সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র



(জলরঙ)

ঘোমটা

—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ
কার্তিক ১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড
প্রথম সংখ্যা



মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

● ঈশা অনুসরণ ●

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অত্যন্ত আসক্তি

১। যখন কোনও মনুষ্য কোন বস্তুর জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়—তখন তাহার আভ্যন্তরিক শান্তি নষ্ট হয়।(ক)

অভিমানী এবং লোভীরা কখনও শান্তি পায় না কিন্তু অকিঞ্চন এবং বিনীত লোকেরা সদা-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। যে মানুষ স্বার্থ সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ মৃত হয় নাই, সে শীঘ্রই প্রলোভিত হয় এবং অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় সকল তাহাকে পরাভূত করে।(খ)

যাহার আত্মা দুর্বল এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রিয়ের বশ এবং যে সকল পদার্থ কালে উৎপন্ন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভবের উপর যাহাদের সত্তা বিদ্যমান, সেই সকল বিষয়ে আসক্তি-সম্পন্ন, পার্থিব বাসনা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। সেই জন্যই যখন সে অনিত্য পদার্থ সকল কোনও রূপে পরিত্যাগ করে, তখনও সর্বদা তাহার মন বিমর্ষ থাকে এবং কেহ তাহাকে বাধা দিলে সহজেই ক্রুদ্ধ হয়।

তাহার উপর যদি সে কামনার অনুগমন করিয়া থাকে তাহা হইলে, তাহার মন পাপের ভার অনুভব করে; কারণ, যে শান্তি সে অনুসন্ধান করিতেছিল, ইন্দ্রিয়েরা পরাভূত হইয়া, সেদিকে আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

অতএব, মনের যথার্থ শান্তি ইন্দ্রিয় জয়ের দ্বারাই হয়; ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিলে হয় না। অতএব, যে ব্যক্তি সুখাভিলাষী, তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই, যে ব্যক্তি অনিত্য বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করে তাহারও মনে শান্তি নাই; যিনি আত্মারাম এবং যাঁহার অনুরাগ তীব্র, তিনিই শান্তি ভোগ করেন।(গ) —স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

(ক) ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

সঞ্চরমাণ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মন যাহারই পশ্চাৎ গমন করে সেইটিই, বায়ু জলে যে প্রকারে নৌকাকে মগ্ন করে তদ্রূপ তাহার প্রজ্ঞা বিনাশ করে—ভগবদ্গীতা।

(খ) ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বাহ্যবস্তুর চিন্তা করিলে, তাহাদের সঙ্গ উপস্থিত হয়। তাহা হইতে বাসনার এবং অতৃপ্ত বাসনায় ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতিধ্বংস হয়। স্মৃতিধ্বংস হইলে, নিত্যানিত্যবিবেক নষ্ট হয় এবং তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ পতন উপস্থিত হয়।—গীতা।

(গ) যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।

যে সকল দৃঢ়পুরুষ সংযমী হইবার জন্য যত্ন করিতেছেন অতি বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহাদেরও মনকে হরণ করে।—গীতা।

নগরী ও নাগরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



হল্লা! হল্লা!

এক লরি লাঠিধারী পুলিশ এসে পড়ল আর চকিতে ফুটপাতের দোকানগুলো তছনছ হয়ে গেল। কতগুলি ছুটে বেরিয়ে গেল, কতগুলি গা-ঢাকা দিল, কতগুলি ফাঁকায় গিয়ে আপোষ করল।

তেমনি করেই হল্লা নামল বস্তিটার উপর।

সরে পড়ো। বেরিয়ে যাও। ঘর-দোর খোলসা করে দাও।

ফুটপাতের পসারীদের মত মেয়েগুলো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে প্রশ্ন করতে লাগল: কেন, ব্যাপারখানা কী?

উপরালারা বললে, বেশ, সাতদিন সময় দিচ্ছি। সাত দিনের মধ্যে বস্তি খালি করে দিতে হবে।

কেন, কী হল? বস্তিওয়ালার লোককে ডাকো।

বস্তিওয়ালার লোক এসে বললে, এখানে রিফিউজিরা থাকবে।

'আমরা যাব কোথায়?'

'সরকারী অনাথ আশ্রমে।'

'সেখানে আমাদের চলবে কী করে?'

'তাঁত বুনে—'

একটা মেয়ে আরেকটা মেয়েকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল: 'ওলো শুনছিস এবার থেকে আমরা তাঁত বুনে খাব।'

এত ভয়-ভীতি অনিশ্চয়তার মধ্যেও হাসতে পারে মেয়েগুলো।



কেউ-কেউ থানায় গেল মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে। যোগ্য ক্ষেত্রে পাওয়া গেল মুলতুবি। হুকুম হল যদি বিয়ে করে গেরস্ত বনে যেতে পারো দেব থাকতে। গেরস্তর সঙ্গে উদ্বাস্তু বাসিন্দেদের কোনো ঝগড়া নেই।

বেশির ভাগই গাঁয়ে-ঘরে পালাল। পুরোত ডাকিয়ে বা মন্দিরে গিয়ে বিয়েও হল গোটা কতক। আবার কতগুলি দিশপাশ না পেয়ে হিমসিম খেতে লাগল।

আমরা কী অপরাধ করেছি!

অপরাধ করো নি? তোমরা মূর্তিমন্ত পাপ

এতদিন ইংরেজের আমলে তো বেশ ছিলাম—

সে আমল আর নেই। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতায় এ সব পাপ থাকতে পারে না। কোনো পাপই থাকতে পারে না, থাকবে না। সমস্ত পাপ উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্যেই স্বাধীন হওয়া।

কিন্তু আমরা যাই কোথায়? আমরাই তো আবার রিফিউজি হলাম। আমাদের আশ্রম কই?

আশ্রমের প্ল্যান হয়েছে। এই তৈরি হল বলে।

যদ্দিন না হয়?

সবাই যা করে প্রসেশান করো—

কেউ কেউ দিব্যি ভদ্রপাড়ায় ঢুকে গেল। জানলা-দরজায় শান্তিনিকেতনী পর্দা ঝোলালো। কেউ কেউ পাখি ফেলে কুকুর রাখল।

তরী একবার বলেছিল অধীরকে, 'এস আমরা বিয়ে করে ফেলি।'

'দূর!' এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল অধীর। পরে সহজ হবার চেষ্টায় বললে, 'বিয়ে হলে সুবিধে কী।'

'মানে এইখানেই থেকে যাওয়া যায়।'

'না। আমি তো তোমার জন্যে ঘর দেখেছি।'

'কোথায়?' খুশিতে তরী উথলে উঠল।

'ভদ্রপাড়ায়। বদন দত্ত লেনে। খুচরো ঘর নয়, গোটা একটা বাড়ি বলতে পারো।'

'বাড়ি?' আবার তক্ষুনি মিইয়ে গেল তরী।

'একতলার ছোট একটা ফ্ল্যাট। দু'খানা ছোট ঘর, এক-চিলতে বারান্দা, বাথরুম আর রান্নার জন্যে একটা পায়রার খোপ।'

'ভাড়া কত?'

'বেশি নয়।'

'তবু শুনি না—'

'পঞ্চাশ টাকা।'

'ওরে ব্বাবা:!' তরী আরো শুকিয়ে গেল: 'চালাব কী করে!'

'তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।' অধীর বললে সগর্বে, 'সমস্ত আমি চালাব। আমি আমার মেস ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে উঠে আসব।'

'সত্যি?'

'নইলে তুমি ঐ বিদেশে একা-একা থাকবে কী করে?' পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'কিন্তু একটা বিষয়ে তোমার অসুবিধে হবে।'

'কি?'

'তোমাকে একেবারে হোলটাইমের হয়ে যেতে হবে। আর এদিক-ওদিক ছুটোছাটা চলবে না।'

'কোনো দরকার নেই।' তরী হাসিমুখে তাকাল। 'তাই তো বলছি বিয়ে করে ফেল।'

'দূর! বিয়ে করে ফেললে আর ভালোবাসা থাকে না। বিয়ে করে ফেলবার পরেই ঝগড়া সুরু।' অধীর সিগারেট ধরাল। 'এই তুমিও কারু নও আমিও কারু নই এতেই ভাবটা ভালো জমে। তোমারও দরজা খোলা, আমারও দরজা খোলা, এতেই বেশি হাওয়া বেশি আলো— নইলে আইন দিয়ে বাঁধা ছোট একটা সম্পর্কের মধ্যে থাকা— এতে সুখ নেই।'

তরী বাধ্য মেয়ের মত বললে, 'তুমি যেমন বলবে তেমনি হবে।'

বদন দত্ত লেনের একতলার ফ্ল্যাটে তরীকে নিয়ে উঠে এল অধীর। পাশে—উপরে আরো ভাড়াটে আছে, তাদের থাকতে দাও। রাস্তার উল্টো দিকের বাড়িতে বুড়ো বাড়িওয়ালা থাকে, সে এদিকে নজর না দিক। আমরাও তোমাদের কিছু দেখব না, তোমরাও আমাদের কিছু দেখো না এরই নাম তো সভ্যতা। আমরা পাপের দেশ থেকে এখন সভ্য দেশে এসেছি। স্বাধীনতার উপকূলে।

কোনো দরকার ছিল না, বাড়িওলা খোঁজ নিতে এল।

'আপনারা স্বামী-স্ত্রী দু'টিতেই বুঝি থাকবেন—'

'আপাতত তাই।' স্নিগ্ধমুখে অধীর বললে।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়তেই যে কোনো লজ্জাশীলা গৃহস্থ-বধূর মতই তরী পাশের ঘরে অদৃশ্য হল।

মুখোমুখি ধরা পড়লেও তরীকে দেখে ভদ্রলোক হতাশ হতেন না। সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে শাঁখা পরেই সে এসেছে। ললাটে-মলাটে কিছুই ত্রুটি রাখে নি।

তরীর মা-ই তরীকে এ পথে নিয়ে এসেছিল। পূর্ব-পুরুষের ব্যবসা উত্তরপুরুষে করে তার মধ্যে নতুনত্ব কী। তবু তরীকে যে তার মা ক'টা বছর ইস্কুলে পড়িয়েছিল শুধু তার ব্যবসায় জৌলুস বাড়াবার জন্যে। তাই, ওরই মধ্যে একটু সম্রান্ত বলে, তরীকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে দেয় নি, ভিতরের ঘরেই বসিয়ে রেখেছে। তরীর মা'র সাধ ছিল একটি ভালো দেখে বাবু বেছে নিয়ে তার কাছেই ও বাঁধা থাকে। ভালো মানে শুধু বড়লোক নয়, ভালো

মানে বড়লোকের চেয়ে কিছু বেশি। দু-তিন জন যারা রাখতে চেয়েছিল তাদের মধ্যে শুধু টাকাই ছিল, বেশিটুকু ছিল না, তাই তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তরীর মা। একমাত্র অধীরকেই পছন্দ হয়েছিল, তার মধ্যে টাকা তেমন না থাক, বেশিটুকু—টানটুকু ছিল। এই টানটুকু, ব্যথাটুকুই আসল—বুঝতে ভুল করে নি তরীর মা, তাই ষোল আনা না পারলেও অধীরকে টাইমের বাবু হতে বাধা দেয় নি। তারপর তীর্থ করে এসেই তরীর মা যখন মারা যায় তখন অধীরকে বলেছিল, তরীকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। জানি না কী হবে, তবু যতদিন পারো ওকে দেখো। ভগবান করুন, তোমার টানটুকু যেন না যায়!

তরীর মা স্বপ্নে ভাবতেও পারত না, এ কোথায় এসে তরী উঠেছে। কী সম্মান আর সমৃদ্ধির এলেকায়। অধীর আজ তার সব সময়ের লোক। তার একমাত্র আশ্রয়। মা ঠিকই বুঝেছিলেন, মনে যদি একটু টান থাকে তা হলে অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারে।

টান থাকলেই বুঝি ক্ষমা আসে, ত্যাগ আসে, হিসাব-কিতাব ভুলে যেতে হয়।

কিন্তু এতখানি খরচ কি একা অধীর চালাতে পারবে?

'কেন পারব না? আমার মেসের খরচ তো আর টানতে হচ্ছে না!' অধীর সতেজে বললে।

'তবু দেখ তুমি হিসেব করে।'

'দেখেছি। তুমি যে কিছু নিচ্ছ না এটা ধরেছ?'

'বা, আমি নেব কেন?'

'যখন টাইমের ছিলে তখন নিতে। যারা হোলটাইম বাঁধা থাকে তারাও রিটেইনার ফি পায়। তোমারও পাওয়া উচিত।'

'যারা আশেপাশে আছে তারাও অমনি পায় বুঝি?'

'পায়, অন্য নামে পায়।'

'তুমি যখন পারবে তখন তুমিও অন্য নামে দিও। কিন্তু আমি বলছি কী, এখন, আমাকে কিছু না দিতে হলেও', তরী সস্নেহে বললে, 'তোমার বর্তমান আয়ে স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে উঠতে চাইছে না—আমি বলছি কী—'

'হ্যাঁ, ব্যবসাটা ভালো নয়, বাজার বড় মন্দা—'

'তা ছাড়া তুমি মাস-মাস তোমার বাড়িতে যে টাকাটা পাঠাতে, তাতে কম পড়ে যাচ্ছে—'

'হ্যাঁ, তা কী আর করা যায়! বাজার উঠলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বাবদও কিছু-কিছু জমাতে হবে মাস-মাস।'

শেষের কথাটায় তরী মনোযোগই দিল না। বললে, 'আমি বলছিলাম কী, আমি কিছু একটা রোজগারের চেষ্টা দেখি।'

বিমূঢ় হবার ভাব করল অধীর। 'রোজগার? এ পাড়ায় ওসব তো চলবে না।'

অধীরের গায়ে তরী হাত দিয়ে ঠেলা মারল। 'ও সবের কথা কে বলছে? বলছি অন্য উপায়ে কোনো কাজকর্ম করা যায় না? এ ফ্ল্যাট-বাড়ির কত মেয়েকেই তো দেখি দশটা-পাঁচটা করে।'

'তাদের তো সব আপিসের কাজকর্ম।'

'আমার ওসব হবে না, কিন্তু আমি অন্য কিছু চেষ্টা করে দেখতে পারি তো?'

'কী চেষ্টা করবে?'

'একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি না। তুমি যদি মত দাও—'

'আমি মত দেব বৈ কি। আমার কিছুতে অমত নেই।' হাসতে গিয়েই আবার গম্ভীর হল অধীর। 'তবে পাড়ার মানটা রাখতে হবে।'

'সে একশোবার। শুধু পাড়ার কেন, আমার তোমার সকলের মান।'

'কিন্তু কী যে তোমার কাজকর্ম জুটতে পারে—'



'বাড়ি থেকে সাহস করে একবার বেরুই—' কালো চোখে তরী ঝিলিক দিল।

'না, তা বেরোও না! বরং সতী-সাধ্বী সেজে যে বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে আছ এ ভাবতেই যেন কেমন লাগে। একদিন একটু খাবে?'

'না, না, পাড়ার মধ্যে নয়।' জিভ কাটল তরী।

'নিজেদের ঘরে বসে খাব, তাতে কার কি বলবার আছে?'

'সে হবে'খন একদিন।'

'সত্যি,' অধীর তরীকে কাছে টানবার চেষ্টা করল, 'তুমি আজকাল ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছ।'

'ভদ্রপাড়ায় থেকে ভদ্র হয়ে গিয়েছি যে।'

শাড়িতে-ব্লাউজে-স্যাণ্ডেলে ছিমছাম সেজে হাতে ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরুল তরী। পানের থেকে এককণা চুনও খসতে দিল-না। ছিপছিপে দোহারা গড়ন, পিঠে লম্বা মোটা একটা বেণী ঝুলছে, ছিরি-ছাঁদে ঝরঝরে, পথচারীদের কেউ সোজা কেউ বাঁকা করে দেখবে তাতে আর বিচিত্র কী। পরিপাটি দেখতে, কোন মেয়েটার দিকে লোকে না তাকায়। তাতে ভড়কালে চলে না। দ্রুতপায়ে হেঁটে যেতে পারলেই হল। যা মন্থর যা থেমে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে নিয়েই লোকে মন্তব্য করে।

তবু কেউ-কেউ যে তাকে অনুসরণ করে এ বেশ টের পায়। বাস-স্টপের থেকে বেশ খানিকটা দূরে বাড়ি তো, তা ছাড়া এ-রাস্তা ও-রাস্তাও তো ঘোরাঘুরি করছে, তাই কারু মাথায় হঠাৎ মতলব গজিয়ে উঠবে এ সে বাধা দেয় কী করে? তারপর যখন দেখে তরী কোন বাড়িতে গিয়ে ঢুকছে, কোন সম্ভ্রান্ততার দুর্গে, তখন পাজীগুলো গালের উপর কেমন সটান চড় খায়! দরজাটা ফাঁক করে দেখতে ইচ্ছে করে কেমন সরে পড়ছে লেজ গুটিয়ে।

এ সব তো পথের জঞ্জাল, এ নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? কত ভদ্রমেয়েও তো অনুসৃত হয়। কত শত গোলমালও তো হয় এ নিয়ে। তার বেলায় আর নতুন কী!

তবু, কেন কে বলবে, তার বেলায় যেন একটু বেশি হচ্ছে, রোজই হচ্ছে। তবে কি তার সাজগোজে কিছু ত্রুটি ঘটছে? শায়ার লেসটা কি শাড়ির প্রান্ত পেরিয়ে এসে রাস্তার ধুলো-কাদা মাখছে? ব্লাউজ কি একটু বেশি খাটো হয়েছে, হাত কি একটু বেশি উদ্ধত? না কি সিঁদুরটা একটু বেশি লাল? কিংবা কে জানে সমস্তটাই হয়তো তার মনের ভুল। চিরকালের আবিল মন, নির্দোষ পায়ের শব্দকেও পাপের শব্দ বলে ভাবছে।

যাক গে, মরুক গে। হন হন করে চলতে লাগল তরী। তার কিসের ভয়? কাকে ভয়? তার একমাত্র লোক তো অধীর। আর অধীর তো সব জানে। সব কিছুতেই তার সম্মতি, তার প্রশ্রয়।

একদিন বাড়ি এসে তরী বললে, 'একটা চা-কোম্পানীর ক্যানভাসিং পাওয়া যায়—নেব?'

'বেশ তো, নাও না।'

তারপর একদিন ক্লান্তস্বরে বললে, 'জানো বড্ড হাঁটাহাঁটি করতে হয়, মুনাফাও সামান্য।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দাও।' একবাক্যে সায় দিল অধীর। 'চায়ের ক্যানভাসার—এ যেন কেমন ভালো শোনায় না।'

'সত্যি—'

তারপর তরী একটা পারফিউমারি কোম্পানির ক্যানভাসার হল। আগে লোকে চা-দিদি বলত এখন গন্ধ-দিদি বলছে। তবু শত সেন্টে-স্নোতেও হেঁটে-বেড়ানোর, খদ্দের-খুঁজে-বেড়ানোর দুর্গন্ধটুকু যাচ্ছে না। তারপর মুনাফাই বা কত। ওটাও তরী ছেড়ে দিল।

আরেকদিন এসে বললে, 'একটা রেস্টুর‍্যান্টে চাকরি পেতে পারি—নেব?'

'কী চাকরি? কাপ-ডিস ধোয়া?' কষ্টের মুখ করল অধীর।

'প্রায় সেই জাতীয়। বয় হওয়া।' তরীর মুখটাও কিছু তরল হল না।

'কী দুর্ভোগ, গার্ল হয়ে বয় হওয়া।' অধীর হাসল।

'কিন্তু কী করি—নেব?'

'নাও না, দেখ না কতদূর কী আছে।'

এই চাকরিটাও পোষাল না। গায়ে সেই ধুলোই লাগছে অথচ কীর্তন হচ্ছে না। যে রাণীর পার্ট করেছে সে ঝিয়ের পার্টে সুখী হবে কেন? মাসে তিরিশ টাকা তার আগের জীবনের তিন দিনের রোজগার। আর এখন যখন সে সম্ভ্রান্ত হয়েছে, কুলীন পাড়ায় উঠে এসেছে, এখন ত্রিশ টাকা তো তার তিন মিনিটের নয়তো বড় জোর ট্যাক্সিতে তিন চক্কর ময়দানের উপার্জন হওয়া উচিত।

তারপর সত্যি-সত্যিই একটা ভালো চাকরি জোগাড় করল তরী। ভিতরের আনন্দটা বাইরের শুষ্কতা দিয়ে ঢাকতে চাইল। বললে, 'একটা ভালো চাকরির সন্ধান পেয়েছি। যদি মত দাও তো নিই। অনেক টাকা।'

'কী চাকরি?' সস্নেহ কৌতূহলে তাকাল অধীর।

'হোটেলের মেয়ে।'

'তার মানে রেস্টুরেন্টের বড় সংস্করণ?'

'না, না, হোটেলের ভেতরে নয় হোটেলের বাইরে চাকরি।'

'ও!' বুঝেছে অধীর, কিন্তু বুঝে মুখ তার শুকিয়ে গেল না বরং উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'কোন হোটেল?'

'জানো এটা নতুন রকম। দু'টো-তিনটে প্রাইভেট গাড়ি আছে, ট্যাক্সির মতন খাটে। লোকে ভাবে ভেতরের খদ্দেরদের গাড়ি, ওয়েট করছে। আসলে ওগুলো

হোটেলেরই গাড়ি। খাওয়ার শেষে ওয়েটিং রুম থেকে একটা মেয়েকে পিক-আপ করে নিয়ে গাড়িতে চাপো আর আধঘণ্টা কি বড়জোর একঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে ফিরে এস।' যেন লাইন পেয়েছে এমনি উৎসাহে দীপ্ত হল তরী।

'কোথায় ফিরে আসবে!'

'সেই হোটেলেই। গাড়ি যে হোটেলের। তারপর সেখান থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাও।'

'পথে নামা-থামা নেই!'

'না, সেইটেই সুবিধে।' করুণ কটাক্ষ করল তরী, 'সেইটেই নিরাপদ।'

'নিরাপদ শুধু নয়, সম্ভ্রান্ত।' চমৎকার সায় দিল অধীর 'কিন্তু পেমেণ্টটা কখন!'

'শুনেছি গাড়ি নেবার আগেই, মেয়ে ও টাইমিং বুঝে। সে পেমেণ্টের ভাগ হোটেল থেকে পাব। তার উপর নামবার আগে টিপস বা কোন না কিছু আদায় হবে। কী বলো, নেব!'

'বেশ তো নাও না, তোমার আরেকটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

'শুধু অভিজ্ঞতা!'

'না না, টাকা—টাকার ভীষণ দরকার। আমার ব্যবসা তো প্রায় ফেল।'

যাক, অবস্থাটা অধীর ভুল করে নি, ভুল বোঝে নি। সহজেই মানিয়ে নিয়েছে।

'শোনো,' ঘুরে দাঁড়াল তরী। 'আমি আগে চাকরিটা নিই। তারপর তুমি একদিন এস। তুমি নিজের চোখে দেখে যাও না কোথায় কী হচ্ছে!'

ক'দিন পরে অধীর গেল হোটেলে। মদ খেল। ওয়েটিং রুমে গিয়ে দেখল তিনটে মেয়ে বসে আছে। তার মধ্যে একটা তরী। তাকেই নির্ভুল বাছল। আঙুল নেড়ে ইশারা করে বললে, তুমি এস।

হুবহু আগন্তুকের মত ব্যবহার করল।

টাইমিং এক ঘণ্টা। ভারী হাতে পেমেণ্ট করল ম্যানেজারকে।

কালো রঙের প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তাতে উঠল দু'জনে, তরী আর অধীর। অধীর তো টলছে, তরীও ওয়েটিং রুমে বসে টেনে নিয়েছে এক পাত্র।

গাড়ি এঁকে বেঁকে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

অধীর একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'তোমাকে ভীষণ নতুন লাগছে!'

এও এমন কোনো কথা নয় যা আগন্তুকের পক্ষে অসঙ্গত।

অধীর বুঝল ড্রাইভার কেমন হুঁশিয়ার, খানিকটা নির্জনের পর আবার কেমন ব্যস্ত রাস্তার মধ্যে গাড়ি নিয়ে আসা। বুঝল, তরী কেমন, কতটুকু পর্যন্ত শিথিল, আবার কখন কঠোর ও দৃঢ়বদ্ধ। বুঝল দেশকাল অবস্থাটাই কী সঙ্কীর্ণ ও কৃপণ।

টিপস দাও। হাত পাতল তরী।

দিচ্ছি, এই ভঙ্গি করে তরীর হাতের উপর অধীর শূন্য হাত উপুড় করে রাখল। এইটুকুই যা আগন্তুক নয়। কিন্তু তার অর্থ ড্রাইভার বুঝবে কী!

হোটেলে ফিরে গেল গাড়ি। সেখানেই কার্টিং হল। একটা ফিটনে করে একা-একা বাড়ি ফিরল অধীর।

তরী হয়তো আরো একটা-দু'টো খেটে যাবে। রাত এখনো বেশি হয় নি।

ফিটনে করে বাড়ি এসে অধীর দেখল তরী আগেই ফিরেছে। হোটেলের গাড়িই তাকে আগেই পৌঁছে দিয়েছে। হোটেলে তার এখন অনেক খাতির। তার জন্যে হোটেলের বাড়বাড়ন্ত।

'তোমার সম্মানে আজ আর খাটলাম না।' তরী বিজয়িনীর মত বললে, 'একটা ভাটিয়া ভদ্রলোককে ডিসয়্যাপয়েণ্ট করে এলাম।'

'তবে আজকের রাতটা আমার।' অধীর উছলে উঠল।

'আমাদের।'

অনেকদিন পর দু'জনে মিলে একসঙ্গে মদ খেল। ভরপুর নেশা করল। তারপর ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে কোরাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরল।

দীপা স্কুলে মাস্টারি করছে আর অমিয় কী একটা ফার্মের কেরানি। তাতে তাদের ভালোবাসা আটকায় নি। দীপা চাইছে এম-এ দিতে আর অমিয় এম-কম পড়ছে। তাতে করে তাদের আর্থিক অবস্থাটা ভালো হতে পারে কিন্তু তার জন্যে তাদের বিয়ে বসে থাকতে পারে না।

'কী রকম বুঝছো?' জিজ্ঞেস করল দীপা।

'যে মুহূর্তে বাবাকে বলব আমি দীপাকে বিয়ে করছি যার পদবী উপাধ্যায় না হয়ে বিশ্বাস সেই মুহূর্তে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে।'

'আমারো প্রায় সেই দশা।' বললে দীপা, 'আমাকে তো আর মুখের উপর গেট-আউট বলবে না, তবে কাঁদতে বসবে। সেই কান্না বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ারই সমান।'

সুতরাং বিয়ে করবার আগে ছোটখাটো একটা বাড়ি ভাড়া করো। তার মানে বাড়ি ঠিক করে পরে বিয়ে করো।

নইলে বিয়ের পর বাড়ির জন্যে ফ্যা-ফ্যা করছ সে এক

দুঃসহ অবস্থা। তুমি শুনছ নিত্য গেট-আউট আর আমি নিত্য মরাকান্না। শুনে শুনে বিয়ের বারোটা বাজিয়ে দেওয়া।

আরেক কাজ করা যায়। রেজেস্ট্রি করে এসে বিয়েটা গোপন করে থাকা যায় ক'দিন, যদ্দিন সুবিধেমত বাড়ি না মেলে। এ অবস্থা আরো দুঃসহ। এ যেন সন্দেশ খেতে দিয়ে জল খেতে না দেওয়া।

তার চেয়ে বাড়িতে আগে ঢুকে নিশ্চিন্ত হয়ে ধীরেসুস্থে বিয়েটা সেরে নিলেই হবে। আগে ঘর পরে বৌ।

কিন্তু সস্তায় ছোটখাটো ঘর পাচ্ছি কোথায়?

দীপা বললে, তোমার বন্ধু বিজয় ঘোষকে বলো না। তাদের ফ্ল্যাট-বাড়িতে আমাদের একটু জায়গা হয় কি না।

অমিয় সকাতর আবেদন জানাল। তুই তো দীপাকে দেখেছিস। দে না একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট। ন্যায্য ভাড়া নিশ্চয়ই দেব, চলতি থেকে না হয় কিছু বেশি। দীপাকে দীপান্বিতা হতে দে।

দাঁড়া বাবাকে বলছি।

বুড়ো বাড়িওলাকে বলতেই সে খেপে উঠল: 'নিশ্চয়ই। হারামজাদা অধীর চক্কোত্তীকে তাড়াও।'

পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বিজয় অধীরের ফ্ল্যাটে চড়াও হল। ফ্ল্যাট-বাড়ির কতক বাসিন্দেও অভিযানে যোগ দিল।

'ভদ্রপাড়ায় এ সব বেলেল্লাগিরি চলবে না।'

'কেন, কী করেছি?' অধীর তেড়ে গেল।

'মদ খেয়ে হল্লা করেন, গান গান'—

'নিজেদের বাড়ির মধ্যে বসে যা খুশি করব তাতে কার কী?'

'ঐ মেয়েমানুষটা কে?'

'মুখ সামলে কথা কোন।' অধীর আগুন হয়ে উঠল।

'তা কইছি। কিন্তু কে ও?'

'উনি আমার স্ত্রী।'

'প্রমাণ করতে পারেন?'

'কোন শালা স্ত্রী প্রমাণ করতে পারে? স্ত্রী-স্ত্রী। তার আবার প্রমাণ কী!'

'স্ত্রীর সঙ্গে বসে কোনো স্বামী মদ খায়?'

'ঢের ঢের স্বামী মদ খায়। খোঁজ করুন না ঘরে-ঘরে। জানেন না শোনেন না যত বাজে বকতে এসেছেন!'

'কিন্তু যাই বলুন অমন চেঁচিয়ে গান গাওয়া চলবে না।'

'চেঁচিয়ে গাইবে না তো কি গুনগুন করে গাইবে?' আবার তেরিয়া হল অধীর: 'আর, যে গান গাই বলতে পারেন সেটা অশ্লীল? সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত।'

'বেশি কপচাবেন না।' বিজয়কে সরিয়ে দিয়ে আরেকটা লোক এগিয়ে এল: 'আপনার ঐ স্ত্রী তো হোটেলে গিয়ে বসে।'

'কেন বসবে না? যার যেখানে চাকরি সে সেখানেই তো বসবে।'

'চাকরি!' কতগুলো হাসির ছররা ছিটিয়ে পড়ল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রিসেপশানিস্টের চাকরি। যে যেমন জোটাতে পারে। তাতে আপনাদের কী!'

'আমাদের এই যে আমরা আমাদের পাড়াকে পবিত্র রাখব। আপনাকে স্ত্রী খাটিয়ে তার উপার্জন খাবার ব্যবসাকে আমরা প্রশ্রয় দেব না।'

অধীর আবার আগুন হয়ে উঠল: 'স্ত্রী রোজগার করে স্বামীর সংসার চালালে মহাভারত অশুদ্ধ হয় এ কোন শাস্ত্রে বলেছে? পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করুন না গিয়ে, কত বাড়িতে স্ত্রীর রোজগারে স্বামী খাচ্ছে, কত বাড়িতে স্বামীর আয় বেশি নয় বলে স্ত্রী আয় করে কমতি পূরণ করে দিচ্ছে—'

একজন একেবারে অধীরের হাত চেপে ধরল। বললে, 'মোটকথা, আপনাকে এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।'

'ককখনো যাব না।' হাত ছাড়িয়ে নিল অধীর।

কিন্তু দু'টো প্রাণী, প্রবল প্রতাপান্বিত ভদ্রপাড়ার সঙ্গে পারবে কেন? রাত্রে-দিনে জানলা-দরজায় ঢিল পড়তে লাগল। যখনই তরী পথে বেরোয় তখুনি তার পিছে লোক লাগে, নানারকম বচন ঝাড়ে। যদি নেওয়া-দেওয়া করতে হোটেলের গাড়িও আসে, তা হলে সে গাড়ির উদ্দেশেও ঢিল ছোঁড়ে। কেউ কেউ আবার হোটেলের দোরগোড়ায় গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে।

কাঁদো-কাঁদো মুখে তরী বললে, 'চলো আর কোথাও চলে যাই।'

'কোথায় যাবে?'

'আবার বস্তিতে। তুমি দেখ না চেষ্টা করে।'

'বস্তিতে গেলে তোমার হোটেলের চাকরিটা থাকবে না।'

'না থাক, আবার না হয় ক্যানভাসার হব।'

অধীরের মুখও বিষণ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু কোথাও কারু কাছে তার সমর্থন নেই, এ অখণ্ড মরুভূমিতে সে টেঁকে কি করে?

অনেক খোঁজাখুঁজি করে আগের চেয়েও ঘোরতর নোংরা একটা বস্তিতে ঘর ঠিক করেছে অধীর। ঠিক হয়েছে মাসের পনেরো তারিখে উঠে যাবে।

আজ সেই মাসের পনেরো তারিখ।

বাক্স বিছানা বেঁধে-ছেঁদে অপার ম্লান মুখে বসে আছে তরী, দীপা আর অমিয়ও এসেছে বাক্স বিছানা নিয়ে বাড়িতে দখল নিতে। অমিয় যে ঠেলাতে করে মাল এনেছে সেই ঠেলাতে করেই অধীরদের মাল যেতে পারে কি না তারই দরাদরি করছে অধীর।

যে মেয়ে উপরতলার রাখে নি আবরণ

নমিতা চক্রবর্তী

টপ্‌লেস—
অর্থাৎ কি না অত্যাধুনিক মেয়েটার
অত্যাধুনিক ড্রেস।
বিশ শতকের শেম্‌লেস মেয়ে
রাখে নি উপরতলার আবরণ,
কবির ছন্দে আঁকা হলো তারি
অকরুণ বিবরণ।
কালিদাস হলে নিরাবরণার অঙ্গশোভা
দেখা দিত হয়ে যুবজন মনোলোভা,
কবির কাব্যে তনুর মাধুরী ছড়াতো দিব্যবিভা।

টপ্‌লেস ছবি
এঁকেছেন তো এ যুগের মহাকবি।
সেই যে আকুল ফেনার মাঝে
উর্বশী দাঁড়ায়েছে টপ্‌লেস সাজে,
আর মুনিরা পাগল তার পায়ে দিতে
তপস্যার ফল।
তারে ভালোবেসে ত্রিভুবন
হয়েছে চঞ্চল।
সেদিনের এসব কাণ্ডকারখানা শুনে
ভেবেছিল কি বিশ শতকের মেয়ে,
উর্বশী আর তার মাঝে ব্যবধান শুধু
গায়ে জড়ানো কাপড়খানা নিয়ে?
মেয়েরা শুনেছে পুরুষের রক্তধারা
আকুল করেছে টপ্‌লেস যারা।
তাদের পায়েই নিজেকে করেছে নিঃশেষ,
সরম কুণ্ঠিতাকে চিরদিন হারিয়েছে টপ্‌লেস।
সেই তো কবে লাজুক মেয়েরা লিখতো লিপি পদ্মপাতায়
বাজায়ে মুখর কাঁকনে,
বেত্রবতীর তীরে গিয়েছে অভিসারে, নূপুর পায়ে
চপল চরণে।

নীল নিচোলে নিজেরে আবরি
বাসরঘরে গিয়েছে ভীরু তরুণী,
প্রিয়রে স্মরি' বয়ান তাহার
হয়েছে অরুণ বরণী।
সে সব সেকেলেপনা আধুনিকতার অন্তে
হয়েছে নিঃশেষ,
এখন এসেছে টপ্‌লেস।
অজন্তা আর ইলোরার পাষাণ বুকে
অমর যাদের তনুর লাবণি,
তাদের ছবিই বাঁকা রেখায়
আঁকছে আজো কবির লেখনী।
আজকে যদি সেকালিনী কোনো
যুঁথীর গুচ্ছে পাঠায় পত্রদূত
গোপন তাহার বার্তাখানি লয়ে
চমকে বিদ্যুৎ—
কবির চোখে ঘনাবে বিস্ময়,
অচেনা এ ভাষার সঙ্গে নাই তো পরিচয়!
রান্নাঘরের নিস্তারিণী আর
পথিক-বধূ মালবিকা
তারাই হয়েছে বেশবাস ছেড়ে
টপ্‌লেস আধুনিকা।
সভ্যতার আগুন লেগেছে ঘরে
দয়িতা হবে মোহিনী,
বধুকে করবে বরণীয়া
অনেক চোখের লোলুপ লেহনী।
শতাব্দী মেতেছে মৃত্যু তাণ্ডবে
এভারেস্টের তীক্ষ্ণ চূড়ায় দাঁড়িয়ে,
বাহুতে তার বাঁধা টপ্‌লেস মেয়ে—
ছিন্নমস্তা। নিজের রক্ত পড়ছে তার মুখে,
পড়ছে তার সারাটি শরীর বেয়ে,
আধুনিক সভ্যতার বলিদান
শেম্‌লেস টপ্‌লেস মেয়ে।

দীপা অমিয়কে জিজ্ঞেস করলে, 'ঐ মেয়েটা কে?'

অমিয় বললে, 'ওই তো ঐ ভদ্রলোকের রক্ষিতা।'

'রক্ষিতা বলেই বুঝি ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে?'

'তা ছাড়া আর কি! পাড়ার মধ্যে একটা কুৎসিত দৃষ্টান্ত রাখা চলে না।'

কথাটা দীপার বুকের মধ্যে ধক করে লাগল। বললে, 'আমরা যে এ বাড়িতে ঢুকছি আমিও তো সম্প্রতি তোমার রক্ষিতা। এক রক্ষিতাকে তাড়িয়ে আরেক রক্ষিতা ঢোকে কি করে?'

দীপা তরীর কাছে এগিয়ে গেল। বললে, 'আপনারা যাবেন না। আপনার ভদ্রলোককে ডাকুন, ঠেলা ভাড়া করার দরকার নেই। আর বাড়িওলাকে বলুন, কোর্ট করে উচ্ছেদ করুন, অমনি যাচ্ছি না। না, যাচ্ছি না, উচ্ছেদ অত সহজ নয়।' বলতে-বলতে অমিয়কে নিয়ে দীপা বেরিয়ে গেল বাইরে।

এক্স-রে-র প্রতিক্রিয়া

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজকের দিনে মানুষের রোগনির্ণয় এবং তার কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্যে যতো রকম পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকে—তার একটি হলো এক্স-রে। অনেক ব্যাপারে, বিশেষ করে আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ কোনো গোলযোগ সঠিকভাবে ধরবার জন্যে এক্স-রে একটি অপরিহার্য উপায়। সভ্য পৃথিবীর সর্বত্রই এক্স-রের আজকের দিনে বহুল প্রচলন।

আমাদের দেশেরই একজন কবি একসময় বলেছিলেন যে, মানুষের পক্ষে কিছুই অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়—পৃথিবীতে এমন কিছুর সন্ধান আমরা আজো পাই নি, যার দ্বারা আমরা শুধুই লাভবান হতে পারি, কিছুমাত্র ক্ষতির আশঙ্কা বা ঝুঁকি না নিয়ে। প্রসঙ্গত এক্স-রের কথায় আসা যাক।

আজকের দিনে অনেক জটিল রোগের জন্যে এক্স-রের ওপর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নির্ভরতা অপরিসীম। ডাক্তারবাবুরাও এর প্রচুর সাহায্য নিয়ে থাকেন। এক্স-রের ব্যবহারের সময় যে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় বা করা উচিত—সে সম্পর্কেও ডাক্তারবাবুরা তো সকলেই জানেন, এমন কি এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যাঁরা কখনো না কখনো বাধ্য হয়েছেন ঘাঁটাঘাটি করতে, তাঁরাও জানেন। এক্স-রে ব্যবহারের সময় যে সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রচলন আছে সেগুলি পালন করে সাধারণ মানুষ তো বটেই, ডাক্তারবাবুরাও নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু আশঙ্কার কথা হলো ঐ সমস্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলার পরেও যখন এক্স-রে করা হয় তার ফলেও মানুষের নানা ক্ষতির সম্ভাবনা—এ যেন এক রোগ সারাতে আর এক রোগ ডেকে আনা আর কি। এ সম্পর্কে সবার আগে আমাদের হুঁসিয়ার করে দেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকান বিজ্ঞানী-অধ্যাপক এইচ জে মুলার।

অধ্যাপক মুলার নানাজাতের পোকা-মাকড় এবং গরু ও ছাগলের ওপর এক্স-রে প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, এর সাহায্যে ঐ সমস্ত প্রাণীর ভেতর এমন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব—যার ফলে হয়তো একটা গরু দু'টো মাথাওয়ালা বাছুর প্রসব করে বা একটা ভেড়া এমন বাচ্চা দেয় যার ঠ্যাং বলে কিছু থাকে না কিম্বা হয়তো দু'-তিনটে লেজ নিয়েই জন্মালো। এ হলো প্রজননশাস্ত্রে (Genetics)-এ যাকে বলে Mutation (পূর্বপুরুষের চেহারার ভিন্নাবস্থায় জন্মানো)।

অধ্যাপক মুলার বলেন যে, জীবজগতে মিউটেশন অত্যন্ত ক্ষতিকর—তা এক্স-রের সাহায্যেই ঘটানো হোক বা অন্য কোনো কারণবশতই ঘটুক। এর ফলে শুধু যে একটি জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা দেওয়া হলো তাই নয়—তার আয়ুও কেড়ে নেওয়া হয়। ওঁর পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, মিউটেশন-এর ফলে সৃষ্ট কোনো জীবই তার পূর্বপুরুষের অধেক স্বাভাবিক আয়ুও লাভ করে না। উপরন্তু তাদের শারীরিক গঠনের মতো মানসিক গঠনেও দেখা দেয় রকমারী অস্বাভাবিকতা।

এবার মানুষের বেলায় এক্স-রে কি কুফল সৃষ্টি করে দেখা যাক। অধ্যাপক মুলার বলেন যে, শরীরের যে সমস্ত 'বিপজ্জনক' জায়গা সেসব বাদ দিয়েও অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদ যেমন হাত বা পায়ের এক্স-রে যার একবার কি দু'বার করা হয়েছে তারও কিছু আয়ু ক্ষয় সেই সঙ্গে অবশ্যই হয়ে গেছে। শরীরের কোনো অঙ্গের এক্স-রে করবার পরে যদি সেইখানকার চামড়া তামাটে হয়ে যেতে থাকে বা চুল পড়তে আরম্ভ করে—তবেই সাধারণত ডাক্তারবাবুরা আজকাল মনে করেন যে, এক্স-রের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু অধ্যাপক মুলার বলেন যে, তা নয়—ঐ সমস্ত পরিবর্তন যখন চোখে পড়ে তখন তো বুঝতে হবে খুব মারাত্মক রকমের ক্ষতিই হয়ে গেছে—কিছু-কিছু ক্ষতি তার অনেক আগে এমন কি একবারমাত্র এক্স-রে করালেও হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক্স-রে করবার ফলে মানুষের যে ক্ষতি তা প্রধানত সেই রুগীর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু 'বিপজ্জনক' অঙ্গগুলি অর্থাৎ পাঁজরের নীচু থেকে হাঁটুর কয়েক ইঞ্চি ওপর পর্যন্ত—বিশেষ করে তলপেট বা জননেন্দ্রিয় যদি এক্স-রের বিমুক্ত রশ্মির আওতায় এসে যায় এবং তারপর যদি সেই পুরুষের ঔরসে বা সেই নারীর গর্ভের সন্তান জন্মে তা হলে তার মধ্যেই হোক বা অধস্তন দু'-এক পুরুষের মধ্যেই হোক 'মিউটেশন' অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেবে।

তাই অধ্যাপক মুলার প্রায় ত্রিশ বছর এক্স-রে নিয়ে গবেষণা করবার পরে আজকের দিনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, ক্যানসারের চিকিৎসা বা জটিল কোন রোগ-নির্ণয়ের জন্যে এক্স-রের ব্যবহার সীমিত হওয়া প্রয়োজন—আর যাদের বয়স কম অর্থাৎ সন্তানাদির হবার সম্ভাবনা আছে তাদের ক্ষেত্রে তো এক্স-রে অবশ্যই বর্জনীয়।

—ডাঃ নাগ।

স্মৃতিশক্তির কথা

আসুন, একটি সত্য ঘটনা দিয়ে বর্তমানের আলোচনাটা আরম্ভ করা যাক। এক তরুণ যুবক তাঁর দেশের একটি অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে একজন প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের সভা-সমিতির আয়োজন চলেছে পুরোদমে। যথাসময়ে যাকে বলে 'ক্যাম্পেন', অর্থাৎ নির্বাচনী প্রচার এবং ভোট সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ভোটদাতাদের স্বমতে আনবার চেষ্টা, সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সময়টা ছিলো ফসল তুলবার সময় এবং সে অঞ্চলটি ছিলো কৃষক-প্রধান। কাজেই প্রার্থীদের নির্বাচনী-প্রচারসভাগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যথেষ্ট প্রচারকার্যের পরেও যখন একটি সভার আয়োজন করা হতে লাগলো তাতেও দেখা যেতে লাগলো—যা লোক হবে বলে বক্তা-প্রার্থীরা আশা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তার দশ ভাগের এক ভাগ লোকও আসছে না। অধিকাংশ প্রার্থীই বেশ কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেন। যে যার দলের কেন্দ্রীয় অফিসে খবরটা পাঠালেন।

কেন্দ্রীয় অফিস জানালেন: সভায় লোক না এলে আর তোমরা কে কি করতে পারো!

বাস্তবিকই তো, প্রার্থীরা ভাবলেন, নির্বাচনী সভায় যদি ভোটদাতারা না-ই আসে তা' হলে দলের বা নিজের বক্তব্য আর জনসাধারণের গোচর করবার উপায়ই বা কি!

তখনকার দিনে প্রচারকার্য সাধারণত প্রকাশ্য সভার মাধ্যমেই করা হত। ক্রমে একজন বাদে, এই কেন্দ্রের আর সমস্ত নির্বাচনপ্রার্থীই একেবারে হতাশ হয়ে যে যার দলের আস্তানায় ফিরে কপাল চাপড়াতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ঐ একজন প্রার্থী ছিলেন একটু ভিন্ন স্বভাবের। তিনি বুঝলেন যে, রাজনৈতিক সভায় গিয়ে উত্তেজনায় কালক্ষেপ না করে কৃষকেরা যে যার নিজস্ব কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, এ তো ভালো কথাই। উনি ঠিক করলেন, কৃষক ভোটদাতাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রত্যেককে নিজ বক্তব্য শুনিয়ে আসবেন। এইটা ঠিক করেই বেরিয়ে পড়লেন উনি। কিন্তু কৃষকদের দেখা বাড়িতেও পাওয়া গেলো না। সবাই মাঠে। কেউ ফসল কাটতে, কেউ বা ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজে। সুতরাং তরুণ নির্বাচনপ্রার্থী মাঠে-মাঠেই ঘুরতে লাগলেন এবং মাঠে-মাঠে ঘুরেই প্রত্যেক কৃষক-ভোটদাতাকে নিজের বক্তব্য শুনিয়ে যেতে লাগলেন। এইরকম এককভাবে ইলেক্শন 'ক্যাম্পেন' চালাতে চালাতেই একদিন ঐ তরুণ প্রার্থী এক মাঠে এসে উপস্থিত হলেন।

কৃষক-ভোটার তরুণ নির্বাচনপ্রার্থীর সমস্ত কথাই শুনতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই সমানে তাঁর হাতও চলতে লাগলো—কাস্তে দিয়ে মুঠো মুঠো ফসল কাটছিলেন উনি, কখনো বা শান-পাথরে ফসলের গোছা আছড়ে ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজও করতে লাগলেন। এই অবস্থাতেই প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী বক্তব্য শেষ করলেন। তারপর সুরু করলেন চাষ-আবাদের কথা। কৃষক-ভোটার বিধানসভায় নির্বাচনপ্রার্থী লেখাপড়া জানা 'ভদ্রলোকে'র চাষের কাজের জ্ঞান দেখে বেশ কিছু অবাক হয়ে গেলেন। কৃষকটির বাড়ি ছিলো কাছেই। বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার ডাক এলো।

তরুণ নির্বাচনপ্রার্থী বললেন: চাষের কাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা কেবল বই পড়ে হয়েছে মনে করবেন না। কাস্তেখানা রেখে যান, এসে দেখবেন আমি কেমন সুষ্ঠুভাবে আপনার কাজ এগিয়ে রেখেছি।

কৃষক-ভোটারটি কিছুটা লজ্জিত হয়ে আপত্তি জানালেন। কিন্তু নির্বাচনপ্রার্থী নাছোড়বন্দা, বললেন: আপনার লজ্জার কোনই কারণ নেই, এ সমস্ত কাজ আমি যে শুধু জানি তাই নয়, আমি রীতিমতো ভালোবাসি এ কাজ।

অগত্যা কৃষক-ভোটার কাস্তেখানা রেখে বাড়িমুখো হলেন।

স্নানাহার সেরে কৃষকটি যথাসময়ে মাঠের দিকে আসতে লাগলেন। তাঁর বাড়ির গেটের পাশে কাস্তেখানা ঝোলানো অবস্থায় দেখে বুঝতে পারলেন যে, নির্বাচনপ্রার্থী চলে গেছেন। মাঠে এসে দেখলেন যে মাঠের খানিকটা জায়গার ফসল শুধু কাটাই হয় নি, সুন্দর করে ঝেড়ে গুছিয়ে রেখে গেছেন নির্বাচনপ্রার্থী।

এ ঘটনার প্রায় পঁচিশ বছর পরের ঘটনা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ শুনবার জন্যে সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র আলোচনা-সভার আয়োজন করেছেন সরকারী ভবন হোয়াইট হাউসের একটি প্রকোষ্ঠে। অনেক লোকের মধ্যে সেই কৃষকটিও এসেছেন তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। একটু পরে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে একজন সরকারী কর্মচারী এসে কৃষকটিকে বললেন:

আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন, প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

কৃষকটি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলো। প্রেসিডেন্টের আহূত সভায় উনি এসেছেন বটে, তবে কোনো অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করবার জন্যে নয়। কোনো অভাবই ওঁর নেই। উনি এসেছেন শুধু নতুন প্রেসিডেন্টকে একটু দেখবার জন্যে, যেমন অনেকেই এসে থাকে।

যাই হোক উনি কর্মচারীটিকে অনুসরণ করে প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি যেতেই প্রেসিডেন্ট নিজে কয়েক পা এগিয়ে এলেন করমর্দনের জন্যে। তারপর স্বভাব-সুলভ সহাস্যমুখে তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করে খবরাখবর সব জানতে চাইলেন।

কৃষকটি এবার একেবারে স্তম্ভিত। বিস্ময়ে তাঁর আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মনে আনতে পারছিলেন না, কবে কোথায় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো।

প্রেসিডেন্ট কৃষকটির মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন: আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না কেন? সেই যে সেবার প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় আপনার জমির ফসল কেটে দিয়ে এসেছিলাম।

—বাই জোভ, আপনি সেই লোক!

এরপর দু'জনে দু'জনকে আলিঙ্গন করলেন। অনেক রকম কথাবার্তা চললো কয়েক মিনিট। তারপর এক সময় কৃষক ভদ্রলোক বললেন: দেখুন, মিঃ প্রেসিডেন্ট, এতকাল পরে দেখা যখন হয়েই গেলো তখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—বেশ তো বলুন।

—আপনার সঙ্গে সেই একদিন দেখা হয়েছিল আর আজ হলো, অথচ সেই প্রথম দেখার পর থেকে প্রত্যেক বছর ফসল কাটার সময়েই একটা পছন্দসই জিনিসের অভাবে আপনার কথা মনে হয়—অবশ্য আপনি এখন আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, আর আমার কথাটা এমন একটা তুচ্ছ জিনিস সম্পর্কে যে·····

—আহা, তা কেন, পৃথিবীতে কিছুই তুচ্ছ নয়, বলুন আপনার কি কথা।

—দেখুন, আপনি আমার মাঠের ফসল যেটুকু কেটেছিলেন খুবই সুন্দর হয়েছিল। ঝাড়াইয়ের কাজটাও যে আপনি খুবই ভালো জানেন তার পরিচয়ও পেয়েছিলাম। আমার কাস্তেখানা আপনি আমার বাড়ির গেটের পাশে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন তাও ঠিকমতই পেয়েছিলাম, কিন্তু দেখুন কিছু মনে করবেন না, আমার পূর্বপুরুষের চিহ্ন আর আমারও খুবই পছন্দসই শান-পাথরখানা আপনি চলে আসবার পর থেকে আর খুঁজে পাই নি। আমি সারা মাঠের খড়কুটো ঘেঁটে দেখেছি, কোথাও নেই।

এ কথার উত্তরে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ২৫ বছর আগের ঘটনা স্মরণে আনবার জন্যে মুহূর্তকাল চোখ বুজে রইলেন। তারপরে চোখ খুলে সহাস্যে তাকালেন কৃষকটির দিকে: দেখুন, আমার মনে পড়েছে। আপনার বাড়িতে ঢুকবার গেটের বাঁ দিকে যে চার কোণাচে গেটপোস্টটা আছে আপনার শান-পাথরখানা আমি তার ওপর তুলে রেখেছিলাম।

বলাবাহুল্য কৃষকটি বাড়ি ফিরে দেখলেন তাঁর শান-পাথরখানা ২৫ বছর আগে আব্রাহাম লিঙ্কন যেখানে সযত্নে রেখেছিলেন, সেখানেই রয়েছে।

অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তির জানা কাহিনীগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং চমকপ্রদ এই সত্য কাহিনীটি বলার প্রধান কারণ হলো, এই আব্রাহাম লিঙ্কনই কিশোর বয়সে তাঁর স্মৃতি খুব দুর্বল বলে মাঝে মাঝে শঙ্কিত হতেন এবং তার পর যাকে বলে একেবারে প্ল্যান করে নিজের স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্য চেষ্টা করে পরবর্তী-জীবনে এইরকম অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

লিঙ্কন যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন—আজকের দিনের মনো-বিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, স্মৃতিশক্তি বাড়াবার পক্ষে তা আশ্চর্যরকমের সহায়ক হতে পারে। একে বলে চারটি 'R' নিয়ম। অর্থাৎ—

Registration—নিবন্ধভুক্তকরণ; যেটা আমরা যখন জানবো, তা যাতে ভালো করে মনে ছাপ দিতে পারে সেজন্যে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তা দেখা বা শোনা বা বলা—

Retention—স্মরণে রাখা; যদি ভুলে যাই এ রকম অহেতুক আশঙ্কা করবেন না, মনে ছাপ নেওয়ার সময় যদি প্রকৃতই মনোযোগ দিয়ে থাকেন তা হলে আপনার স্মৃতিশক্তি দেখে ভবিষ্যতে কখনো হয়তো আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।

Recall—পুনরায় স্মরণ করা; ইচ্ছে করলেই অতীতের যে কোন কথা বা ঘটনা স্মরণে আনবার অভ্যাস করা দরকার।

Recognition—বুঝতে পারা, চিনতে পারা; অতীতের কোন কথা, কাজ বা ঘটনা যে সঠিকভাবে আপনার স্মরণে এলো এটা আপনার নিজেরই বুঝতে হবে।

—তীরন্দাজ।

মেয়েরা কেন খাটো হয়?

মেয়েরা কেন খাটো হয়? এর কারণ কিছু যে আছে তা অবশ্যই স্বীকার করবেন জানি। কিন্তু সে কারণটা কি বলে আপনার ধারণা? এক বন্ধুকে প্রশ্নটা করতে সে তো হেসেই উড়িয়ে দিলে: আরে, মেয়েরা তো খাটো হবেই, এ যে প্রকৃতির নির্দেশ। এ নিয়ে আবার আলোচনার কি আছে হে।

তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম অনেক করে। বললাম যে প্রকৃতির নির্দেশ—এই বহুল প্রচলিত কথাটায় যেমন সব কিছুই বোঝায় তেমনি 'বিশেষ' করে কিছুই বোঝায় না। সবকিছুই প্রকৃতির নির্দেশ, কিন্তু তার পরেও কথা থাকে, প্রত্যেকটি বিষয়ের পেছনে আলাদা আলাদা কারণ থাকে।

আর এক বন্ধুকে প্রশ্নটা করতে সে আরো সরলভাবে উত্তর দিলে: মেয়েরা খাটো না হলে ছেলেদের পাশে নেহাৎ বেমানান হতো, সুতরাং······

এমনিভাবে আরো কয়েকজনকে প্রশ্ন করে দেখেছি মেয়েদের খাটো হবার আসল কারণ যে কিছু থাকতে পারে সেই কথাটাই অনেকের মনে হয় নি কখনো এবং নারী-প্রগতির উগ্র সমর্থক যাঁরা—তাঁরা বলেন যে, অল্পবয়স থেকে মেয়েদের প্রকারান্তরে বন্দী করে ঘরে ঢোকানো হয় বলেই বেচারীরা খাটো হয়ে পড়ে। শারীরিক কসরৎ, খেলাধূলো এবং পরিশ্রমের কাজ না করবার দরুণ সমগ্রভাবে ওদের শরীর যথেষ্ট বাড়তে পারে না, আর তারই ফলে খাটো দেখায়।

এটাও কিন্তু সত্যি কথা নয়। গরীব দিন-মজুর এবং কৃষকের ঘরের মেয়েরা একেবারে ছেলেবেলা থেকেই তাদের ভাইদের সঙ্গে সমান ভাবেই কায়িক পরিশ্রম করে থাকে। কিন্তু তবু দেখা গেছে এবং দেখা যায় যে, সে সমস্ত মেয়েরাও তাদের ভাইদের তুলনায় লম্বায় খাটো—অর্থাৎ সমগ্রভাবে শরীর তাদের ছোটো। এটা কেন হয়?

আমরা আগেই বলেছি যে, যা কিছু হচ্ছে জীবজগতে সবই যে প্রকৃতির 'নির্দেশে' হচ্ছে এ-কথার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে। এবার আসুন আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রকৃতির নির্দেশের 'বিশেষত্ব' কি, দেখা যা'ক।

বিজ্ঞানলব্ধ অনেক জ্ঞানের মতোই মেয়েদের খাটো হওয়া সম্পর্কেও আজকের দিনে আমাদের যে জ্ঞান তাও এক বিজ্ঞানীর আকস্মিকভাবে লব্ধ জ্ঞান—অর্থাৎ অন্য এক বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন।

অধ্যাপক ডবলু এস বুলক ইংলণ্ডের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণায় রত। ত্বকের ক্যান্সার সম্পর্কে বেশ কয়েক বছর গবেষণার পরে উনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, যে অবস্থায় বা যে জিনিসের দ্বারা শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবকোস 'অতি দ্রুত' (অর্থাৎ স্বাভাবিকের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি) পুনরুজ্জীবিত হয়ে থাকে—কিম্বা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবকোষের জায়গায় নতুন নতুন জীবকোষ 'অতি দ্রুত' সৃষ্টি হতে পারে সেই অবস্থায়ই শরীরে নানা ধরণের 'টিউমার' হয়ে থাকে বা হতে পারে। কালে কালে এই সমস্ত টিউমারের বেশিরভাগই ক্যান্সার হিসেবে প্রমাণিত হয়।

অধ্যাপক বুলক তাঁর এই গবেষণা করতে গিয়ে একসময় 'এসট্রোজেনিক' অর্থাৎ নারীদেহের বিশেষ হর্মোন শরীরের বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে বলে দেখতে পেলেন। উনি আরো দেখলেন যে, ঐ হর্মোন মেয়েদের এ্যাড্রিন্যালকে এমন 'বিশেষভাবে' ক্রিয়াশীল করে তোলে যার ফলে 'কর্টিশন' জাতীয় একটা রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই তরল পদার্থটি নারীদেহে তাপ সৃষ্টিতে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করতে থাকে—যে তাপের অভাবে একদিকে যেমন ত্বকের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনরুজ্জীবন বিলম্বিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নারীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরুষদের মতো বাড়তে পারে না এবং সমগ্রভাবে মেয়েরা খাটো হয়ে যায়। —নার্স মিত্র।

রমণীর পরিণয়ে, পবিত্র প্রণয়।
সমভাবে সকলের, হৃদয়ে উদয়॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন।
পীযূষ-প্রণয়-রসে, সমান বিলীন॥

রম্য হর্ম্যে, গজদন্ত, নির্মিত পালঙ্গে।
যত সুখ, ভুঞ্জে ভূপ, রাণী-রসরঙ্গে॥
তৃণশালাবাসী কৃষী, প্রেয়সীর সনে।
ততোধিক হয় সুখী, প্রেম-আলিঙ্গনে॥

কৃষিণীর বিম্বাধরে, করিয়া চুম্বন।
পাতার কুটীর ভাবে, ইন্দ্রের ভবন॥ —দীনবন্ধু মিত্র

মাদাম লাফাঁর কারাবাস

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

আর্সেনিক বিষের সাহায্যে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর হত্যাকাহিনী যা ভারতবর্ষে ঘটেছিল, তা হ'ল মীরাটের বিখ্যাত ক্লার্ক-ফুলাম হত্যাকাহিনী। প্রেমের ব্যাপারে স্ত্রী তার প্রেমিকের সাহায্যে কিভাবে ধীরে ধীরে স্বামীকে হত্যা করেছিল, সেই রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল এই কাহিনীর মধ্যে।

এখানে আর্সেনিক ঘটিত একটি বিখ্যাত বিদেশী হত্যাকাহিনীর ঘটনা আপনাদের কাছে উল্লেখ করছি। ঘটনাটি ঘটেছিল ফরাসী দেশে এবং এটি মাদাম লাফাঁর বিখ্যাত ফৌজদারী মামলা নামে পরিচিত।

ঘটনাটি বহুদিনের হলেও এমন এক জটিল রহস্য জড়িয়ে ছিল এই বিচিত্র মামলার মধ্যে যে, আজও লোকের মুখে মুখে এটি আলোচিত হতে দেখা যায়। যদিও জুরিদের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তথাপি এই মামলার চারিদিকে এমন সব অকাট্য সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছিল, যার ফলে মাদাম লাফাঁর দোষটা হয়ে পড়েছিল লঘু—জোর গলায় তাকেই আসামী বলে মেনে নিতে পারে নি বহু বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোক। এমন কি এই ঘটনার অনেকদিন পরে দু'জন প্রুশিয়ান জুরি ঘোষণা করেছিলেন যে, 'তাঁরা আশ্চর্য হয়েছিলেন, কারণ যেখানে উপযুক্ত প্রমাণের একান্ত অভাব ছিল, সেখানে কি করে এই মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়!'

মাদাম লাফাঁর জীবনের প্রথম দিককার পাতা উল্টোলে যে কাহিনী আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই—

মাদাম লাফাঁর আসল নাম ছিল মেরী। অল্পবয়সে পিতামাতার মৃত্যুতে মেরী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। নিরালম্ব অসহায় এই রূপসী কিশোরীটিকে আশ্রয় দেয় তার এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। অল্পবয়স থেকে পড়াশোনায় মেরীর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের জন্যেই ঐ আত্মীয়ের সহায়তায় মেরী প্যারিসের একটি স্কুলে ভর্তি হয় এবং স্কুল-জীবনেই নানা ধরণের বন্ধু-বান্ধবীর আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। অল্প বয়সেই নানা বয়সের মানুষজনের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হবার সুযোগ ঘটে। মেরীর উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি, ক্ষীণ কটিদেশ, লোভনীয় গঠনভঙ্গী, কুঞ্চিত কেশদাম ও নয়ন-যুগলের মোহনীয়তা দেখে স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ত। বিশেষভাবে আশ-পাশের যুবকদের মধ্যে তাকে কেন্দ্র করে নানা ধরণের গণ্ডগোল প্রায়ই লেগে থাকতো।

মেরীর বিবাহ করার কোন ইচ্ছাই প্রথমটা ছিল না। ছেলেদের নিয়ে নাচানাচি করাতেই তার ভাল লাগত সবচেয়ে বেশি। স্বাধীনভাবে লেখাপড়া শিখে, কাজকর্ম করেই জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে, এই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে, অদ্ভুত এক আবর্তের মধ্যে পড়ে চার্লস লাফাঁর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যায় এক শুভ-রাত্রে।

চার্লস লাফাঁ বংশগৌরব বা চেহারার দিক থেকে যদিও মেরীর মোটেই উপযুক্ত ছিল না, তবুও তার নিজের ব্যবসায় সে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করতে পারে, এটাই ছিল অনেকের আশা-ভরসা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় চার্লসকে মেরী গোড়া থেকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। এটা-ওটা নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে খিটমিট লেগে থাকত। একদিন মাদামের তাচ্ছিল্যভরা কটাক্ষপাতে চার্লস অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো এবং ব্যবহারে মেরীর উপর এমনই সে কঠোর ভাব দেখাতে লাগলো যা অসহ্য। ব্যাপারটা ক্রমশ আরও ঘোরালো হয়ে উঠলো, যখন লৌহ-ব্যবসায়ী চার্লস মেরীকে নিয়ে এসে তুললো গ্লানডায়ারের নোংরা এক এঁদো বাড়িতে। অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডা ঘর; চিম্‌নির কালো ধোঁয়ায় সারা চত্বরটা সারা দিনই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এখানে এসে মেরীর চোখ দু'টো জলে ভরে গেল। এমন বিশ্রী পরিবেশে থাকার চেয়ে মৃত্যুই যেন ভাল ছিল তার কাছে। ঐখানে থাকতে-থাকতেই হঠাৎ একদিন রাগের মাথায়, মেরী একখানি চিঠি লিখলো তার স্বামীকে। মুখে যা সে বলতে পারছিল না, তাই চিঠি লিখে জানালে সে।

তাতে লিখলো, 'এই পৃথিবীতে সে একজনকেই শুধু ভালবাসে, কিন্তু সে চার্লস নয়। স্বামী হিসাবে চার্লসকে নিয়ে ঘর করতে সে ঘৃণা বোধ করে। তাকে যেন এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, নয় তো চিরতরেই সরিয়ে ফেলা হয় এই পৃথিবী থেকে!'

চিঠি পড়ে চার্লস-এর যা মনে হওয়া স্বাভাবিক তা

সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমটা রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে গিয়েছিল,—স্ত্রীর কাছ থেকে এ ধরণের চিঠি পেলে কার না মাথায় খুন চেপে যায়! কিন্তু মুখে একটি কথাও বললো না সে মেরীকে। মনে মনে শুধু ভাবলো—দেখাই যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই ব্যাপারে পরে মেরী কিন্তু খুবই অনুতপ্ত হয়েছিল এবং স্বামীর কাছে গিয়ে তার কৃতকর্মের জন্য মাফ চেয়েছিল। সরল প্রকৃতির মানুষ চার্লস স্ত্রীর এই ব্যবহারে খুবই অভিভূত হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার দোষত্রুটি সবই ভুলে যায়।

তাদের দু'জনের মধ্যে আবার শান্তির সুবাতাস বইতে লাগলো। চার্লস আবার নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ব্যবসায় মন দিলে। মেরীও তার সঙ্গে এগিয়ে এলো কোমর বেঁধে। নানারকম উপায়ে ব্যবসার জন্য অনেক টাকা যোগাড় করলে তারা দু'জনে। ইতিমধ্যে চার্লস লোহা গলাবার অদ্ভুত এক কৌশল আবিষ্কার করেছিল। এতে লাভবান হতে গেলে প্রয়োজন আরো অর্থের। তাদের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় সে অর্থও যোগাড় হ'ল এবং এই নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় চার্লস একদিন রওনা হ'ল প্যারিসের পথে। মেরীর সঙ্গে তার তখন যোগাযোগ রইল মাত্র পত্রের মাধ্যমে।

চার্লস প্যারিসে চলে যাবার পর থেকে চঞ্চল চপল চটুল মেরীর মনে নানা ধরণের কুমতি একে একে এসে বাসা বাঁধতে লাগলো। নানা বন্ধু-বান্ধব জুটলো তার। তাদের সঙ্গে নানা ধরণের ফুর্তির মধ্যে ডুবে গেল মেরী। মদ খাওয়া, নাইট ক্লাবে যাওয়া, আজে-বাজে লোকের সঙ্গে চলাচলি করা নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠলো তার জীবনে। এদিকে সতী-সাধ্বীর মত প্রত্যেক মেলে সে চিঠি লিখতো চার্লসকে, আর তাতে লিখতো: তার জন্যে সে যে বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করছে, তারই কথা নানা ভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে।

এক কথায় একেবারে ব্যভিচারের চরমে তলিয়ে গেল মাদাম লার্ফা। বোকা, মোটা চার্লস মন থেকে একেবারেই মুছে গেল তার। চার্লসের উপস্থিতির কথা ভাবতেই যেন বিশ্রী লাগতে লাগলো তার কাছে! এই জীবনযাত্রার মধ্যেই তার বেঁচে থাকার সার্থকতা—এখানে আর কোন অন্তরায়ই সে সহ্য করতে পারবে না! কিন্তু চার্লস ফিরে এলে? অতএব চার্লস যাতে আর ফিরে এসে তার এই স্বাধীন মুক্ত-জীবনের অন্তরায় না হতে পারে, তার জন্য এই পৃথিবী থেকেই চার্লসকে সরিয়ে ফেলার জন্য মতলব আঁটলো সে।

চার্লস-এর জন্মদিন এসে পড়েছিল কাছাকাছি। মেরী ঠিক করলে প্যারিসে তার স্বামীর কাছে ঐদিন তার নিজের একটি ছবি পাঠাবে এবং সেই সঙ্গে সে তার শাশুড়ীর কাছে প্রস্তাব করলো যে, তিনি যেন ঐদিন তাঁর ছেলের জন্যে কিছু পাঠিয়ে দেন। চার্লস-এর মা ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের সরল প্রকৃতির মানুষ। জাঁহাবাজ পুত্রবধূর এই প্রস্তাব তিনি ভাল মনেই মেনে নিয়ে, ছেলের জন্যে একটি কেক আর মেরীর ছবিটি ভালভাবে প্যাক করে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে মেরীর অনুরোধে, তিনি একটি পত্রে তাঁর ছেলেকে, জন্মদিনের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে ঐ কেকের একটি টুকরো মুখে দিতে লিখে দিলেন এবং সেই সঙ্গে এ কথাও লিখলেন যে, ঠিক ঐ সময়, এখানে মেরী এবং আমিও তার স্মৃতিতে ঐ কেকের টুকরো মুখে দেবো।

যথাসময়ে প্যাকেটটি প্যারিসে গিয়ে পৌঁছল। খুশির আমেজে ঝলমলিয়ে উঠল চার্লস-এর মুখ। প্যাকেট আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এলো মার চিঠি! চিঠির লেখা মত, মার আদেশ শিরোধার্য করে, জন্মদিনের বিশেষ দিনটিতে সেই নির্দিষ্ট সময় চার্লস সেই কেকের বেশ কিছুটা অংশ খেয়ে ফেললো—টেবিলের উপর রাখা মেরীর ছবিটি দেখতে-দেখতে। সে কি তখন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে, এই কেক পাঠানোর পেছনে তাকে হত্যা করার অমানুষিক এক ষড়যন্ত্র লুকোন রয়েছে।

কেকটি খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কেমন যেন অসুস্থ বোধ করতে লাগলো চার্লস। ক্রমশ যেন আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগলো তার দেহের শিরা-উপশিরাগুলি।

ব্যাপারটি অতি সামান্যই। অর্থাৎ চার্লস-এর মা টুকরো কেকের প্যাকেটটা প্যারিসে ছেলের কাছে পাঠাবার জন্যে যখন মেরীর হাতে দেন, তখন সে সেটি অতি সন্তর্পণে খুলে, তার মধ্যে থেকে মার দেওয়া কেকটি বার করে নিয়ে, ভরে দিয়েছিল আর্সেনিক মেশানো বড় একটি কেক্। এই কেকটি মেরী সংগ্রহ করে এনেছিল এক পরিচিত ডাক্তারের সাহায্যে, ইঁদুর মারার জন্যে।

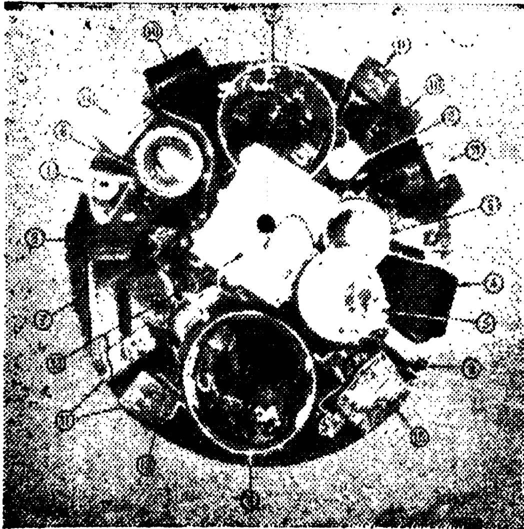
একটু বেশি অসুস্থ বোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই চার্লস ফিরে আসে তার স্ত্রী ও মার কাছে গ্ল্যানডায়ারে। এখানে এসে শরীর ক্রমশই তার আরও অবনতির দিকে এগিয়ে চলে। ডাক্তার আসে, কিন্তু প্রথমটা কোন কারণ সে ধরতে পারে না। কিন্তু ক্রমশ চার্লস-এর অসুস্থতার লক্ষণগুলো এতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ধরে ফেলেন যে এটা আর্সেনিকেরই বিষক্রিয়া। চার্লস-এর মার পুত্রবধূর উপর ভীষণ সন্দেহ হয়। অসুস্থ ছেলের ঘরে সে যাতে আর বেশি ঢুকতে না পারে সেজন্যে তিনি সতর্ক হন এবং তাকেও নানাভাবে বাধা দিতে থাকেন। কিন্তু মেরীর জোরালো অভিনয়ে তাঁর এই সতর্কতা টেকে না। চোখে জল নিয়ে দিনরাত স্বামীর বিছানার পাশে বসে সে সেবা-শুশ্রূষায় দিন কাটায়।

এইভাবে কয়েক দিন কাটতে-না-কাটতে মেরী আবার সুযোগ গ্রহণ করে। এই অসুস্থ অবস্থায় উপরেই একদিন

সে পানীয়ের সঙ্গে আবার আর্সেনিকের গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ায় চার্লসকে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা বাড়ির দু'একজনের নজর এড়ায় না, কথাটাও কানে ওঠে ডাক্তারের। কিন্তু মেরীর পরিচিত এই ডাক্তার ব্যাপারটাকে তেমন কিছুই গুরুত্ব দেন না। চার্লস-এর মা গোবেচারী ভালমানুষ হলেও, এ ব্যাপারে আর এতটুকু সময় নষ্ট করা উচিত নয় মনে ক'রে, তিনি অন্য একজন প্রতিষ্ঠাবান, মর্যাদাসম্পন্ন ডাক্তারের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে ব'লে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করেন। এদিকে যে চাকরটিকে মেরী হাত করে, পয়সা দেবার লোভ দেখিয়ে, আগেকার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল, সে চার্লস-এর মা'র অসহায় ও কাতর অবস্থা দেখে ঘুরে দাঁড়ায় এবং নতুন ডাক্তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলে তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি চার্লসকে পরীক্ষা করার দিনই তার মৃত্যু ঘটে। চার্লস-এর মা ছেলের মৃত্যুতে পাগলের মত হয়ে যান এবং মেরীকেই তাঁর সন্তানের হত্যাকারী বলে চীৎকার করে কাঁদতে থাকেন। এর পর মেরী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় এবং এই মামলা ওঠে আদালতে। অপর দিকে যে ডাক্তারের উপর শব-ব্যবচ্ছেদের ভার পড়ে, তাঁর রিপোর্টে চার্লস-এর দেহে আর্সেনিকের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না, অথচ ইঁদুর মারার জন্য মেরী যে আর্সেনিক ডাক্তারখানা থেকে এনেছিল, তা প্রমাণিত হয়। ক্রমশ এই রহস্যজনক মৃত্যুর চাঞ্চল্যকর কাহিনী ফ্রান্সের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ডাক্তারের রিপোর্টে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া না গেলেও এবং ময়না তদন্ত মাদাম লার্ফার অনুকূলে গেলেও, বিচারকের হাতে মেরী কিন্তু অব্যাহতি পায় না। তার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়ে যায়, অধিকাংশ জুরির সম্মতিক্রমে। এই মামলায় মেরীর প্রতি সহানুভূতিশীল লোকও যেমন ছিল, তেমনি অভিযোগ-কারীর দলও কম ছিল না! সহানুভূতিশীল লোকদের অভিযোগকারীরা মাদামের প্রেমিক বলে অভিহিত করত। কারাগারে থাকাকালীন মাদাম লার্ফার কাছে উভয় পক্ষেরই নানা ধরণের শত শত চিঠি আসত। দূর-দেশান্তর থেকে তার কাছে প্রেম-নিবেদন করেও চিঠি লিখত বহুজন। মেরী নিজের হাতে উত্তর দিত সেইসব চিঠির এবং সকলকেই সে তার হৃদয়ের গভীর ভালবাসার কথা জানাত। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই জেলে তার মৃত্যুর পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আজও আর্সেনিকঘটিত মাদাম লার্ফার এই বিচার-কাহিনীর কথা ইউরোপে অনেকেই আলোচনা করে থাকেন।

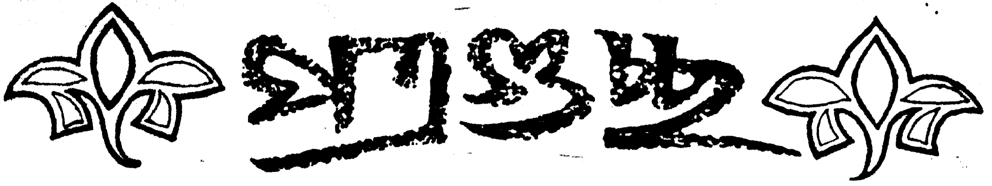
উপগ্রহের আভ্যন্তরীণ আলোকচিত্র

(আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত টিরোজ উপগ্রহের অভ্যন্তরে কি কি যন্ত্র ছিল, তাদের নাম, সংখ্যা ও কার্যকারিতার বিবরণ।)



১ দীর্ঘকোণ টেলিভিসন ক্যামেরা
২ সূক্ষ্মকোণ টেলিভিসন ক্যামেরা
৩ টেলিভিসন টেপ রেকর্ডার
৪ নিম্ন-লোহিত রশ্মি বিকিরণ পরিমাপক পদ্ধতি (পাঁচটি প্রণালী)
৫ উক্ত পদ্ধতির জন্য তড়িৎ-পরমাণু যন্ত্র
৬ উপগ্রহের কার্যাবলীর সময় চিহ্নিত করিবার তড়িৎ-পরমাণু যন্ত্র
৭ চৌম্বক ব্যবস্থার স্থানান্তরিতকরণের মাধ্যমে উপগ্রহ কক্ষপথ ঠিক রাখিবার যন্ত্র।
৮ তড়িৎ-পরমাণু যন্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা
৯ নিম্ন-লোহিত বিকিরণ দিগন্তের সূক্ষ্ম পরীক্ষণ
১০ ক্যামেরাসমূহের জন্য তড়িৎ প্রবাহ চালনার ব্যবস্থা
১১ টেলিভিসন টেপ রেকর্ডারের জন্য তড়িৎ প্রবাহ চালনার যন্ত্র
১২ টেলিমিটার নিয়ন্ত্রক
১৩ এণ্টিনা সুইচ
১৪ স্বয়ংক্রিয় সাঙ্কেতিক যন্ত্র

(স্বাধীনতা পত্রিকার সৌজন্যে)



[বাঙলা সাহিত্যে কবি কামিনী রায় একটি বরণীয় নাম। আমাদের সাহিত্য বহু মহিলা কবি ও লেখিকার সাধনা ও সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। বাঙলা সাহিত্যের এই ঐতিহ্য শতাব্দীকালের। কবি কামিনী রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৪ সালে। এই কবির সৃষ্ট কাব্যসম্ভার বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে সুপরিচিত। বঙ্গাব্দ ১৩৭১ সালে কবির শতবর্ষ পূর্তি লাভ করছে। এই উপলক্ষে মাসিক বসুমতীর পত্রগুচ্ছ বিভাগে স্বর্গতা কামিনী রায় লিখিত দু'খানি মূল্যবান পত্র প্রকাশিত হল। এই দুর্মূল্য পত্রদ্বয়ে মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে নানা অজ্ঞাত তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।—স]

[কবি কামিনী রায়ের পত্র—মন্মথনাথ ঘোষকে লিখিত]

বিষয়: মহাকবি হেমচন্দ্র

হাজারিবাগ
২রা মার্চ, ১৯১৮

মান্যবরেষু—

আপনি কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার জীবনের কথা কিছুই জানি না। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার পিতৃদেবের 'বন্ধু' ছিলেন ঠিক এ কথাও বলা যায় না। আমার পিতৃদেবের পাঠ্যাবস্থায় তিনি হেমবাবুর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য পাইয়াছেন এই কথা শুনিয়াছি।

আমি জীবনে একদিন মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। তখন 'আলো ও ছায়া' যন্ত্রস্থ।

আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় ইতিপূর্বে আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে দেন এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি অবশ্য ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি কে রায়কেই দেখিতে দিয়াছিলাম।—কবিবর কতগুলি কবিতার উপরে 'সুন্দর' Beautiful ইত্যাদি এবং খাতার উপরে A true poet লিখিয়া দুর্গামোহনবাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ছেলেটি কে হে?'

দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, 'ছেলে নয় মেয়ে।'

তিনি অতিশয় আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমার কবিতা তাঁহার মত লোকের ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আমার ভয় ও সঙ্কোচ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইল। তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন জানিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতেও আর দ্বিধা রহিল না। যখন কয়েক ফর্মা ছাপা হইয়াছে, একদিন সকাল বেলা মিসেস পি কে রায় (৺দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমার জন্য গাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কবিবরকে তাঁহারা আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি কলেজের কাজ হইতে ছুটি লইয়া তাঁহাদের রডন স্ট্রীটস্থ ভবনে আসিলাম। সেখানে হেমচন্দ্রের সহিত উমাকালী মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা আসিয়াছিলেন। কবি তাঁহার নব-রচিত গঙ্গা-স্তোত্রটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আহারের পর উমাকালীবাবু তাঁহাকে তাঁহার নিজের কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তিনি কবিতাবলী হইতে 'হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে' ইত্যাদি কয়েক ছত্র পড়িয়া বলিলেন, 'না, মিস সেনের কবিতা হইতে পড়ি।' তখন খুব ভাবের সহিত 'বর্ষ-সঙ্গীত' পড়িয়া শুনাইলেন।

এই দেখাসাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্নেহপূর্ণ চিঠিগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার চিঠি পড়িয়া আমার কবিতার মত আমার গদ্যরচনারও খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আসল কথা তিনি দোষ খুঁজিতেন না, গুণ খুঁজিতেন; সৌন্দর্য দেখিবার চেষ্টা থাকিলে সর্বত্রই দেখা যায়।

তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ ছিল বলিয়া উহাতে আমার আপত্তি হয়। তিনি সেইজন্য দ্বিতীয়বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। উহাই 'আলো ও ছায়া'র দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই বিশ্বাস।

তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত 'আলো ও ছায়া'র সমালোচনাগুলির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং কোন কাগজে সমালোচনা বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত আমাকে জানাইতেন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তিনি চিঠি লেখা কেন বন্ধ করিলেন জানি না। একবার উত্তর না পাওয়াতে আমিও আর লিখিতে সাহস পাই নাই। 'নির্মাল্য' ও 'পৌরাণিকী' প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে

পাঠাইয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই। হয়তো চক্ষুপীড়ার জন্যই চিঠি লিখিতে পারেন নাই।

আমি বাল্যকালে কল্পনা জগতে, আমার দিবাস্বপ্নে তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া কল্পনা করিতাম। সত্য সত্যই তিনি আমার মানস-পিতা। কিন্তু তিনি যে আমার কবিতা পড়িবেন এবং প্রশংসা করিবেন এ কথা আমার 'নিশার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কি সূত্রে তাঁহার উজ্জ্বল নাম আমার প্রথম পুস্তকের সহিত গ্রথিত হইল মনে করিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

আমি তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, অথচ আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। তাঁহার বাক্যেই আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাই বিশ বৎসর পরে, 'আলো ও ছায়া'র ৫ম সংস্করণের সময় তাঁহার নামেই 'আলো ও ছায়া' উৎসর্গ করিলাম।

আমি তাঁহার কথা লিখিতে গিয়া 'আলো ও ছায়া'র কথাই লিখিলাম। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে পারিতেছি না। সময়ান্তরে লিখিব। ইতি—

শুভার্থিনী
কামিনী রায়
৯৮, বেলতলা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

মান্যবরেষু— ১১ই জুলাই ১৯২৩।

হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি, এ সকল কথা এক সময়, অর্থাৎ 'আলো ও ছায়া'তে তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকা পড়িবার পর, তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, সমালোচনা করিবার ইচ্ছা কখনও হয় নাই, এখনও হইতেছে না। পিতা মাতা বা ধাত্রীকে যেমন মানুষ চিরদিন ভালবাসে, তাহাদের গুণাগুণের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করে না, আমারও কতকটা সেই রকম।

হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনা করিয়া বর্তমানে কাহাকেও তাঁহার কাব্যের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিব সে বিশ্বাস আমার নাই। যাঁহারা তাঁহার কবিতা পূর্বে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ভালবাসিতেছেন। নব্য-তন্ত্রের সাহিত্যবিলাসিগণ তাঁহার খুঁতগুলিই ধরিবেন এবং হয়তো গুণের যথেষ্ট সমাদর করিবেন না। সেজন্য আপনার আমার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। এক এক সময়ে এক একটা বিশেষ ধরণের লেখা সাধারণের নিকট প্রিয় ও আদরণীয় হইয়া উঠে। আজকাল রবীন্দ্রযুগ—এ যুগে 'আর্ট'র দিকেই বিশেষ রবীন্দ্রের আর্টের দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ। কবিতার প্রভাব (effect) কানের উপর যতটা, ততটা প্রাণের উপর হয় কি না কেহ দেখে না।

রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জলন্ত স্বদেশপ্রীতি, নারীজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ—এ সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলা-কুশলতা (art) হইতে কবির উচ্চ সত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত; আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধা বুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেইজন্য ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষে কর্ণে কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গভীর সাড়া পাওয়া যায় না।

এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে যেন বক্তব্যটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই, নিজেকে ভুল বুঝাইতেছি। কেহ হয়তো মনে করিবেন আমি রবীন্দ্রনাথকে অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা, গীতরচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার লেখনীস্পর্শে শুষ্ক বিষয়ও সরস ও মধুর হয়, যাহা কিছু তাঁহার কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়, সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু গীত-রচনায় তাঁহাকে মাপকাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব-কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 'স্কুলের' প্রবর্তক, তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ, সুর, নিখুঁত মিল, উপলাহত গিরি-স্রোতের কল-কল ধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানা বর্ণের ক্ষণিক খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশ এই সব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক উপাদান। এগুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানবজীবন তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে—এবং তাহার একটা সরল সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম এবং স্পষ্টকে অস্পষ্ট ও সরলকে জটিলও হয়তো করিলাম। এইখানে অন্ধকার মত শেষ করি।

কাল চিঠিখানা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। অন্য কাজে উঠিয়া যাইতে হয়। আজ লিখিতে বসিয়া অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবুও একটা কথা বাকি রহিয়া গেল, সেটা এই মহাকাব্য এখন out of fashion. কবিতার গুণ দোষ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা গীতি-কবিতারই কথা।

বিনীতা
কামিনী রায়

অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কনকাঞ্জলি'র উৎসর্গ পত্র

[বাঙলা দেশের কাব্যসাহিত্যে অক্ষয়কুমার বড়াল একটি অবিস্মরণীয় নাম। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবি হিসাবে তিনি যে পরিমাণ বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার পরিচয় প্রদান করেছেন সাহিত্যসমাজে এ সম্বন্ধে আজ নতুন কিছু বলার নেই। বাঙলার আর এক বরণীয় কবি বাঙলা কাব্যে রোম্যান্টিসিজমের জন্মদাতা 'সারদামঙ্গল'-এর অমর স্রষ্টা স্বর্গত বিহারীলাল চক্রবর্তীকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর 'কনকাঞ্জলি।' সেই স্মরণীয় উৎসর্গপত্রটি এই মাসিক বসুমতীর 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত করা হল।—স]

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্মী—গর্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্তি ছবি;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল শুধু গাহিতে প্রভাতী,
না ফুটিতে ঊষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি,'
কুহরিল ধীরে ধীরে;
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি' স্বপ্ন-বাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে'।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,—
কি অতল হৃদ, কি অপার স্নেহ!
হা ধরণী, তুই কি অপরিমেয়,
কি কঠোর, কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি'
রহে জাগি' নিশিদিন?

মৃত তোর ভক্ত, কাঁদ, মা জাহ্নবী,
মৃত তোর শিশু, কাঁদ, গো অটবী,
হে বঙ্গ-সুন্দরী, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর!
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার!

কাঁদ, তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান,—
কত মুক্তা-ছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে!
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান্
ওই যায় লোকান্তরে!

যাও, তবে যাও। বুঝিয়াছি স্থির,—
মানব-হৃদয় কতই গভীর;
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম-প্রেমপথ!
দিলে বাণীপদে লুটাইয়া শির,
দলি' পদে পর-মত।

বুঝায়েছ তুমি,—কত তুচ্ছ যশ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির-সুধা রস;
প্রেম কত ত্যাগী - কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী!

বুঝায়েছ তুমি,—কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মজিলে;
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
থাকে না আত্ম-পর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্যে হেরিলে
পদে লুটে চরাচর।

বুঝায়েছ তুমি,—ছন্দের বিভবে;
কি আত্ম-বিস্তার কবিত্ব-সৌরভে;
সুখদুঃখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি'।
ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চির-স্বপ্নে জাগি'!

তাই হোক, হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির রাণীর চরণে—
রাজহংস সম, চির কলস্বনে,
পক্ষ দুটি প্রসারিয়া;

করুণাময়ীর করুণ নয়নে
চির স্নেহরস পিয়া !
তাই হোক, হোক । চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক !
জগতে থাকুক জগতের দুখ,
জগতের বিসংবাদ ;
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ ।
তাই হোক, হোক । ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে !

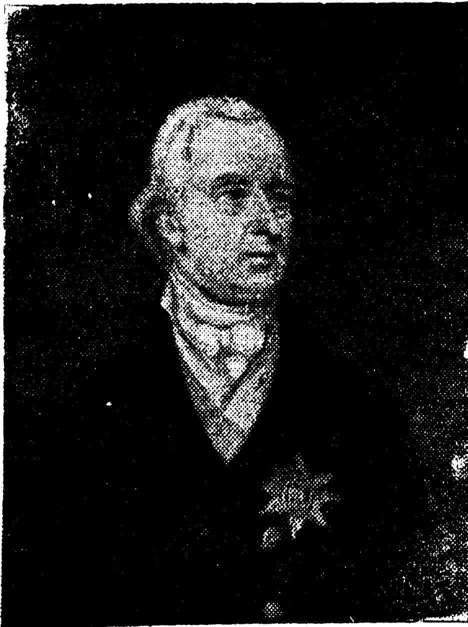
দেখুক প্রেমিক,—সুগভীর যামে,
স্বপনে জগৎ ঢাকি'
নামিছে অমরী, এই সুর ধরি',
আঁচলে মুছিয়া আঁখি ।
তাই হোক, হোক । নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল !
দুখ-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
কবি-জনমের হাহা !
লও—লও, গুরু, মরণ-সম্বল—
জীবনে খুঁজিলে যাহা !

কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক পত্র

হেস্টিংসকে লেখা হিকির পত্র

নভেম্বর ১৭৯৩

বিরাট পরিবার, পোষ্য অনেক । সকলকে যথাযথভাবে লালনপালন করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । এই ঘোরতর দারিদ্র্যে সে কার্য যে আমার পক্ষে কতখানি কষ্টকর তাহা অনুমেয় । একে সাংসারিক দুশ্চিন্তা তদুপরি রোগের ক্রমান্বয়ে আক্রমণ আমাকে সকল দিক দিয়া দুর্বল করিয়া তুলিতেছে ।



ওয়ারেন হেস্টিংস্

হেস্টিংসকে লেখা হিকির আর একটি পত্র

সরকারের অধীনে যদি কোনপ্রকার কর্ম আমি পাইতাম, যাহাতে কায়ক্লেশেও সন্তানদের মুখে অন্ন জোগাইয়া কোন প্রকারেও দিনযাপন করা যায় তাহা হইলেও আমি এই দেশ ত্যাগ করার সঙ্কল্প সর্বতোভাবে পরিহার করিতাম । আমার তা হলে প্রয়োজনই হইত না কলিকাতা ত্যাগের । বয়স বাড়িয়াই চলিতেছে, বার্ধক্য, রোগ, জরা দেহে তাহাদের ঘাঁটি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছে, এমতাবস্থায় যদি মৃত্যু আসে তাহা হইলে আপাতদুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণার কবল হইতে আমি মুক্তি পাইব বটে কিন্তু আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি আমার সন্তানগণকে কলিকাতার পথে পথে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইবে । যদিও তাহারা এখন পূর্ণবয়স্ক, স্বাবলম্বী হইবার সময় বহু পূর্বেই আসিয়া গিয়াছে তথাপি পরিতাপের বিষয় এই যে, আপন আপন দায়িত্বভার গ্রহণে তাহারা এখনও অক্ষম ।

এ হেন অসহায় অবস্থায় আপনার সহৃদয় পৃষ্ঠপোষণা ও বিবেচনার জন্য একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি । 'ক্লার্ক অফ দ্য মার্কেট'-এর পদ যিনি আজ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন তিনি বার্ধক্যের ভারে অবনত । শুধু যে বয়সেরই প্রশ্ন তাহা নয়, অর্থসম্পদেও তিনি যথেষ্ট সৌভাগ্যশালী, তবে তাঁহার পালনীয় কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে অযোগ্যতার পরিচয়মুক্ত নয়, সে কারণে আমার মনে হয় তাঁহার একজন সহকারী নিয়োগ করা হউক । তাহার বেতন অল্প অঙ্কেরই হউক । আর এই অঞ্চলের অনেকের মতে এই প্রস্তাবিত পদটি সৃষ্টি করিয়া আমাকে উক্ত আসনে অধিষ্ঠিত করিলে জনসাধারণকে নানাভাবে সেবা করিবার একটি সুযোগ আমাকে দান করা হইবে । তাহা ছাড়া, এই সংক্রান্ত কার্যে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহাও আমার মধ্যে অবর্তমান নয় ।

অবশ্য, হ্যাঁ, কোনক্রমেই ইহা অস্বীকার করা যায় না

যে, আমিও যৌবনের সীমা বহুকাল অতিক্রান্ত করিয়া আসিয়াছি। প্রৌঢ়ত্বের দ্বারও পার হইয়া গিয়াছি। পুনরাবৃত্তি করিয়াই বলিতে হয় যে, বার্ধক্যের ভারে আমি জর্জর। তথাপি, ইহাও অকপটে ব্যক্ত করি যে, বয়সে বৃদ্ধ হইলেও ঈশ্বরের অসীম কৃপা বলে অনেকের তুলনায় আমি যথেষ্ট সক্ষম এবং কর্মঠ। এই অঞ্চলে আমার সমকক্ষ কর্মক্ষম ব্যক্তি কয়জন আছেন তাহা জানা নাই।

এখন আপনার দুই ছত্র সুপারিশ আমার কর্মপ্রাপ্তিতে যে পরিমাণ সহায়তা করিবে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে আপনার সহায়তা বিশেষভাবে অপরিহার্য বলিয়াই আমার ধারণা এবং ইহাও ঠিক যে, আমি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছি না। তবে আমি যে কেবল এই পূর্বোক্ত পদটির জন্যই আবেদন করিতেছি তাহা নয়, যে-কোন পদ পাইলেই আপাতত আমার এক বিরাট সমস্যার সমাধান হয়। অনটনের কবল হইতে মুক্তি পাই, আমার সমগ্র পরিবারটি তাহা হইলে নিদারুণ দারিদ্র্যের হাত হইতে রক্ষা পায়।

হেস্টিংসকে লেখা হিকির আরও একটি পত্র

বড়দিন, ১৭৯৯

একটি সুদীর্ঘ পত্র পাঠ করা নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে আরামদায়ক হইবে না, তদুপরি যে পত্রের মাধ্যমে কেবল নিরবচ্ছিন্ন বেদনার বার্তা প্রেরিত হয়, স্বভাবতই তাহা কাহাকেও আনন্দ দিতে পারে না। যে পত্রের প্রতিটি ছত্রে করুণ রাগিণী ধ্বনিত হয়, মানুষের অন্তরে তাহা কোন সুখের পুলকানুভূতি সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই দুঃখকষ্টের বিস্তারিত তালিকা পেশ করিয়া আপনার বিরক্তি উৎপাদন করা আমার অভিপ্রায় বহির্ভূত। শুধু এইটুকু জানাইয়া রাখি যে, আমার যাহা কিছু ছিল তাহার প্রায় সমস্তই আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং বাঁধা পড়িয়াছে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আমাদের দারিদ্র্য দুঃখের গভীরতা আর কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

আপনার এবং শ্রীমতী হেস্টিংসের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি এবং ঈশ্বরের কৃপা অফুরন্তভাবে আপনাদের উপর বর্ষিত হউক সর্বান্তঃকরণে এই কামনাই করিতেছি।

আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

আপনার সবিশেষ অনুগত

স্বাঃ—জাস এ হিকি

প্রধান বিচারপতিকে লেখা হিকির পত্র

১৭ই জানুয়ারী, ১৭৮৩

উনিশটি মাসেরও অধিককাল এই কারান্ধকারে আমার অতিবাহিত হইল। মধ্যে নয় মাস পরিবারের পোষ্যদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এ-টি টাকাও অর্জন করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিলাম, আমার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করার ফলেই সংসারের যে এই নিদারুণ অচলাবস্থা তাহা এখানে উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র। একটি নগণ্য বাড়ি পর্যন্ত ভাড়া করা তাহাদের পক্ষে সাধ্যাতীত বিধায় আমারই সহিত গত বড়দিন পর্যন্ত কারাগহ্বরে অবরুদ্ধ অবস্থায় তাহাদের কাটাইতে হয়। আপনারও সন্তানাদি আছে, (করুণাময় ঈশ্বর তাহাদিগকে দীর্ঘজীবী এবং কৃপা করুন)। শুধু প্রধান বিচারক হিসাবেই নয় পিতা হিসাবে আপনার নিকট আমার এই আবেদন আশা করি উপেক্ষিত থাকিবে না। পত্রের মূল বক্তব্য সহৃদয়তার সহিতই আশা করি আপনি বিচার করিবেন। আপনি বিচক্ষণ তাই সন্তানদের এই কুৎসিত কারাগারের দূষিত বায়ুর মধ্যে আবদ্ধ রাখা স্নেহশীল পিতার পক্ষে যে কতখানি মর্মপীড়াদায়ক পিতৃত্বের দৃষ্টি লইয়া আশা করি আপনি তাহা নিশ্চয়ই অনুভব করিবেন। এই যন্ত্রণা হইতে মুক্তির প্রবল ইচ্ছা শুধু ক্ষমতার অভাবেই যে কার্যকর হয় না তাহাও বলা বাহুল্য, এই যন্ত্রণা এই জ্বালা এ তাবৎ চলিয়া আসিতেছে হয় তো ভবিষ্যতে আরও চলিবে। দণ্ড আমার একারই পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তির আমি বিন্দুমাত্র ক্ষতি কখনও করি নাই তাহার দ্বারা এই অকারণ লাঞ্ছনা ভোগ অতীব পীড়াদায়ক। এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আমি কখনও অভিযোগ করি নাই, এখনও অর্থাৎ এই পত্রে যে আমি অভিযোগ করিতেছি তাহা অনুগ্রহপূর্বক ভাবিবেন না। এই বিবরণাদি প্রদানের অর্থ শুধু অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিহিত করা। আমার নিজের ক্ষমতায় যদি কুলাইত তাহা হইলে আমি কালাবিলম্ব না করিয়া এই দূষিত ক্লেদজনক পরিবেশ হইতে সরিয়া যাইতাম, আপনাদের উত্ত্যক্ত করিতাম না।

প্রধান বিচারপতিকে লেখা বিচারপতি চেম্বার্সের পত্র

মিঃ হিকির নিরতিশয় অসহায় অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার পত্রে প্রকটিত অনুচিত আচরণ ক্ষমা করা যাইতে পারে কিন্তু তা হলে ঘোর বিপদের তিনি সম্মুখীন সেই অবস্থা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করা আমাদের পক্ষে কি উপায়ে সম্ভব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

যতদূর মনে পড়ে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (বার-এ্যাট্-ল)

[মাসিক বসুমতীর গত সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এই ধারাবাহিক রচনাটি আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকামহলে সাড়া জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। রচনাটি আইনকেন্দ্রিক এবং রচয়িতা আইনজ্ঞরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হলেও সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি যে যথেষ্ট শক্তি ও খ্যাতির অধিকারী তা অজানা নয়। তাঁর রচিত 'সুশান্ত সা' একদা আলোড়ন এনেছিল পাঠকসমাজে। সেই বহুপঠিত উপন্যাসটি বর্তমানে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে এ সংবাদও সকলের জ্ঞাত। তাঁর উক্ত গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায় 'সিন্ধুপারে' ও 'বিদেশিনী' উপন্যাস দু'টিও মাসিক বসুমতীতে একদা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের বর্তমান রচনার পরবর্তী কিস্তীগুলিতেও তাঁর সুনাম ও দক্ষতার পরিচয় অক্ষুণ্ণ থাকবে—এ বিশ্বাস আমরা পোষণ করি।—স।]

দুই

যাত্রা হল সুরু

ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসেই মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। আমার একটি ছোট্ট বোন নাম প্রভা—এসে শুনলাম সে আর নাই। বিলেত যাত্রার সময় হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে খুব কেঁদেছিল সে—যারা আমাকে বিদায় দিতে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিল কেউ অত কাঁদে নি। বুঝতে পেরেছিল কি আর আমাদের দেখা হবে না? যাই হোক, মনে একটা বেদনা নিয়ে আইন-আদালতের পথে আমার যাত্রা হল সুরু।

আমার প্রথম মামলা। ব্যারিস্টারী সুরু করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ কোর্টের একটি উকিল—যতদূর মনে পড়ে নাম শ্রীআশু ঘোষ। একটি ফৌজদারী মামলা নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন—আমাকে আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে হবে, কেবলমাত্র সওয়াল জবাব (argument) করার জন্য। মামলাটি ছিল ব্যাঙ্কশাল কোর্টের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ জেড্ খানের আদালতে।

আমার পিতৃদেব তখন অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট—জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টের প্রধান বিচারক। তিনি প্রথমেই আমাকে বারণ করে দিয়েছিলেন, আমি যেন তাঁর কোর্টে কোনও মামলা না নিই এবং যতদিন তিনি বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আমি তাঁর কোর্টে কোনও মামলা নিই নি। তবে আমি ফিরে আসা মাত্র, আমার তখনও কোনও অভিজ্ঞতা নেই তবুও যে একটা মামলা সওয়াল জবাবের জন্য আমার কাছে এলো, এটা কলকাতায় আমার পিতারই প্রতিপত্তির ফল—সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম।

মামলাটি ছিল অবশ্য অত্যন্ত সহজ। কোনও একটি আপিসের একটি হিন্দুস্থানী দরোয়ানের হাতে চার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল ব্যাঙ্কে জমা দিতে। কিন্তু দরোয়ান টাকাটা জমা না দিয়ে টাকাটা নিয়ে উধাও হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে খুঁজে গ্রেপ্তার করে এবং পরে তাকে কোর্টে আসামী বলে চালান দেয়। দরোয়ানটি মাত্র তিন বৎসর সেই আপিসে কাজ করছিল।

আসামী পক্ষের কথা ছিল যতদূর মনে পড়ে—সরকার পক্ষের মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দেশে তার স্ত্রীর খুব অসুখ হওয়াতে সে ছুটি চেয়েছিল। কিন্তু তাকে ছুটি দেওয়া হল না। তখন সে আপিসের বড়বাবুর সঙ্গে রাগারাগি করে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে চলে যায়। তার চলে যাওয়ার পরের দিনই, তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তার নামে দোষ দিয়ে এই মামলাটি রুজু করা হয়। টাকাটা আপিসের ভিতরেই হয় বড়বাবু কিংবা তারই অনুপ্রেরণায় আর কেউ সরিয়ে নিয়েছে।

দরোয়ানের এই গল্প দরোয়ানেরই কথা, না উকিলের বুদ্ধিতে তৈরি হয়েছিল—আমি জানি না। কেন না, আমাকেও মামলার জেরা ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার পর কেবলমাত্র সওয়াল জবাবের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

যাই হোক, সওয়াল জবাবের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আদালতে দাঁড়িয়ে অত লোকের মধ্যে বক্তৃতা করতে হবে—বেশ একটা উদ্বেগ বোধ করতে লাগলাম মনে, আজও ভুলি নি। শেষ পর্যন্ত উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে ভাল করে সাক্ষীদের জবানবন্দি পড়ে, বক্তৃতাটি আগাগোড়া লিখে ফেলে মুখস্থ করতে লাগলাম। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে পায়চারী করি, আর মুখস্থ আবৃত্তি করি। দু-এক লাইন আজও মনে আছে। লিখেছিলাম—

You are asked to believe that a Darwan of three years standing is entrusted with a sum of four thousand Rupees to go to Bank all by himself to deposit the amount there! How absurd! ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোর্টে গিয়ে যখন বক্তৃতার সময় হল, ভগবানের নাম স্মরণ করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি যা মুখস্থ করেছিলাম কিছুই ঠিক মনে আসছে না—সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। দু-এক মিনিট বোধ হয়, একটু আবোল-তাবোল বলার পরেই বেশ জোর বক্তৃতা করতে সুরু করলাম। মুখস্থ বলি একেবারেই নয়। আপনা থেকে ভাষা জোগাতে লাগল। প্রায় একঘণ্টা বলার পর, বক্তৃতাটি শেষ করে আশেপাশে চেয়ে দেখি—কোর্টে অনেক লোক জড় হয়ে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ খান, আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য মৃদু হেসে বললেন, 'চমৎকার সওয়াল জবাব করেছেন আপনি।'

পুলিশ কোর্টের তখনকার স্বনামধন্য উকিল শ্রীসুরেশ মিত্র—তিনি, যতদূর মনে পড়ে অপরপক্ষ সমর্থন করেছিলেন—উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অমন বাপের উপযুক্ত ছেলেই বটে।'

খুব উৎসাহিত হলাম—নিজের উপর একটা আস্থা হল। এর পরে কখনও বক্তৃতা লিখে মুখস্থ করি নি। তবে অবশ্য এর পরে প্রত্যেক মামলারই সওয়াল জবাবের আগে, মামলার বিষয়বস্তুটি কিভাবে গুছিয়ে বলতে হবে—পয়েন্টগুলি লিখে নিতাম।

তবে হ্যাঁ, আর একবারও মুখস্থ করেছিলাম, কিন্তু সে বক্তৃতাটি ছিল বাংলায়—জুরীদের প্রতি ভাষণ (Jury address)

* * * *

খুলনার দায়রা আদালতে ঘর-জালানী মামলা। পাকিস্তান হওয়ার অনেক আগের কথা—কাজেই খুলনা জেলা তখন বঙ্গদেশের মধ্যেই ছিল। একটি ঘর-জালানী মামলায় দায়রা আদালতে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য আমাকে খুলনায় নিয়ে যাওয়া হল। কলকাতার বাইরে মফস্বলের দায়রায় এই আমার প্রথম মামলা—যদিও পরে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় দায়রা আদালতে অনেক মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।

মামলায় সরকার পক্ষের মোটামুটি কাহিনী হচ্ছে এই—খুলনা জেলার অন্তর্গত কোনও একটি গ্রামে একঘর বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল। তাদের জমি-জমা, গরু-বাছুর ছিল অনেক। আসামীদের সঙ্গে তাদের জমির দখল নিয়ে বিবাদ হয়। আসামী পক্ষও সেই গ্রামেরই একঘর বাসিন্দা। যাই হোক, এই বিবাদের ফলে আসামী পক্ষ, গভীর রাতে ফরিয়াদী পক্ষের গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ফলে তাদের তিনখানা ঘর পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।—'সরকার পক্ষ' বললাম, তার কারণ, এ-সব মামলা সরকারের পুলিশেরই মামলা, কেন-না পুলিশই তদন্ত করে প্রমাণ পেলে, আসামীকে কোর্টে চালান দেয়—ফরিয়াদী পক্ষের লোকেরা সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসেবে কোর্টে দেয় জবানবন্দি।

আসামীদের কথা শুনে, আমাদের পক্ষে আমার সঙ্গে যে-সব উকিলরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে যে, গল্পটি আসামী পক্ষ থেকে কোর্টে বলা হল সেটা হচ্ছে—আমাদের সঙ্গে এ অগ্নিকাণ্ডের কোনও সংযোগ নাই আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ; ফরিয়াদী পক্ষ দুর্দান্ত মামলাবাজ এবং শুধু আমাদের উপরই নয়, গ্রামের অন্যান্য গরীব গৃহস্থের উপর অযথা অত্যাচার করে, দরকার হলেই অন্যের জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়; আমাদের জমিও কেড়ে নিয়েছে; তাই গ্রামে ওদের শত্রুর অভাব নাই; হয়ত অন্য কোনও শত্রু আগুন লাগিয়েছে কিংবা হয়ত নিজেরাই নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে আমাদের জেলে পাঠাবার জন্য এই মামলা করেছে।

জুরীর বিচার। জুরীরা কেউ কেউ হয়ত ইংরাজী না জানতে পারেন তাই মফস্বল কোর্টের জেরা ইত্যাদি সব বাংলা ভাষায়ই হত। জজ অবশ্য সবই তর্জমা করে ইংরাজীতে লিখে নিতেন।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের অনেক জেরা করা হল। গ্রামের কত লোকের সঙ্গে তাদের বিবাদ, আমাদের উপর কি রকম অত্যাচার করেছে, কি রকম জোর করে আমাদের জমি দখল করেছে এবং আরও একখণ্ড জমি এখনও জোর করে দখল করতে চায়—এই সব নিয়ে হল জেরা। সরকার পক্ষের দু-একটা সাক্ষী ছিল—যারা বলে যে, স্বচক্ষে তারা দেখেছে আসামীদেরই ঘরে আগুন দিতে। তারা যে মিথ্যা সাক্ষী, ফরিয়াদী পক্ষের টাকা খেয়ে এবং পুলিশের জুলুমে মিথ্যা সাক্ষী দিতে এসেছে—জেরা করে সেটাও দেখাবার চেষ্টা হল, কেন না গভীর রাতে জেগে থেকে কেউ ঘরে আগুন দেওয়া দেখে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাক্ষী প্রমাণ শেষ হলে জুরীর প্রতি আমার ভাষণ দেওয়ার সময় হল—বাংলায় জুরীর ভাষণ দিতে হবে। সরকার পক্ষের উকিল কেমন সুন্দর ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা দিক দিয়ে দু'ঘণ্টা ধরে জুরীদের নিজের পক্ষের কথাগুলো বোঝালেন। সরকারী উকিল ছিলেন প্রবীণ, নাম—রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ সেন। মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথাগুলি শুনলাম। মনে মনে ভয় হল—বাংলায় বক্তৃতা ত' এর আগে করি নি, আমি কি এমন সুন্দর করে জুরীদের বোঝাতে পারব। সরকার পক্ষের বক্তৃতা শেষ হতে ৫টা বাজল। পরের দিন সকালেই অর্থাৎ বেলা ১১টা আন্দাজ আমার ভাষণ হবে সুরু।

সন্ধ্যাবেলা ডাকবাংলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে খালি ঐ কথাই ভাবছি—কোনদিক দিয়ে কিভাবে কি বলব। মনের উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ল এবং শেষ পর্যন্ত

ঠিক করলাম—ভাষণটা লিখে ফেলাই যাক। তৎক্ষণাৎ ঘরে গিয়ে বসে ভাষণটা লিখতে সুরু করলাম। লেখা যখন শেষ হল, তখন রাত প্রায় বারোটা বাজে। ইতিমধ্যে আমার রাত্রের খাবার নিয়ে এসে ছিল—একপাশে ঢেকে রেখে দিতে বলেছিলাম। রাত্রে খাওয়ার পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে—এতক্ষণ বসে যা লিখেছি মনে মনে আওড়াতে লাগলাম। ঘরে আলো জেলেই রেখেছিলাম—নিজের মনে মনে আওড়াই এবং মাঝে মাঝে লেখাটি দেখি। যাই-হোক অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হয় নি—আজও মনে আছে।

পরের দিন সকাল বেলা কোর্টে জুরীর ভাষণ দিতে উঠে দু-চার কথা বলতে বলতে ক্রমে অনুভব করলাম—কাল রাত্রে যে সব কথা লিখেছিলাম যদিও তা প্রায় সবই মনে আছে কিন্তু সে সব কথার ভিত্তিতে যে সব কথা বলছি সবই প্রায় নতুন, শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয় ভাবের দিক দিয়েও—অতি সহজেই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। অনুভব করলাম—বাংলাও আমার নিজেরই ভাষা, তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গুছিয়ে-সাজিয়ে নিজের মনের ভাবগুলি শ্রোতাদের উপযোগী করে বলা এমন ত' কিছুই কঠিন নয়। এর জন্য কাল রাত্রে এত পরিশ্রম করেছিলাম কেন? জীবনভোর বিভিন্ন জেলার দায়রা আদালতে বাংলায় অনেক জুরীর ভাষণ দিয়েছি কিন্তু কখনও আর ভাষণ লিখে মুখস্থ করি নি।

শুধু তাই নয়, জুরীর ভাষণ দিতে দিতে আরও লক্ষ্য করেছিলাম ভাবের দিক দিয়ে অনেক নতুন নতুন ভাবধারা বলতে বলতে মনের মধ্যে আপনা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে—যে সব বিষয় আগে মোটেই ভাবি নি। এই মামলাটির বিষয়বস্তু নানা দিক দিয়ে জুরীর কাছে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ মনে এল রবীন্দ্রনাথের কবিতা—দুই বিঘা জমি। জুরীদের হৃদয় স্পর্শ করে এমন ভাবে, কোর্টে যেখানে ফরিয়াদী পক্ষ বসেছিল, সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে জুরীদের বললাম—তুমি ফরিয়াদী পক্ষ, তুমি প্রবল শক্তিশালী, তুমি আমার জমি কেড়ে নিয়েছ, আবার তুমিই আমাকে জেলে পাঠাতে চাও। এই সব কথা বলতে বলতে 'দুই বিঘা জমি' খানিকটা আবৃত্তি করে গল্পটি জুরীদের বুঝিয়ে দিয়ে বললাম—

'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ
আমি আজ চোর বটে।'

শেষ পর্যন্ত জুরীরা একমত হয়ে নির্দোষী বলেছিল—আসামীরা খালাস হয়ে গেল, মনে খুবই উৎসাহ পেলাম।

* * * *

কেশরীর মামলা। কেশরী একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে—দেখলে মনে হয় বয়স উনিশ-কুড়ি বৎসর। যেমন গায়ের রং তেমনি একহারা লম্বা গড়নে যৌবনের পূর্ণতা। মুখশ্রী অতি সুন্দর। যতদূর মনে পড়ে উত্তরপ্রদেশবাসিনী,—বাঙালী নয়।

এই কেশরীকে নিয়ে মামলাটি হয়েছিল জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টে। যে হাকিমের কাছে মামলাটি হয়েছিল তাঁর নাম যতদূর মনে হয় শ্রীসুন্দরলাল মিছির।

বহুদিন আগেকার কথা তাই মামলাটির বিস্তারিত বিবরণ এখন আর আমার ঠিক মনে নেই। মামলাটির মোটামুটি কথা ছিল—কেশরী কার কাছে থাকবে, বাপ-মার কাছে না আর একটি যুবক যে কেশরীকে নিজের বিবাহিত স্ত্রী বলে দাবী করছিল—তার কাছে। এই নিয়ে দুইপক্ষের বিবাদ, তাই মামলাটি কোর্টে এসেছিল—কি ভাবে, কার আবেদনে, সে সব মনে নাই।

যাই হোক, কেশরীকে কোর্টে ডাকা হল—হাকিম তার কথা শুনবেন। যেদিন কেশরীর জবানবন্দি নেওয়া হবে সেইদিনের জন্য বাপ-মার পক্ষ থেকে আমাকে নিযুক্ত করা হল—জোড়াবাগান কোর্টে বাপ-মার পক্ষ সমর্থন করার জন্য।

আমাকে নিযুক্ত করার জন্য যেদিন আমাদের বাড়িতে কেশরীর বাবা এলেন, মোটামুটি মামলার কাহিনীটি শুনে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'তা আপনার মেয়ে এখন কোথায়?'

বললেন, 'আমাদের কাছেই আছে। ঐ লোকটা ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা আবার ফিরিয়ে এনেছি।'

শুধালাম, 'তা আপনার মেয়ে কি বলে?'

বললেন, 'ও আর কি বলবে—নেহাৎ ছেলেমানুষ। এইবার ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।'

শুধালাম—'তা কোর্টে গিয়ে বলবে ত'—আপনাদের কাছেই থাকবে?'

বললেন—'তা বলবে।—ও ত' দেখছে—ওর মা অনাহারে রয়েছেন, জলস্পর্শ পর্যন্ত করছেন না, যতক্ষণ না ও কোর্টে গিয়ে সেই কথা বলে।'

একটু চুপ করে থেকে শুধালাম—'তা আপনাদেরই বা ওকে রাখবার জন্য এত জিদ্ কেন? সত্যিই যদি আপনার মেয়ে ভালবেসে বিয়ে করে থাকে তবে ত' ছেড়ে দেওয়াই ভাল।'

বললেন—'বিয়ে না ছাই। ও ছেলের সঙ্গে আবার বিয়ে—এক পয়সার মুরোদ নেই। তারপর আমাদের স্বজাতও ত' নয়। অমন সুন্দরী মেয়ে আমার—অনেক পয়সাওলা বড় ঘরে ওর বিয়ে প্রায় ঠিক করেছি।'

কোনও প্রয়োজন ছিল না তবুও শুধালাম—'তা যেখানে ওর বিয়ে ঠিক করেছেন সে ছেলেটি কেমন?'

বললেন—'খুব ভাল ছেলে—চমৎকার স্বভাব। তবে একটু বয়স বেশি, দ্বিতীয় পক্ষ। তা আর কি?'

বুঝতে বাকি রইল না—সেই চিরন্তন কাহিনী।

বললাম—'তা আমাকে নিয়ে যাওয়ার কি দরকার? মেয়ে যদি আপনাদের স্বপক্ষেই বলে—তবে ত' সব সহজই হয়ে গেল।'

বললেন—'না—না। আপনি একবার চলুন। কি জানি ছেলেটা আবার কি সব বলে। যদি কোনও দিক দিয়ে আবার কোন গোলমাল হয়।'

মামলার দিন জোড়াবাগান কোর্টে গেলাম—দোতালায় ব্যারিস্টারদের বসবার জন্য একটা ছোট ঘর ছিল, সেই ঘরে গিয়ে মামলা ডাক হবার প্রতীক্ষায় বসলাম। কেশরীর বাপও সেই ঘরে এসে ঢুকলেন কেশরীকে সঙ্গে নিয়ে। কেশরীর দিকে চেয়ে সত্যিই যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। তবে কেশরীর চোখ দু'টি অত্যন্ত বিষন্ন বলে মনে হল। ইচ্ছে হ'ল—কেশরীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলি, কিন্তু বলি নি। কেশরী মাথা নীচু করে চুপ করেই বসেছিল।

মামলা ডাক হল। যতদূর মনে পড়ে মামলায় বিশেষ কিছুই গোলমাল হয় নি। কেশরী অল্প দু-চার কথায় বাপ-মা'র কাছেই ফিরে যেতে চাইল।

অপর পক্ষের উকিল কেশরীকে কিছু-কিছু জেরাও করেছিলেন। আর কি কি হয়েছিল—মনে নেই। যাই হোক শেষ পর্যন্ত আদালতের রায় হল—কেশরী বাপ-মা'র কাছেই ফিরে যাবে।

মামলা শেষ হলে ফিরে এসে সেই ব্যারিস্টারদের ঘরেই বসলাম। কেশরীর বাপ কেশরীকে নিয়ে এসে আবার বসলেন সেই ঘরে।

আমি বললাম,—'মামলা ত' শেষ হয়ে গেল—এইবার মেয়েকে নিয়ে চলে যান।'

কেশরীর বাবা বলল—'একটা কথা বলব—যদি কিছু মনে না করেন।'

শুধালাম—'কি?'

বললেন—'আপনি ত' আপনার গাড়ি করে স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাইকোর্ট ফিরবেন। যদি আমাদের পথে নামিয়ে দেন'—

সে-যুগে আমার ছোট একখানা Two seater গাড়ি ছিল—নিজেই চালাতাম। তাতে কেশরী এবং তার বাপ দু'জনকে ধরতও না এবং তা' ছাড়া কোর্ট থেকে ওদের আমার গাড়িতে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও হ'ল না।

মুখে শুধালাম—'কেন?'

বললেন—'ওই ছেলেটা রেগে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বেড়াচ্ছে। কোর্টেই রয়েছে এখনও। মতলব ভাল নয় বলে মনে হচ্ছে। যদি যাওয়ার সময় কিছু করে।'

বললাম—'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে—কোর্টের চারিদিকে পুলিশ সার্জেন্ট ছড়ান। মেয়েকে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে যান।'

এই বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম—হাইকোর্টে ফিরে যাব। লক্ষ্য করলাম—কেশরী ও তার বাবা আমার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। আদালতের সিঁড়ি, বেশ ভিড়, অনেক লোকজন সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে।

যাই হোক, সিঁড়ির মাঝামাঝি এসেছি—কেশরী ঠিক আমার পিছন পিছনই আসছিল—এমন সময় হঠাৎ 'বাবুজী' বলে তীব্র আর্তনাদ করে কেশরী পিছন থেকে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। কোনও রকমে টাল সামলে, ফিরে চেয়ে দেখি—কেশরী ততক্ষণে এলিয়ে সিঁড়ির উপর পড়ে গেছে, তার পিঠের বাঁ দিক দিয়ে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে এবং নিমেষের জন্য দেখেছিলাম সেই যুবকটি সিঁড়ির রেলিং পার হয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে গেল—হাতে রক্তমাখা ছোরা। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানটি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। কেশরীকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

পরে খবর পেয়েছিলাম—কেশরী সেরে উঠেছে, আঘাত তেমন গুরুতর হয় নি। কিন্তু সেই যুবকটিকে পুলিশ কোনওদিনই খুঁজে পায় নি।

আজ ভাবি—কেশরীর চোখে সেই যে গভীর বিষন্নতা লক্ষ্য করেছিলাম, সেটা কি ছেলেটির প্রতি অন্তরে একটা গভীর প্রেমের দরুণ, না মনে মনে একটা আতঙ্কের ফল। যদি বেঁচে থাকে, আজও তার চোখে সেই বিষন্নতা কি আছে?

[ক্রমশ।

প্রমাণ

অমলকান্তি ঘোষ

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে
আমার বয়স যখন আশির কোঠা ছুঁই ছুঁই করবে
যদি তখন কোন কৌতূহলী কিশোর আমাকে প্রশ্ন করে,
'তুমি যে এতদিন বেঁচে ছিলে,
তার প্রমাণ দাও',
বেশ একটু চাপা গর্বের সঙ্গে
আমার এক-মাথা সাদা চুল দেখিয়ে দেব তাকে।

যেন একটা প্রকাণ্ড গাঁজাখুরি গল্প বলে ফেলেছি
এমন ভাব দেখিয়ে
হেসে উঠবে সেই প্রগলভ কিশোর।

অতঃপর অন্য কোন জুৎসই প্রমাণের আশায়
আধো-অন্ধকার ঘরে হাতড়াতে হাতড়াতে
খুঁজে বেড়াব, কোথায় সেই ভাঙা সিন্দুক।
কোথায় সেই একরাশ কাগজের বাণ্ডিল।

লোকসভার অন্যতম সদস্য

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার-অ্যাট-ল

কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা

সংবিধান অনুযায়ী

সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের

বিচার বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা

[ভূমিকা]

[সংবিধানকে বুনিয়াদী আইন, মৌলিক আইন, জৈবিক আইন, চূড়ান্ত আইন অথবা সর্বোচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বলা হয়, যে-কোন শব্দই ব্যবহার করা হউক না, সংবিধান যে অন্যান্য আইন অপেক্ষা অনেকখানি স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠতর এই কথাই প্রকাশ পায়। ভারতের একটি লিখিত সংবিধান আছে এবং ইহার কাঠামো অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের, কার্যত কিন্তু ইহা অধিক এককেন্দ্রিক, লিখিত সংবিধানগুলিকে একান্তভাবে একটি নিয়মানুগ সরকার বুঝায়, বিচার বিভাগীয় সমালোচনা এই নিয়মানুগ সরকারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

ভারতের স্বাধীন সার্বভৌম জনগণ সংবিধানের মাধ্যমে সরকারের একটি কাঠামো খাড়া করিয়াছেন এবং উহার ভূমিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতকে একটি গণতন্ত্রী সাধারণতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সমস্ত নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব অর্জনই ইহার লক্ষ্য। ভূমিকাকে ঠিক সংবিধানের অংশ অথবা কোন বিশেষ ক্ষমতার সূত্ররূপে গণ্য করা না গেলেও সংবিধান রচয়িতাদের মানসিক অর্গল মোচনের চাবিকাঠিরূপে ইহাকে অভিহিত করা যায়। (বেরুবাড়ি রেফারেন্স ১৯৬০ (৩) 'এস সি আর' ২৫০ এ আই আর ১৯৬০ এস সি ৮৪৫)। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অথবা মনন, মতামত প্রকাশ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের স্বাধীনতা রক্ষা অথবা সমস্ত নাগরিককে সমান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দানের অপরিহার্য প্রয়োজনেই এমন একটি সীমারেখা টানিয়া দেওয়া উচিত, যাহা অতিরিক্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অথবা বিধান মণ্ডলী এবং প্রশাসনিক স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিয়া মৌলিক স্বাধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। সংবিধান ও উহার অন্তর্নিহিত মূল নীতিসমূহের মর্যাদা রক্ষা এবং ঐগুলি যথাযথভাবে কার্যকরী করা, যাহাতে ঐগুলি মানিয়া চলা হয় এবং অমান্যকারীদের দণ্ডবিধান করা হয় তজ্জন্য কোন এক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিতেই হইবে। সংবিধানে প্রধানত সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টগুলির সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা ও কার্যকরী করার এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে।

অন্য সমস্ত আইন সংবিধানের ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে কি না ইহা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের, আইনসমূহ এবং



শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরীক্ষা এবং সংবিধানের সহিত উহা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না বিচার করিয়া দেখা এবং অসঙ্গত বিবেচনা করিলে বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতাকেই সাধারণত বিচার বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতারূপে অভিহিত করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টগুলির উপর এই ক্ষমতা ন্যস্ত করার কথা যে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে তাহার তুলনা নাই। বস্তুত এই সুপ্রীম কোর্ট সৃষ্টি ভারতীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সংবিধানের ৩২ ধারা অনুযায়ী এই কোর্ট স্থাপন ও আপীল গ্রহণের ক্ষমতাসহ এই কোর্টকে অন্যান্য ক্ষমতা প্রদান সাংবিধানিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক এবং ইহাতে আইনগত ও সাংবিধানিক ক্ষমতার উচ্চাদর্শ বিধৃত। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাই চূড়ান্ত, কারণ ইহার রায়ের বিরুদ্ধে কোথাও কোন আপীল চলে না, সুপ্রীম কোর্টের রায়ই সর্ব ভারতীয় আইন। আয়ার্লণ্ডের সংবিধানেও সংবিধান-বিরোধী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত এবং এই ধরণের আইন বাতিলের কথা উল্লেখ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে অবশ্য কোন বিচারালয়ের বহির্বিচার বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট স্বয়ংই এই ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে প্রধান বিচারপতি মার্শাল ১৮০৩ সালে বিখ্যাত মারব্যারি বনাম ম্যাডিসন মামলায় সর্বপ্রথম এই সর্বোচ্চ ক্ষমতার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। (১ সি আর, ১৩৭)।

মারব্যারি বনাম ম্যাডিসন

১৮০১ সালের ডিসেম্বর মাসে উইলিয়ম মারব্যারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে মার্কিন স্বরাষ্ট্রসচিব জেমস্ ম্যাডিসনের উপর এক রুলিং-এর আবেদন জানান। উহাতে কলম্বিয়া জেলার 'জাস্টিস অব পিস' হিসাবে মারব্যারিকে প্রাপ্য মিশন আদায় দিবার জন্য কেন তাহাকে আদেশ দেওয়া হইবে উহার কারণ দর্শাইবার জন্য বলা হয়। ১৮০১ সালের বিচার বিভাগীয় আইন মতে প্রেসিডেন্ট আদম মারব্যারিকে অন্যতম 'জাস্টিস অব পিস'-এর পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন, ১৮০১ সালের ৩রা মার্চ। কমিশনপত্রে স্বাক্ষর ও সীলমোহর করা হইয়াছিল কিন্তু পাঠানো হয় নাই। ৪ঠা মার্চ জেফারসন প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ম্যাডিসন তাঁহার সচিব নিযুক্ত হন। ১৮০০ সালের শরৎকালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ১৮০১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আদম স্বপদে বহাল ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আদম কার্যভার ত্যাগের প্রাক্কালে ১৮০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রচিত বিচার বিভাগীয় আইনবলে সৃষ্ট নূতন পদগুলিতে লেখক নিযুক্ত করিয়া যান এবং প্রেসিডেন্ট জেফারসন কর্মভার বুঝাইয়া লইবার পূর্ব রাত্রি পর্যন্ত ঐ সব নব-নিযুক্ত লোকদের কমিশন স্বাক্ষর করিয়া রাখিয়া যান, কিন্তু নূতন রিপাবলিকান সরকার সেই কমিশনগুলি—পূর্ববর্তী সরকারের স্বাক্ষরিত কমিশনগুলি আর পাঠান নাই, এই কারণেই ম্যাডিসনকে উক্ত কমিশন দিতে বাধ্য করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন জানানো হয়।

জেফারসনের যে মারব্যারিকে কমিশন দেওয়ার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, এমন কি সুপ্রীম কোর্ট আদেশ দিলেও নয় একথা সকলেরই সুবিদিত ছিল। কার্যত রিপাবলিকান সরকার শক্তির পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। তাহাদের আশা ছিল যে, সুপ্রীম কোর্ট আপীল মঞ্জুর করিয়া রুলিং জারী করিবেন এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মার্শালকে তাঁহারা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

কিন্তু প্রধান বিচারপতি মার্শালের রায় শুনিয়া সারা মার্কিন মুলুক বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল এবং উহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই মামলার রায় মার্কিন সাংবিধানিক আইনের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হইয়া রহিয়াছে এবং এই রায়ই সংবিধানের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া মার্কিন কংগ্রেসে রচিত আইনের বৈধতা বিচারে সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্ব ও ক্ষমতার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব নির্দেশক। আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বিচার বিভাগীয় সমালোচনা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই, তথাপি উক্ত মামলার রায়ে মার্শাল এই কথাই প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন যে, কোন আইন সংবিধানবিরোধী হইলে উহাকে বাতিল করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের রহিয়াছে এবং এই দায়িত্বও সুপ্রীম কোর্টের। প্রধান বিচারপতি মার্শাল মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রিপাবলিকান সরকারের মার্শালের কমিশনে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত ছিল সুতরাং উহা দিয়া দিবার আদেশই এক্ষেত্রে বিধেয় হইত। কিন্তু তিনি এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে, এই আদেশ জারী সংক্রান্ত সুপ্রীম কোর্টের পূর্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া রচিত ১৭৮৯ সালের বিচার বিভাগীয় আইন সংবিধানানুযায়ী কংগ্রেসের ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত ধারাকে বাতিল ঘোষণা করা কোর্টেরই কর্তব্য বলিয়া তিনি রায় দেন।

এইভাবে সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা সম্পর্কিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস রচিত আইন বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা গ্রহণ করে। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রকৃতপক্ষে নূতন প্রবর্তন নয়। নিম্ন ফেডারেল কোর্টগুলি আইন

সুষীম হৃদয়

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সেই রাক্ষসের গ্রসমান হাঁ-য়ের মধ্যে
হাড়-কাঁপানো পৌষের হাওয়ায়
অসংখ্য জোনাকিযোনি জ্বলে আর নেভে।
অতিকায় চোয়ালের ওপর সমাহিত
একটি পরমলগ্ন
বাহুলীন প্রেমের অস্ফুট কণ্ঠস্বরে
কি যেন বলে।

পৌষের ঠাণ্ডা হাওয়ায়
অকালমৃত্যুকে বিদ্রূপ করা
সেই আত্মনিবেদনের মুহূর্তগুলি
অমূর্ত হৃদয়ের বৃন্তে
আলোর কমলগুচ্ছ হ'য়ে আছে।

সে তার প্রার্থিত বস্তু পেয়েও
গ্রহণ করে না,
মৃত্যু-গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়েও
সে তা'র দ্বিতীয় আত্মাকে
একানুরক্তির নক্ষত্রবর্ণা প্রতিমা হ'তে দেখে।
সেই ভয়ঙ্কর হাঁ-য়ের মধ্যে
নির্লিপ্ত বাসনার ছায়াচ্ছন্নতা
শিউরে ওঠে প্রহরীর পদশব্দে।

বহু দূরের নিষ্কম্প আকাশ থেকে
প্রেমচন্দ্রমার সুষীম হৃদয়—
সামনের দীঘির বুকে কাঁপায়
জ্যোৎস্নার মরকত দ্যুতি-তরঙ্গ।
বর্ণহারা গাছগুলোর পাতা
শির শির করে ওঠে
দুর্জ্ঞেয় অভীপ্সার রোমাঞ্চে।

তাদেরও সুষীম হৃদয়
ক্ষণ শাশ্বতবাদী নয় ব'লে,
দু'টি শরীরের সংহত উত্তাপ
সুখ চায় না।
সুখ কাম্য নয় পার্থিব সংকটে,
যেখানে মহাপ্রলয়
মাথার ওপর মেঘসঞ্চারী।

পৌষের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায়
নিবিড় চুম্বনের অমৃত আস্বাদে
তা'রা প্রেমসিদ্ধ পদক্ষেপে
এগিয়ে চলে
রাক্ষসের ধারালো দাঁতগুলোকে
মাড়িয়ে দিয়ে।

বাতিলের ক্ষমতা প্রয়োগ করিত এবং জনমতও ইহাকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ব্যবহারের স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইত। প্রকৃতপক্ষে প্রধান বিচারপতি মার্শালের রায়কে বিচার বিভাগীয় সমালোচনার মতবাদ ঘোষণার জন্য নয়, একজন কেবিনেট সদস্যকে ক্ষমতাসীন আদালতের হুকুমনামা তামিল করিতে বাধ্য বলিয়া ঘোষণা করার জন্যই সমালোচনা করা হয়। এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা দরকার।

ম্যাডিসন আদম সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন। সুতরাং প্রেসিডেন্ট আদমের কার্যভার ত্যাগ করার পূর্বে ম্যাডিসনের কমিশন পাঠাইয়া না দিবার ত্রুটির জন্য সে দায়ী। অনেক সময় মারব্যারি মামলায় প্রধান বিচারপতি মার্শালের প্রদত্ত রায়ের এই বলিয়া সমালোচনা করা হয় যে, আদেশ জারীর ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত নয় এই সিদ্ধান্ত যখন ঘোষণা করা হইয়াছে তখন উক্ত কোর্টের এই মামলার বিচার ও রায়দানও সঙ্গত হয় নাই। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে—

'এই মামলায় আদেশ জারীর ক্ষমতা যখন এই কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে, তখন এই মামলার গুণাগুণ বিচার করিয়া এই কোর্ট রায় দিতে পারে না।'

—সায়ার্স বনাম ইউ এস ২৭২, ইউ এস ৫২-৭২ আই এড ১৬০।

[ক্রমশ।

অনুবাদক—অরুণ জানা

বলিছে সোনার ঘড়ি

টিক্ টিক্ টিক্—

পিকাশো নাকি একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'কোন সাধুকে কখনও হাতঘড়ি ব্যবহার করতে দেখা গেছে কি?'

সুখের বিষয় এই যে দুনিয়াটায় সাধুর সংখ্যা অত্যন্তই নগণ্য, না হলে বিবেচনা করুন সুইটজারল্যাণ্ডের কি দশা হত; এই ছোট্ট দেশটির সুখসমৃদ্ধি তো পনেরো আনাই নির্ভর করে ওর ঘড়ি তৈরির কেরামতির উপর।

এমন লোক কে আছেন যিনি সুইস্ ঘড়ির আদর কদর করেন না?

প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লাখ ঘড়ি সুইট্জারল্যাণ্ড পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানী করে থাকে এবং নিঃসন্দেহে এটিই তাদের বৃহত্তম জাতীয় শিল্প।

রপ্তানী করার পরও যা অবশিষ্ট থাকে, বিদেশী ভ্রমণকারীদের দৌলতে তা পড়তে পায় না, কারণ শুল্ক ফাঁকি দিয়ে একটি নিটোল নিটুট সুইস ঘড়ির মালিকানা স্বত্ব লাভ করতে আগ্রহী নন এমন ব্যক্তি বিরল, অতএব জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা; বৎসরান্তে লভ্যাংশ হিসাব করতে করতে, অকারণ নয় সকারণ পুলকেই স্পন্দিত হতে থাকে অনেক সুইস চিত্ত।

ঘড়ি বিক্রয়লব্ধ রৌপ্যমুদ্রার ঝঙ্কারে এতদিন নির্বিঘ্নেই আয়াসে আরামে কেটে গিয়েছে সুইটজারল্যাণ্ড ফেডারেশনের, তবে সম্প্রতি তাতে যেন একটু ছন্দপতন ঘটেছে; কারণ দুনিয়ার আরও অনেক জাতি এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে, নানা জায়গায় গড়ে উঠেছে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা কেউই আর এই লাভজনক ব্যবসাটিকে অবহেলা করতে প্রস্তুত নয়, বরং যেন একটু অধিকমাত্রায়ই উৎসাহী।

বলা বাহুল্য, এমন একটি লাভের ব্যবসাকে বেহাত হতে দিতে সুইট্জারল্যাণ্ড সরকার মোটেই রাজী নন, অতএব তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন কি করে বিশ্বের বাজারে ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসাবে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখা যায় তারই সদুপায় উদ্ভাবন করতে। এরই পয়লা নিদর্শন হিসাবে আইন করে ঘড়ি নির্মাণের যন্ত্রপাতি ও ঘড়ির বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ বিদেশে রপ্তানী করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, অবশ্য এতে যে বিশেষ কিছু সুফল দেখা গিয়েছে তা নয়, বিভিন্ন দেশে বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়নে এই শিল্প চমকপ্রদভাবেই অগ্রগতি লাভ করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতি বৎসর মোট সাত লক্ষ ঘড়ি বিদেশে রপ্তানী করত আজ সে বছরে পনেরো লক্ষ ঘড়ি অনায়াসে রপ্তানী করছে নিজেদের চাহিদা মিটিয়েও।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধ ও সুইস ঘড়ি শিল্পকে অনেকাংশে ঘায়েল করেছে, সুয়েজ খাল নিয়ে দ্বন্দ্বর ফলে ইজিপ্টের বাজারে সুইস ঘড়ির চাহিদা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গিয়েছে। কিউবাতেও ১৯৫৭ সালের পর থেকেই সুইস ঘড়ি আমদানীর প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে, এইভাবে সুইস ঘড়ির বিশ্বজোড়া বাজার আজ মার খাচ্ছে, যার ফলে সুইট্জারল্যাণ্ডের জাতীয় সরকার সমস্যাটিকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করেছেন।

বর্তমানে এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ঘড়ির বিচ্ছিন্ন অংশাদি আবার বাইরে রপ্তানী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু সুইস সরকার এই রপ্তানী দ্রব্যের মান কিছুটা নিম্নস্তরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে ওই সব অংশ দ্বারা প্রস্তুত ঘড়ি কোনমতেই খাস সুইস ঘড়ির সমতুল্য হতে না পারে।

সুইস ঘড়ির মান সর্বোচ্চ রাখার জন্য আর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা হল এই শিল্পের শিল্পপতিদের উপর একটা বাধ্যতামূলক কর ধার্য করা, যা দিয়ে ঘড়ি শিল্পের উন্নতিকল্পে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব এবং সেই উদ্দেশ্যে এই অর্থের একটা ফাণ্ডও খোলা হয়েছে। ইলেকট্রোনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে এ ব্যাপারে যে যথেষ্ট সাফল্য লাভেরও সম্ভাবনা আছে সুইস বিজ্ঞানীরা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

অবশ্য অন্যান্য দেশ যে বেশিদিন এই ধরণের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকবে তার কোন গ্যারাণ্টি নেই তবু সুইস সরকার বর্তমানে এই উপায়ে আরও কিছুদিন ঘড়ি শিল্পের বাজারে প্রাধান্য অধিকার করতে পারবেন বলেই আশা করেন।

এ ছাড়া শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চোরাই চালানের বাজারটা তাঁদের মারে কে?

বিভিন্ন সরকারের আপ্রাণ চেষ্টার পরও সুইস্ ঘড়ির এই বে-আইনী রপ্তানীর বাজার আজও পুরোদমে চালু আছে, সুইস ঘড়ির মান যে আজও জগতে অনন্য ও অদ্বিতীয়, এই চোরাবাজার কি তাই প্রমাণ করে না?

অতএব, মনে হয় যে সোনার ঘড়ি টিক্ টিক্ করে আরও বহুদিন দুনিয়ায় সুইট্জারল্যাণ্ডের নাম ঘোষণা করে যাবে সগৌরবে, সদম্ভে।

—সুচরিতা

দাম্পত্যকে সজীব রাখতে হ'লে

আপনার কি কখনও মনে হয় যে দিনের পর দিন একই ভাবে না কাটিয়ে মাঝে মাঝে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ পেলে জীবনটা আরও উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে?

ধরুন আপনার স্বামী কর্মস্থল থেকে হয়ত নিয়মিত বাড়ি ফেরেন রোজই, এক্ষেত্রে আপনার কি কখনই মনে হয় নি যে, একদিন এর ব্যতিক্রম ঘটলে না জানি কি মজাই হত, একদিন সম্পূর্ণ একাকিনী থেকে দাম্পত্যের ছুটি ভোগ করে নিতে পারতেন; কিম্বা ধরুন ছেলেমেয়েদের প্রাণ ঢেলে ভালবেসেও কখনও কি আপনি ভাবেন নি যে, তাদের জন্য প্রাত্যহিক যে পরিশ্রম আপনাকে করতে হয়—দু'টো দিন যদি কোন কারণে তা থেকে মুক্তি পান, তা হলে কি ভালই না হয়।

জানি যে আপনি একজন কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী ও স্নেহশীলা মা। কাজেই এ ধরণের চিন্তা মনে এলেও তাকে প্রশ্রয় দেবেন না কখনই বরং সভয়ে তা ভুলতে চাইবেন, কিন্তু এর জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে দুঃখ করবেন না যেন। কারণ মানুষ মাত্রেরই মনে রুটিন গাঁথা জীবনযাপন প্রণালীর বিরুদ্ধে সময় সময় বিদ্রোহ জেগে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাঁধা নিয়মকানুন সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য যে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে সে রুটিনের ব্যতিক্রম ঘটাটাও কম প্রয়োজনীয় নয়, কারণ তা না হলে একঘেয়েমির প্রাবল্যে জীবনটাই বিষিয়ে ওঠে।

দাম্পত্য জীবনের যত কিছু অশান্তি ও মনোমালিন্যের পেছনে সচরাচর থাকে এই একটাই কারণ—একঘেয়েমি। এজন্যই দাম্পত্য জীবনকে সজীব রাখতে হলে মাঝে মাঝে অবকাশ যাপনের প্রয়োজন। এর অর্থ সংসারের চাকা থেকে মুক্ত হয়ে স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছিন্নভাবে বাস করা প্রয়োজন; সোজা কথায় বছরে অন্তত কয়েকটা দিন বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের আলাদা থাকা প্রয়োজন।

খুব স্নেহশীল প্রেমময় দম্পতির পক্ষেও কথাটা সমভাবেই প্রযোজ্য, আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হলে ও নিরন্তর একত্র বাসের ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণে শিথিলতা জাগার আশঙ্কা থাকে এবং তার থেকেই ঘটে বিপর্যয়। মনে ভালো লাগার ক্ষমতা যতই কমে যায়, সংসারের প্রতি আকর্ষণও ততটাই হ্রাস পেতে থাকে। ফলে সামান্য সামান্য কারণেও মনের তিক্ততা প্রকাশ পেয়ে সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হয়। পুরুষের বাইরের কর্মজীবন থাকাতে ঘরের একঘেয়েমি তাকে ততটা পেড়ে ফেলতে পারে না যতটা পারে নারীকে; দিনের পর দিন ঘর-গৃহস্থালীর মাঝে নিয়মবদ্ধ জীবনযাপন করার ক্লান্তিতে প্রায়শ মেয়েদের মন হাঁপিয়ে ওঠে তখন সে চায় মুক্তি, চায় কর্তব্যের বাঁধন থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত হওয়ার অবকাশ।

আগের দিনে বাপের বাড়ি যাওয়াটা তাই সীমন্তিনীদের প্রাণে বইয়ে দিত অতটা খুশির জোয়ার।

বর্তমানে সে সুযোগ কম, কাজেই বছরের ক'টা দিন আলাদাভাবে কাটিয়ে দেওয়ার প্ল্যান মন্দ নয়, ধরুন পূজাবকাশ বা গ্রীষ্মের ছুটিতে যাঁরা বাইরে যান তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় গেলে ক'দিনের বিরহে পারস্পরিক আকর্ষণকে নতুন করে ঝালিয়ে নিতে পারেন। 'পতির ইচ্ছাই সতীর ইচ্ছা' কথাটি কানে শুনতে মধুর হলেও সব সময় সুফলপ্রদ নয়, স্ত্রীদেরও যে মন বলে স্বতন্ত্র একটা পদার্থ আছে—এই সত্যকে স্বামীরা যদি মেনে নেন, তা হলেই দাম্পত্য জীবন সত্যকার সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পারে। তা নইলে একদিন না একদিন সমস্তটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। —শ্রীমতী

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন
শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

[আমেরিকায় তেনজিং—একটি সাক্ষাৎকার]

[শুধু ভারতের মধ্যে বললে ভুল হয় সমগ্র বিশ্বে তেনজিং নোরগে আজ একটি বিখ্যাত নাম। ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট জয়ের দ্বারা এ দেশে পর্বতারোহণের যে ঐতিহ্য তিনি সৃষ্টি করলেন তা অবশ্যস্বীকার্য। আজকের দিনে পর্বতারোহণ সম্বন্ধে যে ব্যাপক সচেতনতা দেখা দিয়েছে তার মূলে তেনজিং-এর অবদান অতুলনীয়। নির্দিষ্ট রীতিতে পাহাড়ে ওঠার কলাকৌশল প্রভৃতি শিক্ষার যে ব্যাপকতা আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়েও তাঁর কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। গত জুলাই মাসে ভারতীয় টি-বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় মাউণ্ট এভারেস্ট বিজয়ী শ্রীতেনজিং নোরগে সস্ত্রীক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন সপ্তাহের জন্য সফরে গিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর সমাপনান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আমেরিকাবাসীর কাছ থেকে তিনি যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছিলেন তা বর্ণনা করেন। আলোচ্য রচনায় সেই বিবরণ প্রকাশিত হল। এই সাক্ষাৎকারের তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশান সার্ভিস।—স]

এগারো বছর পূর্বে যে তেনজিং নোরগে ২৯ হাজার ২৮ ফুট উচ্চ এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন—তিনি তাঁর আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে, আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের সব থেকে উচ্চ ভবন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর চূড়ায় ওঠাই ছিল ঐ সফরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশ্বের সব থেকে উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় তিনি উঠেছিলেন পায়ে হেঁটে। কিন্তু ঐ এম্পায়ার ভবনটির শীর্ষে তিনি পায়ে হেঁটে যান নি। সেখানে গিয়েছিলেন লিফ্‌টের সাহায্যে। যন্ত্রসাহায্যে গেলেও শীর্ষে ওঠার যে আনন্দ তাতে কম হয় নি।

এম্পায়ার ভবনের শীর্ষের উপর থেকে নীচে তাকিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠেছিলেন ছুটে চলেছে সবাই—যেন ছুটে চলেছে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে। মানুষের জীবনযাত্রার গতি কি দ্রুত! ভেবে আমি অবাক হই, মানুষ কি করে এই দুর্বার গতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে।

শ্রীতেনজিং তাঁর ছোটখাটো সুশ্রী সহধর্মিণী শ্রীমতী দাখু নোরগেকে নিয়ে তিন সপ্তাহের জন্য আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর এই আমেরিকা সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন ভারতের টি-বোর্ড।

আমেরিকায় যাওয়ার পর নিউইয়র্কের বিশ্বমেলায় তাঁর সম্মানার্থে 'তেনজিং নোরগে দিবস' (Tenzing Norgay Day) পালিত হয়েছিল। গত ১৪ই জুলাই তারিখে ঐ মেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট চার্লস পোলেটি (Charles Poletti) ব্যাণ্ডবাদ্য সহযোগে শ্রীতেনজিংকে মার্কিন মণ্ডপে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ও তাঁর সম্মানে সৈন্যবাহিনীর প্যারাট্রুপার্স (Paratroopers) দল ও বয়-স্কাউট দল নানা প্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করেছিল।



● পর্বতারোহণ শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যাখ্যারত তেনজিং

ঐ মেলায় ভারতীয় মণ্ডপে আয়োজিত এক দ্বিপ্রাহরিক ভোজে বেরী বিশপ (Barry Bishop) উপস্থিত ছিলেন। বেরী বিশপকে দেখে শ্রীতেনজিং অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালের আমেরিকার এভারেস্ট বিজয়ী দলের তিনিও ছিলেন অন্যতম সদস্য। শুধুমাত্র ভারতের এই প্রখ্যাত শেরপার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ও তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্যই তিনি আমেরিকার আর এক প্রান্তিক রাষ্ট্র ওয়াশিংটন থেকে এসেছিলেন নিউইয়র্কে।

মিঃ জেমস রামজে উলম্যানই 'টাইগার অফ দি স্নো' (Tiger of the snow) নামে শ্রীতেনজিং নোরগের

একটি জীবনী রচনা করেছিলেন। আমেরিকার ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিকট শ্রীতেনজিংকে তিনি এই বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যে—

More than a mountain-climbing machine-... a very special kind of human being.

শেরপা নামে পরিচিত ও সারা বিশ্বে সম্মানিত এই ব্যক্তিটির এইসব বিশেষ গুণের পরিচয় এই মেলায় ও নিউইয়র্কের রাস্তায় আমেরিকাবাসীরা কিছুটা পেয়েছিলেন। তেনজিং ও তাঁর স্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত সাধারণ মানুষেরা তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছিলেন। কখনও কখনও একটু-আধটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা শ্রীতেনজিং ও তাঁর স্ত্রীকে মুগ্ধ করেছিল ও তাঁরা তাঁদের আপন করে নিয়েছিলেন খুব অল্পসময়ের মধ্যে।

বয়-স্কাউট দলের এক সমাবেশে শ্রীতেনজিং তাঁর পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন এবং এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, গৃহের বাইরে খেলাধুলা প্রভৃতিতে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন—তা সারা জীবনই কাজে লাগে। আমেরিকার বয়-স্কাউটদের নেতা বরাস্মিথ বলেছিলেন যে, 'অন্যান্য দেশের যুবকদের যে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, তা জানা থাকা খুবই ভাল।' আমাদের ছেলেরা তেনজিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এই চমৎকার সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগটিও পেয়েছে।

তেনজিং স্কাউটদের একজন বিশেষ বন্ধু। হামবুর্গের পিটার ফার স্কাউটদের পক্ষ থেকে বলেছিলেন যে—

We are thrilled to meet Tenzing. We have read many stories in our scout publications about him. Because we do a lot of mountain climbing in the United States, Tenzing is a big hero to us.

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫ হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ে শ্রীতেনজিং জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে তিন সপ্তাহের জন্য ঐ শহরে গেলেও আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পক্ষে ঐ সময়ই ছিল যথেষ্ট। আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় মাউন্ট রেইনিয়ারের (Mount Rainier) উচ্চতা হচ্ছে ১৪ হাজার ৪১০ ফুট। মাউন্ট রেইনিয়ারের চূড়ায় ওঠার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও তিনজন আমেরিকান জেমস হুইটটেকার (James whittaker) লুথার জার্স্টেড (Luther Jerstad) ও ডাঃ টমাস এফ হর্নবিন (Dr. Thomas F Hornbein)। ১৯৬৩ সালে এই সব মার্কিন পর্বতারোহী এভারেস্ট জয় করেছিলেন। তাঁদের পরামর্শদাতা ছিলেন শ্রীতেনজিং নোরগে এবং পথনির্দেশক ছিলেন তেনজিং-এর ভাইপো নোয়াং গোম্বু। হুইটটেকার ও গোম্বু একই সঙ্গে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন।

পর্বতারোহণের চেয়ে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গলাভই ছিল শ্রীতেনজিং-এর রেইনিয়ার অভিযানের উদ্দেশ্য। তবে তাঁর স্ত্রীর জন্য তিনি বিশেষ গর্ব বোধ করে থাকেন। কারণ শ্রীমতী দাখুর আগে আর কোন মহিলাই ঐ পর্বতশীর্ষে আরোহণের কৃতিত্ব লাভ করতে পারেন নি।

তেনজিং-দম্পতি দার্জিলিং-এ থাকেন। দার্জিলিং-এ হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (Himalayan Mountaineering Institute) নামে পর্বতারোহণ শিক্ষার যে স্কুল আছে তিনি তারই ডিরেক্টর এবং শেরপা পর্বতারোহণ সমিতির (Sherpa Climbers Association) সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল পথে পর্বতশীর্ষে কি করে আরোহণ করতে হয়, তা তিনি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বহু বছর পূর্বে একজন শেরপা পথনির্দেশ বা গাইড বলত পর্বতশীর্ষে উঠতে চান আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু এখন শ্রীতেনজিং বলেন,—

I teach Let me show you

শ্রীতেনজিং প্রথম শেরপা যিনি ১৯৫৩ সালে বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চ পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে সাধারণ শেরপাদের এই মর্যাদার আসনে এই শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনুবাদক—সন্ধানী।

অনন্য

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

আমার অস্তিত্ব আমি পাই খুঁজে' রক্তের উত্তাপে,
নিঃসঙ্গ শয্যার 'পরে নিশ্ছিদ্র রাত্রির তন্ময়তা
জাগায় উন্মত্ত ঝড় অতলান্ত অব্যক্ত সন্তাপে
রূপমদিরাক্ত ঠোঁটে চুম্বনের দীর্ণ ব্যাকুলতা।
নিবিড় নিশ্চিন্ত নিদ্রা নিরুদ্দেশ নির্বোধ নয়নে
রঙিন ফানুস ওড়ে সৌকর্য-দুর্লভ ব্যঞ্জনায়,
ক্লান্তির কলঙ্ক ক্লিন্ন, সেই সুখ-শয্যা সে-শয়নে
লক্ষের সীমায় এসে' ভেঙে পড়ি শুষ্ক বেদনায়।

তুমিও কী আধো রাতে জেগে' ওঠ আঁধার-সঙ্গীতে—
মর্ত্যের মৃত্তিকা হ'তে পাও না-কী অমৃত-আঘ্রাণ?
সযত্নে সাজায়ে' রাখো—সব ইচ্ছা উদ্দীপ্ত বাসনা
কবরী কুসুমগুচ্ছে, কল্পনার বিভঙ্গ দ্যুতিতে
ভ'রে দাও অগোচরে সুনিবিড় সবটুকু প্রাণ?
সে-গান সে-কবিতায় তুলে' ধর সুরের-মূর্ছনা!

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৭৪

রাধাভাবে রামানন্দকে সখী বলে সম্বোধন করছেন প্রভু। বলছেন, সখি, বলো, কী করে চোখ ফিরিয়ে নেব? মন কী করে ভাববে আর অন্য কথা? আমার চোখ চাতকপাখি আর কৃষ্ণ জলভরা কালো মেঘ—চাতক কী করে মেঘের থেকে মন ফেরাবে? আর মেঘের মধ্যে দেখছ সৌদামিনীকে? মনে হচ্ছে যেন তমাল শ্যামল কৃষ্ণ পীতাম্বর পরে রয়েছে। আর দেখছ ঐ বকপাঁতি? মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণের গলায় দুলছে মুক্তাহার। সেই সঙ্গে আবার দু'টো ইন্দ্রধনু উঠেছে। উপরেরটা কৃষ্ণের মাথায় শিখি-পাখা আর নিচেরটা বৈজয়ন্তীমালা।

দেখ দেখ নবীন মেঘের মধুর গর্জন শুনে ময়ূর নৃত্য করতে সুরু করেছে। এ কি বৃন্দাবনে সেই কৃষ্ণের বাঁশির স্বর-শোনা ময়ূরের নাচ নয়? আকাশের চাঁদ তো দেখেছ, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি আছে কিন্তু আমার কৃষ্ণের বদনচাঁদ যে ষোলকলায় ভরা, তা যে চিরন্তন পরিপূর্ণ। আকাশের চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু আমার কৃষ্ণের বদনচাঁদে কালিমার ছায়াটুকুও নেই, সর্বক্ষণই তা লাবণ্যজ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। আর তোমার আকাশের মেঘ জলের বেশি আর কিছু ঢালতে পারে না, কিন্তু আমার কৃষ্ণমেঘ অমৃত বর্ষণ করে, সেই লালামৃতে চৌদ্দ ভুবনের ত্রিতাপ জ্বালার নিবারণ হয়। দুর্দৈব মেঘ আমার সেই কৃষ্ণমেঘকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল? সেই মাধুর্যবারি ছা । এ পিপাসিত চাতকের প্রাণ কী করে থাকে? রাম রায়, তুমি আবার শ্লোক পড়, আমার শ্যামসুন্দরের রূপ গুণ বর্ণন কর।

রামানন্দ পড়তে লাগল।

প্রভু নিজেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কৃষ্ণের মুখ পদ্ম ও চন্দ্র উভয়কেই জয় করেছে। আর অধরে এমন একটি হাসি এঁকে রেখেছে যার ফাঁদে বন্দী হচ্ছে গোপসুন্দরীর দল আর বলছে হে পুরুষ-ভূষণ, আমাদের তোমার দাসী কর। কুলধর্ম গৃহধর্ম দেহধর্ম পর্যন্ত মানছে না। বন্ধু বলো, এ-কি কৃষ্ণের ব্যাধের আচার নয়? নইলে কি কেউ নারী-মৃগী-মর্ম ছেদন করে? তার সস্মিত কটাক্ষবাণ কে প্রতিহত করবে, কার সাধ্য? আর নিরীহ নারীবধে তার এতটুকু ভয় নেই? তার মুখই তো সুন্দর নয়, তার বুকও সুন্দর। তার বুক উন্নত ও সুবিস্তার, দক্ষিণে শ্রীবৎস ও বামে স্বর্ণবর্ণ লক্ষ্মীরেখা—কিন্তু আসলে তা ডাকাতে বুক, লক্ষ-লক্ষ ব্রজযুবতীকে হরিদাসী করবার জন্যেই উন্মুখ। বাহুযুগল যেন কৃষ্ণসর্প, যে দেখবে তারই হৃদয়ে গিয়ে দংশন করবে আর সে মরবে কন্দর্প-জ্বালায়। কিন্তু কৃষ্ণের করতল পদতল কোটিচন্দ্রের চেয়েও সুশীতল, তার মুখেই আবার স্মরজ্বালার উপশম। তাই কামক্লিষ্ট যুবতীরা সেই করপদতল স্পর্শের জন্যে লালায়িত।

রাধা যেমন বিশাখার কাছে কৃষ্ণবিরহের দুঃখ জানাচ্ছে তেমনি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু রামানন্দের কাছে জানাচ্ছেন তাঁর বিরহকাতরতা।

সখি, সেই হরিচন্দনশীতাঙ্গ মদনমোহন আমার বক্ষস্পৃহা বর্ধিত করে কোথায় অদৃশ্য হল? এই তাকে দেখলাম, আবার এই সে হারিয়ে গেল। কৃষ্ণের স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল, এক জায়গায় কখনো স্থির হয়ে থাকে না, দেখা দিয়ে মনোহরণ করেই তিরোহিত হয়।

রাসলীলায় গোপীরা যখন কৃষ্ণকে পেল তখন তাদের সৌভাগ্যগর্ব হ'ল, রাধিকার হ'ল প্রণয়মান। গোপীদের গর্ব হ'ল কৃষ্ণ সকলের সঙ্গেই সমান বিলাস করছে, কারু প্রতি উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য নেই, কৃষ্ণ সমানস্নেহ, কিন্তু রাধিকার মান হ'ল, সে প্রেয়সীদের মুখ্যতমা, তবু তার প্রতি কৃষ্ণের কোনো বিশেষ আদর নেই। সেই গর্ব ও সেই মান ভাঙবার জন্যেই কৃষ্ণ অন্তর্ধান করল।

কিন্তু রাধিকার মানভঙ্গ হ'ল কী করে? কৃষ্ণ যে একা রাধিকাকে নিয়েই অন্তর্ধান করল। রাসলীলার পরে এ আরেক রহস্যলীলা।

'স্বরূপ, এমন গান গাও যাতে আমার বিরহবেদনার অবসান হয়।' প্রভু স্বরূপকে লক্ষ্য করলেন।

স্বরূপ গীতগোবিন্দের শ্লোক কীর্তন করতে লাগল।

'সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা,
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।'

গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণ সমান ব্যবহার করছে দেখে রাধিকার ঈর্ষা হল। সে লতাকুঞ্জে একাকিনী গিয়ে বসল। অতি দীনার মত সখীকে বলতে লাগল, সখি এই মহারাসে যে বিবিধরূপে বিলাস করেছিল সেই পরিহাসবিশারদকে আমার এখন মনে পড়ছে। বলতে পারো, সেই প্রাণমনহারী হরিকেই আমি বিরলে বিজনে স্মরণ করছি।

সে কী রকম হরি? তার মোহনবংশী তার অধরসুধামধুর ধ্বনিতে মুখরিত, তার ইতস্তত কটাক্ষ-বিক্ষেপে তার মুকুট চঞ্চল, কপোলে কুণ্ডল দোলায়মান। কেশদাম অর্ধচন্দ্রাকারে বলয়িত, তাতে শোভা পাচ্ছে ময়ূরপুচ্ছ, ইন্দ্রধনু অনুরঞ্জিত নবজলধরের কান্তি তার সর্বাঙ্গে। নিতম্বিনী গোপিনীদের মুখচুম্বনের লোভে সে উদ্দীপ্ত, তার অধরপল্লব মৃদুহাস্যে উল্লসিত, বিহ্বলকোমল ভুজদ্বয়ে বল্লবযুবতীরা আলিঙ্গনাবদ্ধ। তার করচরণ-কিরণচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার বিগলিত। তার কথা ভাবছি। তার সেই অনঙ্গ তরঙ্গিত দৃষ্টি তার কলহক্লেশনাশন চাটুবাক্য।

শুনতে-শুনতে প্রভুর প্রেমাবেশ হল। অঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকট হল, প্রভু নাচতে লাগলেন। ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ, মাদনাখ্য মহাভাব উপস্থিত হল।

প্রভুর শ্রম দেখে থামল স্বরূপ, পদকীর্তন শেষ করল।

'বলো, বলো, আরো বলো।'

ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠল। রামানন্দ পাখা করতে লাগল, মুছিয়ে দিল গায়ের ঘাম। সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে বাসায় ফিরিয়ে আনল। ভোজন করিয়ে শুইয়ে দিল প্রভুকে।

এমনি ভাবে প্রণয়বিহ্বল হয়ে ভক্তসঙ্গে প্রভু আছেন নীলাচলে।

এবার গৌড়ভক্তদের সঙ্গে কালিদাস এসেছে। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়ো, বৈষ্ণবের পদরজে ও উচ্ছিষ্টে এর প্রবল নিষ্ঠা। সরল, উদার, মহাভাগবত, কৃষ্ণনাম সঙ্কেতেই লোকব্যবহার করে। কাউকে ডাকতে হ'ল হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে, সম্মতি বোঝাতেও সেই বুলি। সে যে পাশা খেলে তাও হরেকৃষ্ণ বলে ধ্বনিত হয়ে ওঠবার সুযোগ পাবে বলে।

ছোট-বড় বিচার না করে পরিচিত সকল বৈষ্ণবেরই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে কালিদাস। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বৈষ্ণববাড়িতে যায়, গিয়ে বলে উচ্ছিষ্ট করে দিন, আমি তাই খাব তৃপ্তি করে। যদি কেউ উচ্ছিষ্ট না দেয় কালিদাস লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে কোথায় এ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়। তারপর সেই আবর্জনা থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে খায়।

ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব কিন্তু জাতিতে ভুঁইমালি। তার বাড়িতে কতগুলো আম নিয়ে একদিন হাজির হল কালিদাস। ঝড়ুঠাকুর ও তার স্ত্রীকে আম দিয়ে প্রণাম করল, বলল কৃষ্ণকথা। ঝড়ুঠাকুর বললে, 'আমি নীচ জাতি, তুমি সৎকুলোদ্ভব অতিথি, বলো কী দিয়ে তোমার সেবা করব? তুমি আদেশ করো, কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার আহারের বন্দোবস্ত করি। তুমি যদি প্রসাদ না পাও, অভুক্ত চলে যাও, তা হলে আমি বাঁচব না।'

কালিদাস বললে, 'ঠাকুর, আমি পতিত, আমি পামর, তোমার দর্শনে পবিত্র হবার জন্যে এসেছি। তোমার কাছে আমার শুধু এক প্রার্থনা, আমাকে তোমার পদরজ দাও, আমার মাথায় তোমার শ্রীচরণ রাখো।'

ঝড়ুঠাকুর অস্থির হয়ে উঠল। বললে 'ছি ছি ও কী কথা, ও কথা বলতে নেই। আমি নীচ জাতি আর তুমি সুসজ্জন, তুমি অমন অসঙ্গত প্রার্থনা কোরো না।'

'কিন্তু শাস্ত্রে কী বলেছে ?' শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাল কালিদাস: 'চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিশূন্য হয় সে আমার প্রিয় নয় আর চণ্ডালও যদি আমাতে ভক্তিমান হয় সে আমার প্রিয় হয়। সুতরাং ভক্ত চণ্ডালকেই সৎপাত্র জ্ঞান করে দান করবে আর তার কাছ থেকেই প্রতিগ্রহ করবে। সে যে আমারই মত পূজ্য। আবার শোনো। কৃষ্ণচরণে ভক্তি নেই এমন দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে কৃষ্ণচরণে মন বাক্য চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করেছেন এমন চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু সেই চণ্ডাল নিজের কুলকে পবিত্র করতে পারেন কিন্তু সেই বহুগর্বিত ভূরিমান ব্রাহ্মণ তা পারে না।'

ঝড়ুঠাকুর বললে, 'হ্যাঁ, শাস্ত্রে তা বলেছে বটে কিন্তু আমার সেই ভক্তি কই ? আমি শুধু হেয়কুলেই জন্মেছি, কৃষ্ণভক্তির কানাকড়িও আমাতে নেই।'

কালিদাস আর কি করে ফিরে চলল। ঝড়ুঠাকুর কয়েক পা এগিয়ে দিল কালিদাসকে।

ঝড়ুঠাকুর চলে গেল ফিরে দাঁড়াল কালিদাস। দেখল পথের ধুলোয় ঝড়ুঠাকুরের পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। সেই ধুলো তুলে নিয়ে মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে।

তারপর ঝোপ-ঝাপের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

ঝড়ুঠাকুর ঘরে ফিরে এসে সেই আম মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রকে নিবেদন করল। তারপর স্বামী-স্ত্রীতে আম খেয়ে আঁঠি আর খোসা ফেলে দিলে আঁস্তাকুড়ে। কালিদাস তা দেখল, পরে চুপি-চুপি সেখান থেকে চোষা আঁঠি কুড়িয়ে নিয়ে চুষতে লাগল। চুষতে-চুষতে তার প্রেমোল্লাস হল।

প্রভু জগন্নাথদর্শনে মন্দিরে যান, জলকরঙ্গ নিয়ে সঙ্গে যায় গোবিন্দ। সিংহদ্বারের উত্তরে বাইশ-সিঁড়ির নীচে কপাটের আড়ালে একটা গর্ত আছে, সেখানে প্রভু প্রত্যহ পা ধোন। পা ধুয়ে, পরে সিঁড়ি ভেঙে যান ঈশ্বরদর্শনে। গোবিন্দকে বলে দিয়েছেন, দেখো, আমার পাদোদক যেন কেহ না নেয়।

মন্দিরে যাবার আগে প্রভু সেদিন পা ধুচ্ছেন কালিদাস হাত পেতে এসে দাঁড়াল। একে-একে তিন অঞ্জলি জল নিয়ে সে পান করল। তারপর প্রভু তাকে বারণ করলেন, বললেন, 'আর নয়, তোমার বাসনা এতেই পূর্ণ হয়েছে।'

প্রভু জানেন কালিদাসের বৈষ্ণবশ্রদ্ধা, তাই যে প্রসাদ অন্যের পক্ষে দুর্লভ তাই পাইয়ে দিলেন তাকে। বুঝিয়ে দিলেন শুধু বৈষ্ণব নিষ্ঠায়ই ভগবানের মহৎ কৃপা লাভ করা যায়।

বাইশ-সিঁড়ির উপর দক্ষিণ দিকে এক নৃসিংহমূর্তি আছে, প্রভু প্রত্যহ তাকে প্রণাম করেন আর বলেন, যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা যার পাষাণ-দারণ নখ হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃশিলা ছিন্ন করেছে সেই নরসিংহ-দেবকে প্রণাম করি। এখানে নৃসিংহ ওখানে নৃসিংহ যেখানে যেখানে যাচ্ছি সর্বত্র নৃসিংহ, অন্তরে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আদিপুরুষ নৃসিংহেই আমি শরণাগত হলাম।

দর্শনান্তে প্রভু ঘরে এসে আহার করছেন, দেখলেন বহির্দ্বারে কালিদাস প্রত্যাশা করে বসে আছে। প্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন, গোবিন্দ কালিদাসকে প্রভুর ভুক্তাবশেষ খেতে দিল।

যে ঘৃণা লজ্জা ছেড়ে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খেতে পারে সেই চূড়ান্ত কৃপার অধিকারী হয়।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ আর ভক্ত-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের নাম মহা-মহাপ্রসাদ।

'ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল॥'

এই তিনের সেবা থেকেই কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস। ভক্তপদধূলিতে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত যাগযজ্ঞ তপস্যা বা বেদপাঠ দ্বারা ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞানোদয় হয় না। সাধুদের চরণধূলির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ভগবানের পদস্পর্শ।

শিবানন্দ সেন এবার তার শিশুপুত্র পুরীদাসকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সাত বছরের ছেলে প্রভুর চরণ বন্দনা করলে। প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণ বল।'

শিশু মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'কৃষ্ণ নাম বল।' প্রভু আবার আদেশ করলেন।

পুরীদাস যেমন নীরব ছিল তেমনি নীরব রইল।

শিবানন্দ অবাক মানল। সে কী, বল কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

শিশু তখনো নিঃশব্দ। কৃষ্ণনাম বলল না কিছুতেই।

'আমি সর্বজগৎকে কৃষ্ণনাম নেওয়ালাম' প্রভু বললেন, 'স্থাবর জঙ্গম সকলে কৃষ্ণনাম বলল আর এই এক শিশুর কাছে পরাস্ত হলাম। কিছুতেই পারলাম না কৃষ্ণনাম নেওয়াতে।'

স্বরূপ দামোদর বললে, 'আমি জানি এর কী রহস্য। তুমি যেই শিশুকে কৃষ্ণনাম নিতে বলেছ ও ভেবেছ ঐ 'কৃষ্ণ'ই বুঝি তার দীক্ষামন্ত্র। তাই শিশু তার দীক্ষামন্ত্র কারু কাছে প্রকাশ করছে না। মুখে না বললেও মনে হচ্ছে মনে-মনে সে কৃষ্ণনামই জপ করছে।'

আরেকদিন পুরীদাসকে প্রভু বললেন, 'পুরীদাস, শ্লোক বল।'

তখুনি সে সাত বছরের ছেলে মুখে মুখে শ্লোক রচনা করে বসল।

'যিনি বৃন্দাবন রমণীদের শ্রবণ যুগলের কুবলয়, চক্ষু যুগলের কজ্জল, বক্ষঃস্থলের মহেন্দ্র মণিমালা, যিনি অখিলমণ্ডল নিখিলভূষণ স্বরূপ, সেই শ্রীহরির জয় হোক।'

সাত বছরের বালক, লেখাপড়া শেখে নি, তার মুখে এই শ্লোকোচ্চার! সকলে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর কৃপার মহিমাই এমনি! আরো শৈশবে বালকের মুখে প্রভু তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠ দেন নি? তারই জন্যে হয়তো এই কাব্য বিকাশ।

আর এই পুরীদাসই তো কবি কর্ণপূর! আর তারই লেখা তো আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু।

একদিন প্রভু জগন্নাথদর্শনে গিয়েছেন, সিংহদ্বারে দারোয়ান তাঁকে প্রণাম করল। প্রভু তাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমার কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ কোথায়?'

দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'কই দেখাও, আমাকে আমার কৃষ্ণকে দেখাও।' বলে প্রভু দারোয়ানের হাত ধরলেন।

দারোয়ান বললে, 'বেশ, এস আমার সঙ্গে, দেখাব তোমাকে। এই মন্দিরে আছেন তোমার ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

'তুমি আমার বন্ধু, দেখাও কোথায় আমার প্রাণনাথ।' রাধাভাববিভোর প্রভু বললেন আকুল হয়ে।

'এই দেখ তোমার পুরুষোত্তমকে দেখ। চোখ ভরে দেখ।' বললে দারোয়ান।

প্রভু গরুড়স্তম্ভের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন জগন্নাথ মুরলীবদন হয়েছে।

প্রাণভরে প্রিয়তমকে দর্শন করতে লাগলেন প্রভু। এমন সময় জগন্নাথের সকালবেলাকার গোপাল-বল্লভ-ভোগ লাগল, বাজল আরতির শঙ্খঘন্টা। ভোগান্তে জগন্নাথের সেবকেরা প্রভুর গলায় প্রসাদী মালা পরিয়ে দিল। হাতে দিল প্রসাদ। আস্বাদ তো পরের কথা, প্রসাদের গন্ধই মনকে মাতিয়ে তোলে! প্রসাদের কিঞ্চিৎ প্রভু মুখে দিলেন, বাকিটা গোবিন্দকে বললেন কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিতে, ভক্তজনে বিতরণ করতে হবে। প্রসাদের আস্বাদে প্রভুর সর্বাঙ্গে পুলক সঞ্চার হল, নেত্রে নামল অশ্রুধার।

'এই দ্রব্যে এত স্বাদ কি করে এল?' প্রভু নিজের মনেই বিচার করলেন: 'যেহেতু এতে কৃষ্ণের অধরামৃত লেগেছে।'

'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাঁহা হৈতে আইল?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল॥'

প্রসাদস্বাদে প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভু বারে বারে বলতে লাগলেন, 'সুকৃতিলভ্য ফেলালব।'

এ কথার অর্থ কি? সেবকেরা জিগগেস করল প্রভুকে।

প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণের যে ভুক্তাবশেষ তার নাম ফেলা। আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে লব বলে। তাই কৃষ্ণের প্রসাদের ক্ষুদ্র অংশ বা কণিকাই ফেলালব। সুকৃতির অর্থ পুণ্য, কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য। সুতরাং যে ফেলালব পায় সেই ধন্য সেই পুণ্যবান। সামান্য ভাগ্য হতে এ জোটে না, এ জোটে শুধু কৃষ্ণের পরিপূর্ণ করুণায়।

উপলভোগ দেখে প্রভু বাসায় ফিরলেন। যা কৃত্যই করুন সর্বক্ষণ কৃষ্ণাধরামৃতের কথা অন্তরে স্ফুরিত হচ্ছে।

'কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ।'

মধ্যাহ্নকৃত্য ও অবশেষে সন্ধ্যাকৃত্য করে ভক্তদের নিয়ে নিভৃতে বসলেন প্রভু, নানা কৃষ্ণকথারঙ্গ সুরু করলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ এনে সকলকে বিতরণ করে দিল। প্রসাদের সৌরভ্যে-মাধুর্যে সকলে চমৎকৃত হল। এ কী অলৌকিক আস্বাদ!

প্রভু বললেন, 'সামান্য বস্তু দিয়ে এ তৈরি। ঘৃত গব্য কর্পূর এলাচ মরিচ লবঙ্গ কাবাবচিনি দারুচিনি। এসব প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ গন্ধ আমরা সকলেই জানি কিন্তু এই প্রসাদের স্বাদ গন্ধ যা পাচ্ছি তা ভুবনদুর্লভ, তা লোকাতীত।'

কেন?

কৃষ্ণের অধরস্পর্শের গুণে। মহামাদক এই কৃষ্ণ-স্পর্শ। 'ইতররাগবিস্মরণ।' অন্য সমস্ত বস্তুর মাধুর্য ভুলিয়ে দেয়। 'আপনা বিনু অন্য মাধুর্য করায় বিস্মরণ।'

[ক্রমশ।

সাহিত্য পরিচয়

টলস্টয়ের পুণ্য স্মৃতিপূত ইয়েসনায়া পলিয়ানা বিশ্ববাসীর তীর্থক্ষেত্র। পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত থেকে টলস্টয় প্রেমিকরা এ তীর্থভূমি দর্শনাভিলাষে আকুলাগ্রহে ছুটে আসেন।

ইয়েসনায়া পলিয়ানার মত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার সারা রাশিয়ায় আর একটিও নেই। টলস্টয়ের মাতামহ ইয়াসনায়া পলিয়ানার প্রতিষ্ঠাতা নিকোলাই ভলকন্স্কি এই গ্রন্থাগার প্রথম গড়ে তোলেন। এই বইগুলির মধ্যেই বড় হয়েছিলেন টলস্টয়-মাতা মারিয়া ভলকন্স্কায়া, আর নিজের সন্তানদেরও এখানেই জ্ঞানের আলোয় দীক্ষা দিয়েছিলেন।

ইয়াসনায়া পলিয়ানার অতীত ইতিহাস তাই গৌরবান্বিত.ঐতিহ্যময়।

লিও টলস্টয়ের সৃজনী-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এইখানেই। এই গ্রন্থাগারে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ বাইশ হাজার গ্রন্থ। এই সংগ্রহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে তবেই অমর এই বিশ্বসাহিত্যিকের বহুমুখী প্রতিভার গতি-প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যাবে। কিছু আভাস পাওয়া

টলস্টয়-গ্রন্থাগারের বহু দুর্লভ গ্রন্থের মধ্যে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকাশকরা ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন বিষয়ক বই ও পত্রিকা টলস্টয়ের কাছে পাঠাতেন।

ভ্যাঙ্কুবার থেকে এপ্রিল, ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ফ্রি হিন্দুস্থান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা এই গ্রন্থাগারে আছে। ভিতরে লেখা :

কাউন্ট লিও টলস্টয়কে, গভীর শ্রদ্ধার সহিত—তারকনাথ দাস, মে ২৩, ১৯০৮।

এই পত্রিকায় বহু জায়গায় টলস্টয়ের নিজের হাতের পেন্সিল-চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় টলস্টয় গভীর কৌতূহলে 'হিন্দুস্থানে দুর্ভিক্ষ ও উহার প্রতিকার' নামক প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। তিন নম্বর পাতার নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির বাঁ দিকে রেখাচিহ্ন দিয়েছিলেন তিনি—

'বৃটিশ সরকারের বাণিজ্য-নীতি যেভাবে দেশ থেকে দেশের ধন বার করে নিয়ে যাচ্ছে অনবরত, হিন্দুস্থানে দুর্ভিক্ষ বন্ধ করতে হলে তা বন্ধ করতেই হবে আমাদের।

টলস্টয় পাঠাগারে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রাম সংক্রান্ত গ্রন্থরাজি

যাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার বহুবিস্তৃত আকর্ষণের। জীবনের বহু বিচিত্র রূপ ও রস আহরণ করেছিলেন বলেই তিনি জীবন-শিল্পী। তাঁর সেই আহরণের পশ্চাৎ-কাহিনী অনেকখানিই শোনাবে এই গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারের মূল্য তাই অসীম।

টলস্টয়ের এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে বহু বিচিত্র ও দুর্লভ গ্রন্থের সমাবেশ। এই জ্ঞানতপস্বীর সংগ্রহশালায় বহু বই, বহু পত্রিকা নিয়মিত আপনা হতেও এসে জড়ো হ'ত। প্রবীণ এই বরেণ্য সাহিত্যিকের সংগে চিন্তার আদান-প্রদানে আগ্রহী মানুষরা পাঠাতেন—শিষ্যরা, গুণমুগ্ধ ভক্তরা ও বন্ধুরা, নানা দেশের লেখক ও প্রকাশকরা। এই সব বইয়ের মধ্যে আর্ট ও সাহিত্যের বই ছিল—দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানের বই ছিল। ম্যাক্সিম গর্কি, ভাদিমির করলেনকো, আনাতোল ফ্রান্স ও বার্নার্ড শ', তাঁকে উৎসর্গ করে স্বরচিত বই পাঠাতেন। ঐতিহাসিক ও পদার্থবিদরা, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও জীববিদরা তাঁদের আপনাপন রচনা তাঁকে দিয়ে ধন্য হতেন। বিশ্বকোষ অভিধান ও নানা বিষয়ক সারগর্ভ পত্র-পত্রিকায় টলস্টয়ের গ্রন্থাগার পূর্ণ ছিল।

আর তা করতে হলে, আমাদের দেশের শাসনভার আমরা নিজেরা গ্রহণ করা ব্যতীত পথ নেই।'

'আমাদের দেশের শাসনভার আমরা নিজেরা গ্রহণ' এই অংশটুকুর তলায় টলস্টয় দাগ দিয়ে রেখেছিলেন। নিম্নলিখিত আলোচনার প্রতিও তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল :

'স্বরাজই হিন্দুস্থানে দুর্ভিক্ষ দমনের একমাত্র উপায়। সারা পৃথিবীর রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহে যত মানুষ মরেছে, এই হিন্দুস্থানে গত পঁচিশ বছরে দুর্ভিক্ষের মৃত্যুহার তার দশগুণেরও বেশি।'

এ লেখাটির মধ্যেও টলস্টয়ের হাতের রেখাচিহ্ন।

ইণ্ডিয়া পত্রিকার ১৯০৭ সালের ২৩শে অগাস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'Glimpse of Famine and Flood in East Bengal' রচনাটি পাঠকালে গুরুত্বপূর্ণ নানা জায়গায় যেসব চিহ্ন তিনি দিয়েছিলেন তার থেকেই বোঝা যায় উক্ত সমস্যা সম্বন্ধে কতটা সচেতন ও আগ্রহী তিনি ছিলেন।

ভারতীয়দের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও গ্রেট-বৃটেনের স্বৈরশাসনের বিরোধিতা সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্যের প্রতি সুগভীর আগ্রহ ছিল টলস্টয়ের। এই জাতীয়

পত্রিকার যেসব অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে এই বিশ্বপ্রেমিকের মনে সাড়া জাগাত ও সমবেদনায় ভরে তুলত তার পাশে মার্জিনে তিনি গভীর লাল ও কালো দাগ দিতেন। উদাহরণ হিসাবে নীচে তেমনই এক কৃষ্ণ-লোহিত চিহ্নে শোভিত লেখাংশের উল্লেখ করা গেল। ইণ্ডিয়া পত্রিকার ১৯০৮ সালের ২১শে অগাস্ট সংখ্যায় লেখাটির সন্ধান মিলবে। 'মিঃ তিলককে অপরাধী সাব্যস্ত করা হলে বম্বেতে যে দাঙ্গা শুরু হয়, সরকারিভাবে ঘোষণা অনুসারে সে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা সবশুদ্ধ চৌদ্দজন।··· কেবলমাত্র এই গোলযোগের প্রথম দিনটিতেই (শুক্রবার, জুলাই ২৪) চুয়াল্লিশ জন আহত ব্যক্তি জামসেদজী হাসপাতালে আসে। তিনজন তার মধ্যে মারা যায়'···

ভারতের পরিস্থিতি জানার জন্য টলস্টয় মুদ্রিত তথ্যাদির ওপরই কেবল নির্ভর করতেন না। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতাদের সংগে সাগ্রহে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতেন তিনি। কেউ ভারত থেকে ঘুরে এলে তাদের মুখে তিনি তাঁর এই প্রিয় দেশটির কথা শুনতে চাইতেন। এ দেশের প্রকৃতি ও লোকসংখ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করতেন। উপনিবেশবাদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে বেদনায় বুক ভরে উঠত তাঁর। আপনার চার পাশের মানুষকেও তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলতে চাইতেন। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে বিখ্যাত রুশ মহিলা-পরিব্রাজক কর্সিনি যখন ইয়াসনায়া পলিয়ানায় আসেন টলস্টয় ভারত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন তাঁর সংগে। নিজের বাড়িতে তাঁর একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন, সংগে স্লাইড দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। চারপাশের চাষীদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন বক্তৃতা শোনবার জন্য। তাঁর চিকিৎসক ডাঃ মাকোভিৎস্কি পরে বলেছিলেন ছবি দেখে আর বক্তৃতা শুনে টলস্টয় নিজেই ভারি খুশি হয়েছিলেন আর ভারতীয়দের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—'An extremely interesting a supremely interesting people.'

—প্রয়াসী

ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য / সংস্কৃতি প্রকাশন

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত এক চিহ্নিত নাম, তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন সম্বন্ধেও দ্বিমতের অবকাশ নেই, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তারই সূত্রপাত করে চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন একান্তভাবেই সাধারণের প্রিয় কবি, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অবদান ও প্রভাব ছিল বিস্ময়কর, এমন কি স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও কিয়দংশে তাঁরই উত্তরসাধক ছিলেন বলে জনশ্রুতি। রসরচনা বা ব্যঙ্গাত্মক রচনাই ছিল ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য কীর্তির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, বস্তুত সে যুগে গুপ্তকবির শ্লেষ-বিদ্রূপ মিশ্রিত কাব্য শুধু সাধারণেরই নয় বিদগ্ধ মনেরও মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক এই একদা প্রসিদ্ধ অথচ বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিকারের সাহিত্য সাধনার সম্যক্ পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। গুপ্তকবির আবির্ভাব, বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব, তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপ, তাঁর জীবনদর্শন ইত্যাদি সব ধরণের তথ্যই প্রামাণ্যতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—সঞ্জীবকুমার বসু। প্রকাশনায়—সংস্কৃতি প্রকাশন, ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

গিরিশ রচনাবলী (২য়) / ধ্রুপদী সাহিত্য সংসদ

মহাকবি, নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর এই ২য় খণ্ড সাহিত্যরসিক পাঠকমাত্রেরই মনোরঞ্জন করবে। গিরিশচন্দ্রের অমূল্য রচনাশক্তির কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে এই খণ্ডে। সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে সাম্প্রতিক সাহিত্যের পাশাপাশি ধ্রুপদী বা ক্লাসিক সাহিত্যের পরিচয় পাওয়াটা আবশ্যক—তা না হলে সাহিত্য বিচারে সামগ্রিকতা আসতেই পারে না; সেদিক দিয়ে দেখতে হলে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যকে সযত্নে রক্ষা করার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। আলোচ্য রচনাবলীর প্রকাশক এই প্রয়োজন সম্বন্ধেই অবহিত হয়েছেন এবং এজন্য তাঁরা বাঙালী সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। জনা, সিরাজউদ্দৌলা, য্যায়সা কা ত্যায়সা ও দোললীলা এই চারটি রচনা স্থান পেয়েছে এই খণ্ডে। জনা সম্বন্ধে বিশেষ পরিচিতির আবশ্যক নেই, কারণ এটি গিরিশচন্দ্রের এক বহুল প্রচারিত রচনা; সিরাজউদ্দৌলা ঐতিহাসিক নাটক এবং বর্তমানে এর খ্যাতি ততটা না থাকলেও এক সময়ে এটি বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। অপর দুটি রচনার একটি ফার্স ও অপরটি রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গীতিকাব্য। আলোচ্য সংকলনের সম্পাদন-কৃতিত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়, কারণ এই খণ্ডে যেসব রচনা সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবার অবকাশ আছে। গ্রন্থটির আঙ্গিক মনোরম ও মূল্যবান। লেখক—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক—রমেন চৌধুরী, প্রকাশক—ধ্রুপদী সাহিত্য সংসদ, ১৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলি-৩৭। দাম—দশ টাকা।

আধুনিক প্রেমের গল্প / সেনগুপ্ত ব্রাদার্স

বাংলা প্রেমের গল্পের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম না হলেও, আলোচ্য সংকলনটির মত সর্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন বোধ হয় এর আগে আত্মপ্রকাশ করে নি। প্রাচীন ও নবীন মিলিয়ে মোট সাতচল্লিশ জন সাহিত্যকারের সাতচল্লিশটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই সংকলনে, বাংলা ছোটগল্পের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিদ্যমান এমন পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন যে, বাছাইয়ের কাছে সংকলনকর্তাদ্বয় গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বাছাই করা গল্পগুলির মাধ্যমে শুধু প্রেমের বিচিত্র রূপই পূর্ণ প্রকাশিত নয়, কথাশিল্পীদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও রূপায়িত হয়েছে।" বিভিন্ন মেজাজের বিভিন্ন রঙের ছোঁয়ায় গল্পগুলি উজ্জ্বল ও মধুর, তবু তারা যেন অসংখ্য নদীর মত একেরই অভিসারী, সাগর সঙ্গমেই যেমন সকল জলধারা পূর্ণতা লাভ করে, প্রেমের সেই মহাসঙ্গমস্থলেই যেন এরা সকলে মিলেছে, একীভূত হয়ে গিয়েছে। লেখকবৃন্দের শৈলী বিভিন্ন, বক্তব্য বিভিন্ন তবু একই গানের বহু বিচিত্র ধুয়ার মত তাঁদের সৃষ্টির মূল সুরটি যেন একই পূর্ণতার পরিচয়বাহী। প্রেমের আনন্দ, বেদনা, সার্থকতা ও ব্যর্থতার পরিচয়ে উজ্জ্বল রচনাগুলির মাধ্যমে পাঠক একটা অখণ্ডতার আভাস পেয়ে তৃপ্ত হন—সে অখণ্ডতা প্রেমের কালজয়ী মহিমার। সংকলনে স্থান পেয়েছেন বয়োজ্যেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ থেকে বয়োকনিষ্ঠ প্রাণতোষ ঘটক পর্যন্ত। অর্থাৎ ইং ১৮৬১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত মানব-হৃদয়ের সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পদ যে প্রেম, সেই প্রেমেরই নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে বর্তমান রচনাগুলির মাধ্যমে; পড়তে পড়তে বিস্ময়ে চকিত হয়ে ওঠে মন, রসাপ্লুত হয়ে ওঠে হৃদয়। এমন একটি মনোরম ও মূল্যবান সংকলন প্রকাশ করার জন্য প্রকাশকও আমাদের ধন্যবাদার্হ। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। সংকলনকর্তা—বিশ্বনাথ দে ও সুখময় সেনগুপ্ত। প্রকাশক—সেনগুপ্ত ব্রাদার্স। ২৪।১এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—বারো টাকা।

ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ (১ম) / জিজ্ঞাসা

ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য অপার ও বিস্ময়কর, বর্তমান রচনায় ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসকে একটা সামগ্রিক রূপদান করার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। এর পূর্বে ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে আরও বহু রচনাদি প্রকাশিত হলেও একই সঙ্গে সংগীত ও সংগীতবিদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার নজির নেই, সেই হিসাবে এ গ্রন্থকে পায়োনীয়ার বা পথপ্রদর্শক বলা চলে। এ গ্রন্থে লোকসংগীত ব্যতীত অন্যান্য সব ধরণের সংগীতেরই ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, যত্ন অনুশীলনের ফলে লেখক সহজেই সংগীত সম্বন্ধে একটা সুসম্বদ্ধ ধারণার আভাস দিতে সক্ষম হয়েছেন, ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকমাত্রই যে এ রচনাটি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন এ আশা করা দুরাশা নয়। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডাঃ বিমল রায়। প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯। দাম—ছয় টাকা।

ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ রচনা / ইউ এস আই এস

আজকের দিনে ব্যক্তিমাত্রেরই সমাজ সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে, বর্তমান গ্রন্থে এ সম্বন্ধেই বিশদ আলোচনা করেছেন বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনশো বছরব্যাপী শিল্প-বিপ্লব ও দুটি বিপুল ও ধ্বংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়েই অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রনীতিবিদগণ আজ একথা উপলব্ধি করেছেন যে, সভ্যতার প্রকৃত অর্থ ও সুখ-সুবিধাগুলি পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়াতেই নিহিত রয়েছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ। এ গ্রন্থে লেখক সেই কল্যাণেরই পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এই বিরাট পটভূমিকায় লেখক জাতি গঠন, পল্লী উন্নয়ন, শিল্পপ্রসার ও সমাজকল্যাণের লক্ষ্য এবং সেই সঙ্গে ভারত-চীন সম্পর্কের বর্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্র সচেতন ব্যক্তিমাত্রই এ রচনাটি পাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—চেস্টার বোলজ, প্রকাশনায়—ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা।

যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ / প্রতিমা পুস্তক

বাংলা দেশ তথা ভারতের ইতিহাসে, উনবিংশ শতাব্দী শুধু গৌরবোজ্জ্বলই এক যুগ নয় পুণ্যময়ও বটে, কারণ এই শতকেই পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নরদেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর সাধনাকে মূল লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেও মানবসেবাকে প্রাধান্য দিতে ইতস্তত করেন নি, বস্তুত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করা রূপ মহামন্ত্রের তিনিই মূল উদ্গাতা। পরবর্তীকালে তাঁর প্রধানতম উত্তরসাধক স্বামীজীর কণ্ঠে এই বাণীই উদাত্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমান রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই লোকপিতা রূপটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-দর্শন পৃথিবীর ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসে যে বিশেষ ভূমিকার অধিকারী—এ রচনায় তারই পরিচয় পাওয়া

যায় এবং সেজন্যই রচনাটিকে মূল্যবান বলে অভিহিত করা যায় অনায়াসেই। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রলয় সেন। প্রকাশক—প্রতিমা পুস্তক, ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—ছ' টাকা।

আবহ সঙ্গীত / প্রতিমা পুস্তক

আলোচ্য উপন্যাসে কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিবৃন্দের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার এক ছবি পাওয়া যায়, কারণ উপন্যাসোক্ত বহু চরিত্রই একে কেন্দ্র করে বিকশিত। কাহিনী মামুলী হলেও ডকার্স জীবনের এক অখণ্ড রূপায়ণে বৈচিত্র্যের আস্বাদবাহী। লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হয়েও ভাষারীতির দৌর্বল্যে যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়ে উঠতে পারে নি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—নীরদ ভট্টাচার্য, প্রকাশনায়—প্রতিমা পুস্তক, ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—ছ' টাকা।

পৃথিবী থেকে চাঁদে / আলফা-বিটা

পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা চলেছে বহুদিন ধরে এবং বর্তমানে সে প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সফলও। বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুও একে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। গান-ক্লাবের সদস্যরা ঠিক করলেন চাঁদের ওপর গোলা ফেলা হবে, নির্মিত হল ন'শো ফুট লম্বা এক কামান, তারপরই সুরু হয়ে গেল অবিশ্বাস্য চন্দ্র অভিযান, সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত হয়ে উঠল সে সংবাদে, জুল ভর্ন লিখিত এই কাহিনী একদিন বিস্ময় চকিত করে তুলেছিল বিশ্ব-পাঠক সমাজকে, রকেট বই সিরিজে সেই কাহিনীরই নব-রূপায়ণ ঘটেছে, কিশোর-কিশোরীর বুদ্ধিগ্রাহ্য করে। শিশু-সাহিত্যের আসরে এ ধরণের অনুবাদকর্ম নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক মোটামুটি। লেখক—জুল ভর্ন, অনুবাদক—অদ্রীশ বর্ধন। প্রকাশনায়—অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌, পোস্ট বক্স-২৫৩৯। কলিঃ-১। দাম—এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

মাটি ও মানবী / সুপ্রকাশ

সাহিত্য-জগতে যেসব নবাগত লেখক আবির্ভূত হয়েছেন এবং স্বীয় বলিষ্ঠ লেখনীর বলে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রবোধ সরকার অন্যতম। সাম্প্রতিক গ্রন্থটি একটি সামাজিক উপন্যাস। এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র বিন্দীর। অল্পবয়সে স্বামীহারা বাল্য-বিধবা বৈষ্ণবী নারীর জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নিরাশা, সুখ ও দুঃখের একটি অপূর্ব কাহিনী লেখকদের মর্মস্পর্শী লেখনীর সৃজন ক্ষমতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। পল্লী-বাংলার যে গ্রামের সবুজ ও মনোরম নিখুঁত চিত্র লেখক উদ্ঘাটন করেছেন তা সত্যই লক্ষণীয়। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র যেমন সৌরভী, নিত্যানন্দ, মদন পাগলা, রাখাল ছেলে ও রায় মশাই প্রভৃতি চরিত্রগুলি পাঠকের মনে গভীরভাবে দাগ কাটতে সক্ষম বলেই মনে করি। ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—প্রবোধ সরকার। প্রকাশনায়—সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিঃ, ৯, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—পাঁচ টাকা।

বিবেকানন্দ যুগ / সাধনা প্রকাশনী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক প্রবন্ধ সংগ্রহ, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে মানসগোচর করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধ নিচয়ের মাধ্যমে। ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের আদর্শপূত স্বামী বিবেকানন্দের যে অবদান, তারই মূল্যায়ন করেছেন লেখক এই রচনায়। প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে এ সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণার অবকাশ ঘটে। সৎসাহিত্য চিন্তা করার মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত তার সন্ধান মিলবে এই গ্রন্থে। আমরা বইটি পড়ে আনন্দলাভ করেছি। লেখকের আন্তরিকতায় রচনাটি হৃদ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, প্রকাশনায়—সাধনা প্রকাশনী, ৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা—৪৮। দাম—দুই টাকা।

বল পড়ে ব্যাট নড়ে / করুণা প্রকাশনী

বাংলা সাহিত্যকে জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য লেখকেরা আজ সচেষ্ট হয়েছেন। সেই সাহিত্যকে খেলার মাঠে নিয়ে গেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। তাই বলে তিনি লেখা নিয়ে ছেলেখেলা করেন নি। তাঁর খেলার লেখা সাহিত্যের পর্যায়েই পড়ে। তাঁর সর্বশেষ ক্রিকেট বই 'বল পড়ে ব্যাট নড়ে' তারই সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই বইটিতে শ্রীযুক্ত বসু ক্রিকেটের বহু বিখ্যাত চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন এবং ক্রিকেটে অজস্র সরস ও আকর্ষণীয় কাহিনীকে হাজির করেছেন বিরল ক্ষমতায়। ডবলিউ জি গ্রেস, সিড বার্নস, ব্রাডম্যান, ওরেল, উইকস, ওয়ালকট, উমরিগড়, ডেক্সটার, টনিলক প্রভৃতি বহু চরিত্র ভিড় করে আছে এখানে। তা ছাড়া ভারত-ইংল্যাণ্ড এবং ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। 'বল পড়ে ব্যাট নড়ে' বইটির নাম যেমন তাৎপর্যময় তেমনি উচ্চাঙ্গের এর লিখন-কৌশল। ক্রিকেটের নতুন ভাষা তৈরি হয়েছে এখানে। বইটিতে আছে কখনো গল্প, কখনো নাটক, কখনো কাব্য—কিন্তু ক্রিকেট সর্ব সময়।

সন্দেহ না রেখে বলা যায়, যেভাবে বিভিন্ন ক্রিকেটারের চরিত্র চিত্রণ করা হয়েছে, তেমন রচনা, এমন কি ইংরেজী ক্রিকেট খেলাতেও সুলভ নয়। আমরা এ প্রসঙ্গে ওরেল সম্বন্ধে লেখার উল্লেখ করতে পারি। গ্রন্থটি আকারে বড়, দাম তুলনায় বেশি নয়। ক্রীড়া-অনুরাগী এবং সাহিত্য-অনুরাগী সকলকেই বইটি পড়তে অনুরোধ জানাই। লেখক—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, করুণা প্রকাশনী। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গীতা-মাধুরী / জয়নারায়ণ কাপুর

গীতা সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নেই। প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার নানারকম ব্যাখ্যা হচ্ছে।' এদিক থেকে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের 'গীতা-মাধুরী' বাংলা সাহিত্যে অতি মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থকার বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক। তিনি মহাপ্রভুর মতানুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর আগে বাংলা ভাষায় এ কাজ কেউ করেছেন বলে জানা নেই। স্বীয়মত প্রতিষ্ঠার জন্যে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত এবং উপনিষৎ থেকে তিনি বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 'গীতা-মাধুরী' পড়ে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ গ্রন্থকারকে লিখেছেন: 'ভক্ত ভিন্ন শ্রীভগবানের বাণীর মর্ম সকলে বুঝাইতে পারে না। আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তদনুরূপ বিভিন্ন ভক্তবৃন্দের ভাবে ভাবিত হইয়া গীতা-রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক।' সুধী-সমাজে এই গ্রন্থখানি যে বিশেষ সমাদর লাভ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লেখক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, প্রকাশক—শ্রীজয়নারায়ণ কাপুর, ৭ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৩। দাম—বারো টাকা।

বর্ষপঞ্জী ১৩৭১ / এস আর সেনগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং

মানুষের মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। প্রবল অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি তার সমগ্র মন আজ আচ্ছন্ন করে আছে। আজকের পৃথিবীর ব্যাপ্তি এবং বিশালতার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ না করে উপায়ও নেই, সেই বিচারে আলোচ্য গ্রন্থটি যেমনই অপরিহার্য তেমনই উপযোগী। গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৃথিবীর সর্ববিষয়ক বিবিধ তথ্যে ভরপুর। জাতীয় জীবনে এই জাতীয় গ্রন্থের গুরুত্ব তাৎপর্য ও উপযোগী এককথায় অনস্বীকার্য। এই জাতীয় গ্রন্থ মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে যেভাবে সহযোগিতা করে চলে, সেদিক দিয়ে এবং তার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষের দিক দিয়েও সর্ব পাঠকসমাজের অকুরন্ত অভিনন্দনের সার্থক অধিকারী। উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বর্ষপঞ্জীর বর্তমান সংকলনটি তার পূর্ববর্তী সংকলনগুলিকে অতিক্রম করে গেছে। শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে অতুলনীয় নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার ফলে সমগ্র গ্রন্থটি সার্থকতার স্পর্শে ভরপুর হয়ে উঠেছে। তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, এই জাতীয় গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। সম্পাদক এ-বিষয়ে আরেকটু সচেতন হলে গ্রন্থটি আরও সার্থক ও বৈশিষ্ট্যবান হতে পারত। ছাপা, বাঁধাই, সাজসজ্জা প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। প্রকাশক—এস আর সেনগুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানী, ৩৫-এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা—৬। দাম—ছয় টাকা।

বুলবুল / শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

আলোচ্য উপন্যাসটি এক বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ। আগ্‌নেস স্লিম্ রচিত মূল রচনা থেকে ভাষান্তরিত করার কাজটি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই করা হয়েছে। পুরনো ছোট্ট শহর 'লেডিক্লার্ক' নতুন যুগের সংস্পর্শে এসেও বজায় রাখতে পেরেছে নিজের মৌলিকতা। শহরের অধিবাসীরা আজও ব্যক্তিগত প্রীতির বাঁধনে বাঁধা, পরস্পরের সুখ-দুঃখ তারা ভাগ করেই ভোগ করতে চায়, ঈর্ষা বা দ্বেষের কালোছায়ায় আবিল হয়ে ওঠে নি তাদের অস্তিত্ব আজও। একটা সুস্থ ও সৎ জীবনবোধকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন লেখিকা বর্তমান রচনার মাধ্যমে। অনুবাদকের কৃতিত্বে লেখিকার বক্তব্য সহজেই পৌঁছে যায় পাঠকের মনে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থকে এক উল্লেখ্য সংযোজন বলেই গ্রহণ করা যায়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখিকা—আগ্‌নেস্ স্লিম্ টার্নবুল। অনুবাদক—অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সীমন্তিনী / প্রতিমা পুস্তক

আলোচ্য উপন্যাসে যা সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তা হল, সমাজের নানাবিধ গলদকে কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করার অত্যুৎসাহ। বাস্তবিক একটিমাত্র কাহিনীতে যে কতরকম সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে তার সীমা-পরিসীমা নেই, কখনও মনে হয় ভেজালনিরোধ আন্দোলনের প্রচার-পুস্তিকা, কখনও বা মনে হয় আসলে বুঝি বা এটি রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজেরই অন্তর্গত। সে যাই হোক, এতরকম করেও কিন্তু লেখক শেষরক্ষা করতে সক্ষম হন নি। কাহিনী সাহিত্যে পরিণত হয় নি। লেখকের শৈলী দুর্বল ও অপরিণত।

কলম ধরতে জানলেই যে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, এ সত্যকেই উপস্থিত করেছেন তিনি বর্তমান রচনার মাধ্যমে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—বিপন্নপালক বসু। প্রকাশনায়—প্রতিমা পুস্তক। ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম—দুই টাকা।

ছবির খেলা (১) / শিশু সাহিত্য সংসদ

ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে অসংখ্য ধাঁধা রেখা-চিত্রের মাধ্যমে রচনা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে নির্দেশক ছড়াগুলি। বস্তুত ছেলেমেয়েরা তো বটেই, তাদের মা-বাবা শুদ্ধ আকৃষ্ট হবেন এ বইটি পড়ে, মজার মজার ধাঁধার রহস্য উদ্ভাবন করতে গিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ও জানা হয়ে যাবে এর ক্ষুদে ক্ষুদে পাঠক-পাঠিকার। একাধারে এমন শিক্ষামূলক ও আকর্ষণীয় রচনা বিরল, শিশুসাহিত্য সংগ্রহ ভাণ্ডারে এ বই অনস্বীকার্যরূপেই এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—বাদল সরকার, প্রকাশক—শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। দাম—দুই টাকা।

তালপাতার বাঁশি / প্রতিমা পুস্তক

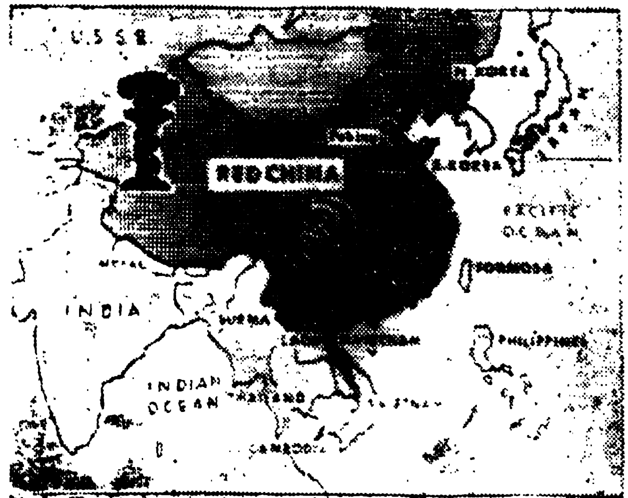
আলোচ্য গ্রন্থটি এক ক্ষুদ্রায়তন গল্প-সংগ্রহ। মোট এগারোটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই সংকলনে। গল্পগুলিতে ইনটেলেক্টের প্রাধান্য লক্ষণীয়, লেখক মনোবিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, ফলে গল্পগুলিতে রস-মাধুর্য অপেক্ষা মননশীলতাই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। ছোটগল্প লেখার আঙ্গিকে লেখকের কিছুটা অধিকার যে জন্মেছে, একথা স্বীকার করলেও—তাঁর লেখনী যে এখনও অনেকটাই পরিণতিসাপেক্ষ এ-সত্যকেও অস্বীকার করার জো নেই। তাঁর শৈলীর দুর্বলতা গল্পগুলিকে শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে বারবার। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে আরও অবহিত হবেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রলয় সেন, প্রকাশক—প্রতিমা পুস্তক, ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম—দুই টাকা।

আশুতোষের ছাত্রজীবন / শ্রীভূমি পাবলিশিং

আজকের নীতিহীন, উদ্দেশ্যহীন ছাত্র-সমাজের চোখের সামনে আদর্শ ছাত্রজীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই এবং সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বর্তমান গ্রন্থটি মূল্যবান বলেই পরিগণিত হতে বাধ্য। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের ছাত্রজীবনই আলোচ্য রচনার মূল বিষয়বস্তু। লেখক আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন ও তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলার এক উল্লেখ্য পুরুষের আকর্ষণীয় জীবনী সাধারণের বোধগম্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান ছাত্র-সমাজ এই মূল্যবান রচনাটি পাঠ করলে সবিশেষ উপকৃত হবেন। লেখকের শৈলীও সহজ ও সাবলীল। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি ভাল। লেখক—সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী। ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম—দুই টাকা।

জঙ্গীবাদী লাল চীনের আর এক নষ্টামি !!

যুদ্ধ-লোলুপ, অশান্তি-প্রিয় চীনা নেতাদের উদ্যোগে ও উৎসাহে চীনের তথাকথিত সাম্যবাদী সরকারের দুষ্কীর্তির কেন্দ্রস্থল সিংকিয়াং অঞ্চল (রাশিয়া-ভারত-চীনের সীমান্তে)—যেখানে লাল-চীন প্রথম আণবিক বোমা ফাটিয়েছে !!



● সিংকিয়াং অঞ্চল। চীনা বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থল।

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

উনপঞ্চাশ

অর্জুনকে তাই অর্জুনসখা শংখচক্রগদাপদ্মপাণি শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন মুখব্যাদন করে যে, তিনিই মেরে রেখেছেন সকলকে। সব্যসাচী নিমিত্তমাত্র। শুধু মহাভারতের কাহিনী নয়, সৃষ্টির পরম ও চরম বাণীই এই। যা কিছু ঘটছে কিংবা ঘটবে তা সবই ঘটে আছে। ইটার্নাল প্রেসেন্ট। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। আমাদের ছোটো ছোটো সীমার খেলাঘরের সুবিধের জন্য আমরা তাকে ভাগ করেছি। ঘড়িতে দাগ কেটে যেমন দিনরাত্রিকে ভাগ করা চব্বিশ ঘণ্টার মাপে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, এ আমাদের পরিভাষা, না হলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত বলার সত্যি সত্যি কোনও মানে হয়? বৈজ্ঞানিকরাও ক্রমশ এই সত্যের সম্মুখীন হচ্ছেন যে, অদ্য, কল্য, পরশ্ব বলে কিছু নেই; সব,—ইটার্নাল প্রেসেন্ট।

ঋষিরা এ সত্য জানতেন। তাই তাঁদের ঋষি বলা হয়েছে। কবি যখন এ-সত্য অবগত হন তখন তিনিও ঋষি। 'কবয় বদন্তি,' উপনিষদের এ-কবিতে আর ঋষিতে এক; একাকার। নতুন কোনও সত্য নেই, তাই নেই নতুন কোনও ঋষি। যা চিরন্তন তাকেই নতুন করে স্মরণ করা মাত্র। কেউ যদি দাবী করেন তিনি নতুনতর কোনও সাধনায় সিদ্ধ অভূতপূর্ব কোনও ঋষি, তিনি হয় ভ্রান্ত নয় উদ্‌ভ্রান্ত।

শক্তিপদ বসুরায় সেই চিরন্তন, ভারতের মৃত্যুহীন বাণীর নবীন প্রতিধ্বনি,—কারণ—

'সব লেখা লুপ্ত হয় বারংবার লিখিবার তরে।'

শক্তিপদর শক্তি আজকের অথবা আগামীকালের নয়; চিরকালের। ক্ষণকালের আভাস থেকে চিরকালের তরে সে সত্য আবির্ভূত আজ কাশীর সত্যবাক্‌ শক্তিপদর মধ্যে। তাঁর অন্তরংগতমেরা বলেন, পূজা করে যখন উঠে আসেন শক্তিপদ, তখন তাঁর সমস্ত শরীর আলো হয়ে যায়। এ আলো ম্যাজিকের আলো নয়। ওই চিরন্তন সত্যের আভা। যে এর যতটুকু কণা পেয়েছে ততটুকু তমো মহত্তম হয়ে গেছে তার। শক্তিপদ যখন তাঁর নিজের পূজা করার কথা বলেন, তখন ব্যাপারটাকে বলেন 'বুজরুকি'। যারা বুজরুকি করে সত্যি সত্যি, তারা মিথ্যে মিথ্যে বলে, 'পূজা করছি; আর সত্যি-সত্যি যে পূজা করে সে বলে মিথ্যে মিথ্যে: 'বুজরুকি করছি।'

তুমি রূপের পূজা কর, রূপবান হবে; খ্যাতির সাধনা কর, খ্যাতিমান হবে; জয় চাও,—জয়ী হবে। কিন্তু তার বেশি কিছু হবে না। খ্যাতিমান হবে, কিন্তু man হবে না। সম্পূর্ণ মানুষ হবে না; অসম্পূর্ণ রইবে। জীবন অন্তে তুমি 'শব' হবে। আর কিছুই চেও না, দেখবে,—তুমি আস্তে আস্তে সব হবে। তাই আসক্তির পদে নয়, শক্তিপদে নিজেকে লুটোও, নিরাসক্তির পদে,—'শব' থেকে তুমিই সব হবে।

'দক্ষিণেশ্বর' বলেছিলেন: 'লোকসান চাই না': 'লোকসান' কোনোও লোকের এত হয় নি। দক্ষিণেশ্বর বলেছিলেন: 'সিদ্ধাই চাই না মা'; অষ্টসিদ্ধাই করতলগত হয়েছিলো শ্রীরামকৃষ্ণের। চাইলে যাকে পাওয়া যায় তার নাম, রূপ, জয়, যশ, শত্রুবিনাশ। না চাইলে যাকে পাওয়া যায় তিনিই 'সব'। তার দিকে একবার চাইলে তখন আর রূপ-জয়-যশ-শত্রুবিনাশের কথা মনে পড়ে না; মুখ দিয়ে তখন যে-কথা বেরোয় তা বিবেক-বাণী: জ্ঞান দে, বৈরাগ্য দে, শুদ্ধাভক্তি দে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুই কিছু নয়। জ্ঞানে হয় না, বিজ্ঞানেও হয় না কারুর; আবার কারুর কেবল গানেই হয়ে যায় বাজি-জেতা। রামপ্রসাদের হয়েছিলো। কেন হয়েছিলো? কারণ গায়ক হিসাবে নন্দিত হবেন বলে গান নয়; রামপ্রসাদের গান তো,—মায়ের জয়গান। রামপ্রসাদের গান ও সাধন, এক ও অভিন্ন। সাধনা করতে করতে গাওয়া; গাইতে গাইতে সাধনা করা। গানের টানে, প্রাণের টানে বেড়া বেঁধে দিতে এসেছিলেন তাই মায়ের বেশে নয়, মেয়ের বেশে স্বয়ং মা; গানের আবেশে যখন বুঁদ হয়ে গেছেন রামপ্রসাদ। গানের ওপারে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন,


SUNLIGHT
Soap
সানলাইট সাবান

জ্ঞানের ওপারেও, তাঁকে রামপ্রসাদ টেনে এনেছিলেন, বেড়া-বাঁধার ছলে বাঁধা পড়েছিলেন তিনি।

মা দেখতে কেমন, এ-প্রশ্নও রামপ্রসাদের মনে ওঠে নি কখনও।

লোকে বলে কালী কালী
কে জানে মা কালী কেমন ?
লোকে হাসে মা প্রসাদ ভাসে মা
সন্তরণে সিন্ধুতরণ!

রামপ্রসাদ সাঁতার কেটে সিন্ধুপার হয়েছিলেন; চোখের জলে সাঁতার দিয়েছিলেন তিনি। বাসনার সিন্ধুতে বই তরণী করে নয়, সোনার তরীতে বৈতরণী অতিক্রম করেছিলেন কারণ সেই কৃপাসিন্ধু রামপ্রসাদের এই অশ্রুবিন্দু দিয়ে তৈরি।

শক্তিপদ বসুরায়কে কেউ বলে তান্ত্রিক, কেউ বলে তাঁর ওপর বিদেহী আত্মা অর্থাৎ ভূতে ভর করেছে। ভূতে নয়, শক্তিপদকে ধরেছে সেই 'অদ্ভুতে' যে স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে এ-ধরায় তাকে খুঁজে পায় এমন সাধ্য কার। সেই 'অদ্ভুত'-এর সবচেয়ে ভালো বাসা-ই হচ্ছে ভালোবাসা। কাশীতে শক্তিপদর বাস যেখানে তা দেখে চর্মচক্ষে তাকে অত্যন্ত ভালো বাসা ছাড়া আর কীই-বা বলা যাবে? কিন্তু মর্মচক্ষে শক্তিপদর শক্তির উৎস মানুষের প্রতি তার অকারণ, অবারণ ভালোবাসা। তন্ত্র নয়, মন্ত্র নয়, মন্ত্রণাও নয়,—কেবল একটি ধ্বনি,—মানুষের ভালো হোক,—এরই প্রতিধ্বনিতে পৃথিবী কাঁপাও। 'মানুষের ভালো হোক' বলতে বলতে আলো হোক মুহূর্তে যা আছে অন্ধকার। তমো থেকে মহত্তমে যাত্রার পাথেয় একাধিক,—কিন্তু সর্বাধিক হচ্ছে নিরন্তর অন্তর থেকে উত্থিত তিনি : 'মানুষের ভালো হোক'।

যত মত তত পথ, ঠিক। কিন্তু সব পথ যেখানে এক, সেখানে ভালোবাসা ছাড়া আর পথ নেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ভালোবাসাই তাঁর সবচেয়ে ভালো বাসা,—এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

শক্তিপদ বসুরায়ের দু'চোখ,—ভালো হোক বলতে বলতেই এমন আলোক পেয়েছে। কোনও স্ত্রীলোকের এক অংগে এত রূপ নেই এই অপরূপের সংগে যার তুলনা চলে। রূপের জৌলুষ আছে; অপরূপের আছে আলো। শক্তিপদর কাছে গিয়ে বসলে সবচেয়ে বড় যে শক্তি, যার নাম নিরাসক্তি যা মানুষকে অনির্বচনীয় শান্তি দেয় তা পাওয়া যায়। শক্তিপদর কাছে যায় কেউ অসুখের আরোগ্য পেতে, বিপদে ত্রাণ লাভ করতে, জ্ঞান লাভ করতে কেউ, ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান সন্ধানেও যায়। লোকে চাইলে এবং শক্তিপদ ইচ্ছা করলে এ সবই পাওয়া যায়। কিন্তু না চাইলেও যা পাওয়া যায়, ইচ্ছে না করলেও, তার নাম—শান্তি।

শক্তিপদ বসুরায়ের অলৌকিক শক্তির পরিচয় কাশী থেকে কলকাতা অবিরল অব্যাহত। অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্ত্রীকে একলা ঘরে পেয়ে স্বামীর একজন আত্মীয় আঘাত করতে উদ্যত, শক্তিপদ যেন শূন্য থেকে সহসা আবির্ভূত ত্রাণকর্তার বেশে। অন্তরংগ বন্ধু নতুন বড় চাকরি সুনিশ্চিত হওয়ায় শক্তিপদকে ভরসা দিচ্ছেন একাধিক টেলিফোন ও গাড়ির। শক্তিপদ হেসে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়েছেন বন্ধুর হাতে। তাতে লেখা 13. W I. তখন বোঝা যায় নি মানে। বোঝা গেছে তখন, যখন জেল হয়েছে সেই বন্ধুর। থার্টিন উইক্‌স্ ইমপ্রিসনমেণ্টের পর বেরিয়েছে সেই বন্ধুটি। জেলে শক্তিপদর অন্তরংগতম আরেকজনও আসছে,--এ বার্তাও আগে থেকে জানিয়েছিলেন শক্তিপদ। 13. W. I. এই চিরকুটে শক্তিপদ যা বলেছেন, বন্ধুর তের হপ্তা জেল হবার পরেও, এখনও তা ফলতে বাকি আছে বলে জানিয়েছেন শক্তিপদ।

গুরু খুঁজতে বেরিয়েছেন কাশীতে, দমদমের এক বাঙালী ব্যবসাদার। শক্তিপদ বলেছেন, বাড়ি বয়ে তাঁর নির্দিষ্ট গুরু এসে দীক্ষা দেবেন। অভ্রান্ত মিলেছে সে-কথা। অন্তরংগতম এক বন্ধুর মৃত্যু সন্নিকট, এ-কথা জানিয়ে দিয়েছেন আগে থেকে। কোনও লোক তার যে ক্ষমতা হয় নি তার বড়াই করলে ধরে ফেলেছেন মিথ্যা। জিজ্ঞেস করলে, যে, কী করে ধরলেন যে তার সে ক্ষমতা হয় নি, সংগে সংগে উত্তর করেছেন শক্তিপদ : তা' হলে নিঃশ্বাসে টের পেতাম। নিঃশ্বাসের ধারা পালটায় নি।

কিন্তু শক্তিপদর চেয়েও শক্তিমান লোক কাশীতে আছেন; কলকাতায় আছেন; কোথায় নেই? তবু শক্তিপদর সংগে কোনও শক্তিমানের তুলনা হয় না। শক্তিপদর মতো ভালো বাসা কাশী, কলকাতা, পৃথিবীর কোথাও এমন ভালোবাসা আর নেই। কে পরলোকগত আত্মা এসে দেখাতে পারে, কে পারে সুনিশ্চিত মৃত্যুকে মার্জনা করতে, মামলায়-রেসে-ফাটকায় জিতিয়ে দিতে পারে কে, কে পারে চাকরি পাইয়ে দিতে, সন্ধান দিতে গুপ্তধনের, জানি নে। কিন্তু এটুকু জানি, শক্তিপদর মতো ভালোবাসতে পারে না কেউ।

শক্তি মূল্যবান; নিরাসক্তি অমূল্য।

শক্তিপদর সংগে তর্কও করেছি। বলেছি, রবীন্দ্রনাথ অপরূপ কবিতা লিখেছেন, কাব্য হিসেবে তার তুলনা কোথায়, কোন্ দেশে কোন্ কালে আর কে লিখেছে এমন!—তবু,—তবুও, তা, মনোরমতম মিথ্যা ছাড়া আর কী?

শক্তিপদ বলেছেন: মনোরমতম মিথ্যা নয়; রবীন্দ্রনাথের কবিতা, অন্তরতম সত্য।

শক্তিপদ বসুরায় একসময় কিছুই মানতেন না; এখন

সবাই মানেন। এমন কি রাস্তায় ফুলের মালা, ডাব ইত্যাদি পড়ে থাকলে ছুঁতে বারণ করেন। বলেন, ওগুলি কারুর মন্দ করবার কারণে রাখা; যার উদ্দেশে রক্ষিত সে না হয়ে যদি আর কেউও না জেনে স্পর্শ করে তা হলে তারও ক্ষতি হবে।

শক্তিপদকেও উত্তেজিত হতে আমি দেখেছি। বলেছি: যে, আপনি এ সব বই-পড়া-কথা বলছেন।

ঠাণ্ডা মানুষ শক্তিপদ হেলে বসে সুখটান দিচ্ছিলেন সিগারেটে, উঠে বসলেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যেন, বললেন গলার স্বরে জোর দিয়ে: একটাও শোনা কথা বলছি না। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ধ্রুবলোক, সত্যলোক, লক্ষ্মী-সরস্বতী-লোক আছে; মৃতলোক দেখা দিতে পারে, দেখা দেয়, জন্ম-জন্মান্তর আছে। তারপর নেমে এলো কণ্ঠস্বর, নরম গলায় শান্ত শক্তিপদ বললেন: সাধারণত মর্ত্যহিসেবে পাঁচ থেকে পঁচিশ হাজার বছর সময় লাগে একজনের আবার জন্মাতে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনি দ্বাপরের লোক,—

আমি বললাম: আমাকে বলে লাভ নেই, এসব আমি বিশ্বাস করি না—

তা হলে বার্ধক্যে বারাণসী লিখছেন কেন?—শক্তিপদর শক্ত প্রশ্ন।

বিক্রি বেশি হবে বলে; দুঃখকষ্ট যত বাড়ে, অলৌকিকে ভারতীয়দের আস্থা বাড়ে তত,—আমার সহজ উত্তর।

শক্তিপদ অস্বীকার করে বার্ধক্যে বারাণসী সম্পর্কে যা বললেন তা ছাপা যাবে না কারণ তা নিন্দাসূচক নয়।

অতঃপর শক্তিপদ বসুরায় তাঁর বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা করেন অনর্গল। বলেন: স্পিরিট এখানেও, যেখানে আমরা দু'জনে বসে কথা বলছি, এখানেও আছে। সূক্ষ্মদেহধারী এরা দেওয়াল ভেদ করে যেতে-আসতে পারে; টাকা বার করে নিয়ে আসতে পারে আপনার তালাবন্ধ সিন্দুক থেকে, কিন্তু টাকা আবার তাকে রেখে আসতে হবে বন্ধ সিন্দুকের মধ্যেই। নিয়ে যাবার উপায় নেই। সাদা কাগজে প্রশ্ন করে খাম বন্ধ করবার পর তার মধ্যে উত্তর লেখা হয়ে যায়,—এ রকম ঘটনা, অনেকেই জানেন। সেটা সম্ভব হয় এই রকম কোনও স্পিরিটকে কণ্ট্রোল করে। অনেক সময় এই সব উত্তর দারুণ ভুলে নিদারুণ হাস্যকরতায় ভরা হয় যে তার কারণ এই স্পিরিটের যা কাজ নয় তা করতে গিয়ে লাঠি বাজে। অনেক সময় স্থূল শরীরে যে রকম জামা-কাপড় পরা অবস্থায় কাউকে দেখে যেত মৃত্যুর পরেও তেমনই বেশে তাকে দেখে লোকে সন্দেহ করে। আসলে তন্মাত্র শরীর সব সংস্কারই ধারণ করতে পারে; এতে নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

ধ্রুবলোক মানে শক্তিপদর অন্তর্ভেদী উক্তিতে, হচ্ছে সেই জায়গা যেখানটার বার্তা ধ্রুব, যেমন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনার বাড়িটাকে যদি আপনার লোক বলা যায় তা' হলে ধ্রুবর যেখানে আধিপত্য সে-জায়গাকে বলতেই হয়, ধ্রুবলোক। দেব-দেবীরা ভক্তের প্রার্থনার উত্তর দেন যখন, তখন তাঁরা কী ভাষায় কথা বলেন, এ-নিয়ে লোকের মনে ধন্দ আছে। অর্থাৎ সন্দিগ্ধ মনের প্রশ্ন হচ্ছে গ্রীক দেবী গ্রীক ভাষায়, দেবী সরস্বতী সংস্কৃতে অথবা বাংলায় বলেন, এ-কি সম্ভব? অতএব এগুলি ভক্তের মনগড়া প্রশ্নোত্তর নিছক। শক্তিপদ বলেন: ব্যাপারটা তা নয়। সমস্ত ভাষার সমস্ত শব্দের উৎস যে ধ্বনি তাই প্রতিধ্বনিত হয় মর্ত্যলোকের বাসিন্দাদের যার যার যে যে বোধগম্য ভাষা আছে, তাতে। অর্থাৎ দেব-দেবীর উত্তরের উৎস এক অনাদি ধ্বনি; তার প্রতিধ্বনি একেকজনের কানে একেক রকম।

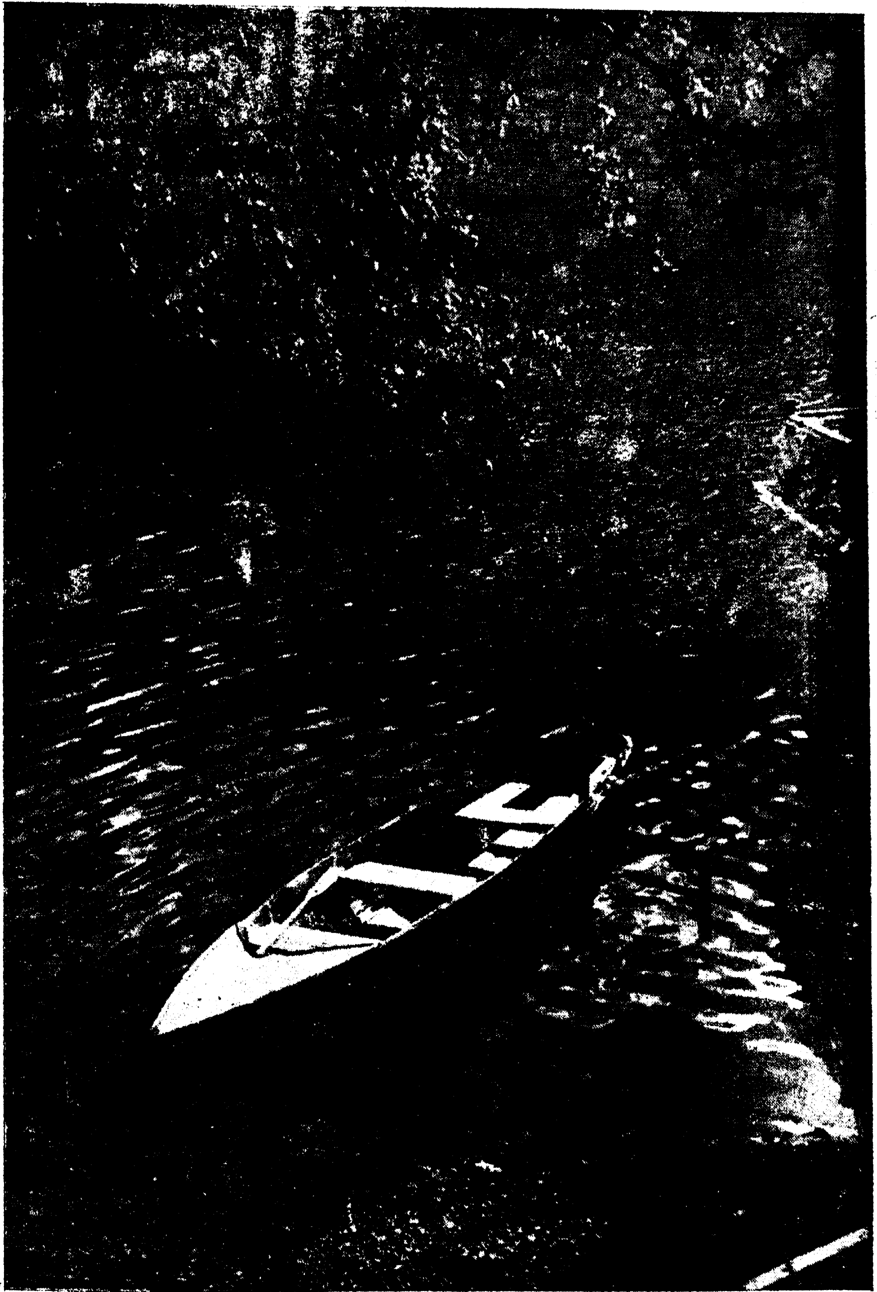
শক্তিপদ বসুরায়ের ঘরে, ঘরে-বাইরের দিগ্বিজয়ী মানুষেরা আসেন।

তাঁরা কেউ জাঁদরেল পণ্ডিত, কেউ ধুরন্ধর রাজনীতিবাজ, কেউ গায়ক, কেউ লেখক, কেউ কবি, কেউ কর্মী। একটা কথাই চালু আছে, যে, শক্তিপদর যাঁরা অন্তরংগ তাঁরা সবাই প্রায় বিশিষ্ট পুরুষ। এমন একজন লোককে আমি জানি, বর্তমান ভারতের শেষ অশেষ বিস্ময় বলে যাঁকে আমি জানি এবং মানি, তিনিও আসেন শক্তিপদর কাছে। কেন আসেন? পাণ্ডিত্য ফলাতে? না। আলোচনার জন্যে? না। আলোর জন্যে। আশা করে নয়; ভালোবাসার টানে।

এঁরা সবাই দর্শন পড়েন; শক্তিপদর সংগে এঁদের তফাৎ হচ্ছে, এঁরা দর্শন পড়েন,—শক্তিপদ দর্শন করেন।

শক্তিপদর কাছে একবার গেলে আর একবার যেতেই হয়, আরও একবার। বারবার যেতে হয়, শক্তিপদ তাড়িয়ে দিলেও না গিয়ে উপায় থাকে না। শক্তি-তাড়িত আমরা সবাই। শক্তিপদর চেয়ে বড় তীর্থ, আমার জানা নেই। শক্তিপদকে আমার মনে হয়, শক্তিপদ বুঝি কোনও মুহূর্তে স্বয়ং মহাশক্তির সতীর্থ! [ক্রমশ।

গেছে যাক ভেঙে সুখের স্বপন,
স্বপন অমন ভেঙেই থাকে,
গেছে যাক নিবে আলেয়ার আলো
গৃহে এস, আর ঘুর' না পাঁকে।
—কামিনী রায়



আলোকচিত্র

মাসিক

বসুমতী

কার্ত্তিক / '৭১

কে যাবি পারে

—আনন্দ মুখোপাধ্যায়

ধনধান্যে

—বি, আর, পানেশার





শরতের আকাশ

—নীরোদ রায়



সমুদ্র-সৈকতে
—অজিতকুমার কর্মকার



● চন্দ্র ও হেমবতী (চুম্বন-রত)

শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী

(পূর্বানুবৃত্তি)

চারুলতা রায়চৌধুরী

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী যখন মাদ্রাজের সরকারী চারু ও কারু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন, তখনও আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় নি। বাগ্‌দান মাত্র হয়েছে। দেবীপ্রসাদ যখন উক্ত পদের জন্য আবেদন করেন, সত্যি কথা বলতে কি—কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। শিল্পী যে সত্যি সত্যিই ঐ পদগ্রহণে ইচ্ছুক—এইটেই ভাবা বা এই সিদ্ধান্তে অনায়াসে উপনীত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। দেবীপ্রসাদ যে ভিতরে ভিতরে এই পদের মাধ্যমে একটি স্থায়ী ও নির্দিষ্ট আয়ের চেষ্টায় কতখানি চেষ্টাশীল ছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁদের মনে খুব একটা স্পষ্টতা ছিল না। তাই তাঁরা খুব সংশয়হীন মনে প্রথমে এই আবেদনকে গ্রহণ করতে পারেন নি—মিঃ এ ম্যাক, জি সি টেম্পো, আই-সি-এস-এর কাছে এ কথাগুলি আমি পরে শুনেছি। দেবীপ্রসাদকে মাদ্রাজে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর উদ্যোগ ছিল অন্তহীন। এই তালিকায় অবশ্যই আরো ক'টি নাম উল্লেখনীয়। যথা ডাঃ সুব্বারায়ণ, এস ভি রামস্বামী মুদালিয়ার, সি ডব্লিউ ই কটন, কলাসমালোচক বেঙ্কটচলম এবং শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।

অতএব বিয়ের আগেই নতুন কর্মভার নিয়ে কর্মস্থানে গেলেন দেবীপ্রসাদ। দেবীপ্রসাদের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব যে, তিনি যা করার সঙ্কল্প করেন তা চরিতার্থ করার জন্য অপেক্ষা করা তাঁর স্বভাব-সমর্থিত নয়। অতএব মাদ্রাজ থেকে আমার শ্বশুরমশায়ের কাছে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল—প্রতিটি চিঠির বক্তব্য একই বিবাহের দিনস্থির করার তাগিদ। শ্বশুরমশাইও জানতেন যে, ছেলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া তাকে শান্ত করার দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। আমার বাবা-মা'র সঙ্গে তিনি তখন এ-বিষয়ে যোগাযোগ করলেন। দিনস্থির হল। সমস্তই এক বিরাট তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততার মধ্যেই হয়ে গেল। চোখের পলকে যেন সব হয়ে গেল। মাত্র এক হপ্তার ছুটি নিয়ে তিনি এসে শুভকাজ শেষ করেই আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন। আমি এখানেই রয়ে গেলাম। সেখানে অধ্যক্ষের আবাস-গৃহটি তখনও তাঁর অধিকারে আসে নি—তাই আমাকে কলকাতাতেই তখন থেকে যেতে হয়েছিল।

আমাদের ফুলশয্যার একটি স্মৃতি আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ফুলশয্যার পরের দিন সকালে যখন ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি, দেখি দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা করা হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য যে দ্বারমূল্য হিসাবে বর শ্যালিকাদের কিছু অর্থ দিলে তবে দরজা অর্গলমুক্ত করা হবে। ব্যাপারটি উপলব্ধি করলেন দেবীপ্রসাদ। দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল তাঁর চোখে-মুখে। করে বসলেন এক কাণ্ড। অর্গল থেকে পাকওয়ালা পেরেকটি হাতের খেলায় অবলীলাক্রমে বার করে নিয়ে দরজা খুলে ভোরের আলোয় আমাকে করে দিলেন রীতিমত অবাক। সেদিন প্রভাত আমার জীবনে এল শুধু নবজীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়েই নয়, একরাশ বিস্ময় নিয়েও।

বিয়ের আগে দেবীপ্রসাদের পরিজনবর্গের মধ্যে তাঁর বাবা ছাড়া আমি আর কাউকে চিনতাম না। নববধূ হয়ে এ বাড়ির আঙিনায় পা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির পরিবেশ, পরিজন, আবহাওয়া, আবেষ্টনী একে একে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল। লক্ষ্য করলাম, এ বাড়ির রীতিনীতি, আচারপ্রথা সবই যেন কিছু ভিন্ন ধরণের। এই সংরক্ষণশীল পরিবারে আমার সামনে যা ঘটতে থাকে বা যে সব-আলাপ-আলোচনা আমার কানে ভেসে আসে, তা আমাকে রীতিমত শঙ্কিত করে তুলতে থাকে। আমি কি তা হ'লে ভুল করলাম, জীবনের চলার পথে কি ভুল পা ফেললাম, পথনির্বাচন কি তা হলে আমার ভ্রান্তিপূর্ণ—এই চিন্তাই আমাকে বিচলিত করে তুলতে থাকে—দিবারাত্রি এই চিন্তা, আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শিল্পীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। পৃথিবীর অনন্ত রহস্য যে চোখকে এড়িয়ে যেতে পারে না, আমার পক্ষে সেই সন্ধানী চোখকে প্রতারিত করা কি সম্ভব? তিনি যখনই জিজ্ঞাসা করেন—আমার ভাবান্তরের কারণ—কাষ্ঠহাসি হেসে উত্তর দিয়ে যাই—কই না, কিছু হয় নি তো!—তবে এই অবস্থা আমার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, পরে জানতে পেরেছিলাম এঁরা আসলে ইতিহাসের দিক দিয়ে পাঞ্জাবের ক্ষত্রিয় পরিবারোদ্ভূত, সেইজন্যেই এঁদের সামাজিক রীতিনীতি কিছু পৃথক। স্বস্তির শ্বাস ফেললাম। মন থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল।

আমার দাদাশ্বশুর অর্থাৎ বাড়ির কর্তা, তাঁর পৌত্রের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু আমি ছিলাম তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। আমার নামের পিছনে একটা ডিগ্রীর ছাপ থাকায় আমার পক্ষে তাঁর আনুকূল্য অর্জন করা আরও সহজ হয়েছিল। ধীরে ধীরে নাতির প্রতিও তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন, বোধ হয় ভেবেছিলেন যে, নাতির সম্বন্ধে যা অন্ধকারাচ্ছন্ন মনোভাব তিনি মনে পোষ

করেছিলেন—তা আসলে ভ্রান্তিপূর্ণ। নাতিটি তাঁর মোটেই অযোগ্য বা শক্তিহীন নয়। হঠাৎ এই সুস্থ, সবল বৃদ্ধটি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, নিলেন শয্যা। দেবীপ্রসাদ ততদিনে অধ্যক্ষের বাঙলোটি দখলে পেয়েছেন, তিনি চিঠি লিখে আমার শ্বশুরকে জানাচ্ছেন মাদ্রাজে যাত্রার জন্যে, ফাঁপরে পড়লেন আমার শ্বশুরমশায়। বড় ছেলে তিনি। মৃত্যুপথযাত্রী বাবাকে ফেলে তিনি মাদ্রাজে যান কি করে। এ রীতিমত এক সঙ্কটের ব্যাপার। পুত্রবধূকেই বা তিনি এখন পাঠান কি করে! দিনের পর দিন কাটে। শিল্পী এদিকে অধৈর্য হয়ে ওঠেন। শেষে একদিন অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে শ্বশুরমশায় তাঁর বাবাকে ঘটনাটি জানালেন—কিন্তু আশ্চর্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল আশাতীত উত্তর, আমার মাদ্রাজে যাওয়ার অনুমতি। সে অনুমতি অনিচ্ছাজাত নয়—সে অনুমতি প্রসন্নচিত্তের। আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২৯ সালের মে মাসে একদিন আমি মাদ্রাজ রওয়ানা হলাম। তার একমাস পরেই আমার দাদাশ্বশুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আর সাতটি বছর বাঁচলে তাঁর জীবনের একটি শতাব্দী পূর্ণ হোত।

তখন গ্রীষ্মকাল। বিদ্যালয় বন্ধ। হাতে অফুরান অবকাশ। আমার ভাইকেই মডেল ঠিক করলেন দেবীপ্রসাদ। কিছুদিন পরে আমার ভাই যখন চলে এলেন, তখন আমরা একেবারে একা। পরস্পরের নিবিড় সঙ্গী, পরিপূরক। মাথার উপরে অসীম আকাশ, চারপাশে রূপ-রস-গন্ধে ভরা বিরাট পৃথিবী। চোখের সামনে অজানা ভবিষ্যৎ।

গৃহস্থালীর কাজে আমি তখন একেবারে অনভিজ্ঞা বললেই চলে। তবে, আমাকে সেদিক দিয়ে খুব বিব্রত হতে হয় নি। কলকাতা থেকে আমি একটি পাচক আনিয়ে নিয়েছিলাম। রন্ধনবিদ্যার সঙ্গে আরও একটি বিদ্যায় ছিল অপার দক্ষতা—সে বিদ্যাটি মস্তবড় বিদ্যা—চৌর্য বিদ্যা। আমার স্বামীর খাস বেয়ারা যিনি ছিলেন—শেষোক্ত বিদ্যায় তাঁরও হাতটি ছিল পাকা। আমি মাদ্রাজ যাওয়ার দু'মাস পরেই চাকরী ছাড়লেন, তিনি সোজাসুজি জানালেন যে, তাঁর প্রভুর বাক্সে তিনি কিছু টাকা রেখেছেন এবং সে টাকাটি নাকি তাঁরই—তাঁর প্রভুর নয়। বলা বাহুল্য, অঙ্কটি লোভনীয়ই। শিল্পীকে জিগ্যেস করায় তিনি কোন সদুত্তরই দিতে পারলেন না। অগত্যা টাকাটি আমাকে বাক্স থেকে বার করে ভৃত্যকে বিদায়-দক্ষিণা দিতে হয়েছিল। এই ঘটনাই একজন শিল্পীর গৃহস্থালী কি ধরণের হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার মনে প্রথম সচেতনতা এনে দেয়।

মাদ্রাজে ইংরাজী ভাষার প্রচলন খুব। ভৃত্যশ্রেণীর লোকেরাও ঐ ভাষার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। মাদ্রাজের প্রধান ভাষা তামিল। সকলেই যে ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী এ কথা অবশ্য জোর দিয়ে বলা চলে না। কেউ কেউ এখনও আছে—মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা জানে না। আর্ট স্কুলে কি শিক্ষক, কি ছাত্র—তামিল ভাষাভাষী, সে ক্ষেত্রে সেখানকার অধ্যক্ষের ক্ষেত্রেও, তামিল ভাষায় মোটামুটি জ্ঞানলাভ অনুভূত হ'ল। এবং একটি পরীক্ষার জন্য তাকে আহ্বান জানান হ'ল একজন মুন্সী নিযুক্ত হলেন। হপ্তায় তিনদিন তাঁর আসা ঠিক হল, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা একটু অন্য রকম, দেখলাম, তিনি আসেন দু-চারটি কথা বলেন এবং তা ইংরাজীতেই। শিল্পী একটা কাজের দোহাই পেড়ে তাঁকে ভাগিয়ে দেন, মাসান্তে মুন্সী নির্দিষ্ট অঙ্কটি পকেটে রাখেন, তবে ভাষাশিক্ষার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আইনের উপাধি দেবীপ্রসাদের না থাকলেও তর্ক এবং কাউকে কিছু বোঝাবার ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম। শেষে দেখা গেল পরীক্ষা দেওয়ার হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কৃতি পেলেন মুন্সীর হাত থেকেও।

অধ্যক্ষ হিসাবে দেবীপ্রসাদ অনেককে তাঁর বক্তব্য ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু বাড়িতে তাঁর ধারা ছিল অন্য ধরণের। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা বা উচ্চস্বরের দ্বারা বক্তব্য বোঝাতে চাইতেন। কেউ এততেও যদি না বুঝত তা হলে দোষটা তার। দীর্ঘকাল মাদ্রাজবাসের ফলস্বরূপ যদি কখনও ক'দিন মাঝে মধ্যে দু-একটি বিশুদ্ধ তামিল তাঁর সংলাপে প্রকাশিত হোত, তা হলে তো তাঁর আত্মতৃপ্তির সীমা-পরিসীমা থাকত না। সে যেন এক দিগ্বিজয়ের আনন্দ। মনে হোত তামিল সরস্বতীর যেন কৃপালাভ তিনি পরিপূর্ণভাবেই করেছেন।

উপরের একটি ছোট কাঠের বারান্দায় তাঁর আঁকার সরঞ্জাম থাকত—রঙ, তুলি, পেন্সিল, ব্রাস, ক্যানভাস ইত্যাদি ইত্যাদি। জায়গাটির পবিত্রতা ছিল অসাধারণ, আঁকার ঘর কি ঠাকুরঘর বোঝার উপায় ছিল না। আঁকার সময় শিল্পীকে মনে হ'ল সাধক যেন সাধনায় নিমগ্ন। সুন্দরের সাধনায়, রূপলোকের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের দ্বারোন্মোচনের তপস্যায়। আমি অনেক সময় সেখানে উপস্থিত থাকতাম। নির্বাক অবস্থায় আমি লক্ষ্য করে যেতাম, তাঁর এই নবসৃষ্টির মহান অভিসার। লক্ষ্য করেছি, আমি হয় তো উঠে গেলাম একটি প্রায়সমাপ্ত ছবি দেখে। এসে দেখি শিল্পী তার চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছেন, মনে হয় যেন অন্য ছবি দেখছি। তাঁর বিখ্যাত ছবি 'আফটার দ্য স্টর্ম-এর সৃষ্টিও এইভাবেই। ছবিটি প্রথমে আঁকা হয়েছিল একটি সুন্দরী মেয়ের এক চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায়। ছবিটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল,

সংসারের কি কাজে আমাকে উঠে যেতে হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। ওমা এসে দেখি, কোন যাদুমন্ত্রে সুন্দরী ললনা চোখের আড়াল হয়ে গেছে, তার জায়গায় একটি সিক্ত বায়স। সে দিনটি ছিল বাতাস-বওয়ার দিন, এই ঘটনার আগে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। বৃষ্টি বন্ধের পর একটি কাক ঐ অবস্থায় তাঁর চোখের সামনে পড়ে গিয়েছিল কিম্বা সে বুঝতেও পারল না যে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর হাত তাকে অমর করে রাখল বিশ্বরসিকের দরবারে।

তাঁর কাজের সময় আমি কখনও কখনও দু'টি-চারটি সাংসারিক বিষয় তাঁর কাছে উত্থাপন করতাম। অল্প কথায় তিনি জবাব দিতেন না, চিত্রপট থেকে চোখ ফেরাতেন না। আমি তখন জিনিসটি এতটা তলিয়ে বুঝি নি, তিনি চাইতেন কাজের সময় সারা পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন থেকে কেবল নিজের পৃথিবীতে মহিমায় বিরাজিত থাকুন। শেষে নীচের তলায় নেমে এলেন, সেখানেও আমি প্রয়োজনে হানা দিতে আরম্ভ করলাম। অবশেষে গৃহস্বামীকে তল্পিতল্পা গুটোতে হল, বিদ্যালয় ভবনেই করতে হল স্টুডিও। সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না, সেখানে পিওনকে নির্দেশ দেওয়া হল তাঁর কাজের সময় কেউ যেন তাঁর ঘরে না ঢোকে, বক্তব্য জানাতে আরম্ভ করলাম চিঠির মাধ্যমে, অবস্থা বুঝে আমি একটি নির্ধারিত সময় ঠিক করে নিলাম, যে সময় তাঁকে বাস্তবের গণ্ডীতে পাওয়া যাবে। এর ফল ফলল তুলনামূলকভাবে ভাল।

কথাটা কিভাবে প্রকাশ করব ভেবে পাচ্ছি না যে ছেলেবেলা থেকেই শিল্পকলার প্রতি আমারও একটা আসক্তি ছিল আর আসক্তিটা একটু প্রবলই ছিল। আমার ছেলেবেলার কাজ যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা কিন্তু সকলেই এক অভিমত ব্যক্ত করেছেন—আমার মধ্যে না কি এক প্রখর শিল্পরুচির ছাপ বিদ্যমান। শিল্পের প্রতি আমার অনুরক্তি থাকলেও শিল্পীদের প্রতি কোনদিনই তা ছিল না। শিল্পীদের কোন জীবনী পড়ার তাগিদ মন থেকে কোনদিনই আমি পাই নি। তখন কি জানতাম—যে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সঙ্গে আমার জীবনের গাঁটছড়া বেঁধে যাবে।

দেবীপ্রসাদের অভ্যাস ভোর চারটেয় শয্যাত্যাগ করা। আবার সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে তিনি উঠে নিজেই চা তৈরি করে নিতেন, অত ভোরে চাকরদের জাগাতেন না। আমাকে বললেন—আমিও যদি ওঁর সঙ্গে উঠি তা হলে মন প্রফুল্ল থাকবে, কাজে উদ্যম আসবে। আমার বেলায় কিন্তু ঘটল বিপরীত, উদ্যম বা প্রফুল্লতা তো দূরের কথা, সারাদিন একটা অবসাদ ও ক্লান্তি এবং তন্দ্রাভাব থাকে যা মনের সমস্ত সজীবতাকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, শেষে একদিন তাঁকে বললাম ঘটনাটা। তিনি শুনে শেষে বললেন তাঁর জীবনসঙ্গিনীর কাছে এ তিনি প্রত্যাশা করেন নি, যাই হোক আবার আমি ফিরে গেলাম আমার পুরানো অভ্যাসে।

একটি বছর পরে আমাদের জীবননাট্যের পট-পরিবর্তন হল আমাদের ছেলের আবির্ভাবে। তার শৈশব অতিক্রম করে সে যখন বাল্যে উপনীত হল, সেই সময় দেখা দিল সমস্যা। তার শৈশবে আমরা দু'জনেই সমানভাবে তাকে আদর-যত্ন করে গেছি। কিন্তু যখন তার শিক্ষালাভের সময় হল, বাস—তাঁর আর কোন দায়িত্ব নেই। তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ অতিক্রম করেন নি বলে এ কাজে তিনি উপযুক্ত লোক নন বলে ফতোয়া দিলেন। বলা যায় না, নিজে গণ্ডিবদ্ধ পুঁথিশিক্ষার বিরোধী বলে ছেলেকে পড়াশুনোয় প্রেরণা না দিয়ে তার উল্টোটাই হয় তো দিয়ে বসবেন। অতএব আমাকেই সমস্ত ঝুঁকি নিতে হয়। তাকে স্কুলে দিতে হয়। প্রচলিত প্রথায় শিক্ষাদানের বিরোধী হলেও এ-সত্যটি দেবীপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্কুলের শিক্ষা যুগের বিচারে অপরিহার্য। তবে দায়-দায়িত্ব আমার, বাধ্য হয়েই অনেকখানি সময় তার পিছনেই আমায় দিতে হয়েছে, সময় করে নিতে হয়েছে তার জন্যে। একবার তার সম্বন্ধে স্কুল থেকে ফোন এল, দেবীপ্রসাদ সরাসরি—মাই ওয়াইফ ম্যানেজেস দিস্ থিংগস্, উড ইউ কাইণ্ডলি স্পিক্ টু হার? —বলে রিসিভারটা আমার হাতে তুলে দিলেন।

ছেলে বড় হতে লাগল। আমাদের কথাবার্তায় যোগ দিতে আরম্ভ করল। বাবার মনোভাব বুঝতে তাকে বেগ পেতে হল না। কলেজী শিক্ষা শেষ করার আগেই সে পড়ায় ইতি করে দিল। তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছুনোর বাধা হিসাবে মনে করল সে এই প্রচলিত ধারায় শিক্ষা গ্রহণকে। কলেজ-কর্তৃপক্ষ যখন তার এই পড়া ছাড়ায় আমরা অসন্তুষ্ট হব কি না জিজ্ঞাসা করলেন—সে সটান উত্তর দিল—মাই মাদার মাইট বাট নট মাই ফাদার।

কাজের সময় শিল্পীরা তার মধ্যেই বিভোর থাকেন, কিন্তু অন্য সময় সারাদিনের নৈঃশব্দের শোধ তুলতে চান, মনের সমস্ত ভাবাবেগকে সংলাপের মাধ্যমে চান প্রকাশ করতে। সকল সময় আমার সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব হত না তাঁর। এই নিঃসঙ্গতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আর এক ধরণের কাজে মন দিলেন দেবীপ্রসাদ। আমাদের ওপরতলার বসবার ঘরের পিছনে একটি ছাদ ছিল, সেই ছাদে বাঙলার গ্রাম তৈরি করলেন দেবীপ্রসাদ। গাছ, পাখি, নদী, ছায়া-ঘেরা পথ, কানন কুঞ্জ, মেঠো রাস্তা, সবুজ ঘাস, সবই ছিল

সে এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি যে অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক দক্ষতার পরিচয় দিলেন তা অভাবনীয়। নানারকম গাছ পুঁতলেন তিনি, আকারে ছোট কিন্তু বৈশিষ্ট্যে অনন্য।

ঠিক সামাজিক বলতে যা বোঝায়, দেবীপ্রসাদকে সে পর্যায়ে ফেলা চলে না। চিরাচরিত অসার প্রাণহীন পরিবেশ বা গতানুগতিক কথোপকথন তাঁকে আকৃষ্ট করে না, অনেক জায়গায় নেহাৎ কর্তব্যের খাতিরে বা নেহাৎ স্ত্রীর জন্যে তাঁকে যেতে হয় বটে, তবে পারতপক্ষে এইসব থেকে দূরে থাকতেই তিনি চান—কিন্তু তাঁর মনোমত সঙ্গী, মনোমত আলাপ-আলোচনা, মনোমত বিষয়বস্তু পেলে তাঁর মত সঙ্গী তুলনারহিত।

আঁকার সঙ্গে সঙ্গে লেখাও চলতে থাকে তাঁর। লেখক হিসাবেও তিনি কম প্রসিদ্ধির অধিকারী নন। বাঙলা দেশের পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়েছে তাঁর লেখা। অরণ্যের রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আমি অনেক পাঠক-পাঠিকার মুখে শুনেছি—তাঁর বর্ণনা এত জীবন্ত যে, পাঠককে স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়ে দেয়। লেখার প্রসাদগুণে যথার্থ পরিবেশ গড়ে ওঠে।

এক সহজাত প্রতিভা আর এক দুর্দমনীয় অধ্যবসায় দেবীপ্রসাদের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে তাঁকে এক সার্থক বিচিত্রকর্মায় পরিণত করে। সাধারণত কোন শিল্পী শিল্পের একটি দিকে যশস্বী হলেই তার অন্যান্য দিকেও সমান যশস্বী হবেন এ আশা করাই অসমীচীন। যদি কারো ক্ষেত্রে তা ঘটে তবে তা ব্যতিক্রম। দেবীপ্রসাদ নিঃসন্দেহে এই ব্যতিক্রম। চিত্রকলার প্রতিটি অলিন্দে পড়েছে তাঁর পদক্ষেপ। তাঁর সৃষ্টির পাখনা উড়েছে তার প্রতিটি আকাশের উপর দিয়েই। জলরঙ, তেলরঙ, ব্রাসের কাজে, তুলির টানে, পেন্সিলের আঁচড়ে তিনি সিদ্ধহস্ত। এ অভিমত আমার নয়—এ অভিমত বিশ্বের সেরা রসিকমণ্ডলীর। চিত্র ও ভাস্কর্য ছাড়া প্ল্যাস্টিকশিল্পেও তাঁর ব্যুৎপত্তি অনস্বীকার্য—তাঁর লেখার কথা আগেই বলা হয়েছে। সঙ্গীতেও তিনি প্রতিভাধর।

ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর এক প্রবল অনুরাগ দেখা গেছে। নিজেদের বাড়িতে বা মামার বাড়িতে প্রায়ই সঙ্গীতের আসর লেগে থাকত, সেই সাঙ্গীতিক পরিবেশে গড়ে ওঠার ফলে আপনা থেকেই তাঁর কান সুর-সচেতন হয়ে গিয়েছিল। তিনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীতেরই অনুরাগী। বাঁশি বাজানোর ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। গানের গলা তাঁর যেমনই ভরাট তেমনই সুরসমৃদ্ধ। তাঁর মত কৃতী বংশীবাদক—আশ্চর্যের কথা কারো কাছেই এ বিদ্যা শেখেন নি।

শ্বশুরমশায় ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। তাঁর স্নেহের আধিক্যের ছায়ায় লালিত হওয়ার জন্যেই আমার মনে হয়—হয় তো দেবীপ্রসাদ তাঁর শিশুসুলভ মনোভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। হায়! শ্বশুরমশায় এখন এমন এক জগতের বাসিন্দা যে, আমার সহস্র অনুযোগ পার্থিব দূরত্ব অতিক্রম করে তাঁর কাছে পৌঁছবে না।

তাঁর ব্যায়ামচর্চার কাহিনীও অবিদিত নয়। তবে সাধনা ও পরিশ্রমে লব্ধ এই শক্তির অপব্যবহার বা অন্যায় প্রয়োগ তিনি কখনও করেন নি। তবে যখনই প্রয়োজন হয়েছে সেক্ষেত্রে কোন বাধা তাঁকে শক্তির প্রয়োগ থেকে বিরত করতে পারে নি। বৃটিশ রাজত্বে টমিরা নিজেদের ওজন রীতিমত হারিয়ে ফেলেছিল। পশুসুলভ আচরণ দেখা যাচ্ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু সাধারণ মানুষ একে তখন যুদ্ধের আতঙ্কে ভীত, তার উপর এদের বর্বরোচিত পাশবশক্তিও সাধারণের মনে যথেষ্ট ভয়ের কারণ। তাই এদের যথেচ্ছাচারিতার কোন প্রতিকার হোত না, বৃটিশ এদের সম্বন্ধে তো তখন দরাজ ছিল। পথ চলতে তাদের অসৌজন্য দেখতে পেয়ে তিনি দিয়েছিলেন তাদের সমুচিত শিক্ষা। তারা ভাবতে পারে নি যে, একজন বাঙালীর কাছে তারা এই আচরণ পাবে। প্রথমটায় তারা তাঁকে আঘাত করে কিন্তু এই আঘাত প্রত্যাঘাতের দ্বারা শোধ করলেন দেবীপ্রসাদ। একটি টমিকে হাতে তুলে নিয়ে তিনি শূন্যে ঘোরাতে লাগলেন, তারপর শূন্যেই তাকে দিলেন ছুড়ে, চেয়েও দেখলেন না তার পরিণতি—তাঁর কপালে এখনও সেদিনের স্মৃতি বর্তমান আছে একটি দাগের মধ্যে দিয়ে।

মাদ্রাজে একটি ছবিঘরে দু'টি নাবিককেও একদিন জব্দ করেছিলেন দেবীপ্রসাদ। কথাবার্তায় সময় নষ্ট করার লোক তিনি নন। দিলেন দু'জনের নাকে নাক ঘষে। তার ফল রক্তারক্তি। একদিন অবশেষে তাঁর কর্মজগতের কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি তাঁকে একদিন শান্ত হতে বললেন, তাঁকে বোঝালেন যে, তাঁর মত উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিজের হাতে আইনের ভার গ্রহণ করা বিধেয় নয়। কথঞ্চিৎ ফল হল। কিন্তু এই পরিবর্তন আসার আগে তাঁর জীবনে 'ভয়' শব্দটি ছিল অলিখিত। একবার তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে। একটি ঘোড়া বাঁধনহারা উদ্দাম বেগে ছুটে আসছে। দিক-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে সর্বনাশের সুস্পষ্ট পদধ্বনি, নির্ভীক মানুষ দেবীপ্রসাদ। ভয়ের লেশমাত্র নেই সোজা দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা সামনে আসতেই সোজা লাগাম ধরে দিলেন তার গতি থামিয়ে, দুর্দান্ত অশ্ব হয়ে গেল স্থির শান্ত। তার আরোহিণী ছিলেন এক ইংরেজ মহিলা। নিশ্চিত সর্বনাশের দরজা থেকে ফিরে এলেন

তিনি। কৃতজ্ঞতায় শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানালেন, হয় তো এই বীরত্বের জন্যে তাঁকে পুরস্কৃত করার জন্যে। দেবীপ্রসাদ যান নি, মহিলাটিকে যে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছেন, তাঁর মতে তাঁর অসমসাহসিকতার সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা। তাঁর পিতামহের জন্যে নানারকম মিষ্টান্ন বাড়িতে তৈরি হত, তাতে আর কারো অধিকার থাকত না। একদিন ফাঁক পেয়ে বালক দেবীপ্রসাদ সেই গরম সদ্যনির্মিত মিষ্টান্ন জল দিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে লাগলেন, ধরা পড়লেন। ঘরে তাঁকে বন্ধ করে রাখা হল। হাত-পা বেঁধে। ঘষে ঘষে হাতের বাঁধন লাগলেন খুলতে, তারপর পায়ের বাঁধন গ্রন্থিমুক্ত করতে আর বাধা কোথায়? ব্যাস, তারপর জানালা। দশ বছরের বালক দেবীপ্রসাদ জানলার লোহার গরাদগুলো উপড়ে নিজের বেরোবার মত স্থান করে নিলেন। পিতামহ আবার লোক পাঠালেন দুর্বিনীত পৌত্রকে ধরার জন্যে, এবার নাতিও প্রস্তুত, যে আসে তাকে লাঠি নিয়ে তেড়ে যান। বাড়ি ফিরলেন বাবা। তাঁকে জানান হল তাঁর পুত্রের কীর্তি। পুত্রও পিতার কাছে দিলেন অকপট স্বীকৃতি। পরিষ্কার বললেন কাউকে আঘাত করার ইচ্ছে তাঁর ছিল না, ভৃত্যদের হাতে অপমানের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই এই পন্থা অবলম্বন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। পিতা শুধু ভবিষ্যতে যাতে এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে সম্বন্ধে পুত্রকে সজাগ থাকতে বললেন। পুত্রের প্রতি স্নেহশীল বলে পুত্রের অন্যায় তিনি কখনও তা বলে সমর্থন করেন নি। দেবীপ্রসাদ তখন এয়ারগানে টিপ অভ্যাস করছেন। চোখে পড়ল একটি লোক চলেছে তার পরিচ্ছদে একটুখানি ছেঁড়া ছিল যার ভিতর দিয়ে তার শরীরের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল। ব্যাস লক্ষ্য স্থির করার এমন একটি উপায় তিনি ছাড়তে পারেন কখনো, ট্রিগার টিপলেন, লোকটিও তার ফলে পপাত ধরণীতলে। সেদিন শ্বশুরমশায় একটি চাবুক ভেঙেছিলেন পুত্রের পিঠে।

দেবীপ্রসাদের শরীর সুগঠিত হোক, পৌরুষদৃপ্ত হোক, বীরত্বব্যঞ্জক হোক। এ ইচ্ছা ছিল তাঁর অদম্য। যদিও পুত্রের কলানুরাগ বা সৃজনী-প্রতিভার কোন মূল্য তিনি দেন নি বলে তাঁর পুত্রের অনুযোগ। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যায়ামচর্চার দিকে তাঁর উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। জাপানী গুরুর কাছে দেবীপ্রসাদ শিখলেন যুযুৎসু। প্রসিদ্ধ পালোয়ানদের কাছে শিখলেন পালোয়ানী। আখড়ায় পাঠ নিলেন কুস্তির। একজন শিল্পীর মধ্যে এসব দিকে দক্ষতা অর্জন সত্যিই বিরল দৃষ্টান্ত।

একটি বিরাট বাড়ির অধীশ্বর তাঁর বাঁশি শুনে তাঁকে বাড়ির মধ্যে বাঁশি শোনাবার ফরমাস করলেন। বাঁশি শুনে মোহিত হলেন। ভাবলেন, লোকটি হয় তো এইভাবে জীবিকানির্বাহ করে। পারিতোষিক দিতে গেলেন নগদ টাকা। স্মিতহাসি হেসে টাকাটি নিলেন দেবীপ্রসাদ, গৃহস্বামী একটু পরেই দেখতে পেলেন সেই পাঁচটি টাকায় একটিন মূল্যবান সিগারেট কিনেছে সেই বাঁশিওয়ালা। তাঁর যে বাঁশি শোনার জন্যে পুরাঙ্গনারা একদিন কাজ ফেলে বাড়ির বারান্দায় ভিড় জমাতেন, সে বাঁশি আজ নীরব বয়সের আধিক্য। আজ বাঁশি থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রেমিক শিল্পীকে পরিণত করেছে স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিকে। [ক্রমশ।

অনুবাদক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃস্বপ্ন

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

নিশুতি রাত, দুঃস্বপ্নে ভাঙলো ঘুম ঃ
আমায় যেন চোখের জলে ফিরিয়ে দিলে
দিয়েছিলাম তোমাকে যেই রক্ত-গোলাপ—
নিবিড় ক'রে বুকে পাওয়ার অভিজ্ঞান।

স্তব্ধ হাওয়া, প্রেতের মত বৃক্ষগুলো
অন্ধকারে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে।
কি এক অবোধ যন্ত্রণাতে লক্ষ তারা
আর্তনাদে মুখর হবে হয়তো এখন!

পাখির গানের রাজ্যে যাব কখন আমি
আলোকবিহীন কবরখানার দরজা খুলে?
নিশুতি রাত অন্ধকারের বিশাল পাহাড়
বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হাসছে হা-হা॥

অমল ইচ্ছার স্রোতে

গোবিন্দ গোস্বামী

অমল ইচ্ছার স্রোতে যতবার ভেসে যেতে চাই
দেখেছি আলোর বাঁধ সন্তর্পণে চতুর্দিকে ঘিরে;
সময়ের প্রতিবিম্বে জীবনের যেদিকে তাকাই
কি এক যন্ত্রণা থাকে চেতনার নিঃসঙ্গ তিমিরে।

পলাতক দিনগুলো বেঁচে থাকে স্মৃতির পাতায়
আমাদের ভালোবাসা দেহ ছেড়ে ঈশ্বরের প্রতি
নিবেদিত হবে জানি। অন্তহীন কালের যাত্রায়
মিথ্যে তাই খুঁজে দেখা নেপথ্যের পরিশিষ্ট ক্ষতি

এ পথ প্রবহমান···আমাদের প্রবাসী সময়
সপ্রত্যয়ে দেখে যাবে অবিনাশী জীবনের জয়।

॥ নয় ॥

মিলন যুদ্ধ

আগে বলেছি, আবার বলতেও দোষ নেই, বর্তমান জার্মানীর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পূর্ব-পশ্চিমের পুনর্মিলন। এ বিষয় ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই। থাকলেও বলব না। কারণ, প্রথমত আমি রাজনীতি বুঝি না, দ্বিতীয়ত এ বিষয় অন্যান্য যে কোন রাজনীতিক শিরোমণির মতন আমার চিন্তাধারাও রীতিমত জট-পাকানো। ওখানে থাকা-কালীন যা শুনেছি, পড়েছি এবং চোখে পড়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই আলোচনা করব। না করলেও চলত কিন্তু আজকাল বামপন্থী ইণ্টেলেকচ্যুয়াল হ'তে গেলে এ সব করতেই হয়। আমি নেপো। ভারত সরকারের দৈ যখন মেরেছি, তখন প্রয়োজনবোধে অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতামতকে নিজের বলে চালাতে পেছ-পা হই কেন? বিশেষ করে ওটাই যখন হল ইণ্টেলেকচ্যুয়াল হবার সর্বজনবিদিত, সুনিশ্চিত এবং সহজ পথ।

এই পূর্ব-পশ্চিম মিলনের পক্ষে কে? এক কথায় বলা চলে, সবাই। বিশেষ ক'রে রাশিয়া। এটা একটা মহৎ আদর্শ এবং ছোট-বড় সকলেই বলেন, এ না হ'লে জার্মানীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবে, এটা হল প্রকাশ্য সভায় বলার কথা। আসলে, অনেকেই চান না যে পুনর্মিলন ঘটুক। কেউ বলেন, এতে বিপদ আছে। কেউ বলেন, আপদ বাড়াই কেন। কিন্তু একবাক্যে সবাই উঁচু গলায় বলেন, 'হোক', বলায় দোষ নেই। ওটা সহজে হবার নয়।

পুনর্মিলনে আপত্তি কার? প্রধান আপত্তি পশ্চিম-জার্মানীর। ওরা রাশিয়াকে ভয় পায় এবং অবিশ্বাস করে। ওরা মনে করে—এবং ঠিকই—যে এতে রাশিয়ার আধিপত্য বাড়বে, কম্যুনিস্টদের অত্যাচার বাড়বে এবং দৈনন্দিন জীবনে অশান্তি বাড়বে। পূর্ব-জার্মানী কৃষি-প্রধান এলাকা। কাজেই, পশ্চিমের তুলনায় গরীব। পুনর্মিলন ঘটলে পশ্চিমের ঐশ্বর্যে ঘাটতি পড়বে। যদি না হয় তা হ'লে না হওয়া পর্যন্ত কম্যুনিস্টরা মাথায় উঠে নাচবে। ওদিকে আবার রাজনীতিক দলেও হের-ফের হবার সম্ভাবনা। পশ্চিম-জার্মানীতে Christian Democratic Union-এর একচেটিয়া আধিপত্য, কারণ এ অংশে রোমান ক্যাথলিক বেশি। পুনর্মিলন হলে প্রোটেস্ট্যাণ্টরা আপনা থেকেই দলে ভারি হ'য়ে উঠবে। পূর্ব-জার্মানীর অধিকাংশ লোকই প্রোটেস্ট্যাণ্ট। এদিকে আবার Social Democrats-রা পুনর্মিলন চাইছেন কারণ ওঁদের আধিপত্য ছিল পূর্ব-জার্মানীতে। পূর্ব-জার্মানীর ভোট পেলেই তবে এঁরা Christian Democratic Unionকে বাগে আনতে পারবেন।

গোধূলি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

আর সবচেয়ে আপত্তি হল রিফ্যুজিদের। পুনর্মিলন হ'লেই ওঁদের রিফ্যুজিত্ব লোপ পাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে বসবেন সুখ-সুবিধা, আদর-আপ্যায়ন। ওঁরা বলেন, পূর্ব-জার্মানী থেকে সব লোক নিয়ে এস। সেটা সম্ভব নয়। প্রয়োজনবোধে পূর্ব-জার্মানীকে না হয় রাশিয়াকেই দিয়ে দাও। সেটা আরও অসম্ভব। ওঁদের কর্তারা বলেন, যুদ্ধ ছাড়া পুনর্মিলন অসম্ভব। আরও বলেন, যুদ্ধ মানেই সর্বনাশ। অর্থাৎ পুনর্মিলনের কথা না ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ!

সরকারি ভাষায় দুই জার্মানীর পাইকারি মত হল পুনর্মিলন চাই। দু'দলই বলেন যুদ্ধ ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, যুদ্ধ আমরা চাই না। পুনর্মিলন চাওয়াটা যেমন স্বাভাবিক, যুদ্ধ না চাওয়াটাও তেমনি। একটা দেশে দু'ভাগ বেদনাদায়ক। সেই দু'ভাগকে এক করতে গিয়ে দু'টোকেই ভেঙে টুকরো টুকরো করা আরও বেদনাদায়ক।

যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম হল—শক্তিই হচ্ছে আসল বল। জার্মানী পঁচিশ বছরের মধ্যে দু-দু'টো যুদ্ধ হেরে হয়েছে ফুটবল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জার্মানীর যা জনবল ছিল, তার আদ্দেক মরেছে যুদ্ধে: বাকি আদ্দেকের শতকরা ষাট ভাগ আছে পূর্ব-জার্মানীতে। তারাই চাইছে পুনর্মিলন একবারে মরিয়া হ'য়ে। তার জন্যে যদি যুদ্ধেরও দরকার হয় তো হোক। তবু চাই। তার কারণ আছে। আগে একবার ওরা মরিয়া হ'য়ে মাথা নাড়া দিয়েছিল। মার খেয়েছে। আবার ওদের মধ্যে অল্পবিস্তর সেই মরিয়া ভাবটা জেগে উঠছে। এখন ওদের বক্তব্য হল, আঠারো বছর প্রতিদিন মরছি, তার চেয়ে না হয় একদিনেই আঠারো বার মরব। অর্থাৎ ব'সে ব'সে মার খাওয়ার চাইতে, মারতে গিয়ে মার খাওয়া অনেক ভালো। আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাই হোক, আর প্রতিবিধানের জন্য যে ব্যবস্থাই ওরা ভাবুক, পুনর্মিলনের ব্যাপারে ও পক্ষের বরকর্তা হল রাশিয়া। পণের টাকা কত হবে আর কনের রূপ কেমন

হবে সবই ক্রুশ্চেভবাবুর মর্জি। উনি বরপক্ষের জ্যাঠামশায় এবং কন্যাপক্ষের ছোট কাকা অর্থাৎ কেনেডিবাবুকে দাবি-দাওয়ার যা লিস্টি দিয়েছেন তাতে কনের ওপরও চাইছেন কনের মাকে এবং জ্যাঠাইমাকে। সঙ্গে চাইছেন বেয়াইবাড়ির লোহার সিন্দুকের চাবি। বলা বাহুল্য, এ পক্ষ বিয়ে দিতেই আপাতত রাজী নন। অবশ্যই না হবার কথা।

ওদিকে রাশিয়ার পুনর্মিলনের দাবী অনেকটা ছোট ছেলের বায়না কান্নার মতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রেই চলেছে 'পুনর্মিলন চাই চা-আ-ই-ই···।' এ নিয়ে রাশিয়ার ছেলেমানুষিরও অন্ত নেই। মাঝে ১৯৪৭ সালে রামের সুমতির ক্ষুদে শয়তানের মতন একমুঠো ছাই নিয়ে ছিল খাবারের ওপর ছড়িয়ে—অর্থাৎ হঠাৎ একদিন হুকুম হল পশ্চিম-বার্লিনের জন্য খাবার, দুধ, ফল, রুটি কোন কিচ্ছু পূর্ব-বার্লিনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। এই পশ্চিম-বার্লিন ব্লকেডের গুরুত্ব বুঝতে গেলে পশ্চিম-বার্লিনের ভৌগোলিক পরিস্থিতি খানিকটা বোঝা দরকার।

পশ্চিম-বার্লিন অর্থাৎ বার্লিনের যে অংশটা রাশিয়ার আওতায় নয় দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সেটা হল আনুমানিক তিরিশ বর্গ মাইল। এই জায়গাটি রাশিয়া অধিকৃত পূর্ব-জার্মানীর মধ্যে একটি দ্বীপের মতন। এখানে আসতে গেলে রাশিয়ান এলাকার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। ওদিকে আবার পশ্চিম-বার্লিনে নিত্যপ্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস—দুধ, কয়লা, সব্জি, ডিম, রুটি সবই—প্রত্যহ আসে পশ্চিম-জার্মানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে রেলে, জলে, তবে বেশিটা রাস্তা দিয়ে—কিন্তু পূর্ব-জার্মানীর মধ্যে দিয়ে ব্লকেডের ফলে রাতারাতি এ সব আসা বন্ধ হ'য়ে গেল। এক শনিবার ভোরবেলায় দেখা মাংস, ডিম কিচ্ছু আসে নি এমন কি পাঁউরুটি পর্যন্ত না। বাজার-হাট সব বন্ধ। আমেরিকা ব্যস্ত হয়ে দূত পাঠালো। রাশিয়া বললো আজ শনিবার, দপ্তর বন্ধ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল অধিকর্তারা গেছেন ছুটি উপভোগ করতে সমুদ্র কিনারে। ফিরবেন সোমবার সকালে। হিসেবটা রাশিয়ার ঠিকই ছিল। শনি, রবি সোম তিন দিন যদি মাল আটকানো যায়, তা হলে লরি বোঝাই পচা মাল ফেলে, টাটকা জিনিস নিয়ে আবার নতুন লরি আসতে যাবে আরও কম ক'রে তিন দিন এবং এই ছ-সাত দিনের অব্যবস্থায় পশ্চিম-বার্লিন অবশ্যই বুঝবে যে, ওদের জীবন-মরণের চাবিকাঠি রাশিয়ার হাতে! পুরো পশ্চিম-জার্মানী এ ভাবে পাওয়া যেত না ঠিকই, তবে পশ্চিম-বার্লিন পকেটে আসাটা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার ঠিক ছিল না। অর্থাৎ ভারতবর্ষ না পাই, দিল্লী তো পেলাম!

আমেরিকান দূত ফিরে এল। জার্মান প্রতিনিধি গেল পূর্ব-বার্লিনের বার্গো মাস্টারের সঙ্গে জার্মান ভাষায় আলাপ করতে। তিনি বুড়ো আঙুলটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন রাশিয়ান দূতাবাসের সদর দরজা। শনিবার সারাদিন গেল উমেদারিতে। রাগে, দুঃখে আর ক্ষিদের জ্বালায় সমস্ত পশ্চিম-বার্লিন পথে নামল হাতিয়ার হাতে। হয় মারবে, নয় মরবে। ঠিক রাশিয়া যা চেয়েছিল। সারা রবিবার গেল তাদের মাথা ঠাণ্ডা করতে। আমেরিকা আশ্বাস দিল, সোমবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই রবিবার রাত তিনটে থেকে পশ্চিম-জার্মানীর এয়ারপোর্টে প্রতি মিনিটে দু'টো ক'রে বড় বড় প্লেন নামতে আরম্ভ করল। প্লেন তো নয়, পঙ্গপাল, আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। দলে দলে আসে, দলে দলে চলে যায়। প্লেন তো আর কেউ পকেটে ক'রে আনে না; পূর্ব-জার্মানীর ওপর দিয়েই ওদের আসা-যাওয়া। আর সাধারণ যাত্রিবাহী প্লেন নয়, আমেরিকা, বৃটেন আর ফ্রান্সের রাজকীয় বিমান। রাশিয়া বুঝল নেহাৎ যুদ্ধেরই প্রস্তুতি। অতএব সাজো। সারা পূর্ব-জার্মানীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেপাইরা সঙ্গীন নিল। বিমানঘাঁটিতে বোমা। হুইসিল বাজলেই ড্রপ-সিন উঠবে।

সোমবার সকাল থেকে রাশিয়ান দূতাবাসের সদর দরজা খোলা। ওদের কাছে মার্কিনী দূত আসবে, খাবারের লরির পরিবর্তে পশ্চিম-বার্লিন দান করে যাবে, আর না হয় যুদ্ধের নোটিশ দেবে। কিন্তু কেউ এলো না; এলো খবর। বার্লিনের দৈনন্দিন-জীবনযাত্রা রীতিমত আরম্ভ হয়েছে। খাবারের কোন অভাব নেই, বরং প্রাচুর্য। সব আসছে প্লেনে, মায় কয়লা পর্যন্ত। প্রতিদিন প্লেনে আসে প্রায় দু' হাজার বার। নামার দেড় মিনিটের মধ্যে খালি হয় আর চার মিনিটের মধ্যে ফিরে চলে যায়। এই ক'রে কাটল ঠিক এগারো মাস আঠাশ দিন। বছর পুরো হতে যখন আর মাত্র দু'দিন বাকি, তখন পশ্চিম-বার্লিনের কারো একজনের মাথায় এক কুবুদ্ধি খেলে গেল। এই এয়ারলিফটের প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হবে পূর্ব-জার্মানীকে জব্দ ক'রে সেটাও এক মজার ব্যাপার।

পূর্ব-বার্লিনের সুয়েজ সিস্টেম পশ্চিম-বার্লিনের তলা দিয়ে। অর্থাৎ পূর্ব-বার্লিনের যত ময়লা জল আর মানুষের পরিত্যক্ত বিশেষ জিনিসগুলো বেরিয়ে যায় পশ্চিম-বার্লিনের তলা দিয়ে। সেই দুষ্টু শিরোমণি সে পথ দিল বন্ধ ক'রে। ফলে পূর্ব-বার্লিনের ময়লা নিষ্কাশন পুরোপুরি বন্ধ। খাবার জিনিস না হয় প্লেনে আনা যায় কিন্তু ময়লা জল আর সারা দেশের পরিত্যক্ত জিনিস তো আর লরিতে নিয়ে যাওয়া যায় না। রাশিয়া প্রমাদ গুণলো। হয় দুর্গন্ধের চোটে দেশ ছাড়তে হয়, আর না হয়

আমেরিকার কাছে ভিক্ষার ঝুলি পাততে হয়! নিরুপায় হ'য়ে পূর্ব-জার্মানীর মধ্যে দিয়ে পশ্চিম-বার্লিনে যানবাহন যাওয়ার বিনা-সর্তীয় ছাড়পত্র নিয়ে রাশিয়ান দূত হাজির হ'লেন আমেরিকান দূতাবাসে। রাশিয়ান সাপ মরল। আমেরিকান লাঠি তো ভাঙলোই না, উপরন্তু মরা সাপের চামড়া দিয়ে জুতোও একজোড়া পায়ে উঠল।

দিন যায়। মাস যায়। জীবন চলছে নিয়মের বাঁধা ছন্দে। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিম-বার্লিনের কোন বাড়িরই উনুন জলছে না। গ্যাসের সাপ্লাই সরাসরি বন্ধ। কি ব্যাপার? পশ্চিম-বার্লিনে গ্যাস আসে পূর্ব-বার্লিনের গ্যাস প্লাণ্ট থেকে। তারা জানিয়েছে আর সাপ্লাই করতে পারবে না—নানান অসুবিধা। রাত্তিরে চাও পেতে পারো, তাও মাত্র দু'ঘণ্টা—একটা থেকে তিনটে। খাবার না হয় প্লেনে ক'রে এসেছিল, গ্যাস তো আর তাই বলে আনা যায় না! অগত্যা নিরুপায় হ'য়ে পশ্চিম-বার্লিনকে তাতেই রাজী হ'তে হল। উপায় কি? গ্যাস প্লাণ্ট না হয় এক্মাসে তৈরি করা যায় কিন্তু সারা শহরের সরবরাহ ব্যবস্থা তো আর সহজ কথা নয়। সেটা সময় সাপেক্ষ! ফলে, দিনের গতি ঠিকই থাকল, কিন্তু পশ্চিম-বার্লিনে রাত্রের রূপ গেল পাল্টে। মেয়েদের রান্না করতে হয় একটা থেকে তিনটে। অগত্যা জীবনের ধারা বদলালো। অধিকাংশ রেস্তোরাঁ সারাদিন বন্ধ থাকে আর সারারাত চলে। যাঁরা এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন তাঁরা একবাক্যে বলেন চিরন্তনী নিয়মের এই বৈচিত্র্য তাঁদের বেশ ভালোই লাগত। দিন হল রাত আর রাত হল দিন। প্রথম প্রথম অসুবিধা অবশ্যই হত, সার্টের খোলা দিকটা পেছনে দিয়ে পরার মতন, কিন্তু পরে ওটাই নিয়ম মনে হত।

যেদিন পশ্চিম-বার্লিনের নতুন গ্যাস প্লাণ্ট আকাশে ধোঁওয়া ছেড়ে জানান দিল যে, সে তৈরি—সেই দিনই আবার নোটিশ এল পূর্ব-বার্লিনের গ্যাস প্লাণ্ট থেকে, ওদের অসুবিধার অবসান ঘটেছে। গ্যাস আবার পাওয়া যাবে পুরোনো ব্যবস্থায়!! রাতারাতি আবার রাত হল দিন আর দিন হল রাত।

দিনরাত এইরকম ছেলেমানুষি খেলা চলেছে পূর্ব ও পশ্চিম-বার্লিনে। কিন্তু আসল সমস্যা—যেটা অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানীর পুনর্মিলন, সেটার কোন সুরাহা হয় নি —কখন সহজে হবারও নয়। মাঝে একবার এই সমস্যা সমাধানের পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হল পশ্চিম-জার্মানীর নেতাদের ওপর। বাধ্য হয়ে আপোষ মীমাংসার জন্য ওঁরা ঘরোয়া বৈঠক ডাকলেন। সেখানে Social Democratsরা বললেন পুনর্মিলন চাই, Christian Democratic Unionও বললেন চাই—কিন্তু যুদ্ধ না করে এবং Socialist Nationalist Party (যাঁরা সোসিয়ালিস্ট তো অবশ্যই নন, ন্যাশন্যালিস্ট কি না সন্দেহ!) বললেন শুধু চাই নয়, সঙ্গে যুদ্ধও চাই। Christian Democratic Union দলে ভারী। ওঁদের ভোটাধিক্যে ঠিক হল পূর্ব-জার্মানীর জার্মান উপ-পতিদের সঙ্গে আলোচনা কর।

খবর শুনে আমেরিকা বললে ও! তোমরা তা হলে রাশিয়ার সঙ্গে দলে ভিড়তে চাও?—সেটি হচ্ছে না বাপু!

হল এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি! পুনর্মিলন চাই অথচ সে ব্যাপারে বৈঠক চলবে না, বিশেষ করে জার্মানদের মধ্যে, আপোষে সেখানে আমেরিকা উপস্থিত থাকবে না! পশ্চিম-জার্মানী যদি বলে বেশ তো, থাকো তোমরা, তো পূর্ব-জার্মানী রাজী নয়! তারা বলে আমাদের ব্যাপার আমরা বুঝব, তোমরা কে? বাধ্য হয়ে পশ্চিম-জার্মানী যখন হাত গুটিয়ে বসল তো য়ুরোপ টিট্‌কিরি দিয়ে বললে তা তো বসবেই, নইলে যুদ্ধ বাধবে কেমন করে?

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এতই যদি ঝঞ্ঝাট তো দরকার কি? থাক যা আছে। রাশিয়ার তাতে আপত্তি। তার অনন্য কারণ রুর (Ruhr)।

পশ্চিম-জার্মানীতে রাশিয়ার লোলুপদৃষ্টি ঐ রুরের ওপর। ডসেলডর্ফে রুর হল প্রধান শিল্পক্ষেত্র। আর ওদের প্রধান প্রডাক্ট হল অস্ত্র। আধুনিক সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে আরম্ভ করে আজও পর্যন্ত জার্মানীর ঐতিহ্যের ভিত্তি আর ঐশ্বর্যের মূল সূত্র হল রুর। আমি ইতিহাসের ছাত্র নই, তবুও জানি যে, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ নাকি রুরের অধিনায়করা। ওঁরাই বন্দুক বানিয়ে আর কামান বিক্রি করে (দু' পক্ষকেই!) যুদ্ধ লাগিয়েছিলেন বেশ দু' পয়সা বানাবার জন্য। বলা বাহুল্য, ওঁরা বানিয়েও ছিলেন। শোনা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্তও রুরের অধিনায়করা ছিলেন পর্দার আড়ালে জার্মানীর হর্তাকর্তা ও ভাগ্যবিধাতা। খানিকটা আমাদের কংগ্রেসী সরকারে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের মতন। এঁরা টাকা দিয়ে কংগ্রেসী টিকি কিনে রেখেছেন, ওঁরা অর্থাৎ রুর অধিপতিরা কেনা টিকি নিয়ে নাকি যথেচ্ছা টানাটানিও করতেন! প্রভেদ শুধু এইটুকু এবং এর কারণও আছে। মাড়োয়ারী তরিতরকারি খেয়ে টাকা বানায়। ওঁরা টাকা খেয়ে বন্দুক বানান।

বন্দুক তো আর রাম শ্যাম যদু কেনে না, কেনে দেশ। আর, কেনা জিনিসের ক্ষয় না হলে ব্যবসাদারদের ক্ষতি। বন্দুক কামান, খাবার জিনিস নয়। ওর ক্ষয় হয় যুদ্ধে। অতএব রুরের উন্নতির মূলে হল যুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধে ওঁরা দু'দলকেই যে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করতেন এটা ঐতিহাসিক সত্য। রুর-অধিপতিদের এতে অবশ্য কোন লজ্জা ছিল

না, আজও নেই। কেউ কেউ ওঁদের মধ্যে বড়াই ক'রে আজও বলে থাকেন অন্যায়টা কোথায়? ব্যবসাদারদের কাছে সবাই সমান। যে টাকা দেবে সেই-ই জিনিস পাবে! হ্যাঁ, অবশ্যই অন্যায় হত যদি আমরা দর ঠিক না রাখতাম! দর সমান রাখা আমাদের দস্তুর! শ্রমিকদের ব্যাপারে ওঁরা সাম্য না মানলেও ক্রেতাদের ব্যাপারে যে মানেন এবং আজও মেনে আসছেন—এটাও ঐতিহাসিক সত্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ বোমার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল রুর। শোনা যায়, প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরির ইট-পাথর পর্যন্ত বোমায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম-জার্মানীর সামরিক প্রভুরা দেখলেন রুর না হ'লে জার্মানী অন্ধকার! অতএব যাঁরা রুর ধ্বংস করেছিলেন তাঁরাই আবার কোটি কোটি টাকা খরচ ক'রে রুরকে নতুন ক'রে খাড়া করলেন। রাশিয়ারও বেশ কিছু বোমা ওখানেও পড়েছিল। আমেরিকা যখন বললে তোমরাও কিছু টাকা দাও তখন রাশিয়া বললে মাথা খারাপ, রুর মানেই তো যুদ্ধ! আমরা ও পথে নেই।

বাধ্য হ'য়ে আমেরিকার টাকা বৃটিশ ব্যাঙ্ক মারফৎ এসে রুর তৈরি হল!

রুর তো তৈরি হল, কিন্তু বানাবে কি? অস্ত্র বানালে আবার যদি রুর-অধিনায়কদের পুরোণো খেলা আরম্ভ হয় তো যুদ্ধ অবধারিত! বন্দুক না বানিয়ে অন্য জিনিস বানায় তা হলে জার্মান দক্ষতার কাছে অন্য সব দেশের হার অনিবার্য এবং ফলে ওদের সকলের—বিশেষ ক'রে বৃটেনের এবং ফ্রান্সের চালানি ব্যবসা একেবারে চুলোয় যেতে বাধ্য! এই আলাপ-আলোচনায় গেল বছর দু'য়েক। ঠিক হল বানাক বন্দুক। আর, পাছে ওরা পেজোমো করে তাই ঠিক হল কোন পুরোনো অধিনায়কদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে না। বানাও কর্পোরেশন্। আমেরিকার তাতে প্রভূত আপত্তি। কারণ ওখানকার যে টাকা আমেরিকা থেকে এসেছে, সে টাকা আমেরিকার ব্যবসাদারদের! মতদ্বৈধতার ফলে দশটা কেন্দ্র ভেঙে হল তেইশটা কর্পোরেশন আর বাইশটা (আমেরিকান ব্যবসাদারদের ইচ্ছেয়!) পুরোনো জার্মান অধিনায়কদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা।

বেশ চলছিল। হঠাৎ দেখা গেল জিনিসের দর বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে, অস্ত্রের রপ্তানি বাড়ছে। কিনছে কিন্তু অদলীয় দেশগুলো! খোঁজ নিয়ে জানা গেল অস্ত্র কিন্তু যাচ্ছে সরাসরি কোরিয়ায়! জার্মান অধিনায়করা সুযোগ পেয়ে ঘুরে বললেন কোরিয়াম যুদ্ধ তো আর আমরা লাগাই নি!!

এই হল মোটামুটি রুর। যুদ্ধ যেই লাগাক আর অস্ত্র যেই কিনুক অর্থ সমাগম হবে রুরে। অতএব, এই রুরটি রাশিয়ার চাই—চাই-ই। চাইবার আরও অনেক কারণ অবশ্যই আছে। জার্মানীর যে অংশটা রাশিয়ার হাতে এসেছে—সেটা হল কৃষিপ্রধান। প্রথমত লাঙল দিয়ে যুদ্ধ হয় না; দ্বিতীয়ত চাষাদের মধ্যে কম্যুনিসমের ওজন কম; তৃতীয়ত জাতের সম্পদ হল শিল্প! এই শেষ কারণটার ওজন সবচেয়ে বেশি। এই সম্পদের জন্যেই পশ্চিম-জার্মানীর এত উন্নতি এবং এরই অভাবে পূর্ব-জার্মানীর এত দৈন্য। অন্যান্য সব দেশের মতন এখানেও রাশিয়ার চেষ্টা হল ঘরের যত কম খেয়ে যত বেশি মোষ তাড়ানো যায় ততই মঙ্গল। এই 'মঙ্গলের' মূল উপায় হল রুর। এই রুর পেতে গেলে চাই যুদ্ধ আর না হয় পুনর্মিলন। যুদ্ধে রাশিয়া জড়াতে নারাজ। অতএব বাকি রইল পুনর্মিলন। ছেলেমানুষি ক'রে সেটা সম্ভব হয় নি। হুমকি দিয়েও যে তা হবার নয় ত' সেকথা দেখাই গেছে। বৈঠকের আলোচনায় গালমন্দ ছাড়া আর কিছু যে বড় একটা হয় না তার বৃহত্তর প্রমাণ হল U. N. O. এবং ব্যক্তিগত প্রমাণ হল আপনার (আমার তো বটেই!) সংসার। অতএব হয় ঐ পুনর্মিলন হবার হয়, আর না হয় হবে যুদ্ধ!!!

ওঁ শান্তি। শান্তি॥ শান্তি!!!

॥ দশ ॥

আবার প্রদর্শনী

দেশ দেখা (কাঁধে ক্যামেরা না ঝুলিয়ে। ওটা করলেই সবাই ধরে নেয় যে, পকেটভর্তি ডলার আছে!) আর বামপন্থী ইন্টেলেকচ্যুয়াল হবার প্রচেষ্টায় রাজনীতিক খোঁজখবরের মাঝে-মাঝেই ছবি দেখি। মাঝে মাঝে শ্রীমতী নায়িকার সঙ্গে দেখা হয় নগরের আনাচে-কানাচে। নাগরদের সঙ্গে আর পাজির সঙ্গে দেখা হয় হোটেলের লবীতে। দেশ থেকে আসার সময় কুটিরশিল্পের নিদর্শন এনেছিলাম ছোট ছোট পুতুল, হাতে আঁকা কার্ড, হাতির দাঁতের খেলনা। প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি দেশের প্রত্যেকটি প্রতিনিধির মধ্যে সেগুলো বিতরণ করে পাজি দাদাকে করেছি একমেব অদ্বিতীয়ম্। এতে অবশ্য নিজেদের জাহির করার বাসনা ছিল না, ছিল আমার দেশের সৌন্দর্যকে নানান দেশে ছড়িয়ে দিয়ে বন্ধুত্বের আসন পাতা। আমরা সবাই সমগোত্রীয়, একই শিল্পের সাধনায়, নানান মত দিয়ে আর বিভিন্ন পথ দিয়ে চলেছি একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ভাষা আমাদের আলাদা, ভাব আমাদের বিভিন্ন কিন্তু আদর্শ আমাদের এক। আলোছায়ার সীমায় সৌন্দর্যের সৃষ্টি। কেউ সেটা করছে নাটকে, কেউ কাহিনীতে, কেউ কল্পনার জাল বিছিয়ে আর কেউ ক্যামেরার কারসাজি

দিয়ে। পথ আলাদা। পাথেয় সমান। দূর দূর দেশ থেকে আমরা এসেছি কয়েকদিনের মেয়াদে, কাছে বসে পরস্পরকে জানবো, চিনবো, ভাবের আদান-প্রদান হবে, তর্কের খণ্ডযুদ্ধ, আদর্শের ওজন। তারপর আবার যে যার পথে ফিরে যাবো, কিছু দিয়ে যাবো, কিছু নিয়ে যাবো। এই পরিমিত গণ্ডির মধ্যেও যে অসীমের সুর আছে সেইটাকে ব্যক্তিগত জীবনে ধরে রাখারই সামান্য প্রয়াস হল আমাদের আনা ঐ মাটির খেলনাগুলো। ওগুলো বেশির ভাগই মাটির—সে আমার দেশের মাটি। ওর গায়ে খড়িমাটির রং। সে আমার দেশের সৌন্দর্যবোধ। খেলনাগুলো তৈরি করেছে আমার দেশের অর্ধভুক্ত অভাব-জর্জরিত শিল্পী। আজ আমার মনে তাদের সৃষ্টির সার্থকতা। পরিনির্বাণীয় আনন্দ ওদের ঐ মাটির খেলনাগুলোর আদর দেখে। দেশে যেটার দাম দশ পয়সা, এখানে সেটার আদর দশ দিকে! ছোট্ট মাটির খেলন—তাই নিয়ে কত কাড়াকাড়ি, কত মান-অভিমান। এ বলে আমারটা ভালো, ও বলে ওরটা। এ বলে আমার চাই হু'টো—পেয়ার। ও বলে আমার চাই তিনটে। এ বলে পেঁচাও একটা আমায় দিও, ও বলে ঘোড়াও আমার চাইই। জুরি সম্প্রদায়কে ইচ্ছে করেই দিই নি। তাই নিয়ে আবার অভিমান করলেন হ্যারল্ড লয়েড (Harold)।

উনি ছিলেন টকির প্রথম যুগে প্রধান কমেডিয়ান। আমি জীবনে প্রথম টকি দেখেছিলাম ওঁরই ছবি 'Speed'। সেদিক দিয়েও উনি আমার প্রণম্য। প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণের শেষে এবং শেষ অভ্যর্থনার প্রথমে ওঁকে যখন আমাদের দেশের কারুকার্যের অনন্য নিদর্শন একটা কুঁচের মধ্যে হাতীর দাঁতের সাতটা হাতী দিলাম (দেশে তার দাম ৩০ নয়া পয়সা!) তখন ঐ বয়োবৃদ্ধকেও আনন্দে কাঁদতে দেখলাম। ওঁর ভাঙা হাতখানা আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন তোমার আদর্শ এবং চিন্তাধারার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন!

পুরস্কারের মধ্যে আভিজাত্য হয়ত আছে, কিন্তু এই অভিনন্দনের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। আমি চলেই আসছিলাম, উনি টেনে আমায় পাশে বসালেন, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। রুথ সঙ্গে ছিল। সেও বসল। মিসেস লয়েড আমার হাতখানা ধরে বললেন, আমি দক্ষিণ-আমেরিকার মেয়ে, প্রথম জীবনে নিগ্রোদের ভয় পেতাম। কিন্তু ওদের ওপর আমার দেশবাসীর বীভৎস অত্যাচার চিরদিনই আমায় বেদনা দিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে—তোমার ছবি আমারই মনের কথা, আমার মতন মেয়েদের প্রাণের কথা। এখানে আসা আমার সার্থক হয়েছে।

রুথ মিট্‌মিট্ ক'রে আড়চোখে চায় আর হাসে। যখনই ছবির কথা উঠেছে তখনই ও আমায় বোঝাতে চেয়েছে যে, আমার ছবিতে আমার চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে আমার আদর্শ। সেটা শিল্পের সঠিক ধর্ম নয়। লয়েড দম্পতির মতামত ওর মুখোমুখি। আমি ত' ভাবি উল্টো। শিল্প অবশ্যই বড়, কিন্তু সকলের কাছে নয়। যারা শিল্পের সাধক, শুধু তাদের কাছে। যারা ছবি দেখে তাদের কাছে বড়, বলার কথাটুকু, সেই ব্যক্তব্যের অভিব্যক্তিটুকু, সেই অভিব্যক্তির পেছনে প্রাণস্পন্দনটুকু। মিঃ লয়েড বললেন—

আমি মানুষ হিসেবে দেখেছি তোমার মনটা। মুগ্ধ হয়েছি। তোমার উদ্দেশ্য আমায় ভাবিয়েছে, তোমার আদর্শ মনটাকে উর্ধ্বে উঠিয়েছে। আমার অবচেতনায় তোমার বক্তব্য তার স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। বিচারক হিসেবে আমি দেখেছি অভিনয়, কলা-কৌশল আর যান্ত্রিক পটুতা। সেখানে অনেক ঘাটতি আছে।

তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই।

যান্ত্রিক পারদর্শিতার মূল্য-যাচাই সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীতে; আদর্শের গতি মন থেকে মনে, দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। ভারতের একপ্রান্তে বসে, মুষ্টিমেয় লোকের ভাষায় (অসমীয়া) আমার বক্তব্য যদি সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, যদি যান্ত্রিক পটুতাবিহীন ছোট্ট ছবির মাধ্যমে সাউথ-আফ্রিকার অ্যাপারথেড নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে অন্তত একটা সাদা চামড়াকেও কালো চামড়ার বাঁচার সামান্য আনন্দের ছোট্ট দাবি সম্বন্ধে সচেতন করে থাকতে পারি, তা হলে সেই-ই আমার অনেকখানি সার্থকতা। সোনার তকমার মধ্যে 'আমিত্ব' আছে, আর পাঁচজনের তুলনায় 'আমি বড়' তারই প্রকাশ্য স্বীকৃতি। আদর্শের ব্যাপ্তিতে আছে বৃহত্তর জীবনে বাঁচার আনন্দ।

রুথের মতামত তাই আমি মানি না। ছায়াচিত্র শিল্পে (যেটা সর্বসাধারণের জন্যে) আদর্শের স্থান কলা-কৌশলের অনেক ওপরে। বিচারক হ্যারল্ড লয়েডের চেয়ে আমার কাছে মানুষ হ্যারল্ড লয়েড অনেক বেশি আদরের। মানুষ আমি, মনুষ্যত্বই আমার কাছে বড়। ছায়াচিত্র শিল্প আমার সাধনা, তার চেয়ে বড় ওটা আমার সাজ, আমার সরঞ্জাম যা দিয়ে আমি মনুষ্যত্বের সেবা করি। সেইটাই আমার আসল সাধনা। এই সেবার মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি আসে যান্ত্রিক পারদর্শিতা, কলার কৃতিত্ব তো ভালো; তা বলে এটাকে বড় করতে গিয়ে অন্যটাকে যদি ছোট করে ফেলি তো সেটা হবে আমার সাধনার অপমৃত্যু।

প্রদর্শনীতে খান-পঁচিশেক পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখেছি।

ফ্রান্সের ছবিতে, সাধারণভাবে শিল্পকলার প্রাচুর্য আছে কিন্তু শ্লীলতার বালাই নেই; আদর্শ তো দূরের কথা। ইতালীয় ছবিতে দৃশ্যাবলীর প্রাচুর্য আছে—প্রাণের স্পন্দন নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর জীবনের ছোটখাটো ঘটনার যখন সমন্বয় ঘটে তখন সুন্দর একটা ছন্দ জেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যখন সেটা পূর্ণাঙ্গ ছবির আকারে দেখা যায় তখন ছন্দপতন ঘটে। আমেরিকান ছবিতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, যৌবনের খাপছাড়া আবেদন এবং নারী আকৃতির নিখুঁত প্রয়োগ। রুচি নেই, শিল্পীর আত্মমর্যাদারও মর্মান্তিক অভাব। আলিয়া কাজান (Elia Kazı) ইন্টেলেকচ্যুয়াল মহলে প্রণম্য পরিচালক। তাঁর ছবিতে যৌন-সমস্যার ভোজবাজি। বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির আরও একখানি নিকৃষ্ট নিদর্শন। ইংরেজি ছবি সাধারণভাবে মন্দ নয়, শিল্পচাতুর্য না থাক, আভিজাত্য আছে। জাপানের ছবি আরও একটা 'মনোগাটারি'—অর্থাৎ আমাদের দেশের মাইথলজিক্যাল। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং কল্পনার বিস্তারে আমাদের বোম্বাই ছবিকেও হার মানায়। পাকিস্তানের ছবি রাশিয়ার অনুকরণে তোলা; ওঁদের প্রেসিডেন্ট আয়ুবের জয়গান। মানিলা থেকে যে ছবিখানা এসেছিল তার ক্যামেরার কাজ একটু ভালো হ'লে আর ভাষাটা বাংলা হলে একেবারে আমাদের ছবি। 'মা'র ত্যাগের গল্প। আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায় মাতৃত্বের দিকে আঙুল দেখিয়ে পরিচালক বলতে চেয়েছেন যে, মেয়েরা যদি মাতৃত্বের আদর্শে ফিরে না যান তা হলে পৃথিবীতে শান্তি নেই। তাঁর মতে আধুনিক সভ্যতার বিকৃত রুচির অন্যতম কারণ—মেয়েদের আত্মমর্যাদার অভাব। ছবিটা আমার মন ছুঁয়েচে।

সবচেয়ে ভালো লাগল স্পেনের ছবি 'ভিখারীর ছেলে।' ওর শেষটুকু বাদ দিলে—যেটুকু টাকা রোজগারের কথা ভেবে করা হয়েছে—ওটা সহজেই হ'তে পারত এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। ছোট্ট গল্প, ছোট্ট তার আয়তন।

একটি ভিখিরীর ছেলে, বড় ভালো। একদিন মা তার রাগ ক'রে বললে দূর হ!

ছেলেটি ভাবল মা তার খারাপ, অমন মা তার দরকার নেই। চ'লে গেল দেশ ছেড়ে। গিয়ে জুটল এক অন্ধ ভিখিরীর সঙ্গে। অন্ধের মতনই ভালোবাসে তাকে। সেবা করে, যত্ন করে, পারলে তার জন্যে প্রাণটাও দিয়ে ফেলে। একদিন দেখল লোকটা অন্ধ নয়, শয়তান।

গিয়ে জুটল এক পাদরীর সঙ্গে। ছেলেটির অনেক দিনের বাসনা ধর্মজ্ঞদের সেবা করবে। সুযোগ পেয়ে ধন্য হল। যীশুর কাছে চুপি চুপি ব'লেও ফেলল তোমার পায়ে নমস্কার! এসে দেখল পাদরী চোর, জোচ্চোর, ভণ্ড। মর্মাহত হ'য়ে আবার বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল ছোট্ট শহরের এক নোংরা গলিতে, ভিক্ষে ক'রে রোজগার করল বেশ দু-চার পয়সা। খাবার কিনতে গিয়ে দেখল ওরই সমবয়সী একটি খোঁড়া মেয়ে ব'সে ব'সে কাঁদছে। আলাপ হল, ভাবও হল এবং ছেলেটির দয়াও হল তার কথা শুনে। উজাড় ক'রে তাকে দিয়ে দিল নিজের শেষ সম্বলটুকু। দেবার সময়কার তার সেই অভিব্যক্তিটুকু আমার স্মৃতির ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ। তার সেই হাসির আর দেওয়ার পর তার হাত ঝাড়ার তুলনা নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের মধ্যেও ঐ প্রাণস্পন্দন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ওকে বসিয়ে রেখে, মেয়েটি 'আসছি' বলে চলে গেল আর এলো না। দু'দিন দু'রাত্রি ছেলেটি ব'সে রইল মেয়েটির অপেক্ষায়—তারপর বের হল খুঁজতে। এক অখ্যাত গলিতে তার দেখা পেল। সে খোঁড়াও নয় ভিখিরীও নয়, আর তার মা অন্ধ নয়। মেয়েটি মিথ্যে কথা বলে তাকে ঠকিয়েছে। ছেলেটি ফিরে গেল তার মা'র কাছে।

গল্পের মধ্যে এমন সারল্য আর গল্প বলার মধ্যে এমন সাবলীল গতি সাধারণত চোখে পড়ে না। অচেনা, অজানা শিল্পী নিয়ে ছবিটা স্পেনের পথে পথে তোলা। ক্যামেরা দেখছে এবং দেখাচ্ছে, তার মধ্যে আমিত্বের বালাই নেই। জীবনের টুকরো-টুকরো ছবি, বাইরে থেকে তুলে এনে চমৎকার একটা নাটকীয় কাঠামোর মধ্যে সাজানো হয়েছে। স্বচ্ছ, সজীব এবং সুন্দর। মাকে সরিয়ে রেখে এবং মাতৃত্বের উল্লেখ না করে সারা ছবিতে তাকে এমন ভাবে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দেওয়া পরিচালকের অক্ষয়কীর্তি।

এই ছবিটি প্রথম এবং প্রধান পুরস্কার পেয়েছে বলেই মনে হয় জুরীদের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং সমঝদার মানুষ দু-চারজন ছিলেন; নইলে ভারতীয় জুরীটির নমুনা দেখলে অবাক মানতে হয়। তিনি আমাদের স্বনামধন্য পরিচালক; ব্যক্তিগতভাবে তাঁর খানদান আছে, অতীতের সিনেমা জগতে তাঁর পুকারও ছিল এবং কিছুদিন আগে রঙ দিয়ে ভারতের অন্যতম বীর রমণীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার অভিযোগও অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ক'রে থাকেন। তাঁর 'খানদান' (বংশমর্যাদা) যাই হোক আর 'পুকার' (চিৎকার!) যতদূর থেকেই শোনা যাক, ছবির মান বিচারের ব্যাপারে তাঁর মন বোঝা গেল এক পার্টিতে। প্রশ্ন করলেন—ছবি দেখছেন খুব?

প্রত্যেকটা।

প্রত্যেকটা? আপনার ধৈর্য আছে।

আপনার তো ধৈর্য হারাবার কথা নয়?

একগেলাস হুইস্কি একচুমুকে খালি ক'রে বলেন—

দেখবার মতন ছবি কি আছে একটাও। কোনটাই ছবি নয়, ছেলেখেলা!

একটিই দেখবার মতন ছবি দশ বছরের মধ্যে হয়েছে—ক্লিওপ্যাটরা!

কথাটা শুনে একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ে গেল। সেটা ওঁকে বলবার সুযোগ উনি নিজেই ক'রে দিলেন। প্রশ্ন করলেন, কেমন লাগছে বার্লিন?

ছোট্ট গল্পটা বললাম। আমার বন্ধুর দাদামশায়ের এক অতি প্রিয় চাকর ছিল। সে প্রভুর সঙ্গে সারা বিশ্ব বেড়ালো রাজকীয় ব্যবস্থায়। তৃতীয়বার বিশ্ব পরিভ্রমণের পর যখন সে দেশে ফিরল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম কাকা এতো দেশ তো দেখলে, কোনটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগলো?

অম্লানবদনে কাকা বললেন, লণ্ডন দেখলাম আর পারসীও (প্যারিস) দেখলাম, কিন্তু বাবা আমার বনগাঁওর কাছে কিছুই কিছু না!

সত্যি! জুরী মশাই হাসলেন।

মনে মনে আমিও হাসলাম।

ছবি দেখেছি, ভালোও লেগেছে, কিন্তু মন ভরে নি। সব ছবিই যেন ছন্নছাড়া। কিসের যেন মস্ত অভাব। অনেক ভেবেছি, কূল-কিনারা পাই নি। যত দিন যাচ্ছে, যত ছবি করছি তত আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ছে, কিন্তু কোথায় সেই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়? দর্শকদের কি ভালো লাগছে, কেন ভালো লাগছে, সে নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই—আছে শুধু 'নতুন কিছু করার' মিথ্যা অহংকার। প্রদর্শনীর আলোচনা-সভায় প্রতিদিন যেসব কথা হত—বেশির ভাগই দো-ভাষীর মাধ্যমে—তাতে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা গেল। ছায়াচিত্র শিল্পের উদ্দেশ্য আর আদর্শের মানদণ্ডে পৃথিবীকে তিন দলে ভাগ করা যায়। একদল হল মার্কিন আদর্শে অনুপ্রাণিত, যাঁদের কাছে ছবি হল অবসর বিনোদন, সাময়িক আনন্দের সামান্য উপকরণ; মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্লেদ ও গ্লানি থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ছবি হল নিছক ব্যবসা, যার প্রধান মূলধন হল মানুষের রিপুগুলোকে সুড়সুড়ি দেওয়া।

দ্বিতীয় দল ফ্রান্সের অনুগামী। তাঁদের কাছে দর্শক হল মুর্খের দল, যাদের ভগবান পাঠিয়েছেন গাধা করে, কেবল পাঠাবার সময়, বোধ হয় ভুল করেই ল্যাজটা লাগাতে ভুলে গেছেন। আলোচনা-বৈঠকে ফরাসী পরিচালক, জোর গলায়, টেবিল চাপড়ে এবং নিতান্ত দুর্বোধ্য ভাষায় অকথ্য গালাগাল দিলেন দর্শকদের, আর বুঝিয়ে দিলেন আমাদের যে, রেনোয়াঁর পর থেকে ও দেশে শিল্পের মানদণ্ড নিয়ে যে গবেষণা চলেছে, তার বিন্দুবিসর্গও কেউ এখনও সঠিকভাবে বোঝে নি। আমার ছবি প্রসঙ্গে বললেন, এটা গল্প, আদর্শও কিছু আছে—কিন্তু ছবি নয়! স্পেনের ছবিটাও ছবি নয়, ক্যামেরা নিয়ে ছেলেখেলা।

প্রশ্ন করলাম—আপনার মতে শ্রেষ্ঠ ছবি কোনটা?

অকপটে ভদ্রলোক বললেন—সেটা এখনও তৈরি হয় নি, তবে কাছাকাছি গেছে জাঁ ককটোর 'অরফি'।

লণ্ডনে থাকাকালীন জাঁ ককটোর অরফি দেখার সৌভাগ্য (এবং পয়সার কথা ভাবলে দুর্ভাগ্য!) আমার হয়েছিল। প্রথমবার একলা, দ্বিতীয়বার একজন ফরাসী বান্ধবীর সঙ্গে (বয়োবৃদ্ধা, কাজেই সন্দেহ করার কিছু নেই!) এবং তৃতীয়বার য়ুনি-ফ্রান্সের সৌজন্যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বসে। দেখার বহর দেখে দেখতেই পারছেন যে, ছবির মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝি নি। প্রথমবার ছবির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না, ভাবলাম, বোধ হয় ভাষার জন্যে। পরদিন নিয়ে গেলাম ফরাসী বান্ধবীকে (টিকিট ছাড়া, ট্যাক্সির খরচ এবং খাওয়ানোর অর্থদণ্ড লেগেছিল!) তিনি ছবি দেখলেন না, ইংরেজি ভাষায় আমায় ডায়লগ ব'লে গেলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। চারিধারের লোকদের রাগে চিৎকার করার কথা। উল্টে তাঁরা দেখলাম খুশিই হলেন। জানা গেল ছবিটা শেষ হবার পর। একজন মন্তব্য করলেন, আমরা সবাই সমগোত্রীয় 'অরফি' না-বোঝার সম্প্রদায়ে লাইফ মেম্বর!

ফেরার পথে ফ্রান্সের মাটিতে পা দিয়েই মনে পড়ল ককটোর কথা। আধুনিক ফ্রান্সে উনি অনন্য ইন্টেলেক-চুয়াল। ডলারের নামে য়ুরোপ যেমন মুগ্ধ, ককটোর নামে তেমনি ফ্রান্স। ককটো ছাড়া আর একজন বামপন্থী ইন্টেলেকচ্যুয়ালকে ওঁরা আমল দেন—তাঁর নাম কার্ল মার্ক্স।

শরণাপন্ন হলাম য়ুনি-ফ্রান্সের। বহির্জগতে ফরাসী ছবি দেখানোর ভার ওঁদের। ওঁরাই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা। ছবি দেখারও। ছবির শেষে স্বয়ং স্রষ্টা আমায় বুঝিয়ে দিলেন ছবির মর্ম কি এবং সার্থকতা কোনখানে। সেইটাই সংক্ষেপে বলি।

ওঁর মতে মানুষের তিনজোড়া চোখ। একজোড়া মুখে এবং বাকি দু'জোড়া মনে। দেহের চোখ দিয়ে দেখে সামনে যা কিছু ঘটছে—অর্থাৎ বর্তমান। মনের একজোড়া দিয়ে দেখে অতীত, অন্যটা দিয়ে ভবিষ্যৎ। অতএব, এতদিন একজোড়া চোখ দিয়ে যদি এত প্রচুর আনন্দ ওরা পেয়ে থাকে, তা হলে একসঙ্গে তিনজোড়া চোখ দিয়ে ছবি

দেখলে পাবে তারও তিনগুণ বেশি। তারই পরীক্ষা হল 'অরফি'।

অরফিতে প্রত্যেকটি ঘটনার তিনটে রূপ। এক নম্বর যেটা চোখের সামনে ঘটছে, দু'নম্বর, যেটা অতীতে ঘটেছিল এবং তিন নম্বর, যেটা ভবিষ্যতে ঘটবে। উদাহরণ দিই তা হলে। কলকাতার মাঠে বসে দেখছি ফুটবল ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান। এটা ঘটছে এবং চোখ দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের একটা অংশ দেখছে শিয়ালকোটে ফুটবল তৈরির কারখানা (অতীত); এবং অন্য অংশটা দেখছে —ম্যাচ জিতেছে বলে মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারীর সেইদিন রাত্রে চিংড়িমাছের কাটলেট খাওয়ার আনন্দ!

আলোচনার প্রয়োজন বোধ করলাম না। ব্যস্ততার অজুহাতে উঠে দাঁড়ালাম। বিদায় নেওয়ার আগে প্রশ্ন করলাম—আপনার পরবর্তী ছবি কি?

গর্বভরেই বললেন—আপাতত কিছু করছি না। দর্শকদের মন এখনও ঠিক তৈরি হয় নি।

সেটা কি করে হবে বলে আপনার মনে হয়?

কখনই হবে না।

কেন?

ওরা নির্বোধ।

বৈঠকের ভাষণে ফরাসী পরিচালক পরোক্ষভাবে আমাদেরও ঐ দলেই ফেলে দিলেন। উনি বললেন আজ ফরাসী দেশে ছবির একান্ত দুরবস্থা। আমরা যত এগিয়ে চলেছি, দর্শক তত পেছিয়ে পড়ছে। এই ধরুন না গত বছর। আমরা ছবি করেছি একানব্বইটা, দর্শক দেখেছে তার মধ্যে মাত্র এগারোটা। বাকিগুলো সব ফ্লপ করেছে বক্স অফিসে। আর ঐ এগারোটা ছবিই হল জঘন্যতম। শিল্পের বালাই নেই, আছে খালি গল্প, নাটক। সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। সিনেমাটা গল্প বলার জন্য নয়। সিনেমার ধর্ম হল দর্শককে নতুন জগতে পৌঁছে দেওয়া, যেখানে পায়ে হেঁটে সে যায় নি, কল্পনার পথ বেয়েও যেতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি···

তৃতীয় দল হল আমাদের মতন ছোট আয়তনের ছোট্ট মানুষগুলো যারা গল্পের পেছনে দাঁড়িয়ে আর, (কখনও কখনও) আদর্শের একটা পরিধি টেনে ছবি বানাই দর্শকদের সামনে রেখে। আমাদের কোন জাত নেই, কুল নেই, ভবিষ্যতের কিনারা তো নেইই। বামপন্থী প্রগতিশীল ইন্টেলেকচ্যুয়ালদের ভাষায় আমরা ক্রশ ব্রীড, ফিল্ম-ক্রিটিকদের মতে আমরা সাধারণ, দর্শকদের ভাষায় কখনও আমরা মন্দ নয়, কখনও ভালো, কখনও চমৎকার। অনেক সময় অতি বাজে। এই দলে আছে পুরো ভারত নয়, বাংলা দেশের অধিকাংশ, স্পেন, ডেনমার্ক, বৃটেন, জার্মানী এবং বোধ হয় বেশিটা জাপান। ইতালিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ আমেরিকার অনুগামী, এক ভাগ ফ্রান্সের ফোড়ে আর এক বড় ভাগ আমাদেরই সমগোত্রীয়।

আলোচনায় একটা কথা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। ছায়াচিত্র শিল্পের সঠিক মানদণ্ড এখনও স্থির হয় নি। শিল্পসৃষ্টির মূল্য নির্ধারণ অবশ্যই সহজ নয় কিন্তু মানদণ্ড ঠিক না হলে, সেটা আরও শক্ত। পৃথিবীব্যাপী, বিশেষ করে য়ুরোপে বছর বছর হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। নানান দেশ থেকে নানান ভাষায় নানান রকম ছবি যাচ্ছে নিয়ত। এতদিনে একটা কোন মাপকাঠি অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয় নি। সাধারণত দেখা যায় প্রতিনিধি হয়ে যারা যায়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই যায় অবসর বিনোদনের জন্য (ফরাসী দল), নয় তো যায় ছবি বিক্রি করে অর্থোপার্জনের জন্য (আমেরিকা, বৃটেন, জাপান)। কেউ কেউ যায়, ফিরে এসে নিজেকে জাহির করার জন্য (ভারতবর্ষ)। আরও একদল যায়, যারা ছোট, নগণ্য, ছবির পর ছবি দেখে, ছবি নিয়ে ভাবে, কিন্তু অর্থ এবং সুযোগের অভাবে তাদের ভাবনাটা দৌড়দৌড়ি করে আশা থেকে হতাশার মধ্যে।

এইভাবে যদি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ধারা বইতে থাকে, তা হলে শিল্প হিসেবে ছায়াচিত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতে, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে অর্থাভাবে প্রযোজক হাত গুটিয়ে বসছে—চিন্তা তো দূরের কথা; ফ্রান্সে সরকার টাকা জুগিয়েও কূল-কিনারা পাচ্ছে না; ইতালিতে, বৃটেন, স্পেন এবং জার্মানীতে সরকার প্রচুর অর্থ সাহায্য ক'রে এবং ট্যাক্সের ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধা না করে কোনরকমে ছায়াচিত্র শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এইভাবে ছবি হবে হয়ত, ছবির ভবিষ্যৎ গড়বে না। অথচ সেটারই প্রয়োজন এবং যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

আমার মনে হয় য়ুরোপের সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী-গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। কোথাও দেখানো হোক, যাকে ক্রিটিকরা বলেন সাধারণ ছবি। অর্থাৎ গল্প, নাটক আর উদ্দেশ্য এবং আদর্শের মিলনে যে ছবির ভিত্তি। এক জায়গায় দেখানো হোক পরীক্ষামূলক ছবি, যাকে বলা হয় ইন্টেলেকচ্যুয়াল, প্রগতিশীল, প্রগ্রেসিস্ট ইত্যাদি। আর এক জায়গায় চলুক যত আমুদে ছবি—হৈ, হুল্লোড়, হাল্কা নাচ, গান, যৌন আবেদন—যে সব ছবিতে পয়সা বানাবার যত প্যাঁচ পয়জার। এমনিভাবে ধারা ভাগ করলে প্রতিযোগিতা সহজ হবে, বিচারের একটা সাধারণ মানদণ্ড পাওয়া যাবে এবং খানিকটা একঘেয়েমি থাকলেও ঐক্যসূত্রে একটা পাওয়া যাবে।

তারপর এই তিনটি ধারার বিশেষ ছবিগুলো নিয়ে সারা

পৃথিবীতে, বিশেষ করে যে সব দেশে ছবি তৈরি হয় সেই সব দেশে বাৎসরিক প্রদর্শনী করলে ছবিগুলো পয়সা পাবে, শিল্পধারার ক্রমবিকাশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে এবং সবচেয়ে বড় কথা প্রতিনিধি হিসেবে মুষ্টিমেয় যে ক'জন বিভিন্ন প্রদর্শনীতে গেছেন—তাঁরা ছাড়া অন্য অসংখ্য টেকনিশিয়ান এবং দেশের জনসাধারণ পৃথিবীর সত্যিকার ভালো ছবিগুলো দেখবার সুযোগ পাবে। এখন এর কোনটাই হয় না। আমার দেশের শতকরা নিরানব্বইজন টেকনিশিয়ান নিতান্তই কূপমণ্ডূক। তাদের ভালোমন্দ বিচারের মানদণ্ড হল তাদের নিজেদের ছবি। আমার দেশের অল্পবিস্তর প্রায় দর্শকই বাংলার বাইরে দেখেছেন হলিউডের ছবি আর তার খুড়তুতো ভাই বম্বের ছবি। ছবি সম্বন্ধে এঁদের সকলেরই জ্ঞান বাড়া প্রয়োজন, এই শিল্প সম্বন্ধে সহানুভূতি হওয়া দরকার এবং এই শিল্পের ক্রমোন্নতি বিষয়ে সচেতন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তা না হলে ছায়াচিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং এই শিল্পের সাধকদের অপমৃত্যু অনিবার্য।

এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় অপরাধী ভারত সরকার। মোরারজী তাঁর বাজেটে বলেন প্রযোজক চোর, কালো বাজারী, সমাজের কলঙ্ক অথচ এই শিল্পের দিকে এক কণাও এঁদের দৃষ্টি নেই। বছরের শেষে কয়েকজন নিতান্তই গবেট লোককে দিয়ে কয়েকটা ছবির পরিচালক আর প্রযোজকদের গলায় মেডেল ঝুলিয়েই এঁদের দায়িত্ব শেষ করেন। যে ছবি একেবারে চতুর্থ পর্যায়ের তাকে প্রথম শ্রেণীতে ফেলে আর সত্যিই ভালো ছবিকে অবজ্ঞা ক'রে এঁরা ছবিকে অপমানই শুধু করেন না, এই শিল্পের ভবিষ্যতকেও ঝরঝরে করে দেন। এই ধরণের একটা নয় বহু দৃষ্টান্ত প্রতি বছর পাওয়া যায়। লোকে মেডেল দেখে, ছবি দেখে, আর আমরা—যারা ছবি নিয়ে ওঁদের সামনে দাঁড়াই—দেখি ঐ বিচারকদের। তাঁদের মধ্যে কেউ অসফল পরিচালক যিনি পর পর আট-দশখানা ছবি করে গালাগাল আর ঋণের বোঝা ছাড়া কিছু পান নি, কেউ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সুন্দরী, পয়সা দিয়ে কালচার কিনে ইন্টেলেকচ্যুয়াল হয়েছেন; কেউ—যাক গে। এ প্রহসন চলবেই যতদিন না আমাদের আত্মাভিমান নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবো। এ বিষয়ে যাঁকেই প্রশ্ন করি তিনিই বলেন, ঠিক বলেছেন—এ না হ'লে উপায় নেই। উপায় তো নেই বুঝলাম, কিন্তু আমরা করছি কি? সোজা কথায়, কিচ্ছু না।

আমাদেরই একজন নামকরা প্রযোজকের সঙ্গে এ বিষয়ে একবার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। প্রযোজক হিসেবে তাঁর পরিচয় খুব বড় না হলেও, পয়সার দিক থেকে আর সরকারী মহলে পসারের দিক থেকে তিনি অজেয়। নানান কথার পর যখন তিনি আর আমার কথায় সায় দেওয়া ছাড়া পথ পেলেন না, তখন সুন্দর পানের ডিবে থেকে চারটে পান একসঙ্গে মুখে পুরে আর কাঁচি পাড় ধুতির

কোঁচাটি ঝেড়ে বললেন—চট ক'রে কিছু করা ঠিক হবে না, বুঝলেন। আসল ব্যাপার কি জানেন, এই ধরণের কিছু করতে গেলে সুযোগ চাই···মানে প্রসপেক্ট চাই!

ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই প্রসপেক্টের আশায় দিন গুণছি। তবে আমার দেশে প্রসপেক্টটা যে কি রকম তা বোঝাতে গেলে একটা ছোট্ট গল্প বলতেই হয়—

দুই গাধা ছিল। একটা ছিল ধোপার গাধা আর অন্যটা ছিল সার্কাসের। ধোপার গাধাটা ইয়া মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস। কিন্তু সার্কাসের গাধাটা রোগা টিং-টিংয়ে। একদিন দুই গাধার দেখা হল নদীর ধারে।

ধোপার গাধাটা নিতান্ত সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিতে সার্কাসের গাধাটাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বললে—কেন দাদা প'ড়ে আছো সার্কাসে। চলে এস আমার মনিবের কাছে। কাজ কম, খাওয়া প্রচুর।···এই দেখ না, সকালবেলা মোট নিয়ে আসি, সারাদিন চ'রে বেড়াই আর সন্ধ্যে হলে আবার মোট নিয়ে ফিরে যাই···আবার সারারাত ঘাস খাই। যেদিন ভালোমন্দ কিছু খেতে ইচ্ছে করে, মোট থেকে সার্ট ধুতি শাড়ি যা ইচ্ছে খেয়ে নি!···আর তুমি? সারাদিন কাজ আর কাজ···

সার্কাসের গাধা এক মুহূর্ত কি ভাবল তারপর বললে—না ভাই, সার্কাসের চাকরি ছাড়া হবে না। ওখানে প্রসপেক্ট আছে।

ধোপার গাধা জিজ্ঞেস করল—প্রসপেক্ট? কি রকম শুনি?

সার্কাসের গাধা বললে—শো'র আগে প্রতিদিন সকালে রিহার্সাল হয়। ম্যানেজারের সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটা আমার পিঠে চ'ড়ে নানান রকম খেলা প্র্যাক্টিস্ করে। মাঝে মাঝে সে যখন পড়ে যায় তখন ম্যানেজার বলে, এবার যদি পড় তা হলে ঐ গাধার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব। ঐ কবে আবার মেয়েটি পড়বে এবং ম্যানেজার আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে তারই আশায় বসে আছি···সেই আমার প্রসপেক্ট!

আমাদেরও ঐ প্রসপেক্ট। হোক, তবু প্রসপেক্ট তো বটেই!!

দেখতে দেখতে যাবার দিনও এসে পড়ল। এবার ফেরার পালা। কিন্তু শেষের আরম্ভের আগে, আরম্ভের একটা শেষ থাকে। আরম্ভের সেই শেষ হ'ল আমাদের পার্টি। সেও এক প্রহসন!

আমরা সবাই গেছি প্রচণ্ড অর্থ-সঙ্কটের মাঝখান দিয়ে। সঙ্গে আমাদেরই সামান্য পুঁজি। দু চারটে জিনিস আর দু'-চারদিন ভ্রমণের সংস্থান। তবু যাওয়া মাত্রই আমাদের ডেলিগেশনের সদ্য নিযুক্ত মাথা এবং তদীয় স্ত্রী ধ'রে বসলেন পার্টি একটা দিতেই হয়। প্রায় সব ডেলিগেশনই দিচ্ছে, আমরা কেন বাদ যাই। সব ডেলিগেশন অবশ্য দেয় নি আর দিয়ে থাকলেও সব পার্টিতে সব প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ বড় একটা হয় না। আমাদেরও হয় নি—অন্তত আমার তো নয়। যাই হোক, হিসেব ক'রে দেখা গেল পার্টিটা গুটিয়ে ছোটখাটো ক'রে দিলেও লাগবে কম ক'রে আড়াই হাজার টাকা। টাকার অঙ্ক শুনেই আমি ঘাড় কাৎ! আমার কাছে আড়াই শো টাকাও নেই। আমি তো কিছুতেই রাজী না। পাজি নির্বাক। বন্ন মাদ্রাজী (Bonn থেকে আসা তাই বন্ন) নাছোড়বন্দা। পার্টি দিতেই হবে, নইলে ভারতীয় রাজদূতের মান থাকে না। অথচ এই আড়াই হাজারের এক পয়সাও ওঁরা দেবেন না, খালি দয়া করে ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। পার্টি কেন দেব, এই ছোট্ট প্রশ্নের কোন সদুত্তর উনি দিতে পারলেন না। সবাই দিচ্ছে, এটা উত্তর নয়। মার্কিনী ডলার আমাদের নেই, ফ্রান্সের উৎসাহ আমাদের নেই, ইতালির মতন জার্মানীতে বিস্তারিত ছবির ব্যবসা আমাদের নেই। বৃটিশ ডেলিগেশন এসেছে সরকারের টাকায়, সরকারি টাকা আমাদের নেই। জাপান থেকে এসেছে ওখানকার এসোশিয়েশনের প্রতিনিধি। আমাদের এসোশিয়েশন আমাদের আসার ব্যাপারে বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটি নাড়ে নি—তা হলে?

রাজদূতের মান থাকে না—তা হলে রাজদূতের উচিত পার্টিটা দেওয়া। তা ছাড়া ভারত সরকার যদি দশ হাজার টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে প্রতিনিধি আনতে পারেন, (সস্ত্রীক)—পার্টিতে পার্টিতে মদ খাবার জন্য, তা হলে অন্যদের মদ খাওয়াবার জন্য এ পার্টিটাও নিশ্চয় দিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত বন্ন মাদ্রাজী বলতে বাধ্য হলেন আই বেগ অফ ইউ!

'বেগ'-এর পরে আর বাক্যব্যয় সম্ভব নয়, কাজেই একদিন ভাববার সময় নিয়ে ফিরে এলাম। ফেরার পথে পাজিদা' বললে, বুঝলে দাদা এ ঘোর অন্যায়, জুলুম, এ হতেই পারে না!

পরদিন সকালে পাজির সঙ্গে দেখা হল না, অগত্যা একলাই গেলাম রাজদূত ভবনে, পার্টি যে আমরা দিতে পারব না—সেই খবরটা জানিয়ে দিতে। আমায় দেখেই মাদ্রাজী সাহেব স-উৎসাহে উঠে এলেন, সোজা নিজের ঘরে নিয়ে বসালেন, কফি আনার হুকুম দিলেন আর হাতে আমার একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলেন। নামের তালিকা। অবাক হলাম। মাদ্রাজী সাহেব স-উৎসাহে জানালেন গত রাত্রে ফরাসী ডেলিগেশনের পার্টিতে পাজি পার্টি দিতে রাজী হয়ে গেছে।—এবং পাছে আমি মত বদলাবার অবকাশ পাই, তাই আমার আসার আগেই মদের অর্ডার চলে গেছে বেলজিয়ামে!

হাসব কি কাঁদব ভেবেই পেলাম না। পাজির সঙ্গে দেখা হল প্রদর্শনী-দপ্তরে। ও আমায় দেখে আর হাসে, তারপর ছেলেমানুষের মতন আত্মসমর্পণ করে বললে—বুঝলে না, মানে··এই তো আনন্দ···হেঁ হেঁ হেঁ···যাকে বলে প্রেস্টিজ!

নেমন্তন্নের চিঠি গেল রাজদূতের নামে—অর্থাৎ উঁরাই যেন পার্টি দিচ্ছেন আমাদের আপ্যায়ন করার জন্য। নেমন্তন্নের লিস্টটা আজ ঠিক আমার মনে নেই—তবে এইটুকু নিশ্চয় মনে আছে যে, তাতে ফিল্মের প্রতিনিধি ছিলেন জনা-তিরিশ, রাজদূতের স্থানীয় বন্ধু ছিলেন শ'-দেড়েক আর আমাদের কলকাতার কোন ছু'টো নামকরা কাগজের য়ুরোপীয় প্রতিনিধির বিভিন্ন দেশীয় মহিলা বন্ধু ছিলেন জনা-কুড়ি। এই সাংবাদিকটি থাকেন ফ্রান্সে, ঘুরে বেড়ান সারা য়ুরোপ আর মদ খান সারা দিনরাত। এই সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে সময়টুকু পান, মহিলা বন্ধু আবিষ্কার করে বেড়ান—ভদ্রসমাজের বাইরে। কাজে উনি জার্নালিস্ট, মহিলা-মহলে একেবারে জেনারেল! উঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হল আমাদের ছবি দেখানোর দিনে। হল থেকে বেরিয়ে আসতেই হাতখানা ধরে আচ্ছা জোরে ঝাঁকানি দিয়ে খাঁটি বাংলায় বললেন—আপনার ছবি ভালো কিন্তু মতের সঙ্গে মিল নেই!

মানে?

আপনি বলেছেন সব মানুষ সমান। আমি বলি সব মেয়েমানুষ সমান! নিজের অনবদ্য রসিকতায় নিজেই হেসে খুন।

আমার সঙ্গে উঁর পার্থক্য আরও কিছু আছে। আমি ছবিতে বলেছি সব মানুষ সমান। ব্যক্তিগতভাবে সেটা জীবনে মেনে নেবার চেষ্টাও করি। সব সময় পারি এ কথা বলব না, তবে পারতে হবে এ কথা ভাবি। উনি মহিলা-সংক্রান্ত-ব্যাপারে প্রতিদিনকার কাজে প্রমাণ করেছেন যে, ওঁর মতামত উনি মনে-প্রাণে এবং দেহে পালনও ক'রে থাকেন, কিন্তু ওঁর কথার মালা কার কাজে লাগবে? শুনেছি ওঁর কাগজে উনি লিখেছেন যে, ভারতীয় প্রতিনিধিরা বার্লিনে নাকি 'বেলেল্লাগিরি' করেছে এবং এখানে অনেকে সে কথা বিশ্বাসও করেছেন। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য—আমাদের 'বেলেল্লাগিরি'টা নয়, ওটা যদি আমরা নিতান্ত মূর্খের মতন প্রকাশ্যভাবে একান্তই করে থাকি—তা হলে এমন কিছু করি নি, যা আর পাঁচজনে করে না (পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, আর সবাই গোপনে করে আর আমরা করে থাকলে প্রকাশ্যে করেছি—নইলে জানাজানি হবে কি করে!) দুর্ভাগ্য হল নামকরা জাতীয়তাবাদী পত্রিকার এমন জঘন্য প্রতিনিধি। আমাদের কথিত 'বেলেল্লাগিরি' ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চরিত্রের কলঙ্ক; ওঁর 'বেলেল্লাগিরি' আমাদের দেশের কলঙ্ক, আমাদের জাতির কলঙ্ক। শুধু তাই নয়, ওঁর সঙ্গে আলাপ আছে মনে পড়লেই নিজেকেও কলঙ্কিত মনে হয়। যাবার আগের দিন এসেছিলেন আমাদের হোটেলে—কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য চাইতে। পাজি চালাক মানুষ। এককথায় বিদায় দিয়েছে, আমি পাঁচ কথায় বোঝাতে চাইলাম যে, আমি অপারক।

উনি জেদ ধরে বসলেন, দিতেই হবে; বললেন—প্যারিসে আসুন, দিয়ে দেব।

প্যারিসে আমি যাব না।

ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন। সে কি মশায়? প্যারিসে যাবেন না?···আসুন, আসুন···দেখবেন মদ আর মেয়েমানুষ কাকে বলে!

দেশের নামকরা জাতীয়তাবাদী পত্রিকার য়ুরোপীয় প্রতিনিধির ভাষা শুনে গা'টা ঘিন ঘিন ক'রে উঠল। ঢুকে গেলাম বাথরুমে। এসে দেখি ভদ্রলোক চ'লে গেছেন। যাবার সময়, বোধ হয় ভুল করেই আমার মেয়ের জন্য কেনা পেনটা পকেটে করে নিয়ে গেছেন।

পার্টি হল বার্লিনের বাইরে। আমাদের হোটেল থেকে ছ' মাইল দূরে—একটা বাগানের ধারে সুন্দর ক্লাবঘরে। ওর ধারেই আইফেল টাওয়ারের নকলে তৈরি ইস্পাতের তোরণ। ওপরে উঠলে সারা বার্লিনটাকে মনে হয় খেলাঘর। পয়সার অত্যন্ত টানাটানি, ট্যাক্সি নেবার ক্ষমতা নেই। মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমতী নায়িকা প্রদর্শনী দপ্তর থেকে চাইলেই গাড়ি পান। ওঁকে সারাদিনে ধরাই গেল না। পাজি তো সকাল থেকেই উধাও। বাকি রইল বন্য মাদ্রাজী। বাধ্য হয়ে তাকেই বললাম, বাপু হে যাবার সময় আমায় সঙ্গে নিও।

বাপুমশায় আমায় না জানিয়ে কখন যে পালালেন, তার হিসেব আজও পাই নি। পরদিন অবশ্য বলেছিলেন যে, আমাকে নাকি হোটেলে খুঁজেছিলেন, পান নি। ওঁর মিথ্যে কথার কায়দা দেখে নিজেকে সাধু মনে হল।

পরদিন পাজির মুখে শোনা গেল, পার্টিটা নাকি খুব জমেছিল। সে তো বোঝাই গেল শ্রীমতী নায়িকার অবস্থা দেখে। সকাল এগারোটায় প্রাতর্ভোজনের টেবিলে আমার হাত ছু'টো ধ'রে তিনি কেঁদেই সারা, বললেন—দাদা, আপনি কাল ছিলেন না সব মার্ডার! আমার আদর যদি দেখতেন···ময়···আমি···আই ওয়াজ দি কুইন অব—অফ দি পার্টি···রাণী···রাণী এলিজাবেথ্···ট্রু···

সে বিষয়ে আর যারই সন্দেহ থাক, আমার নেই। নায়িকা দিদি আদব-কায়দায় পুরোপুরি রাণী, কেবল পয়সার বেলায় যে পাজির পকেট ধরে টান মারে সেইটাই যা দুঃখু!

[ক্রমশ।

শাশ্বতী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা চক্রবর্তী

মাঘ মাসের উত্তুরে হাওয়া যখন মাত্র তার পাখা মেলেছে, বাগানভরে সাদা হয়ে ফুটেছে চন্দ্রমল্লিকা, ঠিক সেই সময়ে শুক্লা একাদশীতে শৈলেন রায়ের বাড়িতে সানাই বেজে উঠল। বিয়ে—প্রথম সন্তান তপতীর বিয়ে। আলোর মালায় হাসলো বাড়ি। ভাস্করের হাতে তুলে দিলেন শৈলেন রায় তপতীর স্বেদাক্ত পাণি। ছলছল চোখ বাবার, তারা হওয়া এণাক্ষী এসে বাসা বেঁধেছে মীনাক্ষীর উতলা বুকে। আনন্দ-উৎসব—রামকেলী, পূরবী।

—'তোমার কি কি কাজ বল তো?' নবোঢ়াকে জিজ্ঞেস করলো ভাস্কর।

—'কাজ?' চোখ কপালস্থ করল তপতী। 'কাজ আবার কি? এখন তো কেবল ফর্সা হবার চেষ্টা করব, আর সাজগোজ। তোমারই বরং অনেক কাজ বাড়ল।'

—'যথা?'

—'দেরি করে অফিস যাবে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, মার্কেটেও।'

—'মার্কেটে? কি কিনবে তুমি?'

—'বা-রে। কিনব কেন? দেখব তো সব সাজানো জিনিস দোকানের। জানো, কি যে মজা ঘুরে-ঘুরে দেখতে! এই, নড়ো না।'

ভাস্করের গায়ে সম্পূর্ণ নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল তপতী! স্বামী একটু সরবার উপক্রম করতেই বাধা দিল।

—'নড়বো না? পায়ে ঝিনঝিন ধরেছে যে।'

—'কিছু হবে না। আমার নাম করে পায়ে চিমটি কেটে দাও, এক্ষুণি সেরে যাবে। জানো না, সবচেয়ে যে ভালবাসে তার নাম করে চিমটি কাটলে ঝিনঝিন ধরা সারে? আর—।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তপতীর—'আমি তো আণ্ডার-ওয়েট। ভার আছে নাকি যে, ঝিনঝিন ধরলো তোমার?'

অতএব ভাস্করকে স্বীকার করতে হল তপতীর যখন কোন ওজন নেই, তার পায়ে ঝিনঝিন ধরতেই পারে না।

—'চল, দেখে আসি লিলির আর্ট-একজিবিশন।'

—'চল, চল। কি মজা! ওখানে জয়াদি'র ছবিও আছে।'

আর্ট-একজিবিশন। সৃষ্টিকর্তা দু'টো তুলি বানিয়ে, একটা দিয়েছিলেন বিশ্বকর্মাকে আর একটা পাঠিয়ে ছিলেন নরলোকে। অমৃতলোকের শিল্পী আকাশের রং বদলে সকাল-সন্ধ্যাকে নানা রং-এ সাজিয়ে যত ছবি আঁকতে লাগলেন; মর্ত্যের মানুষ তা ধরে রাখতে লাগলো তার তুলি দিয়ে মাটিতে, পাথরে, কাগজে।

লিলির একজিবিশনে বিখ্যাতদের সঙ্গে অখ্যাতদেরও ছবি কিছু আছে, জয়ন্তী তাদের দলে। একদা নদীকে দেখে বিস্মিতা দেবমাতা অদিতি জানতে চেয়েছিলেন—ওর এত চঞ্চলতা কিসের! কিসের খোঁজে নদী অমন উলুধ্বনি দিতে দিতে ছুটে চলেছে! একটি সেই প্রবাহিকা নদীর ছবি জয়ন্তী সোমের নামাঙ্কিত হয়ে খানিকটা জায়গা দখল করেছে। মামুলি ছবি। সকালবেলার আলো পড়েছে নদীর ছলছলে জলে। ছবিতে বিশেষ বিশেষত্ব কিম্বা রং-এর কোন কারিকুরি নেই, তবে ছবিটি সাজানোয় কিছু কারুকার্য আছে লিলির। ধারে-কাছের ছবিগুলোর মধ্যে চোখে পড়বার মত করে রেখেছে ওটা।

জয়ন্তী আর মীরাকে সঙ্গে এনেছিল তপতী। আলো আর ঝলমলে সাজগোজ দেখে ঘাবড়ে যাবার মেয়ে নয় জয়ন্তী, কিন্তু ছবির ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল একেবারে।

—'ভাল লাগছে?' প্রশ্নে চমকে তাকাল জয়ন্তী কোথায় কোথায় ঘুরছে তপতী আর মীরা। একা সে মগ্ন হয়ে দেখছিল জলরং-এর ছবিগুলি। লিলি, সঙ্গে আরো দু'টি মেয়ে। সাজে আর আভিজাত্যের গরিমায় তিন কন্যাই স্বর্গলোক বিহারিণী। একটু হাসলো জয়ন্তী

ছবির ব্যাপারে ইতিমধ্যে দু-একবার লিলির সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। পরামর্শও চেয়েছে লিলি।

একজিবিশন ওপেন টু অল। লিলিকে বলা হয়েছিল দশ টাকার কম যেন টিকিট না থাকে। ভিড় জমাবার সুযোগ যেন না পায় সাধারণ মানুষগুলো মাসের প্রথম দিকে। কথা শুনবার মেয়ে নয় লিলি, আর তার ইচ্ছাই তো সব ব্যাপারে চূড়ান্ত। দলে দলে আজেবাজে সবাই ঢুকে যাচ্ছে পাঁচ সিকির বদলে। যেন কত বোঝে ছবি! একটা পুয়োরলি লুকিং এসে গেছে একজিবিশনটাতে। একটু রাত বাড়লে তবেই উপরের মহলদের আসা চলে। সন্ধ্যার দিকে তো প্রায় ঠেলাঠেলির মত বিশ্রী ব্যাপার।

মারাঠী মেয়ে সরস্বতী ঘাটওয়ালে কলা-রসিকা। তাকে ছবি দেখাচ্ছিল লিলি, সঙ্গে বেণু। হঠাৎ জয়ন্তীকে যেন একেবারে আবিষ্কার করে ফেলল লিলি। বেশ! দেখা হয়েছে, চেনা আছে—হেসে চলে যাও, তা না, সরস্বতীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া! সঙ্গে নিয়ে বসে-পড়া চায়ের স্টলে! প্রবীর বোসের সঙ্গে এই মেয়েটার কানেকশনের কথা কে না জানে। আচ্ছা মেয়ে লিলি! সরস্বতীর সঙ্গে ছবি নিয়ে তুমুল আলোচনা চালাচ্ছিল জয়ন্তী। চোখ গোল করবার শুরুতেই বেণু আর স্টলে-বসা সব মেয়েদের মনে পড়ে গেল মেয়েটা মাস্টারণী। পেটের দায়ে জানতে হয়েছে সব খবর। বেণুদের দায় পড়েছে ছবির পুরাতত্ত্ব গবেষণায়, কবে চীন, জাপান আর ভারতবর্ষে কি হত সেই আদ্দিকালের খবরে! যদি বাংলা না জানত ঘাটওয়ালে? কি হোত? বলতে পারতো জয়ন্তী একটা কথা? আর বেণু, রমলা? ইংরেজী? ফ্রেঞ্চ বলবে অনর্গল। মারাঠী মেয়েগুলোও হ্যাংলার একশেষ, কেমন হাত জড়িয়ে চলছে দেখ জয়ন্তীর! লিলিও তেমনি।

Ah me! Ah me!' গালের বাঁ-পাশে টোল ফেললো টুন্টু মিত্তির। হাসল বেণু, রমলা।

—'আচ্ছা, লিলির এটা কি হচ্ছে? ইণ্ডিভিজুয়ালিটি, না স্বাদেশিকতা?'

জিজ্ঞেস করল টুন্টু, কিউটেক্স-করা নখের চিমটিতে একটা চিপ্‌সের আধখানা ধরে।

—'মডার্নইজম্। আধুনিকতার চরমতম প্রকাশ।' প্রায় লিলির মত শাণিত কথা বলার প্রয়াস করল বেণু।

—'ড্রইংরুম সাজাবে পচা-পুকুরের সবুজ শ্যাওলা দিয়ে।'

—'আঃ! অত কথা বলে দরকার কি? সোজাসুজি তো বোঝা যাচ্ছে ভাইয়ের জন্য জয়ন্তী সোমকে জাতে তুলবার চেষ্টা করছে লিলি। আর্টিস্ট! শেম!' উষ্মা প্রকাশ পেলো রমলার কণ্ঠে। একদা প্রবীর আর রমলার বন্ধুত্ব ঘনীভূত হবার উপক্রম হয়েছিল। খবরটা জানা সবার, তাই রমলার রাগে কৌতুকের সঞ্চার হোল বান্ধবীদের চোখে।

—'প্রবীর কিন্তু মার্ভেলাস।' সবাই স্বীকার করলো টুন্টুর উক্তি। ডেঞ্জারাস্‌লি স্পোর্টিভ! কি দেখলো জয়ন্তী সোমের মধ্যে যে, বিয়ে পর্যন্ত গড়ানোর রিউমার উঠেছে! আর শুধু রিউমার কেন। হতেও পারে বিয়ে। না হলে লিলি কি প্রশ্রয় দিত জয়ন্তীর ছবি এখানে! কি যে সব রুচি আর প্রবৃত্তি এদের! ভাস্করের মত ছেলে—পাঁচ বছর কাটিয়েছে ইওরোপে, বিয়ে করল মোস্ট ক্যাড তপতী রায়কে। এন্সিয়েণ্ট হিস্ট্রি, সেতার! হাউ ফানি! অথচ একটুও বোঝা যায় নি ভাস্করের মতিগতি। যখন যার সঙ্গে কথা বলেছে, মনে হত সেই তার হৃদয়হারিণী। লিলিকে তো প্রায় হস্তগত করে ফেলেছিল আর কি। আর্ট-একজিবিশন নিয়ে না মাতলে, কোথায় তলিয়ে যেতো তপতী। তবে—তবে হ্যাঁ। লিলি যে পারলো না, প্রায় হারলো—এ-ও একটা খুশির ব্যাপার বৈ কি! প্রবীর? নো বডি ইজ কনসার্নড্‌। একটা হাসির আর মজার গল্প। কে মিশবে জয়ন্তীর সঙ্গে?

—'তপতী, আমার পকেটে কি?'

—'কি? কি? যাঃ! কিচ্ছু না—আমাকে ঠকাবার মতলব।'

সদ্য অফিস-ফেরা ভাস্করের কাছে আসতে আসতেও ফিরে গেল তপতী। লেগে গেল নিজের কাজে—মুখ প্রসাধনে।

—'এই! লিলির লিপস্টিকের ব্র্যাণ্ড কি? তোমার আঙুলে! ও কি লাল লাল?'

নিজেকে আয়নায় নিরীক্ষণ করে মুখ ফেরাল তপতী, সন্দেহসূচক প্রশ্ন।

হাসল ভাস্কর!

অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজল বিহীন সজল নয়নে হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো

—'জানো, কবি সাজতে বারণ করেছেন, সুতরাং লিলির লিপস্টিকের ব্র্যাণ্ড জেনে কাজ নেই। বুঝছ না? আঙুলে লিলির লিপস্টিকের রং। সব সময় কেবল হিংসুটিপনার মতলব!'

ওয়ার্ডরোবে কোট ঢোকাতে ঢোকাতে কথা বললো ভাস্কর, ঢুকে গেল সংলগ্ন বাথরুমে।

—'বা রে! কি এনেছো বললে না?'

—'দেখ পকেটে।'

আধঘণ্টা পরে ভাস্কর ঘরে ফিরে এল। সেজেগুজে খাটের উপর শুয়ে পড়েছে তপতী। ভ্রূ-কুঁচকে চেয়ে আছে ঘূর্ণায়মান ফ্যানের দিকে।

—'দেখেছ পকেট?'

—'বয়ে গেছে আমার কারোর পকেট ঘাঁটতে!'

—'আঃ! এমন আলসে মেয়ে দেখি নি কখনো। বেড়াতে যাবে না? শাড়ি-টাড়ি পরে বিছানায় শুলে কেন আবার?'

—'শুলে কি হয়? আলসে? জানো—সারাদিন কত কাজ করেছি! যাও না তোমার লিলির কাছে। বাড়ি এসেই কেবল বকুনি।'

—'সত্যি। ভারি অন্যায়। আর বকুনি নয়, কি কি কাজ করলে বল।'

—'বলবো না।' ভারী মুখ করল তপতী।

—'বেশ। আমিও বলবো না কি আছে পকেটে। উঃ। ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। আমার চাপরাশি রাজু কি সুখী, বাড়ি গিয়েই বৌয়ের তৈরি গরম রুটি খায়।'

—'আহা! কি দুঃখ!' হেসে ফেললো তপতী।

—'জানো তোমার জন্য কি চমৎকার কাস্টার্ড করেছি?'

—'আর কি?' লোভী লোভী চোখে চাইলো ভাস্কর।

—'ডিমের কচুরী।'

খাওয়া শেষ করে সোফায় বসলো। হাতলের উপর বসে তার গলা জড়িয়ে তপতী।—'বল না কি আছে পকেটে।'

—'দেখ পকেট।'

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুললো তপতী, হাত ঢুকিয়ে দিল ভাস্করের দোদুল্যমান কোটের পকেটে। লম্বা খাম—তপতীর নাম, ঠিকানা কিন্তু অফিসের। সেখানে দাঁড়িয়েই পড়ে নিল চিঠি। ক্রমে চোখ বিস্ফারিত, খুশিতে জলজলে।

—'এ মা! কি কাণ্ড! কবে করলে? নাম লিখলে কার? বল নি তো কখনো। বল, বল না সব কথা।' স্বস্থানে অধিষ্ঠিতা হল তপতী। চুলের সিঁদুরে মাখামাখি গেঞ্জি।

প্রাচীন ভারত নিয়ে তপতীর কৌতূহলের অন্ত নেই, এম-এ পাশ করার পর আরো বেড়েছে। অবশ্য ইদানীং ভাল ভাল প্রসাধনের লাবণ্য বর্ধন-ক্ষমতা আবিষ্কারেই তার সব চাপা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ভাস্কর চেষ্টা করছিল যাতে তপতী গবেষণা করবার অনুমতি পায়। সব শুনে খুশি হয়েছিলেন তার নিজের প্রফেসার মিঃ গাঙ্গুলী—।

—'এ তো খুব ভাল কথা হে! গাড়ি, ক্লাব আর ইংরেজী নভেল না পড়ে, রিসার্চ করতে চান বৌমা। দত্তর কাছে আজই চল, লুফে নেবে সে, আর বৌমা তো তারই ছাত্রী।

আজ সেই চেষ্টার ফলে চিঠি এসেছে। তপতী অনুমতি পেয়েছে প্রফেসর দত্তর সুপারভিশনে প্রাচীন ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে রিসার্চ করবার।

বিস্তার করে সব বললো ভাস্কর। কত কষ্টে তপতীর নামটা নিজেই লিখেছে—তাও।

—'সকালবেলার আলসেমি দুপুরের গড়াগড়ি, পুডিং কাস্টার্ডে তদারক, রুজ-লিপস্টিকের আলোচনা স্থগিত থাক সম্প্রতি। পড়াশুনা আরম্ভ কর। মাঝে মাঝে যাবার সময় আমি লাইব্রেরিতে ছেড়ে দিয়ে যাবো, নিয়ে আসব ফিরবার পথে।'

—'ইঃ। ছেড়ে দিয়ে আসবে লাইব্রেরিতে। আমি যেন গরু, মাঠে ছেড়ে দেবে। পারবো না এত পড়তে। বিয়ের পর আবার কে পড়ে? আমি বই নিয়ে থাকব, আর নিজে ঘুরবে লিলির সঙ্গে।'

ছিটকে খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো তপতী।

—'উঁহুঁ হুঁ। ওসব আব্দার চলবে না। একটা হৈ-চৈ ফেলতে হবে রিসার্চটা নিয়ে।'

উঠে এল ভাস্কর। নত হল তপতীর মুখের উপর—

—'সোনা! আমার কত ভাল লাগে তোমার পড়া, পড়বে না তুমি?'

—'হ্যাঁ! আমি পড়বো, আর নিজে আড্ডা দেবে লিলিকে নিয়ে।'

—'পাগল! আড্ডা দেবার সময় কোথায় আমার? সকালে তোমার ঘুম ভাঙাতেই তো ন'টা বাজবে। তারপর দাড়ি কামানো, অফিস। ফিরে এসে তোমার কাজ কতটা হোল দেখা, সেতার শোনা, বেড়ানো।'

—'তোমার অফিসে তো যায় লিলি।'

—'সে তো বিয়ের আগে। এখন কেবল তোমার ফোন যায়। একদিন একদিন না হয় তুমিও যেয়ো।'

—'যাঃ! বৌ বুঝি অফিসে যায়?'

—'তখন কি আর বৌ থাকবে? আমার পি-এ হয়ে যাবে তো।'

পর্দার ওপাশ হতে শশী ডাকল—'বৌদি সান্যাল সাহেবের বাড়ির মেয়েরা এসেছে, মা ডাকছেন।'

তপতী উঠে পড়ল। হাসিমুখে একটু তাকাল স্বামীর দিকে। চলে-যাওয়া তপতীর দিকে চেয়ে ভালবাসায় ভারী হল ভাস্করের হৃদয়। এম-এ পাশ করা তার বাইশ বছরের বধূর মধ্যে বসে আছে এক উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী—চোখে তার আমের মুকুলের রং, কঠিন পৃথিবীর সঙ্গে আজো ভাল পরিচয় হয় নি। ভাগ্যিস জীবনসংগ্রাম নয় ভাস্করের, তা হলে কি আগ্নেয়াস্ত্র যোগাতে পারতো তপতী? ভাবলো ভাস্কর।

না, পারত না। মনে মনে বলল সে। তপতী শুধুই বৌ। তার ঈর্ষার প্রকাশ হয় স্ফুরিতাধরে। সে গলে যায় আদরে, ছুটে আসে হাত বাড়ালে। যদি তপতী এক শক্ত আধুনিকা হোত! ভাস্করের চোখে চোখে চাইতে পারতো নিবিড়তম মুহূর্তে? মাদকতাময়ী হোত? শিউরে উঠল ভাস্কর। না, না। এই ভাল। এই সরল, ভীতু একটু গ্রাম্য আবার বিদুষী—ভাস্কর মিত্রের বেমানান, তপতী-ই ভাল।

কতটা যে ভাল সে কথা ভাস্কর নিজেই বোঝে না। মাঝে মাঝে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে তপতী। ক্লাবে সারাক্ষণ থাকবে ওর গায়ের সঙ্গে লেগে, আর অন্যথা হলেই চোখে জল। সবাই তপতীর স্বামীর প্রেমিকা, কখন বুঝি নেবে তারা কেড়ে ভাস্করকে, তাই শক্তমুঠিতে স্বামীকে চেপে আছে সে। ভাস্কর জানে না, পুরুষ বন্ধুরা প্রায় ঈর্ষান্বিত তার ভাগ্যে। আজকাল পুরুষ পায় বেটারহাফ—আধুনিক যুগের কড়া সভ্যতার মাধুর্যহীন প্রণয়-পরিণতি। ভাস্কর পেয়েছে একটি বৌ। তাকে সে কাঁদাতে পারে, হাসাতে পারে। পূর্ণিমার রাতে বলতে পারে কানে কানে—

> And the sunlight clasps the earth
> And the moonbeams kiss the sea
> What are all these kissings worth
> If though kiss not me ?

আর তা শুনে কক্ষণো রঞ্জিতাধর তীক্ষ্ণ করে তপতী বলবে না—সিলি, ননসেন্স!

জানে কি ভাস্কর কোনদিকে চলেছে আজ সমাজ? ছেলেদের পরিবর্তন তেমন না হলেও মেয়েরা একেবারে বদলে যাচ্ছে। তাদের শাড়িটা ফ্রক করে দিলেই এক রং ছাড়া কিছুই প্রাচ্যভূমির সাক্ষ্য দেবে না। ছেলেরা সাহেব বনলেও মনে মনে তাদের তৃষ্ণা আছে এখনো একটি সহজ-সরল নারীর জন্য, যে তার মনোময়ী হয়ে থাকবে। হবে সন্তানের জননী, কল্যাণী। কিন্তু মেয়েদের যে সেই ঘরের স্বপ্ন একেবারে ভেঙে গেছে। কথার পর কথা বলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির তীব্র প্রক্ষেপণকে তারা ভাবছে প্রণয়ালাপ। শুধু জলে-ধোয়া মুখ তো প্রায় নগ্নতার মতই অশ্লীল। কেবল বিচার, বিতর্ক। কেবল আত্মসম্মানের দম্ভ। চুরমার হয়ে গেছে পুরুষের জীবন। একদিন তারাই চেয়েছিল বটে মেয়ের চোখের স্বপ্ন ভেঙে দিতে, বিলাস-লালসের সঙ্গী করতে বধূকে, তাই ইচ্ছা করলেও আজ আর ফিরবার পথ হয়ে গেছে বন্ধ।

অথচ আধুনিক মেয়েদের যে মানসিক লাবণ্য নেই, তাও সত্য নয়। কড়া কড়া প্রসাধনে ঢাকা পড়ে আছে। শক্ত হাতে ছুরি ধরলে, দেখা দেবে সব নারী-মহিমা—লাবণ্য ও লজ্জা।

পড়া, লেখা, নোট নেওয়া, বইতে ডুবে গেল তপতী। রাশি রাশি নোট, তথ্যের উদ্ধার, উদ্‌ঘাটন। কত সকাল

সন্ধ্যা হয়ে গেল লাইব্রেরিতে বসে। মা ক্ষুব্ধ, বাবা বিস্মিত। আত্মীয়-স্বজন কেউ ভাস্কর, কেউ তপতীকে দোষ দিতে লাগল। লিলি ধরলো ভাস্করকে ক্লাবে।

—'কি কাণ্ড বাঁধিয়েছ ভাস্কর!'

—'অর্থাৎ?'

—'অর্থাৎ আবার কি! বৌকে পড়তে লাগিয়েছ ফের?'

—'দোষ কি তাতে? পড়তে তো ভালই বাসে তপতী। আর এ তো পরীক্ষার পড়া নয়? প্রবন্ধ লেখা।'

হাসিতে ঝলমলে হল লিলির চোখ!

—'কেউ কোনদিন শুনেছে নূতন বৌকে লাইব্রেরিতে ঢুকিয়ে বর ক্লাবে পালায়? তপতী বোকা। আর কেউ হলে সন্দেহ করতো, স্ত্রীকে অ্যাভয়েড করছো তুমি।'

—'তুমি হলে?'

—'আমি? আমি হলে তো সন্দেহ করবার সুযোগই দিতাম না। শোন ভাস্কর,'—গম্ভীর হল লিলি—'কি তোমার বুদ্ধি! হানিমুনের সময় বৌকে লাগিয়েছ বাণিজ্যতত্ত্ব জানতে। দেখতে পাও না কত রোগা হয়ে গেছে তপতী। তোমার মাও খুব দুঃখিত হয়েছেন।'

হাসলে ভাস্কর, কিন্তু চিন্তিত হোল মনে মনে। প্রতিভা দেখেছিল সে তপতীর মধ্যে, সে প্রতিভা যেন ব্যর্থ না হয়, তাই ছিল ভাস্করের ইচ্ছা—আর তপতীও তো খুশি।

বাড়ি ফিরে ভাস্কর দেখল তপতীর হাসিমুখ, কিন্তু চিন্তা জেগে রইল ভাস্করের মনে। টেবিলের উপর জমে উঠেছে ফাইল। এলোমেলো শাড়ির আঁচল লুটোচ্ছে মেঝেতে। সত্যি! অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে তপতী! নিজেকে মারতে ইচ্ছা হল ভাস্করের।

—'তপতী, তুমি ভাল নেই?'

—'ভাল—ভীষণ ভাল। কি এনেছ?' লিখতে লিখতে হাত বাড়াল তপতী।

—'তোমার শরীর খারাপ হয়েছে।' তপতীর কণ্ঠায় একটু হাত দিল ভাস্কর, মুখ রাখলো চুলের উপর।

—'খারাপ হয়েছে? বিশ্রী লাগছে দেখতে,—না? দাঁড়াও, এক্ষুণি মেরামত করছি চেহারা। এটা লেখা হোক।'

—'আর লেখা নয়। স্নান করে এসো।' কলম তুলে নিল ভাস্কর।—'চলো একটু ঘুরে আসি।'

—'বেড়াতে? কোথায় কোথায়?' আনন্দে প্রায় নেচে উঠলো তপতী। কঠিন আঘাত পেল ভাস্কর। প্রায় তিন মাস তারা একটুও বেড়ায় নি। দত্ত কড়া লোক। বিরক্তি

প্রকাশ করেছিলেন তপতীর অমনোযোগিতা দেখে, অনুযোগ দিয়েছিলেন ভাস্করকে।

—'ও কি খাচ্ছ?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো ভাস্কর।

দু'টো সাদা বড়ি মুখে ফেলে দিয়ে হাসলো তপতী—

—'সারিডন। অসুখ?'

—'যা। কিছু না, এই একটু—দেখ না, দেখ না সবুজ শাড়িতে মানিয়েছে কি না আমায়।'

—'সুন্দর মানিয়েছে। গলা জড়িয়ে-ধরা তপতীকে আরো কাছে টেনে নিলো ভাস্কর। সুখের ব্যথায় প্রায় চোখে জল এসে গিয়েছে তার। তপতী—ওকেই তো ভাস্করের পঞ্জরাস্থি দিয়ে নির্মাণ করেছে বিধাতা, না হলে এমন করে বুকের মধ্যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় কেন সে!

—'শোন, তোমার মনে একটা কষ্ট হয়েছে।' রাত এগারোটার বিছানায় বললো তপতী স্বামীকে।

—'কি করে বুঝলে?'

—'বুঝলাম?' একটু ভাবল তপতী।—'বুঝলাম, সেই যে, তখন তুমি আমাকে আদর করছিলে, তোমার চোখ ছলছল করছিল। বল বল না কি কষ্ট তোমার?'

—'কষ্ট?' বাঁ-কনুইতে ভর রেখে ভাস্কর ডান হাত বুলিয়ে দিল তপতীর মুখের উপর।—'এখন পড়া-লেখা থাক সোনা! তুমি বড় রোগা হয়ে গিয়েছ।'

—'রোগা? আমি? জানো—আমার না'—কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল তপতী।

—'কি? কি বলছিলে?' একটু আদর করল ভাস্কর।

আস্তে আস্তে, খুব আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো তপতী। দূর। কিচ্ছু হয় নি, মিথ্যে ভাবাবে ভাস্করকে। বললো—'আমি না পড়লে, তোমার খারাপ লাগবে না?'

—'পাগল! একটুও খারাপ লাগবে না বরং বেঁচে যাবো, তোমাকে সব সময় কাছে পেয়ে। কিন্তু তোমার তো কষ্ট হবে?'

—'বা, কষ্ট কিসের! আমি তো তোমার জন্যই পড়ছি।' অন্ধকারে চকচক করল তপতীর চোখ।

—'আমার জন্য?' হতবাক ভাস্কর।

—'হ্যাঁ তোমার জন্যই তো।' আবার জোর দিয়ে বললো তপতী।—'লিলি, দেবকী, রমলা—ওরা কত জানে, কি সুন্দর। আর আমি একটা কিচ্ছু না। সবাই ভাবে তুমি ঠকেছ, একটা বাজে বৌ তোমার। তাই তো আমি এমন বিদুষী হবো, যে ওদের সকলকে ছাড়িয়ে আমার নাম উঠবে।'

—'তপতী!' দু'হাতে বুকের মধ্যে তপতীকে জড়িয়ে নিলো ভাস্কর।

সবাই খুশি হল। এই তো, এই তো কেমন সুন্দর বেড়াচ্ছে দু'জন। দুই সপ্তাহ দার্জিলিং, পুরীর সমুদ্রের ঢেউ খেয়ে, কালো হয়ে ঠোঁট উল্টালো তপতী—'সমুদ্র বিশ্রী।'

—'নাচতে শেখো তপতী, মোটা হবে।' ক্লাবে লিলি বলল।

—'আহা! নিজে যেন কত মোটা। আর রোগা বোলো না। আমি 'তন্বীশ্যামাশিখরীদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।' খুব হাসলো দু'জনে।

—'কে বানাল এমন কবিতা তোমায় নিয়ে? ভাস্কর?' লিলি জানতে চাইল।

—'দূর! ও কেন! আমার সভাকবি, মালঞ্চের মালাকারই বানিয়েছেন।'

—'ও বাবা তিনি আবার কিনি?'

—'তিনি মহাকবি কালিদাস।'

—'এত হাসি কিসের?' জানতে চাইল টুন্টু মিত্তির।

—'কবি কালিদাস তপতীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন।' হাসতে হাসতে বলল লিলি।

—'কালিদাস! কবি? নামটা একটুও পোয়েটিক নয় কিন্তু।'

—'ওদের ফ্যামিলীটারই ওরকম নাম, জানো না তুমি?' জ্ঞান দিল দেবকী।—'কালিদাস, চণ্ডীদাস, কাশীদাস।'

—'তুমি তো বেশ জানো দেখছি। ওদের সম্বন্ধে পড়ছো-টড়ছো না কি?'

—'আমি? স্টাডি ইজ মাই হবি। আর ওসব এনসিয়েন্ট ব্যাপার ভারি ইন্টারেস্টিং তো। বাড়িতে আমার গ্রানি ছ্যাট ওল্ড লেডী এই এনসিয়েন্ট পোয়েটদের নিয়ে একটা কালচারাল ব্যুরোই খুলে ফেলেছেন প্রায়।'

প্রশংসার গুঞ্জন উঠল। তপতী চেয়ে আছে হতবুদ্ধি।

—'সময় নেই? দেরি হয়ে গেছে।'

সময় নেই? উদ্গত আর্তনাদকে দু'হাতে মুখ চেপে বন্ধ করলো তপতী। শোনা গেল ভাস্করের স্বর—

—'ডিপ এক্সরে? অপারেশন? যদি ভিয়েনাতে নিয়ে যাই?'

—'কিছুর—কিছুরই সময় নেই?'

—'অপারেশন অসম্ভব। তিন-চারটে জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। ডিপ এক্সরে করে দেখা যেতে পারে, তবে আর্লি স্টেজেই ওটা এফেক্টিভ।' বললেন ডাক্তার।

—'কিন্তু এত দেরি হোল কেন? প্রথম হতে চিকিৎসা করালে হয় তো দুঃসাধ্য হোত না রোগ। বাট বি সিওর অব ইয়োর নার্ভস। বাঁচবে না জানা—রোগীর পক্ষে সেটাই সাংঘাতিক।'

—'যন্ত্রণা কমবার ওষুধ?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেখুন মিঃ মিত্র, ডাক্তার শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়ে না, সুতরাং কেবল যন্ত্রণা কমাবার ওষুধ নয়, রোগের ওষুধও দিতে হবে। যদি ইচ্ছা করেন, নিয়ে যেতে পারেন ভিয়েনাতে।'

কথা বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল ভাস্কর, আর তপতী পালিয়ে এল তার ঘরে। এক্ষুণি ভাস্কর এসে পড়বে, যদি বোঝে তপতী জেনেছে সব—আঃ। সে কি মর্মান্তিক কষ্ট তার! বিছানায় শুতে পারলো না, বসলো তপতী সোফাতে। ডাক্তার সেন দেখে যাবার পরই তপতী পা টিপে টিপে গিয়ে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। শুনে এসেছে শেষ কথা—আর তার সময় নেই। এই তো সবে ভূপালীতে তান ধরেছে বীণা, মিলনের মধুর লগ্ন শেষ হল না এখনো। স্বর্ণভৃঙ্গারের জলে অধরপুট সিক্ত হয় নি ভাল করে, এরই মধ্যে সময় শেষ হয়ে এল? চলে যেতে হবে? কোথায় যেতে হবে ভাস্করকে ছেড়ে, ভাললাগা-ভরা পৃথিবীকে ফেলে? বড় বড় চোখে চারদিকে তাকালো তপতী। টেবিলের উপর তিন মাস আগে তোলা যুগল ফটো। খাটের মাথায় দুলছে শুকনো বকুলমালা—ভাস্করের বর্ষার উপহার।

বুকে ব্যথা, অল্প জ্বর—সব, ভেবেছে তপতী বৃষ্টিতে ভিজে হয়েছে। বড় গরমের পর আকাশ কালো করে পৃথিবী ভিজিয়ে বৃষ্টি নেমেছিল, প্রমত্তা ময়ূরীর মত ধারা-স্নান করল তপতী। যূঁথীর মালা সিক্ত চুলে, নীল শাড়ি, ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত বাসক-শয়ন। দু'টি বাহুর ঘন আশ্লেষে স্বপ্ন নেমেছে জীবনে। তখন কি মনে থাকে কোথায়—বুকের কোন ডানদিকে ব্যথা? আর সে ব্যথাও তো সুখের মতন। তারপর ক্রমে বাড়ল ব্যথা। সারিডন খেত তপতী। চারটে, ছ'টা, আটটা। ক্রমে রোগা হচ্ছিল সে, শাশুড়ী, মা ভাবলেন—বুঝি তার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে নূতন প্রাণ। ভাস্করের তো আরো বুঝবার উপায় ছিল না। সে আসবার আগেই যন্ত্রণার সব চিহ্ন মুখ হতে মুছে ফেলতো তপতী। দিন-পনেরো হোল ধরা পড়েছে সে। চা ঢালছিল সকালবেলায়, ভয়ানক ব্যথা আরম্ভ হোল। এখন আর সারিডনে কিছু হয় না। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা আটকাতে চাইল তপতী, পারলো না। মাথা ঘুরে অন্ধকার হয়ে এলো সকালের আলো।

জ্ঞান হতে প্রথম চোখে পড়লো উদ্বিগ্ন শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখ। ভাস্কর ঘরে নেই। ফোনে ডাক্তারকে পেতে দেরি হতে পারে—নিজেই গাড়ি নিয়ে গেছে তাই। ডাক্তার এসে দেখলেন। নানা পরীক্ষা, কত প্রশ্ন। শাশুড়ী

ইঙ্গিত করলেন শুভ সম্ভাবনার, হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন ডাক্তার। তারপর এলো বড় ডাক্তার, আরো বড়। এক্সরে, বুক হতে নিয়ে গেল মাংস ছিঁড়ে, বড় কষ্ট। তপতী জানতো হোক কষ্ট, যন্ত্রণা, ভাস্কর তাকে সারিয়ে তুলবেই। আবার সে ভাস্করের সঙ্গে আশি মাইল স্পীড দেওয়া গাড়ি চড়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি দেবে, পূর্ণিমার চাঁদ, অমাবস্যার আকাশভরা তারা তাদের ভালবাসার সাক্ষী হবে।

কিন্তু এক্ষুণি জানলো তপতী—আর তার সময় নেই। মেয়াদ শেষ হয়েছে পৃথিবীতে, ভাস্করের কাছে থাকবার। কোথায়, কোন অস্থিতে স্নায়ু, পেশীতে তার রোগ বাসা বেঁধেছে? ভাস্করের ভালবাসায় তা সারবে না, কমবে না এত বড় বড় ডাক্তারের ভাল ওষুধে?

পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল ভাস্কর, দাঁড়ালো তপতীর সামনে। ততক্ষণে তপতী সব চোখের জল মুছে ফেলেছে, চোখে-মুখে হাসি।

—'কি? ডাক্তার বললো বুঝি সব তোমার পাগলামী? জানতাম আমি—কিছু হয় নি আমার, মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছ। আর সেরে তো উঠেইছি, আজ ব্যথা নেই বললেই হয়।'

স্বামীর হাত ধরে পাশে বসালো তপতী। ভাস্করের প্রসন্ন-গম্ভীর মুখে কোন ব্যতিক্রম দেখলো না সে, কেবল ঠোঁট দু'টো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে আর চোখ জবাফুলের মত লাল।

—'তপতী, ইয়োরোপটা ঘুরে এলে কেমন হয়? হানিমুনের বড় বেড়ানোর পাওনাটা তো তোমার রয়ে গিয়েছে।'

বাঁ হাতে তপতীর পিঠ জড়িয়ে ধরলো ভাস্কর। স্বামীর মধুর ছলনায় চোখে জল আসতে চাইলো তপতীর। বুঝলো, ভিয়েনায় নিয়ে যাবার সংকল্প; কিন্তু না। মাথা নাড়লো তপতী। মনে মনে দৃঢ় হল। মৃত্যু তাকে এই ঘর হতে, ভাস্করের হাত হতে গ্রহণ করুক। যদি বাঁচবার আশা থাকতো, ভিয়েনা কেন, মঙ্গলগ্রহে যেতেও রাজী তপতী। তা যখন হবে না, তখন কোথাও যাবে না সে। এই ভালবাসার মায়া ছড়ানো তার দু'দিনের বাসর ছেড়ে কক্ষণো নড়বে না। মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, লিলি-ভাস্কর; সব প্রিয় মুখ দেখতে দেখতে, কিছু না বোঝার ভাণ করে মরে যাবে তপতী। কি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ?

'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

ছাই! মরণ কখনো ভাল হতে পারে, ভাস্করের মত ভাল?

—'কথা বলছ না কেন? আজকেই পাসপোর্টের ব্যবস্থা করবো।'

—'না।' নত হয়ে আসা ভাস্করের অধরের উপর নিজের গাল রাখলো তপতী।

—'ভাল না হয়ে আমি কোথাও যাব না। কোথাও না।'

—'আঃ! দুষ্টুমি করে না। ওখানে গেলেই তো তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

—'না, আমি এখানে থেকে ভাল হয়ে তোমার সঙ্গে পৃথিবী বেড়াতে যাবো।'

—'তা যেও। এখন টুক্ করে এই বিলেতটা দেখে আসি, কেমন? সোনা মেয়ে!'

ভাস্করের বুকের উপর নিজেকে একেবারে সমর্পণ করলো তপতী। ভীষণ, ভীষণ ব্যথা করছে তার। সব শক্তি পরাস্ত করে, বেরিয়ে আসছে চীৎকার, তবু নিজেকে সামলালো তপতী।

—'বলো, বলো, কথা দাও, আমাকে আমার ঘর হতে কোথাও নিয়ে যাবে না তুমি। এখানেই ওষুধ দাও আমাকে। তোমার হাত ধরে, আমার মস্ত খাট ভরে এমন এক ঘুম দেব যে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সেরে উঠবো আমি।'

শেষ কথাটা উচ্চারিত হল অর্ধ-চৈতন্যের মধ্য হতে।

[ক্রমশ।

জীবন-জিজ্ঞাসা

শ্রীবীথিকা পাল

জীবন কি?
নদী? গাছ? পাহাড়?
না তার চেয়ে বেশি কিছু, আকাশ—
যার নীল্ নীল্ বুকে—
নিয়ত মানুষ ওড়ায় রঙিন ফানুস।

জীবন কি?
স্বপ্ন? কল্পনা? আলেয়া?
না আরও বেশি কিছু, একেবারেই অলীক—
স্তরে স্তরে যার—
উঁকি দেয় শুধু সেকি কথারই ঝিলিক।

জীবন কি?
রং? তুলি? ক্যানভাস্?
অথবা আরও স্পষ্ট বেশি, সিনেমা—
যার মোহিনী মায়ায় মানুষ আজকে—
নিজেকে দিয়েছে জমা।

মঙ্গলগ্রহের ভাষা

বিগত বছর দশেকের মধ্যে রকেট-বিজ্ঞানের যেভাবে উন্নতি হয়েছে, তাতে হয়তো আগামী বছর দশেকের মধ্যেই মানুষ চাঁদে পৌঁছে যাবে আর তারপরেই আর পাঁচ-দশ কি পনেরো বছরের মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলে গিয়ে পৌঁছবে।

কল্পনা করুন যে, কয়েকজন মানুষ নিয়ে একটি 'শূন্য-যান' (Space Ship) এইমাত্র মঙ্গলগ্রহে গিয়ে বেশ নিরাপদেই পৌঁছুলো। কিন্তু তারপর? তারপর মানুষ সেখানে কি করবে? আজ কয়েক বছর ধরেই এই জিনিসটা এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের কাছে একটা রীতিমতো সমস্যা হয়ে উঠেছে।

মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি নেই তা নিয়ে বিগত ৫০ বছর ধরে নানা বিতর্ক চলবার পরে আজকের বিজ্ঞানীরা বেশিরভাগই এ বিষয়ে একমত যে, মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে—অর্থাৎ একাধিক শ্রেণীর প্রাণী আছে। একজন ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী শিয়াপারেলী তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, মঙ্গলগ্রহে প্রায় মানুষের আকৃতিরই জীব আছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে তারা মানুষের চাইতেও শ্রেষ্ঠতর।

তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? এতো কষ্ট করে শূন্য-যান বানিয়ে মানুষ মঙ্গলে পৌঁছে দেখতে পাবে যে, তাদের চাইতে উন্নততর এবং শ্রেষ্ঠতর মানুষ সেখানে বসবাস করছে—যাদের জীবন হয়তো নিশ্ছিদ্র শান্তি এবং নিখুঁত শৃঙ্খলায় ভরা। পৃথিবী গ্রহের মানুষদের অসহায় অবস্থাটা সবচাইতে শোচনীয় হয়ে উঠবে—যখন তারা দেখতে পাবে যে, নিজেদের তারা কোনমতেই ব্যক্ত করতে পারছে না। কারণ আমাদের এই পৃথিবীর দেবভাষা সংস্কৃত, রাজভাষা ইংরেজী, সাহিত্যের ভাষা ফরাসী, লড়াইয়ে ভাষা জর্মন, জবরজঙ্গ রূশ, চিত্রময় ভাষা চীনা বা যাকে বলে 'বাজাআআর' হিন্দুস্থানী এর কোনোটাই নিশ্চয়ই মঙ্গলগ্রহবাসীরা শিখবার সুযোগ পায় নি, সুতরাং বাকপটু মানুষ বার্তাচিৎ আদান-প্রদান না করতে পেরে নেহাৎ বেয়াকুব বনে যাবে। এইরকম একটা অবস্থা আশঙ্কা করে অনেকে এমন কথাও ভাবছেন যে, কোনও মূক-বধির বিদ্যালয় থেকে এক-আধজন ইনস্ট্রাক্টর ধরণের লোক নিয়ে যাওয়া মন্দ নয়। তিনি নিশ্চয়ই হাত-পা নেড়ে এবং চোখের ইসারায় মঙ্গল-গ্রহবাসীদের পৃথিবী-গ্রহবাসীদের মনের ভাবটা ব্যক্ত করে বলতে পারবেন। কিন্তু এ আইডিয়াটাও অনেকের মনঃপূত হচ্ছে না এই কারণে যে, কি ভাববে মঙ্গলগ্রহের ভদ্রলোকেরা। বেদব্যাস, শেক্সপীয়ার, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের গ্রহ-বাসীরা কি না শেষ পর্যন্ত হাত-পা নেড়ে মনের কথা বোঝাবে? ছিঃ! তাও কি হয়!

কিন্তু তা হলে উপায়ই বা কি!

এই রকম একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েই বৃটিশ ইন্টারপ্লানেটারী সোসাইটি অধ্যাপক ল্যান্সলট হগবেন নামে একজন স্বজাতীয় বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হন কিছুকাল আগে। অধ্যাপক হগবেন নানা চিন্তা-ভাবনার পরে রায় দিলেন যে, মঙ্গলগ্রহে পৌঁছবার পরে নয়, তার আগেই মঙ্গল-গ্রহবাসীদের সঙ্গে আমাদের ভাব আদান-প্রদানের প্রয়োজন হবে। তা না হলে আমাদের গ্রহ থেকে কেউ যদি হুট করে গিয়ে পড়ে সেখানে, তা হলে শত্রু ভেবে নিমেষেই তারা আমাদের লোকজনকে ভস্ম করে ফেলবে। কাজেই অধ্যাপক হগবেন বল্লেন যে, মঙ্গলে গিয়ে পৌঁছবার আগেই রাডারযোগে আমরা যখন ঐ গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবো, তখন থেকেই ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে একটা উপায় বের করতে হবে। তা না হলে ওদের যেমন আমরা বুঝবো না, আমাদেরও বুঝতে পারবে না ওরা। অধ্যাপক হগবেনের মতে রাডারযোগে পৃথিবীর কোন ভাষা মঙ্গলগ্রহবাসীদের বোঝানো সম্ভব নয়, ওদের কোনো ভাষা শিখে নেওয়াও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।



বিজ্ঞান বার্তা

সুতরাং নতুন একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

এবার দেখুন এই নতুন পদ্ধতিটা কি। অধ্যাপক হগবেন বলেন যে, ভাষার পার্থক্য থাকলেও সংখ্যার কিছু পার্থক্য কোনো গ্রহেই নেই, থাকতে পারে না। একটি গরুকে আমরা যেমন ১টি বলি, মঙ্গলগ্রহবাসীরাও তেমনি ১টিই বলবে। অবশ্য এই এক সংখ্যাটি ইংরেজী, বাংলা বা হিন্দিতে বলতে বা লিখতে গেলে তিন রকম হয়ে গেলেও আসল বক্তব্যের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। মঙ্গল-গ্রহবাসীদেরও নিশ্চয়ই সংখ্যার চর্চার প্রয়োজন হয়েছে। কারণ, সংখ্যা বা গণিতের চর্চা ভিন্ন ওরা বিজ্ঞানে অত উন্নতি করতে পারতো না। সুতরাং আমাদের এমন একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে, যার

ফলে অনেকটা টেলিগ্রামের টরে-টক্কার মতো ডট এবং ড্যাসের সাহায্যে পৃথিবীর মানুষ নিজেদের বক্তব্য বলে যাবে। অধ্যাপক হগবেন মনে করেন যে, ক্রমাগত একই রকম আওয়াজ পেতে থাকলে মঙ্গলগ্রহবাসীরা নিশ্চয়ই আমাদের বুঝবার চেষ্টা করবে। এবং তারাও টেলিগ্রামের ঐ সাংকেতিক পদ্ধতিই যে সবচাইতে সহজবোধ্য তা অনুধাবন করে, আমাদের রাডারের উত্তরে তাদের রাডার-যোগে আওয়াজ পাঠাবে। এইভাবেই একটা কিছু নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়ে যাবে বলে আজকের বিজ্ঞানীদের ধারণা।

—শ্রীরসিক

পশু, পাখি ও মানুষের ভাষা

শব্দকে কি করে চিত্রে পরিণত করা যায়—তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেকদিন হতেই চিন্তা করছিলেন। টেলিফোনের আবিষ্কর্তা গ্রাহাম বেলের মূক-বধিরদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ছিল। বিশেষ করে তিনি তাদেরই জন্যে এই বিষয়টিকে কাজে পরিণত করার উদ্দেশ্যে চেষ্টাও করে গেছেন।

এই তথ্যটি কাজে রূপান্তরিত না হলেও বেল টেলিফোন লেবরেটরিতে 'ভয়েস প্রিন্ট' (Voice Print) নামক একটি নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ফলে লোকের গলার আওয়াজকে (স্বর) বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে পরিণত করা হয়। তারপর একরকমের টেলিভিশন পর্দার উপরে ঐ সঙ্কেতটি প্রতিফলিত করা হয়। বেল লেবরেটরির বিজ্ঞানীদের মতে, এতে যে ছবি পাওয়া যায়—তাতে দেখা গিয়েছে একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি আওয়াজই (স্বর) ভিন্ন ধরণের। যাদের গলার আওয়াজ এমনি শুনলে একই রকম মনে হয়, তাদের ভয়েস প্রিন্ট (Voice Print) নিয়ে দেখা গেছে যে, এদের আওয়াজের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে।

এই ভয়েস প্রিন্ট (Voice Print) প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক লরেন্স কার্স্টা এই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের দিক হতেই নয়, ব্যবহারিক জগতের দিক হতেও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের একটি সভায় মিঃ কার্স্টা এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা দেখিয়েছেন। মিঃ কার্স্টা বলেছেন, যে সব ব্যক্তি নিজের পরিচয় লুকিয়ে রেখে ভয় দেখিয়ে থাকেন—কিম্বা গালাগালি করে থাকেন, এই প্রক্রিয়ার সহায়তায় তাদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়। কারণ, গলার আওয়াজ যত বিকৃতই করুক না কেন, ছদ্মবেশ ধারণ করুক না কেন, প্রত্যেকটি আওয়াজের যে বৈশিষ্ট্য যে প্যাটার্ন রয়েছে তা কোনভাবেই গোপন করা সম্ভব নয়—। ভয়েস প্রিন্টে তা ধরা পড়বে। কিন্তু কথার শব্দ সমূহ কিভাবে সৃষ্ট হয়—অর্থাৎ কথা যে কিভাবে বলতে হয়, সে প্রশ্নের জবাব ভয়েস প্রিন্ট দিতে পারে নি।

তবে ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স রেডিয়েশন লেবরেটরির জর্জ বার্টন যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে হয় তো এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। বার্টন একটি টেলিভিশন টিউবে বা একটি অসিলসকোপের ভেতর শব্দকে প্যাটার্নে রূপায়িত করা যায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখছেন। মাইক্রোফোনের সাহায্যে সামান্য শব্দ করলে চক্রাকার প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়। প্রথমত তিনি অনেকটা ঐ ধরণের প্যাটার্ণ নিয়েই শব্দকে চিত্রে পরিণত করবার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন।

একদিন তিনি তাঁর রেডিওটির সঙ্গে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিসমূহ জুড়ে দিলেন। গান থেমে গেল এবং বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণা করা হল। ঘোষণাটি বেশ কয়েকবার করা হল। বার্টন লক্ষ্য করে দেখলেন যে, ঘোষকের ঘোষণায় প্রত্যেকটি উচ্চারিত শব্দে ঐ যন্ত্রে যে ছাপ বা প্যাটার্ন স্পষ্ট হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট এবং প্রত্যেকটি শব্দের প্যাটার্ন বিভিন্ন। একটির সঙ্গে অপরটির সামঞ্জস্য নেই।

কার্স্টা উদ্ভাবিত ভয়েস প্রিন্ট বিভিন্ন গলার স্বরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা ধরা পড়ে। বার্টনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্বরের ভেতর যে মিল রয়েছে, তা নিরূপণ করার দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়। ঐ প্রক্রিয়ায় যতক্ষণ অবধি বিভিন্ন লোক একই শব্দ উচ্চারণ করে, তখন প্রায় একই প্রকার প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়। বার্টনের প্রক্রিয়ায় গলার আওয়াজের যে প্যাটার্ন বা চাপ সৃষ্টি হয়, তাতে সেই আওয়াজ উঁচু বা নীচু পর্দায় থাকলেও কিছুই আসে যায় না। পর্দা যে প্রকারেই হোক না কেন, প্যাটার্ন একই রকম হয়ে থাকে। প্রথমত তিনি তাঁর নিজের পরিবারের লোকজনের গলার আওয়াজ নিয়েই পরীক্ষা করে দেখেন। তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন রকমের গলার স্বর তুলনামূলক আলোচনার জন্যে তাঁর যন্ত্রের পর্দায় যে বিভিন্ন রকমের প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়েছিল তাদের আলোকচিত্র (Photograph) গ্রহণ করেন।

তাতে দেখা গেছে যে, প্রত্যেকটি শব্দের বিভিন্ন অক্ষরসমূহ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটির সঙ্গে আর একটির সংযুক্তি অর্থাৎ শব্দাংশসমূহ বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শব্দের চিত্ররূপ গৃহীত হয় বলে বার্টন এই নব প্রক্রিয়াটিকে ক্যালিগ্র্যাফোন (Celigraphone) নামকরণ স্থির করেছেন।

জর্জ বার্টন একজন রসায়ন বিজ্ঞানী। তিনি এই নতুন বিষয়ে এই আশায় গবেষণা করে যাচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে এমন কেউ হয় তো আসবেন, যাঁর চেষ্টায়

এক্ষেত্রে সমূহ উন্নতি সাধিত হবে। তিনি শুধু সূত্রের সন্ধান দিয়ে গেছেন। বিশেষ করে যে-সব বধির মানুষের কথা না শোনার জন্যে অনুকরণ করতে পারে না—মিঃ বার্টনের ধারণা, সেই সব বোবাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ক্যালিগ্র্যাফোন কাজে লাগতে পারে। কারণ, কোন কথা বললে ক্যালিগ্র্যাফোন যন্ত্রে তার ছাপ উঠে যায়। বধির ঐ ছাপ দেখে ঐ শব্দের অনুকরণ করে কথা বলতে ও উচ্চারণ শিখতে পারবে সে মাইক্রোফোনে কথা বলবার চেষ্টা করবে। প্রতি বারের চেষ্টারই ফল সে চোখে দেখতে পারবে। কারণ প্রতিবারই এর আওয়াজের ছাপ তৈরি হবে এবং তার সামনে থাকবে স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষের কথার ছাপ—তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেই সে এগিয়ে যাবে।

বার্টন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির দাম সামান্য। ষাট ডলার মূল্যেই এইসব যন্ত্রপাতি পাওয়া যেতে পারে। এবং তা ছাড়া বুদ্ধিমান যুবকেরা নিজেরাই তা তৈরি করে নিতে পারবে।

বিজ্ঞানীরা শুধু মানুষের গলার আওয়াজ নিয়েই নয় পশু-পাখির গলার আওয়াজ নিয়েও গবেষণা করেছেন। অধিকাংশ পশু-পাখির আওয়াজ করে মনের ভাব প্রকাশ ও বিনিময় করে থাকে। বিজ্ঞানীরা পাখির ডাকেরও রেকর্ড করেছেন। ভীত ও সন্ত্রস্ত পাখিদের ডাকেরই রেকর্ড করা হয়েছে। এই সব বাজিয়ে পাখি তাড়ানো যায় এজন্য তাঁরা তা বাজিয়েও থাকেন। ডলফিন ও শুশুকের ভাষা বোঝবার চেষ্টাও তাঁরা করছেন। এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শুশুকেরা যে বিজ্ঞানীদের কথার অনুকরণ করে তা তাঁরা দেখেছেন। স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে শুশুক খুবই চালাক। বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক অন্যান্য ছোটখাট প্রাণীর শব্দ নিয়েও গবেষণা করছেন।

রোড আয়ল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সমুদ্র-বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিদ্যালয় বা ওশ্যানোগ্রাফী স্কুলের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মাছেরা যে কেবল নানারকম শব্দই করতে পারে তা নয়—রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শব্দের মাত্রাও বাড়তে থাকে। ক্রাকার জাতীয় মাছ খুব বেশি শব্দ করে, জলের নীচে পঁচিশ ফুট দূর থেকে এদের আওয়াজ শোনা যায়। জেলেরা এই আওয়াজ অনুসরণ করে মাছ ধরতে পারে।

পশু-পাখির ভাষা নিয়ে জাপানে খুব ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা হয়েছে। কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ মিয়াদী, বাঁদরের ভাষা নিয়ে তাঁরা যে অনুশীলন করছেন, সে বিষয়ে আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশান অব দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্সের (American Association of the advancement of Science) সাম্প্রতিক অধিবেশনে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। ডাঃ মিয়াদী বলেছেন, যে-কোন বিপদের আশঙ্কা দেখলেই কোন বাঁদর দলের নেতা একটা বিশেষ আওয়াজ করে বিশেষ ভাষায় দলের সবাইকে সজাগ করে দেয়। আবার আক্রমণ করতে হলে সে অন্য রকম আওয়াজ করে দলের সবাইকে নির্দেশ দেয়।

ডাঃ মিয়াদীর মতে বড় বড় দলের বাঁদরদের ভাষার পুঁজি ছোটখাট দলের বাঁদরদের তুলনায় অনেক বেশি। বাঁদরেরা দলের প্রত্যেকটিকেই চেনে এবং অন্যান্য বাঁদরেরা নেতাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিশেষ সম্মান করে থাকে।

—অনুসন্ধানী

য়ুরোপের অতি আধুনিক স্টুডিও শহর

একদিন এমন পরিস্থিতি হয়েছিল য়ুরোপে যে, টেলিভিশনের চাপে চলচ্চিত্রশিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছিল। কিন্তু বছর চারেক আগে এই দুই শত্রুর মধ্যে আপোস হয় এবং এখন এরা য়ুরোপের অতি আধুনিক স্টুডিওতে একত্রে মিলেমিশে থাকে।

১৯৫৮-৫৯ সনে চলচ্চিত্রের মহা দুর্দিনের কথা আজ আর কারুর মনে নেই। বছরে তখন সর্বসাকুল্যে চারটে কি পাঁচটা ছবি তৈরি হচ্ছে। টেলিভিশন চিত্র প্রযোজনার চাপে স্টুডিওতে তখন চলচ্চিত্র তোলার জায়গা নেই। সেই সময় স্টুডিও-মালিক গিউলা ট্রেবিটৎশ এগিয়ে এসে তাঁর



● হামবুর্গের অন্যতম স্বয়ংক্রিয় আলোকসম্পাতের স্টুডিও

স্টুডিওকে এমন ভাবে বাড়ালেন—যাতে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র দু'য়ের প্রয়োজন একই স্টুডিওতে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র যেভাবে স্টুডিও তৈরি করলে একসঙ্গে কাজ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাকে এখন বলা হয় 'ট্রেবিটৎস্ সিস্টেম।' এই পদ্ধতি আজ সর্বত্র স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়।

হামবুর্গ স্টুডিওর সাজ-সরঞ্জাম আজ কোন অংশেই হলিউড-ফিল্ম-স্টুডিওগুলির চেয়ে কম নয়। স্যুটিংয়ের জন্যে এখানে দশটি আলাদা স্টুডিও আছে। এ ছাড়া গান, শব্দের সঙ্গে ছবির যোজনা, মহড়া দেবার জায়গা, কারখানা, আপিসবাড়ি সবই এই স্টুডিওর মধ্যে বর্তমান। স্টুডিও পরিচালনা, যান্ত্রিক-পদ্ধতি এবং সব কিছুর সুসম ব্যবহারের ওপর কড়া নজর রাখা হয়।

যেসব ছবি তোলার কাজ চলে অনেক আগে থাকতে সে-সব ছবির সেটিং তৈরি হয় ও কখন কোথায় কিরকম আলো লাগবে তারও ছক তৈরি ক'রে রাখা হয়। আসল ছবি তোলার সময় আলো ফেলার জন্যে মাত্র চারজন লোক লাগে। স্টুডিওর কোন ঘরে ব'সে হেড লাইটম্যান মাইক্রোফোনে নির্দেশ দেন ও সেইমত অপর একজন কয়েকটি চাবি টিপলেই স্টুডিওর আলো প্রয়োজনমত বাড়ে কমে কিম্বা নিভে যায়। —বার্নড লেপ্টিন

বিশ্ব টেলিভিশন স্বপ্ন নয় সত্য

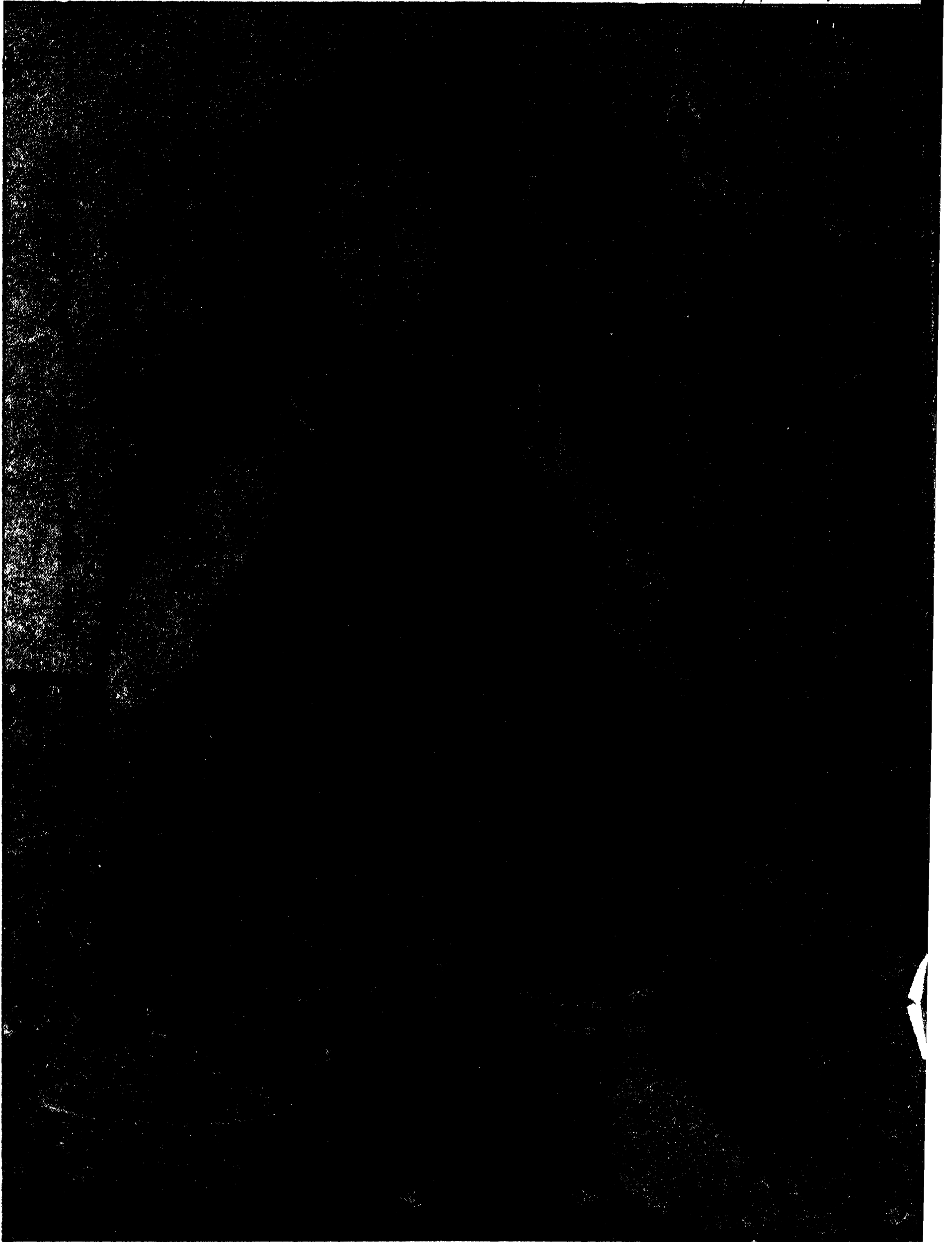
ছোট্ট গ্রাম রেজটিঙ্গ। অতীত ও ভবিষ্যৎ এখানে হাত মেলাতে চলেছে। অতীতের রেজটিঙ্গে চাষবাস চলছে আর ভবিষ্যতের রেজটিঙ্গে উঠেছে চারটি অট্টালিকা। সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবে রেজটিঙ্গ। মহাকাশে টেলস্টার জাতীয় যেসব উপগ্রহ বিচরণ করবে, তাদের থেকে খবর ও ছবি সংগ্রহ ক'রে আবার চারদিকে সে-সব ছড়িয়ে দেবে রেজটিঙ্গ।

বর্তমানে যে চারটি ভবন নির্মিত হচ্ছে, তাতে যেসব এরিয়াল থাকবে, সেগুলি অন্য ধরণের। প্রত্যেকটি এরিয়ালে থাকবে ছয় মিটার উঁচু একটি কংক্রীটের চাকা ও একটি প্লাস্টিকের বেলুন যার ব্যাস ষাট মিটার ও উচ্চতা পঁচিশ মিটার। প্লাস্টিক বেলুনের খোলসটি মাত্র দুই মিলিমিটার পুরু। এই বেলুনের মধ্যে থাকবে একটি বাঁকানো আয়না এরিয়াল, যাকে বলে শেল এরিয়াল। যেটি চারদিকে দোলানো যায়। মহাকাশে কোন টেলস্টার জাতীয় উপগ্রহ নিকটবর্তী হলেই একটি স্থান নির্দেশক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এরিয়ালটিকে উপগ্রহের সঙ্গে নিখুঁৎ সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করবে এবং যতক্ষণ না উপগ্রহটি অদৃশ্য হয়ে যায়, ততক্ষণ সেই সংযোগ অব্যাহত থাকবে এবং উপগ্রহ থেকে বার্তা ও ছবি গ্রহণ করতে থাকবে। এইভাবে ভবিষ্যতে যখন একাধিক উপগ্রহ আকাশপথে ভ্রমণ করবে, তখন দু'টি এরিয়াল একটি উপগ্রহকে অনুসরণ করবে ও অপর দু'টি এরিয়াল পরবর্তী উপগ্রহকে ধরার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এইভাবে উপগ্রহ মারফৎ বার্তা ও ছবি গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

সম্ভবত টোকিও অলিম্পিকের সময় এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য সম্বন্ধে, প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হবে। ঐ সময় টোকিও অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সমস্ত বার্তা ও দৃশ্য এই যন্ত্রে গৃহীত হবার পর য়ুরোপের টেলিভিশন স্টেশনগুলিতে রীলে করা হবে। —বি এল



● উপগ্রহ নিকটবর্তী হ'লেই এই টেলিভিশন যন্ত্রে দেখতে পাওয়া যাবে।



গৃহবধূ

—রথীন মৈত্র অঙ্কিত

অঙ্গনে ও প্রাঙ্গনে

হাসপাতাল

শ্রীমতী স্মৃতি ঠাকুর

যাক শেষ পর্যন্ত হাসপাতালটার পত্তন করা গেল। আজ তার ওপনিং-ডে। কলকাতা থেকে দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উদ্বোধনী-সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথি করে নিয়ে আসা হচ্ছে। রতনপুর গ্রাম শুদ্ধু প্রায় সকলেই এই উপলক্ষে বিকেল চারটের মধ্যে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হবে।

যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই আমাকে খুব প্রশংসা করছে এমন একটা জনহিতকর কাজ করার জন্য। কিন্তু আমার ঠিক এ প্রশংসা প্রাপ্য নয়। সে কথাও আমি বলছি সকলকে, এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মূলে যিনি আছেন— তোমরা তাঁর প্রশংসা করো, আমার নয়। তিনি জীবনপণ করে তোমাদের কল্যাণে উদ্যোগী না হলে, এ হতো না কিছুতেই। নিজে তিনি শুধু দুঃখই পেয়ে গেছেন।

সত্যি সকাল থেকে বারবার মঞ্জুলাদি'র কথাই মনে পড়ছে। ছোটবেলায় কবে দেখেছিলাম মনে নেই। অনেকদিন বাদে দেশে ফিরে মঞ্জুলাদি'কে দেখে আমি ওঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সে সময় উনি সর্বক্ষণ কাজে মেতে আছেন। সকাল থেকে রাত অবধি একটানা রুটিং বেঁধে কাজ করে যাচ্ছেন গ্রামের জন্য—তাই গ্রামের সকলের মুখে মুখে ফিরছে ওঁর নাম। আগে তো আমাদের এই অজপাড়াগাঁয় কোনো ডাক্তার বা সে-রকম কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানের বালাই ছিল না। চিকিৎসা বলতে এক সতু বদ্যির বড়ি, পাঁচন—তাতে যে লোকের বিশেষ উপকার হতো তা নয়, যার ভাগ্য ভাল হতো সে সেরে উঠতো। তারপর মঞ্জুলাদি'-ই প্রথম অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে একটা ছোটোখাটো সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

দেশ ছাড়া হয়েছিলাম অনেকদিন। বাবা মারা যাবার পর, মা যখন আমাকে নিয়ে কলকাতায় বড় মামার বাড়ি ওঠেন, তখন আমার বয়স মাত্র সাত। সেইখানেই আমার পড়াশোনা। মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে স্থায়ী কোনো কাজে লাগার আগে একবার দেশে ঘুরে যাবার বাসনা হয়েছিল। দেখলাম এর মধ্যে গ্রামের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। একজন সদ্য-ডাক্তারী পাস করা দেশের ছেলে যে দেশে ফিরেছে একথা সারা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পড়তে বেশি দেরি লাগে নি।

মঞ্জুলাদি'র কানে যেতে সে কথা—উনি আমায় একদিন ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ভবিষ্যতে আমার কি করার প্ল্যান আছে। কলকাতাতেই প্র্যাক্টিস করার ইচ্ছে শুনে বলেছিলেন দেশে বাড়ি-ঘর রয়েছে, বাপের টাকাও রয়েছে বাইরে যাবে কেন? এইখানেই তুমি প্র্যাক্টিস্ সুরু করো। এখানে একটাও ভাল ডাক্তার নেই তাই আমি বড় একলা পড়ে গেছি। এত রুগী একলা সামলে উঠতে পারি না। কয়েকজন মেয়েকে নার্স-এর কাজ শিখিয়ে নিয়ে আমি বাড়িতেই একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছি, তাদের নিয়ে কাজ চালাচ্ছি কিন্তু আরও লোকের দরকার, তোমাকে পেলে আমার অনেক সাহায্য হয়।

কথায় কথায় ওঁর বিগত দিনের কথাও বলে ফেললেন সেদিন। মঞ্জুলাদি'র বিয়ে হয়েছিল ওই একই গ্রামের ছেলের সঙ্গে। ওঁর তখন বছর-পনেরো বয়স। কিছুদিন পরে ওঁর একটি ছেলেও হয়। ছেলেটি যখন বছর-পাঁচেক তখন এক অজ্ঞাত রোগে ছেলেটি মারা যায় সুচিকিৎসার অভাবে। সতু বদ্যি রোগ নির্ণয় করতে পারার আগেই সে তাঁর কোল থেকে বিদায় নেয়। মঞ্জুলাদি' সামলে নিলেও ওঁর স্বামী তা পারলেন না। একমাত্র ছেলের শোকে দু'-বছরের মধ্যে হার্ট এ্যাটাকে তিনিও পুত্রের অনুগমন করলেন।

মঞ্জুলাদি' খুবই শক্ত মেয়ে, পরপর দু'টি কঠিন আঘাতে ভেঙে না পড়ে—মনে মনে ঠিক করলেন যে, চিকিৎসার অভাবে উনি স্বামী-পুত্র হারিয়েছেন, গ্রামের সেই চিকিৎসার উন্নতি করাই হবে ওঁর জীবনের একমাত্র কাজ।

ওঁর এক বান্ধবীর কলকাতায় বিয়ে হয়েছিল। তাকে চিঠিতে জানালেন সব কথা। সে ওঁকে সাহায্য করতে রাজী হলো। জানালে উনি কলকাতায় গেলে ওঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আত্মীয়-স্বজনের ওজর-আপত্তি না শুনে মঞ্জুলাদি' জোর করে কলকাতায় চলে গেলেন বান্ধবীর বাড়িতে। তারপর ওর সাহায্যে ক্লাস সেভেনে গিয়ে ভর্তি হয়ে স্কুলের বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করতে লাগলেন। ছেলেবেলায় উনি বাবার কাছে ক্লাশ সিক্স্ অবধি ভালভাবেই পড়েছিলেন। ওঁর নামে নগদ টাকা কিছু রেখে গিয়েছিলেন ওঁর স্বামী তাই থেকেই খরচ চলতে লাগলো। দিবারাত্র ওঁকে পড়াশোনার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে সে-সময়। ওঁর এইভাবে জোর করে পড়াশোনা করাটা গ্রামের কেউ ভাল চোখে দেখলেন না। ওঁর স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে বলে চারিদিকে কুৎসা রটাতে লাগলেন। অনেকে এমনও বললেন কলকাতায় গিয়ে মঞ্জুলাদি' খারাপ ব্যবসা করতে শুরু করেছেন, তাঁদের নিজের কানে শোনা খবর, পড়াশোনা সব বাজে কথা।

মেয়েমহলেও আর কোনো কথা নেই। সর্বদা মঞ্জুলাদি'র কথা নিয়েই হাসি টিটকিরি চলেছে। আমাদের কি আর ছেলে মরে না? না স্বামী মরে না? তাই বলে আমরা কি কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়ার নাম করে পয়সা ওড়াচ্ছি? না দেশ উদ্ধার করার কাজে নেমে পড়েছি? ও-সব-আদিখ্যেতা দিদি, আসলে ভেতরে ভেতরে অন্য ব্যাপার। এসব কথায় আর কান পাতা যাচ্ছে না বলে ওঁর আত্মীয়েরা ওঁকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন কলকাতায় ওঁর কাছে, কিন্তু উনি কিছুতেই ফিরলেন না, বললেন আমি ডাক্তারী পাশ না করে ফিরবো না। ছেড়ে দাও ওদের কথা, চিরাচরিত বাঁধা পথে চলতে ওরা এমন অভ্যস্ত যে, তার একটু এদিক-ওদিক দেখলেই ভাবে ভয়ঙ্কর একটা কিছু অন্যায় কাজ ঘটেছে। একজন কাউকে নিয়ম ভেঙে এগিয়ে যেতে তো হবে আগে? না হলে কি আর উন্নতি হবে কোনোদিন ও গ্রামের? আমি যখন পথে নেমে পড়েছি আমায় এগিয়ে যেতে দাও। আত্মীয়েরা সকলে নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন সেদিন।

দীর্ঘ বারো বছর পরে মঞ্জুলাদি' যখন দেশে ফিরলেন নামের আগে ডাক্তার আর নামের শেষে গোল্ড-মেডালিস্ট এম-বি, বি-এস, নিয়ে, তখন গ্রামের আবহাওয়া পাল্টে গেছে অনেক। পুরোনো কথা ভুলে গেছে অনেকে, আর এতদিনে যারা বড় হয়ে উঠেছে তাদের মন থেকে পুরনো সংস্কার অনেক দূর হয়ে গেছে। তবু মঞ্জুলাদি'কে প্রথমদিকে কাজে নামতে গিয়ে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেউই ওঁকে আমল দিতে চায় নি। বিশ্বাস করে চিকিৎসা করতে ডাকে নি। এরকম একজন কোলকাতার উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে বলে গ্রামের মেয়েরাও সমীহ করে দূরে রেখে দিত। পয়সাও বেশি ছিল না ওঁর হাতে আর এদিকে গ্রামের লোকেরাও সহায় নয়, উভয় সঙ্কট। ওষুধপত্র কলকাতা থেকে আনাতে গেলেও অর্থের প্রয়োজন। সে সময়টা মঞ্জুলাদি'কে অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

কারুর আপদ-বিপদের খবর পেলে তিনি নিজে থেকেই গিয়ে পড়তেন সেখানে। কার বাড়াবাড়ি অসুখ, রাত জেগে সেবা করার লোক নেই, কার ছেলেমেয়ে অনেকদিন ভুগছে, কাদের বৌয়ের বাচ্চা হবে—উনি হাসিমুখে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেছেন। এইভাবে কখন যে উনি সকলের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন, কেউ খেয়ালই করে নি। গ্রামের সকলেরই উনি মঞ্জুলাদি' হয়ে উঠলেন।

মেয়েদের অন্দরমহলে গিয়ে হাসি-গল্পের মধ্যে মেয়েদের পরিচ্ছন্নতা, শিশুপালন, সেবা শুশ্রূষা করা, নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া—একটু একটু করে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ক্রমশ অনেক মেয়ের নার্সিং শেখবার ইচ্ছাও হতে লাগলো। মঞ্জুলাদি' আগ্রহী মেয়েদের নিয়ে নিজের বাড়িতে রোজ দুপুরে এক নার্সিং শিক্ষার ক্লাশ বসাতে লাগলেন। সকালে সকলের বাড়ি গিয়ে মায়েদের আর বাচ্চাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বেড়াতে লাগলেন। এছাড়া কারুর সেরকম বিশেষ অসুখ করলে তার চিকিৎসা করা তো আছেই। এসব কাজের জন্য এবং গরীবদের সাহায্যের জন্য একটা ফণ্ড খুলে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে চালাতে লাগলেন। গ্রামের উৎসাহী তরুণদেরও এমন অনেক কাজে লাগিয়ে দিলেন। জনাকুড়ি মেয়েকে তৈরি করে নিয়ে উনি তারপর বাড়িতে সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে, যখন সারা গ্রামে চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছিলেন, তখনই আমার সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর আমিও ওঁর সঙ্গে কাজে যোগ দিই।

সেই সময় থেকে ওঁর ইচ্ছে হলো এবার গ্রামে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবেন। এ ক'য় বছরে গ্রামে স্কুল হয়েছে এবং রাস্তা-ঘাটেরও একটু উন্নতি হয়েছে। চেষ্টা চললো আপ্রাণ। উৎসাহের চোটে মঞ্জুলাদি' আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে কাজে লেগে গেলেন। গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে একটা হাসপাতাল কমিটী করলেন। তারপর চললো টাকা সংগ্রহ করার পালা। হাসপাতালের জন্য জমি কিনে বাড়ি আরম্ভের চেষ্টা চললো একদিকে, আর একদিকে তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের চেষ্টা। আরও নার্স সংগ্রহের চেষ্টা। বছর-তিনেক ধরে এইভাবে চেষ্টা করে করে আশা করা যেতে লাগলো সামনের বছর হয়তো কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে। বাড়িটার খানিকটা গাঁথা হয়ে গেছে এর মধ্যে।

অনেক রাত অবধি একটা মেডিকেল জার্নাল পড়েছি, একজন সিরিয়াস রুগী হাতে এসেছে তাই। ভোর রাত্রিতে কার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল, ভাবলাম সেই রুগীর বোধ হয় বাড়াবাড়ি, তাই ডাকতে এসেছে। দরজা খুলে দেখি ডাকতে এসেছে মঞ্জুলাদি'র চাকর গণেশ—বললে, শীঘ্রি চলুন ডাক্তারদাদা, মা কেমন করছেন!

সে কি? কাল তো ভালই দেখেছি? তবে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল সন্ধ্যাবেলা যখন শেষ দেখি। গণেশ বললে, হবে না? কাল মা'র একাদশী গেছে তার ওপর সমস্ত দিন এমন খাটাখাটনি করেন শরীরের আর দোষ কি?

আমার সাইকেলটা নিয়ে গণেশের সঙ্গে ঝড়ের মত মঞ্জুলাদি'র বাড়ি গিয়ে দেখি মঞ্জুলাদি অজ্ঞান হয়ে গেছেন ঝি সারদা মুখে জল ছিটিয়ে হাওয়া করছে। নাড়ি দেখি অতি দুর্বল। রক্ত নেই। খাওয়া-দাওয়া না করা তার ওপর অত্যধিক পরিশ্রমের ফল। যদিও নিজে ডাক্তার ছিলেন এবং সকলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব যত্ন ছিল, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি দিনের পর দিন অযত্ন করে গেছেন। হয়তো খানিকটা ইচ্ছাকৃত এ অবহেলা।

তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশন দিলুম বটে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে···হার্টের অবস্থাও সুবিধের নয়। নানারকম চেষ্টা করার পর সকাল সাড়ে ছ'টায় একটু জ্ঞান হয়েছিল। মুখে দু' চামচে গ্লুকোজ ওয়াটার দিলুম, খাবার চেষ্টা করলেন—গড়িয়ে পড়লো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। একবার চোখ খুলে কাকে যেন খুঁজলেন। কি বলবার জন্য যেন ঠোঁট নেড়ে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না, মাথাটা ঢলে পড়লো। নাড়ি ধরে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা এতো আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে, ভাববার সময়ই পেলাম না—কি হলো। তারপর তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার ভার বলতে গেলে আমিই নিলাম পুরোপুরি। কমিটী রইলো নামে মাত্র। হয়তো তিনি শেষকালে আমাকে এই কাজের ভার দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বলতে পারেন নি।···

আরও বছর দেড়েক গত হয়েছে তারপর। তাঁর একান্ত ইচ্ছাকে যে আজ পূর্ণ করতে পেরেছি সেই আমার আনন্দ। এই সেবা করার আদর্শ আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।

তাঁর আত্মাও হয়তো আজ সুখী হয়েছে।

আজকের সমাজ ও বিবাহ প্রথা

মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবাহ একটি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠান—যা বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। নর-নারীর বিবাহ অতি স্বাভাবিক ঘটনা। বরং যে-সব নর-নারী আজীবন বিবাহ না করে কাটালেন, তাঁদেরই অস্বাভাবিক বলা চলে। খোঁজ করলে জানা যায়, নেপথ্যে কোন কারণ থাকার জন্যই তাঁরা অবিবাহিত থাকতে মনস্থ করেছেন।

কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন বিবাহ বলে কোন সামাজিক প্রথা প্রচলিত ছিল না। সেদিনের মানুষ পশুর মত যৌন আকাঙ্ক্ষার যথেচ্ছ নিবৃত্তি ঘটাতো। কোন এমন লজ্জা, বাধা বা আইন ছিল না—যা তাদের এই পাশবিক মনোবৃত্তি দমন করতে পারতো। কিন্তু কালক্রমে সেই আদিম যুগের মানুষ যখন দল বেঁধে বাস করতে শিখলো, তখন তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা ও সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো। মানুষে মানুষে এতদিন যে বিবাদ চলছিল ক্রমশ তার নিবৃত্তি হওয়ায় মানুষ এই প্রথম উপলব্ধি করল ভালবাসার স্বাদ। আর স্ত্রী-পুরুষের উভয়ের ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল বিবাহ প্রথার। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই অশান্ত ইন্দ্রিয়-ক্ষুধাকে স্বীকার করে শরৎচন্দ্র বলেছেন—

'সেই দুর্দান্ত প্রকৃতির তাড়নাকেই সৌখীন কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসের নিখুঁত ভালবাসা তৈরি হয়।'

তখনকার মানুষ দল বেঁধে বাস করতো এবং একদল পরাজিত হলে বিজিত দলের নারী বিজেতাদের ভোগ্য হিসাবে পরিগণিত হতেন। কিন্তু ক্রমশ ভেদাভেদ দূর হয়ে শান্তি ও আইন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অপরকে ভালবাসতে শিখলো। এই ভালবাসা থেকেই হলো বিবাহ প্রথার উৎপত্তি। নর-নারী একে অন্যকে ভালবেসে একান্ত আপনার করে কাছে পাওয়ার আশায় বিবাহ করতো। অর্থাৎ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রেমকে ভিত্তি করেই বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হতো।

কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ প্রথার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিল। এখন থেকে ধর্ম বিবাহের উপর হস্তক্ষেপ করে নানা নিষেধের জালে মেয়েদের অধিকার হরণ করে দাসীতে পরিণত করলে। বৈদিকযুগে নর-নারীর মেলামেশা ও স্বেচ্ছায় বিবাহ করার যে স্বাধীনতা ছিল, পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যযুগে তা থাকলো না।

এরপর বিবাহ প্রথায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। রাক্ষস, গান্ধর্ব, পৈশাচ ইত্যাদি বহু প্রথায় বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রেমকে ভিত্তি করে যে বিবাহ সংঘটিত হতো—তাকে বলা হতো গান্ধর্ব প্রথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ-ধরণের বিবাহে বর-কনে আত্মীয়-স্বজনের অগোচরে বিবাহ করতেন। অনেকটা আমাদের আধুনিক রেজেস্ট্রী ম্যারেজের মত আর কি!

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিবাহপ্রথা নিয়ে সমস্যা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বর্তমানযুগেও বিবাহ এক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। সমাজে এখন দু'টি নিয়ম প্রচলিত আছে। নেগোশিয়েটেড, বা সামাজিক বিবাহ এবং লভ্ ম্যারেজ বা প্রেমজ বিবাহ। একাধিক নিয়ম থাকলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোন প্রথাটি শ্রেয়? প্রাচীনপন্থিগণ বলবেন, সামাজিক অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক যে বিবাহ দেন সেটাই গ্রহণযোগ্য। আর নব্যপন্থী বলবেন, পাত্র-পাত্রী নিজেরা নির্বাচন করে যে বিবাহ সম্পন্ন করেন সেটাই ভাল।

যদিও আজ আমাদের মা-ঠাকুমা বলেন, 'আমাদের কালে এমন ভালবাসাবাসি করে ঢলাঢলির বিয়ে ছিল না।' গুরুজনে যা দেখে দিতেন তাই মেনে নিতাম—কিন্তু সে কথা খুব আস্থাজনক বলে মনে হয় না। প্রেমঘটিত বিবাহ যে প্রাচীন যুগেও ছিল, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গান্ধর্ব-প্রথা। আর প্রেম-ভালবাসা যদি তখনকার কালে না ছিল—তবে আমরা শৈবলিনী-প্রতাপ; কুন্দ-নরেন্দ্র; কচ-দেবযানী; শকুন্তলা-দুষ্মন্ত—এঁদের সাক্ষাৎ পেলাম কি ভাবে? হয়তো এঁদের কেউ প্রেম বিবাহে সফলতা লাভ ■

করেছিলেন—কেউ হতাশায় বিনষ্ট হয়েছেন, কিন্তু প্রেম ছিল না এমন কথা বলা চলে কি করে? এ-কথা তো অনস্বীকার্য যে, সাহিত্যিকগণ সেই যুগের বাস্তব ঘটনার ছায়াবলম্বনেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রচনা করে থাকেন।

সামাজিক-বিবাহে অভিভাবক পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করেন। পাত্র-পাত্রীর মতামতের বিশেষ মূল্য দেওয়া হ'তো না। কিন্তু এ প্রথার যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। তাই মতামতের প্রশ্ন উঠতো না। এখন ছেলে-মেয়ে উভয়েই সাবালকত্ব প্রাপ্ত ও উচ্চশিক্ষিত হয়ে তবে বিবাহ করেন। তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনাও পাকা হয়। এই পরিবেশে কোন ছেলে বা মেয়ে যদি কাউকে ভালবাসেন এবং তাঁর স্বনির্বাচিত সেই পাত্র-পাত্রী যোগ্য হন, তা' হলে প্রেমঘটিত বিবাহে বাধা কোথায়?

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য দু'টি নর-নারীর মধ্যে হৃদয় বিনিময়, যার প্রধান ভিত্তি প্রেম। যৌবনে উপনীত হয়ে পুরুষরা স্বভাবতই নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ইন্দ্রিয়জ। অপরপক্ষে নারী কামনা করে তার স্বামীর মধ্যে দিয়ে পাবে তার ঈপ্সিত পুরুষ ও প্রেমিককে। ইংরাজী-সাহিত্যে প্রেমের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করে গেছেন H. D. Lawrance তাঁর মতে—

'Love is the happiness of the world..Love is a comming together..In love, all things unite in a oneness of joy and praise'.—

এমতাবস্থায় যদি অভিভাবক নিজের জিদ বজায় রাখতে জোর করে অন্যত্র বিবাহ দেন, সে বিবাহে দম্পতী যদি সুখী হতে না পারে, তার ফল যে কতদূর বিষময় হতে পারে—সহজেই অনুমেয়। তবে এ-কথা খুবই সত্য যে, অভিভাবককে দেখতে হবে যে, প্রেম কেবলমাত্র চাক্ষুষ মোহজনিত নয় এবং তাঁর পুত্র বা কন্যার স্বনির্বাচিত পাত্র-পাত্রী শিক্ষা, রুচি, আচরণ প্রভৃতি দিক থেকে যোগ্য কি না।

এদিক থেকে অমিল না থাকলে প্রেমজ-বিবাহে আপত্তির কি থাকতে পারে? তবে যোগ্যতার বিচারে অর্থকে মাপকাঠি করা উচিৎ নয় এবং সেটি মানবিকতার পরিচায়ক নয়। কোন ধনী-পরিবারের পুত্র-কন্যা যদি নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত, ভদ্র, সুরুচিসম্পন্ন কোন ছেলে বা মেয়েকে ভালবেসে বিবাহ করতে চায়—তখন অভিভাবক দরিদ্রের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে মাথা হেঁট হবার ভয়ে অথবা তত্ত্বতাবাস জাঁকজমক করে প্রতিবাসীদের দেখাবার যোগ্য হবে না ভেবে শাসনের বেত্র উত্তোলন করেন। কিন্তু অপ্রিয় হলেও এ-কথা সত্য যে, টাকাই মানুষের জীবনে সুখের মাপকাঠি নয়। লাখ টাকার বিনিময়েও একরত্তি সুখের সন্ধান দিতে পারে না মানুষ।

তাই প্রসঙ্গক্রমে এ-কথা বলা অসমীচীন হবে না যে, বর্তমান যুগের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলতে হলে—কিছু পুরাতন সংস্কার ত্যাগ ও কিছু নতুন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতেই হবে। নচেৎ পদে পদে সংঘর্ষ অনিবার্য।

উপসংহারে বলা চলে, সামাজিক ও প্রেমঘটিত কোন বিবাহ-প্রথাই ক্ষেত্র বিশেষে নিন্দার নয়। পাত্র-পাত্রী যদি আজকের দিনে অভিভাবকের নির্বাচন নিয়ে বিবাহে সম্মতি দেন—সেক্ষেত্রে সামাজিক-বিবাহই আনন্দদায়ক। কারণ তাঁরা পুত্র-কন্যার জন্য যথাসাধ্য সুনির্বাচনই করতে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু পাত্র-পাত্রীর অমতে কেবলমাত্র লোকনিন্দা ও বংশমর্যাদা হানির ভয়ে জোর করে বিবাহ দেবার মত মধ্যযুগীয় আবহাওয়া আর নেই। এখন সে চেষ্টায় তাই সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠতে বাধ্য। যুগোপযুগী আবহাওয়াকে মানিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

ওয়েলকাম্ হোম

ওয়াশিংটনে ক'দিন অক্লান্ত হৈ-চৈ-এর পর বস্টনে ফিরে এসে নিজের এপার্টমেণ্টে পা দিয়ে যেন বাঁচলাম। মনে হল ফিরে এলাম আপন ঘরে। হাতের লগেজগুলো ভাল করে নামাবারও তর সইল না—টেলিফোন বাজতে সুরু করল অবিশ্রান্ত। মিসেস ওয়েলজের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, এই যে তোমরা পৌঁছে গেছ, কেমন আছ সব, ছেলে কেমন আছে? টেলিফোন রাখতে না রাখতেই আবার ঝন্‌ঝন্, এবার মিসেস চিজোম—কেমন হল ওয়াশিংটন? তোমাদের কথা এ ক'দিন কেবলি ভেবেছি। এরপর ওয়েস্টন থেকে মিসেস্ টেলর তারপর আর একটা, সেটা নামিয়ে রাখতে না-রাখতেই আবার।

কি আশ্চর্য এত ঘনিষ্ঠতা বস্টনের সঙ্গে কবে হয়ে গেল? এত শুভাকাঙ্ক্ষীর ভিড়! সকলে আমাদের অভাব বোধ করেছে এ ক'দিন, কুশল প্রশ্ন করছে সবাই। মনে পড়ল প্রথম যেদিন এ-বাড়িতে আসার পর মিস্ত্রী টেলিফোনটা ফিট করে দিয়ে গেল ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলেছিলাম 'শ'-কে, এখানে আমাকে কে আর ফোন করবে, এ তো কলকাতা নয়। আজ তাই যখন টেলিফোন সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছি আমি 'শ' আমার দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়ে মুচকে হেসে বেরিয়ে গেল।

নিজের কর্মস্থলে পৌঁছে ডিপার্টমেণ্টে দরজা দিয়ে ঢুকতেই বস্ নিউহাউসার সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন, ওয়েলকাম হোম। ওয়েলকাম হোমই বটে! আমাদের

এই ওয়াশিংটন-পর্বের শেষে সেবারই প্রথম অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলাম আমাদের অজ্ঞাতসারে কবে যেন বস্টন আমাদের 'হোম'-এ পরিণত হয়েছে।

হাতের কাজ গুছিয়ে রেখে পাড়ার সকলের খবর নিতে বার হলাম। বুড়ো মিঃ শ্রুহেন 'হা-ই বিগ ম্যান' বলে বুঁর দিকে ছুটে এলেন। শ্রুহেনের বড় মেয়ের কোর্টশিপ পর্ব চলছে তখন। বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হল কি না তাই নিয়ে কথাবার্তা চলল। মেজ মেয়ে আমার বিশেষ বন্ধু, যে তার অবসর সময় অজস্র বেবী-সিটিং করে দিয়েছে আমার জন্য। ছোট ছেলে মাইক স্কুল পড়ে। মিঃ শ্রুহেন আমার জন্য বাড়ি খুঁজে দেবার ভার নিলেন। সে সময় আমরা বাড়ি বদলের চেষ্টা করছিলাম।

শার্লি তার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলে আমাকে, এই যে অ্যাম্বেসেডর অফ্ গুড-উইল—কোথায় চলেছ, শুনে যাও। আমার পরিচিত বন্ধুমহলে আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে হত সবসময়। সাহিত্য, রাজনীতি থেকে সুরু করে শাড়ির ফ্যাসান পর্যন্ত সব বিষয়ে আমাকে অথরিটি ভেবে বসেছিল আমার অনেক সরল আমেরিকান বন্ধুরা। একবার এক মেমসাহেবের সঙ্গে শেয়ারে ট্যাক্সি চড়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তো ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, পাতিয়ালার মহারাজা কেমন আছেন? ওঁর সঙ্গে প্যারিসে নাকি আলাপ হয়েছিল কোন সালে। কি বিপদ!

সম্প্রতি অনেক ক্লাব-সভা-সমিতিতে জড়িয়ে পড়ায়, দেশের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্র ব্যাপকতর হয়ে পড়েছিল। শার্লি তাই দুষ্টুমি করে আমাকে ডাকতে সুরু করেছিল অ্যাম্বেসেডর অফ গুড উইল, শুভেচ্ছাদূত। সে ঠাট্টা করে বললে, জানি তুমি ইণ্ডো-আমেরিকান সম্পর্কের উন্নতি সাধনে বর্তমানে বিশেষ ব্যস্ত আছ, তবে যদি সময় থাকে তো একটা নতুন রকমের 'কারি' করা শিখিয়ে দিয়ে যাও।

কারি এবং শাড়ি এ দু'টোর প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা সব আমেরিকানদের। এ দু'টোর একটার মধ্যেও যে বিশেষ কোন ভারতীয় ম্যাজিক নেই—এ কথাটা বুঝতে চায় না ওরা। রান্নার ওপর একটু কারি পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে কারি বানাই না আমরা, সবরকম মশলা একটু একটু দিয়ে রুচিমত বিভিন্ন মশলার হেরফের করে কারি তৈরি করে—শার্লিকে অনেক করে বুঝিয়েছিলাম ব্যাপারটা।

সেবার যখন নিউইয়র্ক থেকে ওঁর শাশুড়ী ওর কাছে থাকতে এল, কয়েকদিন কারি খাইয়ে তাকে দস্তুরমত হাত করে ফেললে শ্যাল। বলে, আমি যখন রান্না চাপাই মশলার মিষ্টি গন্ধে বাড়ির হাওয়া ভরে ওঠে, আমার শাশুড়ী তো তাইতেই থ্রিল্ড।

এদের আর এক থ্রীল হল শাড়ি। হ্যারিয়েটের তিন মেয়ে—বয়স যথাক্রমে চৌদ্দ, দশ আর ছয়—আমার বেশ ফ্যান হয়ে পড়ল শুধু শাড়ির আকর্ষণে। হ্যারিয়েটের কাছে খবর পেলাম আমি যেদিন ফ্রেমিংহ্যামে যাই, সেদিন সকাল থেকে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তিন বোনে তর্কাতর্কি চলে, আচ্ছা, আজ কি রঙের শাড়ি পরে আসবে মনে হয় তোমার!

ওদের আগ্রহ দেখে একদিন শাড়ি পরা শেখালাম তিন বোনকে। ওদের তাক্ লেগে গেল। ওরা ভেবেছিল সামনে কোঁচা, পেছনে আঁচল সব কিছু দিয়ে দর্জি বানিয়ে দেয় এই ড্রেস—আর আমরা টুপ করে মাথা গলিয়ে পরে ফেলি। এরকম ড্রেস করে পরতে হলে শাড়ি পরতে ক'ঘণ্টা লাগে, এবার হল এই প্রশ্ন। আধমিনিটও লাগে না শুনে ওরা আশ্চর্য।

হলিউডের চিত্রতারকাদের সিনেমার পর্দায় দেখে দেখে আমেরিকান মেয়ের পোশাক সম্বন্ধে আমার যে রকম ধারণা ছিল, বস্টনে থাকার সময় সে ধারণা অনেকটা পাল্টাতে বাধ্য হলাম। মিলিয়নেয়রেসদের কথা জানি না। সাধারণ স্বচ্ছল আমেরিকান পরিবারের মেয়ের পোষাক-পরিচ্ছদে বাড়াবাড়ি দেখি নি কোন। একটা স্কার্ট—ব্লাউসের স্যুট সবসময় পরবার, হ্যারিয়েট বলত ড্রাইভিং স্যুট। কারণ সেটা পরে গাড়ি চালিয়ে দোকান-বাজার করা, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে আনা-নেওয়া করা সবই করত সে—তাই পরেই তো দিনের পর দিন চালিয়ে দিচ্ছে দেখতাম।

শার্লির বাড়ির বাইরে সাইড ওয়াকের ওপর ডেকচেয়ারে বসে পড়ে আরো দু-একটা রান্না বলতে হল ওকে। ইভ আর জেসি দুই শিশুকন্যা ওর, স্বামী স্যাম হার্ভাড মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। এবারই গ্র্যাজুয়েশন হবার কথা। শার্লির বই পড়ার ঝোঁক খুব। ওটা আমাদের দু'জনের কমন হবি। বস্টন পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই এনে বদলাবদলি করে পড়তাম দু'জনে। আমি পড়ছিলাম তখন শান্তা রামারাওর 'মাই রাশিয়ান স্টোরি,' শার্লি পড়ছিল চেস্টার বোলজের মেয়ের লেখা 'ভারতবর্ষের ভ্রমণ কথা।' শার্লি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আমাকে, আচ্ছা ফিরে গিয়ে তুমি একটা বই লিখবে না?

আমি একটু অবাক হলাম, কেন বলো তো?

এবার হেসে ফেলে ও বললে, আর তো কোন আশা নেই। তোমার লেখার মধ্য দিয়ে যদি অমরত্ব লাভ করতে পারি!

আমি বললাম, তুমি তা হলে সেই আশাতেই থাকো, আমি আপাতত চললাম ডাঃ উইলসনের বাড়ি। উইলসনরা শীগ্‌গিরই স্পেনে চলে যাবে। ওদের এপার্টমেন্টটা বেশ ভাল, দেখি পাওয়া যায় কি না।

এপ্রিলের শেষের দিকে ক'দিন বৃষ্টি হল খুব। সবাই বললে, এপ্রিল শাওয়ার উইল ব্রিং ফ্লাওয়ার—কথাটা বোধ হয় সত্যি। বৃষ্টির পর প্রথম যেদিন বাড়ি থেকে বার হলাম—চারিদিকে চেয়ে দেখি ফেনওয়ে পার্কের গাছপালাগুলো কবে যেন সবুজ হয়ে গিয়েছে। হ্যারিয়েটের কাছ থেকে আমন্ত্রণলিপি এল নিউ ইংলণ্ডের বসন্তের সৌন্দর্য যদি দেখতে চাও, তবে আমাদের এদিকে চলে এসো। শহর থেকে বেরিয়ে কাণ্ট্রি সাইডে না এলে প্রকৃতির এ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।

ফ্রেমিংহ্যামে ওদের ছোট্ট দোতলা কাণ্ট্রি-হাউস। বাইরে থেকে দেখলে তো একতলাই মনে হয়। ঘোড়া আছে বাড়িতে বড় দুই মেয়ের দু'টো, হরিণ আছে, আর আছে খরগোস। পোষা কুকুর তো আছেই। জীব-জন্তুদের দেখাশুনোর ভার এক এক ছেলেমেয়ের ওপর। ঘোড়া হল বড় মেয়ে গ্রেশনের, খরগোসের ভার মেজ মেয়ে ক্যারেনের, হরিণগুলো স্বয়ং গৃহকর্তা ডিক উইটেনবার্গের তদারকীতে। ছোট এ্যানা নেহাৎ ছোট তাও কুকুরটার দেখাশুনো করে। ঘর-সংসার ও বাগানের পরিচর্যা হ্যারিয়েটের হাতে। ছেলে পিটার বোর্ডিং-স্কুলে থাকে, তখন ছুটিতে বাড়ি এসেছে।

নিজেদের শোবার ঘর আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে হ্যারিয়েট আশ্রয় নিল একতলায় ওদের লাইব্রেরি ঘরে। আমেরিকান আতিথেয়তা আমাদের অভিভূত করেছিল সে ক'দিন। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ব্যস্ত—কি করে একটু কাজে লাগবে। পিটার বলে, টেলিভিশনটা খুলে দেব কি, একটা পেরী মেশনের নাটক হচ্ছে দেখবে? গ্রেশন বলে, এমাসের নতুন আটলাণ্টিক মান্থলি এসে গেছে তোমার জন্য এনে দিই? ছোট দু'জন তো বুকে নিয়ে মত্ত হয়ে রইল। ঘুড়ি ওড়ানো শেখাচ্ছে, খরগোস ছানা ধরে এনে দিচ্ছে।

চিজ-স্যুফলে (cheese-soufle) দিয়ে একটা আমেরিকান সাপার সেরে বসবার ঘরে বসে ডেজার্ট খাচ্ছিলাম। একটুকরো করে মেলন, তরমুজ। বাইরে থেকে ছোটরা হঠাৎ লিভিং রুমের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। গুজ্‌গুজ্‌, ফুস্‌ফুস্ চলছে ওদের মধ্যে খাবার টেবিল থেকেই। বুঝলাম কিছু একটা দুষ্টুমির মতলব আঁটছে ওরা। খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে হ্যারিয়েট আর আমি উঠলাম রান্নাঘরের দিকে, ডুয়িং দি ডিশ বাকি ছিল।

রান্নাঘরে পা দিয়ে হ্যারিয়েট আর আমি থ', মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি দু'জন। মন্ত্রবলে যেন বাসনগুলো ধোয়া-মোছা হয়ে গেছে, ঝিক্‌মিক্ করছে যে-যার জায়গা থেকে। এবার রান্নাঘরের দরজার পিছন থেকে ছেলে-মেয়েদের খিল্‌খিল্ হাসি। মাকে একটা সারপ্রাইজ দেবে তারা ঠিক করেছিল, সন্ধ্যাবেলা থেকে ভাইবোনে চলছিল এরই তোড়জোড়।

অবশ্য সর্বদাই ওরা এরকম আদর্শ ছেলেমেয়ে হয়ে থাকে না। পরদিনই খাবার টেবিলে কি একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে পিটার আর ক্যারেনের কথাকাটাকাটি হয়ে গেল একচোট। হ্যারিয়েটের কাছে ধমক খেয়ে টেবিল থেকে উঠে গেল দু'জনে। ওরা উঠে যাবার পর হ্যারিয়েট বললে, নাও, আমেরিকান পরিবারের সব দিকই দেখে নাও ভাল করে।

এর ফাঁকে ফাঁকে হ্যারিয়েট তার স্টেশন ওয়াগন ড্রাইভ করে আমাদের ওদিকটা ঘুরে-ফিরে দেখিয়ে দিল। ফ্রেমিংহামের লাইব্রেরি, ছোটর ওপর বেশ মূল্যবান সংগ্রহ, একটা রয়েছে ঘোড়দৌড়ের মাঠ, কিশোর-কিশোরীরা ঘোড়ায় চড়ছে খুব। সেদিন ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা। আমাদের গ্রেশনও তার মস্ত ঘোড়ায় চেপে নেমে পড়ল। পিটারের খুব শখ আমি তার বোর্ডিং-স্কুলটা দেখি। নিউ ইংলণ্ডের সেটা না কি প্রাচীনতম বোর্ডিং-স্কুল। ফ্রেমিংহামের প্রতিবেশী শহর সাডবারিতে পিটারের স্কুল দেখতে যাওয়া হল একদিন।

সাডবারিতে রয়েছে ওয়েসাইড ইন (Wayside Inn) কবি লংফেলো তাঁর কবিতায় অমর করে রেখে গেছেন এই সরাইখানা। এই সরাইখানার মালিকের মুখেই বসিয়ে দিয়েছেন পল রিভিয়েরের ওপর লেখা সেই অপূর্ব কবিতার ছত্র—

A hurry of hoof in the village street
A shape in the Moonlight, a bulk in the dark—

• • • •

That was all ! And yet through the gloom
and the light
The fate of a nation was riding that night.

সরাইখানার পুরাতন ঘরগুলি সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। তা ছাড়া আধুনিক অতিথিদের থাকা-খাওয়ারও ভাল ব্যবস্থা আছে। আমার তো বেশ ইচ্ছে হচ্ছিল ক'দিন এখানে থেকে যাই। সমস্ত জায়গাটারই কেমন একটা নীরব, শান্ত, সৌন্দর্য আছে। সাধে কি লংফেলো লিখেছিলেন—

A region of repose it seems,
A place of slumber and of dreams
Remote among the wooded hills !

ওয়েসাইড ইনের কাছেই রয়েছে একটা পুরোন উইণ্ড মিল (old grist mill)। ছবির মত দেখতে এবং এখনো চালু। মিলের প্রায় উল্টোদিকেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট লাল রঙের স্কুলবাড়ি। শুনলাম, নার্সারি রাইমস্-এর বহুপঠিত কবিতা—

'Mary had a little lamb
Whose fleece was white as snow'

এর নায়িকা ছোট্ট মেরী না কি এই স্কুলেই পড়ত। ওয়েসাইড ইন, পুরোন গ্রিস্ট মিল, লাল স্কুলবাড়ি সব মিলে সাডবারির পরিবেশ মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে যেন উইনস্লো হোমারের আঁকা কোন ছবি।

ফ্রেমিংহাম ছাড়িয়ে আরো মাইল কুড়ি পূবে চলে গেলে আরো একটা ঐতিহাসিক জায়গা আছে দেখবার মত, তার নাম ওল্ড স্টারব্রিজ ভিলেজ। সেবারই অল্পদিনের মধ্যে স্টারব্রিজ দেখবারও সুযোগ এসে গেল। মিসেস ওয়েলজ-এর মেয়ে, জামাই ইলিনর আর জ্যাক এল নিউইয়র্ক থেকে। জ্যাক ইতিহাসের শিক্ষক। প্রধানত তার ও আমার উৎসাহে একদিন সারাদিন স্টারব্রিজে কাটাবার কথা হল।

মিসেস্ ওয়েলজ-এর মনটা সে সময় বেজায় খুশি। তার ইণ্ডিয়া ফেরৎ বড় মেয়ে বারবারার একটি ছেলে হয়েছে কিছুদিন আগে। বারবারা থাকে আর্জেন্টিনাতে। তার চিঠি এলেই আমাকে টেলিফোন করেন—শোন, শোন বারবারা কি লিখেছে ছেলের কথা—he has the blackest of eyes and the longest of eye lashes ইত্যাদি। ছোট মেয়ে জুডি পড়ছে বস্টন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আর নিয়মিতভাবে ডেটিং করছে ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এক ছাত্রের সঙ্গে। ছেলেটি সম্বন্ধে আড়ালে খোঁজখবর নিচ্ছেন মিসেস্ ওয়েলজ। রিপোর্ট যা পাওয়া যাচ্ছে ভালই মনে হয়। এর মধ্যে মেজ মেয়ে ইলিনর আর জ্যাক এল ওঁর কাছে বেড়াতে।

দিনের খাওয়া-দাওয়া প্যাক করে নিয়ে সবাই মিলে দল বেঁধে স্টারব্রিজ গ্রামে হাজির হলাম একদিন। গ্রামের বাইরে গাড়ি পার্ক করে রেখে হেঁটে ভেতরে ঢুকলাম। স্টারব্রিজ হল একটি জীবন্ত মিউজিয়াম। দেড়শো বছর আগে আমেরিকার গ্রাম কেমন ছিল, দেখাবার জন্য একটা আস্ত গ্রাম সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। সে যুগের নিউ ইংলণ্ডের গ্রামবাসী কি ধরণের জীবন যাপন করত—তার একটা আভাস পাওয়া যায় স্টারব্রিজে এলে। দু'শো একর জুড়ে ছড়ানো এই গ্রামে আছে—সে আমলের ঘরবাড়ি, গির্জা, একটা ট্যাভার্ন, একটি মিল আর একটা মস্তবড় কান্ট্রি-স্টোর গ্রামের মুদিখানা।

এই ঐতিহাসিক গ্রামের মহিলা গাইডদের পরনে সেকালের পা পর্যন্ত লম্বা গাউন, মাথায় ফ্রিল-দেওয়া সাদা বনেট। আচ্ছা, পোষাকটা খাটো করে ফেলল কেন ওরা, ভাবতে সুরু করলাম। অনেক বেশি সৌষ্ঠব ছিল আগেকার সুদীর্ঘ পোষাকে। গ্রামের ভিতর যাতায়াতের একমাত্র যানবাহন হল ঘোড়ার গাড়ি। আমরা ট্যাভার্ন থেকে মিল পর্যন্ত সাবেককালের ঘোড়ায়-টানা কোচ গাড়িতে বেশ একটা 'জয়-রাইড' নিলাম। মাঠের মধ্যে এক জায়গায় দেখি দর্শকের ভিড়। সবাই 'পিলোরি' দেখছে। দু'টো কাঠের তক্তার মধ্যে মাথা ও হাত দু'টো আটকে দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে অপরাধীকে শাস্তি দিত গ্রামবাসীরা। শুনতে পেলাম গ্রামের তরুণীদের প্রতি কোন অশোভন আচরণ করলে এ শাস্তি পেতে হত চপলমতি তরুণদের। দর্শকেরা অনেকেই পিলোরির তক্তার মধ্যে মাথা গলিয়ে ছবি তুলিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ফিরতি-পথে চেস্টনাট হিল পেছনে ফেলে আমাদের গাড়ি যখন ধীরে ধীরে বস্টন শহরে ঢুকছে তখন মনে হল স্টারব্রিজের সেই পাখি-ডাকা, ছায়ায়-ঢাকা গ্রামের প্রান্ত থেকে সুরু করে আজ কতখানি পথ পার হয়ে এসেছে আমেরিকান নাগরিকেরা।

[আগামীবারে নবজাতা ।



॥ ১৭ ॥

বালুকাময় সমতলভূমি উত্তরে হল্যাণ্ডের সীমানার দিকে চলে গেছে, মাঝে-মাঝে সমুদ্রের বালিয়াড়ি লুপিন পাতায় ঢাকা। ভোর পাঁচটা, সূর্যোদয় হতে আর খুব বেশি দেরি নেই।

লা ট্রিনিটির অপরেশন-রুম থেকে সিস্টার লুক বেরিয়ে এল। দিনটা ১০ই মে, ১৯৪০। এমন একটা দিন যাকে সে, তার দেশ বা পৃথিবী কেউই কোনদিন ভুলবে না।

সেদিনও সকালে প্রতিদিনের মতই বোমারুদের মহড়া চলছিল বলেই মনে হয়েছিল, যেমন শোনা অভ্যাস তার চেয়েও কাছে। মাসের পর মাস বেলজিয়াম সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে যুদ্ধার্থে।

মিউস নদীর তীরবর্তী দুর্গগুলো সৈন্যে ঠাসা, সমর-পরিচালন-কৌশল এত পরিচিত হয়ে গেছে যে, ভয়ও আর করে না। বিশেষ করে নানদের, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কথা তারা কিছুই জানে না। বিচক্ষণতার ভাষায় তারা তাদের নিরপেক্ষ দেশের রণসজ্জার ব্যাখ্যা করেছে। বিচক্ষণতাকে তারাও সমর্থন করে, মানব মনে বিচক্ষণতা ভগবানের দান।

—কেসটার জন্যে রাতেই আমাকে ডেকে খুব ভাল করেছিলেন সিস্টার। দীর্ঘদেহী ডাক্তারটি একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন তার মুখ দেখতে পান যা'তে—বিপদ বোঝবার বেশ একটা নিশ্চিত সহজাত প্রবৃত্তি আপনার আছে। প্রশংসাটুকু হাসিতে ফোটালেন ডাক্তার।—যাক, এ-সব ব্যাপার তো শেষ হ'ল, আশা করি এবার একটু বিশ্রাম করতে পারবেন।

প্রত্যুত্তরে সেও স্মিত হাসল একটু, গ্র্যাণ্ড সাইলেন্স ভেঙে কথা বলার ইচ্ছা নেই। ডাক্তারের সংগে সংগে সদর দরজা পর্যন্ত এসেছে, চামড়ার বেল্টে চাবির গোছা ঝুলছে, তারই একটা দিয়ে দরজাটা খুলে দিল। তার সংগে নিজেও বাইরে এসে দাঁড়াল তারপর। অনেকখানি সময় ইথারের গন্ধে কেটেছে, বাইরের খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার লোভ তাই।

মে'-র সকালে টাটকা মিষ্টি একটা গন্ধ। উষাকাশে আকাশটা ফিকে গোলাপী, ছোট ছোট সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। অমলিন, ক্ষুদ্রকায়, অস্তিত্বহীন। আকাশের দিকে চেয়ে তীব্র একটা যন্ত্রণাবোধের অনুভূতি ছেয়ে এল মনোমধ্যে। জলভরা মেঘ ভাবে কংগোর আকাশ এখন কাজল-কালো।

বিশেষ মনোযোগে ডাক্তার তাকিয়ে আছেন মেঘগুলোর দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে সিস্টার লুক অনুভব করছে দেহটা কেমন শক্ত হয়ে উঠল তাঁর।

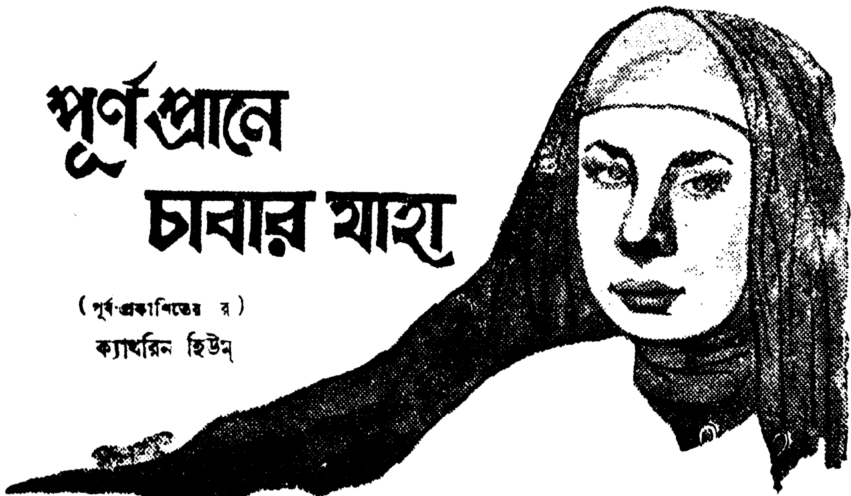
—ওগুলো মেঘ নয় সিস্টার, প্যারাস্যুট। আক্রমণ শুরু হ'ল, হায় ভগবান!

নিজের গাড়িটার দিকে ছুটতে শুরু করেছেন, পিছন ফিরে চেঁচিয়ে তাকে বলছেন ভিতরে চলে যেতে, বাইরে না থাকতে।

ক্রুশিফিক্সটা আঁকড়ে ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। উষালোকে পুষ্পাকৃতি বস্তুগুলো নেমে আসছে। অনেক নীচে তার সুতোয় মানুষ ঝুলছে এক একটা সূর্যের আলোয় সুতো চকচক্ করে উঠছে এক-একবার, চোখে পড়ে যাচ্ছে। ও যেন উপলব্ধি করতে পারছে না জীবনে এই দ্বিতীয়বার জার্মানদের আসতে দেখছে।

আতংকে হতবুদ্ধি হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল দ্বিতীয়বার। ঠিক ছাব্বিশ বছর পরে···

আবার একবার শিশু হয়ে গেছে সে, দিদিমার বাড়ির লেসের পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। দেখছে



কাইজারের অশ্বারোহী হুজার সৈন্যদল চমৎকার কালো ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে খোয়ার ওপর দিয়ে। পিছনের পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে ঘোড়াগুলো···ওদের কেপগুলো ছড়িয়ে আছে তাদের পিঠের পিছন দিকটায়, ডানদিকের রেকাব থেকে নিখুঁৎ মাপে হেলিয়ে রাখা আছে লম্বা বল্লম। দিদিমার ফোঁপানি শব্দ কানে আসে নি যতক্ষণ, আর মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখে নি—ভেবেছিল ওরা কোন রূপকথার রাজপুত্র। সেইখানে তার শৈশবের সমাপ্তি, তবু তখনও ঘৃণা করতে শেখে নি। শিখল ক্রমে। যখন দেখতে পেত বিদেশী সৈন্যরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, মা আর দিদিমা ভীত-সন্ত্রস্ত দাসী-চাকরের মত তাদের পরিচর্যা করে ফিরছেন সংগে সংগে আর তারা বাবার গতিবিধি নিয়ে জেরা শুরু করলেই ভয়ে হিম হয়ে একেবারে মূক হয়ে যাচ্ছেন···তখন শিখল।

প্যারাস্যুটগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সেই পুরোনো অনুভূতি কাঁপিয়ে দিল তাকে। বোমা ফেলে পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে পূর্বাহ্ণেই···অখণ্ড নীরবতায় নেমে আসছে এখন···অশুভ-সুন্দর ভংগিমা।···কয়েক কিলোমিটার দূরে নামছে নেদারল্যাণ্ডের সমতল ভূমিতে, স্মরণাতীত কাল থেকে জার্মানি থেকে বেলজিয়ামে ঢোকবার এটাই প্রশস্ত পথ।

অগ্নিশিখার মত রক্তে ছড়িয়ে পড়ছে ঘৃণার অনুভূতিটা। বুঝতে পারছে ঐ দূরবর্তী প্যারাট্রুপ সৈন্যদের কেউ একজন যদি হঠাৎ এই মুহূর্তে কনভেন্ট-আংগিনায় নেমে পড়ে। প্রচণ্ড বেগে ছুটে গিয়ে শূন্য হাতেই তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করবে সে।

চিন্তা তার স্বেচ্ছায় হত্যা করে চলেছে তাদের সবাইকে···

হত্যা করিবে না—বিবেকের উক্তি কানে আসছে···

দ্রুতপদে কনভেন্টে ফিরে এল। দরজাটা বন্ধ করল শুধু, চাবি দিল না। ওরা যখন আসবে, দরজাটা ভেঙে ফেলবার কোন উপলক্ষ না পায়।···কথাটা ভাবছে, অথচ অবাক হচ্ছে না যে এ ধরণের কথা কি করে আপনা আপনি জানা হয়ে গেল তার।

চ্যাপেলে যেতে দেরি হয়ে গেছে। কুড়িজন সিস্টার তার ধ্যান শেষ করে প্রাইম আবৃত্তি করছে। সুপিরিয়রকে অভিবাদন করল, তিনি তাকিয়েও দেখলেন না। বিলম্বের প্রায়শ্চিত্ত করতে মেঝের ওপর সোজা শুয়ে পড়ল ও, কনুইয়ের ওপর সারা দেহের ভার, হাতের পাতায় মুখখানা ঢেকে ফেলেছে।

প্রাচীন ল্যাটিন স্তব গাইছে সিস্টাররা···

সমুদ্র-তীরের বালিয়াড়িতে জার্মানরা নামছে···হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যকর একটা সাইকেল-ভ্রমণের দূরত্বে···

সরোষে ভাবল, হেলমেট-পরা বিশাল চেহারাগুলো দেখতে আড়চোখে তাকাতে হবে তোমায়! হাতে তাদের মারণাস্ত্র! ক'মাস আগে থেকে কথা রটেছে নাৎসী গুপ্তচরেরা প্যারাস্যুটে করে নামছে এখানে নানের ছদ্মবেশে—ক্যাথলিক ধর্মপ্রধান দেশে প্রাথমিক নিরীক্ষায়। এরপর নানরা অনুমতি পেয়েছে কোন বিশেষ অনুমতি ছাড়াই চুল বাড়াতে পারে তারা ইচ্ছা করলে। কোনসময় শহরে কাজে গেলে ছদ্মবেশী জার্মান বলে ভুল করে পুলিশ ধরে যদি, তাই।

—কিন্তু হে ঈশ্বর, রেসেড ভার্জিনের বেশ ধরে এলেও যে একটা বজ্জাত জার্মানকে আমি নিশ্চয় চিনতে পারব! চিনতে পারব আমারই মনের বিতৃষ্ণা দিয়ে। এমন তীব্র বিতৃষ্ণা যে আছে আমার মনে আজ সকালের আগে তা কোনদিন বুঝতেও পারি নি।···তাই কি ওদের পুনরাগমন দেখালে আমায়? নাকি এর অর্থ এমন নানে তোমার দরকার আছে যে কোনদিনও নিরপেক্ষ হতে পারবে না।··· নান একজন, হে প্রভু, জার্মানদের মারতে চায় যে!··· ন্যামার দুর্গে কোন পীপহোলে ডিউটিরত আমার ভাই এনটোনিকে ওরা যেমন মেরে ফেলবে, ওরা যেমন এই হাসপাতালের প্রত্যেক রোগীটিকে হত্যা করবে খাবার একটুও কম পড়ে যদি, তোমার পুণ্য সংঘের এই সব অংগীরা ওদের চোখে অদরকারী কতকগুলো খাবার মুখ ছাড়া আর কিছুই নয়···

একটি সিস্টার আস্তিন ধরে টানল তার, উঠে নিজের পিউতে গিয়ে দাঁড়াল সে। স্বদেশবাসীর মুক্তির উদ্দেশ্যে নিজের ম্যাস উৎসর্গ করে দিল। প্রার্থনাগুলো উৎসর্গ করা অভ্যাস সাধারণত পারগেটরির ক্লিষ্ট আত্মার উদ্দেশ্যে, এখন মনে হচ্ছে পাপমোচনের যন্ত্রণা ভোগ করেও ওরা এদের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত জায়গায় আছে, সুখে আছে।

স্মৃতি তার সেদিন সকালের প্রাতরাশটা অদ্বিতীয় নমুনা হিসেবে চিরকাল সংরক্ষণের জন্য রেখে দিয়েছে বেলজারের তলায়। সুদূর মাদার হাউস থেকে নিশ্চয় টেলিফোন পেয়েছেন মাদার ডিডাইমা—সে যখন প্যারাস্যুট দেখেছে সম্ভবত তারও আগে। টেবিলের একপ্রান্তে বসে মাথাটা মৃদু নেড়ে খাওয়া শুরু করলেন তিনি। নিজের রুটির টুকরোটা ছোট ছোট চার টুকরো করে কাটলেন রোজকার মত, কাঠের প্লাংকে রাখলেন সার করে। নিত্যদিনের মতই সামান্য মাখন মাখালেন সেগুলোয়, চায়ের চামচের ঝাড়া ঝাড়া দু' চামচ চিনি নিলেন কফিতে। তারপর চিনির পাত্রটা এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যাচ্ছে যেমন, সংগোপনে লক্ষ্য করতে লাগলেন কোন কোন সিস্টার সেদিন চিনি না খেয়ে আত্মকৃচ্ছ্র অভ্যাস করছে। তাঁর ক্ষুদ্র কমিউনিটির আত্মাগুলোর আত্মিক অবস্থাদির দিকে নজর রাখা কেবল, কিছুই যেন কোথাও ঘটে নি।

সুপিরিয়রের সংযত মুখখানা লক্ষ্য করে দেখছে সিস্টার লুক, আর কান দু'টো খাড়া হয়ে আছে এই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা অমংগল-শব্দ শোনবার জন্য। ঠিক এই মুহূর্তে জার্মানরা চার জায়গা দিয়ে বেলজিয়াম সীমান্ত অতিক্রম করেছে। ব্রাসেলস বিমান-বন্দরে বোমা ফেলেছে তাদের উড়োজাহাজ, নিকটতম শহর হাসেলটে বিমান-বিধ্বংসী বাহিনী বেলজিয়ামের পূর্বতম সীমায় অবতীর্ণ প্যারাস্যুট-বাহিনীর দ্বিতীয় দলটার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। হাসেলটের দিক থেকে অস্পষ্ট প্রতিরোধী শব্দ ভেসে এল যেই, কর্কশ ন্যাপকিনটা খুলে নিয়ে সামনের টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে পুলপিটে গিয়ে দাঁড়ালেন মাদার ডিডাইমা।

দাঁড়িয়ে নানদের উদ্দেশ্যে আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন, বেনেডিকুটে।

—ডোমিনাস। বিস্ময়ের আতিশয্যে প্রথমটায় কথা সরছিল না নানদের মুখে। আজ সকালে খাবার ঘরে কিছু একটা অন্যরকম ঘটছে যেন।

তৈরি করে আনা একটা কাগজ থেকে সুপিরিয়র পড়তে শুরু করলেন, 'পূর্বসতর্কিত একজন লোকের মূল্য দু'জনের সমান। আজ খুব ভোরে রেভারেণ্ড মাদার ইমান্যুয়েলের কাছ থেকে একটা টেলিফোন পেয়েছি আমি। রাত তিনটেয় রোটের্ডামের ওপর বোমা পড়েছে, বহু সহস্র লোক নিহত হয়েছে তাতে। বেলজিয়ামের ওপর বোমা পড়েছে ভোর পাঁচটায়। আক্রমণরোধের সবরকম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, জার্মান অগ্রগতি বন্ধ করতে কতকগুলো প্রধান পথ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ইতোমধ্যেই।'

মাদার ডিডাইমা পড়ে চলেছেন কাগজখানা। শুষ্ক কণ্ঠস্বর চিড় খায় নি কোথাও। এ ভয়ংকর সংবাদ না দিয়ে ও-কণ্ঠস্বর সহজেই বলতে পারত যেন—আজ তোমাদের ওপর এই দায়িত্ব রইল···

একমাত্র সিস্টার লুক একদৃষ্টে তাকিয়ে নেই সুপিরিয়রের দিকে। সে বরং নানদের চেয়ে চেয়ে দেখছে এক এক করে—সিস্টার ইগনাটিয়াস, ওর ভাইও তারই ভাইয়ের সঙ্গে আছে ন্যামারে···সিস্টার টারসিসিয়াম, ওর বাড়ির সবাই মাসট্রিচে ছিল, ইতোমধ্যেই সম্ভবত তারা জার্মানদের কবলে গিয়ে পড়েছে···সিস্টার রিয়াট্রিস, লেঁগ দুর্গ পরিচালনার ভার ওরই বাবার ওপর!

দৃষ্টি যা দেখল স্মৃতি তা সংরক্ষণ করে রাখল আবারও। একটিমাত্র দৃষ্টান্তে, তাদের অতি জাগতিক জীবনের অনেকখানি সূক্ষ্মতা ধরা রইল।

কোন মুখে ভয়ের কম্পন নেই, বেদনার অভিব্যক্তি নেই কোন।

'আমি এসব কথা বলছি যাতে তোমরা প্রস্তুত হতে পার। হাসপাতালে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে। বাইরের ছাত্রী নার্সরা রেডিও শোনে, তারা পালাতে চাইবে আত্মীয়-স্বজনের কাছে। তোমাদের প্রথম কাজ হবে তাদের এখানে রাখা আর শান্ত রাখা রোগীদের। এমনভাবেই কাজ করে যেতে হবে আমাদের, যেন কিছুই ঘটে নি···'

কথার মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে কামানের শব্দ শোনা গেল তিনবার। মাদার ডিডাইয়া থামলেন একটু, যেন একটা অভদ্র বাধা এসে পড়েছে। তারপর শুরু করলেন আবার।—'সাহস আর স্থৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ভীত মানুষদের তোমাদের পথে টেনে আনার দায়িত্ব তোমাদেরই। মনে রেখ ঈশ্বর ভালবাসেন আমাদের, তিনিই আমাদের দেখবেন।'

কাগজখানা ভাঁজ করলেন সুপিরিয়র।—এরপর ঘটনা যেমন এগোবে বুলেটিন বোর্ডে দেখতে পাবে তোমরা। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন তাদের, স্থিরনিশ্চয় হতে চান যে তারা বুঝেছে তাঁর কমিউনিটিতে যুদ্ধালোচনা হবে না।

এই কমিউনিটিতে আসার পরে এই প্রথম সিস্টার লুক তার এই দুর্বোধ্য সুপিরিয়রটির সম্বন্ধে একঝলক প্রশংসা অনুভব করল।

পরবর্তী আঠারোটি দিন একটানা দুঃস্বপ্ন যেন। সীমাহীন ঘটনাপ্রবাহ কেবল, একের পর এক, চকিত অশংকিতপূর্ব। কনভেন্ট হাসপাতালে উদ্বাস্তরা আসছে—হল্যাণ্ড থেকে, তারপর বেলজিয়ামের পূর্বদিকের সব ক'টা জেলা থেকে। নানদের সামান্য সঞ্চিত খাদ্যের ভাগীদার বাড়ছে যত, কোমরের বেল্ট তত টান করে পরছেন ওঁরা। হাসপাতালের সব করিডর আর ফরে হাল্কা খাট আর চাকা দেওয়া চেয়ারে ভরে গেছে···নানরা তারপর মেঝের ওপর তোষক পেতেছেন।

বুলেটিন বোর্ডের সংক্ষিপ্ত সমাচার উদ্বাস্তদের উত্তেজিত খবরাখবরে বিস্তারিত হয়। শত্রু-আক্রমণে ১৭ই মে এ্যালবার্ট ক্যানাল ভেঙে পড়েছে। ১৯শে মে ব্রাসেল্‌সের পতন, ম্যালিন্স আর লাউভেন দখল···অর্ধেক বেলজিয়াম ইতোমধ্যেই বিধ্বস্ত।

রেভারেণ্ড মাদার ইমান্যুয়েলের কাছ থেকে আসা চিঠিগুলো আরও নির্ভরযোগ্য। পরিষ্কার করে লেখা শিরোনামার নীচে সুন্দর করে দাগ টানা—'মাদার হাউসের কতিপয় পরামর্শ'—তার তলায় সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন সুপিরিয়র জেনারেল, সিস্টাররা যেন বিদেশীদের প্রতি ব্যবহারে সতর্ক হয়, অনুমতি ব্যতীত নিজেদের পরিবারের কোন খোঁজখবর না করে, জাতীয়তাবাদী কোন কাজে অংশ না নেয়, খাদ্য কমবে যতটা সেটাকে কৃচ্ছ্রসাধন হিসেবে নেয় যেন এবং সেটাকেই যথেষ্ট মনে করে নিজের ইচ্ছায় অতিরিক্ত কোন আত্মনিগ্রহে লিপ্ত না হয়। লিখেছেন, দেশের খাদ্যের যে পরিমাণ ঘাটতি সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে আমাদের অতিমাত্রায় দ্বিধান্বিত বিবেককে তৃপ্ত করার পক্ষেও যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন হবে তা।

২৬শে মে বুলেটিন বোর্ড জানাল, ডানকার্কের সমুদ্র তীরে হতাবশিষ্ট বেলজিয়াম-বাহিনী কিছু ইংরাজ ও কিছু ফরাসী-সৈন্যসহ যুদ্ধ করছে। ২৮শে মে'র বুলেটিন বোর্ডে একটিমাত্র বিবর্ণ সংবাদ: রাজা লিওপোল্ড আত্মসমর্পণপত্রে সই করেছেন।

দেশের রাজার বেদনাময় আত্মসমর্পণে আঠারো দিনব্যাপী উত্তেজনা শেষ হল, আর এই ক'দিনের মধ্যে সিস্টার লুক না জেনে প্রথমবার বেলজিয়াম-গুপ্ত-প্রতিরোধ আন্দোলন দলের কাজ করল। ব্রাসেল্‌সের পতনের দিন সন্ধ্যায় চাষার ধরণের পোশাক-পরা একটা লোক এক গাড়ি উদ্বাস্ত নিয়ে এল। মাঝবয়সী লোকটি, হাতে একটা চেন দেওয়া ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগ। কিন্তু দেখা গেল সে নিজেই রোগী। একটা স্লিপ এনেছে তাতে বলা হয়েছে টি-বি উইংবের যে প্রাইভেট রুমটা সাময়িক খালি আছে সেখানে তাকে রাখা হয় যেন। স্লিপটি সই করেছেন একজন ডাক্তার, বিমানাক্রমণ শুরু হয়ে অবধি তিনি হাসপাতালে আর পা দেন নি। সিস্টার লুক অবাক হল, ঘরটা খালি হয়েছে ডাক্তারটি জানলেন কি করে। বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সে মানুষটিকে তিনতলায় নিয়ে এল।

ঘরে এসে রোগীটি তাকে বললে রাত্রে যেন কোন নার্সকে এ-ঘরে আসতে না দেওয়া হয়। সে নির্বিঘ্নে ঘুমুতে চায়, কেউ না বিরক্ত করে। নিম্নস্বরে অনুরোধ করল পরদিন ভোর চারটের তার কাছে একা একবার আসতে —এটাও নিয়মবহির্ভূত।

সুপিরিয়রকে জিজ্ঞাসা না করে যুদ্ধের সময়ও নানরা প্রাইভেট রুমের কোন অচেনা লোকের সংগে দেখা করতে ভোর চারটেয় উঠতে পারে না। সিস্টার লুক জানে, জিজ্ঞাসা করে যদি তো এ অনুরোধ বাতিল হয়ে যাবেই, কারণ এর সমর্থনে কোন যুক্তিই দেখাতে পারবে না সে। কিন্তু কি দেখেছে ঐ মানুষটির চোখে, বিবেক তার ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতার দিকেই ঝুঁকছে। দেখেছে একটা ত্বরার ছায়া, ঐ ছায়া যেন মিনতি করছে তাকে এই অদ্ভুত অনুরোধ রাখতে!

পরদিন তখনও অন্ধকার আছে, সিস্টার লুক দরজায় টোকা দিল, সংগে সংগে খুলে গেল দরজাটা। পোশাক পরে পুরোপুরি তৈরি হয়ে মানুষটি অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালেন, ম্যাসের উপাসনায় আমার সংগে যোগ দেবেন সিস্টার?

সংযম অভ্যাস করতে করতে সেটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে এখন, বিস্ময় গোপন করে মাথা নাড়ল সে। ত্বরিৎকরে ব্যাগটা খুলে ছোট একটা অল্টার-পাথর, একটা মিসল্, একটা দাঁড় করানো ক্রুশিফিক্স আর মোমবাতি বার করে দিলেন তার হাতে। বিছানার পাশের টেবিলে একটুকরো রেশমী কাপড় পেতেছেন। ও অল্টারটি তুলে নিয়ে তার ওপর স্থাপন করল, উনি ততক্ষণে পাতলা রেশমী যাজকীয় পোশাকগুলি ঝাড়ছেন বার করে। কংগোর ভ্রাম্যমাণ ফাদাররা গির্জাহীন জংগলে গির্জার প্রতীক নিয়ে যাবার সময় এমনি ছোটর মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে যান উপাসনার সরঞ্জাম আর পোশাক। অনেক যাজক নাৎসীদের কবলে পড়ার আগেই বেলজিয়াম ছেড়ে চলে যেতে চেষ্টা করছেন স্পেনে এবং সেখান থেকে সম্ভবত ইংলণ্ড বা ইউনাইটেড স্টেটসে, নাৎসীরা ধরে যদি তাদের হুকুমমত ধর্মোপদেশ দিতে হবে। বুঝতে পেরেছে তেমনই একজন ফাদারের সংগে উপাসনায় যোগ দিয়েছে, বুঝে কাঁটা দিয়ে উঠছে গায়ে। নিশ্চয়ই উচ্চপদস্থ কেউ হবেন, তাই গির্জার পুণ্যসীমার বাইরে ম্যাস আবৃত্তি করার অনুমতি পেয়েছেন।

উপাসনা শুরু হ'ল। শয্যাপার্শ্বের টেবিলটি থেকে তিন পা পিছু হটে এসেছেন, যেন সেটি ও তাঁর মধ্যে তিনটি অল্টার ধাপ আছে। পিছনে নতজানু হয়ে বসেছে সে, বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে যেন। সামনের মানুষটির সুন্দর সুসম হাত দু'খানি দেখছে, লাঙল ওরা কোনদিন স্পর্শও করে নি। ধুলোকাদা মেখে না নিলে ওরাই কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবে ওঁর সংগে। মনে করে রাখল কথাটা, ম্যাসের পর বলতে হবে।

পরবর্তী একুশ মিনিট হাসপাতালের পরিচিত ঘরখানা ঈশ্বর-আবাসে পরিণত হ'ল।

উপাসনা শেষে প্রিস্টটি সাজ-সরঞ্জামগুলো ভরে নিলেন ব্যাগে, তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্মিত হাসলেন তারপর।

—ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন সিস্টার। এবার··· এককাপ কফি যদি খাওয়াও আমায়।

বেয়ারা-চাকরদের ব্যবহারের সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘরে নেমে এল সিস্টার লুক, কেউ দেখতে না পায় যাতে। ফিরে গিয়ে দেখল প্রিস্ট্ চলে গেছেন। বেড-টেবিলের আলোটা জ্বালা, সেটাই চাপা দিয়ে একটি চিরকুট রেখে গেছেন তার চোখে পড়ার সুবিধার্থে। পরিচ্ছন্ন ঈষৎ তির্যক অক্ষরে লেখা তাতে, আমার জন্য প্রার্থনা কোর।

ফ্রান্সের দিকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিপদসঙ্কুল পথটা পেরিয়ে যেতে একজন মানুষের যতদিন লাগতে পারে বলে মনে হ'ল, ততদিন সেই কাগজের টুকরোটা স্ক্যাপু-লারের তলায় ঠিক নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর বয়ে নিয়ে বেড়ালো। তাতে সজীব একটা অংশগ্রহণী মনোবৃত্তি জেগেছে মনে, যেন তার নিজেরই একটা অংশ ঘুরছে বিপদের মধ্যে—কৌশলে জার্মানদের এড়াচ্ছে, দিগন্তসীমায় জার্মান ট্যাংকের আভাস পেলে ঝোপঝাড় কি গোলাবাড়িতে লুকোবার মত জায়গা খুঁজছে।···সে সুপ্ত স্বাদেশিকতা-বোধকে মনে হ'ত নিরীহ পূর্বগামুকৃতি পূর্ণমাত্রায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেটা। সতেজ নাড়ির মত স্পন্দিত হচ্ছে তার মধ্যে।

ছাত্রী নার্সদের আলাপ-আলোচনা এখন ইচ্ছে করেই খেয়াল করে শোনে। শোনে অর্ডেন্স একেবারে সম্পূর্ণ জার্মানদের কবলে এখন।···অথচ তার সেই প্রিস্ট্ নিঃসন্দেহে অর্ডেন্সের ভিতর দিয়ে যাবেন! ব্লেসেড্ ভার্জিনের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর জন্য, পাহাড়ের সুঁড়ি পথগুলো দিয়ে যেন তিনি গোপনে চলতে পারেন তাঁর কৃপায়—সে নিজে একালে সে-সব পথে অনেক ঘুরেছে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরার নেশা ছিল যখন।···শোনা যাচ্ছে বড় রাস্তাগুলো দিয়ে স্রোতের মত পালাচ্ছে মানুষ আর তাদের ওপর মেসিনগানের গুলীবর্ষী নাৎসী বিমানবহর বক্রগতিতে নেমে আসছে অকস্মাৎ।

জানেও না এক অপরিচিত প্রিস্টের জন্য প্রার্থনা করছে যখন তার নিজের বাবাও ঐ বিপদসংকুল পথ ধরে ফ্রান্সের দিকে চলেছেন। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেবার অনুমতি চাইবে না প্রতিজ্ঞা করেছে নিজের মনে, অনেক নানই করেছে যেমন তেমনই। প্রিয়জনরা কোথায় আছে না জানার বেদনা আর একটা অতিরিক্ত দুঃখ যা তাঁর নামে বইতে পার তুমি! কেবল ইস্টারে বাবাকে চিঠি লিখেছে যখন শেষবার তখন ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করে পিসীমার কথাটা সত্য কি না—যদি কখনও জার্মানরা আবার আসে তো দেশ ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। লেখে নি, মাদার ডিডাইমা পড়ে যদি ভাবেন এ তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা, সেই ভয়ে।

আহার্য বিরলতর হয়ে উঠছে, নানরা ক্ষুধার্ততর। কনভেন্টের কেউ এখনও একটাও জার্মান দেখে নি। বোমাপড়া রাজপথ থেকে আহত মানুষ তুলে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আসে নিয়মিত; দায়িত্বে অনেক সময়ই প্রিস্টরা কেউ থাকেন, কালো পোশাকের আস্তিনে তাঁদের রেডক্রশের আর্ম-ব্যাণ্ড আটকানো। সিস্টার লুক তাঁদের ছবি তোলে, গুলীর ঘা-খাওয়া এ্যাম্বুলেন্সগুলোরও। অমানুষিকতার এই সব প্রমাণপত্র কার জন্য তৈরি করছে কোন ধারণা নেই।

গুপ্ত খবরের কাগজ প্রচারিত হচ্ছে—নানদের প্রতি এগুলো না পড়ার অনুরোধ আছে। বাধ্যতার নিয়ম থেকে তার প্রথম ইচ্ছাকৃত বিচ্যুতির জন্য এক প্রিস্ট পালাবার পথে বলে গেছেন, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। এটাই সাহস জোগাল তাকে আর একটায়। ছাত্রীদের কাছ থেকে এ পত্রিকার খবরাখবর পায় সে। শোনা যায় এই পত্রিকার এককপি লেফটেনান্ট জেনারেল ব্যারন আলেকজাণ্ডার ভন ফলকেনহসেনের ডেস্কের ওপর রোজ রাখা থাকে, সারা বেলজিয়ামে এখন তিনিই নাৎসী মিলিটারী কমাণ্ডার। আজ অবধি কেউ জানে না কে রোজ তাঁর ডেস্কে ঐ বিরক্তিকর কাগজখানা রেখে যায়!

হাসপাতালে সব কিছু এমনভাবে চলছে, স্বাভাবিকতার হানি কোথাও ঘটে নি যেন।

ছাত্রীদের ফোন এলে সে-ই ধরে। বলে, আমি দুঃখিত মঁসিয়ে, ডিউটিতে আছে ম্যাডমোজেল এখন, ফোনে কথা বলতে আসতে তো পারবে না।

ওপারের কণ্ঠস্বর কোন প্রিস্টের বাচনভংগী অনুকরণ করবার চেষ্টা করে, আমি ফাদার জন বলছি সিস্টার, ব্যাপারটা খুব জরুরী।

তখন মেয়েটিকে ডেকে দিতে হয়। সিস্টার লুক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মেয়েটিকে, গোপনতার আবরণ সরিয়ে একঝলক উত্তেজনার রক্তিমাভা এসে পড়ে তখন সে মুখে।...

তারপর ছাত্রীটি ঘণ্টাখানেকের জন্য একবার শহরে যাবার অনুমতি চায়।

একদিন রাত্রে সিস্টার লুক ছাত্রীদের ডরমিটোরিতে উঠে এল। মেয়েরা রেডিওটা ঘিরে ভিড় করে আছে। মোটা জার্মান উচ্চারণে ফরাসীতে ভাষণ দিচ্ছে কে, শুনছে তাই। সব বেকার বেলজিয়ানদের জন্য জার্মানির মধ্যে চাকরির উজ্জ্বল প্রস্তাব দাখিল করা হচ্ছে বেতার ঘোষণায়—লোভনীয় শর্ত, চড়া মাইনে। কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে কথাগুলো গিলল সিস্টার লুক, যে মেয়েটির কাছে সবচেয়ে বেশি টেলিফোন আসে তার কাঁধে মৃদু টোকা দিল তারপর।

মেয়েটির নাম লিজা, তার অন্তরংগ খুব। ওর কমনীয় মুখখানির দিকে তাকালে কংগোর বেগনিয়া ফুলগুলোকে মনে পড়ে—স্পর্শমাত্রে ঝরে পড়ে যায় সেগুলো। কৃষ্ণ পল্লবিত চোখ দু'টিতে ওর শিশুর সারল্য।

—সিস্টার লুক! লিজা দাঁড়িয়ে উঠেছে তখনই। —কোন ওয়ার্ডে ঘটেছে কিছু?

সবসময় সব আগে রোগীদের জন্যে ভাববে...নিজেরই মুখের কথাটা শুনে মৃদু হাসল সিস্টার লুক, মাথাটা নাড়ল। দরজার কাছাকাছি ডেকে নিয়ে এল লিজাকে।

বলল, আজও আবার শহরে যাবার কৈফিয়ৎটা তোমার একেবারে উদ্ভট হয়ে যাচ্ছে না লিজা—ঐ অসুস্থ কাকার কৈফিয়ৎটা দু'বার ব্যবহার করা হয়ে গেছে, মনে নেই?

—ও হো সিস্টার, তাই বুঝি! আয়ত দু'টি ধূসর চোখে পুঞ্জীভূত বিশ্বাস নিয়ে তাকাল লিজা। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল তাড়াতাড়ি, আমাদের যেসব ছেলেরা লুকিয়ে আছে, তাদের রেশন কুপন বিলি করছি সিস্টার। অপ্রত্যাশিত প্রবেশাধিকার দিয়ে তাদেরই একজন করে নিল তাকে।—আমাদের এই শহরেই বহু ছেলে রয়েছে সিস্টার, যারা জার্মানদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, রেশন-বইয়ের জন্যেও নাম রেজেস্ট্রী করায় নি। যে চাষারা লুকিয়ে রেখেছে তাদের, খাওয়াচ্ছে, তাদের খাবারের দাম দেবার জন্যে কুপন যে চাই-ই ওদের। কুপনগুলো ব্রাসেল্‌সে ছাপানো হয়, হয়ে আমাদের কাছে আসে। কে পাঠান জানি না আমরা, কেবল জানি পাওয়ামাত্র আমাদের যেতেই হবে তখনই।

ইশারায় তাকে থামালো সিস্টার লুক।

বলল, এই যথেষ্ট লিজা, আর কোন প্রশ্ন করব না আমি।

...করব না করতে পারব না বলে...একটা বাসনা মনের মধ্যে জলে উঠেছে হঠাৎ...ইচ্ছে হচ্ছে তার সামনে এই যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তার মত স্বাধীনতা পেতে। স্বাধীনতা পেতে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার, তাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হবার, তার ছোট দু'টি ভাইয়ের বয়সী ছেলেদের কাছে চুরি করা রেশন-কুপন পৌঁছে দেবার...ঐ দেশভক্ত কৃষকদের খড়ের মাচায় লুকিয়ে থাকা ছেলেগুলোর মধ্যে তারাও আছে সম্ভবত...

অনুচ্চে বলল আবার, কোনদিন আমি যদি কোন সাহায্য করতে পারি লিজা, বোল আমায়।

চলে যাবার জন্য ঘুরেছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, তোমাদের মধ্যস্থকে জানানো যদি সম্ভব হয় তো তাঁকে বোল টেলিফোনে যেন আর না বলেন যে তিনি একজন প্রিস্ট। যে কোন নান বুঝতে পারবে প্রিস্ট তিনি নন, কোনদিনও ছিলেন না। ছাত্রীর দিকে চেয়ে স্মিত হাসল, এমন হাসি কদাচিৎ হাসে সে।—প্রিস্ট হবার অনেক আগেই ভাবী-প্রিস্টের গলা থেকে এরকম জাগতিক ব্যস্ততার সুর লুপ্ত হয়ে যায়।

পরের বার লিজার ফোন ধরল যখন, মধ্যস্থ ব্যক্তিটি নাম ধরে সম্বোধন করলেন তাকে।—আপনি আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছেন আমি শুনেছি সিস্টার লুক, ধন্যবাদ। ভগবান আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা - প্রণতি মুখোপাধ্যায়

স্বর্গ খেলনা

সুজাতা



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সংসার কিন্তু নতুন-আসা ভানুদি'র হাতে মন্দ চলল না, মা যদিও দোতলা থেকে নীচে নামলেন না—তবু ওপর থেকেই যথা সম্ভব দেখাশোনা, এমন কি তোলা উনুনে দু-একটা রান্নাও চলতে থাকল।

মহুয়ার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে; ফাগুন মাসের উতলা হাওয়ায় সন্ধ্যেবেলা অনেক, অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে আর বাধা নেই, বাধা নেই সারা দুপুর আলস্যভরে উপন্যাসের পাতা ওল্টাতে আর স্বপ্ন দেখতে। সেই ছোটবেলার মহুয়ার মতই আজও মহুয়া স্বপ্ন দেখে। হঠাৎ চাঁদের আলোয় মহুয়া বালা পরা নিজের দু'খানি হাতের দিকে চেয়ে দেখল, শুধু দেখলোই না—যেন আবিষ্কার করল, আশ্চর্য হল; এত সুন্দর, এত লাবণ্যভরা কোমল অপরূপ দু'খানি হাত মহুয়ার! এত সুন্দর সে! চোখের সামনে দু'হাত তুলে নেড়ে-চেড়ে দেখল মহুয়া। বাঃ! লাল পাতলা মিলের শাড়ির আঁচলটা টেনে গায়ে জড়াল, সাদা সিল্কের ব্লাউজের স্পর্শটা যেন নতুন করে অনুভব করল; কি স্নিগ্ধ। কি কোমল? আর হঠাৎ ভারি ভাল লাগল নিজেকে; হাতের মধ্যে হাত জড়িয়ে মুখ উঁচু করে মহুয়া চাঁদের দিকে চাইল।

'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো'

কি অপরূপ। কি আশ্চর্য সুন্দর। এই মুহূর্তে মহুয়ার মনে হল, কি আশ্চর্য সুখী সে, কি পরিপূর্ণ তার জীবন। শিরশিরে বসন্তের হাওয়ায় মহুয়া গায়ের কাপড়টা আরো একটু টেনে নিল।

মৌ। এই মৌ।

দাদা। কি রে?

কি করছিস এখানে একা একা?

তুই বা কি করছিস? তোর না আর দু'দিন বাদে পরীক্ষা!

রাখ তোর পরীক্ষা, শীগ্‌গির চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

প্রসূনের বাড়ি।

কেন দাদা?

আ রে শচীনদেব বর্মন এসেছেন, ওদের বাড়ি। বিরাট জলসা!

সত্যি?

হ্যাঁ এক্ষুণি প্রসূন আমায় স্লিপ পাঠিয়েছে, ছাখ না।

ও মা সত্যি ত'। চল যাচ্ছি।

তর তর করে নেমে আসছিল দুই ভাই বোন।

তুলতুলির সঙ্গে দেখা সিঁড়ির মুখে। কোথায় যাচ্ছিস রে দিদি।

গান শুনতে; যাবি তুই?

বা রে! যাব না মানে; খালি নিজেরা···

চল, চল।

মহুয়া তুলতুলির হাত ধরল; মা'র ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—মা আমরা একটু আসছি প্রসূনদা'দের বাড়ি থেকে। তিন ভাই বোনে চলে গেল গান শুনতে।

'সুরিয়া অস্ত হো গ্যয়া, গগন মস্ত হো গ্যয়া'

রাত্রে শুয়ে শুয়েও মহুয়া গুন্‌গুন্ করছিল।

'সুরিয়া অস্ত হো গ্যয়া'

এই মৌ!

ওপাশের খাট থেকে সঞ্জয় ডাকল।



তুই তখন প্রসূনদের বাড়িতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের সঙ্গে কথা বলছিলি রে?

কখন বলত?

ঐ গানের পরে।

ও, সেই খদ্দরপরা ভদ্রলোক?

মহুয়া বিছানার ওপর উঠে বসল।

সেই ঘুরঘুট্টি কালো লোকটা?

ঘুরঘুট্টি কালো বলিস নি, খুব ভালো দেখতে ভদ্রলোককে।

ঐ যদি তোর ভালো হয়···,

কি যে বলিস! অমন প্রশান্ত চেহারা!

তোর কাছে ত' খদ্দরপরা হলেই সাতখুন মাপ। সব ভালো তার।

তা ভালো।

খদ্দরপরা লোকেদের সম্বন্ধে মহুয়ার সত্যিই একটা আকর্ষণ আছে; আর ঐ ভদ্রলোক, নিশীথ সেন, তিনি ত' সত্যিই সুন্দর দেখতে; কালো? কিন্তু কি সুঠাম চেহারা, আর কি সুন্দর বাঁশি বাজান; সেদিন রাত্রে যে বাঁশির সুর শুনে মহুয়া পাগল হয়েছিল সে বাঁশি ত' উনিই বাজিয়েছিলেন।

শচীনদেব চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে প্রসূনদা'র বোন হাসির ঘরে তাদের আসর বসেছিল। ভদ্রলোককে সত্যিই ভারি ভালো লেগেছে মহুয়ার, আর আশ্চর্য, মহুয়াও বেশ বুঝতে পেরেছে ভদ্রলোকেরও খারাপ লাগে নি মহুয়াকে।

কি করে ঐ কালো লোকটা···?

এই দাদা? ওরকম করে বলবি না।

বাঃ কালোকে কালো বলব না ত' কি, ফরসা বলব? সঞ্জয় উঠে এল মহুয়ার বিছানার কাছে।

এই দাদা! কি হচ্ছে, তোকে কাল ভোরে উঠে পড়তে বসতে হবে না!

তা তো হবে, কিন্তু তার আগে আসল কথাটা বল। ঐ কালো লোকটিকে তোর একটু বেশি পছন্দ হয়ে গেছে! তাই না? মাকে বলব নাকি?

যা ভাগ।

মহুয়া বালিশে মুখ চেপে ধরল; সত্যিই কি ঐ কালো লোকটিকে তার খুব বেশি পছন্দ হয়ে গেছে! দাদা কি সত্যিই মাকে কিছু বলবে না কি? কিন্তু কি বলবে? আর বললেই বা কি হোত; যদি সত্যিই মহুয়া চাইত—না মহুয়া জানে খদ্দরপরা লোকেদের সম্বন্ধে মা'র যত শ্রদ্ধাই থাক—মা কিন্তু কোনদিনই শুধু খদ্দরপরা স্বদেশী লোকের সঙ্গে যুক্ত হতে দেবেন না মহুয়ার সারা জীবন।

আশ্চর্য! মা-বাবা সকলেই ত' কি ঘোরতর দেশপ্রেমিক, এখনও সন্ধ্যেবেলায় মা অর্গ্যান বাজিয়ে মিষ্টি মিহি গলায় গান করেন—

বল বল বল সবে,

আর শুতে যাবার আগে তাদের পারিবারিক বৈঠকে রোজই গাওয়া হয় 'জনগণমন অধিনায়ক'। মা কখনও মিলের শাড়ি পর্যন্ত পরেন না; সুন্দর সুন্দর ধনেখালি আর ঢাকাই শাড়ি নিয়ে কাপড়ওলা আসে মহুয়াদের বাড়ি, বাবা বেছে বেছে স্বদেশী জিনিসই কিনে আনেন, শুধু ওষুধ আর স্নো-পাউডার ছাড়া।

ওগুলো?

মা একটু ম্লান হেসে বলেন, দেশী এখনও তেমন হয় নি;

কিন্তু তবুও, মহুয়া জানে, গভর্নমেণ্টের চাকুরে, বিলিতি ডিগ্রীধারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ এ বাড়িতে; এই ত' সেদিন বাবার বন্ধু শৈলেশবাবু একটি বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন মহুয়ার জন্যে।

লেখাপড়ায় ভাল কিন্তু গরীব, বিলেতও যায় নি আর মাইনে পায় দু'শো টাকা।

শৈলেশবাবু গর্ব করেই বলেছিলেন, দু'শো টাকা মাইনে।

মা শুনে কেমন একটু উপেক্ষার হাসি হেসেছিলেন, সে হাসিটা মহুয়ার মনে হয়েছিল, একটুও মানায় না মা'র মুখে।

আর বাবা বলেছিলেন, তোমার বৌদির একটু অন্যরকম ইচ্ছে শৈলেশ।

ইচ্ছেটা কি মহুয়া জানে। আর তাই ত' মহুয়া নিজের ইচ্ছেটা সব সময় চাপা দিয়েই রাখে।

আচ্ছা! এ রকম কেন হয়; যে বাবা সারাজীবন ইংরেজ সরকারের গোলামী করার দুঃখ ভুলতে পারেন না, সেই বাবাই সরকারী বড় চাকুরে ছাড়া মেয়ের বিয়ে দিতে চান না, যে মা মহুয়ার মনে দেশাত্মবোধের প্রথম প্রেরণা এনেছেন, দেশের সুসন্তানদের কথা বলতে বলতে যাঁর মুখ লাল হয়ে ওঠে, চোখ সজল হয়ে আসে—তিনিই মহুয়ার জন্যে বিদেশী ছাপ দেওয়া পাত্রের সন্ধান করেন।

মহুয়া ঠিক বুঝতে পারে না। বাবা কিংবা মা'র স্বদেশপ্রেম একান্তভাবেই আন্তরিক তাতে সন্দেহ কি? বিশেষ করে মা! কি অনুরাগভরে স্বদেশীপ্রথা, রীতিনীতি, সব কিছুকে আঁকড়ে থাকেন মা। পাছে মহুয়া মিশনারী স্কুল থেকে বিদেশী বিধর্মী ভাবধারায় অভ্যস্ত হয়, সেজন্য কি সদাজাগ্রত সতর্কতা মা'র; পাছে উত্তরপ্রদেশে মানুষ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তারা বাংলা ভুলে যায়। তাই কত যত্ন করে তাদের তিন ভাই বোনকে বাংলা শেখাতেন মা নিজে; আর কত সুন্দর সুন্দর মাসিকপত্র যেত তাদের বাড়িতে বাংলা দেশ থেকে। সন্দেশ, শিশুসাথী, মৌচাক। মহুয়া বড় হয়ে মৌচাক আর শিশুসাথীই পড়েছে নিয়মিত; আর খুব ছোটবেলায় তখনও মহুয়া পড়তে শেখে নি, সন্দেশের

ছবি ওল্টাত আর দাদার কাছে শোনা পংক্তিগুলো মুখস্থ বলে যেত; মৌ বই পড়তে শেখার আগেই কবিতা বলতে শিখেছে। আর সেই যে কবিতার নেশা লাগল ছোট্ট মহুয়ার মনে, সে নেশা কি আজও গেছে!

ছোটবেলার সেই—

'গান ধরেছেন ভীষ্মলোচন শর্মা'

পড়তে পড়তে কখন যেন ধাপের পর ধাপ উঠে একদিন সেই গায়ে কাঁটা-দেওয়া লাইনগুলো পড়ল—

'আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে ঝুলন খেলা,···'

মনে আছে রবীন্দ্রনাথও মহুয়া যার কাছেই প্রথম শুনেছে; সেই যে মীরাটে মহুয়া আর তুলতুলির শিয়রে বসে মা গুনগুন্ করে আবৃত্তি করতেন—

'বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস।'

আর তারপর কলকাতায় এসে কতবার মহুয়ারা মঞ্চে মূক অভিনয় করেছে এই কবিতার সঙ্গে। আর সবসময়ই মহুয়ার মনে হয়েছে, যেন মা পর্দার আড়ালে তাঁর রিনরিনে গলায় বলে চলেছেন—

'আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি।··'

মৌ!

দাদা আবার ডাকল মহুয়াকে।

এই দাদা! কি হচ্ছে! তুই আজ ঘুমুবি না! আমাকেও ঘুমুতে দিবি না!

আচ্ছা, কি করে ঘুমুব বল! তুই আমার এদিকে এসে ছাখ না, অসভ্য চাঁদটা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, এ রকম চোখের ওপর চাঁদের আলো নিয়ে ঘুমুনো যায়!

সত্যি?

মহুয়া হাল্কা পায়ে উঠে এল সঞ্জয়ের বিছানার কাছে। ইস দাদা! কি অপরূপ রে!

মহুয়া সঞ্জয়ের বিছানার এক পাশেই বসে পড়ল।

আঃ কি আলো!

'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।'

গুন্‌গুন্ করতে করতে মহুয়া আবার উঠে দাঁড়াল। আমি যাই।

কোথায়?

সঞ্জয় সত্যিই অবাক হয়ে গেছে।

বনে না কি?

আপাতত ছাদে; বন থাকলে সেখানে যেতাম নিশ্চয়ই।

মহুয়া ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সামনের ছাদে, আর এসেই ওর মনে হল, ভাগ্যিস এসেছিল! সারা ছাদ ভরে চাঁদের আলো, আর মা'র হাতে পোঁতা টবের বেগনভোলিয়ার লতার ডালে ডালে আলোছায়ার কি অপরূপ আলপনা! হঠাৎ মহুয়ার মনে পড়ল সন্ধ্যার সেই গান—

'সুরিয়া অস্ত হো গ্যয়া, গগন মস্ত হো গ্যয়া'

কে বলে সূর্য অস্ত গেলে আকাশের আলো চলে যায়? কে বলে 'গগন মস্ত হো গ্যয়া'। এই ত' চাঁদের আলোয় সারা পৃথিবী, আকাশ কথা কয়ে উঠেছে। মহুয়া বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল একঝলক দখিনা বাতাস হঠাৎ বয়ে গেল, আর ক্ষণকাল আগের ভাললাগা হঠাৎ কোথায় উধাও হল; চাঁদের আলোয় মায়াপুরীর মত ওল্ড বালীগঞ্জের বাড়ির সারি আর সযত্নে রাখা বাগানগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ উদাস হয়ে গেল মহুয়ার মন।

দোতলায় ছোট কোণের ঘরে মা'র কাছে বসে মহুয়া স্টোভে পান্তুয়া ভাজছিল। পরীক্ষা হয়ে গেছে, ছুটি এখন, রান্না শেখার প্রশস্ততম সময়; এই রাধারাণীর অভিমত। আর মহুয়ারও মন্দ লাগে না এইসব পান্তুয়া আর রসগোল্লা বানাতে আর কাটলেট ভাজতে। অবশ্য মহুয়া রান্না যে কতটা শিখেছে এইভাবে, সে সম্বন্ধে মহুয়ার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ মা ত' আছেনই তা ছাড়াও বাবুর্চি, ভাদুদি' এমন কি আয়া পর্যন্ত আছে সবসময় কাছে কাছে। খোকি জেরা সামালকে বায়ঠো; হাঁ আভি উঠাও, লাও ছোড়ো, ম্যয় দেখতি হুঁ।

মহুয়ার হাত থেকে খুন্তী কেড়ে নিয়ে আয়াই ঘিয়ের মধ্যে থেকে ফুটন্ত পান্তুয়া ছেঁকে তোলে।

মোড়ার ওপর বসে আয়ার সর্দারি আর সতর্কতার মধ্যে রান্না শিখতে ভারি ভালো লাগে মহুয়ার।

কি সুন্দর গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ, এই ভাজা ভাজা গন্ধটা নাকে লাগলেই মনে হয় যেন উৎসব লেগেছে কোথাও। শিষ দিতে দিতে সঞ্জয় এসে ঢুকল।

মা, ছানা আর গাওয়া ঘিয়ের দাম আছে বেশ তা জানত?

হঠাৎ!

মা পান্তুয়া গড়তে গড়তে সঞ্জয়ের দিকে তাকালেন। এই মৌটাকে বসিয়েছ কেন এখানে?

আহা! আমিই বলে পান্তুয়া করছি।

তাই ত' বলছি সে কি আর মুখে দেওয়া যাবে রে?

মা মুখটিপে হাসলেন; রসে ফেলা নরম পান্তুয়া একটা ছোট প্লেটে রেখে এগিয়ে দিলেন সঞ্জয়ের দিকে; নে খোকা, চেখে ভাখ।

কাঁচা ছানা খাইয়ে মারবে ত' আমায় এই সকালবেলায়।

মা দাদাকে একটাও পান্তুয়া দিতে পারবে না বলে দিচ্ছি। মহুয়া খুন্তী ফেলে উঠে দাঁড়াল।

আমি বাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি এই ক'টা, আর···

মুখের কথা মহুয়ার শেষ হল না, সঞ্জয় এক প্রকাণ্ড ভেংচি কাটল—তাই যাও; বাবার আদুরে কন্যে; তোমার ঐ অপরূপ ছানার চচ্চড়ি বাবাকেই দাও, বাবা ত' মুখে না দিয়েই বলতে শুরু করবেন, আঃ অপূর্ব চমৎকার; খেয়ে মুখ জুড়োল, এমন কখনও খাই নি।

মা তোমার আদুরে ছেলেকে বারণ কর।

আঃ! ও বলুক না বাপু—তুই নিয়ে যা না তোর বাবার জন্যে। মা সুন্দর ফুল-আঁকা দামী কাচের প্লেটে চারটি পান্তুয়া তুলে দিলেন। চঞ্চল পায়ে প্লেট হাতে মহুয়া বেরিয়ে গেল; সঞ্জয় মা'র কাছ ঘেঁষে মহুয়ার মোড়ায় বসল।

খুব ভালো হয়েছে মা! সত্যিই মৌ করেছে?

হ্যাঁ তো!

ওমা পাগলীটা বেশ শিখেছে ত'!

মৌ'র হাত আছে রান্নায়; শিখে নেয় চটপট।

মহুয়া প্রায় নাচতে নাচতেই ফিরে এল। এই ভাখ! ওর হাতে ধরা একটা পাঁচটাকার নোট; কি মজা; কি মজা।

মহুয়া পাঁচ টাকার নোট সঞ্জয়ের চোখের সামনে নাচাতে লাগল। আর তখুনিই খপ করে সঞ্জয় ছিনিয়ে নিল নোটটা মহুয়ার হাত থেকে; ওমা···আ···। ভাখ না দাদা কি করছে। এই দাদা শীগ্‌গির দিয়ে দে বলছি।

আহা; উনি গিয়ে দিব্যি বাবার কাছ থেকে টাকা বাগিয়ে এনে রোজ রোজ গোছা গোছা কাচের চুড়ি কিনবেন।

বেশ করবো, আমার টাকা দিয়ে আমি যা খুশি তাই করব, তোর কি?

মৌভাই! যা ফাস্টোকিলাস পান্তুয়া তুই বানিয়েছিস না

যতই খোশামোদ কর, আমি ভুলছি না, টাকা পাবে না।

ভাখ, মৌ, মেট্রোয় মেরী এ্যান্টয়নেট?

আহা বাবা বলেছেন নিয়ে যাবেন; তুমি কে?

বাবার আশায় আছ তুমি! তবেই হয়েছে, বাবার সময় হতে হতে, ছবি চলে যাবে সাগর পার।

রাধারাণী দেবী এতক্ষণে কথা বললেন। মৌ'র টাকা তুই ফেরৎ দে; আমি টাকা দিচ্ছি তোরা তিন ভাই বোনেই দেখে আয়।

তুমিও চল না মা; আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কোথাও যাওয়া একদম বন্ধ হয়ে গেছে। কতদিন যে আমরা সবাই একসঙ্গে বেরুই নি!

সত্যি! মা'র শরীর খারাপ হয়ে পর্যন্ত মা ত' বাইরে বেরুনো প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। এই তিন মাসের মধ্যে ওরা সবাই মানে, বাবা, মা, দাদা, তুলতুলি, মৌ সব একসঙ্গে সেই আগেকার মতন একদিনও কোথাও যায় নি।

অতক্ষণ বন্ধ ঘরে বসে থাকতে আমার কষ্ট লাগে রে। হাঁফ ধরে যায়।

মা? সঞ্জয় এতক্ষণে উৎসাহিত হয়েছে মনে হল। মেট্রো ত' এয়ার কণ্ডিসাণ্ড কিচ্ছু কষ্ট হবে না, দেখবে কি আরাম লাগবে।

মা হাসলেন, চল তা হলে! তোর বাবাকেও বলে আসি।

কি মজা! কি মজা!!

মহুয়া হাততালি দিয়ে উঠল।

কি রে দিদি!

বারো বছরের তুলতুলি তার নতুন বড় পুতুলটা হাতে করে এসে দাঁড়াল।

তুলতুলিটা আর বড় হোল না; না রে দাদা? এখনও পুতুলই ওর প্রাণ।

মহুয়া সস্নেহে ছোট বোনটিকে কাছে টানল।

তোমার মত রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রাণ হওয়ার চেয়ে পুতুল প্রাণই আমার পছন্দ।

হো হো করে হেসে উঠল সঞ্জয়।

মহুয়া সস্নেহে তুলতুলির কপালে চুমো খেল।

তুলি, তুলতুলি, তুলু সোনা!

আঃ দিদি!

মোটে পাঁচ বছরের বড় দিদির এই মাতৃসুলভ আচরণ তুলতুলি মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না; ও দিদিকে চায় তার সখীরূপে, সঙ্গী হিসেবে। কিন্তু দিদির যে কি পাকামী, দিনরাত বসে থাকবে বই মুখে দিয়ে, আর

নয়ত গল্প করবে মা কি দাদার সঙ্গে। না দাদার সঙ্গেও বেশি নয়। মা আর বাবার সঙ্গেই ত' বেশি ভাব দিদির। এক-এক দিন আবার বাবা ডাকেন দিদিকে কবিতা পড়তে। আর দিদিটা সেই ছবির শকুন্তলার মত সারা পিঠে চুল ছড়িয়ে, ইজিচেয়ারের নীচে বাবার পায়ের কাছে পড়তে বসে 'নৈবেদ্য'। পাশের ঘরে পুতুল খেলতে খেলতে তুলতুলি অর্থাৎ মালতীর কানে ভেসে আসে দিদির মিষ্টি গলা। তখন আর তুলতুলির মন্দ লাগে না রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনতে। মাঝে মাঝে বাবার গলাও শুনতে পাওয়া যায়—

'হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি'।

বাবা আর দিদি একসঙ্গে থাকলেই কেবল ভারত আর ভারত। দিদি বলে বাবার মত পণ্ডিত লোক নাকি খুব কম আছে। আর বাবার মুখে ইতিহাসের গল্প শুনলে দিদির নাকি গায়ে কাঁটা দেয়।

অথচ ছাখ বাবা ইকনামক্স-এর ছাত্র; ফিন্যান্স পাশ। দাদার সঙ্গে দিদির এই সব আলোচনায় তুলতুলিও যোগ দিতে চায়। ওরও ইচ্ছে করে দিদির মত সেই ছবি দেখে বলতে—

ইস, মরে গেলাম; কি অপরূপ!

কিন্তু দিদি বিশেষ করে দাদা ওকে আমলই দেয় না, কখনও ডাকেই না ওদের আড্ডায়। সেই যখন দিদির বন্ধুরা কমলাদি', হাসিদি', ছায়াদি' সব আসে, আর দাদার বন্ধুরাও জমা হয়, নীচের খাবার ঘরে প্রভাতদা', রঞ্জিতদা', সমরেশদা', মাও সেখানে থাকেন মাঝে মাঝে। কি তর্কাতর্কির ঝড় বয়ে যায় একেক সময়। হো হো করে হাসিই কি কম হয় নাকি? কিন্তু তুলতুলি বেচারা সেই তার খেলার ঘরেই। কখনও যদি ও এসে দিদির গা ঘেঁষে দাঁড়ায় অমনি দাদা বকে ওঠে।

তুলতুলি? কি চাই তোমার এখানে? যাও নিজের ঘরে যাও।

দাদার চেয়ে দিদিই বেশি ভাল তাতে সন্দেহ কি?

তুলি—? জানিস! আজ আমরা সবাই একসঙ্গে সিনেমা যাব!

সত্যি!

না না, তুলিকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, তা ছাড়া ও কিছু বুঝবেই না।

সঞ্জয় যথারীতি তুলি সম্বন্ধে তার আপত্তি প্রকাশ করল।

হ্যাঁ আমি যাব।

না না ও বেচারা একলা থাকবে কোথায়? আমরা সবাই যাচ্ছি।

মহুয়া আবার তুলতুলিকে একহাত দিয়ে কাছে টেনে নিল।

মা এলেন, উনিও যাবেন বললেন। বললেন মেরী এ্যান্টয়নেট যাবো বৈ কি!

এই রে! বাবা সত্যি যাবেন?

সঞ্জয় মাথা চুলকোল; বাবার সঙ্গে বসে ছবি দেখতে, বিশেষ করেই বিলিতি ছবি দেখতে সঞ্জয়ের আপত্তি। বিলিতি ছবির প্রণয়-ঘন দৃশ্যগুলো ঠিক বাবার সঙ্গে বসে দেখা যায় না।

আহা বাবা যাবেন ত' তোর কি? তুই কি আর বাবার পাশে বসছিস?

তবুও এক রো ত'!

বোকা!

মৌ সঞ্জয়ের কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করল— মা আর বাবার দু'খানা আলাদা রো-এ কাটিস, আর আমাদের তিনজনের আলাদা।

ঐ প্যানপেনে তুলিটা আবার থাকবে সঙ্গে।

অ্যাঁ, মা ছাখ না, দাদা কি বলছে, তুলতুলি ঠিক শুনতে পেয়েছে সঞ্জয়ের কথা।

আঃ খোকা! ফের তুই তুলিকে জ্বালাচ্ছিস?

না বাবা, কাউকে জ্বালাচ্ছি না, এখন টাকা দাও ত' টিকিট কেটে আনি।

খোকা, এই বোশেখের রোদে তোমার ঐ নড়বড়ে মোটর 'বাইক নিয়ে বেরিও না ত'; ড্রাইভার ত' বসেই আছে। গাড়ি নিলে, তোমায় ড্রাইভার নিতে হবে।

কেন; আমার লাইসেন্স নেই?

সঞ্জয় টাকা নিয়ে তুলতুলির মাথার চুল টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তুলতুলি চেঁচাবার অবকাশ পেল না, অভিযোগ করার আগেই মহুয়া রসে-ভরা পান্তুয়া ফেলে দিল তুলির মুখে।

ছবি দেখে গাড়িতে উঠেই মা বললেন—বেশ হয়েছে ফাঁসি হয়েছে, অমন বদ মেয়ের ফাঁসিই হওয়া উচিত!

মা! আহত মহুয়া জবাব দিল। কি বলছ যা তা।

মহুয়ার চোখের সামনে তখনও ভাসছে নর্মাসিয়ারারের অপূর্ব সুন্দর মুখ, কানে বাজছে তাঁর অনিন্দ্য কণ্ঠস্বর— 'Mother! I shall be the Queen, the Queen of France.'

যা তা কি? স্বামী ছেড়ে পাঁচটা লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে! মা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলেন। ফাঁসি হওয়াই উচিত ওর!

বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন; এই তা হলে ওর ফাঁসি যাওয়ার একমাত্র যুক্তি—কি বল?

নিশ্চয়, সন্তানের মা, স্বামীর স্ত্রী; সে কি না……! ঘৃণায় মা'র গলা বুজে এল।

ছিঃ! ছিঃ!

আশ্চর্য! মা'র সঙ্গে সুর মিলিয়ে মহুয়াও কেন ছি-ছি করতে পারল না ফরাসী সম্রাজ্ঞীকে। পরপুরুষের প্রতি তাঁর আসক্তি। হ্যাঁ, পরপুরুষই ত'। স্বামী ভিন্ন যে কোন পুরুষই ত' পরপুরুষ সতী-নারীর কাছে; আর সেই পর-পুরুষকে ভাললাগা, ভালবাসা, সে ত' দস্তুরমত পাপ। কিন্তু সব নীতিবোধ ছাপিয়ে মহুয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল ভ্যাটিকান রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে মধুর প্রেমের দৃশ্য—ভেসে উঠল টাইরন পাওয়ারের সুঠাম সুন্দর মূর্তি। মহুয়া যে সমস্ত অন্তর দিয়েই অনুভব করেছে তাঁদের বেদনা, তাঁদের আবেগ, তাঁদের ভালবাসা। সে কি পাপ! সে কি অন্যায়!

রাত্রে মহুয়া বিছানায় শুয়ে দাদাকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করল। আচ্ছা দাদা, তোর কি মনে হয় মেরী আঁতোয়ানেত পাপ করেছিলেন ভালবেসে?

কিসের পাপ! ঐ একটা গজকচ্ছপের মত স্বামীকে ঐ ফুলের মত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হোল কেন?

তাও ত' বটে! কিন্তু মা যে বলেন···সোচ্চারে কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল মহুয়া, মনে মনেই বলল মা'র কথাটা।

স্বামী যেমনই হোন তিনি স্বামী-ই! বিশেষ তিনি যখন তোমার সন্তানের পিতা। সেই স্বামীকে ছাড়া মুহূর্তের জন্যেও অন্য কাউকে মনে স্থান দেওয়া পাপ, মহাপাপ। দ্বিচারিণী হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল, মা কিরকম উত্তেজিত হয়ে বললেন কথাটা। তা সত্যি! মহুয়া কোনদিন দ্বিচারিণী হবে না, না। সতী মায়ের সতী মেয়ে মহুয়া। মা বলেছেন স্বামী যে হবে, তার প্রতি নাকি আপনা থেকেই ভালবাসা এসে যাবে; আর জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তমই ত' ফিরে আসেন স্বামীর রূপে।

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।

আচ্ছা! মহুয়া কি চিনে নিতে পারবে তার যুগ-যুগান্তের দয়িতকে? দর্শনমাত্র কি বুঝতে পারবে—এই তার প্রিয়তম; তার স্বামী! কেমন হবেন তাঁর স্বামী তিনি কি হবেন টাইরন পাওয়ারের মত সুদর্শন সুপুরুষ? নাকি হবেন সেই নিশীথ সেনের মত শ্যাম-স্নিগ্ধ-কান্তিময়? কত লোককে দেখেই ত' মহুয়ার কুমারী হৃদয়ে দোলা লাগে।

হৃদয় দান করবার মত মনের ভাব যদিও মহুয়ার কাউকে দেখেই হয় নি, তবু ভাল ত' লেগেছে কতজনকে। স্বামী! বিয়ে! না মহুয়া আজও খুঁজে পায় নি তার মনের মত মানুষ, যাকে দেখেই তার মন-প্রাণ ফুলের মত ফুটে উঠবে, দেহে-মনে বেজে উঠবে প্রেমের রাগিণী।

এই মৌ শোন!

দাদা বিছানার ওপর উঠে বসেছে।

কি রে?

নর্মাসিয়ারারের রিয়েল লাইফ জানিস কিছু?

না তো।

আমি জানি।

কি করে জানলি?

আমার কাছে বই আছে একটা, তাতে সব ফেমাস স্টারদের ছবি, জীবনী সব আছে; দাঁড়া দেখাচ্ছি।

সঞ্জয় উঠে খাটের তলা থেকে একটা ছোট স্যুটকেশ বার করল, আর বাক্সটা খুলতেই রাশি রাশি ছবি। হলিউডের তারকা সব; চকচকে চোখ তাদের, টকটকে ঠোঁট।

কোথায় পেলি রে দাদা, এত ছবি?

আমার বন্ধু আছে না, বীরেন! ওর দাদারা একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন বের করছে। সেইখানে সব ছবি পাঠায়। ওদের ছবি ছাপা হয়ে গেলে বীরেনের কাছ থেকে আমি এগুলো নিয়ে আসি।

খুব সাবধান দাদা!

ছবি দেখতে দেখতে মহুয়া বলল—বাবা যেন কোনদিন না জানতে পারেন।

ফুঃ, কি হবে জানতে পারলে, গর্দান নেবেন?

প্রায় তাই; ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।

আরে যা, যা।

সঞ্জয় ছবিগুলো গোছাতে গোছাতে বলল—গ্রেটা গার্বো, মার্লিন ডিয়েট্রিখ সব কত বড় শিল্পী। এদের ছবি রাখা যদি দোষ হয়, তা হলে হুঁ—মনের মত উপমা পেল না বলেই বোধ হয় কথা শেষ করতে পারল না সঞ্জয়।

বাবা এমনিতেই কি রাগ করেন—তুই রোজ রোজ সিনেমা দেখিস বলে।

কি করে জানতে পারলেন রে? তা ছাড়া রোজ রোজ ত' আমি যাই না।

কি জানি, সেদিন মাকে বলছিলেন—কেন ওকে পয়সা দাও; রোজ রোজ ছবি দেখে হতভাগাটা শুধু কি চোখ খারাপ করছে, মাথাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

মাথা খারাপ। হুঃ। ছাখ তুই, বি-এস-সির

রেজাল্টটা বেরোক, তারপরই আমি এন টিতে ঢুকে পড়ব। অ্যাসিস্টান্ট সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট হয়ে।

কোথায় ঢুকবি ?

এন টিতে।

সে আবার কি ?

আঃ তাও জানিস না; এন টি মানে নিউ থিয়েটার্স, ঐ যে রে, হাতীমার্কা ছবি যাদের—দেবদাস, মুক্তি; তোর প্রমথেশ বড়ুয়া আছেন যেখানে।

ও, তাই বল ; প্রমথেশ বড়ুয়ার কোম্পানী ?

ভাগ্! তুই কিছু জানিস না, কোম্পানী ত' বি এন সরকারের, স্যার এন এন সরকারের ছেলে।

সে যাই হোক দাদা, ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ করবি এমন কথা তুই ভাবতে পারলি কি করে ?

ভাখ মৌ, বুড়ি ঠাকুমার মত কথা বলিস না, যুগ বদলে যাচ্ছে, চোখ খোলা রেখে চলতে শেখ। ফিল্মের নামেই আঁতকে ওঠার দিন আর নেই; আজকাল কত ভদ্রঘরের ছেলে-মেয়েরা ফিল্মে কাজ করে, জানিস তা তুই ?

একজন-দু'জন হয়ত শিক্ষিত লোক থাকতে পারে ওখানে, তাই বলে ?...

সব, সব। আমি নিজে এন টি স্টুডিওতে গিয়ে দেখেছি যে, চমৎকার ভদ্র আবহাওয়া। লোকগুলো এত ভাল ওখানকার।

দাদা! তুই ফিল্ম স্টুডিওয় গেছিস ?

মহুয়া বিস্ফারিত চোখে তাকাল দাদার দিকে।

নিশ্চয়! একশবার যাব, যাব না কেন শুনি ?

সঞ্জয় উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল, আর তখনই ঠক করে একটা বড় খাম খসে পড়ল ওর হাতের আড়াল থেকে, বেরিয়ে পড়ল হাসি হাসি সুন্দর একটি মুখ।

ইনি আবার কোন মনোমোহিনী ?

মহুয়া ছবিটা তুলতে গেল আর সঞ্জয় হাঁ হাঁ করে উঠল ; ওটা দেখিস নি, ওটা দেখিস নি।

তবে ত' দেখতেই হয়।

মহুয়া চোখের সামনে তুলে ধরল ছবিটা। বড় বড় কটা চোখ মেয়েটির ; ঘাড় অবধি বাদামী চুল, ঝকঝকে দাঁতের হাসিটি সুন্দর।

এ আবার কে রে দাদা ? ফিল্ম স্টার বলে ত' মনে হচ্ছে না।

ফিল্ম স্টার নয়ত! ফিল্ম স্টার মনে হবে কেন ?

ও বাবা, এই যে নীচে আবার লেখা—To my Sanjay, yours only রি-টা। দাদা! তুই প্রেম করছিস ?

ভাগ, প্রেম আবার করব কি ? I am in love। সঞ্জয় মহুয়ার হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নিয়ে চিৎ হয়ে শুল।

জানিস! এ বড় ভাল মেয়ে ; সঞ্জয়ের মুখ কোমল হয়ে এল কেমন যত ও বলে গেল রিটার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে। আর মহুয়া অবাক হয়ে শুনল তার দাদা শ্রীমান সঞ্জয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কি করে ধীরে ধীরে ওর সতীর্থ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে জনির পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কেমন করে সেখানে জনির বোন রিটাকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে দিনে দিনে ওরা পরস্পরের কাছে এসেছে আর সেই যেদিন ওরা প্রথম আবিষ্কার করল ওদের বন্ধুত্বটা ঠিক আগের মত আর নেই, ওরা ভালবেসেছে পরস্পরকে।

কিন্তু দাদা! মহুয়া সঞ্জয়ের উচ্ছ্বাসে বাধা দিল ; এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে কি মা বাবা কখনও রাজী হবেন ?

হয়ত হবেন না, তখন তাঁদের অমতেই বিয়ে করতে হবে।

দাদা!

এতে এত শক্‌ড হবার কি আছে ? মহুয়া তুই ভারি ছেলেমানুষ—তুই বুঝবি না প্রেম! প্রেমের জন্যে মানুষ সব করতে পারে, দেখলি না এই ত' ক'বছর আগে এডওয়ার্ড দি এইটথ প্রেমের জন্য রাজসিংহাসন ত্যাগ করেছেন।

দাদা। রাজসিংহাসন তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু মা-বাবা, তাঁদের ভালবাসা—তাকে কি ত্যাগ করা যায় ? না সেটা উচিত ?

আর যাকে ভালবাসি তাকে ত্যাগ করাই বুঝি খুব উচিত কাজ!

না, তাও নয়। প্রেমাস্পদকে কোন কিছুর জন্যেই ত্যাগ করা যায় না।

প্রেমে না পড়লেও মহুয়া সেটা বোঝে। ভালবাসার অপমান ? না, মহুয়া দাদাকে এমন অন্যায় করতে অনুরোধ করবে না। কিন্তু আরেক দিকে যে মা-বাবা তাদের সমস্ত সংসার। মহুয়া জানে, খুব ভাল করেই জানে, রাধারাণী কখনই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে স্বীকার করে নেবেন না পুত্রবধূ বলে। কিন্তু তা হলে কি হবে ? দাদা কি করবে ? বেচারা রিটা। অদেখা রিটার জন্যে হঠাৎ ভারি একটা মমতায় ছেয়ে গেল মহুয়ার মন।

এই দাদা। তোর রিটাকে আমায় একবার দেখা না ?

তুই আলাপ করবি ওর সঙ্গে ? সঞ্জয়ের মুখ আগ্রহে দীপ্ত হয়ে উঠল ; কিন্তু মা যেন না জানতে পারে, যা বোকা তুই গল্প করতে করতে বলে ফেলিস নি যেন আবার মাকে।

না, না তা কেন বলব ? বলব না। মহুয়া মুখে বলবে না বললেও মনে মনে ওর ভারি একটা অপরাধ বোধ জাগল সঙ্গে সঙ্গে। মাকে লুকিয়ে এতবড় একটা কাণ্ড। দাদার প্রেয়সীকে, ভাবী বধূকে দেখবে, আলাপ করবে অথচ মা জানতেও পারবেন না—সেও কি হয় ? এ কি সমস্যায় পড়ল মহুয়া।

চুলের সৌন্দর্য তেলের অপচয়ে নয় — যত্নে

চুলের যৌবনে ভাটা পড়লে অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই
কারণ চুল সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেরই একটা প্রচ্ছন্ন ঔদাসীন্য আছে।
কোন রকমে একটু তেল মাথায় দিয়ে চট্ করে স্নানের পাট চোকাবার
দিকেই আগ্রহটা বেশী। এতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চুলের
যত্নের চেয়ে তেলের অপচয়টাই বেশী হয়।



তেল চুলের প্রধান
খাদ্য তাই অন্ততঃ দশ মিনিট
চুলের গোড়াগুলিতে তেল বেশ ভাল
করে মালিশ করা উচিত। সামান্য
একটু যত্নে চুলের সৌন্দর্য যে
কত বর্দ্ধিত হতে পারে তা কিছুদিন
যত্ন নিয়ে জবাকুসুম তেল ব্যবহার
করলেই বুঝতে পারবেন।



জবাকুসুম



কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KALPANA

১, টাকার্স লেন, ব্রডওয়ে মাদ্রাজ-১

মৌ?

দাদার ডাকে মহুয়া চকিত হল।

মৌ! শোন, এখনিই তোকে দেখাতে পারব না রিটাকে, ওরা দার্জিলিং গেছে।

আচ্ছা, পরেই হবে।

মৌ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক। এখনকার মত বিপদ কাটল। বর্তমানের সমস্যা না হয় এইভাবে এড়ানো গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে! মহুয়ার মন আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল আগামী দিনের সঙ্কট স্মরণ করে।

ঝড় উঠবে। মহুয়া নিশ্চিত জানে, প্রলয় বেধে যাবে এই লাভলক প্লেসের বাড়িতে, দাদা সহজে হার মানবে না, আর মাও কিছুতেই মেনে নেবেন না দাদার দাবী।

দাদা! সত্যি তুই রিটার জন্যে সব ত্যাগ করতে পারবি? মানে আমাদের সকলকে; মা, বাবা, আমি, তুলতুলি, এই বাড়ি—সব, সব ছাড়তে পারবি?

ইচ্ছে করে কি ছাড়ব মৌ?

গাঢ় হয়ে এল সঞ্জয়ের গলা।

তুই কি মনে করিস মা বাবাকে আমি তোর চেয়ে কম ভালবাসি?

জানি রে দাদা!

মৌ সঞ্জয়ের কাছ ঘেঁসে এল।

ছাখ দাদা এমনও হতে পারে, মা হয়ত কিছুই রাগ করবেন না। হয়ত, হয়ত মতই দিলেন।

আশা খুব কম।

চিন্তিতমুখে সঞ্জয় উঠে বসল বিছানার ওপর। আর তারপরই হো হো করে হেসে উঠল।

আচ্ছা আমরা এখনই এত ভাবছি কেন বল্ ত'? আগে পাশ করি চাকরি করি তবে ত'?

তুই চাকরি না করলে তোর বৌ কি খেতে পাবে না দাদা।

বাঃ বাবা যদি বিয়েটা সমর্থনই না করেন, বাড়িতেই যদি না থাকি—

বাবা আপত্তি করবেন না; জানিস ত' বাবার মতামত। খৃষ্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মুসলমান যা খুশি বিয়ে কর বাবা কখনও না বলবেন না। কারুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ……

মৌ ভুলে যাস নি বাবা মা ছাড়া নন।

না না ভুলি নি ভুলব কেন?

বাবা যে মা ছাড়া নন, তাঁর ব্যক্তিগত মতামত যাই থাক, তিনি যে মা'র ইচ্ছারই ছায়ামাত্র—সে খবর কার অজানা। মার সামান্যমাত্র ইচ্ছাও কি কখন এ বাড়িতে অনাদৃত হয়েছে; মা বাবাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করেন; সে শ্রদ্ধা ভক্তিতে গিয়েই পরিণতি পেয়েছে; তবু সাংসারিক ব্যাপারে মা'র মতই শেষ কথা—এই ২ নং লাভলক প্লেসের বাড়িতে।

দাদার কাছ থেকে উঠে এসেও মহুয়ার অনেকক্ষণ ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে দক্ষিণের জানলা দিয়ে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলই কোন না জানা ব্যথায় ক্ষণে ক্ষণে মহুয়ার বুক ভারী হয়ে উঠল; মনে হোল—কে যেন নেই তার পাশে, কে যেন আসে নি; সেই না-দেখা-বন্ধু, না পাওয়া প্রেমের জন্য ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল মহুয়ার হু'চোখ বেয়ে গালে, গলায়; বুকের কাপড় ভিজে উঠল।

কলেজ থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়া হবে, মহুয়া ভোর থেকে তিনবার সুটকেশ গোছাল।

শান্তিনিকেতনে মহুয়ার এই প্রথম যাওয়া।

রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য ও দেখেছে বছর-তিনেক আগে; কিন্তু সে শুধু চোখের দেখা দূর থেকে।

আশুতোষ কলেজ হলে শ্যামা নৃত্যনাট্যে কবি এসেছিলেন। স্টেজের ওপর একপাশে আলোর তলায় বসেছিলেন গেরুয়ার ঢোলা পোষাক পরে; তাঁর সেই অবিস্মরণীয় কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন—

'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে-রে···'

মহুয়ার মন সত্যিই নেচে উঠেছিল ময়ূরের মত। রবীন্দ্রনাথ তার সামনে; একটু দূরে স্টেজের ওপর বসে। মহুয়া দেখছে তাঁকে, হু'চোখ মেলে, কান ভরে শুনছে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। এই দুর্লভ ভাগ্য কি সত্যিই এল মহুয়ার জীবনে? স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সত্যিই মহুয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখল। সেদিন সারারাত মহুয়ার ঘুম হয় নি; তন্দ্রায় জাগরণে কেবলই তার চোখে ভেসেছে সেই দেবোপম মূর্তি, কানে বেজেছে তাঁর অনুপম কণ্ঠস্বর। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে সারারাত মহুয়া নিজের ভাগ্যকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

আজ ও চলেছে শান্তিনিকেতন। হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয় কবিকে আরো কাছ থেকে দেখবে। কথাও বলতে পারবে আর হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে করতে পারবে প্রণাম। এই জন্যেই ত' শান্তিনিকেতন যাওয়া; না হলে সাতদিনের জন্যে বাড়ির বাইরে থাকা এখন মহুয়ার অনুচিত, মা'র শরীরের যা অবস্থা! শাড়ি পাট করতে করতে মুহূর্তের জন্য মহুয়া থমকে থেমে গেল।

আচ্ছা! মা কি সত্যিই আর বেশিদিন বাঁচবেন না? না, না তা-ও কি কখন হয়? মা ভুগছেন বহুদিন বাংলা দেশে এসে অবধি; এক-একবার মনে হয় বাংলা দেশে

আসাই তাঁদের কাল হয়েছে। না, না ছি ছি একি ভাবছে সে। মা'র শরীর ত' উত্তরপ্রদেশেও খারাপ হতে পারত, আর যদি সত্যিই মা বিশেষ করেই বাংলা দেশের আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়েই থাকেন—তবুও বাংলা দেশে না ফিরলে, মহুয়া ভাবতেও পারত না—

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

মৌ!

ভানুদি' কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তোমার খাবার দেব ত' সঙ্গে?

না, না খাবার কি হবে?

ও-মা রাস্তায় ক্ষিদে পাবে না? খেতে হবে না?

কি যে বল ভানুদি'! কলেজের অত মেয়ে থাকবে—প্রফেসররা থাকবেন; তার মধ্যে আমি বাক্স বের করে তোমার দেওয়া খাবার খেতে শুরু করব? পাগল নাকি!

ও-মা তাই বলে ক্ষিদে পেটে নিয়ে বসে থাকবে? বলি কলেজের মেয়েরা, প্রফেসররা কি হাওয়া খেয়ে বাঁচে?

আরে বাবা, খাবার ব্যবস্থা কলেজ থেকেই হবে, তুমি কিচ্ছু ব্যস্ত হয়ো না, বরং নিজেরা একটু সাবধানে থেকে, তুলতুলিকে একটু ভাল করে দেখাশোনা কোর, ওটা বড়ই হচ্ছে শুধু মাথায়, বুদ্ধি আর বাড়ছে না।

তোমার কোন ভাবনা করতে হবে না মা, সব ঠিক থাকবে তুমি ফিরে এসে দেখো; ভানুদি' আজ পর্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কিছু করেছে কি?

না তা করে নি। আর সত্যি, ভানুদি' না থাকলে এই সংসারের যে কি দশা হত ভাবাও যায় না। হয়ত মহুয়ার বি-এ পড়াই হত না। মা বিছানায় পড়ে, সংসার চলত কি করে? কিন্তু সংসার এখন অবধি ত' মা-ই চালাচ্ছেন; বিছানায় শুয়ে শুয়েই ভাঁড়ারের চাল-ডালের হিসেব থেকে বাগানে মালীর চুরি ধরা সবই এখনও অব্যাহতগতিতে চলেছে। আশ্চর্য! এখনও ভোরে মহুয়াকে ডেকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন জিমি কুকুরকে বেড়িয়ে আনানো হয়েছে কি না, পাখির জল-ছোলা ঠিকমত দেওয়া হয়েছে কি না, তারপর বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে নিজের হাতে বাবার চা ঢালেন; মহুয়ারা নিচের খাবার ঘর ছেড়ে সকালের খাওয়াটা মার ঘরেই সারে, মার চোখের সামনে। স্নানের পর মহুয়া চুল রোদে মেলে দাঁড়িয়েছে কি না, বাবার পোশাক ঠিক সময় বের করা হচ্ছে কি না, তুলতুলি নিশ্চয়ই দু' মিনিটে স্নান সেরেছে, সঞ্জয় সাত-সকালেই কোথায় আড্ডা মারতে বেরুল,—সব—সব দিকেই রাধারাণীর চোখ! বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি যেন ত্রিনয়ন পেয়েছেন, একতলার কোণের ঘর থেকে আর বাগানে গেটের কাছ পর্যন্ত কি হচ্ছে তা ওঁর অজানা থাকে না। বেচারা মা! সংসার করতে এত ভালবাসেন, এত উত্তপ্ত আবেগ দিয়ে সারা হৃদয়-মন দিয়ে তিনি সংসারকে সব সময়ই আঁকড়ে থাকতে চান,—তাই কি অসময়ে, এমনভাবে অকর্মণ্য অপারগ বিছানায় পড়ে থাকলেন।

দিদি!

যথারীতি মুখের মধ্যে এক আঙুল পুরে, পুতুলের কোমর ধরে তুলতুলি এসে দাঁড়াল।

আঃ, তুলি আবার আঙুল খাচ্ছ?

মহুয়া তুলতুলির মুখ থেকে হাত টেনে নামিয়ে দিল।

খাবোই ত'! আমায় ফেলে দিব্যি বেড়াতে চলেছ!

কলেজ থেকে যাচ্ছি যেরে, না হলে কি তোকে না নিয়ে যেতাম।

আহা! ইচ্ছে থাকলে কি আর নিজের বোনকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

আচ্ছা তুলি তুই বড় হয়েছিস না, সামনের বছর ম্যাট্রিক দিবি!

তাতে কি?

এইটুকু বুঝতে পারিস না যে আমাদের কলেজের ছাত্রী না হলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারে না।

ছাই! যত বাজে কথা!

তুলতুলি গাল ফুলিয়েই রইল। মহুয়া সস্নেহে তুলতুলির ফুলো ফুলো গাল টিপে বলল, তুলি তুলতুলি, তুলো সোনা। যাও!

তুলতুলি ছিটকে সরে গেল মহুয়ার পাশ থেকে, দুমদাম করে নীচে নেমে গেল।

নাঃ, তুলতুলিটা সত্যিই বড় হবে না কোনও দিন। তুলতুলি! একরাশ তুলোর মত পড়ে থাকত ছোট্ট ঘেরা কাঠের খাটে, দোলাটে, আর মহুয়া আদর করত ওকে 'আমার ছোট্ট বোনটি, আমার তুলোটি' আর এই তুলো তুলো করে আদর করতে করতেই ওর নাম দাঁড়িয়েছে তুলতুলি। মোটে পাঁচ বছরের ছোট তুলতুলি মহুয়ার চেয়ে। কিন্তু

মহুয়ার মনে হয় অন্তত পঁচিশ বছরের তফাৎ তার সঙ্গে তুলতুলির। তুলতুলির জন্যে সর্বদাই একটা চিন্তা লেগে থাকে মহুয়ার মনে। ও এত সরল! এত ছেলেমানুষ, এখনও দিনরাত পুতুল খেলেই কাটায়, লেখাপড়া কিছু বিশেষ করছে বলে মনে ত' হয় না। ফার্স্ট টার্মে রেজাল্টও বিশেষ ভাল করে নি। নাঃ এইবার শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে একটু বিশেষ করেই মন দিতে হবে তুলতুলির দিকে।

মহুয়া স্যুটকেশ বন্ধ করল। নীচে নেমে প্রথমেই দেখা সঞ্জয়ের সঙ্গে। জীনের সাদা ট্রাউজার, ময়লা ছোপ লাগা এখানে-ওখানে, সার্টের বোতাম খোলা, চুলগুলো এলোমেলো।

কিরে কবিনী!

এ আবার কেমন সম্বোধন? কবিনী!

পেছনে লুকোন হাতটা সঞ্জয় সামনে নিয়ে এল; চোখের সামনে নাচিয়ে দিল মাসিক পত্রটা।

এ মাসের বন্দনায় কুমারী মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমর্পণ' কবিতাটি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ,···না কি, তাই ত' বলে রে!

ওমা বেরিয়েছে! সত্যি দাদা! দেখি!

আগ্রহে মহুয়ার চোখমুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

অজয়দা'! অজয়দা'র কাছে চিরকৃতজ্ঞ মহুয়া! উনিই ত' সেদিন জোর করে মহুয়ার খাতাটা নিয়ে গিয়েছিলেন; বলেও ছিলেন 'শীগগিরই ছাপার অক্ষরে দেখতে পাবে নিজের নাম'।

সত্যিই তা হোল! এই ত'···

দাদার হাত থেকে পত্রিকাটা নিয়ে মহুয়া দেখল সূচীপত্রে লেখা—সমর্পণ···কুমারী মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্নিমেষে একটুক্ষণ চেয়ে রইল মহুয়া নিজের ছাপানো নামের দিকে, তারপরই ছুটল মাসিক পত্রটা হাতে নিয়ে।

মা মা!

কি রে?

বিছানায় বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে বসে রাধারাণী টেবিল ক্লথে এমব্রয়ডারি করছিলেন; ছুঁচ চালানো থামিয়ে অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

তোর ত' বেরুতে দেরি আছে; দেরি হয়ে গেল নাকি?

মা না, সে সব নয়, এই দেখ না।

মহুয়া এক হাতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে পত্রিকাটা মা'র চোখের সামনে মেলে ধরল। রাধারাণী চশমাটা ঠিক করে নাকে বসিয়ে নিয়ে মহুয়ার কবিতাটা পড়লেন একবার, দু'বার। তারপর মহুয়ার মাথাটা বুকে চেপে ধরলেন।

সত্যি তুই লিখেছিস? এত সুন্দর! কবে পাঠালি।

পাঠাই নি মা! অজয়দা' এসে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অজয় ত' শিল্পকলা নিয়ে থাকে জানি, সাহিত্য নিয়ে ও এত উৎসাহী জানতাম না ত'।

কেন মা, অজয়দা' ত' লেখেনও; আজকাল ছোটগল্প দু'চারটে এদিক-ওদিক যা লেখেন, বেশ ভাল।

তাই নাকি? বাঃ, আমি ত' জানতাম যে অজয় মোটে বাংলা জানেই না।

এখন শিখেছেন।

শিখেছেন বলিস কিরে? কত ভালভাবে জানলে তবে সেই ভাষায় সাহিত্য রচনা করা যায়।

মৌ তোর ট্রেন কখন রে?

বাবা ঢুকলেন ঘরে।

বাবা?

কি মা?

দেখ!

মহুয়া পত্রিকাটা মেলে ধরল বাবার চোখের সামনে।

তোমার মেয়ে যে কবি হয়ে উঠলেন গো!

তাই নাকি কাগজে বেরিয়েছে মহুয়ার কবিতা?

বাবা মহুয়ার পিঠ চাপড়ে দিলেন—সাবাস! বেটি সাবাস!

আসল ক্রেডিটটা কিন্তু আমার বাবা।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল সঞ্জয়।

তোমার?

বাবা অবাক হলেন; কিরকম শুনি!

বাঃ অজয়কে এ বাড়িতে এনেছে কে? মহুয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়েছে কে?···

অজয়কে এ বাড়িতে আনার সঙ্গে,···মানে ঠিক বুঝলাম না।

আহা! মহুয়াই বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা।

অজয়দাই এটা নিয়ে গিয়েছিলেন 'বন্দনা'য় ছাপাবার জন্য।

ওঃ! তাই বল, তা এটা যদি ছাপাবার উপযুক্ত না হত তা হলে ত' আর অজয় ছাপিয়ে দিতে পারত না!

সে ত' বটেই। রীতিমত ভাল হয়েছে মহুয়ার লেখাটা।

হাসিভরা মুখে মহুয়ার দিকে তাকালেন মা।

মেয়ে আমার কবি! এবার কবি মেয়ের উপযুক্ত একটি—

মহুয়া তাড়াতাড়ি মা'র কথার মধ্যেই বলে উঠল, মা···

মহুয়া জানে এবার মা কোন কথায় আসবেন; সেই ভাল ছেলে আর মহুয়ার বিয়ে। বাবার সামনে এসব কথায় মহুয়ার বড় লজ্জা করে। তাই মা'র কথা মহুয়া আর বাড়তে দিল না।

মা আমার স্যুটকেশ এবার নামিয়ে নিয়ে আসি, তুমি দেখবে ত'। সময় হয়ে এসেছে।

হ্যাঁ নিয়ে আয়।

মহুয়া যদিও গোছান-গাছানো ব্যাপারটা ভালই শিখেছে, তবুও নিজের চোখে একবার দেখে না নিলে রাধারাণীর শান্তি নেই।

ওপর থেকে স্যুটকেশ আনতে গিয়ে মহুয়া ঘরের মধ্যে থমকে দাঁড়ালো।

মা যেন কি! আজকাল যখন-তখন সবায়ের সামনেই এই সব কথা বলেন; বাবার সঙ্গে ত' দু'মিনিট পরে পরেই ঐ এক কথা।

মৌ-র বিয়ে······ভাল ছেলে।

বাবা সেদিন মাকে বলছিলেন যেন কার কথা।

য়ুনিভার্সিটির রত্ন, কিন্তু বড় গরীব।

মা রাজী হলেন না।

নিজেদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত নেই। পঁচিশ টাকা ভাড়ার বাড়িতে থাকে। আড়াল থেকে শুনতে পেয়ে মহুয়ার কিন্তু বেশ ভাল লেগেছিল ভাবতে; গরীব! তাতে কি? মহুয়ার বেশ ভালই লাগবে গরীব হতে। স্বামী যখন ডক্টরেটের জন্য পুরু কাচের চশমা লাগিয়ে, রাত জেগে থিসিস লিখবেন—মহুয়া তখন ছেঁড়া মাদুরে বসে ছেঁড়া কাপড় রিপু করবে। গরীব, তারা গরীব। বেশ একটা রোমাঞ্চ লাগে ভাবতে—মহুয়া খুব গরীব। স্যাঁৎসেতে নড়বড়ে বাড়ির একতলায় থাকে—'কিনু গোয়ালার গলি'। কিন্তু নিঃসঙ্গ একক নয়, হরিপদ কেরাণীর মত। বিদ্বান পণ্ডিত স্বামী থাকবেন পাশে। স্নেহে, প্রেমে সেই 'একটুকু বাসা'র স্বর্গ নেমে আসবে।

শান্তিনিকেতন থেকে মহুয়া ফিরল যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। কবিকে কি চোখে দেখেছে শুধুই? কথা শুনেছে একান্ত কাছে পায়ের তলায় বসে। অন্য সব মেয়েরা যখন মোড়ায় ও চেয়ারে মহুয়া তখন বিশেষ করেই বেছে নিয়েছিল কবির পদপ্রান্ত। কবি সন্দর্শনের উপযুক্ত পোশাকও করেছিল মহুয়া। তার সেই কমলা পাড়ের টাঙ্গাইল সাদা খড়কে ডুরে শাড়ি আর দুধ সাদা গরদের ব্লাউজ যার হাতে-গলায় রাধারাণীর নিজের হাতে তোলা কমলা রঙের লতা; কানে ছিল সেই বড় বড় রূপোর কটকী কানপাশা, আর লম্বা বেণীর মাথায় সেই কটকী কাজের বড় রূপোর ঝুমকো। হাতের বালা অবশ্য সোনার। কবির পায়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করেছিল মহুয়া দু'টি শ্বেতপদ্ম আর একরাশ সাদা গোলাপ দিয়ে। কলকাতা থেকেই নিয়ে গিয়েছিল মহুয়া বেতের টুকরীতে করে ভিজে কাপড় চাপা দিয়ে; উনি কেমন মহুয়ার পিঠে হাত দিয়ে স্নেহ-সম্ভাষণ করলেন। অতবড় শ্বেত-পদ্মের কত প্রশংসা করলেন। তারপর যতক্ষণ ওরা ওখানে ছিল মহুয়া ওঁর সেই সোনার রঙের ঈষৎ-ফোলা পায়ের আঙুলগুলি দু'হাত দিয়ে ছুঁয়ে বসেছিল। উনি কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে নীচু হয়ে দেখছিলেন মহুয়াকে আর আসবার সময় মহুয়ার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। আর সেই পশ্চিমের রোদ মহুয়ার মুখে এসে পড়ছিল বলে কত ব্যস্ত হয়ে বার বার বলতে লাগলেন—সরে বস তুমি, রোদ লাগছে; পশ্চিমের রোদ আসছে যে, ঐ মহান স্রষ্টা পশ্চিমের রোদ লাগছে কার মুখে সেটুকুও ওঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

এত পরিতৃপ্ত, এত সুখী লেগেছিল নিজেকে, মনে হয়েছিল জীবনে আর কিছুই তার চাইবার রইল না। সব পেল সে, পরিপূর্ণ হোল। এত সুখ এত আনন্দ! মহুয়া হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরবার পথে বারবার অনুভব করছিল তাঁর হাতের স্পর্শ, এখনও যেন পিঠে লেগে আছে। ধন্য! ধন্য মহুয়ার এ জীবন, সার্থক তার বেঁচে থাকা।

দিদি!

ড্রাইভার সুরেনের ডাকে চমক ভাঙল মহুয়ার।

কি?

মা'র শরীর খুব খারাপ।

সুরেন সাবধানে বাঁক নিল।

সে কি! কি হয়েছে মা'র? এখন কেমন আছেন?

আজ একটু ভাল।

পথের দিকে চোখ রেখে সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতে সুরেন বলল, আপনি যাবার পরদিনই দাদাবাবুর সঙ্গে কি নিয়ে যেন মা'র খুব চেঁচামেচি হোল, বাবুও খুব রেগে গেলেন দাদাবাবুর ওপর। দাদাবাবু ত' আজ তিনদিন বাড়ি ছাড়া।

সে কি!

মহুয়ার গলা দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

দাদা বাড়িতে নেই। এত গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে সাতদিনের মধ্যে! মহুয়া যখন মহানন্দে শালবীথি আর আম্রকুঞ্জে খালি পায়ে লাল সুরকি মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে—মহুয়ার নিজের বাড়িতে তখন এতবড় নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে, নেমে এসেছে এতবড় সর্বনাশ!

সুরেন জোরে চালাও শীগগির বাড়ি পৌঁছতে হবে।

হ্যাঁ দিদি।

সুরেন জোরে এক্সেলেটর চাপল, সাঁ-সাঁ করে রেড রোড দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি।

মাকে জড়িয়ে ধরে মহুয়া মার বুকেই ভারী কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মা, মা, এ কি চেহারা হয়েছে মা তোমার, কেন আমি গেলাম! কেন বোকার মত গেলাম!

এখন অনেক ভাল আছি, উঠে বোস মৌ, উঠে বোস।

মা বল দাদার সঙ্গে কি হয়েছে? দাদা এখন কোথায়?

এইবার মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ওরে মৌ! আজ চারদিন হোল খোকা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। চারদিন আজ আমি জানি না ও কোথায় আছে, কি করছে, কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে!

কিন্তু কেন মা? দাদা এমন কি করতে পারে যার জন্য তোমরা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে?

খুব গর্হিত কাজই করেছে। মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন।

গর্হিত কাজ?

হ্যাঁ, তোমার দাদা একটা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছে। আর—আর ফিল্মে ঢুকেছে।

বিয়ে করেছে তা হলে।

হ্যাঁ—তিনি একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন মহুয়ার মুখের দিকে তারপর বললেন মৌ! তুইও জানতিস একথা; আমায় বলিস নি ত'!

না মা! আমি এতদূর জানতাম না; একদিন শুধু··· মৌ ধীরে ধীরে দেড় বছর আগেকার এক রাত্রের ঘটনাটা বলল মাকে।

রাধারাণী দেবী নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকলেন অনেকক্ষণ; তারপর বললেন, যা মৌ, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নে আগে, তারপর তোর সঙ্গে পরামর্শ আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মার একটা কথাই মহুয়ার কানে এল, আর ওর মনে হোল এমন বুকফাটা আর্তনাদ ও জীবনে শোনে নি—'খোকা! তুই আমায় এতবড় কষ্ট দিলি।'

দাদার বন্ধু অজয়কে টেলিফোন করে মহুয়া তাঁকে আসতে বলল একবার। আর অজয় আসতেই মহুয়া সোজা প্রশ্ন করে বসল, অজয়দা', দাদা কোথায়? কোথায় আছে এখন ও?

অজয় মাথা চুলকুলো।

আমি জানি আপনি জানেন; লক্ষ্মীটি অজয়দা,' আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে চলুন!

হ্যাঁ মহুয়া একবার মুখোমুখি দেখা করতে চায় সঞ্জয়ের সঙ্গে, জিজ্ঞেস করতে চায় কি এমন পেয়েছে ও যার জন্যে মাকে এতবড় আঘাত দিতে পারল!

কিন্তু জিজ্ঞেস করার দরকার হোল না। সঞ্জয়ের উজ্জ্বল দীপ্ত মুখে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল ওর দুর্লভ সৌভাগ্যের ইতিহাস।

বালিগঞ্জ স্টেশনের ধারে গলির মধ্যে, পুরোন বাড়ির একচিলতে ঘর; সেই ছোট্ট ঘরের মাঝামাঝি এক তক্তপোষ; ধবধবে বিছানা তার ওপর, মাথার কাছে কাচের পেয়ালায় দু'টি বেলফুল। মহুয়ার বুকটা হঠাৎ দুলে উঠল। অতি শিশুকাল থেকে মা-ই এই অভ্যেস করিয়েছেন তাদের; মাথার শিয়রে বেলফুল অল্প জলে রাখলে গন্ধে ঘর ভরে যায়; শুধু মহুয়া মনে মনে বলল—

লাভলক প্লেসের বাড়িতে রূপোর বাটিতে ফুল থাকে, আর এখানে কাচের কাপে।

মৌ! তুই এসেছিস? আয় আয়!

সেই উজ্জ্বল একান্ত সুখী-সুখী মুখে সঞ্জয় এসে মহুয়াকে জড়িয়ে ধরল।

আমি জানতাম তুই আসবি, না এসে পারবি না।

দাদাভাই!

সঞ্জয়ের বুকে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মহুয়া।

একি হল! সঞ্জয়কে তীব্র তিরস্কার করবে বলেই ত' মহুয়া অজয়ের সঙ্গে এখানে এসেছে, কই ভর্ৎসনার একটি ভাষাও ত' বেরুল না মহুয়ার মুখ থেকে, দাদার সুখী-সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে কেন খুশিতে ভরে গেল মহুয়ার মন? আর কেনই বা তবে এই চোখের জল?

বোস মৌ! রিটা রিটা!

সঞ্জয় চেঁচিয়ে ডাকল।

কামিং!

মিষ্টি তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল ভেতর থেকে। আর পরক্ষণেই শাড়ি পরার অনভ্যস্ত ভঙ্গি নিয়ে মাথায় লাল তাঁতের শাড়ির আঁচল দিয়ে রিটা এসে দাঁড়াল।

সঞ্জয় আলাপ করিয়ে দিল—

This is মৌ my······

কথা শেষ হোল না রিটা আবেগভরে জড়িয়ে ধরল মহুয়াকে—I know, I know···শাড়ির আঁচল খসে পড়ল মাথা থেকে, রিটা উচ্ছ্বাসভরে কত কথাই বলে গেল। সঞ্জয়ের মুখ থেকে শুনে শুনে মহুয়াকে সে কবে থেকেই চেনে, চেনে তুলতুলিকে, মাকে, বাবাকে, আয়াকে পর্যন্ত। আর রিটা নাকি ওদের সকলকে খুব ভালবাসে, তারা যে সঞ্জয়ের মা সঞ্জয়ের বোন সঞ্জয়ের বাবা।

মহুয়া মুগ্ধ হয়ে গেল। এত সুন্দর এত ভাল দাদার বৌ রিটা! এই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য মা অত দুঃখ পেয়েছেন। বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হবে, বলতে হবে মাকে বাবাকেও।

রিটার হাতের অমলেট আর চা খেয়ে মহুয়া উঠল, আর যাবার সময় হঠাৎ মহুয়ার একটা কথা মনে হল।

রিটা! শোন।

মহুয়া নিজের গলা থেকে লম্বা সোনার হারটা খুলে নিয়ে রিটার গলায় পরিয়ে দিল।

একি! একি হচ্ছে!

রিটা আর সঞ্জয় দু'জনেই প্রবল আপত্তি করে উঠল।

মা, না।

তুই আমার সঙ্গে ফর্মালিটি করছিস মৌ!

দাদা! রিটা তোরই বৌ শুধু? আমার কেউ না?

তা' না, তা' মা। মানে মা-বাবা যখন আমাদের মেনে নেন নি, তখন এই গয়না দেওয়ার ব্যাপার··

দাদা, তুই জানিস এই হার দিদিমার দেওয়া, মা-বাবা কারুর নয়। একান্ত আমারই জিনিস, যাকে খুশি দিতে পারি আমি, আর দেখিস মা খুশিই হবেন।

সত্যিই রাধারাণী দেবী খুশি হলেন সব কথা শুনে। বেশ করেছিস হার দিয়ে, বলছিস মেয়েটি যখন এত ভাল··· শোন্। একটু চুপ করে থেকে কেমন একটু লজ্জামুখে বললেন —আমার চাবিটা নিয়ে আয়রণ-সেফটা খোল্ ত'।

মহুয়া উঠে গিয়ে মা'র মাথার দিককার দেয়ালে লাগানো লোহার আলমারিটা খুললো।

গয়নার বাক্সটা নিয়ে আয়।

তারপর রাধারাণী বেছে বেছে বার করলেন চুড়ি, হার, কানের দুল, হীরের কণ্ঠিটা একপাশে রাখলেন। এটা মা দিয়েছিলেন তোর জন্য; আর এই সব গয়না রইল তোদের দু' বোনের, ভাগ করে নিস, বাকি এইগুলো সব সঞ্জয়ের বৌ-এর···রাধারাণী ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন।

মা, কি হবে এখন এসব ভাগ করে? থাক্ মা পরে হবে।

ওরে, পরে আর সময় যদি না পাই, তোরা কি বুঝতে পারছিস না, আমার দিন যে হয়ে এসেছে।

ওমা, মা কি বলছ যা' তা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মহুয়া।

সাত দিন, মোটে সাত দিনে এত বদলে গেলেন মা। সাত দিন আগেও যিনি অখণ্ড বিশ্বাসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সংসারের কর্তৃত্ব করেছেন, সামনের শীতে নিশ্চয় উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবেন বলে অনেক আশা নিয়ে বাবার সঙ্গে বসে আলোচনা করেছেন কোথায় যাওয়া হবে চেঞ্জে—সেই মা, সেই চিরকালের আত্মবিশ্বাসী, আশাবাদী মা'র মুখে এমন কথা!

চুপ কর্ মৌ চুপ কর্—মা কি কারুর চিরদিন থাকে?

মহুয়া ছোট্ট মেয়ের মত মাকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কেঁদেই চলল।

কি হয়েছে মৌ? কাঁদছ কেন মা? পাশের ঘর থেকে হীরেন্দ্রনাথ কাগজ হাতে উঠে এলেন।

বাবা!

মৌ মা'র কাছ থেকে উঠে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, মা কি সব বলছেন, দেখো না!

বাবা গভীর স্নেহে মহুয়ার মাথাটা বুকে চেপে ধরলেন।

রাণী, কেন শুধু শুধু সন্ধ্যেবেলা মেয়েটাকে কাঁদাচ্ছ বল তো? বাবার গলার স্বরও কেমন সজল।

পাশের ঘর থেকে সব শুনতে পেয়েছেন বোধ হয়। মা'র চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল।

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মা বললেন—মৌ শোন্, কাছে আয়।

না···আ।

মৌ যেন হঠাৎ অনেকদিন আগেকার মীরাটের সেই ছোট্ট মহুয়া হয়ে গেছে। মা'র ওপর অভিমান করে সে বাবার বুকে মুখ ঘষে ঘষে কাঁদত—আর বাবা আশ্বাস দিতেন, আদর করতেন।

আয় কাছে আয়।

বাবা মহুয়াকে ধরে মা'র কাছে বসালেন, আর মহুয়া আবার বাবার বুক থেকে মা'র কোলে মাথা গুঁজল। মহুয়ার আল্গা খোঁপার ওপর মা হাত রাখলেন একটু, তারপর স্বামীর দিকে ফিরলেন।

ছেলের ব্যবস্থা ত' ছেলেই করল, মেয়ের ব্যবস্থা কর এবার।

ব্যস্ত কেন? আগে বি-এ টা' পাশ করুক।

কি যে বল!

মা আবার সেই আগের মত ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বাবার

ওপর। মা'র এই ঝঙ্কার দেওয়াটা মহুয়ার ভারি ভাল লাগল। মা যখন বাবাকে বকে ওঠেন, কপট-রাগে বাবাকে অনেক কথা শোনান—তখন মহুয়া ভারি একটা আশ্বাস পায়। তখন যেন ও বুঝতে পারে নিশ্চিত হতে পারে, কোথাও কোন গোলমাল ঘটে নি : সব চলেছে ঠিক মত।

কি যে বল।

মা বলেই চললেন।

বি-এ পাশ করতে এখনও ঢের দেরি।

ওকি মা!

এবার মুখ তুলল মহুয়া।

বলছ কি তুমি? আর এক বছরও নেই, তুমি কি চাও আমি ফেল করি?

না তা ভাবেন নি রাধারাণী। রাধারাণীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় আশ্চর্য ভাল না হলেও মোটামুটি মন্দ নয়। দু-একটা লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগেই পাশ করে যায় ঠিক। মহুয়া যে অনার্স নিয়েই বি-এ পাশ করবে সন্দেহ কি তাতে।

ওরে এক বছরও অনেক সময়। ততদিন আমি···একটু থেমে কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন।

তোর এই সিঁথিতে কবে যে সিঁদুর দেখব, কবে তুই লাল বেনারসীর ঘোমটা টেনে জোড়ে এসে আমার কাছে দাঁড়াবি রে! ওগো দ্যাখ, মৌ'র বিয়েতে কিন্তু বাগানের সমস্ত গাছে লাল নীল আলো লাগাতে হবে। আর সামনের রাস্তাটা···

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন হীরেন্দ্রনাথ।

আছ কোথায় তুমি? বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছ পৃথিবী চলছে না? প্রায় দু' বছর হ'ল যুদ্ধ লেগেছে ভুলে গেছ সে কথা? আলো বাজী সব বন্ধ জান না? ঘরের আলোই বাইরে পড়তে পাবে না, আবার গাছে লাগাবে আলো!

সত্যি, কি যে হল!

মাকে একটু বিমর্ষ দেখাল।

কোথায় কোন সাত সাগরের পারে যুদ্ধ বাধল আর দ্যাখ আমাদের এখানে জিনিসপত্রের দাম আগুন। সোনার ভরি দেখতে দেখতে পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াল কি যে উপায় হবে!

হবে আর কি! কাচের চুড়ি ভালবাসে মৌ, সেই পরেই ওর বিয়ে হবে; কি বলিস?

বাবা মহুয়ার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

ইস! তাই বৈ কি!

রাধারাণী বিছানার ওপর বালিশে হেলান দিয়ে একটু উঠে বসলেন।

আমার মেয়ের বিয়ের জন্য সোনা তোমায় একরত্তি কিনতে হবে না, আমার মা যে মহুয়ারাণীর গা-ভরা গয়না দিয়ে গেছেন বিয়ের জন্য।

তাই নাকি? বাঃ বাঃ, এ খবর ত' জানা ছিল না; আমি ভাবছি যে, আমার পকেট মেরেই বুঝি তুমি নিজেদের আর মেয়েদের গয়না গড়াচ্ছ।

তোমার পয়সাতেও গয়না কি আর গড়াই নি!

মা ভারি মিষ্টি করে হাসলেন, আর মা'র পাণ্ডুর মুখের সেই চাঁদের ফালির মত হাসিটি মহুয়ার বুকে আঁকা হয়ে গেল।

দেখ মৌ দেখ, সাধে বলি আমার কেন টাকা জমে না। নিজের কানেই ত' শুনলি ঘরের মধ্যে চোর পুষে রাখলে···

চোর বলছ কি?

মহুয়া চোখ বড় বড় করে বাবার দিকে তাকাল, ডাকাত বল! জানিয়ে শুনিয়ে ডাকাতি করে যে।

যা বলেছিস!

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন, মা-ও যোগ দিলেন সেই হাসিতে, পাশের ঘর থেকে তুলতুলি ছুটে এল।

কি হয়েছে রে দিদি। এত হাসি কিসের রে?

বাবা তুলতুলির কোমর ধরে সোজা ওপরে উঠিয়ে আবার নামিয়ে দিলেন।

এক্ষুণি একটা ডাকাত ধরা পড়েছে এই ঘরে!

ডাকাত! ওমা, কই?

তুলতুলি বাবার পাশে সরে এসে শক্ত মুঠোয় ধরল বাবার হাত, আর বাবা আবার হেসে উঠলেন জোরে, মা হাসলেন, মহুয়া হাসল, আর কিছু না বুঝে তুলতুলিও কম হাসল না।

যাক বাবা! এই হাসাহাসির মধ্যে সেই দমবন্ধ করা ভাবটা একটু কমল, আশা করা যায় সবই আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সত্যিই কি সব স্বাভাবিক হবে! আগের মত। এই ২নং লাভলক প্লেসের বাড়িতে দাদা নেই, মহুয়া আছে, একি ভাবা যায়? ভোরে উঠে দুই ভাইবোনে আর তারা বেড়াতে যাবে না, কলেজ থেকে ফিরেই মহুয়া আর ছুটবে না দাদার ঘরে, প্রেমেন্দ্র দাসের গল্প শোনাতে, যখন তখন পেছন থেকে বিনুনী ধরে আর কেউ টান মারবে না আচমকা—আর সন্ধ্যেবেলা তিনতলার বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে মহুয়ার গান শুনবে না মহুয়ার দাদা।

বারান্দায় যুঁইফুলের টবের পাশে দাঁড়িয়ে মহুয়ার মন আবার বিষণ্ণ, উদাস হয়ে গেল।

কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে সব। আস্তে আস্তে কেমন যেন বদলে যাচ্ছে জীবনটা। আশ্চর্য অথচ বছর-দেড়েক আগেই ত' একদম অন্যরকম ছিল; মা অসুস্থ হলেও উঠে হেঁটে বেড়াতে পারতেন, মহুয়াদের সঙ্গে ছবি দেখতে, পিকনিক করতেও গেছেন দু-একবার। আর দাদা! রিটার সঙ্গে তার যত প্রেমই থাক, বাড়ি ছেড়ে যাবার কল্পনাও কি করতে পারত! অ-সহজ, সব দিক দিয়ে

জীবনটা কেমন অ-সহজ হয়ে আসছে, আর খুব ধীরে ধীরেও নয়। কবে থেকে শুরু ?

সেই যেদিন দাদা মার হরলিক্স কিনতে গিয়ে ফিরে এল, কোন দোকানে একটাও হরলিক্স নেই, সব নাকি দোকানীরা লুকিয়ে ফেলেছে চড়া দামে পরে বেচবে বলে, মোটে সাতদিন যুদ্ধ লেগেছে তখন। হরলিক্স পাওয়া গেল না, মার স্যানাটোজেনও না, অথচ ওই দু'টোই ত' প্রধান খাদ্য মা'র। সন্ধ্যেবেলা বাবা কোথা থেকে যেন খুব চড়া দামে অনেকগুলো হরলিক্স, স্যানাটোজেন আর অন্যান্য ওষুধ নিয়ে এলেন। তারপর ত' আইন হোল ওষুধ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুরই যাতে দাম না বাড়ে, কিন্তু কই ? মহুয়ারা ত' এখন পর্যন্ত অন্যায্য দাম দিয়েই এসব কিনছে !

কেন বাবা ?

মহুয়া একবার বলেছিল, অন্যায় দাম কেন দেবে ? এ ত' চোরকে সাহায্য করা।

জানি মা, কিন্তু এইটাই যে এখন বাজার দাম হয়ে গেছে। আমি ত' তবু চেনা লোকের কাছ থেকে আনি বলে খাঁটি জিনিসটা পাই···

ওষুধে আবার ভেজাল হয় নাকি বাবা ?

হয় মা ! হচ্ছে ত'।

বাবা হতাশায় মাথা নেড়ে ছিলেন।

কি যে না হয়, আজকালকার দিনে।

রাত্রে তেতলার ঘরে একা শুয়ে মহুয়ার আবার কান্না পেল। একা ঠিক নয়, পাছে মহুয়ার ভয় করে তাই মা ভানুদি'কে শুতে পাঠিয়েছেন ওপরে মহুয়ার ঘরে। মেঝেতে কার্পেটের ওপর বিছানা করে ভানুদি'ই শুয়েছে। আগে হলে আয়াই শুত, কিন্তু আজকাল বাড়ির সব দায়িত্বই ভানুদি'র।

আচ্ছা মৌ—

ভানুদি' শুয়ে শুয়েই ডাকল।

খোকার বৌ ত' মেমসাহেব, না ?

মেমসাহেব ? এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে কি মেমসাহেব বলা যায় ? মহুয়া ঠিক জানে না। খাঁটি পাশ্চাত্য রক্তই ত' একমাত্র 'সাহেব' আর 'মেম', না কি ? মহুয়া ঠিক জানে না। আচ্ছা দাদা যদি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বিয়ে না করে খাঁটি ইউরোপীয় মেয়েকে বিয়ে করত ? তা হলেও কি দাদাকে চলে যেতে হত এ বাড়ি ছেড়ে ? বোধ হয় না ! মহুয়া আপন মনেই মাথা নাড়ল। খাঁটি মেমসাহেবে দোষ নেই—সে বিশুদ্ধ গব্যঘৃত। দোষ আছে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানে, দোষ আছে অসবর্ণ বিয়েতে। সেই যে লিলির দাদা রঞ্জন মিত্র, মা'র যাকে খুব পছন্দ ছিল—বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার, বড় চাকরী করে, সুন্দর চেহারা। সব—সব ছিল ভদ্রলোকের। মা যা, যা, চান। আর সব থেকে বড় ছিল মহুয়ার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আকর্ষণ। ওরা ত' বলেও ছিল মাকে। আর মা কি আফশোষটাই করেছিলেন বাড়ি এসে, আহা ! অমন ছেলে, বুক জুড়োন জামাই হোত আমার, ইস ! মিত্তির না হয়ে মুখুয্যে হোত যদি ! সেইদিনই মহুয়া ভাল করে বুঝে নিয়েছিল; ব্রাহ্মণ ? হ্যাঁ মহুয়ার স্বামী শুধু বিলিতি ডিগ্রি, বড় চাকরী থাকলেই চলবে না, তাকে হতে হবে ব্রাহ্মণ। বর্ণশ্রেষ্ঠ, কিন্তু কেন ? কেন থাকবে মানুষে মানুষে এই ভেদ ? এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান !

মহুয়া ভেবে পায় না; ব্রাহ্মণ না হলে কি হয় ? কেন বিয়ে হবে না ? অব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করা যায়, ভক্তি করা যায়, আর বিয়েই করা যায় না শুধু ? মহাত্মা গান্ধী কি ব্রাহ্মণ ? বাবা ত' বলেন 'কলির শ্রীকৃষ্ণ' আর সেই শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তবে ? আশ্চর্য ! মাকে বোঝাতে গেলে মা খালি হাসেন রাগ করেন না, হেসে হেসেই বলেন—জানি না মা; ঘেন্না কাউকে করি না, অব্রাহ্মণদের ছোটও মনে করি না, কিন্তু বিয়ে ?

মা একটু থামেন, সুন্দর ফর্সা নাকটা একটু কুঁচকে যায়, বলেন—ওটা সামাজিক ব্যাপার, চিরকালে যা হয়ে আসছে তাই হওয়াই ভাল; আর কেন ! খামকা জাত ভেঙে বেরিয়ে যাবার দরকার কি ? নিজের নিজের জাতে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর অভাব আছে নাকি ?

পারে না; মাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে না মহুয়া। 'Caste system should be abolished' বলে ডিবেট করে কলেজে জেতে, কিন্তু মাকে কিছুতেই স্বমতে আনতে পারে না।

মা'র সঙ্গে কত কিছুই মহুয়ার মতে মেলে না, তবু মার মতকে লঙ্ঘন করা যেতে পারে এ মহুয়া ভাবতেই পারে না। আশ্চর্য ! দাদা কি করে পারল ! মাকে ত' দাদাও ভালবাসে মহুয়ারই মত ! তবে ! কি যেন—প্রেম ! মহুয়া আপন মনে সরবেই উচ্চারণ করল 'প্রেম'। এমন অমোঘ শক্তি একমাত্র প্রেমেরই আছে, সেই যে দাদা বলেছিল—'I am in love !'

মহুয়া দাদার খালি বিছানার দিকে তাকাল, বালিশটা উল্টে নিয়ে মহুয়া পাশ ফিরে শুল। [ক্রমশ।


বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

খেলার অবসরে খেলা !



● কলকাতায় অকাল বর্ষণে ক্রিকেট খেলা ব্যাহত হওয়ায় ক্ষণিক অবসরের ফাঁকে বিলিয়ার্ড খেলছেন জয়সীমা। দর্শক—পতৌড়ী ও হনুমন্ত দেশাই।

● মস্কোয় সদ্য অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলনের নাচের আসর।

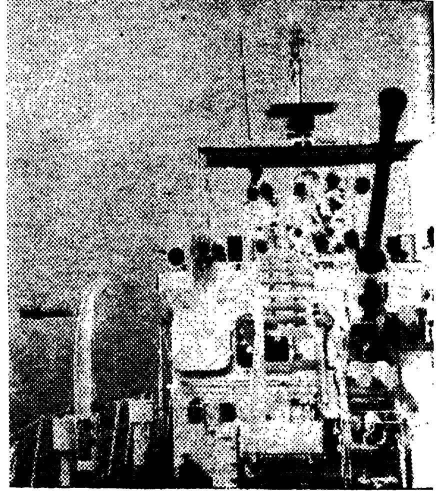
আনন্দে মুখর শান্তিপ্রিয় সাম্যবাদী !!

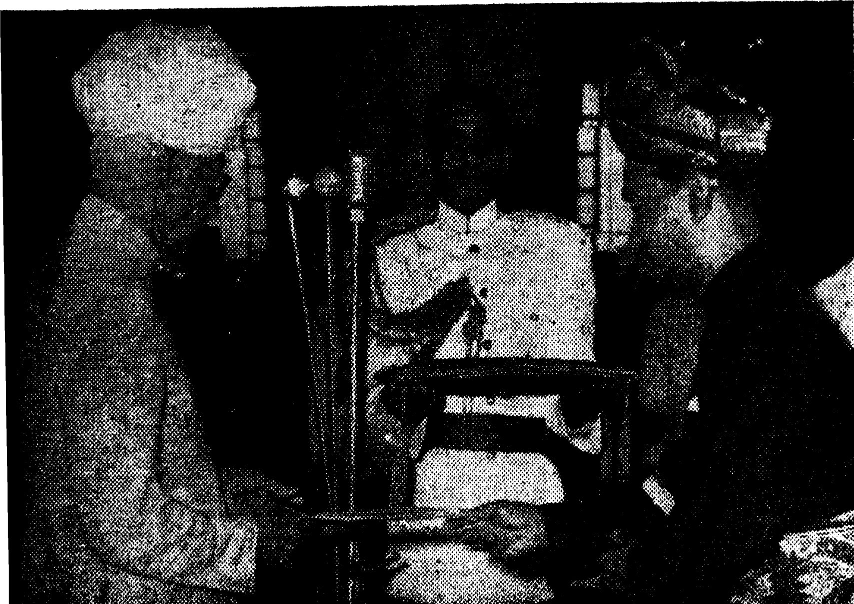




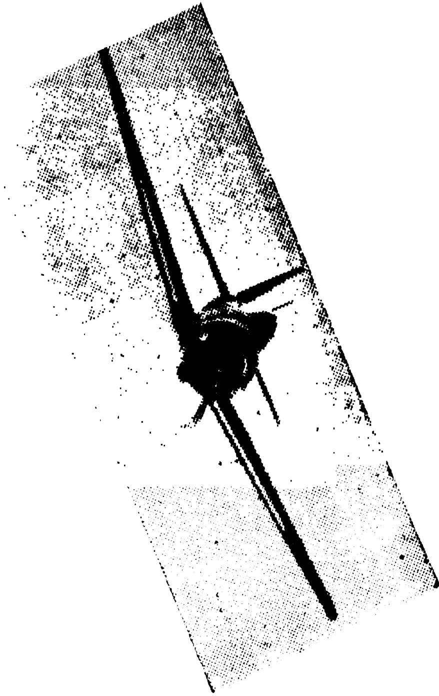
● আয়ুবশাহী পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ আঁধার দেখে উদ্বিগ্ন মিস ফতেমা জিন্না (৭০)।

● ভারতীয় নৌ-সপ্তাহের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ আ[illegible] এন, এস, অভয়—একটি টহলদারী জাহাজ।





● রাষ্ট্রপতি [illegible] রাধাকৃষ্ণণের কা[illegible] আপন পরিচয়প[illegible] সমর্পণ করছে[illegible] মালয়েশিয়ার [illegible] নিযুক্ত হা[illegible] কমিশনার [illegible] আহম্মদ।

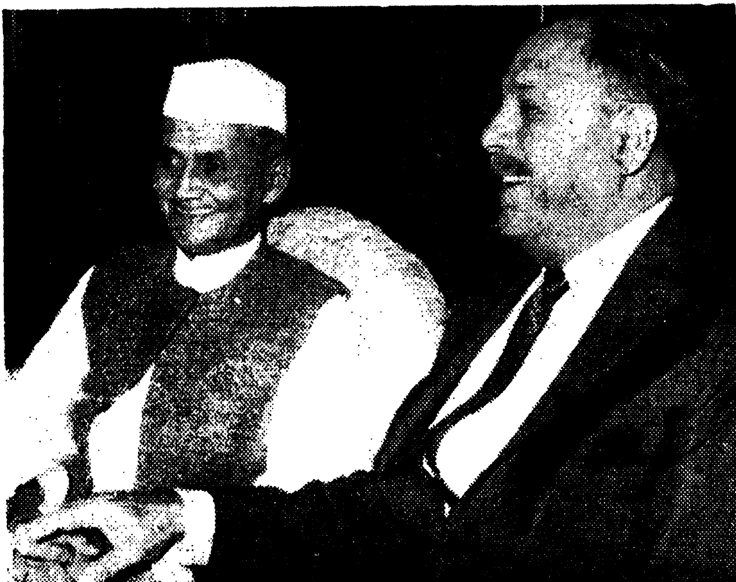


● গতি ও উচ্চ-বিহারে একদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাপানী জেরো বিমান



● বিজয়ের উল্লাসে নবনির্বাচিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রমিক নেতা মিঃ হ্যারল্ড উইলসন

● ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে জেনারেল আয়ুব খাঁ





● বিদেশে ভারতীয় চায়ের জনপ্রিয়তা। ক্রেতা ও বিক্রে

● ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক বি
সেবা-পদক (১ম শ্রেণী) প্রদান। গ্রহী
মেঃ জেঃ দেওয়ান প্রেমচাঁদ।





যুদ্ধবাজ
সাম্যবাদী
শান্তি

● আমেরিক
সমরবিশারদ
ম্যাকনামার
সায়গনে
মারতে
গুলীবিদ্ধ
কং গরিলা।



অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাতাসী মঞ্জিল

সুলতান মিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে চলে গেলাম সেই বাতাসী মঞ্জিলের গেটে। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দারোয়ান কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে আমাকে যে পথে এগিয়ে নিয়ে চলল, সেটা পুকুর ঘাটের দিকে যায় নি কালকের মতো। বুঝলাম আজকের গন্তব্যস্থান পুকুরের ধারে নয়, অন্যত্র। অনাবশ্যক বাহুল্যবোধে পথ-প্রদর্শক দারোয়ানকে কোনো প্রশ্ন করলাম না।

দারোয়ান আমাকে যে ঘরে নিয়ে বসাল, অমন সুন্দর সৌখীন ড্রয়িং-রুমে আগে কখনো আমার বসবার সৌভাগ্য বা সুযোগ হয় নি। চোখ জুড়ানো মৃদু রঙে রাঙানো দেয়ালের গায়ে গায়ে লাগানো লম্বা অস্বচ্ছ কাচের নল থেকে চোখ-না-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে সারা ঘরময় মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। দেয়ালের গায়ে ঝুলানো একটি বড় অয়েল-পেইন্টিং—একজন বলশালী সুপুরুষ যুবকের প্রতিকৃতি। কোনো পুরুষের মুখশ্রীতে লালিত্য এবং পৌরুষের অমন অপরূপ মিশ্রণ দেখি নি, কল্পনাও করতে পারি নি। শিল্পের ব্যাকরণ, ভূগোল বা ইতিহাস আমার নেই, বোদ্ধা সমঝদার নই আমি, কিন্তু ঐ ছবিটি দেখে অজ্ঞাত শিল্পীর প্রতি বিস্মিত শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠল। ছবিটি আশ্চর্যরকম জীবন্ত, মনে হচ্ছে যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে ঐ বলিষ্ঠ, গভীর, প্রশস্ত বক্ষ; দু'টি স্মিত অধর যেন কি একটা কথা বলি-বলি করছে; সুপুরুষ যুবক যেন ছবির ফ্রেমের ভেতর থেকে যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসবেন।

ভেতর থেকে পিয়ানোর টুং-টাং আওয়াজ ভেসে আসছিল থমথমে নীরবতা ভঙ্গ করে—কখনো মৃদু, কখনো জোরালো; কখনো ধীর, কখনো দ্রুত। বিদেশী যন্ত্র, যে সুর বাজছিল তাও এদেশী নয়, ঐ ছন্দের সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই, তাই ঠিক রস গ্রহণ করতে পারছিলাম না, তবু ঐ পরিবেশে ঐ আওয়াজে মনের ভেতর একটা রোমান্টিক আমেজের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাবছিলাম: কে বাজাচ্ছে এই পিয়ানো? অ্যাটর্নী বাড়ির বধূ মৃণালিনী, যাকে ময়ূরপঙ্খী মোটর গাড়িতে সর্বপ্রথম বধূরূপে আসতে দেখে বুড়ো সুলতান মিয়ার মনে হয়েছিল 'সেই পুরোনো বাতাসী বিবি যেন আবার অনেকদিন বাদে নতুন সাজে এসে ঢুকল বাতাসী মঞ্জিলে?

'শুনে আপনার হয়তো ভারি তাজ্জব মালুম হবে, বাবুসাহেব,' সুলতান মিয়া বলেছিল আমাকে, 'কিন্তু সেদিন আমার ঠিক ঐরকম মনে হয়েছিল, আল্লার কসম বলছি আপনাকে।' উন্মাদ, উন্মাদ, উন্মাদ সুলতান মিয়া!

আমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে বাবুকে খবর পাঠাবে বলে দারোয়ান কখন বিদায় নিয়ে চলে গেছে খেয়াল

করি নি, ছবিতে আর পিয়ানোর ধ্বনিতে এমন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম।

মন তাকালো অতীতের দিকে। বাতাসী বিবির আমলে এ ঘরের কেমন চেহারা ছিল? কি হতো তখন এ ঘরে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গা ছমছম্ করে উঠল, বাতাসী বিবির অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করলাম যেন। নেপথ্যে পিয়ানোর আওয়াজ কখন যে থেমে গেছে তাও খেয়াল করি নি, কল্পনার কানে তখনো সেই টুং-টাং আওয়াজের রেশ বাজছিল।

হঠাৎ মধুর-গম্ভীর এবং বলিষ্ঠ পুরুষকণ্ঠের অভিবাদন ধ্বনি শুনতে পেলাম: 'নমস্কার, ধনপতিবাবু।'

ঐ আওয়াজের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত, চমকিত, স্তম্ভিত হলাম। দেখলাম ওদিকের পর্দা সরিয়ে নেপথ্য থেকে নবাগত একজোড়া আশ্চর্য নর-নারী। এদের একজনের চেহারা এতক্ষণ দেয়ালের বুকে ঝুলানো তৈলচিত্রে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, এবার সেই তৈলচিত্রের জীবন্ত মডেলকে চোখের সামনে দেখে, মুগ্ধতর হলাম। বুঝলাম এই যুবকটিই ঐ তৈলচিত্রের মডেল, তরুণ অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির, যিনি সুপুরুষ শুনেছিলাম কিন্তু এমন সুপুরুষ তা ভাবতে পারি নি। তাঁর পিতা নিমাই মিত্তির নিজের যৌবনকালে এমন সুপুরুষ ছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত নিমাই-গৃহিণী অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, কানাই মিত্তির রূপবান হয়েছেন মায়ের রূপের অনেকখানি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে।

কানাই মিত্তিরের সঙ্গিনীটিও অপরূপা, উজ্জ্বলা, প্রাণৈশ্বর্যময়ী; তাঁর সারা দেহে রূপ আর যৌবনের জোয়ার। আশ্চর্য সপ্রতিভ, হঠাৎ অপরিচিত আমার মুখোমুখি পড়েও সলজ্জ আত্মসচেতনতা নেই, তাঁর সারা দেহে যে উদ্দাম যৌবন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তা গোপন করবার চেষ্টা বা ছল নেই; রূপ আর যৌবনের দেবতা তাঁদের ঐশ্বর্য উদার হাতে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর ওপর, সেজন্য গর্ব করবার হীনতা অথবা লজ্জা অথবা দীনতা নেই মেয়েটির। বুঝলাম এঁরই চম্পক অঙ্গুলির স্পর্শে পিয়ানোর বুকে ধ্বনি জেগে উঠেছিল।

মনে হ'লো এমন পুত্র এবং এমন পুত্রবধূ পেয়েও নিমাই মিত্তির তবু অসুখী, এমন যুগলের আজও সন্তান হলো না বলে। সত্যিই সব দিক দিয়ে সৌভাগ্যবান বা সুখী হওয়া মানুষের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে ওঠে না। এই অপরূপ যুগলের দিকে তাকিয়ে মনে হল পরমেশ্বর এঁদের দু'জনের জন্যই দু'জনকে সৃষ্টি করেছিলেন।

কানাই মিত্তিরের অভিবাদনের জবাবে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত জুড়ে অভিবাদনের ভঙ্গি করে বললাম: 'নমস্কার।'

নমস্কারের পর কি বলা উচিত তাই নিয়ে মনে মনে গবেষণা করছি, এমন সময় কানাই মিত্তির বললেন: 'বাবা যা বলেছিলেন তাতে আপনার আরো আগে আসবার কথা ছিল। দেরি দেখে ভেবেছিলাম আজ আপনি কোনো বিশেষ কারণে আসতে পারলেন না।'

আমি বললাম: 'আমি ঠিক সময় মতোই এসেছিলাম। কিন্তু তামাক দোকানের সুলতান মিয়ার মুখে শুনলাম বিকেলে সবুজ ক্যাডিলাক গাড়ি বেরিয়ে গেছে। তাই—'

কানাই মিত্তির বললেন: 'ঠিকই বলেছেন সুলতান মিয়া। আর্জেন্ট ফোন পেয়ে বাবা ক্যাডিল্যাক গাড়ি নিয়ে ওকে সঙ্গে করে রওনা হয়ে গেছেন ব্যারাকপুর—তাঁর বন্ধু সূর্যকান্ত বরাটের বাগানবাড়িতে। না গিয়ে উপায় ছিল না। অথচ আপনার সঙ্গে আগে কথা ঠিক আছে, আপনি আসবেন; আর এসে বেকার ফিরে যাবেন, সেটাও আমাদের অমার্জনীয় অপরাধ হবে। তাই বাবার প্রতিনিধি হয়ে আমাকে থাকতে হল।'

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, জেনে হোক বা না জেনে হোক কানাই মিত্তিরের আটকে থাকার কারণ হয়েছি জেনে ঈষৎ লজ্জিত এবং দুঃখিত হলাম। হয়তো এঁরা দোঁহে মেরুনরঙা প্যাকার্ড গাড়িতে চড়ে বেড়াতে বেরিয়ে যেতেন, বৃদ্ধ নিমাই মিত্তিরের অপ্রত্যাশিত পূর্ব অনুপস্থিতিতে আমার অভ্যর্থনার জন্যই এঁদের দু'জনকে বাইরের আনন্দ-ভ্রমণ বর্জন করে ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকতে হয়েছে।

আমার মনের এই সংকোচ দূর করবার জন্যেই কি না জানি না—কানাই মিত্তির বললেন: 'সেজন্যে ভগবানকে —এবং আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

তারপর সুন্দরী সঙ্গিনীকে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন: 'আমাদের পরিবারের নতুন বন্ধু—ধনপতিবাবু।'

ভাবলাম ভূতপূর্ব অ্যাটর্নী নিমাই মিত্তিরের অবসর গ্রহণের পর এঁরা দু'জনই তো গৃহস্বামী এবং গৃহস্বামিনী—বর্তমান ক্ষেত্রে আমার 'হোস্ট' এবং 'হোস্টেস'। আমি আমার পরিচয়-বাণী শুনে সৌজন্যের খাতিরে আরেকবার আলাদা করে অভিবাদন জানালাম তরুণী গৃহস্বামিনীকে।

মেয়েটি সুললিত ভঙ্গিতে দু'হাত জুড়ে আমাকে অভিবাদন জানালেন: 'নমস্কার, ধনপতিবাবু।'

সযত্নমার্জিত সুললিত কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ, কিন্তু সেই ভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ অবাঙালিয়ানা মেশানো। সেটা অস্বাভাবিক বলে মনে করলাম না, মনে হলো বড় বাড়ির বৌ, নিশ্চয় কনভেন্টে পড়ে এসেছেন, শিক্ষা পেয়েছেন ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে, তাই তাঁর মুখের বাংলা উচ্চারণ সাধারণ বাঙালী ঘরের কুলবধূর মতো নয়।

আমার কানে আবার মধু ঝরিয়ে তিনি বললেন: 'কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে। বসুন।'

মহিলাকে দণ্ডায়মানা রেখে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে আসন গ্রহণ করা শোভন নয়। তাই বললাম: 'আপনি বসুন।'

মৃদু হেসে তিনি বললেন,: 'এইবারে আমাকে যেতে হবে, ধনপতিবাবু। হোপ টু মীট ইউ এগেন। আশা করি আবার দেখা হবে।'

বিদায়োন্মুখতার দিকে তাকিয়ে এবার খেয়াল হলো—কি ভোলা চোখ আমার, এতক্ষণ খেয়াল করে নি!—তাঁর ললাটে বা সীমন্তে সিঁদুরের চিহ্নমাত্র নেই।

কানাই মিত্তির আমাকে যেন হঠাৎ একথাটা খেয়াল করে বললেন: 'আপনাকে এঁর পরিচয় দিই নি, ধনপতিবাবু। মিস লীলা সেহান, সেলিব্রেটেড পিয়ানিস্ট আমার স্ত্রীকে পিয়ানো শেখান। পূর্বভারতের স্বনামধন্যা মিস্ স্টেয়ারির পরে এঁর কাছাকাছি আসবার মতো পিয়ানিস্ট আর একটিও নেই। সি ইজ সুপার্ব, সিম্প্লি সুপার্ব!

যে প্রগাঢ় উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল কানাই মিত্তিরের কথায়, তাতে সন্দেহ রইল না তিনি যা বলেছেন তা তাঁর মুখের কথা নয়, অন্তরের কথা।

প্রশংসা শুনে আনন্দও পেলেন, লজ্জায় একটু লাল হয়ে উঠলেন কুমারী নীলা সেহান। স্মিতহাস্যে বললেন: 'আঃ ইউ আর পুলিং মাই লেগস্, মিস্টার মিটার। আপনি বাড়িয়ে তুলছেন আমাকে। আমার মতো অনেক—অনেক আছে। কিন্তু আপনি বসুন ধনপতিবাবু। বসুন, মিস্টার মিটার। আমি চলি। নমস্কার।'

'নমস্কার' শব্দটা 'নোমোস্কার'-এর মতো শোনালো।

'একটু বসুন, মিস নীলা। জাস্ট ফর এ ফিউ মিনিট্স্, শোফারকে গাড়ি বার করতে বলি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

একটু যেন বিব্রত এবং লজ্জিত বোধ করেই নীলা সেহান বললেন: 'না না, তার কোনো দরকার নেই, মিস্টার মিটার।'

নীলাকে যেন প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই সোফায় বসে পড়তে বাধ্য করে কানাই মিত্তির বললেন: 'দরকার আপনার নেই মিস নীলা, কিন্তু আমার আছে। আপনার ছাত্রী আজ অনুপস্থিত, আপনি অনেক আগেই চলে যেতে পারতেন। আমিই আপনাকে এতক্ষণ আটকে রেখে কষ্ট দিয়েছি।'

অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যাঁকে এতক্ষণ আটকে রেখেছেন,

তাঁকে নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করে দেবার দায়িত্বটাও তাঁর।

আবার বিব্রত বোধ করলেন মিস নীলা সেহান। বললেন: 'না না, তা নয়, তা কখনোই নয়, মিস্টার মিটার। দিস হ্যাজ বীন দ্য মোস্ট ডিলাইটফুল ইভ্‌নিং ইন মাই লাইফ! এই সন্ধ্যাটির কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

আবেগে কণ্ঠস্বর উচ্ছল হয়ে উঠল, দু'টি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কুমারী নীলা সেহানের। তিনি বলতে লাগলেন: 'পিয়ানো আমি অনেক জায়গায় অনেক শ্রোতার সামনে বাজিয়েছি, অনেক হাততালি-প্রশংসা-পুরস্কার পেয়েছি, কিন্তু আপনার মতো আশ্চর্য শ্রোতা আমি আর কখনো পাই নি।'

'ছাটস্ এ গ্রেট কমপ্লিমেণ্ট টু মি, মিস্ নীলা। আমাকে এত বড় প্রশংসা আজ পর্যন্ত আর কেউ করে নি।' হেসে বললেন কানাই মিত্তির। 'আমি অনুরোধ করছি, প্লীজ হ্যাভ ওয়ান মোর ড্রিঙ্ক ইন অনার অব আওয়ার নিউ ফ্রেণ্ড, বিফোর ইউ গো।'

অর্থাৎ ভদ্রে, আপনি যাবার আগে আমাদের এই নতুন বন্ধুর সম্মানে আরেক গ্লাস সুস্বাদু পানীয় উপভোগ করে যান।

জানি না আমার তখনকার মনের অবস্থাটা ঠিক কিভাবে বর্ণনা করব। মনে হলো আমি যেন অত্যন্ত অসময়ে এসে পড়েছি অবাঞ্ছিত অতিথি, নিতান্ত বেরসিকের মতো এসে পড়ে রসভঙ্গ ঘটিয়েছি। মনে হলো নীলা সেহানের সুমধুর সাহচর্য এত ভালো লাগছে কানাই মিত্তিরের, যে তাঁকে ছেড়ে দিতে কিছুতে মন চাইছে না; যেতে তাঁকে দিতেই হবে, তব এ অজুহাত সে অজুহাত দিয়ে তাঁকে যতক্ষণ আটকে রাখা যায়। আমি এসে বিঘ্ন না ঘটালে হয়তো এই মধুর সাহচর্যের এত দ্রুত সমাপ্তি ঘটাবার দরকার হত না কানাই মিত্তিরের।

একটা ভুল আমার ভেঙে গেল; ভাগ্যিস সেই ভুলটা মুখে উচ্চারণ করে ফেলি নি! ফেললে কি লজ্জার ব্যাপারই না হতো! এঁদের দু'জনের যুগল আবির্ভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে ইংরাজিতে ভেবেছিলাম 'দে ওয়্যার বর্ন ফর ইচ্ আদার' —আর বাংলায় ভেবেছিলাম কানাই মিত্তিরের এই সঙ্গিনীই তাঁর জীবন-সঙ্গিনী।

আশ্চর্য উপাদেয় পানীয় পান করলাম আমরা তিনজন—কুলু উপত্যকার প্রায় তাজা ফলের রস, রেফ্রিজারেটারে ঠাণ্ডা করা। শুধু অসাধারণ তৃপ্তিদায়কই নয়, অসামান্য পুষ্টিকরও বটে।

কাগজের তৈরি নকল খড় দিয়ে ধীরে, অতি ধীরে আমরা পান করলাম সেই পানীয়। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কোনো অস্থিরতা নেই।

কথায় কথায় কানাই মিত্তির অনেকটা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভঙ্গিতে বললেন: 'ঝোঁকের মাথায় আজ সন্ধ্যার যা করে বসলাম, এখন মনে হচ্ছে তা না করলেই ভালো করতাম, মিস নীলা। এমন করে এতক্ষণ আপনার পিয়ানো শোনা আমার উচিত হয় নি।'

এতক্ষণের ভেতর এই প্রথম মিস নীলা সেহানের মুখ ম্লান হয়ে উঠল। তিনি আর্তস্বরে বলে উঠলেন: 'আমার বাজানো কি আপনার ভালো লাগে নি, মিস্টার মিটার? ডিড আই বোর ইউ?'

জানি না এ আমার কল্পনার অতিরঞ্জন, না সত্য অনুভূতি, কিন্তু তাঁর এই আর্তনাদ শুনে আমার মনে হল যেন কানাই মিত্তিরের ভালো লাগাতেই নীলা সেহানের পিয়ানো-সাধনার সেরা সার্থকতা, কানাই মিত্তিরের ভালো না লাগলে তাঁর সমস্ত সাধনা ব্যর্থ।

'অসাধারণ ভালো লেগেছে, মিস নীলা।' বললেন কানাই মিত্তির। 'তাই শুনে যত মুগ্ধ হয়েছি ততই মনে হয়েছে আপনার ছাত্রীর হয়তো আপনার কাছাকাছিও কোনোদিন পৌঁছনো সম্ভব হবে না।'

দুর্ভাবনা কেটে গেল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন নীলা সেহান। আশ্বাসের সুরে বললেন: 'সাধনা থাকলে অসম্ভব কিছুই নয়, মিস্টার মিটার। আমার পিয়ানো-গুরু বলতেন: 'পিয়ানো শিক্ষাতে তিনটি জিনিস সবচেয়ে বেশি দরকার—প্রথমটি অভ্যাস, দ্বিতীয়টি অভ্যাস, তৃতীয়টিও অভ্যাস। মিসেস মিটার যেন আরেকটু বেশি অভ্যাস করেন। আমি আমার যথাসাধ্য করছি, করব। আই লভ টু ডু মাই বেস্ট, অলওয়েজ।'

'তা আমি জানি, মিস নীলা।' বললেন কানাই মিত্তির গভীর বিশ্বাসের সুরে, সেই বিশ্বাসের সঙ্গে কিছুটা বিষাদ মেশানো যেন। 'ছাত্রী বলে পরিচয় দিতে আপনি অখুশি হবেন না, আমার স্ত্রীকে যদি তেমনটি শিখিয়ে তুলতে পারেন, তা হলে আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ থাকবে না।'

'আপনার কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে দুনিয়ায় আমার চেয়ে খুশি আর কেউ থাকবে না, মিস্টার মিটার।' বললেন মিস নীলা সেহান। 'ঈশ্বর দয়া করলে, আমার আশা আছে আপনার আশা আমি পূর্ণ করতে পারব।'

খানিক বাদে 'শোফার' রামভজন কানাই মিত্তিরের মস্ত মেরুনরঙা প্যাকার্ড গাড়িখানা এনে গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড় করাল। তারপর দরজা খুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে কানাই মিত্তিরকে অভিবাদন করে বলল: 'হুজুর!'

অর্থাৎ 'হুজুর হুকুম করেছিলেন। গাড়ি এসে হাজির হয়েছে।'

দাঁড়িয়ে উঠলেন মিস নীলা সেহান। দাঁড়িয়ে উঠলেন কানাই মিত্তির। বললেন: 'মিস সাহেব যেখানে যাবেন সেখানে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, রামভজন।'

'যো হুকুম, হুজুর।'

আমাদের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন মিস নীলা সেহান। শোফার গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে গাড়ির জানালার ধারে মুখ এনে দু'-হাত জুড়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললেন: 'নমস্কার মিস্টার মিটার। নমস্কার ধনপতিবাবু। গুড নাইট।'

গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল শোফার রামভজন। আমরা ফিরে গিয়ে বসলাম আমাদের এইমাত্র পরিত্যক্ত আসনে। আমার মনে হতে লাগল ঘরের নিওন আলো যেন হঠাৎ অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

এতক্ষণ যেন ঠিক নিজের মধ্যে নিজে ছিলেন না কানাই মিত্তির; এইবার নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এলেন। এতক্ষণ যেন আমি ছিলাম গৌণ, এইবার হঠাৎ আমার প্রতি পূর্ণ কর্তব্যবোধ জাগরিত হওয়ায় তিনি বললেন: 'ধনপতিবাবু, ক্ষমা করবেন আমাকে, আশা করি আপনার কোনো অসুবিধা হয় নি এবং আপনার ভয়ানক কিছু তাড়া নেই?'

আমি দৃঢ়কণ্ঠে তাঁকে ভরসা দিলাম তাঁর দু'টো আশাই ঠিক। কানাই মিত্তির বললেন: 'আজ একটা বড় অদ্ভুত যোগাযোগের দিন, ধনপতিবাবু। বিধাতাপুরুষের এ যেন এক অসাধারণ খামখেয়াল। অনেক বছরের ভেতর আজই প্রথম বাবা সন্ধ্যায় বাড়ির বাইরে। বহুকাল বাদে আজ এই প্রথম শনিবার সন্ধ্যায় আমি বাড়ির ভেতরে। আপনার সঙ্গে আজ এই প্রথম আলাপ, যা বাবার হঠাৎ বাইরে চলে যেতে না হলে হতো না। আর মিস্ নীলা সেহানের সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছে বটে, কিন্তু আজই প্রথম তেমন আলাপ হলো, যাকে সত্যিকারের আলাপ বলা চলে। আর ছ'মাসের ভেতর আজই প্রথম সন্ধ্যা, যে সন্ধ্যায় পিয়ানো-শিক্ষয়িত্রী এসে দেখলেন তাঁর ছাত্রী বাড়ি নেই।'

প্রশ্ন করলাম: 'কোথায় গেছেন তিনি?'

এ প্রশ্নটাও অতি কৌতূহলবশত মুখ থেকে চট করে বেরিয়ে গেল, প্রশ্নটা করা শোভন হবে কি না সেটা ভেবে দেখবার আগেই।

'তিনি গেছেন তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে ব্যারাকপুর।' বললেন কানাই মিত্তির। 'বাবা বৌমা বলতে অজ্ঞান। বৌমাও বাবা বলতে অজ্ঞান, বাবাকে অতদূরে একা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না, তাই সঙ্গে গেছেন। বাবা যেন তাঁর বুড়ো ছেলে, বলেন: বৌমা, আমার মনে হয় তুমি আগের জন্মে নিশ্চয় আমার মা ছিলে।'

'অথচ সেই বৌমা এ-জন্মে এখনো মা হ'তে পারেন নি, এই পাঁচ বছরেও!' ভাবলাম আমি। কানাই মিত্তিরের কথাগুলো মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে লাগল। কোনো শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থাকেন না কানাই মিত্তির, বাড়িতে রেখে যান স্ত্রীকে, স্ত্রী পিয়ানো-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পিয়ানো শিখবেন বলে। কোথায় যান কানাই মিত্তির? কেন? মনের ভেতর এমনি আরো নানা বেয়াড়া প্রশ্ন ঘোরাফেরা করতে লাগল। পাছে কোনো প্রশ্ন শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে আমি তাকালাম কানাই মিত্তিরের প্রায় নিখুঁত প্রতিকৃতি ঐ তৈল-চিত্রটির দিকে। প্রশংসা-গদগদ কণ্ঠে বললাম: 'আশ্চর্য শিল্পীর প্রতিভা! মনে হয় ফ্রেমের ভেতর যেন আপনিই দাঁড়িয়ে আছেন।'

আমার কথা শুনে কৌতুক উপভোগের হাসি হেসে কানাই মিত্তির বললেন: 'আমার ঠাকুরদাকে আপনি আমি বলে ভুল করছেন, ধনপতিবাবু।'

আমি চমকে উঠে বললাম : 'সে কি ?'

কানাই মিত্তির বললেন : 'উনি আমার পিতামহ, স্বর্গীয় অ্যাটর্নী নটবর মিত্তির, 'পালোয়ান অ্যাটর্নী' নামে যাঁর খ্যাতি ছিল।'

'আশ্চর্য ! অতি আশ্চর্য !' বললাম আমি, ছবির ৺নটবর মিত্তির আর আমার সামনে উপস্থিত জলজ্যান্ত কানাই মিত্তিরের আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা ভেবে।

কিন্তু আমার কথার মানে অন্যরকম বুঝে কানাই মিত্তির বললেন : 'হ্যাঁ, সত্যিই আশ্চর্য। বাবার মুখে শুনেছি দাদুর এ ছবি নাকি ফোটোগ্রাফের চাইতেও অনেক বেশি নিখুঁত আর জীবন্ত।'

আমি বললাম : 'তার চাইতে বড় আশ্চর্য আপনি আপনার দাদুর জীবন্ত ফোটোগ্রাফ। আপনার বাবার সঙ্গে আপনার দাদুর তেমন মিল নেই, কিন্তু আপনার মিল নিখুঁত।'

যেন এটাই স্বাভাবিক, এমনিভাবে কানাই মিত্তির বললেন : 'মেণ্ডেল-এর থিয়োরি অনুযায়ী ওটাই তো বংশানুক্রমের ধারা। সাদৃশ্য দেখা দেয় এক ধাপ বাদ দিয়ে। মনে করুন দাদুর যদি খামখেয়ালী ধাত থাকত, তা হলে সেটার উত্তরাধিকার বাবার চাইতে আমারই পাবার বেশি সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ও ধাতটা ছিল না দাদুর। তাই আমিই পাই নি। পেয়েছি দাদুর চেহারা।'

তিনি কি পান নি, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত না হয়েও বললাম : 'একটা প্রশ্ন করবো ?'

'করুন।'

'আপনার দাদুর এই তেল-ছবিটি কে এঁকেছিলেন ?'

'বিদেশী শিল্পী হেক্টর কাচাডুরিয়ান। শুনেছি জীবন্ত মানুষকে মডেল করে এ জাতীয় প্রতিকৃতি আঁকতে তাঁর জুড়ি ছিল না।'

'বাতাসী বিবির ছবিও তো তিনিই এঁকেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। শুধু বাতাসী বিবিরই নয়, শুনেছি আরো অনেকের তৈলচিত্র এঁকে দিয়ে অনেক টাকা রোজগার করে তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কাচাডুরিয়ানের আঁকা বাতাসী বিবির ছবি কি আপনি দেখেছেন, ধনপতিবাবু ?'

'দেখেছি। আপনার বাবাই দেখিয়েছেন। সে ছবিও আশ্চর্য সতেজ, জীবন্ত। আপনার দাদুর এই ছবির মতো সেই ছবিটিও আশা করা যায় বাস্তব মডেলের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ?'

'শিল্পী কাচাডুরিয়ানের যে আশ্চর্য দক্ষতার কথা বড়দের মুখে শুনেছি, তাতে অমন বিশ্বাস নিঃসংশয়ে করা যেতে পারে। কাচাডুরিয়ানের আঁকা দু'টি ছবি এ বাড়ির একই ঘরের দুই দেয়ালে ঝুলানো ছিল, অসামান্য শিল্পীর দু'টি অসাধারণ কীর্তি হিসেবে। আমিই দাদুর ছবিটি এ ঘরে আনিয়ে নিয়েছি যেদিন বাবার মুখে শুনলাম মৃত্যুকালে দাদুর সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল তিনি আমার মুখ দেখে যেতে পারলেন না।'

'কেন ?'

'আমার জন্মের দু' বছর আগেই তাঁকে ওপারে চলে যেতে হলো। বাবার মুখে এ কথা শুনে, দাদুর ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারি নি ভেবে মনে বড় দুঃখ পেয়েছিলাম, ধনপতিবাবু। ভেবেছিলাম সেই তো জন্ম নিলাম, দু'টো বছর আগে নিলে দাদুকে এই দুঃখ নিয়ে চলে যেতে হত না।'

কানাই মিত্তিরের কণ্ঠস্বরে আফসোসের আভাস পেলাম। সান্ত্বনার সুরে বললাম : 'জন্মগ্রহণ বলি বটে, কিন্তু আসলে জন্মকে তো আমরা গ্রহণ করি না, জন্মই আমাদের গ্রহণ করে, আর আমাদের জন্মের স্থান, কাল, পিতা-মাতা সব ঠিক করে দেন বিধাতা পুরুষ।'

কানাই মিত্তির বললেন : 'ঠিক বলেছেন ধনপতিবাবু। সব ঐ বিধাতা লোকটার হাতের মুঠোয়। তা যাই হোক, দাদুর এই প্রাণবন্ত ছবিটিকে এখানে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছি, অবসর পেলেই এখানে এসে বসি আর দাদুর দিকে তাকিয়ে, বলি : দাদু! এবার আমায় দেখ, যত খুশি দেখ।'

মনে হলো শনিবারের সন্ধ্যার এই কানাই মিত্তির, আর অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির, দু'জন যেন আলাদা মানুষ। আর নিমাই মিত্তির যে আমাকে বলেছিলেন এই অ্যাটর্নী-বাড়ি সন্ধ্যার পর আর অ্যাটর্নি-বাড়ি থাকে না, হয়ে যায় 'বাতাসী মঞ্জিল,' সে কথাটাও একেবারে বাজে কথা নয়।

আর ৺নটবর মিত্তিরের আশ্চর্য তৈলচিত্রটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো সত্যিই যেন তিনি তাকিয়ে দেখছেন তাঁর নাতি কানাই মিত্তিরকে।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে কানাই মিত্তির বললেন : 'ঠিক আপনাকেই—অর্থাৎ আপনার মত একজনকে—বাবার একান্ত দরকার ছিল। ইউ আর এ গডসেণ্ড। ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ আপনি। পয়লা আলাপেই—অবশ্য আলাপটা প্রচুর লম্বা হয়েছিল—আপনি বাবার কাছে আমার চাইতে প্রিয়তর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু বাতাসী বিবি সম্পর্কে এত কৌতূহল কেন আপনার ?'

উপন্যাসের প্লট বা মালমশলা যোগাড় করছেন সন্দেহ করতে পারতাম, কিন্তু ও-সব ছাইপাঁশ যাঁরা লেখেন, তাঁদের ফর্দে তো আপনার নাম নেই।'

আমি বিস্মিত হলাম। আমার সম্বন্ধে এত খবর উনি কি করে জানলেন, তাই ভেবে। বললাম : 'কি আশ্চর্য ! আপনি কি—'

'না। আধুনিক কথা-সাহিত্য পড়ে জবাই করবার মতো সময় আমার নেই—কিন্তু বইয়ের বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর নিয়মিত চোখ বুলিয়ে দেখি। আপনার নাম তাতে কোথাও দেখি নি। আপনার ওপর সেই জন্যেই একটু শ্রদ্ধা হয়েছে, ধনপতিবাবু।'

আমার পক্ষে এটা আনন্দেরই কথা। কিন্তু কথা-সাহিত্যিকদের তরফ থেকে কিছু বলা উচিত মনে করে বললাম: 'কিন্তু কথা-সাহিত্যিকরা জীবনের যে ছবি আঁকছেন তাঁদের রচনায়, তা থেকে কি জীবনের সঙ্গে আপনার পরিচয় আরো ঘন হয়ে উঠবে না কানাইবাবু?'

'বরং ঘোলো হয়ে উঠবার সম্ভাবনাই বেশি, ধনপতিবাবু। আমি জীবনের পরিচয় নেবো নিজের মুখে ঝাল খেয়ে, প্রত্যক্ষ জীবনের পাতা থেকে—পরের মুখে ঝাল খেয়ে বইয়ের পাতা থেকে নয়। যাঁরা দিস্তে দিস্তে কথা-সাহিত্য লিখছেন, জীবনের কতটুকু গভীরে তাঁরা প্রবেশ করেছেন? কথা-সাহিত্যের খড়ের এক ডগায় জীবনের এককোঁটা ফেনা মাখিয়ে অন্য ডগায় ফুঁ লাগিয়ে লাগিয়ে তাঁরা মস্ত মস্ত ফাঁপা বুদ্বুদ তৈরি করে চলেছেন। তাই ফিকশ্যনে আমার দরকার নেই ধনপতিবাবু, আমি চাই ট্রুথ—ট্রুথ দ্যাট ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশ্যন—কথা-সাহিত্যের নকল জীবন নয়। আমি চাই বাস্তব জীবন। মনে করুন এই নীলা সেহানের কথা, যাকে এইমাত্র দেখলেন। ইজন্ট সি ওয়াণ্ডারফুল? আশ্চর্য মেয়ে নয় নীলা সেহান?'

একঢিলে দুই পাখি মারবার এমন আশ্চর্য সুযোগ খুব বেশি মেলে না। আমি এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করে বললাম: 'সত্যি আশ্চর্য।'

'সেইজন্যেই ওকে এত আগ্রহ করে, আদর করে আহ্বান করে এনেছি, মৃণালিনীকে হপ্তায় দু'ঘণ্টা পিয়ানো শেখাবে বলে। ওকে দাক্ষিণা কত দিই জানেন, ধনপতিবাবু?'

'জানি না।'

'মাত্র তিনশো টাকা।' পরম লজ্জিত এবং দুঃখিত কণ্ঠে বললেন কানাই মিত্তির। 'অথচ পিয়ানোর বুকে নীলা সেহানের এক একটি আঙুলের টোকার দাম তিন শো টাকার বেশি।'

অতুলনীয়া পিয়ানো-প্রতিভাকে এ ভাবে ঠকাচ্ছেন, এই দুঃখে যেন একেবারে মুষড়ে পড়লেন অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির।

তারপর একটু সামলে নিয়ে স্বপ্নময় চোখে বলতে লাগলেন: 'শুনলে আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না ধনপতিবাবু, এই নীলা সেহানকে আমি প্রথম দেখেছিলাম সাত বছর আগে এক সুইমিং অ্যাণ্ড বডি বিউটিফুল কম্পিটিশনে। এক অভিজাত সৌখীন সমিতি পরিচালিত মেয়েদের সাঁতার এবং দেহ-সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়। তখন সে বয়সে ষোড়শী কিশোরী। একশো মিটারের তিন রকম সাঁতারে নানা প্রদেশের সতেরোজন প্রতিযোগিনীর মধ্যে সে অনায়াসে বিজয়িনী হল। দেহ-সৌন্দর্যের বিচারে বিচারকবৃন্দ একবাক্যে তাকে বিজয়িনী ঘোষণা করলেন, তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো বিজয়িনীর মুকুট। মুকুটপরা মাথায় সাঁতারের পোশাকে ছবি তোলা হলো, সেই ছবি আর্টপেপারে ছাপা হলো উঁচুদরের কাগজে। একদিকে বিশ্ববিখ্যাত ভিনাসের মর্মরমূর্তি বিশ্বের সেরা নারী-সৌন্দর্যের প্রতীক; অন্যদিকে রক্তমাংসের ভিনাস, নীলা সেহান। দু'টি ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়ে নানা মহলে সাড়া জাগাল।'

'তারপর?'

'তারপর সেই মেয়ে যেন রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেল। চারদিক থেকে আমন্ত্রণ, বহু প্রলোভন এবং লাভের সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাধারণের সামনে আর আত্মপ্রকাশ করল না সন্তরণ-যাদুকরী দেহ-সৌন্দর্যময়ী নীলা সেহান। আরো অনেক সাঁতার-প্রতিযোগিতা আর প্রদর্শনী হলো, দেহ-সৌন্দর্যেরও অনেক প্রতিযোগিতা, কিন্তু বহুর আশা ব্যর্থ করে পূর্ণ আড়ালেই গা-ঢাকা দিয়ে রইল বহু-অপেক্ষিতা নীলা সেহান।'

'কিন্তু কেন, কানাইবাবু?'

'নীলার পিয়ানো-গুরু ফাদার ফনসিকার কঠোর নিষেধ।' বললেন অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির।

বললাম: 'তিনি বোধ হয় খুব পিউরিটান ছিলেন কড়া নীতিবাগীশ; নারীদেহের সৌন্দর্য সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে রাখবার পক্ষপাতী?'

'না। তিনি বললেন, সাধনা একাগ্র না হয়ে বিক্ষিপ্ত হলে সম্পূর্ণ হয় না; যদি ওদিকে যেতে চাও, ওদিকেই যাও, আমি তোমাকে পিয়ানো শেখাব না। যদি পিয়ানো আমার কাছে শিখতে চাও তো ওদিকটা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি পিয়ানো-শিক্ষাতেই একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে।'

ফাদার ফনসিকা পাদ্রী 'ফাদার' ছিলেন না; বৃদ্ধের নামের আগে 'ফাদার' অর্থাৎ 'পিতা' শব্দটির ব্যবহার শুরু করেছিলেন শহরের পিয়ানোবাদক এবং পিয়ানোরসিক মহলের ধুরন্ধরেরা, যাঁরা সবাই তাঁকে গুরুস্থানীয় তথা পিতৃস্থানীয় বলে মানতেন। বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত একাগ্রভাবে পিয়ানো সাধনা করে এসেছেন, বৃদ্ধ বয়সেও পিয়ানোর সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে শক্ত সঙ্গীতগুলোও তাঁর শীর্ণ আঙুলগুলোর ডগায় যেন অনায়াসলীলায় রূপায়িত হয়ে উঠত।

আলোকচিত্র



কাকাতুয়া

—বি এন মিত্র



বিস্ময়াবিষ্ট

—সন্দীপ সেন

মাসিক বসুমতী । কার্তিক / '৭১

সমুদ্রস্নান

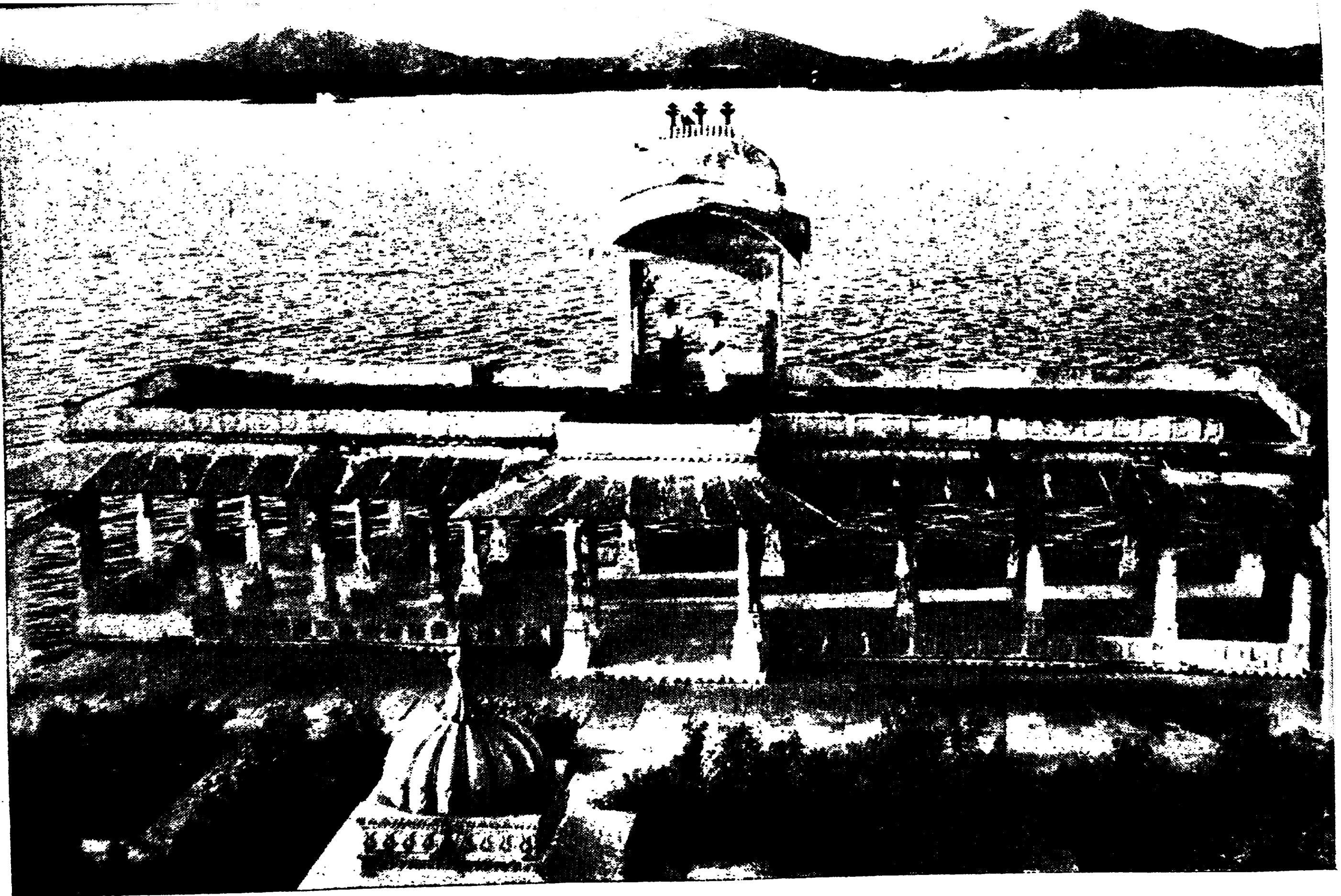
—সুনীলকুমার দে





মন্দির (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া)

—কেশবরঞ্জন সেন



নিচোলা লেক (উদয়পুর) —অমলকৃষ্ণ রায়



'না, না গো না—'

—দেবু দাস

এই বৃদ্ধ পিয়ানো-ঋষির কাছে পিয়ানোর তালিম পাওয়ার সৌভাগ্য ছিল একান্ত দুর্লভ। অসাধারণ সম্ভাবনা যার ভেতরে নিশ্চিত না দেখতেন, এমন কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে তিনি তাঁর শিক্ষাধীনে গ্রহণ করতেন।

বহু সাধ্য-সাধনা করেও যাঁর শিষ্যত্ব পাওয়া যেতো না, সেই ফাদার ফন্‌সিকা নিজেই এগিয়ে এসে ছাত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন প্রাথমিক পিয়ানো-শিক্ষার্থিনী নীলা সেহানকে। নীলার বাজনা শুনেই পাকা জহুরীর মতো তিনি জহর চিনে নিয়েছিলেন, নীলার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ভাবীকালের এক অতুলনীয়া পিয়ানো-শিল্পীকে। পিয়ানোর সেরা ওস্তাদ ফাদার ফন্‌সিকার পরম যত্নে-দেওয়া তালিমে পিয়ানো-বাদনে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল নীলা সেহান, ঈর্ষার পাত্রী হয়ে উঠেছিল অনেক অভিজ্ঞ পিয়ানো বাদক-বাদিকার।

'সী ইজ এ বর্ন পিয়ানিস্ট। (She is a born pianist)' বলেছিলেন ফাদার ফন্‌সিকা। 'আমার পিয়ানো জীবনের সেরা বিস্ময়। পিয়ানো-সঙ্গীতে সহজ প্রতিভা নিয়েই সে জন্মেছে। আমার কাজ শুধু তাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে এগোবার সুবিধা করে দেওয়া।'

এমনি সময় ঐ সাঁতার আর দেহ-সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় কিশোরী নীলা সেহানের জয়-জয়কার। অমন অসাধারণ জয়-জয়কারে মাথা ঠিক রাখা শক্ত কিশোরী বিজয়িনীর আর তার সন্তান-গরবিনী সম্প্রতি পতিহারা জননীর। মহা উদ্বিগ্ন হলেন পিয়ানো-সাধক ফাদার ফন্‌সিকা, শঙ্কান্বিত হয়ে উঠলেন তাঁর জীবনের সেরা ছাত্রীর পিয়ানো-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। দু' নৌকোয় পা রাখলে কোনো নৌকোতেই পারবে না অদ্বিতীয়া হতে, তাই তিনি আল্টিমেটাম বা চরমবাণী শোনালেন নীলা সেহানের মাকে, আর নীলা সেহানকে। অনেক চিন্তা করে একটি নৌকো বর্জন করল নীলা সেহান, রয়ে গেল ফাদার ফন্‌সিকার নৌকোয়—অন্য কোনো দিকে এতটুকুও মন দিয়ে সে তার পিয়ানো-সাধনাকে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। এই সিদ্ধান্তে পরম তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পিয়ানো জগতের গুরুদেব ফাদার ফন্‌সিকা, তাঁর আপন সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলগুলি আপন ঝুলি উজাড় করে ঢেলে দিতে লাগলেন প্রিয়তমা ছাত্রীর ঝুলিতে—এ জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে। প্রকাশ্য বাহবা আর জয়-জয়কারের লোভ কঠোর শাসনে সংযত করে নেপথ্যে একাগ্র সাধনা চলতে লাগল নীলা সেহানের। কয়েক বছর পর এক সন্ধ্যাবেলায়···

'কিন্তু সেই স্মরণীয় সন্ধ্যাবেলার কথা বলবার আগে আপনাকে একটা কথা বলা দরকার, যা বলি নি এবং খুব সম্ভব আপনিও অনুমান করতে পারেন নি। পেরেছেন কি?' বললেন কানাই মিস্তির।

'পারি নি।' বললাম আমি।

'আজ থেকে সাত বছর আগে সাঁতার আর দেহ-সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী নীলা সেহানের মাথায় সমিতির তরফ থেকে বিজয়িনীর মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন··· সমিতির অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক···কানাই মিস্তির।

'আপনি?????'

'হ্যাঁ, ধনপতিবাবু। সাত বছর আগেকার আমি। তার সাত বছর পরের এই আমি সেদিনের ছবিটা আমার মনের চোখ থেকে আজও মুছে ফেলতে পারি নি। মনে হয় এখনো যেন চোখের সামনে জলজল করছে সদ্য জল থেকে উঠে-আসা সাঁতারু ষোড়শী নীলা সেহান, মুখে তার বিজয়িনীর হাসি। ঈশ্বর তাকে কি আশ্চর্য ঐশ্বর্য দিয়েছেন, সে বিষয়ে সচেতন হবার বয়স তার তখনো আসে নি, কিন্তু আসন্ন। আমার পিছনে ক্যামেরা উদ্যত, সদ্য-স্নানোত্থিতা সাঁতারু ভিনাসের ছবি তুলবে বলে; আর সামনে এক আশ্চর্য কুঁড়ি, যে আশ্চর্য ফুল হয়ে ফুটে উঠি-উঠি করছে।'

আমি তার কয়েক বছর পরের সন্ধ্যাবেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, যখন কুঁড়ি আর কুঁড়ি নেই, পরিণত হয়েছে প্রস্ফুটিত কুসুমে।

তাই বললাম: 'তারপর?'

[ক্রমশ।

প্রথম উপলব্ধি

কমলা মুখোপাধ্যায়

শুব্ধ বিশাল বাড়ি;
ফাঁকা ফাঁকা ঘর
পেরিয়ে এলাম তোমার বাইরের ঘরে।
একখানা শূন্য চেয়ার,
বিগতদিনের স্মৃতিভারে মুহ্যমান;
হাসিমুখে সেথা হতে উঠে
সস্নেহ দৃষ্টি মেলে কেউ জিজ্ঞাসা করে না
কুশল সংবাদ।
চারিদিকে শুধু নীরবতা।
বিশাল শূন্যতা,
ছেয়ে ফেলে আমার চারিধার
জানাল
তুমি আর আসবে না দাদু!



হে মহাজীবন

মীরা রায়

তোমরা হয়ত অনেকেই সংবাদপত্রে লক্ষ্য করে থাকবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ-বৈষম্য নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যায় কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো-জাতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। অথচ দীর্ঘদিন যাবৎ এরা শ্বেতাঙ্গদের সমানাধিকার থেকে সর্ববিষয়ে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বর্ণাপরাধে নানাবিধ মানবিক অধিকারচ্যুত হয়ে নিগ্রোদের নিরুপায়ভাবে কাল কাটাতে হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি শ্রেষ্ঠ উন্নত দেশে যদি জনসংখ্যার এক বৃহদংশ এইভাবে অপাংক্তেয়, হেয় হয়ে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত হয়ে পিছিয়ে থাকে—তা হলে সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ স্থায়ী উন্নতি কি করে সম্ভব হতে পারে? এ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির মাঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করে নিজেকে সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে, যদি নিজের মাঝেই এতবড় ফাটল থাকে? এইসব চিন্তা করে মার্কিন রাষ্ট্রনেতারা বর্ণ-বৈষম্য তুলে দিয়ে নিগ্রোদের স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পরলোকগত জন কেনেডির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিগ্রোদের সমানাধিকার দান ও সমান সুযোগ দান করা।

তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট জনসন গত ২রা জুলাই নিগ্রো স্বাধিকার দান বিলটি সমর্থন করে নিগ্রোদের পুরোপুরি সর্ববিষয়ে মুক্তিদান করেছেন। আজকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রগতিশীল যুগে কেনেডি, জনসন ইত্যাদি মানবিকতার মূল্য ও মর্যাদা বুঝে কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যে সমানাধিকার দান স্বীকার করলেন—এই মানবিকতার মূল্য ও মর্যাদাদানে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন ঠিক একশো বছর আগে মানবদরদী আব্রাহাম লিঙ্কন—যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেণ্ট। সে যুগে নিগ্রোদের কেউ মানুষ বলে গণ্য করত না, আফ্রিকা থেকে ওদের ধরে এনে আমেরিকার বিভিন্ন বন্দরে বিক্রি করা হ'ত এবং আজীবন পশুর মত জীবনযাপন করে ওরা শ্বেতাঙ্গ মনিবদের সেবা করত। শ্বেতাঙ্গ মনিবরা সামান্য খাওয়া-পরার বিনিময়ে সারা জীবন ওদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যেত। ক্রমশ দক্ষিণ আমেরিকায় এই ক্রীতদাস-প্রথা একচেটিয়া হয়ে গেল। কিন্তু উত্তরাংশের কিছু লোক এই হীন বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করল এবং ক্রমে এর ব্যাপকতা সারা উত্তরাংশে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু নেতৃত্ব-বিহীন আন্দোলন সমগ্র জাতীয়-জীবনে ফলপ্রসূ হতে পারে নি, যতক্ষণ না রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে আব্রাহাম লিঙ্কন এই অবমানিত, লাঞ্ছিত জাতীয়-জীবনের পুনর্বিন্যাসে অগ্রবর্তী হয়েছিলেন।

আজকের যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোরা যে স্বাধীন মানবিক অধিকার ভোগ করবার সুযোগ পাচ্ছে—এর প্রথম ভিত্তি রচনা করে গিয়েছিলেন মহামতি লিঙ্কন। তদানীন্তন ৪৪ লক্ষ নিগ্রো-জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়টুকু মুছে দেবার জন্যই যেন এই মহান নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। যদিও আইন করে তিনি মুক্তিদান করে গেলেও সে যুগের নিগ্রো সমাজ আর্থিক ও নানাবিধ কারণবশত মুক্তি-লাভ সম্পূর্ণ করতে পারে নি। কিন্তু তাঁর সেই সদিচ্ছার জয়যাত্রার আজ একশো বছর পরে সফল পরিসমাপ্তি ঘটল—নিগ্রো সমাজ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল সর্ববিষয়ে প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসনের 'নিগ্রো মুক্তি সনদ' বিলটি সমর্থনে। যদিও এ-যুগেও এই বর্ণ-বৈষম্য রীতি তুলে দেওয়ার জন্য কয়েক শ্রেণী শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে, তবুও মঙ্গলের ও সদিচ্ছার জয় সর্বকালের ও সর্বযুগের। লিঙ্কন নিজের জীবন দিয়ে এটাই প্রমাণ করে গেছেন এবং সে-যুগে এই বর্ণ-বৈষম্য নীতির তীব্র বিষক্রিয়া তাঁকে অহরহ সহ্য করে যেতে হয়েছে—তার রূপ আরও ভীষণ, আরও ক্রূর।

লিঙ্কন কেনটাকির হাজেনভিল নামক জায়গায় ১৮০৯ খৃস্টাব্দে এক দরিদ্র নিরক্ষর কৃষকের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্ষেত-খামারে কাজ করতেন, মাঝে মাঝে ছুতারের কাজও করতেন ও নৌকা পারাপারের কাজও করতেন। বাল্যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লিঙ্কন অতিবাহিত করতে থাকেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রে অসাধারণ নির্ভীকতা সাধুতা ও দৃঢ় মনোবল থাকায়, তিনি সব প্রতিবন্ধকতাকেই ধৈর্যের সঙ্গে জয় করতে পারতেন। পিতার নিরক্ষতা তাঁর মনকে বিশেষ ব্যথিত করত, এজন্য তাঁর মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা যেন চতুর্গুণ হয়ে জেগে উঠল। বাল্যের এই জ্ঞানস্পৃহাই তাঁকে উত্তরকালে মহাজ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি হতে সাহায্য করেছিল। অতি শৈশব থেকেই তাঁর চরিত্রে গভীর চিন্তানুশীলনতা দেখা গিয়েছিল। বাইরে সকলের সঙ্গেই হাসি, গল্প, কথাবার্তা চালিয়ে যেতেন কিন্তু তাঁর অন্তর্জগতে সদাই কিছু না-কিছু ব্যাপারে গাঢ় চিন্তাশীলতা কাজ করে যেত। মানুষের প্রতি মানুষের

অবিচার-অত্যাচার এই নিদারুণ বৈষম্যরীতি তাঁকে অতি শৈশব থেকেই গভীরভাবে বিচলিত করে তুলতো। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশের ও রাষ্ট্রের অবস্থা যত জানতে ও বুঝতে শিখলেন তত তাঁর দেশ ও দেশবাসীর ওপর প্রীতি ও মমতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগলো। তিনি বুঝলেন মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ একটি জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুর্বল করে তোলে, জাতির উন্নতির পক্ষে এই বৈষম্যদূরীকরণ একান্ত প্রয়োজন। এই সময়ে একটি ঘটনায় তাঁর মনে বর্ণভেদের সমস্যা প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

লিঙ্কন ও তাঁর এক বন্ধু ব্যবসায় উপলক্ষে দক্ষিণে নিউ অর্লিস শহরে মিসিসিপি নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে রাত্রি নেমে আসায় নদীর তীরে নৌকা বেঁধে তাঁরা সে-রাত্রের মত বিশ্রাম করতে গেলেন। মাঝ রাতে যখন তাঁরা ঘুমে অচেতন সাত-আটজন নিগ্রো হঠাৎ তাঁদের আক্রমণ করে নৌকার জিনিসপত্র তছনছ করে নষ্ট করে ফেলল। তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য খানিকক্ষণ খুব ধস্তাধস্তি করে নৌকার কাছি কেটে নৌকা নিয়ে পালিয়ে গেলেন। ঐ মারামারির ফলে লিঙ্কনের চোখের ওপর গভীরভাবে ক্ষত হয়ে গেল—ঐ দাগ তাঁর চোখে আজীবন ছিল।

এই ঘটনার জন্য তিনি আততায়ীদের দায়ী করতে পারলেন না। নৌকায় বসে তিনি ভাবলেন, এই যে শ্বেতাঙ্গদের ওপর নিগ্রোদের আক্রোশ এজন্য তো শ্বেতাঙ্গরাই দায়ী। শ্বেতাঙ্গরা যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত নিগ্রো জাতির মনে এই তীব্র বিদ্বেষ ও হিংসার সৃষ্টি করেছে। আজীবন ওদের পশুর মত ব্যবহার করে ওদের মধ্যে পাশবপ্রবৃত্তিটাই ক্রমশ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। মার্কিন গণজীবনে যদি এইভাবে শ্রেণী-বিদ্বেষের ফাটল ধরে, এই ভেদবুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা যদি জাতিকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে তোলে, তা হলে আমেরিকার রাষ্ট্রজীবনে এর ফল মঙ্গলজনক হবে না। একটি রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে গেলে মানুষে মানুষে সহৃদয়তা থাকা চাই, সহযোগিতা থাকা চাই, সবাই সমষ্টিগতভাবে দেশকে ভালোবাসবে তবেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। রাষ্ট্র গঠনের এই মৌলিক নীতি লিঙ্কন রাজনীতিতে প্রবেশ করবার বহু আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন।

সেদিনের ঐ ঘটনার পর তিনি শ্রেণী-বৈষম্য রহিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং ঐ ঘটনার ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর পরে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে আমেরিকার সর্বাধিক প্রিয় রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তিনি 'দাসত্ব থেকে মুক্তির' ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে প্রায় চুয়াল্লিশ লক্ষ নিগ্রোর মুক্তির অধিকার দান করলেন। এই মুক্তি ঘোষণাটি মার্কিণ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনের মূলসূত্র। ইতিহাসের পটভূমিকায় ও মার্কিন রাষ্ট্রীয় সংবিধানে এটি একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনা।

এই রকমে মানুষকে ভালোবেসে, দেশকে ভালোবেসে, বহু সংগ্রাম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ১৮৬০ খৃস্টাব্দে তিনি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ জননায়ক হিসাবে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রূপে নির্বাচিত হন। দরিদ্র নিরক্ষর কৃষক সন্তান লিঙ্কন প্রমাণ করেছিলেন দৃঢ় চরিত্রবল, ধৈর্য ও অধ্যবসায় থাকলে ও মানুষের প্রীতি অর্জন করতে পারলে দেশ ও দেশের লোক তাঁকে শীর্ষস্থানে সসম্মানে বসিয়ে দেবে। দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির ও শুভ ইচ্ছার জয় অনিবার্য—লিঙ্কনের জীবনই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রেসিডেণ্ট হয়েই তিনি উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলকে সংযুক্ত করতে আত্মনিয়োগ করলেন। এই দুই অঞ্চলে তখনও বর্ণ-বৈষম্যের তীব্র আন্দোলন ও সংঘর্ষ চলছিল। অনেকেই লিঙ্কনের নিগ্রো-সমানাধিকার নীতি মানতে রাজী ছিল না এজন্য বেশ বড় রকমের গৃহযুদ্ধ বেধে গেল। লিঙ্কন শান্তির ও মৈত্রীর বাণী দিয়ে আহ্বান জানালেন জাতির প্রতিটি অন্তরে, জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে জাগ্রত করে তুলতে লাগলেন জাতীয় ঐক্যের অনুভূতি।

তাঁর শুভেচ্ছা ও মানবপ্রীতির কাছে অবশেষে হিংসোন্মাদনার পরাজয় হল দুই অঞ্চল পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনা করল—দেশে অখণ্ড শান্তি ফিরে এল! কিন্তু লিঙ্কনের গোপন শত্রুর দল ঠিকই অপেক্ষায় রইল তাদের প্রতিহিংসা নেবার জন্য। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাস এমনি একটা সুযোগ তাদের এনেছিল। সেদিনে এক নাট্যশালায় জন উইলকস বুথ নামে এক আততায়ীর গুলীতে নিজের জীবন দিয়ে চিরঞ্জীব হয়ে গেলেন আব্রাহাম লিঙ্কন—তাঁর আদর্শ জয়পতাকা উড়িয়ে নিয়ে চলল যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়ে, তাঁর বাণী অমর হয়ে রইল—

'দ্বেষ নেই কারো প্রতি,
আছে শুধু প্রীতি নিরন্তর'।

তাঁর মহাপ্রয়াণের একশো বছর পরে যখন তাঁর স্বপ্ন সফল হল, প্রেসিডেণ্ট জনসন নিগ্রোমুক্তি সনদ স্বীকার করে তাঁর আরব্ধ কাজে পূর্ণাহুতি দিলেন তখন আজকের দিনে সারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদেরও তাঁকে স্মরণ করার যুগোপযোগী শ্রদ্ধা নিবেদনের পুণ্য মুহূর্ত পাওয়া যাবে এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রে লিঙ্কনের চরিত্র ও আদর্শ এক মহাপ্রেরণামূলক কাজ করবে।

আজব শেখা

শ্রীমতী সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

বাপি বড় দুষ্টু,
করে সে যে লাফালাফি
বলে না সে উর্দু॥

বাবা, কাকা, মামা, দাদা
বলতে সে শিখেছে,
গালাগালি, মারামারির
ভক্ত সে হয়েছে॥

দুই হাত গালে দিয়ে
গালটা সে আঁচড়ায়,
ছড়ে গাল লাল হলে,
আছাড় কাছাড় খেয়ে
পাড়াটা মাতায়॥

মামার বাড়িতে এক
কুকুর যে আছে,
ঝন্টু সোনা বলে তার
নাম ডাক আছে॥

বাপি তারে বলে মামা
মানে না সে কিছু,
বলে, নতুন শিখেছি এসে
জার্মানী উর্দু॥

মানুষ-খেকো গাছ

রাণী মজুমদার

সম্প্রতি (৮ই জুলাই, ১৯৬৪) সংবাদপত্রে মানুষ-খেকো গাছের কথা হয়তো অনেকের নজর পড়েছে। নয়াদিল্লী থেকে ইনফা সংবাদটি প্রচার করেছে। তাতে জানা যায়—কাশ্মীর উপত্যকার গভীর অরণ্যে কোথায় নরখাদক বৃক্ষরাজি বিরাজ করছে তার সন্ধানে একদল বিশেষজ্ঞ বেরিয়ে পড়েছেন।

বিদেশী পর্যটকদের অভিজ্ঞতার যে বিবরণ বাইরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—তা থেকেই জানা যায় যে, কাশ্মীর উপত্যকায় এ ধরণের গাছ আছে। দিনের বেলায় এই গাছের সঙ্গে অন্য গাছের পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু অন্ধকার হওয়ামাত্র এরা নতুন বর্ণ-ধারণ করে এবং এক অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কররূপে শাখা-প্রশাখা আন্দোলিত করতে থাকে। কোন মানুষ এদের নিকটবর্তী হওয়ামাত্র এরা তাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে এবং সবটুকু রক্ত শুষে নেয়।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে যে-সকল ইয়োরোপীয় কাশ্মীর উপত্যকায় এসেছিলেন—তাঁরা তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে এই ধরণের গাছের কথা উল্লেখ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আফ্রিকার লোকবসতিহীন অঞ্চলেও এই ধরণের গাছ আছে।

এতদিন জানা ছিল একমাত্র আফ্রিকায় নাকি মানুষ-খেকো গাছ আছে। এখন আবার জানা গেল—শুধু আফ্রিকায় নয়—আমাদের দেশের কাশ্মীরেও নাকি নরখাদক গাছ জন্মায়। কিন্তু আফ্রিকার পূর্বদিকে অবস্থিত ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মানুষ-খেকো গাছের কাহিনী প্রকাশ হবার পর যে সব বৈজ্ঞানিক অভিযান সেখানে করা হয়—তাতে কিন্তু মানুষ-খেকো গাছের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সুতরাং মানুষ-খেকো গাছ সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। অবশ্য পৃথিবীর নানা দেশে এমন অনেক গাছ আছে—যারা তাদের দেহপুষ্টির জন্য কীট-পতঙ্গ, ছোট ছোট পাখি, টিকটিকি প্রভৃতি শিকার করে খায়। এদের বলা হয় শিকারী গাছ এবং শিকার ধরবার কৌশলও বিচিত্র, ভারতবর্ষেও কয়েক রকমের শিকারী গাছ আছে।

১৮৫১ সালে ক্যাপ্টেন আর্করাইট 'মৃত্যুর দ্বীপ' পরিদর্শন করেন। 'মৃত্যুর দ্বীপ' চলতি নাম হলেও—তার আসল নাম হল বাম্বুর দ্বীপ এবং দ্বীপটি প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। তিনি এই দ্বীপের একরকম ফুলের কথা বলেছেন। সেই ফুল নাকি বিরাট এবং তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে একটা মানুষ ঢুকতে পারে। ফুলের ভিতরের গর্তটা ঠিক গুহার মত এবং তার রঙও বাহারী। ফুলের সুবাসও মনমাতানো। কেউ যদি সুবাস ও চটকদার রঙের লোভে ফুলের গর্তের ভিতর প্রবেশ করে—তবে আর রক্ষা নেই। সুগন্ধের প্রভাবে সে সেখানে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পাপড়িগুলি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। শিকারকে দেহসাৎ করবার পর আবার পাপড়িগুলি খুলে যায়—নতুন শিকারের আশায়।

আমেরিকার এক প্রকৃতি-বিজ্ঞানী মিঃ ডানস্টান নিকারাগুয়ার জলাভূমিতে তাঁর দেখা একরকম শিকারী গাছের বিবরণ দিয়েছেন—যার দ্বারা তাঁর কুকুরটা আক্রান্ত হয়। মেক্সিকোর সিয়েরা ম্যাডার অঞ্চলের 'সাপ-গাছ' নামক শিকারী গাছের কথাও এক সময় শোনা গিয়েছিল। এই গাছের অনেকগুলি সর্পাকৃতির ডাল বের হয় এবং ডালগুলি ভীষণ স্পর্শকাতর—ছোট পাখি বা অন্য কোন প্রাণী এই ডালের উপর বসলে তার আর রেহাই নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে শিকারকে ডালের সাহায্যে বেঁধে গাছের ভিতর টেনে নিয়ে হজম করে ফেলে। এক পর্যটক নাকি হঠাৎ হাত দিয়ে সাপ-গাছের ডাল ধরেছিলেন। ডালটা তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতটা জড়িয়ে ধরে এবং তিনি খুব মেহনৎ করে হাতটাকে ডালের কবল থেকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। এই কাহিনী খুব চাঞ্চল্যকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এর সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে আবার সন্দেহ পোষণ করেন।

সত্য হোক আর মিথ্যা হোক—ম্যাডাগাস্কারের মানুষ-খেকো গাছ সম্বন্ধে ডাঃ কার্ল লাইকের নিজের দেখা বিবরণীই সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর। ১৮৭৮ সালে তিনি এই গাছের মানুষ খাওয়া প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী যেমন চাঞ্চল্যকর—তেমনি অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়কর। সে সময়ে নানা দেশের বিভিন্ন কাগজে এই বিবরণ প্রকাশিত হয়। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র দারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। এমন কি ১৯২০ সালেও কোন কোন সংবাদপত্রে ঐ বিবরণ পুনরায় ছাপা হয়েছে।

ডাঃ লাইক মানুষ-খেকো গাছের যে বর্ণনা দিয়েছেন—তাতে জানা যায়—প্রকাণ্ড একটা আনারস গাছের মত দেখতে হয়—এই মানুষ-খেকো গাছ। গাছের কাণ্ডটা ১০ ফুট উঁচু বড় একটা পিপের মত—মাথার দিক থেকে আটটা চ্যাপ্টা বড় পাতা ঝুলে আছে। সেগুলি লম্বায় ও চওড়ায় যথাক্রমে ১২ ফুট ও ১ ফুট এবং ক্রমশ সরু হয়ে সূচের মত হয়েছে। পাতাগুলিতে আছে অনেক বিষাক্ত কাঁটা। কাঁটাগুলি দেখতে ভয়ঙ্কর।

সেখানকার বাসিন্দা উপজাতিরা মানুষ-খেকো গাছকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো আর তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাকে মানুষ উৎসর্গ করতো। একে বলা হতো নরবলি প্রথা, এই অনুষ্ঠানে খুব ধুমধাম হতো।

একদিন রাত্রিতে এ রকম একটি নরবলির অনুষ্ঠানে স্থানীয় উপজাতিরা ডাঃ লাইককে নিয়ে যায়, সেদিন একটি যুবতীকে গাছটার নিকট নিবেদন করা হয়। কয়েকজন যুবতীটিকে ধরে নিয়ে গাছটার উপর বসিয়ে—সেখানে সঞ্চিত একরকম রস জোর করে মেয়েটিকে খাওয়ায়, ডাঃ লাইকের ধারণা হয়—মেয়েটি বোধ হয় গাছ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু তার বদলে যা ঘটলো—তা দেখে ডাঃ লাইকের আক্কেলগুড়ুম, যে দৃশ্য তিনি দেখেন—তা জীবনে ভোলবার নয়। ভয়ে আর বিস্ময়ে তিনি যেন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

খানিকক্ষণ আগেও যে গাছকে একটা নির্জীব বলে মনে হয়েছিল—তা যেন কোন শক্তির প্রভাবে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলো। ঝুলন্ত পাতাগুলি মেয়েটির সর্বশরীর জড়িয়ে ধরে শক্ত করে। মেয়েটি ছটফট করতে থাকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভীষণ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। শিকারকে কাহিল করবার জন্য পাতাগুলি চাপ দিতে থাকে প্রচণ্ডভাবে, ফলে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত কাঁটাগুলি বিঁধে যায় তার সর্বাঙ্গে। তারপর সেই ভীষণ দৃশ্য! এই দৃশ্য দেখে ডাঃ লাইকের দেহের সব রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে গেল। পাতাগুলি ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শিকারকে একেবারে মুড়ে অদৃশ্য করে ফেলে—অর্থাৎ শিকারকে সে পুরোপুরিই আত্মসাৎ করে।

গল্প হলেও সত্যি

ছবি বসু

একটি বারো-তেরো বছরের স্কুলের ছেলে। ছেলেটির পড়াশুনোয় খুব মনোযোগ। একবার তার কঠিন অসুখ হ'ল। চিকিৎসকের আপ্রাণ চেষ্টায় সে ভালো হয়ে উঠল। কিন্তু শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে, সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না। চিকিৎসকের নির্দেশে তাকে পড়াশুনো করতে দেওয়া হল না। ছেলেটির বাবাও তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। ছেলেটি কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাঁপিয়ে পড়ল। বাবাকে লুকিয়ে পাঠ্যবই পড়তে লাগল। কিন্তু তিনি একদিন সব জানতে পেরে ছেলেটির ঘরের সমস্ত বই-খাতা পত্তর সরিয়ে ফেললেন। এমন কি একটুকরো খড়িও সে ঘরে রাখতে দিলেন না। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন যাতে সে কোনও উপায়ে পড়াশুনো না করতে পারে। অবশ্য এ-সবই তিনি করেছিলেন তার স্বাস্থ্যের জন্য। দুর্বল শরীরে পড়াশুনো করলে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হতে পারে এই ভয়ে।

একদিন ছেলেটির বাবা রুদ্ধঘরে ছেলেটি কি করছে দেখবার জন্য জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন হাতের কাছে আর কোনও কিছু না পেয়ে ছেলেটি একটুকরো কয়লার সাহায্যে মেঝের ওপর জ্যামিতির কঠিন কঠিন প্রশ্নের সমাধান করছে।

দেখছ তো পড়াশুনোয় ছেলেটির কি আগ্রহ! আচ্ছা, বলতো এই ছেলেটি কে?

ইনি বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বৃষ্টি পড়ে

গৌর মোদক

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
ছোট্ট মেয়ের পায়ের নূপুর।
গাছের পাতায়, দূর্বাদলে,
নূপুর সে তার বাজিয়ে চলে।
সন্ধ্যা-দুপুর সকাল-বিকেল,
বৃষ্টি ফোঁটা পড়ছে অঢেল।
জলে জলে ভরিয়ে দিলে,
ধানের মাঠে খালে বিলে।
রাতে-দিনে ব্যাঙগুলো সব,
লাগিয়ে দিলে মহোৎসব।
আর বর্ষারাতে ঘরের কোণে,
ছেলেরা সব গল্প শোনে।



স্যার অশোককুমার রায়

[ভারতের ভূতপূর্ব আইনসচিব]

বিগত যুগে আমাদের সমাজজীবনে শীর্ষস্থান অধিরোহণের গৌরব যাঁদের করায়ত্ত স্বর্গত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ সেই তালিকায় একটি বিশেষ নাম। কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এবং তদানীন্তন কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক স্যার চন্দ্রমাধবের স্বনামধন্য এবং সুযোগ্য দৌহিত্র স্যার অশোককুমার রায়। কৃতী ব্যারিস্টাররূপে এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল, হাইকোর্টের বিচারপতি ও কেন্দ্রীয় আইনসচিব হিসাবে তিনি যে অভূতপূর্ব শক্তিমত্তা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষ স্বীকৃতির দাবীদার।

শ্রীপুরের রায়বংশের জগদীশচন্দ্র রায় এবং স্যার চন্দ্রমাধবের কনিষ্ঠা কন্যা নলিনীবালা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র অশোককুমার। স্যার চন্দ্রমাধবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও টাকীর সুবিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের অক্ষয়কুমার রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী ষোড়শীবালা দেবী ভগ্নীপুত্র অশোককুমারকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন, সেই সামাজিক স্বীকৃতিতে অশোককুমার, অক্ষয়কুমার ও ষোড়শীবালার পুত্র এবং পিতৃপরিচয়ে উভয় দিক দিয়েই সমান উল্লেখের অধিকারী।

গাণিতিক বিচারে অশোককুমারের বয়েস আজ আটাত্তর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আগামী ৯ই সেপ্টেম্বরে অশীতিবর্ষে তিনি পদার্পণ করবেন।

বাল্যকালীন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে অশোককুমার ভর্তি হলেন ডাফটন কলেজে। এফ-এ, বি-এ পরীক্ষাগুলিতে সসম্মানে হয়ে গেলেন উত্তীর্ণ। ১৯০৬ সালে ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে। বয়েস তখন মাত্র কুড়ি। এম-এ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের পর রিপন কলেজে যোগ দিলেন আইন অধ্যয়নের জন্যে। ১৯০৭ সালে আইন পরীক্ষাতেও তিনি হাত মেলালেন সফলতার সঙ্গে। হাইকোর্টের উকীলদের তালিকায় তাঁর নামটি যুক্ত হল ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে।

এ্যাডভোকেট অশোককুমার রায় ১৯১০ সালের মার্চ মাসে বিদেশযাত্রা করলেন ব্যারিস্টারী পড়ার সঙ্কল্প নিয়ে। ভর্তি হলেন মিডল টেম্পল-এ। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে সফলতা আবার তাঁর হাতে হাত রাখল।

অতি অল্পকালের মধ্যে ব্যারিস্টার হিসাবে অশোককুমারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে, দিক থেকে দিগন্তরে ব্যাপ্ত প্রসারিত হয়ে গেল আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর প্রতিভার পরিচয়। উদীয়মান ব্যারিস্টার পরিণত হলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টারে।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অশোককুমার নিযুক্ত হলেন হাইকোর্টের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল। ১৯৩১ সালের জুলাই থেকে নভেম্বার পর্যন্ত এবং ১৯৩২ সালের ২৯এ এপ্রিল থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যথাক্রমে এ্যাডভোকেট জেনারেল ও বিচারপতিপদে অস্থায়িভাবে কার্য করেন। আবার তিনি এ্যাডভোকেট-জেনারেলের কার্যভার পালন করেন ১৯৩২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৩ সালের ২০এ জানুয়ারী এবং ১৯৩৩ সালের এপ্রিল থেকে অগাস্ট পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৩৩ সালের ২৪এ নভেম্বর থেকে ১৯৩৪ সালের মে পর্যন্ত পুনরায় তিনি অস্থায়িভাবে বিচারপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। স্থায়িভাবে তিনি এ্যাডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত হলেন ১৯৩৪ সালের মে মাসে। ১৯৩৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি আসাম প্রদেশেরও এ্যাডভোকেট-জেনারেল ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এ্যাডভোকেট-জেনারেল হিসাবে অশোককুমারের পূর্বসূরী ছিলেন ভারতীয় আইনজগতের এক অমলিন নাম—স্বর্গীয় স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার।

১৯৩৭ সালে অশোককুমার 'নাইট' উপাধিলাভ করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত স্যার অশোক বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের সদস্য (আইন) ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসচিব হিসাবেও তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা সুবিদিত।

স্যার অশোক যে-বছর হাইকোর্টের উকীল শ্রেণভুক্ত হন, সেই বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালে স্বর্গত তারাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর চতুর্থী কন্যা স্বর্গতা চারুহাসিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পঞ্চাশ বছর বিবাহিতজীবন যাপনের পর ১৯৬৩ সালে চারুহাসিনী স্বর্গলাভ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, একষট্টি জন বাঙালী (অমুসলমান) বৃটিশ সরকারের দ্বারা 'নাইট' উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন আজ জীবিত। এই পাঁচজনের মধ্যে স্যার অশোকই আজ জ্যেষ্ঠতম। অন্য চারজনের নাম বয়ঃক্রমানুসারে বর্তমান এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার সুধাংশুমোহন বসু, স্যার ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এবং স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পশ্চিম-জার্মানীতে ভারতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত]

মাত্র ক'দিন আগে বন-এ যিনি ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন, ভারত আর পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্র দৃঢ় করবার দায়িত্ব নিলেন বাহান্ন বছরের প্রবীণ বাঙালী আই-সি-এস শ্রীশিশিরকুমার বন্দোপাধ্যায় এককথায় প্রথম আলাপেই মনের গভীরে এক সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখার শক্তিসম্পন্ন একজন স্মরণীয় মানুষ, একজন লব্ধকীর্তি বাঙালী।

জন্ম ১৯১৩ সনের ২১শে অক্টোবর। জন্মস্থান—উত্তরপাড়া, হুগলী। বাবা ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। কানপুর ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের অধ্যাপক। ছেলে শিশিরকুমারের জন্ম মামার বাড়িতে। মামা শ্রীবলাইলাল মুখোপাধ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী। সাতবছর বয়স পর্যন্ত কানপুরে কাটিয়ে বাবার সঙ্গে দেরাদুনে চলে যেতে হয়। বাবা তখন দেরাদুন ডি এ ভি কলেজের উপাধ্যক্ষ পরে তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শিশিরকুমার সেখানেই মানুষ।

কৃতী ছাত্র, হাই স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম-এর ছাত্র। পরীক্ষায় বসতে হয় নি। তার আগেই ১৯৩৫ সনে আই সি এস-এ প্রথম হয়ে তিন বছরের জন্য অক্সফোর্ড নিউ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সেই সুযোগে রাশিয়া, পোলাণ্ড ও পর্তুগাল ছাড়া ইওরোপের সব ক'টি দেশ ঘুরে দেখেন।

১৯৩৭ সনে ভারতে ফিরে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে পাকাপাকিভাবে যোগ দেন। প্রথমে তাঁকে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে (এখনকার মধ্যপ্রদেশ) এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়। পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বিভিন্ন জেলার শাসনকার্যে দক্ষতার পরিচয় দেন। তাই তাঁকে নাগপুরে সেক্রেটারিয়েটে নিয়ে আসা হয় ১৯৪৬ সনে।

১৯৪৭ সনে আমাদের স্বাধীনতা লাভ। জাতীয় সরকার নতুন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে 'ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস' সৃষ্টি করেন। তার সঙ্গে শুরু থেকেই শিশিরকুমার জড়িত রয়েছেন। ঐ বছরই তাঁকে তেহরানে ভারতের নতুন দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারী করে পাঠান হয়। কার্যত তিনিই দূতাবাসের কাজ আরম্ভ করেন। এক বছর পর তিনি চার্জ দ্য এফেয়ার্সের পদে উন্নীত হন।

১৯৪৯ সনের কথা। নেহরুর নেতৃত্বে ভারত ইতোমধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। দুই বিবদমান শক্তি-শিবিরে বিভক্ত বিশ্ব ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভারত এর আওতামুক্ত একটি জোট নিরপেক্ষ শক্তিগোষ্ঠী গঠনের কাজে নেমে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে তার কম্বুকণ্ঠ এশিয়া ও আফ্রিকার শোষিত দেশের মানুষকে নতুন শক্তি ও নতুন চেতনায় জাগ্রত করেছে. পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর অত্যাচার চলেছে। লৌহ-মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের হুমকীতে ভীত লিয়াকৎ আলী নয়াদিল্লীতে ছুটে এসেছেন, ফল—নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি। প্রতিবাদে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ।

অথচ পররাষ্ট্র দপ্তরের বাইরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ লোকের অভাব, ডাক পড়লো শিশিরকুমারের, শক্ত হাতে ধরলেন হাল। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি কার্যকরী করার দায়-দায়িত্ব তাঁরই। ১৯৫১ থেকে '৫৩ পর্যন্ত লাহোরে ভারতের ডেপুটী হাই কমিশনার—এই সময় ১৯৫২ সনে 'মিনিস্টারের' মর্যাদায় তাঁকে উন্নীত করা হলো। ওখান থেকে সানফ্রান্সিস্কোতে ভারতের কন্সাল জেনারেল হিসেবে পশ্চিমাঞ্চলে সারা মার্কিন মুল্লুকের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। '৫৫ সনে রাষ্ট্রসংঘের দশম বার্ষিকী সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের তিনি একজন। ঐ বছর বৃটিশ ও ফরাসী টোগোল্যাণ্ড ও রাষ্ট্রসংঘ ভিজিটিং মিশনের চেয়ারম্যানরূপে তিনি পশ্চিম আফ্রিকা সফরে যান. এই মিশনের রিপোর্টকে ভিত্তি করে এদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, '৫৬ সনে তাঁকে ভারতীয় লিগেশানের মিনিস্টার করা হয়, পরে যখন ঐ লিগেশানকে দূতাবাসের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়, শিশিরকুমার সেখানকার প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন।



শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৮ সনে সিরিয়া সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁকে মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার করে পাঠান হয়, '৬০সনে আবার দিল্লীর ডাক। বছরখানেক পররাষ্ট্র দপ্তরের জয়েণ্ট সেক্রেটারীর কাজ করার পর ভারত সরকারের চীফ অব প্রোটোকল নিযুক্ত হন।

এই '৬১ থেকে '৬৪ সনের জুলাই পর্যন্ত দিনগুলি শুধু স্মরণীয় নয় বরণীয়ও বটে। তাবৎ বিশ্বের বহু রাষ্ট্রনায়ক জ্ঞানী গুণী মনীষীকে তিনি আতিথেয়তার ঐতিহ্যবিশিষ্ট ভারতের প্রতিনিধিরূপে স্বাগত জানিয়েছেন, অভ্যর্থনায় আপ্যায়নে তাঁদের হৃদয় জয় করেছেন, এই সময়ের মধ্যে যে ২৮০ জন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে তিনি মিলতে পেরেছিলেন তার মধ্যে রাশিয়ার তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মি: ব্রেজনেভ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসেস কেনেডী, পশ্চিম-জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট লুবকে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী মি: ইকেদা ও মালয়ের রাজারাণীর নাম করা যেতে পারে।

গত জুলাই মাসে বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস-গুলি পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয় এবং ৯৩টি দূতাবাসের মধ্যে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ১২টি দূতাবাসের কাজ পরিদর্শন করেছেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক বন রওনা হয়ে যাবেন। উন্নয়নকামী ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইউরোপের সব চেয়ে বড় দেশ পশ্চিম জার্মানীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যাবার আগে তাঁকে সারা ভারত ঘুরে সব ক'টি ভারত-জার্মান শিল্পোদ্যোগ ও নানান ধরণের সংস্থা ঘুরে দেখতে হচ্ছে।

ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ, দক্ষ প্রশাসক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বাইরের নিয়মতান্ত্রিক আবরণের ভেতরে একটি আরণ্যক মন লুকিয়ে আছে। তাই খেয়ালী প্রকৃতি তাঁর মনকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি গহন অরণ্যের সবুজিমার মধ্যে ঢুকে পড়ে অনিয়মের রাজত্বে কিছুদিন কাটিয়ে দিয়ে আসেন। তিনি চিত্ররসিকও, তাই তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় নানান দেশের খ্যাতিমান চিত্রকরদের চিত্র। এ ছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহও তাঁর দেখবার মতো।

শ্রীভবেশচন্দ্র নাগ

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক]

বর্তমান বাঙলার সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা শুধু ভারতীয় নয় আন্তর্জাতিক পটভূমির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র নাগ তাঁদেরই একজন।

এই স্বনামধন্য প্রবীণ সাংবাদিকের আদি নিবাস শ্রীহট্টের অন্তর্গত বানিয়াচোঙ। পিতৃদেব স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র নাগ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ভবেশচন্দ্র ভারতচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। প্রথম বিদ্যারম্ভ গ্রামেই শুরু হয়। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তনের অন্তর্ভুক্ত কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ছাত্র হিসাবে ইংরাজীতে অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ভবেশচন্দ্র। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তখন চান্সেলার ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং অধ্যক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র।

১৯২৬ সালের শেষ ভাগ থেকে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা। স্বনামধন্য পি কে চক্রবর্তী (প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী) সম্পাদিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের হাতেখড়ি। কয়েক বছর পর মজিবুর রহমানের 'দ্য মুসলমানস' যখন দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হল, ভবেশচন্দ্র সেদিন নিযুক্ত হলেন ঐ পত্রিকার সংবাদ-সম্পাদক। তারপর যোগ দিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক এস সদানন্দের 'ফ্রি প্রেস জার্নাল'-এ। এই সময়ে তিনি সান্নিধ্য লাভ করেন কে রাম রাওয়ের।

ভবেশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে যাঁদের স্বাক্ষর মালিন্যমুক্ত দীপ্তিতে চিরভাস্বর—রাম রাও তাঁদেরই একজন। রাম রাও তাঁর মনের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছেন। সাংবাদিকতা সম্বন্ধে বহু শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন রাম রাওয়ের কাছে। বোম্বাইয়ে বছরখানেক থাকার পর কলকাতায় ফিরে এসে যুক্ত হলেন 'লিবার্টি' পত্রিকার সঙ্গে। লিবার্টি পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর শীর্ষে সেদিন সমাসীন ছিলেন স্বর্গীয় ডা: বিধানচন্দ্র রায়। লিবার্টির পর শ্রীযুক্ত নাগকে কিছুকালের জন্য দেখা গেল ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে। এই পত্রিকাটি তখন আত্ম-প্রকাশ করে চলেছে শ্রীযুক্ত অমল হোমের সম্পাদনায়। তারপর মহম্মদী সংবাদগোষ্ঠীর বিজ্ঞাপন-সচিবের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন কিছুকাল।

১৯৩৬ সালে সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি যোগ দেন অমৃতবাজার পত্রিকায়। ১৯৩৯ সালে তিনি এলেন তাঁর



শ্রীভবেশচন্দ্র নাগ

বর্তমান কর্মস্থানে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে। সহ-সম্পাদকরূপে আজ সেখানে তিনি সসম্মানে সমাসীন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসব ও ভগবান রামকৃষ্ণের শতাব্দী উৎসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সমগ্র প্রচার বিভাগের ভার গ্রহণ করেন ভবেশচন্দ্র।

১৯৫৭ সালে ভবেশচন্দ্র প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশ তিনি একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছেন। সর্বত্র তিনি লাভ করেছেন যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর। যে সময়ে ইনি ব্লুমিংটনে ইণ্ডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ইণ্টারন্যাশনাল সেমিনার অব জার্নালিসমে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন, সে সময় আমেরিকার দু'টি কাগজের সঙ্গে তিনি অতিথি-সম্পাদকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাগজ দু'টির নাম—ইভনিং ডেলি এবং সানডে বুলেটিন (ফিলাডেলফিয়া থেকে প্রকাশিত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত সান্ধ্য-দৈনিক) এবং বিখ্যাত পত্রিকা 'অরেগোনিয়ান'। অধুনালুপ্ত ইঙ্গ-ফরাসী পত্রিকা 'L' Amicale'-এর অবৈতনিক সম্পাদকের আসনেও তিনি কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। জার্মান ও ফরাসী ভাষায় কথোপকথনেও তিনি অপারগ নন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তিনি আমেরিকান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্স প্রমুখ বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানাদিতে নিরস্ত্রীকরণ ও ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, সুইডেন, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইস্রায়েল প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন সংবাদ পত্রাদিতে নিয়মিতভাবে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারগর্ভ চিন্তাশীল রচনাদি লিখে থাকেন।

ইণ্ডিয়া ফেডারেশান অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট-এর সংগঠনে তাঁর বিরাট ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশানের সচিবের পদও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে।

শ্রীমতী বিজলী ঘোষ

[প্রখ্যাতনাম্নী সমাজসেবিকা]

নারীজীবনের তিনটি স্তর—নন্দিনী, ঘরণী, জননী। তাই নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে, তাই বহু হতভাগ্যের জীবনে মাতৃত্বের মহিমাময়ী মূর্তিতে যাঁরা দেখা দেন তাদের তাপদগ্ধ জীবনে শান্তির প্রলেপ দিতে—তিনি নিঃসন্দেহে অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও বিরাট স্বীকৃতির অধিকারিণী—এই তালিকায় শ্রীমতী বিজলী ঘোষ এক অত্যুজ্জ্বল নাম।

বিখ্যাত বংশের কন্যা, সুখ্যাত বংশের বধূ ও প্রখ্যাত বংশের দৌহিত্রী শ্রীমতী ঘোষের জন্ম ১৯১৮ সালের ২৬এ এপ্রিল। পিতামহ স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু। পিতৃদেব বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও আই টি ট্রাইব্যুনালের সভাপতি অনিলপ্রকাশ বসু। মাতামহ ছিলেন কলকাতার প্রধান বিচারাধিকরণের অন্যতম বিচারক স্বর্গত স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ।

ডাফ স্কুলে শিক্ষালাভ করতে থাকেন শ্রীমতী ঘোষ। সেণ্ট মার্গারেট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩২ সালে। বেথুন কলেজ থেকে পাশ করলেন বি-এ (১৯৩৬) অনার্স ছিল গণিতশাস্ত্রে। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে অনার্স পরিত্যাগ করেছিলেন। পাশ করলেন ডিস্টিংসনসহ। বিজলী ঘোষের সমগ্র ছাত্রজীবন ছিল এককথায় কৃতিত্বের রশ্মিতে উজ্জ্বল। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি লাভ করেছেন স্কলারশিপ। 'স্পোকেন ইংলিশ'-এ ডিপ্লোমা লাভের ক্ষেত্রে তিনি অধিকার করেছেন প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান।

১৯৪৭ সালে কমিশনার হিসাবে নিজেকে যুক্ত করলেন ভারত স্কাউটস এবং গাইডের সঙ্গে বর্তমানে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেট কমিশনাররূপে জড়িতা। রেড ক্রসের এ্যাডাল্ট এডুকেশান সেণ্টারের সঙ্গেও তিনি সংযুক্তা। সেণ্ট জনস এ্যাম্বুলেন্স থেকে শিক্ষণ সম্বন্ধীয় পাঠনির্দেশ নেন প্রাথমিক চিকিৎসা ও গৃহ-শুশ্রূষা সম্বন্ধে। পরে এ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে থাকেন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে।

এ আই ডব্লিউ সি, ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ উওমেন, ক্যালকাটা অরফ্যানেজ, সরোজনলিনী নারীশিক্ষা-সমিতি, ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল, লাইট হাউস ফর দ্য ব্লাইণ্ড, বোধিপীঠ প্রমুখ জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। পুরুলিয়া ও কালিম্পঙের



শ্রীমতী বিজলী ঘোষ

কয়েকটি লোকহিতকর সংস্থার সঙ্গেও ইনি জড়িতা। ইউনিভার্সিটি উওমেনস এ্যাসোসিয়েশান অফ ইণ্ডিয়ার সচিবের আসনও তাঁর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে।

খ্যাতনামা এ্যাটর্নী শ্রীযুক্ত শোভেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে ইনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধা হন ১৯৩৭ সালে। এঁদের একমাত্র সন্তান প্রতীপ ঘোষ এক অসাধারণ সম্ভাবনাময় তরুণ। এম টেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ফেলোশিপ নিয়ে ইনি বিদেশযাত্রা করেছেন, বর্তমানে ডেট্রয়টে ইনি উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেছেন।

১৯৫১ সালে শ্রীমতী ঘোষ সমগ্র কন্টিনেন্ট পরিভ্রমণ করেন।

পৃথিবীর মানুষ হয়ে জন্মেও সুখ যাদের জীবনে অনুপস্থিত, সম্ভাবনার পথ যাদের কাছে চিররুদ্ধ, আনন্দ যাদের জীবনে নিছক একটি আভিধানিক শব্দ মাত্র—তাদের পরিচর্যায় লিপ্ত থাকার মধ্যেই অপরিসীম আনন্দের রসাস্বাদন করেন শ্রীমতী ঘোষ। এই মনোভাবের মধ্যে দিয়েই তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও অফুরন্ত দরদভরা মনের একটি নিখুঁত আলেখ্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

দু'টি পুরস্কারপ্রাপ্ত দেওয়ালচিত্র

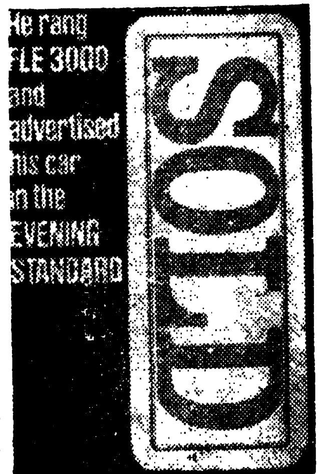
পোস্টার বা দেওয়ালচিত্র আধুনিক প্রচার-বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আমাদের দেশেও আজকাল এই পোস্টার বা দেওয়ালচিত্রের প্রাচুর্যে শহর, শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে বহু দর্শনীয় দেওয়াল আর দেখতে পাওয়া যায় না বললেই হয়—অর্থাৎ বলা যায় পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। এই দেওয়ালচিত্রে শ্রেণীবিভাগে দেখা যায় রঙ্গমঞ্চ ছায়াচিত্র সরকারী বিজ্ঞাপন, সিগারেট, ওষুধপত্র প্রভৃতির প্রচার মাধ্যম হিসাবে অনেকটা স্থান দখল করে আছে। সারা দুনিয়ার শিল্পিমহল পোস্টারচিত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কত না অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে চলেছেন। বিস্মিত হতে হয় একদা খ্যাতিমান ও প্রতিভাধর ফরাসী-শিল্পী স্বর্গত তুলো লুত্রেককে নৃত্য প্রদর্শনীর জন্য পোস্টার আঁকতে হয়েছে। আমাদের সুপরিচিত বাঙালী-শিল্পী শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি সি নামে সমধিক পরিচিত) কর্তৃক অঙ্কিত পোস্টার আমরা আজও ভুলতে পারি না। শিল্পস্রষ্টা শ্রীঅন্নদা মুন্সী, শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত, শ্রী ও সি গাঙ্গুলী ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর প্রচারচিত্রে শিল্পময় অবদান আমাদের স্মরণ করতে হবে। এই রচনার সঙ্গে দু'টি পুরস্কারপ্রাপ্ত ইংরাজী পোস্টারের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

● সাবধান!! সিগারেট খেলে ফুসফুসে—



ক্যান্সারে মৃত্যুসংক্রান্ত প্রকাশিত পোস্টারটি শ্রীরেজিনাল্ড মাউণ্ট ও শ্রীমতী এলিন ইভান্স কর্তৃক অঙ্কিত ও পরিকল্পিত। এই দেওয়ালচিত্রটির মূল আয়তন ডবল ক্রাউন। বিখ্যাত মুদ্রক স্যার জোসেফ কসর্টন এ্যাণ্ড সান্স লিঃ কর্তৃক মুদ্রিত। অন্য দেওয়াল চিত্রটি বিখ্যাত সংবাদপত্র ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড কর্তৃক প্রচারিত। এই চিত্রের বক্তব্য ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেই মোটর-গাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। এই চিত্রটি উক্ত পত্রিকার পক্ষ থেকে ফ্লেচার—ফরবেস গিল লিঃ কর্তৃক পরিকল্পিত। বিদেশী পত্রিকার মতে প্রথম চিত্রটি নাকি একটি অত্যন্ত সফল দেওয়ালচিত্র—যেটি অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণকারী এবং ভীতিপ্রদ। মূল চিত্রে পোড়া সিগারেটের নিভন্ত আগুনের রঙ লাল দেওয়া হয়েছে। অন্য চিত্রটি সম্পর্কে প্রকাশিত মতামত 'একটি অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ দেওয়ালচিত্র।' এই সঙ্গে প্রকাশিত চিত্র দুইটি প্রিন্টিং ট্রেডস জার্ণালের সৌজন্যে।

ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডে বিজ্ঞাপন দিলেই গাড়ি বিক্রি হয়ে যায়।





(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

ইন্দ্রনাথের বেটাল পদক্ষেপ, বিস্রস্ত বেশবাস আর বিশৃঙ্খল চেহারার দিকে দু'চোখ পড়তেই চোখ বন্ধ করে—

'আকাশভরা সূর্য তারা,
বিশ্বভরা প্রাণ—'

মনে মনে আউড়ে যেন শিবানী জর্জকোর্ট রোডের এই বাড়িটা থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে বিশ্বের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করে নিল নিজেকে।

ফের ছাদে উঠে এলো সে। এখন নীচে নামতে গেলে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। হয়তো সেটা এড়াতে। হয়তো তাও ঠিক নয়। ফের ছাদে উঠে এলো সে, হয়তো মাতাল বিস্রস্ত ইন্দ্রনাথকে দেখে মনটা ওর ফের ক্লেদাক্ত হয়ে উঠতে চাচ্ছিল তা থেকে মুক্ত হতে।

ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বার বার বলতে লাগল, অপূর্ব লাগছে! চমৎকার লাগছে! এই আকাশ, এই বাতাস, এই আলো—এই টবে টবে আন্দোলিত রং-বেরং-এর ফুল, ফুলের মিষ্টিগন্ধ চমৎকার লাগছে সব—

'ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে'—

সত্যি মন মেতে উঠল শিবানীর। ঝকঝকে চাঁদের আলোভরা আকাশের দিকে চকচকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুরের আর ছন্দের অবগাহনে যেন নিজেকে স্নান করাতে লাগল শিবানী—

'আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥
ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ—
আমার লাগল না মন লাগল না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥
হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন,
বনের পথে আঁধার-আলোর আলিঙ্গন—
আমার লাগল রে মন লাগল রে,
তাই এই গানেতেই দিন কাটে এই খেলার ছলে—
শ্যামল মাটির ধরাতলে—'

কে ইন্দ্রনাথ? ওর ধরাতলের এই খেলায় ইন্দ্রনাথের এতো কি মূল্য যে তাকেই একমাত্র সঙ্গী পেতে হবে? তাকে না হলেই সব মিথ্যে হয়ে যাবে ওর? কি আসে যায় ইন্দ্রনাথ না ফিরলে? মাতাল হয়ে অন্য কোথায় পড়ে থাকলে? কিম্বা একেবারেই তার জীবনে অনুপস্থিত হয়ে গেলে?

ইন্দ্রনাথকে একেবারে অনুপস্থিত করে দিলে শিবানী—ওর জীবনে। উল্টে পাল্টে কেবল তার কথাই ভাবা। তার জন্যই প্রতীক্ষা করা। তাকেই উত্যক্ত করবার জন্য চাকরী করা—না আর ইন্দ্রনাথের জন্য কিছু করা নয়। চাকরী করতে হয় নিজের ইচ্ছে করছে বলেই করবে।

যদি ছাড়তে হয়, তো নিজের ইচ্ছে করছে না বলেই ছাড়বে। যদি ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে, ঘরে বসে থাকবে। যদি না লাগে থাকবে না। ওর বর্তমান চালচলনের বেশিটাই ছিল ইন্দ্রনাথের সঙ্গে টানা-পোড়েন। ঝেড়ে ফেলে দিল শিবানী সে টানা-পোড়েন। একেবারে অনুপস্থিত করে ফেলল শিবানী ইন্দ্রনাথকে ওর জীবনে। পরের দিন সমস্ত সকাল বসে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে মস্ত এক বই-এর তালিকা তৈরি করল। দুপুরে ট্যাক্সি বোঝাই করে সব বই কিনে নিয়ে এলো। শোবার ঘরটাকেই পড়বার ঘর করলো।

শিবানীর মনটা ইন্দ্রনাথের দিক থেকে যত প্রকারে পারে দূরে সরে যেতে চাইছিল। সম্ভব হলে ও ওর শোবার ঘরটাই তুলে নিয়ে যেত অন্যত্র। কিন্তু সেটা হবে খুবই দেখতে বিসদৃশ। তাই পড়বার ঘরটাকেই ও টেনে নিয়ে গেল দূরে বাড়িটার একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তের একটা ঘরে। যে ঘরটা দেখতে হলে সে ঘরে এসে ঢুকতে হবে—বাড়ির অন্য কোন আসা-যাওয়ার পথে এ ঘর কোন মতেই দেখা যাবে না। ইন্দ্রনাথের দেখা যাওয়ার পথ থেকেও শিবানী দূরে থাকতে চায়। ওর নিবিড় মনের বই পড়া নষ্ট হয়ে যাবে—ইন্দ্রনাথের বারান্দা দিয়ে চলায়, ঘরে বসে থাকায়। আবদুলের গ্লাস বোতলের শব্দ তোলায়।

ইন্দ্রনাথকে আর ওর বুকে তরঙ্গ তুলতে দেবে না শিবানী। আর সে ইন্দ্রনাথকে প্রশ্রয় দেবে না। প্রশ্রয় সে দিয়েছে। অনেক দিয়েছে। দীর্ঘ বিস্মরণের পর যখনি সে হাত বাড়িয়েছে, তখুনি সব অসম্মান, সব পরাজয় ভুলে গিয়ে লোভীর মতো নিজেকে সমর্পণ করেছে সে ইন্দ্রনাথের হাতে। সে সমর্পণ মনে হলে যেন সর্বশরীর আজ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে আসে ওর। আর নয়। আর নয়। আর এমন আত্মঅবমাননাকর আত্মসমর্পণ সে করবে না কোনদিন। ইন্দ্রনাথের ভুলে যাওয়া আর মনে করা; মনে করা আর ভুলে যাওয়ার ভেলায় সে আর তার জীবনতরী ভাসিয়ে চলবে না।

কিন্তু কি করবে?

থেমে থাকাও তো চলে না।

আপাতত বই-এর ভেতর দিয়েই চলা যাক। তারপর দেখা যাবে

চাকরী ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিলো না। একমাসের ছুটি পাওনা ছিল। সেটা নিয়ে বই নিয়ে বসল শিবানী। পনেরোটা দিন কোনদিকে চোখ তুলে তাকালো না শিবানী। এক যখন দিনের আলো কমে আসত, বাতি না জালিয়ে আর পড়া সম্ভব হতো না, কিন্তু উঠে গিয়ে বাতিটা জালাতেও ইচ্ছে করত না—তখন জানালা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে পশ্চিম আকাশে সূর্য ডোবার রং-এর খেলা দেখত, যতক্ষণ না কাচ্চি এসে বাতি জালাত। কাচ্চিও সহজে বাতি জালাত না। এই একটা সময়ই শিবানীকে বই থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতে দেখে শিবানীর আকাশ দেখার সময়টাকে দীর্ঘ করতে চাইত কাচ্চি। সে যে জানে শিবানী আকাশ ভালোবাসে।

এর ভেতর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি শিবানীর। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে তার পড়ার ঘরে চলে আসে। সে ঘরেই তার ব্রেকফাস্ট সে খায়। আর ইন্দ্রনাথের বাড়ি থাকার সময় তো এই ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্তই। তারপর ইন্দ্রনাথ যে বেরিয়ে যায়, ফেরে কখন তা এক আবদুল ছাড়া কেউ বলতে পারে না। আজ বলে নয়। এই নিয়ম। শুধু বর্তমানে ব্যতিক্রম চলছে। এই সময়টুকুতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দেখা-সাক্ষাৎ হতো সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এবং ইন্দ্রনাথ এই সময়টুকুতে ওর চাকরী ছাড়া নিয়ে যে উপদ্রব আরম্ভ করত, সেটা করছে না। অবশ্য উপস্থিত কাজে যাচ্ছে না শিবানী। কিন্তু যদি সে কাজে যেত তবু ইন্দ্রনাথ এসে যে ওর পথরোধ করে চাকরী ছাড়বার বায়না নিয়ে এসে দাঁড়াত না, এ কথা শিবানী বেশ ভাল করেই জানে। এখন কিছুদিন ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে ইন্দ্রনাথ। তার আকর্ষণ-বিকর্ষণ খেলার এই পদ্ধতি।

জানে—জানে সবই। তবু জেনেশুনেও একটু সমাদর পাওয়ামাত্র যে লোভী মেয়েটা ইন্দ্রনাথের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওর ভিতরকার সেই লোভী মেয়েটাকে মনে মনে চাবুক মেরে ক্ষতবিক্ষত করে শিবানী। লোভী মেয়েটা ওর হাতের মার খেতে খেতে কাঁদে ঠিকই, কিন্তু অভিযোগ করতেও ছাড়ে না।

কাঁদতে কাঁদতে বলেঃ আমাকে মেরে কি ফল হবে? তোমার ইচ্ছার ভেতর থেকেই তো আমার জন্ম। তোমার ইচ্ছাটাকে কি মেরে ফেলতে পেরেছ? যদি তা পেরে থাকো, তবে আমাকে মার—মেরে ফেলো। আমার মৃত্যুতেই লোভী মেয়েটার মৃত্যু হবে। কিন্তু যদি তা না পেরে থাকো তবে আমাকে মেরে কি হবে? তোমার লুকোনো ইচ্ছা আবার আমায় জন্ম দেবে।

কপালে ঘাম দেখা দেয় শিবানীর।

লোভী মেয়েটা ওরই ত আত্মজা—শিবানীর কপালে ঘাম দেখা দেওয়া তার দৃষ্টি এড়ায় না। চোখের জলে ভেজা চুলগুলি মুখচোখ থেকে সরাতে সরাতে একটু হাঁফ ছেড়ে বলে, আচ্ছা, তুমি তো হিন্দু কোড বিলের এক মস্ত সমর্থক ছিলে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল সমর্থন করে পত্র-পত্রিকায় ওজস্বী ভাষায় প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছ। তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হলে আনন্দে নেচে ফেলেছ। বলেছ,

মেয়েদের জীবনের যে কি উপায়হীনতার শৃঙ্খল-মুক্তি ঘটল, কি নিঃসীম অন্ধকারে আলো জ্বলল, তা বুঝতে আমাদের আরো কিছু সময় লাগবে। বহুক্ষণ অন্ধকারে কাটালে অতর্কিত আলো চোখ সহ্য করতে পারে না। নিজে বুজে চোখ অন্ধকার খোঁজে। জানি আমাদের আরো কিছুকাল তেমনি যাবে—তবু আলো—ভালোই। সে অন্ধকার দূর করবেই।

তোমার এসব কথা গেল কোথায়? তোমার তো চোখ বুজে অন্ধকার খোঁজার কথা নয়। তুমি জর্জকোর্ট রোডের ভিত আঁকড়ে পড়ে রয়েছে কেন, জানতে চাইতে পারি?

পারো।

আঁচল তুলে কপালের ঘাম মুছল শিবানী। এতক্ষণে যেন নিজেকে রক্ষা করবার সুযোগ পেলো সে। গম্ভীর-কণ্ঠে বলল, তুমি লোভী মেয়ে আমার চলে না যাওয়াটা থেকে কেবল আমার লোভকেই বড় করে দেখছ? আমার এই না যাওয়া যে কত বড় একটা 'দেখার' কথা বলছে তা বুঝছ না। মানুষ কোথায়? ঘর বদলে কি হবে? মিঃ অমল বোস, মিঃ তপন মিত্র আর সুধীর ব্যানার্জি নামের তফাৎ ছাড়া তফাৎ কার সঙ্গে কার? ঘর বদলালেই কি সখ্য-বন্ধুত্ব-প্রীতি মিলবে? চরিত্র হারানো এতো মন্দ কেন? চরিত্র হারালে সব হারায় মানুষ। আজকের মানুষ চরিত্র হারিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছে সখ্য-প্রেম-প্রীতি দেওয়ার ক্ষমতা। কোথায় যাবো? কোথায় খুঁজব? কোথায় মিলবে সুন্দর জীবনের এ সব অমূল্য উপচার? আমি জানি না। কি হবে বৃথা ছুটোছুটি করে! দশ ঘাটের নোংরা জলে মুখ ডোবাবার চাইতে যে ঘাটে নৌকো লাগিয়েছি, সে ঘাটের জলটা থিতানোর অপেক্ষা করছিলাম বা করছি—বুঝেছ? হয়তো আরো করব। হয়তো করব না। এখন তুমি যাও। আমাকে বই পড়তে দাও। আমাকে মানুষ হতে দাও। নিজে তো আগে মানুষ হয়ে নি। তারপর মানুষ অন্বেষণ করা যাবে। বৃথা ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করে লাভ কি? তুমি এখন দূর হও। তোমাকে আমি আর এক মুহূর্তও সইতে পারছি নে।

চমৎকার কাটতে লাগল শিবানীর বই নিয়ে। একটা শেষ করেই আর একটা নেয়। ভালো লাগলে একটানা পড়ে যায়। খারাপ লাগলে বই পালটায়। চরিত্রগুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে। যে গল্পের যে জায়গাটা

মনঃপূত হয় না, সে জায়গাটা মনমত গড়ে নিয়ে চোখ বুজে বসে উপভোগ করে। ঘরে ইন্দ্রনাথকে নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, অন্তর্দাহ নেই। বাইরে অমল বোসকে নিয়ে বহির্দাহ নেই। উপন্যাসের নায়কদের মধ্যখানে বসে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে—ইউজিন বাজারভ, সিডনি কার্টন, সিরানো দ বার্জেরাক এক একজনের হাত ধরে আর যেন সে হাত ছাড়তে ইচ্ছে করে না শিবানীর।

কিন্তু যত বড় ভাবে এসেই স্পর্শ করুক—ওগুলি বই-এর হাত। বই শেষ হয়ে গেলে একটা দীর্ঘশ্বাসে চরিত্রেগুলি মিলিয়ে যায়। বই হাত থেকে নামিয়ে রাখার পর দেখে ঘরটা যেমন নিঃসঙ্গ ছিল, তেমনি নিঃসঙ্গ আছে এবং ওর নিঃসঙ্গ লাগছে।

শুধু ওর ঘরটা নয়। কলকাতা শহরটাই ওর কাছে শূন্য মনে হয়। কারও জন্য প্রতীক্ষা করার নেই। কাউকে ডাকার নেই। কারও কথা মনে হয় না। মনে হলেও মন এতটুকু দোল খায় না—এ যে মরার বাড়া!

একদিন গিয়ে ললিতাদের বাড়িই উপস্থিত হলো। কিন্তু তাকে পেলো না। ললিতাকে সপ্তাহে একবার করে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে। সে ডাক্তারের কাছে গেছে।

না, ললিতাকে এখন পাওয়া যাবে না আর গেলেও ওর সঙ্গে এখন জমবে না। ও এখন ওর শরীরে সন্তানের ভার নিয়েই হিমসিম খাচ্ছে।

ফিরে এসে সোজা ফোনের কাছে চলে গেল শিবানী। ছ'টা নম্বর ঝটাং-ঝটাং শব্দে ঘুরিয়ে ফোন কানে ধরে বৌচে বসল।

উল্টোদিক থেকে সাড়া এলো—হালো……

মিঃ বোস?

কথা বলছি—

আমি শিবানী সেন কথা বলছি—

ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। এবার কাজ ছেড়ে দেওয়ার দরখাস্ত পাঠাচ্ছেন আমাদের কাছে, এই তো? গম্ভীর-গলা অমল বোসের।

মিষ্টি করে হেসে উঠল শিবানী। বললো, না, বরং উল্টোটা। ছুটির সাতদিন বাকি থাকতেই আমি কাজে যোগ দিচ্ছি কালকে—।

—এতো ভালো!

অতি মিষ্টি করে হেসে উঠে শিবানী বললো, হাঁ, এতো ভালো।

খুব আনন্দের কথা।

খুব আনন্দের কথা তো? বেশ, এখন বলুন আজ কখন ফ্রি হচ্ছেন আপনি?

এক্ষুণি হতে পারি।

সে কি! অফিসে কাজ নেই?

অফিসে কেন আপনি ডাকলে পৃথিবীতে আর কোথাও আমার কোন কাজ থাকতে পারে না, এ কথা কি আপনি জানেন না?

তবে চলে আসুন।

কোথায় আসব?

কোথায়···কোথায়···দাঁড়ান ভাবছি। না, মনে আসছে না। আপনি বলুন। তক্ষুণি আবার মত বদলে ফেলে বলল, থাকগে অত বলাবলির, ঠিকঠাকের দরকার নেই। গাড়ি নিয়ে চলে আসুন এখানে। ততক্ষণে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। বেরিয়ে পড়ে দেখা যাবে কোথায় যাবো। কি করব—ঠিক আছে?

ঠিক আছে মিসেস সেন। আপনি ঠিক থাকলেই আমার সব ঠিক আছে।

ঝরঝর করে হেসে উঠল শিবানী। বলল, আমি ঠিক থাকলে নয় বলুন আমি বেঠিক থাকলে।

হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে ওটাই ঠিক। তারপর আবেগভরাকণ্ঠে ভেসে এলো মিঃ বোসের, একেই স্বর্গ হাতে পাওয়া বলে কি না আমি জানি না মিসেস সেন……

আবার হেসে উঠল শিবানী। বলল, সামনে শুনব।

অমল বোস হেসে বলল, আচ্ছা।

যেন মরে গিয়েছিল। এবার বেঁচে উঠল শিবানী।

আরে নমিতা না! গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বেশ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল শিবানী—বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে। তারপর ড্রাইভারকে আদেশ করল বাস-স্ট্যাণ্ডে গাড়ি থামাতে। ড্রাইভার গাড়ি থামালে সোল্লাসে হাত নেড়ে ডাকল শিবানী, এই নমিতা—

নমিতা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল শিবানীর দিকে। সে শিবানীকে চিনে উঠতেই পারলে না প্রথম। এমন নতুন ঝকঝকে গাড়ি থেকে কেউ ওকে কলকাতা শহরে হাত বাড়িয়ে ডাকছে—এ যেন চোখে দেখেও নমিতা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কি হাঁ করে তাকিয়ে আছিস? শীগগির উঠে পড় গাড়িতে। শিবানী একরকম টেনেই গাড়িতে তুলল নমিতাকে। পেছনে গাড়ির স্রোত। গাড়ি থামিয়ে রাখার কি উপায় আছে?

নমিতা এবার চিনল। বলল, শিবানী?

হাঁ শিবানী। তবু যে এতক্ষণে চিনলি! আমি তো তোকে একবারেই চিনেছি। তুই চিনতে পারছিস না কেন?

কুণ্ঠিতভাবে বলল নমিতা—একটু মোটা হয়েছিস।

তারজন্য চিনতে পারবি নে—আমাকে! সে তো তুই একটু নয়—শুকিয়ে আদ্দেক হয়ে গিয়েছিস। আমার চিনতে বাকি থাকল তোকে? অমন করে বসেছিস কেন? যেন এক্ষুণি নেবে যাবি। বোস ঠিক হয়ে। এখন যেতে পারছিস নে। চল আমার সঙ্গে আমার অফিসে—তা তোর আবার অফিস নেই তো?

না। বলে নমিতা হাতের থলেটা কোলের ওপর রেখে একটু পেছনে সরে ভালো করে বসল।

শিবানী বলল, তবে আর কি। চল আমার অফিসে। অনেকদিন বাদে তোকে পেয়েছি। কত কথা যে জানতে ইচ্ছে করছে। তোর তাড়া নেই তো?

খুব না।

একটু আছে? কোথাও যাবি?

ইণ্টারভিউ আছে—

ইণ্টারভিউ? ক'টায়?

বারোটায়। ট্রাম বাসের যে অবস্থা তাই আগেই বেরিয়ে পড়েছি।

ঠিক আছে। চল। তারপর আমার গাড়ি তোকে পৌঁছে দেবে'খন ইণ্টারভিউর জায়গায়।

এই নমিতার সঙ্গে কিন্তু শিবানীর বন্ধুত্ব হওয়া দূরের কথা, জীবনে একত্র হবারও বুঝি কথা ছিল না। জমি জরীপ করা একশ' টাকা মাইনের কর্মচারীর মেয়ে নমিতা যখন মফস্বল শহরের টিনের চালাঘরের স্কুলে পড়ত, হাজার টাকা মাইনের পি, ডব্লিউ, ডি-র মেয়ে শিবানী তখন লণ্ডন-মেড জুতো জামা পরে, মাথায় রিবন জড়িয়ে বাড়ির গাড়িতে মেমের স্কুলে পড়তে যেতো। কিন্তু ফুল আর সুতোর সঙ্গে যতই ব্যবধান থাক, মালা যে গাঁথে তার কোলের উপর তাদের যেমন একত্র হতেই হয় তেমনি জীবনের গল্পের মালা যিনি গাঁথেন সেই নিয়তির অদৃশ্য টানে তাঁর কোলের উপরও দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে ঘটনাকে এসে মিলিত হতে হয়। প্রাইমারী স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে নমিতা যখন এসে ঢাকা ইডেন স্কুলে ভর্তি হলো তখন সে স্কুলে শিবানী পড়ছে।

কুনো স্বভাবের স্বল্পভাষিণী নমিতা। শরীরভরা ওর জড়তা আর সঙ্কোচ। চেষ্টা করেও পারে না সহজ হতে। মেয়েদের চলাফেরার দিকে তাকিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। হাসছে, ছুটছে, খেলছে। এ ওর গলা জড়িয়ে

ধরে মাঠে ঘুরপাক খেতে খেতে অনর্গল কথা বলছে—ও পারে না কেন!

একদিন বই-খাতা গুছোচ্ছিল নমিতা স্কুল ছুটির পর, বয়সের তুলনায় অনেকটা বেশি লম্বা একটি মেয়ে তার মাথার লম্বা বেণী দোলাতে দোলাতে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বিরক্ত কুঞ্চিত ভ্রূতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই—তুমি এতো বাজে বাজে প্রশ্ন করো কেন ক্লাসে?

নমিতা লজ্জায় বুঝি কেঁদেই ফেলে আর কি। সত্যি রোজই কিছু না কিছু পড়া জেনে নেয় ক্লাস-টিচারের কাছ থেকে। ওর যে বাড়িতে কেউ পড়াবার নেই। কিন্তু বাজে! কোনমতে ঢোক গিলে বলেছিল, কেন, বাজে হবে কেন?

কেন হবে তা আমি কি জানি। কিন্তু হয়। রোজ রোজ অত প্রশ্ন করবে না ক্লাসে, বুঝলে। বলতে বলতে সামনে এসে পড়া বেণীটা কাঁধের এক ঝাঁকুনিতে পেছনে সরিয়ে দিয়ে গর্বিত পা ফেলে চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

বই-পত্র হাতে নিয়ে কোনমতে কান্না লুকিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল নমিতা। তারপর থেকে কিছু বুঝে নিতে চাইতে ওর সাহস হতো না। শিক্ষয়িত্রী পড়া শেষে কারো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না জানতে চান। বিশেষ করে নমিতার দিকে লক্ষ্য করেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সে-ই বেশি জানতে চায় বলে। নমিতা নত মুখে 'না' বলে।

তিনি চলে যান। মেয়েটি নমিতার পিঠে চাপড়ে খুশি মুখে বলে, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।

অন্য মেয়েদের ডাক শুনে নমিতা জেনেছিল মেয়েটির নাম শিবানী। শিবানীই ছিল ক্লাশের মধ্যমণি। সমস্ত ক্লাস ওকে ঘিরে গুঞ্জন করতো, মিছরীর চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো। শুধু নমিতা দূরে সরে থাকত। কিছুটা তার স্বভাবের জন্য। কিছুটা—ওর ভালো ভালো প্রশ্নগুলিকে বাজে প্রশ্ন বলার অভিমানে। যেদিন নমিতার অভিমান ভাঙল সেদিনই সে হৃদয় দিয়ে ফেলল শিবানীকে।

একদিন স্কুল থেকে বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে মেয়েরা সব যখন উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল, 'গোলাপ-বাগিচা দেখতে যাবো আমরা—গোলাপ-বাগিচা।' তখন দাঁড়িয়ে উঠে শিবানী আপত্তি তুলল—না, দিদিমণি আমরা যাবো মণিপুর ফার্ম দেখতে।

গেল দুটো দল হয়ে। একদল বলে, 'গোলাপ-বাগিচা দেখতে যাবো।' একদল বলে, 'মণিপুর ফার্ম দেখতে যাবো।' দু পক্ষের চেঁচামেচিতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শিক্ষয়িত্রী ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। মেয়েদের মুখ উঠল কালো হয়ে। আর শিবানী বেঞ্চি বাজিয়ে গেয়ে উঠল—

'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা—'

রুষ্ট মুখে বিরুদ্ধদল বললো, কি করে তোমার জয়ের মালা গাঁথা হলো শুনি? আমরা ক-খ-নো মণিপুর ফার্ম দেখতে যাবো না—যাবো না—

শিবানীও ঠিক তাদের মতো করেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, আমিও না। কুমড়োর মতো টম্যাটো, চাল কুমড়োর চেহারার ডিম, ময়ূরের মাপের মুরগী—যত কিম্ভূত! গোলাপ-বাগিচার লক্ষ গোলাপের বাগান ফেলে কেউ যায় ও সব দেখতে! রাম!

মেয়েরা তো হতভম্ব! তবে তুই মিথ্যে মিথ্যে তর্ক তুলে ক্লাসটা নষ্ট করলি কেন?

মিথ্যে মিথ্যে কোথায়? ক্লাসটা করতে চাই না বলেই তো সত্যি সত্যি তর্ক তুলেছি—

কথাটা শুনেই খিল খিল করে হেসে উঠল নমিতা।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, তুমি অমন হেসে উঠলে কেন?

নমিতা বলল, সেদিন আমার প্রশ্নগুলিকেও তুমি বাজে বলেছ ঐ বেশি সময় আরো ক্লাসে থাকতে হয় বলে।

এতোদিনে বুঝলে!

একটি মেয়ে বলে উঠল, গা থেকে এখনও গাঁয়ের গন্ধ যায় নি নমিতার—ও বুঝবে আমাদের!

দেখি, দেখি—বলে নমিতার উপর ঝুঁয়ে পড়ে নাক টেনে গন্ধ শুঁকলো শিবানী। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ তো। ঠিক তো।...একেবারে গেঁয়ো-গন্ধ রয়ে গেছে। দেখি তোর। বলে এবার যে মেয়েটি নমিতাকে 'গায়ের গন্ধ যায় নি' বলেছিল তার কাছে গিয়ে নাক টানল। নাক টেনেই চোখ নাচাল শিবানী। হ্যাঁ, তোর গায়ে একেবারে খাটি শহুরে গন্ধ। তাও কলকাতার পর্যন্ত নয়। একেবারে প্যারিসের। কিন্তু তুই প্রেমে পড়েছিস মীরা।

ক্লাস সুদ্ধ সব হেসে উঠল।

আর মীরা উঠল দুরন্ত ক্ষেপে। গন্ধ শুঁকে বুঝলি তুই?

গন্ধ শুঁকেই বুঝলাম। আরো বুঝলাম তোর প্রেমিক তোর স্কুলের আসা-যাওয়ার পথেরই কোন মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নইলে স্কুলের সময় তোর সেন্ট মাখবার কথা কিছুতেই মনে আসতে পারে না।

মীরাও কম যায় না। বিদ্রূপে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, তোর অভিজ্ঞতা তাই?

হ্যাঁ। তাও ঠিক প্রেমে পড়া বলা চলে না, একটি ছেলেকে একটু ভালো ভালো মতো লাগতে শুরু করেছিল মাত্র—তাতেই বৌদির সেন্টের শিশি খতম্ করে ফেলেছিলাম। যেই সে-ভাবটা কেটে গেল—সেন্টের কথাও ভুলে গেলুম।

সেদিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে শিবানী নমিতার হাত টেনে নিয়েছিল হাতে। বলেছিল, তোমার খুব অসুবিধে

হয় ক্লাসে পড়া বুঝে না নিয়ে গেলে—তাই না? তুমি পড়া বুঝে নিও কাল থেকে। আমি তখন বুঝতে পারি নি।

এখন কি করে বুঝলে?

তুমি পড়াশুনায় ভালো। তোমার পরীক্ষার ফল ওবার ভালো হয়েছিল। এবার হয় নি বললে—তা তুমি এতো বোকা কেন?

আবার মনটা গুটিয়ে গিয়েছিল নমিতার। বলেছিল, বোকা আমি?

অপ্রতিভ কণ্ঠে শিবানী বলেছিল, বোকা মানে—বলছি অমন যে যা বলে শুনে চুপ করে থাকো কেন?

কোথায় চুপ করে থাকি? তুমি যখন বলেছিলে, 'বাজে প্রশ্ন করো কেন।' তখন আমি প্রতিবাদ করি নি? বলি নি, কখনো বাজে নয়।

করেছিলে? ঐ দেখে করা না-করা সমান হয় যদি কথায় জোর না থাকে। জোরের সঙ্গে বলবে। জোরের সঙ্গে চলবে—বুঝলে।

সেই বন্ধুত্ব ওদের নিবিড় হয়েছিল।

আই-এ পাশ করার পর শিবানীর বাবা বদলী হয়ে গেলেন। শিবানী চলে গেল কলকাতায় বি-এ পড়তে। প্রথম প্রথম চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চলত। তারপর গেল তাও বন্ধ হয়ে। সাত-আট বছরের না দেখায়, না যোগাযোগে সম্পর্কটাই প্রায় মুছে এসেছিল। শিবানী যদি এভাবে ডেকে না নিত তবে নমিতা শিবানীকে চিনতে পারলেও এগুতে পারতো না। শিবানীর সেই জোরের সঙ্গে বলার, জোরের সঙ্গে চলার উপদেশ নমিতা এখনও পালন করে উঠতে পারে নি। ভাগ্যের মার খেয়ে খেয়ে ভীরু স্বভাব আরো ভীরু হয়ে গেছে ওর।

শিবানী ওকে অফিসে নিয়ে গেল। মিস জেনির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। কফি খাওয়াল। তারপর গাড়ি দিয়ে ওর ইণ্টারভিউর জায়গায় পৌছে দিল। যাওয়ার সময় বলল, কাল আসবি নমিতা?

আরো দু'টো ইণ্টারভিউ আছে কাল।

পরশু?

আসব।

চিনে আসতে পারবি?

ঠিকানা রয়েছে। পারব।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে মনে বললো নমিতা, আসবো শিবানী। তোমার কাছে যে সমাদর পেলাম তার সিকি ভাগও এ কলকাতা শহরের আর কোথাও পাই নি। কোথায় চাকরী। কোথায় অন্ন। কোথায় ঘর। বাংলা ভাগের ধাক্কায় কলকাতা শহরে ছিটকে পড়ে কুকুরের মতো পথে পথে ঘুরছি।

যে প্রাণ-মানের ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে এখানে এসেছি সে দুই-এরই বিসর্জনের বাজনা কানের কাছে বাজছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর মনে হচ্ছে সে বাজনা যেন এবার থামল।

[ক্রমশ।

দু'কাঠা জমি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন ধরেই কথাটা বলছিল ভবেশ। 'দিনকালের যা অবস্থা পড়েছে ভাই, জমির দাম হু-হু করে বাড়ছে। এইবেলা কোথাও কাঠা দু-তিন জমি কিনে রেখে দাও। তারপরে যখন হয় বাড়ি কোর। নয়ত শেষে এমন হবে, টাকার জোগাড় হয়েছে, কিন্তু মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কোথাও একছটাক জমি নেই।

কথাটা যে সুনন্দও ভাবছিল না তা নয়। ইদানীং সে বরং আরও বেশি করে ভাবছিল। তাদের অফিসের মাধববাবু কিছুদিন আগে হঠাৎ মারা গেলেন। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে ভদ্রলোকের। ছেলেরা সবাই নাবালক। তাঁর বড় ছেলে সুনন্দর বড় ছেলে অরুণের বয়সী। বছর তেরো-চোদ্দ বয়স। মাণিকতলায় এক ভাড়াবাড়িতে আজ বিশ বছর ধরে বাস করছিলেন। দুম করে মারা যাওয়াতে এখন গোটা পরিবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

মনে মনে পরিণামটা ভেবে শিউরে ওঠে সুনন্দ। বে-সরকারী অফিসে একটিমাত্র চাকরির ওপর ভর করে গোটা তার পরিবারটা ভেসে রয়েছে। বুড়ো বাবা-মা, এক অপোগণ্ড ভাই, অবিবাহিতা দু'জন বোন, নিজের ছেলেমেয়ে অবশ্য খুব বেশি নয় সুনন্দর। বলতে গেলে পরিকল্পিত পরিবার। এক ছেলে, এক মেয়ে। কিন্তু তা হলে কি হবে সব মিলিয়ে এক বিরাট পরিবারের কর্তা হয়ে বসেছে সুনন্দ—এই চল্লিশ বছর বয়সেই, সে যেন এক বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের অতিবৃদ্ধ পিতামহ।

তবু আরতির মত স্ত্রী পেয়েছিল বলেই সুনন্দর সংসার-তরণী অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে নির্বিবাদে এগিয়ে যেতে পেরেছে। নয়ত এই দুর্মূল্যের বাজারে কি হোত তা বলা শক্ত।

আরতিও মাঝে মাঝে বলে: একটা সুবিধেমত জমিটমি দেখে কিনে রাখতে পারলে মন্দ হোত না। ঐ তো ও-বাড়ির রাখালবাবুরা কেমন একটা জমি পেয়েছেন পাইকপাড়ায়। আর কতদিন এভাবে ভাড়া টানবে তুমি?

তা' কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলে নি আরতি। এই বিশ বছর ধরে যত ভাড়া গুণে এসেছে সুনন্দ, তাতে জমি কেন, একটা গোটা বাড়ি হয়ে যেত। কিন্তু জমি কেনা বললেই তো কেনা নয়,—এত টাকা একসঙ্গে কোথা থেকে বার করবে সুনন্দ।

আরতি বলে, আমার গহনাগুলো না হয়—

সুনন্দ বলে, আর সেদিন নেই আরতি। স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে পুরুষের নবাবী করার দিন এখন চলে গেছে। ফোর্টিন ক্যারেটের যুগে খাঁটি সোনা বাজারে অচল। বিক্রি করতে গেলেও পুলিশের হাঙ্গামা। ভাগ্যে যদি থাকে তা হলে জমি হবে, বাড়িও হবে।

এবার একটু ব্যঙ্গ করেই যেন বলে আরতি হ্যাঁ, সারা জীবন ভাগ্যের ফলতো ফলল। এখন শুধু বাকি আছে জমি-বাড়ি হওয়া।

কিন্তু সুনন্দ ভাগ্যবাদী। সে মনে করে, মানুষের সমস্ত কিছু চাওয়া-পাওয়া একই জায়গা থেকে, এক কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিধাতা পুরুষের সেখানে আসন। সেই পুরুষের প্রসন্নতা ও ভ্রূকুটির ওপরেই মানুষের সাফল্য আর ব্যর্থতা নির্ভর করছে। সেই খেয়ালী পুরুষ আর কারুর কথা শোনেন না। নিজের খুশিতেই তিনি চলেন।

কিন্তু ভায়রাভাই ভবেশ সুনন্দর এ থিয়োরিতে বিশ্বাস করে না। অবস্থা মোটামুটি খারাপ নয় ভবেশের। সুনন্দর তুলনায় ভালই। সরকারের গেজেটেড অফিসার। দু-তিনটি ছেলেমেয়ে। আর স্ত্রী প্রণতি। সংসারে এ-ছাড়া কোন ঝুট-ঝামেলা নেই। ছেলে দু'টি চৌরঙ্গী এলাকার সাহেবী স্কুলে পড়ে। মেয়েটি শান্তিনিকেতনে।

ভবেশ বলে, পুরুষ মানুষের জীবনে ভাগ্য বলে কিছুই নেই। মানুষই তার ভাগ্যের নিয়ন্তা। তোমরা যাকে বল ভাগ্য আমি তাকে বলি এবিলিটি। যে যত এবল, সংসারে তারই তত দাম।



তা বড় ভায়রাভাই হিসেবে উপদেশ দেওয়ার অধিকার আছে ভবেশের। প্রণতি তো আরতিরই মায়ের পেটের বোন। প্রণতি ভালবাসে ছোটবোনকে। নিয়মিত তত্ত্ব-তল্লাশী করে। আরতিই বরং তেমন মেশে না। এ-বিষয়ে একটু ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে আরতির।

ভবেশই অনেকদিন ধরে বলছে সুনন্দকে: এই বেলা কোথাও একটু জমি ধরে রাখার চেষ্টা কর সুনন্দ।

সুনন্দ বলে, আমার কথাই বলছেন দাদা, কই আপনি নিজে তো কিছু—

ভবেশ বলে, আমার টাকা কোথায় ব্রাদার? দেখতে এইটুকু সংসার। কিন্তু মাস গেলে ধার করতে হয়। একেবারে ডিফিসিট ফিনান্সিং। তপতী, বাচ্চু আর মিণ্টুর এডুকেশন খরচাই মাসে তিনশ' টাকা।

সুনন্দ বলে: তা হলে আমার অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। আমি তো আপনার কাছে একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।

ভবেশ বলে: ক্ষুদ্ররাই বৃহত্তের স্বপ্ন দেখতে পারে সুনন্দ। তাদের শক্তি কম হতে পারে কিন্তু ধৈর্য বেশি।

আরতি শুনে বলে: জামাইবাবুর আর কি' উপদেশ দিতে তো পয়সা খরচ নেই। ঘরে বসে অমন লম্বা-চওড়া বাত আমরাও ঝাড়তে পারি।

সুনন্দ জানে, মনে মনে বড় বোনের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করে আরতি। প্রথম মেয়ের বিয়েতে বাবা উপার্জনের সব টাকা খরচ করে ফেলেছিলেন। তাই বি সি এস পাশ জামাই পেয়েছিলেন বাবা। তার বেলায় কেরানীর বেশি আর দর তোলা গেল না। সঞ্চয়ে টান ধরল, নয়ত প্রণতির চেয়ে অনেক ভাল দেখতে আরতিকে।

কিন্তু সে সমস্ত মনে চেপে রাখে আরতি। বুদ্ধিমতী মেয়ে মুখে কোনদিন প্রকাশ করে না। কিন্তু সুনন্দ একমাত্র জানে তার মনের কথা।

তব সত্যি সত্যি জমি কেনার কথা সিরিয়াসলি চিন্তা করে নি সুনন্দ, যতদিন না সে অপ্রত্যাশিত নোটিশ পেয়েছিল বাড়িওয়ালার কাছে। বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে বাড়িওয়ালা। নতুন মালিক ভাড়াটেদের নোটিশ দিয়েছেন। আর ভাড়াটে রাখতে চান না ভদ্রলোক। সপরিবারে বাসের উদ্দেশ্যেই তিনি ভদ্রাসনখানা নিচ্ছেন।

কিন্তু কলকাতা শহরে বাড়ি মেলা যে কত কঠিন, এতদিন ধারণা ছিল না সুনন্দর। গৃহসমস্যার কথা সে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধেই পড়ে আসছিল। এবার দেখল, এ সমস্যা আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি প্রবল। একটা চাকরি জোগাড় করার চেয়েও বাড়ি জোগাড় করা কঠিন।

এদিক ওদিক সমস্তই ঘুরল সুনন্দ। প্রতিটি রবিবার সে কলকাতা শহর চষে বেড়াতে লাগল। ভোর না হতেই দালালের সঙ্গে ঘুরে বাড়ি খোঁজা।

কিন্তু আকাশছোঁয়া ভাড়া। সাধ্যের মধ্যে যেগুলি, সেখানে সেলামি নামে এক ভয়াবহ বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হতেই আঁতকে উঠতে হল সুনন্দকে। সুনন্দ ভাবল জমিদারি প্রথা উঠে গেছে, কিন্তু কলকাতা শহরে খানকতক বাড়ি থাকলে কোন রাজা-মহারাজাকেও কেয়ার করত না সুনন্দ। নির্বিবাদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালিয়ে যেত।

প্রণতি বলে: এমনি বাড়ি পাওয়া অসম্ভব আরতি। সুনন্দকে বল না, সি আই টি'র বাড়ি-টাড়ি দেখতে।

শুনে আরও হতাশ হল আরতি। তাকি আর বলি নি ভাবছিস। কিন্তু ও বলল, সে সব নাকি ভাগ্যবানদের জন্যে। ওদের অফিসে খোঁজখবর করতে গিয়েছিল। কিন্তু একজন নাকি বলেছে, আপনার ছেলে কত বড়? লবণ হ্রদে আমাদের অনেক ফ্ল্যাট হবার কথা। দরখাস্ত করে যান। আপনি না পান, আপনার ছেলে নিশ্চয়ই সে ফ্ল্যাট পাবে।

প্রণতি বলে: কি জানি ভাই, ওঁর এক বন্ধু এই তো সেদিন দরখাস্ত করল আর পেয়ে গেল। আসলে সুনন্দ বড় মুখচোরা, ঠিকমত কথা বলতে জানে না। নয়ত এত লোক পাচ্ছে আর ওই শুধু—।

পতিনিন্দাটা খুব ভাল মনে গ্রহণ করতে পারল না আরতি। প্রণতি প্রায়ই সুনন্দর দোষ-ত্রুটিগুলি বড় করে দেখায় আরতির সামনে। এর আগেও বহুবার বলেছে প্রণতি, সুনন্দ নাকি মিনমিনে, 'সুনন্দ আনস্মার্ট,'। আরতি মুখে কিছু বলে না। কিন্তু মনে মনে ভাবে দিদির বড় অহঙ্কার। অফিসার-স্বামীর গিন্নি। অফিসারেরা যেমন কেরানীদের মনে মনে ঘৃণা করে—তাদের গিন্নিরা ততোধিক। প্রণতি তাই ছোট ভাবে সুনন্দকে।



কিন্তু স্বামীকে কোনদিনই দোষী করতে পারে না আরতি। প্রণতি বড়লোক হলে কি হবে, তার মা পেটের দিদি হলে কি হবে, আসলে প্রণতির মন ছোট হয়ে গেছে। প্রমোশান, গহনার প্যাটার্ন, আর পরিচিত লোকজনের কেচ্ছা ছাড়া সূক্ষ্ম কিছু ভাবতে পারে না প্রণতি। সুনন্দ যে সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, ওদের কাছে তা স্মার্টনেসের অভাব। সুনন্দ যে খোশামোদ করতে পারে না, ওরা তার ভাষ্য করে সে মিনমিনে। সুনন্দকে আর কেউ না চিনুক,—আরতি চেনে। দারিদ্র্য সম্পর্কে, স্বামীর আর্থিক অক্ষমতা সম্পর্কে তারও মনে মনে ক্ষোভ আছে, কিন্তু তবু জানে সুনন্দ অসৎ নয়, আন্তরিকতার অভাব তার নেই।

আরতি কোন কথা বলল না দেখে প্রণতি বলল: কি রাগ করলি নাকি?

মুখে সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটিয়ে বলে: নারে রাগ করব কেন? তবে তুই তো জানিস দিদি, ও ওসব পারে না—।

প্রণতি বলে: আমি বলি কি, সুনন্দকে তুই জমিই দেখতে বল। মাস ছয়েক সময়তো পাবি। একটা জমি কেনা থাকলে লাইফ ইন্সিওরেন্স থেকে লোন নিয়ে দু'খানা ঘর তুলে নিতে পারবি। . .

অতএব জমি খোঁজা সুরু হল সুনন্দর। এটা বরং অনেক সোজা। কলকাতা শহরে এখনও যে এত জমি পড়ে আছে তা জানত না সুনন্দ। তবে শহরে নয়—শহরের শেষে, শহরতলীর সুরুতে। খাল, ডোবা, বিল বুজিয়ে রাতারাতি কলোনী গড়ে উঠছে। যে যেখানে একটু জায়গা পাচ্ছে বসে যাচ্ছে। দালাল শ্রীপতি বলল: কি দেখছেন স্যর, এখন তবু তো পাচ্ছেন আর পাঁচ বছর পরে গড়ে থেকে বরানগর এক ছটাক জমিও মাথা খুঁড়ে পাবেন না।

শুধু বাড়ি আর বাড়ি। অর্ধসমাপ্ত। সদ্যসমাপ্ত। সুনন্দ অবাক হয়ে ভাবে কলকাতা শহরটা যে এত বেড়ে গেছে তা তার ধারণাই ছিল না। ডালহৌসি আর মাণিকতলার মধ্যে ছকে-বাঁধা তার জীবন। কালে-ভদ্রে বালিগঞ্জ পর্যন্ত দৌড়। কিন্তু এই শহরটা কেমন হাঁটি হাঁটি পা-পা করে দুরন্ত ছেলের মত এগিয়ে চলেছে। কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে?

কিন্তু দাম শুনে চমকে ওঠে সুনন্দ। ডালহৌসি থেকে ঘণ্টাখানেকের মত পথ। এখন তো ধু-ধু করছে মাঠ। বাস রাস্তা থেকে অন্তত দশ মিনিটের মত। কিন্তু জমির দর হাঁকছে ছ'হাজার টাকা কাঠা। কর্নার প্লট হলে আরও বেশি!

দালাল বলল: এই আর পাবেন না স্যর। এখন এ রকম দেখাচ্ছে বটে। কিন্তু কলোনী তৈরি হয়ে গেলে নিউ আলিপুরকে টেক্কা দেবে। হাই সোসাইটির লোকেরা জমি বায়না করেছেন। এই দেখুন না, চারজন রিটায়ার্ড জজ, ছ'জন প্রফেসর, রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার জন আষ্টেক। সি এম পি ও-র স্কীমের মধ্যে পড়ে গেছে এই জায়গা—।

সি এম পি ও শব্দটা একটু জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করে লোকটা। যেন বোঝাতে চায় আর ভাবনা নেই। স্বর্গের সঙ্গে তফাৎ থাকবে না এ-জায়গার।

আরতি তো এখন থেকেই বাড়ির স্বপ্নে বিভোর। ঘর কিন্তু তিনখানা করতে হবে। অরুণ আর টুকু বড় হচ্ছে। ওদের জন্যে আলাদা ঘর না হলে—। বাড়ির সামনে একটু কিন্তু জায়গা রাখতে হবে। ছোটবেলা থেকে ফুলগাছের বড় শখ। তা কপাল আমার—ভাড়া-বাড়িতেই কেটে গেল অর্ধেক জীবন।

সুনন্দ হাসে। কোথায় জমি তার ঠিক নেই। গাছে কাঁঠাল, তুমি গোঁফে তেল মেখে বসে রইলে—

আরতি বলে: আশা করে বসে থাকতে ক্ষতি কি। আর তেলের যদি খরচ না লাগে তা হলে না হয় গোঁফে তেল লাগালামই।

তবু সুনন্দ যে জমি খুঁজছে, তা যেন কি করে রাষ্ট্র হয়ে গেল ওর আত্মীয়মহলে। একদিন তো ওর এক মাসতুতো দাদার সামনাসামনি পড়ে গেল।

বরাহনগরে গিয়েছিল জমি দেখতে। কাছাকাছিই সুখেন মানে সুনন্দর মাসতুতো দাদার বাড়ি। লুংগি পরে হাতে থলি নিয়ে বাজারে চলেছিলেন ভদ্রলোক। সুনন্দকে দেখে বললেন: আরে তুমি কোথায় চললে? অনেকদিন কোন পাত্তাই নেই তোমার। তা শুনলাম নাকি জমির সন্ধান-টন্ধান কোরছ।

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসল সুনন্দ। যেন কতই অপরাধী।

: বেশ! বেশ! এই তো চাই। ছেলেপুলে বড় হচ্ছে। তুমি যে তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছ, তা শুনে খুবই আনন্দ হোল সুনন্দ। তা জমির সন্ধান পেলে কোথাও?

: না। এখনও তেমন পছন্দমত পাইনি। তবে চেষ্টা করছি খুব।

: আমাদের এই পাড়াটা তোমার কেমন লাগে? কতগুলি প্লট ছিল এখানে। তুমি যদি বলতো দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারি। মালিক আমার বন্ধু লোক। সার্চের কোন হাঙ্গামা নেই।

: তা বেশ তো চলুন না আজই যাই।

আগে বোধ হয় পুকুর ছিল। সেটা ভরিয়ে জমির প্লট করা হয়েছে কয়েকটা। দু'কাঠা-তিনকাঠা প্লট। মাঝখানে পনের ফুট চওড়া রাস্তা। মালিক ভদ্রলোক

ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে এলেন। এই দেখুন মশাই, এইখানে ইলেকট্রিক লাইন, এই পর্যন্ত টেলিফোন লাইন পাবেন। বাস রাস্তা মিনিট তিনেক। কেমন নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ দেখেছেন। শুধু ট্যাব-ওয়াটারের ব্যবস্থা এখনও হয় নি। শীগগির হয়ে যাবে।

: কত করে কাঠা ?

: সাড়ে চার হাজার। দু'টো প্লট তো আগেই বায়না হয়ে গেছে। মাঝখানের ছ' কাঠার প্লটটা নিন। সাউথ ওপেন। লোক হাঁটাহাঁটি সুরু হয়ে গিয়েছে। আপনি সুখেনবাবুর ভাই আপনাকে আর কি বলব স্যর। আপনার দাদাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ভবেশকে বলতেই ভবেশ বলল: চল দেখে আসি। দলবেঁধে ওরা একদিন দেখতে এল। ভবেশ, প্রণতি, আরতি, ওদের ছেলেমেয়ে।

ভবেশের তো খুব পছন্দ। যদি চার হাজারে দেয় তো নিয়ে নাও হে সুনন্দ। অনেক জমিই তো দেখলে। সুখেনবাবুর যখন এতই চেনাশোনা। তা হলে ঠকার ভয় নেই।

সুখেন সামনেই ছিল। একগাল হেসে বলল: আমার শালীর জন্যে জমিটা ঠিক করেছিলাম। সুনন্দ নিতে রাজি হওয়ায় আমি ওদের বলেছি জমি বিক্রি হয়ে গেছে।

ভবেশ বিজ্ঞের মত বলল: আপনারা পাঁচজন আছেন, আপনারাই তো ওকে দেখবেন।

চার হাজারেই রফা হল। রেজিস্ট্রী খরচ নিয়ে প্রায় হাজার নয়েক টাকা। বায়নার পর মাথায় হাত দিয়ে বসল সুনন্দ। ব্যাঙ্কে সারা জীবনের সঞ্চয়ের টাকা যা ছিল তা তুলে ফেললেও হাজারখানেক কম পড়বে।

কোথায় পাওয়া যায় টাকাটা ? আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ ফুটে চাইবে না সুনন্দ। আর চাইলেও যে দেবে কেউ তার সম্ভাবনাও কম। অফিস থেকে ধার নিতে পারে, কিন্তু তা হলেও সেই মাসে-মাসে কাটবে। সংসার খরচ যেখানে বাঁয়ে আনতে ডাইনে কুলোয় না, সেখানে বরাদ্দ টাকার ঘাটতি হওয়া মানেই সংকট অনিবার্য।

কিন্তু কোথা থেকে শ' পাঁচেক টাকার জোগাড় করে দিল আরতি। সুনন্দ তো অবাক হয়ে গেল। বলল: তুমি কোথায় পেলে ?

এবার একটু খোঁটা দিল আরতি: সাতজন্মে তো একটা টাকাও আমাকে দাও না। এ একেবারে আমার নিজের খাস তহবিলের টাকা। শেষ কপর্দকও বলতে পার।

বিয়ের পর বছরকয়েক মাস্টারি করেছে আরতি। সে সময় হয়ত কিছু টাকা জমিয়েছিল। মুখে আর কিছু বলল না সুনন্দ। তা হলে হয়ত অনেক কিছু শুনতে হবে। সত্যি ত্রুটি তারই। সংসার খরচের হিসেব করা টাকা ছাড়া কোনদিন সে এক-আধলাও আরতির হাতে তুলে দেয় নি।

যাক এই পাঁচশ' টাকা তার কাছে আশীর্বাদ হয়ে এল যেন। বাকি পাঁচশ' টাকা নিশ্চয়ই অফিস থেকে নেওয়া যাবে। এ যাত্রা তা হলে কোনরকমে ম্যানেজ হয়ে গেল।

রেজিস্ট্রী অফিসে করকরে নোটগুলো মালিকের হাতে তুলে দিতে গা শির-শির করছিল সুনন্দর। টাকা নয় তো দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু। তিল তিল করে সঞ্চয় করেছিল সুনন্দ। ওভারটাইম খেটে, টিউশনি করে, শখ-আহ্লাদ না করে এ টাকা তার জমান।

রেজিস্ট্রী অফিস থেকে যেন জন্মান্তর নিয়ে ফিরল সুনন্দ। এই মুহূর্ত থেকে সে একটুকরো জমির মালিক। তার নিজের জমি। এতদিন সারা পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কিছুই ছিল না।

সুনন্দর মনে হল, আজ এই মুহূর্তে তার জীবনে যে বিরাট সৌভাগ্য জন্ম নিল তার অংশীদার সবাইকে না করে পর্যন্ত তার শান্তি নেই। সমস্ত মানুষকে যেন ডেকে ডেকে তার সৌভাগ্যের কথা বলতে ইচ্ছা করল।

পথের মাঝেই দেখা তাদের অফিসের কৃষ্ণকান্তবাবুর সঙ্গে। তারই সহকর্মী। অফিস থেকে ফিরছেন।

কৃষ্ণকান্তবাবু বললেন: কি সুনন্দবাবু আজ অফিস যান নি ?

সুনন্দ বলল: না। একটা জমি রেজিস্ট্রী ছিল কি-না।

: ও, কে কিনল ? আপনি সাক্ষী বুঝি ? ওই এক ঝামেলা মশায় !

: না। সাক্ষী নয়। আমি নিজেই একটা জমি কিনলাম। একটু গর্বের সঙ্গে বলল সুনন্দ।

: আপনি ? পায়ের ধুলো দিন মশায় ? একেবারে জমিদার হয়ে বসলেন ? ভাগ্যবান পুরুষ। ভাগ্যবান পুরুষ মশায় আপনি ? আচ্ছা চলি সুনন্দবাবু।

কৃষ্ণকান্তবাবু আর কিছু না বলে চলে গেলেন। সুনন্দ ভেবেছিল ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করবেন, কি জমি, কি বৃত্তান্ত। কত দাম। সুনন্দ সব বলবে বলে তৈরি হয়েছিল। চাই কি সেই জমিটা দেখিয়েও দিতে পারত এবং মতামত জিজ্ঞাসা করত ভদ্রলোকের।

সে আশা করেছিল, কৃষ্ণকান্তবাবু বলবেন: খুব বিবেচকের মত কাজ করেছেন মশায়। জমির দাম যা হু-হু করে বাড়ছে। কিন্তু কৃষ্ণকান্তবাবুর এই আচরণ অত্যন্ত অদ্ভুত লাগল সুনন্দর।

সুখেনের বাড়ি যাবে বলে বাস ধরল সুনন্দ। রেজিস্ট্রীটা যে হয়ে গেছে এ খবরটা ওকে দিয়ে আসা দরকার। রেজিস্ট্রী অফিসে আসার কথা ছিল সুখেনের। কিন্তু ওর আর ক্যাজুয়াল লিভ পাওনা নেই অফিসে।

বাড়ি গিয়ে শুনল সুখেন ফেরে নি। বৌদি মানে সুখেনের স্ত্রী বলল: তবু ভাল ঠাকুরপো, এ বাড়িতে তোমার পায়ের ধুলো পড়ল।

সুনন্দ বলল : কেন, আমি তো মাঝে মাঝে আসি বৌদি।

: সে দরকার পড়লে। তা শুনলাম তুমি নাকি জমি কিনেছ—।

জমির কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল সুনন্দ। বলল : হ্যাঁ, বৌদি। সুখেনদাই সব ঠিকঠাক করে দিলেন। জমিটা আপনি দেখেছেন? আপনার কেমন পছন্দ হোল?

সুনন্দর এ কথার উত্তর না দিয়ে আপন মনেই সুখেনের স্ত্রী বলল : তুমিও জমি করে ফেললে। আর তোমার চেয়ে বয়সে বড় হয়ে, বেশি রোজগার করেও তোমার দাদা কিছু করতে পারল না। পাঁচ-ছটা ছেলেপুলে নিয়ে ভাড়া-বাড়িতে পড়ে আছি। সবই কপাল ভাই।

সুনন্দ মর্মাহত হল। এর দ্বারা কি বোঝাতে চান বৌদি। বৌদি কি খুশি নন? কিন্তু সুনন্দ তো ভেবে পাচ্ছে না, কেন বৌদি বললেন না, খুব খুশি হলাম ঠাকুরপো সব শুনে।

সুনন্দ বলল : আমি আজ আসি বৌদি। সুখেনদা ফিরলে বলবেন কাজটা হয়ে গেছে।

এককাপ চাও খেতে বলল না সুখেনের বৌ। সুখেন আবার বাসে উঠল। এবার যেতে হবে ভবেশের বাড়ি। ভবেশ এতক্ষণ নিশ্চয়ই ফিরেছে অফিস থেকে।

অন্যদিন সুনন্দ এলে প্রণতিই এগিয়ে আসে।

আজ অনেকক্ষণ ধরে বসে থেকে থেকেও প্রণতি এল না। তোয়ালেতে মুখ মুছতে-মুছতে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকল ভবেশ।

: তুমি অনেকক্ষণ বসে আছ দেখছি। আমি বাথরুমে ঢুকেছিলাম।

: না, তাতে কি আছে। জমিটা রেজিস্ট্রী হয়ে গেল আজ।

: তাই নাকি? বেশ, বেশ! আর কিছু বলল না ভবেশ। রেডিওটা খুলে কোন একটা স্টেশন ধরার চেষ্টা করল। তারপর নিতান্ত ব্যর্থ হয়েই যেন বলল : ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়ার টেস্টম্যাচের লেটেস্ট খবরটা জান?

সুনন্দ অপ্রস্তুতের মত ঘাড় নাড়ল।

জমির কোন প্রসঙ্গই আজ তুলল না ভবেশ। সে রাজনীতির প্রসঙ্গ পাড়ল। দুর্নীতিদমন সম্পর্কে গুলজারিলাল নন্দের অভিযান প্রসঙ্গে সুনন্দর মত জিজ্ঞাসা করল। গোল্ডওয়াটার আমেরিকাতে জিতবে কি না, এ আলোচনাও বাদ গেল না।

চা নিয়ে ঢুকল প্রণতি। বেশ একটু গম্ভীর আজ।

সুনন্দ বলল : জমিটা রেজিস্ট্রী হয়ে গেল আজ।

প্রণতি বলল : তা হলে সত্যি সত্যি জমি কিনলে সুনন্দ। আরতির সত্যিই ভাগ্য ভাল।

: তা আপনাদের আশীর্বাদে—কথাটা বলা শেষ হয় নি সুনন্দর। আরতি চলে গেল চা দিয়ে। 'আরতির ভাগ্য' কথাটার মধ্যে শ্লেষ আছে কি না তা বুঝতে পারল না সুনন্দ অথবা তার আসার আগে এ-সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কি না তাও বুঝতে পারল না। মনে হল হয়ত হয়েছে—কারণ তা না হলে ভবেশ আরও গম্ভীর হয়ে যাবে কেন।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরল সুনন্দ। ভবেশের বাড়ি থেকে সে চলে এসে পথে পথে কিছুক্ষণ ঘুরেছে। ভেবেছিল, আজ তার জীবনের সবচেয়ে সাফল্যের দিনটিকে সে প্রাণভরে সকলের সঙ্গে মিলে উপভোগ করবে। কিন্তু এই পৃথিবীর কেউ তো তার প্রাণের আনন্দের, সাফল্যের, প্রাপ্তির শরিক হতে পারল না। এই যে রাজপথে এত মানুষ তারা কেউ তার সম্পর্কে উৎসাহী নয়। এমন কি তার নিকট আত্মীয়রাও কেউ খুশিমনে আজকের দিনটিকে গ্রহণ করতে পারল না।

সবাই জেগেছিল বাড়িতে। দরজা খুলে আরতি জিজ্ঞাসা করল : ভেবে খুন হয়ে যাচ্ছি। সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছি কখন তুমি আসবে। এই কি আসার সময় হল।

সুনন্দ বলল : ভবেশদার ওখান থেকে আসছি। সুখেনদার কাছেও গিয়েছিলাম।

: কাজ হয়েছে?

: হয়েছে। আজ থেকে জমি আমাদের।

ইলেকট্রিকের কম পাওয়ারের আলোতেও আরতির মুখে খুশির ঔজ্জ্বল্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। সে বলল: যাও এখুনি। বাবা-মা তোমার জন্যে জেগে বসে আছেন। প্রণাম করে এস।

পাশের ঘরে তখনও ওঁরা জেগে বসেছিলেন। সুনন্দ প্রণাম করতেই বাবা ওকে আশীর্বাদ করলেন: আমি পারি নি। তুমি পেরেছ। তাতেই আমার গর্ব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি সুনন্দ, বাড়ি তোমার হবেই। আমার মন বলছে নিজের আশ্রয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে তুমি।

আরও অনেক রাত ধরে টেবিলের ওপর কাগজ রেখে কি আঁকজোক কাটতে লাগল সুনন্দ। আরতি বার বার ডাকতে লাগল: অনেক রাত হল, এবার ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি।

সুনন্দ বলল: আর পাঁচ মিনিট। এই দেখ না, এইটা হবে ড্রইংরুম, এইটা বেডরুম, এইটা ডাইনিং স্পেশ—

মুখটিপে হেসে আরতি বলল: গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

সুনন্দ হেসে উত্তর দিল: না হে, কাঁঠাল আর গাছে নয় কাঁঠাল পাড়া হয়ে গেছে। শুধু পাকতে যে ক'টা দিন দেরি।

স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরে আরতি বলল: বাবা কি বলে আশীর্বাদ করলেন শুনলে না। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ। সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর জান, তোমার ছেলেমেয়েরাও খুব খুশি। হ্যাঁ তখন যেন কি বলবে বলেছিলে?

সুনন্দ আরতি ও সুখেনের স্ত্রীর মন্তব্যের কথা বলবে ভাবছিল। এমন কি কৃষ্ণকান্তবাবুর কথাও। আজকের আনন্দকে সে ওদের মধ্যে জড়িয়ে দিতে পারল না। তার এই সৌভাগ্যে হয়ত সবাই ঈর্ষান্বিত কিন্তু সত্যিকারের সুখী হবার মত কাউকে পেল না।

কিন্তু বাড়ি এসে সুনন্দ ভাবল। তা না পাক তার সমস্ত পরিবারের মুখে সে হাসি ফুটিয়েছে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে তার বুড়ো বাবা-মা, স্ত্রী, তার ছেলেমেয়েরা। এদের দুর্বার আশাবাদ ও ইচ্ছাশক্তির কাছে কোন ঈর্ষা কোন অসূয়াই দাঁড়াতে পারে না। এরাই তো তার কাছে সমস্ত পৃথিবী।

আরতি আবার বলল: কি বলবে বলেছিলে, বল না?

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সুনন্দ বলল: ও কিছু না।

সাঁতার শেখার ভূমিকা

সত্যধন ঘোষাল

শৈশবে আমরা সেই ছোট্ট
পাহাড়ে চড়ে সমুদ্র দেখতাম
কেমন করে নদী গিয়ে মিশত
সাগরে আর বিরাট বিরাট
তরঙ্গের হুটোপুটি দেখে আনন্দে
উচ্ছ্বসিত হতাম।

যৌবনে প্রায়ান্ধ হয়ে গিয়ে
সেই দৃষ্টি শেষ করেছি
এখন সমস্ত ভঙ্গি নিয়ে প্রাণপণ বেঁচে যাওয়া।

ফের যদি শৈশব থেকে
আরম্ভ করা যায়
সেই রকম হাততালি দিতে দিতে
দৌড়ে যাওয়া দুরন্ত দিগন্তে
উৎকাঙ্ক্ষা।

এখন অগাধ জলে
আমি বা
আমরা
পৃথক
নির্জন।

আবেদন

শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডেকে ডেকে তোর পাই না কো সাড়া
দেখা তোর আজো মিলিল ক'ই?
মন যে মানে না, তবু মাগো তোর
ভজন হইতে বিরত নই।
জ্বলিয়া বক্ষে তীব্র অনল
সিক্ত করিয়া চরণ কমল
বুকের রক্তে, পাষাণ ফলকে
দ্বারে তোর মাগো পড়িয়া র'ই॥

পারিবি কি তুই কৃপা সম্বরি
থাকিতে পারিবি নিদয়া হ'য়ে?
পারিবি কি তুই দীন ভক্তের
অপরাধ-গ্লানি সকলি সয়ে?
আলুলিত-কেশা করালী শ্যামা-মা
কতদিন আর র'বি হেন বামা
সাধনার বলে জিনিব ও পদ
জানি তা মিলে না সাধনা বৈ॥



মার্গসঙ্গীত ও দেশীরাগ

'মহামানবের সাগরতীর'—এই ভারত সর্বধর্ম, সর্বজাতি এবং সর্বশ্রেণীর সম্মিলিত এক মহত্তোমহীয়ান কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনের মত সযত্নে ধারণ করে আছে। কি শক-হূন-দল-পাঠান-মোগল, কি আর্য-অনার্য সকলের অবদান তীর্থবারির মত সযত্নে সঞ্চিত। অনার্য বলে কাউকে ঘৃণা করে নি, পর বলে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখে নি। তাই ত' পুরাণের যুগ থেকে সুরু করে আজ অবধি একদিকে বৈদিক ঋষিবর্গের ধ্যান-ধারণা, ত্যাগ-তপস্যা ও উচ্চমনীষীপ্রসূত সংস্কৃতির ধারা, অন্যদিকে সর্বসাধারণের জীবনরস-রসিকতার নানামুখী প্রেরণার ধারা গঙ্গা-যমুনার মিলনছন্দে গ্রথিত হয়ে এক অভিনব বৈচিত্র্যময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আশ্চর্য বিকাশ সম্ভবপর করেছে। একই কারণে বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগে আর্য-অনার্য সম্মিলিত প্রতিভার এক জীবন্ত ভাস্বর রূপ পরিলক্ষিত হয়। বৈদান্তিক ও বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ভিত্তির উপর রচিত পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা, কাব্য, শিল্প ও সঙ্গীতের যে উজ্জ্বল অভ্যুদয়—তার মধ্যে অশিক্ষিত, বন্য পার্বত্যজাতির অবদান তুচ্ছ করবার বস্তু নয়।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের খবরটুকুর ওপর আমরা আলোকপাত করবার চেষ্টা করব। বৈদিকসঙ্গীত হতেই পৌরাণিক, গান্ধর্ব ও পরে মার্গসঙ্গীতের সৃষ্টি। মার্গসঙ্গীত বৈদিক ঋষিবর্গের ধ্যান-ধারণার ফলশ্রুতি—মার্গসঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই শুধু দৃঢ় নয়—এর রসাবেদন মানবচিত্তকে ঊর্ধ্বমুখী করে। কিন্তু এই গাম্ভীর্যমণ্ডিত সঙ্গীতের আবেদন যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মার্গসঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে—সাধারণ লোকও যাতে এই রসগ্রহণে বঞ্চিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ভারতীয় সুরকারগণ মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের লোকসঙ্গীত ও অনার্য-জাতির মধ্যে প্রচলিত সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে দেশীরাগের সৃষ্টি করেন। এইসব রাগগুলির নামই এদের উৎপত্তির পরিচয়বাহক।

সাধারণত দেশগত এবং জাতিগত ভিত্তিতেই এই রাগগুলির নামকরণ। আভীর বা গোয়ালাদের গানের সুর থেকে 'আহীরি'—পুলিন্দ জাতির সুর থেকে 'পুলিন্দিকা', ভীরবা জাতির সুর থেকে 'ভৈরবী' রাগের উৎপত্তি। আবার সৌরাষ্ট্র দেশের সুর থেকে 'সুরট', কর্ণাট দেশের সুর থেকে 'কানাড়া'—কলিঙ্গ দেশের সুর থেকে 'কালাংড়া', সিন্ধুদেশের সুর থেকে 'সৈন্ধবী'—ইত্যাদি এত পুরাতন রাগ দেশীসুরে গঠিত হয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মার্গসঙ্গীতের দৃঢ়সংবদ্ধ নিয়মকানুন, সুগভীর গভীরবাঁধ

সঙ্গীতজ্ঞমহলে সমাদৃত, কিন্তু এই সঙ্গীতের রস পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে যে সামান্য প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তা আহরণ করা সাধারণের পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না। তাই সাধারণ্যে প্রচলিত সুরের মিশ্রণে একে শ্রুতিমধুর করায় এই সঙ্গীতের আবেদন একদিকে যেমন সর্বজনব্যাপী হয়েছে, অন্যদিকে রাগসঙ্গীত পর্যায়ের সর্বলক্ষণ প্রয়োগ করে (যেমন আরোহী, অবরোহী, বাদী, সমবাদী, পকড় ইত্যাদি দশটি লক্ষণ) একে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মোগলযুগেও এইরূপ কয়েকটি সুন্দর রাগের গঠন পরিলক্ষিত হয়—যেমন 'তিলক কামোদ' তানসেনবংশীয় কলাকার বড়ে পিয়ার খাঁর প্রাতর্ভ্রমণকালে রন্ধনরত এক গ্রাম্যবালার ময়দা-বেলার গানের সুরগুঞ্জন শ্রুতিগোচর হয়। সেই সুরের পর্দা ছিলো সরপধগ রগস। এই সুরকেই রাগের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে তিনি 'তিলক কামোদ' রাগ সৃষ্টি করলেন। এই রাগে তিনি ধ্রুপদ-ধামার সৃষ্টি করেন, উত্তরকালে এই রাগে খেয়াল-ঠুংরীও গাওয়া হয়েছে। সিমলা পাহাড়ের সুর থেকে পিয়ার খাঁর ঘরেরই কোনো গুণী 'পাহাড়ী ঝিঁঝিঁট' রাগ সৃষ্টি করেছেন। কাম্বোজ নগরের সুর থেকে তানসেন নিজে 'খাম্বাজ' রাগ সৃষ্টি করেছেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই সকল সৃষ্টিতে কোনো জোড়াতালির ব্যাপার নেই, এগুলি নূতন রাগসৃষ্টি। দেশীরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হবার দরুণ এর আভিজাত্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। অভিজাতবংশীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনদ্বারা অপেক্ষাকৃত নিম্নকুলোদ্ভব রমণীগণ যেমন নূতন মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারিণী হন ঠিক তেমনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন রাগরূপে ভূষিত হয়ে এই দেশীয় রাগগুলিও যেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসনে সসম্মানে স্থানলাভ করেছে। হিন্দুশাস্ত্র বলে 'স্ত্রী-রত্নং দুষ্কুলাদপি' এই উক্তির কিছু পরিবর্তন করে—আমরাও বলব সঙ্গীতের মাধুর্যলোক বিস্তার করবার অধিকার আমাদের জন্মগত—সে অধিকার-উচ্চ-নীচ, আর্য-অনার্য বা দেশ-কালের সংকীর্ণ শ্রেণী-বিভাগের অপেক্ষা রাখে না।

প্রাচীন মার্গ সঙ্গীতের মত হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেও নূতন সৃষ্টির পথ সর্বদাই খোলা আছে। তবে সে সৃষ্টি সত্যিকারের সৃষ্টি হওয়া চাই। যথার্থ সৃষ্টি মানে সুরের গভীরতা গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্য যা একান্তভাবেই সঙ্গীতের মর্মগত সত্য।

বৈদিক যুগ থেকে সুরু করে আজ অবধি জাতি ও ধর্মগত ভাবধারায় যে সম্মিলিত ঐতিহ্য চলে আসছে বর্তমান তার দাম দিয়েছে। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ঘরানার সুযোগ্য উত্তরসাধক ওস্তাদ আলি আকবর খাঁন ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতের বহু সুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এলাকায় এনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতরাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেছেন। শুধু তাই নয়—কিছু কিছু ইউরোপীয় সঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের আবেদন সারা জগতে পৌঁছে দেওয়া—তাঁদের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রনন্দন, গৌরীমঞ্জরী, নটভৈঁরো, মিশ্র-মান্দ এবং আরো অনেক রাগের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের কত অভাবনীয় ভাগ্যপরিবর্তন, কত ক্ষয়-ক্ষতি, আঘাত-সংঘাত। কিন্তু কালের অবক্ষয় উপেক্ষা করে ভারতীয় সঙ্গীত আজও দাঁড়িয়ে আছে আপন উজ্জ্বল-অনাহত স্বরূপে। আর্য-ঋষিকুলের তপস্যার ধনকে এ যুগের সঙ্গীত-সাধক যেন তাঁদের সাধনার বলে আগলে রেখেছেন—সকল বিপর্যয়ের কবল থেকে। এ সাধনার দাম উত্তরকাল দেবে এই আমাদের বিশ্বাস।

—শ্রীসন্ধ্যা সেন

উত্তর কলিকাতায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসর

উত্তর কলিকাতার জগৎ মুখার্জী পার্কের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের শূন্য পূজামণ্ডপে গত ১৯শে অক্টোবর সন্ধ্যায় একটি রবীন্দ্র-সংগীতানুষ্ঠান হয়েছিল। উত্তর কলিকাতায় এই প্রচেষ্টা বোধকরি, এই প্রথম। পল্লীর পূজা-কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এই সংগীতানুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। মঞ্চসজ্জা ও শিল্পিনির্বাচন অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রধানতম শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র এই অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন। সেইজন্য অনুষ্ঠানটি অযথা আড়ম্বরবর্জিত একটি শুদ্ধ রাবীন্দ্রিক অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। পর পর সাতখানি গান গেয়ে শ্রীমতী মিত্র রবীন্দ্র-সংগীতানুরাগীদের পরিতৃপ্ত করেন। তন্মধ্যে 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে' ও 'আমার মাঝে তোমারি মায়া' বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এরপর কাজী সব্যসাচী ও আবুল কাশেম রহিমুদ্দীনের একক ও দ্বৈত আবৃত্তি শ্রোতাদের অশেষ আনন্দ দেয়। বনানী ঘোষ, সাগর সেন, পূরবী মুখোপাধ্যায় ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন। প্রত্যেকের প্রতিটি গান সুগীত হয়েছিল। সর্বশেষে আসন গ্রহণ করেন শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। গভীর রাত্রের নীরবতার মাঝে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের উদাত্ত কণ্ঠের 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' অনবদ্য হয়েছিল। প্রতিটি শ্রোতার মনেই বহুক্ষণ অনুরণিত হয়েছিল এই গানটি।

এমনি সুষ্ঠু-সুন্দর রবীন্দ্র-সংগীতানুষ্ঠান আরও হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ৩রা অক্টোবর 'সিংহগড়' ভবনে 'রাগরঙ্গের' প্রযোজনায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি মনোজ্ঞ ঘরোয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে সরোদ বাজিয়ে শোনান শ্রীপ্রণবাংশু মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অঞ্জলি সুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ইনি প্রথমে খেয়াল পরে ঠুংরী ও সর্বশেষে দাদরা পরিবেশন করেন। শ্রীমতী সুরের সুললিত কণ্ঠমাধুর্য ও নিজস্ব পরিবেশন-রীতি উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত নানকু মহারাজ এবং সারেঙ্গীতে শ্রীরামনাথ মিশ্র। সর্বশেষে শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে পণ্ডিত নানকু মহারাজ তবলায় কয়েকটি তাল বাজিয়ে শোনান। এই সুন্দর ও রুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে 'রাগরঙ্গের' কর্তৃপক্ষ তাঁদের উন্নত চিন্তাধারা ও রুচিবোধের পরিচয় দিলেন।

দীপালী নাগ ঃ কে ও কি ?

দু'টি পথ খোলা ছিল সেদিন মেয়েটির সামনে। একটি সঙ্গীতের, একটি চিত্রশিল্পের—উভয়েরই সমান আকর্ষণ। মেয়েটির নিজের পক্ষেই উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে কোনটির আকর্ষণ বেশি, কোনটির আকর্ষণ কম। এই দোটানায় দিশা হারিয়ে যায়। শেষে সঙ্গীতের পথেই পদার্পণ করল মেয়েটি এবং সেই পদক্ষেপণ তার জীবনে এনে দিল সার্থকতা, তাকে উপনীত করল যশ, প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার জগতে। মেয়েটির নাম দীপালী নাগ।

১৯২২ সালের ২২এ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিঙ-এ দীপালী নাগের জন্ম। পিতৃদেব স্বর্গীয় জীবনচন্দ্র তালুকদার ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র তালুকদারও ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ। ছেলেবেলা কাটে আগ্রায়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বারাণসী থেকে। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করলেন আই এ, প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি অধিকার করেছিলেন চতুর্থ স্থান, বি এ-তে দ্বিতীয় এবং এম এ-তে (ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য) তৃতীয় স্থান অধিকার করে ছাত্রী হিসাবে রেখেছিলেন যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর।

গানের চর্চা শুরু হয় দশ বছর বয়েস থেকে—কিছুপরেই আরম্ভ হয় ছবি আঁকা। মারাঠী ওস্তাদ সীতারামের কাছে গান শিখেছেন। আগ্রা স্কুলে অনেকেরই কাছে শিখেছেন, তবে এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সঙ্গীত-জগতের দিকপাল ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে বাড়িতে গান শেখার সৌভাগ্য তাঁর দ্বারা অর্জিত হয়েছে। বাড়িতে ফৈয়াজ খাঁকে আনিয়ে গান শেখার নিদর্শন সচরাচর মেলে না। সেইজন্যে এ দিক দিয়ে শিল্পী হিসাবে দীপালী নাগ নিঃসন্দেহে এক দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী। বশীর খান এবং তশাদ্দুক খানও গান শিখিয়েছেন শ্রীমতী নাগকে।

১৯৩৭ সালে বেতারের মাধ্যমে তিনি প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর গানের প্রথম রেকর্ড হল আনুমানিক ১৯৩৮-৩৯ সালে (মেঘ মেদুর বরষা··· গীতিকার—কাজী নজরুল)। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ-তিরিশটি হবে)। চলচ্চিত্রজগত থেকে বহুবার তিনি সুযোগ পেয়েছেন গান গাইবার, কিন্তু একবারও সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নি।

১৯৪৮ সালে তিনি ইয়োরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। সেখানে রঙ্গমঞ্চে, টেলিভিশনে ও বি বি সিতে তিনি কাজ করেছেন। ট্রিনিটি কলেজ অফ মিউসিকেও যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পূর্বেই দেশে চলে আসেন পাঠ অসমাপ্ত রেখে। বর্তমানে সাধারণ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজনে তিনি সফলতার স্পর্শ পেয়েছেন। উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের প্রসার ও সাধারণকে সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও সচেতন করে



দীপালী নাগ

তোলা। বক্তৃতার মধ্যে বৈচিত্র্য আরোপের জন্য একাধিক কণ্ঠ নিয়োগ করা হয়। 'সঙ্গীত ভারতী' সহাধ্যক্ষার আসনে বর্তমানে তিনি সমাসীনা।

১৯৫৬ থেকে '৬৩ সাল পর্যন্ত আকাশবাণীর সঙ্গে সহসঙ্গীত প্রযোজিকারূপে তিনি যুক্তা ছিলেন। বিলাতে থাকাকালীন রয়্যাল সোসাইটিতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে ইনি কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষিকা নিযুক্তা হয়েছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর একটি তথ্যবহুল ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থও বর্তমানে প্রকাশের পথে।

ভারতের অন্যতম বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক ও সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর পরিচালক ডক্টর বি ডি নাগচৌধুরীর (বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী) সঙ্গে দীপালী নাগ পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধা। তাঁদের একমাত্র পুত্র বর্তমানে খড়্গপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠরত।







লোলিতা চ্যাটার্জী
ফটো-নৃপেন দত্ত









এক অদম্য জীবন পিপাসা

আকাশ-ছোঁয়া মূল্যমান ও করভারপীড়িত আজকের মানুষ। কারুকে জীবনে সাফল্য লাভ করতে দেখলে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলবেই যে লোকটার জোর কপাল বটে, অর্থাৎ জীবনে সাফল্য লাভ করাটা যেন নিতান্তই দৈবাধীন—পুরুষকারের ভূমিকা সেখানে নিতান্তই গৌণ, কিন্তু সত্যই কি তাই? বর্তমান যুগের অন্যতম নামী চিত্রাভিনেতা কার্ক ডগলাসের জীবনকথা অন্তত আমাদের অন্য কথা শোনায়।

আমেরিকায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আরও অনেক রুশীয় বহিরাগতদের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন কার্ক ডগলাসের পিতৃপুরুষ।

এক ভাই ও ছয় বোনের বৃহৎ মিছিলের অন্যতম ছিলেন কার্ক। অত্যন্তই দরিদ্র ছিলেন তাঁরা।

বিলাসদ্রব্য জোটে না জোটার মত সখের দারিদ্র্য নয়, ক্ষুধার অন্নেও ঘাটতি পড়ত তাঁদের।

আমস্টার্ডামে বসবাস সুরু হল তাঁদের।

বহুদিন অভাব খাঁড়া উঁচিয়েছিল এই পরিবারের মাথায়, ডগলাস খবরের কাগজ বিক্রি করেছেন, ছোকরা চাকরের কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এই ধরণের আরও বহু কাজ করেছেন দারিদ্র্যপীড়িত সংসারকে চালু রাখার তাগিদে।

কিন্তু তাঁর জ্ঞানস্পৃহা দমে যায় নি, যে-কোন উপায়ে শিক্ষার সুযোগ করে নিয়েছেন তিনি।

জীর্ণ-মলিন পরিচ্ছদে প্রত্যহ স্কুলে গিয়েছেন তারই মধ্যে সময় করে এবং যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গেই বিদ্যালয়ের সব ক'টি ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছেন।

স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হলে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য ব্যাকুল হলেন কার্ক। সে সময় তাঁর সংসারের অবস্থা অবশ্য তাঁর সম্পূর্ণই প্রতিকূল ছিল, কিন্তু মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলে কথাটির বোধ হয় সত্যই অস্তিত্ব নেই, যে জন্য শেষ পর্যন্ত পূর্ণমনোরথ হলেন তিনি এক্ষেত্রেও।

স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে কলেজ-জীবনে প্রবেশ করার আগে বছরখানেক নানান কাজ করেন ডগলাস উচ্চতর শিক্ষার কড়ি যোগানোর জন্যে; এই সময় তাঁর সহোদরারাও নানান জীবিকার মাধ্যমে ভাইকে সাহায্য করার জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন; তাঁদের কাছে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল সেদিন একমাত্র ভাইকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

এই সমবেত প্রচেষ্টা বিফল হল না। যথাসময়ে কার্ক নিউ ইয়র্ক ক্যান্টনে অবস্থিত, সেণ্ট লরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইণ্টার কলেজিয়েট স্টুডেণ্ট' হিসাবে যোগদান করলেন।

কলেজের ব্যয় সঙ্কুলান করার জন্য অবসরসময়ে পরিচারকের কাজ করতেন কার্ক, কোনরকম কাজেই তাঁর আপত্তি ছিল না, আবার শুধু পড়াশোনাই নয়, খেলাধূলাতেও তাঁর ছিল সমান পারদর্শিতা।

অল্পসময়ের ভেতরেই কলেজের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়নরূপে ঘোষিত হলেন কার্ক, লেখাপড়া খেলাধূলায় সমান পারঙ্গমতা ছিল তাঁর, দিনে দিনে জনপ্রিয়তার অধিকারী হলেন, শেষে ছাত্র-সমিতির সভাপতির পদেও বৃত হলেন।

এই সময় অলক্ষ্যে এক বাসনা বাসা বাঁধল ডগলাসের হৃদয়ে, অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে সুরু করলেন তিনি।



চিনতে পারেন?—ডি সিকা পরিচালিত 'ম্যারেজ ইটালিয়ান স্টাইল'এ অভিনয়রতা সোফিয়া লোরেন

নিউ ইয়র্কে অবস্থিত 'অ্যামেরিকান এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস' নামে অভিনয় শিক্ষার যে বিখ্যাত সংস্থাটি ছিল, তাতে যোগদান করলেন 'কার্ক'। ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অনুনয় করে কিছু আয় না-বাড়া পর্যন্ত বাকি বেতনে পড়তে পাওয়ার আদেশ ও মঞ্জুর করে নিলেন সেই সময়ে।

এবার আবার জীবিকার সন্ধানে ব্রতী হলেন ডগলাস। ব্রডওয়ের সুখ্যাত ক্রাফট রেস্তোরাঁয়। পরিবেশকের কাজে নিযুক্ত হলেন তিনি, সেই সঙ্গে গ্রীনউইচের এক সমিতির অন্তর্গত শিশু-রঙ্গালয় বিভাগে নাট্য-শিক্ষকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হলেন।

শেষোক্ত কর্মের বেতনস্বরূপ তিনি চার বেলা খাওয়ার খরচটুকুই শুধু পেতেন, তার বেশি কিছু নয়।

কলেজের এক সহপাঠীর কাছ থেকে ধার করা পুরোনো জীর্ণ একটি শীতবস্ত্রে নিজেকে ঢেকে, হাড়-কাঁপানো শীতে ম্যানহাটানের পথ বেয়ে চলতেন এক সন্ধানী পথিক, চোখে যাঁর রঙীন স্বপ্নের জাল জড়ানো, প্রাণে যাঁর দুর্দম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আবার জয় হল তাঁর, এ্যাকাডেমী থেকে অভিনেতার স্বীকৃতি নিয়ে বেরিয়ে এলেন কার্ক, সার্থকতার পথে যেন কতকটা উত্তীর্ণ হলেন তিনি।

ব্রডওয়ের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ খুঁজে ফিরলেন ডগলাস, পর-পর কয়েকবার মঞ্চাবতরণের সুযোগ ঘটল, কিন্তু হায় আশানুরূপ কিছুই ঘটল না, খ্যাতি জুটল না অদৃষ্টে। বড় বড় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এসময় তিনি কল্পনা করতেন আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের; সেন্ট্রাল পার্কে দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী 'হ্যাম্পশায়ার হাউসের' দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতেন যেন ওখানকারই বাসিন্দা বনে গেছেন; ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুকোনো মান, খ্যাতি, অর্থাগম-সম্ভাবনা যেন তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ বাস্তবের রূপ নিয়েই আবির্ভূত হত তখন। কি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়, কি দারুণ উচ্চাভিলাষ।

ইতিমধ্যে তাঁর এক সতীর্থা 'মিস্ লরেন বাকল' হলিউডে চলচ্চিত্রাভিনেত্রীরূপে যোগদান করলেন।

একদিন কোন নৈশভোজ-সভায় চিত্রপরিচালক 'হল ওয়ালিসের' মুখে শোনা গেল যে, তাঁর একটি নির্মীয়মাণ চিত্রে একজন চরিত্রাভিনেতার প্রয়োজন আছে। শোনামাত্র ব্রডওয়ের সেই তরুণ ছাত্রটির মুখ মনে পড়ল 'মিস্ বাকলের', সতীর্থের জন্য সুপারিশ করলেন তিনি জোর গলায় এবং তারই ফলে কিছুদিনের মধ্যেই নতুন জীবনে প্রথম পদক্ষেপ ঘটল কার্ক ডগলাসের।

'দি স্ট্রেঞ্জ লাভ মার্থা আইভারস্' নামীয় ছবিতে 'বারবারা স্ট্যানউইকের' বিপরীতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ডগলাস।

ভূমিকাটি ছোট হলেও দর্শকের মনে সহজেই ছাপ ফেলতে সক্ষম হলেন 'কার্ক' প্রথম চিত্রাবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই।

এতদিনে পথ পেয়েছেন তিনি, পর পর কয়েকটি ছবি সাফল্য বহন করে নিয়ে এল; 'লেটার টু থ্রি ওয়াইভস' 'ওয়ালস্ অফ জেরিকো' ও 'মোর্নিং বিকামস্ ইলেক্ট্রা' এই তিনটি ছবিই এগিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে খ্যাতির পথে।

তারপর এল সেই ছবি, যাতে একলাফে যশের উত্তুঙ্গ শিখরে উপনীত হলেন 'কার্ক'। একজন স্বল্পপরিচিত প্রযোজক স্ট্যানলি ক্র্যামার মুষ্টিযোদ্ধা অবলম্বনে তুলতে প্রয়াসী হলেন, 'দি চ্যাম্পিয়ন'; যার মাধ্যমে কার্ক ডগলাস খুঁজে পেলেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটিকে।

'দি চ্যাম্পিয়নে' অবতীর্ণ হলেন কার্ক ডগলাস, সমগ্র বিশ্বের চলচ্চিত্র-প্রেমিকের মনে সাড়া পড়ে গেল, নতুন তারকার অভ্যুদয়কে সাগ্রহে অভিনন্দন জানালো ছায়াছবির আকাশ।

সহস্র সহস্র মানুষের মুখে ধ্বনিত হল তাঁর নাম, সুসজ্জিত প্রাসাদতুল্য হোটেলে নির্ধারিত হল তাঁর বাসস্থান, তাঁর স্বাক্ষর-সংগ্রহে এগিয়ে এলো স্বাক্ষর-শিকারীর দল, হাটে-ঘাটে-মাঠে অনুরাগী ভক্তবৃন্দ তাঁকে উল্লেখ করতে লাগল 'দি চ্যাম্প'—এই অভিধায়।

সফল চিত্রতারকার কর্মব্যস্ত জীবন আলিঙ্গন করল কার্ক ডগলাসকে।

সেদিন থেকে যে জয়যাত্রা সুরু হল, আজও তার গতি রয়েছে অম্লান, সাফল্য, যশ, মান, অর্থ অজস্রধারে ঝরে পড়তে লাগল তাঁর মাথায়; চলচ্চিত্রের অধ্যায়ে সংযোজিত হল এক চিহ্নিত নাম, 'কার্ক ডগলাস'। —রেবা দেবী



এই জাজ্বল্যমান চক্ষু দুটির অধিকারী কে?···চার্লটন হেস্টন
—এতৎসহ প্রকাশিত রচনা দ্রষ্টব্য

গান-বাজনার গালগল্প

সুর ধরে রাখা

কিংবদন্তী দিয়ে আরম্ভ এ গল্পের, আর কোথায় যে শেষ তা কেউ জানে না। সুর হল সাধনার বস্তু। বহু সাধ্যসাধনায় সিদ্ধসাধকের কণ্ঠে সুরলোকের সুরধুনী নেমে আসে, যেমন ভাবে স্বর্গ হতে মর্ত্যে নেমেছিল গঙ্গা। মহাদেবের জটায় আশ্রয় নিয়েছিল—না হলে মর্ত্য ভেসে যেত। সুর আশ্রয় নেয় সাধকের কণ্ঠে, হাতের যন্ত্রে—মুহূর্তে মর্ত্যের মৃত্তিকা স্বর্গের পারিজাতগন্ধে ভরপুর হয়। সুরসাধকের সঙ্গে শ্রোতাকেও আনন্দ-ধারায় পরিপ্লাবিত করে পরমুহূর্তে সেই সুর তিরোহিত হয়, থেকে যায় মূর্চ্ছনা, থেকে যায় সুরের পরশ মনের পরতে পরতে। শ্রুতিধর তারই অনুরণন তুলে আবার আবাহন করেন সুরলক্ষ্মীর। অমর্ত্যসম্ভবা সুরপরীরা মর্ত্যে নামে মাত্র, কিন্তু স্থায়িভাবে বাসা বাঁধে না, চঞ্চল পাখনায় তাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়, তাদের ধরে রাখাই দায়। স্মৃতির সুরভির মত সুরের রেশ আমাদের মনের আকাশে ভাসতে থাকে, তার আবেগমধুর আবেশের প্রতিচ্ছটা ইন্দ্রধনুর বর্ণসমারোহ বিস্তার করে, কিন্তু অশরীরী সুর মুহূর্তে নিঃসীম শূন্যে বিলীন হয়ে যায়।

তাই হরিদাস গোস্বামীর কুটিরে সম্রাট আকবরের ছদ্মবেশে গিয়ে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণের কাহিনী, তানসেনের বৈজু বাওরার সঙ্গীত-সাধনার অলৌকিক কাহিনীগুলি কিংবদন্তীর মধ্যেই বেঁচে আছে। তাঁদের গান-সুর-তান-লয় শিষ্যপরম্পরায় বর্তমান মার্গ-সঙ্গীতে এসে কি রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। দীপক রাগিণীতে আগুন জ্বলত, মেঘমল্লারে বর্ষা নামত—এ ত ছোটবেলা হতে শুনে আসছি। সেই রাগ-রাগিণীর গান যে কণ্ঠে ধ্বনিত হলে তবে ঐ সব অঘটন ঘটতে পারত, সেই কণ্ঠ কার আছে জানা নেই। শুধু তো গানের পদটি পেলে হবে না, গায়কী চাই। গায়কী পেলাম, সুর-তান-লয় বিশুদ্ধ ভাবে তালিম দিলাম—তবু যে ব্যক্তির যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তা যে একান্তভাবে তারই। কোন নির্দিষ্ট ঘরানায় তালিম নিলেই তো আদত ওস্তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সবটা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এই জন্যই দু'জন ফৈয়াজ খাঁ জন্মান না, দ্বিতীয় আব্দুল করিম-এর কল্পনাও করা যায় না।

তানসেন যে ভাবে যে গান গাইতেন সে ভাবে সে গানটি গাইলে তানসেনের গান গাওয়া হয় বটে কিন্তু তাতে কি আমরা তানসেনের নিজকণ্ঠের গান শুনবার আনন্দ পেতে পারি? সে সৌভাগ্য পেতে হলে সম্রাট আকবরের রাজসভায় উপস্থিত থাকতে হত। কিন্তু কোনও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আজ যদি শত শত বৎসর পূর্বে গাওয়া তানসেনের নিজকণ্ঠের গান ঈথার-তরঙ্গ থেকে ধরে আনা যেত তবে কি মজা হত।

শুধু গান-বাজনা নয়, মানুষের মনের চিন্তাও বিদ্যুৎ-ধর্মী, অতিচঞ্চল। ছন্দের মঞ্জীর বাজিয়ে যখন কবিতার আবির্ভাব হয়, মানুষের মনে তা-ও আসে আর চলে যায়। বারম্বার আবৃত্তি করেও আদি কবি বাল্মীকি হয়ত তাঁর রামায়ণ কণ্ঠস্থ করে রাখতে পারতেন না, যদি না তা সুরের তরঙ্গে ভাসিয়ে গানে পরিণত করে লব-কুশের কণ্ঠে তুলে দিতেন। লক্ষ লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন মহর্ষি ব্যাসদেব, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ লেখনী ধারণ করেও তার সবটা রক্ষা করতে পারেন নি। কালের করালগ্রাসে বহু শ্লোক বিনষ্ট হয়েছে, বিস্মৃত হয়েছে।



ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়—গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থানকালীন গৃহীত চিত্র

শ্রুতি আর স্মৃতি—এই ছিল মানুষের চিন্তাধারার বাহন। কানে শুনে স্মরণ করে রাখা, আবার আর একজনের কানে সে কথা-কাব্য-কাহিনী-শাস্ত্র-বচনাদি তুলে দেওয়া—গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই ছিল রীতি। ছাত্র গুরুগৃহে গিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন শ্রবণ-মনন ও স্মরণ করে করে একদিন স্মৃতিতীর্থ হয়ে ফিরে আসত। স্মার্ত রঘুনাথের কথা শোনা যায় যে, তিনি গুরুগৃহ হতে দুরূহ ন্যায়শাস্ত্র সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে এনেছিলেন এবং তার ফলেই বাংলা দেশে নব্য-ন্যায় প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানুষ যখন লিখতে শিখল তখনই সে তার মনের চিন্তা, প্রাণের আনন্দের অভিব্যক্তি স্থায়িভাবে সংরক্ষণ করে উত্তরপুরুষের হাতে তুলে দিতে পারল, তবেই কবি বলতে পারলেন—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

কবি ঠিক যে ভাষায় তাঁর কবিতাটি শতবর্ষপূর্বে বলেছিলেন এবং লিখেছিলেন, শতবর্ষ পরেও অবিকল সেই ভাষায় সেই কবিতাটি পড়া যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে কবি কি বলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ঠিক অনুরূপভাবে জানলেন কি ভাবতে পেরেছিলেন—তাঁর গান শতবর্ষ পরে ঠিক অবিকল সুরে আর কেউ শুনবে? পারেন নি, কেন না—কাব্য অক্ষয় করা সম্ভব লেখার মাধ্যমে, লিপি-সংকেতের বজ্র-বাঁধনে তাকে বাঁধা যায়। কিন্তু সুরের বেলায় লিপির বাঁধন অচল। স্বরলিপি এলো বহু পরে, তাতেও সুরের কাঠামোটা কেবল খাড়া করা যায়। সুরের, রাগ-রাগিণীর বৈয়াকরণ-বিশ্লেষণ তাতে সম্ভব। কিন্তু ব্যাকরণে যেমন কাব্যের আনন্দমূর্তি পরিস্ফুট হয় না, সেটা থাকে কবিতার অন্তরে, তেমনি স্বরলিপিতে গানের কাঠামো পেলেও তার আন্তর-রসমূর্তি সাধক শিল্পীর নিজস্ব সাধনা ব্যতীত আর কোন ভাবেই রূপ পরিগ্রহ করে না।

মনের কথা যেমন লিখে রাখা যায়, প্রাণতন্ত্রীতে যে গান গুঞ্জরণ করে ওঠে তাও কি তেমন কোন কৌশলে লিখে রাখা যায় না? কথাটা উদ্ভট শোনালেও মানুষের মাথায় এই ভাবনাও বাসা বাঁধল। সুর, যা অদৃশ্য ঈথার-সমুদ্রে ঢেউ তোলে—তাকে কি ভাবে ধরা যাবে? যাকে দেখা যায় না তাকে ধরব কেমন করে? আর যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তাকে বেঁধে রাখা যাবে কেমন করে?

পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে একটা ঢিল ছুঁড়লে তার তরঙ্গ জলের বুকে স্পষ্ট দৃশ্যমান রেখা বিস্তার করে; বাতাসে গাছের পাতা কাঁপে। গান বা বাজনাতেও এমন একটা সুর-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা আমাদের শ্রবণ-যন্ত্রের সূক্ষ্ম ঝিল্লিতে অনুরূপ কম্পন সৃষ্টি করে, তাই আমরা শুনতে পাই। কর্ণযন্ত্রের গঠন বিশ্লেষণ করে এই তত্ত্ব জানতে কষ্ট হয় নি বিজ্ঞানীদের। কিন্তু ভগবদ্দত্ত কর্ণকুহরে যে জটিল বিধি-ব্যবস্থা স্বভাবত সৃষ্টি হয়, মানুষ কি ভাবে তার অনুরূপ বা তারই কাছাকাছি কোনও যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারে, সে কথা ভাবাও এক সময়ে বাতুলতা মনে হত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা যেতে পারে, মনুষ্যসৃষ্ট শব্দধর-যন্ত্র এখন যত সূক্ষ্ম শব্দ ধরতে পারে, মানুষের নিজের কানের সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু এই কলাকৌশল একদিনে আয়ত্ত হয় নি।

গান এবং বিজ্ঞান এখানে শুধু পাশাপাশি নয়, মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। এ কথা বললেও অন্যায় হবে না যে, এযুগের কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীরা এমনভাবে যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছেন যে, যন্ত্রসাহায্য ব্যতীত তাঁদের শিল্পসাধনা লোকসমক্ষে পরিবেশনযোগ্য বিবেচিত হবে কি না সন্দেহ। এই যন্ত্রনির্ভরতা ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে যান্ত্রিক সহায়তায় শিল্পীর সাধনা অনায়াসে বহুজনমধ্যে প্রচার প্রসারে যে বিপুল ব্যাপকতা লাভ করেছে, তা অতীত যুগের কোন শিল্পীর ভাগ্যে কখনও ঘটে নি।

সুরের বিলীয়মান তরঙ্গরেখাকে চিরস্থায়ী করে রাখবার উদ্ভট কল্পনাটাও কিন্তু এসেছিল একজন কবির মনে। তিনি তাঁর কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন নি, সম্ভবত তেমন কোনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর ছিল না। তবে মোটামুটি যে কথাটি তাঁর মনে এসেছিল, তা হল সুরের তরঙ্গকে রেখায় পর্যবসিত করে সেই রেখাটি স্বয়ংক্রিয় কোন যন্ত্রসাহায্যে এঁকে রাখা, যাতে অনুরূপ রেখা হতে আবার সেই গান প্রয়োজন মত পরিস্ফুট করা সম্ভব হলেও হতে পারবে।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল চার্লস ক্রস নামক সেই অস্থিরচিত্ত কবিপ্রকৃতির মানুষটি একখানি চিঠি লিখলেন ফ্রান্সের 'আকাদামি দ্য স্যায়ান্সেস' নামক বিজ্ঞান-পরিষদে। সে চিঠিতে সুরতরঙ্গকে রেখাচিত্র ধরবার একটা প্রস্তাবিত পরিকল্পনা তিনি পেশ করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর চিঠিতে কোন গুরুত্ব দিলে না। ১৮ই এপ্রিলে লেখা চিঠি ক্রস জমা দিয়েছিলেন ৩০শে এপ্রিল, আর সেই চিঠি খোলা হল—৫ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ আট মাসের মাথায়। কিন্তু তার আগেই ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ১২ আগস্ট টমাস আলভা এডিসন আমেরিকায় ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন। [ক্রমশ।

—সন্তোষকুমার দে



● একটি অপরূপ নৃত্য ভঙ্গিমায় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠা ব্যালেরিনা মায়া পিসেৎস্কায়া

'সাধারণের সুবিধার্থে রেকর্ডের দাম কমানো উচিত'—

—সুচিত্রা মিত্র

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

'যে রবি পশ্চিমে ডুবে
নিত্য পুন উঠে পূবে,
আমাদের এ রবি সে নয়।
যে রবির পাখি মোরা
আকাশে নাহি যে জোড়া,
ডুবিলে তো হবে না উদয়

* * *

জগতে তো কত শত
কত হয় [illegible]
এ সন্ধ্যা কি না হলেই নয়?'

বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এই আকুল আকৃতি নিয়তির অমোঘ বিধানে পরিণতিতে বিফলতাই বরণ করেছিল। জগতে ভুলের নকীবের শেষ নেই, ভ্রান্তির পাহাড় চোখে পড়ে। প্রকৃতি নিয়ত কত কিছু ব্যতিক্রম ঘটে গেছে, কিন্তু এখানে যা নির্দিষ্ট তাই ঘটল। সমগ্র আকাশ চরাচরে তুলনাবিহীন সেই রবির মরজীবনের অন্তিম সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে সহস্র সহস্র মানুষের ব্যাকুল হাহাকারও রোধ করতে পারল না। ভবিতব্য অপরাজেয়। সমগ্র মরজগতের সেই সর্বনাশা দুর্যোগের দিন এবং সমগ্র অমর জগতের বহু সময়ের বহু সাধনার সিদ্ধিলগ্ন পরম শুভ মাহেন্দ্রক্ষণটি—২২এ শ্রাবণ ১৩৪৮, ৭ই অগাস্ট ১৯৪১।

ঠিক তার কুড়ি দিন পরের কথা। রবীন্দ্র-স্বপ্ন-সমৃদ্ধ শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রী-তালিকায় লেখা হল আর একটি নাম—সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়—আজকের দিনের সুচিত্রা মিত্র; রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার একটি নতুন ধারার হল সূচনা, রবীন্দ্রনাথের গানের অনুশীলনের ইতিহাসের একটি বিশেষ পরিচ্ছেদের হল শুভ উদ্বোধন।

● সুচিত্রা মিত্র



শিল্পীর মূলধন হল অনুভূতি। ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠসম্পদ যদি তাঁর আয়ত্ত হয় তাহলে সফলতার সঙ্গে হাত মেলাতে তাঁকে হতে হয় না কোন বাধার সম্মুখীন। কিন্তু, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সেইখানেই শেষ কথা নয়। সেখানে অবশেষ নয়, অশেষ। আমাদের সামগ্রিক জীবনধারা যেমন তাঁর কল্যাণে আরও বহুদূর গভীর থেকে গভীরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে, তাঁর গানের সম্বন্ধে এই একই কথা নিঃসংশয়ে প্রযোজ্য। তাই শুধু অনুভূতি, শুধু সুরজ্ঞান, শুধু তাল-লয় সম্বন্ধে দক্ষতা নয়, তার সঙ্গে চাই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবের অর্থে আর অন্তর্নিহিত বক্তব্যে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এই একমাত্র ও মুখ্য কারণেই সুচিত্রা মিত্রের নাম প্রথম শ্রেণীর রবীন্দ্র-গীতি গায়িকার তালিকায় এক বিরাট সাধুবাদের সঙ্গে উল্লেখের অধিকারী।

তাঁর সাধনাও ঐতিহ্যবিহীন নয়। সাধনার ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন প্রথমেই ছিল। [illegible] বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি [illegible] করেছেন সংস্কৃতির সুষ্ঠু [illegible]। সেই পরিবেশে পুষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর মন। বাবা [illegible] সাহিত্যিক, 'ভারতী' যুগের অন্যতম স্তম্ভ এবং বর্তমান বাংলার প্রবীণতম উপন্যাসিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যসম্রাজ্ঞী স্বর্গতা অনুরূপা দেবী সম্পর্কে সুচিত্রা মিত্রের পিসীমা।

একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে তাঁর শিল্পিজীবন ও সঙ্গীতজগৎ সম্বন্ধে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনার মধ্যে শুধু তাঁর শিল্পিমনই ধরা দেয় নি, তাঁর চিন্তাশীলতাও আলোচনার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে গানের প্রসার ঘটাতে গেলে অর্থাৎ মানুষের মনকে সঙ্গীত সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলতে হলে, তাঁদের দিকটাও সর্বাগ্রে ভেবে দেখা দরকার, তাঁদের সম্বন্ধে একটু বিশদ খবর রাখার প্রয়োজন আছে বৈকি। তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য ও প্রতিকূলতা প্রমুখ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত সবিশেষ প্রয়োজন। সেই কারণে সর্বসাধারণের অবস্থা বিবেচনা করে শ্রীমতী মিত্রের মতে রেকর্ডের দাম কমানো সর্বতোভাবে বিধেয়। সর্বসাধারণের জন্যে তাঁর এই গভীর চিন্তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

১৯২৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সুচিত্রা মিত্রের জন্ম। জন্মস্থান বাহিরবঙ্গ। তাঁর যে অমৃতনিঃস্যন্দীকণ্ঠের আজ জনপ্রিয়তার অন্ত নেই, যে কণ্ঠ রসিকচিত্ত ভরিয়ে তুলেছে কানায় কানায়, রেকর্ডের মাধ্যমে সেই কণ্ঠের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৩ সালে (মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান)। তাঁর সঙ্গীতানুশীলনের ইতিহাস অনুসন্ধান করে জানা যায় জন্মসূত্রেই একটি মধুর সুরেলা কণ্ঠ তিনি পেয়েছিলেন, ছেলেবেলায় যা শুনতেন তাই গাইতেন। রীতিসম্মতভাবে প্রথম শিক্ষালাভ করেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের

এ-যুগের মহত্তম শিল্পী শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছে।

তাঁর শান্তিনিকেতনে যোগদানের কথা আলোচনার পূর্বাহ্নেই বিবৃত হয়েছে। সেখানে তাঁর হাতেখড়ি হয় শান্তিদেব ঘোষের কাছে। শান্তিদেব ছাড়াও গুরুরূপে তিনি পেয়েছেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, অমিতা সেন প্রভৃতি। সাহচর্য পেয়েছেন অনেকেরই। তার মধ্যে একটি উজ্জ্বল নাম প্রমথ চৌধুরী। ইন্দিরা দেবীর স্মৃতি শ্রীমতী মিত্রের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইন্দিরা দেবীর অপার স্নেহের অধিকারিণী ছিলেন তিনি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়িকা হিসাবে অশেষ সাফল্যের অধিকারিণী সুচিত্রা মিত্র বাংলার অন্যান্য বরেণ্য গীতিকারদের গানেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতি স্বর্গীয় গীতিকারদের গানগুলি তাঁর কণ্ঠে নবজীবন লাভ করেছে।

বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের একটি অমর কীর্তি 'রবিতীর্থ'। সঙ্গীতচর্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম—দ্বিজেন চৌধুরী। এই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী-সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে তিন শ'-চারশ'। এঁদের বিশেষত্ব এই যে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত করতে এঁরা সহায়তা করে থাকেন। অর্থের অভাবে অনেক সম্ভাবনাময় জীবনের প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, সেই রুদ্ধদ্বার সম্ভাবনার অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে রবিতীর্থের এই ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য দুটি সুচিত্রা মিত্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়ে বহু সুধীজনের অন্তর স্পর্শে সমর্থ হয়েছে এবং সমগ্র প্রচেষ্টা আপ্লুত হয়ে গেছে প্রভূত সাধুবাদে।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করি—আধুনিক গান সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি?

তিনি বললেন—আগে আধুনিক বলতে যা বোঝাত এখন তাকে অভিহিত করা হচ্ছে 'রাগপ্রধান' আখ্যায়। আর এখন যা আধুনিক বলে আমরা শুনি তা আমার মতে—বলে একটু থামলেন শিল্পী—তারপর স্পষ্ট বললেন—হচপচ।

যে কোন গানের যথাযথ বিকাশ নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর। পরিবেশ হচ্ছে গান গাওয়ার এক মূল কথা, পরিবেশ যদি যথাযথ না-হয় তা হলে শিল্পীর ভাবলোকের অর্গল অবরুদ্ধই থেকে যায়। অনুভূতির স্পর্শে ভাবের দরজা সেখানে খোলা যায় না—এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় শিল্পীর কাছ থেকে উত্তর আসে—পরিবেশ রচনার দায়িত্ব কিন্তু প্রধানত শিল্পীরই, যিনি সার্থক শিল্পী তাঁর কণ্ঠ থেকে সুরধ্বনি নির্গত হওয়ামাত্রই পরিবেশ আপনা থেকে গড়ে ওঠে।

হাল আমলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুশীলনে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীমতী মিত্র নিঃসংশয়, কিন্তু এই সঙ্গেই একটি জিনিস লক্ষ্য করেছেন তাঁরা গানের টেকনিক্যাল অর্থাৎ কৌশলগত দিক সম্বন্ধেই যেন বেশি সচেতন, সেই জন্যেই প্রাণ সেখানে যেন অনুপস্থিত।

১৯৫১ সালে শ্রীমতী মিত্র হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানী প্রভৃতি দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেছেন। তা ছাড়া, ফরাসী ভাষার সঙ্গে তাঁর অপরিচয় অবিশ্বাস্য। বিদেশী ভাষায় গান গাওয়াতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিনী।

তাঁর সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগীবৃন্দের কাছে যে সংবাদটি সবচেয়ে আনন্দ জাগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস, সেটি হল আগামী বছর তিনি বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর উদ্দেশ্যের সাফল্য আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

● '[illegible]' নাটকে নবাগতা অভিনেত্রী
শ্রীমতী মিতা চট্টোপাধ্যায়

'সেন্সরের ভাবধারা অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে'—

—সত্যজিৎ রায়

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

আইজেনস্টাইন, বার্গম্যান, হাস্টন, ফেলিনি, ডি সিকা, হিচকক, ডি সরেন্টিস—আজকের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের মধ্যে কয়েকটি স্মরণীয় নাম। না, এ তালিকার এখানেই শেষ নয়, এই নামগুলির পাশেই সমমর্যাদায় আর একটি নাম উল্লেখিত হওয়ার সুযোগ্য দাবীদার—সেই নাম সত্যজিৎ রায়। বিশ্বের স্রষ্টাদের দরবারে আজকের লাঞ্ছনা-নিপীড়িত বাঙলার একটি উজ্জ্বল উপহার।

দোসরা নভেম্বর উনিশ শ চৌষট্টি। দক্ষিণ কলকাতার লেকের নিকটবর্তী একটি বাড়ির তিনতলায় একটি প্রশস্ত কক্ষ। বেলা এগারোটা। সূর্যের রশ্মি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে, তবে হেমন্তের সূর্য তাই তার রশ্মিতে ঔজ্জ্বল্যই অধিকতর বিদ্যমান, দাহনশক্তি নয়। ঘরের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে বিদগ্ধ শিল্পীর আঁকা একাধিক ছবি। একটি কেদারায় অধিষ্ঠিত গৃহস্বামী সত্যজিৎ রায়। পরিধানে ঢিলে ইজের, গায়ে গৈরিকবর্ণের পাঞ্জাবী, হাতে ধূমায়মান সিগারেট আর মুখে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ হাসির স্মিতরেখা।



● স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়

তাঁর নির্মীয়মাণ ছবি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। তাঁর আগামী ছবি 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ'। 'কাপুরুষ'-এর কাজ সম্পূর্ণ। 'মহাপুরুষ'-এর কাজ শেষ হচ্ছে ডিসেম্বর নাগাদ। 'কাপুরুষ'-এর চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প অবলম্বনে গৃহীত এই ছবিটির কাহিনী প্রেমকেন্দ্রিক। ছবিটির সঙ্গে কুশলী হিসাবে জড়িত আছেন সৌমেন্দু রায় (ক্যামেরা,) বংশী চন্দ্রগুপ্ত (শিল্পনির্দেশ,) দুলাল দত্ত (সম্পাদনা)।

ছবিটির আউটডোর গৃহীত হয়েছে ডুয়ার্স জলপাইগুড়ি অঞ্চলে। প্রায় অর্ধেক ছবির কাজ আউটডোরে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাময়িকভাবে বাঙলা ছবিতে আউটডোর সম্বন্ধে কথা উঠল—জিজ্ঞাসা করি, বাঙলা ছবিতে এর স্কোপ কতটা?—

শ্রীরায় উত্তর দিলেন—সেটা নির্ভর করে ছবির গল্পের উপর। তবে কৃত্রিম উপায়ে গাছপালা তৈরি বলতে গেলে তো উঠেই যাচ্ছে। এখনকার চলচ্চিত্রে সেন্সর ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু-আলোচিত বিষয়। সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাই—তাঁর মতে সেন্সর কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারা স্পষ্ট নয়, কোন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে তাঁরা কাজ করেন তা বোঝা দুষ্কর। বলতে বলতে রাজকাপুরের 'সঙ্গম' ছবিটির কথা উঠল—তিনি বললেন যদিও আমি এ ছবি দেখিনি, তবে এ ছবি সম্বন্ধে যা শুনেছি সে-ক্ষেত্রে ছবিটি যদি 'U' ছাড়পত্র পেতে পারে তা হলে 'A' আখ্যায় চিহ্নিত হবে কোন ছবি? এই ঘটনার মধ্যেই সেন্সার কর্তৃপক্ষের এক ধোঁয়াটে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া, শ্রীরায়ের মতে একটি শিল্প রসসমৃদ্ধ ছবিকে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে কাঁচি চালালে তার যে পরিমাণ রসহানি ঘটে—তা অপূরণীয়, বলতে গেলে তার আর কিছুই থাকে না। পরম্পরা হারিয়ে যায়, উপমাস্বরূপ তিনি বললেন—'লা ডলস ভিটা'র কথা—ছবিটি থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট-ব্যাপী অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল, কি থাকল ছবিটির?

আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন শ্রীরায়। মুহূর্তকাল নীরব থেকে বলতে শুরু করলেন—তবে হ্যাঁ, আজকাল দেখা যাচ্ছে সেন্সর অনেকটা রিল্যাক্সড হয়েছে এবং এর জন্যে অনেকটা দায়ী বোধ হয় ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৬৪ সালের ২৭-এ মে জওহরলাল নেহরু লোকান্তরিত হলেন। ৯ই জুন তাঁর শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভায় তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্তা হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। চলচ্চিত্র এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কার্যধারা সম্বন্ধে সত্যজিতবাবু যথেষ্ট আশাবাদী। তাঁর ধারণায় এই অল্পকালের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর কার্যক্রম যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, চিন্তাধারা এবং পরিকল্পনাদি ঠিক পথেই এগোচ্ছে এবং তা ফলপ্রসূ হবে বলেই মনে হয়। তার পরেই তিনি বললেন, বৃহৎ বক্তব্যের দোহাই দিয়ে ছবি করার থেকে নিছক আনন্দের নামে ছবি করা বরং অনেক ভাল।

আজকের দিনের নাটক সম্বন্ধে প্রশ্ন করি তাঁকে। বললেন—শোনা যাচ্ছে নাটকের মধ্যে অনেক ভাল জিনিসের সন্ধান মিলছে, এতে গতিবেগ ও প্রাণের স্পর্শের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

কথার মাঝখানে হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠায় কথার গতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার আলোচনার সুরু। জিজ্ঞাসা করি—হিন্দী ছবি দেখেন কি না! নেতিবাচক উত্তর দেন সত্যজিৎ রায়। তারপরই হেসে বলেন—এই না-দেখার মধ্যেই বোম্বাইয়ের ছবি সম্বন্ধে আমার ধারণার কোন ইঙ্গিত কি পাচ্ছেন না?

বাঙলা ছবি দেখে থাকেন সত্যজিৎ রায়। ভাল ছবি এলে তো নিশ্চয়ই। তা ছাড়া বন্ধুদের পরিচালিত ছবি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তিনি দেখে থাকেন। বন্ধুরা অর্থাৎ তপন সিংহ, মৃণাল সেন প্রভৃতি।

ভোর ছ'টা থেকে কাজ শুরু করেন তিনি। রাত বারোটা অবধি কাজ করেন। কাজের ফাঁকে ক্ষণকালের জন্যে যখন অবকাশের দেখা মেলে তাঁর আঙিনায়, সেই অবকাশ তিনি তখন ভরিয়ে তোলেন গান-বাজনা শুনে।

ভারতে আয়োজিত আসন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তাঁকে দেখা যাচ্ছে অন্যতম বিচারক হিসাবে। নভেম্বর মাসেই তিনি পাড়ি জমাচ্ছেন মোস্কোর উদ্দেশে।

পৃথিবীর বহুদেশ পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। লাভ করেছেন বিশ্বব্যাপী সমাদর ও স্বীকৃতি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার মতে পৃথিবীর কোন কোন দেশ এখন চলচ্চিত্রের দিক দিয়ে অগ্রসরশীল।

মুহূর্তকালের জন্য মৌন হলেন সত্যজিৎ রায়। নীরব স্রষ্টা আবার মুখর হলেন, বললেন—জাপানকে খুব উন্নত বলেই মনে হয়। তা ছাড়া ইটালী, ফ্রান্স এদিক দিয়ে এরাও কম বৈশিষ্ট্যের দাবীদার নয়।

আলোচনার মোড় ঘুরল। তামাম দুনিয়ার খবরাখবরের পর আলোচনা আবার ঘুরে আসে তাঁর নিজের ছবিতে। তাঁকে সেদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আপনার নিজের ছবিগুলির মধ্যে কোন ছবি বা ছবিগুলি তাঁর প্রিয়। উত্তরে বলেন—'চারুলতা' আর 'পথের পাঁচালীর' দ্বিতীয়ার্ধ"। 'অপুর সংসার' আর 'পোস্টমাস্টার' ছবি দু'টিও তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে।

সময় এগিয়ে যায়, আলোচনার সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। কথা উঠল বাঙলার রঙ্গমঞ্চের নবযুগের অবিস্মরণীয় উদ্বোধক এ-যুগের শ্রেষ্ঠ নট, প্রয়োগাচার্য, শিল্পস্রষ্টা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সম্বন্ধে। শিশিরকুমার সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের কাহিনী শোনালেন শ্রীরায়। পথের পাচালী দেখে শিশিরকুমার সত্যজিৎ রায়কে ডেকে অভিনন্দন জানান। পরিচয় আগেও ছিল। তারপর একদিন সত্যজিৎ রায় আবার যান শিশির-সান্নিধ্যে। সেদিন তাঁর মনের মধ্যে পোষিত ছিল একটি অভিপ্রায়। নটগুরুর কাছে প্রকাশ করলেন আপন অভিলাষ। তাঁর একটি ছবিতে শিশিরকুমার অভিনয় করুন, এই তাঁর ইচ্ছা—এই ইচ্ছা শিশির-সমীপে ব্যক্ত করার পর শিশিরকুমার উত্তর দিলেন—'সে তো তুমিই অভিনয় করবে, আমি আর কি করব, আমায় বাদ দাও।'

সত্যজিৎ রায়ের আগামী ছবিগুলি দেশে ও বিদেশে তাঁর খ্যাতি আরও বহুগুণ বিবর্ধিত করে ভগ্নোদ্যম হৃতসর্বস্ব বাঙালীর মনে আবার নতুন করে প্রেরণা, আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করুক, এই আমাদের কামনা।



সুমিতা সান্যাল : ছায়াছবির বাইরে

'কি এদেশে—কি ইংল্যাণ্ডে : চলচ্চিত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষণা থেকে বঞ্চিত'—

—মঞ্জু দে

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

ভারতবর্ষ তখন আগাগোড়াই শুধু পরাধীন। স্বাধীনতার আন্দোলন তার তখন অন্তিমে গিয়ে পৌঁছেছে। নির্বাসিত জীবনের পর স্বাধীনতার প্রেরণা-কল্পে আজাদ হিন্দ ফৌজের আর দেরি নেই। মাত্র কয়েক বছর আগে সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান যাত্রা করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মদিন। সেই বছর থেকেই সাড়ম্বরে সুভাষ জন্মোৎসবের সূচনা। সেই দিন যে বিরাট মিছিল চলেছিল কলকাতার দক্ষিণপ্রান্ত থেকে উত্তরপ্রান্ত অভিমুখে তা প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার নয়। সেই মিছিলে ছিল আরও একটি আকর্ষণ। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সহানুক্ত শাহনওয়াজ, ধীলন ও সায়গল।

টালিগঞ্জের বাড়িতে বসে সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক মিছিলের স্মৃতি প্রকাশ করছিলেন মঞ্জু দে। আজকের দিনের বাংলা দেশের একজন প্রতিভাময়ী ও রূপদক্ষ শিল্পী মঞ্জু দে। কিন্তু সেদিনকার সেই মিছিলের সঙ্গে মঞ্জু দে'র যোগ নিছক একজন দর্শিকা হিসাবে বলে মনে করলে ভুল করা হবে—সেই শোভাযাত্রায় তাঁর ভূমিকাও ছিল অনন্য। আই এন এর অধীনে রাণী ঝাঁসী বাহিনীর ... ছিলেন তিনি, সুতরাং এই শোভাযাত্রায় তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। তখনও তাঁর শিল্পিজীবন সূচিত হয় নি।

হেমেন গুপ্ত পরিচালিত 'ভুলি নাই' ছবিখানি খুব ভাল লেগেছিল মঞ্জু দের। তারপরেই খবর পাওয়া গেল ১৯৪২-এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে পটভূমি করে হেমেন গুপ্ত একটি চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। হেমেন গুপ্তের সঙ্গে আগেও পরিচয় ছিল। শ্রীমতী দে চিত্রাভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রাথমিক পরীক্ষাদির পর তিনিই নির্বাচিতা হলেন নায়িকার ভূমিকায়। এই সময়ে হেমেন গুপ্তের সহকারী ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা বিকাশ রায়। '৪২' মঞ্জু দের প্রথম অভিনীত ছবি হলেও প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যকার স্বর্গত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ'। কাহিনীটি চিত্রে রূপায়িত করেন চিত্রাচার্য দেবকীকুমার বসু। 'রত্নদীপ' ছবিটির মাধ্যমেই দর্শক সাধারণ মঞ্জু দে'র অভিনয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। তারপর প্রায় তের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অসংখ্য চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে পরিচয় দিয়েছেন অভূতপূর্ব চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা এবং উপনীত হয়েছেন জনপ্রিয়তার ও সাফল্যের সপ্তস্বর্গে।

রঙ্গমঞ্চে পেশাদারীভাবে তাঁর প্রথম আবির্ভাব 'তাপসী' নাটকে। ১৯৫২ সালে চলচ্চিত্র সমারোহে অভিনীত চিরকুমার সভায় নীপবালার ভূমিকায় ইনি হয়েছিলেন অবতীর্ণা। অভিনেতৃসঙ্ঘের 'মিশরকুমারী' নাটকেও ইনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই নাটকে সেদিন অংশগ্রহণকারী অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, সরযূ দেবী, সীতা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণা হন মঞ্জু দে। বয়েস তখন কুড়ি। পঠিতব্য বিষয় ছিল, বিশেষ বাংলা এবং দর্শন। 'অনার্স' ছিল বাংলাতেই। এম-এ পড়েছেন বাংলাতেই।



চিত্র পরিচালিকা—মঞ্জু দে

বাংলা দেশের চিত্র-পরিচালিকাদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়া হলেও অভিনেত্রী-পরিচালিকা হিসাবে তিনিই প্রথমা। 'স্বর্গ হতে বিদায়' ছবিটির পূর্বে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'জনা' চিত্রে রূপায়িত করার প্রস্তাব এসেছিল তাঁর কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনার পরিচালনভার গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁর পরিচালিত আগামী ছবি 'অভিশপ্ত চম্বল'।

সেদিন তাঁর সঙ্গে অভিনয় ও অভিনয়জগৎ সম্পর্কে নানা আলোচনা চলছিল। চলচ্চিত্র আজ এক বিরাট শিল্প, প্রচারের এক মহান বাহন। কলা ও বিজ্ঞানের এক সমন্বয়ক্ষেত্র।

ভারতের মত আজকের দিনের বিশ্বস্বাধীন এক রাষ্ট্রের চলচ্চিত্রনীতি কেরূপ হওয়া উচিত, তদনুরূপ নীতি কার্যক্ষেত্রে অনুসৃত হচ্ছে কি না—প্রশ্ন

কথায় শ্রীমতী দে বললেন—শোনা যায় অনেক বড় বড় পরিকল্পনার কথা, কিন্তু কাজে দেখা যায় না কিছুই। একটু থেমে বলতে থাকেন মঞ্জু দে—মোট কথা যথাযথ সংগঠন-শক্তির অভাব তার উপর…

টেলিফোন বেজে উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে আবার আমাদের আলোচনার পথে ফিরে এলেন মঞ্জু দে। বলতে আরম্ভ করলেন—তার উপর চলচ্চিত্রের গঠনমূলক দিকে তাঁদের যতটা দৃষ্টি আছে তারচেয়ে অনেক বেশি দৃষ্টি তাঁদের প্রমোদকর ইত্যাদির দিকে।

চরিত্রচিত্রণই হচ্ছে অভিনয়ের মূলকথা। অভিনেয় চরিত্রের বক্তব্য যিনি যত গভীরভাবে উপলব্ধি করে সফলতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন শিল্পী হিসাবে তিনি তত সার্থক। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে শ্রীমতী দের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—কোন ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে আপনি বেশি তৃপ্তি পান।

বলামাত্র শিল্পীর কাছ থেকে উত্তর আসে—দুরূহ জটিল চরিত্রে অভিনয় করেই আমি যথার্থ আনন্দ পেয়ে থাকি বা দৈন ব্যক্তিত্বমূলক চরিত্রও আমাকে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি দেয়। সাধারণ গতানুগতিক বৈচিত্র্যবিহীন চরিত্রে অভিনয় করার মধ্যে আমি কোন আনন্দ খুঁজে পাই না।

মঞ্জু দে সব সময়েই চেষ্টা করেন চরিত্রের মধ্যে একেবারে মিশে যেতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সরিয়ে রেখে চরিত্রকে রূপ করে তোলার ইচ্ছাই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অভিনয়ের সহজস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্যের বীজ এই মনোভাবের মধ্যেই নিহিত।

১৯৫৮ থেকে '৬০, এই দু'বছর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন মঞ্জু দে। এই সময়ে কম্যুনিস্ট দেশগুলি ছাড়া ইয়োরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন মঞ্জু দে। ইংল্যাণ্ডের অভিনয়-জগৎ সম্পর্কে বিবরণাদি জিজ্ঞাসা করি তাঁকে। প্রথমেই তিনি বললেন—সব কিছু ছাপিয়ে একটি জিনিস চোখে পড়ে Perfection. একটু নীরব থাকার পর বক্তব্যটি আরও প্রাঞ্জল করে প্রকাশ করলেন—ওখানে ছোট ছোট শিল্পীর মধ্যেও বড় হবার যে কি হবার সাধনা—তা দেখলে মন আপনা থেকে অভিভূত হয়ে যায়, ওখানে খাপছাড়া ভাবে কোন-কিছু হওয়ার উপায় নেই, যা হয় তা নিখুঁত ভাবেই হয়। সেখানে এক-একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের এক মিনিটব্যাপী এক-একটি প্রোগ্রাম দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। প্রশ্ন করি—সেখানকার চিত্রজগতের সামগ্রিক পরিস্থিতি কি রকম দেখলেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁর কাছ থেকে জানা গেল—আর্থিক দিক দিয়ে ভাল নয়। এর জন্য দায়ী টেলিভিশন। স্বভাবতই টেলিভিশনের ব্যাপকতার



● চিত্রাভিনেত্রী মঞ্জু দে

জন্যে ফিল্মকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। চিত্রগৃহগুলি তো প্রায় উঠেই যাচ্ছে। তবে মঞ্চজগৎ সম্বন্ধে তাঁর কাছে যা শুনলুম, তা চিত্রজগৎ সম্বন্ধীয় তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ড্রুরি লেনথিয়েটারে 'মাই ফেয়ার লেডী' চলেছিল আট বছর, 'মাউস ট্র্যাপ' দশ বছর চলেছে। দর্শক হিসাবে আপনি যদি টিকিটঘরের সামনে দাঁড়ান রেজিস্টারের পাতা উল্টালে যে টিকিট আপনি পাবেন তাতে দেখবেন লেখা আছে—প্রায় এক বছর পরের কোন তারিখ।

কিছুকাল আগেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের ধারণা খুব উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ছিল না। তবে, শ্রীমতী দে বলতে থাকেন—সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণা তাঁদের ভিন্ন রূপ নিচ্ছে। এখন ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাবধারা সম্বন্ধে জানার একটা প্রবল আগ্রহ তাঁদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। সে সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের প্রবল শ্রদ্ধায়।

অভিনয় ছাড়া তাঁর প্রধান সখ হল মোটরচালনা। মোটর চালনার ক্ষেত্রেও তিনি অদ্ভুত দক্ষতার অধিকারিণী মোটরযানের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম অনুরাগ অনেকের মতই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যুবরাজ ফিলিপের। শ্রীমতী দেকে তিনি জিজ্ঞাসাও করেছিলেন—'আপনি একজন অভিনেত্রী, মোটরচালনায় এত আগ্রহ আপনার হল কি করে?'

সময় এগিয়ে চলে। মধ্যাহ্নের পদধ্বনি শোনা যায়। আলোচনায় টানতে হয় যবনিকা।

মিউনিকে প্যাণ্টোমাইমের জয়যাত্রা

গতি আছে, ভাব আছে, ছন্দ আছে—নেই ভাষা। এরই নাম প্যাণ্টোমাইম। কত বিরাট বক্তব্য যে এর মাধ্যমে পরিবেশিত হয় সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বা রসিকমহলে আজ আর কোন জিজ্ঞাসা নেই। শিল্পীরা তাঁদের মূক অভিনয়ে এমন নিখুঁতভাবে বক্তব্য প্রকাশ করেন, যার ফলে ভাষার অভাব দর্শককে পীড়িত করে না। এর ইতিহাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং তথ্যবহুল।

এমন একটিই প্যাণ্টোমাইম সম্প্রদায় পৃথিবীর নানা দেশের মত গড়ে উঠল মিউনিক অঞ্চলে। গড়ে উঠল পাঁচটি সম্ভাবনাময় তরুণের অক্লান্ত সাধনায়। এঁদের সাধনা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। দল সংগঠন করে এঁরা শুরু করলেন মূক-নাট্যাভিনয়। তাঁদের প্রচেষ্টা মনে করিয়ে দেয় সেই মধ্যযুগের কথা অর্থাৎ প্রকাশ্য রাস্তায় অভিনয়ের রীতি যখন বলবৎ ছিল। গৃহনির্মিত কাষ্ঠমঞ্চে অভিনীত এই নাট্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করার জন্য দর্শকদের কোন প্রবেশ-মূল্য দিতে বাধ্য হতে হয় না, তবে অভিনয়ান্তে স্বেচ্ছায় কেউ কিছু দিলে এঁরা তা প্রত্যাখ্যানও করেন না বরং তা সাদরে গ্রহণ করেন সহৃদয় দর্শকের পৃষ্ঠপোষণার পরিচায়ক হিসাবে। দলটি ছোট হলেও তাঁদের আন্তরিকতা, অধ্যবসায় ও উদ্যম কোনটিই অল্পমূল্যের নয়।

—'স্বালা' পত্রিকার সৌজন্যে।





জার্মানীর মিউনিকে অনুষ্ঠিত মূক-অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দ। এঁদের আবির্ভাব এই প্রথম।

(এতৎসহ প্রকাশিত রচনা দ্রষ্টব্য)

টেলার নয়, বার্টন

এলিজাবেথ টেলার—পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের অগণিত নরনারী অতি ঘনিষ্ঠভাবে এই নামটির সঙ্গে পরিচিত। চিত্রসমাজে এই নামটি যে বিরাট আলোড়ন এনেছে এবং যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া জাগিয়েছে, সমকালীন ইতিহাসে তা বিরল দৃষ্টান্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই নামটি চিরতরে মুছে যেতে চলেছে। এই নাম আর দিক থেকে দিগন্তরে শোনা যাবে না। এ নাম আজ শুধু ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকবে। এলিজাবেথ ঘোষণা করেছেন, তাঁর বর্তমান স্বামী রিচার্ড বার্টনের পদবী অনুসারে তাঁকে ভবিষ্যতে 'এলিজাবেথ বার্টন' বলে অভিহিত করতে হবে। অর্থাৎ, এখন থেকে আর এলিজাবেথ টেলার নয়—এলিজাবেথ বার্টন।

সেক্সপীয়র : রুশ-মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে

শিল্পের সম্পদতার জাত নেই যেমন—নেই দেশের বাঁধন, সমাজের অর্গল, ফুলের শোভায় মুগ্ধ চোখ যেমন মনে রাখে না ফুলটার জন্ম মজা-পুকুরে কি রাজোদ্যানে, সাহিত্যও তেমনই সব গণ্ডী, সব সীমারেখা, সব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। সাহিত্যের দেশ তাই ত্রিভুবন জুড়ে আছে, সাহিত্যিকদের সব আছে নাই সব ঠাঁই।

মহাকবি সেক্সপীয়রকে তাই রাশিয়া আপন হতে আপনতর করে নিয়েছে, সগর্বে সে আজ মহাকবির এই চতুঃশততম জন্মোৎসব বর্ষে দাঁড়িয়ে দাবি করে রাশিয়া তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি।

সেক্সপীয়রের ত্রিশততম জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে বিখ্যাত রুশ-লেখক ইভান তুর্গেনেভ তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, আমরা রাশিয়ানরা সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি মহাকবি সেক্সপীয়রের পুণ্যস্মৃতিকে। সেক্সপীয়র শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে স্মরণীয় বিশিষ্ট একটি নামমাত্র নয়, তাঁর নাম আমাদের অস্তিত্বের মিশে গেছে, মিশে গেছে আমাদের রক্তধারায়, আমাদের জীবনে, কৃষ্টিতে। রুশ-মঞ্চে তাঁর নাটক অভিনীত হয় যখন, দর্শক-সারির মধ্যে দিয়ে একবার যাতায়াত করুন, তাকান তাদের মুখের দিকে, তাদের মন্তব্যগুলো শুনুন, কবির সঙ্গে দর্শকদের অন্তরের যোগসূত্রটি আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

সুদীর্ঘ এই একশত বৎসরেও তুর্গেনেভের মন্তব্যটি তেমনই অম্লান, তেমনই উজ্জ্বল আছে। বরং আরও এই একশ' বছরে মহাকবির সঙ্গে রাশিয়ার আত্মিক যোগ দৃঢ়তর হয়েছে, রাশিয়া আজ গর্বভরে দাবি করে—সেক্সপীয়র তারও দেশের কবি, প্রাণের কবি। দাবির মধ্যে অতিশয়োক্তি কিছু নেই। রুশ-মঞ্চে আজ সেক্সপীয়রের নাটকগুলি খুবই সাফল্যে নির্ভুলভাবে হয়ে দাঁড়িয়েছে, ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দিনে দিনে দৃঢ় করে তুলছে এগুলিকে, ব্যাপকতর করে তুলছে এদের প্রচার ও প্রসারকে। সেক্সপীয়রীয় নাটকের অভিনয় আজ আর মস্কোর মধ্যে কিংবা রুশ ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। রাশিয়ার শহর থেকে মফস্বলে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে সেক্সপীয়রের নাটক, বহু আঞ্চলিক ভাষায় সেগুলি অনূদিত হয়েছে।

বহু নামকরা রুশ অভিনেতা সেক্সপীয়রের নাটকের মূল সুরটি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। ঘনিষ্ঠ সাধনায় দক্ষ করে তুলেছেন নিজেদের সেক্সপীয়রের নাটকাভিনয়ে। মনোহারী অভিনয় দেশ-দেশান্তরে অতুল খ্যাতির অধিকারী করেছে তাঁদের। ইয়েরমোলোভা, ইউঝিন, মোসাখোভ, ইউঝিয়েভ, অস্টুজেভ প্রভৃতি এই জাতের প্রখ্যাত শিল্পীদের কয়েকজন।

সেক্সপীয়রীয় নাটকের অভিনয় ঐতিহ্যমণ্ডিত রুশ-মঞ্চের গৌরব বাড়িয়েছে। ১৯১৯ সালের শীতকালটাকে ওরা ভোলে নি আজও—সেই শীতকালে শত্রুসৈন্য-পরিবেষ্টিত মস্কোয় জনসাধারণের জন্য সেক্সপীয়রের ছয়টি নাটক একসংগে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত রুশ-মঞ্চে সেক্সপীয়রের জয়যাত্রা অপ্রতিহত গতিতে চলেছে।

সেক্সপীয়রের রচনার ভাবগাম্ভীর্য, বাস্তববাদ, মানবতাবোধ ও গণজীবনের সংগে তাঁর আত্মীয়তাবোধ রুশদর্শককে বিশেষ মুগ্ধ করেছে চিরদিন। রুশ-মঞ্চ সর্বদা পূর্ণ নিষ্ঠায় ঐতিহাসিক সত্য ও মূল রচনার অনুরূপতার ওপর দৃষ্টি রেখে সেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করে, এটি তার বিশেষত্ব। সেক্সপীয়রকে রাশিয়া গ্রহণ করেছে দেশ ও কাল নামক দু'টি সংকীর্ণতার অতীত বিরাট এক চিন্তানায়ক হিসেবে, কবি ও দার্শনিক হিসেবে। রুশ-দৃষ্টিভংগীতে সেক্সপীয়র তাঁর রচনায় মানব-অস্তিত্ব ও মানব-সমাজের সর্বাংগীণ উন্নতির জন্য তার মূল সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করেছেন। সেক্সপীয়রের দার্শনিকতাকে সম্যক মর্যাদা না দিয়ে ভাসা-ভাসা অগভীর মন নিয়ে তাঁর নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত করা হলে তাই রুশ-দর্শক ও সমালোচকেরা একযোগে নির্দয় সমালোচনায় লিপ্ত হন। সম্প্রতি মস্কোয় ভাখ-তাঙ্গোভ থিয়েটারে রোমিও জুলিয়েট অভিনয়ে এই



মহাকবি সেক্সপীয়র

রকম ব্যাপারই হয়ে গেছে। বিয়োগান্ত এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল নাট্য-পরিচালকদের। সমালোচকরা অভিযোগ করেছিলেন নাটকটির গভীর অর্থ পরিচালকবৃন্দ বুঝতে চেষ্টা করেন নি।

সেক্সপীয়রের নাট্য-চরিত্রগুলির মধ্যে মানব-ধর্ম যার মধ্যে যে ভাবে পরিস্ফুট, রুশ থিয়েটার তাকে মন-প্রাণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে। মানব-ধর্ম কোন-না-কোন প্রকারে লালন করছে যে, নাট্যকারের নিজের সহানুভূতিও তারই প্রতি। ইয়াগোর বিরুদ্ধে ওথেলোর পাশে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন, গোনারেল বিরুদ্ধে রাজা লিয়রের পাশে, ক্লডিয়াসের বিরুদ্ধে হ্যামলেটের পাশে। চিরঞ্জীব এই নাট্যকার বিবিধ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন পাপ কিংবা মানবীয়-দুর্বলতা মানুষের স্বভাবজাত নয়, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে তারা বাস করে, তা থেকেই নানা কার্যকারণে সাময়িকভাবে সেগুলো দুষ্টব্যাধির মত চেপে ধরে মানুষকে। মানুষের প্রকৃত পরিচয় যা এই মহাচিন্তাবিদ তাকে প্রকাশ



● হিন্দী চিত্রজগতের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শিম্মী

করেছেন হ্যামলেট-কণ্ঠে : 'how noble in reason, how infinite in faculty.'

সেক্সপীয়রের নাটকগুলির মূল সুরটিকে ধরা, তার অন্তরতম রূপটিকে উপলব্ধি করা রাশিয়াবাসীর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মস্কোয় প্রায়শই এইসব নাট্যরাজির বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা করার উদ্দেশ্যে মহতী সভার আয়োজন হয়ে থাকে। এই সব সারগর্ভ আলাপ-আলোচনায় এবং বহু মনীষীব্যক্তির চিন্তার প্রকাশে অনেকক্ষেত্রেই বহু গুরুত্বপূর্ণ সুফল ফলে, জগতের জন্য নতুন জ্ঞানের ডালা উপস্থাপিত করবার সুযোগ ঘটে।

রুশ-মঞ্চও এই একই আদর্শে ব্রতী, আজ পর্যন্ত আদর্শের বহু প্রমাণ সে রেখেছে বিশ্বের সামনে। একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না যে, পৃথিবীর বিভিন্ন মঞ্চে সাধারণতই ওথেলোকে এমন একটি মানুষ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়—ঈর্ষা যার সমস্ত চরিত্রটারই মূল। রাশিয়ায় অনেক বছর আগে আলেকজান্ডার পুশকিন লিখেছিলেন, '... y natur ... but ...' সেক্সপীয়রের মূল রচনা পদে পদে এই বিশ্লেষণকে সমর্থন জানায়। রুশমঞ্চ এ ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯৩৫ সালে মালি থিয়েটারে ওথেলো মঞ্চস্থ হয়, যখন স্বনামধন্য শিল্পী এ, ওস্তুজেভ ওথেলো চরিত্রের যে ট্র্যাজেডি ফুটিয়েছিলেন তা ঈর্ষা-বিষ-জর্জর নয়, ... ট্র্যাজেডি বিশ্বাসভঙ্গের বেদনাবিহ্বল। সেক্সপীয়রের লেখনীমুখে শেক্সপীয়র ও কুশকায়ের এই প্রেম সবযুগের সবকালের সব ভালবাসার তত্ত্বের ঊর্ধ্বে।

পরে অন্যান্য বহু অভিনেতা ওস্তুজেভের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওথেলো চরিত্রে রূপায়িত করেছেন। জর্জিয়ান অভিনেতা খোরাভা, মোসোভেট থিয়েটারের মর্ডভিনভ প্রভৃতি আরও অনেকেই ওস্তুজেভের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

ঐ '৩৫ সালেই বিখ্যাত অভিনেতা এস, মিখোয়েলস মস্কো জুইশ থিয়েটারে কিং লিয়রের অত্যন্ত বাস্তব রূপ ফুটিয়েছিলেন। আপন মনের সাজানো কারাগারে অবরুদ্ধ রাজা লিয়র...রূঢ় বাস্তবতাময় পৃথিবী তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত হ'ল ধীরে ধীরে। এ ট্র্যাজেডি প্রকৃতপক্ষে সেক্সপীয়রীয় যুগের নব জাগরিত চেতনার ট্র্যাজেডি। আধুনিক যুগের রুশ-মঞ্চ সর্বদা সানন্দায় এই ট্র্যাজেডির মূল সুরটিকে ধরতে সচেষ্ট।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সেক্সপীয়র কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়েই সীমাবদ্ধ নেই। সাইগাই প্রোকোফিয়েভের 'রোমিও ও জুলিয়েট' ব্যালেটি সারা বিশ্বের উচ্চ স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। স্টানিসলাভস্কি ও নেমিরোভিচ ডানচেনকো মিউজিক্যাল থিয়েটারে ওরানস্কির ব্যালে 'দি মেরি ওয়াইভস অব উইণ্ডসর' বহু বছর ধরে সগৌরবে চলছে। 'দি টেমিং

অব দি শ্রিউ' অনুসরণে ভিসারিয়ন সেবালিন একটি অপেরা প্রণয়ন করেছেন।

রুশ-চলচ্চিত্রও সেক্সপীয়র সম্বন্ধে উদাসীন থাকে নি। সার্গেই ইয়ুটকেভিচ 'ওথেলো' নাটকটিকে ছায়াছবির রূপ দিয়েছেন। ইয়াকোভ ফ্রিড 'টুয়েলভ্থ নাইট' চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। 'রোমিও জুলিয়েট' ও 'ওথেলো'র ব্যালে-রূপও সেলুলয়েডের বুকে বন্দী হয়েছে। 'হ্যামলেট' নাটকটির চলচ্চিত্র-রূপ দুটি ভাগে এখন সমাপ্তির পথে।



● বাগিনী মা—এ যুগের নর্তকী : মহারাণী পদ্মিনী চিত্রে শ্রীমতী ইন্দিরা।

হলিউডের সূর্য-চন্দ্র

ক্লার্ক গেবল ঃ গ্যারী কুপার

একজন এলেন টেলিফোন কোম্পানী থেকে আর একজন এলেন কার্টুন-জগৎ থেকে। মিলিত হলেন হলিউডের চিত্ররাজ্যে। অল্পকালের মধ্যে সারা পৃথিবী তাঁদের চিনল হলিউডের সূর্য-চন্দ্র হিসাবে। চিত্র-জগতের সঙ্গে যাঁদের অপরিচয় নেই, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা আমাদের সঙ্গে দ্বিমত হবেন না যে, এ-যুগের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী ক্লার্ক গেবল ও গ্যারী কুপারকে হলিউডের সূর্য-চন্দ্র বিশেষণে সম্মানিত করা অনায়াসে চলে। অত্যল্পকালের মধ্যে যে অসাধারণ শক্তির স্বাক্ষর এঁরা রাখলেন, তার ফলে পৃথিবীর চিত্ররসিক অগণিত নরনারীর অন্তরের এক গভীর অংশে চিরকালের দাবীতে এঁদের প্রভাব অঙ্কিত হয়ে গেল।



গেবলের অন্যতমা নায়িকা মিরনা লয়।

দুই দিকপাল শিল্পীর জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয় তা হল উভয়েরই জন্ম-মৃত্যু যেন একসূত্রে বাঁধা। তাঁদের উভয়েরই পৃথিবীতে আসা এবং পৃথিবী থেকে যাওয়া দুই-ই মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে।

১৯০১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী উইলিয়াম ক্লার্ক গেবলের জন্ম ওহিওর ক্যাডিজে। পাঠ সমাপ্ত করার পর প্রথমে একটি কারখানায় যোগ দেন গেবল। তাঁর মাসিক উপার্জনের অঙ্ক তখন একশ' ডলার। তারপর তেলের খনিতেও কাজ নিলেন, তারপর হলেন টেলিফোনের লাইনম্যান। চব্বিশ বছর বয়সে নাট্যশিক্ষিকা জোসেফাইন ডিলনকে বিয়ে করলেন ক্লার্ক, জোসেফাইন বয়েসে ক্লার্কের চেয়ে চোদ্দ বছরের বড়। ১৯৩০ পর্যন্ত এই বিবাহের আয়ুষ্কাল। পরের বছর টেক্সাসের সমাজ জীবনে খ্যাতিময়ী রিয়া ল্যাংহামকে পত্নীত্বে বরণ করলেন চার্লস। রিয়ার বয়েস তখন সাতচল্লিশ। এই বিবাহের পরিণতিও বিচ্ছেদ (১৯৩৫)। ১৯৩৯ সালে গেবল বিয়ে করলেন ক্যারল লম্বার্ডকে। ক্যারলই গেবলের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম। ক্যারল গেবলের জীবনের পাত্র ভরিয়ে তুলেছেন কানায় কানায়। বিমান দুর্ঘটনা ক্যারলের জীবনে অকাল যবনিকা এনে দিল। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লেডী সিলভিয়া এ্যাসলিকে বিবাহ করেন গেবল। সিলভিয়ার সঙ্গে ক্যারলের আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল লক্ষণীয়। ১৯৫৫ সালে সতের বছরের বান্ধবী কে স্প্রেকলসকে পত্নীত্বের মর্যাদা দিলেন গেবল। কে-ই তাঁর শেষ পত্নী। ১৯৬০ সালের ১৬ই নভেম্বর ৬০ বছর বয়েসে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের অবসান ঘটে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে তাঁর একমাত্র সন্তান—তাঁর ও কে-র পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তানের অভাব তাঁর সারা জীবনের বিরাট সম্মান-খ্যাতি-জনপ্রিয়তা আবৃত করে দিয়েছিল। নিয়তির পরিহাস সেই পুত্রের মুখ তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

চিত্রজগতে যোগ দেওয়ার পূর্বে তিনি যুক্ত ছিলেন হলিউডের মঞ্চরাজ্যে। ১৯২৫ সালে এক্সট্রা হিসাবে হলিউডে তাঁর যোগদান। তাঁর দ্বিতীয় চিত্র 'ফ্রি সোল' তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে খ্যাতির আসনে। ১৯৩৪ সালে তিনি অস্কার লাভ করলেন 'ইট হ্যাপেনড ওয়ান নাইট'-এ অভিনয় করে। সংখ্যাতীত চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে পোজেসড, পার্ল অফ দ্য সার্কাস, রেড ডাস্ট, নো ম্যান অফ হার ওন, মিউটিনী অন বাউন্টি, কল অফ দ্য ওয়াইল্ড, ইডিয়টস ডিলাইট, গন উইথ দ্য উইণ্ড, মোগাম্বো, টিচার্স পেট, ইট স্টার্টেড ইন নেপলস, মিসফিটস্ প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত নাম। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সময় সীমায় সে-যুগের ও এ-যুগের প্রায় সকল বিখ্যাত



ক্লার্ক গেবলের জীবনসঙ্গিনী নয়—চিত্রসঙ্গিনী

বাম থেকে দক্ষিণে : এভা গার্ডনার (মোগাম্বো) ডোরিস ডে (টিচার্স পেট) সোফিয়া লোরেন (ইট স্টার্টেড ইন নেপলস) মেরিলিন মনরো (মিসফিটস)



'ফাউণ্টেন হেড'-এর একটি দৃশ্যে গ্যারী কুপার ও প্যাট্রিসিয়া নীল



গ্যারী কুপার ও প্যাট্রিসিয়া নীল ছায়াছবির বাইরে—



গ্যারী কুপার ও অড্রে হেপবার্ন (লাভ ইন দ্য আফটারনুন-এর একটি দৃশ্যে)

অভিনেত্রীকেই তিনি লাভ করেছেন নায়িকা হিসাবে।

১৯০১ সালের ৭ই মে গ্যারী কুপারের জন্ম মণ্টানায়। পাঠ সমাপ্ত করে অঙ্কনে মনোনিবেশ করলেন। চিত্রজগতের আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন মনে মনে। সেই আকর্ষণকে অস্বীকার করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে। দৈনিক ৫ ডলার পারিশ্রমিকে গ্যারী হলিউডে যোগ দিলেন এক্সট্রা হিসাবে। তারপর সেই দিন এল, যেদিন সাড়া জাগিয়ে তুললেন সমগ্র চিত্রসমাজে। দিক থেকে দিগন্তরে ব্যাপ্ত প্রসারিত হল তাঁর নাম। ... তাঁর কর্মারম্ভ। ১৯৩৩ সালে বিবাহবন্ধনে প্রবেশ করলেন গ্যারী—তাঁর স্ত্রীর নাম ভেরোনিকা বালফ। তাঁদের একমাত্র সন্তান ম্যারিয়ার জন্ম ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। ১৯৬১ সালের মে মাসে ক্যানসাররোগে গ্যারী কুপারের ঘটনাবহুল জীবনপ্রদীপ চিরনির্বাপিত হয়।

গ্যারী অস্কার লাভ করেছেন দু'বার—১৯৪১ সালে ও ১৯৫২ সালে যথাক্রমে 'সার্জেণ্ট ইয়র্ক' ও 'হাই নুন'-এ অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ। তাঁর অভিনীত গণনাতীত চিত্রগুলির মধ্যে মরক্কো, ফেয়ারওয়েল টু আর্মস, টু ডে উই লিভ, মিঃ ডিডস্ গোস টু টাউন, লেডী এ্যাণ্ড দ্য কাউবয়, বল অফ ফায়ার, ফর হুম দ্য বেল টোলস, সারাটোগা ট্রাঙ্ক, ফাউণ্টেন হেড, ফ্রেণ্ডলি পার্স্যুয়েশান, লাভ ইন দ্য আফটারনুন, নেকেড এজ। হলিউডের গত দুই যুগের প্রায় সকল অভিনেত্রীই নায়িকা হিসাবে গ্যারীর বিপরীতে অভিনয় করেছেন।

ক্লার্ক ও গ্যারী একই সময় হলিউডে যাঁদের নাম দীপ্যমান ও আলোকিত হয়েছে—উভয়ের মধ্যে আরও দু'টি মিল আছে। উভয়েই চিত্ররাজ্যে পদার্পণ করেন ১৯২৫ সালে আর উভয়েরই রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ এক্সট্রা হিসাবে।

বর্তমান সংখ্যার এই বিভাগে বিভিন্ন নায়িকাদের সঙ্গে গেবলের ও কুপারের কয়েকটি আলোকচিত্র প্রকাশ করা হল।



মার্লে ওবেরোন ও গ্যারী কুপার (লেডী এ্যাণ্ড দ্য কাউবয়-এর এক দৃশ্যে)

চার্লটন হেস্টন : পৌরুষের প্রতীক

পুরুষের সৌন্দর্য শুধু কোমলতা, পেলবতা ও নমনীয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত তার শক্তিমত্তায়। তার শক্তির প্রকাশই সৌন্দর্যের প্রকাশের নামান্তর। শুধু আবয়বিক সুশ্রীতা, গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য আজ পুরুষের সৌন্দর্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। আজকের পৃথিবী তার সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দিচ্ছে তার বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে।

হলিউডের চিত্ররাজ্যে চার্লটন হেস্টন এমনই এক নায়ক, যাঁর চেহারার সঙ্গে রূপকথার রাজপুত্রের বা কাব্যলোকের রোম্যান্টিক নায়কের আকৃতির মিল নেই। মিল আছে—রূঢ়, কঠোর বাস্তব জীবনের উপযোগী একটি অক্লান্ত শক্তিমান বলিষ্ঠ মানুষের, যাঁর চেহারার সঙ্গে সমকালীন যুগের এক স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। ১৯২২ সালের ৪ঠা অক্টোবর পৃথিবীর আলো-জল-বাতাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। জন্মস্থান ইভানস্টোন। লেখাপড়া শেষ করেই এ-জগতে তিনি আসেন নি, ঘুরে এসেছেন ব্যবসার-জগৎ হয়ে। ফাটকার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। তারপর রঙ্গজগতে যোগ দিলেও সরাসরি চিত্রজগতে নয়। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর প্রথম মিতালি। তারপর এলেন চিত্রজগতে।

১৯৫০ সালে হলিউডের চিত্ররাজ্যে তাঁর প্রথম পদার্পণ। তারপর বহু ছবিতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়দৃপ্ত অভিনয় তাঁকে দর্শকসাধারণের হৃদয়-রাজ্যের একটি বিরাট অংশে সগৌরবে অধিষ্ঠিত করেছে।

বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান তিনি পেলেন বেন-হারে তাঁর অভূতপূর্ব চরিত্রায়ণের স্বীকৃতি স্বরূপ (১৯৫৯)। এ ছাড়া 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস' এ-ও মুসা চরিত্রে তাঁর রূপদান অবিস্মরণীয়। এই ছবি দুটি ছাড়া 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ', 'লুসি গ্যালাণ্ট', 'ডার্ক সিটি', 'গ্রেটেস্ট স্টোরি এভারটোল্ড', 'মেজর ডাণ্ডি' প্রভৃতি চিত্রেও তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। এই তালিকায় আরও দুটি সাড়া জাগানো ছবির নাম উল্লেখনীয়। ছবি দুটির নাম 'ফিফটি ফাইভ ডেস এ্যাট পিকিং' এবং 'এল সিদ'।

ব্যক্তিগত জীবনে লিডিয়া ক্লার্কের সঙ্গে তিনি পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের একমাত্র সন্তান ফ্রেসারের জন্ম হয় ১৯৫৫ সালে।

সংবাদবিচিত্রা

নয়াদিল্লী থেকে ঘোষিত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রণালয়ের ফিল্মস ডিভিশান কর্তৃক প্রযোজিত 'গুরুতর সমস্যা' শীর্ষক বংবহুল তথ্যচিত্রটি ১৯৬৪ সালের কমনওয়েলথ চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছে। এই পুরস্কারের উদ্যোক্তা হলেন রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস। বৃটেন ব্যতীত কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে বছরের শ্রেষ্ঠতম তথ্যচিত্র নির্মাণে সফলতা প্রদর্শনের জন্য এই পুরস্কার প্রদানের রীতি বিদ্যমান।

আগামী জানুয়ারী মাসে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য চলচ্চিত্র সমারোহে যোগদানকারী প্রতিযোগী চিত্রগুলির বিচারের জন্য ভারত সরকার দুটি আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী গঠন করেছেন। পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ বিচারের জন্য এগারোজন সদস্যবিশিষ্ট যে বিচারকমণ্ডলীটি গঠিত হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। বাঙলা দেশের দর্শক সাধারণ এই সংবাদে যে প্রভূত আনন্দলাভ করবেন তা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয় বিচারকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা পাঁচ। তাঁরা প্রামাণ্য চিত্রগুলি সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত।

বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে এ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গী একটি স্মরণীয় নাম। বাঙলা দেশে কবির গান, হাফ আখড়াই, তরজা প্রভৃতির যে সময়ে ব্যাপক প্রচলন ছিল, সে সময় উক্ত ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিস্মরণযোগ্য নয়। সম্প্রতি তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন অভিনেত্রী-প্রযোজিকা সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনার ভার নিয়েছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম-ভূমিকায় দেখা যাবে বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় চিত্রতারকা জয় মুখোপাধ্যায়কে।

প্যারিস থেকে ঘোষিত হয়েছে যে ফ্রেঞ্চ ন্যাশানাল সিনেমাটোগ্রাফিক সেণ্টারের উদ্যোগে সম্প্রতি যে পরিসংখ্যানকার্য পরিচালিত হয় তাতে দেখা গেছে যে, গত বৎসর এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক চলচ্চিত্র নির্মাণের কৃতিত্ব জাপানের দ্বারা অর্জিত হয়েছে। গত বৎসর জাপানে সর্বসাকুল্যে তিন শ' তেষট্টিটি ছবি নির্মিত হয়েছে। এদিক দিয়ে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতে নির্মিত ছবির সংখ্যা দু-শ' আটানব্বই।

বিপদ যে কখন কোথা দিয়ে আসে বুদ্ধি দিয়ে তার সূত্র উদ্ভাবন করা যায় না। বিপদের পদধ্বনি যে-

কোন মুহূর্তেই প্রস্তুত হতে পারে। বিপদের সম্ভাবনা স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডীর বাইরে। 'ফ্রেমস অফ প্যাইপ্রাস' ছবিটির দৃশ্য গ্রহণকে কেন্দ্র করে যে একটি বিরাট বিপর্যয় ঘটে যাবে একি পূর্বাহ্নেই নির্মাতারা মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পেরেছিলেন? অথচ ভবিতব্য খণ্ডন করা গেল না। একটি নকল যুদ্ধের দৃশ্য গ্রহণকালে পরিবেশসৃষ্টির জন্যে ধূম্রসৃষ্টিকারী বোমা ফাটানোর চেষ্টা এক নিদারুণ পরিণতি লাভ করে। এই প্রচেষ্টা এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের রূপ নেয়। অগ্নির সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখায় সমগ্র অঞ্চলকে এক বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ছবিটির প্রযোজক এবং পরিচালককে পুলিশে গ্রেপ্তার করে।

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিত্রতারকা বৌটা চিপবিন্টুই বর্তমানে ভারতে। ভারত-জার্মান যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মীয়মাণ 'আলেকজাণ্ডার এণ্ড চাণক্য' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি ভারতে এসেছেন। তাঁর বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় দেখা দেবেন প্রদীপকুমার। শ্রীমতী বৌটা মাতৃভাষা ছাড়া জার্মান ও ফরাসী ভাষাতেও পারদর্শিনী।

চিত্র-সংবাদ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে বিখ্যাত জীবনীচিত্রকার হিরণ্ময় সেনের পরিচালনায় যে ছবিটি রূপ নিচ্ছে, তার শুভসূচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইম্ফলে—এখানে যে স্থানটি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অধিকারে এসেছিল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী কৈরেং সিং। নাম-ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন [illegible]। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন বীণা রায়, বলরাজ সাহনী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] হোসেন প্রভৃতি। শেষোক্ত শিল্পী এবার [illegible] প্রমোদবিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

কঁচকাটা হীরে

প্রখ্যাত কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সান্যালের 'কাঁচকাটা হীরে' কাহিনীটির চিত্রে রূপায়ণ করবেন বিখ্যাত পরিচালক অজয় কর। নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, একটি বিশেষ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন বিকাশ রায়। আর ডি বনশাল প্রযোজিত এই ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মৃণাল সেন।

অতিথি

রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য গল্প 'অতিথি'। এই গল্পটিকে ছায়াচিত্রে রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন কবিগুরুর 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর সার্থক চিত্ররূপস্রষ্টা তপন সিংহ। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ যে এই ছবিতে পরিচালক ছাড়া সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবেও তপন সিংহের দেখা মিলবে। সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে এই ছবির মাধ্যমেই হবে তাঁর প্রথম আবির্ভাব।

শৌখীন সমাচার

মায়ামৃগ

এম, আই, সি, কালচারাল এ্যাণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব সিটি ব্রাঞ্চের (কলি) প্রযোজনায় অভিনীত হ'ল 'মায়ামৃগ' নাটক। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শিবব্রত সুর, সুধাংশুবিমল শর্মা, গৌরমোহন বসু, শিবকালী মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথ চক্রবর্তী, শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলাবতী দেবী প্রভৃতি।

পাহাড়ী ফুল

বৈষ্ণবী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হ'ল 'পাহাড়ী ফুল' নাটকটি। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন প্রবীর চক্রবর্তী, অসিত সরকার, জ্যোতির্ময় পাত্র, দিলীপ বসু, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা রায় ও মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী প্রভৃতি।



শ্রীমতী গীতা দে—ছায়াছবির বাইরে

বার্লিনের একটি নাট্য-শিক্ষালয়

● বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী
[illegible]

● বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী

● অভিনয়-শিল্প সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন
শ্রীমতী কেটি ব্রাউন

শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যাগুলির মধ্যে নাটক অন্যতম, চৌষট্টি কলার মধ্যে তার স্থান সসম্মানে নির্ধারিত। নাটক ভাব ও কল্পনা প্রকাশের এক মহান বাহন। তাই আমাদের জীবনে নাটকের মূল্য এত বিরাট ও তার প্রভাব এত গভীর। সেই কারণেই তার চর্চায় ফাঁকি দিয়ে সাফল্যলাভ করা যায় না। তার অ-আ-ক-খ না জানলে তার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন অসম্ভব। এ জন্যে প্রয়োজন গভীর অধ্যবসায়, যথেষ্ট নিষ্ঠা ও একাগ্র সাধনা। নাটকের রাজ্যে পাড়ি জমাতে গেলে এই মূলধনেরই একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর যে দিকপাল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় আমরা পেয়েছি তার পটভূমিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের দেশেও নাটকাভিনয়ের মত নাট্যসাধনার ইতিহাসও সমান গৌরবোজ্জ্বল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি অপরাজেয় শিল্পীরা নট হিসাবে যতখানি অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন নটস্রষ্টা হিসাবেও ঠিক ততখানি অনন্যতার পরিচয়ই দিতে পেরেছেন। এযুগে নাট্যশিক্ষক হিসাবে শম্ভু মিত্র, তরুণ রায়, উৎপল দত্তের খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

এ কথা অনস্বীকার্য, ভগবদ্দত্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটবেই, কোন শক্তি তাকে রোধ করতে পারে না। তবু, প্রতিটি বিষয়ের মতই নাটকের এক স্বতন্ত্র বর্ণমালা আছে, আছে তার রীতিসম্মত শিক্ষাধারা, নটকে শিক্ষার্থী হিসাবে সেই শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করতে হবে। শিখতে হবে নাটকের অ-আ-ক-খ, তবেই সিদ্ধি দেখা দেবে তাঁর সাধনার দ্বারপ্রান্তে।

বিপুলা এ পৃথিবীর দিকে চার দেওয়ালের সীমায়িত গণ্ডী অতিক্রম করে নেত্রপাত করলে দেখা যাবে যে, সর্বত্রই নাটক সম্বন্ধে আজ এক নবতর সচেতনতা এসেছে। যুগের প্রভাবও এর জন্যে নিশ্চয়ই অনেকখানি দায়ী। তারই ফলে নাট্যশিক্ষার এক [illegible] আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই রচনার আলোচ্য বার্লিনের নাট্যশিক্ষা-কেন্দ্র। ম্যাক্স রেনহার্ট জার্মান মঞ্চজগতের এক অম্লান নাম। তাঁরই নামানুসারে আলোচ্য নাট্যশিক্ষালয়ের নামকরণ হয়েছে। এখানে শিক্ষাকালের নির্দিষ্ট সময়সীমা তিন বছর। বছরে একবার ছাত্রভর্তি হয়। নাটক সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিবান কয়েকজন এই ছাত্রনির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত। নিছক অর্থোপার্জনের জন্যে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নয়। সততা, আন্তরিকতা ও গভীর নাট্যপ্রীতি এঁদের মূলধন। তাই শুধু শিক্ষাদানই এঁদের উদ্দেশ্য। তাই রেনহার্ট নিজে যখন এই শিক্ষাশালার সঙ্গে তার প্রাণস্বরূপ জড়িত ছিলেন, তখন ষাটটি আবেদনপত্রের মধ্যে আটচল্লিশটি বাতিল হয়ে যেত। এখন তিন-শ' আবেদনপত্রের মধ্যে গৃহীত হয় মাত্র চোদ্দটি। কারণ, প্রত্যেকের মধ্যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিদানের প্রয়োজন এঁরা অস্বীকার করেন না, তাই ছাত্র-ছাত্রীর



● ভাবীকালের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিভিন্ন রূপসজ্জায় সজ্জিত করা হচ্ছে

সংখ্যাধিক্য ঘটলে নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে তাঁদের শিক্ষাদানের নীতি যথাযথভাবে অনুসৃত হওয়ার পক্ষে বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সকলেই।

বিদ্যালয়টি আজ 'ম্যাক্স রেনহার্ট স্কুল অফ দ্য স্টেজ অফ বার্লিন' নামে ৩৪৩৮ ক্লে এ্যালিতে অবস্থিত। শিক্ষাদান চলে এখানে দৈনিক আট থেকে দশ ঘণ্টা। প্রয়োজনানুযায়ী কখনও স্বতন্ত্র শিক্ষাদান হয়, কখনও

● অসিচালনাও শিক্ষা দেওয়া হয়



হয় সম্মিলিত শিক্ষাদান। নাটক সম্পর্কে সর্ববিধ শিক্ষাদান ছাড়া ব্যালে, প্যান্টোমাইম, শরীর চর্চা সাহিত্য, সাঁতার, অসিচালনা, অশ্বারোহণপ্র ভৃতি সম্বন্ধেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এই বিরাট সূচী উদ্যোক্তাদের বা কার্যনির্বাহকদের সৃষ্টিধর্মী জনকল্যাণকামী মনেরই পরিচয় বহন করে।

এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছেন। সুযোগ পেয়েছেন কর্মজীবনের বৃহত্তর পটভূমিতে পদক্ষেপণের। স্বনামধন্য নাট্যবিদ ও শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থায়িভাবে শিক্ষাদাতা ও নির্দেশক হিসাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা আছেন, কেউ বা অতিথি-শিক্ষক হিসাবেও সংযুক্ত। এই তালিকায় টিলা ডুরিউ, স্বর্গতা লুসি হফলিচ, কেটে ব্রাউন কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য নাম।



● মিস্ ইউনাইটেড কিংডম (যুক্তরাজ্য-সুন্দরী): কুমারী এ্যান সিডনী (২০) সম্প্রতি বিশ্বসুন্দরী (মিস্ ওয়ার্ল্ড) নামে ঘোষিতা হয়েছেন

বর্তমান সংখ্যার 'কলা-কাকলি' বিভাগে প্রকাশিত কয়েকটি আলোকচিত্র মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় সান্যাল এবং চিত্রজিৎ ঘোষ।

সম্পাদকীয়

ক্রুশেভের প্রস্থান

এযুগে শান্তি ও সভ্যতার মূর্তিমন্ত বিগ্রহ রাষ্ট্রনায়ক কেনেডির মর্মান্তিক মৃত্যুর পর একটি বৎসর আবর্তিত হইতে না হইতেই যে ঘটনা সমগ্র শান্তিকামী পৃথিবীকে পুনর্বার আর একটি চরম আঘাত প্রদান করিল, তাহা হইল—রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশেভের আকস্মিক এবং রহস্যাভিত্তিক অপসারণ। লোভ, হিংসা ও আগুন জর্জরিত পৃথিবীর তাপদগ্ধ বক্ষে শান্তির পবিত্র বারি সিঞ্চন করিয়া তাহার মধ্যে পুনরায় স্নিগ্ধতা, শোভনতা ও লাবণ্যের সঞ্চার করার স্বপ্নে এযুগে যিনি আত্মমগ্ন ছিলেন, তিনি নিকিতা ক্রুশেভ। প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত, প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকান্তরিত—তাই এখন ক্রুশেভ সেই একমাত্র মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন যাঁহার সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পৃথিবীকে অন্ধকারের অতল গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া আলোর অমৃতলোকে প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি বহন করিত।



● রুশ-প্রধানমন্ত্রী কোশিগিন

রাজনীতি বড় জটিল। তাহার পতন-উত্থান সম্বন্ধে মুহূর্তকাল পূর্বেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না। শুধু এযুগেই নয়, চিরকালই রাজনৈতিক পথ বন্ধুর, মসৃণ নয়। তাই রাজনৈতিক নিয়মে সোভিয়েট রাশিয়ার এই পটপরিবর্তন বিস্ময় বহন করে না—যাহা করে তাহার নাম বেদনা।



● রুশ-রাষ্ট্রপতি মিকোয়ান

রাশিয়া ভারতের একটি বন্ধুরাষ্ট্র। সেই বন্ধুত্বের বুনিয়াদকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছেন ক্রুশেভ। ভারতের চরম দুর্যোগের দিনেও দেখা গিয়াছে—সাহায্য ও সমর্থনের ডালা লইয়া ক্রুশেভ বন্ধুত্বের হাতখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন ভারতের দিকে। চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধে তাঁহার সহযোগিতা বিস্মৃত হইলে অকৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ, অনগ্রসর দেশগুলিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তাদান এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মূলত এই তিনটি নীতিই ক্রুশেভ তাঁহার কর্মজীবনে অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অপসারকগোষ্ঠী তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগের ফর্দ দায়ের করিয়াছেন, তাহার আয়তনও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ব্যক্তিপূজা, স্বজন পোষণ, কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা, পশ্চিমের সহিত আপোষে ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি কম্যুনিস্ট

বিরোধী প্রেসিডেন্ট নাসেরকে 'হিরো অফ দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন' উপাধিতে ভূষিত করা প্রভৃতি তাঁহার পতনের কারণ বলিয়া অভিজ্ঞমহল মনে করেন। ইহা যদি সত্যও হয় তথাপি পৃথিবীতে তাঁহার মহান কীর্তিগুলিও ম্লান হইবার নয়। কিউবা সঙ্কটের সময় পৃথিবীকে ঘন দুর্যোগ হইতে রক্ষা করা, ক্যারিবিয়ান সঙ্কটের মীমাংসা, মস্কোর পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধের চুক্তি, সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব, বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের নিকট সনির্বন্ধ আবেদন, মহাকাশ অভিযানে তাঁহার অগ্রের সদিচ্ছা প্রমুখ কীর্তিগুলি পৃথিবীর নরনারীর স্মৃতিতে তাঁহাকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। এই কীর্তিগুলি স্মরণ করিয়া পৃথিবীর মানুষ চিরদিন তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে।

'কালের চক্র বক্র গতিতে ঘুরিতেছে অবিরত
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে কাল তারা পদানত
আজি যে সম্রাট, কালি সে বন্দী,
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী...'

ক্রুশ্চেভের প্রস্থানের অল্পকালপূর্বে রুশ রাষ্ট্রপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন শ্রী মিকোয়ান। তাঁহার প্রস্থানের পর সোভিয়েট রাষ্ট্রতরীর কর্ণধার হইলেন শ্রীকোশিগিন ও শ্রী ব্রেজনেভ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইঁহারা তিনজনেই ভারত পরিক্রমা করিয়াছেন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোশিগিন ভারত-নায়ক নেহরুর অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইঁহারা তিনজনেই ভারতের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন এবং রাশিয়ার ভারত নীতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে—সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ এই আশ্বাসও দিয়াছেন।

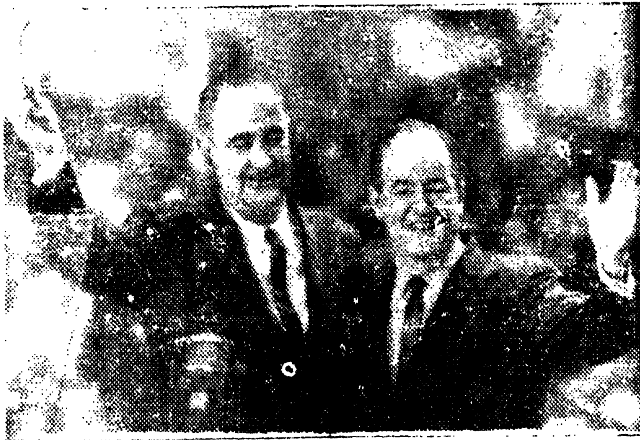
কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিখ্যাত কবিতার উপরি উদ্ধৃত অংশবিশেষ আজ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আমাদের মনে পড়িতেছে।

ভবিষ্যৎ চিরকালই অজানা। তাই ভবিষ্যতের সংবাদ আমরা দিতে অপারগ। তবে, আমাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা একাত্তর বৎসর বয়স্ক নিকিতা ক্রুশ্চেভের অবসরজীবন শান্তিপূর্ণ হোক, হোক নিরুপদ্রব, হোক বিঘ্নবিহীন।

জনসনের জয়

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সম্প্রতি পট-পরিবর্তনের যে সমারোহ পরিলক্ষিত হইতেছে, সে অবস্থায় প্রেসিডেন্ট জনসনের জয়লাভে যে কোটি কোটি চিত্তে আনন্দের তরঙ্গ জাগিয়াছে সে বিষয়ে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে না।

সময়ের হিসাবে আরও কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্ট জনসনের কার্যভার গ্রহণের একটি বৎসর পূর্ণ হইবে। সাধারণত এত অল্প সময় গুণাগুণ বিচারের পক্ষে যথেষ্ট নয় তথাপি জনসন এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কর্মদক্ষতা, অক্লান্ত উদ্যম ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং গঠনধর্মী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন তাহাকেও কোনক্রমে অকিঞ্চিৎকর বলা চলে না। বস্তুতঃ সারা পৃথিবীর আঙ্গিনায় আজ



● সাফল্যের হাসি: আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মিঃ জনসন ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ হামফ্রে

সমস্যার ব্যাপক প্রকাশ, বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত, মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ, স্বভাবতই রাষ্ট্রনায়কের চলার পথ আজ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণই, সে অবস্থায় জনসন যে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার কৃতিত্বেরই বৈজয়ন্তী।

ইংল্যাণ্ডে রক্ষণশীল সরকারের পর প্রতিষ্ঠিত হইল শ্রমিক সরকার, পাকিস্তানে চলিতেছে ঘোরতর নির্বাচনী সংগ্রাম, ভারতবর্ষে চীনের হামলা এবং পাকিস্তান-ব্রহ্ম ও সিংহলের ভারতীয়দের কেন্দ্র করিয়া নিদারুণ সমস্যা, মাও, চু-এন-লাই এবং সুকর্ণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা জল্পনাকল্পনা, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ক্রুশ্চেভের অপসারণ—বর্তমান পৃথিবীর ইহাই মোটামুটি এক আভ্যন্তরীণ চিত্র। এমতাবস্থায় জনসনের জয়লাভ নিশ্চয়ই এক আশাপ্রদ এবং সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ঘটনা।

রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচন অতি স্বাভাবিক ব্যাপার তবে এত আনন্দের পশ্চাৎপট আছে বৈকি, এই নির্বাচনের মধ্যে প্রমাণিত হইল যে আমেরিকার নরনারী আজ শান্তি চায়—সভ্যতার নীতিতে বিশ্বাসী, কেনেডির পবিত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তাই কেনেডির সার্থক উত্তরসূরী, তাঁহার ধ্বজাধারী, তাঁহার স্বপ্নের রূপদানে ব্রতী লিণ্ডন বি, জনসনের হাতেই রাষ্ট্রতরণী চালনার ভার সানন্দে তুলিয়া দিল। ইহা ছাড়াও আরও একটি বিশেষ কারণে এই নির্বাচন বিশেষত্বে বিমণ্ডিত। জনসন-লব্ধ ভোটের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমেরিকার সর্বোচ্চ রেকর্ডকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। জনসনের জয়লাভে বিশ্বব্যাপী হর্ষোল্লাসের আর একটি প্রধান কারণ, স্বয়ং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গোল্ডওয়াটার। গোল্ডওয়াটারের নীতি যে নানাভাবে বিপজ্জনক এবং শান্তিস্থাপনার প্রধান অন্তরায় তাহা আজ জলের মত স্বচ্ছ। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হইবার পর হইতেই সারা পৃথিবী এক ভয়ানক উৎকণ্ঠায় প্রহর গুণিতেছিল। ক্রুশ্চেভের বিদায়ে সেই উৎকণ্ঠা আরও তীব্র হইয়া উঠিল, শেষ অবধি সকল উৎকণ্ঠা রূপ পরিগ্রহ করিল এক পরম স্বস্তির। ক্রুশ্চেভের বিদায়ে ভারতবর্ষ এক মহান বন্ধু হারাইয়াছে, জনসন পরাজিত হইলে ভারতবর্ষ আরও একটি শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে হারাইত এবং তাহার ফল যে কি ভয়াবহ হইত, সে সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

ডক্টর লিণ্ডন বি, জনসনকে পুনরায় নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে হইবে চার বৎসর পরে। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার পৃথিবী হইতে অশান্তি দূরীকরণের, শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং কেনেডির স্বপ্নের বাস্তব রূপদানের সাধনা সর্বাংশে সফল হউক এবং তাঁহার কার্যকালে বহু নরনারীর বৃহত্তম কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধিত হউক এই কামনা জানাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

সিংকিয়াং-এ বিস্ফোরণ

৩০এ আশ্বিন ১৩৭১। ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৪। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। বিজয়াদশমীর সেই মুহূর্তটিতে বাঙলা দেশের বহু গৃহবধূ হয়তো সেই সময় শঙ্খধ্বনি সহযোগে মৃন্ময়ী প্রতিমার ওষ্ঠদেশ তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত করিয়া বরণকার্য সমাধা করিতেছিলেন। পৃথিবীর অন্য এক অঞ্চলে—বাঙলা হইতে রীতিমত দূর সিংকিয়াং প্রান্তরে সেই সময়েই সমকালীন বিশ্ব-ইতিহাসের একটি নিদারুণ অধ্যায় রচিত হইয়া গেল। তাহা যেমনই আতঙ্কের তেমনই বেদনার। চীনা পটকা নয়। চীনা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে, সিংকিয়াং-এর সারা আকাশের নীল সেই বিস্ফোরণের বিষবাষ্প আবৃত করিয়া দিয়াছে। সুদূরপ্রসারী নীল দিগন্তে আজ শুধু বিষের ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া সিংকিয়াং-এর আকাশ হইতে ব্যাপ্ত—পরিব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীর দিগ্‌-দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িল এবং কোটি কোটি নিরীহ শান্তিকামী মানুষের মনে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার করিল।

চীন এই দানবীয় ধ্বংসসাধনা শুরু করিয়াছে ১৯৫৫ সালে। এই বিস্ফোরণের ফলে সে আজ পৃথিবীর পঞ্চম পারমাণবিক শক্তি। কিন্তু ইহার পরিণাম কি? হিরোশিমা, নাগাসাকির বিস্ফোরণ যে কত কোটি কোটি নরনারীর হাসি কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের জীবন হইতে আনন্দ-গান-ছন্দ মুছিয়া দিয়াছে, তাহার পরও এশিয়ার অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র কি সাহসে বিস্ফোরণের চিন্তা করিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

পর পর দু'টি মহাযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকে সর্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছে, তাহার পর সমগ্র পৃথিবী শান্তিস্থাপনের সাধনার সর্বস্ব পণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে, সে অবস্থায় শুধু পররাজ্যলোলুপতা এবং মাৎসর্যের বশীভূত হইয়া সারা জগতের শান্তিনাশ করিতে চীন যে-পথ অবলম্বন করিতেছে তাহা আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সমাজে যাহা লাভ করিবে তাহার নাম ধিক্কার।

শান্তির জন্য আমাদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে—সে অবস্থায় এই বিশ্বব্যাপী শান্তিস্থাপন প্রচেষ্টায় যে বাধা দিতে উদ্যোগী, পৃথিবী তাহাকে কখনও ক্ষমা করিতে পারে না।

বিজ্ঞান আমাদের জীবনে ঈশ্বরের এক মহান

আশীর্বাদ। আমাদের এই বিরাট অগ্রগতি বিজ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন অপরিহার্য, কিন্তু লোভ দানবের কয়েকজন ক্রীতদাস জনকল্যাণের কার্যে তাহার প্রয়োগ না ঘটাইয়া ধ্বংসাত্মক দুষ্কার্যে তাহার প্রয়োগ ঘটাইতেছেন।

আসলে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, এই বিস্ফোরণে চীন নিজের সর্বনাশই করিল সর্বাধিক। আজ যুদ্ধ আমাদের সমাজে এক ভয়াবহ অভিশাপ বলিয়া পরিগণিত, পররাজ্য আক্রমণও অতীব কুৎসিত মনের পরিচায়ক। সারা পৃথিবীর (হয় তো দু'টি একটি দেশ ব্যতিরেকে, কিন্তু বিরাটত্বের বিচারে তাহারা অনুল্লেখ্য বলিলেও চলে) সহযোগিতা ও সমর্থন এই নিন্দনীয় কার্যের জন্য চীন যে হারাইল, সে দিক দিয়া চীনই কি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইল না?

শাস্ত্রী-বন্দরনায়ক বৈঠক

একদা যে লঙ্কার সমুদ্র প্রান্তে এক শরৎকালে ভগবান রামচন্দ্র দেবী দুর্গার অকাল-বোধন করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের মহোৎসব দুর্গাপূজার শুভসূচনা করিয়া গিয়াছেন, বর্তমানে সিংহল নামের আচ্ছাদনে আবৃত সেই লঙ্কাদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসিলেন, বর্তমান বৎসরের মহাপূজার অব্যবহিত পরেই। বিজয়ার পর ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য অতিথি। নিছক ভ্রমণের বা অবকাশ যাপনের উদ্দেশে সিংহলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক ভারতে আসেন নাই। তাঁহার ভারত আগমনের পশ্চাতে আছে এগার লক্ষ চল্লিশ হাজার নরনারীর ভবিষ্যৎ-নির্ধারণের প্রশ্ন। এই এগার লক্ষ চল্লিশ হাজার নরনারী সিংহলবাসী ভারতীয়। দূর অতীতে প্রধানত দক্ষিণ-ভারত হইতে যে শ্রমিক সম্প্রদায় কর্মব্যপদেশে সিংহল গিয়াছিলেন, সময়ের ব্যবধানে তাঁহাদেরই বংশ বংশ আজ এই সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে, দীর্ঘকালের পটভূমিতে নামে এবং পরিচয়ে আজ তাঁহারা ভারতীয় হইলেও আচারে, ব্যবহারিক জীবনে তাঁহারা সর্বতোভাবে সিংহলী। সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলের জল, বাতাস, সমাজ তাঁহাদের মজ্জায় মজ্জায় মিলিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে সিংহলী করিয়া তুলিয়াছে। আজ ভাগ্য-দেবতা তাঁহাদেরই প্রতি বিরূপ হাসি হাসিলেন, মূল সিংহলীদের নিকট আজ তাঁহারা বোঝা। তাঁহারা অবাঞ্ছিত। আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, সাধারণ মনুষ্যত্ব বোধটুকুও কি ইহাদের চরিত্র হইতে অন্তর্হিত হইল, না হইলে ইহারা কেমন করিয়া ভুলিল যে, আধুনিক সিংহলের রূপায়ণে ও সমৃদ্ধিসাধনে এই হতভাগ্য অনাদৃত ভারতীয়দের পূর্বপুরুষদের অবদান যেমনই ব্যাপক তেমনই বিরাট। সাধারণ কৃতজ্ঞতার প্রশ্নও কি আজ উঠিতে পারে না? ১৯২২ সালে উদ্ভূত এই সমস্যাই আজ এক বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে।

শ্রীমতী বন্দরনায়ক এখানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত ইহাদেরই ভাগ্যনির্ধারণের জন্য এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। পাঁচ-ছয় দিনব্যাপী এই বৈঠকে যাহা স্থির হইল তাহার দ্বারা সমস্যার মূলোৎপাটন না হইলেও কথঞ্চিৎ সমাধান নিশ্চয়ই হইবে। মীমাংসা যাহা হইল তাহাতে নানাপ্রকার সর্তাদি আরোপিত। কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রহীন সিংহলের নাগরিকত্ব পাইবে আর কিছুসংখ্যক ভারতে আসিবে, তবে সংখ্যা আধিক্য ভারতের দিকেই। অধিবেশন এখানেই সম্পূর্ণও নয়, আরো কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রহারা অবশিষ্ট রহিল। কলম্বোয় অনুষ্ঠিতব্য শাস্ত্রী-বন্দরনায়ক বৈঠকে তাহাদের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে।

এখন পরিকল্পিত বৈঠকে কি স্থির হইবে তাহা আমাদের জানা নাই, তাই সে সম্পর্কে এখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না, তবে অনুষ্ঠিত বৈঠকের আলোকে দেখা যায় যে সিংহল বহুসংখ্যক ভারতীয়দের ভার (?) হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল, কিন্তু ভারত?—প্রথমত ভারতের অখণ্ডতা আজ নাই। ভারত বিভক্ত। দ্বিতীয়ত পাকিস্তান ও ব্রহ্ম হইতে দলে দলে আগত বাস্তুহারাদের সমস্যা, তদুপরি ইহারা। তথাপি ইহারা আমাদেরই স্বদেশীয়, ইহাদের প্রতি আমাদের নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা অচেতন নই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মূল বক্তব্য যে, দিল্লী বৈঠকটি যেভাবে আলো-আঁধারি খেলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইল আগামী কলম্বো বৈঠকটিতে যেন এই প্রকার 'টাগ-অফ-ওয়ার' না হয়। অবশিষ্টদের সম্বন্ধে যেন বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় ও তাহাদের ভবিষ্যৎ লইয়া যেন অকারণে ছিনিমিনি খেলা আর না হয়।

দিল্লী বৈঠকটি আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে না পারিলেও কথঞ্চিৎ তৃপ্তি দিয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞ রাষ্ট্র-নায়কগণকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিই যে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্যার সৃষ্টি—অস্পষ্টতার ও অস্বচ্ছতার পটভূমিতে তাহার সমাধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

॥ শোক-সংবাদ ॥

গত ২৭এ আশ্বিন দেবীপক্ষ সপ্তমীর দ্বিতীয় দিবসে ৭৫ বছর বয়সে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম স্তম্ভ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর তিরোধান ঘটেছে। তাঁর রচিত তিন খণ্ডে 'মহাস্থবির জাতক' বাঙলা ভাষায় লিখিত একখানি অসামান্য গ্রন্থ। এ ছাড়াও একাধিক গ্রন্থ ও অজস্র সারবান ছোট গল্পের তিনি সার্থক রচয়িতা। শিশু-সাহিত্যেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। 'বেতার জগৎ' পত্রিকাটি সর্বপ্রথম তাঁরই সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের সঙ্গেও এককালে তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ইহুদী-কী-লেড়কী, দেনাপাওনা, কপালকুণ্ডলা প্রমুখ বহুচিত্রের পরিচালন দায়িত্ব তিনি দক্ষতাসহ পালন করেন। অভিনেতারূপেও রূপালী পর্দায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বিখ্যাত কবি গোলাম মোস্তাফা গত ২৭শে আশ্বিন ৬৭ বছর বয়সে ঢাকায় লোকান্তরিত হয়েছেন। অবিভক্ত বাঙলার সাহিত্যসমাজে তিনি ছিলেন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 'হাসনাহানা', 'রক্তরাগ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁর কবিপ্রতিভার অন্যতম পরিচায়ক।

বাঙলা দেশের ভয়াবহ পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন গত ৫ই কার্তিক ৭১ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান নাজিমুদ্দীন দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও গভর্নর জেনারেলের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিল।

পশ্চিম বাঙলার অন্যতম ভূতপূর্ব মন্ত্রী রাধাগোবিন্দ রায় গত ১৩ই কার্তিক ৭৫ বছর বয়সে বিষ্ণুপুরে পরলোকগমন করেছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্যে বহুবার ইনি কারাবরণ করেন। ইনি বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা—অধ্যক্ষ ও বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ থেকে '৫৭ সাল পর্যন্ত ইনি খণ্ড-জাতীয় কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রিপদে সমাসীন ছিলেন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক অশ্বিনীকুমার গুপ্ত গত ১৮ই কার্তিক ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পরলোকযাত্রা করেছেন। সাংবাদিক হিসাবে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন এবং এ যুগের সাংবাদিক জগতে একটি প্রথম শ্রেণীর আসন তাঁর জন্য সসম্মানে নির্ধারিত ছিল। দেশের ছাত্র ও যুব আন্দোলনেও ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার দায়ে একাধিকবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। মৃত্যুকালে দিল্লীতে আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, বিউরোর প্রধানের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক ইন্দ্রকুমার চৌধুরী গত ২০এ কার্তিক ৮২ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। একাধিক সংবাদপত্রে অতীব দক্ষতা সহকারে ইনি সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বাঙলা সর্টহ্যাণ্ডের প্রবর্তক মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি উক্ত বিষয় শিক্ষা করেন ও পরে নিজেও তার বহুল উন্নতি সাধন করেন এবং বাংলা সর্টহ্যাণ্ডের এক নবতর ধারার স্রষ্টারূপে স্বীকৃতিলাভ করেন।

বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী অধুনা পাকপাড়া বাসিন্দা রাজেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় ৮৭ বছর বয়সে গত ৮ই কার্তিক লোকান্তর যাত্রা করেছেন। অমায়িকতা, সদালাপিতা এবং বন্ধুবাৎসল্য প্রমুখ মহৎ বৃত্তিগুলি তাঁকে যথেষ্ট জনপ্রিয়তায় বিভূষিত করেছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় স্বর্গত সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র বরোদার সরকারী সংগ্রহশালার প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বর্গত সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী তনুজা দেবী গত ৯ই কার্তিক তাঁর অনুজ শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে ৬৭ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। সাহিত্য ও শিল্পকলায় তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। রন্ধন ও বয়নশিল্পে তিনি ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শিনী। 'পাচামশেলী' ও 'বুনন' গ্রন্থদ্বয় উক্ত বিদ্যা দুটিতে তাঁর দক্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[... লিমিটেড • কলিকাতা ১৬৬এ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, 'চারণ' এই শিরোনামায় প্রখ্যাত কবি শ্রীবিষ্ণু দে ও খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলাম। কিন্তু বিষ্ণু দে ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয় না কেন? এই সাহিত্যিকদ্বয়ের লেখা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন কি? লেখক প্রাণতোষ ঘটকের নিকট হইতে একটি উপন্যাস অনেকদিন যাবৎ আশা করিতেছি। 'মুক্তকণ্ঠ'র মত বড় গল্প নয়, একটি ধারাবাহিক বড় উপন্যাস চাই। শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়ের 'নাগকর্ণী' রহস্যমূলক রচনা। প্রত্যেকবার কৌতূহল যে এক দিন পূর্বে দেখিনি না। সম্পূর্ণ নূতন স্টাইলে রচিত শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তীর 'লক্ষ্মী' ধারাবাহিক উপন্যাসটি আমার নিকট বর্তমানে মাসিক বসুমতীর সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। এই নূতন (?) লেখিকাকে প্রশংসা করিবার উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে এই লেখিকা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রীমতী চক্রবর্তী যথার্থই আপনার এক দুর্লভ আবিষ্কার। প্রার্থনা করি, আপনার যোগ্য সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক। ইতি—পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, জুবলী পার্ক, টালীগঞ্জ।

মহাশয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে এই পত্রখানি লিখছি। আজকালকার দিনে নামকরা মাসিক পত্রিকা বলতে একমাত্র আপনার বসুমতীকেই বোঝায়। আমার 'বাপি-সোনা' (বাবাকে আমি বাপি-সোনা বলেই ডাকি) পত্রিকা প্রকাশ হলেই একখানা করে বাড়িতে আনেন, আর আমি তার পাতা উল্টে উল্টে দেখি। প্রথমে দেখি 'আলোকচিত্র', তারপর 'চারণ'—ক্রমশঃ বইয়ের পাতার মধ্যে ঢুকে পড়ি। এখন আমি আলোকচিত্র সম্বন্ধেই কিছু বলব। সেটা হচ্ছে 'কলসী কাঁকে' নিয়েই লেখা। মেয়েরা, মায়েরা (গ্রামের মেয়েদের কথাই বলব—কারণ শহরের বাসিন্দা মেয়েরা খুবই কম কাঁকে কলসী নেন) সাধারণত বাঁ-কাঁকেই কলসী নিয়ে থাকেন। কোথাও আবার মাথার ওপর বসিয়ে কলসী নিয়ে যাবার রেওয়াজ বা চলন আছে। কিন্তু ডান কাঁকে কলসী নিয়ে যাবার চলন ত কই চোখে পড়ে না। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'আলোকচিত্র' নিম্নে দিলুম। মাস ও সন সবই দিয়ে দিলুম। কষ্ট স্বীকার করে মিলিয়ে নিয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করলে আমি আমার ভুল শুধরে নিতে পারব এবং চিরকৃতজ্ঞ থাকব। পরিশেষে আপনাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং মাসিক বসুমতীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আপাততঃ এখানেই লেখনী বন্ধ করলাম।

সংগৃহীত আলোকচিত্র-তালিকা

মাসিক বসুমতী ফাল্গুন ১৩৬৭ কলসী কাঁকে 'সন্ধ্যাতারা'
" " আষাঢ় ১৩৬৬ " 'মায়া'
" " ভাদ্র ১৩৬০ " 'গাগরীভরণে'
" " আশ্বিন ১৩৬০ " "
" " ভাদ্র ১৩৫৯ " "
" " শ্রাবণ ১৩৬১ কলসী ডান কাঁকে 'পানীয়া ভরণে'
" " ফাল্গুন ১৩৬৮ কলসী মাথায় 'গাঁয়ের মেয়ে'
" " আষাঢ় ১৩৬৩ কলসী কাঁকে 'স্নানের সময়'
([illegible])

—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম—গোবিন্দপুর, পোঃ—দক্ষিণ গোবিন্দপুর, জিলা—২৪ পরগণা।

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর নিম্নলিখিত কপি কয়টি যদি শীঘ্র পারেন ভি-পি করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

মাঘ, ১৩৭০—এক কপি। ফাল্গুন, ১৩৭০—এক কপি।
চৈত্র, ১৩৭০—এক কপি। বৈশাখ, ১৩৭১—এক কপি।

ইতি—আপনার, শ্রীজগৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী, এগ্রিকালচার অফিসার, পোর্টব্লেয়ার, (আন্দামান)।

বেচিতে চাই

মহাশয়, আমার নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বসুমতী অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতে চাই। এই বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হইলে বাধিত থাকিব। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ আমার নিকট খোঁজ করিতে পারেন—

১৩৬৭—বৈশাখ-চৈত্র।
১৩৬৮— " "
১৩৬৯— " "
১৩৭০— " "

—শ্রীকুমুদরঞ্জন হালদার, ৬২, কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৯।

মহাশয়, আমি এবং আমার স্ত্রী বহুদিনের মাসিক বসুমতীর গ্রাহক। আমার এখানকার এজেণ্ট মারফৎ আপনাদের বহুল প্রচার এই পত্রিকাটি পাই এবং নিয়মিত পাই, আমরা একটি অনুরোধ করি—আপনার কাছে এই যে—বসুমতীতে উদ্যান রচনা এবং রান্না শেখার দুইটি আলাদা বিষয়ে থাকা বোধ হয় নিতান্ত দরকার। কারণ উদ্যান রচনা এবং রান্না সম্বন্ধে বহু লোক আগ্রহান্বিত এবং এখানকার অনেকেই আপনাকে এ-বিষয়ে আমায় জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে। আপনি ভাবিয়া দেখিলে ইহার ব্যবস্থা করিবেন, এই আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারব। ইতি—ডাঃ বি-আর গুহ, সুভাস বোস রোড, কাকিনী পাড়া, রায়পুর, এম-পি।

মহাশয় 'চারজন' শিরোনামায় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী সুখপাঠ্য। কৃতীপুরুষ ও মহিলাদের জীবনী জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। এঁদের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের জীবনপথকে সুন্দর সুগঠিত করার বাসনা ভবিষ্যৎ বংশধরদের অন্তঃকরণে যাতে উদিত হয়, তার জন্য এই প্রচেষ্টার বহুল প্রচার কামনা করি। আমি কয়েকজন কৃতীপুরুষদের নামের তালিকা দিলাম—এঁদের জীবনী আপনাদের পত্রিকায় দেখলে আনন্দিত হব।

১। শ্রীহেমেন্দ্র [illegible] চট্টোপাধ্যায় আই সি এস (Secretary to the Chief Minister, West Bengal)।

২। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস।

৩। শ্রী[illegible]কুমার ঠাকুর, আই সি এস।

৪। শ্রীমতী [illegible] মজুমদার (Social Worker) Wife of Late S. B. Mazumdar Rto. D. M.

৫। Mrs. J. C. Sengupta (Wife of Principal J. C. Sengupta Rtd.)

আমি বসুমতীর নিত্য পাঠিকা। আপনাদের পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি। ইতি—জনৈকা পাঠিকা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীসন্দীপকুমার বসু, পি-১২, সি আই টি রোড, স্কিম-VI-এম, কলিকাতা-১১। *** শ্রী আর সি কর্মকার, সংবাদপত্রের এজেণ্ট, ডাক—ইটাগর আসাম *** গ্রন্থাগারিক, হেমচন্দ্র-স্মৃতি-পাঠাগার, গ্রাম/ডাক—রাজবলহাট, জেলা-হুগলী *** সাধারণ-সচিব, নামসাই ক্লাব, ডাক—নামসাই, নিকা *** মেট্রন এস ই রেলওয়ে হসপিট্যাল, গার্ডেন রীচ, কলিকাতা-৪৩ *** মেট্রন এস ই রেলওয়ে হসপিট্যাল, গার্ডেন রীচ, কলিকাতা-৪৩ *** মেট্রন এস ই রেলওয়ে হসপিট্যাল, খড়গপুর, জেলা—মেদিনীপুর, *** শ্রীঅমরেশচন্দ্র রায়, ৮।৯ পি কে সেন রোড, সদরঘাট, চাটগাঁ, পূর্ব-পাকিস্তান।

বর্তমান বৎসরের চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী ইরা ঘোষ, অবধায়ক—শ্রীলীলাময়ী ঘোষ, ডাকঘর—চন্দননগর, জেলা—হুগলী।

আপনার পত্রানুযায়ী দেড় বৎসরের চাঁদা ২০৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়, খেরুয়া কোঁয়ারপুর, বর্ধমান।

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমীনারাণী সাহা, আজমগড়।

Sending herewith Rs. 5/- being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine every month. Mrs. Taruni Mitra, 86/2 Bedford Road, Range Hills, Kirkee, Poona - 3.

I am extremely sorry for the late payment of my subscription to the Monthly Basumati. I have changed my address. Please send the magazine at my new address. Sri. Tarulata Ganguly. C/o, New Building. Churamani Choudhury Lane, (Sen Road), P. o. Berhampore, Dt. Murshidabad.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ২০৲ পাঠাইলাম। গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস। গ্রাম ও পোষ্ট আফিস—দেউলবর, জেলা—মেদিনীপুর।

Renewal subscription of Rs. 15/- is sent herewith for the year 1371 B. S. Please send the magazine regularly. Principal, Tamralipta Mahavidyalaya, Tamluk, Midnapur.

I am remitting my annual subscription of Rs. 15/- for the year 1371 B. S. Please send the magazine every month. S. N. Bhattacherjee, Asst Controller of Stationary, Govt. of India, Regional Stationary Dept, Madras.

বৈশাখ মাস হইতে এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী অর্পণা ত্রিবেদী। ১৭, ইন্দাস ফোর্ট, 'এ' রোড, চার্চ গেট, বোম্বাই-১।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। আমাকে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। —সেক্রেটারী, রবীন্দ্র পাঠচক্র, চন্দনপুর, ফিরুডি, পুরুলিয়া।

এক বৎসরের চাঁদা বাবদ সডাক ১৫৲ পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহক তালিকাভুক্ত করিয়া নিয়মিত প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—হেড মাস্টার, বিষ্ণুপুর হাই স্কুল, বিষ্ণুপুর, বাকুড়া।

I am sending the money of Rs. 15/- as the yearly subscription for the Masik Basumati. Please send the magazine every month.—Sm. Nita Chakravarty, C/o B. M. Chakravarty, Bhandara.

I am remitting the yearly subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly.—Prof. N. K. Banerji, Near Police Lines, Ludhiana.

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র মাসিক বসুমতী

৪৩শ বর্ষ] ১৩৭১ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত [১ম খণ্ড

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র



মাসিক বসুমতী

অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

(জলরঙ)

নীলকণ্ঠ

—আরতি রায় অঙ্কিত

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ — অগ্রহায়ণ ১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড — দ্বিতীয় সংখ্যা



মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

মৃত্যুর পরে জীবনের রূপ

(১)

'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন,
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।'

—গীতা

এইখানে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক এক প্রশ্ন জাগে, সে প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত্যুর পরে জীবনের কি অবস্থা হয়? সাধারণভাবে এই প্রশ্ন হচ্ছে আত্মার পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধীয়। প্রায়শই মানুষ ভীত হয়ে পড়ে এই ধারণায় যে, মৃত্যুর পরে তাদের কোন অস্তিত্বই তো থাকবে না—এবং এই ধারণা অত্যন্ত প্রকট, জীবন অসার বা নশ্বর—এর মধ্যে কিছুই নেই মায়া বা স্বপন। এই ধারণা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও রয়েছে। সুতরাং তর্কশাস্ত্রের চুলচেরা বিচার করে, প্রকৃত সিদ্ধান্তে আসতে হবে। যদিও মানুষ ভাবে তারা বস্তুত শূন্য (Zero) থেকেই এসেছে, তবু যুগ-যুগান্তর ধরে টিকে থাকবার বাসনা তাদের মনে রয়েছে জাগ্রত। সাধারণত যা' শূন্য থেকে আসবে তা অতি নিশ্চিত আবার শূন্যেই গিয়ে মিশবে। আপনি, আমি, অথবা যে কেউ—আমরা শূন্য থেকে আসি নি, আর কেউ শূন্যেও বিলীন হবো না। আমাদের অস্তিত্ব যুগ-যুগান্তরের। আমরা চির-অবিনশ্বর আর সূর্যকিরণ-বিধৌত ভূমণ্ডলে কিংবা তার বহির্ভূত কোন স্থানে, এমন কোন শক্তির উদ্ভব হয় নি, যা আমার বা আপনার অস্তিত্বকে শূন্যে বিলীন করে দিতে পারে। তাই, আত্মার পুনরাবির্ভাবের ধারণা, ঘাবড়ে যাবার মতো কোন চিন্তা নয়—মনুষ্য জীবনধারার আত্মিক মংগলের জন্যে এই চিন্তার অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই সিদ্ধান্তেই—পরিশেষে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এসেছেন। মানুষ অমর—তার আত্মা বা প্রাণ যুগ-যুগান্তর ধরে টিকেই রয়েছে, পুনর্জন্মে অথবা আত্মার অবিনশ্বরত্বে। যদি, আপনি ভাবী সময়ে অমরতার তিলক পরে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন; তবে এও সত্যি যে অতীত যুগ থেকেই আপনার আত্মার অস্তিত্ব বর্তমান। ইহার সম্বন্ধে অন্য চিন্তা অসংগত।

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥'

এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে, যে সমস্ত আপত্তিকর প্রশ্ন উঠে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করবো। অবশ্য, আপনাদের অনেকেরই আত্মার চিরন্তন অবস্থিতির বিরুদ্ধে যে সব কথা ওঠে—সেগুলিকে ছেলেমানুষি বলে ভেবে থাকবেন। তবু, সেগুলির নিরসন করা প্রয়োজন। কারণ, অনেক বুদ্ধিমান লোককেও এই ভুল চিন্তার পথে অনেকখানি এগিয়ে যেতে দেখেছি। আচ্ছা, এত অবাস্তব চিন্তার পিছনে দার্শনিকরা কখনও আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। প্রথম আপত্তির কারণ, আমরা আমাদের জীবনের অতীত দিনগুলির কথা সমুদয় স্মরণ রাখি নে কেন? শৈশবে কে, কি করতেন, তার

সব কথা আপনাদের কয়জনের মনে আছে। আপনাদের অতি শৈশবের কোন কথাই আপনাদের স্মরণ নেই এবং যদি স্মৃতিশক্তির উপরে নির্ভর করি, তবে বলতে পারি আপনাদের শৈশব ছিল না—যেহেতু সে সময়ের কথা আপনাদের মনে নেই। সুতরাং অতি সহজেই বলতে পারি যে, শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তির ওপরে নির্ভর করে, আমাদের অস্তিত্বের অবস্থিতির ধারণা সত্য নয়। অতীতকে কেন মনে রাখবো? কারণ,—

'অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে,
কাজ করো গোপনে গোপনে'

অতীতের যে চিন্তা অপসৃত, যে চিন্তা ভেঙে গেছে, তারই ফলে নব নব চিন্তা মনের মন্দিরে নিত্য আবির্ভূত হচ্ছে। আজ, যে চিন্তা বা ভাবধারা মস্তিষ্কে আসছে—তা' হচ্ছে সে সব অতীত ধারণা সমষ্টির একত্রিত প্রকাশ বা যোগফল (Resultant)। যার দ্বারা আজকের নতুন দেহে, মন বা প্রাণ কাজ কচ্ছে।

আমি, যেভাবে এইখানে দাঁড়িয়েছি, তা হচ্ছে সেই কর্মসমষ্টির ফল, যা অসীম অতীতে আমার মধ্যে জন্মেছে এবং তাই অতীতে কি কি করেছি, তা আমাতে জাগ্রত রয়েছে। যখন কোন মহান প্রাচীন গুরু অথবা কোন প্রচারক সত্যের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কিছু বলেন, আধুনিক মানুষ তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আর বলে, এই ব্যক্তি কি মিথ্যুক। কিন্তু যদি অন্য কোন নামে, যদি তিনি এসে হাজির হোন—কোন আধুনিক নামে, যেমন—হাক্সলি বলেন বা টেণ্ডল বলেন—এই বলে যদি তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন, তবে সবাই তারা মেনে নেবে তাঁর কথা।

অতীতের চিন্তাধারা বা ভাবধারাকে আধুনিক মানুষ বর্তমানের নতুন চিন্তার মধ্যে দেখতে চায়—অতীতের ধর্মযাজকদের ওপরে তারা বৈজ্ঞানিক চিন্তানায়কদের চিন্তার প্রকাশ দেখতে চায়। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, স্মৃতি সম্বন্ধে এই যে আপত্তি, তা টিকতে পারে না। যেহেতু স্মৃতিতে মনে রাখতে পারি নে, সেইহেতু অস্তিত্ব ভুল—সে ধারণা এইভাবে দূর করা চলে। অবশ্য, আমরা দেখেছি অতীতকে সর্বদাই স্মরণ রাখা সম্ভব নয় বা স্মরণ রাখার প্রয়োজন নেই—তবু বহু ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি অতীতের স্মৃতি, সত্যিরূপে মানসে প্রতিভাত হয়। আর যদি কখনও বা আমরা সকল আকর্ষণ থেকে মুক্তজীবনে পৌঁছাতে পারি, তবে জীবনের সমস্ত কথাই স্মরণ থাকা সম্ভবপর।

যদি মুক্তজীবনের আস্বাদ পাওয়া যায়, তবেই আপনি অনুধাবন করতে পারবেন, আপনার নিজের আত্মাই আপনাকে বলবে, এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে আপনি অভিনেতা মাত্র। আর তখনই বিদ্যুৎ শক্তিতে আপনার মধ্যে অনাসক্তির ধারণা সম্পৃক্ত হবে। সমস্ত ভোগের বাসনা, এই জীবনের প্রতি আসক্তি, এই সংসারের প্রতি আকর্ষণ—কিছুই থাকবে না। তখন মন পরিষ্কার দিবালোকের মতো দেখতে পাবে, কতবার এই জগতে আপনি এসেছেন, কত সহস্রবার আপনি পিতারূপে, মাতারূপে, পুত্র-কন্যারূপে; স্বামী-স্ত্রীরূপে আত্মীয়-বান্ধবভাবে—সম্পদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কতবার এসব এসেছে, আর চলেও গেছে। উত্তাল তরঙ্গ শিখরে আপনি কতবার উঠেছেন, আর কতবার নিরাশার অতলে তলিয়ে পড়েছেন। যখন স্মৃতি আপনার কাছে, এই সব নিয়ে আবির্ভূত হবে, তখন আপনি বীরের ন্যায় দাঁড়াতে পারবেন। আর মৃদুহাস্যে জগতের দিকে তাকাতে সমর্থ হবেন। তখনই মাত্র আপনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে পারবেন।

'ওহে শমন, তোমাকে ভয় করি নে, কি ভীতির শৃঙ্খল তুমি পরাতে চাও।'

সে মহাবীর্যের বিকাশ তখনই সম্ভব। আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কি যুক্তি বা বাস্তব প্রমাণ রয়েছে? বহু আছে এবং অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ রয়েছে।

মানুষের পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত ব্যতীত, জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে মানুষে মানুষে শক্তির যে তারতম্য লক্ষিত হয় তার অন্য কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। প্রথমে, যে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, সেগুলি চিন্তা করুন। ধরুন, আমি রাস্তায় গেলুম এবং একটি কুকুর দেখতে পেলাম। কিভাবে আমি ইহাকে কুকুর বলে সাব্যস্ত করি? ইহাকে মনে মনে চিন্তা করি? মনের মণিকোঠায় জমা রয়েছে সমস্ত অতীতের অভিজ্ঞতা। সেগুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত পায়রার কুঠরীর মতো ভাগে ভাগে। যেই কোন নতুন চিন্তার প্রভাব পড়লো, সেই চিন্তার ঠিক অনুরূপ কোন কুঠরীর সংগে তাকে সংযুক্ত করি এবং আমি সন্তুষ্টি লাভ করি। আমি ইহাকে কুকুর বলেই জেনে আসছি, কারণ মনের চিন্তাধারাই তা বলে দিচ্ছে।

আর যদি সমভাবের কোন চিন্তার অস্তিত্ব আগে থেকে অন্তরে না পাই, তখনই মনে অসন্তোষ জন্মে এবং এই অসন্তুষ্টির ভাবকেই বলবো 'অজ্ঞান' (ignorance) বা জ্ঞানের অভাব। আর যদি আগে থেকেই অনুরূপ ভাব অন্তরে জমা থাকে—তবে যে সন্তোষ জন্মে মনে তাই 'জ্ঞান।' যখন একটি আপেল পড়লো, মানুষের মনে অসন্তোষ জন্মাল ক্রমে তারা দেখতে পেলো—সব আপেলই পড়ে এবং এই রকমের বহু জিনিসই পড়ে। চিন্তা করে ইহাকে তারা বললো, মাধ্যাকর্ষণ, মাটির মায়া বা টান (gravitation)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আগে থেকে কোন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় না থাকলে নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করা কষ্টকর, কারণ অন্তরে এমন কোন অভিজ্ঞতা নেই, যার সংগে এই নতুন ভাবধারার সংযুক্তি সম্ভব।* অনুবাদক—হরেন্দ্রচন্দ্র দে

(* Life after Death of Swami Vivekananda)

শাক্ত-দর্শনের ভূমিকা

[শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী এবং সার জন উড্রফ]

আমাদের অনুভবের জগতকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচটা দিক বা অংশ দেখতে পাওয়া যায়। এই পাঁচটা আখ্যাকে পঞ্চক বলা হয়। এই বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। চেতনার যে কোনও বিষয় সম্বন্ধে বলা চলে যে, সেটা অস্তি (আছে), সেটা কারও কাছে ভাতি (প্রকাশিত হচ্ছে) সেটা কারও প্রিয় (আনন্দদায়ী) এবং তার একটা নাম ও একটা রূপ বা কতগুলো ধর্ম আছে। নামের কাজ বাচ্যবস্তুর নির্দিষ্ট রূপটি প্রকাশিত করা: নাম হচ্ছে শব্দ দ্বারা বাচ্যবস্তুটার সম্পর্কিত বোধ বা ভাবের (idea) প্রকাশক; সেইজন্য বাচ্যবস্তুটা নামরূপা শব্দের অর্থ (meaning).

এই পঞ্চবিধ আখ্যার প্রথম তিনটের স্বরূপ সবরকম জ্ঞেয়ের ক্ষেত্রেই অভিন্ন। কিন্তু শেষের দু'টোর আখ্যার অর্থাৎ নাম ও রূপের স্বরূপের বৈচিত্র্য আছে; এক একটা জ্ঞেয়ের নাম ও রূপ এক এক রকম; সেইজন্য জ্ঞেয়ের ভিন্নতা অনুসারে নাম ও রূপেরও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

অপর-ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ-ব্রহ্ম বা জীবজগৎবিশিষ্ট চেতনাচেতন ব্রহ্ম বলতে আমরা যা বুঝি তা হল এই পঞ্চকের এক সমাবেশ বা সমন্বয়। তা হচ্ছে নাম ও রূপের মধ্যে দিয়ে সচ্চিদানন্দের প্রকাশ। জড়-চৈতন্যরূপী বিশ্বই হচ্ছে অপর-ব্রহ্ম; কারণ, ঈশ্বররূপী পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি হচ্ছে এই বিশ্ব এবং সেই ব্রহ্মস্বরূপেই তার লয় হয়। এইজন্য বলা হয় যে, সচ্চিদানন্দের ওপর নামরূপের আরোপ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি। এক তন্ত্রে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর একজন বৃহৎ শিল্পী, কবি বা স্রষ্টা। তাঁর আনন্দ প্রকাশ করার ইচ্ছার ফলে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। নাম ও রূপকে বাদ দিলে বিশ্বের বাকি যে তিনটে দিক অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দ সেগুলোই হল ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মস্বরূপকে সকল শিব বা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং পরম বা নিষ্কল শিব বা নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম এই দুইভাবে দেখা যায় এবং পূর্ণব্রহ্ম হল পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই দুয়ের একত্র সম্মেলন। পূর্ণব্রহ্ম হচ্ছে সেই পরমবস্তু, যার পরাশক্তি অপর বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হচ্ছে এবং যার পরাশক্তিতে অপর বিশ্ব লয় পাচ্ছে, কিন্তু এই ব্যুত্থান ও বিলয়ের জন্য যাঁর পরাশক্তির কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে না। পূর্ণের কলার অন্ত নেই এবং সেই (অগণন) কলার মধ্যে পরা এবং অপরা কেবল এই দু'টো কলাই আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত।

সৎই সম্বিৎ বা চিৎ এবং যেখানেই চিৎ সেখানেই আনন্দ। অদ্বয় সচ্চিদানন্দ প্রাকৃত বা ব্যবহারিক কারণে বহু জীবাত্মারূপে প্রকাশিত হয়েছে। সবিশেষ বা সগুণ ঈশ্বর এবং নির্বিশেষ বা নির্গুণ ব্রহ্ম এই দুই প্রকারে সচ্চিদানন্দের নামরূপহীন প্রকাশ; নামরূপ দ্বারা অনুপস্থিত এই দুই প্রকাশকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলা চলে। নামরূপ দ্বারা অনুপহিত হওয়ার অর্থ কি তা পরে সম্যক বিচার করা হয়েছে। এই শব্দসমষ্টির দু'টো অর্থ হতে পারে—

(১) নাম ও রূপের ব্যতিরিক্ত বা ব্যতীত (২) নাম ও রূপের অধিক।

সুতরাং পূর্ণতত্ত্বের তিন মুখ; (১) নাম ও রূপের উপাধি দ্বারা বিশিষ্ট যে সচ্চিদানন্দ সেটা তার এক মুখ; (২) নাম ও রূপ দ্বারা বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ থেকে পৃথক বা ব্যতিরিক্ত যে অবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ সেটা তার দ্বিতীয় মুখ এবং (৩) নাম ও রূপ দ্বারা বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দের চেয়ে অধিকতর বা বৃহত্তর যে অবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ, সেটা তার তৃতীয় মুখ।

অসন্মাত্র বা শুদ্ধ অসত্তা বলে কিছু নেই, অবস্তু বা অতথ্য শব্দের অর্থ হল 'যেটা 'বস্তু' বা তথা নয়'; অর্থাৎ যেটার কোনও বিশেষ নামরূপ বা চৈতকারিক আকার নেই। বিশেষ বিশেষ মূর্ত নামরূপকে অস্বীকার করা যায়। কিন্তু সৎস্বরূপ বা সন্মাত্র নেই এ-রকম চিন্তা করা যায় না। শুদ্ধ অস্তিত্বকে বা অস্তিত্বমাত্রকে কখনও অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য 'শূন্য' শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষ নামরূপের অবর্তমানতা। নাম ও রূপের নিত্যই পরিবর্তন ঘটে চলেছে: কিন্তু সৎস্বরূপের আবির্ভাব সর্বত্র ও সর্বদা অম্লান রয়েছে: সৎস্বরূপকে কখনও পাওয়া যায় নির্গুণ বা নির্বিশেষ বস্তু বা আত্মা-রূপে, কখনও বা ঈশ্বররূপে এবং কখনও সসীম ও বদ্ধ-জীব ও ভূতাদিরূপে। নির্গুণ ব্রহ্মের ওপর মানুষের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আরোপ হচ্ছে ঈশ্বর। সুতরাং শুদ্ধসত্তা একাধারে চৈতন্যস্বরূপ এবং সর্বপ্রকার চৈতন্যের আশ্রয়স্থল।

'সত্তা' শব্দ থেকে সত্তা কি বোঝা যায় না; নিজের ভেতরে তাকালে তবে সত্তা কি বোঝা যায়। তখন বোঝা যায় যে আমি আছি এবং থাকা মানেই হচ্ছে জানা এবং জানতে থাকা। মানুষের সত্তা এবং তার চৈতন্য অভিন্ন। চৈতন্যের বিভিন্ন বৃত্তিগুলো (প্রকারগুলো) নেই এ-রকম কল্পনা করা যায়, কিন্তু চৈতন্যমাত্র নেই এ-রকম অভাবনীয়। কারণ বিবিধ চৈতন্যবৃত্তির পরিবর্তন হচ্ছে নিরন্তর, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ হল অপরিবর্তনশীল ও অচল। শুদ্ধচৈতন্য পরিবর্তনশীল বৃত্তিগুলোর মূলে নিত্য বিরাজমান।

যাকে অবচেতনা বা অচেতনতা বলে তা চৈতন্যস্বরূপ থেকে আলাদা কোনও সত্তা নয়; ব্যবহারিকদৃষ্টিতে বা

প্রচলিত প্রথায় যে-সব মাত্রা ও প্রকারের চৈতন্যবৃত্তিকে আমরা সাধারণত সচেতন বা সজ্ঞান বলি, সেইসব বৃত্তি থেকে এগুলো আলাদা ধরণের এইমাত্র।

সংস্কৃত চিৎ শব্দের কোনও যথার্থ ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই; অন্য কোনও ভাষাতেও এই শব্দের অনুরূপ কোন শব্দ পাওয়া সুকঠিন। চিৎ শব্দের সবচেয়ে কাছাকাছি ইংরেজী প্রতিশব্দ হল consciousness কারণ যাকে ইংরেজী ভাষায় empirical conscious self বলে, সে চিৎ-শক্তির প্রকাশ। কিন্তু ইংরেজী প্রতিশব্দটা যথাযথ নয়: ইংরেজী consciousness শব্দটার মধ্যে ইঙ্গিত আছে দু'টো দিকের: অহং-এর দিক এবং ইদং-এর দিক। 'consciousness' হল অহং-এর ইদং সম্পর্কে একবিধ অনুভব: অথচ ঈশ্বর-চৈতন্য বা সগুণ ব্রহ্ম চৈতন্যের মধ্যে আছে অহং এবং ইদং-এর অভিন্নতা বা ঐক্য; এবং পরমব্রহ্মের চৈতন্য সর্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত এবং সেই নির্বিশেষ চৈতন্য কখনও আত্মাশ্রয়ী হতে পারে না। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় consciousness শব্দের চেয়ে আরও উপযুক্ত শব্দ নেই। যাকে ইংরেজী ভাষায় empirical consciousness বলে তার বাধাগুলো বা আপেক্ষিকতাগুলোকে বাদ দিয়ে যদি consciousness-এর একটা নির্বাধ ও নির্বিশেষ রূপ কল্পনা করা যায়, সেটার নামই—চিৎ। প্রাকৃত বা জীবচৈতন্যের এই আপেক্ষিকতার অবিচ্ছেদগুলো বা বাধাগুলো হচ্ছে মন ও জড়বস্তুর সঙ্গে চৈতন্যের সংযোগজনিত। সেইজন্য আমরা বলতে পারি যে, শুদ্ধ বা পরচৈতন্য হচ্ছে সংযোগবিহীন: সেই রকম চৈতন্য হচ্ছে উন্মনী ও বিদেহ। প্রাকৃত বা অপরচৈতন্য হচ্ছে জীবাত্মার চেতনা: জীবচৈতন্যের অল্পতা বা অবিশুদ্ধতার কারণ হচ্ছে জীবের দেহ ও মন।

বেদান্তে অনেক সময় নাম-রূপহীন শুদ্ধচৈতন্যের বিশেষ অর্থে চিৎ শব্দকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পূর্ণতত্ত্বকেও চিৎ বলা উচিত। এই বৃহত্তর অর্থে চিৎ হচ্ছে চৈতন্যের সেই পরিপূর্ণ শক্তি বা নামরূপের জগৎ হয়ে প্রকাশিত হয় এবং হতে পারে। এই অর্থে বিশ্বের সার, শক্তি ও প্রকাশ সবই চিৎ।

সচ্চিতের মধ্যে আনন্দ নিহিত আছে। পরিপূর্ণ সচ্চিৎ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ হতে বাধ্য; কারণ তাতে কোন অপূর্ণতা নেই, শ্রুতিতে সেইজন্য বলেছে: অল্পে সুখ নেই; ভূমাতেই সুখ। সত্তার বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সুখ ও দুঃখ জড়িত। যখন কোনও জীব নির্বাধরূপে ও সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রসার করতে পারে তখন তার হয় সুখ বা উল্লাস বা আনন্দ। পরমবস্তুকে সেইজন্য সচ্চিদানন্দ ব্যতীত অন্য কিছু বলে কল্পনা করা যায় না। বিভিন্ন ভূতাদির অস্তিত্বের সারাংশ হচ্ছে এই সচ্চিদানন্দ এবং অন্তর্নিহিত আনন্দ কি পরিমাণ প্রকাশিত বা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তারই উপর নির্ভর করে ভূতাদির সুখ ও দুঃখ।

সচ্চিদানন্দের ধারণায় সঙ্গে আর একটা ধারণা সংযুক্ত করতে আমরা বাধ্য হই, যেমন শক্তির ধারণা। সচ্চিদানন্দকে শক্তির ধারক বলতে হয়। কিন্তু শক্তিমান ও শক্তি দু'টো পৃথক পদার্থ নয়। শক্তিহীন শিব হচ্ছে শবের সমতুল্য। শক্তিধর ও শক্তি অভিন্ন; তবে শক্তির প্রকাশ বহুল। শক্তির আধারভূত বস্তু ও শক্তি হচ্ছে বিশ্বের উপাদান—কারণ ও নিমিত্ত বা সাধক (efficient) কারণ দুইই। সেইজন্যই আমরা পরিণাম বা রূপান্তরের কল্পনা করতে পারি। শক্তি উপাদান কারণ হওয়াতে কার্যরূপে তা রূপান্তরিত হয়েও পূর্ববৎ থাকে। কারণের মধ্যেই কার্য অব্যক্তরূপে নিহিত থাকে এবং কার্য হল কারণের রূপান্তর বা প্রকাশ মাত্র। প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতে নিয়মটা অবশ্য ব্যবহারিকদৃষ্টিতে অন্যরকম মনে হয়; সেখানে দুধ দধিতে পরিণত হওয়ার পর আর দুধ থাকে না।

হিন্দুদর্শনের কোনও শাখাতেই প্রকৃত সৃষ্টির যথার্থতা স্বীকৃত হয় নি, অর্থাৎ শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে—এই তত্ত্বে কোনও হিন্দু দার্শনিকই বিশ্বাস করেন না। সমস্ত হিন্দু-দর্শনেরই কথা হল এই: শক্যতাসম্পন্ন বা সম্ভাবনাপূর্ণ অব্যক্ত একবিধ উপাদান থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি এবং তাতেই বিশ্বের লয় হয়। সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাপার নিত্য এবং চক্রনেমিক্রমে চলে। তবে হিন্দুদর্শনের বিভিন্ন শাখার মূল উপাদানটার স্বরূপ বিভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। অব্যক্ত উপাদান বলতে কোনও আদ্য বা গৌণ জড়পদার্থকে কল্পনা করা হয় না। সর্বপ্রকার ভবনের বা পরিণতির বিশেষ করে জড়-জগতের উৎপত্তির কারণরূপে এক অব্যক্তের প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূর্ণব্রহ্মের চিৎ-শক্তিই এই অব্যক্ত কারণ; জীবাত্মার ক্ষেত্রে এই চিচ্ছক্তিই অহং ও অনহং-এর দ্বিত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

তা ছাড়া আদ্যাসৃষ্টি বলে কিছু থাকতে পারে না। বিশ্বে উৎপত্তি ও বিলয়ের ব্যাপার নিত্য; বর্তমান বিশ্ব একটা সম্পূর্ণ নূতন কিছু নয়; কারণ এই বিশ্ব পূর্ববর্তী বিশ্বগুলোর কর্মের ফল। শুধু যে কেবল সচেতন জীবাত্মারই কর্ম আছে, তা নয়, বিশ্বের প্রত্যেক ব্যষ্টি কেন্দ্রেরই কর্ম আছে। এ স্থলে কর্মের অর্থ হচ্ছে রসের লীলা: অর্থাৎ সকল কর্মই মূলত স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ; তবে ব্যবহারিকরূপে বা কার্যত অনেক কর্ম সবাধ ও পরজন্য।

স্বরূপত মানুষ হচ্ছে আত্মা বা সচ্চিদানন্দ এবং দেহরূপে মানুষ ব্রহ্ম বা আত্মার শক্তির প্রকাশ; সেইজন্য দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মাঝখানে কোনও দুরতিক্রম ব্যবধান নেই। কারণ, মানুষ কার্যত দেবত্বলাভ নাও যদি করে থাকে তার স্বরূপ হচ্ছে দিব্য তার দিব্যস্বরূপ শক্তির আকারে তার

দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া করে; তার ফলে সে পরম বা নির্বিকল্প জ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান লাভ করে।

পরমবস্তুকে তিন দিক থেকে দেখা যায়। এই প্রতীয়মান বিশ্ব হচ্ছে অপর বা প্রাকৃত ব্রহ্ম: কারণ ঈশ্বররূপী পরব্রহ্ম থেকে তার জন্ম এবং তাতেই তার লয়। হিন্দুরা যাঁকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বলে, তিনি হলেন বিশ্বের স্রষ্টা; পাতা ও কর্তা; বিশ্বের সংগে সম্বন্ধযুক্ত এই ব্রহ্ম অপরব্রহ্ম। কারণ মূলত সচ্চিদানন্দরূপে ঈশ্বর পরব্রহ্ম হলেও দেশ, কাল ও নিমিত্তাদি কলাযুক্ত যে ঈশ্বর জগতের রচয়িতা, ধাতা এবং প্রভু তিনি সগুণ বা সোপাধিক। বিশ্বের সংগে সম্বন্ধের বাইরে সচ্চিদানন্দের যে অংশ আছে, সেই অংশ হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম।

পরম ও তুরীয় এ দু'টো শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা দরকার। এই দু'টো শব্দের অভিধার ওপর মায়াবাদ ও শক্তিবাদের পার্থক্য নির্ভর করে।

পরম ও তুরীয় দু'টো শব্দেরই অর্থ হল 'সম্বন্ধের অতীত'। কিন্তু 'অতীত' শব্দের দু'রকম মানে হতে পারে। (১) সম্বন্ধের অধিক (২) সম্বন্ধ ব্যতিরিক্ত বা সম্বন্ধ-বর্জিত। প্রথম অর্থে সম্বন্ধকে অস্বীকার বা বর্জন করা হয় না; এই অর্থে সকল সম্বন্ধে পরমবস্তুর অন্তর্নিহিত এবং পরমবস্তু সম্বন্ধগুলোর সমাহার মাত্র নয়, পরমবস্তু সম্বন্ধগুলোর ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যেই পরমবস্তু নিঃশেষিত হয় না; সেগুলোর অধিক হ'ল পরমবস্তু। দ্বিতীয় অর্থে সম্বন্ধকে অস্বীকার করা হয়; এই অর্থে পরমবস্তু সকল-সম্বন্ধ-বর্জিত। পরমবস্তুর স্বগত বা আগত—কোনও রকম সম্বন্ধ নেই অন্য কোনও কিছুর সংগে; এই দৃষ্টিতে কোনওরকম সম্বন্ধেই পরমবস্তুর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

শক্তিবাদে পরমবস্তু প্রথম অর্থে—পরম ও তুরীয় পদার্থ; এবং মায়াবাদে দ্বিতীয় অর্থে—পরমবস্তু পরম ও তুরীয় পদার্থ। শক্তিবাদীর দৃষ্টিতে—পরমবস্তু নিত্য বা সম্বন্ধবর্জিত পদার্থ এবং লীলা বা অনন্ত নামরূপ ও সম্বন্ধের প্রকাশ, দুইই। পরমবস্তু হ'ল নিত্য ও লীলা উভয়ে মিলে যে সমগ্র ও পূর্ণ বস্তু সেটি। এক দৃষ্টি থেকে পরমবস্তু সমস্ত সম্বন্ধের অধিক ও বুদ্ধির অলভ্য; এবং সেইজন্য তাকে সৃষ্টির কারণ বলা চলে না। তাকে সৃষ্টির অধিষ্ঠান বলতে হয়। আর এক দৃষ্টি থেকে সমস্ত সম্বন্ধ ও নামরূপের জগৎ এই পরমবস্তুর মধ্যে অন্তর্গত এবং পরমবস্তু বুদ্ধির প্রাপ্য; এবং সেইজন্য তাকে সৃষ্টির আদি কারণ বলা চলে এবং সৃষ্টি ব্যাপারে সত্য ইত্যাদিও বলা চলে।

মায়াবাদীর মতে ব্রহ্ম সমস্ত-সম্বন্ধ-বিহীন; সেইজন্য মায়াবাদীর বিচারে সৃষ্টির কথা মিথ্যা এবং ব্রহ্মকে সৃষ্টির কারণ বলা যায় না।

'অতীত' শব্দের দু'টো অর্থের চিত্ররূপ দেখলে জিনিসটা সহজ-বোধ্য হবে। এই শব্দের প্রথম অর্থ হল: 'অধিক বা বৃহত্তর বা অ-নিঃশেষিত' দ্বিতীয় অর্থ হল: 'বিহীন, বর্জিত বা শূন্য' এ দু'টোর চিত্ররূপ নিম্নে দেওয়া হল:

১। খ ক	২। ক খ
'খ' 'ক'-এর অধিক।	'খ' 'ক'-বিহীন।

শক্তিবাদীর মতে পরমব্রহ্ম বুদ্ধির সমস্ত সীমা ও সংজ্ঞার চেয়েও বৃহত্তর ও পূর্ণতর। দ্বৈত ও অদ্বৈতের বাড়া পরম পদার্থ? কারণ সাকার ও নিরাকার ছুয়ে মিলে যে সমগ্র ও পূর্ণ চৈতন্যসত্তা সেইটাই পরমব্রহ্ম। মায়াবাদীর দৃষ্টিতে শুদ্ধব্রহ্ম হচ্ছে এই পূর্ণসত্যের একাংশ মাত্র, সমগ্র পূর্ণসত্তা নয়।

'সম্বন্ধের অধিক' বলতে কি বোঝায় তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একভাবে সম্বদ্ধ, আমার সন্তানদের সঙ্গে আর একভাবে সম্বদ্ধ, আমার ভাইদের ও বন্ধুদের সঙ্গে আরও একভাবে সম্বদ্ধ। এইসব সম্বন্ধের কোনও একটার মাধ্যমেই আমার সত্তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না; এমন কি সম্বন্ধগুলোর সমষ্টির মধ্যেও আমার সমগ্র সত্তা বিস্ফুরিত হতে পারে না। কারণ, আমি এক অনন্ত শক্তিতন্ত্রের অংশবিশেষ এবং সেইজন্য আমার সম্বন্ধের কোনও সীমা বা সংখ্যা নেই; ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই অনন্ত সম্বন্ধগুলোর মধ্যে অধিকাংশ সূক্ষ্ম সম্বন্ধগুলোই আমরা উপেক্ষা করি এবং ধরে নিই যে, কতকগুলো বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারাই আমার স্বভাব বা স্বধর্ম নির্দিষ্ট এবং সেগুলোই অন্য ব্যক্তি থেকে আমার বিশিষ্টতার কারণ। কিন্তু পরম বস্তুরূপে ব্রহ্মের বেলায় এ রকম কোনও বিশিষ্টতার প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার তাৎপর্য হল বুদ্ধি দ্বারা কোনও সত্তাবিশেষের বিভিন্ন অংশ টুকরো টুকরো করে চিরে দেখা; কিন্তু ব্রহ্ম পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ এবং এই পূর্ণ সৎ-বুদ্ধিগ্রাহ্য পদার্থ নয়; অথচ গণ্যই হোক বা অগণ্যই হোক, সম্বন্ধগুলোর নির্ণয় বুদ্ধির ক্রিয়াসাপেক্ষ। সেইজন্য আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বিশ্বশৃঙ্খলার অন্তর্গত অনন্ত সম্বন্ধগুলো যদি জানাও যায়, তবু ব্রহ্মকে জানা হয় না।

সমগ্র বা অখণ্ড অনুভব চিৎ-শক্তিই হল ব্রহ্ম। সেইজন্য পাশ্চাত্যের সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়তত্ত্ববাদীদের অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় স্বয়ং সৎ-বস্তুর সঙ্গে আমাদের এই ব্রহ্মের কোনও সাদৃশ্য নেই।

ভারতীয় দর্শনের সমস্ত শাখাগুলোতেই জগৎকে প্রকৃত বা বাস্তব বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে; জগৎ যে কোনও এক অসীম জীবের মনের সৃষ্টিমাত্র, এইরকম মত কোনও শাখাতেই গৃহীত হয় নি। ভারতীয় দর্শনের সমস্ত শাখাতেই চিৎ ও জড়ের অস্তিত্ব সমানরূপে স্বীকৃত। এমন কি এক রকম একজীববাদীরাও এই সত্যটা মেনে

নিয়েছে। তাদের মতে ব্রহ্মই স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে আদিজীবরূপে পরিণত হয় এবং অন্যান্য জীবের অহন্তা উক্ত মুখ্যজীবের ছায়া বা বিম্বমাত্র (বিম্বমাত্র) এবং মুল জীব ব্যতিরেকে তাদের স্বকীয় কোনও অস্তিত্ব নেই; জড়জগৎ কোনও ব্যষ্টি মনের সৃষ্টি নয়; জড়জগৎ ও ব্যষ্টি মন দুই-ই হচ্ছে মুখ্যজীবরূপী ব্রহ্মের মায়াশক্তির ফল। আদিপুরুষরূপে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকে অনাত্মা বা প্রকৃতি (জীবের বিপরীত বিন্দু) রূপ ধারণ করতে হয় এবং প্রকৃতিই বহুল সম্বন্ধবিশিষ্ট অনেক জীবের প্রতিভাসের মূল কারণ। সুতরাং আদি প্রকৃতিকে আদি-পুরুষের সৃষ্টি বলা চলে না; পরম ব্রহ্মের একই মায়াশক্তিরই ক্রিয়ার ফলে উভয়ের যুগপৎ উৎপত্তি হয়, বলতে হয়।

এক জীববাদ সম্বন্ধে চলতি যে ধারণা আছে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সেটা মনোবিজ্ঞানসম্মত মোটেই নয়। এই মতানুসারে আমিই একমাত্র জীব; এবং তুমি, সে ও অন্যান্য সব কিছু এবং সমগ্র বহির্জগৎ আমার চিত্তের বিকার মাত্র। এর বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, অনহং ব্যতীত আমরা অহং-এর চিন্তা করতে পারি না। সুতরাং যে ক্রিয়ার ফলে ব্রহ্ম থেকে অহং আসে, সেই একই ক্রিয়া অনহংকে এনে দেয়। দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে এই যে, আরোপ বা প্রতিবিম্বের অন্তও দু'টো দিক দরকার। (১) যার ওপর আরোপিত বা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে ও (২) যার কাছে আরোপিত বা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। শূন্যের ওপর বা শূন্যের কাছে আরোপ বা প্রতিবিম্বের ফলও নিতান্ত শূন্য।

যেখানেই জড় আছে সেখানেই চিত্ত আছে। যেখানে স্থুল বা সূক্ষ্ম কোনও রূপেই জড় নেই, সেখানে মনও থাকতে পারে না। দু'টোই সমানরূপে বাস্তব। এবং এ দু'টোর কোনও একটা অপরটি ব্যতীত নিরর্থক। একরকম স্বতন্ত্রবাদী আছে, যাদের মতে জড়বস্তুকে আমরা যেরকম প্রত্যক্ষ করি, আমাদের অননুভূত অবস্থাতেও জড়বস্তু ঠিক সেই রকমই। ভারতীয় দর্শনের কোনও শাখায় এই রকম মত দেখতে পাওয়া যায় না। বস্তুত এরকম হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যিনি এই অসম্ভব মতের সমর্থক, তিনি অন্যমনের সমর্থক, তিনি অন্যমনের অবর্তমানতার শূন্যতাকে তাঁর নিজ মন দ্বারা ঢেকে রাখেন বলে মতটার অভাবনীয়তা ধরতে পারেন না। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে মন এবং পরমাণু দু'টো পৃথক ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব; মন থেকে পরমাণু হয় নি কিংবা পরমাণু থেকে মন হয় নি। সাংখ্যযোগ দর্শনে মন ও জড়পদার্থ দু'টোই সমান বাস্তব; কিন্তু এ দু'টোরই উৎপত্তি একটা সাধারণ নির্বিশেষ তত্ত্ব থেকে; সেই তত্ত্বের নাম প্রকৃতি। তবে মনে রাখা উচিত যে, এই দর্শন অনুসারে চৈতন্যের যে-অংশকে চিৎ বলা হয়, মন সেই-অংশ থেকে এক ভিন্ন পদার্থ; মন ও ভূতাদির সম্ভাবনাস্বরূপ যে প্রকৃতি, সেটাও চৈতন্য থেকে স্বতন্ত্ররূপে বাস্তব এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্ররূপে বাস্তব। অদ্বৈত বেদান্তের মতও প্রায় সাংখ্যযোগের মতো। তার পার্থক্য শুধু এইটুকুতে যে, সেখানে প্রকৃতি কোনও স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়; সেখানে প্রকৃতি হচ্ছে ঈশ্বররূপী পরম তত্ত্বের শক্তি। সুতরাং জীবদ্বারা অনুভূত জগৎ যে সত্য ও বাস্তব হিন্দুদর্শনের কোনও শাখাই এই কথা অস্বীকার করে না।

তারপর প্রশ্ন হচ্ছে অদ্বৈততত্ত্ব নিয়ে। অদ্বিতীয় পরমসত্তা বিশ্বের কারণস্বরূপ হয় কি করে এবং এক বহুতে পরিণত হয় কি করে, সাধারণত বলা হয় যে, পরমসত্তার দু'টো দিক: বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তরূপে পরমসত্তা হচ্ছে ঈশ্বর এবং বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধহীনরূপে পরমসত্তা হচ্ছে ব্রহ্ম। মায়াবাদীর মতে ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলা চলে; কিন্তু ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা যায় না। তার কারণ, ঈশ্বর হচ্ছে মন ও বুদ্ধির দ্বারা মিত বা মায়া (অর্থাৎ সীমা) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা আবৃত ব্রহ্মের রূপ। কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছে মানুষের মন ও বুদ্ধির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধের বাইরে পরম সৎ, নিজের কাছে নিজে যেমন তেমন অর্থাৎ পরম সত্তার নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নিরপেক্ষ রূপের নাম ব্রহ্ম। বুদ্ধির ধারণার অতীত যে তত্ত্ব তার ব্যক্তিত্ব বা আত্মত্ব নেই; পরমাত্মারূপী ঈশ্বর হচ্ছে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের শ্রেষ্ঠ ধারণা। পরমবস্তু পরমবস্তুরূপে কারণ হতে পারে না। তুরীয় বা পরম দৃষ্টিতে বিশ্ব বা তার সৃষ্টিনামক কোনও ব্যাপার নেই। পরমবস্তু সম্বন্ধে শুধু বলা চলে যে সে বিরাজমান; তাকে ঘটক বা ঘটমানরূপে কল্পনা করা অসম্ভব। কেবল ব্যবহারিক কিংবা প্রাকৃত দৃষ্টিতে পরমবস্তুকে কারণস্থানীয় বিবেচনা করা যেতে পারে। স্বরূপত শুদ্ধ ব্রহ্ম ও বিশ্বের মধ্যে কোনও সংযোগসূত্র নেই। একমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গেলে উভয়ের মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ কল্পনা করতে হয়।

সংসার তা'হলে কি? কেউ-কেউ বলেন সংসার বা জগৎ হচ্ছে এক অলীক, প্রতিভাস বা প্রপঞ্চ? কিন্তু 'প্রতিভাস' শব্দটা ঠিক উপযুক্ত নয়। কারণ, প্রশ্ন উঠে, কার কাছে প্রতিভাস? জীবের কাছে নিশ্চয়ই নয়; প্রত্যেক জীবের কাছেই সংসারটা যে বাস্তব তা সকলেই স্বীকার করবে। 'অলীক প্রতিভাসের' জন্য অন্তত একজন জীবের দরকার যার কাছে বিষয়গুলো বাস্তব কিংবা অবাস্তবরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের পর জীববোধই অন্তর্হিত হয়; সুতরাং জীব বা অহংতাই তো অলীক। সেইজন্য সংসারকে মায়া বলে অভিহিত করলে যথার্থতর হয়। কিন্তু মায়াবাদে 'মায়া'র অর্থ কি? মায়াবাদীর মতে মায়া কোনও সৎপদার্থ নয়; কারণ মায়া পরমব্রহ্ম নয়, কিংবা তার স্বতন্ত্র কোনও সত্তা নেই; আবার মায়া অসৎ নয়; কারণ

সুবুদ্ধির কাছে মায়া স্বীকার্য। মায়ার সত্তা ব্রহ্মের সত্তার সঙ্গে অভিন্নও নয় কিংবা ব্রহ্মের সত্তা থেকে ভিন্নও নয়। মায়া এক অনির্বচনীয় তত্ত্ব। সেইজন্য অনেকে মায়াবাদকে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ বলে থাকে।

শক্তিবাদে মায়াকে শক্তিরূপী মহামায়া বলে। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর পরমসত্তার এই দুই রূপই শক্তিবাদীর মতে সত্য। বিশ্বের প্রভু বাস্তবিকই আছেন; কিন্তু তিনি প্রভুত্বও অনেক অধিক। শুধু প্রভু বললেই পরমসত্তার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয় না। সংসারের সঙ্গে পরমসত্তার যে অংশ সম্বন্ধযুক্ত সেই অংশ প্রভুরূপী ঈশ্বর। এতদতিরিক্ত বাক্য ও মনের অগোচর সমস্ত সম্বন্ধের ওপারে পরমসত্তার আর এক অংশ আছে। সেইজন্য সমগ্র পরমসত্তা হচ্ছে যুগপৎ ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম; ঈশ্বররূপী পরমবস্তুকে কারণ বলা যায়; কিন্তু ব্রহ্মরূপী পরমবস্তু কারকত্বহীন। একই তত্ত্ব শিব ও শক্তি দুই-ই। সেইজন্য দুই দিকই সত্য; এবং যেহেতু জগৎ-সংসার পূর্ণতত্ত্বেরই প্রকাশ, সুতরাং জগৎ-সংসারও সৎ। পরমতত্ত্বের অন্তর্নিহিত শক্তিই সংসাররূপে পরিণত হয়েছে। পরমসত্তার দুই রূপ: প্রতীয়মান ও প্রকাশমান বিশ্বসংসার হচ্ছে তার এক রূপ এবং স্বরূপত পরমসত্তা যাই তার আর এক রূপ। জন্ম মৃত্যুর সংসার এবং মুক্তি বা মোক্ষ দুই-ই মূলত এক। কারণ, বিশ্ব-শক্তি যুগপৎ বিশ্ব বা সংসাররূপে প্রতিফলিত তথ্য এবং অখণ্ড চৈতন্য দুই-ই। পরমতত্ত্ব হচ্ছে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের এক সবিশেষ সমন্বয়। 'একের' সত্তা রূপ লাভ করে অনেকের প্রকাশের মধ্যে এবং 'অনেকের প্রকাশ' প্রতিষ্ঠিত হয় একের সত্তার মধ্যে। সেইজন্য কারণপূজার সময় শক্তি উপাসক নিজেকে শিব-শক্তি বা জগন্মাতারূপে কল্পনা করে; সে কল্পনা করে যে তারাই হচ্ছে উপাসক এবং তারাই আবার কারণরূপী দ্রব্য, কারণপানের সময় তারাই তারাকে ভোগ করছে; শুধু যে কেবল সে নিজে ভোগ করছে তা নয়। মানবজীবনের সমস্ত কর্মের সম্পর্কেই শাক্ত দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী এ-রকম। এই অদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গীর কুফল যাই হোক না কেন, দৃষ্টিভঙ্গিটার গৌরব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আবার আমরা বিশ্বাস করি যে বস্তুসত্তার স্তরভেদ আছে। এবং যে সত্তা স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্ভূত সেই সত্তা উচ্চতম বা পরমসত্তা। সত্তার শ্রেষ্ঠরূপে হচ্ছে ঈশ্বর; ঈশ্বর দোষলেশহীন ও অপরিবর্তনশীল। সংসারের সত্তা নিম্নতর; কেন না তা পরম সত্তার ওপর নির্ভরশীল এবং তার সীমা ও পরিবর্তন আছে। সংসারের সত্তা অনিত্য; সেইজন্য সংসারকে অবস্তুও বলা চলে। সংসারের সৃষ্টি আছে ও লয় আছে, কিন্তু এই সৃষ্টি ও নাশ নিত্য এবং পরম সত্তা হচ্ছে নিত্য সৃজনশীল। সুতরাং পরমসত্তা (১) অপরিবর্তনশীল ও অনন্ত সত্তা এবং (২) অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টির ধারা, দুইই একাধারে। যে কোনও বস্তুসত্তার সম্বন্ধে বলা চলে যে সেটা যতক্ষণ আছে (অস্তি) ততক্ষণ হচ্ছে (ভবতি); থাকার অর্থই হচ্ছে ক্রিয়মাণ থাকা; এবং শক্যতা ও বিদ্যমত্তা সেইজন্য একই জিনিস; কিন্তু অনন্ত ক্রিয়াশীলতার জন্য পরম সত্তার স্বরূপের কোনও লাঘব বা হ্রাস হয় না; অনন্ত ও অবিরাম প্রকাশের পরও পরমসত্তার ভাণ্ডার পূর্ববৎ অফুরন্তই থাকে। সেইজন্য সসীম ও অসীম দুইই সত্য।

আবার পুরুষার্থের অর্থে সত্তা শব্দের ব্যবহার করা যায়। সেই অর্থেই আমরা অসৎ থেকে সৎ-এ যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি; এই প্রার্থনায় অসৎ শব্দের অর্থ অলীক বা স্বপ্নবস্তু বা তেমন কিছু নয়, এখানে অসৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে, অকিঞ্চিৎকর।

যে অর্থেই বস্তু সৎ বা বাস্তব শব্দটার ব্যবহার করা যাক না কেন সংসারকে অলীক বা মরীচিকাসম বলা যায় না। উপনিষদে বলে: সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সেখানে বলেছে: সব (সর্বম) সেখানে এমন কথা বলে নি: এটা ব্রহ্ম, ওটা নয়। সমস্তটা বা সমগ্রটাই হচ্ছে বুদ্ধির প্রত্যয়ের অগোচর একটা মূর্ত বা সবিশেষ সত্তা; তাকে দ্বৈত বলা যায় না, কারণ সেটা অদ্বৈত এবং তাকে অদ্বৈত বলা চলে না, কারণ সেটা দ্বৈত। এক এবং বহু দুইই তাকে বলতে হয়, সেইজন্য কুলার্ণব তন্ত্রে শিবের মুখে শোনা যাচ্ছে এই কথা: কেউ দ্বৈত খোঁজে; কেউ অদ্বৈত খোঁজে; আমার মত দ্বৈতাদ্বৈত বর্জিত। অর্থাৎ এই মতে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। নৈসর্গিক বা দৃশ্যমান লোক ও পারমার্থিক লোকের মধ্যে বস্তুত কোনও ভেদ নেই।

পরমবস্তু বুদ্ধির একটা নির্বিশেষ প্রত্যয় বা ভাবমাত্র (abstraction) নয়। সত্তার বৈচিত্র্য ও বহুদেশিত্বকে উপেক্ষা করা প্রত্যয়ের বা ভাবের ধর্ম। সমগ্র বা অখণ্ড অনুভবই হচ্ছে পরমসত্তার অনুভব। পূর্ণ সৎ স্বয়ং সেই অনুভবের বিষয়স্থানীয়; আবার এই অখণ্ড চৈতন্যের অন্তর্গত খণ্ড বা আংশিক যেসব অনুভব আছে সেগুলোকেও বাস্তবধর্মী বলতে হয়। খণ্ড-অখণ্ডের সমন্বয়কে বুদ্ধির প্রত্যয় দিয়ে বোঝা যায় না; কিন্তু তাই বলে এই সমন্বয় অজ্ঞেয় নয়। কারণ অনংশ ও অংশের সমন্বয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব বা বোধ আমাদের আছে। যেমন স্থিতি থাকা ও সৃষ্টি হওয়ার শক্তির দ্বন্দ্ব, চেতন ও অচেতনের দ্বন্দ্ব শরীর ও মনের দ্বন্দ্ব পুরুষকার এবং অদৃষ্টের দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সর্ববিধ দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের সাক্ষাৎ অনুভব আমাদের আছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অনুবাদক—জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার

যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

অধ্যাপক উইন্টারনীজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাইবার কয়েক বৎসর পরে তিনি বিশ্বভারতী আশ্রমের বিদ্যাপীঠের জন্য ইউরোপ হইতে বড় বড় পণ্ডিতগণকে আনিয়া অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে সিলভ্যান লেভী ও উইন্টারনীজ, স্টেলা কেমব্রিন, ডাকে ছিলেন অন্যতম।

লেখক তখন বিশ্বভারতীর সংসদের সভ্য ছিলেন অর্থাৎ বিশ্বভারতীর পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য। তখন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহালানবীশ মহাশয় ছিলেন প্রধান কর্মসচিব। একদিন সংসদ মিটিং-এর পর অপরাহ্ণ চারটার সময় বিখ্যাত প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব (ওরিয়ান্টেলিস্ট) উইন্টারনীজের সহিত তাঁহার বাসভবন 'রতন কুটীর'-এ দেখা হয়। অধ্যাপক উইন্টারনীজ 'প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর অধ্যাপক। তাঁহার বাসায় উন্মুক্ত আকাশতলে একটি বেদীর উপর বসিয়া ছিলেন। প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় দেখা হইবামাত্র বয়সে নবীন এই অপণ্ডিতকে পার্শ্বে বসাইলেন। 'রতন কুটীর' টাটা কোম্পানীর অর্থে নূতন নির্মিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে নানা কথা হইল—তিনি শিক্ষার্থীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও মথুরার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সংযোগসূত্র কোথায়?

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া একেবারে মরমে মরিয়া গেলাম; বাঙালী হিন্দু হইয়া এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিবার অক্ষমতা প্রকাশ করিবার পূর্বে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভগবৎ-কৃপায় উত্তরের সূত্র মিলিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে পাটনা শহরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মূল সভাপতি এবং ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়—তখনও তিনি মাসে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করেন—সাহিত্য শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় স্বাগত জানান।

সেই সময় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন; তাঁহার বক্তৃতার কথা স্মরণ হওয়া মাত্র অধ্যাপক উইন্টারনীজের প্রশ্নের উত্তরের সূত্র খুঁজিয়া পাইলাম। উত্তর দিলাম যে—দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ এক বিখ্যাত দেশের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারথি—কুটিল রাজনৈতিক নেতা আর মথুরার শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। যদিও ইঁহাদের লীলা পৃথক পৃথক বিভূতিতে বিকাশিত, তথাপি একই সূত্রে সংযোজিত।

এ কথা শুনিয়া অধ্যাপক প্রবর বলিলেন—ঠিক কথা—তবে 'Where is the connected link'—

উত্তরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণর ও মথুরার কৃষ্ণর মধ্যে কবি যে কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা পূর্ণেন্দু সিংহ মহাশয়ের যুক্তি দিয়া উত্তর করিলাম—যখন অক্রুর সহিত বৃন্দাবনবিলাসিনী গোপীজনবল্লভ বংশীধারী ত্রিভঙ্গমুরারি রাধাবল্লভ নৌকা করিয়া যমুনা পার হইয়া মথুরায় যাইতেছিলেন তখন তিনি লীলার ছলে যমুনার জলে পড়িয়া যান এবং বিরহ ও খেদের মধ্যে তিনি বৃন্দাবন-বিলাসিনীদের মনোমোহনমূর্তি ত্যাগ করিয়া বীরবেশে যমুনার অপর কূলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইভাবে দক্ষ কবি সূত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন।

অধ্যাপকের চিত্ত পুলকে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল; খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভাগবতের নানা তথ্য জানিতে লাগিলেন এক সরল শিশুর মতন। কুলদা মল্লিক মহাশয় তদানীন্তন-কালে সুবক্তা ভগবৎ-প্রেমিক লোক ছিলেন—দিনের পর দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিয়া যে সব তথ্য আহরণ করিয়াছিলাম, তাহাই ব্যক্ত করিলাম। যদিও কুলদাবাবুর জ্ঞানের ও বিশ্লেষণা-পাণ্ডিত্য সবই তদানীন্তন জার্মান দার্শনিকদের অভিজ্ঞতার ফল। পরদিন উপনিষদের উপর আলোচনা চলিল—জ্ঞান অতি সীমিত, অপূর্ণ এমন কি অর্বাচীন—তথাপি এই মহাপণ্ডিতের সহিত আলোচনা করিতে মন যেন ক্ষেপিয়া উঠিল।

উপনিষদের ভাষার সম্বন্ধে কুলদা মল্লিক মহাশয়ের মত অবলম্বনে বলিলাম—'উপনিষদের প্রাগৈতিহাসিক ছন্দ, ভাষা, তত্ত্ব ও বর্তমান প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা হইতে অধিকতর বিশিষ্ট পরিমার্জিত সংক্ষিপ্ত ও ভিন্ন···সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। অথচ সকল উপনিষদ কত গভীর সার্বকালীন সর্বদেশের সার্বভৌম সত্যপূর্ণ। অধ্যাপকবর তখনই আওড়াইলেন—

ওঁ পূর্ণমদং পূর্ণাৎ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদাচ্যতে।
পূর্ণস্য মাদয়ে পূর্ণমেবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

তাঁহার পরিষ্কার ও উদাত্ত উচ্চারণধ্বনি এখনও যেন কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে সব জ্ঞান তপস্বীদের আর সাধনার ফল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অ্যানি বেসান্ট

জগদ্বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ বাগ্মী, পরমার্থিক, যোগী, বিখ্যাত থিয়সফিস্ট, স্বাধীনতাকামী, উচ্চাঙ্গ শিক্ষাব্রতী, ভারতবন্ধু মহামান্যা মিসেস অ্যানি বেসান্টের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৯২ সালে মেদিনীপুর শহরে। তখন আমার বয়স ১২ বছর, তবু সে স্মৃতি এখনও দেদীপ্যমান। মিসেস বেসান্ট ঠিক এক ঘন্টাকাল উপর মেদিনীপুর টাউন হলে ওজস্বিনী ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার পর আমার মাতুল (কাশীর চৌখাম্বা নিবাসী ফটিকবাবু) উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অ্যানি বেসান্টের পিঠে একখানি শাল জড়াইয়া দিলে—যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বলিলেন —সে দৃশ্য এখনও পাঁচটি বৎসর পরেও মনের কোণে উদ্ভাসিত। তাঁহার বক্তৃতা একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই, তবু তাঁহার তেজঃপূর্ণ চক্ষুদ্বয় এবং বাক্যচ্ছটা আমার কর্মজীবন পরিচালিত করিয়াছে।

সেই প্রথম সাক্ষাৎ দিনেই আমি তাঁহার স্নেহ পাই। মধ্যাহ্নভোজনের সময় যখন আহারে বসি—সেই নিরামিষাশী স্বল্পাহারী আইরিশ মহিলা আমি পালং শাক ভাজা না খাইয়া একপাশে ফেলিয়া রাখিতেছি দেখিয়া বলেন—"Boy you should eat it, it provides Phosphorus which will keep your brain productive"—সেই কাল অবধি আমি শাক ভক্ষণে খুবই রত।

১৯০৩ সালে কলিকাতায় ২২/২ বৃন্দাবন মল্লিক রাস্তায় (বাদুড়বাগানে) আমি আমার বড়মামা নগেন্দ্রনাথ বসুর বাটীতে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পড়িতাম, তখন মিসেস বেসান্ট তিন দিন এখানেই এক ছোট ঘরে থাকিতেন। গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা, শুভ্র রেশমী বস্ত্রের শাড়ি গাউনের মতন পরিতেন—শাড়ি ও পুরা হাতার ব্লাউজ শুদ্ধ তপস্বিনী—দেখিলে মাথা নত তাঁর চরণে আপনিই হত। তিনি অন্তর্যামী ছিলেন। পুরাকালের মুনি-ঋষিদের মতন সবজান্তা ও স্থানে মনকে চালনা করাতে পারিতেন।

সেই সময় তিনি স্বয়ং আমার initiate করেন তারপর আমি একনিষ্ঠভাবে theosophy অনুশীলন করি। তাঁহার এক প্রধান শিষ্য Miss Edgar-এর নিকট অনেক পাঠ ও Lesson গ্রহণ করি। বহু বৎসর ভবানীপুরের Theosophical Branch-এর Esoteric Section ও কলিকাতার গিরিশ মিত্র লেনে ও কলেজ স্কোয়ারে Theosophical Society Hall-এ বছরের পর বছর Esoteric Section-এ পাঠ গ্রহণ করিতাম। যখন মিসেস্ বেসান্ট কৃষ্ণমূর্তিকে অবতাররূপে প্রতিপাদ্য করিতে চান, গান্ধীকে ঐন্দ্রজালিক ধাপ্পাবাজ বলিতে লাগিলেন তখন তাঁহার প্রতি ভক্তি শিথিল হইতে আরম্ভ করে। তবুও হীরেন্দ্রবাবুর বাগান বাড়িতে যখন থাকিতেন তখনও দিনের পর দিন তাঁহার সেবা করিয়াছি। Col. Olcot Madam Bladbosky ও মিসেস্ বেসান্ট মনে করিতেন, ভারতে মৈত্রেয়ী নামে এক যুগ-অবতারের আবির্ভাব হইবে। সে ধারণাও আমার মনে জাগে।

সেই সময় শুনিতাম এই আইরিশ মহিলা যিনি Woman Suffragette Movement-এর স্বেচ্ছাসেবিকা ছিলেন তিনি Madam Bladbosky Col Olcot সর্ব ধর্মের সার Esoteric গ্রহণ করিয়াও ভাবিতেছিলেন বাস্তব জগতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না করিলে আত্মিক ও পারমার্থিক উন্নতিমার্গে বিচরণ করিবার সুখ-সুবিধা হয় না। তাই তিনি ভারতে Home Rule Movement আরম্ভ করেন। বাঙ্গলার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার সমর্থক।

এ্যানি বেসান্টের প্রধান লীলাক্ষেত্র বেনারসে—কামেচ্ছা পল্লীতে। সেখানে তিনি Theosophical Society of Indian Section-এর Head Quarter স্থাপিত করেন এবং প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, বাগ্মিতা ও লেখনী পরিচালনা করেন। তাঁহার বাগ্মিতাশক্তি ছিল অদ্ভুত—ঠিক একঘন্টার বেশি বলিতেন না, যত ভিন্নমতাবলম্বী হউন বা দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকুন দর্শকগণ এক-ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। জীবনে বহু বহুবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি। ঘোর দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার মধ্যে যখন ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের সভানেত্রী রূপে বক্তৃতা দেন, তাহা যেমন চিত্তে স্বদেশপ্রীতি জাগাইয়া ছিল তেমনই আত্মোৎসর্গ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাঁর তুল্য ইংরাজীতে বক্তা সরোজিনী নাইডু ও লালমোহন ঘোষ ব্যতীত আর কাহাকেও দেখি নাই, অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রাণমাতানো বক্তৃতা—সকল সময়েই আবাল-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিত। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

বেনারসে তাঁহার লীলাক্ষেত্রে তিনি Central Hindu College ও School, Women College, Hindu Boarding, শান্তিকুঞ্জ (যেখানে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসরের উপর বাস করিয়াছিলেন) গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্রতে প্রধান সহায়ক মদীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ বসু ও জ্ঞানঋষি ভগবান দাস (প্রাক্তন হাই কমিশনার, ভারতের মন্ত্রী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, আসামের গভর্নর ও পরম ভাগবত শ্রীপ্রকাশের পিতা) এই Central Hindu Collegeই অধুনা বেনারস

ধূমপান প্রসঙ্গে

আপনাদের মধ্যে যাঁরা ধূমপানে অভ্যস্ত তাঁদের একটা কথা বলতে চাই। কথাটা শুনতে খুবই সরল মনে হবে, কিন্তু শুনবার পরেই বুঝতে পারবেন যে, কথাটার ভেতরে অন্য একটা অর্থ লুকিয়ে আছে। হঠাৎ শুনলে যত সরল মনে হবে আসলে তা নয়। কথাটা হলো আপনি প্রকৃতই ধূমপান করেন না। নিজেকে আপনি ধূমপানে যতই অভ্যস্ত মনে করুন না কেন, ধূমপান আপনি করেন না—অন্তত বেশির ভাগ সময় করেন না। কথাটার মধ্যে ঈষৎ হেঁয়ালীর গন্ধ পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। এবার আসুন আলোচনা করা যাক, আসলে ব্যাপারটা কি।

আমরা নিজেদের ধূমপানে অভ্যস্ত মনে করি না—আসল ব্যাপারটার মধ্যে একটা কৌতুককর জিনিস লুকিয়ে আছে। ধূমপানের জন্যে আমাদের অনেকের যে নেশা আমরা বোধ করি প্রকৃতপক্ষে সেটা ধূমপানের নেশা নয়—ধূম দেখার নেশা। হ্যাঁ, ধূম দেখার নেশা।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে চক্ষুষ্মানেরা যতটা ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন বা ধূমপান উপভোগ করেন, অর্থাৎ ধূমপান করে আরাম বা আনন্দ পান, কোনো জন্মান্ধই তা পান না। এমন কি চক্ষুষ্মান কোনো ব্যক্তির যদি দু'চোখ বেঁধে দেওয়া যায়, পরীক্ষা করে দেখা গেছে তা হলে তিনিও ধূমপান করে আর আগের মত আরাম পান না, বা তাতে নেশা হল মনে করেন না। কিন্তু যেই আবার তাঁর চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া যায় অমনি তিনি 'ধূমপান' ক্রিয়াটি পুরোপুরি উপভোগ করতে আরম্ভ করেন। এর থেকেই এই রকম একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন বিশেষজ্ঞগণ যে, তামাকের ধোঁয়ায় নেশার যেটুকু কাজ করে তার অর্ধেকেরও বেশি ধোঁয়া পান করবার জন্যে নয়, ধোঁয়া দেখার জন্যে।

ধূমপানের যে আনন্দ তার বেশিরভাগই ধূম দেখার আনন্দ; তারপর আবার আর একটা ব্যাপার ঘটে, যে হলো ঘ্রাণের আনন্দ। তামাক পুড়বার সময় যে গন্ধ ছড়ায়—যে ধূমপান করে তার তৃপ্তি অনেকখানি সেই গন্ধের ওপর নির্ভর করে। এই যে ধূম দেখা আর ধূমের ঘ্রাণ নেওয়া এ দুটো বাদ দিলে ধূমপানের মধ্যে আর 'পান'-জনিত আনন্দ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু বাকী থাকে?

—শ্রীবিজ্ঞানী

হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়। মিসেস বেসাণ্ট ভগবান দাস, উপেন্দ্রনাথ বসু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালন সমিতির (Court) আজীবন সভ্য ছিলেন।

সমগ্র বিশ্বে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক মহাসভা (Annual Convention) হয় তাহা এক বৎসর মাদ্রাজে পর বৎসর বেনারসে হইত। এ্যানি বেশাণ্টের চেষ্টায় তন বৎসর এইরূপ বিশ্ব পদার্থবিদদের (Theosophist) সম্মেলনে যোগদান ও কর্ম করিবার সুযোগ হইয়াছিল। এখন রামকৃষ্ণ মিশন, গৌড়ীয় মিশন বা গান্ধী (সবরমতী বা ওয়ার্ধা) অরবিন্দ ও শান্তিনিকেতন আশ্রমে বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীদের নগ্নপদে ভারতের আশ্রমের আচার-ব্যবহারে জীবনযাপন করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত আমরা হই, কিন্তু ইহার পূর্বে থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান নর-নারীগণ পদার্থ বিদ্যা শিখিতে আসিয়া মিসেস বেসাণ্টের অনুপ্রেরণায় ভারতীয় আচার, আহার ও পোশাক ব্যবহার করিত। আমরা ইহা ১৯০২-৩ সাল হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

যখন হোমরুল আন্দোলন কৃতকার্য হইল না, মিসেস্ বেসাণ্ট তখন পুনরায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর কার্য পূর্ণ উদ্যমে করিতে লাগিলেন। তখন তিনি World's Theosophical Societyর প্রেসিডেণ্ট হইলেন এবং আডেয়ার-এ মাদ্রাজের সহরতলীতে 'শান্তির বাগান' Garden of Peace গড়িয়া তুলিলেন—সেইখানেই তিনি প্রায় নব্বুই বৎসরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সেখানেও সাংস্কৃতিক, শিল্প-স্থাপত্য ও শিক্ষার বিরাট কেন্দ্র প্রস্তুত করে যান।

তিনি যখন প্রেসিডেণ্ট—হীরেন্দ্রবাবু তখন এই বিশ্ব পদার্থ সমিতির (World's Theosophical Society) সহ-সভাপতি হন। সেই সময় বার্ষিক (World's Annual Convocation) মহা সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আডেয়ার যাই এবং সেই আশি বৎসরবয়স্কা মহীয়সী মহিলার চরণে প্রণতি জানাই। উপেন বসু, নগেন বসুর ভাগ্নে—একথা তখনও তাঁহার স্মরণে ছিল, তেমনই তাঁহার অপার স্নেহলাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও পুণ্য মনে করিতে লাগিলাম।

হে মহিমামণ্ডিতা, ভারত ও হিন্দুকল্যাণ কামিনী মিসেস্ এ্যানি বেসাণ্ট তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

একটু শুনুন

একটু শুনুন।—এরকম কাতর প্রার্থনা অনেক সময় আমাদের কানে এলেও আমরা দাঁড়াই না।

কিন্তু কেন? আমরা কি সবসময়ই সত্যি খুব ব্যস্ত থাকি? না কি অবজ্ঞা? বা অন্য কিছু? নেহাৎ ক্ষমা-ঘেন্না করে শুনলেই বা কতটুকু শুনি? যাঁরা কানে কম শোনেন তাঁদের কথা বলছি না, যাঁরা কানে স্বাভাবিকভাবেই শুনতে পান বলে তাঁদের বা অন্য সকলের ধারণা, তাঁদের কথাই বলছি। কতটুকু শুনতে পান? সবটুকু তো নয়ই—চার ভাগের তিন ভাগ যে পান তাও নিশ্চয় করে বলা চলে না। তবে আধাআধি নিশ্চয়ই পান, তা না হলে অবশ্যই কানে কম শুনতে পাওয়াদের দলে পড়ে যেতেন। বুঝতেই পারছেন, যাঁদের কানের কোনোরকম গঠনগত গোলমাল নেই অথচ কম শোনেন তাঁদের কথাই বলছি। এঁরা কারা? অর্থাৎ কানের বাইরে বা ভেতরে কোনো রকমের অরগ্যানিক গোলমাল না থাকা সত্ত্বেও কম শোনেন এরকম মানুষের সংখ্যা শতকরা ক'জন? ভয় পাবেন না—এঁদের সংখ্যা শতকরা একশ' জন। অর্থাৎ কি না, আমাদের মধ্যে যাদের কানে কোনো রকমের গোলমাল নেই; তারাও সবাই আমরা কম শুনি। যে সমস্ত কথা আমাদের উদ্দেশ্যে কেউ বলেন তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর-এর মধ্যে থাকে আমাদের শ্রবণের ক্ষমতা। এর বেশি যে আমরা শুনতে পাই না, তার কারণ সম্পূর্ণ মানসিক।

কেউ হয়তো কিছু বলতে আরম্ভ করেছেন। পাঁচটি কি দশটি শব্দ শোনবার পরেই আপনার মনে হলো কথাগুলি আপনার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, ব্যস সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অজ্ঞাতসারে আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়বেন। এই অন্যমনস্কতা অনেক সময় এতো বেশি হয়ে পড়ে যে অন্তত সাময়িক কিছুক্ষণের জন্যে হয়তো কারো শতকরা দশটি শব্দও কানে যায় না।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মানুষের এই যে অপরের কথা শোনার ক্ষমতা বা দক্ষতা এটা বাড়ানো চলে। আসুন এ সম্পর্কে কয়েকটি অবশ্য-পালনীয় নিয়ম কি কি দেখা যাক।

১। কেউ কিছু বলতে চাইলে সম্ভবক্ষেত্রে একটু সময় ব্যয় করবেন। অপরের কথা শুনলে দু'টো নীট ব্যক্তিগত লাভ হয় এবং একটা সামাজিক কর্তব্য পালন করা যায়। লাভের দিক হলো—অপরের কথা শুনে অনেক সময় আপনার নিজের চিন্তা-ভাবনার জট ছেড়ে যাবে, আর দ্বিতীয় লাভ হলো—ভবিষ্যতে যখন আপনার কোনো কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন অনায়াসে একজন শ্রোতা আশা করতে পারবেন। সামাজিক কর্তব্যটা হলো—অপরকে আপনি যে কথা বলবার সুযোগ দিলেন তার ফলে সে ব্যক্তি নিজেকে বেশ খানিকটা হাল্কা করতে পারলো। এইভাবে আমরা সকলে মাঝে মাঝে নিজেদের হাল্কা করতে পারি বলেই স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয়; নচেৎ আমরা বেশিরভাগ মানুষই পাগল হয়ে যেতাম।

২। অপরের কথা যদি আদৌ শোনেন তা' হলে অবশ্যই পুরো মনোযোগ দিয়ে শোনবার চেষ্টা করবেন। এমন কি কেউ যদি আপনাকে আক্রমণ করে কিছু বলতে থাকে তা হলেও শুনবেন। দেখতে পাবেন (অন্তত অনেকক্ষেত্রেই) যে আপনারও অনেক দোষত্রুটি বা খুঁৎ সত্যি আছে—যেগুলি আছে বলে হয়তো একটু আগেও আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ হতো না।

৩। কখনো জোর করে কোন কথা বের করবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যখন কেউ কিছু বলতে থাকে অপরকে, তখন সে স্বেচ্ছায়ই বলতে আরম্ভ করে। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কথার স্রোতের ধর্মই প্রকৃতিই হলো সামান্যতম বাধাতে থমকে যাওয়া। সেই বক্তব্য বুঝতে পারে যে শ্রোতা কিছু কথা বা খবর আদায় করে নিতে চাইছে অমনি তার অবচেতন মন বলতে গেলে দরজা বন্ধ করে দেয়। এই কাজটা সবচাইতে লক্ষণীয়ভাবে হয় যখন শ্রোতা নিজে থেকে কিছু প্রশ্ন করেন। আপনাকে যা বলা হচ্ছে তা নিঃশব্দে আগ্রহভরে শুনবার চেষ্টা করবেন তার ফলে বক্তা নিজেকে যতটা পরিষ্কার করতে পারবে—আপনার কোন প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলতে গেলে অবশ্যই তা করবে না বা করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কথা বলা যায়। সাইকোথেরাপির কথা কম-বেশি আজকাল সকলেই জানেন। মানসিক রোগ সারাবার জন্যে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কেও দ্বিমত নেই। যাঁরা জানেন তাঁরা সকলেই বলে থাকেন যে, অন্তত ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খাইয়ে মানসিক রোগের যেটুকু উপশম হয় তার চাইতে অনেক বেশি হয় সাইকোথেরাপিতে। এই সাইকোথেরাপি জিনিসটা হলো প্রধানত কথা শোনা। অর্থাৎ রোগীর কথা শোনা। ক্রমাগত একজন কথা বলবে আর চিকিৎসক নিজে বা তার কোন সহকারী কথা শুনবে। বলাই বাহুল্য, এইভাবে ক্রমাগত কথা বলে যেতে যেতে রোগী একসময়

আপনা থেকে নিজের মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠে এবং তারপর রোগমুক্ত হওয়া সামান্য কিছু সময়ের ব্যাপার মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য সাইকোথেরাপির ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা যে কথা একদম বলেন না তা নয়—বলেন, তবে এক-আধটা মাত্র এবং সেও এমন এক-আধটা কথা, যা শুনবার পরে রোগী আরো কথা বলতে প্রলুব্ধ হয়।

৪। কারো কথা শুনবার পরে উপদেশ কিছু যদি না দিয়ে পারেন তা হলেই ভালো হবে। এমন কি বক্তা যাই খোলাখুলিভাবে আপনার উপদেশ চান তা হলেও নয়। কারণ কোন মানুষই অপরের সমস্যাটা কখনো পুরো বুঝতে পারে না। তাই একজন তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে অন্যকে উপদেশ দিতে গেলেই তার মধ্যে অনেক ভুল থেকে যাবার সম্ভাবনা। অথচ বক্তা যদি নিজের সমাধান নিজেই করবার চেষ্টা করেন তা হলে হয়তো ভুল অনেক কম হবে—কারণ তার নিজের সমস্যার সমস্ত দিক সে নিজে যতোটা ভালো বুঝতে পারে—অন্য কারো পক্ষে তা বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

শ্রোতার কাজটাই হলো নিঃশব্দ থাকা। এমন কি এক-আধটা—হুঁ, তাই তো, তাই নাকি—বেশ তো বাঃ—বাব্বা—ওঃ এমনধারা শব্দও বক্তাকে অন্যমনস্ক করে দিতে পারে। এমন কি বক্তা যেকথা বলতে যাচ্ছিলো সেদিক থেকে তার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

একটা জিনিস সব সময় মনে রাখা দরকার। আমরা যখন কারো সঙ্গে কথা বলি, তখন বাস্তবিকপক্ষে আমরা তাকে আয়নার মতো ব্যবহার করি। আমাদের কথাগুলি যেন শ্রোতার গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার আমাদেরই কানে প্রবেশ করে এবং এই কাজটা যখন চলতে থাকে তখন একদিকে যেমন শ্রোতার অনেক জট-পাকানো চিন্তা পরিষ্কার হতে আরম্ভ করে বক্তাও তেমনি নিজেকে হাল্কা করবার ফাঁকে ফাঁকে নিজের সমস্যাগুলি যথাযথ ভাবে বুঝতে আরম্ভ করেন।

—ডাঃ নাগ

ভয়েস প্রিন্ট

কারো আর হারিয়ে যাবার ভয় নেই। কথাটা অন্যভাবে বলা যায় যে, কারো আর আত্মগোপন করে থাকবার উপায় রইলো না। সশরীরে মানুষ অপরের চোখে ধুলো দিতে পারে 'মেক-আপ'-এর সাহায্যে। সাধারণ সিনেমা-থিয়েটার থেকে আরম্ভ করে পুলিশের ডিটেক্টিভ বিভাগ পর্যন্ত মেক-আপ শিল্পের (বিজ্ঞান?) চর্চা করে থাকে। এ রকম অদ্ভুত মেক-আপ অনেক সময়ই নেওয়া হয়ে থাকে যে, লোকটার কিছুমাত্র সাদৃশ্য আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। এমন কি অনেক মেক-আপ বিশেষজ্ঞও অনেক সময় আর একজনের মেক-আপ দিয়ে কাউকে ধরতে পারেন না। কিন্তু তবু বলবো, মেক-আপ দিয়ে কাউকে একেবারে লুকোনো যায় না, বা কেউ শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আত্মগোপনও করতে পারে না। একজনের চোখ না হলেও আর একজনের চোখ ধরে ফেলে। একেবারে সঠিকভাবেই চিনতে পারে।

আত্মগোপন করা যাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে—(রাজনৈতিক কারণে বাড়ির ওপর অভিমানী কিম্বা অপরাধীরা) তারা অনেকে তাই একদিকে যেমন আত্মগোপনের জন্যে নিত্য-নূতন কায়দা আয়ত্ত করবার জন্যে সদাচেষ্টিত—তাদের ব্যর্থ করে দেবার জন্যও তেমনি নানা দেশের পুলিশ বিভাগ অনলসভাবেই চেষ্টা করে আসছেন।

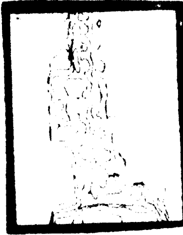
মূলত অপরাধটি সনাক্ত করবার প্রয়োজনেই হাজার লোকের মধ্য থেকে বিশেষ কোনো মানুষকে বের করবার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে থাকে এবং এইভাবেই একসময় ফিংগারপ্রিন্টের প্রচলন হয়েছিল। ফিংগারপ্রিন্টের সাহায্যে যে কিভাবে অপরাধী ধরা হয় তা সকলেই জানেন। অবশ্য এ পদ্ধতির প্রয়োগ খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই সম্ভব। আগে যার ফিংগারপ্রিন্ট নেওয়া আছে শুধুমাত্র এইরকম কোনো লোককেই ফিংগারপ্রিন্ট দেখে অন্যান্যদের মধ্য থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব।

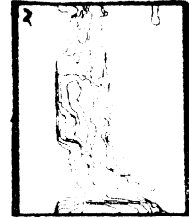
ফিংগারপ্রিণ্টেরই মতো সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য আর একটি পদ্ধতিরও সম্প্রতি উদ্ভাবন হয়েছে—এ হলো ভয়েসপ্রিণ্ট। অপরাধীদের 'আইডেনটিফাই' করবার জন্যে শুধুমাত্র ফিংগারপ্রিণ্টের ওপরই যাতে নির্ভর করতে না হয় সেজন্য ভয়েসপ্রিণ্ট অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকরী হচ্ছে বলেই এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। কারণ, আঙুলের ডগা থেকে ঈষৎ চামড়া তুলে ফেলে কিম্বা দাগগুলি আড়াআড়ি-ভাবে একাধিক জায়গা থেকে সামান্য একটু একটু করে চিরে ফেললে ফিংগারপ্রিণ্ট আইডেনটিফাই করতে পারে না দেখা গেছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভয়েসপ্রিণ্ট অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। একবার যার ভয়েসপ্রিণ্ট নেওয়া হয়েছে, তাকে অন্তত দশ হাজার জনের মধ্য থেকে অনায়াসেই বেছে নেওয়া যায়। সে ব্যক্তি তার কণ্ঠস্বরের কোনো রকম বিকৃতি ঘটিয়েও আইডেনটিফিকেশনে বাধা সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে না দেখা গেছে।

অবশ্য একটা কথা। কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ভয়েসপ্রিণ্ট-এর বিশেষ কোনো সম্পর্কও নেই, অর্থাৎ কি না, মিহি, মোটা বা ক্যানকেনে গলা বলতে আমরা যা বুঝি—ভয়েসপ্রিণ্ট কোনোভাবেই তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। যে কোনও লোক একবার যদি একটি শব্দ উচ্চারণ করে—তা সে যেভাবেই করুক না কেন, তা হলে তার স্পেকট্রোগ্রাম যা উঠবে, পরে যে কোনও সময় সেই একই শব্দ যদি সেই ব্যক্তি অন্য কোনও ভাবেও উচ্চারণ করে—তা হলেও স্পেকট্রোগ্রামের ছবি ঠিক সেই ধরণেরই উঠবে।

এক্স-রে প্লেট বুঝবার জন্যে যেমন বিশেষ শিক্ষা নিতে হয়, 'ভয়েস স্পেকট্রোগ্রাম' বুঝবার জন্যও তেমনি বিশেষ শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এবং এই বিশেষ শিক্ষা নেবার পরে আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীরা প্রায় পঁচিশ হাজার ভয়েসপ্রিণ্ট তুলে প্রিণ্ট-যুক্ত কার্ডগুলি তাসের মতো শাফ্‌ল করে বিশেষজ্ঞদের কাছে দিয়ে দেখেছেন এবং শতকরা ৯৭টি ক্ষেত্রে তাঁরা সফলকাম হয়েছেন। অর্থাৎ একখানা বিশেষ ভয়েসপ্রিণ্ট পেলেও বিশেষজ্ঞগণ পঁচিশ হাজার কার্ডের মধ্যে লুকনো সেই রকম আর একখানা কার্ড অনায়াসেই ঠিক ঠিক ভাবে বের করে দিতে পেরেছেন। নীচে দু'টি স্পেকট্রোগ্রাম দেওয়া গেলো। ১নং টি হলো একজনের স্বাভাবিকভাবে 'you' শব্দটি উচ্চারণের কম্পনচিত্র আর ২নং টি হলো সেই একই ব্যক্তির দ্বারা ঐ একই শব্দ প্রায় এক বছর বাদে বিকৃতভাবে উচ্চারণের চিত্র। চিত্র দু'টির মধ্যে যে প্রাকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে, তা অবশ্য আমাদের মতো অ-বিশেষজ্ঞের কাছেও খুবই পরিষ্কার।

—বিজ্ঞানরসিক





তারার হিসাব

আমাদের দেশে সুপ্রচলিত একটি কিংবদন্তী আছে কোনও এক কুলবধূ সম্পর্কে—যিনি অঙ্কশাস্ত্রে এতই পারদর্শিনী ছিলেন যে স্রেফ একটা অঙ্ক কষে বলে দিতে পেরেছিলেন আকাশে কতো তারা আছে। এই কুলবধূর অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞানের আরো এমন দু'চারটে কাহিনী সকলেই জানি, যেগুলির যাথার্থ্য, বিশেষ করে কৃষিকর্ম বিষয়ে সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এবং বিশেষ করে এই শেষোক্ত বচনগুলি দেখেই মনে হয় যে ঐ মহিলা হয়তো গোটা সৃষ্টির না হোক, অন্তত আকাশের একটা সীমাবদ্ধ এলাকার তারার সংখ্যা কোনো একটা আঙ্কিক পদ্ধতিতে বের করে থাকতেও বা পারেন।

তবে এই সমস্ত হয়তো যদি এবং কিন্তুর কথা বাদ দিয়েও আমাদের এই আধুনিক যুগেরই একটা ঘটনার কথা বলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগের ঘটনা।

কয়েকটি ফরাসী যুবক মিলে একবার ঠিক করেছিলেন যে আকাশে যতো তারা আছে, তা তাঁরা গুণে ফেলবেন। গোটা আকাশে নয়—প্যারিসের একটা সাততলা বাড়ির ওপর থেকে আকাশের যেটুকু খালি চোখে দেখা যায়—সেইটুকুতে। যে কথা সেই কাজ। একদিন সন্ধ্যার পরে দেখা গেলো ওঁদের মধ্যে চারজন সেই বাড়ির ওপরে গিয়ে পৌঁছলেন। এবং প্রায় আট ঘণ্টার পরিশ্রমের ফলে অর্থাৎ রাত প্রায় তিনটের সময় ওঁদের গোণা শেষ হলো। চারজনের মোট সংখ্যার পার্থক্য হয়েছিল ১৬০। অর্থাৎ একজন খালি চোখে গুণে দেখলেন প্যারিসের আকাশে রয়েছে ১১,০৬০টি তারা, আর একজনের হলো ৭ টি বেশি, তৃতীয় জনের ৯৫টি বেশি এবং চতুর্থজনের হলো ১৬০টি বেশি। অনেকেরই ধারণা যে একটা সাধারণ বাইনোকুলারের সাহায্য নিলে ওরা অন্তত আরো হাজার দুই বেশি তারা দেখতে পেতেন—মাঝারী শক্তির দূরবীণের সাহায্য নিলে অন্তত আরো ৬০০০ বেশি। কিন্তু সবাপেক্ষা শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্য নিলে যে কতো দেখা যেতো বা প্যারিস থেকে আকাশের যেটুকু দেখা যায় তার মধ্যে কতো তারা বাস্তবিকই আছে তা কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত সঠিক করে বলেন নি।

ইদানীং অর্থাৎ এই স্পুটনিকের যুগে অবশ্য তারাদের একটা হিসাব পাওয়া গেছে। ভাববেন না তারারা অসংখ্য নয়—তাদেরও সংখ্যার মধ্যে আনা গেছে, তবে কিনা সংখ্যাটা একটু বেয়াড়া রকমের। আমরা অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটা যে ছায়াপথের বাসিন্দা সেখানে মোট তারার সংখ্যা হলো এক কোটি কোটি—অর্থাৎ কি না ১০০০০০০০০০০০০০০। আমাদের সূর্য এর মধ্যে একটি। এই এক কোটি কোটি নক্ষত্রের প্রত্যেকেরই নিজস্ব গ্রহ এবং তাদের অনেকেরই উপগ্রহও আছে। তার এই সংখ্যাটা শুধু আমাদের ছায়াপথেই সীমাবদ্ধ। শোনা যায় লক্ষ লক্ষ কোটি ছায়া পথ আছে গোটা ব্রহ্মাণ্ডে।

—অর্কাবদ।

আত্মহত্যা সম্পর্কে

মানুষ যতোরকম সমস্যার পীড়নে ভারাক্রান্ত তার মধ্যে জটিলতম একটি হলো আত্মহত্যার প্রশ্ন। মানুষ কেন আত্মহত্যার জন্যে চেষ্টিত হয়? যেমন ব্যক্তির নিজের পক্ষে, তেমনি যে কোনও পরিবার, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের পক্ষেও অনেক সময় আত্মহত্যার প্রয়াস দেখা দেয়। ব্যাপকভাবে আত্মহত্যার এই যে নেশা বা ব্যাধি এ সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করবো। আপাতত আসুন ব্যক্তি-মানুষের জীবন আত্মহত্যার প্রশ্নের সঙ্গে কি ভাবে জড়িত দেখা যাক। প্রায় একযুগ ধরে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে যে অনুসন্ধান এবং বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে, তার থেকেই আজকের এই সিদ্ধান্তে আসা যায়।

সাধারণত একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, যারা প্রকৃতই আত্মহত্যা করে তারা কখনো তা মুখে ব্যক্ত করে না। এ ধারণাটি ভুল। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, আত্মহত্যা করে সফল হয়েছেন এরকম ব্যক্তিরা শতকরা ৮০টি ক্ষেত্রেই আগে থেকে এবং একাধিকবার সে কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। কাজেই আত্মহত্যা করবো এ রকম হুমকী বা ভয় দেখান কথা একবার কানে আসবার পর সে ব্যক্তিকে অবশ্যই নজরে রাখা দরকার। কাজেই বলা চলে যে আত্মহত্যার কাজটি কদাচিৎ হঠাৎ বা অকস্মাৎ ঘটে থাকে।

আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মনে করি যে, যে আত্মহত্যার চেষ্টাই করেছে সে প্রকৃতই মরতে চায়। কিন্তু এ কথাটি ঠিক পুরো সত্য নয়। বেঁচে থাকবার জন্যে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা, তার বেশির ভাগটাই থাকে আমাদের অবচেতনে। এবং সে অবস্থায় আমাদের সজ্ঞান মনের বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণই খাটে না। বরং ঠিক উল্টো। ফলে দেখা যায় যখন আমরা সজ্ঞান মনের কোনও সিদ্ধান্তের ফলে বিশেষ কোনও কাজ করতে যাই—তা যদি নিজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়—তা হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভেতর থেকে বাধা আসছে অনুভব করা যায়। যেমন—ধরুন, কোনো সাবালকের পেট খারাপ অবস্থায় সে যদি কোনো অখাদ্য খেতে যায় (রসনার তাড়নায়) তা হলে ভেতর থেকে বাধা আসে না কি? এও অনেকটা তেমান আর কি। আত্মহত্যার চেষ্টা যখন কেউ করে তখনও তার অবচেতনে (শতকরা প্রায় ৭৫টি ক্ষেত্রে) এ রকম একটা বাসনা থাকে যে, কেউ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে আমাকে।

সাধারণত মনে করা হয় যে, যে ব্যক্তি একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, তাকে সে যাত্রায় নিবৃত্ত করতে পারলেও, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবার কখনো সুযোগ পেলেই আত্মহত্যা করে বসবে। কিন্তু এ ধারণাও সত্যি নয়।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে—একবার আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে এ রকম ব্যক্তি শতকরা ৯৮টি ক্ষেত্রেই আর কখনো আত্মহত্যার চেষ্টা করে নি এবং স্বাভাবিকভাবেই জীবন যাপন করেছে।

এ রকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, আত্মহত্যা একটা বংশগত রোগের মতো—যে বংশে আছে অর্থাৎ যে বংশে বা পরিবারে একবার কেউ আত্মহত্যা করেছে, সে পরিবার বা বংশে পরবর্তীকালে অন্যান্যদেরও আত্মহত্যা করবার ঝোঁক দেখা দেয়। কিন্তু এটাও সত্যি নয়। সংক্রামক বা বংশগত ব্যাধির মতো আত্মহত্যা একেবারেই নয়। রক্তের সঙ্গে (অর্থাৎ পূর্বপুরুষের রক্তের সঙ্গে) এর কোনই সম্বন্ধ নেই। এটা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত 'মুড'-এর ব্যাপার।

সাধারণত মনে করা হয় যে, যারাই আত্মঘাতী হয় বা আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করে, তারা সকলেই মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ—অর্থাৎ যাকে বলে 'মানসিক' রোগী। কিন্তু তাও সত্যি নয়। আত্মহত্যার চেষ্টা যে করে সে অবশ্যই অসুখী—নিদারুণভাবে অসুখী, কিন্তু শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারা কোনো মনের রোগ থেকে ভুগতো না।

অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, সাধারণত বড়লোকেরাই আত্মহত্যা করে থাকে। কিন্তু তা সত্যি নয়। আত্মহত্যা যেমন বড়লোকের খেয়াল নয়, তেমনি গরীবদের অভিশাপও নয়। সমাজের সর্বস্তর এবং শ্রেণীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা দেখা যায়—কোনো বয়স বা পেশার লোক এর কবল থেকে মুক্ত নয়। তবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা বেশি দেখা যায়।

—নার্স মিত্র

রোগের সঙ্গে সংগ্রামে চলন্ত ক্লিনিক

সুদূর অজ-পাড়াগাঁয়ে কারুর শক্ত অসুখ হলে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। হাসপাতাল হয়তো দশ-বিশ-একশো মাইল দূরে। অতদূরে রোগীকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা কি কম ঝকমারি। কিন্তু খুব শীগ্গিরই মানুষ এই দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাবে। পশ্চিম জার্মানীতে তৈরি জলে স্থলে চলার উপযোগী 'ক্লিনোমোবাইল' আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে হাজির হচ্ছে। এই অভিনব আবিষ্কারের কল্যাণে দূর দূরাঞ্চলের মানুষরাও এখন ঠিকমত ওষুধ পাচ্ছে, ছোঁয়াচে রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাচ্ছে, প্রয়োজন হলে অস্ত্রোপচার করাও সম্ভব হচ্ছে। জনসাধারণকে ওষুধ দেবার মত যাবতীয় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ক্লিনোমোবাইলের ডাক্তারখানায় মজুত থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার সাঁইত্রিশটি দেশে এই আধুনিক চলন্ত ক্লিনিক সরবরাহ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। দেশে দেশে ক্লিনোমোবাইল সরবরাহের ব্যাপারে রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নেই। প্রত্যেকটি রোগাক্লিষ্ট মানুষ যাতে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সুবিধা পায় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ক্লিনোমোবাইল সরবরাহ করা হচ্ছে ও হবে। প্রত্যেকটি দেশ থেকে সংক্রামক রোগ ও মহামারী সমূলে দূর করার কাজে এগুলি ব্যবহার করা হবে।

পশ্চিম জার্মানীর হ্যানোভারের কাছে 'ক্লিনোমোবাইল' হসপিটাল ভের্কে নামে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে ১২৫টি 'ক্লিনোমোবাইল' সরবরাহ করা হয়েছে। সাজসরঞ্জাম অনুসারে এক একটি ক্লিনোমোবাইলের দাম পড়ে নব্বুই হাজার থেকে দু' লক্ষ তিরিশ হাজার জার্মান মার্ক। বর্তমানে দন্ত চিকিৎসার জন্যে সাতটি ও সাধারণ চিকিৎসার জন্যে চারটি ক্লিনোমোবাইল ত্রিনিদাদের পথে যাত্রা করেছে। এরপর পশু-চিকিৎসার জন্যে পশ্চিম আফ্রিকায় পাঠানো হবে ক্লিনোমোবাইল। ইন্দোনেশিয়া ও কলম্বিয়ার জন্যে বিশেষভাবে জলচারী-ক্লিনোমোবাইল তৈরি হচ্ছে। অদূরভবিষ্যতে তুর্কী, ভারত ও সাহারাতেও আরও ক্লিনোমোবাইল পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। অতি অল্প জায়গার মধ্যে আধুনিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্তই ক্লিনোমোবাইলের বিশেষত্ব। যে ধরণের চিকিৎসার জন্যে যেসব ওষুধপত্র ও সাজসরঞ্জাম লাগে ক্লিনোমোবাইলের মধ্যে সেসব তো থাকেই, তা ছাড়া প্রত্যেকটি ক্লিনোমোবাইলের নিজস্ব বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকে। চিকিৎসা-সংক্রান্ত নানারকম পরীক্ষা করার জন্যে ক্লিনোমোবাইলে একটি ল্যাবরেটরীও থাকে। তা ছাড়া ক্লিনোমোবাইলের দু' পাশে লাগানো ছাউনি খুলে দিলে চিকিৎসার জন্যে আগত মানুষরা তার তলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারে। —ডি এ ডি

অকূল মন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বাতাস স্বচ্ছ শঙ্খনীল
গাছের পাতায় চিক্‌চিকে রোদ
নদী চঞ্চল বিজ্ঞ পাহাড়
বালি ওড়ে হু-হু শব্দ ঝড়ের
ঢেউ সাগরের
শূন্যে হাজার গ্রহপথিক ;
যাযাবরশিখা রক্তমশালে
রাত্তিরে দিনে সন্ধ্যা সকালে
বাসনা হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক্‌ ।

স্বপ্ন কোথাও নেই জেনে
খুঁজেছি সুরায় আহিফেনে
বিবশ মদির নয়নানন্দ নির্নিমিখ ।
গোটা সহরের
ইস্পাতে গড়া নৌবহরের
সোনা রূপো মণি মুক্তা প্রেমের
হৃদয়দীপ্ত বৈতালিক ।
দিন উজ্জ্বল মুখর চপল
প্রাণের চূড়ায় ঝুড়ি ঝলমল
বিস্ময় সুখ তন্দ্রা বিভল
রাত্রি তো নীল নির্মায়ক ।

তোমার নামেই কবিতা লিখি
সমুখে চলার ছন্দ শিখি
বিরহে মিলনে অনবরত
কত রং আর বাসনা কত
ঢেউ ভেঙে ভেঙে বিস্মৃতির ;
ছায়া চঞ্চল
স্তব্ধ অতল
অনিমেষ মন শতাব্দীর ।

ঝিঁঝিঁ-ডাকা রাত জোনাকি জ্বলে
নিশাচর পাখি তোমার মন !
বাঘের আওয়াজ মন্দ্র মেঘ
রাঙা-দিগন্তে কী উদ্বেগ
কত না সুযোগ দুর্যোগের
শবরী রাতের নিশিযাপন ।

সুখ চেয়ে সুখ পালায় পাছে
দূরে বা কাছে
গ্রাম্য-নদীতে পাহাড়ে গাছে
সজাগ দৃষ্টি সংহত ।
জন্মেছে যা'রা, জন্মাবে যা'রা
জ্বলবে নিভবে ঝলমলে তারা
জানবেই জানি অন্তত
সুখ আছে, সুখ জগতে আছে,
হাজার শস্যশিখায় নাচে
উজ্জীবন !
রোদে-বিদ্যুতে দেয়ালে কাঁচে
ঠিকরে ছড়ায় টুকরো মন ;
উচ্চাভিলাষী নয় অবিনাশী
মুগ্ধ বাসনা স্ববাসী প্রবাসী
নাগরিক দ্যুতি বিচ্ছুরণ ।

অতলে তোমায় খুঁজেছি পাতাল
নীরক্ত নীল স্বপ্ন মাতাল ।
স্বর্ণায়মান মরুভূ মনের দিগন্তে ;
বর্ষায় শীতে বসন্তে ।
আশা-উদ্বেগ স্তব্ধ আকাশ
নয় অনায়াস বালিতে সোনা
প্রেম বোঝে নাকো প্রবঞ্চনা ।
কেউ বলে প্রেম প্রবঞ্চনাই ভালবাসে
রূপের রসের
সুরভি সুরের
রোমাঞ্চকর ইতিহাসে ।

ভোরে বুল বুল শিস্ দেয় নীল
অপরাজিতায়
স্বর্ণ চাঁপায়
কোকিল—অশোক কৃষ্ণচূড়ায়,
'চোখ গেল পাখি' ভুল ঠিকানায়
রাত জাগে ; দিনে রোদের জ্বালায় ।
রাত্রি দুপুরে,
'পিউ-পিয়া' সুর আকাশ কাঁপায় ।
নদী চলকায় নাগরিক মন
অভয় প্রজ্ঞাপারমিতার ;
যে সাগর কূল ছাপিয়ে মাতায়
সৈকতে তৃণে লতায়-পাতায়,
কূল খুঁজে দিতে পারো কি তা'র ?

লোকসভার অন্যতম সদস্য

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার-অ্যাট-ল

কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা

সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচার বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রধান বিচারপতি মার্শালের ঘোষণা

১৮০৩ সালে মারব্যারি মামলার পর ১৮৫৭ সালে সুপ্রীম কোর্ট বিখ্যাত ড্রেড স্কট মামলায় কংগ্রেসের আর একটি আইনকে বাতিল ঘোষণা করেন। ঐ মামলায় যদি বিচার বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত না হইত তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্ভবত ভিন্ন ধরণের হইত। মারব্যারি মামলায় প্রধান বিচারপতি সর্বপ্রথম এই প্রশ্নই আলোচনা করেন যে, সংবিধান বিরোধী কোন আইনের ধারা দেশের আইন হিসাবে গণ্য হইবে কি না। অকাট্য যুক্তি দিয়া তিনি এই ক্ষেত্রে সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

মার্শালের এই বলিষ্ঠ অভিমতকে ভিত্তি করিয়া বিচারপতি রবার্টসও ১৯৩৬ সালে ইউ এস বনাম বাটলার (২৯৭ ইউ এস ১, ৬২ = ৮০ এল, এড, ৪৭৭ ১৯৩৬) মামলায় এই মন্তব্য করেন যে, 'বিধানমণ্ডলীর আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গুণাগুণ বিচার আদালতের কাজ নয়। রচিত আইন সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না ইহা নির্ধারণই তাহার দায়িত্ব এবং এইটি সুষ্ঠুরূপে করিতে পারিলেই কাজ চুকিয়া যায়।'

ভারতীয় সংসদ এবং মার্কিন কংগ্রেসে প্রণীত আইন বৈধ অথবা সংবিধানসম্মত কি না ইহা নির্ণয় করা কিন্তু খুব জটিল। কারণ সরকারের আইন বিভাগীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিধানমণ্ডলীতে যে বিল আইনরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে, উহার বৈধতা নির্ধারণ বাস্তবিকই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বিচারপতি সাদারল্যাণ্ডও বিখ্যাত আডকিন্স বনাম চিলড্রেন্স হসপিটাল মামলার ২৬১ ইউ, এস, ৫২৫, ৫৪৪ (১৯২৩) ৬৭ এল, এড ৭৮৫ রায়ে এই মন্তব্য করেন যে, সাধারণ আইনের সহিত সংবিধানের বিরোধের ক্ষেত্রে সংবিধানকেই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সংবিধানের তুলনায় কংগ্রেসে রচিত আইন নিকৃষ্ট।

আডকিনের মামলায় সর্বনিম্ন বেতন আইনকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বিরোধী বলিয়া রায় দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট ওয়েস্ট কোস্ট হোটেল কোম্পানী বনাম প্যারিস, ৩০০ ইউ এস ৩৭৯ = ৮১ এল এড ৭০৩ (১৯৩৭) মামলার রায়ে উক্ত আডকিন মামলার রায়ের বিরোধিতা করিয়া নারী ও খনি শ্রমিকদের জন্য নিম্ন বেতন আইন সংবিধান বিরোধী নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। তা সত্ত্বেও বিচারপতি সাদারল্যাণ্ডের রায়কে অভ্রান্ত নীতির প্রবক্তারূপে মর্যাদা দেওয়া হইতেছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমাদের সুপ্রীম কোর্ট ও ইউ পি বনাম দেওমান উপাধ্যায় (এ আই আর ১৯৬০ এস সি ১১২৫ = ১৯৬১ (১) এস সি আর ১৪), মামলায়ও ওয়েস্ট কোস্ট হোটেল কোম্পানীর মামলার অবতারণা করিয়াছেন।

প্রধান বিচারপতি শাস্ত্রীর অভিমত

আমাদের সুপ্রীম কোর্টে বিখ্যাত মাদ্রাজ বনাম ভি জি রো (১৯৫২ এস সি ১৯৬) মামলার রায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন আইন সংবিধান সম্মত কি না এ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় সমালোচনা ও রায় দানের ক্ষমতা আমাদের সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রীর অভিমতকে আজকাল মানবাধিকারের রক্ষাকবচ হিসাবে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিরূপে গণ্য করা হইতেছে।

প্রধান বিচারপতি কানিয়া কিন্তু আরও জোরালো মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সংবিধানের রায়ে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতাগণ এ সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছেন।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার উপর খড়গাঘাত

সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক দুইটি রায়ে বিচার বিভাগীয় সমালোচনায় ক্ষমতার উপর কিছুটা অপ্রত্যাশিত আঘাত হানা হইয়াছে। প্রথমটি ১৯৬১ সালের ২৭শে মার্চে দারিয়াও বনাম ইউ পি রাজ্য মামলায়, দ্বিতীয় আঘাত ১৯৬২ সালের ২৩শে এপ্রিলের উজ্জমবাঈ বনাম ইউ পি রাজ্য মামলায়।

দারিয়াও মামলা

দারিয়াও মামলায় সংবিধানের ৩২ ধারা মতে ছয়খানি আবেদনপত্র পেশ করা হয়। বিবাদীর জবাবে প্রথম বলা হয় যে, ২২৬ ধারা মতে বাদী ইহার পূর্বেই হাই কোর্টে অনুরূপ আবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু হাই কোর্ট উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং তারপর আর এই আবেদন খাটে না। আমাদের সাধারণতন্ত্রী সংবিধান চালু হইবার মাত্র এক বছরের পরেই এই ধরণের আপত্তি অর্থাৎ ৩২ ধারা মতে সুপ্রীম কোর্টে আসিবার পূর্বে ২২৬ ধারা অনুযায়ী হাই কোর্টে আবেদন করার বাধ্যবাধকতার প্রশ্নে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেল শ্রীরাজা আয়ার সুপ্রীম কোর্টকে সরাসরি কিছু না বলিয়া বাদী রমেশ থাপারের নিম্ন কোর্ট লঙ্ঘন করিয়া সুপ্রীম কোর্টে আবেদনের জন্য আপত্তি উত্থাপন করেন।

প্রতিকারের অধিকার—মৌলিক অধিকার

শ্রীরাজা আয়ারের আপত্তি খণ্ডন করিয়া বিচারপতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী তাঁহার রায়ে বলেন, '৩২ ধারায় সুপ্রীম কোর্টের উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে উহা ২২৬ ধারায় হাই কোর্টকে প্রদত্ত ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। ৩২ ধারায় কেবল অধিকারের আবেদন নয় অধিকন্তু ঐ সব অধিকার যাহা মৌলিক অধিকাররূপে গণ্য সেগুলি আদায় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতিও উহাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা সুপ্রীম কোর্টকে মৌলিক অধিকারের রক্ষক ও প্রতিশ্রুতিদাতা হিসাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সুতরাং এই ৩২ ধারা উক্ত ২২৬ ধারার সমপর্যায়ের নয়।'

এইভাবে দেশের সর্বোচ্চ আদালত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেবল মৌলিক অধিকারের রক্ষক ও প্রতিশ্রুতিদাতাই নয়, উক্ত অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য আবেদন গ্রহণের ক্ষমতাও তাহার আছে। ৩২ ধারা মতে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন জানাইয়া এই প্রতিকার লাভের অধিকারও নাগরিকদের দেওয়া হইয়াছে। এই অধিকারই একটি স্বয়ংস্বীকৃত মৌলিক অধিকার।

দারিয়াও মামলায় বিচারপতি গজেন্দ্র গাদকার ৩২ ধারার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, 'এই ধারায় কোন ইতর বিশেষ নাই, যে কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার যদি বে-আইনীভাবে এবং সংবিধান লঙ্ঘন করিয়া হরণ করা হয় তাহা হইলে উক্ত ধারা অনুযায়ী প্রতিকার প্রার্থনা করা চলিবে।'

কিন্তু এই মামলায় ৩২ ধারার কিছুটা সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। কারণ সুপ্রীম কোর্টের মতে মৌলিক অধিকার হরণ করা হইলে যে কোন নাগরিক প্রথম আবেদন সুপ্রীম কোর্টে করিতে পারিবেন। কিন্তু ৩২(১) ধারায় এতদুদ্দেশ্যে যে 'উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থার' কথা উল্লেখ আছে উহার দ্বারা আবেদনকারী কি ধরণের আদেশ নির্দেশ বা ব্যবস্থা চাহেন তাহার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হইয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ৩২ ধারাকে ২২৬ ধারার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ধরিয়া লইয়া সুপ্রীম কোর্টে আবেদনের অধিকারের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সমূহ যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু শেষে আবার এই মন্তব্যও করা হইয়াছে যে, ২২৬ ধারা মতে কোন আবেদন হাই কোর্ট অগ্রাহ্য করিলে সংশোধিত আকারে অথবা সংবিধানসম্মত অন্য কোন উপযুক্ত নির্দেশের জন্য যদি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে হাই কোর্টের রায়ই আবেদনকারীকে মানিয়া চলিতে হইবে।

আইনের ফাঁক

উক্ত রায়ে মৌলিক অধিকারের উপর কঠোর আঘাত করা হইয়াছে ঠিকই, তবে বাঁচাইবার ব্যবস্থাও কিছুটা রাখা হইয়াছে, রায়ে বলা হইয়াছে যে, ২২৬ ধারার আবেদন যদি গুণাগুণ বিচারে বাতিল না হইয়া পরিচালনার দোষে হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমন ক্ষেত্রে ৩২ ধারা মতে আবেদনের কোন বাধা থাকিবে না। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি এমন আইনের ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে যেগুলি হাই কোর্টে ব্যর্থ নাগরিকদের সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হইবার পক্ষে সহায়ক।

এটর্নি জেনারেল শ্রীশীতলবাদের অভিমত

ভারতের এটর্নি জেনারেল শ্রী এম সি শীতলবাদ ১৯৬১ সালের ১৫ই এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে মন্তব্য করেছিলেন—

'সম্প্রতি নাগরিকদের অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের সেই পুরাতন প্রবণতা দেখা যাইতেছে, কোন নাগরিক হাই কোর্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুপ্রীম কোর্টে আপীল আবেদন না করিলে তিনি প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। আবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই মৌলিক অধিকার আদায়ের

পথে এমন সমস্ত বিধি নিষেধ প্রবর্তন করিতেছেন যাহা সংবিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বানচাল করিয়া দিবে। নাগরিকগণ সঙ্গতভাবেই তাঁহাদের স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নিকট উপনীত হইবার দাবীদার, সুতরাং সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার সঙ্কোচ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের এই রায় অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার।

আইন আলোচনাচক্রের মতামত

আলোচনাচক্রে সমবেত সমস্ত খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ও জুরিস্টগণ আমাদের এটর্নি জেনারেল শ্রীশীতলবাদের সহিত একমত হন এবং সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল যে, সংবিধান প্রণেতাগণ যে মৌলিক অধিকার দিয়াছিলেন তাহার উপর দুর্ভাগ্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে। তৃতীয় ভারতীয় আইন সম্মেলনেও আমি যোগ দিয়াছি। তথায় ডঃ কে এম মুন্সী 'মৌলিক অধিকার কোন দিকে' এই বিষয়বস্তুর উপর সুচিন্তিত ভাষণ দেন। আলোচনায় কতিপয় বিশিষ্ট আইনজীবীও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মৌলিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উজ্জম বাঈ'র মামলা

উজ্জম বাঈ'র মামলায় আবেদনকারী একটি হাতে তৈরি বিড়ি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা এক সংস্থার অংশীদার। উত্তর প্রদেশে সরকার ইউ পি বিক্রয়কর আইন অনুসারে এক নোটীশ জারী করিয়াছিলেন।

বিক্রয়কর-অফিসার উক্ত সংস্থার নিকট ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুনের মধ্যে বিক্রীত বিড়ির উপর বিক্রয়কর ধার্যের জন্য এক নোটীশ পাঠাইয়া দেন। উক্ত সংস্থার পক্ষ হইতে আপত্তি জানাইয়া বলা হয় যে, বিড়িকে বিক্রয়কর হইতে রেহাই দিয়া একটি নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা বিড়ির বিক্রয়কর দিতে রাজী নন। বিক্রয়কর-অফিসার আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। বিড়ি সংস্থা ইউ পি বিক্রয়কর আইন অনুযায়ী মামলা করিলেন, কিন্তু মামলা টিকিল না। হাই কোর্টে ২২৬ ধারা অনুযায়ী আপীল করা হইলে হাই কোর্ট রায় দিলেন বিক্রয়কর-অফিসার নোটীশের ব্যাখ্যা করিয়া কোন ভুল করেন নাই। শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টে সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আবেদন জানানো হয়। অধিকাংশ বিচারপতি ৩২ ধারা মতে আবেদনের বৈধতার বিরুদ্ধে রায় দেন। কিন্তু বিচারপতি সুব্বারাও তাঁর পৃথক রায়ে এই মন্তব্য করেন যে, সংবিধানের ১৯ (১) ধারা অনুসারে যে-কোন নাগরিকের বিড়ির ব্যবসায় করিবার মৌলিক অধিকার রহিয়াছে। রাজ্য সরকার সেই অধিকারের উপর সঙ্গত কারণে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারেন। উত্তরপ্রদেশ বিক্রয়কর আইন সেইরূপ একটি আইন। কিন্তু উক্ত আইন অনুযায়ী বিক্রয়কর কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে সঠিক না হওয়ার দরুণ বিক্রয়কর-অফিসারের নির্দেশ বে-আইনী এবং উহার বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনার অধিকার আবেদনকারীর রহিয়াছে।

বিচারপতি আয়েঙ্গারও বিক্রয়কর-অফিসারের নির্দেশকে অবৈধ বলিয়া জোরালো মন্তব্য করেন এবং সুপ্রীম কোর্টে আবেদন জানাইবার মৌলিক অধিকারের স্বপক্ষে রায় দেন।

তৃতীয় নিখিল ভারত আইন সম্মেলনেও উজ্জম বাঈ-এর মামলার কথা আলোচিত হইয়াছিল এবং কার্যবিবরণীতে এ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ে স্বাভাবিক বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করা হয়।

জামানত সম্পর্কিত নিয়ম

আইন সম্মেলনের আলোচনাচক্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছিল, সেটি হইতেছে ৩২ ধারা মতে আবেদনের সময় জামানত তলবের নিয়ম আইনসঙ্গত কি না, তখন জানা গিয়াছিল এ বিষয়ে একটি মামলা সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন রহিয়াছে, পরে ১৯৬২ সালের ৬ই নভেম্বর উহার বিচার হয়, প্রধান বিচারপতি শ্রীসিংহ সহ আরও ৪ জন বিচারপতিকে লইয়া গঠিত কন্সটিট্যুয়েন্ট বেঞ্চের প্রদত্ত রায়ে জামানতের উক্ত নিয়মকে মৌলিক অধিকার বিরোধী এবং উহা চালু রাখা ন্যায়সঙ্গত নয় বলিয়া মন্তব্য করা হয়, এইভাবে ৩২ ধারার মৌলিক অধিকার প্রায় সমস্তই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। [ক্রমশ।

অনুবাদক—অরুণ জানা

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

—কামিনী রায়

যতদূর মনে পড়ে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (বার-এ্যাট্-ল)

কুলী হত্যার মামলা

কুলী হত্যার মামলাটি হয়েছিল ব্যারাকপুরে। ব্যারাকপুরের তখনকার সাবডিভিসানাল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হল্যাণ্ডের কোর্টে। মোটামুটি কাহিনীটি হচ্ছে এই—

গঙ্গার ধারের কোনও একটি জুটমিলের একটি সাহেব—নাম, যতদূর মনে পড়ে মিঃ স্পেন্স (Spence)—মিলের একটি কুলীকে কাজের ত্রুটির দরুণ এমন জোরে একটা চড় মারে যে, কুলীটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং বাঁ পাশের কানের উপরের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার দরুণ তার মৃত্যু হয়। এই নিয়ে স্পেন্স-এর বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরে মামলা হয় রুজু।

তখন ইংরেজ রাজত্ব। স্পেন্স মিলের একজন বড় সাহেব। চব্বিশ পরগণার সাহেব, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সাহেব সকলের সঙ্গেই তার খাতির, তাই ক্রমে গুজব রটল যে স্পেন্সের বিরুদ্ধে মামলাটি চেপে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই নিয়ে কুলীমহলে এবং স্বদেশীমহলে খুব আন্দোলন চলতে লাগল। এবং আমার কাছে এলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত দেশসেবিকা এবং কুলী-মজদুর আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেত্রী। তিনি এসে একেবারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম নিয়ে আমাকে বললেন, 'তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি এই মকোদ্দমার ভার নিয়ে, ওদের মামলাটিকে বানচাল করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে পারেন।'

কেন যে দেশবন্ধু মামলাটিকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন আজ আর মনে নাই। আমি অনেক ছোট, তাঁর সঙ্গে আমার এমন কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল না। তবে বোধ হয় দু'একটা চাঞ্চল্যকর স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কিত মকোদ্দমা আমি ইতিমধ্যে করেছিলাম, তাই দেশবন্ধুর শুভদৃষ্টি পড়েছিল আমার উপরে। আমি অবশ্য সানন্দে মামলাটি গ্রহণ করতে রাজী হলাম, কেননা এসব মামলা করলে শুধু যে দেশে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে তাই নয়, দেশের দিক দিয়ে এসব মামলা করা আমি আমার নিজের একটি প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতাম।

যাই হোক, মামলার দিন সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গেই আমি ব্যারাকপুর কোর্টে গিয়ে হাজির হলাম। এবং মামলার ডাক হলে, কোর্টে গিয়ে মিঃ হল্যাণ্ডের কাছে অনুমতি চাইলাম—এই মামলায় আমি সরকার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য দাঁড়াতে চাই। মিঃ হল্যাণ্ডের কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম তার কারণ—আগেই বলেছি ফৌজদারী আদালতে পুলিশ তদন্ত করে যে সব মকোদ্দমা চালান দেয়, সে সব সরকার পক্ষেরই মামলা, কোর্টে তার ভার নেয় হয় গভর্নমেণ্ট নির্বাচিত সরকারী উকিল কিংবা পুলিশের একজন কর্মচারী কোর্ট ইন্সপেক্টার। তবে বিচারকের অনুমতি নিয়ে বাইরের যে কোন আইনজীবী সরকার পক্ষ সমর্থন করতেও পারেন।

যাই হোক, আমি অনুমতি চাওয়া মাত্র মিঃ হল্যাণ্ড আমাকে অনুমতি দিলেন এবং যে পরিণতবয়স্ক কোর্ট ইন্সপেক্টারের উপর মামলা চালানোর ভার ছিল তিনিও কোনও আপত্তি করলেন না। আমি সহজেই মামলার ভার গ্রহণ করলাম। তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ কোর্টে কি হাজির করা হবে বা না হবে সে সব পুলিশের ইচ্ছা সাপেক্ষ, সেদিক দিয়ে আমার কোনও হাত ছিল না।

মামলার বিশেষ ব্যাপারটি হল কর্নেল গডসনের সাক্ষ্য সেটা মনে আছে। নামটা যতদূর মনে পড়ে—কর্নেল গডসনই হবে। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন বড় ডাক্তার চব্বিশ পরগণা জেলার সিভিল সার্জেন। তাঁকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল যতদূর মনে হয় সরকার পক্ষ থেকেই এবং তিনি আমাদের পক্ষের সাক্ষী হয়ে আমাদের মামলা সমর্থন করতে এসে অনায়াসে বললেন—চড় মারলে মাথার হাড় ভাঙ্গে না। (Fracture হয় না), যত জোরেই চড় মারা হোক না কেন। সামান্য একটা চড় মারার অপরাধ হতে পারে এইমাত্র।

আমি ত' অবাক। দেশনায়িকা মহিলাটি কোর্টে আমার পাশেই বসেছিলেন। বললেন দেখলেন ত' ওদের চালাকিটা। একটা লোক মরে গেল অথচ আসামীকে সামান্য পাঁচ-সাত টাকা জরিমানার উপর দিয়েই মামলাটি শেষ করতে চায়। কর্নেল গডসন আমাদেরই সাক্ষী তাই আমি বিচারকের কাছে কর্নেলকে জেরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন এবং সেদিন সময় ছিল না বলে পরে একদিন ধার্য করলেন—জেরার জন্য।

ইতিমধ্যে মামলাটি দেশে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং আমিও ডাক্তারী শাস্ত্রের বই পড়ে তৈরি হতে লাগলাম কর্নেলকে জেরা করার জন্য। দেশনায়িকা ভদ্রমহিলাটি একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন—পরলোকগত ডাঃ বিধান রায় মহাশয়ের কাছে, তাঁর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে। তিনিও আমাকে বুঝিয়ে দিলেন হাড়ভাঙ্গা (Fracture) এমন কিছুই কঠিন নয় অতি সহজেই হতে পারে।

মামলার দিন আবার ব্যারাকপুর কোর্টে গেলাম। কর্নেল

গডসনের জেরা হল সুরু। প্রশ্নোত্তর যতদূর মনে পড়ে এই ধরণের হয়েছিল—

প্রশ্ন—'লোকটা মারা গেছে—এটা জানেন ত'?'

উত্তর—'হ্যাঁ।'

প্রশ্ন—'লোকটার বয়স এমন কিছু বেশি ছিল না—সেটাও জানেন?'

উত্তর—'হ্যাঁ।'

প্রশ্ন—'তার মৃত্যুর পরে তার দেহের Post-mortem Examination হয়েছিল (অর্থাৎ তার মৃতদেহ কেটে ভিতরের সব পরীক্ষা করা হয়েছিল) সেটাও জানেন?'

উত্তর—'হ্যাঁ—সে রিপোর্ট আমি দেখেছি।'

প্রশ্ন—'সেই রিপোর্টে লোকটির বাঁ কানের ঠিক উপরে একটি Fracture পাওয়া যায় এবং সেখানে রক্ত জমেছিল—মনে আছে?'

উত্তর—'হ্যাঁ'।

প্রশ্ন—'এই Fractureটি হল কি করে?'

উত্তর—'তা আমি কি করে বলব। হয়ত পড়ে গিয়ে হয়েছিল।'

প্রশ্ন—'সাক্ষ্য-প্রমাণে পাওয়া যাচ্ছে—লোকটা চড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল ডানদিকে বাঁদিকে নয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায়। বাঁদিকের Fractureটা কি করে হল?'

উত্তর—'সে ত' আমার জানার কথা নয়। হয়ত চড় খাওয়ার কিছু আগে আর একবার পড়ে গিয়েছিল বা কোনও রকম চোট খেয়েছিল।'

প্রশ্ন—'চড় খাওয়ার আগে কতক্ষণ সময়ের মধ্যে পড়ে গেলে বা চোট খেলে ঐ রকম Fracture নিয়েও সে স্বাভাবিক লোকের মত চলাফেরা করতে পারে?'

উত্তর—'এই বড়জোর পনেরো-কুড়ি মিনিট।'

প্রশ্ন—'তা হলে আপনার কথা হচ্ছে—চড় খাওয়ার মিনিট পনেরো-কুড়ি আগে সে একবার পড়ে গিয়েছিল—বা কোনও রকম চোট খেয়েছিল?'

একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ।'

প্রশ্ন—'শুনে অবাক হবেন কি—সেদিক দিয়ে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ এ-মকোদ্দমায় নেই। বরং সাক্ষ্য-প্রমাণে পাচ্ছি—চড় খাওয়ার আগে সে আর পাঁচজনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করছিল।'

এসব দিক দিয়ে অন্য অন্য সাক্ষীর সাক্ষ্য ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

কর্নেল উত্তর দিলেন, 'তা আমি কি করে বলব।'

তারপর কর্নেলকে Fracture হওয়া যে কত সহজ, এই দিক দিয়ে জেরা করতে সুরু করলাম। বিভিন্ন ডাক্তারী বই ধরে বিভিন্ন উদাহরণ দেখিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'মনে আছে 'Taylor'কে আপনি মানেন?'

উত্তর—'যিনি Medical Jurisprudence লিখেছেন?'

বললাম—'হ্যাঁ। তিনি ডাক্তারী শাস্ত্রের দিক দিয়ে একজন বিখ্যাত লোক—কেমন?'

বললেন—'হ্যাঁ।'

প্রশ্ন—'তিনি যদি বলে থাকেন Fracture হওয়া সময় সময় অতি সহজে—এমন কি উদাহরণ আছে যে একটি মেয়ে দু'হাত তুলে গলায় হার পরতে গিয়ে হাতের সংযোগ-স্থলে Fracture হয়ে গিয়েছিল—সে-কথা আপনি মেনে নেবেন কি?'

একটু চুপ করে থেকে বললেন—'কই বই দেখি?'

বইখানি খুলে জায়গাটি নির্দেশ করে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে বইখানি দেখতে লাগলেন।

তারপর বললেন—'এ সব হচ্ছে অসাধারণ ঘটনা।' (Exceptional cases)

শুধালাম—'তা হলে এ-রকম অসাধারণ ঘটনা ঘটে?'

বললেন—'হ্যাঁ।'

শুধালাম—'তা এই কুলীটির ব্যাপার যে একটা অসাধারণ ঘটনা নয়—আপনি কি করে বলেন?'

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন—'তা সাধারণত যা ঘটে সেইদিক দিয়েই ত' আমরা সব জিনিস বিচার করব।'

স্পেন্স (Spence) কোর্টেই আসামী হিসাবে হাজির ছিল। লম্বা-চওড়া তার চেহারা, হাতের আঙ্গুলগুলো অসাধারণ মোটা এবং বড়। তাকে উঠে দাঁড়াতে বললাম। তারপর সাক্ষীর দিকে চেয়ে বললাম—'আপনি একবার আসামীর দিকে চেয়ে দেখুন ত'।'

সাক্ষী আসামীর দিকে চাইলেন। শুধালাম—'দেখুন ত'—ওর চেহারা বেশ লম্বা-চওড়া এবং বিশেষ করে ওর হাতের আঙ্গুলগুলো অসাধারণ রকমের মোটা মোটা এবং বড় দেখেছেন?'

বললেন—'হ্যাঁ'।

ইতিমধ্যে প্রায় দু'ঘণ্টা হয়ে গেল। বিচারক আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—'আপনি আরও কতক্ষণ নেবেন?'

বললাম—'আমার এখনও আরও প্রায় দু'ঘণ্টা লাগবে। আমার জেরার বিষয় আরও অনেক আছে। Post-mortem রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত-ব্যক্তিটির শরীরের দিক দিয়ে ত' কোন প্রশ্ন এখন পর্যন্ত করি নি।'

তখন বিচারক বললেন—'তা হলে আজ এই পর্যন্ত থাক। আমার অন্য অনেক কাজ আছে। আর একদিন হবে।'

এই বলে তিনি দিন দশ-বারো পরে আর একটি তারিখ ঠিক করে দিলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি—কোর্টের মাঠে লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেছে—অনেক কুলী-মজুর এসে হয়েছে হাজির। তাদের কাছে কি খবর এসে পৌঁছেচে জানি না, সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে ছিল চেয়ে। হাজার হলেও বয়স কম, মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। মনটাও যে ছিল খুশিতে ভরা—ভাল জেরাই ত' করেছি। সেই আমার প্রথম বড় রকমের জেরা—তাই তার বিষয় এত বিস্তারিত আজও মনে আছে। দেশ-নায়িকা ভদ্রমহিলাটি বললেন—'আপনার জেরা অতি চমৎকার হয়েছে—আমি মুগ্ধ হয়েছি।—দেশবন্ধুকে আজ রাত্রেই আমি সব বলব।'

এই ভদ্রমহিলাটির আর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সে যুগে তাঁর নাম সকলেই জানত—কেন না তিনি যে শুধু রাজনীতি এবং কুলী-মজদুরদের আন্দোলনের ক্ষেত্রেই একজন নায়িকা ছিলেন তাই নয়, তাঁর চরিত্রের তেজ এবং সাহসের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন বিশেষ পরিচিত। কোথাও কোনও সংঘর্ষ হলে কিংবা পরোক্ষভাবে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় কিছু বললে তিনি বেত হস্তে অপরপক্ষের সঙ্গে দেখা করে তাকে দু-এক ঘা বেত্রাঘাত করতে পর্যন্ত দ্বিধা বোধ করতেন না।

যাই হোক ধার্যদিনে আবার কর্নেলকে জেরা করতে হবে, তাই আমি জেরার জন্য আরও তৈরি হতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমার জেরার কাহিনী খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তাই দেশে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, এইবার স্পেন্স-এর কার্যের উপযুক্ত সাজাই হবে।

ধার্যদিনে আবার সেই দেশনায়িকার সঙ্গে যথাসময়ে ব্যারাকপুর কোর্টে গিয়ে হাজির হলাম এবং আমরা দু'জনেই দেখে একটু বিস্মিত হলাম—কোর্টের চারিদিকে অনেক সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী আনা হয়েছে। কুলী-মজদুরও জড় হয়েছে কম নয়।

মামলার ডাক হলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কর্নেলকে জেরা করার জন্য। সহসা সেই কোর্ট ইন্সপেক্টার—যিনি সরকার পক্ষের তরফ থেকে মামলায় ছিলেন—উঠে দাঁড়িয়ে বিচারককে বললেন—'হুজুর! উনি (অর্থাৎ আমি) এ মামলায় সরকার পক্ষ সমর্থন করার দিক দিয়ে আমার আপত্তি আছে। সরকার পক্ষর ইচ্ছে নয় যে বাইরের কোনও লোক এসে এ মামলায় আর কোনও অংশগ্রহণ করেন।'

আমি ত' অবাক। বিচারককের দিকে চেয়ে বললাম, 'আপনার অনুমতি নিয়েই আমি সরকারের পক্ষ সমর্থন করছি এবং আশা করি আমার দ্বারা সরকার পক্ষের মামলার কোনও ক্ষতি হয় নি। হঠাৎ এ আপত্তির অর্থ কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি এ অন্যায় আপত্তি গ্রাহ্য করবেন না।'

মিঃ হল্যাণ্ড বললেন, 'আমি বিশেষ দুঃখিত মিঃ দাশগুপ্ত। কিন্তু সরকার পক্ষ যদি আপত্তি করে তবে আমি আমার অনুমতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য।'

বিচারক যে মোটেই বাধ্য নয়, আইনের দিক দিয়ে দু'চার কথা বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ফল কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত আমি কোর্ট থেকে বেরিয়ে এলাম—সঙ্গে সঙ্গে এলেন সেই দেশনায়িকা ভদ্রমহিলা।

কোর্টের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললাম—'দেখলেন ত' ব্যাপারটা। ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে কতদূর পর্যন্ত ষড়যন্ত্র গড়িয়েছে। তাই আজ এত পুলিশ প্রহরী।'

তিনি কোনও জবাব দিলেন না। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—তিনি অত্যন্ত গম্ভীর, মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। স্থির-ধীর ভাবে একদৃষ্টে কুলী-মজদুরদের দিকে আছেন চেয়ে। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী এবং তার ওধারে কুলী-মজুররা অনেকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের কাছে কি খবর পৌঁছোচ্ছিল জানি না—কিন্তু তাদের মধ্যেও যেন একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম।

এমন সময় সেই কোর্ট-ইন্সপেক্টারটি কোর্ট থেকে এলেন বেরিয়ে।

আমি শুধালাম, 'কি—এর মধ্যে আপনার মামলা হয়ে গেল?'

বললেন—'আমি, ত' আর জেরা করি নি। অন্য সাক্ষী ছিল না তাই মামলার দিন পড়ে গেল।'

এই বলে, আমার সঙ্গে আর কোনও কথা বলাও যেন মহাপাপ—এইভাবে চলে যেতে সুরু করলেন।

দেশনায়িকা হঠাৎ তাঁর পথ রুখে দাঁড়ালেন। বেশ জোরের সঙ্গে বললেন—'আপনি ভারতবাসী বাঙালী না ইংরেজদের পোষা-কুকুর।'

এই বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে কোর্ট-ইন্সপেক্টারটির গালে বসিয়ে দিলেন এক চড়।

তিনি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে চলে গেলেন কোর্টের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে কি না জানি না।

লোক জড় হয়ে যেতে লাগল। আমি দেশনায়িকাটিকে বললাম—'চলুন! চলুন আমরা এখান থেকে যাই—উকিলদের লাইব্রেরীতে গিয়ে বরং বসি।'

এই বলে চলতে সুরু করলাম—তিনিও অবশ্য এলেন আমার সঙ্গে।

কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য যখন কোর্ট থেকে যাত্রা করি চারিদিকে কুলী-মজুররা সমস্বরে চীৎকার করে উঠল ইনক্লাব জিন্দাবাদ। [ক্রমশ।

রাজকুমারী গাওরাম্মা

অণিমা রায়

আজকাল বহু ভারতীয় মহিলা ইংলণ্ডে বসবাস করছেন—রাজকুমারীদের ত' কথাই নেই। সাধারণ ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ইংলণ্ড প্রবাসী হয়েছিলেন তা বলা যায় না। কিন্তু রাজকুমারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংলণ্ডবাসিনী হয়েছিলেন রাজকুমারী গাওরাম্মা।

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সব ভারতীয় নৃপতি ইংরাজ বণিকের দল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা গদিচ্যুত ও লাঞ্ছিত হন, গাওরাম্মার পিতা বীররাজা তাঁদের অন্যতম। তিনি ভারতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কুর্গরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন ভারতে ইংরাজরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ছলে-বলে-কৌশলে ধীরে ধীরে তা বাড়িয়ে তুলছিলেন। যদিও ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কুর্গাধিপতির (বীররাজার পিতা) সঙ্গে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন যার প্রধান সর্ত ছিল যে, কুর্গের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু বীররাজা কুর্গের রাজসিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকেই কোম্পানী কুর্গরাজ্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করতে শুরু করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ষড়যন্ত্রের ফলে বীররাজাকে একসঙ্গে হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হয়। ফলে কুর্গরাজ্যের মধ্যে নানারকম অশান্তি ও গোলোযোগের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ নিয়ে ইংরাজেরা ঐ ছোট্ট রাজ্যটিতে পুনরায় শান্তি স্থাপনের অজুহাতে বহু সৈন্য পাঠিয়ে ১৮৩০ খৃস্টাব্দে বীররাজাকে গদিচ্যুত করে বন্দী করেন।

বন্দী অবস্থায় বীররাজাকে প্রথমে ভেলোরে আটক রাখা হয়। তাঁর জহরত ও টাকা-কড়ি অবশ্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর পরিবারবর্গও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ভেলোরে বিদ্রোহ শুরু হলে বীররাজাকে বানারসে পাঠান হয়। ধনদৌলত ও পরিবারবর্গও তাঁর সঙ্গে গেল। ১৮৫২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বানারসে বন্দী অবস্থায় বাস করেন এবং ১৮৪১ খৃস্টাব্দে তাঁর কন্যা গাওরাম্মার জন্ম হয়। গাওরাম্মা নামটির অর্থ হল শ্বেতসুন্দরী—এটি কার্নাটিক নাম। সত্যিই গাওরাম্মা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন এবং সেইজন্যই বোধ হয় তাঁর এই নাম রাখা হয়েছিল। বারবছরকাল বন্দী পিতার সঙ্গে কাটিয়ে গাওরাম্মা ভারতীয় নারীর লালিত্য ও মাধুর্যের অধিকারিণী হয়ে উঠেন। ইংরাজের অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত রাজাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে তাঁর শিশু-হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠে। পিতার অবস্থা স্বচক্ষে দেখে ও তাঁর কাছে নানারকম গল্প শুনে গাওরাম্মা অতি অল্পবয়সেই ইংরাজের অত্যাচারের কাহিনী হৃদয়ঙ্গম করেন। স্নেহ, প্রীতি, সহিষ্ণুতা, দুঃখসহন ক্ষমতা প্রভৃতি সংবৃত্তিগুলি তাঁর অন্তরে ভালভাবে বিকশিত হয়েছিল।

গাওরাম্মার পিতা রাজা বীররাজা প্রায় আঠারো বছরকাল বন্দী অবস্থায় কালযাপন করেন। তাঁর সঙ্গী ছিল অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের চিন্তা আর কন্যা গাওরাম্মা। নিজের ও কন্যার ভবিষ্যতের বিষয় অহরহ চিন্তা করতেন। এই সময়ে তাঁর সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে বহু উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। এমন কি ইংরাজ লাটবাহাদুররা ও বড়লাটবাহাদুরও মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন। কিন্তু বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার কোনও লক্ষণই তিনি দেখতে পান নি।

তখন তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে বৃটিশরাজের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করবেন বলে মনস্থ করেন। অবশ্য প্রকাশ্যে বলেন যে, তিনি প্রিয়তমা কন্যাকে সুশিক্ষা দেবার জন্য ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে চান। এ সম্বন্ধে বহু আবেদন-নিবেদন করার পর অবশেষে একদিন বীররাজা বড়লাট বাহাদুর ও তাঁর মন্ত্রণাসভার কাছে কন্যাসহ ইংলণ্ড যাত্রার অনুমতি লাভ করেন। এই অনুমতিপত্রেও কতকগুলি অপমানকর সর্ত সন্নিবেশ করা হয়েছিল যে, জনকয়েক সরকারী প্রহরী ও পরিচালক তাঁদের সঙ্গে যাবে এবং বীররাজাকে তাদের যাবতীয় ব্যয় ও নিজেদের পথ-খরচা বহন করতে হবে।

এই সব সর্ত মেনে নিয়ে বীররাজা একদিন কন্যাসহ ইংলণ্ড যাত্রার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বন্দর থেকে জাহাজে উঠেন এবং তিন মাস পরে ইংলণ্ডে উপনীত হন। ভারতীয় নৃপতি ও রাজকুমারীর এই প্রথম ইংলণ্ডে পদার্পণ।

অল্পদিনের মধ্যেই বীররাজাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দরবারে গাওরাম্মাকে উপস্থাপিত করবার অনুমতি দেওয়া হয়। এইখানে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে গাওরাম্মার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

গাওরাম্মার অতুলনীয় রূপ, লালিত্য ও নম্র ব্যবহারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া মোহিত হয়ে নিজের ব্যক্তিগত তদারকে গাওরাম্মাকে লালন-পালন করতে রাজী হন। তিনি গাওরাম্মার জন্য নিজব্যয়ে একজন ধাত্রীও নিযুক্ত করেন। এর কিছুদিন পরে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের খাস

গির্জায় মহারাণীর সমক্ষে ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ (বড় পাদ্রী) গাওরাম্মাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁর খৃস্টান নাম রাখা হয় ভিক্টোরিয়া গাওরাম্মা।

তারপর বীররাজা হাউস অফ লর্ডসের কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন এবং ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি মারফৎ নিজ রাজ্য ও স্থাবর সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু বীররাজার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি হাউস অফ লর্ডসের মামলাটিতে হেরে যান। কিন্তু তিনি কন্যার জন্য ইংলণ্ডেই বসবাস করেন এবং ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডেই মারা যান। মৃত্যুকালে গাওরাম্মা তাঁর পাশে ছিলেন এবং গাওরাম্মাকে তিনি নিজের সমস্ত টাকাকড়ি ও জহরত প্রভৃতি উপহার দেন।

এদিকে রাজকীয় অভিভাবকত্বে গাওরাম্মা শিক্ষিতা হয়ে উঠলেন। এই সময়ে একজন পাঞ্জাবী রাজপুত্র নির্বাসিত হয়ে ইংলণ্ডে বাস করতে থাকেন। এই যুবকের সঙ্গে গাওরাম্মার বিবাহ দেবার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া সঙ্কল্প করেন। কিন্তু গাওরাম্মার শরীর অসুস্থ থাকায় মহারাণী ঐ যুবক ও একজন ধাত্রীকে সঙ্গে দিয়ে গাওরাম্মাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য ইউরোপে পাঠান।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পরও গাওরাম্মার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখনও ভিক্টোরিয়া গাওরাম্মার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে গাওরাম্মা পাঞ্জাবী যুবকটিকে পছন্দ করছেন না, তখন তিনি বিবাহ প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন এবং গাওরাম্মাকে নিজের পছন্দমত বিবাহ করতে আদেশ দিলেন।

মাদ্রাজী রেজিমেণ্ট থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ক্যাম্বেল নামে এক ইংরাজের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া গাওরাম্মার প্রণয় হয় এবং তিনি শেষে তাঁকেই বিবাহ করেন। তাঁদের একটি কন্যা জন্মে। কন্যার নাম রাখেন এডিথ ভিক্টোরিয়া। কিন্তু ভিক্টোরিয়া গাওরাম্মা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েন। সেই পীড়া তাঁকে শয্যাশায়ী করে ফেলে এবং ১৮৬৪ সালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কর্নেল ক্যাম্বেল পত্নী বিয়োগের শোক সহ্য করতে পারলেন না। স্ত্রী-বিয়োগের কিছুদিন পরেই তিনি গৃহত্যাগ করে চলে যান। তাঁকে আর কেউ খুঁজে পায় নি। ধাত্রীর কাছেই তাঁদের কন্যা পালিত হয়। এডিথ, ইয়ার্ডলে নামক এক ইংরাজ যুবককে বিবাহ করেন। তাঁদের একটি পুত্র হয়। তার নাম রাখলেন নীল ভিক্টর ইয়ার্ডলে।

রাজকুমারী গাওরাম্মার জীবন ঝড়-ঝাপ্টায় পূর্ণ। প্রায় ১২৫ বছর আগে এই ভারতীয় রাজকুমারী ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। তাঁর আগে কোন রাজকুমারী ইংলণ্ডে যান নি।

ডান হাত

(চার্লস্ ম্যাকে-র কবিতা)
১৮১৪-১৮৮৯

মানুষের দেওয়া দারুণ দুঃখে পড়িয়া যখন আমি
নালিশ জানাই বিধাতার কাছে আঁখি জলে দিবাযামি;
প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া যখন হয়েছি ব্যর্থকাম,
সঙ্গী-সাথীরা সবে' পড়ে দেখি,' লয় না আমার নাম;
লুকায়ে আনন ছুটে চলে যায় ছাতির আড়াল দিয়া,
যাচিয়া কেহ বা দেয় উপদেশ, পাছে চাই, কাঁপে হিয়া;
এসব হেরিয়া সহসা আমার আত্মা ক্ষেপিয়া কয়:
'আছে রে বন্ধু; যাক্ এরা সব, এরা মোর কেহ নয়।
যা হোক্ বিপদ, এই তো সুহৃৎ সাহায্য করে একা,
সাহস জোগায়, ভরসাও দেয়, ভাগ্যে যা থাক্ লেখা।
বালিতে দালান তোলার মতন নাহি করি কারো আশ,
শুধু ভগবান আর ডান হাত ঘুচাবে সকল ত্রাস।'

অতি দুর্দিন, তবু উৎসাহ আসিল চিত্তে মোর;
হৃদয়ের বোঝা হয়েছে হাল্কা, হাতে এলো খুব জোর।
দুঃখের থেকে তুলিল আমায়, জুড়ালো যাতনা সব;
খাওয়ালো আমায়, পরালো আমায়, সবি হোল সম্ভব।
বন্ধু যাহারা সরিয়া গিয়াছে, তারাও আসিল ক্রমে,
হাসিমুখে আসে উপদেষ্টারা যাহারা আসে নি ভ্রমে।
চাহি নাকো আর তাদের কারেও, জানে তারা নাহি আশ;
ধন্য তুমি হে ডান হাত মোর, তোমে করি বিশ্বাস!

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কৃষ্ণাধরামৃতের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক ভাগবতের শ্লোকটি পড়ল রামানন্দ।

স্মরতবর্ধন শোকনাশন
স্বরিতবেণুচুম্বিত অধরামৃত।

মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হলেন। এবার রামানন্দ রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোকটি পড়ল—

'স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম।'

সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার স্পৃহাকে বিস্তার করছেন।

দিব্যোন্মাদের ভাবে প্রলাপ বলছেন প্রভু, দুই শ্লোকের ব্যাখ্যা করছেন।

কৃষ্ণের অধরসুধা আমার তনু-মন বিক্ষুব্ধ করছে, বাড়াচ্ছে সম্ভোগেচ্ছা, অপহরণ করে নিচ্ছে সমস্ত সুখ-দুঃখ। 'পাসরায় অন্য রস।' অন্য সমস্ত রস ভুলিয়ে দিচ্ছে। সেই অমৃতই একমাত্র আস্বাদ-চমৎকার। সমস্ত জগৎকে বশীভূত করছে, লজ্জা ধর্ম ধৈর্য কিছুতেই অন্তরায় হতে দিচ্ছে না। কুলবালাদের আর্যপথ থেকে টেনে নিচ্ছে। সেই অমৃত আস্বাদের কাছে কিসের কুলমান, কিসের লোকধর্ম। কৃষ্ণ-সুখী হবে এই অনুভবটিই তো তাদের অমৃত আস্বাদ।

তোমার অধরের আচরণ অদ্ভুত। 'বিচারিতে সব বিপরীত।' আমি নারী অধররসের লালসা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু বলতে লজ্জা হয়, হে ধৃষ্টরায় হে নির্লজ্জের চূড়ামণি, তোমার অধরামৃত পুরুষকেও আকর্ষণ করে। শুধু পুরুষ কী ছাই, বন-বিহঙ্গকেও উতলা করে তোলে। আকর্ষণ কী বলছি, তোমার অধর এমন বাজিকর, অচেতনকে সচেতন করে, যে বাঁশের শুকনো জ্বালানি কাঠ হয়ে জ্বলবার কথা সে বাঁশি হয়ে ওঠে। মনে হয় তোমার অধর-স্পর্শের শক্তিতে বেণুতে প্রাণ-মন-রসনার উদ্ভব হয়েছে আর সেই বেণু নির্মম পরিহাস করছে গোপিনীদের সঙ্গে।

কী বলছে?

বলছে, কৃষ্ণের অধররস তোমাদেরই ধন, কিন্তু কী করব, আমিই এখন তা পান করছি। এতে তোমাদের যদি অভিমান হয়, তবে দৃপ্তপায়ে চলে এস, লজ্জা ভয় ধর্ম ছেড়ে চলে এস, লোককথায় জলাঞ্জলি দিয়ে গৃহত্যাগ করে চলে এস, আমি তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের ফিরিয়ে দেব। তোমাদের ভোগদখল কায়েম করো। আর যদি না আস, আমি একাকীই তবে ঐ অধরসুধা পান করব, আমি কাউকে ভয় করি না, অন্যকে তৃণের সমান দেখি।

কিন্তু কী নিদারুণ লাঞ্ছনার মধ্যেই রাখছে গোপিনীদের! রাধাভাবে আবার বিলাপ করছেন প্রভু। যদি ধর্মনাশের ভয়ে ধৈর্য ধরে ঘরে থাকি, তোমার কাছে না আসি, তবে ঐ বেণু, ঐ 'শুষ্ক বাঁশের কাঠখান' আমাদের নাচিয়ে বেড়ায়। গুরুজনদের সামনেই আমাদের কটিবন্ধন খসিয়ে দেয়, শুধু তাতেই রেহাই দেয় না, চুল ধরে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। শুধু কি তাই? টানতে-টানতে একেবারে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে আসে। তোমার দাসী করে ছাড়ে।

আমাদের বলবার-কইবারও কোনো উপায় থাকে না। কার কাছে নালিশ করব আর কার বিরুদ্ধে?

'চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাই।'

তোমার অধরের সঙ্গে যাদের সংযোগ হয় সঙ্গদোষে তারাও দাম্ভিক হয়ে ওঠে। যা তুমি পান করো বা ভোজন করো অধরসঙ্গহেতু সেই ভক্ষ্য-পানীয়ের কী দর্প! বলে, আমরা আর এখন সামান্য ভোজ্য-পানীয় নই, আমরা এখন প্রসাদ, আমাদের নাম কৃষ্ণ-ফেলা। দেবতারাও আমাদের এই কৃষ্ণ-ফেলার এককণাও পাবার যোগ্য নয়। আর, তোমার চর্বিত-চর্বণের কী স্পর্ধা দেখ! বলে পানের পিক আমি যেখানে-সেখানে ফেলি না, পিকদানিতে ফেলি, আর গোপিনীদের মুখই আমার পিকদানি।

তুমি এ সমস্ত কুটিলতা ত্যাগ করো। বাঁশি দয়ে কেন আমাদের প্রাণহরণ করো। বাঁশি তোমার আনন্দ হতে পারে কিন্তু আমাদের কুঠার। তুমি নিজে এস, এসে অধরামৃত দিয়ে আমাদের প্রাণে বাঁচাও বলতে-বলতে প্রভুর ভাবের পরিবর্তন হল। ক্রোধের পরে দেখা দিল উৎকণ্ঠা।

দেখ, বিচার দেখ। যোগ্য না হয়ে কোথাকার এক বংশখণ্ড অমৃত পান করছে আর আমরা যোগ্য, যোগ্যতম হয়েও ভোগবঞ্চিত। এই লজ্জা রাখবার জায়গা নেই অথচ আমাদের প্রাণ যাচ্ছে না। তবে না জানি ঐ অযোগ্য শুষ্ক কাঠ কখন কী তপস্যা করেছিল, নইলে তার এত সৌভাগ্য কেন? আর আমরা? আমাদের কথা না বলাই ভালো।

কৃষ্ণ তো দামোদর। যশোদা তাকে দাম বা রজ্জু দিয়ে বেঁধেছিলেন বলেই তো তার ঐ নাম। দামোদর তো গোপবালক, গোপিকাতনয়। সুতরাং আমরা গোপবালা, আমাদেরই তো কৃষ্ণাধরামৃতে প্রথম অধিকার, সেই বস্তু অন্যে নেয় কী করে, তা তো অন্যের লভ্য নয়। যাও, তোমরা কেউ গিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে এস কোন জন্মে এই স্থাবর পুরুষ বাঁশ জপতপ করেছিল কোন তীর্থে কোন সিদ্ধমন্ত্রের শক্তিতে?

দেখ তার ধৃষ্টতা। আমাদের জিনিস চুরি করে তো খাচ্ছেই, উলটে আবার আমাদের জানাচ্ছে, তোমাদের ভোগ্যবস্তু কেমন আমি সম্ভোগ করছি। শুধু বেণু কেন, যমুনাই বা কম কী! কৃষ্ণ যখন স্নান করতে নামছে, যমুনা তখন বেণুর উচ্ছিষ্ট রসই লুব্ধ হয়ে পান করছে। নদীর রস টেনে নিচ্ছে গাছ-পালা তাই তারাও 'নিজাঙ্কুরে পুলকিত। পুষ্পহাস্য বিকশিত'। আর সেই শক্তিতেই তো তারা পত্রে পুষ্পে ফলে পরোপকার করে চলেছে।

কোন তপস্যায় বেণুর এত বাড়বাড়ন্ত যদি জানতাম, তবে করতাম সেই তপস্যা। যা আমরা এত প্রার্থনা করেও পাচ্ছি না তাই কে এক অযোগ্য বিনায়াসে লাভ করবে এ অসহ্য।

মধ্যরাত্রে মহাপ্রভুকে শয়ন করিয়ে সবাই বিদায় নিয়েছে, গম্ভীরার দরজায় ঘুমিয়েছে গোবিন্দ। সমস্ত রাত প্রভু উচ্চকণ্ঠে সংকীর্তন করেন, সেদিনও করছেন, রাধার আবেশে হঠাৎ শুনতে পেলেন কৃষ্ণবেণুগান হচ্ছে। রাধিকার মত বেরিয়ে পড়লেন অভিসারে তিন-দুয়ার কপাট পেরিয়ে সিংহদ্বারের বাইরে যেখানে কতগুলো গরু ছিল সেখানে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

প্রভুর শব্দ না পেয়ে গোবিন্দ স্বরূপকে ডেকে আনল, তারপর মশাল জ্বেলে খুঁজতে বেরুল। দেখল গাভীদল পরিবৃত হয়ে প্রভু শুয়ে আছেন মাটিতে।

কিন্তু এ তাঁর কী আকৃতি! সমস্ত হাত-পা শরীরের মধ্যে ঢোকানো, কূর্মের আকার পড়ে আছেন। মুখে ফেনা, অঙ্গে পুলকরোমাঞ্চ, নয়নে অশ্রুধার।

'অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।'

গরুগুলো প্রভুর গা শুঁকছে, প্রভুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁর সঙ্গ ছাড়ছে না। অনেক যত্নেও প্রভুর চেতনা ফিরে এল না। তাঁকে ঘরে নিয়ে এসে সকলে কৃষ্ণকার্তন সুরু করল। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গেই হাত-পা বেরিয়ে এল গা থেকে। যথাযোগ্য শরীর পেয়ে প্রভু ইতি-উতি তাকাতে লাগলেন, স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে এলে? বেণুধ্বনি শুনে আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, দেখলাম গোষ্ঠে ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণু বাজাচ্ছে। সঙ্কেত শব্দে রাধিকাকে কুঞ্জ ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, আমি সখীভাবে তাদের পিছু পিছু চললাম, শুনতে পেলাম তার ভূষণশিঞ্জন। শুনতে পেলাম তাদের বিহার-হাস-পরিহাস, তাদের কণ্ঠস্বরই আমার কর্ণানন্দ। এমন সময় তোমরা সকলে কোলাহল করে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এলে। আর শোনা হল না সেই নর্ম-সহাস্য কথা সেই মুরলী-আলাপ। সেই বা ভূষণশব্দ।'

'আমার কর্ণের তৃষ্ণা দূর কর।' স্বরূপকে উদ্দেশ করে মহাপ্রভু বললেন, 'রসায়ন পড়ে শোনাও।'

ভাগবতের শ্লোক পড়তে লাগল স্বরূপ।

ত্রিলোকে এমন স্ত্রীলোক কে আছে যে তোমার পদামৃতবেণুগানে মুগ্ধ হয়ে নিজধর্ম থেকে না বিচ্যুত হবে। তোমার সকলসৌভগ রূপ দেখে শুধু নারী কেন, সমস্ত পুরুষ এমন কী, গো-দ্বিজ-দ্রুম মৃগ অর্থাৎ গরু পাখি গাছ ও বন্যজন্তুরাও পুলকিত। সমস্ত নারী-পুরুষই যখন তোমাতে আকৃষ্ট তখন আমাদের আর ভয় কী? কে আর আমাদের উপহাস করবে? আমাদের ধর্মত্যাগে সর্বস্বত্যাগেও যে আর কোনো গ্লানি নেই, অশুভ নেই।

প্রভুর এবার গোপীভাবাবেশ উপস্থিত হল। রাসস্থলীতে উপস্থিত হলে গোপীদের কৃষ্ণ বলেছিল, 'তোমরা কুলবধূ, তোমরা এখানে এসেছ কেন? তোমরা ঘরে ফিরে যাও, গিয়ে পতিপুত্রের সেবা করো, তাই তো কুলবতীদের ধর্ম, সে কুলধর্ম কেন অতিক্রম করবে? সে কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়েছিল গোপীরা, অনেক কিছু শুনিয়েছিল কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের সেই উপেক্ষা ও গোপীদের সেই ভর্ৎসনা মনে পড়ল প্রভুর।

গোপীদের সেই ভর্ৎসনাই তাঁর কণ্ঠে আবার স্ফুরিত হল :

হে নাগর শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিজগতে এমন যোগ্য নারী কে আছে যে তোমার বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হয় না?

'তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়?'

সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনীরা পর্যন্ত বেণুবাদ্যবশংবদ। আমরা কি নিজের ইচ্ছায় ঘরের বার হয়েছি? তোমার ঐ বেণুই আমাদের পাগলকরা ডাক দিয়ে ঘর থেকে, আর্যপথ থেকে ছিন্ন করে এনেছে।

এখন তো ভালোমানুষের মত বলছ ঘরে ফিরে যেতে, বাঁশিতে টান দেবার সময় সে কথা মনে ছিল না? তুমি বাঁশি বাজাবে আর তা শুনেও আমরা গৃহধর্মে স্থির থাকব এই কি তোমার অভিলাষ ছিল? তোমার বাঁশিতে এত তবে বিষ কেন, বৃক্ষলতা দূরের কথা পর্বতগাত্রে পর্যন্ত রোমাঞ্চ হয়।

'মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্যপথ ছাড়াইয়া আনি
তোমায় করে সমর্পণ।'

এখন ধার্মিক সেজে ধর্ম না শোনালেই ভালো করবে। তোমার বেণুর তো দূতীর স্বভাব। সরলা অবলা গ্রাম্য গোয়ালিনীদের ছলনা করে নিয়ে এসেছে। দূতীরা যে বশীকরণ বিদ্যা জানে। আমরা কী করে তা অতিক্রম করব? ও যে আমাদের লজ্জা-ভয়কেও ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

সবই তো তোমার কারসাজি। বেণুধ্বনিতেই তো তোমার কামশর কটাক্ষ এসে আমাদের বিদ্ধ করেছে। সর্বাঙ্গে বিষসঞ্চার করে হিতাহিত ভুলিয়ে দিয়ে এখন ধর্মের কাহিনী শোনাচ্ছ। পতি যদি দুঃশীল দুর্ভগ বৃদ্ধ জড় রোগাক্রান্ত বা নির্ধনও হয় তবু তাকে ত্যাগ করবে না এ কুলধর্ম কে না জানে? কিন্তু এ কুলধর্ম আমাদের ভোলাল কে? কে কুলবতীদের কুলত্যাগ করাল? সর্বনাশ ঘটিয়ে এখন আর সাধু সেজো না। তোমাকে মানায় না ধর্মকথা।

শঠ-পারিপাট্য ছাড়ো। মনে এক রকম, কথায় আরেক রকম এ প্রবঞ্চনা কেন? আমাদের সর্বনাশ তোমার পরিহাসের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং 'কুটিনাটি' কৃত্রিমতা বর্জন করে সরল সম্ভাষে আমাদের অভ্যর্থনা করো।

এক অমৃত, বেণুনাদের অমৃতেই প্রাণ অস্থির, তার উপর আরো দুই অমৃত—ভূষণধ্বনি আর তোমার কণ্ঠস্বর—এই তিন অমৃতে সমস্ত জগৎ তোলপাড়—আমরা কোথায় যাব, কী করব, আর কোন বিষয়ে চিত্তকে নিক্ষেপ করব? তোমার কণ্ঠের ধ্বনি যেন নবজলদ নিঃস্বনের মত গম্ভীর, যার মাধুর্যের কাছে কোকিলকণ্ঠও লজ্জিত—সেই ধ্বনির এতটুকু, কণামাত্রও যদি কেউ শোনে সে আর অন্য শব্দে কান দেয় না, পারে না দিতে। যার কান একবার শুনেছে তার কান সেই স্বরের থেকে আর ফিরে আসে না। কৃষ্ণের থেকে ফিরে এলেও না। তারপর কথার সঙ্গে আবার একটু হাসি মিশেছে। যেন অমৃতে কর্পূর পড়েছে। কথার দুই শক্তি, শব্দশক্তি আর অর্থশক্তি। কৃষ্ণের স্বরে এই দুই শক্তি উদ্ভাসিত। তাতেই বিচিত্র রসের ব্যঞ্জনা। 'প্রত্যক্ষরে নর্ম বিভূষিত।'

আমাদের তুমি বিনামূল্যের দাসী করে ছেড়েছ। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং লক্ষ্মী তোমার ধ্বনি শুনে তোমার সঙ্গলাভের আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে চলে এসেছিল। তোমার সঙ্গ না পেয়ে তপস্যা করতে গেল, তাতেও ফল পেল না। সেই লক্ষ্মী দুর্লভ ফল আমরা কী করে পাব?

তোমার কণ্ঠের তো শুধু স্বর নয়, তাতে আবার কথা আছে। তাই অমৃত তিন নয়, অমৃত চার। বেণুধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণীর শব্দ, কণ্ঠের ধ্বনি তার উপর আবার শ্রীমুখের বচন। এর একটি শব্দও যে শুনতে না পায় তার কান অসার্থক, বলতে পারো মূল্যহীন কানা-কড়ির সমান।

'ইহা যেই নাহি শুনে,
সে কান জন্মিল কেনে,
কানাকড়ি-সম সেই কান॥'

তোমাকে পাবার আশা করা সুদূরপরাহত। তবে

বলো আমি কী করব, কাকে বলব, কোথায়ই বা যাব? তুমি নিষ্ঠুর অথচ তোমার কথা ছাড়া আর কারু কথা, আর কোনো কথা ভালো লাগে না। তুমিই যে আমার মন ও নয়নের উৎসব, তুমিই তো আমার হৃদয়ে শুয়ে আছ, আর আশ্চর্য, তোমারই জন্যে আমার তৃষ্ণা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

তোমরা সখীরা, তোমরা এর একটা উপায় করো। কিন্তু তোমরাই বা কী উপায় করবে? বিরহবিষাদে তোমরা নিজেরাই তো ম্রিয়মাণ হয়ে আছ। এই দুঃখ নিবারণের একটা মাত্র উপায় আছে। সে হচ্ছে কৃষ্ণের আশা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া। আশা ছাড়া থাকতে পারলেই মন খুশি হয়। তাই বলছি, অধন্য কৃষ্ণকথা ছাড়ো, অন্য কথা বলো, আনো অন্য প্রসঙ্গ, যাতে কৃষ্ণের নামগন্ধও নেই! আশা ছেড়ে দিলেই উৎকণ্ঠা যাবে, আর উৎকণ্ঠা গেলে পেলেই বিস্তীর্ণ উপশম।

কিন্তু যার আশা ছাড়তে বলছি সে যে ছাড়ে না। সে যে হৃদয়ের মধ্যে শয়ন পেতে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। দূরে থেকে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না সে এখন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে হৃদয়ে এসে স্থান নিয়েছে। মনের আর সব ভাবকে দমন করতে পারি কিন্তু লালসাই বশ মানে না। কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গের লালসা।

মনকে ভৎর্সনা করছেন। তুমি প্রতিকূল, তুমি দরিদ্র, তুমি কৃষ্ণধনে বঞ্চিত। জল না পেলে যেমন মাছ মরে তেমনি তুমি, মন, কৃষ্ণহারা হয়ে তুমিও মরে যাবে।

হায় কৃষ্ণ প্রাণধন তুমি কোথায়? কোথায় হে আমার পদ্মলোচন শ্যামসুন্দর। আমার গুণসাগর রাসবিলাসী, বল কোথায় গেলে তোমার দেখা পাবে?

স্বরূপ উঠে প্রভুকে কোলে করে তুলে নিয়ে গেল।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে প্রভু স্বরূপকে পাইতে বললেন। স্বরূপ বিদ্যাপতির গান ধরল।

দিব্যোন্মাদেরই কত শত ভাবের বিকার প্রকট করলেন প্রভু।

'অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐ হে দয়ালু দাতা নাহি শুনি অন্য॥'

রাত্রিদিন কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসছেন প্রভু। কৃষ্ণ বুঝবে কী এই ভক্তের প্রেমবিকার? কী করে বুঝবে সে প্রেমের কত স্তর কত আলো-ছায়া—বুঝতে পারে না বলেই তো কৃষ্ণকে রাধিকার ভক্তভাব অঙ্গীকার করতে হয়। প্রেম কি যে সে বস্তু? সে যেমন ভক্তকে নাচায় তেমনি আবার কৃষ্ণকেও নাচায়। কৃষ্ণ তাই কোথায় আমাদের ঠেলে দেবে? সে তো প্রেমের হাতের পুত্তলিকা।

রাসের শ্লোক শেষ করে জলকেলির শ্লোক পড়তে লাগলেন প্রভু।

মহারাসে রাসনৃত্য করে যে শ্রম হয়েছিল তা দূর করবার জন্যেই কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে যমুনায় জলকেলি করতে নেমেছিলেন।

একদিন এমনি শ্লোক পড়তে-পড়তে প্রেমাবেশে একটা বাগানে বেড়াচ্ছেন প্রভু, দূর থেকে হঠাৎ সমুদ্র তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল। চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল তরঙ্গে ঝলমল করছে। প্রভুর মনে হল ঐ বুঝি যমুনা। যেমনি ভাবা তেমনি আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়া। সবার অলক্ষিতে বেরিয়ে পড়লেন, পৌঁছুলেন গিয়ে একেবারে সমুদ্রের পারে। কে বলে সমুদ্র! এ তো সেই বৃন্দাবনের যমুনা।

যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন প্রভু। ঢেউয়ের টানে ভেসে পড়লেন চলে গেলেন কোনারকের দিকে।

এদিকে স্বরূপ মাথায় হাত দিয়ে বসল, প্রভু কোথায়? কখন মনোবেগে চলে গিয়েছেন কেউ টের পায় নি। কিন্তু যাবেন কোথায়? জগন্নাথের টানে মন্দিরে গিয়েছেন, না কি অন্য বাগানে? না কি গুণ্ডিচা মন্দিরে, চটক পাহাড়ে, না কি কোনারকে? কে জানে হয় তো বা নরেন্দ্রসরোবরে। চলো বেরিয়ে পড়ি।

নানাদল নানাদিকে যাচ্ছে, একদল এসেছে সমুদ্র-পারে। খুঁজতে-খুঁজতে রাত্রি প্রায় শেষ তবু প্রভুর দেখা নেই। তখন সবাই ঠিক করল নিশ্চয়ই অন্তর্ধান করেছেন।

অনিষ্ট আশঙ্কা করা ছাড়া মন আর কিছুতেই রাজি নয়। যারা সুহৃদ তাদের অন্তরে শুধু অনিষ্ট আশঙ্কাই স্থান পায়।

ভোর হয়ে আসছে, কেউ গেল চটক পর্বতের দিকে। আবার কেউ-কেউ সমুদ্রের জল দেখে দেখে এগুতে লাগল। প্রভুর বিরহে সকলে বিষাদাচ্ছন্ন তারপরে এই পথক্লান্তি—আর হাঁটতে পারছে না। তবু প্রভুর প্রেমেই সমস্ত সহ্য করে চলেছে।

কতক্ষণ পরে দেখতে পেল কাঁধে জাল ফেলে একটা জেলে এদিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা হাসছে কেন, কাঁদছে কেন—দেখেছ নাচছে, হরি-হরি বলছে। এমন তো কোনোদিন দেখি নি। চলো এগিয়ে চলো, একে জিজ্ঞেস করলে হয়তো আমাদের প্রভুর খবর পাওয়া যাবে। [ক্রমশ।



খা-জু-রা-হো

চন্দেল্ল স্মৃতি

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অপরূপা সে,—অতুল রূপশালিনী। মর্ত্যবিহারিণী কোনো সুরসুন্দরী যেন। তাই ভেবেছে পুষ্প-বীথিকার ফুল্লমঞ্জরীর দল,—তাকে দেখে লজ্জায় নতমুখী হয়েছে তারা, ফেলেছে সুরভিত দীর্ঘশ্বাস। তাই ভেবেছে চঞ্চল মধুপের দল, তারা বন্ধ করেছে পাখা, স্তব্ধ করেছে গুঞ্জন।

বসন্ত-গোধূলির বিজন বনপথ দিয়ে সে চলেছে। তার পায়ের স্পর্শে ঝরাপাতার বুকে বেজেছে মর্মর, তার আঁচলের ছোঁওয়ায় নবকিশলয়ের প্রাণে জেগেছে শিহরণ। অশ্রান্ত কোকিল কুহু থামিয়েছে তার দিকে তাকিয়ে।

চরণে তার নূপুর নেই, নির্জন পথে নিঃশব্দ পদসঞ্চার। মুখে নেই লোধ্ররেণু, কপোলে নেই কুঙ্কুমচিহ্ন, ললাটে নেই সিন্দূরবিন্দু। ধূসর অবেণীবদ্ধ কেশ, অলক্তহীন চরণ। নির্ভূষণা একবসনা উদাসিনী। নিশ্চুপ বনস্থলী তাকে দেখে ভাবছে, এ কোন শাপভ্রষ্টা কিন্নরী!

বেলা শেষ হয়ে এসেছে,—পশ্চিম দিগন্তে অবসিত দিনমণি। অরণ্য-চক্রবালের উপরে অস্তরবির রক্তাভা। দূর দেবদারুর মাথায় মাথায় সেই রক্তিমাভার শেষ স্পর্শ। পাখিরা ফিরছে কুলায়। দিনের পুষ্পগুলি মুদিত করছে কোরক,—রাতের পুষ্পগুলি জাগছে।

চলেছে সে, অভিসারের দ্রুতত্রস্ত গতি নিয়ে নয়। পরম হতাশার অলস-মন্থর পায়ে পায়ে সে চলেছে। তার কাজলবিহীন রিক্ত চোখে উদাস দৃষ্টি, তার বর্ণবিহীন বস্ত্রাঞ্চলে অসিত শূন্যতা। তার কঙ্কণবিহীন দু'টি হাত মূর্ত নিরাশা।

নাম তার হেমবতী। দ্যুতিময়ী স্বর্ণবর্ণা যুবতী। ঘনায়মান সন্ধ্যায় সে দ্যুতি বিষাদপাণ্ডুর। অস্তবর্ণ মুদিত স্বর্ণকমলের মতো ম্লান।

হেমবতী অতি সম্ভ্রান্ত বংশের নন্দিনী। তার পিতার নাম হেমরাজ। নিষ্ঠাবান ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ,—পরিহার বংশের ক্ষত্রিয় নৃপতি ইন্দ্রজিতের রাজপুরোহিত তিনি। হেমরাজ রাজার অতি বিশ্বাসভাজন, পুরোহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে গূঢ় মন্ত্রণার অধিকারী। রাজানুগ্রহে প্রচুর সমৃদ্ধিশালী। সামন্ত-দুহিতা বা শ্রেষ্ঠীকন্যার মতোই হেমবতীর পিতৃসৌভাগ্য। কিন্তু হেমবতী যৌবনে যোগিনী,—পরম দুর্ভাগিনী।

হেমকান্তিমণী পরমাসুন্দরী কন্যা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার এই পরম দুর্ভাগ্যের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি তার পিতামাতা। তারপর অজস্র স্নেহ দিয়ে তাঁরা তাকে পালন করেছিলেন,—উদ্ভিন্ন কৈশোরে পরম আগ্রহে সমর্পণ করেছিলেন উপযুক্ত পাত্রের হাতে। কিন্তু প্রিয় ভর্তার প্রেমস্পর্শ থেকে চিরবঞ্চিতা হেমবতী। স্বামীর সম্পর্ককে উপলব্ধি করবার আগেই স্বামীকে সে হারাল।

বালবিধবা হেমবতী।

ভাগ্যের সেই প্রচণ্ড আঘাতকে উপলব্ধি করার বয়সও সেদিন হেমবতীর হয় নি। অনভিজ্ঞ কুমারী দেহ আর অবোধ মূঢ় মন নিয়ে সে পিতৃগৃহে ফিরে এসেছিল,—আবার কোলে তুলে নিয়েছিল ফেলে-যাওয়া প্রিয় ক্রীড়নকগুলিকে। তাদের আদর করেছিল, বুকে দুলিয়েছিল, চুম্বন করে ঘুম পাড়িয়েছিল।

তারপর ঋতুর পর ঋতু কেটে গেছে, অতিক্রান্ত হয়েছে বৎসরের পর বৎসর। বারে বারে ঝরেছে শীতের পাতা, ধরেছে বসন্তের মুকুল, ঘন জম্বুবনের ওপারের আকাশে ঘনিয়েছে নববর্ষার ঘনমেঘ। ক্রমে গ্রীষ্মের তুই সুরভিত পক্ক ফল আশ্রয় পেয়েছে হেমবতীর হৃদয়ে, বর্ষার পূর্ণ

জোয়ারের স্ফীত মন্থরতায় আবিষ্ট হয়েছে হেমবতীর গুরুভার যুগল শ্রোণী। শরৎ সমীরণের প্রসন্ন হিল্লোলে কুঞ্চিত ও সুদীর্ঘ হয়েছে তার কেশদাম, বসন্ত-মধুপের পক্ষ-শিহরণে কম্পিত হয়েছে তার সঘন আঁখি-পল্লব। প্রাণহীন ক্রীড়নক নিয়ে খেলা করে প্রাণ আর তার ভরে না।

বাঁশি বাজে। শুভলগ্নে প্রতিবেশীর গৃহ বিবাহ-উৎসবে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। সে উৎসবে বালবিধবার প্রবেশ নেই। আলোকোজ্জ্বল শোভাযাত্রা করে বর আসে। সেই বরের উত্তরীয়ে অঞ্চলাগ্র বেঁধে সীমন্তে সিন্দুর পরে প্রতিবেশিনী সখী জীবনের নবপথে যাত্রা করে। গবাক্ষ-প্রান্তের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একাকিনী হেমবতী সে দৃশ্য দেখে, অলক্ষ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অলিন্দছায়ায় গৃহপালিত কপোত-কপোতী একে অপরকে আদর করে। হেমবতী তাও দেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আর সেই নির্বোধ নিশ্চিন্ত বয়স নেই, সেই আত্মভোলা বাল্যকাল। এখন নিষ্ঠুর যৌবন। জ্বালাভরা যৌবন। সেই জ্বালা নিয়ে সে শীতল স্নান-সরোবরে যায়। তার স্ফটিক-স্বচ্ছ জলে নিজের ছায়া দেখে সে শিউরে ওঠে। এ ছায়া এক বিহ্বল আকুল বিভ্রান্ত বাসনার উষ্ণ ছায়া। এ ছায়ায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা কখনো হবে না।

হেমবতী বুঝেছে ব্যর্থ তার যৌবন, তুচ্ছ তার জীবন। তার জীবনে বাঁশি কখনো বাজবে না, শুভলগ্ন কখনো আসবে না। দয়িতের রথ তার বদ্ধ হৃদয়দ্বারে কখনো এসে পৌঁছবে না। তাকেই যেতে হবে অভিসারে,—খুঁজে নিতে হবে সেই পরমপ্রিয়কে, যার চরম আলিঙ্গনে যৌবনের সব বেদনার বিলয়, যৌবনের সব তুচ্ছতার মুক্তি।

সেই অভিসারেই চলেছে হেমবতী। রাজধানীতে সেদিন বসন্ত-উৎসব, প্রজাপুঞ্জ আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা। দক্ষিণ প্রাচীরদ্বার অতিক্রম করে কৃষকদের শস্যক্ষেত্রগুলি পার হয়ে হেমবতী প্রবেশ করেছে অরণ্য মধ্যে। বনবীথিকার পথ ধরে ধরে আসন্ন সন্ধ্যায় সে পৌঁছেছে কুমুদ-সরোবরের তীরে।

চারিদিকে ঘন অরণ্য—দেবদারু, মহানিম, শিরিষ, সপ্তপর্ণী, শাল, সেগুন ও বেতসের জটলা। মাঝখানে ছায়াঘেরা বিশাল এক সরোবর,—সহস্র কুমুদিনীশোভিত। একধারের পর্বতসানু বেয়ে কয়েকটি নবীনা নির্ঝরিণী সরোবরে এসে মিশেছে। তীরে ঘন সবুজ ঘাস, বন্যগুল্মে বসন্তমঞ্জরীর কটু মধুর সুবাস।

সেই কুমুদ-সরোবরের তীরে এসে বসল হেমবতী। নিশ্চুপ প্রকৃতির নির্জন একাকীত্বে সে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে।

● চন্দ্রাত্রেয় সম্ভব



মৃদু সমীরণ হাত বোলালো তার অলক-চূর্ণে, মুছে নিল তার ক্লান্ত কপোলের স্বেদবিন্দু।

কিন্তু তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই, শীতলতা নেই। অশান্ত কোকিল আবার শুরু করেছে তার পাগল-করা ডাক,—সে ডাকের বিরাম নেই। অশ্রান্ত রক্তে ব্যর্থ-যৌবনের জোয়ার, সেই সর্বগ্রাসী বন্যা থেকে পরিত্রাণ নেই। শান্তি আছে মুক্তি আছে শুধু ঐ কুমুদ-সরোবরের অতল কালো জলে। ওরই গভীরে বুঝি অপেক্ষা করে আছে তার জীবনের প্রথম ও শেষ অভিসারের পরমপ্রিয়।

দিগন্তপ্রান্ত আলো করে উদিত হলেন পূর্ণচন্দ্র। প্রসন্ন পূর্ণদৃষ্টিতে তিনি তাকালেন সরোবরের দিকে। এই সরোবর তাঁর অতি আদরের,—এখানে তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে সহস্র কমলিনীর দল। নতমুখী মুদিত আঁখি কমলিনীরা পূর্ণচন্দ্রের আলোকস্পর্শে ফুটে উঠল, চন্দ্রমার অমৃত সুধাপানে তৃপ্ত হোলো তাদের ফুল্ল অধর।

তারপর চন্দ্রদেবের দৃষ্টি পড়ল বিজন তীরের ঐ একাকিনী নারীমূর্তির দিকে। পায়ে পায়ে সে জলের ধারে এগিয়ে চলেছে। ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়েছে তার আঁচল, নীবিপ্রান্ত থেকে খসে পড়েছে বসনভার। কবরীচ্যুত আলুলায়িত কেশ। অশ্রুঘন দীঘল চোখে কোন্ দুর্নিরীক্ষ্যের ইসারা। সামনে প্রসারিত দীর্ঘ দুই বাহুতে কোন্ সুদূরের আহ্বান!

হেমবতীর কেশদামে আর কপোলে, বাহুতে আর বক্ষে, কণ্ঠে আর স্তনাগ্রচূড়ায় চন্দ্রদেবের পূর্ণদৃষ্টি পড়ল। সে দৃষ্টি কটিতল অতিক্রম করে প্রসারিত হোলো চরণমূলে। নিবসনা হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রদেবের চোখের পলক পড়ে না! এ কোন্ বিদ্যুৎময়ী চন্দ্রপ্রভা? অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অধরা রোমাঞ্চিকা!

মানবনন্দিনী হেমবতীর বরবর্ণিনী রূপপ্রভার আকর্ষণে স্বর্গের দেবতা চন্দ্র মর্ত্যে নেমে এলেন। হেমবতী তখন সরোবরে নেমেছে,—জানু স্পর্শ করেছে শীতল জল। সেই জলে শান্তি, সেই জলে পরিত্রাণ। সম্মোহিতার মতো সে এগিয়ে চলেছে,—আর কোনো চিন্তা নেই, বাসনা নেই।

ত্বরিতগতিতে কাছে এসে চন্দ্রদেব হেমবতীকে আকর্ষণ করলেন। বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতে তার কৃশ কটিদেশ জড়িয়ে তাকে তীরে টেনে আনলেন। অপাপবিদ্ধা হেমবতী এই প্রথম পরপুরুষস্পর্শিতা হোলো। চকিতে মূর্ছিতা হয়ে ছিন্ন লতার মতো সে লুটিয়ে পড়ল দেবচন্দ্রমার বিশাল বক্ষে।

দেবসম্ভোগলাঞ্ছিতা মোহাচ্ছন্না মানবী। সমস্ত বসন্তনিশি ধরে নিশাপতির কঠিন আলিঙ্গনবদ্ধা। পুরুষকে হেমবতী চেনে না। দেহমিলনের পরিচয় কখনো সে পায় নি, অনাঘ্রাত পুষ্প আগে কখনো খোলে নি তার পল্লবদল। দীর্ঘ প্রহরের রভস-আশ্লেষে দেহমনের অসহ্য যন্ত্রণা কখন অসহ্য পুলকে রূপান্তরিত হয়েছে তা সে বোঝে নি। বোঝে নি কোন আশ্চর্য মুহূর্তে অন্তরের কোন গভীর অন্তঃপুর থেকে আত্মনিবেদনের অকুণ্ঠ আবেগ ধন্য করেছে তার জীবন-যৌবন।

নিষিদ্ধ মিলনের নিভৃত নিশি শেষ হোলো। নিবিড় আলিঙ্গন থেকে হেমবতীকে মুক্ত করলেন পরিতৃপ্ত সোমদেব।

তন্দ্রাজড়িত ক্লান্ত দুই চোখ উন্মীলিত করে হেমবতী বললে,—আমার জীবনযৌবনের অপহরণকারী হে নিষ্ঠুর দস্যু, কে তুমি?

প্রসন্ন হাসি হেসে চন্দ্র বললেন,—আমাকে দেখে তোমার কি হীন দস্যু বলে মনে হয়?

হেমবতী প্রত্যূষের প্রথম আলোয় পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবপ্রেমিকের দিকে তাকাল। প্রশান্ত চন্দ্রবদনের অপরূপ মাধুর্য দেখে আনন্দে বিস্ময়ে পরিপ্লুত হয়ে গেল তার হৃদয়। বললে,—আমি জানি না, তুমি তস্কর কি সম্রাট, দেব কি মানব,—এই শুধু জানি তুমি আমাকে লুণ্ঠন করেছ, তুমি আমাকে সংহার করেছ!

সংহার? চন্দ্রদেব বললেন,—তুমি না ঐ সরোবরে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে? আমি তোমাকে সার্থক করেছি, তোমাকে নবজীবন দান করেছি!

গত সন্ধ্যার কথা হেমবতীর মনে পড়ল। দেহের সব আভরণ, জীবনের সব আকর্ষণ পরিত্যাগ করে সে যখন গভীর জলরাশিকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত, সে মুহূর্তে তাকে টেনে এনেছিল এই অপরিচিত পুরুষ! দিয়েছিল নারী জীবনের পরম-রমণীয় অভিজ্ঞতার আস্বাদ।

সেই অভিজ্ঞতাকে রোমাঞ্চভরে স্মরণ করল হেমবতী। তারপর ম্লানকণ্ঠে বললে,—না, আত্মহত্যাই আমার পথ,—তা ছাড়া অন্য পথ আমার নেই।

চন্দ্র বললেন,—কেন কুমারী, এতো ঘৃণা কেন আমার প্রেমকে?

হেমবতী নতনয়নে বললে,—তুমি কে আমি জানি নে কুমার, কিন্তু একথা জেনেছি যে প্রেম কখনো ঘৃণার্হ নয়, —প্রেম সঞ্জীবনী।

তবে?

প্রেমে আমার অধিকার নেই। আমি অস্পৃষ্টা, অস্পৃশ্যা,—আমি বালবিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা। প্রেম আমার জীবনে চরম অভিশাপ। মৃত্যুতেই সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করলেন চন্দ্রদেব। তারপর পরম স্নেহে নতমুখী দুর্ভাগিনীর চিবুকে হাত দিয়ে তার ব্যথাপাণ্ডুর মুখখানি তুলে ধরলেন। কোমলকণ্ঠে বললেন,—নাম কি তোমার?

হেমবতী।

মর্ত্যমানবের প্রেম অভিশাপ হতে পারে, কিন্তু দেবতার প্রেম নয়। শোনো হেমবতী, আমি আকাশের দেবতা চন্দ্র। দিগন্ত থেকে তোমার রূপমাধুরী দেখে আকৃষ্ট হয়ে মর্ত্যবাসিনী তোমাকে আমি গ্রহণ করেছি,—তাতে তুমি অভিশপ্ত হও নি, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করে যাব।

রোমাঞ্চিতা হেমবতী আভূমি দেহলুণ্ঠিত করে চন্দ্রদেবকে প্রণাম করল। তারপর নতজানু হয়ে বললে,—আমি কলঙ্কিতা মানবী, তোমার আশীর্বাদে আমার কি হবে প্রভু?

হেমবতীর মাথায় হাত রেখে চন্দ্র বরদান করলেন,—আমার ঔরসে তোমার চন্দ্রপ্রতিম পুত্রলাভ হবে হেমবতী। সেই পুত্রের গৌরবে তুমি হবে চির-গৌরবময়ী মাতা।

আর্তস্বরে হেমবতী বললে,—ভর্তৃহীনা বিধবার পুত্রলাভ কি গৌরব,—না মহাকলঙ্ক প্রভু?

মেঘগম্ভীরকণ্ঠে দেবতা বললেন,—কে বলে তুমি ভর্তৃহীনা হেমবতী? তুমি আমার মর্ত্যপ্রেয়সী, আমি তোমার দেবভর্তা। আমার বরে কোনো কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করবে না। নিঃশঙ্কচিত্তে তুমি শ্রবণ করো।

হেমবতী শুনল চন্দ্রদেবের অমোঘ ঘোষণা,—কর্ণবতী নদীর তীরে তোমার পুত্র জন্মলাভ করবে। সে হবে মহাবীর, মহাক্ষত্রিয়, মহারাজা। খর্জুরপুর নগরের সে প্রতিষ্ঠা করবে, বহু দেবমন্দিরের গৌরবে ভুবনবিখ্যাত হবে সে নগর। কলঞ্জর গিরিশিখরে সে স্থাপিত করবে তার দুর্ভেদ্য দুর্গ। সে দিগ্বিজয়ী হবে, এক অবিস্মরণীয় রাজবংশের পুরোধা হবে। আমি তাকে স্পর্শমণি দেব, যার স্পর্শে লৌহখণ্ড স্বর্ণে পরিণত হবে।

নতজানু হেমবতী দেবচন্দ্রমার বাণী শুনছিল। শেষ পর্যন্ত বললে,—সন্তানবর তো দিলে দেব, কিন্তু আমার কলঙ্ক? মর্ত্যসমাজে আমার কলঙ্ক তো ঘুচবে না?

ঘুচবে হেমবতী, ঘুচবে। মাতৃত্ব কলঙ্ক নয়, মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ গৌরব। তোমার সন্তান যখন জন্ম নেবে, তখন দেববৃন্দসহ তার শিয়রে আমি উপস্থিত হব,—দেবসমাজে স্বীকার করব আমার পিতৃত্ব। আর তোমার পুত্রের ষোলো বছর যখন পূর্ণ হবে তখন সে এক মহাযজ্ঞ করবে। সেই যজ্ঞস্থলীতে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে মানব সমাজের সামনে যজ্ঞকারীকে পুত্র বলে আমি ঘোষণা করব। যজ্ঞের সেই পূত সলিলে তোমার সব কলঙ্ক ধৌত হবে।

নিশানাথ ও হেমবতীর এই প্রেমোপাখ্যানের উৎস কোথায়? রামায়ণে নয়, মহাভারতে নয়। অষ্টাদশ পুরাণের কোনো পুরাণেই এই কাহিনীর ইঙ্গিতমাত্র নেই। প্রাচীন আর্য ব্রাহ্মণ্য যুগের সব সাহিত্যেই এই কাহিনী সম্বন্ধে নীরব।

পৌরাণিক পরিচিতি অনুসারে অত্রি ঋষির পুত্র চন্দ্র। তাঁর অপর নাম সোম। অত্রি বেদবিজ্ঞাতা মহাঋষি,—তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কর্দম প্রজাপতির কন্যা মহাসতী অনসূয়া অত্রির পত্নী ও চন্দ্র-জননী। সুসন্তান লাভের মানসে অত্রি-অনসূয়া গভীর তপস্যা করেন। তাঁদের তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁদের অংশ হতে তিনটি পুত্র দম্পতিকে দান করেন। বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করেন দত্তাত্রেয়, শিবের অংশে দুর্বাসা ও ব্রহ্মার অংশে চন্দ্র। চন্দ্র নিশাপতিরূপে আকাশে বিরাজিত হন। রোহিণী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি দক্ষের সাতাশটি কন্যা চন্দ্রের পত্নী। তাঁরা নক্ষত্ররূপে চন্দ্রকে ঘিরে আকাশরাজ্যে বিরাজিতা।

আকাশের দেবতা চন্দ্র থেকে পুরাণ-প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের উদ্ভব, যেমন সূর্য থেকে উদ্ভব সূর্যবংশের। বর্তমান কল্পের আদি মানব বৈবস্বত মনু। মহাপ্রলয়ের একার্ণবে তিনি রক্ষা পান। পুরাণোক্ত সমস্ত মানববংশ তাঁর থেকেই সৃষ্টি। তিনি সূর্যের পুত্র,—তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকু সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মনুকন্যা ইলাকে বিবাহ করেন চন্দ্রের পুত্র বুধ। বুধ ও ইলার পুত্র পুরুরবা চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ইনি সেই পুরুরবা,—স্বর্গ-অপ্সরা উর্বশীর সঙ্গে যাঁর অনন্ত প্রেম।

রামচন্দ্র সূর্যবংশীয় ছিলেন, কুরু পাণ্ডব চন্দ্রবংশীয়। রামায়ণ সূর্যবংশের কাহিনী, চন্দ্রবংশের কাহিনী মহাভারত।

বিজন কান্তার মধ্যে কুমুদ-সরসীর তীরে ব্রাহ্মণ বিধবা হেমবতীকে যিনি নিভৃতে গ্রহণ করেন তিনি কোন্ চন্দ্র? চন্দ্রবংশের আদি দেবপুরুষ যিনি, তিনি সেই। তবে এ কাহিনী কোনো পুরাণে নেই,—আছে মধ্য ভারতের মধ্যযুগীয় লোকগাথায়। সে লোকগাথা লোকভাষায় রচিত। চারণ কবিরা দেশে দেশে সেই গাথা গেয়ে বেড়াত,—সাধারণের কণ্ঠে লোকসংগীতের সুরে আজও সেই গাথা ফিরছে।

চন্দ্রদেব বিদায় নিলেন। বিধবা হেমবতীর কুমারী তনু তখনো শিহরিত হচ্ছে দেবস্পর্শের মহিমায়, কানে বাজছে দেবদয়িতের অমোঘ আশীর্বাদ। সেই স্পর্শে সেই আশীর্বাদে নবজন্ম হয়েছে তার।

পিতৃগৃহে ফিরে গেল না হেমবতী। গেল সে নূতন জীবনের সন্ধানে অরণ্যের আরো নিভৃত গভীরে,—সমাজ-সংসার থেকে বহুদূরে। খর্জুরপুর গ্রামের দূরপ্রান্তে আরণ্যক অনার্য-সমাজ,—সেই সমাজে এক বনবাসীর কুটীরে আশ্রয় পেল সে।

প্রসবকাল ঘনিয়ে এল। সুদীর্ঘ গর্ভধারণের পর হেমবতীর চন্দ্রপ্রতিম পুত্রের জন্ম হোলো। সোমবার, বৈশাখী শুক্লা-একাদশী তিথিতে,—ব্রাহ্মমুহূর্তে।

পুত্রমুখ দর্শন করতে আকাশ থেকে চন্দ্রদেব নেমে এলেন কর্ণবতীর তীরে। প্রসূতি ও নব-জাতককে আশীর্বাদ করতে উপস্থিত হলেন স্বর্গের অন্যান্য দেবদেবীগণ। জাতকের ললাটে ভাগ্যলিপি রচনা করলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। চন্দ্র তাঁর পুত্রের নামকরণ করলেন—চন্দ্রবর্মণ।

হেমবতী সীমন্তিনী নয়, সভ্য সমাজের চোখে সে কলঙ্কবতী। সংসারে তার স্থান নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না তার সন্তানের পিতৃপরিচয়। বনের মধ্যেই সে রয়ে গেল, অনার্য বনবাসীদের মধ্যে মানুষ হতে লাগল দুঃখিনী মায়ের হৃদয়চন্দ্র।

দেবপুত্র চন্দ্রবর্মণের দেবপ্রতিম রূপ। চন্দ্রতনয় চন্দ্রেরই মতো উজ্জ্বল। বনবাসী সহচরদের সে স্বাভাবিক নেতা। শুধু সে রূপবানই নয়। প্রচণ্ড সাহসী, দুর্মদ শক্তিধর। শৈশব ও বাল্য অতিক্রম করে সে কৈশোরের দ্বারে এসে পৌঁছেচে। তার প্রতাপে সারা অরণ্যরাজ্য কম্পমান।

ক্রমে চন্দ্রদেবের দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার শুভসময় ঘনিয়ে এল। ষোলো বছর বয়সে চন্দ্রবর্মণ বিনা অস্ত্রে একাকী সম্মুখযুদ্ধ করে এক বাঘ আর এক সিংহকে বধ করল। পুত্র-গরবিনী হেমবতী মন্ত্রোচ্চারণ করে চন্দ্রদেবকে আহ্বান করলেন।

মর্ত্য-প্রণয়িনীর মন্ত্র প্রার্থনায় আবার আকৃষ্ট হলেন শশাঙ্কদেব। কাননভূমির দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করে পৃথিবীতে নেমে এলেন। ষোলো বছর পরে আবার তিনি দেখলেন হেমবতীকে। উদ্ভিন্নযৌবনা যে রূপসীর নগ্নরূপ দেখে একদা তিনি আত্মহারা হয়েছিলেন,—হেমবতী যেন সে নারী নয়। হেমবতী মাতৃত্বগৌরবশালিনী মহিমময়ী। সার্থক জীবনের অহংকারে নবকান্তিময়ী।

তার মাথায় সস্নেহে হাত রাখলেন চন্দ্রদেব, বললেন,—এতো দিন পরে তুমি আমাকে স্মরণ করেছ প্রিয়ে,—ছাখো, আমি বিলম্ব করি নি।

হেমবতী তরুণ চন্দ্রবর্মণকে পিতার সামনে আনলেন। বললেন,—প্রভু, পনেরো বছর ধরে তোমার পুত্রকে আমি পালন করেছি। আমার কর্তব্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এইবার তুমি একে আশীর্বাদ করে জীবনের পথে পরিচালিত করো।

আত্মজ কিশোরের বলিষ্ঠ সুন্দর রূপ দেখে প্রীত হলেন সোমদেব। পুত্র বলে সম্বোধন করে তিনি তাকে দিলেন অমোঘ অস্ত্র-কুণ্ডল ও স্পর্শমণি। নরবাহন উপাধিতে তাকে ভূষিত করলেন। দেবাস্ত্র-সজ্জিত চন্দ্রবর্মণ অজেয় হলেন, স্পর্শমণির কল্যাণে তিনি হলেন কুবেরের মতো ধনশালী।

প্রথমে চন্দ্রবর্মণ নিকটবর্তী কলঞ্জর জনপদ জয় করলেন ও নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজা দিলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি অসংখ্য সুবর্ণ মুদ্রা দান করলেন।

কলঞ্জরে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করলেন চন্দ্রবর্মণ। তারপর সেই দুর্গকে কেন্দ্র করে দিকে অভিযান পরিচালনা করলেন।

এক বৎসরের মধ্যে বিজয়-অভিযান সম্পূর্ণ করে এক বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন চন্দ্রবর্মণ। তারপরে জন্মভূমি খর্জুরপুরে জননীর কাছে ফিরে এলেন তিনি।

দিগ্বিজয়ী পুত্রের শিরশ্চুম্বন করলেন হেমবতী। বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের পুঞ্জীভূত অভিমান এতোদিনে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন,—পুত্র, তুমি জেনেছ চন্দ্রদেব তোমার পিতা। কিন্তু মানুষ সে কথা জানে না, বললে বিশ্বাসও করত না। এতোদিন অনাথিনীর পিতৃপরিচয়হীন পুত্ররূপে তুমি মানুষ হয়েছে। লোক গঞ্জনার অপবাদকে মাথায় নিয়ে আমি তোমায় মানুষ করেছি। তোমার মুখ চেয়ে সমাজের সর্ব অপমানকে আমি সহ্য করেছি।

ক্রোধে রক্তবর্ণ হোলো চন্দ্রবদন। চন্দ্রবর্মণ বললেন,—

সেই অপমানের শোধ নেবার সময় এতোদিনে এসেছে। তোমার পুত্র আজ মহারাজ। আমার বাল্যে শৈশবে তোমাকে যারা অপমান করেছে তাদের পরিচয় আমাকে দাও,—আমি তাদের নিষ্ঠুর শাস্তি দেব।

না বৎস, না ব্যাকুলকণ্ঠে হেমবতী বললে,—ভুল বুঝেছ তুমি। কেউ আমার অপমান করে নি। আমার অপমান ভাগ্যের বিধান। সর্বসমক্ষে যদি প্রচারিত হয়, সর্বলোক যদি বিশ্বাস করে চন্দ্রদেব তোমার পিতা, তা হলেই আমার ভাগ্য সম্মানের আলোকে উদ্ভাসিত হবে।

কি করে তা সম্ভব মা?

শোন বৎস। ষোলো বৎসর বয়স তোমার সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমার পিতা চন্দ্রদেব নির্দেশ দিয়েছিলেন ষোলো বৎসর পূর্ণ হলে তুমি এখানে ভাণ্ডযজ্ঞ করবে। সেই মহাযজ্ঞে তুমি সমগ্র লোক-সমাজকে নিমন্ত্রণ করবে। সেই যজ্ঞস্থলীতে চন্দ্রদেব সশরীরে উপস্থিত হবেন। মানবমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি ঘোষণা করবেন তাঁর পিতৃত্ব। সেই ঘোষণায় আমার সর্ব অপমানের মোচন হবে।

খর্জুরপুর গ্রামকে অবিলম্বে সুরম্য নগরে পরিণত করলেন চন্দ্রবর্মণ। তারপর মহান ভাণ্ডযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সমস্ত দেশ আমন্ত্রিত হোলো সেই মহাযজ্ঞে। রাজা ও প্রজা, অভিজাত ও দরিদ্র, শ্রেষ্ঠী ও কৃষক, লক্ষ লক্ষ লোকে ভরে গেল যজ্ঞক্ষেত্র।

স্বর্গের দেবদেবী সামভিব্যাহারে সেই যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলেন চন্দ্রদেব। ভয়-বিস্ময়ভরা অসংখ্য নরদৃষ্টির সম্মুখে। হোমস্থলীর কেন্দ্রে দক্ষিণে চন্দ্রবর্মণ ও বামে হেমবতীকে নিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

ঘোষণা করলেন,—এই মর্তমানবী আমার সহধর্মিণী, এই মর্তনন্দন আমার আত্মজ সন্তান। আমি আশীর্বাদ করছি আমার পুত্র পৃথিবীতে এক মহান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করবে। আমার নামে সে বংশের নাম হবে চন্দ্রাত্রেয় বংশ!

অগণিত মানবকণ্ঠের জয়ধ্বনি, অবমানিতা মানবী মাতা হেমবতীর বিশাল-করুণ আঁখি আনন্দে গৌরবে অশ্রু-টলমল।

চন্দ্রদেব আরো ঘোষণা করলেন,—এই চন্দ্রাত্রেয় বংশের কল্যাণে আমার নির্দেশে এখানে বহু মহামন্দির নির্মাণ করবেন বিশ্বকর্মা। সেই মন্দিররাজি স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মহৈশ্বর্যে যুগ যুগ ধরে বিশ্বভুবনের বিস্ময় হয়ে বিরাজ করবে।

সেই চন্দ্রাত্রেয় বংশ মধ্য ভারতের ইতিহাসে চন্দেল্ল বংশ নামে পরিচিত। লোকগাথায় উল্লিখিত খর্জুরপুরের অপর নাম খাজুরাহো। [ক্রমশ।

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

পঞ্চাশ

'প্রসাদ পেতে হয়,—খেতে হয় না।'

কয়েকদিন আগের কথা। যাদবপুর অঞ্চলে মরলোকত্যাগী অমরলোকের এক মহৎ মানুষের সমালোচনা হচ্ছিলো গৃহস্থদের সরস মন্তব্যের মুখে। নিন্দার ঝাঁজে বাতাস হয়েছিলো ভারী। 'আলোচনার মধ্যে আলো কোথাও ছিলো না, ছিলো পরনিন্দার চোনা।' এই সমালোচনার কয়েকদিনের মধ্যে সেই দিব্যধামবাসী ইহলোক গৃহীত কাচ দিয়ে বাঁধানো আলোকচিত্রের মধ্যে পায়ের ওপর দেখা গেলো ফুটে উঠেছে সাদা ফুল। একজনের বাড়িতে নয়। ওই অঞ্চলের একাধিক ভক্তের গৃহে তাঁর ছবিতে ঠিক একই রকম ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে পুষ্প। অবিশ্বাসীর উদ্ধত রাগের উত্তরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অসীম ঊর্ধ্বে যাঁর বাস এ তাঁরই অনুরাগ। হুল ফুটোনোর পালা শেষে ফুল ফুটোনোর খেলা। সব দেশে সব কালে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্রুশবিদ্ধ হয়েও তিনি আক্রোশে বিদ্ধ করেন না কাউকে। শিক্ষা দিবার প্রয়োজনে কপট-রোষস্থ হন যদি বা ক্ষণেকের জন্যে অকপট রসস্থ তাঁরা চিরক্ষণের! কলসীর কাণা ছুড়ে মারলে রাগে অন্ধ হন না; অনুরাগের চোখ ফোটান।

মহাভক্তের কালে যদুপুরেও যা, এ-কালের যাদবপুরেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবর্তন। এখন যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি, যাদবপুরে সেই অঘটন-ঘটনপটীয়সের পুণ্য পবিত্র পরমাশ্চর্য পুরুষের নাম,—শ্রীশ্রীরামঠাকুর।

কাশীতে প্রায়ই শ্রীশ্রীরামঠাকুরের নাম করেন যিনি, তিনি কাশীর অন্যতম দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য,—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। হিমালয়ের মনুষ্য অনধিগম্য অঞ্চলে প্রস্তরবৎ দেবপুরুষের সান্নিধ্যে রামঠাকুরের কথা তিনি আমায় বলেছেন। দীর্ঘকায়, দীপ্ত, দিব্য একাধিক পুরুষ। মনে হয় পাথরের মূর্তি। রামঠাকুর এবং তাঁর আর এক গুরুভ্রাতা তাঁদের প্রণাম করতে তাঁরা হাত তুলে আশীর্বাদের ভংগী করতে জানা গেল যে তাঁরা পাথরের মূর্তি নন; ধ্যানাবিষ্টতার মূর্ত-প্রতীক। ঠাকুর এবং গুরুভ্রাতা প্রত্যহ তাঁদের ভোগ দেন এবং তাঁরা তা গ্রহণ করেন।

পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত এই পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য মানব বিরল; কিন্তু এখনও কোথাও কোথাও কেউ কেউ লোকহিতব্রতে লোকালয়েও আসা-যাওয়া করেন। সাধুরা কেবল বিনাশ্রমে আশ্রমে বসে আকাশকুসুম চয়নে সময় কাটান একথা বলাই এখন ফ্যাসান। যারা জানে তারা মানে যে ব্যক্তিগত বিপদ থেকে সুরু করে সমগ্র মানবের মংগলের জন্যে এঁরা যাপন করেন বিনিদ্র রজনী; জেগে থাকেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে আজও বাধে নি তার জন্যে বিশ্বের দুই শক্তি,—ম্যারিকা ও রাশ্যার সচেষ্টতাই সব নয়; তৃতীয় আর এক শক্তিও ঠেকিয়ে রেখেছে যে তাকে, তৃতীয় চোখ ছাড়া তা দেখবে কে?

সে শক্তি,—নিরাসক্তি। শক্তর চেয়ে বড় সে, যে নিরাসক্ত এবং যুদ্ধ বাধলেও এ-বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত যে বাঁচাবে, সে ওই পারমাণবিক মৃত্যু নয়; পরমাশ্চর্য 'ঠাকুর'। বিশ্ব ধ্বংস হবে না; বি[illegible] না। যুদ্ধে রক্তাক্ত হবে রংগভূমি, বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাস অসভ্যতার চূড়ো গুঁড়ো হবে; সুরু হবে আবার সভ্যতার জয়যাত্রা; Man থেকে জন্ম নেবে ইভলুসানের পরবর্তী অধ্যায়ে, Superman সংখ্যাতত্ত্ববিদরা নয়, এ কথা জানেন কবি, তিনি মানেন!

'ফুরায়নি তো ফুরাবার এই ভাণ।'

শ্রীশ্রীরামঠাকুর আলোকের অধিকার নিয়ে এসেছিলেন এই অন্ধকার লোকে। তিনি ভগবানের দূত। মুক্তির মন্ত্রে এসেছিলেন জীবনের বন্ধদ্বার খুলে দিতে। সে মন্ত্রে মৃত্যুভয় দূর হয়; মৃত্যুঞ্জয় হয় মানুষ।

রামঠাকুরের লৌকিক জীবন অলৌকিক ঘটনায় উজ্জ্বল। তাঁর একমাত্র উপদেশ হচ্ছে, নাম কর। নাম করতে করতেই প্রণাম করার অধিকার পাবে। কেবল পায়ে হাত দিলেই প্রণাম করা হয় না। নাম কানে দেবার নয়; প্রাণে দেবার। নাম করতে খারাপ লাগলেও নাম করো। এক সময়ে শুষ্কতার পাথর ভেদ করে নামেতেই ঝরনা ঝরানো।

নাম-এর পরেও কথা আছে; প্রণামের পরেও আছে পথ। সে পথ দুর্গম, ক্ষুরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেয়েও তা শক্ত। বহুজন্মের সুকৃতি, সাধনা এবং অহৈতুকী কৃপার পরে কোনও কোনও ভাগ্যবান তার সন্ধান পায়। যে পায় না তার উপায়? তার উপায়,—নামের দু'পায় লুটিয়ে পড়া। রামঠাকুর নাম করতে বলেছেন। তার চেয়ে গূঢ় কথা, নিগূঢ় ক্রিয়া দেন নি এমন নয়। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কৃপা যা সাধারণের কানে নয়, প্রাণে বাজিয়ে গেছেন তা ওই 'নাম'।

একজন ভক্ত, তাঁর লেখা, 'শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে' পুস্তকে 'নাম'-এর মহিমা কি বিপুল তার একটি প্রমাণ দিয়েছেন। এই প্রমাণের মধ্যেই সেই মাহাত্ম্যের পরিচয় পদ্মরাগমণির মতো প্রদীপ্ত।

ভদ্রলোকের নাম, রোহিণীকুমার মজুমদার। রামঠাকুরকে তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'আচ্ছা, নামের শক্তিতে চোখ বন্ধ করে রাস্তা দিয়ে চলতে পারা যায়?'

রামঠাকুর বললেন: 'তা তো পারাই যায়।'

'বেশ, আমি তা হলে এখুনি পরীক্ষা করে দেখতে চাই',—বলে রোহিণীবাবু রামঠাকুরের কাছে নাম নিয়ে, রাস্তায় বেরিয়ে চোখ বন্ধ করে চলতে সুরু করলেন, মনে মনে নাম নিতে নিতে। তারপরের বর্ণনা শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে গ্রন্থের লেখক রবীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায়:

'ডিক্সন লেন থেকে রোহিণীকুমারের তৎকালীন বাসস্থান অক্রুর দত্ত লেনের দূরত্ব বেশি না হলেও পরিক্রমা বেশ জটিল। পার্ক, ছোট-বড় রাস্তার সংযোগস্থল, সংকীর্ণ গলি, গাড়ি-ঘোড়া সংকুল ও অগণিত পথচারী অধ্যুষিত অঞ্চলটি অন্ধের অনুকরণে অতিক্রম করতে চাওয়া একমাত্র উন্মাদ ছাড়া আর কেউ আশা করে না জেনেও সদ্য-নামপ্রাপ্ত রোহিণীকুমার নামের শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অধ্যবসায়ী ছাত্রের মত একেবারে চোখ বুজে চলেছেন তো চলেইছেন। মানুষের মৃদুস্পর্শ এমন কি তাদের তপ্ত নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত অনুভব করছেন। গতি স্বাভাবিকের চাইতে কিছুটা মন্থর হলেও একটিবারও তাতে ছেদ পড়ল না। কতক্ষণ যে এইভাবে কেটে গেল সেদিকে কোনই খেয়াল নেই। অবিরাম নামোচ্চারণের সঙ্গে গতির ছন্দ আপনা হতে কখন মিলে গেছে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার ইচ্ছা তাঁকে একান্তভাবে বিধৃত করে রেখেছে বলে অন্য কোন চিন্তাই নেই। হঠাৎ একটি ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে তিনি পড়ে গেলেন। চোখ মেলতে যা দেখলেন তাতে তাঁর আনন্দের আর সীমা রইল না। নিজ বাসস্থানের একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে একখানি সীমানা-নির্দেশক উঁচু পাথরের সঙ্গে তাঁর সঙ্ঘাত হয়েছে।'

[শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে: রবীন্দ্রনাথ রায়: পৃ ১৬-১৭]

এই নামের বিজ্ঞানে আমাদের আস্থা নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের নামে যে কোনও ভ্রান্ত কিংবা উদভ্রান্ত তত্ত্ব স্বীকার করতে নেই এতটুকু অনীহা। এর কারণ নাম-বিজ্ঞান ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। যেদিন বিজ্ঞান এর নাগাল পাবে, সেদিন লোকে এতে বিস্ময়ের অবকাশ পাবে অল্প। ওয়ারলেসে খবর পাঠানো আজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে না বিন্দুমাত্র। কিন্তু কোনও মহাত্মা সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল শরীরেই দূর-দুরান্তরের কোনও বিপন্নকে দেখা দিতে পারেন উন্মোচন করতে ভয়ের বন্ধন, একথা শুনলে সেই একই লোক অবিশ্বাসের হাসি হাসে। আগামী কোনও কালে যখন বিজ্ঞান এমন অবস্থাকে সম্ভব করবে তখন কেউ তাতে অবাক মানলে আমরা বলব: এতে অবাক হবার কি আছে?

অধ্যাত্মবিদ্যাকে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা যায় না, বিজ্ঞানের তত্ত্বকে দেখানো যায় চর্মচক্ষুতে চিরে চিরে। ওষুধে কাজ না হলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দায় নেই; দায়ী,—হয় ডাক্তার, নয় ওষুধ। নাম নিয়ে একজন চোখ বুজে পার হয় পথ, আরেকজন পারে না, তাতে দায়ী হয় সেই লোক নয়, নাম-বিজ্ঞানই প্রমাণিত হয় প্রতারক বলে। জ্যোতিষী যখন কারুর অতীত অথবা ভবিষ্যৎ মেলায়, তখন তা কাকতালীয়। কেন? না, কখনও মেলে, কখনও মেলে না। ওষুধেও যে কখনও অসুখ সারে, কখনও অসুখ সারে না, সেকথা তুললে উত্তর হচ্ছে, সেটা শাস্ত্রের দোষ নয়, ওষুধের কিংবা ডাক্তারের ভুল। জ্যোতিষী যে ভুল করতে পারে—জন্মকোষ্ঠি যে ভুল হতে পারে, এ তর্ক তুলে লাভ নেই, কারণ আমরা প্রত্যেকেই মস্ত মস্ত বৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম,—যে বাইরে থেকে ভেতরে এবং ভেতর থেকে বাইরে আসার রহস্যলোকের দুটি চাবি একথা যেদিন জানব, সেদিনই শুধু মানব যে বিজ্ঞানকে বেশি বিশ্বাস এবং অধ্যাত্মকে পুরো অবিশ্বাস করে আমরা যা বলি, তা নিছক—

'a tale told by an idiot!'

পরলোক এবং ইহলোক যে 'দেখা না-দেখায় মেশা বিদ্যুল্লতা',—সত্যি সত্যি জন্ম এবং মৃত্যু যে ভিন্ন নয়, গত এবং আগামীকাল ভেদ যে অনর্থক, বিজ্ঞান যেদিন একথা বলবে তার অনেক অনেক আগে, স্মরণাতীত এককালে অধ্যাত্ম যে নির্ভুল উক্তি করেছে, তা আমরা জানি না বলেই মানি না।

সত্যি কথা বলতে এগুলি কোনও অলৌকিক তত্ত্বও নয়, অলীকও নয়। সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার। যে কেউ ব্যক্তিগত সাধনায় এর সন্ধান পেতে পারেন। গোমেশ বসু যে বিশালকায় গুণ মুখে মুখে করতেন তা যাঁরা দেশে-বিদেশে দেখেছেন তাঁরা তা অবিশ্বাস করতে পারেন নি

কিন্তু 'ফ্রিক অভ নেচার' বলে রায় দিয়েছেন। ব্যাপারটা যে তা নয় এবং সোমেশ বসু ছাড়াও কোনও কোনও যোগী এ রহস্য জানেন তার একাধিক প্রমাণ আছে।

একটি প্রমাণ আমি এখানে উপস্থিত করছি, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে' নামে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ থেকে। এ বই-এর ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় একটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন লেখক রবীন্দ্রনাথ রায়।

'বিদেশে সোমেশচন্দ্রের মানসিক গণিতে এই অসাধারণ কীর্তির কথা শোনা অবধি রাজেন্দ্রলাল নিরলসভাবে মানসাঙ্কের সাধনা করে চলছিলেন। এতে করে তাঁর সময়ের যে প্রচুর অপব্যবহার হচ্ছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। একদিন রাজেনবাবু মনে মনে একটি অতিকায় গুণ করছেন, এমন সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি করছেন?'

'মনে-মনে গুণ করে দেখছি হয় কি-না?'—রাজেনবাবু জবাব দিলেন।

'—ওকে গুণ বলে না, পূরণ বলে—ঠাকুর একটু হেসে কথাটি বলেই রাজেনবাবুকে কয়েকটি পূরণ অঙ্ক দিতে অনুরোধ করলেন।

...'রাজেনবাবু তখন বড় বড় সংখ্যায় কয়েকটি অঙ্ক লিখে কাগজখানি ঠাকুরের সামনে ধরতেই তিনি গুণফলগুলি পরের পর বলে দিয়ে রাজেনবাবুকে লিখে নিতে বললেন। লেখা শেষ হ'লে রাজেন্দ্রলাল বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাগজ পেন্সিলের সাহায্যে যখন কষলেন তখন দেখা গেল ঠাকুরের সব উত্তরগুলিই নির্ভুল। পরম আশ্চর্যভরে মুখের দিকে চাইতে ঠাকুর নির্বিকারকণ্ঠে তাঁকে বললেন—'এ আর এমন শক্ত কি? সব অঙ্কেরই একটি ফল আছে জানেন ত'? কাউকে সেটা কষে বার করতে হয়, কেউ না কষেই তাকে বলতে পারে। এই নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ কি আছে?'

[শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রায়: পৃ: ৫১—৫২]।

দু'টো অঙ্ক কষার, চারটে পদ্য লেখার ক্ষমতা কিংবা খ্যাতিকে যাঁরা শূকরীবিষ্ঠাজ্ঞানে অনায়াসত্যাগের দুর্লভ দীপ্তিতে দীপ্তিমান তাঁরাই বলতে পারেন কেবল: যা আমায় অমৃত দেবে না, তা নিয়ে আমি কি করব?

কোটি কোটি লোকের মধ্যে একটি কি দু'টি এমন 'আলোক'-এর যে দেখা পাওয়া যায় তার মূলে কি আছে? জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার। রূপ থেকে অপরূপের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ পৌঁছবে, সব মানুষই, যখন তার সময় হবে। সবাই খেতে পাবে, কেউ বেলায়, কেউ সকাল-সকাল। এর মধ্যে অলৌকিকও নেই; অলীকও কিছু না। একমাত্র হিন্দুরাই এ সত্যের সন্ধান পেয়েছে। তাই তারা কাউকে ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা করে নি, কারুর ধর্মে আঘাত দিয়ে কথা বলে নি কখনও।

হিন্দুরা জীবনের চরম ও পরম বাণী শুনিয়েছে। মানুষকে অমৃতের পুত্র এক তারাই বলেছে।

একজন মানুষ যে দুঃখ পায় এবং আর একজন সুখ, এর মূলে জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম ও অকর্ম ছাড়া আর কিছু নেই। জীবনরহস্যের সবচেয়ে সঙ্গত ব্যাখ্যা,—হিন্দুরাই করেছে। এ ব্যাখ্যায় কারুর ভয় পাবার নেই। সকলেই শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় পৌঁছবে। তার নিজের ইচ্ছায় নয়, তাঁর ইচ্ছায়। যে পঙ্গু সে-ও একদিন গিরি লঙ্ঘন করবে; মূক হবে বাচাল, এ বাণী সত্য এবং মনুষ্যত্বের মর্মবাণী। পুরুষকার এবং প্রোভিডেন্স, এ দুই-ই সত্য। অনেকের কাছে এটা পরস্পরাবিরোধী মনে হয়। যে হিন্দু দর্শন, শাস্ত্র পাঠ করেছে, যে দর্শন করেছে সত্য, সে জানে এ দুই-ই সত্য। ভালো-মন্দ জ্ঞান যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আছে পাপপুণ্য। যাঁর এ জ্ঞান গেছে যেমন ত্রৈলঙ্গ, তাঁর কাছে মল ও পায়সে, কোনও তফাৎ নেই। সেই জন্যেই মানুষের মহত্তম অবস্থার বর্ণনা গীতায়:

দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনা,
সুখেষু চ বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ।

আরেকজনকে ভুল বুঝেছে একাল। তার নাম চার্বাক। বার্হস্পত্য দর্শন, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ বলতে হট্ টিউব এণ্ড বি-মেরির FOOL-অসাফ আওড়ায় নি। সে বলেছে, এই দেহেই নিঃসন্দেহে তাঁকে পাওয়া যায়, যাঁকে পেলে পুনরাবর্তনের প্রয়োজন হয় না এবং যথার্থ হিন্দুর কাছে উপনিষদ এবং চার্বাকের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, পরস্পরবিরোধিতা নেই।

কিন্তু বই পড়ে এ অনুভূতি হওয়া প্রায় অসম্ভব। এরই জন্যে প্রয়োজন হয় ভগবানের দূতদের। তাঁরা আসেন সমস্ত জীবন দিয়ে এই বাণীকে প্রাণ দিতে। সেই জন্যে সাধকের জীবনের চেয়ে মহত্তর গ্রন্থ নেই। কবিও এ সত্য ধ্যানে অবগত, যখন তিনি বলেন:

'অনায়াসে সে পেরেছে ছলনা সহিতে,
সে পায় তোমার হাতে, শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

[ক্রমশ।



আলোকচিত্র

মাসিক

বসুমতী

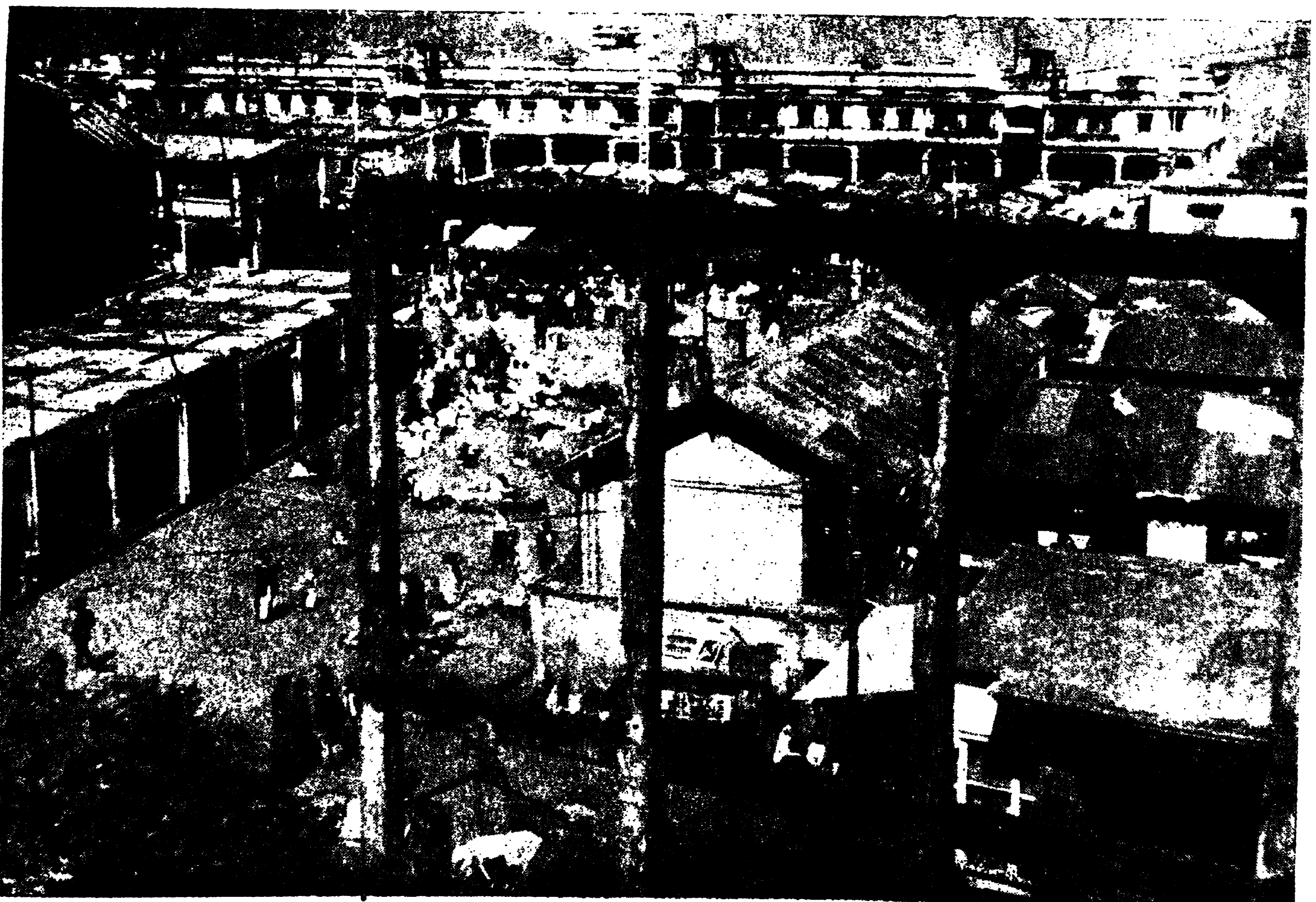
'আমি বুদ্ধের দাসী'

—আশীষ মিত্র



সুহাসিনী

—শান্তিময় সান্যাল

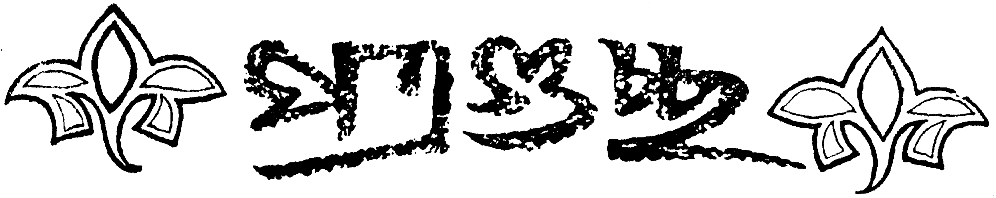


দার্জিলিং চকবাজার
—নিখিল ভট্টাচার্য



আলিম্পন

—দীপক ঘোষ



মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের পত্রাবলী

[তদানীন্তন ভারতের বিভিন্ন করদরাজ্যগুলির মধ্যে নানা কারণে বরোদা এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। বরোদার গায়কোয়াড় স্যার সায়াজী রাও ছিলেন একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। আপন রাজ্যের সর্বপ্রকার উন্নতি-সাধনে তাঁর যত্নের এবং উদ্যমের অন্ত ছিল না। তাঁরই সময়ে বরোদায় কিছুকাল কর্মরত ছিলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। তাঁরই সময় (২৩এ আগস্ট, ১৯০৪) বরোদা রাজস্বসচিবরূপে লাভ করল ঐতিহাসিক মনীষী সাহিত্যরথী এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্তকে। বরোদার নানাবিধ উন্নয়নসংক্রান্ত রমেশচন্দ্রের কতকগুলি পরিকল্পনাই নিম্নোদ্ধৃত পত্রে প্রকাশ।—স।]

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,

সমৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য আমি গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করিয়া কয়েকটি নূতন পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছি। সম্মুখাভিমুখে নিজে অগ্রসর হইতে এবং ঐ দিকেই সমগ্র রাজ্যটিকে পরিচালিত করিতে আমি বদ্ধপরিকর। একদা যে শক্তি এখানে বিরাজিত ছিল—সেই শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করাই আমার উদ্দেশ্য। নানাবিধ কল্যাণকর কার্যাবলীকে সক্রিয় সমর্থন জানানো, যুব-সম্প্রদায়ের শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া, নূতন নূতন পরিকল্পনা ও চিন্তাধারাকে স্বাগত জানানো এবং বিচ্ছিন্ন শক্তিকে পুনরায় সমন্বয় সাধন আমার মুখ্য উদ্দেশ্যের তালিকাভুক্ত। এইভাবেই এই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াই আমি বরোদারাজ্যকে এক পরম সমৃদ্ধ আনন্দে পরিপূর্ণ কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাই।

আমি সর্বসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিতেছি। আমার পরিকল্পনাগুলিকে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য সাধারণো প্রচার করিতেছি এবং এই সকল বিষয় লইয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাতও করিতেছি। তবে, এখানকার প্রবীণ কর্মচারীরাও তো আছেন। আমার পরিকল্পনাটি তাঁহাদের নিকট অযৌক্তিক ও প্রচলনের অযোগ্য। অতএব এই সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইয়া আমাকে অগ্রসর হইতে হইতেছে এবং আপন স্বপ্নের রূপদান করার চেষ্টা করিতে হইতেছে। এখানকার কৃষিজীবীদের অতিরিক্ত করভার হইতে মুক্তিদানের এবং সকল ধনীদিগকে একত্র করিয়া তাঁহাদের দ্বারা মিল বা নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পত্তন ঘটাইতে আমি বিশেষভাবে ইচ্ছুক। যদি এখানে একটি বিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইতে পারি, তাহা হইলে জনগণের সহিত সংযোগ রাখিয়া জনকল্যাণের কার্যে আমরা আরও সাফল্য-লাভ করিতে পারি বলিয়া মনে হয়।

প্রশাসন সংক্রান্ত যাহা হইবার প্রকাশ্যেই হউক। কোন কিছু গোপনে, চুপিসারে যেন না হয়। সর্বসাধারণের প্রশ্ন যেখানে জড়িত—সেখানে অত্যাচার ও খেয়ালখুশির দ্বারা কখনও কোন সুফলদায়ী কার্য হইতে পারে না। হয়তো কেহ কেহ আমার পরিকল্পনাদি নিছক স্বপ্ন বলিয়া পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন। দিন, তাহাতে আমি ভয় পাই না বা তিলমাত্র বিচলিত হই না। নিশ্চল, নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা কিছু ভাল কাজের ও লোকহিতকর ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখা বহুগুণে ভাল।



● ভগিনী নিবেদিতা

স্বাঃ—

তোমার স্নেহময় ধর্মপিতা

দৌহিত্রী সুষমা সেনকে লিখিত

২৫এ জুলাই, ১৯০৬

এখনও পর্যন্ত একটু বিশ্রাম আমার ভাগ্যে জুটিল না। ২৫এ জুন অর্থাৎ ঠিক একমাস পূর্বে আমি লণ্ডনে পৌছাইয়াছি। এই পুরা একটি মাস কেবল গভীর শ্রম, ঘোরাফেরা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারেই অতিবাহিত

হইল। আমাদের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন অর্থাৎ হিউম, স্যার হেনরি কটন, ওডোনেল, গোখলে (যাঁহারা এ বিষয়ে যাহা করণীয়, তাহা আপ্রাণ পরিশ্রমে করিয়া চলিয়াছেন) তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ তো করিয়াছিই অধিকন্তু ভারত-সচিব, স্যার জন মোরলে প্রভৃতির সহিতও এই বিষয়ে মিলিত হইয়াছি। অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু কাজ আমি করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, সংশ্লিষ্টমহলে একটি ছাপ রাখিতে আমি সমর্থ হইয়াছি। 'পার্টিশান' অবশ্য এখনই বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ মোরলে বলিলেন—ইহা তো একটি 'নির্ধারিত বিষয়'। ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র আমি সঙ্গেই রাখিয়াছিলাম জনসাধারণকে ক্ষুব্ধ না করিয়াও 'পার্টিশান' কি করিয়া কার্যকর হইতে পারে সে বিষয়ও মোরলেকে অনেক কিছু বুঝাইয়াছি। অন্যান্য বিষয়েও গোখলে ও আমি কৃতকার্যতা বরণ করি নাই। তদুপরি বিধান পরিষদের বিস্তারিত আবেদন-নিবেদন সংক্রান্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা দীর্ঘ দশ বৎসরের প্রচেষ্টার পর এই প্রথম ঘোষিত হইল। ইহাকে এক শুভসূচনা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বর্তমান পার্লামেণ্ট তাহার পূর্ববর্তীগুলি হইতে পরিপূর্ণভাবে পৃথক। এখানকার অধিকসংখ্যক সদস্যরা বর্তমানে ভারতের স্বপক্ষে এবং শ্রমিক দল ভারতবর্ষের জন্য নানারূপ অনুকূল চিন্তা করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহার জন্য গোখলের কৃতিত্বই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনিই ইঁহাদের মনে ভারত সম্বন্ধে একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—যাহার ফলে তাঁহারা ভারতের প্রতি এক অনুকূল মনোভাব পোষণ করিতেছেন। আমিও এই একটি মাসে যতটা সম্ভব তাহা করিয়াছি।



রমেশচন্দ্র দত্ত

ভারতীয় বাজেট সম্বন্ধীয় বিতর্কের পূর্বদিন হাউস অফ কমন্সে গোখলে এবং আমি এক চা-চক্রে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম এবং সেখানে প্রায় পঞ্চাশ অথবা ততোধিক সদস্যদের সম্মুখে বক্তৃতা করিলাম, উঁহারা আমাদের বক্তৃতা শুনিতেই আসিয়াছিলেন এবং আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য সর্বজাতীয় পার্লামেণ্টারী মিটিং-এ গোখলেও আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। ক্ষেত্র প্রস্তুতই আছে এখন আমাদের যথাযথভাবে কাজ করিতে হইবে। আগামী বৎসর আমি বরোদার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মাসখানেক কলিকাতায় থাকিব তাহার পর এখানেই বাসা বাঁধিব। টোরী সরকার এবং লর্ড জি হামিল্টনের অধীনে নয় বৎসর যে কাজ করিলাম তাহা অপেক্ষাও বহুগুণ উদ্দীপনা ও আশার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া এখানে কাজে থাকিয়া দেশের কাজে লাগিব। সৈনিকের ভেরী শুনিলেই যুদ্ধের অশ্ব যেরূপ চঞ্চল হইয়া উঠে, আমার মনের অবস্থা এখন ঠিক তদনুরূপ।

'সংসার'-এর গুজরাটী অনুবাদিকা সারদা মেহটাকে লিখিত

১৭ই এপ্রিল, ১৯০৭

তোমার খাঁটি এবং অকৃত্রিম মনোভাব আমায় বল তো সারদা। সারদা, তুমি কি মনে কর না যে, আমার অবশিষ্ট জীবনকে 'লেক অফ পামস'-এর ন্যায় গ্রন্থাদিরচনার কার্যে ব্যাপৃত রাখিলে তাহা সর্বতোভাবে ফলপ্রসূ হইবে। বরোদাতে কাজ করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা অপেক্ষা ভারতবর্ষের আদিকাল হইতে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নরনারীদের কেন্দ্র করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করা বিধেয় নয় কি? বরোদাতে আমি একজন অমাত্য, অস্থায়ী দেওয়ান—লোকে আমায় সমীহ করে, মান্য করে, সম্মান দেয়, একজন শীর্ষস্থানীয় ভাবে সবই ঠিক—তবে কি জান—আমার মনে হয় আমার আসল কার্যসাধনে আমি যেন অবহেলা করিতেছি। আমার নির্ধারিত পথ যেন পরিহার করিয়া ভিন্ন পথে পদার্পণ করিয়া নিজেরই কাছে মিথ্যাবাদী হইয়া যাইতেছি। এই তিন বৎসরে বরোদার জন্য কিছু কাজ তো করিলাম এখন আমার অন্তর হইতে যে কাজের তাগিদ আসে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করাই স্থির করিতেছি। অন্তরের ডাকে সাড়া দেওয়াই আজ আমার ইচ্ছা। তুমি যেমন নওসারির সীমাবদ্ধ পরিধি হইতে বরোদার বৃহত্তর পরিমণ্ডলে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছ, আমিও ঠিক সেই মনোভাবের বশীভূত হইয়াই বরোদার সীমায়িত পরিবেশ হইতে সাহিত্য ও রাজনীতির বিরাট জগতে পাড়ি জমাইবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে প্রহর গুণিতেছি।

ভারত-সচিব লর্ড মোর্লেকে লেখা

জানুয়ারী, ১৯০৮

নিছক শাসনব্যবস্থা নয়, আমাদের যাবতীয় অনুসন্ধান শাসনব্যবস্থার নেপথ্যে পরিচালনশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া। শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ কার্যনির্বাহকদের ভবিষ্যতের পন্থা নির্ধারণে সক্রিয় সহায়তা করিবার ক্ষমতা রাখে। আমি সেই জাতের অন্তর্ভুক্ত—যাহারা দগ্ধ পোড়া রুটিই শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লয় না তাহা অপেক্ষা বরং কিছু না লওয়াই ভাল বলিয়া মনে করে। অনুসন্ধানের সম্মতিদানের জন্য আমি কৃতজ্ঞ জানিবেন।

বিহারীলাল গুপ্তকে লেখা

প্রথমত, কর্ম হইতে অবসর লওয়ার পর আমার সমালোচনা অন্যান্য বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বিন্দুমাত্র হইবে না, ইহাতে তাহাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তিলমাত্রও ব্যাহত হইবে না। বরং আমার বিশ্বাস, তাহাদের সুযোগ-সুবিধা ইহাতে বৃদ্ধিই পাইবে, শুধু মিটমাটের মনোভাব লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিক্ষোভ তুলনামূলকভাবে অনেক সুফলদান করে।

দ্বিতীয়ত ইণ্ডিয়া অফিসকে তো আমি চিনি। জাতি বিচারই যেখানে মুখ্য। তাহারা আমাদের সর্বতোভাবে দমন করিতে চায়। এই দমন আমরা 'সমালোচক' বলিয়া নয়। আসলে আমরা 'কালা-আদমী' বলিয়া। তাহারা সর্বতোভাবে ইংরেজদের নির্দেশ এবং বুদ্ধিতেই চালিত হইতে চায়। কুড়িটি বৎসর যাবৎ এই মনোভাব তাহাদের মধ্যে লালিত হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের পদলেহন করিয়া মনোরঞ্জন করিলে তাহাদের অনুসৃত নীতি হইতে টলানো যাইবে না। এ ক্ষেত্রে অবিরাম সংগ্রাম ও কঠোর সমালোচনাই একমাত্র পথ। ইহা ব্যতীত কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে অন্য কোন পন্থা নাই।

তৃতীয়ত, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে আমার ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক হয়তো ফলদায়ক হইয়াছে। ইহা সরকারকে তাহার অতীতের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিতে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের করধার্য সম্বন্ধীয় প্রচলিত নীতিগুলির পরিমার্জন করিতে এবং শস্য যে সময় কম পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেই সময়ে করের অঙ্ক কমানোর বিষয় আইন প্রবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছে।

৭ই অক্টোবর, ১৯০৮

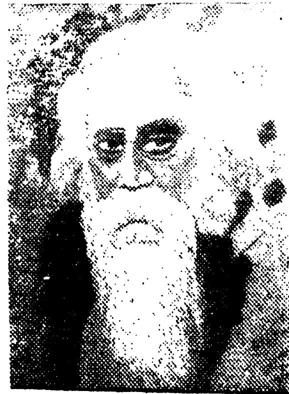
প্রকৃত এবং লোকহিতকর সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের বিষয়গুলি চিন্তা করিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা, লর্ড মোর্লেকে তাঁহার লোককল্যাণধর্মী পরিকল্পনাদির সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিবে।

'সংসার' ও 'সমাজ' সম্বন্ধে একটি পত্র

বিষয়: অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪

অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের যে এক বিশেষ কর্তব্য আছে এই চিন্তা আমাদের জীবনে নীতিরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। আমার মতে অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমেই আমাদের বিভক্ত এবং ক্ষয়িষ্ণু জাতির মধ্যে এক সমন্বয়সাধন সম্ভব এবং সহজও। আমাদের ক্ষুদ্র সমাজকে এই নীতিতে বিশ্বাসী করাও আমাদের আশু কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। আমাদের এই ক্ষুদ্রপরিসর সমাজ তো বিরাট বিশাল সুপ্রসারিত হিন্দুসমাজের এক অংশমাত্র এবং তাহার প্রগতিশীল অবধারক বিশেষ, অতএব আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্যে আমরা সফলকাম হইলে মনে হয় সমগ্র হিন্দুসমাজেই আমাদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সর্বান্তঃকরণে গৃহীত হইবে। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতির দ্বারাই আজ সংহতি বা সমন্বয় সম্ভবপর। এমন কোন ভাষা নাই যাহার সাহায্যে আমি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে পারি যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমি কি গভীর চিন্তায় কালাতিপাত করিয়াছি। এ চিন্তায় পরিপূর্ণভাবে মগ্ন হইয়া ইহার বিভিন্ন দিকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। আমার উপন্যাসের মধ্যে আমার সংশ্লিষ্টবিষয়ক চিন্তাধারা ছায়া ফেলিয়াছে। আমি আমার 'সংসার' ও 'সমাজ' নামক উপন্যাস দুইটির কথাই বলিতেছি। প্রথমটি বিধবা-বিবাহ এবং দ্বিতীয়টি অসবর্ণ-বিবাহ সংক্রান্ত।



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

কন্যা বিমলা বরাকে লেখা

লণ্ডন, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭

তুমি জানিয়া নিশ্চয়ই আশাতিরিক্ত আনন্দলাভ করিবে যে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে নিয়মমত পাঠ দিবার এক ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ঐ বিষয়ক প্রবক্তারূপে তাঁহারা আমাকেই নিয়োগ করিয়াছেন। এই পদগ্রহণের বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট বেতন আমি পাইব না কেবল ছাত্রেরা আমার ভাষণ শোনার জন্য যে 'ফি' দিবে আমি শুধু তাহাই পাইব তবে ইহা গুরুতর দিক নয়, অর্থ-সংক্রান্ত চিন্তা এখানে মনকে স্পর্শ করে না, আর্থিক দিক দিয়া এই নিয়োগ লাভজনক না হইলেও অন্য দিক দিয়া ইহা এক বিশেষ মূল্য বহন করে, সেই মূল্যের গুরুত্বকেও অস্বীকার করা চলে না। ইহা যে সম্মান বহন করে তাহার মান নির্ধারণ সাধ্যাতীত বলিলেও চলে। ইহা আমাকে একটি সৎকার্যে নিযুক্ত করিল শুধু তাহাই নয় এখনকার সমাজে প্রতিষ্ঠার ও মর্যাদার দিক দিয়া আমাকে একটি বিরাট আসনে অধিষ্ঠিত করিল তাহার তাৎপর্যও অপরিসীম।

কন্যা সরলা গুপ্তকে লেখা

৩০এ এপ্রিল, ১৮৯৭

এই বৎসরেই আমার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা খুবই অল্প। এখানে আমার লেখার অনুশীলন, যথেষ্ট অভিনিবেশ ও আন্তরিকতা সহকারে চালাইয়া যাইতে হইবে। এখানে আসা আমার উদ্দেশ্যবিহীন নয় অতএব আমার উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় বা যতদূরসম্ভব সফল হবে এবং সেদিকে আমাকে সর্বশক্তিপ্রয়োগ করিয়া নজর রাখিতে হইবে। কর্মজীবন আমার নিকট বলিতে গেলে একেবারেই তো বৈচিত্র্যহীন, জীবনের কোন প্রকার স্পন্দন বা চাঞ্চল্য তাহাতে অনুপস্থিত। অতএব অন্যদিকে যদি আমি কোন বৃহত্তর সম্ভাবনার সমৃদ্ধজগতের সন্ধান পাই তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই দিকেই পাড়ি জমাইব এবং আমার সকল সাধনা, সকল অধ্যবসায় আমি বলা বাহুল্য, সেই দিকেই নিয়োজিত করিব।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রমেশচন্দ্র

(গৌরহরি সেনকে লেখা)

১৬ই পৌষ, ১৩১৬

তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিতে সর্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে বস্তুত ইহাই বলশালীতার লক্ষণ। এই কারণে সর্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি—এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার কর্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অরুগ্ন নির্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

কবিরে সেলাম

দিব্যেন্দু লাহা

জাগো বীর, জাগো হে বিদ্রোহী, বেদুঈন্ চেঙ্গিস্
ব'ল নত হয় নি শির, কারি নি কাহারে কুর্নিশ।
ব'ল বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি, এসেছি আবার
নাহি রে নিস্তার; চির দুর্বিনেয়, আমি দুর্নিবার।
ধূম-ধ্বজ ধূম-কেতু ধূমে আমি দেব রে হুঙ্কার,
ঈশান বিষানে বাজিবে এবার প্রলয় ডঙ্কার;
প্রখর নখরে দাঁতে ছিঁড়ে কুটে হবে খান্ খান
খুন-চোষা খুনে, দেব ফাঁস টেনে, গ'লে টান্টান।

বিদ্রোহী কভু হয় না শ্রান্ত, সে যে পাগল অশান্ত
উৎপীড়িতের ক্রন্দনে ক্ষ্যাপা পারে না হইতে ক্ষান্ত।
দুঃশাসনের শোষণে আমি বসাব শ্মশান শান্তি,
ভুখারি ভুখায় মরিবে না আর, ঘুচিবে অশান্তি।
নিধন শেষে সৃজন হবে নয়া সুখী-পরিবার
বিশ্বে নূতন হবে এবার শান্তি-সুধা-পারাবার।

গেছে অস্ত রবি, তুমি যুগ-কবি নজরুল ইসলাম
খোদা হাফিজ, জাগো হে আবার, লহ হাজারো সেলাম।

রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

[সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশিষ্ট পূজারী]

বাঙলা দেশের বিভিন্ন রাজপরিবারের যে রাজপুরুষরা জনজীবনে অমর হয়ে আছেন তাঁদের মহিমায়, কীর্তিতে ও বিরাটত্বে লালগোলার প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা রাও স্যার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয় সেই তালিকার এক স্বর্ণোজ্জ্বল নাম। বংশের মর্যাদা, ঐতিহ্য ও সম্মানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর সুযোগ্য পৌত্র রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ভূমিকাও যথেষ্ট গৌরবের সার্থক দাবীদার।

শুধু বিশিষ্ট ভূস্বামী হিসাবেই নয়, সাহিত্যিক, শিকারী, ক্রীড়াবিদ, শিল্পরসিক, সমাজসেবী হিসাবেও তিনি প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে এক বিশেষ সম্মানের ও জনপ্রিয়তার আসন অধিকার করেছেন। রাজর্ষি যোগীন্দ্রনারায়ণ ও মহারাণী মণীন্দ্রমোহিনী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার হেমেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম ১৩০৪ সালের জগদ্ধাত্রীপূজার বিসর্জনের দিন (৪ঠা নভেম্বর, ১৮৯৭) মাতা বধূরাণী অভয়াসুন্দরী দেবী ছিলেন জেমো রাজপরিবারের কন্যা ও সাহিত্যরথী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাগ্নী।

ধীরেন্দ্রনারায়ণের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় পিতামহের স্নেহদৃষ্টির ছায়ায়। কৈশোরে কলকাতায় এসে পাঠাভ্যাস করতে থাকেন রামেন্দ্রসুন্দরের তত্ত্বাবধানে। এই সময়ে অতি ঘনিষ্ঠভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের সান্নিধ্যলাভ করে নানাভাবে নিজেকে লাভবান করে তুললেন ধীরেন্দ্রনারায়ণ। এক অভাবনীয় সাহিত্যিক ও সুধী সমাবেশে তাঁর জীবনের যৌবনলগ্ন অতিক্রান্ত হয় তার সুফল তাঁর পরবর্তী জীবনে নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায়ও সে সাধনা আজও অব্যাহত। স্পর্শের প্রভাব, অচল প্রেম, চিরন্তনীর জয়, নীল শাড়ি, তা হয় না, ছন্দগীতি, ঘরে বাইরে, রামেন্দ্রসুন্দর, হিমাচলম, শিকারী জীবন, বাঘের লুকোচুরি, বাঘ ভালুকের দেশে প্রমুখ গ্রন্থগুলি বঙ্গভারতীর পদপ্রান্তে তাঁর এক-একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্জলি। স্পর্শের প্রভাব গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র। এই উপন্যাসটি 'পতিব্রতা' নামে নাটকে রূপায়িত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে দর্শকদের আনন্দ জুগিয়ে আসছে। গ্রন্থটিকে নাটকে রূপায়িত করেন স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

জনগণের কল্যাণে যোগীন্দ্রনারায়ণ দান করে গেছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। দাতা হিসাবে তাঁর তুলনা খুব নগণ্য সংখ্যকের সঙ্গেই চলতে পারে। এই দানশীলতাও তাঁর পৌত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। দুর্দান্ত শীতের দিনে বস্তা বস্তা কম্বল কিনে কলকাতার পথে পথে ঘুরে ঘুরে শীতের শিকার অসহায় ভিখারীদের সেই কম্বলগুলি



তাঁকে দান করতে দেখা গেছে। এ ছাড়াও বহু অসহায় মানুষকে ও বহু বিদ্যার্থীকে তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে জনারায়ণের প্রকৃত সেবার ক্ষেত্রে এক অভিনন্দনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তাঁকেও এড়িয়ে যায় নি। তাঁর অতিপ্রিয় শিকারের বন্দুকগুলিরও একসময়ে বাজেয়াপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেশাত্মবোধক ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি শ্রীঅরবিন্দের



● রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আশীর্বাদধন্য। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তাঁর সমবয়সী সুহৃদ।

ফুটবল, টেনিস প্রভৃতিতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৪৫ সালে তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করলেন। রাজর্ষি যোগীন্দ্রনারায়ণ তখনও জীবিত। পিতা অথবা পিতামহের জীবদ্দশায় 'রাজা' উপাধি লাভও সেই সর্বপ্রথম ঘটনা।

'কলাভারতী' শিল্প শিক্ষালয় গীতিকা ও গীতাঞ্জলি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা মর্যাদাযুক্ত হয়েছে। তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের তিনি পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি আজীবন সভ্য। মুর্শিদাবাদের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যপদ তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়াও আরও অসংখ্য সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত।

এই আনন্দঘন, প্রাণচঞ্চল, সদাহাস্যময় মানুষটির চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব হ'ল প্রচারবিমুখতা। নিজের সাধনার মধ্যেই তিনি সমাহিত হয়ে থাকতে চান আত্ম-প্রচারের ঢক্কানিনাদকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে। বলা বাহুল্য, তাঁর চরিত্রের এই বিশেষত্বটি তাঁর মধ্যে আরও ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে।

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

[অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব]

অক্লান্ত কর্মোদ্যম, একাগ্র নিষ্ঠা আর অভিনন্দনীয় দক্ষতা যাঁদের কর্মজীবনকে সাফল্যের সপ্তস্বর্গে সমুত্তীর্ণ করেছে—অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম সেই তালিকায় অনায়াসে উল্লেখ করা চলে। সরকারী প্রশাসকমহলে আজ একটি বিশেষ সম্মানের আসন তাঁর জন্যে নির্ধারিত।

পুণ্যভূমি বারাণসীর পবিত্র অঙ্কে ১৯০৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর (ভাদ্র, ১৩১১) তাঁর জন্ম। তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গৌহাটির কটন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। সন্তোষকুমারের বাল্যকাল প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মধ্যে না কাটলেও, কেটেছে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশে, এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবহাওয়ায়।

ছাত্রজীবন তাঁর অসাধারণ মেধার আলোয় সমুদ্ভাসিত। প্রতিটি পরীক্ষায় তাঁর প্রতিভা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৯২১ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। গৌহাটি কটন কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল তাঁর নাম। আই-এস-সি পরীক্ষায় এবং অর্থনীতিতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন যথাক্রমে ১৯২৩ ও ১৯২৫ সালে। তাঁর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে প্রবেশিকা, প্রাক-স্নাতক এবং স্নাতক—এই তিন পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বাবলম্বী এবং সর্বতোভাবে আত্মনির্ভরশীল। নিজে মেধাবী ছাত্র হিসাবে নিয়মিত স্কলারশিপ পেয়ে এসেছেন, সেই স্কলারশিপের টাকায় চালিয়েছেন পড়ার খরচ। পারিবারিক আদর্শ ও ভাবধারায় নিজের মনকে পুষ্ট করে গঠন করেছেন নিজের ভবিষ্যৎ, যে ভবিষ্যৎ সফলতার আলোয় ভরপুর।

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতেও তাঁর পরীক্ষার ঐতিহ্য নষ্ট হয় নি, অটুটই থেকেছে, প্রথমই হয়েছেন (১৯২৬)। তারপর দু'বছরের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইমানুয়েল কলেজে আই-সি-এস প্রোবেশনার হিসাবে শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ অর্থনীতিতে ট্রাইপস লাভ করেন।

ভারতে ফিরে এসে শুরু হল ঘটনাবহুল কর্মজীবন। যে কর্মজীবন গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল। সিভিলিয়ান হিসাবে বহু দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদাযুক্ত আসন অলঙ্কৃত হয়েছে তাঁর দ্বারা। বলা বাহুল্য, আসনগুলির মর্যাদা তিনি বৃদ্ধিই করেছেন বহুলাংশে। ঢাকা ও ময়মনসিংহে অতিরিক্ত জেলা জজের, আলীপুরে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের, নদীয়ায় জেলা জজের, মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের প্রধান পরিচালকের ও সচিবের কার্যভারগুলি তিনি সগৌরবে পালন করে এসেছেন। পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তরের সময়ে ইনি মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সেইসময় অসহায় নরনারীর কল্যাণার্থে ইনি যে অতুলনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা বিরল। দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে ইনি সেদিন স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাঁর মানবপ্রেমী কল্যাণধর্মী মনের।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতে তিনিই প্রথম সরকারী অফিসার—যিনি রেশনপ্রথা চালু করেন (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৪৩)।

দেশবিভাগের পর ইনি ভার পেলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের। পাঁচ বছর পর অসুস্থতার জন্য ইনি দীর্ঘকালীন মেয়াদে নিলেন অবকাশ। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর একান্ত সচিবের পদগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন সন্তোষকুমারকে। সন্তোষকুমার গ্রহণ করলেন সেই আমন্ত্রণ। ১৯৬২ সালে বিধানচন্দ্রের লোকান্তরের পর নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও সন্তোষকুমারকে স্বপদে বহাল থাকতে



● সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনুরোধ জানালেন। এই ঘটনার মধ্যেই সন্তোষকুমারের কর্মদক্ষতা ও কৃতিত্বের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এই পদটি ছাড়াও ক্যাবিনেটে সেক্রেটারীর আসনেও এক-যোগে তিনি সমাসীন আছেন।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করছেন তিনি। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং অর্থ-নীতিতে তাঁর প্রবল অনুরাগ নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী পুষ্পরাণী দেবী সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পাঠিকা ও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে তাঁর স্থান অনায়াসে নির্ধারিত করা চলে।

ডাঃ অনিলকুমার রায়

[প্রথিতযশা শল্য-চিকিৎসক]

১৯৪৮ সালের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস পরীক্ষার ফল ঘোষিত হ'ল। সেই ঘোষণা থেকে জন্ম নিল এক বিরাট বিস্ময় সংশ্লিষ্ট মহলে। দিকে-দিকে সাড়া জাগাল সেই ঘোষণা। চাঞ্চল্য এবং আলোড়ন আনল পরীক্ষক-অধ্যাপক-ছাত্রমহলে। পরীক্ষান্তে তার ফল ঘোষণা শুধু কলকাতা কেন পৃথিবীর যে-কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক অতি স্বাভাবিক ঘটনা, তার মধ্যে অভাবিত বৈশিষ্ট্যের কি থাকতে পারে! পরীক্ষার পর তার ফলপ্রকাশ এক অতি স্বাভাবিক বিষয় এবং পরীক্ষার এক সুনির্দিষ্ট পরিণতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই সাড়া পড়ে যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ আছে। কারণটি হল এম-এস পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে দেখা গেছে, এতাবৎ একবারের প্রচেষ্টাতেই ঐ পরীক্ষায় কোন ছাত্র সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। সেবারই তার ব্যতিক্রম ঘটল। উত্তীর্ণ ছাত্রের তালিকায় দেখা গেল এমন একটি নাম—যে ঐ পরীক্ষায় এর আগে কখনও অংশগ্রহণ করে নি। যে ছাত্রটিকে কেন্দ্র করে সেদিন এত চাঞ্চল্য, এত আলোড়ন, এত বিস্ময়—বাঙলার শল্য-চিকিৎসক-সমাজে আজ সে একটি বিশিষ্ট নাম। সেই নাম ডাঃ অনিলকুমার রায়।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর পঞ্চাশে পা দিয়েছেন ডাঃ রায়। পিতৃনাম স্বর্গীয় অবনীকান্ত রায়। আদিনিবাস ঢাকায় কিন্তু ডাঃ রায় জন্মেছেন নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জ আবার শুধু তাঁর জন্মস্থানই নয়, তাঁর বিদ্যালয়-জীবন সেখানেই হয় অতিবাহিত। ১৯৩০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আই-এস-সি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন অনিলকুমার। ১৯৩২ সালে ঢাকা থেকে উক্ত পরীক্ষাতেও তিনি হলেন উত্তীর্ণ। তারপর এসে ভর্তি হলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। সাফল্য অর্জন এম-বি-বি-এস পরীক্ষায়, সাধারণ অর্থে পরীক্ষায় সাফল্যলাভ বলতে যা বোঝায় এ ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান যিনি অর্জন করেছিলেন অনিলকুমারের স্থান ছিল তাঁরও উর্ধ্বে। শল্য-চিকিৎসায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সুবর্ণ পদক প্রাপ্তির গৌরব প্রথম তাঁর দ্বারাই অর্জিত হয়। তাঁর সমগ্র ছাত্রজীবনের প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার। মেধা ও গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল তাঁর ছাত্রজীবন।

বিদেশের দিকে পা বাড়ালেন ডাঃ রায়। উদ্দেশ্য—অধিকতর শিক্ষা অর্জন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে তাঁর-



● ডাঃ অনিলকুমার রায়

কৃতিত্ব ও নিপুণতা বিদেশের বুকে দেশের মুখ উজ্জ্বলও করল বহুল পরিমাণে। ইংল্যাণ্ড থেকে এফ-আর-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সসম্মানে।

দেশে ফিরে এসে শুরু হল তাঁর কর্মময় জীবন। মেডিক্যাল কলেজে যোগ দিলেন সহকারী অধ্যাপক হিসাবে। ১৯৬০ সালে উন্নীত হলেন অধ্যাপকের আসনে।

চিকিৎসক-সমাজে আজ তিনি এক উজ্জ্বল নাম। যে-সমস্ত গুণাবলী একজন চিকিৎসককে এক আদর্শ চিকিৎসকে পরিণত করে, বলা বাহুল্য তার সব ক'টিই তাঁর মধ্যে বর্তমান। চিকিৎসাপ্রার্থীদের প্রতি তিনি যে কি পরিমাণ আন্তরিকতা, যত্ন এবং দরদের পরিচয় দিয়ে থাকেন অভিজ্ঞমহলে, সে সম্বন্ধে আজ আর কোন জিজ্ঞাসা নেই। তাঁর এই বিশেষ গুণগুলি চিকিৎসকরূপেই যে তাঁকে প্রভূত খ্যাতি এনে দিয়েছে তাই নয়, তাঁকে অধিষ্ঠিতও করে জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ আসনে।

শ্রীমতী নবীন রায় তাঁর সহধর্মিণী।

শ্রীমতী সীতা চৌধুরী

[স্বনামধন্যা সমাজসেবিকা]

অন্যায় দুঃস্থ, ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীদের ভাগ্যের আকাশ থেকে ঘোর কৃষ্ণমেঘপুঞ্জ সরিয়ে দিয়ে সেই আকাশকে আবার প্রভাতসূর্যের প্রসন্নরশ্মিতে উজ্জ্বল করে তোলাই যাঁদের স্বপ্ন, যাঁদের সাধনা, যাঁদের ব্রত—সেই তালিকায় শ্রীমতী সীতা চৌধুরী এক অবশ্য উল্লেখনীয় নাম।

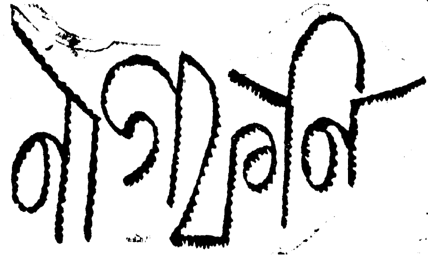
ভারতীয় আইন ও সংবিধান জগতের অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল স্বর্গত স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এবং লেডী প্রতিমা মিত্রের একমাত্র কন্যা সীতা চৌধুরীর জন্ম কলকাতা মহানগরীতে ১৯১২ সালের ১০ই জুলাই (আষাঢ়, ১৩১৯)।

ডায়োসেসানে প্রথম পাঠারম্ভ তাঁর। তারপর ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রী হিসাবে। এইসময় বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের আইনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য নিযুক্ত হলেন স্যার ব্রজেন্দ্রলাল—সে কারণে কিছুকালের জন্য তাঁকে কলকাতার বাস তুলতে হয়। বাসা বাঁধতে হয় দিল্লীতে সপরিবারে। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীমতী চৌধুরী (তখন কুমারী মিত্র) বাড়িতে অধ্যয়ন নিয়েই মেতে থাকেন। বাড়িতে এই বিদ্যাচর্চা তাঁর ক্রমশই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ নিতে থাকে।

১৯৩০ সালে অষ্টাদশী সীতা মিত্র পরিণত হলেন কল্যাণী বধূতে। আজকের দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ও লোকসভা সদস্য শ্রীশচীন চৌধুরীর সঙ্গে প্রজাপতির নির্বন্ধে তাঁর জীবনের গ্রন্থিবন্ধন হয়ে গেল। হাসিতে, কান্নায়, আবেগে, অনুভূতিতে, ভাবে, ভাবনায়, চিন্তায়, কল্পনায় দু'টি জীবনধারা মিলিত হ'ল একটি উৎসে। ১৯৪৩ পর্যন্ত গৃহকোণের মধ্যেই তাঁর দিন কেটেছে, সংসারের তরণী নিয়েই। তেতাল্লিশ সালে এল বৃহত্তর জগতের আহ্বান, চার দেওয়ালের বাইরের সীমাহীন কর্মজগতের হাতছানি, সমাজসেবিকার গৌরবময় ভূমিকায় সীতা চৌধুরী সেদিন পদক্ষেপ করলেন বৃহত্তর পটভূমিতে। বাঙলা দেশের আকাশে বাতাসে তখন সর্বনাশের স্বাক্ষর, চতুর্দিকে শুধু মৃত্যুর ইশারা দিকদিগন্তে শুধু ভয়ঙ্করের হুহুঙ্কার। পঞ্চাশের মন্বন্তর সেদিন পাল্লা দিচ্ছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সঙ্গে। সেই পরিবেশে গঠিত হ'ল নারী সেবাসঙ্ঘ—সীতা চৌধুরীর কর্মজীবনের এক মহত্তর কীর্তি! একটি বিরাট মহীরূহের সেদিন বীজ বপন হ'ল এই প্রতিষ্ঠানটির সংগঠনে। সেদিন এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন পশ্চিম বাঙলার নবরূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

তাঁর মাতামহী স্বর্গতা কমলা বসুর (মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা ও দিকপাল ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসুর সহধর্মিণী। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, এঁরই বিবাহবাসরে বঙ্কিমচন্দ্র আপন কণ্ঠের মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন) নামানুসারে কমলা গার্লস স্কুলের সচিবের আসনও শ্রীমতী চৌধুরী অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁর অগ্রজ স্বর্গীয় শঙ্করলাল মিত্রের স্মৃতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মিত্র কীর্তন শিক্ষালয়েরও তিনি সচিব। এ ছাড়াও ১৯৬২ সালের চৈনিক আক্রমণের সময় গঠিত উইমেন্স ভলাণ্টিয়ারী সার্ভিস, রিফিউজি হ্যাণ্ডিক্রাফটস ও দক্ষিণ কলিকাতার বিখ্যাত নারী সমবায় প্রতিষ্ঠান সুদক্ষিণা প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সভানেত্রী হিসাবে তিনি জড়িত আছেন। টাইম এ্যাণ্ড ট্যালেণ্টস ক্লাবের ইনি প্রাক্তন সভানেত্রী। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র ইনি কয়েকবার পরিভ্রমণ করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে নারী সেবাসঙ্ঘ তাঁর গঠনধর্মী কার্যাবলীর এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই প্রতিষ্ঠানের অসহায় ও অশিক্ষিত বাঙালী মেয়েদের সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার শিক্ষাদান করা হয়। তাদের লেখাপড়া, সেলাই, তাঁতবোনা, শাড়ির অলঙ্করণের জন্য নানাপ্রকার শিল্পকর্ম, বই বাঁধানো প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

।। এগারো ।।

সীমার মধ্যে অসীম

আসর ভাঙল জার্মান সরকারের বিদায়ী অভ্যর্থনার পর। অমন সুন্দর হল, নাম ফেস্টিভ্যাল হল, আমার অভিজ্ঞতায় অল্পই দেখেছি। এটাও আমেরিকান ঐশ্বর্যের আর আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের অক্ষয়কীর্তি। সামনে থেকে মনে হয় ভেতরে আছে সৈনিকদের বাসস্থান। ভেতরে গেলে অন্য জগৎ। এখানেও সেই ঘুরে ঘুরে ওঠা-নামা অসমতল বসার জায়গা। মাঝে-মাঝে গাছের ঝোপ, যে গাছ রোদ্দুরে মরে যায়, রীতিমত অসূর্যম্পশ্যা। আলোর রঙিন খেলায় দিকে দিকে রামধনুর আর্চ, কাচের সিঁড়ি, কাচের চেয়ার—শেষ প্রহরে দেখা গেল মদের নেশায় মনগুলোও সব কাচের হয়ে যাচ্ছে, বিদায়ের কথা উঠলেই চিড় খায়।

কম করে হাজার দুয়েক লোক। সিনেমার জু গার্ডেন দেখবার জন্য পঞ্চাশ টাকার টিকিট কিনে সব লোক আসে। মদের দাম আলাদা। তারা সারারাত মদ খায় আর সিনেমা স্টারদের মাতলামো দেখে। বার্লিনের সেরা ব্যাণ্ড আসে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মদ আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মদ খাইয়ে। মদটা যদি চা হত তো মন্দ হত না, খেয়ে যাই হোক, খাওয়ার সময় আনন্দ পাওয়া যেত। কিন্তু মদটা চা নয়। আর চা-টা মদ নয় বলে নেশা হয় না। অতিরিক্ত খেলে পেটগুলোয়। আমার তাই মেজাজ খারাপ।

রুথ সরকারিভাবে রিসেপশনের ডিউটিতে ছিল তাই বেরিয়ে আসাটা আমার পক্ষে সহজ হল। রাত তখন প্রায় দু'টো। সামনের প্রকাণ্ড চত্বরে এসে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে চাইলাম। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। তারই একটানা টিপ্-টিপ্ শব্দের ওপর দিয়ে গা ভাসিয়ে আসছে ব্যাণ্ডের মৃদু ছন্দ। খারাপ লাগল না শুনতে, কিন্তু মনটা অবশ্যই খারাপ হল। সাত হাজার মাইল দূর থেকে এসেছি চোদ্দ দিনের মেয়াদে। ঘর ছেড়ে এসেছি, কাজ ছেড়ে এসেছি, নিতান্ত প্রিয়জনদের ছেড়ে এসেছি। তাদের সকলের সঙ্গে এই যে আমার সান্নিধ্যের বিচ্ছেদ, যেটা জীবনে আর কখনও কোনমতেই পূরণ হবে না, আমার এই অভাববোধের বদলে আমি কি পেলাম? কি দিয়ে গেলাম? ওখানে পাজিটা আছে। আসবার সময় দেখে এসেছি হেলেনা ট্রেটেকের সঙ্গে নাচছে। ওখানে গুডেদিদি আছে, ক্যারি গ্রান্টের সঙ্গে ছবি তুলবার জন্য একদল ফটোগ্রাফার নিয়ে তাঁর আশেপাশে ঘুরছে। ওখানে রুথ আছে তার অভ্যর্থনী হাসির আড়ালে আমার দেশের মেয়ে হয়ে না জন্মাবার প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে।

ওখানে যারা দুনিয়ার ছায়াচিত্র শিল্পীর সাধক আছে আর আছে তাদের দেখবার জন্য এবং দেখে কৃতার্থ হবার জন্য বার্লিনের সম্ভ্রান্ত-পরিবারের ছেলেমেয়েরা; ঐ হলের ঠিক মাঝখানে যে প্রকাণ্ড সন্ধানী আলোটা ছিল সেটা যখন ঘুরে-ফিরে আমার ওপর এসে থামল আর আমার পরিচয়ের ছাপানো চারটে লাইন লাউডস্পীকারে ঘোষিত হল তখন সারা হল হাততালি দিয়েছিল। যে আলো ঘুরিয়ে এনে আমার ওপর থামাল সে আমায় চেনে না, যে আমার পরিচয়লিপি পড়ল সে আমায় জানে না, যারা সেই শুনে হাততালি দিল তারাও আমায় জানে না। কি মোহ তা হ'লে আমার মধ্যে, কি মূল্য আমার কাছে ঐ হাততালির? একটা মেকি অহঙ্কার, একটা মিথ্যা অহমিকা, তার বেশি কিছু নয়।

মন খারাপ নিয়ে পথে নামলাম। বাস বন্ধ, ট্যাক্সির পয়সা নেই, পথও অচেনা। সামনে, ধারে, প্রকাণ্ড বাড়ি। কোনটা ভাঙা কোনটা মার্কিনী। অধিকাংশই অন্ধকার। তারই মাঝখান দিয়ে চলেছি; একবারে আন্দাজে, এলোমেলো পথ চলা। মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড একটা অভাববোধ আমার মনকে খোঁচা দেয়। এই আমার মধ্যে সার্থকতা খুঁজে পাই না, এই প্রদর্শনী, এই প্রেস-কনফারেন্স, এই বৈঠকী আলোচনা, এই ছবি দেখা, এই পূর্ব-বার্লিনে রাশিয়ার রাজনৈতিক জুয়াখেলা সবই অহেতুক মনে হয়। জীবনে যেগুলো ঘটলেও চলত, না ঘটলেও চলত। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। নিরুপায় হ'য়ে আশ্রয় নিলাম, একটা ভাঙাবাড়ির নিচের তলায়। দরজাটা ভাঙাই ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে দরজার ঠিক সামনেই বসলাম কয়েকটা ইটের একটা স্তূপের ওপর।

সামনের সিমেণ্ট বাঁধানো রাস্তাটা ভিজেছে। সেই ভিজে পথের ওপর বিজ্ঞাপনী রঙিন আলোর, বৈচিত্র্যময় আলপনা। উল্টো কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পড়া যায়, সমগ্রভাবে বোঝা যায় না এ ভাষা আমার অজানা। জলের ফোঁটা পড়ে, সাময়িকভাবে আলপনার রূপ বদলায়, আবার যে-কে সেই। তন্ময় হ'য়ে জল আর আলোর খেলা দেখি সিমেণ্টের বুকে আর মিলিয়ে নিই আমার

জীবনের সঙ্গে। পথটার মতন আমার লম্বা টানা জীবন; অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ; জলের ফোঁটা হল আমার অনুভূতি। কখনও বেশি কখনও কম। আর ঐ রঙিন আলো আমার জীবনে ছোট-বড় ঘটনার সমাবেশ। জলটুকু বাদ দিলে ঐ সিমেন্টের ওপর যেমন ঐ আলোগুলো দাগ কাটে না, আমার অনুভূতিটুকু যদি বাদ দিই তা হ'লে কোন ঘটনাই আমার জীবনের ওপর দাগ টানে না। অনুভূতির আলোয় যখন দেখি তখন ঐ অক্ষরগুলোর মতন ঘটনাগুলোও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে কিন্তু সমগ্রভাবে কোনটাই বুঝি না। জার্মান ভাষাও জানি না আর জীবনের এই ভাষাও বুঝি না। কোন ঘটনার কি তারতম্য আমার জীবনে কে বলতে পারে? কোন কোন ঘটনার সমাবেশে আমার আজকের 'আমিত্ব' সেটা যেমন জানি না, কোন কোন ঘটনার অভাবে আমি অন্য মানুষ নই সেটাও জানি না।

সবটাই বেশ হেঁয়ালি মনে হয়। পাজি সুন্দরী কিশোরী হেলেনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে নাচছে, ওর চেহারায় অসীমতার আনন্দের রেশ। গুডেদিদি ক্যারি গ্রান্টের সঙ্গে ছবি তুলে পাবে আসার সার্থকতা। পেয়েওছে। ও নিজেই বলেছে, এমন দিন যে ওর জীবনে আসবে ভাবেই নি। কুর্ট চেয়েছিল আমায় তর্কে হারিয়ে কয়েক মুহূর্তের সার্থকতা, এখন বাংলা দেশের মেয়ে হয়ে না জন্মাবার বেদনাবোধের মধ্যে পাচ্ছে সার্থকতা। আমি কেন পাই না? ব্যাণ্ডের ছন্দ আমায় দোলা দেয় না, রুপের মতন উছলে পড়া নারীত্ব আমায় কাছে টানে না, দু' হাজার লোকের হাততালি আমাকে মোহাবিষ্ট করে না, মদের নেশা আমায় মাতাল করে না। কেন? বসে বসে ভাবতে থাকি আমার এই ছন্নছাড়া সৃষ্টিছাড়া জীবনটার কথা।

ভাবনার সুর ছিঁড়ে দেয় একটা বেড়াল। সেও বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য আশ্রয় নিল এই ভাঙা বাড়িটার মধ্যে। ঢুকবার সময় বোধ হয় আমায় লক্ষ্য করে নি, ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। একপলক ভালো করে দেখে একলাফে উঠে গেল কোণের বড় ঢিপিটার ওপর। ওখান থেকেই ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—'ম্যাও!'

আমার প্রচণ্ড একাকিত্ববোধের মধ্যে প্রাণস্পন্দন ভালোই লাগল, হেসে বললাম—'মিআউ!'

বেড়ালটা ঘুরে দাঁড়াল, দেখল, কি ভাবল জানি না, পা গুটিয়ে বসল। একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়েছিলাম। ও-ও চেয়েছিল। দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল ওরই পেছনের দেওয়ালে, তারপর দেওয়াল বেয়ে সারা বাড়িটার কোণায়-কোণায়। কে তৈরি করেছিল বাড়িটা, কে থাকতো এখানে, কার হাতের ফেলা বোমায় এটা এমন গুঁড়িয়ে গেল আর সঙ্গে শেষ হল কার জীবন, কোন আশা, কার বাঁচার আনন্দ? একদিন কেউ একজন অনেক আশা নিয়ে এ বাড়িটা তৈরি করেছিল এটাও যেমন সত্য, যে মানুষটা এই বাড়িটা ভাঙবে বলে আকাশপথে এসেছিল সেও নিজের জীবন বিপন্ন করেই এসেছিল, সেটাও তেমনি সত্য। আর, এ বাড়িটা ভাঙা না হ'লে আজ আমি এখানে আশ্রয় পেতাম না এটাও আর এক সত্য। বাড়িটা যখন ছিল তখন পৃথিবীর কি লাভ ছিল? আর আজ নেই তাতেই বা কার ক্ষতি? এতবড় পৃথিবীতে একটা ছোট বাড়ি থাকল কি গেল তাতে কি আসে-যায়? ঠিক বুঝি আমার মতন। আজ আছি—একটা ভাঙা বাড়ির সাময়িক আশ্রয়ে; কাল থাকব না, পৃথিবীর কতটুকু যাবে? নিজেকে নিঃস্ব, একাকী মনে হয় গলার তলায় শক্ত একটা মাংসপিণ্ড জমা হয়ে ওঠে। আর না, উঠে পড়ি। বেড়ালটা ওপর থেকে বলে ওঠে—'ম্যাও!'

আবার আমার পথ চলা। হঠাৎ কানে ভেসে আসে সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—'ম্যাও!'

কেমন যেন মায়া লাগে। ফিরে যাই। দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবো ভেতরে, জার্মান ভাষায় কিছু একটা হুঙ্কার আসে ভেতর থেকেই। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি।

প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে আসে সৈনিক। ট্যুনিকের বোতাম ছেঁড়া, চুল উস্‌কো-খুস্‌কো মার্কিনী নাকিসুরে প্রশ্ন করে, 'কে তুমি?'

কোন জবাব দিই না। নাম বুঝবে না, দেশ জানবার দরকার নেই।

আবার প্রশ্ন করে, 'কি চাই?'

আঙুল দেখিয়ে বলি, 'বেড়ালটা!'

লোকটা বেড়ালটার দিকে তাকাল, তারপর হাতের ঘড়ির দিকে দেখল, তারপর বাঁ দিকে ঘাড় কাৎ করে দেখে বলল—'গেট আউট!'

আমি অবিচলিতচিত্তে আবার বললাম, 'বেড়ালটা!'

লোকটা রেগে উঠে চিৎকার করে বললে, 'গেট আউট!!!'

পেছন থেকে ক্ষীণ মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল। জার্মান ভাষায় কিছু একটা সে বললে। রাগের কারণটা তখন বোঝা গেল। ঈষৎ হেসে বললাম—'আই অ্যাম সরি!'

হেসেই লোকটা বললে, 'থ্যাঙ্কস বডি!!'

পথ চলতে চলতে ভাবি এরই বা কি সার্থকতা?

হোটেলে এসে শুনি চাবি নেই। কেমন যেন খটকা লাগল। তবে কি যাবার সময় চাবিটা বন্ধ করি নি? না চাবিটা রিসেপশনে দিতে ভুলেছি। পকেট হাতড়ে দেখি, পাসপোর্ট আর কয়েকটা মার্ক ছাড়া পকেটে কিছু নেই। ওপরে উঠে যাই। চাবিটা দরজায় ঝুলছে। হাসি। গৃহিণীর গঞ্জনা মনে পড়ে যায়। গঞ্জনা থেকেই গুঞ্জন। তার থেকে ছোট-বড় নানান কথা। সারা পথের প্রবল একাকিত্ববোধের যে বিরাট শূন্যতা সেটা নিমেষের

মধ্যে অন্তর্হিত হয়। মনের মধ্যে একটা নতুন সুর শুনি, পলকের মধ্যে বাঁচার একটা নতুন ছন্দ আমার দেহ-মনকে দোলা দেয়। দরজায় চাবি বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ঢুকি। আলোটা জ্বালি।

আমার বিছানায় রুথ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মৃদু নিঃশ্বাসের ওঠা-পড়া সত্ত্বেও ওকে মনে হয় যেন পাথরের নিখুঁত মূর্তি। কোন শিল্পী তার সমস্ত সৃষ্টিশক্তি অকাতরে ঢেলে দিয়ে ওকে খোদাই করে সযত্নে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে।

আলোটা নিবিয়ে সিগারেট ধরাই। পাঁচটা বেজেছে। ছ'টায় রওনা হলেই সময়মত পৌঁছোন যাবে। জিনিস গোছাতে লাগবে খুব বেশি হলেও বিশ মিনিট।

ছ'টা বাজতে পাঁচ। এবার ওকে তুলতেই হয়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। জুতোটা পায়ে গলাতে গলাতে বলল—'কাল কখন পালালে?'

'বোধ হয় দু'টো। কাল নয় আজ!'

ও হাসে, বলে—'সন-তারিখের হিসেব নেই। হারিয়েছি। কিসে এলে?'

'হাঁটতে হাঁটতে!'

'বদ্ধ উন্মাদ!'

উঠে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করতে লাগল লম্বা-আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে।

আমার প্রতিচ্ছবিকে বলল, 'ভয় হয়েছিল! পথই বুঝি হারালে!'

হাসতে হাসতেই বলি, 'পথ আমি হারাই না। আর কেউ না জানুক, তুমি তো জান!'

লম্বা দীর্ঘনিশ্বাসের পর ছোট্ট উত্তর এল—'জানি।'

লবিতে নেমে এলাম। হিসেব নিয়ে হিমসিম। কিছুতেই বোঝান গেল না যে পুরো একদিনের পয়সা ওরা বেশি নিচ্ছে। আমার পয়সার ঘাটতি আর হিসেবের বেলায় ওদের জেগে জেগে ঘুমোনো। পাঁচ মিনিট রীতিমত অঙ্কের সোজা পথে গিয়েও ওদের বাঁকা বিল কমানো গেল না।

এয়ারপোর্ট।

নাম লিখিয়ে এসে বসলাম আরাম-কেদারায়। পাশে রুথ। ওর চেহারায় গত রাত্রের ক্লান্তি। নীল চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠেছে। চুলগুলো জট পাকিয়ে আছে। বললে—'তুমি কি আবার আসবে?'

হাসলাম।

'এই বারই যে আসব, তাই তো জানতাম না।'

'এখন তো জান।'

'কি?'

'আমি থাকব!'

'সে তো আমি না এলেও তুমি থাকবে।'

'সেটা সত্যি।'

রুথ চুপ করে কি সব ভাবতে থাকে। আমার দিকেও তাকায় না। আঙুলের নখ দিয়ে নখ পরিষ্কার করতে থাকে। হঠাৎ এক সময় বলে—'জান—'

'কি?'

'তোমার হারানো বান্ধবীকে আমি ঈর্ষা করি!'

হেসে ফেলি।

'আমি কি এতই মূল্যবান?'

এবার রুথ হাসে, একেবারে খিলখিলিয়ে বলে, 'চিরন্তন পুরুষ। কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত!'

'তুমিই তো বললে!'

'কি?'

'আমার স্ত্রীকে তুমি ঈর্ষা কর।'

'করিই তো।'

'তা হ'লে?'

'করি কিন্তু তোমার জন্যে নয়!'

এবার অবাক হ'য়ে তাকাই ওর দিকে। রুথ বলে, 'ভুল বলেছি। তাঁকে ঠিক নয়, তাঁর অন্তহীন ভালোবাসাকে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ তিনিই সত্যি ভালোবাসতে জানেন। তাঁরটাই সার্থক ভালোবাসা।'

'কি ক'রে বুঝলে?'

'তোমায় দেখে, জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাতের মধ্যেও তুমি তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু পেয়েছ যেটা পেয়েছ ব'লে জীবনের আর সব কিছু মিথ্যে হ'য়ে গেছে। কোন-কিছুই তোমার মনে লাগে না। কিছুই তোমায় টানে না। তোমার মন পড়ে থাকে সেই অভাবনীয় পাওয়ার মধ্যে। এমন ক'রে যে ভালোবাসতে পারে সে এ জগতের বিস্ময়।'

লাউডস্পীকারে ডাক পড়ল। উঠে দাঁড়ালাম। রুথ হাতটা বাড়িয়ে দিল। ধরলাম। ও আর ছাড়ল না। হাত ধরাধরি ক'রেই এসে দাঁড়ালাম গ্যাঙ্গওয়েতে। দরজাটা অটোম্যাটিক। খুলে গেল। নেমে যাচ্ছি। চিৎকার ক'রে রুথ বললে—'তোমার সেই বান্ধবীকে আমার প্রণাম দিও।'

প্রণামটা ও শিখেছে 'পুবেরুণ' থেকে।

প্লেনটা দুলে উঠল। জানলার ধারে বসেছি। কাচের মধ্যে দিয়ে দেখি রুথ রোমাল নাড়ছে। বোধ হয়

নাকটাও মুছল। অত দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না। প্লেনটা দূরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে দম নিল। উড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে মুখ বাড়িয়ে দেখি রুথ এখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট লাল বিন্দু।

এই বিরাট পৃথিবীর ঐ একটা ছোট্ট লাল বিন্দুই আমার এখানে আসার সার্থকতা। ওর মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে চিনেছি। আমার জীবন-জোড়া মিথ্যা আর ফাঁকির মধ্যে অন্তত একটা সত্য যে সীমার মধ্যেও অসীম হ'য়ে আছে সেটা ওর জন্যেই আমার স্পষ্ট ক'রে আজ জানা হ'ল।

ওর রাত্রের পোষাক প'রে আমায় দিনের বেলায় পৌঁছে দিতে আসায় আমার সমর্থন ছিল না। মনে মনে বিরক্তিই খানিকটা ছিল। এখন মনে হচ্ছে ও না এলে, কাল রাত্রের ভাঙাবাড়ির নির্জনতায় যে অজস্র প্রশ্নচিহ্নগুলো আমায় এক একটা বিরাটাকার অজগরের মতন জড়িয়ে ধরেছিল, তার উত্তর কি পেতাম? ওইই ওর দীর্ঘা দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে আমার এমন কিছু পাওয়া হ'য়ে গেছে জীবনে যার জন্যে আর সব পাওয়াই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, অবান্তর মনে হয়।

প্লেন ওপরে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও।

॥ বারো ॥

বিলেত, পুরুষ ও কাপুরুষ

পশ্চিম-জার্মানীর যেটুকু দশদিনে দেখা সম্ভব, দেখে, বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে লণ্ডন পৌঁছোলাম রাত এগারোটায়। আশা ছিল আমার কালো ভায়ে আর মেম ভায়ে-বৌ ওদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে। প্লেন লেট ছিল বলে ওরা আর অপেক্ষা করেনি। আমায় প্রকাণ্ড লণ্ডন শহরের অকূল পাথারে ভাসিয়ে ফিরে গেছে। লণ্ডন আমার কাছে নতুন নয়। বসন্তকালের লণ্ডনকে বেশ চিনি। প্রমাদ গুণলাম।

প্রকাণ্ড এয়ারপোর্টটা ছোটখাটো একটা শহর। বসন্তকালে তো বেশ বড়সড় মেলা বসে ওখানে। মিনিটে মিনিটে প্লেন নামে আর হাজারে হাজারে ট্যুরিস্ট। বেশির ভাগ আমেরিকান। কাঁধে ক্যামেরা, মাথায় মস্ত টুপি, নৃত্যরতা উলঙ্গ মেয়ের ছবি-আঁকা টাই, আর মুখে সাত ইঞ্চি লম্বা সিগার। ব্যস। ভুলচুক নেই। ওরা বাজার দর ধর্ষণ করতে করতে আর ডলার বর্ষণ করতে করতে ঘুরে বেড়ায় কানামাছির মতন শহরের আনাচে-কানাচে। ওদেরই একদল উঠল বৃটিশ য়ুরোপীয়ান এয়ারওয়েসের বাসে। এয়ারপোর্ট থেকে টার্মিনাস প্রায় দশ মাইল, ভাড়া দশ শিলিং। প্রায় পাঁচ টাকা।

টার্মিনাসে নামলাম রাত সাড়ে বারোটায়, মাথায় প্রচণ্ড বৃষ্টি নিয়ে আর ভাবনার বোঝা নিয়ে। উঠব কোথায়? পকেট তো প্রায় খালি আর বসন্তকালের লণ্ডন শহরে বেজায় রকম স্থানাভাব। সুটকেশ সঙ্গে দু'টো, কাঁধে ব্যাগ আর পিঠে বই-কাগজের প্যাকেট। দড়ি দিয়ে গলায় বাঁধা। গৃহিণী প্রায়ই বলেন, বাড়িতে যা কাগজের জঞ্জাল তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে কাঠ লাগবে না। আজ সামনে থাকলে দেখতেন ওগুলো তার আগেই আমার গলায় ফাঁস হয়ে ঝুলছে। একটা ব্যাগ আর ছোট সুটকেশটা সঙ্গে নিয়ে বাকি জিনিস টার্মিনাসের জিম্মায় রেখে পথে নামলাম। আকাশ ফর্সা। তারাও ঝলমল করছে।

টার্মিনাসের পাশেই আর্লস কোর্ট। পাড়াটা আমার চেনা। ওখানে অনেকগুলো হোটেল আছে লাইন বেঁধে। দরজায়-দরজায় ধাক্কা মেরে, ধাক্কাই খেলাম। ঘর সব ডলারের লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে—অথচ শীতকালে এদের অভাবের কাঁপুনিতে পাড়ায় টেকা যায় না, পা ধরে সাধাসাধি করে। হোটেলের আর এক এঁদো পাড়া হল রাসেল স্কোয়ার। মানে, হোটেলের বৌবাজার। ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলাম সেই পাড়ায়। রাত তখন প্রায় দু'টো।

এখানে আর দরজায় ধাক্কা মারারও পথ নেই। বারান্দায় নোটিশ টাঙান আছে 'হাউস্ ফুল'! চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে ভাবি মরুকগে ছাই! বেঞ্চিতেই রাত কাটাই, সকালবেলা দেখা যাবে। পাশেই পার্ক, কিন্তু ঢোকার পথ বন্ধ। তালা ঝুলছে এক একটা বিরাট ওজনের। বাধ্য হয়ে আবার পথ চলা। সুটকেশের ওজনে কাঁধ একেবারে পায়ের হাঁটুতে নেমে এসেছে আর হাঁটুটা যে কোথায় পড়ছে তার হদিসই নেই। ক্লান্তির এমন কুৎসিত চেহারা কদাচ দেখেছি। নিরুপায় হ'য়ে ফুটপাথের ওপর সুটকেশটা রেখে বসে পড়লাম, তারই ওপর একটা পাঁচিলে হেলান দিয়ে। বৃষ্টি নেই, আকাশ ঝকঝকে। ভগবানের অসীম দয়া। পকেটে সিগারেটের একগাদা প্যাকেট। আন্তর্জাতিক যাওয়া-আসায় ঐটাই লাভ। দামী সিগারেট কম দামে মেলে। একটা ধরিয়ে মৌজে দু'টো টান মেরেছি, পুলিশ এসে উপস্থিত।

'বসে কেন?'

'ক্লান্ত।'

'বসবার নিয়ম নেই।'

'দাঁড়াবার শক্তি নেই!'

'হয়েছে কি?'

বুঝিয়ে বলি। কথায় বলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এ একেবারে উল্টো। পুলিশ না শোনে হতভাগ্যের কাহিনী। ওদের স্বভাবসুলভ শান্ত ভাষায় হুকুম দেয়—'হাঁটো।'

'কোন দিকে?'

এবার ও হেসে ফেলে, 'যেদিকে দু' চোখ যায়।'

'চোখ তো হোটেলের দিকে, কিন্তু ভাগ্য যে বাধা সাধছে।'

'আবার খোঁজ।'

বাধ্য হয়ে উঠতেই হয়। হুকুম মতন আবার খুঁজি। ঘুরতে ঘুরতে এবং যতদূর সম্ভব নাকিসুরে (মার্কিনী অনুকরণে) কথা বলতে বলতে একটা জায়গায় একটু জবাব মিলল। দরজার একটা ভাঙা কাচের মধ্যে থেকে টকটকে লাল থ্যাবড়া নাক বের ক'রে এক বুড়ি নিতান্ত ওঁছা গ্রাম্য ঝিয়ের ভাষায় প্রশ্ন করে, 'কি চাই।'

ভাবলাম বলি সুন্দরী তোমাকেই চাই—জন্ম-জন্ম তোমার তপস্যা করেছি পথের দিকে চেয়ে। বললাম, 'একরাত্রের আস্তানা!' কথাটা বললাম গ্রেগরি পেকের অনুকরণে।

বুড়ি আমার আপাদমস্তক ওজন করে বললে—'পাঁচ ডলার!'

'দেব।'

বুড়ি ঐ ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়েই হাত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আমি মাথায় হাত। পকেটে পাউণ্ড। দিলাম দু'খানা। বুড়ি এমনভাবে ফেলে দিল নোট দু'টো, যেন ওর হাতে ফোস্কা পড়েছে। কিছু বলবার আগেই আলো নিভিয়ে উধাও। আবার কড়া নাড়ি তো অন্ধকারেই চিৎকার করে বলে, 'পুলিশ ডাকব!'

বাধ্য হ'য়ে আমিই ডাকি। প্রথমত আসতেই চায় না। বলে ওটা আমার এলাকার বাইরে। সুটকেশটা ধপাস্ করে ফেলে বললাম—'বসলাম তা হ'লে তোমার এলাকার মধ্যে!'

এবার ওর সমূহ বিপদ। আইন অমান্য করলে ধরতেই হবে। ধরলেই নিয়ে যেতে হবে হাজতে। সেখানে হাজার প্রশ্নের হাঙ্গাম। তা ছাড়া 'নেটিভ' হলে কি হবে, ভিজিটার তো বটেই। না ধরলে ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি। বললে, 'চল।'

দরজার কাছে ওকেই এগিয়ে দিলাম। বুড়ি সহাস্যে অভিবাদন জানাল আর জানাল যে ঘর খালি নেই। ডাহা মিথ্যা কথাটা অম্লানবদনে বলে গেল। পুলিশ আমার দিকে চেয়ে খাতা বের করল। বলুন রিপোর্ট।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বুড়ি বললে, 'খাট অবশ্য আছে একটা, কিন্তু সেটা আমার, বলেন তো দিতে পারি!'

পুলিশ বললে, 'যান!'

'যাবো তো' সভয়ে বলি, 'ও যদি আবার খাটের ভাগ চায়!'

পুলিশ হাসে। বুড়িরও ফোকলা দাঁতের হাসি। ঘরে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ ক'রে বুড়ি আমায় আর একবার আপাদমস্তক দেখে বললে—'টাকাটা?'

দিলাম দু'খানা পাউণ্ড নোট। আলোয় ধরে পরীক্ষা ক'রে বলল, 'কখন চা দেব!'

বললাম, 'কাল সকালে!'

ঘুম থেকে উঠলাম বেলা দু'টোয়। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এখনও হয় নি, তবে ওটা যে এ ঘুমের চেয়ে আরামদায়ক হ'তে পারে, আমার বিশ্বাস হয় না।

উঠেই আবার পোড়ারমুখি বুড়ির ঘ্যানঘ্যানানী। কখন যাবে? আ মর! মুখ-হাত ধুই, খাবার খাই, ঘর খুঁজি, তবে তো যাবো। কাবস্য পরিবেদনা। ওর ঐ বাঁধা বুলি, কখন যাবে? এই ল্যাণ্ডলেডি জাতটাই এই রকম। যেমনি কদাকার চেহারা, তেমনি কুৎসিত স্বভাব। সব ক'টা একছাঁচে গড়া। লোকে বলে হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। এবার যে বলবে এমনধারা কথা, নিজের পয়সায় পাঠাবো ওদের কবলে; দেখবেন একটা কেন, পাঁচ হাজার হাতের পঁচিশ হাজার আঙুল একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সমান। শীতকালে একেবারে কেঁচোটি, ফুঁ দাও তো কুঁকড়ে যায়, আর বসন্তকালে একেবারে বিচুটি, ছুঁয়েচ কি মরেছ!

খাবারের সন্ধানে পথে বেরিয়েই দেখি পাজি আর গুডেদিদি সঙ্গে বেরিদাদা। পাজি হাত বাড়িয়ে বলে—'গুড আফটারনুন! ফাইন ওয়েদার!'

লাও ঠ্যালা। বিলেতের মাটিতে পা দিয়েছে কি দেয় নি, একেবারে সাহেব!

প্রথম সাক্ষাতে আবহাওয়ার আলোচনা সাহেবদের জাত-



টাকা পাবার পর ল্যাণ্ডলেডি

—লেখক কর্তৃক অঙ্কিত

ব্যবসা। এইটাই সাহেব হবার প্রথম সুনিশ্চিত লক্ষণ। জল হোক, ঝড় হোক, বন্যায় দেশ ভাসুক আর রোদ্দুরে লোকের সান-স্ট্রোক হোক, আবহাওয়াটা সুন্দর হ'তেই হবে। এই সৌন্দর্যের ব্যাপারে দ্বিরুক্তি নেই, মতবিরোধ নেই। আপনি যদি বললেন 'কই না তো' তো গেলেন। আপনার সাহেব হওয়া তো হলই না, সভ্যজগতের মানুষ বলে গণ্য হবার সম্ভাবনাও গেল। আবহাওয়ার সৌন্দর্য যে বোঝে না, হয় সে উন্মাদ না হয় সে জংলী। জর্জ মিকেশর মতে বহুদিন পর দুই সাহেববন্ধুর অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার —এমন কি দুই আজন্ম শত্রুর প্রথম কথার নমুনা খানিকটা এইরকম—

'চমৎকার দিনটা—না ?'
'অপূর্ব···না ?'
'সূর্যটা···'
'সুন্দর না ?'
'অদ্ভুত। গরম···অথচ নরম···'
'আমার বড় ভালো লাগে···গরম অথচ নরম···'
'আমার আনন্দে মরতে ইচ্ছে করে···আপনার ?'
'আমারও···তাই না ?'
ইত্যাদি···ইত্যাদি···

সাহেব হবার আরও কয়েকটা নিশ্চিত কায়দা আছে। সেগুলো সম্বন্ধে সামান্য সচেতন হলেই সাহেব হওয়া যায়, পুরোপুরি হলে খাঁটি সাহেব। যেমন ধরুন আলাপ করিয়ে দেওয়া। কেউ একজন আপনাকে তাঁর বন্ধুর (অথবা বান্ধবীর—সেটা অবশ্য কদাচিৎ ঘটে, কারণ বান্ধবীর বন্ধন বদল ওখানে একটা চলতি ধারা। হামেসাই ঘটে!) সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। দেশে হ'লে কি করেন ? নমস্কার। কি বলেন ? কথা। ওখানে ওটি হবার জো নেই। প্রথমেই আপনাকে হাত বাড়াতে হবে হ্যাণ্ডসেক করার জন্য। উনি লক্ষ্যই করবেন না। অপ্রস্তুত হ'য়ে আপনি হাত গুটিয়ে নেবেন। তখন ওঁর খেয়াল হবে এবং হাত বাড়াবেন। এখন অবশ্যই আপনার খেয়াল নেই। যখন খেয়াল ক'রে আপনি হাত বাড়াবেন, তখন উনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন। এই রকম হাতাহাতি চলবে প্রথমে। তারপর এক সময়ে হাতে হাতে মিলন হবে, তারপর থেকে দেখবেন কথারও হুবহু মিল। যেমন—

আপনি : 'হেঁ হেঁ হেঁ···কেমন আছেন ?'
উনি : 'হেঁ হেঁ হেঁ···কেমন আছেন ?'
আপনি : (আলাপ ক'রে খুশি হন আর নাই হন) 'আলাপ ক'রে খুব খুশি হলাম।'
উনি : (আলাপ ক'রে খুশি হন আর নাই হন) 'আলাপ ক'রে খুব খুশি হলাম।'
আপনি : 'চমৎকার দিনটা।'
উনি : 'সত্যি অপূর্ব'·

ইত্যাদি। (ওপরে দেখুন—এবং রাতারাতি সাহেব হ'তে চান তো চটপট মুখস্থ ক'রে রাখুন!)

আমি তো পুরোপুরি ভেতো-বাঙালী। নমস্কার করি দু'হাত তুলে। পাজিদা এতক্ষণ একটা হাত বাড়িয়েই রেখেছিল। আমাকে নমস্কার করতে দেখে অপ্রস্তুত হ'য়ে নমস্কার করল—একটা হাতেই—অন্যটা তুলতে ভুলেই গেল!

গিয়ে বসলাম সবাই মিলে 'লায়নে।' ওটা একটা 'স্বাবলম্বী রেস্তোরাঁ' (মানে নিজের পয়সায় চলে না—পয়সাটা আপনারই নেয়!)। ওখানে ওয়েটারের বালাই নেই। খাবারটা ট্রেতে করে নিজেকেই আনতে হয়। এই রেস্তোরাঁ লণ্ডনের অলিতে গলিতে ছড়ানো আছে এবং আমার মতন ছাপোষা মানুষদের এখানেই সুবিধে। খুব গা-সওয়া দর। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল ওরাও আমার মতন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এবং পুলিশের সাহায্য নিয়ে ঘর পেয়েছে, আমার আসার দিনতিনেক আগে। আর বেরিদাদা? উনি ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং কাঁটা ধরার কায়দা দেখে বোঝা গেল—খাঁটি সাহেব।·

এই কাঁটা (মহিলার মাথার নয়—ওটা সব দেশেই সমান ভাবে ফোটে। আমি বলছি খাবার কাঁটার কথা।) জিনিসটা একটা সাংঘাতিক জিনিস। কাঁটা ধরার কায়দা এবং ব্যবহারের নমুনা দেখে জাত চেনা যায়! যাঁরা কাঁটাটা সোজা ধরেন এবং কাঁটার ঈষৎ বাঁকা পেটের ওপর খাবার বোঝাই ক'রে সেটা মুখে চালান দেন, তাঁরা জার্মান। যাঁরা কাঁটাটা উল্টে ধরেন এবং খাবারটা—এমন কি কড়াইশুঁটির বিচি পর্যন্ত কাঁটার ধনুকের মতন বাঁকা পিঠে তুলে (অতি কষ্ট ক'রে এবং আমার মতন অনভিজ্ঞ লোক রীতিমত কসরৎ ক'রে) মুখের মধ্যে চালান দেন, তিনি ইংরেজ। যিনি কাঁটাটা উল্টোও ধরেন না, সোজাও ধরেন না, ধরেন লম্বালম্বি এবং কাঁটাটা সরাসরি খাবারের বুকে (অথবা পিঠে) ফুটিয়ে খাবারটাকে গোগ্রাসে মুখের মধ্যে এবং না চিবিয়েই পেটের মধ্যে চালান দেন তিনি আমেরিকান—আর কাঁটাটা যাঁরা খাবারের জন্যেই ব্যবহার করেন না, পারলে (এবং মাঝে মাঝে সত্যিই) সামনের উপবিষ্টা মহিলার চোখে ফুটিয়ে দেন তাঁরা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে উড়নচণ্ডী বৌ-এর নির্যাতিত স্বামী!

স্বামী-জাতটা সংসার থেকে লোপ পেতে বসেছে, বৃটেন থেকে তো বটেই। সেদিন কাগজ খুলে দেখি মহিলা বনাম পুরুষ নামে চমৎকার একটা তথ্যবহুল আলোচনা। সরকারীমহল খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছেন যে, বৃটেনে মহিলার সংখ্যা পুরুষের পাঁচগুণ বেশি। হায়, হতভাগা নারী! মহিলার গড়পড়তা জীবনীশক্তি পুরুষের দু' গুণ

বেশি (হায় হতভাগা পুরুষ!)। পাঁচ বছরের হিসেবে (গড়পড়তা) মহিলারা বিয়ে করেন পুরুষদের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। এইটাই সবচেয়ে জটিল তথ্য। বিয়ে জিনিসটা মেয়েতে মেয়েতে হয় না, তখন হিসেবটা হওয়া উচিত ছিল মেয়ে-পুরুষে সমান সমান। কিন্তু তা নয় এবং টাইমসের মতন পত্রিকায় ছাপার ভুলও চট্ করে বড় একটা হয় না। তা হ'লে এই হিসেব অনুযায়ী হয় একজন মেয়ে আড়াই ভাগের একভাগ পুরুষকে বিয়ে করেন (সেটা কতখানি এবং কোন্‌দিক—মুড়োর দিক না ল্যাজার দিক? না, বিয়ের সময় পুরুষটি আস্তই থাকে তারপর অত্যাচারে কমতে কমতে ঐ অবস্থায় দাঁড়ায়?) আর না হয় একজন পুরুষ আড়াইজন মেয়েকে বিয়ে করেন অর্থাৎ দু'জন আস্ত এবং একজনের আদ্দেক (এইখানেও ঐ একই প্রশ্ন থেকে যায়—কোন্ আদ্দেক?)। পরে, বহুবিধ লোকের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আসল তথ্যটি জানা গেল! ওটা কিছুই নয়, এক-একজন মহিলা পাঁচ বছরে আড়াইবার বিয়ে করেন অর্থাৎ গড়পড়তা প্রত্যেক দু' বছর অন্তর স্বামী বদল করেন।

আরও কিছু তথ্য ছিল—যেমন বৃটেনে প্রতি সপ্তাহে গড়পড়তা সাতশো বারোটি পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তানের জন্ম হয়; প্রতি বছর গড়পড়তা আঠারো শো স্বামী স্ত্রীর শোকে (মৃত্যুর নয়, নির্যাতনের, ডিভোর্সের) আত্মহত্যা করেন এবং প্রতি বছর গড়পড়তা ছ' হাজার সাতশো মহিলা স্বামীর ওপর অত্যাচার করার অপরাধে দণ্ডিত হন!

এ হেন অবস্থায় স্বামী-জাতটার ভবিষ্যৎ যে একদম অন্ধকার তা বলাই বাহুল্য। দোষ অবশ্যই স্বামীদের। এটা আমার বন্ধু জর্জের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তিনি হাঙ্গারীতে সাংবাদিক ছিলেন, ভালোই ছিলেন। বিলেতে এসে হয়েছেন স্বামী এবং সাহেব। ওঁকে বিয়ের আগে যা দেখেছি এবং এবার দু'দিনে যা দেখলাম তাতে এইটাই বোঝা গেল যে বিলেতে স্বামী-জাতের তিন অবস্থা। স্বামী হবার আগে তাঁরা 'পুরুষ' এবং স্বামী হবার পর তাঁরা 'কাপুরুষ'। 'পুরুষ' অবস্থায় তাঁরা শিকারী এবং অসীম তাঁদের সাহস। পথে-ঘাটে-দোকানে-পার্কে আর বিবাহিত বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁদের বাড়িতে তাঁরা শিকার খুঁজে বেড়ান আর একবার পেলে আর তর সয় না। বাড়ি নিয়ে গিয়ে রান্না করে, প্লেট সাজিয়ে টেবিলে বসে যে খাবেন সে সময় কৈ? যেখানে পান সেইখানেই খান। দিনই হোক আর রাত্রিই হোক। ট্রেনেই হোক আর ড্রেনের ধারেই হোক। ওরই মধ্যে যাঁরা একটু-আধটু খেলিয়ে খেতে ভালোবাসেন তাঁরা দু-পা বাড়িয়ে চলে যান হাইড পার্কে। হাইড পার্ক হল লণ্ডনের ময়দান আর শিকারী জাতটার রাজধানী।

শিকারকরা সব মাংসই যে সহজে হজম হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অতএব গর-হজমের ওষুধ দরকার। সে ডাক্তারখানার নাম রেজিস্ট্রেশন অফিস। সারা দিন-রাত খোলা, ডাক্তার সব সময় হাজির। নাম সই করে, বড়িটা (আয়তন গড়পড়তা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি—ওজন এক মণ আঠারো সের এটা ঐ সরকারী বিজ্ঞপ্তিতেই বলা হয়েছে!) মুখে ফেললেই, গর-হজম সারুক আর নাই সারুক, জাত বদলটা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। 'পুরুষ' হয়ে যায় 'স্বামী' এবং অল্পদিনের মধ্যেই পুরুষত্বের তৃতীয় এবং শেষ অবস্থা 'কাপুরুষ'।

বিলেতের মেয়েদেরও তিনরূপ। বিয়ের আগে অবলা, বিয়ের পর স্ত্রী এবং শেষ অবস্থায় ইস্তিরি। অবলা অবস্থায় তাঁরা সচকিত বন-হরিণীর মতন চঞ্চলা, শিকারী দেখলে পালানোর কথা ভুলে গিয়ে সরল খরগোস শাবকের মতন চোখ বুজে দাঁড়িয়ে পড়েন। শিকারী যখন পরখ করে দেখে যে জিনিসটা বাঁচা না মরা তখন অল্প চোখ খুলে বলেন—'মেরে আর কি হবে বাপু! সরাসরি খেয়ে ফেল।'

অর্থাৎ জ্যান্ত অবস্থায় যদি একবার পাকস্থলীতে ঢোকা যায় তো গর-হজম করিয়ে দেওয়াটা সহজ হয়ে ওঠে। হয়ও তাই।

দ্বিতীয় অবস্থা সুরু হল। অর্থাৎ অবলা হ'য়ে উঠলেন বলার রাজা। প্রথমে ফিসফিসিয়ে তারপর পাড়া মাত ক'রে। এই অবস্থায় তাঁরা বাজার করেন, সংসার সামলান, কিউতে দাঁড়ান এবং অল্পদিনের মধ্যেই হ'য়ে ওঠেন ইস্তিরি। সব সময় গরম এবং সদ্য-কাচা স্বামী নামক সামাজিক পোষাকটিকে ধোপ-দোরস্ত রাখার জন্য উদ্‌গ্রীব। অনেকেরা এই পর্বের নাম দিয়েছেন স্বামী-নির্যাতন-পর্ব। ইস্তিরির একই সঙ্গে চলে দুই পর্ব, পুরোনো স্বামী নির্যাতন এবং নতুন স্বামী নির্বাচন।

এই নির্যাতন পর্বের সময় কাপুরুষরা কি করেন? নিছক পাগলামি। বাগান থাকলে মালির কাজ, গাড়ি থাকলে ক্লিনারের কাজ, ছেলে থাকলে বেবি সিটিং আর পয়সা থাকলে প্রকাণ্ড মাঠে ছোট্ট ছোট্ট গর্তের মধ্যে বহুদূর থেকে ছোট্ট ছোট্ট বল ফেলার প্রচেষ্টায় সারাদিন হাঁটাহাঁটি। এমনি করে (গড়পড়তা হিসেবে) বছর দুইয়ের মধ্যে একদিন বাড়ি এসে দেখেন ইস্তিরি আবার অবলা হ'য়ে গৃহত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ মহিলার নির্যাতন পর্ব শেষ, নির্বাচন পর্ব শেষ এবং স্বামীর নির্বাসন পর্ব আরম্ভ। কোথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন, তা নয় গিয়ে দেন গলায় দড়ি। হা কপাল!

বিলেতের পুরুষদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন ধরুন, বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চুপে পথ হাঁটেন, কিন্তু কুকুর নিয়ে বেড়াতে গেলে তার সঙ্গে অনবরত কথা বলেই চলেন। বাড়িতে ওঁরা কথা বলেন, ক্লাবে গিয়ে ওঁরা আগুনের ধারে কোন একটা

ম্যাগাজিন নিয়ে চুপ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকেন এবং এই নিশ্চুপে বসে থাকার জন্য বছরে মোটা টাকা চাঁদাও দেন। তাই জন্যই বোধ হয় ইংরেজি শব্দ 'ক্লাব'-এর অন্য মানে 'ডাণ্ডা'!

খাওয়া শেষ হল। অল্পদামে অনেক খেয়ে মনটা বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে। আমাদের দেশে যেমন এক দামে নানানরকম খাবার মেলে, ও-দেশে তেমনি একই খাবার নানানরকম দামে এবং নামে মেলে। তার কারণ ও-দেশে সব খাবারেরই একই রকম স্বাদ। আমার কাছে বি-স্বাদ।

উঠতে যাব পাজিদা পুরোপুরি সাহেব হবার দ্বিতীয় এবং সুনিশ্চিত লক্ষণ দেখালেন। বললেন—'আসুন চা খাওয়া যাক!'

চা-টা কোন-এক সময় চীন দেশে সু-পানীয় ছিল সন্দেহ নেই। সাহেব চা-বিদরা সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। তাতে চিনি, দুধ এবং কখনও কখনও লেবুর ব্যবহার নির্ধারিত করে চায়ের চায়ত্ব ঘুচিয়ে ওটাকে বানিয়ে দিয়েছেন বৃটেনের জাতীয় পানীয়। পুরোপুরি সাহেব হ'তে গেলে চা খাওয়াটাও সাহেবী কায়দায় আয়ত্ত করতে হয়। বিলেতে চা খাওয়ার সময় এবং সিচুয়েশন মোটামুটি এই রকম।

ভোরবেলায়, মুখ না ধুয়েই, তারপর মুখ ধুয়ে ভালো করে। বেলা এগারোটায়; লাঞ্চের পর; চায়ের টেবিলে (তখন অবশ্য কফিও খাওয়া চলে)। সন্ধ্যা ছ'টায়; রাত আটটায়; শোবার আগে এবং খাঁটি সাহেবরা, মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে। এ ছাড়াও বেরুবার আগে; ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলে। বৃষ্টি নামলে এবং থামলে। ক্লান্ত হলে (না বেরিয়েও), একলা লাগলে (স্ত্রী বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও); বিষণ্ণতায়, নার্ভাসনেশে এবং আনন্দে। বাড়িতে লোক এলে অবশ্যই; না এলে নিরুপায় হ'য়ে। এবং যখন ইচ্ছে। আর, কেউ দিলে।

বাধ্য হ'য়ে রাজী হলাম। বেরিদা খান অল্প, খাওয়ার ভাণ করেন বেশি, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, শরীরটা বড় খারাপ, ওষুধ নিয়ে আসি। সুস্থ মানুষের শরীর খারাপ হলে যে ধরণের ওষুধের প্রয়োজন তার ডাক্তারখানা লণ্ডনের পথে-ঘাটে দু'পা অন্তর। দু' মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন এবং চায়ের সঙ্গে মিলিয়ে ওষুধ সেবন করে আধ মিনিটের মধ্যে চাঙ্গা! সাধে বলে ওষুধ তো ওষুধ বিলিতি ওষুধ! শুনেছি স্কটল্যাণ্ডে নাকি আরও ভালো। সে ওষুধে মরা মানুষও চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। ইচ্ছে আছে মরবার আগে ওখানে একবার যাবো। যাবার বাধা নেই, ভয় ঐ কিউ জিনিসটাকে।

চায়ের মতন কিউতে দাঁড়ানোও সাহেবদের জাতীয় স্বভাব। ওখানে একজন মানুষ একলা, দু'জন হলেই কিউ। গতবার বিলেতে ছ' দিন ছ' রাত্রি আমি কিউতে বসেছিলাম টসকানিনীর কনসার্ট দেখবার প্রয়োজনে। সাহেবরা

কিউতে দাঁড়ান আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যে। সাহেব স-পরিবারে কিউতে দাঁড়ালেন বাস ধরবার জন্য। গন্তব্য সমুদ্র কিনারা, উদ্দেশ্য ছুটি উপভোগ। ঘণ্টা-তিনেক কিউতে দাঁড়িয়ে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলেন সেখানে। সেখানে আবার কিউ থাকবার জায়গার জন্য। তারপর কিউ চায়ের দোকানে, তারপর কিউ খাবারের জন্য। আবার কিউ সমুদ্র স্নানের সুন্দর জায়গাটির জন্য। তারপর কিউ ভিজে কাপড় ছাড়বার ঘেরা জায়গাটির উদ্দেশ্যে। আবার কিউ বাসে, ফিরবার জন্য। বাড়িতে সবাই কিউ দিলেন, আপন আপন কিউ-অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য। কেউ কেউ বলেন কিউতে দাঁড়াবার জন্যও নাকি ওখানে কিউ দিতে হয়। কথাটার সত্য-মিথ্যা জানবার অবকাশ পাই নি। কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, পরে জানাবো।

পথে নেমেই গুডেদিদি বললেন ৬০ নম্বর বেলসাইজ মিউতে যাব বহু পুরোনো বন্ধু আছেন। ডিনার খাওয়ার নেমন্তন্ন।

এগিয়ে যাবার জন্য বলি, 'সে তো অনেক দেরি!'

গুডেদিদি নাছোড়বন্দা, 'বাড়ি খুঁজতে যদি দেরি হয়!'

কথাটা ঠিকই। আমার অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট; লণ্ডনে সব পাওয়া যায়, কেবল ঠিক যে বাড়িটা খুঁজছেন সেইটি বাদে। দোষ আপনার নয়, যে বাড়িটা খুঁজছেন, তার। উনষাটের পর এবং একষট্টির আগে ষাটের নির্ধারিত স্থান। কিন্তু সেখানে সেটা কখনই থাকে না। জাত বানিয়ার দেশে অধিকাংশ বাড়িই এই নিতান্ত অ-বানিয়াগিরির দোষে দুষ্ট। গুডেদিদি চালাক মেয়ে। পাছে বাড়িটা খুঁজে না পেলে ডিনারটা ফস্কে যায় (খাবার বহর বার্লিনেই দেখেছি!) তাই শুধু ঠিকানাটাই লিখে নেন নি, যাবার পথটাও লিখিয়ে নিয়েছেন। পথ-নির্দেশটা পড়লাম। খুব সোজা। বেলসাইজ পার্ক টিউব স্টেশনে নেমে বাঁ-দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে ডানদিকে বেঁকে তিন ফার্লং হাঁটলে যে চৌমাথা তার বাঁ-দিকের রাস্তাটা বেলসাইজ স্ট্রীট। ঐ স্ট্রীটে পড়ে ডানদিকে যে ছোট লাল বাড়িটা আছে তার বাঁ-দিক দিয়ে যে পথটা গেছে সেটা ধ'রে দেড় ফার্লং গেলে একটা ল্যাম্প-পোস্ট; তার ডান দিকের রাস্তাটা বেলসাইজ অ্যাভিন্যু। অ্যাভিন্যুর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে ডান হাতি রাস্তাটা তার শেষে বেলসাইজ অ্যালি। অ্যালি পেরিয়ে বাঁ-দিক বেঁকলেই ডানদিকে যে রাস্তাটা পড়বে তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বেলসাইজ রোড। সেখানে জিজ্ঞেস করলেই যে-কেউ বলে দেবে বেলসাইজ ম্যুটা কোথায়।

বেরিদার শরীরটা আবার খারাপ হল, উনি কাট মারলেন। পাজিদাও কাট মারবার তালে ছিল, কিন্তু পার পেল না। গুডেদিদি জানে ওর পকেটেই পয়সা, ওকে ছাড়লে ফেরার পথে ট্যাক্সি পাওয়া বন্ধ। অনুনয় করে নিল সঙ্গে।

পাজিদা কিন্তু খুব সচেতন, বললে, 'ট্যাক্সি কিন্তু নিতে পারব না। আগেই বলে রাখছি!'

মুখে বললাম দরকার নেই। মন হাসল। গুডে-দিদিকে ও তা হ'লে এখনও চেনে নি!

চললাম তিনজন গল্প করতে করতে টিউব ট্রেনে। বেলসাইজ পার্ক স্টেশনে নেমে গুডেদিদি বলল, কাউকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। মন সায় দিল। ইংরেজ হিসেবি জাত। যা বলবে একেবারে অঙ্কের মতন নির্ভুল। এক বৃদ্ধ কাগজ বিক্রি করছিল। পাড়াটা তার অবশ্যই চেনা। তাকেই জিজ্ঞেস করলাম।

সে আমাদের আপাদমস্তক দেখে প্রশ্ন করল—'ফরেনার?'

হেসে মাথা নাড়লাম।

লোকটা গম্ভীর হয়ে নাক ঝাড়ল। তারপর আস্তে আস্তে বললে—'সোজা যান। তিনটে রাস্তা পেরিয়ে বাঁ-দিকে ঘুরুন। তারপর দু'টো রাস্তা পেরিয়ে আবার বাঁ-দিকে, তারপর দু'টো গলি, তিনটে রাস্তা এবং একটা পার্ক পেরিয়ে আবার বাঁ-দিক। সেখানে ৭৩ নম্বরের বাস ধরে তিন পেনির টিকিট কিনুন। টার্মিনাসে নেমে আবার কাগজওয়ালার স্টলে জিজ্ঞেস করবেন। সে বলে দেবে।

অঙ্কে আমি চিরদিনই কাঁচা, মগজে বুদ্ধি কম। তা ছাড়া সদ্য রাশিয়ান পদ্ধতির অভিজ্ঞতা হয়েছে ইস্ট-বার্লিনে। কাজটা কমরেডদের মতন ভাগাভাগি করে নেওয়াই ভালো। বললাম—'পাজিদা স্টল পর্যন্ত তুমি পথ দেখাও, বুড়োর হিসেব মতন, তারপর বাকি পথটা আমি হিসেব রাখব।'

আমি অঙ্কে কাঁচা হলে কি হবে, পাজি ব্যবসায় পাকা। ও হিসেব করে দেখল প্রথম পর্বটা ওর কাঁধে চাপলে বাস ভাড়ার ন' পেনিও ওকেই দিতে হবে। নানান ওজর-আপত্তি জানিয়ে প্রথম পর্বটা আমার কাঁধেই চাপলে। হিসেব মতন ঘুরে ঘুরে যখন বাস থেকে নামলাম তখন দেখি—আবার সেই বেলসাইজ পার্ক টিউব স্টেশন। কি হল? এমন ভুল! কাগজওয়ালা বুড়োকে প্রশ্ন করি—'আমরা কি ভুল করলাম?'

বুড়ো একগাল হেসে বললে, 'না!'

'তা হ'লে আবার ঘুরে-ফিরে তোমার কাছে এলাম কি করে?'

বুড়ো নির্বিকারচিত্তে বললে, 'দেখছিলাম পরখ ক'রে পথ বলে দিলে তোমরা ঠিকমত ফলো করবে কি না। না করলে বাড়ি পাবে না, দোষটা হবে আমার। ফরেনারদের গালাগাল আমার অসহ্য। এইবার তা হ'লে বলি—'

সর্ত মতন পাজিদাকে এগিয়ে দিলাম। পাজিদা মন দিয়ে শুনল, দু-চারটে জিনিস লিখেও নিল। তারপর মাইলখানেক হেঁটে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।

'কি হল পাজিদা?'

'দক্ষিণ-পূর্ব কোন দিক?'

উত্তর আমার জানা নেই। জানবার কথাও নয়। দ্বিতীয় পর্বের দায়িত্ব পুরোপুরি ওর। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক দেখে, দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করে, নাজেহাল হ'য়ে বললে, 'ধ্যাৎ তেরি ট্যাক্সিতেই চল!'

মিটার উঠল ন' শিলিং। টিপস্ তার সঙ্গে আরও তিন শিলিং।

বেলসাইজ ম্যু মিলল তো বাড়ি মেলে না। একধারে এক দুই তিন অন্যধারে সত্তর একাত্তর বাহাত্তর। ষাটের কোঠা খুঁজতে খুঁজতে অমন শীতেও ঘাম দেখা দিল। ষাট আর পাওয়া যায় না। হতাশ হ'য়ে রাত ন'টায় (তখন অবশ্য সবে সন্ধ্যে) একষট্টিকে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি হেসে বললেন, 'ও ষাট! এইটেই!

'এটা তো একষট্টি!'

'আজ্ঞে!'

'তা হ'লে?'

'আগে ষাট আলাদা বাড়ি ছিল, এখন একষট্টির সঙ্গে মিশে ষাটও একষট্টি হ'য়ে গেছে!'

'—কোথায়?'

'তিনি বেরিয়ে গেছেন—আপনারা?'

গুডেদিদি পরিচয় দিলেন। খাবারের নেমন্তন্ন আছে তাও জানালেন।

ভদ্রলোক বিড়বিড় করে বললেন—'তা তিনি তো আপনাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে বেরিয়ে গেলেন। আপনাদের তো ডিনারে আসবার কথা!'

গুডেদিদি বললেন, 'ডিনার তো সন্ধ্যাবেলাই খায়!'

'আজ্ঞে না। বিলেতে ডিনার খায় সাতটায়! উনি সাতটা থেকে অপেক্ষা ক'রে ক'রে সাড়ে আটটায় বেরিয়ে গেছেন!'

ফেরার পথে আমি আর পাজিদা বিলিতি আদব-কায়দার পিণ্ডি চটকাচ্ছিলাম, গুডেদিদি কখন পিছিয়ে পড়েছেন খেয়ালই করি নি। হঠাৎ করুণ আর্তনাদ। ফিরে দেখি গুডেদিদি মাটিতে বসে এবং চোখে জল।

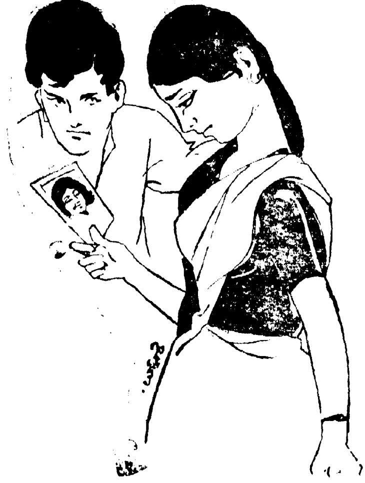
'কি হল?'

'পা মচকেছে!'

বাধ্য হ'য়ে পাজিদা আবার ট্যাক্সি নিল। এবার উঠল এক পাউণ্ড ছ' শিলিং। টিপস্ আট শিলিং!

বেচারা পাজিদা। দেশে দেয় ইনকাম ট্যাক্স আর এখানে দেয় ভালোমানুষীর খেসারৎ! [ক্রমশ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]



আবার মহুয়ার পরীক্ষা এসে গেছে; সেই পড়ার টেবিলের কাছে সেই গোল চেয়ারে বসে দুলে দুলে আগের মতই পড়া মুখস্থ করে মহুয়া। কিন্তু তেমন করে বুঝি আর পড়ায় মন বসাতে পারে না।

মা আরোও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখন দিনরাত মা'র কাছে নার্স থাকে, মহুয়ার সামনে পরীক্ষা এসে গেছে বলে মা-ই জোর করে এই ব্যবস্থা করিয়েছেন, পড়া তৈরি আর রুগীর সেবা একসঙ্গে সম্ভব নয়। বাবার দেখাশোনা পর্যন্ত আজকাল ভানুদি'ই করেন, শুধু কাঁপা কাঁপা হাতে বাবার রায়তা কি দইবড়ার মশলা এখনও বিছানায় শুয়ে-শুয়েই মা মিশিয়ে দেন।

দাদা প্রায় রোজই আসে, রিটাও এসেছে কয়েক বার। মা রিটাকে গয়নায় মুড়ে দিয়েছেন, নিজের বেনারসী পরিয়ে, হাতে লোহা দিয়ে, মাথায় সিঁদুর দিয়ে সাজিয়েছেন। বারবার বলেছেন, চমৎকার মুখখানি, যেন দুর্গা-প্রতিমা!

কিন্তু আশ্চর্য! কখনও এ-বাড়িতে ওদের উঠে আসতে বলেন নি। দাদাও কি আর চায়? এই বাড়িতে এসে সবায়ের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে। দাদাটা কেমন যেন বদলে গেছে বিয়ে করে। মহুয়ার থেকে থেকে কান্না পায়। এ-বাড়ির এমন দশা হবে কে ভেবেছিল? আর শুধু কি এই বাড়ি? সারা বাংলা দেশ, গোটা পৃথিবীটাই যেন বদলে গেছে মনে হয় মহুয়ার।

স্বর্গ খেলনা

সুজাতা



যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ! সারা পৃথিবী ভরে শুধু এই যুদ্ধ ছাড়া যেন আর কোনও খবর নেই। সকালবেলা খবরের কাগজ খুলেই দেখ—কোথায় ইংরেজ-সৈন্য ক' ইঞ্চি পিছু হটলো, আর জার্মানরা কোথায় হু-হু করে এগিয়ে চলেছে, কোথায় বাধা পেয়েছে। আর সন্ধ্যেবেলা বাবা ত' রোজ মাকে বসে বসে শোনান যুদ্ধের খুঁটিনাটি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। এ-যুদ্ধে ভারতের কি কর্তব্য, মহাত্মা গান্ধী কি বলতে চান, কেন ইংরেজ-সরকার গোটা কংগ্রেসকেই জেলে পুরতে চাইছে এইসব নানা কথা।

মাঝে-মাঝে খুব উৎসাহিত বোধ করে মহুয়া, সকালে কাগজ টেনে যুদ্ধের খবরটাই আগে চোখ পেতে ছাখে, আবার কখনো কখনো অপরিসীম ক্লান্তিতে ছেয়ে যায় মহুয়ার হৃদয় মন,—এমন দেশ কি পৃথিবীতে কোথাও নেই যেখানে যুদ্ধের কালো ছায়া পড়ে নি? যেখানে নদীর জলে সূর্যাস্তে সোনা জলে, শান্ত গ্রাম নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, আর লোকে শুধু হেসে কথা বলে, কৌতুক করে নাচে-গায়, আকাশের চাঁদ-তারা দেখে বিহ্বল হয়, আর সবাই সবাইকে ভালবাসে কোথায়? সে দেশ কোথায়? কবে মহুয়া সেই দেশে যেতে পারবে?

মহুয়া!


SUNLIGHT
Soap
সানলাইট সাবান

অজয়দা প্রায় ছুটতে ছুটতেই ঘরে ঢুকলেন।

মহুয়া শীগগির ওঠো, তৈরি হয়ে নাও, আমার সঙ্গে এখনি একবার যেতে হবে।

কোথায়? কেন? এখন পড়ছি যে!

রিটার অবস্থা খুব খারাপ, সঞ্জয় এখনও জানে না যে··· বলতে বলতে থামলেন অজয়দা।

আমার মনে হয় তোমার এসময় একবার যাওয়া উচিত

অজয়দা! খুলে বলুন কিছু বুঝতে পারছি না!

অজয়দা এক মিনিট থামলেন, কি যেন ভেবে নিলেন তারপর পরিপূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন মহুয়ার মুখের দিকে।

রিটা যে সন্তানসম্ভবা ছিল তোমরা জানতে না?

না ত'!

মহুয়া বিস্মিত হোল। এতবড় একটা খবর রিটা তার কাছে বলে নি; অথচ এত ভাব মহুয়ার সঙ্গে; পরশু বিকেলেও মহুয়া গিয়েছে রিটাদের সেই ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে; মা যদিও ওসব জায়গায় যাওয়া পছন্দ করেন না, মহুয়ার নিজেরও খুব ভাল লাগে না পাড়াটা তথা পরিবেশটা, তবু দাদা থাকে যে। কিন্তু রিটা···; মহুয়া আর দেরি করলে না।

চলুন।

মহুয়া চটিতে পা গলাল।

মাকে বা কাউকেই এখন কিছু বলবার দরকার নেই, রাস্তায়ই শুনব সব।

গাড়িতে যেতে যেতে অজয়দা দিলেন বাকি খবর। কাল রাত্রে সঞ্জয়দের পাড়াতেই এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারে ওদের নিমন্ত্রণ ছিল। রিটার কোন মামাতো বোনের বিয়ে না জন্মদিন তা অজয়দা ঠিকমত জানেন না। মোটকথা সেইখানে শুধু খেয়ে নয় যথেষ্ট পান করে নাচানাচি করে, বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে সহজে উঠতে পারে নি রিটা। উঁচু হিলের জুতোয় খটখটিয়ে পড়ে গেছে, বেশি নয়, দু-তিন ধাপ মাত্র; সঞ্জয় ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, আর তারপর ওরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। পড়ে যাওয়াতে যে সাংঘাতিক কিছু হয় নি তখন পর্যন্ত এই বিশ্বাসই ছিল দু'জনেরই। ভোররাত থেকে আরম্ভ হয়েছে যন্ত্রণা তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব কিছু; ডাক্তার এসে মুখ গম্ভীর করেছেন, সঞ্জয় অজয়কে টেলিফোনে খবর দিয়েছে, অজয় আসতে আসতে রিটার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সঞ্জয় রক্ত আনতে গেছে মেডিকেল কলেজে, তখন রিটার বোন আর দাদাকে ওর কাছে রেখে অজয় এসেছে মহুয়াকে নিয়ে যেতে। এ সময় সঞ্জয়ের বাড়ি থেকে কারুর উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

অনেক কথা বলল অজয়, আর মহুয়ার মনে হল আরো কি যেন বলতে গিয়ে বলল না সে; আর অজয়ের সেই না-বলা কথাটা গিয়ে প্রত্যক্ষ করল মহুয়া। অজয় জানত, দেখেই গিয়েছিল, রিটার কাছে বসে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আর কোনদিনও রিটার জন্যে কাউকে অপেক্ষা করতে হবে না, এখন প্রয়োজন সঞ্জয়কে সান্ত্বনা দেওয়ার, তার পাশে পাশে থাকার।

স্তম্ভিত হয়ে গেল মহুয়া।

মৃত্যুকে এত মুখোমুখি আগে কখনও দেখে নি সে। রিটা, পরশুও যে রিটার সঙ্গে এই খাটে বসেই হাস্যপরিহাস করে গেছে, মহুয়াকে যে অমলেট ভেজে খাইয়েছে, যাবার সময় সিঁড়ি পর্যন্ত এসে বেশি পড়ে শরীর খারাপ করতে বারণ করেছে, হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানিয়েছে, সেই রিটা আজ মৃতা। ঐ যে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে আর কোনদিনও সে উঠবে না, চোখ খুলবে না, কথা বলবে না। রিটা মৃতা, রিটা মরে গেছে। মহুয়া বার বার বলে নিজেকেই যেন বোঝাতে চাইল, কিন্তু তবু তার মনে হোল ঠিক যেন বোঝা গেল না।

চারদিকে লোকজনের ভিড় বেশি চেঁচামেচি নেই, প্রায় নিঃশব্দেই কাঁদছে রিটার ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন; আর ঠিক রিটার জন্য নয়, এত লোকের কান্না দেখেই বোধ হয় কখন নিজের অজান্তে ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল পড়ে মহুয়ার বুকের কাপড় ভিজে উঠল।

রিটার মৃত্যুর পর সঞ্জয়কে জোর করেই মহুয়া আবার নিয়ে এল ওদের লাভলক প্লেসের বাড়িতে। সঞ্জয় কিছুতেই ওপরে তাদের দুই ভাইবোনের ঘরে ফিরে গেল না, নীচে লাইব্রেরি ঘরের এককোণে একটা ছোট ক্যাম্পখাট পড়ল, মাথার কাছে ছোট টেবিল; দিনে-রাতে সঞ্জয় ঘর থেকে প্রায় বেরই হয় না, মাঝে মাঝে ওপরে মার কাছে গিয়ে বসে, মা নিঃশব্দে ছেলের পিঠে হাত বোলান আর তাঁর চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে।

সঞ্জয় স্টুডিয়োতে যাওয়াও ছেড়েছে, মহুয়া কি তুলতুলির সঙ্গে পর্যন্ত সামান্য খুনসুটিও করে না, সপ্তাহে সেই তিনটে করে ছবি দেখাও আর নেই, নেই বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ করা। কথাই এত কম বলে আজকাল সঞ্জয়, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সঞ্জয় আজকাল কবিতা পড়ে, মহুয়ার মুখে শুধু গান নয়, কবিতা শুনতে চায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

রিটার মৃত্যুর পরে সঞ্জয়কে মহুয়া একদিনও কাঁদতে দেখে নি, রিটার নাম মুখে আনতে শোনে নি। সেদিন মহুয়া দাদার কাছে বসে পড়ছিল—

'মিথ্যা যদি সত্য রূপে
আসত কাছে চুপে চুপে,
কাহার কিবা ক্ষতি,'—

হঠাৎ সঞ্জয় হু-হু করে কেঁদে উঠল। ঠিক তাই-রে মৌ ঠিক তাই; এত চেষ্টা করি আমি, এত চাই স্বপ্নেও ও একবার আসুক, কেন আসে না? কেন আসে না? মহুয়ার কোলে মাথা রেখে সঞ্জয় ফুলে ফুলে কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। ভাল হল, মহুয়া মনে মনে বলল, একটু তবু কাঁদুক প্রকাশ করুক, সংহত শোকের সর্বহারা রূপ মহুয়া আর চোখ চেয়ে দেখতে পারে না।

দেখতে দেখতে বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল, যতটা ভাল হবে আশা করেছিল ততটা হল না, আর কি করেই বা হবে, টেস্টের পর এই ক'মাসের মধ্যে কম ঘটনা ঘটে গেছে মহুয়াদের সংসারে? শুধু কি রিটার মৃত্যু? মা'র অবস্থাও যে দিন-দিন খারাপ হচ্ছে সে ত' তুলতুলিও বুঝতে পারে।

ভাল লাগে না আজকাল মহুয়ার কিছুই ভাল লাগে না, দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই মহুয়া চুপচাপ কাটায় মা'র বিছানার পাশে বসে, আর তাদের সমস্ত সংসারটাই যেন এখন মার বিছানায় উঠে এসেছে। বাবা মার ঘরের সামনে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়েন নয়ত কোলের ওপরে হাত রেখে দূর-আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবেন। মা আজকাল খুব কম কথা বলতে পারেন, বেশির ভাগ সময়ই আচ্ছন্নের মত অবস্থা, বাবাকে মাকে দেখে দেখে মহুয়ার বুক যেন ফেটে যায়। মা ত' তবু তন্দ্রাচ্ছন্না, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির, আর বাবা? কি অদ্ভুত অসহায় লাগে বাবাকে দেখতে। বাবা যেন বুঝতে পারেন চলে যাচ্ছে তাঁর পঁচিশ বছরের সঙ্গিনী, চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নিভে আসছে তাঁর জীবন প্রদীপ।

বেচারা বাবা! চিরদিন মহুয়া দেখেছে অফিস থেকে এসে বাবা সুসজ্জিতা মাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন আর ইদানীং মা যখন বেরুতে পারতেন না, বাবা আর মা দক্ষিণের বারান্দায় বসে বেগাটেল খেলতেন। সব কাজে-দুঃখে-আনন্দে বাবার পাশে মা ছিলেন ছায়ার মত। সব কি বদলে গেল! মা এখন আর কাঁপা কাঁপা হাতে বাবার খাবার তৈরির নির্দেশও দিতে পারেন না; যা করে ভাদুদি, আয়া ত' দিনরাত মার ঘরের সামনে বসে বিড়বিড় করে কিষণজীর দো ভিখ্ মাঙ্গে!

আর মহুয়া? মার সেবা, তুলতুলি, বাবা আর দাদার দেখাশোনা, মহুয়ার আর সময় কোথায়? দাদা সব সময়ই গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে থাকে বলে, একটু একটু বড় বড় দেখায় ওকে কিন্তু স্বভাবত সেই মার খোকাই রয়ে গেছে; দাদার সার্টের বোতাম আছে কি না, ময়লা পোষাক ধোবার বাড়ি গেল কি না, বেরুবার সময় পকেটে যথেষ্ট পয়সা আছে কি না সব ত' মহুয়াকেই দেখতে হয়। মাঝে মাঝে মহুয়ার ভারি অবাক লাগে; পরীক্ষার পরই হঠাৎ যেন কেমন করে মহুয়া এই বাড়িতে রাধারাণীর পদ পেয়ে গেছে। দারোয়ান, মালী, বাবুর্চি থেকে ভাদুদি পর্যন্ত সবাই সকাল থেকে মহুয়ার হুকুমের অপেক্ষাতেই থাকে। আয়া শুধু পুরোন দিনের মত মাঝে মাঝে এসে মহুয়ার খবরদারী করে।

খোখী আবিতক নাহানে নেই গিয়া? সুবামে কুছ খায়া ভি নেই; হা ভগওয়ান!

কপালে হাত ঠুকে আফসোস করে আয়া।

আয়াও আর বেশিদিন বাঁচবে না, মহুয়া মনে মনেই বলে। কি বুড়ি হয়ে গেছে আয়াটা, চুলগুলো ধবধবে সাদা, মুখের চামড়া কুঁচকে ঝুলে যাচ্ছে, হাত-পাগুলো গাছের ছালের মত দেখতে লাগে যেন। বেচারা আয়া স্বামী-পুত্র হারিয়ে কবে যেন প্রথম যৌবনে রাধারাণীর সংসারে এসে ঢুকেছিল; সারা জীবনটাই কাটিয়ে দিল মহুয়া তুলতুলির খবরদারি করে।

মাঝে মাঝে আয়া রেগে গেলে ঘর চলা যাউঙ্গী বলে ভয় দেখায় কিন্তু মহুয়ারা সবাই জানে আয়া কোথাও কোনদিনও যাবে না।

ঘর যাউঙ্গী! ঘর আর ওর আছে।

মৌ, বাবা।



আয়াই এসে দাঁড়াল কাছে, মা'জী কা তবিয়ৎ অব ক্যায়সি হ্যায় ?

বার বারই এই অবুঝ প্রশ্নটা আয়া মহুয়াকেই এসে করে। আর কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে আয়া বুঝি ভরসা পায় না।

মা জী-কা তবিয়ৎ !

কি উত্তর দেবে মহুয়া ? নিজেই কি সে ভাল করে জানে—রাধারাণীর জীবনদীপ উজ্জ্বল হচ্ছে না নিভে আসছে ধীরে ধীরে !

গম্ভীর মূর্তি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। দশ মিনিটও থাকেন না রোগীর কাছে, নির্দেশ যা কিছু সব দেন ওদের ঘরোয়া ডাক্তার সেনকে। মহুয়া মা'র মাথার কাছে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে ঐ বিরাট মহিমমূর্তি চিকিৎসকের দিকে। বাবা বলেন, বিধান রায় সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ! ভগবান ! তাই যদি, তবে এতদিনেও উনি মা'র অসুখ সারাতে পারছেন না কেন ? অনেক দিন ত' হল।

মৌ ! মৌ !

দাদা খুব ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। মৌ'র অবাক লাগল দাদার মুখে এই ধরণের ডাক এতটা সজীব গতিবিধি মৌ কতদিন দেখে নি যে।

কি রে দাদা !

মৌ, রবীন্দ্রনাথের অপারেশনের ফল ভাল হয় নি, উনি···

দাদা !

মহুয়া সঞ্জয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল কাগজটা আর বড় বড় কালো হরফগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল।

জানা ছিল, এ ত' জানাই ছিল; কবি নিজেও ত' চান নি অপারেশন করাতে। কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি ছিল ? কত বড় বড় ডাক্তার সব, তাঁরা নিশ্চয়ই ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন অস্ত্রাঘাত। কিন্তু কেন তা হলে ফল ভাল হোল না।

কেন ? মহুয়ার কান্না পেল, এ কি হচ্ছে ! কি হতে আরম্ভ করেছে চারিদিকে !

সঞ্জয় একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলল, জানি না, কিছু বুঝতে পারছি না।

আর সত্যিই উনি বাঁচলেন না। মহুয়া মা'র পাশ থেকে ক্ষণে ক্ষণেই উঠে যাচ্ছিল বসবার ঘরে রেডিওর সামনে, বার-বার টেলিফোন করছিল। অনেক আগে থেকেই সবাই বুঝতে পেরেছিল মারা যাবেন রবীন্দ্রনাথ, তবুও বার বার মহুয়ার কেন জানি মনে হচ্ছিল কে জানে, হয়ত কোন মির‍্যাকল ঘটতে পারে। হয়ত কোন দৈব-শক্তির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে; এত জানা তবু মহুয়ার মনে হল এতবড় অপ্রত্যাশিত আঘাত; খবরটা শোনার পর মহুয়া অনেকক্ষণ উঠতে পারল না রেডিওর সামনে থেকে, কখন যেন নিজেরও অজান্তে চোখের জলে ভেসে গেছে মুখ, ভিজে উঠেছে বুকের কাপড়, বেহালার করুণ মূর্ছনা শোনা যাচ্ছে রেডিওতে, মহুয়ার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল, এ-কি কষ্ট ! এ-কি আশ্চর্য বিয়োগব্যথা ! বুকের মধ্যে এমন নিংড়ে নিংড়ে উঠছে কেন ? কেন মনে হচ্ছে খালি গেল সব, অন্ধকার হয়ে গেল মহুয়ার পৃথিবী ! বছরকয়েক আগেকার শোনা সেই গানের কলি যেন ফিরে ফিরে বাজতে লাগল মহুয়ার কানে—

'সুরিয়া অস্ত হো গ্যয়া, গগন মস্ত হো গ্যয়া।'

সারা গগন পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেছেন। বেশ কয়েক দিন, দশ, বারো, পনেরো দিন পর্যন্ত মহুয়ার বুকের কাছে সেই ব্যথাটা মুচড়ে মুচড়ে উঠেছে, মা'র পিঠে পাউডার লাগাতে লাগাতে হঠাৎ মনে হয়েছে, নেই, রবীন্দ্রনাথ আর বেঁচে নেই, খেতে বসে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন, আর ঝরঝরিয়ে মহুয়ার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরেছে, খাওয়া আর হয় নি।

এমন কষ্ট এত যন্ত্রণা মহুয়ার মনে হোল জীবনে আর ও কখনও পায় নি; এ-কি কালো কালো দিনে ছেয়ে গেল মহুয়ার আলো-ভরা জীবন।

মৌ !

দাদার গম্ভীর গলা শুনে মহুয়া পেছন ফিরে তাকাল। এই সময়টা, এই সন্ধ্যে হয় হয় এমন বিকেলে মহুয়ার দাদা কিছুতেই মহুয়াকে ঘরের মধ্যে থাকতে দেয় না, জোর করে পাঠিয়ে দেয় ছাদে।

যা তুই একটু খোলা হাওয়ায়; বাইরে ত' যাবি না, আর যাবিই বা কোথায় ? তোর ফেভারিট বালিগঞ্জের মাঠ ত' মিলিটারীতে ভরা, ওয়ারলেসের তারে আর ট্যাঙ্কে। যা একটু, ছাদে অন্তত গিয়ে দাঁড়া।

আর মহুয়া জানে বিকেলের এই আলো যতক্ষণ না মিলে যাবে সন্ধ্যের অন্ধকারে, ততক্ষণ ওকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না ছাদে; ওকে একলা থাকতে দেবে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে দেবে খোলা হাওয়ায়। আর সূর্যের পড়ন্ত আলোর শেষ রশ্মিটুকু বাগান থেকেও দেখা যায় না বলে মহুয়া উঠে আসে ছাদে।

মৌ !

আবার শোনা গেল সঞ্জয়ের গলা।

কি দাদা ?

নীচে আয়, মা যেন—

সঞ্জয়ের কথা শেষ হবার আগেই আর্ত চীৎকার বেরুল মহুয়ার গলা দিয়ে, কি হয়েছে ?

মা যেন কেমন করছেন; আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুই আয় শীগ্‌গির।

সঞ্জয় দ্রুতপায়ে নেমে গেল নীচে; মহুয়াও ছুটল। মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন, মহুয়া জানে এখন গরম জলের সেঁক দিতে হবে পায়ের তলায়, কৌটা কৌটা করে সেই ওষুধটা দিতে হবে জিভের ওপর, হাওয়া করতে হবে মাথায়, তবে আসতে আসতে আবার চোখ মেলে তাকাবেন রাধারাণী, মুখ অল্প একটু খুলবেন অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরুবে মুখ দিয়ে, আর তখন ফ্লাস্ক থেকে গরম হর্লিক্স এক-দু চামচ করে দিয়ে দিতে হবে মুখে।

সঞ্জয় জানে না কখনও দেখেনি, তাই ভয় পেয়েছে বড়।

ভয় নেই রে!

মহুয়া চামচে করে রাধারাণীর মুখে হর্লিক্স দিতে দিতে বলল—এ কিছু নয়, এরকম ত' হয়ই।

মহুয়ার জানা আছে তাই মহুয়া নিশ্চিন্ত; মহুয়ার মা খুব সুস্থ নন বহুদিন থেকে, কলকাতায় এসে অবধিই ত' ভুগছেন, মার এই রুগ্ন অবস্থাটাই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহুয়ার কাছে, মাঝে মাঝে মহুয়ার ভয় হয় বৈকি, কতবারই ত' মনে হয়, মা বোধ হয় আর বাঁচবেন না, তবুও কোথায় যেন মনের কোণে নিশ্চিন্ত আছে মহুয়া, মা বাঁচবেন অনেকদিন বেঁচে থাকবেন এই রকম ভুগে ভুগেই নিশ্চয় বেঁচেই থাকবেন মা।

কিন্তু রাধারাণী সত্যিই আর বাঁচলেন না। সেদিনের সেই অজ্ঞান অবস্থার পর তেমন করে জ্ঞান আর রাধারাণীর ফিরল না, কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে রইলেন তিন-চার দিন, ডাঃ বিধানচন্দ্র এলেন অতক্ষণ ধরে আর কোনদিনও মাকে দেখেন নি তিনি, সেই গম্ভীর মুখ, সেই অটল গাম্ভীর্য। যাবার সময় হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়ানো মহুয়ার মাথায় একটু হাত ছোঁয়ালেন, যেন নীরবে সান্ত্বনা দিলেন, মহুয়ার তাই মনে হল। আর তারপর নীচে নামতে নামতে ওদের বাড়ির ডাক্তার সেনকে কি যেন বলতে লাগলেন ধীরস্বরে।

তারপর তিন-চারদিন যে কোথা দিয়ে কাটল মহুয়া জানে না, শুধু স্বপ্নের মত মনে হয় বাড়িভর্তি অনেক লোকজন, আয়া মার খাটের নীচে মাথার কাছে বসে বিড়বিড় করে রামজীর দো মাঙছে, বাবা বুকের ওপর দু' হাত আড়াআড়ি রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মার পায়ের কাছে।

মা সামনেই বিছানায় শুয়ে, মা'র গা থেকে কখন কে যেন সব গয়না খুলে নিয়ে গেছে, শুধু নাকের ছোট হীরেটা জলজ্বল করছে, লাল-নীল আলো মাঝে মাঝে ঠিকরে এসে লাগছে মহুয়ার চোখে।

আর তারপর মাঝরাতে হঠাৎ ভানুদি, আয়া আর মাসীমারা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছোট পিসিমা কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বৌদি বৌদি করে চেঁচালেন, আর হঠাৎ মা ডান হাতটা একটু তুললেন, মহুয়ার মনে হল যেন বাবাকে ডাকলেন আর বাবাও যেন বুঝলেন সে ইঙ্গিত, মা'র পাশে খাটে এসে বসলেন, মা'র উদ্যত হাতটা তুলে নিলেন দুই হাতের মধ্যে—রাণী, রাণী আমার!

একঘর লোক, ডাক্তার, নার্স, ছেলেমেয়ে সবায়ের উপস্থিতি ভুলে গেছেন বাবা। মা ঘোলাটে চোখে কেমন এক ক্ষুধিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন বাবার মুখের দিকে। জড়ানো, অস্পষ্ট গলায় যেন ডাকলেন 'ওগো' বলে আর তারপর যে কি বললেন মহুয়া বুঝতে পারল না কিন্তু পিসীমারা বোধ হয় বুঝলেন, বাবার পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত ছোঁয়ালেন মার মাথায় আর মার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন দিলাম বৌদি, দাদার পায়ের ধুলো তোমার মাথায় দিলাম সতীলক্ষ্মী, ভাগ্যমানি তুমি, স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চললে।

মহুয়া স্পষ্ট দেখল মার মুখে তৃপ্তির হাসি, মা আরো জোর করে চেপে ধরলেন বাবার হাত, তারপর আর কারো দিকে চাইলেন না, কোন কথা বললেন না, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলে গেলেন।

ডাক্তার এলেন। অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন মহুয়াকে। তারপর মুখ তুলে পাশে দাঁড়ানো বাবাকে বললেন,—না শারীরিক কোনও গোলমাল ত' দেখছি না, তবে—

নীচু হয়ে মহুয়ার চোখের পাতাটা টেনে দেখলেন ডাক্তার।

হ্যাঁ অ্যানিমিয়া একটু রয়েছে, তবে তেমন কিছু নয়, একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আর আমি একটা টনিক লিখে দিচ্ছি।

ডাক্তার কাগজ টেনে খসখস করে লিখলেন টনিকের নাম, তারপর মহুয়ার দিকে ফিরে বললেন,—

মৌ একটু মনের জোর করতে হবে যে? তুমি যদি এমনিভাবে ভেঙে পড় তা হ'লে কি চলে? সংসার ভেসে যাবে যে!

সংসার! মৌ-র হাসি পেল। সংসারের আছে কি? মা মারা গেছেন, দাদা দু'মাস হল যুদ্ধে চলে গেছে চাকরী নিয়ে, মৌ-র শরীর খারাপ বলে তুলতুলিকে সুদ্ধ বুড়ি মাসীমা নিয়ে গেছেন নিজের কাছে দার্জিলিঙে, সংসারে আছে কে? থাকবে কাকে নিয়ে?

আর দেখুন,—

ডাক্তার আবার বাবার দিকে ফিরলেন।

মৌ-র একটু চেঞ্জ দরকার, একটু খোলা জায়গা সবুজ মাঠ এ-সব দেখলে ও অনেকটা সুস্থ হবে, মনের স্ফূর্তি চাই, আনন্দ চাই; আর স্থান পরিবর্তন এখন মৌ-র প্রয়োজন বিশেষ করে।

হুঁ!

বাবা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন সেই কবি তা হলে, আমারও আর ভাল লাগছে না কলকাতায়।

কলকাতায় ভাল লাগবার আর আছেই বা কি? স্টেথেসকোপটা ব্যাগে পুরতে পুরতে ডাক্তার সেন বললেন, সমস্ত শহর ত' খালি, দিনে-দুপুরে রাস্তায় বেরুতে গা ছমছম করে, জনমানবের চিহ্ন নেই; গিয়েছেন কোনদিন লেকের দিকে?

না, এর মধ্যে যাই নি আর, তবে আমাদের এখানেও ত' পাড়া একদম খালি, এই আমরা আছি আর ঐ কোণে সেই জনসনরা।

কিন্তু সিনেমা হলগুলোয় ভিড় দেখেছেন?

ও তো সব সৈনিকের দল।

সত্যি! কি হয়ে গেল—না? আচ্ছা, কি মনে হয় বলুন ত'? সুভাষ বোস নাকি আসছেন? আর জাপানীরা মশাই শুনেছি···।

মহুয়া বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল, ভাল লাগে না—দিনরাত এই যুদ্ধ আর যুদ্ধ শুনতে।

বাবা, ভানুদি, ডাক্তারবাবু সবাই মহুয়াকে বলেন, একটু হাসতে—আনন্দ করতে। ভানুদি ত' টেলিফোন করে ওদের ক্লাসের মায়া-ছায়াকে ডেকে পাঠিয়েছিল, এল তারা। ভানুদির হাতের মালপো আর মাংসের গরম গরম কচুরি খেয়ে, গ্রামোফোন বাজিয়ে গান শুনে, অনেক হৈ-হৈ করল, কিন্তু তবু মহুয়ার মুখে হাসি ফুটল না। তারপর ওরাও চলে গেল রাঁচি, প্রসূনদারা ত' কবেই কাশী গেছেন, যাবার সময় প্রসূনদার মা এসেছিলেন এ বাড়ি, অনেক করে হীরেন্দ্রনাথকে বোঝালেন, বললেন, বোমায় মরার সখ কেন এত আপনাদের?

বাবা শুধু হাসলেন, অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না, তারপর বললেন বোমা কোথায়!

বোমা সত্যিই এখনো পর্যন্ত পড়ে নি, কিন্তু কলকাতা শহর খালি। শুধু নানান দেশের নানারকম সৈন্যেরা দল বেঁধে মার্চ করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে-আসছে; আর নতুন হয়েছে এ-আর-পি। বোমা যদি পড়ে, তা হলে কি কর্তব্য—কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হবে সব নাকি বলে

দেবে, ব্যবস্থা করে দেবে এই এ-আর-পি'র ছেলেরা! মহুয়াদের বাড়ির নীচের তলার একটা ঘর চেয়েছে ওরা, এ-আর-পি'র অফিস হবে।

ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার হাতে-পোঁতা টবের ফুল-গাছের দিকে তাকিয়ে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল মহুয়ার।

বদলে গেল, সমস্ত জীবনটাই বদলে গেল; আর চেনা যাচ্ছে না তাকে এই বাড়িতে; রাধারাণীর নিজের সাজান বাড়িতেও ফাটল ধরেছে বাড়ির লোকগুলোও সবই এদিক-ওদিক চলে গেছে; দাদা নেই, তুলতুলি নেই, পুরোন লোকজনের মধ্যেও বেশির ভাগই বোমার ভয়ে দেশছাড়া। ভানুদি'ও রোজ যাব যাব করছেন। যায় নি আর প্রাণ থাকতে কোনদিন যাবেও না শুধু আয়া। রাধারাণী তাকে এই বাড়িতে এনেছিলেন; স্বজন বান্ধবহীন অনাথাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এ নাকি আয়া কোনদিনও ভুলতে পারবে না। রাধারাণী মেয়েদের ভার আয়ার ওপর দিয়েছিলেন; নিজের প্রাণের ভয়ে, বোমার ভয়ে, সেই দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হবে সে? সে কি ছোট জাত বলে এতই ছোট, যে রাধারাণীর নিমকের মর্যাদা দেবে না!

মৌ!

বাবা কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন; কি করছিস একা একা?

বাবার ক্লান্ত গলায় শুধু স্নেহ নয় কেমন উৎকণ্ঠা।

কিছু না বাবা, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

হ্যারে যাবি, বায়স্কোপ দেখতে?

মহুয়া অবাক হয়ে গেল, বাবা ডাকছেন সিনেমা দেখতে যেতে! যে বাবা সিনেমা দেখতে কোনদিনও ভালবাসেন না, চার্লি চ্যাপলিন আর গ্রেটা গার্বো ছাড়া কারুর নামও জানেন না, মাঝে মাঝে কচিৎ কখনও ছবি দেখেছেন মহুয়ার অনুরোধে।

না বাবা, ভাল লাগে না।

সত্যিই মহুয়ার আর ভাল লাগে না ছবি দেখতে, বেড়াতে যেতে, বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প করতে। কি তা হলে ভাল লাগে? নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো মহুয়া। না, তাও জানে না, এই রুটিন মেপে চলা, বাবার তদারক আর মার সংসার যাতে আগের মত চলে তার খবরদারী করা এইতেই কি শান্তি পায় মহুয়া? ভাল লাগে? তবে? কি যেন! বাবা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন চুপ করে, তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেলেন। বোঝেন না; তাঁর এই হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়া মেয়েকে তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। সেই মহুয়া, কিছুদিন আগেও যে সঞ্জয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাবার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো, গলা ধরে আব্দার জানাত, যার কলহাস্য আর গুনগুন গানে সারা বাড়ি ভরে থাকত—সেই হাস্যমুখী প্রাণচঞ্চলা মেয়ে তাঁর কোথায় গেল? হীরেন্দ্রনাথের বুক জুড়ে হাহাকার উঠল।

রাণী! তুমি কতদূর? কোথায়? আর যে পারি না, তোমার সংসার, তোমার ছেলেমেয়ে আমি যে এদের বুঝতেই পারি না, কি হোল তোমার মৌ'র? কেন ও দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছে? কি করলে ওর মুখে একটু হাসি একটু আলো দেখতে পাব?

মহুয়া বাবার জন্যে ঘোলের সরবৎ করছিল খাবারঘরে। আয়া এসে খবর দিলো অনেক 'খোখী-লোগ' মহুয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

খোখী-লোগ আবার কে আসবে এখন? সব ত' ইভ্যাকুয়েশনের হিড়িকে বাইরে চলে গেছে।

আরে যাচ!

আয়া হাত-পা নেড়ে বলল, ও ছায়া বাবা, হাসি বাবা সব আয়া হায়। বলতি হ্যায়···

দেখি কি বোলতি হায়।

আয়ার হাতে বাবার ঘোলের গ্লাসটা দিয়ে মহুয়া এসে বসবার ঘরে ঢুকল। বসার ঘরে আজকাল আর আসাই হয় না, মা মারা যাবার পর এই দেড় বছরে আজই প্রথম বোধ হয় ব্যবহার হচ্ছে এই ঘরটা। চাকর-বাকর ত' কেউই প্রায় নেই, বোমার ভয়ে পালিয়েছে দেশ ছেড়ে, আয়াই ঘর ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে করে রাখে। আজ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মহুয়ার বুকে যেন আবার নতুন করে ব্যথা লাগল, আবার নতুন করে মনে পড়ল—মা নেই—মা মারা গেছেন।

এই মৌ!

হাসি, ছায়া দুই বোন হৈ-হৈ করে উঠল মহুয়াকে দেখে; কাল রাত্রেই ফিরে এসেছি রে আমরা!

ওমা! বোমার ভয়ে পালিয়েছিলি না তোরা? ফিরে এলি যে? যুদ্ধ ত' শেষ হয় নি!

আমরাই শেষ হতে চলেছিলাম সব একসঙ্গে। কলকাতা ফাঁকা আর রাঁচীতে কি ভিড়। জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, জায়গার অভাব, কষ্ট। আরো অনেক কিছু বলে গেল হাসি গড়গড় করে। সব থেকে অসুবিধে বাড়ির পুরুষদের থাকতে হয় কলকাতায় কাজের জন্য, মেয়েরা ছোটদের নিয়ে অরক্ষিত অবস্থায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে, কাজেই একটা ডাকাতি হয়ে গেল।

ডাকাতের হাতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে বোমায় মরা ভাল,—এই নাকি হাসি-ছায়ার মার অভিমত।

আর বাবা কোথাও যাচ্ছি না আমরা, হাজার বোমা পড়লেও না।

হাসি আয়েস করে কোলের ওপর টেনে নিল ছোট্ট মখমলের কুশন, রাধারাণীর নিজের হাতের কাজ-করা যার গায়।

হাজার বোমা পড়লে একেবারে স্বর্গেই চলে যাব রে দিদি, আর কোথাও যেতে হবে না।

তা বটে! সবাই হেসে উঠল।

শোন মৌ!

হাসি ছায়া দু'বোনেই আবার প্রায় একসঙ্গেই কথা বলতে শুরু করল—আমাদের ফিরে আসার অনারে বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় একটা ঘরোয়া জলসা করছি। তুই আমাদের বাড়ি রাত্রে খাবি, ঠিক পাঁচটার মধ্যে যাওয়া চাই কিন্তু!

আমি, ছাখ আমার আজকাল কোথাও যাওয়া···

বাজে কথা রাখ। কোন কথা শুনব না, যেতে তোমায় হবেই, আর সেতার বাজাতে হবে, গান শোনাতে হবে।

ধ্যেৎ! পাগল নাকি! ও-সব কিছুই আমি পারব না, আর যাওয়া।

হ্যাঁ হ্যাঁ যাবি বৈ কি!

হীরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,—নিশ্চয় যাবি, যাবি না কেন?

বহুদিন পরে বসবার ঘরে কলগুঞ্জন শুনতে পেয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ, হাসির রোল উঠেছে তাঁর বাড়িতে কতদিন পরে।

আপনি একটু বলুন ত' মেসোমশাই, মহুয়া কিছুতেই যেতে চাইছে না।

না, না যাবে বৈ কি! নিশ্চয় যাবে মৌ!

হীরেন্দ্রনাথ বেশ জোর দিয়েই বললেন,—এই সুযোগ; মহুয়ার মন ভাল করবার এক চমৎকার সুযোগ এসে গেছে অপ্রত্যাশিতভাবে।

আমি কি পারি?

হীরেন্দ্রনাথ নিজের মনেই বললেন,—ওর সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবরাই পারে একমাত্র ওর মনের মেঘ কাটাতে।

হাসিরা অনেক লোককে বলবে বাবা, ওখানে ভিড় হবে, আমার ভাল লাগে না ভিড়ে যেতে।

তাতে কি হয়েছে, লোকজন ত' মানুষের সমাজে থাকবেই, সে তো আনন্দের কথা···

না মেসোমশাই!

হাসি আবার বাধা দিয়ে উঠল, নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, কোনও বাইরের লোকই থাকবে না; মৌকে জানি না আমি যা কুনো; না মৌ কোন কথা শুনব না, আসতেই হবে, না গেলে আমরা টানতে টানতে নিয়ে যাব দু' বোনে।

না বাবা, টানাটানি করতে হবে না, যাব, যাব।

সেতারে জয়জয়ন্তী বাজছিল।

মাটিতে হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে শুনছিল মহুয়া, আর সেতারের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মহুয়ার মনের ওপর ভারী হয়ে বসে থাকা অনেক মেঘ যেন উড়ে যাচ্ছিল।

আঃ, কি অপূর্ব; কি আশ্চর্য সুন্দর হাত ছায়ার এই পিস্‌তুত দিদির। মহুয়া নিজেও সেতার বাজায়, ওস্তাদ করিম খাঁর কাছে আবাল্য তার শিক্ষা, কিন্তু না, এইখানে পৌঁছুতে তার দেরি আছে এখনও নিজেরই অজ্ঞাতে যখন মৃদু মৃদু মাথা নড়ছিল মহুয়ার, সুরের তালে তালে হঠাৎ কোণের দিকে চোখ পড়ায় যেন চমক লাগল মহুয়ার, থেমে গেল। এক মুহূর্তের জন্য জয়জয়ন্তীর উচ্ছ্বাস যেন কানে গেল না মহুয়ার। কে, কে এসে বসলেন ঐ দিকে কার্পেটের ওপর। মহুয়া আর একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। আর হঠাৎই ওর চোখের সামনে কানের কাছে গুঞ্জরণ করে উঠল যেন অনেক পড়া অনেক গাওয়া একটা পংক্তি—

'আহা! মহেন্দ্র নিন্দিত কান্তি, উন্নত দরশন'

আর মহুয়ার মনে প্রশ্ন উঠল, কে, কে ইনি।

সাধারণের চেয়ে অনেকটা লম্বা মাথায়, একটু বড় মুখ, আর চোখ দু'টি যেন প্রশান্তের সাগর, আর সবচেয়ে অপরূপ তার সজ্জা, ধবধবে সাদা খদ্দরের ধুতি পায়ের কাছে লুটোচ্ছে, চুড়িদার খদ্দরের পাঞ্জাবী, আর খদ্দরেরই উত্তরীয় হাওয়ায় উড়ছে; মহুয়ার চোখ যেন অপূর্ব এক দৃশ্য দেখল, কানে তখনও বাজছে জয়জয়ন্তীর কলতান।

মহুয়া আবার মুখ তুলল, আর হঠাৎ ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মহুয়া মুখ নামিয়ে নিল, আর মনে হোল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে মাথার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন আগুনের কণা ছিটিয়ে গেল, কানের কাছেও কি গরম যেন, আর গলার কাছে কি এক নাম না-জানা ব্যথা।

মহুয়া নীচু হয়ে শতরঞ্চির দড়ি ছেঁড়ায় মন দিল।

মৌ! এইবার তোর পালা!

হাসি মহুয়ার হাত ধরে টানল।

পাগল নাকি? এই বাজানোর পর আমি?

আচ্ছা না বাজালি, গাইতে ত' পারিস, ফেমাস রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইয়ে মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় এখন···

না, না লক্ষ্মীটি ছাখ, আজ আমি পারবো না, কিছুতেই না!

বাঃ, না বললে শুনব কেন?

শুনতেই হবে; আজ সত্যি পারবো না, অন্য একদিন, অন্য কোনদিন!

মহুয়া অনুরোধ নয় অনুনয় করতে লাগল ছায়াকে।

সত্যিই ও আজ পারবে না, কি করে পারবে? অনেকদিন গায় নি, গলা ভাল নয় এ ত' সামান্য অজুহাত; এইমাত্র মহুয়ার কেমন একটা লাগছে যে বুকের মধ্যে,

অদ্ভুত একটা লজ্জা—না পারবে না, কিছুতেই পারবে না মহুয়া ঐ ভদ্রলোকের সামনে গান গাইতে, যদি খারাপ হয়, যদি যথেষ্ট ভাল না হয় আজ মহুয়ার গলার গান।

বাই হয়েছিস তুই!

ছায়া হার মানল শেষ পর্যন্ত।

দেখি, যদি অভিজিৎদার বাঁশিটা হয় শেষ পর্যন্ত।

অভিজিৎদার বাঁশি? কে অভিজিৎ, কার বাঁশি?

আর আশ্চর্য! সেই খদ্দরপরা ভদ্রলোককেই ছায়া নিয়ে এল মহুয়ার সামনে, এই যে অভিজিৎদা, সাংঘাতিক দেশপ্রেমিক, পোষাকেই পরিচয় পাচ্ছ, খদ্দর ছাড়া কিছু পরেন না, আর অনেক গুণের মধ্যে একটি যে, অপরূপ বাঁশি বাজান।

মহুয়া হাত তুলে নমস্কার করল।

বাঃ, পরিচয় খালি এক পক্ষে হয় বুঝি! ওঁর গুণের লিস্ট আমার চেয়ে অনেক বড়, নিশ্চয়ই সেটা···না, না আমার কোন উল্লেখযোগ্য গুণই নেই।

ওরে বাবা, কি যে বলে! মহুয়া বন্দোপাধ্যায়ের গান শোন নি রেডিয়োতে অভিজিৎদা!

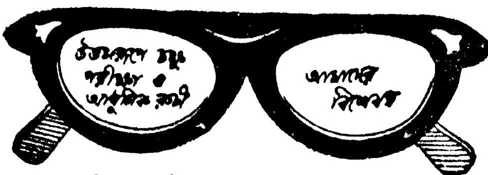
আপনি!

অভিজিৎ রায়ের প্রশান্ত চোখ আগ্রহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বাঃ, ওঁর গান শুনবো না? ওঁর গান থাকলেই ত' আমি রেডিয়ো খুলে বসি; কিন্তু অনেকদিন গাইছেন না, কেন বলুন ত'?

মহুয়ার মা মারা গেলেন, তারপর থেকে ওর শরীরও বেশ ভাল নেই।

ওঃ! আমি দুঃখিত একান্তই দুঃখিত আপনাকে এসব মনে পড়িয়ে দিলাম।

না, না তাতে কি?



মনে পড়ানো? মা নেই একথা কি মহুয়াকে কখনও মনে পড়াতে হয়? কিন্তু আজ এই মুহূর্তে কেন মহুয়ার মনে কোন দুঃখ, কোন বেদনাবোধই আর নেই? যে ব্যথার ভারে সবসময় আড়ষ্ট থাকে মহুয়ার মন, কোথায় গেল সেই দুর্বহ যন্ত্রণা? হঠাৎ যেন মনে হচ্ছে অন্ধকার ঘরে কোথা থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে, আর একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। এই জয়জয়ন্তী, এই লোকের ভিড়, এই ছুটোছুটি, হাসাহাসি হঠাৎ যেন ভুলিয়ে দিয়েছে মহুয়াকে গত দেড় বছরের ক্লান্তি আর অবসাদ, বুকচাপা-ব্যথা-মলিন দিন।

মৌ! অভিজিৎদার বাঁশি যদি একবার শুনিস!

উনি যদি দয়া করে শোনান!

না, না শোনাবার মত কিছু নয়।

ভদ্রলোক বিনয় করলেন আর কিছুতেই রাজি হলেন না তখুনি বাঁশি বাজাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজিৎ রায়ের বাঁশি বাজল; বাজল অনেক পরে। খাওয়া শেষ, মহুয়া উঠেছে বাড়ি যাবে বলে, ছায়া মহুয়ার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে।

এখুনি উঠছিস কি? বোস।

না রে, অনেক রাত হয়ে গেল ন'টা বাজে।

কচি খুকী ন'টা বাজতে না বাজতেই ঘুমুতে হবে?

না, ছাখ বাবা ভাববেন।

কিছু ভাববেন না, আমি এখুনি ফোনে বলে দিচ্ছি, বরং খুশিই হবেন মেসোমশায়···। না না, কিছুতেই এখন তোর যাওয়া চলবে না।

অগত্যা মহুয়া থেকে গেল আরো দু'ঘণ্টা আর সেই দু'ঘণ্টা ছাদে সতরঞ্চি পেতে বসলো তারা আর অভিজিৎ রায় বাঁশিতে বাজালেন বসন্তবাহার। ছায়ার দাদা অমলেন্দু কখন যেন তবলা এনে আস্তে আস্তে ঠেকা দিচ্ছে, চাঁদের আলোয় ছাদ ঝলমল, আর কোথা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে হাস্নুহানার মন্থর সৌরভ।

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরেও কিছুতেই ঘুম এল না মহুয়ার। ঘরের দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে, পূবের বারান্দা দিয়ে চাঁদের আলো আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সোনালী আলোর আভায় সামনের বাড়িগুলো, বাগানের গাছ সব মায়াময়, স্বপ্নরাজ্য!

আর মহুয়া—ও কি স্বপ্ন দেখছে? আশ্চর্য? কেন এত ভাল লাগে? কেন এই অকারণ পুলক। আকাশের ভেসে-চলা সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলই মনে হতে লাগল মহুয়ার, কি সুন্দর এই পৃথিবী, কি ভালো বাঁশির সুর, আর কত ভালো লোকই আছে পৃথিবীতে। [ক্রমশ।

ডাক বাংলো

আশু চট্টোপাধ্যায়

স্থানটি যে রমণীয় সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বন্ধুর পরামর্শে অবসরযাপন ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে সোন-ইস্ট-ব্যাঙ্কের এই নির্জন ডাক-বাঙলোতে এসে ভাল কাজ করেছি বলেই মনে হল। নির্জনতা ব'লে নির্জনতা! এমন জনশূন্য অথচ চিত্তাকর্ষক স্থান ইতিপূর্বে আর দেখেছি ব'লে মনে হয় না। সামনে সোন নদী, বিস্তীর্ণ বালুশয্যায় একটি ক্ষীণ জলধারা। অনতিদূরে ভারতের দীর্ঘতম সোন-ব্রিজটি দেখা যায়। নদীর ওপারে কতকগুলি পাহাড়, যার পিছনে সাসারামের সের সা'র সমাধি-সৌধ। নদীর ওপাড়ে ব্রিজটি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ডিহিরি শহর, বহু লোকের বাসস্থান।

কিন্তু এই স্থানটির নিকটে কোনো লোকালয় নেই। বাঙলোটির পিছনে প্রকাণ্ড শালবন। বাঙলোয় অনেকগুলি ঘর। ঘরগুলি বেশ বড়। শোবার ঘরগুলিতে যে-সব গদি ও তোষক পাতা আছে, সেগুলি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। খাবার ঘরে বিরাট গোল টেবিলের চারপাশে কুড়িটি চেয়ার সাজানো। দ্বারোয়ান জানাল যে, একসঙ্গে ত' দূরের কথা, বছরে কুড়িটি লোকও সেখানে দু'এক রাত্রির জন্য বাস করতে এসেছেন ব'লে তার মনে পড়ে না।

যথাকর্তব্য সম্পর্কে বন্ধুবাক্য স্মরণ ক'রে বৃদ্ধ দ্বারোয়ানের হাতে কয়েকটা টাকা ফেলে দিয়ে বললাম, 'দারোয়ানজী, যে ক'দিন এখানে আছি, খানা বানাবার ভারটা তোমাকে নিতে হবে। যাবার সময় খুশি করে দিয়ে যাব।' লোকটি বিহারী, সন্তুষ্ট চিত্তে সহাস্যে অভয় দিয়ে জানাল যে, খাওয়া-দাওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে আমার চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই।

সন্ধ্যায় সোন নদীর ধার দিয়ে কিছুদূর পদচারণ ক'রে এলাম। ফিরে এসে ক্লান্ত শরীর আরাম-চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বিশ্রামটা উপভোগ্য হয়ে উঠল। ট্রাম-বাসের শব্দ নেই, দূর থেকে একটা বাঁধের জল পড়ার ঝর-ঝর শব্দ কানে আসে। আর শোনা যায় শাল গাছে হাওয়ার শব্দ। সামনের রাস্তায় একটিও পথচারীর ব্যস্ত পদক্ষেপ নেই। শরীরের সমস্ত স্নায়ু আরামে ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

দ্বারোয়ান সন্ধ্যা-রাত্রিতেই আহার্য প্রস্তুত করে আনল। আহারাদি সম্পন্ন হ'লে সে অনতিদূরে তার বাসস্থানের দিকে চ'লে গেল। সেটি বাঙলোটির আউট-হাউস বিশেষ। উচ্চৈঃস্বরে ডাকলে তার সাড়া পাওয়া যাবে। দুইটি লণ্ঠন সঙ্গে এনেছিলাম। একটি নিভিয়ে দিয়ে অপরটিকে শোবার ঘরে একটি ছোট টেবলের উপর রেখে বিছানায় শুয়ে একটি বই খুললাম। যদিও রাত তখন দশটা মাত্র, তবু মনে হচ্ছিল যেন অনেক রাত হয়েছে।

কিন্তু সেই নির্জন অচেনা স্থানে বেশিক্ষণ বই পড়তে পারলাম না। উঠে দরজা দু'টো ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে আলোটা কমিয়ে দিলাম এবং শুয়ে পড়লাম। জানালা দিয়ে অজস্র তারা দেখা যেতে লাগল। কানে আসতে লাগল ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর জলের শব্দ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা জানতে পারি নি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম লণ্ঠনটা নিভে গেছে। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট তারার আলো। সেই আলোতেই মনে হল, অনতিদূরে চেয়ারে একটি নারীমূর্তি বসে রয়েছে।

প্রেতযোনির অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি। যদিও তাদের আমি খুঁজে বেড়াই। তবুও নিদ্রাভঙ্গের পর রুদ্ধদ্বার ঘরে এরূপ দৃশ্যে চকিত হয়ে উঠে বসলাম।

মূর্তিটি কথা বলল, 'ভয় পাবেন না। আমি পাশের ঘরেই থাকি। রাত্রে ঘুম আসছিল না। তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

আলাপ করবার শ্রেষ্ঠ সময় বটে। চেয়ে দেখলাম পাশের ঘরের দরজাটি বন্ধ হয়েছে। হয়ত তিনিই ভেজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অর্ধরাত্রে মহিলাটির নিদ্রিত অপরিচিত ভদ্রলোকের অন্ধকার ঘরে আসবার দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হলাম। আলাপ করবার ইচ্ছা থাকলে তিনি সন্ধ্যাবেলাতেই তা করতে পারতেন। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, দ্বারোয়ানও এঁর কথা আমাকে বলে নি। নির্জন বাঙলো দেখে, আর কেউ এখানে আছেন কি না আমিও তাকে জিজ্ঞাসা করি নি।

বললাম, 'দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি। এই বলে দাঁড়াতে গেলাম। মহিলা বললেন, 'কেন কষ্ট করবেন, বসুন। আলোর দরকার কি! এখানে ত' অন্য লোক কেউ নেই যে সামাজিক দিক দিয়ে কোনটা শোভন আর কোনটা অশোভন তার প্রশ্ন উঠবে। আমি বেশিক্ষণ থাকব না।'

'যতক্ষণই থাকুন, নিজেদের দিক থেকেও ত' একটা অশোভনতার প্রশ্ন আছে।'

'আমার কাছে নেই', তিনি বললেন, 'তা থাকলে এই নির্জন ডাক-বাঙলোয় একলা মাসের পর মাস বাস করতাম না। আমার কাছে এই সব সামাজিক নিয়মকানুনের আর কোন দাম নেই। আর আপনি ত' পুরুষমানুষ। আপনার ভয় কিসের!'

এরূপ অদ্ভুত অবস্থা জীবনে সচরাচর আসে না। অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম।

একটু কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'একলা কেন যে নির্জন বাঙলোয় থাকেন, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। অবশ্য বৃদ্ধ দ্বারোয়ানটি লোক ভাল তবু—'

'ওই বুড়ো কি আমায় রক্ষা করতে পেরেছে? না, কাউকে কোনদিন রক্ষা করতে পারবে! ও নিজেই দলে আছে কি না কে জানে!' মহিলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন।

শুনে আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল।

'কাদের কাছ থেকে রক্ষা করবে? কাদের দলে আছে?' বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম।

'যারা ওর সামনে আমার স্বামীকে খুন করে যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল।'

'কবে?'

'কতদিন হয়ে গেল?' মহিলাটি বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে উত্তর দিলেন।

'কিন্তু তারপরেও আপনি এখানে আছেন কেন? পুলিশ জানে? কই কাগজে ত' দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জানলে আমিই বা এখানে আসব কেন। লোকগুলো কি ধরা পড়েনি?'

বুঝলাম যে বিচলিত হয়েছি, তাই এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করে গেলাম। নির্জন ডাক-বাঙলোয় একা রয়েছি, এইরূপ সংবাদে বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

'অত ব্যস্ত হবেন না,' মহিলাটি বললেন, 'সব কথাই সংক্ষেপে বলছি। বলব বলেই ত' এলাম। একজন কাউকে না বললে ত' মনে শান্তি পাব না। তারা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে কিছুদিন আটক করে রাখল। উপায়ান্তর না দেখে যখন আমি অবস্থাটা কিছু মেনে নিতে বাধ্য হলাম, তখন তারা আমাকে দিয়ে একটা ঘোর অন্যায় কাজ আরম্ভ করাল।'

'কি অন্যায় কাজ?'

'আমি এখানে ওই পাশের ঘরে থাকতাম। আমার সব খরচ তারা দিত। যাত্রীরা এলে আমার কাজ ছিল খবর নেওয়া তাদের অবস্থা কি রকম, সঙ্গে টাকাকড়ি গহনা প্রভৃতি কেমন আছে। ভাল শিকার হলে খবর দিতে হত। রাত্রের অন্ধকারে তাদের লোক এসে খবর নিয়ে যেত। তারপর বেশি রাত্রে তারা এসে লুটপাট করত। খুন অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হত না।'

মনে হল আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় আমাকেও ভাল একটি শিকার মনে করে মেয়েটি অর্ধেক রাত্রে আলাপ করতে এসেছে। ইতিমধ্যেই খবর চলে গেছে কি না কে জানে। ভাবলাম উঠে সুটকেস খুলে হাত ঘড়িটায় দেখব, সময় কত হয়েছে। কিন্তু সর্বাবয়ব যেন নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সকাল হলেই যে স্থানত্যাগ করব, এ-সঙ্কল্প করেই ফেলেছিলাম। কিন্তু, বাকি রাতটা নির্বিঘ্নে কাটবে কি না কে জানে।

মহিলাটি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। হয়ত পুরনো কথা স্মরণ করছিলেন। অন্ধকারে তাঁকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না, শুধু তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করা যাচ্ছিল। চেহারা সুশ্রী কি না বুঝতে পারছিলাম না। খুব সম্ভব শরীরে রূপের অভাব ছিল না, বিশেষ করে যখন ডাকাতদলের শিকার ধরে দেওয়াই তাঁর কাজ ছিল। যাত্রীদের সঙ্গে মিশে তবে ত' তাঁকে তাদের হাঁড়ির খবর বের করতে হত। সুতরাং নারী জাতির পুরুষ-জয়ের অস্ত্রগুলিও নিশ্চয় তাঁর করায়ত্ত।

বিকালে ঘুরে দেখেছি, আধ-মাইলের মধ্যে একটি বাড়িও নেই। চিৎকার করলেও কোনো ব্যক্তির কানে তা যাবে না। সুতরাং রাহাজানির জন্য স্থানটি নিঃসন্দেহে আদর্শ। সহায়-সম্বলের মধ্যে ওই বৃদ্ধ দ্বারোয়ান, কিন্তু তার সামর্থ্যও সামান্য এবং তার সঙ্গে দুষ্ট লোকগুলির একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত এইমাত্র মহিলাটি দিলেন। যে স্থানটি আমার নিকট এতক্ষণ রোমাণ্টিক লাগছিল, এখন সেটি বিভীষিকাপূর্ণ ব'লে মনে হ'তে লাগল।

এতক্ষণ মহিলাটি নিঃশব্দে ব'সে ছিলেন, এইবার আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'ঘটনা যে খুব বেশি ঘটত তা নয়, ধরুন, বছরে দু'টো কি তিনটে। একে ত' নির্জন জায়গা ব'লে কেউ বড় একটা এ বাঙলোটায় আসতেন না। তা সত্ত্বেও যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই বিশেষ অর্থসঙ্গতি থাকত না। দু'-একটা ঘটনার পর পুলিশ অনুসন্ধান করতে এসেছিল, কিন্তু তার পূর্বেই তারা আমাকে কিছুদিনের জন্য দূরে রেখে এসেছিল। তারপর হাঙ্গামা চাপা প'ড়ে গেলে তারা আমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসত। ক্রমে স্থানটির এমন দুর্নাম হয়ে গেল যে, পারতপক্ষে কেউ এ-দিকে আসতে চাইত না। তারপর ঘটল সেই ঘটনাটি, যাতে আমার জীবন অন্য খাদে প্রবাহিত হল।'

ঘটনাটি জানবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। মনে হ'ল জানলা দিয়ে যে হাওয়া আসছিল, তাতে ভোরের প্রফুল্লতা। হয়ত দিবালোক ফুটতে আর বেশি বিলম্ব ছিল না, কিন্তু রাত্রির শেষ প্রহরটিও ভালভাবে কাটবে কি না তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

মহিলাটি বলতে লাগলেন, 'একদিন এখানে এক ভদ্রলোক এলেন। বয়েস খুব বেশি নয়, বোধ করি ছাব্বিশের বেশি হবে না। অর্থাৎ আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় হবেন। অমন সুপুরুষ আমি অল্পই দেখেছি জীবনে।

শুধু তাই নয়, তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তা এত চমৎকার যে, মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অর্থসঙ্গতি ভাল বলেই মনে হ'ল। ভাবভঙ্গি বিমনা, কবির মতো। আলাপে জানলাম তিনি বিবাহিত নন। জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় সখ এইভাবে ভারতের পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো। বেশির ভাগ সময় যেন অন্যমনস্ক থাকতেন, যেন কি এক ভাবে মগ্ন হয়ে আছেন।

'তাঁর মুখের সহজ সারল্য দেখে তাঁকে দলটির শিকার হ'তে দিতে কিছুতেই ইচ্ছা করল না। তাদের লোক জানতে এলে মিথ্যা ক'রে বললাম, চাকরি করেন, কাজে এসেছেন। সরকারী গাড়ি। সঙ্গে বিশেষ কিছু নেই। আমি তাদের অনেক সত্য খবর দিয়েছিলাম, সুতরাং এ-সংবাদ অবিশ্বাস করার কোন কারণই ছিল না। তারা তখন আর লোকটিকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। আমি যে একলা কেন এখানে থাকি এ নিয়ে তিনিও মাথা ঘামান নি। তিনি সর্বদা একটা ভাবজগতে বাস করতেন। আমাকে লক্ষ্য করতেন বলেই মনে হ'ত না। আমি কিন্তু তাঁকে লক্ষ্য না ক'রে পারতাম না। যারা উদাসীন, তাদের দিকেই বোধ হয় মেয়েরা বেশি আকৃষ্ট হয়। বুঝে দেখুন, আমার জীবনে তখন কিছুই ছিল না. বাঁচবার মতো কোন অবলম্বনই ছিল না। একটা সমাজ-বিরোধী দলের দুষ্কর্মের অস্ত্র হয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। ওরা আমার কাছে না থাকলেও আমি জানতাম দ্বারোয়ানকে দিয়ে আমার উপর নজর রেখেছিল। পালাবার কোন চেষ্টা করলেই তৎক্ষণাৎ খবর চলে যেত এবং তারা পথেই আমাকে ধ'রে ফেলত। তাই বৃথা সে চেষ্টা আমি করি নি।

এই লোকটির সম্পর্কে এসে আমার জীবনে এল বাঁচবার নতুন স্বাদ। আমার সমালোচনা করতে হয় করুন, কিন্তু মানুষের চরিত্রে যা স্বাভাবিক তাকে ত' বদলাতে পারবেন না। শুনেছিলাম তিনি বেশ কয়েকদিন থাকবেন। যাতে তাড়াতাড়ি না চলে যান, তাই তাঁর প্রবাস-জীবনে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারা যায়, আমি তার চেষ্টা করতে লাগলাম। দ্বারোয়ান যখন তাদের কাছ থেকে জানল যে বড়লোক নন, তখন সরকারী চাকুরে ব'লে যতটুকু কর্তব্য তাই করতে লাগল তার বেশি কিছু করল না। তার ত্রুটিগুলো আমি সামলে নেবার চেষ্টা করতাম। আমার জীবনে আবার যেন সংসার করার ভাব এসে পড়ল। আমার জীবন আর শূন্য রইল না।

প্রথমটা তিনি লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু পরে যখন পদে পদে আমার সেবা-যত্নের আভাস পেতে লাগলেন, তখন দেখতাম মাঝে মাঝে যেন বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

একদিন বললেন, 'একটা কথা বলতে চাই।'

বললাম, 'বলুন।'

তিনি সহজভাবে বললেন, 'শরৎচন্দ্র লিখে গেছেন, বাংলা দেশের পথে-ঘাটে মা-বোন ছড়ানো আছে। তাঁর কথা সত্য।'

আমি কোন উত্তর না দিয়ে হেসেছিলাম। বোন ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের কথা তাঁর মনে আসা সম্ভব ছিল না, তা জানতাম। তাই তাতে ক্ষুব্ধ হই নি। আমার সেবা-যত্ন যে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, এতেই আমি কৃতার্থবোধ করেছিলাম। আমার বাইরের জীবনে আর পাবার মতো কিছুই ছিল না, মনটা যে ভ'রে উঠেছিল, এইটাই আমার পক্ষে ছিল যথেষ্ট।

শুয়ে শুয়ে ভাবলাম অচেনা-অজানা জায়গায় মধ্যরাত্রে কিংবা শেষরাত্রে অন্ধকার ঘরে এ এক রোমান্সের গল্প জমেছে ভাল। মেয়েটির মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোনো লক্ষণ দেখতে পেলাম না। তা হলে তাঁর গল্পের মধ্যে কিছুটা সত্য নিশ্চয়ই ছিল। অন্তত দ্বারোয়ান সম্পর্কে তাঁর মত যে সত্য তা বুঝতেই পারছিলাম। না হ'লে এই মহিলার অস্তিত্বের কথা আমার কাছে চেপে যাবে কেন এবং এত ঘর থাকতে মহিলাটির পাশের ঘরটিতেই বা আমাকে থাকতে বলবে কেন! এই দু'টি ঘর একটি সুইটের মতো, তাই মাঝখানে দরজা আছে। আর এই সব নির্জন ডাক-বাঙলোগুলোতে যে মাঝেমাঝে অঘটন ঘটে তাও পরে জেনেছি। অবশ্য যখন অফিসাররা কাজের জন্য এসে একদিন বা দু'দিন থাকেন, তখনকার ব্যাপার আলাদা, ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁসে না। যেসব সাধারণ যাত্রী একা কিংবা সাহসীরা স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে এসব স্থানে আশ্রয় নেন, তাঁদেরই বিপদ। ভদ্রমহিলা যখন সেই বিপদের আভাস দিয়ে উপকার করলেন, তখন সকালে চা খেয়েই স'রে পড়তে হবে। মহিলাটি যে বিপদের কথা অকপটে ব'লে সাবধান ক'রে দিলেন সেজন্য তাঁর কাহিনীটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত শোনা কর্তব্য বোধ করলাম। বিশেষত ভয়টা তখন আমার ক'মে গেছে। আশে পাশে যখন বৃদ্ধ দ্বারোয়ান ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, তখন অন্ধকারের সঙ্কোচটাও কেটে যাচ্ছিল, বরং নূতন অভিজ্ঞতায় বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম।

একটা মোরগ ডেকে উঠল। হয়ত দ্বারোয়ানের মোরগ। কিন্তু মোরগেরা প্রহরে প্রহরে ডাকে। ওরা ডাকলেই যে বুঝতে হবে সকাল হয়ে এসেছে, তার কোনো মানে নেই। এক একবার মনে হচ্ছিল, মহিলাটির বোধ হয় কোনো অস্তিত্ব নেই, তাঁর কথা কানে শুনতে পাচ্ছি না। হয়ত সমস্তটাই একটা স্বপ্ন। হয়ত দ্বারোয়ানের প্রস্তুত গুরুপাক আহার্য তেমন পরিপাক হয় নি, তাই একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। হয়ত সেটা স্থান-কালের মায়া। কিংবা ঘুমাবার আগে যে গল্পের বইটা পড়ছিলাম, সেইটাই অন্য রূপ নিয়ে স্বপ্ন

দেখাচ্ছে। ওঠবার ইচ্ছাও আর হচ্ছিল না। শুয়ে শুয়ে এই অদ্ভুত গল্পটা শুনতে ভাল লাগছিল।

মহিলাটি বলছিলেন, 'তিন চার দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে গেল। তখন দেখলাম, বেশ মিশুক লোক। একটু লাজুক। হয়ত মেয়েদের কাছেই। আমরা এই ধরণের লোকের কাছে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি বলেই সহজে ঘনিষ্ঠতা করতে পারি। যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কিছুদিন বাস করছিলাম, তাঁর সম্পর্কে এসে অন্তত কয়েকটা দিন তা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, তাঁর সাহায্যে যদি উদ্ধার পাই, তা হলে লোকগুলির হাত থেকে বেঁচে যাই। ওরা হয়ত কলকাতা পর্যন্ত আমার পিছু ধাওয়া করবে। কিন্তু সেখানে তবু আত্মরক্ষার সুযোগ থাকবে। এখানে ত' একটা চিঠি পর্যন্ত ফেলতে যেতে পারি না। ইতিমধ্যে কোন অফিসারও এখানে আসেন নি।

'প্রায়ই আমরা নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। প্রায়ই তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে খেতে বলতেন। আমি তাঁকে বলতে পারতাম না যে, আমি বিধবা, মাছ-মাংস খাই না। শেষে একদিন জানালাম যে আমি নিরামিষ খাই। তখন তিনি নিজেও মাছ-মাংস বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে একত্র আহার করতে লাগলেন। তিনিও এই ঘরে থাকতেন, যে-খাটে আপনি শুয়ে আছেন, এই খাটে শুতেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা গল্প করতাম। তারপর তিনি একসঙ্গে বিকালে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করলেন। লোকগুলি তাতে রাজী হবে না ভেবে আমি নানা অছিলায় সে প্রস্তাব এড়িয়ে যেতে লাগলাম। শেষে একদিন বেরুতে হল। নদীর ধার দিয়ে বেশি দূর যাই নি, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, অনেক পিছনে একজন আমাদের অনুসরণ করছে।

'সেই দিনই বুঝেছিলাম, আমার জীবনের অন্ধকার ছায়া কাটবার নয়, আমার উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। তখনি ঠিক করলাম, লোকটিকে অন্তত বাঁচিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যেই অলক্ষ্যের লোকগুলির আশে-পাশে উপস্থিতি অনুভব করছিলাম। দ্বারোয়ান হয়ত রিপোর্ট দিয়েছিল যে ভদ্রলোক ঘন-ঘন দশ টাকার নোট বের করছিলেন। তা ছাড়া কোন অফিসার কখনো এতদিন একটা ডাক-বাঙলোয় থাকেন না। আশঙ্কা করলাম যে শীঘ্রই একদিন আক্রমণ হবে।

'অথচ তাঁকে সব কথা খুলেও বলতে পারি না। শুনলে তিনি আমাকে ফেলে যেতে চাইবেন না এবং আমাকে

নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে তাঁর প্রাণরক্ষাও হবে না। অথচ কি ব'লে তাঁকে এখান থেকে সরানো যায় তা-ও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাঁরও যাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তিনি যেন এই ডাক-বাঙলো আর আমার মধ্যে এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন।

'এই অবস্থায় আমারও যেন প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে আসছিল। মন কিছুতেই চাইছিল না যে তিনি একলা চলে যান, তা হ'লে আমার অভিশপ্ত জীবনের আর কোনো আশা থাকবে না। রাত্রে পাশের ঘরে শুয়ে শালগাছের মাথায় হাওয়ার দাপা-দাপির শব্দ শুনে মনে হ'ত যেন অনেক হিংস্র জন্তু গর্জন করছে। প্রতিক্ষণেই মনে হ'ত, ওই বুঝি ওরা আক্রমণ করতে এসেছে।

'শেষে একদিন বলেই ফেললাম, 'জায়গাটার একটা বদনাম আছে, তার উপর এত নির্জন। এখানে বেশিদিন না থাকাই ভাল।'

'তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, সে-কথা এতদিন বলেন নি কেন? তাই বোধ হয় এখানে লোকজন আসেন না।'

বললাম, 'থাকতে ভাল লাগছিল, তাই যাবার কথা তুলি নি।' বলে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটু সময় চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আমি না হয় এখনি যাবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনি?'

বললাম, 'আমি আপনার সঙ্গেই কলকাতায় যেতে পারি, যদি আপনি আমার কথামতো ব্যবস্থা করেন।' একলা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে দু'খানা টিকিট কিনে আনবেন এবং একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে আসবেন। গাড়িতে আপনি জিনিসপত্র নিয়ে একা যাত্রা করবেন, আমি পথে গাড়িতে উঠব। আমি আগে থাকতে বেরিয়ে পথে অপেক্ষা করব।'

'তিনি কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, আপনার যাওয়ায় বাধা দেবে কে? তার কি সে অধিকার আছে?'

বললাম, 'এ-কথার উত্তর পরে দেব। এখন যা বলছি, তাই করুন।'

একটু সময় ভেবে তিনি বললেন, 'বেশ তাই হবে।'

মনে হচ্ছিল যেন পূর্ব গগন ফিকে হয়ে আসছে। এইবার সকাল হলেই এই রোমাঞ্চকর রাত্রির অবসান হবে। তারপর আমিও এখান থেকে চলে যাব। বুঝলাম, শেষ পর্যন্ত মহিলাটির পরিকল্পনা সফল হয় নি, স্থানত্যাগ করতে তিনি পারেন নি, না হলে এখন আমি তাঁর কথা শুনতে পাব কেমন করে।

তবু প্রশ্ন করলাম, 'আপনার যাওয়া হল না কেন?'

শুনতে পেলাম, 'তিনি টিকিট কিনে এনে গাড়িতে জিনিস নিয়ে যাত্রা ঠিকই করেছিলেন। আমি আগেই বেরিয়েছিলাম। হয়ত দ্বারোয়ান আমাদের মতলব আড়ালে থেকে শুনতে পেয়ে তাদের জানিয়েছিল। পথ থেকে আমাকে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমাকে হত্যা করেছিল। ভদ্রলোক হয়ত স্টেশনে ঠিকই পৌঁছেছিলেন।'

এতক্ষণে আলো ফুটেছে। ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পেলাম না। সমস্তটাই স্বপ্ন কি না জানি না। মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম কি না, তাও বলতে পারি না। তবে অনেক বেলায় দ্বারোয়ানের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলে চা খেয়েই স্টেশনের পথ ধরলাম। ছোট বিছানা আর ব্যাগটা নিজেই বহন করলাম।

যাবার আগে চেয়ে দেখলাম, পাশের ঘরটা বাইরে থেকে চাবি বন্ধ। দ্বারোয়ানকে মেয়েটির বিষয় প্রশ্ন না করাই ভাল বিবেচনা করলাম।

রবি-প্রণাম

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

তোমার কথা লিখতে গিয়ে
বারে বারে পড়ছে মনে খালি,
সবটা বুঝি লিখতে গেলে
ফুরায় শেষে, একটা সাগর কালি।
মস্ত বড় ছিলে তুমি
ছিল তোমার, মস্ত বড় মন।
সত্য-ন্যায়ের চলবে পথে
এমনি ছিল, কঠিন-কঠোর পণ।
অসহায়ের পীড়ন নিয়ে
রচো নিকো একটি-দু'টি গাথা—

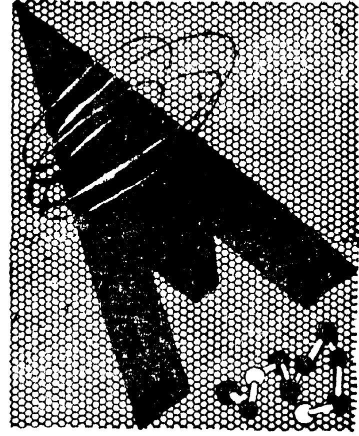
তোমার কাব্য সবার তরে
মেলে দিল বিশ্বব্যাপী ছাতা।
জীবনটা যে, শুধুই মিছে
পীড়ন এবং দুঃখ ভরাই নয়;
তোমার দেওয়া সেই কথাটি
আশা-প্রদীপ নিত্য জ্বলে রয়।
মায়ের যেমন শিশুর প্রতি
চিরদিনের আছে অনুরাগ;
তোমার প্রীতি তেমনি করে
জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে গেল ফাগ॥

চুম্বকশক্তি ও চুম্বকক্ষেত্র

আজকের দিনের বিজ্ঞানের চরম সমস্যা হলো প্রোটন কণাকে মানুষের প্রয়োজনমত নিজের কাজে লাগাবার সহজতম উপায় উদ্ভাবন করা। এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগে থেকেই ইয়োরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সুরু হয়েছিল। যুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেন এবং ফ্রান্সে এ-বিষয়ে গবেষণা অবিশ্রান্তভাবেই চলছে এবং আজকের রকেট বিজ্ঞানের অবস্থা দেখে মনে হয় যে, বৃটেন ফ্রান্সকে পেছনে ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া বিজ্ঞানের এই বিভাগে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে তুলনা করলে হয়তো শেষোক্ত দেশেই এর উন্নতি সর্বাধিক হয়েছে এ কথা বলা চলে।

রাশিয়ার ডুব্‌নো শহরে একটি কারখানা আছে—এখানে প্রোটন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যে সব কর্মযজ্ঞের আয়োজন হয়েছে, তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বস্তু হলো—একখানি অতিকায় প্রোটন সিনক্রট্রন চুম্বকখণ্ড। রীতিমত বড় একটা খেলার মাঠকে স্বচ্ছন্দে ভেতরে রেখে দেওয়া যায়। এইরকম একটা লোহার আংটি তৈরি করা হয়েছে। এই আংটিটির ওজন প্রায় ৩৬,০০০ টন। এই চাকার আকারে বিরাট লৌহখণ্ডকে বেষ্টন করে রয়েছে সরু সরু কয়েক সহস্র তার—যার মোট ওজন প্রায় ৬০০ টন। এর সাহায্যে প্রচণ্ড শক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এই অতিকায় চুম্বকখণ্ডটির প্রধান কাজ হলো একটি বৃহৎ চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করা—যে কোন ধাতববস্তু, যার চারপাশে ঘুরতে বাধ্য হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোনও চুম্বকক্ষেত্র যতো বেশি শক্তিশালী হয় তার প্রভাবে ধাতবদ্রব্যগুলি তত বেশি স্বল্প-বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। তবে কেন্দ্রটি সর্বদা প্রায় একই থাকে।

এইখানেই একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। চুম্বকখণ্ড যত বেশি শক্তিশালী হবে, তার সাহায্যে বিদ্যুৎও ততো বেশি উৎপাদন হবে তা ঠিক। কিন্তু বেশি শক্তিশালী চুম্বক তৈরির জন্যও বেশি বিদ্যুৎ তার চারপাশের তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটা করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যান। কারণ দেখা গেছে বেশিরভাগ ধাতব তারেরই তাপ সহের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। যার থেকে একটু বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োগ করলেই সে তারগুলি একটির পর একটি গলে যেতে থাকে। আর তা ছাড়া বিদ্যুৎশক্তির অদ্ভুতভাবেও অপচয় ঘটে থাকে। যেমন দেখা গেছে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘটানোর পরে লৌহখণ্ডটি অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। তার চৌম্বকশক্তি যে পরিমাণে বাড়লো তাপ সৃষ্টি হলো তার চাইতে



বিজ্ঞান বার্তা

অনেক বেশি গুণ এবং তারপর হয়তো এমন অবস্থাও সৃষ্টি হয়েছে যে, বাঞ্ছিত চৌম্বকশক্তি সৃষ্টি হবার আগেই লৌহখণ্ডটিই হয়তো গলতে আরম্ভ করেছে। এই অবস্থাটাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখবার জন্যেই বিদ্যুৎবাহী তারের পাশে পাশে জলবাহী ঈষৎ মোটা মোটা পাইপ দিয়ে লৌহখণ্ডটিকে বেষ্টন করবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। ইদানীং জলের পরিবর্তে লিকুইড হিলিয়ামের সাহায্যেই চুম্বকখণ্ডটিকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। এরপর দেখা গেলো বিদ্যুৎশক্তির অপচয় অনেক কমে গেছে। কিন্তু তবু বাঞ্ছিত পরিমাণ চুম্বকশক্তি তৈরি হলো না স্থায়ী চুম্বক তো নয়ই।

তার প্রধান কারণ, ইচ্ছেমতো তাপ প্রবাহ ঘটানো চলে এমনধারা ধাতববস্তুর অভাব—যা দিয়ে তার তৈরি করা যেতে পারে। কৃত্রিম চুম্বকশক্তি এবং চুম্বকক্ষেত্র না হলে প্রোটনকে কাজে লাগানোর পথে যে অন্তরায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে শত শত বিজ্ঞানী নানা দেশে চেষ্টা করে যেতে লাগলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় কয়েকজন রুশ-বিজ্ঞানী শেষ পর্যন্ত একটা মিশ্রধাতু তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন—যার তাপ সহের শক্তি যে কোনও জানা বিশুদ্ধ বা মিশ্র-ধাতুর চেয়ে অন্তত পনেরো গুণ বেশি। এই মিশ্র ধাতুটির নাম হলো 'নাইওবিয়াম টিন'। তা ছাড়া জিরকোনিয়াম এবং ভ্যানাডিয়াম গ্যালিয়ামও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কয়েকটি অতি মাত্রায় তাপবাহী মিশ্র ধাতু বিশেষ করে নাইওবিয়াম টিন আবিষ্কৃত হবার পরে আজকের পদার্থবিদগণ মনে করেন যে, আকারে বিরাট লৌহখণ্ড ব্যতীতও প্রচণ্ডশক্তি চুম্বক সৃষ্টি করা সম্ভব। কারণ আসল কথা হলো তাপ প্রয়োগ করা এবং সে তাপকে

ধারণ করার ক্ষমতা। সাধারণ একটা পিপের আকারের লৌহখণ্ডকে পাইওবিয়াম টিনের তার দিয়ে বেষ্টন করে তাতে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে এমন কি লক্ষ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্তও তাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে--যেহেতু লৌহখণ্ডটিকে একই সময়ে লিকুইড হিলিয়ামের সাহায্যে শীতল রাখা হয়—সেইজন্যই সৃষ্ট তাপ আর আগের মতো অপচয় হয়ে যায় না—চুম্বকশক্তিতে রূপান্তর লাভ করে।

প্রচণ্ড শক্তিশালী এই চুম্বকের অনেক প্রয়োজন হবে আগামী দিনগুলিতে। রকেটে করে শূন্যমার্গে ভ্রমণের সময়ে মহাশূন্যের বিভিন্ন দিক থেকে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের তাণ্ডব চলতে থাকে, তাকে মানুষ নিজের ইচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই প্রোটন সিনক্রট্রন যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি চুম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে। রাডার যন্ত্রের গোড়ার কথা হলো এই চুম্বকশক্তি। এর সাহায্যে বিশেষ একটি জায়গায় (অর্থাৎ চুম্বকক্ষেত্রে) পতিত যে কোনও আলোকরশ্মির কতটুকু ওজন তা বলা যায়, আবার ক্ষুদ্র কোনো পতঙ্গ একটা মোমের মধ্য দিয়ে উড়ে গেলে জমিতে কতটুকু কম্পন হয় তাও বলা যায়।

—বিজ্ঞানসাধক

পরিত্যক্ত গ্যাস থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড

রসায়ন শিল্পে সালফিউরিক অ্যাসিড যেমনি জরুরী তেমনি এর উৎপাদনও হয় প্রচুর পরিমাণে। সালফিউরিক অ্যাসিড পেতে হলে সালফার ডাই-অক্সাইডকে দু'বার অক্সিজেনের সংস্পর্শে আনতে হয়। এখন পশ্চিম জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ বেয়ার কোম্পানী সম্পূর্ণ নতুন এক উপায়ে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করার উপায় আবিষ্কার করেছে। কলকারখানার চিমনি থেকে যে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, তাতে প্রচুর পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে। সেই সালফার ডাই-অক্সাইডকে দু'বার অক্সিজেনের সংস্পর্শে এনে ঐ প্রতিষ্ঠান দূষিত গ্যাস থেকে প্রায় ৯৯.৬ ভাগ সালফার ডাই অক্সাইড বার করে নেবে।



● পশ্চিম-জার্মানীর অন্তর্গত লিভারকুসেন-এ পৃথিবীর প্রথম যুগ্ম-সংযোগসহ প্ল্যান্টের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।

কলকারখানার এই পরিত্যক্ত গ্যাস পশ্চিম জার্মানীর আকাশ-বাতাসকে ভীষণভাবে কলুষিত করে তোলে। বেয়ার কোম্পানীর আবিষ্কৃত পন্থায় বিষাক্ত গ্যাস থেকে যখন সালফার ডাই-অক্সাইডের ভাগ নেওয়া হবে তখন বাতাস অনেক নির্মল থাকবে ও তার ফলে এখনকার মত জনজীবনের স্বাস্থ্যহানি ঘটবে না।

—ই কে।

[ডি এ ডি]

নীল প্রসঙ্গে

'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি—'

নীল শাড়ি-পরা মানসীকে যেন অসীম সুন্দরী দেখায়। অথচ ঐ নীল শাড়ীর 'নীলত্ব' সম্বন্ধে আপনি আমি কতখানি জানি?

বাড়িতে জামা-কাপড় কাচার পরে নীল দেওয়ার একটা রীতি আছে। অবিশ্যি এ-রীতি শুধু সাদা জামা-কাপড়ের বেলায় খাটে। রঙিন জিনিসে নীল দেওয়া অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয়। সাদাতে একটু নীলের ছোঁয়া থাকলে বেশ সুন্দর চকচকে দেখায়। সাদা রঙটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা চোখের পক্ষেও সুখকর। এত সাবান-সোডা দিয়ে জামা-কাপড় কাচার পর যে হলদেটে ভাবটা থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়।

অথচ বাড়িতে নীল বলে যে নীল রঙ আমরা জামা-কাপড়ে দিই, তা সত্যি সত্যি 'নীল' নয়, কিন্তু এক ধরণের নীল রঙ। সত্যি সত্যি নীল বলতে যা বোঝায় (যার ইংরাজী প্রতিশব্দ Indigo) তা কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয় না। জলে তা অদ্রবণীয়।

আগে নীলের চাষ করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে এর চাষ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন-না অশেষ পরিশ্রম করে যে নীল চাষ করা হতো তা এখন রাসায়নিক কারখানাতেই তৈরি হচ্ছে অনেক সস্তায়। এই নীল নিয়েই আমাদের নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার আর কারো অজানা নয়। সেই সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'ও।

নীল কিন্তু নীলগাছের ফল নয় বা নীলগাছ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা যেত না। নীলগাছের পাতা, ডাঁটা এগুলো কাটা হত গাছে ফুল ধরার আগেই। তারপর তা জলের মধ্যে রেখে পচিয়ে, তারপর বাতাস দিয়ে ফেনিয়ে নীল সংগ্রহ করা হত।

যে নীল জলে অদ্রবণীয়, কি ভাবে তা জলে গুলে কাপড়-চোপড় রাঙানো হয়?

যারা ফটোগ্রাফির লোক, তাদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না 'হাইপো' কি জিনিস। তাদের কথায় যা হাইপো, রাসায়নিক ক্ষেত্রে তার নাম সোডিয়াম থায়োসালফেট। এটা ব্যবহার করা হয় ফটোগ্রাফির 'ফিক্সিং'-এর জন্য।

ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে যেমন হাইপো, তেমনি ডাইং ইণ্ডাস্ট্রীজে 'হাইড্রো' কথাটার বেশ প্রচলন আছে। হাইড্রো বলতে সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট বোঝায়। এর সাহায্যে অদ্রবণীয় নীলকে জলে দ্রবণীয় করা হয়। তারপর কাপড়-চোপড় তা দিয়ে রাঙানো হয়।

কাপড়-চোপড় নীল রঙে রাঙানোর ব্যবস্থাটাও বেশ চমকপ্রদ। অদ্রবণীয় নীলকে ক্ষারের উপস্থিতিতে হাইড্রোর সাহায্যে জলে দ্রবীভূত করা হয়। তাতে নীল জলে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা তার বিশেষ নীল রঙ হারিয়ে ফেলে। এখানে হাইড্রোর বদলে গ্লুকোজ, দস্তা গুঁড়ো, ফেরাস সালফেট (হিরাকস), স্টানাস ক্লোরাইড ইত্যাদিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

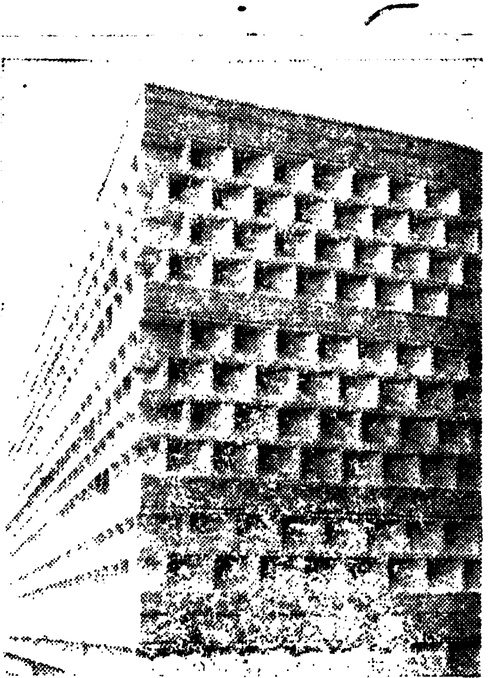
এখন ঐ দ্রবণে যে কাপড় ইত্যাদি নীল রঙে রাঙাতে হবে, তা চোবান হয়। চুবিয়ে তা বাতাসে মেলে দেওয়া হয়। তাতে ঐ 'রঙহীন' নীল তার স্বাভাবিক নীল রঙ ফিরে পায় এবং কাপড়টাকে নীল রঙে রাঙিয়ে তোলে।

—শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু

কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গ্রন্থাগার

কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন যে গ্রন্থালয় তৈরি হচ্ছে তার বাইরের দিকটা দেখতে হবে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। স্থাপত্যের কেরামতি দেখাবার জন্যে এই নতুনত্ব করা হচ্ছে না, হচ্ছে নিছক বাস্তব উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে। স্থপতির পরিকল্পনা হচ্ছে একটার ওপর একটা ভারি সিমেন্টের পাত লাগিয়ে যতদূর সম্ভব রোদ ঠেকানো। প্রত্যেকটা সিমেন্টের পাতের মাপ হচ্ছে বিশ ইঞ্চি পুরু, তিন ফুট উঁচু ও সাড়ে তিন ফুট চওড়া। এই পাতগুলি এমন বেঁকিয়ে বসানো হবে যাতে দিনের কোন সময়েই গ্রন্থালয়ের মধ্যে সরাসরি রোদ ঢুকে বইপত্তর নষ্ট না করতে পারে। এই আটতলা গ্রন্থালয় কার্লস রুহের স্থপতি অধ্যাপক গুটব্রড এমন ভাবে তৈরি করছেন যাতে মেঝের প্রতি বর্গগজ জায়গায় দুই হাজার পাউণ্ড জিনিসপত্র রাখা যায়। ১৯৬৫ সনে এই গ্রন্থালয় নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য পুস্তক সংগ্রহ বিশেষভাবে সারা বিশ্বে সুপরিচিত অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকগুলি এখানে এনে রাখা হবে।

—ডি এ ডি।



● কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত গ্রন্থাগারের সম্মুখভাগ

অঙ্গনে ও প্রাঙ্গনে

আনন্দমুখর আটটি দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বন্দনা মুখোপাধ্যায়

প্রথমদিন নিরাশ হলেও সেদিন আমরা প্রাণভরে নালন্দাকে উপভোগ করলাম। তারপর রাজগীরে ফিরে জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার শুরু হোল আমাদের পথ চলা। ঠিক হয়েছিল, ভাগলপুরে রীণা তার বৃদ্ধ দাদু-দিদিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। আসবার সময় কথা হয়েছিল কোডারমার পথ ধরেই ফিরব, কিন্তু ভগবান বোধ হয় তখন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন, তাই এ রাস্তায় ড্রাইভের আনন্দ আর আমাদের ভোগ করতে হল না। কিছুদূর আসার পরই গাড়ি থেকে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার মত শব্দ হল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গাড়ি গেল থেমে। রঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির বনেট খুলে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু পরীক্ষা করে যা দেখা গেল তাতে প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বার জোগাড়। ব্যাটারী সেট থেকে এ্যাসিড উপছে পড়ে ডিস্ট্রিবিউটার ক্যাপ জ্বলে গেছে। অতএব যতক্ষণ না সেটিকে বদলান হচ্ছে—গাড়ি আর একপাও চলছে না।

এদিকে যে জায়গায় আমরা এই বিপদে পড়লাম—শহর সেখান থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে। দু'দিকে কোডারমার গভীর জঙ্গল, জনমানবশূন্য রাস্তা, ধারে-কাঁছে কোথাও কিছু নেই। মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে একেকটা মালবাহী ট্রাক আর যাত্রীবাহী বাস। কিন্তু তাও বহুক্ষণ বাদে বাদে। কোন উপায় না দেখে দুই বন্ধুতে ভাবছেন কোন একটা গাড়িকে থামিয়ে তাঁদের মধ্যে একজন কেউ শহরে গিয়ে, ডিস্ট্রিবিউটার ক্যাপটা কিনে নিয়ে, আবার কোন একটা গাড়ি ধরে ফিরে আসবেন।

এমন সময় মরীচিকার মাঝে একবিন্দু জলের মত দূর থেকে দেখা গেল একটি ছোট কালো গাড়ি। কাছে আসতেই সেটিকে হাত দেখিয়ে থামান হল। গাড়িতে ছিলেন এক বিহারী ভদ্রলোক। তাঁর ড্রাইভারটির তকমা দেখে বোঝা গেল যে, তিনি কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তাঁকে জানান হল আমাদের শোচনীয় অবস্থার কথা।

উত্তরে ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন, 'আমার গাড়িতে আপনারা মেয়েদের দিয়ে দিন, আমি ফিরে গিয়ে অন্য গাড়ি পাঠিয়ে আপনাদের আর আপনাদের গাড়ি নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করব।'

কিন্তু তখনও তাঁর পরিচয় আমরা জানতে পারি নি—তাই অজানা জায়গায় অচেনা লোকের গাড়িতে ভরসা করে যাওয়া কারুরই মত হল না। রঞ্জনবাবু একলাই তাঁর গাড়িতে চলে গেলেন। তারপর দু'টো বাজল, আড়াইটে বাজল, রঞ্জনবাবুর ও দেখা নেই। আর এদিকে আমরাও পড়ে আছি সেই জঙ্গলে। ভাবনায়-চিন্তায় খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে। বেলা যখন তিনটে বেজে গেছে হঠাৎ একটা ট্রাক এসে সশব্দে আমাদের গাড়ির পাশে থামল। ট্রাকটিতে জিনিসপত্র বোঝাই আর তার ওপরে বসে আছে কতকগুলি কুলী গোছের লোক। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়েছি, দেখি ড্রাইভার-এর আসন থেকে নেমে আসছে প্রায় ছ' ফুট লম্বা-চওড়া একটি লোক, মাথায় পাগড়ি, পাকান গোঁফ। দেখলাম লোকটি আস্তে আস্তে আমাদের দিকেই এগিয়ে এল এবং আমার কর্তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী আপকো ক্যা মুসীবত হ্যায়? ম্যায় আপ কি, কুছ সহায়তা কর সক্‌তা হুঁ?'

ভাবলাম এত গাড়ি ত' পেরিয়ে গেছে, কিন্তু কেউ ত' এভাবে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে নি! সবকিছু জানার পর লোকটি বলেছিল, 'কিন্তু একটু পরেই এখানে সন্ধ্যে হয়ে যাবে, তখন জন্তু-জানোয়ার এবং ডাকাতি দু'য়েরই ভয় আছে। আপনি একলা, সঙ্গে বন্দুকও নেই। মেয়েদের নিয়ে খুবই মুস্কিলে পড়বেন। আমার সঙ্গে দড়ি আছে, চলুন আপনাদের গাড়ি বেঁধে নিয়ে শহরে পৌঁছে দি।' ততক্ষণে দেখি গাড়ি থেকে আরেকটি বিহারী ভদ্রলোক নেমে এসেছেন। তিনিই ট্রাকটির মালিক। তিনিও আমাদের সেই অনুরোধই জানালেন। সব দিকের পরিস্থিতি ভেবে আমরাও তাঁদের কথায় রাজী হতে বাধ্য হলাম।

আমাদের মধ্যে একমাত্র রীণাই ড্রাইভিং জানত, কাজেই তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে জোর করে হুইল-এ বসান হোল। গাড়িতে দড়ি বেঁধে নিয়ে কিছুটা এগিয়েছি হঠাৎ সজোরে একটা ঝাঁকুনি খেলাম। তাকিয়ে দেখি দড়ি গেছে ছিঁড়ে, আরেকটু হলেই গাড়ি একেবারে খাদে গিয়ে পড়ত, কিন্তু রীণা ততক্ষণে প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেছে। মস্ত একটা ফাঁড়ার হাত থেকে বেঁচে গেলাম সকলে, রীণা কিন্তু এবার একেবারে বেঁকে বসল, আর কিছুতেই হুইল ধরবে না। শেষ পর্যন্ত আমাদের অবস্থা দেখে ট্রাকের মালিক ভদ্রলোকটি ভালো ড্রাইভিং না জানা সত্ত্বেও হুইল-এ বসলেন এবং কোন গতিকে আমরা শহরে এসে পড়লাম। বড় রাস্তার ধারেই একটি ছোট

মোটর সারাবার দোকানের সামনে আমাদের গাড়িটিকে রেখে তাঁরা বিদায় চাইলেন। আমার কর্তা পারিশ্রমিক হিসাবে ড্রাইভারটিকে পাঁচটি টাকা দিতে গেলেন, কিন্তু একটি গরীব ড্রাইভারের কাছে সেদিন যা মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম—তা হয়ত কোনদিনই ভুলতে পারব না।

'বাবুজী টাকা ত' আমি নিতে পারব না।'

আমার কর্তা বললেন, 'এমনিতে কিছু না নাও তোমার দড়ি ছিঁড়ে গেছে তার দরুনও ত' কিছু নেবে?'

সে তখন হাতজোড় করল, 'বাবুজী আমরা পথে পথেই ঘুরি। আজ আপনার বিপদ হয়েছে, কাল হয়ত আমার হবে।'

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম তার কথা শুনে। ট্রাকের মালিক ভদ্রলোকটি বললেন, 'ও যখন নিতে চাইছে না, ওকে জোর করবেন না।' নমস্কার জানিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

আসবার সময় পথেও রঞ্জনবাবুর দেখা পেলাম না। মোটর সারাবার দোকানটিকে গাড়িটা দেখতে বলা হয়েছিল, আর আমরা চারিদিকে লক্ষ্য রাখছিলাম তাঁর জন্যে। প্রায় আধঘণ্টা পরে আমাদের সব ভাবনার হাত থেকে রেহাই দিয়ে রঞ্জনবাবু ফিরে এলেন। সঙ্গে একটি জীপ আর একটি ছোট শাদা গাড়ি। তাঁর কাছে শুনলাম আমাদের সন্ধানে তিনি আমাদের ছেড়ে-আসা জায়গাটি পর্যন্ত গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে দেখা না পেয়ে পথের অন্য গাড়িকে জিজ্ঞেস করে এখানে ফিরে এসেছেন। তখন আর বেশি কথা জানবার সময় ছিল না। সেই ছোট দোকানটি আমাদের গাড়ি সারাতে পারে নি, কাজেই রঞ্জনবাবুর কথামত ছোট শাদা গাড়িটিতে আমরা আগে রওনা হয়ে গেলাম অজানা কারুর অতিথি হবার জন্যে। জীপটিকে দিয়ে গাড়িটি টেনে নিয়ে যেতে একটু সময় লাগবে বলে তিনি একলাই রইলেন আমাদের গাড়িতে।

সারাদিনের ক্লান্তির পর যেন একটা রাজপুরীতে এসে পৌঁছলাম। অভ্যর্থনা জানালেন একজন অল্পবয়স্কা মাড়োয়াড়ী ভদ্রমহিলা। যেমন সুন্দর তাঁর চেহারা তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। 'আপনাদেরও সারাদিন খুবই কষ্ট গেছে, খাবার তৈরি আছে আগে খেয়ে নিন।' খেতে গিয়ে দেখি নানারকম জিনিস দিয়ে টেবিল সাজিয়ে রেখেছেন।

এখনও ভাবলে আশ্চর্য লাগে অত বিপদের মধ্যেও সেদিন যে ক'টি লোকের দেখা পেয়েছিলাম, তাঁদের প্রত্যেকেই কি চমৎকার মানুষ। পরে জানতে পেরেছিলাম, আমরা যাঁর গাড়ি থামিয়েছিলাম তিনি হচ্ছেন বিহারের 'ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিস,' কোডারমা অভ্র খনিগুলির পরিদর্শনের কাজে এসেছিলেন। আর তাঁর অনুরোধে যিনি আমাদের গাড়ি পাঠিয়েছিলেন, তিনি কোডারমার একটি অভ্রখনির মালিক। তাঁদের বাড়ির পাশেই ছিল তাঁদের অফিস, কারখানা এবং সেখানে গাড়ি সারাবার কারখানাও ছিল। সেখান থেকেই আমাদের গাড়িটি সারিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই ডিস্ট্রিবিউটার ক্যাপের দাম হিসেবেও তাঁদের কিছু গ্রহণ করান যায় নি।

গাড়ি ঠিক হবার পর যাবার উদ্যোগ করাতে, বাড়ির মালিক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজে আমাদের গাড়িতে তুলে দিলেন। ভাগলপুর যাব শুনে বারবার করে বলতে লাগলেন, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে এখন আবার অতদূর প্রায় একশ' মাইলের ওপর রাস্তা যাবেন।'

সেখান থেকে বেরিয়ে রঞ্জনবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়েছিলেন। ক্রমশ সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার বেড়ে চলেছে আর আমরাও একেকটা জায়গাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছি। পেরিয়ে এসেছি মন্দারগিরির পার্বত্য অঞ্চল। রাতের অন্ধকারে তার পরিচয় আমরা পাই নি, শুধু একটা বিভীষিকাময় পরিবেশ এক অদ্ভুত রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিল। মাঝে মাঝে শুধু দূরত্ব জানবার জন্যে একেকবার গাড়ি থামান হচ্ছিল। পথ যেন আর ফুরোয় না। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় ভাগলপুরে পৌঁছে—

'মনে হোল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে।'

অত রাত্রেও রীণার দাদু-দিদিমার আতিথেয়তায় সব ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন জায়গায় থাকবার জন্যে ত' আমরা আসি নি। চলার পথ সব সময়ই ডাক দিচ্ছে।

৭ই মার্চ—তাই পরদিন বেলা ১টার সময় ভাগলপুর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম মেসেনজোরের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ মেসেনজোর পৌঁছলাম। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, অনুমতিপত্র ছাড়া কোন ডাক-বাংলোই আমাদের থাকতে দেবে না। বিহারের ডাক-বাংলোর অনুমতিপত্র পাওয়া যায় ভাগলপুরে আর বাংলারটা কোলকাতায়। কিন্তু আমরাও তখন মরিয়া, এতদূর যখন এসেছি থাকতে আমাদের হবেই।

'পরবাসী আমি যে দুয়ারে যাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়ে সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।'

শেষ পর্যন্ত সন্ধান দিল বিহার ডাক-বাংলোর একটি বেয়ারা। বিশেষ প্রয়োজনবোধে এস-ডি-ও নাকি বিহার ডাক-বাংলোয় থাকবার অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু তিনিও থাকেন সেখান থেকে আট মাইল দূরে। ড্যামের পাশে পাহাড়ের ধার দিয়ে চলে গেছে একটি সরু লালমাটির কাঁচা রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে সোজা গেলে তাঁর বাড়ি। দেখা পাব কি পাব না ঠিক নেই। খবরটা সঠিক কি না

তাও জানা নেই, তবুও শুরু হল আমাদের অজানার উদ্দেশে যাত্রা। অন্ধকার রাত্রি যতই এগিয়ে চলেছি, জনমানবশূন্য রাস্তা দু'ধারে বসতির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, রাস্তার একপাশে মাঠ আর জঙ্গল আর একপাশ দিয়ে সমানে চলে গেছে একটা খাল। চারিদিকে যেন একটা থমথমে ভাব। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, 'পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কি আছে, শেষে।' সামান্য দূরত্বকেও যেন বড় দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে। আবহাওয়াটাকে হাল্কা করার জন্যে গান আরম্ভ করলাম।

'অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে,
অচেনাকে চিনে চিনেই উঠবে জীবন ভরে।'

হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি দূরে দেখা দিয়েছে একটা আলোর বিন্দু। আশার আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছি সকলে, এতক্ষণে হয়ত সত্যিই সেই অচেনার দেখা পাওয়া গেল।

নিরাশ হতে হয় নি, পথের শেষে দেখতে পেলাম অনেকখানি জায়গা নিয়ে শুধু একটা বাড়ি। গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেতরে খবর পাঠাতেই বেরিয়ে এলেন ঢিলে পায়জামা আর চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবী গায়ে এক মুসলমান ভদ্রলোক—যাঁর উদ্দেশে এতদূর ছুটে এসেছি। সবকিছু শোনা মাত্রই তিনি অনুমতি-পত্র লিখে দিলেন। তাঁর প্রীতি কৃতজ্ঞতা ও জয়ের আনন্দে মন ভরে উঠল। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। ফেরার পথে সেই সংশয়িত পথই বড় সুন্দর বলে মনে হয়েছিল। ন'টা নাগাদ ফিরে এলাম বিহার ডাক-বাংলোয়। বেয়ারাটিকে অনুমতি-পত্রটি দেখাতে প্রথমটা বিশ্বাস করে উঠতে পারে নি। ঘর খুলে দেওয়ার আগে বার বার করে সই মিলিয়ে দেখেছিল।

ঘর পাওয়া গেল কিন্তু খানসামা সে সময় উপস্থিত না থাকাতে খাবার পাওয়া গেল না। তাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই। সন্ধান পাওয়া গেল 'নদীয়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র। তাঁরা তখন কোলকাতা থেকে আগত বত্রিশ জন ছেলের ভাত রান্না করছেন। সেই সঙ্গে আমাদেরও কিছু জুটে গেল। গরম ভাত, ঘি, ডাল আর আলুর তরকারি। তাই তখন অমৃত।

পাহাড়ের ওপর চমৎকার এই ডাক-বাংলোটিতে থাকতে পাওয়ার আনন্দই তখন আমাদের কাছে সব থেকে বড় হয়ে উঠেছে। সামনেই বহুদূর বিস্তৃত মেসেনজোরের অপূর্ব দৃশ্য। আলোর মালায় ঝলমল করছে তার চারিদিক। শাদার মাঝে জায়গায় জায়গায় রঙিন আলোর ছায়া—তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। মনে হয়েছিল কে যেন ময়ূরাক্ষীকে জড়োয়ার সাজে সাজিয়ে দিয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ডাক-বাংলোর বারান্দা ছেড়ে উঠে আসতে পারি নি। জলের ওপর দিয়ে বয়ে আসা ঝড়ের মত ঠাণ্ডা হাওয়া রীতিমত শীত ধরিয়ে দিয়েছিল।

৮ই মার্চ—পরদিন সকালে হেঁটে মেসেনজোরের চারপাশটা ঘুরে দেখলাম। রাত্রে ডাক-বাংলোর বারান্দা থেকে যে রঙিন আলো দেখেছিলাম, সেগুলো রং-বেরঙের ছাতার তলায় একেকটা সুন্দর বসবার জায়গা, আর তার চারিধারে রয়েছে চমৎকার সাজান বাগান। মেসেনজোর দেখে সেখানে থাকবার জন্যে কষ্ট করা যেন সার্থক বলে মনে হল।

শেষ হয়ে এল কর্তার ছুটির মেয়াদ, বাকি শুধু সেদিনটা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফেরার পথ ধরতে হবে। তবু শেষ পর্যন্ত যতটুকু দেখে নেওয়া যায়। মেসেনজোর ছাড়ার পর তিলপাড়া ব্যারেজ শিউড়ি হয়ে চলে এলাম বোলপুর শান্তিনিকেতনে। অনেকদিন থেকে শান্তি-নিকেতন দেখার শখ ছিল কিন্তু সুযোগ পাই নি। ছোটবেলা থেকেই বহুবার বই-এ পড়েছি এবং শুনে এসেছি তার বিবরণ। তাই পথপ্রদর্শক যখন একে একে প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, মনে হল, চোখে না দেখলেও এরা যেন আমার অনেককালের চেনা। সেই উপাসনাগৃহ, উত্তরায়ণ, ছাতিমতলা—সব কিছুর সঙ্গেই যেন অদ্ভুত একটা যোগাযোগ অনুভব করলাম। মনে পড়ল বিশ্বকবির গান—

'আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন

*   *   *

মোদের প্রাণের সঙ্গে সে যে মিলিয়েছে একতানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে এক মন।'

শান্তিনিকেতন দেখে শেষ করতে প্রায় বেলা সাড়ে চারটে বেজে গেল। শ্রীনিকেতন দেখার আর বেশি সময় ছিল না, তবুও ফেরার পথে তাকে একবার ছুঁয়ে নিলাম। শ্রীনিকেতন ছাড়ার পর বর্ধমানে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে রাত বারোটা নাগাদ কোলকাতায় পৌঁছলাম।

রঞ্জনবাবু বললেন, 'প্রায় ১৩০৭ মাইল ঘোরা হোল।' এর আগে একজন একলা ড্রাইভারকে এতখানি রাস্তা এরকম সুন্দরভাবে ড্রাইভ করতে দেখি নি। যাত্রার পথে কত সময় কত যাত্রী, গরুর গাড়ি, ট্রাক ইত্যাদি তাঁর গাড়ির সামনে এসে পড়েছে, আবার কখনও তাঁর দ্রুতির মাপকাঠি উঠেছে চরম সীমায় কিন্তু কোথাও কোন দুর্ঘটনা হয় নি বা একবারের জন্যেও তাঁর হাত কাঁপে নি।

আবার ফিরে এলাম সেই গতানুগতিক জীবনযাত্রার ভেতরে। কিন্তু কোনদিনই ভুলতে পারব না এই আটটি দিনকে। স্মৃতির খাতায় যে পাতাগুলি আনন্দ দেবে, তারই সঙ্গে তুলে রাখলাম এদের।

পাগল

লোপামুদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্গত 'পাগল' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত]

পাগল শব্দটা সাধারণের নিকট ঘৃণার হইলেও রবীন্দ্রনাথের নিকট এই শব্দটি ঘৃণার নহে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'যে একদিকে কাজের, আর একদিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে, যাহাকে একদিকে স্পর্শ করা যায়, আর একদিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত, যে একদিকে রক্ষক আর একদিকে সংহারক যে আপনাতে আপনি সেই 'পাগল।'

জীবনের দৈনন্দিন গতির মধ্যে আমরা সৌন্দর্যের আভাস পাই না। যাঁহারা এই সচরাচর জীবনযাত্রা হইতে দূরে থাকিয়া আত্মভোলা হইয়া সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই পাগল শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই বিশ্বে ক্ষ্যাপা দেবতা ভোলানাথ পাগল, আর পাগল আত্মভোলা কবির দল। কাজের লোক ঘৃণা করেন অবকাশকে, কাজের মধ্য দিয়াই তাঁহারা জীবনকে ভরিয়া তুলিতে চান। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ব্যস্ত হইয়া বাস্তব জগতের মধ্যে প্রয়োজনীয়তা খুঁজিয়া বাহির করা অপেক্ষা অবকাশের মধ্যেই কাজকে পছন্দ করেন। কারণ তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের বাহিরে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই মূল্যবান। সাধারণ হইতে অসাধারণের মধ্যেই ইহার বিকাশ, সীমাকে ছাড়াইয়া অসীমের মধ্যেই ইঁহাদের উদ্দেশ্যের গতিপথ সূচিত, সুতরাং সাধারণের চোখে তাঁহারা 'পাগল।' পাগল অসীম হইয়াও অন্তরে ধরা দেয়, ইহার বিকাশ ও প্রকাশ অন্তরে, তাই সাধারণ বহির্মুখীরা ইঁহাদের বুঝিতে পারেন না, ইঁহাদের জানিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহারা জানেন না, ঘৃণার বাহিরেও পাগলের একটি দিক আছে—ভোলানাথ একদিকে রক্ষক আর একদিকে সংহারক,—তাই তিনি পাগল তিনি আনন্দময়। আনন্দ পাগলের সামগ্রী যাহা আপনার নিয়ম আপনি সৃষ্টি করে, যাহার পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য, কারণ পাগলের মত আনন্দসংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে পাগল—আর—'এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছে।'

যাহা হইয়াছে তাহাকে ছাড়িয়া যাহা হয় নাই তাহাকে সৃষ্টি করিতেই পাগল উৎসুক। যাহারা পাগল তাহারা দশজনের মত কাজ করে না। পাগলের আবির্ভাবে 'বিধি-বিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায় এবং কোথা হইতে এক অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।' প্রতিভাবানের প্রতিভা যখন সমাজ ছাড়িয়া যায় তখনই হয় সে 'পাগল।' পাগল ও নটরাজের সম্পর্ক নির্ধারণ করিলে দেখা যায়, উভয়ের গতিপথ একই লক্ষ্যে। যে 'নটরাজ' সেই 'পাগল' যে 'শিব' সেই 'রুদ্র।' যে 'রক্ষক' সেই 'সংহারক' সুতরাং উভয়ের প্রভেদ কোথায়?

দৈনন্দিন জীবনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর জলজ্জটা কলাপ লইয়া দেখা দেয় নটরাজ, আর তাহার লীলায় সৃষ্টির নব নব রূপ প্রকাশ পায়। তাহার ললাটে ধক ধক অগ্নিশিখায় শুধু আগুনই জ্বালায় না—আলোও দান করে। জীবনের একঘেয়েমী দূর করিয়া নতুনের জয়গান গাহিবার জন্যই নটরাজ পাগলের আবির্ভাব। তাই তো কবি বলিয়াছেন—

'নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ
ঘুচাও সকল বন্ধ হে
সুপ্তি ভাঙাও চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে'—

নটরাজের লীলায় অন্তরের মলিনতা দূর হইয়া তাহা মুক্তি পায়, তাই কবি নটরাজকে বলিয়াছেন—

'নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ
নৃত্যে তোমার মায়া'

নটরাজের লীলাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গতিশীল, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহার লীলাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে জীবন জন্মগ্রহণ করে, তাহার মধ্যেও আছে নটরাজের লীলা। বন্ধনের মাঝে যখন মুক্তিকে দেখি তখনই জানি নটরাজ আছে। নটরাজের লীলাতেই ভালকে মন্দ করে উজ্জ্বল তুচ্ছকে করে অভাবনীয়, রূপকে করে অপরূপ বন্ধনে জাগে মুক্তি, সাধারণের মাঝেই আসে সুদূরের ব্যাপ্তি। নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যে পুরাতন যাহা কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, তুচ্ছ জাগতিক প্রয়োজন হয় বিধ্বস্ত।

আবার সেই নটরাজের নৃত্যেই জাগে সুন্দর, থাকে মহাপুণ্যের ইঙ্গিত, নামে প্রশান্তি তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'নৃত্য করো হে উন্মাদ নৃত্য করো।'

বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

নবজাতা

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়ি 'হার ম্যাজেস্টি রিটায়ার্স ফ্রম পাবলিক লাইফ'…। কি না সন্তান জন্মগ্রহণ করবার কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ প্রতিবার অল্পদিনের মত নেপথ্যে চলে যান, সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠান থেকে অবসর নেন কিছুদিনের মত। খবরের কাগজের ঐ একটা লাইন—হার ম্যাজেস্টি রিটায়ার্স ফ্রম পাবলিক লাইফ—আমার বারে বারে মনে পড়ছিল বস্টন জীবনের কোন এক বিশেষ সময়।

জুনের শেষে জুলাইয়ের প্রথমে নিজেকে ঘরে-বাইরে সবরকম কাজকর্ম থেকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে নেপথ্য-চারিণী হতে হল কয়েকদিন। কারণটা নিতান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু এই ব্যক্তিগত ঘটনাও আমার আমেরিকার প্রবাস জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কেমন যেন অসাধারণ রূপ নিয়ে স্মৃতিতে রয়ে গেছে। এ ঘটনা না ঘটলে যেন আমেরিকার একটা দিক আমার অজানা রয়ে যেত, অসম্পূর্ণ থেকে যেত আমার অভিজ্ঞতা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা দ্রুত বেড়ে গেল। আমার পাড়াপড়শী বন্ধুবান্ধব থেকে সুরু করে বস্টন লাইং-ইন হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স, আশেপাশের কেবিনের অন্যান্য সঙ্গিনীরা আমার অত্যন্ত কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো।

সেবার আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই পড়েছিল শনিবার—তার মানে ওরা যাকে বলে লং-উইক-এণ্ড, শনি-রবি দু'দিন ছুটি। আর এমন 'গ্লোরিয়াস্ উইক-এণ্ড' নাকি অনেকদিনের মধ্যে হয় নি। ঝক্‌ঝক্ করছে সূর্যের আলো, যতদূর দেখা যায় ধূ-ধূ করছে নীল আকাশ। শীত চলে গেছে, গরম তখনো পড়ে নি। আকাশে-বাতাসে আমাদের শরৎকালের মত ভাব।

দলে দলে লোক শুক্রবারেই বেরিয়ে পড়েছে উইক-এণ্ড করতে। রেডিওতে টি-ভি'তে ঘোষণা করছে এত হাজার লোক শহরের বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে রোড-একসিডেন্ট হবে পাঁচশো, মারা যাবে আশংকা করা যাচ্ছে শ' তিনেক ইত্যাদি।

এমনি সময় শুক্রবার সুন্দর রোদে ঝলমল্ দুপুরবেলায় আমি বস্টন-লাইং-ইন হাসপাতালের রিচর্ডসন হাউসের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে প্রতীক্ষমাণা সিস্টার হাসিমুখে এসে হাত ধরে এলিভেটরে উঠলেন। বোতাম টিপতে এলিভেটর ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল।

ডাক্তার-নার্স সকলে আমাকে ঘিরে হেসে-হেসে বলতে লাগল, প্লিজ হোল্ড অন্। আগামীকাল আমাদের স্বাধীনতা দিবস, একটু অপেক্ষা করো কাল খুব শুভদিন।

ওদের অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না—সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ওদের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সুদূর প্রবাসে আমাদের কন্যা জন্মগ্রহণ করল। একজন বললে, আহা, আগামীকাল যদি হত ওর নাম রাখা যেত 'মুকটি'—একটু চেষ্টা করে যখন বুঝলাম 'মুক্তি' অবাক হলাম।

বললাম, তুমি মুক্তি কোথায় শিখলে ?

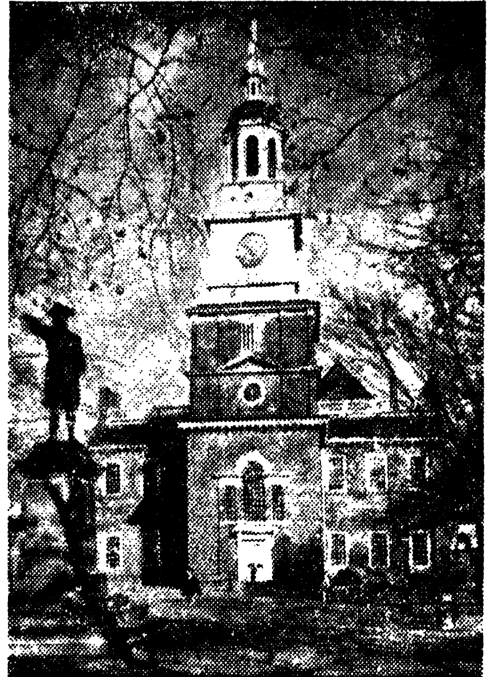
সে হেসে হেসে বললে, জানি, জানি, তোমাদের ভাষায় মুক্তি মানে হল লিবারেশন, নয় কি ?

নাম নিয়ে হৈ-চৈ চলল কিছুদিন। সবাই বলে কি নাম হল ? এখনো হয় নি শুনে আকাশ থেকে পড়ে। এদের নাম ঠিক হয়ে থাকে অনেক আগে, ছোট্টশিশু ঘণ্টা খানেক যার বয়স তারও গালভরা নাম গড়গড় করে বলে চলে ড্যানিয়েল-প্যাট্রিক-চেস্টার ইত্যাদি, ইত্যাদি। এদিকে তো পরস্পরকে ডাকার সময় আমেরিকানরা সব সময় ডাকবে বিল, ডিক, হ্যারি, রিকি ডাকনাম ধরে তা সে আপিসের বড়সাহেবই হোক্ আর কলেজের বন্ধুই হোক। কিন্তু নামকরণের বেলা পিতৃকুল, মাতৃকুল উভয়কুলের আধ ডজন পিতৃপুরুষের নাম জুড়ে এক মস্ত নাম দিয়ে বসবে। মিসেস হার্স্ট চিঠি লিখলেন ডেডহাম থেকে ওর নাম রাখো কুমুদ, তোমার নাম রিপিট করে। ও নামটা বড় সুন্দর লাগে। ওকে বুঝিয়ে চিঠি লিখে দিতে হ'ল আমাদের দেশে এ রকম চল্ নেই।

তবে আমার নাম ওর ভাল লাগে জেনে আশ্বস্ত বোধ করেছিলাম সেদিন। কারণ নাম নিয়ে প্রথম দিকে একটু বিব্রত হতে হত আমার। কারণটা অবশ্য হাস্যকর। প্রথম আলাপেই অনেক আমেরিকান বন্ধু বলে বসতেন, ও তোমার নামটা তো আমাদের খুবই ফ্যামিলিয়র। আমি অবাক হতাম, কি রকম। তারা বলত, কেন কৃষ্ণমেনন। কৃষ্ণমেনন আমেরিকাতে জনপ্রিয় নন এটা কিছু নতুন খবর নয়। আমি একটু ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার তফাৎ বোঝাতে তৎপর হয়ে উঠতাম। ইংরেজী বানানের মহিমায় কাজটা সহজ হত না খুব।

আমার ডেডহামের বন্ধুরা মহা ধুমধাম করে 'বেবি-শাওয়ার' দিয়েছেন আমাকে। এই শাওয়ার যাকে দেওয়া হয় তার কাছে গোপন রাখা হয় সে খবর। সারপ্রাইজ হওয়া চাই। একটা নেহাৎই সাধারণ নেমন্তন্ন পেয়ে মিসেস হার্স্টের বাড়ি উপস্থিত হয়েছিলাম গিয়ে দেখি সেদিনের উৎসবের কেন্দ্র হলাম আমি। এটা একান্তভাবে মেয়েদের ব্যাপার। সবাই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হল। নিমন্ত্রিতেরা উপহার দিলেন সকলে। আমাদের অনুরূপ প্রথার সঙ্গে আমেরিকান বেবি শাওয়ারের একটা বড় পার্থক্য নজরে পড়ল এইখানে। উপহার মায়ের জন্য নয়, সবই অনাগত শিশুর জন্য। জীবনের প্রথম কয়েক মাসে প্রয়োজনে আসতে পারে এমন সবকিছু ভেবেচিন্তে প্ল্যান করে এনেছে সবাই। মিসেস্ প্লাংকেট বললেন, আমরা পণ করেছি একে বস্টনের বেস্ট-ড্রেসড্ বেবি বানাতে হবে। একজন বললেন, আমি তোমাকে একমাসের 'ডায়াপার সার্ভিস' উপহার দিতে চাই। সেটা কি জিনিস। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দেবার পর অবশ্য আমি খুশি হয়ে উঠলাম খুব।

আমেরিকার বড় বড় শহরগুলোতে কতকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে তারা বাচ্চাদের জন্য ডায়াপার বা ন্যাপকিন সাপ্লাই করে মায়েদের। প্রথম সপ্তাহে হয়তো একশখানা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে স্টেরিলাইজ করা ডায়াপার দিয়ে গেল আর ঘরের কোণায় বসিয়ে দিয়ে গেল ঢাকনাওয়ালা সুদৃশ্য চেহারার একটা আধার, তাতে কিছু ওষুধ-বিষুধ ফেলা আছে। এক সপ্তাহ সেই ডায়াপারে কাজ চালাবেন মায়েরা আর ব্যবহৃত



● ইণ্ডিপেনডেন্স হল। ফিলাডেলফিয়া

ডায়াপারগুলো সেই আধারে ফেলে রাখবেন। এক হপ্তা পরে আবার আসবে ডায়াপারম্যান, একশ' ডায়াপারের নতুন একটা সেট বসিয়ে দিয়ে ময়লা ডায়াপারগুলো কাচবার জন্য নিয়ে যাবে। তারপর প্রতি হপ্তায় চলবে এই দেওয়া-নেওয়া এর জন্য অবশ্যই মাসে মাসে দক্ষিণা দিতে হবে কিছু। যতদিন বস্টনে ছিলাম আমি ডায়াপার সার্ভিস বজায় রেখেছিলাম। পরে যখন এ-শহর ও-শহর ঘুরে বেড়ানো শুরু হল তখন কিছু নিজে কাচতে হয়েছে আর কিছু ব্যবহার করেছি আর একটা আমেরিকান আবিষ্কার 'ডিজপোজেবল ডায়াপার,' পাতলা, মসৃণ, কাগজে তৈরি ডায়াপার একবার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয়। জাহাজে, ট্রেনে, এরোপ্লেনে ব্যবহার করে সুবিধা পেয়েছি খুব।

লং-উড এভেনিউর ওপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মায়েদের জন্য বস্টন লাইং-ইন হাসপাতাল ও শিশুদের জন্য চিলড্রেন্স মেডিকেল সেণ্টার। এই দু'টি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বস্টনিয়ানদের গর্বের সীমা নেই। বস্টনিয়ানরা দাবী করে দু'টোই স্বক্ষেত্রে বেস্ট ইন দি ওয়ার্লড। আমেরিকার যে কোন প্রান্তে মায়ের বা শিশুর কোন সঙ্কট দেখা দিলেই দৌড়ে আসতে হবে বস্টনে। এ হেন বিশ্ববিখ্যাত হাসপাতালে কয়েকদিন বাস করার অভিজ্ঞতা



● আমেরিকান সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ ড্রাগ স্টোর

লাভ করে আমি যে রোমাঞ্চিত হলাম সে কথা বলাই বাহুল্য।

সব ব্যাপারে 'থরো' হওয়া আমেরিকানদের সাধনা। বেলা দশটায় ক্লাস বসে যায় রিচার্ডসন হাউসের তিনতলায়। নতুন মায়েদের শেখানো হচ্ছে কেমন করে বেবিকে স্নান করাতে হবে, দুধের বোতল ধরতে হবে, ডায়াপার বদলে দিতে হবে। পুরোন মায়েরাও যোগ দিয়েছেন ক্লাশে—রিফ্রেশার্স কোর্স নেওয়া হচ্ছে। ওখানে শেখা দু' একটা কায়দা কানুন ভারি কাজে লেগেছিল পরে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে 'ফুটবল হোল্ড'। কেমন করে নিপুণভাবে শুধু বাঁ-হাতে ছোট বেবি ধরতে হয়—ডান হাত খালি থাকবে অন্য কাজের জন্য। এই 'ফুটবল হোল্ড'-এ ছোট্ট টুকে ধরে দৌড়ে দৌড়ে কাজ করেছি, কলিং বেল বাজলে দরজা খুলেছি, টেলিফোন বাজলে টেলিফোন ধরেছি—অবশেষে য়ুরোপে দেশে-দেশে ঘুরেছি। আর মনে মনে ভেবেছি ফুটবল হোল্ড-এর জয় হোক।

'বস্টন লাইং-ইন'-এর আইনকানুন কঠোর। চৌদ্দ বছরের নীচে কারু প্রবেশাধিকার নেই। অতএব বুর সঙ্গে দীর্ঘ বিরহ কঠিনচিত্তে সহ্য করলাম। আরো আছে—স্বামী, মা, শাশুড়ী ইত্যাদি ওদের আইনানুসারে নিকটতম স্বজনেরা ছাড়া প্রথম কয়েকদিন আর কারু আসার হুকুম নেই। সেখানে নিকট আত্মীয় আর ম্যানুফ্যাক্চার করব কি করে। আর কর্তব্যপরায়ণ 'শ' অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত। যদিও কর্মস্থলে ওকে নিবিষ্টচিত্তে কাজ করতে দেখলেই ওর বস্ নিউহাউসার ডেকে বলতেন—ডোণ্ট ডেজার্ট ইয়োর ওয়াইফ এ্যাট দিস্ আওয়ার। এই দুঃসময়ে স্ত্রীকে পরিত্যাগ কোর না যেন।

এদিকে হাসপাতালশুদ্ধ লোক আমার মন ভাল রাখার ভার নিয়ে বসে আছে। এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি হয়ত, হয়ত মনে পড়ে গেছে কলকাতার কথা, সকালের ডাকে-আসা মার চিঠিখানা হাতে নিয়ে উদাস হয়ে চেয়ে আছি জানালার বাইরে। টক্-টক্ আওয়াজে চমকে উঠলাম। পাশের কেবিনের প্রতিবেশিনী মার্গারেট নক্ করছে কাঁচের পার্টিশনের গায়ে। আমি মুখ তুলতেই হেসে বললে, ডোন্ট ব্রুড (don't brood)। একটু পরেই নার্স এসে মস্ত এক ফুলের তোড়া বসিয়ে দিয়ে গেল। বললে, পাশের ঘর থেকে পাঠিয়েছেন তোমার মন ভাল থাকবে বলে। আমার ডাক্তার ডাঃ ব্রায়ান লিটল রোজ সকালে একবার দেখা দিয়ে যান। সংকটজনক মুহূর্তগুলোতে সবসময় শয্যাপাশে ছিলেন ডাক্তার। মাঝে-মাঝে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—থিংক্ অফ ইণ্ডিয়া মিসেস বোস, থিংক্ অফ্ দি বিউটিফুল হিমালয়াজ। ডাক্তার-নার্স সকলে সজাগ বিদেশিনীর প্রতি সৌজন্যে ত্রুটি না ঘটে।

হ্যারিয়েট এসে উপস্থিত হল এরই মধ্যে একদিন হৈ-চৈ

করতে করতে—কই আমার বোনঝি কোথায়, where is my niece ?

ওকে দেখে অবাক হলাম, এ কি তুমি এলে কি করে ?

হ্যারিয়েট বললে, কেন রিসেপশনে যখন জিজ্ঞেস করল পেশেন্ট তোমার কে হয়, তৎক্ষণাৎ বললাম আমার সিস্টার, আমার বোন হয়। কেন, সত্যি কথাই বলি নি কি ?

সকলেই দেখা করতে আসছে হাতে সামান্য কিছু উপহার। হ্যারিয়েটকে বললাম তোমরা আরম্ভ করেছ কি ?

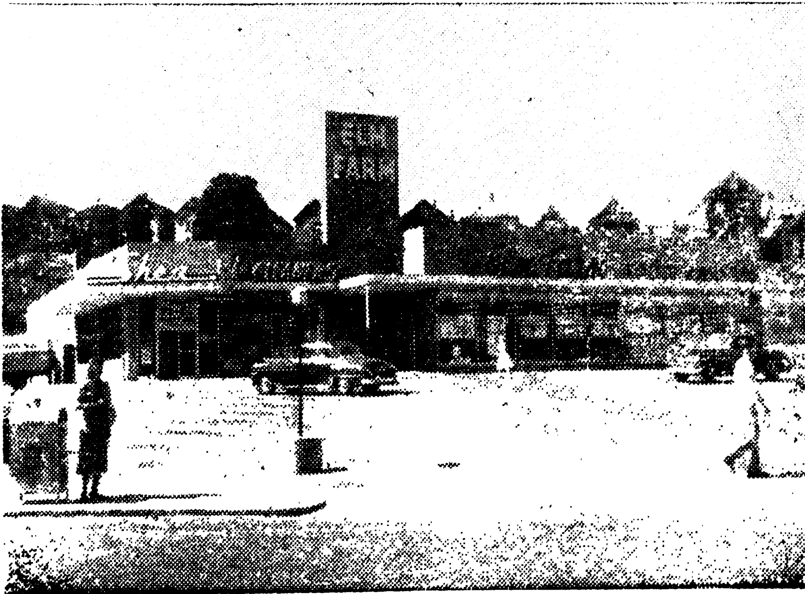
ও বললে, আমাদের একটু করতে দাও, বস্টন লাইং-ইন-এ রোজ একটি করে ভারতীয় শিশু তো আর জন্মায় না।

আমার গ্লোরিয়াস উইক এণ্ড ঘরে বসে কাটলেও বু'র কিন্তু তা কাটছিল না, সে তার আমেরিকান আন্টির সঙ্গে বস্টনের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার অনুপস্থিতিতে মিসেস ওয়েলজ তার ভার নিয়েছিলেন। তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য কখনো নিউটনের প্লে-গ্রাউণ্ডে ছুটছেন, কখনো সালেমের সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাচ্ছেন। যে সময় উনি রোগা হবার সাধনায় ব্যস্ত ছিলেন আর কোথাও না হলে অন্তত slenderizing salonতেই চলে গেলেন ওকে নিয়ে। দিনান্তে হাসপাতালের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠত সারাদিনের সব খবর আমাকে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

ধন্যবাদ দেবার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করে লাভ হত না। ধমকে উঠতেন, হয়েছে আর পাকামো করতে হবে না। তবু তো তুমি দুর্ভাবনা করা ছাড়বে না ওর জন্য। ওর বৃদ্ধা মা মিসেস ওয়েম্বলারের সঙ্গে ট্রেনের সেই দৈবাৎ আলাপ মনে পড়ে যেত—'ওরা কত খুশি হবে তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারলে।' মানুষের শুভেচ্ছার দাম অনেক। কোথায় নতুন দিল্লীর সেই বাউল-পরিবার আর সেনেরা যারা বারবারাকে দূর প্রবাসে অনেক আদর করেছিল তাদের সেই পুণ্যের ফল ভোগ করছি আমি বস্টনে বসে।

আন্টির সংখ্যা অগণিত হয়ে যাওয়াতে বু' করে থেকে যেন ওকে ডাকতে সুরু করেছিল 'নতুন আন্টি', মানেটা বুঝে নিয়ে মহা খুশি হয়ে উঠলেন মিসেস ওয়েলজ। বললেন, হাউ রোমান্টিক।

[আগামীবারে নিউ ইংলণ্ড সামার।



● বস্টনের একটি সুপার মার্কেট



দাম ৬·০০



এই অসামান্য গ্রন্থটি
প্রকাশ করেছেন



আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯

অদ্যাবধি
১১টি মুদ্রণে
মোট
৪১৫০০
কপি
মুদ্রিত
হয়েছে

প্রথম মুদ্রণ (বৈশাখ ১৩৬২) ১১০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ (ভাদ্র ১৩৬২) ৩২০০
তৃতীয় মুদ্রণ (বৈশাখ ১৩৬৩) ৪২০০
চতুর্থ মুদ্রণ (পৌষ ১৩৬৩) ৫২০০
পঞ্চম মুদ্রণ (মাঘ ১৩৬৪) ৩২০০
ষষ্ঠ মুদ্রণ (মাঘ ১৩৬৫) ৩৩০০
সপ্তম মুদ্রণ (মাঘ ১৩৬৬) ৬৩০০
অষ্টম মুদ্রণ (মাঘ ১৩৬৭) ৩৩০০
নবম মুদ্রণ (মাঘ ১৩৬৮) ৩২০০
দশম মুদ্রণ (আশ্বিন ১৩৬৯) ৫২০০
একাদশ মুদ্রণ (মাঘ ১৩৭০) ৫২০০



(জলরঙ)

বাউল

—নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

রেভারেণ্ড মাদার ইমান্যুয়েলের সনির্বন্ধ অনুরোধটা আর একবার পড়তে বিবেক তাকে সেদিন সন্ধ্যায় বহুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখল বুলেটিন বোর্ডটার সামনে। সব নানদের প্রতি তাঁর মিনতি, তারা যেন কেউ জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করে। নিজেকে স্তোক দিচ্ছে নিজে এটা অনুরোধ মাত্র, নিষিদ্ধ বলা হয় নি কোথাও। কিন্তু নানের কাছে সুপিরিয়রের ইচ্ছাই আইন। চারপাশে যারা রয়েছে, তারা কেউ কি এ ইচ্ছা লঙ্ঘন করেছে তার মত? অবশ্য করেছে কি না তাও জানা যাবে না কোনদিন, গুপ্ত আন্দোলন ঠিক কনফেসানালের মতই চিরাবৃত।··· এখন থেকে যা করব আমি সে থাকবে কেবল আমার আর ভগবানের মধ্যে।

মিত্রশক্তির অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন দল বেলজিয়ামের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। গোপন আন্দোলনকারীরা লুকিয়ে রেখেছে তাদের, চেষ্টা করছে গোপনে বার করে দিতে। যেদিন এমনি এক বৃটিশ পলায়নকারী হাসপাতালে আসতে সেই প্রিস্টটি যে প্রাইভেট রুমটায় ছিলেন সেই ঘরে থাকতে দিল, সেইদিনই জীবনের প্রথম জার্মানের সংগে মুখোমুখি দেখা হ'ল তার।

সেই পরিচিত মধ্যস্থ—এখন আর প্রিস্টের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেন না তিনি—টেলিফোনে তাকে বলেছিলেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এক প্যাকেট সিগারেট পাবেন সিস্টার—বৃটিশ মার্কা। একটা রাতের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

ফয়েতে অনেকগুলো স্ট্রেচার ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, সেখানে অনেক কাজ করবার ছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সেই 'সিগারেটের প্যাকেট' এল। চাষীর মোটা পোশাক পরনে, বোনা টুপি একটা মাথায়, অভিজ্ঞ হাতে বাঁধা মাথার ব্যানডেজের ওপর টুপিটা হেলিয়ে পরা।

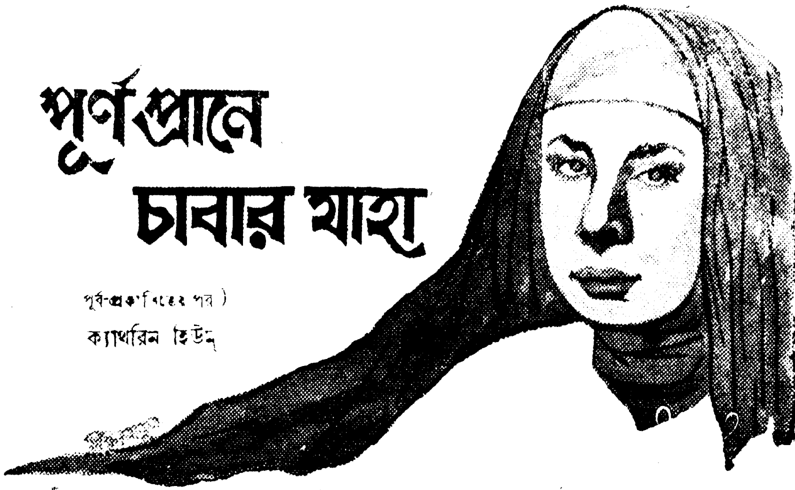
পথ দেখিয়ে ওপর তলায় টি-বি উইংয়ের দিকে নিয়ে যেতে যেতে চুপিচুপি ইংরেজীতে বলল, কাসুন।

ভদ্রলোক এমনই কাসছেন যে সারা ফয়ে শুনতে পাবে তার শব্দ। সেই প্রাইভেট রুমে অন্য নার্সদেরও অজ্ঞাতে চুপিসাড়ে ঢুকিয়ে দিল যখন তাঁকে, ভেসপারের ঘণ্টা বাজছে তখন।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, এখানে আপনায় বন্ধ করে যাচ্ছি, খাবার পরে এনে দেব।

চ্যাপেলে উপাসনায় বসে বসে ভাবল কি ভাবে রাত্তিরের মত ঘরটাকে ইন্সপেকসন্ থেকে বাঁচান যায়। খাবার দেবার পর দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে ফরমাল ডি-হাইড যন্ত্রটা এনে দাঁড় করিয়ে রাখবে দরজার বাইরে—কোন রোগীর মৃত্যুর পর যেন বাষ্পপ্রয়োগে পরিস্রুত করা হচ্ছে ঘরখানা। এ-দৃশ্য তার উইংয়ে চোখ-সওয়া। আটকাবার কাজে লাগাতে অফিসঘরে তার সরু সরু ফালি করে কাটা খবরের কাগজের গোছা রেখে দিয়েছে, আর আঠার বদলে একবাটি ময়দা গোলা লেই। যে জিনিস কোন নান নিজের বুদ্ধিতে করে নিতে পারে পয়সা খরচ করে সে জিনিস কোনদিনই কেনে না তার দারিদ্র্য-ব্রতী কনগ্রেগেশন।

প্রার্থনার শেষ গানটি গাইছে যখন নানরা, সিস্টার লুক আড়চোখে দেখল পোর্টার এসে মাদার ডিডাইমার ডেস্কের ওপর একটুকরো কাগজ রাখল। দেখেই বুকটা ধক্ করে উঠল, বুঝতে বাকি নেই জার্মানরা হাসপাতালে এসেছে। পোর্টারকে এভাবে জোর করে উপাসনার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পাঠাতে এক ঐ গর্বোদ্ধত বিজেতারাই পারে।



রোগীদের কারো জন্য অত্যধিক উদ্বিগ্ন থাকলেই একমাত্র মাদার ডিডাইমা উপাসনা শেষ হবার আগেই চ্যাপেল ছেড়ে যান। আজ ব্যস্ত হয়ে তখনই উঠে পড়লেন যখন তার সংগে চোখোচোখি হয়ে গেল।…চোখের ভাষায় বিপদের সংকেত।

মুহূর্ত-পরে সিস্টার লুক উঠে দাঁড়াল। নিয়মানুগ পথে বেরোতে হলে অনেকটা সময় যাবে, সবে ছোট সিস্টারেরা যেতে শুরু করেছে। স্যাক্রিসটির ছোট পথটা পেয়ে পাশ দিয়ে চলে এল। অপেক্ষা করার সময় নেই যোটে।

দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে এল। অফিস থেকে কাগজের ফালি আর আঠার বাটিটা নিয়ে এসেছে। পাশের ছোট ঘর থেকে মেসিনটা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসে এ ঘরটার বন্ধ দরজার চাবির ফুটো দিয়ে তার নলটা গুঁজে দিল। ফালিগুলো আঁটতে শুরু করল, তারপর ফাঁকগুলো বন্ধ করতে হবে। নীচের তলার যে ওয়ার্ডগুলো আগে দেখবে ওরা, গুণে দেখছে মনে মনে। সার্জারি। মেটারনিটি। কণ্টেজিয়াস। তারপর আর একটা তলা উঠলেই তার ওয়ার্ড।

ময়দার আঠা শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে। জল নিয়ে এসে নরম করে নেবার সময় নেই; ওটাই তোলবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

সিঁড়িতে বুটের শব্দ শোনা গেল তারপরই মাদার ডিডাইমার কণ্ঠস্বর…এত চেঁচিয়ে কথা তিনি জীবনে বলেন না।

—ওপরে এখানে আমাদের টি-বি কেসগুলো থাকে।

সিস্টার লুক ভাবছে, তাহলে উনি জানেন। লোকটিকে ওপরে তুলে আনি যখন, এ্যাডমিশন অফিসের পাশ দিয়ে আসার সময় নিশ্চয় আমায় দেখতে পেয়েছিলেন।

আঠামাখানো কাগজ একফালি জড়িয়ে গেছে হাতে। সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আর একটা তৈরি করে দরজার ছিটকিনির কাছের ফাঁকটায় আটকাচ্ছে, ইন্সপেকসন পার্টি হলের ও প্রান্তে এসে পৌছোল। ঈশ্বরের নাম করছে মনে মনে। ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখছে—জার্মানদের মনে সহজাত একটা ভয় আছে সংক্রামক রোগে।

আড়ষ্ট ফরাসীতে একটি কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করছে, আর এটা কি?

হাতের ফালিটা হাত দিয়ে চেপে আটকে দিল—মেঝে থেকে একফুটের মধ্যে। ঘুরে চাইল তারপর। জার্মান অফিসারদ্বয়ের দিকে চেয়ে স্মিত হাসল—নানসুলভ, সুমিষ্ট। চোখ দু'টো একনিমেষে তাদের সোনালি কাজকরা টুপির ওপর থেকে ভেলভেট টিউনিকের কলারের তলায় রিবনে ঝোলানো গলায়-লাগোয়া লোহার ক্রশচিহ্ন পর্যন্ত বুলিয়ে এনে চমকে উঠল। বাধ্যভাবে সুপিরিয়রের কাছে সরে এল তারপর নিরীহভাবে ভ্রূ দু'টো একটু তুলে ইংগিতে জিজ্ঞাসা করল, কথা বলবে কি না। মাদার ডিডাইমা সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়লে।

বাবার সংগে জার্মানী বেড়াতে যাবার আগে তাঁর হুকুমে জার্মান ভাষা শিখতে হয়েছিল, সেই ভাষাটা কাজে লাগল আজ। নির্ভুল জার্মানে সিস্টার লুক জানাল তাদের, ধোঁয়া দিয়ে বীজাণু নাশ করা হচ্ছে এ ঘরে। খুব খারাপ একটা কেস ছিল, শেষ অবস্থায় রক্ত উঠেছে খুব!

বড় অফিসারটির নীল চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, মৃত্যু এসে বাঁচিয়েছে তাঁকে, ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

বিস্মিত অফিসারটি বুটপরা গোড়ালিতে গোড়ালি ঘসে স্যালুট করলেন তাকে। আমরা খুশি হলাম সিস্টার এমন বীজাণুমুক্ত করে রাখেন আপনারা ঘরগুলো। হয় তো—মাদার ডিডাইমাকে অভিবাদন করে বক্তব্যটা আয়াসসাধ্য ফরাসীতে পেশ করলেন, হয় তো এ সব ঘরগুলো আমাদের দরকার হবে এর মধ্যে, রেভারেণ্ড মাদার অনুমতি দেন যদি।

—ঘর আমাদের খালি থাকলেই আপনাদের আদেশ রাখতে পারব। মাদার ডিডাইমার মুখে একটুকরো নিস্তেজ হাসি।

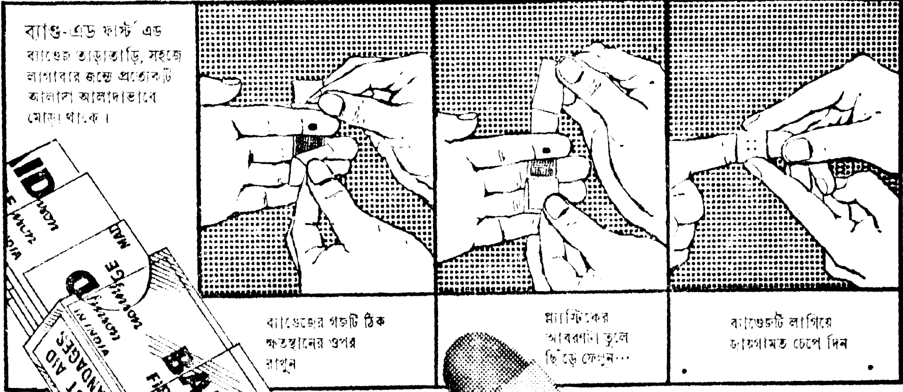
ওঁরা চলে গেছেন। সিস্টার লুকের অনেকখানি সময় লাগছে হাতের বাকি কাজটুকু শেষ করতে।

…তোমার অনুগতা ব্রাইড আর নই আমি, তবু যখনই তোমার সাহায্যের জন্যে কেঁদে উঠি তখনই সাড়া দাও তুমি। ঘৃণা করি যাদের তাদের দিকে সবলভাবে তাকাবার শক্তি তুমিই দাও আমায়, তাদেরই ভাষায় তাদের কথার উত্তর দেওয়া…অথচ সেই কোন ছেলেবেলায় শিখেছিলাম ভাষাটা, তারপর আর ভাবিও নি, চর্চাও করি নি। কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্ছ প্রভু? কি উদ্দেশ্যেই বা? বর্মের মত চোদ্দ বছরের হোলি রুল দিয়েছ তুমি আমায় আজকের এই দিনটির জন্য—এই একটি মাত্র জীবন বাঁচাতে! এই জন্যেই কি কংগোয় আমাকে ফিরিয়ে দিলে না তুমি?

শেষ ফাঁকটা বন্ধ করার আগে সেখানে মুখ রেখে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, সব ঠিক আছে। দরজা ভেজিয়ে রেখে যাব—কাল ভোর হবার আগে কাগজের ফালিগুলো ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে যেতে পারবেন। ওরা এসে পড়ার আগে খাবার আনতে পারি নি বলে দুঃখিত। রাতে আমার অফিসে এক প্যাকেট রুটি রেখে দেব—বেরোবার পথে ডানহাতি দু'নম্বর দরজাটা।

মৃদু দু'টি টোকার শব্দে উত্তর এল ভিতর থেকে। সিস্টার লুক কাগজের শেষ ফালিটা আটকাচ্ছে।

নাৎসীরা ব্যস্ত বিজিত জেলাগুলো সংগঠনে, এদিকে


ব্যাণ্ড-এড ফার্স্ট এড ব্যাণ্ডেজ তাড়াতাড়ি, সহজে লাগাবার জন্যে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে মোড়া থাকে।
ব্যাণ্ডেজের গজটি ঠিক ক্ষতস্থানের ওপর রাখুন
প্লাস্টিকের আবরণটা তুলে ছিঁড়ে ফেলুন…
ব্যাণ্ডেজটি লাগিয়ে জায়গামত চেপে দিন
BAND-AID
FIRST AID BANDAGE
WATERPROOF
MADE IN INDIA
FIRST AID BANDAGES

অনেক দৈবজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে। অদ্ভুত একটা থমথমে শান্তভাব এসেছে দেশে—অধিকাংশ বড় রাস্তা ধ্বংস হয়ে গেছে, অধিকাংশ সেতু ভেঙে পড়েছে, ফলে খবরাখবর-চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রায় সেই সামন্তযুগীয় অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে। আর দৈবজ্ঞের দল ঘুরে ঘুরে বেড়ায় একটা ফ্রান্সের ম্যাপ আর একটা চেনে আটকানো পেণ্ডুলাম নিয়ে। ম্যাপটার এক একটা শহরের ওপর পেণ্ডুলামটা ঝোলায় ওরা, যেখানে সেটা ঘুরতে থাকে সেইখানে ওরা বলে তোমার হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজন আছে।

সিস্টার লুক লক্ষ্য করে দেখেছে ছাত্রীদের মধ্যে কেবল লিজার কোন কৌতূহল নেই দৈবজ্ঞদের বিষয়। একি জাদুবিদ্যার প্রতি নানদের মনোভাবের অনুকরণ? নাকি গুপ্ত সমিতির সংগে মেয়েটির সংযোগ এতই হয় যে আত্মীয়রা কোথায় আছে কেমন আছে জানতে পেরেছে তার মাধ্যমে, তাই নিশ্চিন্ত? লিজার ভাব দেখে মনে হবে না এই ক্লিষ্ট টি-বি ওয়ার্ডের বাইরে অন্য কোন জগৎ আছে তার।

প্রথম যেদিন দৈবজ্ঞ এল হাসপাতালের রোগীদের আত্মীয়দের সন্ধান বলে দেবার প্রস্তাব নিয়ে আধবয়সী স্ত্রীলোক একজন—নানরা তাঁকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিলেন, নিজেরা সেদিকে না তাকাবার ভাণ করলেন।

রোগীদের বিস্ময়-ভাবোচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে সিস্টার লুক চেয়ে দেখতে শুরু করেছে একসময়। ওরা চেঁচিয়ে উঠছে উত্তেজনায়, নিজেরাই নানা যুক্তির অবতারণা করছে।··· ছোট পেণ্ডুলামটা ফ্রান্সের ম্যাপের ওপর দিয়ে শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

সিস্টার লুক একটুকরো কাগজে ছাপার হরফে লিখল বাবার নাম, তাঁর পেশা আর পূর্ব-বাসস্থান। এক রোগীর হাতে দিয়ে বলল, একজন রোগী খুব অসুস্থ—তাঁর সংগে দেখা করা যাবে না।

···চুরি আর ব্যভিচার ছাড়া আর কোন পাপ বাকি রইল না আমার···

মনের অস্থিরতায় ওয়ার্ডটা একবার ঘুরে এল।

—ব্যরডো। স্ত্রীলোকটির গলা শোনা গেল।

যে রোগীটির হাতে নামটা লিখে দিয়েছিল সে চেঁচিয়ে উঠল, দেখুন সিস্টার, কি জোরে ঘুরছে—

বেডের কাছে এল সে দেখবে বলে। ওষ্ঠপ্রান্তে সূক্ষ্ম একটু অবজ্ঞার হাসি বুকের ধক্‌ধক্ শব্দটা ঢেকে রেখেছে। ভাবছে, বাবা তো পৌছে গিয়ে থাকতেও পারেন। হঠাৎ হয় তো বেরিয়ে পড়েছেন মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির ছোট কালো ব্যাগ আর হাল্কা পাথরের পাইপটা সম্বল করে।··· আগে থেকে সাবধান হতে পেরে থাকলেও জামা-কাপড়ের স্যুটকেশ একটা কেবল সংগে নিয়ে থাকেন যদি তো ঢের।

···স্যানাটোরিয়াম ছেড়ে যেতে কত কষ্ট হয়েছে না-জানি! আর যেসব স্পেশাল কেসগুলো নিয়ে কত বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন!···পিসিমা কিন্তু কখনই সংগে যান নি। ওঁর ভয়-ডর নেই। এখানেই থেকে বরং বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র আগলে রাখবেন, কবে তাঁর ভাই ফিরে আসবেন সেই আশায়। ভাই উপাস্য দেবতা তাঁর।···

বাবা নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছেছেন—চিন্তাটা তখনকার মত ভারি একটা স্বস্তি এনেছিল।

সন্ধ্যায় চ্যাপেলে বসে অল্টারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে প্রথম মনে হল এ পাদপদ্মে বিশ্বাস না রেখে কি করে নির্বোধের মত একটা ভণ্ডের ফাঁদে পড়েছিল!

একদিন লিজা চোখের ইংগিতে ইসারা করল তাকে। সিস্টার লুক ওয়ার্ড থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে ট্রিটমেণ্ট-রুমে অপেক্ষা করতে লাগল তার জন্য। মেয়েটি এল হাতে একটা ওষুধ-পত্রের ট্রে নিয়ে।

চুপিচুপি বলল, শুনছি জার্মানরা আজ রাতে আবার আসবে সিস্টার। বিলি করবার জন্যে এক প্যাকেট খবরের কাগজ আছে আমার কাছে। কালকের আগে কোন ব্যবস্থাই করতে পারব না সেগুলোর। তাই সিস্টার—

দু'চোখে মিনতি ঝরে পড়ল লিজার। সে রাতে দ্বিতীয় শিফ্‌ট আছে সিস্টার লুকের—সাড়ে এগারোটা থেকে পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত। লিজা জেনেছে যেই তখন থেকে গুপ্ত খবরের কাগজের মোড়কটা তারই ডেস্কে আছে।

ডেস্কে বসে সিস্টার লুক ভাণ করছে ঐ নিষিদ্ধ পত্রিকাগুলো তার বাঁ-দিকের দ্বিতীয় ড্রয়ারে নেই যেন। স্যালভের পর থেকে এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে সে, প্রথম শিফটের নান তারপর বালিশে মৃদু আকর্ষণ করে জাগিয়ে দিয়েছে তাকে। সে উঠতে একটা চকোলেট-বার দিল তার হাতে। সুপিরিয়র পাঠিয়ে দিয়েছেন তার জন্য—দ্বিতীয় শিফ্‌টের ডিউটির আগে সে খাবে বলে। মন্থর এই নিশীথে ডিউটির আগে কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত, প্রভাতের ম্যাস পর্যন্ত উপবাসী থাকতে হয় নানদের, খাবার ছেড়ে জল অবধি খাওয়া চলবে না। এই যুদ্ধের সময় মাদার ডিভাইনা কি করে এসব বিলাস-দ্রব্য যোগাড় করেন, নাইট-নার্সদের জন্য, অবাক লাগে ভাবতে।

সুইশ চকোলেটের মোড়কটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, ওপরের সোনালী হরফের ছাপাগুলো পড়ল সব গন্ধটা দেখল একবার আঘ্রাণ করে। কাল কোন লণ্ড্রী-নানকে এটা দিয়ে দেবে। তাদের নাইট-ডিউটিও থাকে না, চকোলেট-বারও চোখে দেখে নি তারা।

এই সব টুকিটাকি এটা-সেটা ভাবছে ঐ ড্রয়ারটা যাতে

খুলে না ফেলে তাই। সরিয়ে রাখছে মনকে। মাদার ইমাকুয়েলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও-সব পত্রিকা তাঁর নানরা যেন না পড়ে।

ড্রয়ারটা খুলল তখনই। সুতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া ছাপানো কাগজ, চোখ নামিয়ে দেখছে চেয়ে-চেয়ে। সামনেই যে খবরটা তাতে তারিখ আছে, ২৩শে জুন, ১৯৪০। বলা হয়েছে, সেইদিন ছ'টা পনেরো মিনিটে ফরাসীরা নাৎসীদের সংগে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করল। ছ'ঘণ্টা পর থেকে কার্যকরী হবে সেটা। এ আত্মসমর্পণ ঘোষণার মুহূর্তে ব্যরডোর আশি কিলোমিটারের মধ্যে এগিয়ে এসেছে জার্মানরা।

বাঁধা সুতোর মধ্যে থেকে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে সমস্ত খবরটা পড়ে ফেলল।

পরপৃষ্ঠায় হল্যাণ্ড থেকে সুইডেনের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত জার্মান সিগফ্রেড লাইনের ওপর ছোট লেখা রয়েছে একটা—মিত্রশক্তির বোমা বর্ষণ চলছে সে অঞ্চলে। সেই সংগে বেলজিয়ানদের প্রতি সাবধানবাণী—জার্মানীর অভ্যন্তরে কোন কাজের চুক্তি তারা না করে যেন, বিশেষত টড-পরিকল্পনা নামে লোক সংগ্রহের যে কর্মসূচী চলছে, তাতে।

ম্যালিন্সের আর্চবিশপ আর বেলজিয়ামের প্রাইমেটের একটা প্রবন্ধে নাৎসীরা ইতিমধ্যেই বেলজিয়ামে যে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় নির্যাতন আরম্ভ করেছে তার নিন্দা করা হয়েছে। তারই তলায় কার্ডিনালকে লেখা পোপের চিঠি। হোলি ফাদার তাতে এই দখল আর নির্যাতনের বিভীষিকার কথা বলেছেন, তাঁদের ক্ষুদ্র বীর দেশটির উৎপীড়নের কথা বলেছেন। 'ইতোমধ্যেই পোপের অনেকগুলি ক্ষমতা কার্ডিনালকে দেওয়া হইয়াছে, তিনি এই অধিকৃত দেশে থাকিবেন…'

পাতার নীচের দিকে বক্স-করা একটা খবরে চোখ পড়ে গেল। একদল উদ্বাস্তু বেলজিয়াম ছেড়ে যাচ্ছিল ফ্রান্সের দিকে। পথের মাঝে মেশিনগান আক্রমণের মুখে পড়ল দলটা। কাছাকাছি ডিচের দিকে ছুটল সবাই, কিন্তু দলের মধ্যে বেলজিয়ামের সুবিখ্যাত এক ডাক্তার ছিলেন তিনি গেলেন না কোনমতেই। পথের পাশে মাঠে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আহতদের ফার্স্ট-এড না দিয়ে নিজে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটে যেতে অস্বীকার করলেন। তারপর অনাবৃত মস্তকে সেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে মৃতদের জন্য প্রার্থনাস্তোত্র আবৃত্তি করলেন তিনি—নির্ভীক, উন্নতশির! ডিচের দিকে চলতে শুরু করেছেন যখন, গুলী লাগল তাঁর দেহে। 'পরে আমরা তাঁর দেহ ডিচের মধ্যে নিয়ে এসেছি আর তাঁর জামা থেকে অর্ডার অব লিওপোল্ডের রোজেটটি খুলে রেখে দিয়েছি। তাঁর ছেলে এন্টনি ভ্যান ডি মাল যদি যোগাযোগ করেন আমাদের সংগে রিবনটি তাঁর হাতে দিয়ে দেব আমরা…'

বেদনায় সমস্ত দেহটা শক্ত হয়ে উঠেছে…দু'চোখ ছাপিয়ে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমে। ঐটুকুই যা, না হলে হিমায়িত বহিরাকৃতির তলায় বেদনার আলোড়ন চাপাই রইল, অতর্কিতে এতটুকু অস্ফুট কাতরোক্তিও প্রকাশ পেল না।

বহুক্ষণ সিস্টার লুক কাগজখানা শক্ত করে ধরে বসে রইল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ কানে এল একসময়…নানের স্লিপারের বিক্ষুব্ধ শব্দ…ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে অনেকগুলো ভারী বুটের আগে আগে। পোর্ট্রেস অফিসে ঢুকতেই ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে দিল কাগজখানা।

—দু'জন জার্মান সিস্টার…দ্বার দেখছেন…

গেস্টাপোর লোকরা বাইরে দাঁড়িয়ে। জানাল ব্ল্যাক আউট ইন্সপেকশনে এসেছে তারা। তার ডেস্কের আলোর অনুজ্জ্বল বাল্‌বটা পরীক্ষা করল, অফিসের জানলার ওপরে টানা কাগজের শেডটাও।

অন্য কোন আলো আছে এ তলায়, সিস্টার?

সিস্টার লুক আঙুল তুলে ইসারায় দেখাল—তিন। করিডর দিয়ে দেখাতে নিয়ে গেল—ওয়ার্ডগুলোয় ছোট দু'টো আলো আছে, আর প্রাইভেট রুমে জ্বলছে একটা, সে ঘরে একটি মহিলাকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে।

মুষ্টিবদ্ধ হাত দু'টো স্ক্যাপুলারের মধ্যে ঢোকানো, ওদের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে সিস্টার লুক…মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকিয়ে। বয়কে ঢাকা পড়ে গেছে মুখের আধখানা, সে মুখে ঘৃণার তাণ্ডব তাই দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণীতি মুখোপাধ্যায়

কাশ্বতী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নমিতা চক্রবর্তী

তপতীর বাবা-মা, স্নমোহন মিত্র, সুকল্যাণীও রাজী হলেন না তপতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভিয়েনায় পাঠাতে। মত চাওয়া হল ডাক্তার রায়ের। তিনি জানালেন, হয়েছে এরকম কেস দু'তিনটা। ভিয়েনায় নিয়ে অপারেশন সাকসেসফুল, কিন্তু স্বজনরা ফিরিয়ে আনতে পারে নি রোগীকে।

সারারাত পায়চারি করে কাটালো ভাস্কর। বাঁচবে না তপতী। ভিয়েনার অপারেশনও তাকে বাঁচাতে পারবে না, কিন্তু তবু একটা লড়াই দেবে না ভাস্কর? মৃত্যু কোথায় লুকিয়ে থাকে চোরের মত, আঁধারের গুপ্ত গুহায়! একবার দেখা মিলতো, ভাস্কর মুখোমুখি দাঁড়াতো তার। বাধ্য করত হিংস্র হাত গুটিয়ে নিতে। কত কম সময়, মাত্র একটি বছর, তপতী এসেছে তার কাছে। এখনো তার অধর হতে মিলায় নি যে ভাস্করের প্রথম স্পর্শ, এরি মধ্যে মৃত্যু তাকে অধিকার করে নিল! অনুচ্চারিত আর্তনাদ যন্ত্রণায় ভরে দিল ভাস্করের হৃদয়।

'খোকা, একটু শুবি চল। নার্স বলছে এখন ঘুমুচ্ছে তপতী।'

সুকল্যাণী এসে দাঁড়াল ছেলের কাছে। রক্তের মত লাল ভাস্করের চোখ, কাজলের ঘনরেখা তার তলায়।

'আমি একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি মা।' হাসলো ভাস্কর। রাহুগ্রাসের সময় এমনি হাসে বাঁকা সূর্য। মায়ের চোখে জল এল। সবাই লুকোতে চাইছে আপনাকে; তপতী, ভাস্কর, সে নিজেও। কেউ কাউকে দুঃখ দিতে চায় না, কিন্তু দুঃখ যে দরজায় এসে গিয়েছে।

নীচে থেকে উত্তেজিত পায়ে উঠে এল শশী।

—'দাদা, লিলি দিদিমণি এসেছেন!'

—'এত রাতে? ক'টা বেজেছে? বারোটা? ও! খবর এসেছে হয়তো। মা, চল নীচে।'

অস্থির পায়ে ঘুরছিল লিলি।

—'কেবল এসেছে ভাস্কর। ডক্টর হেরেনবর্গ কাল সকালে ছ'টার প্লেনে এসে পৌঁছাবেন। এগারোটায় অপারেশন।'

—'এত রাতে এলে কেন লিলি, ফোন করলে পারতে।'

একটু হেসে বললো ভাস্কর। লিলি চেয়ে রইল তার দিকে। অদ্ভুত লাগছে ভাস্করকে। ইচ্ছা হয়, তার প্রাণটা দীর্ঘ নখে খুঁটে বের করে নিয়ে এসে দেখে সেটার চেহারা। ভাস্করের জীবন চলে যাচ্ছে, তার শরীরময় জেগেছে সেই চিহ্ন, কিন্তু তাতে কোন চঞ্চলতার প্রকাশ নেই। এ স্থৈর্য দেখাও বড় ভয়ানক ব্যাপার। মাঝে মাঝে তীব্র ইচ্ছা হয় লিলির, সে চীৎকার করে উঠবে, জোরে ঝাঁকুনি দেবে ভাস্করকে, বলবে—তোমার তপতী যে চলে যাচ্ছে। তুমি চেঁচাও, ছটফট কর, অভিশাপ দাও ভগবানকে।

তপতীর অসুখটা জানবার পর হতে, তার আর বাঁচবার আশা নেই বুঝে পাগল হয়ে উঠেছে লিলি। পারলে বুঝি সে নিজের দেহে গ্রহণ করতো তপতীর ব্যাধি। ডক্টর হেরেনবর্গকে আনাবার মূলে সেই। প্রবীর তার সব চেষ্টা, পরিচয় দিয়ে ডাক্তারকে আনা সম্ভব করেছে।

ডক্টর সেনের নার্সিং হোম। লিলি এমন করে ঘরটি গুছিয়েছে যে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, কে যেন তপতীর শোবার ঘরটিই তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে। বেলা সাতটায় তপতীকে নার্সিং হোমে নিয়ে আসা হল। বেশি অনিচ্ছা প্রকাশ করবার শক্তি আর তার নেই, আর বোধ হয় ভাস্করকে কষ্ট দেবে না বলেই একটুও আপত্তি করলো না সে। দু'টি বেণী বেঁধে ধানী রং-এর শাড়িটি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধক্ করে উঠলো ভাস্করের বুক—অবিকল কুমারী তপতী, কেবল মুখটি একটু শীর্ণ আর জীবনের আলোভরা চোখ দু'টি ম্লান।

প্রাথমিক ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ডাঃ সেন। হেরেনবর্গ আসবার পর চলতে লাগলো তাঁর নির্দেশমত নান

আয়োজন। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো সময়। দশটা, এরই মধ্যে সাড়ে দশটা? এগারোটা। অপারেশন থিয়েটারে নেবার আগে তপতী কাছে ডাকলো ভাস্করকে, দু'টি ক্ষীণ হাতে জড়িয়ে নিল স্বামীর কণ্ঠ।

—'আমি, আমি আবার আসব তোমার কাছে। আমায় ভুলবে না তো, চিনতে পারবে তো?' আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো তপতী।

—'পারবো।' দৃঢ় শোনাল ভাস্করের কণ্ঠ। একটুও সে ভোলাবার চেষ্টা করলো না তপতীকে।

—'কখনো, কোনদিন তোমায় ভুলবো না। ঠিক চিনে নেব আবার সবার মধ্য হতে।' গলা পরিষ্কার করল ভাস্কর।

—'তোমার ইচ্ছা না হলে, থাক অপারেশন, সোনা।'

—'না, না। হোক অপারেশন। বাঁচতেও তো পারি, কি বল?'

—'পারো'। এবার মিথ্যা আশ্বাস দিল ভাস্কর মৃত্যু-পথযাত্রীকে। 'নিশ্চয় বাঁচবে। ভাল হয়ে যাবে তুমি।'

দু' হাতে তুলে নিল মুখখানি, আচ্ছন্ন করল অজস্র চুম্বনে। উঃ! এমনি, এমনি করে যদি থাকা যেত অনন্তকাল।

ডাক্তার প্রস্তুত। আর সময় নেই। স্ট্রেচার চললো। পাশে পাশে হাঁটা লিলির মরার মুখের মত ফ্যাকাসে ঠোঁটের দিকে চেয়ে হাসল তপতী।

—'রং নেই কেন?'

দু'দিন অচৈতন্য থেকে প্রাণত্যাগ করল তপতী। অপারেশন না হলে আরো কয়েক মাস হয়তো বাঁচত সে। অপারেশন অবধারিত মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে দিল মাত্র। তাই চাইছিল ভাস্কর। যে যন্ত্রণা পাচ্ছিল তপতী, তার সময় দীর্ঘ হোক, এমন ইচ্ছা একবারও করে নি সে।

সন্ধ্যার আকাশে এককালি তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে, পৃথিবীর মুখ পাণ্ডুর। সবেমাত্র বইতে শুরু করেছে সমুদ্র থেকে ভেসে-আসা বৈশাখী বাতাস, বকুল ফুল একটি দু'টি ঝরছে ফুটপাথে—তপতীর চোখ খুলে গেল, একবার চাইলো চারদিকে, বুঝি বলতে চাইলো কোন কথা—তারপর সব শেষ। আকাশে তখন পূরবীর পর বাগেশ্রীর লগ্ন শুরু হয়েছে।

ভাস্কর তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়াল, দেখল সেই পরমপ্রিয় মুদ্রিত চোখ দু'টি, তারপর পরাজিত সৈনিক তপতীর বিছানার উপর ভেঙ্গে পড়ে আনত হোল বিজয়ী মৃত্যুর পায়ে। হাহাকার করে কেঁদে উঠলো স্বজন, মীনাক্ষী বুক দিয়ে জড়িয়ে নিল তপতীর হিম-শীতল কপালটি। লিলি দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। এক'দিন সে খায় নি, ঘুমায় নি। একনিমেষের জন্য নড়ে নি তপতীর পাশ ছেড়ে। সতর্কদৃষ্টিতে অতন্দ্র হয়ে পাহারা দিয়েছে প্রতিটি মুহূর্তকে। এতক্ষণে ছুটি নিল, পালালো ছুটে।

বের করে আনা হল তপতীর মস্ত খাট। ফুলের মালায়, বেনারসীতে সেজে বিদায় নিল তপতী। ভাস্কর তুলে দিল কপালের লুটিয়ে-পড়া চুলের গুছিটি, ঢেকে দিল ঠাণ্ডা হাত দু'টি শাড়ির আঁচলে।

সবাই দেখছিল ভাস্করের দৃঢ়তা। একটুও ভেঙ্গে পড়ে নি সে তপতীর মৃত্যুতে। ওর চোখ দিয়ে জল পড়লো না, কিন্তু স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো নিজের বন্ধ ঘরে। নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ভেবে প্রথমে তেমন ব্যস্ত হন নি কেউ, তবে তিন মাস কেটে যাবার পর অস্থির হলেন বাবা-মা, উদ্বিগ্ন হোল বন্ধুরা। তপতীর সমস্ত চিহ্ন ভাস্করের ঘর ভরে আছে তখনো, থাকুক আরো কিছুকাল, কিন্তু ছেলের এই মৃত্যু-গহনে নিমজ্জন সহ্য হল না বাপ-মায়ের। নানা উপলক্ষ তাঁরা তৈরি করতে লাগলেন ভাস্করকে বাইরে আনবার জন্য। সবচেয়ে ভাল উপলক্ষ এল প্রবীরের বিয়ের রূপে।

এতদিনে সব বাধা দূর হয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে দু'পক্ষের মুখ। লিলিই দিয়েছে সব বাধা দূর করে। হলদে চিঠি হাতে, ভাস্করের বন্ধ দরজার ওপারে এসে দাঁড়াল মীরা। চোখের জলে দাবী জানাল—দরজা খুলতে হবে।

অবাক হল ভাস্কর দরজা খুলে। ঘরের মধ্যে, বুকের মধ্যে যখন গ্রীষ্মের দারুণ জ্বালা, কখন এসেছে পৃথিবীতে শ্রাবণের শ্যাম-সমারোহ! কালো চোখের কালো চুলের, কালো মেয়েটি স্নিগ্ধ করে দিল তাকে। মনে হল, বুঝি মীরার পাশে চাইলেই দেখা দেবে—বেণী-দুলানো কুমারী তপতীও।

—'ব্যাপার কি?' হাসলো কতদিন পর ভাস্কর।

—'দিদির বিয়ে। যেতেই হবে।' মৃদুকণ্ঠ মীরার।

—'জয়ন্তীর বিয়ে!' মনে পড়লো তপতীর কত আগ্রহ ছিল এ বিয়ের জন্য।

—'বিয়ে একেবারে ঠিকঠাক? বাঃ! মা-বাবা, মিঃ বোস্—সবাই খুশি?'

—'সব খুশি। লিলি সব করেছে।'

—'লিলি? নাঃ, লিলি একেবারে বাহাদুর মেয়ে! কি বল মা?'

ভাস্করের স্বাভাবিক কথায় শান্তি পেল সুকল্যাণী। মনে জেগে উঠতে চাইলো একটি ক্ষীণ আশা।

—'ভাল, খুব ভাল মেয়ে লিলি—।'

থেমে গেল মা। লিলির ভালত্বের যে উদাহরণ হাতে আছে, তা আর ভাষায় প্রকাশ করতে চাইলো না। ভাস্কর কিন্তু থেমে রইল না—'তপতীর অসুখের সময় যা করেছে লিলি। আমি তো বসেই ছিলাম হাত-পা গুটিয়ে।'

ভিজে গেল সুকল্যাণীর চোখ। মীরার অশ্রু ঝরলো টপটপ করে।

ভাস্কর বেরিয়ে এলো তার মৃত্যুশয়ন ছেড়ে। আটাশ বছরের সুস্থ জীবন কেবল স্মৃতি লালন করে বেঁচে থাকতে পারে কি! অফিসে, ক্লাবে—সর্বত্র আবার আগের দিনের মত ছড়িয়ে পড়লো সে। লিলিই তাকে হাসালো, ধরে নিয়ে গেল জীবনের মধ্যে।

বন্ধুরা বলাবলি করল—তিন মাসের শোক ভাস্কর অর্ঘ দিয়েছে এক বছরের স্ত্রীর স্মৃতিতে। যোর ছ্যান সাফিসিয়েণ্ট। বাবা-মা খুশি হলেন। সবাই বঝালো লিলির ভবিষ্যৎ, বলল—সি ডিজার্ভস্। এ বিয়ে আগেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি যে বীণা বাজালো তপতী রায়—এককোণে থাকা, প্রায় অস্ফুট এক মেয়ে—ভাস্কর একেবারে চার্মড্। তার ফলেই মাঝখানের এই আনফরচুনেট অ্যাফেয়ার্সটা ঘটে গেল। অবশ্য বেঁচে থাকলে তপতী—এসব কথা কখনো উঠত না। বেশ ছিল রুনেট মেয়েটি।

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবের লেডী মেম্বাররা শপথ করলো—এবার লিলি বোসের রূপান্তর ঘটবে। গতবার চালে ভুল হয়েছিল, এবার আর সে ঠকবে না। নিঃসন্দেহে পরিণত হবে লিলি শান্তিনিকেতনী সংস্করণে, নয় তো তপতীর বন্ধু মীরাই দখল করে নেবে ভাস্করকে।

দেখে-শুনে কিন্তু হতাশ হতে হোল লিলির বন্ধুনীদের। সেই খাটো চুল বাড়ল না এক ইঞ্চি, নাইলনের অবকাশে প্রকটিত হতে লাগলো কটির মর্মর-শুভ্রতা। ভাস্করের স্কুটারের পিছনে বসে আবার উধাও হল না বটে, কিন্তু নাচল ফক্সট্রট্ অক্লান্ত চরণে।

ভাস্কর খুব হৈ-চৈ করল জয়ন্তীর বিয়েতে। দামী উপহার, পার্টি। অনেকদিন শোক বয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বুঝি সে। মৃতার চেয়ে জীবনের বড় যে দাবী, তাকে আর উপেক্ষা করতে পারলো না ভাস্কর লিলি তাকে সজীব করে তুললো।

ভাস্করের বাবা-মা খুব খুশি হলেন, তবু তাঁদের একবার মনে হল বড়ই তাড়াহুড়ো করে মুছে গেল ভাস্করের শোক। এখনো যেন দেখা যাচ্ছে এলোচুলের মেয়েটিকে—ভোরের আলোয়, পঙ্খের কাজকরা বারান্দায় বসে রামকেলীতে সুর বেঁধেছে। তবু দিন বসে থাকে না। সবাই নিজের কাজে লাগল, মীনাক্ষী-শৈলেন রায়ও ব্যস্ত হলেন তাঁদের জীবনে।

আবার বৈশাখ ফিরে এল চাঁপার সুবাস নিয়ে। একটি বছরের আবরণ পড়ল তপতীর স্মৃতির উপর। সেই কথাই ভাবছিল সুকল্যাণী। আজকের দিনে চলে গিয়েছে তপতী—শান্ত সুন্দর মেয়েটি। চোখে জল এলো। ভাবলো—ভাস্করের ঘরে আছে তপতীর ফটো, নিয়ে আসবে, রেখে দেবে নিজের কাছে। ওখানে ছবি থাকবার মানে তো, মনে পড়া—আর দুঃখ। লিলি খুব ভাল মেয়ে হলেও কি এতটাই পছন্দ করবে? অহরহ ভাস্করের চোখের সামনে তপতীর স্মৃতি জাগিয়ে রাখা!

লিলি? হঠাৎ যেন সচকিত হল সাত-আট মাস কেটে গেছে, ছেলের কাছ হতে কোন ইঙ্গিত এখনো পান নি মা। অবশ্য এক বছর চুপ করে থাকাই শোভন। এবার হয়তো ভাস্কর জানাবে বিয়ের কথা। আর ধুমধাম নয়। সেদিনের সমারোহের আলো আজো যেন লেগে আছে এ-বাড়িতে। এবার রেজেস্ট্রী করুক ওরা। বাড়িতে খুব বড় করে একটা পার্টি দিলেই হবে। এবার লিলির জেদে পড়েই জীবনে প্রথম গরদের ধুতি কোমরে জড়িয়েছে প্রবীর। শালগ্রাম, আগুন সাক্ষী—একেবারে সনাতন হিন্দু-বিয়ে। বোস্ সাহেবকেও পরতে হয়েছিল ধুতি। ভাল লাগছিল দেখতে। বেশ মেয়ে লিলি—কিন্তু! বড় মেমসাহেব; তবু ভাস—আর ভাল ভাগটা এত বেশি লিলির মধ্যে যে, কিন্তুটা উড়ে গেল সুকল্যাণীর মন হতে।

দরজার পর্দা সরিয়ে ছেলের ঘরে ঢুকলো মা। অনেকদিন আসা হয় নি এ ঘরে। স্বামীর শরীর

ভাল যাচ্ছে না তপতীর মৃত্যুর পর হতে, তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় সর্বদা। অনেকদিনের পুরানো চাকর শশীই দেখছে ঘরদোর। ভাস্কর নেই, বোধ হয় ঢুকেছে স্নানের ঘরে। চমকে গেল সুকল্যাণী। টেবিলে যুগল ফটো, তাতে যূথীর মালা। সুগন্ধি গুগগুলের ধোঁয়া উঠছে শ্বেতপাথরের ধূপদানটি হতে। অবাক হল সুকল্যাণী, টেবিলের উপর সাজানো তপতীর প্রসাধন, এমন কি সিঁদুরের কৌটোটি পর্যন্ত তেমনি রয়েছে। খাটের উপর পাশাপাশি দু'টো বালিশ যুগল-শয্যার সাক্ষী। রাগ হোল শশীর উপর। একটা বছর ধরে এমনি বিছানায় শুচ্ছে ভাস্কর! আর সে নিজেই বা কি! একবার লক্ষ্যও করে নি এসব!

দশটা পর্যন্ত কোনমতে ধৈর্য ধরে রইল সুকল্যাণী, ভাস্কর অফিসে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল সে—'দিন দিন তোর বুদ্ধি কোথায় যাচ্ছে শশী? কি বলে তুই এখনো খোকার বিছানায় বৌদির বালিশ রাখছিস?'

—'আমি? আমি না মা। দাদা নিজে রাখছেন বালিশ। তুলে নিলে, রাগ করে মেঝের উপর শুয়ে পড়েন। না হলে আমি কি আর বুঝি না—।' টপ টপ করে জল পড়ল শশীর চোখ হতে।

একে একে সব জেনে স্তম্ভিত হোল কল্যাণী। তপতীকে একটুও ভোলে নি ভাস্কর। তার একতিলও নড়াতে দেয় নি ঘর হতে। রোজ ফুলের মালা নিয়ে আসে, যত রাতই হোক, চুপচাপ বসে থাকবেই তপতীর ছবির কাছে একঘণ্টা। যদি ভুলের পথ বেয়ে উঠে আসে আর কোন সম্ভাবনা, তাই বুঝি ভুলবার সব উপায় বন্ধ করেছে ভাস্কর। মৃত্যুর শীতলতা হতে তপতীকে তুলে এনেছে সে, বেঁধে নিয়েছে তাকে জীবনের সঙ্গে। তপতী স্মৃতি নয়, সত্য হয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে। সে ভার বহনে শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই ভাস্করের, অব্যাহতি পাবার কামনাও নেই। জীবিত ভাস্করের সঙ্গে গাথা মৃত তপতীকে প্রত্যক্ষ করে, ভয়ে শিউরে উঠল সুকল্যাণী। এ কি করেছে ভাস্কর! যখন তারা ভেবেছে—ছেলে ভাল আছে, সব ভুলে সুখে আছে তখন যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে চলেছে সে। এখন তার কণ্ঠলগ্না নিরাবয়ব তপতীকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে কে? সুমোহনকে কিছু বলা অসম্ভব, তাঁর হার্ট ট্রাবল। অনেক ভেবে লিলিকে ফোন করলো কল্যাণী। ভরসা নেই। একটুও ভরসা নেই আর লিলির উপরও, তবু কেউ যদি কিছু করতে পারে, তবে লিলিই পারবে।

—'লিলি! এক্ষুণি একবার এসো। বড় দরকার।'

বন্ধঘরের খাটে গড়াচ্ছিল লিলি—'এক্ষুণি? বড় গরম যে মাসীমা।'

—'গরম? তা হোক, তবু এসো কষ্ট করে।'

ওদিক হতে আবেদন এল।

—'আচ্ছা, যাচ্ছি।'

দরকারটা আন্দাজ করতে করতে সাজ করল লিলি। দুপুরের উপযুক্ত সাজ—সাদা সিফন ফেনার মত লেগে রইল অঙ্গে, চিরুণীতে সংযত হল কেশগুচ্ছের চাঞ্চল্য। বাড়িকে ডিস্টার্ব না করে রাস্তা হতে ট্যাক্সি নিল লিলি। আঃ! মা না হয়ে ডাকটা হোত ছেলের, আধুনিক দুপুরাভিসারের একচ্ছত্র লিখবার ইন্‌স্পেটাস পেত নব্যকবি।

বসবার ঘরে অপেক্ষা করছিল কল্যাণী, ব্যাকুল হাতে জড়িয়ে নিল লিলিকে।

—'তোমরা আর দেরি করছো কেন লিলি?' কোন উপক্রমণিকা না করেই বললো সে।

—'কারা? কিসের দেরি?' আশ্চর্য হোল লিলি।

একটু থমকাল সুকল্যাণী কিন্তু বাধাটা পার হয়ে গেল তক্ষুণি।

—'তুমি আর ভাস্কর বিয়ে করতে দেরি করছ কেন? ওঁর শরীরটা তো ভাল যাচ্ছে না জান।' একটা যোগ্য কারণ দাঁড় করাল নিজের কথার কল্যাণী।

ধীরে ধীরে লিলির প্রসাধন-চর্চিত মুখ কালো হয়ে গেল। একবার মনে হল, বুঝি কোন উত্তর দেবে না সে। কিন্তু মায়ের উৎকণ্ঠা ঠিকই বুঝেছিল লিলি, মৃদুকণ্ঠে বললো—'আমাদের মধ্যে সে রকম কোন কথা তো হয় নি।'

—'হয় নি?' প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল সুকল্যাণীর জিজ্ঞাসা।

—'তুমি জোর করছো না কেন? তুমি তো ভালবাসো ভাস্করকে; জোর করে নিয়ে নাও তোমার প্রাপ্য।' চোখে কখনো জল দেখে নি কেউ লিলির, আজো দেখলো না কল্যাণী।

মনে মনে বলল লিলি—আমি তো ভালবাসি, কিন্তু ভাস্কর? মুখে বললো—'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ও তো ভালই আছে।'

—'ভাল আছে?' সব ধৈর্য হারালো কল্যাণী যা বলতে চায় নি, তাই দেখাল। হাত ধরে নিয়ে এলো লিলিকে ভাস্করের ঘরে। তার মত লিলিও চমকে গেল ঘরে ঢুকে। গ্রীষ্মের তাপ বাঁচাবার জন্য নিজের হাতে জানালা বন্ধ করে, পাখা খুলে রেখে গেছে ভাস্কর। টেবিলের উপর গ্লাসেঢাকা জল, ছোট প্লেটখানিতে দু'টুকরো যষ্টিমধু। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা বারোর পাতায় উবুর হয়ে আছে। সমস্ত ঘর জুড়ে তপতীর চিহ্ন। যেন একটু উঠে গেছে, এক্ষুণি এসে বিশ্রাম নেবে সে।

—'দেখছ। কেমন ভাল আছে ভাস্কর?' তপতীর

আত্মা ঘিরে রয়েছে ওকে। ভূতে—ভূতে পেয়েছে ভাস্করকে। বাঁচাও, বাঁচাও—ওকে তুমি লিলি। তুমি ছাড়া কেউ পারবে না বাঁচাতে। তোমার ভালবাসা দিয়ে ওকে রক্ষা কর। সব অভিমান ফেলে দাও, ও যে মৃত্যুর যাদুতে বাঁধা পড়েছে, তুমি ভেঙ্গে দাও সে যাদু।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সুকল্যাণী। ভয়ে ভয়ে ঘরের চারদিকে তাকাল লিলি। সত্যি কি তপতীর আত্মা আজো রয়েছে এই ঘরে? খাটের পাশটিতে হাত রেখে শুনছে সব কথা, হাসছে তার মিটিমিটি হাসি? ছমছম করলো লিলির গা। সুকল্যাণীর হাত ধরে বেরিয়ে এলো ঘর হতে। তক্ষুণি বইলো দুপুরের একটা ঝটকা হাওয়া—বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজা।

সারারাত ধরে ভাবল লিলি। বার বার ভিজে গেল মাথার বালিশ। তাকে দাম দিতে হবে, ভালবাসার দাম—আত্মসম্মান বিসর্জন! বড় কঠিন এ কাজ, কিন্তু ভালবাসার দেবতা যে প্রসন্নমুখে লিলির কাছে আসেন নি। প্রথম হতেই অকরুণ তিনি। বুঝলো লিলি, এবার নিজেকে নিঃশেষে রিক্ত করে দাঁড়াতে হবে ভাস্করের দরজায়, নিজের মুখে বলতে হবে, আমাকে তুমি নাও। কোনদিন কোন মেয়ে নিজের মুখে বলেছে একথা? ছিন্নভিন্ন হলেও, লিলিও বলতে পারত না। কিন্তু ভাস্করকে যে বাঁচাতে হবে বললেন ওর মা। ভাস্করকে? হ্যাঁ। শূন্যতার প্রেম হতে বাঁচাতে হবে তাকে। বিছানা ছেড়ে উঠে বসল লিলি, সঙ্কল্পে দৃঢ় হল।

সকালে মেয়ের মুখ দেখে চমকালেন মিসেস বোস।

—'লিলি! গরমে ঘুম হয় নি রাত্রে?'

—'একটুও না। খারাপ দেখাচ্ছে? দুপুরে ঘুমোতে হবে।' হাসলো লিলি।

লিলি সুন্দরী, প্রসাধনচতুরা কিন্তু এমন আর কোনদিন সাজে নি সে। পুষ্পধনুর কাছ হতে বসন্তের সব মধু চেয়ে এনে মোহময়ী হয়ে উঠেছে আজ। গোলাপী গোলাপের মাঝখানের নরম রংটি বাধা পড়েছে দু' পাশের সোনালী বন্ধনে। উর্ধ্বাঙ্গের লাবণ্য সংযত হয়েছে নবকিশলয়ের সবুজে। গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুল বেষ্টন করে আছে মুখখানি। নীলার মত চোখ দু'টি হতে আজ ঝরে পড়ছে যেন নূতন আলো।

—'এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে নাকি?' দেবকী চাইলো রমলার দিকে।

—'কে জানে।' ঠোঁট ওল্টালো রমলা।

—'ওর আবার সাজতে অকেশন লাগে না কি? মরাদের ফের মারবার জন্য কেন যে এই নূতন নূতন সাজ বুঝি না।'

—'যা বলেছো! ভাস্করকেও বলি আশ্চর্য! এই তপতীকে নিয়ে কত কাণ্ড! দু'দিন না যেতেই ফের লিলি বোস।' বলল টুনু।

—'অরুণের হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে যাবে। হার্টলেশ ওয়োম্যান।'

—'ভাঙ্গবে কেন? তুমি আছ তো—স্টিকিং প্লাস্টার! এ বরং ভালই হোল, এবার অরুণ তাকাবার সময় পাবে তোমার দিকে।' হাসতে হাসতে দেবকী রমলার হাতে টোকা দিল। থমথমে টুনুর মুখ। কেন! কেন! রমলা ছাড়া আর কেউ নেই বুঝি যোগ্যতরা? নিজের ঠিকঠাক কি না, এখন চাইছে বন্ধুর ব্যবস্থা।

—'আজ কাকে বধ করবে ভেবেছো?' ভাস্কর এগিয়ে এল লিলির দিকে।

—'বধ করবো ভাবছো কেন। নিজেকে নিবেদন করবার সংকল্পও তো করতে পার।' মধুর হাসল লিলি।

এমন নরম তাকে কখনো দেখে নি ভাস্কর। একটু অন্যমনস্ক হল সে।

—'বড় গরম! চলো একটু ঘুরে আসি।' উঠে দাঁড়াল লিলি।

দূরে গাড়ি রেখে দু'জনে বসলো এসে রবীন্দ্র-সরোবরে —জলের কাছে। অনেক দিন পর এখানে এল ভাস্কর। তপতী বড় ভালবাসত এ জায়গা। চমকে গেল ভাস্কর, ঘাসের উপর রাখা তার হাতখান নিজের হাতে তুলে নিয়েছে লিলি, চেয়ে আছে তার দিকে।

—'আমায় কিছু বলবে লিলি?'

—'ভাস্কর।' বুজে এল লিলির গলা। নববধূর লজ্জা প্রত্যক্ষ করল ভাস্কর প্রগলভার চোখে। বুক ব্যথা করে উঠল তার।

—'লিলি!' আদর করে ডাকলো ভাস্কর—'আমায় কিছু বলবে?'

মাথা নাড়লো লিলি—বলবে।

—'বল।'

বলতে চাইলেই কি বলা যায় সব কথা? একি ক্লাবে বসে কথার উপরে কথার কারিকুরি! একি ঝড়ের বেগে স্কুটারে ছুটে পাল্লা দিয়ে হাসি! এ যে রাত দশটায় জ্যোৎস্না-ঢাকা সরোবরের নিরালায় মর্মের কথা বলা। ঠোঁটের ওপরে স্তব্ধ হয়ে রইল লিলির কথা, উচ্চারণ করতে পারল না সে। কে কবে পেরেছে? পারল না দুঃসাহসিনীও। চুপচাপ কাটল দু'দণ্ড। লিলি বুঝলো যুগান্ত বসে থাকলেও ভাস্কর এগিয়ে আসবে না নিজে। সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস ফেললো লিলি, উঠে দাঁড়াতে চাইলো। ভাস্কর আবার তাকাল লিলির দিকে—'কই বললে না তো, কি বলতে চেয়েছিলে!'

মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল, দু'হাতে ভাস্করকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো লিলি—'বলো না, আমাকে কিছু বলতে বলো না।'

লিলির চুলের উপর মুখ রাখলো ভাস্কর। 'লিলি চুপ কর। সব বুঝি আমি, কিছু বলতে হবে না।'

গরবিনী লিলি বোসের সব মহিমা গলে পড়ছে, আর তাই অবাক হয়ে দেখলো আকাশ। হ্রদের জল কাঁপা কাঁপা ছবি তুলে নিল তার। একহাতে লিলিকে বেষ্টন করে চুপ করে রইল ভাস্কর। অবিকল তপতীর মত ফুলে ফুলে কাঁদছে লিলি। লিলি, যার একটুখানি খুশির মূল্যে অনেকে অবহেলায় বিসর্জন দেবে সমরখন্দ বোখারা। জীবনে প্রথম ভালবাসার কান্না ঝরলো লিলির, একজনকে—যাকে ভালবাসে, তাকে সাক্ষী রেখে।

একটু পরে শান্ত হল লিলি, মুছে ফেললো সব চোখের জল।

—'তুমি আমাকে ভালবাস না ভাস্কর।'

—'বাসি লিলি! খুব ভালবাসি। তাই তো তোমাকে ঠকাতে পারি না, বলতে পারি না বিয়ে করবার কথা।'



দু'হাতে ভাস্করকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো লিলি—

—'ঠকাবার কথা ভাবছো কেন? কেউ কি দুবার বিয়ে করে না? আর আমি তো সব জেনেই'—

কথা বন্ধ হল লিলির। হাহাকার করে উঠলো ভাস্করের সমস্ত মন। মহা ঐশ্বর্যময়ী এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে! কিন্তু, কিন্তু সে নিজে যে একেবারে রিক্ত হয়ে গিয়েছে। তার সব প্রেম পাথেয় করে যে যাত্রা করেছে তপতী। চোখ বুজলেই মনে পড়ে যায় সেই নিভরশীল টলটলে চোখ দুটি। আঃ! এখনো যেন গন্ধের মত জড়িয়ে আছে গায়ে। কি দেবে, কি দেবে সে লিলিকে আজ? ভালবাসা? যে ভালবাসা বন্ধু দেয় বন্ধুকে, ভাই বোনকে?

ভাস্কর দু'হাতে কুড়িয়ে নিল লিলিকে, চেয়ে রইলো পরমসুন্দর মুখখানির দিকে—

—'লিলি! কত ভালবাসে তোমায় অরুণাংশু। তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না। যোগ্যপাত্র, যোগ্য ভালবাসা। তুমি সুখী হবে। আজ যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে তাই দেখা দেবে সুন্দর হয়ে।'

থেমে গেল ভাস্কর, কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলো না। অসমাপ্ত কথার বেগই তাকে আরো কথা বলালো।—'শোন লিলি, তপতী আমাকে আজো ছেড়ে যায় নি। জেগে আছে মনের মধ্যে, লেগে আছে আমার বুকের পাশে।'

মুহূর্তে সাম্বিৎ ফিরে পেলো লিলি। আর কান্না নয়, এবার শক্ত হতে হবে তাকে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, কঠিন শোনাল কণ্ঠস্বর।

—'তপতী তোমার গায়ে লেগে নেই, পুড়ে সে ছাই হয়ে গিয়েছে। আছে কেবল তার স্মৃতি, তাই নিয়ে খেলতে বসেছো তুমি আর তার নাম দিয়েছ—মৃত্যুহীন প্রেম।'

—'খেলা? তা হবে। কিন্তু সবই তো আমাদের খেলা লিলি। ভালবাসা, আবিষ্কারের আনন্দে মাতাল হওয়া, সৃষ্টির নেশায় ডুবে থাকা—সবই কি খেলা নয়? বেঁচে থাকবার জন্য খেলা, ভুলে থাকবার, দিন কাটাবার জন্য খেলা!'

হাসিমুখে বললো ভাস্কর।

—'খেলা ভাল। কিন্তু শূন্য নিয়ে খেলা বড় সর্বনেশে নেশা, তাতে সর্বনাশ আনে।'

একটু থামল লিলি, ইতস্তত করলো বুঝি একবার, কিন্তু ভালবাসার জোরই ঠেলে দিল তাকে, নিষ্ঠুর করলো। বললো সে—'এ খেলার পরিণাম বড় ভয়ানক। যাও, দেখে এসো গিয়ে লুম্বিনীর মেণ্টাল-হসপিটাল। তোমার মত আরো কতজন নিজেকে নিয়ে খেলা সাঙ্গ করে, এখন ইলেকট্রিক শক্‌ খাচ্ছে।'

এগিয়ে গেল লিলি, গাড়িতে গিয়ে বসলো। ভাস্কর স্তব্ধ।

ধীমান ভাস্কর বুঝল লিলির ইঙ্গিত। আজ যেন প্রথম দেখা পেলো তার অতল প্রেমের। কোন ভয়ে অস্থির হয়ে সব অভিমান ত্যাগ করে লজ্জাহীনার মত লিলি নিজেকে ভাস্করের কাছে, যে তাকে বার বার অস্বীকার করেছে, তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে এসেছে। সব বুঝে স্তব্ধ হয়ে রইলো ভাস্কর, স্নেহে তার অন্তর ভরে গেল। মনে মনে বললো—ভয় নেই আমি পাগল হব না লিলি। একলা ঘরে বসে যদি ছবি পূজা করতাম, মরা তপতীর সঙ্গে আমিও যেতাম মরে। আমি তো বেঁচে আছি। কি আশ্চর্য সতেজ ভাবে বেঁচে আছি দেখছো না! কিন্তু লিলিকে যে আর ফেরানো যাবে না, পারবে না ফেরাতে, একথা স্থির বুঝে মনে আর একতিলও সুখ রইলো না তার।

বুঝলো ভাস্কর—মনকে তার দু' ভাগ করে নিতে হবে। সেই অন্তরের অন্তঃপুরে তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকবে উনিশ বছরের তপতী তার সেতারের সুর নিয়ে। সেই কবে ইমন-ভূপালীতে ভরে দিয়েছিল সে ভাস্করের মন, তার পর হতে আর বিচ্ছেদ হোল না।

বাইরের সংসারে লিলি হবে ঘরণী-গৃহিণী, সচীব-সখী। কিন্তু ললিতা প্রিয় শিষ্যা কোনদিন হতে পারবে না সে। লিলি জানেই না প্রিয় শিষ্যা হতে। কখনো লিলি গলা জড়িয়ে জুলুম করবে না,—বলো না, বলো না ভৈরবী আর ভাঁয়রোর কি তফাৎ, ধানেশ্রীর সঙ্গে পুরিয়ার? আর সেই তফাৎ বোঝাবার জন্য সারাটা দুপুর আফসের কাজ বন্ধ রেখে, বড় বড় কলাবিস্তদের মতামত অনুশীলন করতে হবে না ভাস্করকে। লিলি ঠোঁট ফোলাবে না ব্রাহ্মী আর খরোষ্ঠী লিপির বিভ্রমে পড়ে, প্রাচীন ইতিহাসের কঠিন বানান ভুল করে চাইবে না ভীতু চোখে। লিলি কি সরিয়ে দেবে তার সব দরকারী কাগজপত্র, মুখ ঠেলে ঠেলে চোখ ফিরিয়ে নেবে নিজের দিকে শাড়ি-ব্লাউজের ম্যাচ দেখাতে? কোন দিন আর শ্রান্ত ক্লান্ত, আফিস হতে সদ্য-ফেরা ভাস্করকে ঘাম না মুছেই শুনতে হবে না সেতারের সদ্য-তোলা সুর বিলম্বিত মধ্যলয়ে। ভাস্করের সব কথায় লিলির চোখে বিস্ময় ঘনাবে না, একটি কান তার পাতা থাকবে না পথের পাতে। গরবিনী কপোতীর মত কখনো আবোল-তাবোলে মুখরা হবে না লিলি নিভৃত-শয়নে। সেই প্রথম বসন্ত দিনের ললিতাকে একটুও পাওয়া যাবে না লিলির মধ্যে।

তা বলে লিলি কি অপ্রার্থনীয়া! রাজরাণীর মত রূপ, রাজরাণীর মত মহিমা। যেদিন তপতী ভাস্করের জীবনে আসে নি,—তার কথা আলাদা। সেদিন একফুঁয়ে লাজুক মেয়ে তপতীকে উড়িয়ে দিত লিলি। কিন্তু তারপর যেদিন এলো তপতী ভাস্করের কাছে, একটুও বিরূপতার প্রকাশ দেখা যায় নি। লিলির যোগ্য প্রীতি

দিয়ে আপন করে নিয়েছিল বিজয়িনীকে। রোগশয্যায় তপতীর জন্য সে কি আকুতি! রক্ত দিয়েছে, বসে থেকেছে সামনে দিনের পর দিন। আর আজকের—এই ভাস্করের অমঙ্গল ভয়ে সব নারী-মর্যাদা, অভিমান ত্যাগ করে আনত হওয়া—এও কেবল লিলিই পারে। আসুক লিলি তার ঘর ভরে, সংসার ভরে। মন? হ্যাঁ মনও ভরে বৈ কি! ভাস্কর ওকে ঠকাতে পারবে না। কেউ কি ঠকাতে পারে লিলিকে?

আকাশভরা কোন তারার রাজ্যে হারিয়ে গেছে তার তপতী। যদি, যদি হঠাৎ এসে দাঁড়ায় সামনে, যেমন দাঁড়াতো নতমুখে বিয়ের আগে! যদি বলে অভিমানে—তুমি আমায় ভুলে গেছ, আমি একেবারে হারিয়ে গেছি তোমার মন হতে। তখন ঠিক তেমনি করে ভাস্কর তাকে জড়িয়ে নেবে দু'হাতে। কপালের চুল সরিয়ে শান্ত করবে মানিনীর স্ফুরিতাধর ঘন চুম্বনে। বলবে—পাগল! একেবারে পাগল! তুমি কি হারাবে কোনদিন! চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ মনের গভীরে,—সেই উনিশ বছরের তুমি আর ছাব্বিশ বছরের আমি বসে আছি একান্তে আমাদের ভালবাসা নিয়ে।

—'খোকা, দোর খোল। কত বেলা হয়ে গেছে।' মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল দরজার বাইরে।

বেলা! ভোর হয়েছে! কেটে গেছে একটি রাত? লেক হতে রাত এগারোটার সময় ফিরে, কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়েছিল ভাস্কর তপতীর শূন্য বালিশটিতে মাথা রেখে। কখন রাত পোহাল, কখন বেলা হল, কিছু টের পায় নি সে। আবার শোনা গেল মায়ের স্বর—'খোকা, জেগেছিস?'

অন্যদিন হলে ভাস্করের কাছে মায়ের ভয় ধরা পড়তো না, কিন্তু কাল লিলির স্পষ্ট কথায় বুঝেছে মায়েরও কত আশঙ্কা তাকে নিয়ে। দরজা খুলে, কতদিন পর মাকে জড়িয়ে ধরলো ভাস্কর।

—'খোকা!' মা দেখল ছেলের রাতজাগা ক্লান্ত মুখ।

—'কিছু হয় নি মা, কিছু না। রাতে যা গরম! এক্ষুণি একটব জল—সব ঠিক হয়ে যাবে। ভারি ক্ষিধে পেয়েছে। কি দেবে খেতে? তোমার পেটেন্ট ডিমের কচুরির অর্ডার দাও, আর মুচমুচে আলুভাজা।'

বাথরুমে ঢুকলো ভাস্কর, সুকল্যাণী শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। টেবিল সাজাতে, এটা ওটা আনতে চাকরেরা ব্যস্তপায়ে ঘোরাঘুরি করলো বারে বারে, শশীর খুঁচকানো মুখ হাসিতে চিক্‌চিকানো।

টেবিলে বসল পরিষ্কার-কামানো ফিটফাট ভাস্কর—'ওঃ! ডিমের কচুরী মার্ভেলাস! কত মাইনে পাচ্ছ শশী? তিরিশ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। একশো টাকার চাকরী পাবে দত্ত মেমসাহেবের ক্যান্টিনে। মা! তোমার কানের পাশে একটা পাকা চুল নাকি? সর্বনাশ করেছ! এবার তোমার বৌ আসবে পাকা মেমসাহেব, পাকাচুল বুড়িকে শাশুড়ী বলে স্বীকারই করবে না হয়তো। শোন মা, মেমসাহেবী তো পছন্দ কর না—এ তো একেবারে তাই, পার্ক স্ট্রীট, রুজ-লিপস্টিক, ক্লাব-নাচ।'

আনন্দে উজ্জ্বল হোল কল্যাণীর মুখ। অসাধ্য সাধন করেছে লিলি। বললো—'তোর ঠাকুমাও তো আমাকে বলতেন মেমসাহেব—মুরগী খেতাম বলে।'

—'তুমি? তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে। গরদের শাড়ি পরে ঠাকুমার চন্দন ঘষতে দেখি নি বুঝি? লিলির কাছে কিন্তু ওসব আশা কোর না। থাকবেই না হয়তো ও তোমাদের সঙ্গে।'

হাসলো সুকল্যাণী। 'সে কথা আমরাও ভেবেছি। একা একা না থাকলে দায়িত্ব বোধ আসে না। ঠিক করেছি, নিউ আলিপুরের নূতন বাড়িতে থাকবি তোরা।'

—'সে কি! সব পরিকল্পনা আগে হতেই ঠিক? কিন্তু তোমার সুক্তো আলুর দমের কি হবে? সে তো লিলি পাকাতে পারবে না। ছোঁবেই না আঙুল দিয়ে মশলা।'

—'আমি শশীকে দিয়ে রোজ তোদের খাবার পাঠিয়ে দেব, আর ছুটির দিনে তো চলেই আসবি এ বাড়িতে। বিয়েটা হবে কবে?'

—'দাঁড়াও। পাত্রীর কাছে এখনো প্রস্তাব পেশ করাই হয় নি।'

—'তা করে ফেল না প্রস্তাবটা।'

—'ভারি সোজা কি না! তার আগে সাহেবী দোকানে চুল কাটাতে হবে, নূতন সুট। গাড়িটাও নূতন হলে ভাল হয়। বাবাকে বল আমার মাইনে বাড়াতে।'

খুব হাসল কল্যাণী—চিরকালের দুষ্টু ছেলে!

মাথা আঁচড়াল, টাই বাঁধলো, সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সুস্থ-সবল ভাস্কর।

না, আর ভয় নেই। ভাবলো মা। ভয় নেই। অফিসে যেতে যেতে গাড়ির মধ্যে ভাবলো ভাস্কর। মিটমাট হয়ে গিয়েছে নিজের সঙ্গে। আজ হতে শুরু হল তার দ্বৈতজীবন। এক ভাস্কর কাজ করবে, টেনিস খেলবে, বাহুলগ্ন লিলিকে নিয়ে মিশে যাবে পৃথিবীর ঘূর্ণিতে। আর এক ভাস্কর বসে থাকবে যৌবন নিকুঞ্জে, রভস লালসে যেখানে ললিত রাগিণী বাজে, প্রিয়া মুখের গন্ধে মাতাল হয় মন।

অফিসে টেবিলে বসতেই সেলাম করে এসে দাঁড়ালো বোসবাড়ির তকমা-আঁটা বেয়ারা, হাতে তার বোস ফ্যামিলীর মনোগ্রাম করা নীলচে খাম। একলাঘর

হতেই খোলা হল এনভেলাপ—গোল গোল লেখা—লিলির লেখা চিঠি। ভাস্করকে চিঠি লিখেছে লিলি।

ভাস্কর,

তোমাকে আমার প্রথম চিঠি। কোনদিন এ চিঠি লিখবো ভাবি নি। তুমি জান, আমিও বুঝি—ভীরু প্রণয়লিপি লেখা আমাকে মানায় না, আমি অশঙ্কিনী। একটা কথা বলবো তোমাকে,—ভেবেছিলাম কাল রাতেই বলবো, কিন্তু রাত আমাদের দুর্বল করে দেয়, বলতে পারি নি তাই।

তুমি আমাকে বলেছো অরুণাংশুকে বিয়ে করতে, বহুবার আরো আকারে ইঙ্গিতে তার ভালবাসার কথা বলেছো। শোন, আমি রং-করা মেয়ে, আমাকে বিশ্বাস নেই তোমার তবু জেনো, অনেক বছর কেটে যাবে, আমার চুল সাদা হবে, বয়সের ছাপ পড়বে মুখে, তখন—তখনো আমি লিলি বোসই থাকবো।

কোথায় তোমার দ্বন্দ্ব আর দ্বিধা, আমি বুঝেছি। সকালবেলা দিগন্তে যে সোনার রেখা দেখা দেয়, ভাবছো তাকে মনে রাখতে হলে অস্বীকার করতে হবে দুপুরবেলা। ভাবছো, তুমি কথা দিয়েছো তপতীকে—তাকে খুঁজে নেবে আবার। ভাবছো আকাশভরে ছড়িয়ে রয়েছে তোমার সেই প্রতিশ্রুতি। সে কথা রাখবার জন্য ছবিতে মালা পরাচ্ছ, পাশে নিয়ে শুচ্ছ দেহহীনাকে। তোমার তপতী আজ আর কিছু চায় না। তাকে খুশি করতে পারো না, কাঁদাতেও পারবে না। সে নেই, একতিলও নেই। বলবে তুমি—আছে তপতী আকাশের নীলে, তারার আলোয়। সে নীল কি ছুঁতে পার তুমি? তারার আলোয় আলো হবে তোমার ঘর? তোমার ঘরের আঁধার কাটবে আমি সুইচ টিপলে, ছুঁতে যদি চাও, পাবে আমার কিউটেক্স-করা নখ—যার ছুঁচোলো ডগায় তুমি হিংসার মাদকতা দেখ। ভাস্কর, যে নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছে, তার জন্য ফেরাতে চাও তুমি আমাকে? যে প্রত্যক্ষ, সত্য! আমি যদি অন্য মেয়ের মত হতাম—অভিমানে বন্ধ করতাম সব দরজা, থাকতে দিতাম তোমায় তোমার দিবাস্বপ্ন নিয়ে। আমাকে যে স্রষ্টা গড়েছেন অন্য ধাতু দিয়ে, ভুলে গেছেন আমার ভালবাসাকে লজ্জার লাবণ্য দিয়ে মোহময় করতে। আমি তোমার সামনে আমার বুকের বসন ছিন্ন করে দাঁড়াতে পারি, বলতে পারি তোমার চোখে চোখ রেখে সোজা গলায়—ধর ধর, আমায় গ্রহণ কর, ধন্য হও। আমি ফুলের মালা নই ভাস্কর, তরবারীর প্রেম আমি, যে পরাজিত সৈনিকের মর্যাদা রক্ষা করে তার বুকে তীক্ষ্ণ চুম্বন দিয়ে।

আমাকে ভুল বুঝো না ভাস্কর। তপতীর সঙ্গে আমার যেমন মিল নেই, বিরোধও নেই তেমনি। আমরা দু'জন আলাদা। মাঝ সমুদ্রের অতলে গহন করেছো তুমি, এসো এবার তীরের তরঙ্গদোলায় দুলবে। মেঘের ছায়া ধরে রাখতে পারি না আমার বুকে, কিন্তু ফেনায় ফেনায় ভরিয়ে দিই শুকনো বালি, ছড়াতে পারি বর্ণালীর ফুলঝুরি।

—তোমার লজ্জাহীনা লিলি

ভাস্কর চিঠি পড়লো, মুগ্ধ হয়ে বসে রইলো, তবু বার বার মনে পড়তে লাগলো ঐ সেই চেয়ার,—পাসের খবর দিতে এসে বসেছিল তপতী এখানে। নানা কাজ, ডিক্টেশন, রাশি রাশি সই। দু'জন এল ভিজিটর। ব্যস্ততায়, কাজের তলায় ঢাকা রইলো লিলির চিঠি, কিন্তু চাপা পড়লো না। মাঝে মাঝে মনকে দোলা দিয়ে যেতে লাগলো অবসরের অবকাশে। একটু একটু করে সুখ, ভাললাগা উঠে আসতে লাগলো মনের তলা হতে ধীরে ধীরে।

পাঁচটায় উঠে দাঁড়াল ভাস্কর ছুটি নিয়ে। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিল স্টিয়ারিং—ক্যামাক্ স্ট্রীট, লান্ড ডেল, বিমান বোসের বাড়ি। তখনো সে বাড়ির বিশ্রাম শেষ হয় নি। বসবার ঘরে জমা হবে বাড়ির লোক,—তার অনেক দেরি। প্রকাণ্ড প্রাসাদের কোন ঘরে ঘুমিয়ে আছে জয়ন্তী আর প্রবীরের মা। প্রবীর, বোস সাহেবের ফিরতে সাতটা। অসময়ে মিত্র সাহেবকে দেখে ত্রস্ত হোল বেয়ারা। কাকে খবর দেবে—লিলি বাবা? মেমসাহেব?

কাউকে খবর দিতে হোল না। নেমে এলো উপর হতে ত্বরিত পায়ে লিলি—অসজ্জিতা। কাছে এল ভাস্করের—'ইস, এত তাড়াতাড়ি এলে কেন!'

—'এলাম। তোমাকে আর বেশি ভয় পাইয়ে লাভ কি?'

—'মোটেই না, মোটেই ভয় পাচ্ছি না আমি।' গোলমাল করে উঠলো লিলি।

—'ভয় পাবার কি! তুমি বিয়ে না কর—চাওলা আছে, দিল্লীলাল। আর ঘরের মানুষ অরুণাংশু তো মজুদই।'

—'দরকার নেই গোবেচারীদের নাকাল করে। এ নায়গ্রা আমিই মাথায় ধরবো, ঢেউ খাবো বে-অব-বেঙ্গলের।'

জীবনে প্রথম লাল হোল লিলির মুখ। জিজ্ঞেস করলো মৃদুকণ্ঠে—'কোথায় যাবে?'

—'প্রথম নীরার নিরালা কোণ, তারপর তোমাকে নিয়ে দৌড় দেব গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধরে। যতক্ষণ তেল না ফুরোবে, টায়ার না ফাটবে, থামবো না।'

—'এ দুঃসঙ্কল্প কেন?'

—'না হলে তুমি কি কাছে আসবে আমার? ভয় পাওয়াতে হবে যে তোমাকে। ভেবে দেখ—অমাবস্যার

রাত, জনমানব নেই কোথাও, কলকাতা ফিরবার পথ বন্ধ, ডেকে উঠছে শেয়াল, ককিয়ে কাঁদছে শকুন, তখন ?'

—'তখন ?' হাসলো লিলি, জড়িয়ে ধরলো ভাস্করকে, মুখ ঢাকলো তার বুকে।

বুকটা ধক্ করে উঠল ভাস্করের। এমনি করেই একবছর আগে, তার বুকে মুখ ঢেকেছিল—না না, মিলিয়ে গিয়েছিল তপতী। চোখে ঝাপসা দেখলো ভাস্কর, গলা বন্ধ—তবু লজ্জাহীনাকে লজ্জা দিয়ে ভালবাসার ফুল তুলে নিল লিলির অধর হতে।

লিলি সফল হোল, সার্থক হোল। কোনদিন হিমালয়ের এক প্রেম-পাগলাখ্যাত মেয়েকে অপর্ণা হয়ে তপস্যা করতে হয়েছিল প্রিয়কে পাবার জন্য। সে ভুল শোধরালো আধুনিকা লিলি। বসন্তের গরিমা জয়যুক্ত হোল, সার্থক হোল ফুলধনুর টঙ্কার। অবশ্য এসব অতি পচা, পুরানো কথাবার্তা, তবু তো পুরানো জিনিস দিয়ে ঘর সাজানো ফ্যাশান,—থাক না জীবনের দু'-একটি পাতায় পুরানো উপাদান অলঙ্করণে।

জয়ন্তী ঠাট্টা করলো—'উমাকে হার মানিয়েছ লিলি!'

—'তার মানে?' ভ্রু তুললো লিলি।

—'মানে অতি সরল। কুমারসম্ভবের গল্প জানো না?'

—'কুমারসম্ভব?'

—'হ্যাঁ কালিদাসের কুমারসম্ভব।'

লজ্জা পেল লিলি—'জানো জয়ন্তী, এমনি ডিফেক্টিভ আমাদের এডুকেশন যে একদম পড়ি নি পুরানো কিছু। বলবে গল্পটা?'

—'বলতে পারি, কিন্তু ভাল লাগবে তো তোমার?'

ভাল লাগবে না? বলে কি জয়ন্তী! এক মাস হোল পৃথিবীর সব ভাল লাগা যে লিলির হয়ে গেছে।

সেই বসন্তের সন্ধ্যায় লিলি শুনলো পুরানো কালের এক মেয়ের ভালবাসার গল্প। সতীকে হারিয়ে মহেশ্বর বসেছিলেন তপস্যায়, বিশ্বের প্রতি কর্তব্য শেষ হয়ে গেল বিশ্বেশ্বরের। কিন্তু ভালবাসা কি হারায়! কখনো, কোনদিন কি ফুরাতে পারে ভালবাসা? হিমালয়ের হিমশীতল রাজ্যে, গিরিকুমারীর সমস্ত হৃদয়ভরে জেগে উঠল প্রেম। কুসুম ভূষণে, বসন্তের স্পর্ধায় নিজেকে সাজালো পার্বতী।

কিঙ্কিণী ঝঙ্কারে তপস্যা ভাঙলো মহাদেবের। রুদ্ররোষে জলে উঠলো তপস্বীর তৃতীয় নেত্র, দগ্ধ হয়ে গেল মনসিজ। লাঞ্ছিত যৌবনের নৈবেদ্য নিয়ে ফিরে এলো গিরি-নন্দিনী, শুরু হোল তপস্যা। কঠিন সে তপ। আগুনে, হিমে কর্কশ হোল বরতনু, চাঁচরচিকুরে জটা। তাপসীর সেই তপরেখা স্পর্শ করলো যোগীশ্বরকে, বিচলিত হলেন তিনি। উঠে এলেন তপস্যাসন ছেড়ে। তারপর? তারপর উমাকে গ্রহণ করলেন শিব নিজ বাহুবন্ধে।

সুন্দর! সুন্দর গল্পটি বললো জয়ন্তী। কথার তুলি দিয়ে এঁকে দিল ছবিটি। মুগ্ধ হয়ে গেল লিলি। কয়েকটি মুহূর্ত কাটলো চুপচাপ। নীরবতা ভাঙলো মীরার কথায়। লিলি আর ভাস্করের মিলনে সুখী সবাই, থেকে থেকে জল আসছে মীরার চোখে কেবল। ভুলে গেল সবাই তপতীকে। ভুলে গেল ভাস্করও, যে কথা দিয়েছিল কোন দিন ভুলবে না তাকে। দুঃখ আছে, তবু হাসি-খুশিই দেখাতে হয় মীরাকে। এখনো হেসেই বললো—'তুই লিলিকে এ গল্প শোনাচ্ছিস কেন দিদি? ও তো আর তপস্যায় বসে নি কখনো।'

—'তপস্যায় বসি নি?' মুগ্ধতা ভেঙে চোখ পাকালো লিলি—'কত ঘণ্টা খেটেছি জান শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে স্টোনের ম্যাচ করতে? স্কুটারের পিছনে বসে বুক ঢিব ঢিব করতো, তবু বেপরোয়া হেসেছি। আর সবচেয়ে বড় কথা—কি তর্কটা করেই না তবে রাজি করিয়েছি পাত্রকে। বলে—তপস্যা করি নি!' খুব হাসলো তিনটি মেয়ে।

দু'দিন পর লিলির বিয়ে। বাড়ি উৎসবের সাজ ধরেছে। লিলির বাইরে-ঘোরা বন্ধ জয়ন্তীর কথায়। খুব বৌদিপনা করছে জয়ন্তী, আর খুশিমনে লিলিও মেনে নিচ্ছে সব নির্দেশ।

ভাস্করেরও প্রবেশ নিষেধ হয়েছে এ বাড়িতে ক'দিন ধরে।

—'আর এখন নয়। দেখবেন এক সপ্তাহ অদর্শনের পর, শুভদৃষ্টির সময় নূতন লাগবে লিলির মুখ।' ভাস্করকে বলেছিল জয়ন্তী।

—'ও! আপনার নিজের পরীক্ষিত সত্য বুঝি এটা?'

—'আমার? ও বাবা! আমি তো বিয়ের একঘণ্টা আগেও ওর সঙ্গ ছাড়ি নি,—পাছে ফস্কে যায়।'

—'তোমার কথার ধারগুলো এবার কমাবে জয়ন্তী?' বলেছিলো প্রবীর।

—'কমাবো? তা হলে আর থাকবে কি আমার বল? ধার দেখেই তো মুগ্ধ হয়েছো তুমি। তারপর দিদু বলেছেন—খোঁপার মতই আমার চোপা। তুক আছে একটা কি না। চোপা থামালেই চুল উঠে যাবে, চাও তুমি তা?

সুতরাং ভাস্কর আসছে না। তার দেওয়া হীরার আংটির পাশেই রয়েছে মুক্তার আংটিটি। তপতীর মুক্তো। না, জয়ন্তী বলেছিল খুলে ফেলতে। চেষ্টা করেও খুলতে পারে নি লিলি। জানে, যতবার তার হাত ধরেছে, ততবার চেয়েছে ভাস্কর আংটির দিকে, ছায়া পড়েছে মুখে, তবু তপতীকে ভোলাবার আয়োজন করতে পারছে না লিলি। ভাস্কর কি ভুলবে! ভুলবে তার তপতীকে? তা হলে যে ওকে

ভুলতে হবে শ্রাবণ মাসের আকাশ, অন্ধকার যে সুরে মিলিয়ে যায় ভোরের আলোয়, যে সুর আছে সন্ধ্যাতারা জ্বলায়—ভুলতে হবে সেই সুরটিকেও।

ভাস্কর যেন তপতীকে ভুলে যায়, সেই জন্য ব্যস্ত হয়েছেন সবাই। নিউ আলিপুরে নূতন বাড়ি, পর্দাটির রং পর্যন্ত অন্যরকম। তপতীর ছায়াও নেই সেখানে। লিলিও কি তার সর্বাঙ্গ দিয়ে একই ভাবনা ভাবছে না? তারও কি ভাল লাগবে যদি ভাস্করের জীবন আচ্ছন্ন করে রাখে তপতীর স্মৃতি। কিন্তু মুক্তোটাকে ড্রয়ারের একবোণেও তো ফেলে রাখা যাচ্ছে না।

—'লিলি।' নিজের ভাবনায় মগ্ন লিলি চমকালো। জয়ন্তী চলে গেছে, মীরা বসে ছিল জানালায় হেলান দিয়ে।

—'লিলি, তোমার মুক্তোর আংটিটা খুব সুন্দর। আমি মুক্তো ভালবাসি, প্রেজেন্ট করবে আমাকে?'

লিলি নিমেষে বুঝলো তার ভাবনা পড়ে ফেলেছে মীরা। মন হতে সব দ্বিধা চলে গেল তার।

—'এ আংটিটা দিয়ে তপতী আমার বোন হয়েছিল মীরা। তোমার ভয় নেই, সে জায়গা তার বোনের অক্ষয় হয়ে থাকবে।'

ধারা নামলো মীরার চোখে, লিলির চোখও ভিজলো।

রজত সেনের ছেলের জন্মদিনের পার্টি। কত? কত? আট? নয়? বারো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বারো বছরেই পড়লো টর্পেডো—রজত আর দেবকীর ছেলে। সুন্দর বকুলকে ছেলে! ঘুরছে আরো অনেক ছেলে-মেয়ে। আনন্দের হাট। লক অ্যাণ্ড জেমস কোম্পানীর পার্টনার রজত সেন। অর্থ আর আভিজাত্য আছে যাঁদের, তাঁরা আলো করেছেন সভা। এসেছেন পাকা চুল জাস্টিস বোস, কর্নেল সমাদ্দার, শিল্পপতি দিল্লীলাল। মস্ত মস্ত সব লোক, তাদের সঙ্গে আছে মিত্র অ্যাণ্ড রসের ভাস্কর মিত্র। ভাস্কর বড় একটা যোগ দেয় না পার্টিতে। সময় কই তার? সারা ভারতবর্ষের কাজ নিচ্ছে। কলকাতায় থাকেই বা সে ক'দিন! আজ এসেছে বাধ্য হয়ে। রজত-দেবকী অন্তরঙ্গ বন্ধু মিত্র-দম্পতীর। না এলে ভাস্কর, কেবল তারাই দুঃখিত হোত না, ক্ষুন্ন হোত স্ত্রীও। মিসেস মিত্রকে কোন কারণে ক্ষুন্ন করা? ভাস্করের পক্ষে তেমন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ধারণার বাইরে সকলের। সুতরাং ভাস্কর এসেছে, বসেছে বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে। হাসিতে-গল্পে ফিরে এসেছে আগের দিনগুলি।

খাবারের ডাক এড়িয়ে গেল ভাস্কর। লেমন স্কোয়াস? ধন্যবাদ! তুলে নিল একগ্লাস। ডাক্তার বলেছেন প্রেসারের রোখটা ভালর দিকে নয় ভাস্করের, খাওয়া-দাওয়া করতে হবে সংক্ষিপ্ত। এসব দিকে বড় সতর্ক লিলি মিত্র। ক্লাব, হাজার রকমের সমাজ-কল্যাণের ফ্যাসানেবল্ কাজ, কিন্তু স্বামীর অনিয়ম হবার উপায় নেই। বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে ভাস্কর।

না করে অবশ্য উপায়ও ছিল না। অদ্ভুত রকমের ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ে লিলি। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলেন, —'পুরাণের চিত্রাঙ্গদা, কুইন প্রথম এলিজাবেথ।'

ভাস্কর চেয়ে চেয়ে দেখছিল অনেক চেনা মুখ। চোখে পড়ছিল জয়ন্তী বোসকে—লিলির ভাতৃবধূ। দেখে চিনবার উপায় নেই, এক কালের সেই কেরাণী-দুহিতা জয়ন্তীকে। চলনে, বলনে, চেহারায়, সে ঘটিয়েছে একেবারে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। চকচকে নূতন তামার পাত্রের মত রং, স্বচ্ছ শাড়ি কুয়াশার মত ঘিরে রয়েছে। হেসে হেসে কথা বলছে লেডী গাঙ্গুলীর সঙ্গে—কে বলবে তারই সমগোত্রীয় নয় জয়ন্তী।

ওদিক দিয়ে দিল্লীলালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছে লিলি। আসরের মক্ষীরাণী এখনো সেই। হাসি পেলো ভাস্করের দিল্লীর মুগ্ধ চোখ দেখে, হাত নেড়ে ডাকল স্ত্রীকে।

—'কি?' কাছে এসে দাঁড়ালো লিলি।

—'নাচবে নাকি দিল্লীলালের সঙ্গে?'

—'দেখতে ইচ্ছে করছে তোমার? ডাকলে কেন বল।'

—'আমাকে ও বাড়ি যেতে হবে। আটটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বাবার মিঃ শোভানের সঙ্গে।'

—'ও! আচ্ছা, যেয়ো। কিন্তু আটটা বাজতে দেরি আছে তো। একটু অপেক্ষা কর, এক্ষুণি বাজাবেন আলি খান সুরবাহার—তুমি তো ভালবাস তারের বাজনা।'

—'আঃ! এই লিলি,' ডাকলো রজত—'এখনো গেল না তোমার ভাস্করের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করবার অভ্যাস?' এদিকে এসো। তোমায় খুঁজছেন জাস্টিস বোস, লেডী বোসের কি মেসেজ আছে তোমার জন্য।'

স্বামীর দিকে হাসিভরা চোখে চেয়ে, একরাশ সাদা মেঘের মত ভেসে ভেসে মস্ত হলের অন্তপ্রান্তে চলে গেল লিলি।

ভাস্কর বাজনা ভালবাসে, তারের বাজনা—সেতার। ভালবাসে? কবে যেন সে প্রথম শুনেছিল, ভাল লেগেছিল তার সেতার? কতদিন আগে? প্রায় গতজন্মে বুঝি। রায় এণ্ড সন্সের শৈলেন রায়ের মেয়ে তপতী তার বার্থ-ডে পার্টিতে সেতার বাজিয়েছিল।

মাত্র একমাস আগে ভাস্কর ফিরেছে ইয়োরোপ হতে। কলকাতার উঁচুমহলে কত জল্পনা-কল্পনা তাকে নিয়ে। মা বলেছিলেন—

'বুক ঢিব ঢিব করতো, বিমান বোসের ছেলের কাণ্ড শুনে। ভাবতাম—তুই যে হাবলা, কোন মুস্কিলে না পড়ে যাস।'

'হাবলা? আমি?' বুকে হাত দিয়ে নিজেকে নির্দেশ করলো ভাস্কর।

মেয়ের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ করতে এলেন মীনাক্ষী রায়। মায়ের সে কি হাসি। নিমন্ত্রণের ধুম পড়ে গেছে। ভাস্করকে হস্তগত করবার সে কি প্রয়াস মায়েদের! মনে পড়লো কি বিলাসিনী ছিলেন মিসেস রায়। এখন তো চেনাই যায় না ওঁকে, গরদ, বেলুড় মঠ, মহাভারত। ভাস্করের মা অবশ্য একরকমই বরাবর।

সুরবাহারের রিমঝিম আরম্ভ হবার আগেই উঠে পড়লো ভাস্কর। জিজ্ঞাসু চোখকে জানালো জরুরী কাজ। দরজার কাছে টুটু, তার মাথায় একটু হাত। গাড়ি।

বালিগঞ্জের বাড়ি নয়, সোজা চলে এলো ভাস্কর নিউ আলিপুর। বাবাকে ফোন করে দিল—আজকে আসতে পারছে না সে। না না, শরীরে কিছু হয় নি। অত ব্যস্ত হলে, এক্ষুণি সে ছুটবে মাকে তার ভাল থাকা দেখাতে। বাড়িতে, হ্যাঁ, বাড়িতেই কাজ আছে একটু। কাল, কাল সকালে ওবাড়ি যাবে, আর খাবে ওখানে। সব, সব খেতে বলেছে ডাক্তার কেবল মুনটা একটু কম—আর কার্বোহাইড্রেড।

মস্ত বড় বাড়ি—নীরব। লোকজন ঘুরছে নীচে। সিঁড়িতে বসে আছে একজন, বেল শুনলেই চলে আসবে হুকুম তামিল করতে। উৎসব ছেড়ে ফিরে আসতে এখনো অনেক দেরি আছে লিলির।

ব্যালকনীতে চেয়ার নিয়ে বসলো ভাস্কর। চুপচাপ, একটা হুটো চুরুট। চুরুট খেতো না ভাস্কর। কবে? সেই গতজন্মে?

ভাস্কর মিত্র ফিরে গেল তার ছাব্বিশ বছরের জীবনে। কি সুর যেন বাজিয়েছিল তপতী আর কি যেন বলেছিল? বলে নি, কিছু বলে নি সে, পরিষ্কার সব মনে আছে ভাস্করের। ইয়োরোপের অক্ষম অনুকরণ দেখে দেখে যখন তার পার্টির সমস্ত কিছুর উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে, তখন তপতী বাজিয়েছিল সেতার। সুরে সুরে ভরে গিয়েছিল মন। স্বপ্নে দেখার মত চেয়ে ছিল তপতী, —উনিশ বছরের, সন্ত বি-এ পরীক্ষা দেওয়া তপতী। ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে।

তারপর? তারপর তপতী ভালবেসেছিল তাকে। তেমন ভালবাসা কোন দিন, কোন পুরুষ পেয়েছে কি না জানে না ভাস্কর।

সেদিনের কথা কতবার ভেবেছে। ভেবে ভেবে আজো অবাক লাগে তার। গ্ল্যামারহীন মেয়ে তপতী,—ভালবাসা ছাড়া সে কিই বা আর করতে পারতো! কিন্তু ইয়োরোপে ট্যান হওয়া প্রবীর, ক্ষুরধার জয়ন্তী, অসম্ভব বুদ্ধিমতী লিলি আর সে—বেশি রকম আত্মস্থ ভাস্কর মিত্র সে নিজেও কেন ভালবাসার হাত হতে মুক্তি পেল না?

কবে, সেই সৃষ্টির বুঝি প্রথম দিনটি হতেই নরনারী ভালবাসার খেলা শুরু করেছিল, কতযুগ পার হয়ে বুড়ো হয়ে গেল পৃথিবী, আশ্চর্যের পিছনে ছুটতে ছুটতে মানুষের মনও হয়ে গেল একটা আশ্চর্য জিনিস। সেই আশ্চর্যকে আবার বুঝবার জন্য কত চেষ্টা। দিন দিন সব বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে পৃথিবী, সময়, মানুষ—কেবল ভালবাসারই কি বদল হতে নেই?

রেলিং-এ হাত রেখে টান টান হয়ে দাঁড়ালো ভাস্কর। নিউ আলিপুরের মাথায় হাজার তারাজ্বলা রাত এগারোটার আকাশ। চারদিকে প্রশংসার গুঞ্জন, সাবাস দেওয়া চোখ। দিনে দিনে বড় হচ্ছে ভাস্কর—মান আর খ্যাতি। সবাই জানে ভাস্করের কত বুদ্ধি আর ক্ষমতা। আরো, আরো বড় হবে সে। আরো বড় বাড়ি—স্কাইস্ক্র্যাপার, ছ'খানা গাড়ি, ইয়োরোপে ব্যবসা।

কেউ কি জানে—মনে করে রেখেছে কেউ, এক মেয়ে রাজা করে দিয়েছিল তাকে! সমস্ত জীবন দিয়ে ভালবেসে বেসে, ঠাণ্ডা হয়ে গেল সে মেয়ে। আঃ, সে কি ঠাণ্ডা! কত তাপ তাকে দিতে চাইলো ভাস্কর, কতবার জড়িয়ে নিল বুকের মধ্যে। তবু তো মুছল না তার ঠোঁটের নীল, ঘুচলো না জীবন-ভুলানো শীতের হিম। তার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্করও ঠাণ্ডা হয়ে গেল, জীবন ভরে দুঃখের রাগিণী।

ট্রেনের তীব্র বাঁশি বাজলো, উড়ে গেল অ্যালুমিনিয়মের পাখা ঝাপটে এরোপ্লেন, একটা গাড়ির হেডলাইটের তীব্র কটাক্ষে বিদ্ধ হোল পথের পীচ।

চমকাল ভাস্কর। কোথায় ঠাণ্ডা! তার রক্তের মধ্যে, ধমনীতে ধমনীতে বইছে উষ্ণ স্রোত—বাজছে সেখানে মালকোষ, সুরের রাজা মালকোষ—তারপর কি বাজতে পারে আর কোন তান!

॥ সমাপ্ত ॥

যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ। সাহিত্য ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জাতির জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। রাজনীতির রণক্ষেত্রে জাতীয়তার স্থান নাই। বিশাল ও বিপুল, উদার ও পবিত্র সাহিত্যই মানবকে উদ্বুদ্ধ, উন্নত ও জাতীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সাহিত্যই মানবের উন্নতির সোপান, মুক্তির পথ; 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

।। ধারাবাহিক উপন্যাস ।।



অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রাতশ্রী মঞ্জিল

'তারপর ছ' বছর বাদে যখন দ্বিতীয়বার নীনা সেহানকে দেখলাম, তখন সে আর কিশোরী নেই, তখন তার পূর্ণ যৌবন।' বললেন কানাই মিত্তির। 'সে এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ব্যাপার।'

আমি বললাম, 'ষোলো বছরের কিশোরী মেয়ে ছ' বছর বাদে পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠবে, এই তো স্বাভাবিক, কানাইবাবু। এতে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের কি আছে?'

কানাই মিত্তির তাঁর নিজের কথারই জের টেনে বলতে লাগলেন, 'দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। অদ্ভুত যোগাযোগ। বিধাতার বিশেষ কারসাজি। নইলে পিয়ানো-সাধক ফাদার ফন্‌সিকার আশি-বছরী জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে হঠাৎ দামী টিকেট কেটে আমি হাজির হতে গেলাম কেন?'

'হঠাৎ খেয়ালে?'

'সম্পূর্ণ হঠাৎ। হলে ঢুকে যখন একেবারে প্রথম সারির মাঝামাঝি একটা আরামদার আসনে বসলাম, তখন জানতাম না অনুষ্ঠানের শেষের দিকে কি বিস্ময়, কি চমক আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে।'

'কি সেই বিস্ময় কানাইবাবু?'

'বিস্ময়ের আগে কি, সেইটে আগে বলে নিতে হয়। অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকে ঘণ্টা দুই বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন বাজিয়ের পিয়ানো আর বেহালা বাজনা। অনবদ্য। আশ্চর্য শুরু, আশ্চর্য বাজানো, আশ্চর্য থামা। পাশ্চাত্য সঙ্গীত আগে শুধু 'মন্দ লাগত না', এবার ভালো লাগল। তারপর……'

'তারপর?……'

ঋষিতুল্য সৌম্যদর্শন ফাদার ফন্‌সিকা এতক্ষণ স্টেজের একধারে চেয়ারে বসে নিবিষ্টমনে সঙ্গীত শুনছিলেন। এইবার উঠে পাদপ্রদীপের সামনে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—'বন্ধুগণ! আমাকে উপলক্ষ করে যাঁরা সঙ্গীত শোনালেন এবং শুনলেন, তাঁরা সবাই আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। তার আগে আজ এই শুভ সুযোগে আপনাদের সামনে পেশ করছি আমার সঙ্গীত-জীবনের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।'

'আমরা ভাবলাম বীঠোফেন, মোৎসার্ট, শপাঁ, হবাগ্‌নার প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য সুর-স্রষ্টারা যেমন পিয়ানোতে বাজাবার জন্য নানা সুর সৃষ্টি করে গেছেন, ফাদার ফন্‌সিকাও তেমনি তাঁর তৈরি কিছু অসাধারণ সুর পিয়ানো-যন্ত্রে বাজিয়ে শোনাবেন।' বললেন কানাই মিত্তির। 'আমরা আশা করলাম এইবার তিনি এগিয়ে যাবেন পিয়ানোর দিকে, গিয়ে বসবেন ঐ পিয়ানো বাজাবার টুলটার ওপর, তারপর পিয়ানোর বুকে ঐ শীর্ণ আঙুলগুলোর ছোঁয়ায়

ছোঁয়ায় জেগে উঠবে অনবদ্য সুর-ঝঙ্কার। কিন্তু না, পিয়ানোর দিকে গেলেন না ফাদার ফন্‌সিকা, ধীরে ধীরে চলে গেলেন স্টেজের নেপথ্যে।'

নেপথ্য থেকে আবার যখন স্টেজে ফিরে এলেন, তখন আর একা নন ফাদার ফন্‌সিকা, তাঁর সঙ্গে······

ছ' বছর আগেকার অতীতে চলে গেলেন মুগ্ধনেত্র কানাই মিত্তির, একেবারে সামনের সারিতে বসে-বসেই। সেই যেদিন সাঁতার আর দেহ-সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী কিশোরী নীলা সেহানের মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন বিজয়িনীর মুকুট। তারপর আর কোনো খোঁজ মেলে নি নীলা সেহানের, সে যেন নিজেকে গোপন করে ফেলেছিল কোন অজ্ঞাতবাসে। তার সেই আত্মগোপনও অদ্ভুত রহস্যময়। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল কানাই মিত্তিরের। এ-কি তবে সেই·····? আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে লাগল কানাই মিত্তিরের মন।

কিন্তু বেশিক্ষণ দোলার দরকার হল না। সন্দেহ নিরসন করে ফাদার ফনসিকা নাম ঘোষণা করলেন: 'মিস নীলা সেহান।'

ফাদার ফন্‌সিকার মুখে ঐ নাম শুনে আমার সারা দেহে আর মনে এক অনির্বচনীয় রোমাঞ্চের বিদ্যুৎ খেলে গেল, ধনপতিবাবু।' বললেন কানাই মিত্তির। 'ভাবটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, সুতরাং চেষ্টা করে লাভ নেই। হলশুদ্ধ সবার দৃষ্টি তখন স্টেজের ওপর ফাদার ফন্‌সিকার পাশের দিকে নিবদ্ধ; সবার চোখ কিছুক্ষণের জন্য পলক ফেলতে ভুলে রইল। আমারও।'

'তারপর?'

ফাদার ফনসিকা বললেন, 'পিয়ানিস্টরূপে নীলা সেহানের সাধারণের সামনে এই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ। আজ আপনাদের সামনে পরীক্ষা, পিয়ানো সঙ্গীতের সার্থক শিল্পী আমি তাকে বানিয়ে তুলতে পেরেছি কি না।'

পিয়ানোতে গিয়ে বসল নীলা সেহান।

'এ যদি সেই নীলা সেহান হয়, তা হলে কৈশোরের নীলা সেহান হার মেনে গেছে যৌবনের নীলা সেহানের কাছে।' ভাবলেন কানাই মিত্তির।

পিয়ানোর বুকে নীলা সেহানের আঙুলের টোকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা পিয়ানো-যন্ত্রটা সুরে সুরে মাতাল হয়ে উঠল। সঙ্গীত-জগতের দিক্‌পাল শিল্পীরা এতক্ষণ ধরে সুরের যে আশ্চর্য ইমারত গড়ে তুলেছিলেন, পিয়ানোর নতুন ঝংকারে ঝংকারে সেই ইমারত তাসের ঘরের মতো ভেঙে ভেঙে ঝরে পড়তে লাগল।

'পিয়ানোর অন্তরে যে এত যাদু লুকানো, তা নীলা সেহানের পিয়ানো বাজনা না শুনলে ধারণাই করতে পারতাম না, ধনপতিবাবু।' বললেন কানাই মিত্তির। 'প্রথম আবির্ভাবেই আসর মাত করে দিল নীলা সেহান। সবাই বিস্মিত আর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানালেন পিয়ানো-সঙ্গীতাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র নীলা সেহানকে, আর তার সঙ্গীতগুরু ফাদার ফনসিকাকে।'

'তারপর?'

'আলাপ করলাম ফাদার ফনসিকার সঙ্গে, নীলা সেহানের সঙ্গে। নীলার মা অসুস্থ থাকায় অনুষ্ঠানে আসতে পারেন নি। আমি বাড়ি ফিরবার পথে আমার গাড়িতে নীলাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চললাম।'

গাড়িতে যাবার সময় কানাই মিত্তির বলেছিলেন, 'ছ' বছর আগে সাঁতার আর 'বডি বিউটিফুল' (body beautiful) প্রতিযোগিতায় এক কিশোরী নীলা সেহানের মাথায় আমি বিজয়িনীর মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলাম।'

'আমি তা ভুলি নি, মিস্টার মিটার।' বলেছিল নীলা সেহান।

একথায় নিঃসন্দেহ হয়ে পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কানাই মিত্তির বলেছিলেন, 'তারপর আর তার দেখা পেলাম না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল, সে যেন লুকিয়ে রইল কোন রহস্যময় অজ্ঞাতবাসে। আমার সমস্ত সন্ধান ব্যর্থ হতে লাগল। অবশেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম, ভাবলাম এ জীবনে আর দেখা হবে না।'

'কিন্তু কেন অত সন্ধান করেছিলেন, মিস্টার মিটার?' প্রশ্ন করেছিল নীলা সেহান, আশ্চর্য সুন্দর সহজ ভঙ্গিতে।

'হয়তো কৌতূহল। অথবা খামখেয়ালী। অথবা পাগলামী। অথবা অন্য কিছু।' বলেছিলেন কানাই মিত্তির। 'অলিম্পিক সাঁতারু আর মিস ইউনিভার্স (Miss Universe) হবার অসামান্য সম্ভাবনা যে মেয়ের মধ্যে, সে অমন জয়জয়কারের মাঝখানে অমনভাবে অন্তর্ধান করলে ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হয় না কি?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নীলা সেহান বলেছিল, 'সেই অন্তর্ধান আর অজ্ঞাতবাস আমার সঙ্গীতগুরু ফাদার ফন্‌সিকার আদেশে। ফাদার বলেছিলেন অন্য সমস্ত কিছু ভুলে থাকতে হবে, ইউ মাস্ট গিভ ইওর হোল-হার্টেড ডিভোশন টু দ্য পিয়ানো (You must give your whole-hearted devotion to the piano)। এই কড়ারে ফাদার আমাকে কি তালিম দিয়েছিলেন, তার কিছুটা আভাস হয়তো পেয়েছেন আমার আজকের বাজনা থেকে। জানি না পেয়েছেন কি না, তেমন করে বাজাতে পেরেছি কি না।'

'ইউ ওয়্যার স্প্লেন্ডিড, মিস্ সেহান। ইউ ওয়্যার সুপার্ব!' বলেছিলেন কানাই মিত্তির। 'অমন আশ্চর্য পিয়ানো বাজনা আমি জীবনে কখনো শুনি নি, শুনবার সৌভাগ্য হবে বলে কল্পনাও করি নি।'

'নাইস অভ ইউ টু সে সো (Nice of you to say so), মিস্টার মিটার।' বলেছিল নীলা সেহান। 'আপনার কমপ্লিমেন্টের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বড় দুঃখিত।'

'কেন, মিস সেহান?' বিস্মিত প্রশ্ন কানাই মিত্তিরের।

'আই ওয়াজ নট ইন মাই ফর্ম টু-ডে (I was not in my form today) মিস্টার মিটার। আমার সেরা বাজনা আমি আজ শোনাতে পারলাম না। চেষ্টার কসুর করি নি। তবু পারলাম না। পিয়ানোয় টোকা দিতে দিতে বার বার মনে হচ্ছিল আমার এই সম্মান দেখবার জন্য, এই বাজনা শুনবার জন্য, বাবা বেঁচে নেই, মাও অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন বাড়িতে। বার বার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। কোনোরকমে যে শেষরক্ষা করতে পেরেছি, তা শুধু এই ভেবে যে আজ আমার ওপর নির্ভর করছে ফাদার ফর্নাসিকার সম্মান, আমার ভেঙে পড়লে চলবে না।'

বলতে বলতে আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল কুমারী নীলা সেহানের কণ্ঠস্বর। সেই আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল কানাই মিত্তিরের মনে। নীলা সেহানের বাজনা শুনছিলেন যখন, তখন বারবার তাঁর চোখ দু'টিও জলে ভরে উঠছিল, কান্নায় ভরে উঠছিল বুক। মুখ মুছবার ছল করে রুমাল দিয়ে অনেকবার চোখ মুছতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি; শুধু তিনি নয়—এইবার বেশ ভালো করেই মনে হল তাঁর—আরো অনেকে। তার রহস্যটা এইবার পরিষ্কার হয়ে গেল। নীলা সেহানের প্রাণের কান্না কেমন করে তার সঙ্গীতে মিলে গিয়েছিল, নীলা সেহান তা নিজেই টের পায় নি, তাই জানতে পারে নি তার সঙ্গীতের দরদী আবেদন শ্রোতাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে কান্নার ঝংকার জাগিয়ে তাঁদের চোখ কেমন করে জলে ভরে দিয়েছে।

নীলা সেহানের মনের অহেতুক সংশয় ভেঙে দেওয়া কর্তব্য মনে করে কানাই মিত্তির বলেছিলেন: 'ইউ ডু নট নো হাউ সুপার্ব ইউ ওয়্যার (You do not know how superb you were), মিস সেহান। আপনি নিজেই জানেন না কি আশ্চর্য বাজনা আপনি আজ বাজিয়েছেন। আমি পিয়ানো সঙ্গীতের ব্যাকরণ বুঝি নে, আমি মুগ্ধ হয়েছি।

আমার দুপাশে বসেছিলেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কয়েকজন প্রবীণ রসিক-পণ্ডিত সমঝদার। তাঁরাও একবাক্যে বললেন 'এমন নিখুঁত আর মর্মস্পর্শী পিয়ানো বাজনা তাঁরা অনেকদিন শোনেন নি। আপনার প্রত্যেকটি সুরের সমাপ্তির পরই তাঁরাও যে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠছিলেন, তাঁদের সেই হাততালি ফাঁকা উচ্ছ্বাসের নয়। আর আপনার সর্বশেষ বাজনার পর আপনি যখন উঠে দাঁড়ালেন হাততালি-রত মুগ্ধ শ্রোতাদের মুখোমুখি, ধীরে ধীরে উঠে এসে ফাদার ফর্নাসিকা আপনার ললাটে এঁকে দিলেন তাঁর স্নেহ-আশীর্বাদের চুম্বন, আমি পরিষ্কার লক্ষ্য করলাম তাঁর দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে আনন্দাশ্রু। প্রথম আবির্ভাবেই জয় হয়েছে আপনার, সঙ্গীত জগৎ আপনাকে স্বীকার করে নিয়েছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়েছেন, তাই সাফল্যের অপরিসীম আনন্দে হৃদয়পাত্র উছলে উঠেছে ফাদার ফর্নাসিকার।'

নীলা সেহানকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাবার পথে গাড়িতে তার সঙ্গে কথোপকথনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন কানাই মিত্তির। এইখানটায় এসে থামলেন, আর ভাবলেন একটু। তারপর বললেন: 'মনের বুকে ঐ ছবিটা এখনো আঁকা রয়েছে, ধনপতিবাবু। মঞ্চে পাদ-প্রদীপের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বার্ধক্য আর যৌবন; বিদায় নেবার আগে বার্ধক্য যৌবনের ললাটে এঁকে দিয়ে যাচ্ছে চুম্বনের জয়টীকা। দেখে মনে হল এই বৃদ্ধ ফাদার ফর্নাসিকারও একদিন যৌবন ছিল। আর নীলা সেহানকে তখন দেখলাম অন্যরূপে। পিয়ানো বাজনায় যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ তার রূপ ছিল দু' হাতের লীলাময়ী আঙুলের ডগায়। এখন শেষ হয়েছে পিয়ানো বাজনা, এখন তার রূপ ছড়িয়ে আছে মাথার চুল থেকে পায়ের ডগা পর্যন্ত। মনে হলো এতক্ষণ যার পিয়ানো বাজনার যাদুতে মুগ্ধ হলাম, সে অন্য নীলা সেহান, এখন যে নীলা সেহানকে দেখছি সে ভারত-সুন্দরী, মিস ইণ্ডিয়া (Miss India), রওনা হতে চলেছে দেহ-সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সেরা সুন্দরী 'মিস ইউনিভার্স' (Miss Universe) হতে। নীলা সেহানের ঐ আশ্চর্য মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল যাদুমন্ত্রে বিশ্বের সেরা সুন্দরী ট্রয়ের হেলেনের আবির্ভাব দেখে ডক্টর ফস্টাসের মুখ থেকে মুগ্ধ উচ্ছ্বাসের যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল:

'Was this the face that launched a thousand ships
And burnt the topless towers of Ilium?
Sweet Helen, make me immortal with a kiss.

এই কি সেই মুখ, যার জন্য এক সহস্র রণতরী ভেসেছিল সমুদ্রে, আর ট্রয়ের গগনচুম্বী মিনারগুলি পুড়ে হয়েছিল ভস্মীভূত? ওগো মধুময়ী হেলেন, আমাকে অমর করো একটি চুম্বনে।'

ডক্টর ফস্টাসের হেলেন-সম্পর্কিত মর্মোচ্ছ্বাস আবৃত্তিতে কণ্ঠস্বর একটু চড়া পর্দায় উঠে গিয়েছিল; তাকে

একটু নীচুতে নামিয়ে এনে কানাই মিত্তির বললেন : 'অনেক অবান্তর কথা বলে ফেললাম, ধনপতিবাবু। কি জানেন? নীলা সেহানের কথা উঠলেই আমার মুখে অনেক কথা ভিড় করে আসে, তাদের সামলাতে পারি না। সি ইজ এ সুপার্ব আর্টিস্ট। ওর পিয়ানো বাজনা আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

হয় তো তাই, কারণ তা না হলে পত্নী মৃণালিনীকে পিয়ানো শেখাবার জন্য কুমারী নীলা সেহানকে তাঁর শিক্ষয়িত্রী করেছেন কেন? আমি পিয়ানো বাজনা শুনি নি নীলা সেহানের, কিছুক্ষণ আগে যা শুনেছিলাম তা সমাপ্তির টুং-টাং মাত্র, তা থেকে কোনো পিয়ানো-শিল্পীর গুণপনার হিসেব করা চলে না। কিন্তু নীলা সেহানকে দেখে তার পিয়ানিস্ট পরিচয় পেয়ে মনে হয়েছিল অসাধারণ পিয়ানো-শিল্পীকে বিধাতা বাহুল্য করে এত রূপ আর এত যৌবন কেন দিয়েছেন? বরং অন্য কোনো আকর্ষণ যে মেয়ের মধ্যে নেই, এ দু'টি সম্পদ পেলে সে উপকৃত হত।

'তারপর অনেক কথা বাদ দিয়ে সংক্ষেপে বলি, ভালো কোম্পানি থেকে গ্র্যাণ্ড পিয়ানো একটা কিনে আনলাম বাড়িতে।' বললেন কানাই মিত্তির।

পিয়ানো দেখে মৃণালিনী বললেন : 'এ কি?'

কানাই মিত্তির বললেন, 'পিয়ানো। তোমার জন্যে আনলাম। পিয়ানো বাজনা শিখবে তুমি।'

'এ যে বিলিতি বাজনা। এ কি আমি বাজাতে পারব?'

'শিখলেই পারবে। আর যাতে শিখতে পারো সেই ব্যবস্থাই করব। পিয়ানো শেখাবার পাকা মাস্টার রেখে দেব তোমার জন্যে।'

'ও মা, বাজনা শিখব আমি মাস্টারের কাছে?' বললেন মৃণালিনী, 'মাস্টার' শব্দটার ওপর ঈষৎ আপত্তিসূচক জোর দিয়ে।

'আচ্ছা বেশ, তা হলে মাস্টার নয়, 'মাস্টারণী'র ব্যবস্থাই করা যাবে।' বললেন কানাই মিত্তির। 'যেমন তোমার পছন্দ।'

তারপর কিছুদিনের ভেতরই অ্যাটর্নী-বাড়ির বধূ মৃণালিনীর পিয়ানো শিক্ষা শুরু হল কুমারী নীলা সেহানের কাছে।…

আরেক গ্লাস ফলের রস আমার হাতে তুলে দিলেন কানাই মিত্তির। গ্লাসটি তাঁর হাত থেকে নেবার সময় লক্ষ্য করলাম তাঁর হাতে একটি বড় নীলার আংটি, যেটি এতক্ষণ আমার চোখে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু পড়ে নি। ঐ নীলা থেকে নীল আলো ঠিকরে পড়ছে বলে মনে হতে লাগল যেন। আমি আংটিহীন মানুষ, কিন্তু নানা মুখে নীলা সম্বন্ধে নানা কথা শুনে আমার মনে এক অদ্ভুতরকম নীলাতঙ্ক জন্মেছিল। নীলা ধারণ করলে নাকি ধারণকারীর অসামান্য মঙ্গল অথবা অসামান্য অমঙ্গল হয়। নীলা মধ্য পথ জানে না এবং কার পক্ষে সে কল্যাণময়ী আর কার পক্ষে সর্বনাশিনী হবে, তা কেউ বলতে পারে না। সুতরাং নীলা ধারণ করা মানেই ভীষণ ঝুঁকি নেওয়া। কানাই মিত্তিরের জন্য উদ্বেগে আমার মন ভরে উঠল।

কানাই মিত্তির ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিলেন তাঁর গ্লাসের ফলের রসে, আর আমি আনমনা ভঙ্গিতে আমার গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর গ্লাস-ধরা ডান হাতের আংটি-পরা আঙুলের দিকে। মনে হচ্ছিল তাঁর হাতের ঐ নীলা যেন জোরালো চুম্বকের মতো ওরই দিকে টেনে রাখছে আমার দৃষ্টিকে।

ক্রমে মনে হল ঐ নীলার নীল আভার সম্মোহনী যাদুতে আমি যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। যেন ভীষণ সুন্দর ঐ নীলা—ভীষণ অথচ সুন্দর, সুন্দর অথচ ভীষণ। এক নজরে ওরই দিকে তাকিয়ে থাকবার ফলেই কি না জানি না, আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। নীলা পাথরের নীল আলোটাও মনে হল যেন ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরময়—শুধু নীল, নীল আর নীল, সমস্ত রং ছাপিয়ে উঠে নীলের আধিপত্য। এক গেলাস জলে একটি নীলের টুকরো ফেলে দিলে যেমন করে সারা গেলাসের জল নীল হয়ে যায়, কানাই মিত্তিরের আংটির ঐ নীলা পাথরটাও যেন তেমনি সারা ঘরের আবহাওয়াটাকেই নীল করে দিল। বিস্ময়, অস্বস্তি আর আশঙ্কায় মেশানো একটা আওয়াজ হঠাৎ বেরিয়ে এল আমার বুক থেকে।

'কি হল, ধনপতিবাবু?'

'ও কিছু নয়। এমনি।'

'আমাকে চমকে দিয়েছিলেন কিন্তু। এবারকার পানীয়টা খারাপ লাগছে কি?'

'মোটেই না। চমৎকার।'

কানাই মিত্তির বললেন, 'দু-চারজন পছন্দ করেন না, কিন্তু এটাই আমার ফেভারিট, প্রিয়তম পানীয়। মদ আমি ছুঁই নে কারণ মদে আমার রুচি নেই। পালোয়ান অ্যাটর্নীর নাতি মদ গিলছে, এ আমি ভাবতেই পারি নে, ধনপতিবাবু।'

কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করলাম কি না জানি না, কিন্তু পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, 'কিন্তু মদ তো শুধু কাচের বোতলেই থাকে না, কানাইবাবু।' আর ভাবলাম মারাত্মক নীলা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দেবো কানাই মিত্তিরকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি মুখ খুলবার আগেই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন : 'একটা কথা বিশেষ করে আপনাকে বলতে চাই, ধনপতিবাবু। মানে আপনাকে একটু হুঁশিয়ার করে দেওয়া উচিত মনে করছি।'

চমকে উঠলাম। কি সম্বন্ধে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছেন তিনি এবং কেন? কৌতূহলী হয়ে কান পেতে রইলাম।

'হ্যাঁ, আপনাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া দরকার মনে করছি আশাভঙ্গের বেদনা থেকে বাঁচাবার জন্যে।' বললেন অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির। 'আপনার রোমান্টিক মনই আপনাকে টেনে এনেছে এই ভূতপূর্ব বাতাসী মঞ্জিলে, যার সঙ্গে কিংবদন্তীখ্যাত বাতাসী বিবির স্মৃতি বিজড়িত।'

'অস্বীকার করব না। কৌতূহলে ভরা আমার মন।'

'রোমান্টিক মনের প্রধান ধর্মই কৌতূহল, ধনপতিবাবু। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে বহুবার শুনে শুনে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছেন সেই ইংরেজি ছেলেমানুষী কথাটা: ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন (Truth is stranger than fiction)। অর্থাৎ কল্পনার মালমশলা দিয়ে বানানো কাহিনী বা কিংবদন্তীর চাইতে নির্ভেজাল, বাস্তব সত্য অনেক বেশি অদ্ভুত। তাই বাতাসী বিবি আর বাতাসী মঞ্জিল সম্বন্ধে আপনি 'ট্রুথ' (truth)-এর সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আশা করছেন ফিক্‌শন (fiction)-এর চাইতে তা বেশি অদ্ভুত হবে।'

আমি কিছু বলবার উপক্রম করতেই তিনি আরো বলে উঠলেন: 'কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে উল্টো: ফিক্‌শন ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ট্রুথ (Fiction is stranger th n truth)। সত্য যখন জানবেন তখন দেখবেন তা সাদা, সহজ, সরল, তাতে অদ্ভুত কিছু নেই। কিংবদন্তী আর গাল-গল্পের রামধনু-রঙা প্রাসাদ যখন সাদা সত্যের ধাক্কায় পড়ে যাবে, তখন সেই আশাভঙ্গের দুঃখ সইতে পারবেন, ধনপতিবাবু?'

'পারব?'

'যেন পারেন, সেই জন্যেই হুঁশিয়ার করে দিলাম। মনে রাখবেন ফিক্‌শন ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ট্রুথ।'

ভৃত্য এসে খবর দিল ফোনে ডাক এসেছে। ভেতরে গিয়ে ফোনে কথা কয়ে ফিরে এসে কানাই মিত্তির বললেন, 'বাবা ফোন করেছিলেন ব্যারাকপুর থেকে। তিনি আর তাঁর বৌমা ওখান থেকে কাল ভোরে ফিরবেন বেশি রাত হয়ে যাবে বলে আজ আর ফিরবেন না।'

'সুতরাং আজকে আর ওঁর সঙ্গে দেখা হল না।'

'আমি দুঃখিত, এতক্ষণ আটকে রাখলাম আপনাকে।' বললেন কানাই মিত্তির। 'ভেবেছিলাম আটটা সাড়ে আটটার ভেতর ওঁরা ফিরে আসবেন, তখন বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হবে। কিছু মনে করবেন না, ধনপতিবাবু। আই অ্যাম সো সরি।'

'আপনার দুঃখিত হবার কিছুমাত্র কারণ নেই, কানাইবাবু। আসা আমার বৃথা হয় নি, আপনার সঙ্গে আলাপে আমি লাভবান হয়েছি। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হল না। তাঁর কাছ থেকে একটি জিনিস নিয়েছিলাম, সেটা আপনার কাছে দিয়ে গেলে তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিতে পারবেন কি?'

জানি না কেন অমন প্রশ্ন ফস্ করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় ঠিক উচিত হয় নি।

'পারা অসম্ভব নয়, ধনপতিবাবু; কিন্তু আপনি নিয়েছিলেন, আপনিই তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিলে ভালো হয়।' বললেন কানাই মিত্তির। 'বাবার ডিপার্টমেণ্টে আমি পারতপক্ষে নাক গলাই নে বা হস্তক্ষেপ করি নে। অবশ্য জিনিসটা কি তা জানতে আমার আপত্তি নেই, জানাতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

সামনের দেয়ালে ৺নটবর মিত্তিরের জীবন্ত জীবনায়তন তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে বললাম: 'আপনার দাদুর রেখে যাওয়া ডায়েরির কয়েকটি অধ্যায়, আপনার বাবার হাতে নকল করা।'

ভেবেছিলাম কৌতূহলী হয়ে উঠবেন কানাই মিত্তির, কিন্তু হলেন না, অন্তত কৌতূহলের কোনো ভাব প্রকাশ পেলো না তাঁর চেহারায় বা ভঙ্গিতে। নিস্পৃহ, সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'পড়েছেন? কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ হয় বাহুল্য মাত্র। বরং প্রশ্ন করি, কেমন লাগল?'

বললাম, 'চমৎকার।' মনে প্রশ্ন জাগল কানাই মিত্তির তাঁর দাদুর ডায়েরি পড়েছেন কি-না। মনে হল যেন আমার মনের প্রশ্ন মনে-মনে শুনে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমি পড়ি নি।' তারপর আমি প্রশ্ন করবার আগেই বললেন, 'পড়বার আগ্রহও তেমন নেই, কারণ অতীত নিয়ে আমি খুব বেশি মাথা ঘামাই নে, ওটা এখন বাবার ডিপার্টমেণ্ট। আমার ডিপার্টমেণ্ট হচ্ছে বর্তমান, কারণ অতীত মৃত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন, ধনপতিবাবু।' বলে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন ওধারের দেয়ালের দিকে, যেখানে ঝুলছিল ফ্রেমে-বাঁধানো ধবধবে সাদা কাগজের বুকে পুরু আর বড় কুচকুচে কালো হরফে আঁকা চার লাইনের ইংরেজি কবিতা:

'The past is dead and gone,
The future uncertain.
Oh, make the most of the flitting moment
That will not come again.'

লাইনগুলো আগে দেখেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্য করি নি। এবার লক্ষ্য করে পড়লাম, আর মনে মনে তর্জমা করলাম:

'যে কাল চলে গেছে, সে অতীত, সে মৃত।
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।
এই যে মুহূর্ত চলে যাচ্ছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করো,
এ আর ফিরে আসবে না।'

'ধনপতিবাবু, আমাদের পরিবারে বংশানুক্রমে

অ্যাটর্নীগিরির ঐতিহ্য চলে আসছে সেই ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমল থেকে। বললেন, এ বংশের সর্বশেষ অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির। 'এ ঐতিহ্য প্রথম চোট খেয়েছিল যখন আমার পিতামহ, পালোয়ান-অ্যাটর্নী নটবর মিত্তির, দেনার দায়ে চরম দুর্দশাপন্ন কুমার-সাহেবের এই সম্পত্তি জলের দামে কিনে নিলেন তাঁর মক্কেলের জন্য—মক্কেলের নাম বাতাসী বিবি, আর এ বাড়ির নাম হল বাতাসী মঞ্জিল। তারপর দ্বিতীয় ধাক্কা এলো, প্রচণ্ড ধাক্কা, যখন—'

'যখন·····?'

"'যখন ফাদার ফন্‌সিকার সম্মান রজনীতে দৈবাৎ হাজির হয়ে আমি নীলা সেহানের পিয়ানো বাজনা শুনলাম।

এমন সময় সোফার রামভজন এসে কানাই মিত্তিরকে সেলাম জানিয়ে বলল, 'হুঁজুর!'

'কি খবর, রামভজন?'

'সেহান মেমসাহেবকে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। তিনি বহুৎ থ্যাংকস্ পাঠিয়েছেন আপনাকে।' [ক্রমশ।

ব্যর্থ বাঁশরি!





গায়কের ভাগ্য

ইণ্ডা-রোমানি-চাই

[সোভিয়েট রাশিয়ায় বহু জিপসী বাস করে, জারের আমলে এরা ছিল অত্যন্ত অত্যাচারিত ও দুঃস্থ, দেশময় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হত বাউণ্ডুলের মত, কারণ সেদিনের রাশিয়ায় এদের ঘর বাঁধবার মত না ছিল কোন সুযোগ, না ছিল কোন সুবিধা। জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, জিপসীরা ভিক্ষুক ও স্বভাব-অপরাধী ব্যতীত আর কিছু হতেই পারে না। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে জিপসীদের ভাগ্যও কিছুটা ফিরল, সোভিয়েট রাষ্ট্র তাদের পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকার স্বীকার করে নিল অসঙ্কোচে। আজ আর সে-দেশে জিপসী ক্যাম্প বলে কোন বস্তু নেই, জিপসীরা সকলেই কাজ করে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত আর সকলের মতই। আজ এই সম্প্রদায়ের ভেতর কর্মকুশল স্থপতি, চিকিৎসক, সুরকার, লেখক, শিক্ষক, অভিনেতা প্রভৃতির কোন অভাব নেই। মস্কোতে অবস্থিত দি রোমান জিপসী থিয়েটার নামে যে নাট্যশালাটি আছে নাট্যামোদীমাত্রই তার নাম জানেন। জিপসী জীবন নিয়ে রচিত একটি কাহিনী-সংকলন সম্প্রতি পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করেছে লেনিনগ্রাড' শহরে, বইটির শিরোনামা 'স্টোরিজ অফ দোজ, ফলোয়িং দি সান'। লেনিনগ্রাড ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা বিভাগের সুযোগ্যা শিক্ষার্থিনী ইংগা অ্যাণ্ড্রনিকোভা উপরোক্ত কাহিনীগুলি সংগ্রহ করেছেন। এই মহিলার 'পেন নেম' অর্থাৎ যে নামে তিনি লেখেন, হল 'ইণ্ডা-রোমানি-চাই'। রোমান ভাষায় এই নামের অর্থ, সাধারণের কন্যা বা যাযাবরী। লেখার জন্য এ ধরণের নাম নির্বাচন করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয় মোটেই, কারণ ইংগা নিজেও জিপসী-কন্যা। জিপসীদের ইতিকথা বা লোকসাহিত্য থেকে সংকলন করার কাজে ইণ্ডা-রোমানি-চাই অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সংকলনগ্রন্থে সংগৃহীত গল্পগুলির মধ্য থেকে একটি অনবদ্য গল্প আমরা পাঠকদের দিচ্ছি।—স]

অশ্ব শুধু সামনের দিকেই এগোয়, যতই কশাহত হোক না কেন, সে নাচবে-কুঁদবে কিন্তু পিছু হঠতে চাইবে না কখনই।

কিন্তু মানুষের মনের কথা স্বতন্ত্র, তা সমান তৎপরতার সঙ্গে এগুতে বা পিছোতে সক্ষম।



লেখিকা

বৃদ্ধরা যা জানে তা তাদের ছেলে-মেয়েকে বলে যায়। আবার ছেলেমেয়ের, ছেলে-মেয়েদেরও বলতে কসুর করে না।

বহু শত হয়ত বা হাজার বছরেরও আগে জিপসীরা যাযাবর ছিল না। তারা বাঘতালি নামে তাদের পিতৃভূমিতে বাস করত আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই। সূর্যালোকে ভেসে যেত সে মনোরম প্রদেশ, নীল আকাশ যেন মিতালী পাতাতে চাইত সে-দেশের শ্যামল পথ-প্রান্তরের সাথে।

যাদুকরদের রাজা সে-দেশ শাসন করতেন। কেউ জানে না কোথা থেকে কবে তিনি এসেছিলেন, তাঁর কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব ছিল না, আর তিনি ছিলেন চিরতরুণ।

লাল পাথরের যে প্রাসাদটিতে রাজা থাকতেন, তার ভিতর-বাহির সজ্জিত ছিল মানুষ ও নানা জীবজন্তুর স্বর্ণনির্মিত প্রতিমূর্তি দ্বারা। প্রাসাদের চারিধার বেষ্টন করেছিল সুরম্য উদ্যান—যার





মাঝখানে অবস্থিত ছিল একটি অপরূপ ফোয়ারা। ফোয়ারাটির বিশেষত্ব ছিল এই যে, তার মধ্য থেকে যা সহস্রধারে নিঃসারিত হয়ে সকলের চোখকে মুগ্ধ করত—তা জল নয় সুরা।

এই যাদুসম্রাট নৃত্য ও গীত প্রিয় ছিলেন।

প্রত্যেকদিন যখন তিনি দেশের মান্যগণ্য ও সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে ভোজে বসতেন, প্রাসাদে গানের সুরধুনী বয়ে যেত।

সূর্য, চন্দ্র ও তারকাদের সম্মানার্থে বছরে তিনটি দিন বিশেষ ছুটির দিন বলে নির্দিষ্ট ছিল।

আর বছরের সব সেরা পরবের দিন বলে গণ্য হত সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ্ ও বাদ্যকরদের ছুটির দিনটি। ধনী, দরিদ্র উচ্চ, নীচ নির্বিশেষে সকলে এই দিনটিতে সমবেত হয়ে উৎসব করত।

সেই বিশেষ দিনটিতে যে-কোন গায়ক, বাদক বা নাচিয়ে রাজার সামনে নিজেদের গুণপনা দেখাবার সুযোগ পেত।

রাজা শিল্পীদের স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ দিতেন, কারুকে দশ, কারুকে কুড়ি, কারুকে বা একশত বা আরও বেশি, কিন্তু হাজারের বেশি স্বর্ণমুদ্রা কারুকেই দেওয়া চলত না।

রম নামে একটি দরিদ্র সন্তান ছিল, পিতৃমাতৃহীন এই ছেলেটি কোন ধনীর গৃহে পশু-পালকের কাজে নিয়োজিত ছিল।

সে এত সুন্দর গান গাইতে পারত যে, শুধু মানুষই নয় পশু-পাখীরাও তার গান শুনতে ভালবাসত।

যখন সে গান ধরত তখন বাতাস স্তব্ধ হয়ে যেত, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্রমর্মর বন্ধ হয়ে যেত, মাঠে মাঠে তৃণগুচ্ছ মাথা দোলাতে ভুলত, আর প্রশস্ত নদীর স্রোতেও নামত সাময়িক বিরতি।

রম যে সব গান গাইত তা সকলেরই প্রিয় ছিল।

চাষীরা ক্ষেতে কাজ করতে করতে সেইসব গান ধরে দিত; কাঠুরেরা কাঠ কাটার সময় সেই সব সুরে গুঞ্জন তুলত, কামারদের কামারশালা ভরে যেত সেই সব গানের অনুরণনে, আবার ধনীর ভোজসভার উৎসবেও শোনা যেত তাদেরই প্রতিধ্বনি।

এই সব কারণেই হয়ত শেষপর্যন্ত রম রাজার সামনে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল। সেভেঙ্কো উৎসবের দিনটি এসে পড়ল।

প্রত্যূষে উঠে প্রত্যেক নগরবাসী নিজের নিজের কাষ্ঠ বা প্রস্তর নির্মিত বাসভবনগুলি ফুল লতাপাতা দিয়ে সজ্জিত করতে সুরু করে দিল।

রাজভৃত্যেরা পুষ্পমাল্যে শোভিত করল প্রাসাদের প্রতিটি স্বর্ণমূর্তিকে।

অবশেষে দীর্ঘ বুরুজে অবস্থিত রূপোর ঘণ্টাগুলি বেজে উঠল এক এক করে, আর সকলে ছুটল প্রাসাদের দিকে।

সম্রাট বেরিয়ে এলেন তাদের অভ্যর্থনা করতে, রাস্তা জুড়ে পাতা—ভোজন টেবিলগুলির পাশে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন তাদের।

ধনীদের ভোজ্য পরিবেশন করল সুসজ্জিত পরিচারকের দল, কিন্তু দরিদ্রদের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, তারা নিজেরাই নিজেদের পরিবেশন করার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

লোকেরা পান-ভোজনের সময় পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগল, আচ্ছা রাজা আজ রমকে কত স্বর্ণমুদ্রা দেবেন বলে মনে হয়?

হয়ত এ পর্যন্ত রাজা যাকে যা দিয়েছেন, রম তার চেয়ে বেশিই পাবে। হয়ত সে যা বইতে পারে তার চেয়েও বেশি টাকা পাবে, বলাবলি করল তারা। রম যাঁর পশুপালক ছিল, সেই ধনী ব্যক্তির কন্যা কারমারি প্রার্থনা করল যেন রম সবচেয়ে বড় পুরস্কারটিই পেয়ে যায়।

মেয়েটি রমের মধুর সংগীতের জন্য তাকে ভালবাসত আর সে ওকে ভালবাসত ওর সৌন্দর্যের জন্য। রম প্রায় নিশ্চিত ছিল যে বড় গোছের একটা পুরস্কার পেলেই সুন্দরীর বাবা ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হবেন।

গায়কেরা গান করে চলল একের পর এক। বিভিন্ন মাত্রায় সম্বর্ধিত হল তারা সমবেত জনতার দ্বারা।

কিন্তু রম গান সুরু করতেই সমস্ত পরিবেশটা বদলে গেল একেবারে, জনতা ভুলে গেল তারা ধনী না দরিদ্র, যুবক না বৃদ্ধ, আর তারা স্বর্গে না মর্ত্যে তাও ঠিক করতে পারল না।

সকলের শুধু মনে হল যে রম যেন নিজের হৃদয়ের আনন্দ বেদনাই শুধু সুরের মাধ্যমে ঢেলে দিচ্ছে না সে আনন্দ বেদনা তাদের সকলের একান্ত নিজস্ব। মনে হল রম নয় তারা নিজেরাই যেন দয়িতার উদ্দেশে হৃদয়ের না বলা বাণীটিকে সোচ্চার করে তুলেছে। রম গাইল, দরিদ্রের ভাগ্য আর ধনীকন্যা কারমারিকে ভালবাসার বেদনাকে উদ্দেশ করে—আনন্দ বেদনায় মেশামিশি সে ভালবাসা যেন সেদিন যাদুসম্রাটের উদ্যানের সুরভিমাখা উদ্যান প্রাঙ্গণে নিখিল মানবের ভালবাসার সঙ্গেই একাত্মীভূত

হয়ে গেল। আকাশে সূর্যদেব যেন প্রদীপ্ততর হয়ে উঠলেন, গায়কের দক্ষিণ পাশে হেলে পড়লেন তিনি।

চন্দ্রদেব নেমে এলেন মাটির বুকে, গায়কের বাম পার্শ্বে স্থান নিলেন উনি।

তারারা তখন দেখা দিল আকাশের বুকে, তারা নিশ্চল হয়ে রইল, খসে-পড়া উল্কারাও নিজেদের গতিরুদ্ধ করে দিল সে গান শুনে।

জীবনে কখনও যেভাবে গায় নি, সেইভাবে গাইতে লাগল উদ্দীপ্ত রম, ভালবাসা তাকে দিয়েছে নবতর শক্তি অচিন্ত্য অভাবনীয় প্রেরণা। তারারা হীরকদ্যুতি বিশিষ্ট অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল, বেদনায় সূর্যের চোখ পদ্মরাগমণির মত রক্তাভ হয়ে উঠল, চন্দ্রের হৃদয় যেন গলে পড়তে লাগল নীলকান্তমণির মত সমুজ্জ্বল আভায় জনতা গানের সুরে এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে এ-সব তাদের চোখেই পড়ল না।

সম্রাট ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গেলেন, দেবতাদের বেদনা-মথিত হৃদয়ের নিদর্শন, রত্নরাজিকে সংগ্রহ করে ত্বরিতে বন্ধ করলেন সেগুলিকে নিজের ধনাগারে।

গান শেষ হল, মোহভঙ্গ হল জনতার, ইতিমধ্যে সম্রাট নিজের পূর্বস্থানে ফিরে এসে আসন গ্রহণ করেছিলেন, যেন কিছুই ঘটে নি এইভাবে।

কপালের ওপর এসে-পড়া চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে, রম এবার ধরে দিল এমন এক আনন্দের গান যে, কারমারি নিজেকে আর সংবরণ করতে না পেরে ওর সামনে এসে নাচতে সুরু করল।

জনতা গানের সুরে সুরে হাততালি দিয়ে চলল, মেয়েটি চড়াই পাখীর মত ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল, ছেলেটি বাজপাখীর পক্ষ বিস্তারের ভঙ্গীতে হাত দু'টো প্রসারিত করে ছুটে গেল ওর দিকে।

নাচের ভঙ্গীতে একপাক ঘুরে নিয়ে নিজের উত্তাল বক্ষে মৃদু মৃদু করাঘাত করল রম।

ওর উদ্দীপনা নেশা ধরিয়ে দিল দেবতার বক্ষেও, নিজের স্বর্ণময় পাদুকায় ঝঙ্কার তুলে সূর্যদেবও নেমে এলেন ওর পাশে, নাচে যোগ দেওয়ার জন্য। সূর্যদেবের পা যতবারই নৃত্যচ্ছন্দে মাটির উপর পড়ছিল, ততবারই স্বর্ণমুদ্রা বর্ষিত হচ্ছিল তা থেকে; নাচতে নাচতে যখনই রমের অনুকরণে বক্ষে করাঘাত করছিলেন তিনি, তখন যেন অবিরল ধারে নেমে আসছিল সোনার চকচকে টুকরোগুলি।

এবার চন্দ্রদেবও যোগ দিলেন নৃত্যে আর রৌপ্য-মুদ্রার প্লাবন বয়ে যেতে লাগল, তারপর তারারা হাত ধরাধরি করে আসরে নামল, আর তাদের নৃত্যচ্ছন্দে বর্ষিত হতে লাগল শুভ্র মুক্তার ধারা। সম্রাট সকলের উপর এক মায়াজাল ছড়িয়ে দিলেন, যাতে তারা নাচ-গান ছাড়া আর কিছুই দেখতে না পায়। আর সেই অবসরে সোনা, রূপা ও মুক্তার স্তূপগুলিকে চালান করলেন নিজস্ব ভাণ্ডারে। এইভাবে রমের কল্যাণে তিনি এত সম্পদের মালিক হলেন যে, পৃথিবীতে তাঁর তুল্য ধনবান নরপতি আর কেউ রইল না।

নাচ শেষ হয়ে গেলে সূর্য, চন্দ্র ও তারারা আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেন, জনতা রাজার ভাষণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু রাজা কিছুই বললেন না।

বোধ হয় ওঁর মন থেকে এখনও গানের ঘোর কাটে নি ভাবল লোকেরা।

প্রাসাদের ভাঁড় গ্রুবো পার, এবার সুরু করল তার গান। তার গলা যদিও ঘণ্টার মতই জোরালো ও কর্কশ, তবু তার গানে আওয়াজের চেয়ে হাস্যকর অঙ্গভঙ্গীটাই প্রধান হয়ে দেখা দিল।

রমের গান শোনার পর তার গান শুনতে কারুরই উৎসাহ দেখা গেল না। মাটির বুকে বা স্বর্গে কোন চাঞ্চল্যই জেগে উঠল না তার গানে। তবু রাজা রমকে এড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন ও জয়মাল্যটি তারই গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে, হাজার স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি থলি তার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

রাজার ধামাধরা বড়লোকরাও সঙ্গে সঙ্গে রমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, ভাঁড়টার কাছে গিয়ে তাকে সাধুবাদ দিতে লেগে গেল সমস্বরে।

গরীবেরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, রাজার বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে তারা প্রকাশ্যে কিছু করতে বা বলতে সাহস করল না বটে, কিন্তু মনে মনে তারা সবাই ভাবল যে, রাজা ন্যায়বিচার করেন নি।

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অশ্রুপূর্ণ চোখে কারমারির দিকে তাকাল রম।

তাদের চোখে চোখে যে অকথিত বাণী ফুটে উঠল, তার ভাবার্থ—আমারা বোধ হয় আর সুখী হতে পারব না।

রাজা এবার বাদবাকি গায়কদের আহ্বান করলেন ও তাদের পুরস্কৃত করলেন, স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিটি তাঁর নিঃশেষ হয়ে গেল।

তারপর তিনি বলে উঠলেন, গায়ক-শ্রেষ্ঠ রম এগিয়ে এসো। তুমিই সর্বোত্তম পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

কারমারির মন আনন্দে ভরে উঠল, ছেলেটাও যেন আবার আশা ফিরে পেল। কিন্তু যেন তার চিন্তাধারা অনুসরণ করেই যাদুকর রাজা বলে উঠলেন, ভেবো না যে অনেক টাকা পাবে, কারণ তা দেব না আমি তোমাকে।

ঐশ্বর্যে মানুষের কণ্ঠমাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়।

আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দেবো, হাজার স্বর্ণমুদ্রার বদলে হাজার বছর পরমায়ু হবে তোমার, সূর্য,

চন্দ্র, তারা ও আমি নিজে ছাড়া কেউই তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না আর। আকাশ-ছোঁয়া এক মিনারের চূড়োয় বাস করবে তুমি।

অত্যন্ত কুটিল পরিকল্পনা, যাদুসম্রাট এতই লোভী ছিলেন যে, এইভাবে গায়কের ক্ষমতা করায়ত্ত করে স্বর্গের সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখলেন উনি।

কিন্তু তরুণ গায়ক উত্তর দিল, আপনি আমাকে পুরস্কারের বদলে বন্দিত্ব উপহার দিতে চাইছেন, বুড়ো থুড়থুড়ে হয়ে অতদিন বেঁচে কি লাভ হবে আমার? বুড়ো হয়ে গেলেই তো নাচতেও পারব না গাইতেও পারব না। আমার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে, মস্তিষ্কের শক্তিও কমে যাবে, আমি গান গাইতে পারব না, গান রচনা করতেও পারব না, শত শত বছর ধরে জরার ভার বইবার জন্যই কি আমায় দীর্ঘ জীবন দিতে চান আপনি?

না-না আমি তোমাকে চির-যৌবন দান করব, আর পঞ্চাশ বছর বাদে তোমাকে বিয়ে করতেও অনুমতি দেব।'

কিন্তু ততদিনে আমার দয়িতা তো বুড়ি হয়ে যাবে, না-না এমন পুরস্কারে আমার প্রয়োজন নেই।

আমরা দু' জনেই যেন একসঙ্গে বুড়ো হতে পারি।

তা ছাড়া মানুষের জন্যই তো আমার গান। একটা মিনারের চূড়োয় উঠে আমি গাইতে যাব কি জন্য?

অকৃতজ্ঞ যুবক—চেঁচিয়ে উঠল যাদুকর!

কি চাও তবে তুমি।

যে পুরস্কার আমার প্রাপ্য ছিল, তা আপনি আমাকে দিলেন না, কিন্তু তা হলেও আমার প্রাপ্য আমি পাবই। যখন এ পৃথিবীর বুক থেকে রমের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে যাবে, তখনও মানুষ মনে রাখবে আমার গান, গাইবে সেগুলি আমারই রচিত সুরে।

ক্রুদ্ধ রাজা নিজের অনুচরদের আদেশ করলেন, রমকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে।

গভীর আয়ত চক্ষু গানের পাখীটি, পাথরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আর গান গাইল না রম। তাকে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা লোপ পাওয়ায়, যাদুকর তাকে বধ করতে আজ্ঞা দিল।

রমের মৃত্যুদণ্ডের খবর শুনে, নির্দিষ্ট দিনে বহু মানুষ এসে জড় হল বধ্যভূমিতে।

তারা এসেছিল, কারণ তারা রমকে ও তার গানকে ভালবেসেছিল।

চাষীরা ক্ষেতের কাজ ফেলে এসেছিল, কামাররা তাদের কামারশালা বন্ধ রেখে এসেছিল, সেকরা মূল্যবান অলঙ্কারে মণিমুক্তা খচিত করা স্থগিত রেখে এসেছিল। এইভাবে রাজরোষকে উপেক্ষা করে চারদিক থেকে দলে দলে সাধারণ মানুষেরা ছুটে এসেছিল তাদের প্রিয় গায়ককে একটিবারের জন্য চোখের দেখা দেখতে।

জনতার আবেগ দেখে ভয় পেয়ে যাদুসম্রাট লুকিয়ে পড়লেন তাঁর সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে।

গর্জন করে উঠল জনতা—রমকে তার শেষ গান গাইতে দাও।

সে এত মধুরভাবেই গাইল যে, ঘাতকের লৌহকঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়ে গেল, রমকে হত্যা করা অসম্ভব হয়ে উঠল ওর পক্ষে।

—গায়ক···তুমি দীর্ঘজীবি হও, আর গেয়ে যাও তোমার মধুর গান; আমি আজ থেকে তোমার দাস হলাম বলে উঠল ঘাতক।

যাই হোক প্রাণে বাঁচলেও, স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হল রম; সূর্যালোক-দীপ্ত সুন্দর প্রদেশ বাঘতালীতে হৃদয়ের প্রশান্তি হারিয়ে গেল ওর।

বহু গায়ক, বাদক ও নৃত্যশিল্পী, যারা ওকে ভাল-বাসত, শ্রদ্ধা করত সমস্ত হৃদয় দিয়ে, অনুগমন করল ওর।

কেল্লার উঁচু বুরুজ থেকে যাদুকর সেই বিরাট জনস্রোতকে চলে যেতে দেখল পথ বেয়ে, রমের ভক্তরা তো নিঃসঙ্গ ছিল না, তাদের পরিবার-পরিজনও সঙ্গ ধরল তাদের।

ধন, ঐশ্বর্য বিলাসময় জীবনের সব আকর্ষণ পেছনে ফেলে, সুন্দরী কারমারিও সাথী হল তার গায়ক-প্রেমিকের।

এত অধিকসংখ্যক লোক রমের সঙ্গে সঙ্গে নগর ত্যাগ করল যে, ইচ্ছা করলেও যাদুসম্রাটের মুষ্টিমেয় প্রহরীর পক্ষে সম্ভব হত না তাদের বাধা দেওয়া।

সাত দিন, সাত রাত ধরে লোকজনদের তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে দেখলেন রাজা; রমের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে তারা পথ চলতে লাগল।

হৃদয়ের গভীর থেকে যে গান উৎসারিত হয়, কোন ইন্দ্রজালেরই ক্ষমতা নেই তাকে প্রতিহত করার, কাজেই যাদুসম্রাটের কোন কৌশলই কোন কাজে এল না।

রমকে অনুসরণ করে, চিরকালের মতই দেশবাসীরা দেশত্যাগ করে গেল। সুখের সন্ধানে সূর্যদেবকে স্মরণ করে চলতে লাগল ওরা, কিন্তু সে সব দেশের আকাশ ছিল অনেক উঁচু কাজেই রমের গান আর সূর্য, চন্দ্র, বা তারাদের কান পর্যন্ত পৌঁছতেই পারল না, মাটির মানুষেরাই শুধু এবার হল তার শ্রোতা।

বহু বহু বছর আগে রমের নশ্বরদেহ ধরণীর ধূলায় মিশে গেছে, কিন্তু আজও বেঁচে আছে তার গান। সেই আদি গায়ককে স্মরণ করেই উত্তরপুরুষরা নিজেদের নাম দিয়েছে রোমানী যার অর্থ জিপসী বা যাযাবর।

ফুল যেমন আলোর সন্ধানী, ঠিক তেমনি ভাবেই রোমানী বা জিপসীরা পুরুষানুক্রমে সূর্য অভিসারী; সূর্যকে বন্দনা করে পথের পর পথ, প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করে চলে তাদের মিছিল।

তারাভরা আকাশের নীচে নাচে, গানে জীবনের জয়গানে মুখর হয়ে ওঠে তারা।

জিপসীদের চোখে আলোকাভিসারের স্বপ্ন, হৃদয় তাদের কাব্যময়।

যাদুসম্রাট তাদের পার্থিব ধন-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেও, তাদের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ সংগীত কেড়ে নিতে পারে নি।

সমস্ত দেশেই তাদের স্বচ্ছন্দ বিহার; গান গেয়ে নেচে জীবনটাকে যেন প্রতিমুহূর্তে নতুন করে উপভোগ করে চলে ওরা।

জিপসী যখন গান ধরে, মনে হয় সমস্ত প্রকৃতিই যেন তার সুরের আগুনে জেগে উঠেছে, শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই বিস্মৃতপ্রায় দিনে রমের গান যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারাকেও নামিয়ে এনেছিল মাটির বুকে, আজও বুঝি তেমনি কোন ঘটনা ঘটার অবকাশ আছে; মনে হয় এমন গান শুনতে শুনতে বুঝি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্ভব।

বিচিত্র জিপসী, আর বিচিত্রতর তার গান।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী রেবা দেবী।

পূর্ব ও পশ্চিম

(একাঙ্কিকা)

[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে অভিনীত]

অধ্যাপক অমূল্য সেন

অক্সফোর্ডে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের গৃহ-ড্রইংরুম

(সময়—রাত্রি ৮॥ ঘটিকা)

১৮৯৬ সালের একটি স্মরণীয় দিবস

[স্বামীজীর অনুরাগী মিঃ স্টার্ডি গভীর মনোনিবেশে একখানা সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ করছেন এবং খাতায় টুকে রাখছেন। বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—]

—May I come in ?

স্টার্ডি। Yes, come in.

(প্রবেশ করলেন একজন পাদ্রি সাহেব এবং একটি চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন) Good Evening.

স্টার্ডি। (করমর্দন করে)—Good Evening Father.

পাদ্রি। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ভেতরে আছেন কি মিঃ—

স্টার্ডি। স্টার্ডি। ই টি স্টার্ডি।

পাদ্রি। ও, আপনিই মিঃ স্টার্ডি! ওই যাদুকর বিবেকানন্দের চেলা—

স্টার্ডি। (মুচকি হেসে) না ফাদার, যাদুকরের চেলা এখনও হতে পারি নি। তবে বিবেকানন্দের অনুরাগী আমি।

পাদ্রি। ও একই কথা। ভালই হল, আপনিও রয়েছেন। আমি লণ্ডন থেকে আসছি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের কাছে ইংলণ্ডের ধর্মযাজক সঙ্ঘের মুখপাত্র হয়ে। বিশেষ জরুরি কাজ আছে। তাঁকে একবার সংবাদ পাঠাবেন অনুগ্রহ করে ?

স্টার্ডি। তিনি একটু পরেই এ গৃহে আসবেন। একজন বিশিষ্ট অতিথিকে নিয়ে তিনি ভেতরে ব্যস্ত আছেন। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। (স্টার্ডি আবার অধ্যয়নে মন দিলেন)

পাদ্রি। (একটু পরে) হ্যাঁ, কথাটা আপনাকেও বলা উচিত। আচ্ছা আপনি ইংরেজ, আপনি ক্রিশ্চিয়ান. সর্বোপরি আপনি রাজার জাত। এ কি আপনারা করেছেন, বলুন তো ?

স্টার্ডি। আপনি কি বলতে চান, বুঝতে পারলুম না তো। কথাটা খুলেই বলুন।

পাদ্রি। হ্যাঁ, খুলেই বলছি। মনে রাখবেন, কথাটা আমার একার নয়, ইংলণ্ডের সমগ্র খৃস্টান সমাজের কথা। আমি মুখপাত্র মাত্র।

স্টার্ডি। সমগ্র খৃস্টান সমাজের নয়, তবে কিছুসংখ্যক ধর্মযাজকের প্রতিভূ আপনি, তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

পাদ্রি। ব্যাপারটা কি এখনও বুঝতে পারেন নি ? পশ্চিমের যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, যে সাম্রাজ্য খৃস্টান সভ্যতার পরম গৌরব, তার প্রতিষ্ঠাতা এই ইংরেজ জাতি। আজ পূবের প্রচণ্ড আক্রমণে তাতে যে ফাটল ধরেছে। এ কি দেখতে পাচ্ছেন না! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আপনারা দেশদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এ ভয়ঙ্কর আক্রমণের পথকে সুগম করে দিচ্ছেন। আপনারা ইংলণ্ডের শিক্ষিত-সমাজের শীর্ষস্থানীয়। অথচ যাদুকরের যাদু আপনাদের এতটা বিভ্রান্ত করেছে যে, আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন না, কি সর্বনাশের পথে আপনারা পা বাড়িয়েছেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসের Glorious tradition এ দেশে traitor জন্মায় না। এ ও কি আপনারা ভুলে গেলেন ? আশ্চর্য!

স্টার্ডি। কি সর্বনাশ! এতবড়ো বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তা তো আপনার সঙ্গে দেখা হবার আগে টের পাই নি।



চলার পথে —পি জি দাস

পারের আহ্বান —বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত



[মাসিক বসুমতী
অগ্রহায়ণ / '৭১

নাঃ ভা
কোম্পানি
অংশ



লছমনঝুলায়

—দুলাল সিংহ

সাইকেল রিক্সা

—এস এম হায়দার



এ ভয়ঙ্কর

। আপনারা

অথচ যাদুকরের

, আপনা

আমাদের মহীয়সী রাণীর শিরে যে মুকুটটি শোভা পাচ্ছে, তার উজ্জ্বলতম রত্ন ভারতের কোহিনুর। ভারতেরই একজন সামান্য গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী সোজা চলে এসেছে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি লণ্ডনে, সেই কোহিনুরটিকে অপহরণ করতে—অথচ তার না আছে সৈন্য, না আছে কোন অস্ত্র। এ যে রোমান সেনাপতি জুলিয়স্ সীজরের কীর্তিকেও ম্লান করে দিচ্ছে। আপনি ঠিক বলেছেন ফাদার। ভারতবর্ষ যাদুকরের দেশ। যাদুকর বিবেকানন্দ এসে জুলিয়স্ সীজরের মতই বলছে—'Veni, Vidi, Vici,'—আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম। আ রে! হাতে লাঠিও আছে যে! জাদুকরের লাঠি। কি ভয়ঙ্কর! নাঃ, এর প্রতিবিধান এখুনি করতে হবে।—অধ্যাপক আসুন।

পাদ্রি। না না, আপনি যতটা সাংঘাতিক মনে করছেন, ততটা এখনও হয়ে ওঠে নি, তবে হতে কতক্ষণ। সাবধান আমাদের হতেই হবে। এই দেখুন না, এ দেশের মেয়ে মার্গারেট নোব্‌ল্, হেনরিয়েটা মুলার, গর্বিত সেভিয়ার দম্পতি, গুডউইন এবং আরও কত ইংরেজ ছেলেমেয়ে তাদের মহান ইংরেজ জন্ম এবং বিশ্বের একমাত্র সত্যধর্ম ক্রিশ্চিয়ানিটিকে বিসর্জন দিতে বসেছে এই বিবেকানন্দের তুক্‌তাক্ মন্ত্রে বশীভূত হয়ে। হ্যাঁ, আপনি অনেকটা ঝুঁকেছেন ওদিকে। তবে দেখতে পাচ্ছি, এখনও আপনার আশা আছে। (স্টার্ডির কানে কানে) একটা গোপন কথা আপনাকে বলছি। অধ্যাপক না আসা পর্যন্ত—

স্টার্ডি। না না, তিনি আসুন। আমি আর এসব কি বুঝি বলুন। লোকে তো বলতে সুরু করেছে যে, আমি ম্যাক্সমুলারের ছায়া মাত্র।

পাদ্রি। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির একজন হয়ে এটা কি আপনি শ্লাঘার বিষয় মনে করেন! ছিঃ ছিঃ! ওই জার্মান অধ্যাপকই তো যত নষ্টের গোড়া। ইংলণ্ডের ঔদার্য আর আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে কি এক ছাই-পাঁশ বই—বেদ—না কি ছাপিয়েছে।

স্টার্ডি। এবং এ কাজে ন' লক্ষ টাকা দিয়েছে আমাদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, একদা যে ছিল ভারতের শাসক।

পাদ্রি। তা হলে বুঝুন, ব্যাপারটা কি গুরুতর। নাঃ, ভারতের শাসনাধিকার হারিয়ে এই বণিক্ কোম্পানি আজ সব হারিয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, তাই এত টাকা জলে ফেললে! তা যাক গে, কত টাকাই তো ইংরেজ তছ্‌নছ্ করছে, আমাদের তো আর সম্পদের অভাব নেই। কিন্তু এ কি! পৌত্তলিক হিন্দু-সম্প্রদায়ের সবচাইতে বীভৎস এক উলঙ্গ নারীমূর্তি—যাকে ওরা কালী বলে পূজো করে, তার এক বর্বর priest-কে ম্যাক্সমুলার বলেছেন—'A Real Mahatman'। এবং সে প্রবন্ধটি ছাপিয়েছে যে-সে পত্রিকা নয়, ইংলণ্ডের সেরা কাগজ,—'The Nineteenth Century'। ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন Oxford University এই অধ্যাপককে এখনও চাকুরিতে বহাল রেখেছে কি করে, অবাক হয়ে ভাবি।

স্টার্ডি। নাঃ। সমগ্র ইংরেজ-সমাজে আজ ঘুণ ধরেছে। আপনারা পাদরিরা সব—এদেশের শাসনের সর্বস্তরে আবার ওই মধ্যযুগের মত প্রাধান্য স্থাপন না করতে পারলে আর রক্ষা নেই।

পাদরি। আপনি ঠাট্টা করবেন না মিঃ স্টার্ডি। আমরা এত মূর্খ নই যে, বুঝি নে—আর সে স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে না। এখন একমাত্র ভরসা আপনারা, দেশের গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা। তাই তো আমি এসেছি, ভগবান যীশুর বাণীকে আবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে, যাতে করে আপনারা এ মহান খৃস্টান সভ্যতাকে আরও মহান করে তুলতে পারেন। মিঃ স্টার্ডি, আমাদের প্রাধান্যের কথা আপনি তুলেছেন। খৃস্টান সভ্যতা বিস্তারের প্রধান বাহন এই যে আধুনিক যুগের উপনিবেশবাদ, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তার কার্যধারায় যীশুর সেবক ধর্মযাজকদের স্থান কি কম গুরুত্বপূর্ণ? এ ইতিহাস তো আপনার অজানা নয়।

স্টার্ডি। আরও অনেক জানার আছে ফাদার এবং তা আপনার মতো মৌলিক প্রতিভাধর ঐতিহাসিকের কাছে। থাক সে কথা। আপনি কি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তা-তো এখনও শোনা হল না। আপনার জরুরি কাজটি কি, এখনও জানতে পারি নি তো।

পাদরি। শুনুন বলছি। ইংলণ্ডের যাজক-সম্প্রদায়ের এক জরুরি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, বিবেকানন্দকে এ দেশে পৌত্তলিকতা প্রচার বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আমরা সুসভ্য ইংরেজ জাতি, একজন সামান্য প্রজার ওপর বলপ্রয়োগ করবো না। তাই স্থির হয়েছে যে, ভারতের মুষ্টিমেয় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে ওদেশের পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের প্রচণ্ড দুর্নীতি ও কলুষ যিনি ধরে ফেলেছেন, সেই ম্যাক্সমুলার যেন ওকে তর্কে পরাস্ত করে মানে মানে এদেশ থেকে বিদেয় করেন। এই অনুরোধ নিয়ে—

[ম্যাক্সমুলারের প্রবেশ]

ম্যাক্সমুলার। কাকে মানে মানে বিদেয় করার অনুরোধ নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন ফাদার?

পাদরি। কেন? ওই বিবেকানন্দকে, অসভ্য দেশের নোংরা গেরুয়াধারী হিন্দু সন্ন্যাসীটাকে। ইংরেজপদলেহী বর্বর হিন্দু-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর স্পর্ধা! মিঃ ম্যাক্সমুলার যে রাজার দেশে পুতুল পুজোর গুণগান করে। আপনি ও

দেশের সামান্য দু-চার খানা যে ধর্মগ্রন্থ আছে, তা পড়ে ফেলেছেন। আমরা ঘৃণাভরে ওসব স্পর্শও করি নে। আপনি জানেন পৌত্তলিকতার অন্তঃসারশূন্যতা। ক্রিশ্চিয়ানিটি আশা করে যে, 'সাপুড়ে আর যাদুকরের দেশ' ওই ভারতবর্ষের হিন্দু সন্ন্যাসীটার ম্যাজিক আর ধাপ্পাবাজির আক্রমণ থেকে আপনি তাকে রক্ষা করবেন। ভদ্রভাবে এ কাজ করতে শুধু আপনিই পারেন।

ম্যাক্স। হ্যাঁ, বোধ হয় পারি। জড়বিজ্ঞানের অসীম শক্তিতে দৃপ্ত, বিশ্বগ্রাসী এই খৃস্টান সভ্যতার কল্যাণকুঃ হয়ে উঠবার যে আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত হয়ে আছে, তার জাগরণী গানে আমিও গলা মেলাতে পারি। কিন্তু সে গানের কথা ও সুর যে আলাদা ফাদার। আপনার অন্ধগলিপথে তার তো সন্ধান মিলবে না।

পাদ্রি। (ব্যঙ্গ করে) আপনা রাজপথটি তবে কোথায় শুনি?

ম্যাক্স। ফাদার, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয়স্বরূপ দু-চার খানা গ্রন্থ সম্বল—এই বক্রোক্তি আপনি করেছেন। মেকলের ভূত ইংরেজ জাতির স্কন্ধে ভারী হয়ে চেপে বসেছে। আপনারা ভাবেন, আপনারা বিশ্বাস করেন যে, বৃটিশ ম্যুজিয়মের একটি ছোট্ট শেল্‌ফে আবদ্ধ করে রাখা যায় পূর্ব দেশের সমগ্র গ্রন্থরাজি—যার উচ্চতা হিমালয়সদৃশ, যার গভীরতা সমুদ্রের মত অতলস্পর্শী। জীবনভর আমি ভারতীয় বিদ্যার অনুশীলন করেছি। আজ এই সত্তর (৭০) বছর বয়সে, এই জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, কিছুই আমার করা হল না—ওই অনন্ত শব্দশাস্ত্রের তীরহীন তরঙ্গহীন গভীর প্রশান্তির সাগর-কিনারায়ও আমি যেতে পারলুম না। ফাদার, মূর্খের অজ্ঞতা ক্ষমা করা যায়, কিন্তু জ্ঞান-পাপীর পাপের বোঝা নামাতে করুণাময় ঈশ্বরও এগিয়ে আসেন না।

পাদ্রি। (চটে গিয়ে) মিঃ ম্যাক্সমূলার, আপনি কখনও ইণ্ডিয়ায় যান নি, তাই এমন অর্বাচীন উক্তি করতে পারলেন। খানকয়েক সংস্কৃত পুঁথি পাঠ করে এবং তার মনগড়া ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে এই যে আপনি স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলেছেন, তা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবে ইণ্ডিয়ার কুশ্রী বাস্তব রূঢ়তার আঘাতে। 'ভারতবর্ষ নরমাংসভোজী, নগ্নদেহ, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, নারীহন্তা—এককথায় সর্বপ্রকার পাপ ও অন্ধতায় পরিপূর্ণ।' ওদেশের ভাগ্য ভাল যে, ইংরেজ জাতি পরম করুণায় ও বদান্যতায় শাসনভার গ্রহণ করে ওই অসভ্য দেশকে সভ্য করে তুলেছে। আর আমরা—এই ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিরা, 'ঈশ্বরের একজাত পুত্রের' সেবকেরা—ওই অন্ধকারের জীবদের আলোর রাজ্যে নিয়ে আসবার দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েছি। আমরা বহুলপরিমাণে সার্থকতাও লাভ করেছি। ভারতের নানা অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আলোক-প্রাপ্ত ভারতীয়গণ নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যে আজ লজ্জা পায়। সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম-সংস্কারে, এমন কি রাজনৈতিক অধিকার দাবিতেও ইংরেজের শুভবুদ্ধি ও ঔদার্যের ওপর আজ ওরা একান্ত নির্ভর। এমন সময় কি না নগ্ন বীভৎস কালীমূর্তির এক পূজারি ব্রাহ্মণের চেলা এসে খাস ইংলণ্ডের বুকে বসে আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেবে! আর আপনাদের মত মনীষীর সমর্থনলাভ করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকতার পশ্চাতে ছুটবে এদেশের ছেলেমেয়েরা! না, এ হতে পারে না, কখনও হতে পারে না। It seems, we are on the verge of a crisis ; yes, a crisis of an unprecedented character. (এত বড় বক্তৃতা দিয়ে পাদ্রি সাহেব হাঁপাতে লাগলেন।)

[ক্রমশ।

রত্নাদিদির ইস্কুল

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

(মোরা) রত্নাদিদির ইস্কুলেতে পড়ি
সেইখানেতে পড়ার কড়াকড়ি!
ক্লাসের মাঝে গোলটি হবার জো নেই,
সব নামতা রাখতে হবে মনেই।
প্রথম ভাগের শক্ত শক্ত পড়া,
পাগলা বুড়োর দুইটি কুড়ি ছড়া,
কতরকম যোগ বিয়োগের আঁক,
হাতের লেখা লিখতে ভাগে থাক!
রত্নাদিদি তাড়াতাড়ি আসে
ভাগ্যে দিদি একটু ভালবাসে,
নইলে পরে কি যে হ'ত দশা,
দাঁড়িয়ে কোথায় খেত দু'শ মশা!
শ্যামলদাদা রত্নাদিদির ভাই
ভুললে পড়া, তারও রক্ষা নাই।
পাড়ার ছেলে রত্নাদিদির দাপে
সময় সময় থরথরিয়ে কাঁপে।
তবু যখন পড়ায় দিদি পন্থ,
চোখের সামনে দেখি সত্য সত্য।
রত্নাদিদি যখন গল্প বলে,
সীতার দুঃখে ভাসি চোখের জলে।
ইঁকড়ি মিঁকড়ি ইংরাজি বই পড়ায়,
মধ্যে মধ্যে হেসে হেসে গড়ায়।
রত্নাদিদির মুখটি হাসি হাসি,
(তাই) পাঠশালাতে পড়তে ভালবাসি।

সাহিত্য পরিচয়

চৌর্যবৃত্তির প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত ও ভাবাদর্শমূলক কাহিনী। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে চৌর্যক্রিয়ারও যে একটা বিধিনিষেধ সমন্বিত নীতি নির্দেশ দেহমনের সাধন প্রস্তুতি ও শিল্পোৎকর্ষ ছিল, এই উপন্যাসে তাহারই একটি রোমান্স-রমণীয় চিত্র আঁকার প্রয়াস দেখা যায়। উপন্যাসবর্ণিত চোরের দলের সহিত কর্মজীবনে সাধু, প্রলোভনজয়ী পুলিস কর্মচারী ও নিষ্ঠাবান শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট। তা ছাড়া এই দলের লোকদের মধ্যে গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি, পরস্পরের সহিত সহৃদয় বিশ্বাসরক্ষা ও যথাসাধ্য আচরণবিধি রক্ষার প্রয়াস প্রভৃতি সদ্গুণের প্রাচুর্য লক্ষণীয়, বিশেষত দলের যে মধ্যমণি—সাহেব—তাহার চরিত্রে দুঃস্থের প্রতি দয়া, ন্যায়নীতির প্রতি ঝোঁক, সংগৃহস্থের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মানুরাগ মাঝে-মধ্যে এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাহার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। সে যেন তস্কর-জগতের হ্যামলেট—দার্শনিক চিন্তার আধিক্য তাহার হাত হইতে সিঁদকাঠি স্খলিত হইয়া পড়ে ও অপহৃত ধন আবার গৃহস্থের ইতর, অথচ সত্যিকার ভালবাসায় মধুর সম্পর্ক সাহেবকে একটা পিতৃত্ববোধের আশ্রয় দিয়া তাহার জীবনে কিছুটা স্থিরতা আনিতে সহায়তা করে। আবার এই নফরই চৌর্যবিদ্যায় সাহেবের হাতেখড়ি দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ামক হইয়াছে। পারুল ও রাণীর সহিত তাহার অন্তরঙ্গতা তাহার জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই, তবে রাণীর কৈশোর অভিলাষ পূরণ তাহাকে চৌর্যবিদ্যার অনুশীলন ও দৈবশক্তির প্রতি একপ্রকার অর্ধ-আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। তাহার পালিতা মাতা সুধামুখীর শোচনীয় মৃত্যু তাহার মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই, তবে তাহার অবচেতন মনে নারীর কল্যাণী মূর্তি অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। মোটকথা, কলিকাতার বস্তিজীবন সাহেবের মনে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই। সে পরিত্যক্ত সন্তানরূপে গঙ্গাজলে ভাসিতে ভাসিতে কলিকাতার ঘাটে সংলগ্ন হইয়াছিল। আবার ঘটনাস্রোত তাহাকে কলিকাতার

নিশিকুটুম্ব

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাণ্ডারে ফিরিয়া যায়। তাহার এই ভাবাতিশয্য কতকটা তাহার প্রকৃতিগত, কতকটা তাহার পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। এই সাহেবের জন্মরহস্য ও বাল্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া লেখক কালীঘাট বস্তীর পতিতা-জীবনের এক সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। সুধামুখীর গণিকাবৃত্তি-অবলম্বনের মধ্যে বিশেষ ভাবালুতার সিক্ত স্পর্শ নাই—সে চোখ খুলিয়া ও সাহসিকতার সঙ্গেই এই পাপপিচ্ছিল পথে পা বাড়াইয়াছে। কিন্তু অকস্মাৎ গঙ্গারঘাট হইতে সাহেবকে কুড়াইয়া পাইয়া তাহার মধ্যে অবরুদ্ধ মাতৃত্বের উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে ও তাহার জীবন স্নেহের প্রেরণা ও জীবিকার অপরিহার্য প্রয়োজন এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। তাহার দেহ বিক্রয়ের কলঙ্কও বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া কালিমার গাঢ়তা হারাইয়াছে। তাহার যে সমস্ত ধনী ও খেয়ালী দেহলোভী অতিথি আসিয়াছে তাহারাও তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার বালগোপালের সেবার অর্ঘ্য যোগাইয়াছে। বিষের প্রস্রবণ হইতে মাতৃস্নেহের অমৃতরস উপচিত হইয়াছে। নফরকেষ্টর সহিত তাহার আটপৌরে, ঝগড়াঝাটি ও গালাগালিতে মাটি হইতে উন্মূলিত করিয়া নদী-নালা-খালের দেশে, নৌকা বাহিত যাযাবর জীবনধারার চিরচঞ্চল প্রবাহে, ছন্নছাড়া, অ-সামাজিক প্রাণোচ্ছলতার অভিযাত্রায় খড়কুটার ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই নদীমাতৃক, খাল বিলের অন্তর্বর্তী, দূর-বিক্ষিপ্ত পল্লী-অঞ্চলের সঙ্গেই তাহার সত্যিকার নাড়ীর যোগ।

দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপন্যাসে চোরের ইতিহাসকে যেন একটা ছলনালীলা বলিয়াই মনে হয়। ইহারই অজুহাতে আমরা অসংখ্য বিচিত্র নর-নারীর জীবনমেলায় কৌতূহলী দর্শকরূপে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাই। চোরের পথ অনুসরণ করিয়া আমরা কত গ্রামে প্রবেশ করি। কত গৃহস্থের অন্তঃপুরের পরিচয় পাই, কত হৃদয়-রহস্যের ইঙ্গিতে উন্মনা হই। নববিবাহিতা, অলঙ্কার-গরবিনী আশালতার বাপের বাড়ির খবর, তাহার মায়ের স্নেহময় আতিথেয়তা, তাহার দাদা মধুসূদনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রাম, চোরের দীক্ষাগুরু পচা বাইটার প্রতিষ্ঠাবান পুত্রদের সংসার, পচার নিঃসঙ্গতা ও সাধু পুত্রদের প্রতি অভিমান-অনুযোগ, কড়া সংসারী নায়েব

মুরারি, ধর্মনিষ্ঠ স্কুল পণ্ডিত মুকুন্দ, মুকুন্দ ও সুভদ্রার অভিমানবিদ্ধ দাম্পত্যসম্পর্ক, চৌর্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য সাহেবের পচার শিষ্যত্ব স্বীকার ও অনলস সেবা, সুভদ্রার সঙ্গে তাহার সম্পর্কের অনির্দেশ্য মাধুর্য—এই সমস্তর মধ্য দিয়া গার্হস্থ্য জীবনের কি উজ্জ্বল চিত্র উদ্ঘাটিত হয়? বিশেষত পচাকে একটা সিদ্ধ পুরুষ বানাইবার চেষ্টা ও তাহার গৃহের প্রতি একটা সিদ্ধপীঠের মহিমা-আরোপ যেন একটা নব দেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠার ভক্তি রসাপ্লুত দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরে। তাহার উপর কানাই ডাক্তার গাঙ্গুলিবাড়ি, কনিষ্ঠ সহোদর হাকিমের পেশার অনস্ত, তাহার নিষ্ঠাবতী গোপন প্রেমলীলা-বিহারিণী বিধবা ভগ্নী নমিতা ও সাহেবের চুরি করিতে গিয়া এই ব্যভিচার নিবারণ চেষ্টায় আসল উদ্দেশ্য বিস্মরণ—সবই যেন একটা কৌতুকোজ্জ্বল কমেডির পালার মত আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই সরস সমাজ চিত্রগুলি এই চোর-কাহিনীর উপরি-পাওনা।

কিন্তু এই কাহিনীর চোরগুলি কে? এই তথাকথিত চোরদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় চৌর্যবৃত্তি তাহাদের অভিনয় মাত্র, একটা চোর-চোর খেলা। তাহারা চুরির লাভ অপেক্ষা উহার রোমান্সের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট। নৌকায়-নৌকায় নানা নদী-নালায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ, মুক্ত জীব নাল্লাসের উপভোগ, নানা বিচিত্র জীবনযাত্রার সহিত পরিচয়, চুরির শিল্প চাতুর্যের অনুশীলন, সহচরদের সহিত প্রীতি কৌতুক বিনিময়—এগুলিই যেন তাহাদের মুখ্য আকর্ষণ বলিয়া মনে হয়। সব মানুষের মনেই যে অতৃপ্ত কামনার স্বপ্নলোক বর্তমান, চৌর্যবৃত্তি যেন তাহারই রুদ্ধ দ্বার খুলিবার চাবি স্বরূপ। সবাই অন্তরে অন্তরে রূপকথার যে কল্পনা পোষণ করে সেই মায়ালোকে পৌঁছিবার ইহাই যেন অরণ্যবীথি। বলাধিকারী মহাশয় দারোগা জীবনে যে কর্তৃত্ব প্রয়োগে ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হইয়াছিলেন, চোরের দলপতিরূপে সেই কল্যাণময় অভিভাবকত্বের বাসনাই তিনি তৃপ্ত করিয়াছেন। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য তাঁহার পুরাণ পাঠে ও জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চায় যে অদৃশ্য শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, চোরের দলের খোঁজদার রূপে সেই রহস্যময় সূত্রেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন—চোর-মহিমা কীর্তনে ও চৌর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্তবে সেই মহামায়ারই একটা প্রকাশ দেখিয়াছেন। বংশী চুরি করে কিন্তু উদাস, আত্মবিস্মৃতি-ভাবে। আর সাহেব ত' চুরির মধ্যে একটা স্বপ্ন সঞ্চরণের আচ্ছন্ন মনোভাবই বহিয়া বেড়াইতেছে। সকলেরই চোখে একটা ভাবাবেশের ঘোর, বঞ্চিত জীবনের এক করুণ দিবাস্বপ্ন। এই স্বপ্নাচ্ছন্নতাই প্রায় সমস্ত চরিত্রেরই সাধারণ লক্ষণ। সুধামুখী ও পারুলের চিরন্তন আকৃতি গণিকা জীবনের কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া ভদ্র পদবীতে উন্নয়ন। এই অনায়ত্ত আদর্শের সমস্ত করুণরস তাহাদের অপরাধী জীবনে সঞ্চিত হইয়াছে। সাহেবও বার্ধক্যে এক বাড়িতে চুরি করিতে গিয়া সেখানে অভিভাবকহীন এক খোকা-খুকির শিশু-কল্পনার মধ্যে জড়িত হইয়া তাহার উদ্দেশ্য ভুলিয়াছে। সে যেন রূপকথার রাজ্যে এক ভগবৎ প্রেরিত দেবদূত হইয়া কাল্পনিক ভয়ত্রস্ত শিশুচিত্তে সাহস ও নিশ্চয়তা আনিয়াছে। লেখক সমস্ত মন্দের মধ্যে ভাল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মানুষের মন্দরূপ একটা কৃত্রিম ছদ্মবেশ মাত্র—উহার অন্তরালে ভাল আত্মপ্রকাশের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। চোরের জীবনে, বেশ্যার জীবনে, নিঃস্নেহ কঠোর-হৃদয় নর-নারীর জীবনে লেখক এই রূপকথা সুলভ সত্যের সমর্থন পাইয়াছেন এবং চোর কাহিনী একটি পরম শুভাস্ত, সব হারান সুখ-কল্পনার পরম প্রাপ্তিতে দিব্য আভায় দীপ্যমান রূপকথার সুরে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।*

* মনোজ বসু—নিশিকুটুম্ব

এ্যালফ্রেড নোবেল প্রসঙ্গে

যাঁদের আবির্ভাব বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে এ্যালফ্রেড বি, নোবেল সেই তালিকায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। যাঁদের সাধনা এবং শক্তি বিশ্ববিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির জন্য দায়ী ইনি তাঁদেরই একজন। নোবেল জাতিতে ছিলেন সুইডিস। ১৮৩৩ সালে তাঁর জন্ম।



● এ্যালফ্রেড নোবেল

তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানায়ক ডি, এস, সি ও পি, এইচ, ডি, উপাধিলাভ করেন। তাঁর কৃতিত্বের সেইখানেই শেষ কথা নয়। ডিনামাইট আবিষ্কারের গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। ১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তাঁর গৌরবময় জীবনের অবসান হয়। অনবধানতাবশত তাঁর

দেহাভ্যন্তরে আর্সেনিক প্রবিষ্ট হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৯০১ সাল থেকে তাঁর নাম জড়িত বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। তাঁর রক্ষিত ১,৭৫০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ থেকে প্রতি বৎসর পাঁচটি বিষয়ে (সাহিত্য, পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা বিদ্যা ও শান্তি) এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

গোটে পুরস্কারের অধিকারী বেনো রাইফেনবের্গ

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর প্রদত্ত গোটে পুরস্কার এবছর পেয়েছেন ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ প্রচারবিদ ও লেখক বেনো রাইফেনবের্গ। গোটের ২১৫ জন্মতিথি উপলক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্টের ঐতিহাসিক সাধু পালের গির্জায় গত ২৮শে আগস্ট তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

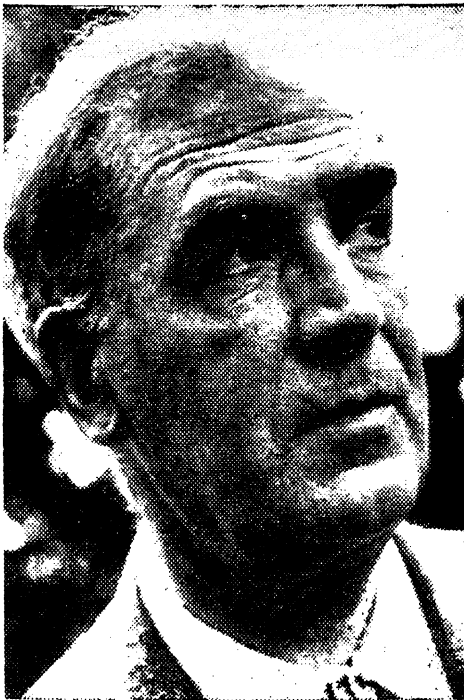
সাহিত্যের জন্য গোটে পুরস্কার দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় কবিতা, বিজ্ঞান বা অর্থনীতির কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধায়। পশ্চিম জার্মানীর সাংস্কৃতিক ও বিদগ্ধ জগতে এই পুরস্কার একটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ফ্রাঙ্কফুর্টের শ্রেষ্ঠ সন্তানের নামে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯২৬ সন থেকে। গোড়ায় প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হত কিন্তু এখন দেওয়া হয় তিন বৎসর অন্তর। প্রথম এই পুরস্কার পেয়েছিলেন কবি স্টেফান জর্জ। অন্য আর যাঁরা এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন, অ্যালবার্ট স্বাইটৎজার, সিগমুণ্ট ফ্রয়েড, গেরহার্ড হাউপ্‌টমান, হান্সপীফিটৎনের, পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক প্লাঙ্ক ও হেরমান হেসে এবং টমাসমান। সাম্প্রতিক কালে পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক এই পুরস্কার পেয়েছেন কবি কার্ল জুকমেয়ের পদার্থ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক কার্ল ফ্রিডরিল ফন ভাইৎজেকের ও স্থপতি ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস।

রাইফেনবের্গ ১৮৯২ সনে জন্মগ্রহণ করেন ও শিল্পকলা ইতিহাস লেখকরূপে জীবন শুরু করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর, ১৯১৯ সনে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টের ফ্রাঙ্কফুর্টার সংবাদপত্র অফিসে যোগদান করেন। এরপর বৎসর দুই প্যারিসে কাটিয়ে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবাদপত্র অফিসে ফিরে এসে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এইসময় তিনি সঙ্কটাপন্ন জার্মান গণতন্ত্রের রক্ষায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। ১৯৩৮ সন থেকে তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখা দিতে থাকেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ বৎসর থেকে বিজ্ঞান পাঠে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৫ সনে কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় রাইফেনবের্গ বর্তমান নামে একটি কাগজ প্রকাশ করেন। ১৯৫৯ সন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টের আলগেমাইনে ফ্রাঙ্কফুর্টার নামে এক সংবাদপত্রের সহপ্রকাশকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।

গোটের প্রতি রাইফেনবের্গের ভক্তি অসাধারণ। সুযোগ পেলেই তিনি জার্মান যুবশক্তিকে গোটের কর্মজীবন থেকে প্রেরণা লাভ করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

রাইফেনবের্গ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অবিচল। কর্মজীবনে তিনি একজন সাংবাদিক হলেও তাঁর শক্তিশালী ও মার্জিত রচনার গুণে সাংবাদিকতাকে তিনি উচ্চমার্গে স্থাপন করেছেন।

—ডি এ ডি



● সুলেখক ও খ্যাতনামা সাংবাদিক বেনো রাইফেনবের্গ (৭২) এ বছরের ফ্রাঙ্কফুর্টের গোটে পুরস্কার লাভ করেছেন

রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ / প্রকাশ ভবন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচিত অধ্যাপক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করে এসেছিলেন; আলোচ্য গ্রন্থে তারই স্মৃতিচারণ ঘটেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

অবস্থিত বৃহত্তর ভারতের এই ভ্রমণ-কথা একাধারে আকর্ষণীয় ও লেখকের ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যের স্পর্শে উজ্জ্বল। ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র এইসব দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কতটা গুরুত্ববাহী, লেখকের পক্ষে তা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার সুযোগ ঘটেছিল; অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি সেই অনুভূতিকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এইসব দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিল্পের মূল ধারাটিকেও তিনি উপলব্ধি করেছেন ও প্রকাশ করেছেন অনবদ্য নিষ্ঠায়। ১৯২৭ সালের পর চল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে, আজকেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক পটভূমি অনেকটাই পরিবর্তিত এবং সে পরিবর্তন শুধু রাজনীতিতেই ঘটে নি, ওইসব দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে, কাজেই বর্তমান গ্রন্থের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে একে এখন ইতিহাসের পটভূমিতে রেখেই বিচার করতে হবে এবং সেদিক দিয়ে দেখতে হলে এ রচনাকে এক ঐতিহাসিক দলিল বলাটা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু সেটাই সব নয়, লেখকের আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় বৃহত্তর ভারতের আত্মাই যেন কথা বলে উঠেছে এই রচনার মাধ্যমে। আর তার সঙ্গে আছে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এক অভূতপূর্ব পরিচয়; ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীক্ষমতা যে অব্যাহত ছিল, তারও নজির রয়েছে এ গ্রন্থে। ওই সময় রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তার কিছু কিছু পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করেছেন লেখক—যার জন্যে রচনার আকর্ষণ ও মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কয়েকটি আকর্ষণীয় ছবি এ গ্রন্থের আর এক মূল্যবান সম্পদ। বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সংযোজন। আঙ্গিক, শিল্প সুষম, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—'প্রকাশ ভবন'। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ দাম—কুড়ি টাকা।

নবযুগের বাংলা / বিপিনচন্দ্র পাল ইনস্টিটিউট

বিপিনচন্দ্র পাল ১৩২৮-৩১ সনে বঙ্গবাণী মাসিক পত্রিকায় বাংলার নবযুগের কথা নামে ধারাবাহিক ১৬টি প্রবন্ধ লেখেন। ১৩৬২ সনে এই প্রবন্ধ নিচয়ই একত্রে সংকলিত হয়ে 'নবযুগের বাংলা' নামে পুস্তকাকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, বর্তমান গ্রন্থটি এরই দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলার নবজাগরণের কালে জাতির সাহিত্যে, সমাজনীতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল, তার সবকটিকেই সযত্নে পর্যালোচনা করেছেন লেখক, গ্রন্থোক্ত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম ভূমিকা হিসাবে স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবী, জাতিভেদপ্রথা উচ্ছেদ করা, লোকশিক্ষা প্রচার ও দেশের হিতার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি যে যে বিষয় সেদিনের দেশপ্রেমিক বাঙালী পুণ্যব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন, তার সবকটিতেই আলোকপাত করেছেন লেখক, এই রচনা পাঠ করলে সেদিনের বাংলায় নবজাগরণের যে স্রোত বয়ে গিয়েছিল তার মর্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন আজকের পাঠক। গ্রন্থকার ছিলেন অবিভক্ত বাংলার এক অবিসংবাদী নেতা, বক্তৃতা বা ভাষণ দানের ক্ষেত্রে তাঁর অলৌকিক পটুত্বের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর লেখনীও যে এক অসাধারণ শক্তির অধিকারী, বর্তমান গ্রন্থে রয়ে গেল তারই অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর। রাজনৈতিক রচনা হিসাবে এ গ্রন্থ এক প্রামাণ্য দলিল। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিপিনচন্দ্র পাল, প্রকাশনায়—বিপিনচন্দ্র পাল ইনস্টিটিউট, (বিপিনচন্দ্র পাল পরিষদ) ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৬, দাম—সাত টাকা।

ভুবনপুরের হাট / শ্রীগুরু লাইব্রেরী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকের এই সাম্প্রতিক রচনা একটা নতুন ধরণের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গ্রাম্য এক তরুণীর জীবন ও জীবন-জিজ্ঞাসাই এ উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য। মালতী গ্রামের মেয়ে, শৈশবে মাতৃহীনা, বিচিত্র খামখেয়ালী চরিত্রের বাপ শ্রীমন্ত ও হাস্য-লাস্যময়ী বিমাতা চাঁপার প্রভাবে তার চরিত্রে এক আশ্চর্য বৈপরীত্য প্রকাশিত। একদিকে সে আর পাঁচটি সাধারণ মেয়ের মতই প্রেমের স্বপ্ন দেখে, আর একদিকে সে প্রচণ্ড, অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বশক্তি সংহত করে রুখে দাঁড়াতে পারে অসঙ্কোচে। কোমলে কঠোরে মেশা এই নারীচরিত্রটিকে লেখক বড় মনোযোগ দিয়েই এঁকেছেন, বস্তুত এইটিই এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্র, অন্য চরিত্রগুলির সৃষ্টি যেন এর প্রয়োজনেই। বাংলার গ্রামাঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ নিখুঁতভাবে উপস্থিত কাহিনীর পটভূমিকায়। লেখকের নিপুণ বর্ণনায় সমস্ত পরিবেশটি যেন জীবন্ত। পড়তে পড়তে পাঠকের মন একাত্ম হয়ে ওঠে ভুবনপুরের হাটের হেটুরে মানুষগুলোর সঙ্গে। পাত্র-পাত্রীর মুখে বিচিত্র সংলাপও অত্যন্ত উপভোগ্য, লেখকের অধিকাংশ উপন্যাসের মত এই উপন্যাসের ভৌগোলিক সীমানা বীরভূম বা রাঢ় অঞ্চল না হলেও তারই কাছ ঘেঁষে যায় এবং সংলাপেও তার ছায়া আছে। ভুবনপুরের হাট সম্বন্ধে শিবদুর্গাকে জড়িয়ে যে কিংবদন্তীটি উদ্ধৃত করেছেন লেখক, তাতেই যেন নিহিত আছে আমাদের গ্রামবাংলার প্রাণসত্তা, বস্তুত ওটুকু না হলে যেন কোন প্রাচীন স্থানের সঠিক মূল্যায়নই সম্ভব হয় না। লেখকের পূর্ব প্রকাশিত আরও অনেক রচনার মতই এ উপন্যাসেও পাঠক গ্রামীণ বাংলা দেশকে এক

বিশেষ ভঙ্গিমায় মনের দরজায় উপস্থিত হতে দেখবেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম—ছয় টাকা।

রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী / জিজ্ঞাসা

সব মানুষেরই মনে সন্ধানের আলো জ্বলে, বর্ষপঞ্জী সেই সন্ধানেরই পিপাসা মেটায়। আলোচ্য বর্ষপঞ্জীতে মিলবে এক বিশেষ ধরণের সন্ধান। রবীন্দ্র-জীবনকে কালের সীমানায় বাঁধার এক আন্তরিক প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহন করে এনেছে এই বর্ষপঞ্জী। কবিজীবনের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই বর্ষপঞ্জী রচনা করেছেন, সুতরাং এর প্রামাণ্যতায় সন্দেহ করার কিছু নেই, বস্তুত রবীন্দ্র-জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে এ-যেন এক সংক্ষিপ্ত দলিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও সাহিত্য-শিক্ষার্থী মাত্রই যে এ রচনাকে সমাদৃত করবেন, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এই মূল্যবান বর্ষপঞ্জীটি সাধারণ পাঠকের দরবারে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য প্রকাশকও আমাদের ধন্যবাদার্হ। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ শোভন। লেখক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; প্রকাশক—জিজ্ঞাসা। ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। ৩৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

একই আকাশ ভুবন জুড়ে / বাক্ সাহিত্য

বর্তমানে ভ্রমণ-কাহিনীমূলক রম্যরচনার আদর সমধিক। আলোচ্য রচনাটিও সেই জাতীয়। তুষারতীর্থ অমরনাথ ভারতের এক সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র, লেখক যাত্রা করেছিলেন একদা এই দুর্গম তীর্থের উদ্দেশে। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁর সেই তীর্থযাত্রারই স্মৃতিচারণ। লেখকের আন্তরিকতায়, তীর্থ ভ্রমণের এই কাহিনী হয়ে উঠেছে উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয় ও মনোরম। তীর্থ ভ্রমণেই পদচারণ ঘটে লেখকের, কিন্তু দেবতা উপলক্ষ হলেও মানুষ অবহেলিত নয় তাঁর রচনায়। পথে-পথে যাঁদের তিনি দেখেছেন, তাঁদের সবারই কথা অকপটে প্রকাশ করেছেন, গেয়েছেন মানুষেরই জয়গান দেবতাকে অন্তরে স্থাপন করে। প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও অকুণ্ঠ তিনি, হিমতীর্থ অমরনাথের বিঘ্নসঙ্কুল অথচ অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভরা পথটি পাঠকের মনের চোখে উজ্জ্বল হয়েই ছাপ রেখে যায়, মনে মনে তিনিও যেন লেখকের অনুসরণ করতে থাকেন। প্রাণবন্ত ভ্রমণ-কথার মূল সম্পদই হল পাঠককে পথের নেশায় মজিয়ে দেওয়ার প্রবণতাটুকু, আলোচ্য রচনায়ও তা পূর্ণমাত্রাতেই সমুপস্থিত।—কয়েকটি ভ্রমণসংক্রান্ত সুন্দর আলোকচিত্র গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে।—প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, প্রকাশনায়—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—পাঁচ টাকা।

লেখকের মুখোমুখি / প্রকাশ ভবন

বই পড়তে ভাল লাগে প্রায় সকলেরই, কারণ দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি থেকে পালানোর এমন পন্থা আর নেই। বই এমনই জিনিস যার পাতায় একবার চোখ ফেলতে পারলে বাস্তব পরিবেশটাকে অনায়াসেই তুড়ি মেরে অস্বীকার করা যায় অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও। একথাও অনস্বীকার্য যে, সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন বা অন্তরঙ্গ পরিচয় সম্বন্ধে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে থাকেন, আলোচ্য গ্রন্থে সে কৌতূহল মেটাবার আয়োজন রয়েছে। লেখক নিজেও সাহিত্যিক এবং সেই সূত্রে যেসব সাহিত্যিককে তিনি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন—তাঁদেরই এক অন্তরঙ্গ পরিচয়ে উজ্জ্বল এ রচনা। বস্তুত এ রচনা মূলত এক অনবদ্য স্মৃতিচারণ ব্যতীত আর কিছু নয়। মোট কুড়ি জন সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপচারীর স্মৃতিচারণ করেছেন লেখক, তাঁর বর্ণনভঙ্গী এতই আন্তরিক যে, পাঠক নিজেকেও যেন ঐসব সাহিত্য-বৈঠকে উপস্থিত হতে দেখেন। কথার মালা আখরের বন্ধনে গেঁথে যাঁরা মানুষের হৃদয়ে দোলা দেন, মুখের কথাও যে তাঁদের কম মনোহারী নয়—এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে তার নিদর্শন। লেখকের আন্তরিকতায় তাঁর বক্তব্য হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও সাবলীল। সাহিত্যপ্রিয় পাঠকমাত্রই যে এ রচনাকে সমাদরে গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও না বলে পারা যায় না যে, শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ লিখিত সম্পাদকের বৈঠকে ব্যতীত এ জাতীয় রচনায় এতটা উৎকর্ষ এর আগে বড় একটা দেখা যায় নি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—প্রকাশ ভবন। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছ' টাকা।

শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল / দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক মহাপুরুষের জীবনী। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম অধ্যাত্মজগতে সর্বজন-বিদিত, তাঁরই জীবনকথা বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। এই সাধক মহাপুরুষের জীবনী যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি অলৌকিক রহস্যপূর্ণ, গ্রন্থকার তাঁর একান্ত ভক্ত ও শিষ্য শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতায় পর্যবসিত, সুতরাং এ গ্রন্থে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু

প্রামাণ্য তথ্যাদির সন্ধান মিলবে, যা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। মহাপুরুষের জীবনকথা মাত্রই সাধারণের জ্ঞান ও ধর্ম-পিপাসা নিবারণ করতে সহায়ক, আলোচ্য রচনাও তার স্বাক্ষরবাহী, অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি সম্বলিত এ-রচনা ধর্মজিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রকেই পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। লেখক—বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাপ্তিস্থান—দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা।

সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু / জিজ্ঞাসা

আলোচ্য গ্রন্থে পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। অনেকেই হয়ত জানেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু অসাধারণ সাধকই ছিলেন না, ছিলেন অসাধারণ এক গায়কও। বর্তমান রচনায় স্বামীজীর সাঙ্গীতিক প্রতিভা ও তার বিকাশ সম্বন্ধে এক সুষ্ঠু আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থ দু' ভাগে বিভক্ত, প্রথমাংশ, ১৪৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনা ও দ্বিতীয়াংশ একটি প্রাচীন ও অধুনালুপ্ত সঙ্গীত গ্রন্থ 'সঙ্গীত কল্পতরু'—যা রচনা ও সম্পাদনা করেছিলেন বৈষ্ণবচরণ বসাক ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বলা বাহুল্য যে, স্বামী বিবেকানন্দেরই গৃহাশ্রমের নাম ছিল 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত'। বিশ্বখ্যাত ও পূজিত এই মহাপুরুষের জীবনের এইদিকটা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কিছু কিছু জানা থাকলেও বিশদভাবে কিছু জানার সম্ভাবনা ছিল অল্প। আলোচ্য রচনার মাধ্যমে সে অভাব মিটবে বলেই মনে হয়। জ্ঞানতপস্বীকে শিল্পের পূজারীরূপে উপস্থাপিত হতে দেখলে স্বতঃই প্রতিভার বহুমুখী বৈচিত্র্যের কথা মনে জেগে ওঠে। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, সাধক বিবেকানন্দর গায়করূপ এক অজানা মাধুর্যের সন্ধান এনে দেয় তাঁর অনুরক্ত ও ভক্ত জনের মননে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, ১৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯, দাম—ছয় টাকা।

বাঞ্ছারাম-চরিত / বিহার সাহিত্য ভবন

সরস সাহিত্যকার হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা প্রসিদ্ধ। বর্তমান রচনাও তাঁর সে প্রসিদ্ধি ক্ষুণ্ণ করবে না।—বাঞ্ছারাম এ গ্রন্থের কাহিনীগুলির একমাত্র নায়ক, প্রেম ও জীবন সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতার কৌতুকপ্রদ বিবরণ মজাদার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানের এই সর্বব্যাপী নেই-নেই রবের ভেতর সাধারণ মানুষের পক্ষে মন খুলে একটু হাসবার মওকা বড় একটা মেলে না; আলোচ্য রচনা মুহূর্তের জন্য হলেও বাঙালী পাঠককে সে সুযোগ এনে দেবে। কোন গুরুগম্ভীর ভাব বা সৌন্দর্য প্রকাশ না করলেও শুধু এজন্যই রস-সাহিত্যের দেশে-বিদেশে এত সমাদর, গোধূলির সূর্যাস্তের শোভা যখন হাল্কা মেঘের দলকে ক্ষণেকের ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দিয়ে যায়, হাল্কা হাসির ছোঁয়ায় মানুষের মনও তেমনি ক্ষণেকের জন্য হলেও মেতে ওঠে আর সেই হঠাৎ খুশির ঝলকানিটুকুই রস-সাহিত্যকারের একমাত্র সম্মান-দক্ষিণা। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকও এ সম্মান-দক্ষিণা লাভের যোগ্যপাত্র।—বইটি পড়তে ভাল লাগে, এটাই সবচেয়ে বড় কথা।—প্রচ্ছদ মজার, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ।—লেখক—অরুণ, প্রকাশক—বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা ৯, দাম—তিন টাকা।

গল্প-সমগ্র / আনন্দ পাবলিশার্স

আলোচ্য গ্রন্থ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতনামা রূপকারের সামগ্রিক ছোটগল্পের এক অনবদ্য সাজি। রমাপদ চৌধুরী নামটি আজ বাংলা সাহিত্য পাঠকের একান্ত পরিচিত, এই শক্তিমান কথাশিল্পী রচিত ছোটগল্পগুলিও সর্বজন-সমাদৃত, কাজেই আলোচ্য সঙ্কলনে সন্নিবেশিত প্রায় সব গল্পগুলিই পাঠকের পূর্বপরিচিত। কিন্তু অপরিচয়ের চমক বহন না করলেও, এ সংগ্রহে পাঠক খুঁজে পাবেন এক অনাস্বাদিত আনন্দের উপচারকে। লেখকের শিল্পিসত্তাও এদের মাধ্যমে পূর্ণ প্রকাশিত। তাঁর মননশীলতা, গভীর জীবনবোধ ও সহৃদয়তা গল্পগুলির ছত্রে-ছত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। এক সকরুণ মাধুর্য এই গল্পগুলির শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার, লেখক জীবনকে দেখেছেন মরমী চোখ দিয়ে, মানুষের দোষত্রুটি, লোভ, মোহ সত্ত্বেও তার একমাত্র পরিচয় যে, সে মানুষ। একথা বিস্মৃত হতে পারেন না লেখক ক্ষণেকের তরেও—আর সেজন্যই তাঁর রচনার প্রধানতম আবেদন মানবিকতারই দুয়ারে। রূপে, রসে, মাধুর্যে অভিষিক্ত গল্পগুলি পাঠকের মনকে মোহাভিভূত করে তোলে স্বচ্ছন্দেই। এমন একখানি অনবদ্য সুন্দর গল্পসংগ্রহ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রকাশক সত্যই ধন্যবাদার্হ। আঙ্গিক সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—রমাপদ চৌধুরী, প্রকাশনায়—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—৯। দাম—দশ টাকা।

A Pocket Book of Spoken English (Anglo-Bengali Medium) / Nimbus Publication.

ইংরাজী ভাষা লিখতে পারলেও শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ অনেক সময় বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কারণ পরের ভাষা বা যে কোন বিদেশী ভাষার ব্যাকরণাদিতে অধিকার লাভ করাটা যত সহজ, তার উচ্চারণভঙ্গী বা কথন-প্রণালী আয়ত্ত করাটা তত সহজ নয়। ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে একথা বিশেষ করেই খাটে এইজন্য যে, এই ভাষার উচ্চারণবিধি, সবসময়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী চলে না। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থীর এইসব প্রাথমিক অসুবিধাগুলি দূর করতে প্রয়াসী হয়েছেন, ইংরাজী কথোপকথনের রীতিনীতি বাংলায় সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য, প্রতিটি বাক্য ও শব্দের উচ্চারণবিধি বাংলা করে প্রকাশ করা হয়েছে। নিতান্ত সাধারণ শিক্ষার্থীও এই গ্রন্থ পাঠ করে ইংরাজী ভাষার নিজের বক্তব্য নির্ভুলভাবেই বলতে সক্ষম হবেন কিছুটা। দৈনন্দিন-জীবনে সচরাচর আমরা যে ভাষায় ভাব বিনিময় করে থাকি, সরল ইংরাজীতে অন্তত সেটুকু করতে সক্ষম হবেন যে কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই রচনার সাহায্যে। ছাত্র-ছাত্রীর কাছে এ গ্রন্থ বিশেষভাবেই মূল্যবান বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। প্রচ্ছদ ছিমছাম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—এন বি দাশ, প্রকাশনায়—নিম্বাস পাবলিকেশন, ৩০/১এ, বারোয়ারীতলা রোড, কলিকাতা-১০, দাম—তিন টাকা পঁচিশ পয়সা।

তিন অধ্যায় / অন্নপূর্ণা লাইব্রেরী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস।—নায়িকা মনীষা চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক সুন্দরভাবে বর্তমান যুগ-যন্ত্রণাকে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন।—সুন্দরী ও শিক্ষিতা মনীষা আকৃষ্ট হয়েছিল পরন্তপের প্রতি, বাইরের সম্পদে দীন হলেও আন্তর-ঐশ্বর্যে যে ছিল মহীয়ান; কিন্তু গ্ল্যামারের আকর্ষণ কাটাতে পারল না মনীষা। স্বামীকে গণ্যমান্য বলে প্রচারিত করার অদম্য পিপাসায় তার রচনা নিয়ে ছুটে গেল সে বিখ্যাত সাময়িক পত্রের দপ্তরে, যেখানে তার রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট সম্পাদক ত্রিলোচন সাদরে গ্রহণ করল রচনাগুলিকে তারই রচনা ভেবে।—নাম-যশের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত মনীষা ভেঙে দিল না সে ভুল, পরন্তপের রচনা আত্মপ্রকাশ করল ওর নামই বুকে ধরে।—বিখ্যাত সাহিত্যিকারূপে সমাদৃত হল মনীষা সর্বত্র, শুধু পরন্তপই যেন এরপর থেকে সরে যেতে লাগল ওর জীবন থেকে ধীরে ধীরে; অবশেষে ওর মিথ্যাচরণে ব্যথা পেয়ে একেবারেই দূরে সরে গেল পরন্তপ; একা হল মনীষা।—অবশেষে যেন এই আঘাতের মাধ্যমেই আবার জীবনের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে সক্ষম হল ও, পরন্তপের মৃত্যু-সংবাদে সত্যদর্শন হল যেন ওর; মনীষা বুঝল পরন্তপহীন জীবনভার বয়ে বেড়ান ওর পক্ষে শুধু নিরর্থকই নয় অসম্ভবও, তাই শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ দিয়ে শূন্যের অঙ্ক কষার ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে আত্মবিসর্জন করল ও। বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে কাহিনীর জাল বুনেছেন লেখক। নারীমনের এক অন্তরঙ্গ পরিচয়ে উজ্জ্বল তাঁর রচনা।—সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় নবাগত হলেও তাঁর রচনা যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিতবাহী, তবে তাঁর রচনাশৈলী আরও অনুশীলন সাপেক্ষ।—বইটির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।—লেখক—পদ্মনাভ, প্রকাশনায়—অন্নপূর্ণা লাইব্রেরী, ৩৩ ডি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬, দাম—পাঁচ টাকা।—

ধর্ম / প্রফুল্ল লাইব্রেরী

ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। আজকের যুগে বিজ্ঞানেরই জয়জয়কার, আধুনিক মানুষ সর্বত্র ধর্মকে স্বীকার করে নিতেও প্রস্তুত নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও কি বলতে পারা যায় যে, ধর্মের সত্যকার কোন মূল্য নেই ও শুধু মানুষের আত্ম-প্রবঞ্চনার একটা সুন্দর মাধ্যম মাত্র? না একথা বলা অন্তত আমাদের সাজে না, কারণ ধর্মই তো ভারতবাসীর মূল অবলম্বন, ভারতের জ্ঞান, ভারতের দর্শন, ভারতের গর্ব করার মত যা কিছু সকলের মূলেই যে রয়েছে ধর্ম। আলোচ্য গ্রন্থে ভারতের প্রধানতম ধর্ম 'হিন্দুধর্ম' নিয়ে প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে, লেখক বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত, বর্তমানে হিন্দুধর্মকে বিশ্বের সম্মুখে সগৌরবে তুলে ধরতে হলে তার সম্পূর্ণ নতুন রূপায়ণ করাটা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় একথাও তিনি মানেন। কাজেই তাঁর এ রচনা শুধু প্রামাণ্যই নয়, শিক্ষাপ্রদও হয়ে উঠতে পেরেছে। হিন্দুকে বাঁচাতে হলে, হিন্দুজাতিকে উন্নত প্রগতিশীল করে তুলতে হলে কুসংস্কারমুক্ত সার্বজনীন ধর্মচর্চা যে আজ এক স্বভাবেই প্রয়োজনীয়, বর্তমান রচনাটি পাঠ করলে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। যে-কোন তত্ত্বজ্ঞ পাঠকের কাছেই এ গ্রন্থ মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—পণ্ডিত মধুসূদন শাস্ত্রী, প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মঠ, শান্তিপুর ধর্মপরিষদ, পোঃ—শান্তিপুর (নদীয়া), পশ্চিমবঙ্গ (ভারতবর্ষ)। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিবেকানন্দ যুগ / সাধনা প্রকাশনী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক প্রবন্ধ সংগ্রহ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে মানসগোচর করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধনিচয়ের মাধ্যমে। ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের আদর্শপূত স্বামী বিবেকানন্দের যে অবদান, তারই মূল্যায়ন করেছেন লেখক এই রচনায়। প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে এ সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণার অবকাশ ঘটে। সৎসাহিত্য চিন্তা করার মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত, তার সন্ধান মিলবে এই গ্রন্থে। আমরা বইটি পড়ে আনন্দলাভ করেছি। লেখকের আন্তরিকতায় রচনাটি হৃদ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশনায়—সাধনা প্রকাশনী, ৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮। দাম—দুই টাকা।

পৃথিবীতে শিশুযুগ আসছে / অ্যাল্‌ফা-বিটা

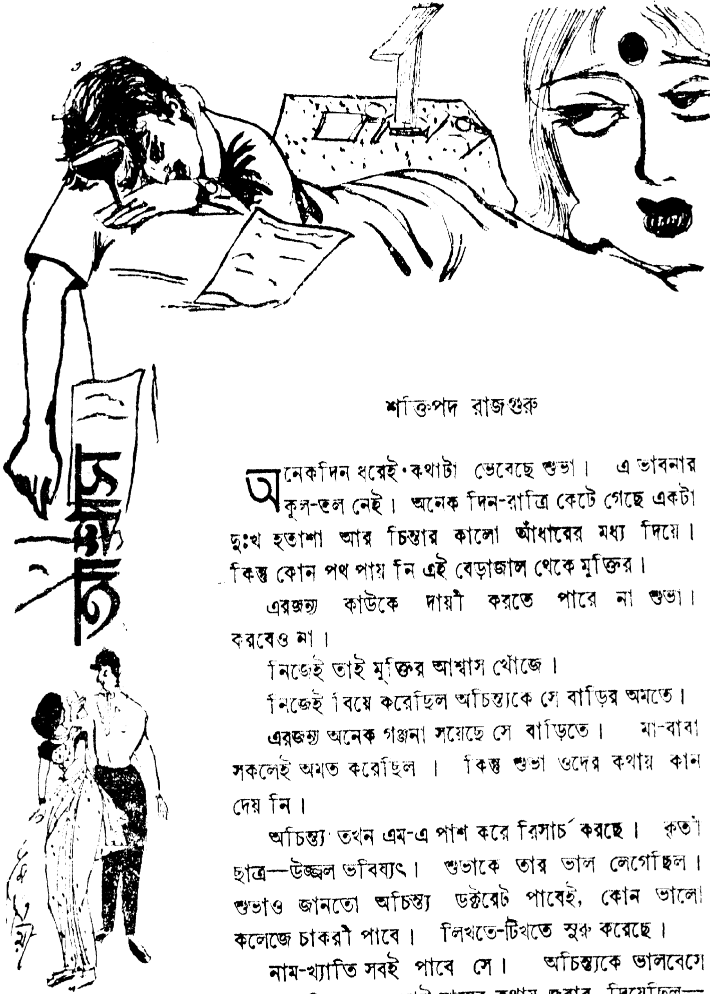
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌, রকেট বই সিরিজের ৩নং বই এটি, পৃথিবীর শাসনভার যদি শিশুদের হাতে চলে যায় তা হলে কি ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব তারই এক মজার বিবরণ এ রচনার মূল উপজীব্য। আপাতদৃষ্টিতে লঘু ও মনোহারী মনে হলেও, এ গ্রন্থে লেখক একটা বিশেষ জীবনাদর্শকেই রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, মানুষে মানুষে যে হানাহানি আজ গোটা পৃথিবীটাকেই বিষিয়ে তুলেছে তাতে মনে হয় যে, বয়স্ক মননে কল্যাণবুদ্ধি জাগবার আশা হয়ত দুরাশাই, অতএব শিশুরা রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়া ছাড়া আর উপায় কি। কাহিনীতে শিশুরা হঠাৎ বিস্ময়করভাবে আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা, আর সে ক্ষমতা তারা যথেচ্ছ প্রয়োগ করছে শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যুদ্ধবিগ্রহ যে মানবতার পারপন্থী তা তারা ভাল রকমেই বোঝে, অতএব নিত্যনতুন মানুষ মারার কল সৃষ্টি না করে সমগ্র যুদ্ধ-বিভীষিকাটাকেই ধ্বংস করে ফেলতে তারা কৃতসংকল্প। ছোটোয় বড়োয় এই বিবাদের কাহিনী ভারি মজাদার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, বইটি পড়ে ছোটরা তো বটেই বড়রাও কম আনন্দ পাবেন না। অঙ্গসজ্জা, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—গৌরীশঙ্কর দে, প্রকাশক—অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশনস্‌, পোস্ট-বক্স—২৫৩৯, কলকাতা—১, দাম—একটাকা পঁচাত্তর পয়সা।

হৃদয়ের গন্ধ / নক্ষত্রের রাত প্রকাশনী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন। একই কবির রচিত ৪২টি কবিতা একত্র সংগৃহীত হয়েছে এই সংকলনে। কবিতাগুলির মাঝে এক সকরুণ মাধুর্যের ছায়া আছে। কবি আর যাই করুন, মননশীল বলে গণ্য হওয়ার লোভে রচনাকে দুর্বোধ্য করে তোলেন নি, কবিতাগুলি পড়লে রীতিমত বোঝা যায়। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের যে 'ছুঁয়ো···না, ছুঁয়ো···না, বঁধু' গোছের একটা মনোভাব সাধারণত দেখা যায়, এ ধরণের কবিতা পড়ার সুযোগ ঘটলে তা হয়ত বা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে, মন বেশ একটা স্নিগ্ধতার আবেশে ভরে ওঠে এবং এই ভাললাগাটুকুই এদের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় বলবার মত কথা। আঙ্গিকে অভিনবত্বের ছাপ আছে, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—সামসুল হক, প্রকাশিকা—করবী হক, গাজী বিল্ডিংস। ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা, দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কয়েদখানা / গ্রন্থপীঠ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক নাট্য সংকলন, একই লেখকের লিখিত চারটি একাংক নাটক সংগৃহীত হয়েছে এই সংকলনে। কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখার চেয়ে নাটক লেখার গুরুত্ব বড় কম নয়, প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত কাজটিই বোধ হয় কঠিনতম। সফল নাটক রচনা করা যে সময় সময় সকল সাহিত্যকারের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়, একাধিক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, কবি প্রভৃতির নাট্যকার হিসাবে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনায় তা সপ্রমাণিত। সফল নাট্যকার এক স্বতন্ত্র প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। আলোচ্য নাটক ক'খানির রচয়িতার মধ্যে সেই প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। নাটকগুলি এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহী। নাটকগুলি জীবনবোধে সমুজ্জ্বল ও বাস্তবসচেতন। বস্তুত সফল নাটকের প্রধানতম সম্ভাবনাই এই দু'টি সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। চরিত্রকে ইচ্ছায় অনুভবে এবং মননে জীবন্ত তথা বাস্তব করে তুলতে নাট্যকার যে একান্তভাবেই সচেষ্ট—নাটক চারটির মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে এবং সেটাই এদের সপক্ষে সবচেয়ে বড় কথা। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—বাণিক রায়, পরিবেশক—গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—তিন টাকা।



শক্তিপদ রাজগুরু

অনেকদিন ধরেই কথাটা ভেবেছে শুভা। এ ভাবনার কূল-তল নেই। অনেক দিন-রাত্রি কেটে গেছে একটা দুঃখ হতাশা আর চিন্তার কালো আঁধারের মধ্য দিয়ে। কিন্তু কোন পথ পায় নি এই বেড়াজাল থেকে মুক্তির।

এরজন্য কাউকে দায়ী করতে পারে না শুভা। করবেও না।

নিজেই তাই মুক্তির আশ্বাস খোঁজে।

নিজেই বিয়ে করেছিল অচিন্ত্যকে সে বাড়ির অমতে।

এরজন্য অনেক গঞ্জনা সয়েছে সে বাড়িতে। মা-বাবা সকলেই অমত করেছিল। কিন্তু শুভা ওদের কথায় কান দেয় নি।

অচিন্ত্য তখন এম-এ পাশ করে রিসার্চ করছে। কৃতী ছাত্র—উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। শুভাকে তার ভাল লেগেছিল। শুভাও জানতো অচিন্ত্য ডক্টরেট পাবেই, কোন ভালো কলেজে চাকরী পাবে। লিখতে-টিখতে সুরু করেছে। নাম-খ্যাতি সবই পাবে সে। অচিন্ত্যকে ভালবেসে ভুল করে নি সে। তাই মায়ের কথায় জবাব দিয়েছিল—কেন পাত্র হিসেবে ও কি খারাপ? তোমাদের পছন্দ ওই শশধরবাবুর মত ওর কাঠগোলা নেই, নিতাইবাবুর মত ধানকল, তেলকল নেই। কিন্তু মানুষ হিসাবে ও অনেক বড়। টাকাকে বিয়ে করছি না মা—বিয়ে করছি মানুষটাকে।

শুভা সেদিন কারোও কথা শোনে নি।

নিজের ওপর বিশ্বাস নিয়ে অচিন্ত্যকে বিয়ে করেছিল।

ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট—শহরের কোলাহল কলরবের মধ্যেই তারা দু'জনে রচনা করেছিল তাদের স্বপ্ননীড়। আকাশ এখানে সীমিত, সবুজের স্পর্শ নেই। তারাই কয়েকটা টবে ফুলগাছ লাগিয়েছিল, মনোরম একটি পরিবেশ গড়ে তুলেছিল দু'জনে।

ওরই মাঝে ঘর বেঁধেছিল তারা দু'জনে।

এতদিন ওরা দু'জনেই ছিল বাইরের প্রাণী। শুভা আর অচিন্ত্য। কলেজ, কফি-হাউস, ময়দান, গঙ্গার ধার এইগুলোতেই দু'জনে চক্কর দিয়েছে মুক্ত বিহঙ্গের মত। দু'জনে এই কঠিন বাস্তবের মাঝে বাঁচার আশ্বাস খুঁজেছে।

অচিন্ত্যের বুনো বেবশ মনটাকে এমনি করে শুভা প্রীতির বাঁধনে বেঁধেছে।

কিন্তু বিয়ের পর অচিন্ত্য কেমন বদলে গেছে।

ওরা জীবনে কোন দায়, বোঝা বইতে চায় না, পারে না। সমাজের ওরাই যেন একটি দায় বিশেষ, কথাটা শুভা ক্রমশ অনুভব করছে।

অচিন্ত্য কেমন বোঝে এটা। সেই উদ্দাম হাসি গান আর হৈ-হৈ স্বভাবটা বদলে গেছে। শুভার দিকে চেয়ে থাকে।

ঝিলের জলে পড়েছে পড়ন্ত রোদের আভা। গাছ-গাছালির মাথায় হলুদ রঙ লেগেছে, পাখিগুলো কলরব করে। এমনি কোন হারিয়ে যাওয়া জগতের অসীমে অচিন্ত্য নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে।

শুভার কথাও ভুলে গেছে যেন সে।

অচিন্ত্য আজ নিজে একাই বের হয়ে এসেছে। শান্তভাবে কথাটা ভাবছে। একটা ঝোঁকের বশেই কঠিন দায়িত্ব নিয়েছে সে। মাঝে মাঝে এখানে আসতো সারাদিনের কাজের পর। দু-এক পেগ মাত্র খেতো। তাতে সে কাজের উৎসাহই পেত।

আজ মনে হয় শুভা একটা পড়া বই, ওর কোন ছত্রে আর অজানা কিছুই নেই। ও শুধু জীবনের বোঝাই যেন হয়ে উঠেছে।

মন থেকে সব দুর্বলতা ওই চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চায় সে। কেমন সব গুলিয়ে আসছে, রিসার্চ-এর কাজটাও তেমন এগোচ্ছে না। মনের মধ্যে সুপ্ত সেই কর্মপ্রবণতাকে সে

জাগিয়ে তুলতে চায়—আরও দু-একটা পেগ নিয়ে বসল।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।

শুভা ঠিক এটা বোঝে নি, বোঝে নি কেন অচিন্ত্য তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে কাজ আছে।

মাঝে-মাঝে বের হয়ে যায়। ফেরে সেই রাত্রে। কেমন এড়িয়ে চলে। মুখ-চোখ থমথমে। ওকে এড়াবার জন্যই বোধ হয় বই কাগজপত্র নিয়ে বসে।

কফি-হাউসের সেই আড্ডার কথা ভোলে নি শুভা। কলেজ পালিয়ে ওখানে প্রায়ই যেতো সে. মানস পঙ্কজ ত্রিদিব—আরও অনেকেই আসতো, ওইখানেই অচিন্ত্যের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল।

কয়েকটি উদ্দাম তরুণ প্রাণ যেন মুঠো মুঠো করে সেই প্রাণশক্তিকে অপচয় করে আনন্দ পেতো। অচিন্ত্যও ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে প্রায় আসতো, দু'জনে বের হয়ে পড়তো গঙ্গার দিকে, কখনও যেতো বটানিক্স্সে।

কফি-হাউসের সেই প্রথম পরিচয়ের আনন্দটুকুকে আজও ভোলে নি শুভা। এমনি শূন্য-মনে বার-বার সেখানের দেখা ত্রিদিব, মানস এদের মনে পড়ে।

ওদের মেশামিশি নিয়ে অনেক কথাই উঠতো অচিন্ত্যকে বলেছিল।

—বেশ কাজের ছেলে কিন্তু অচিন্ত্য।

অচিন্ত্যও মানসকে দেখেছে, কিন্তু অচিন্ত্যের কথাও যেন কেমন তীক্ষ্ণ আর শাণিত বলে ওঠে।

—কেন, আপনার কোন অসুবিধা করলাম নাকি মানসবাবু?

—না। না।

মানসের বাড়ির অবস্থা এমনি ভালোই। ও নিজে পাশ করে বেশ একটা ভালো চাকরীই জুটিয়েছে। গাড়ি হাঁকিয়ে আসে কফি-হাউসে। বন্ধু-বান্ধবদের প্রায়ই খাওয়ায়।

অচিন্ত্য এটা সইতে পারে না। ভাবে ওর বড়মানুষি। তাই ও এলেই শুভাকে ডেকে নিয়ে বের হয়ে পড়ে? অচিন্ত্য তার তুলনায় অনেক ভালো ছাত্র ছিল, তার রোজগার এখনও তেমন কিছু নয়, অথচ মানস এখন হাজার টাকা প্রায় রোজগার করে। শুভা একটু গল্প করার জন্য বসেছিল মানসের ওদিকে।

অচিন্ত্যর ডাক শুনে উঠে এল।

—চল, বেরুতে হবে।

—এক্ষুণিই!

শুভা অচিন্ত্যের কথায় অবাক হয়; কিন্তু উঠে আসতে হোল। তবু লক্ষ্য করে মানসের সঙ্গে সম্পর্কটা অচিন্ত্যের ভালো নয়। কিছু বলল না।

কথাগুলো আজ ভাবে শুভা।

কেমন অর্থবহ বলেই মনে হয়।

অচিন্ত্য চেষ্টা করেছে অনেক যাতে কাজটা এগিয়ে যায়। কিন্তু পাবে নি। কেমন বাধা ঠেকেছে পদে পদে। শুভাই দাঁড়িয়েছে সেই বাধা হয়ে।

এতদিন এই মনোবৃত্তি তার ছিল না, একটা স্বাধীনসত্তা তার ছিল, কিন্তু সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে। মনে হয় সকলেই তার দিকে চেয়ে থাকে।

বন্ধুরা তাকে হিংসা করে ব্যঙ্গ করে।

শুভা!···ভাব দেখে কোথায় যেন একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছে।

অচিন্ত্যকে সে আজ অবিশ্বাস করে; মনে হয় জেনে ফেলেছে ও অচিন্ত্যর মনের সেই সাধারণ সত্তাটিকে যাকে অসাধারণ বলেই শ্রদ্ধা করেছিল এতদিন।

এই দ্বিধা জড়তাই তার মনে একটা সংশয় আর দুর্বলতা এনেছে। তা অচিন্ত্য থিসিস 'সাবমিট' করেছিল। কিন্তু খবর বের হয়েছে তার থিসিস মান উপযোগী হয় নি, তাই বিচারকরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। নাকচ হয়ে গেছে সেই থিসিস।

খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছে অচিন্ত্য।

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় সবাই তার উপর কঠিন অবিচার করেছে।

ওই বিচারকরা পর্যন্ত। আজ বন্ধুরাও খবর শুনেছে। ত্রিদিবও এসেছিল দেখা করতে। মনে হয় সান্ত্বনার কোন ব্যঙ্গসূচক বাণীই সে দেবে।

ওরা সবাই আড়ালে হাসাহাসি করে। কিন্তু অচিন্ত্য জানে তার প্রতিভাকে ওরা হিংসা করে।

তরল উষ্ণ পানীয়টা আজ ওর মনে একটা জোর আনে, সব দুঃখ ব্যর্থতা সহ্য করার আশ্বাস খোঁজে সে ওই পানীয়ের উষ্ণতায়। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। দু'চোখের সামনে নামে সবুজ একটা আভাষ।

শুভা ওকে বাড়ি ফিরতে দেখে অনেক রাত্রিতে। একটা অন্য মানুষ। এগিয়ে আসে।

কি হয়েছে?

অচিন্ত্য আজ দুনিয়াকে যেন টেক্কা দিতে চায়। সবাই এখানে হস্তিমূর্খ—কোন প্রকৃত প্রতিভাকে ওরা চেনে না। চিনতে পারে না।

বলে ওঠে—থিসিসের মানেই বোঝে নি, অল ফুলস্!

শুভা খবরটা শুনেছিল। কিন্তু তারজন্য অচিন্ত্য এইভাবে বাড়ি ঢুকবে এ কল্পনাও করে নি। শুভা চুপ করে থাকে।

আজ মনে মনে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে লোকটার ওপর। সহানুভূতি হয়, কিন্তু সেটুকুও ঘৃণার উত্তাপে কেমন শুকিয়ে গেছে। চেয়ে থাকে ওর দিকে। অচিন্ত্য তখন ভুলে গেছে সেও একটা কলেজের অধ্যাপক। অন্তত সামাজিক শালীনতা বোধ তার কিছু থাকা উচিত।

শুভা দেখছে ওর কদর্য-অন্তরের স্বরূপ। লোকটা কাজ করে নি ঠিকমত, সেই ভুল সেই ফাঁকিটাকেও মানবে না, মানতে চায় না, এমনিই মানুষ ওরা।

অচিন্ত্যর আজ মনে হয় ভুল করেই সে ঘর বেঁধেছে, জড়িয়ে পড়েছে জীবনের ভিড়ে এমন একটি পৃথিবীতে—যেখানে মানুষ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে চরম আঘাত হানতে দ্বিধা করে না। সেই মাটিতে ঘর বাঁধার কি দাম আছে জানে না সে।

ত্রিদিব এসেছিল সান্ত্বনা দিতে, সে একটা রাবিশ সাবজেক্ট নিয়ে রিসার্চ করে ডক্টরেট পেয়েছে। হিপোক্রিট ভণ্ড ওরা সব। শুভাকে ঘিরে ওরা তার আড়ালে নানা কথা বলে। কোন জ্ঞানই নেই, ভাসা ভাসা জ্ঞান সবকিছুতে, তাই নিয়ে সমাজে সম্মান প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে।

অচিন্ত্য আঘাত পেয়েছে মনে মনে। দীর্ঘ চার বছর ধরে সে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরেছে, সংগ্রহ করেছে তার রিসার্চের মালমশলা, নিজের চোখে দেখেছে সেই বিবর্তনের ধারাটিকে, সেই মানুষগুলোকে। তার নিজস্ব একটা মত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই মতের কোন দাম নেই? প্রতিষ্ঠা নেই?

হেরে যাচ্ছে অচিন্ত্য। নিজের ওপরই যে আস্থা ছিল, সেটা কেমন হারিয়ে যাচ্ছে।

শুভা লোকটাকে দেখছে। সামনের সোনালি পানীয়ের গ্লাস থেকে অসংখ্য বুদ্বুদ উঠছে। কোনদিকে খেয়াল নেই অচিন্ত্যর।

রাত্রি হয়ে গেছে, ওর সারা শরীরে মনে ঘনিয়ে আসে একটা অবসাদ। গ্লাস থেকে বুদ্বুদগুলো উঠে চলেছে, মনে হয় ওইগুলোই অফুরান প্রাণশক্তি।

অচিন্ত্য আজ সবকিছুর ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কলেজে সেই একঘেয়ে বকে যাওয়া, কোন নতুনত্ব নেই।

একটা বিষয়ের ওপরই বকে যাও, পিছনে দু-একটা মন্তব্য ওঠে।

ছাত্ররাও যেন ওকে ব্যঙ্গ করে। সবকিছুর ওপরই আজ তার মন তিক্ত হয়ে উঠেছে।

—খাবে না?

শুভার ডাকে ফিরে চাইল।

বলে ওঠে অচিন্ত্য—খিদে নেই। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেও।

শুভা বের হয়ে এল। ওকে চলে যেতেই বলেছে অচিন্ত্য।

ছাদে এসে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে শুভা ওই তারায় ভরা আকাশের দিকে। আঁধারে সবকিছু ডুবে গেছে।

তার সব পথও হারিয়ে গেছে অমনি অতল কোন হতাশার আঁধারে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে দায়ী আর কাউকেই করে না।

ক্লাশেও কেমন বিশ্রী লাগে অচিন্ত্যের।

নিজেই শুধু বকে যায়। এতগুলো ছাত্র এরা অনেকেই কিছু করে না। পিছনে বসে খোসগল্প করে।

—ইউ। রোল নাম্বার ফিফটিওয়ান।

একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল, ছেলে নয় যুবকই বলা যায়। পরনে টেরেলিনের সার্ট, আর ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট, মুখটায় একটা রুক্ষতা। চোখ দু'টো এরই মধ্যে কোটরে ঢুকে গেছে।

ওকে দেখছে অচিন্ত্য। ভবিষ্যৎ নাগরিক।

—বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে পদকর্তা—

বেশিদূর এগোতে হ'ল না। ছাত্রটি বেশ সাফকণ্ঠে জবাব দেয়—ওসব পড়ি নি স্যার!

অচিন্ত্য চটে ওঠে—তবে কলেজে কেন আসো?

ছেলেটি জামাটা ঠিক করে নিয়ে বলে—ওটাও বাবা জানেন। তা ছাড়া ফেল করা—ও স্যার অনেকেই করছে। ছেলেবুড়ো ইস্তক সবাই!

হাসছে ছেলেটা। চকিতের মধ্যে অচিন্ত্যের মনে পড়ে যায় নিজের রিসার্চ বাতিল হওয়ার কথা। খবরটা ইতিমধ্যে ওরা জেনে ফেলেছে, তাই বোধ হয় ব্যঙ্গই করছে তাকে।

অন্য ছেলেমেয়েরাও হাসছে ওর কথায়। অচিন্ত্য চেঁচিয়ে ওঠে।

বের হয়ে যাও ক্লাশ থেকে ইউ ইডিয়ট অল অব ইউ।

ছেলেরাও প্রতিবাদ করে। সকলকেই যেন ইচ্ছে করেই অপমান করেছে সে। অচিন্ত্য নিজেই ক্লাশ থেকে চলে এল।

মনে হয় ওর পিছনে একপাল নেকড়ে তাড়া করেছে। ব্যাপারটা সেইখানেই থামে না।

অনেকদূর অবধিই গড়ালো। ত্রিদিবও নিজে আসে ওর কাছে, ছেলেদের সকলকেই সে অপমান করেছে বরং সে ওদের সঙ্গে মিটিয়ে নিক।

অচিন্ত্য ওর দিকে চেয়ে থাকে শুষ্কদৃষ্টিতে। ত্রিদিবও এসেছে ওকে অপমান করতে ওদের হয়ে। অচিন্ত্যকে ওরা সবাই কোণঠাসা করতে চায়।

বলে ওঠে অচিন্ত্য—তা হয় না ত্রিদিব।

ছেলেরাও থামবে না। ওরা হঠাৎ তাদের আত্মসম্মান সম্বন্ধে খুব বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে গেছে। শেষকালে প্রিন্সিপ্যালই ডাকলেন ওকে নিজের ঘরে।

করিডরে ছেলেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অচিন্ত্য আজ তৈরি হয়েই গেছে। সে ভুলে গেছে তার ঘর-সংসার আছে। একজনের দায়িত্ব নিয়েছে সে নিজে। সব মনে হয় ভুল—মিথ্যা!

—প্রিন্সিপ্যাল ওকে ভাল কথাই বলেন।

—একটু ট্যাক্টফুল হতে হবে অচিন্ত্য। জানোই তো আজকালকার ছেলে ওরা ভবিষ্যতে কথাটা মনে রেখো।

প্রিন্সিপ্যাল নিজেই ব্যাপারটা সামাল দিয়েছিলেন।

তবু মনে হয় অচিন্ত্যের—এত অপমানিত সে জীবনে আর হয় নি। ভেবেছিল ছেড়েই দেবে চাকরী; এই অপমান চুপ করে সইবে না। কিন্তু তা পারে নি। একজনের জন্যেই। সে ওই শুভা!

মনে হয় অচিন্ত্যের কে যেন তাকে কঠিন একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেলে রেখে দিয়েছে। হাত-পা নাড়ার ক্ষমতা নেই।

বদ্ধ অবস্থায় পড়ে পড়ে মার খেতে হবে! এর নাম ভালবাসা! এর নাম সংসার!

চীৎকার করে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে।

শুভারও মনে হয় নিদারুণভাবেই সবদিক দিয়ে ঠকেছে সে। না পেয়েছে অর্থ না পেয়েছে সম্মান—না পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। ক'বছরে অচিন্ত্য ধাপে ধাপে কেবল নেমেই চলেছে। এর শেষ কোনখানে জানে না সে।

বাড়িভাড়া বাকী পড়েছে দু'মাসের। বাড়িওয়ালার সরকার ভাড়ার জন্য তাগাদা দিতে এলে শুভাকেই এগিয়ে দেয়।

সরকার ওকেই কথা শোনায়। শুভা চুপ করে থাকে। মনে মনে অচিন্ত্যর প্রতি ঘৃণার স্তূপই জমে ওঠে। একটি লোক তার জীবন বিষিয়ে তুলেছে।

ত্রিদিব-মানস সেই কফি-হাউসের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। কেমন সে-সব যেন স্বপ্ন বলেই মনে হয় আজ।

বৌদি এসেছিল।

বৌদি শুভার দিকে চেয়ে থাকে, কি দেখছে সন্ধানী দৃষ্টিতে, শুভার মুখচোখ শুকনো, কোথায় যেন নিষ্ঠুরভাবে ঠকেছে সে।

বলে ওঠে শুভা—বসো।

—তোকে দেখছি—তা হ্যারে সংসারের কি ছিরি করে রেখেছিস? চাকর-বাকর নেই?

শুভার মুখচোখে ফুটে ওঠে বিবর্ণতা। কি করে জানাবে শুভা সংসারের অভাবের কথা। এটা আগে বোঝে নি,

এখন বুঝেছে। যা মাইনে পায় অচিন্ত্য তার অনেকটা যায় মদের বিল দিতে। বাকী যা থাকে দয়া করে শুভার হাতে তুলে দেয়।

বৌদিকে জানাতে পারে না সেই কথা। বলে ওঠে—দু'জনের জন্য আর চাকর কি হবে।

বৌদি তবু কেমন যেন খুঁত খুঁত করে। কি যেন চাপতে চলেছে শুভা।

বলে ওঠে বৌদি—হ্যাঁরে, তা অচিন্ত্য এখন লেখেটেখে না? কই কাগজেও তো দেখি না।

শুভা একটু ঘাবড়ে যায়। অচিন্ত্য নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে আনছে। নিজের এই অভাব-দৈন্যটা বড় হয়ে ওঠে অপরের সম্পদ দেখলে। তাই শুভা আজ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে বোধ করে। মনে হয় অচিন্ত্যকে সে চিনতে পারে নি। একেবারে ঠকে গেছে।

দেখেছে ত্রিদিবকে।

সেও ওদের কলেজেরই অধ্যাপক। এরই মাঝে সে নোট বই-টেক্সট বই লিখে বেশ কিছু অর্জন করেছে, বাড়ি করেছে, বেশ সুখেই আছে।

মানসও গুছিয়ে নিয়েছে।

শুভাই ঠকে গেছে। অচিন্ত্য নিজেকে ধ্বংস করুক ক্ষতি নেই তার জীবনটাকে এমনি বরবাদ করে দেবে তা বোঝে নি।

কলেজেও কিসব গোলমাল পাকিয়েছে; নিজেরই লজ্জা করে শুভার। ত্রিদিবও বলে গেছে—ওকে একটু সামলে চলতে বলো শুভা। নিজের ওজন বুঝে না চললে তাতে বিপদ বাড়ে।

শুভা গুম হয়ে বসে থাকে।

অচিন্ত্য ফিরেছে, কিছু টাকাও হাতে তুলে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলেছে। শুভা এই টাকা দেখে চমকে উঠেছে।

—এত কম! এতে কি হবে?

অচিন্ত্যর দাঁড়াবার মত অবস্থা নেই। আজ সব অপমান জ্বালা ভুলতে চায় সে।

তাই বারেই ঢুকেছিল, আকণ্ঠ খেয়ে বের হয়েছে পথে। দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। একটা লাইট পোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে জড়িতকণ্ঠে হাঁক পাড়ে—ট্যাক্সি! এ্যাই—

রাস্তায় লোকজন জুটে গেছে। দু-একজন রসিকতাও করে ওর সঙ্গে। অচিন্ত্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেক্সপীয়রের সনেট আওড়াচ্ছে।

হঠাৎ একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়।

স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল মিঃ রায় ফিরছিলেন। রাস্তার মধ্যে ওই দৃশ্য দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়েছেন। কানে আসে পথচারীদের মধ্যে অনেকেই চেনে অচিন্ত্যকে। তারাই বলাবলি করছে কথাটা।

প্রিন্সিপ্যালের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। নিজেই ড্রাইভারকে পাঠিয়ে ওকে গাড়িতে তুলে আনেন।

—আপনি!

অচিন্ত্য অবাক হয়েছে। বলে ওঠেন মিঃ রায়।

—তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে এসেছিল, অনেক রিপোর্ট—

অচিন্ত্যর নেশাটা কেটে যাচ্ছে, মনে হয় রিপোর্ট কে করেছিল তা জানে সে। ওই ত্রিদিবের কাজ।

মিঃ রায় বলে চলেছেন, এমন ব্যবহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই বদনাম আনে। তাই ভাবছিলাম, তুমি ওখানকার চাকরীতে রেজিগ্নেশন দাও।

অচিন্ত্য স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বেশ বুঝেছে ও চাকরী নিজে থেকে না ছেড়ে দিলে ওকেই ছাড়ানো হবে।

একটা হিমশীতল অনুভূতি সারা মনের উত্তাপকে স্তব্ধ করে দেয়। বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মিঃ রায়।

কথাগুলো এখনও যেন অচিন্ত্যের কানে বাজছে।

সারা মনে একটা নীরব ঝড় বয়ে চলেছে। আজ এটা সবই ঘটেছে এই অসহায় অবস্থার জন্যই। মিথ্যাই সে শুভাকে ভালবাসতে চেয়েছিল। মনে হয় এই শহর একটা অরণ্যে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে এর হিংস্র জানোয়ার। শাণিত নখ আর দাঁত বের করে ঘুরছে।

শুভা বলে ওঠে,—মাত্র এই টাকা!

—হ্যাঁ! এতেই চালাতে হবে।

শুভা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনি করে সামান্য টাকার বিনিময়ে তার ভবিষ্যৎ সম্মান সবকিছু যেন কিনে নিতে চায় ওই অচিন্ত্য। টাকাগুলো ছিটিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে ও পারল না।

আবছা অন্ধকার নেমেছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুভা। বলে ওঠে সে,—মদ গিলে সব উড়িয়ে দিতে লজ্জা করে না?

অচিন্ত্য ওর দিকে চাইল। শুভা আজ চরম অভিযোগ করে, এতদিনের সঞ্চিত ব্যর্থতার বেদনায় মুখর হয়ে ওঠে সে। বলে চলেছে—ওই ছাই-পাশ গিলে নিজেকে শেষ করতে বসেছো, তার আগে আমাকেও শেষ করে দাও, বেঁচে যাই আমি।

অচিন্ত্য আজ নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় বোধ করে। নিজের ওপর সেই বিশ্বাস আজ হারিয়ে যাচ্ছে, মনে হয় এতবড় পৃথিবীতে সে কেমন নিঃস্ব—একা।

চারিদিক থেকে আসছে আঘাত আর আঘাত, কেউই তাকে টানতে পারল না, সবাই ওকে অপমানই করে চলেছে। ব্যঙ্গ করে নির্মমভাবে। ওই ত্রিদিব, মাধো, মিঃ রায়—কলেজের ছাত্ররা, এমন কি ওই শুভা পর্যন্ত।

হেরে হেরে সে একেবারে কোণঠাসা হয়ে আসছে। দম বন্ধ হয়ে যাবে তার।

কোথাও কোন একটু স্থান নেই যেখানে সে শান্তি পাবে, স্বস্তি পাবে। ভালবাসা!···শুভা!···হাসি আসে অচিন্ত্যর।

নিজের ঘরে অনেক বেদনায় আজ অর্ধোন্মাদের মত হাসছে অচিন্ত্য। কেমন যেন অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসছে—একটু জোর, একটু উত্তাপ চায় সে।

তাজা পানীয়টা বোতল থেকে ঢালছে। সব ভুলে যেতে চায় সে। শুভা এখনও জানে না ওর সেই চরম সর্বনাশের খবর।

নিজের চিন্তাতেই সে মত্ত। ক'দিন থেকেই ভাবছে কথাটা। এভাবে সংসার চালানো যায় না। নিজেই একটা চাকরী পাচ্ছে, নেবে কি না তাই ভেবেছে। সকালের দিকে কোন একটা স্কুলে চাকরী।

মানসও এসেছিল সেদিন।

এখন সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। গাড়ি বাড়ি করেছে নিজেই। আলাদা একটা বাড়িতে থাকে। কিন্তু সেই শুভা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। যে মন নিয়ে সেদিন মিশেছিল, প্রাণের আবেগে ভরিয়ে তুলেছিল সেদিনের মুহূর্তগুলো—আজ সে কোথায় হারিয়ে গেছে।

তবু আবার বাঁচতে না চায় কোন নারী।

জীবনের সব দুঃখকে উত্তীর্ণ হয়ে সে বাঁচতে চায়।

ধাপে ধাপে অচিন্ত্য নেমে চলেছে কোন অতলে—একটা তুফানের মাঝে জীর্ণ নৌকা টলমল করছে, যে-কোন মুহূর্তে সে তলিয়ে যাবে। তেমনি একটি আশ্রয়কে ভর করছে শুভা। এতবড় ভুল সে করবে তা ভাবে নি।

মানসই কথাটা বলেছিল। শুভাও ভেবেছে কি তার দায়, একটা লোক যদি কারোও কথা না শুনে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়, তার ফলভোগ সে একাই করবে। শুভা তার জন্য নিজের জীবনটাকে কেন ধ্বংস করবে!

আজ দিন বদলেছে। শুভারও কোন একটা পথ নিয়ে বাঁচার যোগ্যতা আছে। তার জন্য আজও একটি মন নিভৃতে আসন পেতে বসে আছে। মানস বলেছে—নিজের স্বাধীন মতামত তোমার আছে।

শুভা ওর দিকে স্বচ্ছদৃষ্টিতে চেয়েছিল, ওর মনের সেই ব্যাকুল ঝড়ের নিশানা সেও জেনেছে। বারবার সে চেয়েছে বাঁচতে। মানস সেই জীবনের প্রতীক।

শুভা তিলে তিলে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এর একটা শেষ হোক্ এই ঘর বাঁধার প্রহসন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মানস—শুভা।

মানস ডাকছে তাকে। শুভা ওর দিকে মুখ তুলে চাইল। সন্ধ্যা নামছে। লেকের গাছগাছালির মাথায়। আলোভরা দিন আঁধার গগনে কোথায় হারিয়ে গেল। পাখিগুলো আর্তকণ্ঠে কলরব করে।

মানস ওর অসহায় মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে।

শুভার সারা দেহ-মনে একটি ব্যর্থতার জ্বালা। একদিকে মানস অন্যদিকে অচিন্ত্য। একজন জীবনে প্রতিষ্ঠিত, অন্যজন জীবনের ক্ষেত্রে হেরে হেরে চলেছে। নিজের চারিদিকে যে গজদন্তমিনার রচনা করে রেখেছিল, সেই মিনারের ধ্বংসস্তূপের নীচে সে চাপা পড়ে চলেছে।

কঠিন, বিকৃত একটি সত্তা।

বলে ওঠে মানস—এখুনিই জবাব চাইছি না শুভা। ভেবে দেখো কথাটা।

বাঁচার অধিকার তোমার আছে, এ অন্যায় নয়—জীবনের ধর্ম। একজন আত্মহত্যা করবে তুমিও তিলে তিলে তার সঙ্গে মরবে এটা কোন পুণ্যকাজ নয়, সতীত্বের মহিমাও নয়।

শুভা চুপ করে থাকে। সেদিন কোন জবাব দিতে পারে নি।

মুমূর্ষু বুভুক্ষু মন আর্তনাদ করে উঠেছে আজ রাত নির্জনে। ক'দিন ধরেই কথাটা ভেবেছে। যতই আঘাত আর অবহেলা পেয়েছে, ততই যেন মন চেয়েছে এখান থেকে সরে যেতে।

মানসের গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ কেমন চমকে ওঠে শুভা! সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ উঠছে।

মানসের পৌরুষদৃপ্ত পদক্ষেপ, সে আসছে।

এমনি করে শুভার জীবনেও সে আসতে চায়, শুভা ফিরে পাবে তার সবাকিছু—মান, প্রতিষ্ঠা, অর্থ—আগেকার সেই ফেলে-আসা স্বপ্নমুখর জীবনের দিনগুলো।

—মানস এসে ঢুকেছে ঘরের ভিতর। ঘরের ম্রিয়মাণ পরিবেশ কেমন বদলে গেছে। আলোটাকে মনে হয় অনেক উজ্জ্বল। মানসের আবির্ভাবে শুভার মনের সেই অভাব দারিদ্র্য আর দুঃখের কালোছায়াটা মুছে যায়। অকারণেই খুশি হয়ে ওঠে শুভা।

—তুমি বসো, চা করে আনি।

মানস পাইপটা ধরাতে ধরাতে বলে আবার চা! ওসব থাক।

শুভা ওর দিকে চেয়ে থাকে, দু' চোখে কি যেন স্বপ্নের আভাস। মানসের মুখে মিষ্টি একটু হাসি।

—শুভা!

শুভা কেমন যেন চমকে ওঠে।

মনে মনে সে ভেবেছে অনেক কিছুই। এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে তার। এখানে বাঁচতে গেলে তিলে তিলে সে মরেই যাবে। সেই চাকরী করে আর এই প্রতিদিনের

● জনগণের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট জনসন



মাসিক

বসুমতী

অগ্রহায়ণ / '৭:

● রবীন্দ্র-সরোবরে শিশুদের মধ্যে শ্রীঅতুল্য ঘোষ





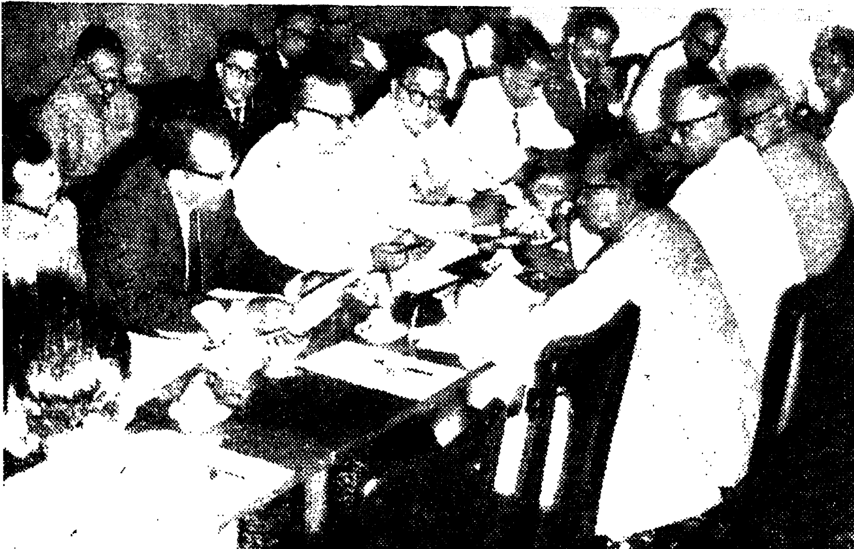
● কোয়াইতের যুবরাজসহ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী

মাসিক

বসুমতী

অগ্রহায়ণ / '৭১

● পরিকল্পনার আসরে আলোচনারত শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন





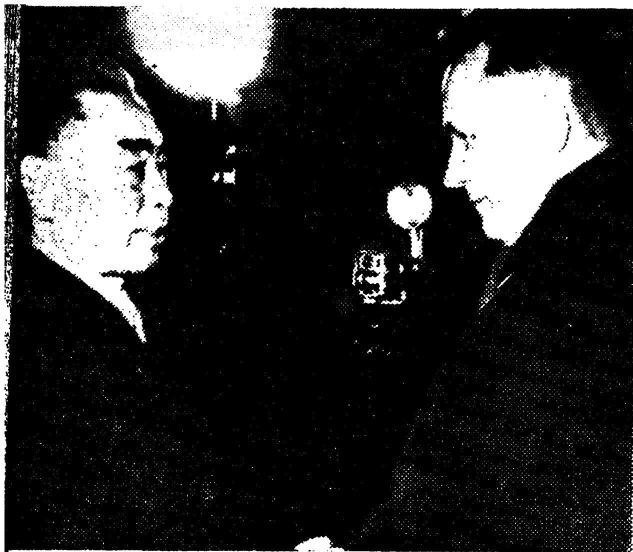
প্রেঃ জনসনের জয়ের উল্লাসে মেয়ে নৃত্যরত



পুলিশ কর্তৃক ধৃত বেবী ফুট

নেহরু-স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতা কমিটির বৈঠক। চিত্রে গৃহস্বামী শ্রীঅশোককুমার সেনকে দেখা যাচ্ছে





● মস্কোয় চৌ-এন-লাই ও কোশিজিন

● মোহনবাগানের প্লাটিনাম জয়ন্তীতে বক্তৃতারত শ্রীঅশোককুমার সেন



কষ্ট সয়ে তাকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। মানস বলে চলেছে।

—পূর্ণ মর্যাদাই পাবে তুমি। জানি এ-ভাবে বাঁচতে তুমি পারবে না, একদিন ফুরিয়ে যাবে।

শুভার দু' চোখে জল নামে।

এতদিন অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সে ওই অচিন্ত্যকে ঘিরে। তারা ঘর বাঁধবে, সুখী হবে। অচিন্ত্য প্রতিষ্ঠিত হবে জীবনে। কিন্তু কোনদিনই তা আর হয়ে উঠল না।

সব স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে গেল। নিজের হাতে-গড়া ঘরের এই অপমৃত্যুতে কাঁদে তার নারীমন। অন্য মন চায় আবার নতুন করে বাঁচতে।

...অচিন্ত্যও শুনেছিল গাড়ির শব্দ। মনে হয় মিঃ রায়ই ফিরে এসেছেন, হয়তো আবার বলতে এসেছেন তাঁর ওসব কথাই মিথ্যে।

আবার চাকরী পাবে অচিন্ত্য, আবার নিজেকে ও শুধরে নেবার সুযোগ পাবে। একটা কঠিন আঘাতের প্রয়োজন ছিল তার তা সে পেয়েছে। হঠাৎ উঠে এসেছে অচিন্ত্য।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে মানসকে দেখে চমকে ওঠে অচিন্ত্য।

কথাগুলো শোনা যায়।

রাতের বাতাস ওর সারা মনে ঝড় তুলেছে, তারাগুলো কি অসহ্য বেদনায় শিউরে ওঠে। হারিয়ে যাচ্ছে অচিন্ত্য কোন তমসার অতলে ওদের কথাগুলো কানে আসে।

শুভা!

অচিন্ত্য আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। মানস আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অচিন্ত্য শুভাকে কি দিতে পেরেছে! দিগন্তে একটু শান্তি স্বস্তি নিশ্চিন্তে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ভরসাও দিতে পারে নি। আজ মনে হয় অচিন্ত্য সকলের ওপর অবিচার করে চলেছে। দুনিয়া শুধু হিংস্র নয়, ... এখানে প্রহসন, বেঁচে থাকা মানেই তিলে তিলে আত্মবিক্রয়।

শুভাকেও সেই বেদনাময় পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে সে।

কি যেন ভাবছে।

আজ নিজের ওপর সব জোর ভরসা চলে গেছে। তার বাঁচার কোন আশ্রয় নেই। কাল থেকে সে বেকার। অপমানিত ব্যর্থ একটি মানুষ।

মানস আজ আশা নিয়েই ফিরেছে।

শুভা কোন কথা বলতে পারে নি, কিন্তু তার দিক থেকে কোন আপত্তি আজ নেই।

শুভাও সাড়া দেবে।

মানস সেই আশা নিয়েই ফিরে গেছে। একা ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুভা। আজ মনে হয় এখানের বাস তার ফুরিয়ে যাবে এইবার।

চাকরী করার দুঃখ একজনকে মিথ্যা ভালবাসার অভিনয় করে তাকে বাঁচতে হবে না।

হঠাৎ অচিন্ত্যকে ঢুকতে দেখে ফিরে চাইল শুভা।

মুখের সেই কমনীয়তা মিলিয়ে যায়। কঠিন হয়ে ওঠে শুভা।

অচিন্ত্য বলে ওঠে।

—এই ভালো শুভা। তুমি ওখানেই যাও। এখনও সময় আছে। নতুন করে বাঁচতে পারবে।

শুভা ওর দিকে চাইল। যেন একটা মানুষের ধ্বংসস্তূপ। একদিন ও চেয়েছিল সব পেতে—অর্জন করবে, নিজের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সে-সব আজ হারিয়ে গেছে।

অচিন্ত্য বলে—কাল থেকে আমিও বেকার। চাকরী আমার নেই। অভাব-কষ্ট-দুঃখ এ-সবের মাঝে নাই বা রইলে।

শুভা আর্তনাদ করে ওঠে। সব চিন্তা তার পলকে হারিয়ে গেছে। এগিয়ে আসে—কি বললে?

হাসে অচিন্ত্য—চাকরী আর নেই। প্রিন্সিপ্যাল মশায় রেজিগনেশন দিতে বলেছেন।

—শুভা ওই আশাহত লোকটির দিকে চেয়ে থাকে।

মনে হয় আজ সে ভেঙে পড়েছে, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

কি অপরিসীম বেদনায় তার মন কাঁদে। মনে হয় এমনি একটি মানুষকে সে আবার নতুন করে গড়তে পারবে—এ ক্ষমতা তার আছে।

মানস!

ওসব কথা ভাববে না শুভা।

অচিন্ত্য ওর দিকে চাইল অবাক হয়ে। শুভা বলে চলেছে।

—একটা চাকরী নিচ্ছি, তুমিও আবার কাজ দেখে নাও।

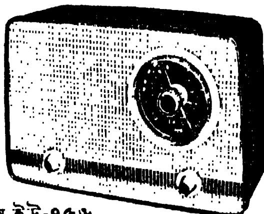
আবার চেষ্টা করলে আমরা নতুন করে বাঁচবো, নিশ্চয় বাঁচবো। অচিন্ত্য ওর দিকে এগিয়ে আসে। রাতের আঁধারে কোথায় চাঁদ উঠেছে। পাখিডাকা একটি পরিবেশ। অচিন্ত্য আজ নতুন করে শুভাকে চিনছে।

এতবড় কঠিন পৃথিবীতে তাই বোধ হয় মানুষ এখনও বেঁচে আছে এত দুঃখের মধ্যেও। মানুষের মনের একটা সুর এখনও হারিয়ে যায় নি।

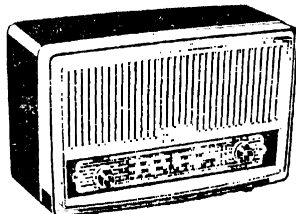
অচিন্ত্যও বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

কেউ পছন্দ করেন ট্র্যানজিস্টর, কেউ বা বিদ্যুৎচালিত—**ন্যাশনাল-একো** 'মনসুনাইজ্‌ড্‌' রেডিও আপনার যেটা পছন্দ হয় কিনুন—কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কেননা এ তো জানা কথাই যে বাজারের সেরা জিনিস আপনি কিনছেন।

ট্র্যানজিস্টর আর বিদ্যুৎচালিত যা-ই হোক—**ন্যাশনাল-একো** 'মনসুনাইজ্‌ড্‌' রেডিওর যন্ত্রাংশ বিশেষভাবে গ্রীষ্মমণ্ডলের উপযোগী ক'রে বানানো হয় ব'লে আবহাওয়া প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সাধারণ রেডিওর চেয়ে ১৬ গুণ বেশী।



মডেল ইউ-৭৫৬
শর্ট ও মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ড। নিখুঁত আওয়াজের জন্য ৫" ইঞ্চি স্পীকার, আধুনিক গড়নের প্ল্যাস্টিক ক্যাবিনেট। এসি/ডিসি। **দাম ঃ ১২৫৲ টাকা**



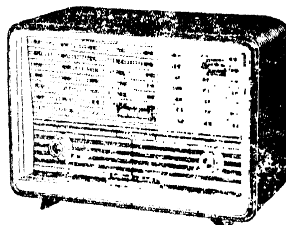
মডেল ইউ-৮১৯
৫ ভ্যালভ, ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, বেকেলাইটের ক্যাবিনেট। এসি/ডিসি। **দাম ঃ ২৯৮৲ টাকা**

একমাত্র ন্যাশনাল একো রেডিওই মনসুনাইজ্‌ড্‌

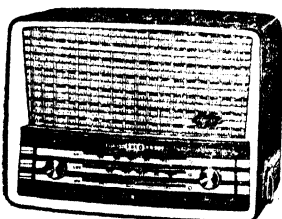
জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ লিমিটেড

- ৮ নিউ কুইন্স রোড, বোম্বাই ৪
- ৩ ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩
- ১/১৮ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ২
- ২৭ নেতাজী মার্গ, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী ৬
- ৮০৯২/১-২ রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দ্রাবাদ ৩
- ফ্রেজার রোড, পাটনা ১
- ৩৬/৭৯ সিলভার জুবিলি পার্ক রোড, বাঙ্গালোর সিটি ২

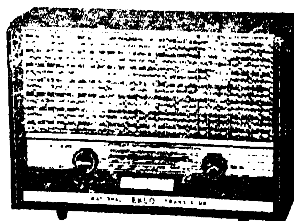
সব মূল্যই উৎপাদন শুল্ক সমেত; অন্যান্য কর আলাদা



মডেল এ-৮২৯ ৬ ভালভ, ৪ ব্যাণ্ড। পার্মানেন্ট ম্যাগনেট স্পীকার। বাস, ট্রেবল ও মিডিয়ামের জন্য ৩টি পুশ বাটন টোন কন্ট্রোল; ব্যাণ্ড বদলাবার পিয়ানো কী, এসি। বেকেলাইট ক্যাবিনেট। **দাম ঃ ৪৮১৲ টাকা**



মডেল বিটি-৭৯২ টেবিল মডেল
৭+২ ট্র্যানজিস্টর ও ডায়োড; ৩ ব্যাণ্ড। ছাঁচে ঢালা ক্যাবিনেট। **দাম ঃ ৩৬৫৲ টাকা**



মডেল বিটি-৭৫৭ টেবিল মডেল
৭+২ ট্র্যানজিস্টর ও ডায়োড; ৪ ব্যাণ্ড। ঝকঝকে ক্যাবিনেট। **দাম ঃ ৪১৫৲ টাকা**

ভারতের বৃহত্তম রেডিও কারখানায় তৈরি

JWT/GRA 3271

শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী

(পূর্বানুবৃত্তি)

চারুলতা রায়চৌধুরী

আজকের মত তখনকার দিনে কথায় কথায় এরোপ্লেনে যাতায়াতের প্রচলন ছিল না। মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে কলকাতা আসা মানেই আড়াই দিনের ধাক্কা। মাদ্রাজে থাকার সময় সারা বছরে দেবীপ্রসাদ দীর্ঘ অবকাশ পেতেন দু'বার। একবার গ্রীষ্মে পুরো ৬'মাসের। আর একবার বড়দিনের। গোড়ায় গোড়ায় ছুটির মুহূর্ত যত ঘনিয়ে আসত আমাদের প্রবাসী মন তত গৃহব্যাকুল হয়ে উঠত। এই সময়ে প্রতিমুহূর্তে আমরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতাম কলকাতা-অভিমুখে যাবার দিনটি। এই সময়গুলি অতিবাহিত হ'ত এক-একটি দারুণ উত্তেজনার মধ্যে। নির্ধারিত সময়ের বহুপূর্বে স্টেশনে হাজির হয়ে থেকেন দেবীপ্রসাদ। সময় সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করলে তিনি বলতেন—বিলম্বে যাওয়ার চেয়ে আগে যাওয়া অনেক ভাল। দেশে যাওয়ার সেই পরম প্রতীক্ষিত দিনটি অবশেষে যখন এসে পড়ত তখন সবচেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন দেবীপ্রসাদ। সে এক অকল্পনীয় উত্তেজনা, সে এক অভাবনীয় চাঞ্চল্য, সে এক অচিন্তনীয় শিহরণ। ভাষায় যার বিবরণ দান সাধ্যাতীত। এক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে এক শিশুসুলভ উল্লাস আমিও সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করতাম।

মাদ্রাজ থেকে প্রথম যেবার আমরা কলকাতা যাত্রা করলাম আমার ছেলের বয়স তখন ন' মাস। তখন ডিসেম্বর মাস। শিল্পীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম ট্রেনভ্রমণ। সে-বারের ভ্রমণ খুব একটা ঘটনাবহুল ছিল না। কামরাময় তিনি যে সিগারেটের ভস্মাবশেষ আর দগ্ধ দেশলাইয়ের কাঠি ছড়িয়েছিলেন, বলা বাহুল্য তা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে খুব আরামদায়ক হয় নি।

তারপর যখন বাঙ্গলার সীমান্তে পৌঁছলাম তখন সে কি দুর্বার আনন্দ, সে আনন্দ তখন বাঁধনহারা। ট্রেন থেকে দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গলার গ্রামগুলির অপূর্ব শোভা, প্রকৃতির অফুরন্ত দান তার রূপকে করে তুলেছে অপরূপ, তার 'অবারিত-মাঠ-গগন-ললাট' রূপ যে-কোন রসপিপাসু চিত্তে এনে দেয় এক অভিনব অনুভূতি। সরু সরু মেঠো পথ, সরল, নিষ্পাপ গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের ভিড়, সারি সারি গাছ, চাষী চাষ করছে, মেয়েরা পুকুরপাড়ে জলপাত্র পূর্ণ করে ঘরে ফিরছে—এইসব দৃশ্যগুলিই তো এক একটি জীবন্ত ছবি। সমস্ত মন প্রাণের গভীর হতে তখন শুধু একটি ধ্বনিই তরঙ্গিত হয়—'এই বাঙ্গলা দেশ'—এই আবেগের মধ্যে শুধু যে সৌন্দর্যপ্রীতিই বিদ্যমান তা নয়, নাড়ীর সংযোগ ও রক্তের টান থেকেও এ আবেগ, এই উচ্ছ্বাসের জন্ম। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতেই তারপর যখন বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল আমার স্বামী পুলকিত হয়ে বলে উঠলেন—দেখ, বাঙ্গলায় এসে গেছি, ওরা বাঙ্গালী, বাঙলায় কথা বলছে। আমার আনন্দও যে কম হচ্ছিল তা নয় তবে বহিঃপ্রকাশ অতখানি আমার ছিল না। স্পষ্ট শুনতে পেতাম, মনে মনে আমার 'আমি'ও বলছে 'এই আমার দেশ, আমার প্রিয়ভূমি।'

তারপর কতবার আসা-যাওয়া করেছি তার সীমাসংখ্যা নেই, দীর্ঘকালের মেয়াদে মাদ্রাজে বাস করায় তার জলে, তার মাটিতে, তার বাতাসের সঙ্গেও আমাদের প্রবাসী সঙ্গ একীভূত হয়ে গেছে। এই জলে হাওয়ায় মাটিতে সেও আমাদের ধীরে ধীরে তার আপন জনে পরিণত করেছে কিন্তু মাদ্রাজ থেকে সেই প্রথম কলকাতায় ফেরার স্মৃতিটি আমার মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরকালের দাবী নিয়ে।

বন্ধু এসে দেবীপ্রসাদকে অযাচিতভাবে জানালেন যে তাঁর কোন কাজে তিনি লাগতে চান। একটি তৃপ্তির হাসির ঝিলিক খেলে গেল শিল্পীর মুখে। একটা সমস্যার যেন সমাধান হয়ে গেল। আমরা সেবার কলকাতা থেকে মাদ্রাজ ফিরব। একটি চারটি আসনযুক্ত কামরা প্রয়োজন। সেই রিজার্ভ করার ভার সানন্দে বন্ধুকে দিলেন দেবীপ্রসাদ। তারপর স্টেশন পৌঁছন পর্যন্ত স্বাভাবিকতার কোন ব্যতিক্রম নেই। স্টেশনে পৌঁছেই মিলিয়ে গেল শিল্পীর মুখের হাসি। কোথা থেকে কে যেন এসে পলকের মধ্যে চুরি করে নিয়ে গেল তাঁর যা কিছু স্বস্তি, যাবং আরাম। দেখা গেল একটি আট আসনযুক্ত কামরার চারটি আসন বন্ধুটি আমাদের জন্য রিজার্ভ করেছেন।

দেবীপ্রসাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই হল যে তিনি যা চাইবেন তা তিনি নেবেনই সে ছলে-বলে-কৌশলে—যেন তেন প্রকারেণ। তিনি বাকী চারটি আসনের মূল্য ধরে দিয়ে পুরো কামরাটিকেই নিজস্ব করে নিতে চাইলেন। অনেক ব্যবস্থার পর কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেন যে ওয়াল্টেয়ার পর্যন্ত আমাদের কামরায় কেউ উঠবে না। তাতেও সন্তুষ্ট হবার পাত্র দেবীপ্রসাদ নন। তিনি বলেন—ওয়াল্টেয়ারের পর—তখন কি হবে? প্রতি স্টেশনে এই নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেন। ওয়াল্টেয়ারে খবর এল যে পাশের একটি প্রথম শ্রেণীর কূপে খালি হয়েছে—আমরা ইচ্ছে করলে সেটি অধিকার করতে পারি—সময় অত্যন্ত কম। জিনিসপত্র সবই প্রায় ছড়ানো কোনরকমে যথাশীঘ্র গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে এমনি সময় একজন কুলী কতকগুলো মন্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করছিল তার অশোভন মনোভাব। কিন্তু তার মন্তব্য বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধ হল শিল্পীর কুশলী হাতের মুষ্ট্যাঘাতে।

এই রিজার্ভেশান নিয়ে আরও একবার প্রতিকূল

পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। একজন অসুস্থ শয্যাশায়ী যাত্রীর অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমাদের রিজার্ভেশান বাতিল হয়। কর্তৃপক্ষ জানালেন পুরো কামরা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে বিভিন্ন বগীতে তাঁরা আসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। শিল্পীতো এ প্রস্তাব কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। সেই ট্রেনেই চার-আসনযুক্ত একটি কামরার একটি আসন খালি ছিল। শিল্পী নিজে সেই আসনটি নিতে চাইলেন আর স্ত্রী-পুত্র ও পরিচারিকার জন্যে একটি কূপে চাইলেন। এদিকে কূপেটি একটি উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্মচারীর অধিকারে চলে গেছে। তাঁকে অন্যত্র আসন দেবার কথা ছিল কিন্তু তিনি ন যযৌ ন তস্থৌ—তাঁর ইচ্ছা তিনি একলা ভ্রমণ করেন, কে অসুবিধেয় পড়ল, কার কিসে সুবিধা হয়—সে-সব বিষয়ে মাথা ঘামাবার বিন্দুমাত্র বাসনাও নেই। তারপর তখনকার যুগচিত্র মনে করুন। রাজার পরেই বলতে গেলে সাহেবদের স্থান। আবার তার ওপর তিনি বা তাঁরা যদি সামরিক বিভাগের কেউ হন তা হলে তো কথাই নেই। নানা আবেদন ব্যর্থ হল তাঁর কাছে। আমার স্বামীও যথেষ্ট ভদ্রভাবে তাঁকে অনুরোধ করলেন, অনুরোধ রক্ষা তো দূরের কথা ভারতীয় নারীদের প্রতি তিনি এমন অবমাননকর অশোভন উক্তি করে বসলেন—যা মুহূর্তে দেবীপ্রসাদের আচরণে এনে দিল পরিবর্তন। সোজা বলপ্রয়োগে তিনি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, সম্মান ও সম্ভ্রম কেবল একটি নির্দিষ্ট জাতিরই একচেটিয়া নয়, পরাধীন হলেও ভারতবাসীরও আছে তাতে সমান অধিকার! বলা বাহুল্য, তাঁর বলপ্রয়োগ ব্যর্থ হয় নি। যে সময়ের কথা বলছি, পৃথিবীর বুকে তখন এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে। ইতিহাসের পাতায় ও মানুষের মনে সেই যুদ্ধ আজ বেঁচে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাম নিয়ে।

সেই সময়ে রেল-কর্তৃপক্ষও তাঁদের ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বদলালেন, যাত্রীদের কামরায় খাবার সরবরাহ বন্ধ হল। যাত্রীরা ইচ্ছে করলে পথিমধ্যে কোন স্টেশনের খাদ্যাগারে গিয়ে খেয়ে আসতে পারেন, কিন্তু দেবীপ্রসাদের যে তাতে অসুবিধা, অতএব এর ব্যতিক্রম অন্তত তাঁর বেলায় ঘটাতেই হবে। আর হ্যাঁ, আপনারা যা ভাবছেন তাই ঘটালেনও।

সামগ্রিকভাবে দেবীপ্রসাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি এক বিচিত্র মানুষ। এক অভিনব বৈচিত্র্য পরিপূর্ণরূপে আবৃত করে আছে তাঁকে। কোন মানুষকে অসহায় দেখলেই তাঁর মন কেঁদে ওঠে তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অন্তর তাঁর হয়ে ওঠে ব্যাকুল। এই মনোভাব সম্ভবত তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। তাঁর মহানুভবতার সুযোগ নিয়েছে বহু স্বার্থ-সন্ধানী ব্যক্তি। একবার এক অকৃতজ্ঞ গ্রহীতা শিল্পীকে এ ব্যাপারে রূঢ় আঘাত হানলেন। শিল্পীর অনুভূতি-প্রবণ সে আঘাত যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। সেই থেকে তাঁর মনকে তিনি কঠোরতার মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, কিন্তু হৃদয়ের সহজাত প্রবৃত্ত থেকে মুক্ত পাবেন কি করে? তবে এই উদারতা তাঁর মনকে দুর্বল করে নি কোথাও, কোথাও বিপরীত কিছু দেখলেই সেখানে তিনি সিংহবিক্রম। যেখানে তিনি দেখেছেন তাঁর মর্যাদায় ঘা পড়ছে, তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ করে সেইখানেই তন্মুহূর্তে তিনি তার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

তাঁর মধ্যে আর একটি বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। সংলাপে তিনি পুরোপুরি অভিজাত। 'রক্তের নীলাভা' সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। বনেদীয়ানার যোগ্য ধারক ও বাহক। অথচ কর্মে কোথায় সেই মনোভাব? সেখানে তিনি অসহায়, লাঞ্ছিত, সর্বহারা মানুষের মাঝখানে যেন নিজের আসনটি করে নিয়েছেন। প্রাসাদচূড়া থেকে যেন নেমে এসেছেন সাধারণের মাঝখানে। রাজবেশের পরিবর্তে দেহ যেন আচ্ছাদিত চীরবাসে—পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের পরিবর্তে এ যেন শাকান্ন গ্রহণ। তাঁর 'ট্রায়াম্ফ অফ লেবার,' 'ভিক্টিমস অফ হাঙ্গার,' 'রিস্ক পুলার,' 'ডাস্টবিন' প্রভৃতি কীর্তিগুলিই এই উপমাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবুও রক্ত ও ঐতিহ্যে তিনি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী, শ্রেণী সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন।

তিনি বিশ্বাস করেন অভিজাত বংশের সন্তানরা তাদের মহানুভবতা প্রমুখাৎ মহৎবৃত্তিগুলি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে আসে; তাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বৃত্তিগুলিও বিকশিত হয়ে তাদের চরিত্রকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেয়। পরিবেশের প্রতিকূলতায় মনোবাসনা সে পূর্ণ করতে যদি না পারে তা হলে সে মরমে মরে যাবে। এইখানেই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের বীজ। কিন্তু অন্যেরা এ বিষয়ে হিসাবের আশ্রয়টাই একটু নিয়ে থাকেন বেশি। দেবীপ্রসাদ বাস করেন মানুষেরই মধ্যে সমাজেই, কিন্তু মনের দিক দিয়ে তিনি আদিম। অরণ্যের সৌন্দর্য, গভীর অন্ধকার তাঁকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে। সভ্যতার আলোকবর্জিত লোকেই পাড়ি জমাতে তিনি আনন্দ পান। সে সুযোগ কদাচিৎ কখনো এসে থাকে। যখন মন তাঁর সেদিকে ব্যাকুল হয়, পথরোধ করে এসে দাঁড়ায় সামাজিক কর্তব্যসমূহ।

দেবীপ্রসাদ শিকারী হিসাবেও কম প্রসিদ্ধির অধিকারী নন। তাঁর মাতুলালয় তাজহাটের রাজবাড়ির অস্ত্রাগার তাঁর মনে এক অভিনব ভাবাবেগ জাগিয়ে তুলত। তাঁর

মামা তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায়ের দলে একবার শিকার যাত্রা করে একটি নেকড়ে মারেন। শিকার বরাবরই তাঁর কাছে এক বিরাট আকর্ষণ তাঁর চরিত্রের এই দিকটি বিয়ের পর বহুকাল আমার অজানা ছিল, আমাদের ছেলে যখন বড় হতে লাগল তখন তার হাতে এয়ারগান শোভা পেতে থাকে পাখী মারার জন্যে। সে তার বাবাকে বারবার বনভোজনের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। এর উদ্দেশ্য, খোলা জায়গায় তার আয়ুধের সে যথেচ্ছ সদ্ব্যবহার করতে পারে। এমনিতে বনভোজন আমার স্বামীর মনে কখনো সাড়া জাগায় না। বাড়িতেই যেখানে অনেক আরাম করে খাওয়া যায় সেইখানেই অত কষ্ট করে খাদ্যগ্রহণ করার পিছনে কোন সার্থকতা নেই—এই ছিল তাঁর যুক্তি। তবে অরণ্যে শিকারের প্রলোভনটাও সেই সময় তাঁর চিন্তা অধিকার করে বসল। অতএব বনভোজনের নয় শিকারের আকর্ষণেই যাওয়া ঠিক করলেন। এরই মধ্যে একটি দোনলা বন্দুক, একটি রাইফেল তাঁর কেনা হয়ে গেছে ও প্রয়োজনীয় লাইসেন্সও সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে শিকারের এক অদম্য স্পৃহা আমার স্বামীর মনপ্রাণ অধিকার করে বসল। কিছুকালের জন্য যা অতীত ছিল তা আবার বর্তমানের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল। শিকারের নাম শুনলেই, তার সম্ভাবনা দেখলেই এক অভিনব উল্লাসে মেতে ওঠেন শিল্পী। এক অনির্বচনীয়তায় তখন ভরে যায় তাঁর মন পূর্ণ হয় তাঁর প্রমাণ। যে এসে যা খুশি সন্ধান দেয় বিনা বিচারে শিল্পী বেরিয়ে পড়েন সেই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে, কিন্তু সফল হন কি, সিদ্ধ হয় কি উদ্দেশ্য, এই অরণ্য-অভিসার হয় কি ফলপ্রসূ ?

সফলতা এসেছে, তবে প্রথমেই নয়, প্রথম আহ্বানে সে নিজেকে ধরা দেয় নি সে দেখেছে পরখ করে যিনি তাকে ডাকছেন তাঁর সেই ডাকের মধ্যে অন্তরের যোগ কতটুকু। কতখানি আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় তাঁর মূলধন, পরীক্ষার কষ্টিপাথরে সেগুলি যাচাই হওয়ার পর তবে সে শিকারী শিল্পীর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি আমার ছেলে ও লোকজন নিয়ে রেনিগুণ্টায় ছিলাম, এটি একটি রেলকলোনী, মাদ্রাজ থেকে এর দূরত্ব একশ' মাইল, আমার কাছে তা কারাবাসেরই নামান্তরমাত্র। কথা বলার কোন সঙ্গী নেই। কোথাও যাবার কোন জায়গা নেই, তারই মধ্যে বিকেলের দিকে একটু যা বেড়াতুম কিন্তু সারাদিনের নিঃসঙ্গতা বেদনার তুলনায় এ বেড়ানোটুকু কিছুই নয়। অথচ মনে তখন পাহাড় প্রমাণ উদ্বেগ। সে-হেন পরিবেশে হঠাৎ এক রাত্রে শিল্পী এলেন অঙ্গে গুরুতর আঘাত নিয়ে—দুর্ঘটনা এই আঘাতের উৎস। সেইখান থেকেই তিনি খবর পেলেন দশ মাইল দূরে একটি শিকার ক্ষেত্র আসে। বাস, আর যায় কোথায়। অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে শিল্পী বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু প্রচেষ্টা ব্যর্থতাই বরণ করল।

কিন্তু সকল দিক দিয়ে দেখতে গেলে বা ভিন্ন কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে এ ব্যর্থতা—'ব্যর্থতা' নয়, এই আঘাত ব্যর্থতাগুলিই শিল্পীর মনকে আরও অধিকমাত্রায় শিকার সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলল। একটা প্রতিজ্ঞা তাঁর সংগ্রামশীল মনে দানা বেঁধে বসল—'শিকারে সফল হতেই হবে' তা ছাড়া এই অভিযানগুলির জন্যেই বাঙলা দেশ পেয়েছে একাধিক সারগর্ভ, তথ্যপূর্ণ, সুরচিত শিকার-কাহিনী—যাদের গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য রসিকমহলে যথোচিত মর্যাদাসহ স্বীকৃত।

অরণ্যের গভীরতা তাঁর মনকে যেভাবে আকর্ষণ করে তা এক কথায় অবর্জনীয়। তাঁর কাছে অরণ্যের এক আবেদন এক কথায় অনতিক্রম্য, মঙ্গলতায় বিচিত্র পরিবেশ বিচিত্র সম্ভার নিয়ে যেভাবে তাঁর উদ্দেশে হাতছানি দেয় তার কাছে অন্যান্য সবকিছুই তখন ভেসে বেড়িয়ে যায়, সেই হাতছানির ডাকে সাড়া দেন শিল্পী তাঁর সমগ্র অন্তরের অনুভূতি নিয়ে। যে-কোন বাধা, যে-কোন প্রতিকূল পরিবেশ কোন কিছুই তাঁকে আটকে রাখতে পারে না। এর মূলে তাঁর সংগ্রামশীল ও রোমাঞ্চপ্রিয় মনের ছাপই সর্বাধিক লক্ষণীয়। যা কখনও তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না, যা চিরকাল তাঁকে গতির মন্ত্রে, বেগের মন্ত্রে, চাঞ্চল্যের মন্ত্রে, সজীবতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে এসেছে, তাদের মন্ত্রে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

একবারের ঘটনা বলি। শিকারে তিনি বেরোবেন—ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করলুম গা তাঁর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, দেহের তাপমাত্রার নিদারুণ আধিক্য। জ্বর এসেছে অনেক আগেই কিম্বা পাছে আমি জ্বরের জন্যে তাঁকে যেতে না দিই সেইজন্যে আমার কাছেও তিনি সে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু জানতে যখন পারলুম, তখনই বা তাঁকে আমি যেতে দিই কি করে, কিন্তু থাকতে বললেই কি তিনি থাকবার পাত্র, অথচ আমার পক্ষেও তখন তাঁকে যেতে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। শেষে তাঁকে উদ্ধার করল আমাদের ছেলে। তার তখন দশ বছর বয়স। সে বলল—'মা, বাবাকে যেতে দাও, কারণ তুমি যেতে না দিলেই সেই চিন্তাতেই বাবার জ্বর আরও বেড়ে যাবে।'

উড়িষ্যার অন্তর্গত জয়পুরে (রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ জয়পুর নয়) জঙ্গল একবার নির্বাচিত হল তাঁর শিকার-ক্ষেত্র হিসাবে তাঁর চিকিৎসক ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধক কিছু ঔষধপত্র তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং সে বিষয়ে নানা প্রকার নির্দেশাদি দিলেন। ওষুধ তো গেল, কিন্তু অরণ্যের সেই সীমাহীন শোভা। অরণ্যজীবনের সেই অভিনব বৈচিত্র্য, পুলক, রোমাঞ্চ, শিহরণের—যেখানে

সমারোহ তার মোহে তিনি তখন মুগ্ধ, ওষুধ কে খায়? নির্দেশ কে পালন করে? ফলও যা হবার তাই হল। তবু ভাবলুম, হয়তো এতে তাঁর নিজের মনেও শরীর সম্বন্ধে সাবধান হবার একটা চেষ্টা দেখা দেবে। কিন্তু আমার ভাবাটাই ভুল, কারণ দেবীপ্রসাদ অন্যান্যের তুলনায় এক পৃথক ধাতুতে গড়া।

এই অনতিক্রম্য আকর্ষণের কাছে রোগ, ক্লান্তি কিছুই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সহস্র পারিপার্শ্বিক বাধা তৃণবৎ ভেসে বেরিয়ে গেছে। এমন মুহূর্তও এসেছে যেখানে শিল্পীর জীবন বিপন্ন, প্রতি পদক্ষেপে যেখানে নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনা, হিংস্র, ভয়ঙ্কর জীবের দংশনের আশঙ্কা—শিল্পীর মনও সেখানেও সম্পূর্ণ বেপরোয়া। নিরুদ্বিগ্ন, লক্ষ্যাস্থির।

মাদ্রাজে আমাদের ওখানে অতিথি সমাগম লেগেই থাকত। তার বিরাম ঘটত কদাচিৎ। মাদ্রাজের শিল্প মহাবিদ্যালয়টি একটি অবশ্য দর্শনীয় স্থান বলে চিহ্নিত হওয়ায় অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ আমাদের নিত্য ঘটত। আসতেন নানাজন, শিল্পজগতের এবং তার বাইরের জগতের অনেকেই আসতেন স্রষ্টা দেবীপ্রসাদকে তাঁরা দেখেছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। মানুষ দেবীপ্রসাদকে দেখার এক দুরন্ত বাসনা তাঁদের টেনে আনত আমাদের ওখানে, যেখানে দেবীপ্রসাদকে তাঁরা দেখতে পেতেন তাঁর কারখানায়। (তাঁর স্টুডিওকে আমি এখানে কারখানাই বলছি।)

ভারডিক্ট অন ইণ্ডিয়ার লেখক মিঃ ওয়েভার্লি নিকলস একদিন বিনা বিজ্ঞপ্তিতেই এসে হাজির হলেন। হয়তো তাঁর ধারণা ছিল যে, অতর্কিতে আগমনে তিনি সংশ্লিষ্ট মানুষ ও পরিবেশের আসল রূপটি দেখতে পাবেন এবং সেই রূপই তিনি তুলে ধরবেন পশ্চিমের পাঠকসমাজে। এর কিছুকাল পর আমরা আমাদের এক বন্ধুর কাছে জানলাম যে, নিকলস তাঁর গ্রন্থের একটি পাতা ভরিয়েছেন দেবীপ্রসাদকে কেন্দ্র করে আর তার মধ্যে বিশেষত্ব এই—যে কারণে দেবীপ্রসাদ সাধারণ্যে খ্যাত সেদিকগুলি সামান্য ছুঁয়ে গেছেন লেখক। মানুষ দেবীপ্রসাদ এবং সংলাপী দেবীপ্রসাদই তাঁর আলোচ্য। দেবীপ্রসাদ তাঁর ধারণায় একজন উঁচদরের কথোপকথনকার।

প্রায়শই আমাদের ওখানে আসতেন ভারতের বিখ্যাত কবি হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর স্বনামধন্য অনুজ) অনেক বিষয়েই শিল্পীর সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য দেখা গেছে। কিন্তু এই মতান্তর তাঁদের মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও মনান্তরের সৃষ্টি করে নি, তার উপর একটি বিষয় দু'জনকে দু'টি বিভিন্ন ধারা থেকে একটি বিন্দুতে মিলিত করেছে,—সেটি সঙ্গীত। হরীন্দ্রনাথ শুধু কবি হিসাবেই নয়, সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও যে যথেষ্ট খ্যাতিমান ওয়াকিবহাল মহলে সে বিষয়ে কারোরই কোন অস্পষ্টতা নেই। যখনই তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন, সমগ্র গৃহকোণ তখন ভরে উঠত সুরের উদাত্ত ঝঙ্কারে। আমার স্বামী বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে সঙ্গীতের শিক্ষা নেন নি বলে সাধারণে গাইতে চান না, কিন্তু উপযুক্ত এবং সমঝদার শ্রোতা পেলে তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার উৎস খুলে যেত। সে পরিবেশ ভোলবার নয়, সুরের সাধনায় শিল্পীরা আত্মহারা। বাইরের পৃথিবী তখন তাঁদের মন থেকে সরে গেছে, পারিপার্শ্বিক জগৎ একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে 'সাবাস' 'বহুত আচ্ছা', 'চলো ভাই' প্রভৃতি উৎসাহ ও প্রশংসাসূচক বাক্যগুলি পরিপার্শ্বকে মুখরিত করে তুলেছে। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দ সকলকে যথারীতি জানিয়ে যাচ্ছে যে সময় এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কে ভ্রূক্ষেপ করে তার দিকে?

সঙ্গীত ছাড়া অন্য বিষয়ে মনের গরমিল তাঁর শুধু হরীন্দ্রনাথের সঙ্গেই ঘটে নি। ঘটেছে দিলীপকুমারের সঙ্গেও। দিলীপকুমার রায়ও কখনো কখনো আসতেন আমাদের কাছে। দেবীপ্রসাদ শক্তির উপাসক আর জীবন সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। দিলীপকুমার সাধারণত উপাসনামূলক ভজনাদি গেয়ে থাকেন, আর দেবীপ্রসাদ ঠুংরী ধারার গায়ক।

মহীশূরের নান্দী পাহাড় থেকে সাধু ওঙ্কারও এসেছেন আমাদের বাঙলোয়। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে একদা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে যাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে ধৃত হন, ফলে কারাবাসের মেয়াদ আরও বেড়ে যায়। জেলে দীর্ঘকাল তাঁর কেটেছে, লৌহকারার অভ্যন্তরেই তাঁর জীবনের ভাবধারা বদলে যায়, পথ-পরিবর্তনের তাগিদ মনে মনে অনুভব করেন। তারই পরিণতি তাঁর এই সন্ন্যাসজীবন। তাঁর জীবনের কত বিচিত্র কাহিনী যে-কোন শ্রোতার কাছে এক অমূল্য আকর্ষণ। আমাদের কাছে এলেই আমরা দার্শনিক প্রসঙ্গের অবতারণা করতাম। কখনো কখনো দেবীপ্রসাদের মতগুলির সঙ্গে নিজের মত মেলানো তাঁরও পক্ষে মুস্কিল হত বৈকি।

একজন শিল্পীর সঙ্গে জীবনযাত্রায় অসুবিধায় পড়তে হয়েছে অনেক, তেমনই পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে, এদিক দিয়ে আমি নানাভাবে লাভবতীই হয়েছি। বিভিন্ন কৃতবিদ্য পুরুষের আগমন এবং বিশেষত শিল্পীর সঙ্গে তাঁদের কথোপকথন, সারগর্ভ আলোচনা, ভাবধারার বিনিময় প্রত্যক্ষ করার যে অমূল্য সুযোগ আমি পেয়েছি তার গুরুত্বও তো কম নয়।

[ক্রমশ।

অনুবাদক : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়



সংস্কৃতির সংজ্ঞা

আজকাল সংস্কৃতি কথাটা শোনা যায় যত্রতত্র। সংস্কৃতিবান বা কৃষ্টিপরায়ণ হওয়ার তাগিদটা যেন সভ্য শিক্ষিত মানুষকে ব্যাধির মতনই পেয়ে বসেছে; তাই কর্মক্লান্ত গৃহকর্তাকে সমস্ত দিনের ক্লান্তির শেষে ছুটতে হয় চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে, ছুটতে হয় সংগীত সম্মেলনে যেতে হয় অভিনয়ের আসরে, সাহিত্য-সভায়। প্রশ্ন এই যে, এসব কি সত্যই আমরা অন্তরের তাগিদে করে থাকি?

সংস্কৃতি শব্দটি সত্যই সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য? জানি একথা বলার বিপদ আছে, কালচার বা সংস্কৃতিকে হাটের মধ্যে টেনে আনার স্বপক্ষে যুক্তিও বহুবিধ, এর ধ্বজাধারীরা সদম্ভে ঘোষণা করবেন, ভাল জিনিস কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জনসাধারণের রুচির মান উন্নয়ন করতে সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হওয়া সমুচিত, না হলে আজ সেক্সপীয়রকেই বা কে চিনত, গর্গ্যা, ভ্যানগগ, পিকাসো—এ নামগুলির সঙ্গেই বা পরিচয় ঘটত কি করে বিশ্বজনের? তবু সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়, সত্যই কি আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা একান্ত মনেই সংস্কৃতিবান?

থিয়েটার-সিনেমা প্রভৃতির উচ্চাঙ্গ উন্নাসিকতাকে আমরা কি সত্যই ভালবাসি, না আর পাঁচজনের কাছে খাটো হওয়ার ভয়েই ভালবাসার ভাণ করে থাকি?

আমার তো মনে হয় হুজুক—স্রেফ হুজুকের মোহেই আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির সন্ধানে ফিরি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর আজকাল গম গম করে মানুষের ভিড়ে, যাদের মধ্যে পনেরো আনাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তো চুলোয় যাক, সঙ্গীত সম্বন্ধেই উৎসাহী নয়, আর পাঁচজনের দেখাদেখি নিজেদের বিশ্রাম অবসরকে খণ্ডিত করে, গান শুনতে এসে প্রতিমুহূর্তে ক্লান্তিতে অবসাদে পূর্ণ হয়ে উঠে, আত্মগ্লানিতে সারা হয়; তবু আসা চাই কারণ



● সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : স্টুডিও যাত্রার প্রাক্কালে



● শাম্মী কাপুর : স্যুটিংয়ের অবসরে

'বড়ে গোলাম আলির' গান, রবিশঙ্করের সেতার, আলি আকবরের সরোদ না শুনলে লোকে কি বলবে? একটা মুখ্যু চাষা ভাববে না কি? অতএব পা ভেরে এলেও বসে থাকতে হবে খুঁটি পুঁতে, নিদ্রালস চক্ষুকে বিস্ফারিত করে সোমের মাথায় বাহবাও দিতে হবে বৈকি।

নামকরা চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে যাওয়ার মূলেও সেই একই প্রেরণা, সংস্কৃতিবান হওয়া চাই, অতএব ভিড় জমাই দলে দলে আর্ট গ্যালারীতে কিম্ভূতকিমাকার মডার্ন আর্টের নিদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে যথোচিত বিমুগ্ধতার অভিনয় করি—চিত্র সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ অনুভব না করেই।

মেয়েদের মধ্যেই আবার এ প্রবণতা অধিকমাত্রায় বিকশিত, পুরুষেরা যদি বা একটু পিছিয়ে পড়েন, মেয়েরা নন, ফলে অনিচ্ছুক স্বামী দেবতাটিকে অঞ্চললগ্ন করে গৃহিণীরা সগর্বে কৃষ্টির স্বাদ গ্রহণ করে বেড়ান যত্রতত্র। ধরুন আমরা যখন কোন অভিনয়ের আসরে যাই, কি উদ্দেশ্য নিয়ে যাই? প্রকৃত অভিনয় সম্বন্ধে কি আমাদের কোন ধারণা আছে? ক'টা নাটক আমরা পড়েছি? অভিনেতাদের কৃতিত্ব, প্রযোজকের পরিশ্রম, নাটকের উৎকর্ষ সম্পর্কে কতটুকু বুঝি আমরা উঁচুমানের কোন নাট্যাভিনয় দেখতে দেখতে? বরং একথাই কি সত্য নয় যে, নাটকটি যেহেতু শতরজনী অতিক্রান্ত একটি সফল বা হিট নাটক, সেজন্যই সেটি দেখতে না গেলেই আমাদের চলে না?

সাংস্কৃতিক কোন উৎসবমণ্ডপে উপস্থিতিমাত্রই—অতএব সংস্কৃতিবান হওয়া চলে না একথা অনস্বীকার্য সত্য।

সংস্কৃতি গুলে খাওয়ার বস্তু নয়, প্রকৃত সংস্কৃতিবান যে-কোন শিল্পের অতল গহনে ডুবে যান, বাইরের নয় ভিতরের তাগিদই তখন তাঁকে চালনা করে।

সত্যম্, শিবম, সুন্দরমের প্রকৃত সংজ্ঞা যে শিল্পের মধ্যে উদ্ঘাটিত তার মধ্যে আনন্দ পাওয়াতেই নিহিত প্রকৃত সংস্কৃতিপরায়ণতা।

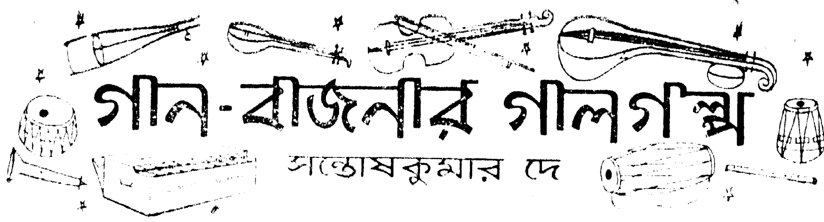
উচ্চশিক্ষার পালিশ বা আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সংস্কৃতির জগতে প্রবেশ লাভ করা যায় না, রসের জগৎ—রূপের জগতের ছাড়পত্র পাওয়া অত সহজ নয়, একমাত্র অনুভূতির গভীরতা দিয়েই শুধু একে মাপা যায়।

তাই শিল্পের প্রাণসত্তা শুধু আর্টগ্যালারী বা সঙ্গীত-সভায়ই বাসা বাঁধে না, জগৎজোড়া সৌন্দর্যের সভায় তার প্রকাশ, তা লুকিয়ে আছে শ্যামল অরণ্যানীর মাঝে, নির্ঝরিণীর তুষারশুভ্র জল-হিল্লোলে, উদার উন্মুক্ত তৃণ প্রান্তরে সোনা রং শস্যের কাঁপনে, ঘরের কোণে মায়ের স্নেহকোমল স্পর্শে, প্রিয়ার কালো চোখের ঈষৎ হাসির ঝলকানিতে, শৈশবের স্বর্গীয় আভাসে।

প্রকৃত সৌন্দর্যের সন্ধান যাতে মেলে তাই সত্যকার শিল্প ও সেই সৌন্দর্যে ডুব দিতে জানে যে মন, সেই মনই সত্যকার সংস্কৃতিপরায়ণ। —শ্রীমতী



● অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় 'জয়া' চিত্রের নায়ক নায়িকার ভূমিকায়



গান-বাজনার গালগল্প

সন্তোষকুমার দে

দুই

সুর ধরে রাখা

চিরচঞ্চল সুরপরীদের ধরে রাখার প্রশ্নে অনিবার্যভাবে টমাস আলভা এডিসনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এডিসন যে ফনোগ্রাফ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন এবং নিজেই তার নানা প্রকার ক্রমোন্নতি সাধন করেছিলেন, সে যন্ত্রে কিন্তু কেবল সুর ধরে রাখাই চলত না, সেই ধরাপড়া সুর নিজের ইচ্ছামত যতবার খুশি বাজিয়ে শোনাও যেত। অবশ্য সুর ধরে রাখবার সার্থকতাই সেখানে, যদি সে সুর আবার ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়। এডিসনের কৃতিত্বও এখানে।

এডিসনের আগে, এমন কি চার্লস্ ক্রসেরও আগে আরও অন্যলোকে সুর ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে লিও স্কট-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্কট একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন যাতে ভুষাকালীমাখা-কাগজ জড়ানো একটি ঘূর্ণিত জলের উপর শব্দতরঙ্গের সংঘাতে পরিচালিত একটি সূক্ষ্ম শলাকায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেখা অঙ্কিত হয়ে যেত। এইভাবে অদৃশ্য শব্দতরঙ্গের একটি দৃশ্যমান রূপ ধরা সম্ভব হয়েছিল। ঐ রেখা থেকে আবার সুর শোনা যেত না বটে, কিন্তু স্কটের এই পদ্ধতি পরবর্তী আবিষ্কারের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্কটের তৈরী যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ফনোঅটোগ্রাফ'।



● সুলতা চৌধুরী : ক্রিকেট মাঠে

এডিসন তাঁর যন্ত্রের যে নাম রেখেছিলেন, সেই 'ফনোগ্রাফ' শব্দটি কিন্তু তাঁর নিজের রচিত নয়। আমেরিকার ওয়রসেস্টর অঞ্চলের অধিবাসী এফ বি ফেনবি নামক এক ব্যক্তি 'ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ফনোগ্রাফ' নামক একটি যন্ত্রের পেটেণ্ট নিয়েছিলেন ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে। ফেনবি-র যন্ত্রটি বিশেষ কোনও কাজে লাগে নি, কিন্তু তাঁর আহৃত 'ফনোগ্রাফ' অর্থাৎ শব্দের লৈখিক রূপ-কল্পনা কেবল যে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে তাই নয় 'ফনোগ্রাফ' শব্দটি কালক্রমে একটি বহুবিস্তৃত যন্ত্রশিল্পের অভিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেকর্ডিং-এর এখন বিচিত্র উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু আজও এই সমগ্র শিল্পটিকে ফনোগ্রাফিক ইণ্ডাস্ট্রি (Phonographic Industry) বলা হয়। ফেনবি-র যন্ত্রটি লোকে ভুলে গেছে, এমন কি ফেনবি-র নামও ভুলে গেছে, কিন্তু তাঁর দেওয়া 'ফনোগ্রাফ' নামটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

এডিসনের সমসাময়িক এ বি লেনার নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ও ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-পত্র 'লা সিময় দ্য চার্জ'-এর ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ১০ই অক্টোবরের সংখ্যাখানিতে শব্দ লিখে রাখবার বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রস্তাবিত যন্ত্রটির নামও তিনি দিয়েছিলেন—'ফনোগ্রাফ'। তবে ফেনবির পূর্বে 'ফনোগ্রাফ' শব্দটি আর কেউ ব্যবহার করেছেন বলে এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। এডিসন তাঁর 'ফনোগ্রাফ' যন্ত্রের পেটেণ্ট পান ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮। তার পনের বছর পূর্বে ফেনবি তাঁর 'ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ফনোগ্রাফ' যন্ত্রের পেটেণ্ট পেয়েছিলেন।

এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্র ইউরোপে আসবার পর

ভারতবর্ষে আসে। স্বামী বিবেকানন্দের পুরাতন পত্রপাঠে জানা যায়, তিনি যখন শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে গিয়েছিলেন (১৮৯৩) তখন ফনোগ্রাফ যন্ত্র সেখান থেকে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্র এদেশে অনেকেই ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ করে স্মরণীয় হেমেন্দ্রমোহন বসুর নাম। কুন্তলীন কেশ-তৈলের খ্যাতনামা প্রস্তুতকারক এইচ বোস পারফিউমারই ছিলেন স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতির কণ্ঠ সিলিণ্ড্রিক্যাল রেকর্ডে ধরেছিলেন। এই স্মরণীয় ঘটনার ইতিহাস 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্রে ধরবার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী উৎসাহী পাঠক 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থেই পাবেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সুর ধরে রাখার কাহিনীই বলছি।

এডিসন তাঁর ফনোগ্রাফ যন্ত্রে প্রথমে পাতলা টিনের পাতের (Tin foil) গায়ে স্বরতরঙ্গতাড়িত সূক্ষ্ম শলাকায় যে রেখাঙ্কন আঁকতেন তা মূলত স্কটের 'ফনো-অটোগ্রাফ' যন্ত্রের অনুরূপ, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে এডিসনের ফনোগ্রাফে তেমন ব্যবস্থা ছিল যাতে তার ঘূর্ণায়মান সিলিণ্ডার থেকে আবার শব্দতরঙ্গ তোলা যেত, যাতে ধরে রাখা গান বা কথা আবার শোনা যেত।

স্বভাবতই জানতে কৌতূহল হয়, কার কণ্ঠে কোন্ গান বা বক্তৃতা সর্বপ্রথম রেকর্ড করা হয়েছিল। অনেকের ধারণা, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ট্রেড মার্কে যে কুকুরটিকে সাগ্রহে গ্রামোফোনের চোঙ্গার সুমুখে বসে থাকতে দেখা যায়, বোধ হয় তাকেই তার প্রভু নাম ধরে ডেকেছিলেন, সেই ডাক এত স্বাভাবিক হয়ে রেকর্ডে শোনা গিয়েছিল যে, তাতেই কুকুরটি গ্রামোফোনের এত কাছে অমন ভাবে এগিয়ে বসেছে। কথাটা আদৌ সত্য নয়। এই পৃথিবীবিখ্যাত ট্রেড মার্কটি গান-বাজনার ব্যাপারের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে-যে, গান-বাজনার গালগল্পে এই ট্রেড মার্কটির কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শোনানো চলতে পারে। সে প্রসঙ্গে যথাসময়ে আসা যাবে। এখানে শুধু বলে রাখি, ঐ যে কুকুরটিকে গ্রামোফোনের সুমুখে বসে থাকতে দেখা যায়, সে এডিসনের কুকুর নয়। এডিসন থাকতেন আমেরিকায় আর এই কুকুরটির বাস ছিল ইংলণ্ডে। দু'জনে কোনদিন দেখা-সাক্ষাৎও হয় নি।—

এডিসন ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। দিনরাত তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে ডুবে থাকতেন। তাঁর নিজ-হাতে আঁকা স্কেচ থেকে প্রথম কথা বলা যন্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী যন্ত্রবিদ্ জন ক্রেউসি। ক্রেউসির তৈরি যন্ত্রটি কেমন হল তা পরীক্ষা করবার জন্য এডিসন তার সুমুখে একটি ছেলেভুলানো ছড়া আওড়ালেন—

'Mary had a little lamb,
Its' fleece was white as snow;
And every where that Mary went,
The lamb was sure to go.'

আশ্চর্যের বিষয়, যন্ত্রটি যখন বাজানো হল, তখন খসখসে আওয়াজের মধ্যে তিনি নিজের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলেন—'মেরি হাড এ লিটল ল্যাম্ব···'।

পৃথিবীতে সেই সর্বপ্রথম মানুষ তার নিজকণ্ঠস্বর একটি যন্ত্রের মাধ্যমে ফিরিয়ে পেলে, ফিরিয়ে পেলে প্রতিধ্বনি আকারে নয়, যা বলবার ক্ষণপরেই পুনরাবৃত্ত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়, ফিরিয়ে পেলে স্থায়িভাবে পুঁথিতে লেখা মনের কথার মত, যখন খুশি, যেখানে খুশি, যতবার খুশি ফিরে ফিরে পাওয়ার জন্যই প্রস্তুত এক অভিনব মূর্তিতে। এ যেন শব্দব্রহ্মকে মূর্তরূপে পাওয়ার মত এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ক্ষণে ক্ষণে হারাবার ভয়ে যে সুরসুন্দরীদের আমরা সাধ্য-সাধনা করে এসেছি তারা এসে যেন আমাদের কাছে ধরা দিল। নতুন করে পেলাম আমরা নিজেদের কণ্ঠের হারাধনকে। এ যেন কবির কথায় সেই—

তোমায় নতুন করে পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
ও আমার ভালোবাসার ধন।

তবে মানুষের ভালবাসার ধন নতুন করে পেল সুর ধরে রাখবার কৌশল আয়ত্ত করে। সুরু হল বিজ্ঞানের আর এক বিচিত্র অভিযান। [ক্রমশ।

ফ্রেড ডাবলিউ গেইসবার্গ

(রেকর্ডিং শিল্পে এক স্মরণীয় নাম)

[বিগত পঞ্চাশ বছর আগে ফ্রেড গেইসবার্গ প্রতিভাধরের সন্ধানে সারা ইওরোপে টহল দিয়েছেন। কেউ তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন, কেউ দেন না। তাঁর এই অভিযানে ধরা দিয়েছিলেন বহু খ্যাতিমান, তন্মধ্যে চালিয়াপিন, এ্যাডেলিনা প্যাটি, মেল্বা, ক্যারুসো এবং প্যাডেরস্কি প্রভৃতি প্রতিভার অধিকারীরা। তাঁর অভিযান যেমন ঐতিহাসিক তেমনি তাঁর সৃষ্টি গান-বাজনার ইতিহাসও এককথায় অনবদ্য। এই রচনাটিতে গেইসবার্গের সন্ধানী বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। রচনাটির মূল লেখক জন ডেভিডসন।—স]

সাতাত্তর বছরের সীমায় পদার্পণ করেও, 'ফ্রেড ডাবলিউ গেইসবার্গ, হারান নি তাঁর যৌবনের শক্তি ও স্মৃতিকে। লণ্ডনের হ্যামস্টেড অঞ্চলে অবস্থিত তাঁর ব্যক্তিগত কামরায় বসে তিনি আমাকে সাম্প্রতিকতম দীর্ঘস্থায়ী রেকড বাজিয়ে শোনালেন একের পর এক।

ভার্ডি রচিত 'লা ফোর্জা ডেল ডেস্টিনো' নামক সুবিখ্যাত সঙ্গীতটি শুনলাম একঘণ্টা চল্লিশ মিনিটব্যাপী একটি রেকর্ডের দু'পিট মিলিয়ে।

পুচ্চিনির 'ম্যাডেম ব্রাটার ফ্লাই', গানটি বন্দী হয়েছে এক গোলাপী প্লাসটিকের রেকর্ডের বুকে, যা নমনীয় ও ভাঙে না; এই রেকর্ডটি আকারে এমন যে, সহজেই এটিকে পাৎলুনের পাশের পকেটে পুরে নেওয়া চলে। রেকর্ড শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে, মিঃ গেইসবার্গ এতই মত্ত যে, অতিকষ্টে আমি তাঁকে এই শিল্পের অতীতে দৃষ্টিপাত করাতে সক্ষম হলাম।

সে যা হোক, অবশেষে তিনি একটি বাদামী রং-এর খাতা কোথা হতে টেনেটুনে বার করে আনলেন, যাতে আবছা হয়ে আসা কালির আঁচড়ে কতকগুলি তারিখ লেখা ছিল; এটি তাঁর ১৯০০ সালের ডায়েরী।

এই ডায়েরীর এখান-ওখান থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করে স্মৃতির সাহায্যে একটি কাহিনী পরিবেশন করতে সুরু করে দিলেন উনি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে কথা বলার এই যন্ত্রটা (অন্যমনস্কভাবে এখনও গ্রামোফোন যন্ত্রকে এই বলে উল্লেখ করে ফেলেন 'মিঃ গেইসবার্গ') ছিল একটা খেলনারই সামিল।

ফোনোগ্রাফ সিলিণ্ডারে ধরে নেওয়া, 'ডেজী বেল' বা 'আফটার দি বল ওয়াজ ওভার' জাতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান শুনত সকলে ভিড় করে এসে কোন মুক্ত অঙ্গনে কানে ইয়ার-টিউব বা শ্রুতি-নল লাগিয়ে; এর জন্য দক্ষিণা নির্দিষ্ট ছিল জনপ্রতি পাঁচ সেণ্ট করে।



সে যুগের গ্রামোফোনযন্ত্র

যখন এমিল বার্লিনার এই ফোনোগ্রাফ সিলিণ্ডারের বদলে গ্রামোফোন যন্ত্র ও রেকর্ডের পরিকল্পনা করে চালু করতে প্রবৃত্ত হলেন সেগুলিকে প্রথম, বেশ কিছু লোক তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখল।—

বোস্টনের জনসাধারণ তাঁকে ধিক্কার দিল শতকণ্ঠে—তুমি ভেবেছ যে, এই চাকাটা ঘুরলেই গান বেরুবে? তোমার বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি। যাও যাও, এ যন্ত্রটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমাদের আগের জিনিসটা নিয়ে এস দিকি।—

আমরা ওই কথা বলার পুতুলটাকেই ফিরে পেতে চাই, কি হবে গানের এসব চাক্তি দিলে।—

কিন্তু বার্লিনার হাল ছাড়লেন না; তরুণ 'গেইসবার্গ' কাজ করতেন তাঁর সঙ্গে, নিউইয়র্কের এক স্টুডিওর ল্যাবরেটরীতে, সেখানে গান ও হাস্য কৌতুকাদির রেকর্ডিং করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো পুরোদমে।—

রেকর্ডিং ডায়াফ্রাগম-এর সঙ্গে একটা বক্সড পিয়ানো যুক্ত করা থাকত; হাতীর শুঁড়ের মতই মোটা একটা রবারের নল দিয়ে।—

প্রাথমিক এই উপায়কে কিছুটা স্থূল না বলে অবশ্য গত্যন্তর নেই, কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডের ইতিকথা এটাই।

১৮৯৮ সালের হেমন্ত ঋতুতে বার্লিনার মিঃ গেইসবার্গকে লণ্ডনে পাঠালেন; যেখানে ইতিপূর্বেই তিনি রেকর্ডিং ইঞ্জিনীয়ারও দক্ষ কর্মী তৈরি করার জন্য এক শাখা অফিসের পত্তন করে রেখেছিলেন।—

মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামোফোন যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও এর মাধ্যমে সংস্কৃতি প্রচার।



প্যাডেরস্কি



ক্যারুসো

প্রায় বছরখানেক ধরে অবশ্য, 'মিউজিক হল'গুলির সাক্ষাৎ প্রভাব থেকে সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে বেগ পেতে হল মিঃ গেইসবার্গ ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দের। তারপর তাঁরা তৎকালীন বোয়ার যুদ্ধ অবলম্বনে দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত, উত্তেজক ভাষণাদি রেকর্ড করে বাজারে ছাড়তে লাগলেন।—

এবার এল অভূতপূর্ব সাফল্য, সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রা গান; জনতার উদ্দেশে উৎসাহসূচক বাণী, সৈন্যদের সমবেত কণ্ঠে গীত 'হোম সুইট হোম,' 'চিঠি দিতে ভুলো না' বলে আবেগদীপ্ত আহ্বান রেকর্ডের মাধ্যমে সাড়া তুলল দেশবাসীর হৃদয়ে; এতদিনে গ্রামোফোন রেকর্ডের অবদান গৃহীত হল সাদরে, গেইসবার্গ আংশিকভাবে সফল হলেন; কিন্তু এর মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রসারের স্বপ্ন তখনও 'হনুজ দূর অস্ত'।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই এক ডজন প্যাকিং বাক্সয় রেকর্ডিং-এর যন্ত্রপাতি ভরে, মিঃ গেইসবার্গ ও তাঁর সহকর্মিগণ 'সেণ্ট পিটার্সবার্গের' উদ্দেশে পাড়ি দিলেন; নিঃসন্দেহে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, সংস্কৃতি দেশের চেয়ে বিদেশেই আদর পায় বেশি।

চারফুট তুষারের মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় রাস্তার ধারে, বাতাসে কুয়াসার হিমশীতল কামড় খেয়ে, ফণ্টাংকা নামে খালের ধারে একটা বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটে আড্ডা গাড়লেন ওঁরা; বাড়িটার চারধারে ছিল ছফুট উঁচু দেওয়াল। বসবার ঘরটিকে স্টুডিও বানালেন ওঁরা; রেকর্ডিং-এর আদি যুগের যন্ত্রপাতিতে বোঝাই হয়ে উঠল সে ঘর।

বালালাইকা পুরুষের দল, বেদে গায়ক, সামরিক ব্যাণ্ড ও গির্জার প্রার্থনা-সঙ্গীত গায়কের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে লাগল সেই ঘরে পর্যায়ক্রমে; ইনস্ট্রুমেণ্ট ভাইব্রেশনের উল্টোদিকে এ্যাডোসিভ টেপ দিয়ে আবদ্ধ টিন কনেসের মাধ্যমে বন্দী হল সে-ধ্বনি চিরতরে।

ঘড়ির সময়ানুবর্তিতা বা বৈদ্যুতিক শক্তি কোনটাই খুব নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে নি এঁদের ভাগ্যে।

মিঃ গেইসবার্গ এক ধরণের গ্র্যাভিটি মোটর প্রস্তুত করলেন, যা নাকি আজও চালু রয়েছে।

আটফুট উঁচু দণ্ডে লাগানো রেকর্ড বাজানোর ঘূর্ণায়মান চাক্তিতে পাঁচ মিনিট স্থায়ী রেকর্ড বাজানো সম্ভব হল।

প্রতিটি রেকর্ড বাজানোর পরই, চাক্তিটি তুলে নিয়ে অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন মিঃ গেইসবার্গ।

এবার সুরু হল নূতন নূতন প্রতিভার অন্বেষণ। 'নার্ডনি ডাম থিয়েটারে' 'ফেডোর শালিয়াপিনের' কণ্ঠের সঙ্গে পরিচয় ঘটল মিঃ গেইসবার্গের।

তখনকার বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার যশ ও অর্থভাগ্যে বিস্মিত হতে হল ওঁকে, তাদের পেছন পেছন ঘুরত অসংখ্য দালাল।

শালিয়াপিনের নিজস্ব প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল চার; এদের ঘুষ না দিলে ওই বিখ্যাত গায়কের কাছে পৌছনই ছিল প্রায় অসম্ভব।

তখনকার সেণ্টপিটার্সবার্গে প্রায় অধিকাংশ মানুষই ছিল হয় ঘুসখোর নয় ঘুসদাতা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘুস দেওয়াটা দিব্যি লাভজনক বলেই প্রমাণিত হত শেষ পর্যন্ত।

মাত্র দু'বছরের মধ্যেই রাশিয়া থেকে বছরে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের মত লাভ করতে সুরু করে দিল 'গ্রামোফোন কোম্পানী' এবং বিপ্লবের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই লভ্যাংশের কোনরকম ঘাটতি হয় নি।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের শরৎ-এর আগেই শালিয়াপিনকে পাওয়া সম্ভব হল কোম্পানীর পক্ষে।

এই সময়ের মধ্যে রেকর্ডিং-এর দল নিয়ে বেশ কয়েকবারই ঘুরে এলেন, মিঃ গেইসবার্গ এদেশে-ওদেশে, তারপর ঘাঁটি গাড়লেন মস্কোতে।

বর্তমান রেডস্কোয়ার ও তৎকালীন 'সেণ্ট বেসিল ক্যাথিড্রালে'র জমকালো মিনারগুলোর ঠিক সামনাসামনি অবস্থিত ছিল তাঁর স্টুডিও।

গ্রামোফোনের মায়াজালে ধরা পড়ার পর থেকে এ সম্বন্ধে শালিয়াপিনের কৌতূহলের আর সীমা-পরিসীমা রইল না।

রেড স্কোয়ারস্থিত গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে প্রায়ই হানা দিতেন উনি, রেকর্ডিং-এর



মেলবা

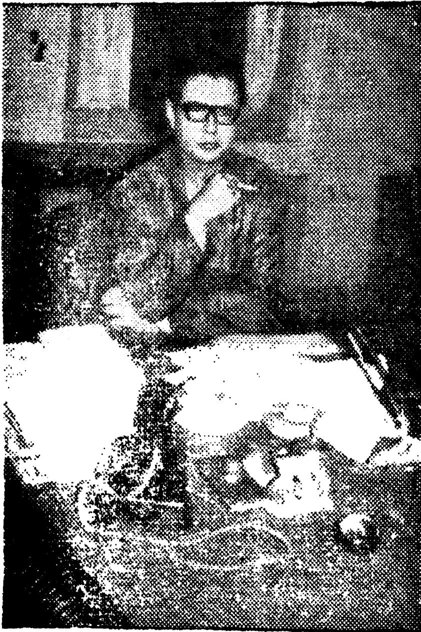
যন্ত্রপাতি ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন।

সে সময় শালিয়াপিন নিজের কণ্ঠস্বর নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে কণ্ঠস্বরকে একটা স্থায়ী রূপ দিতে প্রয়াসী হন এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে রেকর্ডিং সিস্টেম যে তাঁর সহায়ক হয়েছিল, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

সারাদিনব্যাপী সাঙ্গীতিক কর্মব্যস্ততার পর রাত্রে রেকর্ডিং কোম্পানীতে এসে রেকর্ড করাতেন উনি, সে রেকর্ড মনোমত না হলে, ছাদের দিকে চেয়ে হতাশভাবে প্রশ্ন করতেন যে, 'ঈশ্বর কেন তাঁকে এভাবে শাস্তি দিতে আগ্রহী?' আবার রেকর্ডে নিজের কণ্ঠস্বরে যদি কোন খুঁত না খুঁজে পেতেন, তা হলে আনন্দে নেচে কুঁদে এক হৈ হৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন।

একেই বোধ হয় বলে শিল্পিমনের খামখেয়ালিপনা। ১৯০২ খৃস্টাব্দে আর এক অনন্যপ্রতিভার সহায়তা পেল রেকর্ডিং কোম্পানী, এনরিকো ক্যারুসো'র অপূর্ব টেনর কণ্ঠস্বর দেশবাসীর শ্রবণে মধুসঞ্চার করল চিরকালের জন্য।

ওই সময় ক্যারুসোর প্রতিভা এমন জগদ্ব্যাপী খ্যাতির অধিকারী ছিল না, তখনও তা স্ফুটনোন্মুখ মাত্র, কিন্তু তিনি নিজে অন্তত সে সময়ই নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।



অনিল চট্টোপাধ্যায় : সুটিংয়ের অবসরে

মিঃ গেইসবার্গ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন—আমি এক সন্ধ্যায় দশটি গান গাইতে রাজী আছি, তবে তার জন্য অন্তত ১০০ পাউণ্ড সম্মান দক্ষিণা চাই।

মিঃ গেইসবার্গ প্রথমটা একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন, তার পাঠালেন উপরওয়ালার পরামর্শ লাভের আশায়। উপরওয়ালা ফিরতি তারে জানালেন, এ পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব নয়, দয়া করে রেকর্ড করবেন না। কিন্তু ক্যারুসোর ক্ষমতায় তাঁর নিজের মতই দৃঢ়প্রত্যয় ছিল মিঃ গেইসবার্গের, উপরওয়ালার আদেশের বিরুদ্ধে নিজের ঝুঁকিতেই কাজ করতে প্রস্তুত হলেন উনি।

এক উৎসব ভোজসভায় প্রতিশ্রুত দশটি গান শোনালেন ক্যারুসো। এই গানগুলির রেকর্ড শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার একদিন, সাঙ্গীতিক বিজ্ঞানানুযায়ী নিখুঁত বলা চলে না এদের কারণ 'ক্যারুসো' সব সময় পিয়ানো সঙ্গতের সঙ্গে সমতা রেখে চলতে সক্ষম হন নি। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এত খুঁটিনাটি নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাত না, ক্যারুসো'র অপূর্ব কণ্ঠস্বরই লোকের মন কেড়ে নিল স্বচ্ছন্দে। গায়ক সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য পারিশ্রমিক লাভ করলেন। মিঃ গেইসবার্গের কোম্পানীর লভ্য হল পনেরো হাজার পাউণ্ড, খরচ-খরচা বাদে।

এইবার গ্রামোফোন কোম্পানী সত্য সত্যই জাতে উঠল। নেলী মেলবা তখনকার আর এক সুবিখ্যাতা গায়িকা; তাঁর কণ্ঠকে রেকর্ডের মাধ্যমে বন্দী করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন এবার মিঃ গেইসবার্গ। নেলীকে সুদৃশ্য ও মূল্যবান উপহার পাঠানো হতে লাগল রাশি রাশি, অনুরোধ-উপরোধেরও অন্ত রইল না। কিন্তু তাও কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে রইলেন নেলী প্রথমটা, কারণ রেকর্ডিং-এ নিজের কণ্ঠ কেমন আসবে সে সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধায় পড়েছিলেন উনি।

শেষে একদিন যখন তিনি ক্যানেস হোটেলে মিঃ গেইসবার্গেরই এক সহকর্মীর সঙ্গে নৈশভোজে যোগদান করেন; তখন সেই কক্ষেরই লাগোয়া আর একটি কক্ষে ক্যারুসো'র একটি রেকর্ড বাজিয়ে তাঁকে শোনানো হয়।

নেলীর সঙ্গী উচ্ছ্বসিত ভাষায় রেকর্ডটির প্রশংসা করতে সুরু করলেন। তিনি বললেন, রেকর্ডের মাধ্যমে স্বয়ং ক্যারুসোই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছেন।

তাঁর উৎসাহ স্পর্শ করল নেলীর অন্তরকে। এর ফলে একদিন মেলবা'র লণ্ডনস্থিত ফ্ল্যাটের উপবেশন কক্ষটি ভরে গেল রেকর্ডিং কোম্পানীর কলা-কুশলীবৃন্দের উপস্থিতিতে। আসবাবপত্র, সুদৃশ্য টুকিটাকি ও ট্রফি, মেডেল ইত্যাদিতে সজ্জিত সেই ঘরটি সেদিন এমনই ভরে উঠেছিল যে, রেকর্ডিং কোম্পানীর অর্কেস্ট্রা-বাদকদল অতিকষ্টে নিজেদের বাদ্যযন্ত্রে মূর্ছনা তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন মিঃ গেইসবার্গ।

তাঁর স্টুডিও অস্থায়িভাবে স্থানান্তরিত হল সুইজারল্যাণ্ডের কোন অজানা স্থানে, সুখ্যাত পিয়ানিস্ট ইগন্যাক্ প্যাডেরোস্কি'র বাজনা রেকর্ড করার প্রত্যাশায়। মন্ত সেন পাশে'র ঠিক সামনে এক বাড়িতে আশ্রয় নিল সমস্ত দলটি। সুবিখ্যাত অপেরা অভিনেতা ফ্রান্সেস্কো তামাগনো' সেইখানেই গেয়েছিলেন বহুসংখ্যক অপেরা সঙ্গীত। যে কণ্ঠস্বরে একদিন সমগ্র ইউরোপ বিচলিত হয়েছিল, সে কণ্ঠস্বরের তখনও ছিল কিছু অবশেষ।

এবার আসরে এলেন, অ্যাডেলিনা পাত্তি, মিঃ গেইসবার্গ ও তাঁর ভাই ছোট রেলপথ বেয়ে যন্ত্রপাতি সমেত উপস্থিত হলেন এই অতুলনীয়া গায়িকার আবাস ওয়েলশ ক্যাসলে; সেখানেই তখন তিনি প্রায় রাজকীয় সমারোহের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাপন করে চলছিলেন।

পাত্তি অতিথিকে স্টুডিও বানাবার জন্য দু'টি বৃহৎ শয়নকক্ষ ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন ও তাঁদের পানভোজনে আপ্যায়িত করলেন সাদরে।

কিন্তু মেলবার মতই রেকর্ড করানো সম্বন্ধে তিনিও দ্বিধা করতে লাগলেন প্রথমটা।

পুরো দু'টো দিন লেগে গেল তাঁর সম্মতি লাভ করতে। অবশেষে একবার পরীক্ষা করে দেখতে রাজী হলেন অ্যাডেলিনা। মিঃ গেইসবার্গ সমস্ত সময় তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন ও তৎকালীন রেকর্ডিং-এর নিয়ম অনুসারে উচ্চগ্রামে গাইবার সময় তাঁকে পিছনে টেনে সরিয়ে দিতে লাগলেন ও সুর যেখানে কোমল, সেখানে তাঁকে রেকর্ডিং যন্ত্রটির সামনে ঠেলে এগিয়ে দিলেন বারবার।

ভীষণ ক্রুদ্ধা হলেন পাত্তি, প্রথমটা মনে হল সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝি-বা উনি ভণ্ডুল করে দেবেন; কিন্তু রেকর্ডিং কর্মীদের ও মিঃ গেইসবার্গের সানুনয় কাকুতি ও ব্যাপারটার যান্ত্রিক পদ্ধতির বিশদ বিবরণে তাঁর রাগ পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

তাঁর নিজস্ব স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে রেকর্ডগুলি যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন পাত্তি।

ফুল ও পাখির মাংসের উপঢৌকন পেয়ে শহরে ফিরে এলেন গেইসবার্গ ও তাঁর সম্প্রদায়।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে পাত্তিকে লাভ করে রেকর্ডিং কোম্পানী এই সময় মিঃ গেইসবার্গ ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ যা চেয়েছিলেন তা প্রায় পেয়ে গেছেন, গ্রামোফোন সত্যই তখন সংস্কৃতির বাহনে পরিণত, অবশ্য লঘু হাস্য-কৌতুকাদি তখনও পরিবেশিত হয়ে চলেছে; কিন্তু তাতে কি এসে যায়?

সঙ্গীতজগতের অবিস্মরণীয় নামগুলির প্রায় সবই তো ধরা পড়ে গেছে তখন রেকর্ডিং-এর মায়াজালে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবার পর রেকর্ডিং-এর শৈল্পিক উন্নতিও আজ উল্লেখ্য।

অর্কেস্ট্রার বাজনা প্রথম দিকে রুদ্ধশ্বাস সুরবাদ্যের মত শোনা যেত; আজ গ্রামোফোনে অর্কেস্ট্রা শোনায় ও সামনে বসে অর্কেস্ট্রা শোনায় কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না।

প্রথম প্রধান রেকর্ডার হিসাবে ও বর্তমানে কোম্পানীর শিল্প-অধিকর্তা হিসাবে মিঃ গেইসবার্গ আজও এই শিল্পের এক প্রধান অবলম্বনরূপে প্রতিভাত।

তাঁর প্রথম মনিব এমিল বার্লিনারের মতই মিঃ গেইসবার্গ প্রথমাবধিই কথা বলার পুতুলটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি; রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে সত্যকার সঙ্গীত পরিবেশনই ছিল তাঁর ধ্যান-ধারণা, আর আজ তা সফলতায় রূপান্তরিত।

অনুবাদিকা—রেবা লাহিড়ী।



● ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় : ছায়াছবির বাইরে

নিঃসঙ্গ এলভিস প্রেসলে

অর্থ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা শুধু এসেছে বললে অসম্পূর্ণ থেকে যায় মাত্রাতিরিক্তই এসেছে, একদা ট্রাক-ড্রাইভার এলভিস প্রেসলের জীবনে। তাও দীর্ঘ সাধনায় নয়, কঠোর তপস্যায় নয়, নয় দুশ্চর কৃচ্ছসাধনে, এসেছে কখন? বয়েস তখন বুঝি বা পঁচিশও হয় নি, এসেছে সহজ-সরল পথেই। এসেছে ক্ষণকালের আহ্বানে। অসংখ্য সুন্দরী ঘিরে থাকে তাঁকে, তাঁর আকর্ষণে ধরা দেয় গণনাতীত লাস্যময়ী তরুণী, যাদের একটি বিলোল কটাক্ষ মহাতপা মুনি-ঋষিদের আসনও টলিয়ে দিতে পারে, যাদের ভুবনভোলানো হাসি সমগ্র পারিপার্শ্বিক জগতকে সরিয়ে দেয়, যাদের ক্ষীণকটি বরতনুর অনুপম মাদকতা মানুষকে দিশাহারা করে তোলে—সেই মেয়েরাও এত ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে এলভিসের সান্নিধ্যে যে, তাদের সংখ্যার লেখাজোখা নেই। তবু—এলভিস নিঃসঙ্গ, সহস্র বান্ধবের মাঝে একাকী, হৃদয়ের অন্তস্তলের গভীরে জমাট বেঁধে আছে এক শূন্যতা যা চাইছেন তা তিনি পাচ্ছেন না। ক্ষণকালের সঙ্গিনী নয়। নিত্যকালের সঙ্গিনী, একটি মধুর ফাল্গুন-সন্ধ্যার সহচরী নয়, সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনায় বিষণ্ণ-উজ্জ্বল জীবনের সহচরী, এলভিস তাই খুঁজে চলেছেন। কিন্তু সেই নারী কি দুর্লভা—আর এলভিসের পক্ষে।

হ্যাঁ, এলভিসের পক্ষে বলেই দুর্লভা। কারণ সেই অসংখ্য কাঁটার অরণ্যে একটি উজ্জ্বল শুভ্র গোলাপ খুঁজে বার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অনেক কর্দম পেরিয়ে একটি স্থলপদ্ম আনতে পারছেন না এলভিস।



● এলভিস প্রেসলে



● অনুরাগিণী পরিবৃত প্রেসলে

কিছুকাল আগে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা যখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন তখন সবচেয়ে বেশি আনন্দে মেতে উঠেছিলেন এলভিস। কি কারণে? একমাত্র কারণ বাবা একজন 'স্ত্রী' খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছেন বলে।

বিখ্যাত অভিনেত্রীদের মাঝখানে অন্য সময়ে এলভিসকে আপনি সচরাচর দেখতে পাবেন না। সেই সময় এলভিসের প্রহর অতিবাহিত হচ্ছে একটি খ্যাতিহীনার সান্নিধ্যে। খ্যাতনাম্নীদের ভিড় পরিহার করেন এলভিস। খ্যাতি-হীনাদের মধ্যে নিজেকে ক্ষণকালের জন্যে সঁপে দিয়ে নিটোল জীবনের একটি স্পর্শ নিতে উন্মুখ হয়ে থাকে তাঁর পিপাসু-মন।

প্রসিদ্ধারাও তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগশূন্য নন। অভিযোগ এই যে, তিনি ধরাছোঁয়ার অনেক ঊর্ধ্বে, অদ্ভুত তাঁর মন, বিচিত্র এক ধাতুতে গড়া তিনি, তাঁকে পেয়েও পাওয়া যায় না। তাঁর মতিগতি বোঝা দায়, এমনি আরও কত কি। শেরি জ্যাকসন তো একটি সন্ধ্যার প্রথম আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানই করে দিলেন। জুলিয়েট প্রোস শুধু স্বীকার করলেন যে, তিনি সহশিল্পী হিসাবে ভাল—বাস, আর টিউসডে ওয়েল্ড এলভিসের অভিনয় সম্বন্ধে অপরিসীম প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন—কিন্তু অবসর মুহূর্তটি নির্দিষ্ট রইল স্মাল মিনিওর জন্যে।

এই আলোর মিছিলে এই আঁধারের মেলায় এই আলোছায়ায় কখনও কখনও অ্যান্সি সার্পকে—ভাবীকালে হয়তো এমন একদিন আসতে পারে যেদিন এই মেয়েটিই এলভিসের জীবনে আসবে, তাঁর সকল খোঁজার পরম পাওয়া হিসাবে।

'উৎসাহও আছে, ইচ্ছাও আছে, নেই শুধু যোগ্য ব্যক্তি'—

—মৃণাল সেন

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

'খুব ভাল লাগল বাবা, বেশ চমৎকার হয়েছে, আর বাবামশায় যদি আজ থাকতেন এবং এই ছবি দেখতেন তিনিও খুশি হতেন।'—ছবি দেখে ছবিটি সম্বন্ধে এক প্রবীণা এই মন্তব্যটি করেছিলেন এক তরুণের প্রতি। সেই তরুণটি ছবিটির পরিচালক। তাঁর নাম মৃণাল সেন। ছবির নাম 'পুনশ্চ'। আর পূর্বোক্তা প্রবীণার নাম শ্রীযুক্তা মীরা দেবী—রবীন্দ্রনাথের বর্তমানে একমাত্র জীবিত সন্তান, অতএব তাঁর উক্তিতে তিনি 'বাবামশায়' কাকে বললেন সে-বিষয়ে আর কোনপ্রকার অস্পষ্টতার অবকাশ নেই।

জীবনের এক-একটি ঘটনা মানুষের মনে চিরকালের দাবিতে স্মরণীয় হয়ে থাকে। এই বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলিই জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলে, জীবনে বপন করে পূর্ণতার বীজ। পূর্বোদ্ধৃত ঘটনাটিকে এই শ্রেণীতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এ যুগের সার্থক চিত্রকার মৃণাল সেন। কয়েকটি সারবান ছবির সুদক্ষ স্রষ্টা। এক-একটি চরিত্র তাঁর উপজীব্য। সেই চরিত্রের ভাব-গতি-ধর্ম, ভাষাকে রূপ দিতে তিনি প্রয়াসী। তাঁর মতে মানুষ সামাজিক জীব, সমাজেরই সে অঙ্গ—তাই একটি চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুললে সেই চরিত্রের মধ্যে দিয়েই সমাজের এক পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য আত্মপ্রকাশ করবে। সেই চরিত্রের আভ্যন্তরীণ সত্যকে অন্বেষণ করে তার সারসত্তাকে তুলে ধরার মধ্যেই স্রষ্টার সার্থকতার বীজ নিহিত। এর মধ্যে একটু থেমে শ্রীসেন বললেন—আমি কিন্তু কোন 'ইনডেন্ট'-এর প্রয়াসী নই।

ছায়াচিত্র আজ নানাপ্রকার উন্নতির সম্মুখীন হচ্ছে, তার কলাকুশলগত সমৃদ্ধিই এ-ক্ষেত্রে সবিশেষ লক্ষণীয় বলা বাহুল্য। এ-সমৃদ্ধি আনন্দেরই বিষয় কিন্তু কলাকুশলগত উন্নতির ভিত্তিতেই কি ছবির উৎকর্ষ বিচার চলতে পারে এ সম্পর্কে মৃণাল সেনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন—ছবিরই বলুন বা যে কোন শিল্পেরই বলুন—তার প্রধান ধর্মই হল—পৌঁছে দেওয়া, সেই ধর্মপালনে যন্ত্রের সাহায্য যতটা দরকার ততটুকুই চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রের উপযোগিতা ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের এক নিজস্ব সত্তার আছে—প্রকাশপিপাসা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে তার অবদানও অনস্বীকার্য নয়। তা ছাড়া প্রকাশভঙ্গী যন্ত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই সত্তার স্রষ্টা তাঁর আপন কুশলতা দ্বারা বিস্তৃততর ক্ষেত্র করতে পারেন বিস্তারিত।

আমাদের দেশের চিত্রনির্মাণে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে পরিচালক সেনকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তিনি বললেন, পৃথিবী এখন আগেকার তুলনায় অনেক ছোট হয়ে এসেছে। স্বভাবতই এক দেশ অন্য দেশকে গভীরভাবে জানবার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে। এই জানার মধ্যেই পারস্পরিক ভাবধারার বিনিময় হয়ে যাচ্ছে। এক-এক দেশের এক-এক সমাজের আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা ধ্যান-ধারণা আর এক দেশের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সে ক্ষেত্রে প্রভাব এড়ানো কঠিন, তা ছাড়া প্রভাব সেখানে আসতে বাধ্য, তাকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

আমি জিজ্ঞাসা করি—কিন্তু সেই প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আপনি কি বিধেয় বলে মনে করেন।



মৃণাল সেন

উত্তর এল—বিদেশের কোন ভাব বা কোন বক্তব্যকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করে তার মূল সুরটি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরে আমরা যদি আমাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারি, তা হ'লে তার ফল নিশ্চয়ই শুভ এবং ফলপ্রসূ হবে। তাঁর মতে এই বিনিময়েরও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এই বিনিময় নির্ভর করে আবেগ, মেজাজ এবং শিল্পবোধের উপর। এই নির্দিষ্ট নিয়ম পরিহার করলে বিনিময় সার্থকতার রূপ নিতে পারে না।

আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যেতে হ'ল, অন্তত কুড়ি বছর আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করলেন চিত্রকার। বললেন, আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এক ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়ে গেছে আমাদের জীবনধারায়—যার ফলে আমাদের জীবনচেতনা এক নবতর রূপ নিয়েছে। তারই অর্থাৎ সেই নব-জীবনবোধের ছায়া পড়েছে আমাদের সাহিত্যে, সৃষ্টিতে, নাটকে। এ প্রসঙ্গে উপমাস্বরূপ তিনি শিশিরকুমারের 'দুঃখীর ইমান'-এর উল্লেখও করলেন।

চরিত্রের বৈচিত্র্য-সন্ধানী শ্রীসেনের নিজের জীবনও যেমনই বিচিত্র, তেমনই ঘটনাবহুল। চিত্রজগতে তাঁর সংযোগ আজ থেকে অন্তত আঠার-কুড়ি বছর আগে সম্পূর্ণ অভাবিতই ছিল। স্কটিশচার্চ কলেজে বি-এস-সি'র ছাত্র ছিলেন তিনি। অনার্স ছিল পদার্থবিদ্যায়। বিজ্ঞান-চর্চার মধ্যেই তাঁকে আকর্ষণ করে বসল শব্দতত্ত্ব। শব্দতত্ত্ব অনুশীলনের অভিলাষে শিক্ষানবীশ হলেন অরোরা স্টুডিওতে। এখানে অবশ্য বেশিদিন তিনি যুক্ত থাকেন নি। তারপর তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে শব্দযন্ত্র এবং চিত্রশিল্পের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে রীতিমত পড়াশুনা শুরু করলেন। চিত্র-সাংবাদিক হিসাবেও যুক্ত হলেন একটি বিখ্যাত পত্রিকায়, তারপর তাঁকে দেখা গেল অনুবাদক হিসাবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্যারল চ্যাপেক 'চৌট' উপন্যাসটি তিনি বাঙলায় অনুবাদ করলেন, তারপর চিত্রজগতে সহকারী পরিচালকরূপে যোগদান। বাঙলা চলচ্চিত্রের জনক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ডি, জি'র সহকারী ছিলেন কিছুকাল। তারপরের কাহিনী আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ। জীবন-সন্ধানী চিত্রকার নিজের জীবনেও জীবনের নানা অলিন্দে করেছেন পদার্পণ। বাঙলাদেশ কিছুকালের জন্য তিনি ছাড়লেন। উত্তরপ্রদেশে বাসা বাঁধলেন কিছুকাল কর্মোপলক্ষে। এইসময় ঔষধদ্রব্যের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর সাক্ষাৎ মিলেছে। রাজনীতি থেকেও তিনি দূরে ছিলেন না। কিছুদিন একটি রাজনৈতিক দলের কাজও করেছেন। পেশা তাঁর যাই হোক, সাহিত্যচর্চা থেকে তিনি বিরত হন নি। তাঁর সাহিত্যচর্চার পটভূমিও, চলচ্চিত্র। একটি গ্রন্থ রচনা করলেন চ্যাপলিন সম্বন্ধে। সেইসময়, রসিকমহল আশা করি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, চলচ্চিত্রের নানাদিক সম্বন্ধে যে তথ্যবহুল, সারগর্ভ এবং সময়োপযোগী প্রবন্ধাদি মৃণাল সেন রচনা করেছেন—তা শুধু সংশ্লিষ্ট মহলেই নয়, চিন্তাশীলসমাজেও রীতিমত সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। আকর্ষণ করেছিল বহু বিদগ্ধ দৃষ্টি।

১৯৫৫ সালে দর্শকসাধারণ সর্বপ্রথম তাঁর পরিচালিত ছবি দেখার সুযোগ পেলেন। 'রাতভোর' ছবিটিই তাঁর প্রথম পরিচালিত চিত্র। কিন্তু তিনি নিজেই বললেন—এ ছবি আমার জীবনে অনেক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার প্রশ্ন—এ ছবি কি আপনাকে খুশি করতে পেরেছে? দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন একেবারে না।

আলাপ চলতে থাকে, নানাবিধ আলাপ-আলোচনার মধ্যে তাঁর বিদগ্ধ, রসগ্রাহী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মার্জিত অমায়িক আচরণ মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে।

পুরোপুরিভাবে তিনি চিত্রজগতে এলেন ১৯৫৮ সালে 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটিকে কেন্দ্র করে। তারপর তিনি উপহার দিয়েছেন বাইশে শ্রাবণ, পুনশ্চ, অবশেষে প্রতিনিধি। তাঁকে প্রশ্ন করি এই ছবিগুলির মধ্যে কোন ছবিটি আপনার মনকে এক গভীর পরিতৃপ্তিতে আবৃত করে দিয়েছে। চায়ের পেয়ালাটি আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—প্রতিনিধি আমার কাছে সবচেয়ে স্যাটিসফাইং ছবি। জিজ্ঞাসা করি বর্তমানে আপনি কি ছবি করছেন? উত্তর এল—আকাশকুসুম, একটু থেমে বললেন—এ যুগের জীবন-যন্ত্রণার একটা চিত্ররূপ দেওয়ার চেষ্টা বলতে পারেন।

মৃণাল সেনের (জন্ম ১৪ই মে ১৯২৩) পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে ভারতের বাইরে গেছে বাইশে শ্রাবণ। ছবিটি দেখান হয়েছে ভেনিসে। তা ছাড়া ছবিটি লণ্ডনে ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে টেলিভিশানেও দেখান হয়েছে।

চলচ্চিত্রের পরিস্থিতি আজ কিন্তু অনুকূল নয়, নানা সমস্যা তার প্রগতির এবং প্রসারের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসিত হলে সেই প্রসঙ্গে বললেন—সমস্যা বলতে আর্থিক সমস্যাটাই এত প্রকট আকার ধারণ করছে যে, তাকে অতিক্রম করে কাজ করা যায় না, তা ছাড়া এর কোন সহজ সমাধানও তো নেই। তবে—আরামকেদারায় নিজেকে আরও অনেকখানি সঁপে দিতে দিতে মৃণাল সেন বললেন—কণ্টিনিউ করে গেলে সুফল ফলতে পারে।

বর্তমান সরকারের চিত্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল যে সরকার অর্থব্যয় করছেন, উৎসাহও দেখাচ্ছেন কিন্তু পরিকল্পনার এক্সিকিউশান ঠিকমত হচ্ছে না শুধু যোগ্য ব্যক্তির অভাবে, সেই কারণেই সেখানে দেখা দিচ্ছে জটিলতা ছবির বিবিধ উন্নতির জন্যে যে সব কমিটী গঠিত হয়, তাতে অনেককেই নেওয়া হয় যাঁদের সঙ্গে চিত্রজগতের কোন যোগ নেই, পরিচয় নেই বৃহত্তর পৃথিবীর।

সেদিন তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে তাঁর আগামী কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি সুসংবাদ শোনা গেল—স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'রিপাব্লিক ডে প্যারেড' একটি অতি পরিচিত বিষয়। এই অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে একটি চিত্র নির্মাণের ভার শ্রীসেনকে অর্পণ করেছেন ভারত সরকার। ছবিটি কিন্তু হবে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক, প্যারেডের বিভিন্ন প্রতীকগুলির আনুপূর্বিক ইতিহাস ছবিটির উপজীব্য, এরই মধ্যে এক সর্বভারতীয় সংহতির বাণী প্রচারিত হবে, এর জন্যে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস এখন শ্রীসেনকে অনুধাবন করতে হচ্ছে। এই ছবি শুধু ভারতবাসীরাই যে দেখবে তা নয়, এ ছবি প্রদর্শিত হবে নিউইয়র্কের বিশ্বমেলায়, বিশ্বের দরবারে, ভারতের সুদীর্ঘ কালের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের অপূর্ব সম্ভার একটি আধারের মধ্যে যে বাঙালী তুলে ধরছেন তাঁর গৌরবে সারা বাঙলারই অংশ থাকবে, তাঁর সাধনার সফলতাই আমাদের কাম্য।

'যা ঠিক কি ভুল—সে বিচার বর্তমানের সাধ্যাতীত, করবে ভবিষ্যৎ'—

—বসন্ত চৌধুরী

সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

শুধু কলকাতা বললে ভুল বলা হবে। বৃহত্তর কলকাতা, সম্প্রসারিত কলকাতা, পরিবর্ধিত কলকাতা। টালিগঞ্জ থেকে বাঁক নিয়ে গড়িয়ার দিকে দীর্ঘাকৃতি সরকারী বাসটা ছুটে চলেছে দুর্দান্ত বেগে তার বহুদূরগামী ভেরীনিনাদে পথচারীকে প্রকম্পিত করে। মাঝখানে পড়বে সূর্যনগর। টালিগঞ্জ আর সূর্যনগরের মাঝে কোথাও চোখের সামনে ভেসে উঠবে ঘন সবুজ, কোথাও ঘরবাড়ি, কোথাও অসংস্কৃত কয়েকটি দোকান। সূর্যনগরের কাছে রিজেন্ট গ্রোভ। তারই একটি বাড়ি। একটি ছবির মত ছোট সংসার, সে সংসার তিনজনকে কেন্দ্র করে। এই তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ যে, তার বয়েস এখনও তিন হয় নি অথচ বয়েসের অল্পতা তার জানার স্পৃহাকে দমিত করতে পারে নি। অভ্যাগতকে সে হাত তুলে নমস্কার করে স্বাগত জানায়, সে স্কুলে যায়, এখনই তার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে পৃথিবীর অনেক খবর জমা হয়ে গেছে। বাড়ির গৃহিণী অলকা চৌধুরী, সাহিত্যরথী অজিতকুমার চক্রবর্তীর পৌত্রী, বিজ্ঞাপনবিশারদ যুধাজিৎ চক্রবর্তীর মেয়ে, এ কথা কারোরই অজানা নয় যে বহুজনের নামকরণ করে তাঁদের গৌরবিত করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত যাঁর নামকরণ করলেন তিনিই অলকা চৌধুরী। বাড়ির কর্তার নাম বসন্ত চৌধুরী। নাট্যামোদীমহলে একটি অতি পরিচিত এবং ততোধিক জনপ্রিয় নাম।

আজ থেকে তের বছর আগে এক দুরন্ত জিজ্ঞাসায় ভরা সন্ধানী জীবন পথিকের ভূমিকায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশই বাঙলা দেশের শক্তিমান শিল্পীদের তালিকায় তাঁর নাম



● বসন্ত চৌধুরী : রামমোহনের ভূমিকায়

পাকা করে দিল। তারপর একের পর এক অসংখ্য চিত্রে নায়কের ভূমিকায়, অত্যল্পসংখ্যক চিত্রে সহ-নায়কের ভূমিকায় তাঁর অবতরণ দর্শকমহলে এনেছে সাড়া, অনেকখানি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙলা ছবির প্রগতির।

সে এক শীতের সন্ধ্যা। চারপাশ স্তব্ধ। ঘড়ির কাঁটা টিক্ টিক্ করে এগিয়ে চলেছে, ছায়াছবির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে, একটু আগে পরিচারকের কোলে 'টা-টা' জানিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন সৃঞ্জয় চৌধুরী, তাঁর এবার ঘুমোবার সময়।

আমি সর্বপ্রথমেই জিজ্ঞাসা করি তিনি অভিনয়জগতে এলেন কেন—কোন আকর্ষণে অভিনয়জগৎ তাঁকে টানল এই প্রশ্ন করে জানা গেল যে, অভিনয়ের মাধ্যমে স্বীকৃতি পাওয়াই তাঁর চিত্রাবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য—কারণ ছায়াছবি একটি বৃহত্তর পটভূমি। নিজের কাজ বহুজনের সামনে একমাত্র এরই মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। যেদিন তিনি একজন নবাগত হিসাবে এ জগতে এলেন, সেদিন যে মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল, আজ জনপ্রিয়তার সমুন্নত সপ্তস্বর্গে উত্তরণের পর এবং সময়ের অগ্রসরণে ঠিক সেই মনোভাব যথাযথভাবে থাকতে পারে না, পরিচয় ও যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, হয়েছে আরও নিবিড়—তাই আগেকার ধারণায় পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক, ধারণা পল্লবিতও হয়েছে তবে স্বীকৃতি যথাযথ থেকে গেছে।

চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করি—আপনার মতে শিল্পীর দায়িত্ব কি—উত্তর এল—শিল্পী সব সময়েই তো নিজের ইচ্ছেয় চলতে পারে না, তার ভূমিকার গুরুত্বই বা দায়িত্বই বলুন বিরাট, কারণ জনগণের সঙ্গে যোগ শিল্পীরই বেশি, কারণ স্রষ্টা বা অন্যান্য কলাকুশলীরা থাকেন নেপথ্যে আর আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় ফিল্ম মস্ত বড় মাধ্যম, দেশের অর্থগত দারিদ্র্যই মূল—সেই কারণে প্রমোদ বিতরণের শ্রেষ্ঠ পন্থা ফিল্ম, তাই তার চরিত্রায়ণের মধ্যে যে বক্তব্যের প্রচার হচ্ছে, তার ফল ভাল ও খারাপ দুই-ই হতে পারে। তারই মধ্যে খারাপ দিকটি যতদূর সম্ভব বর্জন করে ভাল দিকটির যথাসাধ্য অনুশীলন করে তাকে কাজে লাগানো উচিত।

এরপর তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন—বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাভিত্তিক ছবি করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে শিল্পী হিসাবে আপনার ধারণা কি?

তিনি উত্তরে বললেন—ঐ ধারায় ছবি করা সম্ভব কি না জানি না, তবে এখন তো নয়, তবে আমাদের দেশ এখনও যে পরিমাণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে ছেয়ে আছে সে ক্ষেত্রে এই জাতীয় ছবির উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে, সেখানে ফিল্মের মাধ্যমে তাদের সংস্কারসাধন সম্ভব, কারণ ফিল্মের প্রসার সুবিস্তৃত। একটু থামলেন বসন্ত চৌধুরী, সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে আবার বলতে থাকেন—আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিই এখানে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—যে সব দেশে ফিল্ম রাষ্ট্রায়ত্ত, সেখানে রীতিমত সাহসের সঙ্গে এই জাতীয় প্রচেষ্টায় রূপদান হয়। তার শিক্ষামূলক ছবি আমাদের দেশে যে হয়-নি বা হয় না এমন কথাও তো বলা চলে না, আমাদের দেশেও হয় বৈ কি।

প্রশ্ন করি—শিল্পীর জীবনে, আপনার মতে, সত্যিকারের আনন্দের বীজ কিসে নিহিত আছে—জনগণের বিপুল সমাদরে পূর্ণ শিল্পী একটি কথায় উত্তর দিলেন—কথাটি হল স্বীকৃতিতে।

আজকাল প্রায়শই নানাজনের রচনায় 'প্রকৃত শিল্পী' কথাটি পাওয়া যায়। শিল্পী কখনও অপ্রকৃত হতে পারে না, অপ্রাকৃত হতে পারেন এবং হয়েও থাকেন, কিন্তু অপ্রকৃত নয়—তা ছাড়া পরিপূর্ণতা না-এলে শিল্পীর পর্যায়ে তাঁর জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে না—সে ক্ষেত্রে 'প্রকৃত শিল্পী' কথাটি নিছক একটি ভাষার আতিশয্য মাত্র, উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়, কথাপ্রসঙ্গে পরিষ্কার হ'ল যে, এ-বিষয়ে বসন্ত চৌধুরী কোন ভিন্নতর মত পোষণ করেন না।

আজকের দিনে চলচ্চিত্রের ধারা যে-পথে প্রবাহিত হচ্ছে, সে পথ ঠিক কি ভুল—এ সম্বন্ধেও আজ আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই, বসন্ত চৌধুরীর এ বিষয়ে মন্তব্যটি কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বললেন—সমকালের ভূমিতে এ বিষয়ে কি কখনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, চলচ্চিত্রের আজকের অনুসৃত পথ যথার্থ কি ভ্রান্ত, তার সদুত্তর কিছুতেই আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে রায় দেবে ভবিষ্যৎ, বর্তমান নয়।

অরোরা নিবেদিত রাজর্ষি রামমোহনের জীবনীচিত্রে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল যোগ্য শিল্পীই নির্বাচিত হয়েছেন—এ কথা বললে অতিরঞ্জনের দোষে বিন্দুমাত্র দুষ্ট হতে হয় না। অভিনেয় চরিত্রের ভাব, আদর্শ ও বক্তব্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করে নিজের প্রতিভার সাহায্যে শিল্পী যদি তাকে প্রকাশ করতে পারেন তাহলে সে রূপদান সার্থকতায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেই—বসন্ত চৌধুরীর বিষয়ে এখানে সে আশা অনায়াসে পোষণ করা যায়; এ সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয় প্রকট হতে পারে না। এই চরিত্রে অভিনয়ের আহ্বান যখন এল তখন তাঁর মনের অবস্থা সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন যে, প্রথমে এক অভিনব রোমাঞ্চ তাঁর মধ্যে বইয়ে দিল এই আহ্বান, তবে সে রোমাঞ্চে ঈষৎ ভীতিও প্রচ্ছন্ন ছিল, কারণ চরিত্রটি কার—আধুনিক ভারতের জন্মদাতা, নবচেতনার মন্ত্রোদ্গাতা, নতুন পথের

প্রণম্য প্রদর্শক—রাজা রামমোহনের—এই চিন্তাই কিঞ্চিৎ ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এস্টিমেশান যেন খেই হারিয়ে যেতে থাকে। রাজর্ষি রামমোহনের জীবনীচিত্রে তার বলিষ্ঠ, প্রাণস্পর্শী ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক অভিনয় তাঁর শিল্পিজীবনের একটি দিকচিহ্ন সৃষ্টি করবে এ-বিশ্বাস আমরা রাখি।

কথার ফাঁকে গোটা ঘরটির দিকে একবার চোখ মেলে তাকাই। হ্যাঁ বলতে গেলে সারা পৃথিবীকে যেন ঘরটির মধ্যে গুটিয়ে এনেছেন বসন্ত চৌধুরী। বিশ্বের নানা দেশের নানা মূল্যবান বস্তু ঘরটিকে একটি অপূর্ব সংগ্রহশালায় পরিণত করেছে। যার ভিতর দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে—তিনি শুধু 'অভিনয়শিল্পীই নন, ইতিহাস, শিল্পকলা, সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর দখল কম নয়, প্রত্নদ্রব্য সংগ্রাহক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

তাঁর গাড়িতেই তাঁর সঙ্গে কিছুদূর এলুম, আসতে আসতে কথা উঠল একজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর সম্বন্ধে সেদিন ৩রা ডিসেম্বর সেই শিল্পীর শুভজন্মদিন। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসু সেদিন তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের বয়সটি অতিক্রম করে গেলেন।

'নিজের অভিনয়ে কিছু না কিছু ত্রুটি আমি খুঁজে পাই'—

—কণিকা মজুমদার

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

সুনীতি দেবী প্রায়ই অনুরোধ করেন—গল্প শোনান, শোনান গল্প। গল্প—তবে অন্য কোন গল্প নয়, জীবনের গভীর তত্ত্বসমন্বিত নয়, নয় কোন দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধ, নয় কোন সক্ষম বক্তব্যে ভরপুর—নিছক একটি ভূতের গল্প।

সুনীতি দেবী? পিতৃপরিচয়ে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ে আর স্বামীর পরিচয়ে তিনি কুচবিহারের মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্ত্রী (প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, জয়পুরের বর্তমান মহারাণী ভারতীয় লোকসভার সদস্যা গায়ত্রী দেবী এঁরই পৌত্রী)। স্বপরিচয়েও তিনি অনন্যা। সে কালের বাঙলার মহিলা কবি ও শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, সুনীতি দেবী (১৮০০—১৯৩২) তাঁদেরই অন্যতমা। ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগে মহারাণী সুনীতির এবং সেই ভাল লাগার জন্যেই বাঙলা সাহিত্যকে চিরকালের দাবীতে তিনি তাঁর কাছে ঋণী করে গেছেন। কেন না, তাঁদেরই পূর্বোক্ত অনুরোধের তাগিদে একটি নয় একাধিক ছোটগল্প রচনা করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে—যার ফলে বাঙলা সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে, অতএব এদিক দিয়ে সুনীতি দেবীর পরোক্ষ অবদানও অনস্বীকার্য। এই একাধিক ছোটগল্পের মধ্যে মণিহারা অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে 'মণিহারা'কে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন সত্যজিৎ রায়। এই ছবিটির মাধ্যমে বাঙলা দেশের চিত্রজগতে এক নতুন নায়িকার আবির্ভাব হল। যাঁর বাচনভঙ্গী, অভিব্যক্তি, চলাফেরা সব মিলিয়ে এক বিশিষ্ট শিল্পীর চিহ্ন বহন করে। তাঁর নাম কণিকা মজুমদার। মণিহারার (তিনকন্যা) বাঙলা দেশের দর্শক তাঁকে আরও কয়েকটি ছবিতে দেখেছেন তবে তাঁর প্রথম অভিনয় দর্শকের মনে যে গভীর রেখাপাত করে গেছে তার আবেদন অনতিক্রম্য।



● কণিকা মজুমদার

নৃত্যগীতে দখল ছেলেবেলা থেকেই। তার চর্চাও ছিল অব্যাহত, কিন্তু চলচ্চিত্রে যোগদানের আগে শিক্ষিকা হিসাবে তাঁকে দেখা গেছে। এ্যাগুজ স্কুলের অন্যতমা শিক্ষিকা কণিকা মজুমদার, আজ বাঙলা চিত্রজগতের সুপরিচিতা নায়িকা এবং দর্শকসমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও তাঁর, বলা বাহুল্য, অধিকারগত।

চলচ্চিত্রে যোগদান তাঁর সহজভাবে হয় নি। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের যোগাযোগ ছিল, তাই সত্যজিৎবাবুর ছবি বলেই চিত্রাবতরণ সেদিন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। কারণ চিত্রে অভিনয়ে পরিজনবর্গের সম্মতি ছিল না। পারিবারিক কোণ থেকে সেদিন চিত্রে অভিনয়শিল্পিরূপে আত্মপ্রকাশ সম্মতি লাভ করে নি।

আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি—'তিনকন্যার' কাজ তো শেষ হ'ল। সে ছবিতে যোগদানে আপনি অনুমতি পেয়েছিলেন সত্যজিতের ছবি বলে। কিন্তু, তারপর অন্যান্য ছবিতে আপনার অভিনয়ের ইতিহাস কি?

তিনি উত্তরে জানালেন সত্যজিৎবাবুই মৃণাল সেনের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন। মৃণালবাবুর ছবি 'পুনশ্চ'তে নায়িকার ভূমিকায় আমি অভিনয় করি। তারপর—একটু হাসলেন কণিকা মজুমদার—হাসিমুখেই বললেন—তারপর দেখতে দেখতে সব বাধা, সব আপত্তি মিলিয়ে গেল, আর কোন প্রতিবন্ধকতা রইল না।

তিনকন্যা, পুনশ্চ, আগুন, সন্ধ্যারাগ, অগ্নিশিখা, কুমারী-মন, কাঞ্চনকন্যার সার্থক শিল্পী কণিকা মজুমদারকে এবার দেখা যাবে 'প্রথম প্রেম' ছবিতে। লক্ষণীয় কণিকা মজুমদার-অভিনীত ছবিগুলির অধিকাংশেরই কাহিনী বাঙলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে। যেমন—আগুন, সন্ধ্যারাগ, প্রথম প্রেম-এর কাহিনীকার যথাক্রমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার সন্ধিস্থলে তাঁর বাড়িতে বসে কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল—আপনি ছবি দেখেন?—বিশেষত আপনার ছবি?

তিনি বললেন—বাঙলা ছবি রীতিমত দেখি এবং নিজের ছবি তো দেখিই।

জিজ্ঞাসা করি—কোন মনোভাব নিয়ে আপনি নিজের ছবি দেখেন?

হঠাৎ কি এক বিশেষ প্রয়োজনে দু' মিনিটের জন্যে শিল্পীকে এই সময়েই একটু স্থানান্তরে যেতে হ'ল। ফলে, সাময়িকভাবে আলোচনায় একটু ছেদ পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসেন শিল্পী—আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—নিজের ছবি আমি বেশ খুঁটিয়ে দেখি। দেখি চুল চিরে, করি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার। এমনি একটা উপর-উপর দেখে চলে আসা আমার স্বভাবের বাইরে—অর্থাৎ সেখানে তিনি দর্শিকাই যেন। তিনি বিচারিকাও, নিজের ছবি বলে বিন্দুমাত্র মমতা বা কোনপ্রকার দুর্বলতা তাঁকে গ্রাস করতে পারে না এবং সেই বিচার-বিশ্লেষণের ফলে কিছু ত্রুটিও তাঁর চোখে ধরা পড়ে যায়। নিজের প্রত্যেকটি অভিনয়ে কিছু ত্রুটি তাঁর সামনে ধরা পড়েছে।

প্রশ্ন করি—নিজের ছবি দেখে উপরোক্ত মনোভাব ছাড়া অন্য কোন মনোভাব আপনাকে আশ্রয় করে?

উত্তরে জানালেন—হ্যাঁ, ছবি দেখতে দেখতে আমার কখনও মনে হয় যে, আমি বোধ হয় নিছক ডিরেক্শান ফলো করে চলেছি, আবার কখনও মনে হয় যে চরিত্রে যেন মিশে যেতে পেরেছি অর্থাৎ যার মূল কথা—কোন কোন চরিত্রে তিনি একীভূত হয়ে গেছেন সেখানে অভিনেয়-চরিত্রের সঙ্গে অভিনয়শিল্পীর সর্বপ্রকার প্রভেদ শূন্য হয়ে গেছে, 'আমার আমিকে মিলিয়ে দিলেম' কথাটিই যেন তখন সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার কোন কোন চরিত্রে সে জিনিস অনুপস্থিত থেকে যায়—সেখানে চরিত্রায়ণ যেন যান্ত্রিক অনুসরণমাত্র—তাঁর দৃষ্টিতে সেখানে দীপ্ত প্রাণের পূর্ণপ্রকাশ যেন অবর্তমান। এ-হেন সময়ে যে কথা বারংবার তাঁর মনে হয়েছে, তা হল—'এখন যা দেখছি, তখন এগুলো ধরতে পারি নি কেন?'

কথা উঠল ইংরাজী ছবি প্রসঙ্গে। তিনি বললেন, ইংরাজী ছবি থেকে আমাদের নেওয়ার আছে বৈ কি এবং তাও সামান্য নয়—অনেক কিছু নেওয়ার আছে, কিন্তু—কি জানেন, তার যথার্থ প্রয়োগ আমাদের দ্বারা হয় না, সেইখানেই তো অসুবিধা।

জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে প্রশ্নিতা হওয়ার পর সে বিষয়ে তিনি উত্তরে জানালেন যে, শিল্পীর জীবনে জনপ্রিয়তার মূল্য নিশ্চয়ই আছে আর সে মূল্যও সামান্য নয়, জীবনে এর প্রভাবও অবশ্যস্বীকার্য। তবে নিজের তৃপ্তি-অতৃপ্তির কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না—তার আবেদনও কম নয়। জনগণের অভিশাপ-আশীর্বাদ যেমনই প্রভাবশীল, শিল্পিসত্তার তৃপ্তি-অতৃপ্তিও যথেষ্ট আবেদনবাহী। জনগণের সমর্থন শিল্পীকে ভরিয়ে দেয় অফুরন্ত প্রেরণায়, তাঁর পথ চলার ক্ষেত্রে তা এক পরম পাথেয়, এই জনপ্রিয়তা তাঁর যাত্রার সামনে তুলে ধরে মুঠো মুঠো উৎসাহ, সেই উৎসাহ থেকেই আসে শক্তি, প্রেরণা, আনন্দ।

তাঁর মতে শিল্পী-জীবনের সার্থকতার শেষ কথা কি জানতে চাওয়ায় তিনি জানান—শিল্পী যখন কোন চরিত্রের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে মিশে যেতে সমর্থ বা সমর্থা হন—সেইখানেই তাঁর শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার চাবিকাঠি। তাঁর মতে তার চেয়ে বড় সার্থকতা শিল্পীর জীবনে আর থাকতে পারে না। অর্থাৎ সার্থকতা আসবে সৃষ্টির আনন্দ থেকে, সৃজনৈপুণ্যই সার্থকতার পথ তৈরি করে দেবে।

আমার পরবর্তী জিজ্ঞাসা—কোন ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে আপনি আনন্দ পেয়ে থাকেন।

শক্তিময়ী শিল্পীর তরফ থেকে উত্তর আসে—ট্র্যাজিক চরিত্র।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অভিনয়জীবন গ্রহণ করার পূর্ব থেকেই নৃত্যগীত-অনুশীলনে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিনী। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের ভাষায়—আমি যা কিছু শিখেছি, তা শিখেছি দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে।

আকাশবাণীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রথম গড়ে ওঠে খুব সম্ভব ১৯৫৩ সালে—সেদিন থেকে সময় দেখতে দেখতে প্রায় একটি যুগ আজ এগিয়ে গেল।

সন্ধ্যারাগ যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অজানা নয় যে, সংস্কৃত উচ্চারণ শ্রীমতী মজুমদারের কত অকৃত্রিম, কত জড়তাবিহীন

এবং কত লালিত্যপূর্ণ। উর্দু ভাষার সঙ্গেও তাঁর অপরিচয় নেই। বর্তমানে ফরাসী ভাষার সঙ্গে তাঁর মিতালি গড়ে উঠছে।

সেদিন দু' ঘণ্টাব্যাপী তাঁর সঙ্গে আলোচনার শেষভাগে চলচ্চিত্রের কয়েকটি সমস্যা, চলচ্চিত্রের বর্তমানকালের কয়েকটি রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অভিমত জানা যায় নি, কারণ সেই প্রশ্নগুলির উত্তর তিনি দেন নি।

'স্বরলিপি প'ড়ে গাইতে পারলেই শিল্পী হওয়া যায় না'—

—চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

'পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থোরা দূর দিয়ে যাইয়ে!!
হেথা সা-রে-গা-মা-গুলি সদাই করে চুলোচুলি
কড়ি-কোমল কোথা গেছে তলাইয়ে
হেথা আছে তাল কাটা বাজিয়ে—
বাধাবে সে কাজিয়ে
চৌতালে ধামারে
কে কোথায় ঘা মারে
তে-রে কেটে, মে-রে-কেটে, ধাঁ-ধাঁ-ধাইয়ে!'

কার লেখা?—অন্য কারো নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। সেদিন এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে এই উদ্ধৃতিটি শেষ করে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন—অথচ দেখুন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই গানকে এই পর্যায়ে আজ নামিয়ে আনছেন কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়।—আরো একটু প্রাঞ্জল হলেন শিল্পী, বললেন—তাঁরা মনে করেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তাঁরাই যেন একমাত্র ধারক ও বাহক, রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁদেরই যেন একচ্ছত্র অধিকার মেকি সুরে, মিহি গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া যায় না, সুরেলা গলায় যাই গাওয়া যায় তাই গ্রহণযোগ্য গান পদবাচ্য, অতএব তার প্রতি উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করি—এর ফল কি হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর এল—এই সীমাবদ্ধতার জন্যেই অনেকের কাছেই রবীন্দ্রনাথ দূরে থেকে গেছেন অথচ দেখুন গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দিলেন। গোঁড়ামি, সংস্কার পুরোপুরিভাবে বর্জন করে গতানুগতিকতাকে শতহস্ত দূরে রেখে রবীন্দ্রনাথ গানের উৎকর্ষসাধনে এগিয়ে এলেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব কোণ থেকে বললেন—তিনিই প্রথমজন যিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হাত দেন।

আমার পরবর্তী প্রশ্ন আপনার মধ্যে সঙ্গীতানুরক্তি এল কি করে?

বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে আবার আমাদের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত করলেন শিল্পী। বললেন—গানের সঙ্গে আমার মনে হয় আমার যেন শুধু এ জন্মেরই নয়, যেন জন্মজন্মান্তরের যোগাযোগ। আপনা থেকেই জীবনের সেই বোধনপর্বে কোন অলক্ষ্যে যে সঙ্গীত আমায় হাতছানি দিল তা নিজেই আজ আর ভেবে পাই না। তবে সে আকর্ষণ যে দুর্নিবার অপ্রতিরোধ্য, অতিক্রমের অতীত এইটুকু বলতে পারি।

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রথমেই কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চায় মনোনিবেশ করেন নি। মার্গসঙ্গীত তাঁকে প্রথম আকর্ষণ করে কিন্তু তারপর তৃষ্ণা তাঁর প্রশমিত হওয়া তো দূরের কথা, উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। সেই তৃষ্ণা নিবারণের অফুরান বারিধারার সন্ধান পেলেন রবীন্দ্রনাথের গানে। যেখানে লক্ষ্য করলেন কথা ও সুরের অপূর্ব মালাবদল। রবীন্দ্রনাথের গান এককথায়



চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

একটি দর্পণ বিশেষ যার ভিতর দিয়ে দেখা যায় সমগ্র ভুবন, ধরা পড়ে যায় পৃথিবীর, জীবনের, সৃষ্টির নানা রূপ, নানা রঙ, নানা রস, নানা রেখা, তাদের বিচিত্র রহস্য, যার মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে শাশ্বত ভারতের মর্মবাণী তারই সাধনায় মনোনিবেশ করলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় মূলধন—একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর প্রখর সুরবোধ, এবং নিবিড় অনুভূতি।

কথায় কথায় একটু প্রসঙ্গান্তরে চলে যাই। ক্ষণকালের জন্য আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেন শ্রীমধুসূদন আর ছন্দরাজ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁদের কাব্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান। আবার ফিরে আসি নির্দিষ্ট গণ্ডীতে।

জিজ্ঞাসা করি রেকর্ড ও রেডিও প্রচারের দুই বিরাট বাহন—তবে মাধ্যম হিসাবে এরা কি একই শ্রেণীতে পড়ে?

শিল্পী উত্তর দেন—দু'টো দুইজাতের, দুটোরই জন্যে নির্দিষ্ট দুটি আলাদা জগৎ। তবে এ কথা সব ক্ষেত্রেই বলা চলে না, অনেকেই, আছেন যাঁরা রেকর্ডও কেনেন, রেডিও শোনেন আবার এও ঠিক অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে রেডিও যে অনুপাতে লোকে শোনেন, সে অনুপাতে রেকর্ড তাঁরা কেনেন না। রেকর্ড জগৎ সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে বললেন এ দেশের রেকর্ড-জগতের চেয়ে, আমার যতদূর ধারণা বিদেশের রেকর্ড-জগৎ অনেক বেশি গঠনমূলক কারণ সেখানে শিল্পীরা অনেক কিছু সুযোগ পেয়ে থাকেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর অভিমত এই যে—সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে দৃষ্টির পরিবেশ ও মেজাজের উপর। যদি দেখা যায় সেখানে একটি গান আবশ্যক—তা হলে তো কোন কথাই ওঠে মা, তবে যদি গান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেখানে গানের সর্বনাশ, ছবিরও ক্ষতি, আসলে ছবিতে গানের প্রয়োগরীতি সম্পর্কে পরিচালকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রসার ও চর্চা সম্পর্কে সরকারী নীতি প্রসঙ্গে তিনি বললেন—এই সকল বিষয়ে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন তাঁদের উৎসাহ আছে, সদিচ্ছা আছে তবু প্রচেষ্টাগুলি সার্থক হচ্ছে না যথার্থ পরিকল্পনার অভাবে। স্কলারশিপ দিয়ে শেখান হচ্ছে অনেককে কিন্তু তাদের ভিতর থেকে শিল্পী হিসাবে আবির্ভাব হচ্ছে ক'জনের? এরপর নিজের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করলেন যে কাব্যের সহায়তায় সেই বাক্যটি হল—স্বরলিপি দেখে গান পড়তে পারা আর শিল্পী হওয়া এক জিনিস নয়, শিল্পীত্ব সেইখানেই সীমাবদ্ধ নয় সেখানেই তার শেষ কথা নয়।

আজকের দিনের তারুণ্যের অন্যতম প্রতীক, সুদর্শন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় বহুজনকে গান শিখিয়ে থাকেন তাঁর নির্দেশনায় এবং শিক্ষায় অনেকেরই সঙ্গীতসাধনা এগিয়ে চলছে। তবে তাঁর শিক্ষার রীতিটিও গতানুগতিক নয়, কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরও সেখানে বিদ্যমান, 'তাঁর নিজের ভাষায় গানটি আগে ভাল করে পড়তে দিই, তার কথাগুলি বিশেষভাবে বোঝাবার জন্য, কথাগুলি সম্যকভাবে বুঝলে সমগ্র গানটির মূলকথা উপলব্ধি করা যাবে আর তবেই তা পরিবেশন সম্ভব, উপলব্ধি না এলে প্রকাশ সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে এক অফুরন্ত ঐশ্বর্য রেখে গেছেন, কোন বিষয়ে তাঁর গান নেই, জীবনের কোন প্রাঙ্গণে পড়ে নি তাঁর পদচিহ্ন—তাদের মধ্যে তাঁর শেষ জীবনের গানগুলি আত্মহারা করে দেয় চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন—তারই মধ্যে আমি যেন এক পূর্ণ সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে পাই, পাই পূজা-প্রেম-প্রকৃতির সমন্বয়ে অপূর্ব মহিমায় বিকশিত রবীন্দ্রনাথকে, জীবন-দেবতা সেখানে যেন সত্যিই জীবনের দেবতা হয়ে উঠেছেন।

ভারতের সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের নবরূপদান সম্বন্ধে বর্তমানে তিনি অনুশীলনরত। গানের প্রসঙ্গে তিনি আরও দু'টি মূল্যবান কথা বললেন—প্রথমটি—স্বরনিক্ষেপ, গানের পদ্ধতি, উচ্চারণ ও ভাবের অভিব্যক্তি সম্পর্কে আরও সাধনা, এবং গবেষণারও দরকার। দ্বিতীয়টি—মাইক্রোফোন যখন অপরিহার্য তখন মাইকের মাধ্যমে গান গাওয়ার রীতিটিও বিশেষভাবে আয়ত্তে আনা দরকার। সেজন্যে প্রকৃত কণ্ঠকে অবদমিত করা অনুচিত কারণ উদাত্ত এবং সুরেলা কণ্ঠই সত্যিকারের সমাদর পেয়ে থাকে। যা ভাল, যা সুন্দর, তাই তো প্রাণকে দোলা দেয়।

কথা বলতে বলতে কি যেন মনে পড়ে গেল শিল্পীর। বললেন—হ্যাঁ, তারপর দেখুন মেকি জিনিস দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করা হয় বটে, তবে তা চিরস্থায়ী হবে না। মেকি কখনও টিকে না, তাকে বিদায় নিতেই হবে, যা সত্য, যা সুন্দর, তাই বেঁচে থাকবে। তাই জয়মাল্য আসবে তারই সাধকের কণ্ঠে।

কলকাতার আরক্ষাবাহিনীর নাট্যানুষ্ঠান

বাংলা ভাষায় আধুনিক যুগে রচিত জীবনীনাটকগুলির মধ্যে প্রখ্যাত কথাশিল্পী ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) 'শ্রীমধুসূদন' এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সার্থক দাবীদার। কলকাতার আরক্ষাবাহিনীর সদস্যগণ গত ২৭এ নভেম্বর নিউ এম্পায়ার মঞ্চে এই নাটকটি নিবেদন করলেন। সমগ্র প্রচেষ্টাটির মধ্যে একদিকে আন্তরিকতা নিষ্ঠার যতখানি পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে সমমাত্রায় দক্ষতা ও কুশলতার চিহ্ন প্রস্ফুটিত হয়েছে। নাটক পরিচালনা করেন শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাম ভূমিকাতেও তিনিই আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর অভিনয়

এক কথায় অনবদ্য। তাঁর অভিনয়ে মধুসূদনের কবি-মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রতিভার বহুমুখীনতা এবং নবযুগ সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর মন মূর্ত হয়ে ওঠে। নাটকটির প্রয়োগপদ্ধতি প্রশংসার দাবী রাখে। বিদ্যাসাগর ও মনোমোহনের চরিত্রে যথাক্রমে অম্বিকা ভট্টাচার্য ও অনিল সরকারের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বিদগ্ধজন উপস্থিত ছিলেন।

শৌভনিক নিবেদিত 'ওথেলো'

মহাকবি সেক্সপীয়রের যে অমর রচনাবলী বিশ্ব সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের গরিমা বহুগুণ বর্ধিত করেছে 'ওথেলো' তাদেরই অন্যতম। কলকাতার বিশিষ্ট নাট্য সম্প্রদায় 'শৌভনিক' এই বিখ্যাত নাটকটির বাঙলায় অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। ওথেলোর কাহিনীসার সম্বন্ধে আজকের দিনে বিশদ বিবরণ দান নিষ্প্রয়োজন। নাটকটি আঙ্গিকে, বিন্যাসে এবং গঠন কুশলতায় সকল দিক দিয়েই সার্থকতার স্পর্শসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সর্বোপরি সুষ্ঠু টিমওয়ার্কও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সকল গুণগুলি নাটকটিকে রসাশ্রিত করে তুলেছে। শৌভনিকের এই নাট্যোপহার দর্শকের অন্তর স্পর্শ করে ও দর্শকচিত্তে এক আবেদন জাগাতে সমর্থ হয়। নাটকটি পরিচালনা ও ওথেলো চরিত্রের রূপ দেন কৃষ্ণ কুণ্ডু। বলা বাহুল্য, এই কর্মে তিনি আশানুরূপ সফলতাই অর্জন করেছেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরাও (গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌর চট্টোপাধ্যায়, অলকা পাল ও শুভ্রা ঘোষ ইত্যাদি) তাঁদের প্রাণবন্ত অভিনয়ে নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

নাচের আসরে জনসনকন্যা

শেরাটন পার্ক হোটেলের বল-নাচের আসরে উপস্থিত শতাধিক নর-নারীর জোড়া জোড়া চোখ প্রত্যক্ষ করল বব কনরাডের বাহুবন্ধনে নৃত্যমানসে নিজেকে সঁপে দিলেন লুসি জনসন। বব কনরাড?—হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা আর লুসি জনসন? এ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনসনের দুই কন্যার কনিষ্ঠা।

অষ্টাদশী লুসি ববকে বলেন—একজন চিত্রতারকার সঙ্গে আলাপ করতে মনে মনে একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল বৈ কি।

বব বলেন—দেশের রাষ্ট্রপতির মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে মনে মনে একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল বৈ কি।

লুসি আরও নিবিড়ভাবে ববের বক্ষলগ্না হন। নাচ প্রাণ পায়। ছন্দে, তালে ভরে ওঠে।

বব বলেন—She's a sweet and a delight to talk to.

দু'জনে অনেক কথা হয়, হঠাৎ বব আশ্চর্য হয়ে যান এক অদ্ভুত প্রশ্নে, এ কেমনতরো প্রশ্ন—লুসি কেন এ প্রশ্ন করে বসল। অষ্টাদশী লুসি জানতে চান কুনি স্টিভেন্সের বয়েস কত?—চিত্রতারকাদের সম্বন্ধে এমনিতেই লুসির কৌতুহল কোন বিধিনিষেধ মানে না, কোন সীমা-পরিসীমা জানে না।

হোয়াইট হাউস লুসির ভাষায়—'এক বিরাট জায়গা আর ঠিক ততখানি অন্ধকার।' অনুরাগীদের অটোগ্রাফের শুধু সই করেন—LUCI. তাঁর প্রহরার জন্য নিযুক্ত সিক্রেট সার্ভিসের কর্মীদের সঙ্গে নিয়োজিত থাকেন লঘু হাস্যরসে, ঠাট্টা-তামাসায় আর খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেন—

'খবর ছড়িয়েছে যে আমি চুলে ডাই করি, কিন্তু আমি তা করি না।'



● অভিনেতা বব কনরাড ও জনসন দুহিতা লুসি

বীটলস প্রসঙ্গে

সমগ্র পাশ্চাত্যের সমাজজীবনে অতি অল্পকালের মধ্যে এক ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন যাঁরা, তাঁরা সংখ্যায় মাত্র চারজন, কিন্তু সারা পৃথিবীতে তাঁদের অনুগামী যে কত, সে সংখ্যা নিরূপিত হওয়ার উপায় নেই। বয়েসের হিসাবে এঁদের কৈশোরও এখন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রান্ত হয় নি, বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এঁরা উল্লেখিত হন—'বয়েস' বলেই এঁদের সমষ্টিগত আখ্যা 'বীটলস'। এঁদের অনুকরণ আজকে কে না করছেন—আপনার, আমার পরিচিত গণ্ডীর মধ্যেই অনেককে দেখতে পাবেন, যাঁরা এঁদের অনুকরণ করছেন কেশবিন্যাসে।

হ্যাঁ সেইখানেই তাঁদের স্বরূপ। এই যুবকবৃন্দ এমন এক বিচিত্র ধরণের কেশচর্চার প্রবর্তন করলেন—তারই অনুসরণ করছে পৃথিবীর এক বিরাট অংশ, সেই তালিকায় রাজকুমারী মার্গারেট (৩৫) ভাবী ইংল্যাণ্ডেশ্বর ওয়েলসের যুবরাজ চার্লস (১৭), রাজকুমারী এ্যানিও (১৫) এক একটি বিশেষ নাম—এমন কি প্রবীণ রাজনীতিক বৃটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী হিউমও (৬২) এই তালিকা-বহির্ভূত নন। এঁদের কেশচর্চার গুণাগুণ সম্বন্ধে এতৎসহ প্রকাশিত আলোকচিত্রটি আপনার মনে একটি সম্যক ধারণা এনে দেবে।

বীটল চতুষ্টয়ের জনপ্রিয়তা কল্পনা করা যায় না। কিশোরী তরুণীমহলে তাঁরা তো উপাস্যস্বরূপ। এঁদেরই একজন রিঙ্গো গেলেন হাসপাতাল। নার্সদের মধ্যে যেন এক নবজীবনের জোয়ার এলো। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল রিঙ্গোর সেবার ভার পাওয়ার। সবাই পালা করে সেবা করে যায় রিঙ্গোর, কারোরই সেবা শেষ হতে চায় না। পৃথিবীর নানা জায়গা এঁরা পরিদর্শন করেছেন। এঁদের দেখবার জন্যে যে ভিড় জমে তাতে আহতের সংখ্যা এত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়—যার ফলে হাসপাতালগুলিকে রীতিমত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ্যামস্টার্ডামে এঁদের দেখার ভিড় সামলাতে ছুটিতে থাকা দু' হাজার পুলিশ কর্মচারীকে কাজে যোগ দেওয়াতে হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় ভিড়ের চাপে একটি ষাট বছরের বৃদ্ধা অজ্ঞান হয়ে গেলেন—জ্ঞান ফিরে আসার পর এঁদের দেখতে পেয়ে এমন আনন্দে মেতে উঠলেন যে সে আনন্দের কাছে একটি তরুণীও হার মেনে যায়। একটি তরুণীর আকুল ক্রন্দনে ছুটে আসে অনেকেই—সে আকাশ-ফাটানো কান্না থামতে চায় না—কি হয়েছে, কান্না কেন? অসংখ্য প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হয় মেয়েটির প্রতি। কি আনন্দ, বীটলসদের দেখলাম—কোনক্রমে কথা ক'টি বলে মেয়েটি আবার কান্নার সমুদ্রে ডুব দেয়।

'এ হার্ড ডেস নাইট' নামক ছবিতে এঁরা অবতীর্ণ হচ্ছেন। মাথার ভিতরকার খেলা দেখিয়ে লোকে যশস্বী হয় কিন্তু মাথার উপরকার খেলা দেখিয়ে এঁরা যে আলোড়ন আনলেন তা সত্যিই বিস্ময়ে মনকে ভরিয়ে দেয়।



● বীটল চতুষ্টয় : পল, জন, জর্জ ও রিঙ্গোর স্থলবর্তী জিম নিকলস

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানাত্মক ডি, লিট উপাধি দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে যথোচিত এবং অভিনন্দনীয়। তথ্য ও প্রচার দপ্তরের ভার শ্রীমতী গান্ধী গ্রহণ করার পর ছ'মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই ছয় মাসে তিনি আপন দপ্তর সম্বন্ধে প্রগতিধর্মী এবং জনকল্যাণকর মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদার্হ। তাঁর যুগোপযোগী মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুসংস্কৃত চিন্তাধারা এ দেশের চলচ্চিত্রজগতে যে এক বিরাট সমৃদ্ধি ও কল্যাণের উৎসরূপে পরিগণিত হবে, বর্তমানে সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দেশের চলচ্চিত্র-শিল্প আজ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন, এই শিল্প শুধু নিছক প্রমোদেরই খোরাক জোগায় না। চলচ্চিত্র বক্তব্য প্রচারের এক মহান বাহন। সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ, বিভিন্ন কলার অপূর্ব সমন্বয় তদুপরি অসংখ্য নরনারীর জীবিকা। অতএব এই বিরাট শিল্পের সমস্যা সারা দেশেরই সমস্যা। সেই সমস্যাগুলি সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তার নবগঠনের ও সংস্কারসাধনের যে সঙ্কল্প শ্রীমতী গান্ধী করেছেন, তা নিঃসন্দেহে চিত্রলোকে এক বিরাট আনন্দের বার্তাবহ। আপন উদ্দেশ্য সাধনের অর্থাৎ রঙ্গজগতের সমস্যা দূরীকরণ ও তার উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যে পন্থা শ্রীমতী গান্ধী অনুসরণ করছেন বলা বাহুল্য, তা সার্থকতারই সরণি।

নিকোলাই চেরকাসভ

(সোভিয়েট রাশিয়ার প্রখ্যাতনামা অভিনেতা)

সোভিয়েট রাশিয়ার যুগপৎ চিত্র ও নাট্যলোকের পুষ্টি ও উৎকর্ষসাধনের মহান সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ যে বিরাট শিল্পী লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত হলেন, তাঁর নাম নিকোলাই চেরকাসভ। তাঁর সাম্প্রতিক চিত্র 'এভরিথিং



● পথপরিক্রমায় চেরকাসভ

স্টেস উইথ দ্য পিপল্' এই সম্মান তাঁকে এনে দিয়েছে কিন্তু এও কারো অজানা নয় যে, ঘোষিত যাই হোক আসলে ষাট-উত্তীর্ণ এই শিল্পসাধকের চল্লিশ বছরের সামগ্রিক রূপার্চনার স্বীকৃতিরই নামান্তর এই পুরস্কার।

চেরকাসভ আসলে জাতশিল্পী। শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রে কেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পদ্যুতির প্রকাশ। তিনি সেই জাতের শিল্পী যাঁরা অনায়াসে ব্যক্তি থেকে সাধারণে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারেন, খুঁটিনাটি থেকে এক সামগ্রিকতায় নিত্য সঞ্চরণশীল।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে বিখ্যাত গায়ক ফিওডোর শালিয়াপিন যুবক চেরকাসভের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কৌতুকশিল্পী হতে বলেছিলেন। তিনি ভুলও বলেন নি। কিন্তু চেরকাসভের শক্তি সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর প্রতিভার বহুমুখীনতা সম্বন্ধে তিনি বোধ করি সচেতনই ছিলেন তাই অভিসার শুরু করেছেন বৃহত্তর পটভূমির দিকে লক্ষ্য করে।

'বলটিক ডেপুটি' ভাল লেগেছিল সকলেরই কিন্তু তার নেপথ্যকাহিনী ক'জন জানেন। তার মুখ্য চরিত্র বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানীর রূপদানের ভার পাওয়ার জন্যে তাঁকে যে কি ক্লেশ বহন করতে হয়েছিল তা হয়তো অনেকেই জানেন না। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধের ভূমিকা তিরিশ বছরের তরুণকে দিতে রাজী হচ্ছিলেন না অনেকেই, কিন্তু শিল্পী বুঝেছিলেন এই চরিত্রটির বয়েস পঁচাত্তর হলেই অন্তরে তার তারুণ্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। পরীক্ষায় অসফলই হলেন, শেষে সফল হওয়া তো দূরের কথা সেই ভূমিকায় অবিস্মরণীয় নৈপুণ্য প্রদান করে চমক লাগিয়ে দিলেন।

'এভরিথিং লিভস উইথ দ্য পিপল'-এ ড্রনভ তাঁর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, শুধু রূপায়ণ বললেই সম্পূর্ণ বলা হয় না। তাই সৃষ্টিই বলছি। এক তীব্র জীবনপিপাসু, মানবপ্রেমী ড্রনভের ভূমিকার মধ্যে চেরকাসভ যেন একাত্ম হয়ে গেছেন।

চেরকাসভ চিন্তার রাজ্যে নিত্য পথিক, ঘোর বাস্তব পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ কখন যে কি ভাবে কল্পনার রাজ্যে পাড়ি জমান তা বলা যায় না। আলগা এলোমেলোভাবে ছাড়া ছাড়া কথা কইতে কইতে হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ হয়ে উঠবেন কথোপকথন তখন আর বাঁধ মানবে না অর্থাৎ তখনই ভাবরাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছেন বুঝতে হবে।

মানুষের সান্নিধ্য নিবিড়ভাবে কামনা করেন চেরকাসভ। নানা শ্রেণীর, নানা মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় তাঁর উদ্দেশ্য। রাস্তায় শিশুদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতে তাঁর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই।

সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে যে টলস্টয়ের অমর রচনা



● নিকোলাই চেরকাসভকে লেনিন পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে

'এ্যানা কারেনিনা'য় এ্যালেক্সি কারেনিনের চরিত্রায়ণের ভার তিনি নিয়েছেন।

আলেকজাণ্ডার নেভস্কি, আইভান দ্য টেরিবল, ম্যাক্সিম গোর্কী, ডন কিসো প্রভৃতি চরিত্রগুলির সার্থক এবং অসামান্য রূপদাতা চেরকাসভের সম্বন্ধেও সেই কথাটি অনায়াসে প্রয়োগ করা চলে, যে কথাটি ড্রনভের উক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কথাটি: 'I'm immortal. My life will continue in people, in students—in their children and in their grand children.'

শিল্পীর বক্তব্য

(লোকশিল্পী মিখায়েল আস্তানগভের চিন্তায়)

সোভিয়েট রাশিয়ার সার্থক লোকশিল্পীর তালিকায় মিখায়েল আস্তানগভ একটি উজ্জ্বল নাম। শিল্পী হিসাবে তাঁর কিছু বক্তব্য তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, বক্তব্যগুলি নিছক ভাষার বাহার বা কল্পনার আতিশয্য নয়, যথেষ্ট পরিমাণে সারগর্ভ এবং উপলব্ধি-সাপেক্ষ। বাঙলা দেশের নাট্যামোদীমহলে সেই বক্তব্য তুলে ধরা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিকতার পরিচয় বহন করে না।

তাঁর মতে শিল্পকে বৃত্তির কোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, তা অত্যন্ত পরনির্ভরশীল কার উপর? প্রথমত ধরুন—নাটকের উপরই তাঁকে সর্বতোভাবে নির্ভর করতে হয়। নাটকের চরিত্রের মূল সুর অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী তাঁর চরিত্র পরিচর্যা করতে হয়। তারপর পরিচালক যেভাবে চিন্তা করবেন সেই অনুযায়ী নটকে কাজ করতে হবে অর্থাৎ নটের অভিনয়ের মধ্যে পরিচালকের চিন্তা আত্মপ্রকাশ করবে। শিল্প-নির্দেশক যেভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি করে পরিবেশ গঠন করবেন, সেই পরিবেশের মধ্যে নটকে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। নাটকের সাফল্য অনেকখানি সুষ্ঠু টিম-ওয়ার্কের উপর। দলগত উৎকর্ষই যেখানে বিচার্য, সেখানে বাধ্য হয়েই একজন নট আর এক বা একাধিক নটের উপর নির্ভর করতে বাধ্য।



● মিখায়েল আস্তানগভ

অতএব দেখা যাচ্ছে শিল্পীর নিজস্ব ইচ্ছা বা কল্পনার প্রকাশের অবকাশ নেই। তার প্রতিটি পদক্ষেপই যেন নিয়ন্ত্রিত তবে কি শিল্পীর কোন স্বাধীনতা নেই, তার প্রতিটি পদক্ষেপই কি নিয়ন্ত্রিত, সে কি ক্রীড়নক মাত্র, তুলনীয় দাবার ঘুঁটির সঙ্গে? না—নিয়ন্ত্রিতভাবেই হোক আর যে ভাবেই হোক তার মাধ্যমে যে রূপের সৃষ্টি হয়—সেই রূপ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে এক রসের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, সেই পরিমণ্ডলে তার একচ্ছত্র অধিকার, সেখানে সে সম্রাট, একমেবাদ্বিতীয়ম।

সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পীদের প্রসঙ্গে আসা যাক। তাঁর সুযোগ-স্বাধীনতার পরিধির পরিমাপের একবার সীমা নির্ণয় করা যাক। তাঁর অভিনীত চরিত্রের দার্শনিক ভাষ্য সৃষ্টিতে তাঁর অখণ্ড অধিকার, তাঁর অভিনীত চরিত্রের মূল বক্তব্যটির সঙ্গে দর্শক সাধারণকে একাত্ম করে তোলার ক্ষেত্রে অভিনয়ের দিক দিয়ে যে পন্থা অনুসরণ তাঁর মতে প্রয়োজন তিনি সে পন্থা অনুসরণে অধিকারী। পরিচালক বা নাট্যকারকেও তিনি বুঝিয়ে দিতে পারেন যে চরিত্রমর্যাদা বিচার করে এবং নাটকের খাতিরেই তিনি নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করছেন—এ যদি তিনি না পারেন তা হ'লে তাঁর ভূমিকাগ্রহণই করা উচিত নয়।

আস্তানগভ তাঁর নিজের জীবনের ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন যে, বছর দশেক আগে 'বিফোর সানসেট' নাটকটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করার ডাক আসে তাঁর কাছে। নাটকটির মধ্যে একটি তরুণীর সঙ্গে এক পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির প্রেমকাহিনী ও তার ফলে শেষোক্তের সন্তান-সন্ততির মধ্যে গভীর অসন্তোষ বিধৃত হয়েছে। শিল্পী প্রথমে পড়ে দেখলেন যে এর মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন সংগতি তিনি পাচ্ছেন না। কিছুকাল পর তাঁর চূড়ান্ত উত্তর জানাবার পূর্বে আবার তিনি নাটকটি পড়লেন তখন সেই সংগতি উপলব্ধ হল তাঁর দ্বারা। বুঝলেন শুধু প্রেমই এখানে উপজীব্য নয়। এই প্রেমের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক নবজন্মের বাণীরই প্রচার করা হয়েছে। নাটকের সেই মূলকথা।

আসলে শিল্পীকে চরিত্রের ভাষা বুঝতে হবে। জানতে হবে পরিবেশ। আস্তানগভ একটি স্কুলশিক্ষকের চরিত্রায়ণের ভার পেলেন। এই চরিত্রটির রূপদান যাতে সার্থক হয় সে জন্যে সোভিয়েট স্কুলগুলির সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন, অবসর সময়ে নিজের স্কুল জীবনের

কথা ভাবতে থাকেন, কখনও সময় কাটান বিভিন্ন স্কুলে, লক্ষ্য করেন সেখানকার কার্যধারা। এ সবের পর তিনি যোগ দেন মহড়ায়।

চরিত্রের মূল ভাষা অনুধাবন করে তার যথার্থ রূপায়ণই শিল্পীর প্রধান দায়িত্ব, সেই রূপায়ণ দর্শকের মনের মধ্যে যাতে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে এবং অভিনেয় চরিত্রের আসল বক্তব্য সম্বন্ধে দর্শকও যাতে সমানভাবে পরিষ্কার হতে পারে আস্তানগভের মতে সোভিয়েট শিল্পীর লক্ষ্য সেই দিকে।

পরীক্ষৎ সাহনী—রাশিয়াবাসী ভারতীয় তরুণ চিত্র-পরিচালক

ভারতবর্ষ বিদেশের কাছ থেকে শুধু নেয়ই নি। বিদেশকে সে দিয়েওছে অনেক দিয়েছে না বলে দিয়ে চলেছে বললে বিন্দুমাত্র আতিশয্যের দোষে হতে হয় না দুষ্ট। না, এ নিছক দেশস্তুতি নয়, অন্তঃসারশূন্য দম্ভোক্তি নয়, এ অকাট্য সত্য, পরীক্ষৎ সাহনী তার অন্যতম স্পষ্ট প্রমাণ।

চব্বিশ বছরের এই সম্ভাবনাময় ভারতীয় তরুণের নাম ভারতবর্ষে আজও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, কিন্তু রাশিয়ার চিত্রমহলে সম্প্রতি টেলিভিসানে প্রদর্শিত 'এ মিটিং' ছবিটির ভারতীয় পরিচালক পরীক্ষৎ সাহনী এক সমাদৃত নাম। বিচিত্র তাঁর কর্মজীবনের ইতিহাস। 'এ মিটিং' কে কেন্দ্র করেই চিত্রলোকের সঙ্গে তাঁর প্রথম সংযোগ, তার আগে তাঁর একমাত্র নিজস্ব পরিচিতি ছিল—ইউ এস এস আর ইনস্টিটিউট অফ সিনেমাটোগ্রাফীর এক ছাত্র। তার আগে দিল্লীতে ফ্যাকাল্টি অফ হিস্ট্রী অফ লিটারেচারে তাঁর সময় অতিবাহিত হত প্রগাঢ় অধ্যয়নে। বোম্বাইয়ের জুহু এ্যামেচার স্টুডেন্টস থিয়েটারের সঙ্গে তিনি যখন সংশ্লিষ্ট সেই সময় চলচ্চিত্রের কলাকৌশল সম্পর্কিত গ্রন্থাদি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আইজেনস্টাইন, পুডভকিন প্রমুখ রুশ পরিচালকদের রচনাগুলি তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

পরীক্ষৎ আজ নিজের কৃতিত্বে ও প্রতিভায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন ঠিকই, তবে তাঁর পিতৃপরিচয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট চিত্রতারকা বলরাজ সাহনীর পুত্র তিনি।

মস্কো সম্বন্ধে বলরাজই পুত্রের মনে আগ্রহ এনে দেন। বাবার মাধ্যমেই মস্কোর আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন। তবে চলচ্চিত্রশিক্ষার জন্যে পৃথিবীতে তো আরও নানাস্থান আছে। ইটালি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য—এ সব স্থানের পরিবর্তে মস্কোকে তিনি বেছে নিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় 'ইনস্টিটিউট' সম্বন্ধে বাবার একটা বিশেষ আগ্রহ দেখি, তিনি বলেন, ভাবীকালের চিত্র-নির্মাতাদের শিক্ষার জন্য এই ইনস্টিটিউট একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র।

তাই মস্কোয় এলেন পরীক্ষৎ। সুপ্রশস্ত বক্তৃতাগৃহ চিত্র-গ্রহণের ক্যেত্রাদি শিক্ষণ-স্টুডিও সব মিলিয়ে ইনস্টিটিউট এক অভিনব সুন্দরের মূর্তিতে প্রতিভাত হল পরীক্ষৎ-এর দৃষ্টিতে। রুশ দেশের চিত্রজগতের বহু বিরাট ব্যক্তিত্ব এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত। বহু সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী এখানকার চূড়ান্ত পরীক্ষার ছাড়পত্র নিয়ে কর্মজীবনে অবতীর্ণ হয়ে অর্জন করেছেন প্রভূত খ্যাতি। তাঁদের অনেকে ভরপুর হয়ে উঠেছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে। শিক্ষকরূপে পরীক্ষৎ পেয়েছেন 'দি হাউস আই লিভ ইন'-এর অন্যতম প্রযোজক ইয়াকভ সেগেলকে। তাঁর শিক্ষাদান যেমনই মূল্যবান তেমনই অপরিহার্য। সেগেল ছাত্রদের সজীব চিন্তাশীলতার উপর জোর দিতে বলেন। ছাত্রমহলে শুধু তিনি গুরুই নন, সহধর্মী বন্ধুও। কোন কিছু চাপিয়ে দিও না, শিল্পীর মনস্তত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা কর, সেই বুঝে তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নাও—সেগেলের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টায় তিনি নিরত।

রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় পরিচালকদের সঙ্গে আলাপে, কথোপকথনে চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেছেন পরীক্ষৎ। আজ চার বছর তিনি মস্কোয়। রুশভাষা প্রায় তাঁর মাতৃভাষার মত হয়ে গেছে। মুলকরাজ আনন্দের গল্প অবলম্বনে রূপায়িত 'এ মিটিং' তাঁর প্রথম ছবি বললে আপত্তি তাঁর দিক থেকেই আসে। তিনি বলেন—'না না, ছবি বলবেন না, একটা প্রচেষ্টামাত্র।'



● এক দুরূহ সমস্যার আলোচনার দ্বারা সমাধান করছেন পরীক্ষৎ সাহনী

মায়া প্লিসেটস্কায়া

(ব্যালে-নৃত্যের ইতিহাসে এক বরণীয় নাম)

ব্যালে-নৃত্যে যাঁর অপার নৈপুণ্য সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে বহুগুণ, সম্প্রতি লেলিন পুরস্কারে সম্মানিতা মায়া প্লিসেটস্কায়ার মাটির সঙ্গে যোগ নেই বললেই চলে। না, যে অর্থে এ কথা বলা হয় এ মন্তব্য সে অর্থে নয়। তাঁর অনুষ্ঠান যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের অজানা নয় যে তাঁর নাচ দেখতে দেখতে এই ধারণাই জন্ম নেয় যে, শিল্পী যেন লঘুপক্ষ ডানা মেলে বাতাসের রাজ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। একজন সমালোচকের ভাষায় তিনি—'কুইন অফ দ্য এয়ার, আর একজনের ভাষায় 'মিস্ট্রেস অফ দ্য এয়ার'।



● ব্যালে-সম্রাজ্ঞী মায়া : এক অপরূপ নৃত্য ভঙ্গিমায়



● রূপসজ্জার বাইরে অপরূপা শিল্পী ব্যালে-সম্রাজ্ঞী মায়া

ব্যালে-নৃত্যের ইতিহাসে আজ তিনি একটি স্মরণীয় নাম। এই নৃত্যের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদানের অন্ত নেই। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় এই নৃত্য যেন এক পরিপূর্ণ প্রাণের স্পর্শে লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এই নৃত্যে এক রোম্যাণ্টিকতার আমেজ এনে দিয়েছেন মায়া। পুরোনো রীতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাহীনা নন তাঁর শিল্পমন নিয়ে তিনি বুঝেছেন গতানুগতিকতা আর ক্ল্যাসিক্যাল রীতির অর্থ এক নয়। তাই গতানুগতিকতা পরিহার করে নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন ক্ল্যাসিক্যাল রীতিকেই অবলম্বন করে বর্তমানের ধারায় তাকে নবরূপ দিয়ে। এই নবরূপায়ণের মধ্যেই তাঁর উপস্থাপন কুশলতায় প্রমাণ। সনাতন নৃত্য আঙ্গিকের পুনঃ প্রচলনে তিনি পরিপূর্ণ সফলকাম, তারই ফলে ব্যালে-নৃত্যের জগতে একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান মিলল। অভিব্যক্তির প্রকাশ তাঁর শিল্পে প্রকট। অভিব্যক্তি নাচের একটি প্রধান অঙ্গ এই সত্য তিনি প্রতি ছন্দে অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁর প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন, ঘূর্ণন পদক্ষেপ সব কিছুর মধ্যেই এক প্রাণের সজীব স্পর্শ এবং বিরাট অভিব্যক্তি বিদ্যমান। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কখনও কখনও রোম্যাণ্টিকতার মধ্যে আধুনিক সঙ্গীতের একটি সম্মিলনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেখানেও নয়। তাঁর যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিশ্বের রসিক সমাজে অশেষ অপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিতা করেছে সেটি হল একদিকে যথেষ্ট তীব্রতা অন্যদিকে অপরিসীম নমনীয়তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সম্মিলিত হয়ে গেছে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে কাব্যের ঝঙ্কার, নৃত্যশিল্পী হলেও তাঁর মন কাব্যধর্মী, সমগ্র পরিবেশ তাঁর তাই কাব্যময়। বর্ণবৈচিত্র্য তাঁর প্রিয়। কি বেশভূষায়, কি দৃশ্যপটে, কি মঞ্চ অলঙ্করণে বর্ণের বাহার

দেখা যায়। জীবন্ত, উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক রঙ তাঁর প্রিয়। কট' ধূসর বর্ণের সঙ্গে তাঁর রীতিমত গরমিল। নাচের মধ্যে তিনি যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাচের তালে তালে নৃত্য পরিকল্পনা, তার প্রয়োগে এবং পরিপার্শ্ব গঠনে, বর্ণনির্বাচনে সর্বত্রই নির্ভীকতার স্বাক্ষর প্রকট, যাতে প্রমাণ হয় ঈশ্বর এই মহিলাটির মধ্যে শুধু সৃজনী প্রতিভাই দেন নি, সেই সঙ্গে অপর্যাপ্ত দুঃসাহসিকতাও দিয়েছেন যা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ আশ্চর্য এই যে গোড়ার দিকে মায়ার নৃত্যধারা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, আজ তাঁর মধ্যে যে রীতির, যে আঙ্গিকের, যে ভাবধারার প্রকাশ সেদিন এগুলি তাঁর মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মায়াকে এক যুগসন্ধিক্ষণের শিল্পী বলা চলে। বিশ্ব ইতিহাস যখন একটি মোড় নিচ্ছে সেই সময় তাঁর আবির্ভাব (প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা বলছি), সেই যুগবিবর্তনের ছায়া তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পড়েছে। সেই বিশেষ সময়ের প্রভাব ছায়া ফেলেছে তাঁর মনে, তারই প্রকাশ তাঁর সৃষ্টিতে।

মায়া প্লিসেটস্কায়া জীবনসন্ধানী শিল্পী। জীবনের নানাদিক তিনি দেখতে চান, তিনি দেখতে পান। জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যে জীবনের একটি সমগ্র রূপ তাঁর সামনে ভেসে ওঠে। চরিত্রের স্রষ্টা-প্রদত্ত ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্য ব্যাখ্যা, অন্য ভাষ্যও অন্বেষণ করেন মায়া, অনেক সময় পানও, সেই ভাষ্যই রূপায়িত হয় তাঁর সৃষ্টিতে এক অনবদ্য রূপ নিয়ে।

'পিটার প্যান'-এর পুনশ্চিত্রায়ণ

মেরী মার্টিন যে সময় 'পিটার প্যান'-এ অভিনয় করেন সেই সময়টি থেকে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর বুকে আজ শিশুরূপে যারা বিরাজমান, সেদিন এরা সবাই নিহিত ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে 'পিটার প্যান' চিত্রনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা অড্রে হেপবার্ন (৩৬)। কিন্তু এই শিরোনামার স্বত্বাধিকারী হচ্ছেন ডিসনে, আর বলা বাহুল্য—কোন কিছুর বিনিময়েই এই শিরোনামা ব্যবহারের অনুমতি তিনি দেবেন না।



শিল্পী-দম্পতি মেল ফেরার ও অড্রে হেপবার্ন

ভারত সফরে জার্মান-শিল্পী

সুররসিকের দল জেনে আনন্দলাভ করবেন যে, পৃথিবী-বিখ্যাত একজন গীটারশিল্পী ডিসেম্বরেই ভারতে আসছেন। তাঁর নাম সিগফ্রিড বেরেণ্ড। এই তিরিশ বছর বয়স্ক তরুণ সুরসাধকের ভ্রমণসঙ্গিনী হচ্ছেন গায়িকা বেলিনা। বর্তমানে বিশ্বভ্রমণরত এই বাদ্যশিল্পী তাঁর শ্রোতারূপে অসংখ্য রাষ্ট্রপতি, একাধিক রাজা ও বহু প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতাদের



গীটার শিল্পী বেরেণ্ড ও গায়িকা বেলিনা। ভারত সফররত দুই বিদেশী শিল্পী

তাঁর [illegible]ভিনবত্বে এবং অপূর্ব ঝঙ্কারে প্রতিটি শ্রোতাকে বিমো[illegible]ত করে তুলেছে। ছয়টি ভাষায় কথোপকথনে সক্ষম এবং যথেষ্ট ব্যুৎপন্না বেলিনারও খ্যাতি সর্বজনবিদিত। নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসান্স এবং ম্যাক্স মূলার ভবনের উদ্যোগে দিল্লীবাসী তাঁদের বাজনা ও গান শোনবার সুযোগ পাবেন।

মাদ্রাজে জার্মান-নাটকের অভিনয়

Die Brücke—একটি জার্মান শব্দ, ইংরাজীতে এর অর্থ ব্রীজ অর্থাৎ সংযোগ। এই নামের অন্তরালে ফেডারেল জার্মানীর একটি নাট্যসংস্থা মাদ্রাজে 'মিনা ভঁ বার্নহেম' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এই সম্প্রদায়টি বর্তমানে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ভারতে সফররত। নানাস্থানে এঁদের প্রচেষ্টা বিপুলভাবে দর্শক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। ইংরাজী ও জার্মান ভাষাভাষী বহু খ্যাতনামা শিল্পীর সমন্বয়ে এই সম্প্রদায়টি রূপ নিয়েছে।

সংবাদ-বিচিত্রা

সারা ভারতের পরম পবিত্র শাশ্বত ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত'-এর চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন বর্তমান ভারতের অন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রকার বিমল রায়। শোনা যাচ্ছে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় চিত্রটি নির্মিত হবে। আগামী জানুয়ারী মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য চলচ্চিত্রোৎসবে যোগদানার্থে চেকোশ্লোভাকিয়ার থেকে যে প্রতিনিধিরা আসবেন এ সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে সে-সময় আরও বিস্তারিত আলোচনা হবার সম্ভাবনা আছে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ যে, এর চিত্রনাট্য কোন বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার বা চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত কেউ রচনা করছেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিদগ্ধ অধ্যাপক এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। মহাভারত-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর এই প্রচেষ্টার সঙ্গে চিত্রনাট্যকার হিসাবে সংযোগ সমগ্র প্রচেষ্টাটিকে নিঃসন্দেহে লাভবান করে তুলবে।

ভারতের ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলা একটি মুখ্য নাম। সামান্য অধিক দু'শো বছর আগে এই তরুণটিকে কেন্দ্র করেই একদিন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস আর একবার মোড় নিয়েছিল। ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে সিরাজদ্দৌলার আবেদন তাই এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কারণেই তিনি এক যুগসন্ধির নায়ক হিসাবে ইতিহাসে জীবিত। তাঁর স্বল্পপরিসর অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনকাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন বোম্বাইয়ের প্রযোজক-পরিচালক রামচন্দ্র ঠাকুর। লোকভারতীর পতাকাতলে 'নবাব সিরাজদ্দৌলা'র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে গত ২৪-এ অক্টোবর। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ভারতভূষণ। লুৎফুন্নেসার ভূমিকায় নির্বাচিতা হয়েছেন কল্পনা। সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন মদনমোহন।

দূর অতীতে পৃথিবীর নানা দেশে ভারতবাসী বাসা বেঁধে সে সব দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে অতুলনীয় সহায়তার চিহ্ন রাখে—কালের দুস্তর ব্যবধানেও সেই চিরন্তন সত্য অনস্বীকার্য। সময়ের অগ্রগমনে ধীরে ধীরে সেই সব দেশের জল-হাওয়ায়, মাটির গুণে প্রবাসী ভারতীয়েরা এবং তাদের ক্রমবর্ধমান বংশধরেরা সে সব দেশেরই



● শ্রাবণী বসু : বিভিন্ন ভঙ্গিমায়

অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এইভাবে বহির্ভারতেও এক বৃহত্তর ভারত-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। ফিজি ভারতীয়ের সংখ্যা আজ কম নয়, বা ফিজির সঙ্গেও ভারতের যোগাযোগ আজকের নয়। অতীতে একদিন পূর্বোক্ত-ভাবেই ফিজির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে ফিজি-নিবাসী ভারতীয়দের কেন্দ্র করে একটি চলচ্চিত্র রূপ নিতে চলেছে। এই ধরণের প্রচেষ্টা প্রথম। ইস্টম্যান কলারে নির্মীয়মাণ 'গিরমিট' নামক এই আলোচ্য ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন ফিজিবাসী ভারতীয় লেখক শঙ্কর প্রতাপ। পরিচালনার ভার নিয়েছেন চেতন আনন্দের প্রাক্তন সহকারী অরুণ পদীপ কাউল। ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন। স্বনামধন্য হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও এই প্রচেষ্টাটির সঙ্গে জড়িত আছেন।

মাদ্রাজের সাম্প্রতিক মেয়র নির্বাচনে একটি বিশেষত্ব সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বলা বাহুল্য সেই বিশেষত্বটি দিকে দিকে এক অভিনব সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। একজন চিত্রাভিনেতা এবারে মাদ্রাজের পৌরপালের আসন অলঙ্কৃত করলেন। সারা ভারতের পৌর-ইতিহাসে একজন অভিনেতার মেয়রের আসন অলঙ্করণ বোধ করি এই প্রথম ঘটল। একদা এস সত্যমূর্তি, ডঃ ইউ, কৃষ্ণ রাও, মহারাষ্ট্রের বর্তমান রাজ্যপাল ডাঃ চেরিয়ান ও তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী তারা চেরিয়ান প্রমুখ কৃতবিদ্যদের দ্বারা অলঙ্কৃত এই আসনের বর্তমান অধিকারী শ্রী সি চিট্টিরাজুর বয়েস এখনও তিরিশের নীচে।

ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসানের প্রাক্তন প্রধান প্রযোজক শ্রীএজরা মীর বর্তমানে চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির প্রধান প্রযোজক হিসাবে গত ১৮ই নভেম্বর পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। উক্ত সোসাইটির কার্যনির্বাহক পরিষদের সঙ্গে মতভেদই এই পদত্যাগের কারণ বলে অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ ভারতের চিত্র-তারকাদের মধ্যে বি সরোজা দেবী একটি বিশিষ্ট নাম। শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়, কলাবিদ্যার আরও একাধিক বিভাগে তিনি তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। হিন্দী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ভাষায় তাঁর প্রতিভা রসিকসমাজে স্বীকৃত। প্রদর্শিকা হিসাবেও চিত্রজগতের সঙ্গে তিনি যুক্তা। মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা সম্প্রতি 'অভিনয় সরস্বতী' উপাধিদ্বারা এই প্রতিভাময়ী শিল্পীকে সম্মানিতা করেছেন।

বোম্বাইয়ের চিত্রজগতে একটি সুপরিচিত নাম ডেভিড আব্রাহাম সম্প্রতি ইন্টারন্যাশানাল ওয়েটলিফটিং ফেডারেশানের কর্মপরিষদের অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন। এই নির্বাচনে তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট লাভ করেছেন। বৃটিশ এম্পায়ার এবং কমনওয়েলথ ওয়েটলিফটিং কাউন্সিলেরও তিনি অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচন টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর এই সম্মান সারা চিত্রজগতে গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করবে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

থানা থেকে আসছি

চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড পরিবেশিত 'থানা থেকে আসছি' ছবিটি রূপ নিচ্ছে হীরেন নাগের পরিচালনায়। ইউনাইটেড সিনে প্রোডিউসার্স নিবেদিত ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন কমল মিত্র, উত্তমকুমার, প্রশান্তকুমার, দিলীপ রায়, ছায়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক প্রভৃতি।



● ইনগ্রিড বার্গম্যান: ভিজিট চিত্রের নায়িকার ভূমিকায়

উদ্বার্যিকী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্বার্যিকী' নাটকটি অভিনয় করলেন জাতীয় কল্যাণ সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন তাপস মজুমদার, কান্তিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অনাদি ভট্টাচার্য, তারা রায়, শ্যাম মুখোপাধ্যায় ও পরিচালক ভূপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

নতুন ট্রান্সমিটার আসছে

—ইন্দিরা গান্ধী

বেতার যাঁরা নিয়মিত শুনে থাকেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে দ্বিমত হবেন না যে, ভারতের এক প্রদেশের বেতারানুষ্ঠানের কোন কিছুই ভারতের অন্য প্রদেশে বেতারের মাধ্যমে ভালভাবে শোনা যায় না। দেশের ভিতরেই যখন এই অবস্থা তখন এ প্রসঙ্গে দেশের বাইরের অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়। বিদেশবাসীদের নিকট থেকেও এ অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায় যে ভারতীয় বেতার তাঁদের কাছে অত্যন্ত কষ্টশ্রাব্য। যান্ত্রিক অসুবিধাই এর একমাত্র কারণ। ট্রান্সমিটার যদি জোরালো না হয় তা হলে এ অসুবিধা ঘটবেই। বেতার শুধু সঙ্গীত ও নাটকেরই প্রচারের বাহন নয় একটি রাষ্ট্রের জাতীয় বক্তব্যের এক বিরাট মাধ্যম। তার নিক্ষেপণ শক্তি যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তা হলে তার উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হওয়ার নয়। অথচ পাকিস্তানের ট্রান্সমিটার কত জোরালো তা কারোরই অজানা নয়। চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের তুলনায় এদিক দিয়ে ভারত যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তা হলে তা যথেষ্ট শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আশার কথা কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে ভারতের নতুন শক্তিশালী ট্রান্সমিটার আসছে। শ্রীমতী গান্ধীর এই ঘোষণা এক বিরাট আনন্দের বার্তাবহ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নতুন ট্রান্সমিটার এ দেশের বেতারের এক নিদারুণ শূন্যতা পূর্ণ করবে।

ও কে?

রেশমী এণ্টারপ্রাইজের নিবেদন 'ও কে'? ছবিটির নির্মাণকার্য শুরু হয়ে গেছে। কাহিনীকার দিলীপ বসু চিত্রনাট্য ও পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণের ভার নিয়েছেন কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার, দিলীপ রায়, জহর রায়, গীতা দে, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি।

লতার স্বপ্ন

অভিনয়-শিল্পী শ্রীমতী কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'লতার স্বপ্ন' ছবিটির চিত্রগ্রহণ এগিয়ে চলেছে। ছবিটির কাহিনীও তাঁর দ্বারাই রচিত হয়েছে। এই ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়), বিকাশ রায়, বিপিন গুপ্ত, বীরেশ্বর সেন, শোভেন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, মণি শ্রীমানী, নিভাননী দেবী এবং নবাগতা বিভা রাওয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

সৌখীন সমাচার

চৈতন্যলীলা

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন গিরিশ সংসদ। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিলেন মৃণাল সাহা, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকমল, বিকাশ বসু, দিলীপ সেনগুপ্ত, সন্তোষ দত্ত, সুনীল নাগ, পলাশ মিত্র, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ রথীন, গীতা প্রধান, কবিতা রায়, সুতপা ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা দাস এবং পূর্ণদাস বাউল প্রভৃতি।

কঙ্কাবতীর ঘাট

খ্যাতনামা নট-নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকটি নিবেদন করলেন বাগবাজার পোস্ট অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ভবানী চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ ইন্দ্র, ভোলা রায়, দানীশ পাল, পরিতোষ চক্রবর্তী, ভূতনাথ রায়, জয়শ্রী কর, শবরী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার 'কলা-কাকলি' বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোনা চৌধুরী, চিত্রজিৎ ঘোষ ও শান্তিময় সান্যাল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শিল্পী—শ্রীভাস্কর ঠাকুর।

সম্পাদকীয়

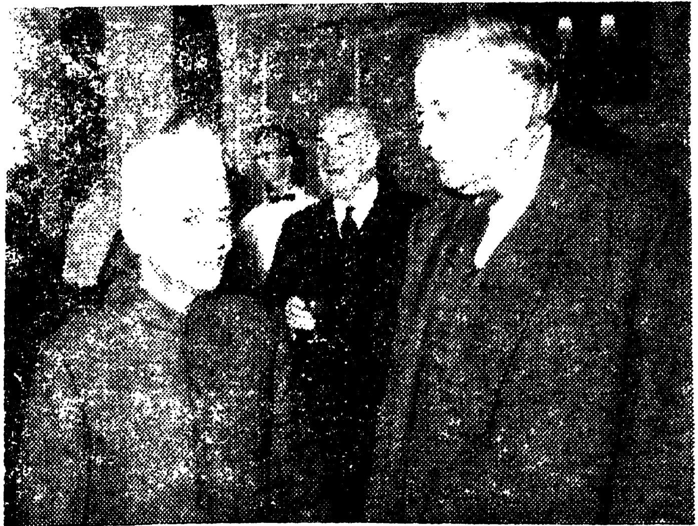
শাস্ত্রীজীর বৃটেন সফর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁহার কয়েকদিনব্যাপী বৃটেন সফর সমাপ্ত করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক জগতে এই সফর যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তাৎপর্যসম্পন্ন। নানা কারণে ইহা বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী এই সর্বপ্রথম পশ্চিম যাত্রা করিলেন। এ যুগে ভারতের বাণী পশ্চিমে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার কর্তব্যভার যে শ্রেষ্ঠ ভারতসন্তানগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন (বা করিয়াছেন) সেই তালিকায় আরও একটি বিশেষ সম্মানিত নাম যুক্ত হইল। সেই নাম লালবাহাদুর শাস্ত্রী। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভাবের বিনিময় আজ সুদীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। শাসনসম্পর্ক তাহার গুরুত্বকে এবং মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ বা ম্লান করিতে পারে নাই। জ্ঞানের, সংস্কৃতির, প্রজ্ঞার সীমাহীন আলোকিত আকাশে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন জগতের সংস্কৃতির ও চিন্তার ভাণ্ডারকে নানাদিক দিয়াই শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে।

সেই ভারতভূমি হইতেই শাস্ত্রীজী যুক্তরাজ্যে গেলেন যে ভারতের দিকপাল সন্তানগণ উভয় দেশের মিলনের সেতুকে প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করার সাধনায় লাভ করিয়াছেন অপরিসীম সফলতা।

আজ অবশ্যই পৃথিবীর রূপের পরিবর্তন হইয়াছে। জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তনের স্পর্শ অনুভূত হইয়াছে। জগতের কর্মসূচীও প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করিতে হইয়াছে। আজ সারা বিশ্বের যে রূপ আমাদের সামনে প্রতীয়মান হইতেছে তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারই মধ্যে আশা এবং আতঙ্কের এক অভাবনীয় সমন্বয় ঘটিয়াছে। নানাবিধ প্রগতিমূলক উন্নয়ন যেমন আশার সৃষ্টি করিতেছে তেমনই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী কোন রাষ্ট্রের হুঙ্কার, ভীতিপ্রদর্শন সুস্থ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়া আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। নানাবিধ সমস্যা প্রপীড়িত, চীন, পাকিস্তান কর্তৃক উত্যক্ত ভারতবর্ষের আকাশও আজ মেঘমুক্ত নয় তথাপি শ্রীশাস্ত্রী বিলাতে স্পষ্টতর বলিয়াছেন যে, 'আমি কোন সাহায্যের প্রত্যাশায় এখানে আসি নাই।' বিদেশী সাহায্যে আমাদের প্রয়োজন হয় ঠিকই তবে শাস্ত্রীজীর এই কথাটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ—'একদিন না একদিন ভারতকে বিনা বিদেশী সাহায্য ব্যতীতই চলিতে হইবে।' এই দুইটি উক্তির মধ্যে এক প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং যথেষ্ট আশাবাদী মনোভাবই সম্যক প্রকট। পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযোগটিও শাস্ত্রীজী খণ্ডন করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদাই রক্ষা করিয়া প্রকৃত দেশপ্রেমী ও জাতির প্রতিনিধির পরিচয় দিয়াছেন।

শাস্ত্রীজীর মধ্যে যুক্তরাজ্য প্রত্যক্ষ করিল একটি খাঁটি ভারতীয়কে। ইংল্যাণ্ডের ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীত শাস্ত্রীজীর স্বদেশী অঙ্গ হইতে দেশীয় বাস অপসারিত করিতে পারে নাই, তাঁর প্রতিটি আচারে-আচরণের মধ্যে একটি নিখুঁত ভারতীয়ই পরিলক্ষিত হইয়াছে। একদিকে দৃঢ়তাব্যঞ্জক



বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসনের সহিত আলোচনারত শ্রীশাস্ত্রী

মনোভাব আত্মমর্যাদা ও দেশের সম্মান সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা, অন্যদিকে অপরিসীম সারল্য, সবিনয় আচরণ সব মিলিয়া শাস্ত্রীজীকে একটি ব্যক্তিত্ববান চরিত্রে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার বিদেশ সফর সফল করিয়া তোলার ক্ষেত্রে এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যই অনেকখানি দায়ী।

শান্তির পটভূমিতেই নেহরু নীতি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। শাস্ত্রীজীও নেহরুর শান্তি নীতি অনুসরণ করিয়াই ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হইতেছেন। অল্পকাল পূর্বেই পারমাণবিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে তিনি যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে তাঁহার শান্তিকামী মনেরই পরিচয় বহন করে। বিষে বিষক্ষয় কখনও কখনও ঘটিয়া থাকিলেও হিংসার দ্বারা কখনও হিংসার বীজ নির্মূল হয় না এই অকাট্য সত্যটি তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। ধীরতা এবং প্রতিটি সমস্যার দক্ষতার সহিত পরিচর্যা—রাজনৈতিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম—শাস্ত্রীজীর, কার্যাবলী এবং চিন্তাধারা এই উক্তিটির সত্যতা বহন করে, চীনের হুমকীলাভের পরও ভারত পারমাণবিক বোমা নির্মাণে অগ্রসর হয় নাই এবং অগ্রসর যে হইবে না এ ঘোষণাও শাস্ত্রীজী দ্বিধাহীনচিত্তে করিয়াছেন। শাস্ত্রীজী বুঝিয়াছেন যুদ্ধ পৃথিবীকে উপহার দিয়াছে এক অপরিসীম শূন্যতা—সেই শূন্যতার অন্ধকার অবসান ঘটাইয়া সমৃদ্ধির আলোর সাধনা শুরু করিতে হইবে। শান্তি ও সহাবস্থান সেই সাধনার পরম পাথেয়।

আগামী বৎসরে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন করিবেন। সেখানেও তিনি প্রভূত সফলতা অর্জন করিয়া সারা দেশের গর্ব আরও বৃদ্ধি করুন আমরা এই কামনাই সর্বান্তঃকরণে করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণাঙ্গ রেশন প্রথা

কয়েকমাস যাবৎ বাঙলা দেশের খাদ্যাবস্থা ক্রমশই যে শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহার স্বরূপ কাহারও অজানা নয়। সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যগুলি ক্রমশই যেন অদৃশ্য হইতেছে এবং 'কালিয়া পোলাও' তো স্বপ্নমাত্র 'দিনের অন্ন' সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। চাল, আটা, ডাল, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যগুলির দুষ্প্রাপ্যতা দেশকে এক ভয়াল দুর্ভিক্ষের সম্মুখে উপনীত করিল। তৈল, ঘৃত প্রভৃতি অশেষ সাধ্য-সাধনায় যদিও বা মিলিল তাহাও অস্বাস্থ্যকর দূষিত এবং নানাবিধ রোগের বীজাণুপূর্ণ। আটার দোকানের লাইন দেখিলে শিহরিত হইতে হয়, কত নিরীহ ব্যক্তি দু' মুঠো আটার পরিবর্তে পুলিশের নির্মম লাঠি খাইয়া ঘরে ফেরেন। শুধু ইতিহাসেই বাঁচিয়া থাকে—'বঙ্গদেশ অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা' জাতীয় উক্তিসমূহ।



● শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

'চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন'—

আজ হৃতসর্বস্ব বাঙলার উজ্জ্বল অতীতের একটি আলেখ্য মাত্র।

দেশের খাদ্যাবস্থার এই শোচনীয় অবস্থায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন—'খাদ্যাবস্থা সন্তোষজনক।' সম্প্রতি রাজ্য সরকার রেশনিং ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের দ্বারা এই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগী হইয়াছেন। সরকার যদি ব্যবস্থা অবলম্বনে আরও বিলম্ব করিতেন তাহা হইলে কি ঘটিত তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। জঠরের জ্বালা এমনই এক জ্বালা যাহার নিকট ন্যায়, নীতির কোন আবেদনই বহন করে না। সে ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ বিলম্বে হইলেও সময়োপযোগী হইয়াছে।

এখন দেখা যাক যে পরিবেশ রেশন ব্যবস্থার অনুকূল কি না? কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত এলাকায় আশীটি চাউলকল বর্তমান, ইহার দ্বারা প্রয়োজন মিটিবে কি না বা যদি না মেটে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার ক্ষমতা কলগুলির আছে কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট চিন্তার প্রয়োজন। বহু ব্যক্তি ভুয়া রেশন কার্ড করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কেহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য পাইতেছেন আর কেহ কার্ডের অভাবে চোরাবাজারের হতভাগ্য শিকার হইয়া চলিয়াছেন দীর্ঘকাল ধরিয়া। তাঁহারা যে কবে রেশন কার্ড পাইবেন তাহার কোনই ঠিক-ঠিকানা নাই এমন কি এই সমস্যা সমাধানের কোন প্রকার আশ্বাসও পাওয়া যাইতেছে না। শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্তদের সংখ্যা অর্ধ লক্ষাধিক। আরও একটি বিরাট

সমস্যা আছে। পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা হিসাবে চালু হইলে তাহার কর্মনির্বাহের জন্য অনেক গৃহের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনীয় গৃহগুলির সংখ্যাও অল্প নয়। কলিকাতার প্রতিটি এলাকাতেই এই বাবদ গৃহের প্রয়োজন। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় গৃহ লাভ কি সম্ভবপর হইবে? অন্ধকার দিকটাই দেখা যাক—যদি না হয় তাহা হইলে সমগ্র পরিকল্পনার রূপদান যে সম্ভবপর হইবে না অথবা আরও বিলম্ব ঘটিবে সে সময়ের মধ্যে দেশের অধিকতর দুর্যোগের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা বলা বাহুল্য পূর্ণ মাত্রাতেই বিদ্যমান।

রেশনিং-এ খাদ্য সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানও হইতে পারে কিন্তু মানুষের নির্লজ্জ মনোবৃত্তি, অপরিমিত লোভ, লিপ্সা, আত্মকেন্দ্রিকতা, মুনাফাবাজি, শিশুর খাদ্যে, রোগীর ঔষধে বিষ মিশাইবার নীচ প্রবৃত্তিগুলির অবসান কোন পন্থায় হইবে তাহাও তো ভাবিয়া দেখিবার মত যথেষ্ট সময় আজ আসিয়াছে। এখনও যদি সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া না হয় তাহা হইলে আর কবে হইবে? এ প্রশ্ন শুধু আমাদেরই নয় এই চরম সর্বনাশের হতভাগ্য শিকার প্রত্যেকটি নরনারীর।

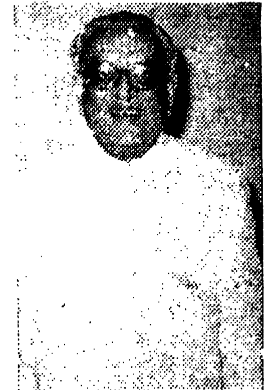
তবু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যে চিন্তা করিয়া একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়াসী হইয়াছেন তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ। ইহাতে প্রমাণিত হইল আপন আসনের মর্যাদা এবং কর্তব্যভার সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তিনি দেশের সমৃদ্ধির ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আনার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের মূলোচ্ছেদের জন্য জনগণের প্রকৃত কল্যাণকর কোন পরিকল্পনা সরকার যদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে সরকার জানিয়া রাখুন যে, তাহার রূপায়ণের জন্য তাঁহাদের পার্শ্বে সর্বপ্রকার সহযোগিতার ডালি লইয়া বিরাজিত থাকিবে বাঙলার ছেলে, থাকিবে বাঙলার মেয়ে। ইহা আমাদের একটি মধুর স্বপ্ন নয়, ইহা ধ্রুব সত্য।

ইংরাজী বনাম হিন্দী

কিছুকাল যাবৎ একশ্রেণীর হিন্দীপ্রেমিক ধুয়া তুলিয়াছেন যে, হিন্দীকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হউক এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক হিন্দীশিক্ষার প্রবর্তন করা হউক। বিষয়টি লইয়া বহু বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক ইতোমধ্যে হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আরও একটি আবদার ইংরাজী বর্জন করা হউক।

যে-কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিক সুস্থব্যক্তি এই প্রকার প্রলাপোক্তির প্রতিবাদ করিবেন। ভাষা হইতেছে ভাব প্রকাশের বাহন। রাজনীতিগত কোন জাতির সহিত বা কোন রাষ্ট্রের সহিত আমাদের বিরোধ থাকিলেও তাহার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা রাজনীতি বহির্গত বিষয়গুলি আমাদের শ্রদ্ধা ও সমাদর চিরদিনই লাভ করিবে। ইংরাজী এমন একটি ভাষা যাহা দীর্ঘদিনের স্রোতে আজ আমাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষায় পরিণত হইয়া আমাদের জীবনযাত্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে একীভূত হইয়া গিয়াছে তদুপরি আন্তর্জাতিক বিচারে ইংরাজী আজ সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। পৃথিবীর এক ভাষাভাষীর সহিত অন্য ভাষাভাষীর সংযোগসূত্র একমাত্র ইংরাজী ভাষাতেই। ইহা ছাড়াও ইংরাজী ভাষা সারা পৃথিবীর প্রতিভা-মনীষার দরবারে বিশ্বের নবজাগরণের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান, কোনক্রমেই বিস্মরণযোগ্য নয়। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং সাংস্কৃতিক পিপাসা কাণায় কাণায় চরিতার্থ হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিলে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া সে অবদান চিরকালের দাবীতে স্মরণীয়। হিন্দী ভাষা ভারতের মধ্যেই একমাত্র উত্তর প্রদেশ ও বিহার ছাড়া অন্য দেশেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয় এবং রাষ্ট্রভাষা হইবার পর্যায়ে সে এখনও পৌঁছাইতেই পারে নাই, তাহার উৎকর্ষসাধন ও গঠনকার্য এখনও অনেক বাকী। তাহাতে সৌন্দর্য ও লালিত্যের সঞ্চার এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন—সেক্ষেত্রে ইংরাজীর পরিবর্তে তাহাকে চিন্তা করাও তো এক অস্বাভাবিক ব্যাপার।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা এই প্রসঙ্গে অতি মূল্যবান এবং যথার্থ মতামতই পোষণ করিতেছেন। তাঁহার চিন্তাশীলতায় এবং ধীশক্তিতে ইংরাজী ভাষার অপরিহার্যতা এবং হঠাৎ হিন্দী ভাষার প্রবর্তনে সম্ভাব্য অসুবিধা তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হইয়াছে হিন্দী সমর্থক রাজ্যগুলির মধ্যে হিন্দী সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে কিন্তু অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে ইংরাজীর ব্যবহার



এম সি চাগলা

অব্যাহত থাকিবে ও মূল চিঠি হিন্দীতে লিখিত হইলে তৎসহ ইংরাজী অনুবাদও দিতে হইবে।

কিছুসংখ্যক সাধারণ বুদ্ধিহীন উগ্র হিন্দীপ্রেমীর আবদারকে প্রশ্রয় না দিয়া শ্রীচাগলা যে বলিষ্ঠ মনোভাব ও আশানুরূপ প্রতিভা এবং যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিলেন তজ্জন্য আন্তরিক অভিনন্দন তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য।

॥ শোক-সংবাদ ॥

সুপ্রবীণ সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গত ১৫ই অগ্রাণ ৮৩ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়েছে। জীবনের দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর সাহিত্য সাধন পাঠক সমাজে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদি রচনায় তাঁর নৈপুণ্য সবজন-স্বীকৃত। বসুমতীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল দীর্ঘকালের, বসুমতীতে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবীণতম নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের গত ১৯এ অগ্রাণ ৭৪ বছর বয়সে জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। প্রথম জীবনে তিনি আইনজ্ঞের জীবন অবলম্বন করে ও নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং নাট্যলোকে একটি স্থায়ী আসন অধিকারে সমর্থ হন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত নাটকের তিনি রচয়িতা। সে নাটকগুলির মধ্যে 'রীতিমত নাটক' ও 'পি-ডবলিউ-ডি' অন্যতম।

যশস্বী চিত্র পরিচালক ও নিউ থিয়েটার্সের স্তম্ভস্বরূপ হেমচন্দ্র চন্দ্র গত ১৮ই অগ্রাণ ৬০ বছর বয়সে রাজগীরে গতায়ু হয়েছেন। বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। নিউ থিয়েটার্সের 'ক্রোড়পতি' (হিন্দি) তাঁর প্রথম পরিচালিত চিত্র। পরিচালকরূপে আত্মপ্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই বাঙলার এক প্রথম শ্রেণীর চিত্র পরিচালক রূপে তিনি স্বীকৃত হন। অনাথ আশ্রম, পরাজ়া, প্রতিশ্রুতি, প্রতিবাদ, বিষ্ণুপ্রিয়া, সৌগন্ধ, ওয়াপস, নতুন ফসল, বন্ধন, মানময়ী গার্লস স্কুল প্রভৃতি চিত্রগুলির তিনি সার্থক পরিচালক।

সচিত্র 'শিশির' পত্রিকার সম্পাদক ও শিশির পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী শিশিরকুমার মিত্র গত ১৯এ অগ্রাণ ৬৮ বছর বয়েসে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। জীবনের সুদীর্ঘকাল তিনি সাহিত্যসাধনায় নিরত ছিলেন। মঞ্চজগতও যথেষ্টভাবে তাঁর সেবালাভ করেছে। সে যুগের প্রসিদ্ধ 'মিত্র থিয়েটার'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সে কালের মঞ্চজগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মহেন্দ্রকুমার মিত্র ছিলেন তাঁর পিতৃদেব।

বিশিষ্ট সাহিত্য প্রতিষ্ঠান 'রবিবাসর'-এর প্রাক্তন সর্বাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ বসু গত ২৯এ কার্তিক ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শরৎচন্দ্র ও জলধর সেন সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থের তিনি রচয়িতা ও অধুনালুপ্ত 'বাঁশরী' সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন।

বাঙলার স্কাউটস আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সত্য বসু (Satta Bose) গত ৮ই অগ্রাণ ভুবনেশ্বরে ৬৭ বছর বয়সে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ভারত স্কাউটস এ্যাণ্ড গাইডস-এর ডিঃ কমিশনার সত্য বসু ১৯১২ সাল থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এবং দীর্ঘ দিনের অবিরামকর্মে আপন ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও কুশলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

পণ্ডিতপ্রবর মনীষী ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী কমলা দেবী ২২শে অগ্রাণ ৬৫ বছর বয়সে লোকান্তরিতা হয়েছেন। কমলা দেবী ভারতের নানাস্থানে এবং রাশিয়াসহ ইয়োরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রে স্বামীর ভ্রমণ-সাঙ্গিনী ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিশিষ্ট পুরোধা নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রলাল খান ২৩-এ অগ্রাণ মাত্র ৪৫ বছর বয়সে পরলোক-যাত্রা করেছেন। কংগ্রেসের নানা গঠনমূলক কাজে ইনি জড়িত ছিলেন এবং লোকহিতকর বহুপ্রচেষ্টায় ইনি সাফল্য অর্জন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্যা শ্রীমতী অঞ্জলি খান তাঁর সহধর্মিণী।

সুসাহিত্যিক মদন বন্দোপাধ্যায়ের গত ৭ই অগ্রাণ মাত্র ৪১ বছর বয়সে ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে জীবনবিয়োগ ঘটেছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন ও কারাবরণ করেন। কয়েকটি সুপাঠ্য সাহিত্যগ্রন্থের তিনি প্রণেতা। 'কবিয়াল এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী' তাঁর একখানি বহুজন অভিনন্দিত গ্রন্থ।

খ্যাতনামা শিল্পী দীপেন বসুর গত ২৪এ অগ্রাণ মাত্র ৪৩ বছর বয়সে আকস্মিকভাবে জীবনাবসান হয়েছে। বাঙলার শিল্পী-সমাজে তিনি এক বিশেষ আসনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী দেশের ও বিদেশের রসিক-সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, মাসিক বসুমতীতে কয়েকটি নতুন বিষয় সংযোজনের আবেদন জানিয়ে আমার মনের কয়েকটি ইচ্ছা জানালাম। এর ভাল-মন্দ আপনার অভিজ্ঞ সম্পাদকীয় দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে দেখলে বাস্তবিকই খুশি হবো। (১) বিশিষ্ট মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। (২) দেশ-বিদেশের বৈশিষ্টপূর্ণ মাসিক ঘটনাপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পূর্বে এটি ছিল, আবার এটি সংযোজন করলে সাধারণ জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে পাঠক সাধারণ উপকৃত হবে বলেই মনে করি। (৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় বাংলা দেশের নব জাগরণে যাঁরা বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক জীবনীর বিস্তৃত আলোচনায় বসুমতীর সাহিত্যিকমূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়। (৪) নবাগত লেখক-লেখিকাদের সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহদানের জন্যে প্রতি বছর যদি মাসিক বসুমতীর তরফ থেকে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আহ্বান জানানো হয়, তাহলে মাসিক বসুমতীর প্রচারই যে শুধু বৃদ্ধি পাবে তাই নয়, বঙ্গ-ভারতীর পূজায় নবীন প্রতিভাকে স্বীকৃতিদানে সাহিত্যের ইতিহাসেও মাসিক বসুমতী একটি বিশিষ্ট মর্যাদা ও স্থায়ী আসন লাভ করবে। এই প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হবে—প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, রম্যরচনা, নাটক, জীবনী ও সমালোচনা। (৫) যদি সম্ভব হয় অধুনা দুষ্প্রাপ্য পুরাতন ভাল ভাল লেখাগুলি যদি অল্প অল্প করে মাসিক বসুমতীতে পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে, তাহলে সাহিত্যরসপিপাসু পাঠক-পাঠিকারা বসুমতীর এই অমূল্য দান আমরণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। কেন না, শতকরা ৯৯জন সাহিত্যপিপাসু পাঠক-পাঠিকা সাধারণ মধ্যবিত্ত। ইচ্ছে থাকলেও তারা বেশিদামের বই পড়তে পায় না, কেনবার সামর্থ্য থাকে না বলে। দ্বিতীয়ত বইগুলি দুষ্প্রাপ্য হলে তা পাওয়াও কঠিন। তৃতীয়ত পাড়ার Public Library-তে এসব মূল্যবান বইয়ের সংগ্রহ একেবারেই অচল। আর ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা সাহিত্য পরিষদ জাতীয় যাবতীয় বইয়ের সংগ্রহশালাগুলিতে অল্পমূল্যে প্রবেশ নিষেধ। সে ক্ষেত্রে মাসিক বসুমতী শুধু মধ্যবিত্তের আনন্দদায়কই নয়, নব নব জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থে ও প্রতিভা বিকাশের সহায়কও বটে।—দীপান্বিতা গুপ্ত, ৫২নং কৈলাস বোস লেন, হাওড়া।

মহাশয়, আজ কয়েকমাস ধরে মাসিক বসুমতীতে 'শাশ্বতী' নামে নমিতা চক্রবর্তীর উপন্যাস আমার মত পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিচ্ছেন তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার কাছে লেখিকা নমিতা চক্রবর্তী তাঁর এই শুধু 'শাশ্বতী'র জন্যই বহুদিন অমর হয়ে থাকবেন। তাঁকে ভুলতে পারব না তাঁর 'তপতী'র জন্য। 'তপতী'ও বাংলা সাহিত্যসাগরে শ্রেষ্ঠা চরিত্রগুলির মত অমর হয়ে থাকবে। স্মরণীয় চরিত্রগুলির পাশে পাশে হাঁটবার মত ক্ষমতা নিয়ে 'তপতী' উজ্জ্বল হয়ে 'শাশ্বতী'র বুকের উপর ভেসে উঠছে। জীবন্ত চরিত্র বাংলা-সাহিত্যের জঠরে অনেক থাকলেও 'তপতী' আর একটি। লেখিকা নমিতা চক্রবর্তীকে অশেষ ধন্যবাদ এই জন্য যে, তিনি যুগোপযোগী একটি চরিত্র সৃষ্টি করে চলেছেন। সমাজের রাস্তাঘাটে একটু দৃষ্টি ফেললেই লক্ষ্য করা যায় আজকের নারী-সমাজ একটু একটু করে কোথায় চলেছে! (লেখিকার ভাষায়)—'তাদের শাড়িটা ফ্রক করে দিলেই এক রং ছাড়া কিছু প্রাচ্যভূমির সাক্ষ্য দেবে না।'··· মেয়েদের ঘরের স্বপ্ন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। কথার পর কথা বলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির তীব্র প্রক্ষেপণকে তারা ভাবছে প্রণয়ালাপ। শুধু জলে ধোয়া মুখ তো প্রায় নগ্নতার মতই অশ্লীল। কেবল বিচার বিতর্ক—কেবল আত্মসম্মানের দম্ভ। ···'আধুনিক মেয়েদের···মানসিক লাবণ্য নেই···কড়া কড়া প্রসাধনে ঢাকা পড়ে আছে,'···এই ত' আজকের আধুনিক নারী। আধুনিক নারী-মনে প্রেমকে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। ভালবাসা তাদের হৃদয়ের গভীরেও যেন এতটুকু স্থান পাবার যোগ্য নয়। ভয় হয় পৃথিবীর বুক থেকে হয়ত একদিন প্রেম ভালবাসা চিরতরে মুছে যাবে। তাহলে মানুষের বাঁচায় কি কোন অর্থ থাকবে? কি জানি! পুরুষ আর যাই চাক যাই বলে থাক,···'মনে মনে তাদের তৃষ্ণা আছে এখনো একটি সহজ সরল নারীর জন্য, যে তার মনোময়ী হয়ে থাকবে।'···শুধু সন্তানের জননী নয় কল্যাণীও। যে নারীর হৃদয়ের কোমলস্পর্শে জীবন-মন হয়ে উঠবে সজীব, জীবন্ত, সেই নারীর মনকে, হৃদয়কে পাবার জন্য পুরুষের মন আজও পিপাসার্ত। আজও সে পৃথিবীর বুকে বুকে ঘুরে বেড়ায় এমনি একটি নারীকে পাবার জন্য। লেখিকাও ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছেন তাঁর 'শাশ্বতী'র মধ্য দিয়ে। এর জন্য লেখিকাকে আমার

অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লেখিকা নারী হয়ে পুরুষের মনকে এমন নিখুঁত করে জেনেছেন যার জন্য তাঁর কাছে ভবিষ্যতে আর কিছু আশা করতে পারি কি? আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ লেখিকার কাছে আমার অন্তরের ধন্যবাদ যদি পাঠিয়ে দেন তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব।—মণি মাইতি। ১২৬নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৫।

বেচিতে চাই

মহাশয়,

নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি প্রতি বৎসরেরটি একত্রে ১২৲ টাকায় বা পৃথকভাবে প্রতিটি কেনাদামে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ক্রেতাগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন।

১৩৬০—বৈশাখ থেকে চৈত্র (১২টি)

১৩৬১—বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র (৮টি)

১৩৬২—আশ্বিন থেকে ফাল্গুন (৬টি)

১৩৬৩—বৈশাখ থেকে চৈত্র (১২টি)

১৩৬৪— ঐ

১৩৬৫— ঐ

১৩৬৬— ঐ

১৩৬৭— ঐ

১৩৬৮— ঐ

১৩৬৯— ঐ

১৩৭০— ঐ

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে প্রতিমাসে বিজ্ঞাপিত করিলে বাধিত থাকিব। লক্ষ্মীপ্রসাদ ঘোষাল। ১৪বি, যুগোল কিশোর দাস লেন, কলিঃ—৬।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

দি হেড লাইট কিপার, ফলস পয়েন্ট লাইট হাউস, ডাক—কুজাং, জেলা—কটক, উড়িষ্যা *** শ্রীফণীন্দ্রনারায়ণ দেব, লাফাপাড়া টি, ই, ডাক—বাগরাহাট, জলপাইগুড়ি *** শ্রীমতী মেঘলা বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধারক—শ্রী এ কে বন্দ্যোপাধ্যায়, দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ, ডাক—টিরুভোটিয়ার, মাদ্রাজ—১৯ *** সচিব, পাণিঘাটা ইউ ভি এম কাউন্সিল, ডাক—পাগলাচণ্ডী (নদীয়া) পঃ বঙ্গ *** শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বাগ, ২০৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, যোগচন্দ্রপুর, চারিয়াল বাজার, ডাক—বজবজ, জেলা—২৪ পরগণা *** শ্রীগোপালচন্দ্র মাঝি, গ্রাম/ডাক—রুইলাল, জেলা—মেদিনীপুর পঃ বঙ্গ *** শ্রীঅনন্তকুমার দে, গ্রাম ও ডাক—কালিকাডিহী (বালীচক হয়ে) জেলা—মেদিনীপুর *** সঙ্কর্ষণ দাস, এজেণ্ট ইংরাজী সংবাদপত্র, ডাক—কেন্দ্রপাড়া, জেলা—কটক, উড়িষ্যা *** শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, অবধারক—বাটা সু কোং (প্রাঃ) লিঃ, ডাক—হাতীনঙ্গ, জেলা—পাটনা, বিহার *** শ্রীমতী হেনা রায় (শিক্ষয়িত্রী), চাতরা নেতাজী বালিকা শিক্ষা-নিকেতন, গ্রাম ও ডাক—দক্ষিণ চাতরা, জেলা—২৪-পরগণা *** সচিব রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, ডি বি কে রেলওয়ে প্রজেক্টস, ডাক—কোরাপুট, উড়িষ্যা।

কার্তিক মাস হইতে আগামী বৎসরের দেয় মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। শ্রীমতী দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়, ০।৮ এইচ এম টি কলোনী, ডাক—জলাহালী, ব্যাঙ্গালোর—১৩।

Herewith Rs. 15/- (Rupees Fifteen) only being one years subscription of Masik Basumati. P. Sengupta. Cachar.

আপনার ১১ ১১ তারিখের স্মারকপত্র অনুযায়ী ১৫৲ পাঠাইলাম। বার্ষিক চাঁদা হিসাবে প্রাপ্তি-সংবাদ দিবেন। শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তী, জেল রোড, ভূপাল।

Herewith I am sending Rs. 15/- being subscription for one year of Masik Basumati from Kartik 1371 B. S. Please send it regularly to Sj Chinmoyee Debi. C/o Sj S. K. Ganguli. Engineer, The U P. Sugar Co. Ltd. Po. Seorahi, Dt.- Deoria U. P.

কার্তিক হইতে এক বৎসরের টাকা পাঠাইলাম। শ্রীদীনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অফিস অব জি ই ফ্যাক্টরী, কানপুর—৯,

I am sending the yearly subscription of Monthly Basumati. Please acknowledge and oblige.—Secretary, Digri Sanatorium Staff Library, Digri, Dist.—Midnapur.

আমি মাসিক বসুমতীর জন্য এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া যথাসময়ে আমার পত্রিকাগুলি পাঠাইবেন। গোপালচন্দ্র মাঝি।

Yearly subscription Rs. 15·00.—Head Master, R. B. S. D. High School, Dubrajpur, Birbhum.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পনেরো টাকা (১৫৲) পাঠাইলাম। প্রাপ্তি-সংবাদ দিবেন। বসুমতী যথারীতি পাঠাইতে থাকিবেন। শ্রীমতী সুকুমারী রায়, কাটালগুড়ি টি ই, ডাক—কাটালগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

I send herewith Rs. 15·00 towards my annual subscription of Monthly Basumati.—Sankarsan Das, Newspaper Agent, Kendrapara, Cuttack.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক মূল্য ১৫·০০ পাঠাইলাম। প্রাপ্তি-সংবাদ দিবেন। শ্রীমতী অমলা বসু, C/0 শ্রী এ টি বোস, সিন্ধিয়া হাউস, নিউদিল্লী।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

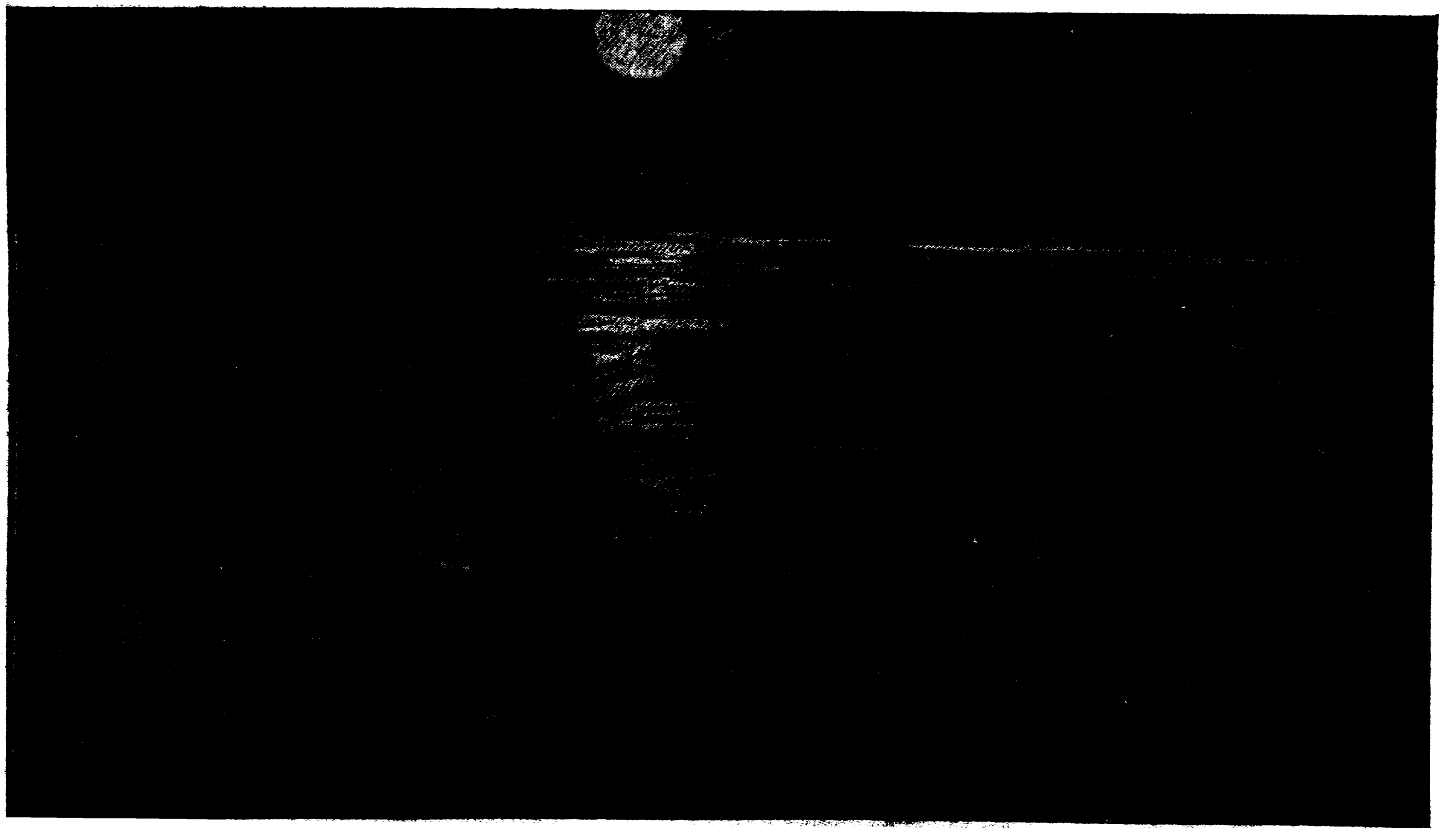
সূচীপত্র

সূচীপত্র

মাছ-ধরা

—বি, এস, পানেশার অঙ্কিত

(রেখাচিত্র)



● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ — পৌষ ১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড — তৃতীয় সংখ্যা



মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

মৃত্যুর পরে জীবনের রূপ

দুই

আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যেই জ্ঞান সংগ্রহের ক্ষমতা স্বতন্ত্র এবং দেখা যাচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই নিজস্ব প্রণালিবদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে আছি। জ্ঞান একটিমাত্র পন্থায়ই, সংগ্রহ করা যায়—তা হচ্ছে অভিজ্ঞতা, অন্য কোন উপায় নেই। যদি এ জীবনে আমরা কোন জ্ঞান সংগ্রহ করতে না পারি, তবে জন্ম-জন্মান্তরের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তাহ'লে সর্বত্রই মৃত্যু-ভীতি কেন? একটি ছোট্ট মোরগশাবক মাত্র অল্পক্ষণ পূর্বে ডিম থেকে বের হয়ে এসেছে, এমন সময় সেখানে একটি ঈগল এলো, আর দেখতে দেখতে মোরগ-শাবকটি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল তা'র মায়ের আঁচলে। এর কি ব্যাখ্যা করবেন—একে প্রবৃত্তি (instinct) বলা হয়। এই ক্ষুদ্র মোরগশাবক, যে মাত্র ডিম থেকে বেরিয়েছে, সেও কেন মৃত্যুর ভয়ে ভীত। এই প্রবৃত্তিই তাকে ভীত করে রেখেছে। আসুন, আমরা প্রবৃত্তির বিষয়ে আলোচনা করি।

একটি শিশু পিয়ানো বাজাতে সুরু করলো, প্রথমেই তাকে এর প্রত্যেকটি চাবি, যেগুলিতে সে আঙুল চালাবে, সেগুলির দিকে নজর দিতে হবে। মাসে, দিনে এবং বৎসরে যতই সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, ততই অবলীলাক্রমে সে বাজাতে সমর্থ হবে। প্রবৃত্তিই তাকে বাজাতে বাধ্য করবে। প্রথমে যে কাজ করতে তার প্রতিটি আঙুল চালাতে যত্ন নিতে হয়েছে, পরে অভিজ্ঞতা জন্মালে ইচ্ছামাত্রেই সে বাজাতে পারবে। ইহাই প্রমাণের সবকিছু নয়। আরো আছে। এখন যে-সব কাজ করছেন, তার সবই সে ইচ্ছাশক্তির অধীনে, আনতে হবে। দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরাকে নিজের কর্তৃত্বের অধীনে রাখতে হবে। এই জিনিসটা সবাই ভালভাবে জানেন। সুতরাং প্রমাণ সম্পূর্ণ হলো, এই দুই পদ্ধতিতে এক্ষণে যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলছি, তা স্বতঃপ্রবৃত্ত ইচ্ছাশক্তি ও কর্মপ্রণালী মাত্র। সুতরাং যদি সমুদয় সৃষ্টির দিকে এই প্রবৃত্তিগুলিকে প্রযুক্ত করি—তবে দেখতে পাই, নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে যা প্রবৃত্তি মাত্র, মানুষের ক্ষেত্রে তাই ইচ্ছাশক্তির প্রতিফলন মাত্র।

যে নিয়মের অনুবর্তন করে আমরা বেঁচে আছি—তা'তে এই প্রমাণিত হয় যে, প্রতি বিবর্তন অন্য কোন বিবর্তনে গিয়ে মিশে যায়। আর প্রত্যেক বিবর্তন, অন্য বিবর্তনের অনুবর্তন করে। আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক প্রবৃত্তি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। যা'কে আমরা প্রবৃত্তি বলি, সুতরাং তা অনুবর্তন করে, বংশানুক্রমায় মানুষ এবং যে-কোন প্রাণীর মধ্যে মুক্ত কর্মের ছন্দে। আর মুক্ত বা অনাসক্ত কর্ম অভিজ্ঞতা ব্যতীত অসম্ভব। আর অভিজ্ঞতা জ্ঞান থেকে আসে। আর সে জ্ঞান আছে

অন্তরে। মৃত্যুর ভয়, কাজে কাজেই এই মোরগশাবকের ঈগলের ভয়ে পালানো ইত্যাদি সমস্ত বিবর্তনমূলক কর্ম যা মানুষের মধ্যে বর্তমান—যাকে বলি প্রবৃত্তি, তা মানুষের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। যতদূর আমাদের আলোচনা এগিয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, অতীত-অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান বা বিজ্ঞানই মানুষকে চালিত করছে। কিন্তু এখানে আর একটু বিপদের ভয় আছে, অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ঘুরে যাচ্ছেন সেই প্রাচীন মুনি-ঋষিদের কাছেই। আর এই উভয় ধারার মিলনে পুরোপুরি মতসাম্য হয়েছে।

সকলেই স্বীকার করেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ বা প্রাণী তাদের মধ্যে কতকগুলি অতীত-অভিজ্ঞতার জ্ঞান নিয়ে জগতে আসে, আর যে-সব কাজ তারা করে, তা সেই সব অথবা আর যা কিছু জ্ঞান তারা অর্জন করে—তারই ফলমাত্র। কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন, এই অভিজ্ঞতাগুলি আমাতেই বর্তমান এইরূপ বলার মানে কি? কেন এরূপ বলা হয় না যে, এইগুলি দেহে বর্তমান অথবা শুধু শরীরেই। কেন ইহাকে বলা যাবে না যে, ইহা পুরুষানুক্রমিক রূপান্তরমাত্র। এই—সর্বশেষ প্রশ্ন। কেন বলা চলবে না যে, এইসব অভিজ্ঞতাগুলি আমরা পিতা-পিতামহদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ফল। সামান্য প্লাটোপ্লাজমের মধ্যে যে জ্ঞান অথবা শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে যে জ্ঞানরাশি, সেগুলির মধ্য থেকেই এই অভিজ্ঞতা—তা কেনই বা বলা চলবে না। কেন বলা যাবে না, দেহ থেকে দেহে পুরুষানুক্রমিকভাবে এইগুলি এগিয়ে আসছে মাত্র। এর দৌড় কতদূর? যতদূর পর্যন্ত না বস্তুর শেষ হবে। আমরা আমাদের অতীত-অভিজ্ঞতার বলে, কর্মের বলে, আমরা কোন না কোন দেহে জন্মগ্রহণ করি আর সেই অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখবার মতো বস্তুগুলি, অর্থাৎ দেহের গঠন আসে সেই পৈত্রিক দেহ থেকে মাত্র। কারণ, সেইসব মাতাপিতারা তেমনতরো জ্ঞানসমৃদ্ধ দেহকে গড়ে দেবার বস্তুতে তাঁদের দেহ পুষ্ট করে রেখেছেন।

এই যে মাতাপিতার মধ্য থেকে সন্তান জন্মাচ্ছে—এই নিয়ম বড়ই বিস্ময়জনক, এতে প্রমাণের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। মনের ইচ্ছা, বস্তুতে ধরা দেয়—মনের অভিজ্ঞতা দেহে রূপ নেয়—'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'।

আমি যখন আপনার দিকে তাকালাম, আমার মনের অজ্ঞাতসারে, তখনই একটা ঢেউ-তরংগ উঠলো। সেই তরংগ নিমেষে গেলো, কিন্তু তার প্রভাব একটি সুন্দর রূপ নিয়ে মনে একটি দাগ কেটে গেলো। আমরা বুঝতে পারি, একটি দৈহিক ভাবধারা শরীরে টিকে থাকে। কিন্তু কি প্রমাণ আছে, যাতে বুঝতে পারা যায় যে মনের ভাবধারা দেহ ধরে রাখে, যে দেহ নষ্ট হয়ে যায়। কি ইহাকে বহন করে?

ধরে নিই, প্রত্যেক মনের চিন্তাধারার পক্ষেই দেহে অবস্থান সম্ভবপর। সেই মনুষ্যজাতির অভ্যুদয়ের প্রথম প্রভাত থেকে আমার পিতার দেহ পর্যন্ত চিন্তাধারা-ক্রমে এগিয়ে আসছে। যা আমার পিতার দেহে ছিল, তা ক্রমে আমার দেহে নেমে এলো। কিন্তু কিরূপে? দেহের প্রতিটি অংগে অংগে—স্তরে স্তরে? তা কিরূপ? কারণ, পিতার দেহ, সন্তানের মধ্যে পুরোপুরি সমস্ত আসে না। একই মাতাপিতার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকতে পারে, সুতরাং এই বংশানুক্রমিক ধারা থেকে—এই যে রূপান্তর—পিতা থেকে পুত্রে (ভাবধারা এবং সেই ভাবধারায় গ্রহণকারী ভাণ্ডো)—উভয়েই এক এবং একান্তর। কারণ, এই প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে মাতাপিতা দেহের কোন না কোন চিন্তার অংশ দান করেন। অথবা যদি কোন প্রথম সন্তানের জন্ম হলে পিতা তাঁর চিন্তাধারার সমস্তই প্রদান করে থাকেন, তবে তাঁর অন্তর শূন্য হতে বাধ্য।*

অনুবাদক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে

*From Life after Death of Swami Vivekananda]

ভারতবর্ষের আদিব্রাহ্মসমাজ যে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজের মধ্যে আনিয়াছেন, ব্রাহ্মসম্মিলন সভা হইতে তাহাকে প্রাণপণে সেই সমাজের মধ্যে রক্ষা করিতে হইবে। আপনাকে তো সজনে কি বিজনে সর্বত্র উন্নত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমারদের প্রতিজ্ঞা, সাধারণ হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইবে—সাধারণ হিন্দুসমাজকে আমারদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি করিতে হইবে—ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজের নেতা করিতে হইবে। এই সাক্ষ্যটি স্থির রাখিয়া ব্রাহ্মেরা সকলে ঐক্য হইয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে তবে আশা করিতে পারি যে, এই প্রশস্ত ও বিচিত্র হিন্দুসমাজ উন্নত ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইবে। হিন্দুপ্রথা হিন্দুরীতি ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতিনীতি ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে। হিমালয়-উন্নত-মস্তকে যে সকল পবিত্র তুষাররাশি ধারণ করে, তাহাতে কি সে কেবল আপনার শোভা ও পবিত্রতা সম্পাদন করে, না তাহাকে বিগলিত করিয়া হিন্দুস্থানের মঙ্গল সাধনের জন্য ভূমিতলে নদ-নদী রূপে সহস্র ধারে নিস্যন্দিত করে? সেইরূপ ব্রাহ্মেরা যে ব্রাহ্মধর্মকে আপনাদের শিরোভূষণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, তাহা সকল হিন্দুসমাজে ওতপ্রোত করিয়া তাহার অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রাণপণে যত্ন করুন।

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ময়ূরকণ্ঠী প্রেম

বিমলচন্দ্র ঘোষ

অনেক স্মরণীয় রাত্রি
সৌরদীপ্ত দিবাশিখরে
অভ্রভেদী তুষার হয়ে রয়েছে !
সরণ্যুপ্রেমিক সূর্যের বর্ণসপ্তকে
যে সব রাত্রির প্রেম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ।

দূরে সরতে সরতে
নিবিড় গভীর কমনীয় উত্তাপ
তুষারে সমাহিত ।
আকাশময়ী রোদসীর বুক চিরে
সংখ্যাহীন স্মরণীয় কথারা
ময়ূরকণ্ঠী রামধনুতে
রঙ কাঁপায় ।

তখনো চাঁদ ওঠে নি ।
নিমগাছগুলোর হালকা সবুজ ছায়াঘেরা
নিরীহ স্বপ্নপরিমণ্ডলে
সেই বিরহকম্প্র ওষ্ঠের রসাস্বাদ
তপোনিষ্ঠ আত্মাকে দিয়েছিল
পরমেশ্বরীর যোগবিভূতি ।

সেই অপার্থিব প্রেমের বরাভয়ে
বিপ্লবের চৈতন্যশিখা,
নিবাত নিষ্কম্প নির্ধূম ।

বিষাদপাংশু গোধূলিকে অতিক্রম করা
অনলস অভিজ্ঞতা
সুদীর্ঘ সংঘাতের ভস্মস্তূপ মাড়িয়ে
পেয়েছে আজ
তুষারমৌলী সূর্য-সামীপ্যের যোগক্ষেম
বহুরূপী প্রেমের আলোয় ।

সর্বংসহা আকাশকন্যা
এখনো যন্ত্রণায় ভারাক্রান্তা !
অসংখ্য ব্যক্তি-বুদ্বুদ
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি··· !
তবু স্বার্থবিমূঢ় অহমেরা
ক্রমাগত সৃষ্টি করে
পাণ্ডুর প্রাণসঙ্কট ।
প্রেম আলো হারায়

নরস্রোত নারীস্রোতে
পঙ্কিল আবর্ত সৃষ্টি করে ।
সর্বংসহার বুকে নেই
পূর্ণপরিতৃপ্তির নির্ভরতা ।
'দেয়ালেই ময়লা জমে
আকাশকে ছুঁতে পারে না ।'—
রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন ।

যখনই দুর্নিবার ডাক আসে
প্রাণোপাসনার মহাপরিমণ্ডলে,
দুজনের উত্তপ্ত অমৃতবিনিময়
চেতনাকে আর উদ্‌ভ্রান্ত করে না ।
প্রেম আজ
স্মৃতির তুষারমৌলী হীরকশিখরে
লোকমুখী উপলব্ধির প্রশান্তিতে
ত্রিতাপজয়ী ।
লবণপুত্তলীর সমুদ্রজয় অর্থহীন,
অর্থহীন নিঃশ্রেয়স,
মোক্ষ মুক্তি নির্বাণও তাই ।
প্রেমই ঈশ্বর সৃষ্টি করে
বলে :
রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব !
ব্যক্তির পরমমুক্তি বিশ্বে বহুরূপে ।

নভোনীল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

টেড সাতদিন বাদে দীঘাওয়ারা ছেড়ে চলে গেছল। তাকে স্টেশনে তুলে দিতে একা দেবরাজেরই যাবার কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমিও সঙ্গী হয়েছিলাম।

দীঘাওয়ারা থেকে আপাতত বিদায় নিলেও টেড এখুনি ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবে না জেনেছিলাম। ইতিমধ্যে ভারতের দক্ষিণদিকের কয়েকটি জায়গা, বিশেষ করে তীর্থস্থান সে ঘুরে এসেছে। এখন কলকাতা হয়ে উত্তর ও পূর্ব-ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থস্থান যেমন পুরী, বারাণসী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, মথুরা, দ্বারকায় ক'দিন করে কাটিয়ে যাবে।

এই তীর্থদর্শনের আগ্রহ নিয়ে টেডকে একটু ঠাট্টা করেছিলাম তার দীঘাওয়ারা ছাড়বার দু'দিন আগে।

বলেছিলাম,—তীর্থগুলিতে একবার করে ঘুরে গেলেই ভারতবর্ষের ধর্মের মর্ম সব পেয়ে যাবে মনে করো?

প্রথম সাক্ষাতের পর টেডকে অহেতুক খোঁচা দেবার যে প্রবৃত্তি হয়েছিল তা থেকে এ ঠাট্টা করি নি। তার বিরুদ্ধে মনের সেই অর্থহীন আক্রোশ এই ক'দিনের পরিচয়েই কেটে গেছে। বরং বেশ একটু অন্তরঙ্গতাই গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে। ঠাট্টাটা নির্দোষভাবেই করেছিলাম তার জবাবটা শুনবার জন্যে।

টেড কিন্তু প্রথম কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছল কথাটা শুনে। কয়েক মুহূর্ত তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভুল বুঝে সে আহত হয়েছে মনে করে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার দরকার হয় নি। গাম্ভীর্যের বদলে টেডের মুখে হঠাৎ কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল।

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে উল্টে আমাকেই একটা প্রশ্ন করেছিল। কৌতুকোজ্জ্বলমুখে জিজ্ঞাসা করেছিল,—আচ্ছা তুমি সাধ করে দেবরাজের সঙ্গে এই আরণ্য নির্বাসন কেন বেছে নিয়েছ বলো ত'?

হেসে বলেছিলাম,—আমার প্রশ্নটা এইভাবেই এড়িয়ে যেতে চাও?

টেডও হেসেছিল। বলেছিল,—না এটা এক হিসেবে তোমার প্রশ্নের জবাবেরই প্রথম ধাপ!

কি রকম?—কপট বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম।

নিজের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে তোমার যা মনোভাব বুঝেছি আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিমানদের তাই হয়ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে দেবরাজের মত মানুষের সঙ্গে লেগে আছ কেন?

সত্যিই যদি শুনতে চাও ত' দেবরাজকেও যা বলি নি তাই তোমায় বলতে পারি। কিন্তু তার আগে বলি ধর্ম আধ্যাত্মিকতা এসব নিয়ে একটু-আধটু কৌতুক করি বলে সে সবের ওপর আমার অশ্রদ্ধা আছে ভেবে নিও না যেন।

না অশ্রদ্ধা আছে বলে ভাবি নি।—টেড একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিল,—তোমাদের মনের ভাবটা হল ঈষৎ অনুকম্পা-মিশ্রিত ঔদাসীন্যের। অজ্ঞ মূঢ় মানুষেরা এইসব ছেলেমানুষী নিয়ে মেতে থাকে এই জন্যে অনুকম্পা আর নির্বোধদের এ দুর্বলতা সারাবার চেষ্টা বৃথা বলে ঔদাসীন্য। পরিহাসচ্ছলে বললেও তীর্থস্থান সম্বন্ধে তোমার সত্যিই একটু বিরূপতা আছে। দুঃখের কথা এই যে, সে বিরূপতা অযৌক্তিক নয়। তীর্থস্থান মাত্রেই যে ধর্মের ব্যবসা চলে একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু প্রদীপের তলায় বলেই এখানে অত বেশি অন্ধকার একথাও ত' ভাবা যায়। আমি অন্তত তাই ভাবি। এই অন্ধকারই হয়ত প্রদীপের সন্ধান দেবে এই আশা করি।

থেমে গিয়ে একটু হেসে টেড আবার বলেছে,—তোমার মত অবিশ্বাসীর কাছে এ উত্তরের অবশ্য কোন মানে হয় না। নেহাৎ জবাব চাও বলে দিলাম। কিন্তু এখন বলো ত'

সত্যি করে তোমার মত মানুষের হঠাৎ এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যহীন অরণ্যবাসের খেয়াল কেন? কি আকর্ষণে এখানে পড়ে আছ?

যদি বলি গোয়েন্দাগিরি!—বলে একটু হেসেছিলাম।

গোয়েন্দাগিরি!—টেড ভুরু কুঁচকেছিল,—দেবরাজ কোন গুপ্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত বলে ত' মনে হয় না। আর হলে তার মত মানুষও এমন সমাদরে তোমায় অতিথি-বৎসলতা বোধ হয় দেখাত না. তুমিও আমার মত একজন দু'দিনের আলাপী একজন বিদেশীর কাছে বাহাদুরী করে গোয়েন্দাগিরিটা জাহির করতে না বোধ হয়।

কথাগুলো শেষ করবার সময় টেড হেসে ফেলেছিল।

কৌতুকের সুরেই বলেছিলাম,—গুপ্ত রাজনীতি ছাড়া গোয়েন্দাগিরির লক্ষ্য কি আর কিছু হ'তে পারে না? রাজনীতির চেয়ে আরো গভীর কিছুর সন্ধানে আমার গোয়েন্দাগিরি!

হেঁয়ালিটা পরিষ্কার করো।

করছি, তার আগে বলো ত' নীনা বলে কাউকে তুমি চেনো?

নীনা!—টেড একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল, —নীনা আবার কে? আমাকে এ প্রশ্নই বা কেন? আমি তোমাদের দেশের কোন মেয়েকেই চিনি না।

এ দেশের নয়। তোমাদের দেশেরই মেয়ে।—বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলাম,—সাধারণ ইওরোপীয় মেয়ে বলতে যা বোঝায় তা নন। প্রচলিত রীতিনীতি রেওয়াজের ধার ধারেন না। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মন।

টেড বাধা দিয়ে একটু পরিহাসের সুরে বলেছিল,—যে সব গুণ বা দোষের ফিরিস্তি দিচ্ছ তা দিয়ে বিশেষ একটি মেয়েকেই চেনা যায় না। আমাদের দেশে ওসব চরিত্রলক্ষণ একেবারে দুর্লভ নয়।

আগে সবটা শোন। তারপর মন্তব্য কোরো। এই নীনা মেয়েটির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ। কিছুকাল আগে বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষেই কাটিয়ে গেছেন, এমন কি বাংলা ভাষাটাও তার মধ্যে ভালোই শিখেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসাহী বলেই হয়ত তোমার পরিচিত মহলের কেউ হ'তে পারেন বলে মনে করছি।

না, সে রকম কাউকে মনে করতে পারছি না।—টেড খানিক ভাববার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিল।—পুরো নামটা কি: শুধু নীনাই ত' বলছ।

পুরো নামটা জানলে ত' বলব। ওই নীনা নামটুকু জানি।

একটু অধৈর্যের সঙ্গে এবার টেড বলেছিল,—আমার নীনাকে চেনা না-চেনার সঙ্গে দেবরাজের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে তোমার এখানে স্বেচ্ছা নির্বাসনের সম্বন্ধ কি?

সম্বন্ধ কিছু আছে।

নীনার সঙ্গে কি ভাবে আমার পরিচয় হয় সংক্ষেপে তা বলে নীনার মুখেই দেবরাজের নাম যে শুনেছি সে কথা টেডকে জানিয়েছিলাম।

টেড খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল,—এ তোমার বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা ছাড়া আর কি বলব! নীনা যেই হোন এই দেবরাজের নামই তিনি করেছিলেন, এরকম অনুমান একটু আজগুবি নয় কি?

একটু আজগুবি নিশ্চয়ই। কিন্তু দেবরাজ নামটা খুব সাধারণ নয়। তা ছাড়া দেবরাজ বাঙালী বলেই নীনার কথায় জানা যাচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসাহী একটি ইওরোপীয় মেয়ের আর কোন আজেবাজে বাঙালী দেবরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। মনে এ বিষয়ে যে সংশয় কৌতূহল ছিল তা হয়ত সুযোগের অভাবে চাপাই পড়ে যেত, যদি না হঠাৎ এখানে শিকারে এসে···

হঠাৎ আমার কথার মধ্যে টেড বাধা দিয়েছিল,— —দাঁড়াও দাঁড়াও। নাম বলছ নীনা। নীনা কেলার নয় ত'?

বললাম ত' শুধু নীনা. ডাকটুকুই শুনেছি। পদবী জানি না। এই নীনা কেলার কি তোমার পরিচিত?

পরিচিত নয়। কিন্তু নামটা একেবারে অজানা নয়। আসল নাম মেয়েটির আলাদা বলে শুনেছি। স্টেজে ওই ছদ্মনাম নিয়েছেন। হ্যাঁ মেয়েটির থিয়েটারের অভিনয়ে কিছু নাম আছে। জার্মান মেয়ে তবে বিলেতেই সাধারণত অভিনয় করেন। অভিনেত্রী-জীবনের সুরুতে কালিদাসের শকুন্তলা আর শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে জার্মানীতে নেমেছিলেন। আমি অবশ্য সে অভিনয় দেখি নি। একটা সেক্সপীয়র অভিনয়ের দলের সঙ্গে দূর প্রাচ্যে এসেছিলেন বলে খবর বেরিয়েছিল। খবর যা বেরিয়েছিল তা অবশ্য অভিনয়-সংক্রান্ত নয়, নাটুকে দলের সঙ্গে নীনার একটা গোলমালের। দলের মান খোয়াবার মত নীনার কোনো বেচালের জন্তে নাকি তাঁকে সাবধান করা হয়। নীনা তাতে কোনো কিছু না জানিয়েই কাজ ছেড়ে চলে যান নাটুকে দলকে আথান্তরে ফেলে। নাটুকে দল নীনার নামে নালিশ করেছিল। খেসারতের দায়ে জার্মন-অভিনেত্রী বলে খবরটা ছাপা হয়েছিল কাগজে।

একটু থেমে টেড আবার বলেছিল,—নীনা কেলার সম্বন্ধে ওইটুকুই জানি। তোমার যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইনি সেই নীনা কি না বলতে পারব না। দেবরাজের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ আছে বলেও ভাববার কোন কারণ নেই।

কারণ অবশ্য সত্যিই তেমন কিছু নেই। তা ছাড়া নীনা কেলারের বেচালের কথাটা বলে মাথাটা আরো

গুলিয়ে দিয়েছ। আমি যে নীনাকে সামান্য একটু জেনেছি বোঝা বলতে যা বুঝি তাঁর পক্ষে সেরকম কিছু করা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়।

মানুষ সম্বন্ধে কি বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য তা কি বলা যায়!—টেড হেসেছিল, কিন্তু এত যখন কৌতূহল সোজাসুজি দেবরাজকেই জিজ্ঞেস করো নি কেন?

করি নি অনেক কারণে। প্রথমত যে কাহিনীই এরমধ্যে থাক জবানবন্দীর মত শুনলে সে কাহিনীর সব সূক্ষ্ম আলোছায়া নষ্ট হয়ে যায়। তাই স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিফলন থেকে এ কাহিনী আবিষ্কার করতে চেয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত সোজাসুজি একথা জিজ্ঞাসা করবার মত ঘনিষ্ঠতা গোড়ায় দেবরাজের সঙ্গে ছিল না। এখনও যে হয়েছে তা বলতে পারি না। তবু শেষ পর্যন্ত ওই মোটা রাস্তাই বোধ হয় ধরতে হবে।

আমার সঙ্গে টেডও এবার হেসেছিল। হেসে বলেছিল, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু শুধু এই কৌতূহলটুকু মেটাবার জন্যেই দেবরাজের সঙ্গে এই নির্জনবাসে এতদিন কাটালে ভাবতে অবাক লাগছে। এই পাওনাতেই তুমি খুশি!

অভিমানে কোথায় যেন লেগেছিল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলেছিলাম,—হ্যাঁ তাতেই খুশি। তুমিই বা কি পাওনার জন্যে এখানে দিন কাটালে শুনি! কি পেলে এ কয়দিনে?

পাই নি হয়ত কিছুই। টেড আমার গলার রুক্ষতাকে যেন স্নিগ্ধ হাসিতে লজ্জা দিয়ে বলেছিল,—পাওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরি করতে পারাও ত' কম নয়। দান নিতে গেলে হাত ছড়িয়ে রাখলে ত' হয় না। আগে হাতদুটো জড় করে অঞ্জলি পেতে ধরতে হয়।

এবার হেসে ফেলে বলেছিলাম,—তোমার মুখেই শুনেছি দেবরাজকে ভারতীয় হেঁয়ালি ছাড়ছ বলে তুমি একদিন বিদ্রূপ করেছিল। এখন ত' তুমিই সেই হেঁয়ালি ছাড়ছ দেখছি।

তাই মনে হচ্ছে তোমার?—টেড এবার কেমন একটু যেন ব্যথিতভাবে আমার দিকে চেয়েছিল,—কিন্তু এক জগতের ভাষা অন্য জগতের কাছে হেঁয়ালিই থাকে যতদিন শ্রদ্ধাভরে অক্ষর পরিচয় না করা যায়।

কথাটা বলেই টেড উঠে পড়েছিল।

এ প্রসঙ্গে সে ছেদ টানতে চায় বুঝেছিলাম। আমারও তখন তাতে আপত্তি নেই।

শেষপর্যন্ত সোজাসুজিই দেবরাজকে নীনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করব বলেছিলাম টেডকে। মনে মনে সেই সঙ্কল্পই তখন করেছিলাম।

কিন্তু তার দরকার হয় নি।

দূর থেকে আভাসে যার হদিস পাবার চেষ্টা করছিলাম, আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগে একেবারে তার যেন মধ্যস্রোতে ভাসবার সুযোগ পেয়েছি।

টেডকে পৌঁছে দেবার জন্যে শেষ মুহূর্তে আমিও দেবরাজের সঙ্গী হতে চেয়েছিলাম। তার আগে একটা দিন মনের মধ্যে বেশ দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে কাটিয়েছি। টেডকে পৌঁছে দেওয়া নয় স্টেশন পর্যন্ত তার সঙ্গী হয়ে সেখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথাও একবার ভেবেছিলাম। নীনা ও দেবরাজ সম্বন্ধে নিজের অদম্য কৌতূহলটা কেমন যেন অন্যায় ও অসুস্থ মনে হয়েছিল। হয়ত টেডের সরল নির্বিষ পরিহাসটুকুই মনের এই আন্দোলনের জন্যে দায়ী। কারণ যাই হোক এ কৌতূহলের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেব না বলেই একসময়ে ঠিক করে দেবরাজকে সেকথা বলতে গেছলাম।

দেবরাজ তখন কুটীরের বাইরে বসে তার সাইকেলের একটা ভাঙা 'স্পোক' মেরামত করছে। আধ্যাত্মিকতা বা সন্ন্যাস তার কোন স্তরের তা বুঝি নি, কিন্তু সে যে ভাবের নেশায় মাতাল অলস স্বপ্নবিলাসী নয়, এ ক'দিনে ভালো করেই তা জানতে পেরেছি। সারাক্ষণ কিছু না কিছু একটা কাজ নিয়ে সে আছে। নিন্দার ছলে বলা যায় অতি ঘোর সংসারীও সারাক্ষণ ছোট তুচ্ছ কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে না। বিদেশের অত বড় বৈজ্ঞানিক ডিগ্রি যার ভূষণ, কাঠকাটা আর জলতোলা আর বাসনধোয়া, সাইকেল মেরামত করা তার পক্ষে নেহাৎ অযোগ্য ছোট কাজ ছাড়া আর কি? কিন্তু তার ধরণ ধারণ দেখলে মনে হয়, এই সব কাজেই তন্ময় হয়ে থাকতে তার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তার তন্ময়তাটুকু উপভোগ করে নিজের বক্তব্যের সামান্য ভূমিকা হিসেবে বলেছিলাম,—তোমার বন্ধু টেডও কাল চলে যাচ্ছে।

কাজ থেকে মুখ না তুলেই দেবরাজ বলেছিল, হ্যাঁ, ওর আর বেশিদিন থাকবার উপায় নেই।

তারপর যেন অন্তর্যামী হয়ে আমার বক্তব্যটা অনুমান করে বলেছিল,—কিন্তু তুমি যেন এই সঙ্গে যাবার কথা বোলো না। তোমার এখন যাওয়া হবে না।

বেশ একটু অবাক হলেও প্রতিবাদের সুরে বলেছিলাম,—কিন্তু এখানে আর কতদিন বসে বসে তোমার শান্তিভঙ্গ করব!

এখানে বসে বসে কেন, অন্য জায়গায় যেতে যেতেই কোরো। শান্তিভঙ্গটা হলেই হোলো। দেবরাজ সকৌতুকে আমার দিকে চেয়েছিল।

না ঠাট্টার কথা নয় দেবরাজ! অস্বস্তি প্রকাশ করে বলেছিলাম,—আমার সত্যি এখানে আর থাকার মানে হয় না।

দেবরাজের সাইকেল মেরামত তখন শেষ হয়েছে। পেছনের চাকাটা দু'বার ঘুরিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সাইকেলটা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে সে স্নিগ্ধ হেসে বলেছিল,—এখানে আমরা থাকছি না। টেড যাচ্ছে কাল, আর পরশুই আমরা কাশী রওনা হচ্ছি।

কাশী! আমি সত্যি বিমূঢ়,—হঠাৎ কাশী কেন? আর আমি সেখানে যাবো কি জন্যে!

যাবে, আমি অনুরোধ করছি বলে। তা ছাড়া সত্যি তোমাকে আমার দরকার।

আমাকে দরকার তোমার! পরিহাস করছ?—আমার গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে একটু ক্ষোভও বোধ হয় ছিল।

না পরিহাস করছি না।—দেবরাজ হেসেছিল,—তোমাকে আমার দরকার হতে পারে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে।

কিন্তু আমি ত' তোমাদের সাধক দলের মানুষ নই। নেহাৎ স্থূল ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট।

কথাটার মধ্যে নিজের অনিচ্ছাতেই ব্যঙ্গ যেটুকু ছিল দেবরাজ তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্নিগ্ধস্বরে বলেছিল,—স্থূল বোলো না। বলো সহজ স্বাভাবিক মানুষ। সেই মানুষই আমার দরকার।

কিন্তু আমার নিজের কাজকর্ম আর নেই। তোমার মত সব কিছু ছেড়ে বিবাগী হয়ে কাটালে ত' আমার চলবে না।

বিবাগী হতে তোমায় বলছে কে!—দেবরাজ প্রসন্ন হাসির সঙ্গে বলেছিল,—এতদিন এই বনবাসে সখ করে কাটাতে পারলে আর হপ্তাখানেক আমার সঙ্গে কাশী গিয়ে থাকলেই তোমার সব কিছু মাটি হয়ে যাবে। তোমার ছুটি ত' এখনও ফুরোয় নি জানি।

এবার হেসে ফেলে বলেছিলাম—আমার কাজ কি তাই না জেনে ছুটিটার হিসেব করে ফেললে কি করে?

তোমার কিছুই না জেনে সমাদরে অতিথি করে রেখেছি মনে করো নাকি! দেবরাজ কৌতুকের স্বরে বলেছিল,—তোমার নাড়িনক্ষত্র সবই হয়ত জানি।

কৌতুকের সুর থাকলেও মনে মনে একটু বুঝি চমকে উঠেছিলাম। কথাটার মধ্যে আমার গোপন কৌতূহল সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত আছে কি না ঠিক বুঝতে পারি নি। মুখে অবশ্য পরিহাসের সুর নিয়েই বলেছিলাম,—আমি ত' নিজে থেকে কিছু তোমায় বলি নি। নখদর্পণ সিদ্ধিটাও তাহলে লাভ করেছ নাকি!

হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই প্রসঙ্গটা শেষ হয়েছিল। দেবরাজের সঙ্গে কাশী যাওয়ার প্রস্তাবেই রাজি হ'তে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

কাশী যাওয়া কিন্তু হয় নি। প্রয়োজন হয় নি তার।

টেডকে তুলে দিতে দেবরাজের সঙ্গে আমিও পাটনা গিয়েছিলাম। টেড আপাতত এখান থেকে কলকাতায় যাচ্ছে। সেখান থেকে পুরী ঘুরে এসে তারপর উত্তর ভারতের দিকে রওনা হবে। উত্তর ভারতের তীর্থগুলি সারবার পর আর একবার তার এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে দীঘাওয়ারাতেই ফিরে আসবার ইচ্ছা আছে শুনেছিলাম।

টেডের দিল্লী-হাওড়া এক্সপ্রেসেই যাওয়ার কথা। আগে থেকে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। ট্রেনে অসম্ভব ভিড়ের দরুণ টেডকে সে গাড়িতে তোলাই গেল না। স্টেশন-কর্তৃপক্ষ জানালেন কিছু পরের ট্রেন আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে একটা বার্থ পাওয়া যাবে।

দিল্লী এক্সপ্রেসে টেডের জায়গা না পাওয়ার মধ্যেও ঘটনার একটা অদ্ভুত যোগাযোগ থাকতে পারে তখন ভাবতে পারি নি।

আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস সেদিন একঘণ্টার ওপরে লেট। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ যে ট্রেন আসবার কথা রাত সাড়ে আটটার আগে তার দেখা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। টেড আমাদের জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। অত রাত্রে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে দীঘাওয়ারা ফিরে যাওয়া দূরের কথা পাটনা থেকে ওপারের স্টীমার পাওয়ারও আমাদের অসুবিধা হতে পারে বলেই তার ভাবনা। আমাদের তাই বেশ কয়েকবার অনুরোধ করলে তার ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা না করে চলে যাওয়ার জন্যে।

আমি ত' আর অবোধ অসহায় শিশু নই। অজানা জঙ্গলের মাঝেও পড়ি নি। সে বোঝাবার চেষ্টা করলে,—আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে অপেক্ষা করবার কোন দরকার নেই।

আমাদেরই বা জঙ্গলের মাঝখানে হারানো অসহায় শিশু ভাবছ কেন! দেবরাজ হেসে জবাব দিল,—ওপারের স্টীমার যদি নাও ধরতে পারি পাটনা শহরে থাকবার একটা জায়গা জোটাতে পারব।

এ জবাবে তখনকার মত চুপ করলেও টেড তার কুণ্ঠাটা ট্রেন আসা পর্যন্ত আরো কয়েকবার প্রকাশ না করে পারে নি।

সেদিন তার অনুরোধে স্টেশন ছেড়ে আগে চলে গেলে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের চমকটা অমনভাবে ওইখানেই অন্তত পেতাম না।

টেডকে তার বার্থে তুলে দিয়ে ট্রেন ছাড়বার পর বাইরের গেটের দিকে দেবরাজের সঙ্গে যাচ্ছি হঠাৎ পেছন থেকে একটা ডাক শুনে ফিরে তাকালাম।

দেবরাজকেই কে ডাকছে। কাছে এসে দাঁড়াবার পর মানুষটিকে চিনতে পারলাম না। আমাদেরই বয়সী হবে! ভারতীয় হলেও একেবারে পাকা সাহেবী পোষাক। প্রথম সম্ভাষণ শুনে অবশ্য বাঙালী বলেই বুঝলাম।

কি আমায় দেখেই পালাচ্ছ নাকি!—লোকটি দেবরাজের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে হেসে উঠল।

দেখলে হয়ত তাই করতাম। দেবরাজও হাসল,—তবে সত্যিই দেখতে পাই নি। কিন্তু তুমি হঠাৎ এখানে কোথা থেকে?

কেন তুমি এখানে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছ বলে গোটা বিহারটাই আমার out of bounds হয়ে গেছে নাকি!

তাহলে ত' তোমাকে আগেই এ অঞ্চলে দেখতাম। দেবরাজও পাল্টা পরিহাস করলে,—নিষেধ জানলেই ত' অম্বর চৌধুরীর জেদ বাড়ে।

অম্বর চৌধুরী নামটা শুনে একটু সচকিত হলাম সত্যিই। চাক্ষুষ পরিচয় কখনো না হলেও নামটা এখনই আমার অজানা নয়। বিদেশ থেকে বিদ্রোহী বেপরোয়া ছাত্র ও নানা আন্দোলনের ধ্বজাধারী হিসেবে ইংরেজ শাসনের শেষ প্রহরে যে দু-একজনের সুনাম দুর্নাম আমাদের কাছে পৌঁছেচে, অম্বর চৌধুরী ছিল তাদেরও মধ্যে অগ্রগণ্য।

চেহারাটা আরো একটু ভালো করে লক্ষ্য করলাম। লম্বায় প্রায় দেবরাজেরই সমান। কিন্তু ময়লা রোগাটে চেহারা। নিখুঁত ইউরোপীয় পোষাকের সঙ্গে মাথার ঝাঁকড়া উস্কো-খুস্কো চুলের রাশ বেশ একটু বেমানান। এই অবাধ্য চুলের মত মুখের ভাবে শরীরের গড়নে ও চলনে বলনে একটা তীক্ষ্ণ দীপ্ত উগ্রতা।

একটু অন্যমনস্ক হওয়ার দরুণ অম্বর ও দেবরাজের মাঝখানের সকৌতুক কথা কাটাকাটি ভালো করে শুনি নি। দেবরাজকে এবার আমাদের পরিচয় দিতে শুনে মনোযোগী হয়ে হাত তুলে নমস্কার জানালাম।

অম্বর চৌধুরী হাত বাড়িয়ে করমর্দনই করতে চেয়েছিল কি না জানি না। কিন্তু নেহাৎ যেন হেলাভরে হাতদু'টো নমস্কারের ভঙ্গিতে একটু তুলেই দেবরাজের দিকে ফিরে মুখ টিপে হেসে বললে,—আমায় দেখে যদি অবাক হয়ে থাকো তাহলে আরো বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত হও।

সেটা কি রকম? দেবরাজ কৌতুকের সুরেই জিজ্ঞাসা করল।

নীনাও আমার সঙ্গে এসেছে এই ট্রেনেই। অম্বর চৌধুরীর মুখের হাসিটা এবার কেমন যেন বাঁকা,—এত রাত্রে স্টীমারে ওপার গিয়ে ত' লাভ নেই। তাই তাকে ওদিকে দাঁড় করিয়ে আমি রিটায়ারিং রুমের ব্যবস্থা করতে আসছিলাম। হঠাৎ তোমার সঙ্গেই দেখা।

কিন্তু নীনা তোমার সঙ্গে···? দেবরাজ প্রশ্নটা আর শেষ করল না। তার মুখে আর সে কৌতুকের আভা নেই।

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে বেনারসের টুরিস্ট সেণ্টারেই দেখা হয়ে গেল যে! অম্বরের মুখে এবার যেন একটু ধূর্ত হাসি,—তোমার সেখানে যাবার কথা। তার বদলে আমিই তাকে আগে টেনে নিয়ে এলাম। অন্যায় করি নি নিশ্চয়। [ক্রমশ।

স্থূলত্ব ও ক্ষুধার পারস্পরিক যোগাযোগ

সম্প্রতি ঔষধ ও পুষ্টি পত্রিকায় পশ্চিম জর্মানীর একজন চিকিৎসক ডাক্তার লোটে থেওয়াণ্ট ম'সের পর মাস পরীক্ষা ক'রে এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, মোটা লোকরা স্রেফ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়। কতকগুলো অসাধারণ রোগ যাতে মানুষ মোটা হয় যেমন শরীরের কোন গ্রন্থির নিঃসরণ কিম্বা মস্তিষ্ককোষের কোন বিশৃঙ্খলা ছাড়া মোটা হওয়ার একমাত্র কারণ গোগ্রাসে খাওয়া। ফলে দেহের মধ্যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পুষ্টি জমা হয়। এটা একটা বদভ্যাস কারণ মানুষ তখন খিদে পাক চাই নাই পাক অসংযমীর মত খেয়ে যারা প্রকৃতির বারণ না মেনে খেয়ে যাওয়ার ফলে শরীর বিগড়ে যায় এবং ঠিক খিদের সময় তখন আর স্নায়ুকেন্দ্র সাড়া জাগায় না। একদিন যখন মোটাসোটা গোলগাল চেহারা ছিল, সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের প্রতীক কিন্তু এখন সে ধারণা পাল্টে গেছে। মানুষ এখন জেনে গেছে যে, মোটা হওয়া একটা রোগবিশেষ আর তাই আজকাল সবাই চেষ্টা করে যাতে সে বেগে মোটা না হয়ে যায়। খুব তেল-ঘি মিষ্টি খেয়ে একবার মোটা হয়ে গেলে খাওয়া-দাওয়ার বাধাবাধি করলেও সহজে রোগা হওয়া যায় না। কারণ তখন দেহের মধ্যে জমা চর্বি বের ক'রে দেওয়া যায় না যেহেতু দেহ তখন অবিরাম বাড়তি খাদ্যশক্তি গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শরীরের গঠনতন্ত্রে তখন বিপজ্জনক পরিবর্তন হতে থাকে। দেহের বিভিন্ন তন্তু তখন এত বেশি রক্ত শর্করা শুষে নিতে থাকে যে, দেহের প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি তাদের উপযুক্ত অংশ পায় না। এর ফলে খিদে পেতে থাকে ও মোটা মানুষরা আরও তেল-মশলা দেওয়া খাবার খায় কিন্তু কিছুতেই তার খিদে যায় না। বেশি খেলে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয় ও দেহে প্রোটিন রাখার জায়গা থাকে না। দেহের তন্তুতে তন্তুতে জল আর সোডিয়াম জমা হতে থাকে। মোটা লোক তখন নড়াচড়া কম করে যার দরুণ তার দেহের পক্ষে বেশি শক্তির দরকার থ কে না কিন্তু তবুও সে সমানে খেয়ে চলে আর দেহে চর্বি জমা করে। তারপর যখন সে দেখে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না তখন সে মোটা হওয়াটাকে মেনে নেয় এবং কিছুদিনের মধ্যে দেহে একটা অবসাদ আসে। এই অবস্থায় খাওয়াকেই সে একমাত্র আনন্দ মনে করে। এই যখন রোগীর অবস্থা তখন মনকে বশে রাখা, কঠোর শৃঙ্খলা ও ধৈর্য, খাদ্যের বাছবিচার করে চলা ছাড়া মোটা লোকের আর গত্যন্তর নেই।

—ডি এ ডি।

শাক্ত-দর্শনের ভূমিকা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী এবং সার জন উড্রফ]

'কন্সাসনেস' চিৎ শব্দের যথার্থ, সম্পূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীন ইংরেজী প্রতিশব্দ নয়। পাশ্চাত্যের জড়বাদীরা একমত যে কন্সাসনেস (চেতনা) হচ্ছে মস্তিষ্করূপী জড়সন্নিবেশের একরকম আকস্মিক ফল; কিন্তু সেখানকার বস্তুতন্ত্রবাদী, বিজ্ঞানবাদী কিংবা ব্যবহারিকসত্তাবাদী দার্শনিকেরা কন্সাসনেসের স্বরূপ ও কর্ম সম্পর্কে একমত নন। তাঁরা এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু এইসব মতের কোনটাই চিৎ সম্বন্ধীয় বৈদান্তিক মতের সমর্থক নয়। বেদান্ত মত অনুসারে চিৎ হচ্ছে পূর্ণ ও পরম সচ্ছক্তি এবং এই মতের প্রসার ও গভীরতা অনেক বেশি। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানবাদকেও শুদ্ধচেতনার (কন্সাসনেস এজ সাচ) গুরুত্ব তেমন স্বীকৃত হয় নি: সেখানে প্রজ্ঞা, বিচার, ইচ্ছে বা কল্পনা এবং অধুনা অনুভবের (Experience) গুরুত্ব হচ্ছে অধিকতর। এই সব বিজ্ঞানবাদী দর্শনে চেতনাকে (কন্সাসনেসকে) সত্তার সারীভূত উপাদান না বলে, কোনও বিশ্বব্যাপী ভাব বা প্রত্যয়, কিম্বা প্রজ্ঞা বা সঙ্কল্প ইত্যাদিকে মূলবস্তু বলা হয়েছে। চেতনাই যে পরমবস্তুর স্বরূপতা এইসব দর্শনে অস্বীকৃত। এমন কি চেতনা যে পরমবস্তুর অপরিহার্য তটস্থ লক্ষণ তাও সাধারণত এইসব দর্শনে স্বীকৃত হয় নি। বিশ্বব্যাপ্ত প্রত্যয়গুলো বা ইচ্ছাগুলো কখনও চেতনার সংযোগে সচেতন হয়ে প্রকাশিত হয়; কিন্তু অন্য সময় অচেতন অবস্থাতেই থাকে।

সাম্প্রতিক বিজ্ঞানবাদে অনুভব বা সংবিদের একাংশ মাত্র, যথা বুদ্ধি, ইচ্ছা বা কল্পনাকে তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ না বলে অনুভবকে (Experience) তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ বলার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। তথ্যের একদেশের ওপর ভিত্তি না করে সমস্ত তথ্যটার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ফলে প্রতীচ্য বিজ্ঞানবাদ অধুনা বেদান্ত মতের অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে, কিন্তু তবুও মূল প্রভেদটা রয়ে গেছে; পাশ্চাত্য দর্শনে চেতনা অনুভবের স্বরূপ লক্ষণ নয়; অনুভব ও চেতনার সংযোগ বিচ্ছেদ্য ও আকস্মিক। সেইজন্য অনেক সময় অনুভব অবচেতন এবং অনেক সময় অচেতন।

পাশ্চাত্য দর্শনে (কন্সাসনেস শব্দটাকে) এই সঙ্কীর্ণ অর্থে নেওয়া হয়েছে; সেখানে শুধুমাত্র জ্ঞানের প্রকাশসত্তা কিংবা স্বাভাবিক ও জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ সচেতন অনুভবকে কন্সাসনেস বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রথমোক্ত মত অনুযায়ী চৈতন্য যেন একরকম দীপশিখা; তার সহায়তায় ব্যক্তিগত চেতনার অন্তর্গত বিষয়গুলোকে বা বিশেষগুলোকে জানতে পারা যায়। দ্বিতীয়োক্ত মত অনুযায়ী অনুভবের যে-অংশ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত সেই অংশই হচ্ছে চেতনা অর্থাৎ চেতনার বিষয়গুলোর মধ্যে যেগুলো জ্ঞাত সেগুলোর সমষ্টি হল চেতনা। যে অর্থেই নেওয়া যাক, চেতনা ও অনুভবের ক্ষেত্র বা পরিধি এক নয়; চেতনার চেয়ে অনুভব হচ্ছে বৃহত্তর তথ্য। দীপশিখার অর্থে চেতনা কতগুলো বিষয়কে উদ্ভাসিত করে: বাকি বিষয়গুলোতে দীপশিখার আলো পৌঁছতে পারে না এবং উদ্ভাসিত বিষয়গুলোর অর্থেও সমস্ত বিষয়গুলোর মধ্যে মাত্র একাংশকে চেতনা বলা চলে। যেমন ব্যষ্টির অনুভবের বেলায় তেমনি সমষ্টির বা ভূমার অনুভবের বেলাতেও অনুভবের ক্ষেত্রের চেয়ে চেতনার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর বলতে হয়। ভূমার অনুভবের নিত্যধর্ম হচ্ছে চেতনা; কিন্তু সাধারণত পাশ্চাত্যদর্শনে এই মতটা প্রচলিত নয়। পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের সাধারণ মত হচ্ছে চেতনা ভূমার অনুভবের স্বরূপগত ধর্ম নয়। কেউ কেউ মনে করেন চেতনা ও অনুভবের সংযোগ বিচ্ছেদ্য; আবার কেউ কেউ মনে করেন চেতনার সঙ্গে অনুভবের সংযোগটা অবিচ্ছেদ্য।

দীপশিখা যেমন আঁধারের জিনিসকে সুপ্রকাশিত করে, তেমনি কন্সাসনেসের কাজ হচ্ছে জ্ঞেয়ের উজ্জ্বল প্রকাশ; সেইজন্য কেউ কেউ দীপশিখাবৎ প্রকাশকে কন্সাসনেস বলেন; কিংবা অনুভূত জগতের বিমর্শের যে অংশ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয় সেই উদ্ভাসিত অংশকে কেউ কেউ কন্সাসনেস বলেন। কিন্তু কন্সাসনেস শব্দকে এইরকম সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করার সপক্ষে কোনও যুক্তি নেই। কেবল উজ্জ্বল প্রকাশের অর্থে কন্সাসনেস শব্দকে গ্রহণ করলে চারটে প্রশ্ন ওঠে। (১) দীপশিখাবৎ প্রকাশটি কি ব্যক্তির অনুভব রাজ্যের সব কিছুকে প্রকাশিত করে, না শুধু খানিকটা অংশকে প্রকাশ করে? অর্থাৎ প্রকাশের পরিধি কি অনুভবের পরিধির সমান না সঙ্কীর্ণতর? (২) এই দীপশিখারূপী প্রকাশটি কি ব্যক্তির অনুভবকে সব সময়েই প্রকাশিত করে, না কখনও কখনও মাত্র প্রকাশিত করে? অর্থাৎ ব্যক্তির অনুভব কি কখনও সচেতন এবং কখনও অচেতন? (৩) এই প্রকাশের আলোতে বিশ্বের সমস্তটাই উদ্ভাসিত হয়, না

অংশবিশেষে মাত্র উজ্জ্বল হয়? (৪) বিশ্বাত্মার অনুভব কি কখনও চেতনাযুক্ত এবং কখনও চেতনাহীন?

উপরি-উক্ত প্রশ্ন চারটির সম্পর্কে শাক্ত-দর্শনের অভিমত হচ্ছে এই: চিৎ-এর প্রকাশ সর্বতোব্যাপী: এমন কোনও অনুভব নেই যা সম্পূর্ণ প্রকাশশূন্য। তবে বহুতর অনুভব জীব কর্তৃক উপেক্ষিত হয় কিম্বা ব্যবহারের অনুপযোগী বলে পরিত্যক্ত হয়। সেগুলো অবচেতন বা অচেতন অনুভব বলে খ্যাতি লাভ করে: কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর প্রকাশসত্তা ও সচেতন অনুভবগুলোর প্রকাশসত্তার মধ্যে পার্থক্যটা কেবল মাত্রাগত। পূর্ণ প্রকাশসত্তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে চিদাকাশ—চিদাকাশের প্রকাশ সীমাহীন ও বাধাহীন। বিমর্শরূপেও চেতনা সর্বব্যাপী। যদিও দু'টো অসীম তত্ত্বের তুলনা করা যায় না, তবুও বলতে পারা যায় যে, অন্তর্লীন বিমর্শের ক্ষেত্র প্রকাশের ক্ষেত্রের চেয়ে ক্ষুদ্রতর; এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় অবেদান্তিক দার্শনিকদের মতে ঠিক এর বিপরীত। তাঁরা বলেন যে বিমর্শের বিষয়ের এক অংশ মাত্র প্রকাশমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কন্সাসনেস এবং চিৎ শব্দ দু'টো একার্থক নয়। কন্সাসনেসকে প্রকাশ না বলে সবিষয়ক-জ্ঞান রূপে বিমর্শরূপে ধারণা করলে আরও একটা অসুবিধা হয়।

আপত্তি ওঠে; বিষয়ক জ্ঞান হচ্ছে চিৎ-এর একটা বিশেষ অবস্থা; এছাড়া চিৎ-এর একটা নির্বিষয়ক ও তুরীয় অবস্থাও আছে। অবস্থাটা সাধারণত প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু শুদ্ধ প্রকাশ কিম্বা শুদ্ধ চৈতন্যকে একটা কাল্পনিক প্রত্যয়মাত্র বলা ভুল। শুদ্ধ চৈতন্যের পরিচয় আমরা আমাদের সাধারণ অনুভবের মধ্যেই পাই এবং যোগের দ্বারাও নির্বিশেষ শুদ্ধ প্রকাশের অনুভব লাভ করা যায়। সেইজন্য আমরা বলতে বাধ্য যে চিৎ দু'রকম, যথা (১) সবিশেষ এবং (২) নির্বিশেষ। রামানুজ প্রভৃতির মত হচ্ছে এই যে, প্রকাশক ও প্রকাশ্যের মধ্যে নিত্যসংযোগসম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু এই মত সত্য নয়। বুদ্ধি প্রত্যয় দ্বারা চিৎ-এর স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। চিৎ স্বরূপত বিষয় ও বিষয়ী এই দ্বন্দ্বসম্বন্ধের অতীত এক পদার্থ। অথচ চিৎ-এর ভেতরেই এমন শক্তি আছে, যার প্রভাবে অনুভব দ্বন্দ্বাকারে প্রকটিত হয়।

লৌকিক অনুভবের মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য চিদাকাশ-রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং যোগসাধনার দ্বারা এই শুদ্ধ প্রকাশের উপলব্ধি হয়। কেউ যদি মনে করেন যে, বিষয়ের বোধকে বাদ দিলে কেবল বিষয়ীর বোধ হবে এবং সেই বোধই হচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্যের বোধ, তা হলে ভুল হবে। শুদ্ধ চৈতন্য হচ্ছে প্রকাশমাত্রের জ্ঞান। এই জ্ঞানে প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশের বিষয় বা জ্ঞেয়। (বিষয় ও বিষয়ীর আকার ব্যতীত জ্ঞানের উদয় অসম্ভব।) এই মত গ্রহণ করলে দু'টো ভ্রমে পতিত হতে হয় না। (১) সবিশেষ চৈতন্য একমাত্র সত্য এবং নির্বিশেষ চিন্মাত্র বলে কিছুই নেই, সেটা এক অবাস্তব কল্পনামাত্র এইরকম মনে করাটা হচ্ছে প্রথম ভ্রম। (২) নির্বিশেষ চৈতন্যই পরমতত্ত্ব এবং চৈতন্যের বিষয়গুলো ও বিশেষগুলো অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ চিন্মাত্রের ওপর একটা মায়াময় আরোপ মাত্র এইরকম মনে করাটা হচ্ছে দ্বিতীয় ভ্রম। প্রত্যুত শুদ্ধ চৈতন্য যেমন বাস্তব, বহুরূপে ও বিচিত্ররূপে প্রকটিত বা প্রলীন হওয়ার শক্তিও তেমনি বাস্তব এবং শক্তির প্রকাশরূপী অসংখ্যগুণসমন্বিত বিশ্বটিও সেইরূপ বাস্তব।

শাক্তমতে চিৎ বা চেতনাকে সৎ-এর পরিহার্য তটস্থ লক্ষণ বলা ভুল, এমন কি তাকে সৎ-এর অপরিহার্য তটস্থ লক্ষণ বলাও ভুল। স্থির চিদাকাশই চিৎ-এর একমাত্র রূপ নয়। শক্তিরূপে চিৎ গতিশীল এবং চিৎসত্তা ও চিচ্ছক্তি অভিন্ন। সুতরাং সবিশেষ ও নির্বিশেষ দুইপ্রকার অনুভবই চিৎ-এর অংশ। চৈতন্যকে একাধারে অনুভবের স্বরূপ, শক্তি ও আকার বা বিষয় বলা চলে। গুণ ও গুণী, শক্তিমান ও শক্তি, কারণ ও কার্যের মধ্যে স্বরূপত বা তত্ত্বত কোনও ভেদ নেই। এগুলোর পার্থক্য কেবল ব্যবহারিক বা বুদ্ধির প্রত্যয়গত। সেইজন্য, চিচ্ছক্তি জগৎপ্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হয়, বিশ্বাস করতে হলে চিচ্ছক্তি ও জগৎপ্রপঞ্চ যে অভিন্ন ও এক তাও স্বীকার করতে হয়। চেতনা এক জিনিস এবং চেতনার শক্তি বা ক্রিয়া আর এক জিনিস এরকম ভাবা একরকম দ্বৈতবাদ। চিচ্ছক্তির সত্তা এক জিনিস এবং তার ক্রিয়া আর এক জিনিস এরকম মনে করাও দ্বৈতবাদ।

বর্তমান মতানুসারে চেতনাকে অন্য কোনও পদার্থের আকস্মিক গুণ কিংবা নৈসর্গিক গুণ বলে গ্রহণ করা ভুল। চেতনাই পদার্থ, চেতনাই শক্তি এবং চিচ্ছক্তির ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই রূপই চেতনার অন্তর্গত। আমরা সাধারণত মনে করি যে, চিৎ এবং সজ্ঞান অনুভব একার্থক এবং সেইজন্য স্বাভাবিক চৈতন্য বলতে সাধারণত আমরা সীমাবদ্ধ, ব্যবহারিক ও সচেতন অবস্থাকেই নিরূপিত করি এবং সচেতন অবস্থা অবচেতন বা অচেতন অবস্থা থেকে পৃথক এরকম কল্পনা করি। এইরকম ভ্রান্ত ও একদেশী ধারণার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে অনেক সময় চেতনাকে এক অপর পদার্থের আকস্মিক গুণ বলে মনে করা হয়। চেতনাকে পূর্ণদৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, চেতনা হচ্ছে একপ্রকার শক্তি, বিচিত্র ও সবিষয়ক অনুভবরূপে প্রকাশিত হওয়াই তার ধর্ম এবং প্রকাশের মধ্যেই তার স্থিতি। সুতরাং আমাদের ভাবনা, চিন্তা, বাসনা ও দুঃখাদির বেদনামাত্র কতক অংশ চেতনার

দ্বারা প্রকাশমান এবং বাকি অংশ চেতনার আলোকের বাইরে ক্রিয়াশীল—এরকম মত অত্যন্ত ভ্রান্ত। মনকে চেতন ও অচেতন অবস্থা নির্বিশেষে নর্তনশীল মনে করা একটা দুষ্ট কল্পনা মাত্র।

দ্বৈতবাদী দর্শন ও কয়েকটা অদ্বৈতবাদী দর্শনও উপরি-বর্ণিত ভ্রান্ত মতটার সমর্থক, তা আমরা দেখতে পাই। এরকম মত পোষণের মূলে আছে চিৎ বা চৈতন্য সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ ধারণা। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে চৈতন্য জীবের একটা সাময়িক ধর্ম মাত্র, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সেটা তাঁর নিত্য ও অপরিহার্য ধর্ম। কিন্তু ঈশ্বরের চৈতন্যও একটা ধর্ম বা গুণ মাত্র—সেটা গুণী বা ধর্মী পদবাচ্য নয়। পূর্ব মীমাংসার ভট্ট-সম্প্রদায়ের মত হল যে, জীবের একাংশ চেতনাত্মক এবং অপরাংশ অচেতন। এই মত অনেকটা সেই আধুনিক মতের সমান যেই মত অনুসারে মানুষের মনকে একটা ভাসমান হিমশৈলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই আধুনিক মত অনুসারে মানুষের মনের নয়-দশমাংশ অবচৈতন্যের অন্ধকার গুহার মধ্যে নিমগ্ন। সাংখ্য-দর্শনে পুরুষ হল চিৎস্বরূপ, কিন্তু এই দর্শনে মহৎ, বুদ্ধি, মন প্রভৃতিকে অচেতন পদার্থ মনে করা হয়েছে। সেইজন্য সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিব্যাপার বা জ্ঞান হল মূলত কতগুলো অচেতন ক্রিয়ার ওপর চৈতন্যের প্রতিফলন বা আলোকপাত। একথা সত্য যে, সাংখ্যদর্শনে চেতনা শুধুমাত্র প্রকাশক বা প্রতিফলন নয়, চৈতন্য সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা বা সাক্ষীও, যতক্ষণ চৈতন্য অচেতন ক্রিয়াগুলোকে দেখে, ততক্ষণ সেগুলো চলতে থাকে। চৈতন্যের দেখা বন্ধ হওয়া মাত্র অচেতন ক্রিয়াগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অচেতন ক্রিয়াগুলোর ওপর চৈতন্যের কোনও কর্তৃত্ব বা কারকত্ব নেই। একজন পুরুষ কৈবল্যলাভ করলেও প্রকৃতির ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় না; তার কারণ, আরও অনেক পুরুষ আছে এবং প্রকৃতির নৃত্য চলে তাদের সম্মুখে। সাংখ্যমতে চৈতন্য অন্য কোনও বস্তুর গুণমাত্র বা তটস্থ লক্ষণমাত্র নয়, চৈতন্যই বস্তু এবং চৈতন্যের সন্নিকর্ষমাত্র জাত একা-ক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চৈতন্যের সত্তার মধ্যে অন্য পদার্থকে প্রভাবিত করার শক্তি আছে। এই মত অনেকটা শাক্তবেদান্ত মতের সমান। কিন্তু মতটার মধ্যে তবুও কিছু ক্রটি আছে। প্রথম ক্রটি হচ্ছে (১) অনুভব ও চৈতন্যের পরিধি, এই মত অনুসারে, এক নয় (২) এই মত অনুসারে প্রকৃতি নামক অচেতন তত্ত্বই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় এবং চৈতন্যের তথাকথিত সন্নিকর্ষমাত্রে জাত ক্রিয়াটা একরকম প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট শক্তির দ্যোতক মাত্র।

এখানে চিৎ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি, অদ্বৈত বিজ্ঞানবাদেও সেই সিদ্ধান্ত অনেক সময় পুরোপুরি স্বীকৃত হয় নি। অদ্বৈতবাদে চেতনা সম্বন্ধে সাধারণত চার রকম মত দেখতে পাওয়া যায়।

১। সবরকম জাতি ও বিশেষের পূর্ণজ্ঞান হল পরম সচ্ছক্তির একটা গুণ; তবে পরম সচ্ছক্তির অসংখ্য গুণের মধ্যে এই জ্ঞানরূপী চৈতন্য হচ্ছে মাত্র একটা গুণ। চৈতন্য সেইজন্য পরম বস্তুর একটা কলা মাত্র। তা ছাড়া চৈতন্যই যে মূলীভূত উপাদান তাও মনে করবার কোনও সঙ্গত হেতু নেই এবং পরম সৎ-এর জ্ঞান সম্পূর্ণ ও সবিষয়ক; অর্থাৎ পরমসত্তা সর্বজ্ঞ; জীব বা পরমবস্তুকারও নির্বিষয়ক জ্ঞান নেই; নির্বিষয়ক বা নির্বিশেষ জ্ঞান একটা কল্পনামাত্র এবং সেইজন্য সেটা অতথ্য।

২। দ্বিতীয় মতটা মূল বিষয়গুলোতে প্রথম মতের সমতুল্য। প্রথম মত থেকে এর পার্থক্য শুধু শুদ্ধ বা নির্বিশেষ চৈতন্যের ব্যাপার নিয়ে। এই মতে সাধকেরা তাঁদের সাধনার এক অবস্থায় পূর্ণ সৎ পরমেশ্বরের জ্যোতিকে নির্বিশেষ বিদ্রূপে অনুভব করেন; কিন্তু সাধনায় আরও অগ্রসর হলে বুঝতে পারা যায় যে, নামরূপহীন নির্বিশেষ ও শুদ্ধ প্রকাশরূপে যা আগে অনুভূত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমান ও সগুণ বিচ্ছুরণ বিশেষ। তত্ত্বত গুণ ও আকারকে ছেড়ে জ্যোতির যে অনুভব সে অনুভব পূর্ণসত্তার একদেশদর্শন মাত্র। তবে তথ্যরূপে অনুভবটি অংশমাত্রিক বলে মনে হয় না। নির্বিকল্প সমাধিতে আমরা শুদ্ধ জ্যোতির মধ্যে দিয়ে পরমবস্তুর যে রূপ দর্শন করি, সেটা তার গৌণ ও স্থূলরূপ। পরমসত্তার স্বরূপ দর্শন করলে বোঝা যায় যে, পরমসত্তা শক্তি ও গুণের পরাকাষ্ঠা। সেইজন্য চিদাকাশের দর্শন একটা নিম্নাবস্থার দর্শন। সাধনার চরমকাম্য চিদাকাশের অনুভব নয়।

৩। তৃতীয় মত হচ্ছে মায়াবাদী মত। এই মত অনুসারে সাধনার শেষ লক্ষ্য হল শুদ্ধ জ্ঞানের অনুভব এবং সগুণ, সাকার, সবিশেষ ও শক্তিমান তত্ত্বের অনুভব এক অন্তবর্তী স্তরের অনুভব। নির্বিশেষ চিন্মাত্রই পরমবস্তু; গুণ, বিষয় বা বিশেষ আদি চিন্মাত্রের ওপর কতগুলো অধ্যাস বা আরোপ মাত্র; এই অধ্যাসের কারণ হচ্ছে মায়া এবং দৃশ্যমান জগতের বিবর্তন এই অধ্যাসের ফল।

প্রথম মতে পরমসত্তার অশেষ গুণসম্পন্নতা ও শক্তিমত্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই মত অনুসারে তত্ত্ব কিংবা তথ্য কোনরূপেই শুদ্ধ প্রকাশকে স্বীকার করা হয় নি। এই মতে চৈতন্য সর্বদাই হচ্ছে সবিশেষ ও সবিষয়ক। নির্বিশেষ চৈতন্য মিথ্যা। দ্বিতীয় মতেও পরমপদার্থের গুণ ও শক্তির পূর্ণতার প্রাধান্য। তবে এই মত অনুযায়ী পরমসত্তার অনুভবের পথে শুদ্ধ প্রকাশের একরকম স্থূল ও বিকৃত অনুভব সম্ভবপর। প্রথম মত অনুসারে যেটা মিথ্যা ও দ্বিতীয় মত

অনুসারে যেটা অবধান, তৃতীয় মত অনুসারে সেইটাই প্রধান বলে স্বীকৃত। সেইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মত অনুসারে যেটা পরমসত্তা—সেটা তৃতীয় মত অনুযায়ী অসৎ বা ব্যবহারিক সৎ বলে গৃহীত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরমতথ্যের কলাবিশেষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে এই বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়েছে।

৪। সেইজন্য চতুর্থ মতটা হল এই। পূর্ণতত্ত্বই হচ্ছে পরমতত্ত্ব। তার বহু অংশ বা দিক আছে এবং সেগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনও এক অংশ বা কলাকে প্রধান বলা চলে না। পূর্ণতত্ত্বটা বুদ্ধির প্রত্যয়ের অগোচর; কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে গেলে এই তত্ত্বের দু'টো দিক স্বীকার করতে হয়। (১) নির্বিশেষ বা স্বরূপে চৈতন্যকে, পূর্ণের এক কলা এবং পরিপূর্ণ সবিশেষ ও সগুণ-চৈতন্য, পূর্ণের আর এক কলা। ব্যবহারিক-দৃষ্টিতে পূর্ণকে নির্বিশেষ চৈতন্য কিংবা সবিশেষ চৈতন্যরূপে বর্ণনা করা চলে। কিন্তু তত্ত্বত পূর্ণসৎ এই দুই কলার চেয়েও বৃহত্তর ও অধিকতর এক তত্ত্ব। সুতরাং পরমবস্তুকে একদৃষ্টিতে চিন্মাত্র বা শুদ্ধ চিৎ বলা চলে। কিন্তু কেবল নির্বিশেষ চৈতন্যই পরমবস্তুর স্বরূপ, এরকম বলা যায় না। আবার পরমবস্তুকে সর্বগুণে পরিপূর্ণ মনে করাও চলে। কিন্তু কেবল পূর্ণ চৈতন্যই পরমবস্তুর স্বরূপ, সেরকমও বলা যায় না। একমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনে বা বুদ্ধির স্বার্থেই পূর্ণতত্ত্বের বিভিন্ন কলার কোনও একটাতে মুখ্য বা উচ্চতর এবং অন্য আর একটাকে গৌণ বা নিম্নতর মনে করা চলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অংশই সমান বাস্তব। অনন্তগুণপূর্ণ চৈতন্যও যেমন বাস্তব, শুদ্ধ ও নির্বিশেষ ও নির্গুণ চৈতন্যও তেমন বাস্তব; চিচ্ছক্তি যেমন বাস্তব, চিন্মাত্রও তেমন বাস্তব এবং চিচ্ছক্তি যেমন বাস্তব, তার প্রকাশও তেমন বাস্তব। বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথার্থত যে সাম্য ও সামঞ্জস্য আছে, সেগুলো আমরা বুদ্ধি ও ব্যবহারের স্বার্থে নষ্ট করে কতগুলো কৃত্রিম স্বতন্ত্র তত্ত্বের ছাঁচ কল্পনা করি।

পূর্ণতত্ত্ব বুদ্ধির প্রত্যয়ের অগোচর এবং এই তত্ত্ব দেশ ও কালের অতীত। এই তত্ত্বকে বুদ্ধির প্রত্যয়ের সাহায্যে ও দেশ ও কালের অধীন তথ্যরূপে বর্ণনা করতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। 'সর্বপ্রথমে বা সৃষ্টির আদিতে' কেবল পরাসম্বিৎ ছিল এই শাক্তমতও এরকম একটা কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনামাত্র। এই মত অনুসারে পরাসম্বিৎ প্রথমে বিজয়ী বা প্রকাশ ও বিমর্শ বা বিমর্শ এই দুই ভাগে অধিকতররূপে বিভক্ত হয়, পরে ভেদ দু'টি ব্যক্ত আকার লাভ করে, তারপর বিমর্শ বহুরূপে পরিণত হয়। শেষে সবকিছু আবার শুদ্ধ চৈতন্যে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু সৃষ্টি ও প্রলয়ের দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্যের কোনও বিকার বা তারতম্য হয় না। শুদ্ধ চৈতন্য অবিকার্য ও নিত্য। এই মতে নির্বিশেষ চৈতন্যই হল চৈতন্যের মৌলিক অবস্থা এবং নির্বিশেষ চৈতন্য থেকেই সৃষ্টিরূপা ও সংহৃতিরূপা শক্তি ও তাদের ক্রিয়ার জন্ম।

(ক) সৃষ্টিরূপী বা ধ্বংসরূপী শক্তি কাজ করুক চাই নাই করুক পরাসম্বিৎ সবসময়েই আছে। (খ) চেতনার মধ্যে সত্তা ও আনন্দের প্রকাশ যত চূড়ান্ত ও অবিকৃত অন্য কোথায়ও সেরকম নয় এবং (গ) সচ্চিদানন্দের অনুভব ছাড়া মোক্ষলাভ করা যায় না। বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখলে, এই সত্যদ্বারা পরাসম্বিত্তের শ্রেষ্ঠত্ব বা মৌলিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু পরমার্থত পূর্ণতত্ত্বটি বুদ্ধির অলভ্য দেশ কাল নিমিত্তাদির প্রত্যয় দ্বারা পূর্ণতত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া চলে না। শুদ্ধ চেতনা বা শিব ও চিচ্ছক্তি বা শক্তি ও তার প্রকাশ এই তিনটিই এক পূর্ণতত্ত্বের বিভিন্ন অংশ। সেগুলো'র কোনও একটা অংশ অন্য একটা অংশের চেয়ে উচ্চতর বা নিম্নতর নয়। সব অংশগুলোই সমান বাস্তব। ব্রহ্মস্বরূপ, কারণ স্থানীয় শক্তি ও কার্যব্রহ্ম সবগুলোই অখণ্ড বা পূর্ণ তথ্যের বিভিন্ন কলারূপে একস্থ এবং পূর্ণসত্তাটি একরকম রহস্যময় তথ্য।

এই জ্ঞান বিনা মোক্ষলাভ অসম্ভব। কারণ এই বোধের অভাবই অর্থাৎ পরমতথ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। সুতরাং কলাবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। সচ্চিদানন্দময় শিব, সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি ও সচ্চিদানন্দময় জগৎ তিনটেই সচ্চিদানন্দের তিন দিক এই জ্ঞান হলেই মুক্তি। যতক্ষণ জগতকে মায়ার সৃষ্টি বা (সদসদ্রূপে) মনে হয় ততক্ষণ মুক্তি নেই। শিবশক্তিই জগৎ এই বোধে মুক্তি। মায়াবাদের মায়া একরকম মৃগতৃষ্ণিকা: মায়ার জগতের অবস্তুত দুঃখ, অচৈতন্যতা হচ্ছে কতগুলো প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ তথ্য। কিন্তু শক্তিবাদীর দৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগতের অসত্তা, অচেতনা ও দুঃখ কতগুলো ব্যবহারিক তথ্য।

পরিপূর্ণ বিশ্বটিই যে কেবল সচ্চিদানন্দের লীলারূপ প্রকাশ তা নয়, বিশ্বের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশও এই একই লীলার প্রকাশ। যেসব বস্তুকে আমরা কাঠ-পাথর বা নির্জীব পদার্থ বলে তাচ্ছিল্য করি এমন কি সেগুলোও সচ্চিদানন্দের লীলাস্থল। ক্ষুদ্র অংশগুলোর মধ্যে শিবশক্তি পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যেসব বস্তুকে আমরা ক্ষুদ্র বলি, সেগুলো স্বরূপত ক্ষুদ্র নয়। বস্তুবিশেষের ক্ষুদ্রত্ব হচ্ছে কতগুলো বিশেষ বিশেষ জীব বা বীজের বস্তুবিশেষ সম্বন্ধে একপ্রকার ব্যবহারিক বা প্রচলিত ধারণা। জীবননির্বাহের জন্য বা ব্যবহারের সাফল্যের জন্য বিশেষ বিশেষ বীজকে কতগুলো সীমা বা নিষেধ বা গণ্ডী মেনে চলতে হয়। বস্তুবিশেষের 'ক্ষুদ্রত্ব' এই বাধ্যতার বা এর প্রয়োজনের পরোক্ষ সৃষ্টি মাত্র। প্রতি ধূলিকণাতেই শিবশক্তি পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত এই অনুভব যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ মোক্ষলাভ হয় না।

মহৎ ও অণুর উভয়ের মধ্যেই পূর্ণসত্তা কি করে সমানরূপে

অনুস্যূত হয়ে আছে, তা আমাদের বুদ্ধির অতীত। সৃষ্টিস্থিতি-রূপে পূর্ণশক্তি বহু বীজ বা জীব দ্বারা পূর্ণ জগদাকারে অভিব্যক্ত হবার মুখে বিন্দুর আকার ধারণ করে। কিন্তু পূর্ণ কি করে বিন্দুতে পরিণত হয় তা আমাদের কাছে একটা পরম আশ্চর্য বা বিস্ময়কর রহস্য। শাক্তমতে পূর্ণসত্তা বিন্দুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েও পূর্ণই থাকে সুতরাং এই মত অনুযায়ী পূর্ণের পক্ষে শান্ত বা অসীমসত্তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় থাকাতে কোনও বাধা থাকতে পারে না। যেটাকে আমরা শান্ত বলি, বিভুরূপে বা পরিপূর্ণ তথ্যরূপে সেটা অনন্ত শক্তি। কিন্তু কতগুলো বীজের বা জীবের ব্যবহারিক বা প্রচলিত দৃষ্টিতে সেটা শান্ত বা সসীম এইমাত্র। এই ব্যবহারিক দৃষ্টি ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্ব নামক অশুদ্ধ তত্ত্বগুলোর দ্বারা সৃষ্ট মায়িক জগৎ সম্বন্ধেই একমাত্র প্রযোজ্য।

সেইজন্য শাক্তমতে অচিৎ বা জড় বলে স্বরূপত কিছুই নেই। সত্তার কিংবা শক্তি কিংবা জগৎ কিছুই অচেতন নয়। আমরা চৈতন্যহীনতার কথা বলি স্থূল ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বা প্রচলিত প্রথায় সাংখ্যের উপজাত চৈতন্য বা বেদান্তের সচরাচর-বর্ণিত চিদাভাস কোনটিই সত্য নয়। জগৎপ্রপঞ্চে যদি কোথায়ও ভাল থাকে, তা হলে সেটা আছে ঠিক উল্টো দিকে। দৃশ্যমান জগতে চৈতন্যই প্রতিভাত হচ্ছে অচিৎরূপে, অচিৎ চিৎরূপে আভাসিত হচ্ছে না। সেখানে আনন্দ প্রতিভাত হচ্ছে দুঃখরূপে এবং লীলা অবভাত হচ্ছে বাধ্যতারূপে। কিন্তু এই ভাণটাকেও অলীক বলা যায় না। জগন্মাতা তাঁর লীলার জন্য মহামায়ারূপী শক্তি দ্বারা বিভিন্ন জীবের মধ্যে আবরণ সৃষ্টি করেছেন, তার ফলেই এই অন্যরকম মনে হয়। এই জ্ঞানকে যথার্থত ভাল বলা চলে না। কারণ আদ্যাশক্তি ও আদ্যাশক্তির লীলা দুই-ই সত্য এবং আদ্যাশক্তিই লীলাস্থলে মায়াবৃত বহুজীবরূপে প্রকাশিত হয়েছেন এবং তারই জন্য এই অবভাস। তবে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় এই অন্যরূপে প্রতীয়মান হওয়াকে প্রকৃত (ভাণ) বলা যেতে পারে। যেমন (১) যখন আদ্যাশক্তি জীবরূপে লীলা ত্যাগ করে নিজের সঙ্গে লীলায় বা আত্মরতিতে প্রবৃত্ত হন এবং (২) যখন কোনও ভাগ্যবান জীবের দৃষ্টির আবরণ তিনি সরিয়ে দেন ও সে আদ্যাশক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য উপলব্ধি করে। কোনও এক জীববিশেষের কাছে একখণ্ড শিলা জড় ও নির্জীব এই জন্য মনে হয় যে, শিলাখণ্ডটির সম্বন্ধে তার বোধ নির্ভর করে কতগুলো কর্ম ও অদৃষ্টের সংস্কারের ওপর। বিশেষ সম্বন্ধপরম্পরার ফলে বিশেষ দৃষ্টি জন্মায়। সেইজন্য বিশেষ দৃষ্টিটাকে মিথ্যা বলা চলে না ও সেটা দুই কেন্দ্রের মধ্যবর্তী এক প্রকৃত লীলার ফলস্বরূপ। সেইজন্য যদি কর্ম ও অদৃষ্টের পরিবর্তন হয়, তাহলে পারস্পরিক লীলা ও তজ্জন্য দৃষ্টির রূপও পরিবর্তিত হয়। সংস্কারের পরিবর্তনে দৃষ্টির পরিবর্তন হয় বলে প্রথম দৃষ্টিটা মিথ্যা, এবং পরবর্তী দৃষ্টিটা সত্য এরকম বলা সঙ্গত নয়।

প্রত্যেক দৃষ্টিটাই নিজ নিজ প্রকারে ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে সত্য ও বাস্তব। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোর অন্তর্বর্তী সম্বন্ধের ওপর এই একদেশী অনুভবগুলো নির্ভরশীল এবং সেইজন্য সেগুলোকে সোপাধিক বলা চলে; এবং সেগুলোকে প্রাতিভাসিক একমাত্র এই কারণের জন্য বলা যায় যে, মায়ার রাজ্যে অনুভব যাই কিছু হোক না কেন স্বরূপত প্রত্যেক বস্তুই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সচ্চিদানন্দের স্বরূপ বা শক্তির কখনও কোনও বিকার নেই। লীলাময় অখণ্ড সচ্চিদানন্দই হচ্ছে শিলাখণ্ডের সত্যতম রূপ; তার সম্বন্ধে পূর্ণ বা পরাকাষ্ঠাস্থানীয় যে অনুভব সেইটাই হচ্ছে তার সচ্চিদানন্দ রূপ; তৎসম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় অনুভব সেই পূর্ণ অনুভবের নীচের স্তরের অনুভব এবং সেই নিম্নস্তরের অনুভবগুলোর মধ্যে যেটা সম্পূর্ণ অনুভবের যত কাছাকাছি বা অনুরূপ, তার মর্যাদা ততো বেশি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে প্রত্যেকটা অনুভবই স্বক্ষেত্রে সত্য।

প্রচলিত বস্তুতন্ত্রবাদ ও প্রচলিত বিজ্ঞানবাদে কতগুলো দোষ আছে। বস্তুতন্ত্রবাদের দোষ এই যে, বস্তুকে সেখানে চৈতন্য-নিরপেক্ষ ও চৈতন্য বা অনুভব থেকে স্বতন্ত্র এক অপর সত্তারূপে কল্পনা করা হয়; এবং বিজ্ঞানবাদের দোষ এই যে, সেখানে বস্তুকে কতকগুলো ভাবের সমষ্টিমাত্র বা কতগুলো সম্ভূত ও সম্ভাব্য সংবেদনের সংগ্রহমাত্রে পর্যবসিত করা হয়। উপরিবর্ণিত শাক্তমত অনুসারে কেন্দ্রাশ্রয়ী চৈতন্য বা অবচ্ছিন্ন জীব চৈতন্যের বাইরে ও তা থেকে স্বতন্ত্ররূপে বস্তুর সত্তা আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এও স্বীকৃত হয়েছে যে, নিরবচ্ছিন্ন ও অবীজ চৈতন্যই হচ্ছে পরমতথ্য এবং সমস্ত তথ্যেরই উদ্ভব এই পরমতথ্য থেকে।

অপরপক্ষে এই মত অনুসারে জীবচৈতন্যের বাইরে অবস্থিত বস্তু জীবের কতকগুলো চৈতন্যবৃত্তি মাত্র নয়। এই মতে স্থিতিরূপা ও সৃষ্টিরূপা পরমচৈতন্যই মন ও মন নিরপেক্ষ অপরবস্তু রূপে পরিণত হয়; সুতরাং বস্তুও সৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে যে-মন ভাবে বা অনুভব করে সেই মনও সৎ। এইভাবে বস্তুতন্ত্রবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মূল সত্যগুলো এই মতে আদৃত ও স্বীকৃত হয়েছে। এই সমন্বয়ী দৃষ্টিতে একখণ্ড শিলা কেবল জড়পদার্থ নয়; শিলাখণ্ডটি চিদানন্দের লীলাবিশেষ, কিন্তু সাধারণ কেন্দ্রের অর্থাৎ জীবের কাছে এই সত্যরূপ আবৃত থাকে। অপরপক্ষে, শিলাখণ্ডটি ভাবমাত্র বা প্রত্যয়মাত্রও নয়; চিচ্ছক্তির সৃষ্টিরূপে শিলাখণ্ড ও যে-মন তাকে জানে এবং তার ওপর কর্ম করে সেই-মন দু'টোই বাস্তব। বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদে

স্বগত ও আগন্তুক গুণের মধ্যে পার্থক্য করে বলা হয় যে, কেবল স্বগত গুণগুলোই বাস্তব। শাক্তমতে স্বগত ও আগন্তুক গুণের প্রভেদ অস্বীকৃত।

আবার স্থূল বস্তুতন্ত্রবাদ অনুসারে মানসিক ভাবগুলো বা অনুভবগুলো বাহ্যবস্তুর অবিকল প্রতিচ্ছবি; শাক্তমতে মন বস্তুর প্রতিচ্ছবি বা ছায়া নয়। স্বরূপত বস্তুগুলো পরমাত্মার বিশেষ বিশেষ অনুভবরূপে তার মনের মধ্যে অবস্থিত এবং পরমাত্মার অনুভবগুলোই বিভিন্ন বস্তুর সত্যতম বা আদর্শ অনুভব। অপরাপর কেন্দ্রের বা বীজের অনুভবগুলো এই আদর্শ অনুভবের আংশিক প্রতিচ্ছবি; সেইজন্য আদর্শের সঙ্গে প্রতিচ্ছবিগুলোর সাদৃশ্যের মাত্রাভেদ আছে; এবং অন্য কেন্দ্রের অনুভবগুলোকে একেবারে মিথ্যা বা অবাস্তব বলা ভুল; সেগুলো স্থূলরূপে এবং কমবেশিরূপে সত্য বা বাস্তব। প্রত্যেক জীব বীজের জ্ঞান, তার কর্ম ও অদৃষ্ট দ্বারা নির্দিষ্ট। এই কারণেই সাধনা ও শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানশক্তির বিকাশ দরকার।

জ্ঞান-বিকাশের ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সম্ভবপর হয় এবং দৃষ্টির প্রসার বাড়ে; সর্বশেষে পরম অনুভব বা ঈশ্বর দর্শন দ্বারা পূর্ণজ্ঞান আসে। এই মতে (১) জড়পদার্থ ও জীবন যতখানি সত্য ও সক্রিয়, মনও ততখানি সত্য ও সক্রিয় (২) এবং অনুভবের কোনও এক বিশেষ অংশ যেমন বিচারবুদ্ধি বা ভাব বা প্রত্যয় কিংবা ইচ্ছাশক্তি বা কল্পনা, অনুভবের প্রধান বা সার অংশ নয়; এই রকম স্বীকার থাকাতে এই মত সরল বিজ্ঞানবাদের ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত। শাক্তমতের চিৎ কেবল তুরীয় অনুভব কিংবা কেবল প্রাকৃত অনুভব নয়; কেবল স্থিতিস্বরূপ বা কেবল সৃষ্টিস্বরূপ নয়; এই চিৎ শুধু শান্ত কিংবা শুধু গতিশীল নয়; শুধু নির্বিশেষ বা শুধু সবিশেষ নয়; এই অনুভবকে কেবল এই রকম কিংবা কেবল ঐ রকম বলা যায় না। এখানে বর্ণিত সমস্ত অবস্থাই চিৎ-এর বিভিন্ন অবস্থা; এ ছাড়া আরও অনেক অনেক অবস্থা চিৎ-এর অংশীভূত। সেই অবস্থাগুলোর সবই যে আমাদের দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাও নয়। চিতের স্বরূপ আনন্দ। আনন্দই ইচ্ছাশক্তি এবং সেই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডলীলা। চিৎ একটা নীরস একদেশী প্রত্যয়মাত্র নয়; চিৎকে শুদ্ধসত্তা কিংবা শুদ্ধ-অসত্তার মরুভূমিমাত্র বলে বর্ণনা করা ভুল।

আধুনিক ও প্রাচীন ব্যবহারিক সত্তাবাদের মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। এই মত তা স্বীকার করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দর্শনে সবসময়েই একটা ব্যবহারের জগৎ মেনে নেওয়া হয়েছে। পরস্পর সম্বন্ধ বিভিন্ন জীব বা বীজ বা কেন্দ্রের অনুভব এবং বস্তুবোধ কতগুলো বিশেষ কারণ বা নিমিত্তের ওপর নির্ভর করে; এই বিশেষরূপে উৎপন্ন জগতকেই ব্যবহারিক জগৎ বলা হয়। ভারতীয় দর্শনের মত হচ্ছে যে কর্মদ্বারাই প্রতি জীবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্দিষ্ট হয়; কর্ম শুধু অদৃষ্টের কারণ নয়। প্রত্যেক জীবের বা বীজের জগৎ-ও তার কর্মেরই সৃষ্টি। কারণ, প্রত্যেক জীবের কর্মের ওপর নির্ভর করে যে জগতের কতখানি কিংবা জগতকে কিরূপে দেখবে বা অনুভব করবে। অন্য কেন্দ্রের বা জীবের কাছে তার কর্মের ভিন্নতার জন্য জগতটা অন্যরূপ। এমন কি কর্মের পরিবর্তনের ফলে একই জীবের কাছে জগতটা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

এই মতের চেয়ে পরিপূর্ণতর ব্যবহারিক সত্তাবাদ হতে পারে না। শাক্তমতে ব্যবহারিক অনুভব এবং ব্যবহারিক সত্তার একটা বিশেষ স্থান আছে; সেগুলোকে স্বপ্নবৎ বা অলীক বলা যায় না। চিচ্ছক্তি বিশেষ বিশেষ রূপে কর্মের (লীলার) জন্য বিশেষ বিশেষ অনুভবের আকারে নিজেকে পরিমিত করে এই বিশেষরূপে পরিমিত অনুভবগুলোই ব্যবহারিক অনুভব। বিভিন্ন জীব বা বীজের ভোগ ও কর্মের জন্য পূর্ণসত্তা নিজেকে বিভিন্ন সত্তার আকারে সীমিত করে এবং এই মিত সত্তাগুলোই ব্যবহারিক সত্তা।

আধুনিক ব্যবহারিক সত্তাবাদ বলে যে, 'ক' নামক কোনও এক বিশেষ কেন্দ্রের কাছে কোনটা কি তথ্য বা কি বস্তু তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে 'ক'-এর ব্যবহারের (behaviour) ওপর। অর্থাৎ 'ক' সেই তথ্যটিকে কিরূপে ব্যবহার করতে চায় তার ওপর। এই মতের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের মৌলিক কোনও বিরোধ নেই। তবে অদ্বৈত বেদান্ত বলে যে, (১) যে ব্যাপারকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে 'ক'-এর ব্যবহার বলা হয়েছে সেটা মূলত 'ক' কেন্দ্ররূপে এবং 'ক'-এর সঙ্গে ইতরেতর সম্বন্ধযুক্ত খ, গ, ঘ ইত্যাদি অপর কতকগুলো কেন্দ্ররূপে লীলা করবার পূর্ণ ব্রহ্মের এক লীলা; (২) 'ক' এবং খ, গ ইত্যাদি কেন্দ্রগুলোর ব্যবহারগুলোও লীলাপ্রসূত; তবে কর্মরূপে সেগুলো 'ক'-এর অতীত কর্মে (লীলা) বা অদৃষ্ট এবং খ, গ, ঘ ইত্যাদি অপরাপর কেন্দ্রগুলোর কর্মতা বা লীলা দ্বারা সীমাবদ্ধ বা স্বীয় নিয়ন্ত্রিত; এবং (৩) সাধনা রূপ যথোচিত ব্যবহার দ্বারা 'ক' ব্যষ্টি কেন্দ্রের ক্ষুদ্রত্ব বা সীমা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

নব্য ব্যবহারিক সত্তাবাদীরা মনের সংস্কারের চাইতে জৈব-প্রয়োজনের ওপর প্রায়ই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। যেমন ধরুন, ক, খ, গ ও ঘ কতকগুলো কেন্দ্রের কথা, এগুলো একত্র থাকার ফলে একটা সঙ্ঘ বা শৃঙ্খলা রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটা

কেন্দ্র সজীব এবং কয়েকটা নির্জীব। কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যে কেবল সহযোগিতার সম্বন্ধ আছে তা নয়, সেগুলোর মধ্যে সংঘর্ষও আছে, অর্থাৎ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে জীবন-সংগ্রাম বিদ্যমান। 'ক' কেন্দ্রের কাছে খ, গ ও ঘ কেন্দ্রগুলো হচ্ছে তার আবেষ্টনী; নিজের সঙ্গে আবেষ্টনীর এবং আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধান করে 'ক' বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে। এই সামঞ্জস্য বিধান করার অর্থ হচ্ছে 'ক' নিজেকে খ, গ ও ঘ-এর উপযোগী এবং খ, গ ও ঘকেও নিজের উপযোগী করে নেয়।

অতএব আবেষ্টনীর মধ্যে পরিবর্তন এলে 'ক' নিজের মধ্যে অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করে আবার নিজের মধ্যে পরিবর্তন এলে আবেষ্টনীর মধ্যেও 'ক' অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করে। এই পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান ব্যাপারের নামই জৈব অভিযোজনক্রিয়া (vital adaptation) প্রাকৃতিক নির্বাচন ও অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার ফলে 'ক'-এর জীবদেহটা এমনভাবে গঠিত হয়ে উঠেছে যে, অনেকটা স্বাভাবিকরূপেই সে জৈব অভিযোজন ক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে যায়। জীবদেহের কতগুলো বাঁধাধরা প্রতিক্রিয়া আছে; সেগুলো জীবদেহের স্বয়ংক্রিয় কর্ম, যেমন প্রতিবর্তি কর্ম, (reflex) স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম, সহজাত কর্ম বা অভ্যাসজাত কর্ম। এই কর্মগুলো দ্বারা সাধারণত জীবদেহ যন্ত্রবৎ তার কাজ পরিপাটিরূপে করে যায়। মনে হয় যেন কর্মগুলো আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

যে স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা এইসব কর্ম সম্পন্ন হয় সেগুলো মেরুদণ্ড, সুষুম্না শীর্ষক (medulla oblangata) এবং লঘু মস্তিষ্কে (cerebellum) অবস্থিত। এই জায়গাগুলোর অবস্থান গুরু মস্তিষ্কের বহিঃস্তর (cerebral cortex) অর্থাৎ যেখানে থেকে চালক (motor) ও সংবেদক (sensory) চেতনার জন্ম, তার নীচে। সেই জন্য স্বয়ংক্রিয় কর্মগুলো সাধারণত চেতনাসম্বলিত বা সজ্ঞান নয় এবং অনেকের মতে চৈতন্যের সঙ্গে সেগুলোর কোনও সম্পর্কই নেই। যখন কোনও স্বয়ংক্রিয় কর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়াতে কোনও বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয় তখন জ্ঞানের বা সংজ্ঞার উদয় হয়। সজ্ঞান বিচার ও সজ্ঞান নির্বাচন নির্ভর করে গুরু মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলোর সক্রিয়তার ওপর। এবং বাধা বা বিঘ্ন দূর করবার প্রয়োজনে এগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। কর্মই হোক বা স্বয়ংসম্পন্ন স্বেচ্ছাকৃত কর্মই হোক জীবের সবরকম কর্মই হচ্ছে মূলত প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে কতগুলো ব্যবহারবিশেষ।

যে বিশেষ অবস্থায় কাম্য বিষয়টা ভবিষ্যতের দিক থেকে শুভ না অশুভ তা স্থির করবার প্রয়োজন হয় এবং তার জন্য বিচার, বিতর্ক ও নির্বাচনের দরকার হয় সেই অবস্থায় জীবের ব্যবহার সজ্ঞানরূপ ধারণ করে। 'তপ্তের' সংবেদন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সেটা এমন একটা অনুভব যা বলে দেয় যে, যে-বস্তুটি তপ্ত সেটা স্পর্শ করলে দগ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ আচরণের ফল কি হবে, যেমন ধরুন, স্পর্শ করবার ফল তার পরিচয় নাই সংবেদনের মধ্যে ফেলে; এবং আচরণলব্ধ বিভিন্ন ফলকে যেসব প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় সেই প্রয়োজনগুলোও এই সংবেদনের অর্থ বা বাচ্য হয়ে দাঁড়ায়। জীবের ব্যবহারের রাজ্য নির্দিষ্ট হয় তার প্রয়োজনের মাপকাঠিতে এবং ব্যবহারের রাজ্যের মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশ সংজ্ঞা দ্বারা অধিকৃত। বিশেষ কতগুলো কারণের জন্য আমাদের ব্যবহার সজ্ঞানরূপ ধারণ করে। কোন কেন্দ্রবিশেষ বা কেন্দ্রগোষ্ঠীর জ্ঞান, ইচ্ছা ও বেদনার পরিধি ও প্রকার নির্ভর করে সেই কেন্দ্রবিশেষ বা কেন্দ্রগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহের পরিধি ও প্রকারের ওপর।

উপরিবর্ণিত মতের মধ্যে যে অনেকটা সত্য আছে, তা ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। প্রত্যেক জীব বা কেন্দ্রের জগৎ ও জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান তার ধর্ম ও ভোগের প্রয়োজন অনুসারে রচিত হয়। সেইজন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সংসার ও সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রকমের হয়। এইজন্যই এক সাধারণ জীবের ও একজন সাধক বা ঋষির দৃষ্টিতে এত পার্থক্য; এইজন্যই কাঠপাথরের ও গাছপালা ও পশুদের অনুভব ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ কর্ম ও ভোগের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়াদি গঠিত হয়। কেন্দ্রগুলোর নিজ নিজ ভোগভাগ্য নির্ভর করে তাদের বিশেষ বিশেষ পুরুষার্থ বা প্রয়োজনের ওপর। সেইজন্য প্রত্যেক কেন্দ্রের বা বীজের চেতনার একটা বিশিষ্টতা আছে; এবং সেইজন্যই কেন্দ্রবিশেষের সংজ্ঞা বা চেতনা একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত কাজ করে এবং সেই সীমার বাইরে জ্ঞান প্রসারিত হয় না। এই কারণেই কেন্দ্রবিশেষের জীবনের সজ্ঞান বা সচেতন অংশের মধ্যেও অবচেতনা বা অর্ধচেতনা থেকে জাগ্রত চেতনা পর্যন্ত নানামাত্রার চেতনা দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু চেতনার এই মাত্রাগুলো এবং গণ্ডিগুলো নিতান্তই কতগুলো ব্যবহারিক তথ্য। বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের প্রয়োজন ও পুরুষার্থ অনুযায়ী তার চেতনার সীমা ও মাত্রা কার্যত নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে এইসব মাত্রা ও সীমার জন্য পারমার্থিক চৈতন্যের স্বরূপের কোন বিকৃতি হয় না। কারণ—

(১) সমগ্র বিশ্ব হচ্ছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন একটা অখণ্ড শৃঙ্খলা এবং যে-চেতনা এই বিশ্বকে অনুভব করে সেই চেতনা স্বরূপত কখনও খণ্ডিত বা অংশমাত্রব্যাপী হতে পারে না। সসীম কেন্দ্রবিশেষের কাছে ব্যবহারিক

কারণের জন্য সেই অখণ্ড চেতনা খণ্ডিত রূপ ধারণ করে।

এই মাত্র।

(২) তথাকথিত অচেতন ও অবচেতন অবস্থাগুলোও যথার্থত চিৎ-এর অন্তর্গত তবে সসীম কেন্দ্রের কাছে এই অবস্থাগুলো চেতনার অন্তর্গত বলে মনে হয় না; এই অবস্থাগুলো সম্বন্ধে প্রত্যেক কেন্দ্রেরই একটা অস্পষ্ট বোধ থাকে। কিন্তু অভিনিবেশ ও প্রযত্নদ্বারা অস্পষ্ট জ্ঞানও উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং অবশেষে অজ্ঞানের আবরণ সম্পূর্ণ খসে গেলে পূর্ণ চিচ্ছক্তির অনুভব সম্ভবপর হয়। এই ব্যাপার থেকেই প্রমাণিত হয় যে কেন্দ্রবিশেষের প্রাত্যহিক অনুভব কখনও পরিপূর্ণ অনুভব নয়; জীবননির্বাহের জন্য সমগ্র বা সম্পূর্ণ অনুভব অব্যবহার্য বা নিষ্প্রয়োজন; সেইজন্য সমগ্রকে উপেক্ষা করে খণ্ডিত অনুভবকে প্রাধান্য দিতে প্রত্যেক সসীম কেন্দ্র অভ্যস্ত; এরকম অভ্যাসের কারণ হচ্ছে এই ব্যবহারিক জগতে প্রত্যেক কেন্দ্রকে তার প্রয়োজন বা পুরুষার্থ সাধন করতে হলে সঙ্কীর্ণ বা খণ্ডিত দৃষ্টি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়।

(৩) এ দু'টো কারণ ছাড়া আরও একটা তৃতীয় কারণ আছে। সেই কারণটা হচ্ছে এই যে সৎ ও চিৎ-এর অভিন্নতা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। আনন্দেও লীলা; চিন্মাত্রের স্বরূপগত লক্ষণ। অপর পক্ষে এমন কোনও সত্তা নেই যেটা আনন্দ ও লীলার প্রকাশ নয়। যাকে আমরা জড়বস্তু বলি তার মধ্যেও আনন্দ ও লীলার বা ক্রীড়ার অবগুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মূলত চিৎ ও সৎ এই দু'টো তত্ত্বই সমানধর্মী; সেইজন্য এই দু'টো তত্ত্বই এক বা অভিন্ন কিম্বা তারা অপর একটা মৌলিক অদ্বয়তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত; এরকম অনুমান করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু চিৎ-এর চেয়ে মৌলতর তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না (কারণ সব জিনিসকেই চেতনার বৃত্তিবিশেষ বা প্রকার বিশেষরূপে কল্পনা করা যায়। কিন্তু চেতনাকে অন্য কোনও পদার্থের বিকার বা অবস্থারূপে কল্পনা করা অসম্ভব।) সুতরাং আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে চিৎ সৎ তত্ত্ব বস্তু, এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত।

উপরি-বর্ণিত মতের সত্যতা আরও একভাবে প্রতিপন্ন হয়। উপযুক্ত সাধনার দ্বারা যোগ্য সাধক ব্যবহারিক জগতের অনুভব অতিক্রম করে উচ্চ থেকে উচ্চতর জগতের অনুভব লাভ করতে সক্ষম হয় এবং সর্বশেষে শুদ্ধচৈতন্য ও পূর্ণচৈতন্যের অনুভবলাভেও সে সমর্থ হয়। আবার পরম অনুভবের পর সে ব্যবহারিক জগতের অনুভবের স্তরেও ধীরে ধীরে নেমে আসতে পারে। অনুভবের এই আরোহণ ও অবরোহণ উপরি-উক্ত মতের একটা পরীক্ষামূলক প্রমাণস্বরূপ। সসীম কেন্দ্রের সঙ্কীর্ণ অনুভব ও খণ্ডিত জগৎ কি করে শেষ পর্যন্ত পূর্ণচৈতন্য বা শুদ্ধচৈতন্য হতে পারে এবং পূর্ণ ও শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ কি করে ব্যষ্টি-কেন্দ্রের ব্যক্তিবিশেষের কিঞ্চিৎকর চেতনা ও ব্যবহারিক জগতে পরিণত হতে পারে তবে তার সন্তোষজনক উত্তর এই যোগজ অনুভবের মধ্যে পাওয়া যায়।

এই পরীক্ষামূলক প্রমাণটা যে-কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সমগোত্রীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন ভূতত্ত্ববিদের কথা মনে করুন। তিনি একখণ্ড শিলার পরীক্ষা দ্বারাই ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের জন্মবৃত্তান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। একজন সাধক তাঁর ব্যক্তিগতসাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা ও অনুভব দ্বারা তেমনি করেই প্রতিষ্ঠা করেন যে বিশ্বের অন্তর্নিহিত কঠিন, তরল, জড়, অজড় প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু শেষপর্যন্ত চৈতন্যস্বরূপ। তাঁর সিদ্ধ অনুভবের মধ্যে সর্ববিধ খণ্ড, ক্ষুদ্র ও ব্যবহারিক জগৎ অন্তর্হিত হয়, তিনি উপলব্ধি করেন যে, সবই পূর্ণচৈতন্য ও পূর্ণজগতের মধ্যে অবস্থিত এবং অনুভব দ্বারাই সৃষ্টির ক্রম কি তা তিনি উপলব্ধি করেন। যথার্থত সচ্চিদানন্দস্বরূপ চিচ্ছক্তিই যে অদ্বিতীয় পারমার্থিক বস্তু, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণই হচ্ছে সাধকের অপরোক্ষ অনুভূতি।

অনুবাদক—জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।

সূক্ষ্মশরীরম্ কিম্? অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতৈঃ কৃতং সৎ কর্ম-জন্যসুখদুঃখাদিভোগসাধনং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাদয়ঃ মনশ্চৈকং বুদ্ধিশ্চৈকা এবং সপ্তদশকলাভিঃ সহ যত্তিষ্ঠতি তৎ সূক্ষ্মশরীরম্।

অনুবাদ—সূক্ষ্ম শরীর কাহাকে বলে? পৃথিব্যাদি অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতারব্ধ পূর্ববৎ সদসৎ কর্মফলস্বরূপ সুখ-দুঃখভোগের সাধন বা কারণস্বরূপ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই—সপ্তদশ অবয়বসমষ্টি দ্বারা যাহা গঠিত, তাহাই সূক্ষ্মশরীর।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুঃ রসনা ঘ্রাণমিতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। শ্রোত্রস্য দিগ্ দেবতা। ত্বচো বায়ুঃ। চক্ষুষঃ সূর্য। রসনায়া বরুণঃ। ঘ্রাণস্য অশ্বিনৌ ইতি জ্ঞানেন্দ্রিয়দেবতাঃ। শ্রোত্রস্য বিষয়ঃ শব্দগ্রহণম্। ত্বচো বিষয়ঃ স্পর্শগ্রহণম্। চক্ষুষো বিষয়ো রূপগ্রহণম্। রসনায়া বিষয়ো রসগ্রহণম্। ঘ্রাণস্য বিষয়ো গন্ধগ্রহণমিতি।

অনুবাদ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা এবং ঘ্রাণ বা নাসিকা, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। শ্রোত্রের দেবতা দিক এবং এইরূপ ত্বক্, চক্ষু, রসনা এবং নাসিকার যথাক্রমে বায়ু, সূর্য, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতা। শ্রোত্রের বিষয় শব্দ অর্থাৎ শ্রোত্রদ্বারা শব্দ গৃহীত হয় বা শব্দজ্ঞান হয় এবং এইরূপে ত্বক্, চক্ষু, রসনা এবং ঘ্রাণের বিষয় যথাক্রমে স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

—শ্রীমৎ যতীশ্বর শঙ্করাচার্য

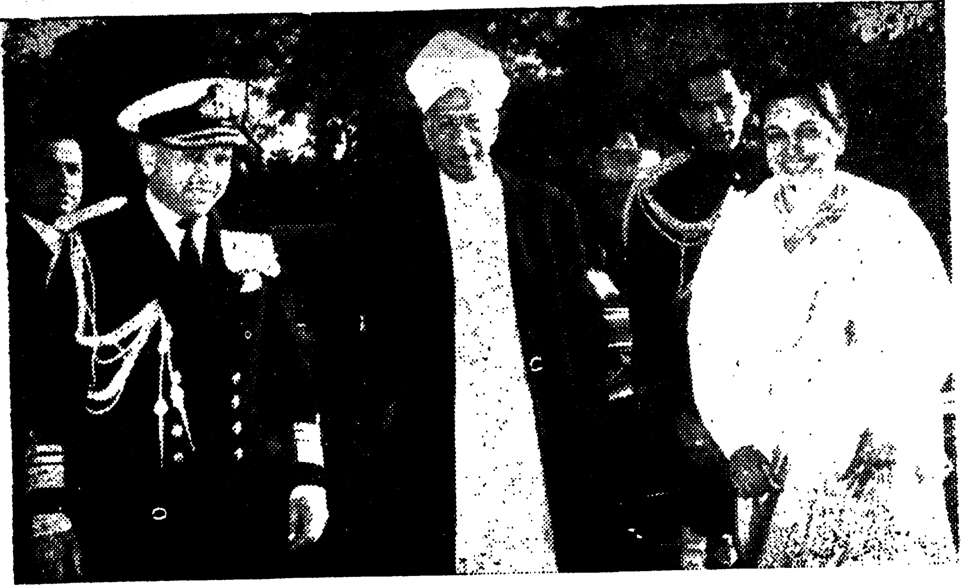
চিত্রে সংবাদ



রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক দৃশ্য : (গ্রোমিকোর মধ্যস্থলে) বক্তৃতা শ্রবণরত আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ

● **হাস্যমুখর!!** আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল





● নৌ-দিবসের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ। নৌ-বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ ভাইস এডমিরাল সোমান ও শ্রীমতী সোমান



● নেফায় অসামরিক অসুস্থদের চিকিৎসারত ভারতীয় সেনা-বাহিনীর চিকিৎসকবৃন্দ

মাসিক
বসুমতী
পৌষ / '৭১



জন্মদিনের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন উইনস্টন চার্চিল। পাশে—লেডী চার্চিল



প্রাক্তন সৈনিক সমাবেশে ক্যাপ্টেন টেকচাঁদের সঙ্গে আলিঙ্গনরত সৈন্যাধ্যক্ষ চৌধুরী



● নতুন রেশন কার্ডের আবেদনপত্র পরীক্ষা করছেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

● মোটর নির্মাণে ইটালির সাফল্য সত্যিই বিস্ময়কর। ছবিটিতে ইটালিতে নির্মিত অসংখ্য মোটরগাড়ির একটি বিরাট অংশ দেখা যাচ্ছে



যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

লর্ড কার্জন

বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব যখন সর্বোচ্চে উঠিয়াছিল এবং সমগ্র পৃথিবীতে বৃটিশ শাসন-ন্যায়নীতির আদর ও কদর জনপ্রিয় ছিল, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। কুইন ভিক্টোরিয়ার সম্মান ও জনপ্রিয়তা বাল্যকালেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাঁহার হীরক জুবিলী অনুষ্ঠানের সময়। কলিকাতা মহানগরী আলোকসজ্জায় অপরূপ শ্রী ধারণ করে, ফুঁকো-শিশির বা কাঁচের বাল্বের মধ্যে নানা রং-এর জল দিয়া তাহাতে রেড়ির তেলের বাতি জ্বালান হইত। অক্টারলোনী মনুমেন্টের ২১০ ফুট উচ্চ স্তম্ভে সারি সারি বাতির লাল-নীল লাইন অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছিল। গভর্নমেন্ট হাউস, হাই কোর্ট, জেনারেল পোস্ট অফিস, মিউজিয়াম প্রভৃতি অট্টালিকা গম্বুজ হইতে পোস্তা পর্যন্ত অতি মনোরম দৃশ্যে মহানগরী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের র‍্যামপার্টের ঢালুতে সবুজ রং-এর ঘাসের উপর লাইনবন্দী এই ফুঁকো-শিশির আলোক জোনাকীর মত মিট মিট করিতেছিল। কেল্লার দক্ষিণের মাঠে এ্যাল্লেনবরা কোর্সে আতসবাজীর খেলা দেখার আনন্দ সেই বালকচিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া রাখে। নায়েগ্রা ফলস্-এর আলোক জলধারা ক্রিস্টাল প্যালেসের ঝিকিমিকি প্রতিকৃতি, হাউই ও রকেটের নানা রং-এর তারা বিচ্ছুরিত ও নানাবিধ পাখীর মত আওয়াজ দেখা ও শোনা এ যুগে কল্পনাতীত বলিয়া মনে হয়, সেদিন ২৪৲ টাকা ভাড়া দিয়া ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তীর কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই লর্ড কার্জন ১৮৯৮ সালে ভারতের রাজ প্রতিনিধি হইয়া (ভাইসরয়) ভারতে পদার্পণ করেন।

এই জুবিলী উৎসব ও তারপর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে যখন দিল্লীর দরবার হয় তখন রাজভ্রাতা ডিউক অব কনটের উপস্থিতিতে লর্ড কার্জন দেশীয় রাজন্যবর্গ লইয়া যে ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকপূর্ণ দরবার করেন তাহা ইতিহাসে অতি রমণীয় ও স্মরণীয় উৎসব। তাহারই জের হিসাবে কলিকাতা মহানগরীতে প্রদীপ্ত, খালি শিশির সৌধাবলীর মনোহারিণী দৃশ্য লর্ড কার্জনের সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাই। তাঁহাকে প্রথম দেখি—'প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখ দিয়া শ্বেতবর্ণের ঘোড়ার খোলা ল্যাণ্ডো গাড়িতে—লাল বেনারসীর রাজ-ছত্রতলে বসিয়া সহাস্যে জনগণকে অভিবাদন করিতে।'

এই প্রিয়দর্শন, দাম্ভিক, বাগ্মী, ঐশ্বর্যশালী লর্ড কার্জনই ছিলেন সুকোমল চারু ও কারু-শিল্পের উপাসক। ভারতীয় কলা ও স্থাপত্যের পরম অনুরাগী। তিনিই ভারতের অবহেলিত কারু ও চারু-শিল্পের সৌধাবলীর উদ্ধার ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ কর্তা। তাঁহারই যত্ন ও উদ্যমে Archaeological Department and Historical Monument Preservation আইন প্রবর্তিত হয়।

তাঁহার এই কীর্তির এক নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। সেই সময়ই এই পরম প্রতিভাবান লর্ড কার্জনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ও হইয়াছিল তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর—১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে কাশীর উত্তরে বুদ্ধ স্মৃতিজড়িত সারনাথের বিশাল ক্ষেত্রে।

তখন সারনাথের ২ মাইল ৩ মাইল (৬ বর্গমাইল) ভূখণ্ডে এক ঢিপি। ধর্মরাজিকা ও চৌখণ্ডী স্তূপ-এর ভগ্নাবশেষ মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান,—ইহাই নয়ন গোচর হয়। এই চৌখণ্ডী স্তূপ এখনও ভগ্ন জীর্ণ অবস্থায় (যদিও সংরক্ষিত) আজ ২৫০০ বৎসরের স্মৃতি লইয়া কালের নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই স্থানে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার প্রথম ও প্রাজ্ঞ শিষ্যগণের সহিত পুনরায় মিলিত হন। তাহারই উত্তরে সম্রাট অশোক নির্মিত ধর্মরাজিক স্তূপ ও মূলগন্ধকুটী বিহার। বিশাল বিহার সঙ্ঘারাম, মূলগন্ধকুটী সকল সৌধাবলী এক বিস্তৃত মৃত্তিকার ঢিপি ছিল যখন লর্ড কার্জন জেনারেল কানিংহামের নির্দেশে এই বিশাল মাটির ঢিপির উপর প্রথম কোদাল চালাইয়া এই ২৫০০ বৎসরের বৌদ্ধ স্থাপত্য সৌধের, অশোক স্তম্ভের, মূলগন্ধকুটীর স্মৃতি সৌধাবলীর পুনরায় লোকচক্ষুর গোচরে আনিবার উদ্যোগ করেন। ভারতের অতীত গৌরব কাহিনীর মর্মবাণী গাহিবার সুযোগ দিয়াছিলেন সেই মহামতি লর্ড কার্জন।

১৯০৪ সালের নভেম্বরের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দীপ্ত উত্তরবায়ু হিল্লোলিত প্রাতে, উন্মুক্ত গগনতলে মহামতি লর্ড কার্জন এই মাটির ঢিপির উপর কোদাল চালাইয়া অপূর্ব কীর্তি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বাঙালীকে অসত্যবাদী বলা, বঙ্গদেশকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া বাঙালীর জ্ঞান গরিমাকে খর্ব করিবার সকল প্রচেষ্টা তাঁহার এই পুণ্যে কীর্তি আবরিত করিয়া রাখিবে।

লর্ড কীচনারের সহিত পরিচয় আছে শুনিয়া তিনিও সাদরে আমায় আজ্ঞা করিলেন 'Have a drive struck a spade'—আমার চিত্ত পুলকে গৌরবে ভরিয়া উঠিল। যতই ঘৃণা ও বৈরীভাব অন্তরতম প্রদেশে সুপ্ত থাকুক না কেন, তৎপুণ্য মহত্ত এই অহিংসা তীর্থ ক্ষেত্রে পুণ্যকার্যে হাত দেওয়ায় লর্ড কার্জনের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া পড়িল। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে সারনাথের ঢিপির উপর লর্ড কার্জনের কোদাল চালানোর ফলে—১৯০৫ সাল হইতেই মেজর কিটোর পরিচালনায় ধামক স্তূপের পাদতলে বিরাট বিহার, চৈত, সঙ্ঘারামের কঙ্কাল ৩০টি মঠ ও ৩০০০ শ্রমণ ভিক্ষুর কক্ষর স্থাপত্য শিল্প-ঐশ্বর্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইল।

এই ধামক স্তূপ—ফা হিয়েন ও হিউ এং সাং দেখিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত (লেখকের লিখিত চার পুণ্যস্থান গ্রন্থে উল্লেখ আছে) ১৯৪৫ সালে যখন হেমলতা ঠাকুরের সহিত ধামক স্তূপের পাতাল বাতি জ্বালাইয়া পরমানুভূতিবোধ করি তখন—হেমলতা দেবী লিখিলেন—

'স্তূপ, ওগো স্মরণীয় স্তূপ,
বাণী কেন নাই মুখে, কেন মৌন চুপ,
রহো কি সমাধিমগ্ন হে মহাস্থবির
আনি যত স্তব স্তুতি একান্ত বধির।
কার পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন যুগ যুগ ধরি
ধরিয়া রেখেছ নিজ উচ্চ শিরোপরি॥'

লর্ড কার্জনের কৃপায় সারনাথ ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রতি বিশেষ অনুপ্রেরণা পাই। প্রায় চল্লিশবারের উপর সারনাথের মূলগন্ধ কুটীর সোপানে বসিয়া ধামক স্তূপে প্রণাম নিবেদন করি—

গন্ধকুটীর গন্ধ ফুল
অর্ঘ সাজায়ে কে দিল আনি
ফুটিয়া উঠিল অফুট মুকুল
শুনাল সবারে বুদ্ধ বাণী॥

লর্ড কার্জনকে যে খনন কাজের পত্তন করিতে দেখি তাহার পাঁচ বৎসর পরে গিয়া দেখি সারনাথ লর্ড কার্জন কর্তৃক প্রবর্তিত Ancient Monument Preservation Act. অনুযায়ী সারনাথ মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ২৪০ খৃঃ পূর্ব হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ-শিল্প স্থাপিত হইয়া দেশ-বিদেশের শত সহস্র দর্শকগণকে আকৃষ্ট করিয়া শুনাইতেছে কবির বাণী—

মমতাময় ছবি তোমারে কোলে লভি
ভূষিত হল ধরা স্বরগ সুষমায়
করুণা সিন্ধু হে ভুবন ইন্দু হে
ভিখারী জগময়ী! প্রণতি তব পায়॥

—সত্যেন দত্ত।

ব্যক্তিগত হইলেও অবান্তর নহে। লর্ড কার্জন চালাইতে বলার এবং মাতুল শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসুর—(ফটিকবাবু) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অ্যানি বেসান্তের সহচর—ভাগ্নে বলিয়া পরিচয় পাওয়াতে কাশী-নরেশ হিজ হাইনেস প্রভু নারায়ণ সিং G. C. I. E. মহাশয় স্নেহ করিয়া নদেশ্বরের প্রাসাদে লর্ড ও লেডি কার্জনের সম্মানার্থে যে রাজকীয় ভোজ দেন তাহাতে নিমন্ত্রণ করেন।

পরদিন লর্ড কার্জন যখন কাশী মহারাজের বত্রিশখানি সুচিত্রিত ময়ূরপঙ্খী বোটে করিয়া অর্ধচন্দ্রাকার কাশীর ঘাট ও মন্দির দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহাতেও বসিবার অধিকার দেন। এমন কি রামনগর কেল্লায় লর্ড কার্জনের সম্মানার্থে যে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করেন তাহাতে নিমন্ত্রণ দিয়াছিলেন।

এতটা অনুগ্রহ করিবার কারণ কাশীর রাজার সঙ্গে কাশীর চৌখাম্বার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত আত্মিক সম্বন্ধ চেৎ সিংহের সময় হইতে বর্তমান। যখন কাশী নরেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন, তাঁহার পাগড়ী বাঁধিয়া দিবেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধর। লেখক সেই বংশের মোক্ষদা দাস মিত্রর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

কাশীর রাজার খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রাক-ঐতিহাসিক ও রামায়ণ মহাভারতের যুগ হইতে নানা শাস্ত্রে, গ্রন্থে ও ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। চেৎ সিং কাশীর শেষ স্বাধীন রাজা। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কাশী সহর ও রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরে এক সন্ধির দ্বারা তাঁহার এক বংশধরকে এ রাজ্যের কিয়দংশ প্রদান করিয়া কাশীর গঙ্গার অপর তীরে রামনগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা এক প্রসিদ্ধ Feudatory State রূপে বিরাজ করিতেছে। রামনগরের প্রাসাদ স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা 'গর্ভ' হইতে উত্থিত হইয়া দুর্গশীর্ষে কাশী নরেশের পতাকা উড্ডীয়মান রাখিয়াছে।

সেই দুর্গে কাশী নরেশের নিমন্ত্রণে লর্ড কার্জন ও লেডি কার্জন মধ্যাহ্নভোজনে তৃপ্ত হন। ভোজনান্তে কাশী নরেশের দুর্গের সুক্ষ্ম ও চারুকার্যমণ্ডিত হস্তিদন্তের সামগ্রী দেখিয়া কার্জনের শিল্পিমন বিস্মিত ও পুলকিত হয়। লেডি কার্জন কাশীর রাজভাণ্ডারে মণিমুক্তা দেখিয়া মুগ্ধ হন। পায়রার ডিমের আকারের এক মতির মালার প্রতি তিনি এমনই আকৃষ্ট হন যে, মহারাজা তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সেই বহু মূল্যবান মতির মালাটি লেডি কার্জনকে উপহার দিলেন এবং লর্ড কার্জনকেও দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত অতুলনীয় দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি দ্রব্য উপহার দিয়া রেহাই পান।

এরূপে লর্ড কার্জন বহু রাজা-রাজড়ার নিকট হইতে উপহার সংগ্রহ করার বদনামের মধ্যেও তিনি ফিউডাটোরী চীফদের উপকার করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন—কারণ তিনি জানিতেন যে ইহাদের দ্বারাই British Imperiality কায়েমী হইবে।

লর্ড কার্জনকে ১৯০৬ সালে এক সভায় বলিতে শুনি যে, যদি তিনি আবার কখনও ভারতে আসেন তাহা হইলে—কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানরূপে আসিবেন ভাইসরয় রূপে নহে। তাঁহার কলিকাতা প্রীতিতে প্রমাণিত হয় কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরিকল্পনা ও ভিত্তিস্থাপন যজ্ঞ সম্পন্ন। তাঁহার ভারতে Art & Architecture প্রীতিও তাহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা যেমন ভারতবাসীর অতীত গৌরব কাহিনীর প্রতি অনুরাগ বাড়াইয়াছে তেমনই তাঁহার কলিকাতার নাগরিকদের তাঁহার স্বপ্ন—ভারতে দ্বিতীয় তাজ নির্মাণ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অনাহতের গান

['এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে' —ঈশ ২]

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

কি তুমি আমাকে দিয়েছ, কি দাও নি
—এ-প্রশ্ন তো স্বপ্নে-ও করি নি কখন-ও।
আমার নিত্য-সাধনার এই তো ছিল আর্ত জিজ্ঞাসা :
কি আমি দিতে পারি আমার পৃথিবীতে॥

দিতেই চেয়েছিলুম নিঃশেষ করে'—উজাড় করে' —
কিন্তু কোথায় কি যেন ছিল বাধা
দানের মত দান দেয়া এবার হ'ল না।
দানের প্রতিযোগিতায় পরাভূত করব তোমাকে
এই ছিল আমার যৌবনের অহংকার ;
যা' তুমি আমাকে দিয়েছ তার সহস্র গুণ দেব ফিরিয়ে
—এই ছিল পণ :
কথা বলার ভাষা দিয়েছ, আমি দেব কবিতা,
বিষয়-ভাবার মন দিয়েছ, আমি দেব প্রেমের প্রেম,
প্রতিষ্ঠা লাভের কর্ম দিয়েছ, আমি দেব কর্মাতীত ধর্মের আনন্দ,
—যৌবনের দম্ভের গভীরে
এই ছিল, আমার শক্তির প্রেরণা।

তোমার প্রেমের দানে অপরাজেয় বুঝি প্রেমপ্রতিভা—
আশা ছিল, এই জীবনেই পাব সিদ্ধি :
দানের প্রতিযোগিতায় পরাভূত করব তোমাকে !···
হায় কৃপণ তোমার দানে-ও কি ছিল না অপূর্ণতা ?

বুঝতে কি এখনো বাকি থাকে : কি তুমি আমাকে দাও নি,
কি তুমি আমা থেকে লুকিয়েছ ?
অন্তরের গভীরে কেন আজ আমার অশান্ত কান্না :
মনের মত দান দেয়ার সাধনায় আবার আমাকে আসতে হবে ?

কত মৃত্যু তো পার হয়েছি, কত জন্ম, কত জীবন,—
সাময়িক সিদ্ধির অহংকারে কখনো-বা মনে হয়েছে :
গন্তব্যের দ্বার হ'ল উন্মুক্ত,
নাট-মন্দিরের প্রান্তভাগ থেকে কি যেন দেখছি আভাসে,
কাকে যেন দেখছি ধুপের ধোঁয়ায়,
কিন্তু না,
সূর্য তো নয় অহং-এর দৃষ্টি,
অন্ধকারে দেবদর্শনে হ'ল বিলম্ব॥

আজ আমার ক্লান্ত শরীর—
প্রৌঢ়ত্বের পথপ্রান্তে অপেক্ষমাণ আমি দূরযাত্রার আলস্যে,
পথিক ভক্তরা ভাবছে, পরাভূত আমি সাধন-সংগ্রামে,
সু-তরুণ শক্তরা ভাবছে
পলাতক আমি নৈরাশ্য-নির্জিত,
কিন্তু কেউ কি জানে
কোন্ বেদনার যৌবনবেগে আমি কৃতাঞ্জলি ?
কোন্ চেতনার আনন্দোল্লাসে
আবার ফিরতে চাই জীবন-তীর্থে ?

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ও খাদ্য সমস্যা

আণবিক যুদ্ধ হবে কি হবে না, এটা মনে হয় আজকের দিনে আর স্কুল, কলেজ বা অবৈতনিক পাঠাগারগুলির সৌখীন ডিবেট-এর বিষয় হয়ে থাকবার মতো বিষয় নয়। আমাদের মতো দেশ বা তার সরকার অক্ষমতাকে যাঁরা নানা বাক্যের কৌশলে ধামাচাপা দিতে চান, তাঁরা ছাড়া আর সকলেই জানেন যে, আণবিক-যুদ্ধ সংঘটিত হবেই—এক-আধ বছরের মধ্যেই হোক আর দশ-বিশ বছর পরেই হোক। এর সম্ভাব্য কারণস্বরূপ অনেক কথাই বলা চলে। কিন্তু বিস্তারিতভাবে সে-সব আলোচনার মধ্যে না-গিয়েও পৃথিবীর প্রধান দু'টি রাজনৈতিক ক্যাম্পের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতানৈক্য এবং ক্রমশ বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আণবিক অস্ত্র তৈয়ারির ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেই আমাদের ধারণার যাথার্থ্য অনুভব করা যাবে।

আণবিক যুদ্ধ হলেই যে পৃথিবীটা গুঁড়িয়ে শূন্যমার্গে ধূলিকণার মধ্যে হারিয়ে যাবে তা মনে হয় না। এ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মতো। আমাদের বিশ্বাস পাঁচ-দশ কি বিশ কোটি নিরপরাধ মানুষ অবশ্যই অকালে প্রাণ হারাবে; হয়ত ঐ সমসংখ্যক মানুষ সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে চিরকালের মতো পঙ্গু হয়েও থাকবে।

কয়েকটি দেশের শিল্পাঞ্চলে ধ্বংসলীলা দেখে হয়তো খাস নরকের অধিবাসীরাও লজ্জিত হবে—এ সবই হতে পারে; কিন্তু, তবু পৃথিবীটাও ধ্বংস হয়ে যবে না বা মানবজাতিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। কয়েক শ' কোটি মানুষ আণবিক যুদ্ধের পরেও পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবে মানে—আণবিক অস্ত্রের সরাসরি আঘাত বা তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু আসল সমস্যা দেখা দেবে তারপর। বোমার হাত থেকে রেহাই পেলেও মানুষ কি খেয়ে বেঁচে থাকবে? এইটাই একটা মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে বলে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা।

আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে যে তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত হয়; তার পরে মানুষের খাবার উপযোগী প্রায় সবকিছুই বিষাক্ত হয় ওঠে। কোনো গরু বা মোষ যদি সরাসরি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় ভস্ম শরীরে গ্রহণ করে, তা হলে তো তার দেহ বিষাক্ত হয়ে গেলোই এবং তার দুধও মানুষের গ্রহণের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আশঙ্কার কথা হলো কোনো গরু, মোষ বা ছাগল যদি তেজস্ক্রিয় ভস্মযুক্ত ঘাসপাতাও খায়, তা হলেও তাদের শরীর এবং তাদের দুধ বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং ফলে মানুষের গ্রহণের অনুপযুক্ত হয়ে উঠবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে দুধ বলে কোনো কিছু নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া চলবে না। অন্যান্য জীবের মাংসেরও একই অবস্থা। খেতের শাক-সব্জি-ফসল বা ফলেরও অবস্থা একই রকম হবে। কাজেই একেবারে প্রথম থেকে অর্থাৎ '৪৫ সালে প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর থেকেই বৈজ্ঞানিকগণ তেজস্ক্রিয়তার প্রতিরোধ করতে পারে এই রকম কিছু আহার্যের সন্ধানে ছিলেন এবং কয়েক বছরের অবিশ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে একটি সাধারণ জীবের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধের গুণের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে হলো মুরগী। মুরগীর তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধের শক্তি বিস্ময়কর বললেই হয়।

জীবের শরীরের 'ক্যালসিয়াম' নষ্ট করে ফেলে তেজস্ক্রিয় শক্তি জীবের মৃত্যু ঘটায়; কিন্তু মোরগ এবং মুরগীর শরীরের ক্যালসিয়ামের বিশেষত্বই হলো তেজস্ক্রিয়তাকে প্রতিরোধ করা। একেবারে সরাসরি বিস্ফোরণ-এর এলাকার মধ্যে যে তাণ্ডবের সৃষ্টি হয়, তার একটু বাইরে থাকতে পারলেই মোরগ-মুরগী আণবিক বোমার কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার নানা দেশে আজকের দিনে তাই নতুন উদ্যমে মোরগ এবং মুরগী পালনের রেওয়াজ উঠেছে। —শ্রীমানবী

() নিজের চোখ নিজেই পরীক্ষা করুন

আমাদের জীবনে চোখের গুরুত্ব সম্বন্ধে নতুন করে বলবার আর কিছু নেই। চোখ যে আমাদের পক্ষে কতখানি মূল্যবান, তা অবশ্য সবচাইতে ভালো তাঁরাই জানেন যাঁরা নিজেদের চোখ হারিয়েছেন। যাঁরা হারাতে চলেছেন তাঁরাও বেশ কিছুটা জানেন, আর যাঁরা তা এখনো হারাবার কোনোরকম লক্ষণ বুঝতে পাচ্ছেন না, তাঁরা নিশ্চয়ই আরো কম বোঝেন। এইখানে একটা কথা। যাঁরা চোখ একেবারেই হারিয়েছেন বা হারাতে চলেছেন তাঁদের পক্ষে ডাক্তারবাবুর

সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু যাঁরা এখনো পুরোদস্তুর তাঁদের চোখ ব্যবহারে সক্ষম, আমাদের এ আলোচনা তাঁদেরই জন্যে।

চোখ এখনো যাঁর পুরোপুরিই ভালো আছে—আগামী বছর এই দিনেও যে ঠিক এই রকমই থাকবে তার কোনো স্থিরতা নেই। খুব সম্ভব থাকবে না। কারণ, আমাদের চোখের দৃষ্টি আমরা কদাচিৎ একদিন অকস্মাৎ অর্থাৎ চট করে হারিয়ে থাকি। আমাদের দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে এবং এটা এতো ধীরগতিতে চলতে থাকে যে, এ বছরের সঙ্গে পরের বছরের তফাৎটা সাধারণত প্রায় বোঝা যায় না বললেই চলে। অথচ খুব কমবয়সে না হলেও অন্তত পঁয়ত্রিশের পরে আমাদের সকলেরই চোখের দৃষ্টি ক্রমশ, অর্থাৎ প্রতি বৎসরই একটু একটু করে কমে আসতে থাকে। এই যে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে এটা যথাসময়ে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলে এবং সময়মত ডাক্তারবাবুদের সাহায্য নিলে আমাদের চোখের আয়ু অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি বেশ লক্ষণীয়ভাবে ধরে রাখা যায়। এজন্যে একটা অত্যন্ত সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছেন আমেরিকার ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডাঃ পিটার ক্রনফিল্ড।

ডাঃ ক্রনফিল্ড বলেন যে, যে কোনো সাবালক সাধারণ মানুষও তাঁর চোখের স্বাস্থ্য নিজেই পরীক্ষা করতে পারেন। এজন্যে সব সময় ডাক্তারবাবুদের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই।

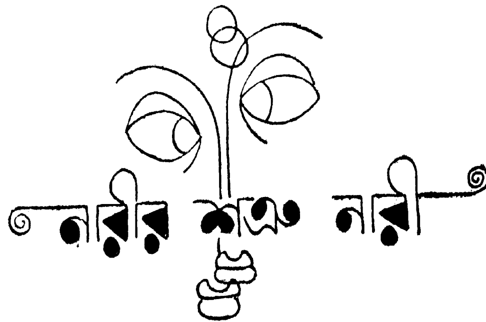
ডাঃ ক্রনফিল্ডের পদ্ধতিটা খুবই সহজ। আমরা যে কেউই এই পদ্ধতিতে আমাদের দৃষ্টিশক্তির অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। যে কোনো লোক দুই, তিন কিম্বা পাঁচ বছর পর পর এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজের চোখ পরীক্ষা করলে এ পদ্ধতির কার্যকারিতা বুঝতে পারবেন।

এবার পদ্ধতিটা শুনুন। নিজের ঘরে বা একটা ফাঁকা জায়গায় বসে আগে কোনো একটা লেখা কয়েকটি অক্ষরই হোক বা কয়েকটি শব্দই হোক পড়ুন। লেখা বোর্ডটা ক্রমশ যাতে কেউ আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় তার বন্দোবস্ত রাখবেন। যখন মনে হবে অক্ষর বা শব্দগুলি আর আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না, তখন লোকটিকে থামতে বলবেন। এবার আপনার কাছ থেকে ঐ অক্ষর বা শব্দ লেখা বোর্ডটি কতো দূরে আছে সেই দূরত্বটা মেপে ফেলুন। এরপর একটি একটি করে, অর্থাৎ পৃথক পৃথকভাবে ডান এবং বাঁ চোখও ঠিক ঐ একইভাবে পরীক্ষা করে দূরত্বটা লিখে রাখুন।

পরের বছরও ঐ একই বোর্ডটির সাহায্যে যদি পরীক্ষা করেন তা হলেই বিগত বছরের সঙ্গে আপনার চোখের দৃষ্টির এ বছরের পার্থক্যটি নিজেরই কাছে ধরা পড়বে। একথা নিশ্চয় যে, আপনার বয়স যদি পঁয়ত্রিশ বা তার ওপরে হয়, তা' হলে আপনার চোখ আর অক্ষর বা শব্দগুলি বোর্ড থাকার দূরত্ব ক্রমশ কমে আসতে থাকবে।

চোখের কতকগুলি রোগ আছে যা সারানোর কোনো উপায় এখন পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান করতে পারে নি যেমন গ্লুকোমা। কিন্তু গ্লুকোমাসহ বেশিরভাগ চোখের রোগেরই একটা উপায় করা যেতে পারে—অর্থাৎ যেটুকু রোগ রয়েছে তার পরে আর না বাড়তে পারে তার বন্দোবস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান করতে পারে। এই সমস্ত মারাত্মক কারণ-বশত আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তির যে হানি ঘটে তা বাদ দিয়ে অন্য যে-কোনোভাবে দৃষ্টিশক্তির ক্রমাবনতি সাধারণ মানুষ ডাঃ ক্রনফিল্ডের পদ্ধতি অনুসরণ করেই বুঝতে পারেন এবং নিজে নিশ্চয় হবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সাহায্য নিলে বেশিরভাগ সময়েই অকাল-অন্ধত্ব রোধ করা যায়।

—ডাঃ নাগ



পুরুষ ও নারীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে আলোচনা স্মরণাতীত কাল থেকেই চলে আসছে। ব্যাপারটার কোনো ফয়সালা আজ অবধি হয় নি (এবং কোনো কালেই হবে বলে মনে হয় না)। যে পর্যন্ত ফয়সালা কিছু একটা না-হচ্ছে সে পর্যন্ত যার যা ধারণা আমরা সবাই অবশ্যই বলবো এবং বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করবো।

নারীমাত্রেই স্বগোত্রীয়দের শ্রেষ্ঠ যে মনে করেন না তা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বাস্তবিক পক্ষে মেয়েদের 'দেখতে পারেন না' এ রকম সাবালকের সংখ্যা পুরুষের চাইতে নারীদের মধ্যে বোধ হয় দ্বিগুণেরও বেশি। বলতে কি, বেশির ভাগ নারীই 'ওয়োম্যান হেটার'। ব্যাপারটা বিশ্বাস হলো না? যদি আস্থা নাই রাখতে পারেন আমার কথায় তো বলবো নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করুন (অবশ্য যদি আপনি নারী হন), আর যদি আপনি পুরুষ হন তো বলবো আপনার মা মাসী পিসি দিদি কি ছোট বোন বা স্ত্রীর মনোভাবটাও বুঝবার চেষ্টা করতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তা হলে অবশ্যই আমার কথার যাথার্থ্য আপনারা স্বীকার করবেন।

একজন নারী যে কেন আর একজন নারীকে সহ্য করতে পারেন না, তার সম্পর্কে নানা থিয়োরী আছে। অতো-শতো থিয়োরী নিয়ে আপাতত ঘাঁটাঘাটি না-ই বা করলাম। তার দু' চারটে নিশ্চয়ই আপনারাও জানেন, কিন্তু পুরুষদের কথা প্রকৃতই একটু অন্যরকম। ত্রিশজন সাধারণ কেরাণী শ্রেণীর ভদ্রলোক অনায়াসে এবং বেশ লক্ষণীয়ভাবে সদ্ভাব বজায় রেখে একই মেসে কিম্বা বোর্ডিং-এ বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন এরকম উদাহরণ কলকাতার মতো সহরে নিশ্চয়ই কয়েক শত মিলবে।

কিন্তু, তার অর্ধেক মেয়ে, অর্থাৎ কিনা পনেরো জন মেয়ে, তাও সাধারণ কেরাণী শ্রেণীর নয়, রীতিমত শিক্ষিতা) বা হয়তো উচ্চশিক্ষিতা (অর্থাৎ বি-এ, এম-এ, পাশ নারী যদি ঘটনাচক্রে কখনো একটা বোর্ডিং-এ বা কোনো বিয়েবাড়িতে এসে জমায়েত হন, তা হলে মাঝে মাঝে পাড়াপড়শীদের অবস্থাটা হয়ে পড়ে শোচনীয়। এটা কেন হয়? এটা কি শুধু আমাদের এই পোড়া বাংলা দেশেরই মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ? না না, তা নয়। বাঙালী নারীদের দুঃখ করবার কারণ নেই, গোটা ভারত তথা পৃথিবীজুড়েই মেয়েদের এই অবস্থা। এঁরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না। এবং এই যে এঁরা নিজেরাই নিজেদের সহ্য করতে পারেন না, সেইজন্য শ্রেণী হিসেবে এঁদের অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায় আরো বিশ্রী।

এ রকম আকছারই দেখা গিয়ে থাকে যে, পাড়ার কোনো মহিলা, অন্য মহিলারা বাজখাই গলা, খুঁত খুঁতে স্বভাব, বদমেজাজ, হিংসা এবং ঈর্ষাপরায়ণতা এবং সব মিলিয়ে যাকে বলে কলহপ্রিয়া, এজন্যে যাকে এড়িয়ে চলে থাকেন তিনিই হয়তো পাড়ার পুরুষদের কাছে নমস্যা শ্রদ্ধেয়া নারী। হয়তো তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্যে অনেক ভদ্রলোকই আন্তরিক খুশি। আশ্চর্য বটে!

হ্যাঁ, আশ্চর্য বৈকি। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই ইয়োরোপ এবং আমেরিকার এক শ্রেণীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আজকাল নারী-ক্রেতাদের জন্যে পুরুষ সেলসম্যান নিয়োগ করবার রীতি প্রবর্তন করেছেন। অনেক সময়ই দেখা গেছে যে, পণ্য নিয়ে কোনো নারী সেলসওয়োম্যান শুধু ব্যর্থই হন নি, হয়তো বা তাঁর হবু মহিলা ক্রেতার কাছ থেকে বেশ কড়া ব্যবহারও পেয়ে এসেছেন। আবার সেই পণ্যই হয়তো অনেক সময় দেখা গেছে পুরুষ সেলসম্যান সাফল্যের সঙ্গে বিক্রি করে এসেছেন।

এর মধ্যে সত্যি একটা ভাববার জিনিস রয়েছে। একেবারে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলোই আমরা স্বেচ্ছায় কিনে থাকি। তারপরের যে কেনা-কাটা তা বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞাপন বা প্রচারের প্রভাবেই আমরা করে থাকি। আমরা শুধু কিনি বললে হয়তো ঠিক বলা হবে না, বরং বলতে হয় যে, আমরা কিনতে বাধ্য হই। অর্থাৎ কিনা সেই বিশেষ জিনিসটার প্রয়োজন যতটুকুই থাক না থাক, আমরা সেলসম্যানের প্রভাবে পড়ে হঠাৎ তার প্রয়োজনবোধ করতে আরম্ভ করি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বাস্তবিক পক্ষে পণ্যটা আসল কথা নয়। আসল কথা হলো সেলসম্যান। কি বিক্রি করছেন তা নয়, কে বিক্রি করছেন সেইটেই আসল কথা।

তাই বলছিলাম নারীর শত্রু নারী। নিজেদের মধ্যে নারীরা এই শত্রুতার ভাবটা না পাল্টানো পর্যন্ত সাধারণের চোখে তাঁরা উন্নীত হতে পারবেন কি। —তীরন্দাজ

খাদ্য ও সংস্কার

খাবার সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কারগুলি তার মূল কারণ সম্বন্ধে ডাক্তার, স্বাস্থ্যবিদ, নৃতত্ত্ববিদ থেকে সুরু করে পুরোহিত এবং ধর্ম সম্বন্ধে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও প্রচুর ভেবেছেন এবং এখনো ভাবছেন।

এই তো পৌষ মাস চলছে, আর ক'দিন বাদেই মাস শেষ হবে। মাঘ মাস পড়লেই দেখবেন বাঙালীর হেঁসেলে মুলোর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যাঁরা জাতীয় সংস্কার সম্বন্ধে অহেতুক গর্ব পোষণ করে থাকেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন—একটা রীতিমতো 'বৈজ্ঞানিক' উত্তর পেয়ে যাবেন: 'মশাই, আমাদের বাপ-দাদারা যা নিয়ম করে গেছেন তার প্রত্যেকটার পেছনে রয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক কারণ। দেখুন না মাঘ মাস পড়লেই মুলো কি রকম শক্ত

হয়ে যায়।' সুতরাং পৌষ সংক্রান্তির দিনে অনেকেই মা কালীকে মুলো উপহার দিয়ে আসেন এবং তারপর থেকে আর নিজেরা খান না। অর্থাৎ কিনা, মা, মুলোটা বেজায় শক্ত হয়ে গেছে, কাজেই এবার থেকে তুমিই খেয়ো।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব জটিল কিছু নয়। এ্যানথ্রোপলজিস্টরা সকলেই জানেন যে, খাবার সম্বন্ধে ছোট-বড়ো যতো রকম অভ্যাস আমাদের রয়েছে এবং যার প্রায় প্রত্যেকটারই ধর্মের সঙ্গে একটা যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে সেগুলি নেহাৎ 'চলে আসছে' বললেই চলে। কেউ যেমন কখনো প্ল্যান করে চালু করেন নি তেমনি কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণের জন্যও প্রচলিত হয় নি। চলে আসছে তাই চলে আসছে। যেই কেউ এ সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করে, ব্যস অমনি ছিঁড়ে যায় তার সংস্কারের বাঁধন।

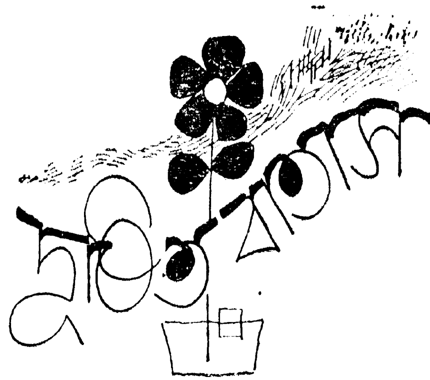
শুধু যে বাঙালী বা ভারতবাসীদের এই অবস্থা তা নয়। পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই খাবার সম্বন্ধে এই সংস্কার জনগণের পুষ্টিহীন শরীরের জন্য দায়ী বলে স্বাস্থ্যবিদগণের ধারণা।

যেমন ধরুণ পূর্ব-আফ্রিকা অঞ্চলে মেয়েদের শরীর স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত দুর্বল এবং তারা ক্ষীণজীবী।

এর একটা কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, ঐ অঞ্চলে মেয়েরা সংস্কারবশত ডিম এবং দুধ খায় না। কারণ ডিম খেলে তার পেটে তো বাচ্চা হবেই না, আর দুধ খেলে বাচ্চা হবে, তবে সে গরুর মতো সারাজীবন হাম্বা হাম্বা করবে। (ডিম সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেয়েদেরও ধারণা প্রায় একই রকম।)

এই যে একটা দেশের কথা এখানে বললাম, তার দ্বারাই আমরা কুসংস্কারের ফলে খাদ্যবর্জন এবং তার ফলে আমাদের (বিশেষ করে মেয়েদের) যে স্বাস্থ্যহানি হয় তার প্রধান দু'টি জিনিস সম্পর্কে জানতে পেরেছি—অর্থাৎ কি না দুধ এবং ডিম। এর সঙ্গে আর একটি জিনিস যুক্ত করা যেতে পারে—সে হলো মাংস। এই তিনটি জিনিসের ওপর আমাদের শরীরের অনেকখানিই নির্ভর করে—আর এই তিনটি জিনিস সম্পর্কে আমরা মেয়েরা কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ।

—নার্স মিত্র



সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে সুরু করে ফ্যারিঞ্জাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা এমন কি শ্বাসনালী, গলনালী এবং ফুসফুসের ক্যান্সার পর্যন্ত একই কারণে ঘটছে দেখা যাচ্ছে। সে হলো শিল্পাঞ্চলের দূষিত বাতাস। এই সমস্ত রোগের আরও অনেক কারণই আছে বা থাকতে পারে, তবে দেখা গেছে শিল্পাঞ্চলের দূষিত বাতাস থেকে যতোটা ব্যাপকভাবে এই সমস্ত রোগ ছড়াচ্ছে ততোটা আর কোনো কারণেই নয়।

শিল্পাঞ্চলের বাতাস দূষিত হতে পারে নানাভাবেই। পাটকল থেকে ধূলিকণার মতো পাটের টুকরোও যেমন ক্ষতি করে থাকে, যে-কোনও কারখানার চিমনীর ধোঁয়াও ঠিক তেমনি ক্ষতি করে থাকে। তবে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, সবচাইতে ক্ষতি করে বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত সালফার-কণিকাগুলি। 'কমবাসশন' জনিত প্রক্রিয়ার ফলেই প্রধানত সালফারের সৃষ্টি হয়ে থাকে; যে অঞ্চলে শিল্পের প্রসার যতো বেশি, স্বাভাবিকভাবেই সে অঞ্চলের বাতাসে সালফার-কণিকাও ততো বেশি পাওয়া যায়—ফলে, বাতাসও ঠিক সেই পরিমাণেই দূষিত হয়ে ওঠে।

আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ডোহান এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চালিয়েছেন। উনি দেখছেন যে, যে কোনও শিল্পমুক্ত সহরের একই উপার্জনের নাগরিকদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের অঙ্গ ছাড়া অন্য যে-কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যারামের হার প্রায় সমানই। তা সে এ্যাপেনডিসাইটিস হোক বা স্ত্রী-রোগই হোক কিন্তু

শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ শিল্পাঞ্চলে সব সময়েই বেশি। এবং দু'টি প্রায় সমান দূষিত বাতাসযুক্ত অঞ্চলে এই সমস্ত রোগের যে মান তাও প্রায় সমান।

ডাঃ ডোহান আরও দেখেছেন যে, গ্রীষ্ম বা বসন্তের সময়ে শিল্পাঞ্চলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ কিছু কম থাকে, বর্ষা বা শীতকালের চাইতে। কারণ ঐ সমস্ত ঋতুতে জ্বালানীর ব্যবহার কিছু কমে যায়, ফলে ধোঁয়াও অপেক্ষাকৃত কম ছড়ায়।

সাধারণ সর্দি-কাশি অনেক সময় মহামারীর আকার নিয়ে থাকে বলে আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু ডাঃ ডোহান বলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্ত রোগের জীবাণুর অতো শক্তি নাই। অর্থাৎ কি না একের থেকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে রোগের বিস্তার ঘটাবার মতো সাংঘাতিক ক্ষমতা তাদের বাস্তবিক পক্ষে নেই। আসলে ব্যাপারটা যে মহামারীর মতো মনে হয়, তার কারণ অঞ্চল বিশেষের বাতাসের দূষিত অবস্থা। অর্থাৎ কি না, রোগটা একের থেকে অন্যের মধ্যে ছড়ায় না—সকলেই একইভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে দূষিত বাতাসের ফলে। —শ্রীচন্দ্রাবলী

মাছও পাগল হয়



পাখী যখন মাছ খায় তখন তা কোনো বলবার মতো কথা নয়, কিন্তু মাছ যখন পাখী খায়? অবশ্যই সে একটা খবর—একটা জোর খবর হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এটা প্রকৃতই ঘটে থাকে। আপনারা কেউ আগে এ সম্বন্ধে কোথাও কিছু শুনেছেন কি না জানি না—কিন্তু পৃথিবীর অন্তত একটা অঞ্চলে একজন ধীবর এটা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। আর পাঁচজনকে ব্যাপারটা তিনি দেখিয়েছেনও এবং সব চাইতে তাজ্জব ব্যাপার—সে মাছকে ধরবার জন্য বঁড়শি, জাল ইত্যাদি সমস্ত রকম উপায়ই যখন ব্যর্থ হলো, তারপর তিনি কৃত্রিম পাখী তৈরি করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে গতিশীল করে—সেই চলমান-পাখীকে শিকারে উন্মত্ত অবস্থায় ঐ জাতীয় একটি মাছ ধরে ফেলেছেন।

আমেরিকার ফ্লোরিডা অঞ্চলের ঘটনা। এক ধীবর-যুবক প্রায়ই শোনে পাড়াপড়শীদের কথা যে, পাড়ার পুকুরে যত হাঁস তাদের বাচ্চা নিয়ে যায়—তারা প্রত্যেকেই এক-আধটি খুইয়ে আসে। এ রকম কথা প্রায়ই ওর কানে যেত বৎসরাধিক কাল থেকে। একদিন সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে শুনলো যে, সেদিন পাড়ার বিভিন্ন বাড়ির মোট চব্বিশটি বাচ্চা খোয়া গেছে। তার মধ্যে তাদের নিজেদেরই চারটি। কথাটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ওর গরম হয়ে উঠলো। কারণ ও ধরেই নিলো যে, ব্যাপারটা আশপাশের জঙ্গলের শৃগালদের দ্বারা হচ্ছে—কিছুটা হয়তো বা ভাম বা বেজী জাতীয় শিকারী জীবের জন্যও হতে পারে। মনে পড়লো—বছর তিনেক আগে একবার শৃগালদের তাড়নায় অস্থির হয়ে সদলবলে বেরিয়ে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে প্রায় তিন শ' শৃগাল ওরা মেরে ফেলেছিল। ঠিক করলো পরদিনই আবার শৃগাল-অভিযানে বেরোতে হবে।

সকালবেলা এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে দেখলো যে, সকলেই যে-যার কাজে বেরিয়ে গেছে। অগত্যা ধীবর-যুবক ঠিক করলো যে, নিজের বন্দুকটা নিয়েই সে পুকুরটার আশে-

পাশে কয়েকটা আওয়াজ করবে—তা'হলে অন্তত সাময়িক কয়েকটা দিনের জন্যও শৃগালদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

ব্‌কটা নিয়ে পুকুরের পাড় অবধি এসে কিন্তু চক্ষুস্থির হয়ে গেলো ধীবর-যুবকের। ও দেখলো অন্তত তিন ফুট লম্বা একটা মাছ জলের ভেতর থেকে লাফিয়ে অন্তত এক ফুট উঁচুতে উঠে একটি হাঁসের ছানা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এ-রকম বার পাঁচেক হবার পরে যুবকটি নিঃশব্দে পাড়ায় ফিরে গিয়ে আরো কয়েকজনকে এনে দেখালো ব্যাপারটা। একবার ঘটলো আরো একটা অবাক কাণ্ড। একটি ভাসমান কদলীখণ্ডের ওপর একটি ফুটফুটে সাদা বক বসেছিল শিকারের আশায়। অকস্মাৎ একটি মাছ জলের ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লো ওর ঘাড়ে এবং তারপর দু'জনেই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মাছটা দেখা গেলো সকলেরই চেনা। স্থানীয় লোকেরা বলে 'ব্ল্যাক ব্যাস' অনেকটা গজাল মাছের আকৃতি। সাড়ে তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এই ব্যাস মাছের দাঁতে মারাত্মক ধার বলে কদাচিৎ জালে ধরা যায়। এটা সবাই জানে। যে জন্যে যে পুকুরে ব্যাস আছে সেখানে জেনে শুনে কেউ জাল নষ্ট হবার আশঙ্কায় জালই ফেলো না। কিন্তু ওরা যে পাখী ধরে খাবার বুদ্ধি রাখে এটা আগে কেউই জানতো না।

তবু আর একবার চেষ্টা চললো ব্যাসগুলিকে ধরবার জন্যে। বঁড়শি, জাল এবং কোচ, বন্দুকের গুলী সব একে একে ব্যর্থ হবার পরে ঐ ধীবর-যুবকটি একটি কৌশলের সাহায্য নিলো। কয়েকটি কৃত্রিম হাঁসের বাচ্চার সঙ্গে একটি বড়ো কৃত্রিম হাঁস তৈরি করে পুকুরে ছাড়া হলো। পাড়ে বসে দূর থেকে ধীবরটি বিদ্যুতের সাহায্যে হাঁস এবং তার বাচ্চাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো। হাঁসের প্রতিটি বাচ্চার শরীরের ভিতর ছিলো একাধিক বঁড়শি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই জলের ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠে সরাসরি একটি বাচ্চাকে গিলে ফেলে বঁড়শিতে আটকে গেলো একটি চারফুট 'ব্যাস' মাছ। প্রত্যেকটি বঁড়শিতে ১২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছিলো। কাজেই বার-কয়েক ছটফট করেই নিস্পন্দ হয়ে গেলো 'ব্যাস' মাছটি।

মাছ সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাসেরা এরকম করে না। এটা ওদের অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ। —তীরন্দাজ

দেড়ঘণ্টা অন্তর

এতদিন সবার ধারণা ছিল যে যখন ঘুম ভাঙবো-ভাঙবো করে, তখনই মানুষ স্বপ্ন দেখে আর ঘুম ভেঙে গেলেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। পশ্চিম জার্মানীর মহিলা মনোবিজ্ঞানী ডাঃ ইঙ্গে স্ট্রাউথ সে ধারণা ভেঙে দিয়েছেন। বেশ কিছুদিন হল জানা গেছে যে, মানুষ যখন ঘুমোয় তখন একটা নিয়মিত সময় বাদে বাদে ঘুমের গাঢ়ত্ব বাড়ে-কমে। বর্তমানে ঘুমের সময় মস্তিষ্কের কর্মপ্রবাহ থেকেও প্রমাণ হয়েছে যে, প্রতি দেড়ঘণ্টা অন্তর ঘুমের গাঢ়ত্বের তারতম্য ঘটে এবং ঘুমের মাত্রাই এই তারতম্য ঘটার সময় মস্তিষ্কের তরঙ্গ দ্রুততর হয় যাকে বলা হয়, 'বেটারদম্ বা ছন্দ।' এই সময় আরও দেখা যায় যে চোখের পাতা নড়ে উঠছে কিম্বা অন্য কোন অঙ্গ নড়ছে যাতে বুঝতে হবে যে মনের মধ্যে কোন জোর মানসিক আলোড়ন চলেছে। ঘুমের এই পরিবর্তন ও দেহের এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার তিন থেকে তিরিশ মিনিট পরে মনোবিজ্ঞানী স্ট্রাউথ তার পরীক্ষার্থী ঘুমন্ত ব্যক্তিদের জাগিয়ে তুলে শুনেছেন যে, তাদের

এক-একটি স্বপ্ন

প্রত্যেকেই ঠিক ঐ সময় কোন না কোন স্বপ্ন দেখছিল। পরের দিন সকালে অবশ্য তারা আর বলতে পারে নি কি স্বপ্ন তারা দেখেছিল কিন্তু এটা তাদের স্মরণে ছিল, যে রাতে তাদের জাগানো হয়েছিল এবং তখন তাদের দেখা স্বপ্ন তারা বলেছিল। এই ধরণের পরীক্ষা বহুবার চালিয়ে প্রমাণ হয়েছে যে স্বপ্ন দেখা একটা নির্দিষ্ট ছন্দে ঘটে। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর পাতলা হয় ও ঠিক তখনই সাধারণত সে স্বপ্ন দেখতে থাকে। স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের আরও একটা ধারণা ডাঃ স্ট্রাউথ ভেঙে দিয়েছেন। এতাবৎ ধারণা ছিল যে স্বপ্ন কেবল কয়েক সেকেণ্ড বা তার ভগ্নাংশ স্থায়ী হয় কিন্তু পরীক্ষায় তিনি দেখেছেন কোন কোন স্বপ্ন আধ ঘণ্টা পর্যন্ত দেখা চলতে থাকে। অবশ্য স্বপ্নতত্ত্বের আর কোন নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে না পারলেও, বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন বিশ্লেষণের প্রতিষ্ঠাতা সিগমুন্ট ফ্রয়েড ও অন্যান্য স্বপ্ন-বিশ্লেষকদের ফলাফলের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধানের ফলের মিল দেখা গেছে।—ডি এ ডি



যৌন আকর্ষণ ও আবেদন

নারীরূপের প্রতি পুরুষের মনে যে আসক্তি জাগে মূলত তা এক ও অভিন্ন হলেও, ক্ষেত্রবিশেষে তা বিভিন্ন ভাবাশ্রয়ী। অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে তা নানা ধরণের রসসঞ্চারী।

সমষ্টিগতভাবে নারী সৌন্দর্যের মূলাধারস্বরূপ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ চিহ্নই পুরুষজাতির মন আকৃষ্ট করে থাকে সর্বদেশে ও সর্বকালে, কিন্তু তাদের মধ্যে কিসে কোন পুরুষ অধিকতর আনন্দের বা আকর্ষণের উপাদান খুঁজে পায়, তা বলা বড় কঠিন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্নটাই বড়।

উদ্রেক করা সম্ভব। এমন কি কানের লতিটুকুকে কোন সুগন্ধি নির্যাসে ডুবিয়ে নিলে বিবাহ প্রস্তাব পর্যন্ত আসতে পারে সেটা ও সঠিক বলে দেওয়ার ভূমিকা নিতে পেছপাও নয় এরা।

অবশ্য বিবাহটা মূল উদ্দেশ্য হলেও নারীর দেহচর্চার এখানেই ইতি নয়, প্রসাধন-ব্যবসায়ীর মতে রূপচর্চা প্রত্যেক রমণীর অবশ্যপালনীয় এক কর্তব্য, কারণ বিবাহসূত্রে ঈপ্সিতজনকে বাঁধতে সক্ষম হলেও রূপলাবণ্যকে সতত মার্জিত উজ্জ্বল রেখেই নাকি শুধু পুরুষের চঞ্চল মনকে বশে রাখতে হয়।

আধুনিক যুগের রমণীর অত্যধিক প্রসাধন-পরায়ণতার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তিও দেখানো হয়ে থাকে বৈকি।

একথা তো অনস্বীকার্যরূপেই সত্য যে, মেয়েদের অবস্থার বহু পরিবর্তন হয়েছে, এ যুগে বহুসন্তানের জননী হওয়া বা ঘর-সংসারের কাজে কৃতিত্ব পরিদর্শন করা, এর কোনটাই নারীত্বের আদর্শ বলে বিবেচিত হয় না।—

আজকের দিনে কম লোকই বৃহৎ পরিবার পোষণে সক্ষম, আর বিজ্ঞানের অসম্ভব অগ্রগতির দরুণ গৃহকর্মে খুব বেশি সময় বা শ্রমের প্রয়োজন বড় বিশেষ হয় না।

তাহলে পুরুষের চোখে অপরিহার্য বলে পরিগণিত হওয়ার আর কোন কোন্ পথ খোলা রইল নারীর পক্ষে?

অধিকসংখ্যক রমণীই যে নিজেদের দৈহিক আকর্ষণ সম্বন্ধে সম্যক সচেতন বা তাকে প্রাণপণে বজায় রাখতে ইচ্ছুক, বেশবিন্যাস-প্রসাধন ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের অত্যধিক আগ্রহেই তার স্বাক্ষর মেলে।

এইসব সাজসজ্জা ও প্রসাধনাদির নিত্য-নতুন উৎকর্ষ বজায় রাখতে সচেষ্ট এমনতর ব্যবসায়ী মানুষের ভিড়ও বাড়ছে ক্রমেই, রমণীদের সৌন্দর্যচর্চার উপচার জোগানই এদের জীবিকা।

এরা বলে দেয় কোন কোন লোসান ব্যবহার করলে নারীরা চুম্বনের জন্য অধিকতর মাত্রায় যোগ্য বলে বিবেচিতা হতে পারে। কি ধরণের সাবান দিয়ে গাত্র মার্জনা করলে পুরুষের চোখে নারী-ত্বক অধিক মাত্রায় লোভনীয় বলে প্রতিভাত হবে। কি কি প্রসাধনে নিজেকে চর্চিত করলে রমণীর পক্ষে পুরুষের বক্ষে সতত চাঞ্চল্য

পুরুষের কামনাকে সতত উদ্দীপ্ত রাখা ও অত্যন্ত সুকৌশলে তার ক্ষুধা মেটানো এই বহুপ্রাচীন অথচ চিরনূতন উপায়টাকেই তাই সবলে আঁকড়ে ধরেছে আজকের মেয়েরা।

আগে এই বস্তুটা বিশেষ এক পেশার অন্তর্গত রমণীদেরই একচেটে বলে ধরে নেওয়া হত, অন্তত ভিক্টোরিয়ান যুগেও মানুষে সে কথাই মেনে নেওয়ার ভাণ করেছে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলায় ঘটল বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

প্রেমের দেহগত দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া হতে লাগল ভদ্রসমাজের আলাপ-আলোচনার আসরেও এবং মেয়েরাও তাদের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গী বদলে ফেলল অনেকটাই।

তারা দেখল স্ত্রী হওয়াটাই সব নয়, প্রেমিকা হওয়াটাও সমান প্রয়োজনীয় এবং দেহ-মিলনের ক্ষেত্রে আনন্দটাই শেষ কথা।

'Man's love is of man's life a thing apart,
'T is woman's whole existence.'

—Lord Byron

(Don Juan. Canto I. St. 194.)

[নর-নারীর জীবনে প্রেম! মানবেতিহাসের আদিপর্বে, যখন পৃথিবী প্রথম আলোর পদপাতে উদ্ভাসিত, সেই আদিকাল থেকেই আদিম বৃত্তির উন্মেষণা মনুষ্যজাতির দেহমনে। দেহবাদী প্রেম থেকেই কামনা-বাসনার সূত্রপাত জীবজগতে। 'ইচ্ছা'র প্রকাশই সৃষ্টি, কবির ভাষায়। মিলনের মন্ত্রতন্ত্রে দেহকে বাদ দিয়ে কোন কথা নেই। দেহসর্বস্ব নায়কের, দেহপশারী নায়িকার চিত্র-বিবরণ ভারতের মহাকাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে! পুরুষ ও নারীর পরস্পর আবেদন ও আকর্ষণের নানা তত্ত্বকথা এই রচনাটিতে। অবশ্যই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষিত ও লিখিত।—লেখিকা]

দৈহিক আকর্ষণকে বাড়াবার কথা এই সময় থেকেই মেয়েরা বিশেষভাবে চিন্তা করতে সুরু করে এবং এজন্য তারা রঙ্গিণীরমণী পদ্ধতিও অনুকরণ করতে দ্বিধা-বোধ করে না।

প্রসাধনদ্রব্যের বেপরোয়া ব্যবহার, চুল রং করা এবং আরও নানা জিনিসে আজকের সীমন্তিনীরা দস্তুরমত অভ্যস্তা হয়ে উঠেছেন। আগের দিনে যা একমাত্র পতিতাদেরই স্বভাবধর্ম বলে বিবেচিত হত।

এর ফলে নিরঙ্কুশ সুবিধাটুকুই যে শুধু লাভ হয়েছে তা নয়।

আজকের নারীর প্রতিপক্ষের সংখ্যা বড় কম নয়; আগে শুধু দেহব্যবসায়িনীর সঙ্গেই ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা; কিন্তু আজ সব মেয়েই তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, কারণ তারই মত প্রসাধননৈপুণ্য ছলা-কলা ইত্যাদিকে অবলম্বন করে আজ প্রায় সব মেয়েই আসরে নেমেছে। আর লোভনীয় নারীত্বের এই প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য সব রকম আয়ুধ ব্যবহারেই প্রস্তুত মেয়েরা।

যৌন-আকর্ষণের বিচিত্র নিয়ম এই যে, সৌন্দর্যই এর একমাত্র মাপকাঠি নয়।

সুন্দরী রমণীর পক্ষে যদিও আকর্ষণীয়া হওয়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজতর, কিন্তু তাই বলে সর্বক্ষেত্রে নয়। ইন্দ্রিয়-কামনাকে যা উদ্দীপ্ত করে তোলে যৌন-আকর্ষণ বলতে সেটাই বোঝায়।

পুরুষের পঞ্চেন্দ্রিয়কে যে রমণী সম্যকভাবে তৃপ্ত করে তার মধ্যে এ-আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত।

শুধু চোখকে তৃপ্ত করতে পারলেই হবে না, অতি লাবণ্যময় মুখশ্রীর অধিকারিণীকেও কর্কশ কণ্ঠস্বরের জন্য অরুচিকর লাগতে পারে।

সর্বসমেত যে অপরের চোখে মোহময়ী বলে পরিগণিত হতে পারে, সেই নারীকেই চিরদিন কামনা করে আসছে পুরুষ, তাকেই আমরা ব্যক্তিত্বসম্পন্না, লাবণ্যময়ী, আকর্ষণীয়া ইত্যাদি বিশেষণে নন্দিত করে থাকি।

আসল কথা মেয়েদের সর্বপ্রধান আকর্ষণ মেয়েলিত্ব—নারীস্বভাব যে মেয়ের মধ্যে যত বেশি, পুরুষের চোখে সে তত বেশি আকর্ষণীয়া।

অত্যধিক দেহসৌন্দর্য সময় সময় ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে উদ্দীপ্ত না-করে সচকিত করে তোলে।

অত্যধিক সাজসজ্জার সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য, কৃত্রিম



বর্ণাদির অনুলেপনে ও উগ্র সজ্জায় অনেক সময় স্বাভাবিক নারীত্বটুকু যেন কোথায় হারিয়ে যায় এবং সে ক্ষেত্রে নারী আকর্ষণ না করে বরং প্রতিহতই করে তোলে পুরুষকে।

অতি-আধুনিকারা একথা ভেবে দেখলে উপকৃতাই হবেন। দেহগত নানা স্বাভাবিক বৈপরীত্য ছাড়াও নারীদেহের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি চড়াই-উৎরাই প্রায় সব পুরুষের চোখেই বিশেষ লোভনীয়।

মানসিকতা ও রুচির ক্ষেত্রে কোন নারীর সঙ্গে ঐক্যবোধের প্রেরণা লাভ করলেও দেহ সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে পুরুষালী মেয়েকে কামনা করে না কোন পুরুষই।

সচরাচর মেয়েদের মধ্যে কয়েকটি জিনিস দেখতে চায় পুরুষে, লম্বা-চুল বেশির ভাগ পুরুষই দেখতে পছন্দ করে মেয়েদের মাথায়, যদিও আজকের দিনে মেয়েরা খাটো চুলের ফ্যাসানকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে।

যে মেয়ে ফ্যাসানের এই নতুন ঢেউয়ে মেতে, মাথায় সুদীর্ঘ কেশ-কলাপের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়, সে বোধ হয় উপলব্ধিও করে না যে, সেই সঙ্গে সে নারী সৌন্দর্যের এক প্রধান সম্পদ থেকে স্বেচ্ছাবঞ্চিতা হয়ে রইল চিরতরে।

প্রায়ই শুনবেন, আধুনিকা গৃহিণীর ঘোষণা,—আমার স্বামী অবশ্য বড় চুলই পছন্দ করেন, কিন্তু আমি বাপু মোটেই করি না, ত্থাখো না···তাই সেজন্যই চুল ছোট করে কেটে ফেলেছি, বাব্বা বড় চুলের হ্যাপা পোয়ানো কি সোজা কথা?

বড় চুলের হ্যাপা পোয়ানোর ঝঞ্ঝাটমুক্তা গৃহিণীর আনন্দে কর্তার না পছন্দ বাতিল হয়ে যেতে দেরি হল না বটে, কিন্তু গরবিনী জানতেও পারলেন না যে সেই সঙ্গে কর্তার মনোযোগ থেকেও তিনি কতটা বাতিল হয়ে গেলেন।

পুরুষের চোখে নারীর পনেরো আনা সৌন্দর্যই বোধ হয় নিহিত তার বক্ষঃশোভায়।

শৈশব থেকেই পুরুষের মনে নারী-বক্ষই, নারীত্বের মূল উপাদান বলে গণ্য হয়ে থাকে, আর সব ক্ষেত্রে যতই ভিন্ন রুচি দেখা যাক না কেন, নারী-বক্ষের উন্নত মহিমা সর্বকালে এবং সর্বদেশেই পুরুষের মনকে আকর্ষণ করে থাকে এবং সেজন্যই বক্ষঃশোভাকে কিছুটা প্রদর্শন করার যে পদ্ধতি আধুনিকারা বর্তমানে অবলম্বন করে থাকেন, নীতির দিক দিয়ে তা যতই দূষ্য মনে হোক না কেন, রীতির দিক দিয়ে তা যথেষ্ট সুফলপ্রসূ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মেয়েদের মধ্যে উন্নত বক্ষঃশোভাকে গোপন করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, সেই সঙ্গে গুরু নিতম্বও লজ্জাকর বলেই পরিগণিত হত এবং সেজন্যই সে সময় মেয়েরা এমনভাবে বেশভূষা করতে সুরু করেন, যাতে বক্ষোদেশ চ্যাপ্টা বা সমতল দেখায় এবং নিতম্বও যাতে গুরুত্ব না পায়, বলা বাহুল্য সেদিনের পুরুষের পক্ষে এ-ব্যবস্থা বিশেষ রুচিকর বলে মনে হয় নি। তবে সুখের কথা এই যে, মেয়েদের এ প্রবণতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; অচিরেই তারা উপলব্ধি করে যে এ-ব্যবস্থা পুরুষের চোখে তাদের আকর্ষণকে বাড়িয়ে না-তুলে বরং কমিয়েই দিয়েছে অনেকটা।

পুরুষচিত্ত মথিত করার জন্য কণ্ঠস্বরও নারীর আর এক শক্তিমান আয়ুধ।

শুধু কথা বলার কায়দাতেই পুরুষকে ঘায়েল করার অনেক নজির আছে অনেক মেয়ের কাছে।

মোহভরা নারীকণ্ঠের অস্ফুটপ্রায় কল-কাকলিতে স্বতঃই আলোড়ন জাগে পুরুষের মনে; কিন্তু মনে রাখা উচিত কোন কারণেই কখনই পুরুষের সামনে উচ্চকণ্ঠে আলাপ করা বা হাসাহাসি করাটা নারীজনোচিত বলে গণ্য হয় না।

এবার আসে গন্ধের প্রভাবের কথা—নারী অঙ্গের সুগন্ধি-মাখা গন্ধের একটা নিজস্ব আবেদন আছে পুরুষের কাছে, কিন্তু সে গন্ধ যেন প্রথম উষার আধো-আলো, আধোছায়ার মতই মৃদু আভাসসঞ্চারী, মেয়েদের পক্ষে তাই চড়া গন্ধের কোন প্রসাধন ব্যবহার না-করাই সঙ্গত।

অনেক সময় দেখা যায় দু'টি সমপর্যায়ের সুন্দরী রমণীর ভিতর পুরুষচিত্ত আকর্ষণ করার ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য বর্তমান, তার একমাত্র কারণ মোহিত করার ক্ষমতা, কবি বলেছেন—

রূপলাগি আঁখি ঝুরে,···
গুণে মন ভোর।

এর অর্থ রূপ কাছে টানে, কিন্তু ধরে রাখে গুণ, অর্থাৎ সৌন্দর্যের মোহে আকৃষ্ট হলেও, স্বভাবের মাধুর্য বা কমনীয়তা না থাকলে কোন রমণীই প্রার্থিত পুরুষকে স্থায়িভাবে পেতে পারেন না। দেহের আকর্ষণে যে মিলন ঘটে, তাকে স্থায়ী করতে হলে তাই রমণীকে হতে হবে একাধারে প্রিয়া ও প্রিয় বান্ধবী, জননীর স্নেহে আশ্রয় দিতে হবে আর্ত পুরুষকে, রঙ্গিণীর লাস্যে ভুলিয়ে রাখতে হবে তাকে, সমগ্র দেহ-মন দিয়ে সজ্জিত করে রাখতে হবে কামনার উপচারকে, যে উপচার মনোহারী হয়ে উঠবে প্রেমের স্নিগ্ধ দীপের শিখায়।

যে-নারী এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, পুরুষের চোখে তিনিই চিরন্তনী নারী; যুগ যুগ ধরে পুরুষ এই নারীকেই খুঁজে এসেছে, যুগ যুগ ধরে এই নারীকেই সে খুঁজে বেড়াবে।

—শ্রীমতী

লোকসভার অন্যতম সদস্য

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার-অ্যাট-ল

কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা

সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচার বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভারতরক্ষা আইনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতাকে বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এলাহাবাদ হাই কোর্ট ভারতরক্ষা আইন ও ডি আই রুলমত আটক রাখা অবৈধ ও সংবিধান-বিরোধী বলিয়া যে রায় দিয়াছিলেন সুপ্রীম কোর্ট উহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। ভারতের তদানীন্তন এটর্নী জেনারেল কিন্তু তাঁহার সওয়ালে এই দুই আইনকে অবৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। উহা সত্ত্বেও সংবিধানের ৩৫৯ ধারাবলে রাষ্ট্রপতির আদেশের বৈধতা সম্পর্কে ১৪, ২১ ও ২২ ধারা মতে মৌলিক অধিকার হরণের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না বলিয়া সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়াছেন।

সংবিধান অষ্টাদশ সংশোধন বিল

অতঃপর সংবিধান সংশোধন করিয়া এই বে-আইনী ও সংবিধান-বিরোধী আইন বৈধ ও সংবিধানসম্মত করিবার জন্য সংবিধান অষ্টাদশ সংশোধন বিল উত্থাপিত হয়। সেই সময় লোকসভার বিরোধী সদস্যদের মুখপাত্র হিসাবে উক্ত বিলের বিপক্ষে আমি চলিয়াছিলাম। অবৈধ ও সংবিধান-বিরোধী আইনকে বৈধ করিবার জন্য সংবিধানকে অবনত করা ঠিক নয়। বরং সংবিধানের যে-সমস্ত ধারায় নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার দেওয়া হইয়াছে সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অন্যান্য আইনকে নামাইয়া আনাই গণতন্ত্রী সরকারের কর্তব্য। এ সম্পর্কে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক আবেদনও পেশ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত জওহরলাল নেহরু আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত বিল প্রত্যাহার করা হইয়াছিল।

স্বতন্ত্র রায়

বিচারপতি সুব্বারাও তাঁহার ভিন্নমতের রায়ে মৌলিক অধিকার হরণ করিয়া সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়াছেন, জোরালো যুক্তি দিয়া তিনি বলিয়াছেন, ৩৫৯ ধারায় রাষ্ট্রপতিকে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা স্থগিত রাখিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা মৌলিক অধিকার হরণের জন্য সংসদকে ক্ষমতা অর্পণের কথা বুঝায় না।

অতঃপর মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে সংবিধানের ১৩ ধারার প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা লইয়া ভারতের বিভিন্ন হাই কোর্টের মামলার রায় এমন কি, আমেরিকান রীতির পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের প্রকাশিত রায়ে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়।

ইংলণ্ড ও ভারতের সাংবিধানিক আইনের পার্থক্য

বিধানমণ্ডলীর প্রণীত আইনের বিচার-বিভাগীয় অভিমত একটি ভিন্ন পর্যায়ের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সংবিধানের ইহা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইংলণ্ডের মতো দেশে যেখানে পার্লামেন্টের ক্ষমতাই চূড়ান্ত সেখানে আইন বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। ইংলণ্ডের কোন বিচারালয় পার্লামেন্টের কোন আইন সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে না।

ভারতের সংবিধানে বিচারালয়সমূহকে প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের ১৩ ধারায় বিধিবদ্ধ ক্ষমতায় ১২ ধারায় বর্ণিত অঞ্চলের অর্থাৎ ভারত সরকার সহ সমস্ত প্রকারের স্থানীয় আঞ্চলিক ও রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করিয়া যে-কোন সরকার আইন প্রণয়ন করিলে তাহার বৈধতার প্রশ্ন বিচারযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রশাসনিক কার্যকলাপের বিচার-বিভাগীয় সমালোচনা

আমাদের সংবিধানে প্রশাসনিক কার্যকলাপ সম্পর্কে বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার অধিকার ৩২ ও ১৩৬ ধারায় সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে। হাই কোর্টসমূহও ২২৬ ও ২২৭ ধারাবলে এই সমালোচনার অধিকারী। তবে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। যেমন কোন মামলা দায়ের করা না হইলে কোন বিচারালয় স্বয়ং অগ্রণী হইয়া কোন আইনকে অবৈধ বা সংবিধান বিরোধী বলিয়া রায় দিতে পারিবে না।

সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টার ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কোন পরামর্শ দিতে অস্বীকার করে। কেন না, মার্কিন সংবিধানে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। আমাদের সংবিধানের ১৪৩ ধারায় সুপ্রীম কোর্টকে আইনগত অথবা অন্য যেকোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি চাহিলে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

গতিশীল ব্যাখ্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হইলেও, ভারতের সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় 'সংবিধানের জীবন্তভাষ্য'। মার্কিন সংবিধান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাই পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া ইহার ব্যাখ্যা করা বিচার-বিভাগের পক্ষে সহজ। আমাদের সংবিধান ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ ধাঁচের অত্যন্ত বিস্তারিত, তাই ব্যাখ্যা করার সুবিধা সঙ্কুচিত। মার্কিন সংবিধান অনমনীয়, আমাদের নমনীয় অর্থাৎ সহজ পরিবর্তন-যোগ্য। যে সংবিধান যুগ যুগ ব্যাপী স্থায়ী এবং যাহাতে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিধৃত, ঘন ঘন ও সহজ পরিবর্তনের ফলে উহা যোগ্য মর্যাদা হারাইয়া ফেলে। অবশ্য ইহাতে বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা সঙ্কুচিত নাও হইতে পারে। তবে আমরা এই বিশ্বাস করি যে, আমাদের বিচারপতিরা আমাদের উদার সংবিধানে প্রদত্ত স্বাধিকারের গতিশীল ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক জনকল্যাণ রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করিতে আমাদের রাষ্ট্রকে সাহায্য করিবেন।

ভারতীয় সংবিধান ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মূল্যবান অভিমত ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিচার-বিভাগীয় আইন নয়

উইভার বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার সীমারেখা সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'আইনের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা বিচারালয়ের আছে, কিন্তু বিচার-বিভাগ আইন প্রণয়ন অথবা কার্যকর করিতে পারে না বা অন্য বিভাগের কাজেও হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।'

উদার ব্যাখ্যা

ভারতে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারালয়সমূহ মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না হওয়া পর্যন্ত কি সরাসরি, কি ইঙ্গিতে পরিষদীয় ক্ষমতার উপর যে কোন রকমের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে বারংবার অস্বীকার করিয়াছে।

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা :—১৪—১৮ ধারা পর্যন্ত সমানাধিকার, ১৯—২২ ধারা পর্যন্ত স্বাধীনতার অধিকার, ২৩—২৪ ধারা পর্যন্ত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ২৫—২৮ ধারা পর্যন্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, ২৯—৩০ ধারা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অধিকার, ৩১, ৩১ক, ৩১খ সম্পত্তির অধিকার এবং ৩২— ৩৫ ধারা পর্যন্ত সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার। এবার কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কার সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের ব্যাখ্যার কথা বলিব।

সমানাধিকার

সমানাধিকারের ক্ষেত্রে সংবিধানের ১৪ ধারাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সংবিধান খুলিলেই দেখা যাইবে, উহার ভূমিকায় অত্যন্ত উদ্দীপনার সহিত ভারতীয় জনগণের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সমানাধিকারের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৪ ধারায় সাধারণভাবে সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং ১৭ ধারায় অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ ঘটাইয়া অস্পৃশ্যদের জন্য জাতির জনক মহাত্মাজীর আজীবন প্রয়াসকে সার্থক করিয়া তোলা হইয়াছে। ১৮ ধারায় পরাধীনতার গ্লানি বিদেশী খেতাব নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে, ১৫ ধারায় কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য দূরীকরণ যথা :— ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী প্রভৃতি। আর ১৬ ধারায় রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরীতে সমান সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। [ক্রমশ।

অনুবাদক—অরুণ জানা

টে লি ফো নে রং নম্বর !

গভীর নিশীথে আপনার ঘরের টেলিফোন-যন্ত্রটি হয়ত মুখর হয়ে উঠল হঠাৎ। ঘুমের অতলান্ত আলিঙ্গন থেকে কষ্টে নিজেকে মুক্ত করলেন আপনি, শিথিল বস্ত্র সামলাতে সামলাতে ছুটে গেলেন শব্দমুখর যন্ত্রটির কাছে। কাঁপা হাতে তুলে নিলেন রিসিভার, উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠ হতে একটিমাত্র আওয়াজ বেরুল···'হ্যালো'—

হা-হতোস্মি রং-নম্বর, এত উৎকণ্ঠা, এত দুর্ভোগ সবই মিছামিছি? ক্রোধে রুদ্ধবাক আপনি আবার ফিরে গেলেন সদ্যপরিত্যক্ত শয্যায়।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, হয়ত বেশ কয়দিন এই দুর্ভোগ ভুগতে হল আপনাকে। অবশেষে অভিযোগ করলেন টেলিফোন অফিসে, সেখানকার কর্তৃপক্ষকে অবহিত হতে হল। আপনার টেলিফোন লাইন বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

রং নম্বর দু'ধরণের হয়, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, কারুকে ফোন করার সময় অনেক সময় আমরা রং-নম্বরের পাল্লায় পড়ে যাই, ধরুন প্রিয়াকে সবেমাত্র ফোন করেছেন আপনি, দু'দিক থেকেই মিষ্টি-মধুর বাণীর বিনিময় হচ্ছে, আপনার ও আপনার তাঁর, দু'জনেরই মন খুশ, মেজাজ প্রফুল্ল, এমন সময় হঠাৎ কামান গর্জনের মতই হেঁড়ে গলা ধমকে উঠল রিসিভারের মাধ্যমে—আরে ভাই ঠিকসে বাত করনা, দিল্লগী কাহে কো কিয়া যায়?

আঁতকে উঠলেন আপনি প্রথমটা, পরে ধাতস্থ হয়ে উপলব্ধি করলেন 'রং-নম্বর'। একেই বলে সক্রিয় রং-নম্বর। দ্বিতীয়ত আপনি সরাসরি রং-নম্বরের কবলায়িত হতে পারেন, যখন টেলিফোনের ঝনঝনানি শুনে রিসিভারটি তুলে নিয়েই বুঝতে পারেন কোন গর-ঠিকানিয়া ভুল করে আপনাকে নাড়া দিয়ে ফেলেছেন।

এসব ক্ষেত্রে মধুরভাবে তাঁর ভুল শুধরে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

রং-নম্বরের গোলকধাঁধায় পথ হারালে আপনি বিব্রত বোধ করবেন ঠিকই, কিন্তু এর একটা মজাও আছে, সেটা আপনার রসবোধকে কিছুটা খোরাক যোগাবে। কখনও বা রং-নম্বরের মাধ্যমে জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পেতে পারেন আপনি, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষণ-বসন্তের সঙ্গিনীকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, তবে মন দেওয়া-নেওয়ার অনেক রঙিন স্বপ্নই যে রং-নম্বরের কৃপায় বাস্তবে পরিণত হয়েছে—এমন ঘটনা বিরল নয়।

রং-নম্বর হওয়ার কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে টেলিফোন কোম্পানী বহু সময়ই অনেক বিস্ময়ের সঙ্গে মুখোমুখি হন। একবার এক তরুণীর অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করতে গিয়ে তদন্তকারী অফিসার আবিষ্কার করেন যে, ঐ তরুণীর কোন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক-প্রবর, প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কোন সাধারণ বুথ থেকে তরুণীটির নাম্বার ডায়াল করে রিসিভারের জায়গায় একটুকরো প্যাড রেখে দেয় এমনভাবে যাতে বহুক্ষণ অবধি ওই লাইন এনগেজড অবস্থায় রয়ে যায়।

ছেলেটির উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয়, যাতে বেশ কিছুক্ষণ অপর কেউ মেয়েটিকে ফোন করতে না পারে তাই করা। সুখের বিষয় এই যে, এ ধরণের উৎপাত সব রকম ফোন এক্সচেঞ্জে করা সম্ভব হয় না।

চোর-ডাকাতের অন্তত আধুনিক চোর-ডাকাতের কল্যাণেও মাঝে মাঝে আপনি রং-নম্বরের প্রসাদে ধন্য হতে পারেন। মাঝরাত্তিরে অনেক সময় এভাবে গৃহে গৃহস্বামীর উপস্থিতি যাচিয়ে নেওয়া হয়।

রং-নম্বরের উৎপাত সম্পর্কে ফোন অপারেটরের প্রায়শ কোন ভূমিকা থাকে না, কারণ-অকারণ সময় নষ্ট করাতে তার কোন লাভ নেই, কাজেই সুইচবোর্ডের পাশে যে সব রসবতীরা বিরাজ করেন, তাঁদের এ বাবদে নির্দোষ বলেই ধরতে হয়।

বর্তমানে অটোম্যাটিক টেলিফোনের ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই চালু হয়েছে, ওক্ষেত্রে ভুল ডায়াল করলে বা ডায়ালবোর্ডে কোন গলদ থাকলেও কখনও কখনও 'রং-নম্বর প্রমাদ ঘটে থাকে। অধৈর্য 'কলার'-রাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরজন্য দায়ী; তাঁদের অতিব্যস্ততাই তাঁদের ভুল পথে চালিত করে, অনেকে হয়ত রিসিভারটিকে না তুলেই ডায়াল করতে সুরু করে দেন এবং সাড়া না পেলে অম্লান বদনে অভিযোগও করেন, সেজন্যই ডায়াল করার সময় যথোচিত যত্ন নেওয়া উচিত সর্বাগ্রে।

দস্তানাপরিহিত বা ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাতে ডায়াল করাটা রীতিমত কঠিন, এবং সেজন্যই এসব ক্ষেত্রে বহু সময়ই রং-নম্বরজনিত বিভ্রাট ঘটতে দেখা যায়। অবশ্য সব সময়ই যে বিভ্রাট ঘটে তা বলা যায় না, পর্যাপ্ত অবকাশ হাতে থাকলে ও ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে, অবসর-বিনোদনেরও নানান নমুনা কপালে জোটে রং-নম্বরের মাধ্যমে কখনও সখনও।

একদিন আমার অফিসে টেলিফোন যন্ত্রটি বেজে উঠল তারস্বরে, সেক্রেটারী এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন··· 'হ্যালো'।

অপর প্রান্ত থেকে পৌরুষকঠোর আওয়াজে শোনা গেল···'হ্যালো, শুনছেন? আমার নাম অমুক চক্রবর্তী, শুক্রবার রাত্রে শো-এর জন্য একেবারে পিছনের সারিতে, দু'টি পাশাপাশি সিট বুক করতে চাই।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে শুধোন সেক্রেটারী···'কি নম্বর চান আপনি?'

অবশ্য এখানে আমার সেক্রেটারী লোকটিকে; তিনি যে রং-নম্বরে ফোন করেছেন, সে সম্বন্ধেই শুধু অবহিত করাতে চেয়েছিলেন, কারণ আমাদের এটা নেহাৎই একটা সরকারী অফিস।

কিন্তু উত্তর এল আবার নিভুর্ল নির্দেশের ভঙ্গিতে··· 'নম্বরে আমার কোন প্রয়োজন নেই মহাশয়া, শুধু দেখবেন যেন পাশাপাশি হয়, আর পেছনের সারি হয়।'

ব্যস খেল খতম, এখন বুঝুন কার গোয়াল আর কেই বা দেয় ধোঁয়া?

যেসব রং-নম্বরে সাড়াটুকু পর্যন্ত পাওয়া যায় না, তা অবশ্যই বিশেষ বিরক্তিকর বলে ঠেকতে বাধ্য। এমন অনেক শোনা যায় যে, প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে কেউ এই ধরণের ফোনকলের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে থাকেন। ক্রিং···ক্রিং শব্দে ফোন বেজে ওঠে, কিন্তু রিসিভারটি তুলে নিলেই অপর পক্ষের আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না, যে কোন মানুষের স্নায়ুর পক্ষেই এ ধরণের অত্যাচার অসহনীয়।

অনেক 'কলার' এমন আছেন, যাঁরা দূরপাল্লার কল করার সময় ইচ্ছা ক'রে অপরের ফোন নম্বর দিয়ে থাকেন, হয় তো ভাবেন যে এইভাবে তাঁদের করা কলের বিল অপরের স্কন্ধে চাপানো যায় স্বচ্ছন্দেই। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল, যে যে জায়গায় এ ধরণের কল করা হয়, সেই সব জায়গা থেকেই এই সব প্রবঞ্চক 'কলার'দের প্রকৃত ঠিকানা ফোন অফিস পেয়ে যান।

পাবলিক বা সাধারণ টেলিফোন-বুথ থেকে ফোন করার সময় নির্ধারিত স্থানে পয়সা না ফেলে, কোন রকমে কল করার প্রচেষ্টাও মাঝে মাঝে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রবঞ্চকরা যেন মনে রাখেন, এই ঘৃণ্য উপায়টি কখনই নিরাপদ নয়, কারণ ধরা পড়লে এর জন্য যথেষ্ট শাস্তিবিধান করা হয়।

রাত্রে সুখশয্যার কোল থেকে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাঁরা প্রায়শ রং-নম্বরের মুখোমুখি হন, তাঁরাই প্রধানত এই ধরণের প্রবঞ্চক কলারের শিকার। এ ধরণের 'কলার'রাও অবশ্য সব সময় অব্যাহতি পায় না, কল করার পদ্ধতিতে অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটলেই সতর্ক-পরিদর্শক ফোন-অফিসে বসেই তার হদিস পেয়ে যান ও ফোনের মাধ্যমেই সেই সব ব্যক্তির নাম-ঠিকানা হস্তগত করে ফেলেন দু'পক্ষের কথোপকথন অনুসরণ করে। অতএব রং-নম্বর সম্বন্ধে সাবধান হবেন। —রেবা দেবী

দু'টি কবিতা

অশোক মুখোপাধ্যায়

॥ বিস্মৃত হতে দাও ॥

বিস্মৃত হতে দাও।
যেমন একটি ফুল
কিংবা একটি গান গাওয়া আগুনের শিখা
আমরা ভুলে যাই,
তেমনি চিরদিনের জন্য
একে বিস্মৃত হতে দাও

তারপর বহুদিন চলে গেলে
যদি কেউ শুধোয়,
তাকে বোলো,
তুমি ভুলে গেছ;
ফুল, আগুনের শিখা আর
তুষারের নৈঃশব্দে হারিয়ে যাওয়া
শান্তি পদধ্বনিটির মত।*

॥ আমি অন্ধকারের ॥

ছাখ, সূর্যের সাত রঙ,—সাতটা রঙের
সকলেরই কিছু সৌন্দর্য, কিছু স্বকীয়তা
আছে; যা ফুটে ওঠে রামধনুর বর্ণালীতে
মুগ্ধ পুষ্পকোরকের মত,
কিন্তু এখানে—রৌদ্রের এই শুভ্র অবয়বে
কি সহজেই তারা মিলেমিশে এক হয়ে আছে!
অথচ ছাখ, অন্ধকারের কোন রঙ নেই—
তবু সে কত গাঢ় সংহত এবং অনন্য!
রৌদ্রের আলোকিত সমন্বয়ে
সাতটি পাপড়ির বিস্মরণ,
কিন্তু আতসি কাঁচের সন্ধানী চোখ
যতই চিরে চিরে দেখুক
অন্ধকারের বিভা অনাহতই থাকবে।
ছাখ, আমি অন্ধকারের হাত ধরেই চলব,
আমাকে আলোর নেশায় ভুলিও না।

* সারা টেসডেল অবলম্বনে।



তপতী রায়

বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই জীবন এমন বিস্বাদ হয়ে যাবে কেই বা ভাবতে পেরেছিল ?

জানলার গরাদে মাথা রেখে, হাতের সেলাইটা কোলের ওপর ফেলে, দূর আকাশে শিউলি তার দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়।

বহুক্ষণ কেঁদে কেঁদে খোকা ঘুমিয়েছে।

নিদারুণ ভ্যাপসা গরমে কাল সারারাত প্রায় একটানা কেঁদে গেছে খোকা, আর ততই রেগে গেছে সুকোমল শিউলির ওপর।

ছেলেটাকে থামাতে পার না ?

থামছে না তো কি করব ?

খোকাকে হাওয়া করতে-করতে আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছে শিউলি।

থামছে না তো কি করব—মুখ ভেংচিয়ে বলে উঠেছে সুকোমল।

সারাদিন খেটে খুটে এসে রাত্রেও একটু নিস্তার নেই, জ্বালিয়ে খেলে।......

বালিশটা বগলে চেপে ধরে—ক্লান্ত দেহটাকে কোনমতে টানতে টানতে পাশের বসার ঘরে চলে গেছে সুকোমল। আর ছেলেটাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে কোল নাচিয়ে নাচিয়ে একটানা সুরে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেছে শিউলি।

শুধু কাল নয়, পরশু, তার আগের দিন। গরম পড়ে অবধি রোজই এমন হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন। শুধু গরম পড়েই বা কেন। হয়ত গরম পড়ে বেড়েছে, কিন্তু খোকার জন্মের কিছুদিন পর থেকেই যেন সুরু হয়েছে।

খোকা হয়েছিল শীতকালে। হয়ত যথেষ্ট শীতবস্ত্রের অভাবে, দারুণ শীতে কুকড়ে কুকড়ে কাঁদত খোকা, মায়ের বুকভরা স্নেহ-ভালবাসাও বোধ হয় তার কাঠির মত শরীরকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারত না, আর ততই বিরক্তিতে যেন ফেটে পড়ত সুকোমল।

তবু শিউলি প্রতিবাদ করে নি।

সহ্ই করেছে সুকোমলের বিরক্তি, কটূক্তি—সব, সব। খোকার সারারাত কান্নার জন্য, যেন সে-ই একমাত্র অপরাধী। মেনেই নিয়েছে শিউলি।

সে তো বোঝে, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর লোকটার একটু বিশ্রামের দরকার। একটু স্বাচ্ছন্দ্য চাই, যাতে আবার শরীরটা চাঙ্গা করে সে পরদিন কাজে যেতে পারে। যাদের জন্য সে খাটছে, তার সেই অতি প্রিয়জনদের কাছ থেকে সে এটুকু নিশ্চয়ই আশা করতে পারে। আর শিউলির দিক থেকে তো সেজন্য ত্রুটিও নেই। সংসারের অনেক ভাবনার হাত থেকে সে রেহাই দিয়েছে সুকোমলকে। ঘরের কোন কাজের জন্য সুকোমলকে ভাবতে হয় ?

কিন্তু খোকার কান্না ?

কি করতে পারে সে খোকাকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা ছাড়া ?

খোকারই বা দোষ কি?

কাঠির মত চেহারা নিয়ে সে প্রাণপণে বিরক্তি জানায়, বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে। দারিদ্র্যের চাপে শুকিয়ে যাওয়া তার দেহ। শুধুই রোগা হয়ে যায় নি, খোকা জন্মাবার দু'মাসের ভেতরেই তার বুকের অমৃত নিঃশেষিত হয়েছে, ছেলেটাকে থামানোর নিষ্ফল চেষ্টায় খোকার মুখে তার শুকনো স্তন গুঁজে দিতে চেয়েছে, আর ততই বঞ্চনার আক্রোশে আরও জোরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে খোকা।

খোকা জন্মে অবধি তো এই চলছে। শুকিয়ে গেছে শিউলিরও একদা সতেজ দেহ। বিশ বছর বয়সেই যেন তার যৌবন ফুরিয়ে গেছে। চোখের তলায় পুরু কালি আর হাড়ওঠা বুক তার সমস্ত সৌন্দর্যকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

গরাদে মাথা রেখে উদাস চোখে শিউলি সেই কথাই ভাবছিল।

কি যে সব হ'য়ে গেল। সব কিছু কেমন যেন গোলমাল লাগে শিউলির।

এই তো সেদিন বিয়ে হল তাদের। কত আশা, ভালবাসা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা বিয়ে করল। ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন তাদের চোখে। দু'জনের সম্মিলিত ভালবাসায় সারা জগতকে যেন তুচ্ছ মনে হয়েছিল তাদের কাছে। বাস্তব জীবনের গ্লানিকে তারা উপেক্ষা করতে চেয়েছিল।

অথচ আজ? তার আর সুকোমলের যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, তা যে সুখী দাম্পত্য-জীবনের পরিচায়ক নয়, তাতে সন্দেহ কি? আর যাই হোক, সে-সম্পর্ক গভীর ভালবাসার নয়। আর তার জন্য দায়ী কি শুধু খোকা? খোকার কান্না?

খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে শিউলি।

খুব বড়লোক না-হ'লেও বেশ অবস্থাপন্নই ছিল শিউলিরা।

ছোটবেলা থেকে এমনি আবহাওয়া, এমনি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে শিউলি, যেখানে অভাব বা দারিদ্র্যের কথা শোনাও পাগলামো।

শুধু খাওয়া-দাওয়া বা সাজ-সজ্জায় নয়, সব দিক থেকে আভিজাত্যের আবরণে মুড়ে রাখতে চাইতেন তার মা। স্কুল-কলেজে হেঁটে বা ট্রামে-বাসে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না ওরা। বাবা অবশ্য অত মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু মার মত অন্য। মা বলতেন, ওতে মান থাকে না, —তাই মান বজায় রাখতে হলে যা যা করতে হয় সব রকমেই অভ্যস্ত ছিল সে।

মায়ের মুখের ঐ কথাই ছিল।—আজ না হয় তোমাদের অবস্থা তেমন নেই, তবু কত বড় ঘরের মেয়ে তোমরা তা ভুল না। নিজেদের মান বজায় রেখে তবে কাজ!

অন্য ভাইবোনেরা মান বজায় রেখেই কাজ করেছে। মাকে সুখী করেছে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু শিউলি পারে নি।

মার মতে শিউলি বংশের মুখ পুড়িয়েছে, বাড়ির মান রাখতে পারে নি। তা না হলে সে কেন তার অত দরিদ্র বন্ধু জয়ার দাদাকে ভালবেসে তাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে যাবে?

ঘেন্নায় মরে গেছেন মা, রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র হালদারের স্ত্রী, মিসেস মনীষা হালদার, কিন্তু শিউলি লজ্জা পায় নি।

ও দারিদ্র্যকে চিনত না। জয়ারা নিম্ন-মধ্যবিত্ত নয়, বেশ দরিদ্র। জয়াদের সংসার দেখে শিউলি অবাক হয়ে গেছে—কিন্তু ঘেন্না করতে পারে নি মা বা দিদির মত। অথচ দারিদ্র্যের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় তো জয়াদেরই বাড়িতে।

অত বড় কাপড় তুই কি ক'রে কেচে নিংড়োবি রে জয়া? ভারী লাগে না?

কতবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে শিউলি জয়াকে কাপড় কেচে, অবলীলায় রাশকরা স্তূপ থেকে মেলে দিতে।

জয়া হেসে ফেলেছে শিউলির কথায়, তারপর কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে হেসে জবাব দিয়েছে—ভারী জিনিস ভারী লাগবে না? তাই বলে না বললে তো চলবে না, পারতে তো হবেই রে। না হ'লে কে কেচে দেবে রোজ?

কেন একটা ঝি রাখলেই পারিস?

ঝি বুঝি এমনি এমনি কাজ করে দেবে? তাকে মাইনে দিতে হবে না?

হবেই তো?

তবে?

বলে এমন একটা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছে জয়া, যার পর শিউলি আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারে নি। কি জানি, এদের সব এমন অদ্ভুত। এমন অন্য জগতে বাস করে এরা।

অথচ সেই অন্য জগতের জয়ার মেজদাকেই ভালবাসল শিউলি।

জয়ার মেজদা সুকোমল, গম্ভীর চুপচাপ মানুষ। নিজের ঘরেই থাকে, অফিস যায় আর বাদবাকি সময় নিজের জীর্ণ তক্তপোষটার ওপর বসে মোটা মোটা বই পড়ে আর লেখে।

শুধু শিউলি কেন কারুরই লক্ষ্য পড়ে নি সুকোমলকে।

লক্ষ্য পড়বার কথাও নয়, একদিনও লক্ষ্য পড়ে নি। দেরি হয়েছে অনেক।

ততদিন জয়া আর শিউলি দু'জনেই স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করল। জয়া তো আরও ভালভাবে। কিন্তু স্কলারশিপ পেল না বলে জয়ার আর পড়া হ'ল না।

কম আঘাত পেয়েছে শিউলি এতে? কত ইতস্তত করে তবে বলেছে,—আচ্ছা—জয়া। আমি যদি তোর মাইনেটা আমার হাতখরচ থেকে দিয়ে দিই?

কেন?

তোর বন্ধু বলে।

পাগল।

পাগল কেন? বল না জয়া, কেউ জানতেও পারবে না। বাবা তো আমায় পনের টাকা হাত খরচ দেন, তার থেকে তোর জন্য বুঝি দশটা টাকা খরচ করতে পারি না?

পারবি না কেন? তুই ভারি বোকা! আসল কারণ তো অন্য?

কি কারণ?

আরে আমার সময় কোথায়? দেখছিস না, স্কুলে যেতাম বলে দাদারা কতদিন হাত পুড়িয়ে খেয়েছে। তা··· তখন না হয় ছোট ছিলাম, কিন্তু এখন তো সব বুঝতে পারি, দাদারা না বলুক, আমার একটা কর্তব্য তো আছে।

হ্যাঁ, সকলের মুখে এক কথা—কর্তব্য। জয়াদের বাড়িতে শুধু জয়া নয়, সকলেই এমনি যেন কর্তব্যপরায়ণ। মা-বাবা নেই জয়াদের, ভাইরা বুকে করে প্রাণপাত করে, ছোট ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্য করেছে, কর্তব্য ছাড়া এরা যেন কিছু ভাবতেও পারে না।

শিউলিদের বিরাট তিনতলা বাড়ির পাশে জয়াদের দোতলা বাড়ির ভাড়া নেওয়া অংশ এক তলার সংসার, তিন ভাই আর জয়া, স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্নই ওঠে না। দু'টি মাত্র ঘর, আর তার সঙ্গে ঢাকা দেওয়া রোয়াক। কিন্তু সেই ছোট্ট সংসারটুকুই কত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজান-গোছান। সকলের হাতের নিরলস সেবায় সেই ছোট্ট সংসারের সব কিছু ঝকঝকে তকতকে।

কেউ বাদ দেয় না কাজ করতে। সকলের পারস্পরিক সাহায্যে গড়া সাজান সংসারে শিউলিও সাহায্য করতে এগিয়ে না এসে পারত না।

মায়ের বকুনি সত্ত্বেও সে বেশির ভাগ সময় এ-বাড়িতে থাকতে চাইত, কাজ করে জয়াকে সাহায্য করতে চাইত।

কখন এই সংসারটাকে, এদের সকলকে ভালবেসে ফেলল শিউলি, নিজেও বুঝি জানতে পারে নি। তবে বি-এ পরীক্ষার আগেই সে বুঝে গেল জয়ার সেই রাত-দিন বইপড়া, ইউনিয়ন করা মেজদা সুকোমলকে ও প্রবলভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

মা তো রীতিমত চমকে গেলেন, দিদির মুখে একথা শুনে।

বলিস কিরে শিউলি? তোর রুচিতে বাধল না? অমন ঘরে একদণ্ড দাঁড়াবার কথাও যে আমরা ভাবতে পারি না।

তুমি পার না মা, আমি পারি।

দারিদ্র্যকে সম্মান করার গর্বে গর্বিত হয়ে বলে উঠল শিউলি।

তোমার পাখা বের করছি। তোমার দাদা আজ বাড়ি আসুক। তখনই কর্তাকে বলেছি যার তার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মিশতে দিও না, আমি পছন্দ করি না, ওতে নজরও নীচু হয়···তা তোমার বাবা যেমন···

বাবার আর কি দোষ মা!

দিদি ফোড়ন কাটতে ছাড়ে নি। বাবা তাঁর ছেলেমেয়েদের অবিশ্বাস করবেন এই তুমি বলতে চাও? তারা যদি বিশ্বাসের যোগ্য না হয়, তো বাবার দোষ কি?

একফোঁটা পুঁচকে মেয়ে তাদের আবার বিশ্বাস অবিশ্বাস কি? মন না মতিভ্রম। এ সব মেয়েদের কড়া শাসন দরকার।

উনিও তাই বলেন মা। হাকিম-গিন্নী প্রণতি, তার দিন দিন মোটা হ'য়ে যাওয়া ভারী গা, ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিতে দিতে বলেছে—তোমার জামাই তো আজকালকার এই সব প্রেম ট্রেমের নাম শুনলে জলে ওঠে।

আর সত্যিই জলে গেছে শিউলি। দিদির ওপর, মার ওপর, সংসারের সকলের ওপর। এক অদ্ভুত জগতে যেন ওরা বাস করছে। আজো জয়াদের জগৎ তার কাছে অচেনা মনে হত, এখন কেন জানি, তার এই অতি আপনজনদেরই অন্য জগতের বলে মনে হয়। সে জগৎ বাস্তবের নয়, সেখানে খালি আরাম, খালি সুখ, খালি স্বার্থ। এদের কাছে সমস্ত জগতের প্রাণকেন্দ্র যেন কেবল নিছক আরাম, আর সুখ, আর অর্থে। আর শুধু তাই নয়, কেবল উপভোগেই তৃপ্তি নেই, তার প্রকাশ্যে আনন্দ।

যতটুকু না অর্থ, তার সহস্রগুণ প্রকাশ। শিউলির সব কেমন নিরর্থক লাগে। এখানে সব মেকি, সব নকল। এমন কি দিদির, মার জন্য বহু দেখে শুনে আনা শাড়ি প্রেজেন্ট করা পর্যন্ত। সব যেন মেকি, তাতে যেন হৃদয়ের স্পর্শ নেই। অথচ জয়ারা?

* * *

বাবা সব শুনলেন।

ধীরভাবে শুনলেন, মার মত অত হৈ-চৈ করলেন না। শুধু মাকে নয়, দিদিকেও থামালেন, দাদাকেও, তারপর একান্তে ডেকে নিলেন শিউলিকে।

বাবার কাছে শিউলি যেন সহজ হতে পারল অনেকটা।

মা শিউলি!

সস্নেহে কাছে ডাকলেন বাবা।

কি বাবা!

আমি সব শুনেছি, যদিও এর থেকে কোন কিছুতেই আমি বেশি অবাক হতাম না, তবু তোমার কাছ থেকে আমি নিজের কানে শুনতে চাই।

বলুন!

তুমি কি বেশ করে ভেবে দেখেছ এ বিষয়ে?

হ্যাঁ, বাবা!

তারপর বাবার সঙ্গে তার আলোচনা চলেছে অনেকক্ষণ। কত রাত হয়ে গেছে, বেয়ারা খেতে যাবার জন্য ডাকতে এসে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতবার ফিরে গেছে, অবশেষে মায়ের গম্ভীর উপস্থিতিতে আলোচনায় ছেদ টেনেছে তারা।

অনেক রাত হয়ে গেছে, কখন খেতে যাবে, সকলে বসে আছে যে তোমাদের জন্য······

মা মোটা গলায় বলেছেন।

আমরা যাচ্ছি তুমি যাও। খেতে আরম্ভ করে দাও···

মাকে পাঠিয়ে, আবার বাবা শিউলিকে বারবার জিজ্ঞেস করেছেন কত কথা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তবে সমস্ত আলোচনার ভেতর দিয়েই এ বিশ্বাস শিউলির আরও দৃঢ় হয়েছে যে, তার এ-কাজে বাবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও কোথায় যেন একটা সমর্থন আছে। তা না হলে তিনি ঐ কথাটাই ওকে জিজ্ঞেস করবেন কেন?

শিউলি, মা!

কি বাবা!

সব তো শুনলাম, কিন্তু আমি তো ভাবতেও পারি না, তুমি এভাবে সুকোমলকে নিজের জীবনে জড়িয়ে এত দুঃখের ভেতর ইচ্ছে করে নিজেকে ঠেলে দেবে। আমি আমার আদুরে মেয়েকে চিনি তো!

জানি বাবা, তুমি আমায় ভালবাস বলেই ভয় পাচ্ছ। কিন্তু আমি দারিদ্র্যকে ভয় পাই না।

তুমি না পাও, কারণ তুমি অনভিজ্ঞ কিন্তু আমরা পাই, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এতে শুধু মানুষের কোমল প্রবৃত্তিগুলোই নষ্ট হয়ে যায় না, জীবনের সব শান্তিই চলে যায়।

আমি তা মানি না বাবা।

বড় ভুল করছ মা, এখনও ভেবে দ্যাখ।

ভেবে দেখছি বাবা, আমি স্থির করেছি সুকোমলকেই বিয়ে করব।

কেন! তোমাকে আর কি ব'লে বোঝাব। শুধু··

কিন্তু মা অত সহজে ছাড়েন নি। তাই বাবার নির্বুদ্ধিতায় ধিক্কার দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি। কড়া পাহারায় রেখেছেন তিনি শিউলিকে, যার ফলে অনেক কষ্টে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল তারা।

মায়ের ইচ্ছা আর ঘোষণামত শিউলির নাম পর্যন্ত অস্বীকৃত হল সে বাড়িতে। সে কথা শিউলিরও কানে গেল। মা নাকি বলেছেন, সে এ বাড়িতে মৃত।

দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কেটে ফেলেছে শিউলি। কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে সুকোমলের বুক, আর ততই সুকোমল ওকে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে আদরে, সোহাগে। সুখ, সুখ, সুখ।

সমস্ত জগৎ ভুলেছে শিউলি সুকোমলকে পেয়ে, সারা জগৎ মাধুর্যে ভরে গেছে, বারবার আবৃত্তি করেছে।

মধুময় পৃথিবীর ধূলি।···

গত তিন বছরেও খোঁজ নেয় নি তার বাপের বাড়ি থেকে, সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে। এর মধ্যে সুকোমল অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে চলে এসেছে। জয়া আর ভাইরা সে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস নিয়েছে, মায়ের অত্যাচারে তাদের নাকি সেখানে থাকা সম্ভব হয় নি।

চলে এসেছে এই মফস্বলে শিউলিরা, তার ছোট্ট সংসার পেতেছে সুকোমলকে নিয়ে, দিনের পর দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেও মুখের হাসি অম্লান রাখতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কেমন করে সুকোমলও যেন বদলে গেছে। শিউলি তো কোন অনুযোগ করে নি, অভ্যস্ত আরামের জীবনের কথা ভেবে সে তো খেদ করে না? তবে সুকোমল কেন এমন বদলে গেল? যার জন্য শিউলি তার আবাল্যের সুখ, পরিচয়, সম্পর্ক সব ত্যাগ করল তার এ কি ব্যবহার? সেই চুপ করে থাকা আদর্শবাদী লোকটা কেমন করে এমন হয়ে গেল? শিউলি তাহলে কি নিয়ে বাঁচবে? কেন এমন হল? কি কারণে? দারিদ্র্য?

ভাববার চেষ্টা করে শিউলি। জানলা দিয়ে নিজের উদাস দৃষ্টি মেলে একথাটাই বারবার মনের মধ্যে তোলপাড় করে শিউলি।

দারিদ্র্য?

হাতের সেলাইটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ফোঁড় দেয় শিউলি।

বাবা কি এই ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? তাই। সত্যিই তাই। দারিদ্র্যে জীবনের শান্তি নষ্ট হয়, সব সুকুমার প্রবৃত্তি, সব কোমলতা চলে যায়। ঠিকই বলেছিলেন বাবা।

অথচ এ জীবন সে সেধে নিয়েছে। এর থেকে তার অব্যাহতি নেই। ক্রমে ক্রমে সুকোমলের সম্বন্ধেও যেন তার সব আশার শেষ হয়েছে। মোহ ভঙ্গ হয়েছে বুঝি। না হলে

যে সুকোমলের এক মুহূর্তের অদর্শনও তার সহ্য হ'ত না, তার দর্শনমাত্র সে ভয় পায় কেন? কেন এড়াতে চায় তাকে? সুকোমলের ব্যবহারই তার প্রতি বিরক্তি এনে দিয়েছে। সুকোমলও কি কম বিরক্ত? হয়ত আর ভালই বাসে না শিউলিকে।

সুকোমল ভাল ব্যবহার শিখবে কোথা থেকে? ও যে আজন্ম দরিদ্র। ওর মাধুর্য যে জন্ম থেকেই নিষ্পেষিত হয়ে গেছে, অভাবের তাড়নায়। তাই বুঝি তার পক্ষে এ ব্যবহার যেমন স্বাভাবিক, শিউলির পক্ষেও সে রূঢ় ব্যবহারকে উপেক্ষা করে মুখ বুজে থাকাটাও তেমনি সহজ। ছোটবেলা থেকে সুখে, সংযত আরামে প্রতিপালিত বলেই না শিউলি এত ভদ্র থাকতে পেরেছে।

কিন্তু খোকা?

কি হবে খোকাকে নিয়ে? খোকাকেও তো এমনি দারিদ্র্যের ভেতর মানুষ হ'তে হবে। তাহ'লে? খোকাও অমনি হবে? অমনি রূঢ় কর্কশ? ভদ্র, সংযত, শান্ত হ'তে ভুলে যাবে?

একবার ঘুমন্ত খোকার মুখের ওপর সস্নেহে দৃষ্টি মেলে দিল সে। ক্রমশ যেন তার দেহ পুরন্ত হয়ে উঠছে। লাল ফোলা ফোলা গাল, লাল ঠোঁট দু'টি ঘুমের মধ্যেও যেন নড়ে উঠছে। খোকাকে আদর করবার একটা সুতীব্র ইচ্ছাকে দমন করে আবার সেলাই করতে লাগল শিউলি।

মফস্বল বলে কোলকাতার মত একখানা ঘরেই পচে মরতে হয় না এই যা রক্ষা। না হলে কুড়ি টাকা ভাড়ায় দু'খানা ঘরের কথা ভাবাও যেত না। কোলকাতায় এ ভাড়ায় একখানা পাকা ঘরও হত কি সন্দেহ।

রান্নাঘরের পাশে যে ফালি জমিটুকু পড়েছিল তাতেই কতগুলো শাক আর আনাজের গাছ পুঁতেছে শিউলি।

সেদিন বিকেলে খোকাকে কোলে করে একটা ছোট লাঠি দিয়ে লাউ শাকের ডগাটা রান্নাঘরের চালার ওপর তুলে দিচ্ছিল।

বাইরে একটা গণ্ডগোল শুনে হাতের লাঠিটা ফেলে একেবারে বাইরে রোয়াকে এসে দাঁড়াল শিউলি।

তাদেরই বাড়ির সামনে ভিড়। পাঁচ-ছ'জন লোক নেমেছে একটা ট্যাক্সী থেকে। গাড়ির ভেতর থেকে তারা ধরাধরি করে বার করবার চেষ্টা করছে একজনকে।

বুকটা ধড়াস করে উঠল শিউলির।

না—

সুকোমলের অচৈতন্য দেহকে শিশুর মত যত্নে নামাচ্ছে অফিসের লোকেরা। চীৎকার করতে গিয়েও হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরল শিউলি।

কি হ'ল? আর্তস্বরে প্রশ্ন করল শিউলি।

সুকোমলবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কখন থেকে? কেমন করে? কেন?—কত প্রশ্ন ভিড় ক'রে এল ওর মনে। কিন্তু শুধু ঘরের ভেতর ওদের ডেকে শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল কখন?

এই দুপুরের পর। সঙ্গে ডাক্তার এনেছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

তক্তপোষের ওপর টানটান করে পাতা বিছানাটা আর একবার ঝেড়ে দিল শিউলি। বড় ইচ্ছে করছে সুকোমলের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে, কিন্তু এত লোক। খোকাকে কোলে নিয়ে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল শিউলি।

এদের কাউকে চেনে না সে। চিনতে চায় না। এতদিনেও এদের সঙ্গে কোনদিন আলাপ করে নি সে। সুকোমলকে ভালবাসে সে, সহ্য করে তার সঙ্গে আসা দারিদ্র্যকে। কিন্তু এই সব দরিদ্রদের নয়, এরা তার কেউ নয়। প্রথমে বুঝি ভালবাসতে চেয়েছিল এদেরও, কিন্তু রূঢ় বাস্তব তার মনকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। সকলে ব্যস্ত হ'য়ে ব্যবস্থা করছে, এর মধ্যে সঙ্কুচিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল শিউলি। হাত দিয়ে একবার ছুঁয়ে দেখল সুকোমলের কপালটা।

না টেম্প্যারেচার নেই।

ওর ঘোমটায় ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার ওকে সান্ত্বনা দিলেন।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। মধ্যে তো জ্ঞান বেশ ফিরেছিল, এখন দেখছি আবার সেন্স হারিয়েছেন, তবু ভয় নেই।···আমরা তো আছি।

এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল শিউলি। রোগা, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, খেটেখাওয়া ক্লান্ত সব মুখ। এরা তাকে ভরসা দিচ্ছে, কতটুকু জোর সে ভরসার? তবু তাদের উদ্বিগ্ন মুখ দেখে একটু যেন জোর পেল শিউলি। আস্তে আস্তে সে সুকোমলের পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রায় পনের মিনিট বাদে সুকোমল সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেল আর তারও পরে বাঁ হাতটি বাড়িয়ে দিল শিউলির দিকে।

যতই বিরক্ত হোক তবু জ্ঞান পেয়েই সুকোমল শিউলিকে খুঁজেছে। চোখে জল এসে গেল শিউলির।

সুকোমলকে গরম দুধ খাইয়ে আরও একটু সুস্থ করে ওর পাশে এসে বসল শিউলি খোকাকে নিয়ে। ডাক্তার নাড়ী দেখে বললেন—ব্যস খুব ভাল আছেন সুকোমল। আর ভয় নেই। তাহলে বৌদি আমাদের জন্য চা আনুন—খুব ক্লান্ত আমরা।

সব থেকে কালো রোগা লোকটি বললেন মাড়ি বেরকরা হাসি হেসে।

বিব্রত বোধ করল শিউলি।

মাসের শেষ। যা চা আছে তাতে বড় জোর দু-তিন কাপ হ'তে পারে, অথচ এরা তো সংখ্যায় সাত-আট জনের কম নয়। তাহলে?

হঠাৎ তার মনে হল, সেও যদি এখন এমনি সুকোমলের মত পড়ে থাকতে পারত তো বেঁচে যেত। কিন্তু···

সত্যি ভুল হয়ে গেছে, জল চাপিয়ে আসি।

রান্নাঘরে চলে এসে ডালের কড়াটা নামিয়ে জলের কেটলিটা বসিয়ে দিল উনুনে। সত্যি কান্না আসতে লাগল তার। এমন বিপদে মানুষে পড়ে। ভারি রাগ হ'ল সুকোমলের ওপর। তার সঙ্গে জীবন জড়িয়ে, কেবলই কি এমন লজ্জাকর পরিস্থিতির সামনে আসতে হবে তাকে?

মনে পড়ল তাদের বাড়ির চায়ের আসরের কথা। এতক্ষণে দামী চায়ের গন্ধে, খাবার টেবিল সুরভিত হ'য়ে উঠেছে। মায়ের দৈনন্দিন উপদেশ আরম্ভ হয়ে গেছে, বিরক্ত হলেও কেউ কিছু বলবে না, বাবা তো নয়ই। কত ভদ্র ব্যবহার। আর এরা? নিজেদের মুখে, চা চেয়ে বসল। শুধু শিউলিকে অপ্রস্তুতে ফেলবার জন্যই নিশ্চয়ই। গোটা জাতটার ওপর নিদারুণ রাগ হ'তে লাগল শিউলির।

খোকা তার বুড়ো আঙ্গুলটা মুখের ভেতর পুরে মহানন্দে নির্বিকারভাবে চুষছে। সকলের ওপর রাগ হ'ল শিউলির। সবাই নির্বিকার, যত দায় শুধু তার।

অসহ্য এই লোকগুলো। চা না খেয়ে যাবেও না। কি রকম হাসি-তামাসা লাগিয়েছে। যেন সব ভোজে নিমন্ত্রিত হয়েছে। ওদের ওপর রাগে জলতে লাগল শিউলি। নিজেই অবাক হয়ে গেল অতিথিদের এত অসহ্য মনে হচ্ছে দেখে। কিন্তু, কি করবে? বাক্স হাতড়ে দেখেছে, দু-আনা পয়সা পড়ে আছে। আজই সুকোমলকে কিছু টাকা আনতে বলেছিল। সে প্রশ্ন তো ওঠেই না এখন। অথচ জল ফুটে এল। তারপর?

শুধু চা নয়, চিনিও নেই। খোকার দুধ থেকে দুধ দিয়ে না হয় কাজ চালাবে, কিন্তু চা, চিনি? দরিদ্র জাতটার ওপর ঘৃণা এসে গেল শিউলির। এরা জঞ্জাল পৃথিবীতে এদের কোন প্রয়োজন নেই, ভার বাড়ানো ছাড়া, এরা পরাশ্রয়ী—প্যারাসাইট্······

বৌদি কোথায়?

ডাক শুনে চমকে উঠল শিউলি।

দেরি দেখে একেবারে অন্দরমহলে হানা দিয়েছে। আসুক, সে বেরোবে না। সামান্য এককাপ চাও না দিতে পারার লজ্জা থেকে অন্তত নিজেদের বাঁচাবে।

কই বৌদি! গেলেন কোথায়?

আবার ডাক এল।

একেবারে আদর্শশীল হয়ে গেলেন যে? তাহ'লে কি আর চলে?

না চলে না। রাগে গা জলতে লাগল শিউলির। অবাক হয়ে গেল সে, তাহ'লে তারও রাগ আছে, বিরক্তি আছে, শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র? চুপ করে বসে খোকাকে কোলে করে অকারণে দোল দিতে লাগল।

নাঃ বৌদি আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

একেবারে রান্নাঘরে এসে হাজির হল। সেই রোগা মতন ছেলেটা যার আধময়লা কাপড় আর কাঁধছেঁড়া জামা শিউলির চোখ এড়ায় নি।

বৌদি আমি অমল, সুকোমলদার সঙ্গেই কাজ করি—এই জিনিসগুলো নিন, হাত যে ধরে গেল।

কি আবার জিনিস?

এই যে···

আপনারা আমায় অপমান করতে চান না?

মানে?

অতিথির জিনিসে অতিথিসেবা করব এত বড় অভদ্র আমি নই।

কথাগুলো নীচুস্বরে বললেও, প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল শিউলির মুখ থেকে। কিন্তু অমল একটুও রাগ করল না, বরং বেশ খানিকটা অবাক হয়েই বলল মৃদু হেসে, কি কি বলছেন বৌদি! সুকোমলদার স্ত্রীকে অপমান—ভাবতেও পারি না যে। আর অতিথি কে? আমরা তো সব ফিস্ট করব। নিন ব্যবস্থা করুন এ সবের।

ওর হাত থেকে প্যাকেটগুলো নামিয়ে রাখল শিউলি। খাবারের ঠোঙাটা ও নিজেই রাখল একটা কাঁসি টেনে নিয়ে তারপর হাত ঝেড়ে এক মুখ হেসে বলল, যাক এবার নিশ্চিন্ত, এখন বৌদির ডিপার্টমেণ্ট—আমরা ফ্রি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শিউলি অমলের দিকে। কৃতজ্ঞতায় চোখ দু'টো জলে ভরে এসেছে।

ও কি বৌদি! চোখে জল কেন!—আশ্চর্য···আরে সুকোমলদার কোন ভয় নেই। ডাক্তারবাবু নিজে বলেছেন।

অমলের আর যাওয়া হল না। এগিয়ে এল শিউলির দিকে।

দিন, খোকাকে আমার কাছে দিন। চা তৈরি করুন জল তো অনেকক্ষণ ফুটে গেছে।

রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপরই বসে পড়ল সে, জানেন বৌদি। সুকোমলদার জন্য আজ আমাদের—মানে এই কেরাণী জাতটারই মান বেঁচেছে। জানেন তো সুকোমলদার একটা লিফট্ হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ টাকার মত মাইনে বাড়ল। কিন্তু সুকোমলদাকে তো ওরা চেনে না। টাকা বা প্রমোশান দিয়ে ওঁর মুখ বন্ধ করবে? ফলে অর্ডার পাওয়ার পরই সুকোমলদা আর সকলের দাবী আদায় করার জন্য সারাদিন আজ যা করেছে···তার জন্যই তো ···পরে সব ডিটেলস্ বলবো। তবে বৌদি সুকোমলদার শরীরটা কিন্তু বড্ড ভেঙ্গে গেছে। উত্তেজিত হওয়ার জন্য উনি যে এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাবেন, তা আমরা ভাবতেও পারি নি। সত্যি সুকোমলদার জন্য গর্বিত আমরা।······

অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল অমল। যেন কতকালের চেনা-জানা তাদের। আর যন্ত্রচালিতের মত কথাগুলো শুনতে শুনতে চা তৈরি করতে লাগল শিউলি।

বড় কাঁসার থালাটায় খাবার গুছিয়ে আর একটা থালায় কাপ আর গেলাসের সংমিশ্রণে চা ঢেলে সাজিয়ে দিল, তারপর আঁচলে হাত মুছে খোকার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল ওকে দিন—

দিন নয় বৌদি, আপনি-টাপনি নয়, খোকা আমার কাছে থাক। সুকোমলদার কাছে ওকে নিয়ে যাই। জানেন অফিসে তো জ্ঞান ফিরে পেয়েই আপনার আর খোকার নাম।

শিউলির কান্না পেল। সুকোমল তাহলে এখনও তাকে ভালবাসে? দারিদ্র্য তার কোমল প্রবৃত্তি এখনও তাহ'লে একেবারে নষ্ট করে নি?

অমল খোকাকে রেখে এসে নিজেই দু'হাতে থালাগুলো বাইরের ঘরে রেখে এল, যেন ও এ-সংসারেরই একজন। বাইরের ঘরের হাসি আর গল্পের পর্দা চড়তে লাগল। সামান্য চা আর খাবারকে ঘিরে তারা উৎসবে মেতে উঠল যেন। আর শিউলির মনে হল বাড়ির পচা ও গুমোটলাগা ঘরে যেন দক্ষিণের বাতাস এসে স্পর্শ করল।

কখন সে নিজেও বাইরের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। মানবিকতার কোন দুর্দমনীয় আবেগে ও ওদের মাঝখানেই এসে দাঁড়িয়েছে।

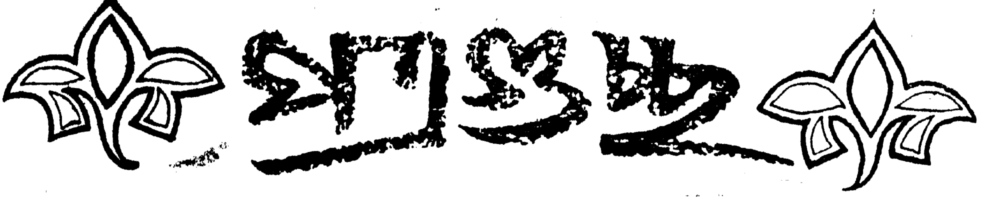
আসুন বৌদি!—

টাকমাথা মোটা লোকটি সাদর আহ্বান জানালেন।

আমরা গরীব মানুষ, তাই খাবার দেখে উল্লাসটা বেশি প্রকাশ করে ফেলি।

বড় বড় চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শিউলি এদের দিকে। নিজেদের আনা জিনিসকে, তারা কত মর্যাদার সঙ্গে, গৃহস্বামীর দান বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। এরা দরিদ্র, তার আবাল্য পরিচিত সমাজ থেকে এরা পৃথক, কিন্তু তার বাবা-মা ভাই-বোনদের কাছে এরা উপেক্ষা বা কৃপার পাত্র। কিন্তু এরাই তো মানুষ, এদের হৃদয়াবেগ তাকে উদ্বেলিত করে দিল। এক চরম অনুভূতির কিনারায় পৌঁছে দিল যেন, তা না হলে সে কি করে বলতে পারল—

সে কি ভাই! আমি তো আপনাদেরই একজন, আমার কাছে কুণ্ঠা?



মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের পত্রাবলী

অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্তকে লেখা

'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' উপন্যাসটির উৎসর্গপত্র

প্রিয় ভ্রাতঃ,

এই সংসার-স্বরূপ ভীষণ কার্যক্ষেত্রে তোমার ভালবাসা, আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালোবাসায় আমি স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাঙ্ক্ষায় যখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে প্রবাসে জীবনের অনন্ত চেষ্টা পরম্পরায় যখন শ্রান্ত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহ্যাড়ম্বরে যখন বিরক্ত হই, তখন ঐ আদর্শরূপ নির্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তিলাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানে না, এ কথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই; ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই; এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে। এ ভীষণ কার্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত অনাদৃত।

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর। জীবনের প্রথম ও প্রিয়তম সুহৃদ। ত্রিংশ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তিলাভ করিয়াছে, অদ্য সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল।

প্রভূত অধ্যয়নের একটি বৎসর অবশেষে অতিক্রান্ত হইল এবং ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় আমরা অবতীর্ণ হইলাম। সত্য বলিতে কি, এই একটি বৎসর যে একাগ্র চিত্তে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, যথেষ্ট অধ্যবসায় সহকারে যেভাবে অধ্যয়ন করিলাম, ইতঃপূর্বে এইভাবে কখনও পড়াশুনা করি নাই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ক্লাসগুলিতে নিয়মিত যোগদান তো করিয়াছিই তদুপরি কোন কোন অধ্যাপকের নিকট ব্যক্তিগতভাবেও পাঠগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট হইতে যে সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা আমরা লাভ করিয়াছি তাহা তুলনারহিত। আসলে তাঁহারা শুধু শিক্ষক হিসাবেই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন নাই, বন্ধুরূপেও তাঁহাদের লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে এবং শিক্ষকের তুলনায় বন্ধুরূপেই আমাদের জীবনে তাঁহারা আরও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া দুইজনের নাম উল্লেখ করা আমি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এই দুইজনের নিকট আমাদের ঋণের সীমা-পরিসীমা নাই। ইঁহারা যে কতভাবে আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন তাহা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ হেনরি মোর্লের ন্যায় দয়ালু, সৎ এবং হৃদয়বান পুরুষ প্রকৃতপক্ষে আমি খুব কমই দেখিয়াছি। আমরা তাঁহার ক্লাসে যোগদান ও তাঁহার নিকট হইতে ব্যক্তিগত পাঠগ্রহণ করা ছাড়াও নিয়মিতভাবে তাঁহার অপূর্ব আতিথেয়তা এবং মূল্যবান বন্ধুসুলভ উপদেশাদি লাভে নানাভাবে ধন্য ও লাভবান হইয়াছি। ডঃ থিওডোর গোল্ডস্টকারের নিকটও আমরা কম ঋণে ঋণী নই। এই প্রগাঢ় বুদ্ধি জার্মান পণ্ডিতের সংস্কৃত ক্লাসে আমরা শিক্ষালাভ করিয়াছি।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পাঠকাল আমাদের অতিবাহিত হইয়াছে কখনও শ্রেণীকক্ষে কখনও গ্রন্থাগারে। সন্ধ্যায় আমরা প্রত্যাবর্তন করিবার পর নৈশভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইতাম। ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়াই পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতাম এবং যতক্ষণ পারিতাম ততক্ষণই পড়াশুনা করিতাম। প্রভাতের স্নানাদিও সমাধা হইবামাত্র খুব দ্রুতগতিতে প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়াই কলেজের উদ্দেশে বাহির হইতাম।

শেষে, প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার মুহূর্তটি দ্বারদেশে উপনীত হইল। সেখানে দেখা গেল তিন শতের অধিক ইংরেজ ছাত্র—সে অবস্থায় আমাদের নিজেদের সাফল্যের সম্ভাবনা যে কতখানি, সে চিন্তাও উদিত হইল। বিশেষ করিয়া ভাবিলাম যে তিন শত জনের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশ জনই হয় তো নির্বাচিত হইবে।

এই পরীক্ষা অত্যন্ত কঠোর, সহজে বা অল্প আয়াসে ইহাতে সফলতা লাভ মোটেই সম্ভবপর নয়। সমগ্র পরীক্ষাপর্ব অনুষ্ঠিত হইল একমাস বা তাহারও অধিক সময়

ব্যাপিয়া। পরীক্ষার অন্তর্গত অনেকগুলি বিষয় আছে তবে কাহাকেও প্রত্যেকটি বিষয়ে বা কোন একটি বিশেষ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয় না। আমি পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছি—ইংরাজী (উহার ইতিহাসসহ), গণিত, মানসিক দর্শন, প্রাকৃতিক দর্শন এবং সংস্কৃত।

প্রতিটি বিষয়েই লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষান্তে ফল যখন ঘোষিত হইল তখন বলিব কি, এক অনাস্বাদিত আনন্দে আমি প্লাবিত হইয়া গেলাম, যখন দেখিলাম যে তিন শত পঁচিশ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ইংরাজীতে দ্বিতীয় স্থানটি আমার আয়ত্তে আসিয়াছে, উহাতে পাঁচশত পূর্ণসংখ্যার মধ্যে আমি চার শত কুড়ি পাইয়াছি।

সংস্কৃতে পরীক্ষক ছিলেন মিঃ কাওয়েল। ইতিপূর্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। আমার অপর দুই হিন্দু সহ-পরীক্ষার্থীদের মধ্যে, ঘোষিত হইল, যে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি। সংস্কৃতে পাঁচশতের মধ্যে চারশত তিরিশ পাইলাম। উচ্চতর গণিতে আমি বিশেষ কৃতি না হওয়ায় উক্ত বিষয়ে অধিক সংখ্যা অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মানসিক দর্শনে আমি মোটামুটি ভাল সংখ্যাই পাইয়াছি। প্রাকৃতিক দর্শনে সামগ্রিকভাবে আমার ফল ভালই হইয়াছে।

ফল ঘোষিত হইতেও একমাস সময় লাগিল। সহজেই অনুমেয় ঐ মধ্যবর্তী সময় কি গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে আমাদের কাটাইতে হইয়াছে। ফল ঘোষিত হইলে দেখা গেল যে আমি শুধু নির্বাচিতই হই নাই, সামগ্রিকভাবে আমি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছি। আমার বন্ধুরাও সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। আমাদের সকল শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় সার্থকতার মুখ দেখিয়াছে। ইহার দ্বারা মনে হয় দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক নবতর জীবনপথের দ্বারোন্মোচন হইল।

আমার ইংল্যাণ্ডে তিনবৎসরব্যাপী করণীয় কার্যসমূহ শেষ করিয়াছি। প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হওয়ার পর আরও চারটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইল। পঠিতব্য বিষয়গুলি হইল—আইন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, ইতিহাস এবং ভারতীয় ভাষা। মিডল টেম্পল-এ বারটি পাঠক্রম সমাপ্ত করার পর আমি 'বার'-এ আহূত হইলাম। ইংলণ্ডের, কতকগুলি অবশ্য দর্শনীয় এবং বিশেষ আকর্ষণকারী স্থান পরিদর্শন করিলাম এবং আমার মনে হয় এখানকার অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, রীতিনীতি প্রভৃতি যাহা এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা আমার জীবনের ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়া শিক্ষাপ্রদ। আমাদের ভারতবর্ষ একটি সুপ্রাচীন দেশ এবং এক বিরাট সাংস্কৃতিক গৌরব ও সভ্যতার অধিকারী। সেই ঐতিহ্যের আমরা ধারক ও বাহক। কিন্তু সে সত্ত্বেও পৃথিবীর নূতন সভ্যতার নিকটও আমাদের অনেক কিছু জানিবার আছে, আছে অনেক কিছুই শিখিবার। ইয়োরোপের বা ইংল্যাণ্ডের সহিত আমাদের যোগ যত ঘনিষ্ঠ হইতেছে ততই তাহাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির সহিতও আমাদের পরিচয় নিবিড়তর হইয়া চলিতেছে, ততই পারস্পরিক ভাবধারার আদান-প্রদান মঙ্গলের মূর্তিতেই পরিণতি লাভ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস, তাহাদের এমন কিছু আছে যাহা গ্রহণ করা বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনও। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা নিশ্চয়ই সেদিন আনন্দের পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিবে যেদিন পৃথিবীর নব নব উদ্ভাবনশীল, প্রগতিবাদী, ক্রমাগ্রসর দেশ-সমূহের সহিত সমপর্যায়ে ভারতবর্ষও উল্লিখিত হইবে। ভারতের সেই শুভদিন যথাশীঘ্র দেখা দিক ইহাই আজ আমার অন্তরের কামনা।

২৪এ মে, ১৮৯৬

আমার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। ১৮৯৩ সালে ইংল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতেই শরীর দুর্বল, স্বাস্থ্য ভগ্ন। ১৮৯৪ সালে আক্রমণ করিল ম্যালেরিয়া। ১৮৯৫ সালে কবলিত হইলাম অজীর্ণ ও অনিদ্রা রোগের। বর্তমানে বাত নিদারুণ যন্ত্রণা দিতেছে। অথচ এই বৎসরের শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে আমায় যাইতেই হইবে, তবে ইহাও ঠিক যে ফিরিয়া আসিয়া কর্মে যোগ আমি নিশ্চিতরূপে দিতেছি না।

জার্মানী

২৪এ আগস্ট, ১৮৯৬

তোমার ১লা আগস্ট তারিখের পত্রখানি আমি পাইয়াছি। আমি জানি যে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির অন্যতম বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ বিষয়ক প্রস্তাবটিতে সমর্থন জানাইয়া আমি কিছুটা ঝুঁকি লইয়াছি। ইহাও জানি যে আমার কমিশনারের পাকা পদ লাভে ইহার ফলে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিবে এমন কি ঐ পদে আমার উন্নতি কতকগুলি অলীক বিবরণের মাধ্যমে নাও হইতে পারে। তথাপি, এই ঝুঁকি বা দায়িত্ব আমি অনেক ভাবিয়াই গ্রহণ করা শ্রেয় মনে করিলাম। পরবর্তী তিন বৎসর আমার বর্তমান পদে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কালেক্টাররূপেই বহাল থাকিব কি কমিশনার পদে উন্নীত হইব—যাহাই ঘটুক তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। বরং অন্যদিকে আমি এক অভূতপূর্ব আনন্দই অনুভব

করিতেছি, শুধু দেশের স্বার্থরক্ষাই যে করিয়া চলিতেছি তাহাই নয়, আমার কিঞ্চিৎ ক্ষমতাও যে সরকারের নিকট আভাসিত হইয়াছে ইহা অনুভব করিয়া আমার মনপ্রাণ এক অভিনব আনন্দধারায় পরিপ্লাবিত হইয়া যাইতেছে। হ্যাঁ আমার সহিত তাঁহারা যথাযোগ্য আচরণই করিয়াছেন সেদিক দিয়া আমার কোন অভিযোগ নাই, তবে ইহাও সত্য যে কোন বিশেষ পোষকতাও তাঁহাদের নিকট হইতে আমি লাভ করি নাই। সচিবালয়ের দ্বারও তো আমার নিকট অবরুদ্ধ। আমি একটি দিনের জন্যও কোন বিশেষ পদে অভিষিক্ত হইবার আহ্বান পাই নাই অথচ আমার তুলনায় অনেক নবাগতও সচিবপদে গৃহীত হইয়াছেন, কেহ বোর্ডের সিনিয়ার সেক্রেটারী, কেহ পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল ইত্যাদি। পদের গুরুত্ব এবং মর্যাদা ও বেতনের অঙ্ক সর্বতোভাবেই উচ্চগ্রামে বাঁধা এবং লোভনীয়। অবশ্য, ইহার জন্য আমি কিঞ্চিন্মাত্রও আহত বা ক্ষোভী নই, এ বাবদ তিলমাত্র আমার অনুযোগও নাই, তবে এত কথা বলিবার কারণ যে সরকার যদি আমাকে উচ্চতরপদে নিয়োগ উচিত বলিয়া মনে নাই করিয়া থাকেন আমার দক্ষতা ও কুশলতায় তাঁহাদের যদি বিন্দুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে আমার অভিরুচি অনুযায়ী কার্য করিতে বাধা কোথায় ও বিশেষত যে কার্যধারা বিবেক ও আদর্শ পরিচালিত পথই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে এবং যে কার্য আমার দেশের কল্যাণের দিকে দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চিন্তিত হইতেছে। আর যাহাই থাকুক বা না থাকুক নিজের দেশের ও দেশবাসীর মঙ্গল ও উন্নয়নচিন্তা ও সেই অনুসারে কাজ করার অধিকারটুকুতো আমার আছে। আর দেখিও, সরকারও ইহা বুঝিবেন যখন দেখিবেন শাসনপদ্ধতির সংস্কারসাধনের জন্য স্যার রিচার্ড গার্থ ও মিঃ রেনল্ডের পেড়াপীড়ির মধ্যে আমিও নিজেকে যুক্ত করিয়া দিয়াছি।

ময়মনসিংহ

২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮

মৎপ্রণীত 'হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া' যদি কিছুমাত্রও সাড়া জাগাইতে পারে, পাঠকমনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাতে যদি সমর্থ হয় তাহা হইলে কেম্ব্রিজেই হউক অক্সফোর্ডেই হউক বা লণ্ডনেই হউক ভারতীয় ইতিহাস বা সংস্কৃতের রীডার পদই আমি ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে নিয়োগের পরিবর্তে চিন্তা করিয়াছিলাম। আমার পেন্সানের অতিরিক্ত কিছু আয়বিশিষ্ট এমন কর্ম আমি চাহিয়াছিলাম যাহা আমাকে আমার দেশসেবার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখিতে পারে। একটি ভারতীয় দল গঠন করিয়া ইংল্যাণ্ডে এবং পার্লামেণ্টে ভারতীয়দের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত করার সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়াই আমার লক্ষ্য। কিন্তু এখন সে সব বিষয়ে চিন্তা করা হয় তো নিষ্ফলই।

জেলা বাখেরগঞ্জ

১৩ই আগস্ট, ১৮৭৭

ইংরাজী ভাষায় আমি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। আমার দেশবাসীদের অর্থাৎ যাঁহাদের জন্য ঐগুলি লেখা—কিছুকালের জন্য আনন্দ দিয়াছে। অর্থাৎ পাঠকের মনে তাহারা ক্ষণকালের। যে আনন্দ তাহাদের দ্বারা অনুভূত হইয়াছে তাহা ক্ষণকালকে ভিত্তি করিয়া তবে বাঙলা ভাষায় আমি যে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছি, আমার দৃঢ় ধারণা তাহাদের প্রভাব আমার মৃত্যুর পরও বহুকাল ধরিয়া জাগরূক থাকিবে। আমার মাতৃভাষাই সর্বতোভাবে আমার আরাধ্যা, আমার উপাস্যা। পৃথিবী ত্যাগের পূর্বে তাহার কিছু সেবা এবং তাহার মাধ্যমে দেশজননীরও কিঞ্চিৎ সেবা আমার সবিশেষ অভিপ্রায়। ইহার মধ্যে যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা যতটুকুই হউক আমার দেহান্তরের পরও আমার দেশবাসীকে তাহা আনন্দ দিতে থাকিবে এই চিন্তা মনে অনেকখানি পরিতৃপ্তির সঞ্চার করে।

ভারত সচিব মর্লেকে লেখা

বোম্বাই

১৪ই নভেম্বর, ১৯০৭

আপনার গত ২০এ অক্টোবর তারিখের পত্রে আপনি আমাকে যে মূল্যবান উপদেশগুলি দিয়াছেন তজ্জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ঐ উপদেশগুলির মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষা করিতে আমি সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিব জানিবেন। সংস্কারের প্রয়াসী মাত্রেই অনেকের বক্রদৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। অনেকেই তাঁহাদের ভুল বুঝিয়া থাকেন। আমার ক্ষেত্রেও স্বভাবতই তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। আমি যাহা বলিয়াছি বা চাহিয়াছি তাহা সাধারণের যত সহজ এবং গ্রহণীয় হইতে পারে—সেইভাবেই চিন্তিত হইয়াছে। জনসাধারণের পক্ষে যাহা সহজে গ্রহণীয় নয় সেইরূপ কোন কিছু আমি কখনই চিন্তা করিতে পারি না। আপনারই ভাষার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে হয় যে আমি 'চাঁদ চাওয়া প্রস্তাব' করি নাই। আমার ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী সমগ্র কর্মজীবনে আমার উপরওয়ালাদের ও সহকর্মীদের সহিত যথেষ্ট ক্লেশ ও অশান্তির মধ্যেই কাজ করিতে হইয়াছে। সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরও এই দশ বৎসরের কর্মজীবনেও সেই একই চূড়ান্ত অসহযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তদুপরি যাহারা সর্বপ্রকার সংস্কারের বিরোধী

তাঁহারা আমাকে 'অধৈর্য ভাববাদী' বলিয়া অভিহিত করিতেছে, আবার যাহারা সর্বপ্রকার সংস্কারের প্রয়াসী তাহাদের ভাষায় আমি আধাআধি মন লইয়া কাজে নামিয়াছি। মধ্যপন্থীদের সত্যই বিপদের অন্ত নাই, তাহাদের চলার পথ কঠিন সমালোচনায় আবৃত। দুই দিকেই তাহার সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্ধু তাহার কেহই নাই। অন্তত আমার নিজের জীবনে আমি সেই সত্যই সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলাম। আমার জীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

অথচ ভারতের সমস্যা যেমন সঙ্কটাপন্ন তেমনই সঙ্কটাপন্নই রহিয়া গেল। সে দিক দিয়া কোনপ্রকার রকমফেরই হইল না। তদুপরি দমনক্ষম প্রতিটি ব্যবস্থা প্রতিটি নীতি চরম পন্থীদের প্রভাব বর্ধিতই করিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত দশ বৎসর পূর্বে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসন। বলিতে গেলে পুণা হইতে নাগপুরের মধ্যবর্তী মারাঠা অঞ্চলসমূহে চরমপন্থীদের সম্প্রদায়ের উদ্ভব করিয়াছে। বঙ্গদেশে যে অত্যন্ত অনুচিত 'বিভাগ' হইয়া গেল এবং জাতিগত শ্রেণীগত যে বিভাগের বৈষম্যমূলক চেষ্টা চলিল বঙ্গদেশে চরমপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধির তাহাই মহান কারণ। সমকালীন ঘটনাই দেখুন ঐ পন্থীদের পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রসার। আপনারা আশা করি নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে অনবহিত নন।

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও আমাদের উপর ক্রমশই অবিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছেন। কিছুতেই যেন আর আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন যে, এই দশ-পনের বৎসরের আন্দোলনে কি সুফল তাঁহারা পাইলেন।

আপনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, আমরা কি চাই তাই স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করা উচিত।

ইতঃপূর্বে মধ্যপন্থীরাও তাহাই করিয়াছেন এবং আমার দৃঢ় ধারণা যে আবার তাহা করিবেন। ভারত সরকারও সম্যকরূপেই অবগত আছেন যে, আমাদের নিজেদের সংক্রান্ত শাসন ও কর্মপরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতাদির একটি বিরাট অংশই আমাদের কাম্য।

২রা ডিসেম্বর, ১৯০৭

ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহ এক্ষণে প্রাদেশিক সংসদগুলির সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ও তদনুযায়ী অগ্রসর হইতেছেন। শ্রেণী ও জাতিগত পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিকল্পনার পটভূমি রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণী হইতে ছয়জন সদস্য মনোনয়ন বা নিয়োগের ক্ষমতা সরকার নিজেই গ্রহণ করিতে পারেন। এইভাবে বে-সরকারী সদস্যের মোট সংখ্যা দাঁড়াইবে কুড়ি।

ইংল্যাণ্ড এই দেশ আজ দেড়শত বৎসর ধরিয়া শাসন করিতেছে। সর্বজাতি ও সর্বশ্রেণীর দিকে সমান দৃষ্টি রাখিয়া এই শাসনকার্য পরিচালিত হইতেছে। জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমগুরুত্ব আরোপই ইংরেজ শাসনের নীতি বলিয়া এতাবৎ বিবেচিত ছিল এবং ইহাই যথার্থ ও অভ্রান্ত নীতি। কিন্তু পরোক্ষ পরিকল্পনা কার্যকর হইলে বিপদের সম্ভাবনা সমধিক ইহার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে এক নিদারুণ বিবাদ-বিসম্বাদ তদুপরি ঈর্ষা ও হিংসা প্রভৃতি সর্বতোভাবে পরিহার্য বৃত্তিগুলির উদ্ভব হইবে তাহার ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর স্বাভাবিকতার পর্যায়ে থাকিবে না। পরিণতিতে সামাজিকগণ্ডী অতিক্রম করিয়া রাজনৈতিক গণ্ডীতেও এই বিষাক্ত আবহাওয়া ছড়াইয়া পড়িবে। জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে পার্থক্য ও বৈষম্য যত নির্দিষ্ট হইবে ও যত লক্ষিত হইবে কি সমাজের দিক দিয়া, কি রাজনীতির দিক দিয়া উভয়তই ক্ষতিকর। ইয়োরোপেও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও রোম্যান ক্যাথলিকের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই। ধর্মীয় পার্থক্য রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনপ্রকার গুরুত্বই লাভ করে নাই, তাহা উপেক্ষিতই হইয়াছে। এই সাধুবাদার্হ নীতি প্রাচ্যদেশেও অবলম্বিত হউক। তাহার ফলে বর্ণবৈষম্য ও শ্রেণীগত পার্থক্যজনিত ঈর্ষা, হিংসা, বিবাদ, বিরোধের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে এবং এখনও যাহারা আলোকের অন্তরালেই অবস্থান করিতেছে সেই অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যে আলোকের রশ্মিপাত ঘটিবে।

শাসনসংক্রান্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে শ্রেণী ও জাতিগত পার্থক্যের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা একমাত্র পূর্বোক্ত কারণেই যে বিপজ্জনক তাহা নয়, অন্যান্য কারণও আছে। এবার সংক্ষেপে তাহাই বলি।

ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়সমূহে জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ বর্জন করিবার শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে, ছাত্রেরা জীবনের বোধনলগ্নে সর্বপ্রকার বৈষম্য পরিহারেরই শিক্ষা পায়। এখন, রাজনীতিক্ষেত্রে যদি জাতিভেদই পটভূমি হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাকে প্রাধান্য দিয়া কর্মসমূহ পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

তাই এই নীতি আমাদের সমাজজীবনে এক মারাত্মক ব্যাধির মূর্তিতেই দেখা দিবে, আমাদের জাতীয় সংহতি ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবে। পরবর্তীকালে ইহার কুপ্রভাব এমন অনতিক্রম্য হইয়া উঠিবে সে বিষয়ে এখন হইতেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ বিধেয় এবং তাহাই শুভবুদ্ধি ও সারগর্ভ চিন্তাধারার স্বাক্ষর সর্বতোভাবে বহন করিবে।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

[পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান]

'আমি কংগ্রেসের সৈনিক মাত্র, কংগ্রেস আমাকে মন্ত্রী করেছিল—আজ তারই আদেশে আমি ফিরে এসেছি আবার আমার পুরাতন কাজে। এতে সম্বর্ধনার কি আছে ভাই?'—শত শত অভিনন্দনের উত্তরে কামরাজ-পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্ত্রিপদত্যাগী, আজীবন সংগ্রামী, নিষ্ঠাবান দেশসেবক শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই মনোভাবই ব্যক্ত করেছিলেন।

উত্তরপাড়ার সুখ্যাত জমিদারবংশের ছেলে স্বর্গত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওকালতি করতে তমলুকে আসেন। সঙ্গে ছিলেন সহধর্মিণী কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ৺বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মেয়ে ইন্দুমতী দেবী। তাঁদের ছয় পুত্রের মধ্যে চতুর্থ সন্তান অজয়কুমার তমলুকে ভূমিষ্ঠ হন ১৯০১ সালের ১৫ই এপ্রিল সোমবার (১৩০৮ সালের ২রা বৈশাখ)।

১৯০৯ সালে অজয়কুমার তমলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে আট বছর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৫২ সালে স্থাপিত এই বিদ্যালয় থেকে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম বসু ইত্যাদি দেশমাতৃকার অনেকগুলি নিবেদিত প্রাণ সন্তান শিক্ষালাভ করেছেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন শরৎচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা। ফলে, তাঁর গৃহে তাঁতশালা, বালাতি, পাপোশ প্রভৃতির কারখানা হল মহকুমার ছেলেদের মধ্যে কর্মীদল গড়ার জন্য। শিশু অজয়কুমার এগুলি দেখে মনে মনে কি স্বপ্ন দেখতেন কে জানে!

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই-এস-সি পাশ করে অজয়কুমার উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পড়তে থাকেন; পরীক্ষার ফীও জমা দিলেন—কিন্তু রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ১৯২১ সালে তিনি মুক্তি সাধনার পথে পা বাড়ালেন।

চৌরিচৌরার ঘটনার পর আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল। অজয়কুমার বাড়ি ফিরলেন—যদিও দাদারা সরকারী চাকুরিয়া তবুও তিনি লেখাপড়ায় মনোনিবেশ না করে গঠনমূলক কাজে মেতে উঠলেন স্বগ্রাম ও মহকুমার মধ্যে। 'দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি'র মাধ্যমে বিদ্যালয় গড়লেন, খালবিল সংস্কার, রাস্তাঘাট তৈয়ারি আর একবেলা ভাতে-ভাত খেয়ে পল্লীর লোকেদের নিয়ে বিরাট সংগঠনের পরিচয় দিলেন তিনি।

১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহে অজয়কুমার নেতৃত্ব করলেন। দেড়বছরের জেল হোল। সরকারী চাকুরীর



উচ্চপদে বসার প্রলোভন দেখান হল—কিন্তু অজয়কুমার 'অজেয়' থেকে গেলেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ছাড়া পেলেন অজয়কুমার কিন্তু পুনরায় আন্দোলনে যোগদানের ফলে ১৯৩৩ সালে বিনা বিচারে আটক রইলেন ছয় মাস—পরে জেল হল তিন বছর পাঁচ মাসের জন্য। ছাড়া পাওয়ার পর আবার সংগঠনে মেতে উঠলেন। এই সময় একরাত্রে রেলপুল পার হবার সময় নীচে জলে পড়ে গেলেন—প্রাণ সংশয় হল—কিন্তু সুচিকিৎসায় সুস্থ হলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। পা ভাঙার জন্য ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারেন নি কিন্তু নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে নিদারুণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অজয়কুমার। তার পরের ইতিহাস বিশেষত মেদিনীপুর জেলা তথা তমলুক, কাঁথি মহকুমাদ্বয়ের কথা আজ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ। ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মদান, তরুণ শহীদ রামেশ্বরের জীবন-উৎসর্গ ও অজয়কুমারের অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভা গোরা ও দেশী সৈন্য তথা বিদেশী শাসকদের স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তখনই দেখা গিয়েছিল সতীশচন্দ্র সামন্ত ও অজয়কুমারের প্রশাসনের ক্ষমতা।

'জাতীয় সরকার' চালনা ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রজ-পত্নী শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর অবদানও কম নয়। দুই বৎসর যাবৎ তিনি প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিলেন এই আন্দোলনের। ১৯৪৩ সালে এক চাপরাশী চরের জন্য অজয়কুমার ধরা পড়ে ছয় বছরের জন্য কারাদণ্ড পান।



● শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে তিনি ছাড়া পেলেন। মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস সংগঠনের ভার নিলেন তিনি।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হতে চান নি, কারণ সংগঠনের কাজেই তিনি লিপ্ত থাকতে চাইলেন। কিন্তু উর্ধ্বতন মহল থেকে নির্দেশ এল। তখন ছোটভাই কম্যুনিস্ট প্রার্থী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে হারিয়ে তিনি রাজ্য বিধান-সভায় আসনলাভ করলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর মন্ত্রিসভায় নদী-মাতৃকা পশ্চিম বাংলার সেচবিভাগের ভার তাঁর হাতে তুলে দিলেন। অজয়কুমার সুখী হলেন গ্রাম-বাংলার কাজ করতে পাওয়ার জন্য।

১৯৬৩ সালের কামরাজ-পরিকল্পনায় তিনি বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে 'লালবাড়ি'র মায়া কাটিয়ে—১১ বছর ৩ মাস ১৭ দিন সেচমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করে থাকার পর। এক প্রখ্যাত সংবাদপত্র লিখলেন 'আবার ট্রাম, আবার মাদুর, আবার সেই অষ্ট-প্রহর স্বদেশী—এতদিন মন্ত্রিত্বের পরেও যে-কোন মানুষ তার জন্যে উতলা হতে পারেন সেদিনের অজয় মুখার্জিকে না দেখলে হয়ত তা বিশ্বাসই হত না।' কিন্তু মন্ত্রী তৈরি করেন যে প্রতিষ্ঠান সেই প্রদেশ কংগ্রেস ১২ই জুন ১৯৬৩ সালে গ্রাম-বাংলার খাঁটি মানুষ অজয়কুমারকে বরণ করে নিল তার সভাপতির আসনে।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান—আর তাঁরই পরিচালনায় 'কংগ্রেস-ভবন' ও 'রাইটার্স বিল্ডিং' মিলেমিশে পশ্চিমবঙ্গকে আবার 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এই মিলিত প্রচেষ্টা যে জয়যুক্ত হবে—অজয়কুমারের মত প্রতিভাধর সংগঠকের সান্নিধ্যে এলেই সে সম্পর্কে আর কোনপ্রকার সংশয় থাকে না।

ডঃ বিমলাচরণ লাহা

[সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম মহারথী]

একদিকে দেশবিশ্রুত অভিজাতবংশের গৌরব অন্যদিকে সাংস্কৃতিক সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ যাঁদের জীবন-আলেখ্যকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে, ডঃ বিমলাচরণ লাহা তাঁদেরই একজন।

উত্তর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা-পরিবারের অন্যতম মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি, 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট'-এর প্রাক্তন সম্পাদক, কলিকাতার ভূতপূর্ব শেরিফ ডঃ বিমলাচরণ লাহার জন্ম ১৮৯১ সালের ২৬শে অক্টোবর। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার অনুজ, স্বর্গত জয়গোবিন্দ লাহার পুত্র অম্বিকাচরণ লাহা তাঁর পিতৃদেব। সুবিখ্যাত পক্ষীতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতপ্রবর ডঃ সত্যচরণ লাহা তাঁর অগ্রজ। স্বনামধন্য ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহাও এই পরিবারের এক বিখ্যাত সন্তান।



● ডঃ বিমলাচরণ লাহা

মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (মেন), প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর শিক্ষালাভ। পালিতে অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি হ'ল তাঁর অধিকারগত। ১৯১৬ সালে এম-এ পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি অধিকার করলেন। ১৯২৪ সালে দর্শনে লাভ করলেন ডক্টরেট। লাভ করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক। লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি লাভ করেছেন যথাক্রমে ডি-লিট (ইতিহাস) ও ডি-লেট। সিংহল থেকে তিনি সম্মানিত হয়েছেন বুদ্ধগমশি রোমনি উপাধিতে।

সমগ্র ছাত্রজীবন তাঁর কৃতিত্বের আলোয় উদ্ভাসিত। প্রসিদ্ধ পরিবারের ঐতিহ্য ও মর্যাদা তিনি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন তাঁর আপন অসাধারণ পাণ্ডিত্যে, মনীষায় ও জীবনব্যাপী সাংস্কৃতিক সাধনায়। আইনের পরীক্ষাতেও তাঁর কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত সদস্য, ক্যালকাটা জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির এমারিটাস প্রেসিডেণ্ট, বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউটের অছি, ইণ্ডো-ইরাণিকা সম্পাদক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানের কার্যকরী সমিতির সদস্য হয়েছেন ও এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানাত্মক সদস্য, (শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানাত্মক সদস্য বাঙালীদের মধ্যে আর একজন মাত্র নির্বাচিত হয়েছেন—তিনি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়), ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অফ সায়েন্স, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানের সহকারী সভাপতি, ক্যালকাটা

ইরাণ সোসাইটির সভাপতি ব্যতীত ও দেশের এবং বিদেশের অসংখ্য সাংস্কৃতিক ও লোককল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আসন তাঁর অধিকারগত। স্বল্পপরিসরে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণতালিকা প্রদান অসম্ভব।

জাতির জ্ঞানপিপাসা বিবর্ধনমানসে এবং সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য সারাজীবনে যে অর্থ তিনি দান করেছেন, তার অঙ্ক যেমনই বিরাট তেমনই বিস্ময়কর।

বিভিন্ন যুগের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভূগোল, দর্শন, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিবরণ, উদ্ধৃত শ্লোক রচনাদি, আইন, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সুধীসমাজে সসম্মানে স্বীকৃত।

বহুসংখ্যক সারগর্ভ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্মরণীয় রচনার তিনি সার্থক রচয়িতা।

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য

[আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও স্বনামধন্য সুধীবর]

সেকালের পরপদানত জাতির তরুণ বিদ্যার্থীদের অন্ধ পরানুকরণের প্রচণ্ড আবেগ অবদমিত করে জাতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারায় শ্রদ্ধাশীল করে তুলবার কঠিন প্রয়াসে বিংশ-শতকের প্রথম পাদে যে মুষ্টিমেয় বাঙালী শিক্ষাগুরু আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং প্রচারজগতের অন্তরালে থেকে নিষ্ঠা সহকারে সেই মহান ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন, অধ্যক্ষ হরিমোহন ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে একটি অবিস্মরণীয় নাম।

এই প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিতের আদি নিবাস ২৪পরগণা জেলার বোড়াল। জন্ম ১৮৯০ সালে। পিতৃদেব স্বর্গত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ছিলেন সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের শুচিস্মিত গৃহ-পরিবেশে তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু। তাই ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগেই সংস্কৃতে 'কাব্যতীর্থ' উপাধি লাভ করে বংশধারা অব্যাহত রাখেন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই-এ পাশ করেন। কিন্তু তখনকার দিনের দর্শনের ছাত্রদের কাছে দুর্নিবার আকর্ষণ স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর হেনরি স্টিফেন, তাই প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে স্কটিশ চার্চে অনার্স নিয়ে দর্শনে বি-এ পড়েন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে দর্শনে এম-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ডাক এলো প্রতিভাসন্ধানী স্যার আশুতোষের কাছ থেকে। অসামান্য প্রতিভাধর মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র হরিমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের লেকচারার নিযুক্ত হলেন। পরের বছর সাউথ সুবার্বন কলেজেরও (অধুনা আশুতোষ কলেজ) অধ্যাপকপদ গ্রহণ করলেন।

দর্শনের সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং লোকোত্তর প্রতিভার খ্যাতি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্সি ও অন্যান্য কলেজের দর্শনের কৃতী বিদ্যার্থীরা তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য শ্রেণীকক্ষে ভিড় জমাতো। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, অন্তরের উপলব্ধ সত্য দিয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর রসোত্তীর্ণ বক্তৃতায় এমন এক অনির্বচনীয় আনন্দলোক রচনা করতেন যে, তরুণ বিদ্যার্থীরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতো।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিশ বছরের অধ্যাপনা সাফল্যের গৌরবে সমুজ্জল, বহু জ্ঞানী-গুণী-মনীষীর সানন্দ-সাহচর্যের স্মৃতিতে অম্লান। স্যার আশুতোষ তাঁকে বয়ঃকনিষ্ঠ দর্শন অধ্যাপক হিসেবে 'ইয়ংগেস্ট পণ্ডিত' বলে ডাকতেন।

অধ্যাপনার পর আশুতোষ কলেজের উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছে। তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন ১৯৫৪ সালে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৫ সালে তাঁকে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সদস্য করা হয় এবং ১৯৩৯ সালের হায়দরাবাদ কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাংলা, ইংরাজী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দর্শন সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর A comparative study of Indian and European systems of thought পাশ্চাত্য-জগতে বিশেষভাবে সমাদৃত। এ ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দর্শন সম্পর্কে তাঁর আরও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষুদিরাম বসু বক্তৃতামালায় 'Science, Religion and Life' সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধারার সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ অত্যন্ত নিবিড়,



● শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য

তাই প্রবন্ধ, কবিতা ও বক্তৃতায় তিনি বরাবর এঁদের উদ্দেশে নৈবেদ্য রচনা করেছেন, ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হয়েছেন।

পঁচাত্তর বছর বয়সেও অধ্যক্ষ ভট্টাচার্যের জ্ঞানচর্চার বিরতি নেই, ভারতীয় দর্শনের গবেষণা, চিন্তন ও মনন তাঁর অবসরজীবনকে ঘিরে আছে।

শ্রীশরদিন্দু গুপ্ত

[কলিকাতার নবনিযুক্ত শেরিফ]

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (বর্তমান স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া) ভূতপূর্ব সেক্রেটারী ও ট্রেজারার অধুনা মার্টিন বার্নের অন্যতম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং কলিকাতার নবনিযুক্ত শেরিফ শ্রীশরদিন্দু গুপ্ত ১৯০১ সালের ২৮শে জুন নদীয়া জেলার মেহেরপুরে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা ৺রায়সাহেব শৌরিবিলাস গুপ্ত ও মাতা স্বর্গীয়া চলচিত্ত-মোহিনী দেবী। বর্ধমান জেলার নিরোল তাঁহাদের স্বগ্রাম।

পিতা সরকারী চাকুরিয়া হওয়ায় শরদিন্দু গুপ্ত প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পাঠগ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালে বাঁকুড়া জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা, বাঁকুড়া ওয়েসলিয়েন



শ্রীশরদিন্দু গুপ্ত

মিশন কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট এবং হুগলী কলেজ হইতে গণিতে অনার্সসহ গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯২৪ সালে কমার্স ফ্যাকালটির দ্বিতীয় বর্ষে তিনি প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরূপে কমার্সে এম-এ পাশ করেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে তিনি ১৯২৫ সালে প্রোবেশনারী অফিসার (Probationary Officer) হইয়া যোগদান করেন। ১৯২৮ সালে লণ্ডন হইতে পরিচালিত ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্স পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম স্থান পাওয়ায় প্রথম ভারতীয় হিসাবে তিনি Gwyther পুরস্কার লাভ করেন। তিনি উক্ত ব্যাঙ্কের উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯৪১ সালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

১৯৪৪-৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজ ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টাররূপে সমগ্র বাংলা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নবরূপায়ণ করেন। ১৯৪৮ সালে নিজ কর্মকেন্দ্রে আসিয়া পরবৎসর ডেপুটী সেক্রেটারী ও ১৯৫৩ হইতে ৫৭ সাল পর্যন্ত উহার সেক্রেটারী ট্রেজারার রূপে নিযুক্ত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ সালের মে মাসে মার্টিন বার্নের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। ইহা ছাড়া তিনি গিলেণ্ডার, আরবুথনট এ্যাণ্ড ইউল, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, একাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রভৃতি শিল্পকলা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

১৯৫ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের সভাপতি নির্বাচিত হন।

যদিও শ্রীগুপ্ত প্রিলিমিনারী ও ইণ্টারমিডিয়েট আইন পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন, কিন্তু ব্যাঙ্কের কর্মে নিযুক্ত হওয়ায় চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে সক্ষম হন নাই।

নিজ গ্রামে তিনি বৎসরে কয়েকবার যাইয়া পারিবারিক দুর্গাপূজাদি কাজ করিয়া থাকেন এবং গ্রামোন্নতি ইত্যাদি কয়েকটি সামাজিক কর্মেও অংশগ্রহণ করেন।

কার্যব্যপদেশে তিনি বারবার সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ফাইনান্স কমিশন ও এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারাণ্টী কমিশনের সম্মুখে তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে হয়। ভারতের কৃষি, জমি, খাদ্যসমস্যার নানাদিক সম্বন্ধে তিনি যে কতখানি চিন্তাশীল এবং ওয়াকিবহাল তা তাঁর সারগর্ভ আলোচনার মধ্যেই ব্যক্ত হয়ে ওঠে।

বাণিজ্যজগতের একটি শীর্ষস্থানের অধিকারী শ্রীগুপ্ত তাঁর বহুমুখীদক্ষতায় ও শক্তিতে দেশের আরও নানাবিধ কল্যাণসাধনে সফলকাম হোন—এই প্রার্থনা আমরা সর্বান্তঃকরণে করি।

ইংরাজের দান

বার্লিন ছাড়বার আগে রাজদূত-ভবনে ভারত সরকার তার করেছিলেন ছবিখানা লোকার্নোতে (Switzerland-এ) পাঠাতে ওখানকার দশদিনব্যাপী চিত্র-প্রদর্শনীতে। বার্লিন থেকে লোকার্নো পাঠাবার খরচা আমাদের আর লণ্ডন থেকে ওখানে আমাদের যাবার খরচা ওদের। কথা ছিল আমি লণ্ডন হাই-কমিশনারের দপ্তর থেকে আমার ভিসার ব্যবস্থা আর পাথেয় সংগ্রহ করে নেব। ওঁরা শুধু দয়া ক'রে লণ্ডনে খবরটা পৌছে দেবেন।

গেলাম ওখানে। অভ্যর্থনা-কুঞ্জে (কুঞ্জ ছাড়া কি বলব? তিনজন মহিলা তিরিশজন রূপগ্রাহী নিয়ে ব'সে থাকেন!) হুকুম হল পাঁচতলার ওপর উঠে খোঁজ নিতে। সেখানে জানা গেল ভুল জায়গায় এসেছি সঠিক লোক আছেন তিনতলার বাঁদিকে। নেমে এসে তাঁকে আর পাওয়া গেল না। আবার নিচে নামলাম। সেখান থেকে আবার পাঁচতলায়। এবার সেখানে পাঁচমিনিট ধরে শুনলাম ভদ্রভাষায় ভারতবাসীর নেটিভপনার ইতিবৃত্ত—আমি নয় আর সবাই। লেকচারের শেষে আমায় গেজেট বের ক'রে বুঝিয়ে দিলেন ওঁদের কাজের যে ভাগাভাগি, সে অনুযায়ী আমার ভাগ্যটার তিনতলায় টিকি বাঁধা। নাব নিচে। এবার ভদ্রলোকের দেখা মিলল কিন্তু মেজাজের হদিস্ মিলল না। তিনও আমায় ভদ্রভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে হাই-কমিশনারের অফিসটা পোস্ট অফিস নয়। কাজেই আমার সমস্যার কোন রকম সুরাহা এখানে সম্ভব নয় এবং বার্লিনের রাজদূত মিছিমিছি আমায় হেনস্তা করেছেন। তবে, নেহাতই যখন এসে পড়েছি তখন দো-তালায় একবার খবর নিয়ে দেখতে পারি। গেলাম দোতালায়। ইনফরমেশন অফিসার চা খাচ্ছেন। চায়ের শেষে একটা ছোট্ট চিট লিখে জানালেন লাঞ্চের পর এলে অবশ্যই দেখা হবে।

এলাম লাঞ্চের পর। দেখা কিন্তু হল না। শুনলাম তিনি লাঞ্চ খেতে গেছেন এবং চা খেয়ে ফিরবেন। নেমে এলাম অভ্যর্থনা-কুঞ্জে। লিখলাম তিন লাইনের ছোট্ট চিঠি। সেইদিন রাত্রে ওঁরাই আমার হোটেলে পৌছে দিলেন খানপাঁচেক চিঠি (যেগুলো আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওঁদের অফিসে), হাই কমিশনারের কমপ্লিমেণ্টসর আর লোকার্নো যাবার পাথেয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিলেন যে আর যদি কিছু প্রয়োজন হয় তাহ'লে ওঁদের সাহায্য নিয়ে যেন বাধিত করি। আরও ওঁরা আশা করছেন যে, লণ্ডনে আমার নিশ্চয় কোন অসুবিধা হচ্ছে না, হলে ওঁদের জানাতে। এত কাণ্ড যে ঘটল তার মূলে ঐ তিন লাইন চিঠি।—

[illegible]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

(আমার চিঠির অনুলিপি)

ইনফরমেশন অফিসার মহোদয়

সবিনয় নিবেদন,

পরশু কৃষ্ণমেনন এখানে আসছেন। আমার ঠিকানাটা তাঁকে জানিয়ে দেবেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কোন বিশেষ রাজনৈতিক কারণে।

ইতি।

আগে ছিল সত্যের জয় সর্বত্র। কংগ্রেস সরকার প্রমাণ করেছেন মিথ্যাই সাফল্যের মহামন্ত্র !!

লণ্ডনে আমাদের ছবি দেখানোর কথা বার্লিনেই ঠিক হয়েছিল একজন বৃটিশ পরিবেশকের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে দেখা করা একান্তই কর্তব্য। গেলাম ওয়ারডাওয়ার স্ট্রীট। দুনিয়ার যত ফিলমের দপ্তর ওখানেই। এটাও লণ্ডনের একটা বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর যে কোন দেশে জিনিসের, মানুষের এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তার গুণে। এখানে এদের পরিচয় গুণে নয় ঠিকানায়। ধরুন কলকাতায়। কাগজের দপ্তর আছে ধর্মতলায়, বাগবাজারে, পেচু মিস্ত্রির গলিতে। ওখানে সবই ফ্লীট্ স্ট্রীটে। কাগজের দপ্তরের ঠিকানা যদি ফ্লীট্ স্ট্রীট না হয়ে বাকিংহাম প্যালাসও হয় তাহ'লে সে কাগজ কাগজই নয়। তেমনি, ডাক্তার যেমনই হোক, ঠিকানা হার্লে স্ট্রীট হলেই সে স্পেশ্যালিস্ট। পুরোন ব'য়ের দোকান সব চেয়ারিং ক্রশে, সিনেমা বেশির ভাগ লেস্টার স্কোয়ারে। আরও একটু ভালো হত যদি মাংসের দোকান সব বেলসাইজ পার্কে হত। পেঁয়াজের দোকান ইস্ট-এতে এবং আলুর দোকান সব সেফার্ডস্ বুসে। কলকাতার মাপকাটিতে, আলুর সব দোকান টালিগঞ্জে, মাংসের দোকান মুর্গিহাটায় আর পেঁয়াজের দোকান সালকিয়ায়।

পরিবেশকের সঙ্গে দেখা করে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে আসতেই আবার সেই ত্রি-মূর্তি। পাজিদা, গুডোদিদি আর বৌরিদাদা। ওরা সবে বাজার শেষ ক'রে বাসের জন্য কিউতে দাঁড়িয়েছে। গুডোদিদির হাতে প্যাকেটের বহর দেখে মনে হল পুরো লণ্ডনটাই কেনা হয়ে গেছে। বেচারি পাজি!

সবাই উঠলাম বাসে। একটাও জায়গা খালি নেই। দাঁড়িয়েই চলেছি। গুডোদিদির হাতের তলায় এক বৃদ্ধ

সাহেব ব'সে। গুডেদিদিকে চোখে দেখে দু' চোখ মেলে দিলেন রাস্তার ভিড়ের ওপর। গুডেদিদি শুদ্ধ বাংলায় বলল—'এটিকেট! এই বুড়ো গাধাটা মহিলাকে সম্মান দিতেও জানে না। দেখছে আমার হাতে প্যাকেট, তবু জায়গা দিল না।' থেমে আবার বলল, 'বুড়ো গাধা!'

দু' স্টপ পরেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, সসম্ভ্রমে গুডেদিদিকে অভিবাদন জানিয়ে সাহেবি কিন্তু স্পষ্ট বাংলা ভাষায় বললেন—'বুড়ো গাধা এবার ছুঁড়ি গাধীকে জায়গা দিচ্ছে নিন!—নমস্কার!' বৃদ্ধ হাসতে হাসতে নেমে গেলেন।

দেখতে দেখতে আর দেখা সারতে সারতে দিন সাতেক কেটে গেল। বৃষ্টি আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কালা আদমির ভিড়ে দম বন্ধ হ'য়ে আসার উপক্রম। এসেছিলাম ছবিটার লণ্ডন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে। কথা পাকা হয়ে গেছে, খালি কালির আঁচড়টানা বাকি। মাঝখানে শনি, রবি, সোমবারেই ওটা সারা হলে বার্নের পথে পা বাড়াতে পারব। তারপর আফ্রিকা ঘুরে বাড়ি। শনিবার পাজির সঙ্গে ঠিক ছিল ফুটবল খেলা দেখতে যাব। সময়মত গিয়ে দেখি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আসামী-বাঙালী সংঘর্ষের সংবাদ এসেছে দেশ থেকে। জীবন সকলের বিপন্ন। যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এস। বেরিদাদা কলম চিবোচ্ছে, গুডেদিদি হাঁটুর ওপর মুখ রেখে কি ভাবছে।

নীরব ঘরে সময়ের সশব্দ পদক্ষেপ। দেখতে দেখতে আকাশে ঘনকালো মেঘ জমা হল; বৃষ্টিও নামল। আমরা তিনজন বাঙালী পুরুষ বসে আছি একটি অসমীয়া মেয়েকে সামনে নিয়ে। ভাবতে চেষ্টা করি, দেশে মেয়েটির কি অবস্থা হত। চোখের ওপর ভেসে ওঠে পার্টিশনের সময় সেই লাহোর থেকে আসা ট্রেনখানা। দাঁড়িয়েছিলাম অমৃতসরের প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার লোকের মাঝখানে। সবাই কত আশা নিয়ে স্টেশনে এসেছে। লাহোর থেকে হিন্দু-ভর্তি ট্রেন আসবে—হয়ত আসবে কারো মা, কারো ভাই, কারো বাবা। আমার হাতে মাইক্রোফোন। রেডিওর জন্যে ইণ্টারভ্যু হবে। জানব ও-দেশের অবস্থা।

ট্রেন এলো, চালিয়ে নিয়ে এল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার। ট্রেন-ভর্তি লোক। সব মৃত। কোথাও প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও নেই। সেদিন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মর্মাহত সহস্র জনতার যে আর্তনাদ শুনেছিলাম—আজ দেশ থেকে সাত হাজার মাইল দূরে বসে তারই প্রতিধ্বনি কানে এসে বাজল, একেবারে নিস্তব্ধ, নির্জন ঘরে।

এসে দাঁড়ালাম তে-তলার জানলায়। নিচে দিয়ে চলেছে ইংরেজ। পুরুষ-মহিলা, ছেলে-বুড়ো। এদেরই অক্ষয়কীর্তি আমাদের আজকের এই নৃশংস পাশবিকতা। এরাই দিয়েছে আমাদের ভেদাভেদের মন্ত্র, বন্দুকের গুলী আর দুর্নীতির বোঝা। ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলি 'ইউ রাস্কেল!' বলতে পারলাম না। ওদের দেওয়া দুর্নীতির ওপরে আছে আমার দেশের কুষ্টি। আমি তারই ক্ষুদ্র, নগণ্য, বার্তাবহ। আমারই বলার কথা সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

পেছন ফিরে দেখি, পাজিটা ছেলেমানুষের মতন কাঁদছে।

রবিবার রাত্রে ওরা গেল দেশে।

সোমবার সকালে আমি গেলাম প্যারিসে। গন্তব্য লোকার্নো।

প্যারিস যাবার পথে লণ্ডন এয়ারপোর্টে আলাপ হল একটি দিশী ছেলের সঙ্গে। চমৎকার সুন্দর চেহারা, ধবধবে রং, টিকোলো নাক, গায়ে বেশ দামী স্যুট। মনটা এমনিতেই খারাপ ছিল পাজিদার কথা ভেবে, ভাবলাম ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করলে সময়টা ভালোই কাটবে।

আলাপ হল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, দেশ পাকিস্তান। দেশ থেকে স্কলারশিপ পায়, ছুটিতে প্যারিস যাচ্ছে।

ভালোই হল। এই একমাস কেবল ছবি আর রাজনীতিক আলোচনায় সময় কেটেছে, কয়েক ঘণ্টা তবু বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাওয়া যাবে। ছাত্র হিসেবে নিতান্ত মামুলি বলেই হয়ত ছাত্র দেখলেই মনে হয় সে একটা ইণ্টেলেকচুয়াল আর এমন যার চেহারা তার তো কথাই নেই।

প্লেনে পাশাপাশি সীট। ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে চলছি। আলাপটা জমাবার চেষ্টায়। অনেক রকম প্রসঙ্গের অবতারণা করেও হুঁ হাঁ ছাড়া আর কিছুই ছেলেটির মুখ দিয়ে বার করাতে পারা গেল না। এমন তার ইণ্টেলেকচুয়াল গাম্ভীর্য যে মাঝে মাঝে আমার ভয়ই লাগে। ভক্তি তো প্রথম দর্শনেই মনের মধ্যে প্লাবনের মতন সঞ্চারিত হয়েছে। কেন জানি না বার বারই আমার মনে হয়েছে ছেলেটি একদিন জগৎজোড়া নাম কিনবে। আজ আলাপ করে রাখলে ভবিষ্যতে বলতে পারবো—'অমুক? খুব চিনি—সেই তো লণ্ডন থেকে প্যারিসে গিয়েছিলাম একই সঙ্গে··· কত গল্প'···

ছেলেটিকে জানবার, চিনবার আমার এত যে আগ্রহ, ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। আড়চোখে দেখি ওর প্রসারিত দৃষ্টি নিচের সমুদ্র ভেদ করে চলে গেছে বহু নিচে, ভাবনার অতল গর্ভে। সভয় প্রশ্ন করি—

'কি দেখছেন?'

'সমুদ্র।'

আবার অখণ্ড নীরবতা। ক্রমেই প্যারিসের কাছে এসে পড়ছি। তাতে সময় অল্প। কথা ওকে দিয়ে বলাতেই হবে। আবার প্রশ্ন করি, 'আপনার সাবজেক্ট কি?'

'ইংরেজি!'

'এম-এ পড়েন বুঝি?'

'না। রিসার্চ করি।'

আর সন্দেহ নেই। ছেলেটি অবশ্যই ইন্টেলেকচ্যুয়াল। আমার ধারণার সঙ্গে সবই হুবহু মিলে যাচ্ছে। প্রশ্ন করি—

'কি বিষয়ে?'

'সেক্সপীয়ার।'

কাছে সরে বসি। ওর সাবজেক্ট আর আমার ইণ্টারেস্ট কাছাকাছি এসেছে। আলাপটা অবশ্যই জমবে। প্রশ্ন করি—'সত্যি। আমারও সেক্সপীয়ার খুব ভালো লাগে। কোন ইংরেজ নাট্যকার'···

এক ধমকে থামিয়ে দেন আমায়—'ইংরেজ মানে?··· উনি ইংরেজ ছিলেন না!'

নেহাৎ প্লেনের দরজা জানলা বন্ধ থাকে, নইলে সত্যি সত্যিই আকাশ থেকে পড়তাম। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি—'কি ছিলেন তাহ'লে?'

'পাকিস্তানী মুছলমান।'

'সত্যি?'

'এইটাই আমার রিসার্চ। ভদ্রলোক (আর ছেলে নয়—রিসার্চের কথা উঠেছে) গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে চলেন—'আমি পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করব—যে উনি ছিলেন পাকিস্তানী মুছলমান।'

'একটু বলুন তো শুনি!'

ভদ্রলোক বলেন—'উনি ছিলেন মুছলমা'ন, নাম শেখ পীর। ইংরেজ দেখল এমন অদ্ভুত নাট্যকার পৃথিবীতে জন্মায় নি···তা'···

বাধা দিয়ে প্রশ্ন করি, 'জানল কি করে যে শেখ্ পীর নাট্যকার?'

'পড়ে। উর্দুতে সবে একটা নাটক লিখেছেন হম্ লার্লায়েত। তারই ইংরেজি অনুবাদ হ্যামলেট।'

'ও!'

কানে ও নাকে হাত দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'শেখ্ পীরকে ইংরেজ নিয়ে এল বিলেতে। বদলে নাম রাখল সেক্সপীয়ার।'

'বুঝলাম। কিন্তু ঐ উইলিয়াম, ওটা?'

'খুব সোজা। ফারসী ভাষায় বিদ্বান্ লোকদের বলে উলেমা। অর্থাৎ জ্ঞানী গুণী সম্মানীয়···বিলেতে ওরা উলেমা বদলে রাখল উইলিয়াম। উলেমা শেখ্ পীর হ'য়ে গেল উইলিয়াম সেক্সপীয়ার!'

অদ্ভুত ইণ্টেলেকচ্যুয়াল সন্দেহ নেই। ভাবটা আরও গূঢ় করবার জন্য বলি, আপনার রিসার্চ তো তাহ'লে হয়েই গেছে প্রায়?'

মাথা নেড়ে ভদ্রলোক বলেন—'প্রায়। ঠিক কোন দেশে জন্মেছিলেন সেটা বুঝতে পারছি না···'

তারপর আর কথা নেই একটাও। ভদ্রলোক কেবলই চোখ বুজে বিড় বিড় করতে থাকেন।

'স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভন···স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভন···'

বিলেত গেলে লোকে সাহেব হয়, ময়লা ঘাঁটলে বনে মেথর। ইণ্টেলেকচ্যুয়ালের পাশে বসে আমারও মগজটা নানান তথ্যে গিজ গিজ ক'রে উঠল। কিন্তু বলতে লজ্জা লাগে। বেফাঁস কিছু বললে যদি আমার মূর্খতা প্রকাশ পেয়ে যায়?

এয়ার টার্মিনাসে ট্যাক্সিতে উঠে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করি—

'আচ্ছা, রাজস্থানের কোন স্টেটের ফোর্টে জন্মান নি তো?'

—'স্টেটের ফোর্ট থেকে স্ট্রাটফোর্ট···'

ভদ্রলোকের চোখে বিদ্যুতের ঝলক দেখলাম। উনি আমার ট্যাক্সির কাছে দৌড়ে আসবার আগেই বললাম—

'চালাও ট্যাক্সি!'··

আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি কেন উনি ছুটে আসছিলেন—সেক্সপীয়ারকে ভারতীয় বলে দাবী করলাম বলে, না ওঁর রিসার্চের একটা মস্ত তথ্য এক মিনিটে আবিষ্কার ক'রে দিলাম বলে?

কে জানে। ইণ্টেলেকচ্যুয়ালদের জাতই আলাদা।

সেই জন্যেই বোধ হয় ফ্রান্স দেশটা আলাদা জাতের। এটা পুরোপুরি ইণ্টেলেকচ্যুয়ালদের দেশ। সবই কেমন যেন বিচিত্র রকমের আলাদা। এই ধরুন ওদের ভাষা। ফরাসী ভাষাটি শুনতে মধুর, বুঝতে অসুবিধা, দেখতে সুন্দর, বলতে প্রাণান্ত। অনুস্বার বিসর্গ না দিলে যেমন সংস্কৃত হয় না, গালাগাল না দিলে যেমন পাঞ্জাবী হয় না, শালা কথাটা না থাকলে যেমন বাংলা হয় না, হাত পা না নাড়লে তেমনি ফরাসী হয় না। সত্যিই অদ্ভুত ভাষা এই ফরাসী। অ আ ক খ শিখুন, বই পড়তে শিখুন কিন্তু তাই বলে যে বলতে শিখলেন তার কোন মানে নেই। বলা তো দূরের কথা শুনলে আপনি যে বুঝতে পারবেন তারও কোন ঠিক নেই। অর্থাৎ পড়া, শোনা এবং বলা তিনটের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই।

এই ভাষার ভিত্তি হল বইতে, পরিপূর্ণ বিকাশ হল বলায় এবং আসল পারদর্শিতা বোঝায়। এর প্রয়োগ শুধু মুখে নয়, হাতে এবং পায়েও। বাড়িতে পণ্ডিত রেখে ভাষাটা যত ইচ্ছে রপ্ত করুন, 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'উচ্চারণ পদ্ধতি,' 'জিহ্বা শুদ্ধি' 'সহজ শব্দকোষ,' 'তিন মাসে ফরাসী শিক্ষা,' যা ইচ্ছে পড়ুন, যত ইচ্ছে পড়ুন এবং যেমন ভাবে ইচ্ছে পড়ুন, ভাষা

আপনার কলমের ডগায় ছুটবে, কথা আপনার কণ্ঠস্থ হবে কিন্তু একটা লোকও আপনার কথা বুঝবে না। কারণ হাত পা নাড়াটা আপনার ঠিক হবে না। ইংরেজি ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রথম এবং প্রধান উপায় হল ঠোঁটের ব্যবহার ভুলে যাওয়া। ঠোঁট যত কম নাড়া যায় এবং কথা যত সুস্পষ্ট হয় ইংরেজি বলা তত শুদ্ধ হয়। ফরাসী ভাষারও অনুরূপ একটা নিয়ম আছে। শুদ্ধ ফরাসী বলতে গেলে হাত পা নাড়া ভাল করে শিখতে হবে।

ফরাসী ভাষার প্রধান উৎস হাতের ওঠা-নামায়, চোখের সাইজের পরিবর্তনে, কানের নড়া চড়ায়, নাকের প্রসারে, গালের পেশিতে এবং বুকের ছাতিতে। এদের সেনটেন্স থেকে সাবজেক্ট সরিয়ে দিন কিছু ক্ষতি নেই, ক্রিয়া বাদ দিন, বোঝাই যাবে না, কিন্তু হাত পা নাড়া বন্ধ করে দিন— ব্যাস্ গোলমাল! যে বলছে তার ভাব হারালো, যে শুনছে তার বোধশক্তি লোপ পেল।

প্রথম বার যখন প্যারিসে যাই, সঙ্গে আমার একটি যুবতী ছিলেন। অস্বীকার করব না, মহিলাটি পরমাসুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং বহুভাবে আকর্ষণীয়া। দোষের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা। প্রত্যেক জিনিসটি নিজে পরখ করে না নিলে শান্তি পেতেন না। ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আগেই ছিল প্যারিসের রোমান্টিক আবহাওয়ায় সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ঠভাবে নিবিড় হল।

ওখানে থাকতে থাকতে এবং ওদের আচার ব্যবহার, আদব কায়দা দেখে শুনে ভদ্রমহিলার মনে হল, যদি ফরাসী ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করা না যায় তো জীবনই বৃথা। উঠে পড়ে লেগে গেলেন ফরাসী ভাষার মূল তথ্যগুলো আয়ত্ত করতে। শিখে টিখে প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রমাদ গণলেন। এ ভাষায় সব করা যায়, প্রেম করা যায় না!

অন্যান্য সব ভাষার চাইতে প্রেমের ভাষা স্বতন্ত্র। ভাষাময় প্রেমে ঠোঁট ছাড়া কিছু নড়লে রসভঙ্গ। এ পোড়া ভাষায় ঠোঁট ছাড়া সবই নড়ে!

মহিলাটিও ছাড়বার পাত্রী নন। রোমান্টিক ব্যবহার না হল তো নাই হল। মর্মান্তিক ব্যবহারে আপত্তি কি? একদিন পরীক্ষামূলকভাবে চাকরের ওপর ভাষাটি ব্যবহারের পরই ভদ্রমহিলা আর্কিমিডিসের মতন 'ইউরেকা' ইউরেকা বলে চিৎকার করতে করতে সোজা আমার পড়ার ঘরে উপস্থিত। কি ব্যাপার? সবিস্তারে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে মহিলাটি বুঝিয়ে দিলেন যে গালাগাল দিতে হয় তো ফরাসী ভাষায়। বাংলায় গালাগালের নানাবিধ অসুবিধা। ছেলেমেয়েরা বোঝে, ভাষার গণ্ডিটা পরিমিত, গালাগালের উপযুক্ত শব্দ খুঁজেই পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় অসুবিধা জিভ ছাড়া শরীরের অন্য কোন অংশ নড়তেই চায় না।

ফরাসী ভাষাটি সেদিকে অতুলনীয়। ছেলেমেয়েরা বোঝে না, রাগ প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ ঝুড়ি ঝুড়ি এবং সবচেয়ে সুবিধে হল জিভ ছাড়া অন্য অঙ্গ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন লাফালাফি করে। ওঁর পাণ্ডিত্যে আমার প্রাণান্ত। চাকর যখন থাকে না তখন এই ভাষার ব্যবহারটি আমার ওপর দিয়েই চলে।

প্রশ্ন উঠতে পারে ইংরেজি এবং ফরাসী দু'টো ভাষাই যখন ল্যাটিনকেন্দ্রিক তখন হাত পা নাড়ার এত তারতম্য কেন? কারণ আছে। ইংরেজি হল ইঙ্গিতের ভাষা, ফরাসী হল অতিরঞ্জনের। যেমন বাংলা আর পাঞ্জাবী। বাংলায় বলি শুনুন; কানে মধু ঢালে। পাঞ্জাবী ভাষায় বলে 'ও ম্যায় কেহ্ণা ইতথে আ···' মাথায় যেন লাঠি মারে!!

ওদেরও তাই। কালবৈশাখীর সময় ইংরেজ বলবে 'হাওয়া বইছে বোধ হয়!' বর্ষার গুমোট রাতে ঝির ঝির করে সামান্য বাতাস বইলে ফরাসী বলবে 'ঝড় বইছে— নিশ্চয়!'

ট্যাক্সির ভাড়ার বেলাও তাই। হোটেলে গিয়ে দেখি মিটারে উঠেছে তিনশো ফ্রাঙ্ক। ড্রাইভার টিপস্ চাইল আরও তিনশো। না দিলে হয়ত ব্যাটকেশ নামাবার আগেই লম্বা দিত!

বিজ্ঞানের মতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থেকে আরম্ভ করে অণু-পরমাণু সবই, কিছু না কিছু কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে। সূর্যটা নেহাৎই নাগালের বাইরে তাই জানি না, তবে অবশ্যই জানি পৃথিবী ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে, চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে, ইদানীং রাশিয়া ও আমেরিকা ঘুরছে চাঁদকে কেন্দ্র ক'রে। আমার প্যারিস ভ্রমণের পরমাশ্চর্য আবিষ্কার, ফ্রান্স ঘুরছে ডলারকে কেন্দ্র করে!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্স জার্মান বোমায় বিধ্বস্ত হবার পর ডলার-ইনজেকশনে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল মার্কিনী আগাছায় দেশ ভরে গেছে। আগাছা বলাটা ঠিক হবে না, সিনথেটিক গাছই বলা উচিত, কারণ একটু নাড়া দিলেই ঝর ঝর করে ডলার ঝরে পড়ে। মার্কিনী গাছের ডলার ফলটা দেখতে ভালো, অতীব রসাল এবং ওর সুমধুর গন্ধে বিশ্ব সচকিত।

আমেরিকানরা তাই যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের এবং বিশেষ ক'রে প্যারিসের জামাই। ওদের চেনাও তখন শক্ত হয়। ফুলকাটা শার্টের ওপর দামী স্যুট, রামধনু রংয়ের মোজা, মুখে চুরুট আর কাঁধে ক্যামেরা। আমার বন্ধু জর্জ বলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমেরিকানদের পোষাক এমনভাবে তৈরি যে, স্ট্র্যাপ দেওয়া কিছু একটা কাঁধে না ঝোলালে ওদের কাপড়জামা খুলে পড়বে। অবশ্য সব সময় যে ক্যামেরা ঝোলে তা নয়, ঐ চামড়ার মোড়কের মধ্যে টেলিস্কোপও হ'তে পারে আবার কিছু নাও হ'তে পারে। প্যারিসের

পথে পথে প্রেমের সন্ধান করা এই মার্কিনী সম্প্রদায়ের পুরোদস্তুর পেশা। ফরাসী ছেলেরা ওদের একদম পছন্দ করে না। পেষণ করে। ওরা ছেলেদের দেখতে পারে না কিন্তু পোষণ করে। ওরা ফরাসী মেয়েদের পেছনে ছোটে, ফরাসী মেয়েরা ডলারের পেছনে ছোটে। এই সব ছোটা-ছুটি, পোষণ-পেষণ মিলিয়ে যে ক্রমবর্ধিষ্ণু বিচিত্র চক্রের সৃষ্টি হয়েছে তার কেন্দ্রস্থলের নাম হচ্ছে ডলার।

এই ডলার নামীয় কেন্দ্রটি প্যারিসের প্রাণস্পন্দন। মার্কিনীরা দু'হাতে ছড়ায়, ওরা প্রাণভরে কুড়োয়। পরিবর্তে মার্কিনীদের একমাত্র চাহিদা প্রেম। ওরা মান চায় না, সম্মান চায় না, ভয় চায় না, ভক্তি চায় না, মায়া চায় না, মমতা চায় না, কৃপা চায় না, করুণা চায় না। চায় শুধু প্রেম। ওদের এই প্রেম-কাঙাল রূপ দেখে মাঝে মাঝে আমার মনে হত, আমেরিকার রাজধানী নিউ ইয়র্ক নয়, নবদ্বীপ।

এই দুই জাতের মধ্যে কিন্তু মারাত্মক পার্থক্য। আমেরিকানরা সময়ের পিঠে চড়ে ঘোড়দৌড় করে, ফরাসীরা সময়ের ল্যাজ ধ'রে খেলা করে।

ফরাসীরা গোলমাল ভালোবাসে, মার্কিনীরা গণ্ডগোল। আমেরিকান পুরুষরা ফরাসী মহিলা ভালোবাসে, ফরাসী ছেলেরা তাদের বিয়ে করে। ফরাসীরা যা কিছু জানে সেগুলো ভুলবার জন্য পাগল, আমেরিকানরা যা জানে না সেগুলো কিনবার জন্য পাগল। কাজেই ফরাসীরা ওদের প্রেমদান করা তো পরের কথা, দেখতেই পারে না। বাধ্য হয়ে আমেরিকানরা ডলার দিয়ে মেয়েদের মন জয় করে আর ছেলেদের মুখ বন্ধ করে।

মার্কিনীরা বড় বড় গাড়ি চড়ে, ভালো ভালো ফ্ল্যাটে থাকে। ফ্ল্যাটের যা ভাড়া তাতে বছরখানেকের মধ্যেই হয়ত পুরো বাড়িটাই কেনা যায়, কিন্তু অনুযোগ করার উপায় নেই। কারণ ওদের পকেটে ডলার, মাঝে মাঝে ওরা অভিযোগ করে, কারণ বড়লোকই হোক আর ডলারই থাকুক, গলাটা মেয়েদের ছবি দেওয়া টাই পরবার অঙ্গ, বার বার কাটবার জিনিস নয়। দুঃখের বিষয়, ফরাসীরা তা বুঝেও বুঝে না।

ঐ জাতটাই ঐ রকম। ওরা বুঝে বোঝে না, জেগে ঘুমোয় আর না ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখে। ওরা বোঝে যে ওদের অতীতের ঐতিহ্য আছে, কিন্তু বোঝে না কেমন করে সেটাকে ব্যবহার করবে। ডলারের প্রতি ওদের সজাগ দৃষ্টি, কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ সম্বলটুকুও তার জন্য ওরা যে হারাতে বসেছে, তার দিকে ওদের ভ্রূক্ষেপও নেই। অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে সে ঘুম ভেঙে যায় যখন মার্শাল এডের মেয়াদ ফুরিয়ে আসে, আর জার্মানীকে রণসজ্জায় সাজানোর রব ওঠে। আবার সব চুপচাপ। তারপর আর ওদের চোখে ঘুম নেই, তখন কেবল স্বপ্ন দেখে কি করে আমেরিকাকে ডলার শুদ্ধ পকেটে পুরে রাখবে।

রেখেওছে। ওদের দুর্বোধ্য সাহিত্য দিয়ে, বিকট শিল্প দিয়ে আর ভাৎসায়নের লোভ দেখিয়ে। ব্রিটিশ বাণিয়া জাত, লোভ ওদের জিনিস রপ্তানিতে আর টাকা আমদানিতে। আমেরিকা বোকা জাত, নেশা—ডলার রপ্তানিতে আর কৃষ্টি আমদানিতে। কৃষ্টির দুর্বলতা হল দুর্বোধ্যের পেছনে ধাওয়া করা। ফরাসী বুদ্ধিমান জাত, সেই সত্যটুকু জেনে নিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সব কিছুই দুর্বোধ্য করে তুলেছে। ছবি আঁকে বোঝবার উপায় নেই, সাহিত্য সৃষ্টি করে, সহজে জানবার উপায় নেই। ফিল্ম বানায় তো 'অরফি'। দন্তস্ফুট করে কার বাবার সাধ্যি। ব্যস, আমেরিকা ভাবে এই সব না হলে কৃষ্টি কোথায়? বোঝে না, বাধ্য হয়ে কিনে বোঝা বাড়ায়। দেশে গিয়ে দশমুখে প্রচার করে যে অতি আধুনিক যা কিছু সব আমাদের কাছে।

আমেরিকান কৃষ্টি অন্বেষী ঘর সাজিয়ে ফিরে এসে দেখে ফরাসীর উর্বর মস্তিষ্ক আরও কিছু 'আধুনিক' কৃষ্টি ইতিমধ্যেই আবার সৃষ্টি করেছে। এবার আর ওরা শুধু নমুনা নিয়েই সন্তুষ্ট নয়, কেনে ঐ 'আধুনিক ডিমপাড়া মুরগী। আমেরিকায় গিয়ে ঐ মুরগী হ'য়ে ওঠে মিলিওনেয়ার। তখন চাই নতুন মুরগী।

এই ভাবে চলেছে আমেরিকান-ফরাসী লেন দেন। পৃথিবীর অন্য সব দেশে মানুষ করে মুরগী জবাই। এখানে মুরগী করে মানুষ জবাই। আর সেই মাংস খায় রাশিয়া। এই কথা বললেন কি গেলেন—সোজা আমেরিকায়। সেখানে চলবে নিয়মিত ডলারোপচার। অল্প দিনের মধ্যেই অন্য মানুষ, একেবারে আলাদা। যেমন হয়েছিল আমার গ্রামের গঙ্গারাম দাঁর ছেলে কালাচাঁদ দাঁর। গাঁজার আড়ৎদার গঙ্গারাম অনেক আশা ক'রে এবং তার চেয়ে অনেক বেশি পয়সা নষ্ট করে ছেলেকে পাঠালো বিলেত। বছরের পর বছর গেল, ছেলে আর ফিরল না। গঙ্গারাম দাঁ কেঁদে কেঁদে অন্ধ। আমি বিলেত যাচ্ছি শুনে গঙ্গারাম এসে হাজির; হাত দু'টো ধ'রে বললে, 'দেখো বাবা একবার চেষ্টা ক'রে—যদি ছেটোর কোন খবর পাও!'...

বহু খোঁজ করেছিলাম পাই নি। প্যারিসে একটা দিশী রেস্তোরাঁয় এক ভদ্রলোককে দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। আমাদের গঙ্গারামের ছেলে কালাচাঁদ দাঁ না? আমতা আমতা করে সভয়ে নাম জিজ্ঞেস করলাম। ঠোঁট বেঁকিয়ে লোকটা বললে, 'নোম? ম'সিয়ো কার্লো সাঁদরাদাঁন', বলে, হেসে পাশের ফরাসী মহিলাটিকে রীতিমত বগলদাবা করে তিনি চলে গেলেন। আমি

যে আমেরিকান গোপন তথ্যটি বেফাঁস বলে ফেলেছি—আমারই কি ভয় কম? কোনদিন শুনব এই সব সত্যি কথাগুলো বলার অপরাধে আমায় 'ম্যারিকা' গিয়ে হ'তে মিলিয়নেয়ার হবে! অনেকটা সেই জন্যই 'নিবারণের' পেছনে আত্মগোপন করে আছি।

হচ্ছিল ফ্রান্সের কথা। বিশেষ করে প্যারিসের। গিয়ে তো উঠলাম, হোটেলে খাব কি? ঐটাই আমার মতন ছা-পোষা মানুষদের মহা মুস্কিল। নামই ছাই বুঝি না তো খাব কি? প্রথমবারকার অভিজ্ঞতা বলি তাহ'লে। সুন্দরী মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে প্যারিসে পৌঁছোলাম সন্ধ্যাবেলা। খাব কি? অনেক ঘুরে ফিরে গিয়ে উঠলাম এক ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। সুন্দরী ওয়েট্রেস্ ইয়া লম্বা চওড়া এক তালিকা এনে দিল। চার পাতার ফিরিস্তি। ফরাসী ভাষা জানি না—এটা মহিলা জানেন, কিন্তু ফরাসী খাবারও চিনি না—এটা জানলেই তো জেনে ফেলবেন আমি ওঁর ইয়ে হবার অনুপযুক্ত। নিজেকে খানিকটা বাঁচাবার জন্যই, মেনুটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম 'তুমি ঠিক কর!'

মহিলাটি খাবার তালিকা নিজের মনেই বানান করে ক'রে পড়তে থাকেন, আর মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে হাসে। আমি যে নিজের মূর্খতা গোপন করেছি মেনুটা ওঁর দিকে ঠেলে দিয়ে তাতো উনি বুঝেই ছিলেন। নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে উনিও কিছু পেছ পা নন। বললেন—'বিশেষ ক্ষিদে নেই, খালি সুপ খাই!'

আমি বাধ্য হয়ে বলি, 'সুপ আমার সয় না, আমি তাহলে শুধু মিষ্টি খাই।'

তাই ঠিক হল। মেনুর প্রথমে সুপ আর শেষে মিষ্টি এইটাই সভ্যজগতের সব রেস্তোরাঁর রীতি। সেই আন্দাজে মহিলা অর্ডার দিলেন—লিস্টের প্রথমটা উনি খাবেন, শেষটা আমি। শুনে মেয়েটি হেসেই বাঁচে না। হাসির মাঝখানে দু-একটা কথা অতিকষ্টে বলে। মহিলা অপ্রস্তুত কিন্তু দমবার পাত্রী নন। উনি যত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মেয়েটি তত হাসে। আমি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম কিন্তু যখন ম্যানেজার এসেও হেসে মাথা নেড়ে জানাল যে হয় না, তখন বাধ্য হ'য়ে আমার পুরুষকারকে জাগিয়ে দিলাম। পকেটে যত পয়সা ছিল সব বের করে টেবিলের ওপর রেখে উত্তেজিত হ'য়ে বললাম (খাঁটি বাংলায়) 'যা পয়সা লাগে দেব—এই আমাদের চাই!'

ব্যাপারটা এতক্ষণ আমাদের মধ্যেই ছিল। টেবিলে পয়সা রাখার পর পাশের টেবিলেও গড়াল। তারপর সারা রেস্তোরাঁয়। সবাই হেসে লুটোপুটি। কোণের টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ। তিনি উঠে এসে বললেন ইংরেজিতে—'সাহায্য করতে পারি?'

হাতে চাঁদ পেলাম। মেনু দেখিয়ে বললাম—'এই প্রথমটা আমার সঙ্গিনীর পছন্দ—আর এই শেষেরটা আমার। যত পয়সা লাগে দেব—আমাদের চাই।' বৃদ্ধ খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন! ভেবেই পেলেন না কি বলবেন; অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন প্রায় এক মিনিট। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'কি করবেন?'

খানিকটা অবাক লাগল, রাগও হল। বললাম, 'খাব।'

ভদ্রলোক আবার থতমত। আমতা আমতা বললেন—'খাবেন?'

'হ্যাঁ!'

অবাক হলেন

'দেশ কোথায় আপনার?'

খেতে এসেছি রেস্তোরাঁয়, খাব পছন্দমত, পয়সা দিয়ে। তার সঙ্গে দেশের কি সম্পর্ক? আরও রাগ হয়। ভিড় জমছে। বলি 'এত' কথার দরকার কি? পছন্দ হয়েছে আমাদের চাই।'

'পাবেন না।'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গিনীর যেটি পছন্দ সেটি হচ্ছে ম্যানেজার আর আপনার যেটি পছন্দ সেটি এখানকার ঐ মহিলা ওয়েট্রেস। গল্প করতে চান, আলাদা কথা। খাওয়া চলবে না!'

ভদ্রলোক ফিরে গেলেন। সারা রেস্তোরাঁ হেসে গড়িয়ে পড়ল আর আমরা দুজন ঐ দু'জনার অতিথি হয়ে অনেক খেলাম।

আর এক বিপদ খাওয়ার শেষে। জল চাইলাম। ওঁরা বোঝেনই না। জলের শত নাম আওড়ালাম—জল, বারি, পানি, তাম্নি, আকুয়া পুরা, ওয়াটার এবং হতাশ হয়ে বৈজ্ঞানিক মতে এইচ-টুও। তাতেও যখন হল না তখন এঁকে বোঝাতে চাইলাম। কল আঁকলাম, পুকুর আঁকলাম, নদী আঁকলাম, সমুদ্র আঁকলাম, বৃষ্টিও আঁকতে চেষ্টা করলাম। হাতের ইসারায় বোঝাতে চাইলাম, কেঁদে বোঝাতে চাইলাম। আধঘণ্টা চেষ্টায়ও যখন কিছু হল না, তখন হতাশ হয়ে বললাম 'অঃ।' সঙ্গে সঙ্গে জল এল!!

শুধু খাবার কেন, ভাষা না জানলে সব ব্যাপারেই চোখে জল আসে। ভাষা না জানার অসুবিধা অন্য সব দেশেই অল্প বিস্তর আছে, কিন্তু এখানকার তুলনায় কিছুই নয়। এঁরা নিজেদের কৃষ্টি সম্বন্ধে এত সচেতন যে, এঁদের ভাষা না জানাটাকে মনে করেন অমার্জনীয় অপরাধ। একবার পথ হারিয়ে এক ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমার সব কথা শুনলেন এবং শেষকালে শুদ্ধ ফরাসী ভাষায় বললেন, 'জানি না।'

অবাক লাগল। ইংরেজি কথা যে উনি বোঝেন তা তো বুঝলামই, আর স্থানীয় লোক যে তাও বোঝা যায়। তাহ'লে? ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম—'আমার বক্তব্য আপনি অবশ্যই বুঝেছেন এবং মনে হচ্ছে আপনি ফরাসী, জায়গাটা কোথায়, জানেন না?'

ভদ্রলোক প্রথমটা চকচকিয়ে গেলেন, পরে বললেন শুদ্ধ ইংরেজিতে—'ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন না করলে আমি জবাব দিই না!'

এইটাই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ফরাসী দেশে ডলার ছাড়া (এবং বাধ্য হ'য়ে আমেরিকান, কারণ টিকির সঙ্গে মাথার অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ!) আর কিছু বাইরের জিনিস সহজে স্বাগতম নয়। ভারতীয় তো নয়ই। একে তারা কালা আদমি তায় ভুখা! একমাত্র ভারতীয় যিনি ওখানে স্থায়ী এবং চিরন্তন তাঁর নাম বাৎসায়ন। প্রাচীন ভারতের এই ফ্রয়েডটি ওদেশে শুধু অমর হ'য়ে আছেন বললে ওঁর অপমান হবে। তিনি পথে-ঘাটে এবং বিশেষ করে প্লাস পিগাল নামক এলাকায় স-শরীরে বিরাজমান এবং উত্তরোত্তর উন্নতিকামী। মধ্যপ্রাচ্যে পেট্রোলের মনোপলি, ভারতবর্ষে পাটের, আমেরিকায় বোকার মনোপলি আর প্যারিসে বাৎসায়নের। ওঁর জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে প্রকাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি গ'ড়ে উঠেছে এখানে। সেইজন্যেই, পৃথিবীর সব দেশ থেকে এরা আলাদা। আমদানি-রপ্তানির ওপর অন্য দেশের উন্নতি। এদের রপ্তানি নেই, আমদানি আছে এবং তারই সমতালে অন্যদের অবনতি।

এঁদের নিজেদের অবনতিরও যে কিছু ঘাটতি আছে তা মনে হয় না। যুদ্ধের আগের কথা জানি না, পরে যে তিন চারবার এখানে এসেছি, প্রতিবারই মনে হয়েছে দেশটা বোধ হয় আরও এক ধাপ নেমেছে। জীবনে সব কিছুরই মূল্যবোধ প্রত্যেক মানুষের মনে আছে। সেটা নির্ভর করে মানুষটির স্বকীয়তার ওপর। চোর ভাবে ডাকাত আমাদের রাজা, ডাকাত ভাবে চৌর্যবৃত্তি নিতান্তই ওঁচা জিনিস। সাধুর কাছে সাধনার দাম অনেক, বিলাসীর কাছে সাধুর ত্যাগ অর্থহীন। বিভিন্ন স্তরের এই যে মূল্যবোধ এটা এদেশে কমতে কমতে একেবারে অদৃশ্য হ'তে বসেছে।

আজকের ফ্রান্সে যেদিকেই তাকাই, অসীম নগ্নতা। শিল্পের মানদণ্ড নেই, সমাজের শৃঙ্খলা নেই, নীতির বিচার নেই, ন্যায়ের মূল্য নেই, রাজনীতিক ঐতিহ্য তো নেই-ই। শিল্পের মানদণ্ড থাকবে কেমন করে? এই সেদিনও শিল্পের আদর্শ ছিল সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। এরিক নিউটন বলেন ভগবান সৃষ্টি করেছে মানুষ, মানুষ সৃষ্টি করেছে সৌন্দর্য—তার শিল্প সাধনা দিয়ে। সৌন্দর্যের মূল হল 'সত্য এবং সারল্য।' আধুনিক ফরাসী শিল্পকে আর যাই বলি সত্যও বলব না সরল তো বলবই না। তাহ'লে রইল জটিলতা এবং কল্পনা। জটিল কল্পনাপ্রসূত জিনিসের মধ্যে আর যাই থাক শাশ্বত আবেদন থাকে না।

গেলাম মুজি দা মডার্ন আর্ট দেখতে। আধুনিক শিল্পের প্রদর্শনী। অদ্ভুত সুন্দর বাড়িটার মধ্যে কিম্ভুত-কিমাকার শিল্পের সমাবেশ। বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির স্থান দখল করে আছে যে নিদর্শন সেটাতে না আছে রং না আছে তুলির ব্যবহার। শিল্পী (?)—নাম ভুলে গেছি, একটা ক্যানভাসকে ছুরি দিয়ে গোণাগুণতি তের্ষট্টি বার ছেঁদা করেছেন—নাম দিয়েছেন 'আধুনিক সভ্যতা'। এই ছবি (?)টির দু'ধারে পাহারাদার মোতায়েন আছে, পাছে আর কেউ এই 'আধুনিক সভ্যতাকে' আরও ঘায়েল করেন। অন্য সমস্ত জিনিস ছেড়েই দিলাম, শিল্পীর প্রথম এবং একমাত্র সাধনা হল 'সৃষ্টি' করা। এই আধুনিক শিল্পীটি(?) ধ্বংস করেছেন। আর এই ধ্বংসের মধ্যে যে জাত সৃষ্টির পরমতম সার্থকতা দেখেছেন সে জাতের চিন্তাধারা যে কোন পথে চলেছে সেটা আলোচনারও অযোগ্য।

সৃষ্টির আনন্দ যাদের ধ্বংসের মধ্যে তাদের সমাজ আমাদের সমতুল্য তো নয়ই, সম্পূর্ণ বিপরীতগামী। আমরা নীতির বাঁধনে বাঁধা, ওরা উচ্ছৃঙ্খলতার উত্তেজনায় উন্মত্ত। এই উন্মত্ততার গালভরা নাম দিয়েছে 'এক্‌টেনশিয়ালিজম'—অর্থাৎ সোজা কথায়, বেঁচে থাকো। আমাদের সভ্যতা বলে আনন্দের জন্য বাঁচা, ওদের ঠিক উল্টো, বাঁচার জন্য আনন্দ। কোন বাধাবাধকতার মধ্যে

বাঁচার আনন্দ নেই, এইটাই ওদের বলার কথা। অতএব নীতিবোধটাকে ওরা বলে গোঁড়ামি, ন্যায়টা ওদের মতে দুর্বলের অফিস। যারা দুর্বল, যারা অসহায়, যাদের বাঁচার আনন্দ নেই, যারা জীবনকে ভোগ করতে জানে না, ওদের মতে তারাই ন্যায়-অন্যায়ের, ভালোমন্দের, তর্ক তুলে সময়ের অপব্যবহার করে। এরা সময়কে দু'হাতে ঠেলে রেখে জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়। অতীতের ফ্রান্স ছিল সভ্যতার অগ্রদূত। আজকের ফ্রান্স হল উগ্র বামপন্থী ইণ্টেলেকচ্যুয়ালদের সদর কেল্লা। ওরা আমেরিকাকে সেই কেল্লায় বন্দী করেছে। রাশিয়া মিছিমিছিই ভেবে মরছে। আমেরিকাকে জেতবার জন্য যুদ্ধের দরকার হবে না। ফ্রান্সে আর দশ বছর থাকলে এমনই আমেরিকা মরবে।

আর ভালো লাগছে না। ফিল্ম দেখি, সেই প্রগতিশীল উগ্র বামপন্থীর দুর্বোধ্য ইণ্টেলেকচ্যুয়ালিজম। ছোট ছোট জাঁ ককটো ভিড় করে আছে। একদিন এই দেশে এদেরই মধ্যে ছিলেন সৌন্দর্যের সাধক রেনোয়াঁ, সূক্ষ্ম জীবনবোধের প্রতীক রেণে ক্লেয়ার। আজ তাঁরা নেই। বামপন্থী ইণ্টেলেকচ্যুয়ালিজমের থিওরি আর ধোঁওয়ায় তাঁরা অবলুপ্ত। আর্ট গ্যালারীতে যাই তো উদ্ভট কল্পনার মাকড়সার জাল। একোল দ্য পারির বাইরে, আঁকা ছবি চোখের সামগ্রী, অর্থাৎ দেখার মধ্যে তার রস। এখানে শুধু দেখলে হবে না, তার বিষয় পড়তেও হবে। সেই একই কারণ—প্রত্যেক ছবিটির পেছনে একটা করে ইণ্টেলেকচ্যুয়াল থিওরি আছে। আগে পড়, বোঝ—তারপর ছবি দেখ। সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, আঁকা ছবির মধ্যেই যদি এত থিওরির বাঁধাবাঁধি তাহলে বিশৃঙ্খলাটা কোথায়। ওদের মস্তিষ্কে। আর আধুনিক ফরাসী চিত্রশিল্পকে যারা মাথায় তুলে নাচে, তাদের মস্তিষ্কে এবং—হয়ত আমি এই আধুনিক শিল্পকে বুঝি না যখন, তখন আমার মগজে !!!

এদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে যখন আধুনিক ইতালীয় চিত্রশিল্পকে দেখি তখন ইতালিকে বুঝি, ভালো লাগে। ওদের রেসেণ্ট এনরিকো, ওদের ক্যাসারোটি ফেলিচে, ওদের মারিনো মারিনি আমার মনকে স্পর্শ করে, জীবনের আনন্দবোধকে নতুন করে জাগিয়ে দিয়ে, আমার সৌন্দর্য-বোধকে নতুন ছন্দে দোলা দেয়। এঁরাও পৃথিবীর শিল্পী, মানদণ্ডে আধুনিক শিল্পী, এঁরাও জীবনকে চিরদিনের জানাজানির বাইরে দেখছেন। এঁদের শিল্পেরও গোড়ার কথা, জীবনের অনুকরণ শিল্পী নয়। এঁরা থিওরি না বলে, ছবির মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শিল্পকে বিকৃত না করেও—এবং না করেই সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্ভব।

আধুনিক ইতালীয় চিত্রশিল্পকে ভালো লাগে ঐ জন্য। অতীতের মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আর লিওনার্দো দা ভিনচিকে এঁরা ভুললেও, তাঁদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধকে এঁরা অবজ্ঞা করেন নি। অতীতের ঐতিহ্যের ওপরই এঁদের বর্তমানের সুদৃঢ় ভিত্তি। এঁদের শিল্পে মানবজীবনই হল মূল কথা। এঁরা রঙ দিয়ে রঙিন করেন মানুষকে, তুলে ধরেন, মানুষকে নয়, তার মনকে, তার আনন্দকে, তার বেদনাকে! এই জন্যই বোধ হয় আধুনিক ইতালীয় চিত্রশিল্প এমন গভীরভাবে সুন্দর।

এদের মধ্যে সবার সেরা রেসেণ্ট এনরিকো। এনরিকো মানুষকে দেখান নি, মানুষের মন নিয়ে প্রকৃতিকে দেখিয়েছেন। উনি সূর্যালোকের মধ্যে দেখেছেন মানুষের আনন্দ, সূর্যাস্তের মধ্যে মর্মান্তিক বেদনাবোধ। তাই ছবিতে ছবিতে ওঁর সূর্যালোকের খেলা, কখনও কখনও পীতাভ সারল্য, কখনও রাগের রক্তচক্ষু। চোখ দেখে প্রাকৃতিক শোভা অনুলিপি, মন দেখে মানুষের মনের নানান রূপ। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে উনি দেখিয়েছেন মনের বিরাটত্ব, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেতের মধ্যে মনের বিস্তার। ভেনিসের আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনী দু'খানা ছবি ওঁর দেখেছি পাশাপাশি। 'কাম্পানিয়া ক্যানাডেসানা' আর 'দিনান্ত'। প্রথমখানা নীল পাহাড়ের সারির নীচে সবুজ ক্ষেতের ছড়াছড়ি। নানান সবুজের লুকোচুরি খেলা চলেছে ভোরের হলদে সূর্যালোকের স্বচ্ছতার সঙ্গে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে ছোট্ট ছোট্ট মানুষগুলো। পুঞ্জীভূত মেঘ পাহাড়ের ওপর এলিয়ে আছে, যেন সদ্যজাগ্রতা রাজকুমারী। রঙে রঙে যেন কবিতার লাইন টানা। ছোট মানুষগুলো যখন মনটাকে আনন্দের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় দিগন্ত পর্যন্ত তখন ঐ ছোট্ট মানুষগুলোই বিরাট সৌন্দর্য দেখে সবার ওপরে—ঐ সদ্যজাগ্রতা রাজকুমারীর মতনই সেটা সহজ, সরল, সুন্দর।

কিম্বা পাশের ঐ ছবিটা 'দিনান্ত'। ধূসর গোধূলির ছায়া পড়েছে বিশ্বজুড়ে, একটা মর্মান্তিক বেদনার সুর বাজছে দিকে দিকে। সামনেই দু'টো গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কিন্তু দু'টোই নিঃসঙ্গ আর একাকীত্বের বেদনায় ভারাক্রান্ত। নীচে, দূরে, অন্ধকারে, আবছায়া বাড়ি, তারই চিমনি দিয়ে কালো ধোঁওয়া। গাছ দু'টো গাছ নয়, পুরুষ আর নারী, তাদেরই একাকীত্বের বেদনাবোধ কালো ধোঁওয়া হ'য়ে মিশে যাচ্ছে ঐ ধূসর গোধূলিতে। এগুলো ছবির তলায় তকমা-আঁটা থিওরি নয়, দর্শকের অনুভূতি। বই লিখে আর বুলি আউড়ে এনরিকোকে কেউ আধুনিক ইতালীয় চিত্রশিল্পের শীর্ষস্থানে বসায় নি। তিনি নিজের সুন্দর এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের সাধনায় সেখানে সমাসীন।

[ক্রমশ।

স্বর্গ খেলনা

সুজাতা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তারপর আলাপ জমতে দেরি হোল না। ছায়াদের বাড়িতে প্রায় রোজই দেখা হয় অভিজিৎ রায়ের সঙ্গে, বাঁশি শোনা আর ডালমুট খাওয়া চলে, চলে সাহিত্য আলোচনা।

ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে মহুয়ার। মার কথা, রিটার কথা মনে পড়ে বৈ কি, কিন্তু তবু যেন কখন ওরই মধ্যে সব ভুলে সেতারের তারের ওপর আঙুল চলে যায় মহুয়ার, দাদার চিঠির লম্বা উত্তর লিখতে বসে লম্বা লম্বা কবিতা লেখে।

আর অজয়দাও ফিরে এসেছেন কাশী থেকে, সেই লম্বা কবিতা পড়া হয়, আড্ডা হয় আবার বাইরের ঘরে; মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন মহুয়ার বুকে কি একটা ব্যথা গুমড়ে ওঠে ধাক্কা লাগে, মা নেই, তবু কি স্বাভাবিকভাবেই চলছে ঘর-কন্না, চলছে জীবন।

আবার বসবার ঘর ভরে উঠেছে। লোকজনের আসা-যাওয়ায় আর আস্তে আস্তে বোমার ভয়ে পালিয়ে যাওয়া লোকজনেরা সবাই ফিরে এসেছে কোলকাতায়, আর মনে হয় যত লোক গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি লোকই ফিরে এসেছে। ফাঁকা বাড়িগুলো ভর্তি, রাস্তায় মানুষের ভিড় দোকানে কেনা বেচা।

সুস্থ, অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আবার কোলকাতাকে, তুলতুলিও ফিরে এসেছে, আর সঙ্গে বুড়ি মাসিমার ছেলে সুজিৎ। দার্জিলিঙে ওর শরীর ভাল নেই মন ভাল নেই, তাই হাওয়া বদল করতে কোলকাতাই বেছে নিয়েছে ও। তুলতুলির চেয়ে মাত্র বছরকয়েকের বড় সুজিৎ, কিন্তু হাবে ভাবে মনে হয়, মহুয়ার থেকেও বয়স বেশি সুজিতের। কিন্তু 'পাকা' নয় ছেলেটা, মহুয়া মনে মনে বলে, আর কৃতজ্ঞ বোধ করে বুড়ি মাসিমার ওপর, এই ভাইটিকে ওদের কাছে পাঠানোর জন্যে। যত গম্ভীর হোক রাজনীতি দর্শন পড়ুক, তবু ত' তারই ফাঁকে চীৎকার করে গান গায়, উচ্ছ্বাসিতে সচকিত করে দেয়, আর যখন তখন খুনসুটি করে তুলতুলিকেও খুশি রাখে।

দাদা যুদ্ধে, মা নেই তবু যেন থেকে থেকে বাড়িতে খুশির জোয়ার বয়ে যায়, গান, গল্প, তর্ক, চেঁচামেচি মহুয়াদের দক্ষিণের বসবার ঘরটা থেকে থেকে আগের মতই জমজমাট মনে হয়।

অভিজিৎ প্রায় রোজ আসে, মহুয়া নিজের অজান্তে কেমন করে পাঁচটা বাজলেই আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। কোটি সাবান দিয়ে ধোওয়া স্নিগ্ধ দেহে, কোটি পাউডার ছড়িয়ে দেয়, চোখে সরু কাজল টানে, রূপালি জরির পাড় হলুদ শাড়িটা পরে দক্ষিণের বারান্দায় এসে মাদুর পেতে বসে। সেতার টেনে নেয় কোলের ওপর। তারপর কখনো পূরবী, কখনো দরবারী-কানাড়া বাজাতে বাজাতে বারবার চোখ সরে যায় বাইরের দরজার দিকে। আর সেই পরিচিত খদ্দরমোড়া প্রিয় মূর্তিটি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেই মিষ্টি হেসে সেতার নামিয়ে রাখে ও, বলে, আসুন।

অভিজিৎ আসে, আরো অনেকে আসে, তারপর ভেতর থেকে ভানুদি পাঠায় আমপোড়ার সোনালি সরবৎ আর ক্ষীরের ছাঁচ, নারকেল তক্তি আর মাংসের সিঙাড়া। খাওয়া হয়, গল্প হয়, গান হয়; আর হীরেন্দ্রনাথ সব দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

রাধারাণীর অভাবে তাঁর জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেলেও ছেলেমেয়েদের জীবন শুকিয়ে যায় নি এখনও। এইবার আসল কাজ, মহুয়ার বিয়ে। পাত্র ত' ঠিক করাই আছে, মহুয়ার মা-ই ঠিক করে গেছেন সব। ফিনান্স পাশ ছেলে, মস্ত চাকরী করে রেলওয়েতে, মহুয়াকে কোন এক সভায় গান গাইতে দেখে ভারি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ছেলেটির, রঞ্জন চ্যাটার্জি। যেচে সেধে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তারা, রাধারাণী খোঁজখবর নিয়ে খুশি হয়েছিলেন। তারপর তারা এই বাড়িতে এসেছে, মহুয়ার সঙ্গে আলাপও হয়েছে। মনে হয় মহুয়ারও অপছন্দ হয় নি ছেলেটিকে। তবে এ সম্বন্ধে কখনও তো মুখ ফুটে কোন কথা বলে নি, বিয়েটা তখনই দিয়ে দিলে হোত। মাঝে মাঝে মনে হয় হীরেন্দ্রনাথের। মহুয়া একটা কথাই বলেছিল মুখ ফুটে 'পরীক্ষাটা হয়ে যাক।' কথা ছিল মহুয়ার পরীক্ষার পরই বিয়ে হবে, আর তার পরই ত'…।

এইবার খোকা ছুটিতে এলে সামনের ডিসেম্বর মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলা যাবে; ততদিনে মহুয়ার শরীরও হয়ত আগের মত স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। যা রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। ডাক্তার বলেছেন কিছুদিন বাইরে ঘুরিয়ে আনা দরকার মহুয়াকে। হীরেন্দ্রনাথও তাই চান, কিন্তু কিন্তু কি করবেন? ছুটি পাচ্ছেন না যে, এখন

এমার্জেন্সী, ছুটিছাটা বন্ধ। আর এই যুদ্ধের হিড়িক না থাকলে এখন ত' তাঁর রিটায়ার করবার সময়।

বাবা!

মহুয়ার ডাকে পেছন ফিরলেন হীরেন্দ্রনাথ, আর ফিরেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কি চমৎকার সেজেছে আজ মহুয়া! টুকটুকে লাল তাঁতের শাড়ি, গলায় লম্বা সোনার হারে লাল চুনীর লকেট দুলছে, হাতে চুনীবসানো চুড়ি। বাঃ বাঃ, এ যে একেবারে বিয়ের কনে সেজে ফেলেছিস রে!

যাও, কি যে বল!

মহুয়া লজ্জায় মাথা নামাল।

বাবা তুমি যে কি! শোন বাবা, হাসিদের বাড়ি আজ আবার কি সব গান হবে, যেতে বলেছে, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে, ওখানেই খাবো। কিন্তু তোমরা ঠিক ন'টায় খেতে বসবে, আর তুমি সব খাবে, পুডিং ফেলে উঠে যেয়ো না যেন।

শেষের দিকে গলায় রীতিমত শাসনের স্বর মহুয়ার।

তুই আজ যা সেজেছিস না মৌ, হাসির বাড়িতে সভার মধ্যেই না তোর বিয়ে দিয়ে দেয়।

যা—ও।

কপট রাগ দেখিয়ে মহুয়া চলে গেল, কিন্তু খুশি হোল বাবার এই রসিকতায়। বাবা আবার পুরোনো দিনের মত রসিকতা করছেন, কৌতুক করছেন মহুয়ার সঙ্গে। শোকের তীব্রতা ভার বয়ে আসছে আস্তে আস্তে। হাসিদের বাড়িতেও কিন্তু সবাই বারবার বাবার কথারই পুনরাবৃত্তি করল, আর এবার মহুয়া সত্যিই লজ্জা পেল; পরেছে ত' সামান্য তাঁতের শাড়ি, শুধু লাল বলেই দোষ? কি করবে? লাল রংই অভিজিৎ ভালবাসে, সেদিন কি কথায় যেন বলছিল হাসিকে। কিন্তু অভিজিৎ-এর ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নিয়ে কেন এত মাথাব্যথা মহুয়ার? এ সে কি করতে যাচ্ছে? বাবা কি মত দেবেন? মহুয়া কি জানে না তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে?

কিন্তু না, সেই সাহেবী মেজাজের অফিসারটিকে শুধু তাকে কেন পৃথিবীর আর কাউকেই স্বামী বলে গ্রহণ করা মহুয়ার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

চোখ বুজে নিজেকে যখন একটি শান্ত সুখী পরিবারে বধূর রূপে কল্পনা করে মহুয়া তখন, সেই ঘরে যে মানুষটি ধীরে ধীরে তার পাশে এসে দাঁড়ায়, সে অভিজিৎ আর কেউ নয়, আর কেউ হতে পারে না।

আর আশ্চর্য! অভিজিৎও ঠিক সেই কথাই বলল, আর আজই বলল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর মহুয়াকে পৌঁছে দিতে আসছিল হাসির দাদা কমল, অভিজিৎ বলল, আমার ত' যেতেই হবে ওদিক দিয়ে, তুই আর কেন কষ্ট করবি?

তারপর মহুয়ার দিকে ফিরল, চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে।

লাল তাঁতের শাড়ির আঁচল ভাল করে গায়ে টেনে মহুয়া বলল, চলুন।

আজ মহুয়া ভেবেছিল অভিজিৎ হয়ত অনেক কথা বলবে মহুয়ার নতুন কবিতা নিয়ে, ওর গান নিয়ে কিছু প্রশংসা কিছু মুগ্ধতা প্রকাশ করবে।

কিন্তু আশ্চর্য! পথে বেরিয়ে অভিজিৎ একটা কথাও বলল না, এমন কি ওর এই লালে লাল হয়ে যাওয়া পোষাক সম্বন্ধেও কিছু না।

নীরবেই দু'জনে পথ হাঁটছে, হঠাৎ মহুয়ার পায়ে ইটের ঠোক্কর, প্রায় পড়ে যাচ্ছিল মহুয়া, অভিজিৎ প্রায় হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে ওর হাত; যা অন্ধকার রাস্তা! কে বলবে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এটা; সত্যি এই ব্ল্যাক আউট কবে শেষ হবে।

মহুয়া মৃদু টান দিল হাতটা তখনও অভিজিতের হাতে ধরা। কিন্তু আশ্চর্য অভিজিৎ মহুয়ার হাত ছেড়ে দিতে চাইল না, বরং আর একটু জোরে চেপে ধরল, আর খুব মৃদু গম্ভীর গলায় বলল, না, ছাড়বো না।

মহুয়ার বুকের মধ্যে আবার সেই কিসের দাপাদাপি, কানের পাশে আগুনের হল্কা, আর সেই গরম গরম লাগা মাথা আর মুখ।

মহুয়া কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু বলা হোল না, জিভ এত শুকিয়ে গেছে কেন? হঠাৎ মহুয়ার মনে হোল, একগ্লাস ঠাণ্ডা জলের বড়ই প্রয়োজন এখন। কিন্তু সে-কথাও বলা হোল না, কোন কথাই বলা সম্ভব নয় মহুয়ার পক্ষে, মহুয়ার হাত ধরে চলতে চলতে অভিজিৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

মৌ!

কি গভীর অন্তরঙ্গ ডাক! কি আশ্চর্য দরদভরা গলা!

উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল অভিজিৎ, মৌ!

বলুন। অস্ফুটে বলল মহুয়া, প্রায় শোনাই যায় না।

তুমি নিশ্চয় জান, বুঝতে পার আমার মনের কথা।

মহুয়া কি উত্তর দেবে? কি বলার আছে। বলবে কি? হ্যাঁ, জানে, মহুয়া সব জানে অভিজিৎ-এর মনের খবর।

অভিজিৎ-এর গাঢ়স্বর আবার ভেসে এল, মহুয়া, মৌ! আমি কি অসম্ভবের স্বপ্ন দেখছি?

না। প্রায় কানে বলার মত মৃদুস্বর মহুয়ার।

না; আমিও, আমিও।

বাকিটা আর বলা হোল না, মহুয়ার হাত ভীষণভাবে ঘেমে উঠেছে অভিজিৎ-এর হাতের মধ্যে।

কিন্তু মৌ! আমি গরীব, আমি সামান্য স্কুল-মাস্টার; আমাকে কি তোমার বাড়িতে—

বলবেন না, ওসব কথা বলবেন না।

মহুয়া হঠাৎ হাত উঠিয়ে তার নরম তালু দিয়ে চেপে ধরল অভিজিৎ-এর মুখ।

আপনি যা তাই বলেই আমার আপনাকে এত ভাল লাগে।

সত্যি বলছ মৌ? সত্যি?

হ্যাঁ। মহুয়ার স্বরে সত্য স্বীকারের দৃঢ়তা।

মৌ, আজ তুমি আমায় যা দিলে—পথের মধ্যেই মহুয়ার মাথাটা ক্ষণেকের জন্য বুকে টেনে নিল অভিজিৎ। জান মহুয়া, আজ এই ক'মাস ধরে ক্রমাগত একটি স্বপ্নই দেখেছি; কি স্বপ্ন জান?

কি?

তুমি এমনি লাল শাড়ি পরে আমার ভাঙা ঘর আলো করে আছ, আছ আমার পাশে পাশে সারা জীবন ভরে।

মহুয়ার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না—শুধু আবেশে, সুখে, চোখ এল বুজে, আর বুকের মধ্যে সেই অশ্রান্ত দাপাদাপি থেমে গিয়ে এক পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল মন। মহুয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে দেখল

'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'

* * * *

এরপর কয়েকটা দিন, দু'টো মাস কোথা দিয়ে কি ভাবে যে কেটে গেল মহুয়া বুঝতেও পারল না। বারবার তার চতুরঙ্গের শ্রীবিলাসের কথাটাই মনে পড়ছিল···'দিনগুলি ছুটিয়াও নয়, উড়িয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।' আর তারপরই আরম্ভ হোল সেই মহাক্ষণ। আসমুদ্র হিমাচল—সমস্ত ভারতবর্ষের বুক থেকে একটা শব্দই গুমরে গুমরে উঠতে থাকল—Do or die করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

দলে দলে লোক, লোকের মিছিল, হরতাল, ট্রাম পুড়ছে, বাস পুড়ছে, খবর পাওয়া যাচ্ছে কোথায় নাকি টেলিগ্রাফের তার কেটে সমস্ত ছোট শহরটাকে রাতারাতি বাকী পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, সেখানে নাকি স্বদেশীরাজ; কোথায় কারা পুল ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে, কোথায় কোন পুলিশ অফিসার গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে, শিশুরাও রেহাই পায় নি।

কিন্তু তবু দমছে না কেউ, ভয়েও পালাচ্ছে না, অজস্র ছেলেমেয়ে রোজ মারা যাচ্ছে পুলিশের গুলীতে, তবু চলেছে অজস্র উপায়ে সরকারকে বিভ্রান্ত করা, ইংরেজ-শাসন বানচাল করে দেবার চেষ্টা।

মহুয়া রোজ ভয়ে ভয়ে থাকে, সুজিৎ কি যে করে বেড়াচ্ছে; রোজই শোনা যাচ্ছে কাদের ছেলে যেন পুলিশের গুলীতে মারা গেছে, কার ছেলেকে হাজতে আটকে রেখেছে,




সকাল থেকে সন্ধ্যে সুজিতের দেখাই পাওয়া যায় না, কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে মহুয়া জানে না।

অভিজিৎ-এর স্কুলও প্রায় বন্ধই বলা চলে; মাইনে পায় না ওরা অনেক দিন; কি করে যে অভিজিতের চলে। মহুয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোনে ছেলেমেয়েদের উন্মত্ত উল্লাস মিলিটারী ট্রাককে বিপর্যস্ত করার; শোনে পুলিশের গুলীর আওয়াজ, দূর থেকে ভেসে আসে কানে, আরো অনেক খবরই মহুয়ার কানে ভেসে আসে আর আকুল ইচ্ছা জাগে বাইরে বেরিয়ে ভাল করে একবার দেখে নেয় এই অশান্ত উন্মাদনা, প্রাণ দিয়ে অনুভব করে এই চঞ্চলতা, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই মনে পড়ে বাবার কথা, চোখে ভাসে তুলতুলির সরল মুখ, মনে পড়ে যায় কঠিন কর্তব্যে বাঁধা সে সংসারের কাছে; যে জন্যে মহুয়া মনে মনে বলে, অভিজিৎকেও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। তুলতুলিকে বিয়ে দিতে হবে, দাদা যুদ্ধ থেকে ফিরবে, তারও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এই সংসার সুশৃঙ্খলে চলছে, সব ঠিক আছে, জানতে পারলে তবে মহুয়ার ছুটি। তখন, তখন হয়ত মহুয়ার অনেক বয়েস হয়ে যাবে, দেখতেও আর ভাল থাকবে না, কিন্তু—তবু আনন্দ থাকবে জেগে, প্রেম তাদের থাকবে অমলিন; আর তখন নতুন করে নীড় বাঁধবে মহুয়া, অভিজিৎ ওর কথা শুনে হাসে, বলে অপেক্ষা দু'এক বছর করতে পারি, বুড়ো হওয়া পর্যন্ত নয়।

দিদি, দিদি!

হাঁফাতে হাঁফাতে এল তুলতুলি;

কি রে।

শীগগির এস, সুজিতের পায়ে পুলিশের গুলী লেগেছে, অভিজিৎদা নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে।

সে কি রে!

মহুয়া ছুটে নীচে নেমে এল।

না গুলী পায়ে ঢোকে নি; খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, সেই অবস্থাতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে এসেছে সুজিৎ। ডাকাবুকো ছেলেটার মুখ শাদা হয়ে গেছে কিন্তু মুখে তখনও হাসি।

অভিজিৎ স্পিরিটে-ভেজানো তুলো দিয়ে ক্ষতস্থানটা মুছছে, আর সুজিৎ অনর্গল বলে যাচ্ছে তার অভিজ্ঞতার কথা। একটা ট্রাক জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসছিল হঠাৎ মনে হল দূরে কোথায় একটা আওয়াজ হোল ফটাফট। তারপরেই দেখে তার পাশের ছেলেটি বসে পড়েছে পথের ওপর, আর তার চোখ দু'টো কেমন মাছের চোখের মত ঘোলাটে হয়ে আসছে; কি হোল আপনার, ও মশাই কি হোল? বলে সাড়া দিতে গিয়েই সুজিৎ দেখলো ছেলেটির বুকের কাছে অনেকটা জায়গা জুড়ে গোল লাল দাগ, আর তার ঘোলাটে চোখ সম্পূর্ণ বোজা, ছেলেটিকে পাঁজাকোলা করে তুলতে গেল সুজিৎ আর তখনই আবার শোনা গেল ফটফট আওয়াজ, আর দেখা গেল দূরে মিলিটারী ট্রাক ছুটে আসছে সেই দিকেই।

তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে সেইখানে শুইয়ে রেখেই, সেই অবস্থায়ই রক্তঝরা হাঁটু নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে সুজিৎ, বড় রাস্তায় পড়ে অভিজিৎ-এর সঙ্গে দেখা।

কি হবে অভি?

মহুয়া ভীতমুখে অভিজিৎ-এর দিকে তাকাল।

বাবা অবধি বাড়ি নেই, ব্যারাকপুরে গেছেন অফিসের কাজে।

ভয় কি! আমি ত' আছি!

ভারি আশ্বস্ত হল মহুয়া; সত্যিই ত' ভয় কি তার? অভিজিৎ-ই আছে যে। আর সত্যিই, অভিজিৎই সব ব্যবস্থা করে দিল। ডাক্তার ডাকল, (এমন ডাক্তার যিনি গুলীতে লাগা বলে পুলিশে রিপোর্ট করবেন না) চিকিৎসার বন্দোবস্ত করল, সারাটা রাত ধরে মহুয়াদের বাড়িতে সুজিতের বিছানার পাশে বসে থাকল।

রাত্রে অনেকবার ওপর থেকে নেমে এল মহুয়া, না, শান্তভাবেই ঘুমোচ্ছে সুজিৎ; কপালে হাত দিয়ে দেখল মহুয়া, না জ্বরও আসে নি। পাশের ইজিচেয়ারে বুকের ওপর খোলা বই রেখে ঘুমোচ্ছে অভিজিৎ।

মহুয়া এক মিনিট দাঁড়াল; অভিজিৎ-এর এলোমেলো চুল সন্তর্পণে সরিয়ে দিল চোখের ওপর থেকে, তারপর টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে শান্ত মনে ওপরে উঠে এলো।

* * * *

হীরেন্দ্রনাথ বললেন আবার সেই মীরাটেই ট্রান্সফার করল রে বুড়ি।

ট্রান্সফার! মীরাটে!

খুশি হতে গিয়েও হতে পারল না মহুয়া; মীরাটে, তার মানে আর কোলকাতায় নয়, দূরে অনেক দূরে অভিজিৎ-এর থেকে ন'শ মাইল দূরে চলে যেতে হবে।

না বাবা, হঠাৎ যেন সব ভুলে গেল মহুয়া।

না বাবা, মীরাটে যাব না, বড় দূর।

পাগলী, যেতে যে হবেই গভর্নমেণ্টের হুকুম।

চাকরী ছেড়ে দাও বাবা।

তাই ত' চাই মা, পারি কই? এখন যুদ্ধ বেধেছে, রিটায়ার্ড অফিসারদের অবধি ডেকে পাঠাচ্ছে, এখন ত' ছাড়তে চাইলেই ছাড়তে দেবে না।

যেতেই হবে বাবা?

হ্যাঁ মা যেতে হবে বৈ কি, আর এক মাসও সময় নেই, সব গুছিয়ে নে আস্তে আস্তে।

আমার কেমন ভয় হচ্ছে মৌ।

যাবার আগে হামিদের বাড়ির সেই ছাদের ঘরে মহুয়াকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে বলেছিল অভিজিৎ।

মনে হচ্ছে তুমি বদলে যাবে, হয়ত আমায় ভুলে যাবে। অভিজিৎ-এর সবল দুই পুরুষ বাহুর মধ্যে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল মহুয়া।

তোমায় কখনও ভুলতে পারি?

তা হ'লে বল কবে আমার ঘরে আসবে?

তোমায় ত' বলেছি তুলতুলির বিয়ে না দিয়ে না, না; অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না আমি, তারপর একটু থেমে ম্লান হেসে বলেছিল, অবশ্য এই ষাটটাকা মাইনের স্কুল টিচারের ঘরে তোমায় ডাকা হয়ত উচিত নয়।

আবার!

মহুয়া সেই প্রথম দিনের মতই ওর মুখে হাত চাপা দিয়েছিল।

বলেছি না, তোমার কাছে থাকব, তোমার পাশে, তাতেই আমি সুখী, আমার জীবন ভরে যাবে।

কিন্তু তোমার বাবা?

বাবাকে মত করাব।

আমার বিশ্বাস হয় না, আমার ত' ওঁকে দেখলেই ভয় করে।

বা:, বাবা খুব ভাল লোক, মা মারা যাবার পর থেকে একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন, আর জান, সেইজন্যেই তো এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতেও চাই না। বলে ফেলেই ভারি লজ্জা করল মহুয়ার; কি করে অভিজিৎ-এর সামনে বিয়ে কথাটা উচ্চারণ করল সে?

কিন্তু মৌ! আমার আর ভাল লাগে না একা একা।

আমারই কি লাগে?

অভিজিৎ-এর হাতের মধ্যে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মহুয়া।

ভাল তারও লাগে না, অনুক্ষণ মন ঘোরে অভিজিৎ-এর কাছে কাছে; আশ্চর্য! মহুয়ার অবাক মনে হয়; এত শীগগির এত সহজে মার বিয়োগব্যথা ভুলতে পারল সে? এখনও দু' বছর হয় নি, এরই মধ্যে···

মৌ! আমি যাব তোমার বাবার কাছে?

বাবার কাছে? কেন?

তোমায় প্রার্থনা করতে।

না, না, এখন না, লক্ষ্মীটি। এখন না।

কেন? তবে কবে?

আমরা ফিরে আসি;

তোমাদের ত' ফেরার কিছু ঠিক নেই।

মাস ছয়েক বাদে আবার বাবার ট্রান্সফার হয়ে যাবে এখানেই।

এ তোমার উইসফুল থিঙ্কিং।

না, না, সত্যি। আর তা ছাড়া তুলতুলির পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে ও থাকবে বুড়ি মাসীমার কাছে, এ বাড়িতে ত' খালি ভানুদি; আর আয়াকে নিয়ে যাব আমি।

তাতে কি?

মানে পাকাপাকি ব্যবস্থা একটাও না, তাই আশা হয় খুব শীগগিরই ফিরতে পারবে বোধ হয়। কিন্তু খুব শীগগির ফেরা হবে বলে মনে হোল না মহুয়ার।

তিন মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল; ঠিক দেখতে দেখতেও নয়; মনে মনেই বলল মহুয়া। তিনমাস না তিনযুগ? কতদিন, কতদিন, দেখে নি সেই ধবধবে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী, সেই হাওয়ায় ওড়া এলোমেলো চুল, সেই শান্ত সুন্দর চোখ।

অভিজিৎ! অভিজিৎ! মনে মনে যেন ধ্যান করে মহুয়া, ভারি ইচ্ছে করে কাউকে বলে তার মনের কথা; তার প্রথম প্রেম, তার একমাত্র প্রেমের সফল ইতিহাস।

মৌ! মৌ বাবা!

হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকলো আয়া।

কি, কি হোল!

আরে জলদি করো!

জলদি করব! কেন? কিসের জন্য।

আরে ও লোগ আ গিয়া!

কোন লোক?

আরে ও সাহাব, তোমারা দুলহা!

মহুয়ার দুলহা? অর্থাৎ বর। কে? অভিজিৎ। যেন বেরিয়ে গেল অজ্ঞাতে মহুয়ার মুখ দিয়ে।

আয়া মুহূর্তকাল অবাক হয়ে চেয়ে থাকল মহুয়ার মুখের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, নেহি।

কে তবে দুলহা এল?

ও সাব যো লাহোর মে রয়হতা, বহৎ বড়া সাব হ্যায় না?

ও! এবার মহুয়া বুঝতে পেরেছে, সেই রঞ্জন চ্যাটার্জী।

কিন্তু কেন? সে ভদ্রলোক হঠাৎ এখানে এলেন কেন? এখানে তাঁর কি দরকার? কি চান তিনি।

মৌ বাবা! জলদী কাপড়া বদলকে মু সাফ কর লেও, আওর ফি চা লেকে চলা যাও।

যা তুই এখান থেকে, কিছু করতে পারব না আমি, চীৎকার করে উঠল মহুয়া। হঠাৎ ক্ষেপে উঠল যেন; ওর ইচ্ছে করল ছোটবেলার মত আয়ার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করে কাঁদে, হাত-পা ছুঁড়ে নিজের আপত্তি জানায়।

মহুয়ার উত্তেজিত মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে কি যেন বুঝে নিল আয়া, তারপর শীর্ণ শির-ওঠা হাতে ধীরে ধীরে মহুয়ার মাথায় হাত বুলোল। বেটি, এ্যায়সি নহি কর না; তারপর অনেক বোঝাল আয়া। মহুয়ার ইচ্ছে না-হয় নাই বিয়ে করবে, কিন্তু একজন ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছেন, তার সঙ্গে অভদ্রতা করে লাভ কি? একজন ভারী সাহাব তো বটে।

একটু পরে বাবাও এলেন, কি খুশি খুশি মুখ বাবার, কি উজ্জ্বল চোখ, অনেকদিন, অনেকদিন পরে মহুয়া বাবার এমন আলোভরা মুখ দেখল।

মৌ? মা! কি করছিস?

কিছু না বাবা, মহুয়া মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে, না বাবার সামনে উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভ নেই; এখন না, পরে রাত্রে শোবার আগে যখন বাবার চুলে মহুয়া আস্তে আস্তে হাত বুলোবে, দুধটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবার জন্য অনুযোগ করবে, আর বাবা বলবেন, যা, মা যা, রাত হয়েছে শুতে যা।

তখন ঠিক বাবার বিছানার পাশ থেকে উঠে আসবার আগে মহুয়া বোলবে বাবাকে, সব কথাই বলবে। বলবে অভিজিৎ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয় মহুয়ার পক্ষে। বলবে অভিজিৎ-ই তার স্বামী (না একথাটা বাবার সামনে উচ্চারণ করতে লজ্জা করবে তার), আর বলবে অভিজিৎ কত ভাল, কত মহৎ, সামান্য স্কুল-মাস্টারী করে জীবিকা নির্বাহ করে সে; তার আই সি এস কাকার দেওয়া সরকারী অফিসের বড় চাকরী প্রত্যাখ্যান করেছে সে। গোলামী, ইংরেজ সরকারের গোলামী সে করবে না, আর এই জন্যে মহুয়ার আরো এত ভাল লাগে তাকে। সে আদর্শবাদী, সে উন্নত, উদার যথার্থ পুরুষ। হ্যাঁ বলবে মহুয়া, আজ রাত্রেই সব খুলে বলবে বাবাকে।

কিন্তু সেই রাত্রেই বলা সম্ভব হোল না। রঞ্জন চ্যাটার্জী আর তার ছোট ভাই এক দিনের জন্য অতিথি হলেন মহুয়াদের বাড়িতে, কোলকাতা যাবার পথে। আর তারপরও দিন-কয়েক ধরে মহুয়া শত চেষ্টা করেও কিছুতেই বাবার সামনে আনতে পারল না অভিজিৎ-প্রসঙ্গ। বাবা যদি রঞ্জন চ্যাটার্জীর কথা বলতেন, মহুয়ার বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতেন তবে হয়ত সহজ হোত, হয়ত মহুয়া বলতে পারত, জানাতে পারত বাবাকে তার মনের কথা, কিন্তু আশ্চর্য!

দু'দিন ধরে বাবা এসব প্রসঙ্গের ধার দিয়েই গেলেন না; বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধের পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, কোলকাতায় মানুষের ভিড় এইসব নিয়েই আলোচনা চালালেন। আর তারপরই রেডিও'র এক খবরে স্তম্ভিত হয়ে গেল মহুয়া।

বোমা পড়েছে কোলকাতা শহরের বুকে, একবার, দু'বার চারবার বোমা পড়ল। আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাস মহুয়া (রেডিওর সামনে থেকে নড়তে পারত না, শুনত লোক পালাচ্ছে, বন্যার স্রোতের মত মানুষের ভীড় হাওড়া স্টেশনের দিকে, যে যে দিকে পারছে পালাচ্ছে। প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করছে লোকজন, অসম্ভব দাম দিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটছে হাঁটাপথে, গাড়িতে, যে যেভাবে পারে কোলকাতা থেকে পালাতে চাইছে; একবার দুবার তিনবার মানুষের উন্মত্ত স্রোত এমনি ভাবে ছুটোছুটি করল, তারপর আবার শান্ত হয়ে গেল সব, মেনে নিল ভাগ্যকে। বোমা যদি আবার পড়ে ত' পড়বেই কি আর করা যাবে! তাই বলে বাড়িঘর ছেড়ে বিদেশে গিয়ে আবার অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে পা বাড়াতে সাহস হোল না বেশির ভাগ লোকেরই।

এ সমস্ত খবরই রেডিও, খবরের কাগজ মারফৎ ছাড়াও অভিজিৎ-এর চিঠিতেই মহুয়া পেয়েছে; আরো একটা খবর পড়ে মহুয়ার মন ভারী হয়ে উঠল; এই বোমার জন্যেই অভিজিৎ-এর স্কুল উঠে গেছে, আপাতত ও বেকার। প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করছে।

এদিকে বাবাকেও কিছু বলা হোল না, আর বলবেই কি? ভারতের রাজনীতি নিয়ে বাবা এত ব্যস্ত অনুক্ষণ অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন, ইংরেজের গোলামী করতে হচ্ছে বলে।

অভিজিৎ-এর চিঠি পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে মহুয়া বুঝতে পারে কোলকাতায় জীবনটা কেমন এক উত্তেজনার মধ্যে কাটছে; মহানগরে—সেখানে মহাজীবনের গান বাজছে, আর উত্তরপ্রদেশের এই ছোট্ট টাউনটাতে? না কিছু নয়, কিছু নেই; বিস্তৃত টেনিস লনে মালী তেমনি পাইপে করে জল দিচ্ছে, ঘাস ছাঁটছে, নিলিটারী ডেয়ারীর মাখন, ঘন দুধ বাড়ি বয়ে দিয়ে যাচ্ছে, কাশ্মীরী চালের পোলাও চড়ছে বড় ডেকচিতে, মহুয়ার ভাল লাগে না মন উধাও হয়ে যায়, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বড় শিশুগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে মহুয়ার। আশ্চর্য! বারো বছর পরে এসেও বাবা আবার সেই পুরোনো বাংলোটাই পেলেন। সাতদিন ওরা ছিল বরাল হোটেলে, তারপরই আবার সেই পুরোনো বাড়ি; পুরোনো জায়গা, পুরোনো লোকজন। গিরিধারীটাও এসে জুটেছে। আর আশ্চর্য! মা নেই, তবুও বাবা যেন এই বাড়িতে অনেক বেশি আনন্দে স্বস্তিতে আছেন। এমন কি সেদিন বললেনও। আখ মৌ! ভাবছি এখান থেকে আর যাব না কোথাও। Mr. Clarke-এর সঙ্গে কথা বলেছি, বাড়িটা কিনেই নিই, রিটায়ার করবার পর ভাবছি বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিই।

বাঃ, কোলকাতায় নিজেদের বাড়ি ফেলে, মহুয়ার চোখে সত্যি জল এসে যায়। মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছেন লাভলক প্লেসের ঐ বাড়ি, আর মার নিজের হাতে সাজানো, প্রতিটি কোণ পর্যন্ত, তা ছাড়া কোলকাতায় অভিজিৎ আছে না!

না বাবা, কোলকাতা ছেড়ে কোথাও ভাল লাগে না।

হঠাৎ বাবা একটা কথা বলে বসলেন, কিন্তু কোলকাতা অত ভাল লাগলে চলবে কেন মৌ! থাকতে ত' হবে তোমায় আপাতত লাহোরে।

লাহোরে? কেন?

ওঃ। মনে পড়ল মহুয়ার, আর হঠাৎ ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল মহুয়া, না বাবা না, আমি কোথাও যাব না, আমার বিয়ে দিও না! না···আ···

আরে পাগলী! হীরেন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কাঁদছিস কেন? কাঁদবার কি আছে?

বাবা।

কি মা?

মহুয়া বলবার চেষ্টা করল, বারবার ডাকল 'বাবা' কিন্তু কই? জিভের আগায় এসেছে কথাগুলো, কিন্তু কেন কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারছে না মহুয়া—

বাবা! অভিজিৎ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না আমি, আর কাউকে না!

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বারবার বালিশে মুখ ঘষে মহুয়া ডাকল—অভিজিৎ, অভিজিৎ!

প্রার্থনা করল মনে মনে।

বল দাও ঈশ্বর, শক্তি দাও, বাবাকে মুখ ফুটে মনের কথা জানানোর মত শক্তি দাও।

*　　*　　*　　*

কিন্তু বাবাকে মুখ ফুটে মহুয়ার আর জানাতে হোল না, বাবাই অদ্ভুত উপায়ে জানলেন।

মহুয়াকে লেখা অভিজিৎ-এর একটা চিঠি ভুল করে বাবা খুলে ফেলেছিলেন, সম্বোধন দেখে চমকে উঠে কিছুটা পড়েও ফেললেন, আর তারপরই বাবার মুখ থমথমে হয়ে উঠলো, হাত থেকে চিঠিটা ঠক করে মাটিতে পড়ে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে আয়া টেবিল পরিষ্কার করছিল, বাবার বজ্রহুঙ্কারে চকিত হয়ে হাত থেকে বড় ফুল আঁকা প্লেট মাটিতে ফেলে দিল, বাবা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—মৌ বাবাকো বোলাও!

বাবার সেই রোষগম্ভীর স্বরে, ভাঙা প্লেটের ঝনঝনানিতে

গিরিধারী ছুটে এলো, মহুয়া ছুটে এলো, মালী বাগানে কাজ করতে করতে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

তুম লোগ সব যাও!

বাবা হাত তুলে দরজা দেখিয়ে দিলেন তাদের। গিরিধারী চলে গেল মালী চলে গেল শুধু আয়া টেবিলে এক হাত রেখে মহুয়ার পাশে এসে দাঁড়াল, যেন ও বুঝতে পেরেছে সাব আজ কিছু বলবেন মহুয়াকে। হয়ত প্রচণ্ড ভর্ৎসনাই করবেন। এ সময় মহুয়ার পাশে আয়ার থাকা প্রয়োজন।

মহুয়া বাবার কাছে এগিয়ে আসতে চাইল, বলতে চাইল 'বাবা কি হয়েছে?' কিন্তু আবারও ওর গলা দিয়ে স্বর ফুটল না, ব্যাকুল চোখ তুলে শুধু ও বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবা হাত তুলে খামশুদ্ধ চিঠিটা মহুয়ার গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিলেন, ঠক করে সেটা মহুয়ার গা বেয়ে মাটিতে এসে পড়ল, আর নীচু হয়ে খামটা কুড়োতে গিয়েই মুহূর্তে মহুয়া বুঝতে পারল সব। আশ্চর্য কোথায় গেল মহুয়ার ভয়? কোথায় সঙ্কোচ? সহজ স্বরেই সে হীরেন্দ্রনাথকে বলল, বাবা, এই কথাই আমি সেদিন তোমায় বলতে চেয়েছিলাম, অভিজিৎকে আমি কথা দিয়েছি।

কথা দিয়েছ? হীরেন্দ্রনাথ গর্জে উঠলেন। একটা ভ্যাগাবণ্ড লোফার, তাকে তুমি কথা দিয়েছ!

ভ্যাগাবণ্ড লোফার নন তিনি।

বাবা আর শেষ করতে দিলেন না।

মহৎ পুরুষ!

বাবা যেন জলে উঠলেন।

তুমি কথা দিয়েছ, আর আমি কথা দিই নি? তোমার মা কথা দেন নি?

জানি বাবা, কিন্তু—

কোনদিন তোমাদের কিছু বলি না বলে। হীরেন্দ্রনাথ বলেই চললেন, আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছো সব! ভাই এক ট্যাঁস বিয়ে করলেন, আর ইনি এক হদ্দরপরা ভ্যাগাবণ্ডকে বেছে নিয়েছেন। একটা দুশ্চরিত্র লম্পট···

বাবা!

মহুয়ার আর্ত চীৎকার বাগানের শেষ প্রান্তেও যেন শোনা গেল। আয়া ব্যতিব্যস্ত হয়ে মহুয়ার পিঠে হাত বোলাতে শুরু করল, মৌ চুপ যা, চুপ যা, সাব কা মুখে বাত করনা ঠিক নেই হ্যায়। কিন্তু আয়ার সদুপদেশ শোনার মত মনের অবস্থা তখন মৌর নেই, মহুয়া বলেই চলল, ভ্যাগাবণ্ড—

ভ্যাগাবণ্ড তিনি নন, লোফার দুশ্চরিত্রও নন, তুমি কিছুই না জেনে।

সব জানি, এই সব 'রিফর্যাফ'দের জানতে আর আমার বাকি নেই, তা ছাড়া হীরেন্দ্রনাথ ফিরে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য শান্ত গলায়বললেন, তুমি ঐ বদমাইসটাকে কথা দেবার অনেক আগেই তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আর সে বিয়ে ঠিক করেছেন তোমার মা নিজে, সুতরাং তার অন্যথা কোনক্রমেই হতে পারে না; আমি তাকে আজই লিখছি, যত শীগগির সম্ভব এখানে এসেই তোমায় বিয়ে করে নিয়ে চলে যাক।

হীরেন্দ্রনাথ আর দাঁড়ালেন না। রায় দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর মহুয়ার চোখের জল গড়িয়ে ঠোঁটে এসে পড়ল, মহুয়া দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে তার উদ্দেশ্যে যেন বলল, না কিছুতেই না।

খোখী! সাব কা বাত মান লো; ও চ্যাটার্জী ছোকরা ত' খুপসুরৎ ভি হায়।

না! চীৎকার করে উঠল মহুয়া, তারপরই কাঁদতে কাঁদতে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল: নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

* * * *

তারপর দুতিন দিন কাটলো একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে। মহুয়া বাবাকে খাবার দিচ্ছে, বাবার আফিস যাবার সময় হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে টুপি আগের মতই, নিজের হাতে বাবার জুতো ব্রাশ করে পায়ের কাছে রেখে যাচ্ছে; রাত্রে শুতে যাবার আগে দেখেছে বাবা দুধটা খেয়েছেন কি না, আলো জ্বালা রেখেই ঘুমুচ্ছেন কি না, সকালে সংসার খরচের টাকাও চেয়ে নিয়েছে; Mr. Clarkদের বাড়ি চা পানের নিমন্ত্রণের কার্ডটাও চোখের সামনে এনে দিয়েছে আফিস বেরবার আগে, কিন্তু কথা বলছে না।

হীরেন্দ্রনাথ দু'একবার সহজ হবার চেষ্টা করেছেন।

মহীতোষরা শনিবার দিল্লী যাচ্ছে। তোর কিছু কেনাকাটা করার থাকলে যেতে পারিস।

না।

সংক্ষিপ্ত দৃঢ় উত্তর মহুয়ার।

হীরেন্দ্রনাথ আবার বললেন।

একটা বাংলা ছবি দেখাবে রবিবার সকালে 'লোটাসে' টিকিট রাখতে বলব? যাবি?

সেই এক ছোট্ট উত্তর।

না।

সেদিন সকালে বন্দুক পরিষ্কার করতে করতে হীরেন্দ্রনাথ হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠলেন।

কি না, না করিস দিনরাত সবেতে; হয়েছে কি তোর? দিনরাত বসে বসে ঐ রাস্কেলটার কথা ভাবা হচ্ছে!

মহুয়া চুপ।

আজকাল মহুয়া সামান্যতম প্রতিবাদও করে না বাবার কথার, কিন্তু তার পাথর কঠিন মুখ দেখে বোঝা যায় সে তার সঙ্কল্পে অটল, চিন্তায় স্থির।

আজই সব গোছগাছ শুরু কর, পনেরো দিনের জন্যে আমরা যাব মুসৌরি।

না।

কি?

হীরেন্দ্রনাথ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, হঠাৎ বন্দুক তুলে নিলেন হাতের মধ্যে।

গুলী করে মেরে ফেলব তোমায়, খুন করে ফেলব ফের যদি ঐ রাস্কেলটার চিন্তায়।

সাব!

কোথায় ছিল আয়া, আর্ত চীৎকার করে ছুটে এসে পড়ল হীরেন্দ্রনাথের হাতের ওপর।

সাব!

দুম করে আওয়াজ হোল একটা, মাথার ওপর দিয়ে ফাঁকা আওয়াজ বেরিয়ে গেল, প্রায় মূর্ছিত আয়া হীরেন্দ্রনাথের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর হীরেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে দেখলেন নির্ভীক, নিষ্কম্প মহুয়া, তার কালো বড় বড় চোখে জলের চিহ্নমাত্র নেই, বিড়বিড় করে শুধু বলে চলেছে।

তাই মারো, মেরে ফেলো আমাকে, তবু নয়, কিছুতেই নয়।

হীরেন্দ্রনাথ বন্দুক ফেলে মহুয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মৌ! মা আমার। মৌ!

বাবা!...

এতক্ষণ পর ঝরঝর করে কেঁদে বাবার বুকে মুখ লুকোল মহুয়া।

সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন হীরেন্দ্রনাথ, শেষ চেষ্টা করলেন একবার বোঝাতে। এ হয় না মৌ, তুমি জান না, ও ছেলেটা ভাল নয়, ও একটা লোফার, ও তোমায় বিয়ে করে খাওয়াবে কি? একটু থেমে হেসে বললেন—তোমার যা কসমেটিক খরচা মাসে, তা ওর সারা মাসের ইনকাম কি না আমার সন্দেহ। তোমার ওডিকোলোনের খরচ জোটাতেই ত'—

ছেড়ে দেব বাবা। প্রসাধন না করেও, দামী জিনিস ব্যবহার না করেও লক্ষ লক্ষ লোক বেঁচে আছে পৃথিবীতে, আমিও বাচব। ছেড়ে দেব সৌখীন অভ্যাস।

ছেড়ে দেবে!

হীরেন্দ্রনাথ অবাক হলেন। মহুয়া ঘরে ঢুকলেই যে একটা হাল্কা মন-মাতানো ফরাসী সুরভির গন্ধে ঘর ভরে যায়। সে সুগন্ধ আর জড়িয়ে থাকবে না মহুয়াকে, মহুয়ার

বিছানা ঘিরে ওডিকোলনের যে ঠাণ্ডা আমেজ স্নেহস্পর্শের মত নাকে এসে লাগে, তা আর পাওয়া যাবে না মহুয়ার ঘরে ঢুকলে। আর কে জানে মহুয়ার ঘর বলতে যে শাদা ফুল আর গোলাপী পর্দার ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, তাও হয়ত আর দেখা যাবে না মহুয়ার নতুন বাড়িতে।

নতুন বাড়ি? হ্যাঁ, মহুয়ার নতুন বাড়ি। নিজের বাড়ি। কিন্তু মহুয়ার যে বাড়ি তিনি—তাঁরা ঠিক করেছেন, তাতে ঢুকতে রাজী নয় মহুয়া, কোথায় সে যেতে চায়? কেমন সে ঘর?

বাবা?

মহুয়ার স্বরের কাতরতা হীরেন্দ্রনাথের অন্তর স্পর্শ করল।

কি মা?

তুমি মত দাও বাবা।

মৌ!

হীরেন্দ্রনাথ মেয়ের মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিলেন; তুই ছেলেমানুষ, জীবনের কিছুই এখন জানিস না, অভিজিৎ অভিজিৎ করে ক্ষেপেছিস, কিন্তু ও কেমন লোক, কি করে, কোথায় থাকে জানিস কিছু?

সব জানি বাবা।

ওর বাড়িতেও গেছিস না কি?

না।

তবে?

সব জানি বাবা, ও খুব ভালো।

হীরেন্দ্রনাথ হাসলেন। মৌ! ওর সবকিছুই এখন তোর কাছে ভাল মনে হবে। কিন্তু ও সত্যিই একটুও ভাল নয়, শুনে রাখ আমার কাছে। আমি জানি, বুঝতে পারি···

না, বাবা না।

মহুয়া কান্নায় আকুল হলো, হীরেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকলেন। তারপর মহুয়ার মাথাটা কোল থেকে সোফার ওপর নামিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আবার বললেন হীরেন্দ্রনাথ, মৌ! ও তোর চাকর হবারও যোগ্য নয়।

বাবা!

মৌ শুধু আকুল হয়ে কাঁদে। বাবা জেনেছেন, বাধা দিচ্ছেন রাগ করছেন, এ অবস্থায় কেমন করে অভিজিৎকে চিঠি লিখবে মহুয়া। বাবার কথার প্রতিবাদ করতে পারে কিন্তু অমান্য করবে কোন স্পর্ধায়। সেই যে ছোটবেলা থেকে মা'র কাছে শিখে এসেছে—

'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ,
পিতাহি পরমং তপঃ…'

না, বাবাকে অমান্য করে অভিজিৎ-এর কাছে যেতে পারবে না সে, হয়ত বাবার মতের জন্য দীর্ঘকাল, সারাজীবনই অপেক্ষা করে থাকতে হবে মহুয়াকে, হয়ত কোনদিনই অভিজিৎ-এর সঙ্গে তার মিলন আর সম্ভব হবে না, তবু, তাও।…এই কথাই ভাবে মহুয়া, ভাবে আর চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজে ওঠে, আর হয়ত এমনি করেই আরো কতদিন কেটে যেত কে জানে, কিন্তু আবার একটা হৈ হৈ হোল, প্রবল আলোড়ন শুরু হোল মহুয়াদের শান্ত-নিস্তরঙ্গ সেই বড় বড় গাছেছাওয়া বাগানঘেরা বড় বাড়িতে।

মহুয়ার চিঠি না পেয়ে কেমন একটা আশঙ্কা এসেছে অভিজিৎ-এর মনে, ও আর থাকতে পারে নি, সোজা চলে এসেছে এইখানে হাতে স্যুটকেশ ঝুলিয়ে।

বারান্দায় বসে রবিবারের কাগজ পড়তে পড়তে চা খাচ্ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। আর আয়া পাশে দাঁড়িয়ে নীচু স্বরে বলছিল মহুয়াকে—এখনিই সেই 'বিলাইত পাস' সাহেবের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে জোর করা উচিত কি না, এমন সময় কাঁকরের রাস্তায় চটি জুতোর শব্দ তুলে অভিজিৎ এসে সামনে দাঁড়াল।

হীরেন্দ্রনাথ অভিজিতকে আগে কখনও দেখেন নি কিন্তু দেখবামাত্রই চিনতে পারলেন।

কি চাই তোমার! ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন হীরেন্দ্রনাথ।

অভিজিৎ হঠাৎ বুঝতে পারল না কেন এই অশিষ্ট তুমি সম্বোধন, কেন এই রুক্ষ আচরণ।

মহুয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

হীরেন্দ্রনাথ এবার কাগজ নামালেন, তুমিই অভিজিৎ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হুঁ, তা কোলকাতা থেকে ছুটে এসেছ শুধু মহুয়ার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে!

হ্যাঁ।

কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা ত' তোমার হবে না।

হবে না?

কলের পুতুলের মত যেন হীরেন্দ্রনাথের কথার পুনরাবৃত্তি করল অভিজিৎ।

দেখা হবে না?

না, তা ছাড়া…বোস তুমি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হীরেন্দ্রনাথের স্বর কোমল হয়ে এল, বোস, বোস।

বেতের বড় চেয়ারটায় আড়ষ্ট হয়ে বসল অভিজিৎ।

তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

বলুন।

ছাখ, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মহুয়ার বিয়ে অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে, আর সেখানেই—

কিন্তু মহুয়া কি…।

মহুয়া আবার বলবে কি? ও তো ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ!

এতক্ষণে হাসল অভিজিৎ।

ওর ত ঠিক একুশ বছর বয়েস হয়েছে না?

তার মানে? কি বলতে চাও তুমি।

ও আর ছেলেমানুষ নেই, এইটুকুই বলতে চাই।

না, ও এখনোও খুব ছেলেমানুষ, নিজের ভালমন্দ বোঝবার বয়স ওর এখনও হয় নি; তুমি, তুমি তার সুযোগ নিও না।

আমি মহুয়ার ছেলেমানুষির সুযোগ নিচ্ছি?

আমারও ত' তাই মনে হয়।

খবরের কাগজটা আবার চোখের সামনে মেলে ধরলেন হীরেন্দ্রনাথ।

দেখুন, আপনি বোধ হয়—

হাত তুলে অভিজিৎকে থামিয়ে দিলেন হীরেন্দ্রনাথ।

ছাখ, তোমায় ত বললাম মৌ'র বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, আর সেখানেই ওর বিয়ে হবে।

একবার মহুয়াকে ডেকে দিন, ওর সঙ্গে একবার আমি কথা বলতে চাই, জিজ্ঞেস করতে চাই!

উত্তেজনায় অভিজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বলেছি ত', তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না; না, কিছুতেই না।

বাবা!

হীরেন্দ্রনাথ চমকে ফিরে তাকালেন। মহুয়া কখন এসে ঘর আর বারান্দার মধ্যের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মৌ, ভেতরে যাও।

হীরেন্দ্রনাথ নিজেই উঠে দাঁড়ালেন।

তোমার এখানে থাকার কোনও দরকার নেই, তুমি ভেতরে যাও।

না বাবা, আমাকে একবার কথা বলতে দাও।

মৌ, খবরদার বলছি! হীরেন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলেন। ঐ লোফারটার সঙ্গে একটাও কথা বলবে না তুমি, যাও, ভেতরে যাও।

না; মহুয়ার জলেভরা চোখ যেন জ্বলছে।

না, ভেতরে আমি যাব না, আর উনিও লোফার নন, উনি, উনি…একটু থেমে যেন আবার দম নিয়ে বলল মহুয়া উনি আমার স্বামী।

কি?

হীরেন্দ্রনাথ যেন বজ্রাহত হয়েছেন।

কি বলছিস মৌ!

ঠিকই বলছি বাবা। মহুয়ার দু'চোখ জলে ভাসছে, গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে।

হ্যাঁ বাবা, মনে মনে ওঁকেই আমি,···আর কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে—

মহুয়া চেয়ারে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বাবার দিকে মুখ তুলে বলল।

হীরেন্দ্রনাথের বিস্ময়ের এবার আর সীমা রইল না। মহুয়া, তাঁর সেই মৌ, সে তার বাবার মুখের ওপর এমন নির্লজ্জের মত নিজের প্রণয়-সংবাদ ঘোষণা করতে পারল এক ভ্যাগাবণ্ডকে দেখিয়ে, উনি আমার স্বামী!

অভিজিৎও বিস্মিত, স্তম্ভিত। এতটাই যে ঘটনা গড়াবে তা ওর কল্পনারও বাইরে ছিল। বারান্দা ঘিরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা, মহুয়াই আবার কথা বলল, বাবা তুমি অনুমতি দাও, আমি, আমি···

কি করতে চাও তুমি? শান্ত স্থির গলা হীরেন্দ্রনাথের।

এইবার অভিজিৎ এগিয়ে এল হীরেন্দ্রনাথের সামনে, আমি মহুয়াকে প্রার্থনা করছি আপনার কাছে।

তুমি, তুমি বিয়ে করতে চাও মহুয়াকে?

অস্ফুটে প্রায় কানে কানে বলার মত করে বললেন হীরেন্দ্রনাথ।

হ্যাঁ বাবা।

মহুয়া এবার এসে হীরেন্দ্রনাথের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

বাবা, আমি সুখী হব, আমি আনন্দে থাকব ওঁর সঙ্গে।

পারবি তুই, এত কষ্ট সহ্য করতে?

আমার কোন কষ্ট হবে না বাবা!

বেশ!

একটা লম্বা নিঃশ্বাস পড়লো হীরেন্দ্রনাথের।

তবে তাই হোক। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ একটু থামলেন, পাশ ফিরে ঘরের দিকে দেখলেন যেখানে রাধারাণীর বড় ফটোটা ঝুলছে দেয়ালের গায়ে, তারপর মহুয়ার দিকে আবার ফিরলেন।

আমার মত নেই তোমার এ বিয়েতে, তবে বাধাও আমি আর দেব না, তোমরা এই বাড়ি থেকে দূরে কোথাও, কোলকাতা বা যেখানে খুশি গিয়ে বিয়ে কর, যা খুশি কর, কিন্তু এখানে নয়, আমার এই বাড়িতে আর নয়।

হীরেন্দ্রনাথ কাগজটা টেবিল থেকে তুলে দৃঢ়পায়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন, আর এতক্ষণের নির্বাক দর্শক আয়া মৌ'কে জড়িয়ে ধরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল।

মৌ, তু, তু সাবকো এ্যাতনা দুখ ক্যায়সে দিয়া···।

গাড়িতে একটু মনমরা হয়েছিল মহুয়া; বাবাকে এত টা

দুঃখ ও দিতে চায় নি, ঠিক এমনভাবে চলে আসতেও ওর বেধেছিল, কিন্তু এ ভাবে বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কি-ই বা উপায় ছিল মহুয়ার? বাবা যে অনুক্ষণ ওকে জোর করছিলেন সেই তাঁর ঠিক করা চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টকে বিয়ে করতে। বারবার বলেছিলেন, মনে করিয়ে দিয়েছিলেন বাবা যে পাত্রটি রাধারাণী নিজেই পছন্দ করে গেছেন। একে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ রাধারাণীকে অপমান করা। তা ঠিক, মহুয়াই কি তা জানে না, কিন্তু রাধারাণীই কি তাকে আরো এক শিক্ষাও দেন নি? সতীত্বই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম। আর সেই সতীত্ব, সেই একবস্ত্রভত্য কি করে রক্ষা করবে মহুয়া, যদি সে বাবার বাধ্য হতে চায়? দ্বিচারিণী? ছিঃ ছিঃ! রাত্রে নিজের ঘরে শুয়ে বারবার ধিক্কার দিয়েছে মহুয়া দ্বিচারিণীত্বের সম্ভাবনাকে; প্রাণ গেলেও নয়; বাবা মহুয়াকে গুলী করে মেরে ফেলতে পারেন, সারাজীবন অভিজিৎ-এর থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে পারেন, কিন্তু পারেন না মহুয়াকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করাতে। দ্বিতীয়? হ্যাঁ দ্বিতীয়ই ত'? অভিজিৎকে সে ত' মনে মনে স্বামী বলেই স্বীকার করে নিয়েছে। কেন এই সহজ সত্যটা বাবা বোঝেন না? কেন?

মৌ?

জানলায় মহুয়ার হাতে হাত রেখে অভিজিৎ ডাকল আবার মৌ! কি এত ভাবছ!

কই, কিছু এমন না ত'।

অসুবিধে হচ্ছে তোমার? কি করব বল! দু'জনের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট অনেক লাগত, তাই···

কেমন যেন কুণ্ঠিত ভঙ্গী অভিজিৎ-এর।

এই! এসব কি বলছ?

না, অসুবিধে হচ্ছে তোমার; জীবনে এই বোধ হয় প্রথম ইণ্টার ক্লাসে চড়লে··

তা ঠিক, ইণ্টার কেন, সেকেণ্ড ক্লাসেও জীবনে চড়ে নি মহুয়া। ছোট থেকে ট্রেনে ট্রেনে অনেক ঘুরেছে মহুয়ারা, ফার্স্ট ক্লাস, স্পেশ্যাল কামরা সব জানা আছে তার। সেই রেলগাড়ির কামরার মধ্যে ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়তেন বাবা, মা তুলতুলিকে ছোট্ট বিছানায় শুইয়ে মাথায় হাত চাপড়ে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়াতেন, আয়া বাক্স গোছাত, টিফিন সাজাত, মহুয়া আর মহুয়ার দাদা সেই ছোট্ট কামরার ভেতরেই ছুটোছুটি করে খেলা করত। প্রতি স্টেশনে লোক ডেকে কামরা ঝাড়া-মোছা করাতেন মা, আর তাদের এক-দু'দিনের ট্রেন-বাসও কি আরামের, কি পরিচিত সংসারের স্বাদ এনে দিত।

ট্রেন চড়লেই মহুয়ার মাকে বড় বেশি মনে পড়ে যায়। মহুয়ার চোখ জ্বালা করে জল এলো।

মৌ! কাঁদছ? কষ্ট হচ্ছে? মন কেমন করছে বাবার জন্যে? খারাপ লাগছে?

ছিঃ ছিঃ, খারাপ লাগবে কেন!

মহুয়া চমকে ফিরে তাকাল; খারাপ লাগবে কেন যখন অভিজিৎ সঙ্গে আছে? যেখানেই থাকুক যেমন ভাবেই থাকুক অভিজিৎ-এর দর্শনমাত্রই যে স্বর্গসুখ মহুয়ার। মন কেমন? তা একটু করছে বৈ কি! কে দেখবে বাবাকে এখন? কে করবে তাঁর খাওয়া-শোওয়ার তদারক? আয়াটা যা বুড়ি হয়েছে।

মৌ! তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে, দাঁড়াও এই সামনের স্টেশনেই খাবার কিনে নেব।

খিদে পেয়েছে? না ত'! আশ্চর্য! আগে ত' মহুয়ার ট্রেনে চড়লেই খিদে পেত; অসম্ভব খিদে পেত—মহুয়া আর মহুয়ার দাদার, কেলনারের বাঁধা বরাদ্দ চারবার যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও যখন তখন স্টেশনের নানারকম নয়নলোভন খাদ্য, তা ছাড়া টিফিন-কেরিয়ারে ভর্তি রাধারাণীর নিজের হাতের তৈরি কতরকম যে মিষ্টি আর নোনতা।

মৌ!

অভিজিৎ মহুয়ার হাতের ওপর আবার হাত রাখল! মহুয়া তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। সামনের সৈনিক ছেলেটি কেমন একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে মহুয়াদের দিকে, আর সারা কামরা ভর্তিই ত' খালি সৈনিক আর সৈনিক। তবু ভাল এরা সবাই ভারতীয় ছেলে, না হলে কেন জানি সৈন্যদের দেখলেই মহুয়ার ভয় করে। আর কোলকাতায় এখন যে সব নিগ্রো সৈন্যরা ঘুরে বেড়ায়। সারা কোলকাতা সহরের চেহারাটাই কেমন বদলে গেছে, গাড়ি নিয়ে রেড রোডের ওপর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে যাওয়া আর সম্ভব নয়, রেড রোড বন্ধ, সেখানে এরোপ্লেন নামে, নিউমার্কেটে বন্ধুদের সঙ্গে ফুল কিনে ডালমুট খেয়ে আর ঘুরে বেড়ানো যায় না, সব নিগ্রো সৈন্যে ভর্তি, বালিগঞ্জে মাঠের মধ্যে ঝরাপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান যায় না, সম্ভবও নয় আর, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সব বন্ধ। বালিগঞ্জ মাঠ এখন মিলিটারী বেশ।

এ কোলকাতা নতুন কোলকাতা, এর সঙ্গে মনে হয় মহুয়ার পরিচয় নেই, তবু এই কোলকাতাতেই ফেরার আনন্দে সর্বাঙ্গে যেন সুখের শিহরণ অনুভব করল মহুয়া। কতদিন—কতদিন যেন কোলকাতা ছেড়ে বাইরে ছিল মহুয়া। একবছর! হ্যাঁ, প্রায় একবছর কোলকাতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। দীর্ঘ বিরহের পর এই মিলন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল মহুয়া। এসে গেছে, মহুয়ারা প্রায় পৌঁছে গেছে কোলকাতায়। এই ত' সেই শ্যাওড়াফুলি, শ্রীরামপুর আর ঐসব পরিচিত চেহারারা।

আস্তে আস্তে গাড়ি ঢুকলো হাওড়া স্টেশনে, আর দূর



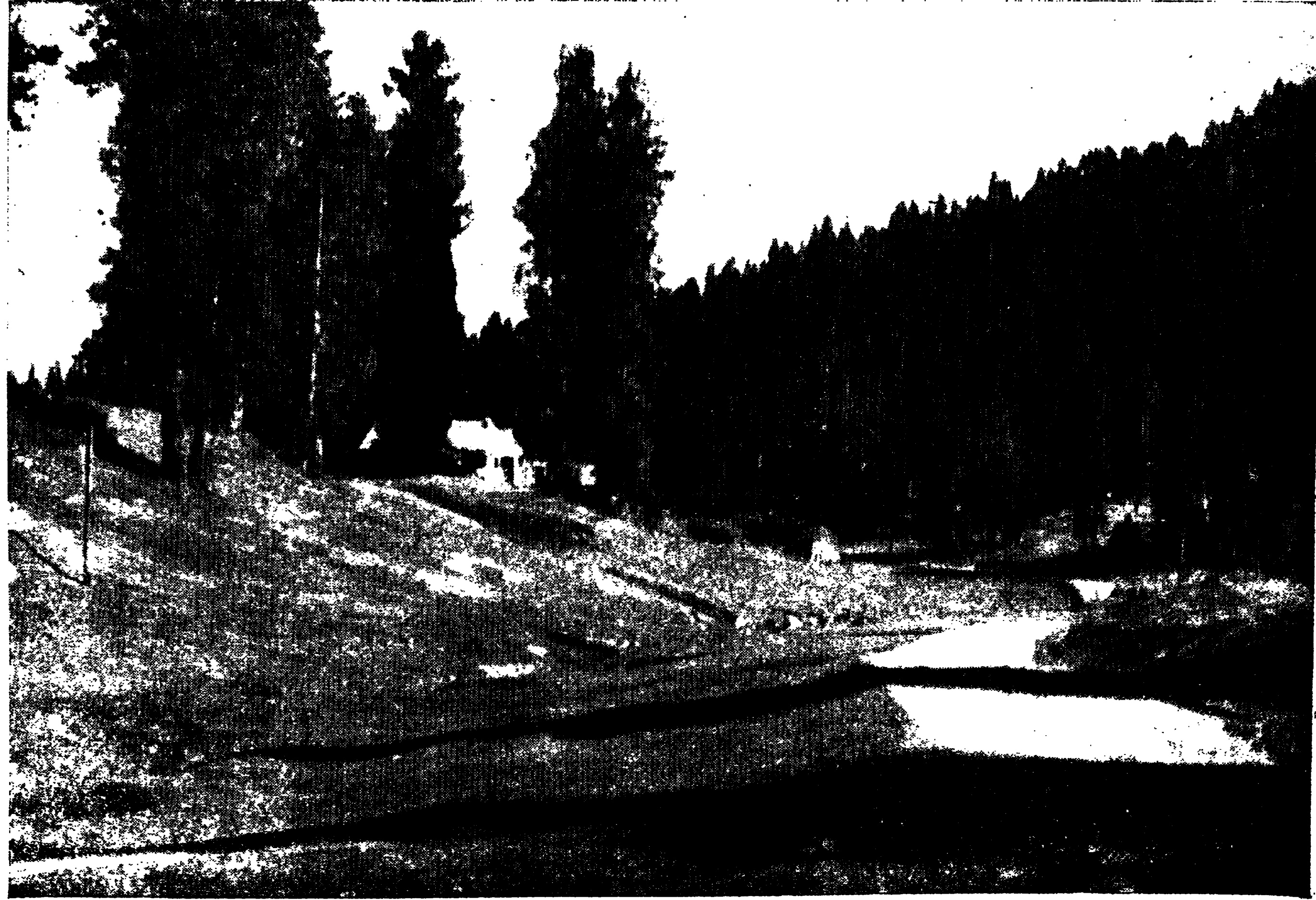
নেপথ্যে

—দীপক চাকলাদার

আলোকচিত্র

গুলমার্গ (কাশ্মীর)

—অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়



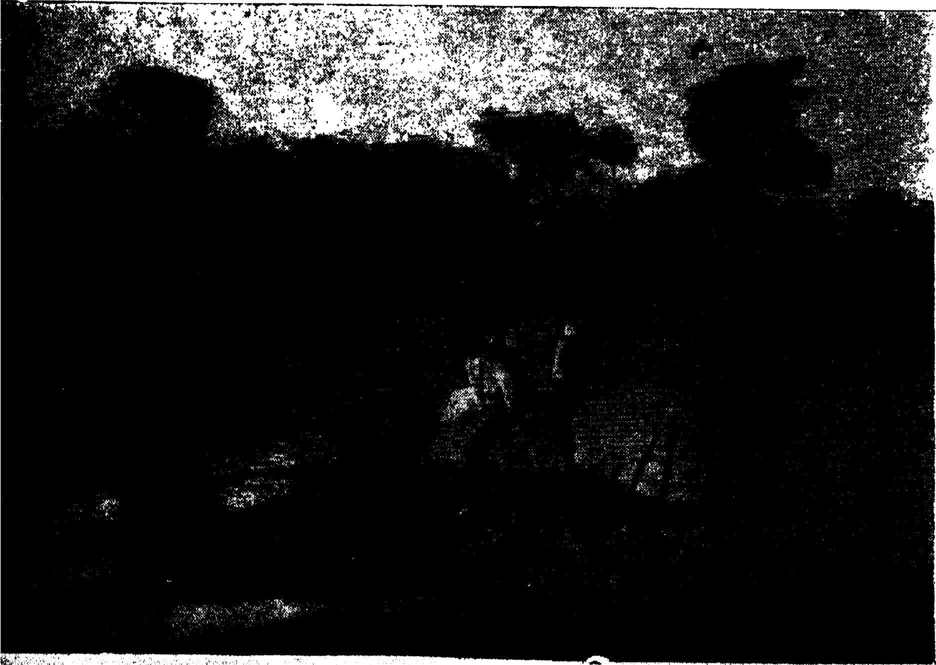
সাৎসুমা (পুষ্পাধার)





দুষ্টু হাসি —বেলা সেন

উচ্ছ্বাস —আশু ভট্টাচার্য



থেকে হাওড়ার পুল দেখেই যেন কত স্বস্তি, কত আনন্দ। মহুয়া আবার চেয়ে দেখল পাশে; হ্যাঁ অভিজিৎ পাশে আছে বলেই আজ ওর এত তৃপ্তি, এত আনন্দ; না হলে কি মানে হয় এই কোলকাতার যেখানে মা নেই, দাদা নেই, ওর খনিক-পাওয়া একান্ত প্রিয়বন্ধু রিটাও নেই।

হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাসে উঠতে গিয়েই থমকে গেল মহুয়া। এ কি! ফুটপাথ জুড়ে এ কারা বসে! মানুষ না মানুষের কঙ্কাল? আর এ কি দীর্ঘ আর্তনাদ! ময়লা আঁচল পেতে পেতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কে?

মাগো!

শিউরে উঠে মহুয়া দু'হাতে চোখ ঢাকল, ভিখারী মেয়েটির সমস্ত শরীরে হাড় ছাড়া কিছু নেই, হাতে ধরা শিশুটিও তাই, মা'র প্রায় মিলিয়ে-যাওয়া বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রাণপণে অমৃত আহরণের ব্যর্থ চেষ্টায় থেকে থেকে গোঙানীর মত আওয়াজ করছে শুধু।

চলে এস। অভিজিৎ মহুয়ার হাত ধরে টানল।

ভিখারী মেয়েটা তখনও অদ্ভুত নাকিস্বরে বলে চলেছে, খেঁতে দে মা, খেঁতে দে—

মহুয়া অভিজিৎ-এর হাত ছাড়িয়ে এক মুহূর্ত ভাবল; তার কাছে ত' কিছুই নেই, সে ত' একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে; তবে? অভিজিৎ-এর কাছে চাইবে? কিন্তু···। অভিজিৎ কেন দাঁড়িয়ে আছে চপ করে? ও কেন কিছু করছে না। হঠাৎ মনে পড়ল মহুয়ার, আসবার সময় দৌড়ে দৌড়ে গেটের কাছে এসেছিল আয়া, মহুয়ার হাতে জোর করে গুঁজে দিয়েছিল যা ছিল আয়ার কাছে—কুড়িটা টাকা আর ভারী সেকেলে সোনার দুল একজোড়া।

মহুয়ার চোখে জল এসেছিল, কেন দিচ্ছিস আমায় এসব তুই! তোর ত' আর কিছুই রইলো না!

প্রত্যুত্তরে মহুয়াকে জড়িয়ে ধরে কান্নাভেজা গলায় আয়া দুঃখ করেছিল, এভাবে দুলহার ঘরে যাবে মৌ, রাধারাণীর আদরের বিটিয়া মৌ!

মনে পড়ল মহুয়ার সেই কুড়িটা টাকার কথা, ব্যাগ খুলে উপুড় করে দিল ভিখারী মেয়েটার হাতের ওপর। মেয়েটা অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল মহুয়ার মুখের দিকে, তারপরই হঠাৎ কি জানি মনে করে, একেবারে পেছন ফিরে দৌড় দিল বাচ্চাটাকে জোরে বুকে চেপে ধরে।

ভারি মজার ত'!

মহুয়া ঘাড় ফেরাতেই দেখল কেমন একটা শক্ত মুখ করে অভিজিৎ চেয়ে আছে মহুয়ার দিকে, আর মহুয়ার মনে হোল অভিজিৎ-এর সেই সুন্দর শান্ত মুখে যেন বিরক্তির, রাগের কালোছায়া।

অতগুলো টাকা ভিখিরীকে দিলে!

দেখেছ ওর চেহারাটা?

একটু থেমে একটু যেন সামলে নিয়ে অভিজিৎ বললো, এরকম চেহারা এখন অনেক দেখবে।

সত্যি! দূরে বসে কাগজেই পড়েছে মহুয়া বাঙলায় দুর্ভিক্ষ এখন; কিন্তু পেশোয়ারী চালের পোলাও আর মিলিটারী ডেয়ারীর দুধ-মাখন খেতে খেতে ভাবতেও কি পেরেছে, দুর্ভিক্ষ মানে কি? কি তার চেহারা; কেমন তার রূপ।

কি ভাবছ দাঁড়িয়ে? চলে এস!

অভিজিৎ হাত ধরে টানল।

বাসটা ছেড়ে দিলে, মিথ্যে মিস করলাম! অভিজিৎ-এর গলায় যেন অভিযোগের সুর।

অভিজিৎ কি রাগ করেছে মহুয়ার ওপর? বিরক্ত হয়েছে?

মহুয়া অভিজিৎ-এর দিকে তাকাবার চেষ্টা করল, আর হঠাৎ ওর দুই চোখ ছাপিয়ে জল এল।

এ কি তুমি কাঁদছ? ঘাড় ফিরিয়ে মহুয়ার জলেভরা চোখের দিকে তাকিয়ে ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেল অভিজিৎ।

মৌ, প্লীজ, আমি ত' কিছু মীন করে বলি নি, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী! পথের মধ্যেই অভিজিৎ হাত বাড়িয়ে মহুয়ার চোখের জল মুছিয়ে দিল, দাঁড়াও বাস নয় আর, একটা ট্যাক্সি ডাকি, এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি-ই!

গাড়িতে উঠে অভিজিৎ মহুয়ার হাত টেনে নিল, নিজের হাতের মধ্যে।

ছি, মৌ, এত ছেলেমানুষ তুমি! আমি কি তোমায় সত্যি কিছু বলেছি? ভেবেছিলাম বাসেই দিব্যি চলে যাওয়া যাবে, মালপত্র যখন সঙ্গে বিশেষ কিছু নেই।

আমি বলেছি ট্যাক্সি করতে? আমি ত', আমি ত'···

মহুয়ার ঠোঁট আবার ফুলে ফুলে কেঁপে উঠল অভিমানে।

ও তুমি, গাড়ির জন্য দাঁড়াও নি?

সন্দিগ্ধ স্বর অভিজিৎ-এর; তারপরই যেন মুহূর্তে বদলে গেল আবহাওয়া।

ভালই হয়েছে ট্যাক্সি করে। গাড়িতে কতক্ষণ তোমায় দূরে দূরে রেখেছি। অভিজিৎ আবার মহুয়াকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল কাছে।

এই! ছাড়ো, ছাড়ো, সবাই দেখতে পাবে!

পেলেই বা, আমি কারুর পরোয়া করি? আর তুমি ত' এখন আমার স্ত্রী, রীতিমত বিবাহিতা পত্নী, তাই না?

হ্যাঁ তারা এখন বিবাহিত; রীতিমত আইনমতে বিবাহিত। দিল্লী থেকে বিয়ে একেবারে সেরেই এসেছে তারা। অভিজিৎ-এর পাঞ্জাবী বন্ধু করণ সিং-এর বাড়িতে তারই সহায়তায় অভিজিৎ আর মহুয়া বিয়ে করেছে আইন অনুসারে।

কিন্তু, তখনই বলেছিল মহুয়া। কোলকাতায় ফিরে একটা হিন্দু অনুষ্ঠানও করতে হবে কিন্তু!

কেন?

অভিজিৎ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আবার অনুষ্ঠান কিসের?

বাঃ, ভগবান সাক্ষী না, কিছু না, না-আ, হিন্দু অনুষ্ঠান একটা করতে হবে কোলকাতা ফিরে।

আচ্ছা, আচ্ছা! হবে, হবে। স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরে অভিজিৎ বলেছে।

মৌ কিন্তু তুমি আমার এখনই, জানত।

যাও!

মহুয়া অভিজিৎ-এর দিকে ফিরল।

বাড়িতে ত' তুমি একলা না?

কিসের? এই ত' তুমি রয়েছ।

যাও, তা বলি নি।

তবে কি বলছ?

বলছি যে যতদিন না আমাদের বিয়ে হয়, ততদিন আমি কিন্তু তোমার বাড়িতে থাকব না।

সেকি! বিয়ে ত' আমাদের হয়েই গেছে। না, না, ওসব হবে না, আর কোথায়ই-বা এখন থাকতে যাবে? লাভলক প্লেসে?

ধ্যেৎ! ওখানে কি!

তবে এখন কোথায় আবার বাড়ি খুঁজতে যাব বলত? তোমার জন্যে।

তাহলে কি হবে?

কি আবার হবে, থাকব আমরা ত্বজনেই।

না, না তা হয় না; তাহলে বরং হাসি আর ছায়াকে বল আমার কাছে থাকুক এসে কয়েকটা দিন।

মৌ, পাগলামী কোর না, আমরা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী এখন।

হলেই বা আইনত···

দ্বিধা আর যায় না মহুয়ার।

ট্যাক্সি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

এস, নাম।

স্বামীর হাতে ভর দিয়ে গাড়ি থেকে নামল মহুয়া।

সেই দিনই সম্ভব হোল না, কিন্তু পাজী দেখে হিন্দুমতে অনুষ্ঠান একটা শেষ পর্যন্ত করতেই হোল অভিজিৎকে। না হলে মহুয়া কিছুতেই একঘরে বাস করবে না অভিজিৎ-এর সঙ্গে। তিনরাত ঘরের সামনে ফালি বারান্দায় রাত কাটাল অভিজিৎ, তারপর আ াঢ়স্য প্রথম দিবসে আর্য-সমাজ মতে বৈদিক অনুষ্ঠানে বিয়ে হোল তাদের। মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিজিৎ সেন, তাই সাধারণ পুরোহিত-দের পক্ষে সম্ভব নয় এ বিয়ে দেওয়া। আরো অনেক কিছুই সম্ভব হোল না মহুয়ার বিয়েতে; সানাই বাজল না, মহুয়ার দাদা, ছোট বোন, বাবা কেউই দেখতে এল না নতুন সিঁদুর পরে বৌ সেজে কেমন দেখাচ্ছে মহুয়াকে, তব্ মহুয়ার বিয়ে হোল, অগ্নি সাক্ষী রেখে, ভগবান সাক্ষী রেখে। মহুয়ার আঁচলের সঙ্গে অভিজিৎ-এর চাদরে গাঁটছড়া পড়ল, স্বামীর সঙ্গে অগ্নি পরিক্রম করে সপ্তপদ হাঁটল মহুয়া, অভিজিৎ মহুয়ার হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করল—···

দিনগুলো এখন একদম বদলে গেছে মহুয়ার। মার মৃত্যুর পর এর আগেও সংসার করেছে মহুয়া। লাভলক প্লেসের বাড়িতে আয়া, ভানুদি থাকলেও সংসার চালানোর দায়িত্ব মহুয়ারই ছিল, কিন্তু সে আর একরকম, অন্য ধরণের সংসার করা। পরম মমতা, ভালবাসা দিয়েই তখনও সংসার করত কিন্তু এই আনন্দ কোথায় ছিল? কোথায় ছিল এই ভাললাগা?

এখন দিনগুলো যেন শুরু হয় বাঁশির সুরে, আর শেষ হয় সেতারের ঝঙ্কারে। ভোর থেকে উঠে কাজ, মহুয়ার কত কাজ।

প্রথম প্রথম অসুবিধে হোত বৈকি। রান্না করতেই ত' জানতো না মহুয়া; মার কাছে খাবার করেছে, বাবুর্চিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতে বিরাট কেক পুডিং বানিয়েছে, রোস্টও করেছে দু' একবার কিন্তু কে জানত ভাতের ফেন গালতে এত পটুত্বের প্রয়োজন, আর তরকারিতে নুন বেশি হ'লে সেটা এমন অখাদ্য হতে পারে তাই বা কে ভাবতে পেরেছিল? আর কি কঠিন এই মাছভাজা। মাগুর, কইমাছ যে কড়ার ওপর এমন লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে কে জানতো তা?

যথারীতি কড়ায় উপুড় করে তেল ঢেলে মাগুরমাছ ছেড়েছিল মহুয়া, হঠাৎ যেন অগ্নিকাণ্ড। চড়বড় করে সে কি আওয়াজ! ফটাস-ফট্ জলন্ত তেল ছিটকে এসে মহুয়ার হাতে-গলায় ফোস্কা পড়িয়ে দিল। আওয়াজ আর মহুয়ার চীৎকার শুনে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল অভিজিৎ, তেলেভরা মাছশুদ্ধ কড়াটা নামিয়ে দিল। বারান্দার বেড়ার ফাঁকে পাশের বাড়ির অমলা বৌদির সে কি হাসি!

ও মা! জিওলমাছ কখন এককড়া তেলে ছাড়ে মানুষ! তুমি কি গো মৌ?

তারপর অমলা বৌদিই শিখিয়েছেন মহুয়াকে নানারকম রান্না, বাতলে দিয়েছেন এই 'মাগ্ গি গণ্ডার বাজারে' অল্প খরচে জীবনযাত্রার নানাবিধ কৌশল। তবুও পারে না মহুয়া। তবুও অনেক ভুল অনেক ত্রুটি থেকে যায়। বাজার করতে গিয়ে সেই অরেঞ্জ পিকো চা'-ই কেনে মহুয়া,

আর কেভেণ্টারের মাখন আর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কিনতেও ভোলে না সন্ধ্যেবেলা। ফলে সাতদিনেই মাসখরচের টাকা শেষ; অভিজিৎ শুকনো মুখে মাথার চুল টানে, দেখে মহুয়ার কান্না পায়, তখন মহুয়ার নিজের ওপর বড় রাগ হয়, প্রচণ্ডরকম একটা শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে নিজেকে আর ও হঠাৎ বলে বসে, ভেব না তুমি, আমি সব ব্যবস্থা করব।

কি করে?

সন্দিগ্ধ সুর অভিজিৎ-এর।

দ্যাখই না কি করি।

অমলা বৌদির সঙ্গে কথা বলে মোড়ের দোকানে দু'গাছা চুড়ি বেচে এল মহুয়া, আর চুড়ি বেচার দু'শ টাকায় স্বচ্ছন্দে কেটে গেল একটা মাস। অভিজিৎ বুঝতে পেরে রাগ করলে, অনুযোগ করলে।

মৌ! এ তুমি কি করলে?

কেন গো?

না না ছিঃ, তোমার গয়না বেচা টাকায়?

আমার গয়না কি তোমার নয়? ও রকম করে বোল না।

মহুয়া স্বামীর বুকের কাছে সরে এল; অভিজিৎ মহুয়াকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল একান্ত কাছে, ওর নরম চুলে হাত বোলাতে বোলাতে ডাকল, মৌ!

কি?

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না?

ছিঃ ছিঃ, কি যে বল! কেন কষ্ট হবে?

আর সত্যিই ত' মহুয়ার কোন কষ্টই নেই। পয়সা তাদের নেই; চালের মণ চল্লিশ টাকা, আর অভিজিৎ-এর মাইনে সাত টাকা; 'কি করে চলবে এতে' অভিজিৎই বারবার বলে, কিন্তু মহুয়ার কোনও দুর্ভাবনা নেই তার জন্য। কি করে চলবে আবার কি? চলছে ত'! হলোই বা গয়না বেচে? কিংবা মাছ না খেয়ে? দিন ত' কেটেই যাচ্ছে। আর সে কি দিন কাটা! বসন্ত বাহার বাজছে যেন অনুক্ষণ; মহুয়ার ত' তাই মনে হয়; দিনগুলো কোথা দিয়ে কেমন করে উড়ে চলেছে যেন ভাল করে বোঝাও যায় না। আর রাতগুলো।

প্রথম প্রথম কেমন যেন ভয় ভয় করেছে, বুঝতেই পারে নি মহুয়া।

বিয়ের আগে মীরাটে যাবার আগে ছায়াদের বাড়িতে সেই ছাদের ঘরেই অভিজিৎ প্রথম ব্যাকুল আলিঙ্গনে মহুয়াকে বুকের একান্ত কাছে টেনে নিয়েছিল, উত্তপ্ত দুই ঠোঁট ওর বারবার মহুয়ার গোলাপী ঠোঁটে ঠাণ্ডা গালে নেমে এসেছিল একান্ত ভালবাসায়, উন্মত্ত আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সেদিন মহুয়ার সর্বাঙ্গ, অবশ হয়েছিল দেহ।

কিন্তু এখন; পুরুষের কামনা শুধু সেইখানেই থেমে থাকে নি, সে চায়, আরো চায়; মহুয়ার সর্বস্ব লুণ্ঠন করতে চায় ঐ একান্ত প্রিয় দস্যু। মহুয়া ত' দিতেই চায়, তার সব উজাড় করে অভিজিৎকে নিবেদন করতে না পারলে স্বস্তি কই! আনন্দ কই! তবু দ্বিধা জেগেছে, ভয় হয়েছে মনে কেন?

না, না!

জলভরা চোখে তাকিয়েছিল মহুয়া অভিজিৎ-এর দিকে। ভয় পেয়ে অভিজিৎ-এর বুকেই মুখ লুকিয়েছিল মহুয়া; এরকম না, এরকম না! আমাদের প্রেম, আমরা···

না না!

অজানা পথে পা ফেলতে সে কি দ্বিধা, কি সঙ্কোচ, কি ভয়!

পাগলী!

অভিজিৎ সস্নেহে নীচু হয়ে ওর চুলে চুমো খেয়ে বলেছিল।

আচ্ছা! আচ্ছা! তোমার অত ভয় পেতে হবে না। সস্নেহে স্ত্রীকে বুকের কাছে আরো নিবিড় করে টেনে নিয়েছে অভিজিৎ, আদরে আদরে ওকে অবশ করে দিয়েছে।

আর আশ্চর্য! এখন আর মহুয়ার কিছু মনে হয় না। মনে হয় না তার স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, মনে হয় না তার প্রেমের দেবতা নেমে এসেছে প্রেমের কল্পলোক থেকে। মনে হয় না তার ছিঁড়েছে। এখন ভারি একটা তৃপ্তি আর আনন্দের আবেশে সারারাত স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে গভীর আনন্দে রাত কেটে যায় ওর, আর ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠে ও; উনুনে আগুন দিতে হবে, তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা চাই অভিজিৎ-এর। টিউশানীতে বেরুবে ও।

তারপর সারাদিন ঘুরতে থাকে কাজের চাকা—রান্না করা, কাপড় কাচা, ঘর-দুয়ার সাফ করা, করতে করতে কখন বেলা-দুপুর গড়িয়ে যায়, মহুয়ার পিঠের কাছে কনকন করে, তক্তপোষে পাতা ধবধবে বিছানার ওপর গিয়ে এলিয়ে পড়ে মহুয়া। আবার ঘড়ি দেখে উঠে পড়তে হয় তিনটের মধ্যে, অভিজিৎ-এর স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়, আবার উনুন ধরাও, লুচি ভাজ, চা বানাও।

অভিজিৎ বিকেলে লুচি খেতে ভালবাসে, কিন্তু ঘিয়ের কি দাম! মহুয়া সন্তর্পণে কড়া নামিয়ে নামিয়ে লুচি ভাজে, এতে ঘি কম পোড়ে, অমলা বৌদি বলে দিয়েছেন। আর ঘি যখন খুব কমে যায়, তখন কড়াটা একপাশে হেলিয়ে ধরে একটু ছোট ছোট গরমের লুচি কড়ায় ফেলে মহুয়া, তাতেও কম ঘিয়েই লুচি ভাজা হয়ে যায়। আর বিকেলে খেতে বসে অভিজিৎ প্রায় রোজই বলে, ও কি! তুমি নিচ্ছ না কেন? তুমি খাচ্ছ না কেন মৌ!

নাঃ, আমার বিকেলে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, ক্ষিধে থাকে না, অনেক বেলায় খাই ত'!

মহুয়ার কিন্তু সত্যিই প্রচণ্ড ক্ষিধে পায় বিকেলবেলা। দুপুরে ঘুম থেকে উঠেই ত' ক্ষিধে পায়, কিন্তু তাই বলে বিকেলবেলা অভিজিৎ-এর খাবারে ভাগ বসাতে পারে না ত'? আর দু'জনের মত খাবার করবে? না সে সম্ভব নয় কিছুতেই। মহুয়ার ভাঁড়ার এত অফুরন্ত নয়। তাই বিকেলবেলা মহুয়া একপেয়ালা চা-ই বেশি খায় দুধ চিনি না দিয়ে, আর ঢক্ ঢক্ করে জল খায় রাত্রে। মাছ-তরকারী যা থাকে তা অভিজিৎ-এর পাতে তুলে শুধু একটু জল দিয়েই ভাত খায় মহুয়া। আর অনেকদিন মাসের শেষ দিকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাতও থাকে না মহুয়ার জন্য। মাসের শেষ সপ্তাহের রেশনটা আর আনাই হয় না, তাই গ্লাসের পর গ্লাস জল খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে মহুয়া।

মাসের শেষে অভিজিৎ-এর স্কুলের চাকরিটাও গেল। বেসরকারী ছোট স্কুল, ছেলেরা নিয়মিত মাইনে দেয় না, স্কুলেই আসে না ত', মাইনে দেবে কে! রোজ হৈ-হৈ, রোজ বিক্ষোভ। কোথায় ট্রাম পুড়ছে, কোথায় বাস ভাঙছে, রাস্তায় একপাল ছেলে জটলা করছে, হঠাৎ তেড়ে আসছে পুলিশের দল, তারপরই টিয়ার গ্যাস হৈ-হৈ, চেঁচামেচি।

শান্তি নেই কোথাও এককোঁটা, শান্তি নেই, নেই নিশ্চিন্ততা।

কিন্তু মহুয়ার এই অভাবের সংসারে আনন্দের ত' কোন অভাব নেই, কোন দৈন্যবোধ নেই মহুয়ার জীবনে।

আরো চারগাছা চুড়ি গেল মহুয়ার, গেল গলার হার, হাতের আংটি। কানের বড় হীরের ফুল দু'টো শুধু প্রাণ ধরে বিক্রি করতে পারে নি মহুয়া, ওটা ষোড়শ জন্ম দিনে রাধারাণীর উপহার।

সংসার চলেছে অভিজিৎ-এর দু'টো টিউশানীর ওপর। কিন্তু আর বুঝি মহুয়া চলতে পারে না।

ওগো!

স্বামীর বুকে মাথা রেখে ডাকল।

কি?

আজকাল ত' মেয়েদের খুব কাজ হচ্ছে অফিসে।

তাতে কি?

না।

মহুয়া ঢোঁক গিলল।

আমি ভাবছি একটা চাকরি নিলে কেমন হয়?

তুমি চাকরি করবে?

বিছানার ওপর উঠে বসল অভিজিৎ।

কেন গো? কি হয়?

না, না সে হয় না।

অনেকেই ত' করে।

না, না তুমি অফিসে চাকরি করতে যাবে? সে হতেই পারে না। মেয়েরা, বাড়ির বৌরা অফিসে যাবে? না, কিছুতেই না।

খিলখিল করে হেসে উঠলো মহুয়া।

ঠিক বুড়ো ঠাকুর্দার মত কথা বলছ তুমি।

আর তখুনি মনে পড়ল মহুয়ার—মাও মেয়েদের বাইরে কাজ করা কি ঘোরতর অপছন্দ করতেন। অফিসে কাজ করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না, স্কুলে চাকরি কি ডাক্তারী তাও রাধারাণীর মতে যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত জীবিকা নয় সম্ভ্রান্ত মহিলার পক্ষে। মেয়েরা লেখাপড়া করুক, সাহিত্যচর্চা করুক, সঙ্গীতে পারদর্শী হোক, সব—সবকিছু, কিন্তু তাই বেচে অর্থ উপার্জন! অবজ্ঞায় সুগঠিত ফর্সা নাক ফুলে উঠত রাধারাণীর।

ছিঃ!

যেসব মেয়েরা যথেষ্ট সুশ্রী নয় দেখতে এবং শৈশবেই মা বাপ হারা, সেইসব দুর্ভাগিনীরাই কেবল নিজেদের অন্ন নিজেরাই আহরণ করতে বেরোয়।

মা'র সঙ্গে কোমরবেঁধে তর্ক করেছে মহুয়া, বোঝাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অসম্ভব—মা কিছুতেই এ যুক্তি মানবেন না, মনে নেবেন না। বি-এ পাশ করার পর বি টি পড়ার একটা প্রস্তাব করেছিল মহুয়া মা'র কাছে, অসুখে শুয়ে শুয়েই সরব প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রাধারাণী।

না, না তা হয় না; বি-টি পড়বে কেন? মাস্টারণী হবার সখ বুঝি? না বি-টি পড়তে হবে না?

আর সত্যিই মার এই আপত্তি এই অনিচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করতে কোন আগ্রহই হয় নি মহুয়ার, আর বি-টি কেন এম-এ পড়াও ত' আর হয় নি; পরীক্ষার পরই ত' মার অসুখ বাড়ল, আর···

মৌ! শোন।

অভিজিৎ মহুয়ার হাত ধরে আরো একটু কাছে টেনে নিল তাকে।

আমিই চাকরি করব।

তুমি? তুমি অফিসে চাকরি করবে? না, না।

কেন নয়?

তুমি যে ইংরেজ সরকারের গোলামী কখনও করবে না বলেছ, তা ছাড়া তোমার নেচারে অফিসের চাকরি ঠিক স্যুট করবে না।

আর তোমার নেচারেই বুঝি খুব করবে? জান, অফিসে মোটা মোটা বাঁধান খাতা আছে, তাকে বলে লেজার বুক, সেখানে যদি কবিতা লিখে রাখ না—

আচ্ছা সেখানে কেন কবিতা লিখতে যাব? আমি কি পাগল?

তা যাবে কেন? এটা কি?

অভিজিৎ হাত বাড়িয়ে পাশের তাক থেকে তুলে নিল হিসেবের খাতা।

এই যে, এই হিসেবের পাশে এটা কি?

এই, কেন তুমি দেখেছ আমার সংসার খরচের খাতা; না, না, ভারী অসভ্য! দাও দিয়ে দাও আমায়, মহুয়া অভিজিৎ-এর হাত থেকে খাতাটা টেনে নেবার চেষ্টা করল।

উঁহু! আগে আমায় বল, কেন আমায় বল নি যে তুমি কবিতা লেখ।

আচ্ছা, এ আবার একটা বলার কথা কি?

বাঃ, বলার কথা নয়, মৌ, তোমার সব কিছুই আমি জানতে চাই, ভালবাসতে চাই, তোমায় একান্ত করে পেতে চাই।

অভিজিৎ দু'হাত বাড়িয়ে মহুয়াকে যেন কুড়িয়ে নিল বিছানা থেকে নিজের বুকের কাছে।

মৌ! তোমার মত রত্ন আমার বুকে শোভা পায় না, এত রূপ, এত গুণ তোমার, রাজরাণী হবার উপযুক্ত তুমি।

রাজরাণীই ত' হয়েছি, তুমি রাজা আমি রাণী। ওগো, পৃথিবীর কোন রাজার রাণী আমার চেয়ে বেশি সুখী?

বেশি সুখী?

অভিজিৎ বাধা দিল আবার।

এত দারিদ্র্য, এত অভাব।

কোন দারিদ্র্য, কোন অভাব নেই আমার; তুমি কি চোখ মেলে দেখতে পাও না আমার ঐশ্বর্য, আমার সুখ, আমার গর্ব।

গর্ব?

হঁ্যা, আদর্শবাদী শিক্ষকের স্ত্রী আমি, আমার স্বামী সামান্য অর্থ-সুখ-সুবিধার জন্য মাথা নামান না, তিনি শিক্ষিত, উদার, মহৎ···

মহুয়া যেন অন্য কাকে বলছে, ঘরের মধ্যে যেন অভিজিৎ নেই, যেন অন্য কাকে ভাবের ঘোরে মহুয়া বলে যাচ্ছে তার মনের কথা, তার পরিতৃপ্তির সংবাদ।

মৌ!

কি গো?

তুমি সত্যি বলছ? তুমি এত সুখী, এত পরিপূর্ণ!

হঁ্যা গো!

মহুয়া ঘন হয়ে এল স্বামীর বুকের কাছে।

ছাখ, বিয়ের আগে, মা মারা যাবার আগেও আমি ত' সুখীই ছিলাম, তবু এখন যেন অন্যরকম, এখন সে কি আনন্দ, কি আশ্চর্য সুখী লাগে নিজেকে···

সত্যি বলছ? সত্যি মৌ!

বারবার শুনেও অভিজিতের যেন বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা।

লাভলক প্লেসের বাড়ির চেয়েও এখানে বেশি সুখে আছ তুমি?

লাভলক প্লেসের বাড়ি!

অভিজিৎ-এর মুখে 'লাভলক প্লেসে'র নাম শুনে হঠাৎ যেন সব মনে পড়ে গেল মহুয়ার।

লাভলক প্লেস! আর সেখানে তাদের সেই বাড়ি; সেখানে মহুয়া তার মা, বাবা, দাদা আর ছোট্ট বোনটির সঙ্গে থাকত, কোথায় সে বাড়ি? কতদূর? আশ্চর্য! এই কোলকাতা শহরেই আজ ক'মাস রয়েছে সে, অথচ একদিনের জন্যেও মনে পড়ে নি বাড়ির কথা, সেখানে যাবার কথা, কি অকৃতজ্ঞ সে? কি স্বার্থপর? হঠাৎ মহুয়ার বুক যেন ব্যথায় টনটন করে উঠল। দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল।

এ কি মৌ! কাঁদছ?

অবাক অভিজিৎ মহুয়ার চিবুকে হাত দিয়ে তুলে ধরল মুখ, আর হঠাৎ মহুয়া জোরে জোরে কেঁদে উঠে স্বামীর বুকে আবার মুখ নামাল।

বাবা, দাদা আর···

দেখতে চাও তাদের? লাভলক প্লেসে যেতে চাও মৌ?

মহুয়ার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে অভিজিৎ বলল। কান্নার মধ্যেই মাথা নাড়ল মহুয়া।

হঁ্যা··

বেশ তো চল না, কালই বিকেলে যাওয়া যাবে। কাল রবিবার আমার টিউশানী নেই, কাল বিকেলে লাভলক প্লেসের বাড়িতে যাব, ছায়াদের বাড়ি যাব; কিন্তু···

হঠাৎ থেমে গেল অভিজিৎ। ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?

কেন? বাবা ত' শেষ অবধি মত দিয়েইছেন বলতে পারো, তা ছাড়া চিঠির উত্তরে ত' আশীর্বাদই জানিয়েছেন; মনে নেই লিখেছিলেন, 'তুমি সুখী হলেই আমার আনন্দ।'

তা লিখেছিলেন বটে, তবু খুঁতখুঁতনি যায় না অভিজিৎ-এর।

কিন্তু তোমার দাদা?

দাদা হয়ত আমার চিঠি পায়ই নি এখনও, কোথায় কোথায় ঘুরছে ঠিক কি!

মহুয়ার চোখ আবার সজল হয়ে এল। দাদা! মহুয়ার সেই দাদা! মহুয়ার বন্ধু সঙ্গী একান্ত প্রিয় দাদা। কতদিন দেখে নি দাদাকে।

আর মহুয়ার একান্ত আদরের বোন তুলতুলি, কেমন আছে সে বুড়ি মাসিমার বাড়িতে? কি করছে? কি করে কাটছে তার দিনরাত্রি দিদির পরিচর্যা বিনা?

কাল সত্যি যাবে বালিগঞ্জে?

হঁ্যা গো; অভিজিৎ আবার সস্নেহে মহুয়ার মাথায় হাত বোলাল। আর মহুয়া স্বামীর বুকের কাছে ঘন হয়ে

শুয়ে নিজের বাল্য-কৈশোরের নানা গল্প স্বামীকে শোনাতে শোনাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু পরের দিনই যাওয়া হোল না লাভলক প্লেসে। সকালবেলা অভিজিৎ ঘুম থেকে উঠল; দুই চোখ লাল, গা গরম।

মৌ!

চায়ে চুমুক দিয়ে অভিজিৎ বলল, মাথাটা ধরেছে বড়, শরীরও ভার ভার, আজ বোধ হয় বেরুতে পারব না।

সে কি?

মহুয়া অভিজিৎ-এর কপালে হাত রাখল। এ কি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

না, না, অত কিছু নয়, বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছে। দাঁড়াও, জ্বরটা দেখি, তুমি শুয়ে পড়।

বেড়ার ফাঁকে অমলা বৌদির কাছ থেকে মহুয়া চেয়ে আনল থার্মোমিটার, জ্বর উঠল প্রায় একশ দুই।

কি হবে? ভীতসন্ত্রস্ত মহুয়া।

ভয় কি? অভিজিৎই আশ্বাস দিল। সামান্য সর্দিজ্বর, দু'দিনেই সেরে যাবে।

কিন্তু দু'দিনেই সারলো না আর জ্বর ক্রমশ বাড়তে লাগল। সারারাত অভিজিৎ-এর পাশে জেগে কাটাল মহুয়া, রোগীর সেবা করা তার খুব অভ্যেস আছে, সেজন্য ভয় করে না মহুয়া, কিন্তু চিকিৎসা? রোগীর পথ্য! ওষুধ?

আর দু'গাছি চুড়ি মাত্র অবশিষ্ট, কিন্তু নিজে ত' বেরুতে পারবে না, অভিজিৎ-এর পাশ থেকে এক মুহূর্তও সরে যেতে চায় না মহুয়া, আর জ্বরের ঘোরেও যে অভিজিৎ কেবল মহুয়াকেই খোঁজে।

অমলা বৌদি এসেছিলেন খোঁজ নিতে, তারই হাতে মহুয়া তুলে দিল শেষ দু'গাছি চুড়ি, আপনিই বেচে আসুন বৌদি, আমি ত' বেরুতে পারছি না। আর যদি একটু ডাক্তারকে খবর দেন।

নিশ্চয়, আমি এখুনি ডাক্তারের কাছে তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মহুয়া সজল চোখে পাখা হাতে আবার স্বামীর মাথার কাছে বসল।

ঈশ্বর, ভাল করে দাও, ভাল করে দাও মহুয়ার স্বামীকে; মহুয়া যে বড় অসহায়, কার কাছে যাবে ও সাহায্যের জন্য, কার দিকে চেয়ে আশ্বাস পাবে ও! অভিজিৎ চোখ বুজে শুয়ে থাকলে কে দেবে ওকে বল, ভরসা, কোথায় পাবে মহুয়া শক্তি?

ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন অভিজিৎকে। বুক দেখলেন, জিভ দেখলেন, চোখ টেনে রক্ত আছে কি না পরীক্ষা করলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন ভয় নেই, সেরে যাবে। খসখস করে ব্যবস্থাপত্র লিখে মহুয়ার দিকে ফিরলেন ডাক্তার, পেনিসিলিন ইনজেক্‌সান! তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ইনজেকসান দিতে হবে। গলায় সেপটিক কনডিশান আর বুকেও, পেনিসিলিন!

পেনিসিলিন কেন? অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলো মহুয়া। পেনিসিলিন দিতে হবে? এত কি অসুখ অভিজিৎ-এর।

ভয় কি? ডাক্তার মহুয়ার শঙ্কিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, পেনিসিলিন পড়লেই একদিনে সব রোগ উড়ে পালাবে, কোন ভয় নেই। পেনিসিলিনের খরচ একটু বেশি পড়বে এই যা! পেনিসিলিন শুনে ভয় পাচ্ছেন কেন! এটা হচ্ছে একরকম···।

জানে মহুয়া জানে; সেই যে অবহেলায় ফেলে রাখা কাঁচের বুকে ছাতা ফুটেছিল আর তাই থেকেই···কিন্তু এই ওষুধই অভিজিৎকে দিতে হবে কেন? কেন এমন অসুখ হবে অভিজিৎ-এর যে পেনিসিলিন না হলে···

আটটায় একটা ইনজেকসান পড়বে, আবার এগারটায়, তারপর···ডাক্তারের গম্ভীর আওয়াজ আবার কানে এসে লাগল মহুয়ার।

দিন্। ডাক্তার প্রেসক্রিপসানটা বাড়িয়ে ধরলেন মহুয়ার দিকে। ওষুধটা আনিয়ে রাখবেন, আমি ঠিক আটটার সময় আসব, আর যদি বলেন, ডাক্তার একটু থামলেন, ঘরের চারিপাশ দেখলেন, আমিই পেনিসিলিন নিয়ে আসতে পারি, আপনার বোধ হয় বাড়িতে তেমন···

খুব ভাল হয় ডাক্তারবাবু—

মহুয়া যেন অকূল সমুদ্রে তীর পেল। আপনি যদি কষ্ট করে নিয়ে আসেন।

না, না আমার আর কষ্ট কি?

মহুয়া লাল রঙের দু' টাকার দু'টো নোট এনে দিল।

ডাক্তার টাকা নিলেন, পকেটে পুরতে পুরতে বললেন পেনিসিলিন পুরো কোর্স দেওয়ার জন্যে আপনার পঞ্চাশ টাকা পড়বে।

পঞ্চাশ!

মনে মনে মহুয়া আর্তনাদ করে উঠলো।

দু'টো চুড়ি বেচে পুরো দু'শ টাকাও পাওয়া যায় নি; তবু একশ টাকা করেই ভরিপিছু দাম নিয়েছে তারা, কিনতে গেলে হয়ত আর একটু বেশি দিতে হয়, কত কে জানে?

তাহলে আমি এখন আসি ঠিক আটটায় আসব আবার। ডাক্তার চলে গেলেন।

সারাদিন, সারারাত ধরে তিন ঘণ্টা অন্তর পেনিসিলিন চলল, ডাক্তার বলেছিলেন মহুয়াকে, একটু বিশ্রাম করার মত জায়গা পেলে আমি এখানেই থাকতে পারি, তাহলে আর বারবার আসতে হয় না।

কিন্তু উপায় কি ?

একটি মাত্র তক্তপোষ সারা বাড়িতে, আর প্যাকিং বাক্সের ওপর অভিজিৎ-এর পুরোন ধুতি পাঞ্জাবী, লাল রঙ-এ ছাপিয়ে পেতে দিয়েছে মহুয়া। সেই তাদের বসার আসন-চেয়ার-টেবিল। মেজেয় বসে খেতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হোত বৈ কি মহুয়ার, কিন্তু এখন সয়ে গেছে। আর অভিজিৎ-এর বন্ধুবান্ধবরা এলে তক্তপোষে বিছানার ওপরে বসেই আড্ডা জমায় সবাই, কিন্তু সেই তক্তপোষের বিছানায় ত' এখন···

না, কুণ্ঠিত স্বরে মহুয়া জবাব দিল। এখানে বিশ্রাম করার মত জায়গা ত' কিছু নেই ডাক্তারবাবু।

ঠিক আছে, আমি তাহলে আসা-যাওয়াই করব। কি আর করা যাবে ?

সারাদিন, সারারাত ধরে ডাক্তার বারবার এলেন, ইনজেকসান দিলেন।

পরের দিন থেকে অভিজিৎ-এর আর জ্বর নেই, নেই সেই অসহ্য মাথার যন্ত্রণা, পেনিসিলিনের সুফল পাওয়া গেল হাতে হাতে।

একটু মাংসের স্টু আর হরলিক্স একটু টোস্টও দিতে পারেন ; তারপর খবর দেবেন কেমন থাকেন।

ডাক্তার চলে গেলেন। স্বামীকে গরম জলে মুখ ধুইয়ে, চা-বিস্কুট খাইয়ে, মহুয়া গিয়ে তার সিগারেটের টিনের ঝাঁপি খুলল। ডাক্তার, ওষুধ আর হরলিক্স করে এই তিনদিনেই একশ টাকা শেষ। এর মধ্যেও পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া এখুনি দিতে হবে, অমলা বৌদির ধার শোধ দশ টাকা। বাকি টাকায় চালাতে হবে সারা মাস। তার মধ্যে কয়লা আসবে, রেশন আসবে, আর অভিজিৎ-এর জন্য মাংস চাই—ফল চাই।

মহুয়া হিসেব করে টাকা বের করে স্বামীকে ফল-মাংস খাওয়ায়।

অভিজিৎ এখনো দুর্বল ; নিউমোনিয়ার মত হয়েছিল অভিজিৎ-এর, ভয় নেই এখন আর, ঠিক সময়ে পেনিসিলিন পড়েছে, রোগ পালিয়েছে, কিন্তু তার আসার চিহ্ন এখনো মুছে যায় নি অভিজিৎ-এর শরীর থেকে। এখনো নিয়মিত ওষুধ, টনিক, ভাল খাবার।

কোথা থেকে এসব আসছে মৌ ?

অভিজিৎ মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করে।

তুমি ভাবছ কেন ?

আবার গয়না বেচেছ !

মৌ।

রুগ্ন অভিজিৎ অক্ষম রাগে বিছানার চাদর চেপে ধরে হাত দিয়ে মাথার চুল টানে।

কেন, কেন আমি এত অক্ষম।

ওকথা বোল না গো, তুমি অসুস্থ, তুমি দুর্বল এমন উত্তেজিত হয়ো না।

মৌ, তুমি বুঝছ না, বারবার তোমার গয়না বেচে, আর যে গয়না আমি দিই নি।

দেবে, আমার সব গয়না একদিন তুমি আবার করে দেবে, অনেক বেশিই দেবে।

ঠিক বলছ মৌ, সত্যি বলছ ?

অভিজিৎ উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসল, একদিন তোমার সব দুঃখ আমি ঘোচাতে পারব, সব অভাব।

আমার কোন অভাব, কোন দুঃখ নেই গো, তবু···আঁচলের কোণে চোখের জল মুছে মহুয়া আবার বলল। আমাদের এ দারিদ্র্য নিশ্চয় চিরদিন থাকবে না, একদিন তোমায় আমি প্রাণভরে খাওয়াতে পারব, আরাম দিতে পারব আর, আর···মহুয়ার কথা শেষ হোল না ; স্বামীর রুগ্ন দেহ অসুস্থ শরীর সব ভুলে মহুয়া স্বামীর ·কে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অসহ্য একটা যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল মহুয়ার। পেটের মধ্যে কি যেন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, মুখের স্বাদ তেতো, জিভ শুকিয়ে যেন কোথায় চলে যাচ্ছে।

ক্ষুধা! হ্যাঁ অসহ্য এই ক্ষুধার যন্ত্রণা।

টাকা নেই, অভিজিৎ এখনোও ভাল করে সারে নি, যা সামান্য টাকা ছিল তাই দিয়েই কোনরকমে অভিজিৎ-এর মত মাছ-মাংস কিনতে, মাস কাবারের অনেক আগেই টাকা শেষ ; গত দু'দিন ধরে অভিজিৎ-এর জন্যেও মাছ আসে নি, বন্ধ অভিজিৎ-এর সকালের ডিম, মাখন। চাল যা আছে তাতে মাসের শেষদিন অবধি চলবে না, মহুয়া গত কয়দিন ধরেই অনেক কম করে চাল রাঁধছে ; অভিজিৎকে দিয়ে মহুয়ার জন্য একমুঠোর বেশি ভাত থাকে না, একটু ডালের জল কিংবা তেঁতুল দিয়ে মেখেই সেই একমুঠো ভাত গোগ্রাসে খায় মহুয়া, তারপর ঢকঢক করে অনেকটা জল। এমনি করেই কেটেছে গত কয়েকদিন, কিন্তু আজ আর তাও খেতে পারে নি মহুয়া, চাল যা আছে তাতে মহুয়ার দু'বেলা ভাত খাওয়া চলবে না, তাই আজ শুধু একগ্লাস জল খেয়েই শুতে এসেছিল মহুয়া!

কিন্তু একি যন্ত্রণা—একি অসহনীয় কষ্ট! এমনভাবে ক্ষিধে পায়! কিছু খাবার চিবোবার বাসনা এমন দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে পারে মানুষের মনে ?

মহুয়া অভিজিৎ-এর বুকের কাছে থেকেও ছটফটিয়ে উঠল।

পারছে না আর পারছে না মহুয়া ; আজ ক'দিন ধরে ক্রমাগত মহুয়ার ক্ষিধে পেয়ে চলেছে, আর কি লজ্জা, গত দু'দিন ধরে এই ক্ষুধাবোধটা মহুয়ার এতই প্রবল হয়েছে যে দিবা-রাত্রে এক মুহূর্তের জন্যেও এই খাওয়ার চিন্তাটা

ত্যাগ করতে পারে নি মহুয়া, সব সময় মনে মনে থালাভরা ভাত, মাছের ঝোল আর কুচো আলুভাজার স্বপ্ন দেখেছে মহুয়া। সেই যে বাবুর্চিকে সরিয়ে দিয়ে মা নিজেই সরু সরু করে কাটা আলু ঝাঁঝরি দিয়ে ভেজে তুলতেন তাদের তিন ভাইবোনের জন্যে। মার হাতের সেই পোলাও আর চিংড়ি মাছের মালাইকারি। ভাবতেও কি ভাল লাগে মহুয়া যেন জিভে তাদের স্বাদ পেল, কিন্তু না, না, ছিঃ! মহুয়া একি করছে, সব ফেলে সব ভুলে পেটুক হ্যাংলা শিশুর মত ভোজ্যবস্তুর স্বপ্ন দেখছে খালি; না ছিঃ! আর নয়, মহুয়া ঘুমন্ত অভিজিৎকে দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল; ঘুমের ঘোরেই অভিজিৎ মহুয়াকে নিবিড় করে টেনে নিল কাছে, মাথার চুলে একবার হাত বুলোল, আর মহুয়ার আবার মনে হোল কেন, এই ত' অভিজিৎই রয়েছে তার পাশে কিসের আর দুঃখ তার কিসের কষ্ট! নাই-বা পেল দু'বেলা পেটভরে খেতে, অভিজিৎ তার পাশে আছে, অভিজিৎ-এর বুকে মাথা রেখে রাত কাটাতে পারে মহুয়া এখন, এটাই কি সবচেয়ে বড় পাওয়া নয়? না-খাওয়ার কথা আর ভাববে না মহুয়া, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক। মহুয়া স্বামীর কাছে এসে ঘন হয়ে চোখ বুজল।

কিন্তু না বৃথা, বৃথা চেষ্টা ঘুমের, পেটের মধ্যে সেই যন্ত্রণাটা ক্রমশই বাড়ছে, জিভটা আরো শুকনো, বুকের কাছে কেমন যন্ত্রণা। কিছু খেতেই হবে এখন, চাই কিছু খাদ্য।

কাল ভোরে উঠে আগেই সব ক'টি চাল রেঁধে ফেলবে মহুয়া পরের দিনের জন্য আর ভাববে না, আর বাঁচাতে চেষ্টা করবে না চাল। কাল পেটভরে ভাত খাবে মহুয়া। আর ডাল দিয়ে শাকের তরকারিও। অভিজিৎকে যতটা দেবে নিজের জন্যেও ঠিক ততটাই রাখবে কাল। কিন্তু সে ত' কাল সকাল কতক্ষণ দেরি আছে আর সকাল হতে। টেবিলের উপরে রাখা রাধাবাজারের টাইমপীস ঘড়িটা দেখল মহুয়া। একটা, একটা বেজেছে ঠিক। ইস! ভোর হতে ভাত বাঁধতে এখনও অনেক দেরি।

মহুয়া আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল; কিন্তু ঘুম আসে না যে।

ক্ষুধা, প্রচণ্ড এই ক্ষুধার তাড়না; না কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না মহুয়া, খেতে হবে তাকে। এখনই খেতে হবে যা হোক কিছু; যা কিছু।

দাঁত দিয়ে চিবিয়ে, জিভ দিয়ে স্বাদ নিয়ে সুধার স্বাদে ভিজিয়ে দিয়ে কিছু খাদ্যবস্তুকে পাঠাতে হবেই দেহের অভ্যন্তরে।

মহুয়া উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে; সন্তর্পণে অভিজিৎ-এর হাত নিজের গলা থেকে খুলে পাশে নামিয়ে রাখল, তারপর তক্তপোষ থেকে নেমে ধীরে ধীরে এসে ঢুকল পাশের ছোট্ট ঘরটায়। এই ঘরটাই মহুয়ার ভাঁড়ার, অন্দর নয়, এরই কোলে সরু ফালি বারান্দায় তোলা উনুন পেতে রান্না করে মহুয়া। ঘরে ঢুকেও একবার থমকে দাঁড়াল মহুয়া।

ঐ তো অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে চালের বড় হাঁড়িটা, আর তার পাশেই রাখা বড় বড় চারটে আলু, আর কিছু পেঁয়াজ; অভিজিৎ-এর দু'দিনের খাবার আর মহুয়ার? মহুয়ার জন্য কোন খাবার নেই, নেই কোন চাল, আলু, পেঁয়াজ।

না, নেই, মহুয়ার জন্য কোন খাদ্য রাখা নেই কোথাও, নেই লাভলক প্লেসে, নেই দক্ষিণ কোলকাতার সুদূর প্রান্তে এই টালিগঞ্জের খালের ধারের বাড়িতে, নেই মীরাটে, নেই কোথাও, মহুয়ার জন্য একবিন্দু তণ্ডুলকণাও রাখা নেই সারা পৃথিবীতে; নেই, নেই, নেই।

হঠাৎ মহুয়া ছুটে এলো, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল কাঁচা আলু পেঁয়াজ আর কাঁচা চালের ওপর। কাঁচা আলুতে কামড় দিল একবার।

না, পারলো না, ওয়াক থুঃ, তারপরই একমুঠো কাঁচা চাল তুলে নিল হাঁড়ি থেকে।

আঃ কুড়মুড় করে কি সুন্দর চালগুলো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে দাঁতের তলায়, কি মিষ্টি স্বাদ চালের, কি সুন্দর গন্ধ

মহুয়া আবার হাত ঢোকাল চালের হাঁড়ির ভেতর; আর একমুঠো, আর একবার।

মৌ! মৌ!

অভিজিৎ-এর ব্যাকুল আহ্বান ভেসে এল মহুয়ার কানে, ঝরঝর করে পড়ে গেল মুঠোয় ধরা চাল, সব,— সব মনে পড়ে গেল মহুয়ার, আর চীৎকার করে কেঁদে উঠল মহুয়া—না, না, না, আমি খাই নি, আমি খাই নি, আমি খেতে চাই নি, না, না, না।

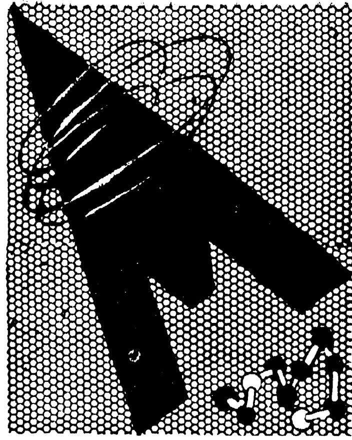
মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল মহুয়া, ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ক্ষমা কর, ঈশ্বর আমায় ক্ষমা কর, আর কখনও লোভ করব না, আর খেতে চাইব না, না, আর কখনও নয়।

ভোরবেলা কার যেন কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল মহুয়ার।

ইস্!

বিছানায় উঠে বসল মহুয়া; এমন কখনও হয় নি রোজই অন্ধকার যখন পাতলা হয়ে আসে, ভোরের শুকতারাটা দপ দপ করতে করতে হঠাৎ যখন কোথায় পালায় তখনই ঘুম ভেঙ্গে যায় মহুয়ার অভিজিৎ-এর পাশ থেকে উঠে ও সোজা ঢোকে কলতলায়, সেখানে চৌবাচ্চায় জমানো ঠাণ্ডা জল বালতি বালতি গায়ে, মাথায় ঢেলে একেবারেই স্নান সেরে দিনের কাজ শুরু করে মহুয়া। [ক্রমশ।



বিজ্ঞান বার্তা

মহাকাশে খাদ্য গ্রহণের সমস্যা

মহাকাশে জীবনধারণ করতে হলে সেখানে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার প্রাথমিক প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মহাকাশে আহারাদির ব্যবস্থা কিভাবে করা যেতে পারে, আহার্যদ্রব্যই বা কি ধরণের হবে, পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে কাজকর্ম করে মহাকাশেও সেইরকম স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করতে পারবে কি না, পৃথিবীর মতই নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পারবে কি না, এসব নানা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে মানুষের মহাকাশ-যাত্রার পরিকল্পনার সঙ্গে। এ-সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা মহাকাশে মানুষ প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মহাকাশ পরিক্রমাকালে মহাকাশচারীদের প্রাথমিক প্রয়োজন হল জল এবং সুষম খাদ্য। বস্তুত একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, ভূপৃষ্ঠের জীবনের চেয়ে মহাকাশের জীবন অনেক বেশি জটিল। এ-বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের তথ্যসন্ধান করতে হবে বায়ুশূন্যতা, ভারহীনতা হ্রাসপ্রাপ্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, সৌরবিস্ফোরণজাত মারাত্মক তেজ বিকিরণ প্রভৃতি সম্পর্কে। এ ছাড়া অতি সূক্ষ্ম উল্কাকণা সম্পর্কেও তাঁদের গবেষণা করতে হবে। এই উল্কাকণা মহাকাশযানের গাত্র ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে।

মহাকাশে উত্তাপ ও শীতলতা দুইই পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চন্দ্রপৃষ্ঠে উত্তাপের কথা ধরা যাক। চাঁদের অন্ধকার দিকের উত্তাপ থাকে ২৪৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং যেদিকে সরাসরি সূর্যালোক পড়ছে সেদিকের উত্তাপ ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

মহাকাশে বিচরণকালে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারে দু'টি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমটি হল, কৃত্রিম উপগ্রহে যে খাদ্য প্রেরণ করা হবে তার ওজন এবং ভারশূন্যতা।

একটু ব্যাখ্যা করা যাক। একটা উপগ্রহকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করতে হলে প্রচুর জ্বালানীর প্রয়োজন হয়। উপগ্রহে যেসব জিনিস সরবরাহ করা হবে, তার প্রত্যেকটিই ওজনে খুব হাল্কা হওয়া প্রয়োজন এবং এ-সমস্ত জিনিসের খুব অল্পস্থান অধিকার করা চাই। প্রতি পাউণ্ড ভারের জন্য প্রায় একশ' পাউণ্ড ওজনের ধাক্কার প্রয়োজন হয়। জেমিনির মহাকাশচারীদের দৈনিক এক পাউণ্ড খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হয়েছিল।

মহাশূন্যে ভারশূন্যতা মানুষের এক নতুন অভিজ্ঞতা। পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ থাকার ফলে দ্রব্যাদি নিজ নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হয় না। মহাকাশে কিন্তু অবস্থা বিপরীত। ভারশূন্যতার জন্য মহাকাশে জলপূর্ণ গ্লাস উপুড় করে দিলেও জল বাইরে গড়িয়ে পড়বে না। তা ছাড়া আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, রুটি বা অন্য খাবারের টুকরো অথবা জলীয় খাদ্যের ফোঁটা মহাকাশযানের মধ্যে মহাকাশচারীর কেবিনের অভ্যন্তরে ভেসে বেড়াতে থাকবে।

মহাকাশ পরিক্রমাকালে মহাকাশযানের কেবিনের মধ্যে ছুরি দিয়ে প্লেটের ওপর স্বাভাবিকভাবে মাংস কাটা সম্ভব হবে না। কারণ মাংসের টুকরো পিছলে বেরিয়ে গিয়ে কেবিনের মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকবে।

১৯৬২ সালে জন গ্লেন যখন মহাকাশ পরিভ্রমণ করেছিলেন—তাঁর সঙ্গে ছিল 'টুথপেস্ট' জাতীয় টিউবের মধ্যে পেস্টের আকারে খাদ্যবস্তু। গ্লেন মহাকাশযানের মধ্যে খুব সহজেই টিউব টিপে আহার্য গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্য পাত্রে রাখা জল নলের সাহায্যে পান করেছিলেন।

এই নরম আকারে খাদ্য গ্রহণ করতে মহাকাশচারীরা কোন আপত্তি করেন নি। কিন্তু তাঁরা বললেন ভবিষ্যতে যাতে কঠিন খাদ্যবস্তুও মহাকাশভ্রমণকালে পাওয়া যায়, বা চর্বণ করে খাওয়া চলে, সেদিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। স্কট কার্পেন্টার ১৯৬২ সালে কিছু কঠিন খাদ্যবস্তু তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। এগুলি হল ঘনকের আকারে বিস্কুট। কিন্তু খাওয়ার সময় অসুবিধা দেখা দিল এই যে, বিস্কুটে কামড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুটের টুকরো তাঁর কেবিনের চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। ফলে বিস্কুটের এইসব টুকরো যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রবেশ করে যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে বিপদ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল।

মহাকাশে যেসব খাদ্য প্রেরণ করতে হবে, সেগুলি সম্পর্কে আর একধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। মানুষ যখন মহাকাশে অবস্থান করবে তখন সে শারীরিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয় থাকবে। তাই তখন অধিক পরিমাণ চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ তার পক্ষে অনুচিত হবে। সুতরাং মহাকাশে যে খাদ্যবস্তু প্রেরণ করা হবে, তার

মধ্যেও খাদ্যে উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য না থাকে, সেদিকে বিজ্ঞানীদের সতর্ক থাকতে হবে।

মহাকাশের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত করা ও তা কোন আধারের মধ্যে রাখার ব্যাপারে খাদ্য-বিশেষজ্ঞরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। কতকগুলি শিল্পসংস্থা শুকনো খাদ্যবস্তু উদ্ভাবন করছে। এ সমস্ত খাদ্যবস্তুর মধ্যে যেমন মাংস রয়েছে, তেমনি শাকসব্জী ও ফলমূল প্রভৃতিও রয়েছে। যেমন আপেল, পীচ, পীয়ার্স ইত্যাদি। যে-কোন ফলের রসই শুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে আপেল, আঙুর, কমলালেবু ও আনারস প্রভৃতির রস শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে।



● বাঁদিকের লম্বা ফালিগুলিতে রয়েছে খাবার। এককামড়ে যাতে খাওয়া যায় সেইভাবেই এগুলি তৈরি। মার্কারী ও জেমিনি মহাকাশযানে এই ধরণের খাবার দেওয়া হয়েছিল। মাঝখানের প্লাস্টিক থলিগুলিতে রয়েছে শুকনো আলু, আপেলের রস এবং চিংড়ি মাছ প্রভৃতি।

প্লাস্টিক থলির মধ্যে ফলের শুষ্ক রস রেখে তাতে জল মিশিয়ে নিলেই মহাকাশচারীর পক্ষে এক সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুত হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তির পর মহাকাশচারী ইচ্ছা করলে শুকনো খাবারের ট্যাবলেট ব্যাগের মধ্যে রেখে দিতে পারে পরে খাওয়ার জন্য।

কিন্তু মহাকাশ পরিক্রমাকালে এমন অনেক সময় আসতে পারে, যখন মহাকাশচারী অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবেন, জল মিশিয়ে খাবার প্রস্তুত করে আহার করার সময় পাবেন না। তখন এমন খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন হবে—যার জন্য কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না, যা সঙ্গে সঙ্গে আহার করা চলে। ফলে মাংস ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু ট্যাবলেটের আকারে এমনভাবে প্রস্তুত করা হল যা একবারে এককামড়ে আহার করা যায়। এইরকম ছোট ট্যাবলেটের আকারে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করা হয়েছে ডিম ফেনিয়ে নিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পর তাকে ট্যাবলেটের আকারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

অন্যান্য আরও নানা খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে এই পদ্ধতিতে। যেমন, ফলের কেক ট্যাবলেটের আকারে। যে-সব মহাকাশচারী মার্কারী মহাকাশযানে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁরা চিনি, স্নেহপদার্থ, নারিকেল ও বাদাম সহযোগে প্রস্তুত খাবারের ট্যাবলেট আহার করেছিলেন। কমলালেবু, পাতিলেবু প্রভৃতির সঙ্গে বাদাম প্রভৃতি মিশ্রিত করেও এইজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৯৬৩ সালের মে মাসে গর্ডন কুপার মহাকাশে পাঁচ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণকালে আনারস, খুবানি, স্ট্রবেরি প্রভৃতি যোগে প্রস্তুত ট্যাবলেট আহার করেছিলেন।

১৯৬৫ সালে জেমিনিযানে মহাকাশ পরিক্রমাকালে এক অভিনব পন্থায় খাদ্য সরবরাহ করা হবে মহাকাশচারীদের। মহাকাশযানের মধ্যে যে জ্বালানি কোষ আছে, তা থেকে জল উৎপন্ন হবে। এই জল পান করা চলবে এবং শুষ্ক খাদ্যবস্তুগুলি এই জলে ভিজিয়ে নিলেই সেগুলি খাওয়ার উপযোগী হবে। এই কোষগুলিই আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এবং এই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে মহাকাশযানের কোন কোন যন্ত্র চালিত হবে।

ভবিষ্যতে অ্যাপোলো মহাকাশযানে গরম জল পাওয়ার কোন ব্যবস্থা সম্ভবত থাকবে অথবা শুষ্ক খাদ্যবস্তুর সঙ্গে জল মিশিয়ে তাকে আবার গরম করার ব্যবস্থাও থাকবে।

তৈরি খাবার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার সমস্যা তো আছেই, এছাড়া খাদ্যবস্তু মজুত রাখা ও খাওয়ার সময় খাদ্যবস্তু যে পাত্রে থাকবে, তা নাড়াচাড়া করার সমস্যাও আছে। এমন ধরণের পাত্র যা হাতে দস্তানা পরে থাকলেও সহজেই নাড়াচাড়া করা যায় এবং এই পাত্রটি থেকে প্রয়োজনমত খাদ্যবস্তুর পুরো একটি খণ্ড মুখে দেওয়া যায়।

পাত্রের নির্মাণে যে প্লাস্টিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয় সে

সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। কারণ এই ফিল্ম ভেঙে গেলে বা এতে ফাটল ধরলে চলবে না। অথচ কোন কোন খাদ্য শুষ্ক করে ট্যাবলেটের আকার দেওয়ার পর এগুলির ধার এত তীক্ষ্ণ হয় যে, তাতে প্লাস্টিক ফিল্ম কেটে যায়।

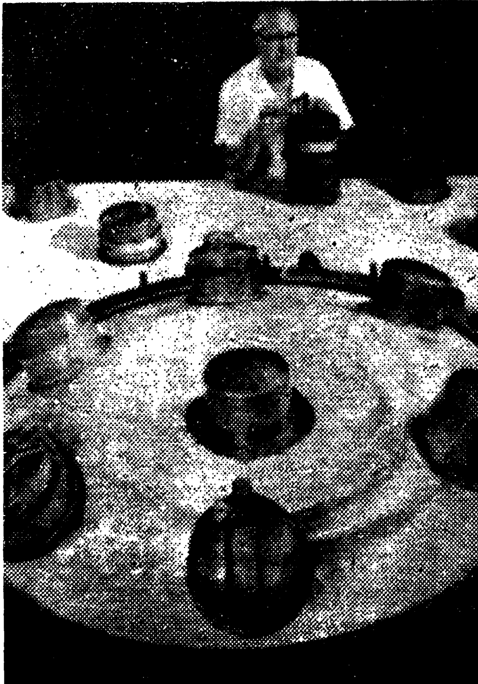
এই ধরণের শুষ্ক খাদ্যবস্তুর উৎপাদন মূলত মহাকাশচারীদের প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হলেও এগুলি পৃথিবীর মানুষদেরও কম কাজে লাগে না। বস্তুত, ভূপর্যটক, শিবির স্থাপনকারীদের এবং কোন কোন বড় বড় সংস্থার পক্ষে এই ধরণের খাদ্য খুবই প্রয়োজনীয়।

এইসব খাদ্যবস্তু মহাশূন্যে পাঠাবার জন্য যে ধরণের হাল্কা ও আর্দ্রতানিরোধক আধার উদ্ভাবন করা হয়েছে তা সাধারণের কাজেও লাগছে। টিউব, প্লাস্টিক থলি প্রভৃতির মধ্যে খাদ্যবস্তু ভরে তা সাধারণের কাজেও ব্যবহার করা যায়, বিশেষ করে পঙ্গু ব্যক্তিদের হাসপাতালে এই ধরণের খাদ্য খুবই উপকারে আসবে।

মহাকাশ গবেষণা এইভাবে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনেও অনেক সাহায্য করছে। প্রধানত মহাকাশ সন্ধানের সহায়ক হিসেবে গবেষণা করা হলেও গবেষণালব্ধ ফলাফল মানুষের অন্য অনেক কাজে লাগানো সম্ভব।

কোনদিন হয়ত পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কক্ষপরিক্রমারত মহাকাশ গবেষণাগারের অস্তিত্ব সম্ভব হবে। এখানে এই কেন্দ্রটির ঘূর্ণনের জন্য নিম্ন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ধরণের কক্ষপরিক্রমারত গবেষণাগারগুলিতে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ সম্ভব হলেও এই গবেষণাগারগুলিতে পুরোপুরি পৃথিবীর পরিবেশ সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব নয়। যদি কোন কারণে মহাকাশযানের পরিক্রমণের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তাহ'লে এটি ভারশূন্য অবস্থায় এসে যাবে এবং সে অবস্থায় এরমধ্যে খাদ্যবস্তু ও খাদ্যের পাত্রসমূহ মহাকাশযানের মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকবে।

পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা মানুষের হাতে আছে। মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে টিউব বা থলের মধ্যে ভরে আহার্য গ্রহণের প্রয়োজন হলে তা সম্ভব করা মানুষের পক্ষে কঠিন নয়। মহাকাশে অবস্থানকালে খাদ্য গ্রহণের সমস্যা যত জটিলই হোক না কেন মহাকাশ সন্ধানের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। —অনুসন্ধানী



● জেমিনির মহাকাশচারীদের জন্য পানীয় জল রাখার উদ্দেশ্যে এই ধরণের ট্যাঙ্ক উদ্ভাবন করা হয়েছে

ওলন্দাজ আলাদীনের প্রদীপ ঃ প্রাকৃতিক গ্যাস

গ্রনিন্‌জেন প্রদেশের বিপুল প্রান্তরে, প্রাচীনকালের উইণ্ডমিল শোভিত বড় বড় খামারগুলিতে এক বিপুল পরিবর্তনের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। এই কৃষিক্ষেত্রে প্রায়ই নতুন একটা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, তা হল কৃষিক্ষেত্রগুলির ওপরে এখানে-সেখানে আলোর শিখা—অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাসের শিখা। নেদারল্যাণ্ড পেট্রোলিয়াম কোম্পানী যেখানে যেখানে ভূগর্ভে পাইপ বসিয়ে গ্যাসের সন্ধান করেছে, সেখানেই পরীক্ষামূলক অবিরাম অগ্নিশিখা দেখা যায়। উত্তর নেদারল্যাণ্ডের মাটি ও বালুকাভূমির দুই মাইল নীচে বিপুল পরিমাণ গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলটিতে ভূনিম্নে প্রায় ১১ শত হাজার মিলিয়ন মীটার গ্যাস অর্থাৎ নেদারল্যাণ্ডের আগামী ৪০ বছরের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস রয়েছে বলে অনুমানকরা হয়।

ওলন্দাজগণের কাছে আলাদীনের প্রদীপ এই গ্যাস একটা অত্যন্ত নূতন জিনিস এবং এর উপযোগিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সব সময়েই পড়ে এসেছেন যে নেদারল্যাণ্ড প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র। তবে এই দেশে কিছু কয়লা ও পেট্রোলিয়াম আছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এই দেশটিতে বিদ্যুৎ বা উত্তাপ শক্তির ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এতো বেড়ে গেছে যে, এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সেই প্রয়োজন কিছুতেই মেটাতে পারে না।

কয়েকটি সংখ্যা দিয়ে এই অবস্থাটা সহজেই বোঝানো যায়। ১৯৫৩ সালে নেদারল্যাণ্ডের শক্তির মোট ব্যয় (কয়লা থেকে প্রাপ্ত উত্তাপ শক্তির হিসেবে) ছিল ২১,০০০,০০০ মেট্রিক টন। এই ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ নেওয়া হয়েছে কয়লা থেকে; শতকরা সাড়ে ১৯ ভাগ পেট্রোলিয়াম থেকে এবং মাত্র ১/২ ভাগ গ্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৬২ সালে এই ব্যয় বেড়ে ৩০,২০০,০০০ টনে দাঁড়ায়। এর মধ্যে কয়লার অংশ কমে গিয়ে শতকরা ৪৭ ভাগ দাঁড়ায়। অন্যদিকে পেট্রোলিয়ামের ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়ে শতকরা ৫১ ভাগে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় কয়লাখনিগুলি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম গ্যাসের ব্যয় ছিল শতকরা মাত্র দুই ভাগ। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ওলন্দাজ কয়লাখনিগুলিকে বিপুল পরিমাণ সরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না। এগুলি এমনভাবে পরিচালিত হয় যে, তারা নিজেদের পায়ের ওপর বেশ শক্তভাবে দাঁড়াতে পারে এবং কয়লা সঙ্কটের ঝড় সুরু হওয়ার অনেক আগে কয়লাখনিগুলির বেশিরভাগ কর্মপ্রচেষ্টা, খনি-শিল্পের রাসায়নিক দিকগুলির উন্নয়নের দিকে পরিচালিত হয়।

ওলন্দাজ বাজারে যখন কয়লা ও পেট্রোলিয়াম নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করছিল তখন হঠাৎ একটা বিপুল আকারের নতুন জিনিস এসে হাজির হ'ল, তাহ'ল প্রাকৃতিক গ্যাস। তবে এই নতুন জিনিসটি কয়লা শিল্পের চরম ধ্বংস ডেকে আনতে পারবে না বা পেট্রোলিয়ামের চাহিদা হ্রাস করতে পারবে না, তা ছাড়া কয়লা ও পেট্রোলিয়াম শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে গ্যাস আহরণ করাটাও জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে শুভ হবে না। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ, নতুন শিল্প সৃষ্টি এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে যে লাভ হবে, অন্য শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিও তেমনি বিপুল পরিমাণে হবে। এই রকম একটা অবস্থার যাতে সৃষ্টি না হয় এবং আর্থিকক্ষেত্রে সুষম উন্নতি হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য, এই গ্যাসের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার অর্থমন্ত্রী এবং নেদারল্যাণ্ড পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর প্রতিনিধিগণের সঙ্গে একটি সম্মেলনে মিলিত হন। এই কোম্পানীর অর্ধেক শেয়ার হ'ল রয়েল ডাচ শেলের।

তা ছাড়া এই প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও, একমাত্র গ্যাসই নেদারল্যাণ্ডের চাহিদা পূর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে বিদ্যুৎ বা উত্তাপ থেকে প্রাপ্ত শক্তির চাহিদা প্রতি বছর যে বাড়ছে (প্রায় ১০ লক্ষ টন কয়লার শক্তির সমান) তা এই গ্যাস থেকে মেটানো যাবে। অনুমান করা হচ্ছে যে, নেদারল্যাণ্ডে যে পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বাস্তবিক এই অতিরিক্ত পয়োজন ৩৫/৪০ বছর ধরে মেটাতে পারবে। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২০০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, পারমাণবিক শক্তি হয়তো এক বিরাট প্রয়োগী হিসাবে বাজারে দেখা দেবে। আশা করা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বছরে প্রায় ৩০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া যাবে অর্থাৎ প্রায় ৩০ মিলিয়ন টন কয়লার সমান বা বর্তমানে নেদারল্যাণ্ডের মোট যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যাবে।

সব রকমের কাজের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হ'ল—মোট যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তার এক-তৃতীয়াংশ গ্যাস থেকে মেটানো যায়। এই অনুপাতে নেদারল্যাণ্ডে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস ব্যবহার করা যাবে। কাজেই আরও যে ১৫ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস অবশিষ্ট থাকবে তার জন্য বিদেশে বাজার খুঁজতে হবে এবং নেদারল্যাণ্ড হয়তো শীঘ্রই তার ইতিহাসে এই প্রথমবার তার অতিরিক্ত শক্তি বিদেশে রপ্তানী করতে সক্ষম হবে।

এই প্রাকৃতিক গ্যাস বাড়ির কাজে এবং শিল্পে ব্যবহৃত হবে এবং কিছুটা বিদেশে বিক্রি করা হবে। নেদারল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু পরিমাণ গ্যাস সংরক্ষিত রাখা হবে। কতকগুলি সর্তে শিল্পগুলিকে কিছুটা সস্তাদরে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।

নেদারল্যাণ্ড পেট্রোলিয়াম কোম্পানীই প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ করবে। শেল (শতকরা ৩০ ভাগ শেয়ার), এসো (শতকরা ৩০ ভাগ) এবং রাষ্ট্রীয় কয়লাখনি (শতকরা ৪০ ভাগ) মিলে একটি কোম্পানী গঠন করে এই গ্যাস আহরণ করবে। যে গ্যাস পাওয়া যাবে তা আর একটি কোম্পানী বিক্রি করবে।

এই নব আবিষ্কৃত সম্পদে কোন্ কোন্ শিল্প উপকৃত হবে? এই সম্পর্কে আলোচনা করার আগে প্রাকৃতিক গ্যাসে কি কি জিনিস থাকে তা জানা দরকার। এই গ্যাসের অন্যতম যৌগিক পদার্থ মিথেইন রাসায়নিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোক ওভেন গ্যাস এবং তৈল শোধনাগার থেকে উপ-পদার্থ হিসেবে যে গ্যাস পাওয়া যায়, তা থেকে সস্তায় যদি এই গ্যাস সরবরাহ করা যায় তা হলেই শুধু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তা ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এই প্রাকৃতিক গ্যাসে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ বেশি না থাকায় উপরে লিখিত অন্য দু'টি গ্যাসের তুলনায় কোন রাসায়নিক শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা কম। অন্য দু'টি গ্যাসে অন্যান্য রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বেশি

থাকায়, রাসায়নিক শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে সেগুলি ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাজেই রাসায়নিক শিল্পের জন্য অন্যান্য গ্যাস যতদিন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে, ততদিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

অন্যান্য যে সব গ্যাস এখন পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলির চাইতে কম মূল্যে যদি প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় তাহলে অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন হবে। কিন্তু এই গ্যাসের মূল্য হ্রাস করে এর আহরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি করলে অন্যান্য গ্যাসের শিল্পগুলি আপত্তি জানাতে পারে। সেইজন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য এমনভাবে স্থির করতে হবে, যাতে তা বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির কোন ক্ষতি না করতে পারে।

তবে কারিগরী সমস্যাটাই হ'ল এর প্রধান সমস্যা। সমগ্র সরবরাহ-ব্যবস্থার মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে প্রায় ৬০০ মাইল এবং এই ব্যবস্থা চার বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইঞ্জিনীয়ারগণ এই কাজ সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন এবং এইসব পাইপ ইত্যাদি বসাবার কাজ পরিদর্শন করবেন। তবে সব চাইতে বড় সমস্যা হ'ল বাড়িতে ব্যবহার করবার জন্য এই প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করার পূর্বে এই গ্যাসের উচ্চ ক্যালোরিফিক মূল্য যাতে কাজে লাগানো যায় সেজন্য সমস্ত গ্যাস কুকার বদলাতে হবে। তার অর্থ হ'ল সমস্ত বার্নার বদলাতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই বিপুল কাজ সম্পূর্ণ করার মতো কুশলী কর্মী নেদারল্যাণ্ডে আছেন কি না সন্দেহ।

তবে শিল্পগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নেদারল্যাণ্ড যে রকম দ্রুতগতিতে উন্নতি করছে তাতে এই প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার যে ওলন্দাজ-শিল্পে নতুন একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক বিদেশী নেদারল্যাণ্ডকে এখনও উইণ্ডমিল ও কাঠের জুতোর দেশ বলে মনে করেন; কিন্তু হল্যাণ্ডের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে গত কয়েক বছরে এই দেশটিতে কি বিপুল পরিবর্তন এসেছে। নিজের উপনিবেশগুলি হারিয়ে এবং ইউরোপের বড় বড় প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির বিপুল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে নেদারল্যাণ্ডকে অন্য দেশগুলির সঙ্গে তাল রাখার জন্য অনেক বেশি দ্রুতগতিতে শিল্পোন্নতি করতে হয়। এককোটি কুড়ি লক্ষ অধিবাসীর এই ঘন বসতিপূর্ণ দেশটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অতিক্রম করে যেতে সক্ষম না হলেও, এটি যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাঁপানী রোগের অভিনব ওষুধ

আমেরিকার জর্জিয়া রাষ্ট্রের আটলাণ্টাস্থিত এমোরি ইউনিভার্সিটি-র স্কুল অব মেডিসিনের (School of Medicine) শারীর ও ভেষজ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক আর ও বৃহাইজ হাঁপানী রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের শ্বাসকষ্ট লাঘব করবার জন্যে বাঁশি বাজাতে বা গান গাইতে বলেছেন। গান গাওয়া বা বাঁশি বাজানোর জন্যে দমের দরকার হয়, ঐ সময়ে ফুসফুস এবং বুকে শ্বাস নিয়ে তা নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে ছাড়তে হয়। অর্থাৎ নিশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা যার যতটুকু আছে তার ততটুকুই প্রয়োগ করতে হয়। ফলে রোগীর নিশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।

সাধারণভাবে এইসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বিশ্রামের সময় ঐ শক্তির মাত্র দশভাগ ও কঠিন পরিশ্রমের কাজে মাত্র পঞ্চাশভাগ প্রয়োগ করে থাকে। হাঁপানী রোগে বাঁশি বাজানো এবং সঙ্গীত চর্চার দ্বারা উপকৃত হবেন।

মানুষের দেহের স্নায়ু কুকুরের দেহে সংযোজন

লস এঞ্জেলস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিদ্যালয়ের ডঃ লিওনার্ড মারনার (Dr. Leonard Marner) মানুষের একটি কাটা পায়ের নার্ভ বা স্নায়ুতে একটি কুকুরের ছিন্ন স্নায়ু সংযোজনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাতে তিনি সাফল্যলাভও করেছেন। ডাঃ মারনার ইতিপূর্বে একটি মানুষের স্নায়ু বা নার্ভ অন্য মানুষের দেহে সাফল্যের সঙ্গে সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু একজাতের জীবের স্নায়ু অন্য জাতের জীবদেহে সংযোজন করা সম্ভব নয় বলেই বিজ্ঞানীরা এতদিন মনে করতেন। তাতে স্নায়ু অন্য যে দেহে সংযোজন করা হতো তার সেখানে দেখা দিত মারাত্মক প্রদাহ। স্নায়ুটিকে ঠাণ্ডা (হিমায়িত) করেও বিশেষ ধরণের রেডিয়েশান (Radiation) বা তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির সাহায্যে শোধন করে প্রয়োগ করার পর দেখা গেছে যে প্রদাহ কম হয়ে থাকে ও তা ভীষণ হয় না। উপস্থিত গবাদি পশু ও বানরের স্নায়ু নিয়ে পরীক্ষা চলছে।

ডঃ মারনার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পশুর দেহের স্নায়ু মানুষের দেহে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যের সঙ্গে সংযোজন করা এখনই সম্ভবপর না হলেও—মানুষের দেহের স্নায়ু কুকুরের দেহে সংযোজন করা ও বিভিন্ন রকমের পশুর ভেতর এই বিষয়ে পরীক্ষা করে যে শিক্ষা অর্জন হয়েছে, তাতে অদূর-ভবিষ্যতে সাফল্যলাভ সম্ভবপর হতেও পারে। তখন হয়তো মানুষ, যখন পশুর খাদ্য বা মাংস গ্রহণ করে তখন ঐসব পশুর স্নায়ুসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে এজন্যে একটি স্নায়ু-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে। —অনুসন্ধানী

খা-জু-রা-হো চন্দেল্ল স্মৃতি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)



নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

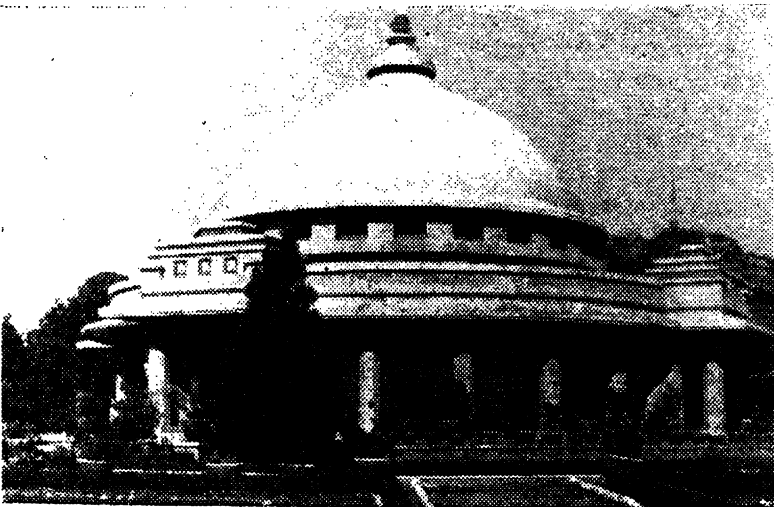
॥ দুই ॥

ধুঁয়াধারের ধারে ধারে সরযুর সঙ্গে সারা সকালটা আমার কাটল। প্রপাতের সামনাসামনি পৌছলাম পাথরের ছোটবড় চাঙড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। উভয়ে উভয়ের পিছল পদক্ষেপ সামলে নিলাম হাত ধরাধরি করে। অমসৃণ পাথুরে চাতালের উপর পাশাপাশি বসে দেখলাম নর্মদার ভীম প্রপাতশীর্ষের কোটি জলকণা রচিত শ্বেত ধূম্রজাল। দেখলাম প্রসন্ন নীল আকাশের নিচে সূর্যকরোজ্জ্বল সবুজ বনানীর দিগন্তরেখা। তারপর রৌদ্র বাড়তে খুঁজে নিলাম বনঝাউ-এর নিভৃত ছায়া।

অতি নিষ্ঠুর শীতকাল। যাত্রা শুরু করেছিলাম মেকলশীর্ষ অমরকণ্টক থেকে। হাতে একটি ব্যাগ, কাঁধে একটি কম্বল। অমরকণ্টক নর্মদা নদীর উৎস। আমার ভ্রমণ নর্মদার দক্ষিণ তীর ধরে ধরে। রামনগর মান্দলা দেখে পৌছেছিলাম জব্বলপুরে। এখানে নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাত ধুঁয়াধার। মাইল দেড় পশ্চিমেই দু'ধারে খাড়া সাদা পাহাড়। সেই পাহাড়ী আলিঙ্গনে ভীমা নর্মদা চাপল্যহীনা বন্দিনী। স্রোতহীনা শান্ত সরসী যেন। ভ্রমণকারীর অবশ্য দর্শনীয় স্থান। মার্বল রক্স নামে খ্যাত।

সরযুর সঙ্গে পরিচয় মাত্র গতকাল সকালবেলায়।

● গান্ধীস্মারক : জব্বলপুর



জব্বলপুর শহরের উপকণ্ঠে গোঁড় রাজাদের প্রাচীন কেল্লা মদনমহল। যারা জব্বলপুরে প্রথম আসে তারা সবাই দেখতে যায়। আমিও গিয়েছিলাম,—অনেক অচেনা লোকের সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে আমিও উঠেছিলাম টিলার মাথায়।

সরযূ এসেছিল আর এক সঙ্গিনীকে নিয়ে তাদের বাংলা ভাষায় কথোপকথন শুনে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল দেহাতে কতোদিন ধরে আমি ঘুরছি, কতোদিন শুনি নি প্রাণ জুড়োনো মাতৃভাষা!

সেধে আলাপ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আলাপ জমে নি। পাত্তা পাই নি, পাবার কথাও নয়। রং-চটা জুতো, ধোকড় পাৎলুন, গলাবন্ধ ভুসো কোট, আর নোংরা গেরুয়া গান্ধীটুপি,—এমনি সজ্জার অপরিচিত পুরুষকে পাত্তা দেবে কোন আধুনিকা তরুণী?

উপক্রমণিকার পর অধ্যায়ের শুরু দৃশ্যান্তরে। সেই দৃশ্যপট সেদিনই উঠল বিকেলবেলা গান্ধীস্মারকের গেটে। জব্বলপুরের গান্ধীস্মারক দর্শনীয়। জাতির জনকের স্মৃতি-সম্মানে সরকার বহুযত্নে এই স্মারক মন্দিরটি বানিয়েছেন। সেটি দেখে যেতেই হবে। তাই এক রিকশাওয়ালাকে ধরে বেলাবেলিই যাত্রা করেছিলাম।

শনিবারের উজ্জ্বল বিকেল। সপ্তাহান্তের ছুটির আনন্দে শহর ভরপুর। কিন্তু গান্ধীস্মারক সম্পূর্ণ জনহীন,—আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লোক নেই। দ্বিতীয় লোকের আবির্ভাব হোলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ঝকঝকে একটা মোটরগাড়ি এসে থামল আমার রিকশার পাশেই। গাড়ি থেকে নামলেন সকালবেলা মদনমহলে দেখা সেই বাঙালী তরুণীদের অন্যতমা।

সরযূ আর আমি,—দু'জন মাত্র। দু'জনের দেখা হওয়াটাও নিতান্ত আকস্মিক। সেই আকস্মিকতার কৌতুকে আর নির্জনতার নিরুপায় ঘনিষ্ঠতায় আলাপ আমাদের ঘন হোলো। গান্ধীস্মারক এক বিরাট ও মহার্ঘ অট্টালিকা। আধুনিক স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ কলার চূড়ান্ত নিদর্শন। যেমন সুন্দর পরিকল্পনা, তেমনি নিপুণ সৃষ্টি। মেঝের মসৃণতায়, ঘি-পালিশ দেয়ালের বর্ণে আর সোনালি সেগুন কাঠের কারুকার্যে হাঁ-করে দেখবার মতো বস্তু বটে।

অনেক হাঁকাহাঁকি করে নিতান্ত নিরুৎসাহী এক চৌকিদারের পাত্তা আমরা পেলাম। সে আমাদের খুব ধমক দিল, বাগিচার ফুলপাতা যেন না ছিঁড়ি, ধুলো পায়ে মেঝের উপর যেন না হাঁটি, দেয়ালে যেন না লাগাই ময়লা হাতের আঙুল।

তারপর অত্যন্ত বিরক্তভাবে স্মারকগৃহের সোনা-পালিশ দরজার তালা খুলল। সেই প্রচণ্ড আড়ম্বরভরা অথচ সম্পূর্ণ স্মারকচিহ্নবিহীন শূন্য অট্টালিকা দেখে শূন্য মনে আমরা ফিরলাম।

সরযূ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—এই গান্ধীস্মারক? গান্ধীজীর নামটুকু পর্যন্ত কোথাও যে লেখা নেই!

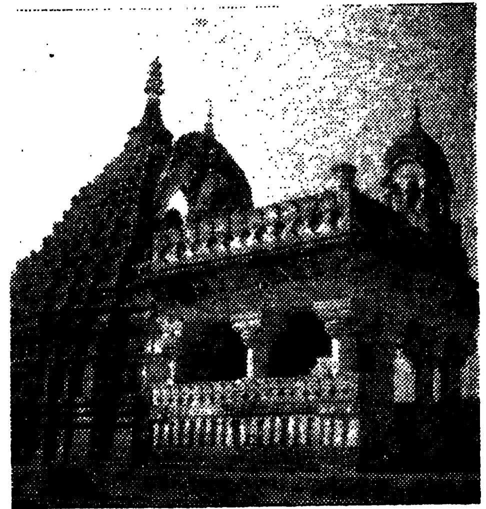
আমি বললাম,—ছিঃ, নাম লিখলে অমন ঝকঝকে দেয়াল নোংরা হয়ে যাবে না?

চোখ পাকিয়ে সে বললে,—তাহলে, এই এতো বড়ো বাড়ি, এই বিরাট গম্বুজ,—এ সব হয়েছে কার জন্যে?

তার অযথা উত্তেজনার উত্তরে শান্ত গলায় আমি বললাম, যে কণ্ট্রাক্টর এটা বানিয়েছে তার জন্যে। রাঁচীর উপকণ্ঠে মোরাবাদি পাহাড়ের মাথায় একটা বাড়ি আছে। বাগান ঘেরা বিরাট বাড়ি। কতোকালের পুরোনো, কতো কাল সে বাড়িতে কেউ থাকে না। সামনের বড়ো ঘর ক'টা তালাবন্ধ, পিছনের মহল রান্নাবাড়ি প্রভৃতি হাট করে খোলা।

কতোকাল সেই শূন্য বাড়িতে মিস্ত্রী মজুরের হাত পড়ে নি। আধুনিক কালে রাঁচী শহরের সুবিশাল উন্নয়নে রাস্তা রেল দপ্তর-কারখানার নির্মাণে যখন লক্ষ লক্ষ টন সিমেণ্ট ব্যয় হয়ে চলেছে, তখন এই বাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণে একবস্তা সিমেণ্ট নষ্ট করার কথাও কেউ ভাবে নি ছাদ্-কার্নিস ফেটে গেছে, খিলান-রেলিং ভেঙে পড়েছে। দেয়ালের ফাটলে বাসা বেঁধেছে গাছের শিকড়, খসে-পড়া পলস্তারা আর ঝুরঝুরে মেঝে পায়ের নিচে ধুলোর মরুভূমি বানিয়েছে। এককালে চারদিকে মনোহর সাজানো বাগান ছিল, এখন সেই বাগানের ভাঙা গেট, অযত্নবর্ধিত লতা-গুল্মের শ্রীহীন আরণ্যক জটলা।

সেই জনহীন প্রেত অট্টালিকার জীর্ণভগ্ন দেয়ালে



● গৌরীশংকর মন্দির—চৌষট্টি যোগিনী ভিড়াঘাট

দেয়ালে কিন্তু অসংখ্য মানুষের হাতে লেখা অজস্র অক্ষরের আঁকিবুকি। কালো পেন্সিল, সাদা খড়ি, রঙিন চক, ভুসো, কাঠকয়লার টুকরো। কেউ বারণ করবার নেই, বাধা দেবার নেই, যে যেমন খুশি দেয়ালগুলোর মাথা থেকে মেঝে পর্যন্ত কলংকিত করেছে। কোনো দেয়ালের কোনো কোণে একটুকরো ফাঁকা জায়গা পাওয়া ভার।

কিন্তু কি আশ্চর্য সেই কলংকরেখা! কতো কবিতার চরণ, কতো গানের কলি, কতো ছবির স্কেচ! দেয়ালে দেয়ালে এই কুশ্রী কলংকস্পর্শের মধ্য দিয়ে এই ভগ্ন প্রাসাদের সহস্র দর্শক আর এক বিশ্বপূজ্য মহামানবের পুণ্যস্মৃতির প্রতি প্রণাম নিবেদন করে যায়। এই মহামানব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাঁচীর মোরাবাদি পাহাড়ের এই গৃহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ছিলেন। সে অনেকদিনের কথা। সে গৃহও এখন ভগ্নাবস্থা। পরিত্যক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু যে-কোনো কবিভক্ত রাঁচীতে গেছে, কবিচরণপূত এই বাড়িটিকে দেখে আসতে ভোলে নি। কবিগুরুর স্মৃতি-তর্পণ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। তাই দেয়ালে দেয়ালে কবির রচনাংশ উদ্ধৃত করতে, কবির প্রতিকৃতি এঁকে আসতে দ্বিধা করে নি। সে উদ্ধৃতিতে কোথাও ভুল আছে, ছবিতে অপটুতা আছে। কিন্তু সেই ভুল সেই অপটুতা শ্রদ্ধার দ্বারা শোধিত।



● ধুঁয়াধার : জব্বলপুর

গান্ধীস্মারকের পিছনেই নর্মদাতীর। পায়ে পায়ে নর্মদার তীরে যেতে যেতে সরযুর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। আমি তাকে মোরাবাদি পাহাড়ের এই আশ্চর্য রবীন্দ্র-স্মৃতি তীর্থের কথা বললাম। সরযু আমাকে শোনালো মাদুরাই-এর বিখ্যাত গান্ধী-সংগ্রহশালার কথা। যেখানে গান্ধীজীর অসংখ্য চিত্র, মূর্তি, রচনা ও তার পাণ্ডুলিপি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা নিদর্শন এবং গান্ধীজীর প্রতি সারা বিশ্বের শ্রদ্ধার্ঘপত্রগুলি সযত্নে সংগৃহীত আছে।

নর্মদার বুকে বিশাল রোড ব্রীজ। জাতীয় সড়কের অঙ্গ, যে সড়ক জব্বলপুর থেকে নাগপুর পর্যন্ত চলে গেছে।

সরযু আঙুল তুলে বললে,—জানেন, এই রাস্তা ধরেই মোটরে আমরা এসেছি নাগপুর থেকে। এলাহাবাদে গিয়ে আমাদের যাত্রা শেষ হবে।

আমি শুধোলাম,—দলে ক'জন?

ক'জন আর? আমি আর সুচরিতাদি',—সকালে যাকে দেখেছিলেন। বেচারী মদনমহল থেকে নামতে গিয়ে পা মচকে পড়ে আছে। কাল মার্বল-রক্স দেখতে যাব। একলা ভালো লাগছে না। যাবেন আমার সঙ্গে?

পরদিন সকালে নব-পরিচিতা সরযুর সঙ্গে মার্বল রক্স দেখতে এসেছি। জব্বলপুর থেকে মাইল পনেরো ষোলো দূরে মার্বল রক্স। আমাকে পাশে বসিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে সে এসেছে। সঙ্গে এনেছে সুস্বাদু আহার্য ও শীতল পানীয়। সারাদিন তার সঙ্গে কাটিয়েছি, সন্ধ্যাবেলা চাঁদের আলোয় ভিড়াঘাট থেকে তরণী ভাসিয়েছি মার্বল রক্সের মাঝে নর্মদার শান্ত স্রোতে।

সরযু অতি-আধুনিকা সুন্দরী তরুণী। তার বসনে-ভূষণে আলাপে-ব্যবহারে আধুনিকতার প্রগল্‌ভ প্রকাশ। উজ্জ্বল তার হাসি, মুগ্ধকর তার ভঙ্গি, তার কথায় ব্রীড়াহীন অথচ শালীন সরসতা। সরযু সাহসিকাও বটে। বাঙালী তরুণী, একটি মাত্র সঙ্গিনীকে নিয়ে ভ্রমণে বার হয়েছে নিজে মোটর চালিয়ে। দীর্ঘ যাত্রা—জাতীয় রাজবর্ত্ম ধরে এলাহাবাদ পর্যন্ত। মাঝে সিওনি হয়ে এসেছে জব্বলপুরে। এখান থেকে যাবে রেওয়ায়। রেওয়া থেকে জাতীয় সড়ক ছেড়ে যাবে সাতনার পথে। সাতনা পান্না হয়ে খাজুরাহো। খাজুরাহো থেকে আবার সাতনায় ফিরে এসে এলাহাবাদ। আমিও নানান জায়গায় অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি,—নানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে পথে-ঘাটে, কিন্তু সরযুর মতো এমনি দু'টি দেখি নি।

সরযুর প্রোগ্রাম শুনে তারিফ না করে পারলাম না।

তব বললাম,—জাতীয় সড়ক যখন ছাড়বে, তখন গোলমালে না পড়ো। পান্না থেকে রাস্তাটা শুনেছি খুবই খারাপ। গাড়ি চালানো খুবই অসুবিধে। তা ছাড়া চারদিকে তো মরুভূমি।

কাডগানের পকেট থেকে একমুঠো চকোলেট তুলে আমার হাতে দিল সরযু। চট্ করে বললে,—তাহলে আপনিও লুন আমাদের সঙ্গে!

আমি? আমি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে কি করব?

খিল খিল করে হেসে বললে—পথে গাড়ি আটকালে ঠেলতেও তো পারবেন! খাজুরাহো আপনি দেখেছেন?

না দেখি নি, তবে পথের বিবরণ শুনেছি। সে বড় খারাপ পথ।

সরযু বললে,—কিন্তু খাজুরাহো দেখব বলেই যে বেরিয়েছি। ওটা বাদ থাকলে সারা ভ্রমণের কোনো মানে থাকবে না!

আমি বললাম—যাই হোক, রেওয়া থেকে একজন মেকানিক-ড্রাইভার সঙ্গে নিয়ে নিয়ো!

সরযু বললে—থাক মশাই, আর অতো দরদ দেখাতে হবে না। সাধলাম নিজে চলুন সঙ্গে, তার তো কোনো উত্তর নেই!

কথা হচ্ছিল ভিড়াঘাটের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে। প্রসঙ্গান্তরের জন্যে বললাম,—জানো সরযু, খাজুরাহোতেও এমনি চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আছে। এ মন্দির যেমন কলচুরিদের, সে মন্দির চন্দেল্লদের। সেখানে কিন্তু আর যোগিনী নেই। এই যে এখানকার দেয়ালে দেয়ালে যোগিনীদের দেখছ, এঁরা চন্দেল্লদের উপর রাগ করে কলচুরি মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

সরযু মুচকি হাসি হাসল। বললে,—রাগ করে নয়, ঠ্যালায় পড়ে।

আমি বললাম,—কি রকম?

চন্দেল্ল আর কলচুরি,—পাশাপাশি দুই রাজ্য,—তার মানেই রাজায় রাজায় লড়াই। সেই লড়াইতে কলচুরিরাজ কর্ণদেবের কাছে একবার দারুণ মার খেয়েছিলেন চন্দেল্লরাজ দেববর্মণ। যোগিনীরা শক্তের ভক্ত হয়েছিলেন। তা ছাড়া আরো কারণ আছে।

সরযুর উত্তর শুনে চমকে গেলাম। নিশ্চয়ই সে বিদুষী মেয়ে, কিন্তু কোন্ বিষয়ে কতোটা তার পড়াশুনো তা তো জানি নে। আমতা আমতা করে বললাম,—বলো তো, কি কারণ?

ততোক্ষণে সিঁড়ি ভেঙে আমরা চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে পৌঁছে গেছি। বিশাল পাথরবাঁধানো প্রাচীন প্রাচীরঘেরা মস্ত গোল চত্বর। দেয়ালের ভিতর দিকে সার সার যোগিনী-মূর্তি। অনেকগুলিই বেশ ভালো অবস্থায় আছে, কয়েকটির ভগ্নাবস্থা। যোগিনী-মূর্তির সঙ্গে আরো কয়েকটি অন্য মূর্তিও আছে। মূর্তিগুলির মুখ চত্বরের কেন্দ্রের দিকে,—যেখানে একটি সুন্দর মন্দির। মন্দিরে আসীন গৌরীশংকর ও শিবানী।

কলচুরি যুগে এই চৌষট্টি যোগিনীর চত্বরে এক বিশাল শৈব মঠ ছিল। সারা ভারতের শৈবসন্ন্যাসীদের পরম তীর্থ ছিল এই মঠ। রাজারা ছিলেন এই মঠের পৃষ্ঠপোষক। কলচুরিরাজ গয়াকর্ণদেবের বিধবা রাণী অলহন দেবী ১১৫৫ খৃস্টাব্দে এই মঠ সংস্কার করেন ও মাঝখানের গৌরীশংকর মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। অলহন্ দেবী ছিলেন মালবের পরমার রাজা উদয়াদিত্যের পৌত্রী। চৌষট্টি যোগিনীর সামনে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের এক ফলকে অলহন্ দেবীর এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লেখা আছে।

সরযূ বললে—এই কলচুরি রাজারা গোঁড়া শৈব ছিলেন। শিব ছাড়া আর কোনো দেবতা তাঁদের কাছে বিশেষ পাত্তা পেতেন না। চন্দেল্লদের অবশ্য এমনি গোঁড়ামি ছিল না। শিবের প্রতি পক্ষপাত থাকলেও হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তি,—ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর,—তিন দেবতাকেই তাঁরা মানতেন। তা ছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন, এই দুই ধর্মেরও তাঁরা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চন্দেল্লযুগের মন্দিরে মন্দিরে রাজাদের সেই উদার ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় আছে। অতএব শিবের যোগিনীদের খাতির যে খাজুরাহো থেকে এই কলচুরি-মঠে বেশি হয়েছিল, তাতে ভুল নেই।

আমি কিছুটা বিস্মিত হয়ে সরযূর কথা শুনছিলাম। বললাম,—তুমি এর আগে খাজুরাহোতে গিয়েছিলে না কি সরযূ?

দাঁত বার করে হেসে বললে,—না। বইপড়া বিদ্যে আওড়াচ্ছিলাম। আপনিও যান নি, আমিও যাই নি। চলুন না আমাদের সঙ্গে?

আমার অন্য পথ, অন্য যাত্রা। এবারও তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। একটি গণেশমূর্তির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম।

কিন্তু খাজুরাহো-প্রসঙ্গ এড়ানো গেল না সারাদিনে। বিকেলবেলা ভিড়াঘাটের পথে ফিরে যেতে আবার সে কথা উঠল।

পথের বাঁ ধারে একটি ছোট চালাঘর। সামনের বারান্দায় ছোট বড় সোপ্‌স্টোনের কয়েকটি মূর্তি। সামনে কয়েকজন দর্শকের জটলা।

সরযূ গাড়ি থামালো। বললে,—চলুন, ওখানে নিশ্চয় আর্ট একজিবিশন বসেছে, দেখে আসি।

আর্ট একজিবিশনই বটে। মাথার উপর খাপরার চাল, ধুলোপড়া ফাটলধরা মেঝে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা চৌকি, সামনের বারান্দায় একটা ভাঙা বেঞ্চি আর গোটা দুই তিন উঁচু নিচু টুল। সেই টুল আর বেঞ্চিতে সাজানো নানা মূর্তি। মানুষের মধ্যে আছেন গান্ধীজী আর নেতাজী আর দেবতাদের মধ্যে হরপার্বতী আর কমলাসনা লক্ষ্মী। আর ক'টি নৃত্যপরা মানবী। শিল্পী এককোণে বসে ডালামাইটের একটা চাঙড়ে নরুণ ঘসছেন। রুক্ষ চুল আধবয়সী রোগা-পটকা চেহারা, চোখে মোটা পরকলার চশমা। পরনে মোটা খদ্দরের ময়লা পায়জামা আর পিরান। আজ থেকে হাজার বছর আগে যারা কলচুরি আর চন্দেল্ল যুগের পরমাশ্চর্য ভাস্কর্য-সুষমার সৃষ্টি করেছিল, তাদেরই প্রতিভূ।

ধুঁয়াধার পৌঁছবার একটু আগেই বাঁদিকে মস্ত জায়গা জুড়ে গভীর খাদ। ডলোমাইটের আকর। মাটি থেকে পাথরের চাঙড় খুঁড়ে খুঁড়ে লরী বোঝাই করা হচ্ছে। এই সাদাটে রঙের নরম পাথর দিয়ে শিল্পী এই সব ছোট ছোট মূর্তিগুলি বানিয়েছে। ভ্রমণকারীদের কাছে বিক্রির আশায় সাজিয়ে রেখেছে রাস্তার ধারে চালাঘরের বারান্দায়।

নিতান্ত সাধারণ কাজ,—প্রচলিত ধারার নিতান্ত সস্তা অনুকরণ। কিন্তু সরযূর কথায় শিল্পী উৎসাহিত হ'য়ে উঠল।

বারান্দার কোণে চট্-ঢাকা একটা বড়ো মূর্তি ছিল। সরযূ তার আবরণ খুলে ফেলল,—সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। ঠিক সেই মূর্তি! একই আয়তন, একই রূপ! সেটি কেবল কষ্টিপাথরের, আর এর পাথর শাদা।

সরযূ খুব মন দিয়ে নিরীক্ষণ করছিল,—শিল্পী আস্তে আস্তে হাতের কাজ সেরে পাশে এসে দাঁড়াল। নরম গলায় বললে,—কেমন নকল করেছি তাই দেখছেন? আমি আর কিছু করি নে দিদি, শুধু নকলই করি।

সরযূ চমকে উঠে শিল্পীর দিকে তাকালো। তারপর বললে,—নকলই যদি করতে হয়, তাহলে এমনি আসলের নকল করায় গৌরব আছে!

তারপর বোধ হয় ঐ মূর্তিগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে,—ঐ সব নকলের নকল করেছেন কেন?

মোটা চশমার নিচে শিল্পীর চোখদু'টো চকচক করে উঠল। বললে,—নকলের নকলই যে সস্তা। আর সস্তা জিনিস বিক্রি করেই যে পেট চলে!

সরযূ কোনো কথা বললে না। মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় এসে নামল।

শিল্পী আবার কাছে এগিয়ে এল। বললে,—আসলের নকলও কিছু কিছু করেছি, দেখবেন?

কোথায় সেগুলো ?

এখানে তো রাখবার জায়গা নেই। আমার ঘরে সেগুলো রেখে দিয়েছি। সেখানেই আমি কাজ করি। বেশি দূর নয়, তবে গাড়ি যাবে না। একটু হেঁটে যাবেন ?

লোকটির আগ্রহ দেখে সরযূ একটু বিব্রতবোধ করল। শান্ত গলায় বললে,—আমি আপনার আসল নকল কোনো জিনিসই কিনব না। আমার জন্যে এখন আপনার দোকান ছেড়ে গিয়ে লাভ কি ?

মৃদুহেসে বললে,—যেগুলি কেনাবেচার নয়, সেগুলিই তো আপনাকে দেখাতে চাইছি! ঐ যে অতো বড়ো পাথর, জানি মার্বল রক্‌সে বেড়াতে এসে ও জিনিস চট্ করে কেউ কিনবে না। তবু দেখবে তো,—এই আশায় ওটাকে এখানে রেখেছিলাম। কিন্তু ওটার দিকে চোখ তুলে কেউ তাকায়ই না, তাই শেষ পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিলাম। আপনিই দেখলাম ওর চটের ঢাকনা সরিয়েছেন, ওকে চিন্‌তে পেরেছেন।

সত্যিই সরযূ চিনতে পেরেছিল। আমরা অনেকেই চিনতে পারি নে, অনেকেই মনে রাখি নে। তার কারণ বোধ হয় এই যে মন দিয়ে লক্ষ্যই করি নে। যা লক্ষ্য করবার তা নিশ্চয় লক্ষ্য করি, কিন্তু সবচেয়ে যা লক্ষ্য করবার তা চোখ এড়িয়ে যায়।

কাশী বিশ্বনাথ তীর্থদর্শন সেরে ফিরে এলাম। মনে আছে মন্দিরের পাণ্ডা-পূজার্থীর ভিড়, বাবার গলির দোকানদারদের নাম, মণিকর্ণিকা থেকে কেদারঘাটের দৃশ্য, তিলভাণ্ডেশ্বরের ভুঁড়ি, সারনাথের পথের দু'ধারে আমের মুকুল। মনে আছে দশাশ্বমেধ ঘাটের সেই পাগলা সাধুটিকে, অশ্রুমুখী সেই ভিখারিণীটিকে। সেই যে লোকটা ছড়া বলে বলে পানিপুরী বিক্রি করত তাকেও মনে আছে।

কিন্তু কেউ যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে,—বাবা বিশ্বনাথকে কেমন দেখলে,—জগজ্জননী অন্নপূর্ণার মাতৃমূর্তিটি বর্ণনা কর তো ? তখন উত্তর দিতে পারি নে। তখন বুঝতে পারি, যা দেখতে গিয়েছিলাম, কতো কিছু দেখতে দেখতে তাই দেখাটা বাকি রয়ে গিয়েছে।

বারান্দার এককোণে চটের আড়ালে যে শিল্প-নিদর্শন লুকিয়েছিল সেটি চৌষট্টি যোগিনীর গৌরীশঙ্কর মন্দিরের বিগ্রহের নিখুঁত প্রতিকৃতি। মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে বিগ্রহটিকে অতি যত্ন সহকারে আমি নিরীক্ষণ করেছিলাম। এমনি শিবমূর্তি কোথাও কখনো আমার চোখেই পড়ে নি। তাই খুব মন দিয়ে দেখেছিলাম।

মন্দিরের পিছনের দেয়াল জুড়ে বিশাল এক কষ্টিপাথর। সেই কষ্টিপাথরের উপর খোদাই করা মূর্তি। বিশাল নন্দী,—সেই নন্দীর পিঠে বসে আছেন শিব ও শিবানী। শিবের কপাটবক্ষ, আজানু বাহু, জটাশোভিত শির, মুখে উজ্জ্বল প্রশান্তি। ক্রোড়লগ্না প্রেমিকা পার্বতী নবীনা লতার মতো ছন্দোময়ী। বৃষভারূঢ় যুগল হর-পার্বতীকে ঘিরে সূর্য, চন্দ্র, লক্ষ্মী-নারায়ণ, গণেশ প্রভৃতি স্বর্গের দেবদেবীগণ বন্দনারত।

এই আশ্চর্য মূর্তিটি আমার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই শিল্পীর ঐ নিপুণ অনুকৃতি দেখে আমি চিনতে পেরেছিলাম, মনে মনে তারিফ করেছিলাম। সরযূরও দেরি হয় নি।

বাঁ-দিকের গলির মধ্যে দু'মিনিট হেঁটেই শিল্পীর কুটীর। তালা খুলে একটা অন্ধকার ঘরে সে ঢুকল। তাড়াতাড়ি ঘরের সব জানলাগুলো খুলে দিয়ে সে বললে,—আসুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। দেয়ালের ধারে ধারে সাজানো প্রায় কুড়িটি ভাস্কর্য নিদর্শন। প্রতিটি ধবধবে শাদা পাথরের,—তিন-চার ফুট উঁচু। কি সুন্দর কাজ, কি অপূর্ব মাধুর্য সে কাজে!

ভিড়াঘাটের গ্রামে সেই দরিদ্র কুটীরের মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের সমাবেশ! মলিন দেয়াল আলো করে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্গ কাননের কতো অপ্সরা, কামকান্তিময়ী কতো নায়িকা, মিথুনবদ্ধ কতো বিভোল প্রেমিক-প্রেমিকা। অপরাহ্ণের আলো জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। সেই আলোর স্পষ্টতায় তাদের বিমোহিনী রূপ, তাদের বাসনা-বিহ্বল নিলাজ আমন্ত্রণ।

হাঁ করে মূর্তিগুলির দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম।

এই মূর্তিগুলি আমার অপরিচিত নয়। বই-এর পাতায় এদের ফোটোগ্রাফ আমি অনেক দেখেছি। আসলগুলি এ পর্যন্ত দেখার সুযোগ পাই নি। যা দেখছি তাও আসল নয়, অনুকরণ। কিন্তু এ অনুকরণ সার্থক শিল্পকার্য,—মৌলিক সৃষ্টির অনেক কাছাকাছি।

সরযূ কানের কাছে বললে,—কেমন দেখছেন?

উত্তর দেবার কিছু নেই। সরযূ তখন শিল্পীকে বললে,—কতদিন খাজুরাহোতে ছিলেন?

শিল্পী বললে,—ন-মাস?

এগুলো সেখানে বসেই করেছিলেন?

না, ছোট ছোট ছাঁচ করে এনেছিলাম। তারপর কাজ করেছি এখানে। কেমন হয়েছে বলুন তো?

বেশ হয়েছে। এগুলো কি বিক্রির জন্যে নয়?

একসঙ্গে সবগুলো যদি কেউ কেনে, তাহলে বিক্রি করব বৈ কি! খুচরো খুচরো বিক্রি করতে চাই নে।

আমার আশ্চর্য লাগল কথা শুনে। বললাম,—তেমনি খদ্দের কি পাবেন? আলাদা আলাদা বিক্রি করবেন নাই বা কেন?

মৃদু হাসল শিল্পী। বললে,—একসঙ্গে এগুলোকে বিদায় করতে পারলে খাজুরাহোর নেশা শেষ হবে। বেশি কিছু টাকা যদি পাই, তাহলে এখান থেকে চলে যেতেও পারব।

কোথায় যাবেন?

যাব বেলুড়ে।

বেলুড় বলতেই যে স্থানটির কথা আমার মনে এসেছিল, তা প্রকাশ করার আগেই আমার ভুল সংশোধন করল সরযূ। চট করে বললে,— মধ্যপ্রদেশ থেকে একেবারে মহীশূরে?

ঠিক বলেছেন। হয়শালা ভাস্কর্য নিয়ে কাটাব কয়েক মাস।

তারপর?

তারপর কাছাকাছি একটা ডেরা বানিয়ে সেখানকার সুরসুন্দরীদের নকল করব।

স্নিগ্ধ হাসি হাসল সরযূ। বললে,—খুব ভালো, খাসা নকলনবীশ আপনি।

ভিড়াঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। শেষ হয়ে আসছে একটি সোনার দিন। পশ্চিম আকাশে শেষ সূর্যের আভা। আঁধার নামছে মার্বল রকের গায়ে। ভ্রমণকারীদের নিয়ে নৌকাগুলি ঘাটে এসে ভিড়ছে। নীরব হয়ে আসছে ঘাটের কলরব। আমরা মার্বল রক দেখব জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে। আমাদের নৌকা ছাড়ল।

নির্জন নিস্তব্ধ বিশ্বপ্রকৃতি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারায় জগৎ প্লাবিত। আকাশ থেকে গলিত রৌপ্যের ঝরনা ঝরে পড়ছে। দু'ধারে রৌপ্যময় পাহাড়, শান্ত নর্মদা যেন রৌপ্যময় হ্রদ। নিঃসীম নিসর্গের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে অবগাহন করছে দু'টি বিহ্বল হৃদয়।

মাঝিরা দাঁড়টানা বন্ধ করেছে। আপন মনে ভেসে চলেছে তরণী। সরযূ বসে আছে আমার সামনে। তরঙ্গের আন্দোলনে নৌকা অল্প অল্প দুলছে,—মৃদু মৃদু দুলছে ওর তনুলতা।

চন্দ্রিমার উজ্জ্বল রশ্মিতে উদ্ভাসিত সরযূর দেহ। বাতাসে আন্দোলিত ওর চূর্ণ কুন্তল, ওর শিথিল বস্ত্রাঞ্চল। কবরী-শাসনের বিচিত্র ভঙ্গিতে উত্তোলিত ওর দু'টি বাহু, চন্দ্র-চুম্বিত স্ফুট বক্ষরেখা।

সরযূ আমার অপরিচিতা। ও আমার বাস্তবের সম্পর্কহীনা, আমার অভিজ্ঞতার প্রান্তবর্তিনী। আমার চেনাশোনা পৃথিবীর ও কেউ নয়। ও যেন শিল্পীর স্বপ্ন সঙ্গিনী, অমর্ত্যবাসিনী সুরসুন্দরী।

চমক ভাঙল। শান্ত দেহশ্রীকে মর্মরিত করে সরযূ আমার কাছে এসে বসল। বললে,—সত্যি বলুন, আমার সঙ্গে খাজুরাহো যাবেন?

আমি স্তব্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোনো উত্তর দিলাম না।

আমার কাঁধে হাত রেখে সরযূ আবার বললে,—বলুন।

আমার প্রৌঢ় অন্তর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এল। বললাম,—তোমার সঙ্গে আমার না এলেই ভালো হোতো সরযূ!

চমকে উঠল সর ।

তার মানে? আপনার ভালো লাগছে না?

খুব ভালো লাগছে বলেই তো একথা বলছি!

সরযূ বললে,—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি নে। আপনি না থাকলে আমি একলা একলা নৌকায় বেড়াতাম কি করে?

সরযূর ডানহাতটি আমার দু' হাতের মধ্যে ভরে নিলাম। বললাম,—একলা থাকতে কে বললে সরযূ? তোমাকে দেখে ঐ আকাশের চাঁদ মর্ত্যে নেমে আসত, প্রেমিক হয়ে এসে বসত তোমার পাশে।

ঝরনার মতো হাসল সরযূ। বললে,—সত্যিই কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ মর্ত্যনারীর আকর্ষণে আকাশ থেকে একদিন নেমে এসেছিল। নাম জানেন সে মেয়ের?

আমি বললাম,—জানি নে। কে সে?

তার নাম হেমবতী।

সেই পূর্ণিমার রাত্রে নর্মদার স্বচ্ছ বক্ষে নৌকায় বসে অনেকক্ষণ আমাদের কাটল। সরযূ শোনালো খাজুরাহোর চন্দেল্ল-মাতা হেমবতীর উপাখ্যান। [ক্রমশ।

।। ধারাবাহিক উপন্যাস ।।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

নমিতা ওর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে টেনে পথ চলছিল না তো, যেন পা দু'টোকে দিয়ে শরীরটাকে জোর জবরদস্তি বওয়া বইয়ে নিয়ে চলছিল। ভাদ্রমাসের পচা প্যাচপ্যাচে গরম। ব্লাউজটার অবস্থা হয়েছে টিপলে জল পড়বে। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে কাঠ হয়ে। চলতে চলতে বার বার শুকনো ঢোক গিলে গলাটাকে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল নমিতা। ওর চোখের ওপর ভেসে উঠছিল ইণ্টারভিউ দিতে ঢোকা অফিসারের ঘরের টেবিলের ওপর রাখা জলের গ্লাসটা। ঠাণ্ডা এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘর—জলটাও নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়েছিল! জলটা ও পেতে পারত। একটা ভদ্রতাসূচক অনুমতি নিয়ে গ্লাসটা তুলে নিলেই হতো। হয়তো অফিসার ভদ্রলোকটি নিজেই এগিয়ে দিতেন গ্লাসটা ওর হাতের কাছে—কিংবা হয়তো বা হাতেই তুলে দিতেন। কিন্তু লোকটির হাবভাব তাকানো এতো বেশি বাজে লাগছিল ওর যে, উঠে আসার দিকেই ব্যস্ততা ছিল নমিতার। এখন শুকনো ঢোক গিলে গিলে যেন সেই জলটাই খেতে লাগল সে।

তিনটে ইণ্টারভিউ—তাও এক চৌহদ্দিতে নয়। পণ্ডিতিয়া রোড, থিয়েটার রোড, মিশন রো—শহরের প্রায় তিনটা চৌহদ্দি। এক জায়গার ইণ্টারভিউ শেষ করে আরেক জায়গায় যাওয়া—অর্থাৎ ফের ট্রাম-বাসে ওঠা—কলকাতার লোকই ভয় পায় আর ওতো সবেমাত্র এ শহরে এসেছে। ও চোখে সর্ষেফুল দেখে। একবার কোন মতে উঠতে পারলে ভাবে আর নামা যাবে না ভিড়ের চাপ ঠেলে। নামলে ভাবে আর ওঠা যাবে না ভিড়ের চাপ ঠেলে। কিন্তু তবু যায়। চ্যাপ্টা নিরেট নয়—মানুষের ভেতরটা পাথর হয়ে গেলেও দেহটা এখনও পাথর হয়ে যায় নি। ঠেললে ধাক্কালে ফাঁক হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ওঠাও যায় নামাও যায়। আর তা যায় বলেই কলকাতা এখনও চলছে, নইলে কবে থেমে যেত।

ঝুলন্ত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে কিছু ট্রাম-বাসে উঠবার চেষ্টাই করে নি নমিতা। কয়েকটায় চেষ্টা করেও উঠতে পারে নি। শেষে ইণ্টারভিউর সময় চলে যায় দেখে মরি-বাঁচি করে একটা বাসের মধ্যে নিজেকে নিয়ে নিক্ষেপ করেছে। লোকজনের আতঙ্কিত শব্দের ভেতর নিজের আতঙ্ক কাটিয়ে যখন চোখ মেলতে পেরেছে তখন দেখেছে ও বেঁচে আছে এবং তার চাইতে বড় কথা ও বাসে উঠেছে।

কিন্তু এই যে জীবন তুচ্ছ করে ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়া, এর শেষ ফল তা কিন্তু নমিতার অজানা নয়। ও বাসের শরীরপেষা ভিড়ের ভেতর খোলা দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে চোখের উপর দেখছে পর পর ওর সাজানো ইণ্টারভিউর দৃশ্যগুলিই। লিফটে সর সর করে উপরে উঠছে। সঙ্গে আরো কয়েকটি ওরই মত ইণ্টারভিউ দিতে আসা মেয়ে। ওরই মতো—তবু তারা ওর মত নয়। সাজে সজ্জায় তারা দীপ্ত। ওর মতো দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ নয়। ওরা নয়। ওয়েটিং-রুমে আরো যারা প্রতীক্ষারত রয়েছে তারাও নয়। ওরা সবাই পরস্পরের দিকে প্রতিযোগিতার দৃষ্টিতে তাকাবে, ওর দিকে বাদে। একবার দেখে নেবার পর আর ওরা

ওকে স্বীকৃতির মধ্যে আনবে না। পরম নিশ্চিন্তে—বা অবহেলায় ওর দিক থেকে মন সরিয়ে নেবে। নমিতা নিজেও মনে মনে ওদের সঙ্গে একমত হবে। ওদের সঙ্গে নমিতা দাঁড়াতে পারে না। বেশবাসে ওরা সুন্দর। সপ্রতিভতায় ওরা সহজ। আরো জড়সড় হয়ে পড়বে ও। এককোণে চুপ করে বসে থাকবে। তারপর এক সময় ওদের সপ্রতিভতার পাশে অপ্রতিভভাবে কোনমতে ইণ্টারভিউ শেষ করে পালিয়ে আসবে। আশা নিয়ে ও যায় না। আশা ভঙ্গের ভাঙ্গনেও তাই ও বোধ করে না কিছু সত্যি সত্যি, কিন্তু তবু—তবু এই নিরাশার ভেতরও 'যদি হয়' এর যে ক্ষীণ আশাটুকু একটা নিশ্চিহ্ন রেখার মতো থেকে যায় সে কিছুটা মুষড়ে ফেলেই।

সকাল থেকে ঘড়ি ধরে ধরে শহরের এ মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত পড়িমরি ছুটোছুটি করতে করতে চাকরীর ব্যর্থ উমেদারি করেছে। এখন দু'টো বেজে গেছে। আর পারছে না ও। কিন্তু পারি না বললে যাদের রেহাই মেলে তাদের জীবনে ওকথাটার সঙ্গে বড় পরিচয় হয় না। আর হলেও যে নির্মম অর্থ সে বহন করে সে অর্থে হয় না। যাদের হয় তাদের সে আবার অর্থ ছাড়িয়েও অনেক দূর নিয়ে যায়। মরতে মরতেও তাদের পারতে হয়। আর তাই বুঝি নমিতা এক সময় দেখে তার এবারের গন্তব্যস্থল শিবানীর অফিসে ছেঁড়া চটি টানতে টানতে আর আকণ্ঠ পিপাসায় শুকিয়ে-ওঠা গলায় শুকনো ঢোক গিলতে গিলতে এসে উপস্থিত হতে পেরেছে।

শিবানী ঘরে ছিল না। মিস জোন নয়। তা না থাক কেউ। ওতো ঘরে ঢুকে বসতে পেরেছে! কালকে বেয়ারা ওকে শিবানীর সঙ্গে দেখেছে। তাই হয়ত সমাদর করে এনে বসিয়ে গেল। চেয়ারে বসে আগেই খুঁজল শিবানীর টেবিলে জল আছে কি না। নেই। বেয়ারাটা বসিয়েই চলে গেছে। নইলে তার কাছে একগ্লাস জল চাইত। টেবিলের বেলটা বাজিয়ে সেদিন শিবানীকে নমিতা বেয়ারাকে ডাকতে দেখেছে। ডাকবে নাকি সে ভাবে। ওকে একগ্লাস জল চাইবে? কিন্তু এটুকুও পারলো না ও। শিবানীর প্রতীক্ষায় বসে রইল। মাংসপেশীগুলো তখন ওর কেঁপে কেঁপে উঠছে। দপ্‌দপ্‌ করছে নিম্নাঙ্গের শিরা-উপশিরা। শিবানীর এখানে আসতে অনেকটা পথ ও হেঁটেছে। এমন শক্ত পথে চলা নমিতার অভ্যাস নেই। যে শান-বাঁধানো পথে ও এখন নিত্যদিন হাঁটে তেমন শক্ত পথ তো দূরের কথা তেমন পাকা ঘরও নমিতা দেখেছে অনেক বড় হয়ে। বাবা যখন ওদের গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে এলেন ঢাকায় তখন। গোবর-মাটি গুলে ঘরের মেঝে এবং পিঁড়ে লেপতে হয় না, শুধু জল নেকড়া পোছা করলেই চলে—এ বিস্ময় কাটতেও নমিতার তখন সময় লেগেছিল—মজা লেগেছিল। কিন্তু তবু ওর ভালো লাগে নি। যেমন ভালো লাগছে না ঢাকা ছেড়ে কলকাতা এসে। এ ভালো না লাগার কারণ কেবল অনাশ্রয় অসহায় তাই নয়, অনভ্যস্ত জীবন প্রতিপদে ক্লিষ্ট করছে।

একদিন গ্রাম ছেড়ে ঢাকা এসে যেমন মনটা পড়ে থাকত গ্রামের সরু মেঠো পথে, নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে, এখন তেমনি পড়ে থাকে ঢাকার বাড়িতে। কুয়োর জল টেনে তুলে মা ওদের যখন স্নান করিয়ে দিতেন ঢাকার বাড়িতে, তখন দীঘির ভরা জলে সাঁতার কাটার জন্য যেমন কান্না পেত, তেমনি এখন যখন বারোয়ারী ফ্লাটের এক ঘরের বাসিন্দে হয়ে অদৃষ্টে বেশির ভাগ দিনই স্নানের জল জোটে না তখন কান্না পায় ঐ কুয়োর জলের জন্যই। আজও ওর অদৃষ্টে স্নানের জল জোটে নি। ভেজা গামছা দিয়ে গা-হাত-পা মুছে স্নানের প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে।···

আরে! শিবানী এসে নমিতার পিঠে হাত রেখে আনন্দিত অভ্যর্থনা জানালো, কখন এসেছিস? বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠাস নি কেন! তারপর এসে নিজের চেয়ারে বসে নমিতার মুখের ওপর একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে এনে বললো, আঃ, মেয়ে ঘুরে ঘুরে চেহারাখানার অবস্থা কি করেছেন দেখ না! হাত দিয়ে পাশের বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে বললো, ঐ যে টয়লটের ঘর। চলে যা। হাত-মুখ ধুয়ে; মাথাটাথা আঁচড়ে ঠিক হয়ে আয়। ওখানে একপ্রস্থ প্রসাধনের সব কিছু দেখতে পাবি, পরিষ্কার হয়ে আয়। তারপর কথা হবে কফি খেতে খেতে। আজ জেনি আসে নি। আমাদের জমবে ভালো।

আগে একগ্লাস জল খাওয়া—

বেয়ারাকে ডেকে জল আনতে আদেশ করলে শিবানী। জল খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসে বসে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল নমিতা। এই নিষ্করুণ নির্বান্ধব শহরে, মুখ ঘুরিয়ে থাকা আত্মসর্বস্ব আত্মীয়গোষ্ঠীর মাঝে পিপাসায় একগ্লাস জল বাড়িয়ে ধরবার মতো কারু দেখা এ পর্যন্ত পায় নি নমিতা। শিবানীর সহৃদয়তায় চোখে জল এসে গেল ওর। 'ইণ্টারভিউগুলির কোথাও কোন আশা আছে কি না' শিবানীর এ প্রশ্নের জবাবে, কিছুমাত্র না—বলে ম্লানভাবে একটু হাসতে চেষ্টা করল নমিতা। কিন্তু ওকে লজ্জিত বিব্রত করে দু'চোখ ছাপিয়ে জল ভরে উঠল।

ভ্রূ বাঁকিয়ে তিরস্কার করলো শিবানী! আচ্ছা নমিতা, এ কি ছেলেমানুষি হচ্ছে!

তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলল নমিতা। হেসে বললো, সত্যি ছেলেমানুষি।

তোকে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারব না—তুই আমাকে এমন ভাবছিস দেখে আমার এবার কান্না

যে স্টেশন ইচ্ছে হয় ধরুন···তারপর শুনে দেখুন কী সুন্দর আওয়াজ !

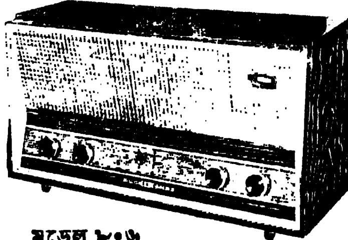
নতুন নতুন সুদৃশ্য মডেলের

ন্যাশনাল একো

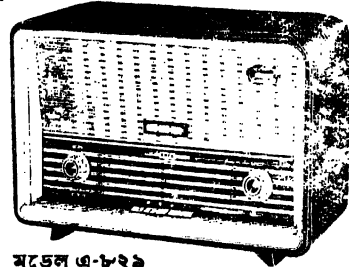


ভারতের অগ্রণী রেডিও-প্রস্তুতকারক **ন্যাশনাল-একো** সগৌরবে আপনার সামনে উপস্থিত করছে তিনটি নতুন মডেল—ইউ-৮১৯, এ-৮০৬ আর এ-৮২৯। প্রত্যেকটি মডেল উৎকর্ষে নিখুঁত এবং **ন্যাশনাল-একো**-র উচ্চ গুণমান অনুযায়ী তৈরী···প্রত্যেকটির আওয়াজ সুস্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর—ঠিক যেমনটি আপনি চান। আপনার নিকটস্থ যে কোনো **ন্যাশনাল-একো** রেডিও বিক্রেতার কাছে গিয়ে ইচ্ছেমত স্টেশন ধ'রে নিজের কানে আওয়াজ শুনুন !

মডেল ইউ-৮১৯
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৫ ভাল্‌ভ।
ব্যাকেলাইটের ক্যাবিনেট।
এসি/ডিসি।
২৯৮৲ টাকা।



মডেল ৮০৬
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৬ ভাল্‌ভ: নতুন স্টাইলের চিকন কাঠের ক্যাবিনেট। মডেল এ-৮০৬ এসি—মডেল ইউ-৮০৬ এসি/ডিসি।
৩৯৫৲ টাকা।



মডেল এ-৮২৯
৬ ভ্যাল্‌ভ ; ৪ ব্যাণ্ড। পার্মানেণ্ট ম্যাগনেট স্পীকার ; ৩ পুশ্‌ বাটন টোন কণ্ট্রোল বাস্‌, ট্রেব্‌ল ও মিডিয়ামের জন্যে ; ব্যাণ্ড ধরবার জন্যে পিয়ানো-কী, এসি।
৪৮১৲ টাকা।

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • দিল্লী বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ • পাটনা

মূল্য উৎপাদন শুল্ক সহ :
অন্যান্য কর অতিরিক্ত

ন্যাশনাল একো মনসুনাইজ্‌ড রেডিও

ভারতের বৃহত্তম রেডিও কারখানায় তৈরী

JWT/GRA 3033A

পাচ্ছে—। যা এতো ভাবতে হবে না। কফির সঙ্গে কিছু খাবি? আনাব?

কি খেয়ে এসেছে! কিছুই তো না একরকম। দু'টুকরো পাউরুটি আর এককাপ চা। খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলছে। আচ্ছা। সম্মতি জানাল নমিতা। কলকাতা শহরে এমন সুন্দর ঘরে এমন সুন্দর একটা মন ওর জন্য রয়েছে এ ওর কল্পনায়ও ছিল না তো!

বেল বাজাল শিবানী। বেয়ারা এলে জিজ্ঞাসা করল, কি খাবি বল?

যা হোক—

যা হোক! আচ্ছা। হাসল শিবানী। বেয়ারাকে আদেশ করলো ক্যান্টিন থেকে রুটি মাখন ওমলেট দু'ডিস আর দু'কাপ কফি আনার। বেয়ারা চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলো, বি-এ তো তুই?

না।

না! একটু অবাক হলো শিবানী। আই-এ তো একসঙ্গেই ওরা পাশ করে এসেছে। তারপর ও চলে এসে কলকাতায় বি-এ ভর্তি হয়েছে, আর নমিতা ঢাকা ইউনিভারসিটিতে বি-এ ভর্তি হয়েছে দেখে এসেছে। পরীক্ষায় পাশ করে নি নমিতা এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই পড়া বন্ধ করতে হয়েছে বা যে কোন কারণেই হোক পরীক্ষা দিতে পারে নি ও। কিন্তু সে কথায় আর গেল না শিবানী। বললো, ঠিক আছে। সেজন্য আটকাবে না। আজ নয় কাল কিছু একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবই তোর।

আজ নয় কাল! কাল হলে আজ খাবো কিরে শিবানী? কথাটার সঙ্গে হাসির প্রলেপ জড়ালো নমিতা।

এবার সত্যি চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল শিবানীর। বললো, এতটা খারাপ অবস্থা তো তোদের ছিল না নমিতা?

অবস্থা কি আমরা কেউ সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছি শিবানী? আর অবস্থা আমাদের খারাপ না থাকলেও ভালোও ছিল না কিছু। গ্রামে জমি-জমা সামান্য ছিল। তাই একরকম চলত। সে সব নিয়ে আসতে পারি নি—বিক্রি করতেও না।

কেন?

কিনবে কে? এমনিতেই যখন সব পাবে ওরা জানে, তখন টাকা দিয়ে কিনবে কেন।

বেয়ারা দু'ডিস খাবার, দু'কাপ কফি ট্রে করে এনে দু'জনার সামনে সাজিয়ে দিয়ে গেল। শিবানী মস্ত ডবল ডিমের ওমলেটটা চামচে দিয়ে কেটে দু'টুকরো করে এক টুকরো নমিতার প্লেটে তুলে দিল। রুটিও তুলে দিল এক পিস।

নমিতা আপত্তি জানাল। বললো, এ কি করছিস শিবানী। সব যে তুলে দিচ্ছিস আমায়।

শিবানী বললো, আমি এই কিছুক্ষণ আগে লাঞ্চ খেয়েছি রে। এ নিলাম শুধু তোকে সঙ্গ দিতে। তুই খা।

নমিতা খেতে লাগল।

শিবানীও চামচে দিয়ে একটু একটু করে ওমলেট কেটে মুখে তুলতে লাগল সময় নিয়ে নিয়ে। মাঝে মাঝে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে নমিতা বললো, আমার কথা তো অনেক হলো। এখন তোর কথা শুনি?

তোর কথা অনেক হলো কোথায়? তোর দাদা আছেন। কিন্তু তোর কথা শুনে যতটুকু বুঝতে পারছি তাতে মনে হচ্ছে, সংসারের সব দায়িত্ব তোর উপর এসে পড়েছে। এর কারণ কি, তোর দাদা কোথায়? বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছেন?

কফির পেয়ালাটার দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল নমিতা, তারপর আস্তে আস্তে চোখ তুলে শিবানীর দিকে তাকিয়ে বললো, দাদা নেই শিবানী।

অতীন নেই! চমকে উঠে ঝুঁকে পড়লো শিবানী নমিতার দিকে।—বলছিস কি তুই! বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শিবানী নমিতার দিকে।

অতীনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল নমিতার ভাই হিসাবেই। তারপর যৌবনের ভালোলাগার একটা মস্ত অংশ সে দিয়ে এসেছিল অতীনকে। ওদের ইউনিভারসিটির অভিনয়ে—বাঁশরির পার্টে নামিয়েছিল ওকে অতীন। সে দিনগুলির আনন্দ ও ভোলে নি। কখনো ভুলবেও না। যদি চলে আসতে না হতো তবে ওদের সেই ভালোলাগা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত কে জানে! হয়তো ইন্দ্রনাথকে চেনার অবকাশই ওর জীবনে আসত না। হয়তো অতীনের সঙ্গেই গিয়ে ঘর বাঁধতো একশ' টাকার ফ্ল্যাটে। হ্যাঁ, এমন কথা সে অতীনকে বলেছেও। অতীন হেসেছে। বলেছে, একশ' টাকার ফ্ল্যাটে ঘর বাঁধাটাই তোমার এমন কৃচ্ছ্র-সাধন মনে হচ্ছে শিবানী! কিন্তু আমি যে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ঘর বাঁধব। সে-ঘর তো মাটির। আর জল আনতে যেতে হবে নদীতে। ও নিজেও কম যায় নি। লাফিয়ে উঠে বলেছে, সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে এমন মাটির ঘর যদি না দিতে পারো তবে ভালো হবে না—মনে রেখো। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করো না। চলে আসবার সময় কেঁদে ও অনুরোধ করেছিল অতীনের দু'হাত ধরে, কলকাতা চলে এসো অতীন। অতীন তেমনি হেসে বলেছিল, আমার কথা দেওয়া আছে নদীর দেশে মাটির ঘরের। তোমায়

আমি ভুলব না। যদি তুমিও না ভোল তবে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। ও ভুলে গিয়েছিল অতীনকে—তাই কি আর দেখা হলো না। জলভরা ঝাপসা দৃষ্টি তুলে তাকাল শিবানী নমিতার দিকে। কিন্তু একে কি ভোলা বলে? অতীনের বোন বলেই তো নমিতার প্রতি ও এতো আকর্ষণ বোধ করছে। নমিতাকে দেখে যখন গাড়ি থামিয়েছিল ও, তখন তো সব প্রথম অতীনের কথাই ওর মনে পড়েছিল। তার খবরই জানতে ইচ্ছে করেছিল। তার কথা শুনবার জন্যই নমিতাকে অফিস পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নমিতার ইণ্টারভিউ থাকায় শোনা সম্ভব হয় নি বলে নমিতার কাছ থেকে কথা আদায় করে রেখেছিল আসবার। চোখের জলটা চোখের ভেতরই মিলিয়ে দিল শিবানী কিছু সময় নিয়ে। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, কতদিন হলো?

আমরা ঢাকা ছাড়বার আগে, এই তিন মাস হলো।

কি হয়েছিল?

প্রথমটায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল নমিতা। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে পরিষ্কার করে বললো, ঢাকার এবারকার দাঙ্গায় মারা গেছেন দাদা।

দাঙ্গায়! মাগো!! বলে শিবানী দু'হাতে চোখ ঢাকল।

কতগুলি নিঃশব্দ মুহূর্ত কেটে চলল। তারপর একসময় ফ্যাকাশে মুখ তুলে শিবানী আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো, তোরা এমন ভুল করলি কেন রে নমিতা? কেন তোরা দেশ ভাগ হবার পরই চলে এলি নে? অতীনই বা কেন এমন মরণ-ভুল করলে রে নমি—

চোখভরা জল হাত দিয়ে মুছে নিয়ে নমিতা বললো, হ্যাঁ শিবানী দাদাকে মরণ ভুলেই পেয়েছিল। মা তো অস্থির হয়েই উঠেছিলেন চলে আসবার জন্য। দাদার হাত ধরে কান্নাকাটি করতেন। দাদা কেবল বলতেন, ঘর বাড়ি ছেড়ে কলকাতা গিয়ে ভিখারির খাতায় নাম লেখাতে পারব না। মা, আমি যখন দাঙ্গা লাগবার আশঙ্কার কথা শুনে এসে ব্যাকুল হয়ে পড়তাম তখন আমাদের নানা যুক্তি দিয়ে কেবল বোঝাতেন কি কি রাজনৈতিক কারণে দাঙ্গা এখন কিছুতেই হতে পারে না।

তারপর?

দাদার কোন যুক্তিই টিকল না। একদিন সত্যি দাঙ্গা লেগে গেল হঠাৎ। দাদা দুপুরবেলা একথলে কইমাছ নিয়ে এসে বললেন, দু' বন্ধু দু' কুড়ি কিনলাম। কি সস্তা! দাম শুনে মাথা ঘুরে পড়ে যাবি তোরা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এত সস্তা পেলে কি করে? দাদা বললেন, শহরে দাঙ্গায় গুজব রটেছে। আর বাজার খালি—আমরা যা দাম বললাম দিয়ে দিল। আরো কম বললেও বোধ হয় পেয়ে যেতাম। এখন আপসোস হচ্ছে রে! এমনি সময় আমাদের পাশের বাড়ির অবিনাশবাবুর স্ত্রী ও মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে উপস্থিত। অতীন ভীষণ দাঙ্গা লেগেছে শহরে। তোমার মেসোমশাই ফোন করেছেন অফিস থেকে। তিনি কোনমতেই বাড়ি আসবার কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। রাস্তায় বেরুনো মানে নাকি অবশ্য মৃত্যু। পুলিশ স্টেশনে ফোন করে গাড়ি চেয়েছিলেন পান নি। বলছেন, আমরা যেন কাছাকাছি বাড়ি ক'টা একত্র হয়ে দরজা-কপাট বন্ধ করে ফেলি এখুনি। দাদা উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলে উঠলেন, একমাত্র আপনার বাড়িতে ফোন আছে। ওটা ছেড়ে এ সময় আপনি চলে এলেন কেন?

ফোন দিয়ে করবে কি অতীন? কাকে ফোন করবে। তোমার মেসোমশাই তো পুলিশ স্টেশনে ফোন করেছিলেন। তিনি বলেছেন আমাদের একত্র হতে।

এমনি সময় সামনের রাস্তায় দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি আর করুণ আর্তনাদ উঠল। মা আর অবিনাশবাবুর স্ত্রী আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে বললেন, অতীন এ মেয়ে দু'টোর কি করবে আগে করো। মরণ সামনে নিয়ে মরণের ভয়

তখন তাঁদের চলে গেছে। তাঁদের ভয় আমাদের দু'জনকে যে ওরা মারবে না!

দাদা পাগলের মতো আমাদের দু'হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির কোঠার তলার অন্ধকার চোরা কুঠরির ভেতর ঢোকালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, একেবারে মরার মতো হয়ে থাকবে। ছুরি বসাতে দেখলেও এতটুকু শব্দ করবে না। জানবে একজনের জন্যে শব্দ করলে সবাইকে মরতে হবে।

কেঁদে উঠলাম আমরা, তুমি?

কিন্তু তখন দাদা দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন চোরা কুঠরির। শব্দে বুঝলাম কোন একটা ভারী আলমারী গোছের কিছু অমানুষশ্রমে টেনে এনে মুখ বন্ধ করেছেন দাদা আমাদের দরজার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুপধাপ শব্দে কতগুলি লোক হাটা-বারান্দায় উঠে এলো, টের পেলাম। কানে এলো, 'মার শালাকে।' কিন্তু দাদার গলার এতটুকু শব্দও আমাদের কানে এলো না। আশ্চর্য! আমরাও কিন্তু একটুকু শব্দ গলা দিয়ে বেরুতে দিলাম না কেউ।

দৌড়-ঝাঁপ করে পাগুলি এঘর ওঘর করে আরো মানুষ খুঁজে বেড়ালো। তারপর যা পেলো লুটপাট করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। নীরব হয়ে গেল বাড়িটা। তারপর সন্ধ্যাবেলা মিলিটারী ব্যবস্থা নিয়ে অবিনাশবাবু এলেন। চারহাত ঘর থেকে আমাদের প্রমাণ সাইজ দেহকে টেনে বের করলেন ওঁরা আধমরা অবস্থায়। বেরিয়ে এসে দেখলাম দাদার রক্তাক্ত দেহ, উপুড় হয়ে পড়ে আছে উঠোনে। বন্ধুদের দোল খেলবার ডাকে ঘর বাঁচাতে আমরা যেভাবে বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে রং নি, দাদা বোধ হয় আমাদের মান বাঁচাতে তেমনি বাইরে বেরিয়ে এসে ছুরি নিয়েছিলেন!

ওঁকে অমনি ফেলে রেখে আসতে হলো তোদের?

অমনি ফেলে রেখে চলে আসতে হলো আমাদের। ছোটভাই রতনের ফিট হচ্ছে। মা প্রায় অচৈতন্য। রাত এগিয়ে আসছে। কোন বাড়িতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নি। একবিন্দু আলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। টর্চের আলো ফেলে পথ দেখিয়ে অবিনাশবাবু আমাদের এনে বাড়িতে তুললেন। পেছনে পড়ে রইল খোলা ঘর রান্নাঘরে সাজানো রান্না। উঠোনে দাদার মৃতদেহ।

দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে রইল।

নমিতার চোখে নতুন করে ভেসে উঠল সেদিনকার মর্মান্তিক দৃশ্য। আর শিবানী যতটুকু কল্পনায় দেখা সম্ভব, তাই দেখতে লাগল আর বারবার শিউরে উঠতে লাগল।

অনেকক্ষণ বাদে মিঃ বোস এসে ঘরে ঢুকলে তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে দু'টি মুহ্যমান মেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলো। নমিতা তাড়াতাড়ি মুখের শোকার্ত ভাবটা সরিয়ে মুখটাকে স্বাভাবিক করে তুলল মিঃ বোসকে দেখে। শিবানী মিস জেনির শূন্য চেয়ারটা দেখিয়ে বললো, বসুন মিঃ বোস।

মিঃ বোস বসলেন না। শিবানীর কাতর বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

শিবানী তখনও সম্পূর্ণ ঘটনাটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। অন্যমনস্কভাবে বললো, কিছু না।

কিছু না! তবে আপনার মুখ কান্নার চাপে এখন ফেটে পড়তে চাইছে কেন? জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেলেন মিঃ বোস। ভাবলেন, হয়তো শিবানীর এটা নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার কিছু। মেয়েটি হয়তো তার কোন দুঃস্থ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। হয়তো কোন বিয়োগব্যথার সংবাদ নিয়ে এসেছে কিংবা কোন দুঃখজনক ঘটনার। একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, আপনি অফিস ছুটির পর বাইরের গেটে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। আধ ঘণ্টা হলো অফিস ছুটি হয়ে গেছে, আমি আধ ঘণ্টা ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার অপেক্ষা করছি—

শিবানী যেমন বসেছিল তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বোঝাই গেল না মিঃ বোসের কথা সে শুনতে পেয়েছে কি না।

নমিতা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে বললো, আজ আমি যাচ্ছি শিবানী?

যাবি—একটুক্ষণ ভাবল শিবানী। নমিতাকে যেতে দিতে ইচ্ছে করছিল না ওর। কথা বলতে যে ইচ্ছে করছিল তাও নয়। কেবল ওকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল।

যেভাবে ছিল সে ভাবেই যদি থাকতে পারতো তবেই তা সম্ভব ছিল কিন্তু এখন আর তা নতুন করে হয় না। নমিতাকে আটকে রেখে তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই হোক বা ওর বাড়িতে গিয়েই হোক আর বলা যায় না, আয় চুপ করে বসে থাকি। তখন কথা বলার জন্য কথা খুঁজতে হবে। শিবানীও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যাবি? আচ্ছা। কিন্তু কালকে আসছিস তো?

দেখি।

দেখি নয়। আসতেই হবে। আমি তোর অপেক্ষা করব।

আচ্ছা।

কথা দিলি?

নমিতা হেসে বললো, দিলাম।

চলে গেল নমিতা।

মিঃ বোস গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই মেয়েটি মিসেস সেন?

আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই নি ?

না।

মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কালকে দেবো।

তার আগে পরিচয় পাওয়া যাবে না ?

না তা কেন। মেয়েটির নাম নমিতা দেব। আমার ছোটকালের বন্ধু।

রেফিয়ুজি মেয়ে ?

'রেফিয়ুজি মেয়ে' কথাটা বড্ড কানে বাজল শিবানীর। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আপনাদের সুখের জন্য বলি দেওয়া মেয়ে।

রাস্তার জনস্রোত আর গাড়ির স্রোতের দিকে নজর রাখতে রাখতেও একঝলক শিবানীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে মিঃ বোস বললেন, বুঝতে পারলাম না।

বোঝা খুব শক্ত।

বুঝিয়ে দিলেও বুঝব না ?

বুঝবেন কিন্তু মনে থাকবে না। তাই ও বোঝার কোন মূল্য নেই।

শক্ত ব্যাপারে মিঃ বোস ঢুকতেও চান না। শিবানী যে কতগুলি শক্ত বক্তৃতা দিলে না খুশিই হলেন মিঃ বোস তাতে। একেবারে সহজ দিকে চলে গেলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, চাকরি চায় মেয়েটি ?

পারেন দিতে একটা—? উৎসাহে আগ্রহে একেবারে মিঃ বোসের দিকে ঘুরে বসল শিবানী।

আপনার বন্ধু যখন তখন যে পারতেই হবে মিসেস সেন।

কৃতজ্ঞতায় শিবানী মিঃ বোসের স্টিয়ারিং ধরা হাত স্পর্শ করে এলো।

এদিকে ট্রামের পথে কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল নমিতা। একটা শরীর হিম-করা ঠাণ্ডা স্রোত সর্বশরীর দিয়ে বয়ে গেল ওর। ওর যে ব্যাগে একটি পয়সাও নেই। নেই বলেই শেষ ইণ্টারভিউর পর ওকে হেঁটে আসতে হয়েছিল শিবানীর অফিসে। ভেবেছিল শিবানীর কাছ থেকে কিছু চেয়ে নেবে আসবার সময়। কিন্তু ভদ্রলোক আসায় আর তা সম্ভব হয় নি। মনেও ছিল না। এখন ও কি করবে !!

[ক্রমশ।

অঙ্গনে ও প্রাঙ্গনে

ব্রাইটনে

শ্রীমতী ছায়া সাহা

সেদিন ছিল শনিবারের এক আলো-ঝলমল সকাল। এদেশে রোদটার বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে শীতের সময়। মার্চ-এপ্রিলে যে সূর্যের মুখ দেখা যায় না—তা নয়। তবে এবছর শীতটা বিশেষ জোরালো না হলেও একটানা। কাজেই সারাদিন আকাশ মুখ অন্ধকার করেই আছে, আর ছিঁচকাদুনে আদুরে মেয়ের চোখের জলের মত ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। মাঝে মাঝে স্লিটও যে না ছিল তা নয়। স্লিট হচ্ছে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ—যেগুলো মাটির ছোঁয়া পেলেই গলে জল হয়ে যায়। যাই হোক এই তো চলছিল। একটানা ন'দশদিন সূর্যদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি।

হঠাৎ সেদিন শনিবার—আলোতে ভুবন গেল ছেয়ে। তার ওপর আবার দিনটা হোল ছুটির। কাজেই খুশি-খুশি মনটা পাখনা মেলে দিল হাওয়ায়। অতএব ভিক্টোরিয়া স্টেশন, টিকিট ঘর—তারপর দৌড়ে গিয়ে ঘন্টি-দেওয়া প্রায় ছেড়ে-দেওয়া ট্রেনখানায় উঠে বসা। কি মজা! কি মজা! দেড়ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ব্রাইটনে। একটা ছোট্ট সাজানো-গোছানো উঁচু-নিচু পাহাড়ী ছোট ছোট পথে ঘেরা শহরটি। স্টেশন থেকে বের হয়ে পথটা সোজাসুজি নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। ভারি সুন্দর দিন। পথে-ঘাটে হাসিখুশি ছেলেমেয়েরা ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। ছোটখাটো শহর। অথচ কি নেই এখানে। লণ্ডনের সেই উলওয়ার্থ, সি এণ্ড এ, স্কচ উল, বারটন—সেই সব। রেস্টুরেন্ট, ড্যান্সিং-হল, বেটিং-শপ সুইমিং-পুল—সব কিছু। উপরন্তু আছে—বিশাল সাগর।

এ সাগর হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল—শান্ত। গ্রেট ব্রিটেনের চারদিকেই সাগর—তার কূলে কূলে সাগরের ঢেউ এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। মানুষ তার বিভিন্ন নামকরণ করেছে। তাই এ দ্বীপের পায়ের কাছে ইংলিশ-চ্যানেল, মাথার ওপরে নর্থ সি আর পশ্চিমকূলে আছড়ে পড়ছে বিশাল আটলান্টিক। ইংরেজ কর্মনিপুণ কলাকুশলী জাত। তাই এই দ্বীপটিকে সাজাতে তারা কার্পণ্য করে নি। সমুদ্রের ধারে ধারে তাই গড়ে উঠেছে সাজানো-গোছানো অসংখ্য ছোট ছোট শহর। একই সঙ্গে শহরের সুবিধা আর সাগরতীরের আনন্দের সম্মিলন ঘটেছে এইসব স্থানে।

ব্রাইটন এমনি একটি জায়গা। বহুদিন আগে ছেলেবেলায় শুনতে পেয়েছিলাম এর নাম। ব্রাইটনের সাগর শান্ত। পুরীর সমুদ্রের সেই মত্ত-অশান্ততা বা সেই মনমাতানো উতলা হাওয়ার গর্জনও নেই। তাই আমার মনকে ব্রাইটনের সাগর বিশেষ দোলা দিল না। এ যেন সভ্য ইংরেজের ভদ্রতা। হৈ-হল্লা করা তার ভদ্রতার রুটিনে নেই। তবে এরা সাজাতে জানে। বিরাট রাস্তা চলে গেছে সমুদ্রের ধার দিয়ে—তার পাড় অনেক উঁচুতে—বসবার দাঁড়াবার জায়গার অভাব নেই প্রোমিনেডে। এরই মধ্যে মধ্যে জ্যামিতিক নানা মাপে, নানা কিউবিকের বাগান, বসবার আর স্নানের জায়গা। ছোটদের স্নান করার জন্যে আছে সুন্দর বাঁধানো পুকুর—গভীর-নীল জল।

বাচ্চারা মনের আনন্দে তাদের হাঁটু পর্যন্ত জলে ঝাঁপা-ঝাঁপি করছে, রাবারের নৌকোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্লাস্টিকের বাল্তিতে জল তুলছে—ঢালছে। মায়েরা কাছেই বসবার জায়গায় শুয়ে-বসে আছে।

আর একটু বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে আছে আরও গভীর জল। সেখানে মোটর-বোট ভাড়া পাওয়া যায়। সেখানে এক খুশির মেলা বসে গেছে। উঁচু-পাড়ের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এ খেলা দেখবার দর্শকের অভাব নেই।

সাগরবেলায় শুয়ে-বসে আছে ছেলেমেয়েরা। এরা একে বলে রৌদ্র-স্নান (Sun-bath)। রোদের অভাব এদেশে। তাই যতটুকু পায়—তার তলানিটুকু পর্যন্ত এরা ভোগ করতে কসুর করে না। বিকিনি পরে গায়ে মুখে ক্রীম লাগিয়ে সারে সারে পড়ে আছে সমুদ্রের ধারে—কেউ বা ডেক্-চেয়ারে হেলিয়ে দিয়েছে শরীরটাকে। সকলেরই এক উদ্দেশ্য—রৌদ্র-স্নান। শরীরটাকে তামাটে করা। এরা বলে সান্-ট্যান্। এ ভারি গর্বের। আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে একটা হাস্যকর-বিস্ময় মনে হবে। শরীরটাকে এরা যেন লেবুর আচারের মত জারায়। যে কোন সাগরপারে গেলেই এ-দৃশ্য চোখে পড়বেই।

কেউ কেউ পাল তুলে ইয়ট্ (yacht) ভাসিয়ে দিয়েছে সাগরজলে। রাজহাঁসের মতো ভেসে চলেছে—নীল-জলের ওপর দিয়ে।

জল বেশি অশান্ত নয় বলে এরা সাগরের মাঝে বেশ কয়েক ফার্লং পর্যন্ত এগিয়ে ব্রীজ খাড়া করে পীয়ার (Pier) তৈরি করেছে। অনেকটা মাচার ওপরে ঘরের মতো। লোহার ফ্রেমের ওপরে কাঠের সেতু। তারই মাঝে মাঝে গম্বুজাকৃতি দু'তিনখানা ঘর। কোনটাতে চা-খাবার বন্দোবস্ত, কোনটা অ্যামিউজমেণ্ট-রুম। সেখানে নানা ধরণের ভাগ্য-পরীক্ষার খেলা আছে। এক পেনী থেকে আরম্ভ করে ছ'পেনী আট পেনী পর্যন্ত বেট্ করা যায়। এর মধ্যে একটাতে ছেলেদের ভিড় বেশি। সেখানে পয়সা ফেললে নগ্ন-সুন্দরীদের ছবি দেখা যায়। ইংরেজরা শিশুকে

জাত নয়। তারই ফলে মনে হয়, তাদের এই গ্যাম্বলিং-প্রীতি।

ডেকের ওপরে ঘরগুলোর দু'ধারে বসবার ডেক্ চেয়ার। ব্যবহার করলে ছ' পেনী ভাড়া লাগে। সেখানে সারে সারে সবাই বসে গেছে সাগর-পানে মুখ ফিরিয়ে।

এই ধরণের দু'টো পীয়ার আছে ব্রাইটনের সাগরতীরে। ওয়েস্ট-পীয়ার আর প্যালেশ্-পীয়ার। দু'টোই একই ধরণের। এখানকার দ্রষ্টব্যবস্তুর মধ্যে আর একটির উল্লেখ না-করাটা অন্যায় হবে। এটি এখানকার রাজপ্রাসাদ—রয়্যাল প্যাভিলিয়ন।

১৭২৪ সালের কথা। ব্রাইটন ছিল তখন একটা ছোট্ট জেলেদের গ্রাম। সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকা ছিল মাছ ধরা। সেই তখন প্রিন্স্-রিজেন্ট পড়লেন অসুখে। তাঁর চিকিৎসক ডক্টর রাসেল বললেন—সমুদ্রের নোনা জোলো হাওয়া ছাড়া শরীর ভালো হবে না।

অতএব খোঁজ খোঁজ। অতঃপর এই ছোট্ট গ্রামে দলবল নিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে এলেন রাজকুমার। বিরাট প্রাসাদ উঠলো সমুদ্রের ধারে। তবে সে প্রাসাদ ডোরিক্, আইওনিক্ বা কোরিন্থিয়ান্ স্টাইলের নয়—যা না কি রেনেসাঁ-যুগের প্রভাবে ইংরেজরা গ্রহণ করতে শুরু করেছিলো। এ প্রাসাদের গড়নে তুর্কী-প্রভাব—বরং বলা ভালো মধ্যপ্রাচ্য-প্রভাব—মনে এক সুদূর রোমাণ্টিকতার সৃষ্টি করে। মনে হয় বুঝি বা আমার দেশে মোঘল যুগে ফিরে গেছি। সেই থেকে এখন পর্যন্ত এই প্রাসাদ এক বিস্ময়। এ না দেখলে ব্রাইটন দেখাই সম্পূর্ণ হয় না।

ঘুরতে-ফিরতে সন্ধ্যা নেমে এল ধীরে ধীরে। এদেশে রোদ যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি আবার যখন পাওয়া যায়—সেই সামারে রাত দশটা, সাড়ে দশটা পর্যন্ত আলো থাকে। এ সময়টা পুরো সামার নয়। তাই সেদিন সেই শনিবারের সন্ধ্যা নামলো রাত আটটায়। আবছা আলো-আঁধারিতে সাগর পারের হু-হু করা হাওয়ার মাঝে বসে যখন আমার যাযাবর-মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছিল, আর ঘরমুখী-মনটা ঘরে ফিরতে ব্যস্ত হচ্ছিল—সেইসময় হঠাৎ পথঘাট আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো। পীয়ার দু'টো, রাজবাড়ি, হোটেল-রেস্তোরাঁ-দোকান-পাট—সবকিছু ঝলমলে চক্চকে। প্যালেস-পীয়ারে শুধু সাদা আলোর ঝক্‌মকানি আর ওয়েস্ট-পীয়ারে নীলচে-লাল্‌চে আলোর রামধনুর ইশারা। রাস্তার পোস্টগুলোতে আলোর মালা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত আলোর মালা চক্‌মক্ করছে। অন্ধকার সাগর যেন দূরের আঁধারে অবহেলিতা—উপেক্ষিতা। সবাই যেন তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন আর সে দ্রষ্টব্য নয়। সকলের দৃষ্টির লক্ষ্য এখন ভিন্নমুখী। সেই মুহূর্তে মনে হোল ব্রাইটন যেন এক লাস্যময়ী সুন্দরী বনিতা। দিনের আলোকে কিম্বা রাত্রির আঁধারে কখনই তার মূল্য বিন্দুমাত্র কম নয়।

গান

অজন্তা সান্যাল

মোর প্রাণ ভরে যে গান দিয়েছ
সেই গান আমি গাইব।
তোমার প্রেমের অলখ-ঝরার
ঝরনা-ধারায় নাইব ॥
মোর হৃদয়-কলির দলগুলি যদি
বিকশিত কর আজি
তোমার দেউলে তোমারই পূজায়
ভরিব আমার সাজি।
ব্যথা যদি দাও সে ব্যথা ভুলিতে
তব মুখপানে চাইব ॥
অভিমানভরে আঁখি যদি ঝুরে
ব্যথাহত থাক চাহি
সে আঁখি-সাগরে মুকুতার খোঁজে
আমি নিতি অবগাহি।
নয়ন-কোণে যে ইশারা জাগায়ে
পাঠায়েছে লিপিলিখা,
তনুতে অনুতে সে লেখায় জ্বাল'
কামনার দীপশিখা
নিজেরে জ্বালায়ে আরতি করিতে
সে শিখার পানে ধাইব ॥

'মরণ-প্রাচীর' বিজয়িনী প্রথম নারী

কার্ল সালিঙ্গের

বয়স বত্রিশ, নাম ডেজি। ডেজি কুক, মিউনিখের এক অফিসে সে সেক্রেটারির কাজ করে। গত শীতকালে টেলিভিশনে আল্পস পর্বতমালার আইগার পর্বতের ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ তার খেয়াল হল আইগারের চুড়োয় উঠতে হবে। কোনদিন ডেজি পাহাড়ে চড়ে নি। সমুদ্রের ধারে সে মানুষ। শরণার্থী হিসেবে ১৯৪৪ সনে সে জার্মানীতে এসেছিল এবং সেই অবধি সে মিউনিখেই রয়ে গেছে। বছরতিনেক আগের কথা অত্যন্ত দুঃসাহস দেখিয়ে ডেজি ডলোমাইট পাহাড়ে উঠেছিল। স্কি খেলাতেও ডেজি বেশ নাম কিনেছে ও ইতিমধ্যে গোটাপঞ্চাশেক পুরস্কার পেয়েছে। এখন সে পুরোদস্তুর অ্যালপাইন ক্লাবের একজন সভ্য। তবে ডলোমাইট পাহাড়ে ওঠা এক কথা আর আইগার পাহাড়ে ওঠা আরেক কথা। আইগার

পাহাড়ে উঠতে গেলে ৫৪০০ ফুট খাড়া দেয়াল আছে যাকে বলা হয় মরণ-প্রাচীর।

মেয়ের কথা শুনে মা আঁতকে উঠলেন, বন্ধু-বান্ধবরা বারণ করলে। সবাই তাকে নিরস্ত করার বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও ডেজি কারুর কথায় কান না দিয়ে মিউনিখের ২৪ বছরের ইঞ্জিনীয়ার ভেরনের বিটনেরকে নিয়ে পাহাড়ের পথে একদিন পা বাড়াল। দু'জনে দিনের বেলা সেই বিপজ্জনক পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠে আর রাতে পাহাড়ের ফাঁকে-ফোঁকরে বিশ্রাম করে। এইভাবে তিনদিনের দিন তারা আইগার পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে উঠলো। ডেজি ও তার সঙ্গীদের ওখানে সম্বর্ধনা জানালেন মিউনিখের পাহাড়ী পথ-প্রদর্শক টোনি হিবনের। অন্য পথে তিনি তাদের দু'জনকে নামিয়ে আনলেন। নিচে এসে ডেজি জানালো যে প্রথমে সে স্নান করে বিয়ার খেয়ে চুল বাঁধবে এবং তারপর সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলবে।

আইগার পর্বত জয়ের ফলে ডেজি রাতারাতি অসামান্য খ্যাতিলাভ করেছে। এই দুঃসাহসী নারীর বিজয় অভিযান সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ডেজি জানিয়েছে যে আরও অনেক পাহাড়ে ওঠার তার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মরণ-প্রাচীর বেয়ে আর পাহাড়ে ওঠা—ভুলেও নয়!

—ডি এ ডি।

নারীর উক্তি

অনুরাধা গুপ্তা (রায়)

সংসারের বিচিত্র ব্যাপার,
তোমায়-আমায় দেখা বারবার।
অন্তরে জাগে সুর আশা জাগে বারবার,
আমি অবলা নারী সদা বহি সংসারের ক্ষুদ্র ভার।
মুকুলিত সৌন্দর্য আসে ক্ষণেকের তরে,
সৌখীন মেজাজে সুর আসে
কখনো গভীর রাতে কখনো আধো-অন্ধকারে।
যত ছিল ত্বরিত আহ্বান,
পরিচিত সংসারের দিগন্তে হয়ে গেল অবসান।
হৃদয়েতে নাহি বল,
সংসারের বায়ুবেগে করিছে তা টলমল।
দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণ-মন-দেহ
এখন কিছুই নাই, আছে শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ।
তুমি আছ সদা আপনমনে
আমি আছি হৃদয়ের প্রান্তদেশে,
ক্ষুদ্র এক গৃহকোণে,
স্বপ্নে ছিল যত আশা,
বুঝেছি আজিকার এ ভালবাসা।

কমলাবাঈ

স্বয়ংসিদ্ধা

সুদীপ্তার অনিচ্ছাতেই ঋত্বিক হারটা কিনে এনেছিল। সুদীপ্তার যে পছন্দ হয় নি তা নয়, কিন্তু হারটার গঠনভঙ্গিমা একটা অশুভ লক্ষণের আভাস দিয়েছিল। বার বার স্বামীকে বলেছিল হারটা ফিরিয়ে দিয়ে অন্য একটা হার আনতে। কিন্তু ঋত্বিক তা শোনে নি তার এই জয়পুরী-হারটা খুব সুন্দর লেগেছিল। সুদীপ্তার সুন্দর গলায় পরিয়ে দিয়ে বেশ গর্বভরেই তাকিয়েছিল, আর কেন যে স্ত্রীর পছন্দ হচ্ছে না, এটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। হারটার দু'দিকে সুন্দর কাজ একদিক চুনী, পান্না, সাফায়ার বসানো উল্টো দিকে সূক্ষ্ম মিনার কাজ দেখলে মনে হয় কোন মিউজিয়ামে রাখা পুরাতন রাণাদের আমলের অলঙ্কার। জয়পুরী-হারটার দামও বেশ ভাল রকমই নিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যার শো'তে ঋত্বিক দু'খানা সিনেমার টিকিট কিনে এনে সুদীপ্তাকে বললে, দীপু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও এখনি বেরুতে হবে।

কিন্তু দীপুর কোন উৎসাহ দেখা গেল না, যে দীপু সিনেমার পোকা সে আজ একেবারেই চুপচাপ।

কি ব্যাপার যাবে না? জিজ্ঞাসা করে ঋত্বিক।

দীপু বলে না, তুমি একাই যাও আমি আজ যাব না।

কেন, কি হয়েছে? ঋত্বিক সার্টটা খুলতে খুলতে এগিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মুখখানাকে করুণ করে বলে, তোমার আর কি, আমায় একা বাড়িতে রেখে তুমি বেরিয়ে যাও, আমার কি অবস্থা হয় তা তুমি কখন ভেবে দেখেছ?

ঋত্বিক বলে, কেন? সুখেন রয়েছে লচ্ছু রয়েছে—

তাদের ডেকে তুমি সাড়া পাবে বিপদের সময়ে? বলে সুদীপ্তা।

দীপু, কি ব্যাপার বলতো, তুমি আজ এসব কথা বলছো কেন? কি হয়েছে?

সুদীপ্তা বলে দুপুরবেলা শান্তাদি এসেছিলেন, গহনার নক্সা সম্বন্ধে কথা উঠতে আমি জয়পুরী-হারটা দেখাবো বলে যেই আলমারিটা খুলেছি অমনি মনে হলো আমার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে। তার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস পর্যন্ত মনে হলো আমার গায়ে লাগছে, হারের বাক্সটায় যেই হাত দিয়েছি, অমনি একটা ঠাণ্ডা জিনিস আমার হাতের উপর অনুভব করলাম। প্রথমটা কিছু গ্রাহ্য করি নি, কিন্তু শান্তাদি' হারটা দেখেই বললেন, সর্বনাশ! এ হার তুমি কোথায় পেলে? ঠিক এইরকম হার আমি রাজপুতানার কোন

একটা মিউজিয়ামে দেখেছি কিন্তু কোথায় দেখেছি বলতে পারবো না। এ সব জিনিস বাড়িতে রাখা উচিত নয়, তবে হারটা সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর!

আমি বললাম, তুমি যে কি বলো শান্তাদি', যে হারটা তুমি দেখেছ তার এটা নকল হতে পারে, এমন কত গয়নার আজকাল নকল বের হচ্ছে। আর তা ছাড়া সুদূর রাজপুতানার মিউজিয়ামের হার আমার কাছেই বা আসবে কি করে?

শান্তাদি'কে মুখে যাই বলি না কেন, তখন থেকে আমার মনটা ওর কথাতেই সায় দিচ্ছে।

ঋত্বিক কথাটা শুনে হাঃ-হাঃ করে খুব খানিক হেসে নিয়ে বললে, খুব হয়েছে, তুমি যে এত ভীতু তা জানতাম না, যে একটা সামান্য হারকে তুমি ভয় পাও? মন থেকে ওসব ঝেড়ে ফেলে এখন ওঠো, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও দেখি, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

সুদীপ্তা এবার উঠে দাঁড়ায়, আলমারিটার কাছে যেতে কেমন ভয়-ভয় করছে, কিন্তু ঐ আলমারিতেই ওর শাড়ি ব্লাউজ আছে—বাধ্য হয়ে সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে আলমারিটা খুলে একটা ফিকে ব্লু রং-এর শাড়ি বের করে আনে। প্রসাধন শেষে ঋত্বিকের সঙ্গে মোটরে বেরিয়ে যায়।

মাস দুই কেটে গেছে, এক অঘ্রাণের সন্ধ্যা। ঘড়িটা ফায়ারপ্লেসের ওপর টিক্‌-টিক্‌ করে চলছে, একটা টিকটিকি দেওয়ালের গায়ে একটা বড় পোকাকে কায়দা করবার চেষ্টা করছে, দূরে ভেসে-আসা সানাই-এর সুর বারে বারে সুদীপ্তাকে আনমনা করে দিচ্ছে। মালকোষ রাগ বোধ হয়—

মারকারী-ল্যাম্পের আলোয় সুদীপ্তা একটা নভেল পড়ছে, ঋত্বিকের সন্ধ্যার আগেই অফিস থেকে ফেরবার কথা, রাত্রে একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে। সকাল থেকে দীপ্তাকে জয়পুরী-হারটা পরে যাবার জন্য সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে ঋত্বিককে, অনেক 'হাঁ-না'র পরে সুদীপ্তা রাজি হয়েছে।

কিন্তু ঋত্বিক এখনও ফিরছে না কেন? বোধ হয় বিয়ের উপহার কিনতে দেরি করছে, মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে সুদীপ্তার—ইজিচেয়ারে শুয়ে আরো দু'পাতা পড়বার চেষ্টা করে সুদীপ্তা, কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারে না খালি মন অন্যদিকে চলে যায়—বাঃ রাগটা সত্যি ভাল বাজাচ্ছে, তার বিয়ের দিনেও ঐভাবে মালকোষ বাজিয়ে ছিল সাজ্জাদ হোসেন আলি, বড় দরদী রাগ মন যেন উদাস হয়ে যায়।

কতক্ষণ চিন্তা করছিল মনে নেই, হঠাৎ ঘরের আলোগুলো ম্লান হয়ে গেল, উত্তরের বারান্দার এক পাল্টা দরজা হঠাৎ খুলে গেল, একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকলো। সমস্ত দেহটাকে শিউরে দিয়ে মোহাচ্ছন্ন সুদীপ্তার কোল থেকে বইটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল, সুদীপ্তা দেখল এক অপরূপা সুন্দরী রাজপুত নারী আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে, পরনে তার ধূসর ঘাঘরী, বুকে একটুকরো রূপালী কাঁচুলি, মাথায় স্বচ্ছ নীল ওড়না, সাপের মত কালো বেণী দুলছে পিঠে, আর—আর সেই জয়পুরী-হার আরো উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে, তার গলায়। আর কিছু দেখার আগে 'মাগো' বলে চিৎকার করে সুদীপ্তা জ্ঞান হারাল।

ঋত্বিক অফিস থেকে এসে দেখে ঘরে সুখন, লচ্ছু, দারোয়ান, ডাক্তারবাবু সব রয়েছেন, ব্যাপার কি ডাক্তারবাবু? ঋত্বিক অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ডাক্তারবাবু বলেন—বৌমা ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, আমি ওকে এখন একটা ঘুমের ওষুধ দিয়েছি উনি এখন ঘুমাচ্ছেন। শরীরটা খুব দুর্বল বলে মনে হয়।

এই লচ্ছু বৌদি-মণি কেন ভয় পেল রে? ঋত্বিক জিজ্ঞাসা করে—

আমি কি জানবে দাদাবাবু, আমরা একটা চীচকার শুনে উপরে আইলুম—বলে লচ্ছু।

সারারাত সুদীপ্তা ভালই ঘুমাল, ঋত্বিকের কিন্তু ঘুম এলো না—পরেরদিন সকালে উঠে স্বামীকে সব কথা বলল। এবার ঋত্বিক কিন্তু হাসতে পারলো না, গম্ভীর হয়ে বললে দীপু আমি আজই হারটা বিক্রি করে দিয়ে আসবো।

কিন্তু হারটা যাদের দোকান থেকে কিনেছিল তারা নিতে চাইলো না, তারা বললে এটা আমাদের হার নয়, যারা এ হার বিক্রি করে গেছে তারা একমাসের জন্য আমাদের দোকান ভাড়া নিয়ে গহনা-শো করেছিল, তারা জয়পুরের লোক, আবার এক বছর পর তারা এখানে আসবে।

ঋত্বিক কি চিন্তা করলো তারপর বললে, আচ্ছা আপনারা আমার এ হারটা রাখতে পারেন না? আমি আপনাদের জিম্মায় রাখতে চাই, যখন ওরা আবার আসবে তখন বরং আমায় খবর দেবেন। দোকানদার রাখতে রাজি হলো। বাড়ি এসে ঋত্বিক সুদীপ্তাকে জানালো হারটা বিক্রি করে দিয়েছে। সুদীপ্তা সেদিন থেকে অন্য মানুষ, এই কয়েক মাস ধরে তার যা অবস্থায় কেটেছে তা সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না, সমস্তক্ষণ একটা আতঙ্ক তাকে ঘিরে থাকতো, যে সময়টুকু সে একলা থেকেছে একটা অশরীরী মূর্তির উপস্থিতি অনুভব করেছে, আর সেটা যে ঐ হারটার জন্যেই এটা বুঝতে তার দেরি হয় নি। যাক্‌ আপদ বিদায় হয়েছে—বাঁচা গেল এবার সে সহজভাবে চলতে ফিরতে পারবে।

বছর দুই কেটে গেছে সুদীপ্তা এখন পুরো সংসারী, কোলে ছোট্ট একটা মেয়ে রিঙ্কু। বাবা রিটায়ার জজসাহেব, মিস্টার শশাঙ্ক রায় ও মা শিবানী দেবী পশ্চিম থেকে মেয়ের কাছে কিছু দিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন। মেয়ের গিন্নিপনায় তাঁরা অস্থির, সব সময়ে তাঁদের সুবিধে-অসুবিধের প্রতি এত বেশি নজর দিচ্ছে যে বাবা-মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। জামাই-এর বাড়িটি ছিমছাম সুন্দর, কলকাতা শহর থেকে দক্ষিণে বেশ কিছু দূরে অনেকখানি জায়গার ওপর বাড়ি। জামাইয়ের ব্যবসা বেশ ভাল চলছে—জমি, বাড়ি, গাড়ি কিছুরই অভাব নেই।

সুদীপ্তা কিন্তু মা-বাবার কাছে তার হার কেনা বা বিক্রি করার কোন কথাই বলে নি, পাছে সব শুনে বাবা-মা ভয় পান। একদিন দুপুরে রিঙ্কুকে নিয়ে সুদীপ্তা শুয়ে আছে, রিঙ্কু অঘোরে ঘুমাচ্ছে সুদীপ্তা রবিঠাকুরের কঙ্কাল গল্পটা পড়ছিল। ভাত খাওয়ার পর সাধারণতো যে ঘুমের ঝোঁক আসে তার প্রভাবে দু'বার বইটা মুখের ওপর পড়ে গেল, কোনরকমে বইটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে যেই চোখ খুলেছে, দেখে সেই হারের অশরীরী মালিক দাঁড়িয়ে, এবার কিন্তু তার গলায় হার নেই—জিজ্ঞাসা করলে—'মেরা কণ্ঠহার কিধার ?'

সুদীপ্তা মেয়েকে জাপটে বুকের মধ্যে চেপে ধরে থর থর কাঁপা গলায় বললে, 'তুমাহারা কণ্ঠহার ম্যায় কেয়া জানু ?'

অশরীরী অদৃশ্যা হলেন। কিন্তু সুদীপ্তা জ্ঞান হারাল। গোঙানির আওয়াজ পেয়ে মা ছুটে এলেন, ভাবলেন মেয়ে বোধ হয় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে তাই অনেক ঠেলাঠেলি করলেন, কিন্তু যখন দেখলেন এ ঘুম নয় অজ্ঞান অবস্থা অমনি হৈ-চৈ ফেললেন। সবাই ছুটে এলো লচ্ছ মাকে বললে বৌদিমণির আগে এমন ধারা দু'বার হয়েছিল ভয় পাইলে এমন হয়।

মা বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলেন, মেয়ের জ্ঞান হতে তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু সঠিক কোন উত্তর পেলেন না।

ঋত্বিক এসে সব শুনলো, কিন্তু কোন কথার উত্তর দিল না খালি বললে দীপু কাপড় জামা গোছাও দক্ষিণ যাবো। সুদীপ্তা বললে সে কি, মা-বাবা রয়েছেন তাঁদের ফেলে— ?

শুধু মা-বাবাকে কেন রিঙ্কুও থাকবে ওঁদের কাছে। তোমার হাওয়া বদল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, তাই কালই আমরা বেরিয়ে পড়তে চাই বলে ঋত্বিক।

—কালই ! খুব বিস্ময়ের সঙ্গে বলে দীপু।

—হাঁ কালই—আর অনেকদিন তো কোথাও যাওয়াও হয় নি। মা-বাবা যখন রয়েছেন রিঙ্কুর ভার ওঁরা ঠিক নিতে পারবেন—

পাশের ঘর থেকে কথাবার্তার আভাস পেয়ে মা বেরিয়ে আসেন বলেন, দীপু তুই যা আমি তোর মেয়ে, তোর সংসার সব দেখবো আর আমাদের জন্য তুই ভাবিস না। এর আগে শাশুড়ীর সঙ্গে ঋত্বিকের সুদীপ্তার প্রথম অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব কথা আলোচনা হয়ে গিয়েছিল, তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ঋত্বিক এই ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু দীপুকে তা জানতে দেয় নি।

বাইরে যাবার তোড়জোড় করতে করতে সাত দিন কেটে গেল। বাইশে অক্টোবর তারা মাদ্রাজ মেলে উঠে বসলো। দক্ষিণের সব তীর্থগুলি দেখে মহীশূর হয়ে বম্বে গেল, বম্বে থেকে আউরঙ্গাবাদ হয়ে অজন্তা-ইলোরা দেখলো। সুদীপ্তা এই ক'দিনে যেন ছোট মেয়েটি হয়ে গেছে, কি তার আনন্দ যত দেশ ঘুরছে ততই যেন আনন্দে আত্মহারা, বাড়ির কথা, রিঙ্কুর কথা, বাবা-মার কথা সব যেন ভুলে বসে আছে।

ঋত্বিক ওর খুশি ভাব দেখে মনে মনে ভাবছে যাক এতদিনে সে ভুতটা বোধ হয় ঘাড় থেকে নেমেছে, সেও সব সময়ে সুদীপ্তাকে নানা ভাবে খুশি করবার চেষ্টা করছে। আচ্ছা দীপু বলতো এবার আমরা কোথায় যাবো।

সুদীপ্তা বলে আমি কি জানি তোমার কোথায় যাবার সখ—

এবার জয়পুর যাবো বলে ঋত্বিক—কিন্তু একি ! তোমার মুখ অমন কালো হয়ে গেল কেন ? ঋত্বিক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

দীপ্তার চোখ ছল ছল করে আসে বলে আবার সেই হার, জয়পুর মানেই তো জয়পুরী-হার।

ঋত্বিক খানিক হাহা করে করে হেসে বলে এ যে দেখছি সুন্দর মানেই সুন্দরবন। আরে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? হার তো তোমার সঙ্গে নেই।

ট্রেন এসে যখন পৌঁছল তখন বেলা প্রায় একটা। নামার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলো হোটেল-দালাল তাদের-ঘিরে ধরলো, নানা দরের হোটেলের কথা বললো, তার ভেতর থেকে হিন্দুস্থান হোটেলে ওঠাই ঠিক হলো।

হিন্দুস্থান হোটেল বড় গেটের সামনে, দূরে অম্বর কোর্ট দেখতে পাওয়া যায়, রামনিবাস গার্ডেনও বেশি দূরে নয়—দ্রষ্টব্যস্থানগুলি সবই প্রায় হোটেলের কাছাকাছি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দু'জনে পায়ে হেঁটে যতটা দেখে নেওয়া যায় তার জন্য বেড়াতে বের হলো, হাতে সময় আর বেশি নেই, ক'দিনের মধ্যেই ফিরতে হবে অতএব যত তাড়াতাড়ি বেশি জিনিস দেখে নেওয়া যায়।

[আগামীবারে সমাপ্য ।

বার্লিনে শীতের ফ্যাশন

সিগরিড ফনফস্

বার্লিনের ফ্যাশনের রাজ্যে এ বছর বসন্তে ও শীতে সাধাসিধে অথচ শোভন পোষাকের রেওয়াজ দেখা দিয়েছে। সে সবের রকমফেরে আন্তর্জাতিক ভাবটিও বেশ ফুটে উঠেছে। পশ্চিম বার্লিনের ফ্যাশনের দোকানে ও তৈরি পোশাকের কারখানাগুলিতে প্রত্যেক বছর প্রায় বিশ মিলিয়ন কোট, স্যুট, ড্রেস, ব্লাউস ও স্কার্ট তৈরি হয় অর্থাৎ রোজ পঞ্চাশ হাজারের বেশি পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি হয়। পশ্চিম জার্মানীর অন্য কোন শহরে ফ্যাশন নিয়ে এতো হৈ চৈ হয় না।

ফ্যাশনের রাজ্যে শুধু কাটছাট নিয়ে মাথা ঘামালেই হয় না, রঙ ও কাপড়ের গুণাগুণ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করতে হয়। এ বছর যেসব কাপড় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে আছে টুইড, ক্যামেল হেয়ার, বুক্লেস ও সেটল্যাণ্ডস্। বাজারে ইতিমধ্যে নানা রকমের টুইড দেখা দিয়েছে। কালো, রক্তলাল ও সবুজের ছোপ দেওয়া বাদামী ও হলুদ রঙ



● পশমী উঁচ গলার



● কোট ধরণের জামা

এ বছর খুব চলছে। হরেকরকম ফার লাগানো পোশাক, স্কার্ফ ও টুপিতে বাজার ছেয়ে গেছে।

মেয়েদের জন্যে দু'রকম পোশাক বেরিয়েছে, আটসাঁট ও ঢোলা। সাধারণতঃ এগুলো সিল্ক শিফন, লেস দিয়ে তৈরি। অনেক পোশাকে আবার মুক্তোর কাজ করা।

বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

নিউ ইংলণ্ড সামার

শরৎকালকে এরা বলে 'ইণ্ডিয়ান সামার'। ইণ্ডিয়ান সামারের সঙ্গে পরিচয় আগেই হয়েছিল, এবার নিউ ইংলণ্ডের সামারের সঙ্গে পরিচয়ের পালা। আমার নিউ ইংলণ্ড সামার সুরু হল নতুন এপার্টমেন্টে। ওয়াশিংটন ষ্ট্রীটের ওপর উইলসনদের একতলার এপার্টমেন্টটা ওরা স্পেনে যাবার সময় আমাদের দিয়ে গিয়েছিল। রিচার্ডসন হাউস থেকে সোজা এসে উঠলাম সেই বাড়িতে।

সেদিন গরম ছিল বেজায়। তাপমাত্রা ৯৫° ডিগ্রি ফারেনহাইট। আর ওদেশের বাড়িঘর শীতকালের উপযোগী করে তৈরি, চারিদিক দিয়ে কেমন বন্ধ-বন্ধ ভাব। যতই জানলা খুলি, পর্দা নামাই হাওয়া খেলে না এতটুকুও। গরমে গলদঘর্ম হয়ে কি যেন করছিলাম, মিসেস্ ওয়েলজ-এর টেলিফোন. কি ইয়ু মাস্ট বি ফিলিং রাইট এ্যাট হোম—তোমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে ইণ্ডিয়াতেই বসে আছ, যা ওয়েদার।

স্বীকার করলাম গরমকালটা আমার খুব বেশি খারাপ লাগছে না। বিরাট ওভারকোটের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচেছি। মোজা আর দস্তানা দু'টো জিনিস একেবারে সহ্য হয় না আমার। খালি পায়ে চটি পরে ফট্‌ফট্ করে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছি বেশ লাগছে।

খুব বেশি গরম লাগলে সামনের কাঠের বারন্দায় বসে কাজকর্ম চিঠি-পত্র লেখা সব করি। আমাদের নতুন এপার্টমেণ্টের এই ছোট্ট কাঠের বারান্দাটুকু আমাদের ভাল লেগেছে। রাত ন'টা পর্যন্ত যখন সূর্য ডোবে না এই কাঠের বারান্দায় বসে তখন আইসক্রীম খাই আর গল্প করি। ওপরতলার মিস্টার লিট্‌ল্‌ফিল্ড্ নেমে আসেন কখনো, ভারতীয় যোগসাধনা সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল।

ছুটির দিনে সারাদিনের মত ফেনওয়ে পার্কে চলে যাই। পার্কের সবুজ ঘাসে চাদর পেতে শুয়ে, বসে, বই পড়ে দিন কাটে। আমাদের মত আরো অনেক আমেরিকান পরিবার আছে। পার্কে চারদিকে সবুজ ঘাসের ওপর লাল-হলদে, বাচ্চা-কাচ্চা-মহিলাদের পোষাকের উজ্জ্বল রঙের সমাবেশ। অনতিদূরে ভাঁজকরা ডেকচেয়ার পেতে মাথায় রঙিন ছাতা ধরে বসে আছেন এক বর্ষীয়সী। ঘন ঘন তাকাচ্ছেন আমাদের দিকে। একটু পরে চেয়ারটা আমাদের দিকে একটু টেনে এনে বললেন, তোমাদের কাছে একটু বসলে তোমরা কি মাইণ্ড করবে? তাড়াতাড়ি ভদ্রতা করে বলি, না, না সে কি কথা। আমি তোমাদের কনগ্র্যাচুলেট করতে চাই, বললেন বর্ষীয়সী। আমি তৎক্ষণাৎ ভেবে বসলাম নির্ঘাৎ বলবে শাড়িটা বেশ সুন্দর। না, তা নয়।

আমাদের একটু চমকে দিয়ে মহিলা বললেন, হোয়াট এ ফাইন প্রাইম মিনিস্টার ইয়ু হ্যাভ।

দেখা গেল আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একজন বিশেষ ভক্ত ভদ্রমহিলা। ভারতবর্ষের হালচালের কিছু খবরাখবরও রাখেন মনে হল। বিদেশে নিজের দেশের তুচ্ছ জিনিসেরও প্রশংসা শুনতে বড় ভাল লাগে। আর এ তো খোদ রাষ্ট্র-কর্ণধারের গুণগান।

ফেনওয়ে পার্কের পেছনে আমাদের পরিচিত ল্যাণ্ডমার্ক ইসাবেলী গার্ডনারমিউজিয়াম ও বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস। দুই মিউজিয়ামের মাঝখানে ছোট দোতলা বাড়িটি ছিল ইনস্টিটিউট অফ্ কণ্টেম্পোরেরি আর্ট। গার্ডনার মিউজিয়াম পিছনে ফেলে বস্টন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পাশ দিয়ে বাড়ির পথ ধরি বিকেলবেলা।

মিসেস্ ওয়েলজ বললেন, তোমাদের ইণ্ডিয়ান' সামারের ঠ্যালায় আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ। চলো সবাই মিলে সমুদ্রের ধারে ঘুরে আসি গাড়ি নিয়ে।

আমি সমস্যায় পড়লাম। নবজাতা কন্যার বয়স পাঁচ সপ্তাহ। তাকে নিয়ে সারাদিন সমুদ্রবেলায় কাটাব, তাও আবার রিভিয়ের বীচ পর্যন্ত দূরপাল্লার পাড়ি মোটর-গাড়িতে।

আমার সব দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলেন মিসেস্ ওয়েলজ। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ধমকে উঠে বললেন, তুমি আমাকে কি ভাবো বলো তো? জানো আমি চারটি ছেলেমেয়ে বড় করেছি। কি না ঘটেছে আমার—ডিফ্‌থেরিয়া, হুপিং কাশি, হাম, কান কটকট, গলা ব্যথা—সব, সবকিছুর ভেতর দিয়ে গিয়েছি কোন-না-কোন সময়। কিছু ভয় নেই তোমার।

সদলবলে এসে নামলাম রিভিয়ের বীচে। ধূসর-নীল আকাশ আর সমুদ্রের পটভূমিতে প্রথমেই চোখ পড়ল লাল-নীল-হলুদ-কমলা রকমারি রঙের স্নানের পোষাকপরা অজস্র নরনারীর ভিড়। গরম বালির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে সকলে, কেউ চিৎ হয়ে চোখে কালো চশমা, কেউ উপুড় হয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে রোদ্দুরে ভাজা-ভাজা হয়ে কি যে আনন্দ পায় এরা তা ওরাই জানে। টুনামাছ আর লেটুসপাতা দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে এনেছেন মিসেস্ ওয়েলজ। খেতে খেতে গল্প হয় নানারকম। পাশে ছোট্ট Carry-crib বা ঝোলা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে টুয়া। আমাদের আশে-পাশের কেউ কেউ রোদ পোহানো ছেড়ে কৌতূহলী হয়ে উঠে এসে দেখে যাচ্ছে ছোট বেবি। মিসেস্ ওয়েলজ-এর মেয়ে জুডির হাত ধরে বু নেমে পড়েছে সমুদ্রে।

গ্রীষ্মকালে উইক-এণ্ড ও ছুটির দিনগুলো সাগরবেলায় কাটানোই রীতি মনে হল। মিসেস্ ওয়েলজ-এর কল্যাণে আমাদেরও বস্টনের কাছাকাছি কয়েকটা দিন সমুদ্রের ধারে বেড়ানো হয়ে গেল। এর মধ্যে সবচাইতে ভাল লেগেছিল বস্টন থেকে মাইল পঁচিশ দূরে সালেমের মনোরম বেলাভূমি। সালেমে সারাদিন কাটাবার পর বিকেলবেলা হঠাৎ আকাশে ঘনঘোর মেঘ করে এল। আমাদের দলের কেউ কেউ মোটর-লঞ্চে করে সমুদ্র ঘুরে আসতে গেছে ঘণ্টাখানেকের জন্য, বু আছে তাদের দলে। লঞ্চ তখনো ফিরে আসে নি। এক-একবার আকাশের দিকে তাকাই আর এক-একবার চাই সমুদ্রের দিকে, মেঘের ছায়ায় কালো হয়ে উঠেছে সমুদ্রের

জল। আমাদের উদ্বেগ দূর করে লঞ্চ এসে তীরে ভিড়ল। বু ঘুমিয়ে পড়েছিল সমুদ্রের হাওয়ায়, বার্থা ওকে কোলে নিয়ে নামছে দেখা গেল। ওরা নামতে-না-নামতে প্রচণ্ড গর্জন করে ঝড় যেন ফেটে পড়ল আমাদের ওপর, আকাশে-সমুদ্রে মিলে সে কি মাতামাতি। গাড়ি পার্ক করা ছিল অনেকটা দূরে। প্রথম হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতেই সবাই মিলে গাড়ির দিকে দৌড়তে সুরু করলাম। টুমার Carry-crib-এর একদিকে ধরেছি আমি, অন্যদিকে মিসেস্ ওয়েলজ, ঐভাবে বেবিশুদ্ধ ক্রিব নিয়ে সে কি ম্যারাথন দৌড় দৌড়লাম সেদিন। গাড়িতে উঠেই গাড়ি চালিয়ে দিলেন মিসেস্ ওয়েলজ্। ততক্ষণে নেমেছে প্রবল বর্ষণ। সামনের সীটে বসে সেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ঝাপসা পথঘাটের আমি তো কোন কূল-কিনারা করতে পারছিলাম না। কিন্তু দৃঢ়হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছেন মিসেস্ ওয়েলজ্। সেদিন তাঁর ড্রাইভিং-এর তারিফ করেছিল সকলে।

অনেক দেরিতে বাড়ি পৌঁছলাম। মনে চিন্তা ছিল বেশ। সে-সময় আমার কাছে আছেন এক ভারতীয় অতিথি। যাবার সময়ও তাঁর অনুপস্থিতিতে হঠাৎই চলে গেছি। এপার্টমেণ্টের চাবি প্রতিবেশিনী মিসেস্ লিটলফিল্ডের কাছে রেখেছিলাম, এলে পর দিয়ে দেবেন বলে। মিসেস্ ওয়েলজ বললেন, চলো আমি তোমার হয়ে এপোলোজাইস করে আসি তোমার অতিথির কাছে। বাড়িতে পা দিয়ে দেখলাম অতিথি বহাল তবিয়তে আছেন, অসুবিধা হয় নি কোন। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম কর্মস্থল থেকে ফিরে শ' আদর্শ আমেরিকান ড্যাডির মত সাপারের যোগাড় করে ফেলেছে। কড়াইশুঁটি ও ভুট্টাসেদ্ধ প্রস্তুত। ফ্রাইং প্যানে ল্যামচপ ভাজছে শ, গন্ধ বেরুচ্ছে ভুরভুর করে। অতিথি আপ্যায়নের ত্রুটি হল না কোন।

কোন কোন জন্তু-জানোয়ার বছরে ছ'মাস হাইবারনেট করে অর্থাৎ ঘুমিয়ে থাকে, বাকী ছ'মাস তারা কর্মচঞ্চল। গ্রীষ্মকালের বস্টন মনে হল যেন 'হাইবারনেশন' ত্যাগ করে সবে জেগে উঠেছে, চারদিকে দেখা দিয়েছে কর্মচাঞ্চল্য। এরকম মনে হওয়ার একটা কারণ হল এই যে, শীতকালে সব কর্মতৎপরতা থাকে ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এখন সবই হচ্ছে ঘরের বাইরে ওপেন্-এয়ারে।

গ্রীষ্মের প্রথমেই খুব ধুমধাম করে উদ্বোধন হল বস্টনের শিল্পমেলা—বস্টন আর্টস ফেস্টিভ্যাল। শহরের মাঝখানে 'বস্টন কমন হল' যেন বস্টনের গড়ের মাঠ। তারই পাশে বস্টন পাবলিক গার্ডেনে তিন সপ্তাহের জন্য বসে এই আর্টের

মেলা। এই আর্টের মেলার বৈশিষ্ট্য হল—এটা প্রধানত আঞ্চলিক। নিউ ইংলণ্ডের সঙ্গীত-নাটক-সাহিত্য-শিল্পকলা সবকিছুর পসরা সাজানো হয় এখানে। মুক্ত অঙ্গনে স্টেজ বেঁধে অপেরা হচ্ছে, নাটক অভিনীত হচ্ছে। কবিরা কাব্যপাঠ করছেন কোন কোন সন্ধ্যায়। বস্টন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা, বস্টন লিটল অর্কেস্ট্রা সঙ্গীত পরিবেশন করছে। লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য, জাজসঙ্গীত-এর আসরও বাদ যাচ্ছে না। এ ছাড়া একটা মস্ত বড় তাঁবুর মধ্যে চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়েছে নিউ ইংলণ্ড চিত্রকরদের। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের নমুনা তাঁবুর বাইরে ঘাসের ওপরও ছড়ানো আছে এধার-ওধার। উদ্যানের হ্রদের জলে নৌকো ভাসছে। ঘুরতে ঘুরতে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। একটু নৌকা-বিহার করে নিলাম। নৌকা থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছি মেলায় মানুষের ভিড়, কিন্তু কোথাও বিশৃংখলা নেই। হত যদি কলকাতার ইডেন গার্ডেনে প্রথমেই একটা বিশ্রী চেহারার টিনের বেড়া বসাতে হত চারদিকে। এখানে বস্টনের এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কিন্তু কোন দর্শনী নেই। সকল নাগরিকের কাছে অবারিতদ্বার, তবু শৃঙ্খলার অভাব নেই কোথাও।

আর্টের মেলা ভাঙতেই বসে গেল মুক্তঅঙ্গন গানের আসর এসপ্লানেড কন্সার্ট। চার্লস নদীর তীরে গড়া আছে স্থায়ী স্টেজ। বিকেল হতে মাঠের ওপর ভিড় করে আসে বস্টনবাসীরা সব সপরিবারে, সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা সব। চাদর বিছিয়ে বসে গেছে সবাই, নয়ত সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে। সঙ্গীতবিরতির ফাঁকে-ফাঁকে গল্পগুজবও হচ্ছে। দু-একটা সন্ধ্যাবেলার স্মৃতি মনে গাঁথা হয়ে আছে—স্টেজের ওপর জমকালো পোষাকে বাদকের দল, আকাশে-বাতাসে সঙ্গীতের মূর্ছনা, চার্লস নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ধীরে—।

সময় কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ফুলের প্রদর্শনী হয়ে গেল বস্টন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা ভবনের ভেতর কয়েকদিন ধরে। একদিন আরবোরেটোরিয়াম অর্থাৎ বস্টনের বটানিক্যাল গার্ডেনও ঘুরে এলাম।

এই ঘুরে বেড়ানোতে আমার প্রধান সহায় হয়েছিল আমার বেবী-সিটার ক্লেয়ার। ক্লেয়ার ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেবী-সিটিং না করে দিলে এসব কিছুই সম্ভব হত না। 'বেবী-সিটার' এই কথাটার কোন বাংলা নেই, কারণ বেবী-সিটার বলতে যা বোঝায় তা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু ওদেশে বেবী-সিটিং করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে, আর আমেরিকান মায়েদের কাছে বেবী-সিটিং-এর এই প্রথা বেশ প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। পেশাদার বেবী-সিটার ডাকলে খরচ খুব বেশি পড়ে। কিন্তু অনেক অপেশাদার আছেন, যাঁরা অন্য কাজ করেন, কিন্তু অবসর সময় বেবী-সিটিং করেন। তাঁদের দর কিছু কম।

গ্রীষ্মের সময় স্কুল-কলেজ লম্বা ছুটি হয়ে যায়। জুন মাসে বন্ধ হল খুলবে সেই সেপ্টেম্বরে। এই সময় অনেক হাইস্কুলের ছেলে-মেয়েরা নানারকম কাজ করে অর্থোপার্জন করে। এতে কোন অপমান নেই। কেউ হয়ত পড়ার খরচ চালাবার জন্য এরকম করছে, কেউ হয়ত একটা গাড়ি কিনবে বলে টাকা জমাচ্ছে। কিছু না করে বসে থাকাই বরং অপমানকর।

ক্লেয়ার পড়ে হাইস্কুলের উঁচু ক্লাসে। গ্রীষ্মের এই দীর্ঘ ছুটিতে ও আমার বেবী-সিটিং করত প্রায়ই। ওদেশে সকলেই বেবী-সিটারের কাছে ছেলে-মেয়ে রেখে নিশ্চিন্তমনে ঘোরাঘুরি করতে অভ্যস্ত। এমন কি হয়ত কিছুদিনের মত রেখে বিদেশেই চলে গেল। আমার কিন্তু প্রথমে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তাড়াতাড়ি ফোন করি বাড়িতে। ওপার থেকে ক্লেয়ারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—এভরিথিং ওকে—নাথিং টু ওয়ারি মিসেস্ বোস। আমার এই ছটফট করায় মিসেস্ ওয়েলজ বিরক্ত হতেন। চেস্টনাট হিলের ফাইলিন দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে ফিরছি মিসেস্ ওয়েলজ-এর সঙ্গে। বাড়ির কাছাকাছি এসে বললাম, না জানি বাড়ি গিয়ে কি দেখব। মিসেস্ ওয়েলজ রেগে বললেন, দেখবে তোমার পনেরোদিনের মেয়ে বেবী-ক্রিব থেকে নেমে দরজা খুলে সোজা হেঁটে বেড়াতে চলে গেছে।

বেবী-সিটার একজনকে বরাবরের জন্য ধরাই ভাল ছেলেমেয়েরাও তাকে চিনে যায়। তবে গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে গেল পর ক্লেয়ারকে আর সব সময়ে পেতাম না। ক্যারল বলে আর একটি মেয়ে মাঝে মাঝে আসত। সে ছিল বেজায় মোটা, তাই তার ভারি দুঃখ। ওদেশে মেয়েদের দুটো প্রব্লেম, মোটা হয়ে যাওয়া আর লম্বা হয়ে যাওয়া। তন্বী তরুণী থেকে স্থূলকায়া বর্ষীয়সী সকলেই রোগা হবার সাধনায় ব্যস্ত। আর খেতে বসে কেবলি ক্যালরি মাপছে—কত ক্যালরি প্রয়োজনাতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেল। আর মায়েরা মেয়েদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন—কি সমস্যা না মেয়ে খুব লম্বা হয়ে যাচ্ছে—কি করে এ রোধ করা যাবে।

এই গ্রীষ্মে কানাডাতে মন্টিওলে আন্তর্জাতিক শিশু-চিকিৎসক সম্মেলন বসল। 'শ' চলে গেল সম্মেলনে যোগ দিতে। যাবার আগে ইতস্তত করেছিল 'শ'। নবজাতা কন্যা ও শিশুপুত্র নিয়ে একা আমি থাকতে পারব কি না সংশয় ছিল। মুখে অনেক উৎসাহ দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিয়ে মনে মনে আমি অত্যন্ত অসহায় বোধ করলাম। 'শ' লোগান

এয়ারপোর্টে রওনা হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর টেলিভিশনটা খুলেছি, সন্ধ্যাবেলার স্থানীয় সংবাদ দিচ্ছে। হঠাৎ শুনি খবর দিচ্ছে বস্টনের লোগান বিমান-ঘাঁটিতে অল্পক্ষণ আগে টেক্-অফ্ করতে গিয়ে একটা বিমান দুর্ঘটনা হয়ে গেছে তাই সেখানে সব বিমান চলাচল স্থগিত হয়ে গেছে। খবর শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনে 'শ'-র কণ্ঠস্বর শুনে আমি সুস্থির হলাম। ঠিক ওদের আগে প্লেনটাই টেক্-অফ্ করতে পড়ে গেছে। আপাতত ওদের সব রেলস্টেশনে পৌঁছে দিচ্ছে বিমান কর্তৃপক্ষ। সেখান থেকে ও মণ্টি্ওলের ট্রেন ধরবে।

শ' যে ক'দিন বাইরে রইল আমাদের বস্টনবাসী বন্ধুরা ও আমার নতুন পাড়ার প্রতিবেশীরা আমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করল। বাজারে যাবার সময় খোঁজ নিয়ে যায় সবাই, তোমার কিছু দরকার আছে, আনব কি? সকালবেলা দরজা নক্ করে খোঁজ করে যায়, কালরাত্রে ভাল ছিলে তো?

[আগামীবারে বিদায় বস্টন।

উত্তর

স্বপ্না লাহিড়ী

বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে॥
সাগরপারের ঝড়ো হাওয়া
এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছিল
রাস্তার দু'ধারের সাজানো পাম্
আর তোমার নীল-রঙা শাড়ির আঁচল।
তোমার জলভরা চোখে দেখেছিলাম
কি যেন পেয়ে হারানোর বেদনা॥

জানি না, কি তুমি পেয়েছিলে
আর কি হারিয়েছ॥
কিন্তু মিল খুঁজে পেয়েছি
ঐ অশান্ত ফেনিল ঢেউ আর
তোমার অশান্ত হৃদয়ের সাথে।

মনে পড়ে?
একদিন যখন একটি-দু'টি করে
তারা উঠছে আকাশে
বাড়ির সামনে, লাল সুরকি-ঢালা পথে
কি প্রশ্ন করেছিলে?
বলেছিলে—বলতে পার—যাকে অন্তর দিয়ে
ঘৃণা করতে চাই, তাকে পারি না কেন
এ কি জ্বালা আমার!
উত্তর দিতে পারি নি সেদিন॥

আজ আমি নিঃস্ব
হয়তো তোমারই মতো
শুধু আছে ব্যর্থতা আর অনিশ্চিতের ক্লান্তি
মনের বাঁধন ছেঁড়া পাল-তোলা নৌকা
দিক্ খুঁজে বেড়াচ্ছে দিক্চক্রবালে;
কিন্তু, তোমার সেদিনের প্রশ্নের উত্তর
আজ আমি পেয়েছি॥

তুমি দেখ নি, কিন্তু আমি দেখেছি,
কেমন করে ঐ সাগরের ঢেউ
ব্যর্থ আক্রোশে আর সীমাহীন ঘৃণায়
কূলে লুটিয়ে এসে পড়ে পাথরে ঢাকা উপকূল
তুমি দেখ নি,
কি নিবিড় বেদনায় সে মুক্ত হতে চায়
সীমাহীনতায়।
কিন্তু আবার তো তাকে ফিরে আসতে হয়
ব্যর্থতার পাষাণ ঘূর্ণাবর্তে?
এ যে সীমার প্রতি অসীমের চিরন্তন আকর্ষণ।
পেয়ে হারানোর পুঞ্জীভূত বেদনার হাহাকার
রণিত হয় সীমাহীনতার হৃদয়ে—
কিন্তু তবু কেন সে সীমিত করে নিজেকে
পারের সীমারেখায়
এ যে সীমিতের পায়ে নিঃসীমের পূজা॥

সেদিন তুমি জানতে না
তোমার অসীম হৃদয়
ব্যর্থ বেদনার বুকভরা জ্বালা নিয়েও
কেন বারবার ছুটে চলে যেতে চায়
সীমিতের কাছে।
কিন্তু যা পেয়েছিলে
তাকে যে অস্বীকার করতে পারলে না তুমি
তাই তো বুকভরা ঘৃণা দিতে গিয়ে
দিয়ে এলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল
কিন্তু
এই যে ক্ষণিকের পাওয়া
এ'ও তো সত্য।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

রাতশ্রী মঞ্জিল

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]



'বহুৎ আচ্ছা, রামভজন।' সদয়কণ্ঠে বলে রামভজনকে বিদায় দিয়ে আমার দিকে ফিরে কানাই মিত্তির প্রশ্ন করলেন :

'কি যেন বলছিলাম, ধনপতিবাবু?'

'আপনাদের বংশের এ্যাটর্নীগিরির ঐতিহ্য দ্বিতীয় ধাক্কা খেল যখন ফাদার ফন্সিকার সম্মান-রজনীতে আপনি নীলা সেহানের পিয়ানো বাজনা শুনলেন।'

'ঠিক।' খুশি হয়ে বললেন কানাই মিত্তির। 'শুনে মুগ্ধ হলাম। ভাবলাম পূব আর পশ্চিমের কি আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে! আমাদের দেশের এক আশ্চর্য মেয়ে আশ্চর্য বিদেশী সঙ্গীত সৃষ্টি করছে বিদেশী সঙ্গীত-যন্ত্রে, শিহরণ জাগাচ্ছে আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে! তারপর কি করলাম তা তো বলেছি আপনাকে।'

'বলেছেন।'

'কিন্তু কি হলাম তা বলি নি। একেবারে বদলে গেলাম, ধনপতিবাবু। এতদিন ধরে যে এ্যাটর্নীগিরি ঐতিহ্যকেই জীবনের সেরা সম্পদ বলে মনে মনে বিশ্বাস করে এসেছিলাম, তুচ্ছ হয়ে গেল সেই ঐতিহ্যের আদর্শ। মনে হল সংগীতের চাইতে সেরা আর কিছু পৃথিবীতে নেই। আমার চেতনায় এক হয়ে গেল সঙ্গীত আর নীলা সেহান, নীলা সেহান আর সঙ্গীত। সঙ্গীতের অপ্রতিরোধ্য যাদু জীবনে প্রথম অনুভব করলাম নীলা সেহানের মাধ্যমে। মনে হল জীবনের নতুন অর্থ, সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পেয়েছি। নীলা সেহানের প্রতি আমি কত কৃতজ্ঞ, তা শুধু আপনাকেই বললাম, ধনপতিবাবু।'

'নীলা সেহানকেও বলেন নি?'

'বলি নি। সুযোগ বা সাহস, কোনোটিই পাই নি। কিন্তু নীলা সেহানের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার।'

আন্তরিকতার প্রবল উচ্ছ্বাসে ভরা এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের কণ্ঠস্বর। আমার তখন কেবলি মনে পড়তে লাগল মৃণালিনীকে, যিনি তখন রয়েছেন তাঁর পূজনীয় শ্বশুরের সঙ্গে ব্যারাকপুরে। শাস্ত্র এবং আইনমতে কানাই মিত্তিরের জীবন-সঙ্গিনী মৃণালিনী। এই সঙ্গিনীত্বের বয়স পাঁচ বছর পুরো হয়ে গেছে, কিন্তু জীবন-সঙ্গীতের কোনো আভাস তিনি দিতে পারেন নি কানাই মিত্তিরকে, এবং তাঁর মাধ্যমে জীবনের কোনো নতুন অর্থ খুঁজে পান নি কানাই মিত্তির। মৃণালিনীর শুষ্ক পাথরে যে তৃষ্ণা মেটে নি, কানাই মিত্তিরের তৃষিত হৃদয় কি সেই তৃষ্ণা মেটাচ্ছে নীলা সেহানের স্নিগ্ধ ঝর্ণা ধারায়? এ খবর জানে না, নীলা সেহান, জানেন না মৃণালিনী? আমি মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম মৃণালিনীর জন্য, মিত্তিরবাড়ির

জন্য, খানিকটা নীলা সেহানের জন্যেও। সামান্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি ঘটবে তা কে বলতে পারে? কানাই-চরিত্র আমার কাছে রহস্যাবৃত।

মনে প্রশ্ন জাগল মিত্তির বাড়িতে এই পরিস্থিতির খবরটা কি নিমাই মিত্তির রাখেন না? অথবা পরিস্থিতি তিনি জানেন, কিন্তু জানেন যে, সেটা জানতে দিতে চান না?

পাঁচ বছর আগে মিত্তিরবাড়ির নববধূরূপে মৃণালিনীকে দেখে সুলতান মিয়ার মনে পড়ে গিয়েছিল তার পৌনে তিনকুড়ি বছর আগে দেখা বাতাসীবিবির কথা, একথা শুনেছি সুলতান মিয়ার মুখে। নাবালক সুলতান আর বৃদ্ধ সুলতান দু'জন আলাদা মানুষ, এদের দু'জনের দেখায় অনেক তফাৎ, একথাও মনে হল।

সারা মন জুড়ে চিন্তার স্রোত বইছে, এমন সময় কানাই মিত্তির বললেন, নীলা সেহান থাকে ওর মা'র সঙ্গে, অনেক ফ্ল্যাটওয়ালা প্যারাডাইস কোর্টের দোতলার এক ফ্ল্যাটে। ঐখানেই ওকে পৌঁছে দিয়ে এল রামভজন যেমন আমি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম ফাদার ফন্সিকার জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শেষে। নীলা যে প্যারাডাইস কোর্টে থাকে, শুধু ওর বিধবা মাকে নিয়ে, সেজন্যে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করি, ধনপতিবাবু।'

'কেন, কানাইবাবু?'

'প্যারাডাইস কোর্ট ইজ ফুল অভ স্কাউণ্ড্রেল্স্ (Paradise court is full of scoundrels)। জায়গাটা নীলা সেহানের মতো মেয়ের পক্ষে খুব নিরাপদ বলে মনে করি নে। মাঝে মাঝে ভাবি নীলাকে একেবারে বাতাসী মঞ্জিলেই তুলে নিয়ে এসে বসাবার চেষ্টা করব, মৃণালিনীর রেসিডেনসিয়াল পিয়ানো টিউটর করে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি, কানাইবাবু?'

'নীলাকে অনুরোধ করলে হয়তো সেই অনুরোধ সে রাখবে না। প্যারাডাইস কোর্টে মাকে একা ফেলে এসে আমার বাড়িতে নিরুপদ্রব নিঝ্ঝাটের স্বাদ নেবে, এমন মেয়ে নয় নীলা সেহান। পিয়ানো-শিক্ষয়িত্রীর মাকেও তো আর বাতাসী মঞ্জিলে তুলে আনা যায় না। তা ছাড়া মৃণালিনীরও হয়তো আপত্তি হবে। সে আপত্তি আমি অনায়াসেই বাতিল করে দিতে পারি, কিন্তু যে আমার হাতের মুঠোয়, তার ওপর জোর খাটাতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়, ধনপতিবাবু।'

মৃণালিনীর সম্ভাব্য আপত্তিকেও সম্মান দিয়েছেন কানাই মিত্তির, এটা বড় ভাল লাগল। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম কানাই মিত্তিরকে। মনে প্রশ্ন জাগল কানাই মিত্তির আর মৃণালিনীর মাঝখানে যে ফাটল তৈরি হ'য়েছে, হয়তো দু'জনের অলক্ষ্যেই ধীরে ধীরে, তারজন্য প্রধানত দায়ী কে? মৃণালিনী, না কানাই মিত্তির? মৃণালিনীর হিমশীতলতার জন্যই কানাই মিত্তির উদাসীন? না কানাই মিত্তিরের উদাসীনতার জন্যই মৃণালিনী নিরুত্তাপ, হিমশীতল? মনে হ'ল মৃণালিনী হতে পেরেছেন শ্বশুর নিমাই মিত্তিরের পুত্রবধূ, মিত্তির বংশের কুলবধূ, এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের গৃহের গৃহিণী, কিন্তু পারেন নি রোমান্টিক তরুণ কানাই মিত্তিরের প্রিয়া হতে। পাথরের প্রতিমা মৃণালিনী, সেই প্রতিমায় প্রাণের পরশ পান নি কানাই মিত্তির, শুষ্ক থেকে গেছে তাঁর হৃদয়, তাঁর জীবন?

'জীবন যখন শুকায়ে যায়,
করুণা ধারায় এসো···'

লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। কানাই মিত্তিরের শুক্নো জীবনে কি করুণা ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে নীলা সেহান? একি বিধাতার আশীর্বাদ, না অভিশাপ? একি সুন্দর, না সুন্দরের ছদ্মবেশে ভয়ংকর? একি কল্যাণের সূচনা, না সর্বনাশের? কানাই মিত্তিরের হাতের আংটির নীলা পাথরটির দিকে তাকিয়ে উদ্বেগে ভরে উঠল আমার মন। তরুণ এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের জীবন-সঙ্গিনী 'লক্ষ্মীপ্রতিমা' মৃণালিনী যখন বুড়ো শ্বশুরের সঙ্গে ব্যারাকপুরে, তখন এদিকে বাতাসী মঞ্জিলে বসে কানাই মিত্তির সদ্যপরিচিত ধনপতিকে সবিস্তারে শোনাচ্ছেন পিয়ানো সুন্দরী নীলা সেহানের কথা—আবেগে উচ্ছল, অসংলগ্ন, এলোমেলো, আনমনা ভঙ্গিতে! মিত্তিরবাড়ির নাটকে এক অতি-নাটকীয় পরিস্থিতি আসন্ন, তারি মুখে আমি এসে পড়েছি দৈবাৎ, অপ্রত্যাশিত। জানি না কি মতলব বিধাতার। জানি না এই নাটকে আমার কোনো সক্রিয় অংশ থাকবে, না আমার ভূমিকা হবে কেবল নিষ্ক্রিয় দর্শকের।

'হ্যাঁ, অন্যের অপ্রস্তুত, অসতর্ক বা অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে আমি একেবারে পারি নে, ধনপতিবাবু। পালোয়ান এ্যাটর্নীর নাতি আমি, এই কথাটা কখনো ভুলতে পারি নে, বলেছি তো আপনাকে। জীবনে অনেক লড়াই করেছেন আমার পিতামহ পালোয়ান এ্যাটর্নী, কোনো লড়াইতে অন্যায় সুযোগ নেন নি, প্রতিপক্ষ বেকায়দায় থাকলে তাকে আক্রমণ করেন নি, কায়দা ফিরে আসবার সময় আর সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু সে কথা থাক। বলছিলাম নীলা সেহানের কথা।'

'বলুন।'

'প্যারাডাইজ কোর্টের ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে অনেক স্কাউণ্ড্রেল; তা থাক, তবু কিছু ভাবনা ছিল না যদি বেঁচে থাকত নীলার বাবা অর্জুন সেহান, এ গ্রেট, গ্রেট স্কাউণ্ড্রেল (a great, great scoundrel)। দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রচণ্ড সাহসী আর বাহুবলী স্কাউণ্ড্রেল।'

'স্কাউণ্ড্রেল !!!'

চমকে উঠে শব্দটা উচ্চারণ করলাম আমি। নীলা সেহানকে দেখে মুগ্ধ হই নি বললে ডাহা মিথ্যেকথা বলা হবে। অমন আশ্চর্যসুন্দর সুঠাম দেহধারিণীর জন্মদাতা একটি বিরাট স্কাউণ্ড্রেল, সে কল্পনাও যেন অসহ্য মনে হল। নীলা সেহানের চরিত্র আমার জানা নেই, তব তার সম্বন্ধে কোনোরকম বিরূপ ধারণা করতে মন রাজি হ'ল না। অসামান্য রূপের এক নিজস্ব মোহিনীশক্তি আছে, যা রূপবতী সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টিতে প্রবলভাবে বাধা দেয়।

আমার দুঃখ বোধ করি অনুভব করলেন কানাই মিত্তির। সান্ত্বনার প্রলেপ তাঁর কাছে তৈরিই ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন :

'এ গ্রেট স্কাউণ্ড্রেল, বাট এ গ্রেটার ফাদার (A great scoundrel but a greater father) স্কাউণ্ড্রেল হিসেবে যেমন তার তুলনা মেলা ভার, বাপ হিসেবে তার চাইতে বেশি অতুলনীয়। অর্জুন সেহানের বাইরের চেহারাটি ছিল অসাধারণ চমৎকার—একেবারেই ভিলেনের মতো নয়। ওর মেয়ে নীলা সেহানকে দেখে খানিকটা আভাস পেতে পারেন। অবশ্য নীলা হচ্ছে নীলা, তার সঙ্গে অর্জুনের তুলনা হবে কি করে? লীলার মতো আশ্চর্য অতুলনীয়ার বাবা একজন অতুলনীয় স্কাউণ্ড্রেল. একথা ভাবলেও বুকে বিষম ধাক্কা লাগা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ব্যাপারটা অসাধারণ কিছু নয়। জানেন তো ইংরেজি বাইবেলে বলে আউট অভ ইভিল কামেথ গুড (Out of evil cometh good)—অশুভ থেকে আসে শুভ, মন্দ থেকে উদ্ভব হয় ভালোর। স্কাউণ্ড্রেল অর্জুন সেহানের জীবনধারা থেকে জন্ম নিয়েছে, এঞ্জেল (angel) নীলা সেহান।'

নীলা—নীলা—নীলা। নীলা-নেশাগ্রস্ত হয়েছেন কি কানাই মিত্তির? নীলার সঙ্গ দুর্লভ বলে তার প্রসঙ্গে তৃপ্তি খুঁজছেন, দুধের সাধ মেটাচ্ছেন ঘোলে? এবং ইচ্ছুক শ্রোতারূপে আমাকে পেয়ে বিধাতার ওপর খুশি হয়েছেন মনে মনে?

'আপনি সেহানদের খবর সব জানেন, কানাইবাবু?'

'সব নয়, কিছু কিছু। তাও আগে জানতাম না, পরে সংগ্রহ করেছি।'

'কিসের পরে?'

'ফাদার ফন্সিকার জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শেষে যে রাতে নীলা সেহানকে প্যারাডাইজ কোর্টে পৌছে দিয়ে এলাম, তারপরে! কিন্তু কথার খেই হারিয়ে ফেলছি, ধনপতিবাবু। বলছিলাম প্যারাডাইজ কোর্টের স্কাউণ্ড্রেলদের কথা। তাই না?'

'তাই।'

'ঐ স্কাউণ্ড্রেলদের জন্যেই আমার ভাবনা ধনপতিবাবু। ওদের দিক থেকেই বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নীলা সেহানের ওপর। তখন তা থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্যে বেঁচে নেই ওর বাবা ভেট্রন্ স্কাউণ্ড্রেল (veteran scoundrel) অর্জুন সেহান।'

কিছুক্ষণ ধরে নীরবে শুনে গেলাম কানাই মিত্তিরের উদ্বেগ-ব্যাকুল ভাষণ। বহু স্কাউণ্ড্রেল-অধ্যুষিত প্যারাডাইজ কোর্টের যে ভীষণ চিত্র ফুটে উঠল এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের আবেগবিহ্বল ভাষণে, তাতে সবল অভিভাবকবিহীনা সুন্দরী সরলা অবলা নীলা সেহানের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমার মনেও কিঞ্চিৎ উদ্বেগ সঞ্চারিত হ'ল। ঋষি বঙ্কিম লিখে গেছেন—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র; সেই সুন্দর মুখের সঙ্গে যদি যুক্ত থাকে একটি অপরূপ সুন্দর সুঠাম দেহ, তাহলে সেই জয় আরো কত বেশি জোরালো হয় সেইটে এবার প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করলাম। কানাই-বর্ণিত নীলার মতো বাস্তবের নীলা সেহানও সত্যিই অত সরলা, অত অবলা ইত্যাদি কি না, সে বিষয়ে একটু ক্ষীণ সন্দেহের উদয় মনের ভেতর হবো হবো করছিল, বহু স্কাউণ্ড্রেল-পরিবৃত সুন্দরী নীলা সেহানের নিরাপত্তার জন্য নিদারুণ উদ্বেগের ঝড়ো হাওয়ায় তা উড়ে গেল।

উদ্বেগের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে বললাম, 'কিন্তু পিতৃহীনা হবার পর শুধু মাকে নিয়ে তো অনেকদিন রয়েছে নীলা সেহান। এতদিন তো কোনো বিপদ ঘটে নি?'

'কাল যা ঘটে নি তা আজ ঘটবে না এমন গ্যারাণ্টী কে দিতে পারে, ধনপতিবাবু? মানুষ যেদিন মারা যায়, তার আগের দিন কি বেঁচে থাকে না?'

থাকে। মৃত্যু-মুহূর্তের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকে। উদ্বেগটা আবার অনুভব করতে শুরু করলাম।

বললাম, 'আপনার উদ্বেগের কোনো ইঙ্গিত কি দিয়েছেন

নীলা সেহানকে? প্যারাডাইজ কোর্টে তার বিপদ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন কি?'

'না। ভরসা পাই নি, ধনপতিবাবু। হুঁশিয়ারি শোনাতে পারি নি নীলাকে, পাছে সে ওর জন্যে আমার এই মাথাব্যথায় চটে ওঠে বা আমার সাবধানবাণীকে ছেলেমানুষি-কল্পনা আর খামখেয়ালী ভেবে হেসে উড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া নীলার জন্যে মাথা ঘামাবার অধিকারই বা কি আছে আমার? সে তো আমার স্ত্রীর পিয়ানো-শিক্ষয়িত্রী মাত্র। নীলা ওর ব্যাপারে আমার মাথা গলানো পছন্দ নাও করতে পারে। অমন মেয়ের মেজাজের কথা কিছুই বলা তো যায় না, ধনপতিবাবু। ভুল কিছু করে বসে ওর মতো একজন বড়ো শিল্পীকে হারাতে চাই নে।'

নীলা সেহানের সান্নিধ্য মন্দ লাগে নি, যদিও সেই মন্দ না-লাগাটা কিঞ্চিৎ অস্বস্তিমিশ্রিত ছিল, কিন্তু কানাই মিত্তিরের মুখে নীলা-প্রসঙ্গ একটু যেন একঘেয়েমির বাড়াবাড়ি মনে হতে লাগল।

বললাম, 'তাহলে বোধ হয় ও বিষয়ে মনে আর উদ্বেগ না রাখাই ভালো, কানাইবাবু। মনে করুন, ওর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়াটা নেহাৎই দৈবাতের ব্যাপার, দেখা না-ও তো হতে পারত। তখন কি হত?'

কানাই মিত্তির বললেন, 'দেখা না হলে আমার কোনো দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু দেখা হয়েছে, অনেক জেনেছি ওর সম্বন্ধে, সে দায়িত্ব তো আর মুছে ফেলতে পারি নে ধনপতিবাবু।'

আমি বললাম, 'নীলার বাবা নেই, কিন্তু মা তো আছেন, কানাইবাবু। যে মা স্বামীহারা হয়েও এত ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে মেয়েকে এত বড় শিল্পী বানিয়ে তুলতে পেরেছেন, তিনি তাঁর মেয়েকে সমস্ত আপদ থেকে রক্ষাও করতে পারবেন।'

'মেয়েকে পিয়ানো-শিল্পী বানিয়ে তোলা আর দুরন্ত স্কাউণ্ড্রেলদের শয়তানী থেকে রক্ষা করা—এক কথা নয়, ধনপতিবাবু। দুনিয়াটা কি ভয়ংকর খারাপ জায়গা, তা জানেন না আপনি। কবি ইয়েট্‌স্ বলেছেন—দ্য ওয়ার্লড ইজ মোর ফুল অভ উইপিং দ্যান ইউ ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড (the world is more full of weeping than you can understand)!'

কথাটা পুরো সত্যি কি না জানি না, কিন্তু জানি পুরো অসত্য নয়। অনেক কান্নায় ভরা এই দুনিয়া। কিন্তু দুনিয়ার কান্নার দিকটাই এত বেশি করে মনে পড়ছে কেন এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের, যার নেই বংশ-মর্যাদার বা ঐশ্বর্যের অভাব? জীবনসঙ্গিনী মৃণালিনী কি হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি তাঁর জীবনে? কেন পারেন নি? কৌতূহলে ভরে উঠল মন। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার ব্যর্থ চেষ্টা কি করছেন মৃণালিনী, স্বামীর প্রেমে হতাশ হয়ে সান্ত্বনা খুঁজছেন শ্বশুরের স্নেহে? চোখে দেখি নি মৃণালিনীকে; দেখবার জন্য আমার দু'টি চোখ উৎসুক হয়ে উঠল।

[ক্রমশ।

আজ রাতে

গোবিন্দ হালদার

শরীরে রোমাঞ্চ আনে আজ রাতে বৃষ্টির প্রহার।
হাওয়ার ক্রন্দন ভাসে বনময় ঝাউয়ের শাখায়—
কুন্তলের মুক্তধারা সম গাঢ় গহন আঁধার
বেপথু বাসনাগুলো ছায়ালীন কুহেলি মায়ায়।

মুখের পত্রালি আঁকা এই রাত সহসা মাতাল।
জানালার ধারে এসো: বুকে থাক্ যত কথামালা—
অলিন্দে বৃষ্টির ধ্বনি। শব্দহীন র'ব কিছুকাল
হাত রাখো হাতে প্রিয়া এই রাত নিবিড় নিরালা।

নিঃশ্বসিত শূন্য আজ সুরময়। বিবশ চেতনা;
সময়ের ক্ষয় যেন মৃত্যুস্তব্ধ। অবাক অবাক:
বৃষ্টির অজস্র শব্দ পদাবলী ছড়ায় বেদনা
আমার স্বপ্নেরা যদি তারি সাথে হারায় হারাক্।...

নির্জন পৃথিবী ঘিরে আজ রাতে বৃষ্টির প্রহার:
রোমাঞ্চিত তনুমন এই ঘরে তোমার আমার।

আকর

[শেক্সপীয়রের ১৪১নং সনেটের অনুবাদ]

তোমারে যে ভালবাসি, সে তো, প্রিয়ে, চক্ষু দিয়ে নয়—
আমার এ আঁখি দু'টি তোমা মাঝে বহু ত্রুটি পায়।
দরশন-শক্তিহীন অন্ধ বটে আমার হৃদয়,
তবু সে-ই তোমাকে গো প্রিয় ব'লে আলিঙ্গিতে চায়।
শ্রবণকুহরে মোর পশি,' তব ওই কণ্ঠস্বর
পুলক জাগায় নাকো; তব অঙ্গপরশন লাগি'
নাহি কাঁদে অঙ্গ মোর; ওই তনুগন্ধের আদর
নাহি করে মোর ঘ্রাণ; তবদেহসুরাস্বাদভাগী
এ জিহ্বা নহে গো নহে। নিবারিতে তবু নাহি পারে
এ মূর্খ হৃদয়টিরে কভু পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমার,
তোমাপানে ধাওয়া হতে। এ প্রাণ চায় বারেবারে
দাস হতে ও-প্রাণের—গরবের যা চির-আধার।
সবকিছু পীড়ামাঝে পাইয়াছি একমাত্র বর:
যে মোরে বানায় পাপী, সে-ই মোর বেদনা-আকর।

অনুবাদক—মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলজিয়াম ব্ল্যাক-আউটের ম্লান আলোয় গুপ্ত পত্রিকাগুলো পড়তে গেলে ছাপাগুলো চোখের সামনে একসংগে হয়ে জড়িয়ে যায় যেমন, জার্মান দখলের বছরগুলোও স্মৃতিতে যেন তেমনই জড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে হেডলাইনগুলো কেবল, বিস্তৃত সংবাদগুলো আলাদা করা যায় না।

এও মনে পড়ে না কবে প্রথম কন্‌ফেসানালে বলতে গেলে কনভেণ্টে থাকবার অধিকার আর তার নেই। শুধু মনে আছে গ্রিলের ওধার থেকে যে কণ্ঠস্বর উত্তর দিয়েছিলেন, বিস্ময়ের পরিমাণ এতই কম ছিল তাতে যেন এই অস্ফুটবিহ্বল কণ্ঠে নানদের পরাজয়-স্বীকারোক্তি আর জাগতিক-জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব—এ একেবারে নিত্যদিনের ঘটনা।

এত অজস্র দিক আছে তার পরাজয়ের, একটা সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব প্রায়। সে কেবল তার দুঃসহ লজ্জার কথা বলতে পারে। ধর্ম-জীবনে সে একটা ভণ্ড, তাই লজ্জা। হোলি রুলকে অবজ্ঞা করার পরও এই বাধ্যতার পোশাক পরে আছে, তাই লজ্জা। ঘৃণা-ভরা বুকের ওপর ক্ষমার দেবতার ক্রুশচিহ্ন ঝুলিয়ে রেখেছে, তাই লজ্জা।

—কোনদিনও আমি কোন জার্মানের মধ্যে যীশুকে দেখতে শিখব না ফাদার। একশ বছর থাকি যদি কনভেণ্টে, তবুও না। আমার অনেক অপরাধের মধ্যে এটা একটা—

দীর্ঘ তিন বছর। সংগ্রাম চলছে অন্তরে-বাইরে। মনের সংগে, ক্ষুধার সংগে। বাহ্যত প্রার্থনা করে সিস্টারদের সংগে আমেরিকানরা এসে পড়ুক তাড়াতাড়ি, মনে মনে সে প্রার্থনাটাকেও বিশ্বাস করে না।

এই ক'বছরে ছাত্রী-নার্সরা আরও রোগা হয়ে গেছে, নানদের মতই। কিন্তু যে ঔদাসীন্যের জোরে নানরা এ পরীক্ষারও মুখোমুখি হতে পারেন—বাহ্যিক স্থৈর্য বজায় রাখতে পারেন অন্তত, সে উদাসীনতা তাদের নেই। সব চেয়ে ভাল যেটুকু যা যোগাড় হয় যক্ষ্মারোগীদের দেওয়া হয়। তাদের ট্রে থেকে ভুক্তাবশিষ্ট তুলে খেয়ে ফেলে ওরা—আবিষ্কার করে বেদনাবিমূঢ় সিস্টার লুক। ওয়ার্ড থেকে ট্রে নিয়ে রান্নাঘরে রাখতে যেতে যেতে মাখনের দলা তুলে গিলে ফেলে মেয়েগুলো, কোন রোগী কাশতে গিয়ে যে মাংসের টুকরো ফেলে দিয়েছে তা অবধি প্লেট থেকে তুলে খেয়ে নেয়।

সিস্টার লুক মিনতি করে তাদের কাছে, খেও না তোমরা ওগুলো। জানি তোমরা ক্ষুধার্ত, তবু এভাবে রোগ ডেকে এন না।

সাপ্তাহিক কুলপায় প্রায়শই সে কোন ছাত্রীর সংগে কথাবার্তা অযথা দীর্ঘায়িত করার জন্য অভিযুক্ত হয়। নতজানু হয়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধান গ্রহণ করতে করতে বিস্ময় লাগে তার।…এই বিশৃংখলার মধ্যেও হোলি রুলকে ওরা জীবন্ত রাখবেই। অথচ প্রত্যেকটি নান জানে কেবলমাত্র তারই ওয়ার্ড থেকে একজন ছাত্রীও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজে বিপদের পথে পা বাড়ায় নি।

কনফেসারের সংগে নিয়মিত দেখা করতে যায় সিস্টার লুক। ফাদার উপদেশ দেন তাকে, বিচক্ষণ হতে বলেন, মনোবল পাবার জন্য প্রার্থনা করতে বলেন, বলেন পরাধীনতার সমস্ত বেদনা ভগবানের চরণে নিবেদন করে দিতে, আর শৃংখলিত সেণ্টপিটারের ধ্যান করতে।

তার সমস্ত কনভেণ্ট জীবনে এই আধ্যাত্মিক লড়াইটা সবচেয়ে নিঃসংগ। প্রার্থনাগুলো শুকনো, প্রাণহীন।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম

করুণা আসে না, সাহায্য আসে না, আহত বিবেককে পথ দেখায় না কোন প্রেরণা। তার মন আর ঈশ্বরের মাঝে অসীম নীরবতার গহ্বর শুধু। ঈশ্বর করুণা প্রকাশ করেন—তাঁর আদেশগুলো পালন করার পথ তৈরি করে দেন—শত্রুকে ভালবাসাও তেমনই এক আদেশ। পালন না কর যদি, যদি অকৃতকার্য হও, তিনি বারবার এগিয়ে আসবেন, সাহায্যার্থে বাড়িয়ে দেবেন হাত—যাতে তুমি বল পাও। কিন্তু সেসব বিফলে যায় যদি, তাঁর সহায়তা সত্ত্বেও তাঁর আদেশ পালনে ব্যর্থ হও তুমি, একসময় তাঁর আদেশ আর এসে পৌঁছোবে না তোমার দ্বারে, তাঁর করুণাও বর্ষিত হবে না তোমার প্রতি। ভেব না তাঁর ভালবাসা হারিয়ে গেল সেই ক্ষণে, শুধু তীব্র বেদনায় স্তব্ধ হলেন তিনি।

চ্যাপলিন প্রায়ই কথা বলেন তার সংগে। কনফেসনালে, টিউবারকোলিসিস ফ্লোরে তার ছোট অফিসটাতেও। বৃদ্ধ, দুর্বল মানুষটি, অসুস্থও।

অস্ফুটকণ্ঠে বলেন, কেন একবার তোমার সুপিরিয়রের সংগে কথা বলার চেষ্টা কর না মাই চাইল্ড ?

উনি যখনই বলেন, সিস্টার লুক ভাবে সুপিরিয়র নিশ্চয়ই একমত হবেন তার সংগে যে, কনভেন্টে আর তার স্থান নেই। বলতে গিয়েও চ্যাপলিনকে সেকথা বলে না কিন্তু, সামলে নেয়।

একবারমাত্র সে সুপিরিয়রকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল কেন আজকাল এই দুঃখ-দুর্দশা আর মৃত্যুর তাণ্ডবের দিনে খেতে যেতে বা উপাসনায় যোগ দিতে এমন বারবার দেরি হয়ে যাচ্ছে তার। হয়তো কোন সন্ত্রস্ত রোগীর সংগে ধর্মালোচনা করতে করতে ঘণ্টা বেজে উঠল—

—হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘুরে চলে আসা···খাবার জন্যে বা একটা অফিস পড়ার জন্যে···এ যেন ঐ তৃষিত প্রাণগুলির কাছ থেকে সময় চুরি করে নেওয়া !

মনে হয়েছিল মাদার ডিভাইমার কুঞ্চিত চোখের সামনে হোলি রুলই ছিঁড়ে ফেলেছে বুঝি ! অল্পবয়সী, দুর্বলচিত্ত মানদের ওপর মিশনের ভার দিলে কিভাবে ক্ষতি হয় কটুকণ্ঠে তাই শোনাতে লাগলেন যখন, সে দৃঢ়ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুপিরিয়রের চেয়ারের ওপরের ক্রুসিফিক্সটির দিকে—মনে থাকে যাতে কমিউনিটির ক্রাইস্ট কথা বলছেন তার সংগে, ব্যর্থ একজন মিশনারি সিস্টার নয়।···বাধ্যতায় শৈথিল্য···স্বাধীন মতামত··আধ্যাত্মিক কর্মসাধনার মুখোশের অন্তরালে আত্মদম্ভ···

এ প্রতিক্রিয়ার পর মন খুলে কথা বলতে আর কখনও ফিরে যায় নি সিস্টার লুক সুপিরিয়রের কাছে।

তথাপি বিবেক তাকে বাধ্য করে প্রতিটি স্খলন-পতনের রিপোর্ট দাখিল করতে—গুপ্ত পত্রিকা পড়ার প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করা, হয়তো কোন রোগীর জন্য খাবার পাঠানো হয়েছে, ইতোমধ্যে এদিকে মারা গেছে রোগীটি—খাবারটা রান্নাঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার বদলে ছাত্রীদের দিয়ে দেওয়া। আর সাপ্তাহিক কুলপাটা তো ফাটা রেকর্ডের একঘেয়ে বাজনা হয়ে দাঁড়িয়েছে—শত্রুদের প্রতি দয়া প্রকাশে ত্রুটি ঘটে তার, তাদের ক্ষমা করতে শিখতে পারে না সে।

যতবার জার্মানরা এসে হাজির হয় হাসপাতালে, ওর মনের ঘৃণায় যেন ঘৃতাহুতি পড়ে। সব প্রার্থনা, সব প্রয়াসের জোরেও এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না সে।

শহরে একটা মিলিটারি ঘাঁটি হয়ে অবধি ঘন ঘন আসছে ওরা। ব্ল্যাক-আউট নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এত কড়াকড়ি করছে যে মাদার ডিভাইমা স্থির করেছেন একজন ব্ল্যাক-আউট নান নিয়োগ করাই ভাল—তার ওপর ভার থাকবে সূর্যাস্তের সংগে সংগে হাসপাতালের আলোগুলোর প্রত্যেকটার ঢাকা টানা আছে কি না দেখার।

প্রথম বছরের পরই কালো কাগজের শেডগুলো ছিঁড়তে শুরু করল। নানরা পিন দিয়ে আটকে রাখে ছেঁড়াগুলো, আঠা দিয়ে তালি দিয়ে দেয়। গোয়েন্দা পুলিশটি চটে যায় তা দেখে। তবু যতদিন তাতে করেও কাজ চলছিল, সিস্টার এ্যালবার্টা নিরাপদ ছিল ততদিন। শেষে একদিন রাত্রে একচিলতে আলো বাইরে গিয়ে পড়ল কোন ফাঁক দিয়ে। ব্ল্যাক-আউট নানের ওপর হুকুম হ'ল অমনি মিলিটারি ঘাঁটিতে গিয়ে পরদিন রিপোর্ট দিতে। সেখানে তার শাস্তি হ'ল পরবর্তী একমাস প্রত্যহ ভোর পাঁচটায় হেড কোয়ার্টার্সে হাজির হয়ে প্রত্যেকটি ব্ল্যাক-আউট শেড গুটিয়ে রাখতে হবে। একটা জবরদখল দুর্গে এই হেড কোয়ার্টার্স—নব্বুইটা জানলা সেখানে ! আর কনভেন্ট থেকে হেঁটে যেতে অন্ততপক্ষে আধঘণ্টার রাস্তা।

সিস্টার লুক যখন শুনল ক্ষীণাংগী ঐ নানটি রোজ ভোর চারটের সময় উঠছে দ্বারবানের মত নাৎসী দখলদারী অফিসগুলোকে দিনের জন্য প্রস্তুত করে দিতে যেতে, অন্তর্দাহে জ্বলল আপন মনেই। অথচ কোন অভিযোগ করা দূরের কথা, সিস্টার এ্যালবার্টা মধুর হেসে এই অবমাননা মাথা পেতে নিয়েছে···দেখে সিস্টার লুকের রাগ আরই বেড়েছে শুধু। সেই সংগে তার সংগে তার বাহ্যত এক এই সিস্টারদের অনতিক্রম্য বৈসাদৃশ্য আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তারপর জার্মানদের ইহুদীনিধন শুরু হ'ল। জার্মান-ভীতি দৈহিক রূপ নিল এবার। তার ছাত্রী-নার্সদের মধ্যে একটি ইহুদী মেয়ে ছিল। পড়াশুনায় ভাল মেয়েটি, আর তেমনই অতুলনীয় তার রূপ। গুপ্ত পত্রিকায় যেদিন খবর বেরোল জার্মান অনুশাসন বেরিয়েছে ইহুদীরা হাতে

'স্টার অব্ ডেভিড' পটি পরবে, সেই সংগে এই অনুশাসন প্রচারের পর এ্যাণ্টওয়ার্পে কি ঘটেছিল তার কাহিনী—জেসি ক'দিন ছুটি চাইল সেদিন।

অনুশাসন প্রচারিত হওয়ার পর কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল শহরের অ-ইহুদীরাও 'স্টার অব ডেভিড' পরেছে সবাই, কোন কোন গীর্জায় যীশু মূর্তির কাঠের হাতেও সূচিশিল্প করা পাতলা রেশমের 'স্টার অব ডেভিড' আটকে দেওয়া হয়েছে।

ফলে অনুশাসন প্রত্যাহারে বাধ্য হ'ল জার্মানরা।

জেসি ছুটি চাইতে সিস্টার লুক জিজ্ঞাসা করল, ওদের ভয় পাচ্ছ না নিশ্চয়ই তুমি জেসি? দেখ, ওদের কি ভাবে হাস্যাস্পদ করেছি আমরা। ওদের নিয়ে হাসাহাসি হয় এ ওরা সইতে পারে না তো, আর···আর আমরা বেলজিয়ানরা হাসতে জানি বেশ ভালই।

থেমে গেল। নিজেকে বারে বারে 'আমরা' বলতে শুনে থেমে গেল।

আমরা। ব্যবহারিক জগতের আমরা।···আমরা, যারা ওদের পেট্রোল ট্যাংকে চিনি ঢেলে দিচ্ছি···যারা ট্রলির ভিড়ে ওদের ইউনিফর্মে জলন্ত সিগারেট দিয়ে ফুটো করে দিচ্ছি···রাস্তার মোড়ে যানবাহনের ভিড়ে সবাইকে এক সংগে দাঁড়াতে হচ্ছে যখন, যারা পিছন থেকে ওদের তলোয়ারে ঝোলানো ট্যাসেল নিপুণ হাতে কেটে নিয়ে জমাচ্ছি, যাদের ওরা জামিন হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে···

জেসি বলল, হ্যাঁ সিস্টার, আমি ভয় পেয়েছি। কিন্তু আমায় এক মাসের ছুটি দিতে পারেন যদি, তাহলে আর ভয় পাব না।

মাসান্তে জেসি যখন ফিরে এল, চেনবার উপায় ছিল না। প্লাস্টিক সার্জারি সুন্দর মুখখানা বদলে দিয়েছে একেবারে, প্যারক্সাইডে কুচকুচে কালো চুলগুলো খড়ের মত হয়ে গেছে। সৌন্দর্যের সে বিকৃতি দেখেও নানরা ঔদাসীনতার ভাণ করেন, সিস্টার লুক শুধু যখনই তাকায় জেসির দিকে, তখনই জার্মানদের অভিসম্পাত দেয়।··· বিবেক বাধ্য করে কনফেসরকে জানাতে সে কথা—শত্রুদের অভিশাপ দিচ্ছে সে, ঈশ্বরের রোষ কবে নেমে আসে ওদের ওপর, সেই দিনটির দিকে চেয়েই বেঁচে আছে!

বৃদ্ধ ফাদার বেদনাহত হ'ন।—তুমি প্রার্থনা কর সিস্টার, ঈশ্বরকে মিনতি কর মনের এই প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে তোমায় মুক্তি দিতে।

একভাবে বলতে গেলে এর থেকে মুক্তি সে পেল অল্পদিনের মধ্যেই, তবে প্রার্থনার জোরে নয়। একটি প্রাশান্ ওয়ার-নার্স হাসপাতালে এল, ফুসফুসে বোমার টুকরো বিঁধেছে তার। এইসব নাৎসী নার্সদের কথা শুনেছিল সিস্টার লুক, ফ্রন্ট লাইনে ঘুরে ঘুরে বোমার আগুনের মধ্যে ওরা নিজের দলের আহতদের খুঁজে বার করে।

সিস্টার এ্যালবার্টা স্ট্রেচারের সংগে এল যক্ষ্মা ওয়ার্ডে। সুন্দর মুখখানায় উদ্বিগ্ন সমবেদনা মাখানো।

চুপি চুপি বলল, ফিল্ড ড্রেসিংয়ের নীচে ভীষণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে, এখনই রক্ত দেওয়া দরকার। আমার রক্ত যদি মেলে তো আমি দেব।

সিস্টার লুক তাকাল তার দিকে। সম্প্রতি নাৎসী হেড কোয়ার্টার্সে নিত্য হাজিরা দেওয়ার শাস্তিতে চেহারাটা শীর্ণ হয়ে গেছে। তারপর স্ট্রেচারে শায়িত নাৎসী নার্সটির দিকে তাকাল। তার গায়ে আটকানো টিকেটে নাম, বয়স ও ব্লাড টাইপ দেওয়া আছে।

—ডাক্তার যদি রক্ত দিতে বলেন, তাহলে সেটা আমার রক্ত হবে সিস্টার এ্যালবার্টা।

নাৎসী নার্সটি চকিতে চোখ খুলে তাকাল। একদৃষ্টে দেখল তার ওপর ঝুঁকে-পড়া নান দু'টির দিকে, উঁচু কলারে আটকানো এনামেল করা স্বস্তিকা ব্রোচের মতই কঠিন আর তীব্র ওর চোখের দৃষ্টিটা।

কর্কশকণ্ঠে নির্ভুল ফরাসীতে বলল, রক্ত দেওয়া হবে না, শুনতে পাচ্ছ! মরতে বরং রাজী আছি আমি, শিরার মধ্যে বেলজিয়াম-রক্ত তা বলে ঢোকাতে দেব না কিছুতেই।

চোখ বুজে ফেলল আবার, যেন চোখের সামনে ওদের সহ্য করতে পারছে না।

সিস্টাররা ওকে একটা প্রাইভেট-রুমে বয়ে নিয়ে গেল। তারই পাশের ঘরে শয্যাশায়ী দু'জন বয়স্ক ইহুদী শেষ সময়ের অপেক্ষায় শুয়ে।

দু'দিন ধরে সিস্টার লুক জার্মান মেয়েটিকে মৃত্যুর সংগে যুঝতে দেখল। রক্ত নিতে সে রাজী না হলে ডাক্তার অপরেশনের ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। শহরের জার্মান অফিসারদের মধ্যে তার রক্তের টাইপ খোঁজ করবার প্রস্তাবও করেছিলেন। উত্তরে মেয়েটি উগ্রভাবে জানিয়েছে জার্মান অফিসাররা কেবলমাত্র তাঁদের পিতৃভূমির জন্যই রক্তদান করে থাকেন, কোন ছল-চাতুরিতেই তার শিরায় বেলজিয়ান সংকর-রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া চলবে না।

সিস্টার লুক তার শত্রুর ঘৃণা আর জিদের প্রশংসা করল মনে মনে। তার নিজের মনের ঘৃণার সংগে এর পুরোপুরি মিল।

শত্রুর রক্ত নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে বেছে নেওয়াই শ্রেয়! সিস্টার লুক সবিস্ময়ে ভাবে সে যদি নিজে আহত অবস্থায় জার্মানদের হাতে গিয়ে পড়ত এতটাই সাহস তার থাকত কি না।

রিক্রিয়েশনে একদিন একজন সিস্টার জার্মান নানটির কথা তুলতে, সে বলল, একথা স্বীকার করতেই হবে যে ওদের দেশপ্রেম আছে। আমিও যদি ওর মত দেশের প্রতি ভালবাসায় মরে শহীদ হতে পারতাম তো খুশি হতাম।

মাদার ডিডাইমা তাঁর বিপুল কাজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন—সিস্টার লুকের দিকে প্রথমে, সিস্টারদের পুরো বৃত্তটাকে ঘিরে তারপর।—শহীদ তুমি প্রতিদিনই হতে পার। আমার বিশ্বাস আমরা সকলেই হচ্ছিও তাই···নিজেদের কাছে প্রতিদিনই মৃত্যুবরণ করছি আমরা—দেশপ্রেমে নয় অবশ্য, ভগবৎ-প্রেমে। মৃত্যুর সাক্ষী কেউ থাকে না, কিংবা পুরস্কার হিসেবে লোহার ক্রুশচিহ্ন মেলে না তার বিনিময়ে। স্বরটা দৃঢ়তর হ'ল আরও।—আমাদের মৃত্যুতে আমরা প্রভুর সামনে একা দাঁড়াই—তাঁর মুখের স্মিতহাসি দেখি, তিনি খুশি হন। সে পুরস্কারের মূল্য আরও অনেক বেশি নয় কি?

নাৎসী নার্সটি পরদিন মারা গেল। চেতনানাশক কোন ওষুধ খাওয়ান যায় নি তাকে, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সজ্ঞানে ছিল। অনুক্ষণ রক্তপাতের ফলে সাদা হয়ে গিয়েছিল দেহটা। শেষ নিঃশ্বাস যখন পড়ল, তখনও ঘৃণাভরা চোখে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ঝুঁকে-পড়া নানদের দিকে—কঠিন নীল চোখ দু'টো খোলাই রইল।

চোখের পাতা দু'টি বন্ধ করে দিল সিস্টার লুক। এই প্রথম কোন জার্মানকে মরতে দেখল সে চোখের সামনে। বক্ষস্পন্দন দ্রুততর, ভাবনাটা যেন খুশির ঢেউ হয়ে লেগেছে হৃৎপিণ্ডে।

শত্রুর মৃত্যুতে এই তৃপ্তি পরে মনকে পীড়িত করে তুলল কিন্তু। ক্ষমা প্রার্থনা করল বারে বারে, তবু স্বস্তি পেল না। ব্যবহারে তার চিরদিনের বন্ধু বেদনায় রুদ্ধকণ্ঠে যেন সাড়া মিলছে না তাই।

পরদিন চ্যাপলিন ওয়ার্ডে আসতে ক্লিষ্ট অন্তরটাকে মেলে ধরল তার সামনে।

—সারাজীবন আমার প্রাণরক্ষার কাজে উৎসর্গ করা ফাদার, আর ঐ মৃত্যুটায় খুশি হলাম আমি! মনে মনে আনন্দ করেছি একটা শত্রুকে মরতে দেখে। এদিকে আমার পরনে এই হ্যাবিটের খোলস ফাদার··

নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখল, ডেস্কে রাখা দৃঢ়বদ্ধ হাত দু'টো ফ্যাকাশে সাদা।···তিক্ততায় ভরে যাচ্ছে সারা অন্তর। সেবার কাজে ব্যাপৃত এই হাত দুটো, পিছনে হৃদয় নেই! এ হাত দুটো একদিন শ্রেষ্ঠ অর্ঘ বলে নিবেদন করেছিলাম ঈশ্বরকে।···তোমার চরণে আমার নিবেদন প্রভু··

—পাপ আমরা সবাই করি চাইল্ড, নিখুঁত কেউ নেই। প্রতিদিন অল্টারে আমাকে বলতে শোন না—হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমার হৃদয়, আমার বাক্য তুমি নির্মল কর··

···আপনার হৃদয়! আপনার বাক্য!···বৃদ্ধের কমনীয় মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখল সিস্টার লুক। বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে ক্ষুধার জ্বালা আর ধর্মানুরাগের দীপ্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে···হাসির শোভাটুকু সমুজ্জ্বল তবু।

ধীরস্বরে বলল, মস্তবড় প্রভেদ একটা রয়ে গেছে ফাদার—এতবড় প্রভেদ যে আমি আর কোনমতেই পারছি না তার সংগে মানিয়ে চলতে। আমি অনুরোধ করছি ফাদার, আমার কেসটা কার্ডিন্যালের কাছে পেশ করুন।

চ্যাপলিনের সংগে যে সব রোগীরা কথা বলতে চায় তাদের নামগুলো লিখে রেখেছিল, কাগজখানা বাড়িয়ে দিল।

বলল, ওয়ার্ডে এখন 'ওপেন' কেসও সব রয়েছে ফাদার, কেন না প্রাইভেট রুমগুলো সব ভর্তি। একটা মাস্ক আপনায় দিচ্ছি তাই। কিন্তু এ আমি অনুমোদন করি না, রোগীদের মনে আঘাত লাগে এতে।

কাগজটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার।—ক্রাইস্টও করেন না সিস্টার।

একটু থেমে অনুরোধ জানালেন তাকে, আরও একটু অপেক্ষা কর সিস্টার, প্রার্থনা কর ব্লেসেড ভার্জিনের কাছে। অসাধ্যসাধন করতে পারেন তিনি, লক্ষ্য কর নি?

ওঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল সিস্টার লুক। পুষ্টিহীন রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে চারদিকে আলোকবৃত্তের মত। কিন্তু সে বৃত্তও যুদ্ধ-খিন্ন।

···আরও অপেক্ষা আমি করব, আপনি যখন বলছেন।

···আবারও প্রার্থনা করব আমি, আপনি যখন বলছেন।

··কিন্তু কিছুই ঘটবে না···

পক্ষকাল কাটল। আলোচনা যেখানে থেমেছিল ঠিক সেইখানেই শুরু করল সিস্টার লুক।

—আমি কনভেণ্ট ছেড়ে গেলেও ক্রাইস্ট আমাকে ছাড়বেন না ফাদার। অনেক অর্ঘ দিয়েছি তাঁর পায়ে, তিনি জানেন চিরদিনই দেব—তাঁর নান হিসেবেই কাজ করি, কিংবা যুদ্ধ-নার্স হিসেবে।

একই কথা, একই যুক্তি—চ্যাপলিনকে বিব্রত করে তুলল প্রায়। নিজের ডেস্কে বসে, কনফেশানালে গিয়ে।

ফাদার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বাইরের জগৎ এখন একটুও নিরাপদ নয় যে মাই চাইল্ড!

—মানছি ফাদার। কিন্তু যদি কেবল সেই ভয়ে কনভেণ্টে থাকি সে তো ভণ্ডামি! কনভেণ্টে থাকা মানে নিজের মনের আর্তিতে থাকা, একমাত্র তাঁকে ভালবেসে থাকা। কোন অসন্তোষ থাকবে না, বিরুদ্ধ ভাবনা আসবে না মনের কোণেও। তা যদি না হয়, তাঁর চোখে এ থাকার তো কোন মূল্য নেই।···আমার থাকার কোন মূল্যই নেই ফাদার! তিনি তো জানেন কেন আমি আছি···

এমনি করেই ও বলে, আঘাত দিয়ে বলে। না হলে নিজে হতে ফাদার তার কেসটার কোন ব্যবস্থাই করবেন না। …শুধু আমার আত্মার জন্যই উদ্বেগ আপনার, আমার হৃদয়-মন-অনুভূতির যে শিবিরে তার বাস তার দিকে আপনি নজর দেন না। আত্মার সে বাসভূমিকে পবিত্র রাখার দায় আমারই, আমি পারি নি তা।

—আমার বিশ্বাস ফাদার, এখানে, এইভাবে হোলি রুলকে মানার ভাণ করে যত কাজ আমি করি তার চেয়ে জাগতিক জীবনে সামান্য একটু সদয়তা কি তুচ্ছ কোন দানেও দশগুণ খুশি হবেন ঈশ্বর—খুশি হয়ে করে থাকি যদি।

মাথার ওপর জার্মানী-অভিমুখী বৃটিশ বোমারু-বিমানের গর্জন…তারই মধ্যে বয়স্ক প্রিস্টের সংগে ঈশ্বর-তত্ত্ব আলোচনা বিস্ময়কর বটে! বিমানবাহিনীর চড়া আওয়াজে কান খাড়া হয়ে ওঠে, আন্তরিক প্রার্থনা ছেয়ে ফেলে ওদের যাত্রাপথ।

ফাদার বলেন, তাই হয়তো হবে। কিন্তু তুমি কি করে জানলে এখানে থেকে যতটা খুশি তুমি করতে পারছ তাঁকে বাইরে তার চেয়ে বেশি পারবে?

দৃঢ়কণ্ঠে সিস্টার লুক বলে, ঈশ্বর যে ভণ্ডদের ঘৃণা করেন ফাদার?

কনভেণ্ট ছেড়ে যাবার ইচ্ছাটাকে বহুবারই সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল সে, এড়িয়ে যেতে চাইল,—চাপা উত্তেজনায় কাহিলও হয়ে পড়ল ক্রমে, কিন্তু বৃথাই। এ ইচ্ছার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার স্তর সে পার হয়ে এসেছে। এমন নানের নজিরও আছে, যাঁরা পালিয়ে গিয়েছিলেন। ও চায় নি তা, নিয়মানুগ কাগজ একখানা হাতে পেতে চাইছিল। সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসার আইনমাফিক অনুমতি, প্রতিজ্ঞা ভেঙে সংসারে ফিরে যাবার পথে সেটা অন্তত তার আত্মার কাছে ছাড়পত্রের মত হবে। কিন্তু সব ছাড়পত্রের মত এটাও পাওয়া কঠিন।

এখন এই '৪৪ সালের গোড়ায় আকাশবক্ষে যুদ্ধ চলে প্রায়ই, ওদের সেন্টারে যেতে হয়। স্মৃতির বেলভারের তলায় ধর্মজীবনের যেসব অমূল্য খুঁটিনাটি জমিয়ে রেখেছে চিরদিন, এই বোমাবর্ষণের মধ্যে নানদের সাহসিকতা বিশেষ একটা কিছু তার মধ্যে। রোগীদের নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না তাঁরা। বহু পরিশ্রমে সিঁড়ি ভেঙে স্ট্রেচারগুলো বয়ে নিয়ে যেতে যারা ঠেলাগাড়িগুলো ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে স্মিতহাস্যে মাথাটা ঈষৎ সঞ্চালিত করে সাহস দেন তাদের। মাদার ডিভাইনা কঠোর আদেশ দিয়ে রেখেছেন তাই, তা না হলে বিমান আক্রমণের সময়ও নিজেরা সেন্টারের মধ্যে থাকার চিন্তাই আসত না তাঁদের মনে। সুপিরিয়রের আদেশ বলেই লঙ্ঘন করার প্রশ্ন ওঠে না।

ভাইদের কাছ থেকে সে খানকয়েক চিঠি পেয়েছে, সেন্টারে যাবে যখন সিস্টার লুক মাঝে মাঝেই আবার পড়ে সেগুলো। রোগীরাও পড়ে তার সংগে, সবাই যেন তারা একই পরিবারের লোক। জ্যামারের পতনে এণ্টনী বন্দী হয়েছে, নরওয়েতে আছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। ছোট দু'জন বেলজিয়ামেই লুকিয়ে আছে, রেজিস্ট্রি করায় নি—যতরকম পারছে দখলদারদের হয়রান করতে চেষ্টা করছে। চিঠি ওরা পেন্সিলে লেখে; তার মানে যা কিছুই 'হ্যাঁ' লিখেছে সব 'না' ধরতে হবে। যেমন তেমন করে লেখা পোস্টকার্ডগুলোয় সহস্রবর্ষী জার্মান-রাইখের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা থাকে। অর্থাৎ তার মেয়াদ আর বেশিদিন নয়। ও পড়ে যখন, রোগীদের চোখগুলো খুশিতে চক্‌চক্ করে।

সেন্টারের থমথমে পরিবেশে বসে অনেক সময়ই ও ঠিক করে, পরের বারে কি কথা কইবে চ্যাপলিনের সংগে। ম্যালিনসের প্রাইসেটের পোপের মত ক্ষমতা আছে কোন নানকে তার সন্ন্যাস-ব্রত থেকে মুক্তি দেবার। তাঁর সংগে ওর আলাপ-আলোচনার মাধ্যম একমাত্র চ্যাপলিন। কিন্তু তিনি ওর কোন যুক্তিটারই মূল্য দেন না। সিস্টার লুক নিজেও বিশ্লেষণ করে দেখে নিজেকে—হোলি রুলের বিরুদ্ধে তার মনটা যে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে, কিংবা কনভেণ্টের জীবনটাকে যে আর সে টানতে চাইছে না, তার জন্য দায়ী করার মত সাংঘাতিক ঘটনা কিছু ঘটে নি। বাহত যে কতগুলো হয়েছে মনে যুদ্ধের সময় ধর্মজীবনেও সেগুলো অসাধারণ কিছু নয়। দেশপ্রেম যখন জলে উঠে অগ্নি-শিখার মত, জেনে-বুঝে তখন বাধ্যতার নিয়ম-ভাঙা হয়ে যায়। উড়ন্ত শত্রু-বিমান চোখে পড়লেই মনটা আপনা হতে অকরুণ ক্রোধে ছেয়ে যায়, যুদ্ধের কাজে সাহায্য করার উন্মাদনায় হঠাৎ মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্ করে ওঠে, চোখের সামনে কোন শত্রুকে মরতে দেখলে খুশি হয়। এসব অপরাধের স্বীকারোক্তি চ্যাপলিন বহু শোনেন। ঐ যেসব নানরা স্মিতমুখে বসে হাতের আঙুলে জপের মালা ঘোরান, বোমার প্রচণ্ড শব্দে যাঁদের মুখের স্মিতহাসি ছাড়া আর সব কিছুই থরথর্ করে কেঁপে ওঠে—তাঁদের কাছেও।

আসলে তার এই সর্বাংগীণ নিরাশার মূল আছে আরও গভীরে কোথাও। রক্তমাংসের গভীরে ওর মজ্জার মধ্যে —যুদ্ধের এই বছরগুলো ছাড়িয়ে অতীতে কোথাও। পুরোনো বেদনার মত লেগে আছে বিবেকের সংগে, এমন অনুক্ষণের সংগী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাকে পৃথক করা কঠিন।

১৯৪৪ সাল, মে মাসের প্রথম তখন। রেভারেণ্ড মাদার ইমাম্যুয়েল বাৎসরিক পরিদর্শনে এলেন। আগের

দিন সন্ধ্যায় বুলেটিন বোর্ডে দেখল সিস্টার লুক নানদের লিস্টে তার নামটা মাঝামাঝি রয়েছে। মাদার ডিডাইমা তাঁর অর্ডারের নানদের ধর্মীয় বয়ঃক্রমানুসারী লিস্ট টাঙিয়ে দিয়েছেন—কে কার পর দেখা করবে রেভারেণ্ড মাদারের সংগে।

সিস্টার লুকের মন বলছে সুপিরিয়র জেনারেলের সংগে দেখা ও আর এবার করবে না।

রিক্রিয়েশানে সিস্টার ফ্রান্সিসের পাশে বসল ইচ্ছে করে, লিস্টে তার নাম ঠিক ওর আগে আছে।

এক সময় খুব সাদামাটা ভাবে তাকে বলল, একটা কথা সিস্টার ফ্রান্সিস কাল রেভারেণ্ড মাদারের সংগে তোমার কথা হয়ে গেলে তুমি একটু বলে দেবে তাঁকে আমার পালা এবার ছেড়ে দিচ্ছি আমি? মানে সত্যিই কোন বক্তব্য নেই এবার আমার, তা হ'লে আর তাঁর সময় নষ্ট করি কেন!

নীচু গলায় শুধু সিস্টার ফ্রান্সিসের শোনার মত করেই বলল বটে, কিন্তু এমন স্বরেই বলল, যেন কথাটা এতই তুচ্ছ যে বৃত্তের সবাইকে শোনাবার মত কিছু নয়।

পরদিন। সকাল থেকে দেখছে নার্সিং সিস্টাররা একে একে ডিউটি ছেড়ে দেখা করতে যাচ্ছে শান্ত, সমাহিত মুখে। সিস্টার ফ্রান্সিস যাবার সময় ওর দিকে চেয়ে মাথাটা একটু নাড়ল। অর্থাৎ তোমার কথাটা আমি ভুলি নি, বলে দেব রেভারেণ্ড মাদারকে।

ওয়ার্ডে আজ কাজের চাপ খুব। সব রোগীদের ওপর আবার তিন-তিনটে কেসের ফুসফুসে অপরেশন হয়েছে, তাদের দেখাশুনা আছে। বেড থেকে বেডে ঘুরে ঘুরে যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে যে দেহটা তারই ভিতরের মানুষটা ঘুরে-ফিরে ব্যংগ করছে—ভীরু! ভীরু! কণ্ঠস্বরটা এত বেশি জোরাল, যেন বাইরে থেকে বলছে কেউ।

কিছু পরে সিস্টার ফ্রান্সিস ফিরে এসে ওকে ডাকল একপাশে।

অনুচ্চকণ্ঠে জানাল, তা হলেও রেভারেণ্ড মাদার তোমাকে ডাকছেন সিস্টার লুক। তোমাকে বলতে বললেন তোমার যদি কিছু বলবার নাও থাকে, তাঁর কিছু জিজ্ঞাস করবার আছে।

মৃদু হেসে টেম্পারেচার চার্টগুলো নিল ওর হাত থেকে। দু'জনেই জানে, আদেশ এটা।

রেভারেণ্ড মাদার ইমাম্যুয়েল তার দিকে চেয়ে মধুর হাসলেন। শ্রদ্ধা জানিয়ে নতজানু হ'ল সিস্টার লুক। মনটা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

···ঐ হাসিটাকেই আমার ভয় ছিল।···

—নিজের ইচ্ছেয় কেন এলে না মাই চাইল্ড? জান না তুমি আমি মনে মনে টের পেয়েছি তোমার দ্বন্দ্বের কথা! প্রার্থনা চাইছিলে না তুমি, সাহায্য চাইছিলে না?

—হ্যাঁ, রেভারেণ্ড মাদার। সিস্টার লুক সোজা তাকাল কালো চোখ দু'টির দিকে, ও চোখের কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না।—কিন্তু আলোচনার সময় আর নেই। মনের সংগে যুদ্ধ করে শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছি আমি।

সুপিরিয়র জেনারেল শান্ত, স্থির।

—ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, 'শেষ' বলে কিছু থাকবার কথা নয় তার কাছে, তুমি তো তাঁকে ভালবাস সিস্টার! তুমি হয় তো আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ, কিন্তু তোমার রিপোর্ট যা পাই আমি তাতে করে এ কথাও বঝতে ধাঁধা লাগছে আমার। তোমার সিস্টাররা তোমায় ভালবাসে, ডাক্তাররা তোমার ওপর নির্ভর করেন খুব বেশি, তোমার ছাত্রীরা তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। মাথাটা একটু নেড়ে মৃদু হাসলেন সুপিরিয়র জেনারেল।—কিংবা সম্ভবত এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছ তুমি যখন যতই ডাকছ ভগবানকে, যতই প্রার্থনা করছ, সাড়া পাচ্ছ না!

ক্রাইস্টের সেই পরিচিত গল্পটা বললেন নতুন করে। পিটারের নৌকোয় ঘুমিয়ে ছিলেন প্রভু, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল। সভয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন শিষ্যের দল, নিদ্রিত প্রভুর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু বহুক্ষণ, যতক্ষণ না তাঁর নিদ্রাভংগ করলেন তাঁরা।

গল্প বলছেন, সিস্টার লুক জানে সময় দিচ্ছেন তাকে ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিতে। কথার মধ্যে দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে তাকে সাহায্যও করছেন কিছুটা।—কখনও কখনও মাই চাইল্ড, নিজের অন্তরের ঝড়ের মুখে যখন পড়ি আমরা —এই মুহূর্তে তুমি যেমন পড়েছ—হয়তো প্রভু ঘুমিয়ে থাকেন, তাই হয়তো তুমি সাড়া পাচ্ছ না। কিন্তু তিনি নীরব হয়ে আছেন বলে বিশ্বাস হারাবার কোন কারণ নেই। ধৈর্যের অভাব ঘটে নি তো তোমার? নিজের মনে এত লড়াই কি তুমি করেছ যে নিঃসংশয়ে বলতে পার শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছো তুমি?

উত্তর দিতে হবে। রেভারেণ্ড মাদার অপেক্ষা করে আছেন।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে সিস্টার লুক বলল, আমার ধারণা রেভারেণ্ড মাদার, বহু বছর ধরে লড়াই করছি আমি··· বহু বছর···

ভাবা কথা নয়, ঠিক এই মুহূর্তে তার সংকটের মূলটা যেন চোখে পড়ে গেল তার, পরিষ্কার সংশয়াতীত। তবু মনে হ'ল না একথা নতুন মনে এল তার, মনে হ'ল যেন কথাটা ও জানত, অনেকদিন আগে থেকেই জানত।

—প্রথম প্রথম প্রত্যেকটা দ্বন্দ্বই পৃথক মনে হ'ত, পরেরটার সংগে আগেরটার কোন মিল থাকত না, এমন কি দু'টোর কারণও যে এক হতে পারে তাও মনে হ'ত না। ক্রমে বুঝলাম। বাধ্যতা, রেভারেণ্ড মাদার।

বিনা প্রশ্নে হুকুম তামিল করা, মনের মধ্যে নীরব একটু প্রতিবাদও না রেখে—অন্ধ বাধ্যতা, দ্বিধাহীন, ত্রুটিহীন। সে আমি কোনদিনও পারি নি। আমার মনে সর্বদাই প্রশ্ন এসে পড়ে রেভারেণ্ড মাদার। হয়তো কোন রোগীর সংগে আধ্যাত্মিক কোন প্রসংগে আলোচনা করছি—তার মনস্তাত্বিক মূল্য অনেকখানি, এমন সময় চ্যাপেলের ঘণ্টা বাজল···অমনি আমার মনে প্রশ্ন ওঠে কোনটা বেশি দরকারী—ঐ আলোচনাটা না হোলি রুল। এ প্রশ্নের সদুত্তর আমি কোনদিন পাই নি।

থেমে গেল। মনে পড়েছে আরও একবার এ কথা সে বলতে চেয়েছিল। মাদার ডিডাইমাকে।

—বলে যাও, মাই চাইল্ড।

—আমার ধারণা আমার প্রায় সব ব্যর্থতার মূলেই এই সংঘাত। অনেক সময় এমন হয়েছে রেভারেণ্ড মাদার, আমার মন আমার সুপিরিয়রদের ইচ্ছার বিপরীতে পা বাড়িয়েছে। ট্রপিক্যাল মেডিসিন পরীক্ষার কথা মনে আছে আপনার? কি করে জানলাম আমি আপনার কাছ থেকে আসে নি প্রস্তাবটা! কিন্তু তা জানলেও কেস করতে পারতাম না আমি···আপনার জন্যেও না রেভারেণ্ড মাদার! সময় এবং শক্তির এমন ভীষণ অপচয় আমার মন কোনমতেই মেনে নিতে পারত না, কোনমতেই আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না নিজেকে এ-ই ভগবানের অভিপ্রায়। এমনি আরও সহস্রটা উদাহরণ আমি দিতে পারি, এ কিন্তু আপনার অজানা তো কোনটা নয়। সব রিপোর্টই তো পেয়েছেন। আর এখন মাদার ডিডাইমার রিপোর্টগুলো পড়েন যখন···

মুহূর্ত থেমে সিস্টার লুক বিবর্ণ একটু হাসল।—চ্যাপেলে বা খাবার ঘরে, কিংবা দু'টোতেই আসতে দেরি হয় আমার প্রত্যহ—ক্রমে ক্রমে এতদূর এসে পৌঁছেছি মাই মাদার! ঘণ্টার শব্দেও এখন আর আমি কোন রোগীর সংগে কথা কইতে কইতে মাঝখানে থেমে যেতে পারি না, বিশেষ করে সে যখন কথা বলতে চাইছে আমার সংগে। নাইট ডিউটি থাকে যখন গ্র্যাণ্ড সাইলেন্স ভাঙি আমি—রাত্রির নীরবতায় সব কিছু যখন শান্ত, বিশ্রামমগ্ন, যন্ত্রণাকাতর, অসুস্থ মানুষ তখন অনেক সময়ই আত্মিক আলোচনা করতে চায়। সেই নির্জন রাতে আমার বিচার-বুদ্ধি রুলকে বুঝতে চায় যুক্তি দিয়ে, উত্তর খুঁজে পায় না। আত্মিক আলোচনায় মগ্ন হয়ে আছে যখন দুটি প্রাণ, কেন তখন ঈশ্বরের কর্মীকে ঐ পাঁচটি ঘণ্টার শব্দে মূক হয়ে যেতে হবে?

বেদনায় পাংশু হয়ে থেমে গেল। নিজেই এবার পিছন ফিরে দেখছে যেন কি সে প্রকাশ করল!

সামনে সে গথিক-ধাঁচের মুখোমুখি ঈষৎ ঝুঁকে আছে তার দিকে, ব্যথার ছায়া দেখছে সেই মুখখানিতে।

দীর্ঘ নীরবতার পর রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল কণ্ঠস্বর ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলেন।

—তুমি কি কনভেণ্ট ছেড়ে যাবে মাই চাইল্ড?

—বোধ হয়, রেভারেণ্ড মাদার। আমি এ নিয়ে কিছুদিন ধরেই কথা বলছি চ্যাপলিনের সংগে।

—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে তুমি কি কিছুদিনের জন্যে মাদার হাউসে ফিরে আসতে চাও?

—না, রেভারেণ্ড মাদার, না। আমি এখানেই থাকতে চাই।—কালো দু'টি চোখের তারায় যে প্রচ্ছন্ন মিনতি দেখেছে, তারপর আর কথা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। তবু বলতে হবে, এতবড় দাক্ষিণ্যের অনুরোধ যে ঠেলে সরিয়ে দিতে যাচ্ছে, তার পিছনে যে কারণ সে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে, সেটা জানিয়ে দিতেই হবে, থামলে চলবে না।—মাদার হাউসের সংগে সর্বাংগীন পূর্ণতা এমনই অংগাংগি জড়িত, আমার মনে হয় না তার সবটাই বাস্তব রেভারেণ্ড মাদার। বাস্তব কনভেণ্ট জীবন এইখানেই আছে, এইখানেই তাই থাকতে হবে আমায়, থেকে লড়াই করতে হবে।

গলার স্বরটা নিজের কানেই কর্কশ শোনাল শেষের দিকে। রেভারেণ্ড মাদার একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, সে দৃষ্টিতে এমনই ভাব ফুটেছে, পারলে ঐ চোখ দু'টো সে সরিয়ে দিত।

—তা হলে তোমায় আমি একটি মাত্রই পরামর্শ দিতে পারি। প্রার্থনা কর সিস্টার, চেষ্টা কর আমাদের হোলি রুল অক্ষরে অক্ষরে মানতে। প্রভুর নামে আর একবার চেষ্টা কর···তাঁর হাতের যন্ত্র হিসেবে আমার জন্যেও। এখান থেকে যাব যখন তোমাকে আমার মনের মধ্যে নিয়ে যাব আমি, আমার প্রাত্যহিক প্রার্থনায় তুমি থাকবে।

ঋজু, কঠিন হাতে ক্রুশচিহ্ন করে দিলেন ওর কপালে, চিরতরে খোদাই করে দিলেন যেন। দু'চোখ ভরা জল, কুচকুচে কালো চোখের তারা দু'টো সেই জলের মধ্যে থেকে আরও বড় দেখাচ্ছে। আর সিস্টার লুক সেই জেট পাথরের মত চকচকে কালো দুই চোখে দেখছে দু'টি নানের ছায়া। বড় ছোট আর ফ্যাকাশে!

মনের মধ্যে রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলের সংগে আলোচনার কথাগুলো ঘুরছে অবিরত। আর একবার চেষ্টা করে দেখার ঐকান্তিক বাসনা বিদীর্ণ করছে অন্তরকে··· অথচ সেই সংগে বিচিত্র একটা অনুভূতি···সুপিরিয়র জেনারেলের সংগে দেখা করে বিদায়ই জানিয়ে এসেছে সে। ধীময়ী, স্নেহশীলা সেই মহিলাটি সে বিদায়ের সুর শুনেছেন, মনে মনে জেনেছেনও।

মাদার জেনারেল কালো চোখে যে দু'টি নানের প্রতিবিম্ব দেখেছে সিস্টার লুক, তারা ওর দ্বিধাবিভক্ত মনের প্রতিচ্ছবি। সে মনের একভাগ ফিরে গেছে কমিউনিটিতে, যথাযথ মনোযোগে রুল অনুসরণ করছে, ঘণ্টাধ্বনি মানছে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে, গ্র্যাণ্ড সাইলেন্সের সময় পূর্ণ মাধুর্যে দেখাশোনা করছে রোগীদের—শুধু কথা বলছে না। অপর ভাগ সশংকে অপেক্ষা করে আছে কপটতার বোঝাটা ভারি হতে হতে কখন ভেঙে পড়ে! ওর ইচ্ছে আর কিছুদিন যাক, এখনই চূড়ান্ত কিছু একটা না ঘটে। ঘটবেই একদিন ও জানে, তবু রেভারেণ্ড মাদার সে প্রার্থনা করছেন তার জন্য, আশা করছেন অলৌকিক কিছু ঘটবে!

ঘটল না তা। কপটতার স্তূপটাই ভেঙে পড়ল।

প্রত্যেক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির সময়ই নিজের নিজের র‍্যাশন-কুপন আনতে হয়। জার্মান দখলের পর থেকেই এ নিয়ম চালু। অনেক সময়ই এমন হয়, মাসের শেষের দিকে সব ক'টা কুপন ফুরিয়ে গেল। নতুন মাসের কুপন-বই না পাওয়া অবধি নানরা জোড়াতালি দিয়ে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে নেন, একজনের কুপনে অন্যকে খাওয়ান। মুমূর্ষু কোন রোগীর কুপনগুলো অন্য রোগীর জন্য ব্যবহার করেন। কিংবা কোন রোগী হয়তো খুব ধরাবাঁধা ডায়াটে আছে, তার ভাগের চিনি-মাখনের কুপনগুলো অন্য রোগীদের কাজে লাগে। ভাঁড়ারের নানকে দেখে যত বিস্ময়ের শেষ থাকে না সিস্টার লুকের। খাবারের পরিমাণ সব সময়ই কম, তারই মধ্যে ভেবে-বুঝে তিনশো মুখে খাবার যোগানো নিত্য! পিটারের খাবারটা কেড়ে পলকে খাওয়াতে হবে, অথচ পিটার জানবে তাকে অতি-যত্নে বাঁধা ডায়াটে রাখা হয়েছে মাত্র, আর কিছু নয়।

মাঝে মাঝেই কিন্তু সব হিসাব-নিকাশ বরবাদ হয়ে যায়। তখন অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য আসে নানদের কুপন-বই থেকে। এদিকে মাদার ডিডাইমা ক্রমে স্থানীয় কমাণ্ডার জার্মান প্রাইভেট রোগী পাঠালেই নির্দ্বিধায় নিয়ে নিচ্ছেন হাসপাতালে। তা নিলে তাদের নাম করে আস্ত একটা শূওর কি ভেড়ার মাংস এসে পড়ে তাঁর অফিস ঘরে, তার জন্য র‍্যাশন-কুপনের দরকার হয় না। তাঁর ক্ষুধার্ত নানরা একবারও অন্তত তাতে পেটপুরে খেতে পায়।

টি-বি উইংয়ে সবচেয়ে বেশি প্রাইভেট রুম আছে। জার্মান রোগীদের বেশির ভাগ তাই সেখানেই রাখা হচ্ছে।

ঐভাবে উপহার আসা মাংস সিস্টার লুকের গলায় আটকে যেতে যায়। ক্ষিধেটা সহ্য করবার শক্তি যতক্ষণ থাকে মাংসটা খায় না, পাশে যে সিস্টারটি বসে ডিশ-সুদ্ধ ধরে দেয় তাকে। শাক-সব্জি, বিট-গাজর, আলুতে ভরে নেয় নিজের ডিশ।

এরই মধ্যে সর্বোচ্চ জার্মান অফিসারের রক্ষিতা, হাসপাতালে তার উইংয়ে ভর্তি হয়ে এল। এল যেন তারই তিক্ত জীবনের বোঝা পূর্ণ করতে। অফিসারটি এর আগে কখনও তার উইংয়ে আসেন নি। ছিপ্ছিপে সুন্দর চেহারা, কটা চোখের দৃষ্টি ঝকঝকে বেয়নেটের মত ধারালো, রূঢ়-ঔদ্ধত্যে বললেন তাঁর অতিপ্রিয় সম্পদ গচ্ছিত রেখে যাচ্ছেন তার কাছে। সম্পদটি এক ফরাসী মহিলা, এক ধনী ব্যবসায়ীর কন্যা। মেয়েটি তার গোয়েন্দা প্রেমিকটিকে সামান্য খবরাখবরও যে দেয় তার বিনিময়ে তার বাবা ফ্রান্সে এই জার্মান-দখলের সময়ও অনেক বিশেষ সুবিধা পান।

ম্যাডামোজেল্ জেনি আসার সংগে সংগে বেলজিয়ান ফার্মের ভেড়া-শূওরের মাংস, নরওয়ের স্যালমোন মাছ, ডেনমার্কের মাখন আর চকোলেট, হল্যাণ্ডের চীজ রোগীদের খাবার ট্রেতে দেখা দিতে লাগল। নানদের খাবার টেবিলেও। বহুদিন পরে মাদার ডিডাইমার মুখ থেকে চিন্তার ছায়া একটু সরতে দেখা গেল।

ক্ষিধের মুখে এই যে খাবার জোটে, তার বিনিময়ে ঐ মেয়েটার সেবা করতে হবে! মেয়েটা দেশের শত্রু, বিশ্বাসহন্ত্রী। আর শুশ্রূষার দায়িত্বটা পড়েছে তারই ওপর। ঐ জার্মান অফিসারটিও তার চোখে এত ঘৃণ্য নয়। ···দ্বিতীয় দিনই মেয়েটি দাবী জানিয়েছে সুপিরিয়রের কাছে, একজন নান তার ঘরে ঘুমুবে। সে ভারও সিস্টার লুকের ওপর পড়েছে। মাদার ডিডাইমা বলেছেন, কেসটা এমনই অস্পষ্ট!

হুকুম শুনে সিস্টার লুক বিনা প্রতিবাদে তাও করেছে। একটা খাট আর একটা পর্দা দিয়ে এসেছে তারপর সেই ফরাসী মেয়েটির ঘরে। কোন অসুখ তার নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ। ওকে ওর প্রেমিক ভদ্রলোক এখানে রেখেছেন এটা নিরাপদ আশ্রয় বলে। নিজে কাজের চাপে আটকে আছেন, তাই। মেয়েটিকে তিনি একেবারে বিশ্বাস করেন না।

মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু ওর অলস দু'টি চোখের বেগুনি তারায় এমন একটি স্থূল স্বার্থান্ধ দৃষ্টি উঁকি দেয় তাতেই লেখা থাকে ও কোন স্তরের জীব। ব্যবহার মোটেই ভদ্রোচিত নয়, খিট্খিটে মেজাজ—স্বভাবটা ভারি বিরক্তিকর। নানদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, হেয় করতে চায়। রাত্রে তার একমাত্র চেষ্টা কি করে সিস্টার লুককে কথা বলাবে।

বলল হয়তো, সিস্টাররা কি জার্মানদের ভয় পাচ্ছে নাকি?

—আপনার দেহ-মন কোন কিছুর জন্যেই এ আলোচনা দরকারী নয় ম্যাডমোজেল। গ্র্যাণ্ড সাইলেন্সের সময় এটা আমার। সত্যি আমায় কোন দরকার থাকলে ডাকবেন—

—তার মানে আমার কথার জবাব দিতে চাইছেন না আপনি—স্বীকার করতে চান না আর কি যে ওরা—

ঐ নীচ মেয়েটা কালি ছড়াচ্ছে সিস্টারদের গায়ে, অসহনীয় রাগে সিস্টার লুক কাঁপে বিছানায় জেগে শুয়ে। মন বলে, আর একবার বিমান-আক্রমণ হোক, এই সাজা-রোগী মেয়েটাকে সেল্টারে নিয়ে গিয়ে পোরবার সুযোগ পাওয়া যায় তা হলে। ও দেখতে পেত কার্যক্ষেত্রে নির্ভীকতা কাকে বলে।

হাসপাতালের কোন ব্যবস্থাই পছন্দ নয় ম্যাডমোজেল জেনির। সব কিছুতেই তার নাকি কষ্ট হচ্ছে। সকালে পরিজে ওর প্রচুর উৎকৃষ্ট ক্রীম দিয়ে দিতে হবে, একটু ইতর-বিশেষ হলেই তিনতলা থেকে একতলার রান্নাঘরে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। এ হাসপাতালের সাপজিটোরি ব্যবহার করতে তার নাকি ভীষণ কষ্ট হয়, বড্ড বড়। প্রত্যহ সকালে তার প্রেমিক ভদ্রলোক যখন ফোন করেন, ইনিয়ে-বিনিয়ে এইসব অভিযোগ শোনায় সে।

একদিন সকালে সিস্টার লুকের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল।

রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে নিজেই ভদ্রলোককে বলল জার্মানে, আমাদের এই পরাধীন দেশে কবে থেকে এই রোগীটির ঠিক মনের মতন সাপজিটোরি তৈরি হচ্ছে জানতে পারলে ভাল হ'ত।

অফিসারটি শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন খোলা গলায়।

সেইদিনই বিকেলে কন্‌ভেন্টে তার নামের কার্ড দেওয়া শূওরের মাংস এসে পৌছোল।

ও সোজা চ্যাপিলনের অফিসে এসে দাঁড়াল তারপর।

—ফাদার, আমি একটা র‍্যাশন-কুপন হয়ে দাঁড়িয়েছি। কার্ডিনালকে চিঠি কি আপনি লিখেছেন? লেখেন নি যে চ্যাপিলনের মুখভাবই বলে দিল সে কথা। ও থামল না সেখানেই, বলল, না লিখে থাকেন যদি—আর লেখার ইচ্ছেই আপনার না থাকে যদি—ক্ষমা করবেন ফাদার, কিন্তু আমাকে অনুমতি ছাড়াই চলে যেতে হবে তা হলে। এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমি—

কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে আর বলল না নতুন করে। মনভরা ক্লান্তি। নিত্যনতুন বাধা আসছে, কত আর বলবে! আজই সকালে ম্যাসের সময় যে চিন্তা ছেয়েছিল মন, আধ্যাত্মিকতার কতটুকু ছিল তাতে? সকালবেলা স্নায়ুগুলো অশান্ত, চোখ দুটো লাল, রাতটা একরকম জেগেই কেটেছে। অল্টারের সামনে বসে প্রথমেই সারাদিনের কাজ ঠিক করেছে, নার্স আর ছাত্রীদের ডিউটি ঠিক করে দিয়েছে। স্পেশ্যাল রোগীদের খাওয়ার মেনু তৈরি করেছে, আর ভেবে রেখেছে, ক'জন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর জন্য আউন্স দশেক কগন্যাক্ চাইতে হবে—জিভ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে তাদের, মেয়াদ ফুরিয়ে এল।

ঐখানে বসে বসেই ভাঁড়ারের নানের সংগে তর্ক করছে।

সব সময় যেমন বলে তেমনই বলেছে, কগন্যাকটা আমার কিন্তু চাই-ই সিস্টার।

—কিন্তু তা তো তুমি পাবে না।

—কেন? ওই যে মানুষটি আটদিন কিছু খায় নি, তার টিকেটে অন্যদের খাইয়েছি আমরা, সে তা হলে কি পেল? মৃত্যুমুখী একটা মানুষের মুখে ক'ফোটা কগন্যাক-মেশানো জল দেবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি না, ভগবানের নামে সেবা করার অর্থ কি এই?···

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল। উপাসনায় বসে এই তর্কাতর্কি সে করে যাচ্ছে আপন মনে।

চ্যাপেলে আসতে দেরি হয়ে যেমন অনেক দিনই ক...আজও সকালে তেমনই ম্যাসের পর আশীর্বচন নিল না। সারাদিনের চলার পথে এর মূল্য বড় সামান্য নয়। সিস্টাররা নতজানু হয়ে অপেক্ষা করে আছেন আশীষ নেবেন বলে। ও একপাশে দু'হাতের পাতায় মুখ ঢেকে বসে। লবণাক্ত অশ্রুজলের স্বাদটা তিক্ত লাগছে।···

একটু থেমে আবারও সেই একই কথা বলল, এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমি—

—আচ্ছা সিস্টার, এতে তোমায় দেখে যারা কন্‌ভেন্টে ঢুকেছে তাদের সবাই হেয় করবে না, তুমি ঠিক জান? আমার মনে হচ্ছে কয়েকটি তেমন মেয়ে আছে।

শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন চ্যাপলিন।

—আমার কোন ছাত্রী যদি ঈশ্বরকে ভালবেসে কন্‌ভে... না এসে কোন নানকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আসে, আমিই স... আগে তাদের ছেড়ে চলে যেতে বলব। ফাদার আমি মিনতি করছি, আপনি চিঠিটা লিখুন।

—তাই হবে সিস্টার। তোমার মন তৈরি হয়ে গেছে। আমরা প্রিস্ট হিসেবে শুনতেই শুধু পারি, প্রার্থনা করতে পারি আর উপদেশ দিতে পারি

থেমে গিয়ে বিষণ্ণ একটু হাসলেন তার দিকে চেয়ে।

ধীরে ধীরে আবার বললেন, কিন্তু অনেক কিছুই বুঝতে পারা যায় না, হেঁয়ালিই থেকে যায়, তাই না? শেষ বোঝাপড়া যা কিছু সব মনের সংগে ব্লেসেড লর্ডের তৃতীয় পক্ষ কেউ থাকতে পারে না।···আজ রাতেই আমি চিঠি লিখব সিস্টার। আর্চবিশপকে বলব তোমার কনফেসর হিসেবে তোমার আবেদন গ্রাহ্য না হওয়ার মত কোন কারণ দেখছি না আমি।

ম্যালিন্সের কাছে চ্যাপলিনের চিঠির তারিখ: ট্রিনিটি, রবিবার, ৪ঠা জুন, ১৯৪৪।

সেইদিনই অ্যাংলো-আমেরিকান ফোর্স রোমকে মুক্ত করল। এদিকে চ্যানেলের ওপারেই ইংল্যাণ্ডে বিরাট মিত্রশক্তির ফৌজ অপেক্ষা করে আছে, জেনারেল আইজেনহাওয়ারের সেনাপতিত্বে ফ্রান্স উদ্ধার শুরু হবে। যে পরিস্থিতির দিকে পা বাড়িয়েছে পৃথিবী, নানের সংস্কার নিয়েও যে-কেউ সেখানে তাড়াতাড়ি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে, স্বাতন্ত্র্যবোধের জড়তা আসবে না। আসন্ন ঝড়ের ঘূর্ণিতে কারো কোন বিশেষত্বই নজরে পড়বে না অন্যের, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু ঝড় ওঠার পূর্বমুহূর্তে এখন সারা বেলজিয়াম ব্যেপে আছে শুধু অখণ্ড স্তব্ধতা, সেই স্তব্ধতার আবরণ ঠেলে কোন কিছুই এখন অনুমান করা যাচ্ছে না।

এক সপ্তাহ পরে জার্মান অফিসারটি এলেন তাঁর ফরাসী রক্ষিতাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে।

মেয়েটির ব্যাগগুলো তুলে নিয়ে প্রথম সিস্টার লুকের দিকে চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন একটা। বিস্ময়াতিশয্যে সিস্টার লুকের দু'চোখ বিস্ফারিত, তাকে না হুকুম করে পোর্টারের মত নিজহাতে মালপত্র তুলছেন জার্মান অফিসার!

—আবারও আপনার সংগে দেখা হবে বলেই মনে হয় সিস্টার। একসংগে একগোছা নোট হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন অফিসারটি।

সুপিরিয়রের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। নিজের মনে গুণতে শুরু করল সিস্টার লুক। ভেড়া-শুওরের মাংসের ঐ বিরাট উপহারের পর নগদ কতটা পাওয়া গেল দেখবে।···টাকার মধ্যে ছোট চিরকুট একটা—'সত্যি যদি কোনদিন বেরিয়ে আসেন সোজা চলে যাবেন'···ব্রাসেল্সের একটা ঠিকানা লেখা আছে।

সেদিন সারাদিন ও চেষ্টা করল দুই আর দুই মেলাতে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় শক্তি ভিন্ন বোঝা সম্ভব নয় জার্মান অফিসার কি করে একথা জানলেন! আণ্ডার গ্রাউণ্ডও তো জানে না তার এ ইচ্ছার কথা। আণ্ডার গ্রাউণ্ড থেকে লিজার কথা মনে পড়ল।

ওর ভয় ছিল তার গুণমুগ্ধ হয়ে যারা কন্ভেন্টে ঢোকার স্বপ্ন দেখে এই মেয়েটি তার একজন। ও জানে সে কথা বলেছে—নার্সিং কোর্স শেষ করে কন্ভেন্টে ঢুকতে চায়। শেষ মনোবলটুকু একত্রিত করে প্রিয় এই ছাত্রীটিকে জানিয়েছে তাই সে কন্ভেন্ট ছেড়ে দিচ্ছে, সেই যেদিন চ্যাপলিনকে শেষ অনুরোধ জানিয়ে এল, সেইদিনই। জিজ্ঞাসার উত্তরে লিজা আশ্বাস দিয়েছে তাকে। না, কোন সিস্টারের পতি মুগ্ধতায় উৎসর্গ করছে না নিজের জীবন ভগবানের চরণে।

—এত লোককে মরতে দেখলাম সিস্টার, মানুষ যখন অবিশ্বাস নিয়ে মরে তখন সে যে কি ভীষণ অসহায়! সেই ভয় টেনে এনেছে আমাকে এখানে, মঠ ছাড়া পৃথিবীতে বিশ্বাস আর কোথাও নেই আজ, কোথাও না।

যে সূত্রেই হোক, জার্মান অফিসারটিকে তার গোপন খবর লিজাই দিয়েছে। রহস্যটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে এবার। জার্মান ছদ্মবেশী ঐ মানুষটি জার্মান নন, ইংরেজ—গোয়েন্দাগিরি করছেন, আণ্ডার গ্রাউণ্ডের সংগে যোগাযোগ আছে।—তাই সেদিন তাকে হুকুম না করে নিজেই ফরাসী মেয়েটির মাল তুলে দিয়েছিল।···তাই টেলিফোনে ওদের কথায় সক্রোধে বাধা দিয়েছিল যখন, উত্তরে তাকে জেলে পোরবার হুকুম না দিয়ে সকৌতুকে হেসেছিলেন।

···নিজে গোয়েন্দাগিরি করছেন, আর ফরাসী রক্ষিতাটিকে সংগে সংগে রেখেছেন চোখ-ধাঁধানো একটা আবরণের মত—সবাই সন্দেহ তাকেই করবে, ভাববে সে-ই দেশদ্রোহিণী—এই জার্মান অফিসারটি তাকে কাজে লাগাচ্ছেন।

চিরকুটটা স্ক্যাপুলারের নীচে রেখে দিয়েছে।

···এটা রইল···আর চুলগুলো···

···মনস্থির করেছি যেদিন থেকে চুলগুলো নিজের ইচ্ছেয় বাড়তে দিয়েছি। ক্যাপ আর কয়ফের ভিতর ছোট ছোট নতুন চুলের উষ্ণতাটুকু এখন অনুভব করা যায় বেশ।

মাঝে মাঝেই স্নান করতে করতে আঙ্‌লগুলো চালিয়ে দেয় ও চুলের মধ্যে। কল্পনা করবার চেষ্টা করে আয়নায় কেমন দেখাত। সাদা চুলের আভাস দেখা দিয়েছে কি? পঁয়তিরিশ বছর বয়স তো পেরোল—আর তার মধ্যে ছ'টা বছর কেটেছে কংগোয়। সেখানে একটা বছর দু'বছরের ছাপ রেখে যায় দেহে।

সুতরাং বলা যায় না।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদে কোনারকের একটি অপূর্ব শিল্পকর্মের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। আলোকচিত্রটি শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।



(গল্প)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভোর থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা। দু'হাত দূরের মানুষ চেনার উপায় নেই। খুব সাবধানে সত্যব্রতবাবু লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্ল্যাটফর্মের ওপর এসে দাঁড়ালেন।

পিছনে সরযূপ্রসাদ বেডিং আর সুটকেশটা নিয়ে আসছে। স্পষ্ট তাকে দেখা যাচ্ছে না। আবছা কুয়াশায় শুধু একটা মানুষের কাঠামো।

আন্দাজ করে সত্যব্রতবাবু প্রতীক্ষাগারের কাছে চলে এলেন। এদিকে কুয়াশার চাপ অনেক কম। ভিতরের আসবাবগুলো বেশ দেখা যাচ্ছে।

সরযূপ্রসাদ জিনিসগুলো ঘরের এককোণে রেখে বেরিয়ে গেল। সত্যব্রতবাবু এদিকের ইজিচেয়ারের ওপর বসলেন। লাঠিটা দু'পায়ের ফাঁকে রেখে।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল, কুয়াশা-পেঁজা তুলোর মতন ভাসতে ভাসতে ঘরের মধ্যে এল। সিগারেটের ধোঁয়ার মতন নানারূপ নিল।

বসে বসে সত্যব্রতবাবু দেখতে লাগলেন।

হঠাৎই তাঁর চমক ভাঙল। ঘরের মধ্যে যেন একটু অন্ধকার। আকাশে জমাট মেঘ করলে যেমন হয়, ঠিক তেমনই।

সত্যব্রতবাবু মুখ তুলে চাইলেন।

না, মেঘ নয়, দীর্ঘ একটা চেহারা দ্বারপথে দাঁড়িয়েছে। আলো আড়াল করে। কাঁধে একটা ব্যাগ। হাতে গোটানো খবরের কাগজ।

একটু পাশ ফিরতেই দেখা গেল। বছর পাঁচিশ ছাব্বিশের এক ছোকরা। সুশ্রী, সুগঠন।

ছেলেটি ধীর পায়ে প্রতীক্ষাগারের মধ্যে এসে ঢুকল।

টেবিলের ওপর ব্যাগটা রাখল। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিল একটা চেয়ারের ওপর। নিজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টেবিলের একটা কোণ চেপে বসল।

সত্যব্রতবাবু এক নিমেষের জন্য দৃষ্টি সরান নি। তাঁর দু'টি চোখ একভাবে ছেলেটিকে অনুসরণ করে চলেছে।

অনেক আগের একরাতের দেখা স্বপ্নের টুকরো চোখের সামনে ভাসছে। সব স্পষ্ট নয়, আবার অস্পষ্টও নয়, আলো-আঁধারের মায়াময় রহস্যজড়ানো দৃশ্যের কিছুটা।

মাঝখানে অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেছে। শীতার্ত অনেক দিন। তাই সত্যব্রতবাবু সব ঠিক বুঝতে পারছেন না।

আপনি কতদূর যাবেন?

ছেলেটি পা দোলাতে দোলাতে প্রশ্ন করল।

অন্যমনস্ক সত্যব্রতবাবু প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেন নি। শুধু কতকগুলো শব্দের সমষ্টি কানে গিয়েছিল। ঝঙ্কার, কিন্তু অর্থবহ নয়।

তাই ছেলেটির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বললেন আমাকে?

বলছিলাম আপনি কতদূর যাবেন? ছেলেটি পুনরুক্তি করল,—

কলকাতায়। সত্যব্রতবাবু ছেলেটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে উত্তর দিলেন।

ছেলেটি আর কিছু বলল না। আলগোছে একবার নিজের কব্জির দিকে নজর বোলাল। ঘড়ির ওপর।

তুমি মানে আপনি কোথায় যাবেন? সত্যব্রতবাবু থেমে থেমে প্রশ্ন করলেন। কণ্ঠে যেন দ্বিধা আর জড়তা।

ছেলেটি সশব্দে হাসল, আমাকে আবার আপনি বলছেন কেন? তুমিই বলুন। আমি আপনার ছেলের মতন।

ছেলের মতন?

মনে হলো ধোঁয়াটে, বিবর্ণ কুয়াশার ছেঁড়া ছেঁড়া স্তম্ভগুলো যেন সত্যব্রতবাবুর সারা মুখ আচ্ছন্ন করে রইল। নিষ্প্রভ, বেদনার্দ্র দেখাল তাঁর মুখের ভাব।

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি। ছেলেটির হাসি অম্লান, আমিও কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি মাসে দু'বার আমাকে এখানে আসতে হয়।

মাসে দু'বার! স্বপ্নাবিষ্টের মতন সত্যব্রতবাবু বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন। ছেলেটি টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল। সত্যব্রতবাবুর কাছে এসে বলল, স্টেশন থেকে মাইলদুয়েক দূরে এয়ারকণ্ডিশন প্ল্যান্ট করপোরেশনের কারখানা দেখেছেন, ওখানেই আসতে হয়। আমি ওদের রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনীয়ার। মেশিন চেক-আপ করতে হয়।

কাজ নয়, যেন কাজের আনন্দে মশগুল, ছেলেটি মুখে চোখে এমনই ভাব ফোটাল। জীবন আর জীবিকা মিশে গেছে একাত্ম হয়ে কথার সুরে তারই পরিচয় মিলল।

আমিও ইঞ্জিনীয়ার। খুব মৃদুকণ্ঠে প্রায় স্বগতোক্তির সুরে সত্যব্রতবাবু বললেন।

মৃদু, চাপা কণ্ঠ, কিন্তু ছেলেটি ঠিক শুনতে পেল।

দু'টো হাতে তালি দিয়ে বলে উঠল, ও আপনিও ইঞ্জিনীয়ার। আই সি! এখানে কেন এসেছিলেন? কোন কোম্পানীর তরফ থেকে? অনেকে মনে করে ওই সব পাহাড়গুলোর মধ্যে লোহার-খনি থাকা নাকি আশ্চর্য নয়। দু' একটা ফার্ম জিওলজিস্ট পাঠিয়েছিল পরীক্ষা করতে। আপনি—

সত্যব্রতবাবু ছেলেটির উচ্ছ্বাস চাপা দিয়ে বললেন, আমি

এসেছিলাম ভগ্নস্বাস্থ্য মেরামত করতে। অতীতের গ্লানি ভুলতে।

ছেলেটি বিস্মিত চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সত্যব্রতবাবুর দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, স্বাস্থ্য ঠিক করতে, মানে আপনি অ.সুস্থ? কি অসুখ আপনার?

এ বয়সে জরাই সবচেয়ে বড় ব্যাধি। আমি অবসর-জীবন যাপন করছি। কর্মজীবনে ইঞ্জিনীয়ার ছিলাম।

আমার বাবাও ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ছেলেটি অন্যদিকে চেয়ে বলল।

ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন? কি নাম তোমার বাবার?

শেষ দিকে সত্যব্রতবাবুর গলাটা ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল। কুয়াশা আর নেই, এবার শীতের নির্মম হাওয়া ঘরে ঢুকছে। ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ।

একটু কেশে সত্যব্রতবাবু গলাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন।

সত্যব্রত মৈত্র। ছেলেটি প্রত্যেকটি শব্দের ওপর জোর দিল।

আওয়াজ করে সত্যব্রতবাবুর লাঠিটা মেঝের ওপর পড়ে গেল। অনেক কসরত করেও সত্যব্রতবাবু তাড়াতাড়ি লাঠিটা তুলতে পারলেন না। খুব কাঁপছে আঙুলগুলো। কেবলই লাঠিটা ফসকে যাচ্ছে।

ছেলেটি নীচু হয়ে লাঠিটা তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই সত্যব্রতবাবু কোনরকমে লাঠিটা তুলতে পেরেছেন।

আর কোথাও কুয়াশা নেই, তবু সত্যব্রতবাবুর মনে হল সব কিছু অস্পষ্ট, সব কিছু বাষ্পাচ্ছন্ন। শুধু সামনেটাই নয়, পিছনের দিনগুলোও।

কতদিন, কত বছর হয়ে গেল? সত্যব্রতবাবুর মনে হ'ল যেন বহুযুগ।

খুব মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, তোমার নাম কি প্রিয়, প্রিয়ব্রত মৈত্র।



ছেলেটি পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছিল, সত্যব্রতবাবুর কথাটা কানে যেতে এত চমকে উঠল যে, হাত কেঁপে জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। সিগারেটটা শক্তহাতে চেপে না ধরলে হয়তো সেটা মাটিতে ছিটকে পড়ত।

আপনি, আপনি কি করে আমার নাম জানলেন?

নিজের সমস্ত শরীরটার ভার সত্যব্রতবাবু লাঠিটার ওপর দিলেন। ও হাতের মুঠোয় নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলেন লাঠিটা। যেন কোন প্রিয়জন, কিংবা প্রিয়তর কোন স্মৃতি আঁকড়ে ধরেছেন।

আমি তোমাদের চিনি। মানে চিনতাম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রতবাবু মুখে অ্যানিমিক হাসি ফোটালেন। এইটুকু হাসতে পেয়েই যেন তিনি বেঁচে গেলেন। রুদ্ধশ্বাস কক্ষে, স্মৃতির চাপে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন এতক্ষণ।

ছেলেটি উঠে এসে একটা চেয়ার নিয়ে একেবারে সত্যব্রতবাবুর খুব কাছটিতে বসে পড়ল। ওর চোখে কৌতূহল, বিস্ময়, প্রশ্ন।

আমাদের চিনতেন?

সত্যব্রতবাবু মাথা নাড়লেন। নিজেকে সংশোধন করে নিলেন, না, চিনতাম না, জানতাম। এত সহজে, এত দ্রুত মানুষ চেনা যায় না। চিনতে অনেক সময় লাগে।

প্রিয়ব্রত এইসব দার্শনিকতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাল না। বলল, আপনি কোথায় দেখেছেন আমাদের?

বোগেনভিলা লেনে।

হ্যাঁ, সেখানেই তো আমরা থাকতাম, অবশ্য মার কাছে শুনেছি। আমি তখন খুব ছোট। বছর ছয়-সাত বোধ হয় বয়স।

সাত বছর। অন্য দিকে চেয়ে স্মৃতি মন্থন করতে করতে সত্যব্রতবাবু বললেন।

বিস্মিত প্রিয়ব্রত অনেকক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে রইল। দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, চেনবার কথা নয়, তবু চেনবার চেষ্টা করল। যদি কিছু মনে পড়ে যায়।

তোমরা থাকতে সাত নম্বর বাড়িতে, আমি থাকতাম উনিশ নম্বরে। একেবারে মুখোমুখি বাড়ি। আমাদের বারান্দায় দাঁড়ালে তোমাদের অন্দরমহল পর্যন্ত দেখা যেত। কোন অসুবিধা ছিল না।

আমার বাবাকে আপনি দেখেছেন?

সত্যব্রতবাবু ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ দেখেছি।

মাকে?

এ বারে কথা নয়, সত্যব্রতবাবু শুধু ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন।

আচ্ছা বলুন তো আমি কার মতন দেখতে হয়েছি?

প্রিয়ব্রতর দিকে না ফিরেই সত্যব্রতবাবু উত্তর দিলেন তোমার বাবার মতন। তোমার কথা বলার ভঙ্গী, তোমার চোখ, তোমার রং, সব তোমার বাবার মতন। তোমার মা একটু কালো ছিলেন। একটু বেঁটে।

হ্যাঁ, মাও তাই বলে। বলে, তোকে দেখলেই আমার ভয় করে প্রিয়। তুই ঠিক তোর বাপের মতন হচ্ছিস। আমি কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, ভয় কি? ছেলে তো বাপের মতনই হয়। মা বলে, না, না, বাপের মতন হয়ে তোর কাজ নেই। তুই তোর নিজের মতন হ।

সত্যব্রতবাবু পরিণত বয়সে যেন রূপকথার কাহিনী শুনছেন। পলক নেই চোখে, রুদ্ধ নিশ্বাস, উদগ্র কৌতূহল একবিন্দুতে সংহত।

আমার বাবার সঙ্গে—কথার মাঝখানেই প্রিয় থেমে গেল। লাঠিতে ভর দিয়ে সত্যব্রতবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন, মনে হ'ল বুঝি বাইরে যাবেন, কিন্তু গেলেন না, একটু পরেই আবার চুপ করে ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন।

আমি সব জানি প্রিয়, সে রাতের কথা আমি জানি।

আপনি জানেন।

সত্যব্রতবাবু আর কিছু বললেন না। লাঠিতে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। পা ফেলে ফেলে দরজার কাছে গেলেন।

রোদ উঠেছে, সকালের সোনালী রোদ। সেই আভায় সামনের রেলের লাইন দুটো চিক চিক করছে। রূপালী পাতের মতন।

সেই ঔজ্জ্বল্যের দিকে সত্যব্রতবাবু একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

অন্ধকার অতীত। পিছনে চোখ ফেরালে কোথাও একটু উজ্জ্বল রেখাও নেই। একটা বিক্ষোভ, একটা মালিন্য সব সৌন্দর্যকে ঢেকে দিয়েছে।

কার দোষ কতটা, এতদিন পরে তার চুলচেরা হিসাব করার কোন মানে হয় না। একটা মীমাংসায় পৌঁছেও কোন লাভ নেই। গোধূলিতে এ বিশ্লেষণ অর্থহীন।

ওই একটিই দোষ ছিল সত্যব্রতবাবুর।

কিন্তু কোন চীৎকার হৈ-চৈ নয়। পাড়ার একটি লোকও টের পেত না। রাত্রির অন্ধকারে ট্যাক্সি থেকে অসম্বৃত পায়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতেন। কাউকে সাহায্য করতে হত না। সোজা জামা কাপড় ছেড়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তেন।

ইঞ্জিনীয়ার সত্যব্রতবাবুর পানাসক্তির জন্য দায়ী তাঁর বন্ধুরা। একটানা পরিশ্রমের অবসরে কোথাও মিলিত হয়ে এই সঞ্জীবনী সুধা পান করতেন। বহুবার দিনের আলোয় এ অভ্যাস পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু রাত্রির তমসায় সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেন নি।

বিরোধের কারণ এইটাই।

প্রথম প্রথম সুমিতা বারণ করেছিল। অনুনয়, বিনয়, উপরোধ। শেষকালে রুদ্রমূর্তি। প্রতি রাত্রে কুৎসিত কলহ, কান্নাকাটি পড়শীদের সচকিত, চঞ্চল করে তুলত।

তারপর সেই সর্বনাশা রাত্রি এল। সুমিতা চরম আঘাত হানল। মনের দিক থেকে বোধ হয় সে তৈরি হয়েই ছিল, সত্যব্রতবাবু ঘরে এসে ঢুকতেই সুমিতা পর্দার কাছে এসে দাঁড়াল।

প্রথমে সত্যব্রতবাবু দেখেও না-দেখার ভান করেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন একপশলা উপদেশ বর্ষণ হবে, কিছুটা কটুবাক্য। রোজকার মতন তিনিও শপথ নেবেন, এ গরল আর পান না করবার। তারপর সব থেমে যাবে।

কিন্তু তা হ'ল না।

সে-রাতে সুমিতার কণ্ঠ আরো কঠিন, আরো নির্মম।

তুমি তা হলে তোমার এ অভ্যাস ছাড়তে রাজী নও?

সত্যব্রতবাবু বিছানার ওপর বসলেন। দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। এ সময় কথার জাল বুনতে ভাল লাগে না। কোন রকমে দেহটা বিছানায় ছেড়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত!

কি কথা বলছ না যে?

আমি তো কারো ক্ষতি করি না মিতা। চীৎকার, হৈ-হল্লা কিছু করি না। অন্যলোকের মতন পাড়া জাগিয়ে তুলি না।

সুমিতা এক পা এগিয়ে এল সত্যব্রতবাবুর দিকে।

পাড়ার কয়েকটা লোককে জাগিয়ে তোলা খুব মারাত্মক ব্যাপার নয়, তুমি যা কর, এ তার চেয়েও ঘৃণ্য। শুধু নিজের সর্বনাশ নয়, আমার সর্বনাশ কর, প্রিয়র সর্বনাশ।

সুমিতার তীক্ষ্ণ গলার স্বর নেশা কাটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কপালে খাঁজ পড়ল সত্যব্রতবাবুর। গালের মাংস কেঁপে কেঁপে উঠল।

তোমার সর্বনাশ, প্রিয়র সর্বনাশ!

হ্যাঁ, তাই।

কয়েক মুহূর্তের বিরতি। মনে হল সুমিতা দম নেবার জন্য থামল। তারপরই ফেটে পড়ল।

সর্বনাশ নয়! যখনই ভাবি একটা মদ্যপ, একটা নষ্ট-চরিত্রের সঙ্গে জীবন জড়িয়েছি, তখন আমার একমিনিট বাঁচতে সাধ হয় না। জান, প্রিয় কতবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, মা, বাবা অমন টলতে টলতে রোজ বাড়ি আসে কেন? আমি—আমি একদিন ছুটে কাছে গেলাম, বাবা কোলে নিল না। বাবার গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ! কি বলব আমি প্রিয়কে? যে প্রশ্নের আজ যে উত্তর খুঁজছে, আর কিছুদিন পরে তার জবাব সে পেয়ে যাবে। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তখন নিশ্চয় তুমি তার কাছ থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা আশা করবে না। আশা করা ভুল হবে।

এতগুলো কথা সত্যব্রতবাবুর কানে গেল না। দু' কানে শুধু একটা কথা বার বার ঝঙ্কার তুলল। নষ্টচরিত্র।

কাজের পরে ক্লাবে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করে। ব্যস, এর বাইরে কোন কিছু সে করে না। একেবারে ছকে বাঁধা জীবন। সুমিতাকে অবহেলা করেছে এমন অভিযোগ শত্রুও করতে পারবে না। অথচ এতবড় একটা শক্ত কথা সুমিতাই বলল।

সত্যব্রতবাবু দু'টো হাত দিয়ে চেয়ারের হাতলটা আঁকড়ে ধরলেন। নেশা আর নেই, সারা মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে। বেদনায়-অপমানে।

সুমিতার কণ্ঠস্বর আর এ ছোট ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ নেই। ইথারে ভেসে ভেসে অনেক দূরে চলে গেছে। তার প্রমাণ, আশপাশের বাড়ির জানলা খুলে গেছে। আলো জলে উঠেছে। জানলায় জানলায় পড়শীদের দেহের কাঠামোও দেখা যাচ্ছে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সত্যব্রতবাবু কথাগুলো বললেন। এগুলো যেন ওঁর কথা নয়। এমন কথা তিনি কখনও বলেন নি। বলতে পারেন, তা নিজেরই জানা ছিল না।

অভ্যাসটা যদি না ছাড়ি তা হ'লে?

এমন উত্তর বোধ হয় সুমিতাও আশা করে নি। মিনিট দুয়েকের বিমূঢ়তা, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, তা হ'লে, আমার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়।

এ বাড়িটা আমার, অন্তত যতদিন ভাড়া দিচ্ছি! সুমিতার দু'টি চোখে বিদ্যুতের দাহ। সমস্ত শরীর ইস্পাত-কঠিন।

আর একমুহূর্তও অপেক্ষা করে নি। দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিল।

কম্পমান পর্দার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে সত্যব্রতবাবু সমস্ত ঘটনাটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। নেশার মাত্রাটা একটু বেশিই হয়েছিল। শেষ কয়েক পেগ না ছুঁলেই ভাল হ'ত। আবোল তাবোল একরাশ কথা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। যা কোনদিন তিনি বলতে চান নি, তাই বলে ফেললেন।

সত্যব্রতবাবু ভেবেছিলেন, পরের দিন ভোরে এর জের চলবে। কিন্তু একটু পরেই বাড়ির সামনে গাড়ির শব্দ হ'তে উঠে বসলেন। খাটে বসেই জানলা দিয়ে রাস্তা নজরে আসে।

ট্যাক্সি। চাকর তুলসী দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়। তার পাশ দিয়ে প্রিয়র হাত ধরে সুমিতা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। তুলসী চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সির পুচ্ছবিন্দু এক সময়ে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন। সে রাতে তাই মনে হয়েছিল। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এই কুৎসিত স্বপ্নটা মুছে যাবে। সব কিছু সহজ, স্বাভাবিক হবে।

কিন্তু তা হ'ল না।

ভোরের বেলা রোজকার মতন সত্যব্রতবাবু স্নান সেরে টেবিলের কাছে বসলেন। তুলসী চা আর ডিম নিয়ে এল। কোথাও কোন বিচ্যুতি নয়, অসঙ্গতি নয়।

মা কই রে তুলসী? খবরের কাগজের পাতার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করলেন।

মা তো নেই। মা কাল রাত্রে চলে গেছেন। তুলসীর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ।

চলে গেছেন? এই প্রথম যেন সত্যব্রতবাবু বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, কোথায় গেছেন?

তা তো ঠিক জানি না বাবু। ড্রাইভারকে বললেন, হাওড়া স্টেশন যেতে।

তুই যেতে দিলি?

ঝোঁকের মাথায় প্রশ্নটা করেই সত্যব্রতবাবু বুঝতে পারলেন, এ প্রশ্ন কত নিরর্থক।

বাড়িতে তুলসী কেন, সত্যব্রতবাবু নিজেও তো ছিলেন। পারেন নি বাধা দিতে? তাঁর সামনে দিয়েই তো সুমিতা ছেলে' হাত ধরে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। অসহায় শিশুর মতন জানলা দিয়ে সত্যব্রতবাবু শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন। নিষেধের একটি অঙ্গুলিও তুলতে পারেন নি।

চা আর ডিম সরিয়ে সেদিন সত্যব্রতবাবু উঠে পড়েছিলেন।

আশ্চর্য, এখনও গাড়ি এল না? গাড়ি আসার সময় কিন্তু হয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত সত্যব্রতবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখছে সিগন্যালের দিকে।

সত্যব্রতবাবুর চিন্তার জাল শতচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অনেক আগের ফেলে-আসা এক রাতের কাহিনী নিঃশেষে মুছে গেল। কিন্তু তার দাহ, তার জ্বালা এখনও একতিল প্রশমিত হয় নি। সূক্ষ্ম একটা কাঁটার মতন মনে বিঁধে রয়েছে। একটু নড়তে চড়তে গেলেই প্রাণান্তকর যন্ত্রণা শুরু হয়।

আপনি তো আছেন এখানে? আমি একবার খোঁজ নিয়ে আসি। প্রিয়ব্রত দ্রুতপায়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল।

সত্যব্রতবাবু আবার পায়ে পায়ে ফিরে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। দু'টো হাতে মাথাটা চেপে ধরে নিজের মনের মধ্যে ডুবুরি নামালেন।

সত্যব্রতবাবু অনেক খুঁজেছিলেন। সুমিতার মা আর বাবা দু'জনেই নেই। পিতৃকুলে কেউ ছিল না। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন চেনাজানার পরিধির মধ্যে যারা ছিল, তাদের কাছেও সত্যব্রতবাবু সন্ধান করেছিলেন। না, নেই, কোথাও নেই সুমিতা আর প্রিয়ব্রত।

দু'টো প্রাণী যেন নিঃশেষে মুছে গেল।

তারপর সত্যব্রতবাবু নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। শামুকের কঠিন বর্মের নীচে আত্মগোপনের মতন। বাড়তি কাজ আর নেন নি। নিতান্ত প্রাণধারণের জন্য যেটুকু দরকার, সেটুকর মধ্যেই নিজেকে সীমিত রেখেছিলেন।

বার কয়েক দু-একটা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সুমিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে ফিরে আসবার অনুরোধ জানিয়ে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছিলেন। কোন দিক থেকে কোন সাড়া মেলে নি।

প্রয়োজনের সময় যা করা সম্ভব হয় নি সর্বনাশ ঘটে যাবার পরে তাই করেছিলেন, নিজের জীবনযাত্রা অতিমাত্রায় সংযত, নিয়মনিষ্ঠ।

সময়ের আগেই জরা এসে শরীরকে গ্রাস করেছিল। নিজের অযত্ন আর অবহেলা এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। চিন্তার চেয়ে বড় ব্যাধি আর মানুষের নেই। বিশেষ করে দুশ্চিন্তা। অলক্ষ্যে কীটের মতন এই দুশ্চিন্তা সত্যব্রতবাবুর জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করতে শুরু করল।

আজ গাড়ি খুব লেট বুঝলেন? দ্বারপথে প্রিয়ব্রত এসে দাঁড়াল। মাঝপথে কোথায় বুঝি মালগাড়ি উল্টেছে। অন্তত ঘণ্টাপাঁচেক লেট।

কথা বলতে বলতে প্রিয়ব্রত সত্যব্রতবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল।

সত্যব্রতবাবু কিছু বললেন না। শুধু চেয়ে রইলেন প্রিয়ব্রতর দিকে।

চেয়ারের ওপর বসে পড়ে হাসতে হাসতে প্রিয়ব্রত বলল, আপনি মশাই ভারি অপয়া লোক। আমি এতদিন যাওয়া-আসা করছি, একটি দিনের জন্য গাড়ি লেট হয় নি, আর আজ আপনি আছেন বলে—

আমার বরাতে সবই একটু লেট-এ আসে প্রিয়। বারবার বুঝি মাঝপথে মালগাড়ি উল্টে যায় পথরোধ করে।

সত্যব্রতবাবুর কথার ভঙ্গিতে প্রিয়ব্রত উচ্চহাস্য করে উঠল।

সত্যব্রতবাবু চমকে উঠলেন। যৌবনে ঠিক এমন ভাবেই তিনি হাসতেন। এমনই সশব্দে।

এই পাঁচঘণ্টা আপনি কি করবেন তা হ'লে? প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল। কি আর করব? সারা জীবন যা করেছি, অপেক্ষা করব; সত্যব্রতবাবু উদাসকণ্ঠে বললেন।

অপেক্ষা তো করতেই হবে। আমি বলছিলাম খাওয়া-

দাওয়ার কথা? এখানেই খেয়ে নেওয়া ভাল। আমি বরং দু'টো লাঞ্চের কথা বলে আসি।

প্রিয়ব্রত চঞ্চলপায়ে আবার বেরিয়ে গেল।

সত্যব্রতবাবু উঠলেন না। একভাবে ইজিচেয়ারে বসে রইলেন। মধ্যে একবার সরযূপ্রসাদ এসে দাঁড়াল। সত্যব্রতবাবুকে জানিয়ে গেল ট্রেন আসতে খুব দেরি হবে। খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?

সত্যব্রতবাবু মানিব্যাগ খুলে টাকা বের করে সরযূপ্রসাদকে দিলেন। বলে দিলেন, নিজের খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিতে।

একটু পরেই প্রিয়ব্রত এসে ঢুকল। হাতে কতগুলি সাময়িক পত্রিকা।

সময় কাটাবার রসদ নিয়ে এলাম। নিন পড়বেন নাকি?

সত্যব্রতবাবু হাত বাড়িয়ে প্রিয়ব্রতর এগিয়ে-দেওয়া পত্রিকাটা নিলেন, কিন্তু পড়ার চেষ্টাও করলেন না। প্রিয়ব্রতর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলে তুমি খুব খুশি হও প্রিয়, তাই না?

একটা পত্রিকা খুলে প্রিয়ব্রত ছবি দেখছিল, সত্যব্রতবাবুর কথায় পত্রিকাটা মুড়ে বলল, বাবার সঙ্গে দেখা হবার উপায় তো নেই।

কেন?

তিনি আর নেই।

নেই, কে বলল? সত্যব্রতবাবুর কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতন শোনাল।

মা। মা বলেছে। আমরা যখন বম্বেতে, তখনই মা বুঝি কোথা থেকে খবর পেয়েছে।

অনেকক্ষণ সত্যব্রতবাবু কোন কথা বলতে পারলেন না। একেবারে মুছে ফেলেছে সুমিতা। কোথাও ছিটে-ফোঁটা অবশিষ্টও রাখে নি। পাছে, স্মৃতিচিহ্ন ধরে ধরে কোন দিন কেউ মানুষটার সন্ধানের চেষ্টা করে, তাই তাকে অবলুপ্ত করে দিয়েছে। একেবারে বিগত-পরমায়ু।

তার মানে, নিজের দেহ থেকেও সুমিতা সধবার সব চিহ্ন মুছে ফেলেছে, সত্যব্রতবাবু বেঁচে থাকা সত্ত্বেও লঘুপাপে এতটা গুরুদণ্ডের কি প্রয়োজন ছিল!

যাক, বোধ হয় এতদিনে সুখী হয়েছে সুমিতা, শান্তি পেয়েছে। জীবন থেকে এক মদ্যপের করালছায়া অপসারিত করে কলঙ্কমুক্ত হয়েছে।

তুমি বম্বেতে মানুষ বুঝি?

বুকের মাঝখানে যন্ত্রণাটা সত্যব্রতবাবু আবার অল্প অল্প টের পাচ্ছেন। অন্য প্রসঙ্গ আনার চেষ্টায় নতুন প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, সেখানেই আমি মানুষ। মা'র এক নিঃসন্তান মেসোমশাইয়ের কাছে। লেখাপড়া তিনিই শিখিয়েছেন। এ চাকরিও তাঁরই কল্যাণে।

কথাটা ঠোঁটের ডগায় এলেও সাহস করে সত্যব্রতবাবু আর জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। লজ্জা আর জড়তা এসে বাধা দিল। সুমিতা পিছনের সবকিছু মুছে ফেলে কি আবার নতুন জীবন আরম্ভ করেছে, নতুন মানুষকে অবলম্বন করে।

কথাটা সত্যব্রতবাবু অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

তোমার মা'র শরীর কেমন?

খুব ভাল আর কোথায়। হার্টের অসুখ আছে। দিনরাত ঠাকুরঘরেই থাকে।

হঠাৎ কি ভেবে প্রিয়ব্রত বলল, আপনি আসুন না একদিন আমাদের বাড়ি। পুরোনো মানুষ দেখলে মা খুব খুশি হবে।

পুরোনো মানুষ দেখলে খুব খুশি হবে সুমিতা? পুরোনো মানুষ যদি ঘরের মানুষ হয়, তাহ'লেও?

ছন্নছাড়া, জরাজীর্ণ জীবনে এমন একটা আমন্ত্রণের প্রলোভন বড় কম নয়। এরই আশায় বহুদিন আর রাত্রি সত্যব্রতবাবু কাটিয়েছেন। কিন্তু নিজের সংসারে অতিথির ছদ্মবেশ ধরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিজের পরিচয় দিলেই সেখানে অনর্থ ঘটবে।

তব ইচ্ছা হয়, এতদিন পরে লাঠি সম্বল করে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহটা টেনে টেনে সুমিতার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। তাকে বলতে, বিশ্বাস কর, আর আমার কোন নেশা নেই, তোমার সংসারে, তোমাদের সংসারে ফিরে আসার নেশা ছাড়া।

তুমি বিয়ে করেছ প্রিয়?

আচমকা প্রশ্নে প্রিয়ব্রত আরক্ত হ'ল। মাথা নীচু করে বলল, না, এখনও বিয়ে করি নি। তবে এক জায়গায় কথা একরকম ঠিক।

প্রিয়ব্রতর এই আরক্তিম সঙ্কুচিত মূর্তি সত্যব্রতবাবুর খুব ভাল লাগল। আর যাই হোক, আধুনিক ছেলেদের মতন এ বিষয়ে নির্লজ্জ হয়ে ওঠে নি।

একটু পরে প্রিয়ব্রত বলল, জানেন, আমি বয়কে বলে এসেছি এখানেই লাঞ্চটা দিয়ে যেতে। অবশ্য ওদের নিয়ম নেই, কিন্তু নিয়ম ভাঙবার ওষুধ আমার জানা আছে।

সত্যব্রতবাবু অভিভূত হয়ে পড়লেন। সেই সেদিনের ছোট্ট খোকন, যার পোশাকি নাম প্রিয়ব্রত, টলতে টলতে এসে বাপের হাঁটু ধরে দাঁড়াত। নিজের ভাষায় অর্থহীন কাকলি তুলত। তারপর একটু একটু করে আরও বড় হল। নিজের পড়ার জগতে ফিরে গেল। মনে আছে সত্যব্রতবাবুর নিজের কোলের ওপর ছেলেকে বসিয়ে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি বড় হ'লে কি হবে খোকন। আজকের মতন অমনি সলজ্জকণ্ঠে প্রিয় বলেছিল, তোমার মতন হব। কলকব্জা তৈরি করব।

সেই খোকন আজ তাই হয়েছে। পৃথিবীতে নিজের স্থান খুঁজে নিয়েছে। হয়তো আরও বড় হবে, আরও প্রতিপত্তিশালী। কেবল তার পিছনে সত্যব্রতবাবুর কোন যোগসূত্র থাকবে না। পরিচয় দেবার ক্ষীণ আশাটুকুও সুমিতা নিভিয়ে দিয়েছে। সত্যব্রত মৈত্রকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলে।

আপনি একেবারে একলা, না? আচমকা প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল। সত্যব্রত ভ্রূ কোঁচকালেন। প্রিয়র দিকে ফিরলেন কি উত্তর দেবেন, বোধ হয় ভাবলেন মনে মনে, তারপর বললেন, হুঁ আমার সব ছিল প্রিয়, আজ আর কিছুই নেই।

কিছুই নেই?

না, সব হারিয়ে গেছে। কুয়াশার ওপারে যেমন পিছনের দৃশ্য মিলিয়ে যায়, ঠিক তেমনি।

শেষ দিকে সত্যব্রতবাবুর গলা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। লাঠির ওপর থুতনিটা রেখে চুপচাপ বসে রইলেন।

প্রিয়ব্রত উঠে গেল। বোধ হয় ট্রেনের খোঁজ আনতে। কিংবা সত্যব্রতবাবুকে কিছুক্ষণ একলা থাকবার অবকাশ দিল।

সরযূপ্রসাদ প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তাকে। আরো দু' একজন লোক জটলা করছে। হয়তো রেলেরই লোক, হয়তো যাত্রী।

সত্যব্রতবাবু চুপচাপ সেই দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রিয়ব্রত ঘরে ঢুকল। পিছনে বেয়ারার হাতে ট্রে। টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট সাজানো হল। প্রিয়ব্রতই দু'টো চেয়ার টেনে দু'পাশে রাখল তারপর সত্যব্রতবাবুর দিকে চেয়ে বলল, আসুন, খেয়ে নিয়ে বসে গল্প করা যাবে।

খাওয়ার ব্যাপারে সত্যব্রতবাবুর কিছু বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে, এই আন্তরিকতা, এই আপ্যায়নের সময় ডাক্তারের তুচ্ছ নিয়মগুলোর কথা বলতে সত্যব্রতবাবুর ভাল লাগল না। বুভুক্ষু পিতৃহৃদয় এমনই একটা স্পর্শের অপেক্ষাতেই বুঝি উন্মুখ হয়েছিল।

চেয়ার টেনে সত্যব্রতবাবু বসলেন। প্রিয়ব্রতর মুখোমুখি। প্রিয়ব্রত উঠে গিয়ে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিয়ে এল তারপর নীচু হয়ে নিজের ব্যাগ থেকে চ্যাপ্টা বোতল একটা বের করল। ছোট গ্লাস।

সত্যব্রতবাবুর দিকে চেয়ে বলল, আপনার বোধ হয় এ সব চলে না?

সত্যব্রতবাবু একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, প্রিয়ব্রতর কণ্ঠে চমকে চোখ ফিরিয়েই আর চোখ সরাতে পারলেন না। টেবিলের ওপর উদ্যত এক কালনাগ দেখলেও বোধ হয় এতটা বিস্মিত হতেন না।

তুমি—তুমি। সত্যব্রতবাবু আর কিছু বলতে পারলেন না।

খুব অল্প। এই স্বাস্থ্য রাখার জন্য। বিলেতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, ছাড়তে পারি নি। ছাড়ার চেষ্টাও করি নি অবশ্য।

সুমিতার সংসারে, তার মুখোমুখি দাঁড়াবার অদম্য একটা প্রলোভন সত্যব্রতবাবুকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করল। যে অপরাধের জন্য স্বামীর আশ্রয়, স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে সুমিতা নিজেকে, নিজের আত্মজকে বাঁচাবার জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, সে অপরাধ, সে অন্যায় তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে কুক্ষিগত করেছে। ফেনিল সুরার স্রোত ছোট এক ফাটল দিয়ে তার সংসারে প্রবেশ করেছে। তার শুচিতা, তার সম্ভ্রম সব কলুষিত।

গোপন একটা জয়ের আনন্দে সত্যব্রতবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। পরাজিত ম্লান সুমিতার মুখটা মানসপটে ভেসে উঠল।

প্রিয়ব্রতর দিকে চোখ পড়তেই সত্যব্রতবাবু শিউরে উঠলেন।

রক্তাভ পানীয় টলমল করছে গ্লাসে। প্রিয়ব্রত গ্লাসটা মুখের কাছে তুলছে।

না। সত্যব্রতবাবু চীৎকার করে উঠলেন। একটা হাতে শক্ত করে প্রিয়ব্রতর কব্জিটা আঁকড়ে ধরলেন, না, ও তুমি খেয়ো না প্রিয়। ও বিষ তুমি খেয়ো না।

প্রিয়ব্রত গ্লাসটা সাবধানে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। বলল, কি হল কি আপনার?

তোমার মা যা পছন্দ করেন না, তা তোমার করা উচিত নয়।

প্রিয়ব্রত হাসল, ও, আপনি পুরোনো কথা ভাবছেন? মা বাবার মদ খাওয়া পছন্দ করে নি। এ যুগ অনেক বদলেছে। ইরা, মানে আমার ভাবী স্ত্রী, সবই জানে। তার কোন আপত্তি নেই।

তোমার বাবা এখানে থাকলে তোমায় এ সব খেতে দিত না প্রিয়।

সত্যব্রতবাবুর কণ্ঠে অসহায় আকূতি।

প্রিয়ব্রত সশব্দে হেসে উঠল। হাসি আর যেন থামতে চায় না। অনেক কষ্টে হাসির আবেগ সংযত করে বলল, আপনি আমার বাবাকে তা হলে চেনেন না। মার কাছে বাবার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে তিনি খুবই খুশি হতেন। রক্তের ধারা বজায় রাখার জন্য।

বিবর্ণ পাংশুমুখে সত্যব্রতবাবু সঙ্কুচিত হয়ে বসলেন। চোখের সামনে নিজের প্রতিবিম্বই বুঝি দেখলেন। যৌবনের প্রতিচ্ছবি। নিজের দেওয়া অস্ত্রেই কে বুঝি তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করছে।

সুমিতার হয়তো পরাজয়, কিন্তু সত্যব্রতবাবুই কি জয়ী হয়েছেন? যন্ত্রণাক্লিষ্ট, বেদনাজর্জর সত্যব্রতবাবর মুখ দেখে তা মনে হল না।



শব্দ ও অতিশব্দ

শ্রীবাসুদেব সিংহ

প্রকৃতির যে মুখ আমরা দেখতে পাই তার বৈচিত্র্য যেমন অনন্ত—প্রকৃতির যে সুর আমরা শুনতে পাই তা কম মনোহারিণী নয়। মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি, সমুদ্রের গর্জন, ঝরনা ধারার কলতান, কোকিলের কুহুতান, ভ্রমরের গুঞ্জন, অরণ্য ও প্রান্তরের বিচিত্র ধ্বনি সুষমা, নিশীথ রাতের শব্দহীন শব্দ—আরও যেসব ধ্বনি আমাদের কানের পর্দায় ভেসে আসে, সে সবই আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকৃতি দেবী শব্দ ও সুরের যে অন্তহীন নাটকের অবতারণা করেছেন তার অঙ্গ।

তোমরা জান, শব্দ একটা শক্তি—আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, চুম্বক এ সবের সমগোত্রীয়। যে বাহিক কারণে আমাদের কানে শ্রবণ-অনুভূতি জাগ্রত হয় তাকেই বলে শব্দ। শব্দবিদ্যার সঙ্গে মানুষ বহুদিন থেকে পরিচিত। ভারতের প্রাচীন পুঁথিতে আছে—যাতে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণ আছে তার নাম ভূত। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্। ক্ষিতির লক্ষণ (গুণ)—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। অপ,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস—এই চারগুণযুক্ত। তেজ,—শব্দ, স্পর্শ, রস—এই তিনগুণযুক্ত। মরুৎ—শব্দ, স্পর্শ—এই দুইগুণযুক্ত। আর ব্যোম্—শব্দগুণযুক্তমাত্র-স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নেই। পঞ্চভূতে একটি সাধারণ লক্ষণ বা গুণ বর্তমান সেটা হচ্ছে শব্দ। আমাদের ধর্মগ্রন্থ গীতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগে শ্রীভগবান বলেছেন—

'রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি সূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥

অর্থাৎ—হে কৌন্তেয়! আমি জলে রসরূপে (রসতন্মাত্ররূপে), চন্দ্র-সূর্যে প্রভারূপে, সর্ববেদ প্রণব (ওঁকাররূপে) আকাশে শব্দ অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্ররূপে এবং মনুষ্যে পৌরুষরূপে অবস্থিত আছি।

ধ্বনি ও বর্ণের মূল এই আকাশ বায়ুতে আহত হয়ে হয় সুরাদির উদ্ভব। গান শব্দ-ব্রহ্মের অন্তর্গত, তাই তার ক্ষমতা অদ্ভুত। একটা ফুলের কুঁড়ি ফুটে ওঠে আলাপে।

এই আলোচনা থেকে একটা জিনিস তোমাদের কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার মনে হবে—যা কবিগুরু লিখে গেছেন তাঁর ছন্দোময় ভাষায়—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্য কাহিনী।

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ধারায় শব্দবিদ্যার চর্চা বেশিদিন আরম্ভ হয় নি। কিন্তু নব্য-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা লক্ষ্য করলে তোমাদের মনে হবে শব্দবিদ্যাচর্চা আজ অতি উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছে। শব্দবিদ্যার নব নব আবিষ্কারের মূলে বহু বিজ্ঞানীর সাধনা মিলিত হয়েছে। এই সাধনার ক্ষেত্রে পিথাগোরাস (জন্ম খৃঃ পূঃ ৫৮২) পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তারপর নিউটন লেপলাস, হেলমহোজ, সাবেফ, কুণ্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই শব্দ নিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করে গেছেন। পিথাগোরাস প্রথম বলেন, শব্দ এক ধরণের স্পন্দন—স্প্রীংয়ের দোলার মত তা জল-বাতাস বা যে-কোন বস্তুকে আশ্রয় করে আলোড়িত হয়। এর নাম শব্দতরঙ্গ। শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার জন্যে যে-কোন বস্তু মাধ্যম প্রয়োজন। পদার্থহীন শূন্য মাধ্যমের ভেতর দিয়ে শব্দ আলোর মত সঞ্চালিত হতে পারে না। আলোক-তরঙ্গের তুলনায় শব্দতরঙ্গের বেগ অতি নগণ্য। শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট পথ যায়—এখানে শব্দতরঙ্গের মাধ্যম শুষ্ক বায়ু আর তার উষ্ণতা ০° সেন্টিগ্রেড। আর সে জায়গায় আলোকতরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল পথ যায়। এখানে মাধ্যম শূন্য স্থান বা বায়ু যে-কোন একটা হতে পারে। গতির এই বিরাট তারতম্যের জন্যে আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিকের বেশ পরে তোমরা মেঘের ডাক শুনতে পাও। বায়ুতে জলকণা থাকলে শব্দতরঙ্গের বেগ বেড়ে যাবে। আবার তরল পদার্থের মধ্যে শব্দ আরও দ্রুতপদে ধাবিত হয়। আর কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে শব্দের গতিবেগ আরও বেড়ে যায়। একটা কথা মনে রেখ, শব্দ-সঞ্চালনের জন্যে কেবল পদার্থ-মাধ্যম থাকলেই চলবে না, এই মাধ্যম নিরবচ্ছিন্ন আর স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। স্থিতিস্থাপকহীন পদার্থ হল কাঠের গুঁড়, তুল, ফেল্ট। এদের মধ্যে দিয়ে শব্দের দ্রুত শক্তি হ্রাস ঘটে আর শব্দ বেশিদূর এগোতে পারে না। আকাশবাণীর স্টুডিও-ঘরের দেওয়াল এই জাতীয় মন্দ-পরিবাহক দিয়ে মোড়া থাকে—যাতে শব্দের প্রতিফলনে প্রতিধ্বনি হয় না।

তোমরা জান সূর্যের আলোয় আছে রামধনুর সাত রঙ। এই সাত রঙের ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য সাত রকমের। লাল রঙের আলোর ঢেউ সব থেকে বড় আর বেগুনি রঙের আলোর ঢেউ সব থেকে ছোট। তেমনি সাধারণ শব্দের ভেতরও

ছোট-বড় নানা ধরণের ঢেউ রয়েছে। ঢেউয়ের কম্পনাংক যত বেশি হবে, তার দৈর্ঘ্য তত ছোট হবে। শব্দের কম্পনাংক যত বাড়ে, স্বরগ্রাম তত উঁচুতে ওঠে। আবার তোমরা জান সূর্যের আলোর বর্ণালীতে সাতটি দৃশ্য রঙ আছে। এই সাতটি রশ্মি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। কিন্তু এ ছাড়া আছে অদৃশ্য আলোকতরঙ্গ—অতিবেগুনী, এক্সরে, গামা রে, অবলোহিত প্রভৃতি বিচিত্র রশ্মি। এদের কোনটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের থেকে বেশি কিম্বা বেগুনী রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থেকে কম। তেমনি শব্দের বেলায় শব্দের পরিধি আমাদের শ্রুতিশক্তিকে অতিক্রম করে দু'দিকে ছড়িয়ে আছে। যেখানে কোনও শব্দ নেই, সেই শব্দহীন স্থানেও অতি শব্দ বা আল্ট্রাসাউণ্ড রয়েছে। অতিশব্দ আমাদের কানে সাড়া জাগায় না। কিন্তু আনন্দের বিজ্ঞান এই শব্দহীন অতিশব্দকেও মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এনেছে। এই অতিশব্দের ঢেউয়ের কম্পনাংক সাধারণ শব্দের কম্পনাংকের থেকে বেশি বা কম। আমাদের শ্রুতিযন্ত্র সেকেণ্ডে ৩০ থেকে ৩০,০০০ কম্পনাঙ্কের শব্দের অনুভূতি পায়। এ ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের কতশত শব্দ আমাদের শ্রুতির অগোচরে থেকে যাচ্ছে, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। এই শব্দহীন অতিশব্দের ঢেউ-এর কম্পনাঙ্ক সেকেণ্ডে ৩০,০০০-এর বেশি। শ্রুতিগোচর শব্দের ঢেউগুলি আকারে বড় হয়, এর জন্যে প্রতিফলক পৃষ্ঠের আকারও বড় হওয়া চাই—আর ঢেউগুলির প্রতিফলনের পর তার জোর যায় কমে। কিন্তু অতিশব্দের ঢেউগুলির বেলায় তা হবার জো নেই। তাই প্রতিফলন প্রক্রিয়ার সাহায্যে যেসব কাজ করা সম্ভব, তাতে অতিশব্দ-তরঙ্গ বিশ্বাসী ভৃত্যের মত মানবসেবায় লেগে গেছে। প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কারের জন্ম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কতশত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছিল, তার মধ্যে র‍্যাড়ার আর অতিশব্দ অন্যতম। শত্রুপক্ষের বিমানের অবস্থান নির্ণয়ের কাজে লেগেছিল প্রথমটি আর শত্রুপক্ষের ডুবো-জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ের কাজে অতিশব্দ-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। তারপর বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ে মানব-কল্যাণের কাজেও একে লাগান হল। সমুদ্রের গভীরতা মাপার কাজে ল্যাঙ্গেভিন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রটির কার্যনীতি হল অতিশব্দ-তরঙ্গ প্রেরণ করা আর তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসলে ঐ ঢেউ আবার ধরা। অথৈ সমুদ্রে মাছ ধরার কাজেও অতিশব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করা হচ্ছে। এই শব্দহীন শব্দ আরও কত কি কাজে লেগে গেছে! খাবার জল, দুধ, অন্যান্য পানীয় জীবাণুমুক্ত করার কাজে একে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভূমিতে। শুধু তাই নয়, জামা-কাপড়ের ধুলো-ময়লা ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিতে পারে এই শব্দহীন শব্দ। শব্দের কি অসীম ক্ষমতা, তা বোধ হয় এবার কিছুটা বুঝতে পারছ। সাধে কি মুনিগণ বলেছেন—শব্দ-ব্রহ্ম।

খুশির মালা

কার্তিক ঘোষ

নীল আর নীল। যেদিকে তাকাও সেদিকেই নীল। চৌদিকে নীলের সমারোহ। গাছের পাতা নীল, গাছের ফুল নীল। ফুর-ফুর করে উড়ে-আসা প্রজাপতির পাখা নীল। ঝুর-ঝুর করে পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমে-আসা ঝরনার জল নীল। মাটিতে বিছানো ঘাসের গালচেখানা নীল—ওপরে মেঘ তাড়ানো আকাশের রং নীল। এইসব দেখতে দেখতে খুশিতে নীলপরী এসে পড়ে নীল ফুলের বনে। নাচতে নাচতে সুরে সুরে ছড়া কাটে—

নীল, নীল, নীল, নীল—
হাসি খুশির মিল
ঝুর ঝুর ঝরনা ঝরে
রোদ ঝিল্‌মিল্‌-মিল্‌···

নীলপরীর ছড়া শেষ হ'তে না-হ'তেই নাচতে নাচতে এসে হাজির হয় হলুদপরী। হাততালি দিয়ে দিয়ে গান গাইতে থাকে—

তাথৈ তাথৈ থৈ রে—
দ্যাখনা চেয়ে সই রে···
চৌদিকে আজ উড়ছে শুধু
মিষ্টি হাসির খৈ রে॥

আবার নীলপরী গায় নাচতে নাচতে—

নীলচে রঙিন দেশটা
মিষ্টি খুশির রেস্‌টা—
কোথায় যেন হারিয়ে দিল
মন মাতিয়ে শেষটা॥

অধীর আনন্দে হলুদপরী এগিয়ে এসে নীলপরীর হাত দু'টি ধরে একসংগে দু'জনে নাচতে নাচতে সুরে সুরে বুনতে লাগলো ছড়ার ফুলকি—

ফুলখুকিরা শোন্ না—
আমরা পরীর কন্যা,
ইচ্ছে মতন আনতে পারি
মিষ্টি মধুর বন্যা॥

সুরে সুরে ভরে উঠেছে চারদিক। নীলপরী আর হলুদপরী প্রাণখুলে গান গাইছে। এমন সময় নূপুর পায়ে ঝুমুর ঝুমুর ক'রে ছুটে এলো সবুজপরী। একা একা নাচতে লাগলো নীলপরী আর হলুদপরীর পাশে পাশে। আর তিনজনেই এখন হাততালি দেয় আর গান গায়—

কি খুশি ভাই আজ না—
নাচ না সবাই নাচ না
আজকে বাজাক পায়ের নূপুর
ঝামুর ঝুমুর বাজনা ॥

হঠাৎ হৈ-হৈ-রৈ-রৈ পড়ে গেলো চারদিকে। দূর থেকে বাঘের গর্জন শোনা গেলো। হালুম-হালুম-হুম্ !! নাচ-গান থেমে গেল পরীদের! একদল পরীর ছেলে ছুটে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে সোনালীপরীর রূপালী ছেলেটা বললে—

বাঘ-বাঘ-বাঘ—
আসছে তেড়ে এদিক পানে
ভাগ রে সবাই ভাগ !!

পরীরা ভয়ে চমকে উঠলো। নীলপরী বললে—

পরীর দেশে বাঘ এসেছে
সত্যি নাকি ভাই রে—
এখন তবে পালাই কোথায়
বল না কোথায় যাই রে !!

হলুদপরী বললে নীলপরীর কথা শুনে—

কোথায় যাবো বল্ না···
তার চেয়ে ভাই বাড়ির পথে
ছুট দিই জোর চল না !···

রূপালীপরীর সোনালী ছেলেটা বললে—

তোমরা পালাও বাড়ি—
আমরা থেকে দেখছি, যদি
বাঘ তাড়াতে পারি।

তিন পরী ভয়ে ছুট দিল বাড়ির পথে। ছেলেরা সবাই মিলে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। সোনালী ছেলেটাই আগে বললে—

করবো না ভয় শত্রুকে কেউ
সাহস রয়েছে বুকে—
দেশকে বাঁচাতে বাঘের সামনে
আমরা দাঁড়াবো রুখে ॥

সোনালী পরীর রূপালী ছেলেটা বললে—

যায় যদি ভাই বুকের রক্ত
যায় যদি যাক প্রাণ—
তবুও আমরা বাঁচাবো মোদের
স্বাধীনতা সম্মান!

এমন সময় ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো একটা থুত্থুরে বুড়ি। হাতে লাঠি। কাঁধে ঝোলা। ফোকলা বুড়ি খোকাদের মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলো ফিক্-ফিক্ করে। তাই দেখে একটি ছেলে বললো—

থুত্থুরে বুড়ি তুমি
হেসো নাকো ছাই,
কোন্ দেশে থাকো বলো—
আগে শুনি তাই!

শীতবুড়ি হাসলো। বললে—আমার নাম শীতবুড়ি। শীতের দেশে আমার বাড়ি। তোমাদের বিপদ শুনে ছুটে এলুম শীতের ঝোলা নিয়ে।···

শীতবুড়ির কথা শুনে কেউ কেউ তো হো: হো: করে হেসে উঠলো। সোনালী ছেলেটি বললো—

আমরা যদি সবাই মিলে
যুদ্ধটা না জুড়ি—
শীত ছাড়িয়ে বাঘ তাড়াবে
এই ভেবেছো বুড়ি ?

শীতবুড়ির হাসি পেলো। বললে, তোমরা জানো না খোকারা—শীতকে বাঘেরা কি ভীষণ ভয় করে। তাই এখন তোমাদের যুদ্ধ করবার প্রয়োজন কি? আমি যখন এসে পড়েছি আমাকে তখন একটু মজা করতে দাও।···বলতে বলতে শীতের ঝোলাটা খুলে দিল শীতবুড়ি। হু-হু ক'রে শীত ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। বরফের মতো সাদা-সাদা ধুঁয়া-ধুঁয়া মনে হলো সবকিছু। তারপরে আর কিছুই দেখা গেলো না। কে কোথায় গেল। দূর থেকে শুধু ভেসে এলো বাঘের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর। হালুম—হুম-হুম-হালুম···।

তিনদিন পর। শীতের ভয়ে পরীর দেশ ছেড়ে বাঘ পালিয়েছে। শীতবুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে গেছে কন্‌কনে শীত। আবার বসন্তের হাওয়ায় ফুল ফুটেছে বনে বনে। মশ্‌গুল হ'য়ে উঠেছে চৌদিক।···

পরীর মেয়েরা গান গাইতে গাইতে ফুলের বনে ফুল তুলতে বেরিয়েছে—

কি মজা! কি মজা রে ভাই
শীতের ভয়ে বাঘ পালায়—
খুশির মালা গাঁথবো তো তাই
ফুল ভরে নে আজ ডালায়।
বিপদ বাধা মাড়িয়ে দিয়ে
আলোর মাঝে হারিয়ে গিয়ে
স্নেহ-প্রীতির মিষ্টি মধু মাখিয়ে দেবো ফুলমালায় ॥

সোনালী আর রূপালী ছেলেরাও ছুটে এলো হাসতে হাসতে। সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে গান গাইতে লাগলো আবার গোড়ার থেকে। আর এদিকে আস্তে আস্তে মঞ্চের পর্দা নেমে এলো।···

পূর্ব ও পশ্চিম

(একাঙ্কিকা)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক অমূল্য সেন

স্টার্ডি। ফাদার, আপনার Sermon শেষ হয়েছে? দুঃখের বিষয়, এ Sermon একেবারেই মাঠে মারা গেল। তার ওপর আপনি নিজেই নিজেকে প্রতিবাদ করেছেন। আচ্ছা, ভারতবর্ষ তো আমাদের পদানত। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় যত বিশাল হোক না কেন, আমরা পেরেছি ভারতকে পশ্চাৎপদ, দরিদ্র ও দুর্বল করে রাখতে। তবু ওদেশের একজন মাত্র অধিবাসীকে কেন এত ভয়! বিশেষত সেই একজন যখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আপনার আশঙ্কা, বিবেকানন্দ ইংরেজ জাতির অস্তিত্বমূলে আঘাত হেনে খৃস্টান সভ্যতায় Crisis সৃষ্টি করতে এসেছেন। তবে স্বীকার করুন, একটা প্রচণ্ড ফাঁকি রয়েছে আমাদের এই জাগতিক সমৃদ্ধির অভ্যন্তরে। স্বীকার করুন, আমাদের বিশ্ববিজয়ী শক্তির গৌরব একটা শূন্যগর্ভ আস্ফালন মাত্র এবং তা এই হিন্দু সন্ন্যাসী ধরে ফেলেছেন। কোন সে অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে এসেছেন এই অভিনব বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যে আপনার মত একজন ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী আজ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। খৃস্টান সভ্যতা কি দেউলে হয়ে গেল!

ম্যাক্স। ঠিক বলেছো স্টার্ডি, অতি খাঁটি কথা বলেছো। অমিততেজাঃ মহাবিপ্লবী বিবেকানন্দ আজ খৃস্টান সভ্যতার মূল ধরে টান দিয়েছেন। স্মরণ করো শিকাগো আর ডেট্রয়েটের ঘটনাবলী। সমগ্র পৃথিবী যার অপরাজেয় শৌর্যের এবং অসামান্য কূটকৌশলের প্রচণ্ড বিভীষিকায় থর্ থর্ করে কাঁপছে, সেই খৃস্টানশক্তির অন্যতম পীঠস্থান আমেরিকার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এতবড় Challenge দেবার স্পর্ধা কোথায় পেলেন বিবেকানন্দ! পত্রিকায় পড়েছো তাঁর সদম্ভ ঘোষণা—খৃস্টান, তুমি এত বড় ধর্মের দেশের, এত মহান অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিকাশভূমির সন্তানদের সরল বিশ্বাস আর জাগতিক ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে তাদের কাছ থেকে একে একে মানুষের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছো। এর প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে। ফিরিয়ে দিতে হবে একে একে সব অধিকার। নয় তো মরবে। তোমার এই নয়নাভিরাম সভ্যতার গগনস্পর্শী সৌধ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ভেঙ্গে পড়বে। সমগ্র পৃথিবী ধূ-ধূ করবে মহাশ্মশানের রিক্ততায়। ফাদার, আমি খৃস্টান, আমি গর্বিত জার্মান। এ আমার গর্ব যে পশ্চিমের বিপুল বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের আমি প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী; এ আমার গৌরব যে জড়-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি জার্মানী আমার পিতৃভূমি। তবু, তবু—আমার চিত্ত শঙ্কাকুল, আমি শিউরে উঠি মানবজাতির ভবিষ্যৎ ভেবে।

পাদরি। আপনার আবার কিসের শঙ্কা মিঃ ম্যাক্সমুলার! আপনার নবজাগ্রত দৃঢ়বদ্ধ পিতৃভূমি আজ অসীম আত্মবিশ্বাসে আর সব ইউরোপীয় দেশকে প্রতিযোগিতায় হঠিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ইলংণ্ড পর্যন্ত সচকিত হয়ে উঠেছে জার্মানীর অভূতপূর্ব প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করে।

ম্যাক্স। রাজনীতি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে ফাদার। ও এক আলাদা জগৎ যেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। আমি শঙ্কাকুল পশ্চিমের খৃস্টান সভ্যতার জন্য, যে আজ জড়-বিজ্ঞানের দৌলতে সমগ্র মানব-সভ্যতার নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। হ্যাঁ, আজ মেধার বলে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃতি তার কোলে সযত্নে লুক্কায়িত অমিতশক্তির উৎসমুখ অবারিত করেছে পশ্চিমের কাছে পরাজয় মেনে। কিন্তু এর শেষ কোথায়! ইউরোপের বিভিন্ন জাতি স্বার্থের দারুণ কোলাহলে, অর্থনীতির নির্মম প্রতিযোগিতায় অগ্নুদ্গারী অস্ত্রের নিষ্ঠুর ঝনঝনানিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পূর্বের অসহায় মানবগোষ্ঠীর ভাগ্য নিয়ে পশ্চিম আজ গেণ্ডুয়া খেলছে। ভয় হয়, শক্তির এই অপব্যবহার দেখে প্রকৃতি একদিন নিদারুণ প্রতিশোধ নেবে। সেদিন মানব-সভ্যতাকে আত্মঘাতী হবার পথ থেকে নিবৃত্ত করবে কে! মুক্তি কোথায়, মুক্তি কোথায়!

(ম্যাক্সমুলার উর্ধ্বে তাকিয়ে রইলেন)

পাদরি। এ প্রশ্নের উত্তর আপনিই দিন না মিঃ ম্যাক্সমুলার। তবে আমি বলবো, এ আপনার অহেতুক কীর্তি। ভারতের ভৌতিক বিদ্যার অত্যধিক অনুশীলনের ফলে আপনার মনে জুজুর ভয় ঢুকেছে। আপনি কায়াহীন ছায়া দেখে চমকে চমকে উঠছেন।

ম্যাক্স। জেগে যে ঘুমায়, তার ঘুম ভাঙ্গাবে কে! তবুও আপনি ঠাট্টার ছলে একটি খাঁটি কথা বলেছেন। হ্যাঁ, ভারতের বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করেই আমার মনে এ প্রশ্ন জেগেছে। ওদেশের উপনিষদে একটি প্রার্থনা আছে—'রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' পশ্চিম বাইরের সবকিছু পেতে গিয়ে হৃদয়কে রেখেছে উপবাসী। রুদ্র জেগেছে প্রচণ্ড সংহার শক্তিতে। সৃষ্টিকে বাঁচাতে হলে যে তাঁর প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে ভরা মুখকে, তাঁর কল্যাণ-শক্তিকে আবাহন করতে হবে। এ আবাহনের মন্ত্র রয়েছে পূর্বদেশের হৃদয়ের মণিকোঠায়, হ্যাঁ ওই ভারতবর্ষের বেদান্তে। আমি জেনেছি, আমি দেখেছি। শাশ্বত মানবকল্যাণের এই মহতী বাণীকে আজ পশ্চিমের দ্বারে বহন করে এনেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। পূর্ব-পশ্চিমের মিলন যজ্ঞ, মানব-

সভ্যতার কল্যাণীশক্তি আজ রূপ ধরে এসেছে তাঁর অভিনব দৌত্যে। ভারতের যুগ-যুগান্তের অক্লান্ত সাধনার ঘনীভূত মূর্তি দক্ষিণেশ্বরের ঋষি রামকৃষ্ণের মানসপুত্র এসেছেন আজ সকলকে অমৃতের অধিকারে নিয়ে যেতে, যেমন একদা এসেছিলেন 'ঈশ্বরের একজাত পুত্র' বিশ্বশান্তির দূত যীশুখৃস্ট। ফাদার, এ মাহেন্দ্রক্ষণটিকে অবহেলা কোরো না। মানবের দুয়ারে ভিখারীর বেশে আবার এসেছেন দেবতা, তাঁকে আর ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিও না।

পাদরি। মিঃ ম্যাক্সমূলার, আপনার মত ভারতদরদী মনীষীরও একটু ভুল হল। এই যদি আপনার বিশ্বাস, মানব-সভ্যতার সঞ্জীবনী মন্ত্র রয়েছে ভারতে—এই যদি আপনার ধারণা, তবে কেন একবারও গেলেন না ভারতে আপনার সর্বতীর্থসার ওই পূর্বদেশে? গেলে নিজের চোখেই দেখতে পেতেন আমার কথা সত্য, না আপনার স্বপ্ন সত্য।

ম্যাক্স। ভারতবর্ষে গেলে আর যে ফিরতে পারব না ফাদার। ভারতের আকাশ-বাতাস, ভারতের বন-উপবন, ভারতের নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত—এমন কি ভারতের কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা—আমাকে হাতছানি দিয়ে সদাই ডেকে বলছে—ওগো বাছা, ঘরে ফিরে এসো, কেন আর পড়ে আছো পরবাসে—আমার জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা রয়েছে ভারতবর্ষ আমার চিত্তলোকে। তাই তো এত উজ্জ্বল, এত প্রাণবন্ত হয়ে শাশ্বত ভারতের ছবি আমার মানসনয়নে ফুটে ওঠে।

পাদরি। ছিঃ ছিঃ মিঃ ম্যাক্সমূলার। আপনি না খৃস্টান, আপনি না জার্মান। আপনি পুনর্জন্ম মানেন! কি ঘৃণার কথা।

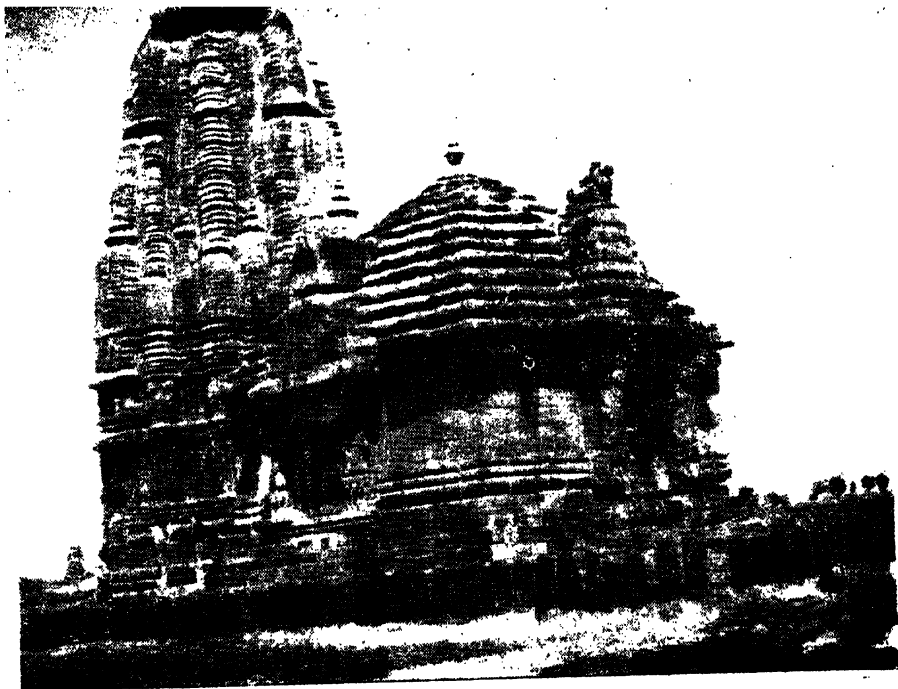
ম্যাক্স। (দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ, আমি খৃস্টান, আমি বৈদান্তিক। পূর্ব আর পশ্চিম দুই-ই আমার স্বদেশ। পশ্চিম আমার গর্ব, পূর্ব আমার অভিমান। বেদ-বেদান্তের জন্মদাত্রী, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিচিত্র ক্রীড়াঙ্গন, ঈশ্বরপ্রাপ্তির যুগ-যুগান্তব্যাপী সাধনায় তীর্থীকৃতা ভারত জননী আজ বিদেশীর শৃঙ্খলে বন্দিনী। এ নিষ্ঠুর বাস্তবকে আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারলে না। মহাবলী অসুর আবার স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছে, সুরগণ সন্ত্রস্ত, পলায়িত। একদিকে আজ কদর্য তামসিকতা আর বিপুল নিঃস্বতা, অন্যদিকে বিচিত্র জাগতিক শক্তি আর সম্পদের চোখ-ঝলসানো আলোর প্রাচুর্য। কতকাল, আর কতকাল চলবে ঈশ্বরের কল্যাণালয় এই পৃথিবীতে মানুষের স্পর্ধায় সৃষ্ট এতবড়ো অনিয়ম। কবে, কেমন করে ঘুচবে ভারতের আত্মবিলুপ্তির অন্ধকার।

কার্ডি। এর উত্তর তো আপনি দিয়েছেন অধ্যাপক। আত্মবিলুপ্তির অন্ধকার ভেদ করে পূর্বগগনে তরুণোদয়ের আভাস তো ফুটে উঠেছে। ওই তো আলোর দিশারি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। মুক্তির মর্মবিদারী প্রশ্নের বলিষ্ঠ সমাধানের সূত্র রামকৃষ্ণ আর তার ভাষ্য স্বয়ং বিবেকানন্দ, যিনি আজ এই মুহূর্তে পশ্চিমের দ্বারে অতিথি।

ম্যাক্স। (উদ্বুদ্ধ হয়ে) সত্য, এই তো একমাত্র সত্য। ধন্যবাদ কার্ডি, এতবড়ো কথাটা আবার আমাকে মনে করিয়ে দিলে। ফাদার, এবার আমি যাচ্ছি ভারততীর্থে। পৌঁছে গেছি ভারতের মহামানবের সাগরকূলে। ওই তো তীর্থঙ্কর বিবেকানন্দ। বার্তা নিয়ে এসেছেন পশ্চিমে, এসেছেন ইংলণ্ডে, এসেছেন আমারই গৃহে। আমি ধন্য, আমি ধন্য। ফাদার, আমাদের ঈশ্বর থাকেন স্বর্গরাজ্যে, করুণা করে একবার মাত্র তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন মানবের মুক্তির জন্য। মুক্তির সে বাণী আধুনিক যুক্তিবাদের মাত্রাধিক্যে আর জড়-বিজ্ঞানের আশ্চর্য চাকচিক্যের মাঝে পশ্চিম আজ হারিয়ে ফেলেছে। ঈশ্বরের পুত্র যীশু আজও ক্রুশবিদ্ধ। জড়বাদের নিষ্পেষণের জালা ওই দেবশিশুর বুকে বড়ো তীব্র হয়ে বাজে, অতীতে পনটিয়াস পাইলেটের দেয়া ক্রুশটি তুলনায় ছিল কুসুমের মালার মত কোমল।

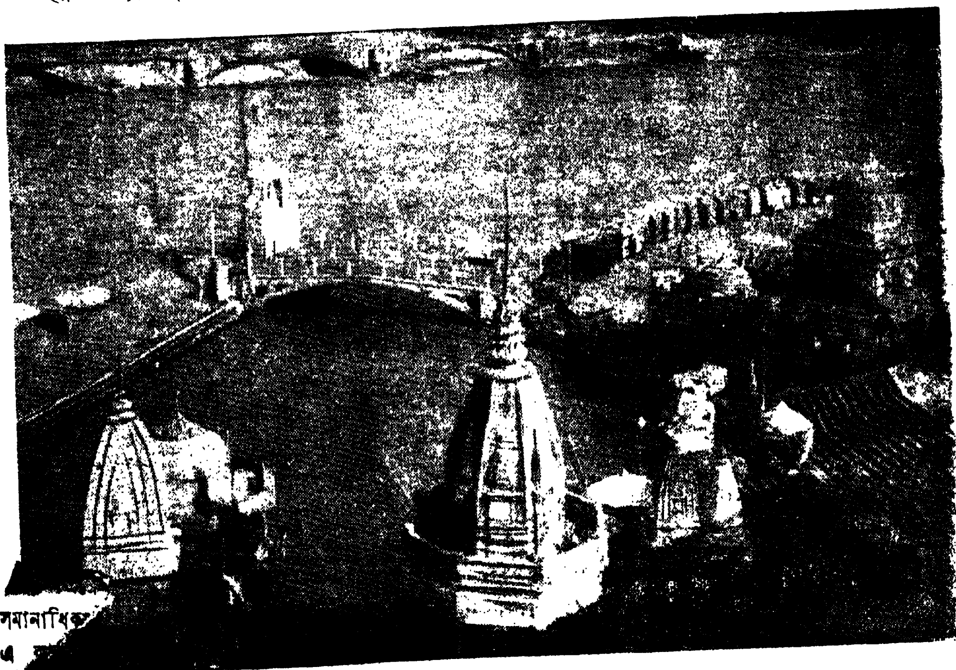
পাদরি। বারবার এ কি অ-খৃস্টান অনোচিত কথাবার্তা! মিঃ ম্যাক্সমূলার, এ কথা কি আপনার মুখে সাজে। অশোভা আপনার এ ধরণের কথাবার্তা। স্বীকার করি, ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্মভূমি আমাদের এই ইংলণ্ডে আপনার চিন্তার ও কথার স্বাধীনতা আছে। তবুও একটা সীমা থাকা উচিত। মাত্রাজ্ঞান হারাবেন না অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার।

ম্যাক্স। মাত্রাজ্ঞান আমি হারাই নি পাদরি সাহেব। আমার কর্মভূমি ইংলণ্ডের ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না। কিন্তু তা বলে আমি বেইমান নই, আমি খৃস্টান। যদিও আপনার সংজ্ঞানুসারে আমি কোনদিন খৃস্টান হতে পারবো না। ফাদার, হিন্দুরও দেবতা থাকেন ওই স্বর্গে, কিন্তু তিনি আসেন যুগে-যুগে মানুষের বেশে অবতার হয়ে। এযুগে এসেছেন রামকৃষ্ণ। আমি জানি, তাই আমি মানি। হিন্দুর সকল শাস্ত্র আমি যত্ন করে অধ্যয়ন করেছি, অনুধ্যান করেছি। ভারতের ধর্ম কোন অবতার বা মহামানব-প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট ধর্মমত নয়। এ সনাতন মানবধর্ম। এ ধর্মে সাকার পূজার স্থান আছে, একই মহিমায় রয়েছে নিরাকার পূজার স্থান। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, মুসলমান—সবাই এ ধর্মে একাসনে উপবিষ্ট। মানবপ্রেমে এ ধর্ম অসীম শক্তিশালী, বেদান্তসূত্রে এ ধর্ম চিরপ্রগতিশীল—ভারতের যে কদর্য ছবি কিছুক্ষণ আগে আপনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন, আমি স্বীকার করি, তা একেবারে অলীক কিম্বা কাল্পনিক নয়। কিন্তু তা অর্ধসত্য, ধর্মের গ্লানিতে বিকৃতিমাত্র।



রাজারাণী মন্দির (ভুবনেশ্বর)　　—অতুল দে

হর-কী-প্যারী (হরিদ্বার)　　—পি মিত্র



সমানাধিক
এ



—দীপক ঘোষ



কর্মরত

—ভবানীপ্রসাদ রায়

চি

ন্তি

তা

—সন্ধ্যা সেন



শীতার্ত

—প্রভাতকান্তি ঘোষ



ভারতের দুর্গতি এসেছে ধর্মের জন্য নয়, ধর্মকে অস্বীকার করার জন্য। পাদ্রি সাহেব, মিথ্যার চেয়েও বড়ো পাপ অর্ধসত্য। খৃস্টান হয়ে তা প্রচার করা ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

পাদ্রি। (অত্যন্ত ক্ষুব্ধস্বরে) দেখুন ম্যাক্সমুলার সাহেব বারবার একই কথা বলে আপনি আমাকে আঘাত দিচ্ছেন। ঈশ্বর যেন আপনাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ওদেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চাইতেও বেশি জানেন? ওরাই তো বলে যে ওদের পুতুলপুজো সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ওদের ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত। এমনি ওদের অন্ধবিশ্বাস যে ওরা মনে করে, ওদের পাশবিক ধর্মানুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হলে সর্বনাশ হবে।

ম্যাক্স। এও আমি জানি ফাদার। আরও জানি, ওই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা না ব্রাহ্মণ, না পণ্ডিত। ওদের কাছে বেদের বিধান আর পাঁজির বিধান এক ও অভিন্ন। এ কারণেই আধ্যাত্মিক ভূমি থেকে স্খলিত হয়ে লৌকিক ধর্ম পরিণত হয় পৌত্তলিকতায়। ভুলে যায় বেদের মর্মবাণী 'একং সংবিপ্রা বহুধা বদান্তি।' এই আত্মবিলুপ্তি থেকে ভারতকে উদ্ধার করতে, মুক্তি দিতে, স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছেন, 'যত মত তত পথে'র ঋষি রামকৃষ্ণ, যাঁর বাণী বেদান্ত-নির্ঘোষে শোনাচ্ছেন বিবেকানন্দ পশ্চিমের কানে কানে। এ তো শুধু ভারতের মুক্তিসাধনা নয়, যুগন্ধর পুরুষের এ অপূর্ব সাধনা সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকল্পে। আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশে আমাদের মিশনারীরা ধর্মপ্রচার করতে যায় কোন স্পর্ধায়।

(বিবেকানন্দের প্রবেশ)

বিবেকানন্দ। দুর্ভাগ্য ভারতের অধ্যাপকজী, এ স্পর্ধার প্রত্যুত্তর দিতে ভারতের আজ আর কোন শক্তি নেই। একটা তীব্র হীনমন্যতাবোধ ভারতকে গ্রাস করেছে। নিজের শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে ভারত আজ পশ্চিমের দানকে গ্রহণ করতে ভুলে গেছে। আত্মবিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধা নেই, আছে 'পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, আর দাসসুলভ দুর্বলতা। এইমাত্র সম্বলে ভারত উচ্চাধিকার-লাভ করতে চায়।'—পরাধীনতার অভিশাপই এই। এ দুর্বলতার সংবাদ রাখেন পাদ্রি সাহেবরা। শক্তিমান খৃস্টান শাসক-শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় ওঁরা ভারতে যান, ধর্মপ্রচার করেন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে. উচ্চবর্ণের হিন্দুর অবহেলা ও ঘৃণার কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ওঁরা প্রচার করেন, অজস্র নিন্দাবর্ষণ করেন হিন্দু-ধর্মের শিরে বিনা প্রতিবাদে, প্রলুব্ধ করেন রাজার ধর্মে সমানাধিকার ও মর্যাদালাভের মিথ্যা প্রলোভনে। আর এ কাজে ওদের সহায় আমার দেশের তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজ-সংস্কারকগণ, বলদৃপ্ত বৃটিশরাজের কাছে যাঁরা হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন।—কাকে আর দোষ দেবো অধ্যাপকজী, কাকে আর দোষ দেবো।

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। পাদ্রি সাহেব
বিবেকানন্দকে দেখে হকচকিয়ে গেছেন)

পাদ্রি। কি আশ্চর্য! আপনি, আপনি বিবেকানন্দ!

বিবেক। হ্যাঁ, আমিই বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণমন্ত্রে, ভারতমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে আমি ভারতকে রক্ষা করতে, ভারতের ধর্মকে জাগাতে শুধু সমগ্র ভারত নয়, সমগ্র পশ্চিম পরিক্রমা করতে বেরিয়েছি। সুতরাং আমি পাদ্রি সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী। (হেসে ফেললেন) পাদ্রি সাহেব, আমার দেশ দরিদ্র, অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু তবুও ধর্মকে আঁকড়ে আছে। এর তাৎপর্য আপনি জানেন না, জানেন অধ্যাপকজী। আপনারা বলেন পৌত্তলিকতা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে ধর্ম পালন করে যুগে যুগে রামানুজ, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এবং এযুগের রামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন, ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন, তা যদি পৌত্তলিকতা হয় তবে ধর্ম আর কোথায়? 'যদি এমন কোন স্থান থাকে যেখানে মনুষ্যজাতির ভেতর সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতার ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে, তবে সে আমার মাতৃভূমি, আমার পুণ্যভূমি, আমার কর্মভূমি ভারতবর্ষ। সাহেব, আমার দেশ পরাধীনতার অভিশাপে তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়েছে, নিজেকে ভুলেছে। ধর্মের দেশে এসেছে আত্মবিস্মৃতি। কিন্তু এ আর থাকবে না। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' ধর্মের শক্তিতে ভারত আবার জাগবে, অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফুরণে ভারত আবার সমগ্র বিশ্বের ধর্মগুরু হবে, বেদান্তকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে একজন ভারতীয় লাখো লাখো মদমত্ত মাতঙ্গের শক্তি অর্জন করে বিশ্বজয় করবে। এর কাছে এসে পশ্চিমের কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ সব স্তব্ধ হয়ে যাবে। ভারত জানে মানুষ দেহ নয়, সে আত্মা, সে চির-অমর, চিরনির্ভীক। আমার গুরুর আবির্ভাব এখানেই তাৎপর্যময়, আমার বেদান্তপ্রচার আর বিশ্বপরিক্রমা এখানেই অর্থপূর্ণ। অধ্যাপকজীর কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলি,—খৃস্টান মিশনারী, আমার দেশে ধর্মপ্রচার করতে যাচ্ছো কোন স্পর্ধায়।

পাদ্রি। (অভিভূত হয়ে) না না, আমরা ভারতে যাই পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ করতে, দুর্গম পল্লী অঞ্চলে স্কুল, কলেজ আর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে চিরবঞ্চিত মানুষদের কাছে মানবজীবনের আশীর্বাদকে তুলে ধরতে। আর, আর কিছু নয়। [ক্রমশ।

খেলাধুলায়



● দু'শো কেজি ওজনের ভারোত্তোলনে রেকর্ড (প্রায় ছয় মণ)

স্পোর্টসে সোভিয়েতের সাফল্যের কারণ ★ ★

স্পোর্টসের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ানের স্থান আজ বিশ্বের প্রথম সারিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ানের এই বিপুল সাফল্যের পেছনে রয়েছে একটি মাত্র সত্য।—তা হলো স্পোর্টসের ব্যাপক চর্চা।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ানে যে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার ফলেই আজকে শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িত প্রায় দশ কোটির ওপর যুবক যুবতীকে বহু রকমে প্রশিক্ষণ ও ট্রেনারের সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। জারের আমলের রাশিয়ায় স্পোর্টসের এই ব্যাপক চর্চা এবং এতো সুযোগ-সুবিধে কোনটাই ছিল না।

আজকের সোভিয়েত ইউনিয়ানে খেলাধুলোর চর্চা যে কতদূর বেড়েছে তা একটা প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা তুলনা করে দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৯১৩ সালে 'কেভ'-এ রাশিয়ান অলিম্পিয়াতে রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের আটটি শহর থেকে মাত্র ৬০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই তুলনায় ১৯৬৩ সালের 'স্পাটাকাভ' প্রতিযোগিতায় প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।



● পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গকারী সোভিয়েত ক্রীড়াবিদ

মাত্র ১২ বছর আগে ১৯৫২ সালে যখন প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ান অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করলো—তাদের বিপুল সাফল্য দেখে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে শুরু করেছিল—এ কি করে সম্ভব হলো! ঐ অলিম্পিকে তারা ২২টি স্বর্ণ, ৩০টি রৌপ্য ও ১৯টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। তারপর ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে সোভিয়েত ইউনিয়ান পদক ও পয়েণ্ট দু'টিতেই শীর্ষস্থান অধিকার করলো।

সোভিয়েত ইউনিয়ানের স্পোর্টসের ক্ষেত্রে সাফল্যের পেছনে আছে অক্লান্ত অনুশীলন আর বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির চর্চা। শুধু শহরেই নয় গ্রামগুলিতেও খেলাধুলোর চর্চার জন্যে শক্তিশালী সংগঠন সংস্থা সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত। সমস্ত দেশটা ঘিরেই চলেছে এই সংগঠনের কাজ এবং তার ফলেই এত বিপুলসংখ্যক প্রথমশ্রেণীর ক্রীড়ানিপুণ প্রতিযোগীকে অলিম্পিকে পাঠান সম্ভব হচ্ছে। বহু পরিশ্রমের পর খুঁজে বের করা হচ্ছে এক একজন কুশলী ও ক্রীড়ানিপুণ যুবক-যুবতীকে। তারপর বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের গড়ে তোলা হচ্ছে আরো কুশলী আরো ক্রীড়ানিপুণ।

সোভিয়েত ইউনিয়ানে শরীরচর্চা ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি কর্মী বিভিন্ন স্তরে কাজ করেন। সেখানে প্রায় ১৩ লক্ষ, ১৯ হাজার রেফারী ও বিচারক

আছেন। এ ছাড়া আছেন ১৬ লক্ষ ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক। যাঁরা তাঁদের অবসর সময়ে নবীন সহকর্মীদের নিপুণতা বাড়াবার জন্যে শিক্ষা দেন।

এমনি কি বিজ্ঞানকেও খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কাজে লাগান হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে গেলে একজন প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়া-বিশারদের সঙ্গে একজন গবেষকের কোন পার্থক্য নেই।

সোভিয়েত জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে আজকাল তাঁরা অনেকটা অবসর সময় পাচ্ছেন এবং খেলাধুলো বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধে থাকার জন্যেই অত বেশিসংখ্যক লোক খেলাধুলোর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন।

শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর ক্ষেত্রে নানা রকমের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ানে একটি মোটা টাকা ব্যয় করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ৩ কোটি ৮ লক্ষ লোক কোন না কোন রকমের ক্রীড়া অনুশীলন করে থাকেন।

আরো জোর—আরো উঁচু

ক্রীড়ার ক্ষেত্রে সাফল্যের মান যে দ্রুততালে বাড়ছে তাতে করে আজ একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—তা হলো ভবিষ্যতে কি এমন দিন আসবে যখন একটি নির্দিষ্ট রেকর্ড আর কিছুতেই অতিক্রম করা সম্ভব হবে না?

বাস্কেটবল, ভলিবল, ফুটবল, ওয়াটার পোলো, হকি অথবা কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রশ্নটি প্রযোজ্য নয় কারণ এগুলোর জয়-পরাজয় নির্ভর করে গোল অথবা পয়েন্টের উপর।

গতিশীলতা, বিশেষ ধরণের সহিষ্ণুতা এবং পেশীর শক্তির উপর নির্ভর করে যে ক্রীড়াগুলি অর্থাৎ সাঁতার, ভারোত্তোলন, স্কেটিং, সাইকেল রেস ও ফিল্ড ও ট্রাকের প্রতিযোগিতাগুলি সম্পর্কে এই প্রশ্নটি প্রযোজ্য।

গত ৫০-৬০ বছরের যে বিশ্ব রেকর্ডে হিসেব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, সমদূরত্বের দৌড়ের থেকে দূরপাল্লার দৌড়ে উন্নতির পরিমাণ বেশি। তুলনামূলক-ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, ১০০ মিটার দৌড়ে ০·৬ সেঃ ও ১০ হাজার মিটার দৌড়ে ১৬৩·২ সেঃ উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। এই হিসেব থেকে দেখা যায় যে, দূরত্বের পাল্লা বৃদ্ধির সাথে সাথে গতিও বাড়ছে।

কম দূরত্বের দৌড়ে গতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে গেলে নার্ভের মৌলিক কার্যক্ষমতার উপর অনেক বেশি চাপ পড়ে। কিন্তু দূরপাল্লার দৌড়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র ও নার্ভের উপর সেই পরিমাণ চাপ পড়ে না।

তবে ভবিষ্যতে এইসব ক্ষেত্রে রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না সে সম্পর্কে একটি কথাই বলা যায় যে, মাদের অতীতের স্পোর্টসে ইতিহাস কোথাও কোন রেকর্ড স্থিতিশীল থাকে না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে মনে হয় না। কারণ মানুষের শরীরের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ



জয়ের উল্লাসে

ব্যবহার এখনও হয় নি। আমরা ভবিষ্যতে প্রতি বিভাগে আরো উন্নতির পথে রেকর্ডের সীমা ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার আশা রাখতে পারি।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় খেলাধুলো

খেলাধুলো যে মুহূর্তে একটি আন্তর্জাতিক স্তরে উপনীত হয়েছে—তখন থেকেই তার সামাজিক গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এর পরিচয় পাওয়া যায় অলিম্পিক গেমস্‌-এর মধ্যে। অলিম্পিক ছাড়াও আরো অন্যান্য অনেকগুলি প্রতি-যোগিতায় বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা এক প্রাঙ্গণে জড় হন। একটা সৌভ্রাত্র ও শুভেচ্ছার আবহাওয়ায় পরস্পরের মধ্যে প্রীতি আর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ান ৮৮টি দেশের সঙ্গে ক্রীড়া প্রতিনিধি আদান-প্রদান করে থাকে। সাম্প্রতিককালে ৩৬ হাজার বিদেশী খেলোয়াড় সোভিয়েত সফর করেছেন এবং ৪৩ হাজার সোভিয়েত খেলোয়াড় বিদেশ সফর করেছেন।

সম্প্রতি সোভিয়েত ও ভারতের মধ্যে ক্রীড়াজগতেও একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এই প্রচেষ্টায় ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী আরো দৃঢ় করে তুলবে। শান্তি এবং খেলাধুলো যে দুই ঘনিষ্ঠ সুহৃদ—পাশাপাশি চলে, হাত মিলিয়ে।



কলা-কাকলি

স্মৃতির আলোয়— গায়িকা হীরাবাঈ বরোদেকার

হীরাবাঈ বরোদেকারকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য ঘটেছিল ১৯৫৫ সালের 'সদারং-সঙ্গীত-সম্মেলনে'— 'ভারতী' প্রেক্ষাগৃহে। সৌভাগ্যই বলব, কারণ সেদিন রাতে এই প্রখ্যাতা প্রবীণা গায়িকার শিল্পিহৃদয় যেভাবে উন্মোচিত হয়েছিল—এমনটা গত দশবছরের সঙ্গীত-সম্মেলনের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়বার ঘটে নি। যৌবনের হীরাবাঈয়ের উল্লেখ বাহুল্য। কিন্তু প্রবীণা হীরাবাঈ যে শক্তি, সম্পদ, লালিত্য এবং মাধুর্য সেদিন সঞ্চার করেছিলেন তাঁর গানে—বিশেষ 'পিলু' ঠুংরীতে—তা অবিস্মরণীয়। সগীরুদ্দিন ও সামসুদ্দিনের সুযোগ্য সহায়তায়—অতীতের হীরাবাঈ যেন ক্ষণকালের জন্য মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ পাশাপাশি শুদ্ধ গান্ধার ও কোমল গান্ধারের স্পর্শের যাদুতে শ্রুতির পূর্ণতা আজও যেন কানে ভাসে। যেমন নম্র গাম্ভীর্য, তেমনই প্রশান্তি-ভরা মুখভাব। এই প্রশান্তি শুধুমাত্র তাঁর শিল্পিসত্তার নয়—তাঁর সামগ্রিক সত্তারই বাদীস্বর। শ্রোতা হিসাবে এই ধীরছন্দ প্রশান্ত মনকে খুশিতে উচ্ছল করেছে—কিন্তু সখি হিসাবে তাঁর কাছে এসে সেই মনই কখন যে তাঁকে শ্রদ্ধার মালা নিয়ে বরণ করে নিয়েছে অন্তরের চির-অম্লান আনন্দলোকে, তা জানতেই পারি নি। সে খবর পেলাম তখনই, যখন স্মৃতির দূর-বিছানো দিগন্তে উজ্জ্বল তারার স্নিগ্ধ আলো বিলিয়ে হীরাবাঈ রইলেন অনিন্দ্য গৌরবে।

এই প্রবীণাকে সখি বলায় অনেকেই হয়ত আশ্চর্য হবেন। কারণ আমাদের মধ্যে শুধু বয়সের ব্যবধানই নেই—তিনি এক যুগের মানুষ, আমি হলাম আর এক যুগের, (উনি ৪২ আমি ২০ কি ২১ বছর)। তিনি ভারত-বরেণ্যা শিল্পী, আমি অতি-সাধারণ এক মেয়ে। Post-graduate-এর ছাত্রী তখন। কিন্তু মনের যে ব্যাপ্তি ইংরাজীতে যাকে বলে elasticity থাকলে বয়স, কাল ও সাধারণ-অসাধারণের গণ্ডী অতিক্রম করে সকল বয়সের মানুষের সঙ্গী হওয়া যায়—সেই স্নিগ্ধ-উদার মাধুর্যের ঐশ্বর্যে হীরাবাঈয়ের সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁকে ভরে দিয়েছেন। তাই ত' আমাদের বন্ধু হতে বাধে নি এতটুকু।

এবার বলি সে কাহিনী। সে বছরই দক্ষিণ কলকাতার কোনো-এক সম্মেলনে তাঁর অতি-কাছে আসবার এক দুর্লভ সুযোগ আমার ঘটেছিল। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা অনেক সঙ্গীত-সম্মেলনের মতই একটা সম্মেলনী সেটা। কি কণ্ঠসঙ্গীত, কি যন্ত্রসঙ্গীতের কোনো শিল্পীই বাদ যান্ নি। শেষের দিন সারারাত

জেগে কত বিচিত্রধরণের শিল্পীর গান-বাজনা শুনে যাচ্ছি কোনোরকম বাচবিচার না করেই। একরাতে অনেক শিল্পীর ভিড়, কাজেই সময়-স্বল্পতার দরুণ সবাই দায়সারা গোছের প্রোগ্রাম করে উঠে পড়ছেন। কারুরই তেমন মেজাজ নেই। রাত ভোর হয়ে এল। ঘুমের আমেজ আসছে। একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলাম বোধ হয়। হঠাৎ চমকে জেগে উঠলাম—সরোদের গম্ভীরনাদী আওয়াজে। এ বাজ ত যে-সে হাতের নয়! চোখ রগড়ে দেখি ওস্তাদ আলি আকবর খাঁন মঞ্চে বসে। সারা ভারতে আজ একমাত্র আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে বাদ দিলে এ বাজ ঐ একটিমাত্র মানুষের হাতেই ধরা দেয়। যেমন গম্ভীরনাদী তেমনই মধুর। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি, আগের শিল্পীদের মেজাজহীন অনুষ্ঠান শোনার হতাশা নিমেষেই যেন মুছে গেল এ সুরের ইন্দ্রজালে। 'ভৈরবী-ঠুংরী'র উদাস গাম্ভীর্যে মনটা যেন একলহমায় তৈরি হয়ে গেল পরবর্তী শিল্পীকে দেখবার জন্য।

এই পরবর্তী এবং সর্বশেষ শিল্পী হলেন হীরাবাঈ বরোদেকার। রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে তখন। ধরলেন 'ললিত'। মিলন-মধুর-রজনী শেষে নায়ক বিদায় নিচ্ছেন। নায়িকা আকুল কান্নার ভাষায় মিনতি জানাচ্ছেন এখনই যেও না—আর একটু থাক। এই ছিল সে গানের ভাববস্তু। লয়ের কণ্ঠশক্তি হয়ত স্তিমিত হয়ে এসেছে, তানে হয়ত সে জৌলুষ আর নেই। উচ্চগ্রামে গলা পৌছে দিয়ে শ্রোতাদের অন্তরকে উল্লাসে ভরিয়ে দিতে হয়ত পারছেন না তখন। তবু শান্ত মেজাজের ধীরছন্দ গতিতে, মুর্কীতানের সূক্ষ্ম-কারুকার্যে, মূর্চ্ছনার ইঙ্গিতে অতীতের দ্যুতিময়ী শিল্পীর দীপ্তছায়া যেন চকিত প্রেক্ষণে দেখা দিয়ে গেল। গানের শেষে দেখা করলাম। আমার কাছে তাঁর একটি ছবি ছিল। যৌবনের হীরাবাঈ। দু'চোখে শান্ত গভীরতা প্রতিভার আলো যেন ঝরে পড়ছে। কিন্তু সে আলোয় অহঙ্কারের তীব্রতা নেই, নিরহঙ্কার নম্রতায় মধুর। ছবিটি এগিয়ে দিলাম স্বাক্ষরের জন্য। মৃদুহেসে ছবিটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন হীরাবাঈ—তারপর ঐ মৃদুহাসির ছন্দে ছন্দ মিলিয়েই যেন মৃদুস্বরে বললেন, বহুত আচ্ছা তস্‌বীর! আমি বললাম, Do you want a copy of the same?' হিন্দী জানি না বলে অবাঙালী শিল্পীদের সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় কথা বলি আমি। এঁদের মধ্যে অনেকেই ভাল ইংরেজী বলেন (যেমন ওঙ্কারনাথ, আমীর খান, কিশোরীবাঈ আমনেকার) যাই হোক আমার কথার উত্তরে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন হীরাবাঈ।

বুঝলাম ইংরাজী বুঝতে না পেরে লজ্জা পাচ্ছেন। বিদেশী ভাষাজ্ঞানের অভাবে লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবু সেই সলজ্জ-মধুর ভঙ্গিটুকু বড় ভালো লাগল। ঠিক যেন ছোট্ট মেয়েটি। তখন ভাঙা হিন্দীতে বললাম, আপকো এককপি দরকার হায় কেয়া?

দু'চোখে তাঁর জ্বলে উঠল আগ্রহের আলো—দোসরা কপি হায়?

জরুর। বিজ্ঞ হিন্দীভাষীর ভঙ্গিতে বললাম।

আমার পিঠে একটা হাত রেখে খুব আদর করে বললেন, মেরা ঘর এক রোজ আনা।

উনি কতদিন থাকবেন, মহারাষ্ট্র নিবাসের কোন্ ঘরে থাকেন সব বলে দিলেন।

যথাসময়ে গেলাম। সকাল ১০॥টা হবে তখন। সবে রেওয়াজ শেষ করে তানপুরাটা পাশে রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমি যেতেই মধুর হেসে—'আইয়ে' বলে কাছে বসালেন। অভ্যর্থনার মধ্যে উচ্ছ্বাস বা আড়ম্বর নেই একটুকু। কিন্তু নম্র ভঙ্গিতে শান্তকণ্ঠে দু'চোখের নিবিড় চাউনিতে এমন একটা আন্তরিকতা ঝরে পড়ছে, যা মনকে মুহূর্তের মধ্যেই কাছে টেনে নেয়। সেইদিনই প্রথম গোঁছ সেকথা বেমালুম ভুলে গেলাম। মনে হোলো যেন কতকালের পরিচয়, কতদিন ধরে তাঁর কাছে আসছি, হাসছি, কথা বলছি। সেবার তিনি এসেছিলেন, ভাই সুরেশবাবু মানেকে নিয়ে। বললেন, ভাই বেরিয়েছেন



● হীরাবাঈ বরোদেকার

থাকলে আলাপ করিয়ে দিতাম—খুব খুশি হতে ওকে দেখলে।

তারপর গান-বাজনার কথা উঠল। তিনি বললেন, আজকাল কেউ সঙ্গীতের মর্মলোকে প্রবেশ করতে চান না। কিছুটা গলা তৈরি হল কি হল না—অমনই তানের চর্কিবাজীতে, কে কতটা গলা তুলতে পারেন, কে বেশি দাপট দেখাতে পারেন, এককথায় কি করে সস্তায় হাততালি কুড়োবেন সেইদিকেই কেবল নজর। কিন্তু সত্যিকারের সঙ্গীত হল শুদ্ধ, শান্ত, আনন্দলোকের বস্তু। যে শিল্পী তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে বিস্তার করে সঙ্গীতের রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন···তিনিই সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করবার অধিকারী হবেন। হীরাবাঈ কিরানা ঘরানার শিল্পী।

আমি ঐ ঘরানার বৈশিষ্ট্য কি জানতে চাইলাম। ওঁর কাছেই জানালাম 'কিরানা ঘরানা'র বড় গাইয়ে হলেন ওয়াহিদ খাঁ। মস্তবড় গুণী তিনি। পিতাজী আবদুল করিমের কাছে সঙ্গীতের বনেদ তৈরি হলেও ওয়াহিদ খাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন শ্রীমতী হীরাবাঈ। এই বিনয়-নম্র শ্যামলী বালাকে অলঙ্কার বিস্তারের অনেক তালিম তিনি দিয়েছেন। কণ্ঠমাধুর্যে ও সুরলালিত্যে ৺আবদুল করিম খাঁর উপযুক্ত কন্যা হলেও ওয়াহিদ খাঁর ঋণ তিনি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করেন। বিরাট প্রতিভার অধিকারিণী ত', মহত্ত্বের বীজ তাঁর মজ্জায় মজ্জায়, তাই ঋণ স্বীকার করতে তিনি জানেন। আমি আবদুল করিম খাঁর সুবিখ্যাত 'যমুনা কী তীর' গানটি তাঁর কণ্ঠে শুনতে চাইলাম। বলার সঙ্গে সঙ্গেই তানপুরাটি হাতে নিয়ে গাইতে সুরু করলেন। আগেকার কণ্ঠসম্পদ হারিয়েছেন সে কথা প্রথমেই বলেছি, তবু কি সুরেলা মাধুর্য প্রতিটি পর্দা লাগানোর ভঙ্গি কি অপরূপ শিল্পীজনোচিত (artistic)। এই পরিমিতি বোধ, এই শান্ত সংযম তাঁর গানের বৈশিষ্ট্যই শুধু নয়, আত্মা যেন। এই বস্তুটির জন্যই আজও তাঁর এত আদর। তান ও বিস্তারের পর যখন গানের মুখ 'যমুনা কী তীর'-এ ফিরে আসছেন, মনে হচ্ছে যেন যমুনার তীরেই মনটা চলে গেছে। ওপরের দিকে যখন গলা উঠল ঠিক যেন আবদুল করিম খাঁর কণ্ঠের ছায়া। গান শেষ হোলো। তানপুরাটি নামিয়ে রেখে হাসিমুখে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

আমি সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলাম, বহিনজী আপ বাপকী বেটি হায়।

উনি খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে আমার পিঠটা



● সদ্যমুক্ত ছবি নাটি প্রফেসর চিত্রে জেরি লুইস

চাপড়ে দিলেন! আবার হেসে উঠলেন। তখন আমার বয়স অল্প। বয়সে জননীতুল্যা এক প্রবীণা শিল্পীকে ঠিক ও ভাষায় অভিনন্দন করা শোভন নয় সে-বোধ তখন ছিল না।

ওঁর হাসি দেখে চেতনা হোলো। তখন লজ্জা রাখবার আর জায়গা নেই। কোনোরকমে বললাম, মুঝে মাপ কিজিয়ে।

উনি সাদরে আমায় কোলে টেনে নিয়ে বললেন, কোই বাত, তুম্ ত' মেরা লেড়কিকা মাফিক্।

তবু লজ্জায় মাথা তুলতে পারি না। তখন উনিই নিজেকে অপরাধীজ্ঞানে কৈফিয়ৎ দিতে লাগলেন, আরে আমার গান শুনে পিতাজী আব্দুল করিম খাঁর গলা তোমার মনে পড়েছে তাই বলেছ। আমি কি এমন 'বেকুব'—যে এটা বুঝব না? অনেকেই আমায় একথা বলেন—তবে তোমার বয়সী শ্রোতার কাছে এই প্রথম শুনলাম—বলেই আবার হাসতে গিয়েই উদ্যত হাসিকে সামলে নিলেন।

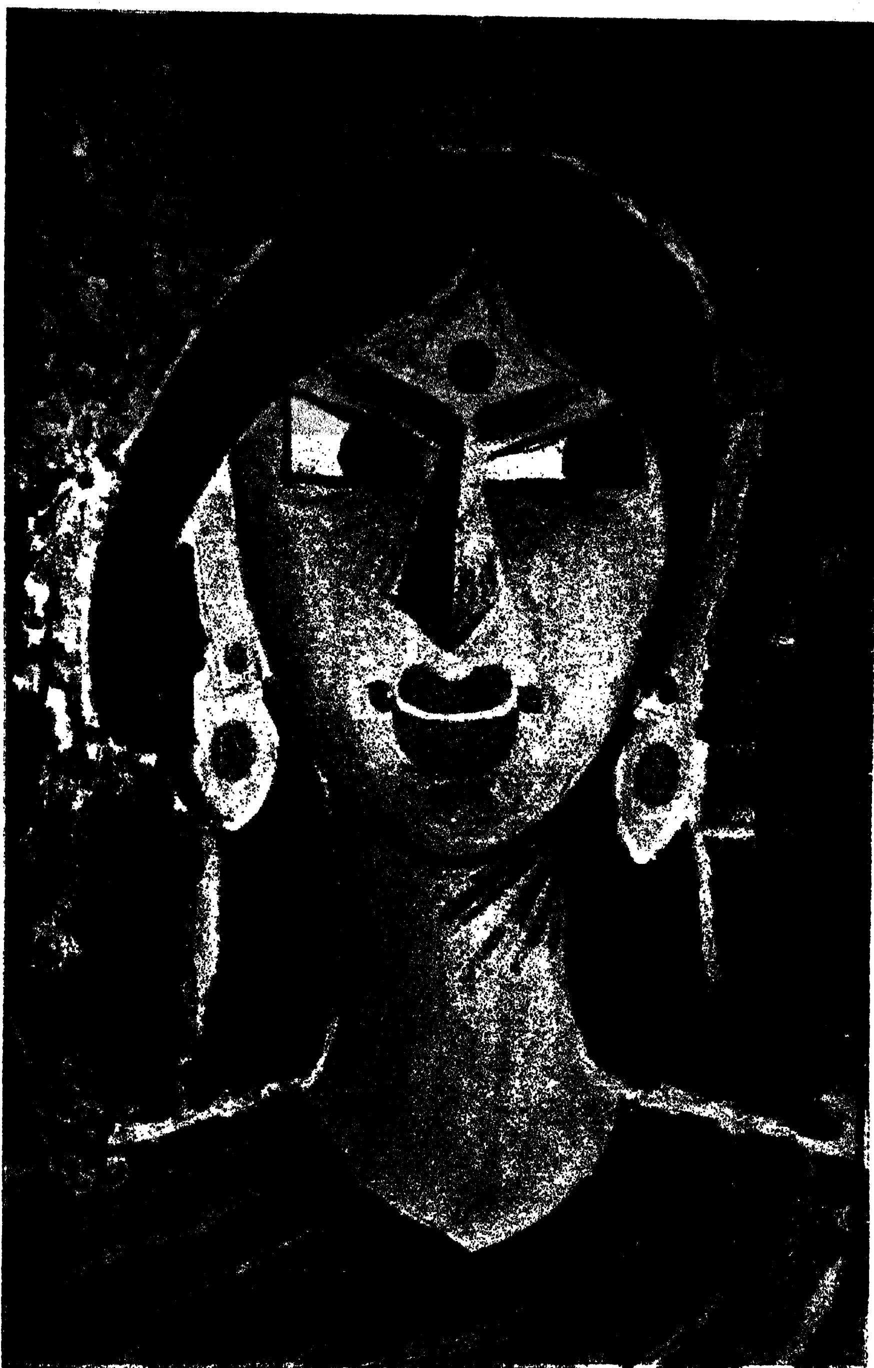
ক্ষমাময়ীর ক্ষমাই শুধু মিলল না—তার সঙ্গে উপরি-পাওনা হোলো তাঁর আদরভরা আশ্বাস। প্রথমটায় একটু আশ্চর্য হলাম বৈকি? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল একটি কবিতার চরণ 'গগন নহিলে তোমায় ধরিবে কেবা'—এতবড় হৃদয় বলেই ত' সঙ্গীতলক্ষ্মী এমন করে সেখানে আসন পেতেছেন। এই উদার দাক্ষিণ্য কোমল সহিষ্ণুতা দুর্লভ বলেই না, এত শ্রদ্ধার! আগেকার অন্যান্য গায়িকার সঙ্গে হীরাবাঈয়ের তফাৎ এইখানেই। তাঁর সময়ে এক কেশরবাঈকে বাদ দিলে—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে হীরাবাঈ ও রোশনারা বেগমের মত ভারতবিখ্যাত মহিলাশিল্পী ছিলেন না বললেই চলে। বিরাট প্রতিভা—কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার কি আছে? নিজে অবাঙালী। তবু বাঙালীদের সম্বন্ধে কি অকুণ্ঠ উদার সাধুবাদ। বললেন, তোমরা বাঙালীরা হলে জাতশিল্পী ও ভাবুক। তাই গুণীর কদর করতে তোমরা জান। 'ইঁয়া সব বহুত প্রেমসে মেরা প্রোগ্রাম শুনতা'—এখানে গান গেয়ে আমি বড় আনন্দ পাই।

কোনো এক সঙ্গীত সম্মেলন আর্থিক অসাফল্যের জন্য হীরাবাঈকে চুক্তিমত টাকা দিতে পারে নি—শুধু আসা-যাওয়ার ভাড়াটুকুই দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বহিনজি? আপনি নাকি এবার পুরো টাকা পান নি? সত্যি?

শান্ত দুই চোখ যেন করুণায় ভরে উঠল—'ব্যাচারারা' বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই সবটা দিতে পারে নি। তবে 'আধা দে দিয়া'। তারপর বললেন, না পারলে আর দেবে কেমন করে?



● 'হি হু গেটস স্ল্যাপড'-এর একটি বিশেষ দৃশ্যে রবার্ট হেলপম্যান ও অড্রে ফিলডেস



মাসিক বসুমতী (জলরঙ) আধুনিকা

॥ পৌষ, ১৩৭১ ॥ —শ্রীবিদ্যুত চক্রবর্তী

আশ্চর্য নয় কি—আজকের এই অর্থসর্বস্ব যুগে এমন মহৎ ঔদার্য? শুধু কি তাই? আরো বললেন, টাকাটা তুচ্ছ করবার বস্তু নয়—কিন্তু এর অভাবে আগ্রহী রসিকজনও গান শোনা থেকে বঞ্চিত হবে এটা কি কোনো কাজের কথা? আমার পিতাজীর কাছে রাস্তার লোক গান শুনতে চাইলেও তিনি শোনাতে দ্বিধা করতেন না।

মনে হলো—সঙ্গীতে এঁর চেয়ে বড় গুণী হয়ত মিলবে এঁর সময়ে। কিন্তু হৃদয়ের সুগভীর মহত্বে? এঁর জোড়া দুর্লভ নয় কি?

শ্যামলা রং, নাতিদীর্ঘ, শরীরের কোথাও এতটুকু মেদবাহুল্য নেই। সুন্দরী নয়, কিন্তু এমন সুষমাময়ী রূপ ও ব্যক্তিত্ব খুব অল্পই দেখা যায়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর বিরাট শান্ত চোখ দুটি। একটা স্তব্ধ-গভীর প্রশান্তি যেন সে চোখের প্রতিভা-দীপ্তিকে একটা স্নিগ্ধ মহিমা দান করেছে। চোখ দুটিই যেন হৃদয়ের সূচীপত্র।

স্বভাবে, ব্যবহারে বাঈসুলভ চটুলতা নেই এতটুকু, শিশুর মত নির্মল সারল্য। এমন অন্তর্মুখী গভীরা যে, সকলকে আকর্ষণ করবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? প্রকাশকুণ্ঠ সলজ্জ স্বভাব যে কত মধুরছন্দে প্রকাশিত হতে পারে তা অনুভব করা যায় শ্রীমতী হীরাবাঈয়ের কাছে এলে।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলাম, বহিনজী আমি জীবনে কিছুই করতে পারলাম না।

কেন এ কথা বলছ? তুমি এত বিদুষী মেয়ে, এমন মধুর স্বভাব, ভাল সেতারও বাজাও, তবে এ আক্ষেপ কেন?

বিদুষী হওয়ার চেয়ে মস্তবড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্নটাই আমার কাছে বড় ছিল। তা আর হোলো কই?

এখনও অনেক সময় আছে। তোমার কি-বা বয়স? একদিন শোনাও না তোমার সেতার। প্রতিবারই 'পিছে হোগা'—বলে ফাঁকি দাও দুষ্টু মেয়ে।

ফাঁকি দিই কি সাধ করে? আপনাকে শোনাবার উপযুক্ত নয় বলেই ত'।

ক' ঘণ্টা রেওয়াজ কর?

এক একসময় দিনে ৫।৬ ঘণ্টাও হয়ে যায়, আবার হয়ত এমন পরিস্থিতি হয় ৬ মাস সেতার তোলাই রইল।

জিভ কেটে বললেন, এ্যাইসা করনেসে ক্যায়সে হোগা? কমসে কম দো ঘণ্টা বৈঠনে হোগা।



● মুক্তিপ্রাপ্ত 'বিদ্যাপতি' চিত্রের এক দৃশ্যে ভারতভূষণ ও নাজিমা

ইচ্ছে ত' থাকে কিন্তু হয়ে ওঠে কই দিদি ?

ম্যাট্রিক পাশ করেছ ক' বছর পড়ে ?

প্রথম থেকে ধরলে বছর দশেক বলতে হয়।

রোজ ক' ঘণ্টা করে স্কুলে থাকতে ?

তা ৬।৭ ঘণ্টা হবে।

তবে ? একটা প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করতে ১০ বছর ধরে ৭ ঘণ্টা বসতে হয়—আর ভারত-জোড়া নামের শিল্পী হতে চাও রোজ এক ঘণ্টাও রেওয়াজ না করে ?

আত্মভোলা শিল্পীর সেই তিরস্কারভরা কৌতুক আজও কানে বাজে।

শেষ করবার আগে আর একটা মজার ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। মহারাষ্ট্র ভবনে তখন হীরাবাঈ ছিলেন। ওখানেই এক সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন খুব সম্ভব ওখানেরই কর্তৃপক্ষ।

দাদা (আলি আকবর খাঁ) আমায় বলেছিলেন, বিকেল পাঁচটায় তাঁর বাড়ি যেন পৌছে যাই। তাঁর বাড়ির সকলের সঙ্গে আমি যাব। ফেরার সময় বাড়ি পৌছে দেবেন।

গিয়ে দেখলাম সারারাত কোন্ film-এ music take করিয়ে দাদা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। দিদি, বৌদি নিশ্চিন্তমনে বই পড়ছেন, বুনছেন—দাদার প্রোগ্রামের বিষয় কোনো কথা জানেনই না। আমার কাছে সব শুনে আশীষকে তলব করে ব্যাপারটা জানে কি না খোঁজ নিলেন।

আশীষ সব দেখেশুনে হেসে ফেলল, বাবার প্রোগ্রাম আজ আছে ঠিকই। তবে বিকেল ৫টায় নয়, রাত ১২টার পর। তবে অন্যান্য আর্টিস্টও আছেন অনেক। বিকেল ৫টা না হলেও সন্ধ্যে ৮টার মধ্যেই হয়ত তাঁরা বসে যাবেন।

আমার ধারণা ছিল ৫টায় আরম্ভ হলে ৯টার মধ্যে বাড়ি ফিরব। বাড়িতেও সেইরকমই বলা ছিল। রাত ১২টায় হলে আর সম্ভব হবে কেমন করে? বাড়িতে তো বলা নেই।



● জাপানী নাটকের একটি দৃশ্য—বিশ্ব-পরিক্রমায় যাত্রা করবে

অগত্যা ফিরি। ফেরার সময় 'মহারাষ্ট্র নিবাসে'র কাছে বাসটা আসতেই মনে পড়ে গেল হীরাবাঈ ত' এখন এখানেই আছেন। নেমে পড়লাম।

সব ব্যাপার শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেছে। তারপর বললেন, আপনভোলা শিল্পী এই আলি আকবর। ওর পা দু'টো মাটিতে থাকে—কিন্তু মনটা ঘোরে 'আশমানে,' সত্যি এই শান্ত, নির্বিরোধ মানুষটিকে এত ভাল লাগে! আলাউদ্দিন খাঁ সাব একখানা শিল্পী তৈরি করেছেন বটে।

তারপর অনেক গল্পগুজবের পর বললেন, এখানে রাত ১০টা থেকে প্রোগ্রাম সুরু—বোধ হয় সারারাত ধরেই হবে। থেকে যাও না ?

কিন্তু মাঝরাতে যদি ভাঙ্গে কি উপায় হবে বাড়ি ফেরার ?

পরোয়া কেয়া ? মেরা সাথ শো যায়েগা। কেয়া মতলব ? রহেগা ?

দেখি, পহেলা বাড়িমে যাকে বোলেগা। দেখি কেয়া বোলতা হায় ?

বোলকে ফিন্ আয়েগা ত' ?

আসতে দেগা ত আয়েগা—না আসতে দেগা ত' কেয়া করেগা ?

তারপর বললাম—দিদিজী! আমার হিন্দী শুনে রাগ হচ্ছে ?

না, না। রাগ হবে কেন ? আমিও ত' বাংলা বলতে পারি না। তোমার মাতৃভাষা নয়—তবু ত' চেষ্টা করছ। একদিন ঠিক পেরে যাবে।

চলে এলাম।

সেদিন আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

তারপর যখনই এসেছেন গেছি। দু'জনে একসঙ্গে বেড়িয়েছি, চাইনীজ হোটেলে লাঞ্চ খেয়েছি, গড়ের মাঠে ফুচকাও খেয়েছি। একবার পুণা যেয়ে তাঁর বাড়ি উঠব বলে কথা দিয়েছি। আজও সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারি নি। অনেকদিন ওঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি কারণ আজকাল আসেন কম।···

তারপর কত শিল্পীর সংস্পর্শে এলাম। নিবিড় বন্ধুত্বও হয়েছে কারো কারো সঙ্গে,—স্বকীয় ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে সকলেই ভাস্বর।

তবু অনেক নিরালা মুহূর্তে হীরাবাঈয়ের সান্নিধ্যের স্মৃতি এক অনির্বচনীয় আনন্দের সুধারস মনকে ভরিয়ে তোলে। ঘুচে যায় স্থানকালের দূরত্ব—অনুভব করি স্নিগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন হীরাবাঈ, কখনও কৌতুকী হাসিতে গাইছেন—'যমুনা কী তীরে'—কখনও বা রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলছেন—পুণামে একবার আনা।—স্মৃতির দেউলে—এ আলোছায়ার আলপনা অনপনেয়।

—শ্রীসন্ধ্যা সেন

হুডিনীর গল্প

হুডিনী সম্বন্ধে কিছু বলার আগে একজন বিখ্যাত ইংরেজ যাদুকরের উক্তি শুনিয়ে রাখছি :

'এক ডজন পথচারীকে যদি কোন যাদুকরের নাম বলতে বলা হয় তবে দেখা যাবে তাদের দশজনই হুডিনীর নাম করেছে।'

কথাটা সর্বাংশে সত্যি না হলেও এ থেকে হুডিনীর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবিক, যাদুকর হিসেবে হুডিনীর মত নাম এ যুগে আর কেউ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অথচ হুডিনীর যাদুজীবনের অনেক খেলাই নাকি কেবল সাহস, ধৈর্য, সহ্যশক্তি এবং নিজের ওপর অগাধ আস্থা এবং বাহুবলের খেলা। পৃথিবীর কোন হাতকড়া বা লোহার শেকল তাঁকে বাঁধতে পারে নি; কোন লোহার বাক্স বা জেলখানার কয়েদঘর তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। অসম্ভব অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে —খ্যাতি, অর্থ এবং যশলাভ করার আশায়। সব পরীক্ষাতেই তিনি সফলতা লাভ করেছেন।

হুডিনী সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে। তার মধ্যে থেকে দু-একটি বেছে বেছে শোনাচ্ছি এখানে।

রাশিয়ার রাজধানী তখন সেন্টপিটার্সবার্গ। সেখানকার গোয়েন্দা-পুলিশ (Secret Police) ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। তাদের হাতে একবার পড়লে ছাড়া পাওয়া সহজ ছিলো না। সে সময় রাশিয়ায় গুরুতর অপরাধীদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হোতো। যে লোহার গাড়িতে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হোতো, একবার পরীক্ষা করার জন্য হুডিনীকে সেই লোহার গাড়ির মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়। গাড়ির চতুর্দিক মোটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি। একটি ছোট্ট দরজা ছাড়া বাইরে বেরুবার আর কোন পথ নেই। গাড়িতে ঢোকবার আগে হুডিনীর সমস্ত পোষাক খুলে হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দেওয়া হোলো। তারপর ঐ অবস্থায় তাঁকে গাড়িতে পুরে বাইরে থেকে কপাট বড় বড় তালা ও লোহার শেকল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হোলো। কাপড়-চোপড় রইলো গাড়ির বাইরে। পুলিশের লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেলো হুডিনী পোষাক পরে পুলিশের লোকদের কাছে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই খেলাটির বিবরণ শুনে রাশিয়ার তৎকালীন ডিউক (গ্র্যাণ্ড ডিউক মার্গে) পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে খেলাটি শিখতে চাইলেন। কিন্তু হুডিনী রাজী হোলেন না। ডিউক হুডিনীকে জব্দ করার জন্যে এক সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে খেলা দেখাবার আমন্ত্রণ জানালেন। ইতিপূর্বে, প্রায় চার সপ্তাহ আগে থেকেই ডিউক রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ লোহার মিস্ত্রী এবং তালা-প্রস্তুতকারীদের দিয়ে একটা ইস্পাতের বাক্স তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। বাক্সের বাইরে লাগাবার



● যাদুকর হুডিনী

জন্যে অসম্ভব শক্ত কয়েকটা তালাও তিনি আগেই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যায় হুডিনী খেলা দেখাতে এলে ডিউক বললেন, আপনাকে এই বাক্সের মধ্যে পুরে তালাবন্ধ করে দেবো। যদি একঘণ্টার মধ্যে আপনি এই বাক্স থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তবে আপনাকে ১০,০০০ রুবল (রাশিয়ান মুদ্রা) পুরস্কার দেওয়া হবে। না পারলে—থাক, সে আপনিই বুঝবেন···

হুডিনী রাজী হলেন, তবে দু'টি সর্তে। প্রথমত বাক্সে ঢোকবার আগে দু'জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁর শরীরের সমস্ত পোষাক খুলে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন কোথাও কিছু লুকোনো আছে কি না এবং দ্বিতীয়ত সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে তিনি কাজ করবেন। ডিউক সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন এই সর্তে। হুডিনীর সমস্ত শরীর ভালো করে পরীক্ষা করার পর হাতে-পায়ে হাতকড়া ও বেড়ি দিয়ে তাঁকে বাক্সে পুরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হোলো। কোথায় একঘণ্টা! মাত্র মিনিট-ছয়েক পরেই হাসিমুখে এসে অভিবাদন জানালেন তিনি। বেচারা ডিউক! এর পরও কি প্রতিজ্ঞা মত ১০,০০০ রুবল-এর একখানি চেক না দিয়ে পারা যায়।

১৯০৬ খৃস্টাব্দ। হুডিনীর বয়স তখন প্রায় বত্রিশ বছর। আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে (যেখানে মোটরগাড়ি তৈরি হয়) হাজার হাজার দর্শকের সামনে একজোড়া নূতন পুলিশের হাতকড়া ও শেকল দিয়ে হুডিনীকে বেঁধে একটা বাক্সে পুরে দেওয়া হয়। তারপর ডেট্রয়েট নদীর ওপরকার জমাট বরফের মধ্যে একটা বড় রকমের গর্ত করে তার মধ্যে বাক্সটা ফেলে দেওয়া হয়। মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়···উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠেন দর্শকরা। অনেকে তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মহিলা দর্শকদের কথা না বলাই ভালো।

একটি-দু'টি করে দু'টি মিনিট কাটলো। তারপর দেখা গেল হুডিনী হাতকড়া আর লোহার শেকল হাতে করে জলের ওপরে ভেসে উঠেছেন, বন্ধনহীন অবস্থায়!

হুডিনীর এইসব অমানুষিক খেলা দেখে পৃথিবী-বিখ্যাত 'শার্লক হোমসে'র লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল বলেছিলেন—এসব খেলা অতিপ্রাকৃত শক্তি (Suparnatural Powe ছাড়া দেখানো সম্ভব নয়।



● নির্মীয়মাণ 'পাড়ির' একটি দৃশ্যে ধর্মেন্দ্র ও প্রণতি ভট্টাচার্য

হুডিনী কিন্তু হেসে বলতেন, না হে, না, আমার কোন খেলার মধ্যেই কোন অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নেই। কেবলমাত্র দৈহিক ও মানসিক শক্তি দিয়ে সবই করা সম্ভব।

হুডিনী যখন জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির উচ্চশিখরে সেই সময়ে তিনি একবার জার্মানীতে খেলা দেখাতে যান। সেখানকার ওয়ার্নার গ্র্যাফ নামে একজন পুলিশ অফিসার এসব বিশ্বাস করতেন না। তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে এমন কথাও বলেন যে হুডিনী একজন মস্ত ধাপ্পাবাজ। যে-সব হাতকড়া বা লোহার শেকল তিনি খেলা দেখাবার জন্যে ব্যবহার করেন তার সবগুলোই কৌশল করা।

এই কথা নিয়ে হুডিনীর সাথে গ্র্যাফ-এর আদালতে মামলা হয়। জজসাহেব হাতে-নাতে পরীক্ষা করতে চাইলেন। জজ ও জুরীদের উপস্থিতিতে গ্র্যাফ, হুডিনীকে একজোড়া বিশেষভাবে তৈরি হাতকড়া পরিয়ে দিলেন—যা একবার বন্ধ করলে চাবি ছাড়া কোনরকমেই খোলা সম্ভব নয়। এরপর গ্র্যাফ তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে নিজে হাতে জার্মানীর সেরা ইস্পাতের তৈরি শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন। বাঁধা শেষ হবার পর দেখা গেলো যে, শেকলের জঙ্গল থেকে বেচারা হুডিনীর মাথাটি কেবল বেরিয়ে আছে বাইরে। তাতেও গ্র্যাফের মন ভরলো না। শেষে বিশেষভাবে তৈরি বড় বড় কয়েকটা তালা দিয়ে ঐ শেকলগুলো আটকে দিলেন তিনি। গ্র্যাফ উপহাস করে হুডিনীকে বললে, দেখি এবার আপনার বাহাদুরীটা।

কিন্তু তাঁর সব দর্প চূর্ণ করে মাত্র মিনিট-চারেকের মধ্যে শেকলের স্তূপের ভেতর থেকে মুক্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন হুডিনী। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত হাততালির ভেতর গ্র্যাফ এবং তার সঙ্গীদের মুখের অবস্থা সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়।

যদিও হুডিনী বলতেন যে, তাঁর সব খেলাই দৈহিক শক্তি ও কৌশলের সাহায্যেই করে থাকেন কিন্তু কোনদিন কাউকে বলেন নি কিভাবে হয় খেলাগুলো। তিনি বলতেন আমার শতবর্ষ পূর্ণ হোলে পর সব কথা আমি পৃথিবীকে জানিয়ে দেবো। হুডিনী তাঁর সমস্ত খেলার কৌশল সীলকরা খামে নিউইয়র্কের এক আইন-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হেপাজতে রেখে গেছেন। আগামী ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হবে। সেইদিন খোলা হবে ঐ সীলকরা খামটা এবং পৃথিবীর মানুষ প্রথম জানতে পারবে তাঁর নিজের লেখা কৌশলগুলো—যা তাঁকে পৃথিবীতে অমর করে রেখে গেছে।

যাদুকর ও যাদু-উৎসাহীরা অপেক্ষা করে আছেন সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষায়।

হুডিনীর খেলার কৌশল কিছু কিছু জানা গেছে অবশ্য। তবে সেগুলো তাঁর নিজের দেওয়া ব্যাখ্যা নয়। পরবর্তী কালের বিখ্যাত যাদুকরেরা নিজেদের যুক্তিতর্ক দিয়ে ঐ সব খেলার কৌশল উদ্ধার করেছেন। জানি না, সেগুলো কতদূর সত্যি।

তাঁর একটি বিখ্যাত খেলা 'নিরেট ইটের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করা।' খেলাটি তিনি দেখাতেন স্টেজের ওপরে। নীরেট ইটের দেওয়াল,—লোহার শাবল দিয়েও যা ভাঙ্গা কষ্টকর, তারই ভেতর দিয়ে অনায়াসে এ-ধার থেকে ও-ধারে চলে আসতেন তিনি।

পৃথিবীর বিখ্যাত যাদুকরেরা হুডিনীর যে-সব ব্যাখ্যা করেছেন সেগুলো লিখছি এখানে। শতবর্ষ পূর্ণ হবার পর হুডিনীর নিজের লেখা যখন প্রকাশ হবে তখন তার সাথে মিলিয়ে দেখবেন এগুলো কতদূর ঠিক।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী জেলখানার সেল্ থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন হুডিনী! এ অসম্ভব কি করে সম্ভব হোলো? যাদুকরের কোট, প্যাণ্ট, জামা সব খুলে সেলের বাইরে রাখার পর কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার তাঁর সারাদেহ তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখলেন কোথাও কিছু লুকোনো আছে কি না। ঐ অবস্থায় খুনী আসামীদের আটকে রাখার সেলে পুরে



● শ্যামল মিত্র প্রযোজিত 'রাজকন্যার' এক দৃশ্যে—উত্তমকুমার ও রীণা ঘোষ

চাবি বন্ধ করে দেওয়া হয়। চাবি না খুলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। চাবি বন্ধ করে, চাবি নিয়ে পুলিশ অফিসারেরা নিশ্চিন্তমনে বাড়ি ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সেই পুলিশ অফিসারদের একজনের বাড়ির কলিং বেল বেজে উঠলো। বেরিয়ে এসে দেখেন যাদুকর হুডিনী হাসিমুখে অভিবাদন জানাচ্ছেন তাঁকে।

খেলাটা দেখাবার জন্যে সেলের একটা অতিরিক্ত চাবি একান্তই দরকার। হুডিনীর কাছে নানা ধরণের তালা এবং হাতকড়ার চাবি প্রায় সব সময়েই মজুত থাকতো। তা ছাড়া প্রথমজীবনে তিনি নিজেও ছিলেন একজন অতি নিপুণ তালা-প্রস্তুতকারী। সুতরাং সম্ভাব্য সব রকমের চাবি তিনি তৈরি করতে পারতেন এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। ধরে নিলাম সেলের একটা নকল চাবি তাঁর কাছে ছিলো আগে হতেই তৈরি করা। কিন্তু সেলের ভেতরে ঢোকাবার আগে সারাদেহ তো তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখা হোলো, তবে চাবিটার কোন হদিশ পাওয়া গেলো না কেন?

এই প্রশ্নের একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে—যে ভদ্রলোকেরা তাঁকে সেলে বন্দী করার সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের সাথে আগে হতেই যোগসাজস ছিলো যাদুকর হুডিনীর। যাদুকরেরা অনেক সময় এরকম সহকারীর সাহায্য নিয়ে থাকেন। ম্যাজিকের ভাষায় এঁদের বলা হয় 'কনফেডারেট' বা 'গুপ্ত সহচর'। হুডিনীকে সেলে বন্ধ করার পর একে একে সকলে তাঁর সাথে করমর্দন করলেন গরাদের ফাঁক দিয়ে। সবার শেষে এলেন সেই গুপ্তচর। করমর্দন করার সময়ে চাবিটা হুডিনীর হাতে চালান করে দিলেন সকলের অলক্ষ্যে, অথচ তাঁকে সন্দেহ করার মত কিছুই নেই।

এরপর আসা যাক জলের তলায় ডুবন্ত বাক্স থেকে হাতকড়া ও শেকল মুক্ত হয়ে আসার খেলায়। হাতে হাতকড়া এবং শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে হুডিনীকে বাক্সে বন্ধ করে জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হোলো। তিনি অবলীলাক্রমে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে—সে গল্প তো আগেই বলেছি। এটাই বা কি করে সম্ভব? অনেকের মতে, এই খেলাটি দেখাবার জন্যে হুডিনী আগে থেকেই অক্সিজেন সিলিণ্ডারসহ ডুবুরীর পোষাকপরা একজন লোককে বাক্স খোলার যন্ত্রপাতিসহ জলের তলায় খেলা দেখানোর জায়গাতে লুকিয়ে রাখতেন। ঐ ডুবুরী সাহায্যকারীই তাঁকে বাক্স, শেকল এবং হাতকড়া থেকে মুক্ত হওয়ার কাজে সাহায্য করতো। অবশ্য এ অনুমান যে কতখানি সত্যি তা বলা শক্ত। তবে যদি অনুমানটা সত্যি হয় তা হলে বোঝা যাচ্ছে একটা খেলা দেখাবার পেছনে কি বিরাট প্রস্তুতি ছিলো তাঁর!

এবার বলি নীরেট ইটের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করার খেলার কথা। ছোট ছোট চাকা লাগানো ইট এবং সিমেন্টের তৈরি প্রায় ৬½ ফুট উঁচু এবং ৮/৯ ফুট লম্বা দেওয়াল স্টেজে ঠেলে আনা হোতো। অনেক সময় আবার দর্শকদের চোখের সামনেই ৫/৬ জন রাজমিস্ত্রী মিলে তৈরি করতো দেওয়ালটা যাতে কারো মনে কোন সন্দেহ না থাকে। কয়েকজন দর্শক স্টেজে এসে হাতুড়ী দিয়ে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে দেখতেন দেওয়ালের প্রতিটি জায়গা, কোথাও কোন কৌশল আছে কি না। দু'টো লম্বা কাঠের বাক্স এনে দেওয়ালের দু'পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোতো। হুডিনী এক পাশের বাক্সে ঢুকে অন্য পাশের বাক্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেন দেওয়াল ভেদ (!) করে। এইভাবে কয়েকবার দেওয়ালের ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করার পর আবার দর্শকরা দেওয়াল পরীক্ষা করে দেখতেন আগে যেমন ছিলো তখনও তেমনিই



● রাজশ্রী শান্তারাম—ছায়াছবির বাইরে

রয়েছে। এ থেকে লোকের মনে ধারণা হয়েছিলো যে হুডিনী সূক্ষ্মদেহ ধারণ করতে পারেন।

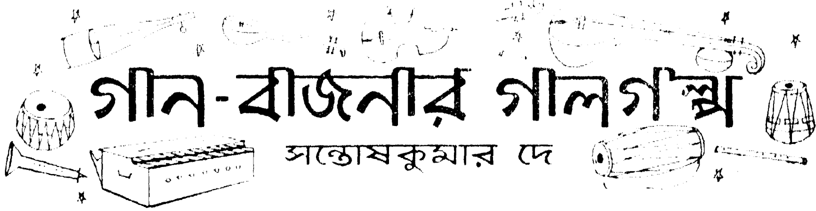
খেলাটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলেও কৌশল খুব সহজ। সাধারণত থিয়েটার বা ম্যাজিকের স্টেজের কাঠের মেঝেতে কতকগুলো গুপ্ত দরজা থাকে, যেগুলো নীচের দিকে খোলা যায়। কার্পেট দিয়ে ঢাকা থাকে দরজাগুলো। এগুলোকে বলা হয় স্টেজ ট্র্যাপ (Stage Trap)। এই রকমের একটা দরজার ঠিক ওপরে, দেওয়ালটা এনে দাঁড় করানো হোতো এমনভাবে যেন কার্পেটের অর্ধেক দেওয়ালের একপাশে এবং অন্য অর্ধেক দেওয়ালের অন্যপাশে পড়ে। একপাশের বাক্সে যাদুকর ঢুকে সংকেত দিলেই তলা থেকে সহকারী কপাট খুলে দেয়। তখন আর দেওয়ালের একপাশ থেকে অন্যপাশে যাওয়া মোটেই কষ্টকর নয়। বলা বাহুল্য বাক্সগুলোর তলা বা পেছন নেই। কাঠের বাক্স ও টৌর জন্যে স্টেজ ট্র্যাপ খোলা বা বন্ধ হওয়া দর্শকদের নজরে পড়ে না।

কত কষ্ট, কত পরিশ্রম, কত অধ্যবসায় থাকলে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছান যায় হুডিনীর জীবনী তারই হিসেব আমাদের জানায়। অথচ অনেক যাদুকর নেহাৎ সস্তায় কাজ সারবার চেষ্টা করেন। কেবলমাত্র প্রচার সম্বল করেই কেউ কেউ নিজেদের 'শ্রেষ্ঠ' বলে প্রমাণ করতে চান।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।'

ম্যাজিকের কৌশলকে অনেকেই আগাগোড়া চালাকি বলেই মনে করেন; কিন্তু এ চালাকি আয়ত্ত করতে দারুণ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম দরকার—'চালাকি' দিয়ে এ চালাকি আয়ত্ত করা যায় না। তাই বোধ হয় আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয় হুডিনীর সাক্ষাৎ মেলে নি। কে জানে ভবিষ্যতে আর কোনদিন মিলবে কি না।

—যাদুকর বি দাস



গান-বাজনার গালগল্প

সন্তোষকুমার দে

তিন

সুর ধরে রাখা

যন্ত্রমাধ্যমে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনবার আর একটি উপায় হল টেলিফোন। টেলিফোন মাধ্যমে দূরের মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। যদিও তাতে সেই স্বর যখন খুশি, যতবার খুশি, শুনবার জন্য ধরে রাখবার ব্যবস্থা নেই, তবু দূরের ভাষণ শুনবার যে প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি, সে কথা আজকের টেলিফোনের বিপুল ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়।

টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল এবং এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের জন্য তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ফ্রেঞ্চ অ্যাকাদামি অব সায়ান্স হতে রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রবর্তিত বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক আঁদ্রে ভোল্টার স্মারক 'ভোল্টা পুরস্কার'-ও (২০,০০০ ডলার) পেয়েছিলেন, তবু একথাও অবশ্যই স্বীকার্য, টেলিফোন যন্ত্রের উন্নতির জন্য টমাস আলভা এডিসনেরও বিশেষ মূল্যবান দান আছে। এমন কি টেলিফোনের যন্ত্রাংশ আবিষ্কারের জন্য তিনি কয়েকটি 'পেটেন্ট'-ও করিয়েছিলেন।

টেলিফোন ব্যতীত আরও বহু বিষয়ে বৈজ্ঞানিক-গবেষণার কৃতিত্ব একা এডিসনের। এমন কি আজ যে বিদ্যুতের বাতি সূর্যের আলোর মতই আপামর জনসাধারণ, সকল সভ্য মানুষের কাছে নিতান্তই সহজলভ্য হয়ে উঠেছে,



আফ্রিকার ছায়াচিত্রের একটি দৃশ্য—প্রেমিক-প্রেমিকা

তাও এডিসনেরই দান। একবার আমেরিকায় এডিসনের মৃত্যুবার্ষিকীতে রাত্রে একটি নির্ধারিত সময়ে সকল শহরে একই সঙ্গে পুরো একমিনিটকাল সকল বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে দিয়ে এডিসনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। সমগ্র আমেরিকাবাসী সশ্রদ্ধ অন্তরে স্বীকার করেছিল—এডিসনের কাছে মনুষ্যসমাজ কতখানি ঋণী!

যাক্, টেলিফোন প্রসঙ্গে ফিরে আসি, কারণ টেলিফোন যন্ত্রের উন্নতির মূলে যেমন এডিসনের দান রয়েছে, তেমনি ফনোগ্রাফ যন্ত্রের পরবর্তী উন্নতির মূলে রয়েছে টেলিফোন আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল ও তাঁর আর দু'জন সহকর্মী,—তাঁর ভ্রাতা চিচেস্টার বেল এবং অধ্যাপক চার্লস সামনার টেইণ্টার-এর দান।

এডিসন টিন-ফয়েল দিয়ে যে রেকর্ড করেছিলেন তাতে শুধু তাঁর নিজ কণ্ঠস্বরে—'মেরি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব' শুনেই লোকে ক্ষান্ত হয়েছিল তা নয়, রেকর্ড মাধ্যমে যে-কোনও লোকের কণ্ঠস্বর ধরে বারবার বাজিয়ে শোনাবার ব্যবস্থা করে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়ার জন্যও লোক এগিয়ে এলো। 'এডিসন স্পিকিং ফনোগ্রাফ কোম্পানী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। সেই কোম্পানীর যাঁরা পরিচালক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে গ্রাহাম বেল-এর শ্বশুর গার্ডিনার জি হুবার্ড যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের ব্যবসা ছিল শহরে-শহরে, গ্রামে-গামে লোকদের যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে বেড়ানো।

টিন-ফয়েল-এ তোলা রেকর্ড বাজত বটে কিন্তু স্বর খুব স্পষ্ট ও মিষ্ট হত না এবং বহুবার ব্যবহার করাও যেত না।



পাকিস্তানের চিত্রতারকাবৃন্দ

অধিকন্তু যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে যে নতুনত্ব ও চমৎকারিত্ব ছিল, তাও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। তখন কেউ আর গাঁটের পয়সা খরচ করে ফনোগ্রাফের শ্রোতা হতে চাইত না। কোম্পানীর পরিচালকেরা বুঝতে পারছিলেন, নতুনত্বের মোহ কাটলেই—এই ব্যবসা অচল হয়ে পড়বে। বস্তুত ঐ নতুনত্বটুকু ব্যতীত টিন-ফয়েল ফনোগ্রাফ রেকর্ডের অন্য কোনও আকর্ষণও ছিল না এবং তার ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎও তেমন উজ্জ্বল বলে মনে হয় নি।

ফনোগ্রাফ যন্ত্রটি একটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক খেলনা ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় নি কারো। কোম্পানীর পরিচালকবর্গও প্রত্যাশা করতে লাগলেন, এডিসন এবার ফনোগ্রাফের দিকে একটু মনোযোগ দিতে পারেন এবং যদি কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করতে পারেন, তবেই হয়ত ফনোগ্রাফ শিল্পটি টিকবে।

কিন্তু এডিসনের তখন মরবারও ফুরসুৎ ছিল না। তিনি দিনরাত গবেষণায় মত্ত—কি করে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার হতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎবাতি তৈরি করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায়। প্রাণচঞ্চল প্রতিভাময় পুরুষ এডিসন এইভাবেই একটার পর একটা নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণায় মেতে যেতেন।

এডিসন যখন বিদ্যুৎবাতি নিয়ে গবেষণায় মত্ত, ঠিক সেইসময়ে আকস্মিকভাবে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল ফ্রান্স থেকে ভোল্টা পুরস্কার পেয়ে গেলেন। এইসময়ে বেল টেলিফোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু স্বয়ং গ্রাহাম বেল অর্থাভাবে গবেষণা কাজ চালাতেও বেগ পাচ্ছিলেন। টেলিফোন চালু হলেও টেলিফোন কোম্পানীর জমার খাতে যৎসামান্য, লাভের অঙ্ক শূন্য। এই পটভূমিতে যখন বেল ২০,০০০ ডলার (প্রায় লক্ষাধিক টাকা) মূল্যের ভোল্টা পুরস্কার পকেটে ফেলে ফ্রান্স থেকে ফিরলেন তখন স্বভাবতই তাঁর উদ্দেশ্য হল—একটি ভালো গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা—যেখানে নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা চালাতে পারবেন। ইংলণ্ড থেকে তাঁর ভাই চিচেস্টার আর তার বন্ধু টেইণ্টারকেও আনিয়ে নিলেন। পূর্ণোদ্যমে গবেষণাগারের কাজ সুরু হল এবং সুরুতেই বেল আর টেইণ্টার এডিসনের পরিত্যক্ত ফনোগ্রাফ নামক যন্ত্রটির উন্নতিবিধানে মন দিলেন।

পূর্বেই বলেছি, এডিসনের আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ যন্ত্রে টিন-ফয়েল-এর ওপর রেকর্ড করা হত। তাতে বক্তা ও গায়কের কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও, তা স্পষ্ট বা মিষ্ট হত না। তা বাদে রেকর্ড করবার লৌহ-শলাকাচিত্র ছিল যথেষ্ট কঠিন। ফলে মনুষ্যকণ্ঠের স্বাভাবিক স্বর ধাতব কঠিনতা লাভে বহুলাংশে কর্কশ হয়ে যেত। বেল এবং টেইণ্টার চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে অপেক্ষাকৃত নরম জিনিসের

ওপর আরও হাল্কা চাপে স্বরতরঙ্গ রেখায়িত করা যেতে পারে। তাঁরা এডিসনের রেকর্ড করবার মূল তথ্যটি আরও উন্নতি করবার জন্য টিন-ফয়েল-এর বদলে মোম-লাগানো নল (Cylinder) ব্যবহার করলেন। এডিসনের সিলিণ্ডারগুলি ছিল ভারী, খোলা-পরানো কিছুটা কঠিন ছিল। মোমলাগানো সিলিণ্ডারগুলি তৈরি হল শক্ত কার্ডবোর্ডের নল দিয়ে, তা খোলা-পরানোও সহজ ছিল। তা ছাড়া হাল্কা চাপে রেখাপাত হতে পারে এমন সরু এবং অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও হাল্কা স্টাইলাস ব্যবহার করা যেত। ফলে অনেক অস্ফুট স্বরও রেকর্ডে রেখাপাত করত। তার জন্য সে রেকর্ড বাজালে দেখা গেল স্বর বেশ স্পষ্ট ও মিষ্ট হয়েছে।

বেল-টেইন্টার প্রবর্তিত এই মোমলাগানো সিলিণ্ডার বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং ততদিনে এডিসন তাঁর বৈদ্যুতিক বাতি নির্মাণ সমাধা করে আবার তাঁর ফনোগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতি করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন।

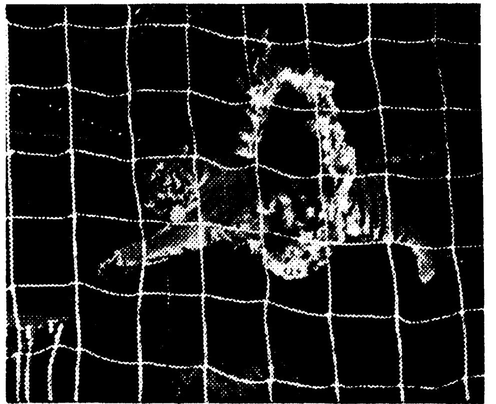
সিলিণ্ডার-রেকর্ড কি করে আরও উন্নত করা যায়, তা নিয়ে এডিসন অনেক পরীক্ষা করে দেখেছিলেন এবং আধুনিক লং-প্লেইং রেকর্ডের পূর্বাভাসও দেখা গিয়েছিল তাঁর দীর্ঘমেয়াদী সিলিণ্ডার-রেকর্ডে, যদিও তা তুলনামূলক ভাবে এখন আর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

এডিসন যেমন রেকর্ডের উন্নতি সাধন করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফনোগ্রাফ যন্ত্রেরও বহু উন্নত মডেল বের করেন। স্বরবিন্যাসের জন্য ধুতরা ফুলের মত চোঙা দেওয়া ফনোগ্রাফ হতে সুদৃশ্য কাঠের ক্যাবিনেটে সুসজ্জিত ফনোগ্রাফ, বিদ্যুৎ চালিত ফনোগ্রাফ সবই এডিসন করে দেখিয়েছিলেন। এডিসনের ফনোগ্রাফ ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং অচিরে ভারতে এসেও এই কথাবলা যন্ত্র যে কিরূপ সাড়া জাগিয়েছিল, পূর্বেই 'কবিকণ্ঠ' প্রসঙ্গে সে-কথা উল্লেখ করেছি। এমন কি বিখ্যাত 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' চিত্রটি প্রথমে যখন আঁকা হয়, তখন ইংরাজ শিল্পী ফ্রান্সিস ব্যারড নীপার নামক তাঁর নিজের কুকুরটির সুমুখে একটি সিলিণ্ডার রেকর্ড বাজাবার ফনোগ্রাফ যন্ত্রই এঁকেছিলেন এবং ছবিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রয়াল একাডেমির চিত্র-প্রদর্শনীতে। সেবার যদি রয়াল একাডেমিতে ঐ চিত্রটি প্রদর্শিত হত, তবে হয়ত সে চিত্রটির পৃথিবীময় এত ব্যাপক প্রচার হত না।

চিত্রটি সেবার প্রদর্শনীতে স্থান না পাওয়ায় ব্যারড ভাবলেন, টকিং মেশিন যারা বিক্রয় করে তাদের কাছে যদি গছাতে পারেন। দুঃখের বিষয় কি সুখের বিষয় বলা কঠিন, তারাও ছবিটি নিতে চাইল না। ব্যারড তখন ছবিটি নিয়ে গেলেন সদ্য-আবিষ্কৃত ডিস্ক রেকর্ড (Disc Record) তৈরি করবার প্রতিষ্ঠান—দি গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে। লণ্ডনে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ওয়েন ছবিটি দেখে পছন্দ করলেন। কিন্তু বললেন, কুকুরটির সুমুখে যে সিলিণ্ডার রেকর্ড বাজাবার যন্ত্রটি বসানো ছিল, সেটি মুছে ফেলে ডিস্ক রেকর্ড বাজাবার গ্রামোফোন যন্ত্র আঁকতে হবে।

ওয়েন-এর আদেশ মত ব্যারড ছবিটি নিয়ে গিয়ে সেই পরিবর্তন করে নিয়ে এলেন। একশত পাউণ্ডে ছবিটি কিনে কিছুদিন ফেলে রাখা হয়েছিল। পরে ছবিটি এবং তার ক্যাপসান 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' কথাটি রেজেস্ট্রি করে ট্রেডমার্ক হিসাবে ব্যবহৃত হতে সুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই ছবিটি আমেরিকায় ভিক্টর রেকর্ডের লেবেলেও ব্যবহৃত হয়।

বেল-টেইন্টারের আবিষ্কৃত মোমলাগানো সিলিণ্ডার জাতীয় বস্তু দীর্ঘকাল ডিক্টেশন (dictation) দিতে ব্যবহার করার জন্য 'ডিক্টাফোন' যন্ত্রে ব্যবহৃত হত। আজকাল অবশ্য সিলিণ্ডার রেকর্ড আর ব্যবহৃত হয় না, ডিস্ক রেকর্ড তার স্থান জুড়ে বসেছে। কিন্তু ম্যাগনেটিক টেপ আবার ডিস্ক রেকর্ডের স্থানও অধিকার করেছে। তবু ডিস্ক রেকর্ডের বহুল প্রচলন এখনও অব্যাহত আছে এবং রেকর্ডিং-এর সামগ্রিক উন্নতি এবং ব্যবহারে ডিস্ক রেকর্ডের দান সর্বোচ্চে। এবার তাই ডিস্ক রেকর্ডের কাহিনী বলছি। [ক্রমশ।



● কলকাতার সার্কাসে 'আগুন নিয়ে খেলা'

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]



● সুরস্রষ্টা হেমন্তকুমার

জীবনের চেয়ে বিচিত্র উপন্যাস আর নেই। এই আশ্চর্য উপন্যাসের পরমাশ্চর্য স্রষ্টা তার পরিচ্ছেদগুলির কোনটিকে কার পর কি অত্যাশ্চর্যভাবে নির্ধারিত করে থাকেন, সহস্র বুদ্ধির অনুশীলনে তা বোধগম্য হওয়ার নয়। যাঁদের জীবনের এই কথাটি মূর্ত হয়ে উঠেছে, সুরসাধক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই দলের দলী। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র পাঠক্রম সম্পূর্ণ করে দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বিশ্বকর্মার আশীর্বধন্য হতে পারতেন, তবে—তাই যদি হোত—তা হ'লে সরস্বতীর পূজাপ্রাঙ্গণ শূন্য থেকে যেত এক মহান সাধকের প্রাণপূর্ণ অঞ্জলি থেকে। দেশের ও বিদেশের অগণিত তৃষিত চিত্তে এই মধুকণ্ঠের দ্বারা রসের প্লাবন বইত না, একটি সুগম্ভীর, লালিত্যপূর্ণ, ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠ সভাগৃহ মুখরিত করে তুলত না। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে ঈশ্বর তা হতে দেন নি—হেমন্তকুমারের জীবনেতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তন তাই যথাসময়েই ঘটেছে আর তার ফল আজ সূর্যালোকের মতই স্পষ্ট।

গান তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ভাল লাগত। গান গাইতেনও বাল্যকাল থেকেই। গাইতেন দেশাত্মবোধক গান, গাইতেন বিদ্রোহের গান। তবে পেশাদারীভাবে গানের জগতে যে, তিনি কোনদিন আসবেন তা তিনি সেদিন বিন্দুমাত্রও ভাবেন নি।

তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম রেকর্ড—'আমার আর হবে না দেরি' এবং 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা'। গানের জগতেও তাঁর প্রবেশ সহজ-সরল পথ পরিক্রমণ করে নয়, রীতিমত বন্ধুর দুর্গম পথ অতিক্রম করে। বহু জায়গার নাম এখানে করা যেতে পারে, যেসব স্থানে তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাতটি সঙ্কুচিত ছিল। কলম্বিয়া রেকর্ড অবশ্যই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কলম্বিয়ার দুয়ার তাঁর সামনে অবরুদ্ধ রইল না। রসের অমৃত-তীর্থের তরুণ তীর্থঙ্করকে সসম্মানে সে ছাড়পত্র দিল। তারপর এই পঁচিশ বছরে—সময়ের অগ্রগমনে তাঁর রেকর্ড-সংখ্যা আজ সহস্রের ঘরে পৌঁছেচে। জনপ্রিয় কবি স্বর্গত অজয় ভট্টাচার্যের মধ্যস্থতায় চিত্রলোকে তিনি প্রবেশ করলেন। ছবির নাম নিমাই সন্ন্যাস, তারপর সহকারী হলেন সঙ্গীত-পরিচালক হরিপ্রসন্ন দাসের। সঙ্গীত-পরিচালকরূপে তাঁর দেখা মিলল জ্যোতির্ময় রায় পরিচালিত 'অভিযাত্রী' ও অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'পূর্বরাগ'-এ।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে হেমেন গুপ্ত তাঁকে নিয়ে গেলেন বোম্বাই। সেখানে তাঁর প্রথম ছবি হিন্দী 'আনন্দমঠ'। পরে 'নাগিন' ছবিটি তাঁকে এনে দিল বিপুল প্রসিদ্ধি। তাঁকে অধিষ্ঠিত করলে জনপ্রিয়তার সমুন্নত শিখরপ্রান্তে। প্রযোজক হিসাবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটিকে কেন্দ্র করে। ১৯৬২ সালে তিনি চিত্রজগতে উপহার দিলেন 'বিশ সাল বাদ।'

বেতারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় যিনি ঘটিয়ে দেন, বাঙলার কাব্যজগতে তিনি আজ একটি স্মরণীয় নাম। স্কুলে একসঙ্গে দু'জনে পড়তেন। তাঁর অবিরাম উৎসাহ ও অকৃত্রিম প্রেরণা সেদিন যথেষ্ট আশা জুগিয়েছিল হেমন্তকুমারকে। তাঁর সেই বিদ্যালয়-জীবনের সতীর্থটি প্রগতিশীল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

'শিল্পীর জীবনের শেষ কথা—ট্রাজেডি।'

—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

হেমন্তকুমার—নামটি বাঙলার বাইরে শুধু বোম্বাইতে বললে ভুল এবং অযথার্থ বলা হবে—সেই নাম—গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া পেরিয়ে গিয়ে উদ্দাম সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশে, নানা ঘরে, নানা মানুষের কানে কানে পৌঁছে গেছে, তবু শিল্পী হিসেবে বাঙলার সঙ্গে যোগ তাঁর এতটুকু কমে নি, দেশ-দেশান্তর থেকে আহ্বান, কাজের চাপ কোন কিছুই তাঁর গৃহব্যাকুল প্রবাসী মনের রূপান্তর ঘটাতে পারে নি।

জীবনে সমস্যার শেষ নেই, প্রতি পদক্ষেপে প্রতিবন্ধকতা, তার উপর প্রতিকূল পরিবেশের সর্ববিধ আক্রমণ, আজকের দিনে জীবন থেকে হাসি, আনন্দ, তৃপ্তি মিলিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে বললেই চলে, তার মধ্যেই শিল্পীমানুষের সমাজে তাঁর গানের মাধ্যমে ক্ষণকালের জন্যেও যদি কিছুটা আনন্দ পরিবেশন করতে পারেন, সেই সমস্যাপীড়িত, ক্লেশজর্জর মনগুলি কিছুক্ষণের জন্যেও যদি তাঁদের গানে পরিতৃপ্ত হয়—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতে একজন শিল্পীর সেইখানেই সবচেয়ে বড় সার্থকতা, সেইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—তবে আবার আমাদের সমস্যাটাও তাঁরা ঠিক বোঝেন না। আমাদের একটু এদিক-ওদিক দেখলেই তাঁদের মধ্যে অভিমান দেখা দেয়, সেই অভিমানই পরিণত হয় রাগ-বিদ্বেষে। ব্যস, তারপর সেইখানেই শিল্পি-জীবনের ইতি। জনসাধারণ শিল্পীকে যে ভালবাসেন সে সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহ নেই। এই জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় যদি শিল্পী সচেতন থাকেন, তা হলেই তিনি বাঁচতে পারবেন।

আতিথ্যপরায়ণ শিল্পীকে সেদিন আলোচনাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হল—আপনার মতে শিল্পি-জীবনের শেষ কথা কি?

ডিসেম্বারের সকাল। পাশের একটি বাড়ি থেকে রেডিওর গান শোনা যাচ্ছে। সেই নাদগম্ভীর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল—ট্রাজেডি।

আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে থাকি। শিল্পী আপন বক্তব্যকে চিত্রিত করেন—দেখুন, যৌবনের সঙ্গে গানের একটা নিবিড় যোগ আছে। যৌবন যেন গানেরই আর এক নাম। যতদিন যৌবন, ততদিনই চাহিদা, জনপ্রিয়তা সব কিছুই। —নাম করলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাসের এক দিকপাল শিল্পীর। বললেন—সেদিন আমি তাঁর গান শুনছিলাম, এখন তাঁর গান আরও ভাল হয়েছে। ম্যানারিজমগুলো গেছে, কিন্তু তাঁর সেদিনকার জনপ্রিয়তা কি আজও অটুট আছে? সময়ের প্রভাবে শিল্পীকে সরে যেতেই হবে।

কথাপ্রসঙ্গে সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় দিকের প্রতি হেমন্তকুমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—বললেন, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে দেখবেন—তিনি শুধু কথা ও ভাবের মধ্যেই আটকে থাকেন নি। প্রকাশরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গানের কথায় তিনি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, যা তাঁর গানগুলিকে এতখানি হৃদয়স্পর্শী করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে উচ্চতায় উপনীত করেছেন তা এক কথায় বহুযুগের সাধনাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। নিজেই কথাকার এবং সুরকার, তাই তাঁর গানে প্রাণের এত প্রাচুর্য। ওয়াশিংটনের একটি ঘটনা শোনালেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বললেন, সেখানে একটি



বিশ্বজিৎ ও মাধবী মুখোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

আসরে আমি ফিল্মের গান গাই একঘণ্টা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছি মাত্র কুড়ি মিনিট, শ্রোতারা রবীন্দ্র-গান শুনে বললেন—এ তুমি আমাদের কোন জগতে নিয়ে গেলে, কি অপূর্ব রসের দরজা আমাদের সামনে খুলে দিলে তুমি।

১৯৫৯ সালে পূর্ব আফ্রিকা, রোম, ফ্র্যাঙ্কফার্ট, সুইজারল্যাণ্ড, লণ্ডন, কায়রো এবং ১৯৬৪ সালে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, জামাইকা, বার্বা ডোস, ত্রিনিদাদ, সুরীনাম; লস এ্যাঞ্জেলস, হনলুলু, ফিজি, হংকং ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে এ দেশের সাংস্কৃতিক দূতের মহান কর্তব্য সাধন করেন—বাঙলার গর্ব ও গৌরব হেমন্তকুমার। ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল যে, আফ্রিকাবাসীরা যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে ভারতীয় গান শুনে থাকেন। ক্যারাবিয়ান দেশসমূহে তিনিই ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে প্রথম পদার্পণ করলেন। তাঁর কাছে জানা গেল যে, ভারতীয় শিল্পী হিসাবে যে বিরাট অভ্যর্থনা তিনি সেখানে পেয়েছেন, তা রাজকীয় সম্বর্ধনাকেও হার মানায়। এক গভীর প্রাণের স্পর্শ তার মধ্যে বিদ্যমান। দেশে-দেশে দূর-দূরান্তর থেকে তাঁকে দেখার জন্যে ভিড় জমেছে, তাঁর গায়ে হাত দিয়ে তাঁরা তাঁর স্পর্শ নিয়েছেন, এক অশীতিবর্ষীয় রোগী তাঁকে দেখার জন্যে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। এই অভূতপূর্ব সমাদর, বলা বাহুল্য শিল্পীর মনের গভীরে রেখাপাত করে গেছে। ভারত সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহলের অনুসন্ধিৎসার অন্ত নেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতে এইসব দেশগুলিতেও সরকার থেকে ডেলিগেশান পাঠানো উচিত।

রেকর্ডের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি তার বিপক্ষেই মত দেন।

এখানে এই রচনার উপসংহারে যে কথাটি সবিশেষ উল্লেখনীয়, তা তাঁর যশ, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির সঙ্গে তালে তাল রেখে বিনয়গুণ, নিরহঙ্কারিতা ও বন্ধুবাৎসল্যও ক্রমশই সীমারেখা অতিক্রম করে চলেছে—যা তাঁকে একটি বিশেষ পরমাকর্ষণীয় চরিত্রে পরিণত করেছে।

'সকলের অফুরান স্নেহ-প্রীতি—শিল্পিজীবনে আমার পরম পাওয়া'

—অপর্ণা দেবী

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

'খুব ছোটবেলায় তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর বয়েস হয়েছে। বার্ধক্যের ছাপও পড়েছে। উত্তর-কলকাতায় আমাদের বাড়ির কাছাকাছি তাঁকে দেখতাম, তখন অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু জানার সুযোগ ঘটে নি—শুধু তাঁর নামটুকু শুনেছিলুম, লোকের মুখে শুনতাম ইনি বিনোদিনী।'

স্মৃতিচারণ করছিলেন অপর্ণা দেবী। বিনোদিনী দেবীর অন্যতমা উত্তর-সাধিকা। বাঙলার অভিনেত্রী-কুলের এক অসামান্যা নাম, রচনাশক্তির অধিকারিণী এবং সর্বোপরি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদধন্যা। বিনোদিনী দেবী শেষ জীবনে যখন তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন অপর্ণা দেবী তখন জীবনের সেই প্রথম পর্বে। অপর্ণা দেবী হয়তো ভাবতেও পারেন নি যে, ভগবান রামকৃষ্ণের পদধূলিধন্য বাঙলার রঙ্গমঞ্চ বিনোদিনী দেবীর মত তাঁরও একদিন সাধনার ক্ষেত্রে পরিণত হবে।



● অপর্ণা দেবী

এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুসংযত ও গাম্ভীর্যমণ্ডিত অভিনয়শক্তির অধিকারিণী অপর্ণা দেবী আজ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে অবিরামভাবে দর্শক সাধারণকে ভরিয়ে তুলছেন তাঁর প্রতিভায়, সুচরিত্রায়ণে ও অভিনব অভিনয় কুশলতায়। অভিনেয় চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় তাঁর অপরিসীম নৈপুণ্য তাঁকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের সারিতে উপনীত করেছে।

রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম পদার্পণ চন্দ্রগুপ্ত নাটকে হেলেনের ভূমিকায় মাত্র এক রাত্রির জন্য, তা সত্ত্বেও এই অভিনয় তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে, কারণ মঞ্চাবতরণের প্রথম রজনীতেই শিশিরকুমারের নির্দেশনায় এবং তাঁর সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ তাঁর শিল্পিজীবনের ইতিহাসকে অনেকখানি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছিল। অপর্ণা দেবী যেদিন হেলেনের ভূমিকায় অভিনয় করলেন সেদিন ঐ নাটকের অন্যান্য ভূমিকায় আবির্ভূত হন শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র,

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, প্রভা দেবী, কঙ্কা দেবী প্রভৃতি দিকপাল শিল্পীর দল।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থায়িভাবে তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন। নাটকের নাম মীরকাশিম। চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য আত্মপ্রকাশ প্রতিশ্রুতি চিত্রে। হিন্দী ছবিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। রামানুজ তাঁর প্রথম হিন্দী ছবি। তারপর অসংখ্য চিত্রে ও নাটকে বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের তিনি প্রাণসঞ্চার করতে পরিপূর্ণরূপে সফলকাম হয়েছেন। বর্তমানে নির্মীয়মাণ 'শেষ তিন দিন' ও 'সূর্যতপা' ছবি দু'টিতে তিনি অভিনয়রতা।

তাঁর গৌরবময় শিল্পিজীবন বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে বাঙলার একাধিক দিকপাল নট-নটীর সঙ্গে এবং শক্তিমান কুশলীর নির্দেশনায় অভিনয়ে। এই তালিকায় বহু স্মরণীয় নামের মধ্যে শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কঙ্কা দেবী, প্রভা দেবী, নীহারবালা দেবী, শেফালিকা দেবী, সরযূবালা দেবী, প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকীকুমার বসু, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

জিজ্ঞাসা করি—আপনার অভিনীত এই অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে কোন্ চরিত্র আপনার মনে গভীরভাবে ছাপ রেখে গেছে?

উত্তর এল—রজনী। তাঁর মতে ঐ ধরণের অভিনয় তার পূর্বে ও পরে কখনও তিনি করেন নি। এই প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি স্মরণ করেন শচীন সেনগুপ্তকে। বলেন—জানেন, শচীনবাবুর হাতে এ সময় মারও খেয়েছি অভিনয় সম্পূর্ণরূপে রসোত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। 'রজনী'র অন্যান্য ভূমিকায় সেদিন আত্মপ্রকাশ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্তী, সরযূ দেবী প্রভৃতি।

অপর্ণা দেবী বলতে থাকেন—সে যুগে এক বিরাট নিষ্ঠা ছিল, গুরুরা প্রাণ দিয়ে শেখাতেন। শিষ্যেরাও প্রাণ দিয়ে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করতেন, তাই তখনকার প্রচেষ্টা এক সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণতি লাভ করত। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই হৃদ্যতাপূর্ণ আদান-প্রদান নানাভাবে সহায়তা করত। তখন গণ্ডীও ছিল সীমাবদ্ধ, সিনেমার আগে থিয়েটারই ছিল নটনাথের একমাত্র আরাধ্য মন্দির। কলাদেবীর আরাধনায় সেদিন কোনপ্রকার ছলনা-প্রতারণা দেখা যেত না।

আজকের পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞা শিল্পীকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন—সময়ের অগ্রগমনে পরিবেশ নিশ্চয়ই বদলেছে, আর সুখের কথা—পরিবেশ ভালর দিকেই গেছে তা ছাড়া ক্রমশই শিক্ষিতদের আবির্ভাব দেশের নাট্যজগতকে নানাদিক দিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালীই করে তুলেছে।

ছায়াছবি ও অপর্ণা দেবীকে তুলনামূলকভাবে পাদপ্রদীপের মধ্যে শেষোক্তই বেশি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে এই আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে দর্শককে একেবারে কাছে পাওয়া যায়। শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের একটা নৈকট্য ঘটে, তার উপর মঞ্চাভিনয় দর্শকের প্রতিক্রিয়ায় অভিনয়ের দোষগুণ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা যায়। নিজের অভিনীত ছবিগুলিও অপর্ণা দেবী দেখে থাকেন। অভিনয়ে কোন দোষত্রুটি থাকলে বলা বাহুল্য তাঁর সন্ধানী চোখ তা এড়িয়ে যায় না।

প্রশ্ন করি—আজকাল নাটকের প্রয়োগরীতিতে, আঙ্গিকে বিন্যাসে যে সর্বৈব পরিবর্তন এসেছে সে সম্বন্ধে আপনার মত কি?

তিনি জানালেন যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে ঠকতে হবে। সেই প্রয়োজনে কলাকুশলগত প্রাধান্যকে আজকের রঙ্গমঞ্চগুলি মেনে নিচ্ছেন। তবে কি জানেন, শিল্পী যদি শক্তিমান হন, তা হ'লে নাটকের মধ্যে এই কলাকুশলগত প্রাধান্য তাঁর প্রতিভাকে চেপে রাখতে পারবে না, তারই মধ্যে দর্শকের মনে নিজের আসন ঠিক করে নেবেন। আবার তাঁর অভিনয়ের সারবত্তায় নাটকও হবে সার্থক, সুতরাং এতে নাট্যধর্ম ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন আশঙ্কাই নেই।

সকল ধরণের চরিত্রেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন শিল্পী অপর্ণা দেবী। করুণ-চরিত্রেও তিনি প্রাণসঞ্চার করেছেন, আবার খল-চরিত্রেও তিনি পরিচয় দিয়েছেন অসামান্য শক্তির। এরই মধ্যে এই বৈচিত্র্যের মেলায় কোন্ ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি আনন্দ পান—জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় যে—'সব চরিত্রই চরিত্র। শিল্পীর কাছে এ-সম্বন্ধে কোনরকম বাদবিচার থাকা উচিত নয়।'

আলোচনা এগিয়ে চলে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে। সহশিল্পীদের প্রসঙ্গে তিনি বললেন—আজ পর্যন্ত সহশিল্পিরূপে যাঁদের আমি পেয়েছি, বা পাচ্ছি—তাঁরা তো নিশ্চয়ই, তা ছাড়াও কর্মসূত্রে যাঁদের সঙ্গেই যোগাযোগ হয়েছে এই দীর্ঘকাল ধরে, তাঁদের প্রত্যেকে আমার প্রতি যে সানুকূল মনোভাব, সহৃদয়তা ও অফুরন্ত স্নেহ-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন—আমার জীবনে তার মূল্য অপরিসীম। শিল্পী হিসাবে আমার তাই পরম পাওয়া।

'বাঙলা ছবির বাঙালীদর্শক কমছে'

—তপন সিংহ

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

দোসরা অক্টোবর তারিখটির তাৎপর্য শুধু দেশের রাজনৈতিক জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের অভিনয়জগৎও তার কাছে কম ঋণী নয়। এ যুগের একজন স্মরণীয় চিত্রপরিচালক—চিন্তাশীলতা ও সৃজনধার্মিতার জন্য যাঁর খ্যাতি আজ সুপরিব্যাপ্ত—কাবলীওয়ালা, ক্ষুধিত-পাষাণের সার্থক চিত্ররূপদাতা তপন সিংহের ঐ তারিখেই পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। গত ২রা অক্টোবর তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর পূর্ণ হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্য হিসাবে শিশিরকুমারেরও জন্মতারিখ ২রা অক্টোবর।

বাল্যকাল কেটেছে তাঁর ভাগলপুরে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন বি-এস-সি পড়তে, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াও চলতে থাকল। ১৯৪৪ সালে যোগ দিলেন নিউ থিয়েটার্সের শব্দবিভাগে শিক্ষানবীশ হিসাবে। ১৯৪৮ সালে যুক্ত হলেন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর শব্দযন্ত্রী হিসাবে, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশে বিলেতে পাড়ি জমালেন ১৯৫০ সালে। ফিরে এলেন দু'বছর পরে। পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম উপহার অঙ্কুশ। তারপর বাঙলা দেশ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে উপহার, টনসিল, কাবলীওয়ালা, লৌহকপাট, কালামাটি, ক্ষণিকের অতিথি, ক্ষুধিত পাষণ, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, নির্জন সৈকতে, জতুগৃহ, আরোহী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলি। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি'র চিত্রায়ণে ব্যস্ত।

তাঁর ছবিগুলি সম্বন্ধে দর্শকদের কাছে আজ নতুন কিছু বলা বাহুল্যমাত্র, তবে তাঁর পরিচালক-জীবনকে বিভিন্ন কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করে যা দেখা যায়, তা হ'ল—মনের দিক দিয়ে তিনি বৈচিত্র্যের পূজারী। কোন ছকে বদ্ধ, বাঁধাধরা গল্পের চিত্রায়ণে তাঁর মন সাড়া দেয় না। ভাল জিনিস কোন বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, অনেককিছুর মধ্যে ভাল ছড়িয়ে আছে, সুতরাং রূপালী পর্দায় তাকে প্রতিফলিত করে, সাধারণ্যে তাকে তুলে ধরতে এক বিশেষ জাতের গল্পের আশ্রয় নেওয়া চলে না। ভাল জিনিসকে, যার সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ আছে, তাকে তুলে ধরাই পরিচালকের ধর্ম। তিনি অপরাধমূলক গল্পের রূপ দিয়েছেন, আবার অধ্যবসায়ের কাহিনীও চিত্রের মাধ্যমে শুনিয়েছেন, আবার একদিকে ইতিহাস আশ্রিত আধ্যাত্মিক, অন্যদিকে নিবিড় প্রেমের কাহিনীর রূপদানেও তিনি সিদ্ধহস্ত।



● তপন সিংহ

বাঙলার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কাহিনী যেমন সার্থকভাবে তাঁর দ্বারা চিত্রিত হয়েছে, সরস হাস্যধর্মী কাহিনীও তেমনই নিপুণভাবে তিনি দর্শকসমাজে পরিবেশন করে গেছেন।

আজকাল চিত্রের মধ্যে কলাকুশলের প্রাধান্য চিত্রশিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর মতে, কাহিনী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, বর্তমানে তার মধ্যে এক স্বতন্ত্র সত্তার আরোপের চেষ্টা চলছে, তা ছাড়া প্রকাশরীতিও বদলাচ্ছে—সেদিক দিয়ে দেখলে কলাকুশলের প্রাধান্য বা ব্যাপ্তি কোনক্রমেই ক্ষতিকারক বলে মানা যায় না।

আজকের দিনে সমাজের কয়েকটি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা সমাজের সুস্থ আবহাওয়াকে বিষাক্ত করছে সে ক্ষেত্রে পরিচালকের কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে কি না সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—এই অবনতির মূল হচ্ছে যুগসন্ধিক্ষণ। আসলে আজ আমরা এক যুগসন্ধিতে উপনীত। গতানুগতিকতা মানুষকে কখনও তৃপ্তি দিতে পারে না, শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গেছে যে, এই যুগসন্ধিতে একটা ওলোট পালোট এসেছে। তবে এই ওলোট পালোটের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সমকালের পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা যায় না। এই ওলোট পালোট পৃথিবীর ইতিহাসের এক অবধারিত

পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। মানুষ আজ হাতড়াচ্ছে, বিদ্রোহ তার শুরু হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে পরিচালকের করণীয় আছে নিশ্চয়ই, সিনেমা এক বিরাট মাধ্যম, সিনেমার মধ্যে যুগের, জীবনের ও মনের বিচিত্র ছবি যথাযথভাবে প্রকাশ করা এ ক্ষেত্রে তাঁর কাজ।

একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করেন তপন সিংহ—জোর করে কেবল আশারই ছবি দেখিয়ে যাওয়া হয়েছে, হতাশা, দৈন্য-অবহেলিত, অথচ তাদের বাদ দিলে জীবনই বলুন, সমাজই বলুন অসম্পূর্ণ। উপমা দিলেন বিদেশের, বললেন ওদের দেশে সস্তা, হাল্কা ছবিও হয়, আবার বার্গম্যানের ছবিও আসে, যা একটা দিক তুলে ধরে। যা মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জুগিয়ে যায়।

কথা উঠল বাঙলা দেশের ছায়াছবির সমস্যাগুলি নিয়ে। তপন সিংহ বললেন—ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছবি করার দরকার নিশ্চয়ই আছে, অর্থসমস্যাই আজ এক প্রধান সমস্যা, তিন হাজার মানুষের ভাগ্য এই জগতের সঙ্গে জড়িত, অথচ তার মধ্যে শতকরা ষাটভাগ লোক আজ কাজ পাচ্ছেন না। অর্থসমস্যার সমাধানের জন্যে সর্ব ভারতীয় ভিত্তি ছাড়া অন্য উপায়ও তো নেই। এই সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে ছবি করতে হবে অবশ্যই প্রগতির দিককে ব্যাহত না করে।

আরও প্রাঞ্জল হলেন তপন সিংহ—বললেন তুলো, লোহা, কয়লা-শিল্পে যেমন গবেষণার শাখা আছে—এখানেও তাই হোক, সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে ব্যবসায়িক দিকে লক্ষ্য রেখে যে ছবিগুলি হবে তার দ্বারা লব্ধ অর্থে শেষের দিকটির সমৃদ্ধিসাধন করা যায়। অর্থের অভাব যখন থাকছে না, তখন সারবান ও লোককল্যাণকর অনেক প্রচেষ্টায় হাত দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সেই পরিকল্পনা সার্থকই হবে, তার ফলে অর্থসমস্যাও ঘুচবে এবং ছবির মানও উন্নত হবে।

শক্তিমান পরিচালকের কণ্ঠে এবার ভেসে ওঠে বেদনার সুর। বলেন, বাঙলা দেশে বাঙলা ছবির দর্শক কমছে। অথচ দেখবেন যাঁরা নিজেদের আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত বলে দাবী করেন তাঁরা 'সঙ্গম'-এর ভিড় বাড়াচ্ছেন। অথচ, অবাঙালীরা বাঙলা ছবি দেখছেন।

তপন সিংহ চিত্রশিল্পের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনসাধারণের তুলনায় সরকারের দায়িত্বকেই স্বীকৃতি দেন। তাঁর মতে প্রতিদিন প্রমোদকর বাবদ আদায় হয় আনুমানিক বিশ লক্ষ টাকা। এর শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সেই টাকাই যদি ঢালা হয় তা হলে চিন্তার কিছু থাকে না।

তপন সিংহের আরও একটি পরিচয় আছে—পথিক।

পৃথিবীর বিভিন্ন পথ তিনি পরিক্রমণ করেছেন। তাঁর নিজেরই ভাষায়—এক মস্কো ছাড়া বলতে গেলে সারা পৃথিবীই আমি ঘুরেছি—তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শোনালেন যে, বিদেশে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ছাড়া আর কারো ছবির চাহিদা নেই। ভারত সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে, এ ক্ষেত্রেও সত্যজিৎ রায়ের অবদান অনেকখানি।

পরিচালক হিসাবে তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক আছে। ক্ষণিকের অতিথির কাহিনীকার তিনি নিজেই। আর প্রত্যেকটি ছবির কাহিনীকার বাঙলার প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীরা। অতিথি নিয়ে তাঁর পরিচালিত তিনখানি ছবির কাহিনীকার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অন্যান্য কাহিনীকারেরা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, রমাপদ চৌধুরী এবং সমরেশ বসু।

দুর্গতদের সাহায্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অভিনন্দনীয় উদ্যম

সংখ্যায় অল্প নয়। দু-দশ হাজার এমন কি দু চার লক্ষও নয়। পনের লক্ষ। এরা দুর্গত, এরা ভাগ্যবিড়ম্বিত। এদের কল্যাণার্থে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে-পন্থার আশ্রয় নিচ্ছেন, তার মূল্য একাধিক দিকে অনস্বীকার্য। একদিকে এই বিরাট সংখ্যক অসহায় নরনারীর উপকার সাধন, অন্যদিকে সংখ্যাতীত সঙ্গীত-পিপাসুদের দরবারে আনন্দরস পরিবেশন—এই উভয় উদ্দেশ্যই একটি পন্থায় সিদ্ধ হতে চলেছে। ইউল ব্রাইনারের ব্যবস্থাপনায় একটি লঙ-প্লেয়িং রেকর্ড গ্রহণ করা হয়েছে। এর বিক্রয়লব্ধ সমগ্র অর্থ দুর্গত সাধারণের কল্যাণের কাজেই ব্যয়িত হবে। এতে যোগ দিয়েছেন



● ক্যাটারিনা ভ্যালেন্তি বিং ক্রশবী এলা ফিটজেরাল্ড



● ইউল ব্রাইনার

পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর মহার্ঘ শিল্পিবৃন্দ। এই কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় সহায়তাস্বরূপ তাঁরা পারিশ্রমিক বাবদ একটি কপর্দকও গ্রহণ করেন নি। লাভের ঘরে একটি কপর্দকও না রেখে এর পরিবেশনভার গ্রহণ করেছেন পৃথিবীর বৃহৎ রেকর্ড প্রতিষ্ঠানসমূহ। এতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নাম এলা ফিটজেরাল্ড, বিং ক্রশবী, লুই আর্মস্ট্রং, পেরী কোমো, প্যাটি পেজ, হ্যারী বেলাফঁতে, ডোরিস ডে, ইভস মঁতা, ন্যাট কিং কোল, নানা মুসকুরি, মাহালিয়া জ্যাকসন, মরিস শিভ্যালিয়ার এবং ক্যাটারিনা ভ্যালেন্তি।

এই সমগ্র প্রচেষ্টাটির মধ্যে যোগদানকারী শিল্পিকুল যে মানবিকতার পরিচয় দিলেন, তা সর্বতোভাবেই অভিনন্দনীয়। মানুষের বিপদে, অসহায় অবস্থায় তাঁরা যেভাবে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন, তা তাঁদের অনুভূতি-প্রবণ দরদী মনেরই পরিচয় বহন করে। অনেকের ধারণা, শিল্পীরা সাধারণত অর্থগৃধ্নু হয়ে থাকেন, উপরোক্ত ঘটনা তাঁদের এই ভ্রান্তি নিরসন করবে। বাঙলা দেশেও দেখা গেছে যখন মানবসমাজে কোন ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে শিল্পীরা পথে পথে পদব্রজে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে সেই দুর্যোগের অবসান ঘটানোর কাজে সহায়তা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

সৌখীন সমাচার

সাহেব-বিবি-গোলাম

'রূপ ও ছন্দ' নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম'-এর নাট্যরূপ অভিনয় করলেন। নাটকটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন রাসবিহারী দাস। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেন দেবী চক্রবর্তী, অসিত মিত্র, প্রভাত চক্রবর্তী, সলিল কর, ধীমান বসু, প্রশান্ত বসু, অজিত দত্ত, দিলীপ সিংহ, জগন্নাথ সাহা, অমর বিশ্বাস, মোহনলাল ভাটিয়া, অশোক দে, অজয় সিংহ, নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন লাহা, মুকুল চৌধুরী, শ্যামল মিত্র, মৃন্ময় প্রধান, অরুণ বসু, নন্টি সরকার, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল কুণ্ডু, রাসবিহারী দাস, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, সুধীর ভড়, গীতা নাগ, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সুতপা ভট্টাচার্য, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা বাগ, অনিলা দেবী প্রভৃতি।



● গত ২৮শে ডিসেম্বর '৬৪ স্টার রঙ্গমঞ্চে রূপ ও ছন্দ কর্তৃক 'সাহেব বিবি গোলাম' নাটকের একটি দৃশ্যে পটেশ্বরী ও ছোট বাবুর ভূমিকায় শ্রীমতী জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও শ্রীদেবী চক্রবর্তী



● হ্যান্স এ্যাণ্ডারসানের 'রেড-সু' অবলম্বনে সি এল টি'র অপূর্ব নৃত্য-নাটিকা 'লাল নূপুরে'র একটি দৃশ্য

সি এল টি'র জয়যাত্রা

আজকের দিনে কলারসিকদের কাছে চিলড্রেন্স লিট্‌ল থিয়েটারের নতুন করে পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই। কলাক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের অভিনবত্বে এবং বৈশিষ্ট্যে একটি প্রথম সারির আসন অধিকার করেছেন। শিশুমনকে সাংস্কৃতিক ভাবধারায় গড়ে তোলা এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে সংস্কৃতি সম্বন্ধে এক সচেতনতা এনে দেওয়ায় এঁদের অবদান বিশেষ উন্মেষের দাবীদার।

সম্প্রতি তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হ'ল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সার্থকতায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। নৃত্য-গীত-নাটকে ছোটদের পারদর্শিতা দর্শকমনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। প্রাপ্তবয়স্করাও এই অনুষ্ঠানে যথেষ্ট আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি পেয়ে থাকেন।

সি এল টি ওরফে শিশু রংমহলের সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ 'লাল নূপুর'। এই নৃত্য-নাটিকাটি হান্স এ্যাণ্ডারসানের গল্প 'রেড-সু' অবলম্বনে রূপায়িত। সারা বছরের এই প্রস্তুতি এক সার্থক পরিণতিই লাভ করে।

বর্তমান সংখ্যায় 'কলা-কাকলি' বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলির কয়েকটি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে বীরেন ধর ও শান্তিময় সান্যাল কর্তৃক গৃহীত। ছাউনীর চিত্রটি 'মায়ামঞ্চ'-এর সৌজন্যপ্রাপ্ত।

সাহিত্য পরিচয়

অতি সম্প্রতিই মস্কোয় প্রকাশিত হয়েছে প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত এক মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ। বইখানির নাম হল 'প্রাচীন যুগের ভারত'। প্রখ্যাত সোভিয়েত ভারতবিদ পণ্ডিত আকাদেমি-সদস্য ভ্যাসিলি স্রুক সম্পাদিত এই গবেষণামূলক নিবন্ধ সংকলনটিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস, রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা, বৈষয়িক ও আত্মিক সংস্কৃতি, প্রাচীনযুগের ভারতবাসীর দার্শনিক চিন্তাধারা ও ধর্মীয় বিশ্বাস, ভারতের ভাষাগোষ্ঠীগুলির নৃকুলতাত্ত্বিক উৎপত্তির সমস্যাদি ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে সোভিয়েত ভারতবিদদের গবেষণাপত্রাদি সংকলিত হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ভারতবিদ পণ্ডিতরা আধুনিককালের ভারতের নানাদিক নিয়ে গবেষণাগ্রন্থমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান আকাদেমির এশীয় জনগণের ইনস্টিট্যুট বিশেষভাবে এই কাজের ভারপ্রাপ্ত। এই ইনস্টিট্যুটের গবেষক খ্যাতনাম্নী ভারতবিদ শ্রীমতী

সোভিয়েত এশীয় জনগণের ইনস্টিট্যুট এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মুক্তি-সংগ্রামের এক ইতিহাস প্রণয়ন করছে। এই ইতিহাস গ্রন্থটি হবে সুবৃহৎ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যায়ের তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে সোভিয়েত ভারতবিদ গবেষকরা ভারতের ইতিহাস গবেষণাকর্মীদের সহযোগিতা নিচ্ছেন।

খ্যাতনামা সোভিয়েত ভারতবিদ পণ্ডিত আলেক্সেই দিয়াকফের বিভিন্ন রচনা ভারতীয় পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। ভারত সম্পর্কে দিয়াকফের নতুন এক গবেষণাগ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় তার নামেই স্বপ্রকাশ: 'বর্তমান ভারতের জাতিসত্তা সংক্রান্ত সমস্যা'। চল্লিশের দশকের শেষার্ধে দিয়াকফ লিখেছিলেন 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের জাতীয় সমস্যা' নামে মূল্যবান গ্রন্থটি। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর পূর্বতন গবেষণা কাজেরই পরবর্তী খণ্ড।

বর্তমান গ্রন্থটিতে খ্যাতনামা সোভিয়েত পণ্ডিত বৃটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ইতিহাসসংক্রান্ত যেসব মত প্রকাশ করা হত, সেগুলিকে জোরালোভাবে

ভারত-সোভিয়েত সাহিত্য

আই আর গর্ডন-পোলোনস্কায়া এই সংক্রান্ত কাজে সম্প্রতি কলকাতা ঘুরে গেছেন।

সমসাময়িক ভারত সম্পর্কে সোভিয়েত ভারতবিদের গবেষণা-নিবন্ধ সংকলন মূল রুশ থেকে ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে অচিরেই প্রকাশিত হবে। সোভিয়েত ভারতবিদদের রচিত এই সংকলন-গ্রন্থটির নাম 'সমকালীন ভারতের ইতিহাস'। ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে সোভিয়েত ভারতবিদদের লিখিত আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে কোতোভ্স্কি লিখিত ভারতীয় কৃষিসমস্যা বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ ও পাভলফ লিখিত ভারতে বৈদেশিক সাহায্যের সমস্যা বিষয়ক গ্রন্থটি। ভারতের শ্রমশিল্পায়ন ও ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের ওপর তার প্রতিক্রিয়া বিষয়ে শ্রীমতী পোলোনস্কায়া গবেষণা করছেন।

শ্রীমতী পোলোনস্কায়ার আর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ হল 'ভারত ও পাকিস্তানের সমাজচিন্তায় মুসলিম প্রভাব', মুসলিম জাতীয়তাবাদের সমস্যাটিকে তিনি এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন।

খণ্ডন করেছেন। সোভিয়েত পণ্ডিত দ্বি-জাতিতত্ত্বেরও বিরোধী। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাল থেকে সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত যে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতীয় সংহতির আদর্শ ভারতীয় জনগণের মধ্যে কাজ করছে, গ্রন্থকারের মতে ভারতের ইতিহাসের বিবর্তনে তার বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক কাল—ভারতেতিহাসের এই নানাপর্ব ওনানাদিক নিয়ে সোভিয়েত ভারতবিদ পণ্ডিত ও গবেষণাকর্মীরা যে-সমস্ত কাজ করছেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এশীয় জনগণের ইনস্টিট্যুট সেইসব বিষয়ে আগামী বছর থেকে একটি নিয়মিত বুলেটিনও প্রকাশ করবেন। এই বুলেটিন ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হবে। এতে ভারতবিদ্যার গবেষণা সংক্রান্ত সোভিয়েত ভারতবিদদের কাজের নিয়মিত সংবাদ ও নিবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকবে।

উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে প্রায় একশত গ্রন্থ সোভিয়েত 'নউকা' প্রকাশভবনের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৩ সালেই প্রকাশ করা হয়েছে।

বসন্তরাগ / গ্রন্থপ্রকাশ

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যের সাম্প্রতিক এই উপন্যাস এক নবীনত্বের আস্বাদ বহন করে এনেছে। রূপময় ভারতের দাক্ষিণ উপকূল এই কাহিনীর পটভূমি, মাদ্রাজ শহরের কাছাকাছি সমুদ্র তীরবর্তী এক শ্যামল পল্লীর কয়েকটি মানুষের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে রচনা। সুকণ্ঠ গায়ক ও বীণকার আচার্য রঙ্গনাথন সর্বজন-পূজ্য, শুধু তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার জন্যই নয়, শুদ্ধ-সংযত চরিত্রের জন্যও। কিন্তু প্রেম কি জীবনকেও সময় সময় অতিক্রম করে যায় না? বোধ হয় এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই ব্রাহ্মণ আচার্যের জীবনে যে প্রেমের দীপশিখাটি প্রথম বহন করে আনল সে শূদ্রাণী লল্লা—কঠোর সমাজ-বিধানে যে ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যা শবরী। দ্বিধায় বিচলিত হয় রঙ্গনাথনের হৃদয়। লল্লাকে কামনা করেন তিনি সর্বান্তঃকরণে কিন্তু গ্রহণ করতে পারেন না জীবনে। অবশেষে অবসান হল দ্বন্দ্বের, প্রিয়তমের সঙ্কোচ উপলব্ধি করে অনুরাগিণী রমণী নিদারুণ অভিমানে নিজেকে সরিয়ে নিল তাঁর জীবনপথ হতে। লল্লাকে হারিয়ে সত্যোপলব্ধি হল আচার্যের। চোখের জলে ভেসে গেল তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পরম মূল্য দিয়ে জীবনের চরম সত্যের মুখোমুখি হলেন রঙ্গনাথন, জানলেন প্রেমই মানবজীবনের প্রাণসত্তা। সত্যকার প্রেমের মধ্যেই নিহিত ভগবৎ ভক্তির মূল উপাদান, বুঝলেন—ঈশ্বরকে ভালবাসা যায় না শুষ্কতার মধ্য দিয়ে, তার জন্যও চাই প্রেমপূরিত হৃদয়। সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন আচার্য, দেশে দেশে গান গেয়ে ফিরলেন, সাধারণ মানুষের মিছিলে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে, হারানো প্রিয়ার সন্ধানে দু'চোখের তারায় মশাল জেলে নিয়ে। বহু দিন কাটল এইভাবে, অবশেষে অভীপ্সা পূর্ণ হল তাঁর, সাক্ষাৎ হল লল্লার সঙ্গে, কিন্তু সে তখন সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী; মানবের প্রতি প্রেমকে ঈশ্বরের নৈবেদ্যে পরিণত করেছে তখন সে। স্তব্ধ হন আচার্য। শ্রদ্ধায়, বিষাদে বিদায় দেন প্রিয়তমাকে। হারিয়ে-যাওয়া প্রেম বসন্তরাগের মাধুর্যে সুরের জাল বোনে ওঁর অন্তরে। দীপ্তমধুর এই প্রেমকাহিনী মুগ্ধ করে মনকে, অভিভূত করে হৃদয়কে। লেখকের কৌশলে বর্ণনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, উপসংহারের মধুর-করুণ পরিণতি বিশেষভাবেই চিত্তাকর্ষক। প্রচ্ছদ বিশেষভাবেই উল্লেখ্য, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ। ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

রাঙা ধুলো / এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

আলোচ্য গ্রন্থটি এক ছোট গল্পসংগ্রহ। সুবিখ্যাত লেখকের সাম্প্রতিককালে রচিত মোট দশটি ছোটগল্প স্থান পেয়েছে এ সংকলনে। মানুষের এক আশ্চর্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে গল্পগুলির মাঝে। মননশীলতায়, আঙ্গিকের কারুকার্যে প্রতিটি গল্প যেন এক একটি নিটোল নিখুঁত মুক্তা, যত তার রূপ তত তার দীপ্তি—বস্তুত গল্পগুলি পড়তে পড়তে এই দীপ্তিতেই বেশি মুগ্ধ হতে হয়, সাধারণ বিষয়-বস্তুকে অসাধারণ করে তুলতে হলে লেখনীর যে পারঙ্গমতা প্রয়োজন, লেখকের তা পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে, আর তাই দিয়েই তিনি চমৎকৃত করে রাখেন পাঠককে। 'প্রাণায় স্বাহা'—গল্পটির মাধ্যমে নারীজীবনের এক অপ্রতিরোধ্য সঙ্কটকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, পরিবার-পরিকল্পনার জন্য অপারেশন করিয়ে নষ্ট-পৌরুষ স্বামী-সহবাসেও যখন মা হওয়ার সম্ভাবনা ঘটল, সেই সময় বিনতির মানসিক অবস্থাকে বড় নিপুণ হাতেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন লেখক, অসহায়তা ও বিমূঢ়তার সে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ এবং বেশ একটা কৌতূহল-উদ্রেককারী পরিবেশও সৃজিত হয়েছে এখানে। প্রথম গল্প 'রাঙা ধুলো'ও এক অপরূপ শিল্পকর্মবাহী পরিবেশ ও পারম্পর্য যে সব সময় বিশ্বাসযোগ্য নয় 'লেখক গৌতম গুপ্তের' কাহিনী তাই প্রমাণ করে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে এ গল্পটি পরিবেশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছোট গল্পের যে সুনাম ইতিমধ্যেই বহুল প্রচারিত, আলোচ্য গল্প-সংগ্রহটি তা বাড়িয়ে তুলবে নিঃসন্দেহে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা।

মনুদ্বাদশ / এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

আমাদের পুরাণে বলে চারশো বত্রিশ কোটি বৎসরে সৃষ্টি পিতামহ ব্রহ্মার একটি দিন, অনুরূপ দীর্ঘ তাঁর রাত্রি। ব্রহ্মার এক দিনে আবার মর্ত্যবাসীর এক কল্প, প্রতিকল্পে চতুর্দশমনু। শাস্ত্রজ্ঞজনের বিচারে আমাদের বর্তমান কাল সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধীন। এ গ্রন্থের কাহিনী তাই বর্তমানেরও নয় অতীতেরও নয়, সুদূর ভবিষ্যতে মানবসমাজের বিবর্তন কি রূপ ধরতে পারে, এ গ্রন্থে তারই আভাস কল্পিত হয়েছে। শক্তিমান লেখকের কলমে মানব-সমাজের এই কল্পিত ভবিষ্যৎ যেন প্রামাণ্য তথ্যের মতই সত্যের স্বাক্ষরবাহী। মানবসমাজ যে সুদূর ভবিষ্যতে সমূলে বিনষ্ট হতে পারে, এই ইঙ্গিতই ছড়িয়ে আছে কাহিনীর ছত্রে-ছত্রে। সম্পূর্ণ কল্পিত আখ্যানভাগ লেখকের চাতুর্যে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, কল্পনাশক্তির প্রাবল্যে ও ভাষারীতির স্বচ্ছতায় এ রচনা রূপকথার মতই মনোহারী। প্রচ্ছদশিল্প শোভন, ছাপা ও

বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—সাড়ে তিন টাকা।

মুগ্ধপ্রহর / গ্রন্থপ্রকাশ

খ্যাতিমান কথাশিল্পীর সাম্প্রতিক এই উপন্যাস, তাঁর অনুরাগী পাঠকবৃন্দকে খুশি করে তুলবে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র জাত-সাহিত্যিক, ভাষা বা আঙ্গিকের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করা তাঁর স্বভাব-বিরোধী; মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব বিশ্লেষণে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আলোচ্য রচনাও এ সত্যের স্বাক্ষরবাহী। বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে কি না জানি না, তবে দিলীপ ও অঞ্জলির প্রেম পরিণয়ে সার্থক হতে পেল না, মন দেওয়া-নেওয়ার বহুবিধ পর্বের শেষে বধূবেশে অপরের ঘর করতে চলে গেল অঞ্জলি, একলা ঘরে কি এক চালায় সতত অধীর হয়ে ওঠে দিলীপ। আবার ডাক দিল অঞ্জলি, সে ডাক শুনে স্থির থাকতে পারল কই দিলীপ? অঞ্জলির স্বামিগৃহে যাতায়াত সুরু করল দিলীপ, কি এক প্রত্যাশায় ভরে ওঠে তার মন, অঞ্জলির মোহভরা সান্নিধ্যকামনায় তার দিনরাত্রি হয়ে ওঠে আবেশবিহ্বল। অবশেষে এক সন্ধ্যায় অবসান ঘটল সব কিছুরই, জীবনব্যাপী পঙ্গুত্বর অভিশাপ বরণ করে নিল দিলীপ একটি মুগ্ধপ্রহরের মাশুল গোণার জন্য। আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন লেখক, দিলীপ-অঞ্জলির পারস্পারক আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব যেন নর-নারীর চিরন্তন ইতিকথা; সমাপ্তি অবশ্য একটা আকস্মিক ট্র্যাজেডির ছায়ায় আবৃত, যে ট্র্যাজেডি শুধুই দুঃখকর নয় খানিকটা মরবিডও। কাহিনীর উপসংহার মনকে যথেষ্ট নাড়া দিয়ে যায়। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ নয়নাভিরাম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রবি-রাগিণী / দি গ্রামোফোন কোং লিঃ

রবীন্দ্রসংগীত বহুদিন ধরে রেকর্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রসংগীতের যে বিপুল জনপ্রিয়তা দেখা দিয়েছে, তাতে রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি এবং অন্যান্য শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত কি কি পাওয়া যায়, তা জানবার বিশেষ আগ্রহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'রবি-রাগিণী' সেই আগ্রহ বহুলাংশে পূরণ করবে। এতে অবশ্য কেবল 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ও কলম্বিয়া রেকর্ডে যেসব রবীন্দ্রসংগীত পাওয়া যায়, কেবল তারই বিস্তারিত ও সুবিন্যস্ত তালিকা দেওয়া হয়েছে, তবুও 'রবি-রাগিণী' নিঃসন্দেহে একখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে আদৃত হবে। এই প্রসঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রচারাধিকর্তা সন্তোষকুমার দে 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি রেকর্ড করবার যে চিত্তাকর্ষক ইতিহাস বিলুপ্তির অন্ধকার গর্ভ হতে উদ্ধার করে উপস্থাপিত করেছিলেন, তাও স্মরণীয়। 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থখানিতেই আমরা সর্বপ্রথম রেকর্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার একটি সামগ্রিক তালিকাও পেয়েছিলাম। সকল রকম লেবেলের রেকর্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের তেমন তালিকা 'কবিকণ্ঠ' ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। 'রবি-রাগিণী'তে সে তুলনায় আংশিক তালিকা দেওয়া হলেও ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকাশিত 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এবং কলম্বিয়া রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীতের তালিকা আছে বলে তা বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে। এতে শিল্পী-তালিকা, গীতি-তালিকা এবং রেকর্ডের ক্রমিক সংখ্যার তালিকাও পৃথকভাবে দেওয়ায় প্রয়োজনীয় রেকর্ডটি খুঁজে নেওয়া খুব সহজ হবে। মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং রুচিশীল প্রচ্ছদের জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী ধন্যবাদের পাত্র। 'রবি-রাগিণী' প্রকাশ করেছেন—দি গ্রামোফোন কোং লিঃ, দমদম। মূল্য উল্লেখ নাই।

দুরন্ত দেহলী / গ্রন্থপ্রকাশ

দেহলী বা দিল্লী নগরবাসী এক তরুণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের কথা বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। আখ্যানভাগ বেশ কৌতুকাবহ, গৃহস্থ-সন্তান সমর শিক্ষিত ও বেকার, সঙ্গে আছে তার আর কয়েকটি বেকার বন্ধু। একই মেসে মাথা গুঁজে থাকে তারা। অবশেষে সরকারী দপ্তরে সমর একটি ভাল চাকরি পায়, এবার এল বাসস্থানের সমস্যা, দেখা গেল কোন বাড়িওলাই অবিবাহিত যুবককে বাড়িভাড়া দিতে রাজী নন; কিন্তু সমস্যা থাকলেই তার সমাধানও থাকে, মেসের বন্ধু কর্মিৎকর্মা নৃপেনের পরামর্শে নিজেকে বিবাহিত বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অবশেষে গৃহসমস্যার সমাধানও সম্ভব হল। ঘর বাঁধল সমর, এর পর কাহিনী গড়িয়ে চলে নানা কৌতুকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে এবং সব ভাল যার শেষ ভাল, এই প্রবাদবাক্যের সমর্থনে শেষ পর্যন্ত বাড়িওলার সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা অরুণার সঙ্গে সমরের পরিণয়ে ঘটল তার সমাপ্তি। বন্ধুর ঘর বেঁধে দেওয়ার স্বস্তি বুকে নিয়ে পথে পা বাড়ায় ছন্নছাড়া নৃপেন। বেশ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখক, চরিত্র-চিত্রণেও নিপুণ তিনি, মেসের বাসিন্দাদের বিচিত্র ছবিগুলিও বেশ যত্ন করেই এঁকেছেন, সবাই যেন আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল

রূপেই উপস্থাপিত। হাল্কা রম্যরচনা হিসাবে এ গ্রন্থ বেশ উপভোগ্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

চিত্ররেখা / গ্রন্থপ্রকাশ

এক করুণ-মধুর কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে এ গ্রন্থের মাধ্যমে। বিচিত্র এক মানসিকতার মানুষ এস ব্যানার্জির একমাত্র সন্তান শোভন পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির দখল নিতে দীর্ঘদিন পরে ফিরে এল বাংলা দেশে; ফিরে এল বটে, কিন্তু শান্তি পেল না। দুশ্চরিত্র পিতার স্মৃতি সর্বদাই যেন কি এক অগ্নিদহনে জারিত করে ওর চিত্তকে, সে অগ্নিদহনে সমিধ জোগায় ওর পরিবেশ, পিতৃবন্ধু প্রৌঢ় প্রতিবেশী চ্যাটার্জি সাহেব। এরই মধ্যে এল প্রথম প্রেম, একমাত্র নিকটাত্মীয় অকৃতদার মামাবাবুর মাধ্যমে পরিচিত হল শোভন সুন্দরী প্রাণবন্তা তরুণী চিত্রার সঙ্গে; প্রেমের মধুর ছোঁয়ায় দীপ্ত হয়ে উঠল শোভনের যুবকচিত্ত; এ প্রেম যে পরিণয়ে সার্থক হয়ে উঠতে পারে—দেখা দিল সে সম্ভাবনাও; কিন্তু অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল যেন, চ্যাটার্জি সাহেবের জারজকন্যা অনীতাকে এক রাত্রে স্কুটারে লিফ্‌ট দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কুৎসার ঝড় উত্তাল হয়ে উঠল, তাতেই নিভে গেল শোভনের প্রথম প্রেমের দীপশিখাটি। চরিত্রহীনের হাতে একমাত্র কন্যাকে সঁপে দিতে অস্বীকৃত হলেন চিত্রার বাবা; অপমান-অভিমানে পর্যুদস্ত শোভন সংকল্প করল দেশত্যাগের। বিদায়-মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়াল অনীতা, যন্ত্রণাজর্জরিত মনে সেও চলেছে সে-দেশ ছেড়ে, যাওয়ার আগে শুধু একবার শোভনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে চায় সে। অপমানে নিপীড়িত দুই মানবাত্মা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল এক শুভলগ্নে, নতুন দিগন্ত প্রসারিত হল শোভনের চোখের সামনে,—জীবন কি এতই সহজে ফুরিয়ে যায়? না, যায় না। দৃঢ় অকম্পিত হৃদয়ে অনীতার হাত ধরল শোভন, জীবনের পথে নতুন করে যাত্রা সুরু হল ওদের। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক আপন মুন্সিয়ানায় এই কাহিনীকে অবিশ্বাস্যরূপেই প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, ভাষার ঔজ্জ্বল্যে ও প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতায় তাঁর রচনা এক অনবদ্য শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। পড়তে পড়তে মন তলিয়ে যায় কাহিনীর মাঝে, পাঠ শেষেও তাঁর রচনার দীপ্ত সৌন্দর্যে মন অভিভূত হয়ে থাকে। প্রচ্ছদ নয়নাভিরাম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশক, ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো/ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড' নামে মূল রুশ গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের এই সরল বঙ্গানুবাদ, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে। সোভিয়েট রাশিয়ার এক বৃহৎ অংশ যে জাতীয় মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত, সেই কসাকদের এক অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই মহতী গ্রন্থে। সমবায় পদ্ধতিতে যে কৃষি-ব্যবস্থা সরকার থেকে চালানো হয়েছে, তার সম্বন্ধেও এক পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মায় বইটি পড়লে, রাশিয়ার গ্রামীণ মানুষ, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, দোষ-গুণ নিয়ে যেন একেবারে জীবন্ত মানুষেরই মত এসে ভিড় করে দাঁড়ায় পাঠকের মননে। লেখকের সহজ শৈলী ও অকৃত্রিম আবেগে তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত ও বিশ্বাস্য। অনুবাদকও তাঁর কর্মে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—মিখাইল শলোখফ, অনুবাদ—সত্য গুপ্ত, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।



● ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি ব্যুরো প্রাইভেট লিমিটেডের তৃতীয় রজত জয়ন্তী উৎসবে ভাষণরত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযাদুগোপাল বসু। পার্শ্বে উপবিষ্ট সভাপতি—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, প্রধান অতিথি—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

॥ ধারাবাহিক জীবনী রচনা ॥

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৭৬

'তুমি কি কাউকে দেখেছ এদিকে?' স্বরূপ-দামোদর এগিয়ে এসে জিগগেস করল জেলেকে।

'কই আর দেখলাম! তবে ধরেছি একজনকে।' বললে জেলে।

'ধরেছ? কে সে?'

'কে জানে কে! মরে পড়ে আছে। কী প্রকাণ্ড শরীর—'

'কী করে ধরলে?'

'আর কী করে! জাল বাই, জালেই ধরেছি।' ভীত-ত্রস্ত চোখে বলতে লাগল জেলে, 'জাল টানতে গিয়ে দেখলাম বেজায় ভারি, ভাবলাম কতবড় মাছ না জানি পড়ল! ও হরি, মাছ কোথায়, এ যে দেখি একটা মরা মানুষ! ওটাকে না ছুঁয়ে তো জাল থেকে ছাড়ানো যায় না, কিন্তু যেমনি ছোঁয়া অমনি সেই মড়ার ভূতটা আমার কাঁধে চেপে বসল! তারই জন্যে দেখছ না কেমন পাগল হয়ে গিয়েছি। শুধু কাঁধে চাপা নয়, ভূতটা একেবারে বুকের মধ্যে গিয়ে বসেছে। এমন ভূতের কথা তো শুনি নি কোনোদিন। এ আমার কী হল?'

'সেই দেহ তুমি কোথায় রেখে এসেছ?' স্বরূপ আকুল হয়ে প্রশ্ন করল।

'ওরে বাবাঃ, সে কী দেহ, পাঁচ-সাত হাত লম্বা হবে। হাড়ের জোড় সব আলগা হয়ে গিয়েছে, চামড়ার সঙ্গে লেগে থেকে নড়বড় করছে, দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। এ কী ধরণের ভূত তা কে বলবে?'

'আছে কোথায়?'

'মাঝে-মাঝে আবার গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।'

'এই যে বললে মরে গেছে, তবে আবার শব্দ করছে কী করে?'

'লোকটা মরে গেছে, শব্দ যা হচ্ছে তা ভূতের শব্দ। আমার কী হবে?' জেলে কাঁদতে লাগল: 'আমি মরে গেলে আমার স্ত্রী-পুত্রের কী হবে!'

'আমাকে সেই ভূতের কাছে নিয়ে চলো।'

'কী সর্বনাশ! সেইখানে আবার আমি যাব! চোখ উল্টে পড়ে আছে, আবার মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে। এ ভূত একেবারেই মামুলি নয়—অসাধারণ ভূত! রাত্রে কত নির্জনে মাছ ধরি আর ভূত-প্রেত যাতে না উপদ্রব করে তার জন্যে নৃসিংহের নাম নিই। এই নতুন ভূত নৃসিংহকেও হার মানাল।'

'কী রকম?'

'নৃসিংহের নাম শুনলে অন্য ভূত পালিয়ে যায়, আর এই নতুন ভূতকে শুনিয়ে যত নৃসিংহ-নৃসিংহ বলছি ততই সে আমাকে চেপে ধরছে। ঐ সাতহাতী দেহের তিন হাত লম্বা হাত চেপে ধরলে বাঁচি কী করে?'

'তা তুমি চলেছ কোথায়?'

'ওঝার বাড়িতে। ভূতটা কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিতে। তবে ভূত যা প্রচণ্ড, ওঝা পারে কি না কে জানে।'

'তোমার ঐ ওঝা পারবে না।'

'পারবে না? তা হলে আমি কোথা যাব?' জেলে কাঁদতে লাগল।

'শোনো, আমিও ওঝা। তোমার ওঝার চেয়ে বড় ওঝা। আমি তোমার ভূত ছাড়িয়ে দিচ্ছি। এস এগিয়ে।'

'তুমি ছাড়িয়ে দেবে?' দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে জেলে এগিয়ে এল: 'আমার এ অস্থির ভাব সুস্থ হবে?'

মন্ত্র পড়ে স্বরূপ তার হাত জেলের মাথায় রাখল। রেখে তিনটা চড় মারল। বললে, 'ভূত আর নেই।'

'নেই?' প্রসন্ন স্বচ্ছতায় হাসল জেলে।

'তোমার ভয়ের অস্থিরতা চলে গেল।'

'সত্যি, আমার আর ভয় নেই।'

'কিন্তু তোমার আরেক অস্থিরতা থেকে গেল।' স্বরূপ হাসল: 'সে যাবে না। সে যাবার নয়।'

'সে আবার কী!'

'সে প্রেমের অস্থিরতা। শোনো', স্বরূপ গদগদ-গভীর কণ্ঠে বললে, 'তুমি যাঁকে জালে টেনে তুলেছ তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।'

'না, না, তিনি নন।' জেলে জোর গলায় বললে, 'আমি প্রভুকে দেখেছি তিনি এমন বিকৃত-আকার নন।'

'এ তাঁর প্রেমবিকার। এ বিকারে শরীর দীর্ঘ হয় অস্থি সন্ধি শিথিল হয়ে যায়। তিনি নিশ্চয়ই প্রেমাবেশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন আর তোমার এমন ভাগ্য—'

'বলেন কী। আমি প্রভুকে স্পর্শ করেছি?'

'তিনিই কৃপা করে এ স্পর্শ ঘটিয়েছেন আর তার ফলে তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয়েছে। এখন চলো প্রভুর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।'

'যাবেন?' জেলের আর ভয় নেই, প্রেমে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'তবে আর দেরি করবেন না। সমুদ্রতীরে একা শুয়ে আছেন—চলুন, ছুটে চলুন।'

শুধু স্বরূপ নয় আরো সকলে ছুটল।

দীর্ঘ শিথিল দেহে উত্তান-নয়নে শুয়ে আছেন প্রভু। অনেকক্ষণ জলে থাকায় দেহ শাদা হয়ে গিয়েছে, বালি লেগে আছে আদ্যোপান্ত। দূরের পথ, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কঠিন। এইখানেই কৃষ্ণনাম কীর্তন সুরু কর।

আর্দ্র কৌপীন ফেলে দিয়ে শুষ্ক কৌপীন পরানো হল। দেহের বালি ঝেড়ে দিয়ে শোয়ানো হল বহির্বাসে। এবার উচ্চগ্রামে প্রভুকে কৃষ্ণনাম শোনাও।

প্রভুর কানে কিছুক্ষণ কৃষ্ণনাম প্রবেশ করতেই প্রভু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। উঠতেই তাঁর শরীর স্বাভাবিক হয়ে গেল, হাড়ে হাড়ে সন্ধি লাগল। অর্ধবাহ্যদশায় এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

প্রভু তিন দশায় থাকেন, হয় অন্তর্দশায় নয় বাহ্যদশায় নয় বা অর্ধবাহ্যদশায়। অন্তর্দশায় বাইরের কোনো কিছু জ্ঞান বা স্মৃতি থাকে না। এই দশায় প্রভু কখনো রাধিকা, কখনো বা গোপী আর যেখানে আছেন তা বৃন্দাবন। বাহ্যদশায় বাইরের বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান থাকে। আধো জাগ্রত আধো ঘুমন্ত ভাবই অর্ধবাহ্যদশা। যেন স্বপ্নের আবহাওয়ায় সমস্ত চলছে-ফিরছে, চিনেও চিনছেন না, শুনেও শুনছেন না এমনি উদাসীন।

অর্ধবাহ্যদশায় প্রভু এখন গোপী হয়েছেন।

'এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥'

এই বিহারে কামগন্ধলেশ নেই, নেই স্বসুখবাসনা, তাই রাসলীলা নিবৃত্তি করা। কৃষ্ণ চায় ব্রজবালাদের সুখ, ব্রজবালারা চায় কৃষ্ণের সুখ। 'কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।' এ প্রেম নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল থেকেই বর্তমান। গোপীকৃষ্ণের কী নয়? সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী শিষ্যসখী পরিচারিকা। সর্বভাবে কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্যে প্রস্তুত। আর গোপীদের মধ্যে রাধিকাই অত্যন্তবল্লভা।

'সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা—রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা॥'

শোনো, আমি কী দেখলাম।

দেখলাম যমুনা, যমুনা দেখে চলে গেলাম বৃন্দাবন। দেখলাম রাধিকা ও গোপীদের নিয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন মহারঙ্গে জলকেলি করছেন। আমি তীরে দাঁড়িয়ে সখীদের নিয়ে রঙ্গ দেখছি।

যেসব পট্টবস্ত্র পরে কৃষ্ণ ও তাঁর কান্তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সেসব ছেড়ে সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র পরে নিলেন। অলঙ্কারও খুলে রাখলেন। বস্ত্র-অলঙ্কার সখী মঞ্জরীর হেপাজতে রেখে জলে নামলেন।

দেখ-দেখ জলকেলিরঙ্গ দেখ। কৃষ্ণ করিবর আর গোপীরা করিণী। হাতিরা শুঁড় দিয়ে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে, এরা হাত দিয়ে করছে। ফেলাফেলি হুড়াহুড়ি চলেছে। এ এক তুমুল জলযুদ্ধ। কে জেতে কে হারে কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারছে না। গোপীরা বিদ্যুতের মালা আর কৃষ্ণ নবীন মেঘ। কখনো মেঘের জয় কখনো বা বিদ্যুল্লতার। যুদ্ধের প্রথম পর্ব শুধু 'জলাজলি'—শুধু জলছোঁড়াছুঁড়ি, পরে 'করাকরি', হাতাহাতি—এ ওকে ধরতে চায় ও একে ঠেলে সরিয়ে দেয়। পরে যুদ্ধ 'মুখামুখি'—অধরে অধর স্পর্শ। তারপরেই 'হৃদাহৃদি'—আলিঙ্গন।

'যত গোপসুন্দরী   কৃষ্ণ তত রূপ ধরি
সভার বস্ত্র করিল হরণে।

যমুনা জল নির্মল অঙ্গ করে ঝলমল
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥
পদ্মিনীলতা সখীচয়ে কৈল কারো সহায়ে
তরঙ্গ হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহো মুক্তকেশপাশ আগে কৈল অধোবাস
স্বহস্তে কঞ্চুলি করিল ॥'

জলকেলির শেষে বিধিমত স্নান করলেন সকলে। তারপরে শুষ্কবস্ত্রে অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে গেলেন রত্ন মন্দিরে। পরে বৃন্দাবনের বনদেবী বৃন্দা তার সম্ভার এনে ধরল, সুগন্ধি ফুলের অলঙ্কার—আর তাইতেই সকলে বেশরচনা করলে। বৃন্দাবনের তরুলতা বারোমাস ফুলফল ধরে—সমস্ত এসে উপস্থিত হল। এল বিচিত্র মিষ্টান্ন। সকলে মিলে বন্যভোজন করলে। তারপর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে শয়ন করলে আর সখীরা কেউ বীজন করতে লাগল, কেউ বা পাদসংবাহন। সখীদের সেবা আর রাধাকৃষ্ণের ঘুম দেখে আমার মন আনন্দে বিভোর হয়ে উঠছে, তোমরা হঠাৎ এসে মহা কোলাহল সুরু করে দিলে। এখন কোথায় আমার বৃন্দাবন কোথায় বা রাধাকৃষ্ণ কোথায় বা যমুনা! আমার সকল সুখের অবসান হল!

ক্রমে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল প্রভুর। স্বরূপকে জিগগেস করলেন, আমাকে তোমরা এ কোথায় নিয়ে এলে?

স্বরূপ তখন সমস্ত বললে। দেখ এই জেলে যে তোমাকে তুলেছে জল থেকে, যাকে তোমার স্পর্শ দিয়ে প্রেমমত্ত করেছ। তুমি তো মূর্ছাছলে বৃন্দাবনে লীলা দেখছিলে আর আমরা তোমার মূর্ছার চারদিকে অন্ধকার দেখছি।

স্নান করবে এস। তারপরে ঘরে চলো।

প্রভু জগদানন্দকে ডাকালেন। বললেন, 'নদীয়ায় যাও। নদীয়ায় গিয়ে আমার মাকে আমার প্রণাম দিও। শুধু মুখে বললে হবে না, আমার হয়ে তুমি আমার মায়ের পা দু'খানি ধরে প্রণাম করবে। মাকে বোলো, তিনি আমাকে রোজ স্মরণ করেন তা আমি জানতে পারি, আর আমিও রোজ গিয়ে মাকে প্রণাম করি, তা কি তিনি জানেন? আরো বোলো, যেদিন তিনি আমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করেন সেদিনই আমি তাঁর দেওয়া খাবার তাঁর পাশে বসে খেয়ে আসি। মায়ের সেবা ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে আমি বাতুলের কাজ করেছি। ধর্মের জন্যে সন্ন্যাস নিয়েছি কিন্তু মাতৃসেবার মত ধর্ম কোথায়? এ সবও তাঁকে বোলো—যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন, বোলো, সন্ন্যাস নিয়েছি বলেই আমি আমার পুত্রসম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলি নি। এই যে আমি নীলাচলে আছি তাঁর আদেশেই আছি আর যতদিন এ জীবন আছে, নীলাচল ছাড়ব না। আমি মায়ের অধীনতা স্বীকার করেই বেঁচে আছি এখনো। সব তাঁকে বুঝিয়ে বোলো।'

আর নিয়ে যাও প্রসাদ আর প্রসাদীবস্ত্র। মাকে দিও।

জগদানন্দ নবদ্বীপে এসে শচীমাতাকে সব দিলে, সব বললে।

এক মাস থেকেই ফিরে চলল নীলাচল। মাগো যাই আবার তোমার ছেলের কাছে।

অদ্বৈত বললে, 'আমার একটি নিবেদন প্রভুর চরণে নিয়ে যাও।'

'কী, বলো।'

'একটু হেঁয়ালি করে বলব। প্রভু ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।'

'সে আবার কী কথা!'

অদ্বৈত বললে, নাও মুখস্থ করে নাও।

'বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল॥'

সত্যিই গো এ তর্জার মানে কিছুই বুঝতে পারছে না জগদানন্দ। আর কেউ পারছে? কেউই তো উচ্চবাচ্য করছে না।

নীলাচলে ফিরে এসে প্রভুকে জগদানন্দ বললে সে হেঁয়ালি। প্রভু মৃদু হাসলেন। বললেন, 'তাই হোক, আচার্যের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

জগদানন্দ তো থ।

প্রভু বুঝেছেন কী গূঢ়ার্থ। বাউলকে কহিয়—মানে বাতুলকে, কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত চৈতন্যদেবকে বোলো, লোকে সকলেই প্রেমোন্মত্ত হয়ে উঠেছে। চাউল অর্থ কৃষ্ণপ্রেম। সকলেই প্রেমোন্মত্ত হয়েছে বলে

প্রেমের হাটে চাউলের আর গাহেক নেই। বাড়িতে নিজের নিজের ভাণ্ডারেই যদি যথেষ্ট চাল থাকে তা হলে কে আর হাটে যায় সওদা করতে? দোকানীরা তাই অনর্থক বসে আছে দোকান খুলে, খদ্দের নেই। দোকানদার অর্থ কীর্তক-কথক প্রচারকের দল। তাদেরও কাজে মানে প্রেমবিতরণের কাজে ব্যস্ততা বা আগ্রহ নেই। বাউলের কৃপায় সকলে নির্বিচারে কৃষ্ণপ্রেম পেয়ে গেছে, দোকানীরা আর তবে কাদের কাছে মাল গছাবে? এই সোজা কথাটা বোলো বাউলকে, বোলো আরেক বাউলের কথা, অর্থাৎ আরেক প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈত আচার্যের কথা।

স্বরূপ গোঁসাইও বুঝতে পারে নি তর্জা। মহাপ্রভুকে বললে, 'অর্থের ব্যাখ্যা করে দিন।'

প্রভু ঘুরিয়ে বললেন, 'আগমশাস্ত্রের বিধান জানো তো? পূজার জন্যে দেবতাকে আবাহন করতে হয়, যতক্ষণ পূজা না শেষ হয় দেবতাকে রাখতে হয় আটকে আর পূজা শেষ হলেই বিসর্জন। কে জানে তর্জার কী অর্থ!'

পরোক্ষে বললেন, কিন্তু কে বোঝে! বলতে চাইলেন, অদ্বৈত আমাকে আবাহন করে এনেছিল জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের জন্যে। যতক্ষণ প্রেম প্রচারের কাজ চলছিল রেখেছিল আমাকে ধরে বেঁধে, আর যেই দেখলে আর প্রয়োজন নেই, সরাসরি বিদায় দিয়ে দিল আমাকে।

কী আশ্চর্য, প্রভু বলছেন এ তর্জার মর্মার্থ তাঁর কাছেও অগোচর।

কিন্তু পূজা নির্বাহ হলে বিসর্জন দিতে হয় এ ইঙ্গিতের তাৎপর্য কী? স্বরূপ বিমনা হয়ে গেল। প্রভু কি তবে লীলাসম্বরণের কথা ভাবছেন? হাটে চাল আসার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে?

সেইদিন থেকে প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদদশা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। অনুক্ষণ রাধাভাবাবেশে দিব্যোন্মাদের আচরণ সুরু করলেন। সখী ভেবে রামানন্দের গলা ধরে প্রলাপ বকতে লাগলেন, আমার নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? এমন প্রিয়তম সুহৃত্তমের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটায় সেই বিধাতাকে ধিক। সখি, একবার কৃষ্ণকে দেখাও, কৃষ্ণকে ডেকে নিয়ে এস। সেই তমাল-দ্যুতিকে আরেকবার দেখি। কৃষ্ণের রূপ যদি একবার চোখে লাগে, চোখ থেকে হৃদয়ে গিয়ে বসে, আর তাকে হটানো যায় না, আঠার মত সে এঁটে বসে। কী আশ্চর্য, তাঁর মুরলীধ্বনিও আর শুনি না। বাঁশিই যদি না বাজে এই গৃহনির্জর ছিন্ন হবে কী করে? কোথায় সেই রাসরসতাণ্ডবী কলানিধি? যে আমার প্রাণরক্ষার একমাত্র মহৌষধি তাকে না পেয়েও আমি এখনো জীবিত আছি এমন যার বিধান সেই বিধাতাকে ধিক। যে বাঁচতে চায় না অথচ তাকে বাঁচিয়ে রাখে এই বিধান তো স্পষ্ট প্রতারণা।

এ কী বালকের মত ব্যবহার! দয়ার লেশমাত্র তো নেইই, বুঝতেও পারে না প্রণয়ে একবার সংযুক্ত করে মনোরথ পূর্ণ না করে বিযুক্ত করার দুঃখ। এ কি কোনো বিচক্ষণের ব্যবস্থা না কি এক অর্বাচীন বালকের পরিহাস? তৃষ্ণার্তের হাতে জলপাত্র দিলে, আর যেই সে-পাত্র সে ঠোঁটে ঠেকিয়েছে তখুনি তার হাত থেকে তা কেড়ে নিলে—এর মধ্যে নির্মমতার চেয়েও মূর্খতাই বেশি। একমাত্র অবোধ বালকেই সম্ভব এই মূর্খতা! না বোঝে প্রেমধর্মের মহিমা, না বা নিজের সৃষ্টির মর্যাদা। নইলে সঙ্গবাসনা দিল, কিন্তু যেই সে বাসনা সিদ্ধ হবার অভিমুখে যাত্রা করল অমনি এনে দিল বিয়োগ-বিচ্ছেদ, এনে দিল ব্যবধান। যারা অনন্যদুর্লভ তারা তো একমাত্র প্রেমেই মিলিত হতে পারে। তাদের মধ্যে বিধি প্রেম দিলে উন্মুখতা দিলে সম্মিলনের সুযোগ দিলে, তারপর চরম মুহূর্তে এনে দিল বিপ্রয়োগ—এ দত্ত-অপহার পাপ ছাড়া আর কী! দিয়ে যে ফিরিয়ে নেয় সে বালকের চোখেও তরলচপল। কিন্তু আসলে বিধি তার চেয়েও বেশি। দুষ্ট আর ধৃষ্ট তো বটেই, সর্বোপরি নিষ্ঠুর।

জানি বলবে, আমি কী করব, অক্রূরই এই দুষ্কার্য করেছে, কিন্তু আসলে তুমিই তো ধরেছিলে ঐ অক্রূর-মূর্তি, চুরি করে নিয়ে গেলে কৃষ্ণকে। তুমি ছাড়া চৌর্যে কার এত নৈপুণ্য! তুমি ছাড়া মায়ামমতায় কার এত উপেক্ষা! নিজের দোষ পরের উপর চাপিয়ে দেবার আগ্রহ!

[ক্রমশ।

সম্পাদকীয়

একটি আলোর অবসান ঃ এলিয়ট

'We are the hollowmen
We are the stuffed men
Leaning together
Head piece filled with straw.'
—*T . S. Eliott.*

পশ্চিমের কাব্যজগতে সম্প্রতি যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে ডেম এডিথ সিটওয়েলের লোকান্তরে—কবি এলিয়টের দেহান্তর সেই শূন্যতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি ঘটাইল।

এলিয়টের মৃত্যু শুধু যে, কাব্যলোকেরই এক বিরাট ক্ষতি তাহা নয়, এলিয়টের মহাপ্রয়াণে এক বিদগ্ধ নাট্যকার ও অভিজ্ঞ সমালোচককে হারাইল। সংস্কৃতির নানা অলিন্দে তাঁহার পদার্পণ ঘটিলেও, সংস্কৃতির নানা বিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠতর সংযোগ থাকিলেও মূলের বিচারে এবং অন্তরের আহ্বানে তিনি কবি। তাঁহার নিজের অভিমতেও তিনি কবি হিসাবেই ভাবীকালের দরবারে বাঁচিয়া থাকিবেন অর্থাৎ আগামী দিনের পৃথিবীর রসপিপাসু নরনারীর চেতনায়, স্মৃতিতে, চিন্তায় কবি হিসাবেই তিনি অম্লান মহিমায় দীপ্তিমান হইয়া বিরাজিত থাকিবেন।

বর্তমান শতকের পাশ্চাত্য কবিতায় নব-যুগের সৃষ্টি এবং তাহাতে নব ভাবধারার আমদানী, তাহার গঠনে, ধেয়ানে এবং স্বপনে পরিপূর্ণরূপে নবরূপদান এলিয়টের কাব্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। উনবিংশ শতাব্দীর অবসানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বিদেশের কাব্যজগৎ যে নবতর দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবধারা ও প্রকাশরীতির সম্মুখীন হইল তাহার মূলে এলিয়টের অবদান অগ্রগণ্য। জীবনকে নূতন করিয়া দেখার যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ সেদিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার গৌরব যাঁহাদের অবশ্যপ্রাপ্য সেই তালিকায় তিনি এক উজ্জ্বল নাম।

এলিয়ট আমেরিকার সন্তান হইলেও বৃটেনের নাগরিক। বৃটেন কাব্যের লীলাভূমি, পৃথিবীর অসংখ্য কবিকে বিশ্ব-সাহিত্যের সীমাহীন গগনের অনেকানেক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বক্ষে ধারণ করিবার গৌরব বৃটেনের অবিসম্বাদিত। হয়তো প্রকৃতপক্ষে সেই কারণেই ভবিতব্য অনুসারে যুক্তরাজ্যই যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই মহান কবিকে তাঁহার যুগে যুগে সঞ্চিত অফুরন্ত ঐতিহ্যের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আপন গৌরবময় অঙ্কে টানিয়া লইল।

এই শতাব্দীর ইংরাজ কবিবৃন্দের মধ্যে পৃথিবীর কাব্যভক্ত সংখ্যাতীত নরনারীর সর্বাপেক্ষা পরিচিত নোবেল-পুরস্কার জয়ী, অর্ডার অফ মেরিট ভূষিত কবি এলিয়ট কিন্তু অনায়াসে কুসুমাস্তীর্ণ পথে সাফল্যের সহিত করমর্দন করিতে পারেন নাই। তাঁহার যাত্রা শুরু হয় কঠোর দুর্দম বাধাকে সম্মুখে রাখিয়া অসংখ্য সমালোচনার তীরে বিদ্ধ হইয়া। ঘরের মঙ্গলশঙ্খ যাত্রালগ্নে তিনি শুনিতে পান নাই। সন্ধ্যার দীপালোক তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। নির্দিষ্ট ছিল কেবল কালবৈশাখী ও শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ। পথরোধ করিবার জন্য গুপ্ত সর্পের গূঢ়ফণা, ধাত্রী হিসাবে ধূসর পথের ধূলিকণা দুর্দান্ত ঝড়ের শঙ্কাকুল রাত্রিই অভিসারের উত্তম লগ্ন হিসাবে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু মূলধন ছিল অফুরন্ত স্বপ্ন। প্রাণজয়ী প্রত্যাশা তাহাই তাঁহাকে উপনীত করিল সার্থকতার সপ্তস্বর্গে।

গতানুগতিকতা কখনও সকল মানুষের মনে বাসা বাঁধিতে পারে না। একদিকে প্রাচীনপন্থীরা যখন সনাতন ভাবধারা, প্রকাশভঙ্গী, বিন্যাসরীতিকে সবেগ অপসৃয়-মানতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া আছেন, অন্যদিকে তখনই মানুষের পিপাসুমন ক্রমশই নূতনত্বের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে—সেই সময় এলিয়টের আবির্ভাব। তাঁহার আবির্ভাব ইংরাজী কাব্যে এক স্বতন্ত্র রীতি উদ্ভাবনেরই নামান্তর মাত্র। যাহা সত্য, তাহা সর্বতোভাবে সত্য। সত্যকে কখনও কোন আবরণের মধ্যে প্রকাশ করা চলে না। সে চেষ্টা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সত্য আপনাতে আপনিই বিকশিত, আপন মহিমায় সে মহিমান্বিত, তাই তাহার প্রকাশের জন্য কোন অবাস্তবতার আশ্রয় গ্রহণ অপ্রয়োজন তো বটেই, অনুচিতও। তাহার মধ্যে কঠোরতা ও দুর্বোধ্যতা থাকিলেও তাহার অবিকল প্রকাশ ঘটানোই বিধেয়, ইহাই ছিল এলিয়টের কবি-জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রের

সাহায্যেই এলিয়ট আপনাকে উন্মোচিত করিয়াছিলেন। এই ভাবধারাই পল্লবিত হইয়াছিল তাঁহার কাব্যে। দর্শনের ছাত্র এলিয়টের কাব্যদর্শন ইহাই।

ঝড়ের রাতের বিদ্রোহী কবি এলিয়টকে তাঁহার জীবনের বোধনপর্বে ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা উভয়ের কেহই প্রভাবান্বিত করে নাই, করিয়াছিল ফ্রান্স—পৃথিবীর শিল্প, সৌন্দর্যকলার আর একটি লীলাভূমি। এলিয়টের রচনা প্রথম প্রকাশিত ফরাসী ভাষাতেই হয়।

বাঙলা দেশের কাব্যরসিকের নিকটও এলিয়ট আজ আর নিছক বিদেশী নন। তাঁহার কবিতা 'মোদের গরব, মোদের আশা' বাঙলা ভাষার তুলনারহিত লালিত্যে, অনুপম সৌন্দর্যে, অপূর্ব ব্যঞ্জনায় আচ্ছাদিত হইয়া বাঙলার ঘরে ঘরে পরিবেশিত হইয়া বাঙালী পাঠকের গ্রহণধর্মী মনে এক অপূর্ব রসানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে। এলিয়টের কবিতা বাঙালীর আঙিনায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার একদা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে আরও অনেকেই সে ভার লইয়াছেন—সেই তালিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অমরলোকে আজ একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত সমাগত। সেখানে শেক্সপীয়ার, শেলী, কীটস বায়রন, ব্রাউনিং, চসার, সাদে, টেনিসন, মুর, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীমধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ জগৎকবির মেলায় আজ আর একটি আলোকোজ্জ্বল কবির প্রবেশ ঘটিল—তাঁহার নাম—টমাস স্টারনস এলিয়ট।

এশিয়ার দুর্যোগ ঘনীভূত

এশিয়ার ভাগ্যাকাশে আজ কিছুকাল ধরিয়াই এক ব্যাপক দুর্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, ঐ দুর্যোগ উত্তরোত্তর ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে যথেষ্ট পরিমাণে আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ, সে সম্বন্ধে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী দ্বিমত হওয়ার কোন উপায় নেই।

ইহাও ঠিক যে, এই দুর্যোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা যে শুধু এশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহা নয়, তাহার রেশ ছড়াইয়া পড়িবে সমগ্র পৃথিবীতেই, সারা পৃথিবীকেই এই দুর্যোগের ঘনঘটার সম্মুখীন হইতে হইবে, এই অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতে হইবে।

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা মোটেই সুখকর নয়, যথেষ্ট পরিমাণেই বিপদের বীজ তাহার মধ্যে অঙ্কুরিত। মালয়েশিয়ার উপর তাহার প্রধান কোপ। মালয়েশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী আখ্যা দিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিতে আজ ইন্দোনেশিয়া বদ্ধপরিকর। ইন্দোনেশিয়াকে শক্তি জোগাইতেছে চীন ও রাশিয়া। মালয়েশিয়ার পশ্চাতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের সমর্থনও মালয়েশিয়ার দিকেই। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মালয়েশিয়ার যে সঙ্ঘর্ষ তাহা পৃথিবীর বৃহত্তম পাশ্চাত্যগোষ্ঠীর মধ্যেও অনায়াসে সংক্রামিত হইতে পারে। এই সঙ্ঘর্ষ শেষে এক বিশ্বব্যাপী সংগ্রামকেও ডাকিয়া আনিতে পারে, যদি অবিলম্বে ইহার প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয়।

চীনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। দেখা যাইবে চীনের দরিয়ায় মার্কিন সাবমেরিন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কি বহন করিয়া আনিয়াছে? আনিয়াছে পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র। চীনের দৈনন্দিন নগর জীবনও ইহাতে আজ আর স্বাভাবিক নাই। ধারণ করিয়াছে এক অস্বাভাবিক রূপ। দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে অস্বাভাবিকতার ছাপ পড়িয়াছে। চীনের ন্যায় পররাজ্যগ্রাসধর্মী রাষ্ট্র ইতাবসরে কি করিয়া ফেলিতে পারে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন, তাহা না হইলে কি ঘটিয়া যাইবে তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

সায়গন কিছুকাল সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আছে। সংবাদপত্রগুলির বিরাট অংশ, শিরোনামা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ণ হইতেছে ও রূপ লইতেছে। এখানকার আভ্যন্তরীণ বিবাদ ক্রমশই এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া চলিতেছিল—দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আমেরিকার সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট। বর্তমানে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব শ্রীডীন রাস্ক ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ যদি আশ্বাস দেয় যে, তাহারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতি আক্রমণের মনোভাব ত্যাগ করিবে ও তাহার দিকে ধ্বংসাত্মক বাহু প্রসারিত করিবে না তাহা হইলেই আমেরিকা সেই স্থান হইতে তাহার বাহিনী সরাইয়া লইবে।

এশিয়ার সমস্যাময় অঞ্চলগুলির মধ্যে কাশ্মীর অন্যতম। দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাহা চলিতেছে তাহা কাহারও অজানা নয় এবং সে সম্পর্কে আনুপূর্বিক আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। বর্তমানে কাশ্মীরের অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা পাকিস্তান করিতেছেন। কাশ্মীরে পাকসৈন্যদের উত্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়া যাওয়ায় কাশ্মীরের সমস্যা আরও তীব্রতর আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা বহন করিতেছে। তাহা ছাড়া পাকিস্তানে সাম্প্রতিক নির্বাচন সমাপ্ত হইবার

পর জয়ের উল্লাসে আয়ুব খাঁর অনুচরেরা যে নারকীয় বীভৎস ও তাণ্ডবনৃত্য অবাধে চালাইয়া যাইতেছে, তাহা সমগ্র সভ্য সমাজকে শিহরিত করিয়া তোলে এবং এক ঘোরতর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট জনসন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিজিনকে আমেরিকা-সফরে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। ইহার দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী যেভাবে এক সমস্যাসংকুল মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে সেই সম্পর্কে কোন স্থায়ী সমাধানের পন্থা সন্ধানের জন্যই তাঁহারা মিলিত হইতেছেন। এই মিলনে হয়তো আরও একটি শক্তি যুক্ত হইতে পারে—যুক্তরাজ্য। পৃথিবীর এই বৃহত্তম তিন শক্তি মিলিত হইয়া সারা বিশ্বকে নিদারুণ দুর্যোগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া তাহার তাপদগ্ধ বক্ষে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ঘটাইতে পারেন। হয়তো জনসন-কোসিজিন বৈঠকে আলোচনার সূচীপত্রে ভারতের বিশেষ বিশেষ আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিও স্থান পাইতে পারে। যাহাই ঘটুক এশিয়ার সাম্প্রতিক বিপদসঙ্কুল ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া ভারত সরকারের অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক থাকা উচিত। ভারত শত্রুশূন্য নয়। কখন কোন মূর্তিতে কোথা হইতে বিপদ আসিবে তাহা বলা কঠিন। অতএব ভারতীয় নেতৃবৃন্দ চুয়াল্লিশ কোটি নরনারীর নিরাপত্তার জন্য তাহার প্রতিরোধ মানসে সর্বশক্তির সর্ব বুদ্ধি ও সর্বচিন্তা নিয়োজিত করুন এই পরিস্থিতিতে ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য।

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচন

পাকিস্তানের নির্বাচনের ফল ঘোষিত হইল। যে নির্বাচন বেশ কিছুকাল ধরিয়া পাকিস্তান ও বহিঃপাকিস্তানের অসংখ্য নরনারীর মধ্যে এক বিরাট কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল এবং তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি যেদিকে স্থিরনিবদ্ধ ছিল তাহা শেষ হইল, প্রচারিত হইল আয়ুব খাঁ জিতিলেন অর্থাৎ পাকিস্তানের আয়ুবশাহী স্বেচ্ছাচারিতা ও ফিল্ড মার্শালসুলভ কঠোর শাসন, স্বৈরনীতিতে প্রতিষ্ঠিত শাসননীতি আরও পাঁচটি বৎসরের পরমায়ু লাভ করিল।

বর্তমান পৃথিবীতে যাঁহারা গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা উৎসর্গচিত্ত—আয়ুবের জয়লাভ নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যথা ও বেদনার সঞ্চার করিবে। ইতিহাসে আমরা বিগত যুগের নৃপতি ও শাসকবৃন্দের নানাবিধ পাশব-অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, বর্তমান যুগের পটভূমিতে সেগুলিকে আজ 'বিগতযুগসুলভ ব্যাপারসমূহ' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। কিন্তু আয়ুব খাঁর বর্তমানকালের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া পূর্বোক্ত ধারণা বদলানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।



প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আয়ুব খাঁর প্রবেশ। তাঁহার পূর্বসূরীদের তুলনায় তিনি নানা দিক দিয়া পৃথক বলিয়া পর্যবেক্ষকমহলে প্রতিভাত হইলেও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহারা এক সুরে বাঁধা, ভারতের প্রতি বিদ্বেষে এবং পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের প্রতি অকথ্য ও অবিরাম নির্যাতন পরন্তু আয়ুব এই কর্মে পূর্বসূরীদের রেকর্ডও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এবং এইখানেই ভারতের উদারতা ও মহত্ত্ব যে, আয়ুবের জয়লাভে ভারতের রাষ্ট্রনায়কের দ্বারা অভিনন্দন-বাণী প্রেরিত হইয়াছে। আশ্চর্যের এখানেও শেষ নয়, তাহার পরেই আয়ুব আবার হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন ভারতকে আমেরিকার সাহায্যদানকে কেন্দ্র করিয়া। খাঁ সাহেবের মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আজ থাকিত তাহা হইলে তিনি এই কথাটি নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইতে পারিতেন না যে, আমেরিকার কাছে পাকিস্তান যে পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছে তাহার তুলনায় ভারত কিছুই পায় নাই।

আয়ুবের এই নির্বাচনী সংগ্রামে জয়লাভকে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু বলিলে বিন্দুমাত্র মিথ্যা ভাষণের দোষে দুষ্ট হইবার অবকাশ থাকে না।

যদিও এই নির্বাচনে ভারতীয় নরনারীর আগ্রহের অবধি ছিল না, তথাপি ইহা অতীব স্পষ্ট যে, ইহা

সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার। নির্বাচনে যদি ফাতেমা জিন্নাই জয়লাভ করিতেন তাহা হইলে ভারতের কোন লাভ হইত ইহা বলা চলে না। তবে পাকিস্তান হয়তো বর্বরোচিত অত্যাচারের পরিবর্তে কিছুটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিত। ফাতেমা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তবে, ভারতের প্রতি তাঁহারও যে মিত্রতার অভাব তাহাও আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তিনি ভারতকে যেসব অংশ দান (?) করা হইয়াছে তাহার জবাবদিহি চাহিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বারা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের যে কিছু উন্নতি ঘটিত বা সেখানকার অবশিষ্ট হিন্দুদের কোন বিপন্মুক্তি ঘটিত এরূপ স্বপ্নও যিনি দেখেন তাঁহার সহিত যাঁহার তুলনা চলে তাঁহাকে আর যাহাই বলা চলুক অন্তত স্থিরমস্তিষ্ক বলা চলে না।

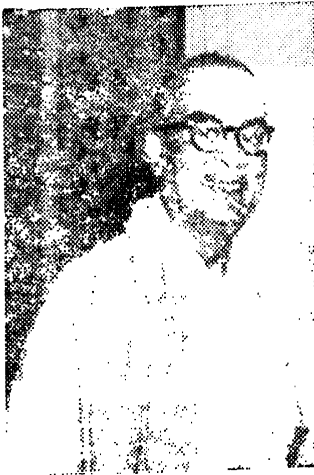
এই নির্বাচনে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ একটি বিরাট শূন্যতাও বিশ্বসমক্ষে সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেখা গেল আয়ুবের অত্যাচার-জর্জর পাকিস্তানে তাঁহাকে পরাজিত করিবার মত কোন নেতা নাই, বিরোধীরা একত্র হইয়া যাঁহাকে দাঁড় করাইলেন ইহা মিথ্যা নয় যে, একমাত্র দেশবিখ্যাত অগ্রজের অনুজা ও ছায়া-সহচরী ছাড়া তাঁহার নিজস্ব কোন পরিচিতি নাই।

আয়ুবের শাসনপ্রণালী আগামী পাঁচ বৎসরে কি রূপ পরিগ্রহ করবে তাহা লইয়া আজ নানাবিধ জল্পনাকল্পনা অনুমান হইতেছে। ভারতের প্রতি তাঁহার আচরণ যে কত বন্ধুসুলভ তাহা কাহারও অজানা নয় এবং অতঃপর জয়লাভের আনন্দে আত্মহারা এই বন্ধুত্ব (?) যে আরও কত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্টতাবিহীন। এশিয়ার মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিবার ও সুযোগ পাইলে তাহার সর্বনাশ সাধনের মনোভাবসম্পন্ন রাষ্ট্রের অভাব নাই, তাহাদের সহিত আরও ঘনিষ্ঠরূপে মিলিত হইয়া পাকিস্তানের ক্রিয়াকলাপ কি রূপ লাভ করিবে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সুতরাং ভারত সরকারের এই আশঙ্কাগুলি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবার এবং তৎসম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার যথেষ্ট সময় যে দুয়ার হইতে দূরে নয়, তাহাই আজ বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনের স্থান হিসেবে এবার নির্বাচিত হইল দুর্গাপুর। আশী বৎসরবয়স্ক এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির সহিত বাঙলা দেশের চিরকালীন যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বিদ্যমান, দুর্গাপুরের অধিবেশন সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিল। বাঙলার সন্তান জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির আসনে একদা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বাঙলার সন্তান আজ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষের আসনে সমাসীন, তাই দুর্গাপুরকে অধিবেশনের স্থান হিসেবে নির্বাচন এক বিশেষ তাৎপর্যের স্বাক্ষর বহন করে।



● স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়



● কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ

জাতীয় কংগ্রেসের কর্মভার দেশের স্বাধীনতা লাভের পর বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে দেশের মুক্তির জন্য কংগ্রেস দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইয়াছে, অবশেষে সেই দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ সেই সদ্য-স্বাধীনতালব্ধ দেশের শাসনভার তাহারই হস্তে আসিল। সেই ভার আজও ঐ প্রতিষ্ঠান বহন করিয়া চলিতেছে।

সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকেও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে বা হইতেছে এক্ষণে চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণাশঙ্কা হইতেও আরও একটি মুখ্য সমস্যা ভারতের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—তাহা পারমাণবিক বোমা সম্পর্কিত সমস্যা। এই অধিবেশনে আলোচনার সূচীপত্রে এই সমস্যাটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারতরাষ্ট্র শান্তির উপাসক, সর্বতোভাবে শান্তি নীতিতে বিশ্বাসী। তাই ভারত সরকার হিংসাত্মক কার্যে অগ্রসর হইতে চাহেন না, সেইজন্য পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের বিরোধী, কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভাবিয়া দেখিবার আছে। বোমা নির্মাণ করিয়া অধিকারে রাখা আর যত্রতত্র বা পররাজ্যে নিক্ষেপ করা এক কথা নয়। যাঁহারা গৃহে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার অনুমতি পান তাহা হইলে কি ধরিয়া লইতে হইবে তাঁহারা তাহা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন। আত্মরক্ষা সর্বশাস্ত্রসমর্থিত। অপরের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার মত উপযুক্তভাবে সজ্জিত থাকা যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তিসম্মত এবং তাহাতে শান্তিনীতি হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমরা কোনপ্রকার পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী থাকিব না, প্রকাশ্যভাবে এই ঘোষণা শত্রুর ধ্বংসাত্মক কাজে সহায়তাই করিবে, এই ঘোষণা দেশের স্বার্থের পক্ষেই ক্ষতিকর।

এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করিয়া দুর্গাপুরের লৌহ-অঞ্চলে এক সাড়া জাগিল, এক অভিনব প্রাণপ্রাচুর্যে এবং উদ্দীপনায় সমগ্র লৌহনগর আজ নবরূপ ধারণ করিল। সমগ্র ভারত আজ এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করিয়া দুর্গাপুরে সম্মিলিত হইল। দেশে নানা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা এবং জাতীয় কল্যাণের নানাবিধ শপথগ্রহণ আজ এখানেই অনুষ্ঠিত হইল।

এই অধিবেশনে আজ আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কথা। ভুবনেশ্বর অধিবেশনেও তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে সেদিন কংগ্রেস গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দীক্ষাগ্রহণ করিল। আজ ভারতের এই চরম দুর্দিনে তাঁহার ন্যায় মহান নেতার অভাব সবিশেষ অনুভূত হইতেছে।

আরও একজন আজ আমাদের স্মৃতিকে বিশেষভাবে তরঙ্গায়িত করিতেছেন। তিনি নবীন বাঙলার স্থপতি সর্বোপরি দুর্গাপুরের রূপকার স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাঙলার একটি অজ্ঞাত অঞ্চল যাঁহার সজীব চিন্তা ও লোকোত্তর প্রতিভার যাদুস্পর্শে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হইয়া বাঙলার গর্ব ও গৌরব বহুগুণ বিবর্ধিত করিল এবং তৎসহ অগণিত বঙ্গসন্তানের জীবিকা অর্জনের পথ খুলিয়া দিল—এক অপরিচিত অঞ্চল যাঁহার স্পর্শে পরিণত হইল শিল্পনগরীতে।

॥ শোক-সংবাদ ॥

নিবারণচন্দ্র ঘোষ

পূর্বভারতীয় রেলপথের প্রথম ভারতীয় জেনারেল ম্যানেজার নিবারণচন্দ্র ঘোষ গত ১৭ই পৌষ ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত নিবারণচন্দ্র সর্বপ্রথম রেলবিভাগের কর্মে যোগ দেন ১১৯৪ সালে। নানা দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে আপন কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে তিনি জেনারেল ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশান ও সিভিল এভিয়েশানের ডিরেক্টার জেনারেলের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়াও আরও বহুসংখ্যক সাংস্কৃতিক ও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' ও 'ও-বি-ই' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহামায়া দেবী

প্রাক্তন বিপ্লবী বর্তমানে বিশিষ্ট কাগজ-ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক শ্রীপ্রহ্লাদ দে'র মাতা মহামায়া দেবী গত ৪ঠা অগ্রাণ ৬৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বদান্যতা, অমায়িকতা ও সহৃদয়তা প্রভৃতি মহান বৃত্তিগুলি তাঁকে পরিচিতমহলে একটি সম্মানের আসন দান করেছিল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীতুষারকান্তি মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, আপনার মাসিক বসুমতী শ্রাবণ, ১৩৭১ সংখ্যায় ৫৪৫ পৃষ্ঠায় শ্রীসতীশচন্দ্র দে লিখিত 'আত্মোন্নতি বৈপ্লবিক সমিতির ইতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া প্রীত হইলাম। কিন্তু তৃতীয় অনুচ্ছেদে ৺প্রভাসচন্দ্র দে'র সম্বন্ধে একটি ভুল তথ্য উল্লিখিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, 'পরে ইনি রাজসাহী কলেজের' ইংরাজীর অধ্যাপক হয়েছিলেন। ৺প্রভাসচন্দ্র দে কখনও রাজসাহী কলেজে অধ্যাপনা করেন নাই। তিনি কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে, বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে, কলিকাতার রিপন কলেজে ও মণীন্দ্র নন্দী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বস্তুত, তিনি যখন কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে Senior Professor of English Literature ছিলেন, ১৯১৬ সালে যে মাসে তাঁহাকে Regulation III of 1818 Act-এ Sate Prisoner হিসাবে arrest করিয়া কলিকাতায় আনা হয়। এই তথ্য বর্তমান পত্রলেখক (তাঁহার একমাত্র পুত্র) তাঁহার নিকট হইতেই শুনিয়াছিলেন। এই সঠিক তথ্যটি আপনার পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি—শ্রীপ্রশান্তকুমার দে, ডি ভি সি এ্যাণ্ডারসন হাউস, কলিকাতা।

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর আষাঢ় '৭১ সংখ্যার ছোটদের আসরে প্রকাশিত জনাব জসিমউদ্দিন সাহেব রচিত 'ভাগাভাগি' নামক ছোট গল্পটি পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, কারণ ২৬ বৎসর পূর্বে আমি যখন ৫ম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমার এক সহপাঠীর এই গল্পটি তাহার নামে আমাদের স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশ্য অনেক দিন আগের কথা প্রমাণ কিছু দেওয়া সম্ভবপর নয়, তবে আমার সহপাঠীর গল্পেও দুই ভাই, একটি গরু ও একটি খেজুর গাছ ও একটি লেপ ছিল তাহা আমার স্পষ্টই মনে আছে। সুতরাং আমার মনে হয় জনাব সাহেবের এই গল্পটি মৌলিক নয়, ইহা অনুবাদ, যদি অনুবাদ হয় তবে তাহার স্বীকৃতি কোথাও না দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিয়াছি। আমার মনে হয় লেখকের ইহা স্বীকার করা উচিত ছিল। ত্রুটি মার্জনা করিবেন, নমস্কার, ইতি। সুতফুল হক, ডাফরিন রোড, ধুবড়ী, আসাম।

মহাশয়, সম্প্রতি আমাদের বদলী হয়েছে। এবার থেকে নীচের ঠিকানায় পত্রিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলে বাধিত হব। মাসিক বসুমতী দিন দিন উন্নতির পথে দেখে অত্যন্ত ভাল লাগে। আমি প্রায় ২০ বছরের গ্রাহিকা। বিয়ের পর বসুমতীকে সঙ্গে করেই শ্বশুরবাড়ি এসেছিলাম। এখানেও ১৭ বছর হয়ে গেল। এখন আমার ছেলেমেয়েরাও প্রতিমাসে মাসিক বসুমতীর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। Nun Story-এর অনুবাদ অত্যন্ত সুন্দর লাগছে। শেষ হলে আশা করি আবার কোন ভাল নভেলের অনুবাদ পাব। আপনাদের কুশল এবং মাসিক বসুমতীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা করি। ইতি।—কৃষ্ণা সান্যাল, লক্ষ্ণৌ।

মহাশয়, পত্রারম্ভেই আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আমি চার-পাঁচটা পত্রিকার মাসিক গ্রাহক (যদিও through agent) এবং ১৩৬৭ সাল থেকে মাসিক পত্রিকাগুলি নিয়ে যাচ্ছি। আপনার মাসিক ও সাপ্তাহিক অতি উচ্চস্তরের পত্রিকা। যদি পত্রিকার বিষয় একটা suggestion দিই তবে আমায় ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মধ্যে criminal গল্প বা শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দেখতে কি আশা করতে পারি না। ইতি—শ্রীপ্রফুল্লকুমার গোস্বামী, রামগড় কেণ্ট (বিহার)।

প্রচ্ছদপট

মাসিক বসুমতী শ্রাবণ
হাতে পেয়ে ভরে গেলো মন।
কে তুমি কলসী কোলে প্রচ্ছদের ছবি
কমল আনন যেন প্রভাতের রবি।
কি দেখো অবাক হয়ে দু' চোখ ডাগর
সামনে তোমার বুঝি পুরীর সাগর?
বেণী তো নেইকো দেখি অল্প অলক,
বিস্ময় বিমুগ্ধ রূপ পড়ে না পলক।
প্রচ্ছন্ন রয়েছে হাসি গভীর আড়ালে,
অমৃতের কুম্ভ নিয়ে কে তুমি দাঁড়ালে?
কোথা থাকো কোন্‌খানে পরিচয়ে কিবা তব নাম?
ছদ্মবেশে দেখা দিলে হে জননী লহ গো প্রণাম।

রেখা চিত্র

মাসিক বসুমতী শ্রাবণ
সূচীপত্র আর বিজ্ঞাপন
পার হয়ে 'কথামৃত' পড়বো যখন
অকস্মাৎ 'রেখাচিত্রে' ধাঁধিল নয়ন।
নির্জীব জীবন্ত তবু ছটি প্রাণী করো
লুকায়ে ফেলিছে নারী তপ্ত অশ্রুধারা!
অর্ধনগ্ন রুগ্নদেহ শিরে দীর্ঘ রুক্ষ কেশ
উদ্‌ভ্রান্ত উদাস দৃষ্টি নিয়ে কি খোঁজে নির্দেশ?
কিছুতো সম্বল নেই কাছে নেই সামান্য সম্পদ,
শূন্য রিক্ত হাতে আগলাও কারে কি হলো বিপদ!
তোমাদের চিনি নাকো পড়ে যাই দৈনিকে খবর
'বাস্তহারা' নাম নিয়ে দিয়ে এলে আপন কবর।
বিসর্জন হয়ে গেছে তোমাদের সতীত্ব রতন
লজ্জায় আনত মুখ সর্বহারা পশুর মতন।
মানবের দ্বারে দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে
কতদিন বেঁচে রবে ও জীবন লয়ে?
অসহায় নিঃস্ব হলে বলো শুনি কার অত্যাচারে
বিস্ময়ে নিস্তব্ধ আঁখি এলে বুঝি দেবতার দ্বারে?
পথে প্রান্তরে অরণ্য জঙ্গলে কোথা বলো নেবে আশ্রয়
সর্বহারা উপবাসী তোমাদের মতো এ পৃথিবী
হয়ে যাক ক্ষয়।

—শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীত্রিদিবনাথ ভাদুড়ী, ডাক—চক্ষরহাট, পশ্চিম দিনাজপুর * * * শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন চক্রবর্তী, ১৮/১৪৬ কুরবন, কানপুর (উত্তরপ্রদেশ) * * * শ্রীহাজারীলাল মণ্ডল, গোবিন্দকাটী শিক্ষা নিকেতন, ডাক—শ্রীধরকাটী (হাসনাবাদ হয়ে) জেলা—২৪ পরগণা * * * শ্রীজয়ন্ত রায়, অবধায়ক—রায় এস এন রায়বাহাদুর, ৫৮/বি, ব্লক-ডি, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩ * * * শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, ডাক—বাগানচরা, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ) মিস্ আসতারী বেগম, রুক উড কটেজ, ডাক—শিলং, আসাম * * * শ্রীমতী পি বসুমতী জেমস্, 'Praise Villa' সিমুলিয়া, ডাক—কনকাদপাল, জেলা—ধেনকানাল, উড়িষ্যা * * * শ্রীমতী রেবা দাস, কোয়ার্টার নং জি ১-৪৪৯, আরমানপুর এস্টেট, কানপুর (উত্তর প্রদেশ) * * * শ্রীরামকৃষ্ণ সামন্ত, ডাক ও গ্রাম—খীরগাম (কেচর হয়ে), জেলা—বর্ধমান * * * শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়, ৪৯৭/এ, নিউ কোয়ার্টার, ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট, কলিকাতা-৫২।

Sending herewith the yearly subscription for Masik Basumati. Will you please arrange to commence despatches from the month of Aswin by Book Post. Hony. General Secretary. H. S. V. Club. Po. Cement Works, Sapla. Dist. Palamow.

আপনি ১৩৭১ সালের কার্তিক মাস হইতে বার্ষিক মূল্য ১৫.০০ গ্রহণ করিয়া মাসিক বসুমতী পাঠাইতে থাকিবেন। শ্রীমতী প্রীতি গুপ্ত, প্রিন্সিপ্যাল, বহরমপুর গার্লস কলেজ, বহরমপুর।

We send herewith the above mentioned amount for the Basumati, Bengali magazine, one year subscription. Please acknowledge the amount. Secretary Institute. D. B. K. Railway, Koraput. Orissa.

Rs. 15/- is sent towards the annual subscription of the Monthly Basumati. Kindly sent the Masik Basumati every month. Sm. Manika Dey. The Bombay Scientific Glass Industries (Private) Ltd. Rustom Building, (2nd floor) 29. Vir Nariman Road, Fort Bombay.

আপনাদের স্মারকপত্র পাইয়া মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম, প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী মায়ারাণী রক্ষিত, বোম্বাই-১৮।

I am remitting Rs. 15/- towards the annual subscription of the Monthly Basumati. Please excuse me for the unintentional delay. Hope you will send the copies from Baisak. Sm. Biva Mukherji, 74, Daryaganj, Delhi-6.

১৩৭১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম, শ্রাবণ সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা মিত্র, ডাকঘর—ভদ্রক, জেলা—বালেশ্বর।

I am sending herewith Rs. 15/- towards the yearly subscription of the Monthly Basumati. Please send the Magazine regularly. The Headmaster, Ratna H. E. School. Po. Ratna. Dt. Malda.

শ্রাবণ মাস হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭ টাকা ৫০ পয়সা পাঠাইলাম, নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী নিবেদিতা রাহুত, রাহুত লজ, জলপাইগুড়ি।

I am sending Rs. 15/- being the yearly subscription of the Monthly Basumati. Please continue despatch as before. Sm. Pratima Raha, 70 B, Hindusthan Park, Calcutta-29.

The yearly subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati is sent herewith. Please send the magazine regularly. Sm. Niharkana Debi, C/o. Amar Nath Mukherji, Hemantika Chandmari, Darjeeling.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র



একটি রূপকথা

—রূপ-শিল্পী শ্রী এফ. মাসেরীল অঙ্কিত

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ | দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ ১৩৭১ | চতুর্থ সংখ্যা



মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ?

বেদান্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দিচ্ছে? প্রথমে, নিজের মধ্যেই সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে। আর সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ এই বর্তমানের মধ্যেই অবস্থিত। অতীতকে শুধু চিন্তা করাই সম্ভব—তাকে চাক্ষুষ দেখা যায় না। যদি ভবিষ্যৎ দেখতে চান—তাকে টেনে আনতে হবে বর্তমানে। কাজেই বর্তমানই একমাত্র সত্য—আর সব কল্পনা। সত্য একই। আপনারা সকলেই এইখানে আছেন, এই এক মুহূর্তই চিরন্তন সময়, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য যে-কোন মুহূর্তের তুল্য। যা বর্তমানে আছে, অতীতে ছিল, বা ভবিষ্যতে থাকবে—সবই এইক্ষণে, এইস্থানে অবস্থিত।

স্বর্গ সম্বন্ধে অলীক কল্পনার চিত্র আঁকার প্রয়োজন নেই। পঞ্চভৌতিক দেহে আমরা পাঁচপ্রকার ধারণা নিয়ে পৃথিবীকে অনুভব করতে পারি। রূপে, রসে, আলোকে, ধ্বনিতে, আকারে। আমি যদি ধারণাতীত অবস্থায় পৌছাতে পারি—তবে আপনাদের মধ্যেই মহাশক্তির বিকাশ দেখাতে পারি—দেখাতে পারি ঈশ্বরের রূপ। সুতরাং চিন্তার উপরেই বস্তুর দৃশ্যরূপ নির্ভর করে। ক্রমে ক্রমে ইহা বুঝা সম্ভব—এই আকাশ, এই পৃথিবী—সবই এইখানে অবস্থিত আর তা স্বর্গীয় ভাবধারামণ্ডিত।

সুতরাং বেদান্ত—বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথাই শুধু বলে না—বেদান্ত চিন্তা করে বিশ্বব্যাপী একাত্মতা (oneness)। অন্য যে-কোন মানুষের সংগে তুলনায়, আমি একই সমান। এক আত্মা—সর্বব্যাপী। এক শক্তি—অবিনাশী। অমৃত্যু—দেহেরও মৃত্যু নেই, মনেরও। গাছের থেকে একটি পাতা ঝরে পড়তে পারে—তাতে কি গাছের মৃত্যু হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার দেহে। দেখুন কিভাবে ইহা অগ্রসর হয়। সমস্ত মন আমার নিজের। সমস্ত পায়ের দ্বারা আমি পদক্ষেপ করি। সমস্ত মুখ দিয়া আমি কথা বলি। সমস্ত দেহে আমি অবস্থান করি।

অমরত্ব কি? আমাদের অস্তিত্বের পরিপূর্ণ ধারণা। বেশির ভাগ মানুষের ধারণা, সবই মরণশীল; আর ঈশ্বর এইখানে নেই, তারা মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের কাছে যাবে—আর মেগে নেবে অমরতার বর। তারা ভাবে, মৃত্যুর পরে ঈশ্বরকে দেখবে তারা। ইহা ভুল ধারণা। যদি আপনি এইখানে ঈশ্বরকে দেখতে না পারেন, তবে মৃত্যুর পরে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করাই অমরত্ব লাভ করার পথ। সবার সংগে একীভাব, সবদেহে, সব মনে নিজের অবস্থিতির চিন্তাই অমরতা। এমন এক সময় আসবে, যখন আমি সমস্ত জগতের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবো।'......

'......পৃথিবীর মাঝখানে
উদয় সমুদ্র হতে, অস্ত সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে—দিকে দিকে'

পান করবো—বিশ্বের সকল পাত্র থেকে, আনন্দ মদিরা-ধারা নব নব স্রোতে—এই আমার ইচ্ছা। বেদান্ত এই

আনন্দ ত্যাগ করতে বলে না। ইহাকে ছড়িয়ে (Expansion) দিতে বলে।

অনেকে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করেন, পাপী মনে করেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায় চিন্তা। অনেকে বলেন, যদি নরক বলে কোন জায়গা না থাকে, তবে কিসের ভয়ে লোকে ধর্মের অনুশীলন করবে। এই অসহায় মানুষগুলি, যদি তাদের নিজের সৃষ্ট নরকে যেতে চায়, তবে তাদের রক্ষা করবে কে? যা আপনি চিন্তা করেন বা ভাবেন, আপনি তাই সৃষ্টি করতে পারেন। যদি সত্যিই নরক থাকে, তবে আপনি মরে, দেখে আসুন গে। যদি পাপ থাকে, শয়তান থাকে—আপনি শয়তান হোন। যদি ভূত থাকে—আপনি ভূত হোন। যা আপনি চিন্তা করেন, আপনি তাই হোন। তাই বলি, চিন্তা যদি করেন, তবে ভাল জিনিসের চিন্তা করুন। বৃহৎ ও মহৎ চিন্তা।

এক্ষণে, বেদান্তের জিজ্ঞাসিত, একটি বড় প্রশ্নের অবতারণা করছি, লোকে এতো ভয় পায় কেন?

উত্তর হচ্ছে, তারা নিজেদের অসহায় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল করে তোলে, তাই।

আমরা, এতো অলস—নিজেদের জন্যও কিছু করতে চাই না। আমরা, প্রত্যেকের জন্যে এক একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে চাই—একজন মুক্তিদাতা, অথবা পয়গম্বরকে—যিনি আপনাদের জন্যে সবকিছু করে দেবেন। যিনি অতি ধনী ব্যক্তি তিনি প্রায়ই পায়ে হাটেন না—সর্বদাই তিনি গাড়িতে চলেন—কিন্তু বৎসরের কোন নির্দিষ্ট দিবসে, তিনি পায়ে হেঁটে দেখলেন আর চিন্তা করে দেখলেন, তিনি যা করছেন, তা মোটেই ভালো নয়। অন্য বহুলোক তাঁর জন্যে হাঁটতে পারে না। যতবারই তার জন্যে অন্যে হেঁটেছে, ততবারই তার অংগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তির সব কাজই, অন্য লোকেরা করে—তবে সে ব্যক্তি তার নিজস্ব অংগ-প্রত্যংগের ব্যবহার নষ্ট করবে। যা কিছু আমরা নিজেরা করি—সেই একমাত্র বস্তু—যা আমরা করি—যাতে রয়েছে কর্মের আনন্দ—কৃতিত্বের ছাপ। আমাদের জন্যে অন্যে যা কিছু করে, তা কখনও আমার নিজের হ'তে পারে না। আপনারা ধর্মীয় সত্য, আমার বক্তৃতা থেকে শিখতে পারবেন না—আমি শুধু একটু প্রেরণা আপনাদের মনে জাগাতে পারি। জগতের সমস্ত প্রবর্তক এবং শিক্ষাগুরু এই শুধু করতে পারেন। যারা সমস্ত প্রকারে অন্যনির্ভরশীল—তারা মূর্খ।

মানুষের জন্য সাহায্য (help) বলে কিছু নেই। সহায়তা কখনও ছিল না—বর্তমানেও নেই আর ভবিষ্যতে আসবে না। সাহায্য কেন আসবে? আমরা কি পৌরুষ-মণ্ডিত নই? যে শক্তিযুক্ত তার সাহায্যের কি প্রয়োজন? পরনির্ভর হতে কি আপনারা লজ্জা অনুভব করেন না? আপনাতে অনন্তশক্তি বিরাজিত। সাহসের সংগে বিপদ-সাগর অতিক্রম করুন। নিজেকে নিজে রক্ষা করুন। আপনার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই—আর ছিলোও না।

বেদান্তে ঈশ্বর বলতে কি বুঝায়? তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ (person) নন, তিনি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি (principle) আমি বা আপনি—আমরা ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর। কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান ভূমণ্ডলের ঈশ্বর, যিনি স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা, জগৎ ধ্বংস করার শক্তিসম্পন্ন—তিনি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। আপনি, আমি, কুকুর, বিড়াল, ভূত-প্রেত সবই প্রাণীরূপী ঈশ্বর। আপনারা শুধুই ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের পূজা করতে চান। ইহা আপনাদের ব্যক্তিসত্তাকেই পূজার নামান্তর মাত্র। যদি আপনারা আমার উপদেশ শোনেন—তবে কোন চার্চে আপনাদের প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। আসুন, নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ করুন। যুগ-যুগসঞ্চিত কুসংস্কার থেকে আপনার অন্তরকে নির্মল করুন। নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে মালিন্যরহিত করা, ইউরোপের পক্ষে অসম্ভব হলেও—ভারতের ঘরে ঘরে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার শিক্ষাই বর্তমান।

ঈশ্বর করুণাময়। সমস্ত প্রকারের অস্তিত্বের পিছনেই তিনি সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত কিছুর সহনীয়তা এবং সত্য হচ্ছেন তিনিই। আপনি, আমি—তাঁরই প্রতিভূ মাত্র। ইহাই আমাদের গৌরবের। যতই আপনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করবেন—ততই কমে যাবে আপনার বিপদ, হবে ক্রন্দনের অবসান। ঈশ্বরের উপাসক যদি দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তবে ঈশ্বরের চিন্তায় জীবন কাটানোর কি অর্থ থাকতে পারে? সেই শক্তিহীন বিধাতাকে কে চায়? তাকে আপনারা প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশির মধ্যে বিসর্জন দিতে পারেন। সেই নিঃশক্তি ঈশ্বরকে আমরা চাই নে।

'পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥'

ঈশ্বর অবিনশ্বর, সর্বশক্তিমান, অমর, অভয়, অমৃত; আমি, আপনি তাঁর অংশীভূত। এই হচ্ছেন বেদান্তের ঈশ্বর। আর তাঁর স্বর্গ—সর্বদিগদেশে বিস্তৃত। সেই বহুবিস্তৃত অসীম স্বর্গের সর্বত্রই তাঁর অবস্থান। শুধু মন্দিরে পুষ্প বিতরণ করে, তাঁর প্রার্থনা থেকে বিরত হোন।*

অনুবাদক—হরেন্দ্রচন্দ্র দে

* 'Is Vedanta the future Religion' of Swami Vivekanand.

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে

সুমেধা দেবী

স্বামী বিবেকানন্দের ভাগ্যে একদিকে যেমন জুটেছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি, অপরদিকে তেমনি জুটেছে মিথ্যা নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা। এ-বিষয়ে তাঁর ভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অনন্য। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘ বাষট্টি বৎসর অতিবাহিত হলেও আজ তাঁর অনন্য দেবচরিত্রে কালিমা লেপনের হীন প্রয়াস চলছে। একদিন একাজে বিদেশীরা অগ্রণী হয়েছিল, আজ অগ্রণী তাঁর স্বদেশবাসিগণ!

'মানুষ মৃতের সঙ্গে সংগ্রাম করে না'—এরূপ একটি প্রবাদ আছে শুনেছি, কিন্তু এ প্রবাদ তাঁর ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত। ১৯৬৩-৬৪ সাল ছিল তাঁর শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী বৎসর; এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমারোহের সঙ্গে উৎসবাদি সম্পন্ন হয়েছে। এই উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্বন্ধে জনমনে নূতন আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে। একদিকে সুধী ও বিদগ্ধজনেরা তাঁর কর্ম ও সাধনা, জীবন-দর্শন, সমাজ-দর্শন ও সাহিত্য-কীর্তি সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করেছেন নানা তথ্যপূর্ণ গভীর আলোচনায়। জিজ্ঞাসু সত্যান্বেষী গবেষকগণ অনুসন্ধান করবার প্রয়াস করেছেন কতদূর সফল হয়েছে তাঁর বাণী ও সাধনা। কিন্তু অপরদিকে নিন্দুকের রসনাও মুখর হয়ে উঠেছে। আলোচনা হলেই সমালোচনা হবে জানা কথা, সমালোচনা হওয়া উচিত নয় বা অবাঞ্ছনীয় আমরা একথা কখনই বলতে চাইছি না। কারণ সমালোচনার মাধ্যমে যে সত্য মূল্যায়ন ঘটে, তাতে অনেক সময় অনেক গভীর অজানিত নিহিতার্থও প্রকাশ পায়। তা শুধু নয়, সমালোচনা অনেক সময় বিষয়-বিশেষের উপর জনচিত্তের আরোপিত গুরুত্বও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সে সমালোচনা যুক্তিসহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অসূয়া ও ঈর্ষাপরবশ হয়ে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য কর্দম নিক্ষেপ—এ অত্যন্ত লজ্জার কথা।

প্রারম্ভেই বলে রাখি স্বামীজীকে 'রক্ষা করবার জন্য' এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয় নি, তিনি এতবড় যে তাঁকে কারও রক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। চিরদিনের এই সংগ্রামী বীরপুরুষ জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে অটল দণ্ডায়মান; অন্যায়, অবিচার, শোষণ, কাপুরুষতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা। তাই ধর্মান্ধ ব্যক্তি, অত্যাচারী ও শোষকগণ কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং এদের তীক্ষ্ণতম তীর তাঁরই বীর বক্ষে চিরদিন নিক্ষেপিত হয়েছে। তাঁর অনুপম মহান চরিত্র, তাঁর উদার মহান বাণী, তীক্ষ্ণ যুক্তি ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক দুঃসাহসিক দর্শন-চিন্তাই তাঁর প্রকৃত রক্ষক। বস্তুত তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সকল সমালোচনার উত্তর আছে, সকল সংশয়ের নিরসন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর বাণী ও রচনার সঙ্গে পরিচিত নন, স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁদের মনে সীমাহীন অজ্ঞতা বিরাজ করছে। তবুও পল্লবগ্রাহিতা বৃত্তির দ্বারা এঁরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেন।

তা শুধু পর্যবসিত ধারণার দরুণ নয়—নিদারুণ ভুল বোঝেন এবং অপরকে ভুল বোঝানোর জন্য তাঁরা ছল-বল-কৌশল কোনোটাই অবলম্বন করতে পিছপা নন। সকল অন্ধ একদেশদর্শীরই এই দশা, সকল সঙ্কীর্ণবুদ্ধিই এই পথ ধরে চলে। এজন্যেই জগতে মত নিয়ে হানাহানির অন্ত নেই।



● স্বামী বিবেকানন্দ

অসত্যকথন, মিথ্যাচার এবং অসাধু উপায় অবলম্বন করে তাঁরা কিরূপে তাঁদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পাচ্ছেন তারই একটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত করছি। সম্প্রতি জনৈক ব্যক্তি একটি প্রখ্যাত-জাতীয় সংস্থার মুখপত্রে প্রকাশিত একটি রেফারেন্স কণ্টকিত প্রবন্ধের শিরোনামা লিখেছেন, 'বিবেকানন্দ ও সমাজ-সেবা' জাতীয়। এই শিরোনামার সঙ্গে আলোচিত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই, ঠিক এই কারণে কর্তৃপক্ষের অনবধনতার সুযোগ নিয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশ পাচ্ছে, এজন্য তাঁরা দুঃখ প্রকাশও করেছেন। এই প্রবন্ধের একস্থলে মন্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে :—

'Swami Vivekananda as well wrote to Swami Ramakrishnanda in 1895, that the specially high spiritual stage (Jeevanmukta) generally inherent in, or associated with an 'Avatar', was not discernible in Paramhansa'.

লেখক বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন বিবেকানন্দের বঙ্গভাষায় অনূদিত 'বাণী ও রচনা'র সপ্তমখণ্ডের ১২১ ও ১২২ পাতায় এ অভিমতটি ব্যক্ত হয়েছে। লেখকের নির্দেশানুসারে উক্ত গ্রন্থের ১২১-১২২ পাতায় যা পেলাম তা হ'ল এই যে, স্বামীজী বলছেন—

'ফলকথা আমি বৈদান্তিক, সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখিতে পাইতেছি না। অবতার মানে যাঁহারা সেই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। অবতার বিশেষত্ব আমি দেখিতে পাইতেছি না। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পাইতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম বাকি অধর্ম।'

এর মধ্যে রামকৃষ্ণের নামোল্লেখ নেই এবং তিনি জীবন্মুক্ত নন (লেখকের সিদ্ধান্ত)—একথা সমগ্র চিঠিখানির কোথাও নেই। চিঠিখানির তিন জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে।

১২০ পৃষ্ঠায় আছে—'রামকৃষ্ণ-অবতার প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। সর্বদা স্মরণ রেখো তিনি জগতের কল্যাণের জন্য আসিয়াছিলেন, নিজের নামের জন্য নয়।'

১২১ পৃষ্ঠায় আছে—'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উদারভাব প্রচার করে আবার দলবাঁধা কেমন করে হয়?'

১২২ পৃষ্ঠায় আছে—'রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে অর্থাৎ—

He was the living embodiment of all past religious thoughts in India. His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of the old Shastras.'

এর মধ্যে কোন কথাটি হতে 'রামকৃষ্ণ জীবন্মুক্ত ছিলেন না' এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে তা পাঠকেরাই বিচার করুন। দিবালোকের মত লেখকের দুষ্ট অভিপ্রায় এখানে সুস্পষ্ট 'বাণী ও রচনা'র কোন খণ্ড, কত পৃষ্ঠা উল্লেখ করে পাঠকদের প্রতারণা করতে চেয়েছেন তিনি। কে ঘুণাক্ষরে ধারণা করতে পারে যে এরূপ ভূয়া রেফারেন্স দেওয়া সম্ভব। আজ আমাদের দেশে দুর্নীতির অন্ত নেই, কিন্তু এর যেন কোন তুলনা নেই। বাস্তবিক এর চেয়ে দুঃসাহসিক অসাধুতার দৃষ্টান্ত আর নেই। এর কি শাস্তি বিধেয়? সকলেই অবশ্য এতদূর পর্যন্ত যান না, কিন্তু পল্লবগ্রাহিতা বৃত্তিসহায়ে সিদ্ধান্ত দেবার অপচেষ্টাও অসাধুতা। সুতরাং স্বামীজীকে রক্ষা করবার জন্য নয়, অসাধু পণ্ডিতম্মন্যদের অপসিদ্ধান্তের হাত হতে জনচিত্তকে রক্ষা করবার জন্য স্বামীজীর বাণী ও সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে এ সকল সমালোচনার গলদ জনচক্ষুর সামনে বারবার তুলে ধরবার।

দেখা যায় স্বামীজীর সমালোচকেরা দুই শ্রেণীর। একদল নিন্দুক, তারা তাঁর দেবচরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার পাপ-প্রয়াস করে। অপর দল কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান, তারা ওরূপ পিচ্ছিল পথে হাঁটে না। তাদের অস্ত্র—ঐতিহাসিক বিচারের মানদণ্ড।

প্রথম শ্রেণী স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসবের সমারোহ দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং এজন্য অসূয়াপরবশ হয়ে অতীতের খবর খুঁড়তে আরম্ভ করে। ১৮৯৩ সনে যখন বিশ্ব-ধর্মসভায় তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা দান করে স্বামীজী খ্যাতি অর্জন করেন তখনই এক শ্রেণীর ব্যক্তি আসরে অবতীর্ণ হয়। ধর্ম-মহাসভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে কারও কারও (প্রধানত ক্রীশ্চান মিশনারীদের) অভিপ্রায় ছিল খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।

কিন্তু বিবেকানন্দ তাদের মুখোস ছিঁড়ে দিয়ে এই মর্মে ঘোষণা করেন—কেউ যদি আশা করেন যে, কোন একটি বিশেষ ধর্ম জয়ী হবে, অন্য সব ধর্ম লোপ পাবে তাহলে তাঁর আশা বৃথা, সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত যে সত্যধর্ম আছে তাই জয়ী হবে।

এ ঘোষণা উপরোক্ত উদ্যোক্তাদের প্রভূত ক্রুদ্ধ করেছিল। তা ছাড়া বিবেকানন্দের বক্তৃতার ফলে বিশ্ববাসী জানতে পারলো ভারতবর্ষ অসভ্য বর্বরদের দেশ নয়, উন্নত সভ্য মানুষদের দেশ—যারা অমৃতত্ব ও সত্যানুশীলনে ব্যাপৃত।

ফলে মিশনারীদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগে। বৎসরে বৎসরে টাকার চাঁদা হিদেনগণের উদ্ধারের জন্য এরা

সংগ্রহ করতো। বিবেকানন্দ সত্য উদ্ঘাটন করায় এরা শঙ্কিত হল যে এই অর্থ সংগ্রহে বাধা পড়বে। সেজন্য ছলে-বলে কৌশলে এরা স্বামীজীকে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস করল। এরা স্বামীজীর দুষ্ট চরিত্রের কথা আশ্রয়দাতাদের জানিয়ে তাঁকে আশ্রয়চ্যুত করতে চেয়েছে, তাঁর বক্তৃতা-সভার আয়োজন পণ্ড করতে চেয়েছে, এমন কি শোনা যায় এ কথাও তারা রাগের চোটে না বলে পারে নি, 'মরুক শয়তান শীতে মরুক।'

এদের সঙ্গে যোগদান করেছিল আমাদের কতিপয় স্বদেশবাসী। এদের সম্মিলিত অপপ্রয়াস অবশ্য সফল হয় নি; কারণ যাঁরা স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন, একবার তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা অনুভব করেছিলেন স্বামীজী কত মহান, কত বিরাট। তাঁরা এদের অপপ্রচারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁকে তাঁর মহান ব্রতসাধনে সহায়তা করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংবাদপত্রের মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদও জানান এবং পরিশেষে এদের অপপ্রচার নিষ্ফল জেনে ক্ষান্ত হন।

স্বামীজীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, আজ সেগুলিই পুনরুদ্ধার করবার প্রয়াসী হয়ে যারা ভাবছে এর দ্বারা জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপন্ন হবে তারা ভুল করেছে। তারা বোধ হয় মনে করেছে সেদিন কি করে আমেরিকার সুধীসমাজ সে সকল অপবাদকে ঘৃণাভরে নস্যাৎ করেছেন তা জনসাধারণের আজ অবিদিত। তারা বোধ হয় জানে না যে, সম্প্রতি মেরী লুই বার্ক নাম্নী একজন গবেষক 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries'-এ।

আজকের নিন্দুক দল জানেন না যে তাঁরা হারানো জমির উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন, তাঁদের পায়ের তলায় জমি নেই। যে-কোন জিজ্ঞাসু সে গ্রন্থ পাঠ করলে সকল ইতিহাস বিশদ জানতে পারবেন, এখানে তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এখানে উল্লেখ করি আমেরিকার প্রখ্যাত মহিলা কবি এলা হুইলার হুইলকক্স স্বামীজীর নিন্দাবাদ শুনে যা বলেছিলেন—

—'এমন মানুষকেও লোকে ভুল বোঝে, এঁর বিরুদ্ধে নিন্দা করে—এই সংবাদে আমি খুবই বিস্মিত হতাম, যদি না জানতাম বুদ্ধ ও খৃস্টরা কিভাবে পরিপার্শ্বের ক্ষুদ্রাত্মাদের দ্বারা নিন্দিত ও নির্যাতিত হয়েছেন।'

ক্ষুদ্রাত্মাদের চিরদিন এই-ই কাজ মহাত্মাদের চরিত্রে কালিমা লেপনের প্রয়াস, কে তাদের বিশ্বাস করবে।

স্বামীজীর চরিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে যদি কেউ চান, বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁর চরিতকথা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা সংগ্রহ করে পাঠ করুন। ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ 'Reminiscence of Swami Vivekananda' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বহু আলোচনা আছে, মেরী লুই বার্কও তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে কিছু কিছু উদ্ধার করেছেন সমসাময়িক বহু ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিঠিপত্র হতে। সেগুলি হতে কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি জনসাধারণের অবগতির জন্য। অবশ্য কেউ যেন একথা মনে না করেন স্বামীজীর Character Certificate উপস্থাপিত করা হচ্ছে; একথা হাস্যকর।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ডাঃ রাইট ধর্ম-মহাসভায় যোগদানের প্রাক্কালে স্বামীজীকে যে কথা বলেছিলেন তা এখানে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—'স্বামীজী আপনাকে পরিচয়পত্র দিতে বলা আর সূর্যকে তার আলো দেবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা—একই কথা।'

তিনি স্বয়ংপ্রভ সূর্যের মতো—একথাই সকলেরই মনে হয়েছিল। আমেরিকাবাসিগণ সেদিন তাঁকে শুধু বাগ্মী হিন্দুধর্মের দক্ষ প্রবক্তা বলেই গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেছিলেন তাঁর 'জীবন্ত আধ্যাত্মিকতা'র জন্য। মেরী লুই বার্ক বলেছেন—

'It is undeniable that American people had not been merely intellectually impressed by the nobility and supreme wisdom of Eastern doctrine which hitherto in the words of Alfred Momerie, 'They had been taught to regard with contempt, but they had been touched by and had responded to the tremendous power of living spirituality that Swamiji embodied. It was as though the soul of America had long asked for spiritual sustenance and had long asked for spiritual sustenance and had been answered.'

আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় ক্ষুধিত আমেরিকাকে শ্রেষ্ঠ যে বস্তু দান করেছিলেন তা দর্শন নয়, ধর্মমত নয়—আপন মহিমামণ্ডিত দিব্য-জীবন। দুঃখের বিষয়—এযাবৎ যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর বাগ্মিতার ওপর, তাঁর মনীষার ওপর, তত এদিকটার ওপর দেওয়া হয় নি।

সেজন্যই নিন্দুকের অপপ্রচারের সুযোগ হয়েছে আজ। বিবেকানন্দ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ ছিলেন, এই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং সেজন্য তাঁর সান্নিধ্য মানুষের রূপান্তর ঘটাতো। মেরী লুই বার্ক এ প্রসঙ্গে বলছেন—

'He permanently lifted the consciousness of all with whom he came into contact... His very presence was a profound blessings and we shall miss the full significance of his activities and teachings if we forget that above all a prophet born...for the good of mankind.'

স্বামীজী নিজেকে আমেরিকার কল্যাণের জন্য যেন ঢেলে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন পূর্ণতমভাবে। সেজন্য

তাঁরা তাঁকে বাগ্মী অথবা ধর্মপ্রচারক বলে অভিহিত না করে অভিহিত করেছেন 'আলোকের দূত' বলে, যিনি মানুষের বন্দী আত্মার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করেন, মানুষের সত্তাকে পুনর্গঠিত করেন।

অধ্যাপক রাইট-পত্নী তাঁর সান্নিধ্যের আশ্চর্য প্রভাব সম্বন্ধে লিখেছেন—

'এ যেন একটা নব-জাগরণ, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এত উদ্দীপিত আমি আর বোধ করি নি।'

ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রিকার সংবাদদাতা লিখছেন—

'কোন বিশেষ নাম বা সম্প্রদায়ের ছাপ তাতে নেই। তিনি উচ্চতর ব্রাহ্মণের দ্বারা সৃষ্ট বিশাল স্বপ্নাচ্ছন্নময় আত্মাহুতিময় হিন্দু-সত্তার মূর্ত বিকাশ—তিনি পবিত্রাত্মা সন্ন্যাসী।'

এখানে লক্ষণীয় এ কথা বলছেন কোন ভক্ত নয়, শিষ্য নয়, সাধারণ একজন সংবাদদাতা—যিনি সংবাদ-সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর কাছে যান নি, তিনিও তাঁর অপূর্ব দিব্যপ্রভাব অনুভব করেছিলেন।

শ্রীমতী ইভা আনসেল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

'তাঁকে মনে হয়েছিল উর্ধ্বতর লোকের জ্যোতির্ময় প্রকাশের মতো।'

এলা হুইলার হুইলকক্স আরও স্পষ্টতর ভাষায় বলছেন—

'আমার বিশ্বাস ইনি কোন বিরাট সত্তার অবতার, হয়তো খৃস্টের, হয়তো বুদ্ধের।'

ইচ্ছে করেই স্বামীজীর খ্যাতনামা শিষ্যবর্গের কোন উক্তি এখানে উল্লেখ করলাম না। তথাপি দেখা যাচ্ছে তাঁর পুণ্য-চরিত-প্রভাবের কথা সকলে একবাক্যে বলছেন।

মাদাম এমা বালেভে, বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী বলেছেন—'তিনি দৃষ্টিদাতা।'

অপর একজন পাশ্চাত্য দেশীয় বলেন—'Vivekananda is nothing if he is not a breaker of bondage.'

বস্তুত এই তাঁর যথার্থ পরিচয়—দৃষ্টিদাতা, মুক্তিদাতা। যে-কোন অবস্থার ব্যক্তিকে তিনি কিভাবে উন্নীত করতেন সে সম্পর্কে।

এলা হুইলার হুইলকক্সের নিম্নোক্ত উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য—

'যে বাণী তিনি দিয়ে গেলেন তাতে ব্যবসায়ী শক্তি পেল, লঘুমনা বিলাসিনীরা চমকে থেমে ভাবতে লাগল, শিল্পী পেল নূতন প্রেরণা, আর ঘরের পত্নী, মাতা, পতি ও পিতা পবিত্রতর, বৃহত্তর কর্তব্যের আলোকে জাগরিত হল।'

মাদাম কালভে তাই তাঁর সম্পর্কে নিন্দাবাদ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন—

'এমন মানুষের নামেও আমি নিন্দা শুনেছি মসিয়ে রায়। শুনে সত্যিই আমার লজ্জা হ'তো—মন ধিক্ ধিক্ করে উঠতো,—কি করে পারে তারা এমন পুণ্যশুদ্ধ মানুষের নামে কুৎসা রটাতে।'

দেখা যাচ্ছে যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁদের কাছে তাঁর জীবনী, তাঁর বাণী, তাঁর পুণ্য-চরিত্রই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। বস্তুত বেদান্ত মানুষের, যে পরিচয়—'নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব আত্মা' এই বলে, বিবেকানন্দ তার জীবন্ত বিগ্রহ। মানুষ যে দুর্বল নয়, অসহায় নয়, পাপী নয়, সে যে অজেয়, অটল, দুর্বার, অসীম শক্তিমান; সে যে পবিত্রতার চেয়েও পবিত্র; কোন বন্ধনই যে তাকে বাঁধতে পারে না, কোন প্রলোভন যে তাকে জয় করতে পারে না, মৃত্যুও যে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, সে যে মৃত্যুঞ্জয় নির্ভয়—তারই ত' প্রমাণ বিবেকানন্দের জীবনে প্রতি পদে পদে।

স্বামীজীর এই চির-অম্লান মহাজীবন ও পুণ্য-চরিত প্রসঙ্গে মহাকবি গিরিশচন্দ্র একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন—

'মহামায়া নরেনকে (বিবেকানন্দ) বাঁধতে গিয়ে হার মেনেছেন। তিনি তাকে যত বাঁধতে যান, সে তত বড় হয়ে যায়, তাঁর মায়ার দড়িতে আর কুলোয় না—অবশেষে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন।'

এইরূপ মহান পুরুষের বিরুদ্ধে যাঁরা নিন্দাকথনে উদ্যত, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমরা মাদাম কালভের মত শুধু বলি—ধিক্ ধিক্ শতধিক্।

[আগামীবারে সমাপ্য।

নির্বিকার মানবক

বুদ্ধদেব গুহ

নহবতে সমাদৃত নায়ক আসে নি কোনো আজ
এসেছেন গোত্রহীন, নির্বিকার মানবক কেউ
ক্ষিপ্তপ্রায় প্রতিপক্ষ যথারীতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝাঁঝ
সুকৌশলে ব্যবহার তো করবেই; সংখ্যাগুরু ফেউ

দীর্ঘকাল উপবাসী উল্লসিত গৃধিনীর মতো
অকস্মাৎ মৃতদেহ পেয়ে গেলে বেসামাল; সেই
মানবক কিছুকাল নিরুপায় হয়ে ইতস্তত
নিজের দুঃখের কথা গোপনে বলবে নিজেকেই;

প্রেক্ষাগৃহ শূন্য হ'লে প্রশ্নাতীত অথচ রবে না
মৌলিক কাহিনী কিংবা কাহিনীর নির্বিশেষ দেনা॥

আমার দেখা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বিনায়ক সেনগুপ্ত

সেদিন নরেশ সেনগুপ্ত গত হ'য়েছেন, তারপর এক মাসও কাটে নি—প্রেমাঙ্কুরও চলে গেলেন। এইবার বোধহয় গত শতকের শেষ দিকে বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিশেষ উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি দিকপাল জন্মেছিলেন অর্থাৎ আজকের সাহিত্যিক বয়োজ্যেষ্ঠরা শেষ হ'য়ে গেলেন।

আমার সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের সাক্ষাৎকার হয় মাত্র একবার এবং সেটা ইদানীং ১৯৫৯ সালে, আমার বয়েস তখন ৪৯ বৎসর। কিন্তু তাঁর সংবাদ রাখি আমি ১৯১৯ সাল থেকে যখন আমি নয় বৎসরের বালক মাত্র। তখন বাংলা দেশে শিশু-মাসিক ছিল বোধ করি বা মাত্র দু'খানি। ঢাকা থেকে শিশু এবং কলকাতা থেকে সন্দেশ। সেই বৎসর কলকাতা থেকে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় এম সি সরকার এণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হ'ল বর্তমান বাংলার সর্বজ্যেষ্ঠ শিশু-মাসিক 'মৌচাক'। এই মৌচাকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রেমাঙ্কুর।

মৌচাকের সঙ্গে আর যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায় এঁরা। এঁদের কেউই বোধ করি আজ আর বেঁচে নেই।

আমার বয়েস তখন নিতান্তই অল্প, আমার পনেরো বৎসরবয়স্ক মেজদা' (তিনিও আজ গত, যদিও একটু অসময়ে) ছিলেন এই প্রথম বৎসরের মৌচাকের গ্রাহক। অক্ষর পরিচয় অনেকদিন আগেই হয়েছে, পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও কিছু কিছু বই তখন পড়তে আরম্ভ করেছি। মনে পড়ে কি গভীর আগ্রহে পড়তুম তখন মৌচাক। যে কাগজ তৈরি করতে তার কর্মকর্তারা নিতেন একমাস, আমরা দু'ভাই তাকে একদিনেই শেষ করে ফেলতুম, তারপর চলত তার রোমন্থন সারা মাস ধ'রে—আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতুম, কবে আসবে আবার পরের মাসের মৌচাক।

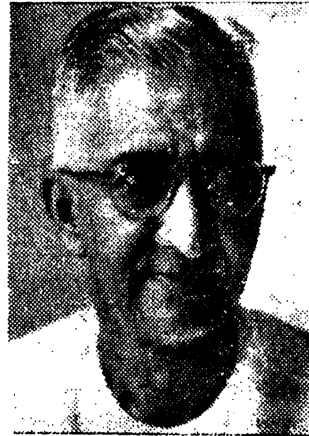
এই মৌচাকে লিখতেন—প্রেমাঙ্কুর। প্রথম বৎসরের মৌচাকে তাঁর দু'টি রচনার কথা খুবই মনে পড়ে—অস্কার ওয়াইল্ডের 'হ্যাপি প্রিন্স'কে ভেঙ্গে বাংলা ভাবধারায় তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন 'হাসি' আর তিন মাসের মৌচাকে ক্রমশ দিয়ে তিন খণ্ডে তাঁর 'দুষ্টু ছেলের ডায়েরী'। এই দুষ্টু ছেলের ডায়েরীর দুষ্টুমীর বহর আমাদের কিশোর মনকে ভারি অভিভূত করেছিল। পরে বড় বয়সে তাঁর 'মহাস্থবির জাতক' পড়ে টের পাই এ তাঁর নিজেরই জীবন-কথা। কারণ তাঁর সেই ডায়েরীর অনেক কথাই রয়েছে তাঁর জাতকে।

মৌচাক-ওয়ালারা মৌচাকের ঐ প্রথম বৎসরই পুজোর সময় একখানি বার্ষিক সাজিয়েছিলেন 'রং মশাল'। তখন এমন বাজার-ভর্তি বড়দের এবং ছোটদের এত শারদীয় সাহিত্যের রেয়াজ ছিল না। যদিও তার পূর্বেও দু'একখানা শিশু-বার্ষিকী আত্মপ্রকাশ করেছিল তবু মনে হয় সে বৎসর সেই রং মশালই ছিল একক। সে বইখানিও আমরা কিনেছিলুম। সুধীরচন্দ্র সরকারই ছিলেন এর প্রধান নাবিক। তবু এর সম্পাদনার ভার ছিল প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শিল্পী চারু রায়ের উপরে। ওঁরা রং মশালের ভূমিকায় যেসব শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, রচনাকার রং মশাল তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন একটি ছান্দোগে,—তাতে ছিল, অবনীনাথকে অবলম্বন করে—

ছবির রাজা অবনীঠাকুর
রংয়ের নেশায় আছেন ভুলি,

সত্যেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে—

সত্যেন্দ্রের ছন্দমধুর
বন্দনীয় ভাষার তালও,



প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সুকুমার রায়কে অবলম্বন করে—
সব সুকুমার কুমার শিশুর
রায় সুকুমার লোকটি
চেনা।
... ... ইত্যাদি
সব শেষে ছিলেন ওঁরা নিজেরা—
শ্রীচারু রায় প্রেমাঙ্কুরের
যুক্তকরে এই নিবেদন।

পরের বৎসর দাদা মৌচাক রাখা ছেড়ে দেওয়ায় প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে বছর দশেকের মত সম্বন্ধ ছিঁড়ে যায়। কিন্তু দুষ্টু ছেলের ডায়েরীর স্রষ্টাকে ভুলে যাই নি। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর ১৯২৯ সালে কলকাতায় আসি পড়াশুনোর জন্যে। এসে দেখি প্রেমাঙ্কুর ছায়াচিত্র নির্মাতাদের দলে ঢুকেছেন। মনে পড়ে সেই সময়কার তাঁর প্রযোজিত দু'খানি ছবি, সম্ভবত তাঁর নিজেরই গল্পরূপ, 'চোরকাঁটা' ও 'চাষার মেয়ে'। আর মনে পড়ে তাঁর তখন সদ্য-প্রকাশিত একখানি উপন্যাস, 'কল্পনা দেবী'। নিজের বয়েস তখন উনিশ, উপন্যাস পাঠ আরম্ভ করেছি তার আগেই।

পাঁচ বৎসর কলকাতা বাসের পর বাংলার বাইরে চলে যেতে হয় জীবনধারণের তাগাদায়। প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে আর একবার হ'লো ছাড়াছাড়ি প্রায় পনের-ষোল বৎসরের মত।

সেটা হবে ১৯৪৯-৫০ সাল। সেই সুদূর বিদেশে বসেই একখণ্ড (১ম খণ্ড) মহাস্থবির জাতক কি করে হাতে এসে হাজির হয়—প্রথম আর দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র তখন প্রকাশ লাভ করেছে। পড়ে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলুম, এ কোন মানুষ যাঁর লিখবার কায়দা এত সুন্দর অথচ কাহিনী পড়ে মনে হয় একেবারে উচ্ছন্নে-যাওয়া লোক, যার জীবনে বলবার কিছুই নেই—অন্তত আত্মজীবনী লিখবার মত বৃহৎ ব্যক্তিদের জীবন-কথায় যে প্রভাতের রৌদ্র থাকে তার কিছুই নেই, এ যে একেবারেই উল্টো। অথচ এত কথা বলেছেন এত গুছিয়ে। 'মহাস্থবির' তাঁর ছদ্মনাম এবং জাতকের গোড়ায় ঐ নামই দেওয়া ছিল। কিন্তু জাতকের শেষ দিকে এসে আমি, অন্তত আমি ধরে ফেলি যে, এ কাহিনী প্রেমাঙ্কুরের কারণ ওর শেষ দিকে দুষ্টু ছেলের ডায়েরীর অনেক সংবাদই ছিল। তাহ'লে এই হচ্ছে প্রেমাঙ্কুরের জীবন-কাহিনী! আশ্চর্য!! কি দুঃখময়, কি ব্যথাময়, কি বাধাময় জীবন!!! কিন্তু কিছুই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, তাঁর ভিতরে ছিল বৃহত্বের বীজ—বৃহত্বে তিনি পৌঁচেছেন কিন্তু কোন একদিকে নয়। হয়তো তাঁর অবস্থা এর জন্য দায়ী, হয়তো দায়ী তাঁর অশান্ত মন। ছেলেবেলায় শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেলেন না, পরবর্তীকালে পেটের ধান্ধায় নানা কাজে হাত দিতে হ'লো,—চাকরি করলেন, ব্যবসা করলেন, গল্প উপন্যাস লিখলেন, শিশু-সাহিত্য রচনা করলেন, নাটক রচনা করলেন, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জন্য নির্মাণ করলেন ছায়াচিত্র। এর কতটা করলেন পেটের ধান্ধায় আর কতটা নিজের অশান্ত চিত্ত-বিক্ষোভে, নিত্য নতুনের স্বাদের প্রয়োজনে সেকথা বলবেন যাঁরা তাঁরা অনেক সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁর।

শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষার সুযোগ তিনি পান নি, কিন্তু তাই বলে তিনি মোটেই অশিক্ষিত ছিলেন না। বরং আপন চেষ্টায় উচ্চাঙ্গের শিক্ষালাভ করেছিলেন, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী তিনটি ভাষাতেই যার অনেকখানিই হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাঁর সাহিত্যকীর্তি পড়লে যদিও তাঁর ক্ষমতার অনুপাতে সে কীর্তি খুব বেশি নয়। মহাস্থবিরের জাতকের চার খণ্ড, কল্পনা দেবী, দুই রাত্রি, স্বর্গের চাবি, প্রভাত সঙ্গীত, বিচিত্র লোক, শ্রেষ্ঠ গল্প, আরও এখানে সেখানে ছড়ানো বহুতর লেখা, এসবের সংবাদ যাঁরাই রাখেন তাঁরাই জানেন, তিনি ছিলেন কতখানি বিদ্বান, কত বড় কবি আর কি বিশাল মানব দরদী।

মহাস্থবির জাতকের প্রথম খণ্ড যখন আমার হাতে এসে পৌঁছোয় তখন তার দু'টি খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হ'য়েছে। কাজেই তার দ্বিতীয় খণ্ডটি কিনতে হ'লো এবং শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী পড়বার মত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলুম আরও খণ্ড করে প্রকাশলাভ করবে সেই আশায়। তবে তাতে বঞ্চিত হ'তে হয় নি মোটেই, কারণ শ্রীকান্তের মতই তিনিও চারখানি খণ্ডই দিয়ে গেছেন বাংলার পাঠককে।

প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে এই আমার তৃতীয় বার পরিচয়। এইবার খোঁজ করতে লাগলুম ওঁর আর কি বই আছে। সংবাদ পেলুম 'স্বর্গের চাবি'র। সঙ্গে সঙ্গে কেনা গেল, পড়ে আর একবার মুগ্ধ হবার পালা। কোন গল্পই সচ্চরিত্র জীবনাদর্শ নয়। কিন্তু কি তার প্রকাশ, কি গল্পের উপাদান আর কি ঘটনা-গ্রন্থন-কায়দা। এ যেন গল্প-সাহিত্যের নতুন একটা দিক, একটা নতুন ধরণ। এ আর কারু মত নয়, এ একেবারেই অনন্য, এ নিতান্তই প্রেমাঙ্কুরী। এর পর হাতে এল ছোট্ট একখানি কয়েক পৃষ্ঠার উপন্যাস 'দুই রাত্রি'। পূর্বে বলেছি তিনি ছিলেন অতি বড় কবি। কথাটা ব্যবহার করা হ'য়েছে কবি-মানস অর্থে তা নইলে তিনি নিজে কোনদিন একটি কবিতার ক্ষুদ্রতম চরণও রচনা করেন নি। অন্তত কোন কবিতাই কোথাও প্রকাশ করেন নি কোন দিন। তাঁর এই কবি-মানসের প্রথম পরিচয় পাই স্বর্গের চাবির 'কবির মেয়ে' গল্পে আর এই 'দুই রাত্রি'তে তা আরও রূপ পেল। কবির মেয়েতে ছিল কাব্যিক ভাব, দুই রাত্রি সম্পূর্ণ উপন্যাসখানাই যেন

একটি কবিতা। অদ্ভুত তার গল্পের বাঁধুনি আর কি মধুর ভাষা-ঝঙ্কার।

এইবার সরাসরি প্রেমাঙ্কুরকেই চিঠি লিখতে হ'লো তাঁর আরও বইয়ের সংবাদ আকাঙ্ক্ষা করে। কলকাতায় এক পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলুম সে চিঠি, কয়েক দিনের ভিতরেই প্রেমাঙ্কুরের কাছ থেকে তার উত্তর এল তখন সবে প্রকাশিত 'প্রভাত সঙ্গীত' ও 'বিচিত্র লোক'-এর সংবাদ নিয়ে। আনালুম, এও প্রেমাঙ্কুরের কিছু গল্প কিছু গল্পাকারে আত্ম-কাহিনী। প্রভাত সঙ্গীতের একটি রচনা আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে তা হচ্ছে 'মুস্কিল আসান'। মুস্কিল আসান আমরা সবাই দেখি, যে কোন সহরের রাস্তায় সব সময়েই (সন্ধ্যের পর) তাদের দেখতে পাওয়া যায়. অথচ এরা যে কে, কি এদের কাজ, কি ধারণা, কি বা দর্শন আমরা জানিও না জানবার চেষ্টাও করি না। হয় তো আমাদের প্রয়োজন হয় না তাই। হয় তো তাকে দেখবার একটা বিশেষ অবস্থা, একটু বিশেষ মুহূর্ত চাই, যে মুহূর্ত প্রেমাঙ্কুরের এসেছিল নিতান্তই ছেলেবেলা, আর তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন একেবারে বৃদ্ধ বয়সে সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় খতিয়ে। এত সাদা জিনিস, এত সহজলভ্য আর এত অবজ্ঞাত এক বস্তু নিয়ে অমন একটি মহতী দার্শনিক রচনা সৃষ্টি শুধু প্রেমাঙ্কুরের পক্ষেই সম্ভব।

এই সময় একবার কলকাতা যাই, সেটা ১৯৫৯ সাল। যাবার আগেই ঠিক করে গেছলুম প্রেমাঙ্কুরবাবুর সঙ্গে দেখা করব। হাজির হলুম একদিন বিকেলে চালতাবাগানের তাঁর ছোট মেয়ের বাসায়, সেখানে তিনি তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি অসুস্থ বৎসর যাপন করেছেন। তখন তিনি ভারি অসুস্থ, হাই ব্লাড প্রেসার। খবর পাঠাতেই ডেকে পাঠালেন। ৪০ বৎসর ধরে যাঁর জীবন ও সাহিত্য কীর্তি অনুসরণ করে এসেছি তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো। শুয়ে আছেন উঠতে পারেন না।

আমায় কুশল প্রশ্ন করলেন, নিজের অসুস্থতার অসামর্থ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আরও দু'চারটি একথা সেকথার পর সাহিত্য আলোচনাতে যেতেই, বিষয়টি টেনেছিলুম মুস্কিল-আসানে—

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন, 'বলবেন না বলবেন না, ওতে আমার মায়ের স্মৃতি আছে—এক্ষুণি ব্লাড-প্রেসার চাড়িয়ে উঠবে।'

কাজেই সাহিত্য আলোচনা এগোল না, ক্ষমা চেয়ে একটি মাত্র সাহিত্যের প্রশ্ন করলুম, 'আপনার সব সাহিত্য কীর্তির মধ্যে কোনটি আপনার নিজের শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়?'

বললেন, 'ঝড়ের পাখী' পড়বেন জোগাড় করতে পারলে।'

দুঃখ এই যে, নানা কাজের ভিড়ে, নানা হালে-চালে, নানা গাফিলতির বিড়ম্বনায়ও আর সংগ্রহ করে পড়া হয় নি। সুখ এই যে, প্রেমাঙ্কুরের একখানা বই এবং ওঁর নিজের মতে ওঁর শ্রেষ্ঠ বই এখনও আমার পড়তে বাকি আছে।

সেই ওঁর সঙ্গে আমার একমাত্র দেখা, সেই প্রথম ও সেই শেষ। যাঁরা ওঁকে ভালভাবে বন্ধুত্বের পর্যায়ে জানতেন, তাঁরাই জানেন উনি কি বৈঠকী মানুষ ছিলেন, কি বন্ধুবৎসল, কি আলাপ-চারিতার যাদুকর। তাঁর গল্প উপন্যাসে যেমন নিজের জীবন ছড়ানো বোঝা যায় না কোনটা জীবন, আর কোনটা কাহিনী, তেমনি বৈঠকে বসেও গল্প করতেন তাঁর জীবনের সব অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ঘটনা—যা আমাদের সাধারণ ছা-পোষা জীবনে নিতান্তই অকল্পনেয়, অসম্ভব। এ সব আমার শোনা কথা সেই সব বন্ধুর কাছ থেকে যাঁরা ওঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন বিস্তর। সম্প্রতি ওঁর মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, যিনি ওঁর নিকট সান্নিধ্যে ছিলেন বহুদিন, ওঁর সম্বন্ধে দু'টি লেখা লিখেছেন, একটি ২৩শে অক্টোবর ৬ই কার্তিকের 'অমৃত'তে ও আর একটি ২৫শে অক্টোবর ৮ই কার্তিকের 'যুগান্তর'-এ সংবাদ পৃষ্ঠায়। এই দু'টি রচনাতেই 'প্রেমাঙ্কুর-চরিত্র' চমৎকার পরিস্ফুট রয়েছে।

জীবনে তিনি নানা বিভিন্ন ধরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাই লেখার কাজ সর্বদাই এক ধারায় চলে নি। ইদানীং অসুস্থ অবস্থায় তিনি অনেক লিখতেন তা যারা প্রতি বৎসরের বিভিন্ন পূজা-সংখ্যার খবর রাখেন তাঁরাই জানেন। গল্প-উপন্যাস-নাটক ছাড়াও তিনি রচনাও লিখেছেন অনেক। বিশেষ দু'টি মনে পড়ে বোধ করি ১৯৪৯-৫০ সনের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'আমাদের ছেলেরা' ও 'আজি হ'তে শত বর্ষ পরে'। দু'টিরই আরম্ভ নিজের জীবনকে অবলম্বন করে আর শেষ দেশের দু'টি বিরাট গম্ভীর সমস্যায়। ছোটদের জন্যও তিনি লিখেছেন অনেক। মৌচাকেই তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করি—পরবর্তীকালেও মৌচাকেই এখানে সেখানে ছড়ানো চোখে পড়েছে তাঁর ছেলেদের জন্য নানা লেখা।

বিদেশ থেকে তাঁর মৃত্যু সংবাদটা ঠিক সময়মত জানতে পারি নি। ওটা প্রথম জানলুম অমৃতর পৃষ্ঠায় (২৩শে অক্টোবর) পরিমলবাবুর রচনা থেকে। স্বভাবতই মনে হ'লো উনি কবে মারা গেলেন এবং মৃত্যুকালে বয়েস কত হ'য়েছিল। বছর তিনেক আগে 'দেশ'-এর পৃষ্ঠায় সাহিত্যিক শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ প্রকাশিত হ'য়েছিল। তাতে সাক্ষাতের শেষ দিকে সুধীরঞ্জন ওঁকে বয়সের কথা জিজ্ঞাসা

রক্তে মাঘ

বিষ্ণু দে

রক্তে মাঘ, তবু স্নায়ু বসন্তবাহারে বিচলিত,
ভাদ্রের সজল ব্যথা বিজ্ঞাপিত অস্থিতে পেশীতে ;
অথচ মনের ক্ষিপ্র কৌতূহল বুভুক্ষু, তৃষিত ;
কামনাও অন্তহীন, যেন বা ফাল্গুন কাঁপে শীতে,
মৃতে, অর্ধমৃতে এল যৌবন বেদনা-রসে ভোলা
একাগ্র ইন্দ্রিয়মগ্ন সন্ন্যাসীর মতো, কিংবা বলো
কৈশোর-উদ্বেল ঘোরে ; কখনও বা শিশুর উতলা
অর্থাৎ সম্পূর্ণ এক মানসিক মুক্তিতে—টলোমলো
খেলার বাস্তবে ধ্যানে অভিন্ন কল্পনা রাত্রিদিন ।

তবু রক্তে হিম হাওয়া ঝরে, বালি ওড়ে, ওঠে চর
বর্তমান চতুর্দিকে পেশীতে গ্রন্থিতে শিথিলতা,—
শিশুর কৌতুক সঙ্গী, যৌবনের করুণার পাত্র,
যদিচ বিশুদ্ধ তীব্র জিজ্ঞাসায় মগ্ন আবিলতা
নেই, নেই আত্মময় লোভ আর ক্লান্তি । একমাত্র
বলা যায়, নিজেই নিজের কাছে প্রায় হাস্যকর ।

অথচ এও তো সত্য বৃদ্ধ রক্তে হৃদয় স্বাধীন ॥

কথায় তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বলেছিলেন, '৭১ও বলতে পার, '৭৩ও বলতে পার ।'

সুধীরঞ্জন অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'মানে ?'

হাসিমুখেই তিনি বলেছিলেন, 'মানে ৭২, তবে ওটা বলি নে—তোমরা শেষে বলবে বাহাত্তরে ধরেছে ।'

সেই হিসেবে ওঁর বয়েস হওয়া উচিত ৭৫ বৎসর । পরে সে সংবাদ, তাঁর বয়সের হিসেব ও মৃত্যুর তারিখ পাই ২৪শে অক্টোবর, ৭ই কার্তিকের 'দেশ'-এর শেষ পৃষ্ঠায়—সাপ্তাহিক সংবাদে । যাঁরা এখনও সংবাদটুকু জানেন না তাঁদের জন্য এটি এখানে তুলে দিচ্ছি—

'১৩ই অক্টোবর, মহাস্থবির-জাতক রচয়িতা প্রথিত যশা সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী অদ্য সকাল প্রায় সাতটার সময় ৭-এ, চালতাবাগান লেনে তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতার বাড়িতে পরলোকগমন করেন । মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল ।'

জার্মানীতে নেতাজী

কমলকুমার ধর

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল, ১৯৪০ সালের শেষের দিকে সে সেই সংগ্রামে নিজের শক্তিকে সুসংহত করে নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। কিন্তু এই সময়ে ইতালী সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় তাকে বেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হলো। কেন না ইতালীর সৈন্যবাহিনী ছিল অদক্ষ। সেইজন্যে জার্মানীকে এই সময়ে তার শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনীর কিছু অংশকে উত্তর-আফ্রিকা এবং বলকান দেশগুলোতে পাঠাবার কথা চিন্তা করতে হলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক এই পটভূমিকায় জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরে একদিন এক বিদেশীর আবির্ভাব ঘটল। নাম তাঁর Mr. Orlando Mazzota. তাঁর হাতে ছিল একটা ইতালীয় ছাড়পত্র। তিনি কাবুল থেকে রাশিয়া হয়ে এখানে এসেছেন। কিন্তু জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সেদিন বুঝতে দেরি হয় নি যে, ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী অর্থাৎ কলকাতার বাড়ি থেকে সুভাষচন্দ্র যেদিন রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করলেন, সেদিন রাত্রে পাঞ্জাব মেলের একটা কামরায়



কর্মরত সুভাষচন্দ্র

জিয়াউদ্দিন নামে লক্ষ্ণৌবাসী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর যে অফিসারটিকে দেখা গিয়েছিল এবং তার ঠিক দু'দিন পরে পেশোয়ার থেকে কাবুলের পথে বোবা এবং বধির যে পাঠান ব্যক্তিটিকে পথ চলতে দেখা গিয়েছিল এবং ঐ বছরেরই ২০শে মার্চ তারিখে মস্কো শহরে একজন ইতালীবাসীর ছদ্মবেশে যে ব্যক্তিটিকে দেখা গিয়েছিল, ইতালীয় ছাড়পত্র হাতে তাঁর সামনে উপস্থিত এই বিদেশী ব্যক্তিটি তাদের থেকে অভিন্ন। ইনিই সেই জনপ্রিয় ভারতীয় নেতা—যাঁর নাম তখন ভারতের বিশেষ করে বাঙলা দেশের প্রতিটি মানুষের মনে এক অক্ষয় আসন লাভ করেছে। তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

শ্রীবসু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা ভারতের অন্য কোন দায়িত্বসম্পন্ন এবং স্বীকৃত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোন পরিচয়পত্র নিয়ে বৃটিশের শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সংগ্রামে ভারতকে সশস্ত্র সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে ইউরোপে আসেন নি। তিনি একমাত্র নিজের ঐকিক ইচ্ছাশক্তিকে পাথেয় করেই পাড়ি জমিয়েছিলেন সেই বিপদসঙ্কুল যাত্রায়। কাজেই তখনকার সেই যুদ্ধোন্মাদনাময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানীর পক্ষে তাঁকে একজন সম্মানীয় অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আশ্রয়দান ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র কেবলমাত্র রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে জার্মানীতে আসেন নি। যুদ্ধে বৃটিশশক্তির দুর্বলতা ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছিল এবং সুভাষচন্দ্রের তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বাইরে থেকে ভারতের বৃটিশশক্তিকে এমন এক আঘাত হানা—যা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে।

এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জার্মান-সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এবং জার্মানীতে বসবাসকারী ভারতীয়দের সহযোগিতায় তিনি প্রথমে 'Free India Centre' নামে—একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কার্যালয়ের কাজ হলো দু'টো কার্যক্রম তদারক করা—

(১) বার্লিন বেতারকেন্দ্র থেকে ভারতবাসীদের উদ্দেশে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা প্রচার করা এবং

(২) জার্মানীস্থিত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদেরকে নিয়ে জার্মানীতে একটি ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা।

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খাঁ তাঁর 'My Memories of I. N. A. and its Netaji' গ্রন্থে লিখেছেন—

'Netaji managed to reach Germany where he met Hitler and discussed the possibility of forming an army of Indians residing in German-occupied territory and from among Indian prisoners of war. Early in January 1942, Netaji raised the first battalion of the Free India Legion in Germany.'

এ ছাড়াও আর একটি পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের মনের কোণে বিদ্যমান ছিল। সেটা হচ্ছে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে সেগুলোকে পরীক্ষা করার জন্যে একটি পরিকল্পনা-কমিটী গঠন করা। এই উদ্দেশ্যটি অবশ্য বেশিদূর অগ্রসর হয় নি।

এইসব পরিকল্পনা কার্যকরী করতে যা ব্যয় হবে জার্মান সরকার তার সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন। স্থির হলো যে, এটা সুভাষচন্দ্রের আন্দোলনের প্রতি 'জাতীয় কর্জ' হিসেবে গণ্য হবে। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভাতা স্থির হলো মাসিক ৮০০ পাউণ্ড। Free India Centre-এর মাসিক বরাদ্দ যা ১৯৪১ সালে ১২০০ পাউণ্ড ধার্য হয়েছিল, ১৯৪৪ সালে তা ৩২০০ পাউণ্ডে উন্নীত হয়েছিল। জার্মানীতে ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন বাবদ যে ব্যয় হবে সেটা অবশ্য এই হিসেবের বাইরে। এও স্থিরীকৃত হলো যে, Free India Centre-এর কার্যাবলীতে জার্মান সরকার কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। টাইগার্টেন (Tiegarten) নামক জায়গায় যেখানে সমস্ত বৈদেশিক দূতাবাসগুলো অবস্থিত, সেখানে এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে একটি সুসজ্জিত বাড়ি জার্মান সরকার দান করলেন। এই বাড়িতে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস থেকে এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কাজ শুরু হয়। সেখানে সুভাষচন্দ্রের সচিব হিসেবে কাজ করেছিলেন তাঁর পুরনো সাথী Fraulein Schenkle এখন যিনি নেতাজী-কন্যা শ্রীমতী অনীতা বসুর জননী। ১৯৩৪ সালে নেতাজী যখন ভিয়েনাতে ছিলেন, তখন ইনি ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামকে শক্তিশালী ক'রে তোলার ব্যাপারে তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য রাজনৈতিক কারণেই নেতাজীর এই বিবাহের সংবাদটিকে গোপন রাখতে হয়েছিল। একমাত্র জার্মানী থেকে দূরপ্রাচ্য যাত্রার প্রাক্কালেই নেতাজী শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে চিঠি লিখে এই সংবাদটি জানিয়েছিলেন।

১৯৪১ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে Free India Centre-এর প্রথম সভায় নীতি নির্ধারণ এবং এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ব্যাপারে কর্মীদের অবশ্য পালনীয় কতকগুলো নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলোর মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১। জয়হিন্দ—আমাদের দেশে বহু জাতির লোকের

বাস। তাদের মধ্যে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাবার নানা রকম পদ্ধতি আছে। যেমন—নমস্কার, নমস্তে, রামরাম, সেলাম আলেকুম ইত্যাদি। কিন্তু এই সভায় স্থির হলো যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে 'জয়হিন্দ' (ভারতের জয় হোক) বলে সম্ভাষণ জানাবে। আজও এই 'জয়হিন্দ' কথাটি প্রতিটি ভারতবাসীর মনে একটা ঐক্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি ক'রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে।

২। নেতাজী—আমরা ভারতবাসীরা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন উপাধি দ্বারা শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। যেমন মহাত্মা, সর্দার, পীর, গুরুজী ইত্যাদি। সেইভাবে সেই সভায় সেই লৌহদৃঢ় ভারতীয় জাতির নেতা সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' এই বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

৩। জাতীয় সঙ্গীত—সেই সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ধর্মের সংজ্ঞা সম্বলিত 'জনগণমন···'এই সঙ্গীতটিকেই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। খুব গৌরবের কথা যে, তার ঠিক ছ'বছর পরেই স্বাধীন ভারতে জাতীয় সরকারও এই সঙ্গীতটিকেই স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ ক'রে নেতাজী এবং বার্লিনস্থিত তাঁর দেশপ্রেমিক সহকর্মীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

৪। জাতীয় ভাষা—বহু ভাষাভাষী অধিবাসী অধ্যুষিত ভারতের একটা সাধারণ এবং জাতীয় ভাষা থাকা একান্ত দরকার এবং সে ভাষাটা বিদেশী নয়, দেশীয় হওয়া চাই। যেহেতু ভারতের অধিকাংশ লোকই হিন্দুস্তানী ভাষা বোঝে, সেজন্যে নেতাজীর মতে সেই ভাষাটিই ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। তিনি বলেছিলেন যে, 'আমাদের চেষ্টা হবে যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ভাষার উপরে ভিত্তি করেই এবং খোলা মন নিয়ে আমাদের জাতীয় ভাষার শব্দসম্ভার রচনা করা।'

জার্মানীতে নেতাজীর কার্যক্রমের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হচ্ছে বার্লিন থেকে বেতারে ভারতবাসীদের উদ্দেশে তাঁর দেশপ্রেমের আগুনঝরা বক্তৃতামালা প্রচার করা। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই বক্তৃতা প্রচার করা হত, যাতে ভারতের শ্রোতারা কোনরকমে সেই বক্তৃতা শোনা থেকে বঞ্চিত না হন। জার্মান-সরকারের ব্যবস্থা অনুযায়ী এই বেতারসূচী 'আজাদ-হিন্দ রেডিও' নামে এবং একটা বিশেষ তরঙ্গের মাধ্যমে প্রচার করা হত যাতে জার্মান রেডিওর কোনো অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই ভারতীয় অনুষ্ঠান মিশে যেতে না পারে। বার্লিনে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রদের সহযোগিতায় ভারত তথা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে এইসব বক্তৃতা প্রস্তুত করা হত। জার্মানীর আভ্যন্তরীণ নানা গোলযোগ এমন কি কয়েকজন সামরিক অফিসার কর্তৃক হিটলারকে হত্যা করার ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও জার্মান-সরকার কোনদিন এই আজাদ-হিন্দ রেডিওর অনুষ্ঠান প্রচারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। স্বাধীন-ভাবেই আজাদ-হিন্দ রেডিওর অনুষ্ঠান যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত চলেছিল।

কলকাতাস্থিত বাড়ি থেকে নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর বৃটিশ সি-আই-ডিরা সব সময় চেষ্টা করেও যখন তাঁর কোন সন্ধান করতে পারল না, তখন তারা এক কূট কৌশল অবলম্বন করে সমস্ত পৃথিবীতে একটা গুজব রটিয়ে দিল যে, একটা জরুরী সভায় যোগদান করার উদ্দেশ্যে টোকিও যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হয়েছেন। তারা ভেবেছিল যে, এই সংবাদ নেতাজীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে একটা বিরাট আঘাতস্বরূপ হবে এবং তাঁদেরকে সেই শোকযন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে নেতাজীকে নিশ্চয়ই তাঁর সঠিক জীবন্ত উপস্থিতির কথা তাঁদেরকে জানাতেই হবে। কিন্তু বৃটিশ সরকার নেতাজীকে চিনতে ভুল করেছিলেন।

১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে আজাদ-হিন্দ রেডিওর প্রথম অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় এবং তাতে নেতাজী প্রথম বক্তৃতা দেন। প্রথমে জার্মান সরকার আজাদ-হিন্দ রেডিওর অনুষ্ঠান প্রচারের জন্যে মাত্র ৪৫ মিনিট সময় দিয়েছিলেন। এই ৪৫ মিনিটে দু' তিনটি ভাষায় এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জার্মান সরকার এই সময় বাড়িয়ে পুরো তিন ঘণ্টা করে দিয়েছিলেন। তখন থেকে আজাদ-হিন্দ রেডিও ছাড়া 'আজাদ মুসলিম রেডিও' এবং 'কংগ্রেস রেডিও' নামে আরো দু'টো স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান প্রচারিত হত।

আজাদ-হিন্দ রেডিও থেকে প্রতিদিন ইংরেজি, হিন্দি, পারস্য, পুশ্‌টু (pushtu), তামিল ও তেলেগু—এই দু'টো ভাষায় এবং পর্যায়ক্রমে গুজরাটী ও মারাঠী ভাষায়ও অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। বার্লিনস্থিত যে-সব শিক্ষিত ভারতীয় যুবক নেতাজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় ভারতের স্বাধীনতার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের সেই মহৎ সংকল্পে অটুট ছিলেন। জার্মানী থেকে নেতাজীর দূরপ্রাচ্য যাত্রার পরেও তাঁরা অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই বেতার অনুষ্ঠানের কর্মসূচী চালিয়ে গিয়েছিলেন।

জার্মানীতে নেতাজীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, সেখানে সকলরকম যুদ্ধকৌশলে সুশিক্ষিত এক শক্তিশালী ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করা। জার্মানীতে সে

সময়ে প্রায় দশ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ছিল। তাদের মধ্যে থেকে পাঁচজনকে আজাদ-হিন্দ-রেডিওর হিন্দুস্তানী অনুষ্ঠান প্রচারে সাহায্য করার জন্যে পাওয়া গিয়েছিল। তারা নির্দিষ্ট সময়ে প্রহরাধীনে আসত এবং অনুবাদ প্রভৃতির কাজ শেষ হলে সেইভাবে প্রহরাধীনেই আবার ব্যারাকে ফিরে যেত। তাদেরকে দেখে নেতাজীর মনে হলো যে, দশ হাজার এই রকম কর্মঠ ভারতীয় যুবককে ঐভাবে বন্দিজীবনের মধ্যে দিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। তাদেরকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কাজে লাগাতে হবে।

কিন্তু ব্যাপারটা ভাবা যতটা সহজ, আসলে ততটা সহজ ছিল না। প্রথমত যুদ্ধবন্দীদের অধিকাংশই ছিল ভারতের দারিদ্র্যপ্রপীড়িত গ্রামের গরীব ঘরের অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত সন্তান। রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যেই প্রধানত তাদেরকে বৃটিশ সরকারের অধীনে সৈনিকের কাজে যোগদান করতে হয়েছিল এবং তাদের এই বন্দিদশায় ভারতস্থিত তাদের পরিজনবর্গ বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে তাদের বেতনবাবদ যে সামান্য অর্থ পেয়ে কোনরকমে পরিবার প্রতিপালন করছিল, বৃটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে নেতাজীর ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতীয় বাহিনীতে যোগদান করলে তাদের পরিজনবর্গ সেই অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়ে অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। তাদের চাকরি এবং পেন্সনও বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও নেতাজীর আহ্বান মিথ্যে হয় নি। জার্মানীর মাটিতে জার্মানীতে অবস্থিত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদেরকে নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন করার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জার্মান-সরকারের অনুমতি পেতেও নেতাজীকে খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি। আর শুধু তাই নয়; জার্মান সেনাবাহিনীর দক্ষ অফিসারেরাই শিক্ষা দিয়ে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদেরকে সবরকম রণকুশলতায় পারদর্শী করে তুলবেন—এতেও জার্মান-সরকার রাজী হলেন। আর শত অসুবিধে আর বিপদ সত্ত্বেও যুদ্ধবন্দীদের একটা বিরাট অংশ নেতাজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি এবং ভারতবর্ষের প্রতি তাদের জলন্ত শ্রদ্ধা ও মমতার পরিচয় দিয়েছিল। প্রথমে বার্লিনস্থিত শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে থেকে দশজন এবং আজাদ হিন্দ রেডিওর কাজে নিযুক্ত সেই পাঁচজন যুদ্ধবন্দী—এই পনেরোজনকে নিয়ে প্রথম দলকে প্রস্তুত করা হলো।

ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রথম দলটিকে বিদায় অভিবাদন জানাবার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে Free India Centre-এর কার্যালয়ে এক সভা হয়েছিল। পরের দিন এই দলটির ফ্র্যাঙ্কেনবার্গ (এই বাহিনীর প্রথম হেড কোয়ার্টার) যাত্রার কথা। বার্লিনস্থিত ভারতীয়রাও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আজাদ-হিন্দ ফৌজের এই প্রথম দলটিকে অভিবাদন এবং আশীর্বাদ জানিয়ে নেতাজী এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। সেদিন তাঁর চোখে ছিল আনন্দাশ্রু।

দশ মাসের মধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হলো ৬০০। অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশায় ফ্র্যাঙ্কেনবার্গ থেকে হেড কোয়ার্টার কেনিগ্‌সব্রুক্‌-এ স্থানান্তরিত করা হলো। কেন না সেখানে পদাতিক বাহিনীকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্র ছিল অত্যধিক প্রশস্ত।

এই বাহিনী এবং যুদ্ধবন্দীদের সভায় নেতাজী যখন তাঁর আদর্শ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করতেন, তখন সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে তাদের এই মহান নেতার কথা শুনত এবং সভাশেষে 'আজাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'নেতাজী জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি সহযোগে তারা তাদের আনন্দ প্রকাশ করত। আজাদ-হিন্দ রেডিওতে নেতাজীর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'This Europe' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

'I saw how the whole audience was coming under his spell and how they were listening... when he had finished...they had acquired new life, new animation, new excitement...'

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল ৩৫০০ অর্থাৎ চার ব্যাটেলিয়ন। নেতাজী চাইলে এই সংখ্যা আরো বিশাল আকার ধারণ করতে পারত। কিন্তু তিনি তা চান নি। এই বিরাট আজাদ-হিন্দ বাহিনী প্রায় ৩০০ জন জার্মান অফিসার ও নন-কমিশন্‌ড্ অফিসারের সুদক্ষ পরিচালনায় সকলরকম যুদ্ধ-কৌশলে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

তারপরে নেতাজী দেখলেন যে, জার্মানীতে তাঁর কাজ প্রায় ফুরিয়েছে। এবার ভারতের কাছে দূরপ্রাচ্যে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন এবং সেই অভিপ্রায়ে অত্যন্ত গোপনে জার্মান এবং জাপান-সরকারের যৌথ সহযোগিতায় তাঁর দূরপ্রাচ্য যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল। এর জন্যে এই উভয় সরকারকেই যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। জার্মানীতে নেতাজীর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী N. G. Gaupuley তাঁর 'Netaji in Germany' গ্রন্থে লিখেছেন—

'...Even after some time when the two Governments agreed, the respective Naval Departments which had to be responsible for the safe transport of this important passenger were required to make very elaborate preparations in consultation with each other... Germany had the most difficult task, as her submarine was required to pass through mine-

infested and carefully guarded waters round the British Isles...Both these submarines had to do that long distance in a scheduled period and were to meet at a given time at an appointed place in the South African waters to exchange this 'precious cargo', and transfer the important personality of Netaji travelling in German submarine.'

অবশেষে ১৯৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নেতাজী জার্মান সরকারের U-190 নং সাবমেরিনটিতে চ'ড়ে সাড়ে তিন মাসব্যাপী সেই দুর্গম এবং ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রায় দূরপ্রাচ্যের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মাদাগাস্কারের কাছে একটি জাপানী সাবমেরিন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেখানে পৌঁছালে জার্মান সাবমেরিনটিকে বিদায় দিয়ে তিনি জাপানী সাবমেরিনে উঠলেন। মে মাসে তিনি সিঙ্গাপুর পৌঁছালেন। সেখানে জাপান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে Colonel Yamamoto তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার মহৎ ব্রত নিয়ে জাপানে তিনি যেসব অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাপানীদের হাতে যেসব ভারতীয়রা বন্দী হয়েছিল তাদের নিয়ে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন এবং তাদের সাহায্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো। অবশেষে জাপান যখন হেরে গেল, তখন আজাদ-হিন্দ-ফৌজও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপর নেতাজীর কি হলো সে-টা একটা রহস্যজালে আবৃত রয়ে গেছে। অনেকের মতে ১৯৪৫ সালে জাপানের পথে এক বিমান-দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। আবার অনেকের বিশ্বাস তিনি এখনো জীবিত আছেন।

নেতাজী ছিলেন একজন অকুতোভয় বীর যোদ্ধা। মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্যে তিনি যে সীমাহীন কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার তুলনা হয় না। তিনি মৃতই হোন অথবা জীবিতই হোন প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে তিনি চিরকাল এক অক্ষয় আসন অধিকার করে থাকবেন। সর্বকালের—সকল দেশপ্রেমিকের কাছেই তাঁর গৌরবময় জীবন এক সীমাহীন অনুপ্রেরণার উৎসস্থল হয়ে থাকবে।

তৃতীয় পক্ষের ছায়া

শক্তি মুখোপাধ্যায়

তোমাকে দিয়েছি সব। পাবার জন্যে
কিছুই দিই নি। তবু, পেয়েছি অনেক।
আরো চাই—মনে হয়, চরম প্রাপ্তির শেষ
এখনো হয় নি।
কিছুক্ষণ আগেও ভাবি নি কিংবা ভাবতে পারি নি,
অসমাপ্ত জীবনের সেতু বিষময়।

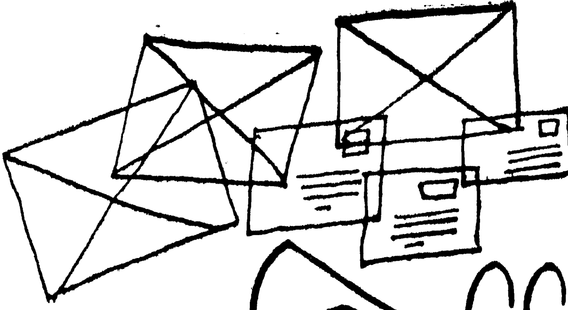
পাশে চেয়ে ছাখো, শুকনো আবর্জনা কাছে
পড়ে আছে, চলো দূরে যাই—
বিশ্বাসঘাতক হাওয়া ওড়াবে এখনি।

তরল অন্ধকারে পায়ে পায়ে হেঁটে
প্রেতাত্মা কবর ফুঁড়ে আবার আসবে।
তার আসার আগেই
অভিশপ্ত ছায়াকে বাঁচিয়ে
চলো অন্য শক্ত খুঁটি খুঁজি।

আমার দেহের রক্তে এখন যৌবনের
সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয় না;
যদি কোথাও থেকে থাকে দু-একটা ক্ষত
স্পর্শ-প্রলেপে সুস্থ হতে পারে—হবে।

এসো আ[illegible] নরকের যন্ত্রণা ভাগ করে
দু'জনেই নেবো। কিন্তু সুখের বেলায়
ছাখো-যেন অন্য কেউ আসে না এখানে।

কিছুক্ষণ আগেও বলি নি কিংবা বলতে পারি নি,
চরম প্রাপ্তির দিনে তৃতীয় পক্ষের ছায়া
বড় বিষময়।



অপরিচিতার চিঠি

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দিল্লীতে পুজোর চেয়েও বেশি জমে বিসর্জনের শোভাযাত্রা। দেখতে দেখতে মহানগরীতে একটি-দু'টি করে চৌত্রিশটি পুজো আরম্ভ হয়ে গেল। না করে উপায় নেই। যা যানবাহনের অসুবিধে তাতে সময়মত পুজো-প্যাণ্ডেলে গিয়ে হাজির হওয়া বড় সোজা ব্যাপার না।

তাই দিল্লীর পরিধির সাথে সাথে বেড়েছে দিল্লীর বাঙালীর পুজো-প্যাণ্ডেলের সংখ্যা। তা ছাড়া আরও অন্য কারণ যে নেই সেটা অবশ্য কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। যাযাবর সাহেব ত' পরিষ্কারভাবেই পেশ করেছেন, যেখানে বাঙালী সেখানে মা কালী। আর সেখানেই দলাদলি। যাক্ গিয়ে সেটা ছবির উল্টোদিক।

চৌত্রিশটি পুজোর প্রতিমার একত্রিত শোভাযাত্রায় চল্লিশ হাজার বাঙালীর উপস্থিতিটুকু রাজধানীর অধিবাসিবৃন্দ বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন। চৌত্রিশটি প্রতিমা নিয়ে ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা, ব্যাণ্ড, বিউগল, মৃদঙ্গ, করতাল নিয়ে যখন শ'খানেক ট্রাক শহর প্রদক্ষিণ করতে বেরোয় তখন দিল্লী প্রবাসী বাঙালীর হৃদয় গর্বে ভরে ওঠে। শহর পুরো প্রদক্ষিণ অসম্ভব। নিউদিল্লী কালীবাড়ি থেকে শুরু হয় এ শোভাযাত্রা। কালীবাড়ি থেকে গোল মার্কেট এরিয়া প্রদক্ষিণ করে প্রতিমা নেওয়া হয় রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র কনট্ প্লেসের দিকে। চারিদিকে শতসহস্র দর্শক-দর্শিকার ভিড়। অনেক দিল্লীবাসী ছুটে এসে ভগবতীর পদপ্রান্তে নতুন শস্যের অর্ঘ্য ডালি দিয়ে যায়। প্রতিমার সাথে সেটাও যমুনায় বিসর্জন করা হয়।

এটা হয়ে আসছে গত দশ-বারো বছর থেকে।

যাঁরা শহর ঘুরে সব ক'খানা প্রতিমা দেখার সুযোগ পান না তাঁরা কিছুক্ষণের জন্য যমুনার তীরে হাজির হলেই সব ক'খানা প্রতিমা দেখতে পান।

বেলা ঠিক দুপুরেই পাড়ার মা ও মেয়ের দল ভগবতীকে বরণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁকে বিদায় দিলেন। ট্রাক দেবনগর ছেড়ে চলল কালীবাড়ির দিকে। কালীবাড়িতে ততক্ষণে পালাম ও ক্যান্টনমেণ্টের প্রতিমা এসে পৌঁছে গেছে।

দেখতে দেখতে সব প্রতিমা এসে হাজির করানো হলো মন্দির মার্গে। মন্দির মার্গ রিডিং রোডের নতুন নাম। একটা-দুটো নয় রাস্তার ওপর চার চারটে বিরাট মন্দির—কালীমন্দির (পাশেই বাঙালীদের শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হল। এই ক' সপ্তাহ পূর্বে), বুদ্ধমন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (লোকে বলে বিড়লা-মন্দির) আর আর্য সমাজ মন্দির।

মন্দির মার্গ হয়ে ট্রাকের শোভাযাত্রা চলল গোল মার্কেট ঘুরে কনট্ সার্কাসের দিকে। পুলিশ প্রহরীর চেয়েও স্মার্টনেস ও নিপুণতায় যাঁরা এদিন সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন নিউদিল্লী কালীবাড়ির ফ্লাইং স্কোয়াড্। স্মার্ট, প্রতিশ্রুতিপূর্ণ যুবকবৃন্দ মটর সাইকেল, স্কুটার কালীবাড়ির রক্তরঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে যখন এ বিরাট শোভাযাত্রা পাইলট করে চলেন মন তখন গর্বে ভরে ওঠে। মিণ্টো রোডের ট্রাক আগে থেকে এসেই কনট্ প্লেসে অপেক্ষা করছিল। রঞ্জিত সিং রোডে বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিমা এসে যোগদান করল। দরিয়াগঞ্জের প্রতিমা যোগদান করল দিল্লী গেটের কাছে।

চারিদিকে একেবারে গম্ গম্ ভাব। ট্রাফিক বন্ধ। রাস্তার দু'ধারে স্পেশ্যাল আলোর আয়োজন হয়েছে। রেড ফোর্টের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল হ্যামিল্টন ব্রীজের নীচু দিয়ে যমুনা ঘাটের দিকে। সেখানে আবার দু'খানা ট্রাক থেমে গেল। বোধ হয় পেট্রল ফুরিয়েছে। কোনো চিন্তা নেই। অবিলম্বে পাইলট্-এর দল এর একটা বিহিত করবেন।

বেলা রোডের প্রান্তদেশে রেড ফোর্টের পিছনে যখন শোভাযাত্রা গিয়ে পৌঁছলো তখন সূর্যদেব পশ্চিমাকাশে আবির ছড়াতে শুরু করেছেন। দূর থেকে ধূপ-ধুনোর গন্ধে চারিদিক আমোদিত। যমুনার জল আবার পানের অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে। তাই ট্যাঙ্কে করে ড্রামভর্তি এসেছে পানীয় ফুটানো জল। শত শত ফ্লাড লাইটে যমুনা তীর ঝলমল করছে। মাইক্রোফোনে বাজছে শানাই। শানাই-এর করুণ সুরে প্রাণে একটা অব্যক্ত বেদনা জাগছে কেন?

আরতি-স্তোত্র যেন একটা প্রতিযোগিতা চলেছে। কেউ দু'টো কেউ তিনটে ধুনুচি নিয়ে নৃত্য করছে। কেউ আবার করছেন মশাল-নৃত্য। জয়ঢাকে বাজছে বিসর্জনের বাজনা।

দিল্লীর বুকে যমুনার তীরে দেখতে দেখতে যেন এসে দাঁড়ালো ছোট একটি বাংলা দেশ।

চোরাবালিতে ওদিকে আবার একটি ছোকরা ফেঁসে গেছে। মাজা পর্যন্ত হঠাৎ বালির ভিতর ঢুকে গেছে। চারিদিকে এক চোরাই কারবার চলছে দেশে, যমুনার তীরে এসে পৌঁছে গেছে তাদের স্পর্শ। গত পঁচিশ বছরে কোনবার কেউ চোরাবালিতে ফেঁসেছে বলে শুনি নি।

দেখতে দেখতে সবার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত মিলন ঘটে গেল। পুরোনো অধ্যাপক, সন্ন্যাসী, আর্টিস্ট, সরকারী চাকুরে, ব্যবসায়ী, সবাই এসেছেন। মহিলারাও নানা রং-বেরঙের শাড়ির বাহার নিয়ে হাজির হয়েছেন। সব আধুনিকার দল।

প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে নানা কথাই মনে পড়ছিল।

এই যমুনার গতি আজ রুদ্ধ হয়েছে বেলা রোডের পাশেই। একদিন এর প্রবাহ রেড ফোর্টের ভিতর দিয়ে চাঁদনী চকের ভিতরে প্রবেশ করেছিল। কোথায় সেই পূর্ণযৌবনা যমুনা?

শক্তির আরাধনা সেদিনও দিল্লীতে ছিল অব্যাহত। কালকাজী মন্দিরে বাঙালী জমিদারের বার্ষিক অর্থপ্রেরণের প্রমাণ রয়েছে ইণ্ডিয়া গেটের ন্যাশন্যাল আর্কাইভ্‌স্-এর পুরোনো দলিলপত্রে।

হঠাৎ পাশে দু'টি সুন্দরী এসে দাঁড়ালেন। দেখতে দেখতে তাঁরা একটু একটু করে পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালেন। একজন ঠিক সামনে। একজন গা ঘেঁসে। ডান দিকে। বাঁ দিকে গা ঘেঁসে সন্ন্যাসী বন্ধু। সরার জায়গাও নেই। যমুনা তীরে তিলার্ধ স্থান নেই। লোকে লোকারণ্য।

পূজো শেষ হয়ে গেল।

বিসর্জনের পর মনটা খারাপ করে বাড়ি ফিরলাম। শুধু প্রতিমা বিসর্জনের জন্যই নয়। পার্সটি খোয়া গেছে। কিছু টাকা গচ্চা গেল। তার চেয়েও বড় চিন্তা সরকারী দপ্তরের পাশটিও ওতে ছিল। সেটাও গেছে। মনটা দমে গেল।

পার্সটা ছিল বান্ধবীর একটি বিশেষ দিনের চিহ্ন।

সবাই বললেন যাক আসল ওপর দিয়ে গেছে। ঘড়িটা আংটিটা গেলে তো আরও লোকসান হত। আর ভেবে কি হবে? সত্যি কথা, ভেবে কি হবে?

পরদিন বন্ধু-বান্ধবদের বিজয়ার চিঠি লিখতে বসে। এমন সময় বিকেলের ডাকে পিওন একখানা চিঠি নিয়ে এলো।

ভৃত্যকে বললাম নিয়ে নাও চিঠি। ডাকিয়া এসেছে বলে অত সোরগোল করছো কেন?

সে বলল, হুজুর চিঠিখানা বেয়ারিং। নব্বই পয়সা চাইছে।

জরিমানা দিয়ে যে চিঠিখানা পেলুম সেটি নীচে নিবেদন করেই আজকের কাহিনী শেষ করছি।

'প্রিয় বন্ধু,

পার্সটা হারিয়েছে। পোষাকের চাকচিক্যের তুলনায় পার্সটায় এমন বিশেষ কিছুই ছিল না। সোনার বোতাম, বড় একটা ক্লকটাওয়ারের মতন ঘড়ি হাতে বেঁধে পকেটে এত ভারী একটা পার্স নিয়ে ঘুরছিলে। সমস্ত সন্ধ্যাটিই মাটি হল। পাঁচটা টাকায় মজুরী পোষায় না। তোমার ব্যাগটাও যমুনায় বিসর্জন করে দিয়েছি। এই পাশটা দেখে মনে হচ্ছে এটার সাথে তোমার চাকরীর কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেটা ফেরৎ পাঠাচ্ছি।

মনে করো না আমরা হৃদয়হীন। হৃদয় আমাদেরও আছে। পূজোর উৎসবে আমরাও একদিন বেশ আড়ম্বরের সাথেই মানাতুম। আজ দিন গেছে। নতুন শাড়ির কথা ছেড়ে দাও। দু'মুঠো খাবারও জুটছিল না ক'দিন থেকে। আজকাল ছেলেবন্ধুরাও চালাক হয়েছে। সখার দল চোখের খেলা মিষ্টি কথাটুকু বলে নিজেদের কাজটুক সেরে প্রজাপতির মতন পালিয়ে বেড়ায়।

ভেবেছিলুম বেশ একটা মোটা মতন পার্স যখন জুটলো তখন ক'দিন চালানো যাবে। তাতে লাভ হলো না দেখছি।

যাই হোক, অত ভিড়ের মাঝখানে অমন হাঁ করে হাবার মতন আর দাঁড়িয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করো না। যদি পারো জীবন্ত দেবীদের মাঝে মাঝে কিছু দান করো। মনে আনন্দ পাবে। দেবে তার চেয়েও বেশি। ইতি—

যমুনাতীরের ক্ষণিকের বান্ধবী

অপরিচিতা।

পুনশ্চ: চিঠিখানা বেয়ারিং দিলুম বলে কিছু মনে করো না। ওটা নিজের আক্কেলসেলামী বিবেচনা করে মনকে সান্ত্বনা দিও।'

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

একাত্ম

আমিষ না নিরামিষ এই নিয়েই আমাদের লড়াই; মুক্তি আমাদের কদাচ লক্ষ্য। তাই সমস্ত জীবন গংগাস্নান, পূজাপাঠ, শুচি-অশুচি বিচার নিয়েই দিন গেল। কেউ বলতে পারলাম না, কিংবা আমাদের দেখে কেউ বলতে পারলো না যে, আমরা কিছু পেয়েছি। যাঁরা কিছু পেয়েছেন তাঁদের কাছে গিয়েও, তাঁদের পায়ে পড়েও তাই আমাদের উপায় হলো না। মামলা থেকে, ঝামেলা থেকে, রোগ-ভোগ, আর্থিক দারিদ্র্য, অপুত্রক হবার দুঃখ থেকে মুক্ত হবার রাস্তাই জানতে গেলাম; মুক্ত হবার মন্ত্র জানবার জন্যে গেলাম না কারুর কাছে। মানবজীবনে যেসব দুঃখ অনিত্য তারও জ্বালা কম নয় জানি এবং গুরুর কাছে তা অজানা থাকে না, তাও জানি। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরে যে দুঃখ নিত্য, তার হাত থেকে রেহাই পাবার সাধনায় উদ্দীপিত হলাম কৈ? সন্ধান করলাম কৈ এমন মানুষের যে দেখিয়ে দিতে পারে, এই সেই পথ—

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

আমরা কাশী যাই, তীর্থ করি, গুরু করি, কেন? না। পরকালে যাতে কষ্ট না হয়। আমরা জানি না, যে এর কোনোওটাই আকুল হয়ে করলে, কারুর জন্যে সত্যি সত্যি ব্যাকুল হয়ে পড়লে, ইহজন্মেই জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনমোচন ঘটে। প্রারব্ধ অর্থাৎ নিয়তি যে নিয়ত সত্য, তার ওপরেও সত্যতর হচ্ছেন গুরু। ইচ্ছে করলে তিনি পারেন যা প্রারব্ধ নয় তা প্রাপ্ত করাতে, যা প্রারব্ধ তাকে করতে খণ্ডন। আমরা বলি, সৎ গুরু। আমরা জানিই না যে সৎ এবং অসৎ গুরু বলে কিছু নেই। গুরু যেই হোক তাতে কিছু এসে যায় না। গুরুবরণ সত্য হলে জীবনে, অ-গুরুও গুরু হয়। অগুরু গন্ধে জীবনের দূষিত বাতাস হয় দূর।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরকে একবার এক ভক্ত বলেছিলেন যে, তাঁর বংশ শাক্ত অথচ ঠাকুর তাঁকে বৈষ্ণব-নামে দীক্ষা দিয়ে নিরামিষাশী করতে বাধ্য করছেন।

নিরামিষ কাকে বলে? প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

চাল-গম-শাক-তরকারি, উত্তর দিলেন ভক্ত।

ঠাকুর হেসে বললেন: জগদীশ বোস তো অনেকদিন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, গাছেরও প্রাণ আছে; তাহলে?

তাহলে তো এক জল ও বাতাস ছাড়া নিরামিষাশী নিরুপায়,—ভক্ত হতাশ্বাস হয়।

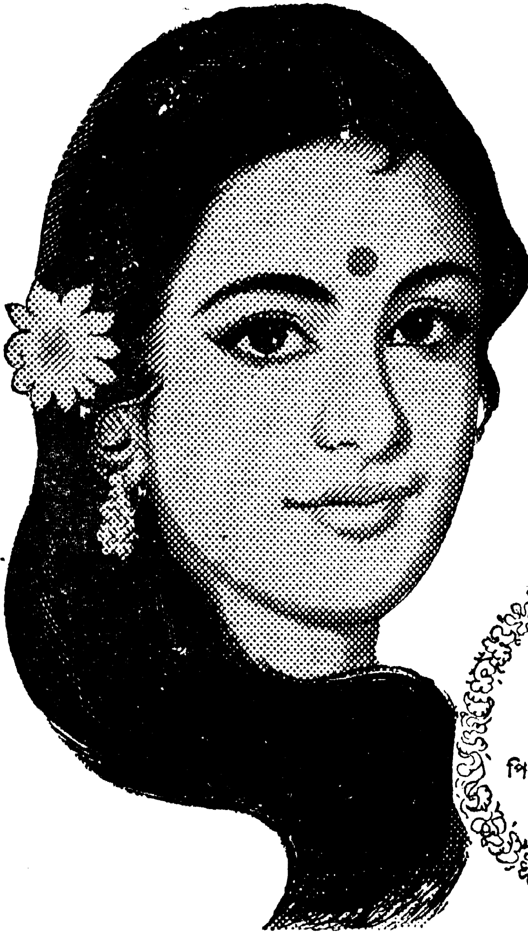
ঠাকুরের মুখে আবার হাসি, এবার আরও হাসি; অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখুন। জলে আর বাতাসে কত প্রাণীর বিচরণ!

তাহলে উপায়? আমিষ ও নিরামিষ সব তাঁর দু'পায়ে নিবেদন করে দিয়ে গ্রহণ করো। 'গেরণ' দোষ কেটে যাবে তাহলেই।

'শ্রীশ্রীরামঠাকুরের প্রসঙ্গে' এই উপদেশটি লিপিবদ্ধ করেছেন স্বর্গত লেখক, রবীন্দ্রনাথ রায়।

সব মহাপুরুষের মতোই শ্রীশ্রীরামঠাকুরের আসল জীবনও অজানা; তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে কিশোরকালেই যোগাভ্যাসে রত হন রামঠাকুর। একদিন তাঁর বৌদি প্রসন্নকুমারী খাবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর দেওর নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট; রামঠাকুরের মাথা প্রায় ঘরের ছাদে ঠেকে-ঠেকে। শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সাধন-জীবনের চল্লিশটি বছর এখনও প্রায় অনাবিষ্কৃত। কথায় কথায় কখনও কখনও তিনি তাঁর গুরুর নাম বলতেন, অনংগদেব। ভূমিকায় [শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে] বলা হয়েছে যে অনংগ অর্থে ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন যে যাঁর দেহী কিংবা বিদেহী সত্তাও নেই এমন কোনও ব্রহ্মস্বরূপের কাছেই তাঁর দীক্ষা হয়।

স্বপ্নে কিশোর রামচন্দ্র মন্ত্র পান। এই মন্ত্রের পরে তাঁর গুরু অনংগদেব তাঁকে পরিভ্রমণরত অবস্থায় অজানা অরণ্যের মধ্যে দুর্গম নির্জন এক মন্দিরে দীক্ষা দেন। দীক্ষার পর গুরুশিষ্য দু'জনের, কখনও রামঠাকুরের একার, কখনও গুরুভ্রাতার সঙ্গে কামাখ্যা থেকে কৈলাস, তন্ত্র সাধনার প্রাণভূমি তিব্বত, কত ঝড়-ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ চির-তুষারলোকে চলে সাধন-প্রব্রজ্যা। এই পথপরিক্রমায় কোটি কোটি জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে কে বলবে দেখা হয়ে যায় ধ্যাননিবিড় নীলিমার কেন্দ্রে চিরজাগ্রত ধ্রুবতারার মত জ্যোতির্দীপ্ত যোগীদের সঙ্গে। পুরাণের চেয়েও পুরানো তাঁদের দেহ; সন্দেহর ঊর্ধ্বে তাঁদের বাস। শরীর পাথরের মত নিশ্চল নিষ্কম্প; ভুরু থেকে চামড়া ঝুলে চোখ দু'টি ঢেকে গেছে। কলেবর এত দীর্ঘ যে সাধারণ লোক দু'পায়ে দাঁড়িয়ে, যোগাসনে আসীন এঁদের কপোল স্পর্শ করতে





পারেন না। বোঝা যায় না যে চিন্ময় না মৃন্ময়মূর্তি।

রামঠাকুর ও তাঁর সঙ্গী প্রণামের উত্তরে যখন তাঁদের হাত ঈষৎ উত্তোলিত হয় তখনই কেবল বোঝা যায় যে তাঁরা কেবল জীবন্ত নন উজ্জীবন্ত পুরুষ। বহুদূর বন থেকে অজানা ফল নিয়ে আসেন শিষ্যরা। কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায় শূন্যপাত্র পড়ে আছে; ভোগ গ্রহণ করেছেন তাঁরা।

গুরু অনংগদেবের সঙ্গে এবার শ্রীশ্রীরামঠাকুর পথে বেরোন একা। নিষ্পাদপ তুষারে-ঢাকা মরুদেশে গুরু অনংগদেবের জন্যে ফল খুঁজতে বেরিয়ে রামঠাকুর দেখা পেয়ে যান এক যুগল দিব্যমূর্তির। ঠাকুর প্রণাম করতে নিখিল বিশ্বের যিনি মা তিনি তুলে দিলেন একটি ফল রামঠাকুরের হাতে। গুরুকে সেই ফল খেতে দিলে গুরু অনংগদেব বললেন যে, এ ফল স্বয়ং পার্বতী রামচন্দ্রকে খেতে দিয়েছেন; তাই এ ফল গুরুর নয় শিষ্যের প্রাপ্য।

[শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে: রবীন্দ্রনাথ রায়: পৃঃ ১০৭—১০৮]

সাধন-অন্তে লোকালয়ে ফিরে এলেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর কণ্ঠে নারায়ণ-শিলা ধারণ করে। এই নারায়ণ-শিলাকে সুন্দরপুর বলে একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন তিনি। পরবর্তীকালে চিতোরের রাজা-রাণী যখন কাশীতে জীবনদীপ নির্বাপিত হবার অপেক্ষায় তখন শ্রীশ্রীরামঠাকুর কলকাতা থেকে কাশী গিয়ে তাঁদের শেষ দর্শন দেন। ৪০ বছর তিনি লোকালয়ে কাটিয়ে গেছেন। গৃহস্থের কল্যাণে মানুষকে তিনি বলেছেন কেবল নাম নিতে। নাম করতে ভাল না লাগলেও বলেছেন নাম করতে। বলেছেন, নামেই ভালো হবে নামেই আলো হবে সব।

লৌকিক পৃথিবীতে অলৌকিকের আলো আজও আসে। কেবল কাশীতে নয়, কেবল তীর্থে নয়, ঘোর কলির কুরুক্ষেত্র কলিকাতাতেও অঘটন আজও ঘটে। ভগবানের দূতেরা ছদ্মবেশে আসেন এখানে-ওখানে-সেখানে। আমরা তাঁদের কাছে যাই তুচ্ছ বাসনা নিয়ে। অমুককে বাঁচিয়ে দাও,—এই কথা বলতে বলতে সেই কথা বলা হয় না যার জন্যে মরলোকে আসা। বাসনাকে সোনা করে দিতে আসেন এঁরা। আমরা সোনাকে বাসনায় পরিণত করি। ঝোটিকে গোটিক কোন ক্যাপ খুঁজতে বেরোয় কোনও পরশ-পাথর। তার সব বাসনা কখন সোনা হয়ে গেছে টের পায় না সে নিজেও।

এর আগে কোলকাতার এক ব্যবসায়ীকে এক মহাপুরুষের নিজে থেকে দীক্ষা দিয়ে যাবার ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন কাশীর শক্তিপদ বসুরায়,—এ-কথা বলেছিলাম। এই মহাপুরুষকে দেখে বুঝবে এমন পুরুষ কে? তিনি ম্যাক্রোপোলো সিগারেট খান ঘন-ঘন। থাকেন একটি বাড়িতে আরামে। চর্মচক্ষুতে দেখলে মনে হবে সবটাই অলীক কিন্তু মর্মচক্ষে দেখলে বলা শক্ত হবে যে, এ জগতে কোন্‌টা লৌকিক আর কি কি অলৌকিক। এই অবিরত ধূমপানরত মানুষটি কোলকাতার যে, ব্যবসায়ীকে নিজে থেকে এসে দীক্ষা দিয়েছেন, সেই ব্যবসায়ীর এক বন্ধু হচ্ছে কোলকাতা পুলিশের বড়কর্তা। এঁর স্ত্রীর মাসীমা দুরারোগ্য রোগে যখন আক্রান্ত তখন ইনি স্বপ্নে দেখেন যে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের দীক্ষাদাতা স্বপ্নে স্বয়ং দেখা দিয়ে বলছেন যে মাসীমা বাঁচবেন না; দশ কি বারো দিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। স্বপ্ন দেখবার কয়েকদিন পর যখন মাসীমার চিকিৎসা চলছে কোলকাতায়, তখন পুলিশ অফিসারটি একবার তাঁর বন্ধুর দীক্ষাদাতার কাছে যান। স্বপ্নের কথা না বলে স্ত্রীর মাসীমার অসুখের কথা বলেন দীক্ষাদাতাকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন মাসীমার কি হয়েছে। অসুখের নাম শুনে মন্তব্য করেন যে এ অসুখে তো কেউ বাঁচে না, মাসীমাও মারা যাবেন।

পুলিশ অফিসার তখনকার মত চুপ করে যান। তারপর এ-কথা সে-কথার পর আবার বলেন সেই দীক্ষাদাতাকে যে তিনি যদি মাসীমাকে একটু আশীর্বাদ করতেন! তখন স্বপ্নে দেখা দেওয়া সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ বলেন: 'তুমি তো স্বপ্নটি বোঝ নি বাবা।' শোনামাত্র, পুলিশ অফিসারের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এই অফিসার ভদ্রলোকের এবং তাঁর স্ত্রীর খুব ইচ্ছে হয় এই ঘটনার পর ওই অলৌকিক শক্তিধর পুরুষটিকে নিজের বাড়িতে একবার আনবার। এরপর মাঝে মাঝেই তাঁদের বাড়ি ম্যাক্রোপোলো সিগারেটের গন্ধে ভরে যায়। কোথা থেকে এই গন্ধ আসে কেউ বুঝতে পারে না। যাই হোক, বন্ধুর দীক্ষাদাতাকে বাড়িতে আনবেন বলে একটি বিছানার চাদর, কিছু খাবার পাত্র কিনে এনে ঘরে রাখেন। তারপর একদিন বন্ধুর দীক্ষাদাতার কাছে যান। এবারেও পুলিশ অফিসার কিছু বলবার আগেই সেই শক্তিমান পুরুষ পুলিশ অফিসারকে বলেন: 'তুমি আমার জন্যে বিছানার চাদর, খাবার প্লেট কিনে এনে রেখেছ, আমি জানি; সময় হলেই আমি তোমার ওখানে যাব।'

এই স্বেচ্ছায় দীক্ষাদাতার নাম আমি জানি কিন্তু এখানে সে-নাম আমি বলব না, কারণ তাতে বহু লোক এঁদের তুচ্ছ কারণে বিরক্ত করবে। যেকথা কাউকে বোঝানো যায় না সে-কথা হচ্ছে এই যে, এঁরা যখন কাউকে কৃপা করেন, তখন তা স্বেচ্ছায় করেন; জোর করে কর আদায় করা যায়, কিন্তু করজোড় করেও আদায় করা যায় না কৃপা।

[ক্রমশ।

গন্ধে মাতোয়ারা

যদি বলি যে কাঁচা পেঁয়াজ আর পাকা আপেল প্রায় একই রকম লাগে খেতে তা হলে কথাটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন না জানি এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনি স্মরণে আনবার চেষ্টা করবেন শেষবার কবে কখন আপনি কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েছিলেন বা পাকা আপেল খেয়েছিলেন। আর তা ছাড়া এ দু'টো জিনিসের আস্বাদ 'স্বাভাবিক অবস্থায়' এতই বিভিন্ন বলে আমরা সকলেই জানি যে, এ দু'টো জিনিসের আস্বাদ যে একইরকম বা প্রায় একইরকম নয়, সে কথার ওপর রীতিমতো 'ডিবেট' করা যায় বলে আমরা সকলেই নিশ্চিত।

স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্যই নয়, কিন্তু একটা বিশেষ অবস্থায় কাঁচা পেঁয়াজ এবং পাকা আপেলের আস্বাদের মধ্যে কিন্তু সত্যি কোনো প্রভেদ পাওয়া যায় না, এটা রীতিমতো পরীক্ষা করে দেখে গেছে। এক-আধজন নয়, বেশ কয়েকজনের ওপর।

আসুন এবার দেখা যাক আসল ব্যাপারটা কি।

খাবার সময় অর্থাৎ খেতে বসে কার্যত আস্বাদনের যে কাজটা তা তো আমাদের জিভেরই করবার কথা। এ কাজটা আমাদের হয়ে জিভই করে থাকে বলে আমাদের সকলেরই এতকাল ধারণা ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের এ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেওয়াতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়ে যায় এবং নানা অবস্থার মধ্যে প্রচুর পরীক্ষাকার্য চালাবার পরে আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, আস্বাদনের কাজটা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র জিভের সাহায্যে করা যায় না বললেই চলে। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য তা তো ধরা যায়ই না, এমন কি পার্থক্যটা যদি খুব বেশিও হয় তা হলেও অনেক সময় জিভ একা তা ধরতে পারে না।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যাঁরা দ্বিতীয় স্তরের ইন্দ্রিয় মনে করেন তাঁরাও নিজেদের ওপর কয়েকটা সাধারণ পরীক্ষা চালালে আশ্চর্য হয়ে যাবেন দেখে যে, বাস্তবিকপক্ষে কেবলমাত্র দূরের জিনিসের ঘ্রাণ নেওয়ার কাজই নয়, একান্ত কাছের জিনিস অর্থাৎ একেবারে মুখের মধ্যেকার যে খাদ্য তার ভালোমন্দ বিচারটা জিভেরই কাজ বলে আমাদের ধারণা, সে কাজটাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

কোনো খাদ্যবস্তু যখন মুখের বাইরে থাকে তখন নাক তার বাইরের দু'টো বাঁশির পথে সে জিনিসের ঘ্রাণ নেয়। কিন্তু যেই কোন খাদ্যবস্তু মুখের ভেতর দেওয়া যায় অমনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দু'মুখো কার্যক্রম সুরু হয়ে যায়। এক বাইরের বাঁশির পথে আর দ্বিতীয়ত মুখের ভেতর দিয়ে অন্তঃপথে যেখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রধান কেন্দ্র অর্থাৎ অলফ্যাক্টরি স্নায়ুগুলি রয়েছে। নাকের এই যে বাইরের পথ আর ভেতরের পথ এ দু'টোই প্রায় সমানভাবে এবং যুগপৎ প্রয়োজন হয় কোনো জিনিসের সঠিক ঘ্রাণ নেবার জন্যে। তবে ভেতরের পথের চাইতে যে বাইরের পথের ব্যবহার বেশি হয় তা তো খুবই সহজ কথা। কারণ কাছের বা দূরের যে কোনও জিনিসের ঘ্রাণ নেবার সময়ে বাইরের বাঁশি-পথের ব্যবহার হয়ে থাকে, আর ভেতরের পথের ব্যবহার শুধু তখনই হয় যখন আমরা কিছু মুখে পুরি।

আর তা ছাড়া ভেতরের পথের চাইতে বাইরে বাঁশি-পথের ঘ্রাণ গ্রহণ ক্ষমতাও অনেক বেশি। যেমন মনে করুন যখন ভয়ানক সর্দি হয়, নাকের বাঁশি প্রায় বন্ধই থাকে, তখন আমরা ঘ্রাণ কম পেতে থাকি না কি? কিম্বা বাইরে থেকে নাকটা চেপে ধরে কোনো জিনিস খেলে তার গন্ধ যে কতো কম পাওয়া যায় তা নিশ্চয়ই দুর্গন্ধযুক্ত ওষুধ-বিষুধ যাঁদের কখনো খেতে হয়েছে তাঁরা সকলেই জানেন।

ঘ্রাণ নেওয়ার সম্পূর্ণ কাজটা যে আমাদের ইন্দ্রিয় কি ভাবে করে থাকে তা খুব বিশদভাবে বলবার মতো বৈজ্ঞানিক তথ্য এখন পর্যন্ত নেই বললেই চলে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, নাসিকার অভ্যন্তরভাগে যে অলফ্যাক্টরী কেন্দ্র রয়েছে সেখানে এক ইঞ্চির কিছু কম বা বেশি (বয়স অনুসারে) প্রায় চৌকো একটা পাতলা পর্দার মতো ঢাকনি রয়েছে। এই ঢাকনির গায়ে থাকে কতকগুলি সূক্ষ্ম লোম। বাইরের গন্ধ যে মুহূর্তে এই লোমগুলি পর্যন্ত এসে পৌছায় তখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুর পথেও তা আমাদের মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা সে ঘ্রাণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানিয়ে দিতে পারি। সমস্ত কাজটা কতো দ্রুত ঘটছে একটিবার ভেবে দেখবেন।

আমরা সকলেই জানি যে কান শব্দ গ্রহণ করতে পারে ভাইব্রেশন হয় বলে, চোখ দেখতে পায় আলোর তরঙ্গ আছে বলে। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজটা এতো সরলভাবে বলবার মতো অবস্থায় আজো বিজ্ঞান পৌছায় নাই। অলফ্যাক্টরী স্নায়ুকেন্দ্র যে এ ব্যাপারে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজটা যে ঠিক কি পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়, সেইটেই হলো রহস্য।

অনেক ENT বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, অলফ্যাক্টরী

স্নায়ুকেন্দ্রের ওপরকার পর্দাটি একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে গন্ধের বিচার করে। অর্থাৎ কি না বায়ুতাড়িত অবস্থায় গন্ধযুক্ত সূক্ষ্মকণিকা এক-আধটি ঐ পর্দার ওপর পড়লেই দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। গন্ধ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তা বাস্তবিকপক্ষে এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল। আগেই বলেছি, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে—অন্তত দশ-বারো রকমের, কোনটা যে অভ্রান্ত তা সঠিক করে এখনো বলা যায় না।

কিন্তু একটা কথা। আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় তার কাজ যে দ্রুততার সঙ্গে করে তার কাছে বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ই হেরে গেছেন। যে-কোনো গন্ধ নেওয়া, তাকে বিশ্লেষণ করা বা অন্য কোনো ঘ্রাণের সঙ্গে তার তুলনা করা এ সমস্ত দুরূহ কাজ আমাদের ইন্দ্রিয় এক আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে করে থাকে।

ভিন্ন জাতের মানুষের শরীর থেকে সব সময়েই 'গন্ধ' পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এমন কি এক জাত বা শ্রেণীর মানুষ, চাই কি এক পরিবারভুক্ত মানুষেরও গন্ধ আমরা গ্রহণ করি। তবে এ ব্যাপারে আমাদের ঘ্রাণশক্তি খুব কণ্ডিশণ্ড হয়ে যায় বলে এটা সচরাচর আমরা বুঝতে পারি না। যাঁরা দৃষ্টিশক্তিহীন তাঁরা এটা অনুভব করতে পারেন। আমরাও যে-কেউ কিছুদিন চোখ বেঁধে অভ্যাস করলে এ কাজ নিশ্চয়ই পারবো এবং প্রিয়জনের উপস্থিতিতে আমাদের যে আনন্দ আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি একই সময়ে তাতে অংশগ্রহণ করে বলেই তার তীব্রতা সাধারণ আনন্দের চাইতে বেশি।

মানুষের ওপর গন্ধের প্রভাব অসীম। এটা বুঝবার পর থেকেই অনেক বিজ্ঞানী আজকাল কলকারখানার ভেতরে সুগন্ধ ছড়াবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং অনেক বড় বিজ্ঞানী যাঁরা প্রধানত চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়েই গবেষণা করে থাকেন ইদানীং 'অডর থেরাপীর' কার্যকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। —ডাঃ নাগ

লেখাপড়া করে যে

লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে—এমন সময় ছিলো যখন এইভাবে গাড়ি চড়ার লোভ দেখিয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী করে তুলবার চেষ্টা করা হতো বালক-বালিকাদের। এ রকম শুধু যে আমাদের দেশেই হয়েছে বা হতো তাই নয়, এটা পশ্চিমেরও প্রায় সমস্ত দেশেই হয়েছে বা হতো এবং আজকের দিনেও হচ্ছে। চাই কি আমাদের মতো দেশের চাইতে ও সমস্ত দেশে গাড়িচড়বার ধারণাটাকে বালক-বালিকাদের মনে আরো বেশি বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়। ফলে আজকের দিনে আমেরিকা তো বটেই, এমনকি ইয়োরোপেরও অধিকাংশ দেশে শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে গাড়িটা আর বিলাসব্যসনের বস্তু বলে বিবেচিত হয় না—খবরের কাগজ বা দুধের বোতলের মতো গাড়িটা জীবনযাত্রার পক্ষে একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে উঠেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কারখানায় আজকের দিনে কোনো শ্রমিক যখন চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিতে আসে তখন মাইনে-কড়ি কি পাওয়া যাবে সে যেমন এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তেমনি জিজ্ঞাসা করে গাড়ি পার্ক করবার কি বন্দোবস্ত কোম্পানী করতে পারবেন বা আদৌ পারবেন কি না। বুঝুন অবস্থাটা।

একবার হিসেব করে দেখা গিয়েছিল (এটা ১৯৬০ সালের কথা) যে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা যদি কখনো ইচ্ছে করেন তা হলে প্রত্যেকে একই সময়ে গাড়ি চড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারেন—এবং সে জন্যে কারো গাড়ির পেছনের সীটে বসবার প্রয়োজন হবে না। একজন ড্রাইভ করবে আর দু'জন কি গড়ে সোয়া দু'জন তার পাশে বসলেই চলে যাবে। অর্থাৎ কি না বিশ কোটি মানুষের দেশে গাড়ির সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি।

আমেরিকায় সাধারণ মানুষের পক্ষে গাড়ি কেনা, তার ব্যবহার বা তার খরচ চালানো যতোটা সহজ হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষে ইলেকট্রিক ফ্যান বা লোকাল সেট রেডিও-ও এখন পর্যন্ত সে অবস্থায় পৌছতে পারে নি। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই গাড়ি সম্পর্কে অনেকটা এগিয়ে গেছে। জাপানের জনসংখ্যা ভারতের চার ভাগের এক ভাগ কিন্তু গাড়ির সংখ্যা প্রায় ভারতের দ্বিগুণ।

অবশ্য আমেরিকার সঙ্গে গাড়ির ব্যাপারে পৃথিবীর আর কোনো দেশেরই তুলনা হতে পারে না। আমেরিকায় গড়ে প্রায় সোয়া তিনজন নাগরিকের জন্য একখানা করে গাড়ি আছে। সে তুলনায় খাস ইয়োরোপে যে দেশে গাড়ির সংখ্যা সর্বাধিক, সে দেশে অর্থাৎ বৃটেনে গড়ে প্রতি বারো জনের জন্য একখানা গাড়ি আছে।

গাড়ি যেমন একদিকে আরাম বিরাম বা প্রয়োজনের সামগ্রী, তেমনি অন্যদিকে এ জিনিসটা একটা সমস্যার সৃষ্টি করে। চলতে চলতে মাঝে মাঝে যখন থামবার প্রয়োজন হয় তখন পার্ক করবার যেমন একটা সমস্যা রয়েছে তেমনি রয়েছে গ্যারেজের সমস্যা—কিন্তু এ সবের চাইতেও

গুরুতর যে সমস্যা সে হলো পথের সমস্যা—অর্থাৎ কি না গাড়ি চালিয়ে যাবার জন্যে উপযুক্ত রাস্তা। বলাই বাহুল্য, আমেরিকাকে গাড়ির এই যে সংখ্যাধিক্য এটা দেখেই বোঝা যাবে যে, গাড়িজনিত সমস্ত রকমের সমস্যাই পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের চাইতে ওদেশে অনেক বেশি উদ্ভব হয়েছে এবং তার বেশির ভাগেরই সমাধানও আমেরিকাবাসীরা করতে সমর্থ হয়েছেন। যে সমস্ত দেশে গাড়ির প্রচলন ক্রমশ এবং দ্রুত বেড়ে চলেছে তাদের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। কাজেই ভারতবর্ষকেও অদূর ভবিষ্যতে এমন সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যার সমাধানের জন্যে আমেরিকার অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা সহজেই আমাদের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবো। আসুন এর কয়েকটি কি ধরণের দেখা যাক।

১। আমেরিকার মতো সস্তায় পৃথিবীর আর কোনো দেশ গাড়ি তৈরি করতে পারে না। তার কারণ আমেরিকার মোটরশিল্পের বিরাট বিরাট সংস্থাগুলি। উৎপাদন কেন্দ্র যতো বড়ো এবং সর্বাধুনিক হবে উৎপাদনের খরচও ততো কম হবে। এ ব্যাপারে আমাদের দেশের শিল্পপতিদের সজাগ এবং সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত।

২। সাধারণ মানুষ যাতে সহজ কিস্তিতে গাড়ি পেতে পারে তার বন্দোবস্ত করা।

৩। নতুন যে কোনো বাড়ি তৈরির সময় গ্যারেজ তৈরির জন্য বাধ্যতামূলক বন্দোবস্ত করা।

৪। গাড়ি চলাচলের জন্যে রাস্তাঘাটের সুবন্দোবস্ত করা। সাধারণ রাস্তা ছাড়াও দূর পাল্লার গন্তব্যস্থানে সহজে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ রাস্তা নির্মাণ করা—যেমন আমেরিকার অনেক শহর-বন্দরে আজকের দিনে উঁচুতে প্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই বন্দোবস্তের ফলে ছয় কোটি গাড়ির দেশ আমেরিকাতে ট্রাফিক-জ্যাম্‌ড হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

—শ্রীচন্দ্রাবলী

যাকে বলে মগজ

আমাদের আজকের দিনের জীবন নানা সমস্যার চাপে এমনই ভারাক্রান্ত যে বলতে গেলে একতিলও স্থিরভাবে চিন্তা করবার অবসর আমাদের অনেকেরই জীবনে নেই। এর ফলে একটা দারুণ লোকসান আমাদের হয়ে যায়। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে অনেক সময়েই এমন সব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায় বা আশ্চর্যজনক বস্তু চলে যায় যা আমরা দেখতে পারলে বা সে সম্বন্ধে একটু ভাবতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো হতো।

আমাদের জীবন থেকে সমস্যা কমে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সমস্যার চাপ ক্রমাগতই বেড়ে চলবে বলে মনে হচ্ছে। তাই আমার মনে হয় যে এই ব্যস্তসমস্ত জীবনযাত্রার মধ্যেই একটু আধটু ভাববার অভ্যাস করলে মন্দ হয় না।

আপাতত একটা আশ্চর্য জিনিসের কথা বলবো। সুবিরাট হিমালয় থেকে শুরু করে কচি দূর্বার ওপরের শিশিরবিন্দু পর্যন্ত পৃথিবীতে আশ্চর্যের অভাব নেই। একটু খোলা মনে চোখ মেললেই মনে হবে এ সৃষ্টি আশ্চর্য সৃষ্টি, এ পৃথিবী আশ্চর্য, এ পৃথিবীর জীবজন্তুরা মায় পিঁপড়েটা পর্যন্ত আশ্চর্য। আমরা মানুষেরাও কম আশ্চর্যের বিষয় নই। অনেকের মতে মানুষই এ পৃথিবীর সব চাইতে সেরা আশ্চর্যজনক বস্তু। আমার নিজেরও সেই কথাই মনে হয়। গোটা মানুষের মধ্যে আবার তার মস্তিষ্কটি একটা চরম বিস্ময়কর বস্তু। বর্তমানে সেই কথাই বলবো।

একজন স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন আড়াই থেকে তিন পাউণ্ড। একতাল জমাট মাখন দূর থেকে যেমন দেখায় আমাদের মস্তিষ্কও অনেকটা সেই রকম দেখতে—তবে রঙটা মাখনের চাইতে একটু গোলাপী আভাযুক্ত। বর্তমানের এই আলোচনাটি এখন পর্যন্ত আপনারা যতটুকু পড়েছেন তার মধ্যেই আপনার মস্তিষ্কের কয়েক কোটি কোষের অন্তত কয়েক লক্ষ বার শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়েছে।

আমাদের যে কোনও ইন্দ্রিয় যখনই কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত থাকে তখনই এই কোষ সমষ্টি সক্রিয় হয়ে ওঠে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া মানেই যে কয়েক লক্ষ কোটি কোষের সমষ্টিতে মস্তিষ্ক গঠিত তাদের ক্রিয়া। অবশ্য

সজ্ঞানভাবে আমরা যখন আমাদের কোনো ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না নেই বা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও আমাদের মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে তবে তখন কোষসমষ্টির ক্রিয়ার দ্রুততা সজ্ঞান অবস্থার মতো থাকে না।

বিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের যে অবস্থা তা দেখে মনে হয় যে অন্তত কয়েক শত কোটি বছর ধরে ক্রমবিকাশের ফলেই এই অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্ক কোনও একটিমাত্র স্নায়ুকেন্দ্র নয়, কয়েক শত স্নায়ুকেন্দ্রের সমষ্টি। ভূতত্ত্ববিদগণ যেমন পৃথিবীর কঠিন ভূভাগের সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্য নানা স্তরে বিভাগ করেছেন এবং একেবারে হালের অবস্থা হলো সবার ওপরে অর্থাৎ মাটিতে পা দিলেই যা আমরা অনুভব করি, আর সবচাইতে পুরানো স্তর সব চাইতে নীচে থাকে ; মানুষের মস্তিষ্কেরও অবস্থা অনেকটা সেই রকম। জীবজগতে ক্রমবিকাশের প্রথম অবস্থায় মস্তিষ্কের যে রূপ ছিল আজও তার নমুনা মানুষের মস্তিষ্কের সর্বনিম্নস্তরে পাওয়া যায়। এই ক্রমবিকাশের ফলে একেবারে চরম যে বিকাশ তা হলো আমাদের মস্তিষ্কের উপরিভাগ।

গত কয়েক হাজার বছর ধরে দার্শনিকেরা মানুষের হৃদয়, মন বা আত্মার সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। বাস্তবিক আমাদের হৃদয় কোথায়? কোথায় বাস্তবিক পক্ষে থাকে আমাদের মনটা? কোথায়ই বা পাওয়া যাবে আত্মার হদিস? আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে হৃদয় মন বা আত্মার একমাত্র স্থান হলো মস্তিষ্ক অর্থাৎ মস্তিষ্কের উপরিভাগ।

আমাদের সারা শরীরে নানা ইন্দ্রিয়ের যে কার্যকলাপ তা এক মুহূর্তের শতাংশ সময়ের মধ্যে সরাসরি মস্তিষ্কের এই উপরিভাগে এসে পৌঁছায়। মস্তিষ্কের এই উপরিভাগটি গোটা মস্তিষ্কেরই অচ্ছেদ্য অংশ। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যেন এ অনেকটা এক বড়াই দুধের ওপরকার সরটা—তবে দুধের চাইতে সর যতোটা ঘন, মস্তিষ্কের নিম্নভাগের চাইতে উপরিভাগ ততোটা ঘন নয়, এই যা তফাৎ।

এখন পর্যন্ত মানুষ যতো রকম আশ্চর্যের বিষয়ের সন্ধান পেয়েছে তার মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কের এই যে উপরিভাগের স্তরটি এর তুলনা নেই। একজন পরিণত বয়সের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্কের এই উপরিভাগে জীবন্ত কোষের মোট সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ কোটি বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

আমরা যে কোনো কিছু শিক্ষা করি বা আমরা যে চিন্তা করি, ধ্যান করি, আমরা যে স্মৃতির গহ্বর হাতড়াই, আমরা যে এ্যাবস্ট্রাক্ট থিয়োরীর সৃষ্টি করি বা কোনও কিছু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করি বা শিশুর নিষ্পাপ হাসির বিশুদ্ধতা উপভোগ করি তা সবই এই মস্তিষ্কের উপরিভাগের কাজ। মস্তিষ্কের এই স্তরটির 'ধারণ' ক্ষমতাও অবাক করা নিঃসন্দেহে। কারণ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে আমেরিকার লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে যে ৯০ লক্ষ বই আছে তার পঞ্চাশগুণ অর্থাৎ প্রায় ৪৫ কোটি বইতে যতো কথা ধরানো যায় বা যতো তথ্য দেওয়া যায়, তা সবই একজন মানুষের মস্তিষ্কের এই উপরিভাগের মধ্যে নিহিত থাকা সম্ভব।

এইবার ভাবুন অবস্থাটা।

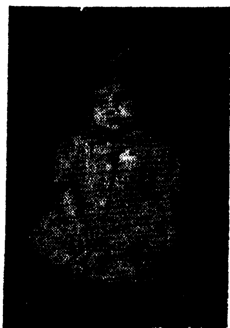
—শ্রীঅরুণা

নিজেকে বিলিয়ে দিন

আমাদের পাড়ার একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। তার রেক্টার হলেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা। আমার ছোটবোনেরা এবং ভাইয়েরা এক সময় তাঁর স্কুলেই পড়েছে। আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ঘটেছিল সেই সূত্র ধরে। তাঁর স্কুলের বেশ সুন্দর গাড়ি আছে একখানা—বাচ্চাদের নিয়ে যাবার জন্যে এবং দিয়ে যাবার জন্যে। বেশ কয়েক বছর আগে যখন ভদ্রমহিলাকে দেখি—তখনও দেখতাম, গাড়ি যেই বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলের সামনে পৌঁছুতো অমনি তিনি অফিস থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেন, আবার স্কুল ছুটির পরে যখন এক একবার গাড়ি বোঝাই করে বাচ্চাদের নিয়ে ড্রাইভার স্টার্ট দেবে দেবে তখনও ঝড়ের মতো কোত্থেকে এসে পাশে দাঁড়াতেন। কারো কারো সঙ্গে এক-আধটা কথা বলতেন—কাউকে বলতেন, বাড়িতে বলো রঙিন পেন্সিল দিতে এক বাক্স কাউকে বা মাকে বলো মাফলারটায় সেফটিপিন এঁটে দিতে।

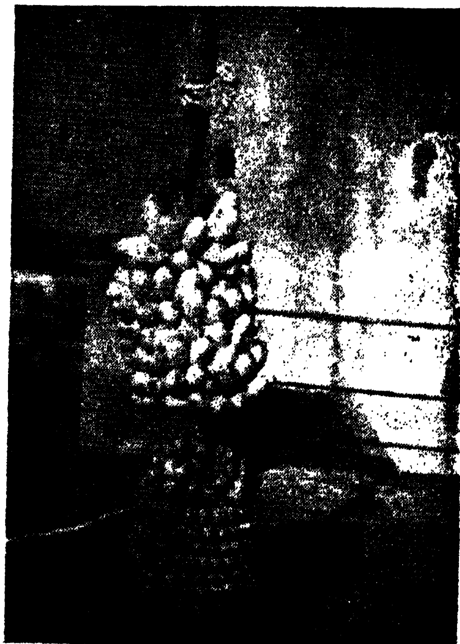


দূরের পিয়াসী —সত্যেন ঘোষ



বিহ্বল
—শ্রীডলি ঘোষাল

কদলী —সুব্রত চট্টোপাধ্যায়



আলোকচিত্র



তালবীথি —অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়



হিজিবিজি

—বিমলকান্তি সাহা

॥ শিশু-মহল ॥



—দেবু দাশ

মাসিক বসুমতী । মাঘ / '৭১

—শঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়





—সমীরকুমার শর্মা

পুতুলের বিয়ে

—বিভূতিভূষণ দাশ



ব্যাপারটা যখন প্রথম দেখি তখন সত্যিকথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে নি। মনে হয়েছিল যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি। কখনো বা মনে হতো 'ট্রেড-ট্রিক'। তারপর যখন ছোট ভাই বোনদের সেই স্কুলে পড়া শেষ হলো, এ সম্বন্ধে ভুলেই গিয়েছিলাম।

আবার মনে পড়লো ঐ ভদ্রমহিলাকে এবং তাঁর স্কুলটার কথা, যখন হালে আমার বড়ো ভাইয়ের ছোট ছেলেটিকে একটা স্কুলে ভর্তি করবার প্রয়োজন দেখা দিলো। গেলাম সেই স্কুলে। যথারীতি আন্তরিক ব্যবহার পেলাম। আমার ভাইপোকে ভর্তি করে নিলেন উনি। কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখলাম বাচ্চাটিকে আপনার করে নিলেন। সাড়ে তিন বছরের ছেলে, বাড়িতে যার কার্যকলাপের একমাত্র সংজ্ঞা হলো দৌরাত্ম্য—সে-ই দেখলাম রেক্টার মহিলার কথামতো একটুক্ষণের মধ্যে কেমন ভব্যসভ্য হয়ে গেলো।

বাচ্চাদের স্কুল-অফিস; ছোটো-বড়ো রঙ-বেরঙের জিনিসের যাকে বলে ছড়াছড়ি। যাতে ও কোনো কিছু ভেঙে-টেঙে না ফেলে সেইজন্যে প্রথমটায় আমি ওকে কোলের ওপর চেপে বসিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু রেক্টার যখন বললেন ছেড়ে দিতে, তখন ছেড়ে দিয়েছিলাম বটে কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছিলাম: এই বুঝি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে।

কাণ্ড আমার ভাইপোটি সত্যি ঘটিয়ে বসলো। কিন্তু সে তার দৌরাত্ম্যজনিত নয়, তার শান্ত অবস্থা দিয়ে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, কি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল কয়েক মিনিটে। ভদ্রমহিলা ওর সঙ্গে কথা বলবার পরে। কিছু ভাঙলো না, কিছু অনর্থ ঘটালো না। আমি যাকে বলে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

চলে আসবার সময় ভদ্রমহিলা যথারীতি আমাদের এগিয়ে দেবার জন্যে গেট অবধি এলেন। আমার ভাইপোকে উনি একটুক্ষণের মধ্যে এমন বশ করে ফেললেন দেখে আনন্দাতিশয্যে বলে ফেললাম: দশ বছর আগেও দেখেছি আপনি বাচ্চাদের কতো ভালোবাসেন, আজও দেখছি তেমনি, একটুও কমে নি।

ভদ্রমহিলা একটু হেসে বললেন: টাকা-পয়সা তো নয় ভাই যে দিলে কমে যাবে, এ যে ভালোবাসা, আমার বিশ্বাস এ জিনিস যতো বিলোনো যায়, ততোই বেড়ে যায়—যে পায় তার চাইতে যে দেয়, তা[illegible] অনেক বেশি। একটু অভ্যাস করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, বাড়ির লোকজনই হোক আর পাড়াপ্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন কিম্বা বন্ধু-বান্ধবদের ওপরই হোক। —অরূপা দেবী

পেশা ও মানসিক রোগ

আজকের পৃথিবীর তিন শ' কোটি মানুষের মধ্যে এ রকম তিন শ' জনও বোধ হয় নেই যার বসে থাকলে চলে। কাজ সবাইকে, অর্থাৎ সাবালক মানুষমাত্রকেই করতে হবে। কেউ কেউ সৌভাগ্যবশত মনের মতো কাজ করতে পারেন, কেউ কেউ, হয় তো বেশির ভাগ মানুষই তা পারেন না। কাজেই এ কথা বলা চলে যে পেশাটা বেশির ভাগ মানুষেরই পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষকেই অবস্থার চাপে পেশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, ভালো লাগাবার জন্যে চেষ্টা করতে হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশির ভাগ মানুষই সারাজীবনের চেষ্টাতেও তার পেশাটাকে পছন্দ করতে পারে না। হয়তো সে দীর্ঘ ২৫ কি ৩০ বছর একটা কাজ করে অবসর গ্রহণও করেছে, তবু জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে সে পেশা তার কোনোদিনই ভালো লাগে নি। সে যে কাজটা করে গেছে তা নেহাতই অবস্থার চাপে। এই হলো বেশির ভাগ মানুষের মনের কথা। এই অবস্থাটা যখন বা যে দেশে ব্যাপকভাবে চলে সে দেশে এবং সে কালে মানুষের মানসিক অবস্থা কোনোমতেই স্বাভাবিক থাকতে পারে না। কাঁহাতক মানুষ পারে নিজেকে ধমকে চলতে? এক সময় তার মন বিদ্রোহ করে—অর্থাৎ তার মনে অস্বাভাবিকতার সূত্রপাত হয়। কখনো দেখা যাবে তার নিয়োগকর্তা সম্পর্কে তার অহেতুক ক্রোধ, কখনো বা পরিবারের লোকজনের ওপর ক্রোধ বা বিরক্তি—কারণ তাদেরই জন্যে তাকে অপছন্দের কাজটা করে যেতে হচ্ছে—যেটা তার কাছে পীড়নস্বরূপ। কখনো বা সে নীরবে নিজের ভাগ্যের দোষ দেয়।

এই অবস্থাটা দেখেই বিজ্ঞানীরা আজকের দিনে রুচি-নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এই পরীক্ষার ফলে যে কোনো সাবালক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কোন ধরণের কাজ ভালোবাসেন তা সঠিক নির্ধারণ করে তারপরে তাকে বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োগ করা হয়। তার ফলে একদিকে যেমন কাজটা ভালো ভাবে হয়, কারণ কর্মচারী তার মনের মতো কাজ পেয়েছে, অন্য দিকে তেমনি সমাজে মানসিক রোগীর সংখ্যা কমে। আমাদের দেশের সরকার এবং নিয়োগ কর্তারাও অবস্থাটা একবার ভেবে দেখতে পারেন। —নার্স মিত্র

❋ পুরুষ কি সাজবে না? ❋

দেহ-সৌন্দর্য সম্বন্ধে মেয়েরা যত সচেতন, পুরুষেরা তত নয়, প্রকৃতপক্ষে একেবারেই নয়।

প্রায়ই দেখা যায় সুন্দর, সুদেহী তরুণ যুবকরা এমন পোষাক-আশাক ব্যবহার করে, যা না কি রীতিমত চক্ষু-পীড়াদায়ক। মনে হয় শারীরিক গঠনকে ছিমছামভাবে প্রকাশ করার চেয়ে ঝলঝলে পোষাক পরে সেটাকে যথাসম্ভব কুশ্রী করে তোলাতেই তাদের সমধিক আগ্রহ।

আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারি না যে, সন্তানধারণ করেও একজন আধুনিকা মেয়ে যখন তার কোন চিহ্নই ফুটতে দেয় না শরীরে, তখন অধিকাংশ পুরুষকেই দেখতে কেন সাত ছেলের বাপের মত হয়।

অথচ মজার ব্যাপার এই যে, বিয়ের পরই বৌয়ের শ্রীহীনতা বা আকর্ষণহীনতার অভিযোগে পুরুষরাই সোচ্চার হয়ে ওঠে সর্বাগ্রে। এ বাবদে তাদের নিজেদের ঘাটতিটা যেন কিছুই নয়।

মেয়েরা আর যাই হোক, দিন-রাতের অনেকটা সময়ই নিজেদের চেহারাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করে, অবশ্য একেবারে মধ্যবিত্ত সংসারের প্রৌঢ়া গৃহিণী বাদে, সেখানে অবশ্য রূপচর্চাটা এক অসম্ভব বিলাসেরই কোঠায় পড়ে; তবু তেমন সংসারেও একটি তরুণী বা কিশোরী নিজেদের চেহারা সম্বন্ধে যতটা ভাবে, বা যত সচেতন, একজন তরুণ বা কিশোর তা নয়। নিজের আকৃতিটা অপরের চোখে কেমন ঠেকতে পারে, একথা ভেবে মস্তিষ্ককে খাটাতে তারা একেবারেই রাজী নয়।

আমাদের দেশে মেয়েরা এখনও পুরুষকে এতটা উঁচু আসন দিয়ে রেখেছে যে, রূপসজ্জার ক্ষেত্রে তাদের এই অনবধানতা বা বিচ্যুতিকে গুরুতর কোন ত্রুটি বলে মনে করে না, পুরুষানুক্রমে সংস্কার এদেশের মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছে যে পুরুষের গুণই সৌন্দর্য, বাহ্যিক সৌন্দর্যের কোন প্রয়োজনই না কি তাদের নেই; কিন্তু একথা আজকের দিনে আর খাটে না কারণ মেয়েরাও আর আগের মত পরানুগৃহীত পরগাছা মাত্র নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই আজ তাদের দেখা মিলছে, জীবিকার জন্য জীবন-সংগ্রামে আজ তারা পুরুষের সহচারিণী, সহকর্মিণী।

অতএব 'যারা রাঁধে তারা চুলও বাঁধে' এই প্রবাদ বাক্যটির সার্থকতা প্রমাণ করে মেয়েরা যদি কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেও রূপচর্চার অবকাশ পায়, তবে পুরুষই বা সে সম্বন্ধে উদাসীন হবে কেন?

স্বভাবতই প্রগতির প্রধান কেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে বেশি অবহিত হয়ে উঠেছেন।

মেমসাহেবদের মতে মেয়েদের পোষাকের কুঞ্চন ও গার্টারবিহীন মোজা দেখলে পুরুষেরা যখন নাক কোঁচকায় তখন তারা নিজেরাই বা ও বিষয়ে মনোযোগী থাকবে না কেন, যা বিশ্রী তা তো সবার পক্ষেই সমান বিশ্রী, তার আবার মেয়েই বা কি, পুরুষই বা কি?

উদাহরণস্বরূপ ছেলেদের কোটের হাতার কথাই ধরা যাক, এ বস্তুটা এতটা লম্বা করার প্রয়োজন কি, বরং এটা একটু ছাঁটলে শার্টের হাতা ও তাতে শোভমান সুন্দর সুন্দর হাতার বোতামগুলি দেখা যায়, তবে তা করতে বাধা কোথায়?

অবশ্য আমাদের বাঙালীদের এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা আছে, ধুতি-পাঞ্জাবী শোভিত হয়ে বাঙালী পুরুষ যখন আসরে আসেন, তখন পাঞ্জাবীর বোতামটা যদি দেখাবার মত হয় তো দেখান যায় স্বচ্ছন্দেই।

সত্যি করে বলুন তো, ফিটফাট করে দাড়ি কামানো সুবেশ সজ্জিত ছিমছাম একটি মানুষকে অবসর সময়ে কাছে পেতে চান কি না যে কোন স্ত্রী বা বান্ধবী? তার বদলে যদি ময়লা লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি ভূষিত হয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে নিয়ে উদয় হন উদ্দিষ্ট স্বামী বা প্রেমিকপ্রবর তাতে হৃদয়ের তাপমাত্রা ঘচাং করে বেশ কয়েক ডিগ্রি নেমে যায় কি না?

বাড়ি-ঘর আসবাবপত্র মোটর গাড়ি ইত্যাদির উৎকর্ষসাধনে কৃতীপুরুষ যতটা তৎপর, তার সিকির সিকিও যে নিজের দৈহিক উন্নতিকল্পে নয়, না হলে একটু বয়স হয়ে এলেই যখন মেদবৃদ্ধি ঘটে বা টাক পড়ে তখন তা রোধ করতে সে যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হয় না কেন; সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে মেয়েরা কত চেষ্টা করে ফিগার ঠিক রাখার জন্য, রূপলাবণ্য বজায় রাখার জন্য।

এ ত' গেল দেহশ্রী বজায় রাখা সম্বন্ধে, বেশভূষা যে এ-বিষয়ে সর্বোত্তম না হলেও অন্যতম প্রধান উপায় এ কথাটাকেও যেন মানতে চায় না পুরুষ ঠিকমত।

এ-কথা কি সত্যি নয় যে, শোভনভাবে সজ্জিত থাকা মেয়ে বা পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়?

সুবেশ ভূষিত মানুষ মাত্রেরই একটা নিজস্ব আবেদন আছে যা দর্শকের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

সুবেশ বলতে অবশ্য মূল্যবান পরিচ্ছদ বোঝাতে চাই না, সুরুচিসম্মত নয়নলোভন পোষাক সম্বন্ধেই ও-কথাটা প্রযোজ্য; আর এক্ষেত্রে রুচিটাই যে সবচেয়ে বড় কথা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ নাস্তি।

ধরুন একজন মহিলা লাল পাড়ের একটি সাদা খোলের শাড়ির সঙ্গে লাল রং-এর একটি সুদৃশ্য ব্লাউজ গায়ে

দিয়েছেন, অন্য যে-কোন রং-এর ব্লাউজ গায়ে দিতেই তাঁর খরচা একই হত, শুধু একটু রুচিশীলতার জন্যই এই সামান্য পোষাকটি অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, পুরুষের বেলাই বা এর ব্যতিক্রম হবে কেন ?

লম্বা ছিপছিপে চেহারায় প্যাণ্ট সার্ট যতটা মানায় একটু মোটা দেহে ততটা নয়, এজন্যই স্থূলদেহে আঁটসাঁট পোষাক না পরে একটু ঢিলেঢালা পোষাক পরাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পুরুষের দৈহিক কুশ্রীতা ঢাকা দিতে বাঙালীর ধুতি পাঞ্জাবী বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ পোষাক, এতে দেহের অসামঞ্জস্য যতটা ঢাকা পড়ে এমন আর কিছুতেই নয়, দুঃখের বিষয় এই যে, এ পোষাকের ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ একমাত্র বাঙালী ছাড়া আর কোন জাতেই এ পোষাকের প্রচলন নেই।

পাঞ্জাবী ও ঢোলা পায়জামাও দেহের স্থূলত্বের পক্ষে কিছুটা উপযোগী পোষাক আর এই পোষাকটি সর্বজনীন না হলেও সর্বভারতীয় বটে।

মেয়েদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পুরুষেরা যথেষ্ট পরিমাণেই সচেতন অথচ তাদের নিজেদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে মেয়েদের সমালোচকের আসন দিতে তারা যেন নেহাৎ অনিচ্ছুক, খুব বেশি দিনের কথা নয় এক সান্ধ্য আসরে এক ভদ্রলোককে উপস্থিত একটি মহিলার পায়ের গড়ন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে শুনেছিলাম আমি, নেহাৎ শোভনতার খাতিরেই তাঁর নিজের কয়েকটি দৈহিক বিকৃতি সম্বন্ধে সেদিন তাঁকে অবহিত করতে পারি নি।

সুন্দরী একটি তরুণীকে বিবাহ করে আত্মতৃপ্ত পুরুষ মনে করে যে তার মনটা বেঁধে রাখার জন্য তার নিজের পক্ষে আর কিছু করণীয় নেই, কারণ সে যে স্বামী, সে যে প্রভু। একথা একবারও ভাবে না যে দখল বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি প্রয়োজন না হলে শেষ পর্যন্ত মূলে হাভাৎ হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে, স্বামী সমস্তদিন কাজ করে যখন বাড়ি ফেরেন সে সময় পত্নী বৈকালিক প্রসাধন সেরে প্রতীক্ষায় থাকেন, এলোমেলো আলুথালু বেশে এ সময় খুব কম স্ত্রীই স্বামীর সামনে আসেন, তবে স্বামীই বা কেন এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন, বেশভূষার সামান্য একটু পারিপাট্যবিধান করাটা কি এতই পরিশ্রমসাপেক্ষ ?

মনে রাখবেন সেই বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যটি,—

'পহেলে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারি,'

আগে চোখের তৃপ্তি তারপর মনের তৃপ্তি, সকলেই অবশ্য রূপবান হওয়ার মত ভাগ্য করে না কিন্তু শোভন হওয়াতে তো কোন বাধা নেই, আর সে শোভনতার অনেকটাই বেশভূষাসাপেক্ষ। নিজে ফিটফাট থাকুন তাহলে অন্তত সুবেশ পুরুষের প্রতি পার্শ্বচারিণী পত্নী বা প্রিয়াকে মনোযোগী হতে দেখে ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলতে হবে না, বরং নিজেই দেখবেন অনেক বরাঙ্গনার লক্ষ্য হয়ে পড়ে আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে উঠেছেন কখন অজান্তেই।

মনে রাখবেন ভোগের মন্দির স্বরূপ দেহকে অসজ্জিত রাখলে দেহমধ্যস্থ মন বা আত্মাকেও প্রসন্ন করা যায় না, দেবতা যেমন সুন্দর-সুপরিচ্ছন্ন পরিবেশেই বিরাজ করেন, মানব দেহের দেবতাস্বরূপ মনও সেইরকম সুন্দর পরিবেশ কামনা করে, দেহীমাত্রেরই তাই দেহকে সুন্দরতর করে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত, তা সে নারীই হোক বা পুরুষই হোক।

মনে রাখবেন স্ত্রীর কাছে স্বামী হওয়াটাই যথেষ্ট নয় প্রেমিক হওয়াটাও সমান প্রয়োজন, আর প্রেমের জন্যই তো সমস্ত সৌন্দর্যের বিকাশ, সমস্ত সৌন্দর্যের সাধনা।

নারী এ তথ্য জানে ও মানে, তাই তার সজ্জাবিলাস চলে আসছে যুগ-যুগান্ত ধরে, কিন্তু পুরুষ এখনও এ বিষয়ে সম্যক অবহিত নয় তাই আজ তার সচেতন হওয়ার সমধিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, নচেৎ নারীর চোখে তার সঠিক মূল্যায়ন হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। —শ্রীমতী

জীবন-স্বপ্ন

বন্দে আলী মিয়া

আমার বসুন্ধরা স্তব্ধ গতিহীন
কুয়াশা কাঁপিছে ঘন যবনিকা সম,
আদিম সৃষ্টির গাঢ় হিম অন্ধকার—
আমার যৌবন-তৃষ্ণা মূর্ছাহতপ্রায়।

নীরক্ত বিষণ্ণ দিক—কুটিল প্রবাহ
অনন্ত জীবন-স্বপ্ন জাগে দুরাশায়—
আমার সুন্দরে হায় গ্রাসিয়াছে রাহু
ক্রন্দসি ফেলিছে শ্বাস দিকে দিগন্তরে।

আমার অরণ্যদিন স্থবির বিবশ
নিঃশেষ হয়েছে তার পুষ্পের বিলাস—
বিজন প্রহর জাগে—জনতা বিরল
কণ্টক যাতনা বহে রক্ত কণিকায়।

আমার নিখিল বিশ্ব সহসা নীরব
আনন্দমুখর দিন হয়েছে অতীত—
স্মৃতির কংকাল কাঁদে মৃত সিন্ধুকূলে
বিষাক্ত শায়কবিদ্ধ মনের ময়ূর।


Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!
বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা



মেরি ক্রিস্‌মাস্‌

সঙ্কর্ষণ রায়

শীতের রাত। কচ্ছের শূন্য মরুপ্রান্তরে সারাদিন ছোটাছুটি ক'রে ভুজে এসে পৌঁছল রাজীব। প্রায় দেড়শ' মাইল পথ পরিক্রমণের অবসাদ তার জীপের স্টিয়ারিং হুইল-ধরা হাত দু'টির আঙুলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। সৌরাষ্ট্রের এ অঞ্চলটিতে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করছে সে। তাই এই পরিক্রমা।

ভুজের পথঘাট প্রায় শূন্য। রাজীবের কব্জি-ঘড়ির কাঁটার রেডিয়ামের রেখা এগারোটা পেরিয়ে গেছে। সঙ্কীর্ণ রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলি যেন কৃষ্ণপক্ষের রাতের আঁধারের প্রস্তরীভূত রূপ। ঘুমন্ত নির্জীব শহর। নিঃসাড় ইটের স্তূপে প্রাণের চিহ্ন নেই।

রাস্তার পর রাস্তা—শহরের নিদ্রাকে চিরে-চিরে জীপটি এগিয়ে চলে। নিরেট আঁধারের মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে চলে রাজীব। কিন্তু কোথাও একফোঁটাও আলো, জাগরণের বিন্দুমাত্রও আভাস মেলে না।

রাত্রির আশ্রয়ের সন্ধান করে রাজীব। প্রথমে সরকারী বিশ্রামগৃহগুলিতে ধন্না দেয়। কিন্তু কোথাও জায়গা নেই।

শহরের কেন্দ্রে তথাকথিত আভিজাত্যের ছাপমারা হোটেলগুলিও সব ভর্তি।

অবশেষে শহরের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পল্লীর বোর্ডিং হাউস্‌গুলিতে সন্ধান শুরু করে রাজীব। সরু গলির জটিল জালের মধ্যে বোর্ডিং হাউস্‌গুলো ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে নিরেট আঁধারের মধ্যে এক ঝলক আলোর মুখোমুখি হয় রাজীব। মোমবাতির আলোয় জ্বল-জ্বল করছে রঙিন কাগজকাটা কয়েকটি অক্ষর—মেরি ক্রিস্‌মাস্‌। সেই আলোয় একটি দোতলা বোর্ডিং বাড়ির আভাস পাওয়া গেল।

রাজীবের মনে পড়ল ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরোলেই ২৫শে ডিসেম্বরের সূচনা হবে—শুরু হ'বে বড়দিন। তার অগ্রিম শুভেচ্ছালিপি জ্বলন্ত ক'টি অক্ষরে উদ্ভাসিত।

'মেরি ক্রিস্‌মাসের' নীচে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'ডি-সুজাস্‌' হোটেল—বোর্ডিং এ্যাণ্ড লজিং।

হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রাজীব। সামনের ঘরে আলো জ্বলছে। পিয়ানোর মৃদু টুং-টাং শব্দের পাশাপাশি টুকরো টুকরো কথাবার্তা কানে এল। চারদিকের তন্দ্রাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে একঝলক জাগরণের আভাসে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে সে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে যায়। ভেতরের উজ্জ্বল আলো বাইরের নিরেট আঁধারকে চিরে ফেলে ধারালো তলোয়ারের মত। একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানির বিস্ময় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ততোধিক বিস্ময় যে মেয়েটি দরজা খুলেছে তার রূপে। বিশ বছরের শিহরলাগা যৌবন যেন তার সর্বাঙ্গে ভরা জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। এতখানি উদ্ধত-যৌবন কখনো দেখে নি রাজীব। মেয়েটি রাজীবের মুখের পানে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললে, আসুন।

মেয়েটিকে অনুসরণ ক'রে ভেতরে ঢুকল রাজীব। ঘরের মাঝখানে একটি ভাঙা নড়বড়ে টেবিলের এক পাশে

একজন শীর্ণদেহ প্রৌঢ় ভদ্রলোক টেবিলের প্রান্তে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছেন। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর খালি একটি মদের বোতল। টেবিলের অন্য পাশে বেতের চেয়ারে ব'সে আছেন একজন স্থূলকায়া প্রৌঢ়া। কোলে তাঁর পশম বোনার সরঞ্জাম। একটি ছাই রঙের সোয়েটারের সিকি ভাগের আদল তাঁর ক্ষিপ্রহস্তে সঞ্চালিত পশম বোনার কাঁটা দু'টির মাঝখানে প্রকাশ পাচ্ছে ক্রমশ।

রাজীবের মুখের পানে তাকিয়ে প্রৌঢ়া বললেন, ঘর প্রায় সব ক'টিই খালি আছে—ওপরতলায় একটা ভাল ঘর আছে। ক্লারা, এঁর মালপত্রগুলো নামিয়ে আন।

শশব্যস্ত হ'য়ে রাজীব বললে, না না, আমিই নামাচ্ছি। মানে আপনি—

মৃদু হেসে রাজীবের পাশ কাটিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্লারা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রাজীবের বাক্স ও বিছানা দু'হাতে অনায়াসে ব'য়ে নিয়ে এল সে।

প্রৌঢ়া বললেন, ওপরে নিয়ে যাও ক্লারা।

রাজীব বললে, না না—আমিই—

প্রৌঢ়া বললেন, আপনি বসুন। ও-ই সব গুছিয়ে ফেলবে।

ক্লারা মালপত্র নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

রাজীব প্রৌঢ়ার পাশের ইজিচেয়ারটিতে বসে পড়ে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে।

প্রৌঢ়া পশম বুনতে বুনতে বললেন, খেয়ে এসেছেন তো ?

রাজীব বললে, না। এখানে কিছু খাবার পাওয়া যাবে না ?

খাবার! এত রাত্রে!—প্রৌঢ়া চোখ বিস্ফারিত করে তাকান।—অসম্ভব! তবে আপনার ক্ষিধের এ্যান্টিডোটের ব্যবস্থা করতে পারি। হ্যাভ্ সাম ড্রিঙ্কস্।

খালি পেটে ড্রিঙ্কস্! রাজীব যেন আঁতকে ওঠে।

ক্ষতি কি ? মৃদু হেসে প্রৌঢ়া বললেন।

সামান্য কিছু খাবারের ব্যবস্থাও কি হ'তে পারে না! সকাতরে বললে রাজীব।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত। প্রৌঢ়া বললেন।

এমন সময় দেয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বারোটা বাজল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ঘণ্টার শব্দে চমকে উঠে খাড়া হয়ে বসলেন। মুহূর্তের জন্য ঘড়ির দিকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি—তারপর রাজীবের মুখের পানে দৃষ্টি নামিয়ে আনলেন। শুকনো নির্জীব মুখে অস্বাভাবিক রকম জীবন্ত চোখ জোড়া। হঠাৎ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রৌঢ় বলে উঠলেন মেরি ক্রিস্মাস্ জেন্টল্ম্যান।

রাজীব ম্লান হেসে বললে, মেরি হাঙ্গরি ক্রিস্মাস্!

হোয়াট! প্রৌঢ় প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

প্রৌঢ়ার মুখের পানে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, ড্যাম্ ইট মার্থা, ভদ্রলোকের খাবারের ব্যবস্থা কর নি!

খাবার! মার্থা ফোঁস করে উঠলেন। খাবার কোথায় যে ব্যবস্থা করব।

—কেন সন্ধ্যাবেলায় যে এত বাজার করে আনলাম!

—তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে ডেভিড! কালকের যে ফিস্টের অর্ডার আছে, বাজার তারই জন্য করা হয়েছে—মেপে মেপে ঠিক দশজনের আন্দাজ বাজার করেছ।

চুলোয় যাক্ গে ফিস্ট! ডেভিড উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠলেন।—এই ভদ্রলোক হাঙ্গরি ক্রিসমাস উইশ করছেন—নরকে পচে মরবে তোমরা।

ঠিক এই সময় ক্লারা ঘরে ঢুকল।

ক্লারাকে দেখে ডেভিডের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। তিনি বললেন, তোমার মায়ের কাণ্ড দেখ ক্লারা। এই ভদ্রলোকটির জন্য খাবারের ব্যবস্থা এত রাত্রে হ'তে পারে না বলছেন তোমার মা। এদিকে ভদ্রলোকটি আমাকে হাঙ্গরি ক্রিসমাস উইশ ক'রে ব'সে আছেন। হাউ হরিবল! যাও তো বাছা, চট ক'রে ভদ্রলোকটির জন্য কিছু খাবার ক'রে নিয়ে এস—দেরি কোরো না।

ক্লারা অপাঙ্গে রাজীবের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে, সত্যি বাবা—এ মায়ের ভারি অন্যায়! এমন দিনে কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে, এ কি হয়!

তারপর রাজীবকে উদ্দেশ্য ক'রে সে বললে, বাবাকে যে হাঙ্গরি ক্রিসমাস উইশ করেছেন, তাড়াতাড়ি তা' উইথড্র করুন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার ক্ষিধে মিটিয়ে দিচ্ছি।

ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার গমনপথের দিকে চেয়ে রাজীবের মনে হ'ল শান্ত নিস্তেজ রাত্রি যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপে বিদ্যুচ্চকিত হ'য়ে উঠছে। হৃদয় উত্তাল করা চলার ভঙ্গি।

রাজীবের খাওয়া শেষ হতে ক্লারা বললে, ক্ষিধে মিটেছে তো ?

পরিতৃপ্তির হাসি হেসে রাজীব বললে, নিশ্চয়ই।

ঠিক তো।—ক্লারার চোখ জোড়াতে যেন রহস্য ঘনায়।

ঠিক তো মানে!—রাজীব ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে বলে।—পেট পুরে খেলাম, ক্ষিধে মিটবে না তো কি!

পেট পুরে খেলেই কি সব ক্ষিধে মেটে!—চাপা গলায় বলে ক্লারা।

ডেভিড হঠাৎ ব'লে উঠলেন, নাও মাই ডিয়ার স্যার, আই থিঙ্ক ইট ইজ নো মোর হাঙ্গরি ক্রিসমাস। এবারে বলুন মেরি ক্রিসমাস।

রাজীব বললে, বলছি। তার আগে এক বোতল শেরি নিয়ে আসুন।

টেবিল চাপড়ে ডেভিড বললেন, হুর্‌রে!

রাত প্রায় দুটোর সময় রাজীব শোবার ঘরে এল। মস্তিষ্কের মধ্যে রঙিন কুয়াশা—মৃদু মিঠে নেশায় সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন।

নিপুণভাবে বিছানা পেতে রেখেছে ক্লারা। শুভ্র মসৃণ কমনীয় শয্যায় উষ্ণ আরামের আমন্ত্রণ। রাজীবের মনে হ'ল স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এই শয্যার আশ্রয়ে।

গরম স্যুটের ভার থেকে শরীরটাকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে আসে রাজীব।

চোখের সামনে নেশার রঙিন পর্দাটি আচম্বিতে ছিঁড়ে যায়। বিছানাটির দিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে থাকে রাজীব।

প্রশস্ত খাটজোড়া বিছানায় দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে গেছে ক্লারা।

রাজীবের দেহের রক্তস্রোত উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। খাটের পাশে রাখা ইজিচেয়ারটিতে ব'সে প'ড়ে সিগারেট ধরায় সে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন প্রতীক্ষায় সজাগ হ'য়ে থাকে।

খানিকক্ষণ বাদে দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ। তা' যেন রাজীবের শ্রবণ থেকে মর্মের গভীরে গিয়ে সহস্রগুণ হ'য়ে বেজে উঠল ও মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিল রাজীব।

ক্লারা ঘরে ঢুকল। পরনে তার স্বচ্ছ নীল রঙের একটি নাইট গাউন। উদ্ধত যৌবনের আত্মঘোষণা কোথাও বাধা পায় না।

রাজীবের চোখের পলক পড়ে না। তার এতদিনের মর্মাশ্রয়ী কল্পমায়া যেন কায়া ধ'রে সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে, যার দেহের রেখায় রেখায় অনন্তকালের বসন্তের লিপিলেখা। বিশ্বের সমস্ত পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করার মন্ত্র যেন তার প্রতিটি অঙ্গে বেজে চলেছে।

রাজীবের মুখের ওপর বিলোল কটাক্ষ হেনে ক্লারা বললে,—আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তো?

রাজীবের কান দুটি লাল হ'য়ে ওঠে। তার মুখে কোন কথা জোগায় না।

বিছানার ওপর ব'সে প'ড়ে ক্লারা বললে, আপনি হোয়াইট ক্রিস্‌মাস্‌ উইশ্‌ ক'রেছিলেন—তার দরুণ আপনাকে কেবলমাত্র খাইয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হ'তে পারি নি।

রাজীব পাথরের মত নিথর হ'য়ে বসে থাকে।

রাজীবের বিব্রত আরক্ত মুখের ওপর তির্যক দৃষ্টি হেনে ক্লারা বললে, হিন্দুরা উপোস ক'রে পুণ্য অর্জন করে—কিন্তু হাঙ্‌রি ক্রিস্‌মাস আমরা বরদাস্ত করি নে।

রাজীব উঠে দাঁড়াল। উন্মত্ত আবেগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে থর থর করে।

ক্লারা বলে চলে, বরদাস্ত না করলেও অবশ্য আমাদের ক্রিস্‌মাসগুলো হাঙ্‌রিই থেকে যায়। আমরা, মানে এদিককার গোয়ানীজ্‌রা যে কত গরীব সে আপনি ধারণা করতে পারবেন না। এই দেখুন না, ক্রিস্‌মাস উপলক্ষে প্রিয়জনদের যে সামান্য উপহার দেব, সে সামর্থ্যও নেই আমার। আমার কত দিনের সাধ ক্রিস্‌মাস উপলক্ষে আমার জনকে ভাল একটা সিল্কের টাই উপহার দিই। কিন্তু আমার নিজের বলতে একটি পয়সাও নেই।

রাজীব চমকে উঠে বলে, জন! জন কে?

—জন আমার ফিঁয়াসে। ওর সঙ্গে আসছে মাসেই আমার বিয়ে। অনেকদিন ধ'রে আমরা এন্‌গেজ্‌ড হ'য়ে আছি।

পরক্ষণে রাজীবের বিস্ফারিত চোখ দু'টির দিকে চেয়ে খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে ক্লারা। বলে, ভয় নেই গো, ভয় নেই। জন ধারে-কাছে কোথাও নেই।

বিস্মিত বিমূঢ় দৃষ্টিতে ক্লারার মুখের পানে চেয়ে থেকে রাজীব বললে, হাউ স্ট্রেঞ্জ! আমি ভেবেছিলাম হোটেলের ব্যবসার সঙ্গে এই ব্যবসাও চালাচ্ছো। অথচ—

মুচকি হেসে ক্লারা বললে, অথচ কি! জনের সঙ্গে আমি এন্‌গেজ্‌ড—অথচ তোমার কাছে আমি এসেছি। কিন্তু এইমাত্র তো তোমাকে বললাম, আমি জনকে ভাল একটি ক্রিস্‌মাসের উপহার দিতে চাই। তার জন্য টাকা দরকার—অন্তত পনেরোটি টাকা।

রাজীব বললে, মোটে পনেরো টাকা! সে তুমি চাইলে অমনিই তো দিয়ে দিতে পারি। আর জন্য তুমি নিজেকে—

অমনি!—ক্লারার চোখ দু'টি জ্বলে উঠল।

দুর্জয় ক্রোধে ক্লারার মুখখানা টকটকে লাল হ'য়ে ওঠে। রুষ্টস্বরে সে বললে, তুমি আমাকে ভিক্ষে করতে বলছ! হাউ ডেয়ার ইয়ু! ভিক্ষে ক'রে আমি আমার ফিঁয়াসেকে ক্রিস্‌মাসের উপহার দেব—আমি কি এত ছোট! টের পেলে জন কি সে উপহার ছোঁবে। আমার কি প্রেস্টিজ্‌ নেই! আমাকে দয়া করবার কি অধিকার আছে তোমার!

বলতে বলতে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে ক্লারার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে।

রাজীব হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ক্লারা উঠে দাঁড়িয়ে রাজীবের হাত ধরে জোর ক'রে তাকে বিছানায় টেনে নিয়ে এল। পরমুহূর্তে উষ্ণতম আলিঙ্গনের মধ্যে তাকে বন্দী ক'রে ফেলে বললে, আমি ভিক্ষুক নই—আমি রীতিমত একজন রেস্পেক্টেব্‌ল লেডি—বুঝেছ হাঁদারাম?

আর একটি কথাও বলতে পারে না রাজীব। উষ্ণ কামনার আবর্তের অতল তলে তলিয়ে যায় সে নিমেষের মধ্যে।

ভোর হ'তেই ক্লারা রাজীবের বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

ভোরের প্রথম আলো ঘরের জানালার কাচে স্বচ্ছতা সঞ্চার ক'রে ক্লারার মুখের ওপর এসে পড়ে। রাজীবের মনে হ'ল একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলের শুভ্র সৌন্দর্য যেন এই ভোরের আলোয় গ'ড়ে উঠল। তাকে যেন ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে মিষ্টি হেসে রাজীবকে ক্লারা বললে, মেরি ক্রিস্‌মাস্‌।

শেক্সপীয়র

ম্যাথু আরনল্ড্‌

'মুক্ত তুমি'—অন্যের অনন্ত প্রশ্ন আমাদেরি মত—
বারবার জিজ্ঞাসায় স্মিতহাস্যে রহস্যে বিলীন,
জ্ঞানের অতীত-সত্তা!—যথা গিরি-শীর্ষ নির্মলিন
তারাস্তোম স্পর্শ করি' মহিমায় বিরাজে সতত :—
গূঢ়-গর্ভ সিন্ধু হ'তে চিরস্থির সে-যে সমুত্থিত,
ঊর্ধ্বের ঔর্বিক-লোক নিত্য তার আত্মার আবাস—
পাদদেশে মেঘপুঞ্জ-গুঞ্জরেখা, দীর্ণ অভিলাষ—
নশ্বরের যত বীপ্সা ব্যর্থতায় সব পর্যুষিত!—

সম্যক তোমার কাছে রবি-রশ্মি নক্ষত্রের আলো—
শিক্ষায় যে স্বতস্ফূর্ত বিচারে সম্মানে সুরক্ষিত
সেই তুমি ব্যতিরিক্ত-অনুমান এ-মরু-মৃত্তির,
যেথা শক্তি মৃত্যুহীন সহ্য করে—অনির্দেশ্য ভালো—
ক্ষীয়মাণ দুর্বলতা, নির্বেদের নতি অকথিত,
বিজয়ী জ্র-যুগে তব পায় যারা বাণী সুগভীর!—

অনুবাদক—শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

কামিনী রায়

ঠিক একশত বৎসর পূর্বে ১২ই অক্টোবর ১৮৬৪ সালে কবি কামিনী রায় বঙ্গজননীর ক্রোড়ে আবির্ভূতা হন। তখন হেম, নবীন, মধুসূদনের যুগ বঙ্গভূমিকে মুখরিত করিয়া চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন চারিদিকে পূর্ণ উজ্জ্বল হয় নাই। তখন কবি কামিনী রায় তাঁহার কাব্যাঞ্জলি বঙ্গমাতার মন্দিরে প্রদান করিতে সুরু করেন।

৪০ বৎসর পূর্বে এই মহীয়সী মহিলার সহিত পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁহার কাব্য-মহিমার সমালোচনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু তাঁহার কাব্যসৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিচয় ১৯৪০ সালের ভাদ্রমাসে, ১৯৩৩ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মহাপ্রয়াণের পরই 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার ১৯৪০ কার্তিক সংখ্যায় লিখি। তিনি আমাদের ভবানীপুর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রধানত হাজরা অঞ্চলেই তাঁহার কার্যক্ষেত্র ছিল। তাই তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা, কাজকর্ম করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাঁহাকে চিনিয়াছি। তাঁহার স্নেহ পাইয়াছি—তাঁহার প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে। তাহারই কয়েকটি নিদর্শন দিলে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় এবং তদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের পরিচয় লাভ হয়।

তিনি কথার মূল্য এবং সত্যের মর্যাদা সকল সময় রাখিতেন। একদা বালীগঞ্জ ওয়ার্ড কমিশনারের অন্তর্বর্তী একটি নির্বাচনদ্বন্দ্বে নামিবার অভিপ্রায় হয়। নির্বাচনী প্রস্তাবকপত্রে স্বাক্ষর দিবার জন্য আমি কামিনী দেবীর নিকট যাই, তাঁহাকে বলিবামাত্র বিনা দ্বিধায় স্বাক্ষর দেন এবং তারপর সমর্থক হিসাবে গ্যাম কোং ম্যানেজার আইরনসাইড নিবাসী মিঃ সাডেক্সের স্বাক্ষর লই এবং মনোনয়নপত্র দাখিল করি। তারপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশীথচন্দ্র সেন মহাশয় নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। তখন কামিনী রায় বলেন, 'আমি যখন জ্যোতিষবাবুকে কথা দিয়াছি—তখন নিজে গিয়া তাঁহাকেই ভোট দিব'—এমনই ছিল তাঁহার সত্যনিষ্ঠা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মহিলাদের স্থান ছিল না, আমারই চেষ্টায় কামিনী রায় ও অনুরূপা দেবী সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনিই প্রথম মহিলা সভানেত্রী হন—সে কি আনন্দ! বলেন, 'জ্যোতিষবাবু সত্যই আপনি বঙ্গ-ললনাদের দরদী, তাহাদের মর্যাদাদানে আপনার মন কত উদার।'

সমাজসেবায় তাহার নিদর্শন পাই অনেক স্থলে। তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ সেন তাঁহার শিক্ষাগুরু ও ধর্মদীক্ষাগুরু। ১৮৭০ সালে চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপরবৎসর তাঁহার স্ত্রী তাঁহার ধর্মের অনুগামিনী হন, কামিনী রায় মহোদয়াও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতা হন। অল্পবয়সে কিন্তু তাঁহার পিতার নিকট রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদ ব্যাখ্যা শিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মন উদারভাবসম্পন্না ছিল। অন্য ধর্ম প্রতি সহনশীল—মদীয় আলয়ে জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে আসিতেন।

তিনি পিতার ধর্ম সর্বদাই পালন করিতেন। চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের অযোধ্যার বেগম 'মহারাজ নন্দকুমার,' 'ঝাঁসীর রাণী' পুস্তকগুলি কামিনী দেবীর স্বাদেশিকতার উৎস। যখন তিনি তাঁহার পিয়ানোতে স্বরচিত গান—

> যেই দিন ওচরণে ডালি দিনু এ জীবন,
> হাসি-অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
> হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাই আর,
> দুঃখিনী জনমভূমি—মা আমার, মা আমার।



● কামিনী রায়

মরিব তোমারই কাজে, বাঁচিব তোমারই তরে
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার
থাক প্রাণ, যাক প্রাণ, মা আমার, মা আমার।

বাজাইয়া শুনাইতেন তখন তাঁহারও সহিত অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না!

ধর্মভাবের কঠোর বন্ধনে প্রতিপালিত হইলেও, তিনি সমাজে উদারভাবের পরিপোষক ছিলেন। তবে কখনও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেন না। সদাই ঘৃণা করিতেন। তিনি যখন পর্দার বাহিরে আসেন বা স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিতেন তখন নারীজনশীলতা, সরম কখনও বিসর্জন দেন নাই। আধুনিকা নারীদের উগ্র স্বাধীনতা (Ultra-modern) ভাব দেখিয়া একদা বড়ই ব্যথিত হন। কোন একদিন তাঁহার নিকট যাইলে তিনি বলিলেন—'জ্যোতিষবাবু, অসহ্য হয়ে উঠেছে, আজকে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে এমন নির্লিপ্ত ও অশোভনীয় ঢং-এ বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখে মনে বড় ব্যথা পেলাম।' তিনি আরো বলিলেন, 'আজ পঞ্চাশ বছর ধরে পর্দার বাইরে বার হয়ে নানা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছি—কিন্তু তবুও এই বৃদ্ধ বয়সে সম্পর্কিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অধোবদন হতে হয়। আমি আই সি এস-এর স্ত্রী, আই সি এস-এর মা, তবু কখনও বেহায়ার মতন রাস্তাঘাটে বার হই না।'

যখন কামিনী দেবীকে ১৯২৯ সালে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক সভায় লইয়া যাই, তখন তিনি আর্টের নামে সাহিত্যে যেরূপ দুর্নীতি প্রকাশ পাইতেছে, তাহা মানব-মনের ও সমাজের ভীষণ অনিষ্টকর বলিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও অন্য সমাজ ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ আদৌ পছন্দ করিতেন না।

তিনি আমাকে এতই ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে বলিবামাত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় একটি কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার শেষ কবিতা। তিনি তাঁহার নিজবাটী ৪২/এ হাজরা রোডে-ই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঠিক একশ' বৎসর পূর্বে এই দিনেও রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। আর তাঁহার স্বামী কেদারনাথ রায় (আই সি এস) তিনিও হাজরা রোডের বাটীতে শেষনিঃশ্বাস ফেলেন।

তাঁহার স্বামীর কথা বলিতে গিয়া তিনি হাসিয়া লুটোপুটি হইতেন—কারণ বলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর মত দুর্দান্ত আই সি এস-কে তিনি কবিতায় মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দাম্পত্য-জীবন কয়েক বৎসর খুবই মধুময় ছিল বলিয়া তিনি বলিতেন, যদিও তাঁহার পরবর্তী জীবন অতি বিষাদময়। ১৯০৯ সালে তাঁহার স্বামীর অপঘাত মৃত্যু হয়, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকের মৃত্যুতে যে ব্যথা পান, তাহা তাঁহার 'অশোক-সঙ্গীত' কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। ১৯২০ সালে তাঁহার একমাত্র কন্যা তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে তিনি একেবারে ভাঙিয়া পড়েন। তাঁহার এই সকল শোক এতই তীব্র ছিল যে, তিনি আমার কাছে কয়েকবার বলিয়াছিলেন—'জ্যোতিষবাবু, আর তো পারি না, ভগবান কবে নেবেন।' তাঁহার বেদনায় স্বীয় সন্তানহীন প্রাণে বেদনা জাগিয়া উঠিত—চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত।

এত দুঃখ-যাতনার মধ্যেও তিনি দেশের ও দশের কাজ নিষ্ঠায় ও দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেন। তখন ১৯৩০ সাল ফেব্রুয়ারী মাস, অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ১৩ই মাঘ ১৯শ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান করি—তখন তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সভানেত্রী ছিলেন। যখনই কোন বিবাদ বা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িতাম তিনি দৃঢ়তার সহিত আমায় সমর্থন করিতেন। তিনি বিপিন পাল মহাশয়কে সমর্থন করেন।

আবার রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে টাউন হলের সভায় যে স্বর্ণফলক খোদিত অভিনন্দন দেওয়া হয়, তাহা কবি কামিনী রায়ই পাঠ করেন।

যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবি কামিনী রায়কে তাঁহার কবিপ্রতিভার জন্য 'জগত্তারিণী পদক' ১৯১০ প্রদান করা হয়, তখন সে সংবাদ তাঁহাকে প্রথম জানাই, তিনি আনন্দে এ দীনজনকে স্বহস্তে-প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য দিয়া আপ্যায়িত করেন। তাঁহার প্রতিভা ও মমতা বঙ্গনারীর মহিমার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

যে সব মহীয়সীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছি এবং তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপনে পুণ্য অর্জন হইয়াছে, তাঁহাদেরই আলোচনা করিতেছি যতটুকু দেখিয়াছি, যতটুকু লাভ করিয়াছি সেইসব সত্য প্রকাশ করিতেছি। অবশ্য ইহার সহিত অল্পবিস্তর পারিপার্শ্বিক ঘটনা, তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির আভাস দিতে হয়। ১৯০৪ সাল হইতে নিয়মিত ডায়রী স্মৃতিকে ঝালাইয়া দেয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী আমার সাহিত্য-সাধনার গুরুস্থানীয়া। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। এই পরমাসুন্দরীর জন্ম হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে। বহুবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হয়। তাঁহার বিবাহ হয় সৎ, হিন্দু, প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ সন্তান জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আইনজীবী। ইণ্ডিয়ান

ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম যুগে বহু বৎসরের জন্য তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জানকীনাথ ও স্বর্ণকুমারীর বিবাহ ব্রাহ্মমতে হইলেও জানকীনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নাই, ঘরজামাইও থাকেন নাই।

আমার জন্মস্থান কলিকাতা মহানগরীর ভবানীপুর অঞ্চলে; ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে (১৮৮৭), যে বাড়ি এখনও অপরিবর্তিত আছ। এই অঞ্চলের অনতিদূরে ২৬ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল বাস করিতেন। সে সৌধ তখন রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাগানবাড়ির অতিথি আলয় ছিল। এই বাগানবাড়ির মধ্যেই সুরম্য চর্মে বিখ্যাত Adam & Eve-এর তৈলচিত্র ছিল। এ বাগানের মধ্য দিয়া ১৯০৮ সালে রিচি রোড নির্মিত হইয়াছে। এখন পূর্ব অংশে St. Lawrence School এবং পশ্চিম অংশে স্বর্ণকুমারী থাকিতেন। তাহার নবরূপ 'উদয়ন' নামে কানাইলাল দত্ত—হিমানী সাবান নির্মাতার কুঠী।

স্বর্ণকুমারীর এক পুত্র জ্যোৎস্না ঘোষাল আই সি এস অন্য দুইটি কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ছিলেন। ইঁহাদের বিষয় পরে বলিব। জ্যোৎস্না ঘোষালের বিবাহ হয় কুচ বহারের মহারাণী কেশব সেন দুহিতা সুনীতি দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা Princess Prety-র (রাজকুমারী প্রীতি) সহিত ১৮৯৮ খৃঃ কলিকাতার ওই বাড়ি হইতেই তখন আমার বয়স ১১ বৎসর। বর, আমাদের বাটির সম্মুখে—পদ্মপুকুর রোড দিয়া উডল্যাণ্ড-প্রাসাদে যাইবে। ল্যান্সডাউন রোড তখন হয় নাই। অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত বরকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। কেল্লার হাইল্যাণ্ডর ব্যাকপাইপ ও আইরিশ গোরার বাদ্যসহ গ্যাস লাইট নামে এক প্রকার আলোয় পদ্মপুকুর রোড আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। আট ঘোড়ার গাড়ি (যাকে postelion drive বলে) ইংরাজ কোচম্যান এক এক আট ঘোড়ার গাড়ি উজ্জ্বল জরির পোষাক পরিহিত হইয়া—চালাইয়া যাইতেছিল। বিরাট রাজছত্রতলে রাজপুত্রের ন্যায় পুলকিত জ্যোৎস্না ঘোষাল বরের সাজে সজ্জিত। দুইন চাকার পার্শ্বে পুরা জঙ্গী পোষাকে পুলিশ অফিসার ও কেল্লার জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং উন্মুক্ত তরবারী হাতে শ্বেত অশ্বোপরি বরের শরীররক্ষীরূপে চলিলেন। আগু-পিছু বৃটিশ অশ্বারোহী এবং শিখ বর্ষাধারী অশ্বারোহীর দল, মাঝে মাঝে গোরার বাদ্য (মিলিটারী ব্যাণ্ড) চলিতেছিল? খাসগেলাসের বাঁধা রোশনাই ঝিকমিক আলো জোনাকীর মত খেলিতেছিল। ৪ মাইল পথে লোক আর ধরে না।

এই দৃশ্য যখন মনে তোলপাড় করিত, ঠিক সেই সময় একদিন এক ট্রাইসাইকেলে চড়িয়া গেঞ্জি গায়ে সাদা হাফ প্যান্ট পরিয়া বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়া ভাইসরয়ের বডিগার্ড লাইনের ঘোড়া দৌড়ের সহিত যাইতেছিলাম—সে রাস্তা সে মাঠ এখনও আছে, কেবল পুরান বডিগার্ড লাইন সেই স্মৃতি মছিয়া নূতন মিলিটারী ছাউনী হইয়াছে। বড় বড় nti Air Craft বসিয়াছে। সেইদিন হঠাৎ স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রাতর্ভ্রমণে বাধা দিয়া বসিলাম। সেই সৌম্যমূর্তি কোন কোপ প্রদর্শন করিলেন না,—পিঠ চাপড়াইয়া মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় থাক?'

নিকটে থাকি জানিয়া তাঁহার বংশের সৌন্দর্যপ্রিয়তার জন্য আদর করিয়া বাড়ি লইয়া গেলেন। এইখানে তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের সঙ্গী প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার টি, পালিতকে বিদায় দিলেন।

ট্রাইসাইকেল চালাইয়া তাঁহার সহিত প্রাঙ্গণে ঢুকিলাম। পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ শুনিয়া—সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িলাম—তদপেক্ষা মধুর স্বর শুনিলাম—'সরি! ও সরি দেখ কেমন একটি সুন্দর ছেলে ধরে এনেছি।' সে মিষ্টি কথাগুলি এই তিন কুড়ি বছর পরেও আমার কানে যেন ঝঙ্কৃত হয়।

প্রত্যুত্তরে যে কর্কশ বাক্য শুনিয়াছিলাম— 'কি করব?' সেও আমার বেশ স্মরণ আছে। তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা স্বনামধন্যা সরলা দেবী। তাঁহার প্রতি সেদিন যে ভয় ও বিকৃত মনোভাব জাগে —পরবর্তীকালে অনেক আত্মীয়তা, স্নেহ সহযোগেও তাহা মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।

তারপর হইতে কয়েক বৎসর স্বর্ণকুমারী দেবীর সকাশে যাতায়াত করিয়াছি এবং বালিগঞ্জের 'বাবু বৃন্দাবনের' রসাস্বাদ পাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছি। নূতন ও পুরাতন বালিগঞ্জ, সানী পার্কে, চেস্টার রোডে, লালকুঠীতে, চৌধুরীর সাত ভাই (জজ স্যার এ, চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর জামাতা—জে, চৌধুরী, ডব্লু, সি, ব্যানার্জীর জামাতা—পি, চৌধুরী, এন চৌধুরী, শিকারী কে, এন, চৌধুরী) সত্যেন ঠাকুর ও তৎপুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কন্যা ইন্দিরা দেবী, সর্বোপরি বসন্তের কোকিলের ন্যায় আসেন রবীন্দ্রনাথ—এই বাবু ন্দাবনে মধুর রসলহরী বহিত।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও আশু চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় বাবু বৃন্দাবনের একটি বৈঠকে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাই। সেটি ছিল সারস্বত সম্মেলন—এক বাসন্তী পঞ্চমীর দিন। এ রসকুঞ্জে প্রধান প্রধান মধুকর ছিলেন—মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ, প্রমথ রায়চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন, ইন্দিরা দেবী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশ সমাজপতিও রসান যোগাইতে ছাড়েন নাই। গানের পর গান, কবিতার পর কবিতা, হাস্য, পরিহাস চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিহাসপূর্ণ বকুনির তুবড়ি ছুড়িয়া মাতাইয়া রাখিতেছেন। এমন সময় সমবেত সুধিবৃন্দ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—এবার রবি কবির গান হউক।

কবি বলিয়া উঠিলেন—

'যদি পরাণ না চায়, আর গাহিব না গান
নীরব হউক তব বীণার তান।'

অনেকক্ষণ অনুরোধ করার পর কবি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'তুমি যদি বাজাও ও মহারাজ যদি পাখোয়াজে তাল দেন তবে কবি গান গাহিবে।'

তখনই ইন্দিরা দেবী বাজানো সুরু করিলেন, আর নাটোর মহারাজ পাখোয়াজে চাঁটী দিলেন—সভা গম-গমিয়া উঠিল—

'যদি বারণ কর তব গাহিব না গান
যদি সরম লাগে তবে আর চাহিব না।'

পূর্বেই জানাইয়াছি স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম আমাকে লিখিবার জন্য উৎসাহিত করেন এবং এ বিষয়ে তিনিই আমার গুরু। স্বর্ণকুমারী দেবী যখন 'ভারতী' পত্রিকার ২য় পর্যায় চালাইতেছিলেন তখন মণি গাঙ্গুলী সেই গোষ্ঠীতে ছিলেন। একদিন তাঁহাকে বলিলেন, 'এ ছেলেটিকে তোমাদের দলে ভিড়িয়ে নাও।'

মণিবাবু বলিলেন,—'এ যে একেবারে ননী' (আমার মা আমায় ননীর পুতুল বলিতেন, সেই থেকেই আমার ডাকনাম ননী চলিত ছিল)।

স্বর্ণকুমারীকে প্রথমদর্শনে এই নামই বলি এবং তিনি এই নামই ব্যবহার করিতেন। মণিবাবুর কথায় আমি লজ্জিত হইলাম স্থির করিলাম বাংলা চর্চা করিব না—তখন স্কুল-কলেজে এমন কি ঘরে ঘরেও বাংলা চর্চা বিশেষ ছিল না। লেখার কথা উঠিলেই পালাইয়া পালাইয়া বেড়াইতাম। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী হাল ছাড়িলেন না।

একদিন মহামতি কবীরের একখানি ইংরাজী জীবনী দিলেন এবং বলিলেন—'ইহার অনুবাদ করে আনো।' একটি কটমট অনুবাদ করিয়া লইয়া গেলাম, ধৈর্য সহকারে পড়িয়া লেখাটির আদ্যোপান্ত কাটিয়া-ছাঁটিয়া দিলেন। হুকুম করিলেন, 'কালই আবার কাগজে কেবল একদিকের পৃষ্ঠায় লিখে আনো।' তাহার পরই দেখিলাম সেই 'মহামতি কবীর' 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৫ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে বলিতে হয় স্বর্ণকুমারী দেবী আমার বাংলা লেখার গুরু।

তাহার পর ৫৫ বৎসর তাঁহার স্নেহচ্ছায়াতলে বসিয়া অনেক কিছু করিতে পারিয়াছি। তাঁহার দুই-একটি স্মৃতি কাহিনী এখানে উল্লেখ করিব। একদিন বালিগঞ্জের ৫৭নং বাড়ির সামনের রেলিং-এর কাজ পরিদর্শন করিতেছিলাম (সিনেট হাউসের উত্তরদিকের রেলিং ভাঙিয়া আনিয়া উহা এই বাড়িতে বসান হয়) স্বর্ণকুমারী দেবী খুব আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'ভারতের এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনের প্রাসাদ এনে তুমি আমার নৈবেদ্য সাজিয়েছ।' হায়! সেই স্মরণীয় বরণীয় বিদ্যামন্দির—সেনেট হাউসের বিলুপ্তি ঘটিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জিদে। বিলোপসাধনে কাহারও বাক্যস্ফুর্তি হইল না, ভাঙিতে হাত কাঁপিল না। প্রাণে ব্যথা লাগিল না। সিনেট হাউস রক্ষার দাবি জানাইতে কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবাদ করিল না। সিনেট হাউসের ভিতর দিয়া না যাইলে ৪০ বৎসর আমার ভাত হজম হইত না, সেই অঞ্চলে এখন যাইলে প্রাণে একটা বেদনা অনুভব করি।

একদিন সকালবেলায় তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়াছি—দেখি, দীন-দুঃখীর সমব্যথী শরৎ পণ্ডিত বা 'দাদাঠাকুর' উপস্থিত—সেই মহীয়সী মহিলা তখন আদর করিয়া কাছে বসাইলেন—'কোলকাতাটা ভুলে ভরা' বারবার শুনে হাসিতে ডুবিয়া গেলেন।

'নদী নাইকো জোড়াসাঁকো—
তাই সেখানে হয় দিনেরাতে রবির উদয়॥'

আমাদের দাদাঠাকুর তৎক্ষণাৎ তৈয়ারী করিলেন—Recitation, Registration, Partition, Petition-Agitation ইত্যাদি।

স্বর্ণকুমারী দেবী আমায় বলিলেন, 'জ্যোৎস্না, Alphanso আম কাল পাঠিয়েছে পণ্ডিত ভোজন করাও'। পুত্র জ্যোৎস্না ঘোষাল স্বর্ণকুমারী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে আলফানসো আম বোম্বাই হইতে পাঠাইতেন। তখন তিনি বোম্বাই এবং পুণা, রত্নগিরির জেলার জজ ও বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। আমার সৌভাগ্য আমি বৎসরের দুই-তিন বার এই আলফানসো আম পাইতাম। যতদিন স্বর্ণকুমারী দেবী বাঁচিয়াছিলেন, এ প্রসাদ পাইয়াছি।

আর একটি সামগ্রী পাইবার সৌভাগ্য হইত। আমার পদ্মপুকুর বাড়িতে ১৯১৪ সাল হইতে জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া আসিতেছে। স্বর্ণকুমারী দেবী যদিও আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা—তথাপি তাঁহার মনে মূর্তিপূজার প্রতি বিরুদ্ধভাব প্রাধান্য পায় নাই। সেজন্য তিনি আমার বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে আসিতেন। নারিকেল নাড়ু ও রসকরা খাইয়া বেশ তৃপ্তি পাইতেন। প্রথম বৎসর হইতে তাঁহার সানিপার্কের বাগান হইতে আশ্বিন মাসে পঞ্চাশটি ঝুনা নারিকেল পাঠাইয়া দিতেন। টি পালিত মহাশয়ের সরকার হরিপদবাবু বাড়ি বহিয়া নারিকেল দিয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যোৎস্না

ঘোষাল মহাশয়ও কয়েক বৎসর পাঠাইয়াছিলেন। এ দান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১৩ই মাঘ উনবিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসিলেন না। অধিবেশনের মাত্র চার দিন পূর্বে পূজ্যপাদ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জানাইলেন।

মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল, ছুটিয়া গেলাম স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট—বলিলাম, 'রবীন্দ্রনাথের স্থান আপনি ছাড়া অন্য কেহ পূরণ করতে পারে না, বিপদ হ'তে রক্ষা করুন।'

তিনি পুলকে হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার কথা এড়ান দায়।'

তিনি রাতারাতি—'সাহিত্যে নারীর অবদান বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত'—সুললিত ভাষায় লিখিলেন। তাঁহাকে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবার, জন্য প্রস্তাব করেন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থন করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অনুমোদন করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ইহাতে তিনি বিনয়ের সাহিত বলেন, 'আপনারা যে এক কত অনুপযুক্তাকে আসনে বসালেন তা বুঝতেই পারছেন যে, এক খঞ্জ, এক জরাগস্ত ও এক অন্ধ দ্বারা মনোনীতা হয়েছি'—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

যখন রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত অভিভাষণ পাঠের আপত্তি করিয়া—অভ্যর্থনার সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার ওজস্বিনী বাগ্মিতা ও দৃঢ়কণ্ঠের সহিত আপত্তি দিলে সভায় যখন তুমুল বিক্ষোভ উঠিল—তখন ঐ মহীয়সী মহিলা তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'রবির ভাষণ পাঠ নিশ্চয় হবে।'

এইরূপে বারে বারে স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিতেন। তিনি বাংলার নব-জাগরণের যুগে সর্ব অগ্রবর্তিনী ছিলেন। তিনি বঙ্গ সাহিত্য সাধনায়ও অগ্রণী। রবীন্দ্রনাথের প্রখর তাপে প্রভাবান্বিতা না হইলেও তাঁহার আওতায় সাহিত্য ক্ষেত্রে পূর্ণ বিকাশ পায় নাই।

ঠাকুরপরিবারের মধ্যে নারী-জাগরণের যে প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল—তাহারই তরঙ্গমালা কলিকাতা ও বাংলা দেশ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সর্বভারতে ছড়াইয়া পড়ে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। সেই তরঙ্গমালার ঢেউ স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় বিদুষী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন—১২৯১ হইতে ১৩০১—দশবৎসর এবং পুনরায় ১৩১৫ হইতে ১৩২১ পর্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদনা করেন। তিনি উপন্যাস, কবিতা, গল্প, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার প্রমাণ সুবৃহৎ স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী। তাঁহার এই সাহিত্য সৃষ্টির জন্য—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী' পদক প্রদান করিয়াছিল।

স্বামীর সহিত তিনিও থিওসফিতে বিশ্বাসী হন। তিনি বাংলা দেশের থিওসফিক্যাল সোসাইটির মহিলা-শাখার সভানেত্রী ছিলেন, যখন ইহা উঠিয়া যায়, তখন ১৮৮৬ সালে 'সখি সমিতি' নামে এক মহিলা সমিতি সংগঠন করেন—সেখানে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিতে ও স্বাবলম্বিনী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত, ভিন্ন ভিন্ন জেলা ও গ্রাম হইতে হস্তশিল্প সংগ্রহ—এক-একটি মেলার অনুষ্ঠান করিতেন।

তাঁহার স্বামী জানকীনাথ খাঁটি কংগ্রেসসেবী স্বর্ণকুমারীও তাঁহার অনুগামিনী ছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ কংগ্রেসের প্রথম নারী প্রতিনিধিরূপে এবং ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই অধিবেশনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলীও কংগ্রেসে যোগদান করেন। এমনিই মহীয়সী ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

অন্ধকার থেকে

গোবিন্দ মান্না

অন্ধকার অজ্ঞানতা জঠরের গহ্বর থেকে
হঠাৎ যখন জেগে মাঝে মাঝে চোখ মেলে চাই—
করুণ কাঁদন এক হৃদয়ের রন্ধ্র সব ব্যেপে—
বাহির বিশ্বের পানে ছুটে যায়—নিজেকে হারাই।

এত আলো এত সুখ এত আশা-ভাষার কাকলি
এত গান তবু কেন পড়ে থাকি পঙ্কিলতা নীচে—
এ চক্ষু মুদিত হয়, ম্লান হয়ে আসে যে সকলি
হস্তপদবদ্ধহীন নির্বিকার ছুটি কার পিছে?

'ইন্দ্রের ঐশ্বর্যে পূর্ণ, যে ধরিত্রী তার বক্ষমাঝে
আমরা রয়েছি যদি তবে কেন কোন দীনতায়—
নিঃস্বতার গ্লানি মাখি—অকিঞ্চন সব পুণ্য কাজে—
ভিক্ষার পসরা নিয়ে ফেরি করি লোভের পাড়ায়।

হে তামসী অজ্ঞানতা—তোমার মোহের কারা হতে—
মুক্তি দাও আমাদের—স্নাত হই পবিত্র প্রভাতে।

যতদূর মনে পড়ে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (বার-এ্যাট্-ল)

পরে শুনেছিলাম আসামী স্পেন্স (Spence) সাহেবের বিশেষ কিছুই হয় নি। চড় মারার অপরাধের জন্য দু-চার টাকা জরিমানা হয়েছিল কি না মনে নেই। কোর্ট ইন্সপেক্টারকে চড় মারার জন্য অবশ্য আর কিছু ঘটে নি। ইন্সপেক্টারটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ রুজু করেছিলেন কি না এবং নালিশ করলেও ম্যাজিস্ট্রেট হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কি না জানি না।

বহু বৎসর পরে ম্যাজিস্ট্রেট হল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তিনি তখন বাঙলা গভর্নমেন্টের একজন সেক্রেটারী। একদিন দু'জনে একসঙ্গে পেলেটি হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন করছিলাম। কথায় কথায় কুলী হত্যা মামলার কথা উঠল।

কথাপ্রসঙ্গে হেসে শুধালাম, 'আপনি যে আমাদের কোর্ট থেকে তাড়িয়ে দিলেন—নিশ্চয় আপনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন—না?'

হেসে বললেন, 'চুপ? চুপ? ওসব সরকারী গোপন কথা।' (State secret)

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে এ ধরণের সরকারী গোপন কথা আছে কি না জানি না।

॥ তিন ॥

বন্দেমাতরম্

বন্দেমাতরম্—এই মন্ত্রে একদিন দেশ উঠেছিল জেগে। তার দীর্ঘকালের অসাড় অন্ধকার ঘুমের ঘটল অবসান। শুধু জেগে ওঠাই নয়, এই মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে অপূর্ব আবেগের শিহরণে দেশবাসী উঠল কেঁপে—ভেঙে ফেলে দিতে চাইল বহুদিনের বন্ধনের শৃঙ্খল। তখন ক্ষণে ক্ষণে আকাশে বাতাসে এই মন্ত্রের হত প্রতিধ্বনি—এমনকি আইন-আদালত পর্যন্ত এই মন্ত্রে মুখরিত হয়ে উঠতে দেরি হল না।

সেযুগে স্বদেশী মকোদ্দমা বলে একরকম মামলার সৃষ্টি হল—স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বেচ্ছাসেনা বাহিনীর শত শত লোককে পুলিশ আদালতে ধরে আনতে লাগল ইংরেজের আইন অমান্য করার জন্য। ফলে কত কত ভারতবাসী যে গেল জেলে, কেউবা দিল প্রাণ ফাঁসীর মঞ্চে। এবং ক্রমে এই সংগ্রামকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য ইংরেজ সরকার নানা রকম দমননীতি অবলম্বন করলেন, দেশবাসীও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল তার বিরুদ্ধে।

আমি ব্যারিস্টারী সুরু করি ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে। সমস্ত দেশব্যাপী আন্দোলনের ঘনঘটা তখন। নানাধরণের স্বদেশী মকোদ্দমা ইতিমধ্যে নানা আদালতে হয়ে গিয়েছে এবং মাঝে মাঝে তখনও হচ্ছে। ইতিমধ্যে দু'টি বিখ্যাত মকোদ্দমা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল—আলীপুরে বোমার মামলা ও নির্মলকান্ত রায়ের মামলা।

আলীপুরে বোমার মামলায় আসামী ছিলেন স্বয়ং [illegible] বিন্দ এবং আরও জনকয়েক। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা মাণিকতলা অঞ্চলে বোমা তৈরির কারখানা করেছিলেন—বোমা দিয়ে ইংরেজ ধ্বংস করার জন্য।

বোমার আঘাতে দেশের এখানে-ওখানে দু-চারজন ইংরেজ ও আমাদের দেশীয় দু-চারজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যাঁরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করতেন তাঁরা যে ইতিপূর্বে মারা যান নি এমন নয়। তাই পুলিশ, আমাদেরই দেশবাসী পুলিশ—এইসব বোমার উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত মাণিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার করে গ্রেপ্তার করে চালান দিল—শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আরও জনকয়েক সহকর্মীকে।

এই মামলা আসামীর পক্ষ থেকে পরিচালনা করেছিলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি তখন ব্যারিস্টারী করতেন। ফলে শেষ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ খালাস হলেন আর জনকয়েকের হল দ্বীপান্তর। এই মকোদ্দমায় দেশবন্ধুর ভাষণ দেশের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

নির্মলকান্ত রায়ের মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে। নির্মলকান্ত রায়ের বিরুদ্ধে ছিল খুনের অভিযোগ—একজন পুলিশের ইন্সপেক্টারকে তিনি হঠাৎ আক্রমণ করে রাস্তার ওপরে খুন করেন, যতদূর মনে পড়ে, রিভলবার দিয়ে। এই ইন্সপেক্টারটি ছিলেন একজন নামকরা গোয়েন্দা—এই সব বিপ্লবী স্বদেশী সেবক যুবকদের ভেতরের খবর তিনি নাকি অনেক সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাদের উচ্ছেদ করার জন্য ইংরেজ সরকারকে বিশেষ সাহায্য করছিলেন।

নির্মলকান্ত রায়ের পক্ষ অবলম্বন করেন একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার—নাম আর্ডলী নর্টন। তিনি আদালতে এমন সুনিপুণ কৌশলের সঙ্গে আসামীপক্ষ সমর্থন করেছিলেন যে, আজও হাইকোর্টে কেউ তাঁকে ভোলে নি। শেষ পর্যন্ত নির্মলকান্ত রায় খালাস হয়েছিলেন!

স্বদেশীআন্দোলনের এই বিপ্লবী ধারাটির বিষয় দু-চার কথা বলা দরকার।

এই ধারাটির সূচনা হয় স্বদেশী আন্দোলন সুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কোন্ মন্ত্রে, ভারতের এবং বিশেষ করে বাঙলার যুবকরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল এই বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন করার জন্য ঠিক জানি না। তবে তাদের পন্থা যাই হোক, তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে মহৎ, একটা বিরাট

আদর্শ ছিল যে তাদের চোখের সামনে—সে বিষয় সন্দেহ করার কিছুই নেই। ইংরেজদের, বিশেষ করে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এবং তাদের সাহায্যকারী দেশীয় লোকদের হত্যা করতে হবে দেশের শত্রু বলে, একটা ত্রাস জাগিয়ে দিতে হবে ইংরেজদের মনে—যে দেশবাসীকে স্বাধীনতা না দিলে এ দেশের বুকের উপর আর তাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি এবং নিশ্চিন্ত আরামে বাস করা চলবে না। এবং ক্রমে ক্রমে এই বিপ্লবী আন্দোলনকে সমস্ত ভারতব্যাপী করে গড়ে তুলে দেশে একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে হবে—তবেই পাওয়া যাবে স্বাধীনতা। হয়ত এ আদর্শে অনুপ্রাণিত পথে চলতে গেলে অনেককেই দিতে হবে প্রাণ, কিন্তু তার জন্য তারা ছিল তৈরি। পরে অনেক স্বদেশী মোকদ্দমায় আদালতে এদের পক্ষ সমর্থন করার সময় এদের অনেকেরই মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি—এদের মৃত্যুভয় একেবারেই ছিল না। এদের মুখের দিকে চেয়ে কতবার আমার রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটি মনে পড়েছে—

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।'

এরা মৃত্যুভয় জয় করেছিল বলে সহজেই যে পুলিশের হাতে ধরা দিত তা নয়। এরা কাউকে হত্যা করে যদি পালিয়ে যেতে পারত এবং বেশির ভাগ সময়েই যেত পালিয়ে, তাহলে এদের ধরা পুলিশের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। এমন কি কাউকে কাউকে ধরার জন্য বালাসোর জঙ্গলে পুলিশকে এদের সঙ্গে একটা খণ্ডযুদ্ধ পর্যন্ত করতে হয়েছিল। এরা পালিয়ে যেত, ধরা পড়লে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হবে সে ভয়ে নয়, এরা পালিয়ে যেত সংগ্রামে শত্রুর হস্তে সহজে আত্মসমর্পণ করবে না বলে, পালিয়ে যেত, বেঁচে থাকলে আরও সুযোগ পাবে দেশের কাজ করার। তবে যেখানে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, অথচ হত্যা করা একান্ত প্রয়োজন, সোজা সামনে গিয়ে গুলী করতেও এরা দ্বিধা করে নি। হাইকোর্টের বারান্দায় একজন পুলিশ কর্মচারীকে কিংবা জেলের মধ্যে নরেন গোস্বামীকে কানাইলাল এইভাবেই হত্যা করেছিল।

এ ধারার গতিবেগ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। এমন সময়, ইংরেজের কোনও দমননীতির ফলে নয়, দেশের দিক দিয়েই এল বাধা। প্রথম বাধা দিলেন—রবীন্দ্রনাথ। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রাণভরা সহানুভূতি নিয়ে, কিন্তু যখন আন্দোলন বিপ্লবের পথ অবলম্বন করল, তিনি সরে দাঁড়ালেন, হিংসার পথ তিনি সমর্থন করেন নি। তারপর, প্রচণ্ড বাধা এল মহাত্মা গান্ধীর দিক দিয়ে। তিনি তাঁর চরিত্রগত দুর্জয় শক্তিতে দেশের সাধারণ লোকের মন সহজেই করলেন আকর্ষণ, প্রচার করলেন অহিংস অসহযোগের বাণী। সমস্ত দেশবাসী তাঁরই নির্দেশিত পথে আইন অমান্য করে দলে দলে যেতে লাগল জেলে—মুখে তাদের সেই মন্ত্র 'বন্দেমাতরম'।

যাই হোক, এইসব বাধার ফলে বিপ্লবী ধারাটি যে একেবারেই শুকিয়ে গেল তা নয়। পরে আবার প্রবল হল। আমি যখন ব্যারিস্টারী সুরু করি—ধারাটি তখন আবার বেশ জোরের সঙ্গেই চলেছে।

অনেক স্বদেশী মকোদ্দমার আসামীপক্ষ সমর্থন করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে সৌভাগ্যটুকুর গর্ব আজও আমার মন থেকে মুছে যায় নি।

আদালতে এইসব মকোদ্দমার আবহাওয়া সাধারণ মকোদ্দমার মতন মোটেই ছিল না—ছিল একেবারে ভিন্ন। এইসব মামলার শুনানীর সময় আদালতের চারিদিকে থাকত সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী, এমন কি আদালতের ঘরের মধ্যে পর্যন্ত সশস্ত্র পুলিশ-পাহারার অভাব ছিল না। বাইরের সাধারণ লোককে আদালতের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হত না—না জানি কার মনে কি আছে, কেউ যদি আবার কিছু করে বসে। লক্ষ্য করেছি পুলিশ অফিসাররা, যারা এইসব মকোদ্দমার তদন্ত করছেন, আদালতের মধ্যেও বেশ সাবধানে ঘোরাফেরা করতেন—আবার কোনও দিক দিয়ে কেউ গুলী বা বোমা না মারে, সব সময়েই যেন চঞ্চল সতর্ক ভাব; এমনকি সরকার-পক্ষের উকিল বা ব্যারিস্টার যাঁরা পুলিশের পক্ষ থেকে এইসব মকোদ্দমা পরিচালনা করবার জন্য নিযুক্ত হতেন, তাঁরাও যেন বেশ একটু সাবধানেই থাকতেন—এইসব সরকারপক্ষের উকিলদের মধ্যে কেউ যে ইতিমধ্যে বিপ্লবী-দের হাতে গুলীর আঘাতে প্রাণ দেয় নি—এমন নয়। লক্ষ্য করেছি, শ্রদ্ধাস্পদ পরলোকগত শ্রীনগেন্দ্র ব্যানার্জী মহাশয়—যিনি আলীপুরের বিখ্যাত সরকারী উকিল ছিলেন, যিনি একাধিক স্বদেশী মামলা সরকারের পক্ষ হয়ে পরিচালনা করেছেন এবং যাঁর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই পুলিশের সশস্ত্র পাহারা থাকত—তিনিও মামলার ফাঁকে ফাঁকে ফুরসুত পেলেই আসামীদের সদালাপে তুষ্ট করবার চেষ্টা করতেন এবং দ্বিপ্রহরে জলযোগের জন্য কোর্টের কাজ কিছুক্ষণ বন্ধ হলেই তিনি নানারকম সুখাদ্য জল-খাবারের আয়োজন করতেন আসামীদের জন্য এবং আসামীরাও মহানন্দে তা ভক্ষণ করত।

ফলে এই আবহাওয়ায় আমরা—যারা আসামীপক্ষ সমর্থন করতাম—আমরাই ছিলাম নিশ্চিন্ত নির্ভয়। একটা সৎসাহসে ভরে থাকত আমাদের বুক। বিচারককে তাঁর যোগ্য শ্রদ্ধা অবশ্যই দিতাম। কিন্তু বিচারকের কাছে অন্যায়ে মাথা নীচু কখনও করি নি।

প্রয়োজন হলেই বিচারকের অন্যায় দেখিয়ে তার তীব্র

প্রতিবাদ করেছি, সরকার পক্ষের এতটুকু ত্রুটি সহ্য করি নি।

মনে আছে, মামলা সুরু হওয়ার একটু আগেই আমরা (অর্থাৎ উভয় পক্ষের আইনজীবীরা) কোর্টে নিজেদের স্থানে গিয়ে বসতাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা যেত, বাইরে সম্মিলিত পদধ্বনি এবং সমস্বরে গান—

(হয়) সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে—ইত্যাদি
(কিংবা) ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে—ইত্যাদি।

ক্রমে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ তরুণরা আদালতে এসে প্রবেশ করত—তাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হত, তাদেরই জন্য বিশেষ করে তৈরি কঠিন জাল দিয়ে ঘেরা খাঁচার মধ্যে। এবং সেখানে ঢুকেই তারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠত—'বন্দেমাতরম'। সমস্ত আদালত ঘর উঠত কেঁপে। এমনও হয়েছে বিচারক এসে আদালতে বসেছেন, আমরা ত' আছি-ই, আসামীদের নিয়ে আসা হল তারপরে, তবুও তারা আদালতের কাঠগড়ায় ঢুকে সমস্বরে চীৎকার করে উঠত—'বন্দেমাতরম'। বিচারক যে ইতিমধ্যে আদালতে এসে বসেছেন, তার জন্য এতটুকুও দ্বিধা বোধ করত না।

একবার মনে আছে, আলীপুর আদালতে যতদূর মনে পড়ে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় নেলসন্ বলে একজন ইংরেজ বিচারকের সামনে এই ব্যাপার ঘটাতে—তিনি আপত্তি করেছিলেন। আসামীদের ডেকে বেশ কড়াভাবে বলছিলেন, 'তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমরা আদালতে বিচারের জন্য এসেছ। আদালতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা তোমাদের কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন না করলে, সেজন্য তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।' ইত্যাদি।

আসামীরা অবশ্য চুপ করেই ছিল কোনও প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু তাদের ধরণে তারা যে এসব কথায় এতটুকুও ভয় পেয়েছে বা এসব কথার কোনও মূল্য আছে তাদের কাছে, সেরকম কোনও আভাসই পাওয়া যায় নি। নেলসন্ সাহেব শুধু আসামীদের ওসব কথা বলেই সন্তুষ্ট হন নি, তিনি পরে মধ্যাহ্ন অবসরের সময় আমাদের অর্থাৎ উভয় পক্ষের আইনজীবীদের তাঁর খাসকামরায় ডেকে পাঠালেন। বেশ গম্ভীরভাবে আসামীপক্ষ সমর্থনকারী আইনজীবীদের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখুন আপনাদের আদালতের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে। আসামীরা আদালতে ঢুকে ওভাবে চীৎকার করবে, সেটা আদালতের দিক দিয়ে শুধু অশোভনই নয়, আদালতের সম্মানও হানি হয়। আপনাদের কর্তব্য, আপনাদের মক্কেলদের বলে বুঝিয়ে এসব জিনিস বন্ধ করা।'

বলেছিলাম, 'বলছেন, বলে দেখব। কিন্তু ফল কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

নেলসন বললেন, 'তাহলে আমি ওদের এর জন্য শাস্তি দিতে বাধ্য হব।'

হেসে বলেছিলাম, 'দেখুন, ওরা বোকা নয়। ওরা জানে যে অপরাধের জন্য ওদের এখানে আনা হয়েছে, তাতে ওদের ফাঁসী হতে পারে। কিন্তু প্রাণের ভয়ই ওদের নেই, ওরা কি কোনও শাস্তিতে ভয় পায়।'

নেলসন একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'তা বন্দেমাতরমটা চীৎকার করে না বললেই ত' হয়। ওটা বলে বেশি কি লাভ হবে।'

বলেছিলাম, 'বন্দেমাতরম্ ওদের জীবনের মূল মন্ত্র। ফাঁসীর মঞ্চে যখন উঠবে, তখনও ওদের মুখে ঐ মন্ত্রই উঠবে বেজে।'

যাই হোক ওদের একবার বলেছিলাম, 'সাহেবের যখন এত আপত্তি তখন কোর্টে বন্দেমাতরম্ নাই বা বললে।'

ওরা একটু মৃদু হেসেছিল—জবাব দেয় নি। কিন্তু নেলসন্ সাহেবের ভয়ে কোর্টেও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ওরা ছাড়ে নি।

যেসব স্বদেশী মকোদ্দমায় আসামীপক্ষ সমর্থন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা।

—দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা।

—হিজলীতে গুলীবর্ষণে নৃশংস হত্যার তদন্ত।

—চরমুগুরিয়ায় ডাকাতী ও হত্যার মামলা।

—শান্তি, সুনীতির মামলা।

—নেতাজী সুভাষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার মামলা ইত্যাদি।

এসব মামলার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে এক-একটি অষ্টাদশপর্ব মহাভারত না হয়ে উঠলেও প্রত্যেকটিই যে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে দাঁড়াবে, সে কথা জোর করে বলা যায়। তাই এখানে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা ভিন্ন উপায় নেই।

[ক্রমশ।

There's nothing more now you can do in pictures that will amaze, terrify or shock the audience. It's just not possible for a mere movie-maker to compete with space ships, H-bombs and the Kinsey Report. —*Alfred Hitchcock.*

পত্রগুচ্ছ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্রঃ কাশিমবাজার রাজসরকারে

৪ঠা নভেম্বর, ১৮৬৯

শুভাশিষঃ সন্তু

সাদর সম্ভাষণমাদনম্—

আপনি অবগত আছেন বিধবা-বিবাহ কার্যোপলক্ষে আমি বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। ঐ ঋণের টাকা ক্রমে পরিশোধ করিতেছি। দুই ব্যক্তির নিকট কিছু অধিক ঋণ আছে তাঁহারা ক্রমে লইতে সম্মত নহেন, এককালে টাকা পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত করিতেছেন, এককালে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও কোনক্রমে চলিতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি দয়া করিয়া আমাকে ৭৫০০ সাত হাজার পাঁচ শত টাকা ধার দেন। একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব। এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব। এই ঋণ নিয়মিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারিব সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই, সন্দেহ থাকিলে কখন আমি এরূপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সহায় ব্যতিরেকে আমার প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অসন্দিগ্ধচিত্তে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপনাকে কখনও অপ্রস্তুত হইতে হইবেক না, আমি এত অসম্ভ্রান্ত ও অপদার্থ লোক নহি যে পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ঋণ করিতেছি অথচ পরিশোধ বিষয়ে অযত্ন করিব কিংবা নিশ্চিন্ত থাকিব, আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশঙ্কা করিবেন না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ যতদিন জীবিত ও সহজ অবস্থায় ছিলেন তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধার পাইতাম এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতাম। এক্ষণে এখানকার কোন ধনীর সহিত আমার এরূপ আত্মীয়তা নাই যে টাকা ধার চাহিতে পারি। আপনি না থাকিলে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকটেও ধার চাহিতে পারিতাম না। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয়, দয়া করিয়া তাহা করিতে হইবেক। না করিলে আমি অপমানিত ও অপদস্থ হইব এই বিবেচনায় যাহা উচিত হয় তাহা করিবেন। অত্যন্ত অসুবিধায় না পড়িলে আমি কদাচ শ্রীমতীকে ও আপনাকে এরূপে বিরক্ত করিতে উদ্যত হইতাম না জানিবেন। অগ্রহায়ণ মাসে আমার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ধার করিয়া দিলে আর পূর্ববৎ বার্ষিক সাহায্য করিতে হইবেক না। শ্রীমতী আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ঐ সকল উপকার আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি যে তাঁহার যথার্থ গুণগ্রাহী ও আশীর্বাদক অনতিবিলম্বে তাহার পরিচয় দিব। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি। আপনার নিজের ও রাজধানীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২০শে কার্তিক ১২৭৬ সাল।



● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাবলী

দামোদর মুখোপাধ্যায়কে লেখা : দামোদর-রচিত উপন্যাস "শান্তি"র প্রাপ্তি স্বীকার

প্রিয়বরেষু,

শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম—পরলোকেও ভরসা করি, দামোদর তাহাতে আমায় বঞ্চিত করিবেন না। ইতি তাং ২২ আশ্বিন।

স্বাঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জগদীশনাথ রায়কে লেখা

মালদহ

৩০এ ডিসেম্বার (১৮৯১?)

প্রিয়বরেষু,

জগদীশ, তুমি লিখিয়াছ যে পুনর্মিলন উৎসবে আমি কিছু পাঠাইলে তাহা তোমার আনন্দবর্ধনের কারণ হইবে। যেহেতু তোমাকে যে কোন প্রকারে আনন্দদান করিবার চেষ্টা আমি করিয়া থাকি সেই কারণেই তোমার জন্য আমি অবিলম্বে কবিতা লিখিতে বসিলাম। তোমার পত্র আমি ২৮এ অপরাহ্নে পাইলাম। ডাকের কয়েক ঘণ্টার বিলম্ব হইয়াছে। কয়েকটি স্তবক আজ সন্ধ্যায় সমাপ্ত হইল কিন্তু ভয়ানকরূপে নিদ্রা অনুভূত হইতেছে, অগত্যা, অবশিষ্ট অংশ আগামী প্রভাতের জন্য মুলতুবী রহিল।

তোমার প্রীতিমুগ্ধ

স্বাঃ—বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী



● বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে লেখা

অশেষগুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব

আশীর্বাদভাজনেষু।

আপনি আমাকে যে কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি এবং ধর্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোনপ্রকার সমাজ-সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে অথবা সম্পন্ন করা উচিত আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ নিবারণের জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্যন্ত সে মত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙালী-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরি-উক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু সকল বিষয়ই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্মশাস্ত্রের একটা বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্যাই শূদ্রের ধর্ম। বাঙলার শূদ্রেরা কি সেই ধর্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচি-ভাজা ব্রাহ্মণের পদসেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙালী-সমাজ প্রয়োজনমতে ধর্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজনমতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার

নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ-বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না।

আমার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন; শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্তন জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎপরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্রযাত্রায় সমাজের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না; কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যতদিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্রযাত্রা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিবেন না। তবে, ইহাই বক্তব্য যে, সমুদ্রযাত্রার পক্ষে বাঙালী-সমাজ বর্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখনও আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূল, তিনিই ইচ্ছা করিলে ইউরোপে যাইতেছেন। সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যে যান নাই ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনও আসে নাই। তবে, ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একপ্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি আমাদের সমাজের দোষে তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এ দেশে আসিয়া সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্বক বাঙালী-সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে পুনর্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজ সম্মত ব্যবহার করিলে তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন, এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় ইহা ধর্মানুমোদিত কি না। যাহা ধর্মানুমোদিত কিন্তু ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্মশাস্ত্রসম্মত তাহাই ধর্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম, এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে;—

ধারণাধর্ম নিত্যোহদ্ধর্মোধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়॥

'ধর্মলোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এইজন্য ধর্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম নিশ্চিত জানিবে।'

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম। এই সমুদ্রযাত্রা পদ্ধতি লোকহিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বুঝি, ধর্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম নহে; হিন্দুধর্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষত আধুনিক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে, অতএব সনাতনধর্মে এবং এই ধর্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতনধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্মে এবং হিন্দুধর্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যদি কোন বিরোধ থাকে তবে হিন্দুধর্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতনধর্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্মানুমোদিত।

কলিকাতা — আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
২৭ জুলাই, ১৮৯২ — স্বাঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা

অনুকূল সাহিত্যসেবা করিতে গিয়া আজ বিপদগ্রস্ত। তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছ তাহা উঠাইয়া লইবে। যদি লও, তাহা হইলে এ অনুগ্রহ আমার প্রতিই করা হইল জানিবে।

অনুকূল = ঔপন্যাসিক অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

বহুকাল হইল জেনারেল এসেম্বিলির হলঘরে 'ভারতবাসী ও ইংরাজ' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধে আকবরের কিছু প্রশংসা ছিল, তদুত্তরে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন—আকবরের মত কোন মোগল বাদসাই

হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। তিনি বন্ধুত্বের ছলেই হিন্দুর সর্বাপেক্ষা গুরুতর শত্রুতাসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তি কোনো ছাপার কাগজে বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।

রসরাজ অমৃতলালের পত্র

গিরিশচন্দ্রকে লেখা

মহেন্দ্র সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আমার প্রাণে যে কি ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা আপনিই বুঝিবেন। আমাদের সেই সুদূরগত প্রথম নাট্যজীবনের স্বার্থশূন্য Romantic প্রেমের দৃষ্টান্ত জগতে যে অধিক মিলিতে পারে, এমন বোধ হয় না। গত বৃহস্পতিবারে আমার একটি প্রায় তিন বৎসরের মধুরভাষী দৌহিত্রী আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কন্যা আমার সূতিকাগারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, আমার বড় কষ্ট, তবু বুঝিতেছি যে, এ শোক সোডা ওয়াটারের তুল্য; কিন্তু বেল, মতি, মহেন্দ্রের শোক সীতাকুণ্ডের ন্যায় চিরদিন তপ্তভাবে ফুটিতে থাকিবে। কতবার ঝগড়া করিয়াছি—সেই ঝগড়ার মধ্যেও কি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা ছিল।

তথাপি আপনার লিখিত মহেন্দ্রের স্মৃতি-উপহারস্বরূপ সরল সত্য বিষাদ গাম্ভীর্যপূর্ণ হৃদয়ের কথা কয়টি পড়িয়া ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি যেন আগে মরি, আপনি আমায় মনে করিয়া দু'ফোঁটা চক্ষের জল ফেলুন। অতি চমৎকার লেখা—সূর্যদেব আপনি সাবধানে অন্তরে রহিয়া চন্দ্রকে ফুটিতে দিয়াছেন, কিন্তু যে জানে, সে বুঝিতেছে যে—সূর্যের কিরণই চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে। প্রায় অন্ধতায়ই এই আঁকা-বাঁকা লেখা। ১৭-৩-১৯০১

স্নেহের

স্বাঃ—অমৃত

মহেন্দ্র = বিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু

কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত দু'খানি পত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্বরেষু,

একখানি নূতন নাটক শীঘ্র লিখিতে হইবে এ জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি। শেষ নূতন নাটক 'চন্দ্রশেখর' ও শেষ নূতন প্রহসন 'একাকার' সাধারণের বিশেষ সন্তোষ বিধান করিয়াছে। এবার যাহা অভিনীত হইবে তাহা উক্ত পুস্তকদ্বয় অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। কলিকাতায় দর্শকের নিকট নাটকের গুণাগুণ এইরূপে বিচার হইয়া থাকে—কচুরি কচুরির মত ও রসগোল্লা রসগোল্লার মত সুস্বাদু হইলে হইবে না। কচুরির পর রসগোল্লা আহার করিলে রসগোল্লার লবণত্বের অভাবের অভিযোগ হইবে এবং ঐরূপ রসগোল্লার পর কচুরি দিলে কচুরির ভিতর শর্করার রস নাই বলিয়া ভোক্তা মুখবিকৃতি করিবেন। অনন্যগতি হইয়া চির অভ্যস্ত প্রথায় দয়াময়কে বলিতেছি 'হরি—লেখনীতে আসিয়া অবতীর্ণ হও—নাস্তি গতিরন্যথা।'

—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২



স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এক্ষণে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি যে, আমি যদি আমার ব্যবসায়কে সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব, তবে অপরে কেন সম্মান করিবে? জগদীশ্বরের অপার করুণায় আমার অটল বিশ্বাস আছে তাঁহারই কৃপায় আপনার ন্যায় সাহিত্যগগনের প্রভাকরকে সুহৃদরূপে আমার জীবনে আলোক প্রদানের জন্য লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করুন যেন আমি বিশুদ্ধ থাকিয়া স্টার থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হই। গোঁড়ার দল বা থিয়েটারকে ঘৃণা দেখান যাঁহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত, তাঁহারা ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সম্প্রদায়ের নিকট স্টার থিয়েটার এক্ষণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত নাট্যশালা বলিয়া সাদরে পরিচিত হইয়াছে।

স্নেহাভিলাষী

স্বাঃ অমৃত

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

[বিদগ্ধ প্রবন্ধকার ও শিক্ষাব্রতী]

'অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতে
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি।'

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর'-এ মহাভারতের এই বাণীটি একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাতেই বাঙলার বিশিষ্ট লেখক বিদগ্ধ প্রবন্ধকার ও খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী উক্ত অমূল্য শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বলেন যে, বর্তমান যুগে উহার গুরুত্ব অসাধারণ।

১৩০৪ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ ৺কালীশঙ্কর সেন ও স্বর্গতা বিধুমুখী দেবীর পুত্র এবং সাহিত্যরথী দীনেশচন্দ্র সেনের জ্ঞাতিভ্রাতা ত্রিপুরাশঙ্কর কুমিল্লা শহরে ভূমিষ্ঠ হন। ১৯১৪ সালে ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইহার পর পিতার মৃত্যুর জন্য খুবই অর্থকষ্ট পান। কিন্তু আপন চেষ্টায় ঢাকা সরকারী কলেজ হইতে বি এ পাশ করেন ও ১৯২০ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯২৭ সালে কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে 'কাব্যতীর্থ' ও ঢাকা আয়ুর্বেদ মহামণ্ডল হইতে আয়ুর্বেদ গবেষণার জন্য 'শাস্ত্রী' উপাধি পান।

১৯২১ সালে তিনি মাণিকগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং পরবৎসর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া বিক্রমপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। ১৯২৩ সাল হইতে শ্রীসেনশাস্ত্রী ইস্টবেঙ্গল ইনস্টিটিউশান, ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা গার্লস কলেজ ও জগন্নাথ কলেজ ইত্যাদিতে শিক্ষকতা করিয়া ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুণ স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন। এক বৎসর কলিকাতা বেতারকেন্দ্র ও কয়েকটি সংবাদপত্রের সহিত যুক্ত থাকিয়া ১৯৫১ সালে তিনি কলিকাতা মুরলীধর গার্লস কলেজে দর্শন ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের 'গিরীশ সংস্কৃতি ভবন'-এ অধ্যাপনা করেন। ঢাকাতে থাকার সময় তিনি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন।

১৯৩০ সালে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মাণিকগঞ্জ রাজনৈতিক সম্মেলনের সাহিত্যশাখার সভাপতিত্ব করেন। সেইসময় ত্রিপুরাশঙ্কর তাঁহার সহিত, রাজনৈতিক নেতা ও সুকবি কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সহিত নানা বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ্যে সুপরিচিত হন। বঙ্গসাহিত্যের দুই উজ্জ্বল রত্ন মোহিতলাল মজুমদার ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।



ত্রিপুরাশঙ্কর ১৯১৪-১৫ সাল হইতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'বাংলার বাণী' ও পরে 'সোনার বাংলা'য় নিয়মিত লিখিতেন। ইহা ছাড়া কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকাতে তিনি চিন্তামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তৎলিখিত 'গীতায় সমাজদর্শন' প্রবন্ধগুলিতে সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন (Socio Political philosophy) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জলধর সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলাম—এই ত্রয়ীর ব্যক্তিগত পথনির্দেশ তাঁহার লেখক-জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছে বলিয়া ত্রিপুরাশঙ্কর মনে করেন।



শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

১৯৪৭ সালে সাহিত্যবিশারদ আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নবীনচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী উৎসবে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তথায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্বনামধন্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা পঠিত 'জাতীয় জাগরণে পলাশীযুদ্ধের প্রভাব' প্রবন্ধটি শ্রীসেনশাস্ত্রীর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৮ সালের 'নবীনচন্দ্র সেন বক্তৃতামালা'র বক্তা হিসাবে ত্রিপুরাশঙ্করকে আমন্ত্রণ করেন।

তাঁহার সহধর্মিণী হইলেন শ্রীমতীইন্দুপ্রভা দেবী। বিশিষ্টা অভিনেত্রী শ্রীমতী জয়শ্রী সেন তাঁহার কন্যা। তাঁহার লেখা উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্য, ভারত-জিজ্ঞাসা, মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্তপদাবলী ইত্যাদি পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

স্বস্থান মাণিকগঞ্জ চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া আসায় তাঁহার বেদনা ব্যক্ত করিলেন রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত (শিক্ষক জন ডিগবীর নিকট) এই কয়েকটি কথার মাধ্যমে—

'Friends of despotism and enemies to liberties have never been and will never be ultimately successful.''

শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী

[বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য]

সাংবাদিকতা ও শিক্ষাপ্রসারের ইতিহাসে মহীতোষ রায়চৌধুরী একটি স্মরণীয় নাম। এ দেশের সাংবাদিক ও শিক্ষাজগৎ তাঁর অবদানে যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসই তার মুখ্য সাক্ষ্য।



● শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী

মহাকবি মধুসূদনের জন্মভূমি যশোহরের অন্যতম সুসন্তান মহীতোষের জন্ম ১৮৯০ সালের জুন মাসে যশোহরেই। পিতৃনাম—স্বর্গত আশুতোষ রায়চৌধুরী। বিদ্যালয়শিক্ষা তিনি কলকাতার সাউথ সাবারবান স্কুলে লাভ করেন। কলেজীপাঠ গ্রহণ করেন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে এম এ পরীক্ষায় হন সসম্মানে উত্তীর্ণ। ছাত্রজীবন থেকেই নানাবিধ জনহিতকর আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক, শিক্ষামূলক ও সামাজিক নানাবিধ প্রচেষ্টায় ও কর্মে তাঁর নাম সংযুক্ত ঘনিষ্ঠভাবেই। তিনি যশোহরের জেলা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন ষোল বছর। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে তিনি এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তাঁর ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত টুসকেজি ইনস্টিটিউটের ভাবাদর্শে তিনি আপন জেলায় অনুন্নত অধিবাসীদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। যশোহরের মাইকেল মধুসূদন কলেজ শিক্ষাজগতে এক বিশেষ পরিচিতির ও প্রসিদ্ধির অধিকারী। এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। এ ছাড়াও সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে অজ্ঞতা ও অন্ধতা দূরীকরণের সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আরও একাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আপন গ্রামে একটি বিরাট দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করে তিনি অসংখ্য অসহায় রোগ-কাতর নরনারীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের নানাপ্রকার দুর্ভোগ ও অসুবিধা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন ও তার প্রতিকারকল্পে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশানুসারে এবং সহায়তায় তিনি আন্দোলন শুরু করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাঙলা দেশে সেই প্রথম আন্দোলন। আন্দোলনের ফলস্বরূপ বাঙলা দেশে তিনি সর্বপ্রথম রেলযাত্রী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেন।

বঙ্গবাসী কলেজ তাঁর অধ্যাপনার ক্ষেত্র। এই কলেজে তিনি দর্শনবিভাগের প্রধানরূপে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ সুদৃঢ়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তার দায়িত্বও তিনি দীর্ঘকাল গ্রহণ করেছেন। দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তার জন্য এবং তাঁদের নানাবিধ অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের এবং তাঁদের কর্মসংক্রান্ত নানাবিধ উন্নয়নের জন্য তিনি বাঙলা দেশে যথেষ্ট আন্দোলন শুরু করেন। ষোল বছর তিনি নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সংস্থার সভাপতির আসনে সমাসীন ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি

শিক্ষা ও সাহিত্যমূলক একটি মাসিক পত্রিকার পত্তন করেন। পত্রিকাটির নাম 'শিক্ষক'। এই পত্রিকাটি বর্তমানে সর্বতোভাবে তাঁর দক্ষতার ও স্বকীয়তার ছাপ বহন করে এগিয়ে চলেছে। মহীতোষ স্বয়ং এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করে থাকেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে আঠার বছর ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে সহযোগী-সম্পাদক হিসাবে কয়েক বছর ইনি জড়িত ছিলেন। অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল এডিটার্স এ্যাসোসিয়েশানের চেয়ারম্যানের ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যের আসন তাঁর দ্বারা অলংকৃত। ১৯৫২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের সদস্যের একটি আসন এঁর অধিকারভুক্ত হয়ে আছে।

শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও সমাজসেবীর পরিচিতিতেই তাঁর প্রকাশ পূর্ণ নয়। লেখনীও তাঁর যথেষ্ট সচল। একাধিক সুপাঠ্য বাঙলা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

স্বর্গত গোপালদাস ঘোষের কন্যা শ্রীযুক্তা কনকলতা দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীঅজিত বসু

[ফিল্ম ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি ও বিখ্যাত প্রযোজক]

বাঙলা চলচ্চিত্রের আজ সমৃদ্ধির অন্ত নেই। বিশ্বব্যাপী তার জয়যাত্রা আজ অপ্রতিহত। জনমানসে তার আসন আজ অটল। অগণিত দক্ষ কুশলী এবং প্রতিভাধর রূপস্রষ্টা সম্মিলনে এ দেশের চিত্রজগৎ আজ এক স্বতন্ত্র ও বিরাট পৃথিবীতে পরিণত। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মনের মধ্যেও বাঙলা ছবি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল রীতিমত দানা বেঁধে উঠছে। কিন্তু অতীতে কম-বেশি অর্ধশতাব্দী পূর্বে বাঙলা ছবির এই বিরাট খ্যাতি ও প্রসারের বীজ যাঁরা বপন করেছিলেন, যাঁদের সাধনায় বাঙলাদেশের ছায়াছবির সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল—অরোরা চিত্র প্রতিষ্ঠানের স্বর্গীয় অনাদিনাথ বসু সেই তালিকায় একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। এ যুগের বিশিষ্ট প্রযোজক ও ফিল্ম ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ার বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত অজিত বসু তাঁর জ্যেষ্ঠ ও সুযোগ্য পুত্র। পিতৃ পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলচ্চিত্রের যে সেবা তিনি একনিষ্ঠভাবে করে চলেছেন, তা দেশের চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধির পথেই এগিয়ে দিচ্ছে এবং উত্তরোত্তর সম্মান ও জনপ্রিয়তা অর্জনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে চলছে।

উত্তর কলকাতার স্বনামধন্য রামতনু বসুর বংশধর অজিত বসু। এই পরিবারেরই অন্যতম দৌহিত্র ছিলেন স্বয়ং স্বামী



● শ্রীঅজিত বসু

বিবেকানন্দ। ১৯১৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর অজিত বসুর জন্ম। সরস্বতী ইনস্টিটিউশানের ছাত্ররূপে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ বি এস সি পড়তে আরম্ভ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। বি এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের স্থাপনা। আইনের পাঠ তিনি কিছুকাল গ্রহণ করেন। বি সি এস-এর মনোনয়নও তিনি পেয়েছিলেন, বিমানবাহিনীতে ও সৈন্যবাহিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টাগুলি যদি সফল হোত, বা আইনের পরীক্ষায় যোগদান করে ওই পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে আইনব্যবসায়ে মনোনিবেশ করতেন শ্রীযুক্ত বসু, তাহলে চিত্রজগৎ যে এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হ'ত—সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

চিত্রজগতে শ্রীযুক্ত বসু শুধু প্রযোজক হিসাবেই নন, প্রদর্শক, পরিবেশক ও স্টুডিও মালিক (অরোরা স্টুডিও) হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধিলব্ধ। অরোরা ফিল্ম করপোরেশান প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, অরোরা সিনেমা কোম্পানীর অংশীদার, এপিক ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের এবং ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার এক্সপোর্ট করপোরেশনের পরিচালকের আসনে তিনি সগৌরবে সমাসীন। তা ছাড়া বেঙ্গল মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশানের প্রযোজক শাখার ও স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ লিমিটেডের চেয়ারম্যান, চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি, ফিল্ম কনসালটেটিভ কমিটী, জয়েণ্ট ইম্পোর্ট-

এয়ারপোর্ট এ্যাডভাইসারি কমিটির সদস্যের আসনও তাঁর দ্বারা অলংকৃত।

১৯৫৯-৬০ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের কেন্দ্রীয় সংস্থা ফিল্ম ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতিরূপে তাঁকে প্রথম দেখা গেছে। ১৯৬০ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে তিনি ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত 'ইউনেস্কো'-মাস মিডিয়া মিটিং-এ অন্যতম বিশেষজ্ঞরূপে যোগ দেন ও চিত্রবিভাগে পৌরোহিত্য করেন। সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক দিলীপকুমার প্রমুখ আরও কয়েকজনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি প্রেরিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় ছবির অবস্থাদি যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্যে। নির্দিষ্ট অবস্থানকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আরও কিছুকাল আমেরিকায় থেকে যান ও ভারত মার্কিন একটি যৌথ চিত্র প্রচেষ্টার আয়োজন করে আসেন (বিষয়টি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন)।

প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে অরোরা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এবং খ্যাতি অনস্বীকার্য। জনজীবনে ছাপ রেখে যাওয়ার অসংখ্য ঘটনা এঁরা প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী, অপরাজিত, পরশ পাথর প্রমুখ চিত্রগুলির পরিবেশনভার এই প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বসু ইউরোপও ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেছেন।

তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং সক্রিয় চিন্তাধারায় শুধু অরোরা নয়, বাঙলা তথা ভারতের চিত্রজগৎ আরও বহুল উন্নতির সম্মুখীন হোক, এই কামনা করি।

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নন্দনতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক]

বাঙলা দেশে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যাঁরা যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি যাঁদের দ্বারা অর্জিত— প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এবং বর্তমানে প্রথিতযশা নন্দনতত্ত্ববিশারদ ডঃ সুধীরকুমার নন্দী তাঁদেরই অন্যতম।

কুচবিহারের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার কালীচরণ নন্দী মহাশয়ের পুত্র সুধীরকুমারের জন্ম হয় ১৯২৪ সালের ২রা জানুয়ারী চুঁচুড়ায়। ডাফ মিশনারী স্কুল, হুগলী কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতার আইন কলেজ প্রমুখ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯৪৬ সালে নন্দনতত্ত্বে তিনি সর্বোচ্চ সংখ্যা লাভ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে দর্শনশাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রিসার্চ স্কলার নিযুক্ত হন। গবেষণা করা কালীন তিনি বিশ্বভারতীর



ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী

'সাহিত্যভারতী' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৫১ সালে তিনি দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট অর্জন করেন।

তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণা এবং উক্ত বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য শুধু দেশেরই নয়, বিদেশেরও সুধীবৃন্দ কর্তৃক সসম্মানে স্বীকৃত ও সমাদৃত। প্যারীর (Paris) ইণ্টারন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ ফিলসফি কর্তৃক ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থে ডক্টর নন্দীর আধুনিক ভারতীয় নন্দনতত্ত্বসম্পর্কিত মূল্যবান রচনাটি সুধীবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এ্যান্ এস্কোয়ারী ইণ্টু দ্য নেচার এ্যাণ্ড ফাঙসান অফ আর্ট, নন্দনতত্ত্ব, রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ, স্টাডিস ইন এস্থেটিকস প্রমুখ সুধীজন-অভিনন্দিত গ্রন্থসমূহের তিনি সার্থক রচয়িতা।

দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ এবং শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে দু'টি অবিস্মরণীয় নাম। আমাদের নন্দনতত্ত্বসম্পর্কিত বোধের জন্মদাতা বলে তাঁদের অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের অন্তরে নন্দন-চেতনার বীজ বপনে এই দুই বরেণ্য মনীষীর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের নন্দনবোধ সম্পর্কে ডক্টর নন্দীর প্রবন্ধাবলীও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।

ইংরাজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই তিনি অসংখ্য সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইয়োরোপে ও আমেরিকার বহু বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা সাদরে মুদ্রিত হয়েছে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ, ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস, বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষাপরিষদ, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র বিদ্যমান। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের শাখা সভাপতিদের তিনি অন্যতম।

পোস্টকার্ড

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

লোকার্নো প্রদর্শনীর দিন একেবারে সামনাসামনি, অথচ খবর পাওয়া গেল ছবিই সেখানে পৌঁছোয় নি। আবার ছুটতে হবে বার্লিন। প্যারিসে আর যাবারও কোন সার্থকতা দেখছি না। অতএব ডানা মেললাম ব্রাসেলস, কোপেনহাগেন ভিয়েনা হয়ে বার্লিনের পথে।

কোপেনহাগেন থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ান এয়ার লাইন্স। বেনারসের এক্কাগাড়ির চেয়ে অধম। ময়লা, ভাঙা প্লেন নেহাৎ পুরুষালি হোস্টেস্ আর একেবারে কাটাকাটা ব্যবহার। এতদিন আকাশে আকাশ ছুটছি কোনদিন দুর্ঘটনার কথা মনেও আসে নি। আজ হঠাৎ মনে হল, কি জানি?

প্লেনটা ঠিক ওড়ার মুখে গা ঝাড়া দিচ্ছে। হঠাৎ মনে হল বিস্তৃত ডানার ওপর আগুনের ফুলকি। হস্তিনীরূপী হোস্টেস্ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তাকে দেখালাম। বেটি বাঁকা হাসি হেসে বললে, 'প্লেনে ওরকম হয়।' অর্থাৎ তুমি আগে বোধ হয় প্লেনে চড় নি, এই প্রথম। হবেও বা।

প্লেন উঠল ওপরে। হস্তিনী এনে দিলেন দু'টো বিস্কুট আর ছেঁড়া কাগজের গেলাসে ঠাণ্ডা কফি। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কফিটা ঠাণ্ডা।' মহিলা আবার সেই বাঁকা হাসি হেসে বললে—'তোমার আগুন অনেক দূরে, নইলে ওতেই গরম করে দিতাম।'

রাগ হল, কিন্তু নিরুপায়। একে আকাশ পথ, তায় লোহার গরাদের অন্তবর্তী দেশের আকাশ-রথ। দেশ আমার ভারতে, মন আমার কলকাতায়; সাইবেরিয়ায় বনবাস স্থাপনের লোভ নেই একটুও। দরজা খুলে যে নেবে যাব তাও পারি না। নিচে অগাধ সমুদ্র।

হঠাৎ আলোর ঝলকানি। বিদ্যুৎ চমকালো নাকি? জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি ইঞ্জিনটা দাউ দাউ ক'রে জলছে। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলল 'বেল্ট বাঁধো।' ঠাণ্ডা কফি, খাই নি। ফেলবার উপায় ছিল না বলে হাতেই গেলাসটা ছিল। হস্তিনী তড়িদ্বেগে ছুটে এল পাইলটের ককপিট থেকে। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল সবাই। 'বেল্ট বাঁধো।' দেখতে দেখতে এসে দাঁড়াল আমার পাশে 'এই ইণ্ডিয়ান, বেল্ট বাঁধো!'

আমি এবার ওরই অনুকরণে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলি —'আগুন তো এবার কাছাকাছি, যাও কফিটা গরম ক'রে আনো, আমি বেল্ট বাঁধছি!' বলে কফির কাগজের গেলাসটা এগিয়ে দি ওর দিকে। পারলেও মারে আর কি, কিন্তু উপায় নেই, লাউডস্পিকারে ঘন ঘন চিৎকার আসছে 'লাইফ বেল্ট তোল।'

প্লেনের পনেরোজন এতক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করছিল এরপর কি হয়, এইবার নিশ্চিত মৃত্যুর ছায়া নামল সকলের মনে। পাশে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, নিচে অগাধ সমুদ্র আর কানের কাছে অনবরত সতর্কবাণী। কখনও 'লাইফ-বেল্ট বাঁধো', কখনও 'মাথা নিচু কর' কখনও 'ভয় পেও না, মৃত্যু মানুষের দু'বার আসে না'—অর্থাৎ একবারই আসছে, সামলাও! আজ কলকাতা শহরে পাখার তলায় ব'সে সেদিনের সেই মুহূর্তটাকে যত সহজে ভাবতে পারছি, সেদিন যদি তার এককণাও পারতাম, তাহ'লে ঐ হস্তিনীর হাউ হাউ কান্না লরেল-হার্ডির ছবির মতনই উপভোগ করতাম। সেদিন পারি নি। সমবেত কান্নার রোলের মধ্যে শুনলাম আমার অতীতের হারিয়ে-যাওয়া ছোট ছোট কথা, আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে কেবলই দেখলাম আমার ছোট্ট মেয়ের চলচলে চোখ দু'টো। আসবার সময় বার বার বলেছিল 'আমার জন্যে সব দেশ থেকে একটা ক'রে পুতুল এনো।' আমার সামান্য পুঁজির সেইটুকুই সঞ্চয় সঙ্গে আছে, তখন কেবলই মনে হতে লাগল যদি পারতাম তাহ'লে নিশ্চিহ্ন হবার আগে আমার পরিপূর্ণভাবে বাঁচার আনন্দের ঐ প্রতীকগুলোকে অন্তত ওর কাছে পৌঁছে দিতাম। নিজের কথা তখন সেই মুহূর্তে ভাবি নি, কেবল দেখেছি পুতুলগুলো ওর হাতে দেওয়ার মুহূর্তটিকে আর সেই মুহূর্তে ওর আনন্দোদ্ভাসিত টানা টানা চোখ দু'টোর অভিব্যক্তি। সে মুহূর্ত আর বুঝি এলো না জীবনে। বুক ঠেলে কান্না এল। আগুনটাও ঝাপসা দেখি। নিজেকে নিদারুণ অসহায় মনে হচ্ছে। জানলার কাঁচের ওপর মাথাটা রাখতে গিয়ে দেখি সমুদ্র আর নেই, গাছ আর ক্ষেত। চমকে উঠি। কোথায় এলাম? ভাববার আগেই কিম্বা সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড ধাক্কা। তারপর কি যে হল সঠিক মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, হস্তিনী আমার হাত ধরে টান মেরে বলেছিল, 'কফি খাও!'

চোখ চেয়ে দেখি গ্রামের মধ্যে শুয়ে আছি। ওধারে প্লেনটা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। আর চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। হস্তিনী আবার ধাক্কা দিয়ে বলে, 'কফি খাও!'

হেসেই বলি, 'গরম তো?'

'একেবারে। নতুন জীবনের উত্তাপে!'

আনন্দের আতিশয্যে মনে হল ওকেই ভালোবেসে ফেলি!

ওখান থেকে জীপে ক'রে মাইল তিরিশ, তবে পূর্ব জার্মানীর কি একটা এয়ারপোর্ট। সেখানে আবার এক গেলাস ঠাণ্ডা কফি (আর গরম করার কথা বলি!) আর হু'টো শুকনো স্যাণ্ডউইচ। ঘণ্টা চারেক পর নতুন একটা প্লেন এল। তাতেই পূর্ব-বার্লিন। পৌছোলাম সন্ধ্যা সাতটা।

পশ্চিম-বার্লিনের টেম্পলহফ্ এয়ারপোর্টটা ছবির মতন সুন্দর। পূর্ব-বার্লিনের এই এয়ারপোর্টটা আস্তাকুঁড়ের মতন নোংরা। ছোট ভাঙাবাড়ি, লোকজন নেই, কেবল বন্দুকধারী সেপাই। নিজের বাক্স নিজেই প্লেন থেকে টেনে টেনে নাবিয়ে নিজেই ব'য়ে নিয়ে চল কাস্টমস্ দপ্তরে। এখানে আসব জানা ছিল না, কাজেই ট্রানজিট ভিসাও নেই। লেখ ফর্ম। পুরোপুরি ছটা, ছ' রকম। একটাতে নিজের চোদ্দপুরুষের চোদ্দ পরিচয়। একটাতে জিনিসের পুরো ফিরিস্তি। আণ্ডারওয়ার থেকে আরম্ভ করে দাঁতে সোনার গোঁজা আছে কি না—সব। একটাতে কোথা থেকে আসছি তার পূর্ণ বিবরণী; একটাতে কোথায় যাব তার সব তথ্য, মায় সন তারিখ ঘণ্টা সেকেণ্ড পর্যন্ত। এ ছাড়া স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হদিস এবং রাজনৈতিক ঠিকুজী। ফর্ম সই করতে কষ্ট হল না (সাইবেরিয়ার তুলনায় এ আর এমন কি?), মন খারাপ হল টাকা বদলাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি আমাদের এক টাকায়, পশ্চিম-জার্মানীতে, এদের পাঁচ টাকা মেলে। এখানে আমাদের একটাকা তিন আনায় এদের একটা এলুমিনিয়ামের টাকা। পনেরোটা টাকা দিয়ে এদের বারোটা টাকা পাওয়া গেল। তার আটটা গেল ট্রানজিট ভিসায় আর হু'টো গেল বাসভাড়ায়। ফর্ম সই করে আর টিপ সই দিয়ে রওনা হ'লাম রাত দশটায়।

বন বাদাড় পেরিয়ে বাস চলেছে মন্থরগতিতে, নানান রকম বীভৎস আওয়াজ করতে করতে; গ্রামের ট্যাক্সিরও অধম। পথের ধারে ধারে চেকপোস্ট আর পিস্তলধারী প্রহরীর হাতে তিন হাত লম্বা টর্চ। মাঝে মাঝেই বাস চেক হয়। হঠাৎ এক জায়গায় পথের মধ্যেই বাসটা থেমে গেল। এক দানবাকৃতি সেপাই চোখ ধাঁধানো টর্চ জ্বেলে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে হুকুম দিলেন—'পাসপোর্ট!'

সুইচ টিপলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে বাতি জ্বলে তেমনি চটপট সারা বাসের লোকগুলো পাসপোর্ট বের করে মাথার ওপর মেলে ধরল।

টর্চটা পাসপোর্টের ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে স্থির হল আমার চোখের ওপর।

'পাসপোর্ট!'

হাত দিয়ে আলোটা আড়াল করে বলি, 'এখানে এসে দেখে যাও!'

রেগে চিৎকার করে—'পা স পো র্ট!!'

এবার আমি আর জবাব দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করি না। ও আবার চিৎকার করে—'পাসপোর্ট! দেখাবে কি না?'

শান্তকণ্ঠে উত্তর দি 'এখানে এসে ভদ্রভাবে দেখে যাও!'

সারা বাসের লোক চুপ। নিশ্বাস পড়ার শব্দও সব মিলিয়ে গেছে। সেপাইদাদা জার্মান ভাষায় কিছু একটা বলে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাসের সবাই যেন প্রাণ পেল। ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে হেডলাইটটা অফ করে সিগারেট ধরালো। সঙ্গে সঙ্গে কলধ্বনি আরও প্রাণবন্ত। বোঝা গেল যে আমি পাসপোর্ট না দেখালে বাস চলবে না! না চলুক আমার ব'য়ে গেছে। আমিও সিগারেট ধরালাম।

মিনিট পাঁচেক কাটল। বেগতিক দেখে এক বৃদ্ধ জার্মান নেমে গিয়ে সেপাইদাদাকে কিছু একটা বলল। ওদের মাথা নাড়া দেখে বোঝা গেল আপোস নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। হলও। বৃদ্ধ আমার কাছ থেকে পাসপোর্টটা নিয়ে সেপাইদাদাকে সবিনয় নিবেদন করলেন। সেপাইদাদা সেটাকে হাতে নিয়ে দেখলেন তো না-ই; কি ভাবলেন ভগবানই জানেন। আর হুকুম দিলেন কাল সকালে সিক্যুরিটি অফিস থেকে ওটা নিতে। অর্থাৎ শুধু থোড়াই নয়, একেবারে আসামীর সমপর্যায় এবং পরের চেক পোস্ট-এ সরাসরি হাজত বাসের ব্যবস্থা! এক মুহূর্তে সমস্ত অবস্থাটা চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চলন্ত বাস থেকেই লাফ! বাধ্য হ'য়ে বাস থামল। সেপাই কিন্তু একগুঁয়ে। তার অপমানের প্রতিশোধ সে নেবেই! মিনিটদশেক তর্কযুদ্ধের পরও রুশবাবাজীর রোশ কমল না। অথচ ওদিকে বাসটা ছাড়বার জন্য ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে। এ হেন অবস্থায় গান্ধীমত ছাড়া পথ নেই, অতএব 'মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ' শ্লোগানটা ওদের শুনিয়ে বাসের সামনে সটান শুয়ে পড়লাম। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পাসপোর্ট তো পেলামই, সারা বাসের স্তুতিবাদক সোরগোলে এটাও বেশ বোঝা গেল যে ওরা আমায় একেবারে অবতারের দৃষ্টিতে দেখছে। বাকি পথটা আমি সিগারেট টানলাম আর অন্যরা আমার রাশিয়া-বিজয়ের রেস টানল। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডকে টেস্টে হারিয়েছে শুনলে ভারতবাসীর যেমন আনন্দ হত, অনেকটা সেই রকম।

বাস নামিয়ে দিল ব্যানহফে—অর্থাৎ রেল স্টেশনে, রাত সাড়ে এগারোটায়। সেখানে পোর্টার তো নেইই, পরবর্তী ট্রেনের কোন ঠিকও নেই। একান্ত মিলবে কি না তাও কেউ ঠিক বলতে পারল না। বাধ্য হ'য়ে ব্যাগ হু'টো

ছু'হাতে নিয়ে আর অন্য জিনিসগুলো কাঁধে, মাথায় আর পিঠে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ি ট্যাক্সির সন্ধানে। এ আবার এমন হতচ্ছাড়া জায়গা যে পকেটে পয়সা থাকলেই ট্যাক্সি মিলবে তা নয়, দেবতার আশীর্বাদও চাই।

পশ্চিম-বার্লিন পৌঁছোলাম রাত একটা। বড় হোটেলে উঠবার পয়সা নেই; কমদামী ছোট হোটেলগুলো, ওদেশে যাদের বলা হয় 'প্যাশিয়নে'—তাদের মেজাজের হাসি পায় এমন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে; কালা আদমী তো লাখে একটা। রাত্রে ওপথে সেও রাতকানা। নিরুপায় হ'য়ে আশ্রয় নিলাম পার্কের বেঞ্চে। নেহাৎ গ্রীষ্মকাল তাই রক্ষে নইলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

সুটকেশ ছু'টো মাথার কাছে, লাস্ট মিনিট ব্যাগটা মাথার নিচে। শরীরভরা ক্লান্তি আর চোখজোড়া ঘুম। সবে তন্দ্রা এসেছে, পার্কের পাহারাদার এসে উপস্থিত। এক সঙ্গে ছু'জন। মিনিট পনেরো চলল আমার নাড়ি-নক্ষত্রের হিসাব। আমার টিকিটে যে প্লেনের নম্বর লেখা আছে, তাতে ওদের হিসেব মতন, আমার এখানে পৌঁছোন উচিত ছিল বেলা পাঁচটার মধ্যে। পথের বিপত্তিগুলো বাদ দিলে হয়ও তাই। কিন্তু ওদের স্বভাবও সন্দেহ করা। বাধ্য হ'য়ে বলি 'তাহ'লে আমায় অ্যারেস্ট কর। তোমাদের খোঁজখবর নিতে নিতে রাত কাবার—আমি ঘুমিয়ে বাঁচব, আর কাল যখন আমার কথাগুলো সত্যি ব'লে প্রমাণিত হবে, তখন ক্ষমা চাইবার অজুহাতে না খাইয়ে কি আর ছাড়বে?' উঠে দাঁড়িয়ে বলি, 'চল মিছিমিছি বাক্যব্যয় করে তোমাদের ঘোরার ব্যাঘাত, আমার ঘুমের ব্যাঘাত!'

ওদের মন বোধ হয় টলল। আমার কাঁধ ধরে বসিয়ে বললে, 'আচ্ছা তুমি শুয়ে থাক, আমরা কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আসছি!' যেতে যেতে দূর থেকেই বলে 'আচ্ছা থাক কাল সকালেই দেখা হবে!'

আবার সটান শুয়ে পড়ি। ঘুম কিন্তু আর আসে না। কালো টানা পর্দার মতন আকাশটার বুকে জোনাকির মতন তারা জ্বলে। সিগারেট ধরিয়ে, এলোমেলো ভাবনার থালা সামনে নিয়ে বসি। জীবনজোড়া ছোট ছোট কথা, আর হারিয়ে যাওয়া ঘটনা মনের মধ্যে উঁকি মারে। সেই এতটুকু বয়সে এমনি ধারা এক গ্রীষ্মের রাত্রে আমাদের জয়পুরের বাড়ির চারতলার ছাদে শুয়ে ছোট মাসিমাকে বোধ হয় প্রশ্ন করেছিলাম 'তারা' কী? ছোট মাসিমা বলেছিলেন মানুষ মরলে 'তারা' হয়। আকাশটাকে ঘুরে ফিরে দেখি। ছেলেমানুষের মতন ভাবতে থাকি, ছোট মাসি কোন তারাটা? আর কোন তারাটা নুক্রেভু?

নুক্রেভু আমার প্রথমবার প্যারিস ভ্রমণের ভবাবহ স্মৃতি। তখন বয়স কম ছিল, বুদ্ধিটাও তথৈবচ। প্যারিস পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যা সাতটায়। স্টেশনে আমায় নিতে এসেছিল কলকাতারই বড় কাপ্তেন মানকু। মানকু ছিল বিলেত আসার জাহাজে আমার এক কেবিনের যাত্রী। ও আসছিল ব্যবসার ফাঁদ পাততে আর আমি আসছিলাম ফিল্ম স্টুডিওতে আড্ডি পাততে। কথাপ্রসঙ্গে ও জানাল কলকাতায় ওর খানকয়েক দালান আছে। আমিও বুঝিয়ে দিলাম ইংরেজিতে আমার কিছু দখল আছে। এই দালান আর এলেমের যোগাযোগই হল আমার প্যারিস যাওয়ার ভিত্তি—ওর পয়সায়। স্টেশন থেকে মানকুভায়া ট্যাক্সি করে নিয়ে গেল হোটেলে এবং সেখান থেকে আবার ট্যাক্সি করেই অবসর বিনোদনে। ঘুরতে ঘুরতে রাত যখন বারোটা তখন নৈশ প্যারিসের নেশা কেটে ঘুমে আমার চোখ ভেঙ্গে পড়ছে। ছুট নিয়ে ছুটলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে, নাম ঠিকানা না নিয়েই। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসে দেখি মানকুভায়া গায়েব। মানকু আমার চলন্ত ব্যাঙ্ক, কাজেই পকেটে আমার একটা অচল ফ্র্যাঙ্কও নেই। নেহাৎ ট্যাক্সি ড্রাইভারটা ভালো ছিল তাই থানায় না গিয়ে, নাবিয়ে দিল সিঁয়ে নদীর ধারে। আমার মতন বহু লোক ওখানকার বেঞ্চিতেই রাত কাটায়।

সবে সিগারেটটা ফেলে শোবার তোড়জোড় করছি, একটি হাবসি ছেলে এসে বললে 'একটা সিগারেট দিতে পারেন?'

দিলাম। ছেলেটি বেঞ্চিতে বসতে বসতে বললে 'বসব একটু?'

'বসুন।'

ছু'টান মেরে আমায় ভালো ক'রে দেখল, হাসলও। 'আমার নাম নুক্রেভু। ক্যারিবিয়ানে বাড়ি।'

'ও!'

'আপনি?'

'ভারতে।'

'কবে এসেন?'

'আজই।'

তারপরের প্রশ্নে এবং বিশেষ ক'রে প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে ও আমায় অবাক ক'রে দিল—

'কেন এসেছেন এখানে?'

ওর প্রশ্নে আমার আপত্তি থাকতে পারে এইটুকু বোঝাবার জন্য ছোট্ট উত্তর দি'।

'বেড়াতে।'

চেয়ে দেখি ওর দৃষ্টি একেবারে অন্য জগতে। আমার উত্তরটা বোধ হয় শোনেই নি। শুয়ে পড়বার উপায় নেই ও বসে আছে; বাধ্য হ'য়ে বেঞ্চির হাতলে মাথা দিয়ে একটু এলিয়ে পড়ি।

প্যারিসের আঁধারময় তামসী আকাশের ওপর নুক্রেভুর প্রোফিল। ওর ছোট ছোট চুলের সঙ্গে মাথাটা একই লাইনে গোল হ'য়ে ঘাড় পর্যন্ত ঘুরে গেছে। ছোট্ট নাকটার ওপর অনেকখানি চাপা গর্ত। পুরু পুরু ঠোঁট দু'টো গুনটানা ধনুকের মতন বাঁকা। দেখি আর ভাবি কোথাকার মানুষ কোথায় বসে কোথাকার কথা ভাবছে কে জানে? হাতে ওর ধরানো সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে প্রায় আঙুলের কাছে এসে ঠেকেছে। বাঁকা ছাইটা ঝুলছিল। বোধ হয় আমার নিঃশ্বাসের ধাক্কা খেয়ে পড়ল আমার প্যান্টের ওপর। খানিকটা বিরক্ত হয়ে পা'টা সরাতেই ওর যেন ধ্যানভঙ্গ হল।

'কি হল?'

বিরক্ত হয়ে উঠে বসতে বসতে বললাম—'ছাই পড়েছে।'

হাসল। কিচ্ছু বলল না। আমি সিগারেট ধরালাম। ওকেও দিলাম। দেশলাই জ্বালাতেই ও মুখটা বাড়িয়ে দিল। সেই ছোট্ট আলোয় দেখি ওর কপালের শিরাটা দপ্ দপ্ করছে। বাতাস আড়াল দেবে বলে আমার হাতের ওপর ওর হাতখানা মেলে ধরেছিল। সিগারেট ধরিয়ে মুখটা তুলল কিন্তু হাতটা আমার ছাড়ল না। অদ্ভুত এক দৃষ্টি দিয়ে হাতটা দেখে বলল—'আমরা কাল' (coloured) আমরা ভাই···তুমি আমার ভাই না?'

হাসি। মাথা নাড়ি। ও নিজেই বলে—'সাদা আলাদা কালো আলাদা! মিশ খায় না। নেভার।'

থেমে ভাবতে থাকে আর থেকে থেকে বলে চলে—'একদম আলাদা। আকাশ আর পাতাল। কোন দিনও এক হবে না, নেভার।' তারপর যা বলল কিছুই বুঝলাম না। খাঁটি ফরাসী। আপন মনে ও বিড় বিড় ক'রে গেল, কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে আর কথা বলার ভঙ্গিতে এইটুকু অবশ্যই বুঝি যে কথাগুলো ওর মুখের নয়, মনের হৃদয়ের, আরও গভীরের।

থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—

'জে পার্লে ফ্রাসেঁ?'

ঐটুকু ফরাসী অবশ্যই বুঝি, বলি—

'না, একদম না···'

'হুম।'

আবার বেশ খানিকক্ষণ অখণ্ড নীরবতা। গভীর রাতের নিবিড়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ব'সে ভাবতে থাকি কত কি কথা। ও-বলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে—'আমাদের দেশ অনেক ভালো, সেখানে মানুষ আছে, এখানে সব মেশিন। এরা মানুষ নয়, এরা বেঁচেও নেই। এরা সব মানুষের প্রেতাত্মা।'

ফাঁক পেয়ে প্রশ্ন করি—'আপনি এখানে কি করেন?'

'চাকরি।'

'ও।'

'আমি বিবাহিত। ফরাসী বৌ। একটি ছেলে আছে···ছিল···'

'ও!' আই স সরি···'

আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলে—

'হ্যাঁ, ছিল···ছিল···'

বলতে বলতে সিগারেটটা ফেলে নিজের হাত দু'টো ঐ অন্ধকারেই চোখের সামনে তুলে ধ'রে দেখতে থাকে। মনে হল যেন ওর চোখ দু'টো জলে ভেজা-ভেজা। অস্পষ্ট শুধু বলে—'হ্যাঁ ছিল···আর একটা সিগারেট দিন তো!'

দিলাম। টানতে থাকে। অনেকক্ষণ চুপচাপ, হঠাৎ আমার দিকে একপলক চেয়ে ব'লে ওঠে—

'আমি খুনী।'

পাগলের মতন হাসতে থাকে। সামনের বেঞ্চে ছেলে মেয়ে দু'টি তাদের নিবিড়তম পরস্পরকে পাওয়ার মধ্যেও বাধা পায়। মেয়েটি ঘুরে দেখল।

নুক্রেভু বলে—'তুমি বিশ্বাস কর। হ্যাঁ, তবে আগে সাদারা আমায় খুন করছে। আমি কালো, আমরা মারি না নিজেকে বাঁচাই। সাদা-সাদাই থাকবে, কালো কালো। পয়সা থাকে সব পাবে সাদা দেশে। মেয়ে পাবে, মান পাবে, মায়া পাবে; পয়সা নেই—কিচ্ছু নেই ···শূন্য···জিরো।'

সিগারেট থেকে সিগারেট জ্বালিয়ে আমার হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে—'তুমি শোন। আমি দেশে চীফ; চাইলে চারশো মেয়ে—সব দিতে উন্মুখ। সেবা, দেহ, যৌবন, জীবন। সব। ভালোবাসা—অনেক অনেক—দাসীর মতন, প্রেয়সীর মতন, পুতুলের মতন···সব'··· আমি কি করলাম?···সাদা চাইলাম। কাঁদলো। মা··· বাবা···সব মেয়েরা—চারশো—হতে পারে বেশি—আরও অনেক—কিন্তু না আমি চাই সাদা। সুট, প্যাণ্ট, হুলা হুলা শিক্ষা, মোটরকার···প্যারিস···ফ্রাসেঁ···সাদা মেয়ে। ···কালচার, সভ্যতা। দেশ থেকে এলাম। মানি···প্রেণ্টি মানি···পুরো রাজত্ব···আর আমি পাই পুরো ফ্রাঙ্ক···গুড সুন্দর মেয়ে···বিউটিফুল···সব চেহারা মনেও নেই···আর সে আমায় বিয়ে করলে···নাইস হোম···সুন্দর ছেলে···আমি খুশি···ব্যস্···নো মানি নো হোম···আজ রাত্রে বাড়ি এলাম কাজ শেষ করে···অন্য পুরুষ···আমার ছেলে কাঁদছে—আই কিল্।'

ছাড়া ছাড়া কথায় এমন গভীর উত্তেজনা আমি দেখি নি। হাতখানা ওর বজ্রমুষ্টিতে ধরা আছে। হাতে হাতে ওর জীবনযুদ্ধের স্পষ্ট ঘোষণা। আধুনিক ফ্রান্সের পূর্ণ ছবি। বললে—

'পালাও।···রান। এশিয়া স্বর্গ, আফ্রিকা সভ্য, য়ুরোপ ডেড।···একটা সিগারেট দাও।

আবার দিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ঘুমোও। আর ধন্যবাদ।'

দু' পা গিয়ে আবার ফিরে এল। 'আরও দু'টো সিগারেট দিতে পারো?'

পুরো প্যাকেটটাই দিলাম। গিয়ে ঐ ধারের বেঞ্চে বসল। আমি কোটটা খুলে মাথার তলায় দিলাম। নূক্রেভূ বেঞ্চির হাতলে ঘাড় রেখে মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়েছে পেছনে। আকাশের তারা দেখছে। এবার চোখ বুজি। সামান্য তন্দ্রা, এসেছে কি আসে নি, গুলীর শব্দে পুরো দেশটাই যেন কেঁপে উঠল। উঠে দাঁড়াই—একছুটে চলে যাই নূক্রেভূর কাছে।

মাথাটা তেমনি হেলানো। মুখখানা আকাশের দিকে। ডান হাতে ওর রিভলবার। এখনও ধোঁওয়া বেরুচ্ছে অল্প অল্প। কপাল বেয়ে ঘন রক্ত। চাপ চাপ। তারই ওপর ঐ দূরের নিয়ন-বাতির স্পষ্ট প্রতিবিম্ব। আলোটা নিবছে আর জ্বলছে। চেষ্টা করলে কথাগুলোও পড়া যায়। ঘুরে দেখি, নদীর ওপারে, নাইট-ক্লাব। মার্কিনী রক অ্যাণ্ড রোল। সুরটা নূক্রেভূর দেশেরই বোধ হয়। ক্যান ক্যান। মধ্য রাত্রের মিলন ছন্দ। আদিম ও অকৃত্রিম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝিও নি। চোখে সূর্যের আলো পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। সুটকেশ নেই একটাও। কোথায় গেল? কোটের বুক পকেটে গোঁজা আছে ছোট্ট চিরকুট। আভাস দেওয়া ইংরেজি ভাষায় লেখা আছে—

'আপনার সুটকেশ দু'টো পুলিশ স্টেশনে আছে। রাত্রে কেউ নিয়ে যেতে পারত।'

এটা আমার সুটকেশ বাঁচাবার অজুহাতে ওদের সিক্যুরিটির মুন্সিয়ানা। ওখানে যেতে বললে যদি কিছু মনে করি তাই এই ব্যবস্থা।

কথাটা শুনে ওঁরা হাসেন।

'কেন মনে হল এমন কথা?'

'সুটকেশ চুরি যেত না ওখান থেকে আপনারা জানেন।'

'যদি যেত'?

হাসতে হাসতেই বলি—'তাহ'লেও আমায় এখানেই আসতে হত!'

সিগারেট দিয়ে বলেন—'বসুন কফি খান!'

কফি দিলেন, ঘরও ঠিক করে দিলেন। আর ওঁদের জীপ দিলেন যাওয়ার জন্য।

ঘর তো ভালোই, দামও নিতান্তই নগণ্য কিন্তু বিপদ ঘটালো বুড়ি ল্যাণ্ডলেডি। কালা আদমিতে তার প্রভূত আপত্তি। পুলিশের দপ্তর থেকে আসছি, রাখতে বাধ্য হল, কিন্তু তাই বলে গর্জন কমে না! বয়ে গেছে। আমি প্যাঁচ কষছি পূর্ব-বার্লিনে গিয়ে কি করে টাকা উশুল করব, সে তুলনায় বুড়ির ভয় কিছুই নয়।



● জার্মান ল্যাণ্ডলেডি

বেলা দশটায় কোনরকমে ছবির কাজ সেরে সোজা ব্যাঙ্ক। সেখান থেকে মাত্র পাঁচ টাকায় পূর্ব-বার্লিনের পঁচিশ টাকা নিয়ে একেবারে পূর্ব-বার্লিন। গত রাত্রের গোটা দুই টাকা পকেটেই আছে, তার ওপর আরও পঁচিশ। অর্থাৎ আমার সাত টাকায় ওদের সাতাশ। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, ওদের চারগুণ ঠকাবো।

টিউব স্টেশনের ধারেই 'এইচ ও', পূর্ব-বার্লিনের সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেণ্টল স্টোর্স। এখানে বেশি দামে সবচেয়ে খারাপ সব জিনিসই পাওয়া যায়।

পুতুল পছন্দ হল। দাম ওদের পনেরো মার্ক, আমার হিসেবে আমাদের তিন টাকা। জিনিসে হাত দেবার আগেই কাউণ্টারের মেয়েটি কেনার পারমিট দেখতে চাইলেন।

সোৎসাহে পাসপোর্ট আর ভিসা সামনে ধরি। ধারে-কাছে ইতিমধ্যেই বেশ দু-চারজন জমে উঠেছে। মেয়েটি ওধারের চশমা-পরা আরো মোটা মেয়ের সঙ্গে কি সব কথা বলে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিলে আর পুতুলটা আমার হাত থেকে কেড়েই নিল বলতে গেলে। কথা বুঝলাম না, অঙ্গভঙ্গির সার অর্থ হল, চলবে না, পারমিট চাই। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন সহজ ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলেন নিচে অফিসে ব্যাপারটা বললে হয়ত কিছু সুরাহা হ'তে পারে। এরা পারবে না, নিয়ম নেই।

গেলাম নিচে। সেখানেও চলল বেশ রীতিমত শলা-পরামর্শ—বিনা পারমিটে জিনিস দেওয়া চলতে পারে কি না। একদিকে নিয়মের বেড়াজাল, অন্যদিকে নিয়মের

ব্যতিক্রম—বিদেশী টুরিস্ট! ওদের মধ্যে নিয়ম নিয়ে তর্কাতর্কির বহর দেখে বেশ খানিকটা অবাকই লাগে আমার। বহুক্ষণ পরে একজন প্রশ্ন করলেন টাকা আছে কি না। আগেই জানতাম পশ্চিম-বার্লিনে ভাঙানো টাকায় এদের প্রভূত আপত্তি তাই এঁদেরই এয়ারপোর্টের টাকা ভাঙানোর রসিদখানা বাড়িয়ে দিই। আবার তিনটে মাথা এক হল। নানান রকম হিসেব-টিসেব ক'রে আমায় জিজ্ঞেস করলেন 'কত টাকা আছে?'

নির্ভয়ে উত্তর দি, 'দু মার্ক!'

'যে পুতুলটা কিনতে গিয়েছিলেন তার দাম তো পনেরো।'

'জানি।'

'তাহ'লে?'

এবার সত্যি কথাটা বলতেই হয়। 'আরও আছে ২৫ মার্ক, পশ্চিম-বার্লিনে বদলেছি।'

চটে যান ভদ্রলোক।

'তাহ'লে সেখানে জিনিস কিনলেই পারতেন!'

'কিছু এখানে কিনব।'

'পারমিট ছাড়া এখানে জিনিস কেনা চলবে না।' বলে পাসপোর্টটা ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের ওধার থেকে এধারে। আমি ওটা না কুড়িয়ে একদৃষ্টি দিয়ে চেয়ে থাকি প্রায় পুরোপুরি এক মিনিট। ভদ্রলোক খানিকটা অস্বোয়াস্তি বোধ ক'রে বলতে বাধ্য হলেন—

'ঐ দু' মার্ক—যেটা এয়ারপোর্টে ভাঙিয়ে ছিলেন তা দিয়ে যা ইচ্ছে কিনতে পারেন।'

পাসপোর্টটা তুলে নিয়ে বললাম—'আসুন, ওদের ব'লে দিন।'

সামনেই সাজানো সাবানের রাশি। দু'টো কিনে, রসিদ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

এবার ও ধার, আরও খানকয়েক দোকান থেকে বাকি মার্কের জিনিস কিনলাম। পারমিট চাইলেই ভিসা পাসপোর্ট দেখাই আর এইচ ওর সাবানের রসিদখানা এগিয়ে দি। এইচ ও যখন বিনা পারমিটে জিনিস দিয়েছে তখন অন্যরা আর আপত্তি করে না। জিনিস নিয়ে উঠে বসলাম আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্রেনে।

পটসড্যামের প্লাটজ। এই স্টেশন পেরুলেই মুক্ত দেশের বাতাস লাগবে। মনে মনে হিসাব করছি কত টাকার জিনিস কত দিয়ে কিনলাম, হঠাৎ কাঁধে হাত।

'শুনুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।' খুব সাধারণ চেহারার একদম অচেনা মানুষ।

'বলুন।'

'নিচে আসুন বলছি।'

'আমার সময় নেই।'

শান্তভাবেই ভদ্রলোক উত্তর দেন—

'আপনি না নামলে ট্রেন ছাড়বে না।'

'কেন?'

ভদ্রলোক নিতান্ত সাধারণভাবেই তাঁর অসাধারণ পরিচয়লিপি পেশ করলেন সিক্যুরিটি পুলিসের কর্মী।

'এত লোকের অসুবিধা, তা ছাড়া আপনাকে জোর করে নামানোও খানিকটা অশোভন হবে।'

'চলুন।'

আমরা নেমে এলাম। ট্রেনটা চ'লে গেল।

শূন্য স্টেশন। ধারে-কাছে একটাও লোক নেই। সবাই যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছে। ভদ্রলোক আমার আপাদ-মস্তক দেখে বললেন—

'আপনার জিনিস আমি বাজেয়াপ্ত করব।'

'অপরাধ?'

'বিনা পারমিটে জিনিস কিনেছেন।'

'টাকা দিয়ে।'

'ও-টাকা আমাদের দেশে অচল।'

'আপনার দেশেরই তো টাকা।'

'বে সরকারি এক্সচেঞ্জ আমরা মনে করি বে-আইনি।'

'দাম পুরোই দিয়েছি।'

'হলেও, টাকাটা বে-আইনি।

'ফেরৎ দিয়ে দিন, জিনিস দিয়ে দেব।'

'পাবেন না।'

'আমিও তাহ'লে জিনিস দেব না।'

'বাধ্য হ'য়ে তাহ'লে আমায় থানায় নিয়ে যেতে হবে!'

'চলুন।'

পাহারাদার ঘেরা পাঁচতলা বাড়ির এক কোণের ঘরে ভদ্রলোক আমায় বসিয়ে চলে গেলেন। ঘরটায় একটা টেবিল, খানচারেক চেয়ার আর ছাদের মধ্যে লোহার গরাদের ও-ধারে একটা আলো। বসে বসে হিসেব করছি সাইবেরিয়া কতদূর, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন তিনজন রীতিমত সৈনিক-বেশধারী বিভীষিকা। আবার সেই একই ধরণের কথা প্রায় একঘণ্টা ধ'রে। আমার এক বুলি 'টাকা ফেরৎ দাও জিনিস দিয়ে দেব।' জিনিস অবশ্য ইতিমধ্যেই নেওয়া ওঁদের হ'য়ে গেছে।

আমার এক অস্ত্র। গান্ধীজীর দেওয়া। অনশনের ভয় দেখাই। ওঁদের অভিজ্ঞতার অভিধানে গুলী-গোলার কারবার—এ ধরণের অস্ত্র নিতান্তই নতুন। হেসে বলেন—

'ক্ষিদে পাবে।'

'পাবে।'

'কষ্ট হবে।'

'হবে।'

'তিনটের সময় আমাদের অফিস বন্ধ হবে।'

'রাস্তা আছে।'
'শীত করবে।'
'করবে।'
'অসুবিধা হবে।'
'হবে।'
'আমরা দেব না।'

আমি হাসতে হাসতে বলি—'বৃটেনও ঐ কথাই বলেছিল—তারপর দিয়েও ছিল।'

তিনঘণ্টা পর আমাদের আপোষ নিষ্পত্তি হল। আমি মার্ক পাব ওঁরা জিনিস রাখবেন—এবং আমি আর কিছু কিনবার চেষ্টা করব না। আমি সহজভাবেই জানিয়ে দি সর্ত মানতে রাজি নই।

ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে। তিন-চার ঘণ্টার কথা আর আলোচনায় গলা শুকিয়ে কাঠ। ছোট্ট দোকানে একমগ বিয়ার নিয়ে এক চুমুকে আর্ধেক। খানিকটা ক্লান্তির তৃষ্ণা, খানিকটা নিয়মভঙ্গের আনন্দ। এরই মধ্যে আবার সেই সিক্যুরিটি বাবাজী এসে উপস্থিত এবং তাঁর নির্দেশে আমার আধ-খাওয়া বিয়ারের মগ অদৃশ্য। যত বলি 'আরে বাপু ওটাতে মুখ দিয়েছি' বুড়ি তত মাথা নাড়ে সে নাচার আর ইসারায় বলে বের হও।

হলাম। ট্রেনে সোজা পশ্চিম-বার্লিনের প্রথম স্টেশন। পেছনের কামরায় আমার পশ্চাদ্ধাবন করলেন সিক্যুরিটি বাবাজী। ট্রেন থেকে নেমে তাঁকে হাত নেড়ে টা-টা করলাম এবং তিনখানা ফেরার ট্রেন বাদ দিয়ে আবার পূর্ব-বার্লিন। এবার আর ওপরে উঠলাম না। স্টেশনের ধারে-কাছে যে সব জিনিস পেলাম তাই মন ভরে কিনলাম। ওঁরা সবই কেড়ে নিয়েছিলেন মায় ভিসা পর্যন্ত; কিন্তু সাবানের দরুণ সেই রসিদটার কথা আর মনে ছিল না!! সেইটে দেখিয়েই সওদা করলাম। আমাদের সাত টাকায় ওঁদের সাতাশ টাকার জিনিস।

বার্লিন ছাড়বার আগে একটা খামের মধ্যে ঐ সাতাশ টাকার জিনিসগুলোর রসিদ ওঁদের সিক্যুরিটি অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে ছিলাম। পেয়েছিলেন আশা করি। সকালবেলায় খবর নিয়েছিলাম দূতাবাসে, জানা গিয়েছিল ছবি লোকার্নো চলে গেছে। বিকেলবেলা আর এক দফা খবর নিয়ে জানা গেল, ঠিক যায় নি, যাচ্ছে। অথচ লণ্ডনে থাকতেই খবর পাওয়া গিয়েছিল আগামীকাল ছবি দেখাবার দিন। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। বিদেশীর চোখে ভারতীয় অব্যবস্থার আর একদফা অকাট্য প্রমাণ। এবং প্রতিনিধি যখন আমি তখন ওঁদের হীনদৃষ্টি আমারই ওপর বর্ষিত হবে নিঃসন্দেহে। ভারত সরকারের গাফিলতির অন্ত নেই, কিন্তু রেহাই পাবার পথও কোন দেখি না। এক হয়—ও পথ না মাড়ানো। সেটা আরও খারাপ লাগছে ভাবতে। দেশ-দেশান্তর থেকে লোকে আসবে, আমার বাঁধা গাড়ির বাইরে আরও কিছু জানা-শোনার; দেশের বাইরে দশের মধ্যে নিজেকে দেখবার আরও একটা সামান্য সুযোগ, আবার কবে এ পথে পা বাড়াব তাও জানা নেই, একান্ত আর কখনও এমন 'নেপোলিয়ন সুযোগ হবে কি না তাই বা কে জানে। হাওয়াই দপ্তরে যাবার টিকিটটার ব্যবস্থা করে পথে নামলাম রাত আটটায়। ভোর পাঁচটায় প্লেন, আটটার মধ্যে লে কার্নো।

সেই আলোকোজ্জল বুডাম। রং আর আবহাওয়ার মধ্যে নেশার আমেজ। হোটেল আমজু তার আভিজাত্য নিয়ে গমগম্ করছে, কেবল বহু বিদেশীর ভাষার কাকলি—নেই, দরজার বাইরে দর্শনপ্রার্থী জনতার চাঞ্চল্য নেই, প্রদর্শনীর যে প্রাণস্পন্দন তার চিহ্নটুকুও নেই। দোকানভরা জিনিস, রাস্তাভরা লোক. ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশভরা শেষ সূর্যের আলো। একাকীত্বের সুর মনের মধ্যে থেমে থেমে ভেসে ওঠে; নিঃসঙ্গতার একটা বিষাদমাখা ছায়া। সেই কবে দেশ ছেড়েছি, তখন থেকে কেবলই আমার পথ চলা, কখন মন চালিয়ে, কখন পা চালিয়ে। এতদিন গভীর উত্তেজনা ছিল, নতুন দেশের নানান অভিজ্ঞতার আনন্দ ছিল নিজের দিকে তেমন ক'রে তাকাবার সময়ই পায় নি। আজ পথ চলতে চলতে মনে হল কোথায় চলেছি? আর কেনই বা আমার এমনি ধারা চলার নেশা? পাজিদা এসেছিল চলে গেছে। যতদিন ছিল আনন্দের অজস্র ধারা ছিল তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। গুডেদিদির কথা জানি না, একে মেয়ে তায় যুবতী—তার ওপর বাবার সরকারি সুকৃতিতে 'তারকা', বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা তো বটেই। এদের কারোরই না আছে ভাবনার বোঝা, না আছে বোঝবার দায় ও দায়িত্ব। এরা আনন্দ ছড়িয়ে এসেছিল, আনন্দ কুড়িয়ে চলে গেছে।

আমি ওদের থেকে কোথায় আলাদা? কেন আমার এমন থেকে থেকেই নিজের দিকে তাকানোর তাগাদা? যে দিকেই তাকাই, সামনে, পেছনে, পাওয়ার পরিপূর্ণতায় আমি ভরপুর, কোথাও এতটুকু অভাববোধ নেই, অথচ একাকীত্বের সুর থেকে থেকেই শুনি, কিসের যেন গভীর শূন্যতা আমার মনকে কেবলই তার বিরাট গহ্বরে টেনে টেনে নিয়ে যায়।

ছোট্ট করে গিয়ে বসলেই মনটার আয়তন ছোট হ'য়ে আসে, তাই গিয়ে বসলাম বড় হোটেলের মুক্তপ্রাঙ্গণে। সেখানে নানান লোকের ভিড়ের মধ্যে মনটা ছড়িয়ে দিতে পারলে একাকীত্বের বোঝা হয়ত বা কিছুটা কমতেও পারে।

একরাশ লণ্ডনী ইংরেজের ভিড়। জুলাই মাসে ওদের বেড়ানোর মরশুম। দল বেঁধে সব বেরিয়ে পড়েছে। ভাষা ছাড়াও, ওদের চিনবার সহজ উপায় হল হাতে গাইড বুক। ওরা মনের আনন্দে বেড়ায় না, গাইড বুকের ইসারায় ঘোরে।

গাইড বুকের মলাটে যত চাকচিক্য, সেই দেশের আকর্ষণ তত বেশি। যুদ্ধের আগে ওরা বিদেশ যেত বেড়াতে, মিশতো আরও ইংরেজদের সঙ্গে, খেত চা আর ইয়র্কশায়ার পুডিং. কিউতে দাঁড়াত আইসক্রীমের জন্য আর দেশে ফিরে বলত—দেখ বোনেদি ইংরেজের স্বাতন্ত্র্য। আজও ওরা বেড়ায়, আরও ইংরেজের সঙ্গে মেশে, চা আর ইয়র্কশায়ার পুডিং খায়, কিউতে দাঁড়ায় আইসক্রীমের জন্য আর দেশে ফিরে বলে—দেখ আমাদের আন্তর্জাতিকতা! বিশ্ব মহাযুদ্ধের ব্যবধানে ভ্রমণের নেশা ওদের বদলায় নি, বদলেছে নেশার রং। মানুষ হিসেবেও ওরা বদলায় নি, বদলেছে মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টা। দেশে একই বাড়ির পাশের ফ্ল্যাটের লোকের তোয়াক্কা ওরা করে না। ওখানকার সর্ব-সম্মানিত নিয়ম হল নিজের চরকায় তেল দাও। বিদেশে গিয়ে সেই পাশের বাড়ির লোকই ওরা খুঁজে বের করে, করাটা সহজ, কারণ সবাই চুপি চুপি খোঁজ নেয় কে কোথায় যাচ্ছে এবং সেইখানেই সবাই যায়! তার সঙ্গে আলাপ জমায়, গাইড বুক মিলিয়ে দেখে আর দেশে ফিরে বলে পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বড় ভালো। দেশভ্রমণে যে মনের প্রসার বাড়ে ইংরেজের অভিজ্ঞতা তার অকাট্য প্রমাণ।

বার্লিনের বিশ্বস্ত হোটেল প্রাঙ্গণটাকে ওরা ইংরেজি বৈঠকখানা বানিয়ে নিয়েছে। যেদিকেই তাকাই ওদের আড্ডাটা, ওদের ধারায় বেশ জমে উঠেছে। আমার পাশের টেবিলের জমাটি আড্ডার খানিকটা খানিকটা কানে ভেসে আসছে। খানিকটা এই ধরণের:

জন। চমৎকার দেশ, সুন্দর বিকেল···

বিল। সত্যি সুন্দর, না প্রিয়তমে?

মেরি। খুব; অপূর্ব।

(নিবিষ্টমনে চা খাওয়া প্রায় চার মিনিট। তারপর—)

জন। সূর্যটা ঝকঝকে···

বিল। ও-নিশ্চয়···এমন ঝকঝকে যে অবাক লাগে··· না প্রিয়ে?

মেরি। সত্যিই অবাক লাগে···

জন। এই ধরণের দিন আমার খুব প্রিয়···

বিল। আমারও···না ডার্লিং?

মেরি। হুম্···আমার তো বটেই···

জন। আলো আছে অথচ তাত নেই···

বিল। না···একদম নেই, না মেরি?

মেরি। সত্যিই, না গো?

বিল। হ্যাঁ···ইত্যাদি···ইত্যাদি···প্রায় দু'ঘণ্টা।

আড্ডাটা ভাঙল। ডিনারের সময় উপস্থিত, রীতিমত ড্রেস স্যুট না পরলে খাওয়াটা হজম হবে না। ওরাও ওঠে, আমিও উঠি।

আবার ঘুরলাম। এ-পথ ও-পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখি বাখ-স্ট্রাসে। নামটা খুব চেনা সুরে বাঁধা। ভাবতে আরম্ভ করি কোথায় শুনেছি এ নাম? কে থাকে এখানে? কিছুতেই মনে আসে না। খিদেও পেয়েছে। গিয়ে বসি ছোট্ট ছিমছাম কাফেতে। জনাকয়েক লোক ছোট ছোট টেবিলে ছড়িয়ে বসেছে। খাবারের মধ্যে মুরগীর রোস্ট আর রুটি, সঙ্গে বিয়ার। অল্পমূল্যের জিনিস বহুযত্নে পরিবেশিত। একটা চমৎকার আন্তরিকতার সহজ ধারা বইছে। ভালোই লাগে।

মনে পড়েছে। রুথের হোস্টেল এই রাস্তায়। ঠিকানাটা একটুকরো কাগজে লিখে আমায় দিয়েছিল, যদি কখনও প্রয়োজন হয়। হবে না, এইটাই জানতাম। আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে মনে হল জীবনের আরো অনেক কিছুর মতন এই জানাটাও আমার ভুল হ'য়ে গেছে। কাগজের টুকরোটা ফেলবার আগে মনে হয়েছিল ঠিকানাটা টুকে রাখি। আমার এলানো ছড়ানো জীবন-বৈচিত্র্যে একটা ছোট্ট বিন্দু, রাখি নি। হয়ত মনে হয়েছিল আমার ছেঁড়া নোটবুকে আরও বহু অনাদৃত ঠিকানার মধ্যে ওকে ঠাঁই দিলে ওর অপমানই হবে। আমার জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে ও অনন্যই শুধু নয়, সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। সেই স্বকীয়তার পূর্ণমর্যাদা আমার মনে।

বাখ্ স্ট্রাসে যেন পৃথিবীর একবারে বাইরে। নির্জন নিস্তব্ধ। দূরে দূরে নিয়ন-বাতির আলো, মাঝে মাঝে ভাঙা ভাঙা বাড়ি আর ছোট ছোট পার্ক। সন্ধ্যার বিষাদ মন থেকে সরেছে, আমাকে নিয়ে আমার অনন্ত কৌতূহলের বোঝাও অনেক কম। এখানে চলার ব্যস্ততা নেই বলেই বোধ হয় প্রশ্নচিহ্নের তাগিদ পায়ে পায়ে ক্ষয়ে যায়। না, পেট ভরেছে বলেই এই প্রশান্তি? কে জানে।

পথের ধারে প্রেসবাইটারিয়ান গির্জা। ছোট্ট, সুন্দর। সামনে আঁটসাঁট বাগান। রাস্তার নীল আলোয় বাগানের সবুজটা আরও সুন্দর। লাল সুরকি-বিছানো পথের ওপর একফালি আলো এসে পড়ছে বারান্দা থেকে। অর্গান বাজছে ডাক দেওয়ার ভঙ্গিতে।

দরজাটা ভেজানো ছিল। ভেতরে ঢুকলাম। বেদীমূলে তিনটে মোমবাতি জ্বলছে। কোণে ব'সে অর্গান বাজাচ্ছেন পক্ককেশ বৃদ্ধ। আমার দিকে পেছন ক'রে। এ প্রান্তে, দরজার ঠিক ওপরে বাতি জ্বলছে। বাকিটা অন্ধকার। নিঃশব্দে গিয়ে বসি এককোণে। অর্গানের সুরে সুরে ঘরটা ভরে উঠেছে কাণায় কাণায়। নিজেকে মনে হয় যেন নিঃশেষে হারিয়ে গেছি। দু'শো বছর আগে অন্ধ বাখই এই সুরটা বেঁধেছিলেন; প্রথমে নাম দিয়েছিলেন—

'When in the hour of utmost need'—'পরম প্রয়োজনের শেষ প্রহরে।' পরে মনে হয়েছিল হয়ত

প্রয়োজনের তাগিদে স্মরণ করার মধ্যে অসহায়ের আবেদন আছে, সেটায় দেবতার অপমান, তাই বদলে নাম দিয়েছিলেন—

'Before Thy Throne Oh Lord I Come.' 'তোমার সিংহাসনের তলায় প্রভু দাঁড়াই এসে আমি।'

বাখ-এর জীবনজোড়া বেদনার বোঝা। অন্তরে ছিল নিজেকে ব্যক্ত করতে না পারার দুঃসহ বেদনা, বাইরে ছিল দারিদ্র্যের দহন। সারাজীবন সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে বিলীন ক'রে আর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে শেষ জীবনে হারিয়েছিলেন দৃষ্টি। মারা যাবার ঠিক দশ দিন আগে হারানো দৃষ্টি ফিরে পেয়েই লিখেছিলেন এইটে—তাঁর জীবনের শেষ নিবেদন। তবুও, এর মধ্যে বেদনা নেই, ব্যথা নেই, হাহাকার নেই, আছে পরমতত্ত্বের প্রশস্তি, ঐকান্তিকভাবে নিজেকে সমর্পণের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ। আছে জীবনের জয়গান আর আছে জীবনদেবতার অসীমতার আরাধনা।

বাখের সুর মনটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে। য়ুরোপজোড়া সভ্যতার আলোতে আমার মনের যে অন্ধকার আরো বেড়েছে, এখানকার তিনটে মোমবাতির আলোতে সেটা সম্পূর্ণ সরেছে। আমি ভগবান মানি কি না আজও সঠিক জানি না, কিন্তু তাঁকে জানার যে কৌতূহল সভ্যতার প্রথম সূচনা থেকে সভ্য মানুষকে অনবরত হাতছানি দিয়ে চলেছে সেই কৌতূহলকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। মন্দিরে আমি নিয়মিত যাই না, না গিয়ে ভুল করি। যাওয়া উচিত। পাথরের মূর্তির মধ্যে পরমাত্মার সন্ধান পাবার জন্য নয়, মনটাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাঁধা সুরের ওপরে তুলবার জন্য। সংসারের মধ্যে দিনরাত চলে আমার স্বার্থের সংগ্রাম, আমার দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে মস্তবড় একটা 'আমিত্বের' মানদণ্ডে বাঁধা। উপাসনা মন্দিরে সে মানদণ্ড আমিত্ব ছাড়িয়ে ওঠে অসীমত্বের মধ্যে। মাঝে মাঝে সেখান থেকে নিজেকে নিরীক্ষণ করলে জীবনের অনেক জটিলতা লোপ পায়, এটা দেবত্বের সান্নিধ্য নয়, অনন্ততার অঙ্গ। মন্দিরে দেবতা আছে কি না জানি না, তবে অনন্তকাল ধরে সেখানে তাঁর সন্ধান আছে। যুগ যুগ ধ'রে আমার পূর্বপুরুষরা সেখানে গেছেন আত্মার তৃপ্তির জন্য, বহুযুগ ওপারের মানুষরাও যাবে ঐ একই আনন্দের সন্ধানে। এই অনন্ততার মধ্যে একটা সহজ সত্য অবশ্যই নিহিত আছে। সাময়িকতার সর্বশ্রেষ্ঠ দর্পণ আজকের সংবাদপত্র জীবনের প্রথম কথা বলে নি, কালকের সংবাদপত্র জীবনের শেষ কথাটাও বলবে না—তাহ'লে কিসের তাড়া? কিসের মারামারি? কেন এত সংগ্রাম? আমিত্বের এত অহঙ্কার?

যত বড় [illegible] হোক আর [illegible] হোক, এই একটা জায়গা যেখানে সকলকেই 'অহমিকার' টুপি খুলে রেখে তবে ঢুকতে হয়। বাইরে যে যতই চালাক বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্ক এখানে সাময়িক হলেও তার বিরতি। বামপন্থী ইন্টেলেকচুয়ালরা বলেন বুদ্ধিমান মানুষের জগতে ভগবানের স্থান নেই। যখন তাঁদের প্রশ্ন করি তাঁদের জগতে কিসের জায়গা আছে? তখন তাঁরা বলেন, 'যারই থাক যে জিনিসটা জানি না তার অন্তত জায়গা নেই।' প্রকারান্তরে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞতাকে স্বীকার করেন।

আগেই বলেছি, ভগবান মানি কি না জানি না, তবে যাঁরা মানেন তাঁরা উপাসনা-মন্দিরে একটা কিছু এমন জিনিসের সন্ধানে যান যেটা সাধারণ জীবনের বাইরে, সর্বসাধারণের বুদ্ধির ওপরে। কয়লার খনিতে নামলে যেমন গায়ে কালি লাগে, এঁদের মধ্যে এর সঙ্গে বিচরণ করলে, অন্তত সাময়িকভাবেও মনে একটা বিরাটত্বের ছোঁওয়া লাগে। স্বার্থের ঘোরাঘুরি লোপ পায়, ভালো কিছু একটার তাগিদ আসে। নিজেকে 'বড়' প্রতিপন্ন করার যে প্রবল বঞ্চনা বাইরের পৃথিবীতে অবিরাম চলছে, তার কালিমা থেকে মনটা মুক্ত হয়। তাই বা কম কি?

বাজনা কখন শেষ হয়েছে জানি না, চমকে উঠলাম কাঁধে কারো স্পর্শে। মুখ তুলে দেখি হের ডক্টর ডক্টর ভোগার্ট। উনিই অর্গান বাজাচ্ছিলেন।

'আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'এত রাত্রে? এখানে?'

'আপনার বাজনা শুনে।'

'ও।'

উঠে দাঁড়াই। উনি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখের পলকও পড়ে না। নিস্তব্ধতার বোঝাটা ক্রমেই ভারী হ'য়ে ওঠে। ভাঙবার জন্য প্রশ্ন করি—'আপনি তাই'লে পূর্ব-বার্লিন ছেড়ে এসেছেন?'

মাথা নাড়েন শুধু? অস্পষ্ট বলেন—'না।'

'ও…রুথকে দেখতে বুঝি?…কেমন আছে রুথ?'

ভদ্রলোক অসহায়ের মতন হাতটা আমার কাঁধের ওপর রাখলেন। ঠোঁটটা কাঁপতে থাকে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

আবার প্রশ্ন করি—'রুথ?'

উনি সাদা মাথাটা সামান্য নাড়া দিয়ে বোঝান 'হ্যাঁ।' বসে পড়েন পিউতে ভর দিয়ে, মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতন কাঁদতে থাকেন। আমি মাথা নিচু করে দাঁড়াই, মোমবাতির আলোর অস্পষ্ট নাচন দেখি ওঁর পাকা চুলের ওপর। কথা জোগায় না। উনিই বলেন থেমে থেমে—'দশদিন হল? [illegible] ভুলাই। রাত্রে।'

আবার অখণ্ড নীরবতা।

'আত্মহত্যা।'

থেমে বলেন—'আগের দিন এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেক রাত্রে। যেমন প্রায়ই আসত। এবার একেবারে আলাদা মানুষ। নতুন মানুষ। ওর আনন্দ দেখে মনে হয়েছিল একবার যে হয়ত ওকে হারাবার সময় এসেছে। হারিয়েওছি।'

উঠে দাঁড়ান হের ডক্টর ডক্টর। আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলতে আরম্ভ করেন। বলতে থাকেন—'ওর এমন রূপ আমি দেখেছিলাম সেই যুদ্ধের আগে, যখন ছোট্টটি ছিল। আর কখন দেখি নি। তোমার কথা খুব বলেছিল। তোমার ছবির কথাও। প্রায় সারারাত।'

নির্জন পথ। জনমানবহীন। অনেক রাত। দু'জনে পথ চলেছি। নির্বাক। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা। ছাড়া ছাড়া। রুথেরই কথা।

'মা কোথায়?'

'পূর্ব-বার্লিনে।'

'ও।'

মোড়ে একটা প্রকাণ্ড কালো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে লক্ষ্যই করি নি। পেরিয়ে যেতেই পায়ের শব্দ শুনলাম। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি দু'জন রিভলবার হাতে। জার্মান ভাষায় কি কথা হল জানি না, হের ডক্টর হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'গুড বাই।'

রাত্রের গভীর নিস্তব্ধতা আরও হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়ে গাড়িখানা পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নাম্বার প্লেটের ওপর লাল আলোটা নিবে গেল।

সাইবেরিয়া কতদূর?

পথে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকাই। আবার ছোট মাসিমার কথা মনে হয়।

কোন তারাটা রুথ?···

সকালবেলায় প্লেনের টিকিট বার করতে গিয়ে দেখি, রুথের দেওয়া ঠিকানাটা আমার পাসপোর্টের মধ্যে। কাগজটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে করতে সবই আমি ঝাপসা দেখি।

কাউণ্টারের মেয়েটি বলে—'বার্লিন ছেড়ে যেতে মন চাইছে না বুঝি?'

হাসি। কথা বলি না। মেয়েটি টিকিটে নম্বর লিখতে লিখতে বলে—'এখানে সবাই এমন কিছু পায় যা আর কোথাও মেলে না।'

আবার হাসি, বলি—'মাঝে মাঝে এমন কিছু হারায়ও যা আর কোথাও মেলে না।'

চোখ বড় বড় ক'রে মেয়েটি তাকায় আমার দিকে।

'আপনি দার্শনিক?'

মাথা নেড়ে বলি—'না। প্যাসেঞ্জার।'

[ক্রমশ।

বিশ্ববরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে

সন্তোষকুমার দে

নেহরুর স্নেহধন্য, ভারত সংস্কৃতি দূত তুমি—
বঙ্গের মঙ্গলশঙ্খ যেন তব ওষ্ঠাধর চুমি'
স্ফুরিত আপন গর্বে, হৈমন্তী পূর্ণিমা যেন হাসে
হেমন্তের বিজয় গৌরবে, ওই শুনি কানে আসে
মহাসিন্ধু পার হতে অযুত কণ্ঠের জয়গাথা
মত্ত করতালি বাজে, 'সুরিনেম রেডিও' ব্যাখ্যাতা।
নিউ ইয়র্ক বিশ্বমেলা, ভারত প্যাভিলিয়ন প্রাঙ্গণ
ত্রিনিদাদ, ফিজি, লস এঞ্জেলস্, কিংবা কিংসটন—
যেখানেই গেছ তুমি,—সকলের মনের মানুষ
লণ্ডনে, ওয়াশিংটনে,—কোথা আছ থাকে নাকো হুঁস।
কবির কণ্ঠের গানে নিখিলের চিত্ত বিমথিয়া
বাংলা ও হিন্দীর তানে মুগ্ধ করো বিদেশীর হিয়া।
*'ভারত-সিনাট্রা' বলি সম্বোধিলা সুধী সুরসিক,
উদার হৃদয় নিয়ে বড়ো তুমি শিল্পীর অধিক।
তোমার তুলনা তুমি, দেশ-জননীর স্নেহধার
বর্ষিছে উন্নত শিরে, ধন্য তুমি হেমন্তকুমার।

* Frank Sinatra-র ভারতীয় সংস্করণ

অফিসের ঘড়িটা

হিমানীশ গোস্বামী

বৃন্দাবনবাবুকে দেখলাম নিজের সীট ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে আমার দিকেই আসছেন। আমি তা দেখে তাড়াতাড়ি, দু'টো ফাইল খোলাই ছিল, তৃতীয় একটি ফাইল খুলতে লাগলাম। বৃন্দাবনবাবুর ধারণা, কেন হয়েছে জানি না যে আমার সাম্প্রতিক মাসিক তিন টাকা মাইনে বেড়েছে তা কেবল মাল্লিককে তেল দিয়ে। আসলে নাকি আমার কোনো যোগ্যতাই নেই। বৃন্দাবনবাবু আমাকে সে কথা বলেন নি, বলেছেন আমাদের লরি-ড্রাইভার বনমালীকে। বনমালী আবার বলেছে সুরেন বেয়ারাকে। সুরেন বেয়ারা একদিন আমার কাছে আট আনা ধার চাইতে এসে সেটা বলে দিয়েছে। আমি তাই বৃন্দাবনবাবু সম্পর্কে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটু বিরক্ত ছিলাম। কিন্তু এদিকে তিনিও কেরাণী, আমিও। তিনি খাতা লেখেন, আমি চেক করি। অতএব অনেকের ধারণা, আমার পদমর্যাদা তাঁর চাইতে বেশি, যদিও বৃন্দাবনবাবু এই অফিসে গত পোনের বছর কাজ করছেন, আর আমি এসেছি মাত্র চার বছর। তা ছাড়া দিনের মধ্যে একবার আমার সঙ্গে মাল্লিকের মোলাকাত হয়। মালিক জিজ্ঞেস করেন, সব ঠিক আছে? আমি বলি, ঠিক আছে সার। বাস্ ঐতেই আমার সম্মান একটু বেশি। তা ছাড়া কি কারণে জানি না, সম্প্রতি আমার মাইনে বেড়েছে—আর কারুর গত কয়েক বছর একটি পয়সা বাড়ে নি।

বৃন্দাবনবাবু এগিয়ে এসে আমার পাশে বসলেন, তারপর বললেন, দেখুন, একটা কথা ছিল।

আমি বললাম, কি কথা?

বৃন্দাবনবাবু বললেন, রোজই বলব বলব ভাবি, হয়ে উঠছে না। মল্লিকবাবুকে একটা কথা বলতে হবে।

মল্লিকবাবুই আমাদের সর্বেসর্বা। আমাদের মালিক। আমি বললাম, কি কথা? যদিও মনে মনে জানি মাইনে বাড়ানোর কোনো কথা শুনলে তাঁর মাথা ধরে, রাত্রে জ্বর হয়। গত বছরের আগের বছর লক্ষ্মণ বেয়ারা অনেক সাহস করে, অনেক কসরৎ করে বলেছিল তার মাইনে পঞ্চাশ টাকা হওয়াতে তার পক্ষে বড়ই অসুবিধে হচ্ছে।। ট্রামে বিনা টিকিটে আসতে হচ্ছে, রোজ অপমান করছে কণ্ডাক্টর। এক কণ্ডাক্টর হলেও নাকি কথা ছিল, তার উপর পাবলিকেও চায় না যে কেউ বিনা টিকিটে আসুক। এখন একখানা মান্থলি টিকিটের দাম ছ'টাকা, সেই টাকাটা যদি তাকে দেওয়া হয় তাহলে···

বেশি বলতে হয় নি, ফেটে পড়েছিলেন মল্লিকবাবু। বাবুদের মত ট্রামে আসা হয় তোমার, বটে? তুমি অফিসে কি এমন করো বাপু যে তোমার ট্রামে আসতে হয়? তুমি কাল থেকে হেঁটে আসবে—আর ফের যদি মাইনে বাড়ানোর কথা বলতে চাও তো অন্য কোনো অফিসে গিয়ে বলবে, এ অফিসে নয়। ড্যালহৌসি স্কোয়ারে অনেক অফিস আছে, বুঝেছ?

লক্ষ্মণ বেয়ারা তার পরদিন থেকে আর আসে নি। কোথায় যে সে বে-পাত্তা হয়ে গেল তার কোনোরকম হদিশ কয়েকমাস পাওয়া গেল না। তার ঠিকানায় তার বকেয়া মাইনে চোদ্দ টাকা কত আনা পাঠানো হয়েছিল মানি অর্ডার করে, তাও ফেরত এসেছিল। তার ঠিকানায় তাকে পাওয়া যায় নি। কয়েকমাস পরে তাকে একদিন দেখা



দেখুন, একটা কথা ছিল

গেল জেনারেল পোস্ট অফিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চীনে বাদাম খেতে। আমাদের লরি-ড্রাইভার বনমালী তাকে দেখে ফেলে। বনমালী এসে যা আমাদের বলেছিল তাতে আমরা ভয়ানক তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। লক্ষ্মণ নাকি কোন্ এক সায়েবি কম্পানিতে দারোয়ান হয়ে আছে। তার কাজ রাত্রে জেগে থাকা মাইনে একশো পঞ্চাশ টাকা। তা ছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আছে, বোনাস আছে, থাকবার জায়গা দিয়েছে, আর মাসে দশ-বারো টাকার উপর বকশিস পায়।

আমরা সে কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ লক্ষ্মণকে আমরা কত বাজে কথা, তুই তোকারি করেছি। পুজোর সময় আট আনা মাত্র বকশিস দিয়েছি আর সমস্ত বছর তাকে দিয়ে মুড়ি, চা, ডাকটিকিট, শসা কিনিয়েছি, আর এক পয়সার গোলমাল হলে যা-তা মন্তব্য করেছি। তখন আমার মাইনে সাতানব্বুই টাকা ছিল বলেই না তা করতে পেরেছি? আর এখন? লক্ষ্মণ এখন আমার প্রায় দ্বিগুণ মাইনে পাচ্ছে, বোনাস পাচ্ছে, বাড়িভাড়া দিতে হচ্ছে না। লক্ষ্মণের কথা আমাদের মনে হতেই তার চেয়ে আমাদের কত ছোট মনে হয়েছে। এক কথায় চাকরি ছেড়ে দিতে যে পারে তাকে প্রথমে মনে হয়েছিল অবিবেচক, কিন্তু পরে তার উন্নতির কথা শুনে ভেবেছিলাম আমরা কাপুরুষ। লক্ষ্মণ যা করতে পেরেছে, যে ছিল সামান্য বেয়ারা লক্ষ্মণ, আজ সে দারোয়ান। তাও যে সে জায়গার নয় সায়েব কম্পানির দারোয়ান!

আমি বৃন্দাবনবাবুকে বললাম, কি কথা মল্লিকবাবুকে বলতে হবে?

বৃন্দাবনবাবু বললেন, বিশেষ কিছু নয়—যানে রোজ ছটায় ছুটি হয়, আর আমার ট্রেন ছটা পঁয়ত্রিশে। দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে ট্রেন ধরি কোনমতে। তা যদি না পারি পরের ট্রেন সেই আটটা দশ-এ।

আমি বললাম, আপনি তো জানেন, অফিস থেকে এক মিনিট আগে বেরুনোর উপায় নেই, আপনি তো জানেন, এর কি উত্তর—যদি না পোষায় তো চাকরি ছেড়ে দিলেই পারেন।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, তা জানি। এতদিন এ অফিসে কাজ করছি ওটুকু জ্ঞান আমার হয়েছে। আমি কোনদিন এক মিনিট আগে বেরোই নি, বেরোতেও চাই না।

—তবে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, ঐ অফিসের ঘড়িটা মিনিট পাঁচেক স্লো যায়।

—স্লো যায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, আপনি জানেন, ঐ ঘড়িটা স্লো যায়।

আমি বললাম, আমি জানি স্লো যায়, কিন্তু ওটাকে ঠিক করার মত উপায় আমার জানা নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন মল্লিকবাবুর শালার দোকান থেকে ঘড়িটা কেনা হয়েছে—সে ঘড়ি স্লো যায় এমন কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, কেন সম্ভব নয়, মানে, ঘড়ি স্লো যাচ্ছে এটা তো ঠিক?

আমি বললাম, আমার ঘড়ি নেই। একটা ঘড়ি ছিল, সেটা দু' বছর আগে বাঁধা দিয়েছিলাম চল্লিশ টাকায়, এখনো ছাড়িয়ে আনতে পারি নি, আর পারবও না। বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লাম। তারপর বললাম, আর আমার তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আপনার অসুবিধে হচ্ছে আপনি বলুন না?

বৃন্দাবনবাবু আমার কথা শুনে একেবারে দমে গেলেন। বললেন, আমরা তো তাঁর সঙ্গে কালেভদ্রে কথা বলার সুযোগ পাই। তাও কোনো কিছু ভুলচুক হলে তিনি ডেকে পাঠান, আর বলির পাঁঠার মত তাঁর কাছে যাই। তখন কি আর ঘড়ির কথা বলা যায়?

আমি বললাম, আপনি একটা নোট পাঠান না কেন?

বৃন্দাবনবাবু বললেন, দেখুন নোট পাঠানোর কথা আমার মনে হয় নি তা নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি জানেন, আমাকে ডেকে যদি বলেন, কে বলেছে ঘড়ি স্লো যায়, তখন?

আমি বললাম, তখন বলবেন—ঘড়ি স্লো যাচ্ছে তার প্রমাণ তো আপনি করতে পারবেন, পারবেন না? টেলিফোন কোম্পানীতে জিজ্ঞেস করলেই ঠিক সময় বলে দেয়। অটোম্যাটিক্যালি একটি মেয়ে বলতে থাকে সঠিক সময়। আপনি বলবেন আপনার অসুবিধে হচ্ছে।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, কেবল আমার তো অসুবিধে হচ্ছে না, আমি আবার বাড়ি ফেরবার আগে দু' জায়গায় টিউশনি করি। দেরি করে গেলে আমার একটি ছাত্রের বাড়িতে যাওয়া হয় না। তা ছাড়া বিরিঞ্চিবাবু, বিনয় হাজরা, তারাপদ কুণ্ডু, এদেরও অসুবিধে হয়। তাদেরও নানা কাজকর্ম থাকে।

আমি বললাম বেশ তো সকলে মিলে একটা অ্যাপ্লিকেশন করুন। আমি সেটা বেয়ারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, আপনি বললে…

আমি বললাম, মাপ করবেন আমি বলতে পারব না। সবে তিনটাকা ইনক্রিমেণ্ট হয়েছে, এসময় কোন ঝামেলায় আমি যেতে চাই না।

বৃন্দাবনবাবু কি ভাবতে ভাবতে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন।

আমি ঘড়িটার দিকে তাকালাম। ঘড়িটা চলছে—

ফাস্ট কি স্লো বুঝলাম না, কারণ আমার ঘড়ি নেই। ঘড়ি বিনয় হাজরার আছে কেবল, সে বিয়ের সময় পেয়েছিল বছর দু-এক আগে। তার ঘড়ির সঙ্গে হয়ত এ ঘড়ি মেলে না, কিন্তু তাই বলে অফিসের ঘড়ি স্লো হবে কেন? যত সব!

আমি ফাইলগুলো দেখতে লাগলাম। একহাজার বস্তা ছেঁড়া কাপড়ের অর্ডার পাওয়া গেছে কাগজকল থেকে। তাড়াতাড়ি যোগাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কম্পানীর অনেক ব্যবসার মধ্যে এইটে একটি কাগজের কলে ছেঁড়া কাপড় সাপ্লাই দেওয়া। এসব সংগ্রহের জন্য লোক আছে—তাদের কাছে খবর পাঠাতে হবে।

বিকেল ছটা হতেই অফিস থেকে বেরুলাম। এরমধ্যে মল্লিকবাবুর কাছে গিয়েছিলাম একবার, কিন্তু ঘড়ি সম্পর্কে আর কোনো কথা তুলতে পারলাম না। একবার ইচ্ছে হয়েছিল কথাটা পাড়ার, কিন্তু মল্লিকবাবুর মেজাজটা বোঝা গেল না। খুব সম্ভবত তিনি খুশ মেজাজে ছিলেন, কেন না, তিনি একবার দু'বার শিস দিয়ে সুর ভেঁজেছিলেন, কিন্তু তাঁকে কাগজের উপর মানুষের মুখ আঁকতে দেখে আর সেই মানুষটাকে পেন্সিল দিয়ে বিকৃত করতে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর মেজাজটা তেমন ঠিক নেই। এটা সবাই এখন জানে যে তিনি যখন মানুষের মুখ আঁকেন তখন তাঁর মেজাজ ভাল থাকে না বলেই আঁকেন, আর যখন তিনি সেই মুখকে পেন্সিল দিয়ে বিকৃত করেন, চোখ কানা করেন, কান কপাল দাঁত কালো করেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর মনে ঝড় বইছে। অতএব কিছু বুঝতে পারলাম না। তাই ঘড়ির কথাটা পাড়ি পাড়ি করেও পাড়তে পারলাম না!

যদিও বৃন্দাবনবাবুকে আমি আমল দিই নি, তবু অফিস থেকে বেরিয়ে আমার মনে হল সত্যি তো অফিসের ঘড়িটা ফাস্ট না স্লো কি করে বার করা যায়? টেলিফোন করে জানা যায় না তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি টেলিফোন কলের হিসেব রাখতে হয়। সেখানে লিখতে হয় কাকে টেলিফোন করা হল, কে করল, অফিসিয়াল কি না। অফিসিয়াল না হলে অবশ্যই রক্ষা নেই, কারণ অফিসে লিখিত একটি নোটিশ এখনো টাঙানো রয়েছে যে, অফিসের টেলিফোনটি রয়েছে অফিসের কাজে ব্যবহার করার জন্য। দুপুরে আধঘণ্টা ছুটি থাকে, যদি কারুর টেলিফোন করার প্রয়োজন থাকে তাহলে ঐ সময়ে পোস্ট অফিসে গিয়ে ফোন করুন। অবশ্য ঠিকমত দেখতে গেলে অফিসের ঘড়িটি ঠিক আছে কি না দেখবার জন্য ফোন করা অফিসের কাজ হিসেবেই ধরতে হয়। কিন্তু আমরা বললেই তো হবে না, যদি মল্লিকবাবু বলেন, সেটা অফিসের কাজের অঙ্গ নয়, তাহলে? এইসব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি এমন সময় আমার পাশে আমাদের অফিসের ড্রাইভারকে দেখতে পেলাম। সেও আমার কাছে এসে বলল, শুনুন বাবু!

আমি অকস্মাৎ বনমালীর কথা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। বললাম, কি খবর বনমালী?

বনমালী বলল, শুনুন সার একটা কথা আছে।

আমি বললাম, কি কথা?

বনমালী বলল, বৃন্দাবনবাবু আপনার সম্পর্কে যা দু'একটা কথা বলেছেন তা সার খুব খারাপ।

আমি অবাক হলাম।

বললাম, বৃন্দাবনবাবু আমার নামে খারাপ কথা বলেছেন?

—বলেছেন সার। বনমালী বলল।

আমার রাগ হল। বনমালীর উপরেই রাগ হল, বললাম, তিনি কি বলেছেন না বলেছেন তা আমার কাছে বলছ কেন। আমি শুনতে চাই না।

বনমালী বলল, ভাল ভেবে বলতে এলাম, উলটো বুঝলেন সার।

আমি বললাম, এর কথা ওকে তার কথা আমাকে এরকম বলা ঠিক নয়।

বনমালী সায় দিয়ে বলল, মোটেই ঠিক নয় সার, কিন্তু আপনি নাকি মল্লিকবাবুর পা চাটেন। সার এমন কথা সে বলেছে—আমি শুনে আর ঠিক থাকতে পারি নি। আমি অবশ্য ওঁকে কিছু বলি নি—কিন্তু ইচ্ছে হয়েছিল একবার বলতে। সার, আমাদের অফিসের ঘড়ি নাকি আট মিনিট স্লো যায়, তাই সেটাকে নাকি তিনি ফাস্ট করার কথা আপনাকে বলেছিলেন মল্লিকবাবুকে বলতে, আর আপনি নাকি তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

আমি বললাম, তুমি কি বল?

বনমালী বলল, আমি বলি কি সার, যদি ঘড়িটা স্লো-ই যায়, তাহলে আপনি কখনই তাড়িয়ে দিতে পারেন না বৃন্দাবনবাবুকে।

আমি বললাম, তবেই বোঝ—ঘড়িটা আসলে স্লো কি ফাস্ট তাই বুঝবার মত ব্যবস্থা নেই তা আমি বলতে যাব কেমন করে? তবে হ্যাঁ, যদি সত্যি সত্যি ঘড়িটা স্লো যায় তাহলে নিশ্চয় সেটাকে ঠিক করতে হবে, মানে ঠিক করা উচিত।

বনমালী বলল, দেখুন সার—আপনার নামে কেউ কিছু বলবে এ আমার সহ্য হয় না। যদি ঘড়িটা ঠিক থাকে তো ভাল, আর যদি না থাকে তো আপনি নিশ্চয় তার ব্যবস্থা করবেন মল্লিকবাবুকে বলে। আপনি সার উচিতবক্তা আমার জানা আছে, আসলে ব্যাপার কি জানেন, ঐ বৃন্দাবনবাবুর মাথায় কিছু গোলমাল আছে।

আমি বললাম, মাথায় গোলমাল আছে?

বনমালী বলল, হ্যাঁ সার আছে। বাড়ি ফিরবার সময় তিনি একা একা পথ চলেন আর বক বক করেন। কত কি যে বলেন তার ঠিক নেই। একদিন তিনি সার পথ

চলতে চলতে ইংরাজিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তা ছাড়া ঘড়িতে আট মিনিট বাড়লেই বা কি কমলেই বা কি, আমরা গরীব মানুষ—এই রাত্রে যাব, খাব আর শোব।

পরদিন অফিসে যেতেই সুরেন বেয়ারা আমাকে সেলাম করল। তারপর বলল, সার আজ আপনি নাকি বলবেন?

—কি?

সুরেন বলল, বনমালী বলছিল, আপনি নাকি ঘড়ির ব্যবস্থা আজ করবেন?

—ঘড়ির ব্যবস্থা?

সুরেন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ সার। ওটা আট মিনিট স্লো যাচ্ছিল, কিন্তু সার একটা কথা বলি সার, ঘড়ি স্লো একটু যাওয়া ভাল।

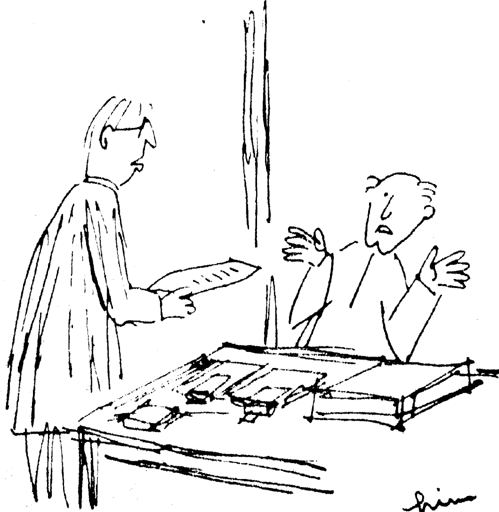
আমি বললাম, কেন?

সুরেন বলল, সার সকালবেলায় আসতে দেরি হয়, ঐ সময় যদি খানিক সময় হাতে পাওয়া যায় তাহলে ভাল হয়।

আমি বললাম, যাও তোমাকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না, আমার জন্য দু'পয়সাওলা দু'টো পান নিয়ে এসো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ সার। বলে সুরেন চলে গেল।

আমি আমার জায়গায় গিয়ে বসলাম। আমাদের ঘড়িতে তখন দশটা বাজতে পাঁচ। আর দু'মিনিটের মধ্যে ঘরের ছাব্বিশখানা চেয়ার ভরে গেল। প্রত্যেকে কাজ শুরু করল। দু'জন টাইপিস্ট চিঠি আর স্টেটমেন্ট টাইপ করতে সুরু করল। কেউ লেজার, কেউ ক্যাশমেমো, কেউ ভাউচার নিয়ে বসে গেল দৈনন্দিন কাজে। ক্যাশিয়ার তার সিন্দুক খুলে একটু উদাসভাবে বসে রইল।



● ঘড়ি জাহান্নামে যাক

খানিক পর বিনয় হাজরা একটা ফাইল নিয়ে আমার কাছে এলেন। এসে বেশ জোরে বললেন, এই চিঠিটার ড্রাফট একটা করেছি একটু দেখে দেবেন? বলেই ফিস ফিস করে বললেন, ড্রাফট-ট্রাফট বাজে কথা, শুনলাম আপনি না কি ঘড়ি ঠিক করাবার ব্যবস্থা করবেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ করব। তা ছাড়া ও এমন কি একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার যে তা নিয়ে চারিদিকে এমন গুজ গুজ ফিস ফিস চলছে, অ্যাঁ?

বিনয় হাজরা বললেন, দেখুন ঐ ঘড়ি স্লো যায় তা আমি জানি—আর অফিস ঘড়িদের স্লো যাওয়াই উচিত।

আমি বললাম, অফিস ঘড়িদের স্লো যাওয়া উচিত কে বলেছে আপনাকে?

ঠিক এই কথাটা বলবার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু হঠাৎ বলে ফেললাম।

বিনয় হাজরা বললেন, কেউ বলে নি, কিন্তু স্লো থাকলে অফিসে ঠিকমত হাজিরা দেওয়া যায়। বুঝতেই তো পারছেন চাকরির মর্মটি। এক মিনিট দেরি হলে খাতা চলে যায়। এতে আমরা মিনিট আষ্টেক পাচ্ছি অতিরিক্ত।

আমি বললাম, ঘড়ি ঠিক করতে হবে, ফার্স্ট যাক স্লো যাক ঘড়ি ঠিক করতে হবে, তাতে লোকের অসুবিধে বাড়ল কি কমল তা দেখবার উপায় নেই। কিন্তু আমি ভেবে দেখছি অফিসে দু'দল লোক রয়েছেন, একদল বলছেন ঘড়ি যে ভাবে চলেছে সে ভাবেই চলুক, আর একদল বলছেন ঘড়ি সঠিক চলুক, এখন আমি চাই একটা পিটিশন।

বিনয় হাজরা বললেন, পিটিশন আপনাকে করব কেন?

আমি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে বললাম, আহা, আমাকে করবেন কেন, আমাকে পিটিশনটা দেবেন, আমি সেটা মল্লিকবাবুকে প্রেস করব।

কথাটা তৎক্ষণাৎ অফিসময় ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে চাপা উত্তেজনা। টাইপিস্টকে দিয়ে টাইপ করানো হল একটা পিটিশন। তারপর সেটা সই হবার জন্য ঘুরতে লাগল।

সে পিটিশনের মর্ম এই যে, ঘড়িটি ফাস্ট যাচ্ছে কিংবা স্লো যাচ্ছে জানি না, যদি ফার্স্ট কিংবা স্লো যায় তাহলে সেটাকে অবিলম্বে ঠিক করার বিশেষ প্রয়োজন। ড্রাফটি আমিই করলাম—আর কেউ নাকি তেমন ড্রাফট করতে পারে না!

শেষ পর্যন্ত যখন ঘুরে এল আবেদনপত্রখানা সেখানে দেখা গেল মাত্র তিনটি কি চারটে সই। তার মধ্যে বৃন্দাবনবাবুর

সইটাকেও আবিষ্কার করতে পারলাম না। আমি নিজেই বৃন্দাবনবাবুর কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম, দেখুন আবেদন এমন কিছু খারাপ করা হয় নি। আপনার কথামতই ঘড়িটি ঠিক করার কথাই আছে—এর বেশি কিছুই নেই, যদিও উইথ মোস্ট রেসপেক্ট, আর ফেইথফুল সারভেন্ট এ দু'টো কথাই বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। যাই হোক, আপনি যদি সই না দেন···

···সই আমি দেব না। বৃন্দাবনবাবু বললেন, সই দিয়ে শেষে ঝামেলায় পড়ি আর কি?

আমি বললাম, ডেমোক্র্যাটিক দেশে আছেন মশাই, দলে মিলে করি কাজ—ঝামেলা আবার কোথায়? তা ছাড়া কাজটা আপনারই জন্য করা হচ্ছে। আপনিই যদি শেষ পর্যন্ত বাগড়া দেন···

বৃন্দাবনবাবু বললেন, বাগড়া আবার কোথায় হল মশাই। আমি ওসব ঘড়ির ফার্স্ট-স্লোর মধ্যে নেই। কথাটা বলেছিলাম, এখন ফিরিয়ে নিচ্ছি—ঘড়ি জাহান্নমে যাক।

ঘড়ি জাহান্নমে গেলেই হল। আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এটা ভারতবর্ষ এবং আমাদের ফাণ্ডামেন্টাল রাইটের মধ্যে এটা পড়ে।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, চুলোয় যাক ভারতবর্ষ। আমি মশাই আবেদন-ফাবেদনের মধ্যে নেই।

আমি গজগজ করতে করতে আমার চেয়ারে এসে বসলাম, বললাম যতসব কাপুরুষ!

খানিক পরই ডাক পড়ল। রোজই এই সময় ডাক পড়ে। আমি আমার ফাইল নিয়ে ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে মল্লিকবাবুর ঘরে ঢুকি। মল্লিকবাবু আমাকে দেখে বললেন, সেলাম! নমস্কার!

ব্যাপারটা নতুন। আমাকে তিনি কখনো ভুলেও সেলাম বা নমস্কার করেন নি।

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, বসুন। বসুন—একগ্লাস সরবৎ দেব কি?

আমি দেঁতো হাসি হাসলাম। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

আমি বসতেই তিনি গর্জন করে উঠলেন। বললেন, ক'দিন হল আপনার মাইনে বাড়ানো হয়েছে?

আমি বললাম, এই, মানে সম্প্রতি।

—ওমনি সিংহের পাঁচ পা দেখেছেন?

আমি বললাম, ঠিক বুঝতে পারছি না সার।

কিছু বুঝতে পারছেন না, বটে? আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন না আপনি? আমি বললাম, আপনাকে কে খবর দিয়েছে জানি না। আমাদের অফিসের ঘড়িটা মিনিট আষ্টেক বোধ হয় স্লো আছে।

বুলেটের মত আওয়াজ করে মল্লিকবাবু বললেন, আর সেই জন্য ট্রেড ইউনিয়ন করা হচ্ছে। আপনি দেখছি দেশকে শত্রুর হাতেও দিয়ে দিতে পারেন।

আমি জানি না কেন, কখনো যা আমার হয় নি তাই হল, মল্লিকবাবুর সামনে তাঁর উপর রাগ হল। বললাম, দেশের শত্রু আমি না আপনি?

আর বলতে হল না। তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, বনমালী?

হুজুর! বলে বনমালী এসে হাজির হল।

—গাঙ্গুলীবাবুকে অফিসের বাইরে পাঠিয়ে দাও বললেন তিনি বনমালীকে। আমাকে বললেন, আপনার যা পাওনা-গণ্ডা আছে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কাল থেকে আপনি আসবেন না। এ অফিসে ঢুকলে পুলিশ ডাকব।

বনমালী বলল, আসুন হুজুর।

স্মৃতির বাসি ফুল

অতুলরঞ্জন দেব

কাকটা উড়ে গেল কোথায়, শকুনি ধায় পিছে।
কুকুর শুয়ে লেজটি নাড়ে, সময় গেল মিছে—
ভাগাড় খালি, পুরনো হাড় গুটিকয়েক আছে।
শেষ অবধি যাবেই বুঝি ওইগুলিরই কাছে!
মৃত জীবের চোখের মণি খাবার লালসায়
নিরাশ হয়ে শকুন-রাজা বেজার, বোঝা যায়।
তিনটি ঘুঘু খুঁটছে দানা, শালিক দু'টি হাঁটে।
হাওয়ার গায়ে রোদের সোনা সূর্যডুবির মাঠে।—
ফসলকাটা গানের শেষে হেমন্তের এ সাজ,
হঠাৎ যেন কুড়ি বছর পিছিয়ে দিলে আজ।

দীর্ঘদিনের প্রবাস শেষে দেখছি ফিরে দেশে,
ছেলেবেলার সকল গেছে কালের বানে ভেসে—
কোথায় আছে, কেমন তারা? হদিস যা'ও পাই,
আগের মত প্রাণের সাড়া তেমন কিছু নাই।

মনের মণিকোঠার মাঝে স্মৃতিই ছিল ভালো···
আবার মিছে জ্বালতে গেছি, জ্বললো না সে-আলো।
জগৎজোড়া নিয়ম চলে, নিয়মে নেই ভুল—
সব গেলেও সুবাস ছাড়ে স্মৃতির বাসি ফুল।

স্বর্গখেলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুজাতা

কিন্তু আজ এত বেলা হোল কেন।

তাকাতে গিয়ে আবার কেমন অবসাদ লাগল মহুয়ার।

কাল রাত্রে স্বামীর ডাকে বিছানায় উঠে বসবার পর কি হোল? কি কথা বলল অভিজিৎ? আজ আর কিছু মনে করতে পারছে না, আজ শুধু অবসাদ লাগছে, খিদে খিদেও আর পাচ্ছে না, কানে খালি একটা পিঁ পিঁ আওয়াজ, আর আমাই চোখের সামনে হলুদ হলুদ ফুলের মত কি সব ভাসছে।

ক্লান্ত পায়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলল মহুয়া। কে আবার এল এত ভোরে।

চা দিতে বলবে হয়ত অভিজিৎ; কি হবে তাহলে, একজনের মতই চা-পাতা আছে মহুয়ার ভাঁড়ারে, আর চিনি তাই বা কোথায়?

মহুয়া বিরক্ত মনে দরজা খুলল, আর দরজা খুলেই চমকে উঠল।

দাদা, তুই!

মুহূর্তের মধ্যে দুই ভাইবোনে আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে; মহুয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তাহলে শেষ পর্যন্ত তুই এলি, তোর রাগ পড়ল।

দূর, রাগ করব কেন? তুই একটা পাগলী। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সঞ্জয় বলল, কই, সে ব্যাটা ভগ্নীপতি কোথায়?

ঐ ত' ঘুমুচ্ছে।

মহুয়া আঙুল তুলে দেখাল।

ও হে ম হ য়া-র ম ন ভ ও হে অভিজিতচন্দ্র, ও ঠো, ও ঠো। মোহনবাঁশি ধর, চুড়া···

মহুয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল; তুই আবার এত বাংলা কোত্থেকে শিখলি দাদা।

শিখেছি ভাই শিখেছি, আমাদের আর্মিতে বাংলা শেখায়।

মহুয়া সত্যিই অবাক হল।

আরে আমি মানে আড্ডা, আর্মির আড্ডা।

তাই বল হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ দুই ভাইবোনের হাসির আওয়াজে চমকে জেগে বিছানার ওপর উঠে বসল অভিজিৎ।

মৌ! কি ব্যাপার?

দাদা, আমার দাদা সঞ্জয়।

ও তাই নাকি, অভিজিৎ তাড়াতাড়ি তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়াল, আর সঞ্জয় এগিয়ে এসে করমর্দন করল অভিজিৎ-এর। ব্রাদার-ইন-ল, বুঝলে ব্রাদার; স্রেফ ভালবেসে পরে আবার—।

আঃ দাদা কি হচ্ছে অসভ্যতা!

আঃ শালাকে শালা বলব না?

সঞ্জয় অভিজিৎ-এর দিকে ফিরল, দেখ তো ভাই, একি অত্যাচার, এখনও ওর সেই বিশ্রী শুচিবায়ুতা গেল না। এই স্যাখ। তুমি বলে ফেললাম, কি আবার মনে করলে বল ত'?

সঞ্জয়ের অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল মহুয়া।

তুই থাম তো দাদা, তুমি না বললেই রাগ করতাম।

এতক্ষণে অভিজিৎ কথা বলল, ভাবতাম আপনারা এখনও মহুয়ার ওপর চটে আছেন এই অধমকে বরমাল্য দিয়েছে বলে।

এইবার রাগ করলাম।

তক্তপোষে বসে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে খুব গম্ভীরমুখে বলল সঞ্জয়।

কেন, কেন?

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠল।

কে ন ন য়? আমায় তুমি আপনি বললে কেন? আমি কি···

ও এই কথা। বেশ তো তুমি কেন তুই বলব এবার থেকে অনুমতি পেলে।

ঠিক ঠিক। তুই, শুধু তুই; আপনি নয়, বাবু নয়, মিস্টার ব্যানার্জি নয়, সঞ্জয় আর তুই।

সঞ্জয় ভাবের আতিশয্যে অভিজিৎকে দুই হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। আর দেখে দেখে মহুয়ার চোখের কোণে আনন্দের অশ্রু জমে উঠল।

মৌ। চা করবে না?

হ্যাঁ, যাই; চা ত' করতেই হবে, কিন্তু চিনি কই? আজ অভিজিৎকে চিনি ছাড়াই চা খেতে হবে; তার চায়ের চিনিটা দিয়েই দাদার চা···

কিন্তু না বাঁচিয়ে দিল সঞ্জয়।

এই মৌ, চা যদি করেই আনিস তবে যেন আমার চায়ে চিনি দিস না, আমি ছেড়ে দিয়েছি চিনি খাওয়া।

ও মা, কেন?

সে তুই বুঝবি না।

মহুয়া ভেতরে চলে গেল; চা হতে দেরি হবে, এখনো ত' উনুনে আগুনই দেওয়া হয় নি; তবু ভাগ্যিস, রাত্রেই মহুয়া উনুন সাজিয়ে রাখে।

চা করতে বেশি দেরি হোল না কিন্তু মহুয়ার। বেড়ার ফাঁকে উনুন জ্বলছিল গন গন করে, অমলা বৌদিই এক

কেটলি জল ফুটিয়ে দিলেন মহুয়াকে। আর অমলা বৌদির কাছ থেকেই দু' আনা পয়সা ধার নিল মহুয়া, ওদের বাড়ির ছোট ছেলেটিই মোড়ের দোকান থেকে বিস্কুট এনে দিল চারটে। ভালই হ'ল অভিজিৎকেও আর শুধু চা-টা দিতে হোল না। চা নিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল মহুয়া। তক্তপোষের ওপর কাগজ বিছিয়ে সঞ্জয় খাবার সাজাচ্ছে পর পর।

বড় প্লাম কেক, নতুন গুড়ের সন্দেশ, কলা, একরাশ মেওয়া···

এ কি হচ্ছে দাদা?

তুই থাম, শীগ্‌গির এদিকে আয়, মহুয়ার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে নামিয়ে রাখল সঞ্জয়; তারপর বড় সন্দেশটা হাতে তুলে নিয়ে নিজের হাতে মহুয়ার মুখে দিয়ে দিল।

খা শীগ্‌গির, খেয়ে নে।

মহুয়াকে সঞ্জয় আর কথা বলবার অবসরও দিল না। অভিজিৎ-এর মুখেও জোর করে সন্দেশ দিয়ে, চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বসল সঞ্জয়।

আঃ সন্দেশের স্বাদে শুধু মুখই ভরে গেল না, মহুয়ার মনে হোল যেন বুকও জুড়িয়ে গেল।

কি অপূর্ব সন্দেশ রে দাদা!

কে কিনেছে দেখতে হবে তো! খা না আর একটা।

এই যে খাই।

বেশি অনুরোধ করতে হোল না মহুয়াকে, পর পর চারটে সন্দেশ খেয়ে জল খেল মহুয়া; আর অভিজিৎ মহুয়ার খাওয়া দেখে বিস্মিত হোল। সন্দেশ এত ভালবাসে মহুয়া আর এমনভাবে মহুয়াকে কোনদিন খেতেও দেখে নি অভিজিৎ।

সব কিছুই ত' মহুয়া বলে তার ভাল লাগে না; মাংস নাকি মহুয়া খায় না, মাছ-ডিম দেখলে তার গায়ে জ্বর আসে, রুটি-মাখন অসহ্য, আর মিষ্টি···

তুমি খাচ্ছ না?

হ্যাঁ খাই।

মহুয়ার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল অভিজিৎ। সঞ্জয় কিছু খাচ্ছে না মৌ, তুমি দেখছ না।

সত্যি ত'! নিজে এত খেতে ব্যস্ত ছিল যে অভিজিৎ বা সঞ্জয় কারুর দিকেই মন দিতে পারে নি মহুয়া।

এতক্ষণে খেয়াল হোল মহুয়ার।

এ কি দাদা তুই খা!

ভুলে গেলি চায়ের সঙ্গে আমি কিছু খাই না!

তাও ত' বটে; দাদা ত' চিরদিন শুধু চা-ই খায়। ঘণ্টাখানেক পরে পুরো ব্রেকফাস্ট চাই সঞ্জয়ের। আশ্চর্য! কি করে ভুলল মহুয়া?

শোন মৌ, আজ, আমি এখানেই খাব, থাকব সারাদিন।

এখানেই খাবি?

মুহূর্তে মহুয়ার মুখ সাদা হয়ে গেল, কি দিয়ে খেতে দেবে দাদাকে, শুধু ডাল-ভাত? তাও যে পর্যাপ্ত নয় দু'জনের পক্ষে। আর সঞ্জয় ত' ভোলা মহেশ্বর নয় অভিজিৎ-এর মত; তাকে ত' ভোলাতে পারবে না মহুয়া, সে ঠিক বলবে।

তোর ভাত কই?

আর এতদিন বাদে একসঙ্গে দাদার সঙ্গে খেতে বসবে না মহুয়া তাই বা কি করে সম্ভব; কি বলবে এখন ও দাদাকে? কিন্তু আশ্চর্য সঞ্জয় কি আজ ভগবান হয়ে ওদের বাড়িতে এসেছে?

কলকাতায় শুনলাম ভাল চাল পাওয়াই যায় না।

হ্যাঁ তাই ত'···ভাল চাল··মানে···

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পুরো কথা বলতে পারছে না।

সঞ্জয়ই আবার বলল, আমি তাই সেরদশেক ভাল চাল নিয়ে এলাম, সেইটেই আজ রাঁধ মৌ, বুঝলি।

চাল! ভাল চাল! কোথায় কোথায়?

মহুয়ার চোখ যেন জ্বলে উঠল।

গাড়িতে আছে, দাঁড়া আনছি; তা ছাড়া তোর এখানে আসছি বলে ভানুদি সেই রাত থাকতে উঠে কত কি যে সব গুছিয়ে দিয়েছে, আয় না দেখবি। সঞ্জয় মহুয়ার হাত ধরে টানল।

বহুদিন পরে পেটভরে খেয়ে কি যে পরিতৃপ্তি হোল মহুয়ার, সে মহুয়া ছাড়া আর কে বুঝবে? খাবার পর তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে তিনজনে গল্প করছিল। মহুয়া কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে; পেটভরে খাওয়ার পরিতৃপ্তিতে ভারি একটা মধুর আবেশে শরীর ভারী হয়ে এসেছিল। আর হাতে মাথা রেখেই মহুয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল অঘোরে।

ঘুম ভাঙলো সঞ্জয়ের ঠেলাঠেলিতে।

এই মৌ! ওঠ, কত ঘুমোবি? চা দে, তৈরি হ' তাড়াতাড়ি। সিনেমা যাব।

মহুয়া চোখ রগড়ে উঠে বসল। ইস! কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমায় আগে ডাকিস নি কেন?

এখনও অনেক সময় আছে।

কিসের সময় আছে?

সিনেমার।

সিনেমার?

হ্যাঁ আমরা এক্ষুণি ছ'টার শোয়ে যাব সিনেমায়।

সিনেমা, মানে ছবি?

হ্যাঁরে হ্যাঁ। কতকাল বাংলা ছবি দেখি নি।

কতকাল শুধু বাংলা ছবি দেখে নি সঞ্জয়, আর মহুয়া

ছবিই দেখে নি যে কতকাল। মহুয়া তাড়াতাড়ি চা করল, (তামুদি পাঠিয়েছে একটিন চিনি, কোথা থেকে যেন সংগ্রহ করে) লুচি আর বেগুন ভাজল তারপরে সযত্নে প্রসাধন করল। পোষাকী কাপড় মহুয়ার বেশি নেই, তবু বিয়ের পরই যা দু-একখানা কিনে দিয়েছিল অভিজিৎ, আর ছায়ারা উপহার দিয়েছিল একটা।

ছায়াদের উপহার দেওয়া সেই নীল জরিপাড় শাড়িটাই পরল মহুয়া, বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা দিল কপালে।

বাঃ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ত' তোকে মাথায় কাপড় দিয়ে।

যাঃ!

মহুয়া দাদার প্রশংসায় লজ্জা পেল।

তুই বেশ খানিকটা রোগা হয়েছিস, তবু যেন ভারি সুন্দর হয়েছিস।

তোমার বোনকে ত' আমি চিরদিনই সুন্দর বলেই জানতুম হে! তাই ত' বিয়ে করলুম; আমায় তাহলে ঠকিয়েছে বল! আমার কাছে এসে সুন্দর হয়েছে। আগে ছিল না?

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল অভিজিৎ। বেশ বলেছ; কিন্তু জান সত্যি বলছি, মৌ একটু অন্য রকমের হয়েছে দেখতে, কেমন যেন, বোধ হয় বৌ সেজে।

তাই হবে।

চল দাদা।

হ্যাঁ যাই চল। একটু তাড়াতাড়ি যাই চল, না হলে আবার টিকিট পাওয়া যাবে না।

ওরা তিনজনে বাইরে এল, বহুদিন পরে মহুয়া আবার দেখল তাদের বাড়ির সেই পুরোন বড় গাড়ি। তেলের রেশনিং বলে গাড়ি চড়া ত' ইদানীং ছেড়েই দিয়েছিল মহুয়ারা; আর তা ছাড়া ড্রাইভারও যুদ্ধের বাজারে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ট্রাক চালাচ্ছে; নতুন ড্রাইভারও পাওয়া যায় না। যুদ্ধের বাজারে কাজ করবার লোক কই? সবাই ত' খাতায় নাম লিখিয়েছে।

ওঠ মৌ! গাড়ির দরজা খুলে সঞ্জয় ডাকল।

যাই, এক পা গাড়ির মধ্যে আর এক পা তুলেছে, হঠাৎ চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেল সব, দুলে উঠল যেন পৃথিবীটা, অচেতন মহুয়ার মাথাটা লুটিয়ে পড়ল সঞ্জয়েরই হাতের ওপর।

একি হোল! একি! মৌ, মৌ!

অভিজিৎ আর সঞ্জয় দু'জনে ধরাধরি করে মহুয়াকে ঘরে নিয়ে এল; শুইয়ে দিল বিছানায়; তুমি ততক্ষণ ওর মাথায় একটু হাওয়া কর, আমি চট করে ডাক্তার ডেকে আনি।

সঞ্জয় বেরিয়ে গেল আর একটু পরেই মহুয়া চোখ খুলল। স্বামীর ব্যগ্রব্যাকুল চোখের দিকে চেয়ে সব মনে পড়ল মহুয়ার। কিছু হয় নি আমার, কিছু নয়, এমনি একটু মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, ভয় পেয়ো না।

কেন তোমার এমন হোল মৌ?

ও কিছু নয়।

কেন এমন হল? নিজেকেও প্রশ্ন করল মহুয়া। এর আগেও অনেকবার মাথা ঘুরে গেছে, চোখের সামনে হলদে দেখেছে, কিন্তু সে ত' এরকম নয়। তা ছাড়া মহুয়াও জানে সে রকম মাথা ঘোরা, অন্ধকার দেখা, সে সব হয়েছে অনেকক্ষণ না খাওয়ার জন্য। কিন্তু আজ হোল কেন? এমন ভূরিভোজন ক'মাসের মধ্যে কবে আর করেছে মহুয়ারা!

তবে কেন? কেন?

সেই 'কেন'র উত্তরই ডাক্তার এসে দিলেন।

হাতটা নামিয়ে রেখে মিটিমিটি হাসলেন ডাক্তার। আর কি কি হয় বলুন ত'?

আর, আরও বিশেষ কিছু...

হুঁ যা ভেবেছি, কিছু ভাববার নেই মা, একটু সাবধানে থাকবেন, একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া যেন করেন, ডাক্তার অভিজিৎ-এর দিকে ফিরলেন, এ সময় দুধটা খাওয়া প্রয়োজন, আর ফল খেতে পারলে—

এ সময় মানে?

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল।

মহুয়াও নীরব প্রশ্নে ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল, কি সময়?

আশ্চর্য আপনিও জানেন না!

বড় বড় চোখ চেয়ে মহুয়া মাথা নাড়ল, না ত'!

আপনি মা হতে চলেছেন মা; মাস দুয়েক মত মনে হয়।

'মা', মহুয়া মা হতে চলেছে!

কথাটা যেন ভাল বুঝতে পারল না মহুয়া।

অস্ফুটে উচ্চারণ করল 'মা,'!

মা ত' রাধারাণী, সেই টকটকে রঙে ধবধবে শাড়ি, পায়ে কাল ভেলভেটের চটী, কানে হীরের ফুল জ্বলছে, সুগন্ধি জর্দা আর পানের হাল্কা গন্ধ সারা শরীর ঘিরে। সেই ত' মা। মহুয়া আবার মা কি? সে ত' মৌ। মহুয়া তাই না কি— সঞ্জয়ের উৎসাহভরা গলা শোনা গেল আবার।

আমি মামা হব, বাঃ বাঃ!

ডাক্তারকে সঞ্জয়ই টাকা দিল; অভিজিৎ কিছু একটা বলতে এসেছিল তাকে থামিয়ে দিল এক ধমক দিয়ে।

বেশি পাকামি কোর না অভি!

ছবি দেখা সেদিন আর হোল না, তিনজনে বসে গল্প করল। মহুয়া যতক্ষণ রাঁধল সঞ্জয় আর অভিজিৎ ততক্ষণ কি যে হাবিজাবি যুদ্ধ, ব্যবসা ইত্যাদি বলতে লাগল তার

কিছুই মহুয়ার মাথায় ঢুকল না। একটা কথাই কেবল বারে বারে ফিরে তার মাথায় যেন গুঞ্জরণ করতে লাগল, 'আপনি যে 'মা' হতে চলেছেন মা।'

মা, মহুয়া মা!

ভাবতেও কেমন একটা শিহরণ লাগে। মহুয়া মা। এই ঘরে অভিজিৎ আর মহুয়ার বিছানার পাশে ছোট্ট একটা বিছানা আর সেই ছোট ছোট বালিশ-গদীর মধ্যে ছোট্ট ফুটফুটে একটা মুখ। কেমন হবে সে দেখতে? সেই যেমন তুলতুলি ছিল ছোট বেলায়। একরাশ সাদা তুলোর মত। তাই ত' মহুয়াই নাম রেখেছিল তুলতুলি; ভাল নাম তার পাপিয়া, ডাক নাম পিউ, মৌ-এর সঙ্গে মিলিয়ে, কিন্তু পিউ বলে ক'টা লোকই বা ডাকে তাকে মহুয়ার দেওয়া তুলতুলি নামেই তার পরিচয় সর্বত্র। কতদিন দেখে নি তুলতুলিটাকে; কি বলবে সে মহুয়ার বাচ্চাকে দেখলে? আচ্ছা কি হবে মহুয়ার? ছেলে না মেয়ে? খুন্তি নামিয়ে পেটের ওপর হাত রাখল মহুয়া।

আছে. এইখানে আছে সে। এই যে মহুয়া বসে বসে রান্না করছে,—একলা নয় কিন্তু এখনও। আছে, আরও একজন, এক হয়ে মিশিয়ে আছে সে মহুয়ার সঙ্গে সর্বক্ষণ; ঘুমে, জাগরণে, দিনরাতে মহুয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আছে সে। মহুয়া আর কোনদিনও একলা হবে না। একলা ত' মহুয়া ছিল না কোনদিন। অভিজিৎ ত' সব সময়ই আছে কাছে; দুপুরে টিউশানী করতে বা স্কুলে যেতে যা বেরোয়, তা ছাড়া সর্বক্ষণই ত' মহুয়ার স্বামী মহুয়াকে সঙ্গ দেয়।

কিন্তু না, এ আর একরকম। এ মহুয়ার নিজের। মহুয়ার সঙ্গে এক হয়ে জড়িয়ে আছে সে, একান্ত মহুয়ার নিজের।

রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে অভিজিৎ কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলল।

মৌ! কি হবে?

কিসের?

না, না, আমাদের এই দারিদ্র্যের সংসারে, নিজেরাই খেতে পাই না, তার মধ্যে আবার একজন।

তো কি?

না, না, আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে সে আমায় বলেছিল।

কি?

অভিজিৎ-এর কথা বিন্দুমাত্র বোধগম্য হচ্ছে না মহুয়ার। অভিজিৎ-এর গলায় কেমন সঙ্কোচের সুর, আর যেন দ্বিধাগ্রস্তও।

মানে আমি বলছিলাম এখনই আমাদের সন্তানের দরকার কি?

দরকার! আসছে সে মহুয়ার জীবন রঙে রসে পরিপূর্ণ করে দিতে, আসছে মহুয়ার নতুন সন্তান, তার আবার 'দরকার কি'র মানে কি?

অভিজিৎ একটু থামল, একবার কাশল, তারপর বলল, কিছু রিস্ক নেই; আমার বন্ধু বলছিল একটা স্ট্রং মিকশ্চারেই···

তবুও বুঝতে পারল না মহুয়া; অভিজিৎ মহুয়ার কানের কাছে নীচু হল।

না, না, না।

মহুয়ার তীব্র চীৎকারে ঘর কেঁপে উঠল যেন।

চুপ চুপ।

সন্ত্রস্ত অভিজিৎ মহুয়ার মুখে হাত চাপা দিল। এ তুমি কি বলছ? একি পাপ কথা!

মহুয়া ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকল।

আঃ-হা, তোমার আপত্তি থাকলে হবে না, কি মুস্কিল, আমি এই প্র্যাকটিকাল দিক ভেবেই বলেছিলাম আর কি; আচ্ছা আচ্ছা!

অপ্রস্তুত অভিজিৎ মহুয়াকে বুকের কাছে টেনে নিল;

যাও তুমি!

মহুয়া ছিটকে সরে গেল অভিজিৎ-এর বাহু-বন্ধনের মধ্য থেকে, তুমি, তুমি··

অভিজিৎ আবার ঘন হয়ে এল স্ত্রীর পাশে।

মৌ! লক্ষ্মী, আমায় ভুল বুঝো না, তুমি না চাও হবে না, বলেছি ত', কিন্তু আমায় উল্টো বুঝো না তুমি, আজকাল সবাই করে তাই······

না, না, না।

ঠিক আছে, হবে না—হবে না।

অভিজিৎ আবার স্ত্রীর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিল; নীচু হয়ে ওর ঠোঁটে চুমো খেল, মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে বার-বার বলল—

লক্ষ্মী আমার, রাণী আমার· শান্ত হও চুপ কর।

দোলনায় শুয়ে খোকা ঘুমুচ্ছিল, আর মাটিতে বসে মহুয়া কাঁথা সেলাই করছিল। দরজার কড়া নড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মহুয়া।

নিশ্চয় পিওন। নিশ্চয় আজ এসেছে অভিজিৎ-এর চিঠি আর মনি-অর্ডার।

আজ প্রায় দু'মাস হতে গেল মহুয়া কোন খবর পায় নি অভিজিৎ-এর। কেমন করে যে মহুয়ার দিনরাত্রি কাটছে। প্রথম যখন অভিজিৎ ব্যবসার জন্য মণিপুর আসাম যেতে চাইল তখনই বাধা দিয়েছিল মহুয়া।

না, না, না; কোথাও যেতে পারবে না তুমি, আমি পারবো না, পারবো না তোমায় ছেড়ে থাকতে একলা।

পাগলী!

অভিজিৎ স্ত্রীকে আদর করে বলেছিল ভয় কি?

ভয় কি! আমি ফিরে আসব সাত-আট দিনের মধ্যেই।

না, তুমি যেতে পাবে না, কিছুতেই না। রাতের অন্ধকারে স্বামীর গেঞ্জি মুঠো করে চেপে ধরেছিল মহুয়া; যেন কোন অদৃশ্য শক্তি টেনে নিচ্ছে ওর স্বামীকে ওর কাছ থেকে, মহুয়ার যুদ্ধ তারই সঙ্গে।

না গেলে কি করে হবে মৌ! দেখছো না এই ব্যবসাটা শুরু করে অবধি আর কিছু না হোক, দু'বেলা ভাতের সংস্থান হয়েছে আমাদের।

তা ঠিক, দাদা এসে অভিজিৎকে কি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে, 'মিলিটারী অর্ডার সাপ্লাই'—তাই ত' অভিজিৎ বলে। স্কুল ছেড়ে ট্যুইশানী ছেড়ে একমন হয়ে অভিজিৎ সেই কাজই করছে। আর সত্যিই তেমন অভাবও নেই এখন। আর অভাবের শেষ হওয়ার প্রয়োজন ছিল একান্তই।

খোকা এসেছে না এখন? খোকন, সোনা, মাণিক মহুয়ার চোখের মণি, বুকের হার! নিজেরা যত অভাবেই থাকুক, যত কষ্ট পাক কিছু এসে যায় না, কিন্তু খোকন না ও যে রাজা। ওর যে অনেক কিছু চাই ওভালটিন, অস্টার-মিল্ক খেলনা, জামা কাপড়, গাড়ি। ঘরের কোণে রাখা বড় পেরাম্বুলেটরের দিকে তাকাল মহুয়া। দাদাটা পাগল, খোকন জন্মাবার কত আগেই এই গাড়ি কিনে দিয়েছে দাদা! ওদের তখনকার সেই বাড়িতে রাখবার জায়গাও ছিল না।

খোকন জন্মাবার পর মহুয়ার রোজ জ্বর হচ্ছে আর রোগা হয়ে যাচ্ছে বলে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে সেই পুরোন বাড়ি ছেড়ে উঠে এসেছে ওরা। বাড়ি পাওয়া যা শক্ত আজকাল; দাদাই যোগাড় করে দিয়েছে এই বাড়ি। ওর কোন বন্ধুর বাড়ি যেন। যুদ্ধে ব্যবসা করে সেই টাকাতেই করেছে বাড়ি। টালিগঞ্জের ব্রিজের কাছে ছোট একতলা বাড়ির একধারে দু'টি ঘর।

একতলা হলেও বাড়িটা নতুন কি না!

সঞ্জয় প্রত্যয়ভরা গলায় বলেছিল।

এখানে অনেক ভাল থাকবি তোরা, আর এই কচি বাচ্চা নিয়ে কি ঐ ভাঙ্গা বাড়িতে পোষায়!

তারপর আমতা আমতা করে মাথা চুলকে বলেছিল সঞ্জয়। আমাদের বাড়ি ত' খালিই পড়ে আছে।

আমাদের বাড়ি, অর্থাৎ লাভলক প্লেসের মহুয়াদের সেই নিজেদের বাড়ি। সেইখানে থাকা?

না রে দাদা।

কেন কি হয়েছে?

ধ্যেৎ তা হয় না; বুঝিস না কেন?

তারপর মুখটা নামিয়ে লজ্জা লজ্জা কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিল মহুয়া, আমি ত' এখন শুধু তোদের বাড়ির মেয়ে নই রে দাদা, অন্যের স্ত্রী।

তাই নাকি?

ঘর ফাটিয়ে হেসেছিল সঞ্জয়। তারপর মহুয়ার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল।

আচ্ছা! আচ্ছা।

সেও আজ কতদিন হয়ে গেল।

তারপর দাদা আবার যুদ্ধে চলে গেল, আবার এল আবার গেল, আর এইবার দাদা যাবার পরই এই আবার কি এক নতুন ব্যবসায়ে মাতল অভিজিৎ। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দিনরাত কেবলই ঘুরছে; ঘুরছে অভিজিৎ টাকার ধান্দায়, ব্যবসার কাজে। আর কি সব বন্ধু-বান্ধব আজকাল অভিজিৎ-এর, তারা নাকি সব ওর ব্যবসার লোক। ভাল লাগে না, একটুও ভাল লাগে না মহুয়ার। কেমন যেন কান্না পায়। কেমন যেন মনে হয় মহুয়ার, অভিজিৎ ব্যবসা নিয়ে বড় বেশি মেতেছে, একটু একটু করে দূরে চলে যাচ্ছে মহুয়ার কাছ থেকে। আর আজ ছ'মাস হল কতদূরেই ত' চলে গেছে; যাবার সময় মহুয়ার হাতে হাত রেখে অভিজিৎ বলেছিল ভয় কি? সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসব। তোমাকে, খোকাকে ছেড়ে বাইরে বেশিদিন কি থাকতে পারি আমি?

কিন্তু কথা রাখে নি অভিজিৎ; সাতদিন বাদে এসেছিল অভিজিতের চিঠি আর কিছু টাকা। তারপর এখান-ওখান থেকে চিঠি এসেছে, আর সব চিঠিতেই সেই এক কথা—শীগগিরই ফিরছি, কোন ভাবনা কোর না।

এমনি করেই দেখতে দেখতে কেটে গেছে ছ'মাস; ছ'মাসের খোকন এক বছরের হয়েছে, হামাগুড়ি ছেড়ে দাঁড়াতে শিখছে, টলে টলে চলতেও পারে। কিন্তু কোথায় অভিজিৎ আজ ছ'মাসের মধ্যে না কোন চিঠি, না কোন টাকা। কি করে যে মহুয়ার দিন কাটছে।

তার ওপর আজ চারদিন ধরে খোকনের জ্বর। শেষ সম্বল দিয়ে ডাক্তার এনেছিল মহুয়া; ডাক্তারের দর্শনী, ওষুধ আর অস্টার-মিল্ক, তাইতেই বেরিয়ে গেছে সব। হাতে আর একটিও পয়সা নেই; আজও যদি টাকা না আসে কি হবে জানে না মহুয়া।

দরজার কড়া আরো জোরে নড়ে উঠল।

যাই, যাই!

ঘুমন্ত খোকার চারপাশে মশারি ভাল করে গুঁজে দিয়ে ঘর থেকে বেরুল মহুয়া। দিনের বেলাতেও মশারি ফেলেই ছেলেকে ঘুম পাড়ায় মহুয়া, মশা না থাক, কতরকম পোকা মাকড় মাছি থাকতে পারে ত'।

এই চিঠিতে নিশ্চয়ই অভিজিৎ ফিরে আসার দিনও জানিয়েছে, আর টাকা! কত টাকা পাঠিয়েছে অভিজিৎ? শ' তিনেক নিশ্চয়ই। দু'মাসের বাড়িভাড়াও বাকি যে।

এই সময় মহুয়া রোজই অপেক্ষা করেছে মনি-অর্ডার পিওনের; অবশেষে এল কি সেই বহু-প্রতীক্ষিত দিন।

মহুয়া খুশি মনেই দরজা খুলল। আর দরজা খুলে পিওনের বদলে দেখল নিখুঁত সাহেবী পোষাকপরা অজয়দা'কে।

এ কি, অজয়দা' তুমি! তুমি কোথা থেকে?

আর বলিস কেন, অজয় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তোর ঠিকানাই পাই না; সঞ্জয়ের সঙ্গে ত' আমার দেখা হয় নি বহুকাল।

এস, এস, বস। বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল মহুয়া। বল, তারপর তোমার সব খবর।

আমার খবর কাগজে দেখিস না?

কাগজে?

মহুয়া অবাক হয়ে গেল। কাগজে লিখছ না কি আজকাল? কি লিখছ অজয়দা'? কবিতা? গল্প? উপন্যাস?

সব সব। বিজ্ঞের হাসি হাসল অজয়। গল্প, উপন্যাস, শুধু ঐ কবিতা বাদ।

সত্যি! ও মা, কোন্ কাগজে লিখছ?

লিখছি, তবে কাগজে নয়।

কাগজে নয়, তবে আবার কিসে লেখা যায়?

সেলুলয়েডে।

কোথায়?

সেলুলয়েড, সেলুলয়েড। ফিল্ম ডিরেক্টর যে আমি এখন, জানিস না?

ফিল্ম ডিরেক্টর! তুমি!

মাথা নাড়ল মহুয়া।

না, জানি না ত'!

বাঙলা ছবি দেখতে গেলেই ত' আমার ছবি রে! পর-পর সব হিট।

কি? হিট! হিট কি?

ফ্লপ নয় একটাও সব সুপার হিট। টাকা যা পেয়েছে না, আমার ছবির প্রোডিউসার!

ও, you mean,—

এতক্ষণে বুঝল মহুয়া।

খুব success হয়েছে।

হ্যাঁ, তাই। আশ্চর্য! তুই আমার ছবি দেখিস নি?

না ত'।

মহুয়া একটু কুণ্ঠিত হল।

আর শুধু অজয়ের কেন, কোন ছবিই মহুয়ারা দেখে না, প্রয়োজনই মনে করে না কখনো, আর টাকা! সিনেমা দেখবার মত অপর্যাপ্ত টাকা কি মহুয়ার ভাণ্ডারে কোনদিন ছিল? আর তার জন্য কোন অভাবই ত' বোধ করে নি মহুয়া কোনদিন?

সব কাজ সেরে সন্ধ্যেবেলার গা ধুয়ে, চুলে বেলফুলের মালা দিয়ে অভিজিৎ-এর কোলে মাথা রেখে সেই এক চিলতে ছাদের ওপর মাদুর পেতে শুত মহুয়া, আর অভিজিৎ বাঁশিতে ধরত কোনদিন বেহাগ, কোনদিন মূলতান আবার কোন কোন দিন বাঁশি বাজত মহুয়ার গানের সঙ্গে।

সম্পূর্ণ হয়ে উঠত জীবন, পরিপূর্ণ হত সুখের পশরা। বাইরে যেতে, সিনেমা দেখতে, বেড়াতে কোনদিন আর ইচ্ছে হয় নি মহুয়া বা অভিজিৎ-এর।

চল দেখবি আজই আমার ছবি, দারুণ লেগেছে এ বইটা। আরো ভাল হত যদি হিরোইনটা ভাল হত; আমার নেকৃস্ট বইটা দেখবি।

খুব ভাল হবে বুঝি?

দুর্দান্ত! সিনারিও যা করেছি না একখানা! আর কি powerful dialogue! আঃ!

অজয় গর্বভরে পা ছড়িয়ে দিল সামনে, টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল মেঝের ওপর।

তাড়াতাড়ি রং-করা মাটির অ্যাস-ট্রেটা সামনে এগিয়ে দিল মহুয়া।

সে ছবিটা কবে বেরুবে?

এই কয়েকমাসের মধ্যেই। হিরোইনের ডেট পেলে ত' আর দেরি হয় না। যত ঝামেলা বাধিয়েছে ঐ সুলেখা সান্যাল।

সেই বুঝি তোমার ছবির হিরোইন?

হ্যাঁ, সেই ত' এখন সবচেয়ে নামকরা, সবচেয়ে কস্টলি স্টার। ও-সব প্রমীলাবালা, চারুবালারা পাত্তা পায় না আর।

তাই বুঝি!

মহুয়ার জ্ঞান এত পরিমিত এ-বিষয়ে যে, আর বেশি আগ্রহ না দেখানোই নিরাপদ। কিন্তু অজয়ের আগ্রহের শেষ নেই, সে মহুয়াকে শোনাবেই তার ছায়াছবির জগতের ইতিহাস।

অগত্যা হাতের ওপর মুখ রেখে শুনল মহুয়া কত টাকা আসে আজকাল ছবি করে, কিভাবে ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা হু-হু করে নামছে এসে সিনেমায়, কত করে 'ব্ল্যাক মানি' নেয় সবাই,···ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে মহুয়া ক্লান্ত হোল, ঘুম পেল। ভাগ্যিস খোকাটা ঘুমুচ্ছে, তাই একটু অবসর আছে মহুয়ার, না হলে

কি এতক্ষণ ধরে অজয়দা'র এত বকবকানি শোনার সময় হোত।

অজয়দা' মানুষটা কিন্তু বেশ, সিনেমার ডিরেক্টার হোক আর যাই করুক আসলে কিন্তু বদলায় নি একটুও।

অজয় ঘুমন্ত খোকাকে দেখে তার ছোট্ট মুঠির মধ্যে পুরে দিল দশ টাকার একটা নোট, কাল আবার আসবে বলে প্রায় বারটার সময় উঠে পড়ল অজয়।

পিওন আজও এল না।

দরজা বন্ধ করতে করতে মহুয়া ভাবল, কি যে হবে। হঠাৎ মনে পড়ল অজয়দা' খোকার মুখ দেখে দিয়ে গেছেন দশ টাকা, বাঁচা গেল, এই দশ টাকায় দিনতিনেক চলে যাবে মহুয়ার। কাল থেকে খোকার ওষুধ আসে নি, আগে ওষুধ আনতে পাঠাতে হবে পাশের বাড়ির সেই বাচ্চা চাকরটাকে দিয়ে। না লোক এখনও রাখতে পারে না মহুয়া, এই দুর্মূল্যের বাজারে আরও একটি মুখ, আরো একজনের খাওয়া-পরা।

অভিজিৎ বলেছিল, তোমার শরীর ভাল নেই, সহ্য হচ্ছে না এত খাটুনি।

না গো না, এখন না, এখন না।

মহুয়াই রাখতে দেয় নি কোন লোক, কিন্তু এখন অভিজিৎ-এর অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে মনে হয় রাখলে হোত একটা লোক, ছোট ছেলে একটা, বাজার যাওয়া, ওষুধ আনা এগুলো ত' করতে পারত সে। খোকনকে প্যারাম্বুলেটরে নিয়ে কতবার আর বেরুনো যায়, আর খোকা বড় হয়েছে এখন, চঞ্চল হয়েছে, জেগে থাকলে এমন লাফালাফি করে গাড়ির মধ্যে যে ভয় হয় পড়ে গেল বুঝি!

পরদিন সকাল দশটায় আবার কড়া নড়ে উঠল, আজ নিশ্চয়ই পিওন! নিশ্চয়ই মনি-অর্ডার! কিন্তু না, আবার অজয়, আবার সেই লাল টাই, ঘি রঙের নিখুঁত সুন্দর সাহেবী পোষাক।

এস অজয়দা'।

কেমন আছে খোকন?

একটু ভাল মনে হচ্ছে, ঘুমুচ্ছে ত';

অভিজিৎ-এর খবর কিছু এল?

না অজয়দা', কোন খবরই নেই, না চিঠি, না টাকা।

আসবে, আসবে, ভাবিস না; টাকা চিঠি কেন, অভিজিৎ নিজেই এসে যাবে।

অভিজিৎ! অভিজিৎ নিজেই এসে যাবে; কবে কখন?

কেন এত দেরি করছে অভিজিৎ? ও কি জানে না, ওর মহুয়া ওর বিরহ সইতে পারে না। স্বামীকে ছেড়ে ঘুমুতে পারে না, স্বামীর বুকে মাথা না রেখে।

এ কি! এই মৌ! তুই কাঁদছিস না কি?

না, না কাঁদি নি। অপ্রস্তুত মহুয়া আঁচলের কোণে চোখের জল মুছল।

আচ্ছা মৌ!

কি অজয়দা'!

অজয় একটু যেন ইতস্তত করল, একবার কাশল, তারপর বলল, তুই ত' ইচ্ছে করলেই পারিস অভিজিৎকে সাহায্য করতে।

তার মানে?

মানে বলছি যে তুই ত' কিছু উপার্জন করতে পারিস, তাতে তোদের কিছু সুবিধেও হয়, আর অভিজিৎকেও টাকার জন্যে এমন হন্যে হয়ে বিদেশ ঘুরে বেড়াতে হয় না।

এক্ষুণি রাজি আমি অজয়দা', আছে তোমার হাতে কোন কাজ!

আছে বৈ কি! না হলে আর বলব কেন!

কবে থেকে অজয়দা'! কবে থেকে! কত মাইনে!

অ্যাপ্লিকেশান তোমার হাতে দিলেই হবে!

হ্যাঁ আমিই ত' সব। অ্যাপ্লিকেশান দিতে হবে না, তবে তোর একটা স্ক্রিন টেস্ট লাগবে বৈ কি। যদিও আমি জানিই যে তুই···

মহুয়া ভাল বুঝতে পারল না কথাটা।

আবার পরীক্ষা দিতে হবে না কি!

আরে না না, সে কিছুই নয়, একটু দেখে নিতে হবে ত' আগে। মেক-আপ করে কি রকম আসে, যদিও আমি জানিই যে তোর মুখ··

কি বলছ অজয়দা'! মেক-আপ, আমার মুখ, কিছুই ত' বুঝতে পারছি না।

সব বুঝিয়ে বলছি তোকে। শোন আমি একটা মস্তবড় হিন্দী ছবির কনট্রাক্ট পেয়েছি।

তাতে কি!

তাতে নতুন হিরোইন নামাতে চাই, অথচ হিন্দী উচ্চারণ তার ভাল হওয়া দরকার, তাই তোর কথাই আমার মনে এল আগে।

আমি! আমি নামব ছবিতে!

মহুয়া অবাক হয়ে গেছে।

হ্যাঁ রে; তোর যা মুখ আর ফিগার না? ছবিতে নামলে তোর লাখ লাখ টাকা মারে কে?

কি বলছ অজয়দা'?

হ্যাঁ রে, ঠিকই বলছি, কত চাস তুই বল; চেক বই পকেটে করে নিয়েই এসেছি আমি। দশ হাজার, পনের হাজার, বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার···বল বল···।

অজয়দা'!

চীৎকার করে উঠল মহুয়া।

এসব কি যা-তা বলছ তুমি !

কেন রে ? ফিল্মে ত' আজকাল ভদ্রঘরের মেয়েরা নামছে।

আমাকে ফিল্মে নামাতে এসেছ তুমি—তুমি অজয়দা' ?

মহুয়া হাঁফাতে লাগল।

কি মুস্কিল এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন ? আমি কি অন্যায় মনে করলে তোকে একথা বলতে আসতাম ?

তা ঠিক। অজয়দা' নিজের মনে জানে এতে কোন দোষ নেই, নেই কোন অপরাধ, তাই সহজেই কথাটা বলতে পেরেছে।

ভেবে ছাখ মহুয়া ; খ্যাতি, নাম, অর্থ।

থাক, থাক অজয়দা'।

মহুয়া হাত তুলে থামিয়ে দিল, আমার খ্যাতি, প্রতিপত্তি চাই না ভাই।

কিন্তু টাকা। ভেবে ছাখ মৌ, একটা ছবি করেই তুই বাড়ি করে ফেলতে পারিস একটা ; পঞ্চাশ, আশি হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে আমার প্রোডিউসার।

না অজয়দা'।

বেশ স্থির দৃঢ়কণ্ঠ মহুয়ার।

কেন মৌ এতে খারাপ কি আছে ?

না অজয়দা', খারাপ বলি নি, তবে আমি নয়, আমার জন্য নয় ওপথ।

ভেবে ছাখ মৌ।

দেখেছি অজয়দা'। ভাববার কিছু নেই আর।

পয়সার দরকার নেই তোর ?

পয়সার দরকার নেই আমার ! মহুয়া ক্ষীণ হাসল। একটা ফুটো পয়সাও যে আজ মহুয়ার কাছে সোনার মোহর। তাই বলে অভিনেত্রী হবে !

না।

আচ্ছা অজয়দা' ! তুমিই না আমার কবিতা বের করেছিলে প্রথম ?

তা করেছিলাম বটে, তুই এখনও লিখিস মৌ ?

কই আর লেখা হয় সময়ই পাই না ; বড় ইচ্ছে ছিল একটা কবিতার পত্রিকা বের করার।

শুধু কবিতার কাগজ ?

হ্যাঁ।

সেরকম কাগজ চালানো মুস্কিল। বিজ্ঞাপনই পাবি না।

তা বটে, শুধু কবিতার কাগজ সাধারণে কিনবে না, বিজ্ঞাপনওয়ালারা বিজ্ঞাপন দেবে না।

আচ্ছা বিজ্ঞাপন ছাড়াই একটা পত্রিকা বের করা যায় না, মহুয়ার মনের কথাই যেন বললেন অজয়দা'। বিজ্ঞাপন ছাড়াই যদি চালাতে পারিস কাগজ—

তাকি হয় অজয়দা' ?

হয়, নিজের যথেষ্ট টাকা থাকলে।

সে টাকা আমি পাব কোথায় অজয়দা' ?

তাই ত' বলছিলাম ফিল্মে নাম। শুধু যে তোর সংসার চলবে ভাল করে তাই নয়, বাড়তি টাকা দিয়ে তুই সাহিত্যের বিলাসিতাও করতে পারিস।

সাহিত্য যদি বিলাসিতাই হয়, আর ফিল্মে না নামলে যদি সে বিলাসিতা করা সম্ভব না হয়, আমার পক্ষে তবে সাহিত্য করা আর হয়ে উঠল না এ জীবনে অজয়দা'।

এতদূর!

যা বল।

খোকন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, মহুয়া ছুটল পাশের ঘরে।

ও আমার সোনা মাণিক! কি হয়েছে তোমার? কেন কাঁদছ তুমি!

মহুয়া খোকার নরম গালে নিজের গাল চেপে ধরল। বড্ড যেন গরম খোকার গা।

জ্বর ত' ছাড়ে নি খোকার অজয়দা'।

ও কিছু নয়, ছোট ছেলেদের ওরকম হয়েই থাকে। তুই কিছু ভাবিস নি, আমি আবার কাল আসব, সব ঠিক হয়ে যাবে। খোকনের জ্বর আজ রাত্রেই ছেড়ে যাবে।

আশ্বাস দিয়ে অজয়দা' চলে গেল; বারবার বলে গেল কাল সকালেই আসবে খোকন কেমন আছে দেখতে।

কিন্তু পরদিন সকালে অজয়দা' এল না, পরের দিনও না, তারপরের দিনও না।

পিওন এল না টাকা নিয়ে, এল না কোন চিঠি, এল না অভিজিৎ, সঞ্জয় কেউ।

কেউ এল না খোঁজ নিতে, কেউ এসে দাঁড়াল না পাশে, আর খোকনের জ্বর বাড়তে বাড়তে একশ'-পাঁচে উঠল; ঘরে এক আধলা নেই, ওষুধের দোকানে ধার জমেছে ডাক্তার শুধু দয়া করে এলেন।

ঠিক আছে, ভাবছেন কেন, আমার টাকা মিটিয়ে দেবেন অভিজিৎবাবু আসলে। সেজন্য কিছু নয়, এখন এই ওষুধগুলো আনিয়ে নিন দেখি। ডাক্তার খস-খস করে কাগজ টেনে প্রেসক্রিপসান লিখলেন।

ওষুধগুলো আমার ডিসপেনসারি থেকেই আনিয়ে নিন। মাস কাবারে টাকা দেবেন।

খোকার কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?

নিউমোনিয়া, দু'টো বুকেই। ডাক্তার চলে গেলেন, আর প্রেসক্রিপসানের কাগজ হাতে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া।

খোকন! মাণিক সোনা! একি হোল তোর! ওরে, চোখ খোল, হাস, তোর মার দিকে চেয়ে দেখ, আধ-আধ স্বরে মা বলে একবার ডাক। আমি যে আর পারি না, আর যে পারি না আমি।

কোথায় তোর বাবা? কেমন আছে সে? সে কি আর ফিরবে না আমার কাছে! সে কি আর নেই? তুইও কি চলে যাবি আমায় ছেড়ে?

দোলনার নীচে মেজেয় বসে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল মহুয়া। তার এই ছ'মাসের দুর্ভাবনা, অভিজিৎ-এর বিরহ, নিঃসঙ্গ জীবনের অসহায় একাকীত্ব সব বেরিয়ে এল ফোঁটায় ফোঁটায়। মহুয়া অনেক, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল, কেঁদে কেঁদে শান্ত হোল।

তারপর তিনদিন ধরে চলল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। ওষুধ, ইনজেকসান, অক্সিজেন। সেই পেনিসিলিন আবার। তিনদিন পর ডাক্তার বললেন আর ভয় নেই।

লেবুর রস, হরলিক্স আর বি ভিটামিনের টনিক। এইবার সত্যিই সঙ্কট। এসব তো ডাক্তারখানা থেকে বাড়িতে আসবে না। এসব তো নগদ পয়সা দিয়ে কিনতে হবে দোকান থেকে। মহুয়ার চোখ ফেটে জল এল। অর্থের অভাবে খোকনের হরলিক্স আসবে না, লেবুর রস খাবে না খোকন, আর ঐ টনিক না খেলে সেরে উঠবে কি করে?

কি হবে? কি উপায় হবে? কোথায় টাকা? টাকা। হ্যাঁ নোট, দশ টাকা, একশ' টাকা হাজার টাকার নোট। মহুয়া খোকার দোলনা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। কি শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে আজ খোকন ওর জ্বর ছেড়ে গেছে, সেই অস্বাভাবিক লাল আভা আর নেই মুখে লেপে, বিশ্রী ঘড়ঘড়ে আওয়াজ নেই নিঃশ্বাসে, সহজ স্বাভাবিক, প্রায় সুস্থ খোকন। কিন্তু ওকে একেবারে ভাল করতে, সবল করতে এখন প্রয়োজন হরলিক্স্-এর, প্রয়োজন কমলালেবু কেনার, প্রয়োজন টনিকের। অভিজিৎ কেন আসছ না তুমি? কোথায় গেলে। ঝনঝন করে কড়া নড়ে উঠল।

অভিজিৎ, নিশ্চয় অভিজিৎ। মহুয়া ছুটে গিয়ে দরজা খুলল।

না অভিজিৎ নয়। অজয়দা'। সেই লাল টাই, সেই ক্রিস স্যুট।

ভাল আছিস যে?

অজয়দা' তুমি!

হ্যাঁ রে ক'দিন আসতে পারি নি; হঠাৎ বম্বে চলে যেতে হয়েছিল এক মেয়ের খোঁজ পেয়ে, তুই ত' আর করলি না। একেবারে সব ঠিক করেই চলে এলাম। কেমন আছে খোকন?

এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলে অজয়দা' কোট খুলল।



● পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে পুনর্নিযুক্তা হওয়ার পর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু শপথ গ্রহণ করছেন

মাসিক বসুমতী

মাঘ / '৭১



● শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা : ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন সভানেত্রী

● ভারত সীমান্তে পাহাড়ী নদীর উপর রজ্জু-সেতু অতিক্রমরত ভারতীয় জোয়ান দল

● ইস্রায়েলের রসায়ন-বিজ্ঞানী মিঃ লেউইন উদ্ভাবিত অগ্নিনিরোধক কাঠের ঘরের একটি আলোকচিত্র

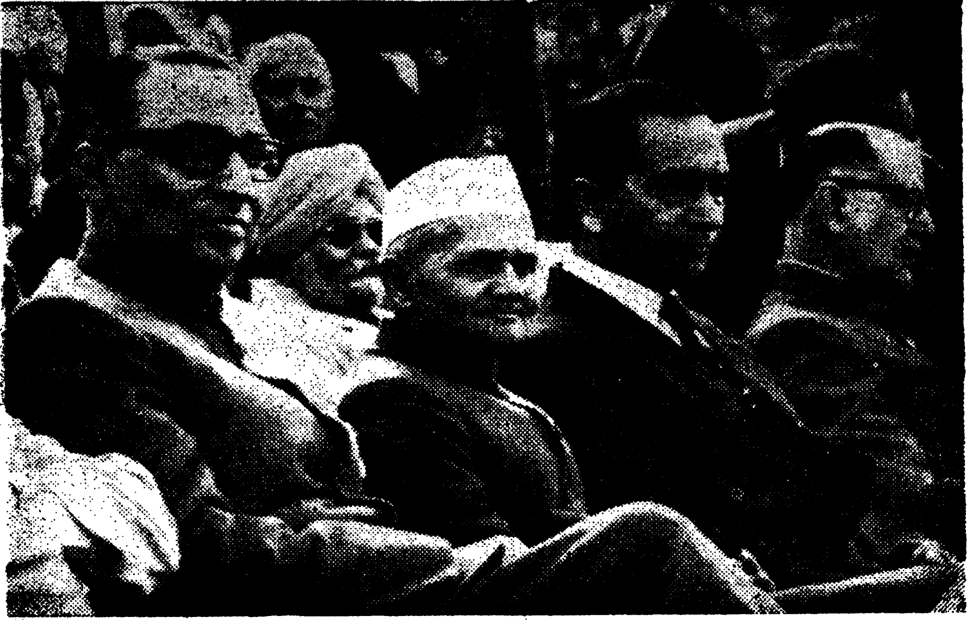




● দুর্গাপুর সার-কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী



● শিবির-শিক্ষার্থীদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন কেন্দ্রীয়-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী



● নেহরু-স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা উপভোগ করছেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীঅশোককুমার সেন



● ভারতের আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা-মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন : ক্রীড়াবিদের ভূমিকায়

চল, খোকনকে দেখে আসি। খুব অসুখ করেছিল খোকনের।

তাই না কি? ইস্! কি হয়েছিল?

অজয়দা' ঘুমন্ত খোকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বাঃ বেশ শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে. মনে ত' হয় না কোন অসুখ আছে ওর

এখন ত' ভাল; তখন যদি দেখতে!

মৌ! যা, আমার কোটটা ও-ঘরে আছে চেয়ারের ওপরে। তার পাশ-পকেটে একটা লম্বামত বাক্স আছে, নিয়ে আয় ত' সেটা।

কি আছে তাতে?

খোকন চোখ খুলে তাকাল কথাবার্তার শব্দে।

ও মা! এই ত' রাজার ঘুম ভেঙেছে। কেমন মিটিমিটি হাসছে আমাকে দেখে, ত্যাখ মৌ!

অজয় হাত বাড়াল খোকনকে বিছানা থেকে তোলার জন্য।

না, না অজয়দা' তুলো না, তুলো না।

আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা চট করে বাক্সটা নিয়ে আয় ত'।

মৌ এ-ঘরে এল। বাক্সটা খোঁজার জন্যে কোটটা উঁচু করে ধরতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল মহুয়ার। নোট! রাশি রাশি নোট! দশ টাকার, একশ' টাকার, হাজার টাকার নোটও এর মধ্যে আছে কি না কে জানে।

মহুয়ার হাত মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে গেল। টাকা! এত টাকা একসঙ্গে! যে টাকার চিন্তা দিনে রাতে পাগল করে রেখেছে মহুয়াকে, যে টাকার চিন্তা, নোটের স্বপ্ন চেতনে অবচেতনে ঘিরে রেখেছে মহুয়াকে সেই টাকা এমন ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি করে একই জায়গায়। এর একটা মাত্র নোটেই কত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় মহুয়ার। খোকার হরলিক্স আসে, ফল আসে, ওষুধ আসে, গরম কাপড়ের নতুন জামা হয়, মহুয়ার নিজেরও কত প্রয়োজন মেটে, শুধু কি ভাঁড়ার ভরে চাল ডাল আর তরি তরকারিতে। মহুয়া কিনতে পারে নতুন কাপড়, গরম চাদর. কম্বল আর তেমন হলে অভিজিৎ-এর খোঁজ করতে মণিপুর চলে যেতে পারে; টেলিগ্রাম ত' করতে পারে এখুনিই।

টাকা কত টাকা!

বাক্স না খুঁজে কি ঐ দিকেই হাত বাড়াবে মহুয়া?

না, না টাকা ত' মহুয়ার নয়, ও টাকা যে অজয়দা'র, অত টাকা সব যে অজয়দা'র; সব, সব যে অজয়দা'র।

মহুয়ার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল. চোখের সামনে টাকা, টাকা, টাকা। যদি মহুয়া হাত বাড়িয়ে ঐ নোটের স্তূপ থেকে টেনে নেয় একখানা নোট—যদি, যদি, কিন্তু সব টাকাই যে অজয়দা'র। তবে, তবে কি!...চোখের সামনে সব মিলিয়ে যাচ্ছে, শুধু রাশি রাশি কাগজের টাকা উড়ছে, ভাসছে হাওয়ায়, মহুয়ার গায়ের ওপর, চোখের ওপর, মাথার ওপর এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে; মহুয়া হাত বাড়িয়েই দিয়েছে তবু ধরতে পারছে না।

ধোঁয়া, ধোঁয়া, কাগজ নোট, কত নোট, কত টাকা, ঐ, ঐতো অজয়দা'র টাকা। না না ওতো সব মহুয়ার। মহুয়ার টাকা, মহুয়ার নিজের টাকা।

মহুয়া হাত বাড়িয়ে শূন্যে কি ধরার চেষ্টা করল, আর পরক্ষণেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, আর চেতনার শেষ মুহূর্তে চোখের সামনে দুলে উঠল সেই লাল টাই। আর কোন একটা মুখ, বড় পরিচিত, বড় প্রিয়।

* * *

চোখ খুলে মহুয়া অবাক হয়ে গেল। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পাশে বসে এ কে?

অভিজিৎ!

তুমি, তুমি!

মহুয়া উত্তেজনায় বিছানা থেকে উঠে বসল। তুমি, তুমি কখন এলে?

ঠিক যখন তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে।

আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম!

হ্যাঁ গো! ঠিক সময়েই আমি এসে পড়েছিলাম;

এখন তুমি একদম আমার বুকের কাছে, আমার দু' হাতের···

অভিজিৎ নীচু হয়ে মহুয়ার কপালে চুমো খেল, আর তখনই মহুয়ার চোখে পড়ল সেই লাল টাই।

একি? এ তুমি কোথায় পেলে? তোমার গলায় টাই কেন?

উত্তেজিত কণ্ঠ মহুয়ার।

অজয়দা' কোথায়?

তোমার জন্য ওষুধ আনতে গেছেন। শুয়ে পড় মৌ, শুয়ে পড়।

কিন্তু মহুয়া শুতে পারল না, অবাক চোখে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। কোথায় অভিজিতের সেই খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবী; কোথায় সেই অমলিন শুভ্রতা। ঝকঝকে সাহেবী পোষাক পরনে, দামী টাই গলায় এ অভিজিৎ নয়, যেন অন্য কেউ।

কি হল মৌ, এরকম করছ কেন?

কিছু না, তুমি এরকম পোষাক পরেছ কেন?

ও এই কথা।

অভিজিৎ হাসল।

বনে বনে পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে হয়। তা ছাড়া সব বড় বড় মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে হয়, পার্টিতে যেতে হয়।

অভিজিৎ খুব সহজভাবেই ওর বেশ পরিবর্তনের কারণ বলে গেল। কিন্তু মহুয়ার কেমন যেন মনে হল। মনে হল এ যেন ঠিক অভিজিৎ নয়, এ যেন আর কেউ।

তারপরই আরম্ভ হল পরিবর্তন।

কি দ্রুত বদলে যেতে লাগল সব কিছু। অভিজিৎ শুধু বেশই পরিবর্তন করে নি, বদলে ফেলেছে তার জীবন। তার হাবভাব, আচার আচরণ।

আজকাল ওর মুহূর্তের সময় নেই।

সদাই ব্যস্ত, সদাই কাজ।

এই ত' এলে আবার কেন বেরুচ্ছ?

মহুয়া স্বামীর কোট ধরে টানে, কোথায় যাচ্ছ?

কি মুস্কিল!

অভিজিৎ-এর মুখে-চোখে স্পষ্ট বিরক্তি, কাজ নেই আমার?

সারাদিন ত' কাজ করে এলে, আবার সন্ধ্যের সময়ও কাজ?

মিঃ বসুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, একটা বড় মিলিটারী কনট্রাক্ট!

যুদ্ধ ত' শেষ হয়ে গেল, আবার কিসের মিলিটারী?

কি যে গাঁইয়ার মত কথা বল!

অভিজিৎ ওর বিরক্তি আর গোপন রাখতে পারে না। যুদ্ধ থেমে গেছে বলে মিলিটারীও উঠে যাবে নাকি? তারা খাবে না, পরবে না, বাঁচবে না?

যত খুশি বাঁচুক তারা, কিন্তু আমিও যে বাঁচতে চাই?

অভিজিৎ এবার সত্যি অবাক হোল। তোমার, তোমাদের বাঁচার জন্যেই ত' এত কাণ্ড, এত খাটুনি আমার। এত খেটে পয়সা উপার্জন করছি কার জন্যে মৌ?

না, না পয়সা আমি চাই না, আমি তোমায় চাই।

মৌ!

অভিজিৎ কাছে এগিয়ে এসেছে, এ কথা যেন আর কখনও না শুনি, পয়সা চাই না আমাদের? জান না, পয়সার অভাবে কি দিন কাটিয়েছ তুমি? তুমি আমায় বল নি যে সেদিন অজয়ের পকেটে টাকা···

চুপ কর, চুপ কর, আর শুনতে চাই না, আর না।

দু'হাতে কান চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে মহুয়া, উপুড় হয়ে পড়েছে বিছানায়। না, সত্যি কথা বলে নি মহুয়া। পয়সা চাই, যথেষ্ট পয়সা চাই, ভাঁড়ার ভর্তি চাল-ডাল চাই, অসুখে ওষুধ চাই, শীতে গরম জামা, লেপ-কম্বল চাই। কিন্তু এ সবের সঙ্গে অভিজিৎকেও চাই যে।

মিথ্যা, মিথ্যা! সব মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, এই যে রোজ পকেট ভরে অভিজিৎ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছে, ব্যাঙ্কে পাঠাচ্ছে, চাকর ঝি ছুটোছুটি করছে এই নতুন দক্ষিণ-খোলা তিনতলার ফ্ল্যাটে, সব অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে মহুয়ার কাছে।

সেই সকালে ন'টা নাগাদ বেরিয়ে যায় অভিজিৎ। ফেরে কোনদিন রাত ন'টায়, কখনো এগারটায়। আর যতক্ষণ যতটুকু সময় বাড়িতে থাকে, এমন কি রাত্রে বিছানায় শুয়েও সেই এক কথা, এক গল্প—ব্যবসা, ব্যবসা আর ব্যবসা।

অভিজিৎ বাঁশি বাজায় নি কতদিন। মহুয়া ভাবতে চেষ্টা করল। মণিপুর থেকে ফেরার পর আর একদিনও বাঁশিতে হাত দেয় নি অভিজিৎ।

মহুয়া অনুযোগ করেছিল।

বাঁশিটাও ছেড়ে দিলে?

হেসে মহুয়ার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল অভিজিৎ। ছেলেমানুষ আছ তুমি এখনও; একদম ছেলেমানুষ। বাঁশি বাজিয়ে সময় নষ্ট করার মত ফালতু সময় কোথায় আমার বল?

রাগ করে ঘর ছেড়ে উঠে গিয়েছিল মহুয়া।

বাঁশি বাজিয়ে সময় নষ্ট। পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলেছিল।

এইরকম ছেলেমানুষই যেন আমি চিরদিন থাকি।

সেদিন মহুয়া আর বেরোয় নি ঘর থেকে অভিজিৎ-এর যাবার সময়, নিজের হাতে বেঁধে দেয় নি টাই।

চাকরের হাত থেকে রুমাল নিয়ে নিজে নিজেই টাই বেঁধে বেরিয়ে গিয়েছিল অভিজিৎ। সন্ধ্যায়

ট্যাক্সি করে নতুন ঝকঝকে গ্রামোফোন নিয়ে এসেছিল আর সঙ্গে একরাশ রেকর্ড।

কত বাঁশি শুনবে শোন না। আরো কত ভাল ভাল সুর, গান।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিল মহুয়া, তারপরই আছড়ে পড়েছিল স্বামীর বুকে। তুমি কি! তুমি কি!

অভিজিৎও কম অবাক হয় নি। এত সুন্দর ইলেকট্রিক রেকর্ড চেঞ্জার। তোমাদের লাভলক প্লেসের বাড়িতেও এই মডেল নেই।

আমি চাই না, আমি চাই না, আমি তোমায় চাই—শুধু তোমায়—স্বামীর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বারবার মহুয়া বলেছিল কান্নাভেজা গলায়।

পা গ ল! এ ক দ ম ছে লে মা নু অভিজিৎ নিবিড় করে স্ত্রীকে বুকের ওপর ধরে রেখে বলেছে, আমি ত' তোমার আছিই।

না, না তোমায় আজকাল একটুও পাই না আমি। আমি তোমার বাঁশি শুনতে চেয়েছিলাম, কলের গান নয়।

আরে, বাঁশি কি আর এখন বাজাতে পারি? সে জোর কোথায়? তা ছাড়া অনভ্যাস।

তুমি কি রকম হয়ে যাচ্ছ দি ন-দি ন। জা নি না কি র ক ম, কেমন; কিন্তু আমার ভাল লাগে না, একটুও ভাল লাগে না এসব।

পাগল! দেখ না আর কিছুদিনের মধ্যেই গাড়ি কিনছি, ছোটমত একটা বাড়ির খোঁজও ক র তে বলেছি।

চাই না, চাই না আমার বাড়ি-গাড়ি।

ছি ছি, বোল না, ও-কথা বোল না মৌ!

তারপর মি টি মি টি হেসেছে অভিজিৎ; তুমি এখনও সেই স্কুলের মেয়ে, স্বপ্ন-দেখা কিশোরীই রয়ে গেলে।

তাই যেন থাকি! স্বপ্ন দেখাই আমার ভাল। -

স্বপ্ন যদি দেখতেই হয় মৌ, তবে সম্পদের স্বপ্ন দেখ। ওসব ছেলেমানুষি স্বপ্ন ছেড়ে দাও; Be practical. উপদেশ দিয়ে টেবিল থেকে কাগজ তুলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে অভিজিৎ, বোধ হয় তার সম্পদের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতেই।

অনড়-অচল হয়ে অভিজিৎ-এর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে মহুয়া, ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল

পড়ে বুকের কাপড় ভিজে উঠেছে। আর তারপর থেকে এই—

রোজই আসছে একটা না-একটা কিছু; আজ রেডিও, কাল পাখা, পরশু রেফ্রিজারেটার। সম্পদ বাড়ছে।

স্বপ্ন, প্রাচুর্যের স্বপ্ন সফল হচ্ছে অভিজিৎ-এর—মহুয়া মনে মনে বলে। তারপর কোমরে কাপড় জড়ায়, ঝাড়মোছ করে, খোকনকে খাওয়ায়, সংসার দেখে, সন্ধ্যাবেলা খোকনকে ঘুম পাড়িয়ে ছাদে উঠে দূর আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ চোখের জলে সম্বিৎ ফিরে পায়; আবার কোনদিন ঘোর ভাঙে ঝি-এর ডাকে 'মা অমলা-বৌদি এসেছেন' কিংবা 'অজয়বাবু ডাকছেন', কি 'ছায়া দিদিমণি, হাসি দিদিমণি', সবাই এসেছে এখন, সবাই আসে। এমন কি বুড়ি মাসিমাও চিঠি দিয়েছেন, আশীর্বাদ জানিয়েছেন, তুলতুলিকে নিয়ে শীগগিরই কলকাতায় আসবেন, তুলতুলির এবার বিয়ে দিতে হবে। লিখেছেন বুড়ি মাসিমা। আশ্চর্য তুলতুলি এতবড় হয়ে গেল তার বিয়ে? তুলতুলির লেখা চিঠিটা পেয়েই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে মহুয়া। না; তুলি তুলুসোনা ঠিক সেইরকমই আছে, কি মজার চিঠিটা লিখেছে।

বাবার চিঠিও পায় মাঝে মাঝে। মীরাটের সেই বড় বাংলোয় একা রাশি রাশি বই নিয়ে বাবা ভালই আছেন মনে হয়। বাবাকে দেখাশুনোরও ভাবনা নেই আয়া যতদিন আছে। 'সাব'কে ও প্রাণ দিয়েই দেখবে। ওবাড়ি, (নিজের পিত্রালয়কে মহুয়া এখন ওবাড়ি নামেই অভিহিত করে) সম্বন্ধে মহুয়ার এখন বেশি দুর্ভাবনা নেই।

কিন্তু এবাড়ি! মহুয়ার নিজের ঘর! ভাবতে মহুয়ার কান্না পায়, কি যেন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কি কুক্ষণেই যে দাদা অভিজিৎকে ব্যবসার মন্ত্রে পাঠ দিয়েছিল।

কিন্তু ব্যবসা যদি অভিজিৎ না করতো, তাহলেও ত' দুর্ভাবনা কিছু কমত না মহুয়ার। অভিজিৎ ব্যবসা আরম্ভ করার আগে দিনগুলো যেভাবে চলছিল মহুয়াদের তাতে নিজেদের না হয় যেমন করে হোক চলে যেত, কিন্তু খোকা! খোকন এসেছে যে এখন। নাঃ! মহুয়া হাত তুলে চোখের জল মুছল। অভিজিৎকে সদাসর্বদা আর অভিযোগ করবে না সে। মহুয়াকে, খোকনকে সুখে রাখার জন্যেই তার এত ছুটোছুটি, এত খাটুনি।

নিজেকে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে মহুয়া, কিন্তু অবুঝ মন তবু কেন কিছুতেই শান্ত হতে পারে না; কেমন একটা চাপা কান্না, একটা অব্যক্ত নালিশ মহুয়ার বুকের ভেতর ফুলে ফুলে ওঠে দিনরাত। কেন মুহূর্তের শান্তি নেই মহুয়ার মনে? কেন বারবার মনে হয় অভিজিৎ বদলে গেছে? সে অভিজিৎ আর নেই। কেন বার বার মনে হয় যে শিল্পী, যে সহজ-সরল, দরিদ্র স্কুল মাস্টারকে মহুয়া ভালবেসে বিয়ে করেছিল সে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

এ কোন নতুন অভিজিৎ আজ মহুয়ার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর চোখে সম্পদের নেশা, প্রাচুর্যের তৃষ্ণা। এ অভিজিৎ টাকার জন্য, আরো অনেক টাকার জন্য পাগল হয়ে ফিরছে। বাঁশির সুর, কবিতার ছন্দ আর ভালবাসার স্বপ্ন আজ এর কাছে অর্থহীন।

মাগো। ছাদের আলসের ওপরেই মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মহুয়া।

মা, কোথায় তুমি? কোথায় তোমার সেই প্রেমস্নিগ্ধ ভালবাসাভরা লাবণ্যময় সুখের সংসার। মহুয়াও যে তোমার মত করেই নীড় বাঁধতে গিয়েছিল, ঘর গড়তে গিয়েছিল! কিন্তু কেন এ রকম হল, কেন এমন হচ্ছে? কি দোষে, কি পাপে মহুয়ার সংসার ভেঙে যাচ্ছে এভাবে?

মা!

মহুয়া পেছন ফিরে দেখল। ঝি-মানদা ডাকছে মহুয়াকে।

কি রে?

বাবু ডাকছেন।

বাবু! এ সময়ে!

মহুয়া অবাক হোল। এমন সময়, এই যখন সন্ধ্যে পশ্চিমের আকাশ লালে লাল আর নীচের বারান্দায় আবছা আলো, খোকন তুলসীর সঙ্গে পার্কে গেছে বেড়াতে, আর গোধূলির আলো-লাগা ছাদের কোণে যুঁই ফুলের টবের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহুয়া ভাবছে কেন এরকম হচ্ছে, কেন অভিজিৎ মহুয়ার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে,—এমন সময় অভিজিৎ ত' কখনোও বাড়ি ফেরে না, কখনো ত' তার মনে পড়ে না মহুয়া একা আছে বাড়িতে, বড় একা নিঃসঙ্গ।

মা বাবু বলছেন তাড়াতাড়ি নীচে আসতে।

মহুয়া আরও অবাক হোল, অসময়ে বাড়ি এসেছে, আবার তাড়াতাড়ি।

অসুখ করেনি ত'?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই মহুয়া মানদাকে জিজ্ঞেস করল, বাবুর শরীর কি খারাপ?

কই, তা তো কিছু বললেন না।

মহুয়া নীচে এলো। শোবার ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে অভিজিৎ। এলোমেলো চুল উড়ছে, মুখ ঈষৎ লাল, সেই শান্ত বড় বড় চোখ কিসের উত্তেজনায় ও আবেগে অস্থির।

কি হয়েছে গো! এমন সময়ে যে বড় বাড়ির কথা মনে পড়ল? শরীর ভাল···

মহুয়ার মুখের কথা শেষ হতে পারল না, অভিজিৎ অশান্তকণ্ঠে বলে উঠল, চাবিটা—গডরেজের চাবিটা—দাও শীগগির।

মহুয়া স্বামীর মুখের দিকে অবাক হয়ে একটু তাকাল, ওর আবার নতুন করে মনে হল, এ কে? এ কোন অভিজিৎ? একে কি ও চেনে!

চাবি কি করবে এখন? শান্ত হয়ে বসো ত', একটু বিশ্রাম কর। কিছু খাও, চা দিই?

আঃ না, না, সময় নেই, চাবিটা দাও। অস্থির অভিজিৎ মহুয়ার আঁচল ধরে টানল।

মহুয়া আবার স্বামীর দিকে অবাক চোখে তাকাল, তারপর নীরবেই ড্রেসিং-টেবিলের ছোট টানা খুলে লোহার আলমারির চাবি তুলে দিল স্বামীর হাতে।

এ কি! এই চাবিটা তুমি এমনভাবে ফেলে রাখ বাইরে? অভিজিৎ-এর গলায় শুধু বিস্ময় নয়, বেশ কিছু বিরক্তি আর রাগ যেন স্পষ্ট প্রকাশ পেল।

এইভাবেই ত' চিরদিন রাখি।

যাবে কোনদিন সব।

চাবি লাগিয়ে আলমারি খুলতে খুলতে অভিজিৎ আবার বিরক্তিভরা গলায় বলল—এবার থেকে দেখছি চাবিটাও আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।

মহুয়ার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হোল···'টা-ও' মানে?

আর কি বয়ে বেড়ায় অভিজিৎ? কতটুকু সম্পর্ক রাখে সে মহুয়ার সঙ্গে! বাড়ির সঙ্গে? সর্বক্ষণই ত' অভিজিৎ ঘুরছে বাইরে, ছুটছে টাকার পেছনে। টাকা, আরো টাকা, অনেক টাকা।

অভিজিৎ-এর স্বপ্ন।

স্বামীর কথার উত্তর দিল না মহুয়া।

আর দরজা বন্ধ করে, সামনের জানলা বন্ধ করে অভিজিৎ আলমারি খুলল।

হঠাৎ সব বন্ধ করছ কেন?

সবাই দেখুক আর কি!

পকেট থেকে টাকা বার করতে করতে অভিজিৎ বলল। আমি কোথায় টাকা রাখি সে কথা পাড়াশুদ্ধ লোককে জানিয়ে লাভ কি, তারপর কোনদিন ছুরি বসাক গলায়।

অভিজিৎ মুঠো মুঠো টাকা বার করতে লাগল পকেট থেকে, দিস্তে দিস্তে নোট।

এত টাকা কোত্থেকে পেলে।

সাবধানে আলমারি বন্ধ করে আর একবার টেনে দেখে নিল অভিজিৎ। তারপর একমুখ হাসি নিয়ে মহুয়ার দিকে ফিরল।

টাকা আর কোত্থেকে আসে! উপার্জন করতে হয় তাই করলাম।

ব্যাঙ্কে না রেখে টাকা সিন্দুকে রাখছ যে?

এ টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে ত' ধরা পড়ে যাব।

ধরা পড়ে যাবে মানে?

মহুয়ার ভ্রূ কুঞ্চিত হোল।

কে ধরবে? কার কাছে ধরা পড়বে?

আঃ, সে সব তুমি বুঝবে না, সে আছে।

কেন বুঝবো না, বল আমাকে সব কথা, বল—বল!

মহুয়া এগিয়ে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নিল অভিজিৎ।

এত উত্তেজিত হবার কি আছে! ফাজলেমিও বোঝ না!

ফাজলেমি!

মহুয়া তীক্ষ্ণ চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। অভিজিৎ কি সত্যিই এতক্ষণ ফাজলেমি করছিল! তবে কেন এত সতর্কতা, টাকা বাড়িতে এনে রাখা!

অভিজিৎ সে সমস্যার সমাধান করল। আসলে কি জান, কালকেই একটা বড় পেমেণ্ট করতে হবে তাই। সকালেই ব্যাঙ্কে ছোটবার সময় হবে না। আর ওরা চেক নেবে না, নগদে কিনতে হবে তাই।

কি কিনতে হবে নগদে, কারা চেক নেবে না!

কিন্তু অত কথার উত্তর দেবার সময় নেই অভিজিতের, রাত্রে এসে বলব সব।

এখন আবার কোথায় যাচ্ছ!

একটু কাজে যাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি ফিরব।

রাগ কোর না লক্ষ্মীটি। অভিজিৎ মহুয়ার গালে হাল্কা হাত ছোঁয়াল একবার, তারপর তর তর করে নেমে গেল ঝকঝকে সিঁড়ি বেয়ে।

স্বামীর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল মহুয়া। কতদিন, কতদিন আর কাটাতে হবে মহুয়াকে এইভাবে। অভিজিৎ আরো কতদিন এমনি টাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটাবে। কবে সময় হবে অভিজিৎ-এর মহুয়ার দিকে ফিরে দেখবার। খোকাকে কোলে নেবার।

মহুয়ার অভিযোগের উত্তরে অভিজিৎ খালি হাসে, আর বলে দাঁড়াও না একটু গুছিয়ে নিই, তারপর দেখবে আমার বাড়িতে বসে থাকাতেই বিরক্ত হয়ে উঠবে তুমি।

আহা, এমন দিন কি হবে?

মহুয়া মনে মনে জানে হবে না; এমন দিন আর কখনো আসবে না জীবনে, আর কোনদিন সেই আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্নভরা রাত, গল্পভরা দিন ফিরে পাবে না মহুয়ারা। বাঁশির সুর আর কোনদিন বাজবে না মহুয়াদের জীবনে।

[ক্রমশ।

খা-জু-রা-হো
চন্দেল্ল স্মৃতি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)



নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

ঝকঝকে মোটর গাড়ি। গায়ের মসৃণ পালিশে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সূর্যের আলো। হেডলাইটের ধাতব আধারটি রূপার মতো ঝকঝক করছে,—তার দর্পণ-সদৃশ বুকে পড়েছে দু'ট মুখের প্রতিবিম্ব।

একটি মুখের হাতীর দাঁতের রঙ। স্বচ্ছ কপালের উপর বাদামী রঙের চুলের রাশ, ঘনপল্লবে ছাওয়া আয়ত দু'টি দীঘল কাজল-আঁখি, গোলাপ-ছোঁওয়া গাল, রক্তরঞ্জিত হাস্যমধুর দু'টি ওষ্ঠের ফাঁকে মুক্তার মতো দাঁতের সারি।



● 'নর্মদা-উৎস' অমরকন্টক

আর একটি মুখ রোদে-পোড়া কালো। মলিন গান্ধী-টুপির নীচে রেখাঙ্কিত কপাল, দাড়ি-ভর্তি শীর্ণ গাল, শীতে-ফাটা শুকনো ঠোঁট। চোখের ওপর চশমার পুরু পরকলা।

একজনের সুরভিত যৌবনকে ঘিরে হলুদ বাটিকের উদ্ধত চোলি, আকাশ-নীল সিল্কের আঁচল আর নরম পশমের সোনালি কার্ডিগান। অপরের পরনে মলিন গেরুয়া পায়জামা, খোকড়ের পাঞ্জাবি কুর্তা, প্রৌঢ় কাঁধে একটা কম্বল।

ওদের কাছাকাছি হবার কথা নয়, ওদের বেশিক্ষণ পাশাপাশি মানায় না। ওদের ভিন্ন গতি, ভিন্ন সংকল্প। একজনের পথ যদি দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পূব থেকে পশ্চিমে অপরের যাত্রা। ভিন্নগামী দু'টি রেখা, ক্ষণিকের জন্যে একসঙ্গে মিশেছে, আবার চলুক ভিন্ন অভিমুখে।

তাই সরযূর অনুরোধ রাখা হয় নি। রাখা অস্বাভাবিক। সরযূর যাত্রা-সঙ্গী হয়ে তার সঙ্গে ভিড়ে পড়ব,—তা সম্ভব নয়। মৃদু হেসে বিদায় দিয়েছিলাম সরযূকে। অত্যন্ত স্বাভাবিক সে-বিদায়,—নেই দীর্ঘশ্বাস, নেই পিছু ফিরে দেখা। শব্দ করে স্টার্ট নিল, ধূলো উড়ল বাতাসে, তার মোটর অন্তর্হিত হোলো পথের বাঁকে। আমি আবার কাঁধে তুলে নিলাম আমার জীর্ণ ঝুলি আর মলিন কম্বল।

যাত্রা শুরু করেছিলাম মেকলশীর্ষ অমরকন্টক থেকে। অমরকন্টক মধ্য-ভারতের বিখ্যাত নদী নর্মদার উৎস। পর্বত-অরণ্যের মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে নেমে এলাম উপত্যকায়। সেখান থেকে নর্মদার দক্ষিণ তীর ঘেঁষে আমি চলেছি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। নর্মদা বক্ষে জ্যোতির্লিঙ্গকে দর্শন করব সংকল্প ছিল, সেই সংকল্প নিয়ে পাঁচশো মাইল পথ অতিক্রম করেছি।

ওংকারেশ্বর তীর্থে সেই সংকল্প চরিতার্থ হয়েছে। অমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গকে প্রণাম জানিয়ে নর্মদার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি।

এবার ফিরবার পালা। প্রত্যাগমনের সেই যাত্রা শুরু করব উজ্জয়িনী থেকে। জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকাল দর্শন হয়েছে। এবার পা ছড়িয়ে বসেছি রামঘাটে,—শিপ্রা নদীর তীরে। ফেরার কথা ভাবছি।

রাগ করে প্রভাত ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন,—কাল আপনাকে নিশ্চয় ট্রেনে তুলে দেব। সোজা কলকাতা।

হেসে বললাম,—বলেন কি? ট্রেনে উঠলেই সোজা কলকাতা পৌঁছে যাব?

সোজা অবশ্য পৌঁছবেন না। তা ইন্দোর খাণ্ডোয়া হয়েই যান বা ভূপাল ইটারসি হয়েই যান, হাওড়ার একখানা টিকিট কেটে টেনে তুলে দেব তাহলেই আমি নিশ্চিন্দি।

অধ্যাপক প্রভাত ভটাচার্যের সঙ্গে আমার সত্ত আলাপ। হোসাঙ্গাবাদ থেকে খাণ্ডোয়ার পথে এক সহযাত্রীর কাছে তাঁর নাম শুনেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন যে উজ্জয়িনীতে একজন বাঙালী ভদ্রলোক আছেন, প্রভাত ভটাচার্য নাম,—যিনি সেখানকার বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শুধু বাঙালী মাত্র তিনি নন, বঙ্গ-সরস্বতীর সেবক। উজ্জয়িনী থেকে একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন,—'কালিদাস পত্রিকা' যার নাম।

উজ্জয়িনীর সঙ্গে কালিদাসের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন। অবন্তী নগরী বিশালা উজ্জয়িনী কালিদাসের অতি প্রিয় ছিল। শিপ্রা তীরবর্তী এই নগরীকে মহাকবি অবিস্মরণীয় মহিমায় বরণীয় করেছেন তাঁর মেঘদূত কাব্যে।

আধুনিক উজ্জয়িনীর এক বাঙালী নাগরিক বাঙলা ভাষায় সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা করছেন,—সে পত্রিকার নাম কালিদাস, একথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। গর্বিতও কম হই নি। সম্পাদকের নামটি মনে গাঁথা ছিল। উজ্জয়িনীতে পৌঁছেই প্রভাত ভট্টাচার্য মহাশয়ের সন্ধান করেছিলাম।

বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য। বয়সে তরুণ, পরনে খদ্দর, গান্ধী রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করছেন। উজ্জয়িনীর নূতন শহরাঞ্চলে তাঁর বাড়ি। শিক্ষাদীক্ষা বাংলার বাইরে। শিক্ষাদান পুরুষানুক্রমিক পেশা। তাঁর বাবা সাগর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অধ্যাপক। বাংলা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই কম। তবে স্ত্রী বাংলা দেশের মেয়ে, ছেলেমেয়েরা মায় উৎসাহে বাংলা শিখছে। উজ্জয়িনীতে বসে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহস করেছিলেন। অকাল বিয়োগ হয়েছে সে পত্রিকার। আশাভঙ্গের দুঃখটুকু খালি রেখে গেছে।

তবু মনে-প্রাণে বাঙালী, বাংলা-সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। বাড়ি খুঁজে খুঁজে যেচে আলাপ করতে গিয়েছিলাম, দূর প্রবাসের একটি অচেনা বাঙালী পরিবার হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য দিয়ে ক্ষণেকের মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

ভট্টাচার্য-গৃহে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ। হাতে একটা টফির বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম। শিশুরা টফি চুষল আনন্দ করে। স্বামী-স্ত্রী গল্প শুরু করলেন আমার সঙ্গে।

আমার গত দু' মাসের ভ্রমণকাহিনী সংক্ষেপে শোনালাম তাঁদের। শোনালাম আমার নর্মদা-পরিব্রজ্যার বিবরণ, কিছু কিছু সাধু মহাত্মাদের কথা।

সরু চালের গরম ভাত আর গাওয়া ঘি। সরষে বাটা দেওয়া মাছের হলুদ্দা, গরম মশলা দেওয়া মাংসের কালিয়া। চাটনি আর দই-মিষ্টি।



● অমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির: ওংকার

ভট্টাচার্য মশাই বললেন,—যদিও রাত্রের খাওয়া, তবুও ভাতই করতে বলেছিলাম। অনেকদিন বোধ হয় এমনি মাছ-ভাত খান নি।

বাংলা দেশের খাওয়া, বাঙালী মেয়ের হাতে রান্না। আমি খেতে খেতে বললাম,—সমুদ্র মন্থনের অমৃত ভাণ্ড থেকে একফোঁটা অমৃত পড়েছিল এই উজ্জয়িনীতে। সেই অমৃতের স্বাদ পাচ্ছি। এমনি রান্না কতো দিন খাই নি!

সদ্য-পরিচিত অতিথির মুখে এমনি অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনে পত্নীগর্বে পুলকিত হলেন অধ্যাপক। কিন্তু পত্নী বললেন এক আশ্চর্য কথা।

মন কেমন করছে না?

চমকে উঠে বললাম,—তার মানে?

শান্ত হাসি হেসে ভট্টাচার্য-গৃহিণী বললেন,—বাঙালী খানা আমরাও প্রায় ভুলে গেছি। আজ যখন রান্না করছিলাম, দেশের কথা কেবলই মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম, যখন খাবেন, তখন আপনারও নিশ্চয় ঘরের জন্যে মন কেমন করবে।

রাত্রে বিদায় নেবার সময় প্রবাসিনী বাঙালী বধূটি আবার বললেন,—অনেক তো তীর্থে তীর্থে ঘুরলেন দাদা, অনেক পুণ্য হোলো। এবার তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যান, দেরি করবেন না।

কিন্তু তাড়াতাড়ি উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করা সম্ভব হোলো না। দেরি হোলো মহাকাল মন্দিরে, শিপ্রা নদীতীরে।

অবন্তীনগরী উজ্জয়িনী। অপর নাম বিশালা। উজ্জয়িনীকে ঘিরে পুরাণের কতো স্মৃতি, ইতিহাসের কতো অধ্যায়,—কতো কাহিনী, কতো কিংবদন্তী। কতো কবির কাব্য, কতো শিল্পীর প্রেরণা, কতো প্রেমিকের স্বপ্ন আর দীর্ঘশ্বাস। সেই উজ্জয়িনী ছেড়ে একদিনে যাওয়া যায়?

বহু যুগব্যাপী সংগ্রামের পর দেবাসুরের দ্বন্দ্বে সাময়িক সন্ধি হোলো। অমৃতলাভ মানসে দুই পক্ষই সমুদ্রমন্থন শুরু করলেন। মন্দর পর্বত হলেন মন্থন-দণ্ড, মন্থন-রজ্জু হলেন বাসুকী। অন্ধকার ছাড়া আলো নাই, দুঃখ ছাড়া সুখ নেই। ক্ষীরোদ সমুদ্র থেকে উত্থিত হোলো বিষ এবং অমৃত। দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হলেন। অমৃতকুম্ভ নিয়ে আবার দ্বন্দ্ব বাধল দেবাসুরের মধ্যে। বিষ্ণু মোহিনীমায়া ধারণ করে অসুরদের বিভ্রান্ত করলেন,—দেবতারা পেলেন অমৃতের অধিকার।

দেবাসুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় অমৃতকুম্ভ থেকে চারবিন্দু অমৃত পৃথিবীতে পড়েছিল,—হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনীতে। ভারতের এই চারটি স্থান কুম্ভতীর্থ।

অমৃত পান করে অমর হয়েছিলেন স্বর্গের দেবতারা, কিন্তু মরণশীল অসুরদের তাঁরা নিজবলে ধ্বংস করতে পারেন নি। অসুর শ্রেষ্ঠদের ধ্বংস করেছিলেন নীলকণ্ঠ মহামৃত্যুঞ্জয়, শিবজায়া দুর্গা ও শিবপুত্র কার্তিকেয়।

উজ্জয়িনী বিজয়নগরী। মহাদেব এখানে ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস করেন। সেই মহাসুরবিজয়ের স্মরণে এই স্থানের নাম উজ্জয়িনী। এই উজ্জয়িনী বা অবন্তীনগরীর অদূরে রত্নমাল পর্বতে দূষণ নামে এক রাক্ষস বাস করত। তার অত্যাচারে প্রজাকুল মহা বিপন্ন ছিল। স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গরূপে মহাদেব এখানে আবির্ভূত হন ও দূষণকে সংহার করেন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহাকাল জ্যোতির্লিঙ্গ উজ্জয়নীতে আসীন।

রামায়ণে উজ্জয়িনীর উল্লেখ নেই,—কিন্তু ভারতযুদ্ধের যুগে উজ্জয়নী প্রসিদ্ধ আর্যজনপদ। সান্দীপনি মুনির আশ্রম ছিল এই উজ্জয়িনীতে। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণ বলরাম ও সুদামা তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন। দ্বারকার নিকটবর্তী সমুদ্রগর্ভে পঞ্চজন নামে এক অসুর বাস করত। সে এক সমুদ্রশঙ্খের মধ্যে থাকত, তাই তার অপর নাম ছিল শঙ্খাসুর। সান্দীপনির পুত্রকে সে গ্রাস করেছিল। শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করে কৃষ্ণ যখন গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন তখন মুনি বললেন পুত্র হত্যার শাস্তিবিধানই তাঁর পরম কাম্য। কৃষ্ণ যদি শঙ্খাসুরকে শাস্তি দিতে পারেন, সেই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। কৃষ্ণ গুরুকে সন্তুষ্ট করেন। পঞ্চজন অসুরকে তিনি ধ্বংস করেন ও তার শঙ্খকে কেড়ে নেন। সেই শঙ্খই কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য।

মূঢ়তা ও মারের অন্ধগুহা থেকে ভারতচিত্তকে মুক্ত করে অমৃতবোধির আলোকে উদ্ভাসিত করেন বুদ্ধদেব। কল্পনা ও পুরাণের ছায়ান্ধকার থেকে ইতিহাসের আলোকে ভারতবর্ষ উত্তীর্ণ হয় তাঁরই যুগে। পৌরাণিক কল্পনার শেষ প্রকাশিত অবতার ভগবান বুদ্ধদেব।

বুদ্ধের জন্মকালে ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল অবন্তী। এই মহাজনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করে মগধ এবং দ্বিতীয় বিখ্যাত রাজ্য ছিল অবন্তী। মগধরাজ অজাতশত্রুর প্রধান প্রতিযোগী ছিলেন অবন্তীরাজ প্রদ্যোত। বৎস রাজপুত্র উদয়নকে প্রদ্যোত রাজধানী উজ্জয়িনীতে বন্দী করে রাখেন। অবন্তী রাজকন্যা বাসবদত্তা উদয়নের প্রেমে পড়েন ও বন্দী রাজপুত্রকে গোপনে মুক্তি দিয়ে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হন। উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রেমকাহিনী অমর।

মৌর্যযুগে অবন্তী সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট প্রদেশ ছিল,—পাটলিপুত্রের পরেই ছিল উজ্জয়িনী নগরীর খ্যাতি। সিংহাসনলাভের আগে রাজকুমার অশোক ছিলেন অবন্তীর

শাসনকর্তা,—উজ্জয়িনী নগরে ছিল তাঁর প্রাসাদ। সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও প্রথম যৌবনের মাধুর্য-স্মৃতিকে ভোলেন নি। তাঁর প্রিয়তমা মহিষী হয়েছিলেন অবন্তীর এক কুমারী,—বিদিশা নগরীর শ্রেষ্ঠীকন্যা দেবী। বুদ্ধ-উপাসিকা দেবী ছিলেন অশোকের প্রকৃত সহধর্মিণী। তাঁরই পুত্র-কন্যা মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা,—যাঁরা রাজসুখ পরিত্যাগ করে ভিক্ষু-বসন পরিধান করে তথাগতের ধর্ম-প্রচারে সুদূর সিংহল যাত্রা করেছিলেন। বৌদ্ধ স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাঁচী অবন্তী প্রদেশের অন্তর্গত, সাঁচীস্তূপের আদি প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট অশোক।

উজ্জয়িনীর গৌরব শিখরস্পর্শ করে গুপ্তসাম্রাজ্যের যুগে। কুটীরগুলি প্রাসাদের রূপ ধারণ করে, প্রাসাদগুলি গিরিশিখরের উচ্চতা লাভ করে। সৌভাগ্যে ও সমৃদ্ধিতে উজ্জয়িনী শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। মালয় এবং কাথিওয়াড় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে আরব সাগরের বন্দরগুলি সারা উত্তর ভারতের পণ্যদ্রব্য পাশ্চাত্য পৃথিবীতে রপ্তানি করতে আরম্ভ করে। এই বহির্বাণিজ্যের মূলে ছিল উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী ছিল সৌরাষ্ট্র ও মগধের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র।

গুপ্তযুগের পূর্বে মালব ও সৌরাষ্ট্র শকদের অধীন ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই দুই অঞ্চলকে জয় করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য, বিক্রমাঙ্ক, সিংহবিক্রম প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করেন। তিনিই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শকারি বিক্রমাদিত্য, লোক কিংবদন্তীর উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য। যাঁকে নিয়ে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা ও বেতাল পঞ্চবিংশতি। ইতিহাসের বিক্রমাদিত্য আর কল্পনার বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর পরিবেশে এক হয়ে গেছেন।

সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে সম্মানিত হয়েছেন। পিতা সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিজয়কে তিনি পূর্ণতর করেন। বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে তিনি সুসংবদ্ধ করেন। তাঁর মুদ্রা সংস্কার বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধকে দৃঢ়তর করে ও মহা সমৃদ্ধির পোষক হয়। চন্দ্রগুপ্ত শিল্প সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের মহান্ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা একটি লোকপ্রিয় কিংবদন্তী। এই নবরত্ন সভায় রত্নাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং প্রধান রত্ন মহাকবি কালিদাস।

চন্দ্রগুপ্তের প্রিয় প্রদেশ ছিল মালব,—প্রিয়তম নগর উজ্জয়িনী। পাটলিপুত্র রাজধানী হলেও সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল উজ্জয়িনী। শিল্প বাণিজ্য ও সংস্কৃতির মহাকেন্দ্র। পাটলিপুত্র সম্রাটের শাসন-নগরী। উজ্জয়িনী মানস-নগরী। গুপ্তযুগকে ভারত ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলা হয়। সুবর্ণপ্রতিমা উজ্জয়িনী।

সেই উজ্জয়িনীর পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম কয়েকদিন। উত্তর বা মধ্যভারতের যে কোনো পুরোনো শহর। স্টেশনের কাছটা পরিষ্কার, নূতন শহরটা ফাঁকা,—পুরোনো মহল্লা দোকানে-বাজারে-বস্তিতে আর আঁকাবাঁকা রাস্তায় ঘিঞ্জি, হতশ্রী। শহরে আর শহরতলীতে যা দেখবার সব দেখলাম। গোপাল-মন্দির, যন্তর-মন্তর, হরসিদ্ধি মাতার মন্দির, ভর্তৃহরি গুম্ফা, কালিয়াদে প্রাসাদ। স্নান করলাম রামঘাটে, আরতি দর্শন করলাম মহাকালের।

কিন্তু যা দেখব কল্পনা করেছিলাম তার কিছুই দেখলাম না। সেদিন বিকেলবেলা প্রভাতবাবুর সঙ্গে আবার দেখা ধর্মশালার সামনে। সঙ্গে তাঁর বন্ধু সহায়জী। প্রভাতবাবুর বাড়িতেই আগে আলাপ হয়েছিল। গুণীলোক, সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়েই সংশ্লিষ্ট।

প্রভাতবাবু বললেন,—আজও আছেন? আমি তো ভেবেছিলাম কবে চলে গেছেন। এ ক'দিন কি করলেন এখানে?

এই ঘুরে ঘুরে দেখলাম সব আপনার শহরের।

নদীতীরে রামঘাটে এসে বসলাম তিনজনে মিলে।

প্রভাতবাবুর সতীর্থ বললেন,—কি আর দেখবার আছে? একদিনেই তো শেষ হয়ে যায়!

আমি বললাম,—হ্যাঁ, দেখা আমার শেষ হয়েছে, তবে খোঁজা শেষ হয় নি। এখন খুঁজছি।

খুঁজছেন।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলাম না। খুঁজছি ক'দিন ধরেই, সকালে-সন্ধ্যায়, পথে-প্রান্তরে,—নদীতীরে। কিন্তু কি খুঁজছি সহজে বলা যায় না,—বললেই বা বুঝছে কে?

আবার প্রশ্ন,—একা একা কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন মশাই?

হেসে বললাম,—আমাদের কবিগুরু যা খুঁজেছিলেন—

তার মানে?

'মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে!'

হো-হো করে হেসে উঠলেন প্রভাতবাবু। বললেন,—পেলেন খুঁজে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—পেলাম আর কোথায়? কতো যে তাকে খুঁজলাম! খুঁজলাম দোকানে, বাজারে, রেল-স্টেশনে, বাসস্ট্যাণ্ডে, মন্দিরের চত্বরে চত্বরে আর এই রামঘাটে। বারান্দা-জানলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতো ধাক্কা খেলাম, কতো যে গাড়িচাপা থেকে বাঁচলাম!

বিদেশ বিভুঁই-এ এমনি করলে মারা পড়বেন মশাই!

করুণস্বরে বললাম,—পাব না কিছুতেই, এবার ভাবছি হাল ছেড়ে দেব।

এবার একটু ঔৎসুক্য নিয়ে বন্ধু বললেন,—কে তিনি বলুন তো, থাকেন কোথায়?

থাকেন এই উজ্জয়িনীতেই, তার বেশি জানি নে।

পরিচয়?

পরিচয় কি দেব? নামটাই যে এতো দিন পরে মনে নেই!

কি আশ্চর্য, নাম জানেন না, ঠিকানা জানেন না, এই ভিড়ের শহরে চেহারা দেখে দেখে লোক খুঁজে পাবেন? পাগল!

তবু আমি বললাম,—জানি নে আপনারা তাকে দেখেছেন কি না, চেহারার একটু বর্ণনা দেব?

বর্ণনা শুনে মানুষ চেনা? তাও স্ত্রীলোক! বলুন।

মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি কুরুবক মাথে।

আরো বলি?

রক্তাম্বরের শিথিল নীবিতটে যূথি-মালিকার বন্ধন। ধূসর ঘন কেশে নিবিড় অগুরু গন্ধ, অঙ্গে অঙ্গে মদির কুসুম সুরভি।

হাঁ করে ওঁরা আমার কথা শুনছিলেন। আমি বললাম,—জানেন, এতো দিন পরেও তার রূপটি আমার চোখের সামনে ভাসছে। মল্লীলতার মতো তার বাহু; কমললোভন তার গাল, কদলীসম তার শ্রোণী, কুংকুমের পত্রলেখায় অলংকৃত তার দু'টি বুক।

আগ্রহভরে প্রভাতবাবু বললেন,—সুন্দর বলছেন, চমৎকার!

দিনান্ত ঘনিয়ে আসছে। ভিড় পাতলা হয়েছে রামঘাটে। শিপ্রা নদীর ওপারের সবুজে ঘনছায়া নামছে। নদীধারার দিকে তাকিয়ে আবার বললাম,—একলা একলা ঘুরে বেড়াই, মনে ভাবি একদিন তার দেখা পাবই। বাতায়নপ্রান্ত থেকে আমার দিকে চোখ তুলে সে তাকাবে,—তার কালো আঁখি থেকে অসংখ্য ভ্রমর ছুটে এসে আমার বুকের মধ্যে গুঞ্জন শুরু করবে।

সহায়জী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার ম্লান হেসে বললেন,—ঐ যার বর্ণনা আপনি দিলেন, আমি তাকে চিনি।

চেনেন?

চিনি বৈকি,—সে যে আমারও পূর্বজন্মের প্রিয়া। আপনার মতো আমিও যখন প্রথম উজ্জয়িনীতে আসি, আমি তাকে অনেক খুঁজেছিলাম।

দেখা পেয়েছিলেন?

কেমন করে পাব বলুন? বড়ো দেরি করে ফেলেছি আমরা। অনেক—অনেক দেরি। কতদিন সে আর অপেক্ষা করবে? কবে নিবে গেছে প্রদীপ, কবে শুকিয়ে গেছে মালা!

একেবারে জলের কিনারে বসেছিলাম। শিপ্রার শান্তস্রোতে আমার প্রৌঢ় মুখের ছায়া পড়েছিল। সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে বললাম,—অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে না? আর আশা নেই এখন,—কতো দেরি?

বন্ধু হেসে বললেন,—অন্তত সাত শতাব্দী দেরি। সাতশো বছর! তার মধ্যে অনেক জীবন অনেক জন্ম পার হয়ে গিয়েছে। সেই অতীত জন্মের প্রিয়া এতো জন্ম ধরে অপেক্ষা করে বসে নেই। আমিও ভুল করেছিলাম, ভুল করে খুঁজেছিলাম। খুঁজে খুঁজে আমি তাকে পাই নি, আপনিও পাবেন না।

আর কিছু বলার নেই। শেষ প্রশ্নটুকু তবু করলাম,—কোথায় সে আছে?

আছে কবির কাব্যে, শিল্পীর স্বপ্নে। আছে নিভৃত মনের সিংহাসনে,—আর কোথাও না। [ক্রমশ।

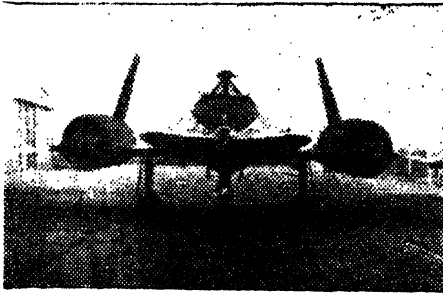


বিজ্ঞান বার্তা

মহৌষধ অ্যাসপিরিন

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সাধারণত কোন ঔষধই চিরকাল জনপ্রিয় থাকে না এবং না থাকার প্রধান দুইটি কারণ—অধিকতর কার্যকরী ঔষধের আবির্ভাব এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের কার্যক্ষমতা হ্রাস। কিন্তু অ্যাসপিরিন, যার জন্ম ১৮৫৩ সালে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে তার কার্যক্ষেত্রই বিস্তার করছে তাই নয় লোকপ্রিয়তাও, জনী ওয়াকারের মত দিন দিন বাড়িয়েই চলেছে।

অ্যাসপিরিন হচ্ছে স্যালইসাইলেট পরিবারভুক্ত। রসায়ন শাস্ত্রে এটি অ্যাসেটইল স্যালইসাইলিক্ অ্যাসিড ($C_9H_8O_4$) একটি তুষারশুভ্র বর্ণ (পাউডার), পাঁচ গ্রেনের বড়ির (টেবলেট) আকার দেওয়া হয়েছে। কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু সংমিশ্রণে ছয়দিক বিশিষ্ট ক্ষুদ্র অণু,



● নূতন এস-আর ৭১ যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষক জেট বিমানের সম্মুখভাগ। গতিবেগ ও উচ্চবিহারে এর বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য

বেনজিন রিং নামে অভিহিত পদার্থটিই অ্যাসপিরিনের রাসায়নিক মূল। বেন্‌জিন রিং প্রায় সকল স্থানীয় অসাড়করী দ্রব্যের আদি ও কার্যকরী মুখ্য অংশ এবং ইহা নারকোটিকের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহার অন্য ভাবান্তর ফেনল বা কার্বলিক অ্যাসিড যার অন্যতম কাজ ত্বকের নিকট স্নায়ুর শেষ অংশটিকে পঙ্গু বা অসাড় করে দেওয়া।

কিমিতি শাস্ত্রবিদ্ ফরাসী পণ্ডিত সি এফ ভন গারহাট ১৮৫৩ সালে অ্যাসেটইল স্যাল্‌ইসাইলিক্ অ্যাসিডের জন্ম দেন। রসায়নবিদ্ জার্মান পণ্ডিত এফ হফম্যান ১৮৯৮ সালে নিজের ও নিজ পিতার উপর ইহা বাতের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ব্যবহার করেন। হফম্যান ঔষধটির নাম দেন অ্যাসপিরিন, কারণ স্পিরিয়া নামক গাছ হ'তে ঔষধটির উপাদান সংগ্রহ করা হয়। ফেডরিক বেয়ার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ঔষধটি পেটেন্ট করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি তাঁরাই ঔষধটির মালিকানা-স্বত্ব ভোগ করেন। বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী বহু ঐশ্বর্য হারায়, সেই সময় এই অমূল্য ঔষধটির মালিকানা-স্বত্বও জার্মানীর হাত থেকে চলে যায়। তদবধি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ব্যবসায়ী নামে, ঔষধটি প্রস্তুত করছেন।

নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অফ মেডিসিন বলেন—'যদিও বিভিন্ন ব্যবসায়ী নামে ঔষধটি পাওয়া যায় কিন্তু রাসায়নিক দৃষ্টিতে ঔষধটি একই, কেবলমাত্র ভিন্ন প্রণালীতে তৈরি এবং অন্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে এর কতকগুলি প্রতিক্রিয়া দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন রকমেই দাবী করা যায় না অ্যাসপিরিন অপেক্ষা এই বিভিন্ন ব্যবসায়ী নামধারী তথাকথিত উৎকৃষ্ট অ্যাসপিরিনগুলি অধিকতর কার্যকরী ও নিরাপদ। বিরাট বিজ্ঞাপনের জন্য যে কেবল সাধারণ লোকই বিভ্রান্ত হয়েছেন তাই নয়. শিক্ষিত চিকিৎসকগণও বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী-নামের ভক্ত হয়ে উঠেছেন। পার্থক্য কেবলমাত্র এই দেখা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ নামধারী অ্যাসপিরিন দ্রুত হজম হয় অথবা কতকগুলি প্রতিক্রিয়া আয়ত্তের মধ্যে রাখে। যে নামেই ব্যবহার করা যাক্ না কেন অ্যাসপিরিন হচ্ছে অ্যাসপিরিনই।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন নামে অ্যাসপিরিন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এত সস্তা ও সহজলভ্য ঔষধ প্রায় নেই বললেই চলে। সুদূর পল্লীগ্রামের মুদির দোকানেও ঔষধটি পাওয়া যায়। কিনতে বা ব্যবহার করতে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন একথা কারো মনেই আসে না। মাথাধরা, দাঁত ও কান কটকটানি, সর্দি, হাত-পা কামড়ান, যে-কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা, এমন কি অল্প জ্বরেও ঔষধটিতে ফল পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকগণ বিশেষ সময়ের বিশেষ ব্যথায় এই ঔষধটিতে খুবই উপকার পেয়ে থাকেন।



● 'মেরিনার ফোর'-এর সাড়ে সাত মাসব্যাপী তিন শ' পঁচিশ মিলিয়ন (এক মিলিয়ন=দশ লক্ষ) মাইল মঙ্গলগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে

ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বৃদ্ধ-বালক যে কেউই যখন ইচ্ছা ঔষধটি ক্রয় ও ব্যবহার করে থাকেন। ঔষধটি মোটামুটিভাবে নিরাপদ হলেও যথেষ্ট ক্ষতি করবার ক্ষমতা রাখে, তাই আমি মনে করি এ বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়াই ভাল।

অন্যান্য ঔষধের মত কেবলমাত্র ঔষধের দোকানের মারফৎ ঔষধটির বিক্রয় সীমাবদ্ধ করা নানা কারণে সম্ভব নয়।

একটি বা দুইটি টেবলেটের বেশি পাঁচ গ্রেনের টেবলেট ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। যদি একটি বা দুইটি টেবলেটে প্রয়োজনীয় আরাম না পাওয়া যায় তা'হলে বেশি বা বারম্বার ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। অতিরিক্ত বা বারবার ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। তা ছাড়া যাঁদের হাঁপানী বা অন্ত্রে অথবা পাকস্থলীতে ঘা আছে তাঁদের এই ঔষধটি ব্যবহার না করাই মঙ্গল।

যদিও ঔষধটি সাধারণভাবে নিরাপদ তবুও এতে স্যাল্ইসাইলিক অ্যাসিড থাকায় খাবার পরই, প্রায়ই পেট জ্বালা করে। কাজেই এই জ্বালাকে এড়াতে হলে অ্যাসপিরিন খালি পেটে না খাওয়াই ভাল এবং বেশ খানিকটা জল বা দুধের সঙ্গে এবং সম্ভব হলে অল্প বাই-কার্বোনেট অফ্ সোডা সহযোগে খাওয়া মঙ্গল। অনেকের অ্যাসপিরিন খাওয়ার পর গা-বমি ভাব দেখা যায়। বেশ একগ্লাস জল বা দুধের সঙ্গে খেলে এই ভাব কমে যায় বা থাকে না।

অ্যাসপিরিন কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত করে রাখবেন না, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। বেশিদিন রাখা টেবলেটগুলি প্রায় ফেটে বা গুঁড়া হয়ে যায়। কদাচ এই ফেটে বা গুঁড়া হয়ে যাওয়া অ্যাসপিরিন খাবেন না। পুরান অ্যাসপিরিনে ভিনিকার গন্ধ পাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ সেরূপ গন্ধযুক্ত অ্যাসপিরিন পরিত্যাগ করবেন।

অ্যাসপিরিন খেয়ে ছোট ছেলেদের অনেক ক্ষতি, এমন



● যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্রমোন্নত নিশি-বীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক শত মিটারের মধ্যবর্তী যাবতীয় কিছু কোনপ্রকার আলোক বিচ্ছুরণ না করেও অন্ধকারে দেখা যাবে

কি মৃত্যু হতেও দেখা গেছে। তাই সব সময়ই অ্যাসপিরিন ছোট ছেলেদের নাগালের বাইরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সান্যাল

পকেট এক্স-রে ক্যামেরা

শিকাগোর ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী সম্প্রতি একটি নতুন অতি ছোট এক্স-রে ইউনিট উদ্ভাবন করেছেন। এই এক্স-রে যন্ত্রটির আকৃতি একটি সিগারেটের বাক্সের মত।

এই ইউনিটটি হাতের ভেতর রেখেই কাজ করা চলে। এজন্যে বিদ্যুৎ-শক্তির কোন দরকার হয় না। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি লাগানো হয়ে যাবার পর তার মধ্যে কোন একটি বিচ্যুতি থাকলে তা নির্ধারণ করবার জন্যে এই যন্ত্রটি খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। এই রকম জায়গায় বড় এক্স-রে যন্ত্র ব্যবহারে প্রচুর অসুবিধা থাকে।

ফিল্মের পরিবর্তে এই যন্ত্রটিতে তেজস্ক্রিয় প্রোমেথিয়াম—১৪৭ (Promethium-147) এক বটিকা (Tablet) ব্যবহার করা হয়। এই বটিকা ঐ যন্ত্রের খোলা শাটারের ভেতর দিয়ে রঞ্জনরশ্মি ছড়িয়ে দেয়।



● গবেষণার জন্য তৈরি—বিশেষ মার্কিন অণুবীক্ষণযন্ত্র

এই পকেটে রাখার উপযোগী ক্ষুদ্র এক্স-রে ক্যামেরাটি দেহের রোগ, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া প্রভৃতি বোঝায় যে কতখানি কার্যকর, তা শিকাগোর মাইকেল রীস হাসপাতালে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

কম্পিউটার যন্ত্র মাত্র চার সেকেণ্ডে প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম

একটি যন্ত্র হাজার হাজার মাইল দূরের অন্য আর একটি যন্ত্রের সঙ্গে কিভাবে 'কথা বলতে' পারে তাই সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের বিশ্বমেলায় হাতে-কলমে দেখানো হয়েছে।

মিজুরির সেন্ট লুই শহরে অবস্থিত আমেরিকান গ্রন্থাগার কনভেনশনের (American Library Convention) Librarian বিশ্বমেলায় মার্কিন প্যাভেলিয়নের গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্রে রক্ষিত একটি ইউনিভ্যাক কম্পিউটার (Univac Co nputor) যন্ত্র হ'তে একটি খবর জানবার জন্যে ইউনিভ্যাক কার্ড প্রেসেসর যন্ত্রের ভেতর একটি কার্ড ঢুকিয়ে দিলেন। কম্পিউটার তার স্মৃতিকোঠা হাতড়ে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ভেতরই সেন্ট লুইয়ের গ্রন্থাগারিকের কাছে একটি সাতশ শব্দ সম্বলিত রিপোর্ট পৌঁছে দিল।

'গণতন্ত্র', 'শান্তিপূর্ণ বিশ্ব', 'শিক্ষা ও শিল্পকলা' ও 'সমৃদ্ধি' এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পঁচাত্তরটি বিভিন্ন বিষয়ের রচনা এই ইউনিভ্যাক যন্ত্রের ভেতর রয়েছে। ইংরাজী, জার্মান, স্প্যানিশ এবং ফরাসী ভাষায় ৭০০ শব্দ এই রচনাগুলি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তৈরি করেছেন।

বিশ্ব মেলার Libraryতে এই কম্পিউটার যন্ত্রটি একটি কাচে ঘেরা ঘরের ভেতর রয়েছে। দর্শকদের জিজ্ঞাসা করবার কিছু থাকলে Librarian সেই প্রশ্ন সম্বলিত কার্ডটি এই যন্ত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। এক মুহূর্তের ভেতর যন্ত্রটি প্রশ্নের জবাবটি বাছাই করে নেয় ও চার সেকেণ্ডের ভেতর তার জবাবটি ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়।

শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান

শব্দের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি দ্রুতগামী যাত্রী বিমান তৈরির পরিকল্পনা চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আরও একটি পরীক্ষা করছেন। এই ভীষণ গতিতে বিমান চলবার সময় বিমানের চালক বিশেষ করে মাটি ছেড়ে উপরে উঠবার সময় এবং মাটিতে নামবার সময় মাটির

জিনিসগুলি কতখানি দেখতে এবং চিনতে পারবেন তা ঠিক করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। তবে এই ধরণের দ্রুতগামী বিমান তৈরি হওয়ার পূর্বেই বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার কাজ শেষ করে ফেলতে ইচ্ছুক। এজন্যে বিজ্ঞানীরা এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

একটি পঁচাত্তর ফুট লম্বা এবং কুড়ি ফুট চওড়া একটি টেবিলের উপর বিজ্ঞানীরা একটি শহরের মডেল প্রস্তুত করেছেন। এতে মোটর গাড়ি, বাড়ি, ট্রেন, গাছপালা, পোস্ট, টেলিফোন, পথচারী সবই রয়েছে। এই টেবিলের উপর একটু উঁচু জায়গায় বসানো রয়েছে একটি টেলিভিশন ক্যামেরা। ক্যামেরা এমনভাবে fit করা হয়েছে যাতে দরকারমত সেকেণ্ডে ১০ ফুট গতিতে উপর, নীচ বা এপাশ ওপাশ সরানো যায়।

এই ক্যামেরার সাহায্যে ঐ নকল শহরের photo তোলা হয়। এই ছবি তারপর একটি পরীক্ষা কক্ষে পর্দায় প্রক্ষেপণ করা হয়। এই ছবি দেখার সময় পরীক্ষকেরা বিমান চালকের চোখে ঐ শহর দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ক্যামেরাটি প্রতি সেকেণ্ডে ১০ ফুট গতিতে নড়াচড়া করার কালে যে ছবি উঠেছে তা পর্দায় দেখার সময় চোখে যে উপলব্ধি জাগে তা ঘণ্টায় ১৪০০ মাইল বেগে চলার সময় বিমান হ'তে বিমান চালকের যে উপলব্ধি জাগে তার সমান। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রকৃত বিমান হ'তে পরীক্ষা চালানো অপেক্ষা মডেলের সাহায্যে পরীক্ষা করায় অনেক সুবিধা, খরচও অনেক কম হয়।

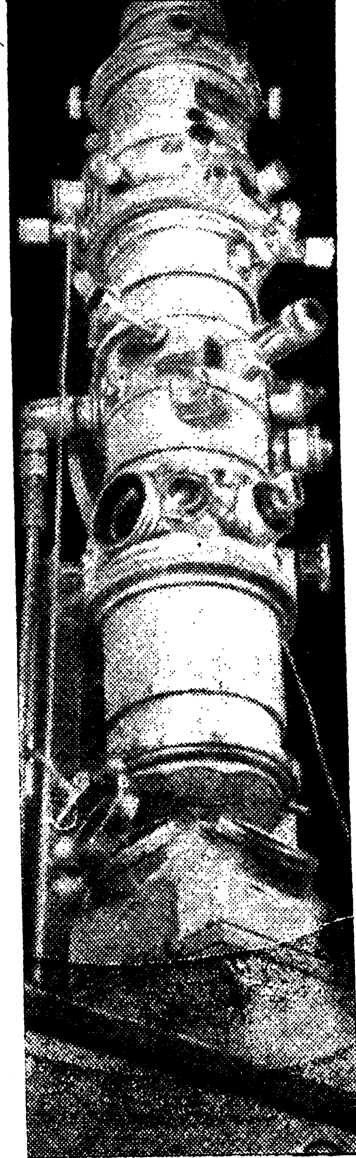
—অনুসন্ধানী

ইলেকট্রনিক স্টেথিসকোপ

আমেরিকায় একরকমের নতুন ইলেকট্রনিক স্টেথিসকোপ উদ্ভাবিত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানফার্নেণ্ডোস্থিত ইণ্টারন্যাশানাল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কর্পোরেশনের বিজ্ঞানীরা উপস্থিত এর কার্যকারিতা ও তার গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখেছেন।

এই অভিনব যন্ত্রটির সাহায্যে শুধুমাত্র মানুষের দেহেরই নয়, মোটরগাড়ি প্রভৃতি যানবাহনের যান্ত্রিক গণ্ডগোল নিরূপণ করা চলবে, তা ছাড়া মহাকাশচারীদের মহাশূন্যভ্রমণের ফলে দেহে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাও এই ইলেকট্রনিক স্টেথিসকোপের সাহায্যে জানা যাবে।

এই যন্ত্রটি মানুষের দেহের ব্যাপারে তার হৃৎস্পন্দন, নাড়ির স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির দিকে লক্ষ্য রাখবে। আর মোটরগাড়ির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে তার আওয়াজের দিকে। মানুষের দেহেও মোটরগাড়িতে কোন গণ্ডগোল ঘটলে এই অভিনব যন্ত্রে তা ধরা পড়ে ও সংকেতধ্বনি হয়ে থাকে।



● সোভিয়েতের একটি বিশেষ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র। যা কিছুই দেখুন, অন্তত দুই লক্ষ গুণ বৃহত্তর দেখতে পাবেন

হাতীর ভুল

শ্রীউমাশঙ্কর

প্রত্যেক জাতি এবং দেশেরই সম্মুখ-যুদ্ধের একটা নিজস্ব রীতি আছে—যদিও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই রীতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। প্রাচীনকালে প্রতিটি দেশেই যুদ্ধে তীর, ধনুক, বল্লম, তলোয়ার প্রভৃতি ব্যবহার হ'ত। কিন্তু বর্তমানে এসবের ব্যবহার কল্পনাও করা যায় না। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে হ'লে যেমন যুদ্ধের প্রাচীনতার পরিবর্তন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শত্রুপক্ষের কলা-কৌশল বা স্ট্র্যাটেজী আয়ত্ত করা।

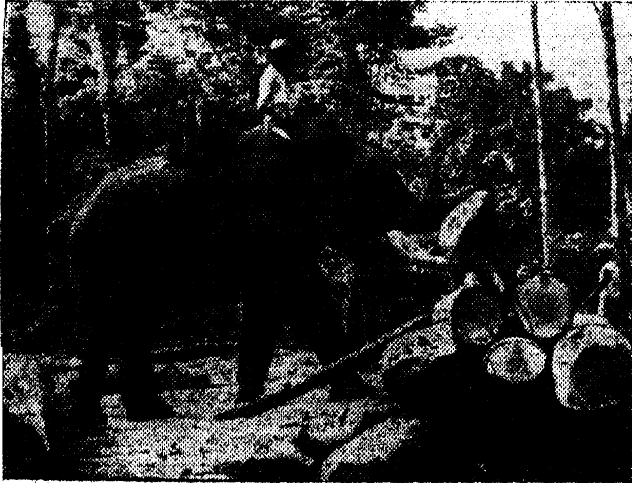
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনা বিপরীত। আমরা সংরক্ষণপন্থী—প্রাচীন সংস্কারকে সহসা পরিহার করতে চাই না। এই সংরক্ষণমূলক মনোভাবের জন্যই বিরাট জনসংখ্যা এবং অদম্য সাহস থাকা সত্ত্বেও প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু রাজাগণ পর পর পরাজিত হয়েছেন বিদেশী আক্রমণকারীর নিকট। এমন কি এই একই কারণে সেদিনও আমরা হিমালয়ের উপরে কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়েছি।

যুদ্ধক্ষেত্রে হাতীর ব্যবহার ভারতীয় যুদ্ধবিদ্যার একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। পুরাণে ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধক্ষেত্রে হাতীর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবহমান কাল থেকে এই প্রথাটির অনুসরণ চলছে। এমন কি আজও উপজাতিদের মধ্যে হাতীর ব্যবহারের প্রচলন রয়ে গেছে। আসামে জবরদখল জমি হ'তে উদ্বাস্তু উচ্ছেদের জন্য হাতী লেলিয়ে দেওয়ার সেই মর্মান্তিক কাহিনী হয় তো অনেকে ভুলে যান নি।

ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে অনেকেই পোষণ করতেন বিরাট হস্তিবাহিনী। পররাজ্য আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বহুলাংশে নির্ভর করতে হ'ত এই হস্তিবাহিনীর উপর। এই সমস্ত হাতীদের বলা হ'ত 'রণহস্তী'। যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ত এদেরকে।

ইতিহাসে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ হাতীকে এই সব কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা সাধারণত 'গুণ্ডা হাতী' বলতে যা বুঝি, এগুলো ঠিক সে ধরণের। বিরাট বিরাট দাঁতওয়ালা রক্তচক্ষু এই সমস্ত হাতীর কাছে শান্ত অবস্থায়ও মানুষ সামনে যেতে ভয় পেত, আর তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত রুধিরাক্ত রণহস্তী প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে ঘন ঘন বিকট ও কর্কশ চীৎকারে শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলে যুদ্ধভূমি কাঁপিয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে থাকে—তখনকার অবস্থা দূর থেকেই কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে হাতীর ব্যবহারে যেমন জয়ী হয়েছেন অনেকে, তেমনি পরাজয়ের সংখ্যাও কম নয়। যেমন, আলেকজাণ্ডারের কাছে পুরুর পরাজয়।

৩২৭ খৃঃ পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন। হিন্দুকুশ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ভারতে আসার সময়েই তিনি ভারতীয় যুদ্ধবিদ্যার সাথে পরিচিত হ'লেন।



● হাতী—মানুষের কাজে

এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরবর্তীকালে এক বিরাট সঙ্কট পার হ'বার ক্ষেত্রে তাঁর খুব কাজে লেগেছিল।

তক্ষশীলার রাজা আম্ভি প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আলেকজাণ্ডারের সাথে হাত মেশালেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পুরুর ধ্বংসসাধন। ভারতীয় যুদ্ধরীতির এটাও একটা মস্তবড় বৈশিষ্ট্য!

আলেকজাণ্ডার প্রথম পদক্ষেপেই সাফল্যলাভ করে দ্বিগুণ উৎসাহে পুরুর রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হ'লেন। ঝিলামের দুই পারে তাঁবু পড়েছে দুই পক্ষের। এক পারে আলেকজাণ্ডার ও আম্ভি, অপর পারে পুরু। কেউ কাউকে প্রথম আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছে না। পুরুর কথা স্বতন্ত্র। কারণ, ভারতবাসীরা মুখ্যত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে না। আর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে যে কারুর কাছ থেকে বাধা পাবেন—তা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু সেই প্রচণ্ড বাধা যখন পুরুর কাছ থেকে এল, তখনই তিনি বুঝে নিলেন প্রতিপক্ষ হেলাফেলা নয়। আর তা' ছাড়া পুরুর হস্তিযূথও খুব মারাত্মক ছিল। একথা আলেকজাণ্ডারের অবিদিত নয়। স্বয়ং মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন গ্রীক সৈন্যদের অবস্থা কল্পনা করে নিতে অসুবিধা হয় না।

এক গভীর অন্ধকার ঝড় বাদলের রাতে আলেকজাণ্ডার ঝাঁপিয়ে পড়লেন পুরু-বাহিনীর উপর। এ জাতীয় পাপযুদ্ধে হিন্দুরা মোটেই অভ্যস্ত নয়। প্রধানত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করত তারা। এরকম আক্রমণ তাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। তাই অপ্রস্তুত অবস্থাতেই নেমে পড়তে হ'ল পুরু বাহিনীকে।

পুরু তাঁর হাতীর শুঁড়ে মোটা লোহার শিকল বেঁধে নিজেই চালিয়ে নিয়ে গেলেন প্রতিপক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে। শিকলের আঘাতে বহু গ্রীকসৈন্য হিন্দুস্থানের মাটিতে রচনা করল তাদের অন্তিমশয্যা। পুরুর হাতীর ভয়ে কোন গ্রীকসৈন্যই আর এগোতে চায় না। আলেকজাণ্ডার দেখলেন সমূহ বিপদ। অথচ ঐ হাতীর উপর বসে আছেন পুরু স্বয়ং।

বহু যুদ্ধবিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার। বিপদ নিয়ে খেলা করতেই তাঁর আনন্দ। তিনি আদেশ দিলেন, ছোড় বর্শা, ছোড় শত শত তীর।

মুহূর্তের মধ্যে হাতীটা যেন তীর আর বর্শার আঘাতে সজারু হয়ে গেল। যন্ত্রণায় আর প্রচুর রক্তক্ষরণে ক্ষেপে উঠল হাতীটা। তার পক্ষে শত্রুমিত্র একাকার হয়ে গেল। পাগলের মত চতুর্দিকে ছুটাছুটি করতে লাগল। নিজ দলের হাতীর এরকম উন্মত্ত আচরণ দেখে পুরুর সৈন্যগণও প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।' আলেকজাণ্ডারের অভিষ্ট সিদ্ধ হল। পুরু বন্দী হলেন—অবশ্য বন্দী হলেন তখন—যখন তাঁর হাতীটি মারা গেছে। পুরু যদি ঐ হাতীটির উপর না থাকতেন, তাহলে যুদ্ধের গতির কোনদিকে মোড় ঘুরত তা বলা সম্ভবপর নয়—হয়তো পুরু-বিজয়ী হ'তে আলেকজাণ্ডারের আরও কিছুটা বেগ পেতে হ'ত।

তেমনি আকবরের পক্ষেও সবিশেষ বেগ পেতে হ'ত দিল্লীতে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনে—যদি না হিমুর দলপতি হাতী হিমুকে নিয়ে পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ওভাবে অকস্মাৎ প্রস্থান না করত। ভারতবর্ষের হিন্দুরাজত্বের ইতিহাসই হয়তো সেদিন অন্যভাবে রচিত হ'ত।

মুঘলবংশকে ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করার জন্য অনেক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এসেছিল ভারতীয় হিন্দুনৃপতিদের কাছ থেকে।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবরের শৈশব অবস্থা এবং দেশে অরাজকতার সুযোগে দিল্লীর সিংহাসনের দাবীদার এবং শেরশাহের পাঠান বংশধর আবদাল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু সসৈন্যে আগ্রা ও দিল্লী দখল করেন।

হিমু জাতিতে ছিলেন মুচি কিন্তু রণক্ষেত্রে এক দুর্ধর্ষ বীর। ইনি জীবনে ২৮টি যুদ্ধের ২৭টিতেই জয়লাভ করেছেন। সমগ্র উত্তর ভারত তখন তাঁর নামে কাঁপত।

দিল্লী অধিকার করে হিমুর মনে গুপ্তযুগের মত হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনা জাগ্রত হল। তিনি নিজের উপাধি গ্রহণ করেন 'রাজচক্রবর্তী'। হিমু জানতেন যে, তলোয়ারের সাহায্যে দখল করা সাম্রাজ্য ততদিনই টিকবে,

যতদিন তলোয়ারের ধার অটুট থাকবে। কিন্তু, যেহেতু তিনি ধর্মে হিন্দু সেইজন্যই বোধ হয় একটু সংরক্ষণপন্থী। তলোয়ারের ধারের চাইতে হাতীর মদমত্ততার উপর অধিক নির্ভর করতেন। আমরা দেখতে পাই, দিল্লীতে দুর্ভিক্ষে যখন পথেঘাটে মানুষ মারা পড়ছে, হিমু তখন আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর ৫০০ রণহস্তীর অনাহারজনিত যেন কোন ক্ষতি না হয়। কেন না, তাঁর ৫০০ রণহস্তীর মূল্য ছিল ৫০০০ হাজার লোকের চাইতেও বেশি। কারণ, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ তাঁকে করতে হবেই।

১৫৫৬ খৃস্টাব্দে ১৩ বছরের বালক আকবর অভিভাবক বৈরাম খাঁর সঙ্গে উপস্থিত হলেন পাণিপথের প্রান্তরে। হিমুও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি গোলন্দাজ, পদাতিক, অশ্বারোহী এবং হস্তিযূথ নিয়ে অগ্রসর হ'লেন। হিমু নিজে দলপতি-হাতীর পিঠে ছিলেন।

গোলন্দাজ ও পদাতিকবাহিনী আকবরের কাছে পরাজয় বরণ করায় হিমু একসঙ্গে ৫০০ রণহস্তী নিয়ে উন্মাদের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়লেন। মত্তহস্তীর আক্রমণে মুঘল সৈন্য প্রাণভয়ে ছত্রভঙ্গপ্রায়। বৈরাম খাঁ প্রমাদ গণলেন, কিন্তু বুদ্ধি হারালেন না। তিনি হিমুর দলপতি-হাতীকে লক্ষ্য করে অবিশ্রান্তভাবে তীর ছুড়তে আদেশ করলেন। কারণ, দলপতি-হাতী পথভ্রষ্ট হ'লে, বাহিনীশুদ্ধ পথভ্রষ্ট হবেই।

যুদ্ধ জয়ের মুখে। বিজয়লক্ষ্মী যখন হিমুর হাতের মুঠোর কাছে এসে গেছে, তখন মাত্র একটি তীর সব ছত্রভঙ্গ করে দিল। চক্ষুতে অকস্মাৎ তীরবিদ্ধ হয়ে হিমু অজ্ঞান হয়ে যান। প্রভুভক্ত দলপতি-হাতী হিমুর এই বিপদে সওয়ারীসমেত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হস্তীবাহিনীও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে। কারণ, দলপতিহীন হয়ে তারা যুদ্ধ করে না।

দলপতি-হাতীসমেত হিমু আততায়ীর হাতে ধরা পড়েন এক নিভৃত জঙ্গলে। আকবর (মতান্তরে বৈরাম খাঁ) স্বহস্তে বধ করেন হিমুকে।

হিমুর দলপতি-হাতী যদি সে সময় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ না করত তা'হলে ভারতের ইতিহাস কি হ'ত আজ আর নিশ্চয় করে বলা যায় না।

যেমন, আজ আর নিশ্চয় করে বলা যায় না দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরাজত্ব কতদূর বিস্তৃতি লাভ করত—যদি না তালকোটের যুদ্ধক্ষেত্রে সদাশিব রায়ের হাতী অকস্মাৎ ক্ষেপে গিয়ে মন্ত্রী রাম রায়ের উপর চড়াও না হ'ত। সমগ্র বাহমনীরাজ্য তো বিজয়নগরের মুঠির মধ্যে আসতই, আর যদি নাও আসত তা'হলেও লক্ষ লক্ষ হিন্দুর রক্তে বিজয়নগর ওভাবে স্নান করে উঠত না।

১৫৬৫ খৃস্টাব্দের কথা। এরও আগের ইতিহাস আছে। তা' হ'ল বাহমনী আর বিজয়নগরের চিরন্তন ঐতিহাসিক রক্তস্নানের ইতিহাস।

এ-সবই ইতিহাসের কথা। ১৫৫৮ খৃস্টাব্দে বিজয়নগরের মন্ত্রী রাম রায় বাহমনীর পঞ্চশাখার দু'টি শাখা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহযোগে তৃতীয় শাখা আহম্মদপুর জয় করেন। দীর্ঘ সাত বছর পর ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের চারটি শাখার সুলতানগণ একযোগে আড়াইলক্ষ সৈন্যসহ হঠাৎ বিজয়নগরের উপর চড়াও হন।

এদিকে রাম রায়ের নেতৃত্বে বিজয়নগরের সৈন্যগণও মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হলেন। বিজাপুরের অদূরে তালকোটে উভয় দলের শিবির পড়েছে। রাম রায় একে ব্রাহ্মণ, তদুপরি একটি রাজ্যের মন্ত্রী। তিনি পাল্কীতে চড়ে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন, আর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন।

দেখতে দেখতে বাহমনীর বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা পরাজয় বরণ করল। বাকি তিনটি বাহিনী নিরুৎসাহ, অপরদিকে বিজয়নগর উল্লসিত। এই জয়ের মুহূর্তে বিজয়নগরের একটি হাতী হঠাৎ ক্ষেপে গেল। তার কাছে শত্রুমিত্র একাকার হয়ে উঠল। কাছেই ছিল রাম রায়ের পাল্কী। হাতী ছুটে গেল সেদিকে। পাল্কীবাহকগণ পাল্কী ফেলে পালাল। রাম রায় পাল্কীর ভেতর থাকা অনুচিত মনে করে বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন আহম্মদনগরের সুলতান নিজামশাহ। তিনি স্বহস্তে রাম রায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। ছিন্নমুণ্ড নিয়ে পরে শোভাযাত্রা করেছিল বাহমনীরা।

প্রিয়মন্ত্রী রাম রায়ের মৃত্যুতে বিজয়নগরের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে বাহমনী সৈন্যদলের হাতে মৃত্যুবরণ করে।

বিজয়নগরের হাতীটি যদি ওভাবে আকস্মিক ক্ষেপে না উঠত বা উন্মত্ততার সাথে প্রিয়মন্ত্রী রাম রায়ের উপর চড়াও না হ'ত—তাহলে কে বলতে পারে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে হিন্দুরাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হ'ত না।

তাই দেখা গেছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে হাতীর ব্যবহার তথা প্রাচীন সংস্কার আঁকড়ে থাকার ফলে বহুক্ষেত্রে হিন্দু নৃপতিগণ পরাজিত হয়েছেন।

অঙ্গনে ও প্রাঙ্গনে

কমলাবাঈ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

স্বয়ংসিদ্ধা

পরের দিন রামনিবাস গার্ডেন, হাওয়ামহল, যন্তর-মন্তর, গোবিন্দজীর মন্দির যাবার কথা কিন্তু সুদীপ্তা বললে, না তার থেকে চলো কাল অম্বর ঘুরে আসি—

যথা হুকুম মহারাণী, বলে ঋত্বিক।

পরের দিন তারা অম্বর ফোর্ট রওনা হয়, সেই যে অনেক দিনের পুরাতন বটগাছটা, যার তলায় গিয়ে বাস দাঁড়ায়, আর কয়েকটা ফুল ও মিষ্টির ছোটছোট দোকান আছে বাঙ্গালীদের, সেখান থেকে সুদীপ্তা কিছু ফুল ও পেঁড়া নেয় মা যশোরেশ্বরীর জন্য। ঋত্বিক জিজ্ঞাসা করে হাতীতে যাবে না পায়ে হেঁটে যাবে ?

হাতীতে চড়ে কাজ নেই তার থেকে বরং সবার সঙ্গে পায়ে হেঁটেই যাবো।

চড়াই রাস্তা উঠতে উঠতে সুদীপ্তা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পাশ দিয়ে লাল-হলদে ঘাঘরি দুলিয়ে তারই বয়সী কত রাজপুত মেয়ে উঠছে-নামছে। যখন তারা প্রাসাদের দ্বারে এসে দাঁড়ায় তখন সুদীপ্তা আর দাঁড়াতে পারে না একটা গাছের নীচে বসে পড়ে। পাশেই কতকগুলো ছোট ছোট টেবিল পেতে দোকান খুলে বসেছে দোকানদাররা, হরেকরকমের হাতীর দাঁতের শ্বেতপাথরের জিনিস আর তার সঙ্গে আছে জয়পুরের ও অম্বরের দ্রষ্টব্য নানা ছবি। ঋত্বিক একটা সিগারেট ধরিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে আর সুদীপ্তা বিশ্রাম নেয়। সুদীপ্তা এক সময়ে উঠে গিয়ে ঐ দোকানের জিনিসগুলি দেখতে আরম্ভ করে, দোকানদার আগ্রহের সঙ্গে সব জিনিস দেখায়। হঠাৎ সেই ছবিগুলোর মধ্যে একটা ছবির উপর বিশেষ করে নজর যায় যেটা খুব পরিচিত বলে মনে হয়। অনেকক্ষণ ধরে সে ছবিটা দেখে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে, ইয়ে কিস্‌কা তসবির ?

দোকানদার সাগ্রহে উত্তর দেয়, ইয়ে কমলাবাঈ রাজকুমারী কমলাবাঈ।

কমলাবাঈ কোন থি ? জিজ্ঞাসা করে সুদীপ্তা।

রাজা জয়সিংহ কা বেটী।

এতক্ষণ ঋত্বিক সুদীপ্তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে হাতে একটা নারীর ছবি দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার তুমি যে দেখছি ছবি কিনতে সুরু করেছ ? দেখি কি ছবি নিলে ?

সুদীপ্তা বলে, এই ছবিটা আমি নেবো।

দোকানদার আরো বলে এই ছবির আসলটা আছে আলবার্ট মিউজিয়মে।

ঋত্বিক ভেবে পায় না হঠাৎ ছবিটা কেন নিচ্ছে সুদীপ্তা।

সমস্ত ফোর্টটা ঘুরে মা যশোরেশ্বরীকে দেখে ফিরতে বেলা প্রায় ১টা বেজে গেল। হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সুদীপ্তা আব্দার ধরলে যে আজই যাবে রামনিবাস গার্ডেন দেখতে।

ঋত্বিক কিছুতেই যেতে রাজী হয় না, অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে বলে, দেখ একদিনে অম্বর ও রামনিবাস দেখলে তোমার কষ্ট হবে, আজ থাক কাল সকাল যাওয়া যাবে।

সুদীপ্তা কিন্তু নাছোড়বন্দা—শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে এলো রামনিবাস বাগানে, সুন্দর ছিমছাম ফুলেভরা বিরাট বাগান বাহারে-পাতার নানা রকমের গাছ। বিরাট চওড়া যে মানসিংহ হাইওয়ে তার দু'পাশে চিড়িয়াখানা—একদিকে শুধু নানা রকমের পাখী আর একদিকে জন্তু জানোয়ার। বাগানের মধ্যে আলবার্ট মিউজিয়ম। রাজপুতানার বহু



● খেলাধুলার জন্য মনোনীতা হাঙ্গেরী মেয়ের দল

উত্থান-পতনের সাক্ষীস্বরূপ এক একটি নির্দশন হিসাবে রয়েছে বহু জিনিস।

রাজাদের অস্ত্রশস্ত্র, ছবি, রাজারাণীদের ব্যবহৃত অলঙ্কার, উত্তরীয়, ঘাঘরি, সুরমাদান থেকে আরম্ভ করে পায়ের পাইজোর পর্যন্ত। ঋত্বিক নানাদিক ভাল করে দেখতে দেখতে যায়, জিনিসের কারুকার্যের তারিফ করে, সুদীপ্তাকে আগ্রহভরে নানা জিনিস দেখায় ও ব্যাখ্যা করে।

সুদীপ্তার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, চোখ যেন মনের আগে ছুটে চলেছে, হঠাৎ সেই চোখ দোতলার দক্ষিণের ঘরের একটা দেওয়ালে আটকে গেল। সমস্ত শরীর তখন তার কাঁপছে থর থর করে একি? মূর্তি কেন তার দিকে এগিয়ে আসছে? সেই বেণী, সেই ওড়নী, সেই ঘাঘরি সেই কণ্ঠহার বেশির মধ্যে গায়ে আরো গহনা। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে, মাথা টলছে।

ঋত্বিক এতক্ষণ দূরে মানসিংহের পোর্ট্রেটটা দেখছিল, হঠাৎ একটা গুঞ্জন শুনে তার খেয়াল হলো সুদীপ্তা তার পাশে নেই, কিন্তু ওখানে ও কিসের ভিড় হয়েছে? এ



● সুরা আর নারী একত্রে। জার্মানীতে এই মেয়েটি এ বছরে 'সুরা-রাণী' উপাধি পেয়েছে

ঘরের বুড়ো দারোয়াম ঐ দিকে ছুটে যাচ্ছে কেন? 'পানি লে আও জলদি, জানানা বেহুস পড় গেয়া,' একজন বলছে অপর জনকে। দেখতে হলো ব'লে এগিয়ে যায় ঋত্বিক। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে সুদীপ্তা একটা অপূর্ব সুন্দরী নারী মূর্তির পোর্ট্রেটের তলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর তার হাতে একটা ছোট ছবি মনে হয় ঐ ছবিরই ছোট সংস্করণ। কিন্তু ঐ নারীমূর্তির গলার হারটা হুবহু সেই জয়পুরী হারটার মত। অজ্ঞানের কারণ জানতে আর বাকি রইল না ঋত্বিকের। যে সব দর্শকের ভিড় হয়েছিল দারওয়ানের সাহায্যে তাদের সরিয়ে দিয়ে জলের ঝাপটা দিতে দিতে জ্ঞান হলো।

বহুদিনের পুরাতন রাজপুত দারোয়ান সস্নেহে সুদীপ্তাকে জিজ্ঞাস করে কেয়া হুয়া থা বেটী? এ তসবির কা সামনা মে কিউঁ বেহুস পড় গেয়া?

ঋত্বিক এবার আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা দারোয়ান জী এ ছবি কার? আর ঐ যে গহনাগুলো পরে আছে, বিশেষ করে ঐ হারটা কি এই মিউজিয়মে আছে?

দারওয়ানজী তার শ্বেতশুভ্র দাড়িতে দু'বার হাত বুলিয়ে কিন্তু কিন্তু করে বলে—ইয়ে কমলাবাঈকা তসবীর, কমলাবাঈ রাজপুত বীর রাজা জয়সিংহ কি লড়কী থি, লেকিন উন্‌কা কাহানী তো বহুত সরম কি হ্যায়, আউর যো কণ্ঠী কা বাত আপ্‌নে কাহা ওভি ইধারহি-থৈ, লেকিন আভি তো ও সাচ্চা নেহি, তিন সাল হো গেয়া ও চোরি হো গেয়া। আভি আপ্‌নে যো দর্শন করেঙ্গে ও দুসরা বানায়কে রাখা।

সুদীপ্তা এবার সুস্থবোধ করছে, জিজ্ঞাসা করলে আচ্ছা দারওয়ানজী তুমি তো এখানে অনেকদিন আছো, এই কমলাবাঈ-এর কাহিনী নিশ্চয় তুমি জান?

কিঁউ নেহি বাঈ, ম্যয় তো জরুর আপ্‌নে সমঝায়ে দেঙ্গে। এরপর সে তার মাথার হলদে ভারী পাগড়িটা একবার ঠিক করে নিয়ে লাঠিটা দু'বার ঠুকে গর্বের সঙ্গে তার দেহাতি ভাষায় বললে, আমার বাবা-ঠাকুর্দা সবাই এ কাজ করে গেছে, তাদের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তাই আপনাদের বলবো।

ঋত্বিক এ ঘটনাটা শোনা সুদীপ্তার পক্ষে ঠিক হবে কি না তাই ভাবছিল, সেইজন্য সুদীপ্তাকে অনুরোধ করলে আজকের মত হোটেলে চলো। কাল এসে শুনবে, এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে আসছে।

সুদীপ্তা ওসব কথায় ভোলবার পাত্রী নয়, সে আজই শুনবে।

কথা বলতে বলতে মিউজিয়মের মার্বেল পাথরের বড় চাতালটায় কখন বেরিয়ে এসেছে খেয়াল নেই। মিউজিয়ম

বন্ধ হবার ঘণ্টা পড়ে গেছে, পুবের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ছে, এখনি টুপ করে ডুবে যাবে। মিউজিয়মের পেছনের মার্বেল চত্বরের একপ্রান্তে এসে তারা তিনজনে বসলো। লোকজন আস্তে আস্তে কমে আসছে। দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠবার জন্য ব্যস্ত। ওদের দু'জনের অনুরোধে দারওয়ানজী কমলাবাঈ-এর কাহিনী আরম্ভ করে—

জয়পুররাজ জয় সিংহের যখন অভিষেক হল তখন তাঁর বিমাতা-পুত্র বিজয় সিংহকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন এবং সেখানেই সে মানুষ হতে লাগলো। এই সময়ে বিজয় সিংহের বয়স ছিল মাত্র ছয়-সাত বৎসর, শিশুকাল থেকেই মায়ের প্ররোচনায় মামারা, বিজয় সিংহকে ভাইয়ের বিপক্ষে দাঁড়াবার জন্য তৈরি করতে লাগলেন। যখন বালক বিজয় সিংহ যুবক বিজয় সিংহ হলেন তখন তিনি দিল্লীবাদশার উজীর কামারুদ্দীন খানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বাদশার প্রিয়পাত্র হবার চেষ্টা করলেন, এই সময়ে বাদশাকে বললেন যে, যদি অম্বরের সিংহাসন পান তাহলে পাঁচ কোটি টাকা নজরানা দেবেন আর পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে বাদশাহকে সেবা করবেন, বাদশা সাহায্য দিতে রাজী হলেন। মায়ের পরামর্শ অনুযায়ী বিজয় সিংহ ভাইয়ের কাছে বুসার দুর্গ চেয়ে বসলেন। জয়সিংহ আনন্দিত মনে তখনি তা দান করলেন। এর কিছুদিন পরে এবার অম্বরের সিংহাসন দাবী করলেন।

মাতা-পুত্রের ষড়যন্ত্রের খবরটি দিলেন জয় সিংহের 'পাগড়ী-বদল' ভাই খায়োদান খান দিল্লীর দরবার থেকে। জয়সিংহ এতদিন ব্যাপারটা ভাল করে তলিয়ে দেখেন নি ছোট ভায়ের আব্দার বলেই ধরে নিয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন সিংহাসনেও হাত পড়ছে তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না, রাজ্যের সমস্ত সর্দারদের ও নাজিরকে ডেকে পাঠালেন।

সব কথা শুনে নাজির বললেন—সোজা পথ ধরলে চলবে না, উল্ট পথ ধরতে হবে, তখন ঠিক হলো সর্দাররা বিজয় সিংহের অভিষেক করবে বুসারে এবং দুই ভাইয়ের মিলন ঘটাবেন।

শুভদিন দেখে জয় সিংহ বের হলেন ভাইয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যে বিজয় সিংহ জয়পুরের ছয় মাইল দূরে নিজের শিবির ফেলেছিলেন। জয় সিংহ যখন লোকজন নিয়ে, হাতে বুসারের দানপত্র নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন এমন সময়ে নাজির খবর দিলেন রাজমাতাও যাবেন তাঁর সঙ্গে, তাঁর বাসনা লালজীদের মিলন দর্শন করা, জয়সিংহ আনন্দিত হলেন, সর্দাররা মত দিলেন। মহাদোলায় চললেন রাজমাতা আর তাঁর সঙ্গে তিন হাজার শিবিকায় তিন হাজার সহচরী। ভাইয়ের নিকটে পৌছে ভাইকে আলিঙ্গন করে বুসারের দানপত্র দিলেন আর বললেন—তুমি যদি অম্বর চাও তাও নাও, আমি নয় বুসারে যাচ্ছি।

বিজয় সিংহ দাদার এই ব্যবহারে এত মুগ্ধ হলেন যে, বললেন আমার আর কিছুই চাই না যার এমন ভাই তার আর কিসের প্রয়োজন?

বিজয় সিংহের ভাগ্যদেবী এ কথায় নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হেসেছিল। এর পর দুই ভাই রাজমাতা দর্শনে চললেন অন্তঃপুরে। দ্বারে খোজা প্রহরীর হাতে জয় সিংহ নিজের তরবারি খুলে দিলেন, তাঁর দেখাদেখি বিজয় সিংহও তরবারি ত্যাগ করলেন। কিন্তু কোথায় রাজমাতা? তার স্থলে বসে আছেন ভট্টি সর্দার উগ্রসেন জয় সিংহের প্রহরীদের হাতে বিজয় সিংহ বন্দী হলেন এবং চিরদিনের মত অম্বরের সিংহাসনে বসবার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হয়েছিল মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়ে।

এত বড় অপমান, এত বড় ছল-চাতুরীর কাছে বিমাতা মাথা নোয়ালেন না কিছুতেই, তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন জয় সিংহের উচ্ছেদ- নারীবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে তিনি বংশে কলঙ্ক লেপনে ব্রতী হলেন।

জয় সিংহের একটি কন্যা ছিল, নাম তার কমলাবাঈ। রূপে-গুণে অতুলনীয়া, তার রূপের খ্যাতি সম্রাটের হারেমে পর্যন্ত পৌঁছেছিল, যার জন্য আওরঙ্গজেবও তাকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বিমাতা এক দূর সম্পর্কের ভাই নারায়ণ সিংহকে এই ষোড়শী কন্যা কমলাবাঈ-এর প্রতি আকৃষ্ট হবার জন্য সাহায্য করতে লাগলেন। পিতার প্রাণস্বরূপা কন্যার



● ডি এ পি অ্যাণ্ড টি অফিসে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া অডিট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের পূর্বাঞ্চল বিভাগের খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীভবানী দত্ত (ডি এ এ পি অ্যাণ্ড টি) ও শ্রীগীতা ভট্টাচার্য (এ জি আসাম অন্যান্য নাগাল্যাণ্ড)।

গতিবিধি ছিল অবারিত। বিমাতার সাহায্যে অতি অনায়াসেই নারায়ণ সিংহ ও কমলাবাঈ-এর মধ্যে সখ্যতা ও পরে প্রেম গড়ে ওঠে। এদিকে নারায়ণ সিং অন্তঃপুরের প্রশ্রয় পেয়ে কমলাবাঈ-এর সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে থাকেন, রাজার কানে কথা পৌঁছতে রাজা কন্যাকে সাবধান করেন কিন্তু বিমাতার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, রাজ্যের ঘরে ঘরে তখন কমলাবাঈয়ের কলঙ্কের কথা। বাধ্য হয়ে একদিন বিষপানে কমলাবাঈ আত্মহত্যা করেন।

এ কাহিনী খুব গোপন কাহিনী—বলে দারওয়ানজী।

এ কাহিনী মেনে নেয় নি জয়পুরবাসী। তারা এটাকে অন্যভাবে সাজিয়েছে, তারা বলে, যখন আউরংজেব মথুরা বৃন্দাবনের মন্দির ধ্বংস করবার আদেশ দিলেন, সেই সময়ে রাজা জয় সিংহ প্রধান ও বেশির ভাগ দেবমূর্তি জয়পুরে নিয়ে পালিয়ে আসেন। তার মধ্যে গোবিন্দজীর মূর্তিটি অম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে তাঁর ষোড়শী কন্যা কমলাবাঈ বিবাহের উপযুক্তা কিন্তু তাঁকে কিছুতেই বিবাহে রাজী করান যায় না, কমলাবাঈ লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা, তাই তাঁর জন্য চাই নারায়ণ। কিছুদিন পর জানা গেল কমলাবাঈ-এর ঘরে সারারাত স্বয়ং গোবিন্দজী লীলা করেন, সকালে বিছানায় নূপুর ও অন্যান্য অলঙ্কার পাওয়া যায়। একদিন স্বয়ং জয় সিংহ উভয়কে শয়ন অবস্থায় দেখে, নিজের উত্তরীয়খানা তাদের দেহে ঢাকা দিয়ে এলেন। প্রভাতে কমলাবাঈ পিতার উত্তরীয় দেখে সব কিছু বুঝলেন, গোবিন্দজীকে জানালেন প্রভু যখন সব জানাজানি হয়ে গেছে, তখন এ কলঙ্কমোচন কর।

গোবিন্দজী তাঁর শ্রীদেহে তাঁকে লিপ্ত করে কমলাবাঈকে উদ্ধার করলেন।

আপনারা যদি গোবিন্দজী মন্দির দর্শন করেন দেখবেন ঠাকুরের সামনে এক সুন্দর নারীমূর্তি পানের বাটা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আর কেউ নন, ঐ কমলাবাঈ।

কিন্তু দারওয়ানজী ঐ হার বিষয়ে কি জান?—বলে সুদীপ্তা।

ঐ হার প্রেমের উপহারস্বরূপ নারায়ণ সিং কমলাবাঈকে দিয়েছিল। সব সময়ে ঐ হার কমলাবাঈ পরে থাকতো, খুব পেয়ারের হার ছিল ওটা। আমি এই মিউজিয়মের একটা ছোট কুঠুরিতে থাকি, যখন রাতে পাহারা দেবার জন্য ঘুরতে বের হই, অনেক সময়ে মনে হয় নীচের ঐ মধ্যের ঘর থেকে কার যেন পাঁইজোরের আওয়াজ আসে, কি যেন সে খুঁজে বেড়ায়। দু-একদিন আবছা কিছু একটা দেখেছি বলে মনে হয়, তবে বুড়ো হয়েছি চোখ-কানের দুইয়েরই শক্তি এবার কমে এসেছে হয় তো মনের ভুল।

গল্প শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু তিন জনের কেউই ওঠবার নাম করছে না, মনটা ভারী হয়ে অনেক যুগ আগে পিছিয়ে গেছে। জয়পুর মেডিকেল কলেজের ঘড়িতে ঢং-ঢং করে ৯টা বাজার ঘণ্টা পড়তে ওদের চমক ভাঙ্গল। সুদীপ্তা উঠে দাঁড়াল। ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকা দারওয়ানজীকে দিয়ে বলল তোমার নাতি-নাতনীকে মিঠাই কিনে দিও।

মাথার ওপর তখন অসংখ্য তারা ঝিলমিল করছে, উদাস মন নিয়ে এক পা এক পা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে সুদীপ্তা, যে রাস্তায় এসেছিল সেই পথেই ফিরে চলতে চলতে সুদীপ্তা জিজ্ঞেস করলে, ঋত্বিককে আচ্ছা সত্যই তুমি হারটা ফেরত দিয়েছিলে?

ঋত্বিক নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে খানিক চুপ করে থেকে বলল, না—তবে এবার দেব।



● রুশ দেশের মেয়ে—চুল ছাঁটায় সেলুনে।

নেদারল্যাণ্ডের নারীসংখ্যা

নেদারল্যাণ্ডে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। তবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্রমশ কমে আসছে। পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ইতিমধ্যেই নারীর চাইতে বেশি, তবে পঁয়ত্রিশ থেকে বেশি বয়সের মধ্যে অবশ্য নারীর সংখ্যা এখনও বেশি।

সমগ্র জনসংখ্যার হিসেবে প্রতি হাজার জন পুরুষের মধ্যে একহাজার সাতজন নারী রয়েছেন।

ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে নেদারল্যাণ্ডে অল্পবয়স্কের সংখ্যা সব চাইতে বেশি। ওলন্দাজ জনগণের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩·৯ ভাগের বয়স পঁয়ষট্টি বছরের উর্ধ্বে। ইটালীতে এই শতকরা সংখ্যা হল ৯·৬, বেলজিয়ামে ১২, ফ্রান্সে ১১·৯ এবং জার্মানীতে ১১·৩। —তথ্যান্বেষী

সৃষ্টিছাড়ার দুঃখ

কমলা মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগে
যখন ছিলাম নিতান্তই কিশোরী,
প্রবাসী মা বাবার বিচ্ছেদে
খেলার ঘরের জানলা ধরে
চুপটি করে
চোখের জল ফেলতাম।
ভাবতাম
বুঝি তাঁদের কাছে না পাওয়ার দুঃখে
আমার মন
এত সুখ সত্ত্বেও সুখী হয় নি।
মনের মাঝে
কিসের অভাববোধ
আমায় কাঁদাতো
মাঝে মাঝেই
তা, তখন বুঝি নি।
বড় হয়ে
যখন পড়া সাঙ্গ করে
ঢুকলাম সংসারের প্রাঙ্গণে,
সেদিন দুহাত বাড়িয়ে
একজন আমায় পরম সমাদরে
করল গৃহে প্রতিষ্ঠিত।
আমি আনন্দে ভাসলাম;
ভাবলাম কোনদিন
মন আর উদাস হবে না।
কিন্তু দুদিন বাদেই,
ও যখন আপিস চলে যায়,
তখন ঘরের কাজ সেরে
আবার বসে থাকি
আমার শূন্য প্রাঙ্গণে
উদাস মনে।
শুনে ও শুধু হাসল
সে হাসি আমায় লজ্জা দিল।
তাই কিছুদিন পরে
ছোট্ট খোকার পেছনে
আমায় দৌড়াতে হয় সারা বাড়ি।
আমি ভাবি
আর উদাস হবার সময় কোথায়?
তবে এইজন্যেই
কৈশোর থেকে আমার মন
খারাপ হত।
হায় রে নিশ্চিন্ততা।
গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনে
বর্ষার বৃষ্টির রিমঝিম তান শুনে
শরতের নীল আকাশে—
হাঁসের মত সাদা মেঘ দেখে
বসন্তের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে
আমার মন কোথায় চলে যায়
এখন কাউকে আর এ কথা বলতে পারি না।
এখন জানি মন চায়—
দূরের ঐ নীলাকাশে গিয়ে দেখতে
এই জীবনের ওপারের যে জীবন
তার রূপ কি;
মন চায়, এই জীবন ছেড়ে
মৃত্যুর মাঝে গিয়ে দেখতে
এই অপরূপ পৃথিবীর স্রষ্টা শিল্পীকে।
এ কি ভয়ঙ্কর ইচ্ছে আমার
মনকে পাকে পাকে নিত্য পিষছে
চারিপাশে নরনারী মত্ত রয়েছে,
রয়েছে নিজ নিজ সংসারে মগ্ন।
শুধু আমি নিতান্ত সাধারণ অতি তুচ্ছ হয়েও
এদেরই মাঝে বসে সৃষ্টিছাড়া দুঃখে
হাহুতাশ করছি।
হায় স্বাভাবিকের মাঝে আমিই কেন
এমন সৃষ্টিছাড়া অস্বাভাবিক?

পশম বনাম কৃত্রিম সুতোর পরিচ্ছদ

দেখা গেছে একজনের থেকে অন্যজনের কাজ করার ক্ষমতা বা কাজ করার দরুণ ক্লান্তি আলাদা আলাদা। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা মানুষের কাজ করার ক্ষমতা নির্ভর করে অনেকগুলি কারণের ওপর যেমন পুষ্টি, নিদ্রাও কাজ করে মনে আনন্দ পাবার ওপর। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর ডর্টমুণ্টে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক 'কর্মশক্তি বিজ্ঞানের' কংগ্রেসে ঘোষিত হয়েছে যে, কর্মক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে মানুষের পরিধেয় বস্ত্র একটি প্রধান অংশগ্রহণ করে।

মানুষের কর্মক্ষমতা ও পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তা পরীক্ষার ফলাফলে নির্ভুল-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে ঐ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পশ্চিম জার্মানীর গবেষক এফ, ডবলিউ বেহ্‌মান যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা' থেকে জানা যায় যে, যারা খেটে খায় তাদের পক্ষে পশমের জামা-কাপড় কৃত্রিম সুতো দিয়ে তৈরি জামা-কাপড়ের চেয়ে ঢের ভালো। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে তিনি একদল শ্রমিকের পশমের পোশাক ও অন্যদলকে কৃত্রিম পলিয়ামাইডফাইবারের

পোশাক পরিয়ে ৯ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সমপরিমাণ কাজ দেন। যারা কৃত্রিম সুতো দিয়ে তৈরি কাপড়ের পোশাক পরেছিল, তাপমাত্রার বিভিন্ন স্তরে তাদের উৎপাদন কম হ'ল এবং তাদের মধ্যে যারা আবার একটু দুর্বল গোছের, তাদের উৎপাদন হ'ল আরও কম—অথচ যারা পশমের পোশাক পরেছিল তারা অনেক বেশি খাটতে পারলে।

এ ছাড়াও এই কংগ্রেসে আর একটি কথা জানা গেছে। ডর্টমুণ্ডের ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউটের কর্ম ও শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক ই এ ম্যুয়েলের জানান যে, এতাবৎ একজন শ্রমিকের রোজ খাটার ক্ষমতা ধরা ছিল প্রতি কিলে ২০০০ ক্যালোরি, কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এতো বেশি শক্তির হারে একটানা কাজ করার ধকল সামলাতে পারে যারা সাইকেল চালায় তাদের পায়ের পেশী, কিন্তু মানুষের হাতের পেশীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। ক্লান্ত না হয়ে বেশিক্ষণ মানবদেহ ০.১ অশ্বশক্তি ক্ষমতায় পৌঁছাতে পারে না। তাই মোটর ইঞ্জিনের মত একটানা সে চলতে পারে না। অবশ্য খুব অল্প-সময়ের জন্য হলে মানবদেহ তিন অশ্বশক্তির সমান ক্ষমতা উৎপন্ন করতে পারে, যেমন দশ-বারো সেকেণ্ডের জন্যে যখন ১০০ গজ দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে হয় কিন্তু আবার যদি ঐ দূরত্ব ঐ সময়ের মধ্যেই যেতে হয়, তাহলে দেহকে অন্তত দেড়ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া দরকার। —ডি এ ডি।

বিবাহিতা নারী কর্মী

বিবাহিতা নারীগণের কর্মসংস্থান সম্পর্কে নেদারল্যাণ্ডের কুশলতা নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠান একটি বিবরণী প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কে প্রধান প্রধান ওলন্দাজ ও বৈদেশিক পুস্তকের একটি তালিকা এবং এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অনুসন্ধান, এই বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিবাহিতা নারীদের কাজে নিযুক্ত করে নিয়োগকারিগণ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেই সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং এই শ্রেণীর কর্মিগণ সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করা হয়, তা জানার জন্যই এই অনুসন্ধান করা হয়। কাজের পরিবেশ, কি কি সর্তে বিবাহিতা নারীগণ কর্মে নিযুক্ত হন, এঁদের কর্মে অনুপস্থিতি এবং অবিবাহিতা নারীদের তুলনায় এঁরা কতখানি বেশি বা কম কাজ করেন ইত্যাদি বিষয়গুলিও এই অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নেদারল্যাণ্ডের কুশলতা নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সাত শ' কার্মের প্রত্যেকটিকে একটি করে প্রশ্নাবলী পাঠানো হয়। এই কার্মগুলির শতকরা ৩৪ ভাগ প্রশ্নাবলীর উত্তর পাঠায় এবং সেগুলি অনুসন্ধানের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। যে ২৩৮টি ফার্ম প্রশ্নাবলীর উত্তর পাঠিয়েছে, সেগুলিতে নিযুক্ত মোট কর্মসংখ্যা হ'ল ২১৭,০৭৯ এবং এঁদের মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা হ'ল ৩৮,৩০৪ জন, তাঁদের মধ্যে আবার ৭,৮২০ জন নারী হলেন বিবাহিতা। প্রধানত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতেই এই অনুসন্ধান চালানো হয়। নেদারল্যাণ্ডে শতকরা ষাট জন বিবাহিতা নারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বাইরে কাজ করেন, কাজেই এই অনুসন্ধানে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত হন নি।

নেদারল্যাণ্ডের কুশলতা নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অভিমত হ'ল এই যে, বিবাহিতা নারীগণ যদি বেশিদিন ধরে পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ করতে রাজী থাকেন, তাহলেই তাঁদের কর্মী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন যে—যতজন বিবাহিতা নারী কর্মীকে প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন। যে বিবাহিতা নারীগণের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশুনা করে, তাঁরা সাধারণত আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন এবং এঁদের সংখ্যা, পূর্ণ সময়ের কর্মীর তুলনায় দ্বিগুণ। বিবাহিতা নারীগণকে কর্মে নিযুক্ত করলে তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিতির পরিমাণ বেশি হলেও তাঁদের কর্মকুশলতা অবিবাহিতা নারীদের তুলনায় কোনক্রমেই কম নয়। নিয়োগকারিগণের মধ্যে শতকরা বাইশ জন বলেছেন যে, বিবাহিতা নারী কর্মিগণের কাজ তাঁরা সন্তোষজনক বলেই মনে করেন। এঁদের দায়িত্বজ্ঞান অধিকতর, এঁরা অনেক বেশি শৃঙ্খলাপরায়ণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কর্তব্যপরায়ণ এবং এঁরা অনেক বেশি নিয়মিতভাবে কাজ করেন। বিবাহিতা নারীগণ ঠিক কি ধরণের কাজের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, অথবা এঁদের কর্মে নিযুক্ত করা সম্পর্কে কি ধরণের দীর্ঘ-মেয়াদী নীতি গ্রহণ করা উচিত—সে সম্বন্ধেও এই বিবরণীতে কোন পরামর্শ দেওয়া হয় নি।

কাজের সময়ের বিভিন্নতা সম্পর্কে প্রশ্নাবলীর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বিবাহিতা নারীগণ আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন, সেখানে কাজের সময় অর্ধেক করে, দুপুরবেলার ছুটি বাড়িয়ে, আগে ছুটি দিয়ে, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কাজের সময় স্থির করে, অর্ধেক ছুটির দিন ঠিক করে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া-আসার সময় অনুযায়ী বা বাড়ির কাজের সময় অনুযায়ী ডিউটির সময় স্থির করে এবং সম্ভব হলে সকাল, দুপুর বা সন্ধ্যেবেলায় কাজের সময় স্থির করে সমস্যার সমাধান করা হয়। তবে একেই হল্যাণ্ডের বিবাহিতা নারীগণের কাজের সাধারণ ধারা বলে এখনও দাবী করা যায় না। —তথ্যাবেষী

বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

বিদায় বস্টন

অবশেষে বস্টন ছেড়ে যাবার সময় ঘনিয়ে এল। দেখলাম বস্টন ছেড়ে যেতে হবে এ যেন ভাবতেই পারছি না। আমার ওয়ার্দিংটন স্ট্রীটের এই এপার্টমেন্টে যে সংসার পেতে বসেছিলাম কবে যেন তার সঙ্গে রীতিমত মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গিয়েছি।

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে শ বললে, এ আবার কি! প্রথম কিছুদিন শুনলাম দেশের জন্য মন কেমন করছে, এখন যখন দেশে ফিরবার দিন এগিয়ে এল তখন আবার Singing another tune কেন?

আমেরিকান এক্সপ্রেস থেকে চিঠিপত্র আসতে সুরু করেছে, ফিরতি পথের প্রোগ্রাম ঠিক করা হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন যেতে এবার আমরা আটলান্টিক মহাসাগর জলপথে পাড়ি দেব বলেই স্থির করলাম। কোন জাহাজে যাব জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল অনেকদিন ধরে। আমেরিকান এক্সপ্রেস থেকে পাঠানো কাগজপত্র সামনে মেলে ধরে শ বললে, ডাঃ নিউহাউসার বলেছেন যদি গুড ফুড এবং গুড ওয়াইন চাও তবে ফরাসী জাহাজ 'লিবার্তে' (Liberté) করে যাও।

উক্ত জিনিস দুটির প্রতি শ'র কিঞ্চিৎ দুর্বলতা থাকলেও আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। যে-দেশি জাহাজে যাব সে-দেশি হাল-চাল, আদব-কায়দাই দেখতে পাব। আমার মনে হল ফরাসীরা আবার কেমন লোক হবে কে জানে বাপু।

শ বললে, তবে বনেদী বৃটিশ জাহাজ 'কুইন মেরী' অথবা 'কুইন এলিজাবেথ' পছন্দ করতে হয়।

আমি ঠোঁট কুঁচকে বললাম, একে তো জাহাজ দুটো বড্ডো সেকেলে তার ওপর বৃটিশরা শুনেছি বেজায় কোল্ড আর ফর্ম্যালিটির ভক্ত। এতদিন খোলামেলা আমেরিকানদের সঙ্গে কাটিয়ে ওদের সঙ্গে আমার পোষাবে না।

মানুষের মনের গতি বিচিত্র। দেশ থেকে আসবার সময় মনে হয়েছিল আমেরিকানরা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজানা। ইংরেজদের তবু কিছু জানি। কন্টিনেন্টও হয়ত সাহিত্য, শিল্পের মাধ্যমে কিছু-কিছু জানা আছে। আজ কিন্তু ফিরে যাবার দিনে মনে হল আমেরিকানরা নিকটতম, তাদেরই সবচেয়ে সহজে বুঝি। শেষ পর্যন্ত আমি তাই পছন্দ করলাম আমেরিকান জাহাজ 'ইউনাইটেড স্টেট্‌স্।' একটা কেবিন বুক করতে লিখে দেওয়া হল।

আমেরিকান আতিথেয়তা এত গ্রহণ করে বসেছিলাম তার ঋণ শোধ করা অসম্ভব ছিল। তবুও ফিরে যাবার আগে মাঝে মাঝে বন্ধুজনদের ডেকে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করতে সচেষ্ট হলাম। আমাদের সব আমেরিকান বন্ধুরাই ভারতীয় রান্না খেতে ভালবাসতেন। 'কারি' তো অবশ্যই চাই, এ ছাড়া পোলাও অথবা চাপাটিও খুব পছন্দ ছিল। আমাদের মিষ্টি ওদের অত ভাল লাগত না। মিসেস্ ওয়েল্‌স্ আমাদের ওখানে খেলেই পকেট থেকে নোটবই বার করে ফেলতেন—এটাকে কি বলে ডাল, এটা পরোটা? খস্ খস্ করে লিখে নিচ্ছেন। বললাম, ও কি হচ্ছে?

বললেন, বারবারাকে সব লিখতে হবে না?

ডিক ও হ্যারিয়েটকে পাকাবিদায় ভোজ দেওয়া গেল একটা। ওর মেয়েরা এক-একজন এসে এক-একদিন কাটিয়ে গেল আমাদের সঙ্গে। ক্যারেন তো কান্নাকাটি জুড়ে দিল কেন বু ইণ্ডিয়াতে চলে যাবে।

এরই মধ্যে কবি-অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী মশাই এসে একদিন খবর দিলেন, কবি টি. এস্. এলিয়ট এসেছেন বস্টনে। কবিতা পাঠ হবে সন্ধ্যাবেলা বস্টনের এক হল্-এ আমরা যাব কি না।

এ আর বলতে। বিদগ্ধ বস্টনিয়ানদের সমাবেশে কবিতা পড়ে শোনালেন এলিয়ট। প্রবীণ কবির সঙ্গে তাঁর তরুণী ভার্যাও উপস্থিত ছিলেন। পাঠ সাঙ্গ হবার পর একটা রিসেপশন মত হল। একটু হাউ-ডু-ইয়ু-ডু বলার আর হাণ্ডশেক করার সুযোগ হল। চিরকাল ইংরেজী-সাহিত্যের ভক্ত আমি তাইতেই যেন ধন্য হয়ে গেলাম।

অমিয়বাবু ফস করে হাতে একটা বই গুঁজে দিয়ে চাপাগলায় বললেন, একটা অটোগ্রাফ।

কুণ্ঠিতভাবে বইটা খুলে ধরলাম।

এলিয়ট হেসে বললেন, এখন এই ভিড়ে একবার যদি সুরু করি রক্ষা নেই।

আমিও আর দ্বিতীয়বার পীড়াপীড়ি করলাম না। এর ক'দিন পর দরজায় ঘণ্টা শুনে খুলে দেখি অমিয়বাবু।

হাসিমুখে আমার হাতে একখানা 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' ধরিয়ে দিলেন।

পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ল—Inscribed for Dr. & Mrs. S. Bose—T. S. Eliot. আমি তো অবাক।

অমিয়বাবু বললেন, পরে নিজেই বলেছেন, আমি লজ্জিত তখন ভিড়ের জন্য করতে পারি নি তাই।

বস্টনের সঙ্গে বিচ্ছেদের দিন যে এগিয়ে আসছে এ-খবরটা ভুলিয়ে রাখার জন্যই যেন এ-সময় নানান কাজে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম। নানান ধরণের কাজে ও এদিক-ওদিক ছুটোছুটির চোটে যাবার তোড়জোড় সবই রইল পড়ে। এরমধ্যে আরো একটা নিউ ইংলণ্ড ফল—শরৎকাল এসেছে এবং চলে যাব-যাব করছে শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে বাতাসে। এমন সময় কোহাসেটে বেদান্ত-আশ্রম থেকে এল আমন্ত্রণলিপি, দুর্গাপুজোর উৎসব স্বরু হয়েছে সেখানে। মনের মধ্যে চমক লাগল, পুজোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিজয়ার দিন সকাল থেকে সারাদিন আশ্রমবাসীদের সঙ্গে আনন্দে কাটল। কাছাকাছি যে ক'জন প্রবাসী বাঙালী ছিলেন জড়ো হয়েছেন সকলেই। তা ছাড়া আমেরিকান ভক্ত ও শিষ্য-শিষ্যারাও কম নন। আশ্রমসংলগ্ন চ্যাপেলে পূজা হল। হয়ত পাশ্চাত্য ভঙ্গির একটু মিশল ঘটল কিন্তু তাতেই বিদেশে এই পূজার আকর্ষণ বাড়ল বৈ কমল না। প্রসাদ, শান্তিবারি এবং সন্ধ্যায় সকলের কোলাকুলি কিছুই বাদ গেল না। প্রবাস-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কোহাসেটের এই বিজয়া-সম্মিলনী স্বতন্ত্র হয়ে মনের কোণে রয়ে গেছে। চোখে ভাসছে চ্যাপেলের বেদীতে-বসানো দুর্গার ছবি। কানে আসছে গান—

একবার বিরাজো গো মা হৃদি কমলাসনে।

টেলিফোন বাজছিল অনেকক্ষণ ধরে। বাথরুমে কাপড়কাচা ফেলে রেখে দৌড়ে এসে ধরলাম। 'আমি বিভার কান্ট্রি স্কুলের হেডমাস্টার কথা বলছি।' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে চাই। হেডমাস্টারদের ভীতিজনক বলেই তো জানি চিরকাল। কি মুস্কিল, এ যে আমাকেই চায়।

খুলে বললেন হেডমাস্টারমশাই। ইউ এন ডে পালিত হবে তাঁর স্কুলে। ম্যাসাচুসেটস্-এর নামকরা স্কুল বিভার কান্ট্রি স্কুল। এখানে ম্যাসাচুসেটস্-এর সব হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা জড়ো হয় ঐদিন। এই ছাত্রসম্মেলনে প্রতি বছর একটি বিশেষ দেশ নিয়ে আলোচনা হয়। এ বছর আলোচনার বিষয়বস্তু হল ভারতবর্ষ। তাই আমার ডাক পড়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো বিভার কান্ট্রি স্কুলের। চেস্টনাট হিলের পথে গাড়ি যখন চলেছে পথের দু'ধারে চেয়ে দেখি গাছের পাতায় যেন আগুন ধরে গেছে। নিউ ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়ান সামার যাই-যাই করেও যেন মায়া ছাড়তে পারছে না। বাঁক ঘুরতেই বিভার কান্ট্রি স্কুল—পনেরো শ' ছাত্র-ছাত্রীর সম্মেলনে গমগম্ করছে।

প্রথমেই যথারীতি কফি-আওয়ার, ব্যাকগ্রাউণ্ডে হিন্দুস্থানী মিউজিক। তারপর বিরাট হল-এ সভা বসল। বিভিন্ন ভারত-ফেরৎ আমেরিকান তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে বক্তৃতা দিলেন। একজন তরুণ আমেরিকান বলল, ভারতবর্ষে গিয়ে সে একটা নতুন কথা শিখেছে 'লভ্ ম্যারেজ'। সেটা কি-বস্তু, তার জানা ছিল না। কারণ তার দেশে তো সবই ভাবতীয়েরা যাকে বলে 'লভ্ ম্যারেজ' তাই। সরস বক্তৃতার মত ভীতিজনক বক্তৃতাও কম হল না। রাত্রে ফুটপাথে শুয়ে লোক ঘুমোয় বা কলকাতা য়ুনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের স্ট্যাটিস্টিকস্ শুনে শিউরে উঠল শ্রোতারা। আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

তাই সভাশেষে যখন পনেরো শ' ছাত্র-ছাত্রীকে ভাগ করে নিয়ে ছোট ছোট দলে প্রশ্নোত্তরের আসর বসল তখন আমাদের দেশের সুস্থ, সহজ দিকটার একটি ছবি এদের সামনে তুলে ধরবার সুযোগ পেয়ে বাঁচলাম।

আমার গ্রুপের ছেলেমেয়েরা তাদের প্রশ্নে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিল। বুঝতেই পারলাম আজকের সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিস্তর পড়াশুনো করে এসেছে সবাই। নয়ত সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে খবরাখবর রাখার ব্যাপারে আমার মনে হয় ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক বেশি উৎসাহী। আমেরিকান ছাত্রের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতার তুলনায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা ইংলণ্ড, আমেরিকা সম্বন্ধে নানা খবর রাখে।

প্রশ্ন নানান ধরণের হল—জাতিভেদ, হরিজন-সমস্যা, আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, অহিংসার আদর্শ, হিন্দু-মুসলমান মনান্তর মায় কাশ্মীর সমস্যা কিছুই বাদ গেল না। আমার বেবী-ব্রিনীর ক্লেয়ার অন্য একটা গ্রুপে ছিল, সে বলল তাদের উত্তরদাতার প্যানেলে একজন ভারতীয় ও একজন পাকিস্তানী ছিলেন। কাশ্মীর নিয়ে কথা উঠতেই দু'জনে প্রবল কথা-কাটাকাটি—ক্লেয়ারের ভাষায় আরগুমেণ্ট স্বরু হল। ফলে ওদের গ্রুপে আলোচনা আর অগ্রসর হতেই পারল না।

সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুড বাই বলা চলছিল বন্ধুদের। কোথাও, কোথাও গিয়ে দেখা করে বিদায় নিয়ে আসছিলাম, কেউ বা বাড়িতে এসে দেখা করে যাচ্ছিলেন। বুড়ি মিসেস্ ওয়েক্সলার আমাদের বস্টনের প্রথম বন্ধু, ট্রেনের পরিচয়। গর্বিতভাবে সকলকে বলতেন—I discovered them—এরা হল আমার আবিষ্কার। জিজ্ঞেস করলেন, আবার কবে আসবে?

শ ফস্ করে বলে বসল বছরতিনেক পর।

সত্যি! খুশি হয়ে বললেন, তবে আমি তিন বছর অপেক্ষা করব, মরব না।

ডাঃ ব্রামান লিটল আমার ডাক্তার। দেখা করে কিছু ভারতীয় উপহার দিয়ে এলাম একদিন। আর

তো কিছুই গ্রহণ করেন নি আমাদের কাছ থেকে। প্রথম বস্টনে আসার পর ওয়েলজদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ গ্রাইফ আমাদের দেখাশুনো করতেন। খামে ফী ভরে ন একদিন খামটা এগিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

ডাঃ গ্রাইফ ফেরৎ দিয়ে বললেন, একই প্রফেশনের সহকর্মী আমরা. এ হয় না।

শ বললে আমি এখানে বিদেশী আগন্তুক মাত্র।

ওকে থামিয়ে দিয়ে দৃঢ়স্বরে ডাক্তার গ্রাইফ বলেছিলেন —মেডিসিন নোজ্ নো বাউণ্ডারি (Medicine knows no boundary)। তুচ্ছ ঘটনা।

কিন্তু মাঝে মাঝে তুচ্ছ ঘটনাও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। দেখা করে আসার পরদিন ডাঃ লিটলের কাছ থেকে সুন্দর একখানা চিঠি পেলাম। ভারতীয় উপহারগুলো খুবই পছন্দ হয়েছে লিখেছেন, আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তরে জানিয়েছেন—ইট ওয়াজ এ প্লেজার টেকিং কেয়ার অফ ইয়ু।

কোথাও যাবার আগে আবার একপ্রস্থ কেনাকাটা করতে হয়। পথের প্রস্তুতি আছে তা ছাড়া দেশেও সকলের জন্য কিছু নিতে হবে। এসব ব্যাপারে মিসেস ওয়েলজ্ আমার সহায়। গাড়িতে চড়িয়ে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরিয়ে দিলেন। মিসেস ওয়েলজ বললেন, তোমার চার ননদের জন্য চারটা সুইমিং কস্টিউম নাও। শুনে আঁতকে উঠলাম। কি সর্বনাশ!

মিসেস্ ওয়েলজ ক্ষুন্ন হলেন ওঁর এমন চমৎকার আইডিয়াটা আমার ভাল লাগল না দেখে।

বস্টনে বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর রয়েছে গোটাচারেক ফাইলিনজ, জর্ডান মার্শ গিলক্রাইস্ট আর সিয়ারস্। বহুতলাবিশিষ্ট এই দোকান বাড়িগুলোর এক এক তলায় এক এক ধরণের জিনিসের বিকিকিনি চলে। আর আছে বেসমেণ্ট অর্থাৎ মাটির নীচের তলা। বেসমেণ্টে অনেকসময় সস্তায় পাওয়া যায় জিনিসপত্র। যেসব জিনিস আউট অফ ফ্যাসন হয়ে যাচ্ছে বা হয়ত সামান্য খুঁত পাওয়া গেছে সেসব বেসমেণ্টে চলে আসে এবং সস্তায় কেনা যায়। আমাদের কেনাকাটা অবশ্য বেশিদূর অগ্রসর হতে পারল না।

ওর ফার্স্ট ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের পাশ বই-এর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে শ বললে, হয় য়ুরোপ বেড়ানো হবে নয় জিনিসপত্র কেনা হবে। দুটো চলবে না, একটা বেছে নাও।

বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ আমি প্রথমটা বেছে নিলাম।

ডাঃ উইটেনবার্গ শ-কে একদিন ধরে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের যাবার দিন কি স্থির হয়ে গেছে? হেসে হেসে বললেন তোমাদের চলে যাওয়াটা সাড়ম্বরে প্রতিপালন করতে চাই।

এরই ক'দিন পর চিঠি পেলাম ডাঃ উইটেনবার্গ ও হ্যারিয়েট উইটেনবার্গ আমাদের জন্য আমেরিকান ভাষায় যাকে বলে একটা পার্টি থ্রো করছেন।

হ্যারিয়েটদের ফ্রেমিংহ্যামের বাড়িতে সেই শেষ যাওয়া। গিয়ে দেখলাম শ'র কর্মস্থলের অর্থাৎ বস্টন শিশু-হাসপাতালের অনেকেই উপস্থিত। ওর নিজের ডিপার্টমেণ্টের তো কেউ-ই বাকি নেই। শ-র ডিপার্টমেণ্ট ছিল বস্টন হাসপাতালের সবচাইতে আন্তর্জাতিক ডিপার্টমেণ্ট। আমেরিকান সহকর্মীরা ছাড়াও সেখানে ছিল কানাডা থেকে দু'জন, জার্মানী থেকে একজন, সুইজারল্যাণ্ড থেকে একজন, পারস্য থেকে একজন, তুর্কী থেকে আরো একজন, ভারতবর্ষ থেকে শ নিজে। ডিপার্টমেণ্টের এই আন্তর্জাতিক খ্যাতি ওদের চীফ ডাঃ নিউহাউসারের গর্বের বস্তু ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের আন্দ্রে গিডিয়ন হাসিখুশি, মিশুকে। সে বলত, কোনদিন সকালে না জানি হাসপাতালে পা দিয়ে দেখব নিউহাউসার বলছেন—এই যে তোমাদের নতুন সহকর্মী ইথিওপিয়ার হাইলে সেলাসী।

ডাঃ নিউহাউসার নিজেও আশ্চর্য চরিত্রের লোক। সহকর্মী ডাক্তারদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অপরিসীম ও আন্তরিক। শুনেছি, রোগীর এক্স-রে ফিল্মের ওপর চোখ রেখে কোষ্ঠি বিচার করার মত তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই বলে যেতে পারেন। এদিকে ডাক্তারি ছাড়াও চারিদিকের নানা বিষয়ে ঝোঁক তাঁর। মাছধরা, বেসবল খেলা, আর্ট, এমন কি রান্না করা—কি নয়! নিউহাউসারের যোগ্য সহকারী ছিলেন ডাঃ উইটেনবার্গ। শুধু কর্মদক্ষতায় নয় মানুষ হিসেবেও। চমৎকার উদার স্বভাব, ডাক্তারি ছাড়া অবসর সময়ে ছবি আঁকার শখ, আর আছে ফ্রেমিংহামে ওদের ফার্মহাউসের পশু-পাখী, ক্ষেত-খামারের তদারকী।

আমাদের বিদায় ভোজসভায় চমৎকার রান্না করেছিল হ্যারিয়েট। টার্কি রোস্ট আর লবস্টার মাশরুম চিংড়ি মাছ ও মাশরুমের একটা প্রিপারেশন। ওদের ছোট বাড়িতে অভ্যাগত উপচে পড়ছে সেদিন। কিচেন, লাইব্রেরী, বসবার ঘর, সব জায়গাতে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে আর গল্প করছে সকলে। আমরা ফিরতি-পথে কোথায় কোথায় যাব তাই নিয়ে জোর আলোচনা চলছিল। দৈবক্রমে আমরা লণ্ডন, প্যারিস, মিউনিক ভিয়েনা, রোম যেখানে যেখানে যাচ্ছি সব জায়গাতেই কোন-না-কোন আত্মীয় রয়েছেন দেখা গেল। একজন বললে, তোমাদের যেন পৃথিবীর সব দেশেই আত্মীয় ছড়িয়ে রয়েছে। কে যেন জিজ্ঞেস করল, লণ্ডনে কে আছে বললে? অমনি একজন ফস করে বলে উঠল, দি কুইন ইজ দেয়ার—স্বয়ং রাণীই রয়েছেন। তুমুল হাসির রোল উঠল এ-কথায়।

হঠাৎ দেখি ডাঃ উইটেনবার্গ পূজার আরতির ঘণ্টার মত একটা ছোট ঘণ্টা টুং-টুং করে বাজিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরছেন। কি ব্যাপার? ওঁর একটা বিশেষ ঘোষণা আছে, সকলকে একবার লাইব্রেরীতে জড়ো হতে বলছেন। সবাই কফির পেয়ালা হাতে লাইব্রেরীতে এলাম। উইটেনবার্গ উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে বলতে লাগলেন—কোন বিদায়ী ছাত্র চলে যাবার সময় ডাঃ নিউহাউসার তার একটা কঠিন পরীক্ষা নেন। সাধারণত একটা জটিল এক্স-রে ফিল্ম দিয়ে রোগ নির্ণয় করতে বলা হয় তাকে। শ'র এই পরীক্ষাটা বাকি আছে।

চেয়ে দেখি উইটেনবার্গের হাতে বড়সড় একটা হাসপাতালের এক্স-রে ফিল্মের খাম। অন্যদিকে নজরে পড়ল একপাশে চেয়ারে বসে নিউহাউসার মুচকে হাসছেন। খামটা হঠাৎ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে উইটেনবার্গ বললেন, 'এ যাত্রা শ'-র বদলে তার স্ত্রীই এই পরীক্ষাটা দিক। একটা জটিল কেস ওর হাতে দিয়েছি আমি।'

আমি তো অপ্রস্তুত। এ আবার কি? এম্-এ পরীক্ষা দিয়েই মনস্থির করে ফেলেছিলাম আর কোন পরীক্ষা-টরীক্ষার ভেতর নেই।

আস্তে খামটা খুলতে বেরিয়ে পড়ল একটা অয়েল পেণ্টিং, শ'-র পোর্ট্রেট। ফ্র্যাংক বেনসিং বলে নিউইয়র্কের এক পোর্ট্রেট-শিল্পীর আঁকা। বেনসিং কিছুকাল আগে বস্টনে এসেছিল নিউহাউসারের একটি পোর্ট্রেট আঁকতে। কর্মরত নিউহাউসারকে ঘিরে বসে আছে তার আন্তর্জাতিক ছাত্রদল—তার একটি অপূর্ব অয়েল পেণ্টিং হাসপাতালের জন্য করেছে সে। শ'-র পোর্ট্রেটও সেই সময়কার রচনা। বুঝলাম শ'-র কর্মস্থলের পক্ষ থেকে এটা আমাদের বিদায়-উপহার। পোর্ট্রেটটা ফিরতে লাগল সকলের হাতে-হাতে। পোর্ট্রেটের সঙ্গে সঙ্গে উইটেনবার্গের দেবার কায়দাটুকুও সকলের তারিফ পেল। সত্যি একটা জটিল কেসই বটে!

[আগামীবারে ফিলাডেলফিয়া—নিউ ইয়র্ক।



অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাতাসী মঞ্জিল

আমি যে মৃণালিনীর কথা ভাবছিলাম, কানাই মিস্তিরের তা জানবার কথা নয়। তিনি কি ভাবলেন জানি না, বললেন, 'থাক এসব কথা। বাইরের লোকের মুখে এই এ্যাটর্নীবাড়ির কথা কি শুনেছেন সেইটে বলুন।'

বললাম, 'বুড়ো সুলতান মিয়ার মুখে শুনেছি এ বাড়ি সম্পর্কে লোকের মনে নানারকম অদ্ভুত ধারণা আছে।'

'যথা?'

'বাতাসী বিবি নাকি এখনো বাতাসী মঞ্জিলের মায়া কাটাতে পারে নি, এখনো অনেক রাত্তে পায়চারি করে বেড়ায় এ বাড়ির মস্ত ছাতে, ফুলের বাগানে, সবুজ ঘাসে ঘাসে, পুকুরের কিনারে-কিনারে, শ্বেতপাথরে বাঁধানো স্নানের ঘাটে বসে থাকে জলে পা ডুবিয়ে।'

'আরো আছে ধনপতিবাবু। অনেক রাতে এই পুকুরের জলে একা আপন মনে সাঁতার কাটে বাতাসী বিবি।'

শুনে আমার গা ছমছম করে উঠল। বললাম, 'কেউ চোখে দেখেছে কি কানাইবাবু?'

'নিজের চোখে দেখেছে এমন কাউকে জানি নে। কিন্তু গভীর নিশীথরাতে এ বাড়ির ছাদের ওপর মেয়েলী পায়ের মৃদু চলাফেরার আওয়াজ আমি নিজের কানে শুনেছি। ঠিক যেমনভাবে যেমন সময় এই ছাদের ওপর একা পায়চারি করে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল বাতাসী বিবির।'

'কিন্তু মেয়েলী পায়ের আওয়াজ বলে বুঝলেন কি করে?'

'মেয়েদের চলার আওয়াজ আলাদা, ছন্দ আলাদা—ও আমার চিনতে ভুল হয় না।'

'আপনার কি বিশ্বাস ঐ পায়চারির আওয়াজ বাতাসী বিবির?'

'তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।'

কথার সুরে মনে হল এ বিশ্বাস ভাঙবার কারণ ঘটলে মনে দুঃখ পাবেন কানাই মিস্তির। আমার মনের সন্দেহ অনুমান করে নিয়ে তিনি বললেন, 'বাবা কখনো ছাদে ওঠেন না। গভীর রাতে ছাদে উঠে একা পায়চারি করার মতো বাড়িতে কেউ নেই। আর রাত্তিরে বাইরের কারও পক্ষে ছাদে ওঠা অসম্ভব, ধনপতিবাবু।'

অতএব তিনি ধরে নিতে চান সুদূর অতীতে দেহে থাকতে বাতাসী বিবির যে অভ্যাসটি ছিল, বাতাসী বিবি বিদেহিনী হয়েও সেটি ছাড়তে পারে নি।

'আমার কানের বা মনের ভুল নয়; ও আওয়াজ আমি নিঃসন্দেহে শুনেছি।' বললেন কানাই মিস্তির। 'দু-একবার প্রায় ইচ্ছে হয়েছে ছুটে ছাদে উঠে গিয়ে ভেদ

করে আসি ঐ পায়চারি-আওয়াজের রহস্য। কিন্তু যাই নি।'

কেন যান নি এবং অশরীরীর পায়চারিতে ছাদের বুকে আওয়াজ জাগা সম্ভব কি না সে প্রশ্ন করলাম না কানাই মিত্তিরকে; কিন্তু প্রশ্ন দু'টি আমার মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে লাগল। জবাবে ভাবলাম অশরীরী বাতাসী বিবির সঙ্গে মুখোমুখি মোলাকাত হবার ভয়েই ছাদে যেতে সাহস করেন নি কানাই মিত্তির; অথবা ছাদে যান নি পাছে রোমান্টিক আতঙ্কময় ভুলটি ভেঙে যায় রহস্যের কোনো অ-রোমান্টিক সহজ সমাধানে, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চলে তবু আমার কানের পাশে বাজতে লাগল কানাই মিত্তিরের জবাব: 'তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।'

তাঁর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে গভীর রাতে এ বাড়ির ছাদের ওপর মাঝে মাঝে যে পদধ্বনি নীচে থেকে শুনতে পান, সে পদধ্বনি বাতাসী বিবির। দিনের আলোয় কি হত জানি না, কিন্তু রাত্রির পরিবেশে আমার মনও তাই বিশ্বাস করতে চাইল। আমি যেন স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনুভব করলাম এই এ্যাটর্নী বাড়ি, তথা বাতাসী মঞ্জিল, বিদেহিনী বাতাসী বিবির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বুদ্ধির চাইতে অনুভূতি অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠল। আর মনে হল, হয়তো বুদ্ধির চাইতে অনুভূতিই সত্যের বেশি কাছাকাছি পৌঁছে দেয়।

আরেকবার তাকালাম তৈলচিত্রের বুকে ৺নটবর মিত্তিরের দিকে, তারপর তাঁর পৌত্র কানাই মিত্তিরের দিকে। আরেকবার বিস্মিত হলাম দু'জনের আশ্চর্য, প্রায়-অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য দেখে। যেন ঐ ছবি থেকেই নেমে এসেছেন কানাই মিত্তির। অতীতে বিধাতার কারসাজিতে বিচিত্র যোগাযোগের ফলে বাতাসী বিবির জীবনে এসে পড়েছিলেন নটবর মিত্তির, আর নটবর মিত্তিরের জীবনে এসেছিল বাতাসী বিবি, দুই আলাদা জগতের মানব-মানবী। আর বর্তমান পিয়ানো-যাদুকরী নীলা সেগানের জীবনে এ্যাটর্নী কানাই মিত্তির এসেছেন বলব কি না জানি না, কিন্তু এ্যাটর্নীর জীবনে পিয়ানো-যাদুকরীর আবির্ভাবের পিছনে বিধাতার একটি বিশেষ মতলব রয়েছে বলে সন্দেহ হল। 'কি সেই বিশেষ মতলব?'

প্রশ্ন জাগল মনে, কানাই মিত্তিরের হাতের আংটিতে বসানো নীলা পাথরের দিকে তাকিয়ে।

মনে হল সেকালের প্রতিনিধি রয়েছেন ঐ তেল-রঙে আঁকা জীবন্ত জীবনায়তন ছবিতে, আর একালের প্রতিনিধি রয়েছেন আমার সামনে বসে রক্ত-মাংসের দেহে। কিন্তু বদলে গেছে পরিস্থিতি আর পরিবেশ। তখন ছিল বৃটিশ শাসনের সূর্য প্রবল প্রতাপে ভারতের আকাশে সমুজ্জ্বল; আর এখন সেই সূর্য এ আকাশে অস্তমিত, এ আকাশে উড়ছে অশোকচক্র-সমন্বিত ত্রিবর্ণ পতাকা। যুগ বদলেছে, মানুষ বদলেছে। দেখা যাক, কি করে নতুন যুগের নতুন মানুষ কিন্তু সেকালের তুলনায় একালের পরিস্থিতি আর পরিবেশ যেন জটিলতর; পরিবর্তনটা যেমন অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক, তেমনি বিরাট —এ যেন এক আলাদা জগৎ।

'এই এ্যাটর্নীবাড়ি সম্পর্কে অনেকের মনে আরো নানারকম উদ্ভট কল্পনা আছে বলে কানাঘুষোয় শুনতে পাই, ধনপতিবাবু।' বললেন কানাই মিত্তির। 'তাদের কিছু কিছুর জন্ম ঈর্ষা থেকে, আর কিছু কিছুর উৎস উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।'

'যথা?'

'কেউ কেউ বলেন পালোয়ান-অ্যাটর্নী মহা ঘোড়েল লোক ছিলেন, বাতাসী বিবি চলে যাবার মওকায় এই চমৎকার দামী সম্পত্তিটি ওর কাছ থেকে জলের দামে হাতিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে, হি গট্ ইট্ ফর এ সং। দাদু দুনিয়াদারিতে পাকা চৌকস লোক ছিলেন, তা সত্যি। জলের দামেই তিনি বাতাসী মঞ্জিল পেয়েছিলেন, কিন্তু কুমারসাহেবের হাত থেকেও এই সম্পত্তি তিনি জলের দামেই কিনিয়ে দিয়েছিলেন মক্কেল বাতাসী বিবিকে, সে কথাটা ভুললে চলবে কেন?'

'তা ছাড়া কি, কানাইবাবু?'

'দাদু যতোই চৌকস পুরুষ হন না কেন, তিনি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বা বোকা বানিয়ে জলের দামে সম্পত্তিটি হাতিয়ে নেবেন, এমন কাঁচা মেয়েমানুষ ছিল না বাতাসী বিবি। অমন আশ্চর্য, অমন চৌকস স্ত্রীলোক পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মায় নি, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

'আপনার এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি, কানাইবাবু?'

দেয়ালে টাঙানো জীবনায়তন তৈলচিত্রটির দিকে তাকিয়ে কানাই মিত্তির বললেন, 'আমার দাদু, প'লোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির।'

৺নটবর মিত্তিরের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ধ্বনিত হয়ে উঠল কানাই মিত্তিরের কণ্ঠে। মনে হল এই মনোভাবের নামই বোধ হয় পুর্বপুরুষ-পূজা, ইংরাজিতে যাকে বলে 'অ্যানসেস্টর ওয়ারশিপ।' অনন্যসাধারণ, ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন ৺নটবর মিত্তির; তাঁর জীবনে একটি বিশিষ্ট, অন্তরঙ্গ ভূমিকায় আবির্ভাবের জন্য বিধাতা যে নারীকে বেছে নিয়েছিলেন, সে নারীর পক্ষে অসাধারণ না হওয়া অসম্ভব, এ-বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই কানাই মিত্তিরের মনে।

ভাবলাম, কি আশ্চর্য, এই কানাই মিত্তিরই ভাবতে ভালবাসেন এবং ভেবে বোধ করি গর্বও বোধ করেন, যে অতীত নিয়ে তিনি খুব বেশি মাথা ঘামান না! তা হলে অতীতের নটবর মিত্তিরের প্রতি এত শ্রদ্ধা কেন? হয়তো সেই অতীত রক্তের ধারা তাঁর দেহে বর্তমান বলেই।

মনে পড়ে গেল বুড়ো সুলতান মিয়ার মুখ থেকে শোনা সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি:

'নানীর কাছ থেকে যখন ফিরে এলাম, তখন বাতাসী বিবি আর নেই বাতাসী মঞ্জিলে। কোথায় চলে গেছে জানে না কেউ। ফটক থেকে উঠে গেছে বাতাসী মঞ্জিল নামটাও। যা ছিল বাতাসী বিবির বাতাসী মঞ্জিল, তার নয়া মালিক হয়েছেন এ্যাটুর্নী লটবর মিত্তির,—এখন যিনি মালিক, এ্যাটুর্নী নেমাই মিত্তির, তেনারই বাপ।' আর বলেছিল, 'শুনতে পেলাম বাতাসী মঞ্জিল বেচে দিয়ে গেছে বাতাসী বিবি, কিনে নিয়েছেন এ্যাটুর্নী লটবর মিত্তির বিক্রির টাকা বাতাসী বিবি খয়রাত করে গেছে এতিমখানায়, হাসপাতালে, দাওয়াখানায়, আরো নানা রকমে। সব বিলিয়ে দিয়ে ফকির হয়ে চলে গেছে বাতাসী বিবি।'

'বাতাসী মঞ্জিলে বেশ গুছিয়ে বসবে বলেই তো এসেছিল বাতাসী বিবি। কিন্তু হঠাৎ বাতাসী মঞ্জিল ছেড়ে চলে গেল কেন বলতে পারেন?' শুধালাম কানাই মিত্তিরকে।

'শুধু বাতাসী মঞ্জিল ছেড়ে নয়।' বললেন কানাই মিত্তির। 'ভারতজোড়া যে বে-আইনী সাম্রাজ্যের সে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী ছিল, সেই সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিল বাতাসী বিবি।'

'কিন্তু কেন?'

'ইংরেজ কেন চলে গিয়েছিল তার ভারতের সাম্রাজ্য ছেড়ে?' বললেন কানাই মিত্তির। 'অনেকটা সেই ধরণেরই প্রশ্ন এটা। এর জবাব নানারকম অনুমান করা যায়, কিন্তু সঠিক দেওয়া শক্ত।'

ভারত থেকে বাতাসী বিবির প্রস্থান এবং ইংরেজের প্রস্থানকে যিনি সমান উঁচু আসনে বসালেন, তাঁর মুখের দিকে আরেকবার তাকালাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। দেখলাম তিনি মৃদু হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আমার বিস্মিত ভাব দেখে যেন কৌতুক-মিশ্রিত অনুকম্পা অথবা অনুকম্পা-মিশ্রিত কৌতুক জেগেছে তাঁর মনে। তিনি বললেন, 'অনেকের মুখে মুখে এ বাড়ির আরেকটি ভয়ানক বদনাম ঘোরাফেরা করে; আপনার কানে তা পৌঁছেচে কি না জানি নে, ধনপতিবাবু। এ না কি অভিশপ্ত বাড়ি। শুধু এই দালানটাই নয়, একে ঘিরে সমস্ত জায়গা—মাঠ, বাগান-বাগিচা, পুকুর, চারদিকের দেয়াল-ঘেরা এই গোটা সম্পত্তিটার ওপরই না কি অভিশাপ আছে।'

'অভিশাপ!'

'অভিশাপ। অকল্যাণের অভিশাপ। এ না কি লক্ষ্মীছাড়া সম্পত্তি, এক হাতে বেশি দিন থাকবে না, আর প্রত্যেক মালিকের অকল্যাণ করবে, এ সম্পত্তির মালিক হয়ে কেউ সুখী বা কল্যাণবন্ত হতে পারবে না।'

'এ অভিশাপের শুরু কি করে হয়েছিল, আপনি জানেন, কানাইবাবু?'

'অতীত নিয়ে আমি বড় একটা মাথা ঘামাই নে, তা তো বলেছি আপনাকে। তবু যেটুকু কানে এসেছে বলি। একেবারে গোড়ায়, শৈশব থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত নানা দুঃখ-অসুবিধা-ঝড়ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে কাটাবার পর জীবনের ভাঁটার দিকে এসে যিনি অনেক আশা করে এই সম্পত্তির পত্তন করেছিলেন, ভেবেছিলেন জীবনের বাকি দিনগুলি একটু আরামে কাটিয়ে যাবেন, এই অল্প কয়েক বছরের আনন্দে আগেকার অনেক বছরের দুঃখ-যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ হবে, তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না।'

'কেন? কি হল তাঁর?' অত্যন্ত উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি। সুদূর অতীতের সেই না-দেখা ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমার মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল।

কানাই মিত্তির বললেন—

'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত গরিবের ধন চুরি।'

পড়েছেন তো দুই বিঘে জমির ওপর কবিগুরুর লেখা সেই কবিতা? তারপর—

'করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি
মিথ্যা দেনার খতে,'

তাও পড়েছেন নিশ্চয়? এ ক্ষেত্রে অনেকটা সেইরকম ব্যাপার করলেন এক রাজাসাহেব। মস্ত জমিদার। অনেক টাকার, অনেক ঐশ্বর্যের মালিক। আর লম্পট শয়তান বললে আপনারা যা বোঝেন, ঠিক তাই। এই সম্পত্তির ওপর প্রচণ্ড লোভ হল রাজাসাহেবের। কেন? না, চমৎকার বাগানবাড়ি হবে তাঁর লম্পট পুত্র কুমারসাহেবের প্রমোদ-বিহারের জন্য, নারী-বৈচিত্র্য এবং সুরা-বৈচিত্র্যের নেশা যার অফুরন্ত, মোসাহেব-প্রীতিও যার অসাধারণ।'

'তারপর?' প্রশ্ন করলাম গভীর উদ্বেগে।

'রাজাসাহেবী পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ জানি নে, জানি শেষ ফলটা। সম্পত্তিটির মালিক হলেন রাজাসাহেবের পুত্র কুমারসাহেব; সেই ভদ্রলোক বিতাড়িত হয়ে শেষে একদিন গঙ্গাসাগরে যাত্রা করে সেই সাগরেই ডুবে গেলেন, আর উঠলেন না। শুনেছি চলে যাবার আগে তিনি এই সম্পত্তির ওপর রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অভিশাপ। এ সম্পত্তি যে গ্রহণ করবে, এই অভিশাপের ফলও তাকে ভুগতে হবে। এই কাহিনী প্রচলিত আছে। জানি নে, এতে কতটা সত্য আর কতটা কল্পনা মেশানো।'

ভেবে দেখলাম, কুমারসাহেবের হাতে এ সম্পত্তি বেশিদিন থাকে নি, দেউলে হয়ে তাঁকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল। কুমারসাহেবের পরের মালিক হয়েছিল বাতাসী বিবি, যার নামে এ সম্পত্তির নাম হয়েছিল বাতাসী মঞ্জিল। ভারতজোড়া বিরাট বে-আইনী দলের প্রবল প্রতাপশালিনী নেত্রী বাতাসী বিবিও এই অভিশাপের আঘাত সামলাতে পারল না। বাতাসী মঞ্জিল ছেড়ে তাকেও মাত্র কয়েক বছরের ভেতরই চলে যেতে হল। তারপরের মালিক হলেন পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির। গেট থেকে উঠে গেল এ বাড়ির পুরোনো নাম 'বাতাসী মঞ্জিল,' কিন্তু তার বদলে সে জায়গায় বসল না কোনো নতুন নাম। নটবর মিত্তিরও বেশিদিন রইলেন না এ সম্পত্তির মালিক হয়ে। নাতির মুখ দেখবার একান্ত সাধ ছিল, সে সাধ পূর্ণ হল না তাঁর। নাতি জন্মগ্রহণ করবার দু' বছর আগেই অকালে তাঁকে ওপারে চলে যেতে হল। তাঁর পরবর্তী মালিক হলেন তাঁর পুত্র এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির। নিমাই মিত্তির পিতৃহীন হবার দু' বছর বাদে পুত্রলাভের আনন্দ পেলেন বটে, কিন্তু তার কয়েক বছর বাদে তাঁকে সইতে হল পত্নী বিয়োগের দুঃসহ অকল্যাণ। তাঁরও অন্তরে প্রচণ্ড নাতি-কামনা, কিন্তু এখনো নাতির আগমন-সম্ভাবনার কোনো লক্ষণ দেখা দেয় নি। কে জানে নাতি-দর্শনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত অবস্থাতেই ৺নটবর মিত্তিরের মতোই তাঁকেও ওপারে চলে যেতে হবে কি না?

এ্যাটর্নীগিরি থেকে বানপ্রস্থ নিয়েছেন নিমাই মিত্তির। এখন মিত্তির বংশের এ্যাটর্নীগিরির ধারা বজায় রাখছেন



ওঁ জবাকুসুম— —দুলালচন্দ্র দত্ত

মাসিক বসুমতী । মাঘ / '৭১

আর কত দূর ? —জহর চট্টোপাধ্যায়



শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দির (নবদ্বীপ)

—মোন চৌধুরী



মাসিক বসুমতী

মাঘ / '৭১



আকাশব্যাপী

—শান্তিময় সান্যাল

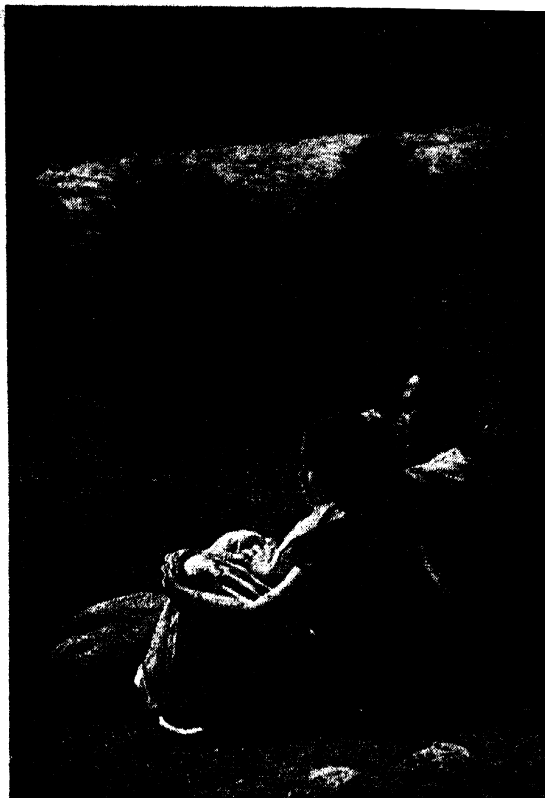


কটাক্ষ

—প্রফুল্ল মিত্র

ছু'জনায়

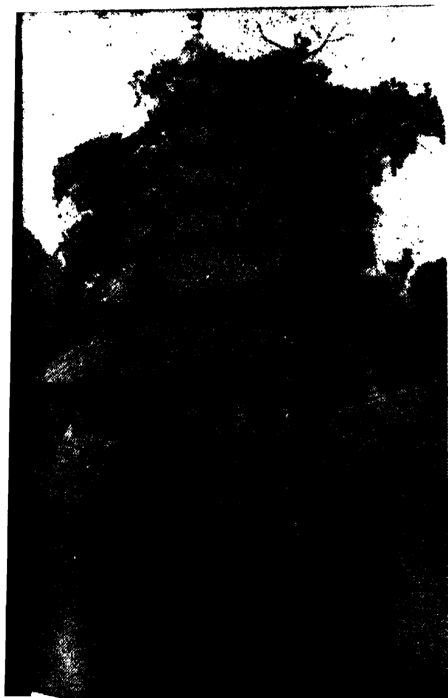
—সত্যেন ঘোষ



মাসিক

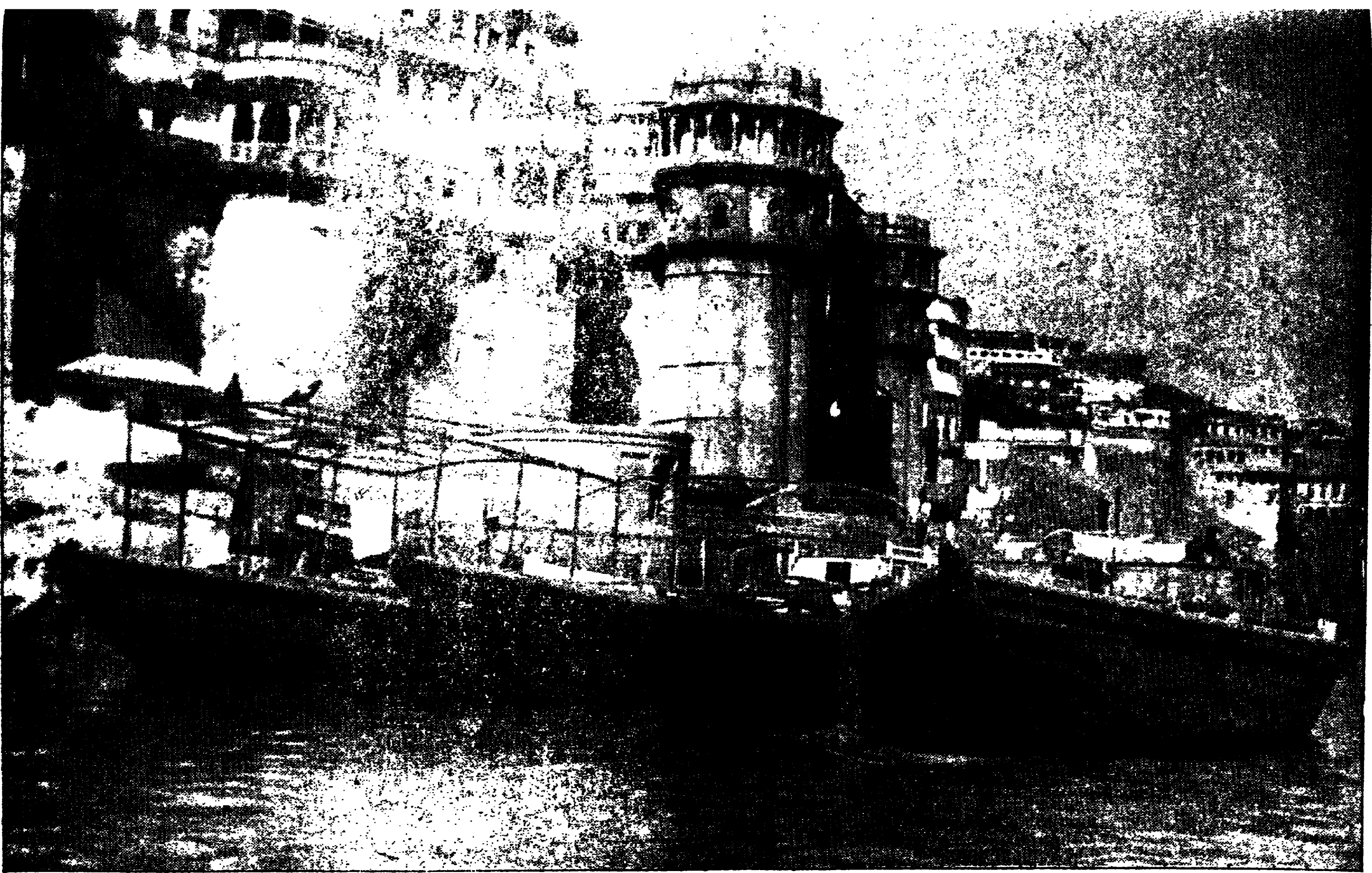
বসুমতী

মাঘ / '৭১



প্যাগোডা (কলকাতা)

—এস ধর



কাশীর গঙ্গা

—দিলীপ বসাক

এ্যাটর্নী কানাই মিত্তির, অভিশপ্ত বাতাসী মঞ্জিলের সর্বশেষ মালিক। পুরোনো অভিশাপের উত্তাপ কি তাঁকেও স্পর্শ করে নি? মৃণালিনীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করে কানাই মিত্তির সুখী হতে পারেন নি; মনে হচ্ছে কি এক অভিশাপ যেন তাঁদের দু'জনের মাঝখানে একটা রহস্যময়, দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। ঘরের ঘরণী মৃণালিনী কানাই মিত্তিরের কাছে কোনো আকর্ষণ নন; কানাই মিত্তিরের দুরন্ত আকর্ষণ এসেছে বাইরের দিক থেকে, সেই আকর্ষণ—

আমার চিন্তার স্রোত হঠাৎ বাধা পেল। এ বাড়ির অন্যতম ভৃত্য, ভেতর থেকে এসে কানাই মিত্তিরকে খবর দিল: 'ফোন এসেছে হুজুর। সেহান মেমসাহেবের কাছ থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক পুলকের যে উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল কানাই মিত্তিরের চোখে-মুখে, তা এ জীবনে ভুলতে পারব না। শিশুর মতো উল্লসিত হয়ে সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তিনি ফোন ধরতে ভেতরে ছুটে গেলেন, যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন, 'আপনি একটু বসুন, ধনপতিবাবু। আমি এখখুনি আসছি।'

যে দরজা দিয়ে নীলা সেহানকে নিয়ে ভেতর থেকে এ ঘরে প্রবেশ করেছিলেন কিছুক্ষণ আগে, সেই দরজা দিয়েই কানাই মিত্তির ভেতরে ঢুকে গেলেন নীলা সেহানের ফোন ধরতে। আমি বসে রইলাম একা ঘরে, আমার সামনে সেই শূন্য সোফা, যাকে পূর্ণ করে কিছুক্ষণ আগে বসে ছিল নীলা সেহান। আবার চোখ পড়ল ৺নটবর মিত্তিরের তৈলচিত্রের দিকে। ভাবলাম এঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল সে যুগের সেই অসাধারণ রমণী বাতাসী বিবি। জানি না, সে কতটা মহীয়সী কতটা পাপীয়সী, কতটা হোলি (holy) কতটা আনহোলি (unholy), কতটা শ্রদ্ধা আর কতটা অশ্রদ্ধা বা ঘৃণার পাত্রী, কিন্তু সে যে অসাধারণ নারী ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ বেঁচে থাকতেই সে কিম্বদন্তীর পাত্রী হয়েছিল আর চলে যাবার অনেক বছর বাদেও তার কিম্বদন্তী বেঁচে আছে।

একা বসে বসে আমি যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম; মনে হল বাতাসী বিবির দেহহীন প্রভাব এখনো সত্যিই বাতাসী মঞ্জিলকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। জানি না, বাতাসী বিবি কেন চলে গিয়েছিল—অভিমানে,

আশাভঙ্গে অথবা নিরাশায়? কিন্তু চলে গিয়েও মায়া কাটাতে পারে নি বাতাসী মঞ্জিলের।

কি চেয়েছিল আর কি পায় নি বাতাসী বিবি? সেই না-পাওয়ার নিদারুণ যন্ত্রণাতেই কি সে পালিয়ে গেছে, আর রেখে গেছে তার অন্তরের বেদনাময় অভিশাপ? অথবা যে মঞ্জিল ছেড়ে সে চলে গিয়েছিল, আবার সেই মঞ্জিলেই নতুন করে ফিরে আসতে চাইছে?

যে পথে একটু আগে ভেতরে চলে গিয়েছিলেন কানাই মিত্তির, সেই পথেই হঠাৎ ফিরে এলেন। বললেন, 'একটা অনুরোধ রাখতে হবে, ধনপতিবাবু।'

'কি অনুরোধ?'

'কাল প্যারাডাইস কোর্টে যেতে হবে। নীলা সেহানের পিয়ানো বাজনা শুনতে। কাল রবিবার, ছুটির দিন। কোনো অসুবিধে নেই।'

মেঘ না চাইতেই জল! আমি উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। তবু বললাম, 'কিন্তু······'

'আর কিন্তু-টিন্তু নয় ধনপতিবাবু। এত বড় আর্টিস্ট যেচে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে পিয়ানো শোনাতে চায়, এ একেবারে অভাবনীয় সৌভাগ্য, রেয়ার অপর্চুনিটি। এ সুযোগ ছাড়া যেতেই পারে না। নীলা সেহানের পিয়ানো আমায় মুগ্ধ করেছে।'

নীলা সেহানের পিয়ানো আমার শোনা হয় নি, আমি তেমন পিয়ানো-রসিকও নই, কিন্তু মনে-মনে বললাম মুগ্ধ করবার জন্য নীলা সেহান নিজেই যথেষ্ট। আর মনে পড়ল কানাই মিত্তিরের ভাষায় 'প্যারাডাইস কোর্টে অনেক স্কাউণ্ড্রেলের মেলা।' ঠিক এই কারণেই প্যারাডাইস কোর্ট দেখবার জন্য মনটা উৎসাহী হয়ে উঠেছিল, প্যারাডাইস কোর্ট সাধুপুরুষে ভর্তি শুনলে যা হ'ত বলে মনে হয় তা হয় না। যে জায়গা নীলা সেহানের মতো মেয়ের পক্ষে নিরাপদ নয়, তাকে দেখবার আগ্রহ জেগেছিল; সে আগ্রহ মেটাবার সুযোগ সঙ্গে-সঙ্গেই এগিয়ে এসেছে।

বললাম,—'কখন যেতে হবে?'

'বেলা তিনটেতে পৌঁছব কথা দিয়েছি। আপনাকে কোথা থেকে তুলে নিয়ে যাবো বলুন।' বললেন কানাই মিত্তির।

ঠিক হ'লো প্যারাডাইস কোর্টের ট্রামহীন রাস্তাটি প্যারাডাইস কোর্টের সিংহদ্বার পেরিয়ে পূবদিকে এগিয়ে এসে যেখানে চওড়া ট্রাম রাস্তায় পড়েছে, সেই মোড়ে পৌনে তিনটে থেকে তাঁর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকব আমি, তিনি প্যারাডাইস কোর্টের রাস্তায় ঢুকবার মুখে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নেবেন।

একটু ভেবে কানাই মিত্তির বললেন, 'আপনার বাড়ির নির্দেশটা দিয়ে দিলে সেখান থেকেও আপনাকে তুলে নিতে পারতাম। অবশ্য আপনি যা চাইছেন তাই হবে। কিন্তু সময়মতো ঠিক জায়গায় থাকবেন, ভুল করবেন না যেন।'

ভরসা দিলাম ভুল হবে না আমার। শুনে খুশি হলেন কানাই মিত্তির। তারপর বললেন, 'কালকের তারিখটা নীলার জীবনে একটা বিশেষ তারিখ, বিষণ্ণ তারিখ, ধনপতিবাবু। এই তারিখেই মারা গিয়েছিল ওর বাবা, সুপার স্কাউণ্ড্রেল অর্জুন সেহান, এ স্কাউণ্ড্রেল ওয়ার্থ টোয়েন্টি সেইন্টস্ (a scoundrel worth twenty saints)।'

'স্কাউণ্ড্রেল অর্জুন সেহানের দাম এককুড়ি সাধুপুরুষের সমান???' বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

'কারণ সে নীলা সেহানের বাবা।' বিস্ময়ের সমাধান করে দিলেন কানাই মিত্তির। অর্জুন সেহানের দুষ্কৃতিবহুল জীবনের সমস্ত দুষ্কৃতির কালিমা ধুয়ে-মুছে গেছে একটি প্রবল পুণ্যের জোয়ারে। নীলা সেহানের সে জন্মদাতা।

ফোন এসেছে আবার, খবর দিতে এলো দাসী। 'এবারে উঠি কানাইবাবু।' বলে উঠে দাঁড়ালাম; ভাবলাম অনেকটা সময় নেওয়া গেছে কানাই মিত্তিরের, আর নয়।

'আচ্ছা। অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি, ধনপতিবাবু।' বললেন কানাই মিত্তির। 'কালকের এনগেজমেণ্টটা ভুলবেন না যেন। গুড নাইট।'

ফোন ধরতে ভেতরে চলে গেলেন কানাই মিত্তির; যাবার আগে বিদায়ের ভঙ্গিতে ডান হাতটা উঁচুদিকে তুলে হাওয়ায় দুলিয়ে দিলেন একবার। আলোয় চমকে উঠল তাঁর হাতের আংটির নীলা পাথরটা। ভাবলাম এবার কে ফোনে ডেকেছে কানাই মিত্তিরকে? এবারও নীলা সেহান?

[ক্রমশ।

হরলিক্স-এর একটি বিশিষ্ট বাজির।

শনি তুঙ্গী, তুলা বক্রী—

সময় তো খারাপ যাবেই!

চারু মাসীমা বললেন, 'রাশিচক্র দেখে, ছাই হবে। আমি বলছি না ওসব বাজে, তবে তোর কী হয়েছে জানতে ঠিকুজী-কুষ্ঠী দেখার দরকার পড়ে না।'



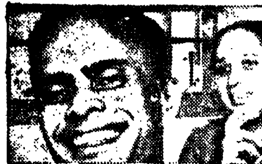
আমি বললাম, 'তার মানে?' [illegible] না, কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস—গত কয়েক মাস ধরে দেখছি তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবার উপায় নেই।' আমি বললাম, 'শুধু এই তাহলে আমার দোষ?' উত্তরে মাসীমা বললেন, 'জানি না, ডাক্তারের কাছে যা—তাহলেই ধরা পড়বে।'



আমি বললাম, 'ডাক্তার দেখিয়ে ছাই হবে!' কিন্তু মাসীমার আবার সিংহরাশি; কাজেই না গিয়ে আমার উপায় থাকল না। ডাক্তারটির বেশ বিবেচনাশক্তি আছে। বললেন, 'তোমার কিছু হয়নি। আসলে পুষ্টির অভাবেই তোমার মধ্যে ক্লান্তি আর অবসাদের ভাব এসেছে। তোমার হরলিক্স খাওয়া উচিত।'



আমি হরলিক্স খাব? সে তো ডাক্তাররা রুগীদের খেতে বলে। সেই রাত্রেই শাস্ত্রী-মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। ওঁর কথা শুনে আমি অবাক। বললেন, 'সব সময় ডাক্তারের কথা শুনে চলবে।'



ভাল একটা দিন দেখে আমি হরলিক্স খেতে শুরু ক'রে দিলাম। কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ঠিক হয়ে যেতে আরম্ভ করল। এর আগে আর কখনো আমি এতটা ভাল বোধ করিনি। চারু মাসীমাও আবার হেসে কথা বলতে লাগলেন। ভাগ্যিস, ডাক্তার আমাকে হরলিক্স ধরিয়েছিলেন!



হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

JWT/HL 4823

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

কলকাতা শহরের অফিস-ছুটির ভিড়! ভিড় তো নয়, যেন জনতার ঢল নেমে আসে অফিস-বাড়িগুলি থেকে রাস্তার ওপর। গাড়ি আর মানুষের স্রোত বয়ে চলে রাস্তায় আর ফুটপাতে। জনতার সেই স্রোতের সঙ্গে—স্রোতের জলের ওপরের ভাসমান বস্তুর মতো ভেসে চলেছিল নমিতা ট্রামস্টপেজের উদ্দেশ্যে। বিদ্যুৎ-চমকের মতো শূন্য ব্যাগের কথাটা মনে পড়ে যেতেই ঠিক বিদ্যুতাহতের মতোই নিঃসাড় দেহে দাঁড়িয়ে পড়ল সে রাস্তার ওপর। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো মানুষগুলির ভেতর থেকে। এসে একটা পানের দোকানের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। ব্যাগটা একবার খুলেও দেখলে না।

নেই—নমিতা জানে ওর এই পুরোনো এবড়ো-খেবড়ো ব্যাগটির মধ্যে একটা পয়সাও নেই। মনের মধ্যে পরিচ্ছন্ন হিসেব রয়ে গেছে ট্রাম-বাসের ওঠা-নামায়। কিংবা কথাটা তাও নয়। আটআনার পয়সা—সমস্ত বাড়ির মোট নগদ ক্যাশ। মনে মনে পরিচ্ছন্ন হিসেব করেই চারআনা পয়সা মা ছোটভাই-এর জন্য রেখে বাকি চারআনা ও ব্যাগে ফেলেছিল। কসবা থেকে গড়িয়াহাটা—ওতো হাঁটা পথ। তারপর সেখান থেকে চব্বিশ নম্বর ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে চেপে সাত পয়সায় পণ্ডিতিয়া রোড। পণ্ডিতিয়া রোড থেকে দশ পয়সায় থিয়েটার রোড। থিয়েটার রোড থেকে মিশন রোও সেই দশ পয়সায়। হিসেবে দু' পয়সা কম হয়ে যাওয়ায়—একটা স্টপ হেঁটে সে কমিয়ে নিয়েছিল দু'টো পয়সা। শিবানী অফিসে যাবে হেঁটে। মিশন রো থেকে ডালহৌসি। যদিও ওর মিশন রোর ইণ্টারভিউর জায়গা থেকে শিবানীর অফিস ডালহৌসির শেষ মাথায়। দূরত্বটা কম নয়। তবু খুব বেশিও নয়। হেঁটে আসা যায় এবং কাউকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করলে হেঁটে যাবার কথা শুনে তাদের চোখে বিস্ময় খুব বড় করে ফুটে ওঠে না—যেমন একদিন ডালহৌসি থেকে থিয়েটার রোডে হেঁটে যাবার কথা শুনে এক ভদ্রলোকে চটে উঠেছিল।

মনে মনে একটা বিষণ্ণ হাসি খেলে গেল নমিতার। কত নিয়ে বেরিয়েছিল! ক'পয়সা নিয়ে বেরিয়েছিল বললেই কথাটা ঠিক বলা হয়।

যদিও ওর মনে হাসি খেলে গেল, যা নিয়ে বেরিয়েছিল তার ভাষা প্রয়োগ নিয়ে। কত নিয়ে বেরিয়েছিল না ক'পয়সা নিয়ে। তবু হোক পয়সা। পয়সা তুচ্ছ নয়। এই 'নাই-বাজারেও' নয়। সদাশয় সরকারের অপার মনুষ্যত্বের মহিমাকে, যে মহিমাকে দিনে কম করেও বিশবার দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে প্রণাম করে নমিতা, সেই মনুষ্যত্বের মহিমায় এখনও এই 'নাই-বাজারেও' চারআনায় আধসের আটা বা একপোয়া চাল হয়। ছোটভাই রতন গিয়ে দোকান থেকে চাল নিয়ে আসবে। মা সে চাল ধুয়ে এক সস্প্যান জলের মধ্যে ফেলে নিয়ে যাবেন কোন এক ঘরের রান্নাঘরে। তাঁরা তাঁদের উনোনে ফুটিয়ে দেবেন চাল ক'টা। মা-ছেলের গ্র্যাণ্ড ডিনার হয়ে যাবে নুন-ফেলা ভাত চার আনায়। আর বাকি চারআনা পয়সা দিয়ে কসবা থেকে মিশন রো পর্যন্ত ও চলে আসতে পেরেছে। আর এখন ব্যাগে সেই চারআনা পয়সা নেই বলে চোখে অন্ধকার দেখছে।

যদি কসবা থেকে মিশন রো আসতে ত্রিশ টাকা হতো ট্রামের টিকিট—কি করতো তবে নমিতা ?

কিছুই না। ঘরে পড়ে থাকত।

যদি একপোয়া চালের দাম একশ' টাকা হতো—কি করত তবে নমিতা ?

কিছুই না। ঘরে মরে থাকত।

কেবল কি ও ?

নমিতা স্পষ্ট দেখতে পায় গোটা দেশটাই ওর মতো হাত গুটিয়ে ঘরে পড়ে থাকত, ঘরে মরে থাকত। তবু তারা—

তবু তারা কি করত না সে কথা থাক। যা করবার শক্তি রাখে না, তা উচ্চারণ করা মিথ্যা বলে শুধু নয়—নমিতা অতি ভীরু মানুষ, উচ্চারণও করে না। ও বরং মহানুভব সরকারকেই দিনে বিশবার হাতজোড় করে প্রণাম করে, এমন মরা দেশের মরা মানুষগুলিকে যে ওঁরা কাচিয়ে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন না, সেই মহানুভবতার জন্য।

শূন্য ব্যাগ নিয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় পথে। ব্যাগ ও হাতে ঝোলালো, হাঁটাও শুরু করলো নমিতা কিন্তু ব্যাগটার মতই মাথাটা শূন্য মনে হতে লাগল ওর।

এখন কি করবে !!

ডালহৌসি থেকে কসবা—কি উপায়ে যাবে !

ভিড়ের সঙ্গেই চলতে চলতে নিজের বোকামিকে ধিক্কার দিতে লাগল নমিতা। মা পুরো আধুলিটাই ওকে নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'রতনের জন্য আমার জন্য যা হোক এ কটা ব্যবস্থা করে নেবোখন আমি। তুই এ কটা পয়সা রাখ। পথে দু'চার আনা বেশি সঙ্গে থাকা ভালো।'

মা'র কথা না শুনে কি মূর্খামিই করেছে! নিজের মাথাটা ছেঁচে ফেলতে ইচ্ছে করতে লাগল নমিতার। নতুন তো নয়, এমন কতদিন চোখ-মুখ বন্ধ করে ঘরের শেষ পয়সা ক'টি নিয়ে ও বেরিয়ে পড়েছে। জ্যান্ত-প্রাণী দু'টো ঘরে বসে ক্ষুধায় ছটফট করবে কি না সে প্রশ্ন পর্যন্ত মনে আসতে দেয় নি। ফিরে গিয়ে দেখেছে মা ব্যবস্থা করেছেন। এক ঘরে চা'ল ধার করে আর এক ঘরে ফুটিয়ে এনেছেন। তারা একটু তরকারীও রতনকে দিয়েছে। তারই কিছুটা আবার মা ওর জন্যও রেখেছেন। নমিতা হাতে মুখে জল ছিটিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে সেই কড়কড়ে ভাত-তরকারী গিলে নিয়েছে। তারপর ঢক ঢক করে গ্রাসভর্তি জল খেয়ে নিয়ে পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছে, আঃ। তারপর সন্ধ্যাটা কী রমণীয়! মা আর রতনের সঙ্গে লণ্ঠনের আলোর সামনে বসে গল্প। কলকাতার, ঢাকার, গ্রামের বাড়ির, ইণ্টারভিউয়ের। মা তো কোন দিনও উপোষ রাখেন নি ওদের। তবে কেন ও বাহাদুরি করে মা'র কথা শুনলে না। মা'র কথা শুনলে তো এই বিপদে ওকে পড়তে হতো না। ওর তো ভাবা উচিত ছিল, এই যে, কেবল যাবার পয়সা হিসেব করে নিয়ে বেরুচ্ছে, যদি শিবানীকে না পায় তবে ফিরবে কি করে! যতই নিশ্চয় থাক শিবানীকে পাবেই—নাও তো পেতে পারে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অফিসে না আসতে পারে সে। এসে প্রয়োজনীয় কাজে বেরিয়ে যেতে পারে। আরো কতো কি হতে পারে।

কিন্তু নমিতা শিবানীকে না পাওয়ার কথা মনেই আনে নি। আনলে ওর পথ চলার শক্তি থাকত না। আজকের দিনটা নমিতাও চলতে পারছে, মাও চালিয়ে নেবেন, কিন্তু কাল? কালকের কপর্দকশূন্য দিনটা মুখব্যাদন করে ওর হাত-পা অবশ করে রাখত। ইণ্টারভিউগুলির প্রতি নমিতার কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং ব্যর্থ-কাজের অবসাদই বেশি ছিল মনে। ওকে খাড়া রেখেছিল শিবানী। শিবানীর অফিসে গিয়ে পৌঁছোবার পর আর কোথাও কোন অন্ধকার দেখছিল না নমিতা।

ও টাকার কথা বলতে না বলতে শিবানী ওর ব্যাগের সব টাকা বের করে হাতে তুলে দেবে। নমিতা কত চাইছে সেটা সে শুনবেও না। তার যা সঙ্গে আছে সব দিয়ে দেবে। সে টাকা কি আর বিশ-পঁচিশের কম হবে? কখনই নয়। হয়তো আরো বেশিই হবে। শুধু তাই নয়। এর পর আর চাইবার প্রয়োজন হবে না। শিবানী নিজেই দিয়ে যাবে টাকা ওকে ওর চাকরি না হওয়া পর্যন্ত।

এ দেখাগুলি যে একটুও ভুল নয় এ-কথা নমিতা খুব ভালোভাবেই জানে। ভুল করেছে ও। না তা-ও নয়। ও-ও ভুল করে নি। একেবারে প্রথম গিয়ে বসেই তো আর টাকার কথা বলা যায় না। তারপর আর সময় পেল কোথায়? ভুলেও গিয়েছিল দাদার মৃত্যুর সেই ভীষণ দিনগুলির কথা বলতে-বলতে। তা বলে গেলেও আবার মনে হতই যদি না এমন অকস্মাৎ ভদ্রলোক এসে এ-রকম ছোঁ মেরে শিবানীকে নিয়ে চলে না যেতেন। তা আজ না হয়েছে কাল হবে—ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নমিতা, থেমে দাঁড়াল। আবার বের হয়ে এলো সেখান থেকে। এসে দাঁড়ালো একটা গাছের তলায়। এমন নিরুদ্দেশভাবে কোথায় চলেছে সে!

এখন কি করবে। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল নমিতা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে।

সকালবেলায়ও অফিস-ভিড়টা যদিও এভাবেই অফিসের দিকে ছোটে, কিন্তু তবু সে সময়কার ভিড়ের চেহারা আর অফিস-ছুটির সময়কার ভিড়ের চাপের চেহারা একেবারে

আলাদা। অফিসের সময় আসাটা নানা সময়ের ভেতর ভাগ হয়ে যায়। কেউ আসে আটটায়, কেউ বা ন'টায়, কেউ এগারোটায়। নানা কাজে, বিভিন্ন সময়ে মানুষের আসা চলতেই থাকে। তাই অফিস-পাড়ার ভিড়টা বাড়ে জোয়ারের জলের মতো। কিছুটা আস্তে আস্তে। কিন্তু যখন ভাঙে তখন যেন বন্যার রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসে লোকগুলি রাস্তায়, ফুটপাতে ছড়িয়ে পড়ে। কেবল নানা রঙের গাড়ির মাথা আর মানুষের—মাথা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। একটা মানুষকেও আলাদা করে দেখবার উপায় নেই। কেবল কালো কালো মাথার স্রোত। ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে। ইণ্টারভিউ হয়ে গেলে চলে গেছে। অফিস-ছুটির ভিড়ের চেহারাটা নমিতার দেখা ছিল না।

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল ছিল না নমিতার। সবকিছুর দিকেই তাকাচ্ছিল কিন্তু কিছুই দেখছিল না। হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালো। দেখলো একটা মস্ত কালোমেঘ জলো হাওয়া নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। লোকজন কিছু হাল্কা হয়ে এসেছিল, এখন সেই হাল্কা ভিড়টা মেঘ দেখে দৌড়োদৌড়ি করে ধরে পালাচ্ছে।

মরিয়া হয়ে একটা বাসের দিকে ছুটতে গিয়েও থেমে গেল নমিতা! না, বাসের কণ্ডাক্টরগুলি যেমন হুঁশিয়ার তেমনি ধূর্ত। ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় না। একদিন ব্যাগ ফেলে আসার অভিনয় করেছিল টিকিট চাইতে এলে কিন্তু বিশ্বাস করাতে পারে নি। পরের স্টপে নামিয়ে দিয়েছিল কণ্ডাক্টরটা ওকে যে কেবল তাই নয়—বিশ্রী মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিল পেছনে। কে যেন ভিড়ের মধ্যে থেকে টিকিটের পয়সাটা দিতে চেয়েছিল—সে কী অসহ্য লজ্জা! কেঁদে ফেলেছিল নমিতা।

জোর বাতাসে নমিতার কাপড় উড়তে লাগল। রুক্ষ চুল উড়তে লাগল। আঁচলটা কোমরে গুঁজে উড়ন্ত চুল হাতে চেপে ধরে নিরুপায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল নমিতা—কী করে!

এমনি সময় একদিকে একটা মস্ত গাড়ি নিঃশব্দে এসে ব্রেক কষে দাঁড়ালো নমিতার এমন গা ঘেঁষে যে, দু'পা পিছু হাঁটতে হলো নমিতাকে। আর একদিকে বড় বড় ফোঁটায় নেমে এলো জোর বৃষ্টি। লোকজন দৌড়ে দৌড়ে এ-দোকানে ও-দোকানে, এখানে আর ওখানে আশ্রয় নিতে লাগল। মুহূর্তে জনশূন্য হয়ে গেল রাস্তা। নমিতাও কোথাও ছাদের তলায় দাঁড়াবার জন্য দৌড়োতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। শুনতে পেলো—গাড়ি থেকে নেমে একজন আর একজনকে বলছে, তুই বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টারেই তবে মিঃ মেননের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস?

গাড়িতে বসা স্টিয়ারিং-ধরা ভদ্রলোক জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

তবে ভাই একটু দাঁড়া। কয়েকটা জিনিস পাঠিয়ে দিচ্ছি, মেননকে দিস। বলিস, আমি কাল সকালে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করছি।

কথাগুলি বলেই বৃষ্টির ভেতর মাথা নিচু করে ভদ্রলোক দৌড়ে গিয়ে সামনের মস্ত দোকানটায় ঢুকলেন।

চঞ্চল হয়ে উঠল নমিতা। তার আর বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য যাওয়া হলো না। বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার্সে যাচ্ছে গাড়িটা! সেখান থেকে কসবা আর ক'পা? ও যদি ওর বিপদের কথা জানিয়ে একটু পৌঁছে দিতে অনুরোধ করে? এতক্ষণ গাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে কতবার ভেবেছে, এর ভেতর কত গাড়ি তো বালিগঞ্জেও যাচ্ছে। যদি ওকে তুলে নিত! যদি জানত কোনটা যাচ্ছে ওদিকে তবে ও হয়তো গাড়ি থামিয়ে অনুরোধও করত ওকে তুলে নিতে। যে যতই কুনো স্বভাবের ভীরু লাজুক হোক—তেমন বিপদে সবা'র পক্ষেই সব সম্ভব হয়।

স্থির থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো নমিতার পক্ষে। একবার গাড়িটার দিকে, একবার স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে তাকাতে লাগল। আবার যখন দেখতে পেলো, ভদ্রলোক তার অস্থিরতা লক্ষ্য করছে তখন অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে লাগল।

একবার পা'টা বাড়াতে চাইল গাড়ির দিকে অনুরোধ করবার জন্য। আবার পা'টা আটকে রাখল।

কিন্তু কি ভাবছে লোকটি ওকে?

ট্রামে-বাসে উঠছে না, আশ্রয়ের জন্য দৌড়োচ্ছে না, জল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কেবল গাড়িটার দিকে আর তার দিকে তাকাচ্ছে কেন মেয়েটা।

ভাববেই তো।

আরো ভাববে—ভাববে বাজে মেয়ে কোন।

একটা লোক দৌড়ে একটা প্যাকেট গাড়িতে দিয়ে গেল। এ জন্যই অপেক্ষা করছিল—

কাজ হয়ে গেল, এখন চলে যাবে। বাড়ি যাবার এমন একটা ঈশ্বর-প্রেরিত উপায়ও যাবে অমনি চলে, কেবল মুখ ফুটে কথাটা না বলতে পারার জন্য। তারপর সামনে থাকবে আগতপ্রায় রাতের অপরিচিত শহর রাস্তা। আর কপর্দক-শূন্য হাত। ভয়ে শিউরে উঠল নমিতা। এ শহরের কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা শোনা আছে। এসব অফিস-পাড়া আরো ভয়ঙ্কর। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনমানবহীন হয়ে যাবে এ জায়গা। থাকবে শুধু মাতাল আর গুণ্ডা।

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হয়েছে—

এক্ষুণি চলে যাবে গাড়িটা—

হয়তো নমিতার ঠোঁট কেঁপে উঠে থাকবে। শরীরে প্রকাশ পেয়ে থাকবে অস্থির ব্যাকুলতা। ঠোঁট বন্ধ থাকলেও দু'চোখে হয়তো ফুটে উঠে থাকবে কাতর মিনতি—ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে বাঁ দিকে একটু এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে ভদ্রলোক বললেন, আসুন।

নমিতার ভেতরটা এমন প্রস্তুত হয়ে ছিল যে, গাড়িতে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে থাকার মতো গাড়ির মধ্যে উঠে এলো ও।

ভদ্রলোক গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার লোকটির দিকে তাকালো নমিতা। একটুক্ষণ যেন অপেক্ষা করলে ওদিক থেকে কিছু জিজ্ঞাসা আসবার। ভেবেছিল লোকটির কাছ থেকে ওকে সহজ করার জন্য সহৃদয়তাসূচক কিছু কথা আসবে। 'একেবারে ভিজে গেছেন যে।' 'কোথায় থাকেন আপনি'—এমনি কিছু। কিন্তু লোকটির মুখ যেন পাথরে গড়া। কোন ভাবের প্রকাশ নেই সেখানে। অন্তত তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী ওর জন্য যে নরম রেখা কয়েকটা মুখে লোকটির থাকা উচিত ছিল—বা স্বাভাবিক ছিল, তা দেখতে পেল না নমিতা সে মুখে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

কোথায় থাকে ও—এটা তো জানতে চাওয়া নিতান্ত দরকার ছিল! নইলে কোথায় যাবেন, কোথায় পৌঁছে দেবেন বুঝবেন কী করে?

হয়তো ভাবছেন ও-ই বলবে?

তাই হবে! তখন নমিতা নিজেই কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, আমাকে নামাবার জন্য আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমি সেখানেই নামব।

ভদ্রলোক যেন বিস্মিত হলেন কথাটায়। একটু আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন, আপনি গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টারে থাকেন না কি?

না। আমি ওখান থেকে হেঁটে চলে যাবো। গড়িয়া-হাট থেকে আমি সব সময় হেঁটেই বাড়ি যাই।

ও-আর অ-জাতীয় একটা মিশ্রিত শব্দ করলেন শুধু ভদ্রলোক, আর কিছু বললেন না। নমিতা দেখল ওর উত্তর শুনে ভদ্রলোকের মুখের বিস্মিত ভাবটা কেটে গিয়ে এবার আবার আগের মতই ভাবলেশহীন হয়ে গেল।

অর্থাৎ ও গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টারে থাকে এটা লোকটির কাছে অভাবিত ঠেকেছে। থাকে না এবং তার পরের কথাগুলি ও লোকটির জানা।

—নমিতা বুঝল ঠিক—কিন্তু এর অর্থটা যা করলে তা ভুল।

একটা ভীষণ রকমের সোঁ সোঁ শব্দের হাওয়া বইছে। নমিতা মা'র কাছে শুনেছে আশ্বিনের কালো মেঘ কাল বৈশাখীর চাইতেও খারাপ। আশ্বিনের আকাশে ঝড়ের যে তাণ্ডব থাকে তা নাকি সাংঘাতিক ভয়াবহ হয়। মার কাছে গল্প শুনেছে তেরশ' ছাব্বিশ সনের আশ্বিনের ঝড়ের। মা'র তখন সবে দশ বছর বয়স। সেই দশ বছরের মেয়ে মা এখনও পঞ্চান্ন বছরেও সেই ঝড়ের বীভৎসতা ভুলতে পারেন নি। শীতলক্ষা নদীর বুক মৃত মানুষে ভরে গিয়েছিল। বাড়িঘর চাপা পড়ে লোক মরেছিল ঘরে ঘরে। সে ঝড়ের কথা বলতে বলতে শিউরে উঠেছেন তিনি এই সেদিন পর্যন্তও। তবে এখন আর শিউরে ওঠেন না। উঠোনে পড়ে-থাকা ছেলের খুন হওয়া রক্তাক্ত মৃতদেহ চোখের ওপর যে মা'র—সে মা আর কোন ভয়ঙ্কর ছবি কল্পনা করে শিউরোবে!

ঝড় উঠছে না? নমিতার চোখে একটু শঙ্কা।

পুরো চোখে নয়, আধা চোখে একবার ভদ্রলোক তাকালো নমিতার দিকে। তারপরই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল, মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর আবার বললে, ভয় করছে?

সম্বোধনহীন জিজ্ঞাসায় একটু যেন অস্বস্তি হলো নমিতার। যদি ভদ্রলোক, 'ভয় করছে আপনার?' বলত তবে এ অস্বস্তিটা হতো না। সসঙ্কোচে বললে, না। ভয় করবে কেন!

মনে মনে বললে, ভয় এখন করবে কেন। গাড়িতে ভয় কি। ভয় করবে বাড়ি গিয়ে যদি সত্যি ঝড় ওঠে। জমিদারের পুরোনো বাড়ি। ভাঙাচোরা কড়িবর্গা খুলে পড়া, ঝুলে পড়া। বাড়িটা মস্ত। কুড়িটার ওপর ঘর। তারই এক-একটা ঘরে বাস করছে ওরা একদঙ্গল উদ্বাস্তু, বাড়িটা দখল করে। একটুকরো করে রান্নার জায়গা পেয়েছে বারান্দায়। জানালায় বেশির ভাগেই পাল্লা নেই। পুরোনো শাড়ি-চাদর ইত্যাদি দিয়ে সবাই পর্দা ঝুলিয়ে নিয়েছে। সেগুলি এতক্ষণে উড়ে গেছে তো নিশ্চয়ই। ঘরদোর, বিছানাপত্র ভিজে একসা হয়েছে জলে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ও নিয়ে ভাবে না ওরা। ওরা—বাড়িটার কড়িবর্গা খসে ছাদ মাথায় ভেঙে পড়াটা নিয়েই কেবল ভাবিত। ওরা কেবল মাথাটাই বাঁচাতে চায়। মাথাটা বাঁচলেই খুশি।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল না গাড়ি চলছে? ডালহৌসি থেকে বালীগঞ্জ কি এত সময়ের পথ? না ও হাঁটতে হাঁটতে উল্টো পথে চলে গিয়েছিল জনতার সঙ্গে?

তাই হবে।

হাওয়ায় শাড়ি-ব্লাউজ প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। ভাবলে খুব স্বাভাবিক। গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারটা হলো সব অফিসার আর বিত্তবানদের জায়গা। ও যে কোন অফিসার বা বিত্তবানের কন্যা বা স্ত্রী নয় তা ওর বেশবাসই বলছে। আর বেশবাস কতটুকু বলে! ওর এই বেশবাসই শিবানীর যদি পরা থাকে আর সে বলে এই মাত্র বিলেত থেকে চার্টারড্ প্লেনে এসে নামলাম, কেউ বিস্মিত হবে না এতটুকুও। কিন্তু ও অফিসার্স কোয়ার্টারে থাকে শুনলেও বিস্মিত হয়। আসল কথা হলো ব্যক্তিত্ব। কিংবা ব্যক্তিত্ব কথাটাও বড় কথা। অবস্থার ছাপটা মানুষের চোখে-মুখে লেখা থাকে। ভাবে-ভঙ্গিতে ফুটে বেরোয়। ওর দৈন্য লেখা রয়েছে ওর চোখের ছায়ায়। ওর পদক্ষেপের পাতায়।

নমিতা একেবারেই ভিজে গিয়েছিল। ব্লাউজ কাপড় একেবারে শরীরে লেপ্টে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে শরীরে জড়িয়ে ব্যাগটা আব্রুর মতো বুকের উপর চেপে ধরে গাড়ির কোণ ঘেঁষে বসে রইল চুপ করে। এতবড় একটা বিপদের সমাধান এমন সুন্দরভাবে মিটে গিয়ে খুব স্বস্তিবোধ করছিল ও। এত দেরি করে ও কখনো ফেরে না। মা যদিও জানেন আজ ও শিবানীর কাছে যাবে। তবু ঝড়-বৃষ্টি দেখে নিশ্চয়ই চিন্তিত হচ্ছেন। মাকে আজ নমিতা সত্যি বলবে, মা, আমরা কেবল ঘরে বসে বসে ভয় পাই। পৃথিবীটা সত্যি এতো ভয়ের নয়। এই তো কেমন বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম বাড়ি আসা নিয়ে, ঝড়-বৃষ্টি সে বিপদ আরো বাড়িয়ে তুলেছিল, কিন্তু এসে গেলাম তো! দেখলে ভালভাবেই তো এসে গেলাম। কেবল ভয় পাবে না। তোমরা মায়েরা এমন ভীতু হও বলেই আমরা ভীরু হই।

গাড়ি চলেছে। ঝড়-বৃষ্টির বেগ যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পথে কোন লোকজন নেই। বৃষ্টির জন্য সামনেটা কুয়াসা ঢাকা মনে হচ্ছে। ওয়াইপারটা অনবরত এদিক-ওদিক করতে করতে গাড়ির জল মুছে দিচ্ছে। লোকজন রাস্তায় না থাকলেও গাড়ি চলছে সমানেই। ওদের গাড়িকে কখনো ডান পাশে কখনো বাঁ পাশ কেটে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলি। কখনো পুলিশের হাত তোলায় ওদের থামতে হচ্ছে। কখনো নীল বাতি জ্বলে উঠতে দেখে ফের চলছে।

রাস্তায় বাতি জ্বলেছে। মাঝে মাঝে রাস্তার সেই আলো পড়ে গাড়ির ভেতরের নীল রঙটা চোখে আবেশ আনছে। পথের উঁচু-নিচুতে এক-একবার গাড়ি দুলে উঠছে আর নমিতার মনে হচ্ছে সাগর জলের এক-একটা নরম ঢেউ যেন চলে যাচ্ছে ওর পিঠের তলা দিয়ে। লোকটি যদি নমিতার আপন কেউ হতো, তবে সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর এত আরামে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ত প্রকাণ্ড গাড়িটার গদীতে মাথা রেখে।

ভিজে শরীরে ভিজে শাড়িজামা শীত ধরিয়ে দিয়েছিল। শীতটাও অনেক কমেছে। শরীরের সঙ্গে আর জামা-কাপড়ও লেপটে নেই। বুকের ওপর চেপে ধরা ব্যাগটা কোলের ওপর নামালো নমিতা। ভাবতে লাগল, ভদ্রলোক তো নামিয়ে দেবেন ওকে এক্ষুণি গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার্সের কাছে, কিন্তু এই ঝড় জলের মধ্যে ও যাবে কি করে বাড়ি। গড়িয়াহাট থেকে হেঁটেই যায় ও ঢাকুরিয়া, কিন্তু তাই বলে দূরত্বটা কম নয় খুব। কতকটা জায়গায় আবার বৃষ্টি হলে জল জমে। চটি খুলে শাড়ি হাঁটুর ওপর তুলে চলতে হয়। ময়লা, নোংরা জল। কসবার কাঁচা ড্রেনের পচা জল আর বৃষ্টির জল এক হয়ে বইতে থাকে। মা ওকে স্নান করিয়ে কাপড় না ছাড়িয়ে ছোন না। ভিজে পা হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা—ও গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মা পচা ড্রেনের জলের ওপর দিয়ে আসার ঘেন্নায় নাক-মুখ কুঁচকে পা ধোবার জল আনতে ছুটেছেন—দৃশ্যটা কল্পনায় দেখেই নমিতার মনে হলো ও মা'র কাছে পৌঁছে গেছে—বেঁচে গেছে। হ্যাঁ, এখন ও বাড়ি পৌঁছোতে পারলেই বাঁচে। তা যেভাবে হোক, যে অবস্থায় হোক। ড্রেনের পচা জলে সাঁতার কেটেই হোক। মা নিশ্চয়ই রতনকে পথের মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। না, এ ঝড়ে রতনকে পাঠান নি। নিজেও আসতে পারেন নি। মা-ছেলে দু'জনই দরজায় বসে আছে। ওকে দেখে রতন লাফিয়ে উঠবে। মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। শ্রান্ত, ক্লান্ত মেয়ের একটু খাওয়া, একটু বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। ও হাত পা ছেড়ে মেঝের বিছানার ওপর টান হবে। পিঠের তলায় ফেইমলার গাড়ির পালকের গদী—(মালিকের ফরমাসে বিশেষভাবে তৈরি) তাতে পিঠ রেখে নমিতা ওর ঘরের মেঝের বিছানায় শুয়ে পড়তে পারার আরাম কল্পনায় উপভোগ করছিল। ভদ্রলোকের অপ্রত্যাশিত জিজ্ঞাসায় একটু চমকে লোকটির দিকে তাকাল। কথাটা ঠিক ধরে উঠতে পারে নি। বিনীত কণ্ঠে বললো, কিছু বললেন?

কি কাজ করেন আপনি?

ভেতরটায় যেন স্বস্তি নেমে এলো নমিতার। লোকটির মুখের এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসায় নীরবতায় আর কাটা কথায় রহস্যময় লাগতে আরম্ভ করেছিল নমিতার। মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করেছিল ও। আরামবোধ করলে এবার। ঘাড় নিচু করে একটু মরা গলায় বললে, আমি কিছু করি না।

আচ্ছা! বলে একটু বিরাম দিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, অফিস পাড়ায় তবে করছিলেন কি?

লোকটির চোখের সন্দিগ্ধ কোণাকুণি দৃষ্টি নমিতা খেয়াল করলে না। বললে, কাজ খুঁজছি। ইণ্টারভিউ ছিল আজ।

আচ্ছা! পেলেন?

না।

গাড়ি যেন সে চালাচ্ছে না—নিজে নিজে চলছে গাড়ির হুইলের ওপর এমনি অলসভাবে ডান হাত রেখে বাঁ হাতে গাড়ির গদির ওপর পড়ে থাকা সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপলেন ভদ্রলোক। লাইটার টিপে সিগারেট জ্বেলে তাতে গোটা দুই টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আশা পেলেন?

নমিতা বললে, না। সে কোথাও কিছু আশা পায় নি। আশা না পাওয়ার কথা বলতে বলতে মনের ভেতর কিন্তু একটা দারুণ আশা জেগে উঠল নমিতার। এই ভদ্রলোকের হাতেই হয়তো কত চাকরি রয়েছে। ইচ্ছে করলেই হয়তো ইনি কাজ দিতে পারেন। কোন বড় ব্যবসায়ী নিশ্চয়। ব্যবসায়ী না হলে কি এত টাকা হয়। ওর যেমন চোখের পাতার কালো ছায়া থেকে ধুলো মাখা গা পর্যন্ত দারিদ্র্যের কথা বলছে, এঁর বাটন হোলের লাল গোলাপ কুঁড়ি থেকে পায়ের ঝক্ ঝকে জুতো পর্যন্ত ঐশ্বর্যের কথা বলছে। গাড়ির মহার্ঘতার কথা নয় ছেড়েই দেওয়া গেল। আর যদি মালিক-টালিক কোন কিছু নাও হন—বিরাট কিছু কাজ করেন এতো নিশ্চয়ই। চাকরি না থাকলেও এঁরা চাকরি তৈরি করে নিয়ে দিতে পারেন, নমিতা কতজনের মুখে শুনেছে।

ইনি ইচ্ছে করলে কালই হয়তো ওর চাকরি হয়ে যেতে পারে—মনের চঞ্চলতা ওকে একটু নড়ে চড়ে বসালো। শিবানী কাজ করে দেবে বলেছে। কিন্তু তার জন্য তো অপেক্ষা করতে হবে। একটা চাকরি পাওয়ার পক্ষে সে অপেক্ষাটা হয়তো কিছু বেশি সময় নয়, কিন্তু ওর যে কালকে—মুখে তুলবার মতোও একটা দানা নেই ঘরে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই দয়ালু। নইলে ওকে তুলে নিতেন না গাড়িতে। তিনি তো জানতেন না ওকে কোথায় নামাতে হবে। ও তো অনেক দূরে—ভদ্রলোক যেখানে যাচ্ছেন ত থেকে উল্টোপথেও—থাকতে পারত।

ভদ্রলোক হৃদয়বান।

আকুল হয়ে উঠল নমিতা—ভদ্রলোক যদি বলেন, আসুন কাল আমার অফিসে। একটা চাকরি দিয়ে দেব।

সম্ভব নয়?

এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে না?

এমন ঘটনা কি ঘটে না?

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য কি একটাও ওদের জীবনে আসতে পারে না? কেবল দুঃখই আসতে পারে?

না না, নিমকহারামি করবে না ঈশ্বরের প্রতি নমিতা। ভাগ্য ওর—ও যে শিবানীর দেখা পেয়েছে কলকাতা শহরে।

মা'র কাছে শুনেছে বিপদ যখন আসে তখন একটার পর একটা আসে। সৌভাগ্য যখন আসে তখনও নাকি তাই আসে। বিপদের মহাসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে—এবার বোধ হয় কূল মিলছে। শিবানী সৌভাগ্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। এবার একটার পর একটা আসবে।

কোথাও কোন কাজ করেছেন কোনদিন ?

করেছি। স্কুলে পড়াতাম।

কাজ গেল কেন ?

ঢাকা ছেড়ে চলে আসতে হলো।

আপনারা রেফিউজি। যেন ঠিকই বুঝেছিল এমনি একটা ভাব করলে লোকটি। বললে, মাস্টারি ছাড়া আর কি কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয় ?

আশায়, উত্তেজনায় ভেতরটা কাঁপতে লাগল নমিতার। একটু হাসল। একটু নড়েচড়ে বসল। একটু তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। বললে, শিখে নেবো যা পাবো।

নমিতা জানে না, ওর এখনকার হাসি ওর এখনকার দৃষ্টি, ওর এখনকার শরীরের সামান্য নড়াচড়ার ভঙ্গিমার ভেতরও যা খেলছে তার নাম লাস্য। নারীর অস্ত্র। পুরুষের কাছে যখন নারী কিছু প্রার্থী হয়, তখন এ সব অস্ত্র প্রয়োগ করে। নমিতা সত্যি জানে না, গাড়ির কোণ ঘেঁষে বসে থাকা মলিন মেয়েটি কখন রূপান্তরিত হয়েছে লীলাময়ী নারীতে।

ভদ্রলোক কথা আর গাড়ি চালানোর ফাঁকে ফাঁকে নমিতার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক-একবার চোখ বুলিয়ে আনতে লাগল। নমিতা অনুভব করল এ-দৃষ্টি শুধু তাকানো নয়। এ দেখা। ভদ্রলোক ওকে দেখছেন। দেখুন।

পুরুষরা সুন্দরী মেয়ে দেখতে ভালোবাসে। ও-ও জানে সুন্দর।

অতি নরম হাতে সামনের চুল পেছনে ঠেলে দিল নমিতা। অনেকখানি বাড়তি কোমলতা ঢালল নমিতা সে হাতে—একটা কাজ, একটা চাকরি, ভদ্রলোক কি ওকে নামিয়ে দেবার সময় বলবেন না, কাল আসবেন আমার অফিসে। একটা কাজ দেওয়া যাবে যা হোক। [ক্রমশ।

রাতের অন্ধকারে আজও যারা ফেরে

সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

রাতের অন্ধকারে
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে আমি
দেখেছি যে বারবার।
কোথা হতে দলে দলে আসিছে বাহিরিয়া
ব্যথাতুরা ক্রন্দসী রমণীর দল।
রিক্ত নিঃস্ব অসহায়া, হাহাকার রবে।
জীবনের মূল সুর পিছে পড়ে রবে
তাদের জীবন চলার পথে॥

হৃদয়ে গভীর প্রকোষ্ঠে,
ছিল বুঝি ক্ষীণ আশা বাসা বাঁধিবার।
নিরজনে দুটি মন শুধু জানিবার,
কিন্তু হোল না তো শেষ তার॥
ঝড়ের দোলায় তারে ছিন্ন করি লয়ে,
ফেলিল এ কর্দমাক্ত পথে।
জীবন বীণার তারে বেজে ওঠে
করুণ মূর্ছনা, হৃদয় শোণিতে জাগে
ব্যর্থতার বিলাপ ক্রন্দন॥

তাই বুঝি নিশীথের গহীন অন্ধকারে,
নিরাশার ঘোমটাখানি ফেলে মুখ পরে।
জীবনের সঙ্কীর্ণ গলিপথ বেয়ে
তাদের চলে যাওয়া আসা॥
জীবনেরে ব্যয় করে
আজও তারা কেঁদে ফেরে
নির্মম এই বিষাক্ত ধরণীর
গৃহ হতে গৃহান্তরে।
কতটুকু পেল তারা ক্ষয়িত এ জীবনের
কে তার হিসাব রাখে এ বিচিত্র ধরণীর॥

(নাটক)

জোয়ার

রমেন চৌধুরী

● চরিত্র-লিপি ●

বিজয়শংকর রায়	··· আদর্শবাদী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী
সর্বজয়া	··· ওই স্ত্রী
অজয়	··· ওই বড় ছেলে
সঞ্জয়	··· ওই ছোটো ছেলে
প্রখরকিরণ চক্রবর্তী	··· প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী ও বিজয়শংকরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু
কেয়া	··· ওই একমাত্র মেয়ে
শংকর	··· ওই কর্মচারী
বেঁটে	··· ওই
শশধর	··· ওই চাকর
সুরেশ লাহিড়ী	··· জনৈক আই-এ-এস যুবক, কেয়ার পাণিপ্রার্থী
ডাঃ সান্যাল	··· বিজয়শংকরের বন্ধু ও চিকিৎসক
ডাঃ বাসু	··· চিকিৎসক
সাব-ইন্সপেক্টর	···
প্রোঃ গৌতম	·· জনৈক অধ্যাপক
প্রিন্সিপ্যাল চৌধুরী	··· মডার্ন বেংগল কলেজের অধ্যক্ষ
মিঃ কাঞ্জিলাল	··· ওই মেম্বার
জেটমল	··· জনৈক মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী
ঘোসবাবু	··· ব্যবসায়ী

কয়েকটি প্রোফেসর, ছাত্রছাত্রী, পথচারী, গুণ্ডা, নার্স ইত্যাদি ইত্যাদি ···

প্রথম অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

একটা গলি। খুবই সরু—এঁকে-বেঁকে চলে গেছে··· দু-একটা লোক মাঝে মধ্যে যাচ্ছে আসছে, বেশ শান্ত পরিবেশ। বিকেল গড়িয়ে গেছে, সন্ধ্যে হবো হবো হয়ে এসেছে···গলিটার আলো জেলে দিয়ে গেল করপোরেশনের লোক। ২।৩ জন লোক—কদাকার চেহারা—দেখলেই সমাজের শত্রু বলে মনে হয়—এসে দাঁড়ালো আলোর কাছটায়। ওরা ঘড়ি দেখে, কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে বলে মনে হয়—রাস্তার লোক পথ দিয়ে যেতে যেতে সন্দিগ্ধ-ভাবে ওদের চেয়ে চেয়ে দেখে একটু তাড়াতাড়িই পা চালিয়ে দেয়···

১ম। কী রে শ্লা—তোর লোক কই?

২য়। (মুখে একটা শব্দ করে) দাঁড়াও না ওস্তাদ—সবে তো সন্ঝের বাতি দিয়েছে।

৩য়। (বিড়ি বার করে) ধুঁয়ো দে নাও মাইরি··· বুদ্ধি—

১নং ওর হাত থেকে বিড়িটা ছোঁ মেরে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

১ম। চোপ শ্লা—

২য়। (সংগে সংগে ইস্-স্ শব্দ করে ওঠে মুখে) চু···প···

৩য়। ব্যাটা সাধু আসচে—

দেখা যায় সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক (বিজয়শংকর রায়) গলির মোড়ে হাজির হয়েছেন, হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ, গতি বেশ মন্থর। বোঝা যায় কোনো পদস্থ কর্মচারী, দিনান্তে ফিরে চলেছেন অফিসের কাজ শেষ করে। মন্থর গতিতে আসছেন উনি—প্রায় নিমেষে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, একই দলের লোক বলে আর বোধ হয় না!

বিজয়শংকর গলির মাঝামাঝি এসেছেন এই সময় ১নং গিয়ে দিলো বেশ জোরের সঙ্গে ধাক্কা—ওঁর অন্যমনস্ক-ভাব দূর হয়ে যায়, চমকে উঠে বলেন—

বিজয়শংকর। (চকিতকণ্ঠে) কে?

১ম। শ্লা, চোকে ত্যাকো না!

বিজয়শংকর। (রাগতস্বরে) কে তুমি?

১ম। যম!

বিজয়শংকর। (ওর হাতটা ধরে ফেলেন খপ করে) ভদ্রভাবে কথা—

১ম। তবে রে শ্লা—

চোখের নিমেষে ছোরা বার করে লোকটা বসিয়ে দিলো ওঁর বুকে! 'আঁ' শব্দ করে বিজয়শংকর লুটিয়ে পড়লেন পথের ওপর। ছুটোছুটি—ওরা তিনজনেই পালালো··· গলির [illegible] দিকে এসে পড়েছে একজন পথচারী, সে দেখতে [illegible] ব্যাপারটা···ওদের ধরবার একটু চেষ্টাও করবে [illegible] চেঁচাতে শুরু করে—

১ম [illegible] খুন খুন—কে আছো বাঁচাও, খুন হোলো—খু[illegible]—

চেঁচামেচি শুনে কয়েকজন লোক এদিক-ওদিকে থেকে এসে পড়বে। এরা দৌড়ে বিজয়শংকরকে দেখতে আসবে, কেউ দেখবে নিশ্বাস পড়ছে কি না, কেউ নাড়ি, ইত্যাদি ইত্যাদি···

২য় পথচারী। নাঃ, নিশ্বাস পড়ছে। বেঁচে আছে—

৩য় পথচারী। কে ইনি? মারলো কে?

১ম পথচারী। ধরে ফেলেছিলুম গুণ্ডাগুলোকে···কিন্তু ইয়া ছোরা মশাই!

২য় পথচারী। বেশ করেছেন দাদা, পৈতৃক প্রাণটা বেঘোরে যেত!

১ম পথচারী। আঃ, ভিড় কোরো না, ভিড় কোরো না, সরে যাও, সরে যাও! একটা গাড়ি পেলে হাসপাতালে নেয়া যেত···

৩য় পথচারী। আমি দেখছি— (ছুটে বেরিয়ে যায়)

৪র্থ পথচারী। ও রে বাবা, দিনদুপুরে খুন! এ কোন্ দেশে আছি রে বাবা? ও রে আমায় ধর্, মাথাটা বোঁ-বোঁ করছে···

২য় পথচারী। ইস্, রক্তে একেবারে ভেসে গেল যে···

(৩নং পথচারী ছুটে এলো)

৩য় পথচারী। ধরুন, ধরুন আপনারা, গাড়ি এসে গেছে—

কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে বিজয়শংকরকে নিয়ে যায়—

৪র্থ পথচারী। ওরে মতি—মতি, আমায় ধর বাবা! আমিও যে হাঁটতে পারছি না···

৫ম পথচারী। আর মতি নয়, সব দুর্মতি, দুর্মতি···

।। দৃশ্য ঘুরতে থাকবে
যন্ত্রসংগীত ইত্যাদি ।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাসপাতালের কেবিন ও তৎসংলগ্ন অপেক্ষা-কক্ষ। কেবিনের ভেতরে ডাক্তার, নার্স প্রভৃতির ব্যস্ততা। দৃশ্য শুরু হবে ডাক্তারী তৎপরতার মাঝ দিয়ে···প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছেন সবাই, ইত্যাদি।

●

এদিকে অপেক্ষা-কক্ষ এতক্ষণ জনহীন ছিল, এইবার দেখা যায় ঢুকছেন প্রৌঢ় প্রখরকিরণবাবু, অজয়, সঞ্জয় এবং সর্বজয়া। সর্বজয়া একেবারে ভেঙে পড়েছেন, চলতে পারছেন না, তাঁকে ধরে নিয়ে আসছে অজয়। ওরা ঘরে ঢোকে, মাকে একটা চেয়ার বসিয়ে দেয় অজয়।

প্রখরকিরণ চিন্তিতমুখে দু'পা এগুলেন, তারপর ফিরে দাঁড়ালেন—

প্রখরকিরণ। অজয়—

(অজয় নিঃশব্দে এগিয়ে এলো)

অজয়। আজ্ঞে?

প্রখরকিরণ। তোমার মাকে একটু দ্যাখো—আমি খোঁজ নিয়ে আসি অপারেশন হোলো কি না।

অজয়। আচ্ছা।

প্রখরকিরণ কেবিনের স্প্রিংডোর ঠেলে ঢুকে গেলেন কেবিনের ভেতরে।

ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলে অজয় এসে দাঁড়ালো মায়ের কাছে—সর্বজয়া চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছেন। অজয় ডাকে—)

অজয়। মা, মা—(সর্বজয়া বহু কষ্টে চোখ চাইলেন। দৃষ্টি বেশ কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত) অমন করছো কেন মা? মা···(সর্বজয়ার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়লো।) তুমি অমন করলে আমরা কি করবো মা? ওই দ্যাখো সুমু কাঁদছে। এই সুমু, আয় এদিকে—আয় বলছি!

(সর্বজয়া যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন—চোখটা মুছে নেন। ওদিকে অজয় সঞ্জয়কে মায়ের কাছে ঠেলে দেয়, সঞ্জয় মাকে জড়িয়ে ধরে, সর্বজয়াও চেপে ধরেন তাকে।

কেবিনের ওদিকে ডাক্তারের সংগে নিম্নস্বরে প্রখরকিরণ কথা কইছেন। পরে সেখান থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসেন অপেক্ষা-কক্ষে, সংগে ডাক্তার এবং একজন পুলিশ অফিসার। প্রখরকিরণ অজয়কে বলেন—)

প্রখরকিরণ। অজয়, অপারেশন মোটামুটি Successful হয়েছে—এই যে ডাক্তার সান্যাল বলছেন···

ডাঃ সান্যাল। হ্যাঁ, প্রথম Operation প্রায় Successful-ই বলা যায়। তবে আর একবার Operation দরকার হবে।

পুলিশ অফিসার। জ্ঞান ফিরবে কখন মনে হয়?

ডাঃ সান্যাল। বলা শক্ত। আপনার ডিক্লারেশন নেয়া এখন সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।

পুলিশ অফিসার। একটু Wait করলে—

ডাঃ সান্যাল। আপনি বরং পরে আসবেন।

পুলিশ অফিসার। আচ্ছা, একটা কথা···

প্রখরকিরণ। বলুন।

পুলিশ অফিসার। আপনারা কাউকে Suspect করেন?

প্রখরকিরণ। আমরা—আচ্ছা, জিগগেস করি··· অজয়—(অজয় এগিয়ে আসে) ইনি জিগগেস করছেন আমরা এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করি কি না। তোমার কি···

অজয়। না কাকাবাবু, আমরা এ ধরণের সম্ভাবনার সামান্য আভাসও কোনোদিন পাই নি।

প্রখরকিরণ। হয়তো বিজয় কিছু বলতে পারে—Let us wait for a while।

পুলিশ অফিসার। আচ্ছা Sir, আর একটা Point—

ডাঃ সান্যাল। Well Mr. Inspector, আপনি কথা বলুন, আমি ওদিকটা attend করি গে—(অজয়কে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে) Don't be disheartened অজয়, আমরা Tooth and nail ফাইট করছি।

(ডাঃ সান্যাল চলে গেলেন।)

পুলিশ অফিসার। Wound কি খুব deep হয়েছে ওঁরা বললেন?

প্রখরকিরণ। বাঁ দিকের ফুসফুসটা সাংঘাতিকভাবে damaged হয়েছে। অতিরিক্ত haemohrrage-এর জন্যেই জ্ঞান ফিরতে দেরি হচ্ছে।

পুলিশ অফিসার। I see—কিন্তু এভাবে এঁকে stab করার উদ্দেশ্যটা তো—

[সর্বজয়ার কাতরোক্তি শোনা যায়:
সঞ্জয় এগিয়ে আসে।

সঞ্জয়। মা একবার ভেতরে যেতে চাইছেন।

প্রখরকিরণ। এখন নয়। এ সময় ওখানে ভিড় করা উচিত নয়। (এগিয়ে গিয়ে) আমি দেখে এসেছি বউঠান। বিজয়ের অবস্থা ভালোই, জ্ঞান ফেরে নি বটে, তবে Dr. Sanyal-এর মতে, out of danger.

সর্বজয়া। আমি একবার দেখতে পাবো না?

প্রখরকিরণ। কেন পাবেন না, নিশ্চয় পাবেন। আর খানিকক্ষণ যাক, তারপর। (ফিরে যান নিজের জায়গায়) Excuse me, যে কথা বলছিলাম—কিছুদিন ধরে আমার এই বন্ধুটিকে মোটা প্রলোভন দেখাচ্ছিলো বলে শুনেছি। ওঁর মুখেই আমার শোনা। আপনি নিশ্চয় জানতে পেরেছেন উনি Income-Tax Officer বিজয়শংকর রায়, ওঁর কৃতিত্বে বহু রাঘববোয়াল এ পর্যন্ত আয়করের জাল থেকে ছাড়া পায় নি।

পুলিশ অফিসার। এবার বুঝেছি। Bribing-এর ব্যাপারে interested party-দের এটা কীর্তি। এই তো?

প্রখরকিরণ। Exactly so! ইনি হচ্ছেন মস্ত আদর্শবাদী—ওই আদর্শের জন্যেই উনি মাথায় করে নিয়েছেন ত্যাগের বিরাট বোঝা। আর সেইজন্যে this pitiable plight।

পুলিশ অফিসার। আমরা all-out effort দিয়েছি—culprit-কে ধরতে খুব বেশি দেরি হবে না। আমি এখন যাচ্ছি।

প্রখরকিরণ। নমস্কার।

পুলিশ অফিসার। নমস্কার···

(পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যান)—প্রখরকিরণ একবার সর্বজয়া প্রভৃতিকে দেখে কেবিনের দিকে চলে যান। সর্বজয়া অজয়কে ডাকেন।

সর্বজয়া। (ক্লিষ্টকণ্ঠে) অজু—

অজয়। কি মা?

সর্বজয়া। ভেতরে আমরা যেতে পারবো না?

অজয়। তা তো জানি না। কাকাবাবুকে—ওই তো কাকাবাবু আসছেন

(দেখা যায় প্রখরকিরণকে—তিনি এগিয়ে আসছেন)

প্রখরকিরণ। বউঠান, আপনি একটু শান্ত হোন। আমাদের বন্ধু ডাক্তারকেই এখানে পাওয়া গেছে। ডাক্তার সান্যাল বললেন বিজয়ের সম্বন্ধে তেমন কিছু চিন্তার নেই। Blood দেয়া হয়েছে, অপারেশনও almost সাক্সেসফুল—এইবার জ্ঞানটা ফিরে এলেই হোলো।

অজয়। কাকাবাবু, আমরা ভেতরে যেতে পাবো না? শুধু একটু দেখতে পেলে—মা বলছিলেন···

প্রখরকিরণ। পাবে অজয়, পাবে—তবে একটু দেরি আছে তার। (ঘড়ি দেখে) রাত এদিকে ন'টা বেজে গেল—বউঠান, আমি এক কাজ করি, সুমুকে নিয়ে যাই। ছেলেমানুষের এখানে থেকে কষ্ট পাওয়ার কোনো দরকার নেই। কি বলো সুমু, কেয়াদি'র কাছে থাকতে পারবে না? (সঞ্জয় মাথা নাড়ে)

প্রখরকিরণ। না না, তোমার এখানে থাকার কোনো দরকার নেই। বউঠান কি বলেন?

সর্বজয়া। সে তুমি যা ভালো বোঝো করো।

প্রখরকিরণ। অজয়, আমি এদের নিয়ে যাচ্ছি। বউঠাকরুণকে তুমি দেখো। বিজয়ের জ্ঞান ফিরে এলেই আমায় একটা ring করে দিও। আমি এসে পড়বো।

সঞ্জয়। আমি বাবাকে দেখবো···

প্রখরকিরণ। কাল সকালে তুমি দেখবে সুমু, আজ

তোমার এখানে এই হাসপাতালে থাকা ঠিক নয়। চলো, আমি তো তোমায় আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে কেয়াদি'র কাছে থাকবে, গল্প করবে—অজয়, তুমি একটু সতর্ক থেকো।

(প্রখরকিরণ ও সঞ্জয় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়)

[ও-দিকে কেবিনের ভেতর]

নার্স বিজয়শংকরের পরিচর্যা করছিলো। একটু দূরে ডাঃ বাসু কাগজে কি একটা note করছিলেন, হঠাৎ নার্স উঠে দাঁড়ায়, বলে—

নার্স। Doctor…

ডাঃ বাসু। (সেখান থেকে) Yes, Sister—

নার্স। আপনি একবার আসুন, রুগী কিরকম করছেন!

ডাঃ বাসু ত্বরিতপায়ে এগিয়ে এলেন বিজয়শংকরের সামনে, ঝুঁকে পড়ে দু-এক মুহূর্ত লক্ষ্য করে—

ডাঃ বাসু। Sister, আপনি অক্সিজেন নলটা ধরুন, আমি ডাঃ সান্যালকে খবর দিই—

[ডাঃ বাসু একরকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন। নার্স অক্সিজেন-নলটা নিয়ে যথারীতি ব্যবস্থা করতে থাকে।

ডাঃ সান্যাল ও ডাঃ বাসু এসে পড়েন, ডাঃ সান্যাল বিজয়শংকরের নাড়ি দেখতে থাকেন।

বিজয়শংকরের যন্ত্রণা খুব বেড়ে উঠেছে, তার জন্যে অসম্ভব গোঁ গোঁ শব্দ করছেন—তারই মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসার লক্ষণ।

ডাঃ সান্যাল। (ঝুঁকে পড়ে) বিজয়…বিজয়… শুনছো—নার্স, মাথাটা আস্তে করে এদিকে ফিরিয়ে দাও, বোস, কোরামিন, Quick…বিজয়—

বিজয়শংকর একবার চোখ মেলে চাইলেন। অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বললেন, বোঝা গেল না। ডাঃ সান্যাল ইঞ্জেকশনটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—

দূরে সুয়িংডোরের কাছে অজয় এসে দাঁড়ায়, একটু অপেক্ষা করে, বলে—

অজয়। কাকাবাবু—(ডাঃ সান্যাল জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকান) মাকে নিয়ে আসতে পারি?

ডাঃ সান্যাল। পারো। কিন্তু কোনো কথা চলবে না—

কথা শেষ হবার আগেই নার্সকে দিয়ে দেন সিরিঞ্জটা। আবার বিজয়শংকরকে নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

(অজয় দ্রুত চলে যায়।)

অবিলম্বে সর্বজয়াকে ধরে ধরে নিয়ে আসে অজয়…ওরা দু'জনে কেবিনের একপাশে দাঁড়ায়, ব্যাকুলভাবে চেয়ে থাকে বিজয়শংকরের দিকে।

ততক্ষণে বিজয়শংকরের জ্ঞান আবার স্তিমিত হয়ে গেছে। ডাঃ বাসু বলে ওঠেন—

ডাঃ বাসু। Sir—

ডাঃ সান্যাল। কি?

ডাঃ বাসু। এদিকটা দেখুন—

ডাঃ সান্যাল। (সেদিকে তাকিয়ে) তাই তো—Haemorrhage শুরু হয়ে গেছে দেখছি! দশ সি সি কোরামিন Ready করো, আমি Pulse দেখছি ততক্ষণ…

ডাঃ বাসু ত্বরিতপদে ওধারে চলে গিয়ে সিরিঞ্জ নিয়ে ওষুধ ভরবেন। নার্স Oxygen-এর নলটা ভালো করে ধরে থাকে বিজয়শংকরের নাকের কাছে। অজয় আর সর্বজয়া রুদ্ধশ্বাসে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে।—

ডাঃ বাসু সিরিঞ্জ নিয়ে ডাঃ সান্যালের হাতে দিলেন—ডাঃ সান্যাল ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবেন। তারপর সিরিঞ্জ ফেরৎ দিয়ে আবার নাড়ি ধরে বসবেন। মুখের অভিব্যক্তিতে মনে হয় ফল আশানুরূপ হচ্ছে না।

ডাক্তার সান্যাল স্টেথিসকোপ বার করলেন, রুগীর বুকে বসালেন একবার, দু'বার—নাঃ, তেমন ভালো লাগছে না তাঁর।—শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বিজয়শংকরের—বারবার হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছেন। কাঁপুনিও হচ্ছে।

ডাঃ সান্যাল। বোস।

ডাঃ বাসু। আজ্ঞে—

ডাঃ সান্যাল। হেমারেজ কমলো না, রাইগার আরম্ভ হয়েছে—

ডাঃ বাসু। হ্যাঁ, Sir!—

ডাঃ সান্যাল। তা'বলে আমরা হার মানবো না—শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবো!—

অজয়। (একটু এগিয়ে এসে) কাকাবাবু—

ডাঃ সান্যাল। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি অজু—এখন Providence-এর ওপর নির্ভর।

অজয়। কাকাবাবু, মা একটু আসবেন এদিকে—

ডাঃ সান্যাল। নিশ্চয়—

(সর্বজয়াকে ধরে নিয়ে অজয় সরে এলো।)

বিজয়শংকরের ওই অবস্থা দেখে সর্বজয়া চোখে কাপড় চাপা দেন, অজয়েরও চোখে জল।

হঠাৎ একটা অস্ফুট চীৎকার শোনা যাবে, ঘরের আলো ২।৩ বার ভীষণভাবে দপদপ করে উঠবে—

ডাঃ সান্যাল Pulse পাচ্ছেন না, হাত নামিয়ে রেখে বুকে হাত দিলেন। না, বোঝা যাচ্ছে না কিছু, ঝুঁকে পড়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছেন—মুখে তাঁর তীব্র হতাশা।

ডাঃ বাসু গম্ভীরমুখে ও-পাশে একটু সরে গেলেন।

অজয় ব্যাকুলভাবে জিগগেস করে—

অজয়। কাকাবাবু—কেমন দে-খ্‌লে-ন? বাবা—

ডাঃ সান্যাল পরীক্ষা শেষ করে ঘর্মাক্তমুখে উঠে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি তাঁর মাটিতে— [ক্রমশ।

১৮

আর্চবিশপের উত্তরের জন্য অপেক্ষা বুঝি আর শেষ হবে না।

বৃদ্ধ চ্যাপলিন যে মুহূর্তে রাজী হয়েছেন চিঠি লিখতে, সিস্টার লুক আর জানে না এরপর কি হবে।

কনভেণ্ট ছেড়ে দিয়ে কি ভাবে এমন করে বাইরে চলে যাওয়া ঘটে কোনদিন সে সম্বন্ধে সংগোপনেও কিছু শুনেছিল কি না মনে করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু বৃথাই। বিভিন্ন কমিউনিটিতে থাকার সময় ক্বচিৎ দু'-একজন নানকে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়ে যেতে দেখেছে। কংগো থেকে একজন প্লেনে ফিরে এসেছিলেন বেলজিয়ামে, পরিস্থিতিটা রহস্যময় ছিল। এমন ঘটনা ঘটে গেলে কোনদিনও আর সিস্টাররা কেউ তার নামও করতেন না তারপর। অনুভূতি দিয়ে বোঝা যেত কোথায় গেল সে, প্রকাশ্যে যদিচ কোন কথাই শোনা যেত না—সবটাই অনুমান মাত্র।

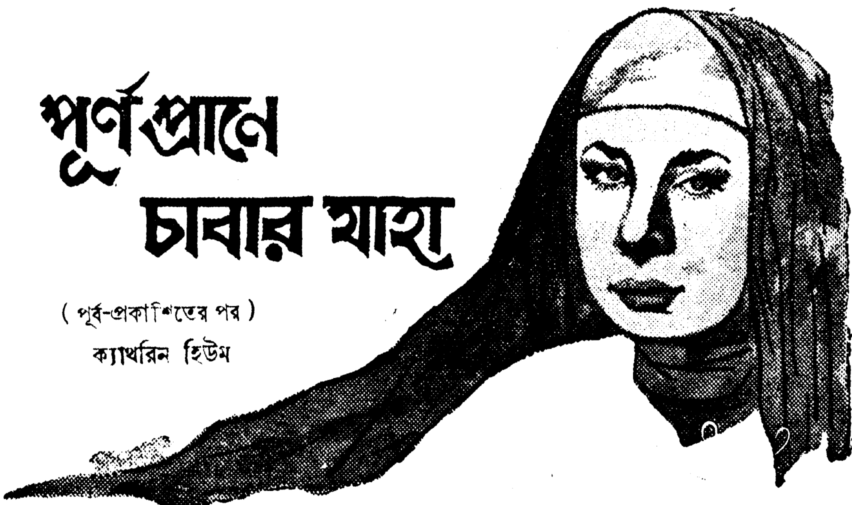
সুনির্দিষ্ট বিধি একটা কিছু আছে নিশ্চিত, কতকগুলো বিশেষ কাজ করতে হবে। তবে সেগুলো যে কি তা অনুমান করা কঠিন। অবশ্য বাইরের জগতে পা দিলে এমন অনেকগুলো কাজ করতে হবে যা এখনই অনুমান করা যায় বেশ। প্রথমেই তো নানের আইডেণ্টিটি কার্ডখানা বদলে অসামরিক সাধারণ মানুষের কার্ড নিতে হবে। টাকাকড়ির ব্যাপার সব শিখে-বুঝে নিতে হবে। কনভেণ্ট চ্যাপারন আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে না সংগে, গাড়ির ভিড়ে নিজে পথ চলতে অভ্যস্ত হতে হবে। এ ছাড়াও কিছু আছে। সতেরো বছরের গণ্ডিবদ্ধ জীবন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে অনেক কিছু থেকে—বইপত্র, খেলাধূলো, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, রাজনৈতিক পরিস্থিতি···

কিন্তু একটা অবস্থা আছে—কাগজপত্র সই করার পর আর হাবিট খুলে ফেলার মধ্যে একটা অবস্থা···ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া···সেই অবস্থাটাকে একটু ভয়-ভয় করছে। ভাবলেই মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করছে কেন যেন—সেই শান্ত, স্মরণীয় মৃত্যু নয়···তিরিশ দিন ধরে নিয়মিত খাবারঘরে মৃতার বসবার জায়গাটি যেখানে সাজানো থাকে তার স্মরণে, এ মৃত্যু একটা আকস্মিক কিছু—নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলবে তাকে, শূন্যে বিলীন করে দেবে।

বোমারু বিমানে ছেয়ে গেছে বেলজিয়ামের আকাশ, সাড়ম্বরে বৃটেন আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে সিস্টার লুক অপেক্ষা করছে যত, মৃত্যুর ছায়া গভীর হয়ে পড়ছে তত মুখে। যে সিস্টাররা জানেও যুদ্ধের ব্যাপারে তার উদ্বেগের কথা, তারাও ভাবছে ওর মুখের ঐ মৃত্যুর ছায়ার পিছনে যুদ্ধরূপী মৃত্যুদূতেরই আনাগোনা বুঝি, আর কিছু নয়।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে একদিন অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। প্রত্যূষে ডরমিটোরি বেল যখন বাজল, ও কল্পনাও করে নি কনভেণ্টে শেষ দিনটি তার প্রভাত হ'ল। কিন্তু চ্যাপেলে ঢুকে যেই মাদার ভিডাইমাকে বাও করতে সামনে গেল তাঁর, বুঝতে পারল তার কাগজপত্র এসে পৌচেছে। নিজের ডেস্কে মাদার ভিডাইমা দু'টো হাত একত্রিত করে এমন জোরে চেপে আছেন, রক্ত সরে গিয়ে আঙুলগুলো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কয়ফে আধখানা মুখই ঢাকা, তবু মুখের দিকে না তাকিয়েই ওর আশংকা হচ্ছে এতক্ষণ কাঁদছিলেন তিনি—তাঁর কমিউনিটি থেকে একটি আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছেন জেনে কাঁদছিলেন। এখন সামলে নিয়ে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করছেন।

এই নিরুত্তাপ হিমশীতল সুপিরিয়রটির জন্য ভারি একটা মমতা অনুভব করল সিস্টার লুক—এই প্রথম। ধ্যান করতে



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম

গিয়ে অন্তর স্থির হ'ল না কোনমতেই—ভিতরের মানুষটা কথা বলে উঠছে বারবার।…আমি নিজে আপনার আগে বলতে পারলে সত্যিই খুশি হতাম মাই মাদার। কিন্তু প্রসংগটা এমনই দুঃখের, সেই মাদার জেনারেলের সংগে যে কথা বলেছিলাম, সেইখানেই শেষ। তারপর আর প্রাসংগটা তুলতে সাহস হয় না আমার। সেই থেকে যেটুকু কথা হয় সে শুধু আমার বিবেক বলে। সরাসরি ঈশ্বরের সংগে।…আপনার মনে লেগেছে আমি আপনার মাধ্যমে না এগিয়ে কনফেসানালে যাবার পথটা বেছে নিয়েছি বলে…

একসময় অদ্ভুত একটা শান্তিতে মনটা আপ্লুত হয়ে এল। নিজের ভিতরে তাকিয়ে দেখছে যেখানে বিদ্বেষের বহ্নি জ্বলছিল ধূ-ধূ করে, শত্রুর মৃত্যুতে উল্লাসের বন্যা বইছিল, সেখানটা একেবারে শান্ত, নিস্তব্ধ। অল্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পায়ে পায়ে—একটিমাত্র অশাস্ত্রীয় চিন্তা ছেয়ে আছে অন্তর—তার সংগে এই পবিত্র ধর্মীয় পরিবেশের কোন সম্পর্ক নেই…অপেক্ষা করে আছে হোস্ট নেবে বলে। ওর আশা, কমিউনিটি উত্তরকালে মনে রাখবে এ কথা আর উপলব্ধি করবে ঈশ্বরের সংগে কোন বিরোধ নেই ওর।

…চার্চকে তো আমি ছাড়ছি না সিস্টার—ছাড়ছি কেবল তোমাদের, আর আমাদের হোলি রুলকে।

এবার প্রার্থনায় মন দিল।

অল্টার রেলিং থেকে স্বাভাবিক মাধুর্যে সরে এল নিজের পিউ-এ। মনটা সবিস্ময়ে ভাবছে এবার কোথায় রুটি তার মাপিয়েছেন ঈশ্বর। আশীষ নিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে নতজানু হ'ল…চ্যাপেলের মাথার ওপর দিয়ে বোমারু বিমান উড়ে যাচ্ছে।

শেষবারের মত সিস্টারদের সংগে ধীর পদক্ষেপে চ্যাপেল ছেড়ে বেরিয়ে এল। মিছিলের পুরোভাগে মাদার ভিডাইমা স্বয়ং।

সবাই হলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলেন।

সবাই আসতে বললেন, প্রাতরাশের পর সিস্টাররা চ্যাপ্টার হলে মিনিট কয়েক থাকতে পারে সিস্টার লুককে বিদায় জানাতে, সে এ্যাণ্টওয়ার্পে যাচ্ছে।

ঠাণ্ডা দুই চোখে সিস্টার লুককে খুঁজে নিলেন, আর তুমি সিস্টার, তারপরই আমার অফিসে এস।

সবাই খাবার ঘরে এসে ঢুকল নীরবে। প্রার্থনান্তে আসন নিল, রুটি এগিয়ে দিল এ ওর দিকে। সিস্টার লুক সচেতনভাবে রুটির ঝুড়ি থেকে সবচেয়ে মোটা রুটিটা তুলে নিল, মোটা করে জ্যাম মাখালো তাতে। নার্স কর্তৃত্ব নিয়েছে নানের ওপর। বলছে, খেতে হবেই তোমাকে বেশি করে, অনেক পথ এখন যেতে হবে তোমায়।

চ্যাপ্টার হলে সংক্ষিপ্ত বিদায় অনুষ্ঠানে একটা কাঁটার ব্যথা খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতে লাগল। দু'টি নানের সংগে সবসময় নিবিড় একটা সংযোগ অনুভব করেছে অন্তরে, ভাষাতীত সংযোগ। অনুমানে তারা বুঝেছে এ বিদায়ের অর্থ। তাই আলিংগন করতে গিয়ে দৃষ্টিতে অপরিসীম বেদনা ফুটেছে তাদের।

একজন চুপিচুপি বলেছে, তুমি কি তোমার কংগোর কালো বয়দের কথা ভাবছ? ভাবছ তারা অপেক্ষা করে আছে?

অন্যজন বলেছে, তুমি ঠিক জান এটা ঈশ্বরের অভিলাষ, তোমার নয়।

কপোলের 'পরে উনিশবার ঈষদুষ্ণ নরম ওষ্ঠের স্পর্শ এসে লাগল সাবানের মৃদু সৌরভ সেই সংগে, আর মাড় দেওয়া গুইম্‌পের কর্কশতা।

উত্তরে দেবার আছে স্মিত একটু হাসি কেবল, আর কিছু নয়। তাই দিল। হৃদয়-উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত হাসিই শুধু দিল ছড়িয়ে।

হঠাৎ তারপর চলে আসার জন্য ঘুরে পা বাড়াল দরজার দিকে। মুহূর্তের জন্যও আর পিছন ফিরে তাকাল না।

পরবর্তী গন্তব্যস্থল সুপিরিয়রের অফিস।

দ্রুতপায়ে হাঁটছে, মন চাইছে করণীয় যা কিছু থাক তা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ততই ভাল। কিন্তু বিচিত্র সেই মন এই ক্ষণে সুপিরিয়রের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। দীর্ঘ সতেরো বছর প্রাতরাশের পর এই সময় নিত্য-নিয়মিত ডরমিটোরিতে গিয়ে সেই খড়ের থলিটা উল্টে পেতে নিজের বিছানাটা করে এসেছে সে। দরজায় টোকা দিতে গিয়ে এক পলক ইতস্তত করল তাই।

মাদার ভিডাইমা নিজের ডেস্কে বসে, সামনে ডেস্কের ওপর তিনখানা কাগজ বিছানো, সেই দিকে তাকিয়ে আছেন। চ্যাপেলে যে মমতা বোধ করেছিল, মনের চার পাশে সেই অনুভূতিটাই ঘিরে আসতে চাইছিল, কিন্তু সুপিরিয়রের ঠাণ্ডা চোখ দু'টোর দিকে চেয়ে নিজেরই দেহ-মন অবশ হয়ে আসতে চাইছে। এই মহিলাটিকে সে কোনদিনও বুঝতে পারবে না।

কর্তব্য অপেক্ষা করে রয়েছে সামনে, সুপিরিয়র সময় অপচয় করলেন না।

—আশা করি সিস্টার, আমাদের রেভারেণ্ড মাদার জেনারেল সম্প্রতি এখানে এসেছিলেন যখন, ভদ্রতাবোধেও তাঁকে তুমি বলেছ সব কিছু।

—তখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত আমি করতে পারি নি মাই মাদার। আমি রেভারেণ্ড মাদারকে শুধু বলেছিলাম যে আমি চলে যেতে পারি।

ইচ্ছা ছিল আরও কিছু বলে। বলে যে সে তাঁকে যে বলতে পারে নি নিশ্চিত করে তার কারণ তিনি আশা করছিলেন অলৌকিক করুণা কিছু এসে পড়বে ওর মাথায়।…আর সেই জন্যেই বোধহয় রেভারেণ্ড মাদার জেনারেল মাদার ডিডাইমার সংগেও এ নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি।

বলা হ'ল না। হিমশীতল ঐ চোখ দু'টো তথ্যই জানতে চায় কেবল।

আড়ষ্টভাবে বলল শুধু, আবেদন মঞ্জুর হ'ল যখন, চ্যাপলিনকে আমি বলেছিলাম তাঁকে ফোন করতে।

—আর জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আমায় জানান হয় নি কেন?

—কারণ, আমি বুঝেছিলাম আর আলাপ-আলোচনা করেও কোন লাভ হবে না মাই মাদার।

—যে ভয়ংকর পথে এগোতে যাচ্ছ, তার গুরুত্ব কতখানি বিবেচনা করে দেখেছ ভাল করে? যেমন ধর, তোমার স্বাস্থ্য কিংবা যে জগতে ফিরে যেতে চাইছ তার বর্তমান অবস্থা?

—হ্যাঁ, মাই মাদার। সিস্টার লুক সোজা তাকাল সুপিরিয়রের চোখের দিকে। বোঝাতে চায় ও ভয় পায় নি।

—ভাল কথা সিস্টার। তাহলে তোমায় বলব সই করার আগে খুব মন দিয়ে এই কাগজখানা পড়। তিনটি কপি আছে এর—একটি তোমার জন্য, একটি আমাদের জন্য আর তৃতীয়টি পোপের দলিলপত্রের অফিসের জন্য। যে মুহূর্তে এতে সই করবে তুমি, এই সংঘের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর থাকবে না তোমার।

নীরসভাবে একখানি কাগজ বাড়িয়ে দিলেন মাদার ডিডাইমা।

এতগুলো বছরের প্রয়াস আর বিচ্যুতির বাস্তব উত্তর এখন তার চোখের সামনে।

অন্তস্থিত নার্স বলছে, দেখ, হাত যেন না কাঁপে।

কাগজখানার মাথার ওপর সিলটা কার্ডিনালের চ্যাপ্টা টুপীর ছবি একটা—তা থেকে একটি শিল্ডের চারপাশে বাহারে ট্যাসেল ঝুলছে সোজা সোজা।

লেখাটা পড়ছে।…'সিস্টার লুককে, সংসার জীবনের নাম গ্যাব্রিয়েল ভ্যান ডি মাল: তোমার অনুরোধে ধর্মীয় কতৃপক্ষ কর্তৃক আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বানুসারে'… অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথাটা ঝিমঝিম করছে কেমন…'একাশীতিসংখ্যক অনুশাসন-নির্দেশিত বিশেষ পরিস্থিতিতে…তোমার ব্রতের বন্ধন হইতে তোমাকে আমরা অব্যাহতি দিলাম…ইহা দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে তুমি অযাজকীয় সাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত হইলে…নিম্নলিখিত সর্তাধীনে…'

মূল লিপি থেকে আলাদা করে তিনটি সর্ত লেখা।

গির্জার অধীনতা থেকে এই মুক্তিসংক্রান্ত লিপি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতে হবে তাকে।

সন্ন্যাসিনীর হ্যাবিট সে ছেড়ে ফেলবে এবং আর কখনও পরবে না।

কথা দিতে হবে যে কাজ সে করেছে সংঘের জন্য, কোনদিন তার মুল্য কিছু চাইবে না সংঘের কাছে।

'…পূর্ণ স্বাধীনতায় এবং সতর্ক ও পূর্ণাঙ্গ বিবেচনার সহিত…'

তারপর পৃথক পৃথক শূন্য জায়গা ছাড়া আছে বিভিন্ন খাতে—

তারিখ, শহরের নাম, নামসই। চোখ তুলে তাকাল।

ইতোমধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে মাদার ডিডাইমার মুখে। হিমশীতল বাহ্যিক অভিব্যক্তির অন্তরালে আলোড়ন জেগেছে একটা কিছু, ফল্গুধারার মত কিছু একটা বইছে, বেরিয়ে আসতে চাইছে অবরোধ ঠেলে।

—কোন উপায় কি নেই সিস্টার…আমরা কি কোন সাহায্য করতে পারি না?

—কিছু না, মাই মাদার।

—সই করার আগে রেভারেণ্ড মাদার ইমান্যুয়েলের সঙ্গে আর একবার আলোচনা করবার কথাটা বিবেচনা করেও দেখবে না তুমি?

—না নাই মাদার। তাতে কেবল বেদনাই বাড়বে··· আমাদের দু' জনেরই···

থেমে গেল। বেদনার চিহ্ন ক্রমে এখনই ফুটে উঠছে মুখে, নিজেই অনুভব করতে পারছে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। কণ্ঠস্বরের দৃঢ়, অচঞ্চল ভাবটা ফিরে আসতে সময় লাগল একটু।

আস্তে আস্তে বলল, কারণ, আমার সিদ্ধান্তের কোন রদ-বদল আর হবে না।

সিদ্ধান্তটা যে অপ্রতিরোধনীয়—এই কথাটাই কি আবার কঠিন করে তুলল মাদার ডিভাইমাকে? নাকি যে কঠিন নিঃসংগ মানুষটির মুখোমুখিতে সে ভয় পেয়েছে এতদিন, ইচ্ছে করেই কাঠিন্যের আবরণ টেনে আনলেন তিনি নিজের মুখে···তার মুখে মনের আবেগ প্রকাশ হয়ে পড়তে চাইছে দেখে?···ও দেখছে বরফের ওপরের চিড়টুকু মিলিয়ে গেল···মাদার ডিভাইমা কলমটা বাড়িয়ে দিয়েছেন তার দিকে।

রূঢ়স্বরে বললেন, এই তোমার কপি। অফিস থেকে সোজা তুমি আমাদের বোর্ডিং স্কুলে চলে যাবে, সেখানে সব কিছু তৈরি আছে। বলতে বলতে ডেস্কের এটা-ওটা হাতড়াচ্ছিলেন। পাঁচশো ফ্রাংকের চারখানা নোট বার করে বাড়িয়ে ধরলেন। আর কিছু বলবার নেই তোমায় এটা রাখ।

এক মুহূর্ত রক্তস্রোত যেন বন্ধ হয়ে রইল বুকের মধ্যে, সিস্টার লুক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নোটগুলোর দিকে। সতেরবছর আগে বাবা তাকে কনভেন্টে পৌঁছে দিয়ে যৌতুকের প্রতীক হিসাবে যে অর্থ জমা দিয়েছিলেন, টাকার অংকটা হুবহু তাই।

···একি আমায় নিতেই হবে? সংঘ আর আমার কোন কিছুই নেবে না, কোন কিছুই না।···ঋণের বোঝা আমার দিকেই ভাবী শুধু, আজীবন সে বোঝা বইতেও হবে। অন্তস্তলে বিকারগ্রস্ত স্বর একটা চিৎকার করে উঠতে চাইছে কেড়ে নাও ওটা···ছিঁড়ে ফেলে দাও ছুড়ে···

হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। কনভেন্ট-সুলভ নম্রতা এই শেষ। তিক্ত একটা বেদনাবোধ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব অনুভূতি, সব চিন্তা এমন আর্থিক লেন-দেনে শেষ হচ্ছে ঈশ্বর-চরণে অর্পিত জীবনের শেষ অধ্যায়। খেয়াল নেই সুপিরিয়র তাকে ভিজিটারদের বসবার ঘর আর করে দিয়ে হাসপাতালের বাইরের দরজায় পৌঁছে দিতে নিয়ে যাচ্ছেন—মঠের মধ্য দিয়ে হাঁটবার অধিকার আর তার নেই। লক্ষ্য করল না দরজার কাছে নিয়মানুগ আলিঙ্গন তিনি করলেন না, ওর নিজেরও মনে হ'ল না যাত্রার পূর্বে আশীর্বাদ নেবার জন্য নতজানু হয়।

ঠিক চেতনার রাজত্বে নেই যেন, ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

এক পক্ষে ভাল। এরই মধ্য দিয়ে শেষের সময়টার জন্য তার মনের প্রস্তুতিপর্ব সমাধা হয়ে যাচ্ছে।

দ্রুতপায়ে হাঁটছে। হেঁটে যেতে এখান থেকে বোর্ডিং-স্কুল পনেরো মিনিটের পথ। একবার ভাঁজ স্কার্টের পকেটে রাখা দু'হাজার ফ্রাংক রাস্তার পাশের নালায় ফেলে দেয়। কিন্তু এই ভোরবেলাতেও দু'চারজন পথচারী আছে পথে, আর ওর পরনে নানের পোশাক এখনও। দারিদ্র্য যাদের ব্রত, একটি সেন্টিমও তাদের কাছে মূল্যবান। পনেরো মিনিটের বেদনার অনুভূতি এত জ্বলন্ত হতে পারে না যে সতেরো বছরের হ্যাবিটকে শ্রদ্ধা করার অভ্যাসকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

স্কুল বাড়ির পোর্টারের ঘরখানা কপিকলের চাকায় আর ঘণ্টায় বোতামে ভর্তি একেবারে। ও পৌঁছোতেই বৃদ্ধা একটি নান মাথা নাড়লেন, বললেন, বার নম্বর ঘরে চলে যাও, সব তৈরি আছে। পোশাক পরে তৈরি হয়ে বোতাম টিপলে আমি দরজা খুলে দেব।

বার নম্বর ঘরখানা ছোট—জানলা নেই, দু'টো দরজা আছে। আসবাব বলতে একটি মাত্র টেবিল, শেডহীন বাল্বটার নগ্ন আলো এসে পড়েছে তার ওপর। টেবিলটার ওপর ভাঁজ করে পোশাকগুলো রাখা। নেভি-ব্লু রংয়ের একটা পুরো পোশাকের সেট, দু'টো সাদা ব্লাউজ, দু'প্রস্থ অন্তর্বাস, নতুন করে সারানো একজোড়া জুতো অন্তর্বাসের গোছাটার ওপর ছোট কালো জেল একটা, সাদা পাইপিংয়ে ধারগুলো মোড়া।—সাধারণ নার্সরা যেমন পরে। সেই সংগে তার র‍্যাশনের চলতি বইটার বাকি কুপনগুলো। পাশে জরাজীর্ণ একটা পাপিয়ামাসি স্যুটকেশ দাঁড় করানো আছে।

ধীরে ধীরে হাত তুলে ভেলটা খুলতে শুরু করল। তারপর এক এক করে পোশাকগুলো খুলল যেমন, নিপুণ হাতে নিয়মমত ভাঁজ করে রাখল।

নগ্নগাত্রে এক নিমেষ দাঁড়িয়ে রইল দরজা দু'টোর দিকে তাকিয়ে—একটা দিয়ে ঢুকেছে এ ঘরে, অন্যটা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। জীবনের এই পথ-পরিবর্তন অগৌরবের, লজ্জার। তাই অন্তরাল খুঁজতে হবে, চলে-যেতে হবে গোপনে, সবার অলক্ষ্যে।···নান হয়ে এসেছিলে, সাধারণ মানুষ হয়ে বেরিয়ে যাবে। কোন মানব-চক্ষু সাক্ষী থাকবে না এই বিরাট রূপান্তরের—তোমার নিজের চোখও না, আয়না তো নেই এখানে।···অপরিচিত এই হাউসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাকে সেইজন্যই। তুমিও অপরিচিত এখানে, বেদনাদায়ক এই যাওয়াটা সহজতর হবে তাই।

গাটা শিরশির করে উঠল। রেয়নের অন্তর্বাসটা পরতে শুরু করেছে। সিল্কের মত চকচকে কাপড়টা। জামাটা এমন হাল্কা, অপর্যাপ্ত মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আরও কিছু

যেন থাকা উচিত ছিল। দ্বিতীয় গোছাটা নেড়ে-চেড়ে দেখল একবার, তাতে এ গোছার কোনটা ভুলক্রমে থেকে গেছে কি না।···সাদা ব্লাউজ দু'টো দেখে থমকালো একটু। দু'টো এক ছাটের নয় ঠিক, কোনটা পরবে ঠিক করতে পারছে না।···হ্যাবিটের উৎকৃষ্ট নরম সার্জের তুলনায় এ পোশাক খসখসে মোটা লাগছে।

পোশাক পরা শেষ। বাকি আর যা কিছু সব স্যুটকেশটায় ভরে নিল। নিয়ে আর একবার টেবিলের ওপর ভাঁজ করে রাখা কালো সার্জের পোশাকটার দিকে তাকিয়ে দেখল। সব কিছুর ওপর রাখা মাড় দেওয়া কয়ফটা সাদা একটা শামুকের খোলার মত দেখাচ্ছে—তারই মধ্যে চামড়ার বেল্টটা গোল করে গুটিয়ে রেখেছে, আর জপের মালাটা। ক্রুশিফিক্সটা নির্দ্বিধায় নিজের স্যুটকেশে ভরে নিল। কয়েক বছর আগে কংগোয় থাকতে তার এক সন্ন্যাসী কাকা এটা উপহার দিয়েছিলেন তাকে। মাদার ম্যাথিল্ডা অনুমতি দিয়েছিলেন এটা নিজের কাছে রাখবার।

পোশাকগুলোর একটু দূরে শক্তসামর্থ জুতোজোড়া খুলে রাখল। সামনে আঙুলের দিকের মুখচাপা জায়গাটা বিকৃত হয়ে গেছে জুতোটার। দীর্ঘদিন প্রার্থনায় নতজানু হয়ে বসতে বসতে। চোখে পড়ে যেতে গলার কাছে কি একটা ঢেলার মত ঠেলে উঠতে চাইছিল, অনেক চেষ্টায় সেটা দমন করতে হ'ল।

প্রত্যহ নতুন করে জীবন শুরু করার আদর্শে এতদিন কেটেছে তাই বোধ হয় এত কিছু সহ্য করা সম্ভব হ'ল। নার্সের ছোট ভেলটা তুলে নিয়েছে। একপাশে একটা ছোট সেফ্‌টিপিন আটকানো। আশ্চর্য, এতক্ষণ পরে হঠাৎ ঐ ছোট্ট পিনটা দেখে প্রথম চোখ দু'টো জ্বালা করে জল ভরে এল। খুলতে গিয়ে আঙুলে ওটা ফুটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে অবশ্য একটু, চোখে জল তা বলে সেজন্য আসে নি।

পিনটা যেন বলছে চুপিচুপি, দেখ, প্রত্যেকটি জিনিসের কথা ভেবেছি আমরা। যা কিছু দরকার সব হাতের কাছে পাবে তুমি। ঘণ্টা বাজিয়ে কোন সিস্টারকে তোমায় ডাকতে হবে না কোন কিছুর জন্যই, আর তাকেও ঐ দরজায় এসে দাঁড়াতে হবে না তোমার এ রূপ দেখতে। তোমার মত কেউ তাদের নজরে না পড়ে, সতর্ক থাকি আমরা। তোমাকেও যেমন এই সতেরোটি বছর আড়াল করে রেখেছিলাম—কেউ কনভেণ্ট ছেড়ে যাচ্ছে, সে মর্মান্তিক অশুভ দৃশ্য তোমায় দেখতে দিই নি।

ছোট ছোট ছাঁটা চুলে চিরুণী পড়ে নি। অবিন্যস্ত চুলগুলো কি রকম হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছে না বটে, হাত দিয়ে অনুভব করা যায়। ছোট ভেলটা চুলের ওপর দিয়ে টান করে ঘাড়ের কাছে পিন করল।

আর একটাই কাজ বাকি আছে।

জার্মান গোয়েন্দা অফিসারের ছদ্মবেশধারী সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটির দেওয়া চিরকুটখানি তার বয়ল পকেট থেকে। ব্রাসেল্সের ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিয়ে কাগজখানা শতধা করে ছিঁড়ল। কোন নানের অফুরন্ত ধৈর্যও এগুলোকে জুড়তে পারবে না আর। কুঁচোনো কাগজগুলো দলা পাকিয়ে টেবিলের ওপর রাখা একপাটি জুতোর মধ্যেই রেখে দিল, ঘরে কোন বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়ি নেই।

এনামেল করা প্লাগের মধ্যে বসানো বোতামটা টিপল এবার।

সিলিং দিয়ে বৈদ্যুতিক তার চলে গেছে ঘরের এ দরজা থেকে ও দরজা অবধি—বোতামটা টিপে দিয়ে ও তাকিয়ে আছে সেই তারের দিকে। দেখছে ক্রমেই তারটা আঁট হচ্ছে, সমস্ত অন্তর প্রার্থনায় ব্যাপৃত···

হে প্রভু, এতদূরে তুমিই এনেছ আমায়, বাকি পথটাও তোমার সংগ যেন পাই···

বাইরের দিকের দরজাটা খুট করে খুলে গেল। স্যুটকেশটা তুলে নিল ও। ছোট স্কার্টটা আর একবার টেনে দিল একটু, পায়ে পায়ে বাইরের জগতের দিকে পা বাড়াল।

পা দু'টো দুমড়ে যেতে চাইছে।

দরজা পেরিয়ে একটা গলিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অপরিসর গলি, প্রত্যূষের তির্যক রোদ বিছানো এখানে-ওখানে। মোড়ের মাথায় স্কোয়ার একটা, সেখানে একটা কর্নার কাফে সবে খুলছে। অন্তস্থিত নার্স পরামর্শ দিল, আপাতত ওখানে ঢুকে এককাপ কফি নিয়ে বসতে। ছবির দোকানে গিয়ে ছবি তোলা দরকার, কিন্তু এত সকালে দোকান খোলে নি।

ওয়েটার একবার তাকাল তার ভেলটার দিকে। চটপট্ ধূমায়িত একপেয়ালা কফি এনে হাজির করল।

হাসিভরা মুখে বার্ধক্যের বলিরেখা। জিজ্ঞাসা করল, আর একটা নতুন বাচ্চা এই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পৃথিবীর আলো দেখল বোধ হয়? ম্যাডমোয়জেল সারারাত বোধ হয় জেগেছিলেন, তাই না?

কৌতূহলী চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে হাসির প্রত্যুত্তরে লজ্জিতভাবে সে-ও একটু হাসল।—তা···হ্যাঁ··· হ্যাঁ, তাই—জেগেই ছিলাম।

—ম্যাডমোয়জেল সংগে কুপন এনে থাকেন যদি—টাট্‌কা বান রয়েছে।

—ধন্যবাদ, এই যথেষ্ট।

বাটি থেকে স্যাকারিন তুলে নিয়ে কফিতে মেশালো সে। ওয়েটার যে এইমাত্র নার্স বলে ধরে নিয়েছে তাকে তা থেকেই চিন্তাটা মোড় ফিরেছে কন্‌ভেণ্টের দেওয়া এই সাধারণ নার্সের ভেলটার দিকে।

…ওরা তো আমায় একটা টুপী দিতে পারত—সেই যখন ঢুকেছিলাম তখন যে-রকম টুপী পরে গিয়েছিলাম সেই রকম একটা টুপী। অন্য আর সব জিনিস তো সেইভাবেই পাওয়া গেছে, প্রতিদানের মত।

কফিতে চুমুক দিল।

…সবকিছুর মধ্যে নার্সের এই ছোট ভেলটা ব্যতিক্রম হয়ে রইল। শেষ পর্যায়ে দেখেছে কনভেন্টের প্রাণহীন ঠাণ্ডা দৃষ্টি শুধু নিয়ম-নির্দেশগুলো যথাযথ পালনের দিকে একাগ্র—নিভৃত অনুভূতিতে সেটা ব্যথার মত বেজেছিল। তবু তার মধ্যেও যে দাক্ষিণ্য লুকিয়ে ছিল, তার প্রমাণ এই ভেলটা—ও যে একজন গ্র্যাজুয়েট নার্স, এই ভেল সেই কথাই বলবে। দয়ার এই আলোটুকু সবকিছুর রূপ বদলে দিয়েছে।

চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকাল। সামনের স্কোয়ারে প্রাণের সাড়া জেগেছে, আর রংয়ের প্লাবন।

কিছুক্ষণ কাটল। নিজেকে টুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে। যেন খুব ভোরের ট্রেনে এসে পৌঁচেছে—এখন দোকান-পসার যতক্ষণ না খোলে, সময়টা কাটাতে হবে। বাবা একজন পাকা টুরিস্ট ছিলেন। বলতেন, নতুন কোন শহরে গেলে প্রথমেই শহরের মাঝখানে একটা কাফে খুঁজে নিতে হয়, তারপর সেখানে একটা টেবিলে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ লক্ষ্য করতে হয় চলমান জীবনস্রোতটা।

কয়ফের আবরণ আর নেই, মনে হচ্ছে যেন জগৎটাকে দেখছে ওয়াইড-এ্যাংগেল লেন্স দিয়ে। ডাইনে ঐ দূরে ওয়েটার টেবিলগুলো ঝাড়ছে। স্কোয়ারের ওদিকে কাফের মুখোমুখি একসার দোকান দেখা যাচ্ছে, আর ট্রাম-লাইন দেওয়া একটা রাস্তা। বিশাল এক দৃশ্যপটে জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে অবিরাম, দেখার জন্য মাথা ঘুরিয়ে এপাশে ওপাশে তাকাবার দরকার নেই।…সশব্দে একটা ট্রাম স্কোয়ারে ঢুকল, একপাক ঘুরে রাস্তায় গিয়ে পড়ল আবার। মানুষের যাওয়া-আসা…কর্মমুখর দিনের ব্যস্ততা চারদিকে।…চোখের সামনে কত লোক নামছে ট্রাম থেকে—ওদের কর্মস্থল এই কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়—ব্যস্তপায়ে এগোতে এগোতে আপনা হতেই নিজেদের পকেট হাতড়াচ্ছে, চাবিটা আছে কি না দেখে নিলে নিশ্চিন্ত!

দোকানে দোকানে লোহার শার্টার উঠতে শুরু করেছে। কোন কোন দোকানের এক একটা জানলায় বিশেষ রঙিন ঢাকনার ব্যবস্থা চোখে পড়ে—নিশ্চয় এমন সব সূক্ষ্ম, কোমল জিনিস সাজানো আছে সে সব শো-উইণ্ডোতে, যাতে রোদের তাপ সইবে না।

কাঁধে ঝোলানো একটা দড়ির থলিতে একবোঝা স্যালাড পাতা, বুড়ো এক চাষা কাফেতে ঢুকল। সব ক'টা খালি টেবিলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওর পাশের টেবিলটায় এসে বসল। থলিটা সাবধানে মেঝেয় রেখে স্যুটকেশটার দিকে তাকিয়ে চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

বেশ স্বগোত্রীয় ভংগীতে বলল, ব্রাসেলসের ট্রেন ছাড়তে এখনও ঢের দেরি। ভগবানের সময়ের অনেকখানি আমাদের অপেক্ষায় ব্যয় করতে হবে।

প্রত্যুত্তরে ও শুধুই স্মিত হাসল, বলবার মত কিছু খুঁজে পেল না।

এতগুলো বছরের নীরব থাকার অভ্যাস, অকারণে একটা তুচ্ছ কথা বলাও অন্যায় ছিল—সেই কঠোর অভ্যাসটাকেই শিথিল করতে শিখতে হবে। মনে পড়ে গেল নভিস ছিল যখন, দু'টি মেয়ে ছেড়ে চলে যাচ্ছে জেনে কেমন করুণা হয়েছিল তার—অবাক হয়ে ভেবেছিল এতদিনের এই আত্মবিলুপ্তির সাধনার অভ্যাস ভুলতে কতদিন সময় লাগবে ওদের?…দেড় বছরের অভ্যাস তাদের। আর তার? সতেরো বছরের।

…প্রভু সাহায্য করবেন আমাকে এই সতেরোটা বছরের অভ্যাস ভুলতে, নিশ্চয় করবেন।

প্রার্থনাই করছে শুধু কনভেন্টের নিয়মনিষ্ঠ ভাবভংগী থেকে মুক্তি পেতে, বুঝছে না মনের মধ্যে তার নান রূপের ভিৎটাও রীতিমত পাকা।…পরার্থপরতা আর ন্যায়, স্বার্থহীনতা আর অকৃত্রিমতা—মনের মধ্যে বদ্ধমূল সংস্কারগুলো ভবিষ্যতে চিরদিনই একটা অবোধ্যতার ছাপ রেখে দেবে তার মধ্যে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। সরু একটা রূপালী রেখা নীলের বুক দীর্ণ করে এগিয়ে যাচ্ছে—সুতীক্ষ্ণ শব্দে দুর্বার গতির আভাস।

চাষাটি বলল, ভগবান করুন ও শব্দ আর শুনতে না হয়, ওই রূপালী রং চোখে দেখতে না হয় আর…তবে যতক্ষণ ঐ শব্দটা শুনতে পাচ্ছি ততক্ষণই রেহাই—নিশানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ওগুলো কোন শব্দ করে না, ঐ ভি-ওয়ানগুলো। ঐ আবার একটা গেল ব্রিটেনে।

বুড়ো মানুষটির কণ্ঠে বিষণ্ণতার সুর। আর ওর মনে একটা বিশেষ অনুভূতি—এই প্রথম মাথার ওপর দিয়ে একখানা ভি-ওয়ান উড়ে যেতে দেখছে। কনভেন্টে প্রায়ই নাম শুনত, কিন্তু জানলার কাছে গিয়ে নিজে কোনদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

এই চুয়াল্লিশ সালের অগস্ট মাসের সকালবেলা ও জানেও না আজ থেকে ঠিক দু'মাস পরে অ্যান্টওয়ার্পে ইংরেজ বাহিনীর মেডিক্যাল ইউনিফর্ম পরে পাথরকুচি বিছানো গোপন ছাউনির মধ্যে গুঁড়ি মেরে চলাফেরা করতে করতে আহত মানুষগুলোকে কি করে বাঁচানো যায় সেই চিন্তাই ছেয়ে থাকবে তার অন্তর, নিজের হাঁটাচলা আর কথা বলার রকমফের নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা মনেও থাকবে না।

বেলজিয়ান আণ্ডার গ্রাউণ্ড মেডিক্যাল সাহায্য দলের জন্য নার্স জোগাড় করে চলেছে। এই ছোট্ট কাফেটায় বসে বসে ওর মনে যখন তোলপাড় করছে ব্রাসেলসের সেই রহস্যময় ঠিকানাটা···ভাবছে কি কাজে লাগবে ওটা তার—তখনও।

আবারও স্কোয়ারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। এমনি বসে বসে তাকিয়ে থাকলেই অনেক কিছু জানা হয়ে যায়—সম্মুখস্থ দৃশ্যপটের গণ্ডী ছোট বটে, কিন্তু অনন্ত বৈচিত্র্য তাতে। পৃথিবীটাই যেন ধরা দিয়েছে ঐ চতুষ্কোণের সীমানার মধ্যে। শুধু ঐ দোকানের জানলা-গুলোয় তাকিয়ে থাকলেও প্রথম পর্যায়ে অনেকখানি জ্ঞান আহরণ সম্ভব। হঠাৎ নজরে পড়ল চকচকে দামী বুটপরা দু'জন উঁচুধাপের জার্মান আফসার মন্থরপায়ে রাস্তা দিয়ে বাঁ-দিকটায় এসে পড়ল।

শ্রমিক একজন যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, তাকে থামিয়ে তার কাগজপত্র দেখতে চাইল। দেখে মাথা নেড়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলে গেল।

ও চাষাটিকে বলল, আমায় এবার যেতে হবে। একটু থেমে খুব নরম গলায় ঘরোয়া-স্বরে বলল, স্যালাড পাতাগুলো ভাল মত বিক্রি হোক আপনার মঁসিয়ে।

স্যুটকেশ তুলে নিয়ে সামনের ডিপার্টমেণ্ট স্টোর্সটার দিকে এগোল—এই মাত্র খুলেছে, বসে বসে দেখেছে ও। চলার গতিতে নানের ভংগীটাই ফুটেছে টের পাচ্ছে নিজেই, তবু চোখে লাগা ব্যস্ততা প্রকাশ করে নি। ধীরে ধীরে দোকানটায় ঢুকে হিংস্রভাবে নিজেকেই নিজে বলছে একমাত্র কোন নানের আইডেনটিটি কার্ড কোন জার্মান কখনও দেখতে চাইত না!···এখন ঐ শ্রমিকটার সংগে কোন তফাৎ নেই আমার! যে কোন মুহূর্তে যে কোন জার্মান অফিসার পথের মধ্যে দাঁড় করিয়ে আমার কাগজপত্র দেখতে চাইতে পারে।

একটি সেলসগার্ল তাকে ছবি তোলার দিকটা দেখিয়ে দিল।

ঘোরানো একটা টুলে আয়নার সামনে বসেছে—ঐ আয়নাটায় এখন সে নির্দ্বিধায় দেখতে পারে নিজেকে। প্রায় কুড়ি বছর পরে! ধীরে ধীরে টুলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রথমে সামনে থেকে নিজের মুখখানা দেখল, তারপর পাশ থেকে। মাথায় রুমালের মত ভেলটা···মুখখানা আশ্চর্যরকম তরুণ। একগোছা চুল ভেলের শাসন এড়িয়ে কপালের ওপর এসে পড়েছে—বিশ্লেষণী দুই চোখের ওপর বিস্ময়সূচক চিহ্ন যেন।

—এখনও কিন্তু এটা থাকে নি!···স্থির হয়ে বসে মেসিনের খাঁজে পয়সা ফেলে বোতাম টিপল—আলোগুলো জ্বলে উঠল মুহূর্তে···একটা একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজের মধ্যে ক্লিক্ করে শব্দ হ'ল···ও শুধু নিজের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে। পরক্ষণেই আবার নিভে গেল আলোগুলো। স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরাটা চকিতে দেখা আলো-ছায়ার সমষ্টিটাকে স্থায়ী রূপ দিচ্ছে, জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছবিগুলো ডেভলাপ হচ্ছে। পর্দা-ঢাকা সেই জায়গাটাতেই ও অপেক্ষা করে আছে সেজন্য। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কখন ছাপা-অক্ষরের নির্দেশটা দেখা যায়; ছবি তৈরি।

রেজিস্টার্ড সিভিলিয়ন হবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ, একটি কাজ কেবল বাকি আছে। আর একটু ভয়ও আছে সেটার জন্য। কেউ যখন নানের আইডেনটিটি কার্ড বদলে সিভিলিয়নের আইডেনটিটি-কার্ড চায় কেরাণীবাবুটির কাছে কি বলে সে? কেরাণীটি ভাববে ও-ও একজন আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মী-যারা অনবরত আইডেনটিটি কার্ড বদল করে। কিংবা যারা নান ছিল এখন আর নেই তাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে যে বিকৃত কৌতূহল ফোটে ঐ কেরাণীটির চোখেও কি তা ফুটবে?

হঠাৎ খেয়াল হ'ল অন্তরটা তার প্রার্থনায় লিপ্ত। জানে তার সিস্টাররা ঠিক এই মুহূর্তে কোন অফিসটি আবৃত্তি করছেন, ঘড়ি দেখার দরকার নেই। পর্দাঢাকা এই ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে বসে ও স্পষ্ট শুনছে তাঁদের সমবেত স্বর, ঈশ্বরের স্তবে প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছেন ওঁরা।

সম্বিৎ ফিরল। স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরাটা নির্দেশ ঘোষণা করেছে। পরমুহূর্তে ধাতুপাত্রটায় ছবিগুলো এসে পড়ল।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

॥ সমাপ্ত ॥

এ মাসের প্রচ্ছদপট

বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তির একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করা হইল। মূর্তিটির নির্মাতা ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল।

কিন্তু হায়, হয়তো বৃথাই তোমাকে গঞ্জনা দিচ্ছি। সব আমারই কর্মফল। তোমার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কোথায়? তুমি-আমি তো কতদূর, কত অচেনা। তুমি আমাকে কেন মারবে? যে আমার দেহ-মনের অন্তরঙ্গ ছিল সেই কৃষ্ণই আমাকে মেরেছে। সর্বস্ব ত্যাগ করে যাকে ভজনা করলাম সেই আমাকে নিজহাতে হত্যা করল। নারীবধে কৃষ্ণের ভয় কী। ক্ষণমাত্রে প্রণয় ভেঙে দিতে তার কিসের আলস্য!

কৃষ্ণকে দোষই বা দিই কেন? এ আমার নিজের দুর্ভাগ্য। নইলে যে কৃষ্ণ আমার প্রেমাধীন ছিল সে কি নিজের ইচ্ছায় আমাকে ত্যাগ করতে পারে? আমার প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। হায়, আমার ভালোবাসার চেয়েও আমার দুর্ভাগ্য বলবত্তর। তাই অমন নমনীয় কৃষ্ণ এমন পাষাণ হয়ে গেল!

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ। তুমি কোথায় গেলে? কোথায় তুমি গোবিন্দ-মাধব-দামোদর? পরম বিষাদে মহাপ্রভু রোদন করতে লাগলেন।

অক্রুর যখন রথে করে কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যাচ্ছে মথুরায় তখনো গোপবালারা 'গোবিন্দ-মাধব-দামোদর' বলে কেঁদেছিল।

হে গোবিন্দ, তুমি তো চললে, তবে তোমার সঙ্গে আমাদের মন বুদ্ধি চক্ষু শ্রুতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কেও নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এই বিচ্ছেদব্যথার অনুভব। হে দামোদর, একদিন তুমি স্নেহরজ্জুতে বদ্ধ হয়েছিলে সে কথাও ভুলে যাও। হে মাধব তুমি তো আমাদের পতি নও, তুমি তো আমাদের সখা, আমরা তোমার পরবস্তু, সুতরাং পরের বস্তুকে তুমি কী বলে বিনাশ করতে চাও?

মহাপ্রভু গোপীভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

৭৭

রাধাকৃষ্ণের মিলনগীত শোনাতে বসল রামানন্দ। তবেই প্রভু স্থির হলেন। তাঁর বিরহযন্ত্রণার নিবারণ হল।

প্রভুকে শুইয়ে তবে বাড়ি গেল রামানন্দ। গোবিন্দ আর স্বরূপ গম্ভীরার দরজার পাশটিতে পাহারা রইল।

কিন্তু কই, প্রভু শান্ত হতে পারছেন কই? উঠে বসে নাম-সংকীর্তন সুরু করেছেন। ক্রমে কৃষ্ণ-

॥ ধারাবাহিক জীবনী রচনা ॥

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, গম্ভীরার দেয়ালে ঘষতে লাগলেন মুখ। মনে হল কৃষ্ণান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু কোথায় দরজা? অন্ধকারে দরজার হদিস করতে পারছেন না, একবার এ-দেয়ালে মুখ ঘষছেন, আরেকবার ও-দেয়ালে। মুখে গালে নাকে ঘা হয়ে গেল, রক্ত ঝরতে লাগল। বাহ্যস্মৃতি নেই তাই জানলেন না ক্ষতের কথা, রক্তের কথা। মনে-মুখে শুধু হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ।

আর্তনাদ শুনে স্বরূপ দীপ জ্বেলে ঘরে এল। এ কী করুণ দৃশ্য!

'এমন দশা তোমার কে করলে?'

'জানি না কে করলে!' প্রভুর বুঝি কিছু বাহ্যস্মৃতি ফিরে এল। 'উদ্বেগে ঘরে থাকতে পারছিলাম না। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে আসতে গিয়ে বারে-বারে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি, তাতেই ক্ষত হয়েছে।'

রাধাভাবে দিব্যোন্মাদ।

প্রেমবৈবশ্যে আবার কী করে বসেন, স্বরূপ আর গোবিন্দ পরামর্শ করতে বসল, কী করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ রক্ষা করা যায়। ঠিক করা হল একজন প্রহরী রাখা দরকার। কিন্তু কে এমন প্রহরী আছে যার সম্পর্কে প্রভুর কোনো সঙ্কোচ নেই। শঙ্কর পণ্ডিতের নাম মনে পড়ল, একমাত্র তার প্রতিই প্রভুর গৌরববুদ্ধিহীন বিশুদ্ধ প্রীতি। শঙ্কর যদি তাই ঘরের মধ্যে শোয়, প্রভু হয়তো আপত্তি করবেন না।

'অনুমতি করো শঙ্কর তোমার পায়ের তলায় শোবে।' স্বরূপ প্রভুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাল।

প্রভু প্রথমে রাজি হল না। পরে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর মত দিলেন।

প্রভুর পায়ের নিচে আড় হয়ে শুল শঙ্কর আর প্রভু তার দেহের উপরে চরণ প্রসারিত করলেন। প্রভুর পায়ের বালিশ হল শঙ্কর, যেমন বিদুর হয়েছিল কৃষ্ণের, আর তার নাম হয়ে গেল 'প্রভুপাদোপাধান'।

কিন্তু শঙ্কর যে শোয়, পায়ে এতটুকু একটা আবরণ নেই। তখন প্রভু নিজের গায়ের কাঁথাখানা শঙ্করের গায়ে চাপিয়ে দেন। তাতে কী, শঙ্করের ঘুম মোটেও গাঢ় হয় না, সে শীঘ্রচেতন, একটুতেই জেগে ওঠে। জেগে উঠে প্রভুর পা টিপতে সুরু করে। শঙ্করের ভয়ে প্রভু বাইরে বেরুতে পারেন না, না বা দেয়ালে মুখ ঘষতে। শঙ্কর দুর্ধর্ষ প্রহরী।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে প্রভু জগন্নাথবল্লভ বাগানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। ভক্তেরা সঙ্গ নিল। বাগানের বৃক্ষ-বল্লী ফুলে ভরে গেছে, ফুলের গন্ধ নিয়ে মলয়পবন বইছে, মৃদু কূজন করছে পাখিরা, জ্যোৎস্নায় সমস্ত বাগান উজ্জ্বল হয়ে আছে, দেখলে মনে হয় যেন বৃন্দাবন উদঘাটিত।

ললিত লবঙ্গ-লতা পদ কীর্তন করো। স্বরূপ গান ধরল, প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। এক বৃক্ষতল থেকে আরেক বৃক্ষতলে উপনীত হচ্ছেন। অশোক-গাছের কাছাকাছি আসতে দেখলেন কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে।

কৃষ্ণকে দেখেই তাকে ধরবার জন্যে প্রভু ছুটলেন অশোকগাছের দিকে। কৃষ্ণ প্রভুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। আর, একটু হেসেই পালিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল।

কৃষ্ণকে কাছাকাছি পেয়েও ধরতে পেলাম না এই যন্ত্রণায় মূর্ছা গেলেন প্রভু। কৃষ্ণ নেই কিন্তু তার গাত্রগন্ধে সমস্ত বাগান ভরে গেছে, সেই গন্ধ নাকে যেতেই প্রভু উঠে পড়লেন, কোথায় কৃষ্ণ। অঙ্গগন্ধ আস্বাদনে আমার মিলন লালসা যে আরো বেড়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণগন্ধলুব্ধা রাধিকা সখীদের যা বলেছিল সেই কথাই প্রভু পুনরাবৃত্তি করলেন :

মৃগমদবিজয়ী কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধের আটটি নিবাসস্থল—দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা, নাভি আর মুখ—সেই অষ্টপদ্মের পরিমল-উর্মি দিয়ে কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের আকর্ষণ করছে, শুধু পদ্মগন্ধ নয়, কস্তুরি কর্পূর বরচন্দন আর কৃষ্ণাগুরুর গন্ধও সেই সঙ্গে মিশে আছে। এ সমস্ত দিয়ে কৃষ্ণ যে অঙ্গলেপন করে। একে নিজের স্বাভাবিক গন্ধ তার উপরে লেপনচর্চার গন্ধ—মদনমোহন যে আমার নাসাস্প হা বিস্তৃত করে দিচ্ছে।

'মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি।'

একসঙ্গে কতগুলো গন্ধডাকাত মিলে সমস্ত চুরি করে নিল। কী চুরি করে নিল? গোপ-নারীদের তনু মন লজ্জা ধর্ম কুলশীল গৃহ সমাজ—সমস্ত। তাদের কেশবন্ধ বেশবন্ধ সমস্ত সংযমের বাঁধ খসিয়ে দিয়ে 'বাউরী'—পাগলিনী করে ছাড়ে। গন্ধ পেয়েও গন্ধের পিপাসা মেটে না—এ কৃষ্ণ-তৃষ্ণায় শান্তি নেই এ তৃষ্ণা নিয়ত-নিরন্তর। এ গন্ধ বুঝি বিনামূল্যে মেলে, কিন্তু গন্ধের এমন যাদু, অন্ধ করে ছাড়ে, একবার বাইরে নিয়ে এসে আর ঘরে যেতে পথ দেয় না।

'মদনমোহনের নাট পসারি গন্ধের হাট
জগন্নারী গ্রাহক লোভার।
বিনিমূল্যে দেয় গন্ধ গন্ধ দিয়া করে অন্ধ
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥'

গৌরহরিও তেমনি গন্ধের উৎসকে, কৃষ্ণকে ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করছে। একেকটি গাছের কাছে যাচ্ছেন আর আশা করছেন এই বুঝি কৃষ্ণ স্ফুরণ হবে। কৃষ্ণ কোথায়, শুধু—অঙ্গগন্ধের তরঙ্গ বয়ে চলেছে। তাঁকে আবার নিয়ে যাচ্ছে আরেক গাছের কাছে। শুধু গন্ধই মিলছে কিন্তু কই সেই গন্ধরাজ?

কৃষ্ণের এত অঙ্গগন্ধ, আমার কেন এতটুকুও প্রেমগন্ধ নেই? আমার যদি সত্যিই কৃষ্ণপ্রেম থাকত তাহলে তো আমি কৃষ্ণমুখ না দেখতে পেয়ে পতঙ্গের মত পুড়ে মরতাম। কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করে যাওয়া সত্বেও যে আমি বেঁচে আছি তার অর্থই আমার প্রেম নেই। অনুরাগী—অনুগতকে কি কেউ ত্যাগ করে? তবে কাঁদছি কেন? আমার এ কান্না ছলনা, লোক-দেখানো। লোকদের আমি আমার সৌভাগ্য দেখাচ্ছি। দেখ আমি কত ভাগ্যবান, আমার মধ্যে কত কৃষ্ণপ্রেম! হায় কৃষ্ণপ্রেমই যদি থাকত তবে এ বিরহানল সইতে পারতাম? দগ্ধ হয়ে যেতাম না? তার অর্থ-ই হচ্ছে আমার এ অশ্রুও কাপট্য।

স্বরূপ আর রামানন্দ নানাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগল।

সত্যিই তো, কৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গনই করুক বা বাহুর পেষণে বধই করুক, আমার পক্ষে দুই-ই সমান। দর্শন দিক বা অদর্শনে রাখুক সমস্তই সে। সে লম্পট হোক তবু সেই আমার নাগর, আমার প্রাণনাথ।

কৃষ্ণের মাধুর্য রাধা কী ভাবে আস্বাদন করেছিল তা বোঝাবার জন্যেই তো কৃষ্ণ গৌর হয়েছে। গৌরই তো রসরাজ আর মহাভাব একসঙ্গে। রাধার সুখের স্বরূপ জানতেই তো বাসনা ছিল কৃষ্ণের, কিন্তু এই দিব্যোন্মাদের আবেশ কেন? এ আবেশে যে নিদারুণ বিরহক্লেশ। কিন্তু বিরহযন্ত্রণা না থাকলে প্রেমের আনন্দ কোথায়? 'বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।' দিব্যোন্মাদ না হলে রাধার প্রেম-মহিমাই বা কী করে জানা যাবে? এদিকে সর্বশক্তিমানের ঐশ্বর্য, অথচ রাধাপ্রেমের প্রভাবের কাছে সর্ব গর্ব খর্বীকৃত।

বহু যত্নে নাম-গান করে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনল রাম রায়।

রাত্রিদিন নীলাচলে বসে কৃষ্ণবিরহবিহ্বল জীবন যাপন করছেন গৌরহরি। সঙ্গী শুধু দু'জন—স্বরূপ আর রামানন্দ। তারা ব্রজের গান গাইছে, আবৃত্তি করছে রসশ্লোক। তাই শুনে প্রভুর কখনো জাগছে হর্ষ, কখনো শোক, কখনো বা রোষ দৈন্য উদ্বেগ কাতরতা। কখনো বা উৎকণ্ঠা আর সন্তোষ।

প্রভুর স্বরচিত অষ্ট শ্লোক—শিক্ষাষ্টক নিয়েই চলতে লাগল রসাস্বাদ।

প্রভু বলে উঠলেন, 'শোনো স্বরূপ, শোনো রাম রায়, কলিতে নামসংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়।'

'নামসঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।'

কিসের উপায়? কলিকালে যখন, তখন সন্দেহ কী, আনন্দের উপায়। কলিকালে স্থির আনন্দ কী? রস। রসবস্তুকেই পেলেই মানুষ আনন্দী হতে পারে। কৃষ্ণই অক্ষয় রসবস্তু। কৃষ্ণই অশেষ রসামৃতবারিধি। মূর্তিমন্ত মাধুর্য। রসস্বরূপ হয়েও আবার রস-আস্বাদক। তাই তার একমাত্র ব্রত ভক্তচিত্তবিনোদন। সুতরাং কৃষ্ণই কলিকালে একমাত্র সন্ধিতব্য বস্তু। তাকে পেলেই জীব পূর্ণানন্দ, কৃতকৃতার্থ।

তাকে পাবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় নামকীর্তন। এই কীর্তনেই ভক্তির উত্থান। ভক্তি ছাড়া কেউ কোন ফল দিতে পারে না, না কর্ম না যোগ না বা জ্ঞান। 'ভক্তিসুখনিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান।' নামকীর্তনই নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ পন্থা। যে আকাঙ্ক্ষা করে বা করে না দু'জনেরই। আর যে আকাঙ্ক্ষা করে তার সমস্ত অভীষ্টই নামকীর্তন পূর্ণ করে দিতে পারে। গমনে উপবেশনে শয়নে উত্থানে লঘুতায় ভর্ৎসনায় অশ্রদ্ধায় অবহেলায় এমন কি কথাচ্ছলে কলিমর্দন হরিনাম উচ্চারণ করলেই তিনি পেয়ে যাবেন কৃষ্ণধন। এসব তো সামান্য কথা, ব্রাহ্মণ যদি রজস্বলা শ্বপচীতে গমন করে, কিংবা যদি সুরাপাচিত অন্ন ভোজন করে, কিন্তু মৃত্যুকালে যদি একবার হরিনাম মুখে আনতে পারে সে অগম্যাগমন ও অভক্ষ্যভক্ষণের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করে।

নামকীর্তনের মুখ্য ফল প্রেম, ভাগবতী প্রীতি। প্রেম কী? প্রেম অর্থ কৃষ্ণের সুখের জন্যে কৃষ্ণসেবা যে সেবা বিনিময়ে নিজের জন্যে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। একবার যদি প্রীত হয়ে কৃষ্ণ ভক্তকে বলে, কী চাও বলো, ভক্ত বলবে, তোমার চরণসেবা। বেশ, তাই হবে। বলে কৃষ্ণের সাধ্য নেই যে সরে পড়বে। যখন চরণসেবা মঞ্জুর করেছ, তখন চরণ নিয়ে তুমি কোথায় পালাবে? আর তোমার ছুটি নেই, তোমার চরণদু'খানি প্রীতিরজ্জু দিয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ করে রেখেছি। এত বড় সর্বেশ্বর ঈশ্বর, শুধু প্রেমের কাছে বশীভূত।

এই প্রেমই জনে-জনে শিখিয়েছেন গৌরহরি, দান করেছেন নির্বিচারে।

একদিন এক ভিক্ষুক শচীর আলয়ে ভিক্ষে করতে এসেছিল, দেখল শচীনন্দন প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করছে। ভিক্ষুকের কী হল, প্রভুকে নাচতে দেখে সেও নাচতে লাগল। প্রভু তাকে প্রেম দিলেন, কৃষ্ণপ্রেমরসে কোথাকার কে ভিক্ষুক ভেসে যেতে লাগল।

হে অর্জুন, বলছে কৃষ্ণ, যারা আমার নাম গান করে আমার সাক্ষাতে নাচে আমি তাদের ক্রীত হয়ে থাকি, আর তারা যদি আমার নাম গান করে রোদন করে তা হলে আমি তার দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত হই না।

প্রভু প্রেম দিলেন সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, গণনা করে বলো তো পূর্বজন্মে আমি কে ছিলাম? জ্যোতিষী বলে দিল, তুমি সর্বৈশ্বর্যময় ভগবান ছিলে, তোমার নিরীহ

রাখালবেশও সে ঐশ্বর্য লুকোতে পারে নি। তুমি যেই হও, তোমাকে প্রণাম। সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠল।

শ্রীবাসের কাপড় সেলাই করে মুসলমান দরজি, তার মধ্যে কী পেয়ে কে জানে, প্রভু তাকে নিজরূপ দর্শন করালেন। 'দেখেছি,' 'দেখেছি,' বলে দরজি প্রেমে পাগল হয়ে উঠল। প্রেমে সুরু করল নৃত্য করতে, 'বৈষ্ণব আগল' অর্থাৎ অগ্রগণ্যে বৈষ্ণব হয়ে দাঁড়াল।

প্রেম দিলেন নবদ্বীপের ভক্তগণকে, সার্বভৌমকে, অমোঘকে, প্রতাপরুদ্রকে প্রকাশনন্দকে। প্রেম দিলেন যত্রতত্র, আলালনাথে, দক্ষিণ পথে, প্রয়াগে, বৃন্দাবনে, অক্রূর ঘাটে। প্রেম দিলেন ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের শুধু নয়, ঝাড়খণ্ডের স্থাবরজঙ্গমকে। আর মনে আছে কৃষ্ণদাস রাজপুতকে, যে স্বপ্ন দেখে প্রভুকে প্রত্যয় করেছিল, চেয়েছিল বৈষ্ণবকিঙ্কর হতে? প্রভু তাকে আলিঙ্গন করতেই সে উঠেছিল হরি বলে, প্রেমে মত্ত হয়ে গিয়েছিল!

প্রত্যক্ষ স্পর্শ নয়, শুধু দৃষ্টিতেই কত লোককে প্রেমে ভাসিয়ে দিয়েছেন। শুধু একটি স্মিতালোক, একটি কল্যাণকটাক্ষ।

'বাহু তুলি হরি বলে প্রেমদৃষ্টে চায়।
মরিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায়॥'

তা ছাড়া প্রভুকে দেখে কত লোক প্রেম পেয়ে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

'যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে হরি বোলে, খণ্ডে দুঃখ-শোক॥'
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম।

এই শ্লোক পড়ে প্রভু পথ চলেছেন আর যাকেই দেখেছেন, হরি-হরি বলো। যেই বলেছে তাকে আলিঙ্গন করে প্রভু প্রেমশক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। কৃষ্ণনামামৃতবন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন দেশ গ্রাম। প্রভুর দেহসৌন্দর্য দেখেও কত লোক প্রেমাবিষ্ট হয়েছে। শুধু দূর থেকে দেখে চিত্রোৎপল নদীতে স্নান করতে এসে রাজমহিষীরা প্রেম পেয়ে গেল। চোখে আপনা থেকেই জল এল, মুখ বলতে লাগল কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। যবনরাজার হিন্দু চর তো দর্শন পেয়ে বাউল হয়ে গেল। আর সেই যবন দূর থেকে দেখেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, প্রেমে উচ্চারণ করল কৃষ্ণনাম।

দর্শনে হবে স্পর্শনে হবে এমন কি গৌরহরির নামমাত্র শ্রবণে মানুষ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হবে। তাই আর কিছু নয়, শুধু নামের আশ্রয় নাও। শুধু নামেতেই, শুধু অর্থহীন অক্ষর উচ্চারণেই পরম প্রেম-প্রাপ্তি। পরম সম্পত্তিলাভ।

স্মরণমনন করবে যে, চিত্তকে তো স্থির করতে হবে। এই স্থৈর্য সম্পাদনের জন্যেই নাম দরকার। নামে কত সুবিধে, সজন-বিজন লাগে না, দীক্ষা-পুরশ্চর্যার দরকার হয় না। যে কোনো লোক যে কোনো সময়ে যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় নাম করে ফলবান হতে পারে। হলই বা না বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, ব্রহ্মচর্যশূন্য—হরিনামে সেও ধর্মিষ্ঠদের দুর্লভ গতি লাভ করতে পারে।

নাম স্বতন্ত্র, তাই কোনো বিধি-নিষেধের সে অধীন নয়। আর কোনো সাধনের এমন স্বাতন্ত্র্য নেই, তাই তো নামই পরম উপায়।

তাছাড়া নামের কৃপা স্বতঃসিদ্ধ। নামী ভগবানকেও নামায়, নামকীর্তনকারীকেও নামায়। একজনকে তার অচল অটল সিংহাসন থেকে আরেকজনকে তার অভিমান থেকে। নিরপরাধে নাম নিলেই প্রেমধন মেলে। নামাপরাধ থাকলে সমস্ত অনর্থক। কিন্তু নামের এমনি কৃপা যে নামাপরাধও খণ্ডন করে দেয়।

নাম আর নামী অভিন্ন। তাই নামীর যেমন মহিমা তেমনি মহিমা আবার নামের।

হরিনাম হরির মতই মধুর।

তা ছাড়া নাম আর নামী অভিন্ন বলে নাম অপ্রাকৃত চিদবস্তু। এমন কি নামের অক্ষরও অপ্রাকৃত চিন্ময়। নামাক্ষরই ব্রহ্ম। 'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম'।

নাম আর নামী এক বলে, আরেক মহিমা, নামাভাসেও প্রেম জাগে। অন্য বস্তুকে নির্দেশ করলেও নামের শক্তি হ্রাস পায় না। নারায়ণ পুত্রের নাম হলেও নারায়ণ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই ভগবান চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

আর সব সাধনাঙ্গে, মন্ত্রে-তন্ত্রে যজ্ঞে-যাগে কত ত্রুটি ও অঙ্গহানির সম্ভাবনা, নাম সমস্ত কিছুকে

নিশ্ছিদ্র করে। নববিধা ভক্তিও এই নাম থেকে পূর্ণতা পায়।

হরি-শব্দ উচ্চারণ করলে সমস্ত বেদ অধীত হয়ে যায়, সমস্ত তীর্থভ্রমণ পরিসমাপ্ত হয়, আর কোনো সৎকর্মের প্রয়োজন হয় না। নামই সমস্ত দুঃসহ পাপ দূরীভূত করতে পারে, নামই সর্বমহাপ্রায়শ্চিত্ত।

ব্রহ্মকে জানার উপায়ও আবার ভক্তি। কৃষ্ণনামই মহামন্ত্র।

সঙ্কীর্তন যজ্ঞে যে কৃষ্ণ-আরাধন করে সেই সুবুদ্ধি, সেই কৃষ্ণচরণের অধিকারী। নাম সঙ্কীর্তন থেকেই সমস্ত অনর্থের নাশ হয়, সকল মঙ্গলের উদয় হয়, কৃষ্ণপ্রেমের বিচিত্রতম অভিব্যক্তি ঘটে।

কৃষ্ণকীর্তনের জয় দাও। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটি দেখ। কৃষ্ণকীর্তনই নিত্য জয়যুক্ত। সে কী করে? চেতোদর্পণ মার্জন করে। দুর্বাসনা দূরীভূত করে। আর কী করে? ভব-মহা-দাবাগ্নি নির্বাপণ করে। ত্রিতাপ জ্বালা শান্ত করে। সংসারবিষানল নিভিয়ে দেয়। জ্যোৎস্নায় যেমন কুমুদ বিকশিত হয় তেমনি কৃষ্ণকীর্তনে জীবের মঙ্গলবাসনা প্রস্ফুটিত হবে। কী সে কল্যাণেচ্ছা? একমাত্র কৃষ্ণসেবা। বিদ্যাবধূর জীবনই এই কীর্তন। বিদ্যা কী? কৃষ্ণভক্তিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। সে বিদ্যারূপ বধূকে কে বাঁচিয়ে রাখবে? শুধু কীর্তনই বাঁচিয়ে রাখবে। আর আনন্দ-অম্বুধির বর্ধন ঘটাবে। আনন্দের ঢেউয়ে ভক্তের হৃদয় তোলপাড় করে তুলবে। প্রতি পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন দেবে। দেহ মন আত্মাকে আনন্দরসে সিঞ্চিত করে রাখবে। উচ্চারণ করছে জিহ্বা কিন্তু সমস্ত দেহ মন আত্মা সুখস্নানে প্লাবিত হয়ে যাবে। সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনই সর্বজয়ী।

'সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন-উদ্‌গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥'

তারপর দ্বিতীয় শ্লোকটি নাও:

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

ভগবান, তোমার কত নাম, কত নামে তুমি কীর্তিত, প্রচারিত। মুকুন্দ-গোবিন্দ-হরি—কত কত অজস্র। সমস্ত নামেই নিজের পূর্ণশক্তি অর্পণ করেছ। সেই নামের স্মরণবিষয়ে সময়ের কোনো নিয়ম নেই অনুশাসন নেই—এমনি তোমার নিরর্গল কৃপা। কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে এমন নামেও আমার অনুরাগ হল না।

ভগবানের সকল নামেই সমান শক্তি সমান গৌরব। যার যাতে প্রীতি সে সেই নামেই আনন্দিত। যে মুক্তি চায় সে মুকুন্দ বলুক, যে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে সেবা করতে চায় সে বলুক গোবিন্দ। যে বিঘ্ন বিপদ উত্তীর্ণ হতে চায় সে বলুক পুতনারি। আর যে শুধু প্রেমে উদ্বেলিত হতে চায় সে বলুক কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

এত যেখানে রুচির স্বাধীনতা সেখানেও আমার দুর্ভাগ্য গেল না। আমিই শুধু নামে জাতানুরাগ হলাম না। এত কৃপার মধ্যেও আমিই কৃপণ রইলাম।

'অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়
দেশ-কাল নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়॥
সবশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ॥'

[ক্রমশ।

When I was young I pretended to know everything. It often got me into trouble and made me look a fool. I think one of the most useful discoveries I ever made was how easy it is to say 'I don't know. I never noticed that it made anyone think the worse of me.

—*Somerset Maugham.*



দু'টি খরগোস

[একটি রুশ গল্প]

এক বসন্তের আরম্ভে, দু'টি ছোট্ট খরগোস প্রথম চোখ মেললো আমাদের এই পৃথিবীর কোলে।

তাদের একটির রঙ সাদা আর একটি ছাই-রঙের। সমস্ত গ্রীষ্মকালটা তারা একসঙ্গে নেচেকুঁদে কাটিয়ে দিল।

শরৎ-এর সূচনায় সাদা খরগোসটি বিচলিত হয়ে পড়ল, সে বুঝলো যে তার পক্ষে জীবনধারণ করাটা আর তত সহজ হবে না। কারণ তার গায়ের সাদা রংটাই শত্রুর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার পথে সবচেয়ে বড় বাধা।



একে তো বেচারা নিজেই একথা ভেবে দিশেহারা হয়ে ওঠার যোগাড়, তাতে আবার তার ছাই রঙ বন্ধুটি পেছনে লাগল ভীষণভাবে,—বাঃ বাঃ, বেড়ে মজা···ভায়া! কি আর করবে বল, এখন চুপটি করে লুকিয়ে থাকো ফিরগাছের পেছনে, আর উপোষ করে মরগে যাও। আমি বাবা দিব্যি থাকব।

বেচারী সাদা-বাচ্চা সত্যই ভয়ে জড়সড় হয়ে চুপটি করে বসে রইল গাছের গোড়ায়, শীতে আর ক্ষুধায় কাতর হয়ে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এ দুর্দিন ওর স্থায়ী হল না। শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়া সুরু হয়ে গেল; সাদা খরগোস আনন্দিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে, সমস্ত জমি বরফে সাদা হয়ে যাওয়ায় তার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা হয়ে গেছে আপনা হতেই। প্রকৃতির সাদার সঙ্গে সেও মিশে গেছে সম্পূর্ণভাবেই, মহানন্দে সে বেরিয়ে এল এবার কোটর ছেড়ে।

এইবার দুর্ভোগের পালা এল ধূসর খরগোসের। শ্বেতশুভ্র প্রকৃতির রাজ্যে ওর গায়ের ছাই রঙটি তো আর লুকোবার জো নেই; গাছের কোটর আশ্রয় করে কাঁপবার পালা এবার ওর।

সাদা খরগোস খুঁজে বার করল এবার ওকে। বলল—'ভায়া ছাই রঙা, অন্যের বিপদ দেখে আর কখনও হাসতে যেও না যেন, বিপদ কারুর একচেটে সম্পত্তি নয়।

বিচিত্র আলোক

শ্রীবাসুদেব সিংহ

১৬০০ সালের কথা। কলচেস্টারের বৈজ্ঞানিক ডাঃ গিলবার্ট আবিষ্কার করলেন আমাদের এই পৃথিবীটা মহাকাশে ঝুলন্ত একটা চুম্বক। একটা লোহার দণ্ডকে অনেকদিন ধরে তিনি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ওই লোহার দণ্ডটি কিছুটা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হল। পৃথিবীর সুমেরুর দিকে ওই দণ্ডটির যে প্রান্ত সেটি উত্তর-সন্ধানী-মেরু, সংক্ষেপে 'উত্তরমেরু' নাম দিলেন। আর দণ্ডটির অন্য প্রান্ত 'কুমেরুর দিকে যেটি সেটি দক্ষিণমেরু।' কলচেস্টারের এই আবিষ্কারের ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। পৃথিবীর চুম্বকধর্মের জন্যই মেরু-অঞ্চলে এক বিচিত্র শোভা দেখা যায়। সুমেরু ও কুমেরুর কাছেই রয়েছে ভূ-চুম্বকের দু'টি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রকে ঘিরে এক অপূর্ব আলোক দেখা যায়। তাকে বলে মেরু-জ্যোতি। উত্তরমেরুতে এই জ্যোতির নাম অরোরা বোরিয়ালিস। আর দক্ষিণ-মেরু জ্যোতির নাম অরোরা অস্ট্রেলিস। দেখতে দেখতে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত জুড়ে ধনুর আকারে যেন জ্বলে ওঠে। আর সেই আলোক-ধনু থেকে আলোর ছটা আকাশপথে ছড়িয়ে চলে। ক্ষণে-ক্ষণে তাতে রঙ বদলায়; আবার দেখতে দেখতে কিছুকাল পরে সব অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কলচেস্টারের আবিষ্কারের দু'শ' বছর পর ১৮৮৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মেরু-অভিযান থেকে এই আলোর তথ্য জানা গেল। মেরুঅঞ্চলের ৩০ থেকে ৬০০ মাইল উঁচু আকাশে জ্বলে এই আলো; মেরু থেকে সরে ভূ-চুম্বক কেন্দ্রগুলির চারধারে ৬০০ মাইলের ব্যাসযুক্ত বৃত্তপথের মধ্যে এই মেরু-জ্যোতি দেখা যায়।

সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে মেরু-জ্যোতির যোগাযোগ। এই কলঙ্কগুলি সৃষ্টি হয় সূর্যের গহ্বর থেকে উৎক্ষিপ্ত ম্লান বাষ্পের ক্ষ্যাপামি। সেই বাষ্পে

রয়েছে বিচিত্র গ্যাসীয় পদার্থ। ১৯৫৭-৫৮ সালে সৌর-কলঙ্কের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। আর তার পরেই লক্ষ্য করা গেল, মেরু প্রদেশের অরোরার আলোর সমারোহ। প্রায় প্রতি এগার বছর পর পর এই আলোর সমারোহ দেখা যায়। আর তিন-চার বছর পর আবার এই বিচিত্র আলোর আবির্ভাব ঘটবে পৃথিবীর বুকে। সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সময় সূর্যের আলোর বুক থেকে ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসে জলন্ত বাষ্প। এই বাষ্পকণাগুলিতে অসংখ্য পরমাণু রয়েছে। এক-একটি পরমাণু ভেঙে-চুরে গিয়ে বেরোয় ইলেকট্রন ও প্রোটন। এই ইলেকট্রন হল ঋণাত্মক তড়িৎ আহিত-কণা, আর প্রোটন হল ধনাত্মক তড়িৎ আহিত কণা। আলোক-রশ্মির প্রচণ্ড উত্তাপেই পরমাণুগুলি ভেঙে যায় আর সেকেণ্ডে প্রায় হাজার মাইল বেগে অসংখ্য ইলেকট্রন এগিয়ে আসে পৃথিবীর আকাশ-সীমায়। তখন মেরুপ্রদেশের চুম্বকের তীব্র আকর্ষণে এই তড়িৎ-কণাগুলি সেদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। আকাশের বায়ুস্তরে ইলেকট্রন কণাগুলির সংঘর্ষে হাল্কা বায়ুর অন্যান্য পরমাণু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন নানারঙের বিচিত্র আলোর হয় সৃষ্টি। নিওন বাতির আলো, যা দিয়ে রঙিন আলোর বিজ্ঞাপন লেখা হয় তাহ'ল অনেকটা এই রকম ক্রিয়ার ফলে।

মেরু-জ্যোতি নাম তার। তবে এ আলোর সমারোহ মেরু-অঞ্চল ছাড়াও দেখা যায়। নরওয়ে, সুইডেন, স্কটল্যাণ্ড এমন কি এডেন ও বোম্বে থেকেও মাঝে মাঝে এই আলোর নাচন দেখা গেছে অন্ধকার রাতের আকাশে। তবে স্কটল্যাণ্ড থেকে বছরে পঁচিশ-ত্রিশবার অরোরার দ্যুতি দেখা যায়। মেরু-জ্যোতি ছাড়াও সারা পৃথিবী জুড়ে রাতের আকাশে এক বিশেষ ধরণের দ্যুতি দেখতে পাওয়া যায়। সে দ্যুতি কোনও গ্রহ-তারকার নয়। সেটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন বায়ুপ্রভা। পৃথিবীর চৌম্বক-ধর্মিতা এর একটা বিশেষ কারণ। স্থান-কাল-ঋতু আর সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে এর নিবিড় যোগাযোগ। Photometer যন্ত্র সাহায্যে এই অস্পষ্ট ও নিষ্প্রভ জ্যোতির পরীক্ষা সম্ভবপর। হাইড্রোজেন ও সোডিয়াম বাষ্প থেকে উদ্ভূত এই জ্যোতি।

পূর্ব ও পশ্চিম

(একাঙ্কিকা)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক অমূল্য সেন

বিবেক। (দৃপ্তকণ্ঠে) মনকে চোখ ঠেরে কাকে ফাঁকি দিচ্ছো সাহেব! 'চালাকি দ্বারা কোন মহৎকার্য করতে চলেছো!'—তুমি না পরম প্রেমময় যীশুর সেবক। তুমি না প্রচার করার ভার পেয়েছো মহামানব যীশুর, ঈশ্বরপুত্র যীশুর সামগ্রিক মানবকল্যাণের আদর্শকে। শোষণাত্মক সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী হয়ে, অজ্ঞ সরল মানুষদের প্রলুব্ধ করে আপাতদৃষ্টিতে মনোহর কতগুলি সৎকাজের আড়ম্বর দেখিয়ে কোন উদ্দেশ্য সাধন কোচ্ছো? সাবধান পাদরিসাহেব, মন-মুখ যদি এক করতে না পারো, তবে তুমি ঈশ্বরের ধর্মযাজক নও, তুমি শয়তানের দূত।

পাদরি। (ভয় পেয়ে)—Yes, Yes, Vivekananda is a juggler, he is a dangerous monk, he is a dangerous monk। ওর দীর্ঘায়ত চক্ষু আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে ফেলেছে। ওর সম্মোহন ব্যক্তিত্ব কম্বুকণ্ঠের নিনাদে বজ্রের ভীষণ রূপ ধারণ করে আমাকে তাড়া করেছে। আমি আর সইতে পাচ্ছি নে, আমি আর সইতে পাচ্ছি নে। (ত্রস্ত হয়ে প্রস্থান)

স্টার্ডি। স্বামীজী, পাদ্রিসাহেব এসেছিলেন অধ্যাপকের কাছে, আপনার যাদু থেকে খৃস্টান সভ্যতাকে রক্ষা করবার দাবী জানাতে। আপনার ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হয়ে পাদ্রিসাহেব আর পালাবার পথ পাচ্ছেন না। কি আশ্চর্য!



● আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া নিয়মিত প্রথা। এই বিদ্যালয়টিতে সাদা এবং কালো ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে

ম্যাক্স। আশ্চর্য হবার কিছু নেই স্টার্ডি। ধর্মের সহস্ররশ্মি দীপটি যখন জলে ওঠে, ভণ্ডামির কালো ছায়া দূরে চলে যায়।—বেদান্ত আজ করুণা করে মূর্তি ধরে এসেছে তোমার সামনে। অসীম আজ সীমায় সীমায় সার্থক হল। এই একটি মানুষের বজ্রকঠিন সংকল্পে, অখণ্ড আত্মবিশ্বাসে, বলিষ্ঠ প্রেমধর্মে রূপায়িত হল বেদান্তের সূত্রগুলি। কি অমোঘ, কি সুদূরপ্রসারী এর প্রভাব। ভারতের মুক্তির বাণী, জগতের মুক্তির বাণী বিবেকানন্দের জীবনপত্রে বেদান্ত আখরে স্বয়ং বিধাতাপুরুষ লিখে দিলেন। উত্তরকালের মানুষের উত্তরাধিকার এই তো চিহ্নিত হয়ে রইলো।

বিবেক। না অধ্যাপকজী, আমি আমার আচার্যের হাতে যন্ত্রমাত্র। আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য, এই আমার পরিচয়। যদি আমি কিছু করে থাকি, সে তাঁরই কাজ; ব্যর্থতা যদি থাকে, তবে সে আমার।—হ্যাঁ, বেদান্ত আমার প্রাণ, ভারতবর্ষ আমার সর্বস্ব। তবু মনে হয় অধ্যাপকজী, 'ভারতবর্ষের ও বেদান্তের ওপর আপনার যেরূপ ভালবাসা, তার অর্ধেকও যদি আমার থাকতো।'—স্টার্ডিকে ধন্যবাদ, আমি তাঁরই জন্যে আপনার এত কাছে আসতে পেরেছি। আজ আমি আপনার অতিথি। আপনাকে আর আপনার সহধর্মিণীকে দেখে আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে বৈদিক ঋষির ঘরকন্নার ছবি। 'বশিষ্ঠ আর অরুন্ধতী' আবার ফিরে এসেছেন আপনাদের জীবনচর্যায়।

স্টার্ডি। আর আমাদের পাদ্রিসাহেব? তাঁর মাঝে কাকে দেখেছেন স্বামীজী?

বিবেক। না স্টার্ডি, ওদের ওপর অবিচার কোরো না। ওদের মধ্যে মহানুভব ব্যক্তি অনেক আছেন। ভারতের বহু ঋণ ওদের কাছে। যে ইংরেজি শিক্ষা ভারতের পুনর্জাগরণের মূল কথা, তার প্রসারে ওদের অনেক অবদান রয়েছে। পশ্চিমকে ওরা পূর্বের কাছে নিয়ে এসেছে। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ডাফ, লঙ্ প্রমুখ উন্নতমনা মিশনারিরা বহু কাজ করেছেন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য। আমার মাতৃভাষা বাংলার ঋণের তো সীমাই নেই ওদের কাছে।

স্টার্ডি। কিন্তু স্বামীজী ওদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খৃস্টধর্ম প্রচার।

বিবেক। আমি তা ভুলি নি স্টার্ডি। খৃস্টধর্ম প্রচার দ্বারা ভারতের ভাবসাগর মন্থনে শুধু তো গরল ওঠে নি অমৃতও উঠেছে। জানো তো, আমার আচার্যের জীবন-সাধনায় সর্বধর্মসমন্বয়ের যে বলিষ্ঠ সূত্রটি রূপায়িত হয়েছে, তার মধ্যে মহামানব যীশুর ধর্ম বড়ো কথা। আমার জীবনের একটি ঘটনা বলি। ১৮৮৬ সালে ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমার গুরুভাই বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) মাতার গৃহে আঁটপুর গ্রামে আমরা ধুনি জ্বালিয়ে সন্ন্যাস-গ্রহণের পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করি। সে সন্ধ্যায় ঈশ্বরপুত্র যীশুর ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেম এক অপূর্ব প্রেরণা এনেছিল আমার মনে, আমার গুরুভাইরাও সে প্রেরণায় আন্দোলিত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, আমাদের কারো মনে ছিল না যে যীশুখৃস্ট জন্মেছেন সে সন্ধ্যায়। পরে সে কথা মনে পড়েছিল।

স্টার্ডি। এ না হলে কি রামকৃষ্ণের শিষ্য হওয়া যায়।

বিবেক। আজ যে বিবেকানন্দকে দেখছো স্টার্ডি, সে রামকৃষ্ণশিষ্য হয়ে যীশুখৃস্টেরও শিষ্য হতে পেরেছিল। সে সন্ধ্যায় যীশু ও রামকৃষ্ণ অলক্ষ্যে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের মহৎ সংকল্পের ওপর যুক্তকরে আশিস্ ঢেলে দিয়েছিলেন। তাই তো পূর্ব ও পশ্চিম দুই-ই আমার স্বদেশ। এ দু'-এর মিলন বা সমন্বয়সাধন আমার জীবনের ব্রত। পশ্চিমের রজগুণ আর পূর্বের সত্ত্বগুণ এ দু'-এর সংমিশ্রণেই মানব সভ্যতার পূর্ণ কল্যাণময় স্বরূপ বিকশিত হবে, নইলে হবে মহতী বিনষ্টি। আমি যা সইতে পারি নে তা ধর্মের নামে গোঁড়ামি ও ভণ্ডামি, সমাজ-সংস্কারের নামে ঘৃণা ও অবহেলা, দেশপ্রেমের নামে বাগাড়ম্বর ও রাজনৈতিক চালাকি। তাই পশ্চিমে—আমেরিকায় ও ইউরোপে বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চ থেকে আমাকে অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হয়েছে। এবার স্বদেশে ফিরে গিয়ে ওই একই কাজ করতে হবে।

স্টার্ডি। (ঘড়ি দেখে) হ্যাঁ, আপনার যাত্রার সময় হয়েছে স্বামীজী। লণ্ডনে সেভিয়ারের গৃহে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে আমি বিদায় নেবো।

ম্যাক্স। আপনি চলে যাচ্ছেন, সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে স্বামীজী। আর একদিনও কি থাকা সম্ভব নয়? আমাদের যে অনেক কাজ বাকি; আপনি কাছে থাকলে সব কাজই হাল্কা মনে হয়।

বিবেক। না পণ্ডিতপ্রবর, আমার জন্মভূমি ছেড়ে দীর্ঘ তিন বছর বাইরে রয়েছি। এবার ফিরে যাবো, আদেশ শুনতে পেয়েছি। 'সময় অল্প, কিন্তু কর্মধারা অতি দীর্ঘ।' পথে ইটালিতে দু' একদিন থাকতে হবে, আমার সঙ্গে যাচ্ছেন সেভিয়ার দম্পতি এবং গুডউইন। ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির দেশে বেদান্ত প্রচার করে, নির্ধারিত দিনে জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উপস্থিত হবো স্বদেশে। ইংলণ্ডের জন্য ভাবি নে, এখানে স্বয়ং ম্যাক্সমূলার রয়েছেন। আমেরিকায় প্রচার হয়েছে বেশি, আর ইংলণ্ডে হয়েছে বেশি কাজ। এ যে বৈদান্তিক মহামনীষী ম্যাক্সমূলারের কর্মক্ষেত্র, যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে আজ আমি কৃতকৃতার্থ। হে বেদজ্ঞ ঋষি, হে নবসায়নাচার্য, হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ভারতের এই দীন সেবকের শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করুন।

স্টার্ডি। আপনি এ কি বলছেন স্বামীজী। খৃস্টান

জার্মান ম্যাক্সমূলার ভারতের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেন কেমন করে ?

বিবেক। (মুচকি হেসে) সে কথা ম্যাক্সমূলারকেই জিগ্যেস করো স্টার্ডি। আমি একটুও বাড়িয়ে বলি নি। জীবনের পঁয়তাল্লিশ বছর যিনি বেদ-বেদান্ত অধ্যয়নে কাটিয়ে দিলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীর বিস্মৃতির পরেও যিনি মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ও মহত্তম ঋক্‌বেদের বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করেছেন, তুলে দিয়েছেন তাকে টীকা ও ব্যাখ্যাসহ জগতের বিদগ্ধ সমাজের হাতে, তিনি যদি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ না হন তবে আর কে, আমি জানি নে। একদা মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতের ঋষি সায়নাচার্য এরূপ মহৎ কার্যই করেছিলেন। তারপর পাঁচশো বছর কেটে গেছে। আধুনিক যুগ জটিলতার ব্যাপ্তিতে, জড়বিজ্ঞানের অসামান্য প্রভাবে মধ্যযুগের গণ্ডিবদ্ধ সমাজকে পশ্চাতে ফেলে রেখে এসেছে। এ যুগের পটভূমিকায় ইউরোপের এই নব-সায়নাচার্যের কার্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। এই মহামনীষীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারতবর্ষ ধন্য হল।

ম্যাক্স। আর আমাকে লজ্জা দেবেন না স্বামীজী। মানবসভ্যতার উৎস সন্ধানের দুর্গম পথে যাত্রা সুরু করেছিলাম প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল আগে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে যাত্রাপথের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখে যেতে পারলাম ইংরেজ জাতির আনুকূল্যে। আমার উপাস্য, ঈশ্বরের পুত্র যীশুর চরণে শিশুর সারল্যে একটি গোপন কামনাও ব্যক্ত করেছিলাম,—আমার সর্বকর্মের ফল হাতে হাতে দিয়ে আমার জীবন ধন্য করো প্রভু। আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। আজ আমার মত ভাগ্যবান কে! আমার জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় একই আধারে মূর্তি ধারণ করেছে, আমার স্বপ্নের ভারত বিবেকানন্দের জ্যোতির্ময়রূপে আজ আমারই গৃহে আবির্ভূত হয়েছে। ইংলণ্ডের গৃহে বসেই আমি ভারত দর্শন করলাম। এ গৃহ তীর্থীভূত হল। একটি মুহূর্ত আমার জীবনে শাশ্বত হয়ে রইলো। হে ভারত, হে মুক্তিপথের অগ্রদূত, হে রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ, হে মূর্তবেদান্ত, আমার শেষ অর্ঘ নাও প্রভু, আমার শেষ অর্ঘ নাও।

[ম্যাক্সমূলার হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। বিবেকানন্দ এগিয়ে এসে তাঁর হাত দু'খানি ধরলেন। স্টার্ডি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বেদান্তের প্রশস্তভূমির ওপর এ যেন পূর্ব ও পশ্চিমের একাত্ম হয়ে যাওয়া। বিধাতার নিগূঢ় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত কৃষ্ণমেঘের কোলে বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়ে উঠলো। নেমে এলো অলৌকিক স্তব্ধতা।]

বিবেক। অধ্যাপকজী, নিগৃহীতা, পরপদানতা, সর্বস্বহারা স্বদেশমাতৃকার অস্ফুট আর্তনাদ আমার হৃদয়বীণায় দীপক রাগে ঝঙ্কার তুলে আমাকে ঘর ছাড়া করেছে। আসমুদ্রহিমাচল ভারত ভূখণ্ড পরিভ্রমণকালে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আমি স্বকর্ণে শুনেছি—কি অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য, কি অন্ধ কুসংস্কার, কি অসহায় দাসত্ব, কি নিরুদ্যম তামসিকতা সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গুরুচরণতলে একদা শাশ্বত ভারতের মহিমাময় রূপটি দর্শন করেছিলাম। তার সঙ্গে আমার দুর্ভাগা দেশকে মেলাতে গিয়ে আমি মর্মান্তিক বেদনায় বিদ্ধ হয়ে পাগল হয়ে গেলাম। ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম সাগর জলে, ভারতের প্রত্যন্ত দেশ কন্যাকুমারিকার মহাসাগর উপকূলে। আশ্রয় নিলাম সমুদ্রগর্ভে দক্ষিণ ভারতের শেষশিলাখণ্ডে। ধ্যান করলাম গুরুর চরণ, সজল নয়নে অন্তরের বিপুল আকুলতায় প্রার্থনা করলাম—শক্তি দাও, শক্তি দাও প্রভু। ভারতের মুক্তিপথ রচনায় শক্তি দাও। তারপর দেখেছি এক অলৌকিক দৃশ্য।

স্টার্ডি। কি, কি সে দৃশ্য স্বামীজী!

বিবেক। সীমাহীন সমুদ্রবক্ষের উত্তাল তরঙ্গের গতিপথে প্রেমময় গুরু আমার চলেছেন চরণাঘাতে পদ্ম প্রস্ফুটিত করতে করতে। পশ্চিমের দিকে তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ। আহ্বান ভেসে এলো কর্ণে—ওরে আয়, আয়, আমার সাথে আয়।

স্টার্ডি। অদ্ভুত ঘটনা, অলৌকিক অনুভূতি! তারপর স্বামীজী, তারপর ?

বিবেক। তারপরেই আমার আগমন আমেরিকায় শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে, পশ্চিমের দ্বারে অচেনা অজানা অনাহূত অতিথি। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬—এই তো কেটে গেলো তিন বছরের অধিককাল আমেরিকায় ও ইউরোপে, জড়বাদী সভ্যতার দুই পীঠস্থানে। কত পেলাম, কত শিখলাম। উল্কার মত ছুটে চলেছি সর্বত্র, প্রচার করেছি গুরুর মন্ত্র, মানবের মুক্তির বার্তা বেদান্তকে ভিত্তি করে; নির্বস্তুক সূত্রাকারে নয়, ব্যবহারিক জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে এলাম আপনাদের মত হৃদয়বান মনীষীদের সান্নিধ্যে।

স্টার্ডি। পশ্চিম আজ এমন করে পূর্বকে পেয়ে ধন্য হয়েছে স্বামীজী।

বিবেক। কিন্তু পূর্বের বেদনা ও বঞ্চনা যে মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি নি স্টার্ডি। উন্নত বলিষ্ঠ পশ্চিমের পটভূমিতে আজ জেনেছি কোথায় আমার স্বদেশের শূন্যতা, কেন তার এই অধঃপতন। গুরুদত্ত ভারত মন্ত্র যাচাই করা হয়ে গেল বিরাট বিশ্বের পটভূমিতে ফেলে। আবার শুনতে পেয়েছি তাঁর ডাক—ওরে, ফিরে আয়, ফিরে আয়। তোর মুখ চেয়ে বসে আছে কোটি কোটি দিশেহারা নরনারী। পশ্চিমের দান মাথায় নিয়ে এবার ফিরে

যাবো মায়ের কোলে। আমাকে, আমাকে বিদায় দিন অধ্যাপকজী। আমার অরুন্ধতী মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। তিনি আমার সর্বাঙ্গে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে আমাকে আশীর্বাদের বর্ম পরিয়ে দিয়েছেন। হে মহান বশিষ্ঠ, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

ম্যাক্স। (অভিভূত হয়ে) আশীর্বাদ, আমি আশীর্বাদ করবো! না না, তাহলে যে আমি প্রত্যবায়ভাগী হবো। আমার শুভেচ্ছা, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন স্বামীজী। আপনার, আপনার হাতখানা আর একবার আমার হাতে রাখুন স্বামীজী। যাবার আগে অমৃতের আর একটুকু পরশে ধন্য করুন, ধন্য করুন আমাকে।

[ম্যাক্সমুলারের চোখে জল। বিবেকানন্দ তাঁর হাতে হাত রাখলেন।]

বিবেক। অধ্যাপকজী, একি? আপনার চোখে জল! বৈদান্তিকের তো মায়া থাকতে নেই। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিন।

ম্যাক্স। ছাড়তে যে ইচ্ছে করে না স্বামীজী। আমার সকল সাধ, সকল স্বপ্ন যাঁর দর্শনে সফল হয়েছে তাঁকে কি ছাড়া যায়।

আমার জন্ম-জন্মান্তরের মাতৃভূমি ভারত, তোমাকে ভালবেসে আমি তোমার শ্রেষ্ঠসন্তানকে বুকে পেয়েছিলাম। তোমারই প্রয়োজনে আজ তাঁকে ছাড়তে হবে। Good night Swamiji, good night. 'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ'।

[দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। পূর্ব-পশ্চিম এক হয়ে গেল।]

বিবেক। Good night Adhyapakaji, good night.। আমি আবার আসবো। আবার আমাকে আসতে হবে পশ্চিমের এই ভূখণ্ডে, যেখানে ম্যাক্সমুলার আছেন, আছে তাঁর বিরাট কর্মসাধনা পূর্ব-পশ্চিম মিলন প্রয়াসে। এসো স্টার্ডি।

[দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। ম্যাক্সমুলার চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।]

বিবেকানন্দ প্রশস্তি

(গান—আড়ানা মিশ্র)

জয় জয় বিবেকানন্দ
কর্মযোগী মহাবীর তুমি, সাগর মেখলা পৃথিবীভ্রমি
বেদান্ত নির্ঘোষে প্রচারিলে নব নব শান্তিসনন্দ।
জ্ঞানে শঙ্কর রূপে কামদেব
সাহসে অর্জুন গুণে শুকদেব
তব প্রাণবীণে যুগ-যুগান্তের সাধনা লভিল ছন্দ।
অবনত ভারতের দুঃখ বেদনা
রাঙিয়েছো তাই তব কল্পনা
সন্ন্যাসী তুমি সর্বত্যাগী, তোমার কর্ম তোমার ভাবনা
রচিল জাতির মুক্তিমন্ত্র॥
ঈশ্বরে তুমি বহুরূপে পেলে
আর্তসেবা তুমি বাণী দিলে
জীবে প্রেম সে তো দেবতার পূজা, পড়ে থাক পুঁথিতন্ত্র।
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কথা
ফোটালে কাজে সে অমৃত গাথা
ত্যাগে ও সেবায় দীক্ষা দানে প্রাণবান করে গড়ে তোলো
ভারত মানবমানবীবৃন্দ।

মাকড়সা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাকড়সাটা জাল বুনে যায় সকাল-দুপুর-সাঁঝে,
ডালে ডালে গাছে গাছে সবুজ বনের মাঝে।
সদাই সে যে কর্মমুখর, বিরতি নেই তার,
খেটে-খুটে নিজের মুখে যোগায় সে আহার।
জাল বুনেছে মস্ত বড়, সেই জালেরই প্রান্তে
ধরতে শিকার লুকিয়ে থাকে সবারই অজান্তে;
যেমনি শিকার জড়ায় জালে অমনি ছুটে যায়,
ধরে এনে ধীরে ধীরে তখন তারে খায়।
এমনিভাবে দিন কাটে তার নাম না জানা বনে—
পরিশ্রমের কথাটি তার সবাই রেখ মনে॥

দিদার নামাবলী

শ্রীডালি বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দনকাননের পারিজাত ফুল
গাল দু'টি তুল্‌তুলে হাসিটি অতুল,
দাদু বলে 'সুনুবাবু' দিদা বলে গুপলু,
মেজমাসী বলে ওর নাম রাখো টুপলু।
ছোটমাসী বলে যায় নাম থাক 'অক্ষয়'
সেজমাসী বলে থাম, নাম হবে 'সঞ্জয়'।
মামা, লেখে 'অম্বরণ' দিদা রাখে 'অনিমিখ'
কারণটা বলবো না, আর কেউ বলে দিক।
নাম নিয়ে মহাজ্বালা, কোনটা যে রাখা যায়,
শেষকালে 'বেনামী' কি ঠিক হ'বে হায় হায়?
অবশেষে কূলে এসে তরীখানি মিললো
মা বলে 'অনিত' থাক, এই ভাল কি বলো?
যাকে নিয়ে এত নাম লেখা হ'ল কবিতায়
নেই তার ভ্রূক্ষেপ, নামে কিবা আসে যায়॥
যে নামেই ডাকো তাকে
হাসি দিয়ে সাড়া দেয়
বিশ্বের সম্পদ তার কাছে হেরে যায়॥

সাহিত্য পরিচয়

বর্তমান আমেরিকার সেরা বই

বহু বিষয়ে বহু ভাল বই গত বছরেও আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ থেকে নানা বিষয়ের পুস্তকই তার মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে আমেরিকার পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ দেখা যায় তার উর্ধ্বগতি ১৯৬৪ সালেও অব্যাহত রয়েছে। এ বছরের প্রথম দশমাসের মধ্যে নতুন বই বেরিয়েছে একুশ হাজারেরও বেশি। গল্প ও উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে কয়েকজন লেখকই বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে লুই অকেন ক্লস উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'বেক্টর অব জাস্টিন' নামে উপন্যাসে যে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন, যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তার স্মৃতি পাঠকের মনে চিরদিন অম্লান থাকবে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর একজন বিশিষ্ট লেখক সলবেলো। তিনি 'হাৎর্জগ' নামে উপন্যাসে একজন আধুনিক মানুষের সমস্যা অপূর্ব ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। রচনাশৈলীতে তিনি যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তারই জন্য পাঠক তাঁকে স্মরণ করবে। তার পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি উপন্যাসিক এবং ছোট্ট গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত জন চীভার। তাঁর 'ওয়াপশট স্ক্যেণ্ডেল' নামে গ্রন্থটি এ বছর খুবই আদৃত হয়েছে। এতে রয়েছে ওয়াপশট পরিবারের অবক্ষয়ের কাহিনী। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল তরুণ লেখিকা শার্লি এন গ্রাউ-এর 'দি কীপার অব দি হাউস' নামে উপন্যাসে রয়েছে প্রতিভার স্বাক্ষর। এটি একটি পরিবারের প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী। তারপর গোর ভাইড্যাল ইতিহাসের পটভূমিকায় রচনা করেছেন 'জুলিয়ান' নামে উপন্যাসটি। জুলিয়ান ছিলেন রোমের সম্রাট, জটিল তাঁর চরিত্র। আলোচ্য বছরে এ ছাড়া আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। যেমন জেমস পার্ডির 'ক্যাবট রাইট বিগিনস,' উইলিয়াম সারোইয়ানের 'ওয়ান ডে ইন দি আফটার নুন অব দি ওয়ার্ল্ড', রিচার্ড কিম এর 'দি মার্টায়ার্ড' এবং হেদার রস মিলারের 'দি এজ অব দি উডস্'। কিম ও মিলার সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। জেমস পার্ডি তাঁর উপন্যাসে পরিচয় দিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টির। হাসি ও অশ্রু দুয়েরই মিলন ঘটেছে এই উপন্যাসে। তিনি সমকালীন পৃথিবীর বিরুদ্ধে মারাত্মক আক্রমণ চালিয়েছেন এই পুস্তকে। সারোইয়ানের 'ওয়ান ডে ইন দি আফটার নুন অব দি ওয়ার্ল্ড'-এ নিউইয়র্কে সপ্তাহান্তিক এক অপরাহ্ণের একটি হাস্যোজ্জ্বল চটুল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর 'মার্টায়ার্ড' পুস্তকটি রচিত হয়েছে কোরিয়ার যুদ্ধের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে। এই পুস্তকে লেখক যুদ্ধ সম্পর্কে মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরদানে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। মিলারের 'দি এজ অব দি উডস'-এ বর্ণিত হয়েছে একটি তরুণীর বাল্যজীবনের কাহিনী।

তাঁর সংবেদনশীল সুকুমার রচনাশৈলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় ছোটগল্পেরও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বে-উল্লেখিত বহু গ্রন্থ রচয়িতা জন চীভার তাঁর 'দি ব্রিগেডিয়ার অ্যাণ্ড দি গলফ উইডো' নামক পুস্তকে মানুষের নির্বুদ্ধিতা, তার ভুল বুঝাবুঝি নিয়ে কয়েকটি রেখায় আঁকা ছবির মত চমৎকার কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন। আর পিটার টেলারের ছোট গল্প রচনায়, হাস্যরস সৃষ্টিতে দক্ষতা যে আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'মিস লিওনরা হুয়েন লাস্ট সীন' নামক পুস্তকে। এ বছরের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ডেন্সার্স অন দি শোর,' লেখক উইলিয়াম মেলভিন কেলী। এই গ্রন্থটি আমেরিকার নিগ্রোদের প্রাত্যহিদিনের সমস্যা নিয়ে রচিত। উপন্যাস ও ছোটগল্পের ন্যায় কাব্যের ফলনও আলোচ্য সময়ে কিছু কম হয় নি। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানা এ বিষয়ে খুবই সহায়ক হয়েছে। তাঁরা বহুগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এ বছরের যে সকল কাব্যগ্রন্থ ও কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে রবার্ট লোয়েলের 'ফর দি ইউনিয়ন ডেড' নামে কাব্যসংকলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ণনাত্মক ও আদর্শবাদের অবক্ষয়সূচক বহু কবিতাই এতে সংযোজিত হয়েছে। জন চিয়ার্ডি আমেরিকায় কবি ও সাহিত্য সমালোচক হিসাবে সমধিক পরিচিত। 'পার্সন টু পার্সন' নামে তাঁর এ বছরে নূতন একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। চিয়ার্ডির কাব্য বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, তাতে আছে দরদ আর নানা ছন্দ। এ বছরের প্রকাশিত আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন হচ্ছে রিচার্ড এবারহার্টের 'দি কোয়েরী'। জীবন ও মৃত্যুরহস্যের বহুদিক নিয়ে এবারহার্ট

কাব্য রচনা করেছেন, সেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন—এই সকল কাব্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রের অন্যতম দিকপাল রবার্ট ফ্রস্টের পত্র সঞ্চয়ন ও তাঁর জীবনী 'রবার্ট ফ্রস্ট: দি এইম ওয়াজ সং' এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'এ মুভেবল্ ফিস্ট' নামে রচনাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ে প্যারিসে কিছুদিন ছিলেন। তাঁর সেই অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী রয়েছে এই পুস্তকে, এটি তাঁর স্মৃতি রোমন্থন। আর জীন গুল্ড রচিত ফ্রস্টের জীবনী কেবল তথ্যপঞ্জী নয়, ঐ পুস্তকে কবির মানসজীবনের তাঁর ব্যক্তিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি গ্রন্থ আলোচ্য বছরে খুবই আদৃত হয়েছে। যেমন, লুই ডেসিয়াস রুবিন-এর 'দি ফার এ্যাওয়ে কানট্রি রাইটার্স অব দি মডার্ন সাউথ' এবং 'হাওয়ার্ড মামফোর্ড জোন্স-এর ও স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ড'।' রুবিন-এর গ্রন্থে আমেরিকার দক্ষিণের রাজ্যসমূহের ঔপন্যাসিক ও কবিদের সমালোচনা করা হয়েছে। আর জোন্স তার দু' খণ্ডে রচিত গ্রন্থে প্রাচীন ও নবীন সভ্যতার সংঘাত, সভ্যতার গতি-প্রকৃতি রূপায়িত করেছেন। মার্কিন সভ্যতার উপলব্ধিতে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি খুবই সহায়ক হবে। আলোচ্য বছরে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আমেরিকার পরলোকগত প্রিয় প্রেসিডেণ্ট জন এফ কেনেডিকে নিয়ে বহুগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জীবনী ছাড়া 'দি বার্ডেন অ্যাণ্ড গ্লোরী' নামে তাঁর বক্তৃতা সঙ্কলন এবং তাঁরই রচিত 'এ নেশন অব ইমিগ্র্যাণ্টস্' নামে গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেনেডির মৃত্যুতে বিশ্ববাসী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিল 'এ ট্রিবিউট টু জন এফ কেনেডি' নামক গ্রন্থে তাই সঙ্কলিত হয়েছে। আর নিগ্রোদের নাগরিক অধিকারদানের জন্য তিনি যে চেষ্টা করে গিয়েছেন, তারই নিখুঁত বিবরণ রয়েছে হারি গোল্ডেন রচিত 'মি: কেনেডি অ্যাণ্ড দি নিগ্রোজ' নামে গ্রন্থে। ১৯৬৪ সাল ছিল আমেরিকার নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের বছর। এই নির্বাচন-উপলক্ষে এবং নব-নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট সম্পর্কেও কয়েকখানি গ্রন্থ আলোচ্য বছরে প্রকাশিত হয়েছে। এ-সকল গ্রন্থ ছাড়া প্রেসিডেণ্ট জনসন রচিত 'মাই হোপ ফর আমেরিকা' এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট হাম্ফ্রী রচিত 'ওয়ার অন পোভার্টি' এবং 'দি কজ ইজ ম্যানকাইণ্ড' এ সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৩ সালের গল্প-উপন্যাস ব্যতীত সাহিত্যক্ষেত্রের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য এ বছরে পুলিৎসার পুরস্কার দিয়ে যাঁদের সম্মানিত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন রিচার্ড হফস্টেডার, ওয়ালটার জ্যাক্সনবেট, সামনার চিলটন পাওয়েল এবং লুই সিম্পসন। মি: হফস্টেডারকে তাঁর 'অ্যান্টি ইনটেলেকচুয়েলিজম ইন আমেরিকান লাইফ' ওয়ালটার জেকসন বেটকে জন কীটস-এর জীবনী এবং পাওয়েলকে 'পিউরিটান ভিলেজ দি ফরমেশন অব্ এ নিউ ইংল্যাণ্ড টাউন' নামে ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং লুই সিম্পসনকে 'অ্যাট দি এণ্ড অব্ দি ওপন রোড' নামে কাব্যগ্রন্থের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। উপন্যাস ও নাটকের জন্য কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নি। আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারাও প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধের জন্য সাহিত্যিকগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। আলোচ্য বছরে জন আপডাইককে তাঁর 'সেণ্টার' নামে উপন্যাস, জন ক্রো-রেনজমকে তাঁর 'সিলেকটেড ওয়ার্কস', এইলিন ওয়ার্ডকে 'জন কীটস: দি মেকিং অব্-এ পোয়েট' ক্রিস্টোফার টানার্ড ও বোরিস পুশকারেফকে 'মেন ম্যাড আমেরিকা ক্যাওস অব্ কণ্ট্রোল' এবং উইলিয়ম এইচ ম্যাকনিশকে 'দি রাইজ অব্ দি ওয়েস্ট এ হিস্ট্রি অব দি হিউম্যান কমিউনিটির' জন্য এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

আলোচ্য গ্রন্থটি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত মূল চণ্ডী গ্রন্থের সরল বঙ্গানুবাদ। অবশ্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর বঙ্গানুবাদ খুঁজলে আরও কয়েকটি নিশ্চয় মিলবে, কিন্তু তার মধ্যে একটিও বোধ হয় সৌকর্যে আলোচ্য অনুবাদটির সমকক্ষ নয়। সুন্দর টীকা সমেত গ্রন্থোক্ত শ্লোকগুলিকে বাঙ্গলায় অনুবাদ করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রাঞ্জলভাবে যাতে অল্প শিক্ষিত মানুষও শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পেতে পারেন। এ ধরণের অনুবাদ প্রায়ই খুব ছোট অক্ষরে ছাপা হয়ে থাকে এবং ফলে বৃদ্ধ ব্যক্তির বা স্বল্প দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে পাঠ করা কঠিন হয়ে ওঠে। বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক সে সম্বন্ধেও অবহিত, আখ্যানভাগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যথেষ্ট বড় বড় অক্ষরে এবং মূল শ্লোকগুলিও উদ্ধৃত হয়েছে সেই ভাবেই, পাঠক অতি সহজেই এ গ্রন্থ পাঠ করতে সক্ষম হবেন। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই অতি আদরণীয় ধর্মগ্রন্থ, অনেক স্থানের দেব-বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থও পূজিত হয়ে থাকে; সেই মহাগ্রন্থের এমন একটি সুন্দর অনুবাদ হাতে পেয়ে ধর্মপ্রাণ হিন্দু-বাঙ্গালী মাত্রই যে উল্লসিত হবেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ লাল রেক্সিনে মোড়া সুদৃশ্য, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা—রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, প্রাপ্তিস্থান—কুমার শুভেন্দু শেখরেশ্বর রায়, ১।১৭, গড়িয়াহাট রোড, যোধপুর পার্ক, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১।

Little Eng-Ben Dictionary / Sahitya Samsad.

আলোচ্য গ্রন্থটি এক সর্বাঙ্গসুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত আয়তন অভিধান; ইংরাজী হইতে বাংলার আরও বহু অভিধান ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু তার কোনটিই বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীর মনোরঞ্জন করতে পারে নি একাধারে এভাবে। সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে যে সব ইংরাজী শব্দ ও শব্দার্থের সচরাচর প্রয়োজন হয়, বর্তমান অভিধানে তার প্রায় সবই সংগৃহীত হয়েছে; ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব প্রচলিত অর্থই ব্যবহার করা হয়েছে যাতে পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য হয় সেজন্য। শব্দ সংকলনে অধুনা প্রচলিত শব্দের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং শব্দের উচ্চারণ সংকেত, ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই দেওয়া হয়েছে। মোটের উপর এমন একখানি পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় অভিধান যে সহজলভ্য নয়, একথা স্বচ্ছন্দেই স্বীকার করা চলে। প্রচ্ছদ সুদৃশ্য, ছাপা ও বাঁধাই ক্রটিহীন। রচয়িতা—শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস, এম এ, তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম এ, পি এইচ ডি, প্রকাশক—শিশু সাহিত্য সংসদ, প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কহিয়ে সময় বিচারি / নিউ বুক স্টল

আলোচ্য পুস্তকখানি দিল্লী হইতে প্রকাশিত শ্রীলক্ষ্মীনিবাস বিড়লা রচিত। কহিয়ে সময় বিচারি। প্রবন্ধমালার দ্বিতীয় সংস্করণের বঙ্গানুবাদ। কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধের এক সংকলন এটি, প্রবন্ধরাজির বিষয়বস্তুগুলির মাধ্যমে লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। সার্থক ও সফল মানুষ হতে গেলে ভালভাবে কথা বলতে জানতে হয়; শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করা ও তার অন্তরে কৌতূহল সৃষ্টি করাটাই সুবক্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে; পরবর্তী প্রবন্ধগুলিও সাধারণ জ্ঞান ও জীবনে অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—লক্ষ্মীনিবাস বিড়লা, অনুবাদ ও সম্পাদনা—ডক্টর শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—নিউ বুক স্টল, ১ ময়রা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ১ম ও ২য় / সাহিত্য সংসদ

বর্তমানে সৎসাহিত্য সংরক্ষণের প্রতি নানা প্রকাশন সংস্থার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা জন্মলাভ করেছে; বলা বাহুল্য মাত্র যে এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবেই প্রশংসনীয়, ক্লাসিক সাহিত্য লোপ পেয়ে গেলে যে-কোন সাহিত্যই পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য, কারণ যে-কোন সাহিত্যেরই পূর্ণাঙ্গ রূপ ও তার ক্রমবিকাশের ধারা উপলব্ধি গোচর করতে হলে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হল তার সম্পূর্ণ ইতিহাস। এজন্যই বাংলা সাহিত্য কি ছিল তা জানতে না পারলে, আজ তা কি হয়েছে তাও জানা সম্ভব নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের এক স্মরণীয় নাম, তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সম্মান বড় অল্প ছিল না, যদিও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রতিভার তখন অভ্যুদয় ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা ছিল বহুমুখী, তবে প্রধানত নাট্যকার ও সঙ্গীত রচয়িতারূপেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে, তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক গান, হাসির গান এক সময় বাঙালীর মুখে মুখে ফিরত; আজও বাঙালীর মনে তাঁর যে পরিচয়টুকু বর্তমান তাও সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে, কারণ আজও বাঙালী তাঁর গান, অন্তত দেশাত্মবোধক গানগুলি ভুলে যায় নি। সাহিত্যিক হিসাবেও যে দ্বিজেন্দ্রলাল কত বড় ছিলেন তার পরিচয় যে আজকের বাঙালী প্রায় ভুলতেই বসেছে তার প্রধান কারণ তাঁর রচনার সঙ্গে সামগ্রিক পরিচয়ের অভাব এবং এ অভাব যে শুদ্ধ আগ্রহেরই অভাব থাকার দরুণ তাও নয়, বেশ কিছুদিন ধরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত অধিকাংশ রচনাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল, পড়বার ইচ্ছা থাকলেও তাই বাঙালী পাঠক তার নাগাল পেতেন না সহজে; বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রকাশক দুই খণ্ডে তাঁর সম্পূর্ণ রচনা প্রকাশ করে বাঙালী সাহিত্যরসিক মাত্রেরই শুধু ধন্যবাদার্হ হলেন না, বাংলা সাহিত্যেরও এক অনবদ্য সম্পদকে রক্ষা করলেন চিরতরে। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক, প্রহসন বা ফার্স জাতীয় নাটক, তাঁর হাসির গান, দেশাত্মবোধক গান, প্রেমসঙ্গীত, বিবিধ প্রবন্ধাদি অর্থাৎ এককথায় তাঁর সমুদয় রচনাই সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রন্থাবলী দু'টিতে। সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁর জীবনকথা ও সাহিত্য-সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়; যার জন্য শুধু সাহিত্যরসিকই নয় সাহিত্যজিজ্ঞাসুর পক্ষেও এই গ্রন্থাবলীদ্বয়ের মূল্য অসীম। কয়েকটি ব্যক্তিগত ছবিও সন্নিবেশিত হয়েছে, আলোচ্য রচনাবলী দু'টিতে যা লেখক সম্বন্ধে পাঠকের ব্যক্তিগত কৌতূহল নিরসন করে। এককথায় এমন সুমুদ্রিত ও সুসম্পাদিত রচনাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বড় সুলভ নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত বোদ্ধা, রসপিপাসু পাঠকমাত্রই যে আলোচ্য গ্রন্থাবলীদ্বয়কে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক ক্রটিহীন। লেখক—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রকাশক—শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। দাম—১ম খণ্ড—বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা, ২য় খণ্ড—পনেরো টাকা।

হাতেখড়ি / ইম্প্রেশন সিণ্ডিকেট

বাঙলা সাহিত্যে রসের নির্ঝর যাঁরা বইয়ে দিয়েছেন বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা তাঁদেরই অন্যতম ; এই সংক্ষিপ্তায়তন গ্রন্থটিতেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। হাতেখড়ি প্রমুখ মোট দশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বাঙালীর একেবারে নিখুঁত ও নিটোল ঘরোয়া রূপটি প্রকাশ করা। বলা বাহুল্য বর্তমান সংকলনের গল্পগুলিও সে পরিচয়ে বঞ্চিত নয় ; বিশেষত 'হাতেখড়ি' ও 'মেয়ে' শীর্ষক গল্প দু'টি বাঙালী গৃহস্থ ঘরের দু'টি বিভিন্ন রূপকে বড় মধুরভাবেই প্রকাশ করে। হাসির পাশাপাশি হঠাৎ একপশলা অশ্রুও যেন কখন চুপি চুপি মুখ বাড়িয়েছে। 'মেয়ে' গল্পটির মাধ্যমে বাঙালী সংসারের কন্যার জায়া ও জননীতে রূপান্তরিত হওয়ার যে বিবরণ লেখক দিয়েছেন, তা যেমন অনাড়ম্বর তেমনই মাধুর্যপূর্ণ। 'গোবিন্দমাসী' পড়তে পড়তে অনাবিল হাস্যরসে পূর্ণ হয়ে ওঠে মন। আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও আলোচ্য গল্প গ্রন্থটি স্বাদে ও গন্ধে বড়ই উপভোগ্য। আমরা যে বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি তা অনস্বীকার্য। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ ত্রুটিহীন। লেখক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—ইম্প্রেশন সিণ্ডিকেট, ২৬।২।এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা—৫, দাম—তিন টাকা।

প্রবন্ধ / ডি, এম লাইব্রেরী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক প্রবন্ধ সংকলন, লেখক সুপ্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। কৈশোরাবধি লেখক যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার প্রায় সবই এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটিকে চারটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে, প্রথম খণ্ডে আছে জীবনদর্শন ও সমাজবিষয়ক রচনা, দ্বিতীয় খণ্ডে সাহিত্যপ্রসঙ্গ, তৃতীয় খণ্ডে লেখকের শিক্ষানবিশীর বৃত্তান্ত 'বিনুর বই', চতুর্থ খণ্ডে প্রধানত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও পত্র। প্রত্যেক খণ্ড যেমন বিষয় অনুসারে সাজানো হয়েছে, প্রত্যেক বিষয় তেমনি সময় অনুসারে সাজানো। অন্নদাশঙ্কর ধর্মে মননশীল, তাঁর লেখাতে হৃদয়বত্তার চেয়ে চিন্তাশীলতাই বরাবর প্রাধান্য পেয়ে থাকে, আলোচ্য সংকলনে তাই পাঠক ভাববার মত অনেক কিছুই খুঁজে পাবেন। সুগভীর প্রজ্ঞার স্বাক্ষরে এ গ্রন্থের রচনাগুলি উজ্জ্বল ও মূল্যবান ; আর সেই সঙ্গে রয়েছে লেখকের অনন্য ভাষা, শৈলী হিসাবে এ ভাষা বোধহয় তুলনাহীন, পড়তে পড়তে অনেকবারই রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যায়, বস্তুত বিশ্বকবি ব্যতীত এত উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ শৈলীর সঙ্গে আর কখনও পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধ সংগ্রহ নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন। বোদ্ধা ও চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই এ গ্রন্থকে সাদরে গ্রহণ করবেন। বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের দুর্বলতাও এর মাধ্যমে অনেকটাই খণ্ডিত হবে। এত মূল্যবান ও সার্থক একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকও আমাদের ধন্যবাদার্হ। প্রচ্ছদশিল্প শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—অন্নদাশঙ্কর রায়। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—ষোল টাকা।

সঙ্গীত পরিক্রমা / রীডার্স কর্নার

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সুখ্যাত প্রাবন্ধিক, ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও গভীর, বর্তমান গ্রন্থে সে সম্পর্কেই তিনি পর্যালোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশই নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছে ; প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে মনে হয় যে, একটি মনের গত কয়েক বছরের সঙ্গীত চিন্তার ধারাবাহিক বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস এগুলির মধ্যে রয়েছে। বেশ কয়েক বছরের পুরোনো লেখা যেমন এতে আছে তেমনি একেবারে হালের লেখাও আছে, সমস্তটা খুঁটিয়ে পড়লে সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখকের মতামতটা আর অন্তত ঝাপসা ঠেকে না এবং সে মতামতটা বহুল পরিমাণে তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য হওয়ায়, নেহাৎ অনভিজ্ঞ পাঠকও সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে সক্ষম হন। শুধু যে সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে তা নয়, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ বা সঙ্গীতশিল্পী ক'জনের পরিচিতিও ঘটানো হয়েছে, ফৈয়াজ খাঁ, 'আবদুল করিম খাঁ', 'কেশর বাই কারকার' ও 'হীরাবাঈ বরোদেকার', সঙ্গীত-নায়ক 'গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়' ও 'জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী' ইত্যাদি জীবিত ও মৃত বহু সঙ্গীত-শিল্পীরই জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গীতরসিক পাঠকের কাছে এর আকর্ষণও বড় কম নয়। এক কথায় সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থের দেখা মেলে কমই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ উচ্চাঙ্গের। লেখক—নারায়ণ চৌধুরী, পরিবেশক—রীডার্স কর্নার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, দাম—আট টাকা।

জ্ঞানদর্পণ / রবীন্দ্র ভারতী

আলোচ্য গ্রন্থটি বহুপূর্বে রচিত হলেও এযাবৎ আত্ম-প্রকাশের সুযোগ না পাওয়াতে সদ্য-প্রকাশিত। উনবিংশ শতাব্দীতে ভদ্র ও ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্রাহ্ম জনৈক ভদ্রলোকের জীবন দর্শনের মাধ্যমে তৎকালীন জীবনাদর্শের একটি সুন্দর ছবি এতে ফুটে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বাংলার ধর্ম

জীবনে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বাংলার তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মের অজুহাতে চলে যাওয়া যুক্তিহীন সংস্কার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে ক্রমেই একটা বিরূপতা দানা বেঁধে উঠতে থাকে এবং তার ফলেই একদিন জন্ম হয় ব্রাহ্মধর্মের। এই নতুন ধর্মের উদ্গাতা ও সমর্থনকারীরা সকলেই ছিলেন বিশেষরূপে সংস্কৃত, সদাচারী ধার্মিক ও পরহিতৈষী; আলোচ্য গ্রন্থের লেখক স্বর্গত হরিশচন্দ্র সান্যাল ছিলেন এঁদেরই একজন। তাঁর রচনায় এই আদর্শের মূল সত্যটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। উনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দুসমাজে ধর্ম সম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, এ গ্রন্থের আদর্শ তারই ফলপ্রসূত। সুতরাং এ গ্রন্থের একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—হরিশচন্দ্র সান্যাল। প্রকাশনায়—রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। দাম—তিন টাকা।

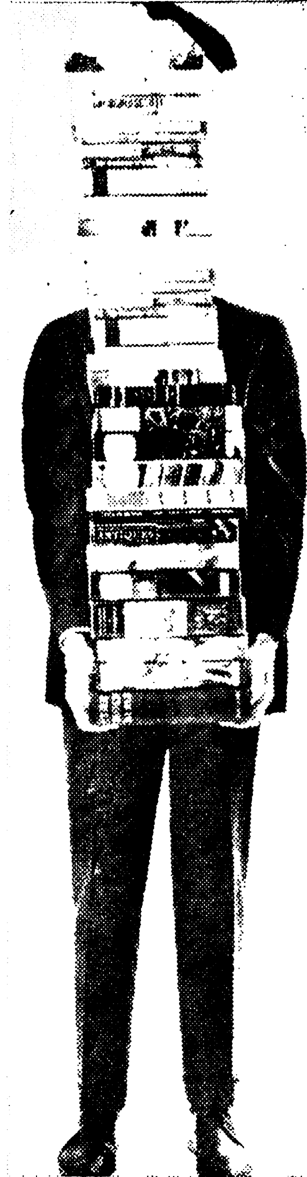
যত দূর তত কাছে / এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

আজকাল গল্প-উপন্যাসে প্লটের বালাই বিশেষ থাকে না, নানাবিধ আঙ্গিক ও মতবাদের গোলকধাঁধায় বিষয়-বস্তু যেন অসহায়ের মতই মাথা খুঁড়েই মরে, ফলে সাধারণ পাঠক চমৎকৃত যদি-বা হন, নিটোল একটি গল্পের রসাস্বাদন করতে না পেরে যে কিছুটা অতৃপ্তি ভোগ করেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই; আলোচ্য উপন্যাসটি এদিক দিয়ে সত্যই এক ব্যতিক্রম। মমতা-মধুর এক কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে এ গ্রন্থের মাধ্যমে, নারীজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি মাতৃত্বই এ রচনার মূল উপজীব্য এবং সেটা আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ফুটে উঠেছে এইজন্য যে, নায়িকা বিজয়ার মাতৃত্ব যাকে আশ্রয় করে স্বতঃ-উৎসারিত, সেই বিলু প্রকৃতপক্ষে তার কেউই নয়, মাতৃ-পিতৃ পরিত্যক্ত এক অনাথ শিশুমাত্র। লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা নন, কিন্তু তাঁর রচনায় কোন দুর্বলতা বা দ্বিধার ছায়া নেই; অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তিনি গল্প বলে গিয়েছেন, যে-গল্প মানবিকতার আভাসে সমুজ্জ্বল, হৃদ্যতায় মনোরম। শিশু বিলু ও তার পাতানো মা বিজয়া সহজেই পাঠকের মন অধিকার করে নেয়, আর সেজন্যই পড়তে পড়তে পাঠক সহজেই কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—মনোবীণা রায়, প্রকাশনায়—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

চিৎপুর চাঁদনী-চৌপট্টি / এম সি সরকার

বর্তমানে রম্য-রচনার খ্যাতি সমধিক, আজকের পাঠক দৈনন্দিন-জীবনে সহস্র সমস্যাপীড়িত বলেই বোধ হয়

উপহারে বই!



● ইংরাজী নববর্ষের উপহারস্বরূপ এই লোকটি এতগুলি বই পেয়েছেন। বই আমাদের দেশেও উপহারে দেওয়া হচ্ছে রীতিমত

অবকাশমুহূর্তে একটি হাল্কা ধরণের বই হাতে তুলে নেন আগ্রহভরে, গুরুভার কোন রচনার চেয়ে রম্য বা রমণীয় কোন রচনার প্রতিই যেন তাঁর সবিশেষ পক্ষপাত। বর্তমান গ্রন্থটিও এই জাতীয়। এ গ্রন্থের নায়ক একজন সাংবাদিক, সংবাদপত্রের দৌলতে বহু বিচিত্র মানুষ ও ঘটনার সংস্পর্শে আসতে হয় তাঁকে প্রত্যহ, তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই এ রচনার বিষয়বস্তু। সাংবাদিক-জীবনের এক অন্তরঙ্গ রূপ ধরা পড়েছে কাহিনীর ছত্রে-ছত্রে, লেখকের মুন্সিয়ানায় তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই বিশ্বাসযোগ্য; মনে হয় লেখক যা প্রকাশ করেছেন, তা যেন একান্তভাবেই তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। লেখক যে সম্পূর্ণরূপেই সমাজসচেতন তারও ইঙ্গিতে বাঙ্ময় এ রচনা; মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় এ রচনা, তাই খুব সহজেই পাঠকের মননে একটা স্থায়ী ছাপ এঁকে দেয়। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নিমাই ভট্টাচার্য, প্রকাশনায়—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস / রূপরেখা

লেখক ভূমিকাতে বলেছেন যে, এ গ্রন্থ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়, তার এক রূপলেখা মাত্র। কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলেস মার্ক্সবাদের প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা, এই দুই মহামানব বিশ্বমানুষকে লক্ষ্য করে সাম্যবাদের যে বাণী দিয়েছিলেন আলোচ্য গ্রন্থে সেটাকেই মূল বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিসাধন শ্রমজীবী মানুষদের নিজেদেরই যে করতে হবে, সাম্যবাদের এই গোড়ার কথাটাকেই বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বাঙ্গালী পাঠকের মর্মে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এ গ্রন্থের রচয়িতা এবং একথা মানতেই হবে যে, সে প্রচেষ্টায় তিনি আংশিকভাবে সফলও হতে পেরেছেন। বইটি পড়লে শ্রম-আন্দোলন ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মায়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই নির্দোষ। লেখক—সুশীতল রায়চৌধুরী। প্রকাশনা—ইনস্টিটিউট অব মার্ক্সইজম্-লেনিনইজম্, প্রাপ্তিস্থান—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ, দাম—দেড় টাকা।

ইওরোপের সূর্য / ন্যাশনাল পাবলিশার্স

ইওরোপের সূর্য মূলত ভ্রমণকাহিনী। মাসিক বসুমতীতে এ গ্রন্থের কিছু অংশ যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন অনেক পাঠক চিঠি লিখে এ গ্রন্থের লেখককে অভিনন্দিত করেন। সচরাচর ভ্রমণকাহিনী বলতে যা বোঝা যায়, এ গ্রন্থটি তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখক একজন তরুণ সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসাবেই তিনি আধুনিক ইওরোপকে দেখেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর দৃষ্টিভংগী স্বচ্ছ এবং নিরাসক্ত। এ গ্রন্থ প্রচুর তত্ত্ব ও তথ্যাশ্রয়ী কিন্তু কোথাও তত্ত্ব বা তথ্যের ভার সাহিত্যমূল্যকে বিঘ্নিত করে নি। রসের হানি ঘটে নি কোথাও। লেখকের ভ্রমণসূচীর মধ্যে আছে ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া আর গ্রীস। লেখক শুধু দু'পাশের প্রাসাদমালা, পথঘাট আর বহিরঙ্গের সৌন্দর্য দেখেই মুগ্ধ হন নি। নব্য জার্মানীর নানাবিধ সমস্যা, অস্ট্রিয়ার সংগীত রাজ্যের পশ্চাৎপট, ১৯৫৭ সালের বিপ্লবের পর হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশ পুরাণের আর নব্য ইতিহাসের গ্রীস তাঁর গ্রন্থে সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপিত, এ ছাড়াও আছে লেখকের নিজস্ব মন্তব্য ও মতামত—মননশীলতার আলোকে যা উদ্দীপিত। চলতি-পথে যে অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন তাঁদের টুকরো টুকরো ছবি মায়াময় হয়ে গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আধুনিকতম ইওরোপ সম্পর্কে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি দলিল। নিছক সাহিত্যপাঠকের কাছেও তা আদরের সামগ্রী হবার যোগ্য। লেখক—পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—চার টাকা।

প্রাণের রেবা / আর কে পাবলিশিং কোং

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্পসংগ্রহ। গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত নন। শহর কলকাতার পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচনায় ইতিপূর্বেই তিনি কিছুটা যশ অর্জন করেছেন, তবে কথাসাহিত্যের আসরে এই বোধহয় তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। বিশেষ কিছু সাহিত্যরসের পরিচয় না থাকলেও গল্পগুলির মাঝে একটা সরল সৌন্দর্যের খোঁজ পাওয়া যায়, মনে হয় অনুশীলন করলে, সময়ে তিনি এক্ষেত্রে কিছুটা কৃতিত্বেরও অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম হবেন; তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর লেখনী বিশেষ পরিণতি লাভ করতে পারে নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিণত না হলেও এই লেখকের রচনায় একটা সহজ সুষমা রয়েছে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে যা উপেক্ষণীয় নয়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রকাশক—আর কে পাবলিশিং কোং, ১১।এ, গোকুল মিত্র লেন, মদনমোহনতলা, কলিকাতা-৫, দাম—সাড়ে তিন টাকা।

জবাব / বাক্ সাহিত্য

আলোচ্য উপন্যাসে এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীর সকরুণ জীবনালেখ্য চিত্রিত করা হয়েছে। অলকা

চেয়েছিল ঘর, চেয়েছিল সংসার। দেহজীবিনী মায়ের মেয়ে হওয়ার অপরাধকে ভুলতে চেয়েছিল সে সর্বান্তঃকরণে, আশা করেছিল আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই ও হয়ত আশ্রয় পাবে গৃহকোণের নিভৃত অন্তরালটুকুর মাঝে; কিন্তু জন্ম-কলঙ্কের বোঝা নামানো কি অতই সহজ? সমাজের প্রতীকস্বরূপ এগিয়ে এল কীর্তন চাটুজ্যে, মদ্যপ ও ব্যভিচারী এই পুরুষ ভেঙ্গে দিল একটি চিরন্তনী নারীর চিরন্তন কামনাকে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল ঘর ভাঙার রূঢ় আঘাতে, বাস্তবের সঙ্গে এবার মুখোমুখি দাঁড়াল অলকা; না আর সে ভুল করবে না, কোন বৃথা প্রত্যাশায় চঞ্চল হতে দেবে না চিত্তকে; শুধু একদিন শেষ জবাব দেবে এই সমাজকে; যে সমাজ তার পবিত্রভাবে বাঁচবার অধিকারটুকুও দিল না, সেই সমাজেরই মুখের উপর দেবে সে শেষ জবাব। প্রাণসত্তা অপরাজেয় ও অমর, কোন মালিন্য, কোন চ্যুতিই পারে না তাকে ধ্বংস করতে, আর সেই নিরাসক্ত মহিমাতেই প্রতিটি মানুষের পূর্ণ পরিচয় নিহিত, সমাজের মুখের উপর এই জবাবই দিয়েছিল অলকা সেদিন। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক। কাহিনীর গতি স্বচ্ছন্দ ও শৈলী সরস, পাঠক সহজেই কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মনোনয়ন / ত্রিবেণী প্রকাশন

সাম্প্রতিক গ্রন্থটি একটি ছোটগল্প সংকলন। স্বনামধন্য কথাশিল্পী শ্রীবিমল করের বর্তমানকালের রচনা মোট সাতটি মনোরম ও রসসমৃদ্ধ ছোটগল্প স্থান লাভ করেছে এই আলোচ্য গল্পসংগ্রহটিতে। শ্রীকরের বলিষ্ঠ লেখনীর কথা নতুন করে পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র। প্রতিটি গল্পের মাঝে লেখক উদ্‌ঘাটিত করেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মনুষ্যচরিত্রের এক এক নতুন দিক। নীরজা, জননী, অপেক্ষা প্রভৃতি গল্পগুলি রচনায় লেখক তাঁর অপূর্ব সৃজন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই গ্রন্থটিতে। বহু বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন শ্রীকর আর সেইসব চিন্তাই যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে পাঠক মনের কাছে। ভাষার ঔজ্জ্বল্যে ও পরিবেশন দক্ষতায় এই গল্পগুলি এক অপূর্ব শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে আদৃত হবে বলে মনে করি। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দ্বিতীয় পৃথিবী / শ্রীভারতী পাবলিশার্স

বাংলা উপন্যাসের পটভূমি আজ দিগন্তপ্রসারী। নিত্যনূতন অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বাংলা উপন্যাস আজ সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হতে চলেছে। যে কয়জন তরুণ বাঙালী সাহিত্যিক ইওরোপকে তাঁদের উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন তাঁদের মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। সম্ভবত দ্বিতীয় পৃথিবী তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। দ্বিতীয় পৃথিবী স্কেচধর্মী উপন্যাস। কোন বৃত্তাকার গল্প এতে নেই। গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ চরিত্র প্রদীপ একজন সাংবাদিক। লণ্ডন ও উলভারহ্যাম্পটনে সে কতগুলি চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছে। এই চরিত্রগুলির জীবনের হাসি-কান্না ও আবেগমিশ্রিত কাহিনীই এই গ্রন্থের উপজীব্য। এদের মধ্যে আছে ফিনচলে রোডের শংকরদা ও অনুবৌদি, সোহোর নাইট ক্লাবের ভাগ্যবিড়ম্বিতা রূপোপজীবিনী সিলিয়া, উলভারহ্যাম্পটনের ভারতীয় ছাত্র শ্যামল আর প্রদীপের বান্ধবী অ্যাঞ্জেলা। ইংরাজীতে যাকে বলে হিউম্যান এলিমেন্ট, প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে সেটি উপস্থিত। তাই চরিত্রগুলি পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। এ ছাড়া লেখকের গল্প বলার মুন্সিয়ানা আছে। গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার সময় নাটককে কোথাও ক্লান্ত করে না। লেখক—পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—শ্রীভারতী পাবলিশার্স। ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

গণতন্ত্র এবং তোমরা / আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স

এই সংক্ষিপ্তাকার গ্রন্থটিতে সহজ শৈলীতে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার বর্ণনা করা হয়েছে। গণতন্ত্রে মানুষ কি ধরণের সুখ-সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং এ-ধরণের সমাজ-ব্যবস্থার সুফলই বা কি, কুফলই বা কি এ-সম্বন্ধে অল্পের মধ্যেই প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা ও তার অপব্যবহার সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে এ গ্রন্থপাঠে, খুব সরলভাবে লেখিকা মোটামুটি জ্ঞাতব্য সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন। বর্তমান রচনা মূলগ্রন্থ নয়, তার অনুবাদমাত্র, তবে অনুবাদক যে সফলতার সঙ্গেই আরব্ধকর্ম সম্পাদন করেছেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখিকা—ডরোথি গর্ডন, অনুবাদ—পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২, দাম—দুই টাকা।

আরও কয়েকটি গ্রন্থ

অর্ঘ্য ॥ সরলাবালা সরকার ॥ ৩·০০
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা ॥ শৈলেন ঘোষ ॥ ২·০০
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ॥ মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥ ২·৫০
আত্মচরিত (চতুর্থ মুদ্রণ) ॥ জওহরলাল নেহরু ॥ ১২·০০
ইন্দ্রজিতের আসর ॥ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ৩·০০
এভারেস্ট ডায়েরী ॥ ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাস ॥ ৯·০০
ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু (চতুর্থ মুদ্রণ) ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ৪·০০
গল্প-সংগ্রহ ॥ সরলাবালা সরকার ॥ ৫·০০
গীতায় স্বরাজ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ॥ ত্রৈলোক্য মহারাজ ॥ ৩·০০
চণক-সংহিতা ॥ কালিদাস রায় ॥ ৩·৫০
চার্লস চ্যাপলিন ॥ আর. জে. মিনি ॥ ৫·০০
চিন্ময় বঙ্গ (তৃতীয় মুদ্রণ) ॥ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ॥ ৪·০০
ছেলেদের বিবেকানন্দ (সপ্তম মুদ্রণ) ॥ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ ২·০০
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ (পঞ্চম মুদ্রণ) ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ২·৫০
ঠগী (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ॥ শ্রীপান্থ ॥ ৫·০০
নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ ৫·০০
পিনকুর ডাইরি ॥ সরলাবালা সরকার ॥ ২·০০
ফুটবলের আইনকানুন (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ॥ মুকুল দত্ত ॥ ৫·০০
বিবেকানন্দ চরিত (একাদশ মুদ্রণ) ॥ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ ৬·০০
বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ॥ জওহরলাল নেহরু ॥ ১৫·০০
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন (তৃতীয় মুদ্রণ) ॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ॥ ৮·০০
রবীন্দ্র-মানসের উৎস সন্ধানে ॥ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ॥ ৩·৫০
রহস্যময় রূপকুণ্ড (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ॥ বীরেন্দ্রনাথ সরকার ॥ ৩·৫০
রাজার রাজা : প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ॥ মৌমাছি ॥ ১·৫০
রাজার রাজা : দ্বিতীয় খণ্ড ॥ মৌমাছি ॥ ১·৫০
রাজার রাজা : তৃতীয় খণ্ড ॥ মৌমাছি ॥ ১·৫০
শিবঠাকুরের আপন দেশে ॥ রাণু সান্যাল ॥ ৪·০০
শিশুদের বিবেকানন্দ ॥ মৌমাছি ॥ ২·৫০
শ্রীগৌরাঙ্গ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ৩·০০
সুর ও সুরভি ॥ সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৩·০০
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ ২·৫০



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলকাতা ৯



মাসিক বসুমতী
॥ মাঘ, ১৩৭১ ॥

(তৈলরঙ)

গোধুলি বেলায়
—শ্রীবলাইলাল মুখোপাধ্যায়



কলা-কাকলি

আইজেনস্টাইনের বর্ণচিন্তা

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বলা বাহুল্য সোভিয়েট রাশিয়া আজ একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। রাশিয়ার ছায়াছবির গৌরবময় ইতিহাসের রূপায়ণে যাঁদের অবদান অগ্রগণ্য সার্জি আইজেনস্টাইন সেই তালিকায় একটি স্মরণীয় নাম। আইজেনস্টাইনকে শুধু একজন বরণীয় চিত্রস্রষ্টা বললে তাঁর সম্বন্ধে বলা সম্পূর্ণ হয় না। চলচ্চিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বৈবভাবে সুষমামণ্ডিত করা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা অতুলনীয়।

ছবির বিভিন্ন দিকগুলি সমৃদ্ধ না হলে একটি ছবি সামগ্রিকভাবে সার্থক হতে পারে না, এই ধারণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নব নব সৃজনধর্মী চিন্তায়, যার ফল রাশিয়ার চিত্রশিল্পের এক বিরাট উন্নতি ও অপ্রতিহত অগ্রগমন।

ছবিতে রঙের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর ভাবধারা ও সক্রিয় উপদেশ ভাবীকালের চিত্রকরদের যে কি বিরাটভাবে উপকৃত করেছে বা করছে, সে সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। রঙিন ছবি সম্বন্ধে তাঁর নানাবিধ ধ্যান-ধারণা তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর প্রবন্ধাদির মাধ্যমে। প্রবন্ধগুলি যেমনই অপরিহার্য তেমনই মূল্যবান।

রাশিয়ায় ছায়াছবিতে রঙ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ শুরু হয় 'পোটেমকিন'-এ তারপর 'জেনারেল লাইন'-এ। রঙের প্রয়োগ ও নির্বাচনের এখনকার তুলনায় এক ভিন্নতর রীতি ও পদ্ধতি সে সময়ে বিদ্যমান ছিল। 'পোটেমকিন'-এ



● বিখ্যাত রুশ-চিত্র পরিচালক আইজেনস্টাইন

পতাকায় লাল রঙ এবং 'জেনারেল লাইন'-এ ষাঁড়ের বিবাদের দৃশ্য এই কারণেই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

মহৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় দেখা দেবেই। আইজেনস্টাইনের কাজেও সমস্যা এসেছে। ১৯৩৯ সালে তাঁকে হতে হয়েছে বাধার সম্মুখীন। 'ফারগানা খাল'কে কেন্দ্র করে এই সমস্যার উদ্ভব। একদা উজবেগীস্থানের চাষীরা যে খাল নির্মাণের দ্বারা সেচ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে সমাজধর্মী মনের পরিচয় দিয়েছিল, সেই খালটিকে পটভূমি করে শেষ পর্যন্ত কিন্তু ছবি তৈরি করতে পারেন নি আইজেনস্টাইন, কাজ তাঁকে বন্ধ করে দিতে হয়।

তাঁর মননশীলতার সম্যক্ নিদর্শন বহন করে 'গোল্ড'-এর চিত্র প্রচেষ্টা। ব্লেসি সেণ্ডার্সের উপন্যাস অবলম্বনে এই চিত্রের কাহিনীকার হ'ল ক্যাপ্টেন সাটারের রোমাঞ্চকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন।

প্রতিটি রঙের এক-একটি জাত আছে, আছে বৈশিষ্ট্য, আছে নিজস্ব চরিত্র। আইজেনস্টাইন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে রঙের আছে এক ঘনিষ্ঠ সংযোগ, ছবির মেজাজের উপর রঙের প্রয়োগ আবার রঙের প্রয়োগের উপর ছবির মেজাজ নির্ভর করে। পরস্পরের সঙ্গেই এ ক্ষেত্রে পরস্পরের একটি যোগসূত্র বিদ্যমান। আইজেনস্টাইনের মতে রঙের ভাষা না বুঝলে তার চরিত্র বোঝা সম্ভবপর নয়। ঘটনা বা কাহিনীর সঙ্গে তাল রেখে রঙের নির্বাচন হবে।

তাঁর মতে পোটসড্যাম কনফারেন্স-এর কোন কোন অংশ রঙের ব্যাপারে বীভৎস, কোন নৈপুণ্যের স্পর্শ বহন করে না, কিন্তু লাল কার্পেটের দৃশ্যটিও তো ভোলবার নয়, সমগ্র পর্দা লাল রঙে রক্তরাগরঞ্জিত হয়ে উঠল, দর্শকের মনে এক বিশেষ অনুভূতি সঞ্চারিত হল। তবে বিশেষ করে কালো রঙটির এক বিরাট তাৎপর্য এবং এর প্রাধান্যও স্বীকার করেন আইজেনস্টাইন।

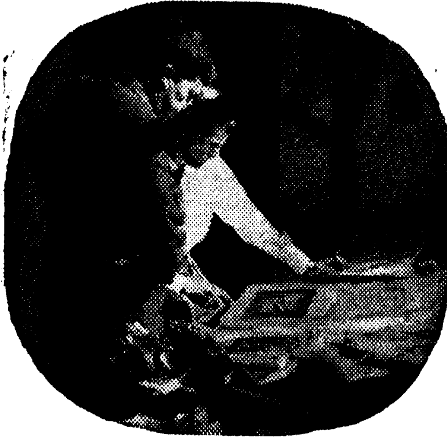
তাঁর অভিমতে প্রতিটি রঙের নিজস্ব ধর্ম ও চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে তার প্রয়োগ ঘটালে সে প্রয়োগ সার্থক হবে।

তাঁর নিজের জীবনে দেখা গেছে—কাজের টেবিলে পাশাপাশি নীল ও হলদে পেন্সিল না দেখলেই তাঁর সব কিছুই সৌন্দর্যশূন্য বলে মনে হত। নীল ডিভানে সবুজ রেখালঙ্কার না দেখলে তাঁর মন অতৃপ্ত থেকে যেত।

রঙের সাধনায় তাঁর জীবনও রঙিন হয়ে উঠেছিল, সেই রঙের ঔজ্জ্বল্য দূর করেছে ছবির জগতের অনেক অন্ধকার।



● পাকিস্তানের দুই নৃত্যশিল্পীর মধ্যস্থলে আলাপরতা রাশিয়ার বিখ্যাত ব্যালেরিনা অলগা লেপেসিনাস্কায়া



টেলিভিশন ও তার ডিজাইনার

[আজ কমনওয়েলথের বহু দেশের নিজস্ব টেলিভিশন সার্ভিস আছে; যে দেশে টেলিভিশন সার্ভিস নেই সেখানেও এই সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমান কমনওয়েলথের এই প্রবন্ধে টেলিভিশনের ডিজাইনারের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। টেলিভিশন প্রযোজনায় ডিজাইনারের ভূমিকা অপরিহার্য। লেখক এবং প্রযোজকের চিন্তাকে ছবির মাধ্যমে রূপ দিয়ে দর্শকদের কাছে গ্রহণীয় ও উপভোগ্য করে তোলা হল এই ডিজাইনারের কাজ।]

এযুগের একজন ডিজাইনারকে বহু রকমের গুণের অধিকারী হতে হবে। উপরন্তু তাঁর থাকা দরকার সৃজনক্ষমতা ও সেইসঙ্গে প্রশাসনিক দক্ষতা। স্টুডিয়োর কাজকর্ম যেমন নিখুঁতভাবে জানতে হবে ঠিক তেমনই ভাবে জানতে হবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ছবির পুনরুৎপাদন পদ্ধতি? পদার্থবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায় তাঁর জ্ঞান গভীর হওয়া দরকার। সৃজনশীল প্রতিভা হিসাবে তাঁর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকলেও দলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা তাঁর থাকা দরকার। তাঁকে হতে হবে সর্বরকম অবস্থার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে দ্রুত কাজ করার উপযুক্ত। অনেক সময় দলের মতে মত দিয়ে ডিজাইন পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁর হয়, কিন্তু এইভাবে আপন করার মধ্যেও মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁকে থাকতে হবে অবিচল।

ডিজাইনারের কাজ সম্পর্কে সাধারণ দর্শক অবহিত নাও থাকতে পারেন, কারণ ডিজাইনার অলক্ষ্যে থেকে অনুষ্ঠানের রূপ দিয়ে থাকেন। অনুষ্ঠান ও উপযোগিতার সঙ্গে ডিজাইনারের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে স্বপ্নজাল, তা-সে বস্তুধর্মী অথবা কাল্পনিক হোক। ডিজাইনের মধ্যে যদি সুরভঙ্গ ঘটে, যদি সেই ডিজাইন হয়ে ওঠে অপ্রাসঙ্গিক ও দুর্বোধ্য তবে দর্শকের স্বপ্নজাল সেই মুহূর্তেই ছিঁড়ে যেতে পারে। দৃশ্যপট, আলোকসম্পাত, পোষাক, মেক-আপ, মাইক্রোফোন ও ক্যামেরার সাহায্যে টেলিভিশন এক মায়ার সৃষ্টি করে এবং এগুলির যথাযথ সমন্বয় অনুষ্ঠানের সংলাপ, সঙ্গীত ও অ্যাক্‌শনের মতই মূল্যবান। তাই এসমস্তই যদি ঠিকমত কাজ করে তবেই লেখক ও প্রযোজকের ধারণা স্পষ্ট রূপ পেতে পারে।



● লণ্ডন থিয়েটারের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারিণী ভারতীয় চিত্রতারকা জীবনকলা

টেলিভিশন শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ডিজাইনারের ভূমিকাও হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। টেলিভিশনের এই প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং কর্মপদ্ধতি এযাবৎ স্থির হয়ে এসেছে।

কত দ্রুত টেলিভিশনের প্রসার হচ্ছে তা একটা মাত্র ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। ১৯৩৬ সালের ২রা নভেম্বর লণ্ডনের আলেক্‌জেণ্ড্রা প্রাসাদ থেকে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বিশ্বে প্রথম নিয়মিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার করতে আরম্ভ করে। আজ বহুদেশ এই টেলিভিশন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে আছে এবং খুব শীঘ্রই বিশ্বের সমস্ত দেশ ছবির সাধারণ ভাষার মধ্য দিয়ে চিন্তা বিনিময় করবে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসের উপর টেলিভিশনের প্রভাব অসামান্য। টেলিভিশন পারে মানুষের মনকে সমৃদ্ধ ও সংস্কারমুক্ত করতে, পারে তাদের মধ্যে সামাজিক চৈতন্য জাগাতে। আবার এই টেলিভিশনই মানুষের মনকে কলুষিত ও কদর্য করে তুলতে পারে। তাই তার মান কি পর্যন্ত বজায় থাকবে তা নির্ভর করছে কি পর্যন্ত তা সৃজনশীল প্রতিভা আকৃষ্ট করতে পারে তার উপর।

কিন্তু তা সবসময় স্বীকৃত হয় নি। যান্ত্রিক দিক থেকে টেলিভিশন ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এবং ২০ বছর ধরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রতীক্ষায়, টেলিভিশনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবসায়ী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্যই এর উদ্ভব হয়। পরে এঁরা যখন দেখলেন যোগাযোগের এই নূতন মাধ্যমকে আরও বেশি করে দর্শকদের মধ্যে নিয়ে আসার প্রয়োজন আছে তখনই তাঁরা চলচ্চিত্র এবং বিজ্ঞাপনের জগৎ থেকে আনতে আরম্ভ করলেন লেখকদের, প্রযোজকদের এবং ডিজাইনারদের।

এখানেই হল টেলিভিশনের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য। অনেকে টেলিভিশনের সঙ্গে চলচ্চিত্রের তুলনা করে থাকেন। কিন্তু এইভাবে তুলনা করা খুব ভুল। কারণ, শুরু থেকেই শৈল্পিক প্রচেষ্টা হিসাবে চলচ্চিত্রের উদ্ভব। আলোকচিত্র গ্রহণের বিজ্ঞানের উপরই এ প্রতিষ্ঠিত। আলোকচিত্রের শিল্পগত গুণাবলী সম্পর্কে যাঁরা সচেতন তাঁরাই শুরু থেকে যোগ দেন চলচ্চিত্রের কাজে। তাই এই কাজে এসেছেন থিয়েটার থেকে বহু সৃজনশীল প্রতিভা। শিল্পমাধ্যম হিসাবে নূতন মর্যাদা তা লাভ করে। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগের বয়স টেলিভিশন এখনও পায় নি। চলচ্চিত্র দীর্ঘ সময় ধরে তার নিজস্ব শৈল্পিক রীতি গড়ে তোলার অবকাশ পেয়েছে এবং এখন এই মাধ্যমটি ব্যবহৃত হচ্ছে বৈষয়িক প্রয়াস হিসাবে।

পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হয়েছে টেলিভিশনের বিকাশ। প্রথম যুগে শুধুমাত্র টেলিভিশনের রহস্যই ছিল মানুষের কাছে প্রধান আকর্ষণ। নূতনত্বের রহস্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, তখন চিন্তা দেখা দিল কিভাবে এই আকর্ষণ জাগিয়ে রাখা যায়। এই সময়েই টেলিভিশনে যোগ দিলেন সৃজনশীল ব্যক্তিরা।

টেলিভিশনের মানকে উন্নত রাখার দায়িত্ব এখন এঁদের উপর। এঁদেরই সৃজনী প্রতিভার উপর নির্ভর করছে শিল্পস্রষ্টা এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে টেলিভিশনের ভবিষ্যৎ।

অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হবার পরই কর্মীরা কাজে হাত দেন। কোন স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে এবং দৃশ্যপট ইত্যাদি রচনায় লোকজনের সাহায্য—ম্যান আওয়ারের হিসাবে—কি পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হবে তা ডিজাইনারকে জানিয়ে দেওয়া হয়।



● তালতলা কিশোর সমিতি আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে সমাগত শিল্পিবৃন্দ—শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত নন্দী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ

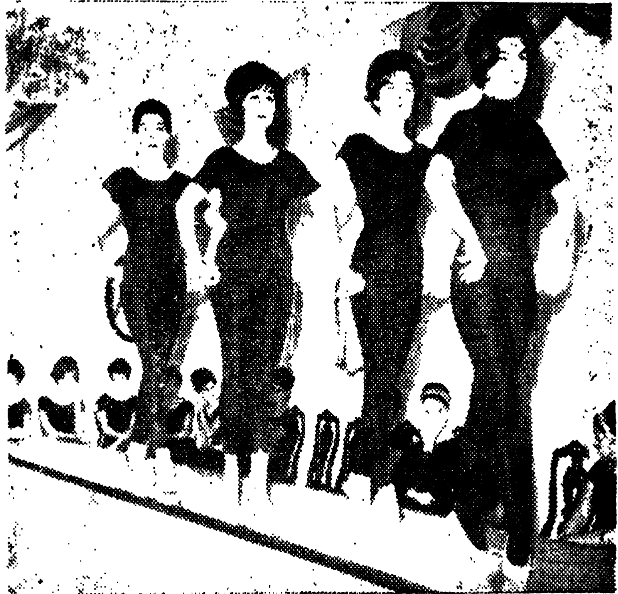
প্রযোজক ইত্যবসরে শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং অনুষ্ঠানটি কিভাবে প্রচার করা হবে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তিনি করে নেন। এই সময় ডিজাইনার তাঁর প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করেন। প্রযোজক অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন সংক্ষেপে এবং ডিজাইনার স্টুডিয়ো প্ল্যানের উপর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের এলাকার একটা স্কেচ করে নেন। স্টুডিয়ো চত্বরের উপর শিল্পীরা কতদূর অবাধ চলাফেরা করতে পারবেন সে সম্পর্কে ধারণা করাই এই স্কেচের উদ্দেশ্য। তিনি বুঝতে বা বিদূষকের ভূমিকা ছাড়া কাহিনী যেমন চোখে পড়ে না, প্যান্টোমাইমেও তেমনি কয়েকটা বিশেষ চরিত্র একেবারেই অপরিহার্য। তফাৎটা এই যে যাত্রায় নিয়তি ব বিদূষক কখনই প্রধান ভূমিকার মর্যাদা দাবী করতে পারেন না কিন্তু প্যান্টোমাইমের বিশেষও আবশ্যিক চরিত্র ক'টি—শুধু প্রধান বললে কম বলা হয়। সমস্ত দর্শক তাদের ভূমিকার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন।

প্যান্টোমাইমের সংগে একটা বেশ কৌতুককর সংস্কার জড়িয়ে আছে। 'Principal Boy' বলে নায়কের অভিনয় করেন কিন্তু কোন একজন মহিলা। তিনি পুরুষের বেশ ধারণ করেন। নায়িকা অবশ্য মহিলাই। এদেশের লোকেদের প্রশ্ন করলে বলে, পুরুষ যদি পুরুষের আর মহিলা যদি সর্বত্রই বনিতার ভূমিকায় অভিনয় করেন তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন মামুলী হয়ে যায় না কি? বিপরীত বেশ ধারণ করে অভিনয় করার মজাই আলাদা।

তাই আবার 'ডেম' (Dame) বলে যে প্রৌঢ়া মহিলাকে প্যান্টোমাইমে দেখা যাবে তিনিও আদতে মহিলা নন। কোনো পুরুষই মহিলার বেশ ধারণ করেন। তাহলেও, আমাদের অপেশাদারী যাত্রায় যে পুরুষরা মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন তার সংগে প্যান্টোমাইমের এই রীতির একেবারেই তুলনা করা চলে না। আমাদের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় কোনো অভিনেত্রীকে আসরে আশা করা যায় না আর এদের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের এই বিপরীত অভিনয় উদ্দেশ্য নিয়েই চালু করা হয়েছিল এবং সে রেওয়াজে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে।

ছেলেমেয়েদের কাছে প্যান্টোমাইম একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। কারণ হরেকরকমের আজব ঘটনা এখানে প্রতিমুহূর্তেই ঘটতে পারে। যিনি এই অঘটন ঘটনের কাজটি করে থাকেন তাঁর নাম হারলেকুইন। যাদুকরের মত তাঁর হাতেও একটা যাদুদণ্ড থাকে। সেইটা ঘোরালেই হয়তো যে মানুষ ছিল সে সিংহ হয়ে গেল, মরুভূমিতে গজিয়ে উঠলো বাগানবাড়ি, এই রকম আরো কত কি! নাটকের সুরুতেই হয়তো হারলেকুইনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না বা চেনা যাবে না। কিন্তু পরে নাটকের প্রধান চরিত্রের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট একজন হারলেকুইনের ভূমিকা নেন এবং আজগুবি সব ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। নাটকের নায়িকাও পরে কলম্বাইনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর দু'টো আবশ্যিক চরিত্র হল ক্লাউন আর প্যান্টালুন বলে অপর এক বৃদ্ধ। এ ছাড়াও আছে নানারকমের পরী বা দেবদূতের দল, রাক্ষস, দানব, শয়তান, সাধারণ মানুষ, পশুপাখী এমন আরো কত কি!

সার্কাস পার্টিতে দু'জন মানুষকে দিয়ে যেমন পশু সাজান হয়ে থাকে এখানেও প্রায় তেমনি। কিন্তু কলম্বাইনের সংগে সহচর হয়ে যে পশুটি ঘোরাফেরা করে, একজন মেয়ে বা পুরুষই সেই পশুর রূপ নেয়। সাধারণত বেড়ালকেই এই পশুর ভূমিকা নিতে দেখা যায়। এরা কথামালার পশুদের মত কথা বলতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহানুভবতা ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়ে থাকে, এবং সৎ,



● সাজসজ্জার পারিপাট্য এবং অভিনবত্বে ইটালির জয়যাত্রার একটি উজ্জ্বল চিত্র

সজ্জন লোকের পরম বন্ধুর ভূমিকা নিয়ে এরা অভিনয় করে থাকে।

কিন্তু কথা হ'ল দিনকাল তো পাল্টে গেছে। শুধু যাদু দেখিয়ে রকেটের যুগের মানুষদের ভোলানো যায় না। স্থান-কাল-পাত্রের সংগে অনুষ্ঠানের সংযোগ না থাকলে তার মৃত্যু অবধারিত। সেই মৃত্যুর হাত থেকে প্যান্টোমাইমকেও বাঁচানোর জন্যে আজ পর্যন্ত নতুন নতুন ভাব সংযোজনার চেষ্টা হয়েছে। প্যান্টোমাইম সেজন্যই একেবারে পুরোণো পুনরাবৃত্তি হয়ে পড়ে নি।

আর একটু খুলে বলি। খৃস্টের জন্মদিনের পরের দিন এদেশে বক্সিং ডে বলে পরিচিত। সেদিন থেকে সুরু। ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ছোট-বড় পেশাদারী মঞ্চে প্যান্টোমাইম মঞ্চস্থ করার আয়োজন করা হয়। পথে-ঘাটে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন দেখা যায় তার থেকে মনে হচ্ছে এই লণ্ডন শহরেই কম করেও দশ-বারোটা নামকরা মঞ্চে প্যান্টোমাইমের আয়োজন করা হয়েছে। কাহিনী হয়তো সেই সিণ্ডারেলা কিংবা শ্লিপিং বিউটি। কিন্তু এ-বছরের বিশেষ আকর্ষণটা কোথায় জানেন? এবারের হারলেঁকুই প্যান্টালুন কিংবা ডেমের মুখে হয়তো ক্রিস্টিন কীলার প্রসংগ নিয়ে যথোচিত শ্লেষ শোনা যাচ্ছে। ভিয়েৎনামের মাদাম নু অথবা মহাকাশে বেড়িয়ে আসা রাশিয়া-দুহিতা ভ্যালেন্টিনার বিবাহবন্ধন নিয়ে দু'-চার কথাও যে থাকবে না এমন নয়। তা'ছাড়া এদেশের লর্ড, ব্যারন, মন্ত্রিসভা, সমকালীন সাহিত্য, নাটক, শিল্পী সবকিছু নিয়েই মজাদারী সব মন্তব্য তো আছেই। রেডিও, টেলিভিশানের অনুষ্ঠানও তার থেকে বাদ যায় না।



● নির্মীয়মাণ 'এতটুকু বাসা'র একটি দৃশ্যে 'রায়' উপাধিধারী তিন শিল্পী—জহর রায়, রেণুকা রায় ও সন্ধ্যা রায়

কিন্তু এ-কথা ধরে নিলে ভুল হবে যে সস্তা কতকগুলো মন্তব্য ও বাকচাতুরী দিয়ে দর্শককে ভোলাবার চেষ্টা হয়ে থাকে। Satire-এর বাংলা অনুবাদে শ্লেষ কথাটা কতখানি উপযুক্ত জানি না। কিন্তু Satire সত্যিই ইংরেজ-চরিত্রের একটা বিশিষ্ট দিক। একটা অননুকরণীয় জাতীয়-চরিত্রও বলা যেতে পারে। ইংরেজি নাটকের মত প্যান্টোমাইমের অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখেও মনোজ্ঞ Satireগুলো ইংরেজ-শ্রোতার চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এই একটা জায়গাতেই ইংরেজরা প্যান্টোমাইমকে পুরোণো হতে দেয় না।

এখানে আর একটা দিকও চিন্তা করার আছে। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আজও প্যান্টোমাইম ছেলে-মেয়েদের মত করে পরিবেশন করার দিকে নজর দেয় বেশি। তাই ঘন ঘন পটপরিবর্তন হয়, জাঁকজমক, বেশবাসের বিরাট সমারোহ, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শক ছেলে-মেয়েদের সংগে কথাবার্তা বলে থাকেন, প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত করে থাকেন। মনিটরের মধ্য দিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি তিনি দেখতে পারেন এবং বুঝতে পারেন কোন্ দৃশ্যের কোন্ জায়গায় জোর দিতে হবে বেশি করে, দেখতে পারেন কোনো জায়গায় কোনো কিছু বাদ পড়ার জন্য দৃশ্যটি বিসদৃশ হয়ে উঠেছে কি না। সুতরাং যদি কিছু সংশোধন করতে হয়, তবে এই হল তার সুযোগ। কিন্তু, এ সব কাজ খুবই সাধারণ, কারিগর বা মিস্ত্রিদের দিয়ে তা করিয়ে নেওয়া যায়।

প্রথমে ক্যামেরার অবস্থান বিচার করে প্রত্যেকটি সেট্ ভাল করে দেখে নেওয়া হয়। তারপর ঘড়ির সঙ্গে তাল রেখে আর একবার সবকিছু পরীক্ষা করে দেখা হয়। শিল্পীরা সাজসজ্জা করে প্রস্তুত হয়ে এলে অনুষ্ঠানটি ঠিক যেভাবে প্রচার করা হবে, ঠিক সেইভাবে চলচ্চিত্রের পদ্ধতিতে আর একবার সবকিছু পরীক্ষা করে দেখা হয়। এখানে অদল-বদলের আর কোন সুযোগ নেই। অনুষ্ঠানটি এখন প্রচারের জন্য প্রস্তুত। তারপর সবাই যখন কাজ নিয়ে মেতে ওঠেন তখন ডিজাইনারের কাজ হয় শেষ। এইবার তিনি অনুষ্ঠান দেখেন দর্শকের আসনে বসে এবং বিচার করেন সমগ্র অনুষ্ঠানের ভালমন্দ।

এই বিষয়ে উৎসাহী পাঠকদের রিচার্ড লেভিন-এর লেখা 'টেলিভিশন বাই ডিজাইন' বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বইটির প্রকাশক লণ্ডনের বড্‌লি হেড। মিঃ লেভিন হলেন 'বি-বি-সি'র টেলিভিশন ডিজাইন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা।

একটি গান

কথা ও সুর—৺অতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু

[বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি শ্রদ্ধেয় ৺অতুলপ্রসাদ সেন যখন তাঁর কর্মস্থল লক্ষ্ণৌ থেকে মাঝে মাঝে তাঁদের স্কোর রোডের বাড়িতে আসতেন, তখন তাঁর গানের মজলিসে নিমন্ত্রিত হ'য়ে প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ও পরিচিত হ'য়ে আজও গৌরব বোধ করছি। সে সময় বন্ধুবর ৺হিমাংশুকুমার দত্ত এবং আরও দু'-একজন খ্যাতনামা গীতশিল্পী কবির গানের আসরকে প্রাণবন্ত করে তুলতেন। কবির ইচ্ছানুযায়ী তাঁর অনেক গান শিখে নেবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার তখনই হয়েছিল। কবির গায়কী পদ্ধতি বড়ই মধুর ছিল। কবি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁহার রচিত 'গীতগুঞ্জ' বই আমায় উপহার দিয়েছিলেন। ৺হিমাংশুকুমার দত্ত দ্বারা অপ্রকাশিত স্বরলিপি সমেত একটি বই প্রকাশ করবার কবির একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং সে ক্ষেত্রে আমার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু কবির অকস্মাৎ মৃত্যুতে তা অসমাপ্তই রয়ে গেল। উক্ত গানটি সেই অপ্রকাশিত গানের একটি স্বরলিপি। ভাষার মাধুর্য এবং সঙ্গতি রেখে কবির সুরটি এতে বজায় রাখা হ'য়েছে।—স্বরলিপিকার]

কে গো গাহিল পথে, এস পথে বলিয়া
দুয়ার খুলিনু যবে কেন গেলে চলিয়া ?

বিজন বরষা রাত
এ কি ছলনা, নাথ !
আঁধারে মিলালে তুমি বারেক উজলিয়া !

ঝড়ের বাতাসে আর
রুধিতে পারি না দ্বার ;
পথে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেম-ফুল হার !

শ্রবণে মিলাল গান,
হৃদয়ে রহিল তান ;
তোমার লাগিয়া আঁখি উঠিছে উথলিয়া !

II র্সা -া । র্সা ণা ণা । র্রা র্সা । ণধা পধা পা ।
কে ০ গো ০ গা হি লে প ০ থে

মা পা । মপা ধণা ধপা । পা পমা । পা -া -া ।
এ স প ০ থে ব লি য়া ০ ০

সা সা । পা -া মা । পা পা । সা া া র্সা
দু য়া র ০ খু লি নু য ০ বে

ণা র্সা । ণর্সা র্রজ্জা র্রসা । র্সণা ণা । ণধা পমা পা II
কে ন গে ০ লে চ লি য়া ০ ০

[র্রা র্সা]
II { মা পা । ণা পা ণা । ণা র্সা । র্সা -া র্সা
{ বি জ ন ০ ব র ষা রা ০ ত

র্সা র্রা । র্সা ণা র্সা । র্রা র্সা । র্রা র্জ্জা র্জ্জা }
এ কি ছ ০ ল না না ০ ০ থ }

র্জ্জা র্জ্জা । র্জ্জা -া র্জ্জা । র্মা র্মা । র্রা -া র্সা
আঁ ধা রে ০ মি লা লে তু ০ মি

ণা র্সা । ণর্সা র্রজ্জ র্রা । র্সা ণা । ণধা পমা পা
বা রে ক ০ উ জ লি য়া ০ ০

ণা ণা । ণা -া ণা । ধা ধা । ণধা পধা পা ।
আঁ ধা রে ০ মি লা লে তু ০ মি

মা পা । মপা ধণা ধপা । গা পমা । গা -া রগা ।
বা রে ক ০ উ জ লি য়া ০ ০

সা সা । গা -া মা । পা পা । র্সা -া র্সা ।
ডু য়া র ০ খু লি মু- য ০ বে

ণা র্সা । ণর্সা র্রজ্ঞা র্রসা । র্সণা ণা । ণধা পমা পা II
কে ন গে ০ লে চ লি য়া ০ ০

II গা গা । গা মা মা । মা মা । মা -া মা
ঝ ড়ে র ০ বা তা সে আ ০ জ

পদা দা । দা া দা । দা দা । ণধা পমা মা
রু খি তে ০ পা রি না দ্বা ০ র

ধা ধা । ধা া ধা । ধা ধা ণধা ণা মা
প থে ঝ ০ ড় ঘ রে ড ০ র

ধা ণা । ধণা র্সর্রা সণা । দা দা । মা গা মা
হা তে প্রে ০ ম ফু ল হা ০ র

[র্রা র্সা]
II { মা পা । ণা পা ণা । ণা র্সা । র্সা -া র্সা
শ্র ব ণে ০ মি লা ল গা ০ ন

র্সা র্রা । র্সা ণা ণা । র্সা র্রা । র্সা র্রা র্জ্ঞা }
হৃ দ য়ে ০ র ছি ল তা ০ ন

র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা া র্জ্ঞা । র্মা র্মা । র্রা া র্সা
তো মা র ০ লা গি য়া আঁ ০ খি

ণা র্সা । ণর্সা র্রজ্ঞা র্রা । র্সা ণা । ণধা পমা পা
উ ঠি ছে ০ উ থ লি য়া ০ ০

ণা ণা । ণা া ণা । ধা ধা । ণধা পধা পা
তো মা র ০ লা গি য়া আঁ ০ খি

মা পা । মপা ধণা ধপা । গা পমা । গা -া রগা
উ ঠি ছে ০ উ থ লি য়া ০ ০

সা সা । গা া মা । পা পা । র্সা া র্সা
ডু য়া র ০ খু লি মু য ০ বে

ণা র্সা । ণর্সা র্রজ্ঞা র্রসা । র্সণা ণা । ণধ পমা পা II II
কে ন গে ০ লে চ লি য়া ০ ০

বেলা বার্ত'ক—প্রখ্যাত সুরকারের পূর্বপুরুষ

জুলিয়া জেকেলি

[হাঙ্গেরিয়ান এ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স-এর 'দি বার্তক আরচিভেস' সম্প্রতি বিখ্যাত সুরকারের স্মরণে একটি সাধারণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। বার্তকের ব্যবহৃত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র প্রদর্শিত করা হয়েছিল; তার মধ্যে ছিল লোকসঙ্গীতের নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রাদি, পোশাক-আশাক এবং অনেক সঙ্গীত সম্বন্ধীয় দলিলপত্র। অন্যান্য ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল একটি অঙ্গাবরণ যা নাকি বার্তক পরিধান করেছিলেন নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভারসিটি-প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী নেওয়ার সময়।—স]

বার্তক পরিবারের আভিজাত্য বহু পুরাতন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল বলেই মনে হয়।

বর্সদ অঞ্চলের 'মিশকল্ক' নগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে সুরকারের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ 'গ্রেগরীয়াস বার্তক' বাস করতেন।

ঐ গ্রামের পুরাতন সমাধিস্থানে 'গ্রেগরীয়াস-বার্তক' ও তাঁর পত্নী 'মারিয়া গণ্ডোস' পাশাপাশি সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 'গ্রেগরীয়াস বার্তক' সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে, তিনি প্রায় পঁচাশি বছর বয়স অবধি বেঁচেছিলেন; পত্নী মারিয়া গণ্ডোসের মৃত্যুর পরও পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন বৃদ্ধ।

তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সুরকার উত্তরপুরুষ নামের পদবীটি বাদে আর কিছুর জন্য তাঁর কাছে ঋণী কি না তা অজানাই রয়ে গেছে চিরতরে।

কিন্তু গ্রেগরীয়াসের পুত্র জানোস বার্তক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আর একটু বেশি, আমরা জানি যে, তিনি ঐ ছায়া-শীতল, শান্ত পল্লীটির নোটারী ছিলেন।

প্রথম জানোসের পুত্র দ্বিতীয় 'জানোস' যিনি নাকি আমাদের সুরকারের সাক্ষাৎ পিতামহ, তুলনায় আরও অনেকটা কাছের মানুষ; আমরা জানি যে, আজীবন তিনি ঐ পল্লীতেই বাস করে গেছেন—যেখানে একদিন প্রথম পৃথিবীর আলো দেখলেন এই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ।

এই 'জানোস বার্তক' সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আমাদের জানা। তিনি ১৮১৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে মারা যান। তিনি ছিলেন সংযতমনা, বুদ্ধিমান, সাহসী ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট এক পুরুষ।

স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করে লড়াই করেছিলেন উনি, আর সে যুদ্ধের পরাজয়ে বহু বৎসর দেশ ছেড়ে বিদেশে কালযাপন করেছিলেন। সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন এই 'জানোস বার্তক' এবং এই সময়ে তিনি কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেছিলেন ও বেশ কয়েকটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

স্বগ্রামে ফিরে এসে তিনি স্থানীয় জমিদার কাউণ্ট নাকোকে প্রভাবিত করে, গ্রামে একটি কৃষিবিদ্যা শিক্ষণালয় স্থাপিত করান।

'জানোস বার্তক' হলেন এই শিক্ষণালয়ের প্রথম ডিরেক্টর এবং এই সময়ই তিনি বিবাহ করেন 'ম্যাটিণ্ড রকোভিক্সকে।'

পিতামহী 'ম্যাটিণ্ড রকোভিক্স' ছিলেন সার্ববংশীয়া। শ্লাভদের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর চরিত্রে পূর্ণমাত্রায়, তাঁর ইচ্ছাশক্তি ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং আরও কিছু ছিল; তিনি চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারতেন। তিনিই প্রথম ঐ পল্লীভবনে পিয়ানো বাদ্যযন্ত্রটি আমদানী করেন।

স্বামী-পুত্রের প্রতি ম্যাটিণ্ডের যে আকর্ষণ ছিল, সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণও তার চেয়ে কম ছিল না। পৌত্র পিতামহের কাছ থেকে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অসামান্য ধী, সহৃদয়তা ও স্বদেশভক্তি উত্তরাধিকারস্বরূপ লাভ করেছিলেন। সেই-সঙ্গে আরও পেয়েছিলেন, জ্ঞানতৃষ্ণা—প্রতিবেশী মানুষদের সম্পর্কে ঔৎসুক্য ইত্যাদি। পারিবারিক কিংবদন্তীতে শোনা যায় যে, 'জানোস বার্তক' বিদ্রোহী নায়ক 'স্যাণ্ডর রোজা'কে এত শ্রদ্ধা করতেন যে, বহুবার তাঁকে নিজের সুন্দর গৃহে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখতেন পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। এই আশ্রয়ে হানা দিয়ে ওই হাঙ্গেরীয়ান রবিনহুড ও তাঁর অনুচরদের সন্ধান করার দুঃসাহস হয় নি কারুরই।



● বেলা বার্তক: মা ও বোনের সঙ্গে

সূর্যাস্তের পর যখন আঁধার নেমে আসত হাঙ্গেরীয়ান মাটির বিস্তৃত বুকের উপর, তখন এইসব আইন ভাঙ্গা অতিথিরা বেরিয়ে আসত গোপন আশ্রয়স্থল থেকে ও লোকগাথা গেয়ে মনোরঞ্জন করত গৃহস্থ শিশুদের।

সবশুদ্ধ নয়টি ছেলেমেয়ে ছিল, আর তাদের মধ্যে বাপ-মায়ের চোখের মণি ছিল 'বেলা বার্তক'।

ভবিষ্যৎ-এ সে তার বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঐ কৃষি বিদ্যালয়ের পরিচালকের আসনে বসবে এরকম একটা সিদ্ধান্ত আপনা হতেই গড়ে উঠেছিল।

প্রথম বেলা বার্তকের জন্ম হয়েছিল ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে। তাঁর আকৃতি থেকেই প্রকৃতির আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পেত; চোখ দু'টি ছিল অনুজ্জ্বাব্যঞ্জক, পাতলা সুকুমার নাকের গড়ন,



● সায়রা বানু : ছায়াছবির বাইরে

প্রশস্ত ও উঁচু ললাটে আঁকা ছিল চারিত্রিক ঔদার্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয়।

পিতার চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল প্রখ্যাত সুরকার পুত্রের।

মাতা ম্যাটিণ্ডের কাছ থেকে সাঙ্গীতিক পারঙ্গমতাও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন প্রথম বেলা বার্তক, তিনি যে শুধু পিয়ানিস্টই ছিলেন তা নয়, চেলো বাজাতেও পারতেন তিনি খুব চমৎকার।

সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রেও দক্ষতা ছিল তাঁর, গ্রাম্য ধর্মসংগীত ও অর্কেস্ট্রার তিনিই ছিলেন পরিচালক।

স্থানীয় সঙ্গীত সমিতির তিনি ছিলেন স্থাপয়িতা ও সভাপতি এবং সঙ্গীত সম্বন্ধীয় স্থানীয় সবরকম কার্যক্রমের প্রাণপুরুষ স্বরূপ।

একটি সাময়িক পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন প্রথম 'বেলা বার্তক' এবং নিয়মিত লিখতেও অভ্যস্ত ছিলেন সেই পত্রিকায়।

এই হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত সুরকারের পিতার ছবি; তাঁর স্বভাব ছিল প্রাণচঞ্চল, ধী-শক্তি ছিল অনন্য-সাধারণ।

দূর দূর দেশে ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন তিনি, কিন্তু স্বদেশ ভ্রমণেও উৎসাহের অভাব ছিল না, প্রায়ই দেখা যেত অশ্বপৃষ্ঠে দীর্ঘপথ অতিক্রম করছেন উনি।

কৃষিবিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজ বেশির ভাগই চলত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের বুকে দাঁড়িয়ে, জমির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য।

'ম্যাটিল্ড রক্কোভিক্স' স্বামীর মৃত্যুর পরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন এবং জীবনের শেষ সে ক'টা দিন তিনি এই পুত্রের আশ্রয়েই অতিবাহিত করেছিলেন।

দৈনন্দিন জীবনের আর সব বিষয়ের মতই পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গীত সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা করতেন 'ম্যাটিল্ড'।

প্রথম বেলা বার্তকের পত্নী 'পলা জয়' নিজেও ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতশিল্পী।

'আমি মনে করি যে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার সব আগ্রহের মূলে রয়েছে এই কোমলা, মাধুর্যময়ী রমণীর প্রেরণা।'

সুপ্রসিদ্ধ সুরকার বেলা বার্তক নিজের হাতে লিখে ছিলেন তাঁর মার সম্বন্ধে।

অনুবাদিকা—রেবা লাহিড়ী।

চলচ্চিত্র সেন্সর

ডাঃ পি ভি রাজামান্নার

প্রাচীন রোমের একজন বিচারপতিকে বলা হত, 'সেন্সর'। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল, জনগণের নৈতিক চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখা। এখনও সেন্সর করা মানে বলতে আমরা এই নীতির কথাই বুঝি। কোনও কিছু ছাপান, প্রচার বা প্রদর্শনের ওপর যখনই কর্তৃপক্ষ নিষেধ-বিধি আরোপ করেন, তখনই তাকে 'সেন্সর' করা বলা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক মান উঁচু রাখা এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ।

সেন্সর করার মানেই সমালোচনা এবং দোষ ধরা। কাজেই কথাটা এবং কাজটা খুব জনপ্রিয় নয়। কারণ প্রচারের এবং প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে এটা খাপ খায় না। ভারতের সংবিধানের ১৯ নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিককে কথা বলবার এবং মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অধিকার একেবারে অখণ্ড অধিকার বা বল্গাহীন অধিকার নয়। সংবিধানের ১৯(২) ধারায় এই সব বাধা-নিষেধের কথা আছে। তাতে বলা হয়েছে—রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অন্যদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্যবোধ এবং নীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন করে এই অধিকার কিছু পরিমাণে খর্ব করতে পারেন।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে

চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় জনসাধারণের কাজে। প্রধানত এগুলি প্রমোদমূলক। অবশ্য কিছু কিছু চলচ্চিত্র তৈরি হয়, কেবলমাত্র শিক্ষাদানের জন্য। চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পীর কাজ। অবশ্য আরেক দিক দিয়ে এটি হল শ্রমশিল্প বিশেষ। চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সুবিধা হল, এটা সকলের কাছেই পৌঁছায়—সমাজের প্রত্যেক স্তরে এর গতি। কাজেই ছবির দর্শকদের মধ্যে থাকেন বুদ্ধিজীবীরা আবার তেমনি নিরক্ষররা। দর্শকদের মধ্যে থাকেন সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা আবার থাকেন অপরিণতবুদ্ধিরা। বই অথবা নাটকের চেয়েও চলচ্চিত্রের প্রভাব অনেক বেশি। কাজেই এর ভাষা, ভাব এবং চিত্রায়ণের ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ১৯৫৫ সালে এক চলচ্চিত্র আলোচনাচক্রে বলেছিলেন:

'সিনেমার প্রভাব বই, খবরের কাগজ, সাময়িক পত্র ইত্যাদির চাইতে অনেক বেশি। কাজেই এর গুরুত্বও বেশি। কাজেই সরকারকে এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়। কি ভাবে, সেটা অন্য কথা। এইসব শিল্পকলার ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করুক, এটা আমি চাই না। তবে যে জিনিসের প্রভাব এবং প্রসার এত বেশি, তার সম্বন্ধে সরকার উদাসীন থাকতে পারেন না। মূল কয়েকটি নীতি সম্বন্ধে একমত হতে হবে, সেটা বলা চলে না। সেই রেখার পরিবর্তনও সম্ভব।'

চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণ আইন

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র আইন বলতে প্রথম আইন পাশ হয় ১৯১৮ সালে। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয় কমিটি গঠন করে যে চলচ্চিত্রগুলি সাধারণের কাছে প্রদর্শনযোগ্য তার সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য। ১৯৪৯ সালে এই আইনের সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে এই ক্ষমতা নিয়ে নেন। পরে ১৯৫২ সালে নতুন এক সিনেমা আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার একটি চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড গঠন করেন। বোর্ডে একজন সভাপতি এবং অনধিক নয়জন সদস্য থাকেন। চলচ্চিত্র তৈরি হলে এই বোর্ডের কাছে আবেদন করতে হয়। বোর্ড ছবিটি দেখে হয় প্রদর্শনের অনুমতি দেন, না হয় বলে দেন যে, এই ছবি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, আর না হলে কিছু কাটছাঁট করতে বলেন। অথবা বলে দেন যে ছবিটি একেবারেই প্রদর্শন করা চলবে না।



● উত্তমকুমার প্রযোজিত 'ছোটী-সী-মুলাকাত' চিত্রের সেটে নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা

অবশ্য ছবিটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বলে সার্টিফিকেট দেবার আগে, অথবা কাটছাঁট করার আগে অথবা প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বাতিল করার আগে আবেদনকারীকে তাঁর বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয়।

কাজের সুবিধার জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং পশ্চিম বাংলায় আঞ্চলিক উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ডে কেন্দ্রীয় সরকার এমন কয়েকজনকে মনোনীত করেন, যাঁরা চলচ্চিত্র বাছাই-এর কাজে সুযোগ্য।

চলচ্চিত্রটি যদি সকলের জন্য প্রদর্শনযোগ্য হয় তাহলে সেন্সর বোর্ড এটিকে 'ইউ' সার্টিফিকেট দেবেন। যদি ছবিটি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হয়, তা হলে এটিকে 'এ' সার্টিফিকেট দেবেন। আইনের ধারায় সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় নিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সেন্সর বোর্ড কি কি কারণে ফিল্মে কাটছাঁট করতে পারবেন। অবশ্য সেন্সর বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করবার অধিকার প্রযোজকের আছে। এ রকম আপীল হলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তলব করে, প্রযোজকের মতামত নিয়ে আদেশ জারী করতে পারেন। ইচ্ছে হলে সেন্সর বোর্ডের সিদ্ধান্ত নাকচ বা সংশোধন করবার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের আছে।

সেন্সর বোর্ডের কাজ সম্পর্কে কয়েকটি নীতি নির্ধারিত



● হিন্দী 'উত্তরফাল্গুনী'র সেটে পরিচালক অসিত সেন নির্দেশ দিচ্ছেন অশোককুমার ও সুচিত্রা সেনকে



● অঞ্জনা ভৌমিক : 'রাজদ্রোহী'র নায়িকা

করা আছে। যেমন আত্মহত্যা, অস্ত্রোপচারের সময় খুঁটিনাটি দৃশ্য, যৌনব্যাধি, মহিলাদের অন্তর্বাস, কুরুচিপূর্ণ নাচ, কুরুচিপূর্ণ গান, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবমাননাকর দৃশ্য, শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, জঘন্য হত্যা, অযথা মাতলামির দৃশ্য, শ্রেণী-বিভেদ প্রচার, অর্থনৈতিকভাবে অর্থ আদায়ের দৃশ্য এবং জীবিত ব্যক্তির মানহানি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্রশিল্প সবচেয়ে বেশি উন্নত। সেখানেও কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলে একমত। মার্কিন চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি মিঃ এরিক জনস্টন বলেছেন, আইনের মধ্যে যে স্বাধীনতা, সেটাই আসল স্বাধীনতা। নৈতিক দিক বাদ দিয়ে কোনও স্বাধীনতাই চলতে পারে না। আইনের নিষেধের বাইরে অবাধ স্বাধীনতার অর্থই হল উচ্ছৃঙ্খলতা।

হয় সেন্সর প্রথা চালু রাখতে হয়, না হলে চলচ্চিত্রশিল্প যাতে নিজে থেকেই কিছু কিছু বাধা-নিষেধ রেখে কাজ চালান, তার ব্যবস্থা দেখতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশই এইসব নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী অর্থাৎ সেন্সর ব্যবস্থা সরকারের হাতে না দিয়ে চলচ্চিত্রশিল্প নিজেরাই একটি বিধি অনুযায়ী চলচ্চিত্র নির্মাণের পক্ষপাতী। দেখা যায় যে, ভারত সরকার যে নীতি অনুসারে সেন্সর

করে থাকেন, মার্কিন দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের নির্মাণ ও বিজ্ঞাপন বিধির ধাঁচও সেই রকমের। এই নীতিগুলির মোটামুটি ভিত্তি হল—

দর্শকদের নৈতিক দিক নিম্নমুখী করবে না, তারা পাপ এবং কুকর্মের প্রতি আকৃষ্ট অথবা সহানুভূতিশীল হবে না, আইনকে ব্যঙ্গ করে আইন ভঙ্গকে প্রশ্রয় দেবে না ইত্যাদি। যে সব ব্যাপারে এবং যে সব বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল অপরাধ, পাপ অথবা নীতিবিগর্হিত কাজ, নরনারীর যৌন-সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সরকারী চাকুরির প্রতি অসম্মান, আইন-শৃঙ্খলার বিরোধিতা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্কহানি, সামাজিক অশান্তি ও হিংসা ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, অপরাধ যারা করে তাদের মহান করে দেখানো উচিত নয় অথবা এমন ভাব দেখানো উচিত নয় যে, অপরাধ করলে সুফল পাওয়া যায়। নরনারীর সম্পর্কে ক্ষেত্রে বিবাহের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে কোনও দৃশ্য যেমন দেখানো উচিত নয়, তেমনি বলাৎকার, গণিকাবৃত্তি ইত্যাদিও দেখানো উচিত নয়।

তা ছাড়া কামোন্মত্ততা, নগ্নতা ইত্যাদি প্রদর্শকের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ চালু আছে।

বৃটেনে সরকারী কোনও সেন্সর প্রতিষ্ঠান নেই। তবে 'বৃটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সর' বলে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান আছে, এই বোর্ড সার্টিফিকেট না দিলে কোনও ছবি প্রদর্শিত হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন চলচ্চিত্র 'বিধি' আছে, বৃটেনে সেরকম কিছু নেই। বৃটেনে তিন রকম সেন্সর সার্টিফিকেট আছে। সাধারণভাবে সকলের কাছে প্রদর্শনযোগ্য, প্রাপ্তবয়স্কদেরই কাছে প্রদর্শন করলে ভাল হয় এবং কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

এইরকম স্বাধীন সেন্সর বোর্ডের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য সদস্যদের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। অবশ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে সেন্সর ব্যবস্থাও খারাপ নয়। যদি সদস্য মনোনয়নের সময় সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এবং চলচ্চিত্র শিল্পের ঠিকমত প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়।

সেন্সর প্রথা থাকলে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা হতে বাধ্য। অনেকে সমালোচনা করেন যে, বিদেশী ছবি একভাবে সেন্সর করা হয়, আর দেশী ছবি অন্যভাবে। এই ধরণের অভিযোগ নির্মূল হবার নয়। তবে খোলা মন নিয়ে সরকার যদি এইসব অভিযোগ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন, তাহলে অভিযোগের তীব্রতাও কমে যাবে।

—এ বি ই এফ কে/বি



● 'যৌবন সরসী নীরে'—তরুণী পরিবৃত এলভিস প্রেসলে

ক্লিফটন ওয়েব প্রসঙ্গে



ক্লিফটন ওয়েব আসছেন

অনবদ্য প্রতিভা আর অফুরন্ত যশ ছাড়াও এক ব্যাপক বৈচিত্র্য যে চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে ক্লিফটন ওয়েব তাঁদেরই একজন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের—উত্তরের, দক্ষিণের, পূর্বের, পশ্চিমের—অগণিত নরনারীকে দীর্ঘকাল ধরে যাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে আনন্দের রসাস্বাদনে তাঁর চারিত্রিক বৈচিত্র্যের বিবরণও কম রোমাঞ্চকর নয়।

একগোছা পাতলা চুল যাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে সেই একজোড়া উজ্জ্বল সতর্ক, সন্ধানী চোখের অধিকারী একহারা চেহারার মানুষটিকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় এক গম্ভীর মানুষ, কোন উত্তাপ নেই, চাঞ্চল্যের স্পর্শশূন্য, এক বিরাট গাম্ভীর্যের আবরণে অন্যান্যের কাছ থেকে নিজেকে যেন সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নিয়েছেন। মনে হয় লোকটি যেন সর্বতোভাবে স্বাতন্ত্র্যেরই উপাসক—কিন্তু যাঁরা তাঁর মনের খবর রাখেন, তাঁর হৃদয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করার অধিকার যাঁদের হয়েছে, তাঁর মনের অক্ষর পড়তে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের কাছেই জানায় ক্লিফটনের এটি প্রকৃত স্বরূপ নয়, এ আবরণই—এই আবরণের অন্তরালে লুকিয়ে আছে সেই মানুষটি যে অন্যান্যের মত হাসি, কান্না, আবেগ, অনুভূতির ধাতুতেই তৈরি।

বিদেশের চিত্ররাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁদের জানা আছে যে, সেখানে পরিচয় অপরিচয়ের বালাই নেই বললেই চলে, সকলেই সকলের বন্ধু 'ডার্লিং', 'হানি' প্রভৃতি ঘনিষ্ঠতাবাচক সম্বোধনগুলি অনায়াসে করা চলে। সেই পরিবেশেও, অন্তত বাহ্যিকদৃষ্টিতে ক্লিফটন গাম্ভীর্যময়, স্বল্পবাক, স্বতন্ত্র। দেড়শ' পাউণ্ড ওজনের, ছয় ফিটের কম দৈর্ঘ্যের বাহাত্তর বছর বয়স্ক এই প্রসিদ্ধির শিল্পীর সময়জ্ঞান বিস্ময়েরই উদ্রেক করে।

তিনি যখন প্রথম হলিউডে বাসা বাঁধলেন তাঁর সম্মানার্থে এক বিরাট ভোজসভা আয়োজিত হল। আয়োজক—মোশান পিকচার এ্যাকাডেমির সভাপতি মিঃ চার্লস বেকেট। সময় নির্ধারিত হল সাতটা। ক্লিফটন যখন পৌঁছলেন তখন অতিথি-অভ্যাগত তো দূরের কথা, বয়-বেয়ারাও পৌঁছয় নি। তাঁর এই প্রখর সময়জ্ঞান অনেক সময় অনুষ্ঠান-কর্ত্রীদের বিব্রতের কারণ হয়েও দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ-দর্শনে যাঁকে দেখলে স্বভাবতই একজন বৃটিশ ড্রিল-মাস্টারের ছবিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তিনি যে যোগসম্মত উপায়ে মাটিতে মাথা রেখে শূন্যে পা তুলে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন এ তথ্য হয়তো অনেকেরই অজানা।

দর্জিমহলে তিনি তো এককথায় আদর্শ। তাঁকে অনুসরণ করে দর্জিমহল এগিয়ে চলার চেষ্টা করেন। প্রথম দশজন সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত পুরুষের মধ্যে তিনি একজন—এ সম্মান বারংবার তাঁর দ্বারা অর্জিত হয়েছে। সকালে তিনি যখন কর্মক্ষেত্রে আসেন তখন অন্যান্য তারকাদের মত মোকাসিনে পা গলিয়ে তিনি না এলেও দেখা যায় তাঁর কোটের সঙ্গে ট্রাউজারটির ঠিক মিল আছে, সার্টটি বেশ উজ্জ্বল, টাইটিও মানানসই এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী। মাথার টুপিকে তিনি পরিচ্ছদের এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন। পোষাকের সামগ্রিক সৌন্দর্যের চাবিকাঠি তাঁর মতে 'টুপিতেই' নিহিত আছে। তাঁর মতে একজন মহিলাকে অভিবাদন জানানোর ক্ষেত্রে টুপির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। করমর্দন করে 'হি—হান' বলা অপেক্ষা মাথা থেকে টুপিটি হাতে নিয়ে বিনম্র অভিবাদন ঢের বেশি ব্যক্তিত্ব ও গুরুত্ব বহন করে।

সবচেয়ে মূল্যবান যে ওয়ার্ডরোব সেই ওয়ার্ডরোব তাঁর

অধিকারভুক্ত হয়েই। পরবর্তীটি দামী স্যুটের তিনি মালিক। কি পোষাক। কি বিনামা—তিনি যখনই কেনেন একেবারে ডজন হিসাবে কিনে নেন। সেবারে রোম থেকে তিনি যখন ফিরলেন তখন তাঁর সঙ্গে নানা জিনিসের মধ্যে এল চব্বিশটি স্যুট এবং দশজোড়া জুতো। তাঁর অবকাশের একটি সুদীর্ঘ অংশ কাটে বিভিন্ন দর্জির দোকানে। তখন সেই মুহূর্তগুলি তাঁর কাছে শুধু অবসরেরই নয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেরও।

ক্লিফটন ওয়েব অসীম অনন্ত অতলান্তিক অতিক্রম করেছেন অন্ততঃ আটচল্লিশবার। লণ্ডন, পারী, ফ্লোরেন্স, বেভারলি হিলস—প্রত্যেকটি জায়গাই যেন তাঁর স্বদেশ। প্রতিটি দেশের মাটির সঙ্গেই যেন তাঁর রক্তের টান। প্রতিটি অঞ্চলের সঙ্গেই যেন তাঁর জন্মান্তরের সম্পর্ক।

ক্লিফটন ভোজনরসিক। নিজে রন্ধনবিদ্যাবিশারদ না হলেও রন্ধনের বিভিন্ন কলাকৌশল, বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োগপ্রণালী সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। 'থ্রি কয়েনস ইন দ্য ফাউণ্টেন' ছবিটি তোলার কাজে রোমে অবস্থান সম্পূর্ণ করে হলিউডে ফিরে এসে তিনি ঐ চিত্র-সংস্থার সদস্যদের জন্যে আয়োজন করলেন যথেষ্ট জাঁকজমক সহকারে এক 'ইটালিয়ান ডিনার'-এর।

দৃষ্টিপথে মনের মত কোন জিনিস পড়লেই ক্লিফটন তা কিনবেনই। শিকাগোর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন ক্লিফটন—হঠাৎ চোখে পড়ল একটি দোকানে বিক্রির জন্যে সাজিয়ে রাখা একখানি সুদৃশ্য প্যাকার্ড। ব্যাস, দশ হাজার ডলারের সেই প্যাকার্ডখানি কিনে ফেললেন প্রথম দর্শনেই।

দোকানী তবু বলেন—একবার চালিয়ে দেখুন। কেনবার আগে একবার জিনিসটি পরীক্ষা করে নিন।

ক্লিফটনের বাঁধা উত্তর—ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাজ চলে যাবে।

যে ছবির ভূমিকালিপি তিনি সমৃদ্ধ করেন সে ছবি আজ অবধি কোন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় নি, একজন সাংবাদিকের এ প্রসঙ্গে উক্তি উল্লেখযোগ্য—

This presence in a cast assures class as well as cash.

শিল্পী হিসাবে নানা ধরণের চরিত্রের তিনি রূপ দিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রায়ণেই তিনি দেখিয়েছেন অসাধারণ নৈপুণ্য, অপরিসীম সৃজনীশক্তি। রেজোর্স এজ, লরা, সিটিং প্রেটি, থ্রি কয়েনস ইন দ্য ফাউণ্টেন টাইটানিক, ইম্পর্টেন্স অফ বিইং আর্নেস্ট, ম্যান হু কেম টু ডিনার, স্কাউটমাস্টার, দিস স্পিরিট প্রভৃতি অবিস্মরণীয় চিত্রগুলি তাঁকে উপনীত করেছে জনপ্রিয়তার সপ্তস্বর্গে। 'সিটিং প্রেটি'তে তাঁর বেলভেডিয়ারের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় ভোলার নয়। এই অভিনয় রাতারাতি তাঁকে যে 'সেনসেশান'-এ পরিণত করেছিল তার পিছনে তারুণ্যের, আকৃতিগত সৌন্দর্যের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, ছিল শুধু প্রাণবন্ত অভিনয়ের। সংখ্যাতীত বিব্রত পিতামাতার তাঁর কাছে শিশুপালন সম্বন্ধে উপদেশ চাওয়া চিঠিতে তাঁর ঘর ভরে গিয়েছিল।

১৮৯৩ সালের ১৯-এ নভেম্বর পরবর্তীকালে সাধারণ্যে ক্লিফটন ওয়েব নামে খ্যাত ওয়েব পারমিলি হোলেনবেক পৃথিবীর আলো জল বাতাসের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হোলেন। বাবা ইণ্ডিয়ানোপলিসের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন—তাঁর সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু চেষ্টা করেও জানা যায় না। মা একজন অভিনেত্রী। অভিনয়-জীবনকেই আদর্শরূপে ছেলের সামনে প্রথম থেকেই তুলে ধরেছিলেন তিনি। জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লিফটন মায়ের কাছে অভিনয়ের মন্ত্রদীক্ষা পেলেন। মায়ের কাছে তিনি রঙ্গলক্ষ্মীর আরাধনাই জীবনের দীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করলেন। বোস্টনের এ্যাবর্ন অপেরা কোম্পানীতে তাঁর শিল্পিজীবনের সূচনা। কিছুকাল পরে শিক্ষকতা শুরু করলেন একটি ঘর ভাড়া নিয়ে। ক্লিফটনের নিজের ভাষায়—'প্রথমে আমার দক্ষিণা ছিল পাঁচ ডলার করে তারপর শুনলাম কাসলরা পঁচিশ ডলার করে চাইছেন। তাই আমার দক্ষিণার



● গান্ধীজীর ভূমিকায় ক্লিফটন ওয়েব : সহশিল্পী হেলেন ব্রোডারিকসহ

নির্ধারিত অর্থ মা বাড়িয়ে দিলেন, সেই অর্থই শিক্ষার্থীরা আমাকে দিতে লাগল।

এই সময়ে ক্লিফটন ওয়েব লিসন লেস্টার, এ্যাজ ইউ ওয়্যার প্রমুখ সঙ্গীতমূলক কয়েকটি কমেডিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর ব্রডওয়েতে সুরু হল তাঁর অপ্রতিহত জয়যাত্রা। 'মিট দ্য ওয়াইফ,' 'সানি', 'থি_স এ ক্রাউড' প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৩৩ সালে ক্লিফটনের জীবন সাফল্যের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল, এই সময়ে জন ডি রকফেলার (সিনিয়র), নোয়েল কাওয়ার্ড এবং গান্ধীজীর চরিত্রে তাঁর রূপায়ণ, বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হল। একজন খ্যাতিমান সমালোচক এই প্রসঙ্গে উক্তি করেছিলেন—Clifton Webb is the most versatile of all American revue artists.

কর্মই তাঁর জীবনের ধর্ম। অবকাশ তাঁর কাটে কখনও দর্জির দোকানে কখনও বাড়ির বাগানের গাছপালার তদারকে। কিম্বা তাঁর অবকাশের মুহূর্ত দীর্ঘ হলেই তাঁর পক্ষে ভয়ানক মুস্কিলের কারণ হয়ে ওঠে। নিরবচ্ছিন্ন কর্মহীন অবস্থায় কাটানো তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য বললেই চলে। একবার ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ে মেট্রো-গোল্ডুইন মেয়ার তাঁকে একটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত করলেন। কিন্তু চিত্রনাট্য নিয়ে হঠাৎ এক দারুণ গোল বাঁধল, কাজ বন্ধ হয়ে গেল। চুক্তি অনুসারে আঠার মাস আটকে রইলেন ক্লিফটন, অবশ্য প্রতি সপ্তাহে তাঁর সর্তানুযায়ী সাড়ে তিন হাজার ডলার বেতনপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন বাধা আসে নি।

ক্লিফটনের আর একটি বিশেষ সখ আছে। চিত্রশিল্পীদের কীর্তিসংগ্রহ। আজ পর্যন্ত বহু বিদগ্ধ শিল্পীর অনেক মূল্যবান সৃষ্টি তিনি অধিকার করেছেন। তাঁর বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে কত গুণীশিল্পী আজ পাশাপাশি অবস্থান করছেন। সিজেন, মোনে, জন সিজার প্রভৃতি শিল্পীদের চিত্রে তাঁর ঘরের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

প্রবীণ শিল্পীর বৈচিত্র্যময় ঘটনাবহুল জীবনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা যা লক্ষণীয় তা তাঁর অচলা মাতৃভক্তি। তাঁর সামগ্রিক জীবনের রূপকার মা। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে মায়ের প্রভাব সুপরিব্যাপ্ত। আজও তাঁর দরদী কণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত হয়—আমার যা কিছু খ্যাতি, যশ, প্রসিদ্ধি সবই মায়ের জন্য, এ সমস্ত মায়েরই আশীর্বাদ।



বাম থেকে দক্ষিণে: অসিত সেন, অনিল গুপ্ত, বারীন ধর, সুচিত্রা সেন, অশিত চৌধুরী, অশোককুমার এবং জ্যোতি লাহা: হিন্দী 'উত্তরফাল্গুনী'র স্যুটিংয়ের অবসরে

প্রতিভাময়ী মঞ্চাভিনেত্রী মেরী উরি

১৯৫৫ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে মেরী উরি বলেছিলেন—

'I don't think I'm star material. I have probably been more of a failure than any of the people I knew at drama school.'

পরের বছর তাঁরই গলায় যুক্তরাজ্যের ভ্যারাইটি ক্লাব শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন, তিনি হয়ে উঠলেন লোকের মুখে-মুখে আলোচনার পাত্রী। নাট্যামোদীদের নয়নের মণি, দিকে-দিকে সাড়া জাগানো এক শিহরণ। মেরী নিজেও এতে কম বিস্মিত হন নি। সে বিস্ময়ের ঘোর হয়তো আজও তাঁর কাটে নি।

আজ থেকে ঠিক চৌত্রিশ বছর আগে, ১৯৩০ সালে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী গ্লাসগোয় তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন সিভিলিয়ান ইঞ্জিনীয়ার। ইয়র্কের মাউণ্ট স্কুলে তাঁর শিক্ষালাভ। জীবনের প্রারম্ভে এক রীতিমত দোটানায় পড়তে হয়েছিল তাঁকে। অঙ্কনবিদ্যা আর অভিনয় সমান আকর্ষণ নিয়ে দেখা দিল তাঁর জীবনে।

কার আকর্ষণ বেশি, কার আকর্ষণ কম তা নিরূপণ করা অসাধ্য হয়ে ওঠে কিশোরী মেরীর পক্ষে। উভয়ের মধ্যেই সমান রসের সন্ধান পান মেরী উরি। শেষে অভিনয়ই জয়লাভ করল। ইয়র্কের একটি মেলায় অভিনয়ের জন্য ১৯৫০ সালে তিনি আবেদন করে বসলেন। সেই অভিনীতব্য নাটকে ভার্জিন মেরীর ভূমিকা তাঁকে দেওয়া হল। সেই একটি অভিনয়ই তাঁর সারা জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দিল, সেই অভিনয়ের মধ্যেই তাঁর জীবন-দেবতার নির্দেশ পেলেন যে, অভিনয়ের সাধনাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পরম সাধনা।

নাট্যশিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন মেরী। লণ্ডনের সেণ্ট্রাল স্কুল অফ স্পীচ এ্যাণ্ড ড্রামাটিক আর্টের শিক্ষণ সম্বন্ধে পাঠ নিতে থাকেন মেরী। অল্পদিন যেতে না যেতেই মেরী বুঝলেন—অভিনয় তাঁর ব্রত শিক্ষাদান নয়। পেশাদারীভাবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ওয়েস্ট এণ্ডে 'সাইমন এ্যাণ্ড লরা'য়। পরবর্তী অভিনয় 'টাইম রিমেমবার্ড' নাটকে—এই অভিনয় তাঁকে এনে দিল বিপুল যশ, অফুরন্ত প্রসিদ্ধি। সেই নাটকে যে ভূমিকা মেরী গ্রহণ করেছিলেন বহু বছর পূর্বে সেই ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ভিভিয়ান লে (৫২)।

জনপ্রিয়তা অর্জনের মামুলী পন্থায় মেরী বিশ্বাসী নন। তিনি তাঁর সাধনায় একনিষ্ঠ থাকতে চান। তথাকথিত জনপ্রিয়তা তাঁর মতে শেষ কথা নয়। তিনি মনে করেন যে, কে কি বলল না বলল এই দিকেই যদি শিল্পীর নজর থাকে তা'হলে তিনি কোনদিন সত্যিকারের কাজ করতে পারবেন না। তিনি যখন নাটকটি পড়েন, তখন গল্প বা নাট্যকার সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র সচেতন থাকেন না। সে-সময়ে চরিত্রটির ভাব, ভাষা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা তাঁর একমাত্র চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। যে নাটকটি তাঁকে অপরিসীম জনপ্রিয়তা এনে দিল সেই নাটকের রচয়িতা জন অসবোর্ন! সম্ভাবনাময় উদ্দীপ্ত সেই তরুণের সামনে সেদিন মুখোমুখি দাঁড়ালেন শক্তিময়ী এক তরুণী। সেই প্রথম সাক্ষাৎ মধুময় পরিণতি পেল ১৯৫৭ সালের অগাস্ট মাসে। চেলসি রেজিস্টার অফিসে মেরী হলেন অসবোর্নের স্ত্রী।

একটি চরিত্রের রূপদানের জন্য মেরী যথেষ্ট পরিশ্রম করে থাকেন। ফাঁকি দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কাজ করার তিনি পক্ষপাতী নন। 'হ্যামলেট'-এ ওফেলিয়ার ভূমিকায় অভিনয়ের পূর্বে কিছুকাল ধরে তিনি নিয়মিত মানসিক চিকিৎসালয়ের রোগিণীদের অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করে গেছেন। 'ওথেলো'য় পল রোবসনের বিপরীতে ডেসডিমোনার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ভোলা যায় না। তাঁর প্রাণস্পর্শী অভিনয় অভিভূত করে দিয়েছিল দর্শকসাধারণকে। দ্য-ক্রুসিবল, এ ভিউ ফ্রম দ্য ব্রীজ প্রভৃতি নাটকগুলিতে তাঁর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

কাজের জন্যে নানা জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়। কিন্তু চেলসি কটেজে—তাঁর নিজস্ব বাড়িটিতে দিন কাটানোয় তিনি আনন্দ পেয়ে থাকেন সর্বাধিক।



● সুন্দরী মেরী উরি

বুনো পশ্চিম ছবিতে এলকে সোমের

পশ্চিম জার্মানীর চিত্রতারকা এলকে সোমের যিনি হলিউডের বিভিন্ন স্টুডিয়োতে অভিনয় করে যশ ও অর্থলাভ করেছেন, বর্তমানে তিনি একজন জার্মান ডিরেক্টারের পরিচালিত একটি ছবিতে অভিনয় করছেন। এই পরিচালকের নাম আল্‌ফ্রেড ফোহরের। এতকাল তিনি এডগার ওয়ালেসের গোয়েন্দা কাহিনীগুলিকে চিত্ররূপ দান করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন, এবার তিনি সমান জনপ্রিয় কাল মে রচিত ওয়াইল্ড ওয়েস্ট বা বুনো পশ্চিম কাহিনীগুলিকে চিত্ররূপ দানে হাত দিয়েছেন। কার্ল মে রচিত এই কাহিনীটি হচ্ছে শকুনিদের জন্যে। অবশ্য ছবিতে এই কাহিনীর নাম পাল্টে রাখা হয়েছে ডিনেটাউ ও ভালুক শিকারী। ছবিতে এলকে এ্যানি নামে একটি সুন্দরী কড়া জবরদস্ত বুনো পশ্চিমী মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন একদা বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা হাইনরিস জর্জের ছেলে গোয়েটজ জর্জ ও স্টুয়ার্ট গ্র্যাঙ্গার। যুগোশ্লাভিয়ায় ছবিটির বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে। —ডি এ ডি।

● এলকে সোমের



চেলোশিল্পী এ্যাঞ্জা থর

(অক্লান্ত সাধনার এক মূর্তিময়ী সার্থকতা)

গভীর অধ্যবসায়, প্রভূত পরিশ্রম এবং একাগ্র সাধনায় যাঁরা জীবনের লক্ষ্যে উপনীতা হতে পেরেছেন, চেলো-শিল্পী এ্যাঞ্জা থর সেই তালিকায় এক উল্লেখযোগ্য নাম। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ১৯৪৫ সালে তাঁর জন্ম। ৩রা জুলাই তাঁর জন্মদিন। ল্যুবেকে তাঁর জন্ম কিন্তু তিনি মানুষ হয়েছেন ট্রেভেমিউণ্ডে। চেলোর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে মাত্র বছরপাঁচেক আগে, সেই পরিচয়ের সুফল সম্বন্ধে অবশ্যই আজ আর রসিকসমাজে কোন



● এ্যাঞ্জা থর

সংশয় বা জিজ্ঞাসা নেই। জার্মানীর বিখ্যাত চেলোবাদক লাডউইগ হোলসার তাঁর প্রথম গুরু। শিক্ষালাভের প্রথম বছরটি অতিক্রান্ত হতেই প্যারিসে সুবিখ্যাত Conservatoire N al Superieure de Musique-এ যোগদানের জন্য তাঁকে স্কলারশিপ দিলেন 'কালচারাল সার্কেল উইদিন দ্য ফেডারেল এ্যাসোসিয়েশন অফ জার্মান ইণ্ডাস্ট্রি।' সেখানে তিনি আচার্যরূপে পেলেন আঁদ্রে নাভারাকে। একবছর পরে সেখানকার সর্বোচ্চ-স্বীকৃতি নিয়ে পাঠ সমাপ্ত করলেন। সারা পৃথিবী থেকে যোগদানকারী বাইশজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে লাভ করলেন গ্র্যাণ্ড প্রাইজ। এই পুরস্কার বা স্বীকৃতি তাঁর জীবনে এক বিরাট মূল্য নিয়ে দেখা দিল। তাঁর চলার পথ এবার এক বৃহত্তর পটভূমির দিকে মোড় নিল।

'সেণ্ড মি নো ফ্লাওয়ার' একটি দৃশ্যে রক হাডসন ও ডোরিস ডে

একনিষ্ঠ সাধনা তাঁর জীবনে এনে দিয়েছে যশ, খ্যাতি, সফলতা তবু তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এখনও সীমাহীন। সে এক একাগ্র তপস্যা বললেও অতিরঞ্জন হয় না। এখনও প্রতিদিন আট ঘণ্টা ধরে তিনি অনুশীলন করে থাকেন।

তাঁর জীবনের গঠনপর্বে এবং সাফল্যের মূলে তাঁর মা—একদা বেহালাবাদিকারূপে যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারিণী রুথ মেস্টার থরের অবদান। তাঁর যত্ন, নিষ্ঠা, তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশনা রসিকসমাজে এক শক্তিময়ী শিল্পী উপহার দিয়েছে, সুরের আকাশে আবির্ভাব ঘটিয়েছে এক উজ্জ্বল তারার। এই প্রসঙ্গে, তাঁর নামোল্লেখ না করলে এই জীবনালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মহানগরীতে শেক্সপীয়র-নাট্যোৎসব

মহাকবি শেক্সপীয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন-মানসে লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্ক মুক্ত অঙ্গন থিয়েটারে দ্য নিউ শেক্সপীয়র কোম্পানী কলকাতার রসিকসমাজে তাঁদের অসামান্য অভিনয়ের দ্বারা সম্প্রতি অপরিসীম আনন্দ উপহার দিয়ে গেলেন। বৃটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় এই নাট্যোৎসবের আয়োজন নানাদিক দিয়ে যথেষ্ট উল্লেখের দাবীদার। এই ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায় তেত্রিশজন শিল্পীর সমন্বয়ে গঠিত। কলকাতায় তাঁরা মহাকবির তিনটি নাটক অভিনয় করলেন। যথা—দ্য টেম্পেস্ট, কিং রিচার্ড দ্য সেকেণ্ড এবং দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু। প্রথম দুটি এবং শেষোক্ত নাটকটির পরিচালনভার গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডেভিড উইলিয়াম এবং ভ্লাদেক শেবল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে অ্যামাণ্ড রেস, জন ওয়াইজ, এডওয়ার্ড এটিবেঞ্জা, উল্‌ফ মরিস আর্থার হাওয়ার্ড, জন কাসল, ডেভিড কিং, শীলা ব্যালেণ্টাইনের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যসেবীদের অভিনয়

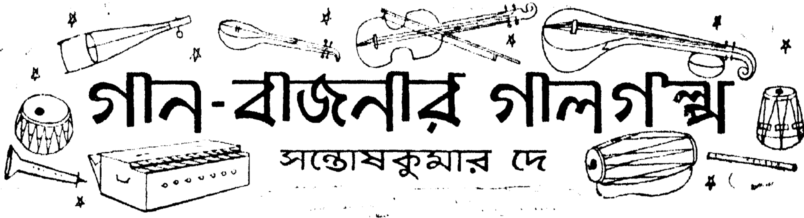
গত ৩০শে ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে বাঙলার কয়েকজন সাহিত্যসেবী দিলীপ দাশগুপ্ত রচিত 'ময়ূরপুচ্ছ' নাটকটি অভিনয় করলেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন নরেন্দ্র দেব, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, অখিল নিয়োগী, দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুকমল দাশগুপ্ত, দিলীপ দাশগুপ্ত, রেবতীভূষণ ঘোষ, রণজিৎ দত্ত, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, মাখন সরকার, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বীরেন বল, সুধা দাশগুপ্ত, চিত্রা মুখোপাধ্যায়, উমা বর প্রভৃতি। নাটকটির প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হন কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীতশিল্পীর সরকারী বৃত্তিলাভ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র ও শিষ্য তরুণ শিল্পী শ্রীশিবনাথ ঘোষ বিভিন্ন সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তরুণ শিল্পীদের বৃত্তিদান পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালে সেতার শিক্ষার জন্য ভারত সরকারের ২৫০৲ টাকার বৃত্তি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি প্রখ্যাত ওস্তাদ আলি আকবর খানের নিকট সঙ্গীতচর্চা করছেন। এই উদীয়মান শিল্পীর রাগবিস্তার বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক।



● সম্প্রতি মৃত হাস্যরসিক হার্পো মার্ক্স



গান-বাজনার গালগল্প

সন্তোষকুমার দে

চার

সুর ধরে রাখা

এমিল বার্লিনার ছিলেন জাতিতে জার্মান, কিন্তু চাকরি করতেন আমেরিকায়। প্রথমে ছিলেন নিউ ইয়র্কে কিন্তু বিধাতার দুজ্ঞেয় ইঙ্গিতে তিনি একটি কেরাণীর কাজ নিয়ে চলে গেলেন ওয়াশিংটনে। সেখানেই তখন চলছিল নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, টেলিফোন নিয়ে, ফনোগ্রাফ নিয়ে।

বার্লিনার সারাদিন কেরাণীর কলম পিষে রাতে ঘরে ফিরে ফিজিক্স-এর বই নিয়ে পড়তেন। পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর কোনও ডিগ্রি ছিল না, কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের এই দুইটি শাখায় আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করতেন। ফলে সামান্য দু'খানি পদার্থ বিদ্যার পুস্তকের সহায়তায় তিনি এমন একটি টেলিফোন ট্রান্সমিটার খাড়া করলেন যা তৈরি করতে লেগেছিল বাচ্চাদের খেলনা একটি ঢোলকের খোল, একটি সুচ, একটি ইস্পাতের বোতাম আর খানিকটা গীটারের তার। অথচ সেই সামান্য যন্ত্রটির পেটেন্টের জন্য বেল টেলিফোন কোম্পানী তাঁকে এককালীন পঁচিশ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা দিয়েছিল, তা বাদে বাৎসরিক পাঁচ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ভাতা দিত। অচিরেই বার্লিনার তাঁর কেরাণীর কাজ ছেড়ে দিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন।



● অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

ডিস্ক রেকর্ড বা চাকতি রেকর্ডের আবিষ্কর্তা হিসাবে বার্লিনারের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে—যদিও এর মৌলিক চিন্তা তাঁর নিজস্ব নয়। সিলিণ্ডার রেকর্ড তৈরি করবার সময় (১৮৭৭) ডিস্ক রেকর্ড তৈরি করবার কথাও ভেবেছিলেন এবং এক বছরের পরীক্ষামূলকভাবে ডিস্ক রেকর্ডও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু চঞ্চল স্বভাব এডিসন তা নিয়ে আর বেশিদূর অগ্রসর হন নি। বস্তুত তিনি গ্রামোফোন নিয়ে পরীক্ষাও সাময়িকভাবে ত্যাগ করে বৈদ্যুতিক বাতি নিয়ে গবেষণায় মেতে ওঠেন এবং তিন বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ বিষয়ক ১৯০টি পেটেন্ট গ্রহণ করেন।

সিলিণ্ডার রেকর্ডে শব্দতরঙ্গের রেখার গতি সমানভাবে একদিক হতে সুরু হয়ে ঘূর্ণয়মান নলের গায়ে আঁকা হত, তাতে নলটির ঘূর্ণনবেগ সব সময় সমান রাখা যেত। ডিস্ক রেকর্ড শব্দতরঙ্গের রেখাচিত্র বাইরে থেকে গোলাকারে ক্রমে ছোট হতে হতে কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে যায়। এর ফলে বাইরের দাগটি যে বেগে ঘোরে, কেন্দ্র সন্নিহিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃত্তগুলির ঘূর্ণন তা থেকে ভিন্নরকম হয়ে যায়। বার্লিনার তার প্রতিষেধক ব্যবস্থাও করেছিলেন। তা ছাড়া দীর্ঘ আট বছর ধরে নিরন্তর চেষ্টা করে তিনি শুধু ডিস্ক রেকর্ড নিখুঁত করলেন তাই নয়, সে রেকর্ড ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি করাও সুরু করেন।

সিলিণ্ডার রেকর্ডের গায়ে শব্দতরঙ্গের যে রেখা আঁকা হত তার স্পষ্টতা ও সূক্ষ্মতা গায়কের কণ্ঠশক্তির উপর নির্ভর করত, ফলে যেসব গায়ক খুব চড়া সুরে গাইতেন তাঁদের গান সিলিণ্ডার রেকর্ডে অধিকতর স্পষ্ট শোনাত।

সিলিণ্ডার রেকর্ড প্রথমে প্রত্যেকটিই গায়ক গাইবার সঙ্গে সঙ্গে কাটা হত; পরে এই ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং একবার গায়ক গাইলে একসঙ্গে কুড়িটা পর্যন্ত সিলিণ্ডার তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তার বেশি রেকর্ড তৈরি করতে হলে গায়ককে আবার ডাকতে হত, তার অর্থ বারবার রেকর্ড করে তবেই একখানা গানের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানো সম্ভব হত। তবে তাতেও একই গান একই গায়কের কণ্ঠে প্রত্যেকবার একই রকম হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না।



● স্যুটিংয়ের অবসরে পিয়ানোবাদনরতা নন্দিতা দেবী

সিলিণ্ডার রেকর্ড গোল আকারের, তাই একসঙ্গে বেশি সংখ্যায় রেকর্ড রাখতে অনেক স্থান দরকার হত, ফলে শুধু ঘরে রাখবার অসুবিধাই নয়, ব্যবসায় হিসাবে সরবরাহ করতেও বেশ বেগ পেতে হত।

ডিস্ক রেকর্ড এই অসুবিধাগুলি দূর করে অতি অল্পদিনেই বাজার অধিকার করলে। বার্লিনার কাচ বা দস্তার পাতের উপর ফোটোগ্রাফিক ইমালসান মাখিয়ে তারপর শব্দতরঙ্গের রেখা এঁকে নিয়ে সেটি এসিডে খাইয়ে সেই রেখা গভীরভাবে এঁকে নিতেন। এসিডের সহায়তা নেওয়ায় গায়ককে তার কণ্ঠশক্তির উপর নির্ভর করতে হত না। তা ছাড়া এই উপায়ে একখানি মূল রেকর্ড হতে স্ট্যাম্পার তৈরি করে সেই ছাঁচে শক্ত রবার-এর মণ্ড নিয়ে ছেপে রেকর্ড তৈরি করা হত, ফলে যতগুলি খুশি রেকর্ড একখানি মূল রেকর্ড হতেই তৈরি করা যেত। এতে যে কেবল গায়ক বারম্বার গাইবার বিড়ম্বনা হতে বাঁচত তাই নয় গানের গুণগত বৈশিষ্ট্যও অক্ষুণ্ণ থাকত। ডিস্ক রেকর্ড কেবল সহজে হাজার হাজার তৈরি করাই যেত না, তা সহজে অল্পস্থানে অধিক পরিমাণে রাখা যেত যাতে শুধু শ্রোতারা খুশি তাই নয়, ব্যবসায়ীরাও তা সহজে নানাস্থানে পাঠাতে পারত। ডিস্ক রেকর্ডের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এডিসন ফনোগ্রাফিক যন্ত্রের সিলিণ্ডার রেকর্ডও ছাঁচে তৈরির ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি ডিস্কের অন্যান্য সুবিধাগুলি জয় করতে পারলেন না। ক্রমশ সিলিণ্ডার রেকর্ড বাতিল হয়ে সবত্র ডিস্ক রেকর্ড চালু হল।

বার্লিনার শুধু ডিস্ক রেকর্ড নিখুঁত করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর আত্মীয় এবং সহকারী গেইসবার্গ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহায়তায় ডিস্ক রেকর্ডের বিরাট সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতেও সমর্থ হন। তিনি আমেরিকার পরে ইউরোপেও ডিস্ক রেকর্ড প্রবর্তন করেন এবং লণ্ডনের গ্রামোফোন কোম্পানী বার্লিনারের কোম্পানীরই ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান। এই বৃটিশ কোম্পানীর পক্ষ হতেই ফ্রেডারিক গেইসবার্গ ১৯০২ সালে ভারতবর্ষে আসেন এবং আজও ভারতবর্ষে সেই গ্রামোফোন কোম্পানীর কারখানা চালু আছে। সুতরাং ভারতের ঘরে ঘরে যে রেকর্ড চলছে, যার দৌলতে এখন গান-বাজনা এমন ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছে তার জন্যও আমরা বার্লিনারের কাছেই ঋণী।

টেপ রেকর্ড এখনও ডিস্ক রেকর্ডের স্থান সম্পূর্ণ দখল করতে না পারলেও সুর ধরে রাখবার ক্ষেত্রে টেপ রেকর্ডের তুলনা হয় না। টেপ দিয়ে কেবল যে বড় বড় ওস্তাদের তালিম বা তার সঙ্গীত ধরে রাখা যায় তাই নয়, বক্তৃতা, স্বীকারোক্তি, বিবৃতি, অনুভূতি—যা খুশি, যখন খুশি, যেখানে খুশি রেকর্ড করে রাখা যাচ্ছে। তেনজিংরা গেলেন এভারেস্টের অভিযানে, হিলারী সঙ্গে নিয়েছিলেন টেপ রেকর্ডার, যখন যেমন অনুভব করেছেন বলে বলে রেকর্ড করে রেখেছেন। টেপ বাজিয়ে যে-কোন বিষয় আবার রেডিওতে প্রচার করা যাচ্ছে। অশরীরী সুরপরীরা আজ ঝাঁকে ঝাঁকে দলবলে ধরা দিচ্ছে, সুর ধরে রাখা আজ আর সমস্যা নয়, সমস্যা হল সুরসৃষ্টি, সুর পরিবেশন—আর সেখানেই শিল্পীর আসন বিজ্ঞানীর উপরে। এবারে বলছি তাই সুরস্রষ্টাদের কথা। [ক্রমশ।



● 'ভূত বাঙলোর' একটি আবেগমধুর দৃশ্যে তনুজা ও পরিচালক শিল্পী মাহমুদ

'বর্তমানে প্রধান অভাব যোগ্য শিক্ষকের'—

—জহর গঙ্গোপাধ্যায়

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

অভিনয়ের রেকর্ডে 'সাজাহান' নাটকটিই বোধ করি বাঙলা ভাষায় রচিত অন্যান্য নাটকগুলিকে অতিক্রম করে গেছে। বিভিন্ন ক্লাব, অফিসের প্রমোদবিভাগে 'সাজাহান' আজও অপরিহার্য বললে অত্যুক্তি হয় না। কালের অগ্রগমন তার চাহিদাকে এখনও পর্যন্ত ম্লান করতে পারে নি। 'সাজাহান' নাটকটির নাম-ভূমিকায় এবং অন্যান্য ভূমিকায় আজ পর্যন্ত বাঙলার বহু বরেণ্য শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। নটগুরু শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি দিকপাল স্রষ্টার দল বারম্বার এই নাটকের নাম ভূমিকায় পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদেরও আগে এই বিখ্যাত ভূমিকাটিতে সর্বপ্রথম দেখা দেন প্রিয়নাথ ঘোষ।



● জহর গঙ্গোপাধ্যায়

১৯২৫ সালে নিউ কোহিনূর থিয়েটারে 'সাজাহান'-এ মহম্মদের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে একটি একুশ বছরের তরুণকে নিয়ে এলেন প্রিয়নাথ ঘোষ। সেদিন দিলদারের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী—জাহানারা ও পিয়ারার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন যথাক্রমে তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী। আর মহম্মদের ভূমিকায় অভিনয়কারী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সদ্য-আগত সেই তরুণটি আজ সারা বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রবীণ শিল্পী—তাঁর নাম জহর গঙ্গোপাধ্যায়। সেই দিনটি থেকে দেখতে দেখতে চল্লিশ বছর কাটল। কত ঘটনার ঘনঘটা বয়ে গেল দেশের নাট্য জগতের উপর দিয়ে। কত দিকপাল শিল্পীর মহাপ্রস্থান ঘটল, কত শক্তিমান স্রষ্টার হল আবির্ভাব, এই সবের মধ্যে তাই জহর গঙ্গোপাধ্যায়ও রঙ্গজগতে এক জীবন্ত ইতিহাসে আজ পরিণত।

দোগাছিয়ার (চব্বিশ পরগণা) স্বর্গত ডাঃ নীলরতন গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র জহরলাল—অন্তরঙ্গমহলের 'সুলালদা' ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর। ১৯২৩ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে মাত্র উনিশ বছর বয়সে বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৯২৫ সালে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভাব। চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় ১৯২৮ সালে, স্বনামধন্য অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তী পরিচালিত নির্বাক ছবি 'গীতা'য়। তারপর অসংখ্য নাটকে এবং ছবিতে তাঁর প্রাণস্পর্শী স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দেখবার সুযোগ জনসাধারণ পেয়েছেন এবং এই নিরবচ্ছিন্ন অভিনয় তাঁকে ভরিয়ে দিয়েছে অফুরন্ত যশ, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিতে। শিল্পী হিসাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার চাবিকাঠি তাঁর মতে রঙ্গমঞ্চের হাতে। তিনি বলেন—সেখানে অনেক নাটক দেখার সুযোগ, করার সুযোগ, সর্বোপরি ভুলত্রুটি সংশোধনের সুযোগও বর্তমান। আজকের দিনের নাটক ও শিল্পী প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্নায়িত হলে উত্তর দেন—আগে বছরে অনেকগুলি নাটক হোত। এখন একটি নাটক চার বছর চলছে, এতে নতুনত্বের করাঘাত আর শ্রুত হচ্ছে না। তারপর শিল্পীর মধ্যেও গতানুগতিকতা এসে যাচ্ছে, তার উন্নতি এতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

জহর গঙ্গোপাধ্যায় আগে নিয়মমাফিক স্ব-অভিনীত ছবিগুলি দেখতেন, দর্শক হিসাবে নিজের অভিনয়ের চুলচেরা সমালোচনা করতেন। নিজের দোষগুণ সম্বন্ধে রাখতেন প্রখরদৃষ্টি।

সেদিন জিজ্ঞাসা করলুম—আজ পর্যন্ত এত অভিনয় করলেন—তার মধ্যে কোন অভিনয় আপনি আজও ভুলতে পারেন নি, আপনার অন্যান্য অভিনয়ের তুলনায় যে আপনার মনপ্রাণ জুড়ে আছে।

একটু ভেবে উত্তর দেন—'নন্দিনী'তে যে চরিত্রে আমি অভিনয় করি। পরিচালক হিসাবে ঐ ছবিটিকে কেন্দ্র করে শৈলজানন্দেরও চিত্রজগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ যুগের নাটকে যান্ত্রিকতার প্রয়োগ এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি মোটেই নৈরাশ্যবাদী নন। নাটকে যান্ত্রিকতার আধিক্য, তাঁর মতে নাটকের ক্ষতির কারণ হতে পারে না।

সাগ্রহে প্রশ্ন করি—সে যুগের অভিনয়-জগতের রীতি-নীতি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তর আসে—তখন কাজ করা কিন্তু শক্ত ছিল। মহড়াতেই পুরো কাজ শেষ করতে হোত। স্মারক তখনও ছিলেন, তবে এখনকার ধারা অনুযায়ী প্রধান নির্ভর হিসাবে সেদিন তাঁরা বিবেচিত ছিলেন না। মুখস্থ করতে হোত পুরো, তাও বাড়িতে মহড়ায় বসে নয়। মহড়া একরকম পরীক্ষাগার ছিল বললেই চলে। তারপর কি জান—তখন ভাল ভাল শিক্ষক ছিলেন, এখনকা'র দিনে যে অভাব ভয়ানক চোখে পড়ে।

ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে পৌরাণিক নাটকে অভিনয় করেই তৃপ্তি পান জহর গঙ্গোপাধ্যায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করেন—ওতে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে অভিনয় করার সুযোগ আছে যে।

অভিনয় ছাড়া আরও একটি জগৎ তাঁকে হাতছানি দেয়। খেলার জগৎ। কাজে অবকাশ পেলেই মোহনবাগানের দিকে পাড়ি জমান জহর গঙ্গোপাধ্যায়। ঐ ক্লাবের হকি-সেক্রেটারীর আসনে দীর্ঘদিন তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সবশেষ জিজ্ঞাসা করি—সুদীর্ঘকাল এই জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে যে অভিজ্ঞতা আপনি অর্জন করলেন—দু'-এক কথায় তা ব্যক্ত করবেন?

একটু ভেবে স্মিতহেসে উত্তর দিলেন অভিনয়জগতের অন্যতম দিকপাল—পরিতৃপ্তি।

'অনেক দুঃখ, জ্বালা, যাতনার পর জীবনে কমেডি আসে।'

—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

[একটি সাক্ষাৎকার—নিজস্ব প্রতিনিধি]

একেবারে বিপরীত। লোহার জগৎ থেকে রসের জগৎ। ১৯৫৬ পর্যন্ত তবু দু'টি বিভিন্ন জগতের সঙ্গেই সমান সংযোগ ছিল কিন্তু তারপর প্রথমটির সঙ্গে সমস্ত যোগ একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টিরই এখন পুরাপুরিভাবে বাসিন্দা। স্টীল কনট্রোলের প্রাক্তন কর্মী বর্তমানে বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ কৌতুকশিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথাগুলির লক্ষ্য।

একুশ বছর বয়েস তখন। ১৯৪১ সাল। কলকাতায় এলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টীল কন্‌ট্রোলের কাজ নিয়ে। কিন্তু অভিনয়ে হাতেখড়ি তখন হয়ে গেছে, ছেলেবেলাতেও অপরিণত মনে অভিনয়ের এক প্রবল ইচ্ছা দানা বেঁধে উঠত। ছাত্রজীবনে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে তাঁর বাচালের ভূমিকায় অভিনয়ের স্মৃতি নানাকারণে মনে স্থায়ী হয়ে আছে। দর্শকের সমাদর ও অভিনন্দনের প্রাচুর্য ও অকৃত্রিমতাই তার একমাত্র কারণ নয়, তার মুখ্য কারণ সেদিন দর্শক হিসাবে তিনি লাভ করেছিলেন বাঙলার একাধিক কৃতবিদ্য সন্তান ও দেশবরেণ্য মনীষীকে। এই তালিকায় মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ শহীদুল্লাহ, জসীমউদ্দীন, ডঃ এইচ এল দে, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য নাম।



● ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতায় শিল্পিজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর প্রথম অভিনীত ছবি ও প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি এক নয়। প্রথম স্যুটিং করেন 'জাগরণ'-এ কিন্তু প্রথম মুক্তি পেল 'যা হয় না'। হিন্দী ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন ('এক গাঁও কী কাহানি' ও 'বন্দীশ')।

আজ দীর্ঘকাল যাবৎ বেদনাজর্জর সমস্যাক্লিষ্ট অসংখ্য মানুষের মধ্যে হাসির তুফান যাঁরা ক্ষণকালের জন্যেও বইয়ে দিচ্ছেন—ভানু বন্দোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। আমাদের বঞ্চনাহত জীবনে তাই এঁদের গুরুত্ব কম নয়, এঁদের কল্যাণে দুঃখের সীমাহীন সমুদ্রে মাঝে মাঝে কয়েকটি আনন্দের দ্বীপপুঞ্জের সন্ধান মেলে, ব্যথার অপরিসর কোণ থেকে এঁরা মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে যান তৃপ্তির বিরাট আঙিনায়, যার তাৎপর্য আমাদের জীবনে অপরিসীম। তাই, হাস্যরসের প্রয়োগ ও কৌতুক শিল্পীকে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনা চলছিল।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজ যে অভিনয় দেখতে পাচ্ছেন—এ ধরণের অভিনয় করার ইচ্ছা তাঁর নিজের কিন্তু মোটেই ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন 'সিরিও-কমিক' অভিনয় করতে। পূর্ববর্তী যুগে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কার্তিক দে, মন্মথনাথ পাল এবং স্বয়ং শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, রবি রায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দিকপাল শিল্পীরা যে-ধরণের অভিনয়ে এক ধারাসৃষ্টি করে গেছেন, সেই অনুসরণেরই সঙ্কল্প তাঁর মনের মধ্যে লালিত হয়েছিল।

তাঁর মতে এখনকার দিনে ছবিতে হাস্যরসের যথার্থ প্রয়োগ তো হচ্ছেই না, বরং যা হচ্ছে—তাও নিতান্ত অল্প। অথচ একটি ছবির সামগ্রিক উৎকর্ষে কৌতুকশিল্পীর প্রয়োজন অনেকখানি, সে কাজে তাঁর অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাঁদের সে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বললেন—সেক্সপীয়ারের যুগেও যখনই দেখা গেল শুধু করুণ গম্ভীররস মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারছে না, মানুষের পিপাসুমনকে ভরিয়ে দিতে অপারগ হচ্ছে—তখনই তার সমাধানস্বরূপ সেক্সপীয়ারের নাটকে জন্ম হল—'ইডিয়ট'দের, তাদের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু আজ সে প্রয়োজন অনেকে মানতে চাইছেন না।

কথায় ছেদ পড়ে। একবার অল্পক্ষণের জন্যে স্থানান্তরে যেতে হয় শিল্পীকে। টেবিলের ওপর রাখা একখানি দৌনিকে চোখ বুলোতে থাকি—কাজ শেষ করে ফিরে আসেন শিল্পী। আবার আলোচনা সুরু হয়। অসমাপ্ত আলোচনার জের টেনে বলেন—ছবিতে রিলিফের দরকার নেই বললেই তার দরকার ফুরিয়ে যাবে না। অবশ্য কমেডিয়ানদের দিয়েই যে সে কাজ করতে হবে তার কোন মানে নেই কিন্তু রিলিফ অপরিহার্য। ভানু বন্দোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে দেশের চিত্রপরিচালকদের সঙ্গেও আলাপ করেছেন, এর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা মেনেও নিয়েছেন। সেইসঙ্গে এও স্বীকার করেছেন যে, কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটাতে তাঁরা সফলকাম হতে পারছেন না।

পিতৃদেবের একটি উক্তি তাঁর স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। পুত্রকে তিনি বলতেন—'দর্শককে দেবতার মত ভাব, মনে কর এদের তুমি পূজো করছ ফুল-বেলপাতার পরিবর্তে তোমার অভিনয় দিয়ে—তাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিচ্ছ।' জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটিও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন, জনসাধারণের প্রীতি, ভালবাসা যথেষ্টই পেয়েছি, এখনও পেয়ে চলেছি। তবে সবকিছুর মধ্যেই ব্যতিক্রম আছে, এখানেও দর্শকদের মধ্যে কিছু বিভিন্নতা আছে বৈকি, এমন অনেক দর্শক আছেন, যাঁরা আমাদের নামের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে 'শ্যালক' বিশেষণটি জুড়ে দেন, অবশ্য স্পানিংও তাঁরা খান। সুতরাং সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়—জনপ্রিয়তার জন্যে মূল্যও দিতে হয়েছে যথেষ্ট।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করি—কৌতুক-চরিত্রের যখন আপনি রূপ দেন, তখন কি সেই চরিত্রে আপনি মিশে যান?

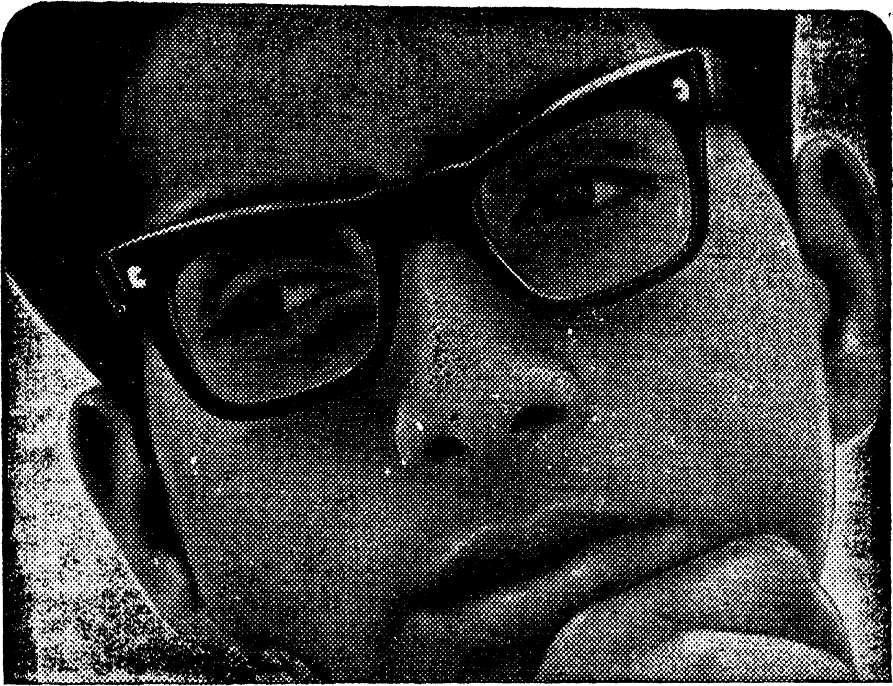
উত্তর আসে—যাঁরা বলেন চরিত্রে মিশে যান তাঁরা ভুল বলেন, সেটা যথার্থ নয়। নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতন থেকে অভিনেয় চরিত্রের আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি এবং সেইটেই স্বাভাবিক।

একটু থামলেন শিল্পী—মুহূর্তের মধ্যে আবার হলেন বাঙ্ময়। বললেন—দেখুন অনেক দুঃখ, অনেক জ্বালা, অনেক যাতনার পর জীবনে কমেডি আসে।

তুলনা উঠল বাঙলা ও বোম্বাইয়ের অভিনয়ের মান নিয়ে। ভানু বন্দোপাধ্যায়ের মতে দাঁড়িপাল্লায় বোম্বাই শূন্যে ঝুলছে, আর বাঙলা মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি আজ পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শিল্পী আশা রাখেন, ভাল বাঙলা ছবির বিদেশে প্রদর্শন ভবিষ্যতে আরও বাড়বে এবং তার দ্বারা বাঙলার বক্তব্য বাঙলার বাণী পৃথিবীর ঘরে ঘরে আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ঐ ছবিগুলির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাবে বাঙলার সৃষ্টি, বাঙলার বৈশিষ্ট্য, আস্বাদ করবে বাঙালীর সৃষ্ট রসের।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার 'কলা-কাকলি' বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সবশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বদেশ ঘোষ, শান্তিময় সান্যাল কর্তৃক গৃহীত এবং সায়রা বানুর চিত্রটি 'পয়গম'-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।



সম্পাদকীয়

লালা লাজপত রায়

ইতিহাসকে এক ব্যাপক বৈচিত্র্যের নামান্তর বলিলে আর যাহা হউক অত্যুক্তির দোষে দুষ্ট হইতে হয় না। যুগ যুগ ধরিয়া পতন-উত্থানের কত বিচিত্র ঘটনার ধারা ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে বৈচিত্র্যে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে তাহা তুলনারহিত। এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস আবার আরও বিচিত্র, আরও রোমাঞ্চকর, আরও মর্মস্পর্শী। সে ইতিহাসের পাতায় পাতায় শিহরণ আর উদ্দীপনার এক অপূর্ব সমাবেশ। লাখে লাখে আত্মত্যাগের এক রক্তেরাঙা কাহিনী, বহু বেদনার, বহু লাঞ্ছনার, বহু নিপীড়নের এক অপরূপ কথা, কত জননীর চোখের জল তাহার পৃষ্ঠাকে সিক্ত করিয়াছে, কত সাধ্বীর সীমন্তের সিঁদুর তাহাকে দিয়াছে অগ্নিবর্ণ।

এই অভিনব ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের নমস্য রূপকার পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীর পবিত্রলগ্নে আজ তাঁহাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি, এই মহান দেশনায়কের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা নিবেদন করি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য।



লালা লাজপত রায়

ইহা মিথ্যা নয় যে, আমাদের দেশের যুগ-যুগব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃবৃন্দের সকলেরই পন্থা এক ছিল না, কিন্তু পন্থা ভিন্ন হইলেও লক্ষ্য ছিল এক। ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় একটি চরম লক্ষ্যে তাঁহারা সকলেই মিলিত হইয়াছিলেন—সেই লক্ষ্যে দেশের স্বাধীনতার বিদেশী শোষকের লৌহনিগড় হইতে দেশজননীর মুক্তি।

আইনের ডিগ্রীধারী লালাজীকে যুক্তি, তর্ক, জেরার জটিল আইনজগৎ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। সেই জেরা বিশ্লেষণের মধ্যে ধর্মের আহ্বান তাঁহার মর্মমূলে দোলা লাগাইয়াছিল। অতঃপর আর্যসমাজের অন্যতম ধর্মনায়ক লালাজী অনুভব করিলেন যে, দেশজননীর বন্ধনমোচনে অংশগ্রহণই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠধর্ম। কোন দেশের স্বাধীনতাই কখনও একক প্রচেষ্টায় আসে নাই এবং তাহা আসিতে পারেও না। দেশের সাধারণ নরনারী স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ হইলে তবেই স্বাধীনতা লব্ধ হয়। সর্বসাধারণকে একতার মন্ত্রে দীক্ষিত করা, স্বাধীনতার সচেতনতা তাঁহাদের মনে আনিয়া দেওয়া, স্বদেশ চেতনার বিকাশ তাঁহাদের মধ্যে ঘটানো স্বাধীনতা-সংগ্রামের মুখ্যকর্ম। এই মুখ্যকর্মের অন্যতম নায়ক হিসাবে লালাজী দেশবাসীর স্মৃতিতে অম্লান মহিমায় চিরজাগ্রত থাকিবেন। সেদিন ভারতের আকাশে-বাতাসে স্বাধীনতার মন্ত্র ছড়াইয়া দেওয়ায়, গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, জনপদে-জনপদে মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে যাঁহারা স্বাধীনতার বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন—লালাজী সেই তালিকায় একটি স্মরণীয় নাম।

লালাজীর চরিত্র অনুধাবন করিলে যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা হইল শান্তি নীতিতে তাঁহার প্রবল আস্থা। রক্তপাতের তিনি চিরবিরোধী, ইহার মধ্যে তাঁহার চরিত্রের একটি দিক বিশেষভাবে আলোকিত হয়—তাহা তাঁহার মানবতা। মানুষের মহামূল্য প্রাণ কোন কারণেই স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করার স্বপক্ষে তিনি অনুপস্থিত। তাঁহার সাধনায় তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, চণ্ডনীতি কখনও মানবশক্তিকে দমন করিয়া রাখার কার্যে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

গুরু নানক, গোবিন্দ সিংহের লীলাভূমি পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবের এ যুগের জাতীয়-চেতনার জনক লালাজীর সমাজনীতিও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রাচীন সমাজধারার যিনি সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারিবেন—লালাজীর মতে তিনিই প্রকৃত সমাজ-সংস্কারক। অতীতকে বিসর্জন দিয়া কখনও কোন জাতি বাঁচিতে পারে না, আবার বর্তমান ও ভবিষ্যতকে উপেক্ষা করিয়া অসম্ভব এবং বুদ্ধিহীনতার পরিচয়ও বটে। সে ক্ষেত্রে ইহাদের সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে লালাজী যে কি গভীর সমাজচিন্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা যেমনই সারবান, তেমনই কল্যাণ প্রসূ।

লালাজীর জীবন প্রেমে ও প্রীতিতে ভরপুর। সারাজীবন তিনি প্রেম ও মৈত্রীর মাধ্যমেই কাজ করিয়া

গিয়াছেন। বিরোধের মধ্যে তিনি অসংহতির আভাস পাইয়াছিলেন, অখণ্ডতা রক্ষার্থে দেশের বৃহত্তর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য তিনি মিলনের মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা বা ব্রত। কিন্তু মিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত বা শান্তিনীতিতে বিশ্বাসী হইলেও অন্যায়, অবিচারের সহিত তাঁহার আপোষ কোনদিনই ঘটে নাই। দেশের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থিরূপে যাহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তদ্দণ্ডেই তাহার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হইয়াছে তাঁহার কম্বুকণ্ঠ। কুখ্যাত গ্রন্থ 'মাদার ইণ্ডিয়া' লালাজীকে উদাসীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, বৃদ্ধ দেশপ্রেমীর অন্তরে দেশপ্রেমের আগুন তন্মুহূর্তে প্রজ্বলিত হইয়াছে। তাহারই উত্তরস্বরূপ লালাজীর লেখনী হইতে জন্ম লইল 'আনহাপী ইণ্ডিয়া।'

লালাজী আজ কোন প্রদেশের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নন বা কোন প্রাদেশিক মাপকাঠিতে স্মরণীয় নন। তিনি সর্বভারতীয়। তবু বাঙলার সহিত তাঁহার যেন এক বিশেষ সম্পর্ক, বাঙালীর নিকট 'লাল-বাল-পাল'-এর অন্যতম লালাজী যেন তাহারই স্বজাতি।

লালাজী আজ আমাদের মধ্যে বর্তমান নাই। বড় করুণ পরিবেশে বৃদ্ধ নায়কের জীবনে অন্তিমমুহূর্তটি ঘনাইয়া আসিয়াছে। রণক্লান্ত যোদ্ধার অপ্রতিহত জীবনকে যবনিকার সম্মুখীন করিয়া দিল পুলিশের নির্মম লাঠি। কিন্তু তাঁহার আদর্শ, তাঁহার ভাবধারা আজও ধ্রুবতারার মত জাতিকে পথ দেখাইতেছে। সেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যে আলোকবর্তিকা জ্বালাইয়া গিয়াছে সহস্র রাজশক্তি তাহাকে নির্বাপিত করিতে পারে না। পরাধীনতা হইতে আজ আমরা মুক্ত, স্বাধীন দেশের মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া স্বাধীন দেশের আলোয়-বাতাসে পরিপুষ্ট মনে আজ আমরা এই বহুকষ্টে অর্জিত স্বাধীনতার অন্যতম ভগীরথ লালাজীর আত্মার নিকট হইতে শক্তি ও মনোবল প্রার্থনা করি।

একটি যুগের অবসান : চার্চিল

পৃথিবীর বুকে জন্ম-মৃত্যুর অবিরাম ধারায় মৃত্যু মাঝে মাঝে এমন এক-একজনকে অধিকার করে, যাঁহাদের প্রয়াণ কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু বলিয়া বিবেচিত হয় না, স্বীকৃত হয় একটি মানুষকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট যুগের অবসান হিসাবে। আমাদের এই ধারণার অতি-সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত উইনস্টন চার্চিল।



● উইনস্টন চার্চিল

চার্চিলের মহাপ্রয়াণ যে-কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু নয়, তাহার কারণ চার্চিল ব্যক্তি ছিলেন না—ছিলেন ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের একদিকে যেমন মহান সন্তান, অন্যদিকে তেমনই মহৎ স্রষ্টাও। ইংল্যাণ্ডের একটি বিশেষ যুগের রূপকার তিনি। ১৯০১ সালে চৌষট্টি বৎসর রাজত্বের পর বিরাশি বৎসর বয়সে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যখন মৃত্যু হয়, চার্চিল তখন সাতাশ বৎসরের একটি সম্ভাবনাময় আশাবাদী তরুণ মাত্র। কিন্তু তখনই তাঁহার জীবননাট্যের অনেকগুলি পটপরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, সাধারণ্যে তিনি তখনই এক পরিচিত নাম। ভিক্টোরীয় যুগে ভিক্টোরিয়ার পরিচিতিতেই যেমন ইংল্যাণ্ডের পরিচয় সে অনুসারে ভিক্টোরিয়ার পরেই চার্চিলের নাম অবশ্য করণীয়। তাঁহার জীবনের বিরাটত্ব, ঘটনার সমারোহ, বৈচিত্র্যের ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে—চার্চিলই ইংল্যাণ্ড—ইংল্যাণ্ডই চার্চিল—এই উক্তি অনায়াসে প্রয়োগ করা চলে।

পিট, মেলবোর্ন, গ্ল্যাডস্টোন, লয়েড জর্জ, ডিসরেলী প্রমুখ ইংল্যাণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয় সন্তানরা যে সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, চার্চিল সেই সাধনায় পূর্ণতা দিলেন। ইংল্যাণ্ডের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধিসাধনের ইতিহাসে এ যুগে চার্চিলের সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন নাম নাই।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ উপাসক চার্চিল সম্বন্ধে ভারতবাসীর মিশ্র মনোভাব সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, চার্চিলের নিকট আমাদের একটি ঋণ আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড পরাজিত হইলে তাহার অধীন (সেই সময়ে) ভারতের ভাগ্য জার্মানীর দ্বারা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত, সে বিষয়ে কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকিতে পারে না। ইংল্যাণ্ডের এক অতীব সমস্যাসকুল দুঃসময়ে চার্চিল ঈশ্বর-প্রেরিত আশীর্বাদ। সেই সময়ে সমগ্র রাষ্ট্রতরীর কর্ণধারের ভূমিকায় তাঁহার আবির্ভাব না ঘটিলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস আজ কি মূর্তি ধারণ করিত, তাহা কাহারও অজানা নয়। ভয়ঙ্করের বিষাণে যেদিন ইংল্যাণ্ডের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত,

তাহার চতুর্দিকে যখন সর্বনাশের স্বাক্ষর, দিকে দিকে শুধু মৃত্যুর ইশারা—সেই দারুণ সঙ্কটের মাঝে শোনা গিয়াছিল তাঁহারই শঙ্খধ্বনি। সেদিন সেই চরম ভয়াবহ দিনে, শিবিরে শিবিরে, শীতে, গ্রীষ্মে, বরষায় প্রেরণার প্রদীপ হস্তে দেখা গিয়াছিল ঝড়ের রাতের অভিসারী এই অসাধারণ মানুষটিকেই।

১৮৭৪ সালের ৩০-এ নভেম্বর, এই মহাজীবনের যেদিন শুভসূচনা সেদিন শান্ত-সমাহিত ভিক্টোরীয় যুগ। ১৯৬৫ সালের ২৪-এ জানুয়ারী যেদিন এই অদ্ভুতকর্মা মানুষটি পৃথিবীকে অনেক কিছু দেওয়ার পর জীবনের অন্তিম নিশ্বাসটি পর্যন্ত উপহার দিয়া, সারা জগতের বিপুল শ্রদ্ধা সম্বল করিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রস্থান করিলেন, তাহার মধ্যবর্তী সময়ে কত ঘটনার ঘনঘটা, কত পতন-উত্থান ঘটিয়া গেল। বুয়র যুদ্ধ, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, রুশবিপ্লব, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, কত মহামূল্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্য-শিল্প, নাটকের কত মহত্তম সৃষ্টি—এই সবকিছুর মহৎ দ্রষ্টা (কোন কোন ক্ষেত্রে স্রষ্টাও) উইনস্টনের জীবনও যেন 'কত রঙে রঙ করা' শুধু বাগ্মিতা বা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁহার গৌরবময় ভূমিকা মহাকালের পটে তাঁহার নাম চিরকালের দাবিতে যুগপৎ স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিবে।

প্রতিভার এই বহুমুখীনতা এবং সর্বক্ষেত্রেই অপূর্ব সৃজনীশক্তির স্বাক্ষর চার্চিলকে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের পরিণতি দিয়াছে। 'ওয়ার মেমরিজ', 'ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস,' 'মাই আর্লি লাইফ,' 'থটস এ্যাণ্ড এডভেঞ্চার,' রিভার ওআর 'হিস্ট্রী অফ ইংলিশ পিপল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পৃথিবীর এক একটি অসামান্য কালজয়ী সম্পদ।

অতঃপর পৃথিবীর নরনারীর দ্বারা সেই অতিপরিচিত দৃঢ়তাব্যঞ্জক নিশ্চয়তাবাচক 'ভি' চিহ্ন এবং চুরুটের সেই প্রজ্বলিত অগ্নি আর দৃষ্ট হইবে না, পার্লামেন্টের চারিদিক সেই বাগ্মী-শ্রেষ্ঠের দৃপ্তভাষণে প্রকম্পিত হইবে না, বহু স্মৃতিধন্য সেই ভবনটিতে এই মানুষটির বলিষ্ঠ চরণচিহ্ন আর কোনওদিন পড়িবে না—ইহা যতখানি সত্য তেমনই একথাও ততখানি সত্য, জীবনব্যাপী সাধনার ও অপরিসীম ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে যে-ইতিহাস চার্চিল সৃষ্টি করিলেন, তাহারই মধ্যে চিরকালের দাবিতে অম্লান মহিমায় বিরাজিত থাকিয়া ভাবীকালের নরনারীর বন্দনায় ভাস্বর হইতে ভাস্বরতর হইতে থাকিবেন।

তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

হিন্দী হঠাও আন্দোলন

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতভূমির অধুনাকালীন আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের মধ্যে যেগুলি সর্বসাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দী ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে পরিণত করার প্রচেষ্টা ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তুমুল বাদ-প্রতিবাদ, আন্দোলন।

এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র, সাহিত্য-কলা-সংস্কৃতির মহিমান্বিত লীলাভূমি, পৃথিবীর বিস্ময় ভারতবর্ষের বর্তমানকালের অন্ন, বস্ত্র ও খাদ্যসমস্যার ন্যায় আলোচ্য বিষয়টিও আজ এক মহাসমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। এই সমস্যা আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ে স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বাদ-প্রতিবাদ অবশেষে আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

সমুদ্রবিধৌত ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের আকাশে-বাতাসে ইহাকে উপজীব্য করিয়া যে ঝড়ের অশনিসঙ্কেত, বজ্রের হুঙ্কার, বিদ্যুতের ঝিলিক পরিলক্ষিত হইল তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দক্ষিণের বিদ্রোহের সুরও যেমনই বলিষ্ঠ, প্রকাশও তেমনই স্পষ্ট। তাহারা মরণপণ করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে যে, এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই কার্যকর হইতে দেওয়া হইবে না। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভাপতির প্রদেশের যুবগোষ্ঠীর এই বিষয়ক ক্রিয়াকলাপ সারা ভারতের সম্মুখে এক দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছে।

রাজনীতিকে ঈষৎ দূরে সরাইয়া রাখিয়া ভাষাগত দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বিরাট বিশাল ভারতভূমির প্রধান ভাষা তিনটি—বাঙলা, তামিল ও হিন্দী। ব্যবহারের মাত্রা বিচার করিয়াই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। অন্যান্য ভাষাগুলি প্রচলনের মাপকাঠিতে এই তিনটি ভাষার নিম্নে স্থান পাইয়া থাকে। তবে ইহাও সত্য যে, হিন্দীভাষা মানানুসারে অন্য দুইটির সহিত কোনক্রমেই তুলনীয় হইতে পারে না। তাহার মর্যাদাও ইহাদের সমান নয়। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবসাধনের ও অলঙ্করণের এখনও অনেক বাকি, তথাপি, ব্যবহারের মাপকাঠিতে ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সর্বভারতের না হউক, ভারতের একটি বিরাট অংশে ইহার প্রসার সর্বজনবিদিত। সেই অঞ্চলসমূহের জনসংখ্যার দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে কতজন নরনারী এই ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দী ভাষার সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। হিন্দী ভাষা-ভাষীরা আমাদের শত্রু নন।

আমরা এক জাতি, এক প্রাণ, একতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, সেই মন্ত্রই মূলধন করিয়া আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের চলার পথ পরিক্রমণ করিতেছি। বিশেষত কোন ভাষা, সরস্বতীর স্পর্শ যাহার মধ্যে বিদ্যমান, কখনই আমাদের বিরাগভাজন হইতে পারে না, সে নীচতার সীমা হইতে করুণাময় ঈশ্বর আমাদিগকে বহুদূরে রাখিয়াছেন। কিন্তু সব সকল জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সবকিছুরই প্রয়োগের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি আছে। সবকিছু ক্ষেত্রেই কিছু বিধি-বাধা মানিয়া চলিতে হয়, সেগুলিকে অস্বীকার করিলেই সাফল্যের ক্ষেত্রে পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। ইহার প্রধান কারণ রাতারাতি কিছু করিতে অগ্রসর হইলেই মানুষের মনের উপর অকস্মাৎ এক ভয়ানক চাপ পড়ে। মানুষের অন্তরের স্থিতাবস্থার ভিত্তি নড়িয়া ওঠে, তাহারই ফলে এক অস্বাভাবিক এবং তপ্ত আবহাওয়ার জন্ম হয়। যাহা একদা সাধারণ্যে পরম সমাদরে গৃহীত হইতে পারিত, ভুল প্রয়োগে বা প্রয়োগের যথাযথ নিয়ম অস্বীকার করায় তাহা সাধারণের মনের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া বসিল।

'হিন্দী হঠাও' আন্দোলনকারীদের অনুভূতির প্রতি পূর্ণমর্যাদা প্রদান করিয়া একটি বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিষয়টি আমাদের দেশ, মাতৃভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী, জন্মভূমি। অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য সমস্যায় তদুপরি বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশ আজ জর্জর। এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশকে শত্রুশূন্য করাই দেশের কল্যাণকামী সন্তানদের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া অবশ্য উচিৎ। যুবশক্তি চিরকালই দেশের আশা-ভরসা, পরম নির্ভর। এখন যে সময় আসিয়াছে, সে-ক্ষেত্রে দেশজননীকে পররাজ্যলোভীদের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষার কার্যে যুবশক্তির সর্বশক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন। আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকিয়া দেশের চরম দুর্যোগের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিদান না করিলে শত্রুর পক্ষেই তাহা সুবিধাজনক হইবে। এই সকল ছিদ্র সকল যুগেই দেখা গিয়াছে শত্রুর সহায়তা করিয়া থাকে, ইতিহাস বারবার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছে। আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা তরুণ সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আমরাও দেশের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রসঙ্গে আকর্ষণ করিতেছি।

॥ শোক-সংবাদ ॥

ডাঃ সত্যবান রায়

বাঙলার সুবিখ্যাত কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও লোকসভার প্রাক্তন সদস্য ডাঃ সত্যবান রায় গত ১৩ই মাঘ ৭০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ইনি এডিনবারা থেকে এফ-আর-সি-এস ও লণ্ডন থেকে ডি-এল-ও উপাধি অর্জন করেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ইনি মেডিক্যাল কলেজের কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠ বিভাগের সার্জন ইনচার্জ ছিলেন। ১৯৫২ সালে নিখিল ভারত স্বররোগ বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে তিনি পৌরোহিত্য করেন ও ঐ বৎসরই লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

বসন্তকুমার দাস

বর্ষীয়ান জননায়ক বসন্তকুমার দাস গত ৫ই মাঘ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক কলিকাতা অধিবেশনে তিনি রাজনীতির সহিত যুক্ত হন এবং মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। আইনজ্ঞরূপেও ইনি সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। ইনি কিছুকাল কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ও বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি ছিলেন। আসামের বিধানসভার অধ্যক্ষ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও পাকিস্তানের শিক্ষা ও শ্রমমন্ত্রীর আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে।

ডাঃ রফিউদ্দীন আহমেদ

প্রথিতযশা দন্তচিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন কৃষি ও পশুপালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রী ডাঃ রফিউদ্দীন আহমেদ গত ২৬-এ মাঘ ৭৫ বৎসর বয়সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ডেন্টাল কলেজ এবং হাসপাতাল তাঁর জীবনের এক অমর কীর্তি। ভারতীয় দন্ত-পরিষদের সভাপতির আসনেও তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পৌর-প্রতিনিধি এবং পরে অল্ডারম্যানরূপে ইনি কলিকাতা পৌরসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৯ সালে ইনি রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন্স-এর ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার ডাঃ আহমেদকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার ভট্টমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়, আমি বাস্তববাদী ইঞ্জিনীয়ার, জীবনে কাব্যের বিশেষ স্থান নেই, সাহিত্যপাঠের নেশাও কম। কয়েকমাস আগে একজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর অনুরোধে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত নমিতা চক্রবর্তীর 'শাশ্বতী' ধারাবাহিক উপন্যাসটি পড়তে শুরু করি. প্রথম সংখ্যায় যে চমক লেগেছিল তা আমার মত লোককেও আবিষ্ট করে তুলল পরবর্তী ক্রমিক লেখাগুলির প্রত্যাশায়। বলা বাহুল্য বর্তমান সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৭১) যখন লেখাটা পড়া শেষ করলাম তখন মনে হল আমার প্রত্যাশা বৃথা হয় নি। শুনেছি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নাকি উচ্চাঙ্গসংগীত পছন্দ করতেন না। কিন্তু দিলীপকুমার রায়ের অনুরোধে খান আব্দুল করিম খানের গান শুনে শরৎবাবু মন্তব্য করেছিলেন, উচ্চাঙ্গসংগীত যদি এমন করে গাইতে পারা যায় তা হলে আমি সারাজীবন ধরে উচ্চাঙ্গসংগীত শুনতে রাজী আছি। 'শাশ্বতী' উপন্যাসটি শেষ করে আমারও বলতে ইচ্ছা করছে যে, লেখার তুলি বুলিয়ে যদি কেউ এমন অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে, তবে সে সাহিত্য আমাদের মত বাস্তববাদী ইঞ্জিনীয়ারের দলও সারাজীবন ধরে পড়তে রাজী আছে। এমন সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি একালের বিপুলাকৃতির বাংলা উপন্যাস রচয়িতাদের কল্পনার বাইরে। লেখিকার লেখা খুব ঘন. ছোট ছোট কথা—অথচ কি অর্থবাহী, সত্যিই আজকের সমকালীন সাহিত্যে এ এক দুর্লভ ব্যাপার। আগামী মাস থেকে লেখিকার আর লেখা থাকবে না ভাবতে খারাপ লাগছে। আশা করব, অদূর ভবিষ্যতে এই নতুন লেখিকার লেখা বসুমতীর পাতায় আরও দেখতে পাব।

'শাশ্বতী' উপন্যাসের প্রসঙ্গে 'মাসিক বসুমতী'র সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটল। তাই পত্রিকাটির সম্বন্ধে দু-একটি কথা না বলে পারছি না। নতুন লেখিকা যতই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসুন না কেন আপনি সাহস করে যে সুযোগ দিয়েছেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় উনি যথার্থই আপনার আবিষ্কার। এতে আপনার কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয়, আর তা ছাড়া একটি পত্রিকায় এত বিভিন্ন ধরণের বিষয় ও রসের সমাবেশ ঘটিয়ে আপনি সত্যিই পত্রিকাটিকে লোভনীয় করে তুলেছেন। বর্তমানে বাজারে চালু পত্র-পত্রিকার মধ্যে আপনার পত্রিকা বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ইতি—বিনীত—তড়িৎ সেনগুপ্ত। C/o, বি বি জে, ৫, লাহিড়ী হাউস, আপকার গার্ডেন্স, আসানসোল।

মহাশয়, 'মাসিক বসুমতী'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ বারো বছর বয়সে। জানি না সেদিন কিশোরীমনে বসুমতী পড়ে কি বুঝেছিল, কি জেনেছিল, শুধু এইটুকু আজও মনে আছে, সেদিন সেই কিশোরী বসুমতীর গুণে. রূপে, লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে 'মাসিক বসুমতী'কে ভালবেসেছিল। ক্রমে ক্রমে সে ভালবাসা গভীর থেকে গভীরত্ব লাভ করে, তারপর—তারপর পিত্রালয় হতে স্বামিগৃহে প্রবেশ করেও তার বসুমতীর উপর ভালবাসা এতটুকু ম্লান হয় নি। বিশ বছর ধরে বসুমতী পড়তে পড়তে আমার জীবন নিজের অজান্তে বসুমতীর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। বসুমতী আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে। তাই বসুমতীতে যখন একটা যুগোপযোগী উপন্যাস পড়লুম তখন আমি এত আনন্দ পেয়েছি—এত মুগ্ধ হয়েছি যে, লেখিকাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পাচ্ছি না। হ্যাঁ নমিতা চক্রবর্তীর 'শাশ্বতী' নামক উপন্যাসটির কথাই বলছি। লেখিকার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা করে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমার পক্ষে তা তো সম্ভব হবে না, তাই আপনার পত্রিকা মারফৎ তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানালুম। চিঠি লিখতে লিখতে একবার আমার মনে হল সামান্য একটা ধন্যবাদ জানিয়ে কি বা হবে কিন্তু পরক্ষণে মনে হল লেখক-লেখিকার জীবনে ধন্যবাদ সামান্য জিনিস তো নয়। লেখক-লেখিকা যখন লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন এই ধন্যবাদই সুস্থ, সতেজ করে তোলে। আর তাঁদের নূতন সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়ে দেয়। সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমার সব শেষ অনুরোধ—কিছু মাস বাদে আবার যেন নমিতা চক্রবর্তীর লেখা মাসিক বসুমতীর পাতায় দেখতে পাই। আপনি আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—শ্রীমতী গীর্বাণী মুখোপাধ্যায়। সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় রোড, চন্দননগর।

মহাশয়, আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এই পত্রখানি লিখছি। আমার কাকাবাবু আপনার এই প্রিয় পত্রিকাটির একজন বিশিষ্ট গ্রাহক। তাই এই আদর্শবাদী

পত্রিকাটি মাঝে মাঝে পড়ার সুযোগও আমার মিলে যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠীর মধ্যে আপনি যে একজন সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের সম্পাদক এ কথাটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। কারণ আমার মনে হয় এই পত্রিকাটির মাধ্যমে বিভিন্ন রুচিশীলসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁদের নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটান। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কৃতীপুরুষ ও মহিলাদের জীবনী, পত্রগুচ্ছ, ছোটদের আসর, কলা-কাকলি, সম্পাদকীয়—এক কথায় যে-কোন বিভাগ এ পত্রিকাটির সৌরভ ছড়ায়, সেগুলি সত্য-সত্যই সুধীজনের নিকট সুখপাঠ্য বলে বিবেচিত হয়। পরিশেষে শুধু আপনাকেই নয়, এই পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাঁরা মনেপ্রাণে খাটছেন তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং 'মাসিক বসুমতী'র অকল্পনীয় শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইতি—শ্রীঅমিয়কুমার রায়, বারমেস্যা, পুরুলিয়া।

সবিনয় নিবেদন, এবারের মাসিক বসুমতীতে শ্রীমতী সন্ধ্যা সেনের হীরাবাঈ বরোদেকার শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছে। শিল্পীদের দূর থেকেই দেখেছি এবং গান শুনেছি তাঁদের এই অন্তরের স্পর্শ এবং ঘরোয়া রূপটি এমন সহজ সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় কোথাও পাই নাই। এরকম প্রবন্ধ আপনাদের মাসিক বসুমতী পত্রিকায় আরো প্রকাশিত হলে খুশি হব। রচনা ভঙ্গীর মধ্যেও নতুনত্ব আছে। এই সংখ্যায় সন্ধ্যা সেনের নামে প্রকাশিত আর একটি আলোকচিত্র দেখলাম। আলোকচিত্রের শিল্পী এবং লেখিকা সন্ধ্যা সেন কি একই ব্যক্তি? নমস্কার জানিবেন। ইতি—কেতকী ঘোষ, শিবালয়, বেনারস।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন, ৩৩, সোদি এস্টেট, নিউ দিল্লী-৩ * * * শ্রীমতী সুকুমারী পালিত, অবধারক—শ্রী এ কে পালিত, আই এ এস, সি-১ ১-১৪১, লাজপতনগর, নয়া দিল্লী * * * শ্রীমতী আরতি মিত্র, ৮।সি, একডালিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯ * * * কুমারী ডি গুহ, বি এ, অবধারক—শ্রী বি কে গুহ, রাউত ব্যাঙ্ক, জলপাইগুড়ি, পঃ বঙ্গ * * * শ্রীমতী জি মজুমদার, ২৬ মার্কাস এ্যাভিনিউ, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা * * * শ্রীমতী দীপ্তি বসু, অবধারক—এ বসু, এল ই ডব্লু মিলস ধারীয়াল, পাঞ্জাব * * * শ্রীমতী মৃদুলা, অবধারক—বিনয়কুমার রায়, ডাক—হেতমপুর রাজবাটী, জেলা—২৪ পরগণা * * * প্রধান শিক্ষক, পাণ্ডুয়া, শশিভূষণ সাহা, উচ্চ বিদ্যালয়, ডাক—পাণ্ডুয়া, জেলা—হুগলী।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান বৎসরের বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম, প্রথম সংখ্যা হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী নিয়তি সেন, রেমুনা, বালেশ্বর।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম, প্রতিমাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভূঞা শ্রীরামচন্দ্র দাস মহাপাত্র, ডাকঘর—জামিরা পানাগড়, জেলা—মেদিনীপুর।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ পাঠাইলাম, এক বৎসর নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী মীরা বসু, ইন্দ্রনগর, জামসেদপুর—৪।

I am sending herewith Rs. 15·00 towards the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine every month regularly. Mrs. Meenakati Mukherjee, Banglow 27. Type IV. Po Pipani. Bhupal.

বার্ষিক মূল্য ১৫ ০০ পাঠাইলাম। আষাঢ় মাস হইতে আমাকে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। কুমারী রুমা লাহিড়ী, পুণা—১।

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫'০০ পাঠাইলাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় চাঁদা পাঠাইতে দেরি হইল। পূর্ববৎ পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। হেড মিস্ট্রেস, বহরমপুর মহাকালী পাঠাগার ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। মুর্শিদাবাদ।

Remitting Rs. 15 00 being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly. Mrs. Arati Sengupta. C/o, Dr. A. K. Sengupta· Po. Talap. Assam.

I am sending the annual subscription of Rs. 15·00. Kindly send the magazine every month. Hony. Secretary, S. E. Rly. Institute Barak Po. Charampa, Dt. Balasore.

মাসিক বসুমতীর জন্য ২০'০০ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এস পি রায়, ব্লক নম্বর ৩১।৩২, বেলি ভিউ। ৮৫ ওয়ার্ডেন রোড, বোম্বাই-২৬।

Remitting the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine every month. Mrs. Sukumari Dey. B. A. C/o B. Dey. Station Road. Narasari, Surat.

Annual subscription of Rs. 15·00 for the Monthly Basumati is sent herewith. Please acknowledge receipt and send the magazine regularly every month. Manager, New Chunta Tea Estate. Po. New Chunta, Dt. Darjeeling.

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ সাবনয় নিবেদন ॥

মাসিক বসুমতীর সূচীপত্রে ও অঙ্গসজ্জায় আপনি নিশ্চয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন। সুখপাঠ্য রচনা, নয়নাভিরাম ছবির এমন বিচিত্র সমাবেশ বাঙলা দেশের অপর কোন মাসিক পত্রিকায় আপনি দেখতে পাবেন না। পাঠক, পাঠিকা, গ্রাহক, গ্রাহিকা ও অনুগ্রাহকবর্গের সহৃদয় সহযোগিতায় মাসিক বসুমতীর অগ্রগতি আজও অটুট ও অক্ষুণ্ণ আছে। এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আপনাদের প্রিয়তম মাসিক বসুমতী আগামী নববর্ষের বৈশাখে ৪৪ বর্ষে পদার্পণ করবে। প্রসঙ্গত আমাদের বিজ্ঞাপন-দাতা ও বিক্রয় প্রতিনিধিদের সাহায্য ও সহযোগ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। বর্ষারম্ভে আমরা অনুরোধ জানাই, পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাবৃন্দ আগামী বর্ষের গ্রাহকমূল্য অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন। কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

● প্রচার বিভাগ ●

॥ মাসিক বসুমতী ॥

কলিকাতা - ১২

সূচীপত্র



কেশের জন্য
সলু-রিসর্সিনল



আসল কোলাপুরী চপ্পল
অশোক এণ্ড কোং
ই ৭৮, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

আপনার সোনা
এবং সোনার জিনিষগুলিকে
১৯৮০ সালের
শতকরা ৭ টাকার স্বর্ণবণ্ডে
পরিবর্তিত করে নিন
১৯৬৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত
এগুলি বিক্রী হবে

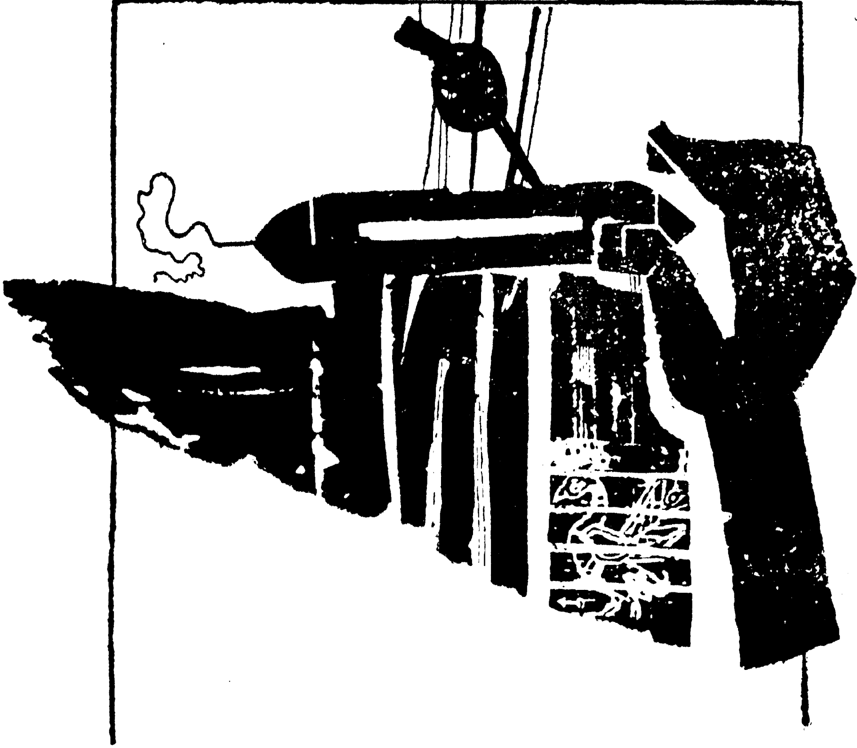
- এই বণ্ডগুলি সম্পত্তি কর এবং মূলধন লাভ-কর থেকে মুক্ত।
- এই বিনিয়োগের উৎস সম্পর্কে অথবা স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী এই সোনার কথা কেন ঘোষণা করা হয়নি সে সম্পর্কে কোন রকম প্রশ্ন করা হয় না।

নিকটবর্তী ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস থেকে, ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলির শাখা থেকে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রক

DA 64/701 (Beng)

তন্তুবায় সেবা কেন্দ্রগুলি
ভারতের হস্তচালিত তাঁতশিল্পেরই সেবা করে



বিশেষ প্রশিক্ষণ

যে শিল্পীগণ, উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাঁরা তাঁদের তাঁতে আধুনিকতম নক্সা ও রুচির বস্ত্রাদি বয়ন করতে পারেন। একাধারে টেকসই ও সুন্দর এই বস্ত্রাদি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

তন্তুবায় সেবাকেন্দ্রগুলির সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত আধুনিক কারিগরি গবেষণাগারগুলিতে বস্ত্রবয়ন, সূতো রং করা ও নক্সা তৈরী করার উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কাজ সম্পর্কে স্বল্প-কালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের এই প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে যোগ দিতে পারেন এবং বৃত্তির সুযোগ সুবিধেগুলি গ্রহণ করতে পারেন। তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলি নিকটবর্তী তন্তুবায় সেবাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তন্তুবায়
সেবা কেন্দ্র
কলিকাতা
২১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা-১৩



অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড

DA 64/696 Bengali



এই বছরে শস্য ভালো হয়েছে।
কাজেই দুশ্চিন্তা করার কি আছে?



হ্যা, এবারে শস্যের ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু যে অঞ্চলে ফলন ভালো হয়েছে, তাঁদের একটু সংযতভাবে খরচ করে এই বাড়তি ফসল, ঘাটতি অঞ্চলগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া উচিত। আমাদের অপচয় করা উচিত নয় এবং খাদ্য ঘাটতির সময়ের জন্য শস্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে সাহায্য করা উচিত।

DA 64/F10 (Beng.)

এ যুগের মহত্তম উপন্যাস

অনল আয়তি

সুশীল রায়ের বহু সম্বর্ধিত সৃষ্টি। ১৫.০০।

নতুন রসের কাহিনী

বর্ণচোরা

বনফুলের কৌতুক-উপন্যাস। ৬.০০।

নবদিগন্ত সন্ধানী উপন্যাস

পাহাড়ী গাঁয়ের কথা

নীলিমা দাশগুপ্তের বিস্ময়কর রচনা। ৫.০০।

রোমান্স-ধর্মী উপন্যাস

রাত্রিশেষের তারা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। (২য় মুদ্রণ) ৫.০০।

অন্যান্য: **পতাকা যারে দাও** প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪.৫০ ॥ **সমুদ্রশঙ্খ** শক্তিপদ রাজগুরু ৪.৫০ ॥ **চিত্রলেখা** ভগবতীচরণ বর্মা ৪.৫০ ॥ **ছন্দহারা** চার্বাক ১২.৫০ ॥ **ভারতবর্ষ ও চীন** তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩.০০ ॥ **পূর্বপত্র** সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৬.০০ ॥ **কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ** সুধীরচন্দ্র কর ৬.৫০ ॥ **মাতৃবন্দনা** (স্বদেশী গান ও কবিতার সংকলন) ৫.৫০ ॥ **চিত্ত যেথা ভয়শূন্য** (কবিতা) ২.০০ ॥

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ,
১-সি, কলেজ স্কোয়ার ॥ কলিকাতা ১২ ॥

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ।

বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন। মূল্য পাঁচ টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - ১২

ফর্ম ৪ (বিধি—৮)

বিজ্ঞপ্তি : মাসিক বসুমতী

প্রকাশের স্থান—কলিকাতা। **প্রকাশের কাল**—মাসিক।

মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম—সুকুমার গুহমজুমদার, জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২

সম্পাদকের নাম—প্রাণতোষ ঘটক। জাতি—ভারতীয়। ঠিকানা—১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯।

শতকরা ১ ভাগের অধিক মূলধনের মালিক :—দিলীপ সেনগুপ্ত—৮৯, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। ডি পি চক্রবর্তী—২০।এ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বীরেন দে—৪ডি, নাসিরুদ্দিন রোড, ৪ তলা, ৯ নং ফ্ল্যাট, কলিকাতা-১৭। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—১৩২, নগেন্দ্রনাথ রোড, সাতগাছি, দমদম, কলিকাতা-২৮। কৃষ্ণকিশোর কর—১৯।এ রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা-২৫। মুরারিমোহন দত্ত—১১।এ, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩। পঙ্কজ চোংদার—চোংদার হাউস, গুস্করা, বর্ধমান। শম্ভুনাথ মুখার্জী, শশাঙ্কশেখর মুখার্জী, করুণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—৫০।এ, সুরি লেন, কলিকাতা-১৪। শ্রীমতী মাধুরী সেন—১৬২।২১।১, লেক গার্ডেন, কলিকাতা। এস জি মজুমদার সুধাংশু রায়—৪৫।এ কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৭। নলিনীমোহন ব্যানার্জী, ধীমানকুমার বসু—২।১, রায় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। শ্যামল মিত্র, শম্ভু চক্রবর্তী, সুনীলকুমার কুণ্ডু—২, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা। শ্রীশ্যামা চক্রবর্তী—২০।এ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সুজিতমোহন ব্যানার্জী, এস পি চক্রবর্তী, রমা ভট্টাচার্য—২।১, রায়বাগান লেন, কলিকাতা। অজিতকুমার দত্ত, অজয়কুমার সরকার অরুণকুমার বসু—১১, শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা। অজিতকুমার দাস তুষার বাগচী, শৈলেশচন্দ্র বর্মণ—৮৫।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সরোজকুমার সোম, কানাই ভট্টাচার্য, ডি এন শ্রীমানী—১১৩, বিধান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। হৃষীকেশ ঘোষ—৬১।৬এ, মুর এভিনিউ, কলিকাতা-৪০ শ্রীমতী লতিকা সান্যাল—২৬।১৭, লান্সডাউন রোড, কলিকাতা। অমর মৈত্র, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য—৪২, ঠাকুরদাস বাবু লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী। বিভূতিভূষণ সরকার—৪২।১।এ, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা। শ্রীমতী জয়শ্রী রায়চৌধুরী—১৫৭।সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

আমি শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর
১লা মার্চ ১৯৬৫ — সুকুমার গুহমজুমদার



সকলের জন্যই খাদ্য রয়েছে কিন্তু অপচয় করার মতো নেই

অপচয় না করাটা খুব ভালো, কিন্তু আমার মনে হয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন আরও বাড়ানোই বেশী প্রয়োজন।

সে তো সত্যি কথা। কিন্তু আমাদের খাদ্যশস্যের উৎপাদনও তো ১৯৫০—৫১ সালের ৫·০৮৩ কোটি মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ১৯৬৩—৬৪ সালে ৭·৯৪৩ কোটি মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া ১৯৬৪ সালে আমরা ৬০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী গম ও চাউল আমদানি করেছি। এতে সকলের জন্যই খাদ্যের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

তাহলে কি আপনি বলতে চান যে উপযুক্ত বণ্টনের অভাবে ঘাটতি পড়ে?

তাতো আছেই, এ ছাড়া মজুতদারী এবং অপচয়ও এই ঘাটতি সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

এবারে যখন ফসল ভালো হয়েছে, তখন তো দুশ্চিন্তার কোন কারন নেই?

আপনি যদি অপচয় না করেন এবং যতটুকু বাস্তবিকই প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ যদি কেনেন তাহলে অবশ্য আশঙ্কার কোন কারণই নেই। ঘাটতি অঞ্চলগুলি যাতে প্রাচুর্য্যের অঞ্চলগুলির খাদ্যশস্যের অংশ পেতে পারে সেজন্য আমাদের সকলেরই একটা শৃঙ্খলা ও সংযম রক্ষা করা উচিত।

শৃঙ্খলা ও সংযমের সঙ্গে

খাদ্যসমস্যা সমাধানে সাহায্য করুন

স্মরণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়



শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তীর

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত ৩·০০

[ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের সাবলীল পদ্য-অনুবাদ এবং তৎসহ ওমর কবির জীবনী, ওমর কবির জীবন-দর্শন এবং ওমর খৈয়াম ও Edward Fitzerald সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক থিসিস জাতীয় আলোচনা।]

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

ভ্রাম্যমাণ ৭·৫০

[সঙ্গীতে নানা রসের সন্ধানে দিলীপকুমার একসময় দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, বহু সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন—এই ভ্রমণ-কাহিনী তারই অভিজ্ঞতাপ্রসূত]

শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর

সালাজারের জেলে উনিশ মাস ১০·০০

[ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী-শক্তির অধিকার নির্মূল করবার শেষ সংগ্রামের চিত্র]

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ'র

আকাশ ও পৃথিবী ১০·০০

[রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত। গল্পে বিজ্ঞান। অসংখ্য চিত্রশোভিত]

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের

ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৫·৫০

[লেখকের রামেন্দ্রসুন্দরের উপর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত অদ্বিতীয় গ্রন্থ]

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২·০০

[স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত]

সুবোধ ঘোষের

অমৃতপথযাত্রী ৩·৭৫

[মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বাণীর বিশেষ আলোচনা]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের

বঙ্কিমচন্দ্র ৫·০০

[প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, সেজন্য এই বইয়ের গুরুত্ব সমধিক]

নলিনীকুমার ভদ্রের

বিচিত্র মণিপুর ৩·০০

[মণিপুরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র]

সুধীরচন্দ্র সরকারের

বিবিধার্থ অভিধান ৬·৫০

[বাংলা প্রবাদ-প্রবচন সহ প্রায় ৫০ হাজার বিশিষ্ট শব্দের সরল অর্থ-সমন্বিত]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালচার ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১



মাসিক বসুমতী
॥ ফাল্গুন, ১৩৭১ ॥

(জলরঙ)

বর্ষার গান

—শ্রীনগেন্দ্রনাথ হেমরাম অঙ্কিত

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

॥ ৪৩ বর্ষ

॥ ফাল্গুন ১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড ॥

পঞ্চম সংখ্যা ॥



মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

॥ দুই ॥

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ?

আমরা কেন প্রার্থনা করি, কিসের জন্যে? স্বর্গে যাবার জন্যে? কিছু পাবার জন্যে? আর সংগে সংগে এও ইচ্ছা থাকে যে, অন্য কেহ যেন এসব না পায়। প্রভু, আমি আরো খাদ্য চাই—আর অন্যদের ক্ষুধার্ত রাখো। ঈশ্বর সম্বন্ধে কি ভয়ংকর চিন্তা। যিনি অনন্ত, অসীম, দয়ালু—যাঁর মধ্যে কোন ক্ষুদ্রতা নেই—যিনি মুক্ত, পবিত্র, পূর্ণ। আমরা তাঁর প্রতি আরোপ করি, আমাদের মনুষ্যগত চরিত্রগুণ, কর্মের ভাব—ক্ষুদ্রতা। তাঁকে আমাদের জন্য খাদ্য আনতে হবে—আনতে হবে বস্ত্র। বস্তুতপক্ষে এসব কার্য আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। অন্য কেহ আমাদের জন্যে এসব কাজ করে দেবে না। এই হচ্ছে, যা খাঁটী—সত্য কথা।

আপনারা এসব কথা প্রায়ই চিন্তা করেন না। আপনি মনে করেন, আপনিই ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র—যখনই আপনি যা বলবেন, তখনই তিনি আপনার জন্য তাই করবেন। আপনি তো তাঁর কাছে সর্বমানবের জন্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। শুধু আপনার জন্যে, আপনার পরিবারের জন্যে, আপনার প্রিয়জনদের জন্যে—সমস্ত প্রাণীকুলের জন্যে নয়। আমাদের সমস্ত চিন্তা যা ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, আমাদের সমস্ত প্রার্থনা যা ভগবৎবিষয়ক; আমাদের পূজো, ধ্যান-ধারণা সমস্তই আমাদের ক্ষুদ্রতায়, অজ্ঞানতায় বিফলে যায়।

আমাদের চিন্তাশীল হতে হবে। প্রতিটি জন্মই কষ্টের মধ্য দিয়ে হয়। ক্ষুদ্র আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে—জগতের সংগে মিশবার জন্যে যে প্রস্তুতি, যে সংগ্রাম—তাই মহৎ পূজো। আর সব ছায়ামাত্র। আপনি ঈশ্বরের রূপে প্রতিভাত। আমি আপনাকেই পূজো করছি। তাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। সমস্ত বিশ্বের পূজো করুন—সেবার মনোভাব নিয়ে। এই জনসেবাই, প্রকৃত পূজো (if it is service, it is worship)।

"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

যা চিরন্তনী সত্য (infinite truth), তা সর্বকালে সর্বসময়ে বর্তমান—জন্মহীন, মৃত্যুহীন। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু; তিনি 'ঈশাবশ্যমিদং সর্বং'। একটিই মাত্র মন্দির বর্তমান—তা' দেহ। "যা আছে, ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে" এই দেহে তিনি অবস্থান করেন, আত্মার অধীশ্বর—রাজ অধিরাজ। আমরা তাঁকে দেখবার চেষ্টা করিনে, তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির তৈরি করি, পাথরের মূর্তি তৈরি করে—কল্পনায় অরূপকে চেষ্টা করি রূপ দেবার। বেদান্ত চিরকালের জন্যে ভারতবর্ষে বর্তমান। সব কিছুকেই ঈশ্বর বলে পূজো করুন—সমস্ত রূপই তাঁর প্রকাশ। সর্বদা

অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন—বহির্দৃষ্টিতে ফল নাই। এই সর্বব্যাপী ঈশ্বরের কথাই বেদান্ত প্রচার করেন। সেবার ভাবই তাঁর প্রকৃত পূজা। কাজে কাজেই, কোন শ্রেণীর প্রশ্ন নয়, জাতির প্রশ্ন নয়, কোন বর্ণ নয়—বেদান্ত এসবের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সুতরাং এই মহান ধর্মেরই ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্মরূপে (national religion), পরিগণিত হওয়া সম্ভবপর।

বেদ (Veda) শব্দের অর্থ জ্ঞান—বেদ শব্দ থেকেই বেদান্ত শব্দের উৎপত্তি। জ্ঞান (Knowledge) কেউ সৃষ্টি করে না। আপনি কি কখনও জ্ঞান সৃষ্ট হতে দেখেছেন? ইহা শুধু আবিষ্কার করা যায়—যা আবৃত ছিল, তাকে অনাবৃত করা মাত্র। ইহা সর্বদা অবস্থিত,—যেমন ঈশ্বর বর্তমান। অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের জ্ঞান—সবই আমাদের মধ্যে অবস্থিত। আমরা শুধু জ্ঞান আবিষ্কার করি মাত্র। জ্ঞান মাত্রই পবিত্র। আবার জ্ঞানই ঈশ্বর (Knowledge is God) —জ্ঞান সকলের অন্তরেই বর্তমান। আপনি কখনও অজ্ঞান নন, যদ্যপি আপনাকে দেখে তাই মনে হয়। আপনি ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। আপনারা সকলেই। এমন একদিন আসবে—যেদিন প্রকৃত জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন বহু মানুষের উদ্ভব হবে—আর সমগ্র জগতের মনুষ্যকুলে এই মহান চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হবে।

তাহলে—কি আমাদের লক্ষ্য (goal)? সে হচ্ছে বেদান্ত; যেসব কথা আমি বলেছি। আমি বেদান্তকে সফল কর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সকল জগতের লক্ষ্যই বেদান্ত। জগতের প্রতি অণুপরমাণু ইহার প্রতি ধাবমান—"জগতের শতকোটি কর টানিছে ইহারে।" সবই ইহাতে বিধৃত—সবই একই লক্ষ্যের অভিমুখী—অন্তরের স্বর্গীয় ভাবধারার আবিষ্কার মাত্র। সমস্ত প্রকার অস্তিত্বের একত্রীভূত অবস্থায় এই ভাবধারা আমরা অনুসরণ করছি—এক্ষণে, জ্ঞানে, কর্মে আরো উন্নতভাবে—ইহা পালন করতে চাই। মানবিক ভালবাসা কি? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ড এই ভালবাসার বন্ধনে (human love) বিধৃত। ভেদ, বিভেদ সত্ত্বেও আমরা মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও প্রচন্ডভাবে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট। পরিবার শ্রেণীতে, শ্রেণী জাতিতে, জাতি সমগ্র মনুষ্যজাতিতে—সকলের প্রণতি গিয়ে মিলিত হচ্ছে সেই একজনেরই চরণতলে। জগতের সমস্ত ধর্মের মূলসূত্র, অনুসন্ধান করে, যা শিক্ষণীয় আদর্শরূপে পাই; তা হচ্ছে পরার্থপর হউন—সবাইকে ভালবাসুন (Service and Renunciation)। আমি সমগ্র জগৎজোড়া অস্তিত্বের অভিব্যক্তি। আত্মার অভ্যুদয় হচ্ছে, যা মিশে যাবে সমগ্র জগতে। বেদান্ত—সব্যসাচী; ঈশ্বর সত্যময়। বেদান্তের বিকাশে, সমস্ত জগৎ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে। কিন্তু তা কি সম্ভবপর? আমি সঠিক কি হবে, বলতে পারি না। তবে প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভারতবর্ষে যান, যে কোন নতুন ধর্মমত প্রচার করতে চেষ্টা করুন—তারা মুখ ফিরিয়ে থাকবে। কিন্তু যদি আপনি বলেন, বেদ থেকেই ইহার উৎপত্তি। তখন তাদের কাছ থেকে সাড়া পাবেন। কাজেই, বুঝুন ভারতবর্ষের মর্মবাণী কি ও কোথায় প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতায়—আমার, এইরূপ মূর্তি এবং মন্দির রয়েছে; ঈশ্বরের নামে, বেদ, বাইবেল, যীশু বুদ্ধ প্রভৃতির নামে। চেষ্টা করে দেখি। আবার হিমালয়ের পাদদেশে, আমার অন্য একটি স্থান আছে; যেখানে আমি দৃঢ়নিশ্চিত—সত্য ছাড়া আর কিছু সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। এইখানে যেসব কথা বললাম তা সেইখানে রূপায়িত করতে চাই। অকুতোভয়—সর্বপ্রকার গোঁড়ামীমুক্ত মানুষ তৈরি (man making religion) করাই আমার চেষ্টা। এমন কতকগুলি শিশু সেখানে থাকবে—যারা যীশুর কথাও জানে না; শিবের কথাও নয়; বুদ্ধের কথাও নয়। জীবনের প্রথম থেকেই তারা জানবে ঈশ্বরের কথা—যে ঈশ্বর শক্তি ও সত্যের উৎস। প্রত্যেক মানুষকে শক্তিরূপে চিন্তা করতে হবে—এই আদর্শ। আমার জানা নেই, পরিণামে কি সাফল্য আসবে।

কখন কখন আমি এতেও একমত হই, কিছু কিছু ভাল এই দুই মতের মধ্যেই আছে। যদি কোন ব্যক্তি, আপনাকে বলে তাকে ধ্রুবতারা দেখিয়ে দিতে। তাহলে, প্রথমেই আপনি নিকটের কোন উজ্জ্বল তারকা দেখাবেন—তারপর আরেকটু অনুজ্জ্বল তারকা, তারপর একটি সামান্য আলোকময় তারকা—তারপর দেখাবেন সেই ধ্রুবতারা। এই পদ্ধতিতে ঐ ব্যক্তির পক্ষে ধ্রুবতারার অবস্থান নির্ণয় করা সহজতর হবে। বিভিন্ন অভ্যাস শিক্ষা,—বেদ, বাইবেল, মূর্তি—এইসব ধর্মের পদ্ধতিমাত্র—ধর্মের অ, আ, ক, খ, বই কিছু নয়।

অপর পক্ষে, চিন্তা করুন। এই ধীর পদাক্ষেপে জগৎ কত দিনে সত্যের সন্নিধানে পৌঁছাবে? কতদিনে?

আমি যে মহাপুরুষের সেবক—তিনি দেহরক্ষা করেছেন। আমি তাঁর বাণীর রূপকার মাত্র। আমি পরীক্ষা করতে চাই—বেদান্তের শিক্ষাগুলিকে। সেগুলি ইতিপূর্বে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়নি। সে সময় অবশ্যই আসছে, মহৎ মানুষের আবির্ভাবে—সত্য ও ধর্ম সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠবে; আলোকে উদ্ভাসিত হবে জগৎ। শক্তি করবে মহাশক্তির আরাধনা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"।*

অনুবাদক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে

* Is Vedanta the future Religion of Swami Vivekananda.

হ্যাঁ, সত্যি জোর খবর।

খবরটা কি জাতীয় অনুমান করবার চেষ্টা করবেন না। কারণ, এটা সত্যি এমন একটা জোর খবর ঠিক যে রকমটি আমরা কখনই খবরের কাগজেও দেখি না। এটা কোনো পুরুষের নারীতে রূপান্তর লাভের খবর নয়, কোনো প্রেমিকযুগলের আত্মহত্যার খবর নয়; কোনো বিখ্যাত কোটিপতির দেউলিয়া হয়ে যাবার খবর নয়, রাস্তার ভিখিরির লটারী পাবার খবর নয় বা তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার খবরও নয়। যে খবরটা বলবো এখন তা সত্যি এ সমস্ত খবরকেও ছাপিয়ে যায়।

ভাবছেন হয়তো তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার চাইতে জোর খবর আর কি থাকতে পারে? কিন্তু পারে। বাস্তবিকই পারে।

আমাদের এ খবরটা হলো একটা বিস্ফোরণের কথা। হ্যাঁ বিস্ফোরণ। আগামী তৃতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন প্রভৃতি দেশ সর্বসাকুল্যে এটম এবং হাইড্রোজেন মিলিয়ে মোট যে হাজারতিনেক বোমা ফাটাবে বলে আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা মনে করেন—আমি যে বিস্ফোরণের কথা বলছি তা ঐ তিন হাজার আণবিক বোমার বিস্ফোরণের মোট শক্তির চাইতেও কয়েক লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমরা মহাকাশের কোনও বিস্ফোরণের কথা বলছি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি ক্রমশই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপাতত যে মহাশূন্যের বিস্ফোরণের কথা বলছি সেটা কবে হয়েছিল জানেন?—খৃস্টজন্মের সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে। এই বিস্ফোরণ যে নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল তার অবস্থিতি হলো লাইরা নক্ষত্র-মণ্ডলীর ভেগা নক্ষত্রটির কিছু উপরে। মহাকাশে এর আবিষ্কর্তা হলেন সুইডেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এলিস ডালগ্রেন। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধারণা যে, এই নক্ষত্রটির যে শক্তি ছিল তা কমপক্ষে আমাদের সূর্যটির অন্তত একশত কোটি গুণ বেশি নিশ্চয়ই।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগে সংঘটিত ঐ বিস্ফোরণটি প্রথম প্রত্যক্ষ করেন (বলাই বাহুল্য দূরবীণের সাহায্যে) আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী এল সি পেলটিয়ার।

এতদিন আগে সংঘটিত একটা বিস্ফোরণ জোর খবর কি করে হলো ভাবছেন না কি? সত্যি এটা একটা জোর খবর। কারণ সাড়ে সাত হাজার বছর আগে সংঘটিত হয়ে থাকলেও সে খবর পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দূরবীণের দৃষ্টিপথে এসে পৌঁছেচে মাত্র আজ ক'দিন হলো।

শীর্ষ সংবাদ

॥ তীরন্দাজ ॥

কারণ নক্ষত্রটি মহাকাশে আমাদের প্রতিবেশী হলেও একেবারে ডাকের মাথায় নেই, যাকে বলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি নয়। ঐ বিস্ফোরণের ফলে যে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল চলে সে আলোর পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে লেগেছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর। সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ মিনিটে ১,১১,৬০,০০০ মাইল, মানে ঘণ্টায় ৬৬,৯৬,০০০০০ মাইল। সাড়ে সাত হাজার বছরে ঐ আলো কত মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছে তা হিসেব করবার কষ্টটা আপনাদেরই করে দেখবার অনুরোধ করছি।

এবার ভাবুন এটা একটা শীর্ষ-সংবাদ কি না।

শহুরে জীবনের বধিরতা

॥ শ্রীচন্দ্রাবলী ॥

যদি বলা যায় যে শহরবাসীদের চাইতে গ্রামবাসীরা কানে বেশি শুনতে পান, তা হলে হঠাৎ কথাটা একটু বেখাপ্পা মনে হবে। মনে হবে এ কি কথা। গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেই কানে কম শুনতে পাবো —এও কি সম্ভব।

হ্যাঁ, সম্ভব। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যে-কোনও বড় শহরের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশজন কানে খাটো। যে পঞ্চাশ খাটো নয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই হলো নারী, শিশু এবং অতি বৃদ্ধ—অর্থাৎ যারা বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির ভেতরে থাকে। বাড়ির ভেতরে থাকলে শহরের কোলাহল অপেক্ষাকৃত কম কানে বাজে বলেই শ্রবণযন্ত্র যথেষ্ট বিশ্রাম পায় এবং বিশ্রাম পায় বলেই সতেজ থাকে। কাজেই, যে-কোনও শব্দ সঠিকভাবে শোনার কাজ করতে পারে।

কিন্তু শহরবাসীদের মধ্যে যাদের প্রত্যহ বেশ কিছু সময় নানা শব্দমুখর অঞ্চলে কাটাতে হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাদের শ্রবণযন্ত্র প্রথমত দুর্বল হয়ে পড়ে; আর দ্বিতীয়ত ক্রমাগত শুনতে শুনতে কিছু পরিমাণ শব্দ সম্পর্কে শ্রবণযন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শ্রবণযন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না বলে বরং বলতে হয় যে, আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশ শব্দ শ্রবণের ভিত্তিতে আমাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে—সেই অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

কোনো পথচারীর দু' ফুট পেছনে যদি অকস্মাৎ মোটরের হর্ন বেজে ওঠে তা' হলে ত্রাসে তার লাফিয়ে উঠবারই কথা। ঐ হর্নটা যদি বিশ ফুট পেছনে বেজে ওঠে তা' হলেও পথচারী একটু সচকিত হবে বৈকি। কিন্তু যদি দু'শো ফুট পেছনে বাজে? তা হলে সে ত্রাসে লাফাবে না, সচকিতও হবে না, কিন্তু তবু শব্দটা সে শুনবে, অর্থাৎ তাকে শুনতে হবে —যে শব্দটা তার না শুনলেও চলতো। অর্থাৎ কি না, না শুনলেও তার নিরাপত্তা কোনোমতেই বিঘ্নিত হতো না।

অথচ তার শ্রবণযন্ত্রকে সে শব্দ গ্রহণ করে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে পাঠাতে হয়েছে সে সম্পর্কে কি করণীয় তা নির্ধারণের জন্যে! মস্তিষ্কই পথচারীকে তার করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে যে ত্রাসের কারণ নেই, সচকিতও হতে হবে না—তবে হ্যাঁ, গাড়ি যাবার পথে থেকো না। এই সমস্ত কাজটাই যে আমাদের মস্তিষ্ক কতো ত্বরায় সমাধা করে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

যাই হোক, এই যে অহেতুক পরিশ্রমের ফলে শহরবাসীদের শ্রবণযন্ত্র তথা মস্তিষ্কের যে অংশ শ্রবণযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত তা অযথা হয়রান হতে হতে বেশির ভাগ সময়েই শব্দ সম্পর্কে 'নিস্পৃহ' হতে আরম্ভ করে। এই শব্দ সম্পর্কে 'নিস্পৃহতা'ই শেষ পর্যন্ত বধিরতার সূত্রপাত করে।

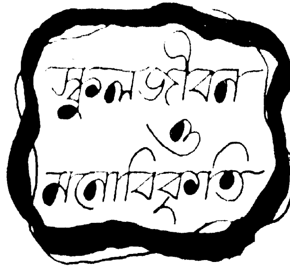
॥ গুরু-শিষ্য সংবাদ ॥

মহাপুরুষ মহারাজ আহারে বসিয়াছেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের আহারাদির প্রসঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, ঠাকুরের হাত নাকি খুব নরম ছিল—এত নরম যে লুচি ছিঁড়তে হাত কেটে গিয়েছিল?'

মহারাজ—'হাঁ, তাঁর হাত খুবই নরম ছিল। হাত কেন, তাঁর সর্বাঙ্গই খুব কোমল ছিল। একরকম কড়া লুচি হয় না? একদিন তাই ছিঁড়তে গিয়ে তাঁর নাকি হাত কেটে গিয়েছিল।'

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে কতটুকু করিয়া আহার করিতেন জিজ্ঞাসা করায়, মহাপুরুষ মহারাজ নিজের থালার প্রসাদী লুচি দেখাইয়া বলিলেন, 'এমনি একখানা, কি বড় জোর দুখানা ছোট লুচি ছিল তাঁর রাত্রের আহার। তার সঙ্গে একটু সুজির পায়েস। খাঁটি দুধ হজম হত না বলে, দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে অল্প সুজি ফেলে, তাই জ্বাল দিয়ে পায়েসের মতন করে দেওয়া হত। সেই পায়েসই একটু খেতেন। তবে মাঝে মাঝে ক্ষিদে পেলে প্রায়ই একটু আধটু কিছু না কিছু খেতেন! শিকেতে সন্দেশ ইত্যাদি তোলা থাকত। ক্ষিদে পেলে তাই থেকে একটি-দুটি সন্দেশ খেতেন। কখনও বা একটি সন্দেশের আধখানা খেয়ে বাকি আধখানা তখন সামনে যে থাকত, তাকে দিয়ে দিতেন। তাঁর সবই ছেলেমানুষের মতন ছিল—ঠিক যেন একটি ছেলেমানুষ।'

—শিবানন্দ-বাণী হইতে উদ্ধৃত



॥ ডাঃ নাগ ॥

আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, প্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে যে মনোবিকৃতি তার মধ্যে অন্তত অর্ধেকের সূত্রপাত হয়ে থাকে ছাত্রাবস্থায়—স্কুল-জীবনে।

কেন এবং কি করে এটা ঘটে সংক্ষেপে সেই কথাই বলবো।

যে-কোনো স্কুলেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস-অনুযায়ী প্রত্যেক ক্লাসের জন্যে একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী থাকে। মনে রাখবেন প্রত্যেক ক্লাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী! ধরুন ঐ শ্রেণীতে বিভিন্ন সেকশনে দু'শো ছাত্র ভর্তি হলো। শিক্ষক মহাশয়েরা উপযুক্ত মনে করেছেন বলেই যে প্রত্যেকটি ছাত্র ঐ ক্লাসে স্থান পেয়েছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো দেখা যাবে যে শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই শিক্ষক মহাশয়গণ ঠিকই করেছেন। ভালো কথা, এই শতকরা ৯০ জন অর্থাৎ দু'শোর মধ্যে ১৮০টি ছাত্র সম্পর্কে কোনো গণ্ডগোল হবে না ধরে নেওয়া গেলো—অন্তত সে বছর। কিন্তু বাকি ২০ জন? এদের মধ্যে হয়তো দশ জনের পক্ষে ঐ পাঠ্যসূচী কঠিন হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে বা বাড়িতে বিশেষ নজর দেবার ফলে তারাও শেষ পর্যন্ত উৎরে যাবে। কিন্তু অন্য দশজন?

অভিভাবকেরা হয়তো চেষ্টা করে করে হয়রান হয়ে পড়বেন, শিক্ষক মহাশয়গণও তাদের প্রোমোশন দিতে চাইবেন না—কিন্তু হয়তো বাড়ির লোকের ধরাধরির চোটে শেষ পর্যন্ত প্রোমোশন দিয়েও দিলেন। কিন্তু বিরাটতর ক্ষতির বীজ বপন যে এরই মধ্যে হয়ে গেছে তার সন্ধান ছাত্রের শিক্ষক বা তার বাড়ির লোকেরা কেউই জানতে পারলেন না। জানতে যখন পারবেন তখন ঐ বীজ একেবারে মহীরুহ না হোক অন্তত বেশ ডাঁটোসাটো একটি বৃক্ষে পরিণত হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা কি করে সকলের অলক্ষিতে ঘটে গেছে বলি শুনুন।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যখনই কোনো ছাত্র বা ছাত্রী তার পাঠ্য-বিষয় বুঝতে না পারে, মাস্টারমশায়রা অল্পবিস্তর চেষ্টা করবার পরও যখন বুঝতে না পারে, তখন প্রথমটা সে বুঝবার জন্যে একটা তীব্র চেষ্টা করে তাতে ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত তার উৎসাহ এবং আগ্রহ কমে যায়। পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে আগ্রহ যে পরিমাণে কমতে থাকে, অবান্তর কিছু সম্বন্ধে তার উৎসাহ-আগ্রহ ঠিক সেই পরিমাণেই বাড়তে থাকে। দুরন্ত প্রকৃতির কিছু কিছু ছেলেরা অবশ্য অনেক সময় খেলাধুলো ও অন্যান্য কার্যক্রমের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে। এটা অবশ্য মন্দের ভালো। কারণ যে শক্তিটা পড়াশুনোর জন্যে ব্যয়িত হতো সেইটেই দুরন্তপনায় খরচ হলো। কিন্তু পড়াশোনাতেও যার মন বসছে না, বাহ্যিক দুরন্তপনাও যে করছে না, সে কি করবে? তার কি হবে? সচরাচর তার ক্ষতিটাই হয়ে থাকে দেখা গেছে।

এই জাতীয় ছেলেমেয়েরা সাধারণত তাদের নিজেদের মনের মধ্যেই ডুব দেয়। স্কুলে দু'শো জন ছাত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তারা নিজেদের মনের মধ্যে এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে যেখানে সে হারবে না—কোনোমতেই তাকে হারতে হবে না। এই হলো অবাস্তব চিন্তার প্রাথমিক অবস্থা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, চিন্তা-শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নিজস্ব ব্যক্তিগত জগৎটি ক্রমে আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং এইভাবেই ঐ ছাত্র বা ছাত্রী ক্রমশ বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। দেখা দেয় রকমারী মনোবিকৃতি।

We must beware of trying to build a society in which nobody counts for anything except a politician or an official, a society where enterprise gains no reward, and thrift no privileges.

—Sir Winston Churchill.



॥ শ্রীবিজ্ঞানী ॥

কোনো চক্ষুষ্মানই অন্ধের কষ্ট বুঝতে পারেন না। কিছুটা হয়তো বা পারেন কোনো কারণে দৃষ্টিহারা হয়ে পড়লে। কিন্তু যাঁরা জন্মান্ধ? তাঁদের কষ্ট সত্যি বুঝতে আমরা কেউই পারি না। পারবার কথাও নয়। রঙ-বেরঙে ভরা এই পৃথিবীর কিছুই তারা দেখতে পেলো না। ব্যাপারটা কতো দুঃখের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হলো, অর্থাৎ ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চক্ষু-চিকিৎসার তেমন লক্ষণীয় কোনো উন্নতি হয় নি, তার পূর্বের বিশ কি পঁচিশ বছরে যা হয়েছিলো তার তুলনায়। কিন্তু বিগত বিশ বছর ধরে চক্ষু-চিকিৎসার যা উন্নতি হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর। একবার ভাবুন তো অন্ধ হয়ে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো—পঁচিশ বছর আগে জন্ম হলে সারাজীবনই যার দৃষ্টিহীন হয়ে কাটানো বাধ্যতামূলক হতো—আজকের দিনে একটু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পিতামাতার সন্তান হলে তাকে সে দুর্ভাগ্যের কবলে আর পড়তে হবে না।

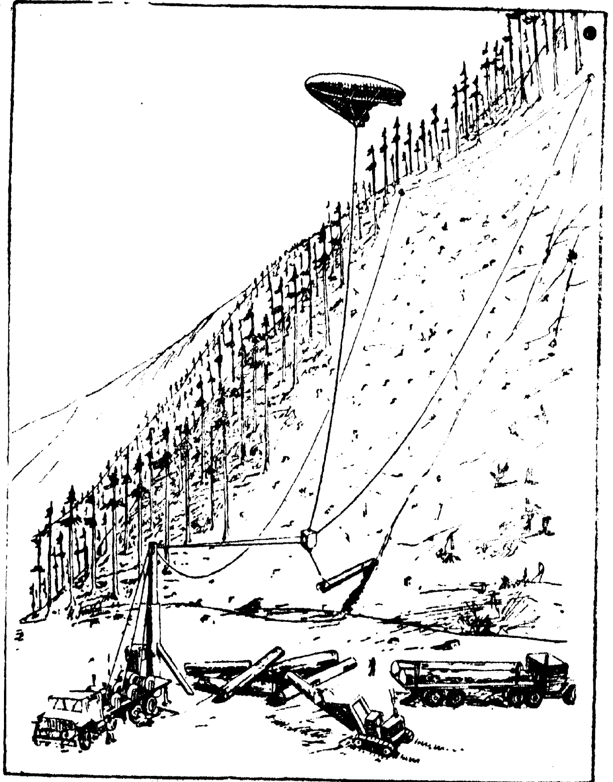
হ্যাঁ, সত্যি এটা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তিনটে কি চারটে অপারেশনের পরে জন্মান্ধ শিশুকে দৃষ্টিদান করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। শিশুর দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে করা হয় দৃষ্টিদানের এই অপারেশনগুলি।

ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং আমেরিকা এখন পর্যন্ত এই চিকিৎসায় এগিয়ে আছে। সবচাইতে অগ্রণী দেশ অবশ্য আমেরিকা। আমেরিকাতেই প্রথম এই জাতীয় অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে করা হয়েছিল।

যাঁরা জন্মান্ধ কিন্তু বর্তমানে বয়স্ক, তাঁদের ক্ষেত্রে এখনো এই ধরণের অপারেশন খুব সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। তবে নানা ধরণের চেষ্টা চলছে।

শরীরের সাধারণ অবস্থা সুস্থ এবং সবল থাকলে শুধুই যদি চোখের অসুখ হয় তা' হলেও আজকের দিনে এমন অনেক উপায় আছে যার সাহায্যে অনিবার্য অন্ধত্ব রোধ করা যায়। ওষুধ-বিষুধ অবশ্যই প্রয়োজন হয়। তবে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই অপারেশন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ধরণের অপারেশন যাতে রোগীকে কোনপ্রকার কষ্ট না দিয়ে করা যায়, সেজন্যও নানা উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

॥ পাহাড়ের গায়ে বেলুনের সাহায্যে ॥



পাহাড় বিভিন্ন ধরণের হয়। অনেক পাহাড়ে সহজেই ওঠা-নামা করা যায়, আবার এমন অনেক পাহাড় আছে যেগুলি সত্যই অনতিক্রম্য বা দুর্লঙ্ঘ্য। এই শেষোক্ত ধরণের পাহাড় থেকে সংগ্রহের জন্য বেলুনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। খুব ভারী ওজনের কাষ্ঠখণ্ড নামানোর পক্ষে এ প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছে। শিল্পীর কলমে আঁকা রেখাচিত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বেলুন থেকে মোটা তার ঝুলিয়ে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড কিভাবে উঁচু পাহাড় থেকে নামানো যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী অরণ্য-বিভাগ থেকে এই সংক্রান্ত গবেষণা-কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

সাগরছেঁচা মানিক

॥ শ্রীমানবী ॥

ধনদৌলতের জন্যে মানুষের দিন দিন যেরকম অস্বাভাবিক ঝোঁক দেখা দিচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় যে একদল অতি উৎসাহী মানুষ সাগরতলেই পাকাপাকিভাবে বসবাস করবার আয়োজন করে নিয়েছে তা হলেও হয়তো আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। কারণ যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে গোটা পৃথিবীতে ভূ-পৃষ্ঠে যত মণি-মাণিক্য আছে তার চাইতে অনেক বেশি আছে সাগরতলে।

ইদানীং জিনিসটা পরীক্ষা করাও হয়ে গেছে। কি ভাবে তাই বলছি। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলভাগে, দশ-বারো মাইল ভেতর পর্যন্ত অসংখ্য হীরকখণ্ড ছড়িয়ে আছে বলে বিগত শতাধিক বছর ধরেই সবাই জানে। হাজার হাজার পরিব্রাজক নানা অছিলায় ঐ এলাকায় ভ্রমণ করতে গিয়ে কিছু না-কিছু পরিমাণ হীরে সংগ্রহ করে এনেছেন। তবে দেখা গেছে যে, এ ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীরা এবং শাসককুলের মধ্যে কিছু কিছু ঝানু ইংরেজই এই হীরক-সংগ্রহের ব্যাপারে সবচাইতে পারদর্শী। বছরকয়েক আগে আমেরিকার টেক্সাসের বাসিন্দা স্যাম কলিনসও এসেছিল এইখানে হীরে সংগ্রহ করতে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসী এবং ইংরেজরা যখন তাকে নানাভাবে বাধা দিতে লাগলো তখন সে ভূ-পৃষ্ঠ ছেড়ে জলে নামলে। সে নিজেই একটা মাটিকাটা কল তৈরি করলো এবং তার সাহায্যে সাগরতল থেকে মাটি কেটে তোলা আরম্ভ হলো। বছরখানেক ধরে ক্রমাগত চলতে লাগলো মাটি কাটা।

এদিকে তীরভূমিতে যারা হীরের সন্ধানে দিনের পর দিন মাটি খুঁড়ে এবং তা ঝাড়াই-বাছাই করে হীরক সংগ্রহে নিযুক্ত ছিল তারা তো সব হেসেই খুন।

শহরের পানশালায় স্যামকে দেখলেই অনেকে গায়ে পড়ে এসে পরামর্শ দিয়ে যায়—আরে বাপু সমুদ্রের তলায় কি আর হীরে পাওয়া যায়? মিছিমিছি জাহাজ কিনলে তাতে কল বসালে কতো রকম হুজ্জোত করলে—এতে এক বছরে তোমার তো অন্তত ত্রিশ লাখ টাকা খরচ হয়েই গেলো। ক'খানা হীরে পেলে বাছা? শুধু শুধু পৈতৃক টাকা ওড়াচ্ছো।

এইভাবে মাসতিনেক অযাচিত সৎপরামর্শ লাভ করবার পরে স্যাম একদিন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলো যে, বিগত এক বছরে সাগরতল থেকে সে যা হীরে পেয়েছে তাতে সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়েও ব্যাঙ্কে তার পঁচাত্তর লক্ষ টাকা জমেছে।

ভূ-পৃষ্ঠের হীরক-সংগ্রহকারীদের তো চক্ষুস্থির।

স্যাম আরো ভেঙ্গে বললে: ভূ-পৃষ্ঠে তোমরা প্রতি কুড়ি টন মাটি খুঁড়ে পাও একখানা হীরে, আর আমি সাগরতলের প্রতি একটন মাটি কেটে পাই একখানা।

বিবাহ বিচ্ছেদ কি ব্যাধি?

॥ শ্রীমতী ॥

[বর্তমানে পাশ্চাত্যের মত আমাদের দেশেও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা আইনসঙ্গতভাবেই চালু হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এর উপকারিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ নাস্তি; তবে পাশ্চাত্য দেশে এর প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ এই দুয়েরই সংখ্যা সমাহীন। আলোচ্য কণিকায় এই প্রথা যে পাশ্চাত্য দেশে একটা ব্যাধির মতই সংক্রামক হয়ে উঠেছে তারই কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। —লেখিকা]

নিউইয়র্কের বাসিন্দা না হলে তাকে চিনতে পারবেন না হয়ত, যদিও সেখানকার ক্লাব ও রেস্তোরাঁগুলিতে লোকটি সুপরিচিত। ধরুন, তার নাম হ্যারি,—'হ্যারি উইলসন'।

দিলদরিয়া স্বভাবের এই মানুষটি বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ এ দুয়েতেই সমান পটু; আজ পর্যন্ত তার কোন বিবাহই তিন থেকে পাঁচ বছরের বেশি টেকে নি; বর্তমানে সে তিন-চারটি ভূতপূর্বা পত্নীর মাসিক খেসারতের কড়ি জুগিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত এবং এখন আবার সে কুমার।

উইলসনের বন্ধুরা যদিও মনে করে যে, তার বিয়ের সখ ভাল করেই মিটে গেছে অন্তত সেটা উচিত, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। উইলসন আবার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং তার এবারের দয়িতাটি এক সুন্দরী টেলিভিশান অভিনেত্রী—বয়সে যে তার চেয়ে অন্তত পনেরো বছরের ছোট।

'হ্যারি উইলসন' আজকের পাশ্চাত্য দুনিয়ার সেই ব্যক্তিত্বের প্রতীক—যা নিয়ে ধর্মযাজক ও নীতিবিদ সম্প্রদায় সত্যসত্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন।

এইসব মানুষের কাছে উইলসন একটা বিপজ্জনক ব্যক্তিত্ব, এঁরা মনে করেন যে উইলসনের মত মানুষের পক্ষে বিবাহের গুরুত্ব একটা পোষাক তৈরি করতে দেওয়ার সমতুল্য এবং এ ধরণের মনোভাব যে-কোন সমাজ-জীবনের পক্ষেই অশুভ।

কিন্তু সত্যই কি 'উইলসন' এতটাই দায়িত্বহীন?

বিবাহ ও নারীর প্রসঙ্গে বাহ্যত অবহেলার ভাব দেখালেও এই মানুষটি প্রত্যেক বিবাহের প্রাক্কালেই যে আর পাঁচজনের মত আশাবাদী হয়ে উঠত, স্বপ্ন দেখত সফল সুন্দর চিরস্থায়ী দাম্পত্য-জীবন ভোগ করার—সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাস্তি।

উইলসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুমাত্রেই জানে যে একথা কতটা সত্য, প্রত্যেকবারই সে চেয়েছে বিবাহবন্ধনকে সার্থক করে তুলতে আর প্রত্যেকবারই বিফল হয়েছে।

এই বিফলতার বেদনা সত্যই অকৃত্রিম, দ্বিতীয় দফা বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় তো সে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, তার পরিচিতবর্গের মধ্যে অনেকেই আশঙ্কিত হয়েছিল এই ভেবে যে, সে আত্মহত্যা করবে।

কেন এমন হল ? উইলসনের চারিত্রিক দৌর্বল্যই কি এর কারণ ? খানিকটা তাইই বটে। ওর দ্বিতীয় বিবাহ অন্তত এই জন্যই ভেঙ্গে গিয়েছিল। ওর তৃতীয় স্ত্রী চেয়েছিল ওর পানাসক্তিকে কমাতে এবং তারই ফলে ওদের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় তাতেই সে মেয়েটি অপর পুরুষের দিকে ঢলে পড়ে ক্রমে ক্রমে।

উইলসনের চতুর্থী স্ত্রী আদালতে অভিযোগ করেছিল এই বলে যে, সে নাকি তার অবিবাহিত অবস্থার সমস্ত রকম অভ্যাসকে বিবাহিত জীবনেও বজায় রাখতে চাইত।

নীতিবিদের চোখে 'উইলসন' অবশ্যই চরিত্রহীন একটি মানুষ, কিন্তু আজকের চিন্তাশীল মনস্তাত্ত্বিকরা অন্য কথা বলেন, তাঁদের মতে 'উইলসন' এবং উইলসনের মত যে-কোন মানুষই নাকি ব্যাধিগ্রস্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবার এই সমস্যার আরেকটা দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক একটি উদাহরণের মাধ্যমে।

'ম্যারিয়ান জন্সার' এক মধ্যবয়স্কা, সুদর্শনা, বুদ্ধিমতী আধুনিকা মহিলা, শিল্প ও সাহিত্যে উৎসাহী, ঘরকন্না ও জীবিকা দুই ক্ষেত্রেই বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

এই মহিলাও বিবাহ-বিচ্ছেদের এক প্রত্যক্ষ শিকার, তাঁর প্রথম দু'টি বিবাহই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

বর্তমান বিবাহিত জীবনের সুরুতে ম্যারিয়ান সুখীই ছিলেন, বন্ধু-বান্ধবরাও ভেবেছিল যে, এবার হয়ত ম্যারিয়ান সত্যই এক সফল দাম্পত্য-জীবনে স্থায়ী হতে পারবেন ; কিন্তু তা হল না। বর্তমানে তিনি এই তৃতীয় স্বামীর বিরুদ্ধেও বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এনেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, ভদ্রলোক নাকি একান্ত উদাসীন ও শীতল প্রকৃতির মানুষ।

এর আগের দু'বারও স্বামী বর্জনের সময় ম্যারিয়ান প্রায় এই একই ধরণের কারণের উল্লেখ করেছিলেন, যদিও এ কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা বোধ হয় নিরর্থক, কারণ তাহলে হয়ত তিনি সমস্ত আমেরিকান পুরুষদেরই কোন শিক্ষিতা স্বাধীনা মেয়ের স্বামী হওয়ার পক্ষে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করবেন।

অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক কিন্তু এ থেকে একটা তথ্যই সংগ্রহ করবেন, তা হল 'ম্যারিয়ান' নিজেই মনোবিকারের রোগিণী, দাম্পত্য-জীবনের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত।

আপনি নিজে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ করে থাকেন একবারও, তাহলে স্বভাবতই বিবাহ-বিচ্ছেদকে ব্যাধি বলে মানতে চাইবেন না, আপনার কাছে অবাঞ্ছিত দাম্পত্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সোপান ছাড়া আর কিছুই নয় এটা ; কিন্তু বিশ্বাস করুন চাই নাই করুন, বারবার বিবাহ-বিচ্ছেদ করার যে প্রবণতা আজ দেখা দিয়েছে, তা এক ধরণের মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।—যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদ মাত্রই যে অসুস্থ মনের প্রতিক্রিয়া তা নয়, কারণ দাম্পত্য-জীবনে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যখন বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যতীত আর কোন পথ খোলা থাকে না, তবে এ ধরণের পরিস্থিতি খুব সুলভ নয় এবং বারবার তা ঘটাও স্বাভাবিক নয়।

এজন্যই কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ যদি বারবার বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারস্থ হয় তখন একথা না বললেই নয় যে তারা সুস্থ বা স্বাভাবিক নয়, এবং আইনের দ্বারে না গিয়ে চিকিৎসকের আশ্রয়প্রার্থী হওয়াটাই তাদের পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়।

সাধারণত বিবাহ করে লোকে শান্তিতে যৌথ-জীবন অতিবাহিত করার জন্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ তাই দাম্পত্য-জীবনের পক্ষে সবচেয়ে বড় পরাজয়ের কথা। কাজেই বিবাহিত জীবন কি করলে স্থায়িত্ব লাভ করে সে সম্বন্ধে দু' একটা কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দাম্পত্য-জীবনকে স্থায়ী করতে হলে অলৌকিক কোন গুণপনার প্রয়োজন নেই, যা প্রয়োজন তা হল মানিয়ে নেওয়া, দু'টো মানুষ অবিরত পাশাপাশি বাস করলে সময়ে সময়ে মতভেদ ঘটাটা যে একান্ত স্বাভাবিক এ কথাটাও ভুললে চলবে না। কাজেই এ জিনিসটা নিয়ে অত্যধিক চিন্তা করাটাও মূঢ়তামাত্র।

সমাজ জীবনে বিবাহ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী, কাজেই অসফল দাম্পত্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বহু পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁদের অনেকের মতে সফল দাম্পত্য-জীবন গড়ে তুলতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই হতে হবে যৌথ-জীবন গড়ে তোলার কাজে উৎসাহী ও আন্তরিকভাবেই সচেষ্ট, তাঁদের মতে আন্তরিক প্রচেষ্টায় সবরকম বাধা-বিঘ্নকেই অতিক্রম করতে পারে।

ক্রমাগত বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রবণতা সাধারণত স্বামী বা স্ত্রী বা উভয়েরই মনোবিকলনের সাক্ষ্য দেয়। সচরাচর এ ধরণের লোকেরা নিউরোটিক বা নার্ভীয় রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে, নিউরোটিক মানুষ ভাবপ্রবণ বিকলাঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অবশ্য বিকলাঙ্গ বলতে এক্ষেত্রে মানসিক বিকলাঙ্গতাই বোঝায় এবং এ ধরণের যে-কোন মানুষেরই যথোচিত চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

মনোবিকলনবিদ চিকিৎসকদের মতে অবিরত বিবাহ-বিচ্ছেদকারী স্ত্রী-পুরুষ মাত্রই মনোবিকলনের শিকার, এই সব বিবাহ-বিচ্ছেদকে এঁরা ব্যাধি বলেই গণ্য করেন এবং বিশ্বাস করেন যে আইনের আওতায় না গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে গেলেই এইসব ক্ষেত্রে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা।

দৈব চেতাবানী

॥ অচ্যুৎ ॥

ভারতের ইতিহাসে দিল্লীর প্রভাব বর্তমানে যত, এত আর কোন সময়ে ছিল না। যদি খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে দিল্লীর আদেশে তা পাওয়া যায়। কাপড়ের দরকার হলেও দিল্লীর হুকুম চাই। বাড়ি বানাবার সিমেন্ট, লোহা দিল্লীই মঞ্জুর করে থাকে। পা সামনে বাড়াও বা পেছনে সরাও, হাত অথবা আঙুল তোল—সব ব্যাপারেই দিল্লীর আদেশ আসা দরকার। কেবল নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়া সমস্ত কিছুর ওপরই দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ। এই হলো আমাদের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। 'জত্তক' (একজন প্রসিদ্ধ উর্দু কবি—অনু.) বলেছিলেন, 'কত্তন জায়ে জত্তক পর দিল্লী কী গলিয়াঁ ছোড় কর' (দিল্লীর গলি ছেড়ে কে যায় প্রমোদে?) কিন্তু সে কবিতাটি আজকাল বদলে দাঁড়িয়েছে, 'কত্তন জাঁয়ে জত্তক পর দিল্লী সে রিশ্‌তা তোড় কর।' (দিল্লীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, কে বাঁচে আনন্দে।)

তা অনেকদিন ধরে দিল্লী যাওয়াটা আমার খুব জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আজ যাই, কাল যাই করতে করতে শেষ পর্যন্ত আর দেরি করা মুশকিল হয়ে পড়ল। একদিন পাকাপাকিভাবে মন ঠিক করে দিল্লীর টিকিট কাটালাম। কিন্তু হঠাৎ পূর্ব-রেলওয়ে কর্মীরা ধর্মঘট করবার সিদ্ধান্ত নিলো।

ভগবৎ কৃপায় বিরোধ কেবল পূর্ব-রেলওয়ের মধ্যেই ছিল। মুগলসরাই থেকে উত্তর-রেলওয়ের শুরু। কোনরকমে মুগলসরাই পৌঁছলে—মনে মনে আশা করলাম দিল্লীই পৌঁছন হয়ে যাবে।

ধর্মঘট শুরু হবার কথা রাত বারোটা থেকে। গাড়ি যদি কোনমতে আসানসোল পেরিয়ে যায় তাহলে হয়তো গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবো। স্টেশনে এসে দেখলাম কুলিরাও চুপচাপ বসে। মোটরগাড়ি থেকে জিনিসপত্র বার করে প্ল্যাটফর্মে রাখলাম, কিন্তু কুলিরা ঠায় বসে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ করতে থাকল। কাছেই বসা একজন কুলিকে ডাকলাম, সে মুখটা বিকৃত করে বসে রইল। আরেকজনকে ডাকলাম। 'আরে বাবু, ফিরে যান', বলে সে চুপ করে গেল। অন্য দু'জন তো মুখও অন্যদিক করে রেখেছিল। এমন সময় একজন কুলি পেছন থেকে এল এবং জিনিসপত্র ওঠাতে লাগলো।

প্রথম কুলি মুখ বিকৃত করে ওর দিকে তাকাল।

দ্বিতীয়জন বলে উঠল, 'ব্যস, লোভে মরলে।'

সে জবাব দিল, 'ভাই, এখনও তো বারোটা বাজতে পাঁচ ঘণ্টা বাকি রয়েছে।' দ্বিতীয়জন বলল,' কিন্তু তুমি তো এমন লোভে পড়েছ যে, চারটে পয়সাও ছাড়তে পার না।'

এ জবাব দিল, 'এ তো পয়সার ব্যাপার নয়, এটা নীতির ব্যাপার।'

যাই হোক, কোনরকমে মাল বোঝাই করে এয়ার কণ্ডিশণ্ড কারে গিয়ে বসলাম। পাশের কম্পার্টমেন্টে এক ভদ্রলোক—দেখে শাসকদলের নেতা মনে হল—বেশ ঠাট নিয়ে বসেছিলেন, যেন পুরো গাড়িটাই তাঁর। অপর দিকে স্যুটপরা এক বিদেশী ভদ্রলোক ছিলেন। পরে জানতে পারলাম—বিদেশী একজন পর্যটক। তার পরের কম্পার্টমেন্টে ছিলেন ড্রেন-পাইপ পাজামা এবং আদ্দেক বুক-অবধি খোলা হাতকাটা জ্যাকেট-পরা এক কালো মেমসাহেব। তাঁর সঙ্গে একটি ছোট ছেলেও ছিল। মাঝে মাঝে তিনি করিডোরে একটা চক্কর দিয়ে আসছিলেন। অপরদিকে চার সিটওলা কম্পার্টমেন্টে একজন প্রাচীন ধরণের ভদ্রলোক ছিলেন। সংগে তাঁর এক বৃদ্ধা—সম্ভবত তাঁর মা।

গাড়ি ছাড়ার সময় যত ঘনিয়ে আসতে লাগলো, তত আমাদের উদ্বেগ বাড়তে শুরু করল। গার্ড কামরার সামনে দিয়ে তিন-চার বার গেলেন। কখনও সামনের দিকে কখনও পেছনের দিকে—কিন্তু গাড়ি চলল না। এমন সময় মেমসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'স্টুঅর্ড, কব্ টক্ চলে গা, টাইম নিকালটা হায়।' (স্টুয়ার্ড, কতক্ষণে চলবে, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।)

স্টুয়ার্ড বিনয়সহকারে উত্তর দিলো, 'আজ্ঞে বুঝতে পারছি না ঠিক ব্যাপারটা কি!' কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁশি বাজল এবং গাড়ি চলতে শুরু করল। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। চল্লিশ মিনিট লেট তবু গাড়ি চলছে। গাড়ি চলায় কিছুটা নিশ্চিন্তভাব এলো, ফলে বর্ধমান পার হতে হতে আমার চোখ লেগে এল। ঠিক বলতে পারবো না, কতক্ষণ শুয়েছিলাম। চোখ খুলতে বুঝলাম গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, কাছেই এক সভা জমেছে আর একটি লোক সিমেণ্টবাঁধানো বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতাবাজি করছে। আমিও গাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

বক্তা বেঞ্চ থেকে নেমে পড়ছিল, এমন সময় আমাদের গাড়ির গার্ডসাহেবও বলতে সুরু করলেন, 'ভাই সব বেতন এবং অন্যান্য ভাতার ব্যাপারে আমরাই সবচেয়ে বেশি মার খাই। এই গুরুদায়িত্ব পালন করে আমরা কিই বা পাই। কিন্তু, আমাদের ধর্মঘট সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ছাড়া সফল হতে পারে না। নতুন গাড়ি আমরা না চালালেও যে সব যাত্রী নিয়ে গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে, তাদের কষ্ট হলে আমাদের প্রতি তাদের সহানুভূতির বদলে বিরূপ মনোভাবই সৃষ্টি হবে। আমার অনুরোধ, এই মেলগাড়ি আটকাবেন না।'

এরকম দু'চারটে যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তার প্রভাব শ্রোতাদের ওপর পড়ল বলে মনে হল। এঞ্জিন-ড্রাইভারও ওখানে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'আমি গাড়ি নিয়ে যেতে রাজী।' ব্যস্ একে একে সবাই প্রস্তুত হল এবং আসানসোল থেকে গাড়ি কোনরকমে বেরোল। আসানসোলই ছিল বড় ঘাঁটি। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

মেমসাহেব আবার স্টুয়ার্ডকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'য়েহ ডাবা টরফ ক্যা হ্যায়?' (এই বাঁ দিকে কি রয়েছে?)। 'ডাবা' শুনে বুঝতে দেরি হল না যে মেমসাহেব গুজরাতের বাসিন্দা। আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হম কিট্‌না লেট হ্যায়?' (আমরা কত লেট?) স্টুয়ার্ড বলল, 'দু ঘণ্টা লেট হয়েছে।' 'আগে সে কিউঁ নেহিঁ বাটায়া? হম হমারা কুট্টা কো ঘুমা লেটা?' (আগে থেকে কেন বল নি? আমি আমার কুকুরকে বেড়িয়ে আনতাম?' স্টুয়ার্ড বেচারা আর কি জবাব দেবে! আসানসোল থেকে যে আবার গাড়ি চলবে তাই বা কে জানত!

বৃদ্ধার শ্বাস কিঞ্চিৎ চড়া বোধ হল। মাঝে মাঝে কাশির সংগে হাঁপের টান শোনা যাচ্ছিল। নেতা মহোদয় তো নিজের কামরায় একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করে বসেছেন। পর্যটক সাহেবও দরজায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করেছেন। হয়তো বা ভারতীয় ধর্মঘটের পদ্ধতি দেখে মনে মনে হাসছেন।

শুনেছিলাম, এখন, এই আসানসোল ছাড়িয়ে ধর্মঘটের ঘটা তেমন জোর নয়। গাড়ি আবার চলতে ঘুমের তাড়া এল। শরীর টান করে শুয়ে পড়লাম। রাতভোর শুয়েই রইলাম। সকালে আলোর সংগে সংগে বাজের কড়কড় শব্দে চোখ খুলল। সংগে সংগে গাড়িও একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল—যেন জোরে ব্রেক কষেছে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ছোট্ট প্লাটফর্ম আর স্টেশনের নাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। স্টুয়ার্ডও দাঁড়িয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ভাই, এখানেও কি মেল থামে?'

'দাঁড়ায় তো না! বোধ হয় সিগন্যাল পড়ে নি।' ও বলল।

পর্যটকও করিডোরে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আমরা দু'জনেই দরজায় গিয়ে পৌছলাম। দেখলাম, সামনের দিক থেকে একজন চশমাধারী, লম্বা-লম্বা চুল মাথায়, স্টেশন মাস্টারের পোষাকপরা অবস্থায় এসে দাঁড়াল। ওদিক থেকে গার্ডসাহেবও এসে পৌছল।

ঠিক আমাদের সামনে এসে দু'জনে মুখোমুখি হল। গার্ড জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? সিগন্যাল ডাউন করুন!'

চশমাধারী বলল, 'আপনি জানেন না, ধর্মঘট চলছে!'

গার্ড আবার তার আসানসোলী যুক্তির আবৃত্তি করল, কিন্তু চশমাধারীর ওপর কোন প্রভাব পড়ল না।

সে বলল, 'আপনি জানেন না, আমি পার্টির এই সার্কেলের নেতা। এই দিককার সেল আমাকে জিজ্ঞেস করেই সব কাজ করে। কেন্দ্রীয় কমিটীর আদেশ অমান্য করার জন্য আপনি আমাকে বলছেন?'

খেয়াল করি নি, নেতামহোদয় এবং মেমসাহেব কখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। মেমসাহেব একটু ঝাঁজের সংগে জিজ্ঞেস করলেন, 'মোগলসরাই কিটনা ফাসলা অন্তর হ্যায়?' (মোগলসরাই আর কতদূর?)

চশমাধারী বলল, 'এই পাঁচশত মাইল হবে।'

'ও গাড, জানটা নেহিঁ, হমারা কুট্টা সখ্‌ত্‌ বীমার হ্যায়। ডিল্লী নেহিঁ জানেসে মর জায়গা।' (হে ঈশ্বর, জান না, আমার কুকুরের দারুণ অসুখ। দিল্লী না গেলে মারা যাবে।)

'কুকুর মরুক আর বাঁচুক গাড়ি চলবে না।'

নেতামশাই এবারে ফেটে পড়লেন। 'জানো, আমি কে? আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর শালার শালা। হয় সিগন্যাল লাগাও আর নয় তো তোমাকে যে-ভোগান্তি ভুগতে হবে—বুঝতেই পারো।'

চশমাধারী বলল, 'মিস্টার, আমি তো ভুগছিই। আমার তো এতো দিনে মোগলসরাই-এর মতো কোন বড় স্টেশনের স্টেশন মাস্টার হওয়া উচিত ছিল। সেখান থেকে সাত মাইল দূর এই গ্রামে আমাকে ফেলে রেখেছে—এটা কি কম ভোগান্তি?'

এঞ্জিন-ড্রাইভারও এসে গেছে। গার্ড তার দিকে তাকাল। সে উত্তর দিল, 'গার্ড সাহেব, আমি তো চালিয়ে দিতাম কিন্তু লাল বাতির কাছে গেলে আমার ওপর মোকদ্দমা চলতে পারে।'

'চাঁদ, কেবল বাতিই নয়, আমি লাইনও সাইডিংয়ে লাগিয়ে লক করে দিয়েছি। আমি কি ঘাস খেয়ে পার্টি চালাই!'

প্রাচীন ঢংয়ের ভদ্রলোক এসে পৌঁছেচেন। বললেন, 'ভাই আমার বৃদ্ধা মা বেনারস যাচ্ছেন শেষনিঃশ্বাস ফেলতে। তার আগেই যদি এখানে মারা যান, তাহলে পাপ তোমার ওপর বর্তাবে।'

'ছাড়ুন, আপনার পাপ। ওসব পাপ-পুণ্য-ভগবানে বিশ্বাস করি না। ওগুলো পুঁজিপতিদের বুলি।'

বেশ ভিড় জমে উঠল। কয়েকটি কামরা থেকেই লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এক সাধুও ছিলেন। তিনি বললেন, 'দেখ বাবা, বিশ্বনাথের কাছে যাওয়ার সময় এ আটকাচ্ছে, তার ওপর পাপ মানে না,—পুণ্য মানে না—এ কেমন হিন্দু?'

আর কি, বেশ কিছুলোক চশমাধারীকে ঘিরে ধরল। সেও ঘাবড়ে গেল, পাছে মারধোর হয়। মুখ দেখে মনে হল হয়তো এবার মেনে নেবে।

এমন সময় গ্যাং-সরদারকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। 'মাট্টর সাহেব, পুল ভেসে গেছে, লাইন ভেঙে গেছে।' চশমাধারীর চেহারা এবারে দেখবার মতো হয়ে উঠল। কখনও আনন্দে ডগমগ যে, গাড়ি চলবে না; কখনও এমন ভাব যেন পেছন থেকে কেউ ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। গাড়ি ধর্মঘটের জন্য নয়—পুলটার জন্য বন্ধ হল। হতভাগা পুলটাও ঠিক এই সময় ভেঙে ধর্মঘটের সমস্ত যশ ছিনিয়ে নিল।

পর্যটক বারবার জিজ্ঞেস করে বুঝেছিল ব্যাপারটা। ও এমনভাবে শুনছিল যেন এক-একটা শব্দ গিলছিল। এ রকম আগ্রহ খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়। সম্ভবত এখানকার ধর্মঘট উনি এই প্রথম দেখলেন।

সন্ধ্যে নাগাদ মরে-বেঁচে, পায়ে হেঁটে আর গরুর গাড়িতে চেপে মোগলসরাই পৌঁছলাম। পরের দিন দিল্লী। খবরের কাগজখানা যখন পেলাম, তখন ওপরের পৃষ্ঠাতেই এক মজার ঘটনার উল্লেখ দেখলাম। বড় বড় হরফে ছাপা "দৈবী অপরূপ ঘটনা।" "স্টেশন মাস্টারের কৃতিত্ব।" তাতে লেখা ছিল:

> 'কুচমনে গিয়া গাড়ি দাঁড়ায়। রাত্রে ভীষণ বর্ষণ হইয়াছিল। স্টেশন মাস্টার সিগন্যাল না নামাইবার ফলে গার্ড খুবই ক্রুদ্ধ হয়। আরও অনেক যাত্রী গাড়ি হইতে নামিয়া পড়ে এবং স্টেশন মাস্টারকে মারিতে পর্যন্ত উদ্যত হয়। কিন্তু কাহারও ক্ষমতা হয় নাই সিগন্যাল নামাইয়া দিবার। কুচমনের প্রায় সাত মাইল দূরবর্তী স্থানে একটি নালা রহিয়াছে। উক্ত নালার উপর একটি ছোট সেতু আছে। স্টেশন মাস্টার বলেন যে, উক্ত সেতুর অবস্থা সুবিধার নহে এবং আমি গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, উক্ত সেতু ভাঙিয়া গিয়াছে ইহা দৈবী চেতাবণি। দৈবী চেতাবণির কথা শুনিয়া সকল যাত্রীই কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিতে থাকেন। দৈব ঘটনা ঘটিবারই। ইতোমধ্যে গ্যাংমেন আসিয়া সংবাদ দেয় যে, সেতুটি সত্যসত্যই ভাঙিয়া গিয়াছে। মন্ত্রিমহোদয় স্টেশন মাস্টারকে দিল্লী আহ্বান করিয়াছেন। শোনা যায় মাস্টারসাহেব স্বপ্নে ভবিষ্যতের পূর্ণ চিত্র দর্শন করিতে পারেন।'

সংগে সংগে এ খবরও ছিল যে ইস্টার্ন রেলওয়ের কর্মচারীদের ধর্মঘটের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। সকল কর্মচারীই কাজে যোগ দেয়।

একটি ঘোষণা

॥ ভি মায়াকোভস্কি ॥
(*Aloud & Straight* অবলম্বনে)

বন্ধুগণ !
হে নমস্য নতুন মানুষ—
যে আঁধার একদা
মায়া আর মোহে আচ্ছন্ন করে
অসমতায় রেখেছিল ঘিরে
তোমরা তাকে সমান করে দিয়েছো।

জানতে কি চাইছো আমি কে ?
কোন অধিকারে গাইছি প্রশস্তি ?
বলি তবে শোন ঃ
বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা মতো পণ্ডিত নই কোন,
অন্তরের অজস্র জিজ্ঞাসাকে যারা
ভয় দিয়ে করে লক্ষ্যহারা ;
আমি নই তাহাদের কেউ
নহি প্রশান্ত বারিকণা, আমি অশান্ত ঢেউ।

হে গর্বিত প্রাজ্ঞজন
রঙিন চশমাটা খুলে ফেলো ;
আর শোন
তোমার কথা আমিই বলছি,
তুমি শুধু শোন।

অক্টোবরের সেই ডাকে যারা
কাব্যকলার তুলতুলে
উদ্যানের মায়া ভুলে,
গিয়েছিল রণে
অসমকে সমান করার কি বাসনা মনে
আমি তাদেরই একজন
মনে শুধু রণ।

বিপ্লবোত্তর প্রথম দিনগুলি মনে পড়ে
শান্ত গৃহকোণ আর রূপডোরে
বিধৃত প্রকৃতি ;
অলীক কল্পনা আর পেছনের স্মৃতি
তখনও দিতো হাতছানি।
দুই যুগে হতো কানাকানি।

দিও, বলে দিও তাহাদের
থামাতে সে গান যাহা সত্য নয়
দেখেছি অনেক, ঢের ঢের।

ওদের ধারে কাছে কোথাও
পাবে না আমাকে খুঁজে।
পাবে না আমাকে খুঁজে গন্ধ-উধাও
শহরের গোলাপ-বাগিচার আশেপাশে।

পারি না কি ?—পারি।
নরম নরম প্রেমের কবিতা লেখা
এমন আর কি শক্ত।
লিখলে লিখতে পারি
ওদের চাইতেও ভালো হতো সে লেখা—
যদি হতাম পুরাতনের ভক্ত।
কিন্তু না, পুরনো শেওলা হতে পারি না আমি
আমি যে সংগ্রামী।

সে কবিতা যদি কোনোদিন এসেই পড়ে কণ্ঠে
তবে তার অবশ্যই অপমৃত্যু ঘটবে
আর, আমিই ঘটাবো তার অপমৃত্যু।

শোনো, বন্ধুগণ !
কবিতা আমি লিখতে চাই ;
সংগ্রামী কাব্য, যার পেছনের টান নাই
মৃত্যুর মধ্যে দেখো তাতে জীবনের জয়গান
ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির ঐকতান।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কবিতা আমি লিখি
যার ছত্রে ছত্রে পাঠক পাবে জীবনমন্ত্র।

আমার সে কাব্য ধ্বনিত হবে
শতাব্দীর সীমানা ছাড়িয়ে।
আর সব কবি আর শক্তির রাজত্ব মাড়িয়ে
আমি জানি আমার সে গান গীত হবে
আমার কাব্যের সে যাত্রাপথ
কুসুমাস্তীর্ণ হবে না জানি।
অলস আর ইন্দ্রিয়পরের জন্যে আমি
লিখবো না।

সুখে দুঃখে আমার সে কাব্য
খুঁজে নেবে নিখাদ মানুষ ;
সমান মানুষ।

একটি ঘোষণা

আমার সে কাব্য
পুস্তকের পৃষ্ঠা বন্দী হয়ে থেকেই মারা যাবে না,
কাহারও অলস মুহূর্তের ভোজ্য হবে না।
সে যে হবে কঠিন অস্ত্র।
ক্ষুরধার বজ্র।

শুধু শুনতে ভালো লাগে
অথচ অর্থহীন;
এমন মধুর কথা আমি বলতে পারি না।
আমি বলবো না।
ওরা লিখতো
যা শুধু তরুণীদের লজ্জা বাড়াতো
ধোঁয়াটে আর অশ্লীল।
আর দেখো আমার কাব্য
পাতাগুলি ছিঁড়েফুঁড়ে যেন শতসহস্র সৈনিক।
রণবেশে এগিয়ে চলেছে।

ছোটো ছোটো কবিতাগুলি
যেন এক একটি মৃত্যুদূত—
জীবনের অমর বাহন।
আর দেখো বড়োগুলি
অফুরন্ত তূণ
লক্ষ্যভেদে অভ্রান্ত সবাই।

নানা জাতের কবিতার মধ্যে—
তারাই আমার সব চাইতে প্রিয়
যারা স্পষ্টভাবে সত্য কথা বলে
তীব্র, তীক্ষ্ণ, লঘুছন্দে চলে।

বিশ বছর লিখছি আমি
এমন কবিতা যারা সবাই সংগ্রামী।
প্রতি ছত্রে যার অস্ত্রের বলিষ্ঠতা—
তাদের প্রত্যেককে—
হে বিশ্বের সর্বহারা মানুষ,
আমি তোমাদের দিয়ে গেলাম।

মেহনতী জনতার যারা শত্রু
তারা আমারও শত্রু নিশ্চয়
তাদের জন্যে আছে সীমাহীন ঘৃণার সঞ্চয়।



● রুশ-কবি মায়াকোভস্কি

দারুণ দুঃখের দিনে
বছরের পর বছর,
লাল নিশানের তলে
আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম।

যেমন করে ঘরের জানালা খুলে দিয়ে
আমরা বাইরের আলো আনি,
তেমনি করে মার্কসের বই খুলে
আমরাও আলো পেয়েছিলাম।
সবকিছু ভালোমতো বুঝবার আগেও
এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম—
কার হয়ে কার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

হেগেলের কুটিল দ্বন্দ্ব
আমাদের পথ দেখায় নি ;
আমাদের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি
সহজ অস্ত্রের সন্ধান দিয়েছে
যা আমরা সরাসরি কর্তাদের তাগ করে ছেড়েছি—
একদিন যেমন তারা আমাদের তাগ করেছিল।

হে বিগত-যৌবনা খ্যাতি
কাঁদো, আরো কাঁদো!
প্রতিভার শুকনো অপব্যবহার নয় ;
এ যে অগ্নি-সংস্কার।

চোখ বোজো, হে আমার কাব্য
সৈনিকের মতো তুমিও নিঃশেষ হও
আমাদের মধ্যে থেকে
যেমন হাজার হাজার জানা-অজানা
সৈনিক প্রাণ দিয়েছে।

পুরস্কার চাই না আমি
চাই না স্মৃতির বিলাপ, আমি যে সংগ্রামী।
আমরা সবাই সৈনিক, আমরা বন্ধু,
একই গৌরবের অংশ নেবো আমরা
আমাদের স্মারক হবে একই বেদী।

আর সে একাই বলবে আমাদের সবার কাহিনী
চিরকাল ধরে ;
বলবে, কেমন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে
আমরা গড়েছি সমাজবাদ।

তোমরা যারা আগামী দিনের
মুক্ত হবে অবক্ষয়ের শ্যেনদৃষ্টি হতে।
যাদের শরীর লৌহ-কঠিন
আর পেশীতে ইস্পাতের দৃঢ়তা—
তারা বুঝতে পারবে
এক কবি গান গেয়েছিল সবার তরে।

দিন বর্ষ মাস আমাতেও মরচে ধরিয়ে দিচ্ছে
আমি যেন ইতিহাসের ধোঁয়া-ঢাপা
এক অতি দীর্ঘ-পুচ্ছ জীব।

এসো, হে বন্ধু জীবন—
পাঁচ-সালা ত্বরান্বিত করি।

কাব্য আমাকে কিছুই দেয় নি
না অর্থ, না আসবাব ;
সত্যি বলছি বন্ধু— আমি চাইও না কিছু
শুধু চাই একটু পরিচ্ছন্ন জীবন।

অনুবাদক—শ্রীসুনীলকুমার নাগ

সন্ধ্যা রাগে

॥ মণিরুল ইসলাম ॥

সাঝের আকাশে উঠেছে চাঁদের আলো
দখিনা বাতাস মনে দিয়ে যায় দোলা ;
জোনাকিরা সব রাতের আকাশ করিয়াছে জমকালো
কি জানি কেন এমন সময় হয়ে যায় আত্মভোলা।

বাতাসে আজিকে সন্ধ্যামালতী ফুলেরা গন্ধ ঢালে
স্বর্ণচাঁপা রজনীগন্ধায় হৃদয় আকুল হয় :
সাঁঝের বেলায় নিশাচর পাখি আকাশেতে ডানা মেলে
ঝাউ ঝির ঝির দখিনা বাতাসে কত কথা বলে যায়।

সেদিন এমনই উতলা বাতাসে আকাশের আঙিনায়
তোমার খোঁপার দু'পাশে রজনীগন্ধা জড় ছিল অনুরাগে
আবেশ মাখানো চাউনি চোখে তুমি ছিলে গীতিময়
চুড়ি ঠুন্‌ ঠুন্‌ বেলোয়ারী সুর তুলেছিলো সন্ধ্যারাগে।

আজ আমি হেথা একা বসে আছি শুনি না'ক কোন সুর
পায়ের নূপুর বাজে না'ক আর চরণ ধ্বনির মাঝে
সন্ধ্যা আলোকে একা ফেলে মোরে চলে গেছো বহুদূরে—
কেবল আকাশে চাঁদ আর তারা জেগে আছে আজ সাঁঝে।

॥ রাণী ভবানী

জীবনের এক অজ্ঞাত অধ্যায় ॥

॥ শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী ॥



বাঙলার কাব্যে ও নাটকে, বাঙালীর ইতিহাসে ও জনপ্রবাদে যাঁহার গৌরবকাহিনী সসম্ভ্রমে কীর্তিত হইয়াছে, সেই পুণ্যশ্লোকা মহারাণী ভবানীর স্নেহ, মমতা ও করুণার রাজ্য শুধু বাঙলা নহে, বাঙালার বাহিরে সুদূর কাশীধামেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ 'কাশী' যখন মোগল-শাসনের শেষভাগে নিষ্প্রভ ও অশক্ত হইয়া পড়িল, তখন তাহাকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন যে-দুইজন রমণী—তাঁহাদের একজন মহারাণী ভবানী এবং অপরজন রাণী অহল্যাবাঈ। কাশীকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মহারাণী ভবানী ভারতীয় সংস্কৃতিকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন (১)। অন্নদান, বিদ্যাদান, ভূমিদান প্রভৃতি ব্যাপারে রাণী ভবানীর দানশীলতার কাহিনী প্রবাদরূপে বাঙালার ঘরে ঘরে আজিও প্রচলিত আছে। কিন্তু মহারাণী ভবানীর বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাদি আলোচনার অভাবে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মহারাণী ভবানী যখন রাজসাহী রাজ্যের অধীশ্বরী, সেই সময় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল বাঙলার জনসাধারণের উপর যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, প্রায় দুই শতাব্দী পরেও বঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত প্রবাদবাক্য তাহার অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকে; আজিও বঙ্গজননীগণ মারাঠা সৈন্যের বা বর্গীদিগের কল্পিত আগমনের কথা বলিয়া শিশু-সন্তানগণের মনে ভীতির সঞ্চার ও চক্ষে নিদ্রাকর্ষণের যত্ন করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণে নবাব আলিবর্দী যখন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত—যখন বঙ্গসেনা সেই দুর্বার বৈরীর সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া অকাতরে প্রাণপাত করিতেছিল, অর্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীও তখন মহারাষ্ট্র আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নবাবের সহায়তা করিয়াছিলেন।

'যে মহারাষ্ট্রীয়গণের শক্তি ও গতিরোধ করিতে নবাব আলিবর্দী খাঁকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাদের সেই অত্যাচার হইতে হিন্দুরমণী রাণী ভবানী প্রজাগণকে অধিকাংশ সময়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনে রাজসাহী রাজ্যের একাংশ নষ্টও হইয়া যায়। কিন্তু রাণী ভবানীর শাসন-কৌশলে পদ্মার উত্তর তীরস্থ রাজসাহী প্রদেশ অনেক অংশে রক্ষা পাইয়াছিল। ইহাই হিন্দুরমণীর বীরত্ব। ইহাই তাহার সুশাসনের পরিচয়। নবাব আলিবর্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয়গণের ভয়ে মহারাণীর রাজসাহী রাজ্যে পদ্মাতীরে গোদাগারী গ্রামে নিজ বাসভবন নির্মাণ করেন। হিন্দুরমণীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে (২)।' নবাবের অনুচর শাহামৎ জঙ্গ যে স্থানে নবাব পরিবারের ধনরত্ন ও রমণীগণসহ আগমন করিয়া অস্থায়িভাবে বসবাস করেন তাহা আজিও 'ভাগনগর' (৩) নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

রাণী ভবানী বিধবা হিন্দুরমণী,—গঙ্গাবাস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী বড়নগরের রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন। বড়নগর রাজবাটীর এখন জীর্ণাবস্থা। কিন্তু রাণী ভবানীর সযত্ননির্মিত দেবমন্দিরগুলি এখনও পরিব্রাজকদিগের নিকট সমধিক গৌরবের বস্তু বলিয়া পরিচিত। রাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাঙালী হিন্দুমাত্রের নিকটই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য, স্বদেশপ্রেমের জন্য, শাসন-কৌশলের জন্য, পুণ্যকীর্তির জন্য, দরিদ্র-পালনের জন্য—রাণী ভবানী স্বদেশীয়দিগের নিকট পূজনীয়া দেবী বলিয়া পরিচিতা হইয়াছেন (৪)।

মহারাণী ভবানী যতদিন জীবিতা ছিলেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বাঙলার রাজনীতি ও অর্থনীতির সহিত জড়িত থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার সুশাসনগুণে রাজসাহীর শিল্প ও বাণিজ্য পৃথিবী-বিখ্যাত হইয়াছিল। বাঙলার ভূস্বামিগণ যখন সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন সুবিধা পাইলে ইংরাজেরা যে বাঙলায় সর্বেসর্বা হইয়া উঠিবে 'প্রতিভাশালিনী রাণী ভবানী ভিন্ন আর কেহই সেইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেন নাই' (৫)।

মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির চক্রান্তে সিরাজদ্দৌলার সর্বনাশের সকল আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হইয়া গেল—কৃষ্ণনগরাধিপতি যখন সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া মহারাণী ভবানীকে তাঁহাদের চক্রে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন—'পুণ্যব্রতধারিণী বীর রমণী মহারাণী ভবানী—যাঁহার রাজ্যের চতুঃসীমা ভ্রমণ করিয়া আসিতে সেকালে ৩৫ দিন লাগিত—শুনিতে পাওয়া যায়, শুধু তিনিই স্ত্রীজনোচিত শঙ্খ, বলয়, সিন্দুর ও চীনাম্বর প্রেরণ করিয়া সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন (৬)।'

'যাঁহারা স্বার্থের চরণতলে দয়া, ধর্ম, কর্তব্যবুদ্ধি, রাজভক্তি বলিদান দিয়া সিরাজদ্দৌলার সর্বনাশ-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন,···তাঁহারা বীর রমণীর ভৎসনাবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ইংরাজ-সাহায্যে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন (৭)।'

ফল যাহা ফলিবার তাহা ফলিল ; পলাশীর প্রান্তরে—

'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল
পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে ?'

বঙ্গবীরাঙ্গনার তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে সেদিন যে বিপর্যয়ের আশঙ্কা অনুভূত হইয়াছিল, বঙ্গপ্রধানগণ সেদিন যদি তাঁহার নির্দেশ গ্রহণ করিতেন, তবে আজ বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত।

পলাশীর প্রাঙ্গণে ইংরাজের যে কামান গর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অনেকদিন পর্যন্ত বাঙলায় তাহা নীরব হয় নাই। 'ক্লাইভের গর্দভ' নবাব মীরজাফর তাহার গর্জনে অভিনন্দিত হইয়া বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন,—আবার তাহারই গর্জনে ভীত হইয়া মীরকাশেমের হাতে রাজদণ্ড অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

অবশেষে নবাব মীরকাশেমও বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙলা বিহার উড়িষ্যার মসনদের মায়া ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তখনও বাঙালীর বীরত্বখ্যাতির অভাব হয় নাই,—তখনও বাঙলার প্রতিটি পরগণা অধিকার করিতে ইংরাজগণকে সসৈন্যে অভিযান করিতে হইয়াছে।

সেই যুগসন্ধিকালে বাঙলার রমণীগণও পুরুষের পার্শে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একথা অনৈতিহাসিক না হইলেও আলোচনার অভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। এই সময়ে প্রজাসাধারণের স্বার্থরক্ষাকল্পে রাণী ভবানী ইংরাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না।

'কোম্পানী বাহাদুর ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া সকল কার্যভার গ্রহণ করিলেন ; পরবর্ষেই মহাধুমধামে মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর পুণ্যাহ সুসম্পন্ন হইল। পুণ্যাহ অন্তে একমাস মধ্যেই যখন নবাব নজমুদ্দৌলা সংসার হইতে বিদায় লইলেন, তখন তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় ভ্রাতা সইফ্-উ-দৌলা বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নবাবী ঠাট বজায় রাখিতে লাগিলেন (৮)।'

তখন বাঙালীর গোলাভরা ধান ও গোয়ালভরা গরু ছিল। কিন্তু ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে যে অনাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, তাহার সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণের অত্যাচারের ফলে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল ; বাঙালীর সর্বনাশ হইয়া গেল। অভাব-অনটনের মধ্যেও কিন্তু জনসাধারণকে রাজস্ব দিতে হইল। দেশের এই দুর্দিনেও জোর-জবরদস্তি করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতে কোম্পানীর কর্মচারিগণ কুণ্ঠিত হয় নাই। সময়মত রাজস্ব দিতে না পারিলে প্রজাগণকে প্রহার, বন্দী, এমন কি সম্পত্তিচ্যুত করা হইত (৯)। সমসাময়িক এক কবি লিখিয়াছেন—

'কত যে খাজনা পাইবে তার লেখা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই ॥
দেও দেও চাই চাই এইমাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥

* * *

রাইয়ং প্রজারা সবে থাকে খাড়া হইয়া।
হাতযুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া ॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খানা করি উপবাস (১০) ॥'

এই সময়ে রাজস্ব যাহাতে ঠিকমত আদায় হয়, তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য কোম্পানী বাহাদুর রাউস সাহেবকে রাজসাহী রাজ্যের পরিদর্শক (Supervisor) নিযুক্ত করেন। সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত তাঁহার কয়েকখানি পত্রে এই সময়কার প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায়। বিভিন্ন সময়ে রাউস সাহেব তাঁহার এলাকার বিবরণ দিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন,—

১। 'কোম্পানীর বার্ষিক খাজনা প্রায় তিন-চারি লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে,'—৮ই অক্টোবর, ১৭৭০।

২। 'রাজস্ব বিষয়ে জমিদারগণ যাহাতে শৈথিল্য প্রকাশ করিবার সুযোগ না পায়, অথবা তহশীলদারগণ যাহাতে অমনোযোগী হইতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি' —১৬ই জানুয়ারী, ১৭৭১।

৩। 'আমি নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণকে নির্যাতিত করিয়াছি। জমিদারগণ এবং নবীন রাজাকে বারংবার তাগিদ দিয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছি যে, রাজস্বের টাকা অবিলম্বে শোধ দিতে হইবে। দেশে দুর্ভিক্ষই থাকুক আর বন্যাই আসুক, কোন আপত্তি গ্রহণ করা হইবে না,'—১৯শে এপ্রিল, ১৭৭১।

৪। 'সমুদয় রাজস্বই আদায় হইয়াছে—বকেয়া বাকি নাই,'—২রা সেপ্টেম্বর, ১৭৭১ (১১)।

দুর্ভিক্ষ ও ইংরাজ কর্মচারিগণের অত্যাচারে শেষে এমন দিন আসিল যে, অনাহারে জনসাধারণ প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তাহারা গরু, মহিষ, হাল-লাঙল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া—অবশেষে একমুষ্টি অন্নের জন্য পুত্র-কন্যা পর্যন্ত বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রয় করিবার মত লোক দেশে আর রহিল না;—খরিদ্দার নাই, সবলেই বেচিতে চায়। বাঙালী গাছের পাতা, মাঠের ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। ১৭৭০ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এমন হইল যে, কুকুর-বিড়াল তো দূরের কথা—বাঙালী নরমাংস খাইতে আরম্ভ করিল (১২)।

শেষে এমন অবস্থা হইল যে, ওয়ারেন হেস্টিংস বিলাতে ডিরেক্টার সভায় লিখিয়া পাঠাইলেন—'ইংরাজের নন্দন-কানন ধ্বংস হইয়াছে—প্রজাগণ জমিজমা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে—প্রতিদিন ঘাটতি পড়িতেছে (১৩)।'

মহারাণী ভবানী তখনও রাজসাহী রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার সুপরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া বাঙলার প্রধানগণ যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকেই করিতে হইল। দেশের দুর্দিনে তিনি নাটোরের রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং বকেয়া রাজস্ব মকুব করিবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরের নিকট আবেদন করিলেন।

বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রাজসাহীর তৎকালীন ইংরাজ পরিদর্শক রাউস সাহেবকে জানাইলেন—'আপনার নিকট রাণী যে আবেদন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, আগামী বর্ষের রাজস্ব যাহাতে সম্পূর্ণ আদায় হয়, সেদিকে আমাদের ন্যায় আপনারও বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। জমিদারদের কথায় বিশ্বাস করিলে চলিবে না। কিন্তু চুক্তিভঙ্গের জন্য বংশপরম্পরা হিসাবে তাঁহাকে যে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য রাণী কি করিতে চাহেন তাহা আমরা আনন্দের সহিত শ্রবণ করিব (১৪)।'

এই উত্তর পাইয়াও মহারাণী ভবানী বিচলিতা হইলেন না। তিনি জনসাধারণের বিপর্যয় রোধ করিবার জন্য যেমন মুক্তহস্তে দান করিতেছিলেন, তেমনি দান করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু ইংরাজ কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহে বাধাদানের নীতি গ্রহণ করিলেন। মহারাণী ভবানীর উৎসাহে নাটোরের রাজ-কর্মচারিগণ বিভিন্ন এলাকায় রাজস্ব সংগ্রহে বাধা দিতে লাগিলেন;—সাময়িকভাবে নাটোর রাজ্য হইতে ইংরাজের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল। রাজসাহী অঞ্চলের বিপন্ন ইংরাজ কর্মচারী গভর্নর জেনারেলের নিকট একজন ইউরোপীয় সেনাপতির অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন (১৫)।

মহারাণীর প্রেরণায় নাটোরের প্রজাগণ বিশেষত আমরুল পরগণার প্রজাগণ ইংরাজ-কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল;—সেই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য লেফটেন্যান্ট বিন্নকের অধীনে একদল সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছিল (১৬)।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থাও হইয়াছিল যে, বিদ্রোহ দমন করিয়া কোম্পানী বাহাদুরকে তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনা বুঝাইয়া দিতে বিলম্ব করিবার জন্য তাঁহারা মহারাণী ভবানীকে রাজ্য-বিচ্যুতা করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। সে অসমদ্বন্দ্বে রাণী ভবানী পরাজিতা হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাহাতে তাঁহার গৌরবের হানি হয় নাই (১৭)।

দানশীলতা, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতির জন্য মহারাণী ভবানী দেশ-বিদেশে পরিচিতা। কিন্তু উপযুক্ত আলোচনার অভাবে তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বজাতি রক্ষার্থ তাঁহার অস্ত্রধারণের কথা সবিশেষ প্রচার লাভ করে নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছিলেন—'সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর অতি অল্প আয়াসেই ইংরাজেরা বঙ্গদেশে তাঁহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। মীরকাশিমের ক্ষণিক প্রচেষ্টার কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙালী জাতি একরকম বিনা আপত্তিতে ইংরাজের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল! কিন্তু জেলায় জেলায় ম্যাজিস্টরের মহাফেজখানায় এখনও যে সমস্ত চিঠিপত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পলাশীর পরাজয়ের—এমন কি, মীরকাশিমের পতনের পরও বাঙালী জমিদারেরা ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইতস্তত করে নাই।......জমিদারদিগের সহিত ইংরাজ সরকারের এই সংঘর্ষের ইতিহাস আজিও লেখা হয় নাই।

অথচ এই ইতিহাসই ইংরাজ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের প্রকৃত ইতিহাস (১৮)।'

মহারাণী ভবানী কর্তৃক ইংরাজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরও ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করা বাঙলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা; কিন্তু উপযুক্ত আলোচনার অভাবে তাঁহার এই বীরেন্দ্রাণীমূর্তির সবিশেষ পরিচয় প্রচার লাভ করে নাই। প্রভাতে তাঁহাকে স্মরণ করিলে আজিও গৃহস্থের দিন বিফল হয় না, এই ধারণা অকারণ গড়িয়া উঠে নাই। দানে, ধ্যানে, বিদ্যোৎসাহিতায় এবং বীরত্বে—রাণী ভবানী চরিত্র অনুপম; ইহা বাঙালী জাতির আদর্শ!

পাদটীকা :—

১। প্রাচীন ভারতে নারী—ক্ষিতিমোহন সেন—২৫ পৃঃ

২। রাজসাহীর ইতিহাস—কালীনাথ চৌধুরী—১৬২ পৃঃ

৩। Alibardi and his times—Kalikinkar Dutta—p. 74.

৪। সিরাজদ্দৌলা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৬৯ পৃঃ

৫। মীরকাশিম—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৫৭ পৃঃ

৬। বাঙালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য—৩৯১ পৃঃ

৭। সিরাজদ্দৌলা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—২৮৩-৮৪ পৃঃ

৮। বাঙালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য—৪১৬-১৭ পৃঃ

৯। Annals of Rural Bengal—
W. W. Hunter—p. 56.

১০। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২য় খণ্ড—১৪১৩-১৮ পৃঃ

১১। Letter from C. W. B. Rous Esqr, dated 8th October, 1770; 10th January, 1771; 19th April, 1771; 2nd September, 1771 as quoted in বঙ্গদর্শন—১৩১৫।

১২। Letter from Richard Beeker to the Select Committee—30th September, 1770.

১৩। General Letters from Bengal—5th September, 1772.

১৪। Proceedings of the Provincial Council of Moorshidabad—20th May, 1771.

১৫। Letter to Governor General etc. enclosing entruet from a letter from Mr. Evelyn when at Rajshahi, respecting the obstruction thrown in the way of collection by the zaminder and her offices and respecting the necessity of having a military force, under command of an European Officer—Bengal Ms. Records—vol I—p 44.

১৬। Letter to Lieutenant Kinloch, commanding in Nator, respecting disturbances of the rayats (husbandmen) in Pargana Amrol—Bengal Ms. Records—vol I—p. 37.

১৭। Annals of Rural Bengal—
W. W. Hunter—p. 58.

১৮। মাসিক বসুমতী—বৈশাখ, ১৩৩৬।

আলোর জোনাকি

॥ অসীমকুমার বসু ॥

এখনও অনেক দেরি লাফ দিয়ে চাঁদ উঠবার
দীপ দীপ তারা জ্বলে, গলে পড়ে তরল আঁধার
সময়ের অবশেষ, এখনও হ'ল না শেষ—
রয়ে গেল বাকি,
আঁধার ঘরেতে এল রাশি রাশি মিটমিটে দীপ—
আলোর জোনাকি।

আঁধার এ ঘর আর মিটমিটে জোনাকিরা জ্বলে,
টিক্‌টিক্ একটানা ঘড়ি বেজে চলে,
প্রতীক্ষা ক্লান্ত হ'ল, এইবার ডাক দেব নাকি?
না, না, না, না, বলে যেন একরাশ
আলোর জোনাকি।

আসবে কি, আসবে না, না না তুমি আসবে নিশ্চয়,
হরেকরকম ভাবি—থমকে কি দাঁড়ালো সময়?
বসে থাকি, ঘড়ি বাজে—ডাকে এক রাতজাগা পাখি,
আঁধার, তোমার মুখ, আশা নিয়ে
আলোর জোনাকি।



নতুন চোখ

আজকাল ঝি কামাই করলে সুনন্দা খবরটা চেপে রাখে, বুড়ো শ্বশুরকে জানতে দেয় না। নিজের গতরের ওপর দিয়েই চালিয়ে নেয়। নইলে একবার তাঁর কানে পৌঁছুলে আর রক্ষা নেই। ছুটবেন তখনই গোয়ালে, খড়-কাটা বঁটিটা পেড়ে খচ্ খচ্ করে খড় কুঁচিয়ে দু'টো গরুর জাবনা, জল এনে, খোল-ভুষি মেখে গামলায় তৈরি করে রেখে তারপর হাত ধুয়ে ঘরে গিয়ে একছিলিম তামাক খেয়ে আবার দু-চারটে গাছের শুকনো ডালপালা ওই গোয়ালঘরের এককোণ থেকে টেনে নিয়ে ছোট কুড়ুলটা বার করে চেলা করতে বসবেন। এ জালানী কাঠ নইলে রান্না হবে না। দু'বেলার জন্যে প্রয়োজনও কম নয়। বৌমাকে এই শ্রমসাধ্য কাজ দু'টো কিছুতেই তিনি করতে দিতে রাজী নন।

সত্যি সুনন্দা সংসারের সব কাজ করতে পারে। শুধু ওই দু'টো ছাড়া! শহরের মেয়ে, চিরকাল শহরেই মানুষ হয়েছে। খড় কাকে বলে কখনো চোখে দেখে নি। আর রান্নার কাঠ যে ওইসব বড় বড় গাছের শুকনো ডালপালা কেটে তৈরি হয়, তাও সে জানতো না—এই পাহাড় জঙ্গল-ভরা শ্বশুরবাড়িতে আসার আগে। তবু দু-একদিন যে, গোপনে সে চেষ্টা করে নি তা নয়, কিন্তু 'হিতে বিপরীত' হয়েছে। খড় কাটতে গিয়ে হাত কেটে রক্তারক্তি করেছে। কাঠ কেটে একদিন রান্না করতে হাত এমন ফুলে উঠেছিল যে যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমতে পারে নি এবং ওই রাত্রে ওষুধপত্রের জন্যে ডাক্তারের বাড়ি ছুটতে হয়েছিল, এই বৃদ্ধ শ্বশুরকেই। মুকুন্দবাবু সেদিন কেবল মৃদু তিরস্কার করেন নি বৌমাকে, নিজের অক্ষমতার কথা তুলে লজ্জা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমার অবস্থা খারাপ হয়েছে, লোকজন রাখবার সামর্থ্য নেই বলে এমন হৃদয়হীন তোমার শ্বশুর নয় যে, তোমাকে দিয়ে ওই কাজ করাবে। তুমি কেন আমাকে না জানিয়ে এ কাজ করতে গেলে মা! ছি, ছি, ছি!

সুনন্দা একটু চুপ করে থেকে জবাব দেয়, আপনারও এই পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হলো, তা ছাড়া চোখেও ভাল দেখতে পান না। আপনারও তো একটা কিছু হতে পারতো, ওই কাঠ চেলা করতে গিয়ে কিংবা খড় কাটতে গিয়ে!

না। ওটা তোমাদের মনের ভুল! চোখে আমি এমন কিছু কম দেখি না যে, ওই দু'টো কাজ করতে গিয়ে হাত

॥ শ্রীসন্মথনাথ ঘোষ ॥

কেটে বসে থাকবো। তা ছাড়া বয়স হয়েছে তাতে কি! শাল-গাছ যত বুড়ো হয়, তত মজবুত হয়। তোমাদের শহরের বুড়োর মত কলের জল, আর বিজলী বাতির আলোয়, আমার এ-দেহ তৈরি হয় নি। পাহাড়ি ঝর্ণার জল, আর এই খোলা প্রকৃতির আলো-বাতাসে এ-শরীর পুষ্ট! তাই তাদের সঙ্গে আমার তুলনা করো না বৌমা! বলে হেসে উঠেছিলেন হো-হো করে। গালভরা, প্রাণভরা হাসি!

সে-হাসি শুনে চমকে উঠেছিল সুনন্দা! পঁচাত্তর বছরের বুড়োর হাসি সে নয়। তার স্বামীর মুখেও এমন হাসি শোনে নি কতকাল!

বাস্তবিক মুকুন্দবাবু যেন একটা বিস্ময়! কে বলবে, তাঁর এই পঁচাত্তর বছর বয়েস। হেঁটে-চলে দিব্যি বেড়ান, ওই উঁচু-নীচু পাহাড়ি পথে। পা ছ'টো যেন পুরনো ইস্পাতে গড়া, হাত ছ'টোও তেমনি। লম্বা লম্বা দীর্ঘ-পেশীবহুল সাঁওতালদের মত। পুরনো বাঁশের লাঠি, তেল মাখিয়ে শুকোতে শুকোতে যেমন মজবুত ও চিক্কণ দেখায়, অনেকটা তেমনি। এখনো ছ' ক্রোশ পথ স্বচ্ছন্দে হেঁটে গিয়ে 'হাট' করে আনেন। সুনন্দার নিষেধ, বারণ কিছু শোনেন না। বলেন, কেন তুমি ভয় পাও বৌমা, শালগাছ এত সহজে মরে না। যখন মরে তখন গোড়াশুদ্ধ উপড়ে পড়ে! বলে একচোট হেসে ওঠেন—রহস্যভরা হাসি!

কি যে বলেন, যত অলুক্ষণে কথা! সুনন্দার চোখে একটা আতঙ্কের ছায়া নামে। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুকুন্দবাবু বলেন, আহা ওই হলো, তোমার ভয়টা ত' সেই জন্যেই গো! বলে একটু থেমে, আবার শুরু করেন—জানো, একদিন বারো-তেরো ক্রোশ পথ হেঁটে কাজ করেছি। ওইসব পাহাড়-জঙ্গল দেখছো, এখান থেকে ভোরে বেরিয়ে কাজ করে আবার রাত্রে ফিরে এসেছি। এক-আধ দিন নয়। বছরের পর বছর। তখন একটা সাইকেল কেনবার পয়সা ছিল না। তারপর অনেকদিন পরে ওই সাইকেলটা কিনি, ষাট টাকায়। ওই সাইকেলটার 'জান'ই কি সোজা! ধর এই ছেচল্লিশ বছর ওর বয়েস। আমার সঙ্গে সমানে আছে। কোথায় না গেছি ওকে নিয়ে! বিশ-তিরিশ ক্রোশ পর্যন্ত এক-একদিন চেপেছি! ওই সাইকেলটাই আমার লক্ষ্মী বৌমা। এত যত্ন করি তাই এখনো ওটাকে।

হঠাৎ সাইকেলটার কথা উঠে পড়তে, লজ্জায় অধোবদন হয়ে যায় সুনন্দা। কারণ, একদিন ওই সাইকেলটাকে বিক্রি করে দেবার জন্যেও জিদ ধরেছিল শ্বশুরের কাছে। বলেছিল, সাইকেল থাকলেই আপনি চাপতে চাইবেন। চোখে ভাল দেখতে পান না। কখন কোন্ গাড্ডার মধ্যে পড়ে হাত-পা ভাঙবেন!

সত্যি আশ্চর্য ক্ষমতা মুকুন্দবাবুর। এখনো সাইকেলটা চেপে বেশ এদিক-ওদিক ঘুরতে পারেন। তবে, কিছুদিন হলো, সুনন্দার অনুরোধে আর তা করেন না। একদিন ফেরবার পথে কোন একটা শালগাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাথা ফেটে বাড়ি ফিরেছিলেন। কপালের রক্তের ধারা লুকোতে পারেন নি, তাই স্বীকার করেছিলেন সুনন্দার কাছে। গাছটাকে ঠিক ঠাওর করতে পারি নি বৌমা, সাইকেলে যেমন 'প্যাডেল' করেছি, ওমনি মাথাটা গিয়ে ঠুকে গেল।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি জল এনে কপাল ধুইয়ে দিতে দিতে বলে, আপনাকে বললে আপনি ত' শুনবেন না কথা! যত নিষেধ করি, চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে, ছানি পড়েছে! চশমা চোখে থাকলেও আপনি ভাল দেখতে পান না—সাইকেল চড়বেন না। তা আমার কথা ত' বিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বাস করবো না কেন? তবে কি জানো, এই পথ-ঘাট সব ত' আমার চেনা-জানা মুখস্থ! পঞ্চাশ বছর কাটলো যেখানে। তা ছাড়া এসব ত' আমার হাতে তৈরি। কি ছিল এখানে আগে। বাঘ বেরুতো। ভাল্লুক কুল খেতে আসতো, এই সামনের জঙ্গলে। ঠিকাদারীর চাকরি নিয়ে প্রথম যখন এখানে আসি, তখন শুধু কয়েকটা সাঁওতাল-বস্তী ছিল, ওই পাহাড়টার কাছে। আর আজ যে দেখছো এত ঘরবাড়ি, রাস্তায় এত লোক চলাচল করছে, সব আমার জন্যে, ভুলে যেয়ো না!

সুনন্দা ঠোঁট কামড়ে, হাসি চেপে বলে, ভুলবো কেন আমি! আপনি-ই ভুলে যান যে, তখন আপনার বয়েস যা ছিল, তার সঙ্গে এখন আরো পঞ্চাশটা বছর যোগ হয়েছে।

তা হোক। তাই বলে কি আমি ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবো। যে বন-জঙ্গলের পথে পথে ঘুরেছি এতকাল, তাকে ভুলে, তাকে ছেড়ে থাকা কি সহজ কাজ বৌমা, তোমায় আমি সে-কথা বোঝাতে পারবো না।

কিসের একটা আবেগে হঠাৎ যেন মুকুন্দবাবুর গলাটা কেঁপে ওঠে। সুনন্দা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

তিনি বলেন, জানো বৌমা, ওই শালগাছের জঙ্গল, ওই মহুয়া বন, ওই পলাশের গাছগুলো যেন আমায় ডাকে। ওদের ভেতর দিয়ে কোন পথ ছিল না। আমিই প্রথম তৈরি করে দিই পথ। সেই রেললাইনের ধার থেকে পথটাকে টেনে এনে, মিলিয়ে দিয়েছি আমি নদীর কিনার পর্যন্ত।

সুনন্দা শ্বশুরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে, জানি আপনি ছিলেন, এই অঞ্চলের একমাত্র ঠিকাদার। এখানের যা কিছু পথঘাট, উন্নতি, সব আপনার তদ্বির ও তদারকে হয়েছে!

হ্যাঁ! কতদিন ওই শালগাছটাকে বাঁয়ে রেখে সাইকেল ছুটিয়েছি, কিন্তু, আজ যে হঠাৎ সে আমার সঙ্গে এইভাবে বেইমানী করবে, তা ভাবি নি!

ম্লান একটুকরো হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে সুনন্দা বলে, ও গাছ আপনার সঙ্গে বেইমানী করে নি বাবা, করেছে আপনার চোখ। ওই চোখের ছানি!

রেগে ওঠেন মুকুন্দবাবু। চোখের ছানি, এক এক সময় মনে হয় দু'হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কবে এ ছানি পাকবে। কবে 'অপারেশন' করার উপযুক্ত সময় হবে বলতে পারো বৌমা।

সুনন্দা বলে, ডাক্তারবাবুরা ত' বলছেন, এখনো দেরি আছে, সময় হয় নি।

মিথ্যে কথা! ওসব ডাক্তারদের আমি বিশ্বাস করি না। যেন একটা আতরব বেরিয়ে আসে মুকুন্দবাবুর কণ্ঠ ভেদ করে! তিনি আপন মনে বলে ওঠেন, তাই ত' আমি ঘুরে বেড়াই। তাদের দেখাতে চাই, আমার কিছু হয় নি!

যেমন জেদী তেমনি একরোখা পুরুষ মুকুন্দবাবু, সুনন্দা এই দীর্ঘ দিনে তার বহু প্রমাণ পেয়েছে। তাই বলে, কিন্তু তাতে তাদেরও কোনকিছু এসে যায় না বাবা। আপনারই ক্ষতি?

আমার ক্ষতি! আমারও কিছু এসে যায় না। তাদের সাধ্য নেই, আমার ক্ষতি করে। তারা মনে করেছে আমায় পঙ্গু, অথর্ব করে ঘরে ফেলে রাখবে, না?

এবার আর হাসি চাপতে পারলো না সুনন্দা। শ্বশুরের মুখের ওপর একঝলক যেন উথলে পড়লো।

মুকুন্দবাবু শুধালেন, হাসছো যে!

সুনন্দা বললে, আপনার কথা শুনে হাসি এলো। আপনি কি অথর্ব, পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে আছেন? তবে কেন মিছিমিছি এত রাগ করছেন।

আসলে আক্রোশটা তার ওই গাছটার ওপরে। চোখের ওপরে। কেন চোখ দু'টো ঠিকপথে অন্য দিনের মত তাকে নিয়ে গেল না! তাই তার পৌরুষে লেগেছে আঘাত। বৌমার সামনে, তাই নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার চেষ্টা করেন তিনি। নানা ছাঁদে।

সুনন্দা স্তোক দিয়ে বলে, বেশ ত' আপনি লাঠি নিয়ে যেমন ঘুরেফিরে বেড়ান তেমনি যাবেন। শুধু আজ থেকে আর সাইকেলে চাপবেন না। এইটুকু আপনার কাছে আমার অনুরোধ। বলুন, কথা রাখবেন!

বৌমার কণ্ঠের আকুতি বুঝি সেই মুহূর্তে বৃদ্ধের আহত মনের গোপন কোণে সান্ত্বনার প্রলেপ এনে দেয়। দীর্ঘ পচিশ বৎসর তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, কিন্তু এমন সহানুভূতি জাগানো সুর যেন ইতিমধ্যে আর কোনদিন শোনেন নি তাই হঠাৎ তিনিও আর 'না' বলতে পারলেন না

সেই থেকে লাঠিটাকেই করেছেন তাঁর দিবারাত্রের সঙ্গী বটে, কিন্তু এমনভাবে সোজা ও সরলভঙ্গীতে হাঁটেন যে, দেখলে মনে হয় না, ওই লাঠিটা তাঁর হাতে আছে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে। যেন ওটা আছে শোভার্থে।

সুনন্দা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, সত্যি কে বলবে যে এত বয়স হয়েছে। এখনো যা ভাত খান মুকুন্দবাবু, আজকালকার দু'টো জোয়ান ছেলে তা খেতে পারে না। একটা গোটা মুরগী অনায়াসে খেয়ে হজম করেন। নাতি-নাতনীদের স্বল্প আহারের প্রতি কটাক্ষ করে এক-একদিন তিনি বলেন, এাঁ এইটুকু খেয়ে কি করে বাঁচবি, আর কি পরিশ্রম করবি। আর লেখাপড়া শিখতে গেলেও মগজের দরকার। বলি 'ব্রেন'টা হবে কোথা থেকে শুনি!

বলতে বলতে সুনন্দার চোখের ওপর নজর পড়তেই সহসা নীরব হয়ে যান। যেন কি এক অপরাধ করে ফেলেছেন তার কাছে। মুকুন্দবাবু জানেন, তাঁর এই যখন-তখন ভালমন্দ খাওয়া এবং বেশি খাওয়াটা একেবারেই পছন্দ করে না বৌমা। তার মনের ভাবটা বাইরে থেকে বেশ অনুমান করতে পারেন তিনি। অর্থাৎ, এইভাবে যদি খেয়ে সব উড়িয়ে দেন শ্বশুর, তাহলে তার ছেলেমেয়েদের জন্যে বিষয়-সম্পত্তির কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে! এ নিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে, সুনন্দা তাঁর কাছে অভিযোগ পেশ করতে ছাড়ে নি। কিন্তু সেসব কথায় কর্ণপাত করার মত ব্যক্তি তিনি নন। তিনি রোজগার করে যে বিষয়-সম্পত্তি করেছেন, তা ভোগ-করবেন খুশিমত, কারুর কিছু বলবার অধিকার নেই তাতে। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিয়েছেন। চাকরিটা পর্যন্ত তিনি নিজে সুপারিশ করে জোগাড় করে দিয়েছেন। তাঁর সবকিছু কর্তব্য তিনি পালন করেছেন।

ছেলের ওপর নিজের দায়দায়িত্ব কিছু চাপান নি। পাঁচটি মেয়ের বিবাহ নিজেই দিয়েছেন। স্ত্রীর রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে ব্যাঙ্কের খাতা শূন্য হয়ে গেছে, তবু কোথাও এতটুকু কার্পণ্য করেন নি। এককালে দিনে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করে যা-কিছু সঞ্চয়—জমিজমা বাগান পুষ্করিণী করেছিলেন, এখন তাকে ভোগ করবেন না কেন? চিরদিন ভাল খেয়েছেন পরেছেন, এখন সে অভ্যাস ত্যাগ করতে যাবেন কেন? যত দিন বেঁচে থাকবেন, সুস্থ ও সবল জীবনযাপন করবেন, এই মুকুন্দবাবুর জীবনের মূল নীতি! এ থেকে কেউ তাঁকে বিরত করতে পারবে না। কারুর কথা তিনি শুনবেন না। পুত্র যদি চাকরি করে, নিজের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে প্রতিপালন

করতে না পারে, সে অপরাধ তার। মুকুন্দবাবু কি করবেন? এর জন্যে তিনি নিজের সবকিছু স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে পারবেন না।

অথচ সুনন্দা মুখ ফুটে বলতে পারে না যে, একদিন এই শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি দেখেই তার বাপ-মা এখানে বিয়ে দিয়েছিলেন। নইলে কলকাতার শহর ছেড়ে এই জঙ্গলে বনবাসে কেউ স্বেচ্ছায় আসে না। বাপের একমাত্র ছেলে ওই প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে একদিন, এই ছিল সকলের গোপন ইচ্ছা। সে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশও এখন নেই। তবু যা আছে তাকে রক্ষা করার জন্যে সুনন্দা সবসময় কড়ানজর রাখে শ্বশুরের ওপর। তার স্বামী যা উপার্জন করে টাটার কারখানায় চাকরি করে; তাতে ওদের খেয়েপরে চলে যায় একরকম করে। কিন্তু পাছে শ্বশুরকে একলা রাখলে তিনি ইচ্ছামত সব উড়িয়ে দেন, সেইজন্যে এখানে কোলের ছেলেমেয়ে ছু'টোকে নিয়ে সুনন্দা পড়ে থাকে—যদিও মুখে বলে, আপনি একা ঝি-চাকরের হাতে থেকে কি শরীর টিকবে! তা ছাড়া এই বুড়ো বয়সে কখন কি হয়, বলা যায় না!

বৌমার স্নেহার্দ্রকণ্ঠের কথাগুলি শুনে মুকুন্দবাবু অভিভূত হয়ে পড়েন। নাতি-নাতনীদের সঙ্গে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে বেড়ান। তবু, দিন যেন কাটতে চায় না! একদিন বেড়াতে-বেড়াতে অনেকদূর চলে গিয়েছিলেন। সেই স্টেশনের কাছে পুরনো মুদীর দোকানটার বাড়িতে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরামে ধোঁয়া ছাড়ছেন, এমন সময় শুনলেন যে, কলকাতার বিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার মুন্সী এসেছেন ওখানে 'চেঞ্জ-এ'।

সঙ্গে সঙ্গে মুদীর কাছ থেকে কোন্ বাংলোয় উঠেছেন জেনে নিয়ে সেখানে গিয়ে তিনি হাজির হলেন। ডাক্তার মুন্সী চক্ষু পরীক্ষা করে বললেন, সময় হয়েছে, এখনি 'অপারেশন্' করা দরকার। তিনি বলেন, দিনপনেরো পরে কলকাতায় তিনি ফিরবেন, তখন তাঁর কাছে গেলে, সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

ছু'মাস পরে যখন চক্ষু অপারেশন্ করে ফিরে এলেন মুকুন্দবাবু, তখন বিস্ময়ে তাঁর মুখে যেন কথা ফোটে না! এদিক-ওদিক, চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে হতবাক হয়ে যান। মাথার ওপরের আকাশটাও এত গাঢ় নীল ছিল না কোনদিন! এতকাল যেসব গাছ-পালা, বন-জঙ্গল, নদী-পাহাড় দেখেছেন—তারাও যেন সব বদলে গেছে! তাঁর চারিপাশে এই নতুন জগত, নতুন পরিবেশ কে সৃষ্টি করলে! এত রং, এত রূপ কোথা থেকে পেল তারা! গাছের পাতায় পাতায় এমন গাঢ় সবুজ রং ত' কখনো দেখেন নি। ওই দূরে যে পাহাড়গুলো, এতকাল যাদের ধূসর ও বিবর্ণ মনে হতো, আজ যেন তাদের দেহগুলো কোন শিল্পী মোটা তুলির টানে চিত্র-বিচিত্র করে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে। নদীর কিনার থেকে যে পায়েহাটা পথটা সর্পিল ভঙ্গীতে সামনের মাঠটার ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ শালবনের গহন অরণ্যে হারিয়ে গেছে, তার সারাদেহে যেন কে আবির ছড়িয়ে রেখেছে! ঠিক বুঝতে পারেন না, কি করে এবং কোথা দিয়ে, মাত্র এই ছু'টো মাসের মধ্যে এত বড় পরিবর্তন সম্ভব হলো! কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের প্রভাত যেন অকস্মাৎ সূর্যের আলোকস্পর্শে ঝলমল করে উঠলো। মুকুন্দবাবুর চোখে আজ সবকিছু নতুন ঠেকে, সবকিছু উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত মনে হয়।

বৃদ্ধের চোখে তারুণ্যের অঞ্জন লাগে। কি এক নবতর শক্তি ও প্রেরণায় তাঁর সারাদেহ যেন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। মুকুন্দবাবু বুঝতে পারেন না যে, নতুন দৃষ্টিশক্তির কি মহিমা!

বহুকালের মজা-নদী সহসা যেন বন্যার স্রোতে স্ফীত হয়ে উঠলো। লাঠি ফেলে দিয়ে দিব্যি ঘুরে-ফিরে বেড়ান মুকুন্দবাবু। সহজ, স্বচ্ছন্দ গতি, নির্ভীক পদক্ষেপ যুবকের মত!

সুনন্দা অবাক হয়ে যায় শ্বশুরের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সংসারের কাজকর্মে নতুন উৎসাহ দেখা দেয়। চুপচাপ ঘরে বসে আর বেশিক্ষণ তামাক খেতে তাঁর ভাল লাগে না। এক-একদিন কোদাল হাতে বাগানে চলে যান। মাটি কেটে গাছের গোড়ায় দেন। আগাছা সাফ করেন। সুনন্দার নিষেধ শোনেন না। বলেন, বৌমা তোমার কোন ভয় নেই। আমার এতটুকু কষ্ট হয় না। একটু পরিশ্রম না করলে হজম হবে কেন?

চুপ করে যায় সুনন্দা। বাস্তবিক ইদানীং তাঁর ক্ষিদে-তেষ্টাও সব যেন গেছে বেড়ে। আগের চেয়ে অনেক বেশি কেবল যে খান তাই নয়, খেয়ে হজমও করেন। একদিনের জন্যেও একটু অসুস্থতা বোধ করেন না। সবচেয়ে লোভও বেড়ে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। খাদ্যাখাদ্যের বিচারও আজকাল করেন না কিছু। হঠাৎ একদিন একটা পাঁঠার মাথা এনে বলেন, বৌমা! বেশ করে রসুন ও পেঁয়াজের সঙ্গে কাঁচালঙ্কা দিয়ে 'ছালন' বানাও ত'!

সেটা আবার কি জিনিস বাবা? প্রশ্ন করে সুনন্দা।

এই মানে যৌবনকালে আমার এক মুসলমান বন্ধু ছিল,

তার বাড়িতে ছেলেবেলায় একবার খেয়েছিলাম। যেমন অত্যধিক ঝাল তেমনি তীব্র পেঁয়াজ-রসুনে পাঁঠার মেটুলিতে ভাজা-ভাজা থকথকে একরকম জিনিস!

বাবা, এখন এসব কি আপনার পেটে সইবে? যৌবন বয়সে যা করেছেন এখন কি তা করা শোভা পায়?

কেন পায় না! আজ পর্যন্ত কি কোনকিছু খেয়ে অসুখ হয়েছে আমার বৌমা? বলে একটু থেমে কথাটা যেন অনুতপ্তস্বরে বলে ওঠেন, এ পোড়াদেহটা ত' খারাপ হলে বাঁচি। কিন্তু শালা শরীর যেন লোহা দিয়ে তৈরি, রোগ কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়!

সুনন্দার মুখের ওপর কিসের ছায়া নামে। সে বলে, আমি কি তাই বলেছি বাবা! আপনি এমন কথাটা আমার মুখের ওপর বলতে পারলেন! তারপর ভারী গলায় আস্তে আস্তে বললে, যখন যা বলছেন, সবই ত' করে দিচ্ছি! বলুন আরো কি চান, কিসের অভাব!

চুপ করে বৌমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা গভীর নিশ্বাস ছাড়েন মুকুন্দবাবু। বলেন, কিছু মনে করো না বৌমা, তোমাকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে আমি বলি নি। ওটা আমার মনের কথা, সত্যি বলছি, এক-একদিন ভাবি, এই দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে এমনিভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি?

অন্য আর কি ভাবে মানুষ বাঁচে বলুন!

তা জানি না! বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মুকুন্দবাবু!

ইদানীং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনকিছু মন্তব্য করে না সুনন্দা। দিনে দিনে তামসিক আহারের প্রতি লোভ যেন বেড়েই চলে মুকুন্দবাবুর। কোনদিন খানিকটা পচা হরিণের মাংস নিয়ে এসে রাঁধতে বলেন। কোনদিন বা একটা বনো খরগোস এনে নিজেই কেটেকুটে রান্নাঘরে দিয়ে যান! মুখের রেখাতে এতটুকু পরিবর্তন না এনে, সুনন্দা শ্বশুরকে রেঁধে দেয়। কিন্তু তবু যেন তিনি খুশি নন। ইদানীং সবসময় কি চিন্তা করেন। কেমন একটা গম্ভীর বিমর্ষ ভাব!

তামাক খেতে ভুলে গিয়ে, হুঁকোটা হাতে করে চুপচাপ বসে থাকেন দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে।

একদিন চুপিচুপি তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে রইল সুনন্দা, অনেকক্ষণ। তবুও তাঁর কোন হুঁস নেই দেখে সে বললে, বাবা, আজকাল সবসময় এত কি চিন্তা করেন বলুন ত'? কোন অসুবিধা হচ্ছে? চেপে থাকবেন না, বলুন। অমন মন গুমরে থাকলে দেহ যে ভেঙে পড়বে!

পড়ুক ভেঙে। এভাবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি!

আজকাল সবসময় আপনার মুখে ওই কথা! আমার বুঝি শুনতে খুব ভাল লাগে? আমার মা বলেন, পুণ্যির জোর না থাকলে মানুষ পরমায়ু পায় না। এ সংসারে বেশিদিন বেঁচে, খেয়ে-দেয়ে জীবনটাকে উপভোগ করা কি যার তার কাজ। কত জন্মের পুণ্যির ফল!

উপভোগ কথাটা সুনন্দার মুখ থেকে ছিটকে গিয়ে যেন মুকুন্দবাবুর মনের ভেতরে আঘাত করলো। পুষ্করিণীর স্তব্ধ জলের ওপর টুপ্ করে একটা ঢিল পড়লে তা যেমন ছোট থেকে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ বড় হয়ে সমস্ত জলাশয়টার বুকে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ওই ছোট শব্দটা ওঁর মনের অন্দরে-কন্দরে সর্বত্র যেন মুহূর্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল! তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে তিনি বললেন, ঠিকই বলেছেন তোমার মা, বৌমা।

তবে, আপনি আর কখনো ও কথা মুখে আনবেন না! বলে সস্নেহ ভৎসনা করে ভেতরে চলে যায় সুনন্দা।

মুকুন্দবাবু বসে থাকেন তেমনি! তাঁর চোখের সামনে যেসব ছোট-বড় পাহাড় উঁচু-নীচু শৃঙ্গের ঢেউ তুলে মিশে গেছে দূরে—অনেক দূরে, একেবারে আকাশের গায়ে, এবার বুঝি তাদের দেখতে পান না। একটা বিশেষ শৃঙ্গের ওপর যেন তাঁর চোখের পাতা দুটো জড়িয়ে গিয়েছিল। নয়নের মণিটা বুঝি কাঁপছিল ভিতরে ভিতরে! আর মনের গভীর থেকে অনেক কালের হারানো এক সুর যেন বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছিল।

অকস্মাৎ তাঁর সারাদেহে রোমাঞ্চ ঝিলিক মেরে ওঠে! হ্যাঁ, ওই ত' সেই পাহাড়ের চূড়া—যার তলায় বাসাভেরার জঙ্গল! ওইখানে থাকে ফুলকী। সেই সাঁওতাল মেয়েটা, তরুণী, যুবতী, কষ্টিপাথরে যেন খোদাই করা মূর্তি! আর কিছু ভাবতে পারেন না। শুধু একটা তীব্র মাধুর্যভরা যন্ত্রণাময় স্মৃতি, এক বিহ্বলভরা মূর্ছনা যেন মনের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে কাঁপে। আচমকা সেতারের কোন একটা তারে ঘা লাগলে যেমন সব ক'টা তার ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে তেমনি।

ওই উপভোগ কথাটার খোঁচা দিয়ে যেন সুনন্দা তাঁর মনের গভীরে লুকনো এতকালের মৌচাকটাকে ভেঙে দিয়ে গেল!

অনেকদিন পরে তাই আবার পুরনো সাইকেলটাকে ঘর থেকে টেনে বার করলেন মুকুন্দবাবু। তারপর চুপি চুপি ট্রাঙ্কটা খুলে বহুদিনের পরিত্যক্ত সেই ঠিকাদারের খাকিরঙের কোট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লেন।

মনের গতির সঙ্গে বুঝি পাল্লা দিয়ে ছোটে সাইকেল। অনেক শালবন অতিক্রম করে অনেক চড়াই-উৎরাই ভেঙে, ছোট-বড় অনেক পাহাড়ি নদী পেরিয়ে ছুটে চলে সাইকেল। বার্ধক্য, জরা সব ভুলে যেন যৌবনের স্বপ্নে উন্মুক্ত বিভোর মুকুন্দবাবু! পাহাড়, নদী, জঙ্গল যেদিকে তাকান, সর্বত্র দেখেন তুলকীকে—তার সেই নিরাভরণা দেহসুষমা যেন ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে।

চারঘণ্টা অবিশ্রান্ত সাইকেল চালনা করে যখন মুকুন্দবাবু পৌছলেন বাসাভেরাতে, তখন অপরাহ্নের ছায়া নেমেছে সাঁওতাল পল্লীতে। নিস্তব্ধ-নিঝুম সব বাড়িগুলো। মেয়ে-পুরুষ যারা কাজে বেরিয়েছিল, এখনো ফেরে নি।

সাইকেলটা হাতে করে তুলকীর ঘরের উঠানে দাঁড়ালেন মুকুন্দবাবু। তাঁর চোখ তখন ভ্রমরের মত ব্যস্ত। কোন ঘরের কোণায় সেই বনকুসুম ফুটে আছে, বুঝি তারই সন্ধানে।

তুলকী—তুলকী—বলে ডাকলেন মুকুন্দবাবু।

কুঁড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো একটা বুড়ি স্ত্রীলোক। মাথার চুলগুলো তার সব পাকা জট বাঁধা—কুঁচকে গেছে গায়ের চামড়াগুলো—রোগা হাড়গুলো সব দেহের মধ্যে থেকে ঠেলে উঠেছে।

মুকুন্দবাবু প্রশ্ন করলেন, তুলকী—কোথায় রে?

হামি ত' তুলকী আছি বাবু।

তুই! না—না—না। বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

মুকুন্দবাবুর সামনে এগিয়ে এসে তুলকী বলে, তুই কাকে চাস বাবু?

যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠলেন। তিনি বললেন, না কাউকে না। বলতে বলতে পিছন ফিরে সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার চেপে বসলেন।

যখন বাড়ি ফিরলেন, রাত অনেক হয়েছে। সুনন্দা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এত রাত হলো কোথায় গেলেন। কখনো ত' এতক্ষণ বাইরে থাকেন না। খাবার ঢাকা দিয়ে তাঁর জন্যে যখন অপেক্ষা করছে, তখন সাইকেল সমেত বাড়ি ঢুকলেন মুকুন্দবাবু।

এ কি, এই পোষাক পরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন। সাইকেল চেপে? আমি ভেবে মরি। আমায় বলে যেতে হয় তো! কত রাত হয়েছে জানেন?

মুকুন্দবাবুর সারাদেহ তখন থর্‌থর্ করে কাঁপছে। বহুকাল এত পরিশ্রম করেন নি। এই দীর্ঘ পাহাড়ি পথ সাইকেল চালিয়ে আসা-যাওয়ার ক্লান্তিতে এমনি অবসন্ন যে, মুখ দিয়ে যেন কথা বেরোচ্ছে না। তাই সুনন্দার কোন জবাব না দিয়ে তিনি শুধু বললেন, বৌমা আমায় ধর!

সুনন্দা তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে সাইকেলটা টেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস করে তিনি পড়ে গেলেন মাটির ওপর।

ওমা একি হলো! বলে ছেলেমেয়েদের জল পাখা আনতে বলেই তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখে সব ঠাণ্ডা! নাকের কাছে কম্পিত হাতটা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে সুনন্দা, নিঃশ্বাস পড়ছে না। তখন হাউমাউ করে সে কেঁদে উঠলো!

সকলের অলক্ষ্যে যখন এতবড় একটা বিয়োগান্ত নাটকের ওপর যবনিকাপাত হলো, তখন তার পাত্র-পাত্রীরা কেউ ঘুণাক্ষরে জানতেও পারলে না যে কে কোথায় কখন কিসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো! শুধু একমাত্র নাটকের যিনি স্রষ্টা তিনিই অদৃশ্যে থেকে বোধ করি একটু মুচকি হাসলেন!

সৃষ্টি এক সোনা

॥ মৃত্যুঞ্জয় সেন ॥

আমরা নিজেরাই পৃথিবীকে সংক্ষিপ্ত-ধৃত করেছি
শিক্ষা-সুন্দরী বউ-ভালো চাকরি চেয়েছি
বলে
নইলে
জাহাজের বাঁশী আমরা শুনতে পাই

পাথরে শিল্পিত যৌবন আমরা বাঁচাই
দু'হাতে প্রণয় গড়ি
ভালবাসি রূপসী নর্ম-সহচরী
অথচ আহত যৌবন-যন্ত্রণার দীপ্ত অভিসার চলে
কারণ সৃষ্টি এক সোনা হয়ে নাচবে বলে।



● দমদম বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও প্রদেশ-কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

● ইথিওপীয় রাজপ্রাসাদে রাণী এলিজাবেথ ও সম্রাট হাইলে সেলাসী

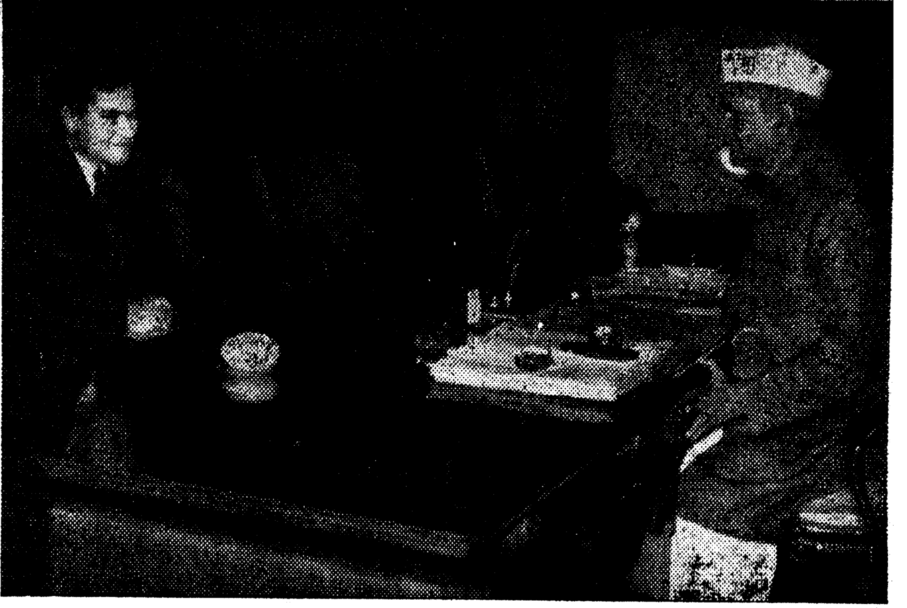




● ভারত-আফিগানিস্থান সাংস্কৃতিক চুক্তি বিনিময় করছেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা ও আফগানিস্থানের রাষ্ট্রদূত শ্রীকবীর লুডিন



◆ নবদ্বীপে সরকারী হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। পার্শ্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়



● প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত নতুন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের জনক শ্রীজয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার

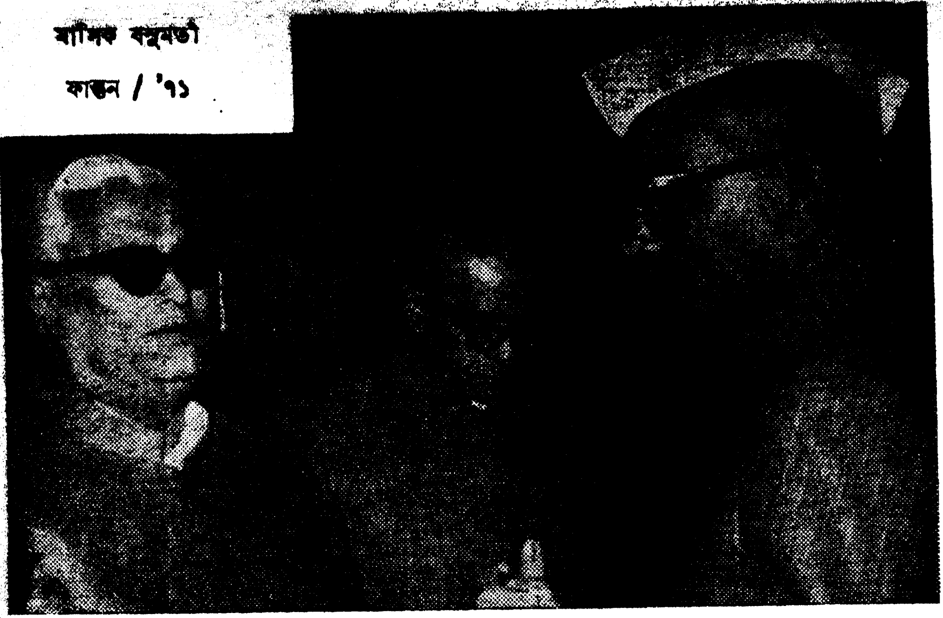
মাসিক

বসুমতী

২ [illegible]ন /'৭১



● দমদম বিমানবন্দরে ডিউক অফ এডিনবরাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছেন শ্রম ও প্রচার-মন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার



● কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আলোচনারত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি সি সেন, সঞ্জীব রেড্ডী ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ

● মহাজাতি সদনে চতুর্থ সর্বভারতীয় পেট্রল ব্যবসায়ী সম্মেলনের প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। পার্শ্বে কেন্দ্রীয় তৈল ও রাসায়নিক মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর



নভোনীল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

এক্জিবিশন রোড দিয়ে নীনাকে সঙ্গে নিয়ে সাইকেল রিক্সায় যাচ্ছি।

নীনা শাড়ি ব্লাউজ কিনবে। সঙ্গী হতে হয়েছে আমায়।

অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে শাড়ি ব্লাউজ-এর জগতের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। আমায় সঙ্গে নিয়ে কোন লাভ হবে না।

নীনা কিন্তু সে কথায় কান দেয় নি। বলেছে, আপনি ছাড়া সঙ্গে যাবে কে? দেবরাজ সন্ন্যাসী আর অম্বর সাহেব। ওদের নিয়ে ত' আর জামা-কাপড়ের দোকানে যাওয়া যায় না। শাড়ি ব্লাউজ না চেনেন পাটনা শহরটা ত' আপনার চেনা। কোথায় ভালো দোকান আছে নিয়ে চলুন। তারপর শুধু সাক্ষিগোপাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, ব্যস।

নিরুপায় হয়েই তাই রাজী হতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। হোটেল থেকে একটা ট্যাক্সি নিতে চেয়েছিলাম। নীনা সে প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে।

বলেছে,—না, না ট্যাক্সি নয়, এ শহরে সাইকেল রিক্সা ছাড়া আর কিছুতে চড়তে নেই।

সাইকেল রিক্সাতেই তাই চলেছি বেশ একটু অস্বস্তি নিয়ে।

অস্বস্তিটা অর্থহীন তা জানি। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা ভারতীয়ের সঙ্গে একাসনে শ্বেতাঙ্গ সুন্দরীকে দেখা পাটনা শহরের জনতার কাছে একেবারে অভাবিত অবিশ্বাস্য কিছু এখন আর নয়। এরকম দৃশ্য শহরের রাস্তাঘাটে ইতিপূর্বেও নিশ্চয় অনেকবার দেখা গেছে। তবু কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি যেটুকু ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করি তাইতেই কেমন একটু আড়ষ্ট বোধ হয়।

নীনার কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। স্বচ্ছন্দে অনর্গল আলাপ করে যাচ্ছে প্রায় একতরফা।

আমাদের দেশের শহরের সঙ্গে আপনাদের তফাৎটা কোথায় লক্ষ্য করেছেন? আপনি বলবেন হয়ত মানুষজনের গায়ের রঙ্, চেহারা পোষাকে, কিংবা ভিড়ে। কিন্তু তা শুধু বাইরের তফাৎ। পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় শহরই এখন প্রায় একছাঁচে ঢালা হয়ে যাচ্ছে তা নিশ্চয় দেখছেন। অন্তত শহরের প্রাণকেন্দ্র বলতে সাধারণত যা বোঝায়। সর্বত্রই সেই বিরাট সব আধুনিক বাড়ি—নিউ ইয়র্ক সিকাগোর মত উত্তুঙ্গ পাহাড় না হলেও কংক্রীট লোহার জমকালো সব ঢিবি। সেই মোটর লরীর ঠেলাঠেলি সেই ব্যবসাদারী বিজ্ঞাপনের নির্লজ্জ ঘটা। তার মধ্যে মানুষের রঙ কোথাও ধলা কোথাও কালা বা তার মাঝামাঝি সব ছোপের। রং পোষাক যত রকমেরই হোক, শহরগুলোর মধ্যে তাই এক হিসেবে জাতিভেদ নেই। গরমিল হল শুধু, শহর যাদের নিয়ে সেই বাসিন্দাদের মনের ভঙ্গিতে। পশ্চিমে আমরা সত্যিই শহরের ক্রীতদাস হয়ে গেছি। সেখানে শহর আমাদের গড়ে-পেটে মানুষ করে, তার কংক্রীট আর লোহা আমাদের মজ্জাতেও ঢুকে গেছে। আর এখানে শহর এখনো প্রাণের নাড়ীকে বিষাক্ত করতে পারে নি। এখনো এদের কাছে শহর যেন একটা খামখেয়ালে পাতা মজার খেলার ঘর। ইচ্ছে করলেই ভেঙে দিতে পারে। ভাঙলে তাদের সত্তাই নিরাশ্রয় হয়ে যাবে না। এই যে আমাদের সঙ্গে রিক্সার ঝাঁক চলেছে,

রাস্তা দিয়ে হরেকরকম ধান্দায় পোষাকে মানুষ ঘুরছে-ফিরছে, এ সমস্তর দিকে চাইলেই বোঝা যায় শহর এখানে কাউকে দিয়ে দাসখৎ লেখাতে পারে নি। ওই যে ভিখিরীটা পথের ধারে ছেঁড়া চট পেতে ভাঙা কুড়োন মাখনের টিনটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ধরছে লোকের কাছে ওর ওই ছেঁড়া ধুলধুলে নোংরা পোষাকের তলাতেও যেন এক বেপরোয়া খুশির মেজাজ ঝিলিক দিচ্ছে। ভিক্ষেটা যেন ওর একধরণের আমিরী, ও জাতের ভিখিরী আমাদের দেশের কোনো শহরে দেখতে পাবে না···

সোজা সামনের দিকে চেয়ে রিক্সায় যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছি। নীনার সব কথায় ভালো করে কানও দিচ্ছি না।

মনে মনে বলছি,—তুমি এদেশের প্রেমে পড়েছ নীনা, তোমার চোখে মোহের রঙিন কাজল। আমাদের দেশের অনেকেও এইরকম রঙিন কাজল নিয়ে তোমাদের দেশ দেখে আসে। তোমার এ মোহের দৃষ্টি সবটাই হয়ত মিথ্যে নয় তবু তা থেকে আত্মপ্রসাদের নেশা চড়াতে পারব না।

নীনার আলাপ উচ্ছ্বাস যেমন কতকটা স্বগতঃ তেমনি অসংলগ্ন।

কয়েকটি কলেজের মেয়েকে দল বেঁধে রাস্তার এক জায়গায় যেতে দেখে তার কথার মোড় আবার অন্যদিকে ফিরল।

শাড়ি কিনতে যাচ্ছি বটে কিন্তু শাড়ি পরবার যোগ্য আমরা নই।

এবার একটু হেসে বলতে হল,—কেন? শাড়ি পরবার জন্যে বিশেষ যোগ্যতা লাগে তা ত' জানতাম না।

জানতেন না!—নীনা যেন অবাক,—শাড়িপরা মেমদের তাহলে ভালো করে লক্ষ্যও করেন নি। শাড়ি যেন বিদ্রূপের ভাঁজে ভাঁজে আমাদের খুঁত ধরিয়ে দেয়। শতকরা নিরানব্বই জন শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে শাড়িতে কিরকম বেঢপ বেমানান দেখায় মনে করে দেখুন না!

সেটা ত' শাড়ির-ই দোষ হতে পারে। ইউরোপীয় মেয়েদের রঙ্-এর কথা ত' ছেড়েই দিলাম, গড়ন-পেটনের সঙ্গেও আমাদের মেয়েদের তুলনাই হয় না।

রঙ্ কি গড়ন-পেটন বলবেন না, বলুন স্বাস্থ্য।—নীনা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল, আর তারই দরুন কিছু সজীবতার কথাও বলতে পারেন। তা বাদে গড়ন-পেটন আমাদের যত ভালোই হোক এ দেশের মেয়েদের সেই শ্রী তাতে কোথায়! ওই যে মেয়েগুলিকে আমরা পেরিয়ে এলাম তারা যেন লাবণ্যের ঢেউ বইয়ে দিয়ে গেল না! আমি ওদের মধ্যে শাড়ি পরে থাকলে যেন ওই যে আপনাদের কি বলে হংসো, হংসো —বলুন না কথাটা!

হংস মধ্যে বকো যথা।—হেসে কথাটা জুগিয়ে দিয়ে বললাম,—আপনি আমাদের ভাষার গলিঘুঁজিও না জেনে ছাড়বেন না দেখছি। কিন্তু শাড়িতে বেমানাই যদি লাগবে মনে করেন তবে তা কিনে পরার এ উৎসাহ কেন? এ দেশে এলে শাড়ি পরতে হবে এমন কোন মাথার দিব্য ত' দেওয়া নেই।

না তা নেই।—নীনা হঠাৎ একটু যেন গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেল।

কথাটা কোনো দিক দিয়ে বেফাঁস হয়ে গেছে কি না বোঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় ধীরে ধীরে নিজে থেকেই—নীনা আবার বললে,—তবু শাড়ি কেন পরতে চাই জানেন? যত বেমানান-ই হোক সরল-সাধারণ মানুষের চোখে কিছুটা দূরত্ব অন্তত ঘুচিয়ে দেয় বলে। শহরে শহরেই কাটাতে হলে অত ভাবতাম না, কিন্তু কোথায় কোন বনবাসে কতদিন থাকতে হবে তা ত' জানি না।

আপনি তা হলে এবার বেশ কিছুদিন এ দেশে থাকছেন—একটু বিস্ময় নিয়েই প্রশ্নটা করলাম।

বেশ কিছুদিন কেন? চিরকালই হয়ত থাকতে পারি—নীনা এবার সহজভাবেই হাসল।

কিন্তু—যা বলতে চেয়েছিলাম তা আর বলা হ'ল না। গন্তব্য দোকানে তখন পৌছে গেছি। ভালোই হ'ল এক হিসেবে। কারণ সময় থাকলেও কথাটা অসঙ্কোচে বলতে পারতাম কি না সন্দেহ। সম্পর্কটা সহজ আলাপের স্তরে পৌছোলেও হঠাৎ ও ধরণের কথা তোলবার মত ঘনিষ্ঠতা নীনার সঙ্গে তখনও হয় নি। রিক্সা থামিয়ে নামবার ব্যস্ততায় তাই কথার সূত্রটা হারিয়ে ফেলবার সুযোগ নিলাম।

বলতে চেয়েছিলাম অনেক কথাই। বলতে শুধু নয়, জানতেও। কায়রোর এয়ারপোর্টে শেষ দেখার সময় কোথায় যেন একটা গভীর আঘাত নিয়ে নীনা চিরদিনের মত ভারতবর্ষ ছেড়ে যাচ্ছে এমনিই আমাকে বুঝতে দিয়েছিল। কি সে আঘাত জানি না তবু শেষ বেদনার স্মৃতির সেই ভারতবর্ষে আবার সে স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছে কি কারণে! তার মনে ও জীবনে নতুন কি ঘটেছে যা এ দেশকে চিরকালের আবাস করবার কথাও তাকে ভাবাতে পারে।

এ সব অনুচ্চারিত প্রশ্নের যন্ত্রণা নিয়েই নীনার সঙ্গে পাটনার বিখ্যাত একটি জামা-কাপড়ের দোকানে গিয়ে ঢুকলাম।

নীনার সঙ্গে সেই পাটনা স্টেশনেই যে দেখা হয়েছে ও

তারপর তাকে নিয়ে দেবরাজ ও অম্বরের সঙ্গে আমিও যে পাটনার একটি হোটেলে গিয়ে উঠেছি তা নিশ্চয় আগের বৃত্তান্তটুকুর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নীনার সঙ্গে পাটনা স্টেশন থেকে শহরের একটি হোটেলে এসে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অস্বাভাবিক হ'ল সেই হোটেলেই আজ পাঁচদিন ধরে থাকা।

স্টেশনের ওয়েটিংরুমে গিয়ে নীনার দেখা পাওয়ার পর দেবরাজ অম্বরের কথায় হোটেলে একটা রাত কাটাবার কথাই তাদের মুখে শুনেছিলাম। সে বন্দোবস্তও হয়েছিল স্টেশনে উপযুক্ত রিটায়ারিংরুম পাওয়া যায় নি বলে। খোঁজ করে জানা গিয়েছিল একটিমাত্র কামরাই তখন খালি আছে। নীনার জন্যেই সেটির ব্যবস্থা করে আমরা রাতটা ওয়েটিং-রুমে কাটিয়ে দেব এই প্রস্তাবই করেছিল দেবরাজ। কিন্তু নীনাই রাজী হয় নি। সেইজন্যেই শেষ পর্যন্ত হোটেলে এসে ওঠা।

নীনার সঙ্গে ওয়েটিংরুমে গিয়ে দেখা হবার মুহূর্তটা মনে রাখবার মত।

আমার নিজের দিক দিয়ে কিছু নয়। কারণ আমি সেখানে অবান্তর। আমাকে নীনা প্রথম লক্ষ্যই করে নি বোধ হয়। করলেও চিনতে পারে নি।

আমার অবশ্য সমস্ত সংশয় ওয়েটিংরুমের ভেতর ঢুকেই ঘুচে গেছল।

ওয়েটিংরুমে সেদিন অত্যন্ত ভিড়। আর ক'জন ইওরোপীয়ান মহিলাও পুত্র-কন্যা সমেত সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। তারই মধ্যে একটি কোণের লম্বা একটি বেতের চেয়ারে আরো কয়েকটি ভারতীয় মহিলার সঙ্গে একটু কেমন অপ্রসন্নমুখে বসে-থাকা মূর্তিটিই আমার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

না, আমার অনুমান ভুল হয় নি। বোম্বাই-এর সেই দারুণ দুর্যোগে এয়ারপোর্টে পৌঁছোবার ব্যাপারে যিনি অমন অযাচিত সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছিলেন আশাতীতভাবে, ইনি সেই নীনাই। কায়রোর এয়ারপোর্টে ইনিই শেষ বিদায় নিয়ে যাবার সময় অমন একটা অদম্য কৌতূহলের বীজ রেখে গিয়েছিলেন আমার মনে।

সেই নীনাই তবু কেমন একটু আলাদা কি!

অপ্রসন্নতা বলে যা প্রথমে মনে হয়েছিল কাছে থেকে দেখবার পর তা যেন অন্য কিছু দেখিয়েছিল। অপ্রসন্নতা নয় কি যেন একটা অস্বস্তি আর উদ্বেগ।

চেহারা পোষাকও একটু আলাদা।

নীনাকে তখন ঝলমলে বাহারে কোন সাজে দেখি নি। সে পোষাকে রুচির পরিচয় ছিল বটে কিন্তু তা এখনকার ম[illegible] নিতান্ত সাদাসিধে প্রায় দারিদ্র্যচিহ্নিত নয়।

এখন শুধু একটি শাদা ব্লাউজ আর কালো রঙের স্কার্ট যেন সরকারী পোষাকের মত কাটছাঁটের বাহুল্যহীন।

মুখটাও কেমন একটু বিবর্ণ হয়েছিল। ভালো ক[illegible] আর একবার লক্ষ্য করেই বুঝেছিলাম সেটা বিবর্ণতা নয় প্রসাধনের অভাব।

উগ্র কোন প্রসাধনের ছাপ প্রথম পরিচয়ের সময়েও নীনা[illegible] মুখে ছিল না। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে ঠোঁটে ঈষৎ কৃত্রি[illegible] রঙের আভাস ছিল। মুখে এবং চুলেও প্রসাধন [illegible] বিন্যাসের কিছু সংযত পারিপাট্য।

এখন আর সেটুকুও নেই।

এই সাজ পোষাকের মধ্যেই যেন নীনার ফিরে আসা[illegible] রহস্যের ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়েছিল।

ভিড়ের মধ্যে আমাদের ঢুকতে নীনা প্রথম দেখে নি। দেবরাজকে নিয়ে অম্বর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর তার সে চমকে কেমন ভীতভাবে দাঁড়িয়ে ওঠার ভঙ্গি ভোলবার নয়।

অন্যায় করে যেন আচমকা ধরা পড়ে যাওয়ার শঙ্কি[illegible] ত্রস্ততা তার মুখে।

দেবরাজ ও অম্বরের পিছনে দাঁড়িয়েই আমি উদগ্রীবভাবে তাকে লক্ষ্য করছিলাম। দেবরাজকে এতদিন বাদে দেখে কি তার মুখের ভাব হয় তা দেখবার কৌতূহল যথেষ্টই ছিল। কিন্তু বিস্ময় উৎফুল্লতার বদলে এই শঙ্কিত ত্রস্ততা সত্যিই কল্পনা করতে পারি নি।

অম্বর তখন ঠাট্টা করে বলছে,—দেখছ ত' নীনা আমাদের দেশের সাধু-সন্তরা কি রকম অন্তর্যামী। ধ্যাননেত্রে তুমি এখানে এসেছ দেখেই শূন্যমার্গে স্টেশনে এসে হাজির।

নীনা যেন সে কথা শুনতেই পায় নি মনে হ'ল। মুখের ভীত ত্রস্ততা কেটে গিয়ে একটু কুণ্ঠিত হাসি তখন দেখা দিয়েছে।

দেবরাজের দিকে চেয়ে যেন একটু কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল, —সত্যি তুমি স্টেশনে আসবে ভাবতে পারি নি। খবর পেলে কি করে?

না খবর কোনরকম পাই নি।—দেবরাজকে অকারণে একটু বেশি গম্ভীর মনে হয়েছিল—এসেছিলাম এক বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিতে। অম্বরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হয়ে গেলে জানতেও পারতাম না তুমি এসেছ।

হ্যাঁ, তোমার জন্যে অপেক্ষা না করে আগেই হঠাৎ চলে এলাম।—নীনার গলায় কুণ্ঠিত অস্বস্তিটা বেশ স্পষ্ট।

কিন্তু তোমার ত' এখানে আসবার কথা ছিল না।—ঠিক

কঠিন না হলেও দেবরাজের স্বরে ঈষৎ যেন ভর্ৎসনার আভাস।

নীনা কি উত্তর এ কথার দিত জানি না, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই অম্বর দেবরাজের পিঠে একটা চাপড় দিয়ে হেসে উঠে বলেছিল,—হয়েছে মাস্টার মশাই। ছাত্রীর অবাধ্যতার বিচার পরে করবেন। আপাতত একটা আস্তানার ব্যবস্থা না করলে নয়। খবর নিয়ে জানলাম একটি রিটায়ারিংরুমের একটিমাত্র কামরাই খালি আছে তাতে কিন্তু আমাদের সকলের জায়গা হবে না।

সকলের জায়গা হবার দরকার কি!—দেবরাজ এবার একটু সহজ হয়ে বলেছিল,—নীনা সেখানে থাক। আমরা ওয়েটিংরুমে কি কোন হোটেলে রাতটা কাটিয়ে দেব। আমি আর পার্থ ত' হোটেল খুঁজতেই যাচ্ছিলাম।

নামটা করায় এতক্ষণে নীনার দৃষ্টি আমার দিকে পড়েছিল। সে একটু সপ্রশ্নদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতেই দেবরাজ একটু হেসে বলেছিল,—ও পরিচয়টা করিয়ে দিতেই ভুলে গেছি। ইনি নীনা কেলার আর ইনি পার্থ চৌধুরী আমার বন্ধু।

এবার একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছিলাম,—আপনার হয়ত মনে নেই মিস কেলার, কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় একবার কিছুক্ষণের জন্যে আমার হয়েছিল।

মনে থাকবে না কেন? খুব মনে আছে!—হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে এসে কি ভেবে থেমে আবার হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে নীনা সরল আন্তরিকতার সঙ্গে হেসে বলেছিল,—সে দুর্যোগের রাতের পরিচয় কি ভোলবার! সেদিন আপনাদের কিছু উপকারে বোধ হয় লেগেছিলাম।

কিছু নয় অশেষ!—অকপটভাবেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলাম,—আপনার সে উপকারের ঋণ জীবনে ভোলবার নয়।

দেবরাজ ও অম্বর দুজনেই আমাদের এ আলাপে তখন একটু বিস্মিত। অম্বরই তার মধ্যে প্রথম একটু যেন অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বলেছিল,—যাক পৃথিবীটা কত ছোট তার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। পৃথিবীতে আমরা নাকি প্রায় তিনশ কোটি মানুষ, তবু খোঁজ করলে হয়ত দেখা যাবে সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু এখন আমাদের সমস্যাটা ত' না মেটালে নয়। রিটায়ারিংরুমে নীনার ব্যবস্থা তা হলে করে আসি।

না।—নীনা প্রতিবাদ জানিয়েছিল,—আমি একা রিটায়ারিংরুমে থাকব, আর আপনারা কোথায় কোন হোটেলে থাকবেন সে হয় না।

কিন্তু তা ছাড়া অন্য ব্যবস্থা যে সম্ভব নয়।—অম্বর কৌতুকের স্বরে বলেছিল,—আমরা অত্যন্ত উদার আধুনিক বটে কিন্তু তোমার সঙ্গে ওই রিটায়ারিংরুমে আমাদের সবাইকার থাকার পর্যায়ে কি উঠেছি! তা ছাড়া ওই কামরায় দুটিমাত্র লোকের জায়গা। তোমাকেই তা হলে সঙ্গী বাছাই করে নিতে হবে।

কিছুই করতে হবে না।—নীনা হেসে বলেছিল,—আমি রিটায়ারিংরুমে থাকতেই চাই না। ওই ইংরেজ ভদ্রমহিলাও রিটায়ারিংরুম পাচ্ছেন না বলছিলেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওঁরই ও কামরাটা পেলে সুবিধে হবে। আপনারা কোন হোটেলই ঠিক করুন। সবাই একসঙ্গে সেখানে থাকব। সেখানে আশা করি ঘরের সমস্যা নেই।

তা বোধ হয় নেই।—দেবরাজ আবার একটু গম্ভীরভাবে বলেছিল,—কিন্তু তোমার স্টেশনে থাকাই ভালো হ'ত নীনা। কাল এখান থেকেই তাহলে ফিরে যেতে পারতে।

আমরা সবাই এ কথায় বিস্মিত হয়েছি, কিন্তু নীনার মুখে বিমূঢ় বেদনার ছায়া সবচেয়ে গাঢ়।

কি বলতে গিয়েও পাংশুমুখে সে চুপ করে গিয়েছিল।

অম্বরই প্রথম গলা ছেড়ে হেসে উঠে হাত কচলাবার সকৌতুক ভঙ্গী করে বলেছিল, ছাত্রীর অপরাধ মাপ করতে আজ্ঞা হয় গুরুমশাই। উদোর দোষে বুধোকে শাস্তি দেবেন না। নীনা নিজের ইচ্ছায় এখানে হঠাৎ আপনার আদেশ অমান্য করে আসে নি। এই অধমই ওকে প্রায় জোর করে এখানে এনেছে। আপনি যে তাতে আপনার তপোবন অপবিত্র হবার বিপদ দেখবেন তা এ অর্বাচীন ভাবতে পারে নি।

সুর বদলে অম্বর আবার বলেছিল,—কিন্তু ঠাট্টা থাক। নীনা ফিরে যাবে না থাকবে সে পরে ঠিক কোরো। আপাতত একরাত্রের জন্যে ত' হোটেলের ব্যবস্থা করা যায়।

একটু চুপ করে থেকে দেবরাজ এবার হেসে ফেলে বলেছিল,—তাই করো তা হলে।

[ক্রমশ।

যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সমস্ত মনীষী বাঙলার কৃষ্টি, ভাষা ও জাতীয় জীবনকে উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী অন্যতম। স্যার রাজেন্দ্র —'বাঙালী অব্যবসায়ী' এই কলঙ্কমোচনকারী, প্রতিভাশালী ব্যবসায়ী, শিল্পী ও স্থপতি ছিলেন। তাঁহার ৮০ বৎসর পর্যন্ত কর্মময়জীবন বাঙলার মুখ-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল। বাঙালী যৌথ কারবার ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কর্ম অক্ষম, বাণিজ্যক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার শক্তির অভাব এই কলঙ্ক রাজেন্দ্রনাথ নিজ কর্ম, সাধনা ও সিদ্ধি দ্বারা মোচন করিয়াছিলেন। তিনি একজন কর্মবীর ছিলেন। তিনি প্রথমে মার্টিন কোং পরে মার্টিন বার্ন কোং প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, আদব-কায়দায়, কথাবার্তায় অফিসে ও জনগণের নিকট পুরো ইংরেজি ধরণে চলতেন, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ স্নেহশীল—

॥ শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ॥

স্নেহশীল বাঙালী ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্ধশতাব্দী মিশিয়া সে ভাব উপলব্ধি করিয়াছি।

রাজেন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখি ১৯০৫ সালে—তদানীন্তন কলিকাতার শেরিফ নলিনীবিহারী সরকারের সঙ্গে স্যার রাজেন্দ্রের বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে। নলিনীবাবু আমার হিন্দু স্কুলের সতীর্থ 'ফজলী' (এস এন সরকারের) পিতা। স্যার রাজেন্দ্র যখন তাঁহার বিডন স্ট্রীটের বাড়ি ছাড়িয়া ৭, হ্যারিংটন স্ট্রীটস্থ নতুন বাড়িতে আসেন, তখন প্রতি বৎসর ভাইসরয়কে পার্টি দিতেন—সেই পার্টিতে যাইবার নিমন্ত্রণ এবং স্যার রাজেন্দ্র ও লেডি যাদুমতীর সহিত মিশিবার সৌভাগ্য হইত।

আমার এক আত্মীয়া জগৎমোহিনী সিংহ ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্নেহলতা ব্যানার্জীর বন্ধু। তাঁহাদেরই মাধ্যমে লেডি যাদুমতীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। লেডি মুখার্জী আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। প্রতি উৎসবে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং আমার বাড়িতে পূজা ও বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন।

পদ্মপুকুরে চড়কপূজা অনুষ্ঠানে...একটি স্বদেশী দ্রব্যের মেলা হইয়াছিল। ১৯০৮ সালে পোড়াবাজারে (অধুনা ক্যালকাটা ক্লাব যে স্থান) এক বিরাট কংগ্রেসের সভার সহিত জে চৌধুরী সাহেবের চেষ্টায় স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাহার পরই এই স্বদেশী দ্রব্যের এই প্রদর্শনী। ইহার সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ এবং সহ-সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় আর সম্পাদক ছিলাম আমি। এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন আচার্য স্যার পি সি রায় মহাশয়। লেডি যাদুমতী মুখার্জীকে আমন্ত্রণ করিয়া আনি। লেডি মুখার্জী এই প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্টা হন। তিনি স্যার রাজেন্দ্রনাথকে প্রদর্শনী দেখিবার জন্য পাঠান।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীর চারিধারে চড়কের মেলা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়া লেডি মুখার্জীকে তিরস্কার করিয়া বলেন—'কুলো, ধামা, আর পাঁপর ভাজার প্রদর্শনী দেখবার জন্য আমায় পাঠিয়ে আমার সময় নষ্ট করলে।'

তখন যাদুমতী দেবী বুঝাইয়া বলিলেন, চড়কের মেলার মাঝেই পদ্মপুকুরের উত্তরে বিরাট স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনীক্ষেত্র।

তখনই আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়া প্রদর্শনী দেখাইতে বলিলেন। দুঃখের বিষয় তখন প্রদর্শনী শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বদেশীয়ানার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল—সেজন্য এই প্রদর্শনীর প্রদর্শকদের সার্টিফিকেট বিতরণ তিনি নিজ হস্তে করেন—সাউথ সুবার্বান স্কুলের হলে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সেই মনোভাব থাকায় ঊনবিংশ সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন গোখেল মেমোরিয়াল নবনির্মিত হর্ম্যে অনুষ্ঠিত হয়। তখন একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সেই প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করিবার জন্য আমি ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় স্যার রাজেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করি। তিনি একবাক্যে তথাস্তু বলিলেন। তিনি প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করিলেন এবং আমার অনুরোধে বাঙলায় বক্তৃতা দিলেন—শুধু তাই নয়, কালো আলপাকার কোট ও ধুতি-চাদর পরিয়া সভায় আসেন। সকলে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হন। মনে আছে—অনভ্যাসের দরুণ তাঁহার কাপড় খুলিয়া যাইতে লাগিল—তখন এক বেল্ট কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে হাস্যমুখে কত উপদ্রব সহ্য করিতেন।

তিনি অতি সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। কোনরূপ

জাল-জুয়াচুরি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা ঠিক করিতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২১ কি ১৯২২ খৃঃ ভারতে দারুণ অর্থক্লিষ্টতা হয়। সেই সময় মার্টিন কোং-এর এক প্রবীণ ইঞ্জিনীয়ারকে তিনি অফিস হইতে ছাড়াইয়া দেন। সেই ইঞ্জিনীয়ার আমায় কাতরভাবে অনুরোধ করেন, স্যার রাজেন্দ্রনাথ যাহাতে তাহাকে পুনর্নিয়োগ করেন। আমি কখনও স্যার রাজেন্দ্রর নিকট কিছুরই অনুগ্রহ-প্রার্থী হই নাই। কোনও বড়লোকের কাছে নিজের স্বার্থে অনুগ্রহ চাওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণের কাতরতা এড়াইতে না পারিয়া স্যার রাজেন্দ্রনাথকে পুনর্নিয়োগের কথা বলি।

তিনি বিরক্ত না হইয়া বলেন—'আমার কর্মচারীকে ছাড়াতে কি আমার ব্যথা লাগে না? বড় দুর্দিন আসছে—তাই ছাড়িয়েছি। তুমি দেখো—২।১ মাসের মধ্যে ক্লাইভ স্ট্রীটে লোক চলবে না।'

ঠিক তাহাই হইল। তিনদিন ক্লাইভ স্ট্রীটের সমস্ত সওদাগরী অফিস, ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল সত্যসত্যই। এইরূপ ছিল তাঁহার দূরদৃষ্টি।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ ইংরাজ জাতির পরমভক্ত ছিলেন। ইংরাজ আইনের পরম অনুরাগী, শ্রেষ্ঠ বৃটেনের শাসনতন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পরম উপাসক—তথাপি তাঁহার অন্তর স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছায় ভরিয়া থাকিত। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একবার পাই। লেডি অবলা বসুর (স্যার জগদীশচন্দ্রের পত্নী) প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ। একদা এক কার্যনির্বাহক সভাতে লেডি বসু নারী-শিক্ষা সমিতির বিদ্যাসাগর বাণীভবনের তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী 'কাকুরী ষড়যন্ত্র' মামলার ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার অপরাধে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন। তখন আমাদের প্রস্তাবার্থে তিনি লেডি বসুরও প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেন।

তিনি বলেন যে, 'মিস গাঙ্গুলী ব্যক্তিগত অধিকারে যদি রাজনৈতিক মামলার অর্থ সংগ্রহ করেন, তাতে বাধা দেওয়া অনুচিত। আর দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা শক্তি ও অর্থব্যয় করেন, তাঁরাই প্রকৃত মানুষ।'

তিনি অতি নিষ্ঠাবান গৃহস্বামী ছিলেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে যেমন কড়া শাসন ছিল—তেমনই ছিল স্নেহপ্রবণতা ও সংঘবদ্ধতা। তাঁহার জিতেন্দ্রনাথ ও স্যার বীরেন্দ্রনাথ নামে দুই পুত্র আর স্নেহ, মায়া, প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধা নামে কন্যাগণ। মধ্যাহ্নভোজন করিবার সময় প্রীতি ও শ্রদ্ধা পরিবেশন করিত।

লেডি যাদুমতী মুখার্জী ধর্মপরায়ণা ও সাধ্বী মহিলা। একদিন স্যার রাজেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে বলেন, 'একটি ভাল ঘরে মেয়ে দেখে দাও আমার ছোটছেলে স্যার বীরেন্দ্রনাথের বিয়ের জন্য।'

আমি ইঙ্গিত করিলাম, 'গৃহস্থের মেয়ে যদি গ্রহণ করেন, তা হলে আমার জানা এক মেয়ে আছে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর মেয়ে—রাণু। রূপসী আর রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহের পাত্রী।'

রাজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'তুমি এখনই কবিকে খবর দাও।'

রাণুর সহিতই বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বিবাহের জন্য বাটী ঠিক করিলাম ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাগানবাটী—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিবাহে উপস্থিত হইয়া কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। হিন্দুমতেই বিবাহ হয়। ফণীবাবুর প্রথমা কন্যা ভক্তি (এখন মিসেস আর্যনায়ক), মুক্তি, শক্তি সকলেই বিদুষী। এই কারণে ফণীবাবু যখন ভবানীপুরের হেসাম রোডে বাস করিতেন তখন বহুদিন মদীয় ভবনে আগমন করিতেন।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ খুব মোটা দান করিয়া যান নাই বটে, তবে তিনি মাসে ৭।৮ হাজার টাকা দান করিতেন বলিয়া আমার জানা। এই দানের মধ্যে তিনি তাঁহার স্বগ্রাম ভাবলার বাটীর আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামবাসীদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা ও পরিধানের জন্য ব্যয় করিতেন।

তবে তিনি দানের অপব্যবহার আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা আমারই পাড়ায় ভেনা মিত্র মহাশয়ের পুত্র চাঁদার খাতায় মৃত বা ভারতে অনুপস্থিত কয়েকজন ইংরাজ দাতার নাম লিখিয়া স্যার রাজেন্দ্রনাথের নিকট ফুট…চাঁদার জন্য এক খাতা উপস্থিত করেন। স্যার রাজেন্দ্র মিথ্যা নাম বসানো ধরিয়া ফেলেন, তখনই পুলিসের হাতে সমর্পণ করিয়া দেন এবং সেই যুবকের ছয় মাস কারাদণ্ড হয়।

স্যার রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় জি পি ও-র সম্মুখে লালদীঘির পশ্চিম সোপানের সম্মুখে। ৫।৬ বৎসর পূর্বে ট্রাম লাইন বসানোর জন্য সেই মূর্তি অপসারিত হইয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে বসান হইয়াছে—এই অজুহাতে মার্টিন কোংই ভিক্টোরিয়া হলের নির্মাতা ছিলেন। তবে ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথের মূর্তি ব্যবসায়ী-অঞ্চল লালদীঘির পাড়ে বসানই সমীচীন।

আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যের স্পৃহা মনে খুবই জাগিয়াছে। স্যার রাজেন্দ্রনাথের পূতচরিত্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা আদর্শ হইয়া থাকিলে দেশের ও দশের মঙ্গল।

গ্রাম প্রেমিক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

[বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যের গ্রাম-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬২ নিউলিটারেটসদের জন্য রচিত বই-এর ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বিবেচিত হয়। ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগ তাঁকে এর জন্য পাঁচশত টাকার পুরস্কারে সম্মানিত করেন।

'মাসিক বসুমতীর' পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে বিবেকরঞ্জনের পরিচয় নতুন নয়। এই পত্রিকাতেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের হাতে-খড়ি হয়েছিল একদিন। পাঠক-পাঠিকাদের সানন্দে 'গ্রাম-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ' পরিবেশন করছি। —স]

তখনও কলকাতায় বিজলী বাতি আসে নি। কলকাতার পথে তখনও দেখা দেয় নি মোটর গাড়ির ছুটোছুটি। শহরের মেয়েরা তখনও মেমসাহেব হয়ে ওঠে নি। আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের মতনই তখনও তারা পাল্কিতে করে এক জায়গা থেকে যেত অন্য জায়গায়। মাথায় থাকত ঘোমটা। সেই যুগের কলকাতায় আজ থেকে ১০০ বছর আগে জন্ম হয়েছিল একটি ছোট্ট শিশুর—সমস্ত পৃথিবীতে যিনি আমাদের দেশের মান বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দেশের জল-মাটিকে যিনি প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন। ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন।

বুড়ো বট গাছটার তলায় পঞ্চায়েত ঘরে বসে গাঁয়ের স্কুলের তারিণী মাস্টার সকলকে গল্প বলছিল। গ্রাম-সেবক হরিহর অনেক চেষ্টা করে শহর থেকে একখানা বড় ছবি এনে পঞ্চায়েত ঘরে টাঙিয়েছে। সেই ছবিখানা দূর থেকে দেখা যায়। হলধর, মদন, গোপীনাথ সব গাঁয়ের মোড়ল। তারা সবাই আজকের দিনের জন্য হুঁকোটাকে ছুটি দিয়েছে। কিছুক্ষণ তারা তামাক ছোঁবে না। আজকের দিনটা পুণ্যের দিন। ঐ দূরে যে-ঋষির ছবিখানা ঝুলছে তাঁর জন্মদিন। দু-পাঁচজন স্কুলের ছাত্রও এসে বসেছে। আজকাল গ্রামের এই পঞ্চায়েত ঘরে কোন উৎসব হলে তাদেরও ডাকা হয়, কেন না পঞ্চায়েত ঘরখানা খাড়া করতে তারা কম পরিশ্রম করে নি।

তারিণী মাস্টার বললেন, শুধু দেশের জল-বাতাস-মাটিকেই তিনি ভালবাসতে শেখান নি। তিনি শিখিয়েছেন হিন্দু, শিখ, জৈন, পারসি, মুসলমান, খৃস্টান, সকলকেই সমানভাবে ভালবাসতে। তিনি মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। ছবিখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই সকলে তাঁর নাম শুনেছো—তাঁর নাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাদের দেশের সকলের গুরুদেব।


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রামের স্কুলের ছাত্র শিবদাস একখানা হাত তুলে দাঁড়ালো।

তারিণী মাস্টার বললেন—তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও কি শিবদাস?

শিবদাস বলল, আজ্ঞে মাস্টারজী আপনি কি সেই কবির গল্প বলছেন, যিনি আমাদের স্কুলের জন্য সেই গানটা লিখে দিয়েছিলেন?

পঞ্চায়েতের সবাই হেসে ফেলল। হলধর মোড়ল আকাশ থেকে পড়ে অবাক ভাবে বলল, তোর স্কুলের জন্য? বলিস কি?

সবার হাসিতে ছোট্ট শিবদাস একটু লজ্জা পেয়ে বললো —আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের স্কুলে রোজ যে গানটা হয়, শুনেছি সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই লিখে দিয়েছেন। ছাপার অক্ষরে আমি সেই নাম দেখিয়ে দিতে পারি।

তারিণী মাস্টার বললেন, তুমি ঠিকই শুনেছো শিবদাস। তোমাদের স্কুলের ঐ প্রার্থনার গানটা যিনি লিখে দিয়েছেন তিনিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু তোমাদের স্কুলের জন্যই নয়, আমাদের দেশের সব স্কুলের জন্য, আমাদের সবার জন্য তিনি ঐ গানটি রচনা করে দিয়েছেন—

'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।'

গানটাতে আমাদের দেশের সবার কথা আছে, তোমার আমার কথা, দেশের নদী, পাহাড়, বনের বর্ণনা আছে। তাই তো ওটা আমাদের জাতীয় সংগীত। দেশের কথা যাতে তোমরা প্রতিদিন মনে কর তাই তোমাদের স্কুলে এ' গানটা রোজ গাওয়া হয়।

ঠাকুরবাড়ি

কলকাতায় জোড়াসাঁকো বলে একটা জায়গা আছে। সেই জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর পরিবার আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুব বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবার। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন সিপাহী বিদ্রোহের কিছুদিন পরেই। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার প্রথম চেষ্টা হয় এই সিপাহী বিদ্রোহে, কিন্তু তারা স্বাধীনতা আনতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন দেশের চারিদিকে শুধু স্বাধীনতারই আলোচনা হচ্ছিল। সবাই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিল।

কলকাতায় এই ঠাকুর পরিবার ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য যা করেছে, পৃথিবীতে কোনো একটা পরিবারে নিজের জাতির উন্নতির জন্য তত কাজ কখনও করে নি।

ঠাকুরবাড়িতে গান হ'ত, ছবি আঁকা হত, ধর্মের উন্নতির জন্য প্রার্থনার সভা বসত। দেশ-বিদেশের গুণী-জ্ঞানী লোকজন আসত। বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা আসত, কেউ খাজনা দিতে, কেউ জমি মাপ করাতে। দেশের নেতারা এসে উঠতেন ঐ বাড়িতে। দিনরাত শুধু দেশের উন্নতির কথাই হত। গানে-বাজনায়, ছবি আঁকাতে, লেখাপড়ায় এই ঠাকুরবাড়ি একটা মৌচাকের মতন হয়ে উঠেছিল। সব গুণী-জ্ঞানীরা এসে সেই মৌচাকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির মধু জমিয়ে রেখে যেতেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এতবড় পণ্ডিত ছিলেন ও এত ধ্যান-তপস্যা করতেন যে, লোকেরা তাঁকে মহর্ষি বলেই জানত।

আমাদের পঞ্চায়েত ঘরে তোমরা যে মাসিক পত্রিকা দেখেছো, তখনকার দিনে একমাত্র ঠাকুরবাড়ি থেকেই এরকম দু'টো মাসিক পত্রিকা বেরুতো।

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির সবচেয়ে ছোট ছেলে।

রবীন্দ্রনাথের মেজোকাকা গিরীন্দ্রনাথ ভালো নাটক লিখতেন। তাঁর নিজের একটা সখের যাত্রার দলও ছিল। রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। আর এক ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় গল্প পড়তে ভালোবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের বোন স্বর্ণকুমারী অনেক কবিতা, গল্প, কাহিনী লিখেছেন। ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথের গল্প কে না পড়েছে? তিনি খুব ভালো ছবিও আঁকতে পারতেন।

ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা যাত্রা-থিয়েটার অভিনয় করতেন। তাতে কলকাতার গুণী-জ্ঞানীদের সবাইকে ডাকা হত। এই যাত্রা-থিয়েটারে সকলের জ্ঞান বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামে নাটক রচনা করেন সেটা সর্বপ্রথম নিজেই নিজের বাড়িতে সবাইকে নিয়ে মঞ্চস্থ করেন।

একটু বড় হয়ে যখন 'ডাকঘর' লেখেন তখন গান্ধীজী, লালা লাজপত রায়, বাল্ গঙ্গাধর তিলক সবাই কলকাতায়। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদে এই বই নিজেই প্রথম মঞ্চস্থ করেন। গান্ধীজী, লালা লাজপত রায়, বাল্ গঙ্গাধর তিলক সবাইকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বই দেখাতে নিয়ে যান। সেই ঠাকুর পরিবারের ছাদে এই মাননীয় অতিথিদের সম্মানে তিনি যে গানটি লিখেছিলেন সেইটির কথা শিবদাস বলছিল। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের সুর প্রথম আমরা শুনেছিলুম ঐ ঠাকুরবাড়ির ছাদ থেকে।

ছেলেবেলা

শিবদাসের ভয় অনেকটা কেটে গেছে সভায় খানিকক্ষণ বসে। সে বলল, মাস্টারজী গুরুদেবের ছেলেবেলা সম্বন্ধে আপনি আমাদের কিছু বলুন না?

এবারে আর হলধর মোড়ল হেসে উঠলো না। হলধর, মদন, গোপীনাথ সবাই শিবদাসের দিকে প্রশংসার সাথেই তাকালো। গ্রামের এই বুদ্ধিমান ছেলেটি মানুষ হলে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হবে। তার প্রশ্নে সায় দিয়ে হলধর বলল, হ্যাঁ মাস্টারজী শিবদাস ঠিকই বলেছে। গুরুদেবের ছোটবেলা থেকেই গল্প বল। এত বড়টা হলাম। আজও তাঁর ছোটবেলা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলাম না।

—তাতে কি হয়েছে মোড়ল ? এতদিন তো জমিই চাষ করে এসেছো। ফুরসুত পেলে কোথায়।

—বল হে, বল মাস্টার। গুরুদেবের ছেলেবেলা থেকেই বল। দেশের গুরুদেব, জাতির গুরুদেব। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের সবারই জানা উচিত। তাই নয় কি ?

তারিণী মাস্টার বললেন, রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার গল্প বলতে হলে সবচেয়ে আগে বলতে হয় তাঁর মা সম্বন্ধে দু-চারটে কথা। রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন। সব সময়ে তাঁর হাতে একখানা বই থাকত। বই হাতে নিয়ে তিনি ঘরের কাজকর্ম সামলাতেন। রামায়ণ ও মহাভারত পড়তে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। মায়ের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ বই পড়ার অভ্যাস পেয়েছিলেন। মা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু নিজে দেখাশুনো করতে পারতেন না। তা ছাড়া তখনকার দিনে বড়লোকদের বাড়িতে বেশির ভাগই চাকর-বাকরেরাই ছেলে মানুষ করত। রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন চাকর-বাকরদেরই হাতে। শিশু রবীন্দ্রনাথকে তদারক করার জন্য যে ক'জন চাকর ছিল তাদের সর্দার ছিল ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর আগে পাঠশালায় পণ্ডিত ছিল। তার মেজাজটা একটু গম্ভীর ছিল। লোকটা একটু লোভী ছিল। ছোট ছেলেদের কম খাবার দিয়ে সে বাকিটুকু নিজেই আরাম করে বসে খেয়ে নিত। ছোটবেলা থেকেই বেচারা রবীন্দ্রনাথ সেইজন্য কখনও বেশি খেতে পারতেন না।

তবে ব্রজেশ্বর একটা ভালো কাজ করতো। সে রোজ সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছেলেদের নিয়ে কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড বাংলা রামায়ণখানা নিয়ে বসত। শিশু রবীন্দ্রনাথ এই সময়টুকুর জন্য বসে থাকতেন। ব্রজেশ্বর ভালোভাবে পড়তে পারতো না কিন্তু সেই ছোট্ট শিশুদের বৈঠকটুকুতে মাঝে মাঝে একজন ভদ্রলোক আসতেন সমস্ত রামায়ণটা যিনি সুর করে না দেখে গাইতে পারতেন। তাঁর নাম ছিল কিশোরী চাটুজ্যে। এই কিশোরী চাটুজ্যে ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ তার মিষ্টি গলা নিয়ে কোনো পাঁচালীর দলে ভর্তি হলে দেশে তার খুব নাম হবে। এই কিশোরী চাটুজ্যের ছড়া কাটা লাইনের রামায়ণের গল্প রবীন্দ্রনাথকে ছোটবেলায় বিশেষ করে মুগ্ধ করেছিল। প্রথমে মা, তারপর ব্রজেশ্বর, তারপর কিশোরী চাটুজ্যে রবীন্দ্রনাথকে ধীরে ধীরে রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনী শিখিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য আর একজন চাকর ছিল যার নাম ছিল শ্যাম। এই শ্যাম ব্রজেশ্বরের মতন কড়া লোক ছিল না। সে রোজ রবীন্দ্রনাথকে নানা রকমের গল্প বলে শোনাতো। কখনও ভূতের গল্প। কখনও বা ডাকাতের। শ্যাম রবীন্দ্রনাথকে যে-সকল গল্প শুনিয়েছিল বালক রবীন্দ্রনাথের তার ভিতর রঘু ডাকাত ও বিশু ডাকাতের গল্প সবচেয়ে ভালো লেগেছিল। রঘু ডাকাত ও বিশু ডাকাত আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করতে আসত। ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার লোকের রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা। মাঝে মাঝে বাড়িতে ডাকাতের খেলা দেখানোই হত।

এই ডাকাতের গল্প রবীন্দ্রনাথের এত ভাল লেগেছিল যে, বড় হয়ে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের কাছে তিনি বহুবার বলেছেন।

খুব ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ গান শিখতে সুরু করেন। তাঁর গানের মাস্টার ছিলেন শ্রীকণ্ঠবাবু। তিনি খুব ভাল হিন্দী ভজন গাইতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে অনেক ভজন শেখেন। তখনকার দিনে হারমোনিয়ম চালু হয় নি, রবীন্দ্রনাথ কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সেজদাও তাঁকে অনেক গান শিখিয়েছিলেন।

তারিণী মাস্টার বললেন, তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে না যে রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখেছিলেন কিন্তু তিনি সত্যিই ছোটবেলায় কুস্তি অভ্যাস করতেন। তিনি বহুবার আমাদের এ গল্প বলেছেন, 'অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শির-শির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাক সাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াতো। দালান ঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায়, শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে আগাগোড়া চাপা দিয়ে বসে নি, কিছু কিছু ফাঁক ছিল। শহুরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত, খাস জমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ। এই পাঁচিল ঘেঁসে ছিল কুস্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে একমণ সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি করে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম।'

তারিণী মাস্টার শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে দেখলেন পঞ্চায়েত ঘরের সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে গাঁয়ের কুস্তিগীর জগু পালোয়ানের দিকে। জগু গোঁপজোড়া

নাচিয়ে একটু মুচকি হেসে নিল। রবীন্দ্রনাথের কুস্তি শেখার গল্পটাতে জগুর বুকের ছাতিখানা যেন ছ ইঞ্চি বেড়ে গেল।

এই তো গেল রবীন্দ্রনাথের কুস্তির গল্প। তারিণী মাস্টার বললেন, রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় রীতিমতন শিকার করতেও যেতেন। তাঁর জ্যোতিদাদা তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। কবিতা লেখাতেও তিনিই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন। জ্যোতিদা খুব ভালো বন্দুক ছুঁড়তে পারতেন। একবার খবর এলো শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে। জ্যোতিদা তক্ষুণি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সাথে নিলেন একজন ওস্তাদ শিকারী নাম তার বিশ্বনাথ। আর সাথে নিলেন ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর ধারণা ছিল এইসব শিকারে নিয়ে গেলে শিশু রবীন্দ্রনাথের সাহস বেড়ে যাবে। ভয়কে সে জয় করতে পারবে। সেবার কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদা সেই বাঘটাকে ঠিক মেরে ফেলেছিলেন।

এ ছাড়া আরও একবার রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিদার সাথে হাতীর পিঠে চড়ে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেবারেও শিলাইদহের জঙ্গলে। আখের খেত দিয়ে যেতে হয়েছিল। হাতী দু' ধারের আখ পট্ পট্ করে উপড়িয়ে চিবুতে চিবুতে চলছিল। তাঁরা জঙ্গলে পৌঁছে বাঘ দেখলেন। সেবারের বাঘটা বোধ হয় বেশি চালাক ছিল। সে মারা পড়ে নি।

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শিশু রবীন্দ্রনাথকে প্রতিটি কাজে উৎসাহ দিতেন। এমন কি তাঁর খামখেয়ালি জিদ্-এও কখনও তিনি ছেলেকে নিরুৎসাহিত করেন নি। একবার শিশু রবীন্দ্রনাথ আব্দার ধরলেন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে তিনি গরুর গাড়িতে চড়ে পেশোয়ার যাবেন। বাড়িতে সবাই হেসে খুন। শেষে রবীন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে ব্যাপারটা মহর্ষিকে জানালেন।

সব শুনে মহর্ষি বললেন, তাই নাকি? গরুর গাড়িতে চেপে পেশোয়ার যেতে চাও, সে তো খুব ভালো কথা। আজকালকার রেলগাড়িগুলো যা হয়েছে, তাতে চেপে ধীরেসুস্থে চারিদিকের সবকিছু দেখেশুনে মোটেই বেড়ানো যায় না। তুমি ঠিক বলেছো। গরুর গাড়িতে চেপে বেড়ানোতেই বেড়াবার আসল সুখ আছে।

আর একবার বালক রবীন্দ্রনাথ কয়েকটা ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে এনেছিলেন। অন্য কোন লোক হলে তখুনি সেগুলো ফেলে দিতে বলত। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব কিন্তু তা করলেন না। তিনি খুশি হয়ে বললেন বাঃ বাঃ। এত সুন্দর পাথর কোথায় পেলে?

বালক রবীন্দ্রনাথ এতে খুব উৎসাহ পেলেন। তিনি বললেন, আমি এমনি হাজার হাজার পাথর কুড়িয়ে আনতে পারি।

মহর্ষি বললেন, তুমি একটা ছোট পাহাড় বানিয়ে ফেলো। আমি সেখানে বসে প্রার্থনা করব।

রবীন্দ্রনাথ ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে সত্যিই একটা পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিলেন। এ থেকেই তোমরা জানতে পারো রবীন্দ্রনাথের বাবা তাঁকে কতখানি ভালোবাসতেন।

মহর্ষি সর্বদা খুবই ব্যস্ত থাকতেন। তবুও যখনই সুযোগ পেতেন বালক রবীন্দ্রনাথকে কাছে কাছে রেখে নানারকম শিক্ষা দিতেন। তিনি একবার রবীন্দ্রনাথকে হিমালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। হিমালয়ের পথে তাঁরা কিছুদিন অমৃতসরে ছিলেন। সেখানে থাকতে রবীন্দ্রনাথ শিখেদের গুরুদ্বারে ধর্মসঙ্গীত শুনতে যেতেন প্রতিদিন। বড় হয়ে শিখদের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা লিখেছিলেন।

হিমালয়ে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির কাছে সংস্কৃত পড়া শুরু করেন। মহর্ষি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথকে বাল্মীকি রামায়ণ পড়াতেন। হিমালয়ের দিনগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্মরণীয় দিন। দেবতাত্মা হিমালয়ের দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বরফে-ঢাকা রুপোলি চূড়োওয়ালা পর্বতশিখরে সূর্যোদয়ে শিশু রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক তেমনিই বাল্মীকির রামায়ণের মধুর ঝঙ্কারে তাঁর মনে এক নতুন আলোড়ন খেলল। এতদিন তিনি রামায়ণ পড়েছিলেন বাংলায়। মা, ব্রজেশ্বর, কিশোরী চাটুয্যে সবাই তাঁকে রামায়ণ শুনিয়েছেন বাংলাতে। এবার তিনি রামায়ণের নতুন স্বাদ পেলেন বাল্মীকি রামায়ণে। রামায়ণের বহু অংশ পড়তে পড়তে তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। হিমালয় থেকে ফিরে এসে তিনি বাড়ির সবাইকে সংস্কৃত রামায়ণ শোনালেন। সবাই মুগ্ধ হ'ল। মা সারদা আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

লেখাপড়া

গ্রামে যে রকম পাঠশালা আছে, তখনকার দিনে ঠাকুর-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপেও ঠিক সেইরকম একটা পাঠশালা বসত। একজন গুরুমশাই থাকতেন। ঠাকুরবাড়ির সব ছেলেরা সেখানে পড়াশুনো করতো। তা ছাড়া কাছাকাছি অন্যান্য বাড়ির ছেলেরাও আসত সেখানে পড়তে। তালপাতায় গুরুমশাই প্রথম লিখে দিতেন স্বরে অ স্বরে আ। ছেলেরা তার উপর দাগ কেটে লিখতে শিখত। এই চণ্ডীমণ্ডপের

পাঠশালাতেই গুরুমশাইয়ের লেখা তালপাতায় রবীন্দ্রনাথ স্বরে অ স্বরে আ'র দাগ বুলোতে শেখেন। বছর পাঁচেক বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল। প্রথম প্রথম স্কুলে যেতে তাঁর খুব ভালো লাগত। বাড়িতে বড় ভাইদের সেজেগুজে স্কুলে যেতে দেখে তাঁরও যেতে লোভ হ'ত। কিন্তু স্কুলে গিয়ে তাঁর মোটেই ভালো লাগত না। চারিদিক থেকে বদ্ধঘরে শিশু রবীন্দ্রনাথের মন বসত না। তাঁর মন চাইত খোলা মাঠে গাছের ছায়ায়, খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে। এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে সেখান থেকে আরেক স্কুলে। এমনি করে একটার পর একটা শুধু স্কুল বদলানোতেই সময় কেটে যেতে লাগল।

ছেলের মন কিছুতেই লেখাপড়ায় বসতে চায় না। বাড়িতে স্কুলে সবাই বলতে লাগলো, এ ছেলের কিছু হবে না।

বাড়িতে সন্ধ্যার সময়ে রেড়ির তেলের আলো জ্বালিয়ে অঘোরবাবুর কাছে পড়তে বসতেন ইংরেজী। ছেলের প্রথমে উঠত হাই, তারপরে আসত ঘুম, তারপরে চলত চোখ রগড়ানি। স্কুলের কথা বললেই তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে জ্বর আসতো। আসল গণ্ডগোল ঐ স্কুলেই ছিল। শিশু রবীন্দ্রনাথ স্কুলে যেতে মোটেই ভালবাসতেন না। স্কুলের মাস্টারদেরও তাঁর ভালো লাগতো না। স্কুলের পড়ানোও তাঁর মোটেই ভালো লাগতো না।

শিবদাস বলল, মাস্টারজী একটা কথা ছিল জিজ্ঞাসা করার।

তারিণী মাস্টার বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে প্রশ্ন থাকলে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে বৈকি। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে কখনও ভয় পাবে না। মনে প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা না করলে কখনও কিছু শিখতে পারবে না।

শিবদাস বলল, মাস্টারজী আপনি এখুনি বললেন গুরুদেব দুনিয়ায় একজন বড় কবি ছিলেন। এখন আবার বলছেন তিনি ছেলেবেলায় স্কুলে যেতে ভালবাসতেন না। এ কি রকম করে হয়? আমরা তো জানি স্কুলে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করলেই সে বড়লোক হতে পারে। স্কুলে লেখাপড়া করতে ভাল না লাগলে সে ছেলে মানুষ হবে কি করে?

হলধর মোড়ল বলল ঠিক কথাই তো। এ তো শুনি নি বাবা কোনদিন যে ছেলের স্কুলে লেখাপড়া করতে ভাল লাগে না। তারপর সেই ছেলেই আবার নামকরা কবি হয়।

তারিণী মাস্টার বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো শিবদাস। হলধর মোড়ল তোমার প্রশ্নও ঠিক? এ প্রশ্ন বহু লোকেই করেছে। যে ছেলে স্কুলে লেখাপড়া করতে ভালবাসে না সে মানুষ হবে কি করে? তোমরা একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য কর নি। আমি কখনও বলি নি গুরুদেব লেখাপড়া করতে ভালবাসতেন না। আমি বলেছি স্কুলে যেতে তাঁর মোটেই ভাল লাগতো না। শহরের স্কুলের ক্লাসের বদ্ধ হাওয়া শিশু রবীন্দ্রনাথের মনকে বাঁধতে পারতো না। ক্লাসে ঢুকলেই তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসত। সুযোগ-সুবিধা পেলে তিনি সত্যি সত্যি ক্লাস ছেড়ে পালিয়ে যেতেন। তিনি চাইতেন খোলামেলায় ছোটাছুটি করে খেলাধূলো করতে। চারিদিকে গাছপালা থাকবে, সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটবে, পাখীরা শিস দিয়ে উড়ে বেড়াবে, মাস্টার মশাইরা ছেলেদের ভালবাসবে। তার ভিতর তিনি চাইতেন খেলাধূলোর সাথে সাথে একটু একটু করে সমস্ত জিনিস শিখতে। তার বদলে স্কুলে তিনি দেখতেন মাস্টারদের কড়া শাসন। বই দেখে দেখে চোখ-কান বুজে মেশিনের মতন পড়ানো। তাতে তিনি শুধু হাঁপিয়েই যান নি, রীতিমতন ভয় পেয়ে যেতেন।

স্কুলের দরজাটা, ক্লাসের চেয়ার-টেবিল যেন একটা দৈত্যের মতন হাঁ করে থাকত। মাস্টার মশাইরা মেশিনের মতন পড়াটা পড়িয়ে যেতেন, তাতে কোনো মাধুর্য ছিল না, ছেলেদের কোন জানবার উৎসাহ ছিল না।

ছোটবেলার এই দিনগুলো রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। তাই বড় হয়ে সবচেয়ে বড় কাজ যেটা তিনি করেছিলেন সেটা হ'ল একটা মনের মতন স্কুল গড়া। রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে কলকাতার কাছে শান্তিনিকেতন নামে গ্রামে একটা স্কুল খোলেন। এই স্কুল সম্বন্ধে আমি তোমাদের আরও অনেক কথা পরে বলব। পৃথিবীতে এত ভাল স্কুল আর দ্বিতীয়টি নেই। রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতা না লিখলেও শুধুমাত্র এই সুন্দর স্কুলটা খোলার জন্যই সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম থেকে যেতো।

বাড়ির সবাই যখন রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনোর হাল ছেড়ে দিল তখন তাঁর নতুনদা জ্যোতি নিজের হাতে ছোট ভাইকে পড়াবার ভার নিলেন। জ্যোতিদার অনেক ধৈর্য ছিল। শিশু রবীন্দ্রনাথ যা দেখতেন সেটা সম্বন্ধেই প্রশ্ন করতেন। প্রত্যেকটি কথায় তিনি প্রশ্ন করতেন।

তারিণী মাস্টারের কথা শুনে সবাই শিবদাসের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসল। এই পঞ্চায়েত ঘরে যত সভা হয়েছে প্রত্যেকটাতেই শিবদাস সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করে।

শিবদাস একটু নড়েচড়ে বসল।

তারিণী মাস্টার বললেন, জ্যোতিদা ছোট ভাই-এর

প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতেন। শিশু রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে জ্যোতিদার পিছু পিছু বেড়াতেন। শুধু জবাব দিয়েই ক্ষান্ত নয় তাঁকে শিশু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প শুনতে হ'ত। তিনি মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা শুনতেন। এমন কি নিজের লেখা বইতে বালক রবীন্দ্রনাথের গান জুড়ে দিতেন। জ্যোতিদা বুঝেছিলেন শহরের বদ্ধ হাওয়ায় শিশু রবীন্দ্রনাথ হাঁফিয়ে পড়ছেন। তিনি তাই প্রায়ই তাঁকে বাংলার বিভিন্ন পল্লীগ্রামে নিয়ে যেতেন। সেখানে নীল আকাশ, সেখানে সবুজ মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুঁয়ে গেছে। সেই খোলা সবুজ মাঠে ছোটাছুটি করে শিশু রবীন্দ্রনাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। গ্রামের মুক্ত বাতাস, মাটির মিষ্টি গন্ধ তাঁকে মোহিত করত। প্রকৃতির সাথে সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। যার জল-বাতাস-মাটির অণুপরমাণুতে আমরা সবাই মানুষ সেই পল্লী-প্রকৃতির প্রকৃত রূপে শিশু রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন। তিনি কবিতা লিখতে শুরু করলেন। এই সবচেয়ে দরকারী কথাটা তোমরা মনে রেখো শিশু রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার উৎসাহ এসেছিল জ্যোতিদার সাথে পল্লী-মায়ের রূপ দেখা থেকে। গ্রামের রূপ দেখে তিনি এতো মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, জীবনে কখনও তা ভুলতে পারেন নি। বড় হয়ে শহর ছেড়ে তিনি গ্রামে এসে তাই চিরদিন বাস করে গেছেন। তাঁর প্রকৃতির বর্ণনার কবিতা পড়ে শুধু আমাদের দেশের লোকই নয়, পৃথিবীর লোক এত আনন্দ পেয়েছে যে, সব দেশের লোকেরা তাঁকে বিশ্বকবি বলে ডাকতে শুরু করেছিল। আমরাও তো গ্রামে থাকি। কেউ কখনও ভেবে দেখেছো কি আমাদের চারিদিকের প্রকৃতির সৌন্দর্য কি মনোমুগ্ধকর? [ক্রমশ।

ভারত-চৈতন্য

॥ বিমলচন্দ্র ঘোষ ॥

ভারত-চৈতন্য শঙ্করের বাণী ঃ
'হৃদয়-আকাশে চৈতন্য
নিত্য বিদ্যমান!
দিবা ভাতি মুহুর্মুহু!
অহোরাত্রং ন পশ্যামি
কথং সন্ধ্যাং উপাস্মহে?'
কখন সন্ধ্যা আহ্নিক করবো?
দিগন্তহীন জ্যোতি-সমুদ্রে
উদয় নেই অস্ত নেই
মন বুদ্ধি অহঙ্কার
জ্যোতির্ময়!
সূর্য-কেশরী পাহারা দেয়
পূর্বাশার হিরণ্ময় তোরণে।

সারা বিশ্বে,
সমস্ত মানবেতিহাসে,
কে কবে বলতে পেরেছে
অহং ব্রহ্মাস্মি?
কে কবে বলেছে
মায়াময় বিশাল সংসার?
লোভ মোহ অর্থহীন
ভারতের প্রজ্ঞাদীপ্ত সমদর্শিতায়
কে কবে বলতে পেরেছে?

কে মা? কে বাপ? কে পুত্র? কে কন্যা?
কেবা প্রিয়া? কেবা প্রিয়তম?
অনাদ্যন্ত আলোর মিছিলে
তুমি কিম্বা আমি নেই।
সৃজনে প্রলয়ে
জ্যোতির্বাষ্পমণ্ডলীতে সব একাকার।

মহাসাম্য-সাধনার মূর্ত দীপাধার
ভারতাত্মা চির জ্যোতির্ময়।
তবু ওরা কারা?
পুঁজির গলিত পুঁজ সর্ব অঙ্গে মেখে
সুড়ঙ্গের পচা পাঁকে থাকে
সরীসৃপ-কৃমি-কৃকলাস!
কারা ওরা?

মানবচৈতন্যস্বর্গে
ফুৎকারে নেভাতে আসে আলো,
কারা ওরা?

জাগো জাগো গদাধর !
ভারতচৈতন্য সমুদ্ভূত !
ওদের মাড়িয়ে দাও
তোমার অতিকায় ভীমপায়ের চাপে।
এত স্পর্ধা কার ?
তোমার সীমান্ত স্পর্শ করে ?
ওদের লোভী হাত ঠুঁটো করে দাও !

দেবভূমি জন্মভূমি !
দেবত্বের আলোর আকাশে
স্বরূপে প্রমূর্ত হও
স্বরাট প্রাণের বরাভয়ে।

ব্যাধিগ্রস্ত কোটি কোটি ছানিপড়া চোখে
আলো দাও !
হে ভারত, আলো দাও ক্ষুধিত আত্মায় !
বড় অন্ধকার !
বড় দুঃখ, নিদারুণ ভয় !
চতুর্দিকে !
মা কাঁদে সন্তানে বুকে টেনে
শ্মশানে শিবের বুকে উলঙ্গিনী শ্যামা
অগ্নিস্রাবী হাহা শব্দে নাচে !
আলো ! আলো ! কই আলো ?
তমসো মা জ্যোতির্গময়···
শোনাও, শোনাও হে ভারত···

---

২৪ . ৬

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে

॥ সুমেধা দেবী ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আধুনিককালে অপর যাঁরা বিবেকানন্দের সমালোচনায় অবতীর্ণ, ইতিহাস ব্যাখ্যার অস্ত্র নিয়ে তাঁরা নিন্দুকদের চেয়ে বুদ্ধিমান ; কিন্তু তাঁরা নিজেদের অতি-বুদ্ধিমান মনে করেন। সেজন্য ইতিহাস-প্রবক্তার ছদ্মবেশে তাঁরা বলতে চান বিবেকানন্দ অপোগণ্ড অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, আরও পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পেলে 'আধ্যাত্মিকতার কুজ্ঝটিকার' হাত হতে উদ্ধার পেয়ে সত্যকারের উদার হতে পারতেন !!! এঁরা ভুলে যান ধৃষ্টতাও একটা অপরাধ। যাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রোঁলা বলেছেন,—

'It was impossible to imagine him in the second position. Whenever he went he was the first'.

যাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে এবম্বিধ ধৃষ্টোক্তি যাঁরা করেন তাঁরা নিজেদেরই বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলেন। স্বামীজীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই ডাঃ রাইটের কথা—



'He is more learned than all our Professors put together.'

কোন বিষয়টা তিনি জানতেন না ? মাদাম কালভে বলেছেন,—

'Science, History and Philosophy had no secrets from him.'

এরিক হ্যামণ্ড নামক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন,—

'He was equally versed in History and Political Economy.'

মেরী লুই বার্কের নিম্নোক্ত কথাগুলিই বিশেষ প্রণিধান করতে বলি—

'He studied and understood modern civilisation with the combined insight of a Sociologist, Psychologist, Historian, Philosopher and mystic.'

মেরী লুই বার্ক আরও দেখিয়েছেন, কিভাবে গণ-মানসের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। বিদ্যায়, মনীষায়, অভিজ্ঞতায় বিবেকানন্দের যে অভাবনীয় বিপুল জ্ঞানসম্ভার সঞ্চিত হয়েছিল তার পরিচয় পাবেন তাঁরা যদি বঙ্গভাষায় অনূদিত তাঁর 'বাণী ও রচনা' শীর্ষক গ্রন্থাবলীর পশ্চাতে সন্নিবেশিত তথ্যপুঞ্জ যা তিনি ব্যবহার করেছেন তার তালিকা আলোচনা করেন। সেগুলি এই সকল সমালোচকেরা নিজেরা একবার আয়ত্ত করবার প্রয়াস করে দেখুন না—এক জীবনে তাঁরা এর কতখানি আয়ত্ত করতে পারেন।

এঁদের সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদী এবং তাঁর নায়কত্বে ভারতবর্ষীয় সমাজের পশ্চাদপসরণ ঘটেছে। চমৎকার সিদ্ধান্ত। কেন পশ্চাদপসরণ ঘটেছে, কি তার লক্ষণ —এ বিষয়ে দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

একদল ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় আস্থাবান —তাঁদের যুক্তি মার্ক্স বলেছেন, ধর্ম আদিম মনের কুসংস্কার-প্রসূত এবং শ্রেণী-সমাজের অত্যাচার ও শোষণের যন্ত্র। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে ভারত যখন ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে জড়-বাদের দিকে এগিয়ে চলেছিল তখনই সে অগ্রগতির দিকে চলেছিল। বিবেকানন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যখন পুনর্বার সে ধর্মে আস্থাবান হয়ে উঠলো সে পশ্চাদপসরণ ঘটলো। কি অপূর্ব যুক্তিপরম্পরা। ইতিহাসের অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যার ভিত্তি যে 'mechanistic, materialistic, deterministic.' বিজ্ঞান তার ভিত্তি ধূলিসাৎ করেছে আজকের বিজ্ঞান—পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। তবু তাঁরা একে অন্ধ আবেগে আঁকড়ে আছেন এর নাম যুক্তি। আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতির রূপ বিবেকানন্দ তাঁর সত্য-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর 'জ্ঞানযোগ' শীর্ষক বক্তৃতাবলীতে। বর্তমান বিজ্ঞান-সম্মত দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিচারপূর্বক তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন এই ঃ ধর্ম মানুষের ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে যাবার চিরন্তন প্রয়াস। আধুনিক পুরাতত্ত্ব গবেষণা



প্রমাণ করেছে যে, আদিম মানুষের মধ্যেও অতীন্দ্রিয় ধারণা-সমূহ দেখা যায়।

বিবেকানন্দ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শোষণের সহায় হয়েছে যা পৌরোহিত্য এবং তার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। ধর্মের প্রাধান্যে সভ্যতার বিকাশ, তার অভাবে সভ্যতার অবনতি। যেমন দেখা দিয়েছিল বুদ্ধের আবির্ভাবে জ্ঞানে, গরিমায়, শিল্প মহিমায়, বাণিজ্যে-সম্পদে সে এক ভারতের স্বর্ণময় যুগ। বিবেকানন্দের ইতিহাস ব্যাখ্যায় সমাজের বিকাশেরও সুন্দর যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বলতে হয় ধর্মের প্রাদুর্ভাবে যখন সভ্যতার অগ্রগতি, তখন বিবেকানন্দের আবির্ভাবে তা যদি ঘটে থাকে, তাহলে তা আমাদের সমাজের অগ্রগতিই ইঙ্গিত করছে। পূর্বপোষিত ধারণা ছেড়ে ইতিহাস চর্চায় অগ্রসর হলে সকলেই তা দেখতে পাবেন।

অপর একদল আছেন নিছক সমাজ-সংস্কারবাদী, এঁদের দৃষ্টিও কতকগুলি পূর্বপোষিত ধারণা দ্বারা আচ্ছন্ন। এঁদের মতে মূর্তিপূজা সমাজের অধোগতির লক্ষণ; তা ছাড়া বাল্য-বিবাহ রোধ করা, জাতিভেদ বর্জন করা, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করা—এ সব ধর্মীয় ব্যাপার। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এঁদের অভিযোগঃ প্রথমত তিনি বেলুড় মঠে মূর্তিপূজার প্রবর্তন করেছেন; দ্বিতীয়ত তিনি কখনও কখনও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলেও ব্রাহ্ম-খ্রীস্টান প্রভাব রোধ করবার জন্য বলে দিয়েছেন—যেমন বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন নি এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করলেও তিনি ঘরোয়া শিক্ষার অধিক এগোতে পারেন নি; তৃতীয়ত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী তাঁর শ্লোগান **'militant aggressive Hinduism.'**

মূর্তিপূজা সম্বন্ধে বলি, তাঁরা জানেন না যখন বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে মূর্তিপূজার প্রবর্তন করেন, ঠিক একই সময়ে তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর পূজা বন্ধ দেন এবং আজও অদ্বৈত আশ্রমের শাখাসমূহে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ। এ স্বামীজীর স্ববিরোধিতা নয়। স্বামীজী যে সর্বধর্মসমন্বয় করেছিলেন এ তার ব্যবহারিক প্রয়োগ—দ্বৈত-অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত সর্বমতবাদের সমন্বয়। প্রতীক-উপাসনা, নিরাকার উপাসনার সমন্বয়। তাঁর মতে সকল ধর্মই একই সত্যে পৌঁছে দেয়, সকল উপাসনাই একই জায়গায় পৌঁছয়। নিজ নিজ রুচি ও মানসিক গঠন অনুযায়ী সকলে পথ বেছে নেয়। বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবক্তা তাই দ্বৈত ও অদ্বৈত উপাসনা উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন এই মর্মে যে, 'আমি খ্রীস্টানদের সঙ্গে গীর্জায় মেরীপুত্রের উপাসনায় যোগদান করবো, মুসলমানদের সহিত আল্লার ভজনা করবো, হিন্দু যোগীর সঙ্গে ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হবো।'

দ্বৈত-অদ্বৈত ভাবনা, সাকার-নিরাকার ভাবনা সত্যধর্মের বিভিন্ন ধাপ। সকল ধাপকে তিনি সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন এখানেই ত' তাঁর কৃতিত্ব ও উদারতা। রোমাঁ রোঁলা এই জন্যই বলেছিলেন—

'In two words equilibrium and Synthesis Vivekananda's constructive genius can be summed up.'

দ্বিতীয়ত, পৌরোহিত্য, বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুসংস্কার তিনি কখনই সমর্থন করেন নি। বেলুড় মঠে শিক্ষার অধিকারে, ধর্মজীবনের কোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন জাতিভেদ নেই। নীচজাতি সম্ভূত কি উচ্চ জাতি সম্ভূত বলে সেখানে কোন সম্মান দেওয়া হয় না। যে যেমন জীবন যাপন করে সে তেমন সম্মান লাভ করে। বিবেকানন্দ কোন কুসংস্কারকে কোল দিয়েছেন তা তাঁরা স্পষ্ট করে বলতে পারবেন কি? পারবেন না। তাঁরা শুধু বলেন বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তাঁর উৎসাহের অভাবের কথা এবং স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ঘরোয়া শিক্ষা প্রবর্তনের কথা।

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে তাঁদের অজ্ঞতা উদ্ঘাটিত। বিবেকানন্দের মত ছিল যাদের সমস্যা তারাই তার সমাধান করুক। তিনি বিশেষ করে নারীদের সম্বন্ধে চাইতেন তাদের ভালো করতে পুরুষেরা যেন হস্তক্ষেপ না করে, যখনই সে প্রয়াস হয়েছে দেখা গেছে পুরুষেরা নারীদের সব স্বাধীনতা হরণ করে চলেছে। সেজন্য তিনি চাইতেন 'hands off'। এর চেয়ে বড় স্বাধীনতার কথা আর কে বলতে পেরেছেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর উপরে যে কটাক্ষ করা হয়েছে তার উত্তরে একথা বলা যায় যে, সে যুগে কোন সংস্কারকই ঘরোয়া শিক্ষার বেশি কোন শিক্ষার কথা ভাবেন নি। স্বামীজী অবশ্য ঘরোয়া মেয়েদের জন্য ঘরোয়া শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর কল্পনায় আর একদল নারী ছিল যাঁদের তাঁর মতে গুরু, দেশ ও মানবজাতি হবে একমাত্র আরাধ্য, যাঁদের কর্মই হবে আশ্রয় বা গৃহ, যাঁরা মুক্ত বায়ুর মত স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার করবেন। তাঁরা হবেন সিংহিনীর মত তেজস্বিনী, যে বৈদিক যজ্ঞাগ্নি হতে সাবিত্রী সম্ভূতা তার মত পবিত্রতা থাকবে তাঁদের মধ্যে আর মধ্যে মাতৃহৃদয়ের কোমলতার সঙ্গে সমন্বিত হবে বজ্রের মত দৃঢ়তা। তাঁরাই হবেন তাঁর মতে জ্ঞানে-পুণ্যে ভাস্বর ভবিষ্যৎ ভারতের জননী, ধাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী। এঁদের শিক্ষায় বিবেকানন্দ প্রাচ্যের ধ্যানানুশীলনের সঙ্গে

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা সমন্বয় করতে চেয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর 'ভারতীয় নারী' শীর্ষক বক্তৃতায় একস্থলে তিনি নারীকে পুরুষদের সঙ্গে একই পাঠক্রমে উচ্চতম শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন এবং হার্ভার্ড ইয়েল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত করতে আবেদন জানিয়েছেন (তখন স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ ছিল)। কোন বিষয়ে তিনি পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের পার্থক্য করেন নি, বরঞ্চ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'আমি পুরুষগণকে যাহা বলি রমণীগণকেও তাহাই বলিব।'

সর্বশেষ অভিযোগ তিনি 'militant aggressive Hinduism'-এর কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় অভিযোগ উঠেছে। তাঁর দু'টি বক্তৃতায় এ বিষয়ে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট মূর্ত হয়েছে—'My Plan of Campaign' এবং 'The Mission of Vedanta' স্থাণু আচার সর্বস্বতায় পরিণত হিন্দুধর্মকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ দ্বারা গতিশীল করতে চেয়েছিলেন এবং বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদ দ্বারা সকল নির্যাতিত, পিছিয়ে পড়া মানবগোষ্ঠীকে অধিকারবোধ এনে দিতে চেয়েছিলেন, এবং সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তাকে গতিশীল, সংগ্রামী ও বৈপ্লবিক ভূমিকায় তিনি দেখেছিলেন এবং জগতের ও মানুষের কল্যাণের জন্য চেয়েছিলেন যে, এই উদার হিন্দুধর্মে সকলে অবিচলিত আস্থাবান হোন এবং তাকে সযত্নে রক্ষা করুন এবং ভ্রান্ত মতবাদীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারে যেন কোনক্রমেই সে পথ ত্যাগ না করেন। এ ছাড়া এমন কথা কি তিনি কখনও বলেছেন যে খ্রীস্টান হিন্দু হোক, বা হিন্দু খ্রীস্টান হোক। তিনি বলেছিলেন, 'আমি কোন নূতন ধর্মমতে দীক্ষিত করতে আসি নি, আমি চাই তোমরা তোমাদের মত ধরে থাক। আমি চাই একজন মেথডিস্টকে আরও ভাল মেথডিস্ট করতে, একজন প্রেসবিটেরিয়ানকে আরও ভাল প্রেসবিটেরিয়ান করতে......তোমরা সত্যে জীবিত হও, তাই আমি চাই। আমি চাই তোমাদের অন্তরের আলোককে অবারিত করতে।'

এই ব্যক্তি নাকি অনুদার। যিনি বলেছিলেন 'সর্বোপরি নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, তাকে পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি, যন্ত্রণা ভোগ করি। আর সর্বোপরি আমার পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির দরিদ্র নারায়ণ, তারাই আমার উপাস্য', তিনি নাকি আরও উদার হতে পারতেন? সে উদারতার সংজ্ঞা কি?

পরিশেষে বাস্তবে আসতে বলি সমালোচকদের। বিবেকানন্দের নেতৃত্বে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের ফলে আমরা সত্যই আজ উনিশ শতকের চেয়ে আজ এগিয়ে এসেছি না পেছিয়ে এসেছি? আমাদের শিক্ষার প্রসার হয় নি? স্ত্রী-স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বে আরোহণ করি নি; সমাজে সকলকে আজ মানবতার ভিত্তিতে সম্মান দিতে পারি নি, আমরা স্বাধীনতা লাভ করি নি, আর্থিক উন্নতি লাভ করি নি? লক্ষ লক্ষ হিন্দুগৃহে আজ মূর্তিপূজা অনুষ্ঠিত হয়; তবুও এ উন্নতি সম্ভব হয়েছে। হয়েছে বিবেকানন্দের অধীনে তাই এমন কি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ডাঃ চেলিশোভও তাঁকে 'democrat ও humanist' বলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন।

পরিশেষে বলি ধর্ম শাশ্বত সনাতন, সামাজিক প্রথা সাময়িক, তা ধর্ম নয়। এক যুগের সামাজিক প্রথা অচল হলে তা অপসারণ প্রয়োজন, তা অপসারণে যাঁরা সহায়তা করেন তাঁরা ইতিহাসে স্মরণীয়। কিন্তু যাঁরা শাশ্বত ধর্মকে রক্ষা করেন, অচল প্রথা হতে পৃথক করে, তাকে সঞ্জীবিত করেন, তাকে গতিবেগ দিয়ে সমাজ-কল্যাণে নিয়োগ করেন তাঁরাও ইতিহাসে চির-অমর, তাঁরা ইতিহাসের নায়ক।

তাই বলি দৃষ্টির বাধা অপসারণ করুন, পূর্বপোষিত ধারণা সকল দূর করুন, যাকে বলে 'মতুয়ার বুদ্ধি' তা ত্যাগ করুন এবং বাস্তব পরিচয়ের ভিত্তিতে অগ্রসর হন সত্য বিচার করতে পারবেন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তা খণ্ডন করুন, লোকে বিশ্বাস করবে। নতুবা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের দোহাই পাড়ুন আর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ব্যাখ্যার নজির দিন তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

আর একটা কথা রামমোহন-বিদ্যাসাগর মহান পুরুষ, অপর কোন মহান পুরুষ জন্মাতে পারেন না, এই বা কেমন কথা। আর রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে বড় করতে হলে বিবেকানন্দকে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রয়োজন হয় কেন? তাঁরা নিজ অবদানে শ্রেষ্ঠ নন, সেজন্য বহু মূর্তিপূজক হিন্দুকে তাঁদের প্রাতঃস্মরণীয় বলে মনে করেন, সেটাই তাঁরা উল্লেখ করুন। বিবেকানন্দকে ছোট করবার কি প্রয়োজন? আর তিনি যদি এত ছোটই হন, তাঁকে নিয়ে তাঁরা এত মাথাই বা ঘামাচ্ছেন কেন? শেষকথা এই সকল সমালোচকদের আর একটু সৌজন্যবোধের পরিচয় দিলে ক্ষতি কি? একথাও স্মরণ করিয়ে দিই যে, যা সত্য তা যদি যথার্থ সমালোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে বলবার কিছু নেই এবং যা সত্য তা কালে জয়ী হবেই। [ক্রমশ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যতদূর মনে পড়ে

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
বার-এ্যাট্-ল

তখন চট্টগ্রামে যুবকদের একটি সঙ্ঘ ছিল। খেলাধূলো, নানারকম শারীরিক ব্যায়ামের সুযোগ ছিল সেখানে। শুধু তাই নয়, নানাভাবে জনগণের সেবা ও শুশ্রূষা করাও এদের ছিল উদ্দেশ্য। ক্ষেত্র ছিল তৈরি, তাই সহজেই দেশ স্বাধীন করবার বিপ্লবী মন্ত্রের ভীষণ বীজ এদের করল সংক্রামিত। এরা গোপনে গোপনে তৈরি হতে লাগল বিপ্লবী পথে দেশকে স্বাধীন করবার জন্য। বাইরে কিছুই ছিল না, তাই পুলিশের বিশেষ কিছু সন্দেহের কারণ ঘটে নি। শুধু তাই নয়, বাইরে এরা পুলিশের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেই চলত, এদের খেলাধূলার অঙ্গনে তাদের প্রায়ই করত নিমন্ত্রণ। এমন কি স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিনসনের সঙ্গে এদের বেশ সদ্ভাব ছিল, তিনিও প্রায়ই এদের খেলাধূলায় এসে যোগ দিতেন এবং এদের সমাজসেবার কাজেও দিতেন বিশেষ উৎসাহ। পরে এদের কারো কারো মুখে শুনেছি—উইলকিনসন সত্যিই সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, এই তরুণের দল তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করত।

ক্রমে পুলিশের কিছু কিছু সন্দেহ দৃষ্টি পড়ল এদের উপরে। কেন না এরা গোপনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্রের যোগাড়ও করেছিল যথেষ্ট এবং চট্টগ্রামের সন্নিকটস্থ পাহাড়-জঙ্গলে গিয়ে এরা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারেও ক্রমে সুপটু হয়ে উঠতে লাগল। এই সম্পর্কে একটি যুবকের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—যাকে এরা বলত মাস্টারদা।

একদিন হঠাৎ এরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে অস্ত্রশস্ত্র নিল নিজেদের করায়ত্তে। তারপর চট্টগ্রাম শহরের ইংরেজ শাসনের যে কটি ঘাঁটি, সমস্ত নিল দখল করে—প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হয় নি। পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাম অফিস এ সমস্ত দখল করে বাইরের সঙ্গে চট্টগ্রামের সমস্ত যোগাযোগ দিল ছিন্ন করে—অন্তত কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের উপর ইংরেজ শাসন দূর করে দিয়ে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে বাইরে থেকে কোনও বাধা না আসে। ওরা জানত এ শাসন বেশিদিন চলবে না, ধরা পড়ে শেষ পর্যন্ত হয়ত প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তবুও বিপ্লবী পন্থায় এইভাবে একটা নতুন আদর্শের সূচনা করতে চেয়েছিল ওরা।

হতও তাই, কিন্তু ইংরেজ শাসন আবার বাঁচালেন সেই উইলকিনসন সাহেব।** জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তিনি, বিদ্রোহের সময় তিনি চুপ করে ঘরে বসে ছিলেন না। অনেকবার সহজেই তাঁকে গুলী করে মারার সুযোগ পেয়েছিল বিপ্লবীরা কিন্তু তাঁকে মারে নি। বরং বিপ্লবীদের কেউ কেউ তাঁকে বলেছিল—তুমি পালিয়ে যাও, তোমাকে মারার ইচ্ছে নেই আমাদের। সেটা এদের মাহাত্ম্য না দুর্বলতা জানি না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যখন চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসনের পতন হল, এই উইলকিনসন সাহেবই গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন পাহাড়তলী অভিমুখে। পাহাড়তলী চট্টগ্রামের সন্নিকটস্থ আর একটি শহর। সেখানে শুধু ইংরেজদের একটি অস্ত্রাগারই ছিল না, ইংরেজ সৈন্য সমাবেশের একটি ঘাঁটিও ছিল সেখানে। পাহাড়তলী দখল করাও অবশ্য বিপ্লবীদের সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল কিন্তু সেটা চট্টগ্রাম দখল আর একটু কায়েমী করার পরে। পাহাড়তলী যাওয়ার রাস্তায় এরা পাহারা রেখেছিল—কেউ ওদের আগে পাহাড়তলীর দিকে না যায়। কিন্তু উইলকিনসন্ সাহেব পাহারাদারদের অজস্র গুলীবর্ষণ অগ্রাহ্য করে দ্রুত মোটর চালিয়ে এগিয়ে যান পাহাড়তলীর দিকে। ফলে যতদূর মনে পড়ে, বীরমল থাপা বলে উইলকিনসন সাহেবের ড্রাইভার গুলীর আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত উইলকিনসন সাহেবই পাহাড়তলী থেকে সমস্ত সৈন্য নিয়ে এসে এই বিদ্রোহ দমন করেন। বিপ্লবীরা বেশির ভাগই যায় পালিয়ে। পরে চট্টগ্রামের সন্নিকটস্থ জেলালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের কারো কারো সঙ্গে একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়—বিপ্লবীদের কেউ কেউ জেলালাবাদ পাহাড়ের জঙ্গলে ছিল লুকিয়ে এবং পুলিশ চেয়েছিল তাদের গ্রেপ্তার করতে। এই খণ্ডযুদ্ধের ফলে অনেক বিপ্লবী দেয় প্রাণ—তাদের মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়েছিল জেলালাবাদের পাহাড়ের গায়ে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পুলিশ তদন্তের ফলে যারা যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল—চট্টগ্রাম আদালতে। তিনজন বিচারক বসলেন এদের বিচার করবার জন্য, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিঃ ইউনি, জেলা জজ। কলকাতা থেকে আমি ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোকগত ব্যারিস্টার অপূর্ব মুখার্জী, আসামীদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য মনোনীত হলাম। আমরা রওয়ানা হলাম—

চট্টগ্রাম অভিমুখে। অনেক আসামী তাদের বেশির ভাগের পক্ষই আমরা দু'জন সমর্থন করেছিলাম ভাগাভাগি করে। আমার ভাগে ছিলেন অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রভৃতি।

অন্য দু-চারজনের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য অন্য অন্য উকিলরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কুমিল্লার প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী পরলোকগত অখিল দত্ত। মামলা চলেছিল অনেকদিন, মাসের পর মাস। পরে পরলোকগত সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার স্বনামধন্য নেতা শরৎচন্দ্র বোস এবং পূর্ববঙ্গের সর্বজন পরিচিত ব্যবহারজীবী শ্রীকামিনী দত্তও আসামী পক্ষে এসে যোগ দেন।

ঘটনা অস্বীকার করা চলে না তাই আসামী পক্ষের কথা মোটামুটি কোর্টে এইভাবে দাঁড় করান হল—ঘটনা ঘটেছে সত্য, কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে কোর্টের আসামীদের কোনও যোগ নাই। আসামীরা সঙ্ঘের সভ্য ছিল একথা স্বীকার করলেও এটা প্রমাণ হয় না যে, এই বিদ্রোহে আসামীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। সঙ্ঘের সভ্য ছিল, হয়ত এই কারণেই পুলিশ এইসব আসামীদের গ্রেপ্তার করে চালান দিয়েছে—এত বড় ব্যাপার, কিছু না করলে যে পুলিশের মান থাকে না।

কাজেই বেশির ভাগ জেরা সেই সব সাক্ষীদেরই করা হল যারা এইসব আসামীকে সনাক্ত করেছে, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে। চট্টগ্রামের আশেপাশের গ্রাম থেকে গরীব গৃহস্থদের অনেকেই সাক্ষী দিতে এল—যাদের বাড়িতে এইসব আসামীদের মধ্যে কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, পুলিশের কাছে ধরা পড়বার আগে। কোনও কোনও সাক্ষীকে জেরা করে দেখাবার চেষ্টা করা হল যে তারা একেবারেই মিথ্যে সাক্ষী—পুলিশ শিখিয়ে-পড়িয়ে সাক্ষী দেওয়ার জন্য তৈরি করেছে। কাউকে কাউকে বা জেরা করে দেখাবার চেষ্টা করা হল যে তাদের কথিত ঘটনা সত্য হলেও, সনাক্ত করার দিক দিয়ে তারা করেছে ভুল—পুলিশের ফাঁদে দিয়েছে পা। Test Identification—অর্থাৎ পুলিশ তদন্তের সময় দশ-বারোজন একই ধরণের চেহারার লোকের সঙ্গে আসামীকে মিশিয়ে কোনও একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সাক্ষীকে দিয়ে আসামীকে সনাক্ত করার বিধি—এই Test Identification-এ সাক্ষী সত্যই ঠিক চিনেছে কি না, এ নিয়েও অনেক জেরা করা হয়েছিল, পুলিশের অনেক রকম কারসাজী দেখিয়ে।

এই মামলা সম্পর্কে যে ব্যাপারটি বিশেষ করে মনে পড়েছে সেটা হচ্ছে প্রধান বিচারক ইউনির সঙ্গে আমার ঝগড়া। আগেই বলেছি এইসব মামলায় আসামীদের পক্ষ হয়ে পরিচালনা করার সময় একটা দুর্জয় সাহসে বুক উঠত ভরে, বোধ হয় আসামীদের প্রাণের ছোঁয়া লাগত আমাদের প্রাণে। ইউনি সাহেব লোক মন্দ ছিলেন না, কিন্তু কোর্টে আইনজীবীদের সঙ্গে ব্যবহার মোটেই ভাল ছিল না। বিশেষত জেরা করার সময় বড়ই বাধা দিতেন—এ প্রশ্ন অবান্তর ও প্রশ্নের মানে নাই ইত্যাদি। শুধু বাধা দেওয়াই নয় সব সময়েই যেন ধমকাচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে আইনজীবীদের প্রতি শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ করতেও কোনও দ্বিধা বোধ করতেন না।

যাই হোক এইসব নিয়ে আমার সঙ্গে গোড়া থেকেই কথা কাটাকাটি এবং ক্রমেই কড়া কড়া কথা বিনিময় হল শুরু এবং এই দিক দিয়ে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, কেন না এ ব্যাপারে আসামীদের দিক দিয়েও ছিল পূর্ণ সমর্থন।

এইভাবে চলছে—হঠাৎ একদিন যেন কোর্টে বোমা ফাটল। কি ব্যাপার নিয়ে মনে নাই, জেরা করতে করতে ইউনি সাহেবের সঙ্গে দু-চারটি কথা কাটাকাটির পর হঠাৎ ইউনি সাহেব আমাকে ধমকে অস্বাভাবিক চীৎকার করে উঠলেন। আমি খানিকক্ষণ জেরা বন্ধ করে চুপ করে রইলাম দাঁড়িয়ে। সমস্ত কোর্ট নিস্তব্ধ। অস্বীকার করব না, রাগে আমার সমস্ত শরীর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিজেকে কতকটা সংযত করে ইউনি সাহেবের দিকে তাকিয়ে জোরের সঙ্গে বললাম, 'মনে রাখবেন—আমি আপনার বেতনভোগী চাকর নই।'

ইউনি সাহেবও এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনি জেরা করুন। আর বৃথা কোর্টের সময় নষ্ট করবেন না।'

তখনও রেগে আছি। বললাম, 'কোর্টের সময়ের মূল্য যে আমার সময়ের মূল্যর চেয়ে বেশি এ ধারণা আপনার কোথা থেকে হল।'

ইউনি সাহেব আবার কড়াভাবে বললেন, 'জেরা করুন, নইলে আমি সাক্ষীকে বিদায় করে দেব।'

বললাম, 'সাক্ষীকে নিয়ে আপনার যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু এরকম অভদ্র ব্যবহারের পরে এখুনিই আবার জেরা করার মত মনের অবস্থা আমার নেই।'

ইউনি সাহেব সেই রকম কড়াভাবেই বললেন, 'জেরা করা না করা আপনার ইচ্ছে, কিন্তু মামলা ত' আর আপনার জন্য বন্ধ হবে না।'

জোরের সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ মামলাও বন্ধ হবে।'

ইউনি সাহেব সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর শুধালেন, 'আপনার কথার মানে।'

বললাম, 'আমি আইনের ৫২৬ ধারা অনুসারে দরখাস্ত দিচ্ছি।'

ইউনি সাহেব চুপ করে গেলেন এবং সমস্ত কোর্ট শুদ্ধ হয়ে রইল। আইন অনুসারে যদি কোনও পক্ষ Criminal Procedure Code-এর ৫২৬ ধারার দরখাস্ত দেয় বিচারক তৎক্ষণাৎ মামলা বন্ধ করতে বাধ্য। কারণ যে পক্ষ দরখাস্ত করে তাদের বক্তব্য মোটামুটি হচ্ছে—এ বিচারকের কাছে ন্যায় বিচার আশা করি না এবং সেইজন্য আমরা হাইকোর্টে এই মর্মে দরখাস্ত করতে চাই যাতে মামলাটির বিচার অন্য বিচারকের কাছে হয়।

দরখাস্তটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা আমি ভাল করেই জানতাম কারণ বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখলে হাইকোর্ট এসব দরখাস্তে কোনও কানই দেয় না। বরং উল্টো উৎপত্তি ঘটে।

ইউনি সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে শুধালেন, 'আপনি বিশেষ বিবেচনা করে এ দরখাস্ত দিচ্ছেন ত'।'

বললাম, 'হাঁ।'

বললেন 'এত বড় মামলা আপনি হঠাৎ বন্ধ করে দিতে চান—কত বড় দায়িত্ব নিচ্ছেন জানেন ?'

বললাম, 'জানি'।

শুধালেন, 'আপনি আপনার সঙ্গের আইনজীবীদের সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করেছেন ?'

বললাম, 'প্রয়োজন দেখি না।'

একটু চুপ করে থেকে আসামীদের দিকে চেয়ে শুধালেন, 'আসামীরা কি এ দরখাস্ত সমর্থন করেন ?'

আসামীরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, 'বন্দেমাতরম।'

মামলা ১৫ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু হাইকোর্টে ৫২৬ ধারার দরখাস্ত করা হয় নি, কেন না হাইকোর্টের আইনজীবীদের প্রবীণেরা পরামর্শ করে ঠিক করেন এ রকম দরখাস্ত করে কোনও লাভ নাই।

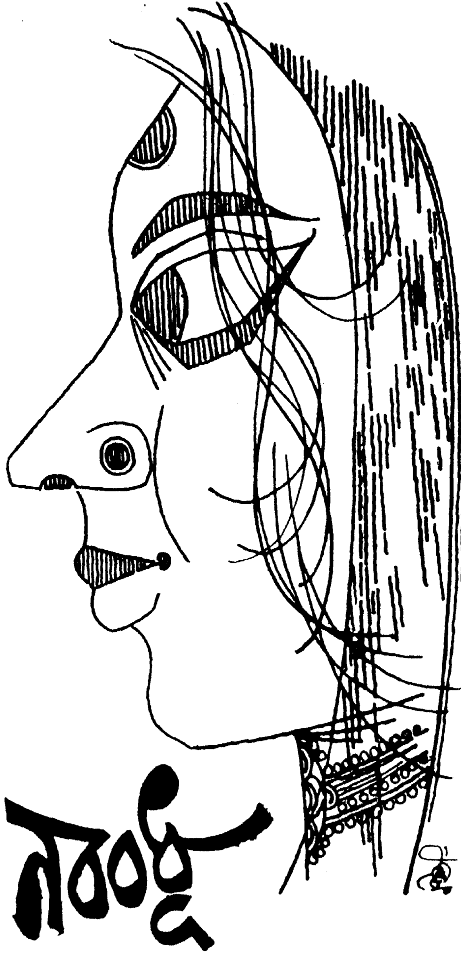
আমি অবশ্য বলেছিলাম, 'লোকসানই বা কি ? মরার বাড়া গাল নেই। ইউনি সাহেব ত' এমনই আসামীদের ফাঁসী দেওয়ার জন্য তৈরি।'

কিন্তু ভুল করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ইউনি সাহেব আসামীদের ফাঁসী দেন নি।

* * * *

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা।

কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরের একটা নির্জন বাড়িতে একটি বোমা তৈরি করার কারখানা তৈরি করেছিল কয়েকটি বিপ্লবী যুবক মিলে। পুলিশ টের পেয়ে যায় এবং পুলিশের হাতে শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পড়ে। বিচার হয়েছিল আলিপুর আদালতে এবং চরম শাস্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে। [ক্রমশ।



সাঁওতাল পরগণার একটা ছোটো পাহাড়ে জায়গা। ভূগোলের পাতায় নাম নেই—ইতিহাসেও স্থান নেই। কিন্তু কলকাতা থেকে যাঁরা স্বল্পব্যয়ে স্বাস্থ্যান্বেষণে আসেন, তাঁদের কেউ কেউ জায়গাটিকে চেনেন। টিলার ধারে ছোটো ছোটো বাংলোগুলি ছবির মতোন। চারিদিকে শালের বন। এক এক সময়ে জোরে হাওয়া বয়, শালের বন অমনি মর্মর করে ওঠে।

নিরিবিলি শান্ত জায়গাটি। কিন্তু একদিন এর মৌন ভেঙে লরীর গর্জন শোনা গেল। লরীভর্তি স্টোনচিপ্‌স আসতে লাগল, কুলি-মজুরের হল্লা আর সেইসঙ্গে শাবল-গাঁইতির পাথর-ফাটানো শব্দ।

রাস্তা তৈরি হবে। মধুপুর থেকে গিরিডি। এত দিন পর্যন্ত ট্রেন ছাড়া গতি ছিল না; কিন্তু সম্প্রতি গিরিডির ভোল বদলেছে।—ইংরিজিতে বলা যায় ইম্‌পরট্যান্স গেছে বেড়ে। বাড়বেই তো। অমন মাইকার কারখানা—

যোগাযোগের সুবিধার দরকার। ট্রেনপথে আর কুলোয় না—রাজপথ চাই।

এই নতুন পথ তৈরির দায়িত্ব নিয়ে প্রিয়নাথ চৌধুরী এল এখানে। খাস কলকাতার ছেলে, তার ওপর সবেমাত্র বিবাহ করেছে। এখানে দু'চার মাসের কাজ নয়—হয়তো বছর পুরে যাবে। ক্যাম্প ছাড়া গতি ছিল না, কিন্তু ভাগ্য ভালো, একখানা গোটা বাড়িই পেয়ে গেল। যেমন-তেমন বাড়ি নয়, ছোটখাটো সুন্দর একটি বাংলো। অবশ্য তার জন্যে অরুন্ধতী চাকলাদারকে ধন্যবাদ।

বাংলোর বুড়ো মালী অবাক। এমন তো কখনো ঘটে নি দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে! প্রতি বছর তালা খোলা হয় বটে একবার, একবার ভালো করে ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সে তো কোনো ভাড়াটের জন্য নয়। স্বয়ং দিদিমণিই আসেন সদলবলে বছরে একটিবার। এ বছর এ কি ব্যতিক্রম!

মানবেন্দ্র পাল

মালী চিঠিখানা বার বার পড়লে, একে ওকে দিয়েও পড়ালে, কিন্তু চিঠির ভাষা বদলালো না। সেই এক কথা—এঁরা আমার পরিচিত বন্ধু। এঁদের বাড়ি ছেড়ে দিও। দু'খানা ঘরই দেবে। শুধু দক্ষিণদিকের ঘরটি নয়।

না, জাল চিঠি নয়। একেবারে দিদিমণির হাতের লেখা। গোটা গোটা অক্ষর যেন মুক্তা বসানো।

প্রিয়নাথ চৌধুরী তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে এই পাহাড়ে দেশে সুখে সংসার আরম্ভ করলে।

জায়গাটা খুব ভালো লেগে গেল আরতির। সবচেয়ে বাড়িখানা। অথচ ভাড়া নামমাত্র। তাও ভাড়া নিতে চান নি মিস চাকলাদার। বলেছিলেন, পড়েই তো আছে। তা আপনারা দু'টিতে থাকুন না। 'দু'টিতে' কথাটার ওপর একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ করেছিলেন, একটু হেসেও ছিলেন।

অবশ্য একটি শর্ত ছিল। প্রতি বছরের মতো এবারও পূজোর ছুটিতে কিংবা শীতের দিকে তিনি মাস দুয়েকের জন্যে বেড়াতে যাবেন। তখন কিন্তু বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। মিস চাকলাদার স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, সে দু'মাস কিন্তু

আপনাকে ক্যাম্পে থাকতেই হবে। অর্থাৎ তাঁর একলার জন্যেও তখন বাংলোয় স্থান হবে না।

প্রিয়নাথ বিনা ভাড়ায় থাকতে রাজি হয় নি, কিন্তু শর্ত মেনে নিয়েছিল। কবে শীতকাল আসবে—কবে শ্রীমতী বেড়াতে আসবেন—আসবেনই যে তারই বা নিশ্চয়তা কি —তবে তো ঘর ছাড়ার প্রশ্ন। সে অনেক পরের কথা। আপাতত মাথা গোঁজার জায়গা চাই। বিশেষ নতুন বৌ সঙ্গে।

ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল প্রিয়নাথ। একা মানুষ। কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। ওদিকে আরতিরও মা-বাপ নেই। মানুষ হয়েছে জ্যেঠিমার কাছে। তারপর কখনো মামার বাড়ি—কখনো মাসির কাছে। কিন্তু ভাগ্যদোষেই বা স্বভাবদোষেই কোথাও এক জায়গায় আরতি সকলের স্নেহ আকর্ষণ করে টিকে থাকতে পারে নি। তার কারণ কি তা সে অনেক ভেবেও স্থির করতে পারে নি। সে জানে, সে স্পষ্টভাষী। জানে না, এইটেই অন্যের চোখে অপরাধ কিনা কিন্তু এই যে দোরে দোরে পরের অনুগ্রহ কুড়িয়ে সে এত বড়টা হল এর জন্যে যেমন কারও কাছে তার কৃতজ্ঞতা-বোধ নেই তেমনি আত্মীয়-স্বজনের বিরূপ মন্তব্যেও অধৈর্যের লক্ষণ নেই। যখনই বুঝেছে কোনো বাড়িতে তাকে নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তখনই সেখান থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। গিয়েছে আর কোনো আত্মীয়ের বাড়ি। এমনি করেই তার জীবনের বাইশটা বছর কেটেছে। তারপর একদিন দৈবাৎ প্রিয়নাথ এসে ভিড়ল এই ভাঙা ঘাটের কিনারায়। দুই ভবঘুরের জীবন একত্র হয়ে একটা নীড় বাঁধার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। ধন্যবাদ মিস ঢাকলাদারকে। তার আশ্রয়েই এদের প্রথম সুখনীড়।

সেই কথাই হচ্ছিল আজ।

আরতি বললে, একবার সন্ধ্যাদিকে এখানে আনতে পারতাম! হিংসেয় জলে পুড়ে মরত।

—কেন? প্রিয়নাথ সিগারেট টানতে টানতে জিজ্ঞেস করল।

—কেন! তুমি তো জান ওর কথা। কি হিংসে করত আমাকে। দু' চোক্ষে দেখতে পারত না।

—কিন্তু সে তো তোমারই দিদি!

—হলেই বা দিদি। আসলে ও পেয়েছে ওর মায়ের স্বভাব। মামা আমার জন্যে কিছু কিনে দিলেই মামী আর তার মেয়ের চোখ ট্যারা হয়ে উঠত।

প্রিয়নাথ হেসে বললে, সে তো তুমি টুনির সম্বন্ধেও অমন কথা বলো।

—টুনি! উঃ! বোলো না। ও এক ন্যাকা মেয়ে। ভগবান বেছে বেছে আমার বোনগুলি দিয়েছেন বেশ। সেদিন বললে, আরতিদি, আর তো পারি না। মা বিয়ে বিয়ে করে খেয়ে ফেললে। আচ্ছা বলো তো, আমার কি এখন বিয়ের বয়েস হয়েছে? আহা—মেয়ে এখনো কচি খুকি! কিছুই বোঝেন না। এদিকে তো—

আরতি মুখের একটা ভঙ্গি করল।

—কিন্তু রতন ছেলেটি?

—রতন! মানে সেজোপিসিমার ছেলে?

—তা হবে। একদিন তো দেখেছিলাম।

—বোলো না, বোলো না। ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট আর পয়েণ্টেড স্যু—দিনরাত চোখে গগলস। ইডিয়টটা একদিন আমাকেই তো একটা প্রেমপত্র দিয়ে বসেছিল। কান মুলে দিয়েছিলাম।

প্রিয়নাথ হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বললে, —কিন্তু তোমার জ্যাঠাইমাকে আমার বেশ ভালো লাগে।

এবার আরতি হেসে উঠল।—তুমি লোক চিনতে একেবারেই পার না। জ্যোঠিমাটি একটি pure ভণ্ড। এদিকে ঠাকুর ঠাকুর করবে, আর ওদিকে বোনের সম্পত্তি গ্রাস করবার চেষ্টা। একদিন সিনেমা দেখতে চেয়েছিলাম তা কি না শোনালে!

আরতি থামল একটু। তারপর বললে, তাই ভাবছিলাম, একবার যদি ওদের এখানে আনতে পারতাম, তা হলে দেখে যেত।

—কি দেখাবে?

—দেখাতাম আমাদের এই ছোট্ট সংসার; এই বাংলো—টিলার ওপাশে ঐ শালবন—

প্রিয়নাথ মুগ্ধকণ্ঠে বললে, এ সবেরই জন্যে কিন্তু আমরা মিস চাকলাদারের কাছে ঋণী।

এবার আরতি কোনো কথা না বলে মুখটা ফিরুলো।

প্রিয়নাথ তা লক্ষ্য না করেই বললে, ভেবে দেখো, আজ তিনি দয়া না করলে আমরা কোথায় দাঁড়াতাম! আমি না হয় ক্যাম্পেই থাকতাম, কিন্তু তুমি—

আরতি ললাটে বিরক্তির রেখা ফুটিয়ে বললে, তুমি দেখছি একটুতেই গলে যাও। 'ঋণী' 'দয়া' এত উচ্ছ্বাস কেন? উনি কি বিনা স্বার্থে থাকতে দিয়েছেন মনে কর?

প্রিয়নাথ তৎক্ষণাৎ বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—বকো না বাড়িটা পড়ে ছিল, ভাড়াটে জুটছিল না—কে মরতে আসবে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে—তাই যা ভাড়া পাওয়া যায় এই আশায়—

প্রিয়নাথ সিগারেটের টুকরোটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে মাথা নেড়ে বললে, না। উনি তা হলে বিনা ভাড়ায় থাকতেই বলতেন না। আমিই জোর করে—

আরতি জোরে হেসে উঠে বললে, ওঃ! পুরুষরা কি বোকা তাই ভাবি। ভাড়া নিতে চাইছিলেন না! মরি মরি! ওটা একটা ভদ্রতার খোলস! নিতান্ত চেনা মানুষ—বন্ধু! friend!

প্রিয়নাথের ভালো লাগল না আরতির কথা বলার ধরণটা। বললে, মিস চাকলাদার সম্বন্ধে কোনো অশ্রদ্ধার কথা বললে আমি দুঃখ পাই। আমি তাঁকে দেখছি বহুদিন থেকে—হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই আমার বন্ধু, আর তুমিও তো তাঁকে দেখেছ। ভোলো নি বোধ হয় বিয়ের পরই—

আরতি তার যৌবনসুষমাভরা তনুদেহখানি ইজিচেয়ারে ছড়িয়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ বিকৃতসুরে বললে, না, ভুলব কেন। তিনি কি ভোলবার জিনিস? অমন দয়ার্দ্র হৃদয়, অমন মহানুভব, অমন কেতাদুরস্ত মহিলা! শুধু গুণই বা কেন বলি, অমন রূপই বা ক'জনের হয়! এত বয়েস হয়েছে, কিন্তু—

—থাক্ আরতি, তোমার কথা বলার ঢংটাই যেন আজ কেমন লাগছে।

কিন্তু আরতি থামল না। বলে চলল—এ বয়েসেও দিব্যি শরীরটিকে রেখেছেন। ষোলো বছরের 'অনাঘ্রাতা যুথি'ও বোধ হয় তাঁকে দেখে ঈর্ষায় জলে যাবে। ঝক্‌ঝক্ করছে মাজা-ঘষা মুখ—চোখে ক্রুক্‌সের চশমা, বাড়িতেও আছেন নাইলন চড়িয়ে, চওড়া বুক থেকে বারে বারে আঁচল খসে খসে পড়ছে, ডোনাড বাঁধা খোঁপায় আবার বেলফুলের মালা জড়ানো। আহা মরি—মরি!

প্রিয়নাথ একটু দৃপ্তস্বরেই বললে, হ্যাঁ, তিনি একটু সাজসজ্জা ভালোবাসেন। ঐটুকুই তাঁর বিলাস। সাধারণ মেয়ের মতো কুড়ি পার হতে না-হতেই বিয়ের জন্যে পাগল হন নি, বরঞ্চ বাবার সামান্য কথায় জেদ করে বিয়েই করলেন না—

আরতি ঝংকার দিয়ে বলে উঠল, তাই এতদিনে তার শোধ তুলছেন হাজার গণ্ডা 'বয়-ফ্রেণ্ড' নিয়ে। বাড়িতে পুরুষ নেই—কিন্তু তাঁদের নিত্য আসা-যাওয়ার চিহ্ন পড়ে আছে দু' তিনটে ছাইদানে। বোলো না বোলো না। গা জলে যায়।

প্রিয়নাথ উত্তেজিত হয়ে বললে, তুমি তাঁর প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে কতটুকু জান?

—যতটুকুই জানি, ততটুকুই যথেষ্ট। আমরা একবার দেখলেই মানুষ চিনতে পারি, তোমাদের মতো অত সহজে গলে যাই না।

প্রিয়নাথ হঠাৎই এবার চুপ করে গেল। মিস চাকলাদার সম্বন্ধে এইরকম একটু দুর্নাম আছে অবশ্য। সেও নিজে যে জানে না তা নয়। ধনীর দুলালী। সংসারে আজ একটি বুড়ি পিসিমাকে নামে মাত্র অভিভাবিকা করে যৌবন সায়াহ্নে নৌকা ভাসিয়েছে। ঝড় নেই তুফান নেই—গন্তব্য স্থানের কোনো নিশ্চয়তাও নেই, তরী আপন খেয়ালে ধীর মন্থরগতিতে ভেসে চলেছে। দাঁড় বাইতে আজ আর ইচ্ছে নেই—তাই শখ করে পাল তুলে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সেই পালে জোরে বাতাস লাগে বৈকি। সেই এক এক সময়ে ভারী নৌকোটাও টলে যায়।

কিন্তু মাত্র একদিন দেখে আরতি এত খবর জানল কি করে? বুঝতে পারল, শুধু যে নারীসুলভ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটুকুই কাজ করেছে তা নয়, আরতি এখানে এসে মালীর কাছ থেকে অনেক কিছুই জেনে নিয়েছে। হ্যাঁ, প্রতি বছরই

দিদিমণি আসেন। সঙ্গে দু-তিনটি পুরুষ বন্ধু। রাতদিন হৈ-হৈ হাসি মশকরা। প্রতিদিন শিকার—তা ছাড়াও কত কি। মালী তা স্পষ্ট করে না বললেও অস্পষ্ট একটা ধারণা হয়ে যায়।

কিন্তু একাই তিনি আসেন? অভিভাবক?

হাঁা, অভিভাবক আসেন বৈকি। ঐ বুড়ি পিসিমা। মালীর কাজ বেড়ে যায়। বুড়ি নড়তে-চড়তে পারেন না। চোখেও কম দেখেন।

মিস চাকলাদারের কথা আর উঠল না কিছুদিন। সত্যিই অপ্রিয় আলোচনা। দু'জনেরই মন কুঁকড়ে যায়। তার চেয়ে এই নতুন জীবনের আনন্দে ডুবে যাওয়া ভালো।

ডুবে গেলও। বাস্তবিক খুব কমজনের ভাগ্যেই এমন নির্জনে প্রথম যৌবন উপভোগের সুযোগ ঘটে। যৌবন-সাথীটিকে এমন একান্ত করে পাওয়ার পরিবেশ বড় একটা মেলে না। এখানে এই পাহাড়ে জায়গায় টিলার ধারে নিরিবিলি একটা বাংলো। তারই মধ্যে দুটিমাত্র মানুষ—একটি পুরুষ আর একটি নারী। তাদের আত্ম-সমর্পণের মধ্যে কোনো আবরণ নেই—তার প্রয়োজনও নেই।

বর্ষাকালে এ অঞ্চলের আর এক রূপ। বর্ষায় কাজ কম। তাই প্রায় ইঞ্জিনীয়ার বাড়ি চলে আসে দুপুরে। দূর পাহাড়ের গায়ে কুয়াশার মতো বৃষ্টি। বৃষ্টি আসছে। দেখতে দেখতে বৃষ্টি এসে পড়ে। বাংলোর পিছনের আতা আর পেয়ারা গাছগুলো বৃষ্টির ছাটে মেতে ওঠে। ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি—চারিদিকে জল। বাংলোটি একা দাঁড়িয়ে ভিজছে। কাছেপিঠে আর কোনো মানুষের সাড়া নেই। ভিতরে শুধু দু'টি মানুষ জানালার শার্শিতে মাথা রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্জনতার এ আনন্দ কি সম্ভব হত কলকাতার নিউ আলিপুর অঞ্চলের কোনো বাড়িতে কিম্বা দিল্লীর কনট প্লেসের কুঞ্জে?

গোটা বর্ষাকালটা কেটে গেল কোথা দিয়ে। এই ক' মাসে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যেন কেমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছে। এমন আর একটি দিনও ছেড়ে থাকা যায় না। এ যেন পরস্পরের ওপর একটা কেমন নেশা ধরে গেছে।

ঠিক এমনি সময়েই একদিন এল একখানা চিঠি। খামে

গোটা গোটা অক্ষরে প্রিয়নাথের নাম লেখা। হাতের লেখা দেখেই প্রিয়নাথ চিনতে পারল। তাড়াতাড়ি খামটা খুলল। মাত্র তিন ছত্র লেখা—

প্রিয় নাথ,

ভালোই আছ আশা করি। মহালয়ায় আমি যাচ্ছি মাস দু'একের জন্যে। সুতরাং দু' মাসের জন্যে তোমাদের অন্য ব্যবস্থা করতেই হয়। ভালোবাসা। ইতি—

চিঠি পড়ে প্রিয়নাথের মাথা ঘুরে গেল। সর্বনাশ! এখন উপায়?

আরতিকে চিঠিখানা দিল। আরতি এক নজর দেখে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বিরক্তিভরে চিঠিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, এ নিয়ে আমি কি করব। তোমাদের ব্যাপার তোমরাই জানো। শুধু শুধু আমায় টেনো না।

প্রিয়নাথ এ ধাক্কা আরতির কাছ থেকে আশা করেছিল। কি দরকার ছিল বাপু 'ভালোবাসা'-টাসা লেখার। শুধু শুধু—

আরতি ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে বললে, —আহা কি সম্বোধন! প্রিয় নাথ!

—প্রিয় নাথ! চমকে উঠল প্রিয়নাথ।

—তার মানে?

—মানে পরিষ্কার। চিঠিখানা দেখলেই বোঝা যাবে।

প্রিয়নাথ দেখল, সত্যিই অরুন্ধতী বড় কঠিন রসিকতা করেছেন। তিনি প্রিয়নাথ কথাটি না জুড়ে দিব্যি প্রিয় আর নাথ আলাদা করে লিখেছেন। কলমের ত্রুটি নয়। ইচ্ছে করেই লেখা। রহস্যপ্রিয়ার এ এক অপূর্ব রসিকতা। ঐ সম্ভাষণটা পড়বার সময় ভদ্রমহিলার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি প্রিয়নাথের মনে পড়েছে বারে বারে। আপন রসিকতায় আপনিই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন।

প্রিয়নাথ মুহূর্তে ওদিকটা ঝেড়ে ফেলে যতদূর সম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললে, ওসব কথা বাদ দাও। এখন উপায়? উনি তো এসে পড়লেন।

আরতি বললে, উপায় আর কি। বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

—তার পর?

—তারপর ক্যাম্প।

—ক্যাম্পে থাকবে তুমি!

—উপায় কি। তা বলে আর তো সন্ধ্যাদি' বা মামীমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না।

প্রিয়নাথ ইতস্তত করে বললে, তাতে ক্ষতির কি? মাত্র তো দু'টি মাস।

আরতি দৃঢ়স্বরে বললে, না। বলেই অন্য ঘরে চলে গেল।

সময় হয়ে এল।

আশা করা গিয়েছিল ইতিমধ্যে হয়তো আবার চিঠি আসবে। কিন্তু প্রিয়নাথ বুঝল, তা হবার নয়। ঐ একটি পত্রই তাঁর চরমপত্র। ঐ দিন—ঐ তারিখ আর নড়চড় হবে না। ঐ দিনই চলে আসবেন। তখনই খালি বাড়ি চাই। তবু অন্যভাবেও দু'একটা চিঠি লিখতে পারতেন। সাজানো সংসার থেকে কোথায় কেমন করে কি ব্যবস্থা করছে, সহানুভূতির সুরে কি জিজ্ঞেস করতেও নেই?

কিন্তু না, আর কোনো চিঠি এল না।

গোছগাছ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ক্যাম্পে আরতিকে নিয়ে থাকা কোনো মতেই সম্ভব নয়। আরতি নিজে দু' একদিন গিয়ে ক্যাম্পের জীবন দেখে এসেছে। অগত্যা তাকে কলকাতাতেই যেতে হচ্ছে। প্রিয়নাথ শেষ পর্যন্ত আরতির জ্যেঠিমাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে অনেকগুলি চিঠি লিখে দু' মাসের জন্যে আরতিকে রাখা স্থির করেছে। জ্যেঠিমা যে খুব খুশি হয়েছেন তা অবশ্যই নয়। আরতির মনেও শান্তি নেই, মুখে হাসি নেই। আবার সেই কলকাতা? আবার সেই জ্যেঠিমা!

প্রিয়নাথ বললে, ভাবছ কেন, এবার তো আর গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না। টাকা তো পাঠাব।

আরতির তাতেও মন ভরল না। তা ছাড়া এই যে অনুগ্রহভিক্ষা এ অসহ্য। এখানকার এই বাংলোটার জন্যেও তো নিয়মিত ভাড়া পাঠানো হচ্ছিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা যে বেদনাটি এই সব মূল সমস্যার মধ্যেও উভয়ের অন্তস্তলে বারে বারে খোঁচা দিচ্ছিল, যাবার মুহূর্তে সেটা বড় জোরের সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করল।

বাইরে একখানা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আজই আরতিকে কলকাতায় রেখে আসবে প্রিয়নাথ। ঘরের ভিতরে আরতি কতকগুলো নিত্য প্রয়োজনের জিনিস ভাগ করে দিচ্ছে। গলার স্বরটা ভাঙা-ভাঙা—এই বোরার মধ্যে রইল একটা থালা, একটা গেলাস, একটা বাটি। দেখে নাও, নইলে কাজের সময় খুঁজে পাবে না। আর এইটাতে রইল বাকি বাসন-পত্তর। এটা খোলবার দরকার নেই।

আরতি থামল। একটু পরে আবার—

—এই হোল্ডলটার মধ্যে তোমার বিছানা রইল। দু'টো

চাদর দিয়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে কাচিয়ে নিও। আর ঐ বেডিংটায় বাকি লেপ-তোষক রইল।

প্রিয়নাথের কানে বোধ করি কোনো কথাই যাচ্ছিল না। বারে বারে চেষ্টা করছিল অন্যমনস্ক হবার। আরতিও বেশি কথা বলতে পারছিল না। স্বর অশ্রুরুদ্ধ। থেমে থেমে কথা বলছিল।

—হ্যাঁ ঐ ট্রাঙ্কে তোমার গরম কাপড়গুলো রইল। চাবিটা নাও। ভালো করে রাখো। হারিও না।

প্রিয়নাথ বললো গরম কাপড়গুলো পর্যন্ত আলাদা করে দেবার দরকার কি? মোটে তো ছ' মাস!

—না না, পাহাড়ে জায়গা। কার্তিক মাসেই শীত পড়ে যাবে। তা ছাড়া—

আরতি একটু থামল। দুই জল-ভরা চোখ মেলে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, ছ' মাসই যে তাই বা কে বললে? সম্রাজ্ঞীর নির্বাসনদণ্ড হয় তো ছ' মাসের জায়গায় চার মাসও হয়ে যেতে পারে।

প্রিয়নাথ মাথা নিচু করল।

এমনি সময় মালী এসে এসে দিল একটা খাম সই করে নেবার জন্যে। চমকে উঠল দু'জনেই। টেলিগ্রাম!

রাত সাড়ে দশটা।

তবু আড্ডাটা আজ জমছে না যেন। অরুন্ধতী চাকলাদার গিটারে একটা নতুন সুর তোলবার চেষ্টা করছিলেন।

মিস্টার দত্তগুপ্ত চুরুটে টান দিতে দিতে বললেন, এর মধ্যেই তো তুমি বেশ শিখে নিয়েছ। আর একবার বাজাও না।

মিস চাকলাদার ক্লান্তভাবে গিটারটা নামিয়ে রেখে বললেন, আজ থাক্। ভালো লাগছে না।

চমকে উঠলেন দত্তগুপ্ত। শরীর ভালো নেই?

মিস্ চাকলাদার ম্লান হেসে বললেন, না, শরীরের ত্রুটি নেই। কিন্তু মনটা—

রবীন বোস সোফায় গা এলিয়ে একটা বিলিতি শিকারের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ছবির পাতা থেকে চোখ না তুলেই বললে, মন তাজা হয়ে উঠবে—চলো দেখি কোথাও থেকে মাসখানেক ঘুরে আসা যাক।

দত্তগুপ্ত বলে উঠলেন, আচ্ছা, তোমার সেই পাহাড়ে বাংলোয় আমরা কবে স্টার্ট করছি? মহালয়ায় তো?

রবীন বললে, হ্যাঁ, সেই রকমই তো সব ঠিক হয়ে আছে।

মিস চাকলাদার ঈষৎ হেসে বললেন, এ বছর আর ওখানে যাব না।

চমকে উঠলেন দত্তগুপ্ত। সে কি!

—হ্যাঁ, সেই রকমই স্থির করে ফেলেছি।

—একেবারে স্থির করে ফেলেছ। দত্তগুপ্তের মুখ থেকে চুরুটটা ঝুলে পড়ল।

—হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যেতেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছি যাচ্ছি না বলে।

দত্তগুপ্ত আর বোস একবার শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কথা সরল না।

দত্তগুপ্ত শেষে বললেন, একটা কথা বলব, কিছু মনে কোরো না। দিন দিন তুমি যেন কেমন মিস্টিরিয়াস হয়ে উঠছ—রহস্যময়ী।

মিস চাকলাদার তাঁর স্বভাবসুন্দর হাসি হেসে উঠলেন। তারপর হঠাৎই কোলের মধ্যে থেকে একটা ছবি বার করে বললেন, দেখো তো ছবিটা।

বোস আর দত্তগুপ্ত দু'জনেই ঝুঁকে পড়লেন।

—এ তো সেই কনট্রাকটারের ছবি। রাস্তা মেরামত করে।

বোস হেসে বললে, হ্যাঁ, আমাদের সেই রোড মাস্টার।

মিস চাকলাদার বললেন, পাশের মেয়েটিকে দেখেছ? ওর স্ত্রী—নববধূ!

—হ্যাঁ, দেখছি। কিন্তু দেখার মতো কিছু দেখছি না। নিতান্তই সাদামাটা।

—কিন্তু মুখে কেমন একটা ইনোসেন্ট ভাব! ভারি ভালো লাগে বৌটাকে। পুরুষমানুষ হলে ভালোবাসতে পারতাম ওকে। বলে ছবিখানা হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন।

দত্তগুপ্ত বুঝলেন, এই ছবিটা নিয়ে আজ সারাদিন অরুন্ধতী অলস কল্পনায় কাটিয়েছে। ওর এই ভাবে-পাওয়া মনটা নিয়েই যত গণ্ডগোল। তখন আর ওকে ছোঁওয়া যাবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দত্তগুপ্ত উঠে পড়লেন। রাত এগারোটা বেজে গেছে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)



॥ সুজাতা ॥

না আর নয়, আর কোনদিনও নয়; বুক খালি করে নিশ্বাস পড়ল মহুয়ার। মনে পড়ল বিয়ের পর টালিগঞ্জের খালের ধারে পাড়া-গাঁয়ের ছাওয়া-ঘেরা তাদের সেই পুরনো একতলা বাড়ির একখানি ঘরে তাদের সেই সুখের সংসার। তখন অভাব ছিল, দারিদ্র্য ছিল, দুশ্চিন্তাও ছিল, তবু সুখ ছিল জীবনে, আনন্দ ছিল। তখন সারাদিন স্কুল, বিকেলে ট্যুইশানির পরও ক্লান্ত অভিজিৎ সময় পেত মহুয়াকে বাঁশী শোনাবার, সময় পেত মহুয়ার মাথাটা বুকে টেনে ওর মুখের ওপর উড়ে-আসা চুল সরিয়ে দিয়ে বলতে—

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা।

এসব কথা অভিজিৎকে মনে করাতে গেলে অভিজিৎ হাসে।

মৌ! চিরদিন কি একভাবে যায়? তখন বয়েস অল্প ছিল তা ছাড়া বিয়ের পর ওসব নতুন লাগে, তাই বলে কি এখনও পাগলামি করা যায় বসে বসে?

পাগলামি! একে বল তুমি পাগলামি।

তীরের মত বিছানার ওপর উঠে বসেছে মহুয়া।

এমন পাগল যেন আমি চিরদিন থাকি।

অভিজিৎ মহুয়াকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনেছে।

শোন, শোন।

না, যাও।

অভিমানে মহুয়ার পাতলা গোলাপী ঠোঁট থরথর করে কেঁপেছে।

যাও, কোন কথা শুনতে চাই না!

বালিশে মুখ চেপে কান্নাভেজা গলায় বলেছে মহুয়া, কথা বোল না তুমি আমার সঙ্গে।

শোন শোন লক্ষ্মীটি!

না, যাও।

মৌ রাণী!

অভিজিৎ জোর করে দূরে সরে-যাওয়া মহুয়াকে কাছে টেনে এনেছে, আলিঙ্গন দৃঢ় করে বারবার চুমো খেয়েছে ওর কপালে, গালে, ঠোঁটে।

রাণী, রাণী আমার! বোঝ না কেন এত খাটি, কেন টাকা করতে চাই, কার জন্যে? কাদের কথা ভেবে?

স্বামীর লোমশ বুকে মুখ ঘষে ঘষে কেঁদেছে মহুয়া, না, না, না, তুমিই যদি দূরে সরে যাও, কি করব আমি টাকা নিয়ে, গয়না নিয়ে, জিনিস নিয়ে? ওগো না, না!

আকুল কান্নায় মহুয়া ভেঙে পড়েছে স্বামীর বুকের ওপর। আমি মরে যাব, মরে যাব আমি, তোমাকে হারিয়ে টাকা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব না।

আচ্ছা গো আচ্ছা!

অভিজিৎ আলিঙ্গন আরো দৃঢ় করেছে, পাবে, আমাকেই পাবে তুমি, যা চাও তাই হবে, কাজ কমিয়ে দেব কাল থেকে।

তার আদরে সোহাগে অভিজিৎ মান ভাঙিয়েছে অভিমানিনীর, গুনগুন করে গান গেয়েছে, প্রতিজ্ঞা করেছে বারবার পরদিন থেকে মহুয়া যা চায় তাই হবে।

সুখের আবেশে চোখ বুজে এসেছে মহুয়ার, পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; আর তারপর দু-একদিন প্রায় সেই পুরোন দিনের সুর যেন বেজে উঠেছে মহুয়াদের জীবনে।

বিকেল পাঁচটার পরই বাড়ি ফিরেছে অভিজিৎ পকেটে বেল-ফুলের মালা নিয়ে। নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছে মহুয়ার খোঁপায়। মহুয়া স্বামীর টাই খুলে দিয়েছে, কাছে বসে খাইয়েছে নিজের হাতে সযত্নে তৈরি ছানার পায়েস, সন্দেশ, মাছের কচুরী। তারপর খোকার প্যারাম্বুলেটর ঠেলে বেড়াতে গেছে দু'জনে একসঙ্গে।

কিন্তু এসবও অনেকদিন আগের কথা। অভিজিৎ সেই প্রতিজ্ঞা সেই উৎসাহ রাখতে পারে নি পনের দিনের বেশি; আস্তে আস্তে আবার অভিজিৎ-এর বাড়ি ফেরার সময় পাঁচটা থেকে ছ'টা, ছ'টা থেকে সাতটা, আটটা থেকে ন'টায় এসে দাঁড়িয়েছে; আর আজকাল ত' এগারটার আগে অভিজিৎ-এর দেখাই পাওয়া যায় না।

আর সেইদিন, সেই পনেরই আগস্ট। মনে করলেও ভয় হয় মহুয়ার। স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা! সেই যে



মাসিক

বসুমতী

ফাল্গুন /'৭১

শিশু ভোলানাথ

—দীপক চাকলাদার



মাসিক বসুমতী

ফাল্গুন / '৭১



প্রতিবিম্ব
—শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

মন্দিরশিল্প (চন্দননগর)
—অমিতদ্যুতি কুমার

বিস্ময়
—এস, সি, পাল



ফসল তোলা
—রত্না সাহানা



পরেশনাথ (বেলগাছিয়া)
—সন্ধ্যা ভট্টাচার্য



কুস্তী লড়াই
—চিত্ত নন্দী



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (কামারপুকুর) —কেশবরঞ্জন সেন

দিনের জন্য এত পথ চেয়ে থাকা, এত সংগ্রাম, এত রক্তপাত! সেই যে দিনের স্বপ্ন শিশুকাল থেকে মহুয়ার মনে, কোটি কোটি ভারতবাসীর চোখে সেই প্রার্থিত দিন অবশেষে সত্যিই এল।

কিন্তু কি নিয়ে এল সে মহুয়ার জীবনে!

বাইরে যখন অগণিত জনতা আনন্দে উচ্ছল, ফুলে, পাতায়, পতাকায় সারা শহর ঝলমল তখন মহুয়া কি করছে? সেই স্বাধীনতা দিবসের আনন্দে মহুয়াও কি উদ্বেল অধীর হয়ে বাইরে আসতে চায় নি? মিশে যেতে চায় নি কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে? চীৎকার করে ওর আনন্দ ব্যক্ত করতে চায় নি? ছড়িয়ে দিতে চায় নি ওর সার্থক স্বপ্নের আনন্দকে মানুষের ভিড়ে, জনতার সমুদ্রে?

কিন্তু কি হোল? কি করল মহুয়া? স্বার্থপরের মত একান্ত মগ্ন হয়ে রইল সেই নিতান্ত ব্যক্তিগত চিন্তায়। অথচ পনেরই আগস্টের আগে কত জল্পনা-কল্পনা, কি উৎসাহ!

কেমন করে বাড়ি সাজাবে, কোথায় পতাকা-উত্তোলনে যোগ দেবে, লাভলক প্লেসের খালি বাড়িতেও যাবে কি না একবার, এইসব কথাই ত রাত-দিন হয়েছে অভিজিৎ-এর সঙ্গে, আর বারেবারেই মনে পড়েছে রাধারাণীর কথা, হীরেন্দ্রনাথের কথা। মনে পড়েছে ছোটবেলার মীরাটের সেই দিনগুলো। কি আন্তরিকভাবেই রাধারাণী চাইতেন, একান্ত মনে কামনা করতেন, স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীনতার। আর মহুয়া? মার সঙ্গে বাবার সঙ্গে, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে মহুয়াও কি স্বপ্ন দেখে নি? আশ্চর্য এক উন্মাদনায় মহুয়ার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে বারবার কি মনে হয় নি—এলো! অবশেষে এলো সেই দিন! সত্যিই ইংরেজ রাজদণ্ড ত্যাগ করল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হোল। আশ্চর্য; শিশুকাল থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে মহুয়ারা, কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন সংশয়ের কাঁটা বিঁধে থাকত—সত্যিই কি স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ? সত্যিই কি বণিক ইংরেজ রাজদণ্ড, সিংহাসন ছেড়ে চলে যাবে আবার সাগরপারে? মনে হোত যেন অসম্ভব, মনে হোত এ বুঝি দিবাস্বপ্ন!

না সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে মহুয়া বা মহুয়াদের বাড়ির কেউই যোগ দেয় নি কখনও; কিন্তু কি আন্তরিক, কি উত্তপ্ত ছিল দেশপ্রেম ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে। চিরদিন মা তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন, প্রণাম জানিয়েছেন সেইসব মহাপ্রাণ শহীদদের—যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য কারাবরণ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। মূল্য দিতে হবে, অনেক বড় মূল্য দিতে হবে।

কার্পেটের ওপর পশমের ফুল তুলতে তুলতে বলতেন মা। অনেক প্রাণ যাবে, অনেক জীবন।

কিন্তু সত্যিই মা কি জানতেন কতখানি মূল্য দিতে হোল ভারতবর্ষকে মুক্তি কেনবার জন্য।

মা কি কখনও ভাবতে পারতেন তাদের তিরিশ বছরের পুরোন বাবুর্চি আব্দুল শুধু মুসলমান বলেই তাদেরই বাড়ির বাগানে খুন হয়ে যাবে উন্মত্ত জনতার হাতে? মা কি জানতেও পারলেন—বাবার বন্ধু মহেন্দ্র কাপুরেরা সপরিবারে নিহত হলেন লাহোরে নিজেদের বাড়িতে। মা কি জানতেন স্বাধীনতা আসবে ভাগ করে? একভাগ হিন্দুর, একভাগ মুসলমানের। আর সেই ভাগাভাগি হবার আগে, সেই বৃষ্টি-ঝরা সাংঘাতিক রাত্রে?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধীর হয়ে মহুয়া প্রতীক্ষা করছিল অভিজিৎ-এর, আর বারবার ঘড়ি দেখছিল।

সাড়ে দশটা বাজল, এগারটা বাজল, সাড়ে এগারটা বাজল, এত রাত তো অভিজিৎ কোনদিন করে না। এদিকে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি আর সোঁ সোঁ হাওয়া। হাতের ওপর মুখ রেখে লেকের জল দেখছিল মহুয়া। মহুয়াদের বাড়িটা লেকের ঠিক সামনে না হলেও, এখান থেকেই দেখা যায় কালো গভীর জল; মহুয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর বারেবারেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল বিকেলের দৃশ্যটা। আমেরিকান সৈন্যরা ছেড়ে চলে গেছে লেকের পাড়; ফিরে গেছে দেশে। তাদের অস্থায়ী সুন্দর কাঠের কুটিরগুলো ফাঁকা, কাঠের বন্ধ গেট খুলে নেওয়া হয়েছে, সাধারণের সেদিকে যেতে আর বারণ নেই। উৎসাহী ছেলের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই পরিত্যক্ত কাঠের কুটিরগুলোর ওপর। যা পাচ্ছে—টেনে বার করে আনছে; রবারের নৌকাগুলো ভর্তি ছেলেতে-মেয়েতে। দেখতে দেখতে নৌকোয়-নৌকোয় ছেয়ে গেছে লেকের কালো জল, হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি গান গল্প। যেন এক আনন্দের মেলা বসে গেছে লেকের দু-পাড় ঘিরে।

খোকার প্যারাম্বুলেটার ঠেলে বেড়াতে বেড়াতে সারা বিকেল মহুয়া দেখেছে এইসব। ভারী ভাল লেগেছে তার। ভাল লেগেছে কিশোর তরুণ-তরুণীদের এইসব চেঁচামেচি, প্রাণের উচ্ছ্বাস। ওরও ইচ্ছে করেছে এই আনন্দের মিছিলে যোগ দিতে, ইচ্ছে করেছে ওদের মত গলা ছেড়ে গান গাইতে, নৌকো বাইতে।

কিন্তু কিছুই সম্ভব হয় নি; কি করে কিছু করবে মহুয়া? অভিজিৎ সঙ্গে নেই যে। সেই তখন থেকেই স্বামীর জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে মহুয়া। কখন আসবে কখন ফিরবে অভিজিৎ!

কতক্ষণে স্বামীর কাছে খুঁটিয়ে বিকেলে লেকের আনন্দ মেলার সবিস্তার বর্ণনা করবে মহুয়া। কখন, কত দেরি

আছে আর অভিজিৎ-এর আসবার। মহুয়া ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে।

অবশেষে অভিজিৎ এল। রাত তখন প্রায় বারোটা বাজে, ছড়ছড় করে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। মহুয়া প্রথমে বুঝতেই পারে নি, ভাবতেই পারে নি, ভাবতেই পারে নি ঘোড়ার গাড়ি করে অভিজিৎ আসবে। কিন্তু পরক্ষণেই চিনতে পারল ; মাথায় খবরের কাগজ চাপা দিয়ে দাড়িওলা মুসলমান কোচোয়ানকে টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে, ঐ তো অভিজিৎ।

হ্যাঁ অভিজিৎ-ই, যত অন্ধকারই হোক, আর যতই বৃষ্টির জলে চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাক ঐ লম্বা একহারা চেহারা চিনতে মুহূর্তের দেরি হয় না মহুয়ার।

বাব্বাঃ, কি মুস্কিল !

ওপরে উঠে ভিজে পোষাক ছাড়তে ছাড়তে অভিজিৎ বলেছিল—সেই পার্ক সার্কাস থেকে এতদূর ঘোড়ারগাড়ি করে আসতে হোল। একটা ট্যাক্সি পাই না, কিছু না। আর একটু হলেই হেঁটে ফিরতে হোত।

পার্ক সার্কাস থেকে ?

পরে কথাটা যতবার মনে হয়েছে, শিউরে উঠে দু-কানে হাত চাপা দিয়েছে মহুয়া। যেন এখনই কোন অশুভ বার্তা শুনতে হবে ; কোন অমঙ্গল সংবাদ।

কি না হতে পারতো ?

ঘুমন্ত স্বামীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শিউরে শিউরে উঠেছে মহুয়া। কি ভাগ্য, কি অসীম সৌভাগ্য মহুয়ার। সেই কালরাত্রে যখন মানুষের মধ্যে পিশাচগুলো জেগেছে, যখন ধর্মের ছুতো করে ঈশ্বরের নামে রক্ত দেখার নেশায় মেতেছে মানুষ, যখন চীৎকার করে জেহাদ দিয়ে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত মানুষের দল ছুটে আসছে খোলা ছুরিহাতে আর একদল নিরীহ মানুষের প্রাণ নেবার জন্য, শিশুকে হত্যা করবার জন্য, মেয়েদের ধর্ম নেবার জন্য, তখন সেই কালরাত্রির সূচনার মুখে, কোলকাতার সবচেয়ে কলঙ্কিত বধ্যভূমি পার্ক সার্কাস থেকে অক্ষত অবস্থায় মুসলমান কোচোয়ানের গাড়িতেই ফিরে এল অভিজিৎ !

কেমন করে সম্ভব হোল এ !

মহুয়া বারবার ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছে। কৃতজ্ঞ, মহুয়া কৃতজ্ঞ তার ভাগ্যের কাছে ; কৃতজ্ঞ ঈশ্বরের কাছে।

কিন্তু পরদিন সকাল থেকে যে হত্যার তাণ্ডব চলেছে, মানুষের ইতিহাসে যে কলঙ্কের পাতা রক্তের অক্ষরে লেখা হয়েছে, তার পরও কি আর মনে হয় ভগবান আছেন, ঐশ্বরিক শক্তি আছে ? ন্যায়, অন্যায়, পাপ পুণ্যের হিসাব হয় ? বিচার চলে কোথাও ? কি বিভিষিকার মধ্যেই কেটে গেছে কয়েকটা দিন।

রাত্রে ঘুম নেই, খোকনকে বুকে জড়িয়ে ছাদের এক কোণে পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে কাঁপছে মহুয়া, অভিজিৎ নীচে ছেলেদের সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে, সম্বল মোটা মোটা বাঁশের লাঠি।

মাঝরাতে হঠাৎ একটা হৈ-হৈ শোনা যায়, দূর থেকে ভেসে আসে 'আল্লা হো আকবর', 'বন্দে মাতরম্', 'জয় শিব শম্ভু' আর ছাদের ওপর মেয়েরা চীৎকার করে কেঁদে উঠে ; পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঈশ্বরকে স্মরণ করে…।

বিভীষিকাভরা কয়েকটা রাত, দুশ্চিন্তাভরা দিন ; কিন্তু তাও কাটল, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল জীবন, লোকজন আবার পথে নামল, সব দোকান-পাট আবার খুলল, তারপর নামল সেই বর্ষার জল। ঝর্‌ঝর, ঝিম্‌ঝিম, ঝম্‌ঝম্— অবিশ্রান্তভাবে চলল কয়েকদিন, রাস্তা-ঘাট জলে ভরা, কলকাতা যেন ভেনিস ; মনে হোল প্রকৃতি যেন ধুয়ে দিলেন, মুছে দিলেন সব পাপ, সব কলঙ্কিত রক্তরেখা।

আর সেই জলের সময় থেকেই অভিজিৎ আবার উধাও, আবার ওর দেখা নেই ; কোথায় সে যায়, কেমন করে কাটায় সারাদিন, সারা সন্ধ্যে, মহুয়ার জানা নেই।

আবার সেই পুরোন রুটিন, পুরোন জীবন। এমনি করেই কাটল এক বছর, এল স্বাধীনতা দিবস।

আনন্দে উন্মত্ত অধীর জনতা, মহুয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে, চোখের ওপর দিয়ে সুখী মানুষের মিছিল চলেছে। মহুয়া একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে, বড় ইচ্ছে করছে বারন্দা থেকে নেমে গিয়ে ঐ জনস্রোতে মিশে যেতে, কিন্তু পারে না মহুয়া ; অভিজিৎ পাশে না থাকলে, অভিজিৎ-এর খুশিভরা বড় বড় চোখের দিকে না-তাকালে কিছু করাই সম্ভব হয় না মহুয়ার পক্ষে।

স্বাধীনতা দিবসে মহুয়া বাড়ি সাজিয়েছে ; বাবাকে, দাদাকে, তুলতুলিকে চিঠি লিখেছে, সকালে খোকনকে নিয়ে গিয়ে লাভলক প্লেসের খালি বাড়িতে পতাকা তুলেছে, মার ছবি ঝেড়ে-মুছে ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, তারপর বসবার ঘরে অর্গ্যানের সামনে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে মহুয়ার মানসচক্ষে ভেসে উঠেছে সব। মহুয়া যেন স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে রাধারাণীর মিহিগলার সেই গান—

'‥ জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ',

শুনেছে কান পেতে সেই আবেগ-স্পন্দিত কণ্ঠস্বর—

'বল বল বল সবে, শতবীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'


KALPANA...

সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছে মহুয়া, আর মনে হয়েছে কি করলে আবার সেদিনের জীবনটাকে ফিরে পাওয়া যায়; আবার তেমনি রাধারাণীর মৌ, হীরেন্দ্রনাথের আদুরে মেয়ে, তুলতুলির দিদি আর সঞ্জয়ের বোন হয়ে নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ান যায়।

কিন্তু না, না, এ কি ভাবছে মহুয়া! তার কুমারী জীবন সুখের ছিল, শান্তির ছিল, আনন্দের ছিল, কিন্তু অভিজিৎ ত' সেখানে ছিল না; সব ছিল মহুয়ার, তবু পরিপূর্ণ ছিল না জীবন। অভিজিৎ না এলে, খোকন না থাকলে সব মিথ্যা হয়ে যায় যে।

যদি মেলাতে পারত এই দুই জীবনকে, যদি এক করে নিতে পারত।

কিন্তু তাকি হয়?

যুদ্ধের আগেকার নিশ্চিন্ত শান্তি কি যুদ্ধের পরে পাওয়া যায়?

নিঃশ্বাস ফেলে গাড়িতে উঠেছে মহুয়া; খোকনকে পাশে নিয়ে খোকনের সঙ্গে আবোল-তাবোল বকতে বকতে বাড়ি ফিরেছে।

খোকন! জান ত', আমরা স্বাধীন, স্বাধীন আমরা, আর পরাধীন নই, স্বাধীনতা-দিবস আজ।

খোকন কি বুঝেছে খোকনই জানে, শুধু সোৎসাহে ঘাড় নেড়ে দুলে দুলে মার বুকে পড়েছে।

থাধীনতা? মা? বাবালও থাধীনতা?

খোকনের মুখে এই প্রশ্ন যেন তীরের মত মহুয়ার বুকে বিঁধেছে।

বাবারও স্বাধীনতা! হ্যাঁ খোকন বাবারও স্বাধীনতা, বাবার খুব স্বাধীনতা, প্রচণ্ড স্বাধীনতা, বাবার কোন মায়া, মমতা, ভালবাসার বাঁধন আর নেই—বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে মহুয়া; ড্রাইভার চমকে পেছন ফিরে চেয়েছে আর খোকা মহুয়াকে আশ্বস্ত করেছে।

বাবাকে মালব, বাবা দুত্তু, বাবা থাধীনতা।

আর সেইদিন রাত্রেই অনেক দেরি করে অভিজিৎ যখন বাড়ি ফিরেছে, তখন লাল চোখ, উস্কো-খুস্কো চুল দেখে ভাল লাগে নি মহুয়ার।

কোথায় ছিলে সারাদিন?

কোথায় ছিলাম?

অভিজিৎ গলা ছেড়ে গেয়ে উঠেছে—

'…ছিলেম মগন ঘুমের ঘোরে…!'

তারপর কাছে এসে মহুয়ার চিবুকে হাত দিয়ে, মুখের কাছে মুখ নামিয়েছে।

আঃ কি কর! চারপাশে খোলা বারান্দা!

কপট রাগে মহুয়া সরে এসেছে, আর রাত্রে বিছানায় বহুদিন পরে স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনে, উত্তপ্ত চুম্বনে কোন স্বাদ পায় নি মহুয়া।

অভিজিৎ আগের মতই মহুয়াকে বুকে টেনে নিচ্ছে, চুমোয় চুমোয় ভরে দিচ্ছে ওর গাল, ঠোঁট, কপাল, চিবুক, গলা, কিন্তু তবু কেন মহুয়ার মন ভরছে না, কেন আগের মত মনে হচ্ছে না—মিশে গেলাম, এক হয়ে গেলাম দু'জনে, কেন মনে হচ্ছে না পরিপূর্ণ এ জীবন, সুখের পাত্র পূর্ণ কানায় কানায়। কেন মনে হচ্ছে অভিজিৎ শুধু শরীর দিয়েই স্পর্শ করছে মহুয়াকে, দুই মন-প্রাণ এক করে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না সেই আত্মার উর্দ্ধলোকে। ঠিক অভিজিৎ নয়, যেন অভিজিৎ-এর মত আর কেউ তেমনি করেই আদর করছে, সোহাগ জানাচ্ছে, কিন্তু সে যেন তার স্বামী অভিজিৎ নয়, কেউ, অন্য কোনজন। স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে ছটফট করে উঠেছে মহুয়া—

ইস, কি একটা গন্ধ, টিনচার আয়োডিনের গন্ধের মত। হঠাৎ কি মনে হয়েছে মহুয়ার।

তোমার মুখেই যেন গন্ধটা! মাগো কি কড়া গন্ধ, কি বিশ্রী!

কই কিসের আবার গন্ধ! কোথায় গন্ধ! যা-তা কথা বোল না।

হঠাৎ অভিজিৎ রেগে গেছে। বিছানার ওপর উঠে বসেছে। আর তখনই বিদ্যুৎ চমকের মত কথাটা মনে হয়েছে মহুয়ার।

তুমি মদ খেয়েছ?

কে বললে?

আমি বুঝতে পেরেছি।

স্বামীর দু-কাঁধে হাত দিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গন্ধ শুঁকেছে মহুয়া।

আমাদের বাড়িতে ব্র্যাণ্ডি রাখতেন বাবা, যদি দরকার পড়ে মার জন্য; তা ছাড়া বাবার সঙ্গে পার্টিতে গিয়েও দেখেছি।

তবে অন্যায়টা কোথায়? তোমার বাবাই যখন…… হঠাৎ ঘর ফাটিয়ে হাসতে শুরু করেছে অভিজিৎ।

বাঃ—বাঃ! বেশ তো! তোমার বাবা খেলে দোষ নেই আর আমি খেলেই…বাঃ বেশ! এ যে দেখি—

সেই দেবতার বেলা লীলা-খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা

চুপ কর!

ঝর্‌ঝর্‌ করে চোখ দিয়ে জল ঝরেছে মহুয়ার।

আমার বাবা জীবনে মদ ছোঁন নি, মাকে দিতে হোত মাঝে মাঝে ওষুধ হিসেবে। কিন্তু সে কথা থাক!

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছে মহুয়া।

কিন্তু তুমি, শেষ পর্যন্ত মদ খেয়ে বাড়ি ফিরলে? আবার চোখের জল ঝরে পড়ে মহুয়ার বুকের কাপড় ভিজে উঠেছে।

অভিজিৎ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল মহুয়ার জলে-ভেজা মুখের দিকে; যেন অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে কেন কাঁদছে মহুয়া? কিসের কষ্ট তার?

তারপর হঠাৎ অভিজিৎ-এর নেশা কেটে গেছে। দু'হাত বাড়িয়ে মহুয়ার দুই পা চেপে ধরেছে অভিজিৎ।

মাপ কর মৌ! মাপ কর আমায়! আর কখনো এমন হবে না, কখনো না কখনো না!

মহুয়ার কোলে মুখ লুকিয়ে শিশুর মত কেঁদেছে অভিজিৎ।

তোমায় এমন বাজবে, এত কষ্ট হবে জানলে আমি,...না-না, আর কখনো হবে না, আর কখনো এ রকম করবো না আমি।

মহুয়াও কেঁদেছে আবার স্বামীর গালে গাল দিয়ে; আর দু'জনের চোখের জলে জল মিশে এক হয়েছে। বহুদিন বাদে আবার স্বামী-স্ত্রী ফিরে এসেছে পুরনো জীবনে, ফেলে-আসা দিনে। চোখের জলের মধ্যে দিয়েই ঘটেছে।

কিন্তু তবু সেই রাত্রির স্মৃতি সুখকর নয় মহুয়ার কাছে। অনেকদিন পরে মহুয়ার স্বামী আবার মহুয়ার খব কাছে এসেছিল; সেই কান্নার পর, সেই পা-ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞার পর অভিজিৎ মহুয়ার মন ভরিয়ে দিয়েছিল, আর অন্যলোক মনে হয় নি অভিজিৎকে; তবু কিছুতেই ভুলতে পারে না মহুয়া কি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিল সে রাত্রে; যখন বুঝতে পেরেছিল অভিজিৎ মদ খেয়ে এসেছে।

আর তারপর থেকে মদ হয়তো আর খায় নি অভিজিৎ। কিন্তু কি যে সে করে, কোথায় তার কাজ, কোথা থেকে এত টাকা পায়, কাকে লুকোবার জন্যে ব্যাঙ্কে না রেখে সমস্ত টাকা এনে বাড়ির লোহার সিন্দুকে দরজা-জানালা বন্ধ করে লুকিয়ে রাখতে হয়, তাও বোঝে না মহুয়া। নাঃ, স্বামী শুধু দিন দিন তার নাগালের বাইরেই চলে যাচ্ছে না, বেশ রহস্যময়ও হয়ে উঠেছে।

*　　*　　*　　*

অজয়দা সেদিন এসে একটা অদ্ভুত কথা বলল, অভিজিৎও ফিল্মের ব্যবসায় নামল তাহলে!

তার মানে?

বাঃ তুই জানিস না?

না তো, কিন্তু ও ফিল্মে নামছে এমন অদ্ভুত খবর কে দিল তোমায়?

আহা! অভিজিৎ ফিল্মে নামবে কেন? ফিল্মটা ফাইনান্স করছে, ও প্রোডিউসার, যদিও নাম থাকবে না ওর, তবে—

কি বলছ তুমি অজয়দা? ফিল্ম প্রোডিউস করবে, অত অত টাকা আছে নাকি ওর? সে তো শুনেছি লাখ লাখ টাকা লাগে।

হ্যাঁ, লাখ টাকা তো লাগবেই।

তবে?

মহুয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

লাখ টাকা সোজা কথা নাকি?

তুই কি মনে করিস লাখ টাকা নেই অভিজিৎ-এর। ওর ব্ল্যাক মানিই ত' বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।

কি বললে, ব্ল্যাক মানি? ব্ল্যাক মার্কেট করে নাকি ও?

আহা না! ব্ল্যাক মার্কেট করবে কেন? কিন্তু যত উপায় করে, তার সবটাই যদি খাতায় দেখানো থাকে, তাহলে তো সবই কেটে নেবে ইনকাম ট্যাক্স; খেটে উপার্জন করার কোন মানেই থাকবে না।

কিন্তু অভিজিৎ ব্ল্যাক মানি রাখে—তুমি ঠিক জানো অজয়দা?

মহুয়ার ব্যাকুল স্বরে অবাক হোল অজয়। তাতে হয়েছেটা কি? ব্ল্যাক মানি তো আজকাল সকলেরই; আর সেই টাকাটাই ফিল্মে ইনভেস্ট করছে অভিজিৎ, তাই ত' সবাই করে।

কিন্তু তুমি, তুমি ঠিক জানো অজয়দা ও ব্ল্যাক মার্কেট করছে?

মার্কেটের কথা জানি না ভাই, তবে ব্ল্যাক মানি আছে ওর কিছু, সে কথা জানি।

অজয়দা!

মহুয়া এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে অজয়ের কাঁধ চেপে ধরেছে; ওর দুই চোখে যেন আগুন জ্বলছে গলার স্বর উত্তেজনায় অস্থির।

প্রমাণ দিতে পার তুমি! এত বড় কথা যে বলছ, বল সত্যি করে।

দাঁড়া দাঁড়া...

অজয় কাঁধ থেকে মহুয়ার হাত নামিয়ে দিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ কিছুই আমি দিতে পারবো না, শুধু বলতে পারি—আমি জানি। কিন্তু মৌ একটা কথা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না, এতে

এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন তুই। ব্ল্যাক মানি ত' আজকাল সকলের কাছেই। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয় না কে ?

অজয়দা কি বলছ তুমি ?

সত্যি কথা বলছি মৌ, তুই ভাবের ঘোরে অন্ধ হয়ে ঘরে বসে আছিস তাই দেখতে পাস না, যাদের বাইরে বেরিয়ে টাকা রোজগার করতে হয় তারাই জানে কি ব্যাপার চলছে জগৎ জুড়ে, আজকাল সব জায়গায়।

না, না, না।

মহুয়া ছিটকে সরে এসেছে অজয়ের কাছ থেকে।

আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না—অভিজিৎ ব্ল্যাক মার্কেট করে, ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়,—সে ত' সে ত'…

কান্নায় গলা যেন বুজে এসেছে মহুয়ার—সে তো চুরি অজয়দা, সে তো চুরি !

চুরি মানে, নিজের টাকা নিজে রাখবে তার আবার চুরি কি ? খেতে না পেলে তোর গভর্নমেণ্ট খেতে দেবে আমাকে যে বেশি টাকা করলে কেড়ে নিতে আসে ?

তোমরা কয়েকজন চুরি করে টাকা জমাও বলেই অনেক লোক না-খেতে পেয়ে মরে, দেশে দুর্ভিক্ষ হয়।

ছ্যাখ, পাকামি করিস না ; দরিদ্র দেশ, অক্ষম সরকার, এ দেশে দুর্ভিক্ষ ত' চিরসাথী।

কি বলছ অজয়দা, তোমরা চুরি করবে আর দোষ দেবে সরকারকে ?

বাজে বকিস না মৌ ! চোর কে নয় ? তোর সরকার চোর নয় ?

কিন্তু এখন তো আমাদের নিজেদের সরকার, আজ যদি সেখানে গলদ থাকে তা'হলে সে দোষও আমাদের।

জানিস না মৌ, তোর এত বকবকানির জবাব দিতে পারি না, গলা শুকিয়ে গেল আমার।

মহুয়া তবু গেল না অজয়ের চায়ের ব্যবস্থা করতে, মোতির মাকে ঘোলের সরবৎ বানাতেও বললো না ; শুধু থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করল—কি করে জানলে তুমি অজয়দা, ওর ব্ল্যাক মানি আছে। আর ও সেই নিয়ে ফিল্ম করবে ?

আঃ এ তো জ্বালালে দেখছি, কি করে আর জানবো ? জানি।

না, বল অজয়দা—তোমায় বলতেই হবে, আমি প্রমাণ চাই।

এত ঝামেলা না করে অভিজিৎকে তো জিজ্ঞেস করলেই পারিস।

অভিজিৎকে জিজ্ঞেস করবে ?—হ্যাঁ তাই করবে মহুয়া। অভিজিৎ-এর নিজের মুখ থেকেই শুনে নেবে সে ব্ল্যাক মানি রাখে কি না। কিন্তু তার আগে অজয়ের কাছ থেকে প্রমাণ চায় মহুয়া ; এতো বড় কথা তার স্বামীর বিরুদ্ধে, সহজে মেনে নেবে না সে।

তোমার এ সন্দেহ হোল কেন ? কি করে…

সন্দেহ কেন ? অভিজিৎ ফিল্ম করেছে এটা ত' ঠিক—

তাও তো আমি জানি না অজয়দা।

জেনে নে, জেনে নে।

বিরক্ত অজয় উঠে দাঁড়াল।

আমি যাই, তুই তো একপেয়ালা চাও দিলি নে।

ইস্ কি ভুলই না হয়ে গেছে। বোস অজয়দা একটু বোস, এখুনি আনছি।

না রে না—ব্যস্ত হোস না এখনই উঠতে হবে।

অজয় ঘড়ির দিকে চোখ রাখল।

একটা জরুরী কাজ আছে।

কিন্তু তুমি যে চা চেয়েছিলে।

এখন না রে, কাল এসে খাব, আর তখনই শোনা যাবে অভিজিৎ-এর কাছ থেকে প্রমাণ তুই যোগাড় করেছিস কি না, হাসতে হাসতে অজয় বেরিয়ে গেল।

বসার ঘরে নীচু বেতের সোফাটায় চুপ করে বসে থাকল মহুয়া, অনেক—অনেকক্ষণ। কি বলে গেল অজয়দা, কি সাংঘাতিক কথা বলে গেল সে।

অভিজিৎ ব্ল্যাকে টাকা করছে ; অভিজিৎ ইনকাম্ ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, অভিজিৎ চোর। আর কে জানে হয়তো ব্ল্যাক মার্কেটও করে অভিজিৎ ; না হলে এত টাকা আসে কোত্থেকে, এতো জিনিস, এতো গয়না। মহুয়া নিজের গলার দিকে তাকাল, ত্রুলহরীর আসল মুক্তোর মালা। তাদের বিবাহ-বার্ষিকীতে অভিজিৎ-এর উপহার। এই তো মোটে কয়েক মাস আগে নির্লজ্জের মত মহুয়াই তাদের বিবাহ-বার্ষিকীর কথা অভিজিৎকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

সকাল থেকে সেদিন মেঘ করে কালো হয়ে এসেছিল দিন, ভোর সাতটায় মনে হচ্ছিল যেন বিকেল হয়ে এসেছে, মহুয়া পেছন থেকে এসে অভিজিৎ-এর গলা জড়িয়ে ধরেছিল।

কি ব্যাপার ?

কিছু না।

মহুয়া স্বামীর কাঁধে মুখ রেখেছিল।

আজ তুমি বেরুতে পারবে না।

সে কি !

অভিজিৎ চোখের সামনে থেকে কাগজ নামিয়ে হাত বাড়িয়ে মহুয়ার মাথাটা একটু কাছে টেনেছিল।

আজ হঠাৎ কি হোল মৌরাণীর

অভিমানে মহুয়ার ঠোঁট ফুলে উঠেছিল।

আজই প্রথম স্বামীর কাছে এমন ভাবে এসে দাঁড়াল মহুয়া; কিন্তু রোজই কি ওর ইচ্ছে হয় না আগের মত স্বামীর বেরুনোর সময় কাছে এসে দাঁড়াতে, একটু সোহাগ একটু আদর পেতে? কিন্তু সেসব কিছুই আজকাল আর সম্ভব হয় না। অভিজিৎ কাগজ পড়ে, দাড়ি কামায়, আর তারপর ওর একান্ত ব্যক্তিগত বেয়ারা বাহাদুরকে ডেকে পোষাক পরে, ব্যাগ গুছোয়, বারবার আলমারীর পাল্লা টেনে দেখে ঠিক বন্ধ হয়েছে কি না, তারপর মহুয়াকে জিজ্ঞেস করে—কিছু আনতে হবে? কিছু করবার আছে?

মহুয়া কখনো ঘাড় নাড়ে 'না', কখনো একটা লম্বা লিস্ট তুলে দেয় অভিজিৎ-এর হাতে।

খোকন ছুটে আসে।

বাবা আমার ঘোড়া কই?

আনবো, আজ তোমার ঘোড়া ঠিক আনবো; অভিজিৎ নীচু হয়ে একবার ছেলের মাথায় হাত বুলোয়, ওর ফুলো ফুলো গালে চুমো খায়, তারপরই ঘড়ির দিকে তাকায়।

ইস, বড় দেরি হয়ে গেল। আমি চলি—

অভিজিৎ চলে যায়, খোকনকে বুকে তুলে নিয়ে আবার খাবার ঘরে এসে ঢোকে মহুয়া।

খোকন, সোনার খোকন, ভাগ্যে খোকন আছে, নইলে —নইলে কি হোত মহুয়ার? এই বাড়ি, এত দাসদাসী, এসব নিয়ে কি করত মহুয়া? কি করে কাটাত সারাদিন, কি দিয়ে ভরাত জীবনের শূন্যতা?

কিন্তু কই? খোকনকে নিয়েও সেই অভাববোধ মেটে কই? স্বামীর বিরহে তেমনি নিঃসঙ্গ, তেমনি একাই তো মহুয়া।

বই পড়ে, কবিতা লিখে, গান গেয়ে, কিছুতেই তো এ ফাঁক ভরে না। কতদিন কতবার ইচ্ছে হয় মহুয়ার—স্বামীর হাতটা টেনে ধরে বলে—না এখুনি যেতে পাবে না একটু বোস আর একটু থেকে যাও।

ইচ্ছে করে বলতে—

চল আজ ছুটির দিনে আমি, তুমি আর খোকন বেরিয়ে পড়ি যেদিকে দু'চোখ যায়।

কিন্তু কিছুই বলা হয় না।

মনের কথা মনের ইচ্ছে মনেই চাপা থাকে। অভিজিৎ বেরিয়ে যায়, আর অফিস ক্লাব বন্ধুবান্ধব সব সেরে ফেরে কোনদিন ন'টায় কোনদিন এগারোটায়।

কিন্তু আজ কি হোল মহুয়ার।

সকালবেলায় চায়ের টেবিলে যখন চারদিক খোলা, যখন মোতির-মা আর বাহাদুর আনাগোনা করছে ঘরে, তখন হঠাৎ মহুয়ার এ কি ব্যবহার!

কণ্ঠলগ্না স্ত্রীকে হাত ধরে সামনে এনেছিল অভিজিৎ। কিছু ব্যাপার আছেই, শুনি ত'।

জানি না যাও, তোমার যদি মনে না থাকে···

মনে না থাকে! কি মনে থাকবে মহুয়া? কোন্ কথা?

মহুয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কথা, কথা কিসের? আজকের তারিখটা কি ভুলে গেলে?

আজকের তারিখ, কি ব্যাপার?

অভিজিৎ টেবিল থেকে কাগজ তুলে আবার চোখের সামনে ধরেছে।

ফিপ্‌টিন্‌থ্‌ জুলাই।

ভ্রূ কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড থেমে থেকেছে অভিজিৎ; তারপরই বলে উঠেছে—ওঃ হো! আমাদের বিয়ের তারিখ!

জলভরা চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে অভিযোগ করেছে মহুয়া। তুমি ত' ভুলেই গিয়েছিলে, সব ভুলতে পারলেই তুমি খুশি হও।

আরে না না, ভুলব কেন? ভুলব কেন? ঠিকই মনে পড়ত একটু পরেই।

ছাই!

না গো না; সত্যি বলছি, আচ্ছা বল তোমার কি চাই?

যা চাইবো দেবে ঠিক!

মহুয়া দুষ্টুমিভরা চোখে মিটি মিটি হেসেছে।

অভিজিৎ একটু সন্দিগ্ধ চোখে চেয়েছে মহুয়ার দিকে তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলেছে—আমার সাধ্যে যা আছে তাই দেব মৌ।

তোমার সাধ্যের মধ্যেই আছে এমন কিছু চাইব!

বেশ তো বল কি চাই?

তোমাকে চাই, শুধু তোমাকে।

আমায়! হাঃ হাঃ হাঃ···

ঘর ফাটিয়ে হেসেছিল অভিজিৎ?

আমায় ত' পেয়েই আছ।

না পাই না, একটুও পাই নি; আজ তোমায় চাই সকাল থেকে রাত, রাত থেকে আবার সকাল অবধি।

সকাল থেকে মানে? অফিস যাব না?

নাঃ। আজ অফিস নয়, কাজ নয়, কিছু নয়—আজ শুধু তুমি আর আমি।

মৌ! [ক্রমশ

জোয়ার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

= নাটক =

................রমেন চৌধুরী

প্রথম অংক **॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥**

নীরবে মাথা নাড়লেন ডাঃ সান্যাল।

ডাঃ সান্যাল। পারলুম না!—

অজয়। (চীৎকার করে) কি বললেন? বাবা নেই? বাবা নেই—বাবা—

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো অজয়—

আলো এতোক্ষণ মাঝে দপ্ দপ্ করছিলো—এই কথার সংগে সংগে গাড়ির অন্ধকারে গোটা মঞ্চ ঢেকে যাবে।

সর্বজয়ার আর্তনাদ শোনা যাবে, অজয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না বাবা—বাবা...শোনা যাবে থেকে থেকে—।

আবহসংগীতের করুণ রাগিণী সমগ্র পরিবেশ বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তুলবে!!

পর্দা নেমে আসবে

॥ প্রথম অংক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অংক **॥ প্রথম দৃশ্য ॥**

প্রখ্যাত ইনকাম ট্যাক্স প্লীডার প্রখরকিরণ চক্রবর্তীর পার্লার। অতি আধুনিক কেতাদুরস্তভাবে সাজানো। একটা কৌচে প্রখরকিরণ বসে আছেন, পাইপ টানছেন—কেয়া একটি উলের হাতে বোনা সোয়েটার নিয়ে হাজির হোলো।

কেয়া। বাবা, তুমি চলে এলে যে?

প্রখরকিরণ। এখনো তোর মাপ নেয়া হোলো না!

কেয়া। বারে, ভালো করে না দেখলে শেষে যদি ছোটো হয়ে যায়!

প্রখরকিরণ। ছোটো হয়ে যায় যাবে—কি বছর তোকে এত খাটতে হবে না। বোস দেখি এখানে—আচ্ছা, এই সোয়েটার না করলেই নয়! এ সব তো কিনতে পাওয়া যায় হাজার হাজার!

কেয়া। এই যে একটুখানি...তোমার কাঁধের কাছটা ঠিক করে নিই, এই যে—আর, বাজারের সোয়েটার পরবে তুমি আমি থাকতে...

কেয়া সোয়েটার মাপ ইত্যাদি দেখে নিতে থাকে, প্রখরকিরণ প্রসন্নহাস্যে মেয়ের কাজ দেখতে থাকেন। কেয়ার মাপ নেওয়া হয়ে যায়, উলের বল ইত্যাদি—

গুছিয়ে রাখতে রাখতে সামনের সোফায় বসে।

প্রখরকিরণ। (সস্নেহে দৃষ্টিপাত করে) ঠিক তোর মায়ের মতন হচ্ছিস। তোর মা-ও এই রকম ছিলো।

কেয়া। (ব্যগ্রভাবে) বলো না বাবা মায়ের গল্প। মাকে তো ঠিক মনে পড়ে না, কেবল তাঁর সেই বড়ো বড়ো চোখ দু'টো ভুলতে পারি না। আর ধবধবে পা দু' খানিতে চওড়া করে আলতা দেওয়া—

প্রখরকিরণ। তুই তখন হ'স নি, সেই সময়ে তোর মা আমায় ভালো দেখে একশিশি আলতা আনতে বলেছিলো। কিন্তু আমি সাত কাজে ভুলে গিয়েছিলাম।

কেয়া। মা খুব রাগ করলেন?—হ্যাঁ বাবা—

প্রখরকিরণ। (নিশ্বাস ফেলে) তিন দিন কথা বলে নি।—মনে হয় সে সব এই সেদিনের কথা। তোকে খুব ভালো করে লেখাপড়া শেখাবে কতো সখ ছিলো তার—

কেয়া। তুমি তো তাঁর ইচ্ছেমতো করেই আমায় মানুষ করছো বাবা !—

প্রখরকিরণ। (মাথা নাড়তে নাড়তে) পাচ্ছি না—মায়ের মমতা আমি পাবো কোথায় ! শুনিস না সবাই বলে প্রখরকিরণ চক্রবর্তী টাকার মতোই শক্ত !

কেয়া উঠে এসে বাবার পাশে বসে তাঁর বুকে মাথা রাখে, বলে—

কেয়া। তোমার মতো বাবা যেন জন্ম জন্ম পাই ! বুঝলে ?

প্রখরকিরণ মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন মমতা ভরে—মুখে বিষণ্ণ হাসি

প্রখরকিরণ। শোন মা—এ সব কথা এখন থাক। অজয়কে আজ আসতে বলেছি। ও এলে বসতে বলিস।

কেয়া। কেন, তুমি কোথাও যাবে এখন ?

প্রখরকিরণ। আজকের ছুটির দিনটাতো বাড়িতেই কাটলো, সন্ধ্যের মুখটায় একটু Stroll দিয়ে আসি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবো।

কেয়া। আচ্ছা বাবা।—

প্রখরকিরণ উঠে পড়লেন। ওদিকের স্ট্যাণ্ড থেকে রূপো-বাঁধানো লাঠিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন…কেয়া খানিক এদিক সেদিক কালো দু' একটা বই নাড়াচাড়া করে, তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়ায় অর্গ্যানটার সামনে। ডালা খুলে দু' একটা চাবি টিপতে থাকে…শেষে গান ধরে।

॥ গান ॥

গান নয়…সুরে সুরে কথা বলে যাই,
যেমন ফুলের কানে
ভোমরা মধুর তানে
গুন্‌গুন্ গুঞ্জনে কয় যে ভাষাই
তেমনি তো সুরে সুরে কথা ব'লে যাই !

গান খানিকটা হয়ে যাবার পরই অজয়কে ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। অজয়কে দেখে কেয়া গান থামিয়ে ফেলে, অজয় বাধা দেয়।

অজয়। (হাত তুলে) চলুক তোমার নাকে কান্না, থামিয়ো না থামিয়ো না…

কেয়া। ফের্ অজয়দা ! আমার পেছনে লাগা হচ্ছে !

অজয়। তার মানে ? সাম্‌না সাম্‌নিই তো বলছি—

কেয়া। না বলবে না। কোনোদিন গান শুনেছো আমার যে তাই ?

অজয়। শুনি নি মানে, দু' কান পেতে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ পান করছিলাম—কিন্তু আর পারলুম না। নাকে-কান্নার ঠেলায় সুড়সুড়িয়ে এসে পড়লাম।—

কেয়া। জানো—এই কেয়া চক্রবর্তীর গান শোনবার জন্যে ইউনিভার্সিটির কত জুয়েল সাধ্যসাধনা করে !

অজয়। তাই নাকি ! স্বীকার করছি এ সন্দেশ আমার জানা ছিলো না। জানো তো, এখনকার দিনে সন্দেশ খেতে জোটে না, শুনতে পাওয়া যায় !

কেয়া। তা নয় হোলো। কিন্তু আমি যে বড়ো হয়েছি সেটাও কি—

অজয় একভাবে কেয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে—তা দেখে কেয়া লজ্জা পায়, বলে :

কেয়া। (সলজ্জে) অমন করে চেয়ে দেখছো কি ?

অজয়। (চমকে উঠে) য়্যাঁ !…ও, মা—জানো কেয়া তোমার সেই Bobbed চুলে ফিতে বেঁধে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার ছবি এখনো আমার চোখে ভাসে।—

কেয়া। আহা, আসল কথা চাপা দেওয়া হচ্ছে।

অজয়। আসল কথাটা কি শুনি ?

কেয়া। গান কেমন লাগলো তা তো বললে না।

অজয়। বলবো তাহলে ? ঠিক তোমার মতো।

কেয়া। মানে ?

অজয়। মানে সুন্দর।

কেয়া। (লজ্জিতভাবে) যাও !

অজয়। না বললে রাগ, বললেও অপছন্দ !

কেয়া। বুঝেছি ! ইংরিজি সাহিত্যের ফুলবনের নিশ্চয় কোনো খবর আছে।

অজয়। তা আছে। Inter University রিসাইটেশনে আমি—

কেয়া। সকলের পেছনে দাঁড়িয়েছো ! এই তো ?

অজয়। (হেসে) Exactly ! এবং সেইজন্যে কর্তৃপক্ষ একটা সোনার মেডেল দিয়েছেন পাঠিয়ে।

কেয়া। কই, দেখি।

রিবনে ঝোলানো Medal-টা কেয়ার হাতে দিলো অজয়। সেটাকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে কেয়া বলে—

যদি না দিই।

অজয়। ওটা তোমার জন্যেই এনেছি। যাদের যেটা মানায়।

কেয়া। অর্থাৎ ?

অজয়। সোনা জিনিসটা পুরুষকে মানায় না। ওর জন্যে দরকার মেয়েদের।

কেয়া। কিন্তু Recitation-এর জন্যে দরকার অজয় রায়কে। বলো না অজয়দা, Tennyson-এর সেই কবিতাটা।

শশধর (চাকর) ট্রে করে চা নিয়ে এলো। কেয়া উঠে এসে কাপ নিয়ে ধরে অজয়ের সামনে—অজয় হাসিমুখে কাপটা নেয়।

অজয়। তোমার Honour-এ নিলাম।

কেয়া। তাহলে কবিতাটাও—

অজয়। Amen—

গলাটা একটু কেশে ঠিক করে নিয়ে আবৃত্তি করে।

I steal by lawns and grassy plots,
I slide by hazel covers ;
I move the sweet forget-me-nots
That grow for happy lovers.

কেয়ার সংগে একবার দৃষ্টি-বিনিময় হবে অজয়ের —মৃদু হাসির ঝিলিক কেয়ার মুখে, সে চোখ ফিরিয়ে নেয় অজয় বলতে থাকে :

I slip, I slide, I gloom, I glance
Among my skimming swallows ;
I make the netted sunbeam dance
Against my sandy shallows.

I murmur under moon and stars
In brambly wildernesses ;
I linger by my shingly bars ;
I loiter round my cresses ;
And out again I curve and flow
To join the brimming river,
For men may come and men may go
But I go on for ever !

কবিতা শেষ করে কেয়ার মুখের দিকে চাইলো অজয় রুমালে মুখ মুছতে মুছতে।

কেয়া। একদম বাজে।

অজয়। কি ?

কেয়া। Recitation তোমার (মাথা নেড়ে চোখে এক ধরণের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে) অচল !

অজয় চটে যায়, মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে ; কেয়া মুখ টিপে টিপে হাসে।

কি হোলো অমন থম্‌থমে মুখে বসে রইলে কেন অজয়দা ? তোমার অমন-ধারা মূর্তি দেখলে—

অজয়। (গম্ভীরকণ্ঠে) আজকাল পড়াশুনো একদম করছো না তুমি। খালি গান হাসি আর—

কেয়া। দোহাই অজয়দা, মাস্টারমশাই-গিরি এক্ষুণি শুরু করে দিয়ো না। বাবাঃ, অম্‌নি মেজাজ খারাপ ! অজয়দা—

অজয়। (বিরূপতা যায় না। অন্যদিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে) কি ?

কেয়া। আর রাগ করতে হবে না—তোমার আবৃত্তি একেবারে মধুর মতো মিষ্টি হয়েছে। বুঝলে ? (গায়ে নাড়া দেয়)

অজয়। থাক্।—

কেয়া। সত্যি, খু-উ-ব ভালো হয়েছে। (অজয় ফিরে তাকায়) কোনোদিন তুমি কোনো কথা আমার বুঝবে না ! তুমি না—একেবারে একটি ইয়ে !···

অজয়। (হেসে ফেলে) ইয়ে !···আচ্ছা। মনে থাকবে একথা !—

শশধর (চাকর) আসে চায়ের কাপ ইত্যাদি নিতে, তাকে উদ্দেশ করে অজয় বলে

অজয়। আজকাল চা করা তোমার কেউ দেখিয়ে দিচ্ছে নাকি শশধর—

শশধর। (একটু হেসে) দিদিমণিই তো সব শিখিয়ে দেয় !

অজয়। আর বলতে হবে না, সে আমি বুঝেছি—

কেয়া। আবার অজয়দা···

শশধর। দিদিমণি কয়—গানের সময় খুব কম চিনি দিবি শশ-দা।

অজয়। কেন কেন ?

কেয়া। এই শশ-দা—তুইও অজয়দার সংগে জোট পাকাচ্ছিস !

শশধর। দেখেন দাদাবাবু, সত্যি কথা কওনের জো নাই !—

অজয়। দিদিমণি গানের সময় কম চিনি দিতে বলে ? বুঝলাম। চিনি তো ওঁর গানের কথায় সুরে ঝরে পড়ে কি না।—

কেয়া। এর শোধ আমি নেবো।—

প্রখরকিরণের আহ্বান ভেতর থেকে ভেসে আসে—

প্রখরকিরণ। (নেপথ্যে) শশধর—

শশধর। (ব্যস্ত হয়ে) ওই কত্তাবাবু ডাক দেছেন—আজ্ঞে যাই···

ব্যস্তভাবে কাপটাপগুলো নিয়ে শশধর বেরিয়ে যাবে—অজয় হাসিমুখে কেয়ার দিকে চেয়ে ভালো হয়ে বসে। ভেতরে প্রখরকিরণের কণ্ঠ আবার শোনা যাবে—এবার অনেকটা কাছে—

প্রখরকিরণ। (নেপথ্যে) ওরে পাইপ আর পাউচটা দিয়ে যা—

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রখরকিরণ এসে পড়বেন জামা-কাপড় বদলেছেন, স্লিপিং গাউন পরেছেন পায়ে শাদা কর্টাক-চটি চোখে প্যাশনে। হাত তুলে অজয়কে উঠতে নিষেধ করে উনি ইজিচেয়ারে বসলেন—ইত্যবসরে শশধর পাইপ আর পাউচ নিয়ে আসে।

শশধর চলে যায়।

প্রখরকিরণ। শুনলাম বাড়ি বদলেছো তোমরা।

অজয়। হ্যাঁ, ও বাড়িটায় সুবিধে হচ্ছিলো না। তা ছাড়া এ বাড়িটার ভাড়া কম···

প্রখরকিরণ। Absolutely meaningless!

অজয়। আজ্ঞে—

প্রখরকিরণ। তোমাদের এই ধরণের Defeatist mentalityর কোনো মানে হয় না!

শশধর পাইপ ও পাউচ রেখে গেল প্রখরকিরণ খানিকটা টোব্যাকো পাইপে ভরে নিয়ে দেশলাই জ্বাললেন। তারপর সেটা টানতে টানতে

প্রখরকিরণ। কেন, খরচ কমাবার দরকারটা কোথায়? খরচ কমাবার চেষ্টা না করে রোজগার বাড়াতে হয়। বিজয় মারা যেতে না যেতেই এই। তোমায় না লেখাপড়া যথেষ্ট শিখিয়ে গেছে। সামান্য তিন-চারজনের দায়িত্ব বহন করতে পার না?

অজয় অধোবদনে বসে থাকে—তোমার বাবার আমল আর নেই এখন, এটা তো দেখছো। কাজেই তাঁর মতবাদ এখন একেবারেই অচল। এখনকার দিনে ও সব জোলো আদর্শ চলবে না!

অজয়। একটা কিছু অবলম্বন না করে এগুনো তো সম্ভব নয়।

কেয়া। জান বাবা, কাকাবাবুর ওই রকম তো রুগ্ন স্বাস্থ্য ছিলো, কিন্তু ওঁর সামনে অনেক গুণ্ডা-গুণ্ডারা দাঁড়াতে সাহস পেত না। উঃ, কি তেজ ছিলো!

প্রখরকিরণ। (পাইপ টানতে টানতে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে) তাই না কি?

কেয়া। একটা পয়সা কারুর ছুঁতেন না তো—কাকিমা বলেছেন—সেইজন্যেই সবাই ওঁর ভয়ে কাঁপতো।

প্রখরকিরণ। কিন্তু তারাই আবার পেছন থেকে ছোরা বসাতে ইতস্তত করে নি। তাই না?

অজয়। সেজন্যে পুলিশ-মহল উঠে-পড়ে লেগেছে।

প্রখরকিরণ। (তিক্তহাসি হেসে) ওই লাগাই সার, আসল Culprit কোনোদিনই ধরা পড়বে না। You can write it down on the four walls, ওরা assassin-এর ধারও ঘেঁষতে পারবে না। মাঝ থেকে কি হোলো না অমন একটা দামী জীবন অকালে নষ্ট হোলো আর পঞ্চাশ হাজার টাকাও ঘরে এলো না। হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার টাকা, একশ টাকার নোটে সব payment করবে বলেছিলো···

অজয়। (ব্যগ্রভাবে) আপনি তাহলে চেনেন তাদের?

প্রখরকিরণ। ও চেনার তো কোনো দাম নেই। এ Evidence-এ ইণ্ডিয়ান রকফেলারদের কেশাগ্র স্পর্শ করা যায় না! বিজয়কে অনেক পরামর্শ দিয়েছিলাম, আরে আমরা তো সব বাল্যবন্ধু, বহু চেষ্টা আমার নিষ্ফল হয়েছে। এখনকার দিনে Time-server হতে হবে—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ!··· যাক্, শোনো। আমি তোমার বাবার বন্ধু, নিকট আত্মীয়-তুল্য; তাই তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কিছুটা আছে। আমি তোমার ব্যাপার নিয়ে অনেক ভেবেছি।

অজয়। (সবিনয়ে) বলুন আমায় কি করতে হবে?

প্রখরকিরণ। জানি না বিজয়ের মতবাদ তোমার মধ্যে বাসা বেঁধেছে কি না, কিংবা কতোটা বেঁধেছে। আমার তো মনে হয় তুমি এ যুগের সংগে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে। And why not? Be a Roman while at Rome!

কয়েকটা টান দিয়ে নেন পাইপে।

অজয়। আমায় কি করতে বলেন?

প্রখরকিরণ। সময় আর নষ্ট করা চলবে না। যতো তাড়াতাড়ি পারো আমার সংগে বেরুতে শুরু করো। বিজয় বেঁচে থাকলে I wouldn't bother—আজ সে যখন নেই, এটুকু বন্ধুকৃত্য আমায় করতেই হবে!

অজয়। কিন্তু—

প্রখরকিরণ। কিছু ভাবতে হবে না তোমায়। আমার Party-র মধ্যে যারা বেশ ঝাঁঝালো, তাদের আস্তে আস্তে

তোমায় দিয়ে দেবো। এদের কি করে Tackle করতে হয়, কি ভাবে নিজের পকেটের শূন্যতা দূর করতে হয়, সব শিখিয়ে দেবো। তোমার বাবাকেও এমন অনেক ঘাতঘোত দেখিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু ওটা ছিলো একেবারে Honesty incarnate! এক ধরণের মানুষ আছে যারা cannot but be good! এটা Regular defect!—তাহলে এবার মাকে জিগগেস করে একটা শুভদিনে কাজ শুরু করে দাও! পয়সার অভাব আছে না কি শহরে, অভাব যা কিছু বুদ্ধির! (হাসি) (উঠে দাঁড়ালেন, অজয়ের পিঠটা চাপড়ে দিলেন) আচ্ছা, তোমরা গল্প করো, আমি যাই। (এক পা এগিয়ে) হ্যাঁ রে খুকি, অজয়কে তোর মশল্লা-মোরগ খাওয়ালি না তো একদিন।

কেয়া। অজয়দার যে এক বছর ও সব খেতে নেই!

প্রখরকিরণ। (সবিস্ময়ে) কেন? ও, সেই Primitive custom! Rubbish! (এগিয়ে যান)

অজয়। (উঠে দাঁড়ায়) কাকাবাবু—

প্রখরকিরণ। (ফিরে দাঁড়ালেন) কিছু বলবে?

অজয়। আমি প্রোফেসারী করবো ঠিক করেছি।

প্রখরকিরণ। প্রোফেসারী করবে?

যাওয়া আর হোলো না প্রখরকিরণের ফিরে এসে আবার বসলেন।

প্রখরকিরণ। কি বললে, প্রোফেসারী করবে? ছাত্রদের বিদ্যা দান? Very noble profession indeed! কিন্তু তার বদলে তোমার পকেটের কতখানি ভরবে? নিজের পেটটই কি ভরবে ভেবেছো?

অজয় চুপ করে থাকে।

মাথার ওপর বট গাছের ছায়া এখন আর নেই, সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তোমার ওপর। মা রয়েছেন, ছোটো ভাই আছে, তাকে মানুষ করে তুলতে হবে। তারপর নিজে? নিজের দিকটা ভেবেছো একবারও? আগামী দিনগুলো?

অজয়। অনেকেই তো প্রোফে—

প্রখরকিরণ। (ধমক দিয়ে) না! অনেকের দলে নাম না লেখালেও চলবে। (উঠে পড়লেন) যা বলেছি সেইমতো চলো, দেখবে দুনিয়াটা মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। But don't be emotional! No···never···মনে রেখো chance never comes twice!···

প্রখরকিরণ ধীর-পায়ে বেরিয়ে গেলেন অজয় নীরবে বসে থাকে—কেয়া শেষে তাকে বলে

কেয়া। কি হোলো! এতো ভাববার কি হোলো তোমার অজয়দা?

অজয়। (চিন্তিতভাব জোর করে তাড়িয়ে) নাঃ—কই। কিছু না। (হাসবার চেষ্টা করে)

কেয়া। বাবার Suggestion তো কিছু মন্দ নয়—একবার যদি Income tax-এর case-এ নাম করতে পারো আর তা পারবেই, বাবা তো তোমার পিছনে রইলেন—তা হলে আর···

অজয়। (উঠে দাঁড়ায়) আজকে আমি যাচ্ছি কেয়া···

কেয়াকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই অজয় বেরিয়ে যায়। কেয়া বিস্ময়-ভরা চোখে চেয়ে থাকে এমন সময় প্রখরকিরণ আবার আসেনি।

[ক্রমশ।

হৃদয়ের শেষ সিঁড়িটিতে

॥ শক্তি মুখোপাধ্যায় ॥

শুনেছিলাম তুমি আজ শীতল রাত্রির মত
অন্ধকারে স্থির হয়ে আছো।

সব দুর্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টির অনিয়মে চলা
কুয়াশার দিন
ফুরোবে জেনেও তুমি অন্য হৃদয়ের
গভীরতা মেপে-দেখলে না!

সুতরাং নিজেই নামবো সেখানে···
সব ভীরুতাকে ত্যাগো পিছনে ফেলে
হৃদয়ের শেষ সিঁড়িটিতে
দাঁড়িয়ে দেখবো তুমি—কতখানি স্থির!

আরও অগ্রসর হবো এবং ঘনিষ্ঠ হবো;
অরণির মত উষ্ণ হয়ে
যখন জ্বলবে, ত্যাখো—হৃদয়টা পুড়ে হবে ছাই······
সে বরং ভাল।

শীতল রাত্রির মত অন্ধকারে স্থির হয়ে থাকা
সেও ভাল নয়।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

গুণবতী

রেখা বড়ুয়া

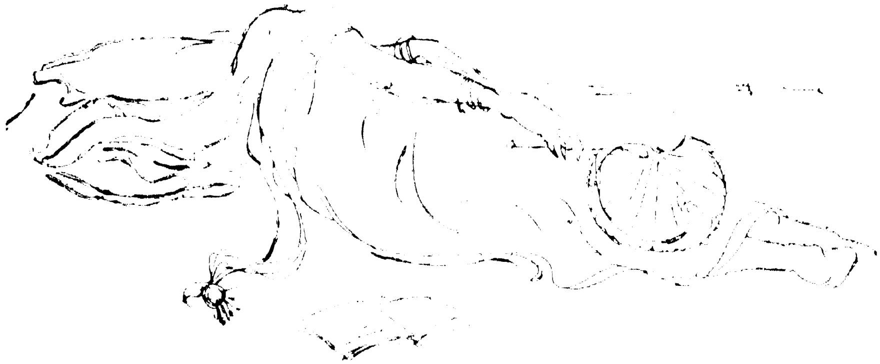
লোক সুধাকান্ত মন্দ নয়, কিন্তু এই এক রোগ। নতুন বিয়ে করবার পরই অবশ্য রোগটা দেখা দিয়েছে। সব কিছুতেই তুলনা। না হয় বাপু তোমার বৌ অসীম রূপবতী গুণবতী। কিন্তু তাই বলে সব কথায় তুলনা দিলেই বা কেমন লাগে মানুষের! এই একটা দোষের জন্যে প্রায়ই আজকাল বন্ধুদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগে ওর। ও যেন প্রমাণ করতে চায় যে, ওর বৌ সব বিষয়ে সবার চেয়ে অনেক উঁচুতে। প্রথম প্রথম এ নিয়ে কৌতুক বোধ করলেও আজকাল আর সবাই সহ্য করে না ওর এইসব কথা-বার্তা। অবশ্য ওকে নিয়ে যে এক-আধটুক্ মজাও উপভোগ করে না এরা, তা নয়। মাণিক আর অমিয় হচ্ছে দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আর আমুদে। তাই মজাটা ওদেরই জমত

—যা বলেছেন সুধাদা, বলে উঠে অমিয়, অলক্ষে বিভূতিকে একবার চোখটিপে নেয় ও, এই ত' সেদিন আপনার বাড়িতে বৌদি চা খাওয়ালেন, আঃ—ফার্স্ট ক্লাস, শুধু এককাপ চায়েই যেন ক্ষিদে-তেষ্টা সব মিটে গেল। ডালপুরীর থালার দিকে হাত বাড়ায় ও।

—এই ছেলেটা, সস্নেহে হাসে সুধাকান্ত, বৌদি বলতে একেবারে পাগল। সেদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছে, শিবানী ত' লজ্জায় একশেষ, বলে মরে গেলেও শুধু চা দিতে পারব না, তুমি ঝপ করে একটু কিমা এনে দাও, মাংসের সিঙাড়া ভেজে দিই খানকতক। আমি বলি আরে বাপু অমিয় ত' ঘরের ছেলে—

—তা বৌমা তা হলে রান্নাবান্না সব নিজেই করেন, জানেন সব তা হলে, বলেন জনার্দনবাবু।

—তা জানে আপনার আশীর্বাদে, মুখে সলজ্জ হাসি ফোটায় সুধাকান্ত, লেখাপড়া করে কখন যে এতসব শিখল তাই ভাবি। জানেন ত' আমি একটু খেতে-টেতে



বেশি। বিভূতির বৈঠকখানায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হয়ত সুধাকান্ত বলে, বিভূতি বৌদিকে বলো চা-এর লিকারটা যেন আর একটু ভিজতে দেন, এতে চা ভালো হয় না।

—কেন পাতলা হয়েছে? দেবে আর এককাপ স্ট্রং করে? বিভূতি জিজ্ঞাসা করে।

—না না আমার জন্যে বলছি না, মানে চা করাটাও একটা আর্ট বুঝলে না, চা ত' সবাই করে, তবে তেমন করে করতে আর ক'জন পারে।

ভালবাসি। তাই প্রতিদিন একটা-না-একটা খাবার করা চাই-ই, আবার সামনে বসে খাওয়ানোও চাই। চতুর্থ ডালপুরীখানাকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয় সুধাকান্ত। ভরামুখে বলে, বাড়িতে লোকজন এলেও ঘরে তৈরি খাবার দিই, বাজারের খাবার ত' আনতেই দেয় না, বলে—

অমিয় হঠাৎ বিষম খায়।

—ষাট ষাট—ওর মাথা চাপড়ে দেয় মাণিক।

কথায় কথায় অফিসে সেদিন আলোচনা উঠল স্ত্রী-

শিক্ষার। ভবতোষবাবু বিপত্নীক। ছেলেমেয়েরা সবাই বড় হয়ে গেছে। দু'টি মেয়ের বিয়ে না দিলেই নয়। এই সব নানা কারণে দ্বিতীয়বার সংসার করবার সুযোগ পান নি ভদ্রলোক প্রচুর ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। বর্তমানে উনি স্ত্রী-শিক্ষা এবং আধুনিকতার অত্যন্ত বিরোধী। আধুনিক মেয়েরা যে অতি নিকৃষ্ট বস্তু এটা প্রমাণ করা জীবনের একটা মহত্তম কর্ম বলে ধরে নিয়েছেন উনি।

মাণিক-অমিয় কোম্পানীর মতে লেডি টাইপিস্ট তপতী মিত্র নাকি ওঁকে দাদু বলে ডাকতে শুরু করেছে কিছুদিন হল। ভবতোষবাবুর নারী-বিদ্বেষের মূলে তপতীরও কিছুটা দান আছে বলে ওরা মনে করে।

—আজকাল মেয়েরা, ভবতোষবাবু বলেন, দু'পাতা ইংরিজি পড়ে যেন ধরাকে সরা দেখছে। ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে ট্রামে-বাসে চড়া চাই, ফড়ফড় করে কথা সর্বদা—মুখে যেন খৈ ফুটছে। না আছে লজ্জাসরম না আছে সহবৎ—

—এটা কিন্তু অন্যায় হল ভবতোষদা, বলেন বীরেন হালদার, ওদেরও ত' কাজ থাকে, না বেরিয়ে কি করবে বলুন। তা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা হেঁসেল আগলে আর কত মানুষ থাকতে পারে, ওদেরও ত' সখটখ আছে। বীরেনবাবুও বিপত্নীক। একটি মেয়ে কলেজে পড়ে ওঁর। পুত্রবধূও নাকি বেশ শিক্ষিতা।

—তা হলে আমিও বলি বীরেনদা এই ত' দেখছি আমাদের বৌদিকে—বলুন না সুধাদা, সুধাকান্তকে ঠেলা দেয় মাণিক। বৌদিও ত' লেখাপড়া জানা মেয়ে।

—আমি আর কি বলব ভাই। আর কেউ না হক তুমি ত' নিজে চোখেই দেখেছ চাল-চলন, কাথাবার্তা কেমন ধীর-স্থির, ডিসেণ্ট। লেখাপড়া ত' নেহাৎ শেখে নি তা নয়, কলেজেও পড়েছে বছরখানেক। তবে ঐ যে বলছি ডিসেণ্ট, কলেজের মেয়েদের মত বাচালপনা আর একা একা রাজ্যি ঘুরে বেড়ানো—ওটি পাবে না আমার ওখানে। তবে বীরেনদা ঠিকই বলেছেন, সখের কথা—অবশ্য ওর সখ পড়াশোনার, ওতেই অবসর সময় কেটে যায়। আউট নলেজ আবার অসম্ভব কি না, তবে সবার ত' আবার তা নয়।

—আরে রাখুন মশাই, মেয়েদের আবার আউট নলেজ, হাসালেন আপনি, বলে বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই তার —তিড়বিড় করে ওঠেন কালিপদ চাটুজ্জে। ভদ্রলোক ডিসপেপসিয়ার রোগী তার ওপর স্ত্রীটি নাকি অত্যন্ত খর-ভাষিণী।

শুধু কালিপদ চাটুজ্জে কেন, আরও অনেকের কাছে আজকাল এসব রকম মন্তব্য শুনতে হয় সুধাকান্তকে। সময় সময় একহাত হয়েও যে না যায় তা নয়, তবে সুধাকান্তর উৎসাহ কমে না তাতে।

সেদিন শনিবার ছুটির পরে অমিয় আর পুলকেশ ঘোষ চলল কলেজ স্ট্রীটের দিকে। তপতী মিত্রর বিয়ে, নেমন্তন্ন করেছে অফিস শুদ্ধ। প্রেজেণ্টেসনের জন্যে একখানা শাড়ি কেনা ঠিক হয়েছে। তাই কিনতে চলল ওরা। মাণিকের কোথায় কাজ আছে তাই ও সঙ্গী হতে পারে না।

—আসুন না সুধাদা, অমিয় ডাকে, আপনি না হয় হ্যারিসন রোড থেকে বাসে উঠে যাবেন।

ওদের সঙ্গী হয় সুধাকান্ত। কয়েক দোকান ঘুরে একখানা নীল রঙের শাড়ি পছন্দ করে অমিয়। পুলকেশেরও পছন্দ হয়।

—নীল শাড়ি ত' নিচ্ছ, গায়ের রঙ কেমন ভেবেছ? সুধাকান্ত বলে, মানাবে ত'?

—না মিস মিত্র ত' ফর্সাই বলতে গেলে, বেশ মানাবে, বলে অমিয়।

—তা নেবে নাও। তবে নীল শাড়ি কি না তাই বলছি, রঙ আবার খুব ফর্সা হলে তবেই না চমৎকার মানায় নীল শাড়িতে, গত পুজায় আমি নিয়েছিলুম একখানা ওর জন্যে—তা নেবে নাও, না মানালেও আজকাল ত' সবাই পরে।

শাড়ি কেনা শেষ হলে ওরা চলতে থাকে। শাড়ির প্যাকেট অমিয়র হাতে। সিগারেট ধরিয়ে গল্প করতে করতে চলে ওরা। শনিবার, মনমেজাজ হাল্কা সবারই। হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে পুলকেশ ঘোষ বলেন একটু এগিয়ে চলুন ত' আমি একটা ছোট রেক্সিনের সুটকেসের দামটা দেখব একবার। মেয়েটাকে স্কুলে দেব, একটু দামটা দেখে যাই। সুটকেসের দাম দেখে ফের বাসস্টপের দিকে এগোয় ওরা।

ফুটপাথ ঘেঁসে চলছিল, হঠাৎ কি একটা তরল পদার্থ ছিটকে এসে পড়ে ওদের মাঝে। মুহূর্তে একটা লাফ মারে অমিয়। দেখা যায় খানিকটা পানের পিচ। পড়েছে ঠিক সুধাকান্তর বুকপকেটের ওপর—আর তার ধারা নেমেছে হাতখানেক জায়গা জুড়ে।

—ছি, ছি, ছি! কি সব অন্যায়, গেছে একেবারে জামাটা। সহানুভূতি জানান পুলকেশ, দেখেশুনে ফেলা উচিত ছিল ভদ্রমহিলার।

—ভদ্রমহিলা, রোষকষায়িত নেত্রে ওপরের দিকে চায় সুধাকান্ত, বে-আক্কেলে মেয়েছেলে।

—ছেলে না মেয়ে, কি করে জানলেন? প্রশ্ন করে অমিয়।

—আরে মেয়েছেলে কি আর দেখতে পেয়েছি, দেখলাম খালি শাড়ির আঁচলটা, বলেন পুলকেশ।

—একটু চূণ লাগিয়ে দিন পানের দোকান থেকে, দাগ উঠে যাবে, অমিয় মোড়ের পানের দোকানের দিকে পা বাড়ায়।

—দাঁড়াও আগে এর একটা বিহিত আমি করব, এই জন্যেই মেয়েছেলেদের একটু লেখাপড়া শেখা দরকার, যত সব অশিক্ষিত ও অসভ্য। চল ত' অমিয়, সুধাকান্ত এগোয়।

—আরে যেতে দিন দাদা, বলেন পুলকেশ, মেয়েছেলের ব্যাপার!

মেয়েছেলে ত' মাথা কিনেছে নাকি, মেয়েছেলে ত' আমাদের বাড়িতেও আছে, তা বলে এমন বে-আক্কেলে!

দ্রুতপদে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়ায় সুধাকান্ত তারপর জোরে জোরে কড়া নাড়ে। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন পুলকেশ ঘোষ আর অমিয়। দরজা খোলেন এক মোটাসোটা ভালমানুষ ভদ্রলোক।

—বলি হাঁা মশাই এটা কি? নিজের জামার রক্তিম অংশের দিকে আঙুল দেখায় সুধাকান্ত, এটা কি রকম ভদ্রতা জানতে পারি কি? ভদ্রলোকের বিমূঢ় ভাব উদ্দীপিত করে তোলে সুধাকান্তর বীরত্বকে।

—আজ্ঞে আমি ত' ঠিক বুঝতে পারছি না, বাড়ির মেয়েরা হয়ত—শুকনো মুখে বলেন ভদ্রলোক।

—আজ্ঞে হাঁা, মেয়েরাই। দেখুন মশাই আমাদের বাড়িতেও মেয়েছেলে আছে, আমার স্ত্রীও পান খান, কণ্ঠস্বরে গুরুগম্ভীর ভাব আনে সুধাকান্ত, তা বলে এমন অভদ্র কাণ্ড করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না, আসল কথা হল ডিসেন্সি। সুধাদা—জামার খুঁট ধরে টানে অমিয়, সুধাকান্ত দৃকপাত করে না। বলে, সেন্স অব ডিসেন্সি আছে বলেই তিনি এমন কাজ করবার কথা ভাবতেও পারেন না। অথচ দেখুন—মশাই-এর উচিত বাড়ির মেয়েদের একটু সমঝে দেওয়া, ওর কথায় বক্তৃতার সুর লাগে।

—কে রে বাপু এত লম্বা লম্বা কথা, ওমা তুমি, একি কাণ্ড। তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর দ্বিধাবিভক্ত হয়েই থাকে শিবানীর।

—কি হল, কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না ত', ওগো—বিপন্নভাবে অন্দরের দিকে চায় ভদ্রলোক।

—এ ছি ছি ছি! গেছে একেবারে জামাটা, তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন সং-এর মত, ভেতরে এসো—কথা বলে শিবানী।

—তুমি? তুমি এখানে? গলা চিরে আওয়াজ বেরোয় সুধাকান্তর।

—ওমা শোন কথা, এ যে আমাদের সুরমার বাড়ি গো, ভাবলুম ঘুরে যাই একবার, ঝি ত' রইলই বাড়িতে রুটিটুটি করে দেবেখন তোমাকে। তা তুমি যে এমন—অমন করে চেয়ে থেকো না বাপু, কি করে জানব যে তুমি ঠিক এই সময়েই নীচ দিয়ে যাবে, জানলে না হয় দেখেশুনেই ফেলতুম। মুখের ভার হাল্কা করে এসেছে বলেই বোধহয় অনর্গল বলে চলে শিবানী।

কি হল আসবে না দাঁড়িয়েই থাকবে ওখানে সারাদিন, ভদ্রলোককে ঠেলে নিজেই এগিয়ে আসে সে। তার পিছনে দেখা যায় তথাকথিত সুরমাকে। তার হাতে একটি সাজা পান। সময় অভাবে মুখে দিতে পারে নি।

বাসস্টপে এসে দম নেয় অমিয়। বলে, জাস্ট এ্যাট দি রাইট মোমেন্ট, ঠিক সময় কেটে পড়া গেছে, কি বলেন পুলকেশদা।

—তা আর বলতে, অবরুদ্ধ হাসির বেগকে মুক্ত করে দেন পুলকেশ ঘোষ।

পণ্ডিত নেহরু

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

হে নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী বীর!
তোমার চিতার ধূমে পরাজিত লাঞ্ছিত জাতির,
বিজয়কেতন ওড়ে, তুমি দেশ সেবার বিগ্রহ,
মূর্ত তুমি কর্মযোগ! চিত্তে চিন্তা ছিল অহরহ,
সদ্য স্বাধীনতা লাভ' কিসে দেশ হ'বে বলীয়ান
কেমনে লভিবে পুনঃ এ ভারত বিশ্বের সম্মান।

হর্ষোৎফুল্ল মুখে তব সদা স্নিগ্ধ প্রেমের গরিমা;
নিরখি মরণ তাই হারায়েছে নিজের মহিমা।
তুমি ত' অমর!
ভারত অন্তরাকাশে তুমি দীপ্ত ভারত-ভাস্কর!
অপরূপ অনবদ্য তোমার সে 'ভারত সন্ধানে'
আহিতাগ্নি হে ব্রাহ্মণ! শ্রদ্ধাঞ্জলি দেই মুগ্ধ প্রাণে।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

মালতী গুহরায়

বহুশ্রুত স্বপ্নরাজ্য ভূস্বর্গ কাশ্মীর। দেখার সুযোগ এল হঠাৎ। শরীর সুস্থ নয়। হাতে একটা অস্ত্রোপচারের ফলে বাঁ হাতটি প্রায় অকেজো। তবু মন বাধা মানলো না। রঙিয়েই উঠলো বরং কাশ্মীর যাত্রার নাম শুনেই।

থাক উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ। এক সকালে ট্রেন ধরলে পরের সকালেই পাঠানকোট। সেখান থেকেই ট্রেনের সংযোগ শেষ। ধরতে হয় বাস। আর বাস যদি সারাদিন ঠিকমত না থেমে চলে, তবে একদিনেতেই পৌছান যায় শ্রীনগর। নইলে পথে বাটোট কিংবা বাণিহালে রাত কাটিয়ে যেতে হয়।

দিল্লী থেকে এ্যারোপ্লেনও ধরা যায়। সময় ও পথশ্রম তাতে কিছু বাঁচে। কিন্তু রসদ তো তাতে বেশ কিছু বেশি লাগেই, তা ছাড়া কাশ্মীরের পথের ছড়ানো যে সৌন্দর্য, তার থেকেই বাদ পড়া যায়।

কাশ্মীর একটি পার্বত্য উপত্যকা-ভূমি। সমুদ্রতীর থেকে এর উচ্চতা ৬২০০ ফিট। পাহাড়ের মাথায় এমনতরো এক সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, এ যেন চোখে না দেখলে ধারণা করাই কঠিন। পার্বত্যরাজ্যের এ এক বিস্ময়।

সাধারণত পাহাড়ের পথ দৃশ্য ও দুর্গমতায় অনেকটা একই। কিন্তু কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা কোন পাহাড়েরই হয় না। পাঠানকোট দিয়ে চলতে সেচবিভাগের খালগুলিই প্রথমে মন মাতায়। এ যেন কাটা খাল নয়, নদী। পথের মাঝে মাঝেই এর জলধারার শোভা। মাঝে মাছে তার উপরে বাঁধানো সেতু। তারই নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গপথে জলগুলি যেন আছাড় খেতে খেতে চলে। সাদা দুধের মত ফেনা দেখা যায় জলের। দুর্দান্ত তার স্রোত। খালের ধারে দূর থেকে দেখা যায় নানা রঙের পোষাকে ওখানকার মেয়েরা ছড়িয়ে বসা। কেউ বা স্নান করছে, কেউ বা কাপড় কাচছে, কেউ বা করছে তার আয়োজন। পথ চলতে মনে হয় ওরা বুঝি মানুষ নয়, পাহাড়ী নদীর তীরে একগুচ্ছ ফোটা ফুল।



আলাপাথরের জমাট হ্রদ
উচ্চতা ১৫০০ ফিট

দু'ধারে ঝোপঝাড় ও গাছপালার সারির মধ্য দিয়ে মসৃণ পথে বাস চলে। পথে সেচ খালের অন্ত নেই যেন। একস্থানে দেখা যায় কোনকালে বয়ে-যাওয়া শুকনো নদীর নুড়ি-বিছানো বিশাল এক পথ। রবি নদীকে ভিন্নপথে বইয়ে দেওয়ায় নাকি এর এই পরিণতি, সেই রবির শুকনো শাখা প্রশাখা অতিক্রম করতে হল আমাদের বারকয়েক মস্ত মস্ত সেতুর উপর দিয়ে।

লক্ষ্মণপুর এসে প্রথম বাস থামলো। বলতে গেলে এখান থেকেই পাহাড়ী চড়াই কিছু সুরু। অত্যন্ত সুন্দর রাস্তা। কিন্তু কোথাও আবার এতই ঢেউ খেলানো, যে, চলার পথে বাস আমাদের দোল খাইয়ে দেয়। ক্রমে একদিকে দেখা দেয় পাহাড়ের সারি, আর অপরদিকে খানিক বাদে বাদেই পাথর বোঝাই খটখটে শুকনো নদীর পথ। সে যে সংখ্যায় কতো, তার বুঝি আর সীমা সংখ্যা নেই। অত বিশাল চওড়া নদীর শুকনো বুক দেখে কষ্টই হয়। কৃত্রিম রাস্তায় এ নদীকে বইয়ে না দিলে না জানি কত উদ্দাম গতিতে, উচ্ছল নৃত্যে, এ পথে সে ছুটতো।

লতা, গুল্ম, গাছপালা সহ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পথের উভয় পাশে রেখে বাস আমাদের ছোটে মনুষ্যবসতি কোথাও বড় একটা চোখে পড়ে না। কদাচিৎ দেখা যায় খড়ের ছাউনিযুক্ত দুটি একটি মাটির ঘর। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে কোথাও বা চোখে পড়ে ছোট্ট ছোট্ট জলাশয়। কোন গাছে দেখা যায় ঝুলে থাকা অসংখ্য বাবুই পাখীর বাসা। গরু মোষ চরে বেড়াচ্ছে বা কোথাও ঘন সবুজের মাঝে। জীব জগতের অস্তিত্ব যেন ওরাই এ পথে জানায়। পথ চলতে মানুষ চোখে পড়ে না একটাও। এই পশুগুলি যে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে ভাবতে অবাকই লাগে।

একটা বাঁকে দেখা গেল সুরকী-গোলা লাল জলের একটা ধারা। হঠাং মনে হয় রক্তনদীই বুঝি। আরো পরে দেখা যায় বিশাল নদীর আরো এক শুকনো পথ। পাথরে পাথরে বোঝাই। তারই ফাঁকে ফাঁকে পথ করে নিয়েছে ঐ রক্তনদী। চলছে সে বিভিন্ন ধারায়। কোনটি বা তার বিনুনুর মত সরু, কোনটি বইছে খানিক প্রশস্তগতিতে।

পথ চলতে ঘুরেফিরে বারকয়েক দেখা হয় ঐ নদীটির সাথে, উঝ যার নাম, কোথাও শুকনো, কোথাও ভেজা কোথাও

ত্রিধারা চতুর্ধারায় বয়ে যাওয়া কালে। মাইল ত্রিশেক এগিয়েই দেখা দিল ক্যাকটাস গাছের সারি। অসংখ্য নানা জাতীয় ক্যাকটাসের ঘন বন যেন। দুই-এক জায়গায় কিছু কৃষককেও দেখা গেল লাঙ্গল চষতে। মাটিগুলি সব লাল। হাম্বা বলে একটা গ্রাম পড়লো পথে। কতক্ষণ পর যে দেখা গেল জনবসতি। কাঁচা-পাকা বাড়ি, দোকান পসার, পেট্রোল পাম্প, চায়ের দোকান, সবই রয়েছে তাতে।

একপাশে পাহাড়ের সারি রেখে আমরা এতক্ষণ এগোচ্ছিলাম, এবারে তারা যেন সরে এল সম্মুখে। এক-একটা করে সেতু অতিক্রম করে এসে পাহাড়দের যেন আর যথাস্থানে পাই না। শুধু যে তারা জায়গাই বদলায়, তা নয়—বদলায় কিছু আকৃতিতেও। এই খানিক আগে দেখা বাঁ দিকের পাহাড়ের সারির জায়গায় তাইতো দিব্যি জাঁকিয়ে আছে গুল্ম ও ঝোপ-ঝাড় সহ সমতলভূমি। আর দূরে ডানদিকের এককোণে সরে গেছে ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে পাহাড়েরা। পাহাড়ে-নদীতে, সমতলে অসমতলে, ঝোপ ঝাড়ে ও বৃক্ষরাজিতে সমানেই যেন চলেছে ভেল্কির খেলা। এই আছে তো এই নেই। অথচ ঘুরে-ফিরে কিন্তু বারে বারেই দেখা দেয়, সাথী হয় তারা। হারিয়েও যায় না হাঁফিয়েও পড়ে না। শ্রান্তিক্লান্তিহীনভাবে সাথে সাথে চলে শ্রান্ত পথিকের পথক্লান্তি বিদূরিত করার তরে যেন অনলস চেষ্টা।

কত যে নদী সেতু দিয়ে পার হতে হয়, কত সেতু যে বাঁধা আছে আরো, সীমাসংখ্যা নেই কোন তার। যানবাহন চলে চলে কোথাও বা পথ গড়ে নিয়েছে শুকনো নদীর নুড়ি-বোঝাই বুকে। ভিন্ন ভিন্ন জলধারা, ভিন্ন তাদের গতি, বিভিন্ন তাদের নাম। শুধু তাই নয়, তাদের জলের রংও কিছু পৃথক। সরু-মোটা একধারা দু'ধারা বহুধারায় তাদের চলা। বিস্তীর্ণ পাথুরে রাস্তায় কোথাও বা চলে তারা লুকিয়ে। বিশেষ লক্ষ্য না করলে বোঝাও যায় না।

পথের এ ধারে সেধারে চোখে পড়ে উঁচানো গলা গুটি কয়েক উট। বিস্ময় লাগে, বালুপ্রান্ত ছেড়ে এ পাথুরে পথে এরা কেন? কিন্তু পথের ধারের ক্যাকটাসের ঝোপই বলে দেয়, ওরা এসেছে তাদেরই সস্নেহ আহ্বানে।



• খিলান মার্গ হোটেল রেস্টুরেন্টের সম্মুখস্থ ময়দানে। দক্ষিণে লেখিকা

একসময় বোঝা গেল বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে এলাম। ক্যাকটাসের অন্ত এখনো হয় নি, ঘন ভাবটাই শুধু কম। চোখে পড়ে তারই মাঝে কিছু কৃষিক্ষেত্র। ইক্ষু ও ভুট্টার চাষ। দু'-চারটে ইটের ভাঁটিও রয়েছে পথে। তারই আশে পাশে কাঁচা পাকা ইটের অনেক স্তূপ। কোথাও বা রয়েছে কাঠ-তক্তার আড়ৎ।



• আজকের যুগে মেয়েদের দরজা সর্বত্র অবারিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণারত নারী

তাওই সেতু অতিক্রম করেই দেখা দিল জম্মু। ঢুকতেই বাঁ দিকটায় ঝলসে ওঠে একগুচ্ছ মন্দিরের সোনালি চূড়া। মনকে যা নাকি প্রসন্ন করে তোলে। জম্মু শহরকে মনে হ'ল যেন বেশ কিছু প্রাচীন। সুন্দর সাজানোও নয় তেমন। জুতো ছাতা বাসন-কোসন থেকে নানা রকমারী বেসাতিপূর্ণ দোকানের পাশ দিয়ে বাস আমাদের চলে। এর পরই হঠাৎ শুরু হয় চড়াই। ঘর বাড়ি দোকান পসার সব নীচে পড়ে থাকে, আমরা উঠে আসি অনেকটাই উপরে। খানিক দূর চলে বাস থেমে যায় রাজ-অভ্যর্থনা মন্দিরের সম্মুখে। ট্যুরিস্ট রিসেপশান সেণ্টার, যাকে জানে লোকে (Tourist Reception Centre)। যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য যদিও এগিয়ে নেই কেউ এখানে, বাসের এটাই সাময়িক বিশ্রাম স্থান, সাথে সাথে আমাদেরও।

হাত মুখ ধুয়ে, খাওয়া দাওয়া সেরে, ঘণ্টা দুই বাদেই আমরা বাসে এসে চাপি পথের তথ্যাদি সব সংগ্রহ করে। সমস্বরে যাত্রীরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'জয় অমরনাথজীকি জয়!' বাস আবার তার চলা শুরু করে।

এবারে যেন মনে হ'ল, আমরা কিছু নামছি। শহরের বসতি ছাড়িয়ে শুকনো নদীর শাখা-প্রশাখা অতিক্রম করে, নাম জানা না-জানা নদী পেরিয়ে বাস ছোটে সমতল রাস্তায় নানা সেতুর উপর দিয়ে। কিছুক্ষণ গিয়ে আবারো দেখা দিল চড়াই।

বাঁদিকে পাহাড়ের গুচ্ছ, ডাইনে তাওই নদীর বিস্তার দেখতে দেখতে চলা। ক্রমেই পাহাড় আসে ঘনিষ্ঠ হয়ে। কোথাও বা দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে বিগত দিনের ঝর্ণার চলার রাস্তা, কোথাও বা ঝরছে জল। ঝোপঝাড়ের অন্তরালে

এ উদাসীন শুকনো নদীর পথ বা রয়েছে কোথাও। বাসের বিশ্রাম নেই। যন্ত্রদানব ক্ষুদ্র মানুষের হাতে বন্দী। চড়াই ওঠাকালে শোনা যায় তার অনিচ্ছা প্রকাশের সরোষ তীব্র গর্জন। কিন্তু যান্ত্রিকজীবনের আর্তনাদ, কেই বা—গ্রাহ্য করে?

হাতে নোট বই, সাথে ঝর্ণা কলম। এদিকে ওদিকে তাকাই, বিস্ময়ঘেরা স্বপ্নরাজ্যের টুকরো-টাকরা স্মৃতি টুকে টুকে রাখি। ভয় পাছে হারিয়ে ফেলি, পাছে বা ভুলে যাই। পেছন থেকে বিদ্রূপ কণ্ঠ ভেসে আসে কানে 'লিখুন, লিখুন, সব লিখুন, পেছনে তাকিয়ে আমাদের কথাও লিখুন, বাদ দেবেন না যেন কিছুই।'

বিরক্তিতে ভরে ওঠে মন। ভাবি মানুষ হতে কতো যে আমাদের বাকি!

জম্মু ছাড়বার পরেই শুরু হয় প্রকৃতির রাজ্যে শুধু প্রকৃতিরই খেলা। মনুষ্য চিহ্ন আবারো উধাও। এমন কি রাস্তার ধারে-কাছেও একটা মানুষ চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে বরং মিলিটারী—যানবাহনের গতায়াত। পথে পথে প্রায়ই তারা আমাদের গতিরুদ্ধ করে। কনভয় আকারে



● চোখের দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ ও প্রখর শরীরও তেমনি সুস্থতার প্রতীক। লীনা হ্যাটফিল্ড এ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিস ফিজিক্যাল এনাটমেস পুরস্কার লাভ করেছেন

তাদের চলা। ট্রাকের পর ট্রাক, গাড়ির পর গাড়ি, তার আর শেষ নেই যেন। ক্রমে কয়েকটা ইতস্তত ছড়ানো কুঁড়েঘর নজরে আসে। আমাদের দেশী কুঁড়ে হতে এগুলি যেন কিছু স্বতন্ত্র। দু'চারটিতে রয়েছে খড়ের ছাউনি, কিন্তু বেশির ভাগই ঢালাই ছাদ। তক্তা ইট পাথর ও মাটির আস্তরণে গড়া। দেয়ালগুলিও মনে হ'ল সেভাবেই গাঁথা। কোন কোন ছাদের মাটির আস্তরণে যেন আলবাঁধা। তার উপরে দেখা যায় ঘাস জাতীয় কিছু চারা। সেগুলি খাদ্যশস্য কি আগাছা, তা চলতি বাসে বোঝা যায় না। কোন কোন ছাদে আবার মানুষ বসে কিছু করছে। দূর থেকে দেখে মনে হ'ল বুঝিবা কিছু বুনছে।

শুধু যে পাহাড়ে নদীতে গাছ গাছড়া নিয়ে সমতলে অসমতলের ভেল্কি দেখতে দেখতেই ওঠা, তা নয়। পাহাড়ের চড়ায় উঠতে এই দেখা যায় একপাশে গভীর খাদ, যাতে উঁকি দিলেও মাথা ঘোরে, আবার সহসা তা যে কোথায় মিলায়! পরিবর্তে ভেসে ওঠে এক সমতলক্ষেত্র। প্রসারিত দৃষ্টি পথের একঘেয়েমীতে কোথাও ক্লিষ্ট হয় না। দৃশ্যের পর দৃশ্য নূতন নূতন রূপে এমনই অদল-বদল হয় যে, দীর্ঘপথ অতিক্রমের কোন কষ্ট অনুভবই হয় না। অনেক দূরে এই যদি দেখা দিল নীলাভ আস্তরণে ঢাকা আবছায়া এক পাহাড়ের গুচ্ছ, খানিক বাদেই তারা স্পষ্ট হয়ে কাছটিতে আসে।

এক-একটা নদীকে আমরা ছাড়িয়ে চলে আসি, কিন্তু নদী আমাদের ছাড়ে না। লুকোচুরি খেলতে খেলতে ঘুরে-ফিরেই আমাদের পথের ধারে আসে। চোখের তারায় চেয়ে তারা যেন আমাদের মনের কানে চুপি চুপি গুনগুনিয়ে বলে—

'হারাই নি গো আমি, যাই নি কোথাও তোমায় ফেলে।
তোমারই মায়ায় আমি চলেছি তোমারই সাথে সাথে।'

অনেকটা চড়াই পথ উঠে দেখা দিল এবার বিশাল ছড়ানো এক সমতলভূমি। সবুজ মখমলের গালিচা বিছানো তাতে। ধানের দিগন্তজোড়া ক্ষেত। যতদূর চোখ যায়, মসৃণ স্নিগ্ধ হরিৎ সবুজের যেন এক মেলা। অদূরে গুটিকয়েক পাহাড়ও নজরে আসে। যোগীবেশ যেন তাদের। শ্যামলিমাপুণ্য লালচে গেরুয়া তাদের রং। মনে হয় বালু সুরকির মস্ত ঢিবি, ধসে যাবে একটু ধাক্কা দিলেই।

খানিকবাদে আর একধাপ উঠে আসে বাস। সাথে সাথে আমরাও। নীচে পড়ে থাকে যত সব নদ নদী ও শস্যশ্যামলা ভূমি। ছোট ছোট পাহাড়ের গুচ্ছ নেয় পরিবর্তে

আমাদের সঙ্গ। পর্বতের বিশালত্ব এযাবৎ নজরে পড়ে নি কোথাও। গাদাগাদি করে কতগুলি পাহাড় কাছেই এক জায়গায় শোওয়া। দেখেই মনে হয় ঝলসানো রোদ্দুরে ওরা বুঝি সব তাতিয়ে নিচ্ছে নিজেদের দেহ। কিন্তু বাসের ঘরঘরানিতে খানিক বাদেই তারা পালায়। কাছে-কিনারে তাই দেখা যায় না কোথাও।

যতই উঁচুতে উঠি, খাদ কখনো গভীর হ'তে গভীরতর হয়ে শঙ্কায় উদ্বেগে ভরিয়ে দেয় না চিত্ত। গভীরতা কখন সমতায় আসে, শান্তি ও স্বস্তিতে ভরিয়ে তোলে মন। পাহাড় নদী ও শ্যামল শস্যক্ষেত্রের বিচিত্র শোভার লুকোচুরি ও খেলা দেখতে গিয়ে তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে যখন দৃষ্টি—রহস্যঘন দুর্ভেদ্য বন এসে আচ্ছন্ন করে দাঁড়ায় দর্শনপথ।

এবারে এতক্ষণে ফুটে ওঠে পাহাড়ের গম্ভীর বিশালত্ব, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর। পাহাড় যেন পর্বত হয়। কত যে ঝর্ণা ঝরে গেছে এত দীর্ঘ সময়ের মাঝে, তার ঠিকানা নেই কোন। এক জায়গায় দেখেছি লাল ও স্বচ্ছ জলের ধারাযুক্ত পৃথক দু'টি নদীকে চলতে পাশাপাশি। চাদরকোট্রি বললো বুঝি ওরা তার নাম। আরো কত নদী যে ঘুরে ফিরে পথে জিরিয়ে দেখা দিয়ে গেল, অন্ত নেই কোন তার। বীরহুন, টিকরী, দু'ধার রকমারী তাদের নাম।

পাহাড় সুন্দর কি নদী সুন্দর, নদীর বুকের শ্বেত নুড়ি-বিছানো পথ সুন্দর, কি সবুজ মখমলে ঢাকা উপত্যকাভূমি সুন্দর, গাছের ঘন শ্যামলিমা সুন্দর, কি পাহাড়-ঝরা ঝর্ণা সুন্দর, প্রকৃতির রাজ্যে এমনতরো তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রের এমন অপরূপ সমাবেশ পৃথিবীতে বুঝি অন্য কোথাও মেলা ভার। [ক্রমশ।

ধাত্রী

প্রতিমা রায়

ক্লান্তি আমার ভুলিয়ে দিও প্রভু।
রাত্রি এখন গভীর হোল কত,
শিয়র ধারে যে দীপ ছিল জ্বালা
শিখা তারও আসছে হয়ে নত।
সামনে আমার রোগীর পাণ্ডুমুখ
দীর্ণ করে দিচ্ছে কঠিন বুক।
অশ্রু তুমি রেখো ধৈর্যটুক্
সহিষ্ণুতার কঠিনতম ব্রত
রাত্রি আরো গভীর হোল কত।

আকাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে চায়
কৃষ্ণা-তিথির বিবর্ণময় চাঁদ,
ঘরের মাঝে সভয়ে দেখি হায়!
মৃত্যু কখন বিছালো তার ফাঁদ।
একটু আগেই যেথায় ছিল প্রাণ
শেষ করে তার সকল অভিমান
কোন দুরাশার ব্যাকুল অভিযান?
এমনি বটে মৃত্যু-প্রেমের ছাঁদ
দেখছে চেয়ে বিবর্ণময় চাঁদ!

যে গেল সে নয়ত আমার কেহ,
রোগ নিয়ে সে এসেছিল কাছে
ধাত্রী আমি, ছিলেম সেবারত
তার তরে কি মর্মবেদন আছে?

এই ঘরেতে এমনি কত আরো
এলো, গেল বাঁচন, মরণ তারো
আজ এ চোখে ছায়াছবি যারো
আঁধার আলোয় গভীর হয়ে নাচে।
রোগ নিয়ে যে এসেছিল কাছে।

ধাত্রী আমি। বজ্রকুসুম প্রাণে,
রোগীর তরে করুণতম আঁখি
কর্তব্যের আচ্ছাদনে ঢেকে
মরণ 'পরে কঠোরতা রাখি।
তাই এ নয়ন রইল অশ্রুহীন
হৃদয় সেও হয় নি মোহলীন
অতল তলে কোন চেতনা ক্ষীণ
রয় যে তাকে কেমন করে ঢাকি?
আবেগবিহীন করুণতম আঁখি।

স্তব্ধ হয়ে বোঝাই অবোধ মনে,
রোগীর কাছে 'মৃত্যু' মরণ নয়—
অধীর রোগের বক্ষে প্রেমিক সে যে
শান্তি চরম গভীর আবেশময়।
আজকে যে তার সুখের বাসর রাতি,
নাই বা সেথায় রইল মাতামাতি,
শান্ত চিতে নিয়ে পরম সাথী,
ভূমার বুকে হয়েছে সে আজ নয়,
মুক্তিবরণ, এ তার মরণ নয়।

ও কে ?

আভা পাকড়াশী

একটা বড় সাদা রুমাল। রুমালটা আমার চেয়ারের পাশ থেকেই কুড়িয়ে নিল যেন—হিন্দিতে বলল, 'বাবুজী ইয়ে আপকো রুমাল।' আপনার রুমালটা পড়ে গেছে, এটা আপনার রুমাল ?

ওর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকাতে আমাকে ইসারায় রুমালটা দেখতে বলল। লিপস্টিক দিয়ে লেখা রয়েছে, আমায় তুমি চিনতে পেরো না।

হাত বাড়িয়ে রুমালটা নিয়ে পকেটে রাখলাম। চেয়ে দেখলাম ওর চোখে বিনয়।

বড় বড় টানা টানা চোখে সুর্মার ছোঁয়া। হাতে মেহদির ছোপ। সেই কোঁকড়া চুলে ঘেরা তরমুজি রং মুখ। সুডৌল হাতে একরাশ কাচের চুড়ি। কানে মস্ত লম্বা জড়োয়ার দুল দুলছে, মাথার ওপর দুলের মুক্তোর টানা, গলায় জড়োয়া নেকলেশ ঝকমক করছে। কিন্তু ঐ অদ্ভুত ঘড়িটি আর আংটিটা কোথায় লুকোবে ? তাই বলেছে—চিনতে পেরো না, কিন্তু কেন ?

দামী জাফরাণী রং সাটিনের সালোয়ার আর সেই রং-এর মুনলাইট কাপড়ের কামিজ। মাথায় চাঁদনী চমক চুন্নী। রং যেন আরও ফেটে পড়ছে। পায়ে সবুজ জরীর নাগরা। যেন বেহেস্তের হুরী। আবার মুখ পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে চুন্নীতে। ঐ আসছে লোকটা, হাতে তার জলের গেলাস।

এসে অবধি শুনেছি—ম্যয় বহুত পিয়াসী হুঁ, বিনা পানি সে এক পল ভি আউর জী নহি সকতি। আমার তেষ্টা পেয়েছে, বড় তেষ্টা, জল ছাড়া আর একদণ্ডও বাঁচব না। এমন রঈস ঘরের খুবসুরত বিবি, তার কথা না শুনে, হুকুম তামিল না করে পারে ? তা সে যত বড় অফিসারই হোক। বাইরে পাহারা রেখে লোকটা জল আনতে গেল। সেই ফাঁকে ও নিজের মুখটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে রুমালটা আমায় ধরিয়ে দিল, বলল—চিনতে পেরো না। কিন্তু কেন ?

যদি চিঠিই লিখল তো পোস্ট না করে ভ্যানিটি ব্যাগেই বা রাখতে গেল কেন ? তাই না সেই ঠিকানা ধরে এরা আমায় টেনে এনেছে। কথায় বলে,—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। পুলিশের নজরে পড়লে আর রক্ষে আছে ? ধন্যি মেয়ে এই মঞ্জু। যা চাতুরী খেলছে; যেন দ্বিতীয় বিমলা। কিন্তু তা তো নয়। ও তো আয়েসা। আমি ওর জগৎ সিংহ। কিন্তু আমার তিলোত্তমা নেই। তবু ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ ও ছিল ওসমানের গৃহিণী। সে যে আমার বন্ধু হয়েছে, বন্ধু হয়েছে এখন, তায় আমার অফিসের বস। কি বলে এখন তার সঙ্গে আমি অসিযুদ্ধে নামি ? শেষে না খেয়ে মরব ? কি জানি কি পেয়েছিল ও আমার মধ্যে। যত ওকে স্থিতি করতে চেয়েছি ততই ও অস্থির হয়েছে। কল্যাণের পথে পাঠিয়ে দিয়েছি, আবার ফিরে এসেছে এই অলুক্ষণে অকল্যাণের কাছে। এই 'কল্যাণ সেন'-এর নাম-ঠিকানা লেখা খামটাই আমাকে টেনে এনেছে এখানে। দেখি কতদূর গড়ায় ?

পাতলা চুন্নীর মধ্যে দিয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে। অন্যমনস্কে আমি ওর চিঠিটা খুলে ফেলি—শেষের লাইনটায় চোখ আটকে যায়—'বার বার ছুটে ছুটে কেন যাই তোমার কাছে বুঝতে পার না! অহঙ্কারটা একটু কমাও, তবে বুঝতে পারবে। কি ভেবেছ তুমি ? জান না ? কৃষ্ণ শুধু রাধার নয়; যশোদারও। তুমি তোমার কল্যাণরূপ নিয়ে কৃষ্ণ সেজে বসে থাক, আমার বলার কিছু নেই, কারণ আমার তো গোপাল আছে।'

সত্যিই তো আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন একটা পর্দা সরে গেল।

এবার পুলিশ অফিসারটি এসে আমাদের সামনের চেয়ারে বসলেন। স্থানটি দমদম এয়ারপোর্টের পুলিশ-অফিস। আর আমাকে ধরে এনেছে সেই পার্ক সার্কাস থেকে। প্রথম প্রশ্নই আমাকে,—কি মিস্টার সেন, আপনার কি চেনা মনে হচ্ছে না এঁকে ? এঁরই ভ্যানিটি ব্যাগে তো চিঠিখানা ছিল। উনি যদিও বলছেন ও চিঠি ওঁর লেখা নয়। ওঁর এক বাঙালী বান্ধবী ঐ মঞ্জু দেবী চিঠিটা ওঁকে পৌঁছে দিতে দিয়েছিলেন। উনি বাঙলা লিখতেই জানেন না। তবে বুঝতে পারেন। নাম বলেছেন—মুনোয়ার সুলতানা। উর্দু তো নিজেই শুনছেন—কিন্তু মশাই আমাদের ডাউট হচ্ছে, উনি খাঁটি বাঙালীর মেয়ে। ঐ মুসলমান ছেলেটিকে পাকিস্থান পাঠাবার জন্য মিথ্যে করে তার মা সেজেছেন। ছেলে তো প্লেনে করে উড়ে গেল তার মাসীর কাছে বিনা পাসপোর্টে। আর আমরা পেলাম এঁকে। দেখুন তো চিনতে পারেন না কি ? সেইজন্যই আপনাকে আনা।

—বিবিজী মেহেরবানি করে যদি মুখের নকাবটা একটু তোলেন। মঞ্জুকে উদ্দেশ করেন এবার।

ধীরে ধীরে মুখের সেই চাঁদনী-চমক চুন্নী দু' হাতে ধরে মাথার ওপর তুলে দিল মুনোয়ার সুলতানা। নীচু হয়ে বাঁ হাত কপালে ঠেকিয়ে একেবারে মুসলমানী কায়দায় সালাম জানাল প্রথমে অফিসারকে পরে আমাকে। বসার কায়দা কি? যেন বেগম নূরজাঁহা সিংহাসনে বসেছেন। কে বলবে ওটা পুলিশ অফিসের কাঠের চেয়ার? আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে বেগম—পুলিশ অফিসারের চোখে অনুসন্ধিৎসা—এবার সেই মিষ্টি রিনরিনে গলায় মুনোয়ার সুলতানা সাফ উর্দুর অ্যাকসেন্টে আমায় জিজ্ঞেস করে—কিউ বাবুজী জিন্দেগী মে পহলে কভি অপ মুঝে দেখোই সব কইয়ে বাবুজী আল্লা পর রহম্ করেঙ্গে।

আল্লা আপনাকে দয়া করবে, সত্যি বলুন, কখনো কি দেখেছেন আমায়?

ওর সঙ্গে আমার শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল—মনে আছে বলেছিলাম—তুমি নয়, আপনি করে বলেছিলাম—আপনি আর আমার বাড়ি আসবেন না। এভাবে আসা ঠিক নয়।

তার উত্তরে ও বলেছিল,—এখনো আপনি! তুমি কি বলত! তুমি কি? কিছুতেই কি আমার কথা তুমি বুঝবে না?

আমি তেমনি শক্তমুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থেকে বলেছিলাম—না, যা হয় না তা হয় না—আপনি আসুন এবার।

কেঁদে ফেলেছিল। জলভরা চোখ তুলে বলেছিল—বেশ চলে যাচ্ছি আমি। তবে এটুক জেনো শুধু তোমার জন্যই আমি আসতাম না। কেন? কেন তুমি সহজভাবে মিশতে পার না?

না, পারি না আমি। সত্যিই পারি নি। ওকে দেখে আমার বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করত। বুঝতাম ওর সম্মান রাখতে পারব না। তাই নিষ্ঠুরতার মুখোস পরতাম।

আবার সেই মিষ্টি আওয়াজ উর্দুতে বলে—খামোস কিঁউ হায় আপ? বাতাইয়ে না?

জল ভরে আসছে ওর চোখে, হয়ত খোকনের কথা মনে পড়ছে ওরও···

আবার বলে, সচ্ বোল্লিয়ে বাবুজী! হাত তুলে মাথার দোপাট্টা টানে—কাচের চুড়ির ঝলক ওঠে।

ওর ঐ হাত নাড়ার ভঙ্গীটি পর্যন্ত যে আমার বড় চেনা—জলে ভরা চোখ কিন্তু মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে

চেষ্টা করে ও, ঠোঁটটা একদিকে একটু বেঁকে যায়—ভরা গালে টোল পড়ে, ঐ হাসিটিও যে আমার অন্তরে গাঁথা আছে। কত কষ্টে লোভ সামলেছি। গভীর রাতে আমার চোখের সামনে বার বার ওর এ হাসি ভেসে উঠে আমায় পাগল করেছে—

পুলিশ অফিসারের গম্ভীর আওয়াজ এবার—কই মিস্টার সেন। কিছু তো বলুন।

কথা বলতে গিয়ে দেখলাম—ও নিজের আতরমাখা সিল্কের রুমালটা বার বার নাড়ছে, যেন বাতাস খাচ্ছে। চোখে করুণ মিনতি। বুঝলাম ওর ইসারা। একদৃষ্টে দেখছিলাম ওকে।

এবার বললাম ধীরে ধীরে—না এঁকে আমি চিনি না।

তক্ষুণি আমার বিবেক বলল—ছিঃ! তুমি কি? শুধু নিজেই বাঁচলে, আর ওকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে আবার বললাম,—মানে এঁকে আগে কখনো দেখি নি, তবে মঞ্জু, ঐ যার চিঠি পেয়েছেন ওঁর হাতব্যাগে, তার কাছে আমি ওঁর কথা অনেক শুনেছি। আগে করাচীতে ইনি মঞ্জুদের পড়শিনী ছিলেন। সে এখন আসামেই আছে। তাই বোধ হয় এঁর হাতে চিঠি দিয়েছিল, তাই না?

—জী হাঁ। ইয়ে সাহাব তো মানতেই নেহি মেরে বাত, কেয়া করু? কান্না-ভেজা গলা ওর।

জিজ্ঞেস করি—এখানে আপনি কোথায় যাবেন?

উত্তর হয়, এঁরা ছাড়লে তো?

অনেক হুজ্জত করে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেল মুনোয়ার সুলতানা।

আমার সঙ্গেই চলেছে ও। ট্যাক্সিতে বসেই বলল—কি করি বল? ছেলেটাকে দেখতে ঠিক গোপালের মত। ওর মার খোঁজ নেই। তাই মা সেজে ছিলাম ওকে ওর দেশে পাঠিয়ে।

হায় রে মাতৃস্নেহ! আমার ছেলে গোপালের জন্য ও আমার বাড়ি ছুটে যেত। আজ কে জানে কোন 'হবিব' মিয়া আর যদিদন বিবি'র বেটা, আসলামের আম্মিজী সেজে সালাম বাচাল। 'ওসমান' মানে 'বিমান' ওকে ইমান দিয়েছে, আরামের আসমানে তুলেছে, কিন্তু আওলাদ দিতে পারে নি। সেটাই হয় তো ওর একমাত্র চাহিদা। সেই শূন্যতা ভরাতেই হয় তো হৃদয়-কারাগারে অন্য কোন প্রাণেশ্বরকে বন্দী করতে চায়—।

মুখে বলি আপনাকে কিন্তু এই পোশাকে চমৎকার মানিয়েছে। মনে মনে তারিফ করি—বন্দেগী মুনোয়ার সুলতানা।

একটি ঘাসফুলের সম্বোধন

অপরাজিতা গোহ

হে আকাশ তুমি কত তারার ফুল ফোটাও, হোক না
লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। তবু মানুষ তাকায়
তাদের দিকে; তাদের জ্বলজ্বল্ করা মুখের দিকে।
তাদের নিয়ে মানুষের ভাবনার অন্ত নেই;
তারা পৃথিবী থেকে কতদূরে থাকে,
তাদের আলোর কত শক্তি, কেন তারা জ্বলে,
কবে তারা শেষ হবে, সেখানে কি আছে—
এমনি প্রশ্ন নিয়ে সে মারামারি করে।

কিন্তু আকাশ, আমি তোমার থেকে অনেক দূরে
মাটির পৃথিবীতে পথের এককোণে জন্মান
'পনের আনার দল'। কবে জন্মাল, বড় হ'ল,
কবে মরে গেল, কেউ জানবে না কোনদিন।

ওগো কতদিন কাঁদি, জিজ্ঞাসা করি,—
কি আমার উদ্দেশ্য! কেন আমি এলুম!
কিন্তু উত্তর পাই না;
জানতে পারি না কোনদিন।
তপ্ত চোখের জলে বুক ভিজিয়ে ফুটে থাকি,
লোকে ভাবে বৃষ্টির জল বুঝি।

শোনো হে আকাশ,
তোমার দৃষ্টি যদি কখনও আমার 'পর পড়ে,
দেখবে আমি হয়ত শুকিয়ে ঝরে গেছি
পথের একপ্রান্তে। শুধু মনে রেখো, জীবনে
আমি পেতে চেয়েছিলুম অনেক কিছুই; কিন্তু
পাবার মত ক্ষমতা ছিল না এতটুকু।'

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বস্টন প্রবাসের দিনগুলি

কৃষ্ণা বসু

ফিলাডেলফিয়া—নিউইয়র্ক ॥

সাউথ স্টেশন থেকে ধক্‌ধক্ করে ট্রেন ছেড়ে চলে গেল। পেছনে পড়ে রইল বস্টন। সঙ্গে নিয়ে গেলাম শুধু প্রবাসে বস্টনে যে দিনগুলো কাটিয়েছিলাম তার স্মৃতি। সেইদিন থেকে বস্টন আর আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতিগোচর রইল না, মাঝে মাঝে চলে শুধু স্মৃতিমন্থন, মনে পড়ে যায়—যখন বস্টনে ছিলাম।

যাবার আগের দিন সারাদিন ধরে চলল বিদায় নেবার পালা। কতলোক যে এল সকাল থেকে। ভিড় করে এল বু'র যত বন্ধু, পাড়ার সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—হেলেন, জীন, পেগি, রিকি, র‍্যালফ, মাইক, প্যাট, জুডি, জ্যাকির দল। আমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদে এদের দুঃখের আন্তরিকতা আমাদের অভিভূত করে ফেলল। হেলেন আর জীন আমাদের সামনের বাড়ির দু'টি মেয়ে। দলের মধ্যে ওরাই একটু বড়, একজনের এগারো, অন্যজনের নয়। ইস্কুলের ছুটির দিনগুলো সারাদিন আমার কাছেই কেটে যেত ওদের। আমাকে কি করে একটু সাহায্য করবে ভেবে পেত না দুই বোন। একজন হয়ত বললে, মে আই রক্ টুয়া? টুয়াকে একটু দোল দিয়ে দেব কি? আর একজন বলে, প্লীজ, মে আই ফিড বু? বুকে আমি একটু খাইয়ে দিতে পারি কি? চলে আসার সময় গুডবাই বলে কেঁদেই ফেলল হেলেন আর জীন।

জানতাম বস্টন ছাড়বার পর বেশ কিছুদিনের মত শুরু হবে আমাদের মুসাফির জীবন। তাই সঙ্গের মালপত্র নিলাম ছিমছাম। হার্ভার্ড কো-অপ্ দোকান থেকে শ কিনে আনল একটা বিরাট কালো ট্রাংক। যাবতীয় জিনিসপত্র তাতে পুরে ফেললাম। সেটা যাবে জলপথে একা। ট্রাংকটার জন্য 'মুভার' বা মালবাহক খবর দিতে হল। মস্ত লরী নিয়ে দুই পোর্টার এসে হাজির। হিমসিম খেয়ে সেটাকে তারা লরীতে তুলে ফেলল।

একজন বু'কে বললে, কাইণ্ড অফ্ হেভী, একটু যেন ভারী মনে হচ্ছে। অপরজন জিজ্ঞেস করল, ভেতরে কি আছে? ইজ ইওর ড্যাডি ইজ ইনসাইড?

শুনতে পেলাম বু গম্ভীরভাবে জবাব দিল, নো, ড্যাডি এ্যাট দি হসপিটাল।

সকালবেলা বস্টন থেকে ট্রেন ছাড়ল। বাইরে সুন্দর রোদ। কিন্তু তখনই নজরে পড়ল রোদের উত্তাপ কমে গিয়েছে এরই মধ্যে। ট্রেনের দু'ধারে গাছপালার পাতা ঝরে গিয়েছে। শীত এসে পড়েছে আবার। আকাশে-বাতাসে বিষণ্ণতার আমেজ, রুক্ষ ধূসর ল্যাণ্ডস্কেপ। বেলা তিনটে নাগাদ পৌঁছে গেলাম ফিলাডেলফিয়া।

বস্টনের পর ফিলাডেলফিয়া অল্পদিনের মত আস্তানা হল আমাদের। শ পুরোদমে হাসপাতালের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আমি ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাসময় ফিলাডেলফিয়ার সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিলাম।

পুরোন শহর ফিলাডেলফিয়া। বস্টনের মতই অনেক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতির অনেকদিকে পথিকৃৎ বলে সুনাম আছে ফিলাডেলফিয়ার। এদিককার লোকেদের মানসিকতা যে বেশ একাডেমিক ধাঁচের তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল শহরের বিভিন্ন একাডেমিগুলো। এখানকার একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া আছে একাডেমি অফ মিউজিক, একাডেমি অফ্ নেচারেল সায়েন্স। বর্তমান পেনসিলভেনিয়া য়ুনিভার্সিটির জন্ম হয়েছে অষ্টাদশ



● ইউনাইটেড নেশনস অট্টালিকা, নিউইয়র্ক

শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ফিলাডেলফিয়া একাডেমি প্রতিষ্ঠান থেকে।

ফিলাডেলফিয়া কোয়েকারদের শহর এ কথাটা সকলের মুখে শুনেছিলাম। City of brotherly love—সৌভ্রাত্রের শহর নামে ফিলাডেলফিয়া পরিচিত। দেখলামও তাই। এরা বেশ ধর্মপ্রাণ এবং সব ধর্মের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন। আমাদের দু' একটি ফিলাডেলফিয়াবাসী কোয়েকার বন্ধুদের জানি তারা প্রতি রবিবার অনেকে একসঙ্গে হয়ে সম্মিলিত ভাবে ধ্যান করে। সকলে চোখ বুজে বসে নীরবে উপাসনা করে পৃথিবীতে যুদ্ধ যেন আর না বাঁধে, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফিলাডেলফিয়ার কোয়েকার শহর হবার অবশ্য কারণ আছে। এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম পেন একদল কোয়েকার সঙ্গীসহ এসে ১৬৮২ খৃস্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া শহরের পত্তন করেন।

স্থাপত্যরীতির দিক থেকে এ শহরের চেহারা বেশ পাঁচমিশেলি। অবশ্য শহরের অধিবাসীরাও তাই। ইংলণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, জার্মানী, ইটালী সব জায়গার লোক এসে বসতি স্থাপন করেছে। নিগ্রো জনসংখ্যাও কম নয়। শহরের নিগ্রো অঞ্চলগুলোর চেহারা বেশ দুস্থ। বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার আমলের বাড়িগুলো লাল ইটের পুরোন ধাঁচের। এরই মধ্যে ডাউন টাউনে অর্থাৎ শহরের কেন্দ্রস্থলে কয়েকটা আধুনিক আকাশচুম্বী অট্টালিকাও মাথা তুলেছে।

ফিলাডেলফিয়া শহরে ঘুরতে-ফিরতে কেবলি মনে পড়বে আমেরিকার জাতীয় জীবনের প্রথম অধ্যায়ের দিনগুলো। আর একজন ভারতীয়ের কাছে সঙ্গত কারণেই সে দিনগুলির স্মৃতি প্রেরণাদায়ক। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যখন বেশ ভালভাবে দানা বেঁধে উঠল তখন বিভিন্ন আমেরিকার কলোনির প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে একটা একযোগে কাজ করার পরিকল্পনা আলোচনা করেন। প্রথম কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস নামে পরিচিত এই প্রতিনিধি সভা ফিলাডেলফিয়াতে আহ্বান করা হয়।

শহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হল। এই বাড়িতে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় ১৭৭৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। টমাস জেফারসনের ওপর ভার পড়েছিল এই ঘোষণাপত্র রচনার। আজ সেই বিখ্যাত দলিলের কথা কে না জানে।

> **All men are created equal and endowed by their creator with certain unalienable rights among which are life liberty and the pursuit of happiness.**

এই ঘোষণাপত্র রচনার সময় তিনটি মূল কথার ওপর জেফারসন জোর দিয়েছিলেন।

এক—কতকগুলি বিষয়ে স্রষ্টিকর্তা সব মানুষকে সমানাধিকার দিয়েছেন।

দুই—অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা।

তিন—যদি কোন গভর্নমেণ্ট এইগুলির বিরোধিতা করেন তবে সে গভর্নমেণ্ট অপসারিত করে নূতন কোন গভর্নমেণ্ট স্থাপন করার অধিকার জনসাধারণের আছে।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হল-এ একপাশে রাখা আছে লিবার্টি বেল নামে প্রকাণ্ড ঘণ্টা। ডিক্লারেশন্ অফ্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স গৃহীত হবার পর এই ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল ফিলাডেলফিয়া শহর। এর কিছুকাল পরে ফেডারেল সংবিধান রচনার জন্য এই ঐতিহাসিক বাড়িতেই সম্মিলিত হন আমেরিকান নেতৃবৃন্দ—জর্জ ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন, আলেকজেণ্ডার হ্যামিল্টন এবং আরো অনেকে।

কতকগুলো পুরোন আমলের গির্জা আছে ফিলাডেলফিয়া শহরে। তার মধ্যে ক্রাইস্ট চার্চের কথা মনে পড়ছে। জর্জ ওয়াশিংটন যেখানে বসে উপাসনা করতেন তাই সবাই দেখতে যায়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় আমেরিকার জাতীয় পতাকার ডিজাইন রচনা করেছিলেন এক মহিলা। এই মহিলার বাড়ি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য হিসাবে রক্ষিত হয়েছে ফিলাডেলফিয়াতে। একতলায় মিউজিয়াম, সংকীর্ণ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। ছোট ছোট ঘর, সে আমলে যেমন ছিল তেমনি সাজানো আছে।

ফিলাডেলফিয়াকে বলা হয় সেকেণ্ড ন্যাশনেল ক্যাপিটাল। নিউইয়র্ক মাত্র অল্পদিনের জন্য জাতীয় গভর্নমেণ্টের রাজধানী হয়েছিল। তারপর ১৮০০ খৃস্টাব্দে পোটোম্যাক নদীর তীরে নবনির্মিত ওয়াশিংটন শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ফিলাডেলফিয়া ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ফিলাডেলফিয়ার একটা নিজস্ব স্থান আছে। তাই নিতান্ত অল্পদিনের জন্য হলেও ফিলাডেলফিয়ার সংস্পর্শে না এলে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাস জীবনে যেন একটা ফাঁক রয়ে যেত।

আবার নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কে আমাদের দু'টো আস্তানা হল। একটা আন্টির এপার্টমেণ্ট সেকেণ্ড এভেনিউ আর ইস্ট ৫০নং স্ট্রীটের মোড়ের কাছে একেবারে যাকে বলে মিডটাউন ম্যানহাটানে। নিউইয়র্কের অভিজাত অঞ্চল সেটা। এ নিয়ে শীগগিরই আমরা আন্টিকে খেপাতে শুরু

করে দিলাম। যদি বলি ইউ, এন্ যাব আন্টি বলেন, ও ইটর্জ্ জাস্ট রাউণ্ড দি কর্নার। সত্যি তাই।

ফার্স্ট এভেনিউ আর ইস্ট ৪৯নং স্ট্রীটের মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রসংঘের অট্টালিকা। সামনেই সারবন্দী পত্ পত্ করে উড়ছে রঙ-বেরঙের বিচিত্র পতাকা বিভিন্ন দেশের। যদি বলি যাব একটু ফিফথ্ এভেনিউর ফ্যাসনেবল দোকানপাট দেখতে, মানে কিনতে নয়, উইণ্ডো-শপিং করতে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনের মত জানালার কাচের ভিতর দিয়ে চোখ চেয়ে প্রায় কিনে ফেলার আনন্দলাভ করতে—আন্টি বলেন হেঁটেই চলে যাও এই তো ওয়ান ব্লক এওয়ে। আর কোথায় যেতে চাই? হুইটনি মিউজিয়াম বা মডার্ন আর্ট মিউজিয়াম, মেট্রোপলিটান বা গাগেন হাইম, রকফেলার প্লাজা—বা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং? আন্টির বাড়ি থেকে সবই জাস্ট রাউণ্ড দি কর্নার! অতটা না হলেও সত্যিই হাতের কাছাকাছি আয়ত্তের ভেতরে।

এ নিয়ে আন্টির পেছনে লাগলে উনি রাগ না করে শান্ত হাসি হেসে বলতেন, 'দেখো, ইণ্ডিয়া থেকে চলে আসবার পর কতরকম যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম বলতে পারি না। স্বামীর মৃত্যুর পর দেশে ফিরে আসছিলাম মায়ের কাছে থাকব বলে। দেশে পৌঁছে জানলাম যেদিন ভারতবর্ষ থেকে আমার জাহাজ ছেড়েছে সেদিনই বস্টনে আমার মা মারা গেছেন। চারিদিকের দুর্বিপাকের মধ্যে আমার হতভাগ্য অদৃষ্টে নিউইয়র্কের এই এপার্টমেণ্টটা একমাত্র সৌভাগ্যের মত জুটে গেল। এটা না পেলে নিউইয়র্কে আমার জীবন একাকী যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

আন্টির কাছে আমাদের রেখে দিয়ে শ চলে গেল নিশ্চিন্ত মনে সিন্‌সিনাটি, সেখানকার হাসপাতালের কাজকর্ম দেখতে। আন্টির নিরানন্দ হাউসহোল্ডে বু আর টুয়া তাদের দেশের রাজপুত্রের মত প্রাণচাঞ্চল্য ডেকে আনল। শোকদুঃখ ভুলে আন্টি তাঁর সাড়ে তিন বছরের ভারতীয় গ্র্যাণ্ডসন ও দু'মাসের গ্র্যাণ্ড ডটারের তদারকীতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বু'কে নিয়ে রোজ ছুটতে হয় ইউনাইটেড নেশনস-এর অট্টালিকা সংলগ্ন প্লে-গ্রাউণ্ডে বল খেলতে। বাড়িতে টুয়ার পাশ দিয়ে গেলে সে করুণভাবে তাকিয়ে কুঁইকুঁই করে কাঁদে, হাবেভাবে কোলে চড়বার বাসনা প্রকাশ করে। ব্যস্ত হয়ে কাঁধে একটা তোয়ালে ফেলে কোলে তুলে নেন আর বলেন, এই দেখো সব বোকা গ্র্যাণ্ডমাদারদের মত আমারও মনে হচ্ছে ওরা আমাকে চিনে ফেলেছে, খালি আমাকেই চায়।





মেক্সিকান রমণীর হাতে উঠেছে আজ বন্দুক। রাজনৈতিক সংঘাত-ক্ষুব্ধ মেক্সিকোর এই দৃশ্য ল্যাটিন আমেরিকাতে এক সময় অভাবনীয় ও অকল্পনীয় ছিল।

সেকেণ্ড এভেনিউর ওপর এ এণ্ড পির সুপার-মার্কেট। সেখান থেকে মশলাপাতি কিনে এনে মাঝে মাঝে বাংলা-রান্না করি। আন্টির নিউইয়র্কার বন্ধুরা কখনো এসে যোগ দেন ডিনারে-সাপারে। বন্ধুরা কেউ ফোন করলেই আন্টি বলে দেন, আমার এখন একটুও সময় নেই, আমার গ্র্যাণ্ডচিলড্রেনরা রয়েছে কিনা, তোমরাই বরং এসো আমাদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান খাওয়া খেয়ে যাবে। সব দেখে দেখে আমার মনে মাঝে মাঝে একটা আশংকা দেখা দিচ্ছিল। চলে যখন যাব বিচ্ছেদটা আন্টিকে বড় বেশি বাজবে। [ক্রমশ।

(পুব-প্রকাশিতের পর)

মানুষ ও প্রকৃতি

লোকার্নোতে লোকে লোকারণ্য। এয়ারপোর্ট ভর্তি ফটোগ্রাফারদের ভিড় আর দর্শকদের দৌরাত্ম্য। মনটা আমার নিঃসাড়, চোখটাও নিশ্চয় অন্ধ, নইলে আমার সামনের লম্বা সুন্দরী মহিলাটি যে ইনগ্রিড বার্গম্যান তা আমার অবশ্যই বোঝা উচিত ছিল।

বুঝি নি তার কারণ মনের মধ্যে তখনও রুশের স্মৃতির ভার। জীবনটা ভবিতব্যের বাঁধা নিয়মে চলে এটা আমার বদ্ধমূল ধারণা এবং যা ঘটেছে সেটা যে ঘটতোই এতে আমার সন্দেহ নেই। তবুও থেকে থেকেই আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন অপরাধের কাঁটা ফুটছে। এক প্রদর্শনী থেকে আর এক প্রদর্শনীর মধ্যে প্রাণান্তের ব্যবধান। কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারছি না যে, এই ব্যবধানের জন্য আমি দায়ী নই। তাই লোকার্নো প্রদর্শনীর প্রতিনিধি হিসেবে আমার প্রাপ্য ফুলের তোড়াটাও হাত থেকে পড়ে পড়ে যায়।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

সেই আদর সেই অভ্যর্থনা কোথাও কিছুর কমতি নেই। মহিলাকর্মীরা মালা হাতে দাঁড়িয়ে; ঝকঝকে গাড়িগুলোতেও সেই একই রকম চাঞ্চল্য। আমাদের পুরে নিয়ে, পারলে এখনই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেয়। জনসাধারণের হাজারজোড়া চোখের মধ্যে সেই সম্বর্ধনা; রিপোর্টারদের কলম তেমনি বাগিয়ে ধরা। আমার অনুভূতিটারই খালি অপমৃত্যু ঘটেছে। এসব আর ভালো লাগছে না। কোথায় যেন মিথ্যা আড়ম্বরের বিরাট ফাঁকি।

বাগান ঘেরা ছোট্ট হোটেলটা ছবির মত ছিমছাম। সামনে উঁচু-নিচু প্রান্তর, এলানো-ছড়ানো ছোট-বড় পাহাড়ে বাড়ি। পেছনে প্রশস্ত লন, তারপরই পাহাড়ি ঢাল নেমে গেছে সেই নিচের ঝর্ণা পর্যন্ত। পাহাড়ের গায়ে ফুলের প্রাচুর্য; যেমনি তাদের রং তেমনি তাদের বাহার। কোথাও এক রংয়ের রাজত্ব, কোথাও নানান রংয়ের মেলা। ব্যাপ্তঘন সবুজের মধ্যে বিভিন্ন আকারের এই ফুলের সারি, ওপর থেকে মনে হয় যেন পাকা শিল্পীর হাতে খেয়াল-খুশির খেলা। আর ঐ নিচে জলের ধারা ব'য়ে যায় নিজের সুরের রেশ তুলে। তার মধ্যে বৈচিত্র্য নেই কিন্তু আকর্ষণ আছে। পেছনে প্রদর্শনীর কোলাহল কিন্তু জলের সুরে আর ফুলের শোভায় সেটা পেছনেই স্তব্ধ হ'য়ে থেমে গেছে। ঘরের মধ্যে অতি-আধুনিক আসবাবপত্রের আতিশয্য এসেই দেখেছি, কিন্তু ক্লান্ত মন আর পরিশ্রান্ত দেহের জন্য এই প্রাকৃতিক প্রাচুর্য অতুলনীয়। ভারাক্রান্ত মনটাকে ভরিয়েছি এই সৌন্দর্য দিয়ে। আর কোথাও প্রকৃতি নিজেকে এমন নিঃস্ব করে দিয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। হয়তো দিয়েছে কিন্তু দেখবার মন ছিল না; দেখাবার তাগিদেই দিন কেটেছে। আজ ফেরার পথের শেষ প্রহরে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততা নেই, কেবল ইচ্ছে করছে ঝাখের সেই শেষ সুরে মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চিৎকার করে বলি—

'তোমার সিংহাসনের তলায়
প্রভু দাঁড়াই এসে আমি।'

কিন্তু উপায় কি? প্রদর্শনী-প্রতিনিধিদের প্রত্যেকটি প্রহরগুলোর ওপর ওদের ব্যস্ততার প্রখরদৃষ্টি। এগারোটায় পরস্পরকে জানবার জন্য মিলনী-বাস অর্থাৎ মদ্যপান। একটায় কর্তাদের সঙ্গে আলাপের অজুহাতে লাঞ্চ মানে আরও মদ্যপান। তিনটায় প্রথম ছবি, সাতটায় মার্কিনী মহলে ককটেল—আরও প্রচুর মদ্যপান। য়ুরোপীয় সভ্যতার আনন্দধারাই হল স্কটল্যাণ্ডের রঙিন জল আর এই জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেই ওঁরা সকলকে দেন 'গুড টাইম'।

আলাপের নিয়মটা স্কুলের রোল কলের মতন। চারিদিকে যে যেখানে পারে ছড়িয়ে বসে আর অধিবেশনের অধিকর্তা কাগজ ধ'রে নাম আর নাতিদীর্ঘ পরিচয়লিপি পড়েন। পড়ার শেষে 'প্রেজেন্ট স্যার'-এর মতন করে উঠে দাঁড়াতে হয় আর সমবেত সকলে হাততালি দেন। এই প্রহসন চলে প্রায় আধঘণ্টা। তারপর সবাই জুটে যায় বারে আর হ'য়ে ওঠে নেপো বিশেষ। যত ইচ্ছে মদ খাও, শুধু মাতাল হলেই জাত গেল। বারে যাবার পথে চলে গেলাম বাইরে। সেখান থেকে নিচে, ঐ ঝর্ণার ধারে, ছোট্ট বেঞ্চিতে। প্রদর্শনীর ঐশ্বর্য থাক মার্কিনী ব্যবসাদারদের জন্য। আমার রইল প্রকৃতির ঔদার্য। স্বচ্ছ জলের ধারা আর গড়ানো পাথরের মৃদুগুঞ্জনে মনটাকে অসীম আনন্দে মাতিয়ে

তোলে। দেনা-পাওনার হিসেব নেই, চাওয়া-পাওয়ার ক্রন্দন নেই, মিথ্যার মোহ নেই। ব'সে ব'সে জলের ওপর আলোর খেলা দেখি আর সেই ছন্দে-ছন্দে আমার স্মৃতির সৌন্দর্য-ভাণ্ডার খুলে বসি। দেখতে দেখতে বেলা যায়, আলোছায়ার খেলাও শেষ হয়।

স্নানশেষে বেরিয়ে দেখি সাতটা। ইতিমধ্যেই মার্কিনী মজ্যাসর বেশ জমে উঠেছে। কালা আদমির ব্যাণ্ড বাজছে আর ধলা মহাপুরুষরা 'গ্র্যাণ্ড টাইম' গোগ্রাসে গিলছেন। যাবো কি যাবো না করছি পেছন থেকে চেনা সুরে ডাক এল—

'হ্যালো, য়ু!'

ঘুরে দেখি শকুন্তলা সায়গল। সুন্দর ছিমছাম্ চেহারা শীতের হাওয়ায় আরও মধুর।

'এখানে?'

ইসারা ক'রে দেখাই—'ওখানে।'

'লাকি!'

'যাবে নাকি?'

'নিয়ে যাবে?'

'হুঁ...'

হাতটি ধ'রে বললো—'ওয়াণ্ডারফুল!'

ওই আমায় টেনে নিয়ে চললো।

সাদা-কালোয় যতই দ্বন্দ্ব থাক না কেন, মার্কিনী মহলে শ্যামলা চেহারার দাম অনেক, বিশেষ ক'রে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে যদি সৌন্দর্যের ইসারা থাকে। শকুন্তলা সুন্দরী নয় কিন্তু ওর সাজসজ্জায় যৌবনের অসীম ঔদার্য আপনিই উপছে পড়ে। তা ছাড়া, ওর টানা টানা চোখের ভাষায় ইণ্ডিয়ান রোপ-ট্রিক, ওর হাসিতেও ভালো লাগার টান আছে। ওর উপলক্ষে আমার দামটাও দ্বিগুণ হল।

আমি মদ খাই না, আর ও নাচতে জানে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাদা চোখে দেখলাম, শকুন্তলাকে ঘিরে যোলাটে নাচের মরশুম নেমেছে। মাঝে মাঝে দু-একজন দলছাড়া লোক এসে 'হ্যালো' বলে যায়। আমি মেকি হাসির রেশ টেনে মাথা নাড়ি। কখন কথা হয় দু-চারটে, নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে। বেরিয়ে আসি বাইরের বাগানে। সন্ধ্যা তখন যাই যাই করেও যায় নি। একেবারে রেলিংয়ের ধারের বেঞ্চিটায় বসে সামনের পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে ওঠা-নামা পথে গোধূলি-আলোর খেলা দেখি। ব্যাণ্ডের ছন্দ আর উত্তেজিত মেয়ে-পুরুষের চিৎকার থেমে থেমে ভেসে আসে। এখানকার আবহাওয়ায় তার সব অসদৃশ ছন্দঃপতন। গ্রামের পথে মেঠো বাঁশীর সুরের জন্য মন কাঁদে। মনে পড়ে যায় কবে কোনদিন

এমনি এক সন্ধ্যায় খোয়াইর ধারে বসেছিলাম একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে, প্রথম প্রেমের উন্মেষ নিয়ে। সে আছে, সেদিনকার মনটা তার নেই; সেদিনকার ভালোলাগাটুকু আমার মনে আছে, কিন্তু সে মানুষটা আর আমি নই। সেদিন ছিল জীবনজোড়া উচ্ছ্বাস আজ আমার মনোময় অনুভূতির আনন্দ। হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলোর জন্য কাঁদি না। একদিন যে তারা আমার জীবনে গভীরভাবে সত্য ছিল, তারই আনন্দ আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। দেশ থেকে ছ' হাজার মাইল দূরে ব'সে আজ হঠাৎ মনে হল আমার মতন জীবনটাকে কে এমনভাবে জানল, কে এমনভাবে পেল? জীবনভোর হারাবার ব্যথা আছে, কিন্তু পাওয়ার আনন্দ কি কম?

একরাশ হাসি বেয়ে শকুন্তলা এসে হাজির। আনন্দে ডগমগ করছে। সঙ্গের মেয়েটিকে দেখেছি কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।

'হ্যালো ডিরেক্টর! প্লট ভাবছ?'

হেসেই বলি—'না, তোমার কথা!'

'পালিয়ে এলে আমায় ছেড়ে?'

'ঈর্ষায়। পালিয়ে বাঁচলাম!'

শকুন্তলা সঙ্গের মেয়েটিকে সামনে টেনে এনে বলে—'আলাপ করিয়ে দি। ইনগ্রিড দি ওয়াণ্ডারফুল!'

আমার আর কথা জোগায় না। অবাক হয়ে ওর কথাই ভাবতে থাকি।

সারা বিশ্বের সেরা অভিনেত্রী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। শিল্পের সাধনায় সবার চেয়ে স্বতন্ত্র। শুধু বলি—'বসুন।'

ওঁরা দু'জনেই বসলেন। শকুন্তলা আমার পাশ ঘেঁষে—

'এই যে মানুষটি—একেবারে আলাদা।'

'কি রকম?'

'হয় অমানুষ, নয় অতি-মানুষ।'

ইনগ্রিড হাসতে থাকে, বলে,—'পুরুষ জাতটাই তাই। হয় এটা নয় ওটা।'

আমি বলি—'এটা-ওটা দু'টো মিলিয়ে একটা।'

শকুন্তলা ছেলেমানুষের মত চঞ্চল। উঠে, রেলিংয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—'তুমি কোনটা?'

'তুমিই বল!'

আকাশপানে তাকায়, নিতান্তই বালিকার চাঞ্চল্যে, তারপর সুর টেনে বলে—'বুঝি না তোমায়!'

ইনগ্রিড এতক্ষণ শুনছিল, এইবার হাসলো, বললে—'এটা হল ভালোবাসার সূচনা!'

স্তিমিত সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে স্পষ্ট দেখি শকুন্তলার মুখে গভীর লজ্জার স্নিগ্ধ সৌরভ। 'হ্যাঁ' আর 'না' দু'টোকেই পাশ কাটিয়ে বলে—'পাগল! ভালোবাসার ও কি বোঝে? —যেটা জানে সেটা হল অভিনয়।'

থেমে বলে—'চল ভেতরে যাই। ওখানে আনন্দের ঝড় বইছে!—দেশে ফেরার আগে জীবনটাকে উপভোগ ক'রে নাও।'

'ও আমার সইবে না।'

ইনগ্রিড বলে—

'শাকি, ও আনন্দ তুমি সব জায়গায় পাবে, যেটা পাবে না সেটা মন ভরে নাও।'

'যেমন?'

হেসে ইনগ্রিড বলে—'এমন সন্ধ্যা, এমন কৌতূহল-ঘেরা মানুষ, এমন কোমল প্রকৃতি।'

'লাভ কি? এ মায়ার চেয়ে ও মাদকতা ভালো। ওতে দেহের ক্লান্তি আছে, এতে স্মৃতির বোঝা। ঐ আমার ভালো!'

শকুন্তলা আর দাঁড়ায় না। ইনগ্রিডও উঠে দাঁড়ায়।

'আসবেন?'

এবার আমি বলি—'লাভ?'

ইনগ্রিড ব'সে পড়ে।

'জানি! ওটা আমারই কথা।'

'তাই তো বললাম।' হেসে আবার বলি—'অনুকরণই শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।'

প্রশ্ন করি—'কবে এলেন?'

'আজই।'

কবে যাবেন?

'কালই!'

'আপনার ছবির দিন থাকবেন না?'

'ছবিটাই তো রইল। আমি তো নিমিত্ত।'

'আপনার ছবির কথা কাগজে পড়েছি।'

'এবার দেখবেন।'

'যদি থাকি!'

'যাবার কথা আছে?'

'না।' থেমে বলেন।

'থাকার নিশ্চয়তাও কিছু নেই।'

'ছবির কাজ আছে?'

সিগারেট ধরালেন। সোনার কেসটা এগিয়ে ধরলেন। বললেন, 'না। জীবনের জটিলতা।'

অল্পক্ষণ নিস্তব্ধতা। সিগারেটটা আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন—'আপনাকে দু-একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?'

'নিশ্চয়।'

আবার কিছুক্ষণ গভীর নীরবতা।

'আপনি "—"কে চেনেন?'

ছোট্ট উত্তর দি—'হ্যাঁ, আলাপ হয়েছিল একবার।'

'উনি কি আমার চেয়ে সুন্দরী?'

'না।'

নিজের মনে ইনগ্রিড বলে—'আশ্চর্য…আশ্চর্য…'

অন্ধকারে দূরের আলোগুলো ঝক্‌মক্ করে উঠেছে এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। দৃষ্টি ছিল ওদিকেই, তবুও না।

'কাগজে পড়েছেন নিশ্চয়ই!'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কি মনে হয়?'

'কখনও ভাবি নি।'

থেমে যোগ করি—'ভাবলে নিশ্চয় আশ্চর্য হতাম।'

'কেন?'

'এমন অঘটন আমাদের দেশে সচরাচর ঘটে না।'

হাসে ইনগ্রিড।

'সব দেশেই ঘটে। যেখানে পুরুষ আছে।'

'মেয়েও থাকা দরকার।'

এইবার হাসিটা ওর মন খোলা—'ঠিক। জিনিসটা পারস্পরিক!'

সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়ায়—'চলি!'

'বসবেন না?'

'না। ভেতরে শাকি আছে।'

হাসতে হাসতে বলি—'ও নিতান্তই সরল মেয়ে।'

'আমার স্বামীও আছেন। ভারতীয় সরল মেয়েদের আমি ভয় পাই! …'তারা যাদু জানে।'

ইনগ্রিড চ'লে গেল।

জগৎজোড়া নামের পেছনে জীবনজোড়া বেদনার ভার। সম্মান, খ্যাতি, অর্থ সব আছে, জানাশোনা সকলের চেয়ে বেশি কিন্তু ও সম্পদে সুখ কোথায়? ভালোবাসার স্নেহ-নীড়খানি লালসার দুর্দাম ঝড়ে ভেঙেছে ওর স্বামী; জীবনের সার্থকতা হারিয়েছে ও। ওর এত পাওয়ার মাঝে ভালোবাসার ছোট্ট না-পাওয়াটাই জীবনের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটিয়েছে। এতখানি সফলতার মধ্যে এতবড় বিফলতা যে ভাবাও যায় না। সারা-বিশ্বজুড়ে তবুও চলেছে বাইরের এই পাওয়ার পেছনে অন্তরের সর্বস্ব খুইয়েও ছোটা। কেবল ভাবি, কেন?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে পড়ে যায় লণ্ডনের একটি বরফ-ঘন সন্ধ্যার কথা। সেদিন ছিল রবিবার। বাইরে বরফ পড়ছে সারাদিন। ঘরে ভালো লাগলো না, ওভারকোটখানা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে

গিয়ে হাজির হলাম ট্রাফালগার স্কোয়ার। চেয়ারিং ক্রস রোডে পড়তেই পাশে গির্জা। সামনে চৌকো চৌকো পাথর বসানো ফুটপাথ। দু'হাতে বরফ সরিয়ে হাত-পা-ভাঙা বৃদ্ধ লাল-নীল খড়ি দিয়ে ছবি এঁকেছে সেই পাথরের ওপর। তারই মধ্যে কয়েকটা পাথরে ছোট ছোট কথা লিখেছে কয়েকটা—

'পয়সা দিয়ে বই কেনা যায় জ্ঞান কেনা যায় না।'

'আরাম কেনা যায় সুখ কেনা যায় না।'

'মানুষ কেনা যায়, মন কেনা যায় না।'

'ঘর কেনা যায়, গৃহ কেনা যায় না।'

ইচ্ছে করে—কথাগুলো সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার ঘরে টাঙিয়ে রাখি, কিন্তু 'চোখ থাকলেই দেখা যায় না।'

অনেক রাতে ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের ঘন্টায়। ঘুম-ভর্তি চোখে কোনরকমে টেলিফোনটা তুলে বলি—'হ্যালো ?'

'আমি শকুন্তলা।'

'অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করি—'এতো রাতে কি চাও ?'

খিলখিলিয়ে হেসে বলে—'তোমাকে !'

'এখনই ফিরলে বুঝি ?'

'এখনও ফিরি নি।'

থেমে সচকিতকণ্ঠে বলে শুদ্ধ হিন্দিতে—'ফেরার পথ বন্ধ।'

'কেন ?'

'পেছনে তিনজন কেউ, বলছে আমার ঘরে কফি খাবে !

হাসতে হাসতে বলি—

'কেন মদ খেয়ে মন ভরে নি ?'

হিন্দিতেই বলে—'উঁহু ! ওদের তাগিদটা মনের নয়, দেহের !'

'উপায় ?'

'নিচে এস।'

বাধ্য হয়ে নিচে নামি। ঘরে ঢুকতেই দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে বলে—'ডার্লিং, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?—এস আলাপ করিয়ে দি'···

করিয়ে দিল। তিনজনই নামকরা কৃতীপুরুষ এবং আমি ওদের তিনজনেরই পরম ঈর্ষান্বিত মহাপুরুষ—শকুন্তলার স্বামী। ঘরভর্তি মাদকতার শেষ প্রহরে উন্মত্ত স্বামীর রুক্ষ সুরে বলি—'আর কত উচ্ছৃঙ্খলতা করবে ? চল, ঘরে চল !'

ও কান্নার ভাণ করে বলে—'আর দশ মিনিট। প্লীজ'···

তিন প্রভু প্রায় সমস্বরেই বলে—'রাত এখনও শিশু··· আমাদের কথা ভাবুন···প্লীজ···'

বিরক্তির ভাণ ক'রে বলি—'না ! ভোরবেলায় আমাদের প্লেন।'

শকুন্তলাকে টানতে টানতেই নিয়ে যাই। আগে আমার ঘর, তারপর ওর।

দরজার সামনে থেমে যায়।

'চল পৌঁছে দিয়ে আসি !'

ও বলে—'না কফি খাবো, তোমার কামরায় !'

ইতস্তত ক'রে ঘরের দরজা খুলি। শকুন্তলা ভেতর থেকে দরজায় চাবি দেয়।

'কফি আসবে কোথা দিয়ে ?

টেবিল ধ'রে দাঁড়ায় শকুন্তলা। ভয়ার্তদৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে—'কী ভাবলে আমায় ?'

খানিকটা বিরক্ত হয়েছি এ তো জানা কথা। অবজ্ঞাভরে বলি—'কি এসে যায় তাতে ?'

আর কথা বলে না, চোখ নিচু করে দাঁড়ায়। খাটের ওপর বসে পড়ি।

'কফি খাবে ?···আনতে বলব ?'

অনাবশ্যক অশ্রু চোখের কোণে টল্‌টল্ করে, কথা কিছু বলে না।

টেলিফোন তুলে অনুরোধ করি—'দু-পট কফি।'

ওকে বলি—'বোস।'

ও গিয়ে খাটের ওপর বসে, হাতে কপাল রেখে। অনেকক্ষণ। দু'টো। আড়াইটে। দরজায় নক। খুলে দেখি বৃদ্ধা মেড। কফি এনেছে।

কফির ট্রেটা টেবিলে রাখতে রাখতে বৃদ্ধা আড়চোখে শকুন্তলার ওপর সন্দিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে; তারপর আমার দিকে। ফিক্ করে একটু হাসে। যাবার সময় বলে—'গরম খেও !'

কফির পেয়ালা ওর দিকে এগিয়ে দি। শকুন্তলা তাকায় চোখের জল গাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে শুকিয়ে গেছে। উঠে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে—'দেশে গিয়ে, দশজনের মধ্যে যে ভাবে দেখতে, পারো তো সেইভাবেই আমায় দেখ।'

কফির পেয়ালা আমার হাতেই থেকে যায়।

সকাল বেলায় বৃদ্ধা কফির ট্রেটা তুলতে তুলতে আমায় দেখে তার সন্দিগ্ধদৃষ্টি দিয়ে। যাবার সময় ছোট্ট মন্তব্য করে গেল—'কফি খাবার সময় পান নি বুঝি ?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বৃদ্ধা চ'লে গেল, নইলে বলতাম পাশ্চাত্য কফি সবলের সয় না।

[ক্রমশ।

॥ চারজন ॥

শ্রীরজনীকান্ত চিত্রকর

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত একমাত্র বাঙালী কারুশিল্পী

রজনীবাবু রেলের কামরায় টিকিট হারিয়ে ফেললেন। খোঁজ, খোঁজ, বাক্স সরানো হচ্ছে, বিছানা, চাদর, লেপ ঝাড়া হলো, পকেট হাতড়ালেন এদিক-ওদিক, ওপরে-নীচে। ফার্স্ট ক্লাসের গদী উল্টে দেখা হলো, বাথরুমের এপাশে-ওপাশে। না, কোথাও টিকিট নেই। মাথায় হাত দেবার অবস্থা এমন সময় টিকিট বেরোলো ফতুয়ার পকেট থেকে, সেপটিপিন দিয়ে পকেটের মাথা আটকে ভেতরে রেখেছেন টিকিট, পাছে অসাবধানে হারিয়ে ফেলেন তাই।

দিল্লী যাচ্ছিলেন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট তাঁকে নিজের হাতে দিয়েছেন জয়মাল্য বিজ্ঞান ভবনে ২৫শে জানুয়ারীর বিকেলে, ভারতবর্ষের আরও ১৩ জন সেরা কারুশিল্পীর সঙ্গে। পশ্চিম বাংলা থেকে এ সৌভাগ্য একমাত্র পেলেন তিনিই, আর সমস্ত কারুশিল্পীর জীবনে এই প্রথম এলো সরকারী সনদ, ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ডস। ১৯৬৪ সালেই এ এ্যাওয়ার্ডের জন্ম, যা দেওয়া হোল ২৫শে জানুয়ারী, '৬৫র বিকেলে।

সাদাসিধে আত্মভোলা মানুষ, মনে-প্রাণে শিল্পী। ছবি আঁকবেন তো বসেছেন ধ্যানে। মা দুর্গার পট বানাবেন তো দুর্গার স্তবটি করছেন মনে মনে, আঁকছেন তার ছবি, তারপর তুলি নেবেন হাতে।

জন্ম মেদিনীপুর জেলার আথুবপুর গ্রামে সন ১৮৯২ সালে। হিসেব অনুযায়ী বয়স বাহাত্তর পেরিয়েছে, কিন্তু চোখের জ্যোতি অসামান্য। চশমা নেই, শুধু চোখেই ছবি আঁকছেন। বলেন, সবই ভগবানের লীলা, তার ছবি আঁকবার জন্য চোখ দু'টিকে ঠিক রেখেছেন।

১১১, কালীঘাট রোড, কলকাতায় তাঁর কর্মস্থল। শৈশবে মাত্র ৮ বছর বয়সেই তিনি তাঁর পিতা উমাচরণ চিত্রকরের সঙ্গে কলকাতায় আসেন দেশের বাড়ি ছেড়ে। তাঁর পিতা উমাচরণও ছিলেন খুব উঁচুদরের পট চিত্রকর। তাঁর কালীঘাটের পট আঁকার কাজের হাতেখড়ি এখানেই।

রজনীবাবুই বলতে গেলে বর্তমান কালীঘাট পটচিত্রকর সম্প্রদায়ের একমাত্র সার্থক উত্তরাধিকারী এবং একপক্ষে শেষ উত্তরাধিকারীও বলা চলে। কেন না, তিনি নিজেই দুঃখ করে বললেন, এ কাজ কেউ শিখতে চায় না; তবে আশার কথাও শোনা গেল তাঁর মুখে, জাতীয় পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে সরকার চিত্রকরদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছেন। বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ বললেন, নতুন উৎসাহে তিনি কাজ শেখাবেন তাঁর নাতিকে। তিনি জানালেন, পটচিত্রের চাহিদা বাড়ছে ক্রমেই দেশে-বিদেশে। তাঁর কাজ করার শক্তি কমেছে, উত্তরপুরুষকে এ কাজ শেখানো চাই। সংগঠনী শক্তিও আছে রজনীবাবুর মধ্যে। তিনিই তৈরি করেছেন বঙ্গীয় জাতীয় চিত্রকর সভা। সভার সভাপতিও তিনি নিজেই।

নানা শ্রেণীর পট আঁকেন রজনীবাবু। যশোদা-দুলাল, বলরাম, দেবীপট এ সব তাঁর বিখ্যাত হাতের কাজ। তাঁর হাতের কাজ আছে ভারতের নানা সংগ্রহশালায়।

কাগজ খুঁজছেন। হাতে তৈরি এমন কাগজ, যাতে পট আঁকা চলবে এবং সে পট থাকবেও দীর্ঘদিন। তিনি বললেন ভাল পট আঁকতে গেলে চাই ভালো কাগজ, ভালো রঙ। ঠিকানা দিলাম, কোথায় ভাল হাতে তৈরি কাগজ পাওয়া যাবে, তার। কি খুশিই না হলেন ঠিকানা পেয়ে।

দিল্লীতে একই হোস্টেলে পাশাপাশি ছিলাম। রাতে হঠাৎ দরজায় আওয়াজ ঠক ঠক। খুলে দেখি, রজনীবাবু, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। বললেন, দেশে ঘন ঘন তামাক খাই, বুড়ো মানুষের আর কাজ কি! এখানে বিদেশে চাই সিগারেট। নিজের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম।



শ্রীরজনীকান্ত চিত্রকর

ফিরছি ট্রেনে। অভিযোগ করলেন, দিল্লীতে মাসিক বসুমতী পেলাম না কেন বলুন তো?

কোথাও কোথাও নাকি খুঁজেছেন পান নি। মাসিক বসুমতীর তিনি একজন একনিষ্ঠ পাঠক। তবে সাধারণের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে দিল্লীতে মাসিক বসুমতীর প্রচার সংখ্যা সমধিক এবং রাজধানীতে মাসিক বসুমতীর বিক্রয়-প্রতিনিধিও আছেন একাধিক।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

[গবেষক জগতের অন্যতম দিকপাল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্]

সাধারণ নরনারীর মধ্যে বাঙলার মহামূল্য লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে এ যুগে যাঁরা এক ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি করেছেন। অক্লান্ত গবেষণায় যাঁরা জাতীয় সঞ্চয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ থেকে করে তুলেছেন পূর্ণতর, দূর অতীতের বহু সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে অবলুপ্তির গ্রাস থেকে উদ্ধার করে তাদের উপস্থাপিত করেছেন দিনের আলোয়—বাঙলার বিদগ্ধ শিক্ষানায়ক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁদের অনেকেরই পুরোভাগে। শুধু গবেষক আর শিক্ষানায়ক হিসাবেই তাঁর পরিচিতি সীমাবদ্ধ নয়। কাব্য, গীতিকাব্য, ছোটগল্প, শিশু-সাহিত্য, প্রবন্ধ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাঁর সারবান লেখনী ফলিয়েছে নানা উল্লেখযোগ্য ফসল। লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির মতই এদেশের মঙ্গলকাব্যে ও নাট্যসাহিত্যেরও তিনি একজন সুধীজনস্বীকৃত বিশেষজ্ঞ।

ময়মনসিংহের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। স্বর্গত মুরারিমোহন ভট্টাচার্যের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৯১০ সালের ১৭ই জানুয়ারী পৃথিবীর আলো-হাওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর অসামান্য প্রতিভার বিকাশ



ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

দেখা যায়। ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন অবশ্য এবং অতিরিক্ত সংস্কৃতে 'লেটার' নিয়ে। বি-এ-তে অনার্স ছিল সংস্কৃত ও বাঙলায়। অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে বছরের উক্ত বিষয়ক অনার্সে প্রথম শ্রেণী কেউই লাভ করেন নি। ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে সংস্কৃত ও বাঙলায় এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে লাভ করলেন বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার। ১৯৫৯ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তাঁর বাঙলার লোকসাহিত্য-গ্রন্থের জন্য পি এইচ ডি উপাধিতে ভূষিত করলেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩১ থেকে '৪৭ পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষার অধ্যাপক-রূপে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের অন্তর্গত বাঙলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬০ সালে অধ্যাপক থেকে পরিণত হলেন রীডারে। সেই আসনে আজও তিনি সগৌরবে সমাসীন। মধ্যবর্তী সময় (১৯৪৭-৫৫) কেটেছে তাঁর নৃতত্ত্বের গবেষণায়। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষার গবেষণা সহকারী নিযুক্ত হন। এই বিভাগের অধ্যক্ষের আসনে সেদিন সমাসীন ছিলেন স্বনামধন্য ভেরিয়ার এলউইন। আশুতোষ তাঁরই সহযোগিরূপে গবেষণাকার্যে ভারতের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।

১৯৫০ সালে শ্রেষ্ঠ গবেষক হিসাবে তিনি লাভ করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক। ১৯৬১ সালে তিনি প্রাপক হলেন শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কারের। ঐ বছর উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত লোকসংস্কৃতি সম্মেলনের মূল সভাপতির আসনে তিনি বৃত হন। এলাহাবাদের অল ইণ্ডিয়া ফোক কালচার ইনস্টিটিউট, নিখিল বঙ্গ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (কৃষ্ণনগর), পশ্চিমবঙ্গের রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ফোক কালচার, গম্ভীরা পরিষদ প্রভৃতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। কলকাতার বেঙ্গল মিউজিক কলেজের লোকসঙ্গীতের তিনি অবৈতনিক অধ্যাপক এবং ঐ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালক। যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয়োজিত সোসাইটি ফর এশিয়ান ফোকলোরের কার্যকরী সমিতির তিনি অন্যতম সদস্য। ১৯৬৪ সালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে তিনি রাশিয়া পরিদর্শন করেন ও বাঙলা দেশের লোকগাথা এবং নাটক সম্বন্ধে লেনিনগ্রাড সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বাঙলার গবেষক জগতের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন আশুতোষের গ্রন্থগুলি জাতীয় ঐশ্বর্যভাণ্ডারের এক একটি উজ্জ্বল সম্পদ। প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা, সম্পাদক ও ভাষ্যকার।

তাঁর বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, বাঙলা নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাঙলার লোকসঙ্গীত, বাঙলার লোক-সাহিত্য, বাঙলার লোকশ্রুতি, বাঙলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস, বাঙলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, বাইশ কবির মনসামঙ্গল, শিবায়ন, গোপীচন্দ্রের গান, গীতিকবি শ্রীমধুসূদন, মহাকবি শ্রীমধুসূদন, সোভিয়েতে বঙ্গ সংস্কৃতি প্রমুখ গ্রন্থগুলি তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য অধ্যবসায়ের সম্যক পরিচয় বহন করে এবং ভাবীকালের গবেষণার তীর্থযাত্রীদের তাঁদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ দেখাবে ধ্রুবতারার মত।

॥ শ্রীবিভুবিলাস ভৌমিক ॥

[রঞ্জনরশ্মি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ভারতে একমাত্র নির্মাতা]

রঞ্জনরশ্মি বিজ্ঞানের এক মহৎ অবদান। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সসম্মানে উল্লেখনীয়। তৎসংক্রান্ত গবেষণায়, অনুশীলনে এবং একক প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে বিদেশী সাহায্য বর্জন করে যন্ত্রপাতি নির্মাণে বাঙলার যে বরেণ্য সন্তান আপন অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নাম শ্রীবিভুবিলাস ভৌমিক। স্মিতমুখ, সদালাপী এবং অদ্ভুতকর্মা, কঠোর পরিশ্রমী শ্রীভৌমিক আপন ক্ষেত্রে একক ও এখনও অনতিক্রম্য, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে তাঁর পূর্বে একমাত্র জাপানে রঞ্জনরশ্মি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে।

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর জন্ম। নদীয়া জেলার শ্যামনগরের স্বর্গত বামনদাস ভৌমিকের তিনি একমাত্র সন্তান। আরা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, পাটনা থেকে আই-এস-সি ও বি-এস-সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এস-সি পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ।

বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়ে গেছে। পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রঞ্জনরশ্মি বিভাগে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ নেন। রঞ্জনরশ্মি সম্বন্ধে এই সময়ে তাঁর আগ্রহ দানা বেঁধে ওঠে এবং এই বিষয়টির মধ্যেই তাঁর জীবনের সার্থকতার পথের সন্ধান পান।

সে সময়ে রঞ্জনরশ্মি ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে এল জি ভাইমার ছিলেন প্রথিতযশা পুরুষ। এই ফরাসী কৃতবিদ্যের কাছে তিনি উক্ত বিষয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। অধিকতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এক বছর পরে ১৯৩৪ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত এক স্কলারশিপ নিয়ে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এম-এস-সি ডিগ্রী অর্জন করেন। সেখানকার রঞ্জনরশ্মি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী অগ্রণী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেতনভুক ইঞ্জিনীয়াররূপে ইনি জড়িত ছিলেন। প্যারিসের রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে যোগদান করে রেডিয়াম needles-এর নির্মাণ পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়গুলি শিক্ষালাভ করেন। এক নতুন ধরণের দুই মিলিয়ন ভল্ট জেনারেটারের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ফ্রেঞ্চ ন্যাশানাল সায়েন্টিফিক রিসার্চ ফাণ্ড থেকে বৃত্তিলাভ করেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশসমূহে ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল অ্যাপারেটাস, হাই ভল্টেজ এবং রঞ্জনরশ্মির রূপায়ণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইনি হাতেকলমে শিক্ষালাভ করেন।



● শ্রীবিভুবিলাস ভৌমিক

১৯৪০-৪১ সালে দেশে ফিরে এলেন বিদেশ থেকে প্রভূত বিদ্যা অর্জন করে সঞ্চয়ের ঝুলি কানায় কানায় পূর্ণ করে দেশের বরেণ্য সন্তান।

দেশে ফিরে এসে তিনি পত্তন করলেন র‍্যাডন এ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, আজও তাঁর পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর বিপুল সাফল্য ও প্রসিদ্ধি অর্জন করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানে ইলেক্ট্রো এ্যাপারেটাস ও রঞ্জনরশ্মি সংক্রান্ত সকল প্রকার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈরি হয়ে থাকে।

আজ তাঁর সাধনা পরিপূর্ণরূপে লব্ধসিদ্ধি, সাফল্যের জয়টিকায় তাঁর ললাট আজ উজ্জ্বল, সারা ভারত এই বিষয়ে আজ তাঁর প্রতি নির্ভরশীল, ভারতের অগণিত চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, কিন্তু সাফল্য এক কথায় তাঁর কপালে জয়টিকা এঁকে দেয় নি। দু' বছর বয়েসে বাবাকে এবং দশ বছর বয়েসে মাকে হারিয়েছেন। সারাজীবন তাঁর কঠোর সংগ্রাম ও নিদারুণ সংঘাতের এক অনবদ্য ইতিহাস। জীবনে তাঁকে বারবার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু পরিণতিতে প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না—সেই শাশ্বত সত্যটিই তাঁর মাধ্যমে আর একবার মূর্ত হয়ে উঠেছে। জীবনে তিনজনের কাছে তিনি অশেষ ঋণী—দেশনায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

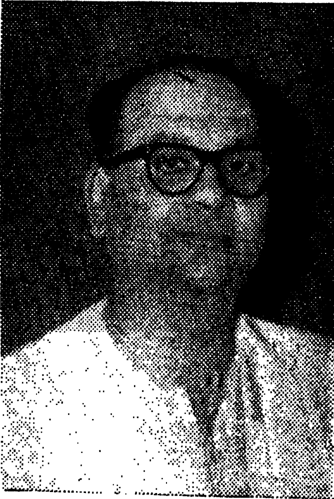
ভারতের ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের তিনি সদস্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজির সভ্যপদ তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ্যাসোসিয়েশান অফ এ্যাপ্লায়েড ফিজিসিস্টসের তিনি সভাপতি। ১৯৫৫ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বরোদা অধিবেশনে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং মেটালার্জি শাখায় তিনি করেন পৌরোহিত্য।

পৃথিবীর নানা দেশ তিনি করেছেন পরিভ্রমণ। সুপ্রসিদ্ধা চিত্রশিল্পী শ্রীমতী সরমা ভৌমিক তাঁর সহধর্মিণী অর্থাৎ কলা এবং বিজ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে সর্দার শঙ্কর রোডের সাত নম্বর বাড়িটিতে।

॥ শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত ॥

[কলিকাতার সহ-পৌরপাল ও বিশিষ্ট শিল্পপতি]

আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সদালাপিতা, বিষয়গুণ ও সৌজন্যবোধ প্রমুখ মহৎ বৃত্তিগুলির এক অপূর্ব সমাবেশ যাঁদের মধ্যে সবিশেষ লক্ষণীয় কলকাতা মহানগরীর সহ-পৌরপাল ও



● শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত

বাঙলার বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল দত্ত সেই তালিকার একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

শুধু মহানগরীর সহ-পৌরপালরূপেই নয় সাধারণ কল্যাণকামী একজন দরদী সমাজসেবক হিসাবে বহুকাল যাবৎ বহুজনের সমাজে তিনি সুপরিচিত। উজ্জ্বল, স্মিত, প্রসন্ন অবয়বের অধিকারী এই মানুষটির জীবনের অর্ধশতক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। শহর কলকাতার অন্যতম সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে কলুটোলার দত্ত-পরিবার অন্যতম। এই সুপ্রসিদ্ধ পরিবারের সুনামবর্ধক সন্তান দেবেন্দ্রলাল কলকাতার বুকেই জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

স্বর্গত সুরেন্দ্রলাল দত্তের দুই পুত্রের জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রলালের শিক্ষারম্ভ প্রথানুযায়ী বাড়িতেই হয়। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে ইনি ভর্তি হন রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজিয়েট স্কুলে। শুরু হল বিদ্যালয় জীবন। প্রবেশিকার পর রিপন কলেজেই ভর্তি হলেন দেবেন্দ্রলাল। বি-এ পাশ করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে। বাণিজ্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৯ সালে। আইনের পাঠ নেওয়া শুরু হল। আইনের অধ্যয়ন সমাপ্তও হল। শিক্ষানবীশ হলেন (articled clerk) স্বর্গত অপূর্বচরণ মুখোপাধ্যায়ের (পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের দৌহিত্র)।

১৯৩৯ সালেই শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দেবেন্দ্রলাল তখন ছাব্বিশ বছরের তরুণ। অফুরান প্রাণসম্পদের প্রতীক। সিভিল প্রেসিডেন্সী ডিভিসান অফ বেঙ্গলের অনারারী এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টেকনিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার নিযুক্ত হলেন। এই কাজে দেখালেন অসাধারণ যোগ্যতা ও পরিচয় দিলেন

অক্লান্ত কর্মশক্তির। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২ সালে অন্যতম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হলেন তিনি। এই সকল কারণে, বিবিধ দায়িত্বমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ায় অধ্যয়নে তাঁকে সমাপ্তির রেখা টানতে হয়।

১৯৪৬ সালের সেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কখনও বিস্মৃত হয় না। মহানগরীর বুকের উপর সেদিন যে সর্বনাশের ঝড় বয়ে গেছে তার মূল্যায়ন অসাধ্য বললেই চলে। তৎকালীন লীগ সরকার পৃষ্ঠপোষিত সেই বীভৎসতার তাণ্ডব-লীলা সভ্যতার ইতিহাসে যে কতখানি মসীলেপন করেছে তার তুলনা মেলা ভার। এই দাঙ্গা দেবেন্দ্রলালকেও কম ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। তাঁদের পৈত্রিক ভদ্রাসনকে গ্রাস করে আগুনের লেলিহান শিখা—জন ও বাসিন্দাদের নিয়ে একবস্ত্রে কোনক্রমে শুধু প্রাণ নিয়ে সেদিন বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন দেবেন্দ্রলাল। শুধু ভদ্রাসনই নষ্ট হল না, তাতে যা ছিল সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতার প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যতম শিকার দেবেন্দ্রলাল কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। আশা ও অধ্যবসায় মূলধন করে আবার নবজীবন গঠনে ব্রতী হলেন। এই মর্মন্তুদ অধ্যায়ের সমাপ্তির পর ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনের কাজে তিনি অবতীর্ণ হলেন—এই কাজে তাঁর ভূমিকা যেমনই বিরাট তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ব্যাপক জনজীবনের সেই প্রকৃত সূচনা। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দেবেন্দ্রলাল দেখলেন যে কংগ্রেস কমিটীর আট নম্বর ওয়ার্ড অবহেলিত বললেই চলে। তারও পুনর্গঠন হল এই কুশলীর হাতে। তার প্রথম সভাপতি হলেন দেবেন্দ্রলাল। ১৯৪৭ সালে আগত উদ্বাস্তুদের অবস্থান ও ডোল দান তাঁর ব্যবস্থাপনাতেই সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৫২ সালে পৌরসভা নতুন করে গঠিত হল। অন্যতম কাউন্সিলার নির্বাচিত হলেন দেবেন্দ্রলাল। এ্যাকাউন্টস কমিটী ও বিল্ডিং কমিটীর চেয়ারম্যানের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত হলেন সহ-পৌরপাল।

প্রসিদ্ধ শিল্পপতি গ্রেট ইণ্ডিয়া মোটর ওয়ার্কসের স্বর্গত কৃষ্ণদাস নন্দীর কন্যা শ্রীমতী যমুনা দেবীর সঙ্গে ১৯৩৩ সালে ইনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন।

তাঁর জীবনালোচনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় যে সমাজসেবা এবং ব্যবসায়—তা ছাড়া তাঁর জীবনের আরও একটি দিক আছে। সঙ্গীতের (তবলা) অনুশীলনে তিনি লব্ধসিদ্ধি। বাড়িতে একাধিক গুণী সঙ্গীতজ্ঞের অবস্থিতি ঘটেছে। তাঁর তবলা-শিক্ষার গুরু স্বনামধন্য শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

একটি মহৎ জীবন

॥ অঞ্জলি দত্তগুপ্ত ॥

স্বর্গতা নলিনীপ্রভা দত্ত এম-এ কুমিল্লার (অধুনা পাকিস্তান) এক বর্ধিষ্ণু, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী একজন কৃতী আইনজীবী, পণ্ডিত এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং মাতা ক্ষীরোদবাসিনী দেবী অতিশয় স্নেহশীলা, দয়ালু ও ধার্মিক মহিলা ছিলেন।

শিশুকাল থেকেই পিতা-মাতার সমস্ত সদ্‌গুণ নলিনীপ্রভার চরিত্রে বিকশিত হ'তে দেখা যায়। নলিনীর বয়স যখন মাত্র আট বছর, সে সময় একদিন পিতা আদর ক'রে কন্যাকে একটি রাঙাশাড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

নলিনী সেই শাড়ি পরে রান্নাঘরে গেলে বাড়ির পুরানো দাসী ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল যে দিদিমণি একাই শাড়ি পরেছে; ওরা গরীব কি না তাই পরে নি।

কথা শুনে নলিনী থমকে দাঁড়ালেন, তাঁর ওই ছোট্ট বুকে দরিদ্রের জন্য একটা কম্পন জাগল এবং নীরবে ঘরে ফিরে এসে একটা কাঁচি দিয়ে অতি পছন্দের শাড়িটি সমান দু' ভাগে কেটে একভাগ দাসীর হাতে দিলেন।

অশিক্ষিত, মূর্খ দাসী চোখের জলে ভেসে বলেছিল, তোমার এই সন্তান বেঁচে থাকলে কালে দীন-দরিদ্রের মা হবে।

পিতা মহেন্দ্রচন্দ্র সেদিনই বুঝেছিলেন এই কন্যা ভবিষ্যতে অনেক দুঃখীর দুঃখমোচন করবে। পিতার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। নলিনী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের অর্জিত অর্থ অতি গোপনে অভাবীকে দান করে গেছেন।



● নলিনীপ্রভা দত্ত

লেখাপড়া ও সঙ্গীতে নলিনীপ্রভা বরাবরই ভাল ছিলেন। তিনি ভাল সেতার বাজাতে পারতেন। ষোল বছর বয়সে পুঁটিজুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়, আই সি এস-এর সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয় হয়। বিবাহের মাত্র দু' বছর পরে অখিলচন্দ্র বিলেতে মারা গেলেন। নলিনীপ্রভা পিতৃগৃহে অবস্থান করে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক, আই-এ এবং কিছুকাল কোলকাতায় বাস করে বেথুন কলেজে পড়ে বি-এ পাশ করেছিলেন।

এরপর নলিনীপ্রভা দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলেন। তখন পরাধীন ভারতের নব-জাগরণ। দিকে দিকে অসহায় মানুষ এই শৃঙ্খল ভেঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মৃত্যুর কোলে, কেউ বা অন্তরালে থেকে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে এই মহাযজ্ঞে! নলিনীপ্রভাও এই মহাযজ্ঞে হাত মেলালেন। তিনি এসে উঠলেন হরীতকীবাগানের তখনকার বিশিষ্ট 'হিন্দু হোস্টেলে', সেখানে সন্ত্রাসবাদী একজন বিখ্যাত নেত্রী থাকতেন। নলিনীপ্রভা সেই মহিলানেত্রীর সাহচর্যে দেশের আন্দোলনে যোগদান করলেন।

নীরব কর্মী হিসেবে দেশ-সেবিকাদের নানাভাবে সাহায্য করাই হোল তাঁর প্রধান ব্রত। এখানেও তিনি নিতান্ত অন্তরালে থেকেই তাঁর ব্রত চালিয়ে যেতে লাগলেন। বৃটিশ সরকার সম্ভবত এই তেজস্বী ও সাহসী মহিলার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাই অযাচিতভাবে নলিনীকে একটি উচ্চ সরকারী পদ দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি অকুতোভয়ে তা' অগ্রাহ্য করলেন। তদুপরি, একজন আই- সি-এস্-এর বিধবা পত্নী হিসাবে বৃটিশ সরকার একটি 'পলিটিক্যাল পেন্‌সন' দিতে চেয়েছিলেন, নলিনীপ্রভা তাও অস্বীকার করেছিলেন। তিনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

এরপর তিনি দর্শন-শাস্ত্রে এম-এ পাশ করলেন। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ দর্শন-শাস্ত্র পড়াতেন। নলিনী তাঁর প্রিয় ছাত্রীরূপে পরিগণিত হলেন এবং তাঁর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শিক্ষার লাইনকে স্বাধীন জীবিকা হিসেবে সর্বোচ্চ স্থান দিলেন। এই সময়ে তিনি ক্রমেই আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করলেন এবং পূজা-অর্চনা এবং জনসেবা করতে লাগলেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের সহিত পরবর্তী জীবনেও তিনি দু' একবার দেখাসাক্ষাৎ করেছিলেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কৃপা পেয়েছিলেন এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্যা হয়ে নলিনীপ্রভা ধন্যা হয়েছিলেন এবং বেলুড় মঠের স্বামীজীদের অনেকেরই তিনি অতিশয় স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

আনুমানিক ১৯৪৬ সালে তিনি 'ভারতের পরিচয়' নামে একটি বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন। এই বইয়ে বস্তুত, 'ভারতের জাতীয় বিশেষত্ব', 'শিক্ষার আদর্শ', 'জাতিগঠনে সর্বাপেক্ষা কঠিন দায়িত্ব নারীর' এবং 'জীবেসেবা' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। নলিনীপ্রভার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের কিশোর-কিশোরীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই বই রচনাকালে নলিনীপ্রভা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁর অকৃত্রিম উৎসাহ ও সাহায্য

পেয়ে ধন্যা হয়েছিলেন। এইসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থের উৎসাহ ও প্রেরণা তাঁর রচনায় প্রভূত সাহায্য করেছিল।

নলিনীপ্রভা 'গোখেল মেমোরিয়াল' বিশিষ্ট উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপিকার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানে সাগর পার থেকে একজন বিদেশী মহিলাকে এনে comparative religion ক্লাশে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং কোনও কারণে সেই বিদেশী ভদ্রমহিলা এ কাজের দায়িত্ব ত্যাগ করলে সেই কার্যভার উপযুক্ত জ্ঞানে নলিনীকে দেওয়া হয়েছিল এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত নলিনী কৃতিত্বের সঙ্গে এই কার্য সম্পাদন করেছেন। গোখেলের প্রধানা অধ্যক্ষা স্বর্গীয়া শ্রীমতী রাণী ঘোষ মহাশয়ার তিনি প্রকৃত সুহৃৎ ছিলেন।

'জীবে-দয়া' এবং 'রোগে-সেবা' ইহাই যেন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। যেখানে 'রোগ' এবং 'শোক' সেখানেই নলিনী এগিয়ে গেছেন নিরাশার আশা হয়ে—অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালাতে! মাত্র ২৫ বছর বয়েসে তিনি তখনকার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের সতর্ক উপদেশ নিঃশব্দে উপেক্ষা করে তাঁর একজন কঠিন টি-বি রোগাক্রান্ত আত্মীয়াকে তার মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত (নলিনী) নিজের হাতে অক্লান্ত সেবা করেছেন। পরবর্তী জীবনেও অনেক টি-বি রোগগ্রস্ত রোগীর নিয়মিত চিকিৎসা, খরচ, পথ্য এবং দামী ওষুধ জুগিয়ে গেছেন। তিনি নিজের জীবনে যত অর্থ উপার্জন করেছেন, 'গোপন দানে' তা অকাতরে ব্যয় করেছেন। কেবল যাঁরা সেই দান গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই তার হিসেব রেখেছেন এবং তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এমন দু' চারটি অসহায় পরিবার তাঁর সাহায্যেই সংসার চালাতেন এবং অনেক বিপন্ন ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি মাসে মাসে সম্পূর্ণ পড়ার খরচ দিতেন। তিনি ছিলেন একাধারে ধার্মিক, তেজস্বী, শিক্ষিতা, কর্মী এবং দাতা। এতগুলি গুণের সমাবেশ সচরাচর একজনের মধ্যে দেখা যায় না। সর্বাপেক্ষা বড় গুণ, নলিনী যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। তাঁর সমস্ত দান এবং কর্ম জনসমাজের অন্তরালে।

নলিনীপ্রভা তাঁর জীবন কাটিয়ে গেছেন তপস্বিনী উমার মত—জনসাধারণের চোখের অন্তরালে নিজের সাধনায় সমাহিত হয়ে। তিনি নিঃসন্তান মহিলা ছিলেন। ১৯৬৫র ২৪শে জানুয়ারী রবিবার অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নলিনীপ্রভা দত্ত মাত্র ৫৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর উপার্জনের অধিকাংশ অর্থই তিনি দরিদ্রের এবং সেবা-প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। তাঁর পুণ্য আত্মা স্বর্গবাস করুক—ইহাই প্রার্থনা।

প্রসঙ্গ

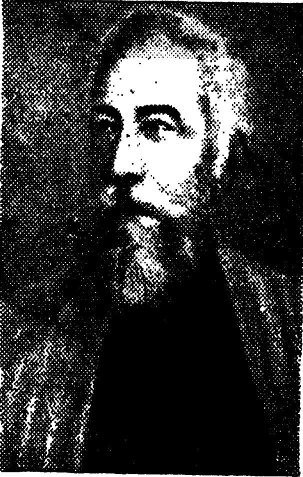
॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র ॥

'নব-নাটক'-এর অভিনয় প্রসঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথকে লিখিত

কালীগ্রাম, নাটোর,
৪ মাঘ, ১৭৮৮ শক
১৬ জানুয়ারী, ১৮৬৭

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভ্রাতার



● মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু, আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা আরও দু'খানি পত্র

শান্তিনিকেতন,
১৭ই ফাল্গুন

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার দ্বিতীয় পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনাকে ইহা বলা বাহুল্য যে, বিবাহের পাত্র-নির্বাচনের কষ্টিপাথর—প্রেম, জহুরী—জ্ঞান। দুয়ের যোগ মণিকাঞ্চনের যোগ। যে বিবাহ প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দ্বারা অনুমোদিত তাহা সর্বথা অনুষ্ঠিতব্য। আইন-রক্ষার্থে যাহা আবশ্যক তাহা দেশকালপাত্র-বিবেচনা-মতে অনুষ্ঠিতব্য। কিন্তু এটাও দেখা উচিত যে, আইন যদি বরকে জোর করিয়া বলাইতে চায় 'আমি হিন্দু নহি', তবে আইনের সেই বলগর্বিত কথার জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দেওয়া অধম নীচত্বের চিহ্ন? বিবাহের ন্যায় অত বড় একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অমন ধারা একটা কাপুরুষোচিত নীচত্ব স্বীকার করা বরের পক্ষে কোনক্রমেই শোভা পায় না।

ব্যথার ব্যথী
স্বাঃ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন,
১লা জুলাই, ১৯১৮

সাদর নিবেদন,

আপনার ২৯শে জুন তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার সকল কথা সবিস্তারে উত্তর দিতে আজ পর্যন্ত কেহ পারিয়াছেন কি না তাহা আমি জানি না। আমি তাহার সম্বন্ধে যাহা সার বুঝি তাহাই সংক্ষেপে বলি; বোধ করি তাহাতে আপনার আকাঙ্ক্ষা কতকটা মিটিতে পারিবে।

১। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

২। যাঁহার যে অবস্থা, তাহা কতক পরিমাণে তাঁহার অনুকূল, কতক পরিমাণে প্রতিকূল।

৩। এইরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া

মনুষ্য নিতান্ত পশুবৎ অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হইতে সভ্যতর অবস্থায় ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনও অগ্রসর হইতেছে।

৪। অগ্রসর হইতেছে কিসের জোরে? নৌকা অগ্রসর হয় কিসের জোরে? দাঁড়ের জোরে এবং বায়ুর জোরে। মনুষ্য অগ্রসর হইতেছে আত্মার প্রভাবে এবং পরমাত্মার প্রসাদে। বায়ু অদৃশ্য দাঁড় দৃশ্য; তেমনি পরমাত্মার প্রসাদ অব্যক্ত—আত্মপ্রভাব—ব্যক্ত। আত্মপ্রভাব কি? না—আত্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি।

৫। মনুষ্য যদি আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইত—তুফানে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিত তাহা হইলে মনুষ্য হয় অনেককাল পূর্বে মারা পড়িত, নয় বংশপরম্পরাক্রমে পশুদিগের ন্যায় মোহান্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত।

৬। ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য হাল ছাড়িয়া দেয় নাই—সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হয় নাই—ঈশ্বরদত্ত আত্মশক্তিকে কাজে খাটাইতে বিরত হয় নাই। বিজ্ঞান-বীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া দূরতম নক্ষত্রগণের গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন, অদৃশ্য পরমাণু অপেক্ষা 'কোটিগুণ সূক্ষ্মতর তড়িতাণুর' (Electron)-এর গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন; জীবশরীরের মধ্যে ব্যাধিজনক এবং আরোগ্যজনক জীবাণুদিগের মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন। ধর্মবীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম এবং রিপুদমনাদি করিয়া আত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব-সকলের সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। ইঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, আত্মা পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় সুখ-দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও সুখদুঃখ হইতে নির্লিপ্ত। আত্মার দর্শন পাওয়ার গুণে ইহাদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

৭। প্রতিকূল অবস্থা মনুষ্যের প্রসুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া তোলে—এই হিসাবে প্রতিকূল অবস্থারই আর এক মূর্তি। প্রতিকূল অবস্থা যদি না থাকিত তবে মনুষ্যের ইচ্ছা-শক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিত।

আত্মশক্তির উদ্দীপন যে কত বড় মঙ্গল তাহা আমরা জানিয়াও জানি না। আমাদের আত্মশক্তি রীতিমত পরিস্ফুট হইলে আমাদের কোন অভাবই থাকে না। আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না—তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জাগিলে পরমাত্মার আত্মশক্তির নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান জানা যায় না। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি তবে, পরমাত্মার আত্মশক্তি—অর্থাৎ জগৎব্যাপারে যে শক্তি খাটিতেছে সেই ঐশীশক্তি কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

৮। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল, তাহা যতক্ষণ না পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ বুঝিতে পারা সম্ভবে না।

৯। গীতাশাস্ত্রে আছে—

'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং।
আত্মানং নাবসাদয়েৎ॥'

আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। একবার যদি রাশি রাশি প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে আত্মশক্তিকে রীতিমত উদ্দীপন করিয়া তুলিতে আমি পারি বা তুমি পার, তবে দেখিতে পাইবে যে, জাগ্রত আত্মশক্তির ন্যায় মঙ্গল জগতে আর কিছুই নাই। তাহা সকল রোগের মহৌষধ। তা শুধু না—আমার আপন আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল জানিতে পারিলে পরমাত্মার আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল, তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না। আমাদের আপনার আত্মশক্তিকে আমরা যদি মনে করি যে তাহা অতি সামান্য বস্তু—তাহা থা'ক; আত্মশক্তি যেমন ঘুমাইতেছে ঘুমাক; এখন আমার যাহাতে উন্নতি হয় তাহারই চেষ্টা দেখা যাক—কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করা যাক আগে, আত্মশক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা দেখা যাইবে তাহার পরে; হীরাকে যদি মনে করি কাচের বেলোয়ারি—তবে আমরা আপনারই বা কি, আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরই বা কি—কিছুরই মধ্যে সার কিছুই পাইব না; সবই আমাদের নিকট অসার এবং অপদার্থ বলিয়া মনে হইবে। আমাদের আপনার আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল, তাহাই যদি আমরা না বুঝিতে পারি—তবে পরমাত্মা যে কত বড় মঙ্গল তাহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব?.........আমি আপনি সাধনার পথে ততটা অগ্রসর হই নাই যে অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। মোটামুটি বলিতে পারি এই যে, Huxley, Mill প্রভৃতির গ্রন্থাবলীর পরিবর্তে গীতা প্রভৃতি পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক সার সার উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

স্বাঃ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন
২৬শে কার্তিক, ১৩৩০

স্নেহের বোনটি আমার,

আমার হাতে এখনো কতকগুলি করণীয় কার্য অবশিষ্ট

আছে। সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র চুকাইয়া ফেলিতে আমি নিতান্তই আগ্রহান্বিত। যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার এক্ষণে তুমি বৈ আর আমার কেহই নাই; সুতরাং তোমার এবারকার ভাইফোঁটা ঠিক আমার সময়োপযোগী, আর সেইজন্য তাহা আমি অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত ললাটে বরণ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন ইহাই আমার



● স্বর্ণকুমারী দেবী

আন্তরিক আশীর্বাদ। দিব্যধামস্থিত আমাদের প্রাণের ভাই সতু'র বিরচিত একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত এক্ষণে আমার জপমালা হইয়াছে। সে গীতটি এই:—

কেহ নাহি আর আমার—সব তুমি।
লয়েছি শরণ তব চরণে দীননাথ।
যদি পাই তোমার ছায়া
নাহি ডরি করাল কালে।

হায়! বিষ্ণু নাই—কে এটা গাইয়া আমাকে শুনাইবে।

তোমার নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বাঃ—বড়দাদা

পুনশ্চ—এইসঙ্গে আর একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত আমার মনে পড়িতেছে। সেটা আমার স্বহস্ত বিরচিত। সে গীতটি এই:—

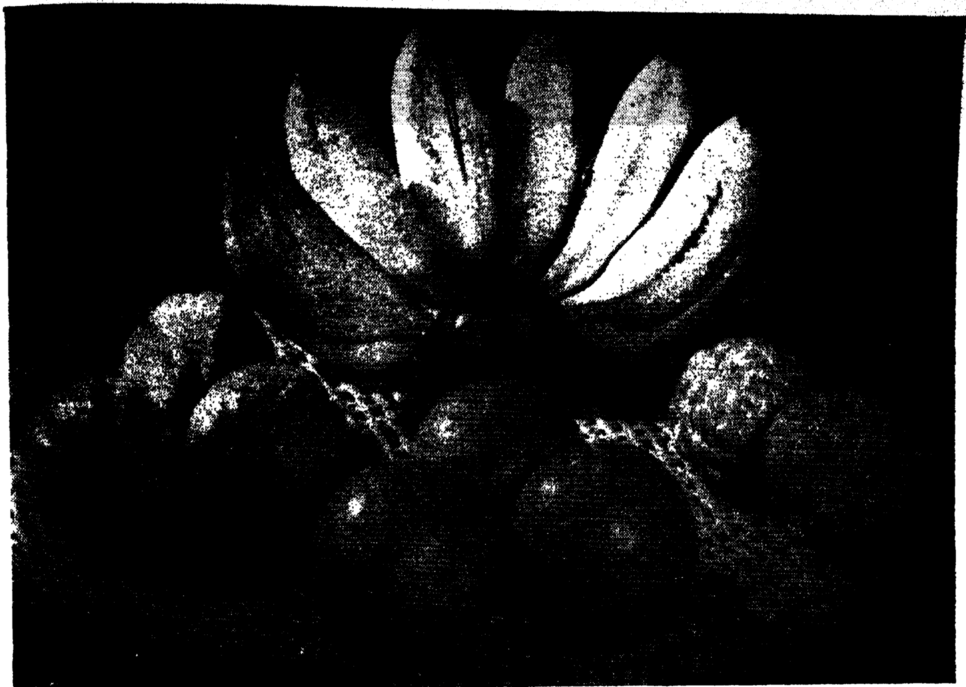
গভীর বেদনা
অস্থির প্রাণ।
কর হে আমারে
শান্তি দান।
মোচন কর হে পাপতাপ।
ঘুচাও রোদনবিলাপ॥
যে যায় যাক্—যে থাকে থাক্—
শুনে চলি তোমার ডাক্॥
কেবলি তোমার আশ্রয়ে
তরিব সাগর নির্ভয়ে॥
তুমি বিনা কর্ণধার
কেহ নাহি আর আমার॥

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

[দ্বিজেন্দ্রনাথের দু'খানি পত্রে বাঙলা ভাষার সঙ্গে সমান পরিমাণে ইংরাজী ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। ইংরাজী অংশগুলি তর্জমা করলে পত্র দু'টির বৈশিষ্ট্য এবং রস ক্ষুণ্ণ হবে। সেই কারণে পত্র দু'টি যথাযথ প্রকাশ করা হল—স।]

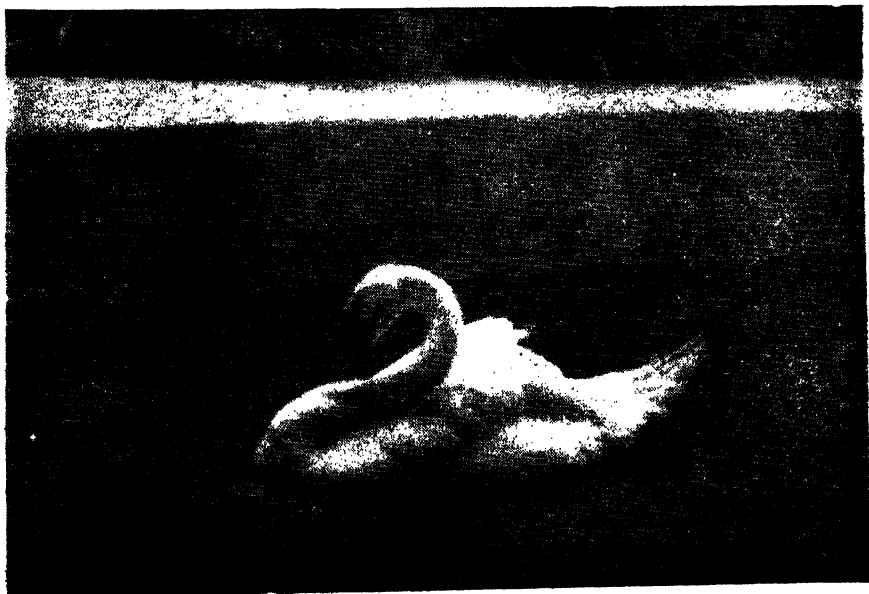
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আর্যের উপর আপনারও শ্রদ্ধা যেরূপ আমারও সেইরূপ কিন্তু আর্যামিকে আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। যখন আমি শুনিলাম যে, কে একজন কুমার কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়িতেছেন ও আর্য movement in an anti-brahmic movement তখনই আমি বুঝিলাম যে আর্যামিতে শুভ নাই—may be আদি সমাজের অনুকরণে সভা স্থাপন করিয়াছে but it is not therefore a friend to Adi-Brahmo Samaj. Adi সমাজ reasonable আর্যের স্বপক্ষে কিন্তু আর্যওয়ালারা unreasonable আর্যতা-পরায়ণ। By reasonable আর্য I mean that আর্য which is allied to the whole length and breadth of আর্য-dom and is not an enemy to enlightenment; by unreasonable আর্য I mean that bigoted আর্য which is dead against every thing that savours of enlightenment and ফালতো আর্য গরিমাতেই বিভোর! আমার উদ্দেশ্য গোঁড়া আর্যদিগকে convert করা নহে this is impossible and absurd. আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত আর্যতা এবং আর্যামির মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেই বিষয়ে লোকের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া —ridiculousness of আর্যামি দেখাইয়া দেওয়া। আর্যামির উপর প্রবীণ ভাবের attitude ধারণ করিলে প্রবীণতার



ফলেন পরিচীয়তে —অশোককুমার ধর

রাজহংস —সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়





সাপুড়িয়া

—শান্তিময় সান্যাল



সেতুবন্ধ রামেশ্বরে
—কালীপদ চক্রবর্তী

মাসিক

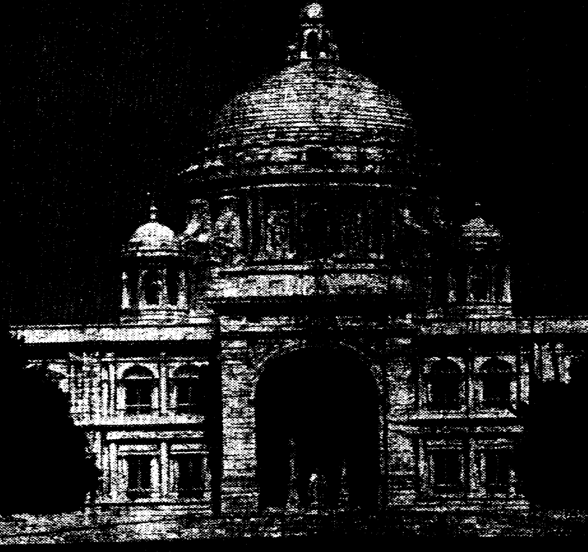
বসুমতী

ফাল্গুন / '৭১



খুকুমণি —গোপালকৃষ্ণ পাল

পূর্বরাগ —দীপক ঘোষ



মহারাণীর সমাধি

—নলিনীরঞ্জন সরকার

অপব্যয় করা হয়। them's—my sentiments। আমাদের দেশের লোক এমনি ঘোর অরসিক যে, একটা জিনিস্ যাহা prima facil ridiculous তাহার ridiculousness তাঁহাদের চক্ষে আঙুল দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা তাহা কোনমতেই দেখিতে পান না। আবার দেখাইয়া দিলে বলেন, 'ও তো জানাই আছে'। না দেখাইয়া দিলে ridiculousকে sublime মনে করিয়া তাহার গোঁড়া admirer হন—এইরূপ উভয় সঙ্কটে আমার মন্তব্য এই যে—'দেখাইয়া দেওয়া at any risk' is preferrable to দেখাইয়া না দেওয়া for প্রবীণতা's sake. আপনার গত পত্র পড়িয়া আমার কলম হইতে উপরের প্রলাপোক্তি বাহির হইয়া পড়িল—আপনি তৎপ্রতি আপনার usual আসান নজরে দৃষ্টি করিবেন। 'প্রণয়ের আড়াআড়ি—ভাল নয় বাড়াবাড়ি' (রেখাক্ষর গ্রন্থ) between Deoghar and Park Street. —Faust un—fausted.

* * *

দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ
টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥
ইচ্ছা সম্যক তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্‌লি মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি॥

* * *

Social amelioration আবশ্যক—সুতরাং আপনার বৃদ্ধের আশা as আশা সকলেরই শিরোধার্য। কিন্তু আমার মন আশা মাত্রটিতেই প্রবোধ মানিতেছে না, has it any power to move জনসাধারণ? English education—English Government—এইটেই হচ্ছে the great moving powers. এক ব্যক্তিও যদি আপনার ঐ Social scheme কার্যে পরিণত করে তাহা হইলে বুঝি যে, আপনার আশা শুদ্ধ কেবল আশা মাত্র নহে। এ কালের Motto এই যে, Social amelioration must be according to reason. Not according to precedent, ইহাতে অনেক বিপদ—কিন্তু লোকে ছাড়িতে পারে না; In spite of বিপদ লোকে Reason-এর পক্ষপাতী। বাল্যবিবাহ লইয়া কত না পাগলামি চলিতেছে। Reason কি বলে—তাহা দেখিলেই এই কথায় চুকিয়া যায়, তা নয়—বড় বড় মহাত্মারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে, তাহাই শ্রেয়। আমার মত এই যে, পূর্বতন আর্য ব্যাপার পূর্বতন কালেরই জন্য—এখনকার কাল নূতন পরিবর্তনের কাল। এখন সমূহ বিপদ—but there is no help for it; we must go through the pending ordeal but to recede to the Antiquity is out of the question. It is thoroughly impracticable. আপনি আমাকে বলিবেন যে 'তবে তুমি কোট পেণ্টুলন পর—ইংরাজী অনুকরণ কর—ইত্যাদি' কিন্তু আমি তাহার এই উত্তর দিব যে, এইজন্য তাহা আমি করি না because reason is against it—not because we are not accustomed to it. Girondist সম্প্রদায় Antiquity পুনরুজ্জ্বল করিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার ফল কি হইল? আমার অভিপ্রায় এই যে যদি আমরা আপনাদের দেশের manners, customs রক্ষা করা শ্রেয় বোধ করি। তবে Reason-এর দোহাই দিয়া সেই পথ অবলম্বন করিব Antiquity-র দোহাই দিয়া নহে। কেন না Antiquity-র দোহাই দিয়া কত যে ছাইভস্ম পার হইয়া যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। আমি আপনার scheme-এর কিছুমাত্র বিরোধী নহি কিন্তু Antiquityকে আপনি যেরূপ আস্কারা দিয়াছেন—আমি আপনার সঙ্গে তত্দূর যাইতে পারি না। ধর্মভাব উজ্জীবিত করা শ্রেয়—এ বিষয়ে আমি আপনার সম্পূর্ণ মতানুবর্তী কিন্তু not because it prevailed ages ago, but because it is in harmony with the development of Human Reason which characterizes the present age. বাচালতা মার্জনা করিবেন।

স্বাঃ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্মা

পুনঃ—মনে করিবেন না যে, আমি আপনার বৃদ্ধের আশার গুণগ্রাহী নহি—Every rose has its thorns, আমি কেবল thorn sideটাই দেখাইলাম।

স্বাঃ—D.N.T.

মহাত্মন,

ঘণ্টা ঠনঠনায়মান। গঙ্গা তীরে, ধীর সমীরে, বসতি সুখং দ্বিজনাথঃ। আপনার শরীরাদির ভাবগতি কিরূপ? একটু নিভৃত হইবার ইচ্ছা হয় কি? গাছ-গাছালির স্নিগ্ধ ছায়ায় ঠাণ্ডা হইবার ইচ্ছা হয় কি? বিস্তৃত এবং বক্রায়মান গঙ্গা দর্শনের ইচ্ছা হয় কি? যে গঙ্গায় নৌকা কখন কখন এমনিভাবে অবস্থিতি করে যে, যেন এক প্রসারিত কুঞ্চিত রূপার পাতে কোন কারিকর নৌকাটিকে বসাইয়া রাখিয়াছে। যে গঙ্গা প্রাতঃকালে সন্ধ্যাকালে দ্বিপ্রহরকালে রাত্রিকালে

অপরাহ্ণকালে, সকলকালেই রমণীয়। যে গঙ্গার সমীরণে শরীর গতজ্বর হয়। যে গঙ্গার দর্শনে শরীরের পাপ ও নয়নের তাপ দূরীভূত হয়। যে গঙ্গা প্রশস্তা। যে গঙ্গা বিশালা। যে গঙ্গার তীরতরু অস্তগামী তপনদেবকে ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া উজ্জ্বল হয়। এবম্ভূতা যে গঙ্গা ইহা 'ব্রহ্মসাধন'-কারীর মনকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতেছে, ইহা যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু এই মানস-প্রত্যক্ষ কবে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে পরিণত হইবে, ইহাই এক্ষণে জিজ্ঞাস্য।

স্বাঃ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্মা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

…আপনি দেওঘরে কতদিন এরূপ পেরেক বদ্ধ (crucified as it were) হইয়া থাকিবেন ? no সাড়া no শব্দ, যেন forgotten অব্দ—this is rhyme ! এখানকার দু' একটি খবর আপনাকে দিই নচেৎ undiluted metaphysical রহস্য আপনার সহ্য হইবে না। সত্ভায়া এখানে সমাগত। বাল্মীকি প্রতিভা আগামী শনিবারে to be acted—in aid of Act. আপনি যদি গ্যাঁ-গোঁ না করিয়া next train-এ সমারূঢ় হন from Deoghar to Baidyanath—from Baidyanath to Howrah will do good to your enfeebled health—the journey will renovate you, will impart to you the long lost buoyancy and freshness of youth—you will enjoy the মলয় সমীর through the flying carriage window far better than through the stationary cottage window. And then what a glee when friends do meet, and hearts do beat and words repeat of olden times.

আপনি দুইটি বিষয়ে বেজায় চুপ করিয়া গিয়াছেন—কার্যকারণতত্ত্ব এবং কৃষ্ণকমলী সংগ্রাম। লেখনীর ছিটাগুলি বর্ষণ করুন—আমি ধৈর্যের ঢাল ধরিয়া বসিয়া আছি। আমি আপনারই তো champion, আমাকে যত উৎসাহিত করিবেন ততই কোমর বাঁধিয়া লাগিব। It costs me a good deal of labour নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। কৃষ্ণকমল is not যে-সে লোক। He is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.…

এই বসন্তে

— রবিরতন ভৌমিক —

মাঘ যায় শীত যায়—
তুয়ারে দাঁড়ায়ে ঐ বসন্ত-রাজ,
কানন-আনন ভরি'
সুগন্ধি ফুলের অপরূপ-সাজ।
পূরবে ফাগের রবি
দিকে দিকে রক্ত—আবির ছড়ায়
পলাশের রাঙা হাসি
বন-উপবন উছলে মাতায়।
বইছে দখিন্ হাওয়া
ঝন্‌ঝন্ ঝরে পল্লব দল,
নীরব মধ্যাহ্ন-বেলা—
ঘুঘু ডাকে ঘন ঘন—মন চঞ্চল।
বুল্‌বুল্ দোল খায়
ফুল-ভরা সজিনার ডালে ডালে,
কোকিল বসন্ত-দূত—
'কুহু' রবে ডাকে আড়ালে আড়ালে।
জরা-জীর্ণ-শীর্ণ তরু
শুষ্ক মরুসম প্রান্তর-কায়া,
কণ্ঠে তৃষ্ণা-ব্যাকুলতা—
দারুণ—নিঠুর বসন্তের ছায়া।
ধূলি ওড়ে—ঝড় ওঠে—
বসন্ত বিজয়-পতাকা ওড়ায়,
বন্দরে জাহাজ ফেরে—
সমুদ্র-লহরী নাচে উন্মাদনায়।
আমের বোলের গন্ধ
মাতাল করে মৌ-ভোমরার মন,
জীবনে বসন্ত নামে—
রূপোলী-স্বপন হেরি সারাখন।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পথে বেরিয়ে কয়েক পা এগোতে না-এগোতেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে কাছে এসে হাজির হল নিমাই মিত্তিরের একান্ত-ভৃত্য ভৈরব মণ্ডল। বলল, 'নমস্কার আজ্ঞে।'

'কি খবর, ভৈরব? কিছু বলবে আমাকে?'

'সুলতান চাচার দোকানে গিয়েছিলাম খানকতক বিড়ি আনতে। আপনাকে দেখেই ছুটে এলাম।'

'ছি ছি! আমার জন্য তোমার বিড়ি আনা হল না ভৈরব?'

'আজ্ঞে তা হয়েছে।' বলে ফতুয়ার পকেট থেকে এক-মুঠো বিড়ি তুলে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে ভৈরব বলল, 'ছোট-

করতে? ভাবছি ট্রাম-বাসের ভিড়ের ভেতর না ঢুকে বরং হেঁটেই ফিরব। এ সময়টা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় হাঁটতে মন্দ লাগবে না।'

'তা মন্দ বলেন নি আজ্ঞে।' বলল ভৈরব। 'ঠ্যাং জোড়া তো ভগবান দিয়েছেন হাঁটবার জন্যেই। বলেন তো আপনার সঙ্গে হেঁটে খানিকটা পথ আপনাকে এগিয়ে দিয়েও আসতে পারি। এখন তো আমার কোনো কাজ নেই।'

বললাম, 'বেশ তো। গল্প-করতে-করতে যাওয়া যাবে। তোমার যদি অসুবিধে না হয়, চলো।'



॥ অজিতকৃষ্ণ বসু ॥

বাসরী মঞ্জিল

বাবুর সঙ্গে কথা কইলেন বুঝি? পিয়োনো মেমসায়েব চলে যাবার পরে এসেছেন আপনি, না আগে?'

'মেমসায়েব রওনা হবার একটু আগেই আমি এসেছি।'

'ও।' বলে দু'তিন সেকেণ্ড চিন্তা করে ভৈরব বলল, 'রামভজন তো একটু আগেই গাড়িতে মেমসায়েবকে প্যারাডাইজ কোর্টে পৌঁছে দিয়ে এলো। আপনাকেও তো—'

ভৈরবকে বাধা দিয়ে বললাম, 'না, না, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে কেন? ট্রাম, বাস আর এই পা দু'টো আছে কি

আমার সঙ্গে চলল ভৈরব। আমি ইচ্ছে করেই খুব আস্তে আস্তে চললাম, যেন পথটা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না যায়, ভৈরবের সঙ্গ যেন-বেশিক্ষণ পাওয়া যায়। অনেক কৌতূহল জমে উঠেছিল মনের ভিতর; ভাবলাম অ্যাটর্নীবাড়ির এই পুরাতন ভৃত্যের মুখ থেকে অনেক কিছু জানা যেতে পারবে, অবশ্য যদি ওর মনে সন্দেহ না জাগিয়ে কায়দা করে ওকে কথা বলানো যায়।

কয়েক পা এগিয়েই ভৈরব সবিনয়ে বলল, 'কিছু যদি মনে

না করেন আজ্ঞে, তাহলে বিড়ি ধরাই একখানা। গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।'

বললাম, 'কিছু মনে করব না ভৈরব। বিড়ি ধরাও তুমি। বিড়ি তো ধরাবার জন্যেই।'

বিড়ি ধরিয়ে তাতে দু'একটা সুখটান দিতেই ভৈরবের মনের ভেতর যেন একটা মধুর আমেজ এসে গেল এবং আমি যে এক কথায় তাকে বিড়ি ধরাবার অনুমতি দিয়ে দিলাম তাতে সে যেন কৃতার্থ বোধ করে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল।

'বড়বাবুর আপনাকে বড্ড ভালো লেগে গেছে আজ্ঞে।' বলল ভৈরব। 'সেই কথাই বড়বাবু বলছিলেন আমাকে। বলছিলেন আপনার মতো মানুষ আর হয় না, খোদ ভগবানই আপনাকে ঠেলে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন।'

'কি আশ্চর্য, ভৈরব! তোমার বড়বাবু আমাকে একদিন দেখেই চিনে ফেললেন?'

'আজ্ঞে, তা ফেললেন। বড়বাবু বলেন যাকে চেনবার, তাকে একদিনেই চেনা যায়; যাকে না চেনবার, তাকে হাজার দিনেও চেনা যায় না।'

শুনে তাক লাগল। এ ধরণের কথা ভৈরব মণ্ডলের মুখে শুনব বলে আশা করি নি। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে যে তাক লাগাবার মতো কিছু বলেছে, সে বিষয়ে সে একেবারেই সচেতন নয়। ভাবলাম কথাটার মানেও হয় তো ভালো করে জানে না ভৈরব, সে শুধু তার মনিবের মুখ থেকে শোনা কথাটা তোতাপাখির মতো হুবহু আউড়ে গেছে মাত্র।

'তা ছাড়া', বলল ভৈরব, 'নিয়তি বড্ড মানেন বড়বাবু। বলেন নিয়তির হাত এড়াতে পারে না কেউ। সবই নিয়তির খেলা। জন্ম বলুন, মরণ বলুন, বিয়ে বলুন, লাভ-লোকসান, মামলা, চাকরি, কারবার, লড়াই যা কিছু বলুন, সব ঐ নিয়তির হাতের মুঠোয়—একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। খুব খাঁটিকথা বলেন বড়বাবু। নিজের চোখেই তো কত দেখলাম, বছরের পর বছর।'

'কি রকম?'

একটু ভেবে ভৈরব বলল, 'এই মাঠাকরুণের কথাই ধরুন না, মানে বড়বাবুর সহধর্মিণী। তাঁর তো সবেধন নীলমণি আমাদের ছোটবাবু। মাঠাকরুণের সাধ ছিল এই ছোটবাবুর বৌ চোখে দেখে যাবেন। তা পারলেন কি? পারলেন না। একদিন হঠাৎ আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে হার্টফেল করে সগ্গে চলে গেলেন।'

'হঠাৎ হার্টফেল করেছিলেন তিনি? কোনোরকম অসুখে না ভুগেই?'

'তা হঠাৎ বৈ কি। ঠাকুরঘরে বসে দু'বেলা 'সন্ধে-আহ্নিক' করতেন—ঠাকুর দেবতার ওপর ভারি ভক্তি-ছেদ্দা ছিল কি না! সোয়ামী পুত্তুরের ভালোর জন্যেই এ সমস্ত। তা, ঐ আহ্নিক করতে করতেই একদিন হঠাৎ ঢলে পড়ে গেলেন। ডাক্তার এসে সার্টিফিকেট দিলেন মাঠাকরুণ আর নেই। একে নিয়তির মার বলবেন কি না, বলুন আপনি।'

আমি এর জবাবে কিছু বলব কি বলব না, তা দেখবার জন্য অপেক্ষা না করেই ভৈরব মণ্ডল বলল, 'নিয়তির শয়তানীটা দেখুন একবার আজ্ঞে। ডাক্তার ডাকবার সময়টা পর্যন্ত দিলে না, তার আগেই সব শেষ। আগে ডাক্তার এলে তবু মিকচার খাইয়ে, ছুঁচ ফুঁড়ে খানিকটা চেষ্টা-চরিত্তির করা যেতো। অবিশ্যি নিয়তি যাঁকে সগ্গে পাঠাবে বলে গোঁ ধরেছে, ডাক্তারের বাবারও সাধ্যি নয় তাকে ধরে রাখা, তবু বড়বাবুর মনে একটা শান্তি থাকত যে, চেষ্টার কিছু কমতি হয় নি। কিন্তু এ যে একেবারে বিনি মেঘে বজ্রাঘাত। এমনটি যে হতে পারে, বড়বাবু তা ভাবতেই পারেন নি। কি যে মুষড়ে পড়লেন তিনি, তা কি আর বলব আপনাকে আজ্ঞে?'

দেখলাম ভুল ধারণা করেছিলাম ভৈরব সম্বন্ধে। মনে হয়েছিল সে অতি অল্প কথার মানুষ, ইসারায় সারতে পারলে মুখের কথা খসাবার পাত্র নয়; কিন্তু এখন বুঝলাম সময়, সুযোগ এবং মেজাজ অনুকূল হলে সে মুখে অনর্গল খই ফোটাতে পারে।

'তা, বড়বাবু যে মুষড়ে পড়বেন তা আর আশ্চর্য কি? বাড়িশুদ্ধ সবাই আমরা মুষড়ে পড়লাম, মায় ঝি-চাকর পর্যন্ত। মাঠাকরুণ ছিলেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী কি না। শুধু ছোটবাবু নয়, আমরা সবাই মা হারালাম। অমন কান্না জীবনে আর কাঁদি নি আজ্ঞে। কিন্তু কাঁদেন নি শুধু বড়বাবু। একফোঁটা জল নেই চোখে। কথায় বলে অল্প দুখে কাতর, অনেক দুখে পাথর; সেই পাথর হয়ে গেলেন তিনি। সইতে না পেরে একবারে বড়বাবুর পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। তবু একফোঁটা জল বেরুলো না বড়বাবুর চোখ থেকে। শুধু বললেন কাঁদিস নে ভৈরব, নিয়তির লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না। নিয়তির কথা সেই প্রথম শুনলাম বড়বাবুর মুখে। তারপর অনেক শুনেছি।'

অতীতের সেই 'অনেক দুখে পাথর' সদ্য-বিপত্নীক নিমাই মিত্তিরের বেদনাগম্ভীর মুখের ছবি আমি বর্তমান কল্পনার চোখে দেখলাম। মনে হল এই আকস্মিক বজ্রাঘাতে মর্মান্তিক বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি অনুভব করছেন নিয়তির বিশ্বব্যাপী অমোঘ শক্তির কাছে তিনি কত অসহায়। হৃদয় তাঁর শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেছে, তবু তাঁর গর্বিত শির তিনি উঁচু রেখেছেন,



এবার
এক সুন্দর
নতুন চেহারায়

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

তাজা ! ঝরঝরে ! স্বাস্থ্যকর ! লাইফবয় মেখে স্নান করলেই এমন চমৎকার লাগে।
লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে আর সুস্থ রাখে !
তাছাড়া, এখন লাইফবয় পাবেন নতুন সুন্দর মোড়কে। আপনার মনের মত হবে বলেই এর নতুন গড়নটিও হাতে ধরতে এমন সুবিধে'র করে তৈরী। আজই লাইফবয় সাবান কিনুন।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

L. 47.140 BG

চোখের জল ফেলে হার মানেন নি নিয়তির কাছে। নিয়তিকে তিনি যেন বলছেন, 'যতই দুঃখ দাও তুমি আমাকে, সে দুঃখ সইবার শক্তি আমার আছে। আমাকে তুমি আঘাত দিতে পেরেছ, কিন্তু জব্দ করতে পারো নি, জয় করতে পারো নি।'

ধীরে অতি ধীরে এগোতে এগোতে দু'জনেই নীরব রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ ভৈরব বলল, 'মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন আজ্ঞে?'

'কি মনে হয়, ভৈরব?'

ভৈরব বলল, 'হয় ঠিক বলতে পারি নে, হয়েছিল। মনে হয়েছিল ছোটবাবুর ওপর অভিমান করেই মাঠাকরুণ মনের দুঃখে অমন হঠাৎ হাটফেল করে চলে গেলেন।'

'কেন?'

'তা বলতে গেলে আগের বিত্তান্ত থেকে শুরু করতে হয় আজ্ঞে।'

'তাই করো, ভৈরব।'

'বড়বাবু আর ছোটবাবু বাপ-বেটায় দু'জনে এ্যাটুর্নী-গিরিতেই মশগুল, আর কোনো দিকে তাঁদের মন দেবার একদম ফুরসৎ নেই।' শুরু করল ভৈরব মণ্ডল। ছোটবাবুর বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, এ আমরা ঝি-চাকর-বাকররা খেয়াল করছি, কিন্তু তেনাদের কারুর সেদিকে খেয়াল নেই, ভ্রুক্ষেপ নেই। ভাবলাম বড়বাবু না হয় কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন, মাঠাকরুণের কি ঘরে বৌ আনবার সাধ জাগে না? এত বড় বাড়ি, এত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, অথচ বাড়ির এক ছেলে ছোটবাবু এখনো আইবুড়ো, এ কেমন ছিষ্টিছাড়া কথা? বড়-বাবুর সামনে মুখ খুলবার মতো বুকের পাটা ছিল না, ছোটবাবুকেও বলাটা ভালো দেখাবে না ভাবলাম, তাই এক দিন সাহস করে কথাটা পাড়লাম মাঠাকরুণের কাছে চুপি চুপি।'

'শুনে মাঠাকরুণ কি বললেন?'

ভৈরব মণ্ডল যখন নিমাই-গৃহিণীকে চুপি চুপি কথাটা বলেছিল কিছুক্ষণ ইতস্তত করে, তিনি তার খানিক আগেই ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েছেন।

'এ তো আমার অনেক দিনের সাধ, ভৈরব।' বলেছিলেন তিনি। খোকার বৌ আনব, নাতি-নাতনীর মুখ দেখব, তারপর একদিন স্বামীর পায়ে মাথা রেখে বিদায় নিয়ে চলে যাব। কিন্তু এখনো ছ'মাসের বাধা আছে, তাই তো মুখ বুজে ধৈর্য ধরে আছি।'

'কিসের বাধা, মাঠাকরুণ?'

'কাউকে এ কথা বলিস নে ভৈরব, তোর ছোটবাবুকে বা বড়বাবুকেও নয়। খোকার একটা ভীষণ ফাঁড়া আছে, খোকার হাত দেখে গুরুদেব গোপনে বলেছিলেন আমাকে। সেই ফাঁড়ার মেয়াদ শেষ হতে আরো ছ'মাস বাকি। সে ফাঁড়ায় কি হবার ভয় আছে, মা হয়ে তা আমি মুখে আনতে পারব না, ভৈরব। ঐ ফাঁড়ার মেয়াদ কেটে না গেলে আমি খোকার বিয়ের কোনো কথাই তুলব না। গুরুদেবের মানা আছে।'

বলে স্বর্গীয় গুরুদেবের উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম জানিয়েছিলেন কানাই-জননী।

ছোটবাবুর মারাত্মক ফাঁড়ার কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ভৈরব বলেছিল, 'এই ফাঁড়ার কথা তো আগে কখনো শুনি নি, মাঠাকরুণ।'

মাঠাকরুণ ম্লান হেসে বলেছিলেন, 'এ কি একটা আনন্দের কথা, যে পাঁচজনকে বলে বেড়াব? ভাবনার বোঝা একাই বয়েছি, আর ঠাকুরের কাছে দিনরাত প্রার্থনা জানিয়েছি: ঠাকুর, খোকাকে তুমি রক্ষা কোরো।'

'আপনার গুরুদেবকে দিয়ে শান্তি সোস্তেন টোস্তেনের কিছু ব্যবস্থা করেন নি, মাঠাকরুণ?'

'তা কি আর আমি বাকি রেখেছি, ভৈরব? তোর বড়বাবু তো এসব বিশ্বাস করেন না, তাই গোপনে আয়ুযজ্ঞ করিয়েছিলাম গুরুদেবকে দিয়ে, ওঁরই আশ্রমে।'

'অনেক টাকা খরচ, মাঠাকরুণ?'

'অতবড় যজ্ঞ, খরচা তো কিছু হবেই। কিন্তু মানুষের প্রাণের চাইতে টাকা তো বড় নয়, ভৈরব।'

কানাই মিত্তিরকে মারাত্মক ফাঁড়া থেকে বাঁচাবার জন্য আয়ুযজ্ঞে গুরুদেব খরচ বাবদ গোপনে কত টাকা নিয়েছিলেন, সে প্রশ্ন মাঠাকরুণকে করতে ভরসা পায় নি ভৈরব, কিন্তু টাকার অঙ্কটা হাজারখানেক হওয়া অসম্ভব নয় বলেই তার ধারণা।

'ছোটবাবুর আয়ুযজ্ঞ বেশ ভালো মতোই হয়েছিল, মাঠাকরুণ?'

'তা হয়েছিল, ভৈরব। গুরুদেবের কাছে শুনেছিলাম তিন দিন ধরে বিশুদ্ধ শাস্ত্রমতে ষোড়শাঙ্গ যজ্ঞ হয়েছিল।'

এ কথা শুনে ভৈরব বলেছিল, 'মাঠাকরুণ, যদি অভয় দেন তো একটা প্রশ্ন করি আপনার শ্রীচরণে।'

অভয় দিয়েছিলেন মাঠাকরুণ। অভয় পেয়ে ভৈরব প্রশ্ন করেছিল, 'ঐ আয়ুযজ্ঞে কি আপনার ঠিক বিশ্বাস হয় নি, মাঠাকরুণ?'

'ছিঃ, বিশ্বাস হবে না কেন, ভৈরব?'

'যদি বিশ্বাস করে থাকেন, তা হলে তো ঐ যজ্ঞে

ছোটবাবুর ফাঁড়া কেটেই গেছে। এখনো ফাঁড়ার ভয় কেন তবে ?'

'ভয়ের কারণ একটু আছে বলেই ভয়ে ভয়ে আছি, ভৈরব। ঐ যজ্ঞের হোমকুণ্ডের মন্ত্রপূত ভস্ম অষ্টধাতুর খোলে পুরে কবচ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন গুরুদেব। বলেছিলেন আগামী পূর্ণিমা তিথিতে এই কবচ ছেলের হাতে অবশ্য ধারণ করিয়ে দিবি। আমি প্রণাম করে বলেছিলাম খোকার প্রাণ-রক্ষা হবে তো, গুরুদেব ? এ ফাঁড়া কেটে যাবে তো ? গুরুদেবের বুকের ওপর গেরুয়া নামাবলী, তারি ওপর হাত রেখে গুরুদেব হাসিমুখে অভয় দিয়ে বলেছিলেন : তোর ছেলের প্রাণের দায়িত্ব আমি নিয়েছি, ভয় নেই। হাসিমুখে আমাকে অভয় দিয়ে চলে গেলেন গুরুদেব। সেই যাওয়াই গুরুদেবের শেষ যাওয়া, ভৈরব।' বলে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললেন নিমাই-গৃহিণী।

মাঠাকরুণের গুরুদেব কিছুদিন আগে পরলোকযাত্রা করেছেন, সে কথা ভৈরবের অজানা নয়। তারও অল্প কিছু দিন আগে তিনি এ বাড়িতে শ্রীচরণ-ধূলি দিয়ে গেছেন, তাও জানা ছিল ভৈরবের। তার জানা ছিল না ছোটবাবুর এই রহস্যময় ফাঁড়া। আর সেই ফাঁড়া কাটাবার জন্য গুরুদেব পরিচালিত আয়ুযজ্ঞ এবং কবচের কথা।

'আগামী পূর্ণিমায় যেন খোকার হাতে ঐ কবচ ধারণ করিয়ে দিই, এই কথা বলে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন গুরুদেব।' বললেন নিমাই-গৃহিণী। আমি সেই আগামী পূর্ণিমার জন্য দিন গুণতে লাগলাম ! গুণতে গুণতে এলো সেই পূর্ণিমা তিথি।'

'তারপর।'

সেই পূর্ণিমা তিথিতে তরুণ এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের ডাক পড়ল চুপি চুপি তাঁর মায়ের কাছে।

মা বললেন, 'খোকা, এই কবচ তোকে ধারণ করতে হবে। দেখি তোর ডানহাতটা। কবচটা বেঁধে দিই !'

'কবচ বেঁধে কি হবে মা ?' হেসে বলল খোকা।

মা বললেন, 'এ হলো মহা শক্তিশালী রক্ষাকবচ। এ ধারণ করলে কোনো বিপদ-আপদ, কোনো ফাঁড়া, কোনো রকম অকল্যাণ তোর কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

খোকা বলল, 'তুমি যার মা, অকল্যাণের সাধ্য কি তার কাছে ঘেঁষবে ? তুমিই আমার রক্ষাকবচ মা, ওসব মাতুলি-ফাতুলিতে আমার কোনো দরকার নেই।'

মাতুলি-ফাতুলি ? গুরুদেবের দেওয়া অমূল্য এই কবচের প্রতি এ হেন তাচ্ছিল্য ? এর আঘাত নিশ্চয় গিয়ে পৌঁচচ্ছে ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ গুরুদেবের বুকের ভেতর ! ভয়ে, দুঃখে আর লজ্জায় শিউরে উঠলেন কানাই-জননী। মনে মনে বোধ হয় পুত্রের হয়ে ক্ষমা চাইলেন গুরুদেবের কাছে, বললেন, 'আমার এই বোকা ছেলের অপরাধ নেবেন না, গুরুদেব।' আর ছেলেকে বললেন : 'ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই খোকা। অপরাধ হয়।'

'কিন্তু তোমার অপমান করলে তার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ হয়।'

'বোকা ছেলে, আমার অপমান করতে বলছে কে তোকে ?'

'বাঃ, বললাম যে তুমি যার মা, তার অকল্যাণ হবে এ আমি ভাবতেই পারি নে। তার ওপর যদি অকল্যাণ তাড়াবার জন্যে হাতে মাতুলি পরি, তাহলে মনে হবে তোমাকে অপমান করছি।'

বিষম দোটানায় পড়লেন কানাই-জননী। কানাই এ কবচ ধারণ করলে কানাই ভাববে তার মাকে অপমান করা হলো ; আর কানাই এ কবচ ধারণ না করলে তাঁর মনে হবে তাঁর গুরুদেবের অপমান হল, গুরুদেবও নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক শক্তি দ্বারা টের পেয়ে যাবেন এই অপমানের কথা।

'আর, শুধু তাই নয় মা।' বললেন কানাই মিত্তির।

'এর ওপর আরো কিছু আছে নাকি, খোকা ?'

'আছে বৈ কি মা। এ জিনিস ধারণ করা তো অভ্যাস নেই, তাই হাতে বাঁধা থাকলে রাতদিন মনে অস্বস্তি জেগে থাকবে, একমুহূর্ত অকল্যাণের কথাটা ভুলতে পারব না। শেষকালে যে-অকল্যাণ থেকে তুমি আমায় বাঁচাতে চাও, দিনরাত ভেবে ভেবে সেই অকল্যাণকেই মাথার ওপর টেনে আনব। তখন তুমিই দুঃখ পাবে মা, ভাববে—'

'থাক, থাক, খোকা। তোরা একেলে ছেলেরা কিচ্ছু মানিস নে।'

পাছে কানাই মিত্তির এমন কিছু এর পর বলে বসেন যার ফলে গুরুদেব আরো চটে উঠতে পারেন, সেই ভয়ে পরিস্থিতিটাকে এভাবে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করলেন কানাই-জননী।

'কিছু মানি নে, এ কথা ঠিক নয় মা' বললেন কানাই মিত্তির। 'হাঁচি, টিকটিকি, মঘা, মাদুলি এ সব কিছু মানি নে, মানি শুধু তোমাকে।'

কানাই-জননী বুঝলেন কবচ ধারণ করানো যাবে না কানাই মিত্তিরকে। কিন্তু কবচের অমর্যাদাও তো করা চলবে না, তাতে কবচেরই অভিশাপে অকল্যাণ হবার সম্ভাবনা আছে। সেই ভয়ে শিউরে উঠলেন তিনি। বললেন: 'তা হলে তোর হয়ে এ কবচ আমিই ধারণ করি?'

মস্ত জটিল সমস্যার যেন সহজ সমাধান মিলে গেল সহসা, অপ্রত্যাশিতভাবে। কানাই মিত্তির উল্লসিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ঠিক বলেছ মা। কল্যাণ কবচ থাকুক তোমারি কল্যাণ হাতে। দাও আমি পরিয়ে দিই।'

যে কবচ তার জন্যে তৈরি হয়েছিল, সে কবচ মায়ের হাতে পরিয়ে দিলেন কানাই মিত্তির। কানাই-জননী মনে মনে গুরুদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা পাঠিয়ে দিলেন, গুরুদেব যেন অপরাধ না নেন। 'অকল্যাণ যদি কিছু হয়, তা যেন আমারই হয়, আমার সন্তানকে যেন স্পর্শ না করে।' মনে মনে বললেন তিনি, আর মনে মনেই অনুভব করলেন গুরুদেব শুনেছেন তার প্রার্থনা। পরদিন এসে পৌঁছল মর্মান্তিক সংবাদ: গুরুদেব অকস্মাৎ দেহরক্ষা করেছেন!

ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে ভৈরবের মুখে এই কাহিনী শুনলাম। অবশ্য তার অনেক হা থেকেই হাওড়া বুঝে নিতে হল।

'কি আশ্চর্য ভেবে দেখুন আজ্ঞে।' বলল ভৈরব মণ্ডল। 'মাঠাকরুণের গুরুদেব দেহ রাখলেন কবে? না, পুন্নিমে তিথিতে ঠিক যেদিন ছোটবাবুর হাতে মাঠাকরুণকে ঐ কবচ ধারণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন তিনি। এদিকে ছোটবাবু কবচ ধারণ করলেন না, ওদিকে গুরুদেব দেহ রাখলেন। এই যোগাযোগটা মাঠাকরুণের মনে বড্ড লাগল। মাঠাকরুণ কি ভাবলেন জানেন?

'কি ভাবলেন?'

'ভাবলেন বিদায়বেলায় গুরুদেব নিজের নামাবলীর ওপর হাত রেখে অভয় দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন তোর ছেলের প্রাণের দায়িত্ব আমি নিলাম, তার প্রাণ রক্ষে হবে। ছোটবাবু ঐ রক্ষেকবচ ধারণ করে নিলে ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় চুকে যেত, কিন্তু তিনি কিছুতেই ধারণ করলেন না। তাঁর আয়ুর ওপর ভীষণ ফাঁড়ার সেই খাঁড়াটা ঝুলতেই থাকল। তখন গুরুদেব কি আর করেন? এদিকে কথা দিয়ে ফেলেছেন, ছোটবাবুর প্রাণের দায়িত্ব নিয়েছেন। মহাপুরুষের কথার তো আর নড়চড় হবার উপায় নেই। ঐ কথা ঠিক রাখবার জন্যেই নিজের সবটা বাকি আয়ু ছোটবাবুকে দিয়ে তিনি নিজে পটল তুললেন।'

'বলো কি ভৈরব? সেও কি সম্ভব?'

'মাঠাকরুণ তো তাই বলেছিলেন আজ্ঞে মানে আমাদের ছোটবাবুকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে গুরুদেব নিজে মরলেন। মহাপুরুষরা তন্তর মন্তর যোগ বিভূতি অনেক কিছু জানেন তো! ওঁরা পরের আয়ু যেমন নিজে নিয়ে নিতে পারেন, তেমনি নিজের আয়ুও পরকে দিয়ে দেহ রাখতে পারেন। আমাদের দেশ হল গিয়ে মুনি-ঋষিদের দেশ, এতো আর বিলেত নয়।'

ভৈরবের মুখে শুনলাম গুরুদেবের এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী ভেবে মনস্তাপের অবধি রইল না কানাই-জননীর। তিনি ভাবতে লাগলেন তাঁর পুত্রের জন্যই নিজের জীবন দান করে চলে গেছেন তাঁর গুরুদেব।

'শুধু তাই নয়। দু'দিন বাদে আরেকটা সন্দেহও ঘোরা-ফেরা করতে লাগল মাঠাকরুণের মনে।' বলল ভৈরব মণ্ডল। 'মাঠাকরুণ ভাবলেন ছোটবাবু কবচ ধারণ না করে কবচের অপমান করেছেন, তাতে গুরুদেবেরও অপমান হয়েছে, সেই অপমান সইতে না পেরেই গুরুদেব মনের দুঃখে দেহ রেখেছেন।'

[ক্রমশ।

সে

: গৌর মোদক :

আমি তাকে চিনি, যদিও সে চেনে না আমাকে,
যদিও স্মৃতির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি তার মুখ।
কল্পনা যদিও মনের ক্যানভাসে সারাদিন তারই ছবি আঁকে
তবুও আমাকে চিনতে সে, কোনদিন হয় নি উৎসুক।

চকিতে চুরি করে মন, সে মেয়ে হয়েছে পলাতকা,
নীড়ে-ফেরা পাখির মত কে জানে কোন নিরুদ্দেশে।
এ জীবন শূন্য তাই, এ হৃদয় তাই লাগে ফাঁকা,
তবুও অবুঝ হৃদয় তারেই, সারাজীবন যায় ভালবেসে।

স্তন্যপায়ী সমুদ্রের জীব

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

স্থলের জীবকে যেমন স্থলে জীবনযাপনের জন্য উপযোগী হ'তে হয়, সমুদ্রের জীবকেও সমুদ্র বাস করার জন্য সেইরকম উপযোগী হ'তে হয়। এই উপযোগিতার অঙ্গ হচ্ছে খাদ্যসংগ্রহে পটুতা, সমুদ্রে ঝড় এবং তজ্জাত প্রবল স্রোতকে প্রতিরোধ করার শক্তি, আর শীতে ও গ্রীষ্মে তাপ মাত্রার প্রবল পরিবর্তন সহ্য করার ক্ষমতা। এ ছাড়া লবণ জলের মধ্যে চিরজীবন বাস করাও বিশেষ সহজ নয়। এই সকল অবস্থার মধ্যে এবং শত্রু প্রকৃতির জীব দিয়ে ঘেরা অবস্থায় বংশবৃদ্ধি করতে পারাও খুব কঠিন। তা ছাড়া আবশ্যকমত দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে এবং যথাসময়ে ডুব দিয়ে নিজেকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করা এবং দীর্ঘকাল জলের তলায় শ্বাসকার্য চালাতে পারাও অসাধারণ পটুতা, নৈপুণ্য এবং সহিষ্ণুতার লক্ষণ বলে মানতে হবে—দরকার হ'লে এদের নাসারন্ধ্র বা শরীরের অন্য ছিদ্রগুলি বন্ধ রাখতে হয় দীর্ঘকাল ধরে।



যদি প্রাণীটি উভচর না হয়ে শুধু জলেই বাস করে, তা হলে তার নবজাত শাবকদের জন্মমাত্রেই সাঁতার কাটার যোগ্যতা নিয়েই জন্মাতে হয়। এইজন্য তার শরীরের ও লেজের ও পাখনার গঠন উপযুক্ত হওয়া দরকার। বহিঃত্বক্ বা চর্মের এবং দাঁতের গঠন এমন হওয়া চাই যে লবণ জলে তার ক্ষতি হয় না এবং জন্মের পরই সে জল থেকে খাদ্যবস্তুকে মুখে চেপে ধরতে ও গিলতে পারে। প্রাণীটি উভচর হ'লে তার এইসব বিশেষ গুণ বা শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হয়। শরীরের ও মেরুদণ্ডের গঠনেই এই তফাৎ ধরা পড়ে। তবে 'সীলমাছ' উভচর হ'লেও তিমি জাতীয় জলচরের সঙ্গে তার অমিলের চেয়ে মিলই বেশি।

সীল এবং তিমি উভয়েই স্তন্যপায়ী জীব। তাদের রক্তের তাপমাত্রাও স্থলচর স্তন্যপায়ী জীবের কাছাকাছি থাকে। সীলের ফুসফুস মানুষের তুলনায় অনেকটা লম্বা। তবে অক্সিজেন সংগ্রহের কাজে তার শক্তি মানুষের তুলনায় বেশি নয়। তার রক্তের অক্সিজেন ধারণের শক্তি কিছু বেশি হ'লেও অনেকক্ষণ ডুবে থাকার শক্তির উৎস কি তা জানা যায় নি। সীল এবং তিমির মাংসের রং কালচে। তাদের শরীরে চর্বি বেশি থাকলেও সেই 'চর্বি' অক্সিজেন ধারণে বেশি সাহায্য করে না। অর্থাৎ তারা রক্তে, মাংসে বা চর্বিতে যে বেশি অক্সিজেন ধারণ করতে পারে, এমন প্রমাণ নেই। তবে স্থলচর প্রাণীর রক্তে কার্বনডাই-অক্সাইডের মাত্রা কিছু বাড়লেই তার যেমন অক্সিজেন নেবার জন্য ফুসফুস এবং অন্যান্য যন্ত্রে বিশেষ চেষ্টা শুরু হয় তিমি বা সীল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ এই গ্যাস অক্লেশে ধারণ করতে পারে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ শ্বাস নেবার জন্য তাদের শরীরে ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয় না। তার মানে এই নয় যে, শ্বাস ছাড়াও অনির্দিষ্টকাল সে ডুবে থাকতে পারে। কারণ স্থলচরের মত তার মস্তিষ্কের অক্সিজেনের চাহিদা সুনির্দিষ্ট থাকে। রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে নামলেই এদের জলের উপরে উঠতে হয়, নতুবা ডুবে মরতে হয়।

তিমির টরপেডোর মত আকারটাও বিশেষ লক্ষণীয়। তার চামড়া দিয়ে জোড়া চওড়া ডানা দাঁড়ের কাজ চালাবার উপযুক্ত, লেজের গঠনও নূতন ধরণের। এদের বুক ও পেটের গঠনও বিচিত্র। ফুসফুসগুলি লম্বা, যকৃতের আয়তন বেশ বড়। অন্ত্রের নলগুলি সরু ও লম্বা, মূত্রযন্ত্রের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ বা lobule আছে। এদের ধমনী ও শিরাগুলি বেশ চওড়া এবং তাদের পরস্পর সংযোগের কুণ্ডলীগুলিও স্থলচরের থেকে বিভিন্ন।

তিমিদের চামড়ার নিচে মোটা চর্বির পর্দা আছে। চর্মের উপর লোম নেই। সীলের কিন্তু বেশ লোমও আছে চর্বিও আছে। এই চর্বি এদের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে। শীত-গ্রীষ্মে এর পরিমাণ ভেদ ঘটে। খাদ্যের অভাব হলে এই চর্বি খাদ্যের কাজ চালায়; অর্থাৎ প্রাণীটিকে তাপশক্তি দান করে। আবার শাবকদের দুধ তৈরিতেও চর্বি কাজে লাগে। এই চর্বি সাধারণভাবে কতকটা তরল থাকাতে সাঁতারের সময় গতি অনুসারে চর্মের নিচে এদিক-ওদিক সরে যেতে পারে। আবার সাঁতারের সময় শরীরের চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে এবং

১০২—১৪

কতকটা তার ফলেই, চর্মের সকল অংশে রক্তের সঞ্চালন উপযুক্তভাবে চলতে থাকে।

সীলের বহিঃত্বক বেশ মোটা ও গাঢ় রঙের। মেলানিন নামক এই রঙ চর্মকে সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোক থেকে কতকটা রক্ষা করে। তিমির রঙও সচরাচর বেশ গাঢ় হয়। বিভিন্ন অংশে এই রঙের গাঢ়তার তফাৎ থাকায় কতকগুলি দাগের মত সৃষ্টি হয়। এগুলি এদের শত্রুর চোখ এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে। চর্মের বিশেষ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তৈল জাতীয় একটি বস্তু চর্ম এবং লোমকে জলের অবিরত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এই বস্তু জলে দ্রবণীয় নয় বলেই এমন হতে পারে।

সীলের গায়ের লোমের ও চর্মের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। লোমগুলির চার স্তরে জন্মে। উপরের বড় লোমগুলি নিচের ছোট লোমগুলিকে চাপা দিয়ে রাখে। এই লোমস্তরের মধ্যে কিছু বাতাস আটকা পড়ে। লোমগুলির গোড়ার অংশ কিছু মোটা থাকে, তার ফলে বাইরের জল সহজে ভিতরে ঢুকতে পারে না। আবার যে তৈলাক্ত বস্তু লোমগুলিকে জলের দ্রাবণক্রিয়া থেকে রক্ষা করে তাও নিঃসারক গ্রন্থি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে জলে ধুয়ে যায় না। অন্য স্তন্যপায়ীদের মত এদের চর্মে ঘর্মগ্রন্থিও থাকে। কিন্তু সেগুলি থেকে জলীয় বস্তু বেরোয় না। একটি চটচটে গন্ধযুক্ত বস্তু বেরোয়; সম্ভবত সীলের গায়ের উৎকট গন্ধের জন্য এই বস্তুই দায়ী।



● কাঠের পুতুল

সীলের চর্মে রক্ত সঞ্চালনের ভাল ব্যবস্থা থাকে। ডুব দেবার সময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার অনেক কমে যাওয়াতে চর্মে সাময়িক রক্তাল্পতা হ'তে পারে। সেই অবস্থা নিবারণের জন্য চর্মের শিরাগুলির সংখ্যা বেশি ও বিস্তারও অপেক্ষাকৃত বেশি সীলের। চামড়ার নিচের চর্বিস্তর ও চর্মের ঘন লোম দুইই প্রাণীটিকে শীত থেকে রক্ষা করে। সীলের মত তিমির হৃৎস্পন্দন ডুব দেবার সময়ে কমে যায় না। মানুষ বা অন্য কোন স্থলচর প্রাণীরও ডুব দেবার সময় এরকম ঘটে না। সীলের এই হার ডাঙায় মিনিটে ১৫০ থেকে ডুব দেবার সময় ৫ থেকে ২৫ বার হয়ে যায়। তখন শুধু অত্যাবশ্যক যন্ত্রগুলিতেই (যেমন ফুসফুস, মূত্রযন্ত্র ও যকৃৎ) রক্ত সঞ্চালন চলে। আবার ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের হার এবং সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন শীঘ্রই আগের মত হয়। গভীর জলে ডুব দিলে শরীরের উপর জলের চাপ অতিরিক্ত বাড়ে। আগেকার ডুবুরিদের এই অবস্থায় যে সাময়িক রোগলক্ষণ ঘটত তাকে বলত 'ডুবুরির রোগ'। তিমিরও এইরকম গভীর জলে ডুবলে শরীরের উপর জলের চাপে খুবই অসুবিধা হতে পারে। তখন বুদ্বুদের আকারে কিছু বাতাস বের করে দিয়ে ফুসফুসের ভিতরের চাপ কম করে দেয়। সীল জন্মের অব্যবহিত পরেই সাঁতার কাটতে পারে।

যে-সকল স্তন্যপায়ী জীব জলে বাস করে না, অথচ জলে সাঁতার কাটতে পারে, তাদের মধ্যে জলে-ডোবা অবস্থায় শ্বাস চালাবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। বর্তমানে এরোপ্লেনে ও জেটপ্লেনের যুগে ওড়ার সময় দুর্ঘটনার ফলে জলে পড়ে গেলে সাঁতার কেটে ক্লান্ত মানুষ কতক্ষণ ডুবে মরা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তা পরীক্ষা করা খুবই দরকার হয়েছে! অন্য জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষার মত এক্ষেত্রে প্রথমে ইতর জন্তু নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এইসব প্রাণীদের কি অনুকূল অবস্থায় জলে ডুবলেও বাঁচিয়ে রাখা যায় নানাভাবে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা চলছে। নিচে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

ধেড়ে ও নেংটি ইঁদুর জলের নিচে থেকেও কয়েকঘণ্টা ধরে শ্বাসকার্য চালাতে পারে। হল্যাণ্ডের ও যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিস্কোতে কয়েকজন বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তবে যে-জলে এই শ্বাসকার্য চলা সম্ভব তার লবণমাত্রা রক্তের মতই হওয়া দরকার এবং সেই জলের ভেতরে বেশি চাপে অক্সিজেন গ্যাস চালানো দরকার।

হল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাইস্ট্রা এই পরীক্ষার জন্য ইঁদুরকে জলে ডুবিয়ে রেখেছেন যতক্ষণ না তার শ্বাসরোধ হ'য়ে মৃত্যু হয়। সাধারণ সমুদ্রজলে বা কলের জলে ডুবালে তার শীঘ্রই দম বন্ধ হয়। কিন্তু রক্তের সম-লবণ (isotonic) জলে রাখলে এবং সেই জলে স্বাভাবিক বাতাসের দশগুণ চাপে অক্সিজেন চালনা করলে তারা প্রায় চার ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আবার সেই জলের তাপমাত্রা ২০° সেন্টিগ্রেডে রাখলে এবং শ্বাসকার্যে উৎপন্ন কার্বন-ডায়-অক্সাইড দূর করার ব্যবস্থা করলে তাদের আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যায়।

ক্যালিফোর্নিয়াতে হর্নার, পেগ এবং ওয়ারেন ক্রুক অন্যভাবে পরীক্ষা করেন। তাঁরা ইঁদুরের শ্বাসনালীতে ছিদ্র করে

ডিপথিরিয়া রোগে শ্বাসবন্ধের উপক্রম হ'লে যেমন করা হয় tracheotomy) তাদের ফুসফুসের ভিতরে রবারের নল ঢুকিয়ে দেন এবং জন্তুগুলিকে সম-লবণ জলে ডুবিয়ে রাখেন ও সেই জলের মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুণ চাপযুক্ত অক্সিজেন চালিত করেন। পরীক্ষার শেষে তাদের তুলে এনে ঐ নলের সাহায্যে ফুসফুসের জল বার করে দেবার পরে দেখা যায় যে, ইঁদুরগুলি স্বাভাবিকের মত লম্ফঝম্প করতে থাকে। তবে কয়েকঘণ্টার মধ্যে ফুসফুস সঙ্কুচিত হয়ে (lung collapse) তারা মারা যায়। সন্ধানীদের মতে জলের সঙ্গে দীর্ঘ সংস্পর্শে ফুসফুসের তজ্জন্য ক্ষতি হয় এবং বার বার বাতাসের বদলে জল ফুসফুসে গ্রহণ ও পরিত্যাগ করতে তাদের অতিরিক্ত পরিশ্রমও হয়। কারণ জল বাতাসের তুলনায় অনেক ভারী।

জন্মের আগে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণশিশু গর্ভস্থ জলের মধ্যে ডুবে থেকেও কিভাবে শ্বাসকার্য চালায় এইসব পরীক্ষায় সে বিষয়ে কিছু সন্ধান পাওয়া যাবে, এই আশায় পরীক্ষাগুলি চালান হয়। তা ছাড়া ডুবুরিদের জলের মধ্যে কোন বিভ্রাটের ফলে এইরকম অবস্থায় পড়লে কিভাবে তাদের মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়েও কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।

দুই মনীষীর গল্প

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। লেখাপড়া শেখার খুব আগ্রহ। দেশের স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এবার কলকাতায় আসবে। কলকাতার কলেজে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করবে। এই আশা।

কিন্তু সমস্যা হলো ওইখানে! কলকাতা শহরে কে তাকে আশ্রয় দেবে। আর কেই বা তার পড়াশোনার ব্যয় বহন করবে। ছেলেটির বাবার যা আয়, তাতে তাদের কোনমতে সংসার চলে।

শেষে উপায় একটা হলো। ছেলেটির বাবার একজন ধনীবন্ধু থাকতেন কলকাতায়। হাইকোর্টের নামজাদা উকিল। ছেলেটির বাবা বন্ধুর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। বন্ধুর অনুরোধ উকিলবাবু উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি বন্ধু-পুত্রকে আশ্রয় দিলেন এবং লেখা-পড়ার সকল ব্যয় বহন করতে রাজী হলেন।



● কাঠের ঘোড়সওয়ার

ছেলেটি উকিলবাবুর বাড়িতে থাকে। সেখানেই খায় এবং কলেজে পড়াশোনা করে। ছেলেটি যেমন মেধাবী তেমনি নম্র ও বিনয়ী। তার মধুর ব্যবহারে সকলেই তাকে স্নেহ করে—ভালবাসে। বাড়ির ছেলের মতনই তার সঙ্গে ব্যবহার করে।

ছেলেটি ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। শরীর ভেঙ্গে গিয়েছে। শরীরের আর অপরাধ কি! এই তো সেদিন তার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলো! পরীক্ষার সময় কি তার জ্ঞান ছিল! নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে গিয়েছিল তখন। শুধু পড়া আর পড়া! দিবারাত্রি বই মুখে করে থাকত! শরীরের দিকে তাকায় নি এতটুকু। শরীরও এতদিনে তার শোধ নিল।

আশ্চর্য ছেলে। দিনের পর দিন রোগে-জ্বরে ভুগছে। অথচ কিছুতেই ডাক্তার দেখাবে না। ডাক্তার দেখাতে বললে বলে, ও ত্ু'এক দিনে সেরে যাবে। এর জন্য আবার ডাক্তার কেন?

কিন্তু জ্বর কি এমনিতে সারে? জ্বর ক্রমশ বেড়েই চলল। শেষে বাড়ির লোক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল তাকে। শহরের সেরা ডাক্তার। এ বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক। নাম—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখলেন। রোগীর কাছে রোগের বিবরণ শুনলেন। কাগজ-কলম নিয়ে খস্ খস্ করে লিখলেন প্রেসক্রিপসন। সবে ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপসন লেখা শেষ করেছেন ঠিক সেই সময় অঘটন ঘটল।

—কি ওষুধ দিলেন ডাক্তারবাবু!

বাড়ির ছোটকর্তা হঠাৎ ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলেন। ছোটকর্তা ডাক্তারবাবুর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিই ছেলেটিকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে এসেছেন। ছেলেটিকে তিনি খুব স্নেহ করেন। ছেলেটিও তাঁকে গুরুজনের মতন ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

—কি ?

ডাক্তারবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি নিজেকে সংযত করে পাল্টা প্রশ্ন করলেন—আপনি কি ডাক্তার? মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ?

—না।

—তবে আর সে খোঁজে প্রয়োজন কি আপনার। দাঁড়িয়ে দেখছেন দেখে যান। রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলেন ডাক্তারবাবু!

মুখটি ম্লান হয়ে গেল ছোটকর্তার। একটি কথা বেরুল না মুখ দিয়ে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন!

ছোটকর্তার অবস্থা দেখে ছেলেটির মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ছোটকর্তা এমনিতে লোক খুব ভাল। কিন্তু তাঁর ওই এক দোষ। সব কিছুতেই তাঁর নাক গলান চাই। সব কিছুই তাঁর জানা দরকার। যদিও সে বিষয়ে তাঁর জানার কোন প্রয়োজন নেই।

দোষ তো মানুষমাত্রেই আছে। আর কি-বা এমন দোষের কাজটা করেছেন! জানতে চেয়েছেন কি ওষুধ দেওয়া হলো। বলে দিলেই মিটে যেত। তা নয় রুক্ষ তিরস্কার! মানুষকে কেউ কখনও অমন রুক্ষ তিরস্কার করে!

এ বড় অন্যায়! এ অন্যায় সহ্য করা উচিত নয়। উচিত নয় চুপ করে বসে থাকা; এর প্রতিকার করা দরকার।

যেই ভাবা সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে মস্ত এক চিঠি লিখে ফেললে ছেলেটি। প্রতিবাদ জানালে ছোটকর্তাকে অমনভাবে রুক্ষস্বরে তিরস্কার করার জন্য। তারপর একটি খামে পুরে পাঠিয়ে দিলে ডাক্তারবাবুর কাছে।

চিঠি পাঠিয়ে দেওয়ার পর ছেলেটির খেয়াল হলো। এ কি করেছে সে! এ যে ডালে বসে ডাল কাটা। যিনি তার চিকিৎসার ভার নিয়েছেন, অতি যত্নের সহিত তাকে পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন, সে কি না তাঁকেই তিরস্কার করে চিঠি দিয়েছে। আর ডাক্তারবাবু এ-বাড়ির মান্য লোক। তিনি নিশ্চয়ই তার এই বেয়াদপি সহ্য করবেন না। তিনি বাড়ির কর্তা উকিলবাবুকে জানাবেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে হয়তো তাকে আর এ-বাড়িতে স্থান দেবেন না।

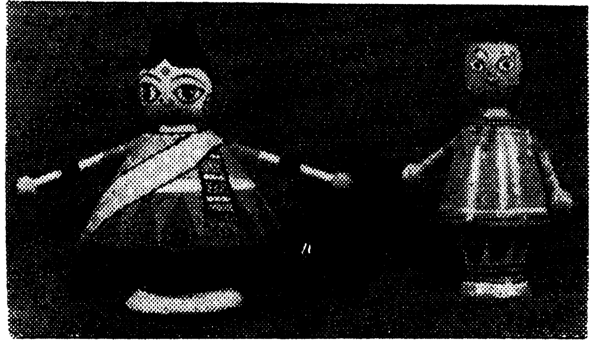
এ-বাড়িতে তার আর স্থান হবে না। তাকে বিদায় নিতে হবে এ-বাড়ি থেকে। তার কলেজে লেখাপড়ার এইখানেই সমাপ্তি ঘটবে। চিঠি লেখার সময় এসব কথা মনে হয় নি, মনে জাগে নি এতটুকু যে সে গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। তাকে দয়া করে এ-বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তার লেখাপড়ার ব্যয় বহন করছেন এঁরা। এইসব আকাশ-পাতাল ভেবে ছেলেটির শরীর ও মন ভীষণ খারাপ হলো।

পরের দিন বিকালবেলা। ছেলেটি মনমরা হয়ে চুপ করে নিজের ঘরে বসে আছে। এমন সময় ডাক্তারবাবুর গলা শোনা গেল। ডাক্তারবাবুরই তো গলা। আজ তো ডাক্তারবাবুর আসার কথা নয়। তবে? তবে কি তার বেয়াদপির কথা উকিলবাবুকে জানাতে এসেছেন। ছেলেটির বুক দুর-দুর করে কাঁপতে লাগলো। না-জানি আজ তার ভাগ্যে কি শাস্তি আছে। ভয়ে-ভাবনায় ছেলেটি কেঁদে ফেলে আর কি!

—ওরে শিবনাথকে ডেকে দে·········ডাক্তারবাবু ওকে ডাকছেন। উকিলবাবু হাঁক দিলেন বৈঠকখানা থেকে!

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ছেলেটি ডাক্তারবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ কি স্বপ্ন না মায়া। তাকে শাস্তি দেওয়া, তিরস্কার করা দূরে থাক, সস্নেহে ডেকে পাশে বসালেন ডাক্তারবাবু! তারপর বললেন, শিবনাথ তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। তোমার সৎসাহস দেখে আনন্দ হলো। তুমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর।

—ব্যাপার কি? সৎসাহস···অভিনন্দন। উকিলবাবু



● কাঠের পুতুল

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন ডাক্তারবাবুর দিকে। —আবার নিশ্চয় একটা পাগলামি কাণ্ড করেছে, আচ্ছা পাগল ছেলেকে নিয়ে পড়েছি।

—ঈশ্বর করুন এমন পাগলা ছেলে যেন বেশি হয়—তবেই দেশ থেকে অন্যায়, অনাচার দূর হবে। চল শিবনাথ আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু ছেলেটিকে নিজের জুরীগাড়িতে তুলে নিলেন। নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। তাকে আদরযত্ন করে বসালেন। তাকে একটু জলযোগ করালেন। তারপর ঠিক বন্ধুর মতন তাকে বুঝিয়ে বললেন—তুমি ঠিকই লিখেছ শিবনাথ, অমন করে রুক্ষকণ্ঠে তিরস্কার করা আমার উচিত হয় নি। কিন্তু ছোটকর্তার এমনি একটু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। অকারণ কৌতূহল ভাল নয়। সব তাতে মাথা গলান অন্যায়; বিশেষ যে বিষয়ে কিছুই জানি না। ছোটকর্তা ডাক্তারীর কিছুই বুঝেন না, কি ওষুধ দিই না দিই তাঁর জানার প্রয়োজন কি? তিনি কি ধরতে পারবেন ও ওষুধটা ঠিক দেওয়া হয়েছে কি না? না, তবে কেন এ অহেতুক কৌতূহল? ভবিষ্যতে যাতে এমন আর না ঘটে তাই এই তিরস্কার। এটুকু শিক্ষার তাঁর প্রয়োজন ছিল।



● কাঠের পুতুল আর পেঁচা

ছেলেটি তো অবাক! ডাক্তারবাবু যে-সে ডাক্তার নন, শহরের সেরা ডাক্তার; ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। আর সে গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে! তার কাছে নিজের দোষক্রটি স্বীকার না করলেও তাঁর কিছুই ক্ষতি হত না। আর তার কাছে কোনরকম কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি এমনি উদার সাধু-চরিত্রের লোক ছিলেন যে, নিজের দোষক্রটিকে ঢেকে রাখলেন না। তাঁর কাছে যে সব বিষয়ে ছোট তার কাছেও তিনি অকপটে স্বীকার করলেন নিজের ভুলভ্রান্তি।

ডাক্তারবাবুর এই অকপট সাধুতা ও মহত্বে ছেলেটি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলো। তার চোখ দিয়ে দরদর করে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার মনপ্রাণ লুটিয়ে পড়তে চাইল তাঁর চরণতলে।

কিন্তু কে এই দুঃসাহসী ছেলে? নিজের সমূহ বিপদের আশঙ্কা সত্বেও অপ্রিয়-সত্যভাষণে কুণ্ঠিত হলো না এতটুকু। ছেলেটি আর কেউ নন—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন গতযুগের একজন দিকপাল মনীষী। যে-সকল মনীষীর চিন্তা ও সাধনায় আজিকার উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, তাঁদেরই একজন তিনি। প্রথম যৌবনে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। গভীর অধ্যাত্ম প্রেরণাই তাঁকে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকার্যে ব্রতী করেছে। তাই তিনি শুধু ধর্মবেত্তা দার্শনিক পণ্ডিতই নন; রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। বাংলা সাহিত্যে ও তাঁর অবদান বড় কম নয়; কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ সব রকম রচনাতেই তাঁর কলম চলত সমান। তাঁর 'আত্মচরিত' ও 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক গোড়াপত্তনের ইতিহাস। ইংরেজী ভাষায় লেখা 'মেন্ আই হ্যাভ সীন্' তাঁর অমূল্য স্মৃতিচারণ।

'আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না কেন, নাবালকদের দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য। দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক। ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়া যায়।'

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বোলনের আলোকের দূতা

বারবারা হেৎজগ

আজ য়ুরোপ থেকে শুরু ক'রে অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই বের্লিনের আলোকের দূতী সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ বাদামী কেশ ও সোনালী ডোরাকাটা গাউনে শোভিত এই ছোট্ট, সুন্দর, স্বতন্ত্র পুতুলগুলি বের্লিনের মহিলা-শিল্পী মার্গা বের্নবুর্গ মাৎজের একক সৃষ্টি। সারা বছর ধরে মোম দিয়ে তিনি এগুলি তৈরি করেন, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, কতকগুলি চতুরা, হাসিখুশি, কতকগুলি গম্ভীর, ধ্যানমগ্না।

বড়দিনের সময় এইসব আলোকের দূতী দিয়ে ঘরসাজানো একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পীর গৃহে তখন আগমন হয় কত ক্রেতার। আলমারি ভর্তি এই পুতুলগুলিকে শিল্পী নিজে ক্রেতাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।

ষোল বছর আগে শিল্পী তৈরি করেন তাঁর প্রথম আলোকের দূতী; বড়দিনের সময় বের্লিনে অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যদের ঘর সাজাবার জন্যে তিনি পুডিং দিয়ে পুতুল গ'ড়ে রাংতা দিয়ে তাদের পোশাক পরিয়েছিলেন তখন।

—ডি·এ ডি।



● পশ্চিম বার্লিনের জনৈক ফ্যাশান ডিজাইনের তৈরি পোষাকে দেবদূত। এর পরনে ১৯৪৮-৪৯-এর এক জবর শীতের দিনের পোষাক। এ পোষাক এখন এখানকার শিশুদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে

শিকার কাহিনী

মিনতি সেন

খাদ্য ছাড়া পৃথিবীতে কোন প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু এই খাদ্যসংগ্রহ করাটা খুব সোজা কাজ নয়; এর জন্য বিভিন্ন প্রাণী যে কত বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়, তা ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত কয়েকটি প্রাণীর খাদ্যসংগ্রহের এই রকম কয়েকটি বিচিত্র কৌশলের কথাই আজ তোমাদের বলবো।

গিরগিটির মত দেখতে বহুরূপী জীবটি তোমাদের নিশ্চয় বেশ পরিচিত। এদের শিকার-কৌশলও বোধ হয় তোমরা অনেকে দেখে থাকবে। এদের অস্বাভাবিক বড় রকমের একটি জিভ্ আছে; ভক্ষণযোগ্য কোন পোকা-মাকড় দেখলে এই বিরাট জিভটি এরা তার দিকে বের করে দেয় এবং নিমেষের মধ্যে সেটিকে টেনে নিয়ে আসে নিজের মুখের মধ্যে। এমন অতর্কিতে ও নির্ভুলভাবে তারা কাজটি সেরে ফেলে যে তুমি যদি কাছে দাঁড়িয়ে থাকো, তুমিও বুঝতে পারবে না, পোকাটি কখন তার পেটে চলে গিয়েছে। বেশ কয়েক হাত দূর থেকে কোন পোকা-মাকড়কে এভাবে ধরে আনার ক্ষমতা এদের আছে।

কয়েকটি দেশে এক ধরণের ছোট পোকা দেখতে পাওয়া যায়, যার ইংরাজী নাম **Bombardier Beetle**, বাংলায় যার নাম আমরা দিতে পারি বোমারু-পতংগ। এদের শরীরের ভেতর এক ধরণের তরল রাসায়নিক পদার্থ আছে। বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র রাসায়নিক পদার্থটি প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে শিকারটিরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

ভগবানপ্রদত্ত এই ক্ষুদে বোমাটি দিয়ে এরা যেমন খাদ্য শিকার করে, তেমনি আত্মরক্ষার কাজও সারে।

পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলগুলিতে মিলিয়া নামে এক শ্রেণীর কাঁকড়া দেখা যায়। অন্যান্য সব কাঁকড়ার মত এদেরও এক-জোড়া দাড়া আছে। কিন্তু সে দু'টি আকারে অত্যন্ত ছোট ও দুর্বল। সুতরাং দাড়ার আসল যে কাজ অর্থাৎ শিকার ধরা, সেটা এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই খাদ্যসংগ্রহের জন্য বাধ্য হয়ে এরা এক অতি চমৎকার উপায় অবলম্বন করে। ক্ষুদ্র আকারের সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে সি-এ্যানিমোন প্রকৃতিতে বেশ হিংস্র। মিলিয়া কাঁকড়া সর্বদা নিজের দু'টি দাড়ায় দু'টি জীবন্ত সি-এ্যানিমোনকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। খাওয়ার উপযুক্ত কোন প্রাণী দেখলেই সি-এ্যানিমোন দু'টিকে তার দিকে ঠেলে দেয় আর নিজে আত্মগোপন করে তাদের পিছনে। সি-এ্যানিমোনেরা তৎক্ষণাৎ আক্রমণ ক'রে সেই জন্তুটিকে ঘায়েল করে ফেলে। কাঁকড়াটি যখন দেখে প্রাণীটি একেবারে শেষ হয়ে গেছে, তখন সেই লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে এবং চটপট সেটিকে গলাধঃকরণ করে ফেলে।

হানি-গাইড বা মৌ-সন্ধানী একটি অদ্ভুত জাতের পাখী। এদের আদি বাসস্থান আফ্রিকা এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছো, মধু এদের একটি প্রিয়খাদ্য। কিন্তু আকারে অত্যন্ত ছোট হওয়ার দরুণ মৌচাক ভেঙ্গে মধু খাওয়া এদের দ্বারা কখনোই হয়ে ওঠে না! কারণ সে ক্ষেত্রে মৌমাছিদের সমবেত আক্রমণে প্রাণ হারাবার এদের সমূহ সম্ভাবনা আছে। তাই এ কাজের জন্য এরা এক কৌশল করে। সেখানকার অরণ্যে ব্যাজার নামে আর এক শ্রেণীর ছোট চতুষ্পদ জীব দেখা যায়! এদেরও প্রধান খাদ্য এই মধু। এরা কিন্তু একটু কুড়ে প্রকৃতির—বনজঙ্গলের মধ্যে খাদ্য খুঁজে বের করতে একেবারে রাজী নয়। তবে আকারে ছোট হওয়ায় ব্যাজার ঘন অরণ্যের মধ্যে খুব দ্রুত দৌড়তে পারে। তা ছাড়া গাছে উঠতেও এরা ওস্তাদ; সেইজন্যে গাছের উপর অবস্থিত মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা এদের পক্ষে মোটেই শক্ত হয় না।

হানি-গাইডের এ তথ্য জানা আছে; তাই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কোন গাছের ওপর মৌচাক দেখলেই এরা দৌড়ে এসে খবর দেয় ব্যাজারকে; শুধু তাই নয়, ব্যাজারকে বনের মধ্যে পথ দেখিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সে নিয়েও আসে। তারপর ব্যাজার গাছে উঠে যখন মধু খায়, তখন তার বন্ধু হানি-গাইডকেও তা ডেকে ভাগ দিতে ভোলে না, তা বুঝতেই পারছো! একটুও শারীরিক পরিশ্রম না করে শুধু বুদ্ধির জোরে যে কত সুযোগ-সুবিধে আদায় করা যায়, হানি-গাইড তার একটি চমৎকার উদাহরণ।

সবশেষে আমাদের পরিচিত একটি মাছের আশ্চর্য বিবরণ দিয়ে আজ শেষ করবো। এখানকার খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে কাঠকই বলে এক ধরণের মাছ দেখা যায়। কীট-পতঙ্গ খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। জলের ওপর ঝুলে-থাকা লতাপাতা বা গাছের ডালে কোন পোকামাকড় বসে থাকতে দেখলে এরা চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে হাজির হয়; তারপর মুখ থেকে কয়েকফোঁটা জল অত্যন্ত তীব্রবেগে এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে পোকাটির দিকে ছুঁড়ে দেয়; বন্দুকের বুলেটের মত জলের ফোঁটাগুলো পোকাটিকে আঘাত করামাত্র সেটি ছিটকে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে আর মাছটিও তৎক্ষণাৎ সেটিকে মুখের মধ্যে পুরে ফেলতে দেরি করে না। লক্ষ্যভেদের কাজে কাঠকই এত নিপুণ যে, দেখলে মনে হয়ে কোন সুশিক্ষিত সৈন্যও ওরকম নির্ভুলভাবে তার 'টারগেট'কে আঘাত করতে পারবে কি না সন্দেহ!

আমার মন

মোহনানন্দ গুপ্ত

যেদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র ওঠে,
তারার আলোক দূর থেকে দূরে ছোটে,
বিদ্যুৎ যবে চমকি চমকি থামে,
যবে বারিধারা অশান্তভাবে নামে,
সেদিন আমার মন নাহি বাগ মানে,
ভেসে চলে এক অদ্ভুত স্রোতটানে।

আমি রুধিতে পারি না তারে,
কুহকী-কুহকে মনখানি মোর কাড়ে।
যেথায় ফুলেরা ধরা দেয় স্নিগ্ধ বায়ুর কাছে,
মনখানি মোর তারও ফাঁকে ফাঁকে আছে।
প্রকৃতির যেথা অপরূপ দান,
সেথা মোর মন গাহে নিতি গান।

॥ কথাশিল্পীর ছেলেবেলা ॥

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

কলকাতার চিড়িয়াখানা দেখার সৌভাগ্য তখনও হয় নি ছেলেটির।

পাড়ার কয়েকজন ছেলে ইতিমধ্যে কলকাতা ঘুরে এসেছে। তাদের সকলের মুখে শুধু চিড়িয়াখানার সুখ্যাতি। ছেলেটি অবাক হয়ে শোনে তাদের গল্প; আর ভাবে তার জীবনে কবে এমন একটি সুদিন আসবে। চিড়িয়াখানার জীবজন্তুগুলো নাকি অদ্ভুত। কথায় বলে, আজব চিড়িয়াখানা।

…ছেলেটির ভাবনার শেষ নেই। চিড়িয়াখানার আজব জন্তুগুলো যেন তার সমস্ত শিশুমনকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু সে ভাবনার কিনারা হল একটা শেষ পর্যন্ত।…

ছেলেটির সমবয়েসী এক মামা একদিন তার কাছে এক প্রস্তাব নিয়ে হাজির। চিড়িয়াখানা দেখা যখন আপাতত হয়ে উঠছে না, তখন কাজ কি অতশত চিন্তা করে! তার চেয়ে নিজেরাই বাড়িতে একটা চিড়িয়াখানা তৈরি করবে।…

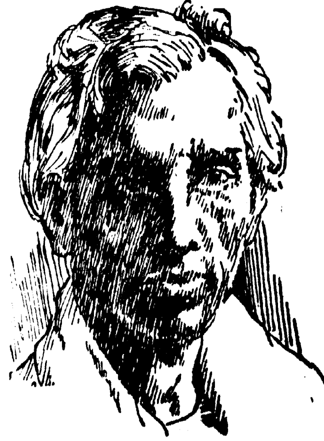
…মন্দ যুক্তি নয়। মামার বুদ্ধি আছে বটে। ছেলেটি তখন আনন্দে আটখানা। কলকাতার আজব চিড়িয়াখানার কথা ভুলে ঘরে একটা চিড়িয়াখানা তৈরি করার আনন্দে মেতে উঠল। কিন্তু চিড়িয়াখানা তৈরি করা তো সহজ কথা নয়। অত জীবজন্তু পাবে কোথায়? ছেলেটি আবার ভাবনায় পড়ল।

একগাল হেসে এবারেও মামা সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিল। এ আর এমন কি শক্ত কাজ!

…যাই হোক, মামা শেষ পর্যন্ত কাজের ভারটা নিল। কয়েকটা শিশিতে ক্ষুদে লাল কালো জাতের কাঠ পিঁপড়ে আর দু'তিন জাতের ফড়িং ভর্তি করে ফেলা হল। একটা হলদে বোলতা কুয়োতলায় জলের ওপর ভুল করে বসতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে তাদের হাতে বন্দী হল। বাঘের অভাবে বাসার মিনি বেড়ালটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেই চলবে। বাড়িতে যখন কোন কুকুর নেই তখন সিংহের বদলি বেওয়ারিশ কোন একটা কুকুরকে ধরে আনলে চলবে। সত্যি মামার বুদ্ধির তুলনা নেই। বিষধর সাপের বদলে কয়েকটা কেঁচো দিয়ে আপাতত কাজ চালিয়ে দিতে পারা যায়, এ বুদ্ধিও মামার মাথায় অনায়াসে খেলে যায়। যেই ভাবা, সেই কাজ। একটা শিশির ভেতর তখুনি কয়েকটা কেঁচোকে বন্দী করে ফেলা হল।

কিন্তু মুস্কিল হল, মামার আনকরা নতুন মতলবটাকে নিয়ে। বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে ইঁদুরের উপদ্রব চলছিল। ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর ধরার ফাঁদ পাতাও হচ্ছিল, কিন্তু ইঁদুরেরা সহজে ধরা দিতে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করছিল না। এ ঘটনাটি তাদের যেন বেশি ভাবিয়ে তুলল। কলে একটাও ইঁদুর যদি ধরা পড়ত, তাহলে চিড়িয়াখানাটা অমন একটা পরমাশ্চর্য প্রাণী থেকে বঞ্চিত হত না। আর ধরা যদি পড়েই, তা হলে তাকে রাখবে কোথায়? রাখবার জায়গা তাদের সত্যিই নেই। যে সব ওষুধের শিশি তারা অনেক চেষ্টায় যোগাড় করেছে, তাদের গলাগুলো এত সরু যে কোন জ্যান্ত ইঁদুরকে তার মধ্যে চালান যায় না।

ইস্! এ সমস্যাটা একেবারেই তারা ভেবে দেখে নি। অনেক চেষ্টার পর তারা অবশ্য ইঁদুরের একটা উপযুক্ত আশ্রয় ঠিক করে ফেলল। ভাঁড়ার ঘরে একটা সেল্‌ফে বড় একটা কাচের বয়েম রাখা আছে। ছোটবড় অনেকগুলো কাচের



● শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শিশি ইতিমধ্যে যোগাড় হয়েছে। কিন্তু ঐ বড় কাচের বয়েমটা না পেলে সব ব্যবস্থা মাটি।

এখন মা রাজী হলে হয়। তাদের সঙ্গে এ ব্যবস্থায় মা যে রাজী হবেন না সে বিষয়ে ছেলেটির যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অতএব মামার পরামর্শমত মায়ের অমতে বয়েমটা সরিয়ে ফেলতে হবে।

একদিন মা ভাঁড়ার ঘরের কাজ সেরে সবেমাত্র রান্নাঘরে গেছেন, এমন সময় চট করে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে কাচের বয়েমটি নিয়ে সরে পড়ল ছেলেটি। কিন্তু পরক্ষণেই মুস্কিল বাধল। এই বয়েম নিয়ে এখন কোথায় যাবে সে? বয়েমটা ছাই এত

ভারী, সে কথা আগে কি সে জানত? কথা ছিল, মামা তার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করবে। কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখে মামা উধাও। মামা যে হঠাৎ এত স্বার্থপর হয়ে উঠবে কে জানত?

...যাই হোক কোনরকমে গেটের ওপর সেই ভারি বয়েমটি জড়িয়ে ধরে হতাশভাবে এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে দেখল ছেলেটি। ত্রিসীমানায় মামার চিহ্ন নেই। এখন কোনদিকে যাবে সে, ভীষণ চিন্তায় পড়ল ছেলেটি। বাড়ির সীমানা পেরুলেই, শুকনো রাঙামাটির মাঠ। দূরে ছোট স্টেশনের রাঙাটালির গড়ানো ছাদে যেন ঢেউ তুলেছে। এতবড় পৃথিবী। কিন্তু তার বয়েমটি রাখবার মত এতটুকু জায়গা নেই। অথচ এই ভারী বয়েমটি নিয়ে আর পথ চলতে পারছিল না ছেলেটি। শেষে অগত্যা সেটাকে নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিল সে। এমন সময় হঠাৎ দেখে বাড়ির পুরানো চাকর লালজিয়া বাজার হাতে করে বাড়ি ফিরছে। তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়তে চেষ্টা করল ছেলেটি। কিন্তু চেষ্টা করেও যেন পারল না। লালজি ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে।

কি দাদাবাবু! কোথায় যাচ্ছ?

কোথাও না।

তোমার জামার নিচে ওটা কি?

কাচের বয়েম।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

জানি না।

আচ্ছা, চল তবে মায়ের কাছে।

তারপর একরকম জোর করেই লালজি তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলল মায়ের কাছে। কোন কাকুতি-মিনতি তার কাছে টিকল না।

মা সমস্ত ব্যাপার শুনে রীতিমত হতভম্ব। জিগ্যেস করলেন,—ওমা, সে কি রে! অতবড় বয়েমটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলি?

ছেলেটির সমস্ত রাগ তখন মামার ওপর পড়েছে। এমন বিপদের সময় সে নাকি গা-ঢাকা দিলে। মামার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে সেও ছাড়বে না। তাই মা'র কথার জবাবে বলে উঠল,—মামা নিয়ে যেতে বলেছিল।

কে, বীরু?

হ্যাঁ।

কেন?

ইঁদুর রাখবে বলে।

বয়েমে ইঁদুর রাখবি কি রে? এই না বলে বাড়ির সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল। সে কি হাসির ধুম। লজ্জায় অপমানে এত লোকের সামনে ছেলেটি তখন দিশেহারা। হাসির তোড়ে অপরাধীর শাস্তি ভেসে গেল বটে, কিন্তু সে এতে মোটেই খুশি হল না। এর চেয়ে যেন দু'টো কানমলা খাওয়া ভাল ছিল।...

যাই হোক, খানিক পরে মামার সাথে দেখা হল তার। কিন্তু রাগ দেখানোর ফুরসৎ পেল না। ইতিমধ্যে মামা আর এক আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছে। চিড়িয়াখানা তৈরি করার কাছে এ কাজের তুলনা হয় না। থার্মোমিটারের খোল থেকে কি করে সত্যিকারের ফাউনটেন পেন তৈরি করা যায়, তাই নিয়ে মামা তখন এক ভীষণ গবেষণায় ব্যস্ত। এই কাজে হঠাৎ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মামা তাকে ঠিক সময়ে চিড়িয়াখানা তৈরির কাজে সাহায্য করতে পারে নি। আবার অবাক হল ছেলেটি। মামার প্রতি তার ভক্তিশ্রদ্ধা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। প্রতিভাবান লোকের প্রতি বেশিক্ষণ রাগ করে কি থাকা যায়? তাই ভাবলে তখন, চিড়িয়াখানা তৈরি করাটা নেহাৎই ছেলেমানুষী। কেঁচো কখন সাপ হয়? মিনি বেড়ালটাকে বাঘ বলে চালালে লোকেরাই বা মানবে কেন? তার চেয়ে ফাউনটেন পেন আবিষ্কার অনেক উন্নত কাজ। মামার সাথে হাত মিলিয়ে আবার নতুন উৎসাহে গবেষণার কাজে মন দিল সে।

এমনি ভাবে জীবনে একটির পর একটি মন গড়ে উঠল তার। যে মন উত্তরকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কখন ক্লান্ত হয় নি। নতুন থেকে নতুনতর অধ্যায়ে অভিযাত্রাই তার ধর্ম।...

ছেলেটি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর একাধিক পরিচয়। একাধারে তিনি কবি, কথাসাহিত্যিক এবং প্রবন্ধকার। তাঁর রচনার প্রধান গুণ, তার মধ্যে একটি সৌন্দর্যপিপাসু কবিচিত্তের স্পর্শ রয়েছে। অত্যন্ত নিবিড় তাঁর অনুভূতি। সাহিত্যে তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। একজন সত্যান্বেষী তিনি। তাঁর সাহিত্যকর্মে মানবজীবনের এক অন্তহীন সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি বিখ্যাত শিল্পী শ্রীঅন্নদা মুন্সী কর্তৃক অঙ্কিত।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

লোকসভার অন্যতম সদস্য

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার-অ্যাট-ল

কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা



সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা




বিধানমণ্ডলী ও বিচার-বিভাগের বিরোধ

বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার ফলে অনেক সময় সাংবিধানিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এজন্য বিধান-মণ্ডলী ও বিচার-বিভাগের যে বিরোধ বাধে উহাকে নাটকীয়-ভাবে দেখার কথা কোন দায়িত্বশীল নাগরিক ভাবিতে পারেন না! এ সম্পর্কে সাধারণভাবে সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(ক) মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে মনে করিলে সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ ধারামতে যে-কোন নাগরিকের প্রতিবিধান প্রার্থনার অধিকার অবিচ্ছেদ্য। ১৯৪ ধারায় হাই কোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের উপযুক্তক্ষেত্রে এ সম্পর্কে প্রতি-বিধানের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয় নাই।

উক্ত অবিচ্ছেদ্য অধিকার ইংলণ্ডের বিচারালয় ও হাউস অব লর্ডস্-এর অনুমোদিত এবং হাউস অব কমন্স-এর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে হাউস অব কমন্স আর কখনও কোন বিচারালয় হেবিয়াস কার্পাসের আবেদনের রিটার্ন ফাইল করিতে অস্বীকার করে নাই।

অধিকারের অস্তিত্ব এবং সীমা-নির্ধারণের ক্ষমতা বিচারা-লয়ের নাই বলিয়া হাউস অব কমন্স-এর দাবী ইংলণ্ডে স্বীকৃত হয় নাই। ভারতীয় সংবিধানের বলে ভারতে কি ইহা স্বীকৃত হইতে পারে?

ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্স-এর 'অসংশয়িত ও প্রাচীন' অধিকারগুলি সেই দেশের আইনের অঙ্গীভূত। হাউস অব কমন্স-এর নিজস্ব প্রস্তাবের দ্বারা একটিও অধিকার সংযোজনের ক্ষমতা ছিল না এখনও নাই।

আমি মনে করি অবমাননার জন্য শাস্তি বিধানের অধিকার বিচার-বিভাগীয় ধাঁচের এবং ইহাকে ন্যায় বিচার নীতি ভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না।

হাউস অব কমন্স যাহা কিছুকে অধিকার বলিয়া মনে করিবে তাহাই যে তাহার অধিকার হইয়া বসিবে এবং ন্যায় বিচার নীতি ভঙ্গের অপরাধের শাস্তিবিধান অসঙ্গত যে ক্ষমতা হাউস অব কমন্স-এর নাই। হেবিয়াস কার্পাস আবেদন ন্যায়বিচারে নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বিচারালয়সমূহ বাধ্য।

ভারতে ২২৬ ধারায় হাই কোর্ট ও ৩২ ধারায় সুপ্রীম কোর্টকে দেশের আইন-কানুনের তত্ত্বাবধায়ক করা হইয়াছে এবং বিচারালয়ে প্রতিবিধান প্রার্থনার অবিচ্ছেদ্য অধিকার সম্পর্কে বিধানমণ্ডলীরও পর্যন্ত উচ্চবাচ্য করিবার নাই।

(খ) ভারতের বিধানমণ্ডলী সংসদের হাই কোর্টরূপে কাজ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয় এবং উহারা সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের আওতা বহির্ভূত স্বতন্ত্র সমান্তরাল বিচারালয়ের কাজ করে না। অবৈধ গ্রেপ্তারের অভিযোগের জবাব চাহিলে বিধানমণ্ডলীর একমাত্র সঙ্গত পথ হইতেছে গ্রেপ্তার বৈধ হইয়াছে বলা।

(গ) ভারতের বিধানমণ্ডলীগুলি দাবী করিতে পারে না যে :—

১। নাগরিকদের সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে প্রতিবিধান প্রার্থনার অধিকার নাই।

২। এইরূপ আবেদন গ্রহণের কোন অধিকার বিচারা-লয়ের নাই।

৩। অসঙ্গত অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে বিধান-মণ্ডলীর এক সভার আদেশে নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে জানা মাত্রই বিচারালয়ের হাত গুটাইয়া লওয়াই সমীচীন।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ও ৩২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয় নাই এবং কি নীতিগতভাবে, কি ক্ষমতার দিক দিয়া হাই কোর্টের আবেদন অগ্রাহ্য করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

প্রত্যেকটি আইনজীবী বিচারালয়ের কর্মচারী। সুতরাং বিচারালয়ে অধিকার আদায়ের আবেদনে নাগরিকদের সাহায্য করাই তাঁহার কর্তব্য। আবেদন মঞ্জুর না হইলে বা অগ্রাহ্য হইলে উক্ত আবেদন পেশ করার জন্য বিধানমণ্ডলীর অবমাননার দায়ে দোষী করা যায় না।

(ঙ) সংবিধানে যাহাদের বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের ঠিক অথবা ভুল রায় দিবারও ক্ষমতা আছে। সুপ্রীম কোর্টের আইনের ঘোষণা সাপেক্ষে হাই কোর্ট তাহার এক্তিয়ার নির্ধারণের ক্ষমতার অধিকারী।

আবেদন সম্পর্কে হাই কোর্টের বিচারপতির রায়ের সত্যাসত্যও বিধানমণ্ডলার পর্যালোচনার বিষয় নয়। কার্যত কোন বিচারকের আচরণ সম্পর্কে আলোচনার অধিকার বিধানমণ্ডলীর নাই।

(চ) ২১১ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, বিচারকের পদে জামিন থাকাকালে অথবা বিচারকের কার্য পরিচালনার সময় বিধান সভারও তাঁহার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন অথবা কোন আলোচনা চলিবে না। কেবল ১২১ ধারা অনুযায়ী অপসারণের জন্য সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে। কিন্তু সংসদে কোন মুলতুবি প্রস্তাব প্রসঙ্গেও সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাই কোর্টের বিচারপতির আচরণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা চলিবে না।

(ছ) মার্কিন সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়ে কি সিনেট কি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ কোনটিই নিজ নিজ ক্ষমতা ও অধিকারের চূড়ান্ত বিচারক নয় এবং উহাদের যে-কোন কাজের বৈধতা বিচারালয়ে পরীক্ষিত ও নিরূপিত হইয়া থাকে।

ন্যায়বিচার ক্ষুণ্ণ হইলে বাতিল

ন্যায়বিচার নীতি লঙ্ঘন করিয়া প্রদত্ত রায় বাতিলযোগ্য নয়। এই ন্যায়বিচার লঙ্ঘন করার অভিযোগ পাইলেই বিচারালয়ের কোন বিচার-বিবেচনার পূর্বেই অভিযোগ সত্য মনে করিয়া যাহাতে অন্যায় অবিচার অব্যাহতভাবে চলিতে না পারে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন এবং দেওয়া উচিতও।

বিচার-বিভাগীয় সমালোচনায় আপত্তি কেন ?

বিধানমণ্ডলী ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এই মনোভাব পোষণ করেন যে, জনগণের সংশ্লিষ্ট নীতিঘটিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাই কোর্টের শুচিস্মিত পরিবেশে মীমাংসা না হইয়া সংসদ অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে হওয়া দরকার। তাই প্রায়ই বিচার-বিভাগীয় সমালোচনায় আপত্তি উঠে। মার্কিন সংবিধানের কার্যাবলীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রধানত এইসব সমালোচনার উৎপত্তি।

আমার বিশ্বাস ইহা ঠিক নয়, কেন না আমাদের সংবিধানের বলে আমাদের সর্বোচ্চ বিচারালয় অথবা হাই কোর্ট সমূহের সমালোচনার ক্ষমতা রহিয়াছে। আমাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতীয় সংবিধানে চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাই কোর্টের নয় সংবিধান প্রণেতা অথবা সংবিধান সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষেরই। সংবিধানের ব্যাখ্যা জনকল্যাণ অথবা দারিদ্র্য ও অসাম্য উচ্ছেদে সংগ্রামশীল সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ না হইতে পারে। সংবিধানের সংশোধন করিয়া ঐ ধরণের ব্যাখ্যার প্রতিকার করা যায়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, সংবিধান ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্বপূর্ণ এবং দুরূহ কাজে আমাদের বিচারালয়গুলি দলিলপত্রের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আইন প্রণয়ন নয় ব্যাখ্যা করাই তাঁহাদের কাজ।

ব্যাখ্যার প্রকৃত পদ্ধতি

আইনজীবীর সুসংবদ্ধ, সীমিত ও সুপ্রথিত সংক্ষিপ্তসার এবং রাজনীতিকদের সুপ্রসরমুক্ত অবাধ স্বভাব—এই পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির সুসমঞ্জস সমবায়েই প্রকৃত ব্যাখ্যা গড়িয়া উঠে। একপক্ষ প্রধানত ভাষা বিন্যাসকেই দেখেন, পরিণতি, উদ্দেশ্য ও যুক্তির ধার ধারেন না। অন্যপক্ষ ভাষাগত দিকটি ছাড়াইয়া মহান নীতি, সুদূরপ্রসারী জাতীয় ফলাফল প্রভৃতির কথা বিবেচনা করেন। একপক্ষ উন্নয়নশীল জাতির শক্তিকে অবদমিত করেন, আর অন্যটি যাহাতে এই শক্তি শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হইয়া পড়ে তজ্জন্য সমস্ত বাধাবন্ধ অপসারণ করিতে চায়, এই দুইটিকে মিলিত করিতে পারিলে বাস্তব আইনের ভাবধারা এবং উক্ত আইনের আওতাভুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের চিন্তাধারা রক্ষিত হয়, সরকারের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব জোরদার হয় এবং জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত গতিতে ও আকস্মিক যে-কোন ঘাত-প্রতিঘাতে অটুট থাকিয়া দ্রুত অগ্রসর হয়।

হুঁসিয়ারী

কিন্তু আমি হুঁসিয়ারী করিয়া দিতে চাই। কেন না, কোন একটি নির্দিষ্ট মামলায় বিচার-বিভাগীয় সমালোচনা পাইবার সুযোগ প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে সেই আইনের ধারার উপর—যে আইনের ব্যাখ্যা বিচারালয় করিতে

যাইতেছে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গ্রেট-বৃটেনে অথবা ভারতে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের খেয়াল-খুশি মত কাজ করিতে এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অথবা কোন কিছুর বিচার করিতে পারেন না।

সোয়াজ যথার্থই তাঁহার 'Introduction in the American Administrative Law' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার জন্য আইনানুগ ধারার উল্লেখ না থাকিলে যে বিচারালয়ে আবেদন করা যাইবে না, একথা ঠিক নয় (১৬২ পৃষ্ঠা)।

বিধানমণ্ডলীর নীরবতা মারাত্মক নয়

আইনের ধারায় বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার কোন উল্লেখ নাই বলিয়া সমালোচনা করা চলিবে না, ইহা হইতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নোক্ত মামলার রায়ে বলা হইয়াছে : 'বিচার-বিভাগীয় সমালোচনা সম্পর্কে কংগ্রেসের নীরবতার দ্বারা জেনারেল কোর্টের উপর সাধারণ এক্তিয়ার অনুযায়ী প্রতিবিধানের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক ন্যস্ত ক্ষমতার অস্বীকৃতি বুঝাইতে পারে না।'

এস্টেপ বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩২৭ ইউ এস ১১৪, ১২০।

স্টার্ক বনাম উইকার্ড মামলায়ও (৩২১ ইউ এস ২৮৮) এই নীতিই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, আইনানুগভাবে কোন ধারার উল্লেখ ব্যতিরেকেও বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে, ভারতের বিচারালয়সমূহেরও এই নীতি অনুসারে চলা উচিত যে, সংসদ অথবা বিধানমণ্ডলীর নীরবতাকে বিচার-বিভাগীয় সমালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের পরিপন্থী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে না।

এই নীতি কেবল মার্কিন সাংবিধানিক কাঠামোতেই যে প্রযোজ্য তাহা নয়, ১৯৪০ সালে বিখ্যাত স্বরাষ্ট্র-সচিব বনাম মাস্ক মামলার রায়ে জুডিসিয়াল কমিটীর মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, সিভিল কোর্টের এক্তিয়ারের বাহিরে রাখা হইলেও বিচার-বিভাগের মৌলিক নীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া যে-কোন বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষমতা উহার রহিয়াছে।

মার্কিন নীতি অপরিহার্য

এই মার্কিন নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিতে চাই এই কারণে যে, আইনের ভিত্তিতে একটি পদ্ধতিমূলক কার্যধারা গড়িয়া তুলিবার পক্ষে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অধ্যাপক সোয়াজ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলীর নীরবতাই চূড়ান্ত নয়, অন্তরায় ইহাই বুঝাইবে যে, আইনানুগভাবে বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনার ধারা না থাকিলে প্রশাসনিক নির্দেশই চূড়ান্ত এবং আইন লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ সত্ত্বেও কোন বিচারালয় সমালোচনা করিতে পারিবে না। 'এই ধরণের অপ্রতিরোধ্য প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রশাসন ও বিচার-বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের সাধারণ ব্যবস্থা-ধাঁচের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য কমিশন ১৯৪৯, ৩৩৭ ইউ এস ৪২৬, ৪৩৩-৪) স্টার্ক বনাম উইকার্ড মামলার রায়ে বিচার-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা কলম্বিয়া জেলার আপীল কোর্টেও খুব জোরালো ভাষায় সমর্থন করা হইয়াছে—'এরূপ ক্ষেত্রে যদি বিচার-বিভাগের কোন ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে কেবল প্রশাসন বিভাগের আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যতীত অন্য কোনও বাস্তব নিয়ন্ত্রণ আর থাকিবে না।' (ফ্লেমিং বনাম মোবার্লি মিল্ক প্রোডাক্টস্ কোং ১৬০ এফ ২৫৯-২৬৫)।

সরকারী স্বেচ্ছাতন্ত্র অনুযায়ী কার্যাবলী অনিশ্চিত এবং স্বভাবসিদ্ধভাবেই নিয়ন্ত্রণক্ষম নয়, এই দৃঢ় বিশ্বাসই প্রধানত আইনকানুনের ভিত্তি। অধ্যাপক ডাইসি যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, যখনই ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা হয় তখনই জোর করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিবার সম্ভাবনা থাকে। অধ্যাপক ওসব তাঁহার গভর্নমেন্ট অব কানাডা গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'এই জবরদস্তিমূলক সিদ্ধান্ত স্বাধীন জনগণকে ঠেকাইতে হইবে।'

বাজোরিয়া মামলা

সংবিধানের ১৪ ধারায়ও যে সমান রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করিয়া উহা অস্বীকারের চেষ্টাও হইতে পারে। যেমন কেদারনাথ বাজোরিয়া বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (১৯৫৪ এস সি ৩০—এ আই আর ১৯৫৩ এস সি ১০৪) মামলায় অনুরূপ প্রশ্নই উঠিয়াছিল পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারী আইন সংশোধন (স্পেশ্যাল কোর্টের) আইনে, ১৯৪৯ সংবিধানের ১৪ ধারা লঙ্ঘন করা হইয়াছে কি না। উক্ত আইনে অপরাধের শ্রেণী বিভাগ করিয়া এক শ্রেণীর অপরাধের জন্য স্পেশ্যাল কোর্ট গঠন ও বিশেষ বিচার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হইয়াছে, যেহেতু উহা অসঙ্গত ও স্বেচ্ছাসিদ্ধান্তমূলক ; সুতরাং ইহাতে সমান রক্ষাকবচের ধারা লঙ্ঘন করা হইয়াছে কি না, উক্ত মামলার ইহাই ছিল বিচার্য বিষয়।

উক্ত আইনের পটভূমিকা বিচার-বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ বিচারের জন্য স্পেশ্যাল কোর্টের ব্যবস্থা ও উহার জন্য একটি বিশেষ বিচার পদ্ধতি নির্ধারণ শ্রেণী-বৈষম্যের নীতি হইতেই উদ্ভূত বলিয়া মন্তব্য করা হয়। বিচারপতি ভিভিয়ান বসু এ সম্পর্কে তাঁহার পৃথক রায়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই আইনে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্য করা হইয়াছে। [ক্রমশ।

অনুবাদক—অরুণ জানা

॥ নকল আকাশ ॥

আকাশ! মহাশূন্যে! এই মহাশূন্যে কিন্তু বাস্তবিকই 'কিছু নেই' এ হিসেবে শূন্য নয়। এখানেও আছে এবং এ সৃষ্টির যতটুকু আমাদের সাদা চোখে প্রতিভাত, তার চাইতে আরো লক্ষ লক্ষ কোটি গুণ আছে—জড়বস্তু আছে। মহাশূন্যে জড়বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবশ্য আদিম মানুষেরাও অবহিত ছিল। কারণ, সূর্য-চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে তারাও ঠিক আমাদেরই মতো সাদা চোখে প্রত্যক্ষ করতে পারত। কিন্তু তারপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জানতে পারলো যে, সাদা চোখে মহাকাশের যতটুকু দেখা যায়, বাস্তবিকপক্ষে তাই সব নয়—এ মহাকাশে আরো অনেক কিছুই রয়েছে—গণিতের সাহায্যে সেদিন পণ্ডিতজনেরা এ জড়বস্তুগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তখনও এ সবকে প্রমাণ বলে মনে করতো না—মনে করলো, যেদিন প্রথম দূরবীণ আবিষ্কৃত হলো।

দূরবীণ আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাশূন্য বা মহাকাশ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কৌতূহল ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। কতো কিছু আছে মহাকাশে! দূরবীণের সাহায্যেও মহাকাশের অতো সব জড়বস্তুকে সব সময় দেখা যায় না। কতো গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, নেবুল্যা—আরো কতো কিছু।

প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্যেই বিগত শতাব্দীর শেষদিকে সর্বপ্রথম জার্মানীতে মহাকাশের একটা নমুনা তৈরি করা হয়েছিল—এই হল আজকের নকল আকাশের (প্ল্যানেটোরিয়াম) গোড়ার কথা।

আজকের দিনে পৃথিবীর নানা দেশে যে নকল আকাশ তৈরি হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর। যে-কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত 'নকল আকাশ' ভবনে যদি আপনি আজ ১৯৬৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী গিয়ে বলেন যে, ১৭১০ সালের ১লা জানুয়ারী উত্তর আকাশে গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্ররাজি কে কোথায় ছিল একটু দেখতে চাই—তা হলে জানবেন মিনিট পনেরোর মধ্যেই বিজ্ঞানীরা তা আপনাকে দেখাতে পারবেন একটা গম্বুজের ভেতরের দিকের পর্দায় প্রতিফলিত আলোক-চিত্রের সাহায্যে। —তীরন্দাজ



বিজ্ঞান বার্তা

নীলরঙের গম

গমকে সবাই 'সোনার বরণ' বলে বর্ণনা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু মস্কোর নিকটবর্তী একটি খামারে নীল বরণ গম ফলানো হচ্ছে। ক্ষেতজোড়া এই নীল গমের শীষ দিগন্তের আকাশের রঙের সঙ্গে মিলে গেছে।

এই নীলরঙের গমের নাম 'এরেক টইড-৭২'। নিখিল সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির কৃষি-গবেষণা ইনস্টিটুটের তেজস্ক্রিয়া-প্রজনন সংক্রান্ত বিভাগের একদল গবেষক একখণ্ড জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই নীলরঙের সঙ্কর গম ফলিয়েছেন। এই গবেষক দলের নেত্রী শ্রীমতী ভেরা য়ভোস্তোভা এ সম্পর্কে 'নোভোস্তি প্রেস এজেন্সির' বিশেষ প্রতিনিধিকে বলেন—

এই 'এরেক টইড-৭২' গমের বৈশিষ্ট্য হল কোনরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে এর কোন ক্ষতি হবে না। অতিবৃষ্টি; ঝড়, এমন কি তুষার ঝঞ্ঝাকেও প্রতিরোধ করার শক্তি এই নীল গমের আছে। তেজস্ক্রিয়ার প্রয়োগেই এই গমের মধ্যে এই বিশেষ গুণ সঞ্চারিত করা গেছে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এ ধরণের নতুন নতুন পরিব্যাক্তির ('মিউটেশান') বিকাশ তেজস্ক্রিয়ার প্রয়োগে ঘটানো হচ্ছে।

পরীক্ষার সময়ে আমরা পাঁচ রকমের বিভিন্ন জাতের শীতকালীন সঙ্কর গমের বীজ বেছে নিয়ে, সেগুলিকে এক বিশেষ ধরণের বাক্সে রেখে কম জোরালো গামারশ্মি প্রয়োগ করি। দেখা গেল, ১৮৬ নম্বরের সঙ্কর গমের বীজই এর পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। এই বীজ বুনে ফসল ফলানোর পরে, সেই গমের সঙ্গে আবার ১৩৯ নম্বর সঙ্কর-গমের সাঙ্কর্য ঘটানো হয়। এর থেকেই উৎপন্ন হয় 'এরেক টইড-৭২' নামের এই আবহাওয়ার বিপর্যয়রোধী নীলরঙের গম।

এই গমের দানাগুলি আকারেও সাধারণ গমের দানার চেয়ে বড়ো এবং ওজনে ২৫ শতাংশ বেশি। এর নীলরঙের রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমতী য়ভোস্তোভা বলেন, গামা রশ্মির তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ার ফলে এই উদ্ভিদের কাণ্ড, শীষ ও পাতায় কিছুটা বাড়তি ত্বকমোমের ('কার্প্‌ওয়াকস') প্রলেপ পড়ে এবং এই মোমের রঙ নীল। এর ফলেই এই গম এতো বেশি আবহাওয়ার বিপর্যয় রোধের ক্ষমতা বিশেষত তুষার ঝঞ্ঝাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে।

অ্যালজী প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য

সামুদ্রিক গাছপালা, সামুদ্রিক শ্যাওলা বা অ্যালজী। বর্তমানে পৃথিবীতে যে রকম লোকসংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে তাতে মানুষের খাদ্যের চাহিদা দূর করবার পক্ষে এই অ্যালজী ভবিষ্যতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পশু-খাদ্য হিসাবে উপস্থিত অ্যালজী উৎপাদন করার উপরই বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। অ্যালজী মানুষের খাদ্য হিসাবেও উৎপাদনের বিষয়টি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (California University) স্যান-ফ্রান্সিসকোর নিকটবর্তী কেন্দ্রে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। নিয়ন্ত্রিত আলোক সংশ্লেষটি (Controlled Photosynthesis) পদ্ধতির মাধ্যমেই এই পরীক্ষা করা হচ্ছে। উদ্ভিদের সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল বা পত্র-হরিৎ নামক রঙিন পদার্থ থাকে। এই ক্লোরোফিলের কণা বা নটস্‌সমূহ সূর্যের আলোর সংস্পর্শে বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টি করে তাকেই বলা হয় ফটোসিনথিসিস বা আলোক-সংশ্লেষণ। এই ভাবে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট আত্মসাৎ করেই উদ্ভিদের দেহ পুষ্টিলাভ করে ও বড় হয়ে থাকে।



• আকাশের গায়ে গ্রহ-উপগ্রহের গমনাগমন দেখাবার জন্য এই অদ্ভুত যন্ত্রটিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এটি একটি সর্বাধুনিক 'জেইস' কৃত্রিম কাশ, যাকে ভৌগোলিক অক্ষাংশের মধ্যভাগে সন্নিবেশিত করা হয়েছে

উদ্ভিদের বিকাশের মূলে যে সব প্রক্রিয়া রয়েছে তাদেরই অন্যতম নাম Photosynthesis. এই প্রক্রিয়াই বাতাসের জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলে শ্বেতসার ও চিনিতে পরিণত হয়, এই শ্বেতসার ও চিনি প্রত্যক্ষভাবে খাবার হিসাবে উদ্ভিদের দেহে জমা হতে থাকে। পরোক্ষভাবে তাই পশুর ও মানুষের খাদ্যের জোগান দেয়। এই মৌলিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এখনও খুব অল্পই উপলব্ধি হয়ে থাকে।



●৮০ফুট ব্যাসের এই কৃত্রিমাকাশটি জার্মানীর লাইপজিগ শহরে রয়েছে

উদ্ভিদের দেহে সূর্যের আলো রাসায়নিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হওয়ায় এই শক্তিই আবার প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় ও উদ্ভিদের খাদ্যের পক্ষে অপরিহার্য অন্যান্য জিনিস গড়ে তোলে। Photosynthesis প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেটস গড়ে তোলার জন্যে উদ্ভিদের দেহের পত্র-হরিৎ বা ক্লোরোফিল থাকা অত্যন্ত দরকার। ছত্রাক প্রভৃতিতে ক্লোরোফিল থাকে না। এ জাতীয় উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্যে অন্যান্য পদার্থের উপর নির্ভর করতে হয়।

California Universityতে 'অ্যালজী' চাষের ব্যাপারে যে গবেষণা করা হচ্ছে, তাতে গবেষকগণ এই Photosynthesis প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করার উপায় বার করবার চেষ্টায় রয়েছেন এবং এর কার্যকারিতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে তারও সন্ধান করছেন। গহ্বর হতে নিঃসৃত ময়লা ও ময়লা জলের উপর এই অতি প্রোটিন-সমৃদ্ধ পশু-খাদ্যের বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়ে থাকে। এই বিষয়টি বিজ্ঞানীরা এইভাবে পরীক্ষা করে দেখছেন।

কাছাকাছি শহরের নালা হতে নিঃসৃত ময়লা জল একটি অগভীর জলাশয়ে এসে পড়ে। সেখানে সবুজ শ্যাওলা বা গ্রীন অ্যালজী বিদ্যমান। এই জলাশয়ের জলে যে জৈব পদার্থ রয়েছে তারা ঐ ময়লা জলের জীবাণুর (Germs) জন্যে পচে যায় ও অ্যালজীর খাদ্যে পরিণত হয়। তারপর Photosynthesis or আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এদের তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি ঘটে।

বেশ বৃদ্ধি পাওয়ার পর জল হতে তুলে এনে অ্যালজীকে শুকিয়ে (Dry) পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ঐ জলাশয়ে অ্যালজী জন্মানোর ফলে জলাশয়ের জলও

শোধিত হয়ে যায় ও ঐ জলের সংস্পর্শে অন্য অন্য জলাশয়ের জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তারপর পুনরায় ময়লা জল নিয়ে তাতে অ্যালজী জন্মানো এবং তার ফলে নোংরা জলের শোধন ও ঐ জলের অপসারণ এইসব প্রক্রিয়া চলতে থাকে।



●নবলাকাশের আর এক টাইপ। এটি জার্মানীর ড্রেসডেন শহরে আছে

বিজ্ঞানীদের ধারণা, অন্যান্য ফসলের তুলনায় অ্যালজী পঞ্চাশ গুণ বেশি সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে থাকে। খাদ্যমূল্য এবং গুণাগুণের দিক হতে অ্যালজী অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

একমাত্র ক্লোরেলা জাতীয় অ্যালজী হতে প্রতি বছরে এক একরে ১২ টন অবধি প্রোটিন পাওয়া যায়। জমিতে উৎপন্ন ফসল এবং খাদ্যের ভেতর সয়াবীন সর্বাধিক প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য। কিন্তু এই পরিমাণ প্রোটিন সয়াবীনে পাওয়া যায় না। সয়াবীনের তুলনায় দশগুণ বেশি প্রোটিন পাওয়া যায় ক্লোরেলা জাতীয় অ্যালজী হতে।

ইউগ্লেনা নামক আর একরকম অ্যালজী আছে। এসব অ্যালজীর সঙ্গে জীবের মিল অনেক বেশি। এই ধরণের অ্যালজী হতে প্রতি একরে দশ টন অবধি প্রোটিন পাওয়া যায়। আমরা যে হারে প্রোটিন পেয়ে থাকি তার তুলনায় একশ' গুণ বেশি ঐ ধরণের অ্যালজী হতে পাওয়া যায়। প্রচলিত চাষবাসের সাহায্যে আমরা যেরূপ পরিমাণ প্রোটিন জোগাড় করে আনি তার তুলনায় অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত Photosynthesis প্রক্রিয়ার সাহায্যে দশ হতে একশ' গুণ বেশি প্রোটিন অ্যালজী চাষ হতে পাওয়া যেতে পারে।

তবে খাদ্য হিসাবে অ্যালজী চাষের বিষয়টি এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থাতেই রয়েছে। তা হলেও খাদ্যগ্রহণে মানুষের যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে, তা সহজে বদলানো যায় না। যে খাদ্য মানুষ কোনদিন দেখে নি এবং যে খাদ্যের সঙ্গে আদৌ কোন পরিচয় নেই তা পেটে অত্যন্ত ক্ষুধা থাকলেও তা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। তাই প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষ না খেয়ে থাকে। সুতরাং ঐ পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার সাফল্য অর্জন করলেও খাদ্যের অভ্যাসে ভীষণ অন্তরায় হয়ে উঠবে।

তবে কোন কোন ধরণের অ্যালজী যেমন সমুদ্রের গাছগাছড়া, ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার সমুদ্রোপকূলবর্তী কোন কোন দেশের লোকেরা অনেককাল হ'তে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আসছেন। কেলপ নামক একরকম সমুদ্রের গুল্মের ছাই হ'তে আইওডীন (Iodine) সংগ্রহ হয়ে থাকে। কেলপও একজাতীয় অ্যালজী।

অ্যালজী যেদিন সাধারণ খাদ্যরূপে গৃহীত হবে সেদিন চাষবাসের চিরাচরিত পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটবে! সেদিন রসায়ন বিজ্ঞানী এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদের দ্বারাই খামারগুলি পরিচালিত হবে।

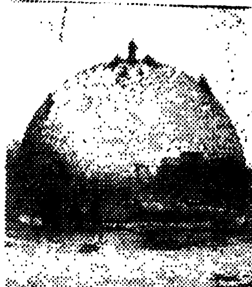
আর অ্যালজীর চাষ তো এই বিশ্বেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এমন কি চন্দ্রলোকেও অ্যালজীর খামার গড়ে তোলা যাবে। অ্যালজী চাষ করে, খাদ্য অক্সিজেন (Oxygen) ও পানীয় জল পাওয়া যাবে। তা ছাড়া দেহনিঃসৃত অপচয় মলমূত্র ইত্যাদি ফেলা নিয়েও কোন সমস্যা হবে না বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

বিজ্ঞানীরা দূর পথের মহাকাশচারীদের খাদ্য নিয়েও গবেষণা চালাচ্ছেন। —অনুসন্ধানী

শব্দ অমান্যকারীদের ধরার ব্যবস্থা

ইটো উলরিখ

যান্ত্রিক গোলমালের দরুণ যন্ত্র থেকে শব্দ হয়। আর এটা যেহেতু যন্ত্রের যুগ এবং কোন-না কোন সময়ে যন্ত্র যখন বিগড়ে যাবেই, তখন যন্ত্র-নির্গত শব্দ থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই? যদিও এখানকার মানুষের কাছে কিছুটা শব্দ সহ্য হয়ে গেছে, তবুও এক এক সময় এমন একটা উৎকট শব্দ হয় যেটা প্রায় অসহ্য। কোন কোন বিমান থেকে উৎকট অসহ্য শব্দ হয়। তাই পশ্চিম জার্মানীর, সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর ফ্রাঙ্কফুর্টের রাইন-মেন বিমানবন্দরে বিমানের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। বিমানবন্দরের কাছাকাছি সব স্থান ঘিরে বিশেষ মাইক্রোফোন যুক্ত খাম বসানো হয়েছে। উড়ন্ত বিমানের শব্দ এ সব মাইক্রোফোনে ধরা পড়ে বিমানবন্দরের



●৫২ টফু ব্যাসের একটি কৃত্রিমাকাশ। নকল আকাশের ছাচের কাজ দেখা যাচ্ছে

প্রশাসনিক দপ্তরে যাবে এবং সেখানে ঐ সব বিশ্লেষণ ক'রে জানা সম্ভব হবে কোন বিমান থেকে ঐ উৎকট শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। ইচ্ছাকৃত শব্দ করলে, বাঁধা পথ ছেড়ে গেলে কিম্বা অনুমোদিত উচ্চতার নীচু দিয়ে গেলে পাইলটকে সতর্ক করা হবে ও কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া হবে। তা ছাড়া এতে শব্দ নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে আরও গবেষণা করা যাবে। পশ্চিম জার্মানী ও বিদেশের অন্যান্য বিমানবন্দর ফ্রাঙ্কফুর্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ব্রতী হয়েছে!

—ডি এ ডি।

টিটেনাসের কবল থেকে শিশুদের রক্ষা করুন

হ্যারল্ড ওয়েলক্সে

টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার একটি মারাত্মক ব্যাধি। অথচ তবুও আমরা সাবধান হই না। কেটেকুটে গেলে টিটেনাসের বিরুদ্ধে, আমরা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করি না কিন্তু সামান্য ঐ কাটার জন্য কি ভীষণ যন্ত্রণাকর মৃত্যুর মধ্যে কত জীবন শেষ হয়ে যায়। ঐ সামান্য কাটাকে অবহেলা না করে ডাক্তারের কাছে গিয়ে অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশন নিলে ধনুষ্টঙ্কার রোগ কখনও হয় না। বর্তমানে বেশ কয়েক প্রকারের অ্যান্টিটিটেনাস ভ্যাকশিন বেরিয়েছে যেগুলি শুধু যে ফলপ্রদ তা নয়, নিরাপদও বটে।

টিটেনাসের ভাইরাস সর্বত্র বর্তমান, বিশেষত সার দেওয়া মাটিতে, পথের, ধূলোয়, ঘোড়া, গরু-মহিষ ও ভেড়ার নাদিতে। এই ভাইরাস সহজে মরে না, বছরের পর বছর বেঁচে থাকে। একমাত্র ২৪৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়ে বেশি তাপে একে মারা যায়। শরীরের সামান্যতম কাটা কিম্বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে দিয়ে টিটেনাসের ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পারে। এই কারণেই এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে ধরা যায় না কোথা দিয়ে এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করেছিল ও দাঁতকপাটি লেগে খিঁচুনি শুরু না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না কতদিন শরীরে প্রবেশ ক'রে আত্মগোপন করে বসেছিল। ছেলেবেলাতেই বাচ্চাদের টিটেনাসের বিরুদ্ধে চিকিৎসা করিয়ে রাখা উচিত।

আগে থাকতে টিটেনাসের টীকা না নেওয়ার ফলে টিটেনাস হলে কিভাবে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে, পশ্চিম জার্মানীর এরলানগেনের হাসপাতালে চিকিৎসক অধ্যাপক হ্বিণ্ডোরফেরের অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অনুচিত হবে না। এঁর মতে টিটেনাসে আক্রান্ত শিশুকে সর্বক্ষণ চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ নার্সের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। আলো ও শব্দজনিত উত্তেজনা যাতে না হয়, তা দেখতে হবে। নিরাময়ের যাবতীয় আধুনিক পদ্ধতি অপেক্ষা নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার পক্ষে বেশি সহায়ক। রোগীকে যতদূর সম্ভব কম ওষুধপত্তর দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত কারণ ওষুধপত্তরের দরুণ উত্তেজনা হলে পুনরায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

—ডি এ ডি।

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

॥ অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কুটনোকোটা ফেলে প্রকাণ্ড বঁটিখানা বারান্দায় কাত করে রেখে মা ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। মস্তবড় ভাতের হাঁড়ির জল টগবগিয়ে ফুটে পড়ে জ্বলন্ত উনুন নিভে যাওয়ার দাখিল,—দশটার মধ্যে পাঁচটি ছেলেমেয়ের স্কুলের ভাত চাই,—মা অনন্যমনা হয়ে সেই চিন্তায় রান্নায় মগ্ন। কোথা থেকে তিন বছরের অতি চঞ্চল দামাল ছেলেটি এসে মার অবর্তমানে মনের আনন্দে কাতকরা বঁটির বাঁটের উপরে দাঁড়িয়ে খলখলিয়ে হাসে আর নাচে। মুহূর্তে ঘটে গেল অঘটন! বঁটি যেমন সোজা হয়ে উঠলো, শিশুটিও সোজা আছাড় খেয়ে পড়লো তার বুকে।



● মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তারপর? তারপর শিশুর পেটখানা নাভির নীচে এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত কেটে দু'খানা,—নাড়িভুঁড়ি প্রায় দেখা যায়। মা শব্দে আকৃষ্ট হয়ে রান্না ফেলে এসেই এক চীৎকার! কি সর্বনাশ হল রে,—মানিকের পেট কেটে দু'খানা!

পাশের ঘরে বিদেশাগত কলেজের ছাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র পাঠে মগ্ন—মায়ের চীৎকারে বাইরে এসে ঐ দৃশ্য দেখে হতভম্ব। কিন্তু মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে দু'হাতের তালুর উপরে তাকে নিয়ে একছুট দুমকার ছোট হাসপাতালটিতে। ভাগ্যক্রমে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল, তিনি তড়িদ্বেগে পেটটি দিলেন সেলাই করে। ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দেবার পর দম নিয়ে বললেন,—একচুলের জন্য রক্ষা পেল ছেলেটি। কাটলো এক নিদারুণ ফাঁড়া। এই দুরন্ত ছেলেই উত্তরকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৮ খৃস্টাব্দে সাঁওতাল পরগণার রাজধানী দুমকা শহরে তার জন্ম। পিতা স্বর্গীয় হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ওখানে সরকারী সেটেলমেণ্ট দপ্তরের এক কর্মচারী। আদি নিবাস বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রাম হলেও, তিনি কর্মব্যপদেশে বহুকাল যাবৎ ঘরছাড়া। মা স্বর্গীয়া নিরদাসুন্দরী দেবী ছয় পুত্র ও চার কন্যার জননী। মানিক ভাইদের মধ্যে চতুর্থ। পিতামাতা প্রদত্ত ভাল নাম তার প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বোধ হয় তার গায়ের উজ্জ্বল কালো রং ও সুন্দর মুখশ্রী দেখেই সেই যে আঁতুড় থেকেই তার নামকরণ হল কালোমাণিক—সেই মানিক নামটিই রয়ে গেল আজীবন। লেখা শুরু করে মানিক নিজেও তার ডাকনামটিই নিলেন বেছে,—কাজেই প্রবোধ গেল বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে! তার মামাবাড়ি মালপদিয়ার সন্নিকটবর্তী গাওদিয়া গ্রামে। জীবনে কদাচিৎ গেলেও এই গাওদিয়ার নাম তার লেখায় অনেক পাওয়া যায়।

অকুতোভয়, সদাচঞ্চল, ডানপিটে, পাঠ্যপুস্তকে অমনোযোগী কিন্তু মেধাবী ছেলে মানিকের দ্বিতীয় ফাঁড়া তার তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে টাঙ্গাইলে। বাবা তখন সেখানে সাব-ডেপুটি-কালেক্টার। তার পূর্বে সে সেটেলমেণ্ট কর্মচারী পিতার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে মেদিনীপুর জেলার নানা যায়গায়—তমলুক, মহিষাদল, কাঁথি, গুইয়াদা, শালবনী, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি স্থানে, অল্প অল্প দিনের জন্য।

টাঙ্গাইলে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ,—পিঠোপিঠি চার ভাই কালীপুজোর আগে রাতদিন যুক্তি আঁটে এবার পূজোয় নিজেদের তৈরি বাজী পোড়াবার। মানিকের উৎসাহই সর্বাধিক। মোটা মোটা শিশিতে নানা মশলা যোগাড় করে রোজ রাত্রে চারভাই শিশি-বোতলগুলো উঠানে বের করে নানা কল্পনায় হয় মশগুল! একজন বলে চমৎকার বাজী হবে, অন্যে বলে কিচ্ছু হবে না, হয়ত জলবেই না। একটি ভাই কি হয় না-হয় দেখার জন্য সবচেয়ে বড় শিশিটির মুখে একটি দেশলাই কাঠি জালিয়ে দেওয়া মাত্র এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! সমস্ত বাড়ির আলো একযোগে নির্বাপিত! সমস্ত শিশি-বোতল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারভাইয়ের শরীরে প্রবিষ্ট—অন্ধকারে রক্ত-স্রোতে ভেসে চারজন উঠানে অজ্ঞান!

অনেক ছুটোছুটি, অনেক হাঁকডাকের পর এলো আলো, —এলো ডাক্তার। সমস্ত রাত্রি ধরে চলে শরীরের ভিতর থেকে অসংখ্য কাচ নিষ্কাষণ পর্ব। ভগবানের কি করুণা,— ঐ কাচের একটিও যদি চোখে-মুখে কি পেটে-বুকে লাগত তবে কি আর রক্ষা ছিল? দ্বিতীয় ফাঁড়াও কেটে গেল একচুলের জন্য!

কিশোর মানিক টাঙ্গাইলের মাঠেঘাটে; ধান ক্ষেতের আলে আলে ঘুরে বেড়াতো উদভ্রান্তের মত;—সংগী হাতের বাঁশী। দরাজ গলায় যেমন গান গাইতে পারত, তেমনি বাঁশীও বাজাত চমৎকার! মন ছিল অতিরিক্ত ভাব ও কল্পনাপ্রবণ এবং দরদী।

এরপর তার মাথায় চাপে আর এক নেশা। ১৪।১৫ বৎসরের ছেলে স্কুলের ছাত্র মানিককে দু-তিনদিন খুঁজে পাওয়া যায় না। যায় কোথায়? জননী কেঁদে-কেটে অস্থির, খোঁজ নিয়ে জানা যায় টাঙ্গাইলের নদীর ধারে যে নৌকাগুলো নোঙ্গর করা থাকে, তাদের মাঝি-মাল্লার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের মধ্যে সে দু'চারদিন থেকে আসে। নৌকার মধ্যে তাদের দেওয়া অন্ন খায় পরম পরিতৃপ্তিতে। এ তার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত পাগলামি! 'পদ্মা নদীর মাঝি' লেখার প্রেরণার মূল কি সেই কৈশোরের স্মৃতি?

মাঝে মাঝে তাকে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের মধ্যেও দেখা যেত। তার মনে ছিল না ভয়-ডর, ছিল না পিতা-মাতার শাসন-ভীতি। গাড়োয়ানদের সঙ্গে গল্প-গুজবে রাত বেশি হয়ে গেলে, একটি গাড়ির ভিতর ঢুকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে থাকতো,—বাড়ি ফিরে যাবার কথাটিও মনে পড়তো না। তার কৈশোরের এই বেপরোয়া ভাব,—নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা,—শাসন-শৃঙ্খলার গণ্ডীতে না আসা;—ছিল তার পরবর্তী সমস্ত জীবনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। এমন অসাধারণ চরিত্রের ছেলে বোধ হয় কদাচিৎ দেখা যায়।

এই সময় থেকেই সে গল্প-উপন্যাস পাঠে মেতে ওঠে। কোনো গল্প, কোনো উপন্যাস তার মনঃপূত না হলে ভাবত, একে অন্যভাবে লিখলে ত' অনেক ভাল হয়। তখন নিজেই ছোট ছোট অক্ষরে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ঐ গল্পগুলো ঢেলে সাজত। টাঙ্গাইলে স্কুলে পড়বার সময় থেকেই এভাবে তার লেখায় হাতেখড়ি হয়। টাঙ্গাইলেই হয় তার আকস্মিক মাতৃবিয়োগ,—তখন মানিকের বয়স ষোল ও ১৯২৪ খৃস্টাব্দ।

মা জীবিত থাকাকালে মানিকের একবার হয় কালাজ্বর। তখন তাকে পাঠানো হয় তার বড়দিদির নিকটে মেদিনীপুরে। সে বৎসরই ছিল তার প্রবেশিকা পরীক্ষার বৎসর। মেদিনীপুরে তিন-চার মাস থাকা এবং চিকিৎসার পরে সুস্থ হয়ে ওঠায় তাকে মেদিনীপুর জিলা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়, তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার বাকি মাত্র দশ মাস। প্রায় এক বৎসর রোগের আক্রমণে পড়ার ব্যাঘাত হওয়ায় মানিক প্রথমে সে বৎসর পরীক্ষা দিতে রাজী না হলেও, সকলের পরামর্শে ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায় সেই বৎসরই সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় মেদিনীপুর জিলা স্কুল থেকে এবং দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

মাতৃবিয়োগ হয় পরীক্ষার কিছুপূর্বে, তাতে সে মনে অত্যন্ত আঘাত পায়, তারপর পিতা যশোরে বদলি হওয়ায় মানিক তার স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কারণে বাঁকুড়া কলেজে ভর্তি হয়। এখানে দুই বৎসর পড়ার পর প্রথম বিভাগে ভালভাবে আই-এস-সি পাশ করাতে পিতা তাকে ভর্তি করেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেই সময় থেকেই সে লেখার নেশায় হয় পরিপূর্ণ মশগুল। কলেজ পাঠ্যপুস্তক তার হাতে কখনও দেখা যেত না, সমস্তক্ষণ ঘরে দরজা বন্ধ করে কেবল লিখতো।

তার বড়দিদি বলেন—অতি শৈশব থেকেই মানিকের বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মানিকের বয়স যখন আড়াই কি তিন,—মুখে ভাল করে কথা ফোটে নি,—সেই সময় বৎসর দেড়েক বয়সের ছোটভাইটির হাত ধরে দুমকার বাড়ির বাগানের ছোট পাতকুয়ায় ব্যাঙ দেখতে যেতো। একদিন ঝুঁকে ব্যাঙ দেখতে গিয়ে ছোটভাই পড়ে যায় কুয়ার ভিতরে। আধো-আধো ভাষায় ভাই কুয়ায় পড়ে গেছে বলতে বলতে ছুটে এসে গৃহকর্মনিরতা মায়ের আঁচল ধরে টেনে নিয়ে এলো বাগানের কুয়ার ধারে।

মায়ের চীৎকারে পাড়া-প্রতিবেশী এসে ছোটভাইটিকে কুয়া থেকে তুলে তাকে মাটিতে ফেলে, মানিককে আদরে আদরে

ভরিয়ে দিল। সকলেই বলতে লাগল,—অতটুকু ছেলের কি বুদ্ধি! সে তাড়াতাড়ি এসে মাকে টেনে কুয়োর ধারে না নিয়ে গেলে ত' ঐ শিশুটির বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না!

মানিক শিশুকাল থেকেই ছিল হাসিখুশি-চঞ্চল-নির্ভীক-প্রাণবন্ত শিশু। কান্নাকাটি অথবা ভয়-ডর ছিল না তার ধাতে। তার বড়দিদি বলেন,—আর একটু বড় হবার পর যখন তার বঁটিতে পেট কেটে গেল, হাসপাতালের ডাক্তার পঁচিশটি 'স্টিচ্' দিয়ে পেট জুড়ে দিলেন, তখনও সে কাঁদে নি একফোঁটা! ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বলেন,—এ অদ্ভুত ছেলে! অন্য ছেলে হলে চীৎকার করে পাড়া মাৎ করে দিত। পিতার বদলির চাকুরিতে তাঁর সঙ্গে নানাদেশে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ালেও মানিকের প্রথম শিক্ষারম্ভ হয় তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে। তাঁর বাসস্থান কলকাতায়। তাকে প্রথমেই ভর্তি করা হয় মিত্র ইনস্টিটিউশনে। তখন মিত্র ইনস্টিটিউশন ছিল কলকাতার নামকরা ভাল স্কুল এবং এখানে মানিক ভাল ছাত্র বলেই গণ্য হয়েছিল। পাঁচ-ছয় বৎসর মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করার পর তার দাদা কার্যব্যপদেশে বহুদূরে চলে যাওয়ায় সে তার পিতার নিকটে টাঙ্গাইলে যায় এবং সেখান থেকেই আরম্ভ হয় তার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন।

বাঁকুড়া কলেজে পড়ার সময় সে ঘন ঘন মেদিনীপুরে দিদির নিকটে আসতো ও কলেজের নানা গল্প শোনাতো। বাঁকুড়া কলেজটি ছিল মিশনারীদের কলেজ, কড়া নিয়ম-শৃঙ্খলার গণ্ডীতে ঘেরা। সন্ধ্যা সাতটার পরে কোনো ছাত্রের কলেজ সীমানার বাইরে থাকার নিয়ম ছিল না। নিয়ম-ভঙ্গকারী ভাবপ্রবণ মানিক রোজই বিকেলে বাইরে বেড়াতে গিয়ে রেলস্টেশনের ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের দিকে চেয়ে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা—সঙ্গী হাতের বাঁশীটি। সে ঘরে আসামাত্র কলেজের অধ্যক্ষ ইংরেজ ফাদার তাকে ডেকে পাঠাতেন এবং নিয়মভঙ্গের কৈফিয়ৎ তলব করতেন। বাঁশী হাতে মানিক নিঃশব্দে দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং কিছু সময় পর অধ্যক্ষ একটু হেসে তাকে ছেড়ে দিতেন। রাত্রে অনেক সময় তার বাঁশীর আওয়াজ সকলের কানে যেতো।

মেদিনীপুরে দিদির নিকটে থাকাকালীন সে রাত্রে খুব কম খেতো। দিদি এর কারণ জানতে চাইলে বলতো, তোমরা পেটপুরে খেয়ে নাক ডাকিয়ে রাত কাবার কর, আর আমি সমস্ত রাত ছাদে বসে রাত্রের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। ভরপেট খেয়ে কি রাত জাগা যায়? রাত্রির যে কি অপরূপ রূপ তা তোমরা কিছুই জান না।

মানিকের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার পর তার পিতা পেন্‌শন্ নিয়ে কলকাতায় এসে প্রবাসী জ্যেষ্ঠপুত্রের বালীগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডস্থিত বাড়িতে সকলকে নিয়ে বাস করেন। এখানে এসে মানিকের পাঠ্য-অপাঠ্য পুস্তক পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে কল্পনার জাল বোনা ও আশেপাশের সকলের সঙ্গে মেলামেশা। মেধাবী ছাত্র বেশি পড়ার দরকার হয় না। প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েটের বেড়া অনায়াসে পার হয়ে এলেও বি-এস-সি-তে এসে গেল আট্‌কে। সে নিজেই বলত, অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান তার খুব ভালো লাগে বিশেষত ল্যাবরেটারীর প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাশগুলো। কিন্তু দেশ-বিদেশের গল্প-উপন্যাসে তখন তার মন এত মুগ্ধ যে, পাঠ্যপুস্তকে হাত দেবার সময়ই ছিল না। আর ছিল অগণিত বন্ধুবান্ধব।

এই সময়েই একদিন একদল বন্ধুর সঙ্গে লেখা ও তার প্রকাশ সম্বন্ধে হয় মানিকের ভীষণ তর্কযুদ্ধ। তখন বাংলা ভাষায় প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকাগুলি প্রথম শ্রেণীর মাসিক। বন্ধুরা অনেকেই বলে যে, এসব কাগজে চেনাশোনা না থাকলে কখনোই কোনো নূতন লেখকের লেখা ছাপানো যায় না—তা লেখা যতই ভালো হউক না কেন!

মানিক মানে না একথা। বলে তোমার যদি প্রতিভা থাকে, আর লেখায় তা ফুটিয়ে তুলতে পারো, তবে সম্পাদকের সাধ্য নেই তা বাতিল করে সে লেখা ফিরিয়ে দেয়। ভালো লেখা কি এতই সস্তা?

বন্ধুরা বলে, তুমি লিখে প্রমাণ করতে পারো একথা?

মানিক বলে, পারি।

বন্ধু বলে, আচ্ছা রাখো বাজি।

দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে মানিক রাজী! খুব খেটে অতসী মামী নামক গল্পটি লিখে মানিক পাঠিয়ে দিলো 'বিচিত্রায়'।

প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন গঙ্গোপাধ্যায় তখন বিচিত্রার সম্পাদক। হঠাৎ একদিন তিনি এলেন হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি, হাতে কিছু টাকা। তিনি বলেন,—মানিকের গল্পটি উৎকৃষ্ট। তার হাতে টাকা ক'টি গুঁজে দিয়ে বলেন,—তুমি আরও লেখো - তোমার কাছ থেকে আমরা আরও গল্প চাই।

'লেখকের কথা' পুস্তকের 'গল্প লেখার গল্প' প্রবন্ধে মানিক নিজেই লিখেছে এই কাহিনী। এই প্রবন্ধেই পাওয়া যায় কি ভাবে তার নাম, পোষাকী প্রবোধচন্দ্র বাতিল হয়ে ডাকনাম মানিকে দাঁড়ালো। মানিক লেখে,—

'...এক ঘোরানো ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম 'অতসী মামী'। ভাবলাম এই উচ্ছ্বাসময় গল্প, এই নিছক পাঠকের মনভুলানো গল্প, এতে নিজের নাম দেবো না। পরে যখন নিজের নামে ভালো লেখা লিখবো,

তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দে করবে। এই ভেবে বন্ধু ক'জনকে জানিয়ে গল্পের নাম দিলাম ডাকনাম—মানিক। কল্পনাশক্তি একটা ভালো ছদ্মনামও খুঁজে পেলো না।'

এই গল্পই মানিকের প্রথম প্রকাশিত গল্প। তখন বয়স তার কুড়ি-একুশ—বি-এস্-সির ছাত্র। পরে এই গল্পটি এবং আরও কয়েকটি গল্পের সমন্বয়ে 'অতসী মামী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে।

মানিকের ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা শেষ করে একটু বয়স বেশি হলে লেখা আরম্ভ করবে। তার আগে চলবে তার প্রস্তুতি, কিন্তু কার্যকালে তা আর হল না। অল্পদিনের মধ্যে প্রবাসীর ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় মানিক পায় প্রথম পুরস্কার। এবার পড়াশোনা মাথায় ওঠে। বিজ্ঞানের ছাত্রটি বিজ্ঞান-লক্ষ্মীকে দূরে সরিয়ে সাহিত্য-লক্ষ্মীর সাধনায় সমগ্র মনপ্রাণ সমর্পণ করে।

তার বৈজ্ঞানিক দাদা তখন বম্বের কোলাবা অবজারভেটরীর ডিরেক্টার,—তিনি সেখান থেকে নিয়মিত পাঠান ভাইয়ের পড়া খরচ। উপর্যুপরি দু'বৎসর বি-এস-সি-তে অকৃতকার্য হওয়ার দরুণ মানিকের নিকট চান কঠোর কৈফিয়ৎ,—কেন সে পাঠ্যজীবনে পড়াশোনায় অবহেলা করে অন্যদিকে মন দেয়? কেন সে বার বার পরীক্ষায় হয় অকৃতকার্য?

মানিক অকুতোভয়ে জানায়,—তার পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় নেই,—তার বদলে সমস্ত বৎসরে পড়ে রাশিকৃত বিদেশী লেখকের লেখা গল্প ও উপন্যাস,—যার মধ্যে রাশিয়ান লেখকই বেশি। সেইসব লেখক ও তাদের পুস্তকের এক বিরাট তালিকা পাঠিয়ে দেয় বিস্মিত দাদাটির নিকট,—যিনি জীবনে পাঠ্যপুস্তক ও বৈজ্ঞানিক কেতাব ভিন্ন, কোনো গল্প-উপন্যাসের পাতা উল্টিয়ে দেখেছেন কি না সন্দেহ!

বিপরীতধর্মী দাদা ও ভাইয়ের সে সময়ে হয় বহু পত্র-বিনিময়। দাদা লেখেন—আগে মন দিয়ে পাঠ্যপুস্তক পড়ে পরীক্ষায় পাশ কর, পরে তোমার ইচ্ছামত যতখুশি গল্প-উপন্যাস লিখো ও পোড়ো।

মানিক লেখে—গল্প-উপন্যাস লেখা ও পড়া আমি ছাড়তে পারবো না। কাজেই কলেজের পড়াই আমার ছাড়তে হবে। তবে আপনি দেখে নেবেন, কালে এই লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান করে নেব। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সমপর্যায়ে আমারও নাম ঘোষিত হবে।

ঐটুকু ছেলের কি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়! কি দুঃসাহস। কলেজে পড়ার এখানেই ইতি।

তারপর আরম্ভ হয় মানিকের দারুণ সংগ্রামের জীবন। অর্থকরী জীবিকার্জনের ধারেও না গিয়ে লেখাই হয় তার পেশা। কিছুকাল পরে পিতার সঙ্গে সমগ্র পরিবারটি বালীগঞ্জ পরিত্যাগ করে চলে যায় মুঙ্গেরে। হয়ত পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল বার্ধক্যের বাকি দিনগুলি গঙ্গাতীরে মুঙ্গেরেই কাটিয়ে দেবেন,—কিন্তু বাদ সাধে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্প। সে ভূমিকম্প যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন তার প্রচণ্ড ভয়াবহতা। মুহূর্তে বাড়ি-ঘর-মানুষ-পশু একসঙ্গে ধূলিসাৎ! মানিকের পরিবারেও এই ধাক্কায় অনেক ওলট-পালট হয়ে যায়; দু-একটি কচি-কাচা ভিন্ন সে পরিবারের সকলেই প্রাণে বেঁচে চলে এলো মানিকের মধ্যম ভ্রাতার নিকটে রাঁচীতে।

এই ভ্রাতা অনেকদিন আগেই রাঁচীতে ডাক্তারের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁরই একটি শিশুকন্যা প্রাণ হারায় মুঙ্গেরে ভূমিকম্পে বাড়ি চাপা পড়ে এবং পরিবারের অনেকের সঙ্গে অন্য কন্যাটিও আহত হয় দারুণভাবে। রাঁচীর মনোরম আবহাওয়া ও ডাক্তার ভ্রাতার চিকিৎসা ও যত্নে ক্রমে ক্রমে সকলেই সুস্থ হয়ে ওঠে।

এই নিদারুণ দুর্ঘটনার কিছুকাল পরে পিতা কলকাতায় এসে টালীগঞ্জে একখানি বাড়ি তৈরি করে সকলের নিয়ে স্থায়িভাবে বাস করেন এখানে। টালীগঞ্জে তখন বাড়িঘর অল্প—ভদ্রলোকের বাসও নগণ্য—চতুর্দিকে কেবল গরীবদের বস্তী। এখানেই মানিক তার মনের ও লেখার খোরাক পায় প্রচুর!

বস্তীর অশিক্ষিত মজুর-মিস্ত্রিদের সঙ্গে সে মেশে প্রাণ খুলে, এমন কি তাদের ঘরের লোক হয়ে তাদের ঘরেই কখনো কখনো কাটায় দিনরাত। তাদের সঙ্গে আহারে-বিহারে-পানদোষে জর্জরিত করে নিজের আভিজাত্য। এমন কি—গরীবের জন্য করা 'পাইস্-হোটেলে' গিয়ে কিছুকালের জন্য স্থান নেওয়াও মানিকের আর এক অদ্ভুত বিলাস!

ভিখারী-বোষ্টম, মজুর-মিস্ত্রিদেরও যে প্রাণ আছে,—আছে বিরহ-মিলন-প্রেমকূজন,—আছে ব্যথা-বেদনা-সুখ-দুঃখ সমাজের উপরতলার মানুষের মতই, অথবা তাদের চেয়েও অনেক বৈচিত্র্যময় ওদের জীবন,—তা মানিক ওদের ভিতর থেকে মর্মে মর্মে অনুভব করতে থাকে এবং রাতদিন বিপুলবেগে তা প্রকাশের নেশায় মেতে ওঠে।

তার লেখা প্রথম উপন্যাস 'জননী' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে। তারপর প্রকাশ পায়—প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, ভেজাল, হলুদপোড়া, সমুদ্রের স্বাদ, আজকাল পরশুর গল্প প্রভৃতি ছোটগল্পের বই। দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, জীবনের জটিলতা, শহরতলী—একের পর এক উপন্যাস ক্রমাগত বেরোতেই থাকে প্রচণ্ড

গতিতে। বাংলা সাহিত্যে আনে বিপ্লব। এতদিন বাংলায় গল্প-উপন্যাস রচিত হত শুধু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অথবা ধনী জমিদার-জীবনকে কেন্দ্র করে। মানিক গতানুগতিক রাস্তা ছেড়ে সাহিত্য-সৃষ্টিতে মন দেয় বস্তীবাসীর পঙ্কিল ক্লেদাক্ত পরিবেশ নিয়ে। ওদেরও তুলে ধরে দোষগুণ সমেত অবিকৃতভাবে সুধীজন সমাজে। নীচুতলার মনুষ্য-সমাজের ক্ষতগুলি উলঙ্গ করে দেখাতে চেষ্টা করে সকলকে। সাহিত্য-জগতে ওঠে তুমুল আন্দোলন!

শক্তিশালী লেখক, বর্ণনার ক্ষমতা তার অসাধারণ। ভিখারীর পায়ের ঘাটুকু, অথবা কুসুমের নষ্টামি, সবই বর্ণনাশৈলীতে যেন পাঠকের চোখের সামনে মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায়, মনের পর্দায় আঁকা থাকে বহুদিন! 'প্রাগৈতিহাসিক' যে একবার পড়েছে, সে ভুলতে পারে কি তার পঙ্কিল চরিত্রগুলি? ভালো না লাগলেও, লেখক যেন যাদুমন্ত্রে পাঠককে বাধ্য করে বইখানার শেষ পর্যন্ত যেতে। মানিকের লেখা প্রায় সবগুলো বইয়ের বেলাতেই বোধ হয় খাটে এ কথা। তার লেখা ত' শুধু দেখে নয়,—মর্মে মর্মে অনুভব করে, তাদের আহারে-বিহারে ভালোতে-মন্দতে আমোদে-আহ্লাদে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে এ লেখা।

ক্রমে অনেক বয়সে সে বিবাহ করে এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের একটি লক্ষ্মীমেয়েকে—নাম তার কমলা। সকলে ভাবে এবার জীবনে লক্ষ্মীর আবির্ভাবে বুঝি ঘটবে তার খামখেয়ালী ছন্নছাড়া জীবনের অবসান! কিন্তু যে মানিক সে মানিকই থেকে যায়। চারটি সন্তানের পিতা—খেয়ালবশে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত মানিক, মোটা মাইনের সরকারী চাকুরির ফাঁস কিছুতেই গলায় নেয় না। তখন সে দারুণ কমিউনিস্ট লেখক, সমাজ-শাসনের, নিয়ম-শৃঙ্খলার মূর্তিমান বিদ্রোহ! বলে দশটা-পাঁচটা আফিসে বসে কলম পিষে পরের দাসত্ব করা? সে অসম্ভব!

দারিদ্র্য যেন তার পরম সম্পদ। ভাইরা সব পৃথক হবার পর সে আসে তার পরিবারসহ বরানগরের ছোট ভাড়াটে বাড়িতে। এখানেই কাটে তার জীবনের শেষ ভাগ। দড়ি-ছেঁড়া খাটিয়ায় শুয়ে, সামান্য আহার্য পেটে দিয়ে লিখে চলে রাতদিন কত উপন্যাস, কত গল্প! দেশবাসীকে দেয় প্রচুর আনন্দ ও মনের খোরাক—কিন্তু নিজেকে সে নিঃশেষ করে তোলে তিলে তিলে অর্থে-সামর্থ্যে মস্তিষ্ক চালনায়। লিভার পেকে পচন ধরে কিন্তু বুদ্ধিজীবী মানিক বিরত হয় না এ সর্বনেশে নেশার পথ থেকে। এই সময় থেকে মানিকের মত শক্তিশালী লেখকের দারিদ্র্য-মোচন আশায় রাজ্য-সরকার দেড়শো টাকা করে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাতে তার সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের একটি কোণও ভরাট হয় না।

অগণিত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ-উপরোধ হাসিমুখে অগ্রাহ্য করে উল্কার মত অশান্ত দুর্বারগতিতে ছুটে চলে সে আত্মহত্যার রোম্যান্টিক পথে। মৃত্যুর সাথে পাতে মিতালি, জীবন নিয়ে খেলে ছিনিমিনি। এ ভাবেই তার জীবনের অবসান ঘটে অপরিণত বয়সে। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, দীর্ঘজীবী এক সম্ভ্রান্ত বিদ্বান পরিবারের অসাধারণ ছেলের জীবনের অবসান ঘটে নাটকীয় ভঙ্গীতে বস্তিবাসী মানুষের মতই। একদিন হঠাৎ সে যেন ক্ষেপে গিয়ে নিজের বালিশ বিছানা জিনিসপত্র ভাঙ্গা শুরু করে অপ্রকৃতিস্থের মত, ক্ষীণ দুর্বল দেহে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুরাজের মতই গোমরাতে থাকে কি এক দুর্বার আক্রোশে। মনে হয় যেন তার সাধ্যে কুলালে সমস্ত পৃথিবী করে দেবে ভেঙ্গেচুরে লণ্ড-ভণ্ড। তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে আসা হয় নীলরতন সরকার হাসপাতালে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে শান্ত-সমাহিত আত্মস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে। ধীরে ধীরে নেমে আসে চিরনিদ্রা। একটি অশান্ত বিদ্রোহী সন্তানকে তাঁর শান্তিপূর্ণ কোলে তুলে নেন জগন্মাতা! সেটা ১৯৫৬ খৃস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর। [ক্রমশ।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

খাজুরাহো : চন্দেল্ল স্মৃতি

॥ নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥

॥ চার ॥

আর এক নদীর তীর,—আর এক পবিত্র ঘাট। আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠা স্রোতোস্বিনী জাহ্নবী,—ত্রিলোকপতির ত্রিশূলবাসী বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাট। সেই ঘাটে বসে এমনি এক আসন্ন সন্ধ্যায় কথা বলছিলাম সতীশ সাধুর সঙ্গে।

সতীশ আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু। বছরদশেক আগে প্রথম আলাপ হয়েছিল মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাটে। তারপর গৈবীনাথ পাহাড়ে অন্নপূর্ণা মন্দিরের খোলা বারান্দায় আমরা ক'রাত কাটিয়েছিলাম। জমাট বেঁধেছিল পরিচয়ে।

সতীশের কোনো ঠিকানা নেই। গেরুয়াধারী সে,—কিন্তু তার কোনো সংঘ নেই, আশ্রম নেই, দল নেই। আসলে সে পরম উদাস, মহা বাউণ্ডুল। পথে পথে ঘোরে, তীর্থে তীর্থে বেড়ায়,—কবে কোথায় থাকে কেউ জানে না। সম্বলহীন বলেই সম্বলের প্রয়োজন তাকে বাঁধতে পারে না একঠাঁই। শেষ দেখা হয়েছিল হৃষীকেশে গীতা ভবনে, আবার মিললাম বিশ্বনাথের বারাণসীতে।

উজ্জয়িনীর রামঘাট থেকে ধর্মশালায় ফিরতে ফিরতে দেড় বছর আগে-দেখা সতীশ সাধুর কথা মনে পড়ল। কোথায় সে আছে জানি নে,—জানি নে এই বিষণ্ণ শীত-সন্ধ্যায় কোন্ বন্ধুর পথে রিক্তপায়ে সে হাঁটছে উদাসীন। মনে পড়ল সেদিন সেই নদীতীরে বসে একই সুরে সে কথা বলেছিল।

বড়ো খুশি হয়েছিলাম সতীশকে দেখে। বলেছিলাম,—সাতদিন হোলো কাশীতে আছি, রোজ এই দশাশ্বমেধ ঘাটে আসি, এতদিন তোমায় দেখি নি কেন সতীশ?

দেখবে কোত্থেকে? আজই যে ফিরছি!

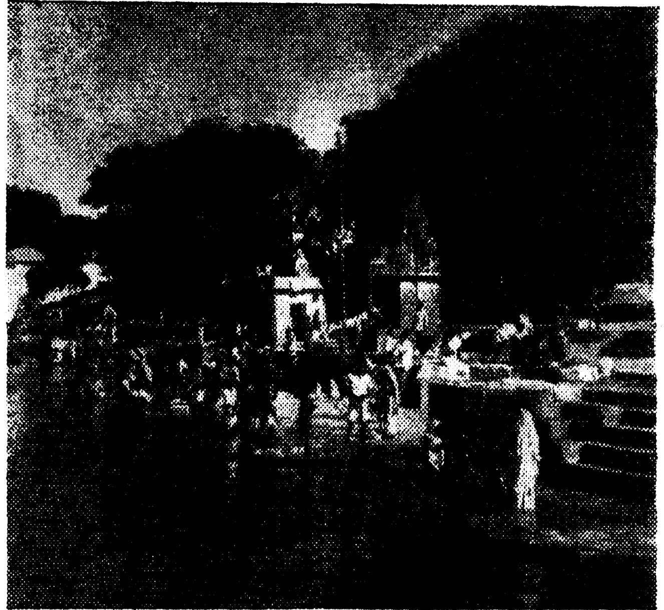
কোথা থেকে?

সে এক মজার জায়গা থেকে।

সতীশের সঙ্গে আমার আর কোনো মিল নেই। কেবল একটা মিল ছাড়া। সে ঘোরে,—তার মতো না পারলেও আমিও কিছুটা ঘুরি, আর ঘোরার গল্প ভালোবাসি। দীর্ঘ ব্যবধানের পরে হঠাৎ হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ভ্রমণের কথায় কথায় দু'জনের আড্ডা জমে ওঠে।

এ ছাড়া আর কোনো কথা নয়। কুশল প্রশ্ন করলেও সে চটে ওঠে। তাই সোজাসুজি কথা পাড়লাম,—মজার জায়গা কেমন দেখলে, শোনাও দেখি?

কি মতি হোলো সতীশের। বললে,—হবে, হবে। এতদিন পরে দেখা, আগে কিছু খাওয়াও দেখি?



● শিপ্রা নদীর তীর: রামঘাট উজ্জয়িনী

সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক-বন্ধু। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে সতীশের আলাপ করিয়েছিলাম।

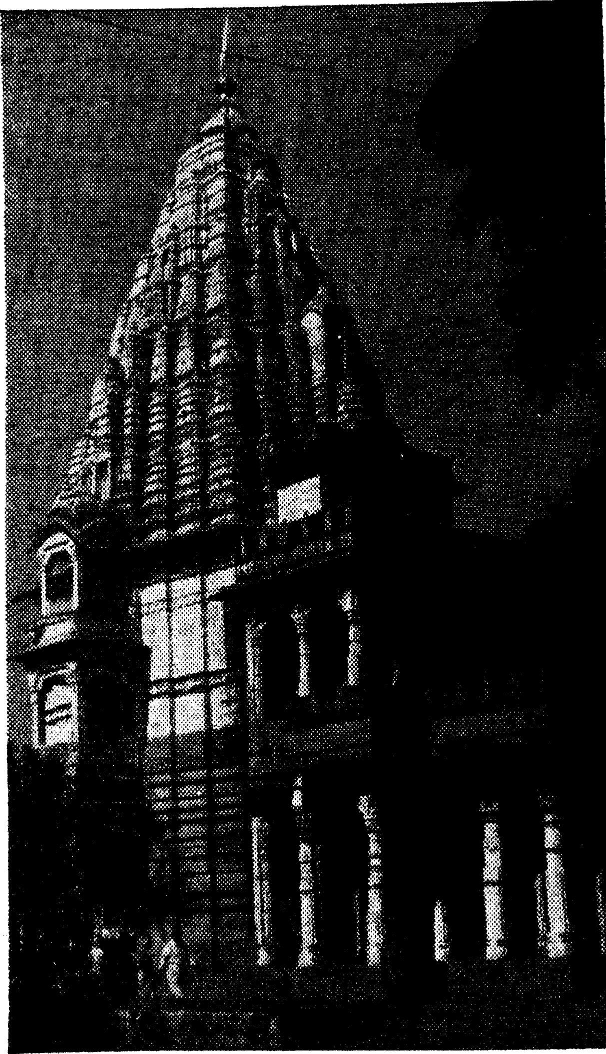
সতীশ বললে,—আসুন স্যার, কিঞ্চিৎ সেবা হোক, —তারপর গল্প হবে।

ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে আনা আষ্টেকের গালগপ্প খেল সতীশ। আমাদেরও কিছুটা খেতে হোলো তার সঙ্গে। তারপর মুখ নিচু করে কয়েক আঁজলা জল খেয়ে সুস্থির হয়ে বসল। বললে,—এমন এক আজব জায়গা দেখতে গেলাম, যে জায়গা নেই।

যে জায়গা নেই? তার মানে?

সেই জায়গাটাকেই তো দেখতে গিয়েছিলাম,—খুঁজে খুঁজে কোথাও পেলাম না।

কি আশ্চর্য! আমি বললাম,—তুমি আবার হেঁয়ালি বলতে শুরু করলে কবে থেকে? যে জায়গা নেই তাকে পাবে কি করে?



মহাকাল মন্দির উজ্জয়িনী

সতীশ বললে,—রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, সাহিত্যে আছে, পুরাণে আছে, কাব্যে আছে, ইতিহাসে আছে, কিন্তু আসলে কোথাও নেই!

অধ্যাপক একটু শ্লেষ করে বললেন, —কোন ভৌগোলিক অভিযানে আপনি বার হয়েছিলেন?

সতীশ অধ্যাপকের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। বললে,—তা হলে জায়গার গল্প থাক, অন্য একটা গল্প বলি শোনো। পুরাণের গল্প।

পুরাকালে এক মস্ত রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল কুশনাভ। তিনি ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র, যেমন ভাগ্যমন্ত তেমনি শক্তিশালী। এই আর্যাবর্তের গাঙ্গেয় উপত্যকায় তিনি তাঁর বিশাল রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করলেন,—রাজধানীর নাম মহোদয়।

স্বর্গের এক পরমা সুন্দরী অপ্সরা ছিলেন,—নাম ঘৃতাচী। উর্বশী-মেনকার সমগোত্রীয়া ঘৃতাচীর রূপের সীমা ছিল না। দেবতারা তো আকৃষ্ট হয়েছিলেনই, বেদব্যাস, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনি-ঋষিরাও ঘৃতাচীর জন্যে পাগল হয়েছিলেন।

মর্ত্যের একটি মানুষের কাছে ঘৃতাচী ধরা দিয়েছিলেন,—যেমন পুরুরবার কাছে ধরা দিয়েছিলেন উর্বশী। ঘৃতাচীর মর্ত্য-প্রণয়ী মহোদয় রাজ কুশনাভ। প্রেমিক রাজাকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন একশোটি কন্যা।

কুশনাভের শতকন্যা মায়েরই মতো পরমা সুন্দরী। রাজকুমারীদের রূপের ছটায় রাজধানী সারা রাজ্য আলোকিত।

একদিন রাজকন্যারা তটিনী পুলিনে কেলি করতে এসেছেন। সেদিন বসন্ত-অপরাহ্ণ। তীরের তৃণশীর্ষে আর নদীর তরঙ্গে হিল্লোল জাগিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন পবনদেব। এক শতফুল্লকমলিনীকে একসঙ্গে সামনে দেখে বিহ্বল হয়ে গেলেন দেবতা। কামনায় আকুল হয়ে তিনি অগ্রসর হলেন। কিন্তু একশো কন্যার একজনও তাঁর কাছে ধরা দিল না।

একে একে প্রত্যেকের কাছে প্রেম নিবেদন করলেন পবনদেব, প্রত্যেকে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। একজনের কাছেও তিনি পাত্তা পেলেন না। দম্ভভরে তিনি বললেন,—আমি স্বর্গের দেবতা, আমার প্রেমস্পর্শে তোমরা ধন্য হবে, তা জানো!

অবজ্ঞায় মুখ ফেরালো কন্যারা। প্রত্যেকে বললে,—আপনি দেবতাই হোন আর যাই হোন, গোপন প্রেমকে আমরা নিষিদ্ধ পাপের মতোই ঘৃণা করি। পুরুষের হাতে আমাদের সম্প্রদান করবেন আমাদের পিতা, পিতৃ-নির্বাচিত স্বামী দেবতার স্পর্শেই আমাদের জীবন ধন্য হবে।

ক্রোধে আগুন হলেন পবনদেব। বললেন,—আচ্ছা, আমিও দেখব কেমন স্বামী তোমাদের ভাগ্যে জোটে!

হঠাৎ ঝড়ের এক প্রচণ্ড দাপট যেন আঘাত করল কন্যাদের। সেই দাপটে নুয়ে পড়ল তাদের শরীর। সেই শরীর আর সোজা হোলো না। প্রত্যেক কন্যার দেহ কুঁজো হয়ে গেল, প্রত্যেকের পিঠের উপর জেগে উঠল বড়ো বড়ো এক একটা করে কুঁজ।

খাশা গল্প শুরু করেছে সতীশ। আমি বললাম,—তারপর?

সতীশ বললে,—দেবতার সেই অন্যায় অভিশাপের দুর্ভাগ্য শেষ পর্যন্ত কেটে গিয়েছিল বৈ কি। কাম্পিল্যের রাজা সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় এই কুব্জবতী শতকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। কন্যাদের সম্প্রদান করেছিলেন পিতা কুশনাভ, আর সঙ্গে কন্যাদের কুঁজও অন্তর্ধান করেছিল, তারা তাদের সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ ফিরে পেয়েছিল।

অধ্যাপক একটু অধৈর্য স্বরে বললেন,—তা তো পেয়েছিল, কিন্তু এ গল্পের সঙ্গে আপনার অভিযানের সম্পর্ক কি?

আছে স্যার, আছে। কুশনাভের কুব্জ কন্যাদের স্মরণে সেই প্রাচীন মহোদয় নগরের নাম হয়েছিল কান্যকুব্জ। নাম শুনেছেন কখনো?

ইতিহাসের অধ্যাপককে কান্যকুব্জের নাম শুনেছেন কি না জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত ধৃষ্টতা। তবে সতীশ সন্নিসি মানুষ, মুখে পাগল-পাগল কথা। অধ্যাপক গায়ে মাখলেন না। স্মিতহেসে বললেন,—শুনেছি বৈ কি, কান্যকুব্জের নাম শুনব না? ভারতের ইতিহাসে কান্যকুব্জ বা কনৌজ একটি অবিস্মরণীয় নাম। গুপ্তযুগের শেষ থেকে তুর্কী অধিকারের আগে পর্যন্ত আর্যাবর্তের রাজধানী ছিল কনৌজ—যেমন মৌর্য থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ছিল পাটলিপুত্র।

কান্যকুব্জের প্রথম ঐতিহাসিক রাজবংশ মৌখারী বংশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মৌখারীরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে মৌখারী রাজ গ্রহবর্মণ শত্রুহস্তে নিহত হন। রাজবধূ ছিলেন থানেশ্বর রাজ প্রভাকর-বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রী গভীর বিন্ধ্যারণ্যে আত্ম-গোপন করেন। শত্রুদের পরাস্ত করে ভগ্নীকে উদ্ধার করে কান্যকুব্জে ফিরিয়ে আনেন প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন কনৌজে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। হর্ষের বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্ররূপে কান্যকুব্জ আর্যাবর্তের নূতন রাজধানীর গৌরব লাভ করে। এই রাজধানীর ঐশ্বর্য ও মহত্বের বর্ণনা দিয়েছেন চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ।

হর্ষবর্ধনের পর থেকে উত্তর ভারতের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা এই কান্যকুব্জ নগরকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। কান্যকুব্জ সে যুগে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নগর—কান্যকুব্জের সিংহাসন যাঁর, তিনিই সম্রাট। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে সম্রাট যশোবর্মণের রাজধানী ছিল কান্যকুব্জ। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট ও পাল রাজাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধবিগ্রহ, তা মূলত এই কান্যকুব্জেরই আকর্ষণে। নবম শতাব্দীতে গুর্জর-প্রতিহাররা উত্তর ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন—সে সাম্রাজ্যের রাজধানী কান্যকুব্জ।

গুর্জর প্রতিহারদের এই সাম্রাজ্য-গর্ব একশো বছরও স্থায়ী হয় না। অচিরে এই সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হ'য়ে গেল। বিভিন্ন খণ্ডের অধিকারী হলেন ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত বংশ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শোনা গেল এক নতুন বিদেশী ও বিধর্মীর পদধ্বনি। ১০১৮ খৃস্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করলেন। উত্তর ভারতের দুই সংস্কৃতি কেন্দ্র মথুরা ও কান্যকুব্জ তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।

সংক্ষেপে কান্যকুব্জের কথা শোনাচ্ছিলেন অধ্যাপক-বন্ধু। সতীশ সাধু বললে,—ইতিহাস তো বললেন, কান্যকুব্জে গেছেন কখনো? জানেন শহরটা কোথায়?

এবার সত্যিই অপ্রতিভ হবার পালা অধ্যাপকের। কান্যকুব্জের নাম কতো পড়েছেন, কান্যকুব্জের কথা কতো পড়িয়েছেন, কিন্তু সত্যি তো, কোথায় কান্যকুব্জ, কোথায় সেই ইতিহাস-বিখ্যাত রাজধানী কনৌজ?

আমি বললাম,—পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার কাহিনী মনে পড়েছে। সংযুক্তার বাবা জয়চাঁদ কনৌজের রাজা ছিলেন না?

অধ্যাপকের কথার খেই ধরিয়ে দিতে আমি পারলাম। তিনি বললেন,—ঠিক বলেছেন। সে সুলতান মামুদের আক্রমণের প্রায় পৌনে দু'শো বছর পরের কথা। এর মধ্যে ভারতের ঐক্যশক্তি আরো দুর্বল হয়েছে। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন চৌহান রাজ পৃথ্বীরাজ। তিনি দিল্লীর রাজা। পাশেই কনৌজ। সেখানে তখন রাজত্ব করছেন জয়চাঁদ। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করলেন না। পৃথ্বীরাজের পতন হোলো। কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। ঘোরী পৃথ্বীরাজকে হারিয়ে তারপর চূর্ণ করলেন জয়চাঁদকে। তারপর ভারতে পাঠান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। কনৌজের পূর্ণগ্রাস হোলো সম্রাট ইলতুৎমিসের আমলে।

সতীশ বললে,—তাহলে এবার আমার ব্যর্থ ভ্রমণের কথা শোনো। সেই পূর্ণগ্রাসের অন্ধকারে কনৌজের ছায়াটুকু পাওয়া যায় কি না তারই সন্ধানে আমি গিয়েছিলাম।

অধ্যাপক অত্যন্ত উৎসুক হলেন, বললেন,—আচ্ছা?

সতীশ বললে,—আমি অবশ্য আপনার মতো ইতিহাসের এতো তথ্য জানি নে। আমি কান্যকুব্জকে মানি মহাতীর্থ বলে। এখানে বিশ্বামিত্র জন্মেছিলেন, এখানে শ্রীরামচন্দ্র বামন অবতারকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দেবী ভাগবতের একশো আটটি শক্তিপীঠের একপীঠ এই কান্যকুব্জ। এখানে গিরিশৃঙ্গের মতো শত শত মন্দির ছিল, আকাশচুম্বী প্রাসাদ ছিল,—তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

অধ্যাপক বললেন,—কোথা দিয়ে যেতে হয়?

কানপুর থেকে ফারুক্কাবাদের দিকে উত্তর-পূর্ব রেলের একটা লাইন গেছে। সেই রেল লাইনের ওপর পড়ে।

গিয়েছিলেন সেখানে? কি দেখলেন?

দেখলাম ছোট লাইনের ধারে একটা ছোট্ট নোংরা স্টেশন। টিক্-টিক্ প্যাসেঞ্জার গাড়ি ছাড়া আর কোনো গাড়ি সে স্টেশনে থামে না। দেখলাম, দেয়ালে বিবর্ণ অক্ষরে লেখা আছে,—কনৌজ। আর কিছু নয়।

কিছু নেই, কোথাও আর কিছু নেই। হিন্দু-ভারতের কোনো কীর্তির নিদর্শন সারা আর্যাবর্তে নেই। কোনো নগর নেই, কোনো প্রাসাদ নেই, কোনো মন্দির নেই। স্থাপত্য নেই, ভাস্কর্য নেই। বর্তমান যুগের বিভ্রান্ত গবেষকের খোরাক রূপে যেটুকু আছে, তা আছে গুহার অন্ধকারে, অরণ্যের গভীরে বা মাটির কন্দরে। কালের হাতে যায় নি,—ধ্বংস হয়েছে ঘাতকের হাতে।

অনেকদিন পরে শিপ্রা নদীর তীরে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে সেই কথাই আবার মনে পড়ল। নেই নেই, সে নেই, সে কোথাও নেই। নেই সেই পূর্বজনমের প্রিয়া,—সেই বিশালানগরী অমরাবতী উজ্জয়িনী।

সত্যি কথাই বন্ধু বলেছেন। খুঁজে খুঁজেই মরব, পাব না কোনোদিন। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির কোনো নিদর্শনই উজ্জয়িনীতে নেই। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা স্বপ্নমাত্র অতীতের গহ্বরে বিলীন হয়েছে কালিদাসের কাল। তারপর, বহু শতাব্দী কেটে গেছে,—বহু ধ্বংস, বহু সর্বনাশ। তার নীরব সাক্ষী শুধু কল্লোলিনী শিপ্রা নদী, শুধু জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকাল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্ত-সাম্রাজ্যের যে তুঙ্গস্পর্শী গৌরবস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন তার ভিত্তিমূল শিথিল হতে দেরি হয় নি। স্কন্দগুপ্ত সারাজীবন ধরে যুদ্ধ করেছিলেন শ্বেত হূণদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের নৃশংস অভিযান ঠেকাতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর কয়েকবছর পরেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরল। গুপ্তদের সাধের প্রদেশ মালব হূণদের অধিকারে চলে গেল। অধিপতি তোরমান ও তাঁর পুত্র মিহিরকুল শেষ পর্যন্ত মালবরাজ যশোধর্মন আর মগধরাজ বালাদিত্য একযোগে মিহিরকুলকে আক্রমণ করে ভারত ছাড়া করলেন।

দশম-একাদশ শতাব্দীতে পরমার নৃপতিদের আমলে উজ্জয়িনীর গৌরব আবার বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রকূট কর্তৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমাররা মালবে স্বাধীন রাজ্যের সূচনা করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ভোজ। তিনি যেমন যোদ্ধা ছিলেন তেমনি পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রাজ্যের পশ্চিমে ছিল চালুক্য রাজ্য, পূর্বদিকে চেদীরাজ্য। এই চেদী-চালুক্যের সঙ্গে তাঁকে সারাজীবন কঠিন যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন।

কিন্তু রণনিপুণ রাজা বলে ইতিহাস তাঁকে মনে রাখে নি। পাণ্ডিত্য, শিক্ষাপ্রীতি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণার জন্যে মালবরাজ ভোজের অবিস্মরণীয় নাম। ভোজের মতো বিদ্বান বিদ্যোৎসাহী রাজা ভারতের ইতিহাসে বিরল।

রাজা ভোজ শৈব ছিলেন,—অকুণ্ঠ ছিল তাঁর শিবভক্তি। তাঁর সময়ে শৈবতীর্থরূপে উজ্জয়িনীর নাম উজ্জ্বলতর হয়। তীর্থনগরীরূপে উজ্জয়িনীর খ্যাতি সারা ভারতকে আকর্ষণ করে। উজ্জয়িনীর এই সর্ব ভারতীয়তার জন্যে রাজা ভোজ আর একটি শাসন নগরী স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ধারানগরী হয় তাঁর নূতন রাজধানী।

বর্তমান সড়ক পথে উজ্জয়িনীর থেকে ইন্দোর হয়ে ধারানগরী বা ধারের দূরত্ব তিয়াত্তর মাইল! এখানে তিনি এক বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন! ভোজশালা তার নাম। বহু কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত ভোজরাজার রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন।

রাজা ভোজের মৃত্যুর পর পরমার শক্তি খর্ব হয়ে যায়। চেদী-চালুক্য রাজারা দু'দিক থেকে মালবের অনেকটা অংশ গ্রাস করে নেন। মালব রাজারা চালুক্য শক্তির সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করেন!

দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিনশো বছর পরমাররা মালব অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। তারপর হিন্দু স্বাধীনতার অবসান, মুসলমান অধিকার। উজ্জয়িনীর প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির সমস্ত চিহ্ন মুসলমান আমলে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শুধু উজ্জয়িনীর নয়, সমস্ত আর্যাবর্তের।

বন্ধু বললেন,—কাব্যের নামহারা নায়িকার সন্ধান করছেন না, ইতিহাসের এক নায়িকাকে মনে আছে? তার নাম কমলা দেবী।

আমি বললাম,—কে কমলা দেবী?

বিধর্মীর হারেমে বন্দিনী সেই প্রথম হিন্দু রাজরাণী। সাতশো বছর আগেকার কথা। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গুজরাটে তখন রাজত্ব করছেন বাঘেলা রাজপুতবংশের রাজা কর্ণদেব। আর পিতৃব্য হত্যার রক্তাক্ত হাত ধুয়ে-মুছে নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন পাঠান সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি। আলাউদ্দিন গুজরাট আক্রমণ করলেন। উদ্দেশ্য শুধু রাজ্য জয় করা নয়, হিন্দু সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা নয়, হিন্দু রাজরাণী কমলা দেবীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এসে হারেমে বন্দিনী করা।

আমি বললাম,—হ্যাঁ মনে পড়েছে, আর মনে পড়েছে রাণী পদ্মিনীর কথা। ঐ আলাউদ্দিনের হাত থেকে সম্মান রক্ষা করতে জহরব্রত করেছিলেন না পদ্মিনী?

ঠিক বলেছেন। চিতোরের গুহিলোট রাণা ভীমসিংহের রাণী পদ্মিনী,—সেইসঙ্গে আরো শত শত রাজপুত রমণী। ভারতের ঐতিহাসিক যুগের শুরু থেকে এখানে গ্রীক এসেছে, কুশান এসেছে, হূণ এসেছে। ভারতীয়ের বংশধারায় তাদের ধারা মিশেছে, ভারতীয়ের প্রেমে তাদের প্রেম মিলেছে, ভারতের ভাবনায় দর্শনে ধর্মে তাদের অবদান এক হয়ে গিয়েছে। সেই মহাভারতের নারীই কালিদাসের নায়িকা। আর যেদিন মুসলমান এদেশে এসেছে, সেদিনই শেষ হয়েছে কালিদাসের কাল। সেদিনই মুখ লুকিয়েছে কবিগুরুর পূর্ব-জনমের প্রিয়া।

ম্লানকণ্ঠে বললাম,—কোথায় সে লুকোলো?

হয় হয়েছে বিধর্মীপৃষ্ঠা, না হয় হয়েছে অসূর্যম্পশ্যা। ছায়াটুকু বাইরে ফেলে রেখে সে যায় নি।

প্রভাতবাবু বললেন,—একথা তুমি খুব রাগ করে বলছ না কি?

রাগ করব? কার ওপর! ইতিহাসের দু'শো বছর-ব্যাপী একটা যুগের ওপর? ইতিহাস কি তোমার আমার রাগের তোয়াক্কা রাখে?

বন্ধু আবার বললেন,—রাগ করার কোনো অধিকার নেই, তবে দুঃখ করার আছে বৈকি! দেখুন, এই আর্যভারতে কতো বিদেশী বিধর্মী জাতি এসেছে। একদা আর্যরা যেমন এসেছিল, তেমনি তারা যুগে যুগে দলে দলে এসেছে উত্তর-পশ্চিমের গিরিবর্ত্ম দিয়ে। তারা যুদ্ধ করেছে, লুণ্ঠন করেছে, রাজ্যস্থাপন করেছে। তুর্কী আর মোঘলরাও তাই করেছে, তবে তুর্ক-মোগলদের একটা বিশেষত্ব আছে। তাদের আগে আর কোনো অভিযাত্রী ধর্মান্ধতা নিয়ে ভারতবর্ষে আসে নি। ধর্মান্ধতা দিয়ে ভারত সংস্কৃতিকে কলুষিত করে নি। পরধর্মকে হীন চোখে দেখা, পরধর্মের উপর নিজের ধর্মের আধিপত্য বিস্তারের জন্য যে-কোনো অন্যায়কে ধর্ম-কর্তব্য বলে মনে করা, এ কেবল মুসলমান বিজেতারাই করেছে। ভারতের ধর্ম-মন্দিরকে ধর্মের নামে ধ্বংস করা, ভারতের নারীত্বকে ধর্মের নামে লাঞ্ছিত করা, ভারতের অধিবাসীকে তরবারির মুখে ধর্মচ্যুত করা আর পরধর্মবিশ্বাসের অপরাধে প্রজাপীড়ন করা এ কেবল মুসলমান শাসকরাই করেছে, আর কেউ করে নি।

ভারতবর্ষ তিনটি বিশাল ধর্মের জন্মভূমি,—প্রতি ধর্মের আবার কতো শাখা-প্রশাখা। হিন্দু-ভারতে রাজায় রাজায় কতো যুদ্ধ যে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে কখনো রক্তপাত হয় নি। যবন, শক, কুশান, হূণ, প্রতি বৈদেশিক জাতিই আর্যভারতের সঙ্গে একীভূত হয়ে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উদারতর ও বিচিত্রতর করেছে। আর ভারতের প্রথম মুসলমান অভিযাত্রী সুলতান মামুদ ধর্মের নামে ধ্বংস করেছেন সোমনাথের মন্দির।

আমি বললাম,—আর কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেছেন শেষ সার্থক মুসলমান সম্রাট আওরংজেব!

বন্ধু বললেন,—ঠিক বলেছেন। এই দেখুন, উজ্জয়িনীর এই মহাকাল স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ। কোন্ স্মরণাতীতকালে তিনি প্রকট হয়েছিলেন। ষোড়শ মহাজনপদের যুগ থেকে পরমারদের যুগ পর্যন্ত ভারতবাসী মহাকালের পূজা দিয়েছে। স্থাপত্যো-ভাস্কর্যে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে যে-মহাকাল মন্দির বিরাজিত ছিল, মেরুশীর্ষকে হার মানাত যার স্বর্ণচূড়া, কোথায় গেল সে

মন্দির? পাঠান সুলতান ইলতুৎমিস যখন মালব আক্রমণ করেন, তখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য মহাকালের মন্দির। সেই মন্দিরকে তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।

আমি শুধোলাম,— এই মন্দির?

এই মন্দির তো হাল আমলের! অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিন্ধিয়ারা বানিয়েছেন! তেরো থেকে আঠারো এই পাঁচ শতাব্দী মুসলমান আমল। এই পাঁচশো বছর ধরে উজ্জয়িনীর হিন্দু-কীর্তিগুলি মুসলমানরা ধ্বংস করেছে,—এই ধর্মকর্তব্যে শেষ কীর্তিমান আওরংজেব। কালিদাসের উজ্জয়িনী কালের হাতে ধ্বংস হয় নি। হলে দুঃখ থাকত না, হয়েছে মানুষের হাতে, যারা আমার স্বদেশবাসী, যারা আমার ভাই!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রামঘাটের ধাপে ধাপে এখানে-ওখানে প্রদীপ জ্বালছে পুণ্যার্থিনীরা। শিপ্রা নদীর ওপারে আর কিছু দেখা যায় না। এবার উঠব, মন্দিরে যাব আরতি দর্শন করতে। আজই শেষ দর্শন মহাকালের। আজ রাত্রেই বিদায় নেব উজ্জয়িনী থেকে।

বন্ধুরা সিগারেট ধরালেন। আমি একটু ভাবলাম! ভাবলাম, সত্যি আমরা ধার্মিক জাতি। ধর্ম আমাদের লৌকিকতার অঙ্গ মাত্র নয়, জীবনের সমগ্রতার উপর ধর্মের প্রতিষ্ঠা। জীবন বিচিত্র জানি বলেই আমাদের ধর্মও বিচিত্র। বৈচিত্র্যই সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যই আনন্দ, বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। জীবনের বিচিত্র রূপকে স্বীকার করেই ভারতবাসী নানা ধর্ম, নানা বিশ্বাস, নানা মতকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। মহাভারতের ধর্ম মহামানবতা।

সেই মহামানবতাবোধ পাঁচশো বছর ধরে ধূলোয় লুটিয়েছিল। বৃটিশ-শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন শুরু, তখন অনেক আশায় অনেক বিশ্বাসে পূর্বযুগের পাঁচশো বছরের গ্লানিকে ভুলতে চেয়েছিলাম। ইতিহাসের শিক্ষাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম। মস্ত আশায় মস্ত ভুল করেছিলাম। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন সে ভুল করেন নি। তিনি বাঁচিয়েছেন।

তবু আমি বললাম,—আপনি বলেছেন হিন্দু-ভারতে ধর্মের নামে রক্তপাত কখনো হয় নি?

সাহিত্যিক বন্ধু হেসে বললেন,—তাই তো মনে হয়! তার প্রমাণ অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন। তার মস্ত প্রমাণ যে হিন্দু-পুরাণের নবম অবতার ভগবান বুদ্ধ। আপনি ফিরবেন কবে?

কালই যাব ভাবছি।

ফিরবার পথে খাজুরাহো দেখে যান। খাজুরাহোর মন্দিরগুলো পাঠান-মোগলের নজর এড়িয়ে কি করে টিকে গেল তাই আশ্চর্য!

আমি বললাম,—খাজুরাহোর স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিশ্বের বিস্ময়, তাই না?

ঠিক, তবে তার চেয়ে বড়ো বিস্ময় সেখানে দেখবেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, আর হিন্দু বৌদ্ধ জৈনের সংস্কৃতি-বিচিত্রার মহাভারতের রূপ সেখানে দেখতে পাবেন।

[ক্রমশ।

॥ দ্বৈত ॥

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

সেই ভালো
দেওয়ালের কোণে কোণে ওই কালো কালো
ঝুলগুলো মুছে ফেলো।
তা না হলে
ঘরের দেওয়ালে
কালের কালিমা পড়া ওই সুতোগুলো
আর জমে থাকা যত ধূলো
সূক্ষ্ম একটা আবরণ বিছিয়ে রাখে
আর তারই ফাঁকে ফাঁকে
যক্ষ্মার জীবাণুরা ঘর বাঁধে নানা ছাঁদে।
ওদেরকে ঘরের মধ্যে বাড়তে না দেওয়াই ভালো
কি বলো?

কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে
তোমার কাছে
তুমি কি বলতে পারো
যদি কারও
বুকের পাঁজরে
ওরা বাসা করে
তবে?
কি উপায় হবে?
কিম্বা ধরো সময়ের কালি পড়ে
মাথার ভিতরে
চিন্তার কালো ঝুল চাঁদোয়া খাটায়
কি করে তা মুছে ফেলা যায়?

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড দাবদাহ তখন সবে শেষ হয়েছে। অপরাহ্নের ছায়া দীর্ঘতর হয়েছে দূর শৈল-সানুতে, গ্রামান্তের কুটির পুঞ্জে আর রিকাবগড় দুর্গের সামান্য দু-একটি গাছের তলায়! অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে নিচের তলার ঐ গবাক্ষহীন ঘরগুলোয়—তয়খানা তোষাখানা মালখানা খাজাঞ্চীখানায়। বাতাসে লেগেছে প্রসন্নতার আমেজ। দুপুরের ঝড়ের মতো গরম হাওয়া মৃদুমলয় জীবনে পরিণত হ'তে চলেছে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচ তেজও অস্তমিত হয়েছে, দিগন্তে দিনের স্মৃতিটুকুও মুছে ফেলতে চাইছে প্রকৃতি।

ফেলবেও মুছে। আর একটু পরেই এই মরু-প্রান্তরের দেশে রীতিমতো শৈত্য নেমে আসবে, বাইরের আবহাওয়ায় দেখা দেবে হিমেল কামড়। রাত্রের চারপাইগুলো বাইরে পড়বে ঠিকই কিন্তু সেইসঙ্গে কম্বল বা রেজাইও পড়বে একটি উপযুক্ত নয়—চামচিকে বাদুড়ের থাকার মতো! আর থাকেও তারা বছরে আট ন' মাস! এই গরমের তিন-চারটে মাস তাদের তাড়িয়ে ধুয়েমুছে খানিকটা মনুষ্য বসবাসের উপযুক্ত করে তোলার চেষ্টা চলে; কিন্তু তারা না থাকলেও তাদের অর্ধ-অস্তিত্ব থাকে, গন্ধটা যায় না কিছুতেই। সমস্ত আবহাওয়া দূষিত হয়ে থাকে সে দুর্গন্ধে।

অল্পবয়স ওদের। বড়ভাই করণেরই বড়জোর কুড়ি-একুশ হবে, অর্জুন আরও ছোট। অবশ্য খুব ছোট নয়—পিঠোপিঠি ভাই ওরা, এক বছর কি দেড় বছরের ছোট হবে হয়ত অর্জুন—করণের চেয়ে। স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ তরুণ দু'জনেই। কাজ এবং কঠিন পরিশ্রমের কাজ—চায় তারা চায় দুনিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে, চায় দুনিয়া জয় ক'রে দুষ্প্রাপ্য জিনিস আহরণ করতে। বিপদে ঝাঁপ



ধারাবাহিক উপন্যাস

বীরের স্বর্গ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ক'রে। কারণ শেষরাত্রে রীতিমত শীত করবে সবাইকার—কম্বল পুরু না হ'লে ভোরে কাঁপতে হবে ঠকঠক ক'রে!

সারা দুপুর নিচের তলায় ভ্যাপসা গন্ধওয়ালা ঘরে বন্ধ থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা দু' ভাই করণ সিং আর অর্জুন সিং। বাইরে এসে, আসতে পেরে যেন বেঁচে গেল ওরা। প্রাণভরে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ক'রে ঈষৎ ধূলোর-গন্ধ মাখানো বাতাস গ্রহণ করল কিছুক্ষণ ধরে, মনে হল দম বন্ধ ক'রে রেখেছিলো এতক্ষণ। এবার সে-দম ফেলে ও নিয়ে বাঁচলো। সত্যিই যেন কে ওদের বুকে চেপে ছিল এতক্ষণ, মুক্তির আনন্দই তাই অনুভব করল এবার। এমনিই নিষ্ক্রিয়তার, কর্মহীনতার ক্লান্তি তো আছেই—তার ওপর চামচিকে বাদুড় আরশুলা অধ্যুষিত ঐ ঘরগুলোর বাতাসটাও যেন বড় ভারী—নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হয় ওদের। ঘরগুলো মানুষের বাসের দিয়ে পড়ে দুঃখের সঙ্গে, প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চায় ওরা। মোটামুটি যুদ্ধবিদ্যাও শিখেছে—রাজবংশের ছেলেদের যেমন এবং যতটা শেখা উচিত ততটাই শিখেছে। অস্ত্রবলে বাহুবলে, দিগ্বিজয় করতে না পারুক—খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করবে—এও তাদের এক স্বপ্ন।

কিন্তু সেসব কিছুই হচ্ছে না, কিছুই করতে পারছে না ওরা। রাজভূমি রাজোয়ারার কঙ্করময় রুক্ষ শুষ্ক এই দেশে কর্মহীন, জ্ঞাতিহীন, ভবিষ্যতহীন—মণ্ডুকের জীবন যাপন করে যাচ্ছে শুধু। এ কি কম পরিতাপের ব্যাপার।

অথচ হাত-পাও যে বাঁধা। শৈশবে মাতৃহীন ওরা, পিতৃ-পরিত্যক্ত! তার ওপর ওরা বিদেশী। ওরা নাকি আসলে 'বাঙালী'—পূরবীয়া। মছলিখোর বাঙালীর ছেলে, কোথায় কোন সুদূর পূর্বাঞ্চলে ওদের দেশ, সে দেশে নাকি বছরে দশ

মাস বৃষ্টি হয়, নদীনালা, পুকুরভর্তি স্যাঁৎসেতে মাটি সেখানকার। মানুষগুলোও তেমনি নিরীহ, দু'বেলা 'চাউল' খায় আর মছলি খায়, ধুতি পরে কোঁচা ঝুলিয়ে—এক কথায় নিতান্ত নালায়েক! তার মধ্যে আবার ওদের দেশ যেখানে—কল্‌কাত্তা সে ভি দক্ষিণে—সেখানে মচ্ছরদানের চালে প্রতি রাত্রে দশ-বারটা 'সাঁপ' জড়ো হয়ে থাকে, খিড়কিতে খিড়কিতে শের উঁকি মারে—নদীতে এত 'ঘড়িয়াল' যে নামা যায় না।

এ সবই শোনা কথা ওদের। সে মুলুক কখনও চোখেও দেখে নি। এখানে ভগবান সিং—সর্দারজীর কলমচি—নাকি গিয়েছিল একবার, তখন কোম্পানীর কাজ করত ও, সে-ই এসব বলে। এ সব ওদের বিশ্বাস হয় না। লোকটা এক নম্বরের মিথ্যুক আর শয়তান, ওদের কষ্ট দেবার জন্যেই, সবলের সামনে হেয় আর হাস্যাস্পদ করবার জন্যেই বলে এসব —বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে। আসলে লোকটা দেখতে পারে না করণ সিংদের, হিংসে করে। রাণীজী ওদের অত স্নেহ করেন বলেই অত হিংসে লোকটার। দু'চক্ষে দেখতে পারে না, সর্দারজী থাকলে তো কথাই নেই, কেবলই তাল খোজে কি করে ওদের নামে লাগিয়ে অপদস্থ করবে, বকুনি খাওয়াবে।

সে যাই হোক, বাঙালীই ওরা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বয়ং রাণীজীই সে কথা বলেছেন ওদের। ওদের নামও নাকি আসলে করণ আর অর্জুন নয় (রাণীজীও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেন না—কোনমতে বলেন), 'সিংও ওদের পদবী নয়—কি যেন মালিক না মাল্লিক কি একটা—উদ্ভট উচ্চারণ,' সিং রাণীজীই করে নিয়েছেন, সুবিধের জন্যে; বার-বার লোককে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না যে পরদেশী বাঙালীর ছেলে এখানে এদের মধ্যে কেন আছে!

কৈফিয়ৎ দেওয়াও কঠিন।

আত্মীয় নয়, স্বজন নয়—এমন কি স্বজাতি স্বভাষাভাষীও নয়—ভাষায়, আচরণে, জীবনযাত্রায় কোন মিল নেই, এমন লোককে পুত্রের মতো, পুত্রাধিক স্নেহে কেন আশ্রয় দিয়েছেন রিকাবগড়ের প্রাচীন রাজবংশের মহাদেবী—এ বোঝানো শক্ত! এমন কোন বাধ্যবাধকতাই তো ছিল না। করণের বাবা মহাদেব মল্লিকরা অবশ্য দু-তিন পুরুষেই পশ্চিমের অধিবাসী। আগে মুঘল সরকারে কাজ করতেন ওর পিতা-পিতামহ, বড়ই গোলমাল এবং ঝঞ্চাট দেখে সে কাজ ছেড়ে আংরেজ কোম্পানীর কাছে চাকরী নেন। মহাদেবের বাবাও কোম্পানীর কাজ করেছেন, মহাদেবও করবে এই সবাই জানত—কিন্তু বেচারার ভাগ্য বিরূপ, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা তার অদৃষ্টে লেখেন নি বিধাতা। জন্মাবধিই একটু উদ্ধত ও উশৃঙ্খল ছিল কেমন যেন—তাই যথাসময়ে অর্থাৎ চৌদ্দ বছর বয়সে ওদেরই মতো একটি প্রবাসিনী বাঙালীর মেয়েকে বিবাহ করা সত্ত্বেও সংসার পেতে বসা ঘটে উঠল না। সে বধূ ঘরবসত করবার মতো হয়ে ওঠার আগেই আর একটি মেয়ের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়ে বসল এবং নিজের বাবা ও সে মেয়েটির বাবার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে এল সুদূর রাজোয়ারায়,— সেখানকারও এক দুর্গম স্থান অচলগড়ে, অর্থাৎ রিকাবগড়ের বর্তমান রাণীজীর বাপের বাড়িতে।

তারপর অবশ্য ঘরই পেতেছিল মহাদেব। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়েই সংসার গুছিয়ে বসেছিল। কারণ যে মেয়েটিকে নিয়ে অচলগড়ে এসেছিল, সে মেয়েটি বেশিদিন বাঁচে নি। তারপর দীর্ঘকাল একাই ছিল। কিন্তু ততদিনে রাজাসাহেবের আস্থাভাজন ও প্রিয় হয়ে উঠেছে মহাদেব। রাজাসাহেব উদ্যোগী হয়ে ওর আবার বিবাহের চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন আর চুপ করে থাকতে পারল না। মাথা নিচু করে রাজাসাহেবকে খুলে বলল নিজের দুষ্কৃতির ইতিহাস। রাজাসাহেব যথেষ্ট তিরস্কার করলেন ওকে কিন্তু তাই বলে তাড়িয়ে দিলেন না, বরং নিজেই উদ্যোগী হয়ে লোক পাঠিয়ে সুদূর এলাহাবাদ থেকে মহাদেবের স্ত্রীকে আনিয়ে নিলেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে, দাস-দাসী দিয়ে ঘরকন্না পেতে দিলেন ওদের।

যে জন্ম-হতভাগা তাকে স্বয়ং ত্রিদশনাথ রক্ষা করলেও সুখী হয় না কখনও। মহাদেবও হতে পারল না। এ বৌটিও ভাগ্যে সইল না তার। মাত্র বছরছয়েক ঘর করার পরই—তৃতীয় সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল বেচারী। তখন কর্ণের বয়স পাঁচ, অর্জুনের মাত্র চার।

মহাদেবেরও বয়স এমন কিছু হয় নি তখন, স্বচ্ছন্দে বিয়ে করা চলত তার। সে পরামর্শ অনেকেই দিয়েছিল। তখন অবশ্য রাজাসাহেব বেঁচে নেই, রাণীজীর বাবা ও মা দু'জনেই গত হয়েছেন—কিন্তু তবু তখনও রাজসরকারে প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্টই। চাকরীও যেত না কখনও। অর্থাৎ পয়সার অভাবে সংসার অচল হত না। বরং তার যা আয়—স্ত্রী বিদ্যমানেই তো আরও কয়েকটি বিবাহ করার কথা, প্রায় সকলেই ওখানে তা করে, সুতরাং আর একবার বিবাহ সম্বন্ধে তো কোন কথাই ওঠে না। একই সঙ্গে তিনটি কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারত সে। কিন্তু কি যে হল—অকস্মাৎ কাউকে কিছু না বলে সে ছেলে দু'টিকে নিয়ে এসে রিকাবগড়ের রাণীজীর পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে, রাণীজী ভাল করে কিছু বোঝবার বা কোন ব্যবস্থা করার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্যি সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেল মহাদেব চিরদিনের মতো। অন্তত এতকালের মধ্যে কেউ আর তাকে দেখে নি, পরিচিত কোন লোকের চোখে পড়ে নি সে। রিকাবগড় বা অচলগড়ের ধারেকাছে কোথাও থাকলে রাণীজী খবর পেতেন, খোঁজ তিনি করেওছেন ঢের—কিন্তু কেউ তার কোন সংবাদ দিতে পারে নি। পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেল লোকটা। রাণীজীর এখন মনে হয় সম্ভবত আত্মহত্যাই করেছে নইলে কি ছেলের টানেও ফিরে আসত না একবার। আবার ভাবেন কোথাও কোন দূরদেশে—হয়ত নিজের দেশ বাংলায় গিয়ে নতুন করে ঘরকন্না পেতেছে আবার—নতুন ছেলেমেয়ের মায়ায় এ দু'টো ছেলের কথাও ভুলে গেছে!

অবশ্য তাতে এদের কোন ক্ষতি হয় নি, কর্ণ ও অর্জুনের। অপুত্রক রাণীজীর কাছে এরা তাঁর পুত্রের মতোই মানুষ হয়েছে। হয়ত এটাই জানত মহাদেব, সেইজন্যেই অচলগড় থেকে এতদূরে এসে তাঁর কাছেই ফেলে দিয়ে গেছে। আজ সবাই সে কথাটাও ভুলতে বসেছে। 'বাঙালী' মহাদেওকে এরা বিশেষ কেউ চিনত না, দেখেও নি বেশি কেউ, সুতরাং তাকে ভুলতে সময় লাগে নি কারও।

তাকেও যেমন ভুলেছে, তেমনি এদের পরিচয়ও ভুলেছে। এরা যে 'ছত্রি' নয় 'বাহ্‌মন'—তাও কারও মনে নেই, যেমন মনে নেই যে এরা মছলিখোর বাঙালী। রাণীজীর সন্তান নয় এরা—সেটা বড়দের কারও কারও অস্পষ্ট ধারণা মাত্র আছে, প্রায়ই মনে থাকে না সেটা। ছোটরা তাও জানে না। 'কুমার সাহাব' বলেই ডাকে এদের, তাই জানে। সেই ভাবেই মানুষ হয়েছে, সেই ভাবেই থাকে।

শুধু এই বুড়ো ঘুঘু—কলমচী ভগবান সিং কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাস টেনে বার করেছে! কোন অতল থেকে পাঁক ঘেঁটে টেনে বার করেছে ওদের পূর্ব-পরিচয়, মায় ওদের পিতারও পূর্বতন কলঙ্কের কাহিনী। সময়ে-অসময়ে সে-ই শুধু ওদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে, খোঁচা দেয়। তবে তার মাত্রাজ্ঞান আছে, সর্দারজীকে তোষামোদ-করা প্রতিষ্ঠা যেন রাণীজীর উষ্মায় না ভেঙ্গে পড়ে সে বিষয়ে সে বিলক্ষণ সচেতন। লোকটা বেশিদিন আসে নি, মাত্র বছর দুই আগে সর্দারজী কলকাতা গিয়েছিলেন কি একটা মামলার তদ্বির করতে বড়লাট সাহেবের কাছে—সেখান থেকেই ধরে এনেছেন। তাঁর প্রশ্রয় প্রায় যথেষ্টই আছে—কিন্তু তবু তিনি আর ক'দিন রিকাবগড়ে থাকেন! দুনিয়াভর ঘুরে মজা লুটে বেড়ান। ভগবানকে এখানেই পড়ে থাকতে হয়—রাণীজীকে চটালে শেষ পর্যন্ত বিপদ বাধতে পারে। এই ভেবেই যা সতর্ক হয় একটু—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-টিটকারিটা খুব অন্তরঙ্গ দু'চারজনের সামনে ছাড়া প্রকাশ্যে কখনও করে না। সুতরাং করণ সিংদের আসল পরিচয় আজও রিকাবগড়ে অনেকেরই অজ্ঞাত।

অবশ্য করণরা জানে। আগে জানত না। বাবার স্মৃতি তাদের মনে ঝাপসা হয়ে এসেছে, তিনি বাঙালী ছিলেন কি রাজপুত ছিলেন তা আর মনে নেই। সুতরাং প্রথম ভগবান সিংয়ের মুখে শুনে চমকেই উঠেছিল, ছুটে গিয়েছিল রাণীজীর কাছে—তবে কি তারা যে ওঁকে নিজের মাসী বলে জানে তা ভুল, মিথ্যে?

রাণীজী অস্বীকার করতে পারেন নি—সব কথাই খুলে বলতে হয়েছে তাঁকে। তাতে এদের শ্রদ্ধা কমে নি। আজন্ম সংস্কার ত্যাগ ক'রে, জাতি, ভাষা ও প্রাদেশিকতার বাধা অগ্রাহ্য ক'রে যিনি পরস্যাপিপর, পিতৃগৃহের জনৈক কর্মচারীর ছেলেদের পুত্রস্নেহে মানুষ করেন—তিনি তো অতুলনীয়া, তাঁর ঋণ কি শোধ করা যায়!

এই সময় শুধু পরিচয়ই নয়—আরও কিছু জানতে পারে করণ আর অর্জুন।

ওর বাবা ওদের জন্য একটা 'খৎ' বা চিঠিও রেখে গেছেন। আর রেখে গেছেন হাজার পাঁচেক সিক্কা টাকা।

খৎ হিন্দীতে লেখা। মহাদেব জানত যে তার ছেলেরা বাঙলা শিখে বাঙালীর মতো মানুষ হবে, সে সম্ভাবনা কম। তাই হিন্দীর ব্যবস্থা। হিন্দীও যে এরা খুব ভাল জানে তা নয়, তবু পড়তে পারে। মহাদেব লিখেছে—

'তোমাদের অকূলেই ভাসিয়ে চললাম—তবে ভরসা আছে মহাবীর তোমাদের দেখবেন! জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত কোন মঙ্গলবার তাঁর পূজা না করে জলগ্রহণ করি নি—এ কখন বৃথা যাবে না। জানি না বর্তমান মনোভাব কতদিন থাকবে—যদি মন শান্ত হয়, আবার সংসার ক'রে মানুষের সমাজে বাস করার মতো হয়—তাহ'লে আবার ফিরে আসব, আবার দেখা হবে। নইলে তোমাদের অকৃতি বাবাকে তোমরা ক্ষমা ক'রো। মহাবীর তোমাদের রক্ষা করুন।'

রাণীজী এই চিঠি দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে ছলছল চোখে বলেছিলেন, 'তোমাদের সে গচ্ছিত পিতৃধন, সে টাকাটা কিন্তু আমি রক্ষা করতে পারি নি।...যখন সে কথাটা কানে গেল, উনি—মানে সর্দারজী জোর করে ছিনিয়ে নিলেন—কিছুতেই বাধা দিতে পারলুম না।...যদি পারি, কখনও শঙ্কর ভগবান দিন দেন তো এ দেনা আমি অবশ্যই শোধ করব, নইলে তোমরা অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা ক'রো।'

করণ সিং ছেলেমানুষের মতোই দু'হাত দিয়ে তাঁর মুখ

চেপে ধরেছিল, বলেছিল, 'ছি ছি—এসব কি বলছ মাসী, আমাদের এত বছর ধরে মানুষ করতে কি তাঁর পয়সা খরচ হয় নি? ঢের, ঢের বেশি হয়েছে। তিনি যদি ঐ সামান্য টাকাটা নিয়েই থাকেন তো তাতে কিছু দোষ হয় নি।'

'ঝুট!' মিছে কথা। তোমাদের মানুষ করতে তিনি এক পয়সাও খরচ করেন নি। তোমরা জানো না আজও আমি অচলগড় থেকে মাসে মাসে হাতখরচ পাই। বাবা জায়গীরও দিয়েছিলেন ঢের—কিন্তু সে সবই উড়িয়ে দিয়েছেন সর্দারজী—যেবার ফরাসী মুলুকে যান সেই বারই সে সব বেচে দিয়েছিলেন। সেটা বিয়ের পরই—বছরখানেকের মধ্যে। খবর পেয়ে বাবা এই মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেই টাকা থেকেই আমি তোমাদের মানুষ করেছি। সত্যি কথা বলতে কি—সেই টাকাতেই অনেকটা খরচা চলে এখানকার। এদের আর আছে কি? বিপুল দেনায় এখানকার 'ইট-পাথরগুলো পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে।'

তা এরাও জানে।

রিকাবগড়ের বর্তমান ঠাকুরসাহেব—সর্দার রতন সিংজীর চরিত্রে সৃষ্টিকর্তা বোধ হয় কোন বদ্‌গুণ দিতে বাকি রাখেন নি। উনি নাকি ষোল বছর বয়স থেকে মদ খাচ্ছেন—কিন্তু কেউ কোনদিন মাতাল হয়ে বেলেল্লাগিরি করতে দেখে নি। এখন তো প্রত্যহ প্রায় একপিপে ক'রে তেজস্কর 'বিলায়তী' সুরা পান করেন—তবুও তাঁর পা টলে না। শুধু নেশাটা পেকে ওঠে যখন তখন সেটা বোঝা যায় তাঁর চোখের দিকে চেয়ে। শাণিত ক্রূরদৃষ্টি তাঁর ক্রূরতর হয়ে ওঠে, সমস্ত মুখখানা ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে। আর সেই সময়গুলোতেই নানারকম শয়তানী মতলব খেলে তাঁর মাথায়।

রতন সিং শুধু মদ্যপ নন, লম্পট এবং দুশ্চরিত্রও বটে। যখন এখানে থাকেন ভয়ে কোন প্রজা তার তরুণী বা যুবতী স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নীকে ঘরের বাইরে বেরোতে দেয় না। তবে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সে অবস্থিতি খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। আগে আসতেন যেনতেন প্রকারেণ কিছু টাকা সংগ্রহ করতে—টাকা হাতে পেলেই 'মজা' উপভোগ করার জন্য ভেসে পড়তেন আবার। কিন্তু এখন আর সে টাকা সংগ্রহের কোন পথই নেই। প্রজারা নিঃস্ব, জমিদারী তিন-চারবার বাঁধা পড়েছে—খাজনা যা ওঠে তা কিছু কিছু সুদ দিতেই চলে যায়। তাও সব শোধ হয় না—ঋণের অঙ্ক ভয়াবহ হয়ে উঠছে ক্রমশ।

তবু—বাইরের পাওনাদারদের ঠেকানো যাবে, রিকাবগড়ের ঠাকুরসাহেবরা সুপ্রাচীন রাজবংশ—তার প্রতাপ না থাক, প্রতিপত্তি আছে এখনও ঢের। হঠাৎ ক'রে এঁদের কেউ বেউজ্জৎ করতে সাহস করবে না। কিন্তু কোম্পানীর পাওনা শোধ করতে না পারলে গদিই থাকবে না। থাকতও না এতদিন, যদি না রাণীসাহেবা প্রাণপণে ধরে রাখতেন। সংশ্লিষ্ট সাহেবদের ভেট পাঠিয়ে, মিনতি ক'রেই এখনও সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রেখেছেন তিনি। এই মহীয়সী নারীর মহত্ত্ব, উদারতা, সদ্‌গুণ প্রভৃতি কাহিনী সাহেবদের কানেও পৌঁছেছে, তাঁরাও শ্রদ্ধা-সমীহ করেন যথেষ্ট। কিছু কিছু টাকাও রাণীসাহেবাই জমা দেন মধ্যে মধ্যে, আংশিক উশুল হিসেবে। অতিকষ্টে যোগাড় করতে হয় এটা তাঁকে। সে যে কি কষ্ট তা একমাত্র জানেন বৃদ্ধ দেওয়ান দুর্গাদাসজী। কিছুটা জানে এরা—করণ সিংরা।

অথচ এতবড় ব্যাপারটা সম্বন্ধেও ঠাকুরসাহেব সম্পূর্ণ উদাসীন। এদের চিন্তায় ঘুম হয় না কিন্তু তিনি নির্বিকার। তাঁকে সচেতন করাতে যাওয়াও বিপদ। ক্ষেপে যান একেবারে, কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন এঁদের—দেওয়ানজীকে, রাণীমাকে। এই তো কিছুদিন আগেই একচোট হয়ে গেছে। অতিকষ্টে, বলতে গেলে সর্বপ্রকারে নিজেদের বঞ্চিত ক'রে আট হাজার টাকার মতো সংগ্রহ করেছিলেন রাণীমা, কোথা থেকে খবর পেয়ে ঠাকুরসাহেব এসে পড়ে সবটা ছিনিয়ে নিয়ে সোজা পাড়ি দিলেন বিলায়ত মুলুক, একমাসে ফুর্তি ক'রে সব টাকা উড়িয়ে দিয়ে চলে এলেন।

তাও সহজে দেশে আসেন না আর, কারণ সবাই স্ত্রী বা বাপের আমলের বৃদ্ধ দেওয়ান নয়। সব স্ত্রীও সমান নয়। আরও একটি বিবাহ করেছিলেন ঠাকুরসাহেব, পাওয়ার লোভেই করেছিলেন—কিঞ্চিৎ নিচুঘরে। কিন্তু পয়সার জোরেই খুব সম্ভব সে ওঁর অত্যাচার সহ্য করে নি। এঁদের বংশে যা করতে নেই তাই করেছে, গহনাগাটি নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। রতন সিং আটকাতে চেষ্টা যে করেন নি তা নয়—কিন্তু সে মেয়েও সোজা নয়, সে তলোয়ার হাতে তেড়ে এসেছিল স্বামীকে কাটতে, ভয়ে নেশা ছুটে গিয়েছিল রতন সিংয়ের, পালিয়ে আসতে পথ পান নি। সে যাই হোক, পাওনাদারের ভয়েই দেশে বড় একটা আসেন না আর। থাকেন বেশির ভাগ দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌতে, সেখান থেকে হুমকি দিয়ে চিঠি লেখেন মধ্যে মধ্যে টাকার জন্যে। টাকা যায়ও কিছু কিছু, অশান্তি বা অপমানের ভয়েই—দু'জনকে দূরে রাখতে রাণীমাই যা হয় করে কিছু পাঠান। দাবির তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ, তবে ঠাকুরসাহেব তাতেই খুশি থাকেন, কারণ তিনি জানেন তিনি নিজে এলে এতটাও যোগাড় করতে পারতেন না, রাণী যে কোথা থেকে এতটা দেয় এখনও—তাই তিনি

খুঁজে পান না। সুতরাং তিনিও রুচি পাল্‌টেছেন, বড়দরের বাইজী বা নাচওয়ালিদের দিকে আর হাত বাড়ান না, সামান্য গণিকাতেই খুশি থাকেন, মুখ বদল হিসেবে দেশি মদও খান মধ্যে মধ্যে।

তবে এবার নাকি তিনি দেশে আসবেন, শীগগিরই—দু' একদিনের মধ্যে এসে পড়বেন, এমনি খৎ লিখেছেন। মুখ শুকিয়ে উঠেছে দাসদাসী দারোয়ান পাহারাদারদের, মুখ শুকিয়ে উঠেছে দেওয়ানজী থেকে শুরু করে কাছারিবাড়ির তাবৎ আমলা-গোমস্তা-নায়েবদের। আর সবচেয়ে যাঁর খুশি হবার কথা—তাঁরই মুখ সবচেয়ে শুকিয়ে উঠেছে, অর্থাৎ রাণীমার। স্বামীর শুভাগমনের সংবাদে বরাবরই মুখ শুকোয় অবশ্য, কিন্তু এবার সেটা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকলেরই চোখে পড়েছে সেটা, পরিজনমহলে আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছে।

কারণটাও যে একেবারে অজ্ঞাত তা নয়। সবলে জানে না—কিন্তু দেওয়ানজী জানেন, দু-একজন বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারীও। তাঁদেরও মুখ অন্ধকার হয়ে উঠেছে তাই।

জানে করণ সিংরাও। কলমচি ভগবান সিংও জানে। তার আকারে-ইঙ্গিতে সে গোপন কথা জানার আনন্দ ঢাকা থাকছে না। দুর্গাদাসজীর বিশ্বাস করণ সিং আসলে ঠাকুর-সাহেবের চর, গোয়েন্দা। এখানকার খবর সেখানে পাঠায়। এরা গোপনে টাকা জমাচ্ছে কি না, খাজনা আদায় হচ্ছে কি না এইসব খবর যোগাবার জন্যই রতন সিং বাহাল করেছে তাকে।

এতগুলো লোক যা জানে তা ফিসফাস হয়ে ভৃত্যমহলে পৌঁছতে বাধ্য।

কানাকানি চলছে সেখানে। এবার রতন সিংহের লোভ সমস্ত শালীনতা-শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করেছে।

ঠাকুরসাহেবদের যেটি রাজমুকুট—বহুকালকার জিনিস, এঁরা বলেন রায় পিথৌরা বা রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান এটি উপহার দিয়েছিলেন এঁদের কোন পূর্বপুরুষের অভিষেক উপলক্ষে। সেই থেকেই বংশপরম্পরায় অভিষেকের সময় এটা পরে আসছেন এঁরা। সোনার মুকুট, চারিদিকে মুক্তো আর পান্না বসানো, কেবল মাঝখানে, শিরপেঁচের নিচে একটি বৃহদাকার হীরে ঐ সব সম্মিলিত জহরতের দ্যুতি ম্লান ক'রে জলজ্বল করছে।

সাধারণ কাজ, কোন এমন বিশেষ কারিগর করেছে বলে মনে হয় না। হীরের কাটাও খুব একটা ভাল নয়। বোধ করি তৈরি হয়ে পর্যন্ত কখনও পরিষ্কার করা বা পালিশ করা হয় নি, সেজন্য সোনার আংটার খাঁজে খাঁজে ময়লা জমেছে বিস্তর—তবু সে পাথরের দীপ্তি এতটুকুও ম্লান করতে পারে নি। সেদিকে চাইলেই চোখ ধেঁধে যায়।

রিকাবগড় ঠাকুরবংশের সবই গিয়েছে—এমন কি সোনা-রূপোর থালা-বাসন পর্যন্ত বাদ দেন নি বর্তমান মালিক—কেবল রাজ ঐশ্বর্য বলতে একমাত্র এই মুকুটটিই ছিল এতকাল। এটিকে সযত্নে এবং সন্তর্পণে রক্ষা করে এসেছেন এঁরা। তোষা-খানায় কিছুই নেই বলে রাণীমার শয়নবক্ষের মধ্যে যে নিশ্ছিদ্র একটি চোরা কুটুরী আছে, তার মধ্যে লোহার সিন্দুকে থাকে সে মুকুট। সে সিন্দুকের চাবি একমুহূর্তও হাতছাড়া করেন না রাণীমা—সে নাকি সর্বদা তাঁর সঙ্গেই থাকে।

এইবার এই একমাত্র বিক্রেয় দ্রব্যটিতেই নজর গেছে রতন সিংজীর।

একতাল যায় নি—এ-ই আশ্চর্য অবশ্য। তবে রাণীমা বা দেওয়ানজীর একটু ক্ষীণ ভরসা ছিল, ঠাকুরসাহেবের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সামান্য একটুখানি আশা যে···রাজা হয়ে মুকুটটা খোয়াবেন না অন্তত। রাজা আছেন অথচ মুকুট নেই—এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা কি হ'তে পারে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে রতন সিং এতদিন পরে ভেবে ভেবে অপূর্ব একটি পন্থা আবিষ্কার করেছেন, যাতে সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন যে আন্দাজী ঐ মাপের একটি পদ্মরাগমণি বা পোখরাজ নিয়ে এবং জহুরী নিয়ে আসছেন। ও মুকুটে অতবড় হীরে থাকার কোন অর্থই নেই, বিশ-ত্রিশ কি পঞ্চাশ বছর অন্তর যা একদিন কয়েকঘণ্টার জন্য লোকচক্ষুর সামনে বেরোয় তাতে ঐ পরিমাণ অর্থ বদ্ধ করে রাখা অন্যায়। তিনি ঐ হীরেটি খুলে নিয়ে সে জায়গায় পোখরাজটি লাগিয়ে দেবেন—কেউ টের পাবে না পরবর্তীকালে। মুকুটের শোভাও তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। আর তাঁর তো ছেলেই হ'ল না—এক মেয়ে, সে জামাই-ই হয়ত এককালে সিংহাসনে বসবে, পরের ছেলের জন্য অতবড় হীরেখানা রেখে যেতে চান না তিনি। বিশেষ তাঁর এখন অনেক টাকার দরকার, শয়তান কর্মচারীরা ও হারামজাদ প্রজারা যখন কিছুতেই তাঁকে তাঁর প্রাপ্য টাকা দিতে প্রস্তুত নয়—তখন এইভাবেই তাঁকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, উপায় কি ?

তিনি যে তারিখে আসবেন বলে জানিয়েছেন, তার আর মাত্র তিনদিন বাকি—আমাদের আখ্যায়িকা যেখানে শুরু হচ্ছে।

॥ দুই ॥

বিকেলটা বদ্ধঘর থেকে মুক্তি পেয়ে সাধারণত করণ সিং আর অর্জুন সিং খুব খানিকটা ঘুরে আসে এদিক-ওদিক। দ্রুত হাঁটার মধ্যে জড়ত্বের গ্লানি দূর করতে চায়। বিল্লা থেকে

বেরিয়ে নিচেও নেমে যায় এক-একদিন পাহাড়ী পথ ধরে—নয়ত কিল্লার মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। আগেকার দিনের স্মৃতিস্বরূপ ফৌজী-বস্তী সারকার ভেঙ্গেচুরে পড়ে আছে, অনেকটা জঙ্গলেও পরিণত হয়েছে। এদিকে জায়গা অনেকখানি—আগে হাজার দুই পর্যন্ত সিপাহী বাস করত এখানে, তাদের শুধু বসবাস নয়, কুচকাওয়াজের জায়গাও রাখতে হয়েছিল। সেইস্থানে এখন কিছু কিছু জওয়ারের চাষ হয়, কিন্তু বসবাসের বারাকগুলো সবই প্রায় প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ওরা বাইরের জঙ্গলে শিকারে যায় প্রায়ই—আবার এক-একদিন এই ভূতপূর্ব ফৌজী ছাউনীর জঙ্গলেও আসে শিকার করতে। বনবরা মারাই আসল শিকার···কিন্তু সে মাংস কাজে লাগে না—জংলী প্রজাদের ভোগে লাগে শুধু। অন্য শিকারের মধ্যে খরগোশ ময়ূর আর বুনো-হাঁস ছাড়া আর কিছুই কাজে আসে না, মেলেও না কিছু বিশেষ। ওসব জঙ্গলে হরিণ নেই। সেজন্যে ওটা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। শুধুই জোরে জোরে খানিকটা হেঁটে কিম্বা বন্দুক কি তীর-ধনুক দিয়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস ক'রে নবীন প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তিতে মরচে পড়া নিবারণ করে।

কিন্তু আজ অভ্যস্ত কোন পথেই গেল না ওরা। অন্ধকার গহ্বরের নিশ্বাসরোধ করা আবহাওয়া থেকে বাইরে এসে প্রথমটা যা অভ্যাসমতো বাইরের সোঁদা সোঁদা মাটি ও বন-ফুলের গন্ধেভরা মুক্ত বাতাস খানিকটা গ্রহণ করল—নাক ভরে বুক ভরে—তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে সীতা তলাওয়ের ঘাটের একটা পৈঠেয় বসল। দু'টিমাত্র তলাও বা পুকুর আছে গড়ের মধ্যে, তার ভেতর রাম তলাওয়ের জল শুকিয়ে যায় চৈত্র মাস না পড়তে পড়তে—সীতা তলাওতেই যা জল থাকে একটুখানি। তবে যেটুকু থাকে সেটুকু নির্মল, স্নিগ্ধ, শীতল। এর চারিদিকের পাথুরে পাড়ের মধ্যেই নাকি কোথায় একটা ঝরনা আছে, তাই থেকে বারো মাসই চুইয়ে-চুইয়ে একটু একটু জল পড়ে বলে, একেবারে শুকিয়ে যায় না কখনই—আর সেই কারণেই এর জল স্বাদু ও শীতল থাকে।

ওরা যখন এসে বসল তখন তলাওয়ের ঘাট জনহীন। তার কারণ এ তলাওতে স্নান করা বা কাপড় কাচা নিষিদ্ধ। এক এক সময় গ্রীষ্মকালে কুয়াগুলোও শুকিয়ে আসে—তখন পানীয় জল বলতে এই তলাওটিই ভরসা করতে হয়। তা ছাড়া এমনিও অনেকে এর ঠাণ্ডা এবং মিঠাজল পান করেন! সেই জন্যই নোংরা করতে দেওয়া হয় না। আর সেইজন্যেই—যাদের পানীয় জল সংগ্রহ করার—তারা নিয়ে চলে গেছে ইতিমধ্যেই। সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই কেউ। দ্বিপ্রহরের নিদ্রা থেকে উঠে সকলেরই বুক পর্যন্ত শুকিয়ে থাকে—সুরাইয়ের জলে শানায় না। দরকার হয় শরবৎ। অবস্থাপন্ন যারা তারা বাদামের কি ঘোলের শরবৎ খায় শক্কর দিয়ে—গরীব লোকদের জন্য গুড়ের ব্যবস্থা কিন্তু শরবৎ যা হয় একটা চাই, আর সেজন্যে চাই সীতা তলাওয়ের ঠাণ্ডা জল।

সুতরাং এখন আর বিশেষ কেউ আসবে না এখানে। কাল সকালের আগে আর জলের প্রয়োজন হবে না। হ'লেও অন্য ইঁদারার জলে কাজ সারতে হবে। এদিকটা বড় বেশি নির্জন ব'লে ঝি-বৌরা সন্ধ্যার পর কেউ তলাওতে আসতে চায় না—আর কতকটা সেই কারণেই এরা এসে বসল। একটু নির্জনতাই প্রয়োজন এদের।

কেউই কারও সঙ্গে কথা কইছে না, তবু দু'জনেই যেন দু'জনের মনের কথা বুঝে নিঃশব্দে এসে ঘাটের মাঝামাঝি চওড়া বড় ধাপটায় বসল। আর একটু নিচেই জল। অতল না হোক—কাকচক্ষু স্বচ্ছ কালো জল, কি এক যেন বুকভরা রহস্য নিয়ে স্থির হয়ে আছে। আর একটু পরে ওর বুকে ফুটে উঠবে একটি একটি ক'রে আলোর টিপ—আকাশের বুকে-জাগা একটি একটি তারার ছায়া! ওপরের মৃদুমন্দ বাতাস এখানে এসে পৌছয় না বিশেষ, কদাচ কখনও এলে ঐ আলোগুলো কাঁপে, তখন জলের কথা মনে পড়ে, নইলে ভ্রম হয় ওপরের একটুকরো আকাশই বুঝি নিচে ছিটকে এসে পড়েছে।

এখানে এসেও দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। কথা বলার খুব প্রয়োজনও নেই, দু'জনেই দু'জনের বক্তব্য জানে, দু'জনের মনে এক চিন্তা। ওরা তো শুধু দুই ভাই-ই নয়, বন্ধুও যে। একই দুর্ভাগ্যের তাপে আর একই স্নেহের ছত্রচ্ছায়ায় মানুষ হয়ে উঠেছে ওরা, একই টানে এই নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে আবদ্ধ। অসংখ্য বিদেশী ও বিদ্বেষীর মধ্যে মাত্র দু'জনেই ওরা পরস্পরের নির্ভর।

অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল করণই। আস্তে আস্তে বলল, 'ভাই অর্জুন, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।'

অর্জুন কাঁকরের মতো ছোট ছোট দু-একটা ঢিল নিচের নিস্তরঙ্গ কালো জলে ফেলে চাঞ্চল্য সৃষ্টির বৃথা চেষ্টা করতে করতে বলল, 'অত নাটুকেপনা না করলেও চলত ভাইয়া,—তোমার প্রার্থনা কি আমি জানি। তুমি মাসীকে ছাখো এখানে বসে বসে—আমি দুনিয়াটা একবার ঘুরে নসীবকে ধরবার চেষ্টা দেখি—এই তো?···কিন্তু সেটি হচ্ছে না তুমি বেরোলে আমিও বেরোব, এক জায়গায় পড়ে থাকব না।'

'কিন্তু মাসী—মাসীকে এই শত্রুপুরীতে কে দেখবে?'

'দেখবেন শংকর ভগবান—আর দেখবে তাঁর মেয়ে মীরা বহিন।'

'মাসী আমাদের জন্যে এত করলেন—তাঁকে ঐ দুশমনের হাতে; এই সর্বনাশের মুখে ছেড়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'হ্যাঁ—ঐ কথাটাই মনে রেখো—তোমাদের জন্যে। মাসী যা করেছেন আমাদের দু'জনের জন্যই। দায়িত্ব দু'জনের সমান। থাকলে দু'জনেই থাকব, গেলে দু'জনেই যাব।'

'কিন্তু অর্জুন ভাইয়া, দু'জনে গেলে যেমন তাঁর ঝঞ্ঝাট দু'জনে থাকা তেমনিই বেফায়দা। তাঁর জন্যেই একজনের সরে যাওয়া দরকার। তাঁর অবস্থা কি হয়ে আসছে দেখতেই তো পাচ্ছ। শেষ বয়সে তাঁকে যদি একটু নিশ্চিন্ত করতে পারি—সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য, নয় কি?...একটু বেয়ে চেয়ে দেখতে চাই সেইজন্যেই—তকদীর ফেরাতে পারি কি না।'

এবার একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস জেগে ওঠে অর্জুনের কণ্ঠে, 'করণ সিং তুমি যত বড় মশহুর মহাবীরই হও, ভুলে যেও না এটা কোম্পানীর আমল, হঠাৎ নিজের হিম্মতে—একার বাহুবলে একটা রাজগী কি জমিদারী জয় করবে, যথেষ্ট হিম্মৎ থাকলেও তা হবার উপায় নেই। এখন কোম্পানীর হুকুম ছাড়া লড়াই দাঙ্গা বাধাবে কোন রাজা-মহারাজার সে হিম্মৎ নেই। তুমি কি করতে পারবে—বড় জোর কোন ফৌজে নাম লিখিয়ে সিপাহী বনতে পারবে, তা থেকে একদিন হাবিলদার জমাদার পর্যন্ত উঠবে, এই তো? কত তনখা তার? আর এ না হলে কেরাণীগিরি করতে পার—কোন রাজসরকারে কি কোম্পানীর কোন দফতরে। পয়সা নেই যে কারবার করবে। সিপাহীগিরি কি কেরাণীগিরি ক'রে কি এমন হাতী-ঘোড়া রোজগার হবে যাতে রাণীজীর দুঃখ ঘুচবে। তিনি এখনও যা মাসোহারা পান বাপের বাড়ি থেকে, অত টাকাও তুমি কামাতে পারবে না।... তার চেয়ে দু'জনেই যাই চলো—চাই কি কোন রাজা-মহারাজার সরকারে কাম নিলে ঠিক তোষামোদ করেও কিছুটা সুবিধে করে নিতে পারব, চাই কি বড় একটা নোকরী মিলে যাওয়াও আশ্চর্য নয় তখন।...তখন একটা বাড়ি করে মাসী আর বহিনকে নিয়ে যাব সেখানে, কিম্বা এখানেই মাসে মাসে টাকা পাঠাব।'

করণের জিভের ডগায় জবাবটা এসেছিল যে, সেভাবে জিন্দিগীর মোড় ফেরাতে সে একাও পারে। তোষামোদটা বরং ছোটভাইয়ের থেকে তারই সহজে আসবে, কারণ অর্জুন অধিকাংশ ছোটভাইদের মতোই বড় বেশ স্পষ্টভাষী, অনেক সময় সে স্পষ্টভাষণ রূঢ়ভাষণে দাঁড়িয়ে যায়। তা ছাড়া সে অসহিষ্ণুও ঢের বেশি, ঢের বেশি অধীর।

কিন্তু সে সব কিছুই বলল না করণ। একটু মুচকি হাসল শুধু। আস্তে আস্তে বলল, 'ও কথা থাক, ঠিক ওজন্য আমি তোমার কাছে আর্জি পেশ করি নি। অন্য একটা কথা আছে।'

'আবার কি কথা?...ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছি তুমি কেমন যেন 'চুপ' হয়ে গেছ। যেমন শামুক নিজেকে খোলের মধ্যে গুটিয়ে নেয় তুমিও তেমনি নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছ। ব্যাপারটা কি বলো দেখি?'

'বলব। আর দু'চার দিন পরে। ভাবছি নিজেদের জীবন, নিজেদের ভবিষ্যতের কথাই। এমন করে আর ক'দিন চলবে? এই তো খাটবার উমর। এরপর বুড়া বয়সে কে এমনভাবে বসিয়ে খাওয়াবে বলো? কিছু একটা এবার করতেই হবে, আর নয়। এখন না করতে পারলে আর পারবই না। সামর্থ্যে কুলোবে না তখন। কিন্তু সে কথাও যাক, নিজের মনের মধ্যে ভাবনাটা পুরোপুরি চেহারা নিয়ে দাঁড়ালে তোমাকে জানাব। এখন শুধু মনে মনে তোলাপাড়া চলছে বৈ তো নয়, সমস্তটাই ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে, কুয়াশায় অস্পষ্ট। কোথাও কোন পাকা পথ দেখতেই পাচ্ছি না।'

'তা হলে আর কি কথার জন্যে এত ভূমিকা?' একটু অসহিষ্ণুভাবেই প্রশ্ন করে অর্জুন।

'বলছি। কেন বলছি প্রশ্ন করো না। কাউকে বলোও না। এটা তোমার কাছে আমার অনুরোধ নয়—ভিক্ষা।'

তবুও থেমে যায় করণ। কিসের একটা সংশয় কাটতে চায় না শেষ মুহূর্তেও।

তারপর আরও ধীরে ধীরে বলে, 'যদি—যদি কোনদিন জানতে পারো যে আমি কোন একটা গর্হিত কাজ করেছি—তো—কোন প্রতিবাদ ক'রো না, কারও সঙ্গে ঝগড়া বাধিও না। শুধু এই কথাটা বিশ্বাস ক'রো, আমার ওপর বিশ্বাস রেখো যে বিনা কারণে আমি কিছু করি না, কিছু করি নি।'

'তা—তার মানে? তোমার মতলবটা কি? কি করতে চাও তুমি? মনে মনে কিসের ফন্দী আঁটছ বলো দিকি?' রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে অর্জুন।

'বলব। তোমাকে বলব বৈ কি। কিন্তু আরও দু'টো দিন যাক। তারপর যেন জোর করেই অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, আচ্ছা ভাইয়া—তোমার কি কাজ করতে ইচ্ছে যায় বলো তো?...ধরো যদি বেরোতেই পারো এখান থেকে—কোন কাজের চেষ্টা করবে? কারবারের চেষ্টা দেখবে? টাকা না থাকলেও ক্ষতি নেই, কোন বড় মহাজন কি কারবারীর কাছে নোকরী নিলে সন্ধান সুলুক সব জানতে পারবে, অন্য মহাজনদের সঙ্গে আলাপ হবে তখন মাল কি মূলধন

কোনটারই অভাব হবে না। দেরি লাগবে হয়ত কিন্তু করে নিতে পারবে ঠিক।'

'না না।' গলায় জোর দিয়ে বলে অর্জুন, 'ওতে টাকা হবে হয়ত কিন্তু মনটা বড় ছোট হয়ে যাবে। বানিয়াদের সঙ্গে মিশে বানিয়াই হয়ে যাব একদিন, কেবল দিনরাত টাকার চিন্তা আর দুনিয়াভর লোকের পায়ে তেল দেওয়া। না, সে আমি পারব না। তার চেয়ে কেরাণীর চাকরিও ভাল, চাই কি কদর দেখাতে পারলে কোন রাজা-মহারাজার দপ্তরে দেওয়ানীও মিলে যেতে পারে। তবে সেও আমার পছন্দ নয়।'

'কি তোমার পছন্দ তাই শুনি।'

'আমি কোন ফৌজেই কাজ খুঁজব আগে। এত কাণ্ড করে লড়াই শিখলুম, ছুঁচের ডগায় গুলী চালিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে শিখলুম—সে কি বানিয়াগিরি করব বলে? না, আমি চাই লড়াই করতে—রিশালাদার কোম্পানীতে থাকব, হাবিলদার থেকে জমাদার সুবাদার মেজরও হয়ে যেতে পারি।'

আবারও হাসল করণ। বলল, 'হাতিয়ার চালাতে শেখা আর যুদ্ধবিদ্যা শেখা এক জিনিস নয়। তা ছাড়া তুমি নাম লেখালেই বা তোমাকে রিশালাদার দলে নেবে তারও কোন মানে নেই; মামুলী সিপাহীখাতায় নাম লিখিয়ে নেয় যদি—যারা মাটি কেটে পথ সাফ করে কিম্বা মাল বয়, রান্না করে—এমনি সব দলে? লড়াই করা সিপাইও আছে—পদাতিক যাকে বলে—কিন্তু তাদেরও কষ্ট কম নয়, বন্দুক আর মাল ঘাড়ে করে এক একদিনে দশ ক্রোশ বারো ক্রোশ পথ হাঁটা—। পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব। সাধারণ মানুষে যা পারে আমি পারব না কেন? যে দলেই হোক ঢুকে যাব। তারপর, কখনও না কখনও কি ঘোড়সওয়ার দরকার হবে না তাদের। তখন কি আর ওদলে ঢুকতে পারব না! অনেকদিন কাজ করে মেজর কি কর্নেল হয়ে যখন পিন্‌সিন্ নিব। ইয়া পাকা মোচ হয়ে, চলে যাব পাহাড়ের ওপর কোন জায়গায়, একটা বড় বাগান নিয়ে বাস করব, বড় একটা কুকুর থাকবে শুধু—। সেই যেমন গাফ্ সাহেবকে দেখেছিলে, মনে আছে?'

'তা আছে। কিন্তু কোম্পানীর ফৌজে ঢুকলে তোমাকে আর কোনদিনই মেজর কি কর্নেল হতে হবে না। কালা আদমীকে অতবড় কাজ ওরা দেয় না।...তা ছাড়া বুড়ো হয়ে পেন্‌সন নেব আর মৃত্যুর দিন গুণব—ও ভাবতে আমার ভাল লাগে না। আমিও লড়াই করতে চাই, লড়াইয়ে যেতে চাই, শুধু তাই নয়—লড়াই করতে করতেই যুদ্ধক্ষেত্রে মরতে চাই। বীরের মৃত্যু কাম্য আমার ছেলেবেলা থেকে।' বলতে বলতেই করণের দৃষ্টি কেমন স্বপ্নালু হয়ে আসে, 'মহাভারতে পড়েছি, যে যোদ্ধা সম্মুখযুদ্ধে লড়াই করতে করতে মরে সে যতবড় পাপীই হোক তার অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। যেজন্যে দুর্যোধনেরও স্বর্গবাস হয়েছিল।'

'তা হয়ত হয় কিন্তু লড়াইয়ের মধ্যে ম'লে—অনেক সময় সেইখানেই মড়া পড়ে থাকে বহুদিন, শিয়াল-কুকুরে খায়, পরে দুর্গন্ধ হয়, সেইটে খারাপ লাগে আমার।'

'সেকথা ঠিক। দাহ করার কি কেরেস্তান মুসলমানদের জন্য তাড়াতাড়ি গোর দেবার একটা ব্যবস্থা থাকলে আর কিছু বলবার থাকত না। কেন যে করে না—! উভয় পক্ষেরই উচিত উভয় পক্ষের মৃতদেহ সরানো কি সৎকারের জন্যে খানিকটা করে সময় দেওয়া। শুনেছি, সত্যিমিথ্যে জানি না, কারণ যাই থাক, মূল ঘটনাটা কিন্তু সত্যি পুঁথিতে আছে—শুনেছি আকবর বাদশা যখন হাজিপুর দখল করেন তখন দুশমনদেরই বহু লোক মারা যায় কিল্লার মধ্যে। হিন্দু-মুসলমান দুই মতের লোকই ছিল। বাদশা দেখলেন যে বেছে নিয়ে সৎকার করা কি গোর দেওয়া অনেক হাঙ্গামা। অতগুলো লোককে গোর দেওয়াও শক্ত। তিনি সোজাসুজি জীবিত লোকদের বার করে দিয়ে গোটা কিল্লাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ ঠিক এইটে কি না জানি না—কিন্তু তা নইলে সদ্যজেতা কিল্লাতে আগুন আর লাগাবার কি প্রয়োজন ছিল তা তো জানি না।'

তারপর হেসে বলে, 'এক্ষেত্রে একটা চুক্তি করে রাখা সব-চেয়ে ভালো, তুমি বা আমি যদি সত্যিই কোনদিন লড়াই করতে করতে মরি তখন অপরজন যে বেঁচে থাকবে সে যেমন করেই হোক সৎকারের ব্যবস্থা করবে। তার জন্যে যদি অমনি কিল্লাতে কি একটা গোটা জঙ্গলে আগুন লাগাতে হয় সেও ভাল।'

হেসে ওঠে দু'জনেই।

কথা কইতে কইতে কখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে তলাওয়ের ওপর, ওদের চারপাশে—তা দু'জনের কেউই লক্ষ্য করে নি। একটা দু'টো নয়—অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে নিচের কালো জলে ঠিক্‌রে-পড়া একটুকরো আকাশে। কিল্লার দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টা ঘড়ি বাজছে আরতির—নিচের গ্রামাঞ্চল থেকেও সন্ধ্যারতির শব্দ ভেসে আসছে।...

[ক্রমশ।

শিল্পীর জীবন সঙ্গিনী

॥ চারুলতা রায়চৌধুরী ॥

ডিসেম্বর মাস। বড়দিনের আর দেরি নেই। আমার সংসারে ব্যস্ততাও অশেষ, গোছগাছে মহাব্যস্ত। দেবীপ্রসাদকে সরকারী কাজে উটাকামণ্ড যেতে হবে। আমি ঠিক করলুম ব্যাঙ্গালোর যাব কারণ উটিতে ভয়ানক শীত। সেইজন্যেই ছেলেকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোর যাওয়াই ঠিক করলুম আমি। ভারতের বড়লাট তখন লর্ড উইলিংডন। মদ্রদেশ সম্বন্ধে লেডী উইলিংডনের মনের এক গহনকোণে কিছুটা দুর্বলতার কারণও আছে—বড়লাট হওয়ার আগে এই মাদ্রাজেই তিনি দিন কাটিয়েছেন লাট হিসাবে।

শিল্পীর উটি যাত্রার দু'একদিন আগেই আমি বেরিয়ে পড়েছি। শিল্পীর আয়োজনও সম্পূর্ণ। স্কুল বন্ধের দিনই সকালে টেলিফোন এল গভর্নমেণ্ট হাউস থেকে। টেলিফোনের সারমর্ম—ভাইসরিন আসছেন স্থানীয় লাট সমভিব্যাহারে শিল্পীর কাজ দেখতে এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে।

অভাবিত-অপ্রত্যাশিত সংবাদ। হাতে সময়ও যে প্রচুর তাও নয়। মাত্র একঘণ্টা সময়ের মধ্যে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলতে হল মাননীয়া অতিথির মর্যাদা অনুযায়ী।

শিল্পী নিজে যখন সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলেন তার অল্পক্ষণের মধ্যে ছাত্রমহলের একটা চাপা হাসির ঢেউ শুরু হল। গুরু অবাক, তাঁকে দেখে তাঁর ছাত্ররা চাপা হাসি হাসছে। এ রহস্যের সূত্র উদ্ধার রীতিমত অসাধ্য হয়ে ওঠে দেবীপ্রসাদের পক্ষে—তা ছাড়া তাঁর মত ব্যক্তিত্ববান কোন গুরুর সঙ্গে ছাত্রেরা ঐ জাতীয় পরিহাস করবে তাও ভাবা যায় না।

ঘটনা হয়তো আরও ঘোরালো হত (কারণ আস্তে আস্তে শিল্পী যেন রেগে উঠছিলেন ছাত্রদের এই অশোভন (?) ব্যবহারে) যদি না সেখানে উপস্থিত এক জার্মান অতিথি রহস্যটি ভেঙে দিতেন। আসলে শিল্পীর বেশভূষাই এই হাস্য-গুঞ্জনের জন্মদাতা। শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল তাঁর পায়ের মোজাটির দিকে। তখন শিল্পীর চোখে পড়ল মোজা দু'টির একটি শাদা, একটি কালো। সময়ও একদম নেই বললে চলে, বড়লাটপত্নী আর হয়তো কয়েকটি মিনিটের মধ্যেই এসে পৌছবেন।

তবে শাদাকে কালো করতে একজন শিল্পীর কতক্ষণই বা লাগে। পূর্বোক্ত অতিথিকে তিনি নির্দেশ দিলেন তাঁর সংগ্রহ থেকে দোয়াতের কালো কালি এনে শাদা মোজাটিতে লাগিয়ে দিতে। অল্পকালের মধ্যেই অতিথি সেই কাজে মেতে গেলেন। এই অতিথি পেশায় ছিলেন ডাক্তার। ভাবতেও কি রকম লাগে যে, সেদিন শিল্পীর এই অন্যমনস্কতাই একজন ডাক্তারের হাতে কাঁচি-ছুরির পরিবর্তে তুলে দিয়েছিল শিল্পীর তুলি।

এই প্রকার নানাবিধ অস্বাভাবিকতা ও অদ্ভুত ঘটনার সমারোহ একজন শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী হিসাবে আমার জীবনে এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল।

যদিও তাঁর জন্ম হয়েছিল রূপোর চামচই মুখে দিয়ে তবু তাঁর জীবনের চলার পথের প্রথমাংশ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিক্রমার পাথেয় কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর হাতে তুলে দেয় নি, তা তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে দুশ্চর সাধনায়। তাঁর নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে তিনি নিজে গড়ে তুলেছেন, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে তিনি পরিচয় দিয়েছেন সর্বপ্রকার দুঃসাহসিকতা, বরণ করে নিয়েছেন নানাবিধ ক্লেশ, নির্বাসিত হয়েছেন পরিজনবর্গের কাছ থেকে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ সরকারী পদ অর্জনে তিনি ছিলেন কৃতসঙ্কল্প।

কলকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ খালি ছিল। দেবীপ্রসাদ ঐ পদের জন্য আবেদন করতে উৎসুক হলেন, কিন্তু নিবৃত্ত হলেন তখনই যখন জানলেন যে, আবেদনকারীদের মধ্যে একজন আছেন যাঁর পিছনে আছেন একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। এর অল্পকাল পরে দেবীপ্রসাদ উটাকামণ্ডে আমন্ত্রিত হলেন শ্রী এস ভি রামস্বামী মুদালিয়ারের দ্বারা। মুদালিয়ার ছিলেন মাদ্রাজের সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রী। এবারে বাদ সাধল বয়েস। যে সময়ে এই ঘটনা ঘটছে দেবীপ্রসাদ

তখন জীবনের একটি শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ করেছেন মাত্র।

অফুরন্ত আশা আর প্রাণজয়ী সম্ভাবনা নিয়ে শিল্পী যখন মন্ত্রীর মুখোমুখি হলেন বিজ্ঞ মন্ত্রীর চোখে তখন ফুটে উঠল এক অপার বিস্ময়। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি অধ্যক্ষের পদ চান, কিন্তু সে তুলনায় আপনার বয়েস যে নিতান্ত কম?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন শিল্পী, বয়েসের স্বল্পতা কি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে?

কিন্তু এ উত্তর তখন নির্বাচককে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ভাগ্য আর একবার মুখ ফেরাল শিল্পীর দিকে। বারংবার এই ভাগ্যের আঘাত শিল্পীকে কিন্তু পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। তার বাছা-বাছা শরে যত তিনি জর্জরিত হয়েছেন তত তিনি আপন লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন—ততই তাঁর অন্তরের প্রতিজ্ঞা আরও জোরালো আরো বলিষ্ঠ এবং আরোও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর মনে। জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রেরণা যেন তিনি আরও গভীরভাবে পেয়েছেন এই প্রতিটি আপাতব্যর্থতার কাছ থেকেই। অবশেষে, আরও চার বছর পর, সফল হল তাঁর স্বপ্ন। তাঁর সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সেদিন যেন এক পরিপূর্ণ সফলতার রূপ নিয়ে দেখা দিল তাঁর জীবনে। তিনি নির্বাচিত হলেন মাদ্রাজের সরকারী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে।

আসলে দেবীপ্রসাদের চরিত্রের লিপি পাঠ করলেই জানা যায় যে, যা তিনি চেয়েছেন হঠাৎ কোনপ্রকার লোভ বা খেয়ালের বশে কখনও তিনি তা চান নি, সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে সচেতন হয়েই তবে তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়েছেন সুতরাং এ তাঁর প্রতিভার স্বাকৃতি। এ কারো দয়ার দান নয়। এই আত্মবিশ্বাস তাঁর চরিত্রের একটি মূলকথা।

অপ্রতিহত চর্চার মধ্যেই শিল্পীর বেঁচে থাকার চাবিকাঠি। শিল্পী যতই প্রতিভাধর হোন তাঁর চর্চা যদি থেমে যায় তা হলে সেইখানেই তাঁর শিল্পসত্তার মৃত্যু। যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মোহে কোন শক্তিমান শিল্পীই সেই অপমৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার স্বপক্ষে সায় দিতে পারেন না। দেবীপ্রসাদ ভেবে দেখলেন যে, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে যদি বাইরের কাজ করতে না দেওয়া হয় তা হলে তো তাঁর শিল্প-সাধনা এক নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ঐ নিয়ম মেনে নেওয়ার থেকে দারিদ্র্য-কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিনাতিপাত ঢের ভাল।

এতবড় ক্ষতির বিনিময়ে অর্থ স্বাচ্ছল্যকে মেনে নিতে তাঁর মন চাইল না। তিনি সরাসরি জানালেন তাঁর মনোভাব। কর্তৃপক্ষে এক বিস্ময়ের বন্যা বয়ে গেল কারণ এই ঘটনা পূর্বতন কোন অধ্যক্ষের বা কোন সরকারী (যতদূর জানা যায়) ঘটে নি, সে দিক দিয়ে এ জাতীয় ঘটনা এই প্রথম ঘটল। সুতরাং তাতে বিস্ময়ের স্বাক্ষর তো থাকবেই। বলা বাহুল্য দেবীপ্রসাদের ইচ্ছা পূর্ণ হল। ইচ্ছামত অন্য কাজে হাত দেওয়ায় তাঁর যথেষ্ট স্বাধীনতা রইল (অবশ্য সরকারী কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়টি বাদ দিয়ে)।

দেবীপ্রসাদ কার্যভার গ্রহণ করেই কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করলেন স্কুলের কার্যধারায়। মেয়েদের পার্ট-টাইম ক্লাস তিনি তুলে দিলেন। মেয়েদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা গ্রহণধর্মী মন নিয়ে এবং গুরুত্ব সহকারে শিখতে আসতেন না। শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কোনক্রমে ডিপ্লোমাটি অর্জন করে কোন বিদ্যালয়ে ড্রইং-মাস্টারের ছাড়পত্র অঙ্কন শিক্ষয়িত্রীর কাজ জোগাড় করা। যে সব মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষার মনোভাব নিয়ে আসতেন, দেবীপ্রসাদ তাঁদের জন্যেই বিদ্যালয়ের দ্বার খোলা রাখলেন। তাঁদের ছেলেদের সঙ্গে কাজ শেখানো হতে লাগল।

কোন জিনিস সম্যকরূপে অবগত না হয়ে তার আদি-অন্ত সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা না হলে তার বিশেষ বিশেষ তত্ত্বগুলিতে পূর্ণ সচেতনতা না এলে কখনও সে বিষয়ে শিক্ষাদান সম্ভব নয়—সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গভীর থেকে গভীরে না গেলে অন্যের হৃদয়ে তাকে প্রবিষ্ট করানো সম্ভব নয়—এই মনোভাব দেবীপ্রসাদ অন্তরে পূর্ণমাত্রায় পোষণ করতেন।

দেবীপ্রসাদ আর একটি প্রচলিত প্রথার অবসান ঘটালেন। ব্ল্যাকবোর্ডের ছবি আঁকার পদ্ধতি তাঁর আমলে বাতিল হয়ে গেল। দেবীপ্রসাদ হাতে-কলমে কাজ ছাত্রের পক্ষে শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ক বলে মনে করেন। এর ফলে, গুরুর কাজ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার এক পূর্ণ অবকাশ ছাত্রের মিলল।

ক্লাসে শিক্ষকরাও অলসভাবে সময় কাটাতে পারলেন না। ছাত্রদের মধ্যে, কাজের মধ্যে তাঁদের কাজের সময় অতিবাহিত হল। এর ফলে গতানুগতিকতার হাত থেকে সমস্ত পরিবেশ মুক্তি পেল। এক গম্ভীর সৃষ্টিধর্মী আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। গুরু-শিষ্য পরস্পর পরস্পরের নিকটে আসার অধিকতর সুযোগ পেলেন—যার সুফল ফলতে থাকল তাঁদের শিল্পানুশীলনে।

দেবীপ্রসাদ নিজে শিল্পী বলে শিল্পীর মনের বিচিত্র ভাবধারার আবেগ অনুভূতির ভাষা তাঁর অপরিচিত নয়। ছাত্রের সমস্যা, মনের দ্বন্দ্ব তিনি উপলব্ধি করতেন, যখনই দেখতেন কোন ছাত্রের ঠিক কাজে মন আসছে না, কাজের

দিকে ছাত্র যখন চেষ্টা সত্ত্বেও মনঃসংযোগ করতে পারছে না, তখনই তাকে তিনি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে ঘুরে আসতে বলতেন। স্থানপরিবর্তন তার মনের অবসন্নতা ঘুচিয়ে তাকে সজীব, প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত করে তুলত, ঘুরে এসে সে পূর্ণোদ্যমে কাজে মেতে উঠত।

কোন রূপের ছবি আঁকতে গেলে অর্থাৎ রঙের সাহায্যে পটের বুকে একটি রূপকে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে সেই রূপের গঠনপদ্ধতি এবং বিশেষভাবে তার সৌষ্ঠব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য সেই কারণে সেই দেহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সচেতন, সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে 'নিউড স্টাডি' এক অতি সাধারণ ব্যাপার কিন্তু এই প্রথা আমাদের দেশে কিছুকাল আগেও ব্যাপকভাবে প্রসারতা পায় নি, তথাকথিত নীতিবাগীশ সমাজপতির দল তো এই প্রথার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। এই বিষয়ে একটি মনে রাখার মত ঘটনা ঘটেছিল।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে একদিন এলেন শিল্প-বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা। এই পদ্ধতি দেখে তিনিও খুব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন নি, তাঁর মতে এই ব্যবস্থা শুধু দেবীপ্রসাদের ক্ষেত্রেই চলতে পারে। কারণ দেবীপ্রসাদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিনা আয়াসে লব্ধ এতবড় প্রশংসা কিন্তু দেবীপ্রসাদকে খুশি করতে পারে নি। এই উক্তির মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যক্তির শিল্প সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার পরিচয়ই পেয়েছিলেন দেবীপ্রসাদ। তিনি উপমা দিয়েছিলেন কোন চিকিৎসকের। তাঁর মতে শিক্ষার্থী যখন কাজে ডুবে থাকে, তখন তার সমস্ত মনপ্রাণ সেই কাজে আচ্ছন্ন থাকে, সে তখন সাধনায় মগ্ন থাকে। তিলমাত্র কোন প্রকার ভিন্ন আকর্ষণ তখন তার সাধনাকে প্রতিহত করতে পারে না। এখানে এই পরিবেশে নারীদেহ তার লালসা-দীপ্ত ও ভোগের সামগ্রী নেয় তার সাধনার উপচার।

স্কুলের সময় ছিল সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে। এর বেশির ভাগ সময় তাঁর কাটত সরকারী কাজে যা তিনি 'কেরাণীর কাজ' বলে অভিহিত করতেন। ফাইল দেখা, হিসাব রাখা, চিঠিপত্রের জবাবাদি দেওয়া ইত্যাদি সেই কাজের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশের সময় খুব অল্পই তিনি পেতেন। যেটুকু সময় ছাত্রদের মধ্যে তিনি কাটাতেন সেইটুকু সময়ই তিনি তাঁর 'মনের কাজ' করার সুযোগ পেয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়টুকু ছাড়া অন্য সময় তাঁর মনের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয়িত হত, তখন কোন বাধা নেই, ফাইলের পাহাড় নেই, সরকারী চিঠির স্তূপ নেই, সে সময় তাঁর একান্ত নিজস্ব, তাঁর সাধনার পবিত্র মুহূর্ত।

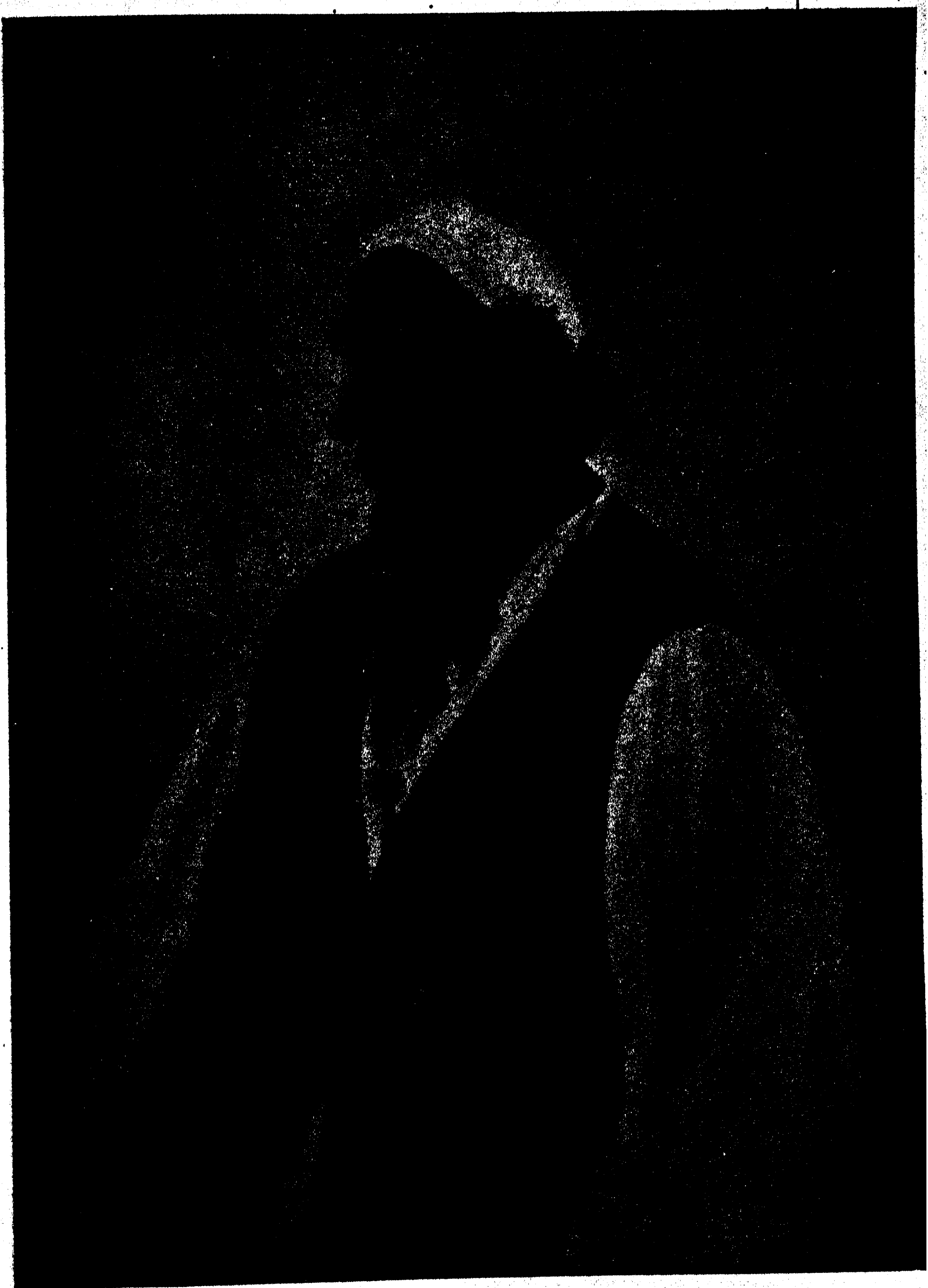
কাজে যখন তিনি মগ্ন থাকতেন সে কি এক অভিনব দৃশ্য। তাঁর সামনে 'সিটিং' দেওয়ার সুযোগ আমার একাধিক-বার ঘটেছে। তাঁর অভিব্যক্তি, তাঁর কার্যধারা, সে সময়ে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করত। এদিকে-সেদিকে রঙের ছড়াছড়ি। চতুর্দিক সরঞ্জামে ভর্তি—সে এক অভিনব দৃশ্য। ছাত্রেরা কেউ কেউ সেখানে উপস্থিত থাকতেন। কেউ থাকতেন গুরু বা অধ্যক্ষের কাজ অনুধাবন করতে, আবার কেউ বা থাকতেন সহযোগিতা করতে। চোখের সামনে রাখা যে সব জিনিস সে সময় তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যেত সেগুলিকে প্রয়োজনানুযায়ী থরে থরে তাঁর সামনে এগিয়ে দেওয়ার কাজ নিয়ে। নিজে তখন দেবীপ্রসাদ রঙের বৈচিত্র্যে জলের স্পর্শে এক অভিনব আকৃতিতে প্রতিভাত হতেন—যার ফলে তাঁকে শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অথবা শিল্পী বলে চেনাই যেত না। ভাস্কর হিসাবে কাজের আবেগে দেখা গেছে অবিরামভাবে দশ-বারো ঘণ্টা তিনি দাঁড়িয়ে। পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে তিনি তখন মুক্ত। বিশ্বজগৎ তখন লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে, আবার তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সমগ্র জগৎ ধরা দিচ্ছে—সে জগৎ রূপের, সে ভুবন রসের।

এই দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যে অতি অল্পক্ষণের জন্য তাঁর সাধনায় বিরতি পড়ত, খাবার সময়। দেবীপ্রসাদের মডেল যিনি হতেন, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর উপর আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তাঁকে যে কি পরিমাণ সহনশীলতা এবং ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়েছে তা বর্ণনার বিষয় নয়, তা উপলব্ধির বস্তু। দেবীপ্রসাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হত সমানে। দেবীপ্রসাদ কাজে এত মশগুল যে, তাঁর মনেই থাকত না যে তাঁর মডেল একজন মানুষ।

একবার তাঁর সুগভীর বহুদূরপ্রসারী দৃষ্টি সম্পর্কে একজন মহিলা-মডেল বলেছিলেন—মনে হয় আপনি যেন আমার মনের ভিতরটাও সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাচ্ছেন।

হয় তো চরিত্রের যথার্থ প্রকাশের জন্য শিল্পীর পক্ষে তার প্রয়োজনও ঘটেছিল। একবার তাঁর সামনে বসেছেন মাদ্রাজের এক ইংরাজ রাজ্যপাল। তাঁর আবক্ষ চিত্র তিনি তৈরি করছেন। কাজের আবেগে দেবীপ্রসাদ ভুলে গেছেন যে কার ছবি তিনি আঁকছেন, তাঁর পদমর্যাদা সম্বন্ধে তখন তাঁর খেয়ালই নেই। বলে বসলেন—টার্ন। রাজ্যপাল একটু যে হতচকিত হন নি তা নয়, কারণহুকুম করতেই তিনি অভ্যস্ত হুকুম শোনার অভ্যাসটা তাঁর নেই। তবে তিনি গুণগ্রাহী এবং রসিক শিল্পীর তন্ময়তায় ও একাগ্রতায় এ ক্ষেত্রে তিনি আনন্দই পেয়েছিলেন। [ক্রমশ।

অনুবাদক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়



মাসিক বসুমতী

॥ ফাল্গুন, ১৩৭১ ॥

(জলরঙ)

অন্ধ

—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত

সাহিত্য পরিচয়

॥ শতাব্দীর সঙ্গীত ॥

॥ এক ॥

চোখে স্বপ্ন, বুকে তীব্র ভাবাবেগ, মুক্তিকাম সংকল্পের দৃঢ়তায় হাতের মুঠি খোলে আর বন্ধ হয়,—বিপ্লবী বাংলার একপ্রান্ত থেকে কিশোর-কবি তাকায় শতাব্দীর সূর্যোদয়ের দিকে। তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় অভীক সুরের যুগমানব বন্দনা :

'তোমারে বন্দনা করি হে জাগ্রত যুগের মানব,
তোমারে বন্দনা করি জগতের আসন্ন বিপ্লব !
সমাজে সংসারে রাষ্ট্রে প্রভুত্বের দম্ভ উপহাস,
বিলাসীর ব্যভিচার, রমণীর কাতর নিঃশ্বাস
সভ্যতার পঙ্ক মাখি বর্বরের উলঙ্গ নর্তন
ব্যাকুল করেছে আজ মহত্তর মানবের মন,
তুমি এস মহাকাল এই নব শতাব্দীর রথে
ধূর্জটীর জটাজালে এস, এস জাহ্নবীর স্রোতে ;
এস এস আমার জীবনে
এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর যুগসন্ধিক্ষণে।'

[শতাব্দীর সঙ্গীত : পৃঃ ৪।

কিশোরকে বিচলিত করে শৃঙ্খলিতা মাতৃভূমির পাঁজর-ভাঙা কান্না, উত্তেজিত করে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীর বুটের লাথিতে পিলে-ফেটে মরা শ্রমিকের মর্মভেদী আর্তনাদ, বিশাল ভারতভূমির নগরে শহরে গ্রাম গ্রামান্তে কোটি কোটি শোষিত ও নিগৃহীত মানুষের অসহায় দীর্ঘশ্বাস কিশোর-কবির বুকে প্রচণ্ড ক্ষোভের অগ্নিবাষ্প কুণ্ডলী সৃষ্টি করে। আমরা কবি-কণ্ঠে শুনি :

'হে বিপ্লবী, জাগো জাগো, অস্ত্রে তব দাও তীক্ষ্ণধার···'

[হে বিপ্লবী জাগো জাগো : পৃঃ ৫]

বিপ্লবী জাগে কিন্তু সে জাগরণ লক্ষ্যহারা। জাতীয় জীবন-জাহ্নবী শ্রেণী-চেতনার দুর্বার তরঙ্গভঙ্গে প্রকৃত বিপ্লব-মন্ত্রে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী সুসংগঠিত গণ-আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বিভ্রান্ত বিপ্লবী উত্তাপ সীমাবদ্ধ থাকে। অপর দিকে জাতীয় আন্দোলনের দুর্বল নেতৃত্ব আপোষের যূপকাষ্ঠে বিপ্লবকে বলি দেয়। বিপ্লবী হয়ে ওঠে বিদেশী রাজার দ্বারে স্বাধীনতা-ভিক্ষুক। মুক্তিস্বপ্নের আকাশ নৈরাশ্যের কালো মেঘে অন্ধকার হয়ে ওঠে। আসে বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অনশন। কিশোর-কবি স্তব্ধ যন্ত্রণায় কান পেতে শোনে জাতীয় দুর্ভাগ্যের শ্মশানে-মশানে কঙ্কালের করতালি, শোনে মরা ধানক্ষেতের রুক্ষ বাতাসে নিরুপায় হতাশার হা-হা শব্দ। অভিমানী কবি জন্মভূমিকে প্রশ্ন করে :

'সোনার ধানের মঞ্জরী মাগো শুকালো কি এতদিনে ?
কচি শিষগুলি ঝরিয়া পড়িল করুণার ধারা বিনে !
বুকের অমৃত শুকায়েছে যদি
কেমনে বহিছে গিরি নদনদী
মধু নাই মাগো ?—মধুমতী আজো বহিছে কল্লোলিনী !
কোন স্বরগের করুণার সুরে বহে আজো সুরধুনী ?'

*　　*　　*

'কত দীপ জ্বলি নিভে গেল হায় মনের রুদ্ধদ্বারে।
তবু সেই শিখা হেরি মাঝে মাঝে চিতার অন্ধকারে।'

[অনশন হাহাকার : পৃঃ ১০।

সমাজ-সচেতনার পূর্ব-তোরণে দাঁড়িয়ে কিশোর দেখতে পায় নবজাগ্রত এশিয়ার থমথমে অগ্নিমুখ। সংঘাতের কুরুক্ষেত্র



● বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

থেকে শিখায়িত চৈতন্য বাষ্পের দিকে তাকিয়ে কবি প্রশ্ন করে :

'কে তুমি বসেছ পুনঃ হে বিপ্লবী, ধ্যানের আসনে ?
বিগতবৈভবা এই, নগরীর শেষের শ্মশানে ?
এশিয়ার যজ্ঞভূমে জাগিবে কি প্রাণশক্তি আর
দক্ষিণ সমুদ্র হ'তে উত্তরের মেরুপ্রান্ত পার ?'

[পৃথিবীর ধূলি পূর্বদ্বার : পৃঃ ১৮।

যে ছায়া-ঝিলমিল ঝাউগাছ রোমান্টিক কবির মনে জাগায় স্বপ্ন-শিহরণ, সেই কম্প্রকোমল ঝাউ শাখায় জ্বলে ওঠে কালাগ্নি-শিখা। কিশোর-কবির দৃষ্টিতে ঝাউগাছও বিপ্লবের প্রতীকে পরিণতি লাভ করে। কবি তাঁর সেই প্রতীকী বিটপীরাজকে উদ্দেশ করে বলেন :

'ডালে ডালে তব পাতায় পাতায় শন শন শন প্রলয় শিস্
বাজে যেন কোন্ বিদ্রোহভরা হৃদয়ের ব্যথা অহর্নিশ !'

[ঝাউ : পৃঃ ১৯।

এই বিদ্রোহভরা শাঁ শাঁ শব্দের মধ্যে দিয়ে পুনরভ্যুদিত মুক্তিসংগ্রামের যুগসন্ধিকাল এসে যায়। শোণিতসিক্ত বিপ্লব স্বপ্নের রুক্ষ-শুষ্ক ধূলি উড়িয়ে আসে অহিংসা অসহযোগের অভিনব উন্মাদনা।

তারুণ্যে উপনীত কবিকণ্ঠে শোনা যায় অহিংস সত্যাগ্রহীর প্রশস্তি গান :

'হে বীর সত্যাগ্রহী,
ঘরে ঘরে তুমি বিলালে আগুন। বক্ষ আগুনে দহি।'

[গাহি তার জয়গান : পৃঃ ২৪।

এ আগুনে ঐতিহাসিক বিস্ময় ছিল, আধ্যাত্মিক আলো ছিল, নিরুপদ্রব স্ফুলিঙ্গ ছিল, ছিল না শুধু দাহিকা, ছিল না ওপরতলার বিরুদ্ধে নিচের তলার শ্রেণী-চেতনার সুতীব্র জ্বালা। এ আগুনে সর্বহারা শ্রেণীর হাতে বিপ্লবের রক্তমশাল শিখায়িত হয়ে ওঠে নি। এ আগুন এনেছিল শৃঙ্খল মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রেণী-সহযোগিতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত একটা বিরাট অবৈজ্ঞানিক আলোড়ন। ধনী-দরিদ্রে সমদর্শিতা যার ভিত্তি—সেই সর্বগ্রাসী বিভ্রান্তিকেও বিপ্লবীরা সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিলেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে। সেই সাময়িকতার নিরুত্তাপ অগ্নিচমকে বিমোহিত কবি শোনালেন :

'প্রাসাদের চূড়া ভাঙিয়া পড়িল, খুলে গেল কারাগার
ফাঁসির মঞ্চে ফুলমালঞ্চে হয়ে গেল একাকার !'

[গাহি তার জয়গান : পৃঃ ২৫।

স্বাধীনতা এল রাজনৈতিক অধিকারের সীমা-সীমান্ত ঘেরা ভৌগোলিক ভূমিতে, কিন্তু দেশের কোটি কোটি কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত পেলো না এ স্বাধীনতার অমৃত-আস্বাদ। যুবক-কবির ক্ষুব্ধ ললাটে ফুটে উঠলো যুগ-সংকেতের ভ্রূকুটি।

সে দিনের সেই কিশোর-কবি এবং যুগসন্ধির সেই যুবক-কবির নাম বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কবি বিবেকানন্দের বিপ্লবী-সত্তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে প্রগতিশীল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হয়ে উঠলো একটি আলোকস্তম্ভ।

॥ দুই ॥

কবিতা সাংবাদিকতায় পরিণত হলে কাব্যরসিক-সমাজে যেমন তার কৌলীন্য থাকে না, তেমনি একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি কাব্য-সাধনা ছেড়ে সাংবাদিকতার কাজে আত্মনিয়োগ করলে কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয়। দেশ একজন কবিকে হারায়। সাংবাদিকের মস্তিষ্ক স্বদেশ ও বিদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তায় অহোরাত্র ভারাক্রান্ত থাকার ফলে তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে কাব্য-সাধনায় সমাহিত থাকার অবসর থাকে না। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও যে কবি কবি-সাংবাদিক কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি আনুগত্যে অটল থাকেন, কাব্যপ্রেমিকদের কাছে নিঃসন্দেহে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। এই শ্রদ্ধা কবি-সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অনায়াসেই দাবি করতে পারেন। এই কর্মব্যস্ত সাংবাদিকের কাব্যনিষ্ঠা বিস্ময়কর।

একজন সমসাময়িক কবি হিসেবে আজ আমার স্পষ্ট মনে পড়ে চল্লিশ বছর আগে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা যখন 'উদ্বোধন', 'ভারতবর্ষ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বেরুতে আরম্ভ করে, তখনই তৎকালীন রসিক-সমাজের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার সৌর-মণ্ডলে কবিসূর্য রবীন্দ্রনাথ যখন ভাস্বরদ্যুতিতে বিরাজমান; সত্যেন দত্ত-মোহিতলাল-যতীন সেনগুপ্তের রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কাব্য-বৈচিত্র্যে যখন তরুণ কবিসমাজ উদ্বুদ্ধ, নজরুল প্রতিভা যখন অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর মতো স্বদেশী আন্দোলনের ঈশানী আকাশে আবির্ভূত, বাংলা কাব্যের সেই উত্তেজনা-উদ্দীপনা-মুখর যুগে একজন তরুণ-কবির পক্ষে নিজেকে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও উচ্চ মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সেই দুর্ভেদ্য যুগদুর্গেও তরুণ-কবি বিবেকানন্দ প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর অগ্নিগর্ভ কবিতা বৃটিশ শাসকদেরও বিচলিত করেছিল! যার ফলে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতাব্দীর সঙ্গীত' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজদ্রোহের অভিযোগে সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিপ্লবী নায়িকা'—কবির মতে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু দেশব্যাপী উত্তপ্ত আবহাওয়ার ফলে প্রকাশক ধৃত ও অন্তরীণে আবদ্ধ হয়েছিলেন! চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'জীবনমৃত্যু'

প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অধিকাংশই ছিল প্রেমের কবিতা। প্রকৃত প্রেমিক না হলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। সর্বমানবের সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে প্রেমিক কবিকে বিপ্লবের তরবারি ধারণ করতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত মহান কবিকেই বারে বারে তাই অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে।

বিশুদ্ধ কাব্য রচনার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে দেশসেবা সম্ভব নয় বলেই কবি বিবেকানন্দ সচেতনভাবে সংবাদপত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মালিকানার লৌহবেষ্টনীতে শত ফাটল সৃষ্টি করে তিনি সুকৌশলে সংবাদপত্রকে লোককণ্ঠ করে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি মানব-দরদী কবি, তাই তাঁর সহৃদয় লেখনীস্পর্শে নীরস সম্পাদকীয় রচনা কাব্যধর্মে উন্নীত হল। তাঁর বহু সম্পাদকীয় রচনা আমার কাছে রীতিমত গদ্য-কবিতা বলে মনে হয়েছে। সংবাদপত্র সেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কাব্য-সাধনা সমানে বজায় রেখেছেন। সে-দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, প্রতি বৎসর ঐ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তাঁর একটি করে কবিতা বেরিয়েছে। এই কবিতাগুলির অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ সার্থক কবিতা।

কবি-সাংবাদিক বিবেকানন্দ সব্যসাচীর মত একহাতে সাংবাদিকতার গাণ্ডীব ও অন্যহাতে কাব্যের পুষ্পধনু চালনা করেছেন। একাধারে বিপ্লব ও প্রেমের অর্ধনারীশ্বর বাক্-চৈতন্য এই মহৎ কবি-সাংবাদিকের উপাস্য দেবতা।

॥ তিন ॥

'শতাব্দীর সঙ্গীত' বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সদ্য-প্রকাশিত কাব্যসংকলন। কৈশোর কাল থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যত কবিতা লিখেছেন, সংখ্যায় খুব কম হলেও, তার মধ্যে থেকে সুনির্বাচিত ৪৮টি কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। কবি তাঁর এই কবিতাগুলিকে কালানুযায়ী তিনটি পর্যায়ে সাজিয়েছেন। (১) প্রথম যুগ: ১৯২৬-১৯৩০, (২) মধ্যযুগ: ১৯৩২-১৯৪৪ ও (৩) শেষের যুগ: ১৯৪৪-১৯৬৩। আলোচনার প্রথম দিকে আমি প্রথম যুগের কবিতাগুলির সম্পর্কে গুণাবধারণ করেছি। প্রথম যুগের কবিতাগুলির যাচাই অত্যাধুনিক রস-বিচারের কষ্টিপাথরে করি নি, যাচাই করেছি দেশপ্রেমের কষ্টিপাথরে। কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত। রসপিপাসু সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এইসব মতামতের ধার ধারেন না। এই কারণেই আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশা প্রশান্তি-বিক্ষোভ প্রভৃতি প্রগাঢ় অনুভূতিব্যঞ্জক কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা এ কালের বুদ্ধিদীপ্ত দুর্বোধ্য কবিতাগুলির চেয়ে অনেক বেশি। জনপ্রিয় কবিতাগুলির ধর্ম সম্পর্কে প্রাচীন আলঙ্কারিকরা বলতেন,—

> 'চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃসুখাদল্পাধিয়ামপি।
> কাব্যাদেবযতস্তেন তৎস্বরূপং নিরুপ্যতে॥'

কাব্য থেকেই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনায়াসেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফলপ্রাপ্তি হয়। এই হল হৃদয়ধর্মী রসোত্তীর্ণ কাব্যের মর্মকথা। আদি কবির রসনায় শোক থেকে শ্লোক উচ্চারিত হয়েছিল সর্বপ্রথম। তাই বোধ হয় সমস্ত যুগেই জনপ্রিয় কবিতার উৎস মানুষের জীবন-যন্ত্রণা। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'শতাব্দীর সঙ্গীতে' এই জীবন-যন্ত্রণার ধ্রুপদী অনুরণন প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যেই ছন্দায়মান। তাঁর কবিতায় নয়টি রসের সুললিত ভাবমাধুর্যময় অভিব্যক্তি তো আছেই, অধিকন্তু দশম রস বিস্ময়ের আলোকিত ঔজ্জ্বল্য কোনো কোনো কবিতাকে লাবণ্যময় করেছে। 'জলদস্যু' ও 'ক্লিয়োপেট্রার মৃত্যু', 'পৃথিবীর নবজন্ম' (সক্রেটিসের মৃত্যুর পর ক্রিটোর প্রতি প্লেটো), 'দেহ-সমুদ্র', 'নূতন প্রেম' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই শেষোক্ত রসের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিচেতনা প্রজ্ঞায়, প্রেমে ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। ডক্টর জনসন বলেছিলেন,—

…'That which though not obvious is acknowledged upon its first production to be just, that which he who never found it, wonders how he missed.'

কথাগুলি বিস্ময়-রসাত্মক কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি রোমান্টিকতায় পাঠক মনে যুগপৎ রোমাঞ্চ ও মোহ সঞ্চার করে। প্রতিটি কবিতা থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। 'পৃথিবীর নবজন্মে'র কয়েকটি পংক্তি আমাদের প্রবীণ মনকে দার্শনিক করে তোলে।

> ……হায়, মিথ্যা এ কবিতা
> মিথ্যা এ প্রলাপ যত, দুর্বলের বিচিত্র ভণিতা
> ছন্দে ছন্দে বিকার ক্রন্দন! তার চেয়ে এই ভালো
> দিগন্তবিস্তৃত এই পৃথিবীর প্রভাতের আলো
> পড়েছে ললাটে মোর; এ আলোর সমুদ্রের তলে
> মুগ্ধ পতঙ্গের মত পড়ে থাকি স্তব্ধ কোলাহলে
> যুগযুগান্তর ধরি।'……

[পৃথিবীর নবজন্ম: পৃঃ ৪৭।

এই কবিতাটির শেষের দিকে সক্রেটিসের বিনা অপরাধে মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে কবি Plato-র মুখ দিয়ে Crieto-কে বলেছেন—

—'বন্ধু একি দুঃসহ বেদনা
যাদের লাগিয়া ঋষি করিলেন দুখের সাধনা
তারাই বধিল তাঁরে।'

[পৃথিবীর নবজন্ম : পৃঃ ৫০-৫১।

[Plato-র 'Apology', 'Phaedo' প্রভৃতি গ্রন্থে সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী আছে। অসংখ্য শিষ্য ও বন্ধুর সামনে ঋষি সক্রেটিস হেমলক বিষপানে জুরীদের বিচারে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর প্রিয়শিষ্য Apalodorus গুরুকে বলেন, 'আমার সর্বাপেক্ষা দুঃখ আপনি বিনা অপরাধে মৃত্যুবরণ করছেন।'

সক্রেটিস উত্তর দেন, 'তুমি কি ইচ্ছা করো আমি অপরাধী হয়ে মৃত্যুবরণ করবো?']

উদ্ধৃত পংক্তি দু'টি পড়ে মন বললে, এমনিই হয়। যুগে যুগে যাঁরা মানুষের দুঃখমোচনের জন্যে সর্বস্বপণ সাধনা করেছেন, অকৃতজ্ঞ মানুষ তাঁদেরই প্রাণবধ করেছে। সক্রেটিস, খৃস্ট থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত তার নিদর্শন। এই 'দুঃসহ-বেদনা' ইতিহাসের প্রবাহ নিত্য-সত্য। একেই বোধ হয় বলে অসঙ্গতির অসঙ্গতি (Negation of negation) কোথাও নৈসর্গিক, কোথাও মানবিক। ডায়ালেকটিক্স তাই বলে।

'আদিম পৃথিবী' বিবর্তিত সৃষ্টিতত্ত্বের মহিমায় অপরূপ। কবিতাটি পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাবার যোগ্য। এটি প্রথম পর্যায়ের মধ্যে আছে। কবি 'স্পেন্সারিয়ান' ছন্দে 'ক্লিওপেট্রার মৃত্যু' কবিতাটি রচনা করেছেন। দর্পিতা মিশরেশ্বরীর সর্বনাশা রূপ ও তার গরলনীল পরিণতি কবিতাটির প্রতিপাদ্য। 'বোধন' শীর্ষক কবিতাটির মধ্যে তিনটি অষ্টাদশক্ষরা সনেট আছে। কতকটা Shakespearian Sonnet-এর মতো এগুলির আঙ্গিক। বিষয়বস্তু মহাযুদ্ধ ও মানবীধরিত্রী। যে অজ্ঞাত সেনাদল আকাশে মাটিতে সমুদ্রে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তাঁদের উদ্দেশে কবির উক্তি স্মরণীয় :

'হে অজ্ঞাত রণযাত্রী তোমাদের সমাধি শিয়রে
প্রভাত শিশিরসিক্ত পৃথিবীর অশ্রুবিন্দু ঝরে।'

[বোধন : পৃষ্ঠা ৬০।

'নূতন প্রেম' কবিতাটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। নিচের পংক্তিগুলি প্রেমিক মনকে বিহ্বল করে—

'পৃথিবী আবার বিবশা হয়েছে জানি
বিধুর হয়েছে কুমারী কমল দল।
তারায় তারায় বেদনার কানাকানি
চোখের পাতায় অশ্রু যে টলমল।
এখনি হৃদয় ফাটিয়া পড়িবে বুঝি……'

[নূতন প্রেম : পৃঃ ৭০।

'ঠোঁটের কাব্য' নানা বিচিত্র ছন্দের স্তবকে রচিত যেন একখানি প্রেমের মিশ্ররাগিণী। এর পরেই 'সমুদ্র সৈকতের' মৃদঙ্গগম্ভীর সুর মনকে আত্মসমাহিত করে।

'শেষের যুগ : ১৯৪৫—১৯৬৩' এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে কবি সুদীর্ঘ ইতিহাস পরিক্রমা ও প্রেমের অলকাপুরী ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন। কবির সমাজ-বিজ্ঞানী মন আত্মকামিতার অন্ধকারে বিদীর্ণ করে—ব্যক্তিত্বের বীতংসমুক্ত চেতনায় এই কবিতাগুলির মধ্যে বৃহত্তর জীবন সত্যের সার্থক রসরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে! কবিতাগুলির মধ্যে নিখুঁৎ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে! 'নতুন মানুষ', 'হিমালয় জেগেছিল', 'ছিন্নমূল', 'ফায়ারম্যান', 'মহাকাশচারী', 'মাটি কার?' প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। 'ফায়ারম্যান' একটি পরমাশ্চর্য কবিতা। কবিতাটি যে-কোনো পাঠককে অভিভূত করবে। প্রকৃত মার্ক্সবাদী কবিতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন 'ফায়ারম্যান'।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সদাজাগ্রত আন্তর্জাতিক মন 'শতাব্দীর সঙ্গীতে'র বেশিরভাগ কবিতার মধ্যেই ভাস্বরদ্যুতিতে প্রকাশ পেয়েছে। কবির বহু কবিতাই আমাকে ইতিপূর্বে বহুবার আনন্দ দিয়েছে। এই সংকলনে তাঁর বেশির ভাগ সার্থক কবিতা একসঙ্গে আস্বাদ করার সুযোগ পেয়ে আমি আজ আনন্দিত। কবিকে আমি অন্তহীন ভালবাসা জানাচ্ছি, কবি হিসেবে তিনি দেশবাসীরও অকুণ্ঠ ভালবাসা পাবেন।*

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

বৌরাণী ॥ রীডার্স কর্নার ॥

আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া আছে। প্রাচীন জমিদারবংশের এক কুলবধূকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী; কিন্তু এই বৌরাণী জীবিত কোন মানুষ নয়—অশরীরী প্রেতাত্মা। সন্তানের মায়ায় মিত্র

*শতাব্দীর সঙ্গীত : বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম :—পাঁচ টাকা।

মঞ্জিলের বৌরাণী মায়া মৃত্যুর পরও আবদ্ধ ছিল পৃথিবীর বুকে, সকলের অলক্ষ্যে নয়, দৃষ্টিগোচর হয়েই সে আসত প্রতিদিন মিত্রমঞ্জিলে, খেলা করত মেয়ে রাণুর সঙ্গে, সান্ত্বনা দিত তাকে ; এই ভৌতিক মায়ার বাঁধন থেকে মুক্ত করতে পারল না রাণুকে তার পার্থিব প্রিয়জনেরা, অবশেষে মৃত্যুর মাধ্যমে সে চলে গেল তার পরলোকগতা মায়ের কাছে। কাহিনী বয়নে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন লেখক, তাঁর বর্ণন-কৌশলে ভৌতিক পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, পড়তে পড়তে পাঠকের গা ছমছম করে, কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। রহস্য-রোমাঞ্চ জাতীয় কাহিনী যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা এ রচনাটি হাতে পেয়ে নিঃসন্দেহে সুখী হবেন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বীরেন দাশ। প্রকাশনায়—রীডার্স কর্নার। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অফ্ হিউম্যান বণ্ডেজ ॥ রীডার্স কর্নার ॥

সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের একটা স্বতন্ত্র দাম আছে, কারণ এরই মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় ঘটে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই শাখাটির যে ক্রমেই সমৃদ্ধি ঘটছে, এ সত্যও অনস্বীকার্য ; আলোচ্য রচনাও এই জাতীয়। সমারসেট মম্ বিশ্ববিখ্যাত লেখক, তাঁরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'অফ্ হিউম্যান বণ্ডেজে'র এই বঙ্গানুবাদ নিঃসন্দেহে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখ্য সংযোজন রূপেই পরিগণিত হবে। মম্ যে কতবড় জীবনশিল্পী আলোচ্য রচনায় তা উদ্ঘাটিত হয়েছে ; একটি ছেলের শৈশব অবস্থা থেকে তার যৌবনপ্রাপ্তি অবধি সমস্ত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে কাহিনীতে ; কালের বিচারে তিরিশ বছরের উর্ধ্বে না হলেও, কালজয়ী লেখনীর প্রসাদে এই ব্যাপ্তি চিরকালীন, মানব জীবনের চিরন্তন বাণীই এর প্রাণসত্তা। এই গ্রন্থের গঠনবিন্যাসে মূল গ্রন্থকার যে রীতি অবলম্বন করেছেন, অনুবাদকও তা যথাযথভাবেই অনুসরণ করেছেন ; তাঁর অনুবাদকর্মও অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল, পড়তে পড়তে লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে উঠতে পারেন পাঠক। এই অনুবাদকর্মের সম্পাদনাও প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সমারসেট মম্। প্রকাশক—রীডার্স কর্নার। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। অনুবাদক—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। সম্পাদক—সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র। দাম—আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সুসমাচার ॥ স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স ॥

আলোচ্য গ্রন্থটি এক ছোটগল্পের সঙ্কলন, মোট ছয়টি গল্প স্থান পেয়েছে এতে—যার প্রত্যেকটিই এর আগে কোন না-কোন সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বস্তুনিষ্ঠ ও আশ্চর্য-রূপেই সমাজ-সচেতন, বর্তমানের ভাঙ্গনধরা ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে গল্পগুলির মাধ্যমে, বিশেষ করে 'বন থেকে বেরুল টিয়ে', 'আজকের দিন' প্রমুখ গল্প দু'টি তো বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য, শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ায় মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ যে একটা কথার কথায় পর্যবসিত হতে বসেছে, এই গল্প দু'টির মাঝে তার নির্ভুল ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লেখকের শৈলী হয়ত মার্জিত-রুচি পাঠক মাত্রেরই কাছে একটু অশালীন ঠেকবে ; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, রূঢ় সত্যকে প্রকাশ করার সৎসাহস তাঁর আছে। এই গল্পগুলির মাধ্যমে যে কথা লেখক বলতে চেয়েছেন, আজকের দিনে তা ভাববার মতই এক সমস্যা ; বোদ্ধা পাঠকমাত্রই সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য। প্রচ্ছদ—রুচিসঙ্গত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, দাম—তিন টাকা।

পরকীয়া ॥ গ্রন্থম ॥

লেখক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম পাঠকের অপরিচিত নয়। এই পুরাতনপন্থী সাহিত্যিকের রচনায় এক অনির্বচনীয় মাধুর্যের স্বাদ পাওয়া যায়—যার আবেদন চিরকালীন। আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রবীণ সাহিত্যিকের মোট তেরটি ছোটগল্প সংগৃহীত হয়েছে। হাস্য, মধুর, করুণ এই ত্রিবিধ রসে জারিত গল্পগুলি সত্যিই উপভোগ্য, কিছু বাস্তব সমস্যারও ইঙ্গিত যে এদের মাঝে নেই তা নয়, কিন্তু লেখকের মানবিক ও প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কল্যাণে তা কটুগন্ধবাহী হয়ে উঠতে পারে নি, 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই মহা সত্যটিই যেন উদ্ঘাটিত হয়েছে এদের মাধ্যমে। পড়তে পড়তে এক নির্মল আনন্দে ভরে ওঠে পাঠকের মন। অতি আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ রচনাভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত সাহিত্য-পাঠক যখন সমস্যা ও কর্মের গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ওঠেন, তখন এই জাতীয় রচনা তাঁদের পরম আশ্রয় ; কারণ এগুলির মাধ্যমেই আবার তাঁরা নিটোল সুন্দর গল্প পাঠের আনন্দকে উপভোগ করতে পারেন স্বচ্ছন্দ চিত্তে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—গ্রন্থম, ২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পৃথিবীর জঠরে

॥ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ॥

আলোচ্য রচনাটি বিজ্ঞানভিত্তিক, কোটি কোটি বছর পার হয়ে আসা আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বা ভূত্বক চিরকাল একরকম থাকে নি, বহু ভাঙ্গাচোরার পর আজ আমরা একে এই রকম দেখছি। এ পরিবর্ত্তনের পালা কিন্তু শেষ হয় নি আজও, পরিবর্তন কোথাও বা হঠাৎ সংঘটিত হয়, কোথাও বা দীর্ঘকাল ব্যেপে হয়। ভূত্বকের এই পরিবর্তনের কারণ কি ও কেনই বা তা সাধিত হয়ে আসছে, স্মরণাতীতকাল থেকে সে সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থোক্ত প্রবন্ধগুলি বিশিষ্ট সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দ্বারা লিখিত; সুতরাং এদের প্রামাণ্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ নেই। শিক্ষার্থী তো বটেই পরন্তু জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠক মাত্রেরই কাছে এই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ সংকলনটি বিশেষভাবেই সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থের ভাণ্ডারে, বর্তমান রচনা নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। অনুবাদ—অরুণ রায়। প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দু' টাকা ত্রিশ পয়সা।

ভালবাসার অনেক নাম **॥ পূরবী বুক স্টোর ॥**

আলোচ্য গ্রন্থটি এক ছোট গল্পসংগ্রহ, মোট এগারোটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এতে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত ; কিন্তু তাঁর লেখনী যে কিছুটা প্রতিশ্রুতির আভাস দেয়, একথা মানতেই হয় গল্পগুলি পড়লে। ছোট গল্পের মূল সুরটি ধরা পড়েছে এদের মাঝে, কাজেই তরুণ লেখকের শৈলী কিছুটা অপরিণত হলেও গল্পগুলি সুপাঠ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। 'পারি না' গল্পটি আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরবাহী। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—ডেভিড মোমেস। প্রাপ্তিস্থান—পূরবী বুক স্টোর। ৩এ, ডাঃ জগদ্বন্ধু লেন, কলিকাতা-১২। দাম—দু' টাকা।

চিন্ময়ী **॥ বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস ॥**

আলোচ্য গ্রন্থটিতে সুবিখ্যাত সাহিত্যিক 'তারাশঙ্করের' ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে। লেখক স্বয়ং ভূমিকা করেছেন এদের সম্পর্কে একটু, বলেছেন যে, এগুলি মধুর রসের গল্প ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু মধুর রসের-না বলে করুণ-মধুর রসের গল্প বলে উল্লেখ করলেই বোধ হয় এদের সত্য পরিচয় দেওয়া সম্ভব। বাহ্যিক নীচতা ও অভাবের অন্তরালে সামান্য ও সাধারণ একটি মানুষের মনে উচ্চ আদর্শ ও করুণা যে কেমন করে বাসা বেঁধে থাকে, 'কাক-পণ্ডিত' গল্পটি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ রচনার শৈলীতেও লেখকের অপরাপর অধিকাংশ রচনার মতই রাঢ় অঞ্চলের বিশেষ ভঙ্গীটি ধরা পড়ে—যা নাকি একান্তই লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ; বস্তুত এ বিষয়ে লেখক একটা বিশিষ্ট ঘরাণার স্রষ্টা বলাটাই বোধ হয় সঙ্গত। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—দু' টাকা।

কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র **॥ বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ ॥**

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ আলোচনা এ যাবৎ খুব বেশি হয় নি, তার কারণ উপকরণের স্বল্পতা, স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যতটা আমরা জেনেছি, মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা ঠিক ততটাই অজ্ঞ ; আলোচ্য রচনায় এ অভাব কিছুটা মেটবার সম্ভাবনা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে কাছ থেকে দেখার সুবিধা হয়েছে এমন কয়েকটি মানুষের রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ক'জন মনীষী ; সুতরাং এ আশা করা দুরাশা নয় যে, এই প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে ঋষি বঙ্কিমের যে-পরিচয় আমরা পাই তা প্রামাণ্য ও তথ্যনির্ভর। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম শুধু তাঁর সৃষ্টির জন্যই নন, তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্যেও বটে। এই ব্যক্তিত্বই নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে বর্তমান রচনার পাতায়। মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র কি ছিলেন তার একটা ধারণা আপনা হতেই গড়ে ওঠে পাঠকের মনে এই গ্রন্থ পাঠ করলে। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে এই রচনাগুলি থেকে উদ্ধার করা গেছে তিনি এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব; আর সেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সহায়ক বলেই রচনাগুলি এক বিশিষ্ট মূল্যমানের অধিকারী। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। সম্পাদনা—সোমেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশনা—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম—ছ' টাকা।

গল্পে বিচিত্র বিজ্ঞান **॥ রীডার্স কর্নার ॥**

আলোচ্য গ্রন্থটি শিশুপাঠ্য, এতে গল্পের মাধ্যমে ছোটদের বিজ্ঞান শেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। বিজ্ঞান অতি সমৃদ্ধ বিষয়, এর বহু শাখা, লেখক অত্যন্ত সহজ শৈলীতে গল্প করার ভঙ্গীতে ছোটদের এইসব শাখা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়ে দিতে চেয়েছেন। খাদ্যতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বর্তমান কালের মহাকাশ অভিযান ইত্যাদি

সবেরই অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে; মূলত শিশুপাঠ্য হলেও বড়রাও এ বইটি পড়ে খুশি হয়ে উঠবেন। ছাপা, বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়, প্রকাশক—রীডার্স কর্নার। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদ

॥ বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ ॥

আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মানসিক দৃষ্টিকোণকে এক নতুন দিক থেকে অধ্যয়ন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্র-দর্শনকে বোঝাবার ও বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর সৃষ্টির উৎকর্ষ বিচারই যে সব নয়, তাঁর অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধেও যে পূর্ণভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজনীয়, একথা বলেই শুধু ক্ষান্ত হন নি লেখক, এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনাও করে দেখিয়েছেন। বস্তুত এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধাবলীর মাঝে এ সম্পর্কীয় প্রবন্ধটিই দীর্ঘতম। অসামান্য রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখী সৃষ্টি ও বহু বিচিত্র অভিব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সহায়তা করবে। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ রচনা এক মূল্যবান অবদান রূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। প্রচ্ছদ রুচিসঙ্গত, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। প্রকাশনায়—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম—পাঁচ টাকা।

বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়

॥ বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ ॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা উপন্যাসের রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রামাণ্য আর কোন গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় নি বললেই চলে এবং সেজন্যই বর্তমান গ্রন্থটি এক বিশেষ মূল্যমানের অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত ক্ষমতাশালী সব কথাসাহিত্যিকের রচনা সম্বন্ধেই প্রামাণ্য ও বিশদ আলোচনা করেছেন লেখক। অবশ্য বাংলা উপন্যাসের জনক হিসাবেই বঙ্কিমচন্দ্র উল্লিখিত হয়েছেন। তাঁর রচনা-পদ্ধতির পরিচয় দেওয়ার কোন প্রচেষ্টা লেখক করেন নি, করার কথাও নয়; কারণ এ গ্রন্থে বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়টাই আলোচ্য বিষয়বস্তু। প্রধানত কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকবৃন্দ দ্বারাই একদিন বাংলা উপন্যাসে আধুনিক সূচনা ঘোষিত হয়েছিল। এ গ্রন্থে তাঁদের সাহিত্যকর্মের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের পদক্ষেপেই যে সেদিন বাংলা উপন্যাস রচনা-রীতিতে একটা মৌল পরিবর্তন এসেছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই, তবে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন—তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; কারণ প্রধানত এঁদেরই সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়ের সূচনা ঘটে। সাহিত্য-জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী—এই উভয়বিধ পাঠকই আলোচ্য গ্রন্থটি হাতে পেয়ে উপকৃত হবেন বলেই আমরা আশা পোষণ করতে পারি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—রণেন্দ্রনাথ দেব। প্রকাশনায়- বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম—বারো টাকা।

শেক্সপীয়রের গল্প

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ সন্তোষকুমার দে অনূদিত ॥

কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার দে সম্প্রতি বিবিধ প্রবন্ধ পুস্তক রচনায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকলেও শাশ্বত রসসাহিত্যেও যে আসক্তি হারান নি, তার প্রমাণ শেক্সপীয়রের চতুঃশত-জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত তাঁর 'শেক্সপীয়রের গল্প' গ্রন্থখানি। শেক্সপীয়রের ছয়টি নাটকের কাহিনী তিনি অতি সরলভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, যাতে মূল নাটকের রস সহজেই উপভোগ করা যায়। কিশোর-পাঠ্য হিসাবে লিখিত হলেও বড়রাও বইখানি পড়ে আনন্দ পাবেন। পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে ভাষায় কাহিনীগুলি বলা হয়েছে। এতে আছে 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'পেরিক্লস্', 'ভেরোনার দুই ভদ্রলোক', 'নিদাঘ রাতের স্বপ্ন' এবং 'সব ভালো, যার শেষ ভালো'। প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে একটি করে শীর্ষচিত্র সংযোজিত হয়েছে। ভাষার লালিত্যে, মুদ্রণ পারিপাট্যে এবং মূল্যের সুলভতায় 'শেক্সপীয়রের গল্প' অতি অবশ্যই জনপ্রিয় হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শেক্সপীয়রের গল্প—দ্বিতীয় ভাগ। লেখক—সন্তোষকুমার দে। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

I put the reading of a good novel among the most intelligent pleasures that a man can enjoy.

—Somerset Maugham.



॥ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এশীয়-সঙ্গীত শিক্ষা ॥

১৯৫৪ সালে শরতের এক অপরাহ্ণ। লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ম্যান্টল হুড নোটিশ-বোর্ডে এই বিজ্ঞপ্তিটি আটকে দিলেন:

'গ্যামেলান স্টাডি গ্রুপ—প্রথম মহলা ৩রা নভেম্বর'

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এই বিজ্ঞপ্তি পড়ে কোন ছোট সঙ্গীত-রসিক দল তাঁর বাড়িতে এসে হয়ত তাঁর ইন্দোনেশীয় গ্যামেলান বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজানো শিখতে পারে। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞপ্তির ফলে অভাবিত সাড়া পাওয়া গেল। উৎসাহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক হুড এই সঙ্গীত-শিক্ষার্থী দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিসর পরিধির মধ্যে আনতে বাধ্য হলেন।

এইভাবে ছাত্রদের একটি পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের চর্চা শুরু হল। পরীক্ষামূলকভাবে পত্তন হলেও ডাঃ হুডের এই সঙ্গীত-চর্চার আসরটি ক্রমে বিরাট আকার ধারণ করল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বাইরে যে বিরাট সঙ্গীতজগৎ রয়েছে তার চর্চায় লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আজ আমেরিকার একটি প্রধান প্রাচ্যসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-বিভাগে প্রাচ্যের বাদ্যযন্ত্রসমূহের যে সংগ্রহ রয়েছে তা বিস্ময়কর। পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ বৃহৎ ও সুন্দর সংগ্রহ আছে কি না সন্দেহ। এই সঙ্গীত-বিভাগটি তিন শতাধিক প্রাচ্য-বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহে সমৃদ্ধ। বালী বা বলিদ্বীপ ও জাভার গ্যামেলান বাদ্য-যন্ত্রের এরূপ পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ ইন্দোনেশিয়ার বাইরে আর কোন দেশে দেখা যায় না।

কিন্তু এগুলি শুধু তো জাদুঘরের নিদর্শনমাত্রই নয়। এর মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে ছাত্রদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণাগার বলা চলে।

স্কুলের মরশুমে যে-কোন দিন রাতে বা দিনে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-বিভাগে এলেই দেখা যাবে সেখানে কোন না-কোন একটি প্রাচ্য-বাদ্যযন্ত্রের মিষ্টিমধুর আলাপনে পরিবেশটি মুখর হয়ে উঠেছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে জাভার সবগুলি গ্যামেলান বাদ্যযন্ত্রের মহলা চলে তিনঘণ্টা ধরে। প্রায় পঁচাত্তরজন যন্ত্রী এই মহলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া যাঁরা ভারতীয়, পারসিক, গ্রীক, জাপানী ও বলিদ্বীপের



দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতগোষ্ঠীর পরিচালনায় বিশ্বনাথন (বাঁদিক থেকে তৃতীয়) সর্ব দক্ষিণে বসে আছেন হার্ডজো সুসিলো



বলিদ্বীপের গ্যামেলান বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মহলারত ছাত্রদল



ডাঃ ম্যাণ্টল হুড তাঁর ছাত্রদের জাভার সঙ্গীতের মুদ্রিত স্ক্রিপ্ট দেখাচ্ছেন

সঙ্গীত চর্চা করেন তাঁদের জন্যও পৃথক পৃথকভাবে মহলার ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাচ্য-সঙ্গীতের এমন সুন্দর একটি কেন্দ্র যে আমেরিকার গড়ে উঠতে পেরেছে তার সবটুকু কৃতিত্ব ডাঃ ম্যাণ্টল হুডের। প্রাচ্য-সঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও আগ্রহের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। প্রথম তিনি যখন ইন্দোনেশীয় সঙ্গীতের রেকর্ড শোনেন, তখনই তিনি ইন্দোনেশীয় গ্যামেলান বাদ্যযন্ত্রের সুর-মূর্চ্ছনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি উপলব্ধি করেন ইন্দোনেশীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ ও দার্শনিকতত্ত্ব পাশ্চাত্য-সঙ্গীতবিদদের অনুশীলন ও গবেষণার বিষয়, পাশ্চাত্য-সঙ্গীত শিল্পীদের এ এক নতুন পথের সন্ধান দেবে।

লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ডিগ্রী লাভ করার পর ডাঃ হুড ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে নেদারল্যাণ্ডসে দু' বছর ইন্দোনেশীয় সঙ্গীত সম্পর্কে অনুশীলন ও গবেষণা করেন। ডাঃ জ্যাপ কান্সটের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় তিনি গবেষণা কার্যে অগ্রসর হতে থাকেন। ডাঃ কান্সট ইন্দোনেশীয় সঙ্গীতে সুপণ্ডিত। তিনি আমস্টার্ডমে রয়েল ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউটে গ্যামেলান বাজাবার প্রাথমিক কৌশলগুলিও শিখেছিলেন। এখানে তিনি ডক্টর অব ফিলজফী উপাধি লাভ করেন।

তিনি যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন সঙ্গে নিয়ে আসেন জাভার একটি ছোট গ্যামেলান বাদ্যযন্ত্র। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত-বিভাগে প্রথম যে শিক্ষার্থীদল প্রাচ্য-সঙ্গীত অনুশীলন করেছিলেন তাঁরা এই যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন। পরে ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে তিনি জাভায় কুড়ি মাসকাল গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকেন। এইভাবে তিনি অত্যন্ত কঠিন বাদ্যযন্ত্রগুলি আয়ত্ত করেন।

লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা প্রাচ্য-সঙ্গীত চর্চা করছেন এঁদের অনেকেরই মূল পাঠ্যবিষয় কিন্তু সঙ্গীত নয়। এঁদের অনেকের আবার সঙ্গীতে কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতাও নেই।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে নানা ধরণের, নানা পর্যায়ের লোক। একটি শিক্ষার্থী দলে রয়েছে গৃহকর্ত্রী, ছাত্র, গ্রন্থাগারিক, নৃত্যশিল্পী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের ছাত্র। এছাড়া রয়েছে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান এবং সঙ্গীতের ছাত্র।

লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রাচ্য-সঙ্গীত বিভাগটি সংগঠিত হওয়ার সাত মাস পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শ্রোতাদের অনেকেরই এ সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাই প্রথমেই এ সঙ্গীতের একটা রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে সঙ্গীত পরিবেশন আজও চলছে।

প্রাথমিক কোন মন্তব্য না করেই ইন্দোনেশিয়ার একটি দীর্ঘকালের পরিচিত সঙ্গীত শোনানো হয়। তারপর হুড ইন্দোনেশীয় জীবনধারায় সঙ্গীতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন এবং এই ঐকতানবাদনে প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্র কতখানি অংশগ্রহণ করছে তা বুঝিয়ে দেন।

এই গ্যামেলান দল সত্যিই ছাত্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এশীয়-সঙ্গীতের আর যে সব দল আছে তারাও কম আগ্রহের সঞ্চার করে নি। বাঁশীতে দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীত যেমন আমেরিকার মানুষকে আকর্ষণ করেছে, তেমনি জাপানের প্রাচীন সভাসঙ্গীত নাগা-উঠাও।

১৯৫৭ সালে লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় রকফেলার ফাউণ্ডেশন থেকে যথেষ্ট সাহায্যলাভ করে। এই অর্থে এশীয় বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করা হয়, এশীয়-সঙ্গীতে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য মার্কিন ছাত্রদের এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-কর্মসূচীতে সহায়তার জন্য এশিয়ার সঙ্গীতবিশারদদের নিয়ে আসা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বছরকয়েক আগে ভারতীয় বংশীবাদক বিশ্বনাথন এবং মধ্য জাভার সঙ্গীত-শিল্পী হার্ডজো সুসিলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এশীয়-সঙ্গীত বিভাগে যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন। এই দুটি তরুণ শিল্পী পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের ধারা ও পদ্ধতি এবং তার শিক্ষণ-প্রণালী অনুশীলন করেন এবং আমেরিকানদের এশীয়-বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এশীয়-সঙ্গীত কর্মসূচীতে প্রভূত সাহায্য করেন।

প্রাচ্য-সঙ্গীতগোষ্ঠী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রাচ্য-বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শেখায়, যাতে বিদেশে সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এদের কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়। ভারত, জাপান, সিংহল, পাকিস্তান, গ্রীক, তুরস্ক, ইরান, তাইল্যাণ্ড প্রভৃতি সকল দেশেই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকেরা এসে অনুশীলন ও গবেষণা করে।

বর্তমান সংখ্যার কলা-কাকলি বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় সান্যাল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

টেলিভিশনের সঙ্গে মানিয়ে চলুন

॥ সমীরণ চৌধুরী ॥

॥ C. A. Lejeune-এর প্রবন্ধ অনুসরণে ॥

টেলিভিশন অপরিহার্য কি না সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। প্রশ্ন হ'ল কেমন করে মানিয়ে চলব। নান্যঃ পন্থাঃ। কাজেই অবশ্যম্ভাবীকে স্বীকার করে নিজেদের কাজে লাগানো যাক, যতটা ভালভাবে সম্ভব।

হ'তে পারে টেলিভিশন না কিনে, ওকে অবজ্ঞা করে দিনযাপনের মানসিক দৃঢ়তা আপনার আছে। কিন্তু আপনার প্রতিবেশী সম্ভবত টেলিভিশন-রসিক; শুধু তিনি কেন, হাটে-বাজারে দেখা পান তাদের অর্ধেক অন্তত আপনার বিপক্ষে। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে টেলিভিশন ঘরে ঘরে; কাজেই ওর সঙ্গে জীবনযাত্রা মানিয়ে নেওয়াই উত্তম। ক্রমশ সব আলোচনাই টেলিভিশন-কেন্দ্রিক হয়ে পড়বে, আজ বা কাল, যবেই হোক না কেন। সামাজিক প্রথা প্রভাবান্বিত হচ্ছে এর দ্বারা, টেলিভিশন গেরস্থালীরও মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধীরে ধীরে।

একে ছেঁটেফেলা অসম্ভব; কিন্তু যতটা সম্ভব খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় কি ভাবে? এই 'সামাজিক আশীষ' বা 'বহু ক্ষতির আকর'কে সব থেকে ভালভাবে কাজে লাগাই কি করে?

নিন্দা স্তূপীকৃত হয়েছে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে; কিছু সত্যি, কোন কোনটায় ছিটেফোঁটা তাৎপর্য আছে, কিন্তু অধিকাংশই অযৌক্তিক। কয়েকটা নমুনা পড়ুন :—

চোখের ক্ষতি করে।

পারিবারিক সময়সূচী বিপ্রস্ত করে দেয়।

সমাজ-বিরোধী অভ্যাসের জনক।

অনেক রাত্রি অবধি বাচ্চাদের ঘুমুতে দেয় না।

এর ফলে ঘরের কাছে উৎসাহ পায় না তারা।

অতিরিক্ত উত্তেজক, যার ফলে বাচ্চাদের নিজে নিজে আনন্দভোগ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয় ক্রমে ক্রমে।

বই পড়ার অন্তরায়।

কথোপকথনের মত চমৎকার অভ্যেস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ভিন্ন জাতের আমোদ-প্রমোদে মানুষ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে।

খেলোয়াড় না হয়ে অনেকেই দর্শকে রূপান্তরিত।

আরও অনেক কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে এর উদ্দেশ্যে। এই ত' সেদিন বলা হ'ল: টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলো একটানা জনসাধারণের নিম্নগামী রুচির পোষকতা করছে।

চাঞ্চল্যকর উপায়ে জনমনের ওপর প্রভাবশীল সমসাময়িক নানা ঘটনা দেখানো হচ্ছে টেলিভিশনে।

টেলিভিশনকে ব্যক্তিজীবনের অজানা অংশে স্থান দেওয়া হচ্ছে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। 'কেতাদুরস্ত রাজনীতিবিদ্ আর লাল্‌চে নাকওলা-ভিড়ে বাড়ি ভরে থাকে সর্বক্ষণ। অবিরাম গুনগুনানি শোনার থেকেও খারাপ তার গায়কের সঙ্গে মোলাকাৎ।'

'দেশের নির্জ্ঞান আচার-আচরণ, মানসিক পুষ্টি এবং খবরাখবরের মানের ওপর এর প্রভাব ভয়াবহ।'

যুবসংঘে যুবকরা যাচ্ছে না নাকি এরই ফলে; ধর্মেরও ক্ষতি করছে, কেন না, টেলিভিশনে উপাসনা দেখার সময় উপাসনা করা অসম্ভব; কোলে খাবার নিয়ে নিচু চেয়ারে বসে দেখতে হয়, কাজেই হজমের গণ্ডগোল হচ্ছে; বন্ধুদের সান্নিধ্যে যে সন্ধ্যাটি চমৎকার কাটতো, তা হচ্ছে না,—কারণ খানিক পরেই একজন না-একজন টেলিভিশন চালাবেই, অবশ্য ভদ্রতাটুকু বজায় রেখে: 'মাপ করবেন, মানে এই অনুষ্ঠানটা দেখা বিশেষ প্রয়োজন কি না, তাই…।' যারা পড়তে চায় বা অন্য কাজে মশগুল হ'তে ইচ্ছুক, তাদেরও টেনে নেয় টেলিভিশন।

এর কিছু কিছু সত্যি বৈ কি। কিন্তু টাকার উল্টো পিঠটাও দেখা দরকার। যাদের মুগ্ধ করে টেলিভিশন, তাদেরও সুযোগ পাওয়া উচিত দু'চার কথা বলার। ঠিক না?

অনেকেই দীর্ঘকাল এর প্রেমে মজে আছেন। অহো! যুদ্ধের আগের সেই বৈশাখী সন্ধ্যাটি মনে করুন তো। ঘরে বসে দেখছেন ওভাল মাঠে লেন হাটন তিনশো রান করলেন, সদ্য ম্যুনিক প্রত্যাগত শ্রীযুত চেম্বার্লিন প্লেন থেকে নামছেন ব্যঙ্গের সঙ্গে 'টুক্‌রো কাগজ' নাড়তে নাড়তে, হাতে ছত্রদণ্ড।

যুদ্ধের আগে কতদিন কেটেছে, কত বিনিদ্র রজনী, টেলিভিশনের সামনে বসে; তখন ছবিগুলো কাঁপত পর্দায়

ওপর, এমন কি তালগোলও পাকিয়ে যেতো কখনো কখনো। স্মারক চিহ্নের মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও অনেকে তাদের টেলিভিশন রেখে দিয়েছিলেন, যেমন রাখা হয় প্রেমপত্র অত্যন্ত যত্ন সহকারে।

এদের কিছু বক্তব্য আছে নিশ্চয়ই। অবশ্য এর ক্ষতিকর দিকগুলো মনে রেখেই বক্তব্য উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। অতি প্রিয় সন্তানের ব্যবহারেও কি বিরক্ত হয় না মানুষ? তা বলে তাকে বাদ দেওয়া চলে কি? বি-বি-সি-র অনেক অনুষ্ঠানই অকিঞ্চিৎকর, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কিন্তু এতো ব্যবহারের খুঁত, টেলিভিশনকে এসব ত্রুটির আকর ভাবা যায় কি করে! টেলিভিশনকে এর জন্য দায়ী করা আর যাই হোক যুক্তিশীলতার পরিচয়বাহী নয়।

মনে হয়, সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যাঁদের চোখে মূলত অকল্যাণকর, তাঁরাই টেলিভিশনকে সুনজরে দেখতে পারেন না। পরমাণু-বিভাজনকারী এ্যাটম্ বোমের স্রষ্টা, বা রোগ সারানোর ওষুধ খেয়ে মানুষ আত্মহত্যা করে, কাজেই আবিষ্কর্তা খুনি—অনেকটা এ ধরণের যুক্তি এঁদের।

বিবেচনার সঙ্গে ঠিকভাবে কাজে লাগালে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই কল্যাণপ্রদ। টেলিভিশনও ব্যতিক্রম নয় কোন



'মেরে মন মিতুয়ার' তুইটি চরিত্রে সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও নাজ

মতেই। ঠিক এদের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই; নির্জ্ঞান মন মানুষের সংযমের অভাব, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আর নিয়মানুবর্তিতার একান্ত অভাবকেই দোষী করে নিজেরই অজান্তে।

টেলিভিশন সর্বনাশা হ'তে পারে বৈ কি। রেডিও তাই। কিন্তু এমনটা করে তোলা কি উচিত? সর্বক্ষণ, সব অবস্থায় যিনি ব্যক্তিগত খেয়াল মেটানোর তাগিদে যন্ত্রটি খুলে আর সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন, তার রুচিবোধ নেই, ভালোমন্দ বিবেচনার অভাব আছে, আচরণও ঠিক ভদ্র-সমাজের উপযুক্ত নয়—সবই ঠিক, কিন্তু এর জন্য যন্ত্রটি দায়ী নয় নিশ্চয়ই।

টেলিভিশন চোখের ক্ষতি করে না। ঘনান্ধকারে খুব কাছে বা খুব দূরে বসে না দেখলে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না চোখের ওপর। টেলিভিশন মানুষকে বই-বিমুখ করে—এমন অর্থহীন বাগাড়ম্বরও শোনা যায়। কেউ যদি সত্যিই পড়তে চান তাকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না। বাচ্চাদের পাঠানুরাগ শিক্ষক আর মা-বাবার ওপর নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে। মায়েরা যদি শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ে শোনান এবং বই যুগিয়ে যান তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে টেলিভিশনের সব আকর্ষণ সত্ত্বেও তারা পাঠ-বিমুখ হবে না কোনক্রমেই।

ছেলেদের অনেক রাত অবধি জাগিয়ে রাখে টেলিভিশন—এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এসব কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। যে সব অভিভাবক ছোটদের জেগে থাকার অনুমতি দেন, এ দোষ তাঁদেরই। আর একদফা অভিযোগ এই যে, টেলিভিশন নাকি বাচ্চাদের ঘর-গেরস্থালীর কাজ থেকে টেনে আনে নিজের কাছে। কি মুস্কিল বলুন তো! হয়ত তাই, তবে এও ঠিক যে কাজটি হয়—(ক) অত্যাবশকীয়, না হয় তো (খ) বাঞ্ছনীয়। প্রদর্শকরা অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে সাফাই গাইবেন, টেলিভিশনের দায় ঠেকেছে আত্মরক্ষা করতে। একই ধরণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল রেডিওর বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞান নিত্য-নতুন খেলনা তুলে দিচ্ছে আমাদের হাতে। খেলার ধরণ তো আমরাই ঠিক করছি। অসাবধানে গাড়ি চালিয়ে এই তো সেদিন একটি তরুণকে পিষে মেরে ফেললো বাসের অসাবধানী চালক; গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেলো একটি ফুটফুটে মেয়ে লরীর ধাক্কায় কয়েকদিন আগে;—তা বলে বাস আর লরী নিশ্চিহ্ন করতে হবে, না কি করে ওদের আমাদের কাজে লাগানো যায় নিরাপদে তাই ভেবে দেখবো। আপনিই বলুন।

সংস্কৃতির অনুসন্ধানে আমেরিকা

[সাক্ষাৎকার—পিটার উস্তিনোভ : হেনরী ব্রাণ্ডন]

পিটার উস্তিনোভের কর্মজীবনের প্রারম্ভ। থাকতেন তিনি তখন পিকাডালীর নীচের তলায়, ভি-বোমার বিস্ফোরণ ভুলে পেলমারস থিয়েটারে দর্শকরা উপস্থিত হতেন তাঁর অভিনয় দেখতে। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। ওয়াশিংটনে ওঁর সঙ্গে আবার এই সাক্ষাৎকার হলো—ওখানে উনি ওঁর নাটক 'রোমানিক ও জুলিয়েট' নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ওঁর বয়স ছিল উনিশ—কিন্তু বর্তমানে চেহারার দিক দিয়ে কোন পরিবর্তন হয় নি। বরাবরই ওঁকে দেখে একটা রাজকীয় আকৃতির আমুদে টেডী ভালুকের কথা মনে হয়েছে—এখনও ঠিক তাই মনে হয়। ওঁর থাবাগুলি হয়তো তীক্ষ্ণতর হয়েছে—দাড়ি হয়েছে ফসফসে কিন্তু এখনও দাড়ির প্রবীণ কাজ ওঁর বালকোচিত মুখে বয়সের ছাপ ফেলা। এখনও ওঁর মধ্যে রয়েছে সেই ছোঁয়াচে হাসিখুশি, নিছক ভালো-মানুষির উত্তাপ, লোককে আনন্দদানের জন্য উৎসুক তৎপরতা, সেই ঢুলে ঢুলে চলা—সুষম স্থূলতা।

পিটার উস্তিনোভ—সেই যুগের আশ্চর্য বালক এখন রেনাসাঁসিয় ব্যক্তি। এই বিশেষেকের যুগে এই ভার বহন খুব সহজ নয়, অনেক দিক থেকেই ওঁর উভয়সঙ্কট লিওনার্ড বার্নস্টিনের মতো। এঁর প্রতিভাও বহুমুখী এবং কোনটায় যে শ্রেষ্ঠ তা নিজেও জানেন না। কিন্তু আমার মনে হয় পিটারের সমস্যা অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং তিনি জানেন যে কোনটা করতে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসেন। অভিনয়ের অপেক্ষা লেখাই তাঁর ভালো লাগে কিন্তু প্রথমোক্ত-ই তাঁকে জীবন ধারণে প্রধানত সাহায্য করে। তা ছাড়া, বার্নস্টিনের মতো তিনি অত 'অতি কঠোর' নন, তাঁর পক্ষে সুবিধে হলো যে তিনি একই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভা নিয়োজিত করতে পারেন—নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন, তাতে অভিনয় করেন এবং এরই ফাঁকে ফাঁকে ছোটগল্প লেখার ও টেলিভিশন অথবা ফিল্মে নামবার সময় খুঁজে নেন।

একটা ব্যাপার থেকে আর একটায় তিনি অনায়াসে গমনাগমন করেন। তাঁর মধ্যে পরিবর্তন ও গ্রহণের ক্ষমতা অসীম। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমনভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন যে, যে-কোন দর্শককে সুখী করতে পারেন। এক সন্ধ্যায় তিনি টেলিভিশনে হাস্যকর নাৎসি জেনারেলের অভিনয় করলেন যা প্রায় গালে চড় মারার মতো হলো এবং তিনি দাঁতে অথবা ডাঃ জনসনের মতো গম্ভীর প্রতিভাসম্পন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর নিজের বাইরে প্রাথমিক বুদ্ধিজীবীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রচুর বাগ-বৈদগ্ধ্য ও সর্বাধুনিক জ্ঞান আছে কিন্তু স্থূল-রুচিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রচুর রং-তামাশাও আছে। তিনি চেষ্টা করলে তাঁর ব্যাস শুধুমাত্র এ্যাংলো-সাক্সন শ্রোতাদের মধ্যেই সীমায়িত হতো না। ফরাসী, জার্মানী, ইটালীয়, রুশ সর্বপ্রকার দর্শকদের তিনি সমভাবে মনোরঞ্জন করতে পারেন। আমার টেপ-রেকর্ডের সামনে তিনিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত সম্পাদনকারী।

ওঁকে কতকটা উইল রোগার্সের মহানগরীয় সংস্করণ মনে হয়। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বিভিন্ন জাতির দুর্বলতা ও অদ্ভুত বিশেষত্ব বুঝবার ক্ষমতা তাঁকে অনুভবক্ষম এবং আমুদে সমাজ সমালোচক করে তুলেছে, কিন্তু তাঁর মন্তব্য অথবা অনুকৃত ব্যঙ্গকাব্য যতই ধ্বংসাত্মক হোক না কেন—স্পর্শাত্মক স্নায়ুতন্ত্রকে যতই শেষ করে দিক না কেন—এ কখনও নীচ আক্রমণাত্মক নয়। বেশি রকম খারাপ অবস্থায় এ হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন। তাঁর একটি বড় গুণ সুগ্রাহী কান—যা স্বরাঘাত ও উপভাষায় ব্যাখ্যা, অনুভূতি, বর্ণ প্রভৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্যের সুরে বাঁধা। অবশ্য তাঁর নাগরিক শিক্ষা ও আধ ডজনখানেক ভাষাজ্ঞান এ বিষয়ে সহায়তা করে। তাঁর পিতা ছিলেন জার্মান রাষ্ট্রবিদ, মা ফরাসী কিন্তু মূলত তাঁর পরিবার রাশিয়া থেকে এসেছে এবং পিটারের জন্ম ও শিক্ষা ইংলণ্ডে।

লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ডে যখন ওঁর নাটক অভিনীত হয় তখন ওঁর বয়স কুড়িও হয় নি। তখন থেকে তিনি প্রায় বারটি নাটক লিখেছেন। দু'টি নাটক 'চারিটি কলোনেলের প্রেম' ও 'রোমানক ও জুলিয়েট' যুক্তরাজ্যে প্রযোজিত হয়েছিল কিন্তু সম্ভবত তাঁর সার্থকতাই তাঁকে আমেরিকায় সুপরিচিত করেছিল। বহুমুখী প্রতিভার কথা বাদ দিলেও



● 'টপ্ কাকি' চিত্রে পিটার উস্তিনোভ



● আকাশ-কুসুমের সেটে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক মৃণাল সেন



● [illegible] শিল্পী সবিতা চট্টোপাধ্যায়

তাঁর সার্থকতার প্রধান মূল হচ্ছে অবিশ্বাস্য মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রাচুর্য। তা না থাকলে এই শ্বাসরোধকারী পদক্ষেপে তিনি চলতে পারতেন না।

ওয়াশিংটনে চব্বিশ ঘণ্টা আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম এবং আমি স্বীকার করতে বাধ্য যা ঘটেছিল তা হয়তো আদর্শের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তা হচ্ছে এই সেদিন তিনি 'রোমানফ ও জুলিয়েটে'র পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে অভিনয় করেন। নাটকের পরে তিনি নৈশ-ভোজের জন্য আমার গৃহে এলেন। অল্প খাদ্য ও স্বল্প মদ্যপানের পরে তিনি তাঁর বিভিন্ন চরিত্র-গল্পগুলি প্রায় বারটি বিভিন্ন স্বরাঘাতে



'আর্ট অফ লাভ' চিত্রের শিল্পী এলকে সোমের

বলতে থাকেন। রাত দু'টোর পরে সুজ্যানি'কে সঙ্গে করে হোটেলে ফেরেন—তখন তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পরদিন মধ্যাহ্নভোজে দেখা হলে আমি ওঁকে গতরাত্রে অতক্ষণ আটকে রাখার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাতে উনি শুধু অল্প ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে বললেন, হোটেলে ফিরে 'দি অ্যাটলান্টিক মানথ্লি'র জন্য একটা ছোটগল্প লিখবার সময়টুকু পেয়েছিলাম। সেদিন আমাকে ওঁর আঁকা একটি স্কেচও দিয়েছিলেন—আন্তর্জাতিক কুকুরের গ্যালারী কি রকম হবে সেই সম্বন্ধে ওঁর ধারণা নিয়ে স্কেচটি আঁকা। আর তাঁর একটি নেশা হচ্ছে ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কন।

অল্পবয়সে সাফল্য লাভ তাঁকে নষ্ট করে দেয় নি। 'সানডে টাইমস'-এর জেমস এজেট যিনি একদা ইংরেজী নাট্য-সমালোচনায় পণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন, উস্টিনোভের সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'মঞ্চশিল্প সম্বন্ধে সর্বোত্তম জ্ঞানী যিনি—এখন এখানে লিখছেন।'

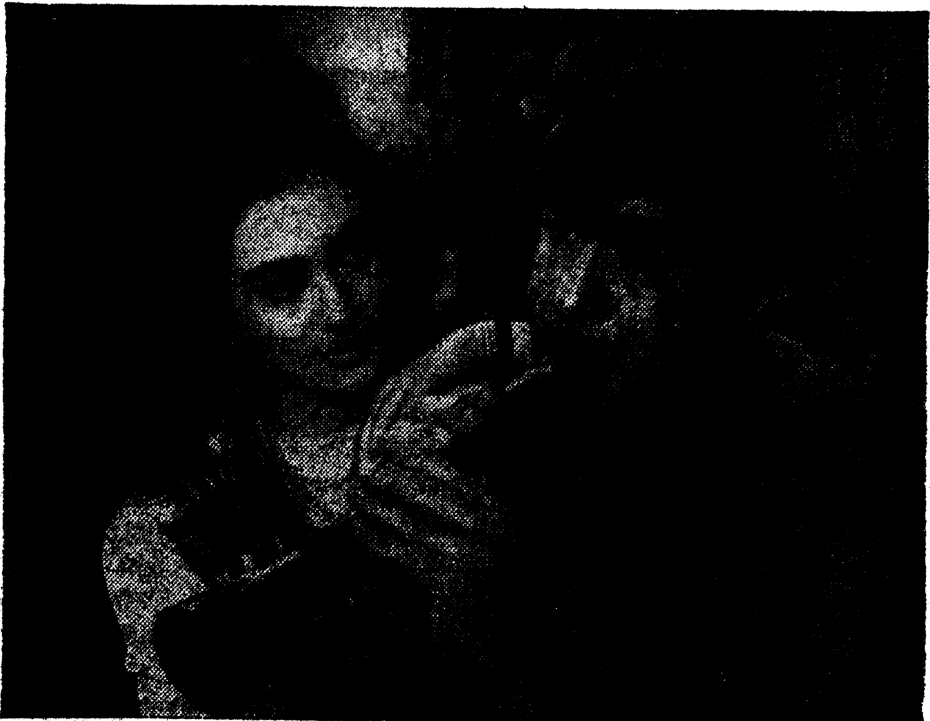
তাঁর বয়স তখন বাইশ। সাফল্য, প্রশংসা এবং কয়েকটি ব্যর্থতা তাঁকে আরও সহৃদয়, বিজ্ঞতর, ভদ্র ও দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে দিয়েছিল। বিলম্বিত ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তখনও 'যুবক' কিন্তু ক্রুদ্ধ যুবক নন। তাঁর জগৎ স্বপ্ন ও আনন্দে পূর্ণ! তিনি সেটা অনুকরণ করে ব্যঙ্গকাব্য লিখতে ভালোবাসেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কখনও ধরা ছোঁয়া দেন না যদিও সর্বদাই একটা প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অভিনয়ক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক রচনা সহজেই নষ্ট হয়ে যায় এমন কি বার্নাড-শ'-এর বেলাতেও তাই হয় এবং এই কারণেই হয়তো তিনি অনেক লিখলেও সব ক্ষণস্থায়ী হয়েছে—কিন্তু, যা হোক সমস্ত জীবনই তাঁর সামনে পড়ে আছে।

ব্রাওন। 'রোমানফ এবং জুলিয়েট' যুক্তরাজ্যে এত বেশি চলেছে যে আমার মনে হয় কিপলিং-এর মন্তব্য। যুক্তরাজ্যে যথেষ্ট রোমিও নেই ব্যাল্‌কনি অত্যধিক। বর্তমানে অনুপযোগী!

উস্টিনোভ। আমার মনে হয় আমরা যাকে জানি তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুক্তরাজ্যকে জানতো। এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখানে আসবার আগে অনেক আমেরিকাবাসী আমাকে সাবধান করে বলেছিলেন যে, এই দেশ এমন ব্যঙ্গরচনা হজম করতে পারবে না—যাতে তারা নিজেরাই ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। দেখে আনন্দিত হলাম যে ব্যাপারটা সে রকম নয়। আমার মনে হয় তারা অত্যধিক ব্যালকনি'র যুগ পার হয়ে এসেছে। আমার মনে হয় তারা এখন রোমান্সের অভিসারে ব্যাকুল। প্যারিসের প্রতি তাদের গভীর আকর্ষণ এদিকে ইঙ্গিত দেয়। আমার সর্বদাই



● অজয় বিশ্বাস পরিচালিত 'প্রথম প্রেম' চিত্রে বোম্বাইয়ের প্রদীপকুমার ও বাঙলার বিশ্বজিৎ



● অনুপম চিত্রের 'দিওয়ানা'র উপভোগ্য দৃশ্যে রাজকাপুর ও সায়রা বানু

মনে হয়েছে যে, প্যারিসের ব্যাপারে তাদের প্রকৃত উচ্চাশা 'প্যারী'কে ফরাসীদের কবলমুক্ত করা।

ব্রাগুন। কি? মানে এটাকে তুলে নিয়ে আসবে···

উস্টিনোভ। না। আমি বলতে চাইছি এ তাদের নিকট তুঁলেলেত্রাক এবং রেনঁা এবং সেই দেওয়ালে যা আছে। তারা খুব বিরক্ত হয় যখন তারা দেখতে পায় যে, প্যারিসে সবাই ফরাসী ভাষা বলে ও প্রকৃতপক্ষে ফরাসী···

ব্রাগুন। আপনার কি মনে হয় না যে আমেরিকাবাসীদের নিকট প্যারিসের একটি পৃথক আকর্ষণ আছে? এখানে ঐ শহরটির চপলচিত্ততার দুর্নাম আছে।

উস্টিনোভ। হ্যাঁ। কিন্তু, ফরাসী ইম্প্রেশনবাদীদের ছবি ফ্রান্সের প্রতি বিরাট আকর্ষণ জাগিয়ে তুলেছে। চপলচিত্ততাও কারণ, তাদের ফিল্ম সেন্সার না করেই নিয়ে নেওয়া হয়। অন্য কোন ভাষায় হলে তা হতো না। আমার এক বন্ধু 'মাই ফ্রেঞ্চ ওয়াইফ' নামে একটি টেলিভিশনে ধারাবাহিক করেছেন—কিন্তু কর্তৃপক্ষ আপত্তি করে বললেন এটা ঠিক নাম নয়—নাম হবে 'মাই আমেরিকান হাজব্যাণ্ড।'

ব্রাগুন। আমেরিকা কি এখন রোমান্সের অভিলাষী।

উস্টিনোভ। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার এতটা প্রভেদের কারণ এর বিরাটত্ব। ইংলণ্ডে লণ্ডন থেকে লিভারপুল যেতে কামরায় যদি আটটি লোক থাকে তবু কেউ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না। এটা হচ্ছে দেশ যা তার চেয়ে বড় ভাববার জন্য এক প্রকার অভিলাষ; এইজন্যই ইংরেজের গৃহ-ই দুর্গ। তার কারণ ইংরেজদের দুর্গ নেই। রাস্তায় দেখা হলে তারা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবে কিন্তু রোববার খিড়কীর উঠোনে বসে চারফিট দূরে অবস্থিত প্রতিবেশীকেও তারা না দেখার ভাণ করে। এইসব কারণেই এমন একটা রক্ষণশীলতা গড়ে উঠেছে যা একস্যুট পোষাকের মতো তা ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকছে, পক্ষান্তরে, আমেরিকায় অদ্ভুত 'মিলিত ভাব'—সামনের দরজা সর্বদাই খোলা থাকে এবং যে-কেউ মাথা গলিয়ে বলতে পারে, বাড়িতে কেউ আছ? 'আমি কি তোমার 'মিক্সার'টা একটু ক্ষণের জন্য নিতে পারি? আমার মনে হয়, এটা সেইসব প্রথম আগমনের দিন থেকে চলে আসছে যখন প্রতিবেশীরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতো।

আমেরিকাবাসীরা এখন তাদের সমালোচনায় বেশ বুদ্ধিমানের মতো সাড়া দেয় বিশেষত ব্যবসায়ী-চিত্ত লোকেরা। আমার মনে হয় এটা একটু আশ্চর্য ব্যাপার। এই আয়তনের একটি দেশের মালিক হয়ে যা এখনও অনেকটা অ-দেখা রয়েছে জানে না যে মাটির নীচে কি আছে? গর্ত করতে করতে যে



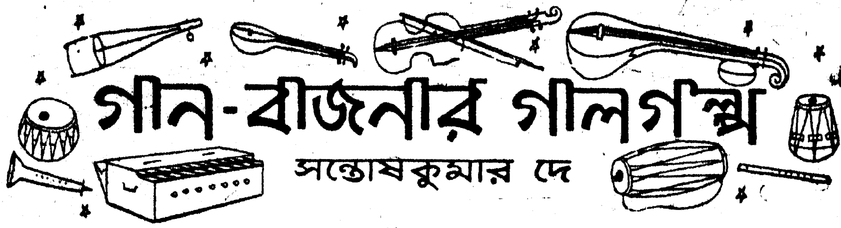
● 'সূর্যতপা' চিত্রের নায়িকা সন্ধ্যা রায়

কোন কিছু পাওয়া যেতে পারে। যে দেশে এ রকম সম্ভব নাটক ও লেখায় দেখতে পেয়েছে—তার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত হেনেছে এবং সংস্কৃতির সন্ধানে জাহাজ থেকে নেমে পড়েছে।

ব্রাগুন। আপনার কি মনে হয় আমেরিকার সংস্কৃতি বলে কিছু আছে?

উস্টিনোভ। নিশ্চয়ই আছে, আমার মনে হয়, এখনও ওরা সেই বিরাট মহৎ উপন্যাস, আমেরিকার বিরাট সিম্ফনী মহান দৃশ্যকাব্যের···অন্বেষণে ব্যস্ত। খুব সম্ভবত এ সব লেখা হয়ে গেছে কিন্তু লোকে মূল্য দেয় নি। স্পষ্টতই তারা খুব চেষ্টা করছে এবং 'সচেতনভাবে'। এটা ঠিক পথ নয় কিন্তু তবুও এতে মানবিকতার আবেদন আছে। কিন্তু প্রায়ই এতে অর্গানের উচ্চগ্রামের জাঁকজমকভাব ফুটে ওঠে। কাজেই মনে হয় এর গতি-প্রকৃতি যেন রোমান সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের দিকে গ্রীকদের মতো ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে ফুটে ওঠা নয়। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—রাণু ভৌমিক



॥ পাঁচ ॥

আমার বেশ মনে আছে, ছোটবেলায় আমি আর আমার দিদি সন্ধ্যাবেলায় খেলা ছেড়ে বাড়ি ফিরছি। নারকেল-সুপারি বনের তলায় তলায় পথ, সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অদূরে আসশ্যাওড়ার ঝোপ, আনারসের ঝাড়, তার ওধারে নানা গাছগাছালি মিশে অন্ধকার থমথমে হয়ে উঠেছে। আর সারা পরিবেশ জুড়ে ঝিঁঝিপোকার সঙ্কীর্তন শুরু হয়েছে। অন্ধকার আর একটু গভীর হলে জোনাকিরা আলো নিয়ে বেরুবে, তার আগেই আমরা ঘরে ফিরে যাব।

বাড়িতে পৌঁছে উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে আমি আর দিদি পোড়ামাটির পাত্র ভাঙা 'চাড়া' কুড়িয়ে একখানার উপর আর একখানা ঘা দিয়ে বট্ বট্, বট্ বট্ করে আওয়াজ তুলতাম এবং আশ্চর্য এই, ওই বিকট আওয়াজ ঘন হয়ে উঠলেই দু-একটা ঝিঁঝিপোকা আমাদের গায়ের উপর উড়ে এসে পড়ত। আমি হয়ত প্রথম প্রথম ভয় পেতাম, দিদিই ভয় ভাঙাত, থাপ্পড় দিয়ে ধরেও ফেলত দু-একটা ঝিঁঝিপোকা।

এখন প্রশ্ন হল, চাড়া বাজানো শুনে ঝিঁঝিপোকা উড়ে আসত কেন? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ ছিল। মনে হয়, চাড়ার বাজনার মধ্যে ঝিঁঝির একটানা ঝিঁ ঝিঁ সঙ্গতের বোধহয় কোন সঙ্গতি ছিল, তাই তারা কোনও সঙ্গীর সন্ধানে ছুটে আসত।

বসন্তকাল সমাগমে আমের বনে কোকিল যখন কুহু কুহু রবে মুখর হয়ে উঠত তখন আমরাও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কু-উ-উ কু-উ-উ বলতাম। পাখি আমাদের ডাকে যেন আরও উৎসাহিত হয়ে উঠত। ময়ূরের কেকারব বাংলা দেশে বড় একটা শোনা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গাঁয়ের এক বাড়িতে পোষা ময়ূর ছিল, কিন্তু তার গলার আওয়াজ সচরাচর শোনা যেত না। যখন যেত, তা নকল করতে পারি নি। আর ছিল 'বৌ কথা কও' পাখি। কি চমৎকার হলুদ রং। অমন বর্ণ-গৌরব কম পাখিরই দেখতে পাই। 'বৌ কথা কও' পাখির ডাক নকল করে ডাকতাম—ইষ্টি কুটুম টু। কোকিল, কাক, চিল,—এদের ডাক নকল করা কঠিন নয়। ঘুঘুর একটানা ঘু-ঘু-ঘু, ঘু, ঘু-ঘু—শুনলে দুপুরের রৌদ্রশিহরিত নির্জন পল্লীর রোমাঞ্চকর আবহাওয়া মনে আসে। দুপুরের শূন্য আকাশে শঙ্খচিলের ডাক, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাহুকের ডাক, নীড়ে ফিরে-আসা পাখিদের কল-কাকলি, পায়রার বক্ বকম্, চাতকের কাতর প্রার্থনা, হাড়িচাচার ক্যাচ্ ক্যাচ্ ঝগড়া, হাঁসের প্যাঁক্ প্যাঁক, হুতুম প্যাঁচার হুম্ হুম শব্দে মনে পড়তে থাকে এক একটা পরিবেশের কথা। ময়না, টিয়া, চন্দনা, শুক এরা আবার অবিকল মানুষের কণ্ঠ নকল করতে পারে।

মানুষের কণ্ঠই সবচেয়ে আশ্চর্য গুণসমন্বিত, কারণ আগে যতগুলি পাখির কথা, ঝিঁঝির কথা যা যা বলেছি, মানুষ চেষ্টা করলে তার সব কিছুরই নকল করতে পারে। যারা ventriloquism জানেন তাঁরা শুধু পাখি বা পশুর ডাক নয়, বহু যান্ত্রিক শব্দও অবিকল নকল করতে পারেন। যাদুকর এ সি সরকার নাকের সুরে নানা রকম যন্ত্রসঙ্গীত শোনাতে পরম দক্ষ। মানুষের মন আর এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। সে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অনেক কিছু রচনা করতে পারে—এবং মানুষের রচনা শক্তির পরম বিকাশ তার সুর-সাধনায়।

আকাশে-বাতাসে, প্রাকৃতিক পরিবেশে, পাখির কণ্ঠে, পশুর কণ্ঠে, ঝর্ণার প্রবাহে, নদীর সৈকতে, সমুদ্রের তরঙ্গে—সুর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কান পেতে শুনলে চমৎকৃত হতে হয়, প্রাণ ভরে যায়, মন আনন্দে অভিষিক্ত হয়। বৈদিক ঋষিরাও তাই অনুভব করেছিলেন, প্রাণের আর্তি প্রাণের আনন্দ সব কিছুই তাঁরা সুরে সুরে সুরপুরীর উদ্দেশে উৎসর্গ করতেন। রচিত হয়েছিল সামবেদ। গান দিয়েই তাঁরা মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, গান দিয়েই তাঁরা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেন সকল পূজার্চনার।

স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে সুরের প্রবাহে সকলেই অবগাহন করে শুচি হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে আফগানিস্তানে বেলুচিস্তানেই হোক বা মরুভূমিতে আরব বেদুইনের তাঁবুতেই হোক, নিউইয়র্কের শততল প্রাসাদ শিখরই হোক বা পূর্ববঙ্গের টাবুরে নৌকার গলুয়ের মাথাতেই হোক, সুরের আবেদন চিরন্তন, সুরের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, সুরের বিস্তার দেশকাল ভাষার গণ্ডী পেরিয়ে মর্মের মণিকোঠা পর্যন্ত প্রসারিত।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলি। সুর কেবল দেশকালপাত্র

এমন কি ভাষার গণ্ডী অতিক্রম করে না, তা মনুষ্যেতর জীবের মনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেছেন কি না তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম ভারত-বিখ্যাত গাইয়ে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলিকে। তিনি জীবনে অনেক বড় বড় গানের মজলিসে গিয়েছেন, তা ছাড়া অনেক বড় বড় ওস্তাদের দুর্লভ সঙ্গ পেয়েছেন তাই তাঁর পক্ষেই এ বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব মনে করে প্রশ্ন করেছিলাম।

উত্তরে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন,—প্রমাণ হিসাবে বলবার মতো অনেক ঘটনাই তিনি দেখেছেন, তার মধ্যে একটা অত্যন্ত চমকপ্রদ।

আফগান রাজদরবারে নিমন্ত্রিত হয়ে গেছেন ওস্তাদজী। সেখানে গিয়ে ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে তিনি গাইলেন তাঁর আজন্ম চর্চায় পরিপূর্ণ অধিগত হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের রাগ—মিঞা কি মল্লার। গানে দরবার ভর্তি শ্রোতারা নির্বাক নিস্পন্দ। দরবারের সম্মুখের প্রশস্ত অঙ্গনে একটি শ্বেতময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাগের আলাপ শুনে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল এবং রাগের বিস্তার শুনে সে কলাপ বিস্তার করে নৃত্য করতে লাগল। সে কি নাচ! বেহেস্তে হুরী-পরীদের নাচ কেমন জানা নেই, কিন্তু তা কি এর চেয়েও সুন্দর?

যতক্ষণ গান চলল, নাচও চলল অবিরাম। গান যখন থামল, নাচও তখন থেমে গেল, মনে হল যেন গানের সঙ্গে সঙ্গত রেখেই ময়ূরটি নেচে চলেছিল। সে-দৃশ্য উপস্থিত সকল লোককেই চমৎকৃত করেছিল।

জীবজন্তুর উপর গানের প্রভাব আরও দেখেছেন ওস্তাদজী। পরে বলছি সেইসব আশ্চর্যসুন্দর ঘটনা—যা গল্প হলেও সত্য।

উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি আছে। দীপক রাগে আগুন জ্বলে, মেঘ রাগে বৃষ্টি নামে। গান গেয়ে বৃষ্টি নামাবার ঘটনা কিছুদিন আগে সংবাদপত্রেও বেরিয়েছিল। বিশুদ্ধ রাগে গাইতে পারলে প্রকৃতির উপর যদি এরূপ প্রতিক্রিয়া সম্ভব হয় তবে জীবজন্তুর উপর তার প্রভাব আরও কার্যকরী হবে তা তো সুনিশ্চিত! হ্যামেলিনের বাঁশীওয়ালার কথা হয়ত একেবারে গাঁজাখুরি গল্প না হতেও পারে।

অপরপক্ষে মানুষের গানের উপর জীবজন্তুর কণ্ঠের প্রভাবও অনস্বীকার্য। আধুনিক গানেও এর নিদর্শন মেলে। আধুনিক বাংলা গানে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় যে-মোহ সৃষ্টি করে থাকেন তার মধ্যে সুরের মূর্চ্ছনায় লীলায়িত লহরীতে কোকিলের কুহুরব এবং পায়রার বক-বকম আশ্চর্য সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। একটি গানে আছে—



● নবাগতা রীণা ঘোষ 'রাজকন্যা'র নায়িকা

গানে মোর ইন্দ্রধনু আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায়
আবেশে জড়াতে চায়।
মিতা মোর কাকলি কুহু……

কোকিলের কুহুরবের মূর্চ্ছনা এখানে এমন চমৎকারভাবে সন্ধ্যার কণ্ঠে রূপায়িত হয় যে, তা কোকিলের কণ্ঠমাধুর্যের আবেশই সৃষ্টি করে।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গানে আছে—

ওরে ও বকম্ বকম্ পায়রা
তোদের রকম সকম দেখে
মুখ টিপে যে হাসছে ও নীল আকাশটা
দূর থেকে।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই উপরোক্ত গান দু'টি অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, পরে রেকর্ডে প্রকাশিত হয়ে তা ঘরে ঘরে কোকিলের কণ্ঠ আর পায়রার বক্‌বকম্ পৌঁছে দিয়েছে। আমরা কোকিলকণ্ঠী সন্ধ্যার কণ্ঠ শুনে যেন আবার অনুভব করেছি কোকিলের কুহুরব আর পায়রার বক্‌বকম্ আমরা কতটা ভালোবাসি। [ক্রমশ।

বহু প্রতীক্ষা, একটি দিন

[অশোককুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

খবরটি ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুতেরই বেগে। এ সব খবর এইভাবেই ছড়িয়ে পড়ে। এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে সেদিকে। এঁর কাছ থেকে ওঁর কাছে, ওঁর কাছ থেকে তাঁর কাছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ঈশান থেকে নৈঋতে। একজনের কাছে অন্যজন শুনলেন, অন্য জনের মুখ থেকে শুনলেন আর একজন। মাসিক বসুমতীর কর্মমুখর সম্পাদকীয় কক্ষেও খবরটি পৌঁছে গেল। জানা গেল—তিনি এসেছেন, কলকাতাতেই আছেন এখন, কয়েক দিনের মধ্যেই কিন্তু চলে যাবেন আবার। তিনি?—অশোককুমার মানুষের মধ্যে বড় শিল্পী হিসাবে যত জনের সন্ধান আজ পর্যন্ত মিলেছে—শিল্পীর মধ্যে বড় মানুষের সংখ্যা সে তুলনায় এক নয়। অশোককুমার এই শেষের দলেরই দলী।



হিন্দী 'উত্তর ফাল্গুনী'র নায়ক প্রখ্যাত অভিনেতা অশোককুমার

অনেক অগভীর খাল-বিল পেরিয়ে তবেই পৌঁছানো যায় সীমাহীন মহাসমুদ্রে। অনেক বেদনার গহন অরণ্য অতিক্রম করে উপনীত হওয়া যায় আনন্দের পুষ্পিত কাননে। অনেক না-পাওয়ার মূল্য দিয়ে জীবনে আসে একটি পরম পাওয়ার লগ্ন। তেমনই বাঙলার এইসব হারাণোর দিনেও অনেক পাওয়ারও তো বিরাম নেই। তার একদিক যেমনই ভাঙছে, আর একদিকও তো ঠিক ততখানিই গড়ে উঠছে তার এক একটি শক্তিমান সন্তানদের অবদানে।

আজ তিরিশটি বছর পেরিয়ে গেছে সেই দিনটি থেকে যেদিন বোম্বাইয়ের ছবি 'জীবন-নাইয়া' নায়কের ভূমিকায় দেখা গেল একটি বাঙালী ছেলেকে। বয়েস তেইশ বছর। হয় তো কোন দূরদর্শী সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন যে, রূপশিল্পীদের ইতিহাসে সেদিন যুক্ত হল আর একটি মহৎ, অম্লান ও স্মরণীয় নাম। ইতিহাসে যে নাম ধরে রাখবে চিরকালের দাবীতে, সৌরজগতের আকাশের কথা বলছি না, রঙ্গজগতের আকাশে সেদিন দেখা দিলেন একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা—তাঁর অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা আর প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে মূলধন করে।

তারপর জগতের বুকের উপর দিয়ে ঘটনার ঘনঘটা ঘটে গেল, কত পতন, উত্থানের বিচিত্র কাহিনী, কত হাসি, কত কান্না, কত আলো, কত অন্ধকার। এরই মধ্যে পঁচিশে বৈশাখের দ্যুতিমান সূর্যকে আবৃত করতে এগিয়ে এল বাইশে শ্রাবণের ঘন মেঘ, শোনা গেল দেশ-বিদেশে অন্ন বিতরণ করা চিরকল্যাণময়ী বাঙলার ঘরে ঘরে তের শ' পঞ্চাশের হা অন্ন হা অন্ন 'হাহাকার, হিরোসিমা, নাগাসাকির একঝাঁক মানুষের গায়ে, মনে, চেতনায় লাগল রূপোর কাঠির ছোঁওয়া, কত মহতের হল আগমন, কত মহানের হল মহাপ্রস্থান, দীর্ঘকালীন পরাধীনতার

ত্রিযাম রাত্রির অবসানে দিকচক্রবাল নবারুণরাগে রঞ্জিত করে আকাশে দেখা দিলেন স্বাধীনতার প্রথম সূর্য···কিন্তু সেদিনকার সেই তেইশ বছরের নবাগত নায়কটির অভিসার আজও অপ্রতিহত, সময় তাঁর জয়যাত্রাকে করতে পারে নি ব্যাহত। বয়স তাঁর সামনে গড়ে তুলতে পারে নি বাধার পাহাড় তাঁর অফুরন্ত প্রাণসম্পদের কাছে সময়ের দাবী তৃণবৎ ভেসে গেছে।

তাই তুষারশুভ্র হিমালয় থেকে তরঙ্গচঞ্চল কন্যা-কুমারিকার সীমাবেষ্টিত ভারতের ঘরে ঘরে কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ে সময় তাঁর প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলছে। ভারতের চিত্রতারকাকুলের তিনি শিরোমণি। শুধু ছায়াচিত্রেরই নয়, সারা ভারতের চিত্র-নায়ক সমাজেরও আজ তিনি মহানায়ক অশোককুমার। তাঁর জয় হোক।

ক্ষণকালীন এই কলকাতাবাসের পরিধি মাত্র কয়েকটি দিন। প্রতিটি দিনই ব্যস্ততায় সমাবৃত। কাজের পর কাজ, অবকাশ কোথায়? তবু, তারই মধ্যে তাঁকে ধরতে হবে, যোগাযোগ করতে হবে তাঁর সঙ্গে, অধিকার করতে হবে তাঁর কর্মব্যস্ত দিনের কিছুটা সময়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পৌঁছে দিতে হবে অসংখ্য নরনারীর মধ্যে মাসিক বসুমতীর মাধ্যমে।

কিন্তু পরিকল্পনা করা যতটা সোজা, তাকে কার্যে পরিণত করা ততটা সোজা নয়। চার পাঁচ দিন ধরে চলল ফোনের পর ফোন। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সেই নির্দিষ্ট কক্ষটির টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ অচিরেই সম্ভব হয় কিন্তু ধরা যায় না সেই কক্ষের আপাত-অধিকারী নির্দিষ্ট মানুষটিকে। স্টুডিওতে ফোন করা অসম্ভব। অশোককুমারের মত শিল্পীকে হঠাৎ স্টুডিওর ফোনে ডাকা চলে না বিশেষত যেখানে তিনি কর্মরত। হোটেলের ফোন ধরেন শ্রীমতী শোভা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে কথা হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—ঠিক কোন সময়ে অশোকবাবুকে পাওয়া যেতে পারে?

কিন্তু যেখানে ব্যস্ততা ও অনিশ্চয়তা যুগপৎ বিরাজমান সেখানে সঠিক সময় দেওয়া শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

স্টুডিওতে গিয়ে যোগাযোগ করার উপদেশ দিলেন বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা শ্রীঅসিত চৌধুরী—আমাদের পরম সুহৃদ। হিন্দী 'উত্তরফাল্গুনী'তে অভিনয়ের জন্যেই অশোককুমারের কলকাতায় আসা। শ্রীযুক্ত চৌধুরী এই ছবির নির্মাতা। নিউ থিয়েটার্সে তোলা হচ্ছে হিন্দী উত্তরফাল্গুনী। স্টুডিওতে পৌঁছেই শ্রীসুনীল রায়চৌধুরীর মাধ্যমে খবর পাঠালুম শিল্পীর কাছে একটি ছোট চিরকুট দিয়ে; যার বক্তব্য—দু'এক মিনিটের জন্য আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি, একান্ত অসম্ভব হ'লে কবে, কোথায়, কখন আপনার সঙ্গে একটি আধ ঘণ্টার আলোচনায় মিলিত হওয়া সম্ভব হবে অনুগ্রহ করে জানালে অনুগৃহীত হব।···ইচ্ছে ছিল সেইদিন সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত আলোচনার সময়টি ঠিক করে নেওয়া।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এলেন সুনীল রায়চৌধুরী। বহন করে আনলেন শিল্পীর বারতা—যার সারমর্ম আজ একেবারে সময় নেই। অন্যদিন।

আবার টেলিফোন। চতুর্থ দিবসে অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর—আমি কথা বলছি। ফোনে যথাসংক্ষেপে পেশ করলুম বক্তব্য।

ওদিক থেকে ভেসে আসে শিল্পীর কণ্ঠস্বর—বুঝছি, কিন্তু কখন আপনাকে টাইম দিই। কাজ থেকে যখন ছাড়া পাব সেটা যে uncertain···শেষে ঠিক হল—'ঠিক আছে আপনি স্টুডিওতে একবার খোঁজ নেবেন।'

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও। চিত্ররাজ্যের পুণ্যভূমি তীর্থক্ষেত্র। যার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের স্পর্শ। যার ধূলিকণায় ছড়িয়ে আছে চিত্রলোকের অগণিত মহারথীর চরণ-চিহ্ন। বিশ্ব সমাদৃত বাঙলা ছবির গৌরবময় ইতিহাসের রূপকার যাঁরা, সেই পথিকৃৎদের একদা অভাবনীয় সমাবেশধন্য নিউ থিয়েটার্সেই সেদিন উপস্থিত আছেন অশোককুমার।

আগেই ফোনে সুনীলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। খুব ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি বললেন—এখনি চলে আসুন। এসে তো পড়ুন, তারপর দেখা যাবে কতদূর কি করা যায়! যে-কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্যে সাংবাদিককে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়। সাংবাদিক জীবনের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যই এই।

মাসিক বসুমতীর আলোকচিত্রী পূর্বাহ্ণেই উপস্থিত হয়েছেন। খবর পৌঁছে যায় শিল্পীর কাছে। নির্দেশ আসে অপেক্ষা করার। প্রহর এগোতে থাকে, দেখা হয়ে যায় কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে, সময় কাটে তাঁদের সঙ্গে আলাপে, আলোচনায়, চায়ের পেয়ালায়, সিগারেটের ধোঁয়ায়। কিন্তু প্রতীক্ষার সুফল ফলে না। আলোকচিত্রীকে মাঝে মাঝে পাঠাই। একই নির্দেশ আসে, সেইসঙ্গে এও শুনতে পাই তখনও শিল্পী বলছেন—কখন সময় দিই, সময় কোথায়? একটা সামগ্রিক অনিশ্চয়তা। মাঝে মাঝে ফ্লোরের মধ্যে ঢুকে দেখি দূরে এককোণে পিছন ফিরে বসে আছেন শিল্পী, রূপকল্পনায় তখন বিভোর, সাধনায় সমাহিত। সংলাপ শ্রবণরত ধ্যানমগ্ন রূপকার।

[ক্রমশ।

বাঙলা ছবিতে হাস্যরস অবহেলিত

জহর রায়

(বিশেষ সাক্ষাৎকার)

বাঙলা ছবির মুখে তখনও কথা ফোটে নি। শব্দযন্ত্র তখনও ছায়াছবির গণ্ডীর বাইরে। ছায়াচিত্রের নির্বাক যুগের কথা। সে যুগের ইতিহাসে স্মরণীয় শিল্পী তালিকায় সতু রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নির্বাক যুগের চিত্রনায়ক সতু রায় এখন বয়সের অঙ্কে সাতের কোঠায় পা দিয়েছেন কিন্তু তাঁর সাধনা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় নি। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর নাট্যানুরাগ বর্তেছে তাঁর পুত্রের মধ্যে। আপন প্রতিভায় ও অনুশীলনে রসিকসমাজে সতু রায়ের পুত্রও আজ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও স্বীকৃতির সুযোগ্য অধিকারী। বাঙলা দেশের অগণিত দর্শকদের কাছে জহর রায় আজ এক অতি প্রিয়নাম।

পুরো নাম জহরলাল রায়। ১৯২০ সালের ১০ই অক্টোবর জন্ম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বি-এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেন।

পটুয়াটোলা লেনের 'অমিয় নিবাস'-এর অজস্র পুস্তক-শোভিত তিনতলার একটি আলোকিত কক্ষে তাঁর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত এই তথ্যগুলি জানা গেল। প্রশ্ন করি—তারপরেই কি অভিনয় জগতে এলেন?

হেসে উত্তর দেন শিল্পী—না-না, তার মধ্যে আরও অনেক কিছু ঘটে গেছে।



● জহর রায়

জিজ্ঞাসা করি—কি রকম?

অপরপক্ষ থেকে উত্তর আসে অনেক রকম কাজ আমি করেছি—ওষুধের প্রচারকের কাজ, ব্যবসা, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রুফ দেখার চাকরি (সাহিত্যিক চিত্র-পরিচালক নবেন্দু ঘোষের সঙ্গে) ইত্যাদি।

নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে জীবনের পথ। তাঁর জীবনেতিহাসের প্রথম পর্বে নিত্য-নতুন অধ্যায়ের সংযোজন তাই তাঁর অভিনয় গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত নতুনত্বের স্পর্শবাহী। কৌতুকশিল্পী হিসাবে বিপুল প্রসিদ্ধির অধিকারী জহর রায় একদা ছায়াচিত্রে গম্ভীর চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন তা ক'জনের স্মরণ আছে জানি না।

পাটনা থেকে তাঁর কলকাতায় আসার নেপথ্যেও আত্মগোপন করে আছে এক বিচিত্র কাহিনী। সাত দিনের জন্যে বেড়াতে আসার নাম করে চলে এলেন কলকাতায়, তারপর থেকে গেলেন। নিজের চেষ্টায় অভিনয়ের সুযোগ অর্জন করলেন, তাঁর বর্ণাঢ্য নটজীবনের করলেন সূচনা। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্বরাগ' ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পেলের জহর রায়। সেই বছরই সুযোগ পেলেন বিমল রায়ের 'অঞ্জনগড়' ছবিতে। পাটনার ডঃ অজিত সেনের মধ্যস্থতায় বিমল রায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হল। ডাঃ সেন শ্রীরায়ের আত্মীয়। জিজ্ঞাসা করি, কমিক চরিত্রে আপনি প্রথম কোন ছবিতে অবতীর্ণ হলেন?

জানা গেল সুনীল মজুমদারের 'সাহারা'। চিত্রলোকের সঙ্গে জহর রায় নিজেকে যুক্ত করেছেন ১৯৪৫ সালে, তারপর দেখতে দেখতে সেদিন থেকে কুড়িটি বছর পার হতে চলল। এই কুড়ি বছরে প্রায় দেড়শ'খানি ছবিতে অভিনয় করে দর্শকসমাজে একটি বিশেষ প্রীতির আসন আয়ত্তে এনেছেন শিল্পী। বর্তমানে চারখানি ছবিতে তিনি অভিনয় করছেন।

শুধু রূপালী পর্দায় নয় পাদপ্রদীপের সামনেও তিনি দাঁড়িয়েছেন। ১৯৫৪ সালে 'দূরভাষিণী' নাটককে কেন্দ্র করে রঙমহল-এ তিনি যোগ দেন। সে যোগসূত্র আজও অটুট। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নাট্যামোদীদের আশা করি স্মরণ আছে কিছুকাল পূর্বে রঙমহলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিল্পীদের নাট্যশালা পরিচালনাকে কেন্দ্র করে যে মতভেদ দেখা দেয়—সেই সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেন পশ্চিম বাঙলার স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। সেই থেকে রঙমহল নাট্যশালা আজও পরিচালিত হয়ে চলেছে সমবায়ভিত্তিতে।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অবশ্য আগেও মঞ্চে বহু অভিনয় করেছি। স্থায়িভাবে 'দূরভাষিণী' প্রথম। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের নবযুগের পুণ্যমন্ত্রোদ্গাতা নটগুরু শিশিরকুমারের সঙ্গে কয়েকটি নাটকে অভিনয় তাঁর জীবনালেখ্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রশ্ন করি কোন কোন নাটকে শিশিরকুমারের সঙ্গে আপনি অভিনয় করেছেন—শিল্পী উত্তর দেন 'আলমগীর'-এ রামসিংহ, 'প্রফুল্ল'তে কাঙালী, 'চন্দ্রগুপ্ত'তে বাচাল, 'চিরকুমার সভা'য় দারুকেশ্বর। [ক্রমশ।

শিল্পীর জীবনে যান্ত্রিকতা এসে যাচ্ছে

শ্যামল মিত্র

বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নৈহাটির অবদানের অন্ত নেই। এ দেশের সাহিত্য-কলা-সংস্কৃতির ইতিহাসে সেই কারণেই নৈহাটি একটি বিশেষ আসন অধিকার করে আছে। এ যুগে সাঙ্গীতিক ক্ষেত্রে নৈহাটির অবদান উল্লেখযোগ্য। এ কালের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক শ্রীশ্যামল মিত্র নৈহাটিরই সন্তান। ডাঃ সাধনকুমার মিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্যামল মিত্র গত ১৪ই জানুয়ারী জীবনের ছত্রিশটি বছর পূর্ণ করলেন।

আজকের দিনের গায়ক-সমাজে একটি বিশেষ আসন তাঁর অধিকারভুক্ত। প্রখর সুরবোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং মধুর কণ্ঠসম্পদ তাঁকে এই আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছে।

বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যেমন নৈহাটি, রাজনৈতিক ইতিহাসে তেমনই চন্দননগর! চন্দননগরে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। ১৯৪৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে হাত মেলালেন শ্যামল মিত্র। প্রবেশিকার পর বিজ্ঞানের পাঠ নিতে থাকেন শিল্পী। ১৯৪৬ সালে হুগলী সরকারী কলেজ থেকে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হলেন বি-এস-সি'র ছাত্র হিসাবে।

বাড়ির আবহাওয়াই ছিল সাঙ্গীতিক। বাড়ির বাসিন্দাদের মনের মধ্যে আঁকা ছিল সুরের আলপনা, তাঁদের জীবনধারার প্রতি ছন্দে ছন্দে যেন ছিল সুরের ঝঙ্কার। তাই ছেলেবেলা থেকেই সেই পরিবেশপুষ্ট শ্যামল মিত্রের জীবনের দীক্ষাও আপনা থেকেই হয়ে গেছে সুরের মন্ত্রে। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের এক অমোঘ আকর্ষণ তিনি করেছেন অনুভব। এই আকর্ষণই তাঁকে ঠিকানা দিয়েছে জীবনের সার্থকতার পথের।

প্রখ্যাত গায়ক স্বর্গত সুধীরলাল চক্রবর্তী তাঁর প্রথম গুরু। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেছেন চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে। এখনও সময়ে সময়ে শ্রীলাহিড়ীর নিকট তিনি শিক্ষালাভ করে থাকেন।

জাতীয়-জীবনে এ দেশের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল সবিশেষ স্মরণীয়। শ্যামল মিত্রের ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসেও ঐ বছরটি সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আজকের দিনের বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী এই শিল্পী ঐ সময় সাধারণ্যে প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর শিল্পী-জীবনের জয়যাত্রার ঐ সময় হয় স্মরণীয় সূচনা।

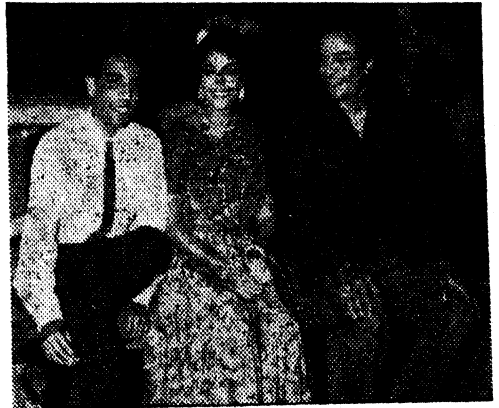
'সুনন্দার বিয়ে' ছায়াচিত্রে তিনি প্রথম কণ্ঠদান করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁকে প্রথম দেখা গেল 'লাখ টাকা' চিত্রে, অবশ্য এককভাবে নয় পরিচালক নীরেন লাহিড়ীসহ। এককভাবে তাঁর প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা 'জয় মা কালী বোর্ডিং' ছবিতে।

কণ্ঠশিল্পীকে অভিনয়-শিল্পী হিসাবেও দেখা গেছে দু'বার। সাড়ে চুয়াত্তর এবং শাপমোচন ছবি দু'টিতে তিনি অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেন। উভয় ছবিরই নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাড়ে চুয়াত্তর ছবিতেই উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন প্রথম একত্রে অভিনয় করেন। প্রযোজক হিসাবে শ্রীমিত্রের প্রথম অবদান 'দেওয়া নেওয়া', 'রাজকন্যা' চিত্রটি তাঁরই প্রযোজনায় রূপ নিচ্ছে। রেকর্ডের মাধ্যমেও তাঁর অসংখ্য গান ধরা আছে।

প্রভাত ও মধ্যাহ্নের সন্ধিলগ্নে ইংরাজী মাসের প্রথম দিনেই তাঁর লেক ভিউ রোডের বাড়িতে বসে তাঁকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি,—আজকে যাঁদের শিল্পী হিসাবে আবির্ভাব ঘটছে, তাঁদের মধ্যে যথাযোগ্য নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আপনার মতে কি প্রকাশ পাচ্ছে?

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে শিল্পী উত্তর দেন—যদিও আধুনিক গান এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে চলছে, তবু এও ঠিক নয় যে, তার গভীরতা কমে যাচ্ছে আর তার একমাত্র কারণ গান আজ অর্থোপার্জনের একটা সহজ পন্থায় পরিণত হওয়ায় যথাযথ সাধনা ও নিষ্ঠার অভাব ঘটছে। এ আনন্দের বারতা নয়।



● উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরীর সঙ্গে শ্রীশ্যামল মিত্র।

জনজীবনে সঙ্গীতকে আরও ব্যাপ্ত, প্রসারিত করার কাজ সফল হচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে সে সম্বন্ধেও নেতিবাচক উত্তর আসে শিল্পীর কাছ থেকে। তিনি বলেন—সাধারণ্যে প্রচারের জন্য সঙ্গীতের যে মাধ্যমগুলি আছে তাদের যথাযথ সদ্ব্যবহার ঘটছে না।

জিজ্ঞাসা করি, এখনকার শিল্পীদের ব্যক্তিজীবনের কথা বলছি না—শিল্পী-জীবনের কথা বলছি—সেই জীবন যে ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলছে—সে সম্পর্কে আপনার মত কি।

তিনি জানালেন—শিল্পী-জীবন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, উপমা দিয়ে বললেন—কোন গান তার যদি সাড়া জাগায় সেই গানই পরোক্ষভাবে তার ক্ষতিসাধন করে। সব অনুষ্ঠানে সেই গান গাইবারই অনুরোধ আসে, অথচ একই গান বারবার গাইতে ভাল লাগে না। এর ফলে শিল্পীর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়।

॥ মধ্য কলিকাতায় মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান ॥

কলিকাতার প্রখ্যাত অর্কেস্ট্রা সংস্থাগুলি মহাজাতি সদনে গত ১০ই জানুয়ারী রবিবার সকালে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সুর কলা-কৌশল যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে পরিবেশন করেন। 'হবি রিদম্ অর্কেস্ট্রা' পার্টি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং অরূপ গাইন ও বুদ্ধদেব মিত্র পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক মহাশয় সভাপতির এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যন্ত্রবিদ্ পরিতোষ শীল। সভাপতি মহাশয় সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে এক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। প্রধান অতিথি মহাশয় সঙ্গীতের স্বর-সামঞ্জস্যতা (Harmonisation) সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা পরিবেশন করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম কাজী অনিরুদ্ধ, রজত নন্দী, খোকন মুখার্জী, মুকুল দাস ও সম্প্রদায়, দিলীপ রায় ও সম্প্রদায়, হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়, পরিমল দাশগুপ্ত ও সম্প্রদায়, বটুক নন্দী ও সম্প্রদায় ও হবি রিদম্ অর্কেস্ট্রা। ঘোষণায় ছিলেন কাজী সব্যসাচী।



● 'হবি রিদম অর্কেস্ট্রা' পার্টির শিল্পিবৃন্দ

বার্ধক্যে বারানসী

॥ নীলকণ্ঠ ॥

বাহান্ন

পরলোকগতদের সম্পর্কে ইহলোকবাসীদের কৌতূহল কখনও মরে না। মৃত্যুর সংগে সংগে মানুষ ফুরিয়ে যায় কিংবা তার চলা অফুরান, এ নিয়ে অন্তহীন প্রশ্নের সমুদ্রজিজ্ঞাসার উত্তরে মহাকাল নিরুত্তর হিমাদ্রি। শাস্ত্র বলছে, মৃত্যু বলে কিছু নেই। আজ দেহের জীর্ণবাস পরিত্যাগ করে নবীন দেহবাস পরিধান করা।

'ফুরায় নি তো ; ফুরাবার এই ভাণ।'

কিন্তু দর্শনের পাতা সে তো কথার কথা, যতক্ষণ না চোখের পাতায় দর্শন করা যাচ্ছে যে মৃত্যুর পরের মানুষ অ-মৃত। এ কি কেবল সান্ত্বনা? শুধু স্তোকবাক্য? যদি তা না হয় তা হলে এমন লোক থাকা চাই, কোটিকে গোটিক হোক সে, ক্ষতি নেই, এমন মহান পুরুষের পাওয়া চাই সাক্ষাৎ, যিনি তাঁর দৃষ্টির আলোকে দেখাতে পারেন যে:

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

কবির বাণী যদি জীবনেরও বাণী না হয়ে উঠলো কারুর কারুর জীবনে তা হলে সে বাণীর মূল্য কি? ত্রৈলঙ্গ স্বামী যদি শীত-গ্রীষ্ম, গংগাজল-মূত্র, মল ও পরিমল, স্থল ও জল, জীবন-মৃত্যুর আলোক-অন্ধকারকে সমজ্ঞান করে দেখাতে না পারলেন তাহলে অবিশ্বাসীর ভিত্ নড়বে কি করে? পর্বতের কঠিন বুক বিদীর্ণ করে তোমার করুণাধারা যদি না নামে, তাহলে, এতবড় প্রবঞ্চনা এতদিন ধরে নিখিল সইত না। অহিংসার কথায় চিঁড়ে ভেজে না। জগাই-মাধাই-এর কলসীর কাণায় রক্তাক্ত হয়েও যখন কেউ দেয় প্রেম, তখনই অন্ধকার-আচ্ছন্নের হয় চৈতন্য। কবির কথা তাই:

শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।

শুধু বাণীতে মানুষের মন মানে না। মানুষের যিনি সবচেয়ে প্রিয় তাঁর স্পর্শ মানুষ পেতে চায়। ঈশ্বর-দর্শন যাঁরা করেছেন তাঁদের দর্শন করা তাই মানুষের এত প্রিয়। মহৎ মানুষ যাঁরা, তাঁরা সেই ঈশ্বরের দূত। দক্ষিণেশ্বরে তাই বয় ঈশ্বরের হাওয়া। সেই হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারাই সবচেয়ে বড় পুণ্য। ভাগ্য না করলে সে সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না। ভাগ্য কি? না, অ-দৃষ্ট? অ-দৃষ্ট কি? না, যা তুমি করে এসেছ আগের আগের জীবনে তারই না-দেখা যোগফল। এই যোগের ফল যতক্ষণ না মিলে যাচ্ছে ততক্ষণ কোন যোগের ফলই তোমাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। অংক না মেলা পর্যন্ত কারুরই রেহাই নেই। ঠাকুরেরও না ; আতুরেরও না।

মহৎ কবি, গীতকার, চিত্রকর, শিল্পী কিংবা মহৎ মানুষ যে তার সকল কীর্তির চেয়ে বড় জীবনশিল্পী, জেনে কিংবা না জেনে, তাকে পেতেই হবে সেই স্পর্শ, যে স্পর্শ ছাড়া লেখা হয় না সাহিত্য, ছবি হয় না শিল্প, শব্দ হয় না সংগীত, জীবন হয় না কীর্তির চেয়ে মহৎ।

কাশীতে তার স্পর্শ যাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়, মানুষের মধ্যে তাঁরাই নাম করার যোগ্য ; নাম এবং প্রণাম করার। বাকি আমরা সবাই, 'also ran'-এর দলে। আমাদের জন্যই ওঁদের আসা। সেই আশাকে তামাসা না করাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দারিদ্র্য-দুঃখ, বিচ্ছেদ-বেদনা, অশান্তির দহনে দগ্ধ মানুষ মহাপুরুষের সন্ধানে ছোটে যদি কোনও অলৌকিক উপায়ে এই লৌকিক যন্ত্রণার হাত থেকে মেলে নিস্তার। কখনও কখনও কারুর যে মেলে না তার হদিশ এমন নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন: যা ; তোর বড় দরজা হবে। কিন্তু বিবেকানন্দকে বলেছিলেন: মা'র কাছে তুই যা চাইবি তাই পাবি। একথা আর কাউকে বলেন নি, কারণ, আর কেউ ছিলো না এমন আশীর্বাদের যোগ্য। বিবেকানন্দ, জানতেন তাঁর গুরু, যা চাইবে তা' ধনরত্ন নয় ; তা সেই মণি, যা পেলে ধন ও নির্ধনে কোনও ভেদবুদ্ধি থাকে না। তাই বিবেকানন্দের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না, এমন কথা স্বেচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন নরেন্দ্রকে।

ব্যাপারটা বিস্তৃত ব্যাখ্যার অভাব রাখে।

নরেন্দ্র সেদিনকার কলকাতায় নামকরা ঘরের ছেলে; গ্র্যাজুয়েট। কিছুতেই এমন একজন লোক আজ থেকে আশি বছর আগে পেট চালাবার মতো একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলো না। এটা কি ভাগ্যের চক্রান্ত নয়? একেবারে নিরুপায় করে ঠাকুরের পায় এনে ফেলবে বলেই না, নরেনের মায়ের মতো মায়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: 'চুপ কর ছোঁড়া, তোর ঈশ্বর তো সব করলেন—'!

মায়ের কথা যে ব্যর্থ হয় নি নরেন্দ্র থেকে বিবেকানন্দের জন্ম তো তারই অব্যর্থ প্রমাণ। শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বরই তো সব করলেন। যিনি ঈশ্বর তিনিই দক্ষিণেশ্বরে এসে,—নরেন্দ্রকে বীরেন্দ্র করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন একজন সাধারণ নরকে এক অসাধারণ নরেন্দ্র,—বিবেকানন্দ যাঁর নাম।

কিন্তু আমরা যারা অতি সাধারণ নর, অসাধারণ নরেন্দ্র নই, আমরা কি করব? আমরা কি সন্তান-মৃত্যুতে কাঁদব না? দুঃসহ দারিদ্র্যে নিরুদ্বিগ্নমন এবং সুখে বিগতস্পৃহ হব? হব বীতরাগভয়ক্রোধ? না। চাইলেই তো হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী গুরুভায়ের মৃত্যুতে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য যিনি জানতেন। কাঁদার জন্যে নিন্দিত হলে তিনি বলেছিলেন: সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই কি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছি? নরেন্দ্র যদি প্রিয়জনবিয়োগে ব্যথিত হতে পারেন তাহলে আমরা সাধারণ নর, আমাদের আপনজনের মৃত্যুতে দু'চোখ ভরে উঠলে জলে, আমাদের মনুষ্যত্ব জলে ওঠে; তার পতন হয় না। জীবনকে এত ভালোবাসি বলেই তো জানি ভালোবাসাই ঈশ্বরের সবচেয়ে ভালো বাসা। ঈশ্বরের জন্যে যখন এমনই কাঁদব তখনই সেই অশ্রুবিন্দুতে জীবনসিন্ধু মন্থন করা অমৃত ক্ষরিত হবে। ঈশ্বরের চেয়ে আপন আর কেউ নেই একথা চোখের জলে যে বলতে পারে, সেই তো দক্ষিণেশ্বর!

মৃত্যুদুঃখ দহন আছে; তবু আনন্দ অনন্ত, জাগে। দেহের মৃৎপাত্রে অমৃত যে পেতে চায় তাকে দুঃখ পেতেই হবে! কারণ অমৃতের অধিকার,—'সে তো নহে সুখ ওরে, সে নহে আরাম।' স্মরণাতীতকালের এক সকালে সন্তান-মৃত্যুতে কাতরা এক রমণী বুদ্ধদেবের কাছে গিয়েছিলো,—মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের প্রার্থনা নিয়ে। বুদ্ধদেব সে প্রার্থনার উত্তরে, অন্ধজনে দিয়েছিলেন আলো। বলেছিলেন, খুঁজে বার কর একটি অমৃত্যুস্পর্শ ঘর। এই সান্ত্বনায়, শান্ত না হয়ে উপায় ছিলো না মৃত্যুদুঃখকাতরার। তার উত্তর সে খুঁজে পেয়েছিলো।

দুঃখ হচ্ছে মানব-জীবনের মহৎ অধিকার। এই অধিকারে দেবতারা বঞ্চিত। দুঃখ হচ্ছে মুক্তির যৌতুক। এ যৌতুক মানুষ ছাড়া আর কারুর দেবার ক্ষমতা নেই। স্বর্গ-মর্ত্য পাতালে কখনও দানব কর্তৃক দেবতা, আবার দেবতা কর্তৃক দানব পরাভূত হয়। সৃষ্টির ইতিহাস তাই প্যারাডাইস লস্ট এবং প্যারাডাই রিগেইনড-এর ইতিহাস। এই ইতিহাসে অপরাজিত কেবল মনুষ্যত্ব। দুঃখই সেই মনুষ্যত্বের দীপ্তি। দুঃখই মানুষের মহত্তম অহঙ্কার; তার একমাত্র অলঙ্কার। তাই দুঃখ পেয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। এই দুঃখের মূল খুঁজতে বেরিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এই দুঃখকেই মাথার মুকুট করেছেন যুগে যুগে ভগবানের দূত। তাই সেই অদ্ভুত কথা শুনি কবি-কণ্ঠে:

'এই করেছ ভালো নিঠুর এই করেছ ভালো,
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো'।

দুঃখের আগুনে না পুড়লে তুচ্ছ বাসনা কখনও খাটি সোনা হয় না।

দুঃখ যে পাচ্ছে সেই এগুচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, অসৎ থেকে সৎ-এর দিকে। ঠাকুরের কাছে যে অর্থ চাইছে সে পাচ্ছে বড় দরজা। কিন্তু সে যা হারাচ্ছে কোন মণি হাতে পেয়েই এমন ধনে সে কখনই ধনী হবে না যাতে তুচ্ছ মণিকে ফেলে দিতে পারে জলে; চোখের জলে পেতে পারে তাঁকে যিনি নীলমণি।

যত দুঃখ জীবনে আমরা পাই আসলে তাই যে সুখ এবং সুখ বলে যাকে মনে করি তা যে মনের অসুখ বিশ্বাস যখন কারুর হয় তখন কুন্তীর মত সে কর চায়: আমার জীবন থেকে দুঃখের মেঘ সরিয়ে নিও না, হে কৃষ্ণ, কারণ তাহলেই তোমাকে আমি ভুলে যাব। কিন্তু যে কুন্তী নয়, দুঃখ সহ্য করার শক্তি সে কোথা থেকে পাবে? কোন সান্ত্বনাই তো তাকে শান্ত করবে না। তাকে জানতে হবে, তাকে মানতে হবে যে যাকে সে দুঃখ বলছে তা তার নিজেরই তৈরি। পূর্ব-পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলভোগ করতে আমাদের আসা এই লোকে, লোকান্তরে। আমাদের যিনি স্রষ্টা তিনি তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে, অনিমেষদৃষ্টিতে। কবে খেলা শেষ করে আমরা ঘরে ফিরব। তাঁর পতাকা তিনি তাকে দেন না, যাকে দেন না তা বইবার ক্ষমতা। বাহান্ন কোটি যোনি পার হয়ে তবে যে ঘর থেকে আসা সেই ঘরে ফিরে যাওয়ার আশা পূর্ণ। এর হাত কারুর রেহাই নেই। কেবল সৎগুরু পারেন এক জন্মেই কোটি জন্মের প্রারব্ধ খণ্ডন করতে বা মোচন করতে। কিন্তু সেই সৎগুরু পাওয়াও আবার বহু পূর্বজন্মের মিলিত সুকৃতির ফল।

[ক্রমশ।

সম্পাদকীয়

॥ হিন্দী-হঠাও আন্দোলন প্রসঙ্গে ॥

মাসিক বসুমতীর বিগত সংখ্যায় হিন্দী-হঠাও আন্দোলন সম্পর্কে সম্পাদকীয় বিভাগে আলোচনা হইয়াছে। বর্তমানে ঘটনা আরও বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে। পরিস্থিতি জটিল হইতে ক্রমশই জটিলতর হইতেছে। সমগ্র বিষয়টি ক্রমশই এক গুরুতর রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা আন্দোলনকারীদের অনুভূতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত না হইতে, কারণ দেশের এই ঘোরতর সঙ্কটের দুর্দিনে দেশের অভ্যন্তরে যদি বিরোধ হানাহানির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা মারাত্মক পরিণতি ডাকিয়া আনে, শুধু এ দেশেরই নয় সকল দেশের ইতিহাসই বরাবর আমাদের এই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছে। ঘরোয়া যুদ্ধ-কলহগুলি বহিঃশত্রুকে দেশটি আক্রমণ করিবার সুযোগ করিয়া দেয়। তরুণ-সম্প্রদায় আমাদের অশেষ প্রীতির এবং পরম নির্ভরের পাত্র। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের। তাঁহাদের সমস্ত শক্তি এবং উদ্যম সেই দিকেই নিয়োজিত হওয়া এখন দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারত সরকারের উদ্দেশেও এক্ষণে মূলত আমরা সেই কথাই বলিব। দেশের ঘরে-ঘরে এখন অন্নবস্ত্রজনিত যে বিরাট হাহাকার, দেশের সীমান্তে হিংস্র শত্রুর পদসঞ্চার, একাধিক সমস্যা—সেখানে একটি ভাষার প্রচলনকে কেন্দ্র করিয়া এত শক্তি ও উদ্যম ক্ষয় নিশ্চয়ই বুদ্ধির পরিচয় বহন করে না।

যে-সকল বিষয়ে সরকারের অবিলম্বে দৃষ্টিদান এবং যথাযথ ব্যবস্থাবলম্বন বিধেয়, সেই বিষয়গুলিরই প্রতি সরকারের আশ্চর্যজনক ঔদাসীন্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মানুষের মনে পীড়ন করিয়া বা বলপ্রয়োগে কখনও কোন কাজ গণতান্ত্রিক পটভূমিতে করা চলে না, এ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করার অর্থই গণতন্ত্রের অবমাননা। হিন্দী-ভাষার যদি যোগ্যতা থাকিত, তাহা হইলে সরকারের এই হিন্দীনীতি কখনও বিজ্ঞজনের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইত না। খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে হিন্দী-ভাষায় রীতিমত দখল অতি অল্পজনেরই আছে। অনেকে কাজ চালাইবার মত হিন্দীতে কথাবার্তা বলিতে পারেন এবং হিন্দী বুঝিতে পারেন। আবার কেহ কেহ একেবারেই বলিতে বা বুঝিতে অক্ষম। সে ক্ষেত্রে এভাবে জোর করিয়া ভাষাটিকে সহস্র সমস্যা-প্রপীড়িত ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তির সন্ধান মেলে না। উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু সরকারী ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি কেবল হিন্দী-ভাষায় লিখিত হইতেছে, এই সকল ঘোষণায় ব্যবহৃত হিন্দী-ভাষার সহিত কোন ইংরাজী অনুবাদ অন্তত সারমর্মও নাই। ইহার ফলে অহিন্দীভাষী সংশ্লিষ্টজনকে যে কি দুর্ভোগে পড়িতে হইতেছে, সে বিষয়টি কি বারেকের তরেও কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

যে-পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া বলিতে গেলে একপ্রকার যুদ্ধই বাধিয়া গেল, সে-পরিকল্পনাটির সম্যক রূপায়ণে অধিক অগ্রসর হওয়ার কি সার্থকতা থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। দুইজন কেন্দ্রীয়-মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেন (পরে অবশ্য তাহা প্রত্যাহারও করিলেন), হিন্দী-চিত্রগুলির প্রদর্শন বন্ধ হইল, বিবিধ-ভারতী বর্জনের সঙ্কল্প গৃহীত হইল, দেশের শ্রদ্ধেয় চিন্তানায়ক মনীষিবৃন্দ এবং নেতৃবৃন্দ যে প্রচেষ্টার স্বপক্ষে মত দিতে পারিলেন না, সেই প্রচেষ্টার রূপদানে এখনও ব্রতী থাকিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে আরও ঘোরালো করিয়া প্রদেশে-প্রদেশে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করিয়া ভারত সরকার কি মহান কার্য সম্পন্ন করিবেন তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া সরকারী নীতির সহিত সুরে সুর মিলাইতে পারেন নাই। তিনি স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই যে কেন্দ্রের নেতৃত্ব ভ্রান্ত। তাঁহার ন্যায় বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের প্রাজ্ঞদৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভ্রান্তিগুলি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র বিষয়টি লইয়া যে ঘোর দুর্যোগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অবসানকল্পে বাঙলার এক সুসন্তান একটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের আইন ও সমাজ-নিরাপত্তা বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের অনুরোধে ভাষা-আইনের একটি সংশোধনী বিল প্রণয়নে বর্তমানে তিনি যত্নবান। ইহাতে ভারতীয় রাজ্যগুলির

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অর্জন না করা পর্যন্ত হিন্দী-প্রবর্তন স্থগিত ও ইংরাজী যথারীতি বহাল রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীসেনের এই সাধু প্রচেষ্টাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি এবং পূর্ণমাত্রায় ইহার সাফল্য কামনা করি।

এই প্রসঙ্গে আরও একজনের একটি অদ্ভুত বক্তব্য আমাদিগকে রীতিমত বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। তিনি ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া। তিনি ইংরাজী ভাষার ব্যবহার বন্ধের জন্য ধূয়া তুলিয়াছেন। যে-কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই ধরণের উদ্ভট ও হাস্যকর বক্তব্য বিস্মিত করিবে। ইংরাজী ভাষার প্রচলন করার অর্থ যে সমগ্র বিশ্বজগৎ হইতে ভারতের নিজেকে পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া, এই প্রাঞ্জল তত্ত্বটি কি ডাক্তার লোহিয়ার ন্যায় খ্যাতিমান ব্যক্তির অজ্ঞাত? তাঁহার এই জাতীয় উক্তি মনকে যতটা ক্রোধী ও বিস্মিত করিয়া তোলে তাহার অধিক পরিমাণে সন্দিহান করিয়া তোলে তাঁহার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে।

॥ একটি বিতর্কিত জীবনের আকস্মিক অবসান ঃ কায়রোঁ ॥

পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ের জন্ম-শতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে এ-যুগের পাঞ্জাবের বিরাট ব্যক্তিত্ব সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইল আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে। যে পরিবেশে সর্দার কায়রোঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তটি ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহা যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই শোকাবহ। ক্ষণকালপূর্বেও পরিপূর্ণ সুস্থ, নানা কর্মে বিব্রত প্রতাপ সিংজী বোধ করি ভাবিতেও পারেন নাই যে, তাঁহার জীবনের শেষের প্রহরটি দুয়ার হইতে অদূরেই।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কায়রোঁকে ঝড়ের সহিত তুলনা করা চলে। তাঁহার সমগ্র কর্মের মধ্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এক প্রচণ্ড গতিবেগের স্বাক্ষর। রাষ্ট্রীয় তরণীর হাল তিনি যে অতীব দক্ষতার সহিত ধারণ করিয়া গিয়াছেন সে সম্বন্ধে আজ নূতন কিছু বলিবার নাই। রাজনীতির পথ বড় বিচিত্র, নিন্দা ও স্তুতির যুগল-তরণীর উপর দাঁড়াইয়া রাজনৈতিক সমুদ্র অতিক্রম করিতে হয়। সুতরাং সেই বিচারে রাজনৈতিক প্রতিভার ব্যক্তিত্ববিচার ও মূল্যায়ন চলে না। কায়রোঁর জীবনের আকাশের শেষপর্ব উজ্জ্বল সূর্যের প্রসন্ন রশ্মি অনুপস্থিত, সেখানে কৃষ্ণমেঘের সমারোহ তাঁহার শেষ জীবনের ইতিহাসে এক বেদনা ও বঞ্চনার ইতিহাস, গৌরবময় এক অপ্রতিহত জীবনের এক করুণ পরিণতি, তথাপি তাঁহার গৌরব এবং গুরুত্ব উভয়ই অনস্বীকার্য, স্বীয় রাজনৈতিক জীবনে তাঁহার যত বিপর্যয়ই ঘনাইয়া আসুক, সমগ্র জীবনে তিনি যে বিরাট কীর্তির পরিচয় দিয়াছেন সেই কীর্তির গৌরব তো অপরিসীম।



● প্রতাপ সিং কায়রোঁ

এ কথা মিথ্যা বা অতিরঞ্জন নয় যে, সর্দার কায়রোঁ আধুনিক পাঞ্জাবের রূপকার। স্তুতির আলোয় এবং নিন্দার অন্ধকারে, আলো-আঁধারির বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল এই মানুষটির অক্লান্ত কর্মের ইতিহাস আধুনিক পাঞ্জাবের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। কৃষি ও শিল্পোন্নয়নে পাঞ্জাব আজ যে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহারই অক্লান্ত সাধনার এক প্রতীক্ষিত ফল। রাজনৈতিকজগৎ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যত অভিযোগই উত্থাপিত হউক, ইহাও অনস্বীকার্য যে পাঞ্জাবের সাধারণ নরনারীর স্বার্থ, সুবিধা ও কল্যাণ সম্বন্ধে কায়রোঁ ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন।

মৃত্যু জীবনের ধ্রুব পরিণতি, তাই জীবনে মৃত্যু এক বিরাট সত্য, তথাপি মৃত্যু মানব-সমাজে বিষাদের কারণ। মানব চরিত্রের ইহাই এক বৈশিষ্ট্য। তদুপরি মৃত্যু যদি অস্বাভাবিকভাবে জীবনে আসে তাহা হইল এই বিষাদের মাত্রা বিবর্ধিত হয়। কায়রোঁ নিহত হইলেন বলিয়াই এই মৃত্যু মনকে এত গভীরভাবে অভিভূত করিতেছে।

যে করুণ পরিবেশে সর্দার কায়রোঁকে মৃত্যুবরণ করিতে হইল তাহা একটি সুসভ্য রাষ্ট্রের পক্ষে এক অতি লজ্জাজনক ব্যাপার। যদিও পশ্চিমের কোন কোন অঞ্চলে এই জাতীয় হত্যা হানাহানির সংঘাত এক নিত্য-নৈমিত্তিক স্বাভাবিক ব্যাপার, তথাপি পশ্চিম—পশ্চিম, আর পূর্ব—পূর্ব। আমরা স্বীকার করি যে, দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করা এবং ভারতের প্রতিটি চলার পথের সমগ্র অংশে পুলিশ মোতায়েন করা সম্ভব নয় তবু এই অপরাধ-বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন যে, কায়রোঁর হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করা হইবে এবং যথাযোগ্য

ব্যবস্থাও সে সম্পর্কে অবলম্বিত হইবে। এ সংবাদ আমাদের আশান্বিত করিয়াছে মিথ্যা নয় তবে সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবে যতক্ষণ না পরিণতি লাভ করে ততক্ষণ আমরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারি না। কারণ সরকারের আশ্বাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'আশ্বাস'ই থাকিয়া যায় বাস্তবে রূপলাভ করে না। স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েকমাস পূর্বে ভারতের সলিসিটার জেনারেল—বাঙলার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হেমনাথ সান্যাল মহাশয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরও এই অনুরূপ আশ্বাসই ভারত সরকার দিয়াছিলেন কিন্তু এই কয় মাসে তাঁহার হত্যাকারীকে যে কত শাস্তিবিধান হইল তাহা কেহই আর জানিতে পারিলেন না।

এই অপরাধ-চক্রগুলি যদি প্রতিবারই এইভাবে সরকারী বিচারের নাগাল হইতে দূরে থাকিয়া যায় তাহা হইলে এমন দিন হয় তো আসিবে যেদিন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বলিয়া কিছু থাকিবে না, সারা ভারতে সেদিন একদল গুণ্ডা-ডাকাতের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে। 'শৃঙ্খলা' কথাটি সেদিন শুধু অভিধানেই হয় তো বাঁচিয়া থাকিবে এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্ব কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। দেশজোড়া ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইয়া এই সকল অপরাধচক্রগুলির মূল খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন ভারত সরকারের এ পরিস্থিতিতে অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। নচেৎ সারা দেশে আরও যে একটি ঘোর দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহার প্রতিরোধের কিন্তু তখন আর সহজ কোন পথ থাকিবে না।

॥ শিক্ষাগুরুদের উদ্দেশে ॥

বড়দের আদর্শ ছোটরা অনুসরণ করে, বড়দের ভাবধারা ছোটদের মধ্যে সংক্রামিত হয়—এই ধ্যান-ধারণা চিরকাল যাবৎ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহার সত্যতা নিত্যকালের ভিত্তিতে প্রমাণিত। কিন্তু বর্তমানে, শিক্ষাব্রতী-সম্প্রদায় একটি নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিলেন, ছোটদের আদর্শ এবার বড়দের দ্বারা অনুসৃত হইল, ছোটদের ভাবধারা এবার সংক্রামিত হইল বড়দের মধ্যে, এতাবৎ ছাত্রদের মধ্যে যে-সকল বিশেষত্বগুলি পরিলক্ষিত হইল, সেই বিশেষত্বগুলি ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-অধ্যাপকদেরও বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করিল। ধর্মঘট, পরীক্ষাবর্জন ইত্যাদি ছাত্রজনসুলভ এবং চিরকাল শিক্ষক নিন্দিত ও কঠোরভাবে সমালোচিত কার্যাবলীতে মাস্টারমহাশয়রাও অংশগ্রহণ করিলেন।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সকল দেশেই যতগুলি বৃত্তি বা পেশার প্রচলন আছে তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদানবৃত্তি সবার উপরে, গুরুকুল চিরকালই শুধু ছাত্রমহলেই নয় সাধারণ্যেও এক অবিমিশ্র শ্রদ্ধা চিরকালের দাবীতে পাইয়া থাকেন। রাজার প্রাসাদ হইতে কৃষকের পর্ণকুটীরে শিক্ষাগুরু-সম্প্রদায়ের জন্য একটি পরম শ্রদ্ধার আসন চিরকালের পটভূমিতে সুনির্দিষ্ট।

আর্থিক প্রাচুর্য হইতে অবশ্য ইঁহারা চিরকালই বঞ্চিত, বর্তমানে তৎসংক্রান্ত-দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করিয়াই সাম্প্রতিক পরিস্থিতি রূপলাভ করিয়াছে। মাস্টারমহাশয়রা অবশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ধর্মঘট, পরীক্ষাবর্জন ইত্যাদি দাবীপূরণের পন্থাসমূহ অবলম্বন করিলেন।

'শিক্ষাদাতা' শব্দটি আক্ষরিক হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার পরিসর এবং ক্ষেত্র যেমনই বিরাট তেমনই ব্যাপক, শিক্ষাদান-বৃত্তির মধ্যে যে বিরাট দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিহিত তাহাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যসমন্বিত। জাতিগঠনের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদের সম্মান অর্থের মাপকাঠিতে নির্ধারিত নয়।

শিক্ষক এবং অধ্যাপকবৃন্দের অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। এই নিয়ত মূল্যবৃদ্ধি এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা তথা অপ্রাপ্যতার দিনে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগগুলি কিছুমাত্র অযৌক্তিক নয় এবং তাঁহাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত বলিলেও ভুল বলা হয় না, কিন্তু দাবীপূরণের যে পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিলেন তাহা কোনক্রমেই সমর্থনীয় নয়।

শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এ কথা কোনক্রমেই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, শিক্ষাদানের দ্বারা ভাবীকালের নরনারী সৃষ্টির দায়িত্ব যেমন তাঁহাদের উপর ন্যস্ত তেমনই আপন বৃত্তির গুরুত্ব তাঁহাদিগকে যে বিরাট মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে সেই মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁহাদেরই। তাঁহাদের এক-দেশদর্শী হওয়া কোনক্রমেই শোভনীয় নয়। তাঁহাদের প্রতিটি আচরণ জাতির সম্মুখে আদর্শরূপে প্রতিভাত হইবে। তাঁহারা যদি আপন গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা হারাইয়া ফেলেন তাহা হইলে জীবন গঠনের ক্ষেত্রে এবং চলার পথে আলোর সন্ধানের জন্য আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব ?

শিক্ষাজগতে আজ ঘোর দুর্দিন, শিক্ষা আজ সমস্যায় পরিণত হইয়াছে, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে আজ অশেষ দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইতেছে। শিক্ষার ব্যয়ভারও অনেকের পক্ষে বহন করা সম্ভবপর হইতেছে না, এমতাবস্থায় পরীক্ষা-বর্জন নীতি অধ্যাপকদের দ্বারা অবলম্বিত হইলে বেদনার অবধি থাকিবে না, দেশের আশা-ভরসা শত শত ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি এতবড় অবিচার অধ্যাপকরা করিতে পারেন ইহা

আমাদের চিন্তারও বাহিরে। তাহাদের পূর্ণ সময়ব্যাপী সাধনা তাঁহারা নিষ্ফল করিয়া দিবেন? এত শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়ের পরিণতি ব্যর্থতা? জীবনের বোধনলগ্নে শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এতবড় আঘাত তাহাদের জীবনকে কোন পথে পরিচালিত করিবে তাহা ভাবিয়া পাই না। পরীক্ষাবর্জনের আর এক নাম শিক্ষা-সংহার। স্রষ্টা কি তাহা হইলে সংহারকর্তায় পর্যবসিত হইতে চলিয়াছেন?

আমরা আবার বলিতেছি যে, ইঁহাদের দাবী-দাওয়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র বিপরীত মত নাই। কিন্তু তাঁহাদের নিকট অনুরোধ দাবীপূরণের কোন ভিন্নপন্থা তাঁহারা অবলম্বন করুন, যে-পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা কল্যাণের পথ নয়, তাহা কখনও পরোক্ষে সুফল দান করিতে পারে না, ছাত্রসমাজের সম্মুখে যে আদর্শ তাঁহারা নিজেরা উপস্থাপিত করিলেন ভবিষ্যতে তাহার পরিণামের কথাটিও ভাবিয়া দেখা তাঁহাদের উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙলার গৌরব-পতাকা তাঁহাদের দ্বারা অবনমিত হইলে যৎপরোনাস্তি বেদনার কারণ হইবে, অন্য প্রদেশের বাঙলার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গের খোরাক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা অবিবেচ্যমান নয়। সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া যাহা কল্যাণকর তাহাই করিতে শিক্ষাবিদ-সম্প্রদায়কে অনুরোধ জানাই।

পরিশেষে সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেল, আমাদের সহৃদয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পাইয়া শিক্ষক-আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সকল বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু হইয়াছে।

॥ শোক-সংবাদ ॥

সতীনাথ রায়

সুপ্রবীণ আইনজীবী সতীনাথ রায় গত ১লা ফাল্গুন ৮৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের ডীন রায়বাহাদুর ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র ছিলেন। ১৯০১ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি ভকীল হিসাবে যোগ দেন। ১৯০২ থেকে দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর আলিপুর কোর্টে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে প্রভূত সম্মান ও বিপুল প্রসিদ্ধির অধিকারী হন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন।

সুলতা কর

সুলেখিকা শ্রীমতী সুলতা কর গত ১২ই ফাল্গুন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ইনি যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করেন। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের ফলে জীবনের দীর্ঘকাল তাঁর অতিবাহিত হয় নির্জন কারাবাসে। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি লেখিকা হিসাবে সমাদর লাভ করেন।

ভূপেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

বীরভূমের প্রখ্যাত পরিবহন-ব্যবসায়ী শ্রীভূপেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (ভুতুবাবু) গত ২৩-এ মাঘ ৬৭ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বি বি অটোমোবাইল বর্তমানে ব্যবসাক্ষেত্রে একটি গৌরবজনক সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি শত শত লোকের কর্মসংস্থান করে দিয়েছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর পরলোকগত পিতৃদেব বিশিষ্ট আইনজীবী ৺সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রচুর জনহিতকর কাজে প্রচুর দান করে



গেছেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, একমাত্র কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পাঠক পাঠিকার চিঠি

॥ পত্রিকা-সমালোচনা ॥

মহাশয়,

আমি আপনার এই বহুলপ্রচারিত পত্রিকার চার বৎসরের গ্রাহক। এর আগেও আমাদের বাড়িতে ১৩৭২ সালের বাঁধান মাসিক বসুমতী আছে। আমি ও আমার বাড়ির লোকেরা আনন্দের সঙ্গে এই পত্রিকা পড়ে থাকি ও থাকেন। এই পত্রিকাটি আমার বিশেষ করে ভীষণ ভাল লাগে, কেন না এর মধ্যে সকলের রুচি-অনুযায়ী নানা বিষয়ে রচনা, প্রবন্ধ, কবিতা থাকে। তা ছাড়া আপনার গল্প ও উপন্যাস বাছাই-এর গুণ চমৎকার এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সুবোধবাবুর 'মৌনমন' পড়ে আনন্দ লাভ করেছি; তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আর একটি লেখা গত কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও প্রকাশিত হচ্ছে ও হবে, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর 'নাগফণি', তাঁর এই লেখাটি যেন প্রাণ পেয়েছে, বাস্তব অভিজ্ঞতার এ এক অপূর্ব চিত্র। প্রভাতবাবুকে আমার অশেষ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। 'শাশ্বতী' লেখাটিও ভাল লেগেছে। ঐ লেখিকার লেখা আবার পড়তে পাব আশা করি। এছাড়া আরও কতকগুলি বিভাগ আছে, যা আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকারে পড়ি। যেমন 'যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি'; 'পত্রগুচ্ছ', 'চারজন', ছোটদের আসরের লেখিকা সুলতা করের লেখাগুলি। নিঃসন্দেহে এ পত্রিকা সকলেরই। বৎসরে বৎসরে এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

লেখা শেষ করবার আগে আমি আপনার একটি মতামত জানতে ইচ্ছা করি; আচ্ছা, আমি যদি কোনো বিষয়ে (বিশেষ করে সিনেমা) সমালোচনা পাঠাই আপনার পত্রিকায় তা ছাপাবার ব্যবস্থা আছে কি? যদি থাকে, তার নিয়মাবলী যথাসম্ভব পাইতে ইচ্ছা করি। এছাড়াও আপনারা যদি একটা 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ খোলেন তা'হলে বেশ হয়। পাঠক-পাঠিকাই প্রশ্ন করবেন, আবার পাঠক-পাঠিকাকেই উত্তর দিবার জন্য সুবিধা দেওয়া হইবে এবং শেষে আপনি এর সমাধান করে দেবেন। অবশ্য এই শেষোক্তটি আমার প্রস্তাব, এর সুবিধা ও অসুবিধা জানবার জন্য পরের পত্রিকার অপেক্ষায় রইলাম।

এখানে আমার লেখনী বন্ধ করছি। আপনাকে আমার অশেষ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি—গোপেশ্বর মজুমদার। পোঃ-আঃ—বারুইপুর। সুবুদ্ধিপুর, ২৪-পরগণা।

মহাশয়,

মাঘ মাসের মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদপটে দেখলাম—ভাস্কর শ্রীরমেশচন্দ্র পাল মহাশয় কর্তৃক নির্মিত মর্মরমূর্তির আলোক চিত্রের ছবি। মূর্তিখানি সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে স্থাপিত হয়েছে; আগামী ২৭শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক উহা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হবে। উক্ত গ্রন্থাগারের নাম প্রচ্ছদপত্রের পরিচিতির সহিত উল্লেখ থাকিলে আমরা আনন্দিত হইতাম। আমাদের নিকটও উহার একটি ব্লক আছে। আমন্ত্রণপত্রে ছাপাটি হবে। উহার একটি কপি পাঠাইলাম।

আমরা আপনার বসুমতীর খুব পুরাতন গ্রাহক। গ্রাহক সংখ্যা—৪৬০২৯। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ভবদীয় শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, যুগ্ম-সম্পাদক, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ী, বীরভূম।

মহাশয়, আমি মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত গ্রাহক। নিম্নলিখিত বসুমতীগুলি আমি প্রতিসংখ্যা ৭৫ পয়সা মূল্যে বিক্রয় করিতে চাই। সংবাদটি আপনার মাসিক বসুমতীতে দয়া করিয়া বিজ্ঞাপিত করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

১৩৬৭ সনের কার্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা
১৩৬৮ „ বৈশাখ „ চৈত্র „
১৩৬৯ „ বৈশাখ „ চৈত্র „
১৩৭০ „ বৈশাখ „ চৈত্র „ (ভাদ্র সংখ্যা বাদে)

কোন বিশেষ সংখ্যা এককভাবে বিক্রয় হইবে না। তবে কোন বিশেষ বৎসরের বাৎসরিক সংখ্যাগুলি একসঙ্গে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন। ইতি—শ্রীহিমাংশুবিমল বিশ্বাস, রবীন্দ্রনগর (দাস ভিলা), ২১, শ্যামনগর রোড, দক্ষিণ দমদম, কলিকাতা-২৮।

মহাশয়, ধন্যবাদের সঙ্গে আপনাদের মাঘ মাসের বসুমতীটি গ্রহণ করলাম। আমি বসুমতী নিয়মিত নিই। এর পরের বার

আর আমাকে বই পাঠাবেন না। বসুমতী আমার প্রিয় বই। আমার মনে হয় সকল পত্রিকার থেকে বসুমতীই শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। ইতি—শ্রীমতী ডলি ঘোষাল, ৪১ নং, কুমীরজলা রোড, শ্রীরামপুর।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রী ডি কে হোম, ১১, মন্দির লেন, নিউ দিল্লী-১ * * * অপর্ণা ভাণ্ডার, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী * * * শ্রী ডি চক্রবর্তী, সেণ্ট্রাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিসন ইণ্ডিয়ান এড মিশন, ডাক—ইণ্ডিয়ান এমব্যাসী, কাঠমাণ্ডু, নেপাল * * * শ্রীমতী নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধারক—শ্রী জে এল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাকীরাম সিং রোড, মণিপুর, রাজস্থান * * * মেজর জেনারেল শ্রী পি এন বর্ধন C/o. B F M C পুণা-১ * * * শ্রীমতা অনিলা সেন, অবধারক—Lt. Col. শ্রী জে সি সেন, ১৪৮ জেনারেল হসপিট্যাল C/o. 56 A. P. O. * * * K. K. Nuogi, 7417 Urach Wurttden Ostend Strabe 94, West Germany * * * শ্রীমতী পুষ্পমঞ্জরী পাত্র বারিপদা রোড; কেওঝাড়গড়, কেওঝাড়।

(1) Sending the amount of Rs. 15/- towards the annual subscription to the Monthly Basumati. Please send the official receipt for the amount at an early date. The Librarian, Secretariat of the Orissa Legislative Assembly. Bhubaneswar, Puri.

(2) I am remitting the yearly subscription of Rs. 15/-. Please send the magazine regularly from the current issue. S. Momin Rashid Debkundoo, Murshidabad.

(3) Herewith please send the yearly subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati. Kindly send the magazine every month. D. N. Chatterjee. A F Station. Kanpur-8.

(4) এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অধ্যক্ষ, সতীশচন্দ্র শিক্ষা বিদ্যালয়। শিক্ষা নিকেতন, কলানবগ্রাম, বর্ধমান।

(5) মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী দীপালী ঘোষ, ৮নং বড় খামবা লেন, নিউ দিল্লী-১।

(6) বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠাইলাম। প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী গীতা রায়, অবধারক—ডাক্তার বি এন রায়, ডাকঘর—গঙ্গারামপুর, জিলা—পশ্চিম দিনাজপুর।

(7) মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম; নিয়মিত ভাবে পত্রিকা পাঠাইবেন। প্রধাক শিক্ষক, ডি পি এম হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়। ডাকঘর—রাজনবগড়, জিলা—পুরুলিয়া।

(8) অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বার্ষিক চাঁদা শেষ হওয়ায় পুনরায় বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। পৌষ সংখ্যা হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। কুমারী অজিতা ভট্টাচার্য, অবধারক—এন সি ভট্টাচার্য, অশোক রাজপথ, পাটনা-৬।

(9) মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম, আপনি দয়া করিয়া প্রাপ্তি খবর দিবেন। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী চৌধুরী, হাউস অফ্ লেট পি বি চৌধুরী, ডাকঘর—জগতাই, জিলা—মুর্শিদবোদ।

(10) I send Rs. 15/- as yearly subscription to the Monthly Basumati. Kindly acknowledge receipt, Sm. Pusparani Dutt, C/o. R L Dutt, Asst. Director Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar, Gujrat.

(11) Remitted Rs. 15/- towards the yearly subscription of the magazine 'Masik Basumati'. Please send the magazine every month. Headmaster, Pandua Sasi Bhusan Saha High School. P.O. Pandua, Dist. Hooghly.

(12) পৌষ সংখ্যা হইতে বাৎসরিক চাঁদা ১৫·০০ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী সুধা নায়ারদিয়া, লেকচারার গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়, রাতলাম।

(13) বাৎসরিক চাঁদা ১৫·০০ পাঠাইলাম। নিয়মিত প্রতিমাসে পত্রিকা পাঠাইবেন। শ্রীমতী আরতি মিত্র। ৮।সি, একডালিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯।

(14) আমার পূর্বপ্রদত্ত চাঁদা নিঃশেষিত হওয়ায় পুনরায় বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ পাঠাইলাম। প্রতিমাসে পত্রিকা পাঠাইবেন। শ্রীমতী এম দাশগুপ্ত অবধারক—ডাক্তার এস কে দাশগুপ্ত, সিভিল হাসপাতাল, গাজিপুর, ইউ পি।

(15) I remit Rs. 15·00 being the annual subscription of year esteemed Basumati Monthly. Please send the magazine regularly. The General Secretary, S K G M, Shran-Kalyan Kendra, P.O. Kendra, S E Rly., Singhbhum.